সূচীপত্র

বৈশাখ হইতে চৈত্র, ১৩৩৮

(লেখক লেখিকার নামানুসারে)

৫ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৮ | ১ম সংখ্যা

নব-বর্ষে

অনেক আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদের মধ্য দিয়া প্রতি বৎসরই যেমন পুরাতন বর্ষ বিদায় হয় এবং অনেক উজ্জ্বল আশার ভিতর দিয়া নববর্ষের আগমনকে বরণ করা হয় এবারও পুরাতনকে তেমনি ভাবেই বিদায় দিয়া আমরা নূতন বছরকে বরণ করিয়া লইতেছি। নিখিল কালের প্রবাহে বর্ষ পরিক্রমণ একটা সামান্য বুদ্বুদের তুল্য হইলেও মানুষের স্বল্প স্থায়ী জীবনে এক একটা বর্ষ কম রেখাপাত করিয়া যায় না। বিশেষতঃ এই সময়ে—যখন যুগ পরিবর্তনকারী রাষ্ট্রীয় উদ্বেলতা জাতিকে প্রতিনিয়ত আঘাতে সচেতন রাখিতেছে, যখন বিশ্বগ্রাসী প্রবল ক্ষুধার তরঙ্গে ভারত হাবুডুবু খাইতেছে, যখন তাহার স্বপ্ন-বিলাস সব ভাঙ্গিয়া আসিতেছে !

এমন সময়ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা বাংলার নর-নারীকে আমাদেরই প্রাণের কথা, হর্ষ-বিষাদ, আশা-নিরাশার কথা জানাইতে যাইতেছি। প্রতিদিন দেশের শিক্ষিত লেখক-লেখিকাদের মনে যে চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছে—তাহারই প্রকাশ আমরা করিতেছি। ইহার সঙ্গে দেশের অন্তরাত্মার যোগ কতখানি তাহা পাঠক-পাঠিকারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাংলার মত নিরক্ষর ও স্বদেশী ব্যবসায় শূন্য দেশে মাসিক সাহিত্য প্রচার করিয়া দু'একজন ভাগ্যবান কিঞ্চিৎ লাভবান' হইলেও অনেকেই যে বিপুল ক্ষতি সহ্য করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষতির মধ্য দিয়াই বাংলার সাহিত্য-জীবনের স্পন্দন শোনা যাইতেছে—ইহাই পরম লাভ।—এই ক্ষতির রাজ্যেও পুষ্পপাত্রের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ আমাদিগকে নিরাশার মধ্যেও যথেষ্ট আশা দিতেছে।—

আজিকার নববর্ষে পুষ্পপাত্রের জনকস্বরূপ, প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্রকে মনে পড়িতেছে। প্রিয়তমা কন্যা পুষ্পের স্মৃতি জীবন্ত করিতে তিনি তাঁহার আজীবনের সাহিত্য-সাধনাকেও মূর্ত্ত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন এই পুষ্পপাত্রের মধ্যেই—আজ কন্যা ও জনক দু'জনারই স্মৃতির অমর নিদর্শন হইয়াছে এই পুষ্পপাত্র।—

যে সব ক্ষমতাশালী লেখক-লেখিকার সাহায্য আমরা প্রতি মাসে নূতন'ভাব সম্পদের অর্ঘে পাইতেছি—আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর যাহারা পুষ্পপাত্রকে জীবন্ত রাখিবার জন্য গ্রাহক-গ্রাহিকা হইয়া বা বিজ্ঞাপন দিয়া ইহাকে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদেরও শত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

—আশার মধ্য দিয়াই আমরা নববর্ষকে বরণ করিয়া লইতেছি, আমাদের সে আশা সফল এবং পুষ্পপাত্রকে উত্তরোত্তর আরো সমৃদ্ধ করিতে পারেন—লেখক-লেখিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকারাই। আমরা সব সময়ই তাঁহাদের মনস্তুষ্টির সাধ্যমত চেষ্টা করিব—বিনিময়ে তাঁহাদের সকলের সহানুভূতি পাইলেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

মর্ম্মর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কবিতা

মর্ম্মর! মর্ম্মর! মনোহর মর্ম্মর
মর্ম্মের নর্ম্মের শোনো স্বর থর্ থর্!
কাঁপে মন, কাঁপে বন, পুলকের শিহরণ,
কান ভ'রে প্রাণ ভ'রে করে সুর বিহরণ!
ভরে সুখ, ভরে দুখ, ভরে মোর যৌবন,
চারি ভিত্ ভ'রে প্রীত্ গায় গীত যৌবন!
মনোহর মর্ম্মর—শোনো স্বর থর্ থর্!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! তপতীর মর্ম্মর!
চুম্বনে রুম্ ঝুম্ কপোতীর অন্তর!
কুঞ্জ কি ঘন-শ্যাম, মুঞ্জরী অভিরাম!
দোল্ সখী, হিন্দোলে তান ধরে অবিরাম!
ঠোঁটে ঠোঁট্, বুকে বুক, জ্যোৎস্নার চন্দন!
নন্দিত প্রাণ-মন ছন্দিত নন্দন!
তপতীর মর্ম্মর—ছায়াময় অন্তর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! সুন্দর মর্ম্মর!
তটিনীর তট ঘেঁসে তোল্ কবি তোর ঘর!
কল-তান নদী গায়, তার সাথে মন ছায়—
পল্লব-মূর্চ্ছনা—জাগ্রতে, তন্দ্রায়!
তাই শোনে চন্দ্রমা, সূর্য্য ও শুকতারা,
তাই শোনে নিশীথের আঁখিজল-মুক্তারা!
সুন্দর মর্ম্মর—তোল্ হেথা তোর ঘর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! উন্মাদ মর্ম্মর!
সেই তালে বাদলের কালো মেঘ ঝর্ঝর!
মাঠে আজ কল্-কল্, বন্যার দলবল,
কুল্‌কুচো করে ত্যাখ্ মেঘ্‌লার দম্‌কল্!
দোলে গাছ ঝঞ্ঝায়, গায় মধু মল্লার,
অম্বরে ডম্বর, হুল্লোড় হল্লার!
সেই তালে মর্ম্মর, বর্ষার ঝর্ঝর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! নর্ত্তিত মর্ম্মর!
মঞ্জুস বঞ্জুল আনে প্রেম-মন্তর!
ফাল্গুনে বন্-বীথি, ভ'রে আজ কোন্ গীতি
চুল্‌বুলে ফুল্-বাঁশী, রাঙা সুর শোন্ নিতি!
চোখে মৌ-মঞ্জুষা—প্রাণ-চুরি মঞ্জুর!
কোকিলার মুখখানি পায় চুমু চঞ্চুর!
—আর নাচে মর্ম্মর,
অশোকের মন্তর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! অস্ফুট মর্ম্মর!
আসে শীত বর্ব্বর, কম্পিত জর্জ্জর!
কুয়াশার জাল-বোনা, মিছে আজ তাল-গোনা,
তার-ছেঁড়া শ্যাম-বীণা, মরা-চাঁদ আল্‌পনা!
হিমিকার বুক ভ'রে কাঁদে তাই বুল্‌বুলি,
পাতা সব ঝরা আর উড়ে যায় ফুল্-ধূলি!
ম'রে যায় মর্ম্মর—
হিম-শীতে জর্জ্জর!

বাণী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত (গল্প)

কন্যা বাদলী বা অপর্ণা আই এ পাশ করিতেই মিষ্টার সেনের মনে হইল, তিনি পুরাপুরি 'ফরেন্' আবহাওয়ায় পৌঁছিয়া গেছেন। পূর্ব্ব হইতেই ঐ দিক্‌কার, হাওয়ার মাঝেই না হোক্, সীমানায় তিনি বিচরণ করিতেন—পঠদ্দশায় একবার তাঁর বিলাত যাত্রার প্রস্তাব হইয়াছিল; তিনি উপরকার ত্বক্ আর ভিতরকার জিহ্বা দুরস্ত করিতে সুরু করিয়াছিলেন...তাহাদের ভারতীয় গন্ধশূন্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা এই সমস্যা মনে যখন প্রবল তখন দৈবাৎ যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ্ হইয়া যায়—

কিন্তু সূত্র পাইয়া যে 'ফরেন্' ভাবটি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল সেটা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না।

সেন দম্পতির এ আক্ষেপ যাইবার নয়—বিলাত যাওয়া ঘটে নাই; অতিরিক্ত আক্ষেপ এই যে, সন্তান দুটিই কন্যা রূপে আসিয়াছে; কিন্তু এটি গোপনীয়; শয়নকক্ষে নিভৃত আলাপে গৃহিণীর মুখে এই আক্ষেপটা শোনা যায়—সেন নির্লিপ্ত, অন্ততঃ তাই মনে হয়।

ওঁরা বড় কন্যা সুপর্ণার বিবাহ দিয়াছেন বড় জমিদারের ঘরে; কিন্তু যতদূর অনুমান হয়, জমিদারের ঘরে সুপর্ণা সম্পূর্ণ সুখী নহে। জমিদারের গৃহে তাহাকে জমিদার গৃহিণীর মত থাকিতে হয়, অর্থাৎ "তুল্‌তামলি" ঝামেলার মাঝে তাহাকে শারীরিক ও মানসিক শ্রম করিতে হয়—মেম্‌সাহেবের মত নহে...তাকে যারা মা বলিয়া ডাকে তাহাদের দিকে সে আগে ভ্রূভঙ্গী করিয়া চাহিয়া থাকিত - এখন ক্রমশঃ সহিয়া আসিয়াছে।

কনিষ্ঠা কন্যা অপর্ণার বিবাহ দিলেই হয়—পাণিপ্রার্থী একাধিক সুযোগ্য ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ হাজিরা দিতেছে; কিন্তু পাত্র নির্ব্বাচন লইয়া সেন দম্পতির মতভেদ ঘটিয়াছে।

* * * *

হরিবিলাস সেনের গৃহিণী চম্পকবরণীর প্রতি অসাধারণ অনুরাগ; অনুরাগের একটা ফল ইহাই দাঁড়াইয়াছিল যে, স্ত্রীর বাক্যালাপে কর্ণপাত করিতে না চাহিলেও কথাগুলি ব্যর্থ হয় না—তার কর্ণে প্রবেশ করে—

এখনও করিতেছিল—

ঈষৎ উত্তাপের সহিত ঈষৎ শ্লেষ মিশাইয়া চম্পকবরণী বলিতেছিলেন,—সুপি সুখী হয় নাই তা' বোধ হয় এতদিনে তোমার কানে গেছে। খেটে' খেটে' তার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে এ আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সে ত' জমিদার নয়—চতুর্ভুজ এক দেবতা; চার হাতে করে' মেয়েটিকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।—বলিয়া চম্পকবরণী একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া গেলেন...

জীবন্ত মানুষকে পুতুল নাচের পুতুল করিয়া তুলিলে যে শোচনীয় কাণ্ড ঘটিতে থাকে, একটি নিঃশ্বাসে সে কষ্টের কিছুই প্রকাশ হয় না।

ঠোঁটের ভিতর হইতে চুরুটটা টানিয়া লইয়া হরিবিলাস বলিলেন,—"ভাল কথা!...কাল দেখা করতে গিয়েছিলাম প্রবোধের সঙ্গে—দেখা হল; সুপিকেও দেখে এলাম, রং আরো খুলেছে মনে হ'ল, শরীরও বেশ—

চম্পকবরণী চোখ পাকাইয়া বলিলেন,—ঠিক্' ঠিক... আমার কথা উলটে' দেয়া চাই-ই ত, তোমার! একেবারে স্বচক্ষে দেখে' এসে দাঁড়িয়েছ হলপ্ করে...

হরিবিলাস বলিলেন,—অস্বাস্থ্যকর মেদবৃদ্ধি; তা ছাড়া আর কিছু নয়; আমি তা' দেখেই বুঝেছি—বদ্ধ বাতাসে বাসের দোষ।

কিন্তু চম্পকবরণী শান্ত হইলেন না; বলিলেন,—যে তোমাকে জানে না তার কাছে তোমার এই চালাকি চল্‌বে...

—আমি বল্‌ছিলাম...

চম্পকবরণী স্বামীর মুখের দিকে অনড় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—তুমি কি বল্‌ছিলে আর তার অর্থ কি তা' আমি তখনই বুঝ্‌তে পেরেছি...তুমি অবাক্ হবার ভাণ করলেই আমি তা' ভুলে যাব না।

একটা আপোষের চেষ্টায় হরিবিলাস বলিলেন,—অপর্ণার সম্বন্ধে তোমার কি ইচ্ছেটা ?

—খুকির কথা ভেবে তোমার অস্বস্তি হয় কি না আমায় পরিষ্কার বলো দেখি আজ !

সেন বলিলেন,—হয়।

—তবে ?

বুঝিতে না পারিয়া সেন বলিলেন,—তবে কি ;

—তুমি প্রতুলকে আসকারা কেন দিচ্ছ তা' হলে ? উড়নচণ্ডীর একশেষ—চালচুলো নেই—সম্বলের মধ্যে এক মাতুল শকুনি আর কলকাতার কলেজের বিদ্যে ! ছিঃ !—বলিয়া চম্পকবরণী ঘৃণাভরে ওষ্ঠদ্বয় কিয়ৎক্ষণ বিকৃত করিয়া রাখিলেন।

হরিবিলাস সেই বিকৃতির দিকে চাহিয়া খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাশিয়া লইলেন...নীরবতার মাঝে দু'জনের একজন অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌছিয়া গেলে সঙ্গসুখে কেবল ব্যাঘাত ঘটে এমন নয়—কেমন যেন ভয় ভয় করে। বলা বাহুল্য হরিবিলাস স্ত্রীকে স্বাভাবিক অবস্থাতেই ভয় করিয়া চলেন।

চম্পকবরণীর ঝোঁক্ পড়িয়া গেল—কথাটা তিনি শেষ করিবেনই ; বলিলেন,—তুমি যাকে বলো চট্‌পটে, আমি তাকে বলি ছট্‌ফটে...তুমি যাকে বলো চার চৌকশ, আমি তাকে বলি ডেঁপো' ।...কিসের সঙ্গে কিসে !

হরিবিলাস বলিলেন,—আমি ত' তা কিছু বলিনি...তবে বুঝ্‌বার ভুলে—

—তুমি বলেছ, সত্য গোপনের অপরাধ কত বড় সে শিক্ষা তুমি পাওনি !...অতুল রায় পাচ বচ্ছর বিলেতে বাস করে এসেছে—তোমার ব্যবহারে তুমি তা অস্বীকার করছ, তার বাপের টাকায় বাংলাদেশের আদ্দেক কেনা যায়, কিন্তু মুক্তো তুমি চেন না।

হরিবিলাস বলিলেন—আমি ত' কারু স্বপক্ষে কি বিপক্ষে কিছুমাত্র জিদ্ প্রকাশ করিনি ! তুমি ভুল বল্‌ছ।

—ফলে ঘট্‌ছে কি ?

কিছুই না।

—উল্টো ঘট্‌ছে। আমি ভুল বলিনি···তোমার নিজের প্রকৃতি কদর্য্য, রুচি কদর্য্য—তাই বাঁদরটাকে তোমার ভাল লাগে।

শুনিয়া হরিবিলাসের মনে হইল, কোথাও অপরাধ ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই—নতুবা এই কথাগুলি কন্যার সম্মুখে স্ত্রীর মুখ দিয়া নিঃসঙ্কোচে বাহির হইত না ; সবিনয়ে বলিলেন—আমি তবে এখন থেকে নির্লিপ্ত রইলাম, তোমরা মা ও মেয়ে যা করবে তাতেই আমার সায় দেয়া রইল ; আমি ছুটি নিলাম। অপি কি বলে ?

সেলাই লইয়া অপর্ণা সেই টেবিলের ধারেই ছিল—পিতামাতার কথোপকথন তার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল কিনা সন্দেহ...দু' একবার মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কখন বাপের মুখের দিকে কখন মায়ের মুখের দিকে চাহিতেছিল—কিন্তু সেটা দৈবাৎ, তার অর্থ নাই।

বাপের মুখে তারই সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনিয়াও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। চম্পকবরণী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সীবনমগ্ন চিত্তে কোনো রেখাপাত হইয়াছে কিনা মুখ দেখিয়া তাহা বুঝা গেল না ; নিষ্কাম মুখমণ্ডলে একটী অখণ্ড একাগ্রতা ছাড়া আলোকের প্রতিবিম্ব নাই।

সবাই যেন ওজনের পাল্লায় উঠিয়া দুলিতেছেন কোন্ দিকে ভারি হইবে ঠিক নাই। এমন সময় বৈঠকখানা ঘরের দুয়ারের উপর করাঘাতের শব্দ হইল...

হরিবিলাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন—এমনভাবে যেন কঠিন বন্ধন মুক্ত হইয়া গেছে—

চম্পকবরণী বলিলেন,—এসেছেন বাবু...বাড়ীর মালিক...দুয়োরে জুতো ঘষছে বুঝি ! পথের কাদায় ঘর দুয়োর আমার ভরে দিলে ! বলিয়া দুস্তর ঘৃণায় তাঁর বাক্য বন্ধ হইয়া রহিল...বলিলেন—এমন ফচ্‌কে দেখেছ কখন !

স্ত্রীর এই বিষদৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া হরিবিলাস কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মায়ের আজিকার মুখের পাশে তার মুখখানা অতিশয় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

* * *

হরিবিলাস দরজা খুলিয়া দিয়া প্রতুলকে একেবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন।

প্রতুল চ্যাটার্জ্জী ছাব্বিশ বছরের সুশ্রী যুবক—আধুনিকতার কোনো লক্ষণের অভাব তাহাতে নাই।

চেয়ারে সে বসিল না ; চেয়ারের পিটের উপর দু'হাত তুলিয়া দিয়া হাসিমুখে আর কলস্বরে একটা সংবাদ সে

রাষ্ট্র করিয়া দিল, বলিল—এক নতুন জিনিষ দেখা গেল আজ—শুনে অবাক্ হয়ে যাবেন। বলিয়া সে একে একে সবারই মুখের দিকে চাহিল—যেন এখনই তাঁদের অবাক্ হইয়া যাইবার কথা।

চম্পকবরণী বলিলেন—বটে!

হরিবিলাস ওষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিয়া একটু হাসির ভঙ্গী করিলেন—

প্রতুল বলিতে লাগিল—মেয়েমানুষ ভাগ্য গণনার পেশা নেয় জান্‌তাম না—ধাপ্পাবাজী পুরুষেরই একচেটে ছিল—

চম্পকবরণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তা ঠিক্।

প্রতুল বলিল—ভবিষ্যৎ জান্‌বার এত ব্যাকুলতা মানুষের কেন তা জানিনে…

চম্পকবরণী বলিলেন—অনেক কথাই শেষ পর্য্যন্ত জানবার থাকে—কারু কারু জানাই হয় না।

হরিবিলাস বলিলেন—তা ঠিক্।…তারপর?

—ধর্ম্মতলা দিয়ে আসছি…এক জায়গায় দেখি, বেজায় মানুষের ভিড়। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে? সে বল্‌লে, ভেতরে ভৈরবী রয়েছেন।…কি ভেবে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম জানিনে—

চম্পকবরণী বলিলেন,—কারু কারু জীবনের উদ্দেশ্য থাকে না, কাজেরও কারণ কি কৈফিয়ৎ থাকে না।

প্রতুল বলিল,—তা ঠিক্।…তারপর শুনুন!…আমি শুনে অবধি সেই থেকে মনে মনে খালি হাস্‌ছি।

—কি বল্‌লে বলো বাপু। বলিয়া অতিশয় উত্তাপ বশতঃ চম্পকবরণী নড়িয়া বসিলেন।

হরিবিলাস বলিলেন—বস', বসে বলো। অপর্ণা কৌতূহলী হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল…

কিন্তু চ্যাটার্জ্জী বসিল না, দাঁড়াইয়া সে বলিতে লাগিল, টাকা দুটো জলে দিয়ে এসেছি।

চম্পকবরণী বলিলেন—তা আর বেশী কি! কারু কারু তার ঢের বেশী জলে পড়েছে!

অপর্ণা বলিল—তা ঠিক্। তারপর কি হ'ল বলুন।

আমার ডান হাতের রেখাগুলো দেখে দেখে সে বলতে লাগল, তুমি একটা অপদার্থ, পাষণ্ড তোমার আচরণে তোমার মা কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ করে ফেলবে, কুসঙ্গে মিশে তুমি জাল জোচ্চুরী নেশা টেশা করবে; জুয়া খেলতে টাকা চুরি করবে—তার ফলে পাঁচটি বৎসর তোমাকে শ্রীঘর বাস করতে হবে। আমি তাকে বললাম, ফাঁসি হবে না শুনে আমি দুঃখিত হয়েছি। ভৈরবী বল্‌লে, দুঃখিত কেবল তুমিই হবে এমন নয়, আরও অনেকে হবে! বলিয়া প্রতুল চ্যাটার্জ্জি কৌতুকভরে ঠিক্‌রাইয়া ঠিক্‌রাইয়া হাসিতে লাগিল…

চম্পকবরণী খুশী হইলেন—

বলিলেন, আমি ত এতে অত হাসির কথা কিছু দেখছি নে!

—দেখছেন না!

চম্পকরাণী অকাট্য কণ্ঠে বলিলেন,—না।

শুনিয়া প্রতুলের কৌতুকহাস্য নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতে লাগিল…

হরিবিলাস বলিলেন,—আমি হলে ব্যাপারটা গোপন রাখতাম, প্রতুল…তুমিও আর কাউকে বলো না।

শুনিয়া প্রতুল বড় দমিয়া গেল…অপ্রত্যাশিত একটি ধাক্কা যেন আসিয়াছে। শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—আপনারা নিশ্চয়ই এ-সব বিশ্বেস করেন না!

চম্পকরাণী বলিলেন,—করি। কখন কখন ওদের কথা সত্যিসত্যিই ফলে যায়—দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

হরিবিলাস বলিলেন,—অবাক্ হয়ে কেবল যেতে হয় নয়, বহুদিন পর্য্যন্ত অবাক হয়ে থাকতে হয়—শেষদিন পর্য্যন্ত। আমি একবার হাত দেখিয়েছিলাম যখন কলেজে পড়ি। দৈবজ্ঞ বলেছিল, তোমার যিনি স্ত্রী হবেন তাঁর মত সুন্দরী আর সুশীলা মেয়ে…

প্রতুল হঠাৎ পরমোৎসাহে বলিয়া উঠিল—তা হলেই দেখুন…তা তা তা—

বলিতে বলিতে তেমনি হঠাৎ গলা কাঠ হইয়া প্রতুল থামিয়া হা করিয়া রহিল।

চম্পকবরণীর নাসিকাদ্বয় স্ফুরিত হইয়া ওঠা নামা করিতে লাগিল; বলিলেন—কি বলতে যাচ্ছিলে?

—বলতে যাচ্ছিলাম যে, দেখুন তা হলে ওদের কথা কখন কখন সত্যি না হয়ে যায় না! বলিল বটে, কিন্তু যে অনিষ্টের তুলনা নাই তাহার সংশোধন হইয়াছে বলিয়া ঘুণাক্ষরেও মনে হইল না—তার মনের হাঁপানিও কমিল

না ..চাহিয়া দেখিল, অপর্ণা গম্ভীর, মিঃ সেন ততোধিক গম্ভীর এবং মিসেস্ সেন ততোধিক গম্ভীর।

প্রতুল চেয়ারের উপরে হাত বুলাইতে লাগিল...

হরিবিলাস মৃত্তিকার দিক হইতে চোখ তুলিয়া প্রতুলের দিকে চাহিয়া মৃদু একটু হাস্য করিলেন...

হাসিটুকু ভূমিকা—

পরক্ষণেই তিনি একটি গল্প করিলেন এক ব্যক্তি অবগত হইয়াছিল যে, সে কোনও অজ্ঞাত আত্মীয়ের ধনের অধিকারী হইবে। শুনিয়া আনন্দে সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিল। এরূপ সাতবৎসর বেকার অবস্থায় কাটাইবার পর তার বৃন্দাবনবাসিনী এক পিসি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া নগদ ছাপ্পান্নটী টাকা তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রতুল বলিল,—আমার মনে হয়, ভৈরবী আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল মনে মনে আমি তাকে বিশ্বাস করিনে; মনে আমার বজ্জাতি আছে তাই আক্রোশ করে শুনিয়ে দিয়েছে যা তা। আপনার কি বিশ্বাস? বলিয়া সে অপর্ণার দিকে চাহিল।

কিন্তু অপর্ণাও তার বিরুদ্ধে গেছে, বলিল,—নিশ্চয় জানিনে যখন, তখন একেবারেই অবিশ্বাস করি কেমন করে। চুরি ত আমরাই করি, জেলেও যাই। বলিয়া সে হাতের সূঁচটির দিকে চাহিয়া রহিল।

চম্পকবরণী বলিলেন,—একশোবার।

অপর্ণার মুখের কথা শুনিয়া প্রতুলের মনোবেদনার অন্ত রহিল না; আবেগভরে বলিল,—আপনাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন সত্যিই ওই সব করে বেড়াই—এতদিনে ভৈরবীর কথায় ধরা পড়ে গেছি। আপনি একবার চলুন না; কি বলে দেখি।

যেন অকস্মাৎ জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া গেছে—

এমনি দীপ্ত আর ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে চম্পকবরণী কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন; বলিলেন,—নিশ্চয় যাবে। সত্যি কথা শুনতে ভয় করবে আমার মেয়ে তেমন নয়। বলিয়া কন্যার গুণে যেন প্রথম মুগ্ধ হইয়া তিনি স্বামীর মুখে নিজের পুলকের তরঙ্গাভিঘাত ঘটে কি না তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন...

প্রতুল বলিল,—সত্যি কথা যতই কদর্য্য হোক, আমার কথা বলছি, আমি তা বিশ্বাস করবো না।

চম্পকবরণী বলিলেন,—তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, আর সে পরের কথা। বলিয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিলেন।

নিঃশব্দে আর নিরানন্দ সভার ভিতর হইতে মনমরা প্রতুল চ্যাটার্জ্জি সকাল সকাল আর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

* * * *

পরদিন প্রত্যূষে হরিবিলাস এবং কিছু বেলা হইলে অপর্ণা বাহির হইয়া গেলে চম্পকবরণী অতীতের স্মৃতির মাঝে মগ্ন হইয়া গেলেন...অপর্ণার শৈশব, কৈশোর এবং সম্প্রতি সমাগত যৌবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিরিবিলি বসিয়া তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। করিতে করিতে সুপর্ণার মইয়ের উপর হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া পা মচকানটা অপর্ণায় আরোপ করিয়া বসিলেন—কিন্তু অল্পসময়ের জন্য, পরক্ষণেই চমকিয়া তিনি সতর্ক হইয়া গেলেন...

তারপর যে কার্য্যটি তিনি করিলেন তাহা আরো গোপনীয়। অপর্ণার শোবার ঘরে আসিয়া তার ড্রয়ার খুলিয়া তার সেদিনকার তোলা ফটোখানা লইয়া, একখানা গাড়ী ডাকাইয়া তিনি ধর্ম্মতলার দিকে রওনা হইয়া গেলেন।

* * * *

ধর্ম্মতলায় যাইয়া তিনি কাহার সঙ্গে কি কথা কহিলেন তাহা কেহ জানিতে পারিল না, কিন্তু দশটার সময় যখন তিনি টেবিলে নামিলেন, তখন মনে হইল, পূর্ব্বদিনের বন্দোবস্ত তিনি ভুলিয়া গেছেন...

কিন্তু অপর্ণা ভোলে নাই, সে মনে করাইয়া দিয়া বলিল—মা, আমি কার সঙ্গে যাব?

—কোথায়?

—ধর্ম্মতলায়। ভুলে গেছ নাকি!

চম্পকবরণী জানিতেন, বাধা দিলে মেয়ের জেদ বাড়ে; মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—আমি ত যেতে বারণ করি।

অপর্ণা বলিল,—কিন্তু কালকে ত তোমার কথায় মনে হয়েছিল অন্যরকম!

—ভেবে দেখলাম, ওসব কথায় কান না দেয়াই ভাল, অনর্থক সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা।

হরিবিলাস বলিলেন,—তা ছাড়া আর কিছু নয়।

—কিন্তু অমি যাব।

—তবে যাও। চম্পকবরণী তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন; এবং স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া কন্যাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেন—নাম ধাম খবরদার বলিসনে, যতই জেরা করুক।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা।

রামজিওনের জিম্বায় বাড়ীর গাড়ী অপর্ণাকে লইয়া অল্পক্ষণ পরেই ধর্ম্মতলার দিকে ছুটিল।

* * * *

অপর্ণা দেখিল, আধা অন্ধকার ঘর; বিপুলকায়া ভৈরবী তার অনুচরবর্গ লইয়া কম্বলাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে—পার্শ্বেই সিন্দুর চর্চ্চিত বিশাল ত্রিশূল...তার সম্মুখে জলচৌকি; জলচৌকির দক্ষিণ দিকে ছোট একখানি কম্বলের আসন... কিছুদূরে দর্শকগণের অথবা দর্শন প্রার্থী অথবা দর্শনীদাতাগণের বসিবার জন্য বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে; কিন্তু সে আসন এখন শূন্য...

ভারতীয় তপঃ ক্লেশের কোনো লক্ষণই ভৈরবীর দেহে বিদ্যমান নাই...গৈরিক বসন, চুলের রং কটা. চুলগুলি আগোছাল, যেন কেউ চুলগুলি তুলিয়া ধরিয়া দুলাইয়া দিয়া গেছে...

মানুষকে ভয় দেখাইবার কি প্রলুব্ধ করিবার কোনো আয়োজনই সেখানে নাই—অত্যন্ত সাদাসিদে...মনে হয় না যে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভৈরবী সহচরীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল—

অপর্ণা প্রবেশ করিতেই ভৈরবী একবার তার দিকে চাহিয়া মুখের কথাটা আগে শেষ করিল, তারপর বলিল,—এস, মা, এস, বস'। বলিয়া জলচৌকির পাশেই যে আসন খানা ছিল তাহার দিকে চাহিল...

অপর্ণার মনে হইল, ভৈরবীর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, কিন্তু সে বসিল না; দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি অদৃষ্টজ্ঞ?

ভৈরবী হাসিয়া বলিল,—লোকে বলে তাই।

—লোকে যা-ই বলুক আপনি কি যথার্থ ই তাই?

—হাঁ।...বস'।

ভৈরবীর স্বর অতি স্পষ্ট, এবং অপর্ণার মনে হইল, গম্ভীর।

অপর্ণাকে কে যেন টানিয়া লইয়া যথাস্থানে বাসাইয়া দিল, এবং তার বাঁ হাতখানা টানিয়া লইয়া জলচৌকির উপর চিৎ করিয়া পাতিয়া দিল...

ভৈরবী অপর্ণার প্রসারিত করতলের উপর আসমানী রঙের একটা তরল পদার্থ খানিকটা ঢালিয়া দিয়া বলিল,—বাম হস্তে বিগত জীবন, দক্ষিণ হস্ত ভবিষ্যৎ...বলিতে বলিতে সে হাতের উপর আরো একটু ঝুঁকিয়া আসিল্..একটানা অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল—

তারপর প্রাঞ্জল সুস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল—ছোট্ট মেয়েটী, একমাথা ঝাঁকড়া চুল···চার বছরের শিশু... জরবিকারে শয্যাগত...আরোগ্য লাভ বায়ান্ন দিনে... বেড়ালের আঁচড়—তু'হাতে ঝরুঝরু রক্তপাত।...ইস্কুলে যাতায়াত—সখীসঙ্গে গলাগলি। সমুদ্রতীর—ঢেউয়ের আঘাতে পতন—মানুষের চাঞ্চল্য, জননীর ক্রন্দন। গাড়ীতে মোটরে সংঘর্ষ; পিতা সামান্য আহত; পুত্রী অজ্ঞান।... স্কুল হইতে কলেজ—পদকলাভ...নতমুখী সুন্দরী ছাত্রীর দিকে চাহিয়া বিরাট সভা করতালি দিতেছে...

ঘুমপাড়ানির গানের মত বহমান সুরে অপর্ণার অলস বোধ হইতে লাগিল...

ভৈরবী বলিতে লাগিল—তারপর দেখছি স্বয়ম্বরের আয়োজন। বলিয়া ভৈরবী অপর্ণার বাম হস্ত ত্যাগ করিয়া বলিল—এখন ভবিষ্যৎ। দক্ষিণহস্ত। বলিয়া সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল—কিন্তু অপর্ণার মুখের দিকে চাহিল না।

অপর্ণা প্রথমে বিস্মিত পরে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল; দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে সে ভৈরবীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—কিন্তু সেখানে কোনো ভাবেরই বিকাশ নাই—না দ্বন্দ্ব, না উদ্বেগ, না প্রয়াস, না হর্ষ। জ্ঞাতসারে ক্রমাগত মিথ্যার বাহিনী সে অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে কিনা তাহা তাহার মুখমণ্ডলের রেখাপথগুলিকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র সহজ অথচ অসাধারণ অনুমানশক্তির উপর নির্ভর করিয়া যাহা সে বলিতেছে তাহা এই মুহূর্ত্তে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া যাইতে পারে—এদিকেও তার অসীম নিশ্চিন্ত নিঃস্পৃহা।

অপর্ণা তার ডান হাতখানা ধীরে ধীরে জলচৌকীর উপর তুলিয়া দিল, বলিল—যদি ভয়ঙ্কর কিছু হয় তবে বল্‌বেন না।···স্থানের আবহাওয়ার গুণেই তার কণ্ঠস্বর খুব মৃদু হইয়া ফুটিল।

ভৈরবী বলিল—সম্মুখে বিপদ থাকলে আমি সতর্ক করে দিতে পারি...কি তুমি গ্রহণ করবে, কি তুমি পরিহার করবে তারও ইঙ্গিত তুমি পেতে পারো।

বলিয়া ভৈরবী পুনরায় সেই গুঞ্জনস্বরে সুরু করিল,—সহস্রলোকে মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে...কৃপাপার্থী দুটি লোক অগ্রসর হয়ে আসছে—একজন গৌরবর্ণ, একজন শ্যামল, দুইজনেই একনিষ্ঠ পাণিপ্রার্থী; উভয়েই ধনী... গৌর ব্যক্তি নিজের শক্র—অকুণ্ঠিত ব্যয়ে নিঃস্ব—পরের দুঃখের কারণ...এদেরই একজন তোমার ভবিষ্যৎ পতি—

—কোন্‌টি?

—বুঝতে পারছিনে ঠিক।

অপর্ণা ব্যগ্র হইয়া বলিল,—ভালকরে দেখুন।

—দেখি। তিনজনে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে; একজন হাসিমুখে তাকিয়ে আছে যে দিকে সে দিকে সুবৃহৎ অট্টালিকা, ধনের সমারোহ; দ্বিতীয়টি—

বলিয়াই ভৈরবী যেন হঠাৎ দিশেহারা হইয়া গেল খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,—জাঙিয়া পরা, গলায় পদক, অধোবদন—তার সম্মুখে কারাগৃহ আর কিছু দেখছিনে, বোধহয় আমার দেখবার নয়। বলিয়া ভৈরবী যখন অপর্ণার হাত ছাড়িয়া দিল তখন অপর্ণার সেই হাতখানা কাঁপিতেছে।

ভৈরবী চোখের উপর হাত বুলাইয়া শ্রান্ত দেহে শিথিল হইয়া বসিয়া রহিল...

অপর্ণার মাথা ঘুরিতেছিল—

সে ভৈরবীর সম্মুখে দর্শনীর টাকা দুটি রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, এই অলৌকিক ঘটনার পর পৃথিবী যেন চেহারা বদলাইয়া একেবারে পর হইয়া গেছে—ঘরের কাছে তার সাড়া নাই; দূরে একান্তে দাঁড়াইয়া আছে।

* * * *

অপর্ণা যখন গাড়ীতে উঠিল তখন তাহার মনে হইতেছিল, বাবা আর মায়ের কাছে সব কথা বলিতে পারিলে বুক যেন খালি হয়; কিন্তু চল্‌তি গাড়ীতে বসিয়া ক্রমশঃ তার ইচ্ছার ভাবান্তর ঘটিতে লাগিল। অ... ভবিষ্যতের রহস্যের অভ্যন্তরে মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির প্রবেশ চমকপ্রদ বটে; কল্পনাতীত কত ব্যাপারই সম্ভব হইবার সংবাদ অহরহ পাওয়া যাইতেছে—এটাও হয়তো তাহারই একটা...কিন্তু তবু কোথায় যেন প্রতিবাদ আছে, অপ্রত্যয়ের কারণ আছে!

গৌরবর্ণ ব্যক্তিটি যে প্রতুল তাহাতে সন্দেহ নাই, আবার আছেও যেন...

বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিবার সময়েও সে ভাবিয়া কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই...

* * *

বাপ মায়ের সম্মুখে সে অতিশয় গম্ভীর হইয়া রহিল... কিন্তু তার কথা কহিবার অহেতুকী অনিচ্ছা জননীর জিহ্বা-তাড়নায় অচিরাৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল—

আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া হরিবিলাস মুগ্ধস্বরে কহিলেন,—আশ্চর্য্য শক্তি!...এই সব বল্‌লে?

অপর্ণা শান্তস্বরে বলিল,—হ্যাঁ অবিকল বল্‌লে।

চম্পকবরণী বলিলেন,—"কে রে যায় বেড়ী পায় বিরস বদন"ই তোমাদের প্রতুল চ্যাটার্জ্জী···তিনিই ঘোরতর গৌরবর্ণ। আমার যেটুকুন্ সন্দেহ ছিল তা' গেছে।

হরিবিলাস উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িতেছিলেন, বলিলেন,—বাঃ!···প্রতুলকেও সে চেনে না, অপর্ণাকেও চেনে না; ওদের সম্ভাবিত নৈকট্যের কথাও জানে না; অথচ দৈবী দৃষ্টিতে তা' হুবহু ধরা পড়ে গেছে।...আশ্চর্য্য বটে...আমার আর সন্দেহ নেই।... কেমন করে এসব ঘটে তা' কল্পনাও করতে পারিনে। বলিয়া হরিবিলাস ভৈরবীর শক্তিমত্তায় পরম পুলকিত হইয়া স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন...

চম্পকবরণী প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—ঐশী শক্তি। বলিয়া স্বামীর চোখের ইসারায় চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন, অপর্ণা চোখে রুমাল চাপা দিয়া কাঁদিতেছে।

হরিবিলাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

অপর্ণা চোখের উপর হইতে রুমাল সরাইয়া প্রশ্ন করিল,—কিন্তু সে যে প্রতুলবাবুর কথাই বলেছে তা' তোমরা কেমন করে জেনে একেবারে নিঃসন্দেহ হচ্ছ?

[illegible]কবরণী বলিলেন,—কিছুদিন সবুর সয়ে থাক্‌লেই রাষ্ট্র [illegible]ও ঘুচে যাবে। বলিয়া তিনিও উঠিয়া গেলেন।

অপর্ণা একাকিনী বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল তাহার হিসাব কিতাব নাই।

* * *

প্রতুল চ্যাটার্জ্জী কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিল; ফিরিয়া দেখিল, তাহার স্থানচ্যুতি ঘটিয়া গেছে, এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে অতুল রায়।...তিনদিন আমোদ-প্রমোদ আর ভ্রমণের ঘূর্ণীর মাঝে ফেলিয়া-চম্পক বরণী কন্যার নিরুত্তমতা ক্ষয় করিয়া আনিয়া ছিল ..

অপর্ণা পুনরায় সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে—

একটি বিষয়ে জননীর সঙ্গে তার মতভেদ নাই, তাহা এই যে, রায়ের বাক্‌পটুতায় সামান্য ব্যাপারই অসামান্য রসাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল...বিলাতের মেম সাহেবের সম্বন্ধে কৌতুকের কথা কি এতও সে জানিত—হাসাইয়া মারিয়াছে!

এমনি একটা হাসাহাসির মাঝেই প্রতুল চ্যাটার্জ্জি প্রবেশ করিয়াই অনুভব করিল, সিংহাসন শূন্য নাই—এমন কি, যেন অভিষেকেরই একটা আয়োজন চলিয়াছে।... তাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিল না।

কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী অতুল রায় বলিল—এস প্রতুল; ফির্‌লে কখন? বলিয়া সে সকৌতুকে অর্পণার মুখের দিকে চাহিতে যাইয়াই একটা দ্বিধা জাগিয়া সে প্রতুলের দিকেই চাহিয়া রহিল...

প্রতুল বসিল না—

চম্পকবরণী বলিলেন,—অতুল, তোমার বিলেতেও দৈবজ্ঞ আছে শুনেছি, কিন্তু এমনটি বোধ হয় নেই—এ সর্ব্বজ্ঞ। কাউকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায় আমার নেই; কিন্তু নাছোড়বান্দা লোককে শোনানই ভাল যে, অপর্ণাও তাকে হাত দেখিয়েছিল...অদৃষ্ট গণনায় যাকে জেলে—

প্রতুল বলিয়া উঠিল—কিন্তু নির্ঘাৎ সনাক্ত ত' এখনো হয় নাই ..গৌরবর্ণ অশেষ নির্গুণ ব্যক্তিটি কে, আর শ্যামবর্ণ অশেষ গুণবান্ ব্যক্তিটিই বা কে!

চম্পকবরণী একেবারে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন,—জান্‌তে কি আর বাকি থাকবে!

—আমি বল্‌ছি, অদূর ভবিষ্যতের কথা—আজকালের মধ্যেই জান্‌বার কি উপায় আছে!

—আমাদের তাড়াতাড়ি নেই।

—মিস্ সেন এ-সব রাবিশ বিশ্বেস করেন না এ ভরসা আমার আছে।

অপর্ণা বলিল—রাবিশ নেহাৎ নয়...আমার ছেলে-বেলাকার অত কথা সে কেমন করে বল্‌লে!

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করা ছাড়া প্রতুলের গত্যন্তরই রহিল না—তা-ও নিঃশব্দে।

চম্পকবরণী বলিলেন,—আমরাও কিছু বুঝি সুঝি... একেবারেই অজ্ঞান নই।

খানিক্ চুপ্ চাপ্ গেল...

মাঝখানে অতুল রায় এক্সচেঞ্জ রহস্য ব্যাখ্যা করিতে সুরু করিয়াছিল—এক্সচেঞ্জের হারের দরুণ ভারতবর্ষের বহু টাকা লোক্‌সান যাইতেছে—ইহাই ছিল তার প্রতিপাদ্য...

কিন্তু প্রসঙ্গ নীরস বলিয়া কেহ তাহাতে মনোযোগ দিলেন না...

চারিটি ব্যক্তি একত্র হইয়া আছে, কিন্তু নিঃশব্দ দেখিয়া মনে হয়, সবাই আপন চিন্তায় বিভোর, কিন্তু তা নয়... মনে মনে সবাই ছটফট যাই যাই করিতেছিলেন—

এই দুরূহ অবস্থায় আসান্ দিলেন সেন—

তিনি গৃহে ছিলেন না; বাহিরে আওয়াজে বুঝা গেল, তিনি আসিয়াছেন...

চারিজনেরই মনে হইল, বাঁচা গেল।

কিন্তু বাঁচা গেল কই!—হরিবিলাস এমন গম্ভীর মুখ লইয়া প্রবেশ করিলেন যাহা দেখিয়া তাঁর হিতৈষী মাত্রেরই শঙ্কিত হইয়া উঠিবার কথা...

তিনি ঝপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া এমন শোকাচ্ছন্ন আকার গ্রহণ করিলেন যে, কাহারো বুঝিতে দেরী হইল না, ব্যাপার গুরুতর। সবাই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—

চম্পকবরণী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছে তোমার?

হরিবিলাস অঞ্জলির ভিতর হইতে মুখ তুলিয়া কেবল

বলিলেন—আমার ? কিছুই না ! বলিয়া তিনি পুনরায় অঞ্জলির ভিতর ডুব দিলেন।

অপর্ণা নত নেত্রে নিজের করাঙ্গুলির নখমালা দেখিতে লাগিল ; প্রতুল খদ্দরের চাদরের সরু মোটা সূতা বাছিতে লাগিল ; অতুল দেয়াললগ্ন "তুমি ভয়াবহ" নামক ছবিখানা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং চম্পকবরণী অসহিষ্ণু হইয়া আঙ্গুল তুলিয়াছেন—স্বামীকে কিঞ্চিৎ সম্বোধন করিতে যাইবেন, এমন সময় হরিবিলাস আবার মাথা তুলিলেন ; বলিলেন—জ্যোতিষীর কররেখা বিচারই বল, আর ভবিষ্যৎ দর্শনই বল, সব সময়েই কি সত্য হয় ?

মনে হইল, সত্য না হওয়াটাই যেন তিনি চান্।

চম্পকবরণী বলিলেন,—সে জ্যোতিষীর জ্ঞানের ওপর উপর নির্ভর করে...

—আমি বল্‌ছি ধর্ম্মতলার ঐ ভৈরবীর কথা।

—নিশ্চয় ! তার ঐশী ক্ষমতা আছে !...আর কেউ তা' স্বীকার না করুক, অপর্ণা তা' বেশ জানে।

অতুল রায় বলিল,—আমার পাঁচ সাতটি পরিচিত লোক হাত দেখিয়েছিল ; তারাও বল্‌ছে ঐশী শক্তিই বটে !

হরিবিলাস কাতর স্বরে বলিলেন,—তবু, ভুলচুক্ কি হ'তে পারে না ! তাড়াতাড়িতে, কি হঠাৎ আন্‌মনা হ'য়ে গুলিয়ে যেতেও ত' পারে। কি বলিতে কি ব'লে ফেলা—

চম্পকবরণী মাথা নাড়িয়া চূড়ান্ত করিয়া দিলেন ; বলিলেন,—উঁ হুঁ।

অতুল রায় বলিল,—না।

চম্পকবরণী স্বামীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন,—তোমার চিরটা কালই দু'নৌকায় পা দিয়ে গেল...কোন্ দিকে গেলে সুবিধে হয় তা' তোমার ঠাহর কর্‌তে এত সময় লাগে যে সহ্য করা কঠিন...তুমি যে মানুষ হ'লে না তার কারণ একদিকে তোমার হঠ্‌কারিতা, অন্যদিকে তোমার দ্বিধা...

চম্পকবরণী এম্‌নি করিয়া স্বামীর সহস্র দোষ উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন—কিন্তু সেন সাহেবের ম্লান চক্ষে দীপ্তি ফিরিল না...তাঁর নাক দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ঘন ঘন বাহির হইতেছিল, তাহারও শেষ হইল না...তাঁর অস্থির দৃষ্টি ঘুরিতে ঘুরিতে একসময়ে প্রতুল চ্যাটার্জ্জির উপর পড়িতেই তাঁর আকাশে দোদুল্যমান আত্মা যেন ঠাঁই পাইয়া গেল...

চম্পকবরণীর বিস্ময়াহত চক্ষুর সম্মুখে তিনি হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া প্রতুলের হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন...

চম্পকবরণী বলিলেন,—ও কি হ'চ্ছে ?

প্রতুল বলিল,—হাম্‌বাগ্ ! আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে পুলিশ ডেকে ভৈরবীর বুজ্‌রুকি ভেঙে' দি'।...সে আপনাকে কিছু বলেছে নিশ্চয় ! চাব্‌কে,—

চম্পকবরণী রাগে কাঁপিতেছিলেন : বলিলেন,—তা' তুমি পারো ; কিন্তু তাতে তোমার সুবিধে হতে পারত হাটে হাঁড়ি ভাঙার আগে।...সে যদি কোনো অকল্যাণের কথাও বলে থাকে তবে—

বলিতে বলিতে স্বামীর আর্ত্তনাদে তিনি চম্‌কিয়া উঠিয়া থামিয়া গেলেন, হরিবিলাস বলিতে লাগিলেন,—বল' না, বল' না ; অকল্যাণের কথা জিহ্বাগ্রেও এন না। বলিয়া তিনি প্রতুল চ্যাটার্জ্জির হাত ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

চম্পকবরণী ভয় পাইয়া গেলেন ; আর প্রশ্ন করিলেন না। সেন বলিলেন,—বল্‌ছি, ব্যস্ত হ'ও না ; আমায় একটু একটু সাম্‌লে নিতে দাও...

—সাম্‌লে তুমি নাও। কিন্তু তোমার মন ভাল নেই, তুমি ওপরে যাও

—না না ; একা আমি এখন কোথাও থাক্‌তে পার্‌ব না...তোমাদের পাঁচজনের মুখের দিকে চেয়ে তবু একটু সুস্থ আছি।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে, বাবা ?

—আমিও গিয়েছিলাম তোমাদের সেই ভৈরবীর কাছে কেন গিয়েছিলাম তাই এখন ভাবছি !...একেবারে বুজ্‌রুক আগাগোড়া মিথ্যে...অসম্ভব...কিছু সে জানে না...

প্রতুল বলিল,—আমি তা' বরাবর বলে' আস্‌ছি !... কি বলেছে সে আপ্‌নাকে ?

হরিবিলাস তাঁর একমাত্র অবলম্বন প্রতুল চ্যাটার্জ্জির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—বলেছে...বলিয়া ম্লান একটু

হাসিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—বলেছে, আমি নব্বই বছর পর্য্যন্ত বাঁচব ; চিরদিন সুস্থ সবল থেকে নব্বই বছরে সজ্ঞানে হঠাৎ আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু...

বলিয়া হরিবিলাস স্ত্রীর দিকে চোখ ফিরাইলেন--

বিষণ্ণ ছল ছল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন...

এবং সেদিনকার বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁর নয়নপল্লবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল...

চম্পকবরণী স্বামীকে চিনিতেন ; তাঁহার মুখ দিয়া হাসি কান্নায় মিশ্রিত একটা অদ্ভুত শব্দ নির্গত হইল...বলিলেন, তুমি মিছে কথা বলছ।

—সে ত' সুখের কথা ; চিরদিন সুস্থ সবল থেকে নব্বই বছরে সজ্ঞানে হঠাৎ মৃত্যু খুবই বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু উনি---

চম্পকবরণী ধম্‌কাইয়া উঠিলেন,—ওঠো···ওপরে যাও বল্‌ছি।

—যাই।...ভৈরবী বল্‌লে, তোমাকে দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করতে হবে...তার কটা চোখ আর লাল মুখ দিয়ে ঝড় বইবে ; শুনে' অবধি...

সেন আসিতেই বুঝা গেল তিনি সেই হইতে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছেন...

চম্পকবরণী চোখ বুজিয়া রহিলেন...

প্রতুল হাসিয়া বলিল,—মিছে কথা মিছে কথা, এমন মিছে কথা আর হয় না।

হরিবিলাস কাতরকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন,—ঝড়ের মত মুখ চোখ। সে কেমন ধারা ?

চম্পকবরণী চোখ খুলিয়া তাকাইলেন ; ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—চোখে দেখলেই আর সন্দেহ থাকবে না।... তোমার কপালে যদি বিপত্নীক হওয়া লেখা থাকে তবে হবেই...চোখ আর মুখ—

প্রতুল বলিল,—কটা চোখ আর লাল মুখ !

—চোখ মুখ দেখে' শিক্ষে পাবার লোকই তুমি...

—কিন্তু এত সত্বর। তিন হপ্তা আর তিন মাস ! মোটে !—তোমার পরমায়ুঃ আর একুশ দিন, আমার গ্রহের ফের সুরু হতে আর তিন মাস আছে।—বলিয়া চোখে দিবার অভিপ্রায়ে কোঁচা তুলিতে যাইয়াই হরিবিলাস দেখিলেন, তিনি পেণ্টুলান পরিধান করিয়া আছেন ; রুমালের কথা তার মনেই পড়িল না।

চম্পকবরণীর অকারণেই মনে হইতে লাগিল, প্রতুল চ্যাটার্জ্জিটা তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে—আর কত দুষ্ট হাসি সে চাপিয়া আছে তাহার ঠিক নাই···

প্রতুলও তাঁহারই উদ্দেশে বলিল,—কাতর হবেন না— সত্যি এ হতেই পারে না।...আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন— আপনার আশীর্ব্বাদে আমার ফাঁড়াও কেটে যাবে।

মিষ্টার সেন এতক্ষণে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন একুশ দিন ত' মোটে।···দেখা যাক্‌ !

কিন্তু চম্পকবরণী ততক্ষণে বাহির হইয়া গেছেন।

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী
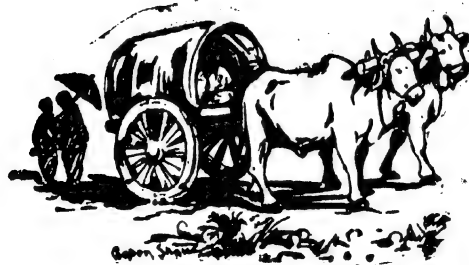
পৌষের একটি সন্ধ্যা।

শুক্লা একাদশীর রাত্রি, শীতের কুয়াসায় জ্যোৎস্না স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে পারে নাই। বাড়ীর সম্মুখের ফুলগাছগুলিতে ফুল ফুটিতে পারে নাই: পাতাগুলি শীতে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রতিনাথবাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলে একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে পিয়ানো বাজিতেছিল। খোলা জানালা পথে কক্ষস্থিত বৈদ্যুতিক আলোর রেখা বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

তরুণী কেবল পিয়ানো বাজাইতেছিল, কণ্ঠে তাহার গান ছিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী গৎ বাজাইয়া সে থামিল, দ্বারের কাছে কাহার পদশব্দ পাইয়া সে মুখ তুলিল।

ভৃত্য কৃষ্ণ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, অনেকক্ষণ হইতে সে অপেক্ষা করিতেছিল, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। এখন বাজনা থামিতে সে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিল।

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ বলিল, "একটি বাবু কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, কর্ত্তাবাবু তো এখনও ফেরেন নি, কি বলব তাঁকে?"

মনীষা বিস্ময়ে বলিল, "বাবা এখনও ফেরেন নি? এই শীত, তার ওপরে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাড়ী গেছে তাঁকে আনতে?"

কৃষ্ণ বলিল,"মোটর রোজকার মত চারটে না বাজতেই অফিসে গেছে।"

ব্যস্ত হইয়া মনীষা বলিল, "ছটা পর্য্যন্ত দেখে কাউকে বাবার অফিসে পাঠান উচিত ছিল, কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটাও তো বিচিত্র নয়। তুমি নিজে যাও, না হয় বাবুর সেক্রেটারীকে পাঠাও।"

কৃষ্ণ চলিয়া যাইতেছিল, মনীষা আবার ডাকিল,—"যে বাবুটীর কথা বলছিলে—"

কৃষ্ণ বিরক্তভাবে বলিল, "তাকে এত করে বলছি তিনি কথা মোটে কানেই তুলছেন না। অবস্থা দেখে ভারী গরীব বলে মনে হল, হয় তো কিছু সাহায্যের জন্যে বাবুর কাছে এসেছে।"

মনীষা বলিল, "তুমি গিয়ে আগে সেক্রেটারী বাবুকে আফিসে পাঠিয়ে তারপর এই বাবুটীরর নাম ধাম আর কি চায় তা জেনে এসে আমায় বল।"

কৃষ্ণ চলিয়া গেল।

মনীষা উদ্বিগ্ন ভাবে পিয়ানো ছাড়িয়া বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতার পথে দুর্ঘটনা ঘটা কিছু বিচিত্র নহে। রতিনাথবাবু কোনদিন এরূপ সন্ধ্যা করেন নাই, প্রতিদিন তিনি ঠিক পাঁচটার সময়ে বাড়ী ফিরিয়া আসেন, আজ সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও তাঁহার ফিরিয়া না আসা চিন্তার কথাই বটে।

খানিক বাদে কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "আফিসে লোক গেছে?"

কৃষ্ণ বলিল, "হ্যাঁ, সেক্রেটারী বাবুকে বলতেই তিনি চলে গেছেন?' নীচের সেই বাবুটী—

মনীষা বলিল, "তিনি চলে গেছেন?"

কৃষ্ণ বলিল, "না, এখনও বসে আছেন, বল্লেন—বাবু এলে দেখা করে তবে যাব।"

মনীষা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তিনি কি কিছু সাহায্য চান, না চাকরী চাইতে এসেছেন?

কৃষ্ণ বলিল, "কোন কথাই বল্‌লেন না, বল্‌লেন যা কথা তা বাবুর সঙ্গে হবে।"

মনীষা বিরক্ত হইয়া বলিল, "চল আমি যাচ্ছি। যদি কিছু সাহায্য চায় ওখান হ'তে দিয়ে বিদায় করে দিলেই হবে এখন, বাবা এই সারাদিন খেটে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরছেন এ সময়ে ও লোকটা আবার তাঁকে জ্বালাতন করে মারবে। এখন তুমি এসো তো কৃষ্ণ, একবার দেখি সে কি চায়?"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কৃষ্ণ বলিল, "লোকটা এ দিকে তো গরীব, অথচ, চালটুকু আছে ষোল আনা আমি চাকর বলে আমায় কিছু বলবে না, বলতে চায় খোদ কর্ত্তার কাছে।"

মনীষা হাসি চাপিয়া বলিল, "এ তার ভারি অন্যায়। তার জানা উচিত, কর্ত্তাবাবু নামেই কর্ত্তা, আসলে সকল কাজ আমাদের কৃষ্ণবাবুই করে, কাজেই কৃষ্ণের কাছে তার দরবার করা উচিত।"

লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ বলিল, "দিদিমণি তামাসা করছেন।"

মনীষা হাসিয়া ফেলিল, "তামাসা কি করে হল বল দেখি? বাবা সংসারের সব ভার তো তোমার পরে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, এটা কি তামাসার কথা?"

নীচে বৈঠকখানা ঘরে একখানা চেয়ারে সঙ্কুচিতভাবে নিরঞ্জন বসিয়া ছিল। এই ঘরের সাজসজ্জার সহিত নিজের পরিচ্ছদের তুলনা করিয়া সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ছিন্ন জুতা, অর্দ্ধমলিন জামা কাপড়ের পানে তাকাইয়া এই ধনীর গৃহ যেন বিদ্রূপ করিতেছিল।

ঘরের মেঝে মূল্যবান কার্পেটে আবৃত, তাহার ছিন্ন জুতা পায়ে দিয়া এ ঘরে সে প্রবেশ করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিল, জুতা সে দরজার সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল।

এই গরীব লোকটাকে দেখিয়াই কৃষ্ণ তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিল এবং তাহাকে দেখা মাত্র বিদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এরূপ ধরণের লোক ধনী গৃহের চৌকাঠ এপর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে নাই, কিন্তু এ লোকটা একরূপ প্রায় জোর করিয়াই ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, কৃষ্ণ বাহির হইতে বলাসত্ত্বেও নড়ে নাই।

সত্যই নিরঞ্জন মরিয়া হইয়া উঠিয়া ছিল। বাঙ্গালির ছেলে চাকরীর জন্য সব কাজই করিতে পারে, বড়লোকের বাড়ীর ভৃত্যের অপমান সহ্য করা তো ছোট কথা।

ঘরে যাহার অভাব, তাহার কানে তুলা দিতে হয়, পিঠখানা গণ্ডারের চামড়া দিয়া মুড়িতে হয়, আত্মসম্ভ্রম-বোধ শক্তি বিসর্জ্জন দিতে হয় নহিলে চাকরী মিলেনা, অনাহারে শুকাইয়া মরিতে হয়।

রতিনাথবাবুর অফিসে সে চার পাঁচদিন হাঁটিয়াছে, দ্বারোয়ান তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, তাহার হাতে নাম লেখা কাগজখানি পর্য্যন্ত বাবুর নিকটে লইয়া যায় নাই। ছাপান কার্ড হইলে হয় তো নিরঞ্জনের নামটাও রতিনাথবাবুর নিকটে উপস্থিত হইত, হাতে লেখা কাগজখানা দ্বারোয়ান ফেলিয়া দিয়াছিল।

আজ জোর করিয়াই নিরঞ্জন রতিনাথের বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং একখানা মূল্যবান চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছে। আজ সে রতিনাথের সম্মুখে নিজের ব্যথা বলিবে, এবং যেমন করিয়াই হোক, একটা কাজের ঠিক করিবেই।

কৃষ্ণ দরজার পর্দ্দা সরাইয়া বলিল, "বাবুর আসতে কত রাত হবে জানিনে, দিদিমণি এসেছেন, আপনার যা কথা থাকে ওঁকে বলে চলে যান।"

দিদিমণি—

নিরঞ্জন ঘামিয়া উঠিল। নিজের অর্দ্ধমলিন কাপড় জামার উপর চোখ পড়িতে সে শিহরিয়া উঠিল। না, এখানে আর না থাকাই ভাল, সে কখনও দিদিমণির সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না, সুশিক্ষিতা সুসভ্য ভদ্র মহিলার সম্মুখে সে এই সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কথা বলিবে কি করিয়া—তাহার এই বেলা সরিয়া পড়াই উচিত, আর এখানে থাকা ভাল নয়।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময় দরজার কাছে কাহার অতি মধুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"তুমি একটু বাইরে থেকো কৃষ্ণ, বাবা এলেই আমায় খবর দিয়ো।

দরজার পর্দ্দা সরাইয়া মনীষা প্রবেশ করিল। নিরঞ্জন সবিস্ময়ে এই মেয়েটির পানে তাকাইয়া তখনই চোখ নামাইল। মনীষা নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনিই বুঝি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

উঠ্‌লেন কেন—বসুন। বাবা এখনও ফেরেনি তা বোধ হয় শুনেছেন, আপনার যা কথা থাকে আমায় বলতে পারেন।"

তাহার কণ্ঠস্বরে এমন একটী সহৃদয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে নিরঞ্জন মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না, সে চোখ তুলিয়া ভাল করিয়া মেয়েটীর পানে তাকাইল।

সুন্দর—অতি সুন্দর। দিদিমণি বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল, এ মেয়েটীর মধ্যে তাহার কিছুই নাই। সে ভাবিয়াছিল- এখানে এমন কোনও মেয়েকে দেখিবে যাঁহার পাশ্চাত্য বেশভূষা আগেই তাহাকে আঘাত করিবে। এখন দেখিল এ মেয়েটী তাহারই ঘরের একটী মেয়ে মাত্র। তরুণী বিধবা, শুভ্র একখানি থান তাহার কোমল দেহখানি বেষ্টন করিয়া আছে, সুন্দর দেহ অলঙ্কারশূন্য। বিলাসিতার লেশমাত্র ইহার মধ্যে নাই, তাহার সম্মুখে একটী পবিত্রা ব্রহ্মচারিণী দণ্ডায়মান।

নিরঞ্জন নরমস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, তাঁর কাছে আমার খুব দরকার। চার পাঁচদিন তাঁর অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু নিতান্ত গরীব জেনেই দ্বারোয়ান আমায় ভেতরে যেতে দেয়নি। এমন কি আমার নাম লেখা কাগজখানা পর্য্যন্ত তাঁকে দেয়নি। সেই জন্যে বাধ্য হয়ে আজ জোর করে এঘরে বসেছি, আপনার চাকর উঠিয়ে দিতে এলেও আমি উঠি নি।"

ছেলেটীর কুণ্ঠাহীন কথায় মনীষা খুসি হইয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ও তা আমায় বলেছে। আমিও—"

নিরঞ্জন একটু হাসিয়া বলিল, "আপনিও সেই মতলবেই এসেছিলেন তা বুঝেছি – কি জানেন, গরীব হওয়া মস্ত বড় অভিশাপ, কিন্তু বাধ্য হয়েও, লোককে এ অভিশাপ কুড়াতেই হয়। ধনী হওয়ার ইচ্ছা করে সবাই, কিন্তু সবাই কি হতে পারে? জগতের দিকে ফিরে চান—দেখবেন দরিদ্রই বেশী, ধনীর সংখ্যা খুব কম। তবু মজার কথা কি জানেন, কোনোদিন এই দরিদ্রেরাই আবার হয় তো ধনী হয়, ধনীই হয় তো তাদের মত একমুঠো ভাতের জন্যে হাহাকার করে বেড়ায়। ওই যে একটা কথা আছে না— "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ" এ কথাটা মানুষ জানে তবু তো বুঝতেও চায় না।"

মনীষার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "সত্যিই দুনিয়ার ধারাই এই—বুঝেও তবু বুঝতে চায় না। আজ যে রাজা কাল সে ফকীর, আজ যে ফকীর কাল সে রাজা, বরাবর এই ধারাই পৃথিবীতে চলে আসছে।

নিরঞ্জন চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "আপনাকে আর বিরক্ত করব না, তাঁর আসতে এখনও হয় তো অনেক দেরী হবে, আমি এইবার যাই, অদৃষ্ট নিতান্তই খারাপ নইলে কয়দিন অফিসে গিয়ে দেখা পেলুম না, আজ বাড়ীতে এসেও দেখা পেলুম না। যাই হোক একটা দিন ঠিক করে বলে দিতে পারবেন কি, কোন সময়ে এলে দেখা হবে সেটাও বলে দিলে ভাল হয়, তা হলে সেই দিনে সেই সময়ে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

মনীষা বলিল, "রবিবার দিনটা তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না, আর যে কোনওদিনে আপনি সকালবেলায় আসবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। আমি আপনার কথা তাঁকে বলে রাখব, কিন্তু কি দরকারে এসেছেন সেটাও যদি বলে যান, আমি তাঁকে জানাব।"

শুষ্ক হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "কি দরকার তা এখনও বুঝতে পারেন নি জেনে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। বাঙ্গালীর ছেলের দরকার চাকরীর, নইলে তারা না খেয়ে মারা যায়, দয়া করে তাঁকে বলে রাখবেন, যদি একটী কুড়ি টাকার চাকরীও আমায় দেন আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। তিনটী প্রাণীর ভরণ পোষণের ভার আমার উপরে—একটী পয়সা এ পর্য্যন্ত ঘরে নিয়ে যেতে পারিনি। অথচ ঘরে কোনদিন অর্দ্ধাহার কোনদিন অনাহার—"

থামিয়া গিয়া সে হাতখানা কপালে ঠেকাইল, "নমস্কার, আসি তা হলে। আপনি দয়া করে তাঁকে বলে রাখবেন যেন ভুলবেন না।"

মনীষা কিছু বলিবার আগেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

দরজার পাশ হইতে রুষ্টস্বরে কুঞ্জ বলিল, "লোকটা আস্ত জানোয়ার।"

মনীষা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "পেটে ভাত না থাকলে অনেক লোকই জানোয়ার হয়।"

(২)

রতিনাথ মিত্র গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, সংসারে

প্রতিপত্তি যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

একদিন তিনি সোনার সংসার পাতিয়া ছিলেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সুখী হইবার আশা করিয়াছিলেন, আজ তাহাদের মধ্যে কেহই নাই, একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ মনীষাই তাঁহার জগতে সম্বল।

পত্নী পুত্র ও কন্যাকে রাখিয়া অনেকদিন পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেকের অনেক অনুরোধসত্ত্বেও পুত্রকন্যার মুখের পানে চাহিয়া রতিনাথ আর বিবাহ করেন নাই।

কন্যাকে তিনি উপযুক্ত রকম শিক্ষিতা করিয়া উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতা শশাঙ্ক সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু অদৃষ্টে এ সুখ সহিল না, বিবাহের কিছুকাল পরেই করুণা মারা যায়। শশাঙ্ক আর বিবাহ করে নাই, বিবাহ করিবে না বলিয়া দৃঢ়পণ করিয়াছে। এখনও সে পূর্ব্বের সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে আসিয়া দুচারদিন থাকিয়া যায়।

মনীষা রতিনাথ বাবুর বাল্যবন্ধু সুরেশবাবুর কন্যা। বাল্যকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। যখন তাহার বিবাহ হয় তখন হিরণ্ময় পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ও মনীষা মাত্র অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা।

এই বিবাহের মূলে ছিল দুই বন্ধুর প্রতিজ্ঞা। পুত্র কন্যার জন্মের বহুপূর্ব্বে হইতে এই দুইটী অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিলে রতিনাথবাবু পুত্রের বিবাহ দিয়া এই মেয়েটীকে কাছে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, সুরেশবাবুর ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইহাতে অসম্মত হইলেন—এতটুকু বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে তিনি একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার মত এখানে কিছুমাত্র ফল দিল না, রতিনাথবাবু যখন সুরেশবাবুর হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া মনীষাকে তখনই প্রার্থনা করিলেন তখন সুরেশবাবু মত না দিয়া পারিলেন না। স্ত্রীর অসম্মতিতেও একদিন মহাসমারোহে মনীষার সহিত হিরণ্ময়ের বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু বিবাহের ফল হইল অন্যরূপ। রতিনাথের সকল আশা ব্যর্থ করিয়া বালিকা মনীষার নাম হতভাগিনী বিধবার শ্রেণীভুক্ত করিয়া বিবাহের দুই বৎসর পরে হিরণ্ময় ইহলোক ত্যাগ করিল।

এই সময় মনীষা ছিল তাই রতিনাথ বাবু আবার উঠিতে পারিয়াছিলেন, আবার দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই মেয়েটী বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিত, পিতার নিকটে কন্যা যেমন অসঙ্কোচে আবদার করে তেমনিই করিত। বিবাহের পূর্ব্ব হইতে সে রতিনাথবাবুর নিকটে থাকিত। পিতা মাতা ভাই বোনের সহিত তাহার বিশেষ সংস্রব ছিল না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরে রতিনাথ বাবুর অন্তরের পুঞ্জীকৃত—স্নেহ ভালবাসা সকলই মনীষার উপর গিয়া পড়িয়াছিল।

মনীষা বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, সে এখানেই বরাবর-কার জন্য রহিয়া গিয়াছিল, পিত্রালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই চলে। রতিনাথের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াই সুরেশবাবুর স্ত্রী সুরমা কন্যার সহিত সম্পর্ক রাখেন নাই। তিনি পুরা রকমে পাশ্চাত্য প্রথায় চলিতেন, পুত্র কন্যা সকলকেই তাঁহার মতানুসারে চলিতে হইত। মনীষাকে নিজের কাছে আনিয়া তাহাকে তিনি নিজের মতানুযায়ী গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, কিন্তু মেয়েটী সব রকমেই তাঁহাকে এড়াইয়া গেল, সে কিছুতেই মায়ের কাছে ধরা দিল না।

রতিনাথের প্রদত্ত শিক্ষায় সে শিক্ষিতা হইয়াছিল, মায়ের এতটা বাড়াবাড়ি তাহার একেবারেই অসহ্য মনে হইত, সেই জন্য সে স্বেচ্ছায় মায়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছিল।

এই বয়সেই কন্যা যে সর্ব্বত্যাগিনী ব্রহ্মচারিণী হইয়া উঠিল, ইহাতে সুরমা মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন বড় কম নয়, ইহার জন্য তিনি স্বামীকে দোষ দিতেন, নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া চোখের জল ফেলিতেন।

পিতা মাতার বুক হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রতিনাথও বড় কম অনুতপ্ত হন নাই। তিনি সন্তানকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মনীষা নড়িল না।

ব্যাকুলভাবে রতিনাথ কেশ বিরল মাথায় হাত বুলাইতেন, কিন্তু প্রতিবিধানের কোনও উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। মাঝে যে ঘটনা পূর্ণ দিনগুলো আসিয়াছিল

যদি তাহা কোনরূপে মুছিয়া দিয়া তিনি মনীষাকে পিতা মাতার কাছে ফিরাইয়া দিতে পারিতেন, তবে নিজের জীবনে চিরকালের জন্য একাকীত্বের কষ্ট বরণ করিয়া লইতেন, মনীষাকে জড়াইতেন না।

এই মেয়েটীর অন্তর বড় কোমল ছিল, কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে বা কানে শুনিলে সে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, তাহার জন্য রতিনাথকেও বড় কম ব্যস্ত হইতে হইত না। অনেক সময়ে নিজের কাজের ক্ষতি করিয়াও তাঁহাকে মনীষার আবদার রাখিতে হইত।

সেদিন নিরঞ্জনের মলিন মুখ ও দুঃখপূর্ণ কথাগুলিতে মনীষা অন্তরে সত্যই বেদনা অনুভব করিয়াছিল। ধনীর দুলালী হইলেও সে দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট বুঝিত এবং সে দুঃখের বেদনা নিজের হাতে মুছাইয়া দিতে তৎপর হইত।

সংসারে নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা ও মাসীমা ছিলেন। একটী মাত্র ভগিনীর সম্প্রতি বিবাহ দিতে তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব গিয়াছে, মাথা রাখিবার আশ্রয় দেশের বাড়ীখানি পর্য্যন্ত নাই। পিতা স্থবির বৃদ্ধ, তাহার উপর নিত্য অসুখ লাগিয়াই আছে।

একদিন সৌভাগ্যের তুঙ্গশিরে তিনি আসীন ছিলেন। মফঃস্বলের কোন সহরে ওকালতি করিয়া যৌবনে তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া তিনি সঞ্চিত অর্থ লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া ছিলেন, তাই বিদেশের ব্যবসার সহিত যোগ রাখিতে গিয়া তাঁহার ব্যবসা নষ্ট হইয়া গেল, উপরন্তু দেনার দায়ে যথা সর্ব্বস্ব গেল।

এই সময় হইতে দারুণ মনোকষ্টের দরুণ তাঁহার স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া গেল, জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটিল, আর কিছুতেই তিনি সুস্থ হইতে পারিলেন না।

নিরঞ্জন বি এ পাস করিয়াও অদৃষ্টের জন্য কোন কাজ পাইতেছিল না, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে ব্যর্থ হইতেছিল।

গৃহের অভাব দিন দিন বাড়িয়া চলিতে ছিল, রুগ্ন ও বিকৃত মস্তিষ্ক পিতার নিকটে সংসারের ব্যাপার আর প্রচ্ছন্ন রাখা চলে না। নিরঞ্জন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

একখানি ক্ষুদ্র খোলার ঘর ভাড়া লইয়া তাহাতে এই চারিটী প্রাণী কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া ছিল। খোলার ঘরের সামান্য মাসিক ভাড়া কিন্তু তাহাই তিনমাস দেওয়া হয় নাই।

মাসিমা উমাসুন্দরী আছেন বলিয়াই কোন রকমে সংসার চলিতেছে। তিনি বাল বিধবা, ভগিনীর নিকটেই বরাবর ছিলেন, ভগিনীর মৃত্যুর পরেও এখানে রহিয়া গিয়াছেন।

(৩)

"মনি—মা—"

কানে এই আহ্বান আসিবামাত্র মনীষা উত্তর দিল, "যাচ্ছি বাবা—"

হাতের বোনাটী টেবিলের উপর ফেলিয়া সে উঠিয়া আসিল।

রতিনাথ শ্রান্তভাবে একখানা ইজিচেয়ারে আড় হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনীষা আসিয়া তাঁহার পিছন দিকে দাঁড়াইল।

রতিনাথ বলিলেন, "আজকাল মায়ের আমার কি যে এত কাজ পড়েছে তা বুঝতে পারি নে, ডেকে ডেকে তবে কাছে পাওয়া যায়।"

কুণ্ঠিত হইয়া মনীষা বলিল, "না বাবা শুধু আজকের দিনটাই তো ডেকেছেন, অন্যদিন আমি তো এখানেই থাকি।"

চাপা হাসি হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "না হয় আজকের দিনটাই, কিন্তু কেন হল বল দেখি মা?"

মনীষা তাঁহার শুভ্র মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "একটা গলাবন্ধ বুনছিলুম বাবা! যার জন্যে বুনছিলুম তার কথা ভাবছিলুম কিনা, সেই জন্যে আপনার আসার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম।"

রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার গলাবন্ধ বুনছিলে মা?"

মনীষা বলিল, "পাশের বাড়ীতে একটী বউ আছে তাকে গলাবন্ধ বুনে দেওয়ার জন্যে তার স্বামী হুকুম দিয়েছে। তার হুকুম মত যদি বুনে না দেয় বউটীর লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না অথচ বেচারার সারাদিনের মধ্যে এতটুকু অবকাশ নেই। কিন্তু স্বামী তো সেকথা বুঝবেন না, এদিকে ঘড়ি ধরে সব কাজ নিয়মিত হওয়া চাই—একচুল

এদিক ওদিক হলে বউটীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। বাড়ীতে একটী মাত্র ঝি আছে, তা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কাজ বউটীকে করতে হয়, সে থাকা না-থাকা সমান। এর পর দুটি ছেলেপুলে, এসব নিয়ে স্বামীর হুকুম মত গলাবন্ধ বুনে দেওয়া যে কি হাঙ্গাম তা তো তিনি বুঝবেন না, তাঁর গলাবন্ধ চাই-ই। বউটী কাল সব দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছিল, আমি তার সেই গলাবন্ধ বুনে দেওয়ার ভার নিয়েছি।"

রতিনাথ একটু হাসিলেন, তখনই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "জীবনটা শুধু পরের কাজেই কাটিয়ে দিলে মা। কার কি হল, কে খেতে পায় নি, কার সেবা করতে কেউ নেই, এই সব দেখে আর তার প্রতিবিধান করতেই দিন কাটালে, আমার ঘরের কাজ যে এদিকে কিছুই হয় না।"

মনীষা অভিমানের সুরে বলিল, "তা তো আপনি বলবেনই বাবা; আমি ঘরের কাজ করে তবে তো বাইরের কাজে হাত দেই। ঘরের কাজ মানে কেবল আপনাকে দেখাশুনা, আর কি করতে দেন শুনি?"

রতিনাথ হাসিতে লাগিলেন—"পাগলী মা আমার এইবার রাগ করেছে বুঝেছি। না মা, রাগ দুঃখ করো না, আমি শুধু তোমায় রাগাবার জন্যেই এ সব কথা বলছি। আমি কি জানি নে তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, যে কাজে তোমার হাত না পড়ে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, দুদিন ছিলে না তাতে আমার খাওয়া হতে আরম্ভ করে সব বিষয়েই দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল। ডেকে ডেকে একটা চাকরকে পাই নে, খেতে গিয়ে দেখি তরকারী কোনটা নুণে ভরা, কোনটাতে নুণ নেই। অফিসে যাওয়ার সময় এতগুলো চাকর থাকতেও কোথায় জামা, কোথায় জুতো, জামায় হয় তো বোতাম নেই—এমনই হাজার অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল।"

তিনি প্রচুর হাসিতে লাগিলেন, মনীষা শুধু মলিন মুখে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

"আচ্ছা বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে অনেক পুরুষে মেয়েদের অভাব বোঝে না কেন, এত নির্য্যাতন করে কেন? আপনি স্বামীত্বের অহঙ্কার নিয়ে মার উপর কোন দিন স্নেহের নামে এ রকম অত্যাচার করে ছিলেন?"

রতিনাথ গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, অতীতের সেই দিনগুলার কথা মনে জাগিয়া উঠিল, ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "না মা, কোনদিন আমার জ্ঞানে তাঁকে একটা কড়া কথা বলিনি। স্ত্রী যে সহধর্ম্মিণী, গৃহের লক্ষ্মী, আমার সন্তানের মা, তাঁকে কি অপমান করা চলে মা? যে সংসারে নারীর অপমান হয় সে সংসার যে উচ্ছন্ন যায় আমাদের হিন্দুশাস্ত্রও তো এ কথা স্পষ্ট বলে থাকে।"

মনীষা বলিল, "তবে কেন ওরা অমন ধারা অত্যাচার করে বাবা? পাশের বাড়ীর এই বউটী—দেখেছি ভোর হতে রাত অবধি ভূতের মত খাটে, একদণ্ড ওর হাতের পায়ের বিশ্রাম নাই, কতদিন গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, আমার ঘরের জানলা বরাবর ওদের খোলা জানলা পথে দেখেছি স্বামী দিব্য আরামে ঘুমাচ্ছে আর বউটি তার গা টিপে দিচ্ছে, ঘুম আসছে—ঝোঁকে তার গায়ের পরে পড়তেই স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে সে গর্জ্জে উঠছে।"

রতিনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এদেশের হাজার করা নয়শ নিরেনব্বই জন মেয়েকে এইভাবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হয় মা। তাদের যখন বিয়ে হয় তখনই তাদের নিজের বলতে যা কিছু সব বিসর্জ্জন দিয়ে আসতে হয়, তারপর তাদের আত্মমর্য্যাদা বোধ পর্য্যন্ত রাখা চলে না।

মনীষা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মেয়েরা না হয় তাদের স্বভাব অনুযায়ী সেবা করতে ভালবাসে বলেই সেবা করে, কিন্তু পুরুষেরা কেমন করে অসঙ্কোচে সেবা নেয়, অনেক সময়ে জোর করে সেবা দিতে বাধ্য করে আমি কেবল তাই ভাবি। সেদিন এই বউটীর স্বামী তাকে মেরেছিল, অথচ আপনি বলেন স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, দেবী, কিন্তু সে কথা এরা কি জানে না বাবা? এ সংসারে পুরুষের পূর্ণ অধিকার রয়েছে—থাকবেও, মেয়েদের কি কোন অধিকার নেই?"

রতিনাথ শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তাই কি হতে পারে মা, আমার তো তা বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় সংসারে পুরুষের যেমন অধিকার, মেয়েদের অধিকার বরং তার চেয়েও বেশী, কারণ নারী মা, সংসারের গৃহিণী। পুরুষ বাইরে অক্লান্তভাবে খাটতে পারে, ঘরের মধ্যে সে

দৃষ্টি দেবে কখন, আর বাইরে খেটে এসে ঘরে যদি সে এতটুকু শান্তি তৃপ্তি না পায়, সে খাটবে কি করে? এই দেখ না, আমি কেমন বাইরে সারাদিন ভূতের মত খেটে এসে বাড়ীতে তোমার স্নেহ, যত্ন, আদর পেয়ে খাটনির কথাই ভুলে যাই, এমনই তো সকলেরই মা। তোমরা যে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছ মা, তোমরা যে মা। এই মাতৃজাতিকে যারা সম্মান করে না, তাদের কতখানি আত্মদানে সংসার সুখময় হয় তা যারা ভাবে না তাদেরকে আমি মানুষ বলি নে, তারা পশু। একদিন এ দেশে অসীম শক্তিশালিনী নারীকে দেবীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, পুরুষ প্রকৃতির পূজা করে ধন্য হয়ে গেছে। সেই দেশেই নারীর এই নিত্য নির্য্যাতনে অপমানে শক্তি কি ঘুমিয়েই থাকবে মা, ওকে যে জেগে উঠতে হবেই। একটা কথা আছে জানো অত্যাচার বাড়তে বাড়তে যখন অনেক বেশীই হয়ে যায়, তখন বিপরীত দিকে কেউ তাকে বাধা দিতে দাঁড়ায়। সহ্যশীলা নারীরও এই অবাধ অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে, দিন আসছে মা—দেখতে পাবে সমস্ত নারীসমাজ এই পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবেই, সে দিনের আর দেরী নেই।"

মনীষা একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হোক, সে দিনের আর দেরী নেই বাবা, দিন আসছে। কারণে বিনা কারণে নারী যে অত্যাচার, যে লাঞ্ছনা সহ্য করছে, তাদের বুকের অন্তঃস্থল হতে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠছে, চোখ হতে যে জল ঝরে পড়ছে, এ সবই জমা হচ্ছে। এমনি করে জমতে জমতে এই ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস একদিন মহাঝড়ে পরিণত হবে, এই লুকিয়ে ফেলা দু'চার ফোঁটা চোখের জল বিশাল সমুদ্রে পরিণত হবে। সেই মহাঝড়ে পৃথিবীর বুকের অত্যাচার উপদ্রব উড়িয়ে নিয়ে যাবে, অনন্ত চোখের জল সাগরে প্রচণ্ড ঢেউরূপে এসে সমস্ত দেশের বুকে প্লাবন আনবে, সেই প্লাবনে সকল মলিনতা ধুয়ে যাবে। সে দিনের আর দেরী নেই তা জানা যাচ্ছে না বাবা?"

রতিনাথ একটু হাসিলেন।

৪

হাতে লেখা নামের কার্ডখানা দ্বারোয়ানের হাতে দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া নিরঞ্জন স্পন্দিত দেহে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। দ্বারোয়ানের নিকটে সে আগেই সংবাদ লইয়াছিল রতিনাথ এখন বাড়ীতেই আছেন, কোথাও যান নাই।

খানিক বাদে দ্বারোয়ান ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বসিতে বলিল, জানাইল বাবু এখনই বাহিরে আসিবেন, তখন দেখা হইতে পারিবে।

সেই বৈঠকখানায় আজও নিরঞ্জন বসিল।

আজ সে কতকটা ভদ্রভাবে আসিয়াছিল। তাহার পায়ে কমদামের একজোড়া স্যাণ্ডাল ছিল, পরণের কাপড়খানা ও জামাটা পরিষ্কার ছিল।

প্রতিদিন কত দরজায় তাহাকে ফিরিতে হয় কোন স্থানে যাইবামাত্র গলাধাক্কা পাইয়াছে, কোন স্থানে এতটুকু বসিয়া বিনয়নম্র কথায় বিদায় পাইয়াছে।

প্রায় মিনিট পনের বাদে রতিনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

নিরঞ্জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল, রতিনাথ একটু হাসিয়া শুধু মাথাটা একটু নত করিলেন। কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি আসিয়া একখানা চেয়ার সরাইয়া দিল, তিনি তাহাতে বসিলেন, শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "বস।"

নিরঞ্জন বসিল।

রতিনাথ বলিলেন, "আমার মার কাছে শুনলুম তুমি নাকি আরও একদিন এবাড়ীতে এসেছিলে, কিন্তু সেদিন আমি বাড়ী ছিলুম না, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।"

নিরঞ্জন নম্রভাবে বলিল, "তিনি আমায় রবিবার ছাড়া আর যে কোনদিন আসবার কথা বলে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন তিনি আপনাকেও আমার কথা বলে রাখবেন।

রতিনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি। কিন্তু আমি একটু মুস্কিলে পড়েছি কেননা আমার অফিসে এখন কোন কাজ খালি নেই তবে হ্যাঁ, মা যখন কথা দিয়েছেন তখন আমায় তোমার একটী কাজ যোগাড় করে দিতেই হবে। আমার একটী বন্ধুর ছেলে সুশীল একটা অফিস খুলছে শুনেছি, সে প্রায়ই আমার কাছে আসে, আজও আসবার কথা আছে। আমি ভেবেছি সে এলেই আমি তার কাছে তোমার কথা বলব, আমার বিশ্বাস তার ওখানে তোমার কাজ নিশ্চয়ই হবে।"

নিরঞ্জন হতাশ হইয়া পড়িল। সে দিন হইতে সে আশা করিয়া আছে, রতিনাথবাবু তাহার একটী কাজ নিশ্চয়ই দিবেন। কে সেই সুশীল, কোথায় তাহার অফিস, কিসের অফিস, সে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে কিনা তাহাই বা কে জানে।

তাহার মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "তুমি তার জন্যে হতাশ হয়ো না, আমি জানি সুশীল আমার অনুরোধ,—তার দিদিমণির অনুরোধ ঠেলতে পারবে না। কতদূর পর্য্যন্ত পড়েছ, আর কোথাও কাজ করেছ কি না—"

নিরঞ্জন শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "বি, এ, পড়েছি—একজামিনে ফার্ষ্ট হয়ে পাশও করেছি, কিন্তু চাকরীর বাজারে তার কোন দাম নেই। এখন মনে হয়—যে পয়সাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ডিগ্রি কিনতে ঢেলেছি, সেটা যদি থাকত তবু আজ একটু উপকার হতে পারত। চাকরী দু এক জায়গায় দু'চার দিনের জন্য করেছি মাত্র, স্থায়ী কাজ কোথাও পাই নি।"

রতিনাথ মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "তুমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কথা বললে সেটা বাস্তবিক সত্য। বড় চাকরী এককালে ডিগ্রির জোরে মিলত বটে। আর বড় চাকরী পাওয়ার লোভে বাঙ্গালী বাস্তবিক সব কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে—এমন কি পেটে না খেয়ে পর্য্যন্ত ডিগ্রি নেওয়ার চেষ্টা করেছে, এখনও করছে। এত ছেলে যে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে এদের সকলেরই লক্ষ্য চাকরী, দাসত্বের নেশা এদের এমন পেয়ে বসেছে যে এরা আর নূতন কোন কিছু করবার কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারে না। দেশের জমিগুলো দিন দিন অনুর্ব্বর হয়ে উঠছে, গো-বংশ ধ্বংস হয়ে আছে,—পেটে খেতে পাচ্ছে না, কাপড় পরতে পারছে না—তবু এরা এদিক পানে চাইতে পারে না। কেন—চাকরী করার চেয়ে সম্মানের সঙ্গে নিজের মাঠে চাষ করা কি মন্দ, কাপড় বোনা কি শক্ত; দেশের ভবিষ্যৎ আশা কচি ছেলেগুলো যে এতটুকু হতে দুধ খেতে না পেয়ে শুকিয়ে যায়, তাদের মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর হয়ে পড়ে,—তাদের জন্য গো-পালন করা কি খারাপ?"

নিরঞ্জন খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখুন যা বললেন সবই সত্য; যদি নিরেট মূর্খ হতুম, শিক্ষার বীজ যদি উর্ব্বর মাথায় না বোনা হতো, গরু পুষতে পারতুম, মাঠেও চাষ দিতে পারতুম, চরকায় সুতো কেটে কাপড়ও তৈরী করতে পারতুম। কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষাই না আমাদের জানিয়েছে ও সব ছোটলোকের কাজ, শিক্ষিত ভদ্রলোক চাকরী করে খেতে পারে—মাঠে চাষ করতে যেতে পারে না।"

রুষ্টভাবে রতিনাথ বলিলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণই ওই। এর কাজটা কি রকম জানো—অতি ধীরে কেন না হঠাৎ যদি কোন সংস্কার উচ্ছেদ করতে যাওয়া যায় তার ফল ভাল হয় না, কিন্তু আস্তে আস্তে দুদিনের জায়গায় দু বছর লাগালে ঠিক ফল দেবেই। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের মুখে বিষের বাটী ধরেছে, এ বিষে একেবারে মারবে না, তাকে জর্জ্জর করে ধীরে ধীরে হত্যা করবে। তুমি প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষ্য করে দেখ ওদের এই নীতিটা বেশ দেখতে পাবে, ধীরে ধীরে আমাদের যা কিছু একদিন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হতো, তার পরে কি রকম বিদ্বেষ এনে দিচ্ছে, আর ওরা—"

দরজার পর্দ্দাটা একটীবার কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পরই পর্দ্দা সরাইয়া একটী ইউরোপীয়ান পরিচ্ছদে সজ্জিত যুবক প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া রতিনাথ বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, তুমি এসেছ সুশীল, এই আর একটু আগেই তোমার নাম করছিলুম।"

নিরঞ্জন ঘামিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সে মুখ নত করিল। তাহার মনে হইতেছিল কোন ক্রমে এ স্থান ত্যাগ করিতে পারিলে সে এখন বাঁচিয়া যায়, পরিচিতের সম্মুখে অপদস্থ হইতে হয় না।

সেই সুশীল—সে আজ সৌভাগ্যের উচ্চশৃঙ্গে বসিয়া, আর তাহারই সহপাঠি সে, সে আজ কোথায়? সুশীল তাহার বাল্যবন্ধু স্কুলে তাহারা বরাবর একত্রে পড়িয়াছিল, তাহার পর ম্যাট্রিক পাশ করিয়া একই কলেজে তাহারা দুই বৎসর একত্রে পড়িয়াছিল, আই এ পাশ করিয়া সুশীল বিলাতে চলিয়া গিয়াছিল, সে আজ চার বৎসর পূর্ব্বের কথা মাত্র।

অদৃষ্ট চক্রের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সুশীল যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু নিরঞ্জনের শুধু ভাগ্যই পরি-

হয় নাই, তাহার আকৃতির পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে যাহাতে সুশীল অপরিচিত বোধে হঠাৎ নিমিষের দৃষ্টি লাভে তাহাকে চিনিতে পারিল না।

পরের কাছে দীনতা জানানো তবু সম্ভব বোধ হয়, কিন্তু আত্মীয় বন্ধুর নিকটে কিছুতেই মাথা নত করিতে পারা যায় না। একদিন, যে সুশীলের পার্শ্বে বন্ধুরূপে সে দাঁড়াইয়াছে, আজ তাহাকে প্রভু স্বীকার করিয়া তাহার আসনের নীচে সে বসিবে কি করিয়া, এ কল্পনাও যে অসহ্য।

সুশীল অপরিচিত এই লোকটীর পানে মোটে দৃষ্টিপাত করে নাই বলিলেই হয়। সে রতিনাথকে নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া তাঁহার কাছেই বসিয়া পড়িল, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "যাই বলুন—রাজার নিজের দেশটী বেশ, বারমাসই ঠাণ্ডা, গরম কাকে বলে তা কেউ জানে না। এই সকাল বেলাই এ দেশে কি গরম দেখেছেন ঘেমে যেন স্নান করে উঠেছি।"

একটু হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "বৈশাখ মাস গরম পড়বারই কথা। পল্লীগ্রামের দিকে যাও এখানকার চেয়ে একটু ঠাণ্ডা বোধ হবে। সহরের মধ্যে অসহ্য গরমে টেঁকা যখন দায় হয়ে ওঠে, তখন পল্লীগ্রাম বেশ ঠাণ্ডা মনে হয়।"

সুশীল বলিল,—"অন্য বছর আপনাদের অফিস দার্জ্জিলিংয়ে উঠে যায়, এ বছর গেল না কেন?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া রতিনাথ বলিলেন, "কর্ত্তাদের ইচ্ছা, আমাদের কথাতো ওখানে খাটে না, ওরা যা খুসী তাই করে যাবেন আমরা কেবল হুকুম মেনে যাব বইতো নয়, হাজার দু হাজারই মাইনে পাই না, তবু আমরা সেই চাকর, হুকুম তামিল করা ছাড়া ওদের মনস্তুষ্টি করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই!"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুশীল বলিল, "যাই বলুন, এমনভাবে নিজের সত্তা বিসর্জ্জন দিতে বাঙ্গালীরা যত বেশী পারে আর কেউ তত পারে না। সমস্ত বাঙ্গালী একসাথে কোন দিন মিলতে পেরেছে—না পারবে? আজকে দেশে এই একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড পড়ে গেছে, এতে সকলেই কি যোগ দিয়েছে? যারা সরকারের চাকরী করে তারা ভয়ে জড়সড়, পাছে কিছু হয়, পাছে চাকরী যায়। এমনি করে হুকুম তামিল করতেই এরা অভ্যস্ত, একদিন যদি হুকুম তামিল না করতে পারে—তাদের জীবনটাই দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে।"

রতিনাথ একটু হাসিলেন, পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তুমি যা বলেছ সেটা বাস্তবিকই ঠিক কিন্তু—

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, "আবার মজা দেখুন—ওদের দেশে ওদের সঙ্গে মিশলে এ রকম ভাবটী দেখা যায় না, ওরা ঠিক নিজের মতই আপনাকে দেখবে, কিন্তু এদেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবটা এমন বদলে যায় যে আপনি তখন ভাবতেই পারবেন না তার সঙ্গেই আপনার সেখানে এত ভালবাসা ছিল! এখানে এসেই সে আপনার সঙ্গে প্রভু ভৃত্য সম্পর্কটা জাগিয়ে তুলবে, তার সমান হয়ে পাশে দাঁড়ানোর অধিকার আর আপনার থাকবে না।"

রতিনাথ বলিলেন, "সেটা এদেশের জল হাওয়ার দোষ। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ কথা চলন আছে লঙ্কায় যে আসে সেই রাক্ষস হয়, কথাটায় মিথ্যে বাস্তবিকই নেই, তার প্রমাণ আমরাও অহোরাত্র পাচ্ছি। ওদের দেশ স্বাধীন, পরাধীন নয়, তাই নিজের দেশের আব-হাওয়ার মধ্যে থেকে পরের মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে ওরা যথেষ্ট সচেতন থাকে। এদেশ পরাজিত, এদেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনভাব ওদের দূর হয়ে যায়; পরাজিতের পরে বিজেতার যে হীন মনোবৃত্তির ভাব জেগে ওঠে তার জন্যে ওদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, মানুষের স্বভাবজ ধর্ম্মই এই যাকে আমি দু কথা শুনিয়ে দিতে পারি তাকে তা শুনাতে আমি ইতস্ততঃ করিনে। যারা আমার অধীনে কাজ করে তারা আমাদেরই দেশের লোক, তার জাতি ধর্ম্ম, আমার জাতি ধর্ম্ম সবই এক, তবু সে আমার অধীনে কাজ করে বলেই আমি নিজের প্রভুত্বটুকু বজায় রাখতে—নিজের সম্মান-টুকু পুরাদস্তুর আদায় করে নিতে ভুলিনে। সেইটুকুই যেন আমার লক্ষ্য আমার বড় কাজের সার্থকতা।"

সুশীল অন্যমনস্কভাবে ঘুর্ণায়মান ইলেকট্রিক পাখার পানে তাকাইয়াছিল। রতিনাথ বলিলেন, "আশা করেছি তোমার জ্ঞান সার্থক হয়ে তোমার মধ্যে এ ভাবটা জাগাবে না। তোমার অফিসে কি রকম চলছে বল দেখি?—"

সুশীল সংক্ষেপে উত্তর দিল, "মন্দ নয়।'

রতিনাথ বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটী কাজের প্রার্থী হয়ে আমার কাছে এসেছেন, আমি ওকে আশা দিয়েছি তোমার অফিসে যাতে কাজ হয় সে চেষ্টা করব। বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছেন, দুই এক জায়গায় অস্থায়ীরূপে কাজও করছেন। তোমার অফিসে একটু বিচিত্রতা আছে, অত বড় একটা ব্যাপারে তুমি ভারতীয় ছাড়া আর কারও সাহায্য নাও নি সেই জন্যেই আমি একে আশা দিয়েছি, স্বজাতীয় একে তুমি ফিরাবে না।

সুশীল এতক্ষণে মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিল, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"নিরু না?"

নিরঞ্জনের মুখে বড় মলিন একটু হাসির রেখা জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আমিই বটে।"

সুশীল লাফাইয়া উঠিল—"আমায় ক্ষমা করতে হবে, আমি তোমায় মোটেই চিনতে পারি নি। না খেয়ে খেয়ে চাকরীর জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে যা চেহারা করেছ তাতে আমি কেন—চার বছর পরে যদি তোমার বাবাও তোমায় দেখ্‌তেন চিনতে পারতেন না।"

প্রবল আকর্ষণে নিরঞ্জনকে তাহার প্রশস্ত বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া দুই একটা ঝাঁকানি দিয়া সুশীল বলিল, "তোমার মত অকৃত্রিম বন্ধু পেলে আর আমি কাউকেই চাই নে। বস এই চেয়ারটায়।"

নিজের পার্শ্বের চেয়ারটায় সে জোর করিয়া নিরঞ্জনকে বসাইয়া দিল।

রতিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তবে আর কি, তোমরা যখন বন্ধু—" মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সুশীল বলিল, "বন্ধু বলে বন্ধু, ওকে আমার জীবনদাতা বলুন। স্কুলে যখন পড়তুম যত অন্যায় কাজ করতুম তার দরুণ যত শাস্তি সব বয়েছে নিরু, আমায় এত তফাতে রাখত যে কেউ জানতেও পারত না যত অকাজ আমার দ্বারাই হয়েছে। ওর পিঠখানা খুলে দেখুন—বোধ হয় হেডমাষ্টারের বেতের দাগগুলো এখনও পিঠে রয়েছে।"

বলিতে বলিতে সে নিরঞ্জনের পিঠ চাপড়াইতে লাগিল।

রতিনাথ বলিলেন, "শুনে সত্যই আমার খুব আনন্দ হল। তা হলে আমি এখন নিশ্চিন্ত—তোমার বন্ধুর জন্যে আর আমায় ভাবতে হবে না,"

উৎফুল্ল মুখে সুশীল বলিল, "কিছু না, কি বল নিরু?

নিরঞ্জন কেবল একটু হাসিল।

(৫)

সুশীল কেবলমাত্র অফিসে পৌছাইয়াছিল, সেই সময় আর্দ্দালী আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দরকার আছে?"

বিনীতভাবে সে বলিল, "হ্যাঁ সাহেব।"

একখানা কার্ড সে সুশীলের হাতে দিল, তাহাতে নাম লেখা আছে, মিস ইরা দাস।

চকিতে সুশীলের মনে পড়িয়া গেল মিস ইরা দাস দুইদিন আগে টাইপের কাজের দরখাস্ত করিয়াছিল, সে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়াছে, এবং অবিলম্বে তাহাকে অফিসে আসিয়া দেখা করিতে বলিয়াছে।

নিরঞ্জন অফিসে ছিল, সুশীল আর্দ্দালীর হাতে কার্ড দিয়া বলিল, "ম্যানেজার বাবুকে নিয়ে গিয়ে দাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি। বাবুকে বল গিয়ে যে মেয়েটী এসেছেন তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন।

বাহিরে কোথায় কাজ ছিল, তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিল।

হাতের কাগজপত্রগুলা নিজের অফিস রুমের টেবলে ফেলিয়া সে নিরঞ্জনের নিকটে চলিল।

নিরঞ্জনের ঘরে গোল টেবিলটার একপাশে বসিয়া নিরঞ্জন লিখিতেছিল, অপর পাশে বসিয়া একটী মেয়ে সেদিনকার সংবাদপত্রখানা দেখিতেছিল। সুশীল প্রবেশ করিতেই সে সসম্মে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাত দু'খানা কপালে ঠেকাইল। সুশীল প্রত্যভিবাদন করিয়া শ্রান্তভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, বলিল "বসুন আপনি। কি রকম গরম দেখেছ নিরঞ্জন, পথে বার হওয়ার যো নেই। এইটুকু পথ হেঁটে গেছি, তবু তো পায়ে জুতো আছে—তাতেই প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে। কত গরীব লোক যে শুধু পায়ে পথ হাঁটছে কি করে আমি তাই ভাবছি।"

চাপা হাসি হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "ওরা হাঁটছে পেটের দায়ে, মটরে উঠে বেড়ানোর অদৃষ্ট তো সবাই নিয়ে আসে না, এমন কি পয়সা খরচ করে ট্রামে বা বাসে উঁ

ক্ষমতাও সকলের নেই, কাজেই ওই পিচ গলা রাস্তাতে লাফাতে লাফাতেও তাদের হাঁটতেই হয়—নইলে খেতে পাবে না।"

"উঃ কি দুঃখময় জীবন—" সুশীল শ্রান্ত ভাবে চেয়ার হেলান দিল।

নিরঞ্জন হাসি চাপিয়া বলিল, "এখন তোমার ভাব বৈচিত্র্য রেখে দিয়ে আসল কাজের কথা বল। ইনি মিস ইরা দাস, সেদিন টাইপের জন্য এখানে দরখাস্ত করেছিলেন, তুমি এঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছ। মিসেস ব্রাউনের বিশেষ পরিচিতা তোমার গার্জেন মিঃ রায় তাঁর বিশেষ বন্ধু তিনি একখানি পত্র লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মেয়েটী বিনীত ভাবে একখানা পত্র বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

মিঃ দেব নারায়ণ রায় ইংলণ্ডে রহিয়াছেন, তাঁহার কন্যা ইন্দিরাও তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। মিঃ রায়ই সুশীলকে, ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন, নিজের অসীম ধনসম্পত্তি ভবিষ্যৎ জামাতার হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মিসেস ব্রাউন দেবনারায়ণ রায়ের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। ইন্দিরাকে তিনি স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন, তাহার জন্য সুশীল তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল।

সুশীল পত্রখানা তুলিয়া লইল: মিসেস ব্রাউন লিখিয়াছেন মিস দাসকে তিনি সুশীলের নিকট পাঠাইতেছেন তিনি আশা করেণ, এখানে মিস দাস সম্মানের সহিত কাজ করিতে পাইবে। এই মেয়েটী টাইপ এবং সার্টহাণ্ডের কাজ খুব সুন্দর জানে, তিনি আশা করেন ইহার দ্বারা সুশীলের উপকার ছাড়া অপকার হইবে না।

সুশীল অন্যমনস্ক ভাবে পত্রখানা মুড়িতে মুড়িতে মিস দাসের পানে চাহিল।

শ্যামবর্ণা মেয়েটী—বয়স বাইশ তেইশ হইবে, লম্বা—রোগা ধরণের আকৃতি। মাথা ভরা কালো চুল, বেণীর আকারে পিছনে জড়ানো আছে; যদিও মাথায় সামান্য একটু কাপড়ের আবরণে লুকাইত তথাপি উপর হইতে দেখিয়াই তাহার পরিমাণ বেশ বুঝা যায়। বড় বড় দুইটী চোখে শান্ত স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিতেই যেন তাহার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। পরণে সাদাসিদা হাত কাটা একটী ব্লাউজ, একখানি কালা ফিতা সাড়ি, পায়ে অল্প মূল্যের লেডিস্ সু। অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না; কানে দুইটী ক্ষুদ্র ইয়ারিং হাতে দুইগাছি করিয়া সরু সোণার চুড়ি।

তাহার বেশভূষা অতি সামান্য কিন্তু ইহাতেই তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সুশীল পলকের দৃষ্টিপাতে তাহাকে দেখিয়া লইয়া চোখ ফিরাইয়া বলিল, "ব্রাউন যখন আপনাকে পাঠিয়েছেন তখন আপনার এখানে কাজের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করতে হবে না। আপনি আজ হতে এ অফিসে কাজ করতে আরম্ভ করুন। তার আগে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি; আমরা যে কাজটা আরম্ভ করেছি আমি এর প্রকৃত মালিক নই। মিঃ দেব নারায়ণ রায় যতদিন ইংলণ্ড হতে না ফিরে আসেন ততদিন আমিই এর কর্ত্তা, তিনি ফিরে এলে সমস্তই তাঁর হাতে যাবে। আপনার বেতন সম্বন্ধে—"

মিস দাস মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মিসেস ব্রাউনের কাছে সে কথা শুনেছি, এখানে চল্লিশটাকা করে বেতন পাবো।"

সুশীল বলিল, "উপস্থিত তাই বটে তবে আমাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আপনার বেতনও বাড়িয়ে দেব, আমরা—ভরতীয়েরা ব্যবসাবণিজ্যের প্রণালী ইউরোপীয় ধারায় গঠন করে সেই ধারাটা চালাতে চাই। যে নূতন পথে চলেছি—ছয়টী মাস গেলে ঠিক বুঝতে পারব। আমাদের কোম্পানীর নাম মেরিন ট্রেডিং কোম্পানী। এর অংশীদার ভারতীয় কর্ম্মচারীরাও ভারতীয়, বিদেশীকে এর সঙ্গে জড়াতে নেব না। ইউরোপীয় যে কোন জাতি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে—আশাতীত উন্নতিও লাভ করে, কিন্তু এ দেশের লোকেরা কেন তা পারে না আমি একবার সেইটাই পরীক্ষা করতে চাই।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "অবশ্য যার কাজ তিনি জানেন না আমি এই নূতনতর ধারায় কাজ করতে আরম্ভ করেছি। যদি উন্নতিলাভ করতে পারি তা হলে তাঁর মনের সংস্কারটা দূর হয়ে যাবে। বুঝেছ নিরু, আমি একদিন তাঁকে আমার কল্পনার এতটুকু আভাস দিয়েছিলুম, কিন্তু তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন ভারতীয়দের দ্বারা কিছু হয় নি, হবে না। আমি তখন মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতি জাতির কথা তুলেছিলুম, তিনি বলেছিলেন তবু

ওরা পারবে কিন্তু বাঙ্গালী কোনদিন কিছু পারবে না। আমারও তাই জিদ পড়ে গেছে, আমি আমার কাজ কেবলমাত্র ভারতীয়দেরই দেব, বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকেও বাদ দেব না।"

মিস দাস প্রশংসমান দৃষ্টিতে এই দীর্ঘ দেহ সুপুরুষ যুবকটীর মুখের পানে চাহিল, শান্তকণ্ঠে বলিল, "বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকে মানুষ করবার জন্যে আপনি যে যত্ন চেষ্টা করছেন তাতে যদিও প্রশংসার কিছু নেই কারণ এটা করা সকল বাঙ্গালীরই উচিত তবু প্রশংসা করি কারণ উচ্চশিক্ষিত কেউই এ রকম করে দেশের পানে জাতির পানে তাকান না। আমি খৃশ্চান হলেও বাঙ্গালী, আমার বাপ মা পূর্ব্বপুরুষ সবই বাঙ্গালী। বাঙ্গালা আমার জন্মস্থান, আমি বাঙ্গালাকে আন্তরিক ভালবাসি। আপনি বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক মুছিয়ে দিয়ে যে রকম চেষ্টা করছেন, যে প্রতিষ্ঠানটী গড়ে তুলছেন, আপনার দেখাদেখি আরও পাঁচজন শিক্ষিত বাঙ্গালী এইরকমভাবে এই জাতিকে সংঘবদ্ধভাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করবেন, বাঙ্গালীকে একটা জাতি নামে পরিচিত করবার চেষ্টা করবেন।"

নিরঞ্জন একটু হাসিয়া বলিল, "আপনাদের মনের ইচ্ছা খুবই মহৎ তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে কি, অনেক সময়ে মনের ইচ্ছা কাজে পরিণত করা যায় না। একদিন বাঙ্গালী জাতি নামে পরিচিত হবে কিন্তু তা ব্যবসার দিক দিয়ে নয়—অন্য দিক দিয়ে। ব্যবসার কাজে বাঙ্গালী এখনও নাবালক রয়েছে, মাথা পাকাতে এখনও অনেক দেরী রয়েছে।"

উত্তেজিতভাবে সুশীল বলিল, "তুমি কি চাও বাঙ্গালী চিরদিনই পেছনে পড়ে থাকবে, বাঙ্গালী কোনদিন সগৌরবে মাথা তুলে জগতের মাঝখানে নিজের জাতীয়তা প্রমাণ করতে পারবে না? এই শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ, এই দেশে যতটা আয় এত আর কোন দেশে হয় দেখাতে পার?"

মৃদু মৃদু হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "ধীরে বন্ধু ধীরে। শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে আর আছে কি? মাঠগুলো ধূ ধূ করছে, নদী খাল বিল কচুরী পানায় ভরে গিয়ে ম্যালেরিয়ার বিষ সঞ্চয় করছে, তবু বলতে চাও শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে নেই কি? হ্যাঁ, তবু এতে আয় হয়। মাঠে ফসল উৎপন্ন না হলেও কৃষককে খাজনা দিতে হয়, পেটে না খেয়েও খাতককে মহাজনের দেনা শোধ করবার জন্যে মাথা গুজবার স্থানটুকু বিক্রি করতে হয়। হ্যাঁ—তবু আয় আছে বই কি, বাংলা সরকারের একটা প্রধান আয়ের যন্ত্র, যত ঘুরায় ততই টাকা পড়ে একথা অস্বীকার করতে পারব না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীল বলিল, "বাংলার প্রকৃত রূপটাকে তুমি দেখলে কোথায় নিরঞ্জন?"

নিরঞ্জন বলিল, "দেখবার অভাব? তোমরা কলকাতার বাইরে হয়তো যাও না, যদিও যাও সেই রকমভাবে যাও যাতে নিজেদের দিক ছাড়া অপর দিকে দৃষ্টি পড়ে না। তোমরা অনেক সময় সখের খাতিরে পল্লীগ্রামে বেড়াতে যাও, কিন্তু সেখানে কতটুকু দেখতে পাও বল দেখি? সবুজ ধানের ক্ষেত দেখতে যাও, পাঁচ ক্রোশ মাঠের মাঝখানে বিঘাখানেক সবুজধানের ক্ষেত দেখে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠ কিন্তু সে যে কতটুকু তা তো দেখ না। নদী দেখতে যাও, কলকাতার গঙ্গা দেখে দেশের যাবতীয় নদী সম্বন্ধে ধারণা করে নাও, কিন্তু সে কথাতো ভাবনা নিজেদের স্বার্থের জন্যে সরকার এই দিককার গঙ্গা পরিষ্কার রেখেছে কিন্তু অন্যদিকে এই গঙ্গাই বন্ধ হয়ে এসেছে, অন্য সব নদীর কথা দূরে থাক। তোমরা দেখতে পাও শুধু ওপরটা, ভেতর তো কোনদিন দেখ নি, হয়তো দেখতে পাবেও না।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল—"না, অনর্থক বাক্যব্যয় করার আর দরকার নেই। তুমি বস সুশীল, আমি মিস দাসকে ওঁর কাজগুলো বুঝিয়ে দিয়ে আসি।"

সঙ্গে মিস দাসও উঠিয়া দাঁড়াইল। সুশীল একটা হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিল, "ওঁকে বুঝিয়ে দিয়ে এসো তারপর তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

তাহাকে অভিবাদন করিয়া মিস দাস নিরঞ্জনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

মিনিট কুড়ি পঁচিশ পরে নিরঞ্জন ফিরিয়া আসিল। টেবলের উপরিস্থিত ছড়ানো কাগজ-পত্রগুলো গুছাইয়া এক করিতে করিতে বলিল, "মেয়েটী বেশ চালাক

খুব কর্ম্মঠ তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। এর আগে যে টাইপিষ্ট ছোকরাটী ছিল সে কোনকাজ বুঝতে পারত না, কিন্তু একে একবার দেখিয়ে বলে দিতেই বেশ বুঝে গেল দেখলুম।"

সুশীল গম্ভীরভাবে বলিল, "তা তো বুঝল, কিন্তু এই এতগুলো পুরুষের মধ্যে একটীমাত্র মেয়ে টাইপিষ্ট আমার যেন কি রকম বোধ হচ্ছে।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "ভয় হচ্ছে?"

সুশীল তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিয়া হাসিল, গর্ব্বিতভাবে বলিল, "ভয় নয়। জানইতো আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, মিস ইন্দিরা আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী, আর সেই জন্যেই মিঃ রায় এতটা সম্পত্তি নিঃসঙ্কোচে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। ইন্দিরাকে যদিও তুমি দেখনি, কিন্তু তার ফটো দেখেছতো তার কাছে মিস দাস দাঁড়াতে পারে?"

নিরঞ্জন বলিল, "তবে? স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে থাকতে হবে বলে কুমার হৃদয় বুঝি সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে, অথবা মিস রায় কি ভাববেন সেই ভয়ে—"

সুশীল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মিস রায় ওকে দেখলে সে ভয় করতে পারবে না। তবুও পাছে আর কেউ কিছু বলে তাই ভাবছি।"

নিরঞ্জন বলিল, "তবে নিশ্চিন্তে থাক। আজ কাল অনেক মেয়েই পুরুষদের সঙ্গে মিশে কাজ করতে যায়, তা হলে সে রকম জায়গায় পুরুষদের কাজ করতে না যাওয়াই উচিত। বিলেতে যে স্ত্রী পুরুষে একত্রে কাজ করে তার বেলায় তোমাদের মনে এতটুকু দ্বিধা ভাব জাগতে পারে না, বরং সেই সাম্যভাবে তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাও, যত দোষ হল কি এই দেশের বেলায়?"

সুশীল উত্তর না দিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "তা হলে তুমিই সব দেখা শুনা কোর আমি চললুম।"

সে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

আকাশ নিবিড় মেঘে ছাইয়া আসিয়াছে, বহুকাল পরে দারুণ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের পর মেঘের এই ছায়াটুকু বড়ই প্রীতিপদ বলিয়া বোধ হইতেছে।

গেটের সম্মুখে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটা লাল ফুলে ভরিয়া উঠিয়া অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। ছোট ছোট পাখীগুলা ফুলের উপর বেড়াইতে কচিৎ দুই একটা পাপড়ি খসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। অনতিদূর পথ হইতে চলন্ত ট্রামের মোটরের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। মনীষা স্নানান্তে পূজার ঘরে যাইতেছিল, লাল ফুলে ভরিয়া উঠা সুন্দর গাছটার পানে একটীবার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিল না। রতিনাথ আহারান্তে খানিক আগে আফিসে গিয়াছেন, এতক্ষণে সময় পাইয়া মনীষা স্নানান্তে প্রত্যহ পূজাহ্নিক করিতে যায়। রতিনাথ বাড়ী থাকিতে তিনি তাহাকে শত অনুরোধ করিলেও সে নিজের কাজে যায় না, প্রত্যেক রবিবারে এজন্য সে পিতৃসম শ্বশুরের নিকট তিরস্কৃতও হয় বড় কম নয়।

আসল কথা পূজাহ্নিক সারিতে তাহার প্রায় দুইঘণ্টা সময় লাগে। প্রত্যহ পূজাহ্নিক সারিয়া নিজের অন্যান্য কাজ সারিয়া যখন সে আহার করিতে বসে তখন দুইটা বাজিয়া যায়। বাড়ীর দাস দাসী সকলের খাওয়া হইল কিনা, কাহার অসুখ করিয়াছে এই সব দেখাশুনা তাহার নিত্য কর্ত্তব্য কাজ। রতিনাথ মনে মনে খুসি হইয়া উঠিলেও, মুখে অনুযোগ করিতেন, মনীষা হাসিয়া উত্তর দিত—ওরা পেটের দায়ে চাকরী করতে এসেছে বাবা, আহা,—ওরাও মানুষ তো। ওদের না দেখলে যে ভগবানের কাছে দোষী হতে হবে।"

প্রত্যহ শিবপূজা করা তাহার চিরন্তন নিয়ম। একজন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গঙ্গা মৃত্তিকা, ফুল বিল্বপত্র চন্দন ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিষ ঠিক করিয়া রাখিয়া যায়, কাজেই মনীষাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

আপন মনে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে মনীষা পূজার আয়োজন করিয়া লইল। স্বামীর ফটোখানি শিবলিঙ্গের পার্শ্বে রাখিয়া সে পূজা করিতে বসিল।

পূজা শেষান্তে সবে মাত্র সে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে সেই সময় হাসির শব্দ কানে আসিল।

আগন্তুক খানিক আগে আসিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সে দিকে পিছন থাকায় মনীষা দেখিতে পায় নাই।

"বাঃ, খাসা পূজো করতে শিখেছ যে মনীষা, তোমার এ বুদ্ধি কে দিলে জিজ্ঞাসা করি—।"

চমকাইয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া মনীষা দেখিল দরজার উপর দাঁড়াইয়া শশাঙ্ক।

মনীষার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "ঘরে গিয়ে বস দাদা আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি আমার পূজা হয়ে গেছে।"

শশাঙ্ক বলিল, এখানে দাঁড়ালেই বা কি হল? ভয় নেই, এই ম্লেচ্ছ লোকটা তোমার পূজোর ঘরে ঢুকে সব অপবিত্র করে দেবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

মনীষা সঙ্কোচের সহিত বলিল, "তা ওঘরে গিয়ে বসলেই বা কি ক্ষতি?

শশাঙ্ক বলিল, "এখানে দাঁড়ালেই বা কি ক্ষতি? অর্থাৎ কি জানো—কোন সেই ছোট বেলায় মায়ের কোল ছেড়ে বিধর্ম্মীদের সঙ্গে থেকে তাদের চেয়েও ঘোর পাষণ্ড হয়ে উঠেছি। তাদের তবুও একটা ধর্ম্ম আছে, আমার কিছু নেই, যে যখন যে দিকে টানে সেই দিকেই আছি—অর্থাৎ দরকার পড়লে খৃশ্চান মুসলমান ব্রাহ্ম হিন্দু—আর যাই বল সবই হই। কিন্তু আসল কি জানো—কোন ধর্ম্মই নেই নি, কাজেই পৈত্রিক ধর্ম্মটা কোন মতে টিকে আছে বলে মানতেই হবে, হয়তো মরব যখন তখন হরিবোল শব্দটাও হবে। সত্যি—পূজো কখনও দেখিনি,—নাস্তিক কিনা—চোখ বুজে কাণে হাত চাপা দিয়ে পালিয়েছি। আজ একটু না হয় দেখ্‌তেই দাও মনীষা পূজো জিনিষটা কি?"

দরজার ওদিকে দুখানা হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে দেখিতে লাগিল, মনীষা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছিল।

"ওটা কি ঠাকুর বল দেখি? যা করে আকন্দ ফুল আর ধুতুরা ফুল বেলপাতায় ঢেকে দিয়েছ তাতে তো ঠাকুরকে দেখে চেনার পথ রাখনি দেখছি। কি ঠাকুর বল দেখি?"

মনীষা উত্তর দিল না।—

শশাঙ্ক একটু ভাবিবার ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ, বুঝেছি, তোমায় বলার লজ্জা হতে মুক্তি দিচ্ছি মনীষা, শিব ঠাকুর ছাড়া আর কোন ঠাকুরই তো বেলপাতা আকন্দ ধুতুরা ফুল ভাল বাসেন, না, কাজেই ওটিযে স্বয়ং শিব তা বুঝতেই পারছি।"

মনীষা, একটু হাসিয়া বলিল, "আমার পূজা হয়ে গেছে, চল ও ঘরে যাই।"

সে উঠিয়া পড়িল।—

শশাঙ্ক বলিল, "রোসো রোসো, আর একটু দেখে নেই। অসভ্য ভেবনা মনীষা, নেহাৎ দেখিনি বলেই এমন করে খুঁটিয়ে দেখছি। তারপর—ওখানা কি বই—এখানে নভেল নাটকও আসে নাকি?"

মনীষা বলিল, "নভেল নাটক পড়ার সময় কোথায়, জানই তো সংসারে আমার কত কাজ, কাজ বাড়ছে ছাড়া কমছে না তো। ওখানা নভেলও নয় নাটকও নয়, ওখানা গীতা।"

শশাঙ্ক যেন চমকাইয়া উঠিল—"এঃ, আবার গীতাও পড়তে সুরু করেছ। বুঝলে মনীষা, ও সব এ যুগের বই নয়, ওর যুগ চলে গেছে, ও সব এখন চালিয়ো না।"

মর্ম্মাহত হইয়া মনীষা বলিল, "চলে যায়নি দাদা, ওর যুগ আছে, চিরকাল থাকবেও। তুমি পড়নি এ কথা বলতে পার, পড়বে না এ জোরও করতে পার, কিন্তু আর কেউ যে পড়বে না এ কথা বলা চলে না।"

শশাঙ্ক বলিল "আমি পড়ব না, একথা বলতে পারিনা। তবে—

মনীষা বলিল, "তবে পড়ে ফেল, অনেক কিছুই জানতে পারবে, বুঝতেও পারবে।"

গম্ভীর মুখে শশাঙ্ক বলিল, "হুঁ, এইবার পড়তে হবে। বইখানা ও ঘরে নিয়ে যাবে মনীষা, ওখানা উদরস্থ করা চাই। সব কিছুই তো উদরস্থ করেছি, ওখানা আর বাকি রাখি কেন? এরপর দরকার পড়লে কোন হিন্দু মহাসভায় খানিক খানিক উগরে ফেলতে পারব।"

বলিতে বলিতে সে অত্যন্ত খুসি ভাবে হাসিতে লাগিল।

তাহার হাসিতে মনীষা আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। অনেকগুলা কথা তাহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল; কয়েক বৎসর পরে শশাঙ্ক আসিয়াছে, এখন কোন শক্ত কথা বলা উচিত নহে।

মনীষা কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিল, তাহার পর চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দাদা, সত্যি বল দেখি—সত্যিই তুমি ভগবানকে মান না?"

শশাঙ্ক মাথা দুলাইয়া বলিল, "মানব কি করে, এমন কি প্রমাণ আছে যাতে ভগবান বলে কেউ আছে মেনে নেব ?"

মনীষা বলিল, "তবে এই যে সৃষ্টি—"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল, "সব প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি, এর মধ্যে কারও হাত নেই। কল্পনা বাগীশ কতকগুলো লোক এই কতকগুলো সৃষ্টি করছে ; যা স্বভাবতঃ হয়—ওরা দেখতে চায় ভগবান নামে কেউ আছে যে এই সব করছে। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি মনীষা, যদি ভগবানই থাকবে—তবে মরা কেন বাঁচে না? জীবন দেওয়ার ক্ষমতা বাস্তবিকই যদি ভগবানের থাকে তবে এতটুকু প্রমাণ নাস্তিক কেন পায় না ?

মনীষা স্থিরকণ্ঠে বলিল, "হয়তো কোনদিন এ প্রমাণ মিলতে পারে দাদা। জীবের জীবন যা তাকে দেওয়া হয়েছে তার একটা সীমা আছে, সেই সীমার একচুল এ দিক ও দিক হওয়ার শক্তি জীবের নেই। সেই সীমাটুকুর মধ্যে আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হয়তো এমন কোন প্রমাণ পেতে পারি যাতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হব-ভগবান সত্যিই আছেন, প্রকৃতিও তাঁর হাতের সৃষ্টি, তার হাতে এই কাজের ভার দিয়ে তিনি সর্ব্বদাই দেখছেন! এখনও যার সত্য নিরূপণ করা যায়নি তার জন্যে প্রস্তুত হতে আমি তোমায় বলিনে। আমার বিশ্বাস আছে প্রমাণ আপনিই আসবে, তাকে জোর করে টেনে আনা চলে না।"

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিল, "হয়তো তোমার কথা একদিন ঠিক হতে পারে ; যদি ঠিক না হয় তার জন্যেও আমি ততটা উৎসুক হব না" একটু থামিয়া সে বলিল, "আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে কিছু করো না। তোমার ঠাকুরের পাশে একখানা ছোট ফটো দেখতে পেলুম ওখানা কার ফটো ?"

মনীষা উত্তর দিল, "আমার স্বামীর।"

তাহার দৃঢ়কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া শশাঙ্ক তাহার পানে চাহিল, হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কবে কার সঙ্গে কোন সেই ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল, যাকে চিনতে না চিনতে সে চলে গেল তবু তাকেই স্বামী বলে জানতে চাও মনীষা ?"

মনীষার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, চলিতে চলিতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, দৃপ্তনেত্রের দৃষ্টি শশাঙ্কের মুখের উপর স্থাপন করিয়া শান্ত সংযতকণ্ঠে বলিল, "তুমি নাস্তিক, বুঝতে পারবে না এ রহস্য কি রকম জটিল। তবে তোমায় এইটুকুই বলে রাখছি দাদা যে ধর্ম্মের ছায়ায় তুমি চিরকাল কাটিয়ে এসেছ, চিরদিন যাদের সঙ্গে মিশেছ, আমরা তার ছায়ায় যাই নি, তাদের সঙ্গে মিশলেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য তোমার মত বিসর্জ্জন দিতে পারিনি। আজ তুমি যে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করছ, এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারতে না যদি তোমার মা থাকতেন। মানুষ অনেক কিছুই তার মায়ের কাছ হতে শিক্ষা পায় এ কথা মান তো ?"

শশাঙ্কর মুখখানা মুহূর্ত্তমধ্যে মলিন হইয়া গেল, প্রায় তখনই স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিল, সে বলিল, "সে কথা খুব মানি। কিন্তু জানোই তো আমার জীবনটা কিভাবে কেটেছে। সাতমাস বয়স যখন তখন মা মারা যান, একবছরের সময় বাবা মারা যান, বাবার বন্ধুর কাছে গেলুম, অচিরে তিনি মারা গেলেন, তখন বয়স মাত্র পাঁচ বছর। তাঁর স্ত্রী আবার বিয়ে করলেন, আমায় বোর্ডিংয়ে দিলেন। আমার জীবনের ঘটনাতো তোমাদের কাছে গোপন নেই মনীষা।"

সে যে কতকটা রূঢ়ভাবেই কতকগুলা কথা বলিয়া গিয়াছে এজন্য মনীষা অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কোমল-স্বরে বলিল, "সব জানি দাদা, তোমায় আর সে সব পুরান কথা নতুন করে বলতে হবে না। ওদিকে আবার যাচ্ছো কোথায়, এই ঘরে এসো।"

অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া শশাঙ্ক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

গয়ায় একদিন

(ভ্রমণ)

শ্রীগিরিবালা দেবী

অগ্রহায়ণের মেঘস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আমরা গয়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। শীতের প্রারম্ভ—পশ্চিমের গাড়ী একেবারেই জন শূন্য। মাত্র দুইটি মহিলা আমাদের সহযাত্রী হইলেন। একটি তরুণী, অপরা বৃদ্ধা। তরুণীর স্বামী থিয়েটারের অভিনেতা। শরীর অসুস্থ বলিয়া কাশীতে জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন। সঙ্গের নেজুরটি অভিনেতার মাসীমা

গাড়ী ছাড়িবার পর সঙ্গিনীদের সহিত অল্প অল্প আলাপ করা গেল। বৃদ্ধা প্রতিকথায় "কাশীতে আমাদের বাড়ী আছে।" বলিয়া গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে কাশীর বাড়ীর বর্ণনা শুনিয়া আমি জানালার পাশে আশ্রয় লইলাম।

রাত্রি বাড়িবার সাথে সাথে মেঘের ঘোর কাটিয়া ম্লান জ্যোৎস্না-লোকে চারিদিক হাসিতে লাগিল। পাতলা কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃতির প্রফুল্ল কান্তি পরিস্ফুট হইল।

ধ্যানমূর্ত্তি বুদ্ধ

মোটা কম্বলে গা ঢাকিয়া আমরা সকলেই শয়ন করিলাম। রাত্রি চারিটায় ট্রেণ গয়া ষ্টেশনে পৌছিবে—কাজেই উৎকণ্ঠার সহিত জাগিয়া কবি সম্রাট রবীন্দ্রের 'যোগাযোগ'খানি পুনরায় পড়িতে লাগিলাম। ভাব সম্পদে ভাষার অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে অল্প সময়ের মধ্যেই অভিভূত হইয়া রহিলাম।

তিনটার পর আর যোগাযোগ লইয়া তন্ময় হইয়া থাকা চলিল না। সাথে আমার বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা, জিনিষপত্র সহকারে তাঁহাকে লইয়া নামিতে হইবে। কাজেই বিছানা বাঁধিতে হইল। রজনী শেষ হইলে তখনও শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় চরাচর হাসিতেছে। ঘনবৃক্ষশ্রেণীর শেষ সীমায় কাল পাহাড়গুলি পটে আঁকা ছবির ন্যায় আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে।

পথের একদিকে অগণিত গিরিমালা, অপর দিকে প্রান্তর—স্থানে স্থানে স্বল্প জলাশয়গুলি রূপার পাতের মত ঝক্‌মক্ করিতেছে।

বাঁশীর তানে চঞ্চল করিয়া রাত্রি চারিটায় ট্রেণ গয়া ষ্টেশনে থামিয়া গেল। আমরা নামিলাম।

গয়ার ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র। গাড়ী ঘোড়ার ভিড় যত না-হোক পাণ্ডার জনতা অনেক বেশী। কম্বলে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া দলে দলে পাণ্ডা শিকারে বাহির হইয়াছে। ঘৃতে দুগ্ধে পুষ্ট স্বাস্থ্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি গয়ালীরা ক্ষীণদেহী বাঙ্গালীর দেখিবার বস্তু।

একদল পাণ্ডা পরিবৃত হইয়া আমরা একটা সাঁকো পার হইয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম। পাণ্ডার দল চতুর্দ্দিক হইতে আমাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়া তুলিল। এক বাঙ্গালী পাণ্ডার নাম বলিয়া অতি কষ্টে আমরা তাহাদের নিকটে অব্যাহতি পাইলাম।

ষ্টেশন ছাড়াইয়া আমাদের গাড়ীখানি প্রশস্ত রাস্তায় গিয়া পড়িল। রাস্তার দুই পাশে দোকান, ইস্কুল, কলেজ, আদালত গৃহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। সমস্ত গয়া সহরটি চন্দ্র কিরণ মাখিয়া মহাসুপ্তিতে মগ্ন। অগণিত তারকা ও রাত্রি শেষের মলিন চন্দ্র আমাদের সঙ্গের সাথী হইয়া সাথে সাথে চলিল।
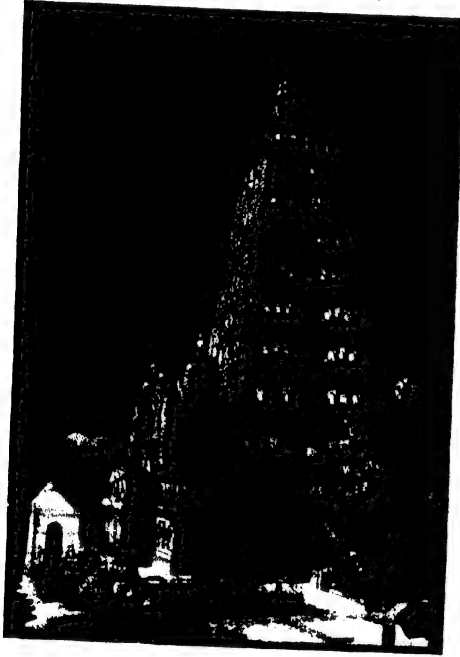
বৌদ্ধ-মন্দির (বুদ্ধগয়া)

ষ্টেশন হইতে আমাদের গন্তব্যস্থান বহুদূর। সেখানে পৌছিতে পৌছিতেই পূর্ব্বাকাশে উষার অরুণরাগ ফুটিবার আয়োজন করিতেছিল।

আমাদের পাণ্ডার নাম রাম ভট্টাচার্য্য, কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায় এখানে আসিয়া যাত্রী পরিচালনার কার্য্যে তিনি এখন বহু টাকার মালিক। আমরা যখন পাণ্ডার গৃহে উপনীত হইলাম তখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তাঁহার পরিচারকগণ আমাদিগকে খাতির করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। দাই হাতমুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল। দালানে অনেকগুলি নধরকান্তি গাভী বাঁধা দেখিলাম।

হাতমুখ ধুইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া আমি একটি বাতায়নে গিয়া বসিলাম। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত করিয়া কত কথা মনে পড়িতে লাগিল।

দুই বছর পূর্ব্বে আমার স্বর্গীয়া জননী এখনে দর্শনে আসিয়াছিলেন, তিনি এই ঘরটিতে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই গৃহ সেই সব আজও তেমনি রহিয়াছে, জগতের কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল মা আমাদের মধ্য হইতে অনন্ত কাল সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারই পদধূলিলিপ্ত স্মৃতি বিজড়িত কক্ষের সুশীতল মেঝেয় লুটাইয়া একবার 'মা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হইল।

(২)

সকলের মুখ হাত ধোয়ার পর আমাদের পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার পিতৃদেব পূর্ব্বেই আমাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ইঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া রামবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আমার শ্বশ্রূমাতার ব্যতীত গয়াতে আমাদের করণীয় কিছুই ছিল না। কথা হইল বেলা হইলে পাণ্ডা আমাদিগকে লইয়া স্নান দর্শনাদি করাইবেন।

পাণ্ডাকে বিদায় দিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া আমরা তখনই বেড়াইতে বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণের প্রথম হইলেও তখনি গয়াতে বেশ শীত পড়িয়াছে, পথে বাহির হইয়া শীতের প্রকোপ বেশ ভাল রূপেই বুঝিলাম।

সহরের চারিদিকে কত মন্দির দেবালয়, দেউড়ির রুদ্ধ দ্বার ভেদ করিয়া প্রভাতের মঙ্গল বাদ্য বাজিতেছে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া দ্রব্যাদি সাজাইতে ব্যস্ত। গয়ার প্রসিদ্ধ কষ্টি পাথরের দোকানে স্তরে স্তরে পাথরের বাসন সজ্জিত। এক পাথরের বাসন ভিন্ন এখানকার প্রস্তুত আর কোন দ্রব্য দেখা গেল না। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও ধূলায় ধূসরিত। অনেক দেশের অনেক অধিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্থান মাহাত্ম্যে দূর দূরান্তের যাত্রীদলের সমাবেশ হইয়াছে।

চারিদিক বেড়াইয়া বেলা নয়টার সময় আমরা বাসায়

ফিরিলাম। রামবাবু আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার ওখানেই আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন।

কিয়ৎকাল পর রামবাবুর সহিত বাহির হওয়া গেল। দাই সকলের কাপড় গামছা লইয়া সাথে চলিল।

রামবাবুর বাড়ী হইতে ফল্গু দূর নহে। একটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া আমরা ফল্গুতে উপনীত হইলাম।

সারি সারি সোপানে সজ্জিত বহুদূরব্যাপী ঘাট, ঘাটের চত্বরে দলে দলে লোক মুণ্ডিত মস্তকে নববস্ত্র পরিধান করিয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতেছে। সাধু প্রজ্বলিত ধুনীর সম্মুখে হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। ভিখারীরা উচ্চ চীৎকারে ভিক্ষা চাহিতেছে। কয়েকটা গাভী পরম উৎসাহে মানুষের হস্ত হইতে ফুল বেলপাতা কাড়িয়া খাইতেছে। ভিন্নকান্তি গয়ালীদের হুঙ্কারে, দরিদ্র যাত্রীগণের কাতর নিবেদনের সহিত ভিখারীদের ঐক্যতান মিশিয়া স্থানটী মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ফল্গুর পরপারেও বিপুল জনতা, সেখানেও যাত্রীগণ পিণ্ডদান করিতেছে। দুই তীরের কোলাহলের মাঝখানে ফল্গু তরঙ্গ তুলিয়া আপনার মনে বহিয়া যাইতেছে। জল এক হাঁটুর বেশী নহে, স্ফটিক স্বচ্ছ জলের মধ্যে হীরকচূর্ণের ন্যায় বালুকণা ঝিক্ মিক্ করিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র মৎস্য জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে জল সরিয়া গিয়া শুভ্র বালুকায় ভূষিত ছোট ছোট চরার সৃষ্টি হইয়াছে। চরার পাশ ঘেঁসিয়া এক একটী ক্ষীণধারা সরিয়া গিয়া জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। এই সেই অন্তঃসলিলা ফল্গু কাব্যে কবিতায় চিরসম্পদশালী, অমর। ইহারই তটে একদিন সতীকুলরাণী সীতা দেবী অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই অভিসাপে সলিল বিপুলা তটিনীর বক্ষে আজ অনন্ত বালির শয্যা।

স্নানের জন্য আমরা সকলেই জলে নামিলাম। জল ভয়ানক ঠাণ্ডা, মনে হইতেছিল পা দুইখানি বুঝি কাটিয়া লইবে। ফল্গুর পরিসর বেশী নহে, পরপার হইতে একবার ঘুরিয়া আসা গেল। গামছা দিয়া কয়েকটা চুনা মাছ ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিলাম। জল অল্প হইলেও জলে অনেকটা নিরাপদে ছিলাম, তীরে ওঠামাত্র নানা ব্যবসায়ী নানারূপ লোক আসিয়া হাজির। কাহারো হাতে সিন্দুর, কাহারো ফুল, প্রতি পদক্ষেপে 'দাও পয়সা, দাও পয়সা,' ভিখারীর যেমন অত্যাচার ততোধিক অত্যাচার গৈরিক পরা ভণ্ডদের।

রামবাবু সকলকে হটাইয়া দিয়া আমাদিগকে লইয়া উপরে আসিলেন। সেই স্থানে যাত্র করণীয় যাহা সমাধা করিয়া আমরা মন্দিরে গেলাম।
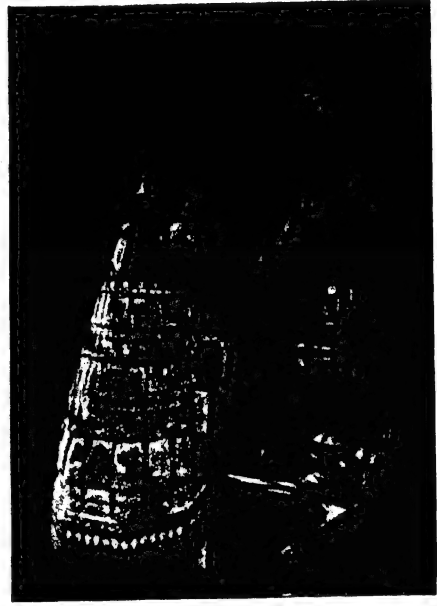
বিষ্ণুপাদ (গয়া)

বৃহৎ মন্দির আলোকিত না হইলেও খুব অন্ধকার নহে। দেয়ালের গায়ে কয়েকটা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, সিন্দুর ও পুষ্পমাল্যে আচ্ছাদিত। মন্দিরের মধ্যস্থলে রূপা বাঁধা এক অনতি গভীর গহ্বর। গহ্বরের বিরাট পাষাণ শিলার উপর সেই বিশ্ববাঞ্ছিত, হিন্দুর চির আরাধ্য পবিত্র পদ চিহ্ন। ইহাই গৌরাঙ্গের সাধনাক্ষেত্র, পিতৃলোকের মাতৃলোকের পুণ্যতীর্থভূমি। ভক্তি বিমণ্ডিত হৃদয়ে কত পিতৃমাতৃহীন স্বজনহারা বেদীমূলে উপবেশন করিয়া অশ্রুজলে অভিসিক্ত হইয়া গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে প্রিয়জনের তৃপ্তির নিমিত্ত পিণ্ডদান করিতেছে।

দর্শনান্তে বেদী স্পর্শ করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। বাহিরে অসংখ্য গাভী শ্রীপাদপদ্মের পরিত্যক্ত পিণ্ড খাইতেছে। মন্দিরের অনতিদূরে অক্ষয় বট। অক্ষয়

বটের মূলে পিণ্ডদান প্রশস্ত। অক্ষয় বটের চারিদিকে বেদী। বেদীর পাশে কয়েকটি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীর সম্মুখে দুইটি সন্ন্যাসী ভস্ম মাখিয়া ধ্যানে মগ্ন। তাহাদের কম্বলাসন চাউল পয়সায় ভরিয়া উঠিয়াছে

ফল্গুতীর

অক্ষয় বটের কাছে কাজ সারিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা রাস্তায় আসিতেই অনেকগুলি ভিখারী ও সাধু আমাদের অনুসরণ করিল। সকল দলের মধ্যেই এক একটী দলপতি। উহাদিগকে বিদায় করিবার জন্য রাম বাবুর নিকটে টাকা ধরিয়া দেওয়া হইল। তিনি কয়েক সের প্যাঁড়া কিনিয়া দিয়া উহাদের বিদায় করিলেন। নূতন আর একদল কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গী হইল। বাড়ীর দরজায় তাহাদের টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দরজা বন্ধ করা হইল।

সকলেই অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলাম, বেলাও হইয়াছিল, সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া সকলেই শুইয়া পড়িলাম। ক্ষণকাল পর রামবাবু আমাদের আহারের নিমিত্ত ডাকিতে আসিলেন।

রামবাবুর স্ত্রীর সহিত কয়েকটা কথা বলিয়া আমরা খাইতে বসিলাম। সকলেরই ক্ষুধা পাইয়াছিল, রামবাবুর স্ত্রী চমৎকার রন্ধন করিয়াছিলেন। পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করা গেল।

(৩)

গুরু আহারের পর বেশীক্ষণ বিশ্রাম হইল না। সেই দিনই বুদ্ধগয়া দেখিয়া রাত্রের গাড়ীতে আমাদের কাশী রওনা হওয়া স্থির হইয়াছিল। সময় সংক্ষেপ—পাণের পরিবর্ত্তে মশলা চিবাইয়া সকলে বাজারের পথ ধরিলাম।

দুই তিন দোকান ঘুরিয়া কতকগুলি পাথরের বাসন কিনিয়া বাসায় ফেরা গেল। তারপর বিছানা-বাক্স বাঁধিবার পালা। বুদ্ধগয়া হইয়া ষ্টেশনে যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ভাড়া হইল।

বেলা তিনটায় রামবাবুর নিকটে বিদায় লইয়া আমরা গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

অল্পক্ষণ পর সহর ছাড়াইয়া গাড়ীখানি একটি ছায়াময় বনপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথটি কাঁচা হইলেও অসমতল নহে, দক্ষিণে কৃষকের শান্তির কুটীর, উপবন, শস্যক্ষেত্র, বামে চির রহস্যময়ী ফল্গু। জলের সহিত তেমন সম্বন্ধ নাই। ক্রোশের পর ক্রোশ বালির চড়া ধূ ধূ করিতেছে। পরপারে হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র, তৎপশ্চাৎ বহুদূরবর্ত্তী শৈলমালা, গাঢ় নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মেয়েরা দুইতিনটা কলসী পর পর মাথার উপর সাজাইয়া জল লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। কেহ কেহ বালি খুঁড়িয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল তুলিয়া কলসী ভরিতেছে। দেখিয়া কবির কথা মনে পড়িল—

যেথানে দু'কর দিয়ে বালুকা খুঁড়ে
জলপান করে লোক আঁজল পুরে।
যে নদী শুকানো মরা,
দেখিবে দুকূল ভরা—
পার হয়ে কিছুদূর আসিতে ঘুরে।

পথের পাশে মহুয়া গাছের তলায় হাট বসিয়াছে। হাটের অধিকাংশ লোকই কোল, উহাদের মধ্যে কয়েক-জনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কালো পাথরের নিখুঁত ছবি, এ কালো রূপে জগত আলো। কোল যুবক-দের মাথায় পাখীর পালক, মেয়েদের ফুল। পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। অনেকেই গোচারণ শেষে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ীর পথ ধরিয়াছে, তাহা-দের গানের কথাগুলি অস্পষ্ট, কিন্তু স্বরটুকু 'কাণের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করে।'

সন্ধ্যার অনতিবিলম্বে আমরা বুদ্ধগয়ার পাদদেশে উপনীত হইলাম। কত বৌদ্ধ, জৈন, ইংরাজ মন্দির

দেখিতে আসিয়াছে। সুদূর বর্ম্মার অধিবাসীরাও আসিয়াছে।

মন্দিরটি মাটির নীচে অনেককাল আত্মগোপন করিয়াছিল, বহু অর্থ ব্যয়ে তাহাকে লোক-লোচনে প্রতিভাত করা হইয়াছে। মন্দিরের উদ্যানে কুলীরা মাটী কাটিয়া দ্রষ্টব্য স্থান সব বাহির করিতেছে। মন্দিরটি নিম্ন ভূমিতে—মাটী কাটিয়া যাতায়াতের সিঁড়ি করা হইয়াছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই শরীর মন যেন জুড়াইয়া গেল। চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর রমণীয়। চতুর্দ্দিকেই বুদ্ধদেবের অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি। কোথায় ধ্যানী বুদ্ধ, কোথাও শিষ্য পরিবৃত বুদ্ধ, কোথাও বা বরাভয়-দাতা বুদ্ধদেবের প্রসন্ন মূর্ত্তি।

রাস্তাতেই আমাদের একটি গাইড জুটিয়াছিল, মন্দিরে আর একটি জুটিল।

জুতা বাহিরে রাখিয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দ্বারে একটি স্ত্রীলোক পদ্মফুল বেচিতেছিল। কয়েকটি পদ্মফুল কিনিলাম। এক মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু আসিয়া আমাদের মন্দিরে লইয়া গেলেন।

বুদ্ধের বিরাট স্বর্ণময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। এতবড় প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। হাতের ফুলগুলি অঞ্জলি দিয়া সেই—

"বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি"র পানে চাহিয়া রহিলাম।

গাইড আমাদিগকে মন্দিরের উপরে লইয়া গেল। মন্দিরের গা দিয়া দুইটি সোপান দ্বিতলে উঠিয়া গিয়াছে। মন্দিরের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর, ঘুরাণো বারান্দার চারি-কোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দিরে বুদ্ধের মাতার এবং পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে।

মন্দিরের পশ্চাতে বোধিদ্রুম, বুদ্ধদেবের চরণ চিহ্নে ভূষিত। দর্শকগণ বোধিদ্রুম স্পর্শ করিতেছে, আমরাও করিলাম। মন্দিরের অনতিদূরে এক স্বচ্ছ সলিলা পুষ্করিণী, তাহার নাম পাতাল গঙ্গা। উদ্যানের স্থানে স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া 'রামসীতা' "লক্ষ্মী নারায়ণ" প্রভৃতি হিন্দু দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া অনেকেই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

চারিদিক দেখিয়া আমরা বুদ্ধদেবের স্তূপমূলে উপবেশন করিলাম। মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইল, উদ্যানস্থ পুষ্পকলিকাগুলি তথাগতর শ্রীচরণ উদ্দেশে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত ফুটিয়া উঠিল। দূর এবং নিকটের বিটপী শ্রেণী হইতে বন বিহগ তাঁহারি বন্দনা গান গাহিতেছিল। আমাদের মাথার উপরে জ্ঞানী বুদ্ধের, ধ্যানী বুদ্ধের এবং ত্যাগী বুদ্ধদেবের সন্ধ্যারতির নক্ষত্রের প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল।

কলীন্ মূর

(অভিনেত্রী কাহিনী)

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

আজ কলীন মূরের নাম চিত্রপ্রিয়দের নিকট খুবই সুপরিচিত। কিন্তু তার পূর্ব্ব জীবনের আত্মনির্ভরশীলতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের কথা শুনলে শ্রদ্ধায় এই তরুণী চিত্রনটীর প্রতি মন ভরে উঠে; যশ সে কত সাধনার সহজেই তা অনুমিত হয়।

সে আজ ১৯০০ সালের ১৯শে আগষ্টের কথা; যখন মিচিগানের পোর্টহুরন নামক স্থানে কলীন মূর জন্মগ্রহণ করে। তার বাপ ও মা স্কটিস্ ছিলেন। ফ্লোরিডার টাম্পা নামক স্থানের এক কন্‌ভেণ্টে লেখাপড়া শেখবার জন্য কলীন মূরকে শৈশবকাল যাপন করতে হয়েছে। তার মা বাপের ইচ্ছা ছিল যে বড় হয়ে কলীন মূর অর্কেষ্ট্রাতে পিয়ানো বাজায়। সেই জন্য পাঁচবছর বয়স থেকে তাঁরা তাকে গানবাজনা শেখাচ্ছিলেন। যখন কনভেণ্টের লেখাপড়া কলীন মূর ছেড়ে দিলে তখনো সে "Detroit Conservatory of Music"এ গান বাজনা শিখ্‌ছে।

গানবাজনা কলীন মূর খুবই ভালবাসত কিন্তু সেটা যে আজ জীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করে জীবন কাটাতে হবে এ চিন্তা তার অসহ ছিল। দশবছর বয়স থেকে তার মনে অভিনয় করবার স্পৃহা জাগে। সেই সময় নিকটবর্ত্তী

এক ষ্টক্ কোম্পানী থেকে একটা ছোট থিয়েটারের দল খোলা হয়, কলীন সেখানে নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করে। প্রথম প্রভাতে, জীবনের যাত্রাপথে মানুষ যদি সুগম পথ, বিশ্বস্ত সঙ্গী আর উৎসাহ উদ্দীপনা পায় ত তার গতি স্বচ্ছন্দ, লীলায়িত ও জয়যুক্ত না হয়ে পারে না। কলীন মূরের এই প্রথম অভিনয় সাফল্যতার প্রাণে নব উৎসাহের বাণ ছুটিয়ে দিলে—আশার স্বপ্নে সে একেবারে মেতে উঠল।

আজ কলীনমূরের দিগন্ত বিস্তৃত প্রতিপত্তির ভিতর কারো কি কল্পনায় আসে যে এই তরুণী প্রথমে 'নগদ কাজ' পাবার জন্য ষ্টুডিওর বাইরের বেঞ্চে একাদিক্রমে ছ'মাস বসে কাটিয়েছে ?

এই 'নগদ কাজের', ইতিহাস শুনলে আমাদের দেশের পেশাদার অভিনেত্রীরা পর্য্যন্ত চটে যাবেন। অথচ হলিউড ষ্টুডিওর আস্‌পাসের গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত অবসর মত এই "নগদ কাজ" করে তাদের পকেট খরচ চালিয়ে নেয়।

ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই:- ষ্টুডিওতে কোন ফিলিম তোলা হচ্চে, তার কোন ভিড়ের দৃশ্যে, দোকানের দৃশ্যে বা যে কোন দৃশ্যে দাসী বাঁদি বা যেকোন ভূমিকার জন্য মাঝে মাঝে 'অতিরিক্ত' extra), লোকের দরকার হয় এবং সেই আশায় বাইরে অসংখ্য মেয়ে 'হাঁ-করে' বসে থাকে। যখন প্রয়োজন হবে প্রযোজক এসে পছন্দসই জনকতককে ডেকে নিয়ে কাজ শেষ্ করেন। যারা কাজ পেলে—তারা দাম নিয়ে, আর যারা পেলে না তারা শুধু হাতেই ঘরে ফিরল! দৈবাৎ এদের ভিতর থেকে দু'এক জনকে মাহিনা দিয়ে দলভুক্ত ক'রে নেয়াও হয়! এত চেষ্টা, যত্ন করে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলে তাই পাশ্চাত্য অভিনেত্রীদের পায়ে 'জগতজোড়া নাম' 'থলিভরা দাম' লুটিয়ে পড়ে আর আমাদের দেশে যে ক'দিন অভিনয় করে সেই ক'দিন 'অডিটোরিয়ম ভরা' নাম ও দামের অভাবে অভিনেত্রীরা "নেপথ্যে" সরে পড়ে।

কলিন্ মুর

তারপর,—ছ'মাস কলীন্‌মূর এমনিতর "নগদ কাজে"র আশায় ষ্টুডিওর বাইরের বেঞ্চে বসে কাটিয়েছে। তার এক কাকা বিখ্যাত সংবাদপত্র-সম্পাদক ছিলেন। একদিন তিনি 'ঈষ্টানে কোম্পানী'র অফিসে গিয়ে ভাই-ঝিকে বাইরের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি এখানে কেন?' কলীন তাঁকে সব খুলে বল্‌লে। তাতে তিনি বল্‌লেন—'তা' তুমি আমায় বলনি কেন? আমি তোমায় ভাল জায়গায় কাজ করে দিতুম।' তাতে কলীন জবাব দিলে—'আমি জানি আপনি পারেন; কিন্তু আমি তা চাই না। যদি আমার যোগ্যতা থাকে, আমি নিজেই কাজ পাব—এবিষয়ে কারো সাহায্য আমি চাই না। আপনি বলুন, এখানে আমার জন্য কাকেও কোন অনুরোধ করবেন না!' কাকা রাজী হলেন।

অন্য কেউ হ'লে এ সুযোগ ছাড়ত ?

মাঝে মাঝে হতাশায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে তার মনে হত

'কাকাকেই বলি';-তখনি আবার আত্মসম্মান সজাগ হয়ে উঠত! এর পরেই সে তিন দিনের জন্য কাজ পেলে।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন বিখ্যাত প্রযোজক D. W. Griffith কলীনমুরকে তার কাকার বাড়ী দেখে এল, তাতে চিত্রাভিনেত্রীর সাফল্য সম্ভাবনা অনুভব করে সবাইকে বললেন। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই মিস্ মুর Griffithএর অধীনে অভিনয় করবার জন্য কালিফোর্ণিয়ায় চলে গেল।

কিছুদিন ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করবার পর, "Fleming youth" চিত্রনাট্য নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য "First National" ষ্টুডিও মিস্ মুরের সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করলে। সেইথেকে মিস্ মুর উন্নতির সোপান বেয়ে ক্রমশঃই উঠছে।

"So big", 'Sally" "Irene', "The perfect Flapper', 'The Desert flower', 'Pointed people'; "Flirting with love', 'We Moderns', 'Elia cinders', "Twinxletoes,' 'Orchids and Ermine', 'Naughty but Nice', 'Hot wild Oat', 'Love never dies', 'Happiness Ahead',, Oh Joy'

নানা বিখ্যাত ও জনপ্রিয় চিত্রনাট্যগুলিতে প্রধান ভূমিকা অভিনয় করে আজ কলীনমুর চিত্রাভিনেত্রী শিরোমণিদের পার্শ্বে বসবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে।

এদেশের জনসাধারণকে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা যায় না কিন্তু ওদেশে যায়। তাও যেমন তেমন করে নয় সমারোহে। কোন বায়স্কোপ অভিনেত্রীরা ছবি দেখতে আসবে, দু'ঘণ্টা আগে থেকে বায়স্কোপের সামনে গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে এক জন-সমুদ্রের সৃষ্টি হয়ে গেল। কে জানে রোদ, কে জানে বৃষ্টি! শুদ্ধ একবার চোখের দেখার জন্য! এদেশের ফুটবল মাঠের মত ও-দেশে অভিনেত্রীদের দেখবার জন্য 'সিট' ভাড়া পাওয়া যায়।

এক জায়গায় কলীনমুর নিজে লিখেছে—"I'll never forget the opening of the Chinese Theatre in May, 1927. It was the greatest crowd that has ever been seen in Hollyword. All the traffic along the Boubevard was diverted for hours before the performance, to make space for the crowd and give the cars a chance to get through. It took 2,500 people over 2½ hours to get inside the theatre, and when we came out we stood on the pavement for exactly 1½ hours before our car came along in its turn. To go and look for it would have been madness, so we simply had to wait."

* * * *

"In spite of that awful downpour on immense crowd stood for hours and hours in puddles and ponds some with raincoats, very few with umbrellas"

এদেশে অহীন্ চৌধুরী বাস থেকে নেমে থিয়েটারে ঢুকছে—রাস্তার দু'একজন যারা চেনে, কেউ বললে "এ্যা—চুলগুলো সব ছেটে ফেলেছে!" কেউ বললে—"এইবার ভুঁড়ি বাগাচ্ছে।" মাত্র এই পর্য্যন্ত। আর অভিনেত্রীদের ত কথাই নেই!

১৯২৩ সালের ১৮ই আগষ্ট প্রতিভাশালী প্রযোজক John Macormixএর সঙ্গে মিস মুরের বিবাহ হয়। কলীন মুরের অধিকাংশ চিত্রনাট্যর প্রযোজনা তিনিই করেছেন। প্রায় ছ'বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে 'ঘরকন্না' করবার পর, শতকরা ৮০টি চিত্রনটীর যা হয় কলীনমুরের তাই হয়েছে! বিগত জুন মাসে স্বামীর বিরুদ্ধে গালাগালি ও দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ করে আদালত থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে।

কলীনমুরের বাৎসরিক আয় গড়পরতায় নব্বইহাজার পাউণ্ডেরও উপর।

খেলা ঘর

শ্রীপূর্ণশশী দেবী (গল্প)

এক

জমিদার দুহিতা অশোকাদের খেলাঘরে আজ মহাধুম। অন্যান্য দিন তার খেলার ঘর করণার একমাত্র সাথী ও সহকারিণী ছিল ছোট বোন রেণুকা, কিন্তু আজ তার খেলুড়ীর সংখ্যা অনেকগুলি, খুড়তুতো দুই বোন ব্রততী ও তপতি পিসতুতো বোন গীতা কাজেই খেলাটা বেশ জমেছিল।

জমীদার মহাশয় সম্প্রতি যে পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন পিতৃ পুরুষদের অক্ষয় স্বর্গ কামনায়—এই পুণ্যাহ বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তার প্রতিষ্ঠা করা হল, সেই শুভানুষ্ঠানে যোগ দিতে কলিকাতা হতে অশোকার কাকা আর পিসিমাও এসেছেন।

এই সুযোগে অশোকা তার আদরের কন্যা 'ডলি'কে পাত্রস্থ করে ফেলেছে, পাত্র তপতীর বড় খোকা পুতুল শ্রীমান 'মানস মোহন'। এই মানসমোহন জামাতা হবার আগেই বালিকা শ্বশ্রূ মাতার মানস মুগ্ধ এবং লুব্ধ করেছিল কিন্তু স্কুলে প্রাইজ লব্ধ এই পুতুলটীকে হাত ছাড়া করতে তপতী মোটেই রাজি নয়, তবু বিয়ের পর জোড়ে আসার বাহানায় জামাইটীকে কিছুদিন কাছে রাখা এবং নাড়া চাড়া করা যাবে তো!—তাই এ ব্যবস্থা।

সেই শুভপরিণয়ের আজ প্রীতি ভোজ। সেজন্য অশোকা আর অশোকার বোনেরা ভোজের আয়োজনে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ লুচি বেলছে কেউ ভাজছে, ছোট ছোট খুরীতে সাজিয়ে রাখছে, উৎসাহের অন্ত নেই। সব চেয়ে বেশী ব্যস্ত অশোকা, কারণ সে কনের মা এবং ঘরের গিন্নি।

সামনে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো রঙ্গীন্ বেদীতে সুখাসনে বসে নির্জীব বরকন্যা দুটী, তারা নিষ্পলক নেত্রে এই সজীব পরিজনদের আগ্রহ ও ব্যগ্রতা দেখে যেন মিটি মিটি হাস্‌ছে।

খেলা ঘরটা পাতা হয়েছিল বাগানে একটা ঝাঁকড়া ফুল গাছের তলায়, সেই গাছের ওধার দিয়ে পায়ে হাটা সরু পথখানি সাপের মত বেঁকে গিয়ে রাস্তায় মিশেছে।

গীতা কুট্‌নো কোটা শেষ করে চাট্‌নির জন্য কাঁচা আম সংগ্রহ করতে দেখে খানিক তফাতে সেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটী মেয়ে, তাদেরই সমবয়সী হবে। রোগা রোগা শ্যামবর্ণ মুখখানি মোটের উপর মন্দ নয় বেশ একটু শান্ত শ্রী আছে; তবে গাল দুটী একটুখানি পুরন্ত হলে ভাল দেখাত।

একখানা আধময়লা বাগ্‌দী ডুরে গাছ কোমর বেঁধে পরা। এলো চুল, গায়ে সেমিজ নেই, গলায় লাল সূতোয় বাঁধা একটী তামার মাদুলী, হাতে একগাছি করে রাঙা 'কড়', কাণে কবেকার ময়লা পড়া পাশী মাকড়ী তার ছোট মুখখানিতে আদপে মানায়নি।

মেয়েটী সেই অপরূপ খেলা ঘর এবং বিশেষ করে বিচিত্র সাজে সজ্জিত নব বিবাহিত দম্পতীর পানে লুব্ধ অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল—এমন কাণ্ড যেন জীবনে কখনো দেখেনি সে!

তার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই গীতা একটু এগিয়ে এসে তড়াতাড়ি বললে—

"তুমি কখন্ এলে ভাই?"

বালক বালিকা যেন পরিচয়ের ধার ধারে না।

গীতার অকুণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটী সঙ্কুচিত ভাবে বললে "এই খানিকক্ষণ হল।"

"ওমা! তা এখানে চুপ্‌টী করে দাঁড়িয়ে কেন? তুমি আমাদের সঙ্গে খেলবে?"

মেয়েটী ঘাড় কাৎ করে একটুখানি হাসলে শুধু, সে হাসিতে খুসী, বিনয় ও ব্যগ্রতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইল।

তা হলে এসোনা ভাই! আমাদের খেলা ঘরে, কাল অশোকার মেয়ে ডলির বিয়ে হয়েছে কিনা, আজ তাই নেমন্তন্ন,—ও অশোকা! তোর কে বন্ধু এসেছে দেখ্‌না…"

মেয়েটীর হাত ধরে গীতা কাছে আসতেই মেয়েদের

কুতূহলী দৃষ্টি একসঙ্গে পড়ল নবাগতার দিকে। অশোকা ভুরু কুঁচ্‌কে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠল—"ধ্যেৎ! ও আমার বন্ধু হতে গেল কেন?—গীতাদি যেন কি!"

"তবে ও কে ভাই?"

অপরিচিতার আপাদ মস্তক একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে জমীদার নন্দিনী অপ্রসন্ন স্বরে বল্লে "তা কি করে বলব?—আমি কি ওকে চিনি না জানি? অমন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুতা করলে মা আমাদের আস্ত রাখ্‌বে কি না! হুঁ! সেদিন চৌধুরীদের লক্ষ্মীর সঙ্গে একটু পুতুল খেলেছিলুম বলে—মা বকে ঝকে কি রকম অনর্থ করে ছিলেন জিজ্ঞাসা করোনা রেণুকে—'

রেণুকা দিদির কথায় সায় দিয়া গম্ভীর মুখে বলে উঠল—"হ্যাঁ মা বড় রেগে যান—আমাদের যার তার সঙ্গে খেলতে দেখলে, বাবাও বলেন ছোটলোকের মেয়ে ছেলের সঙ্গে কখনো মিশতে নেই, তাতে মন ছোট হয়ে যায়—" আর মেয়েটার মুখে চোখে, দীনতা ও নৈরাশ্যের বেদনা পরিস্ফুট হল।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে কুণ্ঠিত স্বরে সে রেণুর কথায় বাধা দিয়ে বল্লে "কিন্তু আমরা তো ছোট লোক নয়—বামুন, আমার বাবা চাটুয্যে—"

"ওঃ! তবে আর কি?"

গীতা ভিন্ন আর সকলেই হেসে উঠ্‌ল।

অশোকা বল্লে—"বামুন হলে কি হয়? তোমরা গরীব তো? গরীব হলেই যে ছোট লোক বলে তাকে। তা নইলে এমন নোংরা কাপড় নিয়ে—ম্যা-গোঃ! গায়ে একটা সেমিজও কি জোটে নি?—"

মেয়েটার ব্যাহত ম্লান মুখখানির পানে চেয়ে গীতার কোমল চিত্ত করুণা ও দরদে ভরে গেল, কিন্তু গৃহিণীর সম্মতি না পেলে তো এই অপরিচিতাকে তাদের খেলাঘরে আসন দিতে পারে না? তাই অশোকার দিকে তাকিয়ে মিষ্ট অনুনয়ের সুরে সে বল্লে "তা হোক না ভাই! বেচারী খেল্‌তে এসেছে তখন খেলুক না একটু"—

"হ্যাঁ কি নাম ভাই! তোমার?"

মেয়েটা মাথা নীচু করে বাধ বাধ ভাবে বল্লে—"আমার নাম,—ভাল নাম তো কিশলয়—"

"ওরে বাবা! কি-শ-ল-য়!

অশোকার মুখে কথাটা উচ্চারণের ভঙ্গী দেখে সব মেয়ে কটী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

ব্রততী তাদের মধ্যে সকলের বড় বয়সেও এবং বিদ্যাতেও তাই সে শুধু হেসেই শান্ত হল না, মেয়েটার অপ্রতিভ মুখের পানে চেয়ে সকৌতুকে প্রশ্ন করলে "ও কথাটার তুমি মানেও জানো? কিশলয় কাকে বলে?"

কিশলয় থতমত খেয়ে মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বল্লে "তা কি জানি। ওনাম আমার মাসিমা রেখেছিলেন নিজের পছন্দে ওনামে তো আমাকে কেউ ডাকেনা—"

"তবে কি বলে ডাকে?

"হারাণী। আমি হবার আগে মার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে,

ঠিক ঠিক! এই নামই তোমাকে মানায় বেশ, কেমন ভাই অশোক!

আহা! অমন মিষ্টি নামটী—

গীতা আর চুপ করে থাকতে পারলে না, ব্রততীর কথার সজোরে প্রতিবাদ করে সে বলে উঠল—

"এ যে তোমাদের অন্যায় কথা ভাই! নামের আবার তেতো মিষ্টি কি? যার যা ইচ্ছে রাখতে পারে, তাতে কারুর কিছু বলবার তো নেই—"

তারপর সেই কুণ্ঠিতা অপমানিতা বালিকার হাত ধরে সহানুভূতিভরে বল্লে—"তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ ভাই? বসো না, ঐ ইট্‌টার ওপর বসো, আচ্ছা আমাদের যজ্ঞিবাড়ীতে তুমি কি কাজ করবে বলো দেখি?"

অশোকা ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে—"ও আর কি করবে?

অশোকার বোন তপতী হয়তো প্রত্যাখ্যাতার প্রতি অনুকম্পা দেখিয়েই বল্লে "কেন বোন? ওকে ঝিয়ের কাজ দিলেই তো হয়—ও যদি নেহাৎ খেলতেই চায়···

কিশলয়ের শ্যামল মুখখানি পলকে লাল হয়ে উঠল।

"না, খেল্‌তে আমি চাই না,—আমি শুধু দেখতে এসেছিলুম—খেল্‌তে আসি নি তো!"

ব্যথাবিদ্ধ কণ্ঠে ঝাঁঝালো সুরে কথাক'টী বলেই কিশলয় ফিরে চল্‌ল যে পথে এসেছিল।

তার গমন পথের পানে চেয়ে গীতা ম্লানমুখে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "না বুঝে সুঝে তোমার ও কথাটা

বলা ভাল হয় নি তপতী ! আহা ! কত আশা করে এসেছিল—"

তপতী মনে মনে একটু অপ্রতিভ হয়েছিল নিশ্চয় কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে মুখভার করে বললে, "আমি আর মন্দ কি বলেছি গীতাদি ? অমন মেথরাণীর মত চেহারা ও ঝিয়ের কাজ করবে না তো কি করবে ? কলকেতায় আমাদের বুড়ো ঝিয়ের নাৎনী পারুল সেও যে এর চেয়ে ঢের পদে আছে, কি রকম সভ্য ভব্য দেখেছ তো ?"

"তা সহুরে আর পাড়াগেঁয়ে একটা তফাৎ থাক্‌বে না ?"

"কেন ? আমার বেয়ানও তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে কেউ বলুক দেখি ?"

অশোককে অসন্তুষ্ট করা গীতার মনোগত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য ছিল না তাই অশোকের অপ্রসন্ন মুখের পানে আড়ে আড়ে চেয়ে সে কথার সুর বদলে ফেলে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"তুই একটা আধ পাগল তপি ! কার সঙ্গে কার তুলনা কর্‌ছিস্ বল্ দেখি ? আমাদের অশোকার মত শিক্ষা-দীক্ষা কজন সহুরে মেয়ের ভাগ্যে ঘটে ? মামাবাবুটি কম চেষ্টা করছেন কম পয়সা ঢাল্‌চেন ওদের দুটী বোনের শিক্ষার জন্যে ?"

ব্রততী উভয় পক্ষেরই মন রেখে বল্লে—"সেতো ঠিক কথা। কিন্তু মেয়েটার কি রকম তেজ দেখেছিস্ ভাই ? এক কথাতেই কেমন ফরকে চলে গেল !—"

"তেজ নয় দিদি ! ভারি দুঃখ হয়েছে ওর, দেখলে না চোখ ছল ছলিয়ে এসেছিল মুখখানি একেবারে শুকিয়ে—

শুকিয়ে তো যাবেই রে। ওযে কিশলয় !···

আবার হাসি !

সেই সমবেত সশব্দ হাস্যরোল বোধ হয় কিশলয়ের কাণেও গিয়েছিল, কিন্তু সে আর মুখ না ফিরিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।

দুই

মেয়ের রূপ নেই, মেয়ের বাপের রূপার জোর নেই, কাজেই দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে পাড়াপ্রতিবেশীদের পক্ষেও নিদ্রা দুর্লভ হয়ে উঠেছিল, তাই তো ! মেয়েটার কি যে গতি হবে !

কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এবং পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে কিশলয় বা হারাণীরও গতিমুক্তি হয়ে গেল কন্যাকাল উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বাহ্ণেই। পাত্রটীর নাম পুলিন কৃষ্ণ মুখুজ্যে, স্বভাব চরিত্র ভাল, অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে লেখাপড়ায় বেশীদূর এগোতে পারেনি। গ্রামে একখানা মেটে বাড়ী আর কয়েক বিঘা জমি ভাগে দেওয়া আছে, তাতে স্বচ্ছলতা না থাকলেও ভাতের ভাবনা ভাবতে হয় না, তাছাড়া পুলিন সম্প্রতি কলকেতায় একটা প্রেসে কাজ শিখছে মাসে প্রায় টাকা কুড়িক পারিশ্রমিক পায়।

হারাণীর মত মেয়ের পক্ষে তাই যথেষ্ট। সবাই বল্লে হারাণীর বরাত ভাল।

শাশুড়ী রুগ্না, রোগজীর্ণ দেহখানা নিয়ে তিনি সংসারের ঠেলা ঠেলতে আর পারছেন না, কাজেই ধুলো পায়ে দিন করে বিয়ের অব্যবহিত পরেই মা-হারা মেয়েটাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে হারাণীর পিতা দুহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

পাত্র নিজে পছন্দ করে হারাণীকে গ্রহণ করেছে, সুতরাং তার দিক থেকে অসন্তুষ্টি বা অনুযোগের সম্ভাবনা ছিল না। শাশুড়ী একমাত্র পুত্রবধূর রূপ এবং অলঙ্কারের অভাবে একটু মনক্ষুণ্ণ হলেও ঘরের লক্ষ্মীকে আদর করে ঘরে তুল্লেন।

অন্তর থেকে অজস্র স্নেহাশীর্ব্বাদ করে বল্লেন—মা লক্ষ্মী আমার ! তোমার লক্ষ্মী ভাগ্যিতেই আমার পুলিনের সংসার যেন···শাশুড়ীর সেই আশীর্ব্বাদ হারাণী তাঁর পায়ের ধুলোর সঙ্গে পরম বিশ্বাসে ও ভক্তিভরে মাথায় তুলে নিয়েছিল।

পুলিনও তার নবপরিণীতার নামের শূন্যতা জ্ঞাপক প্রথম শব্দটী সযত্নে পরিহার করে শুধু "রাণী" নামেই ডেকে ছিল, কিন্তু হারাণী তার আন্তরিক যত্ন সেবা শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে শ্বশ্রূ ও স্বামীকে তুষ্ট পরিতৃপ্ত করলেও সংসারে লক্ষ্মী ভাগ্যি আনতে পারলে না। নববধূর প্রথম দৃষ্টিপাতেই দুধের কড়া উথলে পড়লেও তার শ্বশুর ঘর উথলে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না।

তবু গরীবের মেয়ে হারাণী গরীবের ঘরের বউ হয়ে নিজেকে একদিনের তরেও অসুখী বোধ করেনি। পীড়িতা শ্বশ্রূকে বিশ্রামের অবাধ অবসর দিয়ে সে তার পরিত্যক্ত সংসারের অচল প্রায় চাকা খানা নিপুণ হাতে বেশ সহজেই ঘুরিয়ে নিয়ে চল্ল।

তিন

বছর দুই পরের কথা।

এরমধ্যে হারাণীদের সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

পুলিনের জননী স্বর্গগতা। বধু হারাণী এখন ঘরণী গৃহিণী।

মাতার অবর্ত্তমানে হারাণীকে গ্রামে একলা রাখা চলে না, কাজেই পুলিনকে বাধ্য হয়ে কলকেতায় বাসা করতে হয়েছে। তাতে খরচ বেড়ে গেছে বিস্তর। অবশ্য মাহিনাও এই দুবছরে মারকাট্‌ করে, বেড়েছিল দশটী টাকা, কিন্তু কল্‌কেতা সহরে বাসা করে সপরিবারে না হলেও সস্ত্রীক বাস করা বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ, সে ব্যয়ের অনুপাতে এই 'বাড়তি' আয়টুকু যথেষ্ট নয়। তবু হারাণীর গৃহিণীপণা গুণে গরীবের ঘরকন্না স্বচ্ছন্দে না হোক্‌—শান্তিতে চলে যাচ্ছিল!

কিন্তু সংসারীর পক্ষে শান্তিরক্ষা বড়ই দুরূহ ব্যপার, বিশেষতঃ যেখানে অর্থবল নেই।

মাস তিনেক হল, হারাণীর একটী সন্তান হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক তার পরই হারাণী আঁতুড় কাটিয়ে উঠতে না উঠতে—পুলিন অসুখে পড়ল।

এই আকস্মিক বিপদপাতে হারাণী তার দুদিনের পাওয়া সন্তানটীর মৃত্যুশোকে একটু কাঁদবার অবকাশও পেলে না। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে সে মনে মনে বল্লে "স্বামীকে ভাল করে দাও ঠাকুর। ছেলেয় তার কাজ নেই..."

পুরো দেড়টী মাস শয্যাগত থাকার পর হারাণীর অশ্রান্ত সেবা, ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং অখণ্ড আয়তির বলে পুলিন আরোগ্য লাভ করে আবার কাজে যাচ্ছে। এবং হারাণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অগোছাল সংসারটাকে টেনেটুনে কোনো মতে একটু গুছিয়ে নিয়েছে এমনি সময় তার আলাপ হল পাশের বাড়ীর একটী বউয়ের সঙ্গে। হল্‌দে রঙের প্রকাণ্ড তেতালা বাড়ীখানা, ঘন সবুজ রংয়ের ঝক্‌ঝকে দরজা জানালাগুলো তাতে ভারি সুন্দর মানিয়েছে।

দেখলে মনে হয় যেন রাজপুরী।—

সেই রাজপুরীর মালিক কলকেতার একজন মস্তবড় এটর্নী, বউটী তা'র কনিষ্ঠ পুত্রবধূ।—নাম করুণা।

ধনী কন্যা ধনীর বধূ হলে কি হয় বউটী ছিল তার নামের মতই মিষ্টি ও নম্র, ভারি সরল মিশুক স্বভাবটুকু তার।—বাপের বাড়ী থেকে এসে পর্য্যন্তই করুণা তার প্রায় সমবয়স্কা হারাণীর সঙ্গে ভাব করবার জন্য উৎসুক হয়েছিল। কিন্তু সুবিধা হয়ে উঠছিল না শুধু হারাণীর অমনোযোগিতায়—সে যেন দেখেও দেখে না।

পায়রা খোপের মত বাড়ীখানার একাংশে দুখানি ছোট ছোট ঘর নিয়ে হারাণীর সংসার। একটায় রান্না ভাঁড়ার সবই,—আর একখানা শোবার ঘর। সেই ঘরদুখানার সামনের খোলা ছাতটুকুতে হারাণী কাপড় কাচে, বাসন মাজে, চাল ঝাড়ে, বড়ি দেয়, আরো কত কাজ করে।

আবার বৈকালের দিকে ভিজে চুল শুকোতে বা কাচা কাপড়গুলো তুলতে এসে সারাদিনের খাটুনীর পর—মুক্ত আকাশের তলে একটু ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

করুণা তাদের তেতলার ঘরের একটা জানলার ফাঁক দিয়ে তাই দেখে।

গরীবের ঘরের ঘরণী হারাণীর আকৃতি ও বেশভূষায় দেখবার মত কিছুই ছিলনা, তবু এই প্রায় সমবয়সী নিরলস মেয়েটীর কাজকর্ম্মে তৎপরতা ও চলা-ফেরার ভঙ্গীটুকু দেখতে বউটীর বেশ লাগত। কিন্তু হারাণী নিজের কাজেই মগ্ন থাকে, কোন দিকে চাইবারও যেন ফুরসৎ নেই তার।

সেদিন দুপুর বেলা আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে, কাল বৈশাখীর মেঘ, স্বল্প হলেও উপেক্ষা করবার নয়।

হারাণী সেই হাতে কাচা ধুতি দুখানা কুঁচিয়ে বাক্‌সের উপর রেখে, স্বামীর সাবান দেওয়া কামিজটা তুলে দেখছিল শুকিয়েছে কিনা—এমন সময় একটু জোরে খট্‌ করে শব্দ হল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে দেখলে সেই রাজপুরীর খোলা জানালায় একটা কপাট ধরে দাঁড়িয়ে একটী বউ।

বেশ ফরসা মোটা-সোটা নধর গঠন। গোল গাল কচি কচি মুখখানি যেন হাসিতে ভরা। গা ভরা গহনা। পরণে একখানা চওড়া জরীপার খয়ের রংয়ের সাড়ী—এ কাপড় হয়তো আট পৌরেই পরে থাকে......কত বড় ঘরের বউ সে!

হারাণীকে অবাক্ হয়ে চাইতে দেখে বউটী ফিক্ করে হেসে বল্লে—"বাঃ বা! এতক্ষণে হুঁস্ হল! কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি!"

হারাণী বিস্মিত হয়ে বল্লে—"আমার জন্যে?"—

"হ্যাঁগো হ্যা! তোমার জন্যে নয়তো কি পাড়ার—কথার শেষটা শুধু হাস্য চপল চোখ দুটীর ইসারায় সেরে বধূটী উৎফুল্ল স্বরে বল্লে—শুধু আজই নয় কদিন ধরে বাপের বাড়ী থেকে এসে পর্য্যন্তই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছি, কিন্তু তোমার যে ফুরসদই হয়না।"

হারানী কামিজটা পাট করতে করতে একটু হেসে বল্লে—"ফুরসৎ কি করে হবে ভাই? সংসারে কাজ করবার লোক আর তো কেউ নেই—"

"তাই তো দেখছি। সংসারে কেবল তোমরাই স্বামী স্ত্রী বুঝি? তোমার বর কি করেন ভাই?—"

হারানী তার শেষ প্রশ্নের উত্তরে ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বল্লে "একটা ছাপাখানায় কাজ করেন।"

"ও! তাই—সেদিন দেখলুম কালিঝুলি মেখে... তোমাদের কলতলা বুঝি ঐ ধারে?—"

"হ্যা, ঐ যে রান্না ঘরের ডান দিক পানে—কতটুকুই বা জায়গা?"

"রান্না তুমি নিজেই করো—?"

"তা না তো কে করবে?"

"আহা তাহলে তোমার ভারি কষ্ট হয়তো! এই গরমে আগুন তাতে দুটী বেলা—"

"নাঃ! কষ্ট আবার কি দুজনের তো রান্না।

"তা হলেও, আমার তো ভাই! আগুন তাতে গেলেই মাথা ধরে ওঠে, আর পারিও না—সামনাতে, সেদিন শাশুড়ীর জন্যে একটু চা তয়ের করতে গিয়ে দুটো আঙ্গুল ফোস্কা পড়িয়েছি—দেখনা?—"

করুণা হাস্‌তে হাস্‌তে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দেখালে, সেই শুভ্র নিটোল হাতে 'চেপে' বসা একরাশ উজ্জ্বল স্বর্ণ চুড়ী যেন বিদ্যুতের মত ঝকমকিয়ে উঠ্‌ল।

হারাণী একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলে বল্লে—

"তুমি আর আমি কি সমান? যার কোনো কালে অভ্যাস নেই..."আচ্ছা, তোমার ও চুড়ীগুলি কি প্যাটার্ণের ভাই? দুরকম নয়? বেশ দেখ্‌তে—

"হ্যা—দু 'সেট', এগুলো ইলেকট্রিক আর এইগুলো কি বলে—কার্ণিশ্ চুড়ী,-গড়ন মন্দ নয়। কিন্তু বড্ড ভারি করে ফেলেছে, আবার কোথাও নেমন্তন্নে গেলে টেলে এর ওপর জড়োয়া চুড়ী, ব্রেসলেট তাও চাপাতে হয়, আমার ভাল লাগে না ভাই, কিন্তু কি করি বলো? শাশুড়ীর হুকুম, তাঁর ইচ্ছে বউয়েরা সকল সময় এক গাদা গয়না পরে বেড়ায়" ভাগ্যে—গায়ে গয়না পরা উঠে গেছে।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে—বউটী—হারাণীর মুখপানে চেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগ্‌ল।

সে হাসিতে আভিজাত্যের গর্ব্ব এতটুকু ছিল না, ছিল শুধু আদরিণীর পরিতৃপ্ত প্রাণের সরল মধুর—আনন্দোচ্ছাস। তবু—হারাণী সেই হাসিতে যোগ দিতে পারলে না। তার মুখখানি কেমন উদাস হয়ে গেল। তাকে নীরব দেখে করুণা গল্প করবার একটা ছুতো ধরেই যেন বল্‌লে—"তোমার হাতের ঐ চুড়ী কগাছিও বেশ সুন্দর দেখতে—"

হারাণী অপ্রস্তুত হয়ে বলে "ও তো সোণার নয়—কাঁচের—"

করুণা বেশ চালাক মেয়ে, নিজের ভ্রান্তি সংশোধন করে সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—

"তা' জানি। আজকাল কাঁচের চুড়ী এমন সুন্দর করেছে যে সোণার চুড়ীকে হার মানিয়ে দেয়। আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐরকম কাঁচের চুড়ী পরি, কিন্তু পর্‌তে দেয় কে?"

তারপর আরও অনেক কথাই হ'ল।

সেইদিনকার আলাপ পরিচয়ে এই সমবয়সী, ও অসম অবস্থার মেয়ে দুটীর পরস্পর সদ্ভাব জন্মে গেল।

পরম সৌভাগ্যবতী ধনী বধূ করুণার সরল সৌহার্দ্দের তলে দরিদ্র গৃহিণী হারাণীর দীনতা হীনতার সকল লজ্জা, সকল ব্যথা চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু তাদের আলাপটা সেই জানলা থেকেই হ'ত নিভৃতে, তৃতীয় প্রাণীর অগোচরে।

চার

"ও দিদি! কাল যে তোমাকে একবার আসতে হবে ভাই!"

"কোথায় গো?"

"এখানে,—আমাদের বাড়ী—"

কথাটা শুনে হারাণীর বড় আশ্চর্য্য বোধ হল।

এদ্দিন, করুণার সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত এমন কথা সে তো কখনও বলেনি, কতবার যেন বল্‌তে বল্‌তে থেমে গিয়েছে, তার ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হ'ত, হারাণীর সহিত সখ্যতা যেন বাড়ীর লোকের কাছে গোপন রাখতে চায়—তবে আজ এ উপরোধ কেন?

উর্দ্ধ দৃষ্টিতে করুণার ফুটন্ত ফুলের মত হাসিতে ঢল ঢল মুখখানির পানে চেয়ে—হারাণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে "কেন? কাল তোমাদের বাড়ী কি ভাই?"

"সে এলেই দেখতে পাবেখ'ন—"

বলে করুণা সলজ্জভাবে মুখখানি নামিয়ে নিলে।

মনে মনে কি একটা অনুমান করে হারাণী সহাস্যে বলে উঠল "ওঃ বুঝেছি! কাল তোমার সাধ বুঝি, না?—"

"বাঃ? ঠিক তো ধরেছ! কি করে বুঝলে ভাই?"

"তোমার মুখ দেখে, আর ভুঁড়িখানির বহর দেখে!"

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। করুণা হাসতে হাসতে কিল্ উঠিয়ে বল্লে—

"মাইরি কি দুষ্টু তুমি! কাছে থাকতে, দিতুম এক ঘা বসিয়ে! ওর যেন আর ভুঁড়ি কখনো হবে না!"

আর হয়ে কাজ নেই! বাবাঃ! যা ভোগটা ভুগেছি—"

করুণা এদিক ওদিক চেয়ে তাকে আস্তে বল্লে

"কিন্তু আমার শাশুরীতো এরি মধ্যে মাথা কোটাকুটি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন বলেন—মোটা হয়ে চর্ব্বি হয়ে যাচ্ছে, হয়তো আর—"

"তোমার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের গরীবের ঘরে... আচ্ছা ভাই! নিজের সাধের নিমন্ত্রন নিজেই করলে বুঝি?"

উপরে মিষ্টি হাসি হেসে, টুক্‌টুকে ঠোঁট খানি একটু ফুলিয়ে করুণা বল্লে—"বন্ধুকে তাই যদি করে থাকি তাতে দোষ হয়েছে কি?"

"না দোষ হবে কেন, এতো বড় সুখের, বড় আহ্লাদের কথা। কিন্তু—

"না, তোমার ও কিন্তু,কিন্তু আমি মানব না, তোমাকে একবারটী আসতেই হবে বুঝলে, শাশুড়ীও বলেছেন তোমাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠাবেন—

"তাঁকে তুমিই বলেছিলে বুঝি?"

"বলি নি, তবে বলিয়েছি বটে! নিজের মুখে কি বলা যায়?"

"কার মুখে বললে? বরের?

করুণা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

হারাণী একটুখানি মুচ্‌কে হেসে বলে—

"কাল 'সাধ', তাই বুঝি সোহাগিনীর সব সাধই পূর্ণ করতে হবে তাকে?"

'হ্যাঁ গা হ্যাঁ! বেশী চাগাকী করতে হবে না আর! এখন বলো—কাল আসবে তো?— ঠিক?"

হারাণী একটুখানি ভেবে বল্লে—"ঠিক কি করে বলব? তবে দেখি—"

"এতে আর দেখাদেখির কি আছে ভাই? এই তো দোরগোড়ায়—একবাড়ী বল্লেই হয়—তার জন্যে এত··· ওঃ বুঝেছি! কর্ত্তা মশাইয়ের হুকুম নিতে হবে, না? তা আজ রাত্তিরেই নিয়ে রেখো, নইলে···" লক্ষ্মী দিদি আমার! তোমার দুটী পায়ে পড়ি, একবারটী এসো, আরও কত মেয়েরা আসবে, কত আমোদ হবে, তুমি না এলে কিন্তু..."

সরল প্রাণা সখীর সেই অকপট স্নেহানুরোধ, সাদর আমন্ত্রণ হারাণী এড়ায় কি করে? রাত্রে স্বামীকে সমস্ত জানিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—"যাব একবার? অত করে বলছে··"

সে ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তর পুলিন সহসা দিতে পারলে না। ভাবতে লাগল।

স্বামীকে নির্ব্বাক দেখে হারাণী বুঝল স্বামীর মত নেই। তার মনে শুধু অভিমান নয়—একটু দুঃখও হ'ল—

এই কল্‌কাতা সহরে দেখবার মত জিনিস ও জায়গা কত আছে; থিয়েটার বায়োস্কোপ—আরও কত কি! সকলি ব্যয় সাপেক্ষ ও তাদের সাধ্যাতীত বলে—তেমন কোনো আব্দার ও উপরোধ স্বামীর কাছে সে কোনোদিনই করেনি তো!

কিন্তু আজ এই ঘরের দোরগোড়ায় তারপর সখীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ...তবু—

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বল্লে "তোমার যদি ইচ্ছে না হয় তবে থাক্—আমি না গেলে তাদের কাজ আট্‌কে থাকবে না তো!"—

পুলিন বিমর্ষভাবে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"আমার ইচ্ছে খুবই আছে রাণী! তুমি পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মিশবে—আমোদ-আহ্লাদ করবে—আমার কি তাতে অসাধ? কিন্তু আমরা গরীব, ওঁরা বড়লোক, তাই ভয় করে—"

হারাণীর বুকটা 'ছ্যাঁৎ' করে উঠল। মনে পড়ল করুণার সাথে প্রথম সাক্ষাতে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে কি রকম লজ্জায় পড়তে হয়েছিল, আবার যদি সেই রকম... তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। কিন্তু না গেলে করুণা কি মনে করবে? হয়তো ভাব্‌বে—কর্ত্তা হুকুম দেন নি, তাই—স্বামীর অপরিমিত ভালবাসার কথা বলে বন্ধুর কাছে সে যে কত দিন কত গর্ব্ব করেছে—সে গর্ব্ব তার আর রইল কই?

স্ত্রীর শুষ্ক ম্লান মুখখানি আদরে চুম্বন করে পুলিন ব্যথাভরা স্নেহের সুরে বল্লে—"আচ্ছা, তুমি যেও রাণী! একবারটী যেও, নইলে তোমার বন্ধু দুঃখিত হবেন। কিন্তু এই বেশে যাবে? দুদিন এগিয়ে বল্লে, তোমার চুড়ী ক'গাছি আর হার ছড়াটা একবার চেয়ে এনে দিতে পারতুম—"

হারাণীর অলঙ্কারের মধ্যে ঐ হার ও চুড়ী, তাও আঁতুড় তোলা এবং স্বামীর অসুখের খরচে বাঁধা পড়েছিল। তা হোক্...

হারাণীর এখন সেই বয়স, যে বয়সে মানুষ সংসারটাকে কেবল সবুজ সমতল দেখে, তার কোনোখানে যে কাঁটা খোঁচা উঁচু নীচু থাক্‌তে পারে তা তলিয়ে দেখে না, দেখতেও চায় না, তাই হারাণী অত সাত পাঁচ না ভেবে স্বামীর সাদর সম্মতি পেয়ে পুলকিত স্বরে বলে উঠল—"থাক্,—নাই বা হল গয়না? আমি তো আর সেখানে সাজ দেখাতে যাচ্ছি না যাচ্ছি শুধু বন্ধুর কথা রাখতে—"

পাঁচ

"সাজ দেখাতে যাচ্ছি না—" কথাটা স্বামীর কাছে বড় মুখ করে বল্লেও পরদিন স্বামীকে যথাসময়ে কাজে পাঠিয়ে হারাণী যখন নিজেকে ধনী গৃহে প্রবেশের উপযোগী করে নিতে গেল, তখন শুধু ব্যস্তই নয়—একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের দীন কুটীরে প্রসাধনের উপকরণ নেই বল্লেই হয়। তবু রোজকার দাঁড়াভাঙা চিরুণীর পরিবর্ত্তে বাক্সে সযত্নে তুলে রাখা নূতন চিরুণীতে বেশ পরিপাটী করে চুল বেঁধে, মিশ্‌মিশে কালো চুলে প্রায় ঢাকা ছোট্ট কপাল খানিতে একটী লাল সিঁদুরের 'টিপ্' পরে আয়নাখানা হাতে তুলে হারাণী কেবল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল—নাঃ! মন্দ কি দেখাচ্ছে? কিন্তু কাণের সেই ঢল্ ঢলে মাকড়ী দুটো......আঃ!

হারাণীর আজ ভারি আপশোষ হল, এদ্দিন কলকেতায় এসেছে, এই সেকেলে মাকড়ী দুটো ঘুরিয়ে দুটো আধুনিক ফ্যাসানের দুল কি 'টপ্' কিন্‌তে পারত নাকি?—

না, সে বুদ্ধি তার যোগায় নি, কি বোকা মেয়ে সে! কিন্তু হারাণী ভুলে গেল, নিজের দিকে চেয়ে দেখবার অবকাশ সে কবেই বা পেয়েছে? তার জীবন বসন্তের মধুর দখিনা বাতাসটুকু যে আস্‌তে না আস্‌তে নিদাঘের উষ্ণশ্বাসে মিলিয়ে গেছে—মুকুলিত যৌবন নিকুঞ্জের আধ ফোটা কুঁড়িগুলি ফুল হয়ে ফোটবার আগেই......

যাক্...

আয়না চিরুণী কুলুঙ্গীতে তুলে রেখে হারাণী আর একবার হাত মুখ ধুয়ে এল। এবার কাপড় ছাড়বার পালা।

একে পল্লীর মেয়ে পল্লীবধূ, তাতে গরীব, হারাণীর কাপড় জামার সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। বিয়ের চেলী ছাড়া সিল্কের সাড়ী বলতে বউ ভাতে পাওয়া—একখানি মাত্র কমলালেবু রংয়ের পার্শী সাড়ি, হারাণী সেইখানা নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগল, সাড়ীটার জেল্লা আছে বটে, কিন্তু রংটা যেন বড্ড গাঢ়, গর্ গরে, চোখে যেন বিঁধে যায়! তা হোক্—হারাণীর তো রঙীন্ কাপড় পরবার বয়স যায় নি এখনো—তার বয়সী মেয়েরা যে...কিন্তু এ কাপড়ের সঙ্গের জামা কই? সিল্কের সাড়ীর সঙ্গে সাদা জামা পরা চলবে না তো! তবে...

ট্রাঙ্কের তলা থেকে একটা মাজেণ্টার রংয়ের সিল্কের হাতকাটা লেশ দেওয়া, আধা ব্লাউস্ আধা জ্যাকেট গোছের—জামা বার করে হারাণী মনকে আর খুঁৎখুঁতুনির অবকাশ না দিয়েই পরে ফেল্লে। তারপর কাপড়খানা অনেকটা আধুনিক ধরণে পরে, সেফ্‌টীপিনে আঁচল আটকে স্বামীর একটা কাচা রুমাল কোমরের কাপড়ে গুঁজে প্রসাধিত রূপখানি একবার দেখবার আশায় আয়নাটা আলোর

দিকে ধরে দেখতে লাগল, ক্ষুদ্র দর্পণে সব দিক্ দেখা যায় না তবু—হারাণীর স্বল্প রঙীন্ তরুণ চিত্ত একান্ত সংক্ষুব্ধ আহত হয়ে উঠল। মা গো! একি কিম্ভুত কিমাকার মূর্ত্তি হয়েছে তার! ধ্যেৎ! এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে সবাই 'সং' বলে হাস্‌বে যে! মনে করবে পাড়াগেঁয়ে ভূত···সহুরে সভ্য ভব্য মেয়ে তারা···

হ্যাঁ, এই কাপড়জামার ওপর যদি দুচারখানা দামী গহনা হ'ত কিম্বা রূপের 'জেল্লা' একটু থাকত—ভগবান তাও দেন নি তো!

একটা ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে হারাণী সেই সিল্কের কাপড় জামা তখুনি খুলে ফেল্লে। তার মনে হ'ল সখীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করে সে ভাল কাজ করে নি। কিন্তু এখন আর অনুশোচনার সময় নেই, গাড়ী এল বলে।

হারাণী এবার একখানা কুচিয়ে রাখা চুড়ীপাড় দেশী সাড়ী আর ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সম্প্রতি কেনা গোলাপী ছিটের একটা সাদাসিদে ব্লাউস বার করে সোজা-সুজিভাবে তাড়াতাড়ি পরে নিলে।

হ্যাঁ, এ তবু যেন একটু ভদ্রগোছ পোষাক হয়েছে! এ পোষাকে সুশ্রী না দেখালেও হারাণীকে নেহাত বিশ্রী দেখাচ্ছে না বোধ হয়। কিন্তু বুক কাটা জামা—গলাটা যেন বড় 'ন্যাড়া ন্যাড়া' লাগছে...একছড়া সরু হার যদি...

মরুকগে! খালি নেই—নেই—নেই!—সকলের সব জিনিস থাকে কি? বন্ধুর সাধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এই সাজই যথেষ্ট।

ছয়

হারাণীর সে ভুল ভেঙ্গে গেল অচিরে। যখন বড় লোকের বাড়ীর ঝি, গিন্নিমার প্রধান ও প্রিয় সেবিকা শ্রীমতী কুসুম সুন্দরী ওরফে কুসী,—ভারিক্কি চেহারা, দুধের মত সাদা ধপ্ ধপে গরদের থান পরে, মাংসল হাত দুখানায় দুগাছা মোটা মোটা সোণার তাগা, গলায় একছড়া ভারি চক্ চকে বিছে হার ঝুলিয়ে,—গাল ভরা পান মুখভরা হাসি নিয়ে, কাশীর সুরতির সুগন্ধে ভুর্ ভুর্ করতে করতে অভ্যর্থনা করতে এলো, তখন বেচারী হারাণী যেন হক্ চকিয়ে গেল।

আধ ঘোমটার ভিতর থেকে সে হতভম্বের মত চেয়ে রইল—এটি ঝি? ঝিয়ের এত······

তার গায়ে তো সোণার মধ্যে—সেই মাকড়ী আর পাতলা সোণার পাত মোড়া ম্যাড় ম্যাড়ে শাঁখা দুগাছি!

হারাণীর সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠল, যখন সেই ঝিটী তাকে নিমন্ত্রিতা মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের একটা পর্দ্দা ফেলা দরজার সামনে পৌছে দিয়ে কার্য্যান্তরে চলে গেল।

সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষ।

ঘর জোড়া পুরু নরম গালিচায় বসে অনেকগুলি মহিলা প্রবীণা, নবীনা সবই আছেন। তবে নবীনার সংখ্যাই অধিক।

তাদের কেশ বেশের পরিপাট্য, মণিমুক্তা খচিত উজ্জল স্বর্ণাভরণের তীব্র দীপ্তি যেন চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছিল।

যাদের রূপ নেই বেশ ভূষার বাহুল্যতা তাদের আরো বেশী, রূপের অভাব তারা যেন প্রসাধনে পূর্ণ করতে চায়।

মাথার উপর একখানা নয় দু দুখানা 'ফ্যান্' হস্‌হস্ করে অশ্রান্ত ভাবে ঘুরে ঘুরে তরুণীদের বিচিত্র সাড়ীর রঙ্গীন্ আঁচল চঞ্চল উদ্দাম করে তুলছিল।

সমস্তই হারাণীর অ-দৃষ্ট পূর্ব্ব।

এই ইন্দ্রপুরীর কল্পনাও বোধ হয় সে কোনদিন মনে আনতে পারে নি। পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে হারাণী দরজার কাছটীতেই দাঁড়িয়ে রইল নিতান্ত জড়সড় হ'য়ে।

নিমন্ত্রিতারা তখন পরস্পর কথাবার্ত্তা—ও গল্পের মধ্যে নিমগ্ন, কার জামাতা কেমন রোজগার করে—কার বউয়ের বাপের বাড়ী হ'তে বারোমাসে তের পার্ব্বণের তত্ত্ব আসে, কার স্বামী কাকে মাসে একখানা করে গহনা গড়িয়ে দেয়—ইত্যাদি—

বাড়ীর মেয়েরাও যে যার কাজে ব্যস্ত। করুণার মা এবং ননদেরা বহুদিন অ-দর্শিতা সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে একান্ত মস্‌গুল!

বাড়ীর গিন্নি করুণার শাশুড়ী ঠাকৃরুণ—বধূর সাধ ভক্ষণের জন্য 'বেচ্' পোয়াতী নির্ব্বাচনে ব্যস্ত ছিলেন। তাতো আবার হারানী সকলেরই অচেনা। কাজেই তার সে ধারে উপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করলে না।

"ওমা! মাগো!—সোফার জিজ্ঞাসা করছে সে এখন ফিরে যাবে না কি..."বল্‌তে বল্‌তে একটী সাত আট

বছরের প্রজাপতির মত বিচিত্র রঙীন্ সাজে সজ্জিতা একটী বালিকা হুস্ করে পর্দ্দা ঠেলে প্রায় ঘাড়ে পড়ে—হিল্‌দেওয়া চক্‌চকে জুতার তলায় হারাণীর একখানা পা মাড়িয়ে দিয়ে গট্‌গট্ করে তার মায়ের কাছে ছুটে গেল।

যন্ত্রণায় অস্ফুট স্বরে 'ইঃ। বলে দাঁতে ঠোঁট চেপে হারাণী ভিতরের দিকে খানিক সরে এলো।

ব্যাকুলদৃষ্টি প্রসারিত করে সে দেখতে লাগ্‌ল—এই অপরিচিতাদের মধ্যে সেই চেনা মুখখানি যদি...হ্যাঁ, ঐ যে ওধারে জানলার দিকে বসে তার বন্ধু করুণা—

সাধের জন্য আনা ধূপছায়া রংয়ের নূতন ঝক্‌মকে দামী বেনারসী—আর একগাদা অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে সে যেন অতিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। তাকে ঘিরে কয়েকটী তরুণী, হাত মুখ নেড়ে হেসে হেসে কি বলাবলি করছিল। কেউবা তারি মধ্যে করুণার নূতন ও পুরাতন গহনাগুলি খুঁটীয়ে খুঁটীয়ে দেখে সমালোচনা জুড়ে দিয়েছিল।

হারাণীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই করুণা একটু খানি মুচ্‌কে হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গিনীদের এবং আর ও অনেকগুলি চোখের উৎসুক দৃষ্টি পড়ল সেই অতিমাত্র সঙ্কুচিতা, অতি সাধারণ অপরিচিতা মেয়েটীর উপর।

হারাণী কারুরদিকে না চেয়ে নত মুখে কুণ্ঠিত চরণে একধার দিয়ে পাশ কাটিয়ে বন্ধুর কাছে গেল!

করুণা সাগ্রহে তার হাত ধরে হাসতে হাসতে বল্লে—"বসো ভাই!—এতক্ষণে সময় হল বুঝি!—কর্ত্তা যে ছেড়ে দিলেন।

করুণার ঠিক সামনে যে মেয়েটী বসেছিল, হারাণীর আপদ মস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার দেখে, সে করুণায় মুখের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলে "এ কে ভাই?"

"আমার এক বন্ধু, এই পাশের বাড়ীতে ..."

"সর্ব্বরক্ষে!—আমি মনে করেছিলুম ও বুঝি তোদের—শেষ কথাটা সে অতিসন্তর্পণে করুণার কানে কানে বলে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

করুণা হাসি চাপ্‌তে চাপ্‌তে তাকে ঠেলে দিয়ে বল্লে—"দূর!—তা কেন!—"

হারাণীর মুখখানি বৈশাখের প্রখর রবি তাপে আতপ্ত কচি কিশলয়ের মত নিমেষে ম্লান ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। চোখ দুটীর কোণে কোণে জল ভরে এলো।

তার স্মৃতিপটে চকিতে ভেসে উঠল - অতীত দিনের একটী বিস্মৃত প্রায় চিত্র।—সেই অশোকের খেলা ঘর!

হায়!—শৈশবের সেই ধূলার খেলা-ঘর হারাণীকে যে খানটীতে আসন দিতে চেয়েছিল - আজ সত্যিকার সংসারও তাকে আসন দিতে চায় সেইখানে—তার চেয়ে এতটুকু উর্দ্ধে নয়।

এখানেও সে কিশলয় নয়—রাণী নয়—শুধু হারাণী!

* * * *

হারাণীর নেমন্তন্ন বাড়ী থেকে ফিরতে দেরী হবে মনে করে পুলিন রোজকার চেয়ে দেরী করেই এসেছিল, কিন্তু এসে দেখলে ঘর বন্ধ নয় খোলা, হারাণী কাপড় ছেড়ে—পরিত্যক্ত আধ ময়লা কাপড়খানা পরে তক্তপোষের ওপর চুপটী করে শুয়ে আছে।

পুলিন একটু ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করলে "কই—তুমি যাওনি?"

হারাণী তাড়াতাড়ি উঠে ছাড়া কাপড় জামা একপাশে সরিয়ে রেখে বল্লে "গিয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মাথাটা এমন ধরে উঠল যে বসতে পারলুম না, যা ভিড়! আমার তো কোনো কালে অভ্যাস নেই..."

এইমাথাধরার প্রকৃত তথ্য হারাণীর চোখ মুখের ছল ছল ম্লান ভাব দেখে পুলিনের জানতে দেরী হল না—সে বলতে যাচ্ছিল—আমি এই জন্যই তো বলেছিলুম কিন্তু পত্নীর ব্যথিত অপমানাহত চিত্তে পুনর্ব্বার আঘাত দিতে তার প্রবৃত্তি হল না, তাই পুলিন সমবেদনা ভরে স্নেহকোমল কণ্ঠে শুধু বল্লে "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

"না, অতবেশী মাথা ধরলে কি খাওয়া যায়?"

"আচ্ছা তাহলে এবেলা আর রান্নার হাঙ্গামে কাজ নেই তুমি শুয়ে থাক, আমি বাজার থেকে—"

"না, না, বাজারের খাবার খাবে কেন?—তোমার জন্যে সব গোছ করেই তো গিয়েছিলুম এক্ষুণি রান্না হয়ে যাবে।—

বলতে বল্‌তে হারাণী হয়তো তার উপ্‌চে পরা চোখের জল সাম্‌লাতেই স্বামীর সান্নিধ্য এড়িয়ে রান্নাঘরে চলে এলো।

তখন করুণাদের বাড়ী অর্গানের সুরে সুর মিলিয়ে কে একটী মেয়ে চন্‌চনে চড়া গলায় গান করছিল—

"আর কাহারো কাছে যাব না আমি
তোমারি কাছে র'ব হে!
আর কাহারো সাথে ক'ব না কথা—
তোমারি সাথে ক'ব হে!"

মহাভারত—স্বর্গের পথে—

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

পাত্র :—পঞ্চপাণ্ডব।

স্থান :—ইন্দ্রপ্রস্থের—উপান্ত।

সহদেব।—রক্তসিন্ধু মন্থন করা—ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ। এখনো চিত্রের মত দেখা যাইতেছে। শুধুই কি দেখা যাইতেছে! যেন মৌন ভাষায়—আকুল বেদনায় আমাদের আহ্বান করিতেছে। বিদেশগামী পুত্রের প্রতি মাতা যেমন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন, ইন্দ্রপ্রস্থ ঠিক তেমনই বিহ্বল প্রেক্ষণে আমাদের গমনভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছে।

নকুল।—ঠিক লক্ষ্য করিয়াছ—সহদেব। এ মূর্ত্তি তো ইন্দ্রপ্রস্থের কখনো দেখি নাই। জড় নগরীর এমন প্রাণ আছে? চলিতে বাধা পাইতেছি। মনে হইতেছে চলিব না—যাইব না, এইখানে মিশিয়া থাকি। এই ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাই! কোথায় যাইব স্বর্গে!

দ্রৌপদী একটু উপবেশন করিলে

সকলেই একটু বসিলেন।

সহদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। দাদা! এই স্বর্গ যাত্রার উদ্দেশ্য কি? সারা জীবন কূল পাইবার জন্য প্রাণান্ত করিয়া, কূল পাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার কি তাৎপর্য্য।

যুধিষ্ঠির—নিয়তি সহদেব? মানব নিয়তির দাস। নিয়তির পরিচালনায় কুরুক্ষেত্র সংঘটন, নিয়তির নির্দ্দেশেই এই মহাযাত্রা।

ভীম—কিছুই বুঝি নাই; আজও বুঝিতে পারিলাম না। কৌরব সভায় বিবসনা পাঞ্চালীকে দেখিয়া যখন পঞ্চ পাণ্ডব জড় পুত্তলিকার মত বসিয়াছিলাম, যখন দ্বৈপায়ণ হ্রদ হইতে অসহায়, প্রাণভয়ভীত দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থে আকর্ষণ করিয়া আনা হইল, যখন শ্মশান সমতুল্য কুরু-বংশের সম্রাটত্ব গ্রহণ করা হইল, আবার যখন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন হইবার পর এই মহাযাত্রার সূচনা হইল, এই সমস্ত ঘটনার আদি কি, অন্ত কি কিছুই বুঝি নাই। যন্ত্র আমি যন্ত্রের মতই চলিয়াছি।

পাঞ্চালী অধোমুখে বসিয়া ছিলেন। একবার মধ্যম পাণ্ডবের মুখের দিকে চাহিলেন; তারপর অর্জ্জুনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমি বুঝিয়াছি—আমি বুঝিয়াছিলাম। যে দিন পাঞ্চালরাজ সভায় লক্ষ্য ভেদ করিয়া তোমরা জয়যুক্ত হইলে, যে দিন জতুগৃহ দাহ হইল, যে দিন পাশায় হারিয়া আমায় পণ রাখা হইল, যে দিন অজ্ঞাতবাস স্বীকৃত হইল, দ্রুপদ সভায় যে দিন আমার অপমান হইল, তারপর প্রত্যেক ঘটনায় বুঝিয়াছি উজ্জ্বল ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি রাজসূয় যজ্ঞে, জরাসন্ধ বধে, শিশুপালের শিরশ্ছেদনে, অভিমন্যু বধে বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছিলাম কি আমাদের জীবনব্রত।

যুধিষ্ঠির—কি বুঝিয়াছিলে রাজ্ঞি! আর আজ কি বুঝিতেছনা?

দ্রৌপদী—বুঝি নাই মহারাজ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জননীর পুত্রমুখ দর্শনের মত স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি, প্রাতঃ সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ—দীপ্যমান বিভাসিত নিখিল বিশ্বে, নিখিল গগনে, আলোকস্রাবী পঞ্চ পাণ্ডবের শক্তি সৃষ্ট মহাভারত! সব সহিয়াছি; অভিমন্যুর মরণে নয়নধারা ফেলি নাই; রাজসভায় পাপাত্মা দুঃশাসনের কেশাকর্ষণে কাঁদি নাই; উত্তেজিতা হই নাই—ঐ মহা আশায়।

সহদেব—কি তোমার স্বর্ণস্বপ্ন পাঞ্চালী!

দ্রৌপদী—সব্যসাচীকে শুধাও আর্য্যপুত্র।

সহদেব—দাদা!

অর্জ্জুন—ধর্ম্ম রাজ্য ভাই। পাণ্ডবদের আর কি জীবন-ব্রত থাকিতে পারে?

যুধিষ্ঠির—অর্জ্জুন। কিন্তু আমিও বুঝি নাই ভাই! কেবল সাক্ষাৎ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিয়াছি। হিংসার পরিবর্ত্তে হিংসায় কি করিয়া ধর্ম্ম হইতে পারে, কনিষ্ঠকে হত্যা করিয়া, গুরুহত্যা করিয়া, রাজ্য হইতে পারে, ধর্ম্মরাজ্য কি করিয়া হইতে পারে তাহা কখনও বুঝি নাই। আচার্য্য দ্রোণকে পরাভূত

করিতে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" বলিয়াছি, মূর্ত্তিমান নিয়তির নির্দ্দেশে নারায়ণের অনুশাসনে। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন সে দিনও বুঝি নাই, আজিও বুঝি নাই।

দ্রৌপদী—কেন, তবে এই মহাসমর ঘটিল মহারাজ! আমার ধর্ম্ম, তোমার ধর্ম্ম, গীতার ধর্ম্ম কোথায় কাহার বিরোধ ছিল মহারাজ?

যুধিষ্ঠির—হয়তো ছিল, কিম্বা ছিল না। গীতার ধর্ম্ম হয়তা বুঝি নাই, হয়তো আমি বুঝিবার অধিকারী নই। তবুও পাঞ্চালী আমার ধর্ম্ম আছে; অপরিবর্ত্তনীয় অক্ষয়, ধ্রুব সে ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের দাস—ক্রীতদাস আমি; সে ধর্ম্মের বিনিময়ে আমার কাছে উন্নততর, কিছু শুভতর কিছু, পবিত্রতর কিছু নাই। আমার সে ধর্ম্ম সত্য, অছিদ্র, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, অপরিবর্ত্তনীয়। তাহা যুক্তিতর্ক সমস্তের সম্পর্কশূন্য।

ভীম—কেন তবে এই যুদ্ধে সম্মতি দিয়াছিলেন? আপনার মুখ চাহিয়া কি না সহিয়াছি? আরও না হয় সহিতাম। কেন নিরর্থক একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিতে দিলেন?

যুধিষ্ঠির—কেন? এ কথা আজিও বুঝ নাই ভীম! সত্য আমার ধর্ম্ম বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে কখনো উদ্ধত দুর্ব্বিনীত স্পর্দ্ধিত দেখিয়াছ? সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান সত্য যেখানে আমার শিয়রে, সেখানে যুধিষ্ঠিরের কি স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে ভাই। আমি যুদ্ধ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে প্রিয়তম!

পার্থ—দাদা! ধর্ম্ম রাজ্য নিরর্থক? একটা কি কল্পনা? মহাদেবতা নারায়ণের উদ্দেশ্যহীন, অর্থ হীন, কার্য্যকারণ পারম্পর্য্য বিহীন শিশুর শৈশব ক্রীড়ার মত বাল্য চাপল্য।

ভীম—তাহা নহে পার্থ! কখনই হইতে পারে না? কিন্তু ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই স্বর্গ যাত্রা এতো পরাজয়। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনার ফল কি?

সহদেব—বুঝিয়াছিলাম যখন জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বৃন্দ ভারতের বক্ষের উপর আসুরিক দম্ভে রাজ্য করিতেছিল, তখন ভারত অধর্ম্মের অনলে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছিল, সেই মৃত্যু-অগ্নি হইতে উদ্ধার করাই ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্য ভারতকে কি দান করিল, তাহা যে বুদ্ধির অগম্য দেখিতেছি।

পাঞ্চালী। রাজপুত্র! আমার মানসনেত্রে ছিল—অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবৃন্দকে শক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পঞ্চভ্রাতা ভারত-সিংহাসনে সমাসীন। গীতার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান; প্রেমের ধর্ম্ম ভারত ব্যাপিত, পাণ্ডব শক্তি দীপ্যমান, ভারত জাতি উন্নত, জীবন্ত, বলবন্ত, স্নিগ্ধ শান্ত তৃপ্ত দীপ্ত।

নকুল—তাহার পরিবর্ত্তে কি দেখিতেছ মহারাণি।

ভীম—আমি তাহার স্থানে দেখিতেছি এক মহাশ্মশান—এক বিরাট নারীরাজ্য, ক্ষাত্র বীর্য্যহীন পতিত ভারত।

সহদেব—তাহা হইলে নারায়ণের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ। ভারতকে উন্নত করিতে গিয়া পতিত করা হইল।

পার্থ—সহদেব! শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম মিথ্যা? গীতার বাণী বিস্মৃত হইলে?

যুধিষ্ঠির। "কর্ম্মণ্যেব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" চল ভাই! কর্ম্ম করিয়াছি এখন মহা প্রস্থান করি।

পাঞ্চালী—কিন্তু ভারত! ভারতের ধর্ম্ম—ভারতের জাতি—মহাভারত!

পার্থ—পাঞ্চালী! আমরা নির্ম্মোক মাত্র। যন্ত্র মাত্র। কর্ম্মে আমাদের অধিকার! আর কি করিবার সামর্থ্য আছে আমাদের? কিছুই যে নাই। আর তাহা বুঝিয়াছি সেই দিন, যে দিন বন-প্রান্তে নারায়ণের দেহত্যাগান্তে যাদব নারীকে রক্ষা করিতে গিয়া গাণ্ডীব উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। যে গাণ্ডীব আমার ক্রীড়নক, সেই গাণ্ডীব আমি তুলিতে পারিলাম না!

ব্যাসদেব গীতা গান করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির—মহর্ষি! আজ স্বর্গযাত্রার পথে আমরা দ্বিধা-সঙ্কুল চিত্ত। আপনি চিরদিন আমাদের গুরু। পথদ্রষ্টা! আজ বলিয়া দিন কেন আমাদের এই নিষ্ফল নৈরাশ্য!

ব্যাস—কিসের নিরাশা মহারাজ। দীর্ঘকাল ধর্ম্ম-শক্তিতে বলীয়ান হইয়া পঞ্চভ্রাতা হিমাচলের অপেক্ষা অচল অটলভাবে রাজ্য পালন করিয়াছিলে; অবশেষে জীবন-কর্ত্তব্য শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান—এতো উল্লাস! এই তো পরিপূর্ণতা! নিরাশা কোথা হইতে আসিল?

যুধিষ্ঠির—ঠিক নৈরাশ্য—নহে প্রভু! সন্দেহ! মহাভারত কই? সারাজীবন সহস্র দুঃখ বেদনা সহিয়া যাহার জন্য সাধনা করিলাম, তাহা কই?—

অর্জুন—তাত! আমরা শুধু কি সাম্রাজ্যের জন্যই কুরুক্ষেত্র মহাসমর করিয়াছি! শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা আপনার উপদেশ কি পঞ্চভ্রাতাকে একটা উন্নততর আদর্শ দেয় নাই?

ব্যাস—কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্য—মহাভারত!

পাঞ্চালী—কই সে মহাভারত ঋষিবর! ভারতের ক্ষত্রিয় নিঃক্ষত্রিয়। তাহার স্থানে শুদ্ধশক্তি, পবিত্র তেজ নূতন ক্ষত্রিয় জাতি উঠিল না. সারা ভারতে একটা মৃত্যুময়ী অবসাদ কালিমা! ইহাই কি মহাভারত!

ভীম—পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব কি এই শ্মশান ভারতই চাহিয়াছিলেন। এই কি মহাভারত!!

সহদেব—ভারতের ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত সম্ভব শ্মশান-ভারত! যেখানে ভারতের ক্ষাত্রতেজকে নির্ব্বাণ করিয়াই মহাভারত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, সেখানে আর কি হইতে পারে তাহা কল্পনাতীত!

নকুল—ভারতের তরুণ প্রাণ যেখানে বলি প্রদত্ত হইয়াছে, অভিমন্যুকে উৎসর্গ করিয়া যাহার প্রতিষ্ঠা চেষ্টা, তাহা আর কি হইতে পারে?

ব্যাসদেব—গীতা-বাণী ভুলিয়াছ মাদ্রীপুত্র! কিসের জন্য কুরুক্ষেত্র সমর-যজ্ঞ!

নকুল—কিসের জন্য ঋষিবর!

ব্যাস - পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়াচ দুষ্কৃতাম্! ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়..."

ভীম—বুঝিলাম ঋষি! অত্যাচারী রাজন্যবর্গের হাত হইতে সাধুগণ পরিত্রাণ পাইয়াছেন। বুঝিলাম উদ্ধত অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী, শক্তিমদমত্ত নৃপতিকুলকে উচ্ছিন্ন করিয়া দুষ্কৃত দমন হইয়াছে! কিন্তু ধর্ম্ম স্থাপন?

ব্যাস—ধর্ম্ম যে চিরন্তন মধ্যম পাণ্ডব!

সহদেব—অতএব—

ব্যাস—কুরুক্ষেত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বের ভারত পলিত-গলিত মৃত দেহ! তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিলীয়মান! রাজা, রাজশক্তি, ক্ষাত্রবীর্য্য, ব্রাহ্মণ্য শক্তি, শাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজ, সকলের মধ্যে বিনাশের বিষ প্রবেশ করিয়াছিল। এ ভারত এই উপনিষদের ভারত! নিমি, হরিশ্চন্দ্রের ভারত, জনক সনক প্রভৃতিরভারত অচিরেই বিনষ্ট হইত! চির-তরে বিনষ্ট হইত। কুরুক্ষেত্রে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।

যুধি—এই হত্যায়, এই মৃত্যু-যজ্ঞে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল! সে কেমন কথা মহর্ষি!

ব্যাস—ঠিক তাই। ভারত জীবনের পলিত-গলিত বিষ-দুষ্ট অঙ্গ তাহার ক্ষাত্র তেজ দুর্য্যোধন কর্ণ শিশুপাল জরাসন্ধ! উহা রহিলে সমগ্র দেহ গলিয়া খসিয়া পড়িত! ভারতের ধর্ম্ম প্রাণহীন হইয়াছিল—উহাতে ছিল কেবল কামনার তাড়না। সনাতন ধর্ম্ম মরিতে পড়িয়াছিল! পাশবতা, ভোগতৃষ্ণা, প্রচণ্ড জিঘাংসু অতৃপ্ত লালসাবহ্নি ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতীর্ণ না হইতেন তবে বিশ্ব নাশের একটা মহান্ সৃষ্টি, একটা সুপ্রাচীন বহুসাধনালব্ধ সভ্যতা চিরকালের মত ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইত! ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মতত্ত্ব বড় গূঢ় বড় জটিল। নারায়ণের লীলা নির্ণয় মানব বুদ্ধির অতীত। তাই কৃপা সিন্ধু কৃপা করিয়া ভ্রান্ত মানবকে সস্নেহে উপদেশ দিয়াছেন।—

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে
মা ফলেষু কদাচন!"

ক্ষুদ্র চেতা শাস্ত্র পরিমিত মানুষ আমরা বেশী কিছু করিতে যাইলেই অকর্ম্ম করিয়া বসি!

পার্থ—ঋষিবর! গীতার বাণী কর্ণে ধ্বনিয়া আছে, প্রাণের সহিত মিশিয়া যায় নাই! একবার—একবারমাত্র নিমেষের জন্য সেই মহাদেবতার কৃপা করুণায় বিশ্বরূপ দর্শনের সময় গীতা তত্ত্ব অনুভূত হইয়াছিল; তাহার পর আর প্রাণের মাঝে গীতা তত্ত্ব জাগ্রত জীবন্ত সত্য হইয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে না ঋষিবর।

ব্যাস--পার্থ! সত্যই তাই! ঐ মহাতত্ত্ব নারায়ণের কৃপা ব্যতীত ধারণা করিবার সাধ্য ক্ষুদ্র মানব আমাদের কোথায় বৎস!

পার্থ—ঋষিবর। খাণ্ডব দাহনের সময় ধারণা হইয়া-ছিল পাণ্ডবদের জীবনব্রত কি? বুঝিয়াছিলাম, এই খাণ্ডব সারা ভারত ব্যাপিয়া, আর তাহাই ভস্মীভূত করিয়া আনন্দ মুখরিত, ঐশ্বর্য্য শান্তি পরিপূর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। আর তাহাই মহাভারত! কিন্তু একি

হইল ? নারায়ণ ব্যাধ শরে দেহ রক্ষা করিলেন ; পার্থ আমি, গাণ্ডিব তুলিতে অসমর্থ হইলাম! শক্তির মূর্ত্ত বিভূতি পঞ্চ পাণ্ডব প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। ভারতে ক্ষাত্র শক্তি নির্ব্বাপিত হইল। সমস্তই যেন আজ কুয়াসাচ্ছন্ন!

ব্যাসদেব—অর্জ্জুন! দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তুমি একি কথা বলিতেছ বৎস! মহা দেবতা নারায়ণের লীলা আমরা সসীম শক্তি মানুষ আমাদের জ্ঞানের অগম্য। কর্ম্ম করাই আমাদের কর্ত্তব্য ; আর কিছু দেখিতে যাওয়া অসঙ্গত।

ভারত মহাভারতই হইল! আজ তুমি দেখিতেছ, আমি দেখিতেছি ক্ষাত্র শক্তি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাই বলিয়া নারায়ণের লীলা কি ব্যর্থ হইয়াছে ?

দ্রৌপদী—কে তাহা বলিবে মহর্ষি! আমরা বিক্ষুব্ধ চিত্ত, বিভ্রান্ত বুদ্ধি, কিছুই যে বুঝি না ঋষিবর! কোথায় সেই মহিমান্বিত মহাভারত!

ব্যাস - দেবি! নারায়ণের লীলা—মানব বুদ্ধির অগম্য। মহাভারতই রচিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের রক্তাম্বুধি মন্থন করিয়া ভারতের মহাভারত মূর্ত্তিই উদ্ভূত হইয়াছে।

ভারতের ধর্ম্ম, যাহা শাশ্বত সনাতন, অমৃতময়, যাহা মানুষকে বাঁচায়, ধর্ম্মকে রক্ষা করে, জাতিকে আনন্দময় করে, যাহা সৃষ্টির অমৃত, তাহা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে ভারতে, ভারতের প্রাণশক্তিতে যে কি ভীষণ বিনাশ-বিষ আক্রমণ করিয়াছিল, ধর্ম্মে সভ্যতায় সমাজজীবনে রাজশক্তিতে একটা জাতি-জীবনের অন্তরে বাহিরে কি যে সর্ব্বনাশী—কি যে কালান্তক আসুরিক ভাব আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। কুরু সভায় রাজ্ঞীর অপমানে, কংশের অত্যাচারে, দুর্য্যোধনের মদমত্ততায় তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আবার ব্রহ্মণ্যশক্তিও তখন কলুষিত। ব্রাহ্মণ জাতির শীর্ষদেশ। ক্ষত্রিয়ের পরিচালক—সেই ব্রাহ্মণ মনীষাও তখন বিকৃত—ব্রাহ্মণ যে কি পর্য্যন্ত ধর্ম্মহীন পতিত হইয়াছিল—তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। দ্রোণ কৃপাচার্য্যে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে পরিস্ফুট। উপনিষদের ধর্ম্ম—ভাগবর্ত্ত ধর্ম্ম কোথাও ছিল না। ভারত অচিরেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।

ভীম। ভারতের রহিল কি ?

ব্যাস। বৃকোদর! কাল যে অপরিমেয়! ক্ষুদ্র দৃষ্টি কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। ভারতকে অনন্তকালের জন্য অমৃতমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হইল। কুরুক্ষেত্রে ভারতের রোগমুক্তি মাত্র, ভারতের বাঁচিবার সূত্রপাত। যে ভারত অদূরবর্ত্তী কালের ভিতর ধ্বংস হইয়া যাইত, তাহাকে চিরকালের জন্য জীবিত রাখিবার ঔষধ দান করা হইল!

পার্থ। কি উপায়ে মহর্ষি।

ব্যাস—গীতামৃতে! মানবের ধর্ম্মই শক্তি, ধর্ম্মই প্রাণ, ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব। এই ধর্ম্ম আব্যাকৃত রহিল—মানুষ বাঁচে, জাতি অমর হয়। গীতা অনন্ত অমৃত-প্রস্রবন। ভারত-চিত্তে যে আর্য্যোচিত ক্লৈব্য মোহ আসিবে, গীতার স্পর্শে তাহার অপনোদন হইবে। অন্য ধর্ম্ম বিকৃত হয়, গীতার ধর্ম্ম চির শুদ্ধ, চির নির্ম্মল, চিরন্তন কালের জন্য ওজস্বী, প্রাণপ্রদ! অনন্তকাল ধরিয়া "ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ" বলিয়া ঐ গীতা-গাথা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিবে। যখনই ভারত-চিত্তে অবসাদ, ক্লৈব্য, মোহ, আর্য্যজনোচিত গ্লানির উদয় হইবে তখনই নারায়ণের বাণীমূর্ত্তি বজ্র নির্ঘোষে নিনাদিত হইবে—

"ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ।"

ভারতে যখনই তামস-যুগের আবির্ভাব হইবে তখনই তমো মগ্ন ভারতজাতির কর্ণে বাজিয়া উঠিবে—ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ।

মহাভারত কেবল আজিকার জন্য নয়—অনন্তকালের জন্য। এই কুরুক্ষেত্র সমরে ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল বৎস। ভবিষ্যৎ ভারতে ইহার পূর্ণাহুতি। নারায়ণের ধর্ম্ম রাজ্য কল্পিত নহে ; তুমি আমি দেখিতেছি না ; কিন্তু একদিন বিস্ময়মুগ্ধ বিশ্ব, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র তারা, উদয়াচলের সূর্য্য দেবতা সকলেই দেখিবে মহাভারত! দেখিবে এক মহা সাম্রাজ্য, দেখিবে এক মহাজাতি তাহাদের জীবন যজ্ঞ, কর্ম্মফলহীন মহা যজ্ঞ! তাহা দেবযজ্ঞ ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ অপেক্ষাও মহীয়ান! দেখিবে তাহাদের মহামন—সমত্বযুক্ত সর্ব্বত্র, ব্রাহ্মণ কুকুর হইতে তৃণ লতা পর্য্যন্ত সকলের প্রতি সমভাব। আর দেখিবে তাহাদের ভাগবতী বীর্য্যদ্যুতি—যাহা জগতে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবে। আজ নয়, কাল নয়, কত পরিবর্ত্তন, কত বিপ্লব কত অবস্থার স্তর পারম্পর্য্য অতিক্রম করিয়া নারায়ণের এই মহা বাসনা সম্পূর্ণ হইবে। অনন্তের দিক দিয়া দেখ। বিশ্বরূপ দর্শন কর! অহঙ্কার পরিহার করিয়া বল "শিষ্যস্তেহং। শাধিমাং ত্বাম্ প্রপন্নম।"

মহাভারত ধর্ম্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা যে বাসুদেবের ইচ্ছা। ভারত—মহাভারতই হইবে!

আধপয়সার টিকিট।

(গল্প)

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ

বাঙ্গালীরাম জাতিতে কাহার। বাড়ী চম্পারণ জেলার একটি নগণ্য পল্লীগ্রামে—যাহার নাম বলিলে সেখানকার অধিবাসী ভিন্ন বড় একটা কেহ বুঝিবে না।

বিহারে কাহার দিগকেই কুলিন শূদ্র বলিতে হইবে—কারণ সমগ্র বিহারাঞ্চলে তাহারা ব্যতীত অবস্থাপন্ন উচ্চ জাতীয় হিন্দুর আর অন্য গতি ছিল না এবং এখনও প্রায় নাই, তবে তাহারাও আজকাল সভাসমিতি আরম্ভ করিয়াছে, বাড়ীর মেয়েরা 'দাই'য়ের অর্থাৎ ঝিয়ের কাজ করে তাহাদেরও সন্ধ্যার পরে আর আপন আপন বাড়ীর বাহির হইবার 'হুকুম' নাই। যে যেখানেই কাজ করুক না সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতেই হইবে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ—পান ইত্যাদি ছোটখাটো জিনিষের দোকান সুরু করিয়াছে এবং বৈশ্যত্বের দাবীতে তাহারাও একদিন "তেজঃহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস" পরিধান করিবে এইরূপ আভাসও দিতেছে। কাজেই ইহারাও আর বেশীদিন শূদ্র থাকিবে না।

যে সময়ে বিহার ও বাংলা একত্র ছিল ও বিহারে বাঙ্গালীদেরই সবচেয়ে বেশী প্রতিপত্তি সেই সময়ে বাঙ্গালীরাম চাকুরীর চেষ্টায় একেবারে সদরে অর্থাৎ মতিহারী আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে মাসিক তিনটাকা বেতন ও 'খোরাক পোষাকে' এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারে চাকুরী গ্রহণ করে: তিনি মতিহারীর সেই সময়কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁহার নাম হীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। স্বভাবটি বড় মধুর। মনে কিঁছুমাত্র ময়লা নাই। সকল জিনিষের মধ্য হইতে মন্দটি ছাড়িয়া ভালোটি লওয়া অভ্যাস। সংসার পুত্র, কন্যা, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইত্যাদিতে ভরা। সকলের দিকেই কর্ত্তা এবং গৃহিণীর এমন সমদৃষ্টি যে একদিনের জন্যও কাহারও মনে কোন ক্ষোভ হয় না।

বাঙ্গালীরাম বেশ চতুর। প্রথম হইতেই সে প্রভু ও প্রভু পত্নীর মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল। কোলের ছেলেটিকে যত্ন করিয়া তাহাকে একান্ত অনুগত করিয়া ফেলিল। ছেলের কান্না আর বড় একটা শুনিতে পাওয়া না। কাঁদিবামাত্র বাঙ্গালীরাম হাতের কাজ ফেলিয়া—ছেলেকে থামায়। প্রভুপত্নী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ঘর দুয়ারা বাঙ্গালীরাম আপন মনেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া যায়। বাবুর বসিবার ঘরের টেবিল চেয়ার সযত্নে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া রাখে। প্রভুও মনে মনে ভৃত্যের অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালীরাম প্রভু ও প্রভুপত্নী উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালীরামের দুপয়সা বেশ উপায়ও হইতে লাগিল। মক্কেলদের দুই এক বাল্‌তি জল দিয়া এক আধটা ফরমাস খাটিয়া তাহাদের নিকট বক্‌শিস্ মিলিত। বাজার হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভাল জিনিষ আনার জন্য অন্যান্য ভৃত্য থাকিতেও প্রভুপত্নী বাঙ্গালীরামকে দিয়াই বাজার করাইতেন—ইহাতে তাহার দুপয়সা বেশ থাকিত! বাজারের উপার্জ্জনটা বাঙ্গালীরামের দুই দিক দিয়াই হইত। দোকানীদের নিকট হইতে দস্তরিও আদায় করিত, তাহার উপর আড়াইসের জিনিষের জায়গায় দুইসের দেড় পোয়া লইত। ইহাতেও কিছু বাঁচিয়া যাইত অথচ ধরা পড়িত না। কিন্তু দামে কখুন বেশী করিত না। কাজেই তাহার উপর কাহারও সন্দেহ হইত না।

সারা বৎসর ধরিয়া এই রকম টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাঙ্গালীরাম হোলীর সময়ে একবার বাড়ী যাইত এবং প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু জমী কিনিয়া আসিত। শেষে ভাল দেখিয়া একজোড়া বলদও কিনিয়া ফেলিল। ক্রমে বাঙ্গালীরামের গ্রামে বেশ প্রতিপত্তি হইয়া গেল। সারা গ্রাম কেন সে দিকের সারা অঞ্চলের মধ্যে কেবল তাহার ছেলে মেয়েরাই 'বাঙ্গালী' অর্থাৎ ইংরাজী ফ্যাসানের জামা গায়ে দিত; অবশ্য বাবুর ছেলেমেয়েদের পুরাণো জামা কাপড়েই তাহার চলিয়া যাইত—আর আলাদা করিয়া কিনিতে হইত না।

এত নাম থাকিতে তাহার নাম বাঙ্গালী রাখা হইয়াছিল কেন জিজ্ঞাসা করিলে বাঙ্গালীরাম বলিত, বাঙ্গালীরাই বড় বড় চাকুরী পায়, সব দেশে হাকিমী করে, ফরফর করিয়া ইংরাজী বলিয়া লোকের তাক্ লাগাইয়া দেয় সেজন্য ছেলের ভবিষ্যৎ ভাল হইবে কামনা করিয়া তাহার পিতা তাহার নাম বাঙ্গালী রাখিয়াছিল।

একবার ফসল কাটিবার সময় বাঙ্গালীরামের এক মাসের ছুটি লইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু যাইবার প্রধান বাধা হইল ছুটি লইয়া। ছুটি যে পাইবে না তাহা নয়। ছুটি পাইবে সঙ্গে সঙ্গে মাহিনাও পাইবে তাহা সে খুব জানিত। কিন্তু উপরি পাওনা? তাহা যে মাঠে মারা যাইবে। ইহার উপর আর এক বিপদ। বাজার করিবার লোভ সকল চাকরের। যাহার উপর বাজারের ভার পড়িবে সে যদি বাজার করাটা পাকাপাকি পাইবার লোভে সাধু সাজিয়া বসে? যদি দস্তরির পয়সা পর্য্যন্ত মনিবকে ধরিয়া দেয় বা সব কথা বলিয়া দেয়?

তখন পূরা একদিন ধরিয়া বাঙ্গালীরাম উপায় ও অপায় দুই চিন্তা করিয়া প্রভুপত্নীর কাছে আসিয়া কহিল, "আমাকে এক মাসের ছুটি দিতে হবে মাইজী।

'মাইজী' একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি করে হবে, বাঙ্গালী? তোমাকে এখন একেবারে এক মাসের ছুটি কি করে দিই? ছেলেরা তুমি না হলে শান্ত থাকে না; তার উপর খোকা তো তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড থাক্‌তে চায় না।"

বাঙ্গালীরাম ইহাতে মনে মনে খুসী হইয়া বলিল, "আমিই কি মাইজী দেশে গিয়া থাকিতে পারি? তা আপনি যদি বলেন আমার ছেলেকে এক মাসের জন্য রেখে যাই। সে খোকাকে দেখ্‌তে পার্‌বে; যদি বলেন বাজারও কর্‌বে।"

গৃহিণী বলিলেন, 'তা নেহাৎই যদি যেতে হয়, তাই কর। তোমার ছেলেকে আনিয়ে নিয়ে, কাজকর্ম্ম দেখিয়ে শুনিয়ে তবে যাও।'

গৃহিণীর মত হইবার পর কর্ত্তার মত হইতে আর দেরী হইল না। বাঙ্গালীরাম আর বিলম্ব না করিয়া তাহার চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক পুত্র মহাবীরকে দেশ হইতে আনাইল।

মহাবীরকে দেখিলেই মনে হয় ২।১ বৎসরের মধ্যেই সে মহাবীরই হইবে বটে। বেশ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ;—পাড়া গাঁয়ের ভাবটা ষোল আনা না হউক চৌদ্দ আনা এখনও বজায় আছে। তাহার কারণ সহরে আসিবার তাহার বড় একটা দরকার হইত না। বাঙ্গালীরাম তাহাকে দুই চারি দিনের মধ্যে এক প্রকার গড়িয়া পিটিয়া লইল দোকানীদের কাছে তাহাকে লইয়া গিয়া চিনাইয়া দিল। বলিয়া দিল মহাবীর তাহারই ছেলে; যেন তাহারা উহাকে ছেলেমানুষ পাইয়া ঠকাইয়া না লয় দস্তরিটা যেন নিয়ম-মত ছেলেমানুষকে দেয়।

গোপনে ছেলেকে জিনিস কিনিবার মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিল। সওয়া সের জিনিস কিনিতে দিলে কি করিয়া একসের তিন ছটাক জিনিস কিনিতে হইবে, বাকি এক ছটাকের দামটা কি করিয়া গোপনে কাচার খুঁটে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, বেশী পরিমাণে জিনিস কিনিতে দিলে কি করিয়া ঐ হিসাবে অর্থাৎ পাচ পোয়ায় এক ছটাক হিসাবে জিনিস কম কিনিতে হইবে—ইত্যাদি তথ্য পুত্রকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল। ইহা ছাড়া দোকানী দস্তরি দিবে। দস্তরি ধরা পড়িলেও তেমন ভয় নাই; কারণ উহা প্রায় জানা কথা। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে ব্যাপারটা কতক অভ্যাস করাইয়া বাঙ্গালীরাম গৃহিণীর নিকট হইতে কিছু অগ্রিম লইয়া এক মাসের ছুটিতে বাড়ী গেল।

(২)

বাঙ্গালীরামের ছেলে মহাবীরও বেশ চট্‌পটে। যে কাজ তাহাকে একবার বলিয়া দেওয়া হয় তাহাই বেশ মন দিয়া করে। তবে সে একটু বেশী মাত্রায় সরল। তাহার বাপ যে বীজ মন্ত্র কানে দিয়া গিয়াছিল তাহার মর্য্যাদা সে প্রাণপণে রাখিয়া চলিত। তবে এক এক সময়ে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। ইহা লইয়া একদিন একটা বড় হাসির সৃষ্টি হইল।

একদিন গৃহিণী চিঠির কাগজে একখানি চিঠি লিখিতে গিয়া দেখিলেন মাত্র একখানি এক পয়সার টিকিট আছে, আর একখানি দরকার। সে সময় একখানি খামের বা খামের টিকিটের দাম দুই পয়সা ছিল। ডাকঘর কাছেই ছিল। মহাবীরকে ডাকিয়া তিনি তাহার হাতে একটি পয়সা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানি টিকিট আনিতে বলিলেন।

মহাবীর তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল ও খানিক পরেই ফিরিয়া আসিয়া তাহার আনীত দ্রব্য গৃহিণীর হাতে দিল।

তাহার দিকে চাহিতেই গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে মহাবীর, একি আনলিরে?"

ডাকঘরে টিকিটের যে বড় বড় পাত থাকে তাহার চারিদিকে টিকিটের মাঝে যে সকল অপ্রয়োজনীয় অংশ-গুলি থাকে উহা তাহারই একখানা। মহাবীর কিন্তু অম্লানবদনে বলিল, "কেন মাইজী এই তো ডাকঘরের টিকিট।"

গৃহিণী এবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'টিকিটে রাজার বা রাণীর মুখ থাকে জানিস্ নে? এতে সে সব কই? তুই পাগল হলি নাকি?'

মহাবীরের চোখে মুখে এবার উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিল। তথাপি সে মুখের সাহসে বলিল যে ডাকঘরে সে এই টিকিটই তো পাইয়াছে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দিল তোরে এরকম টিকিট?"

মহাবীর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'খুদ ডাকবাবু।'

গৃহিণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক করে বল্ পয়সা হারিয়ে ফেলেছিস, তাই ছাই ভস্ম যা হয় একখানা নিয়ে এসেছিস্ না কি—ঠিক করে বল্।"

মহাবীর বেশ একটু ভণিতা করিয়াই উত্তর দিল যে সে ছেলেমানুষ নহে—যে পয়সা হারাইয়া ফেলিবে; সত্য কথাই সে বলিয়াছে।

সেদিন কোর্টের ছুটি। হীরেন্দ্রনাথ আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। গৃহিণী গিয়া স্বামীকে উঠাইয়া বলিলেন, "দেখগো, মহাবীর ডাকঘর থেকে এক পয়সার টিকিট এনেছে দেখ। একবার খোঁজ নেও তো ব্যাপার কি।"

হীরেন্দ্র নাথের সহিত পোষ্টমাষ্টারের বন্ধুত্বই ছিল। তিনিও বাঙ্গালী। তৎক্ষণাৎ একখণ্ড কাগজে ঘটনাটা লিখিয়া তিনি ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। অপর একভৃত্য সেই চিঠি লইয়া পোষ্টমাষ্টারের কাছে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই পোষ্টমাষ্টার বাবুর নিকট হইতে চিঠির উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—বেলা ২টা আন্দাজ আপনার বালক ভৃত্য সটান আমার কাছে আসিয়া বলে, 'আধেলাক ডাক টিকিট দিজীয়ে ডাক্‌বাবু।' আজকালকার দিনে এতটা জ্ঞানের প্রাচুর্য্য বড় একটা দেখা যায় না; তাই এই অপরূপ ক্রেতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, পল্লীগ্রাম হইতে সম্প্রতি আসিয়াছে। ভাবিলাম বোধহয় জানে না। তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, আধপয়সায় টিকিট পাওয়া যায় না; পুরা একটা পয়সা লাগিবে। ঐ বাবুর কাছে গিয়া টিকিট লও।

কথাটা তাহার বিশ্বাস হইল না। সে বলিল, না হয় একটু কম করিয়া দিন; কিন্তু আধ-পয়সারই টিকিট চাই। কিছুতেই আপনার ভৃত্যকে বুঝাইয়া পারিলাম না যে আধ পয়সার টিকিট শুধু দুর্লভ্য নহে, একেবারে অলভ্য। সে বেশ গম্ভীর ভাবেই বলিয়া গেল, এক পয়সার টিকিট যদি পাওয়া যায় আধ পয়সার কেন পাওয়া যাইবে না? সে একেবারে গাঁওয়ার (পাড়াগেঁয়ে) লোক নহে; বুদ্ধিসুদ্ধি তাহার আছে; কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারিবে না।

"তাহার কাছে কাজেই হার মানিতে হইল। বলিলাম ঠিক ধরিয়াছ বাপু, পাওয়া যাইবে না কেন? যায়। তবে সবাইকে আমরা দিই না। তুমি খুব বুদ্ধিমান তাই তোমাকে দিলাম। লও; কিন্তু কাহাকেও বলিও না। বলিয়া তাহাকে ঐ নূতন আধ পয়সার টিকিট দিলাম। টিকিট লইয়া সে হাত পাতিয়া বলিল, বাবু আধেলা দিন পয়সা দিতেছি। বুঝিলাম পুরা পয়সাটা আমার হাতে আগে দিতে তাহার ভরসা হইতেছে না। তাহাকে বলিলাম "তোমাকে একটু কষ্ট দিয়াছি সেজন্য ওই টিকিট-খানি তোমাকে বিনামূল্যে দিলাম; উহার দাম তোমাকে দিতে হইবে না।"

হৃষ্টচিত্তে সে যাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কোথায় থাকে।

উত্তরে জানিলাম ও রত্ন আপনার। কিন্তু কেন যে সে হঠাৎ আধপয়সার টিকিট কিনিতে আসিল তাহা এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আশা করি আপনার সহিত দেখা হইলে তাহা জানিতে পারিব। জানিবার কৌতুহলও রহিল, কারণ ব্যাপারটায় বেশ মৌলিকত্ব আছে।"

চিঠি পড়িয়া স্বামী স্ত্রী খুব খানিকটা হাসিলেন

মহাবীরকে ডাকা হইল। হীরেন্দ্র নাথ বলিলেন, "বাপু, তুমি তো ছেলেমানুষ, ইহারি মধ্যে এত বুদ্ধি কোথায় পাইলে? একপয়সার টিকিট আনিতে গিয়া আধ পয়সার টিকিট কেন চাহিলে?"

মহাবীর দেখিল বাবু সবই জানিতে পারিয়াছেন। সে তখন হাতযোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল ও পিতৃদত্ত উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সব কথা বিশদভাবে বলিয়া গেল।

গৃহিণী তো হাসিয়া খুন! বলিলেন, "হাসতে হাস্‌তে যে পেটে খিল ধরে গেল! উঃ বাঙ্গালীর পেটে এত বুদ্ধি ছিল তা জান্‌তাম না। ছেলেটাকে দেখলে তো একেবারে নিরীহ বলে মনে হ'ত। ওরও এত গুণ!

হীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, মহাবীরের তেমন দোষ নেই। দোষ হচ্চে ওর পূজনীয় পিতৃদেবের যিনি ওকে এই সুপথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এবার আসুন একবার তিনি!"

পরে মহাবীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খবর্দ্দার, আর কখন আধ পয়সার টিকিট অন্‌বিনে। পুরো একপয়সার টিকিট এনে বরং তোর মাইজীর কাছে ২।১টা পয়সা চেয়ে নিবি। বুঝলি?"

মহাবীরের ভয় হইয়াছিল পাছে বাবু মারিয়া বসেন বা তাড়াইয়া দেন্। দুইটীর কোনটিই হইল না দেখিয়া সে অতি কৃতজ্ঞ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে বুঝিয়াছে এবং বলিল যে এবার হইতে দরকার হইলে সে এক আধ পয়সা চাহিয়াই লইবে; ওপথে আর কখন যাইবে না।

হীরেন্দ্র নাথ স্ত্রীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আজকাল হাসি আর আনন্দ দুর্ল্লভ। ছুটির দিনে ও যে বিমল আনন্দ ও প্রচুর হাসির সৃষ্টি করেছে তার জন্য ওকে এবার ক্ষমা করা গেল। কি বল?"

গান

শ্রীসুধীরকুমার সেন

ভোরের ঐ শুক্‌তারাটি
যে বাতি জাল্‌লো প্রাণে;
সে আলো উঠ্‌লো ফুটে
আজি মোর নূতন গানে।

ধরণী চেতন হারা,
নিভেছে সকল তারা,
সে কেন একলা জাগে
কি ব্যথায় সেই তা জানে।

সকলেই গেছে চলে
যে ছিল তাহার সাথী;
নিরালায় গগন মাঝে
একা সেই জ্বালায় বাতি;

ছেড়েছে সবাই তারে,
একা তাই বারে বারে,
আসে সে চুপে চুপে
চেয়ে রয় পথের পানে।

আগমন রাতি শেষে
প্রভাতে মিলিয়ে যাওয়া;
বিদায়ের বার্ত্তা বয়ে
আনে তার ভোরের হাওয়া;

তারি সে মৌন ব্যথায়,
আমার এই বুক ভেঙ্গে যায়,
কি জানি কোন মমতায়
নিয়ত আমায় টানে।

পরিশিষ্ট

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

জীবনচরিতটা খুব বেশী বড় নয়,—আরম্ভটা খুবই সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু পরিশিষ্ট—তার যেন সীমা নেই—

নিঃসন্তান দম্পতি ; স্বামী ছিল সরকারী বনবিভাগের অফিসের কেরাণী। জঙ্গলে ঘেরা উপত্যকার ঘনবনের সীমান্তে তাদের আপিস। সেখানেই দিনের পর দিন কাটে।

লেখাপড়া হয়ত, শিখেছিল খানিকটা ; কিন্তু ঘন অরণ্যের নীলার নীড়ে—আর কাজের ভিড়ে লেখাপড়ার চর্চ্চা হয়ে ওঠে না। শ্রান্ত দেহে রাত্রে এসে শুধু ঘুমিয়ে পড়ে।

স্ত্রীটিও ছিল তেমনি ; সারাদিন কি করে,—কি করে শ্রান্ত হয় বলা যায় না ; কিন্তু রাত্রে স্বামীর পাশে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, একেবারে সকালে ঘুম ভাঙে।

বয়স বেশীও নয় কমও নয়—। কিন্তু আপনাদের নিয়ে অপনারা থাকাতে যে বিশেষ ক্ষোভ বেদনা জাগে মনে, এমন মনে হয় না।

পাহাড়ের কোলে নেমে আসা পাইন দেবদারু বন ; নীচের ঘন নানাবিধ গাছের—বনের দিকে চেয়ে স্ত্রীর সময় কাটে, কি কাজ করে কাটে বলা শক্ত। কিন্তু কাটে বেশ, গুনগুন করে গান গেয়ে—সকালে আফিসের রান্না করে,—সন্ধ্যায় আপিস ফেরতের জলখাবার, খাবারের আয়োজনে—আপনার প্রসাধনে—এমনি করে। নিতান্তই সোজাসুজি ; কিন্তু মাঝে মাঝে তারা কাব্যের মতন কথা কয়—।

নিশ্চিন্ত নির্ভরে স্বামীর বাহুমূলে মাথা রেখে স্ত্রী বলে, 'দেখ, আমার মনে হয় যেন তোমার কাছে একেবারে অসহায়ের মতন হয়ে যাই তো বেশ হয়—

'তোমার কি সহায় আছে নাকি—অসহায়ই তো!' সকৌতুকে স্বামী জবাব দিলে।

স্ত্রীও হাসে। কিন্তু তবু অসহায়তার—বিপুল কি এক গৌরবে সে সহায়কে আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর দিয়ে দিতে চায় ;—যে সহায় তারও যেন গর্ব্বের—মধুর কোমল অহঙ্কারের—গৌরবের সীমা নেই যেন।

স্ত্রী আবার বল্লে, 'না এরকম করা নয়—সে যেন কি রকম একটা—'

বুঝতে পারা যায় না যেন।...আনন্দময় বেদনায় দুজনেই চুপ করে ভাবে।—

ঐ টুকুই—নয়ত এই ধরণেরই ;—

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' কি' যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল দিন গুলির' ধারণা—অথবা ধূপের ঐ আপনাকে লোপ করে দেওয়ার অপূর্ব্ব বেদনাময় স্বপ্নে অন্তর ভরে ওঠে—কি কেইবা জানে। চোখ ঘুমে ভরে আসে।

পাহাড়ের পেছন থেকে, সূর্য্যোদয় হয় সে দিকে কিন্তু অনেক বেলায় সূর্য্য দেখা দেন। প্রথমে ওপারের ঘন শ্যাম বন রক্তাভায় রঞ্জিত করে ওঠে তারপর ছায়াঘন উপত্যকায় বেলার সূর্য্য প্রসাদ বিতরণ করেন।

রাত্রির পর দিন যায়—।

মজুর নারীরা সন্তানদের ঝুড়িতে বসিয়ে পিঠে করে কাজের ক্ষেত্রে যায়,—দিনের শেষে ফিরে আসে। সুরমা ছোট ছেলের গাল টিপে দেয়, মজুরণীদের দাঁড় করিয়ে ঘর-করণার কথা কয়।

নিজেদের নিয়েই নিজেরা পরিপূর্ণ।—

ছুটীর দিন সকালে স্বামী-স্ত্রী রৌদ্রে বসে কাজের নয়, নিরর্থক কথা কইছিল।

রবিবারটা যেন কবিতার বইয়ের একখানি পাতা। "কণিকার" মত কবিতার বইয়ের পাতা খুলে যে কোন কবিতা পড়া। "লোভে কম্পমান গানের বুক," "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাওয়া," "নিজের লেখা সমালোচনার মতন" নিরর্থক হাসি আর কথায় রান্নাঘরের কাজ মোটেই এগোচ্ছে না ; অথচ কি রান্না হবে তার তালিকা পুরুষের অনভিজ্ঞ নির্দ্দেশে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, সুরমার হাসিরও শেষ নেই।

শেষ অবধি রাগ করে খিচুড়ী চড়িয়ে—স্ত্রী এসে দাঁড়াল

বনের পথে সহর থেকে একটী ছেলে বেড়াতে এসেছিল। বেশী বড় নয়—ডানপিটে দুরন্ত হাসিমুখ।

মোড়ের মুখে বাঙ্গালীর গলা শুনে সে দাঁড়াল, সুরমার স্বামী তাকে বাঙ্গালী দেখে ডাকলে। পরিচয় পাবার আগে বেশ চেনা হয়ে গেল। যাবার সময় সুরমা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি"?

সে বল্লে, 'সুবোধ, বাপ মা নেই দেশে কাকা মামা আছেন ইত্যাদি—এদেশে চাকরী করতে এসেছে।' সুবোধ চলে গেল।

সুরমাদের রবিবাসরীয় আসরে সুবোধের রীতিমত স্থান হয়ে গেল।—যে তৃতীয়জন কোনো দিন ছিল না সে যে এতখানি আত্মীয় হয়ে উঠবে ওরা ভাবেনি। কল্পনা—"শতপথে ফুল ফুটিয়ে চলে"—

নিঃসন্তান নারীর মনে যেন জাগে, নিজের সন্তান হলে হয়ত এছেলেটীর চেয়ে একটু ছোট থাকত মাত্র!—

নিশ্চিন্ত হয়ে—শুয়ে আর তার কোনো কথাই মনে পড়ে না যেন—শুধু ভাবে।

—স্বামী ডাকেন, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছোট্ট কি একটা নামে, সে জবাব দেয় এক অক্ষরে;—কিন্তু নিশ্চিন্ত তৃপ্তি না নিশ্চিন্ত শ্রান্তি কি বলা শক্ত, তাকে অসহায় তার অসীম লোকে নিয়ে ফেলেছে যেন। সে আপনাকে একেবারে ধূপের মতনই নিঃশেষ করে দিতে চায়। তেমনি যেন কি এক সার্থক বেদনার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে ভস্মাবশেষ হয়ে—অপরূপ সার্থক হয়ে উঠতে চায়।

রবিবারের পর রবিবার চলে যায়। সুবোধ সুরমাদের রবিবারের অবসরে রবিবারে মতনই মিলে গেছে।

সেদিন ছুটী ছিল না, অবসরও ছিল না, সুবোধও আসেনি। স্বামী ফিরলেন সকাল করে।

তারপর আর একটী রবিবার এসে দাঁড়াবার আগেই স্বামী বল্লেন, কিছুই পারলাম না যা রইল তাও পর্য্যাপ্ত নয়, কি করে থাকবে—কোথায় যাবে?

সে একটা কথারও জবাব দিলে না, শুধু ব্যাকুল অসহায় ভাবেই তাঁর বাহুর মূলে মাথাটা গুঁজে চুপকরে রইল। তার যে অসহায়তার সীমাছিল না আজ—তার সঙ্গে আগে কোনো পরিচয় হয় নি। নির্ভরহী বেদনাময় অসহায়তার সীমা নেই।

চাকর বল্লে, "বহুজী আমি তোমার বেটা আছে।" সুবোধ এসে দাঁড়াল খবর পেয়ে—সেও নতমুখে অতিকষ্টে বল্লে, "আপনি কিছু ভাববেন না" আর বলতে পারলে না। ভাববার ছিল অনেক, কিন্তু ভাবতে পারার শক্তির অভাব ছিল।

* * * *

রাত্রি দিনের স্রোত তেমনি বয়ে যায়।

সুবোধ আসে প্রতিদিন। তার ঐ বেদনা পীড়িত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অসহায়া নারীর ওপর করুণার শেষ নেই, হয়ত মায়াও জন্মে।

কথানাই বা পাতা! সুরমা একমনে রোজই পড়ে। এত সময় ছিল? কিন্তু কথা কওয়া তো হয়নি। মনের দিক দিগন্ত এমন আকাশের মতন সীমাহীন? সেই দিগন্তের কোন এককোণে শুধু জীবনের অল্পমাত্র লেখা পড়েছে। তাও খরচপত্র আয় ব্যয়ের মলিন লেখায় ভরা। এত ঘুম? এত কাজ? নিষ্প্রয়োজনের উৎসবময় দিন রাত্রিকে সে কি ফিরিয়ে দিয়েছিল? চোদ্দ পনেরো বছরের মাঝে কটী দিনরাত্রি তার কমলদল মেলেছিল?

সুবোধ এসে দাঁড়ায়।

সুরমা অন্যমনস্কতা পরিহার করে উঠে বসে। কাজ কর্ম্মের কথা কয়। খানিকক্ষণের জন্য সুবোধের স্নিগ্ধ করুণাময় মনখানি তাকে অন্যদিকে নিয়ে যায়।

কিন্তু অতীতে-তন্ময় মন সমুখের জিনিষ সরে গেলে তেমনি কোথায় গিয়ে সেই অনাদ্যন্ত পুরাণ খুলে বসে।

বনের পথে তেমনি মজুর মেয়েরা ছেলে কোলে করে যায়। কেউবা গাছতলায় বসে ছেলেকে ঘুম পাড়ায় খাওয়ায়। জননী শিশুতে নিষ্কারণ পুলকের খেলা চলে।

সুরমা ডাকে, খাবার দেয়, কোলে নেয়। শিশুরা এসে সুরমাকে ঘিরে নেয়। সে আদর করে, সোহাগ করে, কিন্তু জননীর মতন করে সে একটী শিশুকে পায়নি, সেকথা হেমন্তের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশে আকস্মিক দিগান্তে বিদ্যুৎ প্রকাশের মতন কোথায় গোপন বুকের মাঝে চমকে বিপুল শূন্য দিগন্তর দেখিয়ে দেয়।

* * *

চাকর এসে বল্লে, "মাজী, সুবোধবাবুর অসুখ"।

মাতৃহারা

শিল্পী—শ্রীশিবপদ ভৌমিক

নিজেদের [illegible] [illegible] ঘরে সুবোধ চুপচাপ শুয়েছিল। সুরমা মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকল।

"তোমার অসুখ করেছে ?"

"আমি ভেবেছিলাম, সেরে উঠব," সুবোধ বল্লে।

"ওকি কথা বাবা, সুরমা অপ্রস্তুতভাবে তার মাথায় হাত রাখলে।"

নিঃসন্তানা নারী অপ্রস্তুতভাবে তার সেবা করে। দুধ, ফল, জল, ওষুধ নিয়মিত দেবার চেষ্টা করে।

সুবোধ একমনে তাকে দেখে।

রাত্রির আছন্ন অন্ধকারে সুবোধের মাথার কাছে বসে সে ভাবতে থাকে। আকাশ পাতাল, ভবিষ্যৎহীন দুর্গম দিন, স্বজনহীন পীড়িত সুবোধের কথা, সবটাই নিজের কথা।

দরজার বাইরে চাকরটা বসে ঢুলতে থাকে, নয়ত ঘুমায়।

অসুখ কি তা সুরমা বোঝেও না, জানেও না, জর কখনো বাড়ে কখনো কমে; ডাক্তার কি বলেন, তাও সুবোধ কিছুই বলে না।

সুরমার রাত্রি জেগেই কাটে।

মন দিন রাত্রির হিসাব নেওয়ারও বাইরে থাকে যেন।

ভোরের আলো বাইরে, ঘরে অন্ধকার।

সুবোধ মাথার ওপর থেকে সুরমার হাতখানা টেনে নিলে। সুরমা জিজ্ঞাসা করলে "কি সুবোধ ?"

সুবোধ শুধু তার দুখানা হাতের ভেতর মুখ রেখে বল্লে "মা"।

সুরমার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। নত হয়ে তার মাথার ওপর মুখ রেখে বল্লে, "বাবা তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ?"

সুবোধ বল্লে, "মা, তুমি এবারে দেশে চলে যেয়ো"।

সুরমার চোখ থেকে শুধু জল পড়তে লাগল।

সুবোধ চলে গেল।

*

শীতের দিন।

পাশের বাড়ীর হিন্দুস্থানী মেয়েটী তার [illegible] ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছিল। অনেক [illegible] তার, [illegible] ভালবাটা, মামা।

সুরমা [illegible] ওপর বসে নিয়মিত পূজায় পদ্ম [illegible] পড়ছিল। [illegible] [illegible] হেলেটার মার খেয়েও বকুনী খেয়েও ঘুম এলো না।

"নির্গমো নিরহংকারো"

সুরমার দুঃখ হলো, কেন মারে—আহা!

শিশুর কোমল হাতখানি মার বুকের আঁচলের নীচে আপনার প্রসাদ খুঁজছে; ঠোঁট দুখানিতে তখনো অভিমানের কাঁপন লেগে।

মা আবার বকে, "বজ্জিবজ্জাত"

সুরমা বল্লে, "আমাকে দেবে বও" ?

বহু সবিস্ময়ে একটু থমকে স্মিতমুখে ছেলে দিয়ে গেল।

"ঐ পাখী" বলে পায়রা কাক ডেকে, "ঐ লালছবি" বলে ঘরের চতুর্দিকে টাঙানো ঠাকুরদেবতার বিচিত্র বর্ণের ছবি দেখিয়ে, চাকি বেলুন আলু বেগুন, বন্ধ্যার ঘরের প্রবীণ প্রাচীনের খেলনায়, সঞ্চয়ের সমৃদ্ধিতে নানাবিধ অপরূপ প্রলাপ আলাপে কখন শিশুর মন মুগ্ধ হয়ে গেল।

ওদিকে বহুর শিল নোড়া রীতিমত কাজে লেগেছে।

সুরমার রান্নার আয়োজন হয়নি, যোগাড় হয়নি, গীতার পঠ্যমান অধ্যায়টী সম্পূর্ণ হয়নি, জপও যেন বাকি; পট্টবস্ত্র ছাড়া হয়নি।

সুরমা ও শিশু দুজনেই খেলায়—নতুনতর খেলনায় আনন্দে মগ্ন।

খানিক পরেই ক্রীড়াশ্রান্ত শিশুর ঘুম এলো।

সুরমা স্তব্ধ নিস্পন্দ ব্যথিত স্নেহে চুপ করে তার ঘুম ভাঙার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কোলে নিয়ে রইল। নিদ্রাতুর খোকা মাতৃবক্ষ মনে করে তার বুকে হাত রেখে তেমনি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমলো।

কুলহারা ভাবনায় অন্তরের মাঝে কোথায় কোন্ বেদনা বাজে; নিঃসন্তানা নারীর বুকে কোন্ চিরন্তনী জননী অশ্রুসিক্ত আকুল হয়ে ওঠে যেন।

'মাইজী [illegible] না পাড়াবে?—দেবে ওকে?'—বলে শক্কিধের বসনে জলের হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল।

চকিত হয়ে সুরমা চাইলে—'নাও'।—[illegible] তার ছেলে নিয়ে যায়।

[illegible] [illegible] পূজা [illegible] বসে, গীতার অমৃত অধ্যায়টী [illegible] [illegible]।

নাড়াচাড়াতে শিশুর ঘুম তখন ভেঙে গেছে। অপরাহ্ন বেলায় রৌদ্রে ছাতে বসে অবসর প্রাপ্ত জননীর—আর শিশুর নিরর্থক আনন্দের লীলার শেষ নেই।

দুগ্ধপানরত শিশু একবার করে দুগ্ধ খায়—আবার মুখ সরিয়ে মায়ের মুখ পানে চেয়ে হাসে। জননীও হাসে। ছেলের রাঙা ঠোঁটের পাশ থেকে দুধের ধারা গড়িয়ে আসে।

সুরমার মনের কোণ থেকে কখন গীতার পাঠরত অধ্যায়ের পাতা উল্টে গেল।

সমস্ত জীবনচরিতের ১৪।১৫ খানা পাতা উড়ে উড়ে অসংলগ্ন লিপিকাবলী চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে... প্রথম দিকে শরৎ মাধবীর ক'খানা পাতা যেন জাগে ;—কিন্তু যেন চোখের জলে ঝাপসা হয়ে—উঠ্‌ল...।...লেখা না দৃষ্টি ?

তারপর সুবোধের কথা—সুবোধের 'মা' বলে ডাকা... যতদিন সুবোধ কাছে এসেছিল, ততদিন সুবোধের কথা ভাবার অবসরও যেন সে পায়নি—সে যে নিঃসন্তানার অন্তরের মাঝে কতখানি বেদনাময় স্নেহের সঞ্চার করেছিল—সুবোধ চলে গেলে তাকে সমগ্র ভাবে ভাববার অবসর পেলে। স্বামীহীনার সন্তান থাকলে কি রকম হয়...?—

জীবন চরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের খান দুই পাতাও সাঙ্গ হয়ে গেল।

সুরমা—পূজার অসমাপ্ত আয়োজন নিয়ে অন্য মনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল—

কোন্ চিরন্তনী বিরহমিলন গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের এলোমেলো যেন লোণা বাতাসে সমাপ্তিহীন পরিশিষ্টের পাতাগুলি ক্রমাগত তরতর করে উড়তে থাকে—

———

চিরাগতা

শ্রীবাণী রায়

গগনে আজি কার খুলেছে নীলবাস
কাহার ছোঁয়া পেয়ে দুলিছে শাদা কাশ ?
নদীর কালোজলে কাহার হেরি হাসি
কে মোর হিয়া, পরে পরালো প্রেম ফাঁসি !

জীবনে আজো যারে পাইনি ভালো ক'রে
পড়িনু বাঁধা কিরে তাহার ছল-ডোরে ?
দ্বারের পাশ হতে দেখেছি হাসি তার
তাহারে আজি বুঝি দেখিনু আরবার।

হৃদয় নাচে মোর পুলক-মদিরায়,
নয়ন বার বার সুদূরে ছুটে যায় ;
হিয়ার দ্বারে আজ নূপুর বাজিল রে
মালিকা গলে মোর দিল সে রাঙা করে।

ভারতের ভবিষ্যৎ

শ্রীভারত কুমার বসু

"ইণ্ডিয়া ইন্ বন্‌ডেজ্"—নামক পুস্তকের গ্রন্থকার, ভারতের একান্ত বন্ধু, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের রেভারেণ্ড ডাক্তার জে, টি, সান্‌ডার ল্যাণ্ড কিছুদিন আগে চিকাগোর "ইউনিটি" পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তার-ই মর্ম্মার্থ নীচে দেওয়া হ'লো ;—

লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠক শেষ হবার সময়ে মিঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্ এই ঘোষণা ক'রেছিলেন যে, একটা নূতন শাসন-বিধি এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা ঠিক হ'লেই, গোটা কয়েক দরকারী রক্ষা কবচের (safe guard এর) সঙ্গে ভারতবর্ষকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনের—স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছে করেন। এবং এর অর্থ যদি এই হয় যে, ভারতবর্ষকে বাস্তবিকই স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে, তা হ'লে, ভারতের অসন্তোষের যে শেষ হবে এবং ব্রিটিশ রাজত্ব ও ভারতবর্ষের উপর যে বজ্র এবং বিদ্যুৎ-ভরা ঘন মেঘপুঞ্জ জ'মে র'য়েছে, সে-সব যে স'রে যাবে, এ-কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই মনে হয়।

কিন্তু যে-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিরাট জাতি বিগত দুই কিম্বা তিন হাজার বছর ধ'রে রক্ষা-কবচ না নিয়েও রাজত্ব চালিয়েছিল এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রভাবে ও গৌরবে এমন একটা স্থান অধিকার ক'রেছিল, যা কোনো জাতিই ক'রতে পারেনি, সে-জাতির জন্য রক্ষা-কবচের দরকার কি? এ জাতি কি বর্ত্তমানে নিজেদের শাসন ক'রতে পারে না? যদি পারে না, কেন পারে না? ১৭০ বছর ধ'রে ব্রিটিশের শাসনে এরা এম্‌নি অধঃপতিত হ'য়েছে যে, সেই অধঃপতনের জন্যই এরা তা পারে না,—অথচ তারা তা এককালে পেরেছিল অনেক দিন ধ'রে—রীতিমত সাফল্যের সঙ্গে। ভারতবর্ষ এই সব রক্ষা-কবচের জন্য নিজেকে অপমানিত বোধ করে।—

ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেবার নামে, ব্রিটেন কি এই সব রক্ষা-কবচের দ্বারা ভারতকে বাস্তবিকই উক্ত শাসনাধিকার দিতে অস্বীকৃত হচ্ছে না?

রক্ষা-কবচগুলি কি?

প্রথম :—ভারতের রক্ষী অর্থাৎ ভারতের সৈন্যের উপর গ্রেটব্রিটেনের কর্ত্তৃত্ব থাকবে। ভারতের সৈন্য প্রচুর আছে। এদের উপর কর্ত্তৃত্বের অর্থ কি? যদি আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে আমাদের প্রচুর সৈন্য থাকে, এবং ফ্রান্স, জাপান, জার্ম্মানী কিম্বা গ্রেটব্রিটেন তাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, এবং মাত্র একটা সৈন্যের উপরও যদি আমাদের শাসনাধিকার না থাকে, তা হ'লে বাস্তবিক পক্ষেই বলা যাবে কি যে, আমরা স্বাধীন, কিম্বা, স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পেয়েছি? ভারতবর্ষের সৈন্যের উপরে ব্রিটিশের কর্ত্তৃত্বের অর্থ এইতেই বোঝা যাবে। জগৎ কি জানে না যে, যে-কোনো জাতির সৈন্য বিদেশী শক্তির দ্বারা শাসিত হয়, সে-জাতি বাস্তবতঃ স্বাধীন কিম্বা স্বায়ত্ত শাসনাধিকার—প্রাপ্ত না হ'য়ে বিপদ-জনক নিবিড় শৃঙ্খলে বাঁধা থাকে?...

দ্বিতীয় :—যে-নূতন শাসন-বিধি তৈরী হবে, তার মধ্যে ভারতের বৈদেশিক রাজনৈতিক ব্যাপারে ব্রিটেনের কর্ত্তৃত্ব থাকবে। এর মানে কি?—এর মানে, কাগজে-কলমে ভারতবর্ষ অন্য জাতির সঙ্গে পত্র-ব্যবহার, বৈদেশিক সন্ধিতে স্বাক্ষর, কিম্বা যে-কোনো বৈদেশিক কাজ করতে পারবে না। ভারতবর্ষ অন্য জাতির কাছে দূত, মন্ত্রী, পদস্থ কর্ম্মচারী কিম্বা প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে না। ভারতবর্ষ অন্য জাতির কাছে একটা জাতি ব'লেই গণ্য হ'তে পারবে না। সমস্ত পৃথিবীর কাছে সে কেবল গ্রেট ব্রিটেনের পদানত প্রদেশ ছাড়া আর-কিছু ব'লেই বিবেচিত হবে না। এর নাম-ই কি স্বরাজ হবে?

তৃতীয়ঃ—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক পণ্য-বিনিময়—ইত্যাদির উপর ব্রিটেনের কর্ত্তৃত্ব থাকবে। অর্থাৎ, ব্যবসার ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রেট ব্রিটেনের হাতে থাকতে হবে। ভারতীয় ব্যবসাদাররা বলে যে, ভারতের দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ এই যে, অনেক

দিন থেকেই ভারতীয় বাণিজ্য, ব্রিটিশের শাসনাধীন হ'য়ে আছে। এবং এ-কথা সত্য যে, বাণিজ্যের শক্তি রাজনৈতিক শক্তিকে শাসন করে। সুতরাং যে-কোনো দেশ যে-কোন জাতির বাণিজ্যকে শাসন করে, সেই দেশ সেই জাতিকেও শাসন করে।

চতুর্থঃ—প্রস্তাবিত নূতন শাসন-বিধির মধ্যে ভারতের জাতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের যথেষ্ট দায়ীত্ব থাকবে এবং প্রকারান্তরে আগেকার অন্যান্য বড়লাটের চেয়ে, ভারতবাসীদের জন্য, তাঁকে অনেক বেশী স্বেচ্ছাধীন, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হবে। অপর কথায়, ব্যবস্থাপক-সভা-শাসনের কিম্বা ব্যবস্থাপক-সভাকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তাঁর থাকবে এবং তিনি যথেচ্ছাচার দেশ শাসন ক'রতে পারবেন।

এই-ই শেষ নয়। যেহেতু, গ্রেট ব্রিটেন ভারতের প্রাদেশিক শাসক এবং বড়লাট নিযুক্ত ক'রবেন এবং এ-বিষয়ে ভারতের কোনো কথা বা শক্তি থাকবে না, এই কারণে, ভীষণ অত্যাচারী স্যার মাইকেল-ও'-ডায়ারের মতো লোকের দ্বারা শাসিত হ'তে, ভারতবর্ষ কোনো প্রকারেই বাধা দিতে পারবে না।—এর নামই কি ভারতের স্বরাজ?—

এই চারটীই হচ্ছে প্রধান রক্ষা-কবচ (আর-ও রক্ষা-কবচ আছে। কিন্তু এই চারটীই বিশেষ দরকারী।) ভারতবর্ষকে গ্রেটব্রিটেন যে-নূতন শাসন-বিধি দয়া ক'রে দিতে যাচ্ছেন, তার মধ্যে ওই কটী রক্ষা-কবচ না থেকে পারেই না!...

এই নূতন শাসন-বিধির দ্বারা ভারতবর্ষ কি বাস্তবতঃ দায়ীত্বপূর্ণ শাসনাধিকার পাবে? অপরপক্ষে, আগেকার মতই সে কি পরাধীন জাতি হ'য়েই থাকবে না? যে-শৃঙ্খলের দ্বারা তাকে বাঁধা হবে, তা হয়ত আকারে তফাৎ হ'তে পারে,—সেটা কিছু লম্বা হ'তে পারে—যার দ্বারা সে বন্দী-জীবনে চলা-ফেরার জন্য কিছু বেশী স্বাধীনতা পাবে, কিন্তু তার বাঁধন ত তখনও শৃঙ্খলের-ই থাকবে,—ইস্পাতের শৃঙ্খলের? —আগেকার মতো এ-শৃঙ্খল ত সেই দৃঢ়, সেই দুঃখের, সেই দুঃসহনীয়?

কোথা

শ্রীঅমলা দেবী

অচঞ্চল চির দীপ্ত তারার মালিকা
ওরি মাঝে কোন খানে দীপালির শিখা
জ্বালিয়ে তুলিব ধরি? মানসের ধন
কোন দেবালয় মাঝে মোর আয়োজন
নিবেদন করি দেব? ভাবি ক্ষণে ক্ষণে
আজিকার প্রীতি-পুষ্প সে দিন স্মরণে
ম্লান হয়ে যায় যদি! অনন্ত জগতে
কোন চিহ্ন লয়ে আমি চলিব সে পথে?

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

—উপন্যাস—

(১)

সবে মাত্র শীত পড়তে আরম্ভ হয়েছে, গায়ে লেপ দেওয়াও যায়না ; আবার কিছু গায়ে না দিলেও ভোরের দিকে যেন পায়ে শীত করে, সমস্ত গায়ের ভিতর শির শির্ করে ওঠে। আলসেমির জন্যে নিজ গায়ে কাপড় টেনে দেওয়া যায় না—কেউ দিয়ে দিলে খুব আরাম বোধহয়, এ সেই সময়।

ভোর প্রায় হয়ে এল। কলকাতার একটা বড় রাস্তার ওপরেই, মস্ত গেটওয়ালা বাড়ী—দিনের বেলায় গেটের লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে ভেতরের সবুজ মাঠ, খেলবার জায়গা, দরোয়ানদের ঘর, লোকজনের আসা যাওয়া, সবই বেশ দেখা যায় ; কিন্তু এখন সেটা যেন বিরাট দৈত্যের মত, প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে। এর ভেতরে যে কত মানুষের প্রাণ এখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে তার ঠিক নেই। বাড়ীটার আয়তন ও অবস্থান দেখলেই মনে হয় যে এটা কারো বাসের বাড়ী নয়। হয় কারখানা, না হয় অফিস না হয়তো ছাত্রাবাস চলতি কথায় যাকে বলে বোর্ডিং।

এই বোর্ডিংএ তিনতলার একটা ঘরে খান পাঁচ ছয় লোহার খাট্ পাতা। তাতে নানা বয়সের মেয়েরা ঘুমে আচ্ছন্ন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতালের একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছেনা। রাস্তার গ্যাসের আলোর দু'একটা রেখা ছাড়া ঘর একেবারে অন্ধকার—কারণ ঘরে আলো রাখার নিয়ম নাই। ভোরের পাত্‌লা অন্ধকারেই রাস্তায় ঝাড়ুদারের শব্দ শোনা গেল। গ্যাস নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের পুব দিকটা অল্প লাল হয়ে উঠ্‌ল আর সেই লালের আভা তেতলা বাড়ীর ঘরের খোলা জানালা দিয়ে, জানালার কাছে যে মেয়েটী শুয়েছিল তার মুখের ওপর পড়ল। নিশ্বাস ফেলার ছন্দ পতন হল। চোখের ওপর আলো পড়াতে ঘুমটা তারই আগে ভাঙল। চোখ মুছে নিয়ে ঘরের সব ক'খানি খাটের ওপরেই সে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সবাই নিদ্রামগ্ন। দেখে মৃদু হাসির একটা অতিসূক্ষ্ম রেখা তার প্রসন্ন মুখে ফুটে উঠলো। খাটের নীচ থেকে স্লিপার দুটো পায়ে ঢুকিয়ে, খোলা বিনুনিটা হাত দিয়ে জড়াতে জড়াতে পাশের খাটে যে মেয়েটি পাতলা একখানা ধোয়াটে রংয়ের শাল মুড়ী দিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছিল, আচমকা তার গা থেকে সেখানি নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সামনের ছাদে বেরিয়ে পড়ল।

অসময়ে সুখ নিদ্রা ভেঙে যাওয়াতে, নিদ্রকারিণী বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বল্‌লে 'আঃ! মীনু কি হচ্ছে? সকাল বেলায় আর জ্বালাতন করিস্‌নে। দে আমার র‍্যাপার ফিরিয়ে দে!'...

"ওঠ ঠাকরুণ! আর রাতি নাই ভোর হইয়াছে। এখুনি উপাসনার ঘণ্টা পড়বে।"—মুখখানাতে দারুণ অসন্তোষের ছাপ নিয়ে মীনার সহপাঠি মাধবী অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠেই পড়্‌ল। কারণ তখন থেকে প্রস্তুত হতে আরম্ভ না করলে, হয়তো সকাল থেকেই, 'সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট' মিস হাজরার কাছে বক্তৃতা শোনা ও কর্তব্যে অবহেলার ফর্দ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে।

মাধবী উঠে দেখ্‌লে মীনা তার র‍্যাপারখানা বেশ পাট করে, মাথার বালিশের নীচে রেখে দিয়ে, তার বিছানাটা বেড্ কভারে ঢেকে ফেলেছে। সেও যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি এ কাজগুলো সেরে ঘরে আর যে চার জন ঘুমোচ্ছিল, তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। [কারণ এসপ্তাহে সেই ওদের 'মণিট্রেস'। তাদের যত কিছু বিশৃঙ্খলতার জন্যে দায়ী সেই-ই।

ছাদে, তখন আরো দু একজন এসে জুটেছিল—মাধবী গিয়েও সেইদলে মিশলো। মীনা, তখন সুপ্রীতি, তার আর একজন বন্ধুর সঙ্গে মহা উৎসাহে, শেলি ভাল কি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভাল, বায়রণ ভাল কি কীট্‌স ভাল, সংস্কৃত

ভাল কি পালি ভাল এই নিয়ে, সরব আলোচনা লাগিয়ে দিয়েছে। মাধবী তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতেই, সে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলে উঠ্‌লো আইয়ে জনাব, হুকুম ফরমাইয়ে।"

কথাটার একটু ইতিহাস আছে। গ্রীষ্মের বন্ধের সময়ে ছুটী হবার দিন, সব বোর্ডার মিলে বিখ্যাত নাটক আবু হোসেন অভিনয় করেছিল; তাতে মাধবী নিয়েছিল বাদশার পার্ট আর রঙ্গময়ী মীনা হয়েছিল দাই। থিয়েটার কবে চুকে গিয়েছে কিন্তু পরিহাসপ্রিয়া মীনা, মাধবীকে কলেজের সময় ছাড়া, আর সব সময়েই 'জনাব' বলেই ডেকে থাকে।

তার পিঠে সশব্দে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে মাধবী, নিজের র‍্যাপারের একটু আশ্রয় পাবার জন্য মীনার গা ঘেঁসে বসে পড়্‌ল। তাই দেখে সুপ্রীতি বল্‌লে "এই যে পূর্ণিমা, অমাবস্যার মিলন হয়েছে। "এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস"—তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মীনা বলে উঠল "হৃদয় আবরি তোমা রাখি হে।"—মাধবী বল্‌লে "কালো বলে কি এত ঠাট্টা করতে হয়? জানিস্ তো, 'কোকিল যে কালো, তাতে কিবা আসে যায়? থিয়েটারের যত 'মেল' (Male) পার্ট আছে, বেছে বেছে আমিই করি আর কেমন নিখুঁত ভাবে! তোরা তো এগোতে সাহসই করিস্‌নে। কেবল ছিঁচ্‌কাদুনের মত "প্রাণেশ্বর! কি কুক্ষণে দাসী তব"—কণিকা এতক্ষণ ছাদের আল্‌সেয় ঠেস্ দিয়ে এদের কথা শুন্‌ছিল। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে কি দেখে নিয়ে বল্‌লে "আপাততঃ তোমরা চুপ করলেই ভাল হয়। কারণ মিস্ হাজরা এইমাত্র বেরোলেন দেখ্‌লাম।"

মিস্ হাজরার নাম শুনে অত বড় বড় কলেজের মেয়েদের মনেও একটু অস্বস্তির ভাব এলো। এমনি ছিল তাঁর প্রতাপ! মেয়েদের তিনি যে খুব শাস্তি দিতেন তা নয়, কিন্তু কেমন এক আশ্চর্য্য চোখের দৃষ্টি ছিল তাঁর, যে, যে মেয়েই হোকনা কেন ভয় পেয়ে উঠ্‌ত। সে চোখ যেন পাথরের চোখ্ যার দিকে চাইতো, তার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত হিম হয়ে যেত। কালো রং এ, পুরু লাল ঠোঁটে তার ওপর ওই আশ্চর্য্য চোখের দৃষ্টিতে তাঁকে মেয়েদের কাছে একটা ভয়ের জিনিস করে রেখে ছিল। ভয় ছিলনা কেবল একটী মেয়ের; তার নাম রেবা। রেবার সঙ্গে মিস্ হাজরার কথা নিয়ে বোর্ডিং শুদ্ধ সব মেয়েরই কথা কাটাকাটি ও মনান্ত চল্‌তই।

সেই মিস্ হাজরার, আসার আশঙ্কায় মীনা তাড়াতাড়ি মাধবীর র‍্যাপারটা তাকে একেবারেই ছেড়ে দিয়ে, নিজেরটার সন্ধানে ঘরে ঢুকে পড়্‌লো। রেবা হো হো করে হেসে বল্‌লে "কণা, যা হোক্ একটা কাজ কর্‌লি। মিস্ হাজরার নামে একেবারে পট পরিবর্ত্তন!"

গাল ফুলিয়ে কণিকা বল্‌লে "ফেভারিট" বলে, তোমার না হয় মিস্ হাজরাকে ভয় নেই। আমরা তুচ্ছ প্রাণী-অল্পেই ভয় পাই। একটু ধৈর্য্য ধরে দেখই না কেন, শুধু 'নাম' কি কাম! ঐ শোনো জুতোর শব্দ এগিয়ে আস্‌ছে—তোমার সাহস থাকেতো দাঁড়িয়ে থেকে ওঁর বচনাবলী শোনো। আমার অত সাহস নেই আমি পালাই।'

উত্তরে রেবা বললে "তোমরা ওঁকে যতটা বাড়িয়ে বল, আসলে উনি ততটা নন্।"

"ও বাবারে! গায়ে যে তোর ফোস্কা পড়্‌ল দেখ্‌ছি। কি দেখেই যে মজেছ! ওর চেয়ে যদি সুপ্রভাদিকে পছন্দ করতিস্ তাঁর 'এডমায়ারার' হতিস্ তো, তোর পছন্দর বাহাদুরী আছে বল্‌তাম। তা না, একেবারে "Cut and dried! শুষ্কং,কাষ্ঠং!"

রেবা তবুও হঠল না—বল্লে "রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে!"

এমন সময় যে মিস্ হাজ্‌রার কথা নিয়ে সকালবেলাই আলোচনার সভা বসে গিয়েছিল, তিনি সশরীরে হাজির হলেন। কণিকা কোথায় যে লুকাল, তা কেউ টের পেলনা; আর অন্য সব মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে পালাবার এত ধুম লাগিয়ে দিলে যে বেচারী রেবা একলাই তাঁর সামনে পড়ে গেল।

রেবার আপাদমস্তক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বল্লেন 'রেবা! তোমরা বড় মেয়েরাও যদি, সব কাজ রুটিন-মত না করো, তবে ছোট মেয়েরা শিখ্‌বে কি দেখে?"

একটু লজ্জিত হয়ে রেবা বললে "এখনও তো উপাসনার ঘণ্টা পড়েনি!"

"না, পড়ুক। কাজের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে নিতে হয়, তা হলে কাজের মূল্য থাকে। না হলে সে কাজ শুধু

কঠিন কর্ত্তব্যের রূপ ধরে মনকে পীড়াই দেয়। সব সময়ে মনে রাখ্‌বে

"In each duty
Lies a beauty—"

ততক্ষণে মীনা তার কাপড়-চোপর, চুল পরিষ্কার করে, হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে। দেখে হাজরা বোধহয় একটু খুসী হলেন। কারণ তাঁর দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটে অল্প হাসির রেখা ফুটে উঠেই যেন মিলিয়ে গেল। মুখে শুধু বল্‌লেন "বড় খুসি হলাম মীনা যে এতগুলি মেয়ের মধ্যে এক তুমিই যা একটু সময়ের মূল্য বুঝতে শিখেছ।"

হাজ্‌রা তাঁর বক্তৃতা শেষ করে চলে যেতেই, ঘরের মধ্যে থেকে, অদৃশ্য মূর্ত্তিগুলি একে একে দৃশ্যমান হলো। একসঙ্গে পাঁচ সাত জনে মীনাকে বল্‌লে "কার মুখ দেখে, তুই আজ উঠেছিলি মীনু, রেবার বদলে মিস্ হাজরা আজ তোকে প্রশংসা করে গেলেন ?"

কণিকার গায়ের জ্বালাটা তখনও কমেনি। সে চরকির মত এক পাক ঘুরে নিয়ে, রেবার মুখের কাছে হাতটা নেড়ে উঠ্‌লো "ও রেবা, রেবেকা সুন্দরী ! প্রশংসায় যে 'পঞ্চমুখ' হয়ে উঠেছিলে ? কি হোলো এবার !"

রেবার মুখখানা লজ্জায় ও অপমানে কালো হয়ে গেল।—

নীচে ঘণ্টা বাজলো—ঢং—ঢং—ঢং। মুখরোচক আলোচনাটা তখনকার মত স্থগিত রেখে সকলে উর্দ্ধশ্বাসে উপাসনায় যোগ দিতে চল্‌লো।

(২)

পূজার ছুটি হতে আর বেশী দেরী ছিলনা। চারিদিকে ব্যস্ততা, গোলমাল ও আকাশ বাতাসের অপূর্ব্বশ্রীতে সব যেন সজীব হয়ে উঠেছে ! যার কিছু নেই, একেবারে নিঃস্ব, সেও যেন 'পূজা' এই অক্ষর দুটী মহামন্ত্র মনে করে জপ করে যাচ্ছে। "দুর্গা নাম মহামন্ত্র, হৃদয় সদা জপ নাম !"

কল্‌কাতার সেই বোর্ডিংটাতেও ব্যস্ততার আর শেষ ছিল না। কেউ কেউ বাড়ী চলেই গিয়েছে, কেউবা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থেকে যাবে। যারা বাড়ী যাচ্ছিল তারা তো খুসী বটেই, কতদিন পরে আত্মীয় স্বজনদের প্রিয় মুখগুলি দেখতে পাবে এই চিন্তা তাদের মনে প্রবল হলেও, সখীদের বিরহ যে তাদের কাতর করে না তুলছিল, এমন নয় ! কতদিনে আবার আসবে কি ভাবে আসবে, হয়তো যে মুখগুলি ছেড়ে যাচ্ছে, পুনর্মিলনের দিনে তারা না থাকতেও পারে সব, এই রকম দুশ্চিন্তারও দু একটা কালো ছায়া, তাদের মনের ওপর চকিতে দেখা দিয়ে বাড়ী যাওয়ার আনন্দকে ম্লান করে তুল্‌ছিল।

মীনাদের বোর্ডিং থেকে প্রায় সবাই চলে গিয়েছে, বাকী শুধু তারা জন চারেক। তার মধ্যে তিনজনে মিলে চাঁদা করে গোটা উত্তর ভারত দেখে বেড়াবে, এটা অনেক আগেই ঠিক হয়ে ছিল, অপেক্ষা করছিল শুধু মীনার জন্য। তাকে তার বাবা হাজারিবাগ থেকে নিতে পাঠালেই, অন্য তিনজনে নির্ভাবনায় বেরিয়ে যেতে পারে।

মীনার কোন উপায় না হওয়া অর্থাৎ তার বাবার কাছে রওনা না হওয়া পর্য্যন্ত মিস হাজরাও আটকে পড়েছিলেন। তাঁর এক একটী দিন যাচ্ছিল, আর তিনি মীনার ওপর বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়ে তুল্‌ছিলেন। শেষে মীনাকে নিতে তার বাবা লোক পাঠালেন।

লোক যে এল তার নাম যতীশ্বর ! তার সঙ্গেই সে নিজের সব কিছু জিনিস গুছিয়ে নিয়ে রওনা হল। কারণ মীনার বাবা রমাপতি বাবু যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল যে মীনার বোর্ডিং বাস আপাততঃ শেষ হল। দরকার হলে ছুটির পরে এসে আবার এ্যাডমিশন নেবে।

মিস্ হাজরা যখন গম্ভীর মুখে এই আদেশ প্রচার করে চলে গেলেন, তখন উপস্থিত চারটী প্রাণীরই গভীর বিস্ময়ে কথা আর ফুটলো না। এ পরোক্ষ ইঙ্গিতের যে কী অর্থ তা বুঝে নিতে প্রথম যে কথাটী সকলের মনে হল, তার শুদ্ধ ভাষায় নাম উদ্বাহ, অর্থাৎ বিয়ে ! মাধবীই এই নিস্তব্ধতা ভাঙলে। বল্লে "মীনু, আর কি, এবার নীরস নোট লেখা থেকে অব্যাহতি পেয়ে 'প্রেয়সী বধূর' সাজ পরো গে। আর দুকাণ ভরে অনবরত শোনা গে

'তোমারেই ভাল বাসিয়াছি আমি শতরূপে শতবার,
যুগে যুগে অনিবার—"

হেসে মীনা বললে "তুই যে রাম না হতেই রামায়ণ আরম্ভ করলি মাধু ! বিয়ে ছাড়া কি আর যুক্তি সঙ্গত কোনো কারণ থাকতে পারে না বোর্ডিং ছাড়বার ?—"

'কোনো কারণই থাকতে পারে না মশায়, কোনো কারণই থাকতে পারে না। স্কুল, কলেজ ছাড়বার মত

যুক্তিসঙ্গত কারণ একমাত্র, সেটা হচ্ছে 'বিয়ে'। হিন্দুর মেয়ের তা ছাড়া আর কোনো কারণই থাকে না। বোর্ডিং এই থাক, আর কলেজেই পড়, সেন্‌সাসের সময় 'কাষ্ট' হিন্দুই লেখাতে হবে তো ?"

"বিশ্বাস কর মাধু সে সব কিছু নয়। হয়তো মা জেদ ধরেছেন আর বোর্ডিং এ রাখবেন না—অগত্যা কলেজ ত্যাগ। ও আমার মোটেই মনে হয় না।"—

"ওরে বাস্‌রে! কেন? তুমি কি? আর যদি গিয়ে দেখ যে চেলীর কাপড় আর মাথার 'সিঁথি ময়ুর' শুধু তোমার পরবার পথ চেয়ে পড়ে আছে, তা কি করবে?"—

এবারে মীনা সশব্দে হেসে বল্‌লে তোমার 'কথাতেই তুমি ঠক্‌লে এবার! কারণ আমরা যখন হিন্দু, তখন বিয়েটা যদি হতেই হয়, তবে এ দুমাসে হবে না—আশ্বিন, কার্ত্তিকে কি হিন্দু মতে বিয়ে হয়?—কাজেই 'সিঁথি ময়ুর' আর চেলীর শাড়ী শুধু পর্‌বার অপেক্ষায় নয়, কিনবার অপেক্ষাতেও থাক্‌বে—হয়তো বা তৈরীর অপেক্ষাও তারা করবে।"

"হয়েছে, হয়েছে মীনু দর্প করে অত বলিসনে। জানিস্ তো "অতি দর্পে হতা লঙ্কা"।

"খুব জানি। কিন্তু এও জানিস্ মাধু, যে বিয়েই যদি কর্‌তে হয় আমাকে তো, তোরা তার অনেক আগেই খবর পাবি। আর জুটতেও হবে সবাইকে এসে—না হলে 'শিবহীন যজ্ঞ' হবে নাকি!"

একটু হেসে মাধবী ও সুপ্রীতি বল্‌লে "হাঁ রে মীনু, আগে সবাই বলে থাকে, তারপরে, একেবারে সিঁদুর পরে এসে হাজির হয়। আর ক্রমে ক্রমে সেই নতুন সাথীটার মায়ায় এমন জড়িয়ে পড়ে যে পুরাণোদের কথা আর মনেই থাকে না।"

অনীতা খ্রীষ্টান রোমান ক্যাথলিক। উদাস ভাবে বল্‌লে "বড়জোর একপাতা লুচি খেয়ে তোদের যুগল রূপ দেখে আস্‌ব—এর বেশী আর আমি কি করতে পারি? অবিশ্যি যদি তুই নেমন্তন্ন করিস।—"

হাতের খাতাটা দিয়ে ঠক্ করে অনীতার পিঠে একটা আঘাত করে মীনা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে "এত কথাও জানিস্ তোরা?—"—

হাজারিবাগের পথ। ভোরে ট্রেণ থেকে নেমে "প্লেজার কারে" করে মীনা যতীশ্বরের সঙ্গে 'হাজারীবাগ টাউনে' চলেছে। বাড়ী থেকে তাকে ষ্টেশনে নিতে এসেছিল তাদের অনেক দিনের পুরোণো জমাদার। সামনে ড্রাইভার, তার পাশে যতীশ্বর, তার পাশে হীরা সিং এর দীর্ঘ, উন্নত চোহারা মাঝে মাঝে সামনের দৃশ্যগুলোকে ঝাপসা করে তুল্‌ছিল। মীনা ভাবছিল, তার বোর্ডিং থেকে আস্‌বার দিনটার কথা। মাধু, সুপ্রীতি ও অনীতা যদিও তাকে হাসিমুখেই ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিল, তবুও তারা এবং সে, সব ক'জনেই যেন মনে মনে বুঝতে পারছিল যে হয়তো এমন ভাবে আর মেলা হবে না। কতদিনের কত সুখ দুঃখের সাথী তারা, বালিকা মীনা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে আজ পূর্ণ তরুণী! তার মনের বাসনা পুষ্প এদের কাছেই ধীরে ধীরে দল খুলেছে, এদের সে সখী বলে ভালবেসেছে এদেরই সে বিশেষ করে চেনে! যদিই আর বোর্ডিংএ যাওয়া না হয় যদিই এই চলে আসাই শেষ হয়, তবে পরের দিনগুলো কি করে কাটবে, এই চিন্তাতে মীনা এখনই কাতর হয়ে পড়ছিল। মনে পড়ছিল সখীদের অশ্রু সজল ম্লান দৃষ্টির মধ্যেকার জোর করে মুখে ফুটিয়ে তোলা ম্লান হাসিটুকু আর মনে পড়ছিল ঠোঁটের ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা "au revoir!" কথাটা! নিজের মনে এই সব আলোচনা করতে করতে তার মন এমন জায়গায় এসে থামল যেখানে অতি ধীরে ছুঁলেও সমস্ত রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। সকালের মাঠের হাওয়া, দীর্ঘ সরল পথ, মোটরের অবাধ গতি কিছুই তার মনকে আকর্ষণ করতে পার্‌লে না। দুধারের খোলা মাঠের মাঝে, রাখালের মেঠো সুরে মন তার কোথায় হারিয়ে গেল।

মোটর চল্‌তেই থাকল। রাঁচি, হাজারিবাগ, জগদীশপুর, গিরিধি, এ সব জায়গায় মোটর চালাবার যে কি সুবিধা তা বলে শেষ করা যায় না। যেমন সুন্দর পথ, তেমনি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য। পথে অনাবশ্যক কোনো জীব, জন্তু এমন কি মানুষও নেই। হাট বার না হলে লোক দেখাই যায় না। একটানে বিনা বাধায় চলে এসে মোটর 'বগোদরে' থামল। এটা হল হাজারিবাগ রোড থেকে হাজারি বাগ টাউনে যেতে হলে প্রায় ৪০ মাইলের মাঝামাঝি একটা 'হল্টিং' ষ্টেশন। দু চার ঘর লোকের

বসতিও আছে। আর আছে একটা আড্ডা। যেখানে মোটর প্রভৃতি অচল হলে তাকে সচল করবার ও তার যত কিছু দরকার হতে পারে সবেরই ব্যবস্থা করা যায়। মোটর থামলে মীনা দরজাটা খুলে নেমে পড়ে একটু পায়ে হাটবার লোভে চল্‌তে থাক্‌ল। হীরা সিং তার লম্বা লাঠিখানা নিয়ে তার অনুসরণ করতেই, সে হেসে বললে "দরকার নেই দরোয়ান—আমি বেশী দূর যাব না।"

সকালের ঝল্‌মলে আলোয় চারিদিকের মাঠ ভরে গিয়েছে—হয়তো দু একটা পাখী এসে একটু বস্‌ছে আবার উড়ে চলে যাচ্ছে, গরুর গলার ঘণ্টাগুলো টুং টাং করে মৃদু মধুর বেজে এক অপূর্ব্ব রাগিণীর সৃষ্টি কর্‌ছে। চারিদিকের সজীবতা ও আনন্দ দেখে মীনার মনে অচলায়তনের পঙ্কের মত বন্ধন মুক্ত হবার একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল।

পিছন থেকে যতীশ্বর বললে "হেঁটেই কি বাকী পথটুকু শেষ করবে নাকি?"

"আ! যতীদা, তুমি যে দেখছি 'স্পাই' হয়ে উঠলে! দু পা এসেছি কিনা, অমনি পিছু নিয়েছ? তোমাদের জ্বালায়, আমরা কি স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতেও পাব না?

শান্তস্বরে যতীশ্বর বল্‌লে "পাবে, বাড়ী গিয়ে। তোমার বাবা, মার কাছে তোমাকে সসম্মানে পৌছে দিতে আমি বাধ্য এবং অনুরুদ্ধও বটে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, যতক্ষণ তুমি আমার দায়ীত্বের মধ্যে আছ, ততক্ষণ তোমাকে খুসীমত চল্‌তে দিয়ে আমি তোমার কিছু অত্যাহিতের দায়ী হতে পারব না।"

"বক্তৃতা দিতে খুব পার তো। হেঁটে বেড়ানর মধ্যে অত্যাহিতটা কি এলো?"

"কি, তা এখুনি দেখতে পেতে, বলেই যতী চোখের নিমেষে মীনাকে রাস্তার মাঝখান থেকে একেবারে মাঠের মধ্যে ঠেলে দিয়ে, নিজেও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মীনা বিরক্ত হয়ে 'আঃ' বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল। এক খানা মোটর মীনা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখান দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে উল্কার মত বেগে ছুটে গেল। বিশ পঁচিশ গজ গিয়ে সেখানা একেবারে থামল। গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার ও আরোহী দুজনেই লাফিয়ে নামল।

গাড়ীটা ছিন্নমস্তার দিক থেকে আস্‌ছিল। মাঝপথে কি একটা যন্ত্র খারাপ হয়ে যাওয়ায় এই গতিবেগের সৃষ্টি। আঘাত বেশী কারোই লাগেনি। গাড়ীটা একেবারে অকেজো হয়ে যাওয়ায় আরোহী খুবই মুস্কিলে পড়লেন দেখে যতী একটু এগিয়ে গিয়ে বল্লে "আপনি কোথায় যাবেন? আমার দ্বারা আপনার কি কিছু সাহায্য হতে পারে?"

ভদ্রলোক যেন অকূলে কূল পেলেন। বল্লেন "ছিন্নমস্তা" থেকে হাজারিবাগে ফিরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বোধহয় ফেরা এখন হল না। গাড়ী ঠিক না হলে কি করে যাব?"

"যদি অসুবিধা মনে না করেন তো আমাদের গাড়ীটায় আসতে পারেন। আমাদের বাড়ী গিয়ে, সেখানে 'ডাল-ভাত "দুটী খেয়ে তার তারপরে আপনার গন্তব্য স্থানে আপনি যেতে পারেন। কি বলেন, আপত্তি আছে?"

"থাকা উচিত নয়। কিন্তু আপনি তো আমাকে আহ্বান করছেন—বসাবেন কোথায়? স্থানাভাব তো একান্তই দেখছি।"

যতী একথার জন্য প্রস্তত ছিল। সে শুধু বল্লে "উঠে বসবার কথাটাই আপনি ভাববেন। স্থানাভাবের কথা তো আপনার নয়। "বলেই সে তাড়াতাড়ি হীরা সিংকে বল্‌লে দরোয়ান তুমি পিছনের লগেজ কেরিয়ারে কিংবা ছাদের উপরে এই বাকী পথটুকু যেতে পারবে?"

হাতের লাঠিখানা সামনে ঝুকিয়ে সেলাম করে হীরা সিং বল্‌লে "আল্‌বাৎ! হুকুম হলে আমি পায়দলেই এক ক্রোশ পথ যেতে পারি।" বাঙ্গালীদের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে, থেকে থেকে সে খুব ভাল বাংলা বল্‌তে পারত।

যতী বল্‌লে "না, অত কষ্ট করতে হবে না—গাড়ীতেই গেলে হবে।"

মীনা এতক্ষণ চুপ করে সব কথা শুনিতেছিল। যতীকে ডেকে এইবার সে বল্‌লে "যতীদা, তুমি গায়ে পড়ে এত আলাপ জমাতে পার, যে এক এক সময় রাগ ধরে যায়!"

"আচ্ছা! সে না হয় আমার দোষ বলেই মেনে নিলাম—কিন্তু তোমার বাবার কানে যখন একথা উঠত, আর তিনি আমার বিবেচনার দোষ দিতেন, তখন কি তুমি আমাকে সে বকুনি থেকে রক্ষা করতে?"

ঝাঁঝালো সুরে মীনা বল্‌লে "নেমন্তন্ন তো করা হল,

এখন বসাবে কোথায়, তোমার মাথায়? দেখ্‌ছ গাড়ী ভর্ত্তি—তবু—"

"আহা চট কেন মীনা—যেখানেই বসাই তোমার মাথায় বসাব না এটা ঠিক।" বলে হীরা সিংকে ইঙ্গিত করতেই সে গাড়ীর ছাদে উঠবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। তা দেখে মীনা বল্‌লে "কি বুদ্ধি! বুড়ো মানুষ রদ্দুরে আমসী হয়ে যাক্ আর কি! তা হবেনা হীরাসিং তুমি গাড়ীর ভিতরে বসো।"

এক মুখ হেসে হীরা সিং 'খুকী দিদিমণির পায়ের কাছে গাড়ীর মেঝেতে বসে পড়ল। যতী নতুন লোকটীকে ডেকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল।

যতীর এই কাণ্ডে মীনা তার ওপর হাড়ে চটে রইলো। সামনের মনোহর দৃশ্যগুলি তার মনকে কিছুতেই আকর্ষণ করতে পারলনা। নানা এলোমেলো ভাবনার মধ্যে দিয়ে সে এক সময় আবিষ্কার করলে যে নিজেরও অজ্ঞাত সারে সে কখন লোকটীর চেহারা দেখায় মন দিয়েছে। এই খবরটুকু জান্‌তে পেরেই তার কানের ডগা লাল হয়ে উঠল। এই অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে প্রায় এগারটার সময় মীনাদের গাড়ী তাদের বাড়ীর ফটক দিয়ে সুরকি ঢালা পথের ওপর দিয়ে ঘুরে বারান্দার নীচে এসে থাম্‌ল। আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর মুখ নিয়ে সে গাড়ী থেকে নেমেই সামনের হলটায় ঢুকে গেল। যেতে যেতে শুন্‌তে পেলে যতী সেই লোকটীকে বল্‌ছে "আসুন প্রভাতবাবু কাকাবাবু এ সময়টায় বাগানের তদ্বিরে থাকেন। চলুন আপনাকে সেইখানেই নিয়ে যাই। ওরে গোসলখানায় জল দে।"

(৩)

হাজারিবাগ অঞ্চলে প্রায় দোতলা বাড়ী নেই বল্লেই চলে। যা দু-একখানা আছে, তা নিতান্ত সখের খাতিরে। মীনার বাবা রমাপতি বাবুরও এই ধরণের একখানা সখের দোতালা ঘর ছিল। যখন ছুটীতে মীনা আস্‌তো, তখন এই ঘরখানা ব্যবহার হতো—না হলে অন্য সময়ে তালা বন্ধ পড়েই থাকতো।

এবারে মীনা বোর্ডিং থেকেই একটু বিষণ্ন মন নিয়ে এসেছিল, তার ওপর পথের মধ্যে যতীর আত্মীয়তায় গাড়ীতে একটী নতুন অতিথির উদয় হওয়ায় সে মনে মনে তার ওপর বিষম চটে ছিল। শুধু খাওয়ার সময় ছাড়া সে আর তার সেই ঘরখানা ছেড়ে নড়ত না। নীচে, বাড়ীর হাতার মধ্যে প্রকাণ্ড বাগান থাকা সত্ত্বেও তার বেড়াবার সীমানা দোতলার ছাদ পর্য্যন্তই বন্ধ হয়ে রইলো।—

সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে মীনা একলাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভাব্‌ছিল নতুন লোকটীর বেয়াড়া আক্কেলের কথা। সেই যে দু-তিন দিন আগে মোটর ভাঙার সুযোগ নিয়ে এ বাড়ীতে এসে ঢুকেছে, যাওয়ার তো আর নাম নেই! তারপরে সবরাগ গিয়ে পড়ল তার নিরীহ বাবার উপর! বাবা যেন কি! লোক দেখ্‌লে যেন স্বর্গ পান! কবেকার কে, কোথাকার চেনা, অমনি তাঁর কায়েমী বন্দোবস্ত হয়ে গেল এখানে! বাইরের লোক এসে ঘর জুড়ে বসে রইলো, আর তার জন্যে, সে স্বচ্ছন্দ মনে হাঁটা চলা করতে পাবে না! যদিও রমাপতিবাবুর মতটা স্ত্রী স্বাধীনতার খুব পক্ষপাতী ছিল, তবুও মীনা এখন রাগের ঝোঁকে সবটাই তাঁকে দোষ দিয়ে দিল।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। সে উঠে নিজের ঘরের আলোটা জেলে সেই আলোর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলো। দু-তিন দিন আসা হল, অথচ কেন যে তাকে বোর্ডিং ছাড়ান হল, সে খবরটা আজও সংগ্রহ হয়ে ওঠেনি। তার মনে অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করবার জন্যে প্রবল একটা আগ্রহ হচ্ছিল কিন্তু ওই নতুন লোকটীর হঠাৎ এসে পড়ায় তার মন এত বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে তার যে কোন বিষয়েই অসুবিধা বা খারাপ বোধ হচ্ছিল সবের জন্যই সে ওই প্রভাতকেই দায়ী করছিল।

নীচে শাঁখের শব্দ শোনা গেল! চমকে উঠে, খোলা চুলটা বাঁ হাতে জড়াতে জড়াতে সে নীচে নাম্‌ল। নেমে দেখলে তার মা তখন হিন্দুস্থানী ঝিএর সঙ্গে বাজারের ফেরত পয়সা নিয়ে খুব বকাবকি করছিলেন। সেদিন ছিল হাটবার। দুপুরে হাট বসে প্রায় সন্ধ্যার সময়ে ভাঙে। একেবারে দু-তিন দিনের মত বাজার করে রাখতে হয়। অনেকক্ষণ ধরে বকাবকি করে মীনার মা শতদল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাকে আসতে দেখে পারিত্রাণ পেয়ে বল্লেন "এসেছিল মা মিনি! দাই এর কাছে বাজারের হিসেবটা মিলিয়ে নে তো! আমি যাই, উনি আবার

আজ প্রভাতবাবুকে খাওয়ানো উপলক্ষ্য করে জন কুড়ি, পঁচিশ লোক নেমন্তন্ন করেছেন। না দেখিয়ে দিলে পোলাও আর মাংসটা মহারাজ যা করে রাখবে তার ঠিক নেই! আর হাঁ৷ আর একটা কথা ভুলেই যাচ্ছি—হিসেব মিলিয়ে, তুই যদি মা একবার চপের পুরটা ঠিক করে দিস্!" শতদল কাজের তাড়ায় চলে গেলেন।

হাতের কাছে একটা কাজ পেয়ে মীনার বিমনা মনটা একটু খুসী হয়ে উঠছিল। কিন্তু ফের এই প্রভাতের খাওয়ার কথায়, তার মন দ্বিগুণ বেঁকে বস্‌ল। কে এই প্রভাত! কোথায় ছিল সে আর কেনই বা ছেলে বুড়ো ঝি, চাকর সবাই মিলে তাকে এমন করে ঘিরে ধরেছে? এ বাড়ীতে অপ্রত্যাশিত, অনাহুত অতিথি তো এই প্রথম নয়? কত এসেছে, কত গিয়েছে। কেউ কিন্তু এমন করে আসন পেতে বসে নি তো! এই হাজারিবাগে এসে কণ্ট্রাক্টর রমাপতিবাবুর বাড়ীতে যে অন্ততঃ একবেলাও না খেয়েছে, তার হাজারিবাগ আসা অসার্থক! আর কি বেহায়া এই প্রভাত! যার সঙ্গে চেনা নাই, যাকে চোখেও একদিন দেখেনি, বিপদে পড়ে তার বাড়ী এসে, দিব্যি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে! সব শেষে রাগ হল নিজের ওপর। কেনই বা সে প্রভাতের সামনে বের হয় না। একি রাগ, না লজ্জা, না উপেক্ষা, না অনুরাগ? শেষের কথাটা মনে হতেই মন তার আবার বেঁকে বসল। দাই বললে "দিদি অন্য কাজে যাব, হিসেব মিলিয়ে নেও!" এক ধমকে তাকে চুপ করিয়ে মীনা বল্‌লে "যা, যা, তুই তোর কাজে যা অন্য সময়ে বলিস্ লিখে নেব।" বলে সে যেন এতক্ষণে মায়ের দ্বিতীয় অনুরোধের কথাটা একবার ভেবে দেখলে—তারপর ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে "পার্‌বনা আমি—ভারী বয়ে গিয়েছে, আমার কর্‌তে। ওই মহারাজই যা পারে করবে না হয় বৌদি দেখাবে'খন।

পাশেই ছোট একটা ভাঁড়ার ঘর ছিল। কাছেই সেই ঘরটা পেয়ে মীনা তাতে ঢুকে পড়ে দেখলে তার বৌদি মলিনা যেন বিশ্বের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে সেই ঘরে তরকারী কুটতে ব্যস্ত। সেখানে আর একজন ঝি শুধু তাকে সাহায্য কর্‌ছে। মলিনার ও ঝিএর হাত ও মুখ সমানেই চল্‌ছে দেখে সে হেসে বল্‌লে "বক্তৃতাটা কিসের? বুঝিয়ে দিলে আমিও কিছু বল্‌তে পারি।"

মলিনাও ছাড়বার পাত্রী নয়—সেও হাই স্কুলে থার্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েছে। বয়সে সে মীনার চেয়ে কিছু বড় হলেও বাড়ীতে আর কোনো সমবয়সি না থাকার দরুণ সম্বন্ধটা তাদের সখিত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। হেসে বল্‌লে "শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার পরে যে বাগ্মী বক্তৃতা করতে আসে, তার বক্তৃতা দিয়ে আর বিড়ম্বনা ভোগ করানো—কেন? সভায় ঢুকে যিনি বুঝতে না পারবেন যে সভার উদ্দেশ্যে কি, তাঁর না ঢোকাই ভাল।"—

"আজকের প্রেসিডেণ্ট কে?"

"প্রেসিটেণ্ট এখনও কাউকে করা হয়নি মিনু, তোর জন্যে ঐ পদটা আর আসনটা খালি রেখেছি।" বলে মলিনা মীনাকে বস্‌বার জন্যে একটা চালের বস্তা দেখিয়ে দিয়ে তার দিকে চেয়ে বল্‌লে "তারপর, এই সন্ধ্যে বেলা পর্য্যন্ত বিদুষী মহিলার হচ্ছিল কি?—চুল টুল কিছুই তো বাঁধা হয়নি দেখছি, কি ভাবে বিভোরা ছিলে?—পড়ার না বিয়ের?"—

মীনা মলিনার ঠিক সাম্‌নে বসেছিল। হাত বাড়িয়ে তার পরিপাটী করে বাঁধা এলো চুলের খোঁপাটাতে একটান দিয়ে সে বল্‌লে "বিয়ের ভাবনায় আমার তো ঘুমই আস্‌ছেনা তোমার বুঝি তাই হ'ত?"—

"তা, একেবারে যে কিছু হ'ত না, তা কি করে বলি! এই ধর্ মনটা উড়ু উড়ু ঠিক যেন পাখীর মত, প্রাণটা ত্রাহি, ত্রাহি, যেন তপ্ত খোলায় কৈ মাছ, জীবনটা বিফল, যেন ইউনিভারসিটীর সদ্য ফেল করা ছাত্র, তনু অবশ—'সখি ধর, ধর, কাঁপে লো অন্তর মোর' ভাব, হয়েছিল বই কি। এই সব লক্ষণ মিলিয়ে দেখে তবে না আমার বিয়ের 'সময়' এল। তোর যখন এ রকমটী হবে, বুঝ্‌বি 'নিদান কাল' এসেছে—আমাকে বলিস্; ওষুধ দেব।"

"বাবা রে বাবা, এত কথাও জানিস্ ভাই বৌদি। আমার কিন্তু ওসব কিছু না হলেও মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে, তাই তোমার কাছে এলাম, তুমি আর দগ্ধিও না।"

"এই হয়েছে—এও একটা লক্ষণ। মাকে বলে, তোমার একটা গতি শীগ্‌গীরই করতে হবে—দেরী নয়।"

"কেন, আমি কি 'অবারের' মড়া যে আমার গতি করবে। তোমার মেয়ে ক'টীর বেশ ভাল করে গতি

করে দেও যে মহা পুণ্যি হবে। আমাকে নিয়ে পড়্‌লে কেন? বিয়ে বিয়ে করে আমি হেদিয়ে মর্‌ছিনে।"

"চালাক মেয়ে যে! বাইরে মর্‌বে কেন? ভেতরে ভেতরে 'খাবি' খাচ্ছ!"

ঘরের দরজায় মীনার বড়দাদা শুভ্রাংশু দাঁড়ালেন। বল্‌লেন "'খাবি' খাচ্ছেন কে, খাওয়াচ্ছে বা কে?"

শুভ্রাংশুকে আস্‌তে দেখে মীনা লজ্জায় অস্থির হল এই ভেবে যে হয়তো তার বৌদি এখন কি বেঁফাস কথা বলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুল্‌বে। হলোও তাই—মুখরা মলিনা বল্‌লে "তোমার বোনের তো তোমরা কোন খবর রাখ না—বিয়ের বয়েস হল, অথচ বিয়ে দেওয়ার নামটী নেই। মরা কেটে কেটে, আর দিন রাত মানুষের দেহের কষ্ট বুঝে বুঝে কি আর তুমি জ্যান্ত মানুষের মনের কষ্ট কিচ্ছু বোঝ না!" বলা বাহুল্য শুভ্রাংশু ডাক্তার।

স্নিগ্ধ চোখে বোনের দিকে চেয়ে তিনি বল্‌লেন "ভাঁড়ারে আর রান্নাঘরে তোমাকে ধরে না মলিনা তুমি নারী জাগরণের দোহাই দিয়ে দেশের কাজে নেমে পড়।"

মলিনা বল্‌লে "যেতে তো চাই—শুধু তোমার দশা কি হবে ভেবে, আমার যেতে ইচ্ছে হয় না"

"মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব—
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব!"

মীনা ও ঝি এদের অজ্ঞাতসারে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছিল।

ডাক্তার হলেও শুভ্রাংশুর ভিতরটা এখনও শুকিয়ে যায় নি; সেখানে প্রেমিকের প্রাণ তখনো জেগেছিল। সুন্দর সন্ধ্যা, নির্জ্জন ঘর ও অনুপম সুন্দর মুখের আকর্ষণে ডাক্তার শুভ্রাংশু হঠাৎ নব বিবাহিত শুভ্রাংশু হয়ে মলিনার বঁটির পাশে বসে পড়ে তাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন "এই পঁচিশ, ছাব্বিশ বছরেই মরার কথা কেন? ডাক্তার হলেও, তোমার মরার কথা, আমাকে দুর্ব্বল করে ফেলে। শুধু শুধু এমন করে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?"

মলিনাও এক মিনিটের জন্যে তার কাজ বন্ধ রেখে কি বল্‌তে যাচ্ছিল—ব্যস্তভাবে শতদল সে ঘরে ঢুকে যেন অপ্রস্তুত ভাবে বল্‌লেন "মলিনা, মা, পেলাম না তো সেই মসলার পৌট্‌লাটা?" বলে ঘরের ভিতরে এটা সেটা নাড়তে লাগলেন।

শুভ্রাংশু মায়ের সাম্‌নে হাতে হাতে ধরা পড়ে কি বল্‌বে ভেবে না পেয়ে বল্‌লে "মিনি, কোথায় গেল মা বাবা তাকে তৈরী হয়ে নিতে বল্লেন—বাইরে গোটা কতক গান টান কর্‌বে।" তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি যেন বাঁচলেন।

ছেলের এই ছলনাটুকু শতদলের চোখ এড়াল না—প্রৌঢ়া শতদল শুধু একটু মুচকে হাস্‌লেন।

(৪)

প্রভাতের কাছে তার পরিচয় নিয়ে রমাপতি বাবু যখন জন্‌লেন যে সে তাঁর বাল্য বন্ধু ও সতীর্থ জগমোহন বাবুর ছেলে, তখন একদিকে বন্ধুর ছেলে বলে ও অন্য দিকে অতিথি বলে তার সমাদরটা তাঁর কাছে খুব বেড়ে গেল। তাঁর এই আনন্দ উচ্ছ্বাস কিন্তু তিনি তাঁর মনে সংযত রেখে, আর একটা যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে শাখা পল্লবে, তাঁর মনকে ঢেকে ফেল্‌ছিল, সেটার কথাই তিনি তাঁর উপযুক্ত পুত্র ও মন্ত্রণা দায়ক শুভ্রাংশুকে জানিয়ে ছিলেন। শুভ্রাংশু, পিতার কথামত, তাঁর মনের ইচ্ছাটী কাকেও জানালে না।

যে রমাপতি বাবুকে লোকে সংসার বিষয়ে উদাসীন বলেই জান্‌তো তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ে মীনার জন্যে অনেকখানি সংসার আসক্তির পরিচয় দিলেন। শতদলকেও না জানিয়ে তিনি প্রভাতের বাবা জগমোহন বাবুকে, তাঁর আসার কথা, মোটর ভেঙে যাওয়ার সব জানিয়ে শেষে লিখ্‌লেন—

"এতদিন দেশ-ছাড়া হয়ে অচিন্তিত ভাবে যখন তোমার ছেলেটীকে দেখ্‌তে পেলাম, তখন থেকেই মনে করছি, একে আপনার করে রেখে দিই। তোমার ছেলেকে যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। সহজ ভাষায়, আমার একটী মেয়ে আছে সে বেথুনে আই,এ, পড়্‌ছে—তোমার ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চাই। মেয়ে সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখ্‌বনা—তুমি এলেই দেখ্‌তে পাবে। বুড়ো হয়েছি, কখন ডাক্ এসে পড়বে—ছেলেদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি—কপালে থাকে তো ভদ্রভাবে খেতে পাবে—মেয়েটার ভার যদি তুমি নেও তো এজন্মের মত নিশ্চিন্ত হই। তোমার ছেলে এখানে আছে বলে মনে করোনা, যে আমার মেয়ের সঙ্গে তার কোর্টশিপ চল্‌ছে

মেয়েকে কলেজেই পড়াই আর বোর্ডিংএই রাখি, বাড়ীতে অনাচার ঘটানোর পক্ষপাতী আমি নই। শীঘ্র মতামত জানিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিও।

শ্রীরমাপতি মিত্র

যথা সময়ে তাঁর ঈপ্সিত উত্তর এল। জগমোহন খুব উদার ভাবে জানিয়েছেন

প্রিয় রমাপতি,

বহুদিন পরে তোমার চিঠি পেলাম। তোমার খবর আমি প্রায়ই নিয়ে থাকি। কারণ হাজারিবাগ অঞ্চলে যে যায়, এসে বলে, রমাপতি বাবু কনট্রাকটরের বাড়ীর আতিথ্য যত্ন ও সমাদরের কথা। আমি শুনে মনে মনে হাসি।—থাক্।

প্রভাত বাবাজী তোমার কাছে আছে, বড় সুখের কথা। ছুটির আগে আমাকে লিখেছিল, ছুটি হলে হপ্তা দুয়েক পরে সে কুমিল্লায় আসবে—এ দু হপ্তা সে দেশ দেশ ঘুরে বেড়াতে চায়। আমি অমত করিনি, কারণ ছেলে এখন বড় হয়েছে, মনের খোরাকও চাই। এখনকার ছেলে পিলেরা আর ছুটি হলে আমাদের মত পুকুরে ঝাঁপিয়ে, বাজী রেখে ভাত খেয়ে, বাইচ খেলে, দাঁড় টেনে আমোদ বা তৃপ্তি পায়না—এসব গেঁয়োমি। তারা চায় 'ট্রাভ্‌ল' আর 'রিফ্রেস' হ'তে। দেখছ তো পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে, মতটাও আমার পুরোণো বা পচা নয়।

সেদিন যে মোটর এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল তাও 'বিধিলিপি' দেখ্‌ছি। না হলে এত দেশ থাক্‌তে হাজারিবাগে যাওয়ার মন হবে কেন? আর ঘটনাটা তোমার লোকটীর সামনেই বা হবে কেন? এযে হতেই হ'ত। হিন্দু যখন, তখন অদৃষ্টকে তো মানতেই হবে। তাই আমার ঘরের লক্ষ্মী খুঁজতে প্রভাতকে অতদূরে যেতে হয়েছে।

তার পরে আসল কথা বলি। আমার ছেলেটীর বদলে তুমি তোমার মেয়েটী আমাকে দেবে লিখেছ, এর চেয়ে সুখবর আর কি হতে পারে? আজ বহুদিন আমি বিপত্নীক—সুতরাং লক্ষ্মীছাড়া—বহুদিন পরে বুড়ো বয়সে তুমি আমাকে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর্‌বার লোভ দেখিয়েছ। আমি একটু আভাস পেয়েই অনেকখানি লোভ করেছি—বুড়ো বয়সে চাকর বাকরের ভরসায় আর থাকতে পারিনা—ইচ্ছে করে ছোট বেলায় মার কোলের ছেলের মত শান্ত ভাবে, নিরুপদ্রবে জীবনের বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে যাই। "আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা কোলে তুলে নে না।"

বিপত্নীক হয়ে মাতৃহীন শিশু চারটীকে যে কী করে মানুষ করেছি তা অন্তর্য্যামী জানেন! বড় হয়ে মেজ ছেলে প্রভাস জাপান যেতে চাইলে, সেজ প্রণব বল্লে দেশে কিছু হবে না বাবা—বিলেত থেকে টেলিগ্রাফি শিখে আসি—সেও গেল। প্রভাতকে বল্‌লাম তুই বা কেন বাকি থাকিস্‌ বাছা—তুইও হনলুলু কি নিউজীল্যাণ্ড ঘুরে আয়। প্রভাত তখন এম্‌, এ পড়ছে বল্লে "সবাই গেলে চলবে কেন বাবা? ওরা আসুক তো সুবিধা হলে আমি যাব। আপনাকে দেখবারও তো লোক চাই। প্রভাস ও প্রণব ফিরে এসেছে—এখন ছোট প্রশান্ত যেতে চাইছে। কিন্তু প্রভাত যাওয়ার নামও করে নি আর। তোমার মেয়ে খারাপ হবেনা শিক্ষা দীক্ষায়—তাই আমার যে প্রভাত আমারই নিজের উন্নতির দিকটাও দেখ্‌লে না, তাকে তোমার মেয়ে দিয়ে তার জীবন ও আমার সংসারের গোড়া বাঁধতে চাই। অগ্রাণের প্রথমে যেদিন পাবে লিখো—আমি ছেলে নিয়ে হাজির হব।—

প্রভাতকে আমার চিঠি দেখাবে। আমি জানি, আমার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা—সুতরাং সে অমত করবে না। তুমি আমার প্রীতি নিও। প্রভাত ও মা লক্ষ্মীকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। বেহান্‌কে নমস্কার দিও। ইতি—

শ্রীজগমোহন দে।

রমাপতি যখন এই চিঠি পড়ে শেষ করলেন, তখন তাঁর আর সে আনন্দ একা মনে ধর্‌ছিল না। প্রথমেই তাঁর মনে হোল শতদলকে এবার বলা যাক্—কিন্তু আবার ভাবলেন, যেমন তিনি তাঁকে সংসার বিরাগী বলেন, তেমনি দেখিয়ে দেবেন যে উদাসী হয়েও, তলে তলে তিনি মেয়ের জন্যে কেমন সুপাত্র ছেঁকে তুলেছেন। শেষে ঠিক হোল প্রভাত যাওয়ার আগে তাঁকে যখন তার বাবার চিঠিখানি দেখানো হবে, তখনই সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে প্রভাত শুধু পথ থেকে কুড়িয়ে আনা অতিথি নয় সে এবাড়ীর ভাবী জামাতা। মীনার মুখখানি মনে পড়্‌ল—

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়্‌ল একদিন তিনি প্রভাতকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে, সে যেন অভিমান করেই তাঁর কাছে আসেনি। অনুপস্থিতা মেয়েকে সম্বোধন করে তিনি বল্‌লেন "ওরে বেটি! তোর ঐ মান এবার আমি এমন জিনিস দিয়ে ভাঙব যে তুই আর কোনো দিন মান করে থাক্‌বিনে।"

ক' দিন থেকেই প্রভাত 'যাব' 'যাব' করছে—অফিস তার খুলে গিয়েছে, আর থাকা চলেনা কোনমতেই। রমাপতিবাবু ঠিক করলেন জন কয়েক বন্ধুলোক নিমন্ত্রণ করে প্রভাতকে তাঁর ভাবী জামাতা বলে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। আর ওই সঙ্গে অমনি প্রভাতকেও তার বাবার চিঠিখানি পড়্‌তে দিয়ে তার মতামত জেনে নেবেন।

বাইরে তিনি প্রকাশ কর্‌লেন যে প্রভাত তাঁর বন্ধু-পুত্র। তাকে একটা বিদায় ভোজ দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। শতদল তাঁর স্বামীকে খুব ভালমতই জান্‌তেন; সুতরাং বিস্মিত হবার কিছু পেলেন না। এ রকম ভোজ তো নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন রমাপতিবাবু নিজের কাজ থেকে খুব সকাল সকাল ফিরে এলেন। উপযুক্ত ছেলে শুভ্রাংশুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক কর্‌লেন যে যদিও প্রভাতের বাবা সব বিষয়ই তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, তবুও বিয়ের কথা পাকা হবার আগে, প্রভাতের একবার মীনাকে দেখা দরকার। যাতে করে বাড়ী গিয়ে প্রভাত তার বাবাকে ভাবী বধূ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পার্‌বে। কিন্তু মীনাকে দেখান যায় কি করে? দেখ্‌লে প্রভাত যে অরাজী হবে, তা নয়; যে মেয়ে মীনা, ঘুণাক্ষরেও যদি এ চক্রান্তের আভাস পায় তো আর তাকে ঘর থেকে বের করাই যাবে না।

অনেক ভেবে ভেবে শুভ্রাংশু বল্‌লেন "গান শোনাবার নাম করে তাকে ডাকা যাক্‌। এতে তো আর অরাজী হবার কোনো কথা উঠ্‌তে পারে না।"

রমাপতিবাবু এতক্ষণ ঠিক মত 'হাল' ধরে এসে, তাঁর নিজের মেয়ের কাছে যেন হার মেনে যাচ্ছিলেন। কারণ মীনা তাঁর একমাত্র আদুরে মেয়ে। শিক্ষার সঙ্গে, তার দৃঢ়তা মিশে তাকে সকলের কাছেই একটু আলাদা করে রেখেছিল। তাইতে রমাপতিবাবু ভয় পেয়ে যাচ্ছিলেন। শুভ্রাংশুও যে ছোট বোনটার কথা মোটেই জানতেন না এমন নয়। কিন্তু তিনি একেবারে 'হাল' ছেড়ে দেন নি।

লোক জন এসে পড়্‌ল। শুভ্রাংশু মীনাকে নিয়ে আস্‌বার জন্য গেলেন। প্রায় মিনিট পনের পরে তিনি মীনাকে নিয়ে ফির্‌তে রমাপতিবাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। রমাপতি বাবুরই সমবয়স্ক ও সহকর্ম্মী দয়ালবাবু মীনাকে বল্‌লেন "মা, মিনু, তোমার দু একটা গান শুন্‌তেই আমরা এসেছি, যদিও তার পরে খাওয়া দাওয়ার একটা কথা, আছে।" মীনা একটু হাস্‌লে। বল্‌লে "কাকাবাবু, গান যে আমার কত ভাল হয়, তা তো আর আমার নিজের জান্‌তে বাকি নাই-তবে আপনারা যে এই গান শুনেই 'ভাল' বলেন, সে শুধু ভাল গান শোনেন নি বলেই।"

"হোক্ মা তাই-ই হোক। তোমার কচি মুখে তুমি যা গাইবে তা-ই আমাদের ভাল লাগবে। অমৃতম্ বাল ভাষিতম্।"

এক বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও প্রভাত সেই একদিন ছাড়া মীনাকে আর দেখেই নি। তাও সে গাড়ীর সামনের 'সীটে' ছিল বলে ভাল করে দেখার সুযোগই হয়নি। আজ সামনা-সাম্‌নি মীনাকে দেখে সে একটু চম্‌কে গেল ও মনে মনে বল্‌লে এদের বুঝি সবই সাহেবী কায়দা? অনূঢ়া, তরুণী কন্যা, সকলের সঙ্গেই বুঝি মেলা মেশা করে? হবেও বা!"

অচেনা এক তরুণীর আসার সঙ্গে ঘরে অত লোক থাকতেও প্রভাত লজ্জায় ঘেমে উঠ্‌ল। বাতাস চলাচল না হলে যেমন দম বন্ধ হয়ে আসে, তার ঠিক সেই অবস্থা হয়ে এল। উঠে গিয়ে একটু মুক্ত বাতাস পাবার জন্য সে যেন অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। শেষ পর্য্যন্ত, থাক্‌তে না পেরে সে সবার অলক্ষ্যে বাইরে যেতে চাইল, কিন্তু রমাপতি বাবুর দৃষ্টি প্রভাতের ওপরেই ছিল। সে বাইরে আসতেই তিনি তাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার বাবার চিঠিখানি পড়্‌তে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মীনার গান তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তারই প্রথম লাইনটা বারে বারে এসে প্রভাতের কাণে ঢুক্‌ছিল, মনে নয়।—

গান আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে প্রভাতের চলে যাওয়া অবধি তার চোখে কিছুই এড়ায়নি। তাকে এড়িয়ে চল্‌বার এই সুস্পষ্ট নিদর্শনে কুঞ্চিত ভ্রূ তার আরো কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। সে কিন্তু বাইরে গেয়েই চলল—

"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি
পরমোৎসব রাতি।"

(ক্রমশঃ

নিকষ পাথর

ভারতবর্ষ—চৈত্র—১৩৩৭

এসংখ্যায় একখানি উপন্যাস "রক্তের টান" শেষ হইয়াছে! কেদারবাবুর "আই হ্যাজ" এবং বহুকাল পরে শরৎবাবুর "শেষ-প্রশ্ন" আবার দেখা গেল। "বিপত্তি" কিন্তু পূর্ব্ববৎ পুরাদমে চলিতেছে।

ছোট গল্পের সমষ্টি এ সংখ্যায় মাত্র তিন। প্রথম গল্প শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের "বাজীকর।" গোড়া হইতে শেষ অবধি করুণ রসসৃষ্টির প্রয়াসে রচনাটি জমিয়া উঠিতে পারে নাই। আর্থিক অভাবে মানুষকে যে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তারই কতকগুলি সকরুণ বার্ত্তা ও দু'একটী ভাঙা ভাঙা চিত্র। কৌশলের অভাবে কোনটাই তারিফ করিবার মত হইয়া উঠে নাই।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীজগৎ মিত্রের "বিংশ শতাব্দী।" সুপ্রাচীন-পন্থী ও অতি নবীন-পন্থীর জীবনধারায়, মত ও পথে যে সুগভীর বৈষম্য থাকে তারই একটী সকৌতুক ছবি লেখক বেশ লঘু হাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে রঙ ও রস যেন অপরিমিত;—ইহাতে সৌন্দর্য্য একটু ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে নাই। যেমন—

"মোহিত গম্ভীর স্বরে বলিল "চট্‌বেন না বাবা, পাত্র সন্ধানে আছে।" "পিতা বলিতেছেন * * * আমার বাড়ীতে হিঁদুর বাড়ীতে 'লভ্‌?" আর এক জায়গায় "জানো আমি হিঁদুর সন্তান, স্কুল মাষ্টার?" মাষ্টার মহাশয়দের প্রতি এমন নির্ম্মম বিদ্রূপ কেন? ইহা কি কেবল অহেতুক কৌতুক না মূলে কোন দুঃখ-স্মৃতি বিজড়িত?

তারপর এমন মস্তিষ্কহীন স্বল্প মাহিনার স্কুল মাষ্টার কি খুঁজিলে মেলে যিনি মেয়ের উদ্বাহে বরপণ দিতে ব্যাকুল হ'ন? না দিলে ভাবেন, প্রাচীন প্রথার একটী বিশিষ্ট অঙ্গের হানি ঘটিতেছে?

লেখকের রসসৃষ্টির শক্তি আছে; প্রকাশ ভঙ্গীও বেশ এবং রচনাটিতে একটু বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়।

তৃতীয় গল্প শ্রীঅরুণময় সেন গুপ্ত এম-এ ই:র "নির্ব্বাচন।" একটী বিশেষত্ব বর্জ্জিত অসম্পূর্ণ রচনা—না-মঞ্জুর করিলে পাঠকগণের ভাগ্যে পাঠের দুর্ভোগ ঘটিত না।

এ সংখ্যায় ভ্রমণ আছে একটী ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ ই:র "চক্রধরপুর!" সিংহভূম জেলার এই স্থানটি ও তৎসন্নিহিত অপরাপর দর্শনীয় স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত খবর ইহাতে মেলে। রচনাটিতে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দু'এক যায়গায় পরিস্ফুটই বলিতে হইবে। তবে মোটের ওপর পাঠে তেমন আমোদ হয় না।

এগুলি ছাড়া আরও একটী রস-রচনা আছে—শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এসের "মৃগদাবের মনস্তাপ।" কিন্তু ভারতবর্ষ যখন এটিকে "জাতকের" পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন, তখন ইহা বৌদ্ধগণের অবশ্য পাঠ্য ও পণ্ডিতগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য এবং একটা নূতন সৃষ্টি বৈকি।

বাগবাজারের "নীলুখুড়ো" তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র-মহলে স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচিত্র কর্ম্মবলে চিরস্মরণীয়। তিনি এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া হাওড়ার পোল পার হইতেই যে কাণ্ড ঘটাইয়াছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মুখে আজও সে কর্ম্ম-মাহাত্ম্য শোনা যায়। আর এক "খুড়ো" তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া প্রয়াগ ঘুরিয়া কাশী হইতে "মৃগদাব" বা সারনাথ অবধি গিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের যে দারুণ মনস্তাপের কারণ হইয়াছিলেন, রচনাটির রসভাগ তাহাই। এই "খুড়োটিও" "নীলু খুড়ো" অপেক্ষা যে বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্ম্মমাহাত্ম্যে কম নয়—রচনাটিতে তার পরিচয় ও বার কয়েক অরসিকের মত "সে অনেক কথায়" আভাষ মেলে। যাহা হউক, "খুড়ো ভাইপোর" ব্যাপার—রস আছে!

এ সংখ্যায় ভারতবর্ষ পাঁচটি ও পরিশেষে একটী ছয়টী কবিতা ছাপিয়াছেন।

ষষ্ঠ কবিতাটি কবি উমাদেবীর তিরোধানে শ্রীনরেন্দ্র দেবের হৃদয়োচ্ছ্বাস। বাংলার কবিতা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট উমা দেবীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনরেন্দ্র ইঁহাকে "বান্ধবী" "সখী" রূপে দেখিতেন। তাই শ্রীনরেন্দ্র খেদ করিতেছেন—

"* * * পেয়েছিনু যে মধুর স্নিগ্ধ পরিচয়
হে বান্ধবী জানি তাহা নহে ভুলিবার * * *"

তারপর "* * * আবার যেদিন টানিয়া আনিল মোরে তবদ্বারে সখী।"

কবি নিরঙ্কুশ কিন্তু চক্ষুষ্মান তাই—

"তথাপি দেখিয়াছিনু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া
আনন্দ চঞ্চল প্রাণ দুলিছে কাঁপিয়া।"

ইহা এক বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যার আঁধারে যখন "কাব্যের কূজন ল'য়ে দু'জনে "নিভৃতে গুঞ্জন করিতেছিলেন, তখন কবির চোখে পড়ে। কিন্তু মোরা অন্ধ হে কবি—

দেখেছিলে কার—ওসে কার প্রাণ সর্ব্বাঙ্গে দুলিতে?

এই হৃদয়োচ্ছ্বাস শেষে গিয়া একেবারে মিলের জন্য কাগজে মাথা ঠুকিয়াছে—

"মুকুল ঝরিয়া গেল ফলে না চুমিতে
রজনী গন্ধার ডাল লুটালো ভূমিতে!"

ফল ফলিলে মুকুল তাতে যে চুমা দেয় এ উপমা অভিনব, অনুপম ও বড় মধুর। ইহাই শ্রীনরেন্দ্রের বিশেষত্ব। রজনী গন্ধার ডাল মাটিতে লুটাইতে দেখিয়া কবি খেদ করিয়াছেন; কিন্তু সে খেদের কোন কারণ নাই! একটা কাটি পুঁতিয়া সে ডাল আবার খাড়া করা চলে। ভাগ্যে ভারতবর্ষ কবিতাটিকে পরিশেষে ছাপিয়াছেন! নতুবা পাঠকমহলে কি কাণ্ড যে ঘটিত ভাবিতেই গা ছম্ ছম্ করে।

চারখানি রঙিন ছবিতে এবার অঙ্গ শোভার আয়োজন করা হইয়াছে।

প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত সারদা উকীলের 'অন্নপূর্ণা'। শিব অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিক্ষা মাগিতেছেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা। কাজেই শিবের চেহারা কঙ্কলাশের মত। তিনি অন্নপূর্ণার সম্মুখে যেমন করিয়া হাত তুলিয়া, পা বাঁকাইয়া বসিয়া আছেন তাতে তাঁর ভাঙের নেশাটা যে বেশ এক[illegible] চড়িয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। বোধ ক[illegible] শিল্পী যখন শিবকে আঁকিতে ছিলেন তখনই নেশার মাত্রাট[illegible] একটু বেশী ছিল। দেবতারা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া[illegible] বাহু দিয়া জানু চুলকাইতে পারেন, কিন্তু পা' দুখানা[illegible] দৈর্ঘ্য বর্ণনা আজ অবধি কোথাও শোনা যায় নাই[illegible] তবে এই ছবিটি দেখিয়া একটা আন্দাজ পাওয়া যায়—হাঁ, লম্বা বটে। এবং যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে তাহ[illegible] বাঁকানো যায়। আর অন্নপূর্ণার কটিদেশ ও তদোর্দ্ধে বক্ষত[illegible] যেন কুঁজার সরুগলা ও পেট।

দ্বিতীয় ছবি "শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবীর।

'ওরে, ও শ্বেত করবী!
—আজি কি সখী ভাঙলো ঘুমঘোর?"

এক বিলাতি পুতুল শ্বেতকরবীর ডালের আড়ে ফোটা করবীকে আঙুলে চাপিয়া নীরবে ঐ কথাগুলি বলিতেছে! ছবিখানি আড়ষ্ট।

তৃতীয় ছবি "শ্রীযুক্ত কুঞ্জরঞ্জন চৌধুরীর লক্ষ্মণ ও সীতা।" দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার ভয়াকুলা সীতা লক্ষ্মণকে বিপন্ন রামের সাহায্যে যাইতে বলিতেছেন। আর লক্ষ্মণসেনও হাত নাড়িয়া বলিতেছেন না—না—না। অবশ্য সীতার ও লক্ষ্মণের ছবি দেখিয়া তা বোঝা যায় না, আন্দাজে ধরিয়া লইতে হয়। ধানকী লক্ষ্মণ বীর ছিলেন; কিন্তু তিনি যে ভাবে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাতে মনে হয়, ধনুকটি ফেলিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যান।

চতুর্থ ছবি "শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদারের দিনের শেষে" দুইটি পশ্চিমা মজুর ও মজুরণী মাটি কাটিয়া সম্ভবতঃ ঘরেই ফিরিতেছে। মজুরটির কাঁধে আবার একটা খোকা—খুকীও হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের চাঁচর কেশ ও চিকন বেশ দেখিয়া মনে হয়, যেন ছবি আঁকাইতেই দুজনে বাহির হইয়াছে। গায়ে একটুও মলিনতার ছাপ নাই, মুখে চোখে দেহে শ্রমশ্রান্তির আভাষও দেখা যায় না। এমন না হইলে আবার ছবি!"

রুচির কথাও একটু আছে এই যে বাঙালী শিল্পীরা বাংলার নরনারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের উপাদান খুঁজিয়া পান না—তাঁদের পছন্দ উৎকলবাসী অথবা সাঁওতাল বা

অবাঙালী। বাঙালী শিল্পীদের ইহাই বাঙালীত্ব। তাঁরা ঘর ছাড়িয়া পরের দিকেই চোখ দিয়া থাকেন।

প্রবাসী চৈত্র - ১৩৩৭

প্রবসীর এই সংখ্যা প্রবন্ধ গৌরবে অতুলনীয়। ইহা ছাড়া রবীন্দ্র নাথের দুইখানি চিঠি রাশিয়ার শিক্ষা সম্বন্ধে ও গ্রামবাসীদের প্রতি উপদেশ আছে।

গল্পরস পিপাসুগণের জন্যও দুইটি উপন্যাস ও চারটি ছোট গল্প আছে। উপন্যাস দুইটি পূর্ব্বের "মহামায়া" ও "অপরাজিত।" মহামায়া এই সংখ্যায়ই সমাপ্ত; কিন্তু অপরাজিত যে ঠিক কোন অবস্থায় তা বুঝা গেল না:— নীচে "ক্রমশঃ" বা "সমাপ্ত" কোনরূপ নির্দ্দেশই নাই; ইহার সমাপ্তি ও ক্রমান্বয় পাঠকের বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতেছে।

গল্প চারটির মধ্যে প্রথম গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "দীপশিখা ও তৈল।" বর্ত্তমান যুগের দীপশিখা যন্ত্র ও তার তৈল মানুষ। মানুষের সবটুকুর ইন্ধনে এই বিশাল শিখাটি লেলিহান জ্বলিতেছে। যারা ইহাকে জ্বালাইয়াছে তাদের কাছে হৃদয় মূল্যহীন—হৃদবৃত্তিগুলিকে তারা উপেক্ষা করিয়া চলে—এই কথাটি লেখক একটী মিলের গল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিসের মিল তা অবশ্য বলেন নাই, অবশ্য সে দরকারও নাই। Propagandaর উদ্দেশ্য বুঝানো লইয়া কথা। কিন্তু গল্পটি তারিফ করিবার মত নয়।

মাঝে একটু সৃষ্টি রহস্য আছে। আর এক যায়গায় লোক বলিতেছেন "× × × সহসা তরঙ্গশীর্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। জলধির মধ্য স্থলে জাগিয়া উঠিল—একখণ্ড শ্যামল ভূমি। তিনি যেন অমৃতরূপিণী রমা,—প্রসন্ন হাস্যে মঙ্গলাশীষ বিলাইয়া তৃষ্ণার্ত্ত সৃষ্টির বিশুষ্ক প্রায় অধরে ইত্যাদি।"

তারপর তাঁর "রুক্ষ প্রান্তরে প্রথম অর্ঘ্য রচনা করিল নব-অঙ্কুরিত দূর্ব্বাদল।" ব্যাপার ভূতত্ত্বের—কিন্তু সিন্ধুর তামসাচ্ছন্ন অন্তর তল হইতে যে ভূমি খণ্ড বাহির হইয়া আলোর তোরণ তলে দাঁড়াইল তার বর্ণ কি শ্যামল? আর "তৃষ্ণার্ত্ত সৃষ্টির বিশুষ্ক প্রায় অধর" বস্তুটি কি? সৃষ্টি যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয় তবে "রচনাও" চাতকের মত "স্ফটিক জল" বলিয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারে। তারপর ঐ ভূখণ্ডের জন্মের পূর্ব্বেও যে সৃজন লীলা নিশিদিন চলিতেছিল। জলধির গর্ভে অতি ক্ষুদ্র দেহী প্রাণীর দেহ স্তরে স্তরে পুঞ্জিকৃত হইয়া ভূমিকে সহসা জাগাইয়াছে। তা হইলে সৃষ্টির বিলুপ্ত প্রায় অধরে নয়, লীলা রসাতুর অধরপুটেই। তবে এ কথা গুলিকে "কবিত্বের প্রয়াস" বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে। এই কবিত্বের মতে "তৈল" কথাটি কয়েক বার বড় অস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন "ভূমি লক্ষীর পরমায়ু প্রদীপে নিরন্তর তৈল প্রদান" "পৃথিবীর তৈল বিন্দু" ও "বুকের তৈলবিন্দু পোষণে যাহার পরিপুষ্টি"—এত তৈলাধিক্য ভাল নয়।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "হারজিত।" একটী রস রচনা। দাম্পত্য কলহের কাণ্ড —রসটুকু ক্রুদ্ধা পত্নী ও শান্ত পতির কথোপকথনে মন্দ জমে নাই। কিন্তু কলহের কথাগুলি সকল সময় মনে হাসি-উৎসের দরজা খুলিয়া দেয় না।

তৃতীয় গল্প শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্তের "মেঘ ও রৌদ্র।" দীনেশচন্দ্র কর্ণেল সিমসন হত্যামামলার প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত আসামী। গল্পটি বেশ ঝর ঝরে ভাষায় লিখিত। লেখকের সংযমও আছে। সুযোগ পাইলে তিনি কথা শিল্পেও নিপুণতা লাভ করিয়া যশার্জ্জনে সক্ষম হইতেন।

গল্পটি পুলিশের দারোগা নাম ধেয় কর্ম্মচারীর একটী চরিত্র চিত্র। দারোগা বাবু কেমন ক্ষণে ক্ষণে সূর্যের প্রচণ্ড তেজেরও মেঘের মত ছায়া ফেলিয়া আত্ম প্রকাশ করেন—নিঃস্ব বা জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এবং উপর ওয়ালা বা শ্বেতাঙ্গের কেবল মাত্র নাম শ্রবণেই সন্ত্রস্ত শান্ত ও ভূমি বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন—লেখক একটী ঘটনায় তাই অঙ্কিত করিয়াছেন। মনে হয় গল্পের নামটি "দারোগা চরিত" হইলেই বেশ খাঁজে খাঁজে বসিয়া যাইত।

চতুর্থ গল্প শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্তের "পুরুষস্য ভাগ্যং।" ভাল হয় নাই।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীনীরদ চন্দ্র চৌধুরীর "বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ"। প্রবন্ধটি আর কিছু না করুক পাঠকের মনে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে। এই হিসাবে ইহা মাসিক সাহিত্যে স্থান না পাইয়া কোন সংবাদ পত্রে বাহির হওয়াই উচিৎ ছিল।

প্রবন্ধটির আগাগোড়াই উষ্মা ও শ্লেষ। বাঙালী জাতির প্রকৃত শক্তি যতটা না থাক তার হাঁক ডাক, প্রাদেশিকতা বোধ ও শক্তির গর্ব্ব আছে তার অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং সেই কারণে সে ভারতের অপরাপর প্রদেশকে ছোট করিয়া আপনাকে তাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ হওয়া কেবল জাতির জীবনে কেন কোন ব্যক্তির জীবনেও বড় ভয়ের। কেননা বৃথা গর্ব্ব উন্নতির পরিপন্থী। প্রবন্ধকার তাঁর এই উক্তি সমর্থন করিতে দেশবন্ধু রবীন্দ্র নাথ, প্রমথবাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীগণের রচনা ও উক্তি হইতে অনেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি দেশবন্ধুর তদানীন্তন পার্শ্বচর সুভাসবাবুকেও উপেক্ষা করেন নাই, তাঁরও বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে।

কিন্তু গৌরব প্রকাশ সকল সময়েই যে অহিত ঘটায়-উন্নতির পথে বাধা একথা বলা ভুল। কোন্ জাতি না আত্মগরিমার ধ্বজা তুলে? অরে "প্রাদেশিকতা বোধ" কি কেবল বাঙালীরই "মর্ম্মে জড়িত?" এ কথা একবারে মিথ্যা যে—"ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্টকে আকড়াইয়া ধরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার ইচ্ছা বড় একটা নাই।" "বড় একটা" যে আছে তা তিনি এই প্রবন্ধেরই এক যায়গায় স্বীকার না করিয়া পারেন নাই—"আসামীদের জন্য আসাম, বিহারীদের জন্য বিহার ইত্যাদি" "তাহার অতি জাজ্বল্য মান ও অপ্রীতিকর প্রমাণ," তবে একথা বলার সার্থকতা কি? যাক্, প্রবন্ধটি বিশদ আলোচনার স্থান আমাদের নাই, এবং তার আবশ্যকও বোধ করিতেছি না।

এসংখ্যায় তিনখানি রঙিন ছবি দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ছবি "রাজকুমারী— প্রাচীন চিত্র হইতে।"

দ্বিতীয় ছবি "আর তুর্ত কর্তৃক অঙ্কিত—সিরাজ।" বেশ লাগিয়াছে।

তৃতীয় ছবি শ্রীসারদা "উকীলের—ঘুঘু।" এই সুন্দর ঘুঘু দম্পতিকে কয়েকমাস পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিউতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। অবশ্য তাতে ক্ষতি নাই, সুন্দর সৃষ্টি চিরদিনই আনন্দের।

বসুমতী—ফাল্গুন—১৩৩৭

এ সংখ্যায় গল্প-উপন্যাসের মহা বন্যা। একসঙ্গে চারখানি উপন্যাস—"মাটির স্বর্গ," "ধর্ম্মদাস," "রহস্যের খাসমহল," "জীবনস্বপ্ন" ও "বিদায়-বাণী" কে বাহির হইতে দেখিয় পাঠকগণ নিশ্চয়ই হতভম্ভ হইয়া গিয়াছেন। এ যেন বড় লোকের বাড়ী ভোজের আয়োজন। এখন অসুখ না করিলেই মঙ্গল।

গল্পও আছে পাঁচটি। প্রথম গল্প শ্রীচরণদাস ঘোষের "মনের কথা।" নাম শুনিয়া কেহ যেন গল্পটিকে পড়িতে আপত্তি না করেন। ইহা লেখকের মনের কথা নয়—গল্পের নায়িকার পাতানো নাম। এক অসহায়া বিধবার প্রতি গাঁয়ের মোড়ল কেমন নির্ম্মম অত্যাচার করিতে পারে, তার নামে কলঙ্ক দাগিয়া দেয় ও গ্রামবাসীরা নির্লজ্জের মত সেই রক্তযজ্ঞে যোগ দেয় তারই কাহিনী। আর সেই সঙ্গে কলঙ্ক কথায় অবিশ্বাস করিয়া কেহ তাকে মুখে ক্ষমা করিলেও অন্তরে অন্তরে যে তার প্রতি "মারমুখো" হইয়া থাকে, তারও একটু ঘোরালো রঙের ছবি আছে। রচনাটির ঐটুকুই' কৌশল, কিন্তু তেমন কুশলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই।' গল্পের ভাষা বেশ ঝরঝরে কোথাও অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ (কুমার) রায়ের "প্রগতি।" শত চেষ্টায়ও ইহার মধ্যে গল্পত্ব খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল বিদ্বেষবহ্নি জ্বালা। বসুমতী নিশ্চয় এটিকে ভাল গল্প বলিয়া ছাপিয়াছেন। অতএব ভালই।

তৃতীয় গল্প শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রক্ত-সন্ধ্যা।" মনে পড়ে কয়েক মাস পূর্ব্বে লেখকের একটী গল্প পড়িয়াছিলাম —"জাতি-স্মর।" সেই গল্পটির সহিত ইহার মিলটা এত স্থূলে যে মনে হয়, লেখক এই ধরণের গল্প বেশী লিখিলে চিত্তাকর্ষক রচনায় সক্ষম হইবেন না। এ রচনায় কিছু নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু ঘটনায় প্রাচীনত্ব অনেক খানি। তা ছাড়া বিবৃতিতে বৈচিত্র্য নষ্ট হয়। বক্ষ্যমান গল্পটি বেশ হইয়াছে—ব্যক্তির জাতিস্মরতায় যাঁদের বিশ্বাস গভীর, বিশেষ করিয়া তাঁদেরই ইহা প্রচুর আনন্দ দান করিবে।

কলিকাতার বহুবাজারের এক মুসলমান মাংসওয়ালা একদিন তার দোকানে কালিকটের এক নবাগত পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ীকে মাংস ক্রয়েচ্ছু হইয়া উপস্থিত দেখিয়াই —"ভাস্কো-ডা-গামা—ভাস্কো-ডা-গামা—"বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মাংসকাটা বড় ছোরা দিয়া খুন করিয়া ফেলে। এযুগে এই ঘটনার সঙ্গত কারণ পাওয়া

যায় না। আসামী তার পূর্ব্বজন্মের কাহিনী টানিয়া আনিয়া এক নিরপেক্ষ দর্শকের কাছে ইহার একটা কৈফিয়ৎ দেয়। কাহিনীটুকু স্থানাবশতঃ দেওয়া সম্ভব হইল না। ইহার শেষে লেখক বলিতেছেন "ক্ষণকাল পরে সান্ধ্য নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ-টিতে দামামা ও তূর্য্য বাজিয়া উঠিল।

"সূর্য্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোন নূতন গগনে উদিত হইয়াছে—"অর্থাৎ ভারতে মুসলমান রাজত্বের যবনিকাপাত হইল। গল্পের উদ্দেশ্য সেই ছবিটিকে আঁকা। পরিশেষে একটী কথা—মুসলমানগণ কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন?

চতুর্থ গল্প শ্রীপ্রভাবতী দেবী (সরস্বতীর) "পরাজয়।" গল্পটি মৌলিকতায় পরিপূর্ণ—যেমন—" "সাতকড়ি মণ্ডলের বৃদ্ধা মা যখন মারা গেল, তখন বাঁশ যোগাড় করার জন্যই সাতকড়ি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।"

"মৃতা মায়ের জন্য শোক করার অবকাশও তাহার অদৃষ্টে জুটিল না। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।" মায়ের জন্য শোকটা গৌণ করিয়া বাঁশ যোগাড়কে মুখ্য উদ্দেশ্য করায় মৌলিকতা নাই কি? লিপিকৌশল আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—সাতকড়িকে মাথায় হাত দিয়া বসাইয়া ব্যস্ত করায়। কেননা রাখাল তাঁকে বাঁশ দিতে চায় না। আবার সাতকড়িকে এই বাঁশ রাখালের ঝাড় হইতে যোগাড় করিতে হইবে—যদিও হরিদাস মাটি গাঁয়ে আর বাঁশের ঝাড় আছে কিনা, সে কথার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হৌক, রাখাল স্বেচ্ছায় সাতকড়িকে বাঁশ না দিলেও, সে ঝাড়ের বাঁশ কাটাইল সাতকড়ির স্ত্রী মন্দা রাখালের অনুপস্থিতিতে। যদি বলেন, স্বামী যেখানে হার মানিল, স্ত্রী কিসের জোরে জয় লাভ করে? বুদ্ধি? না। গায়ের জোর? না। মুখের জোর? তাও না। তবে কি? মন্দার বিবাহের পূর্ব্বে রাখালের সঙ্গে, একটু কি বলে, প্রেমের সম্পর্কের জোরে। মন্দা বাঁশ আনিল বটে কিন্তু রাখালও ছাড়িবার পাত্র নহে। মাঠ হইতে ঘরে ফিরিয়া যখন তার ঝাড়ের বাঁশ লইয়া গিয়াছে শুনিল তখন "দপ্‌ করিয়া তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল।" সে অবস্থা-পন্ন কৈবর্ত্তের সেকেণ্ড ক্লাশ অবধি পড়া ছেলে। "কি সুচেহারায়, কি স্বভাব চরিত্রে, কি বলে বুদ্ধিতে সে সকলকে পরাজিত করিয়াছিল।" কাযেই একটা মোটা লাঠি লইয়া রুগ্ন, শীর্ণ, দরিদ্র, নিরন্ন, শোকার্ত্ত সাতকড়ির মাথা ভাঙ্গিতে আসিল। কিন্তু পথে মন্দার সহিত তার দেখা। মন্দা ঘাট হইতে বাসন মাজিয়া ঘরে ফিরিতেছে। আর যায় কোথায়? তখন রীতিমত হম্বীতম্বী, কথা কাটাকাটি। পরিশেষে মন্দা বলিল—"মনে পড়ে রাখালদা সেই একদিন" ব্যস্। এ যেন জোঁকের মুখে লবণ, পোড়ার উপর স্পিরিট,—রাখাল অমনি জলবৎ শীতলং। তখন আর লাঠির দরকার নাই। রাখাল শরীর চর্চ্চা করে, তাই "হাতের লাঠিটাকে" কাছে নয় "দূর নদীবক্ষে ছুড়িয়া ফেলিল।" কেন এমন হইল? একটু উদ্ধৃত করিলেই কারণটা চট করিয়া বুঝিয়া ফেলা যায়—

"সে আজ অনেক দিনের কথা।

"সেদিন মন্দা ছিল মন্দা ও রাখাল ছিল রাখাল। তাহাদের মাঝখানে সাতকড়ি আসিয়া দাঁড়ায় নাই, মন্দা সেদিন মন্দা বউদি, রাখাল—রাখাল ঠাকুরপো হয় নাই।"

সাতকড়ির এতবড় অপরাধের মূলে ছিল মন্দার পিতা চরণদাসের কন্যা-পাত্রস্থ করার তাগিদ। ইহাতে সাতকড়ির কোন হাত ছিল না বরং রাখালকেই দোষ দেওয়া যায়। কেননা সে মন্দার পিতার অনুরোধের কোন স্পষ্ট জবাব দেয় নাই। কাজেই চরণ দাস সাতকড়ির হাতে কন্যা সম্প্রদান করে। প্রেমিকরা জানেন প্রেম অন্ধ—সুবুদ্ধি কৈবর্ত্তের ছেলে রাখাল তাই সাতকড়ির সর্ব্বনাশে মন দিল। সে নানা মতে সাতকড়িকে জব্দ করিয়া তার বাস্তুখানি পর্য্যন্ত নীলাম করাইল। তখন সাতকড়ি ম্যালেরিয়ায় মরণাপন্ন। সে বেচারী ভিটার মায়ায় কাঁদিয়া আকুল। কিন্তু মন্দা বড় শক্ত মেয়ে। তার সহিত রাখাল পারিবে কেন? সে রুগ্ন স্বামীকে লইয়া গরুর গাড়ীতে চড়িয়া গাঁ ছাড়িল—আর রাখাল?

"সেই দুইহাতে আর্ত্ত বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া একটা মাত্র শব্দ বাহির হইল, "মন্দা"—এখন পাঠক বলুন, পরাজয় কার? গল্পটির সুরু হইতে শেষ অবধি মৌলিকতায় পরিপূর্ণ নহে কি? 'ক' লিখিতে যেমন বয়ে আঁকড় দিলেই চ'লে তেমনি একটি প্লট

যোগাড় করিয়া সেটাকে "develope" করিলেই তা গল্প। আর মাসিক সাহিত্যের বাজারে পয়লা নম্বর, দোস্‌রা নম্বর ছাপ পরিয়া তা বেশ বিকাইয়া যায়।

পঞ্চম গল্প—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রাজা।" বাঙালীর নয়, এক বীর সাঁওতাল যুবকের প্রেমের গল্প। বাঙালীরা ত গল্পে বহুকাল হইতেই প্রেমে পড়িতেছে, তাদের গল্প পুরাণো। এদিকে যদিও কিছুকাল ধরিয়া সাঁওতালিরাও প্রেমে পড়িতেছে, তথাপি ইহার মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে; এবং তা' এই যে, নায়ক ভোজুল মাঝি বীর। লেখক বলিতেছেন—"কি জানি কেন, কিন্তু ইহা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বত্রই (পাঠকগণ পৃথিবীর ইতিহাসটা একবার মনে মনে আলোচনা করুন ও আশ-পাশে নজর রাখুন) দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সত্য সত্য বীর, সে একজন গভীর প্রেমিক।" যে সত্য সত্যই প্রেমিক, সে কিন্তু বীর নয়;—তাই "ভোজুল" নায়িকা "মোতিয়ার" জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, যদিও দেয় নাই। প্রেমের এতবড় নিদর্শন তিন লোক খুঁজিলেও পাওয়া যায় না যে! নায়ক বীর বটে কিন্তু তার জাত-জন্মের ঠিক ছিল না; মোতিয়ার বাবা তাকে ভালুকের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করে। এই বীরকে ভালুকে মারিতে পারে নাই, কিন্তু মারিয়াছিল কন্দর্প একটা একটা করিয়া পাঁচটি শরেই। তাই বীর ভোজুল মোতিয়াকে ভাল-বাসিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু গল্প ত জমানো চাই, সেজন্য মামুলি প্রথামত তার হাতে কন্যাদানে পিতার ঘোর আপত্তি। কিন্তু প্রেমের টান জোয়ারের টানকেও হার মানাইয়া দেয়। তার সঙ্গে আবার প্রেমিক যদি বাঁশী বাজাইতে জানে ত ঘরে থাকে কার সাধ্য। "ভোজুল নদীর ধারে বটতলায় বাঁশী বাজাইত, সে সুর শুনিয়া মোতিয়াও ঘরে থাকিতে পারিত না," কলসী না লইয়াই সে ছুটিয়া যাইত। অবস্থা যখন এমনি সঙ্গীন তখন, বলিতে হৃদয়ে বীর রসের সঞ্চার হয়—"বীর হৃদয়ের প্রেম কোন বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এক গভীর রাত্রিতে মোতিয়া ভোজুর হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।" Dramatic situation! লেখকের বাহাদুরী ত এইখানেই! আরও বাহাদুরী যে এই যাওয়ায় বীরের বীরত্বের চেয়ে মোতিয়ার আকুলতাকে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া তার Effectটুকু ভোজুলের উপর দেওয়া। তারপর শুনুন—"সর্দ্দার সকল কথাই বুঝিল; কিন্তু সেও ছিল বীর।" অর্থাৎ "হাম্ ভি মিলিটারী, তুম্ ভি মিলিটারী," ফলে—"সেইদিন হইতে সে মোতিয়া মরিয়াছে—এই কথাই—" থাক, আর না। অন্নভোজী বাঙালী, বীরত্বের কাহিনী আলোচনা করিয়া প্লীহা বিদীর্ণ হইতে পারে।

এই বীরত্ব কাহিনী, মাঝখানে এমন এক অদ্ভুত ঘটনায় রূপান্তরিত হইয়া গেল যে পরিশেষে ভোজুল একটা স্ত্রীলোকের মাতৃহীন শিশুকে কোলে করিয়া "ধেই ধেই" করিয়া নাচিতে লাগিল। "মোতিয়া ক্রীড়াচঞ্চল দুটি শিশুর উপর সোহাগ প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া অবাক হইয়া রহিল।"

"* * * ভোজু তখনও নাচ থামায় নাই। সে মোতিয়াকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, একেই আমরা রাজা বানাব ইত্যাদি।" আর ঐ সঙ্গে গল্পের নামকরণও হইয়া গেল। তারপরই পত্রিকায় প্রকাশ ও প্রখ্যাতি লাভ! এই নির্জ্জীব রচনার পরিশেষে একটু তৃপ্তিও বোধ করি আসিয়াছিল। কত মেকী যে এমনি করিয়া চলে।

এ সংখ্যায় একখানি নক্সাও আছে—"বায়স্কোপের সিনারিও" লেখক শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত। নামটি পাওয়া নয়, দেওয়া। কেননা সখ্ করিয়া আর কে নাম রাখে—"ডুবে থাক্।" নামের দিক দিয়া যাই হোক, নক্সাখানিতে সত্যই কতকগুলা ভাবিবার কথা আছে; কেবল ভাবিলেই চলিবে না। বাংলার ছায়া-চিত্রের যথার্থ উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া একান্ত দরকার। বাংলা ছায়া-চিত্রের বৈশিষ্ট্য হইতেছে মাথা-মুণ্ডহীন কতকগুলা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ আবার তার মধ্যেও নিতান্ত আজগুবি এমন সব কাণ্ড থাকে ও অভিনেতাগণ এমন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে সে গুলিকে অভিনয় করেন যে দেখিলে সারামন "ঘিন্ ঘিন্" করে। এতবড় একটা art এর মূলে যে সাধনা ও শিক্ষার দরকার, বোধ করি তার অভাবই ইহার কারণ। কিন্তু স্বয়ম্ভূদলের সেদিকে দৃষ্টি নাই।

তারপর, নক্সাকার এক যায়গায় বলিতেছেন "আমি লেখক" আর—এক যায়গায় বলিতেছেন "গল্প উপন্যাস রচনায় আমি আনাড়ি এ দুইয়ের কোন্‌টা সত্য? তবে তিনি লেখেন কি? নক্সা? নক্সা আঁকিয়া যদি কেহ

'চিত্র শিল্পী" হইতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য নক্সা লিখিয়াও 'লেখক" হওয়া সোজা ও স্বাভাবিক। সে পদ তাঁর বহাল রহিল। তবে যদি কোন সমালোচকের তীব্র কষা তাঁর পৃষ্ঠে পড়ে, ত বিচলিত হইবেন না। শিক্ষার শৈশবে এমন কতদিন হয়ত গিয়াছে যেদিন—যাক্ পুরাতন কথা। বোধকরি কোন নির্দ্দয় সমালোচকের নির্ম্মম আঘাতের স্মৃতি মনে করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন—"সমালোচকবর্গ কুক্কুরের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে—দারিদ্র্য-মূর্ত্ত ছেঁড়া কানি, ছেঁড়া জুতার লোভে রসনা মেলিয়া লম্ফ দেয়" চমৎকার উপমা! একবারে পায়ের তলা ও আঁস্তাকুড় হইতে তিনি এ ভাবটিকে কুড়াইয়া আনিয়াছেন। দৃষ্টির এই অধোগতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে—তিন খানি। প্রথম ছবি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রতিকৃতি।

দ্বিতীয় ছবি শ্রী সতীশচন্দ্র সিংহের "প্রদোষে।" শিল্পী দুইটি অর্দ্ধনগ্ন নারীকে একবারে পাহাড়ের ডগায় বসাইয়া দিয়াছেন—বোধকরি সন্ধ্যাতারার effect দেখাইতে। বিবশা না করিলে Art যে ফোটে না এবং দৃষ্টিও ঠিক-মত খোলে না।

তৃতীয় ছবি শ্রীভুবন মোহন দের "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে—।" (রবীন্দ্র নাথ) হায় কবি! বাঁশী তোমায় উন্মনা করিয়া ছিল, আর সেই কথা আজ শিল্পীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া কি কাণ্ড যে ঘটাইল—যার ঠেলায় শ্রীরাধার বাম হাতের কল্কি ও তালু ডান হাতে রূপান্তরিত হইয়া গেল! আর বসুমতীর কৃপায় একদম এই খোদার উপর খোদ্‌কারী সকলকে নিরুপায়ের মত দাঁড়াইয়া দেখিতে হইল! ইহাকেই বলে creative genius,

অদৃষ্টের পরিহাস

গল্প

শ্রীসুজাতা দেবী

১

রাত্রি দশটা, মিহির টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ টেবিলের উপর টাইম-পিস্ ঘড়িটার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বইটা মুড়িয়া রাখিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, রাত দশটা? এখনও বীথির আসার সময় হ'লনা— মিহিরের কথা শেষ হইতেই বীথি মিহিরের প্রিয়তমা পত্নী এক মুখ হাসি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,— বারে তুমি সবই আমার দোষ দেখ? এবার মিহির চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বীথির নিকট আসিয়া বলিল, আচ্ছা বীথি তোমার প্রাণে কি একটুও দয়া মায়া নেই? আমি সেই থেকে যে, হাঁ করে বসে আছি, আর ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি কখন তুমি আসবে বোলে—আর তুমি দুষ্টুমী করে কেবল রাত করবে? বীথি হাসিয়া ফেলিল—ও হরি এই জন্য রাত দশটা অবধি বই হাতে করে বসে থাকো? মন তাহলে একটুও বইএর দিকে থাকে না, আমি কোথায় ভাবি যে তোমার সামনে এম, এ, পরীক্ষা—শীঘ্র শীঘ্র তোমার কাছে গিয়ে তোমার পড়ার ক্ষতি কোরব না আর তুমি বুঝি এই করো? বীথি মুখে কাপড় দিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল। মিহির বীথির হাসি দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বীথিকে কাছে টানিয়া বলিল, যাঃ কেবল তুমি হাসতেই থাকো আর ত কিছুই বোঝনা এদিকে তোমার বাবা লিখেছেন পরশু তোমায় বেনারস নিয়ে যাবেন কাল তোমার দাদা আসছেন, আমার যে কি অবস্থা হবে তা জানিনা। বীথি খানিক-ক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, কেন কি অবস্থা হবে শুনি? তোমাকে ত আর একা ফেলে যাচ্ছি না, মা রয়েছেন, তোমার বৌদি রয়েছেন—কথায় বাধা দিয়া মিহির বলিল, যতই মা বৌদি' থাকুন, তোমার অভাব ত কেউই পূরণ কর্ত্তে পারবেন না তাত বোঝ? এবার বীথি স্বামীর হাতটা নিজের হাতের উপর রাখিয়া বলিল—এসময় কি আমার তোমার কাছে থাকা উচিৎ? তা'হলে যে তোমার পড়ার কত ক্ষতি হবে? মিহির জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি কাছে না থাকলেই আমার

পড়ায় মোটেই মন যাবে না বীথি, সেই চার বছর আগে তোমায় আমায় মিলে ছিলাম তারপর এর ভিতর সেই বিয়ের পর কিছুদিনের জন্য ছাড়া আর একদিনও তোমায় ছেড়ে থাকিনি, এই আমাদের বলতে গেলে প্রথম বিচ্ছেদ।— কি করে আমি তোমায় ছেড়ে থাকি বল তো? বীথি তাহার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। স্বামী-স্ত্রী কি মিষ্টি সম্বন্ধ। এর ভিতর কোন ব্যবধান নাই ছাড়া-ছাড়ি লুকোচুরী কিছুই নাই। কিন্তু বীথি ভাবিতেছিল সকলেই স্বামী স্ত্রীর ভিতরই কি এইরূপ! তাহার মত স্বামী প্রেমে সুখী কি সকলেই? হঠাৎ কি ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহারই বাল্যবন্ধু মতীর কথা আহা কি দুঃখী সে! বীথিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মিহির বলিল, চুপ করে রইলে বীথি কথা বলো, বলে দাও কি করে তোমায় ছেড়ে থাকবো—।" এইবার বীথি আস্তে আস্তে স্বামীর কথার উত্তর দিল, তুমি পুরুষ মানুষ এত অধৈর্য্য হলে কি চলে? কর্ত্তব্যের খাতিরে অনেক কিছু কর্ত্তে হয় আর তুমি সামান্য দু তিন মাস আর আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না? যদিও আমি একথা বলে তোমায় বুঝাচ্ছি আমারও যে কত কষ্ট হবে তোমায় ছেড়ে থাকতে তা বলে জানাবার নয়।—মিহির অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা বীথি বলতে পারো যে স্বামী স্ত্রীকে প্রকৃত প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে কি করে ইচ্ছা করে সেই স্ত্রীকে ছেড়ে দূরে সরে থাকে? আমার মনে হয়—তারা প্রকৃত ভালবাসে না বা বাসতে জানেনা। বীথি মৃদু হাসিয়া বলিল ধেৎ দূরে দূরে থাকলেই কি ভালবাসে না, কত লোক যে অসুবিধার জন্যও স্ত্রীকে দূরে রাখতে বাধ্য হয় তা বলে কি তারা নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে না? এর কোন অর্থ নেই। মিহির বলিল, না বীথি তুমি জাননা আমি এমন অনেক লোককে জানি স্ত্রীকে ঝঞ্ঝাট মনে করে দূরে ফেলে রাখে আর সুবিধা অসুবিধার খোঁজও লয় না মাঝে মাঝে একটা চিঠি লিখে দেয় ব্যস। নেহাৎ বিয়ে করেছে খেতে পরতেও দিতে হবে তাও সামান্য কিছু দিয়ে নিশ্চিন্ত, নিজে দিব্য ফুর্ত্তিতে কাটায়। বীথি এবার স্বামীর কথায় বলিল, হ্যাঁ আমারও মনে পড়েছে মতীর কথা আহা তার কথা ভাবলে সত্যিই ভারী দুঃখু হয়। মিহির খাটের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল; কেন তার বর কি তাকে ভালবাসে না? বীথি মিহিরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলি[ল] —ঠিক যে ভালবাসে না—তাত বলতে পারি না তবে তোমা[র] মত কিছুই নয়। মিহির উৎসুক ভাবে বলিল, কেন মতী বেশ মেয়ে। সেই যে তোমাদের বাড়ীতে দেখে ছিলাম সে[ই] মেয়েটি ত? বীথি বলিল হ্যাঁ সেই ফর্সা রোগামত মেয়েটী আহা বেচারা তার বাবা মার কি আদরেরই মেয়ে ছি[ল] অসময় বাবা-মা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত ত মতী দুঃখী হয়ে ছিল। আবার বিয়ে হয়েও সে একদিনের জন্য সুখী হ[তে] পাচ্ছে না। মিহির বলিল—অসুখীর কারণটা এক[টু] খুলে বলই না শুনি? বীথি বলিল, সুখী আর অসুখী সমস্তই অদৃষ্টে করে না হ'লে আমিত মতীর চেয়ে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নই—আমারই বা রূপে গুণে সমস্তদিকে ভাল বর হ'ল কেন আর মতিরই বা হয়েও হ'লনা কেন? তবুত মতীর বাবা যা টাকা কড়ি রেখে গিয়েছিলেন সামান্য খুব না হলেও দু তিন হাজার ত বটেই। সেই স[ব] টাকা ব্যয় করে মতীর বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দা নাতনীর বিয়ে দিলেন আর আমার বিয়েতে ত তোমরা একটা আধলাও নাও নাই হ্যাঁ বুঝতাম মতীর চেয়ে আমি সুন্দরী তাও ত নয় মিহির মৃদু হাসিয়া বলিল, মতীর চেয়ে তুমি সুন্দরী কিনা তা আমি জানিনা তবে আমার চোখে বীথির মত সুন্দর আর কারুকেই ঠেকে না। বীথি এবার মিহিরের প্রতি রোষ ভরে তাকাইয়া বলিল, ঠাট্টা হচ্ছে নয়? মিহিরও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল ঠাট্টা নয় তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আমি যে দিন থেকে তোমায় পেয়েছি আমার ত মনে হয় তোমার মত দেখতে কেউ নয়—রং ফর্সার কথা বলছি না, চেহারার কথা। আমার আজকাল প্রত্যেকের খুঁত্ কাটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। বীথি লজ্জিত হইয়া বলিল যাও— তুমি ভারি দুষ্টু। মিহির বীথির একটা হাত নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, আচ্ছা আমিত চিরকালই দুষ্টু তুমি এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত মতীর কথাগুলি বল দেখি? বীথি বলিতে লাগিল মতীর ঠাকুর্দ্দা বুড়ো হয়েছেন বলে যাতে তাড়াতাড়ি মতীর বিয়ে হয়ে যায় তাই কচ্ছিলেন। শেষে দূর দেশে একটী ভালছেলে আছে শুনে সেখানেই ঠিক কর্লে'ন। আত্মীয় বন্ধু কত বারণ কল্লে কিছুতেই শুনলেন না। বল্লেন হলই বা দূরদেশের লোক অমন ভাল ছেলে দেখে দিচ্ছি পয়সাও যথেষ্ট আছে দুই হলেই হ'ল। মতীর

বর ডাক্তার। উপরে যতটা শুনতে ভাল ভেতরে তত মোটেই ভাল নয়। মতীর বর কি একটা যায়গায় প্র্যাকটিস করে, মতী থাকে তার শাশুড়ীর কাছে ফরিদপুর জেলার মধ্যে কি একটা যায়গায়। মতীর শাশুড়ী বুড়ি তায় রোগা। শোনাইত যায় স্বভাবতঃই রুগীরা রাগী বেশী। মতীর শাশুড়ী দেওয়া-থোয়ার কথা নিয়ে অনেক কথা শুনায়, আবার মতী বাসান মাজা বাটনা বাটা এসব কিছুই জানেনা তারজন্য তার শাশুড়ী গালাগাল আরও কত রকম যন্ত্রণা দিতেও ছাড়ে না, এই ত তার শাশুড়ীর কাছে ব্যবহার। স্বামী তার প্রথম প্রথম বেশ ভাল ব্যবহারই কর্ত্ত, পরে সেও যখন বাড়ী আসে নানা কথায় মতীকে খিট খিট করে বিরক্ত করে বলে—তুমি সৎশিক্ষা যাকে বলে সে সব কখনও পাও নাই এরকম জানলে কি আমি তোমায় কি বিয়ে কর্ত্তাম—কি করে শাশুড়ী প্রভৃতির সেবা কর্ত্তে হয় তাও তুমি এতবড় মেয়ে হয়ে শেখনি ইত্যাদি। আবার মতী যদি বলে, বড্ড তোমার কাছে যেতে ইচ্ছা করে, আমায় নিয়ে যাবে? তা ওর বর স্পষ্ট মুখের উপর বলে দেয় যে আমার মা ভাই বোনের যত্ন জানে না আর গৃহস্থালীর বিষয় কিছু জানেনা তাকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে আমি লোকের কাছে মাথা হেঁট কর্ত্তে পারবো না। আর যদি এসব না শিখতে পারো তা'হলে তোমার ঠাকুর্দ্দার কাছেও তোমায় এক দিনও পাঠাব না, সেখানে গেলে তোমার শিক্ষা আরও খারাপ হয়ে যাবে। বীথি এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিয়া পরক্ষণে নিজের মনে বলিয়া উঠিল, যাই বলনা বিয়ের পর একেই কারও কথা সহ্য করা যায় না তার উপর স্বামীর শক্ত শক্ত কথা মোটেই সহ্য করা যায় না। যদিও বুঝি মতীর বর সকল বিষয়ে তাদের মনের মত হবার জন্যই ঐ সব বলে, তবুত সে স্বামী! কেন তুমি যেমন কত মিষ্টি করে আদর করে সব শিখাও তেমন করে কি শেখান যায় না? ও তা'হলে বোধ হয় স্ত্রীর কাছে মান থাকে না শাসনটা ভাল রকম করা হয় না। মিহির বীথির গালটা টিপিয়া বলিল সত্যিই বীথি অনেকে ঠিক ঐ কথাই ভাবে, বৌ ত, কেনা দাসীর সমান। তাকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যাবে ততই সে মাথায় চড়ে বসবে। ছিঃ কি ভুল ধারণা তাদের বীথি বলিয়া যাইতে লাগিল, আবার শোন মতীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা, শরীর খারাপ বলবার উপায় নেই—দুবারের বেশী তিনবার যদি বলে যে শরীরটা বড় খারাপ তা হলে তার রক্ষা নেই, নানান কথা শুনতে হয়। আর একটী কথা শোন মতী যখন যে কাজটা না কর্ত্তে পারল বা কোন একটু অন্যায় কাজ করে ফেল্লো ত সব কথা মতীর বরের কাছে পৌছে দেয় তার শ্বশুরবাড়ীর লোক। কি বিশ্রী কাণ্ড! ছিঃ ভদ্রলোকের বাড়ীতেও যে কত ইতরের মত কাণ্ড আছে তা বলা যায় না। মতী কত কাঁদলে কত দুঃখু করলে। মিহির বলিল, আহা বড় কষ্ট ত বেচারীর। পার্শের ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজাতে মিহির বীথিকে বলিল, বাবাঃ অনেক রাত হয়ে গেল এস এবার শুয়ে পড়া যাক্।

(২)

আজ বীথির বেনারস যাওয়ার দিন। বীথির দাদা লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।—মিহির সকাল বেলাতেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় কতকগুলি জিনিষ লইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকালেই কোথায় বেরিয়েছিলি হিরু! মিহির বলিল, একটু কাজ ছিল মা। মাতা শুভা দেবী বলিলেন, তোর কি শরীরটা ভাল নেই রে মুখ এত শুখ্‌নো দেখাচ্ছে কেন? মিহির মাথা হেঁট করিয়া বলিল শরীর ত বেশ ভালই আছে মা। মা কি ভাবিয়া মৃদু হাসিলেন। মনে পড়িল তাঁহার যৌবনের কথা, ঠিক মিহিরের ন্যায়ই তাঁহার স্বামীও পিত্রালয় যাইবার নাম হইলেই কিরূপ গম্ভীর হইয়া থাকিতেন কত বাধাই না দিতেন, এক মিনিটও তাঁহাকে চক্ষুর আড়াল করিতে পারিতেন না। পুত্রের ভাব দেখিয়া শুভা দেবী বলিলেন, দেখ হিরু আমার মনে হয় বৌমার দাদা ছেলেমানুষ ওর সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়—কি জানি কখন কোন বিপদ ঘটে জিনিষ পত্র সব নিয়ে। আমার ইচ্ছা তুইও সঙ্গে যাস্ কি বল? সেই সময় মিহিরের বড় বৌদি আসিয়া পড়ায় মিহির কোন উত্তর করিল না। মিহিরের বৌদি'ই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ মা ঠাকুর পোর কি এসময় যাওয়া উচিৎ আর শ্বশুর না লিখলে ও কেন যাবে?—মিহিরের স্নেহময়ী জননী পুত্রের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এবার মিহির উত্তর করিলেন, অসীম ত বলছে পারবে

না, যদি না পারে আমিও সঙ্গে ষ্টেশন থেকেই ফিরতে পারি—শুভা দেবী পুত্রের মন ভাব বুঝিয়া বলিলেন, দূর পাগল ছেলে যদি সঙ্গে যাস ত বাড়ী যাবি না? নাই বা তারা লিখ্‌ল সব বারে কি লিখতে হবে তবে যাবি—না হলে যেতে নেই? মিহির তাহার বৌদির প্রতি চাহিয়া বলিল তা হ'লে বাধ্য হয়েই আমায় যেতে হবে কি বলো বৌদি'। বৌদি' দেওরের কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

* * * *

মিহির একটা সুটকেসে নিজের সামান্য কাপড় জামা গুছাইয়া বীথির বড় ট্রাঙ্কটা গুছাইতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে একরাশ জিনিষ ছড়াইয়া বসিয়া মিহির দেখিতে লাগিল কোন জিনিষ বীথির নাই। ঠিক সেই সময় বীথি গৃহে প্রবেশ করিয়া মিহিরের মজা দেখিয়া হাসিয়া বলিল এসব কি ব্যাপার? মিহির গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল, বাঃ তুমি ত দেখছি আস্ত বোকা বেশ ট্রাঙ্ক গুছিয়েছ, —দরকারী জিনিষ ত কিছুই নেই দেখছি। বীথি কোন উত্তর না দিয়া নীরবে স্বামীর কার্য্য দেখিতে লাগিল। মিহির ট্রাঙ্কটা বেশ পরিপাটী করিয়া গুছাইয়া দিয়া বলিল, দু মাসের জন্য যাচ্ছ তোমার অনেক কিছু জিনিষ দরকার লাগতে পারে, আমায় বলে দাও আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি। বীথি লজ্জিত ভাবে মাথা হেঁট করিয়া বলিল, আমার কিছুই দরকার নেই আর যা দরকার হবে মা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারবো। মিহির একটু হাসিল পরে আপন মনেই বলিল, বীথিটা যে একেবারে বোকা তা জানতাম না, একটুও বুদ্ধি নেই। হাজার মা বাপ দিলেও বিয়ের পর তাঁদের কাছে কিছু চাইতে নেই। তা হলেত স্বামীর অপমান করা হয়ই আর তাঁরাই বা কি মনে করবেন? ভাববেন আমি তোমার কোন খোঁজ রাখিনা। বীথিও স্বামীর কথার উত্তরে বলিল, তুমি ত এখনও স্বাধীন হও নাই তুমি যে এখনও কলেজ ষ্টুডেন্ট। মিহির বলিল, বাবাঃ তোমার সঙ্গে কথায় আমি মোটেই পারবো না, আচ্ছা বীথি বলতো আমার কি সাধ যায় না তোমায় কিছু দিতে? যাও ঐ টেবিলের উপর যে জিনিষগুলি আছে নিয়ে এস, এই বড় দুঃখ রইল যে তুমি কখনও কিছু আমার কাছ থেকে চাইলে না। বীথি চট্‌ করিয়া উত্তর দিল, তুমি কি আমার চাইবার মত সময় দাও তার আগেই যে সমস্ত হাজির করো। আচ্ছা বলতে পার নিজে এত কষ্ট করে থেকে হাত খরচের টাকাগুলি সব আমার জন্য খরচ কর কেন? মিহির তাহার বড় বড় সুন্দর চোখ দুটীতে পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তুমি আর আমি কি প্রভেদ আছে কিছু? বীথি পরাস্ত হইয়া চুপ করিয়া গেল। বীথি মিহিরের কথামত জিনিষগুলি আনিয়া মিহিরের নিকট উপস্থিত করিল। মিহির কাগজের মোড়ক খুলিয়া জিনিষগুলি বাহির করিতে লাগিল। বীথি জিনিষের বহর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—প্রায় চল্লিশ টাকার জিনিষ এত টাকা যে কোথা হইতে আসিল? মিহির ত মাত্র পাঁচ টাকা করিয়া মাতার নিকট হইতে হাত খরচ পাইত। শুভাদেবীর স্বামীর মৃত্যুর পরে বিপুল অর্থরাশি তাঁহার হস্তেই পড়িয়াছিল। তিনি টাকাকড়ির বিষয় খুব কড়া ছিলেন একটী পয়সাও বাজে খরচ করিতে দিতেন না—বলিতেন আমার আর কি থাকে ত, ছেলে দুটীরই থাকবে বুঝে চলতে পারলে সাত পুরুষ বসে খেতে পারবে। বীথি দেখিল, মিহির গুছাইতেছে খুব ভাল ভাল আটপৌড়ে সাড়ী, জ্যাকেট সেমিজ ব্লাউজ ইত্যাদি আবার এধারে কোথায় পাউডার সেণ্ট ক্রিম খাম পোষ্টকার্ড যাবতীয় দরকারী জিনিষ। বীথি "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। হাত বাক্সের ভিতর বাতী দেশালাই হইতে আরম্ভ করিয়া সাবান অবধি গুছাইয়া দিয়া মিহির বলিল, দেখে নাও বীথি আর কিছু দরকার লাগবে কিনা। বীথিত স্বামীর কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। কই তাহার শ্বশুর বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে তাহার মাতাও ত এরূপভাবে গুছাইয়া দেন নাই আর পুরুষ হইয়া কি করিয়া এই সব শিখিলেন? মিহির আবার বলিল, তুমি ত বলবে না জানি এই বাক্সের মধ্যে টাকা দশটা থাকলো যখন যা দরকার লাগে কিনে নিও। বীথি এতক্ষণ পরে বলিল, ভগবান তোমায় কি দিয়ে গড়েছেন বলতে পারো কোনখানে কি এতটুকুও খুঁৎ নেই? মিহির উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাই তুলিয়া বলিল, ওঃ তুমি যে আমায় বড্ড বড় করে তুলছ আমি যে আর তাহলে অহঙ্কারে মাটীতে পা-ই ফেলতে পারবো না।

গ্রাম্য দৃশ্য

শিল্পী—শ্রীনেপালচন্দ্র সেন।

(৩)

আজ মিহিরের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। মিহির বাড়ী ফিরিয়া বরাবর নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। আজ কেবল তাহার মনে হইতেছিল কতক্ষণে সে বীথির নিকট যাইবে? শুভাদেবী নীরবে আসিয়া বলিলেন, এমন অসময় শুয়ে কেন বাবা একটু বেড়িয়ে এস না গাড়ী ত খালি রয়েছে? মিহির বলিল, না মা আজ আর কোথাও যাবনা শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। মিহিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমীর নাথ আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, কি মিহির কেমন এগ্‌জামিন দিলে—? মিহির উঠিয়া বসিয়া বলিল, ভাল বলেইত মনে হচ্ছে দাদা?—

সমীরনাথ একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমার কি শরীর ভাল নেই? মিহির উত্তর করিল— হ্যাঁ মাথাটা বড় ধরে উঠেছে। সমীরনাথ তাঁহার শুভ্র বসনা বিধবা মাতার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, মা মনে পড়ে আমার এম, এ পরীক্ষার পর শরীর কিরূপ খারাপ হয়ে ছিল, আমার মতে হিরু একটা স্বাস্থ্যকর যায়গায় দিনকতক ঘুরে আসুক? মিহির তাহার দাদার কথায় মনে মনে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করিল—তাহার তখন মনে কেবল বীথির কথাই জাগিতেছিল। আজ দীর্ঘ ছ মাস সে তাহাকে ছাড়িয়া আছে আবার চেঞ্জে যাইতে হইবে? মিহির বলিল, না দাদা তেমন শরীর খারাপ হয় নি চেঞ্জে গিয়ে বাজে পয়সা খরচ করে কি লাভ? শুভা দেবী পুত্রের কথায় মনে মনে হাসিয়া বলিলেন আমার ইচ্ছা হয় সকলে মিলে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি একঘেয়ে কল্‌কাতা আর ভাল লাগে না মোটেই। সমীর বলিলেন,আমার ত এখন যাওয়া হয় না মা ছেলেদের পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে সে নানান ঝঞ্ঝাট। মিহির বলিল, হ্যাঁ অনেক অসুবিধা মা,এখন আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই একেবারে পূজার সময় দেশে গেলেই হবে। মাতা পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলেন বেশ তাই ভাল, কিন্তু সমীর ছোট বৌমাকে আনার কি হবে? তার বাবার ইচ্ছে আর কিছুদিন কাশীতে থাকে।" সমীরনাথ কি ভাবিয়া, হুঁ ভেবে দেখি কি করা উচিৎ বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মাতাও জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুসরণ করিলেন। মিহির বিরক্ত হইয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, ধেৎ কেউ-ই যেন কিছু বোঝে না—মারও ত এমন দিন গেছে, দাদারত কথাই নাই—সকালে বৌদি বাপের বাড়ী গেলে দাদা ছোটেন শ্বশুর বাড়ী বৈকালে বৌ আনতে। মিহির উঠিয়া তাহার বৌদিদির সন্ধানে গেল। এঘর-ওঘর খুঁজিয়া বৌদি কে না দেখিয়া নীচে নামিয়া গেল—ঠাকুর ঘরে যাইয়া দেখিল বৌদি তখন ঠাকুর ঘরে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছেন ডাক দিল, বৌদি—? বৌদি নীলা মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, যাচ্ছি ভাই। মিহির বৌ দিকে সঙ্গে করিয়া একেবারে উপরে গিয়া নিজের ঘরে বসিয়া বলিল, আচ্ছা তোমাদের ব্যাপার কি বলতে পারো? নীলার দেওরের কথায় কিছু আর বুঝিতে বাকি রহিল না। মনে মনে আজকালকার ছেলেদের নির্লজ্জতার জন্য যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, কেন কি ব্যাপার দেখলে শুনি? মিহির বেশী ভূমিকা না করিয়া স্পষ্টই সোজাসুজি বলিল, বিয়ে যদি দিয়েছই তা'হলে কি বৌকে বাপের বাড়ী ফেলে রাখবার জন্য বুঝি? বৌদি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কেন বাপু তা বলে কি ছমাসও বাপের বাড়ী থাকতে পারবে না,তোমরা কেবল তোমাদেরই সুখ সুবিধাটা দেখ তাদের দিকেও ত চাইতে হয়? মিহির বিরক্তভাবে বলিল, ও তাই বুঝি দাদাকে ছেড়ে একবেলার বেশী ছবেলা থাকতে পার না অথচ বাপ-মাকে দেখবার সাধও ত মনে মনে যথেষ্ট আছে দেখি। যাক বাজে কথা— বীথিকে আনার দিন কবে ঠিক কচ্ছ বল দেখি? তোমার উপরইত সব ভার কাজেই তোমাকেই বলতে হ'ল। নীলার এখন মোটেই ইচ্ছা নয় যে বীথিকে এই মাসে আনা, তার প্রধান কারণ মিহির যেন দিন দিন বৌ পাগলা হইয়া যাইতেছে বলিয়া, আগে মিহির নাকি বৌদি বলিতে সারা হইত আর বিবাহের পর হইতে মিহিরের বৌদিদির উপর আর কিছুই টান নাই—এই জন্য নীলার মনে বিলক্ষণ বিদ্বেষ ভাব আসিয়া ছিল। ইহা অবশ্য স্বাভাবিকই। এই কারণে নীলার বীথির উপরেই রাগটা বেশী হইয়াছিল, কর্ত্তব্যের খাতিরে ছোট যা বলিয়া লোক দেখান আদরটাও না করিলে নয় তাই বাধ্য হইয়া চুপচাপই থাকিতে হয়। নীলা মিহিরের কথায় ঠাট্টারছলে উত্তর দিল, কেন বীথি না হলে কি তোমার চলছে না? কই আগে ত বীথি ছিল না কেমন করে চলত? মিহিরও ঠাট্টা করিয়া প্রত্যুত্তর

করিল, তখন ত আর ও সবের মর্ম্ম জানতাম না কিনা সেই জন্য। তোমার সঙ্গে খুনসুটী করে তোমাকে বেশ বিরক্ত করে একরকম বাড়ীর মধ্যে দিনগুলো কেটে যেত। এখন ত আর তুমি সে বৌদি নেই, তুমি এখন প্রফেসার গৃহিণী ও পুত্রের জননী হয়ে তোমার আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। যাক বাজে কথা বীথিকে যাতে এই কদিনের ভেতর আনা যায় তার ব্যবস্থা কোর ভাই।

(৪)

সংসারে যে কত রকম প্রকৃতির মানুষ জন্মায় তাহার ইয়ত্তাই নেই। এমন কতজন আছে যে নিজে যাহা ভাল মনে করিবে সেটা হাজার খারাপ হইলেও পরের বাধা না মানিয়া তাহাই করিয়া যাইবে, আবার এমনও আছে যে, নিজে যে দোষণীয় কার্য্য করিবে অপরকে তাহা করিতে দেখিলে, তাহাকে তাহার দোষের জন্য তিরস্কার করিতেও ছাড়িবে না। নীলাও ঠিক এই প্রকৃতির মানুষ। মিহিরের কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে স্বামীর নিকট যাইয়া বলিল, শুনছ তোমার ভাই যে পাগল, বলছে যে তার আর দেরী সইছে না বীথিকে এক্ষুণিই এনে দিতে হবে? সমীরনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন এ বয়েসের ধর্ম্মই যে নীনা এইরূপ।" নীলা রাগিয়া বলিয়া উঠিল—তা বলে এতই বা কি বাপু যে দুমাসের বেশী তিনমাস বৌ ছেড়ে থাকলে মাথা ঘুরে যায়? সমীরনাথ সেই একই ভাবে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, নিজেদের দিক ভেবে কথা ব'লতে হয় নীলা, আমি মনে করেছি হিরুকেই কাশী পাঠিয়ে দিই ছোট বৌমাকে নিয়ে আসুক। নীলা তাহার গম্ভীর প্রকৃতির স্বামী প্রভুটীকে বিলক্ষণ চিনিত। সহজভাবে এবার সে বলিল, তুমি কিছু বোঝ না এখন বীথিকে আনা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়, ছোটঠাকুরপোর দিনকতক কোথাও যাওয়া উচিৎ, শরীরও ওর খুব খারাপ হয়েছে। যাক আমি বেশী বলতে চাই না তোমরা যা ভাল বোঝ কোর। সমীরনাথ স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর না দেওয়াই ভাল মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। নীলা যে কেন বীথিকে দেখিতে পারে না বিচক্ষণ সমীর নাথ তাহা বুঝিতেন। ধনীগৃহের একটীমাত্র বধূরূপে আসিয়া নীলার যে কত গর্ব্ব ছিল সব বিষয়ে, বীথি আসিয়া তাহার ভাগ লওয়াতে প্রথমত সে খুবই মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, দ্বিতীয়ত তাহার একান্ত প্রিয় দেবরটী তাহার অনেক দূরে চলিয়া যাওয়াতে সে অত্যন্ত চটিয়া ছিল বীথির উপরেই। সমীরনাথ স্ত্রীর মন এত সঙ্কীর্ণ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কিসে নীলার মন হইতে ঐ সব ঘৃণিত ভাব চলিয়া যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন। এমন কত দিন গিয়াছে নীলা বীথির কার্য্যের কত বিষয় খুঁৎ ধরিয়া তাহার নামে স্বামী ও দেবরের নিকট অভিযোগ করিতেও ছাড়ে নাই। যদিও দুইজনে কেহই নীলার কথায় কর্ণপাত করিতেন না! মিহির ত বৌদিদির সম্মুখেই স্পষ্ট হাসিয়া উড়াইয়া দিত, আর সমীর নাথ গম্ভীরভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেন। কত সুখের সংসারে শুধু এই লাগানোর জন্য অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিদ্বান সমীরনাথের অজানিত নহে! এইজন্য লেখা পড়া-জানা আজকালকার শিক্ষিতা মেয়ে দেখিয়া ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছিলেন—রূপও দেখেন নাই অর্থও দেখেন নাই! মাতা তাঁহার স্ত্রীকে যথেষ্ট রূপরাশি ও ধনীর কন্যা দেখিয়া গৃহে আনিয়া ছিলেন কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্ত্রী তাঁহার সব বিষয় মনোমত হয় নাই কেন তাহা তিনিই বুঝিয়া ছিলেন।

* * * *

আজ চারদিন বীথি কলিকাতা আসিয়াছে। মিহিরের ছুটীর দিনগুলো দিব্য স্ফূর্ত্তিতেই কাটিতেছে বীথিকে পার্শ্বে লইয়া। মিহির আজকাল প্রত্যহ স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, চক্ষু লজ্জার জন্য মাতার নিকটও আব্দার করিয়া বলে, মা তোমাকে একা ফেলে রোজ কি বেড়াতে ভাল লাগে তুমিও চলনা মা? মাতা সস্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন, তোদের সুখেই আমার সুখ—নেহাত যদি না ছাড়িস্ আমায় সইএর বাড়ীটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আয় তারপর তোরা বেড়াতে যা। মিহির কোন দিন সইএর বাড়ী কোন দিন কোন দেবালয় প্রভৃতি দেখাইয়া মাতাকে সুখী করিত। এইরূপে মিহিরের দিন বেশ আমোদেই কাটিতেছে।

আজ সকাল হইতে বীথির শরীর অসুস্থ হওয়ার জন্য মিহির কোথাও যায় নাই। নীচে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কাগজ পড়িতে ছিল। সেই সময় মিহিরের বন্ধু অজিত আসিয়া উপস্থিত

হইল। অজিত, মিহিরের যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না ইত্যাদি বলিয়া ঠাট্টা সুরু করিয়া দিল। মিহির ব্যতিব্যস্ত হইয়া কথা উল্টাইয়া বলিল, আমাদের রেজাল্টের আর কত দেরী বল্‌তো? দুই বন্ধুর কথা হইতেছিল। সেই সময় পিয়ন আসিয়া একটী চিঠি দিয়া গেল। মিহির খামটীর উপরের লেখা পড়িয়া দেখিল, বীথি দেবী। কোন মেয়ের হাতের লেখা। অজিত খামখানা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, খোল্‌না রে চিঠিটা—নিশ্চয়ই তোর বৌএর কোন ফ্রেণ্ড লিখেছে? মিহির মাথা নাড়িয়া বলিল, উহুঁ বীথির চিঠি সে আগে না খুল্‌লে না পড়লে আমি দেখি না। অজিত বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিল, কেনরে স্ত্রীর চিঠি স্বামী আগে দেখবে তাতে এত কেন? মিহির বলিল, স্বামী স্ত্রী যে প্রভেদ নয় তা জানি, তবে স্ত্রীবলে কি সে এতই পরাধীন যে নিজের নামের চিঠিটাও সে আগে খুলতে পাবে না। আমি ওসব মোটেই পছন্দ করিনা।

ইহার পর কিছুক্ষণ কথাবর্ত্তার কহিয়া অজিত উঠিয়া গেলে মিহির বীথির নিকট আসিয়া দেখিল,সে শয্যার উপর একলা শুইয়া আছে মুখ তার অত্যন্ত বিষণ্ণ চোখ দুটী খুব লাল। মিহির বীথির কপালে হাত দিয়া বলিল, না জ্বর ত হয় নি, তবে তোমার চোখ এত লাল কেন বলো? বীথি কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া বসিল। মিহির বীথির পার্শ্বে বসিয়া বলিল, কি হয়েছে বলবে না? তুমি কাঁদছিলে নিশ্চয়। ও মা বাবার জন্য মন কেমন কচ্ছে—কই আগে ত কখনও কান্না দেখিনি তবে শরীরে কি কোন কষ্ট হচ্ছে? বীথি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। কোন উত্তর না পাইয়া ব্যথিত স্বরে মিহির বলিল, আমি কি কিছু দোষ করেছি বীথি? বীথি স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। মিহির বুঝিল যে কোন বিষয় বীথি গোপন করিতেছে। বীথি স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, না অন্য কিছু কারণ নেই মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল বড় বেশী তাই চোখ লাল হয়েছে। মিহির কিছু না বলিয়া পকেট হইতে বীথির চিঠিটা বাহির করিয়া বলিল, এই নাও তোমার চিঠি পড় আমি এখনই আসছি। মিহির বরাবর মাতার নিকট গিয়া দেখিল, তিনি কুটনা কাটিতেছেন। গম্ভীর ভাবে পুত্রকে নিকটে দাঁড়াইতে দেখিয়া মাতা জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিলেন। মিহির এধার-ওধার চাহিয়া মাতার পার্শ্বে বসিয়া বলিল মা তোমার ছোট মেয়েকে কি কোন অন্যায়ের জন্য বোকেছ? শুভাদেবী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—অন্যায়ের জন্য যদি বকি সে হাসি মুখে বলে আর কখনও করব না মা, শুধু সইতে পারে না বাপ মাকে কোন কথা বলা। তা বাবা কি করি বল্ বড়বৌমার এখনও ছেলেমানুষী বুদ্ধি গেল না যখনই সুবিধা পায় ওর বাপের সঙ্গে ছোট বৌমার বাবার তুলনা দেয়। মিহির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া বলিল ওঃ এই কথা? তুমি কিছু বলনি? তাহলেই হ'ল। মা তোমার ছোট বৌ এখনও বড় ছেলেমানুষ—বয়সে দিন দিন বাড়লে কি হয় ও সংসারের কিছুই শেখেনি—তুমি ওকে সব শিখিয়ে নিও মা।

(৫)

মিহির উপরে বীথির নিকট আসিয়া দেখিল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিতেছে সম্মুখে তাহার একটা খোলা চিঠি। মিহির কোন কথা না বলিয়া চিঠিটা তুলিয়া লইল, দেখিল মতীর চিঠি, সে লিখিয়াছে—

ভাই বীথি

যখন তুমি আমার এই চিঠিটা পাবে আমি তখন অনেক অনেক দূরে পৃথিবীর সহিত দেনা-পাওনা চুকাইয়া কোন এক অজানা পথে শান্তির আশায় ছুটিয়াছি জানি না—আমার অদৃষ্টের শেষ কোথায়? জানি আত্মহত্যা মহাপাপ তবুও আমি সেই কার্য্যে হাত দিলাম। এ পৃথিবীতে আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখাবার একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তাই তোমায় আমার জীবনের দুঃখের কথাগুলো জানিয়ে গেলাম। যদিও জানি তুমি খুবই ব্যথা পাবে আমার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। এতদিন সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করে এসেছি শুধু বৃদ্ধ দাদুর কথা ভেবে, এ দুনিয়ায় আমি ছাড়া তাঁর কেউ-ই ছিল না বলে। দাদুও চলে গেলেন আমার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। আর কার জন্য এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করে বেঁচে থাকবো? কাল আমার স্বামীর কঠোর বাক্যে পূর্ণ এক পত্র পাই। তাতে লেখা, তুমি আমার আশা ছেড়ে দাও আমি কোনদিনই তোমার নিয়ে সুখী হতে পারবো না—কারণ তোমার গুণ নেই, তুমি এখন শত্রুরূপেই আমার ঘরে আছ, সেই ভয়েই

আমি বাড়ী যাওয়া বন্ধ করেছি। আমার মায়ের আমি এক সন্তান—মা'ও শুধু তোমার জন্যই সন্তানের মুখদর্শনে বঞ্চিত। একদিন ভেবেছিলাম, তোমায় নিয়ে আমি সুখী হতে পারবো কিন্তু তুমি যখন আমার মা ও আত্মীয়স্বজনের সহিত ভাল ব্যবহার না করো তাহা হলে কি প্রকারে আমি তোমায় নিয়ে সুখী হতে পারি ইত্যাদি। যাক ভাই বীথি তবে আর কেন, আমার তুচ্ছ জীবনের জন্য যদি এতগুলি লোক কষ্ট পায় তাহলে কি আমার বেঁচে থাকা উচিৎ? তোমাকে আর একবার দেখার সাধ মনে ছিল কিন্তু না এ পোড়ামুখ আর কারকে দেখাব না। ভাই পরের মুখের কথা শুনে নিজের স্ত্রীকে না চিনে যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করে তারা কি মনুষ্য নামের যোগ্য? অনেক স্বামীদের এইরূপ মনের ধারণা—নূতন বিবাহের পরেই স্ত্রীরা কেন তাঁদের এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনের মনের মত হয়ে যায় না। একথা তাঁরা বোঝেন না যে তারা বিবাহের আগে বনের পাখীর মতই স্বাধীনভাবে পিতামাতার কোলে মানুষ হয় সংসারের ভাল মন্দ জ্ঞান তাদের হয় না। স্বামীর কি কর্ত্তব্য নয়, স্ত্রীকে আদরের সহিত সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া? মা বা বোন ভাজের উপর স্ত্রীর শিক্ষার ভার দেওয়া কখনই উচিৎ নয়—তাঁরা আগে বৌএর পিতামাতাকে গালি দেবেন পরে তিক্ততার সহিত শিক্ষা দিয়া বলবেন এত বড় মেয়ে করে বাপ মা রেখেছিল শিক্ষা দিতে পারেনি ব্যস ইহাতে কেউ কখনও ভাল শিক্ষা পায় না। মিষ্ট কথায় বনের পশুও বশে আসে। বীথি আমি জানি তুমি যে স্বামীর হাতে পড়েছ তিনি তোমায় সমস্ত অশান্তির হাত হতে উদ্ধার করে চিরদিন নিজের বুক দিয়েই তোমায় রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমার মত ভাগ্যব সকল মেয়েই হয়। এতদিনে আমার চোখের জলের অবসা হ'ল। বিদায়—বিদায় বন্ধু। ইতি—দুর্ভাগিনী তোম মতী।

মিহির চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এমন ভাগ্য নিয়ে মতী জন্মেছিল। মিহির আপন মনে বলিয়া উঠিল, শু মতিই বা কেন? আমাদের দেশে কত শত শত মে নিরুপায়ভাবে এই পথ অবলম্বন করেছে শুধু এই আমাদে মত অপদার্থ স্বামীর হাতে পড়ে। মিহির দুই হাতে বীথি মাথাটা তুলিয়া নিজের বুকের মাঝে রাখিয়া সান্ত্বনার সহি বলিল, কেঁদনা বীথি এখন কেবল প্রার্থনা করো যেন পরপারে গিয়ে শান্তি পায়। বীথি ধরা গলায় বলিল, মতি যে বড় ভাল মেয়ে ছিল, তাকে তার স্বামী চিনলে না মিহির বীথির চোখের জল মুছাইয়া বলিল, এ পৃথিবীতে এমন কত লোক আছে যারা ভালর মর্য্যাদা বোঝে না, কি করবে বল, এখন আর কোনই উপায় নেই। সংসার পথ বড় পিচ্ছিল, বড় ভয়ে বড় আস্তে এই সংসারের পিচ্ছিল সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে যেতে হয় তবেই মনুষ্য জীবনের শান্তি। বীথি স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, একটা কথা আমার গা ছুঁয়ে বলো হাজার আমার দোষ থাকলেও কখনও আমায় তোমার কাছ ছাড়া করবে না, দোষের জন্য ক্ষমা করবে?

মিহির দুই হাতে পত্নীকে বুকে জড়াইয়া বলিল সেই সত্যই করলাম কখনও তোমায় আমার বুক ছাড়া কোরব না। বীথি মিহিরের হাত ছাড়াইয়া গলায় আঁচল দিয়া ভক্তিভরে স্বামীর পদধূলি লইতে লইতে বলিল, সকল মেয়েরই যেন তোমার মত স্বামী হয়।

জোয়ার-ভাঁটা

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

সুকুমারের কথা।

খোট্টার দেশে থাকিতাম, ডাল-রুটি খাইতাম, কতরকম কুস্তীর প্যাচ শিখিয়াছিলাম, কত বড় বড় পালোয়ানের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিলাম, এই সকল কথায় আসরটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। শ্রোতার দলটিও পাইয়াছিলাম ভাল, তাহারা পরম আগ্রহনিবিষ্টচিত্তে বেশ জমাট হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। হঠাৎ কে বে-পরদায় ঘা দিল, সরলা বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, তুমি কত বড় পালোয়ান দেখি, আমার সঙ্গে পাঞ্জা লোড়্‌বে এস।

কথাটা শুনিয়া ততটা অবাক হইলাম না, যতটা অবাক হইলাম শ্রোতৃবর্গের মুখের দিকে চাহিয়া। এত বড় কথাটায় যে কিছুমাত্র অভিনবত্ব আছে তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহা আদৌ বোধ হইল না। সরলা সপ্তদশবর্ষীয়া, তাহাকে যুবতী বলিতে হয় বল, বালিকা বলিতে হয় বল। তাহার বিবাহ হইয়াছিল, স্বামী নিরুদ্দেশ। অপরে বিস্মিত হইল না কারণ তাহারা এ-রূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত। আমি দীর্ঘকাল বিদেশে ছিলাম, সুতরাং সরলার ব্যবহার আমার নিকট কেমন ধারা ঠেকিল। কথা বলিয়াই সরলা নিরস্ত হইল না, আমার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার হাতখানা বাড়াইয়া দিল। আমি দুই পা পিছাইয়া আসিলাম। সরলা ছাড়িল না, আমার হাতখানা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তাহার হাতের উপর রাখিল। আমি পাঞ্জা লড়িব কি, আমার পায়ের তলায় মাটী আছে বলিয়া অনুভব হইল না, দাঁড়াইব কোথায়?

এই একদিনের ঘটনা। এমন অনেকদিন অনেক ঘটনা ঘটিল। আর কেহ এরূপ ঘটনায় কুণ্ঠা বোধ করে না। আমি কুণ্ঠিত হই বলিয়াই যেন সরলা দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে লইয়া পড়িল। আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া যাইত—আমি অবশ, আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। একদিন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, আমি তাহাকে কি একটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। কেমন করিয়া বলিলাম, তাহা এখন আর মনে করিতে পারি না। সেদিন লজ্জার যে মর্ম্মান্তিক তীব্রতা অনুভব করিয়াছিলাম, জীবনে আর কখনও তাহা করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে-দিন বুঝিলাম, সরলা বালিকাও নয়, যুবতীও নয়। বালিকার পক্ষে এত বড় সমস্যাটা উপলব্ধি করাই অসম্ভব, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এরূপভাবে তাহার মীমাংসা করা ত দূরের কথা! আর যুবতী হইলে, যৌবনের স্পন্দন কি তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না?

তারপর আমাদের নামে কত কুৎসা রটিল। তাহার কতক আমার কাণে পৌঁছিল। সরলার কাণে কোন কথা পৌঁছিয়াছিল কি না জানিনা, কিন্তু তাহার মুখে কোনদিন সে চিহ্ন দেখি নাই। ইঙ্গিতে একথা তাহাকে জানাইলাম। সে বুঝিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সাড়া দিল না। স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, একই ফল। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, আরও পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলাম—যখন আমাদের নামে শুধু শুধু এত বড় একটা কুৎসা রোটেছে, কিছু নয় অথচ শুধু শুধু—

বাধা দিয়া সরলা বলিল—কই, আমাদের কারও গায়ে ত পোকা পড়েনি!

ইহার পর আর কথা চলে না, আমাকে নিরস্ত হইতে হইল।

সরলার কথা

আমার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল যে তাঁহাকে দেখি নাই, এমন ত মনে হয় না। তাঁহাকে চিরপরিচিতের মত, নিতান্ত আপনার মতই ত বোধ হইল। তাঁহার ব্যবহার পর্য্যন্ত এমন চিরাভ্যস্ত ঠেকিল যে, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন, কেন আসেন নাই, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে একবারও ইচ্ছা হইল না। আমার স্বামীরও সে সব কথা বলিবার কোন আগ্রহ দেখিলাম না। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, একথা ভাবিতে ভাবিতে আমার কতবার মনে হইয়াছে, যদি কেহ কখনও সেখান হইতে ফিরিয়া আসে আর আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমি তাহাকে স্বর্গের কথা তন্ন-তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু সত্য-

সত্যই কেহ কি তাহা পারে? যদি কাহারও মৃত প্রিয়জন ফিরিয়া আসে, তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কত কথা কহিবার থাকে, স্বর্গের অলীক কাহিনী কি তখন কাহারও মনে স্থান পায়? আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, আমার স্বামীও কোন কথা বলিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিলেন না, আমাকে বক্ষে তুলিয়া লইতে গেলেন। আমি কালামুখি, স্বামীর বক্ষে স্থান অধিকার করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিলাম। বাধা দিয়া বলিলাম—ও কি কর কি?

আমার স্বামী আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাঁহার চোখে মুখে হাসি। হাসিয়া কহিলেন—কিছুই না, যা কর্‌বার—

আমার মেঘভরা মুখ দেখিয়া তাঁহার আর কথা সরিল না, মুখের হাসি মুখে মিলাইল। আমি বলিলাম—আমার নামে কত কি রোটেছে, শোনোনি কি কিছু?

আমার স্বামী উত্তর করিলেন—না। রটুক্ গে।

তাঁহার অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য আমার অন্তরে সজোরে আঘাত করিল। আমি একটু উত্তেজিতভাবে কহিলাম – রটুক্ গে কি? মেয়েমানুষের যার চেয়ে বড় দুর্নাম আর হোতে পারে না—

আমার স্বামী আমার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন—লোকের রটানোয় কিছু যায় আসে না। তুমি যা তাই থাক্‌বে।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—যা রটে, তার কিছুও বটে।

তারপর আমার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আর চিনিতে পারিলাম না—এ যে আর একজন লোক, ইঁহাকে স্বামী বলিয়া কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? একটা মানুষের আবার ক'টা স্বামী হয়?

আর একবার আমার স্বামী লোকের চক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। আমি কিন্তু আমার অন্তরে তাঁহাকে হারাই নাই। বাহিরেও তাঁহাকে আবার পাইলাম, কিন্তু তাঁহার বক্ষে আপন স্থান অধিকার করিতে পারিলাম না—কি জানি, যদি তিনি আমার আধখানাকে মাত্র আশ্রয় দেন! আগে তিনি আমার সবটাকে নগ্ন করিয়া দেখুন—যদি ভাল লাগে, গ্রহণ করুন। না হইলে—অতটা ভাবিয়া দেখি নাই!

আবার আমার স্বামী লোকের চক্ষে নিরুদ্দেশ হই[illegible] আমার অন্তরেও তাঁহাকে হারাইলাম, বাহিরেও [illegible] কখনও খুঁজিয়া পাই নাই।

সুকুমারের কথা

সে সরলা আর নাই মরা গাঙে বাণ ডাকিয়া গিয়া যৌবনের পরিপূর্ণ জোয়ার তাহার দেহ মনকে প্লা[illegible] করিয়া ফেলিয়াছে। কখন বাঁধ ভাঙে-ভাঙে—আ[illegible] এই ভরা নদীটাকে কোন রকমে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আ[illegible] পাহাড়ের গর্ত্তে ফিরাইয়া দেওয়া যায় না? যাহা হই[illegible] নহে তাহা হইল না—তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া আম[illegible] আক্রমণ করিতে লাগিল। আমার কিছু বলিবার [illegible] নাই, একদিন আমিও তাহাকে কতদিক দিয়া আক্র[illegible] করিয়া ছিলাম। সে হেলায় তাহা প্রতিরোধ করিয়াছি[illegible] আমি কি আমার সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহ[illegible] নিবারণ করিতে পারিব না?

সরলা বলিল—নিন্দেয় যে দেশ ভোরে গেছে।

আমি বেশ নির্ব্বিকারভাবেই উত্তর করিলাম—[illegible] গে। আমাদের কারও গায়ে ত ফোস্কা পড়েনি।

আমার কথায় কোন উত্তেজনা প্রকাশ পাইল [illegible] বটে, কিন্তু মনের ভিতর ঝড় বহিতে লাগিল। চারি[illegible] দেখিলাম, চারিদিকেই ঝড় বহিতেছে। সরলা উত্তেজি[illegible] ভাবে কহিল—ফোস্কা পড়ে নি! বুকের ভিতর [illegible] জ্বোলে যাচ্ছে!

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। ভাবিলাম, বুঝি[illegible] চেষ্টা করিলাম, সেদিন কেন ফোস্কা পড়ে নাই, আজই কেন বুকের ভিতর জ্বলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পরিলাম না।

সেদিন এই পর্য্যন্ত। তার পর যাহা হইল সে আখ্যা[illegible] কাতে কাজ নাই। বহুদিন পূর্ব্বে নারীর কাছে প্রত্যাখ্যা[illegible] হইয়া এক মর্ম্মান্তিক লজ্জা অনুভব করিয়াছিলাম। আ[illegible] উপযাচিকা নারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া তাহ[illegible] শতগুণ লজ্জা অনুভব করিলাম। আমি জ্বলিয়াছিলা[illegible] কিন্তু সরলাকে জ্বালাইতে পারি নাই! পরকে জ্বালাই[illegible] কি সুখ—সুখ কি দুঃখ—তাহা জানি না। সরলা জ্বলি[illegible] আমাকে জ্বালাইল। তাহাতে কি সে সুখী হইয়াছে [illegible] যদি হইয়া থাকে, আমার জ্বলিয়াও সুখ। না হইলে আমার জ্বলার যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ যন্ত্রণা।

বাড়বানল

গল্প

শ্রীপ্রভা দেবী গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের অন্তরে থাকে দুটো জিনিষ—জল আর আগুন।...

জোৎস্না রাতে ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় যখন জলের বুকের আঁচলখানায় মৃদু কাঁপন লাগে তখন একটা অপরিসীম আনন্দের, একটা অগাধ শান্তির ঝরণার মুখ যেন আপ্‌না-আপ্‌নি খুলে যায়...মানুষ হয় তখন সৌম্য, শান্ত নিরীহ, নির্লিপ্ত!

মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটে।

...সহসা কালো মেঘ আকাশের প্রান্তটুকু অবধি গ্রাস ক'রে ফেলে, মাতাল বাতাস সৃষ্টিছাড়া তাণ্ডব সুরু করে দেয়, ঝড় আসে, উত্তাল হয়ে তরঙ্গগুলি ফুলে ফুলে দুলে দুলে ওঠে, আর সে তরঙ্গশীর্ষ থেকে ছিট্‌কে পড়ে আগুনের ফুল্‌কি...মানুষ তখন রূপান্তরিত হয় হিংস্র জানোয়ারে, বন্য শার্দ্দুলে!

ঝরণার বুকে তখন পাবকশিখা লক্‌ লক্‌ করে ওঠে।

—বাড়বানল!...

* * * *

রায় বাহাদুর কে, সি, রায়, আই, সি এসের একমাত্র পুত্র জীবন রায় লাহোরে হোষ্টেলে থেকে বি, এ পড়ে।

বাপের ইচ্ছা ছেলে মেজিষ্ট্রেট হয়, বোনের ইচ্ছে দাদা বড় ডাক্তার হ'য়ে পরের উপকার করে, পাড়া পড়্‌শীর ইচ্ছে ছেলে বাপের মতই বিচারকের আসনে বসে লক্ষ লোকের দণ্ডদাতা হয়...

—কিন্তু বন্ধু অমলের আকাঙ্ক্ষা—জলের বুকে আগুন জ্বলে!

সেদিন জীবনের জন্মদিন। বন্ধু অমলকে সঙ্গে করে সে চট্‌ করে সব গুছিয়ে নিয়ে লাহোর এক্‌স্‌ প্রেসে চেপে বসে।

জন্মদিনের আমোদের সীমা নেই। হাসি নেই। হাসি ঠাট্টা, গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া...অনেক রাত অবধি।

মঞ্জুলা ঠাট্টা করে বলে "বি, এ টা পাশ ক'রে যখন দাদা 'বিয়ে' ক'র্‌বে তখন আবার এম্‌নি আমোদ হবে, তাই না দাদা?'

জীবন হেসে জবাব দেয়, 'কিন্তু ততদিন কি আমার জন্যে তোর সবুর সইবে? ততদিনে তুই..."

"যাও, কি সব ছাই বল যে।" ব'লে মঞ্জুলা বেরিয়ে যায়, যেখানে তার সহপাঠিনীরা ব'সে 'রেডিও' শুন্‌চে, সেইখানে।

প্রতিমা আড়চোখে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে জিজ্ঞেস করে, "কি রে মঞ্জু, তুই একা এলি যে? 'তোর' সমীর বাবু এলেন না?"

"তোর সঙ্গে আমি কথা কইতে চাইনে।" ব'লে সে ঝপ্‌ ক'রে কোণের ইজি চেয়ারটাতে ব'সে পড়ে।

সীতা মঞ্জুলার পানে চেয়ে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গেয়ে ওঠে,

ওগো মোর নবীন সাথি,
ছিলে তুমি কোন্‌ বিমানে।...

—সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

এমন সময় জীবন প্রবেশ করে।

নীলিমা জিজ্ঞেস্‌ করে, "আচ্ছা জীবন বাবু, বলুন তো এতে প্রতিমার কি দোষ হয়েছে? শুধু জিজ্ঞেস্‌ ক'রেছে, 'তোর' সমীর বাবু কোথায়, আর অমনি মঞ্জুলা ঝাম্‌টা মেরে বলে কিনা তোর সঙ্গে আমি কথা কইতে চাইনে।—"

"বা বাঃ, কি দরদীরে আমার, তাও তো এখনো 'মালা বদল' হয়নি...

আবার এক পশলা হাসি।

জীবনও এ হাসিতে যোগ দেয়।

—ঝরণার বুকে চাঁদের হাসি।...

সহসা কোত্থেকে অমল এসে জীবনকে এ কল-কোলাহলের বাইরে টেনে নিয়ে যায়, বাগানটার এককোণে একটা বেঞ্চিতে বসে দুজনে আলাপ হয়।

হ্যাঁ, আলাপ হয়, অনেক কথা হয়...কি কথা কে জানে।

চারিদিকে চেয়ে নিয়ে অমল মাঝে মাঝে জীবনের চোখের পানে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে কি যেন বলে, জীবনের চোখের পলক পড়ে না।

হঠাৎ যেন জীবনের চোখ দুটো জলে ওঠে, ঝলকে ঝলকে ঠিক্‌রে পড়ে আগুনের হল্‌কা...

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই সরল মেয়েলি হাসি, সেই শান্ত নির্ব্বিকার ভাব!

অমল আগুন ছড়ায়, কিন্তু অঞ্জলি ভরা তুষার শীতল জলে সে স্ফুলিঙ্গ তলিয়ে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে!...

* * * *

বছর দুই পর।

পুলিশের অব্যর্থ সন্ধানে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। বোমার একটা প্রকাণ্ড কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে...বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তেরোজন বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মারাঠি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রায় বাহাদুর কে, সি রায়ের এজলাসে আজ তাদের বিচারের প্রথম দিন।

এগারোটা বাজতেই কয়েদীদের গাড়ীখানা কোর্টের দরজায় এসে দাঁড়ালো।...হাতকড়া আঁটা, কোমরে দড়ি বাঁধা, চারিদিকে সশস্ত্র গুর্খাঘেরা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নেমে হাসিমুখে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালো।

রায় বাহাদুর কয়েদীদের একবারটি দেখে নেবার জন্য স্প্রিংয়ের চশমাটা নাকে তুলে দিলেন।

—ওকে!

পাব্‌লিক প্রসিকিউটর্‌ তখন সোৎসাহে ব'লে যাচ্ছিলেন;......"এই প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র পুলিসের প্রাণান্ত চেষ্টায় ধরা না প'ড়লে যে একদিন এরা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা কোরতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের বহুস্থানে এর শাখা-প্রশাখা আবিষ্কৃত হয়েছে...এদের দলের প্রধান নায়ক জীবনচন্দ্র রায় লাহোরে ধরা পড়েছে; সেখানে সে এম, এ পড়্‌ছিলো..."

রায়বাহাদুরের হাতের কলম ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে থাকে, চোখের সম্মুখে সব ঝাপ্‌সা হ'য়ে যায়...

পাবলিক প্রসিকিউটর্‌ বলে যান,..."আমি সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দেব যে এই জীবন রায়ই অমৃতসরে পুলিস-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ রাইনারকে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছিলো, এই জীবন রায়ের নেতৃত্বেই এদের দল দিল্লীর ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক লুঠ করেছিল..."

রায়বাহাদুর আর সইতে পারেন না, বুকের ভেতর তাঁর কোথা থেকে যেন খানিকটা বরফ উছলে উঠে, সারা দেহে হিমানী প্রবাহ ছড়িয়ে দেয়..... সংজ্ঞাহারা দেহখানা তাঁর এলিয়ে পড়ে চেয়ারের হাতলের ওপর......

কিন্তু তখনো তুষার শীতল কানের কাছে পাবলিক্‌ প্রসিকিউটরের গলা স্পষ্ট শোনা যায়,......

"এই জীবন রায়ই পুণাতে গভর্ণরের মোটরের ওপর বোমা ছুঁড়েছিল......"

—ঝরণার বুকে আগুন জ্বলে......অনির্ব্বাণ সীতাকুণ্ড!!

নানা কথা

কংগ্রেসে জনসাধারণের অধিকার

মহাত্মার প্রস্তাব

স্বরাজের অর্থ সকলের পক্ষে সমান সুবিধা, সমান অধিকার এবং সমান ব্যবহার। শ্রমিকগণ, কৃষকগণ, রাজাগণ ও সকলে যে ভাবে বুঝিতে পারে, সেই ভাবে স্বরাজের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। উহাকে আমরা স্বরাজ, ধর্ম্মরাজ, রামরাজ বা খোদাইরাজ যে কোন সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে পারি। এই রাজত্ব কি ভাবে চালান হইবে তাহাও আমাদের বুঝা দরকার। উহা যে মাত্র শাসকগণ ও কর্ম্মচারীগণের স্বার্থের জন্য নহে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। গোলটেবিল বৈঠকে যাইবার পূর্ব্বে আমরা কি ধারা ধরিয়া দাবী পেশ করিব তাহা বুঝাইতে চাহিতেছি। আমি পূর্ব্বেই আমার ১১টা দাবীর মধ্যে তাহা বলিয়াছি। ঐ সব দাবীর মধ্যে যেগুলি বলা হয় নাই সেইগুলিও বর্ত্তমান প্রস্তাবে যোগ করিয়া দিয়াছি। এই গুরুত্বপূর্ণ ও বহু শাখাসমন্বিত প্রস্তাব কি করিয়া আপনাদের কাছে উপস্থিত করা হইল, এই বিষয়ে বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে অনেক আলোচনা হইয়াছে। অনেকে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ভুলই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ডেলিগেটদের হাত ধরিয়া কোন কাজ করিতেছি না। আমরা মাত্র তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়া কিরূপ সীমার মধ্যে কাজ করিবেন, তাহাই বুঝাইয়া দিতেছি। কেবল আমাদের পথ নির্দ্দেশের জন্যই নহে—আমরা কি চাই এবং আমাদের আদর্শ কি তাহা জগৎকে বুঝাইবার জন্যও এই প্রস্তাবের প্রয়োজন। আমরা কাহাকেও দ্বিধার মধ্যে রাখিব না। আমরা যে সরলভাবে কাজ করিতেছি এই বিষয়ে যাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ না হয় সে ভাবে আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। আমাদের বড়লাট বর্ত্তমানে মাসে ২০ হাজার টাকা করিয়া পাইতেছেন। আমরা তাঁহাকে ২ হাজার টাকার বেশী দিব না (হাস্য)। কোন লোককে আমরা ৫ শত টাকার বেশী বেতন দিতে প্রস্তুত নহি। আমরা এই সব দাবী উপস্থিত করিয়া সকলকে এই জন্য জানাইয়া দিতেছি যাহাতে সকলেই স্বরাজ অর্থে আমরা কি বুঝি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। আমরা কাহারও অজ্ঞাতভাবে হঠাৎ কোন কাজ করিতে যাইব না এবং এজন্য তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব না। আমাদের দাবী বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা তাহাদিগকে যথেষ্ট সময় দিব। আমাদিগকে সকল প্রকারে স্বাধীন হইতে হইবে এই বিষয় যেন আমরা মনে রাখি।

আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সমস্যা। হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক এবং মুসলমানেরা তাহাদের ভয়ে খুব ভীত। সুতরাং আমাদিগকে মুসলমানদের ভয় দূর করিতে হইবে। আমাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমাদের কাছে তাহাদের ভয় করিবার কোন কারণ নাই—কেন না, আমাদের উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন। উভয় ধর্ম্মেরই মূলনীতি এক। আমি পবিত্র কোরাণ পাঠ করিয়াছি এবং গীতার মধ্যে যে শিক্ষা যে উপদেশ রহিয়াছে তাহাই কোরাণের মধ্যেও পাইয়াছি। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে ভেদ আছে। উহা খুবই স্বাভাবিক। তাহারা উর্দ্দু ভাষা বলে। সুতরাং তাহাদিগকে নানা বিষয়ে বুঝাইবার জন্য এবং তাহাদের মনের ভাব বুঝিবার জন্য আমাদিগকে উর্দ্দু ভাষা শিখিতে হইবে। তাহারা ফারসী অক্ষর লিখে, তাহাও আমাদিগকে শিখিতে হইবে। এই সব ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যে কোন বাদ-বিতর্ক হইতে পারে না।

আর একটি বিষয় হইতেছে মহিলাদের অধিকার। পুরুষের যে অধিকার আছে মেয়েদেরও তাহা থাকা দরকার। হিন্দু আইনে পুরুষ ও মেয়ের অধিকারের তারতম্য করা হইয়াছে। আমাদিগকে এই আইন বদলাইতে হইবে। আমরা তাহাদিগকে সমান ব্যবহার, সমান সুবিধা প্রদান করিব। যদি মহিলারা মিউনিসিপালিটীতে প্রবেশ করিতে চাহেন তবে তাঁহাদিগকে সেই সুবিধা দিতে হইবে। পুরুষের মত তাহাদেরও সম্পূর্ণ সমানাধিকার দিতে হইবে। বর্ত্তমানে কেবল পুরুষেরাই ভারতের বড়লাট হইতে পারে। ভবিষ্যতে আমরা মেয়েদিগকেও আমাদের বড়লাট করিব। (হাস্য)। কংগ্রেসে কখনও পুরুষ ও মেয়েদের অধিকারে তারতম্য করা হয় নাই। পূর্ব্বে বেসাণ্টের মত ও সরোজিনী দেবীর মত মেয়েরাও কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছেন। পুরুষ ও মেয়ের অধিকারে যত প্রকার তারতম্য আছে তাহার সমস্ত আমরা উঠাইয়া দিতে চাই। আমাদের মেয়েরা গত আন্দোলনে খুব বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জন্যই অনেকটা এই আন্দোলন সফল হইয়াছে।

মহিলাদের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম—বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধেও তাহাই বলিতেছি। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অধিকারের যত পার্থক্য আছে তাহা দূর করিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত স্থান, দেবমন্দির প্রভৃতি ব্যবহার করিবার সকলের সমান অধিকার থাকিবে। চাকুরী দান ব্যাপারে কোন প্রকার অনুগ্রহ কাহাকেও দেখান হইবে না। কাহারও প্রতি কোন প্রকার পার্থক্যমূলক ব্যবহারও করা হইবে না। চাকুরীতে যোগ্যতাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইবে।

শ্রমিকদের সম্বন্ধে আমি এই বলিতে চাই যে, তাহাদিগকে অন্ততঃ জীবনধারণোপযোগী মজুরী দিতে হইবে। কোন লোক তাহাদিগকে শোষণ করিবে অথবা অন্নবস্ত্র ও গৃহহীন হইয়া তাহারা মারা পড়িবে—উহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। তাহাদিগকে কাজ করিয়া

জীবিকা অর্জনের জন্য আমরা সকল প্রকার সুযোগ দিব, কাজের সময় নিয়ন্ত্রিত করিবে। যখন গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিজস্ব হইবে তখন আমরা আমাদের স্বার্থের জন্য আইন রচনা করিতে পারিব।

এই প্রস্তাবের প্রত্যেকটী অংশ আপনাদের কাছে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিবার আমার সময় নাই। তবে প্রস্তাবটী এত অধিক ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা করা হইয়াছে যে, উহার মধ্যে এমন কোন কথা নাই যাহার সঙ্গে আপনাদের মতভেদ ঘটিতে পারে। শেষের ধারাটী সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে চাই। ইছলামে সুদ গ্রহণ হারাম। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এমন কোন বিধিনিষেধ নাই। কিন্তু অতিরিক্ত সুদ আদায় করা হিন্দুদেরও ধর্ম্ম নহে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে পাঠানেরাও অত্যধিক সুদ আদায় করিয়া থাকে। আমি জানি যে, মাড়োয়ারী, গুজরাটি বাণিয়ারাও অত্যধিক সুদ আদায় করে। আপনারা শতকরা বার্ষিক ৬টাকা এমন কি ৮টাকা সুদ আদায় করিতে পারেন। ইহার অধিক সুদ আদায় উচিত নহে। যখন আমি আইন ব্যবসা করিতাম তখন কখনও আমি, যে দলিলে শতকরা বার্ষিক ৮ টাকার উপর সুদের কথা থাকিত, তাহা লিখিতাম না বা উহার মুসাবিদা করিতাম না। আমি এই নীতিকে আদর্শ ধরিয়াই চলিতাম।

এখন জমিদারের কথা বলিতেছি। তাহারা ধনী লোক। কাজেই তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে হইবে আমরা যাহারা ধনী তাহাদিগকে দরিদ্র করিতে চাই না। তবে সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য যাহাদের বেশী আছে তাহারা অর্থ দিবে, অথবা আমরা তাহাদিগকে অর্থ দিতে বাধ্য করিব। কৃষকদিগকে বাঁচাইতে যাইয়া আমরা জমিদারদিগকে উচ্ছেদ করিব না। যাহাতে উভয়েই প্রীতির সহিত বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহারই আমরা ব্যবস্থা করিব। আমরা কাহারও উপর অবিচার করিব না কিন্তু কাহাকেও ভ্রান্ত আশা পোষণ করিতেও দিব না। কোন লোকের কাছে আমরা আমাদের প্রকৃত আদর্শ কি তাহা ভুল বুঝাইয়া তাহাদিগকে আমাদের দলে টানিতে চাই না। স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে এখনকার মত জমিদারও থাকিবে, কৃষকও থাকিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জমিদারেরাও আমাদের পক্ষে আছেন। কেননা আমাদের সংগ্রামে তাঁহারা অনেক সাহায্য করিয়াছেন। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রস্তাবটি রচনা করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ভাষার বা অন্যান্য প্রকার ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু আপনাদিগকে উহা উপেক্ষা করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের সংশোধনের জন্য এত প্রস্তাব আসিয়াছে যে হয় আপনাদিগকে প্রস্তাবটী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে অথবা উহা বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিবেন যে, আমাদিগকে সকল শ্রেণীর লোকের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে এবং সকলের সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করিতে হইবে।

* * * *

রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূলনীতি সম্বন্ধে বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে :—

"এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, জনসাধারণের শোষণ বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে বুভুক্ষু জনসাধারণের প্রকৃত আর্থিক স্বাধীনতা থাকা চাই। কংগ্রেস স্বরাজ বলিতে যাহা বুঝে জনসাধারণ যাহাতে তাহার মর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের বোধগম্য করিয়া কংগ্রেসের কথা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, কংগ্রেসের তরফ হইতে যদি কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়, তবে তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকা চাই, অথবা স্বরাজ গবর্ণমেণ্টকে সে সমস্ত ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দেওয়া চাই :—

(১) সর্ব্বসাধারণের কতকগুলি অবিসম্বাদী অধিকার ঘোষণা যথা—

(ক) সমিতিবদ্ধ হওয়া।

(খ) স্বাধীন মত ব্যক্ত করা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

(গ) সাধারণের সুনীতি ও শান্তি নষ্ট না করিয়া যাহার যেরূপ অভিরুচি তাহাকে সেরূপ মত পোষণ করিতে এবং ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে দেওয়া।

(ঘ) জাতি, বর্ণ বা ধর্ম্মের জন্য কেহ কোন সরকারী চাকুরী, অধিকার বা সম্মান অথবা কোন ব্যবসায় বা বৃত্তির অনুসরণ করার অনধিকারী বিবেচিত হইবে না।

(ঙ) পুং-স্ত্রী নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করা।

(চ) সাধারণ রাস্তা, কূপ এবং সাধারণের ব্যবহারোপযোগী সকল স্থান ব্যবহার করিতে সকল লোকের সমানাধিকার।

(ছ) সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ গঠিত কতকগুলি নিয়মাধীনে সকলকে অস্ত্র রাখার ও ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া।

(২) ধর্ম্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা।

(৩) শ্রমিকদিগকে জীবনধারণোপযোগী মজুরী দেওয়া। সীমাবদ্ধ সময় খাটান, কর্ম্মস্থলের পবিত্রতা রক্ষা, মালিকের লোকসানে শ্রমিককে ক্ষতি গ্রস্ত হওয়া হইতে রক্ষা করা ; বার্দ্ধক্য, রোগ এবং বেকার অবস্থায় জীবিকার ব্যবস্থা করা।

(৪) দাসত্ব বা প্রায়-দাসত্বের অবস্থা হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা করা।

(৫) নারী শ্রমিকদিগকে রক্ষা করা এবং গর্ভাবস্থায় তাহাদের জন্য যথোচিত ছুটীর ব্যবস্থা করা।

(৬) স্কুলে যাইবার যোগ্য বালক-বালিকাদিগকে কারখানার কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা।

(৭) নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার দেওয়া এবং শ্রমিকে মালিকে মতান্তর হইলে মিটমাটের জন্য মধ্যস্থের ব্যবস্থা করা।

(৮) কৃষির রাজস্ব বিশেষভাবে হ্রাস করা এবং অফলা জমির খাজনা যতদিন পর্য্যন্ত মকুব করা আবশ্যক ততদিন পর্য্যন্ত মকুব করা।

(৯) একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর কৃষি আয়ে ক্রমবর্দ্ধমান আয়কর ধার্য্য করা।

(১০) ক্রমিকহারে উত্তরাধিকার কর।

(১১) প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার।

(১২) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(১৩) সামরিক ব্যয় বর্ত্তমান ব্যয়ের অন্ততঃ অর্দ্ধেক করা।

(১৪) দেওয়ানী বিভাগের ব্যয় ও বেতন বহুল পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে। বিশেষভাবে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন কর্ম্মচারীই একটা নির্দ্দিষ্ট টাকার বেশী বেতন পাইবে না। ঐ নির্দ্দিষ্ট টাকা সাধারণতঃ মাসিক পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না।

(১৫) দেশ হইতে বিদেশী কাপড় ও বিদেশী সূতা বাহির করিয়া দিয়া দেশী কাপড়কে রক্ষা করিতে হইবে।

(১৬) মাদক পানীয় এবং মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(১৭) লবণের উপর কোন কর থাকিবে না।

(১৮) মুদ্রা বিনিময়ের হার রাষ্ট্র কর্ত্তৃক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যেন ভারতীয় শিল্পের সহায়তা এবং জনসাধারণের সহায়তা হয়।

(১৯) মৌলিক শিল্প এবং খনিজ সম্পদ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণ।

(২০) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কুসিদবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ।

ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য

মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য

"যে সমস্ত বৃটিশ সম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্য করিতেছেন এবং যাহারা ভারতে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বাণিজ্যের অধিকার সম্পর্কে কোন বৈষম্য করা হইবে না—এই নীতি হইতেই আলোচনা উত্থিত হইয়াছিল। এই নীতি খুব নির্দ্দোষ বটে; কিন্তু ইহা দ্বারা একটি গুরুতর বিপজ্জনক অবস্থাকে গোপন রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অবস্থা হইতেছে এই রকম, ভারতবর্ষে কুকুরের লড়াই চলিতেছে এবং যদিও ভারত ভারতবাসীরই, তথাপি তাহারাই এক্ষণে ইংরাজের তলে পড়িয়া আছে। ইংরাজেরা শাসক জাতি বলিয়া জীবনের প্রায় প্রত্যেক পদেই তাহারা একটি সুবিধাজনক স্থান দখল করিয়া আছে। অতিরঞ্জিত না করিয়াও একথা বলিতে পারা যায় যে, ইংরাজের শিল্প ও বাণিজ্য ভারতের ধ্বংসাবশেষের উপরই উন্নতি লাভ করিয়াছে। ল্যাঙ্কাসায়ারের উন্নতি বিধানের জন্য ভারতের কুটীর শিল্পকে ধ্বংস করিতে হইয়াছিল। বৃটিশ জাহাজ ব্যবসায়ের যাহাতে উন্নতি হইতে পারে এই জন্য ভারতীয় জাহাজগুলিকে ধ্বংস করিতে হইয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় ও ইউরোপীয়ানদিগের মধ্যে কোন বৈষম্য না করার অর্থ হইতেছে ভারতের দাসত্বকে চিরস্থন করিয়া রাখা। দৈত্য ও বামনের মধ্যে অধিকারের কি প্রকারের ক্ষমতা হইতে পারে? অসমানের মধ্যে সমান অধিকারের কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, কি প্রকারে বামনকে দৈত্যের আকার দেওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ লোক যখন সমতলক্ষেত্রে বাস করে এবং তাহাদিগকে যখন সিমলার উচ্চ শৈলশৃঙ্গে তুলিতে পারা যায় না, তখন উহার একমাত্র প্রতীকার হইতেছে এই যে, যাহারা সিমলার শৈলশৃঙ্গে আছে, তাহাদিগকে সমতলক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে হইবে।"

ভারতের আর্থিক দুরবস্থা

(ভারতীয় বণিক সভার সভাপতি লালা শ্রীরামের অভিভাষণ)

গত বৎসর ভারতের আর্থিক ব্যাপারে বড় দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। এদেশে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য অসম্ভবরূপে হ্রাস পাওয়াতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর কোন দেশে ভারতের মত কৃষিজাত পণ্যের দাম এত কমিয়া যায় নাই। তারপর ভারতের রপ্তানী জিনিষের দাম খুব কমিয়া গেলেও আমদানী মালের মূল্য সেই হারে কমে নাই। এই জন্যই ভারতের আর্থিক দুরবস্থা আরও চরমে উঠিয়াছে। উহার ফলে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অবস্থাও উহার ফলে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের এই দুরবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপই দায়ী। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট বাট্টার হার এমন অস্বাভাবিক করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে কৃষিজাত পণ্যের ক্রমেই দাম কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কৃত্রিম উপায়ে বাট্টার হার নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে দিতেছেন না।

দেশের আর্থিক দুরবস্থার আর একটা প্রধান কারণ, গবর্ণমেণ্টের টাকা ধার করার নীতি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জিনিষপত্রের দাম সস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার সুদও কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু এদেশের গবর্ণমেণ্ট ক্রমেই অধিকতর চড়া সুদে ঋণ লইতেছেন, তাহা খাটাইয়া যদি আয় হইত তাহা হইলে ঋণ দ্বারা ভারতের উপকারই হইত। কিন্তু ঋণের অধিকাংশ টাকারই কোন আয় হইতেছে না। লোক বিপদে পড়িয়া যেভাবে ঋণ লয় ভারত সরকার সেই ভাবেই ঋণ গ্রহণ করিতেছেন।

ভারতের আর্থিক দুরবস্থার আর এক কারণ, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধি। উহার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ১৯১৩-১৪ সনে এদেশে জিনিষপত্রের মূল্য যে প্রকার ছিল এখনও তাহা তদনুরূপই রহিয়াছে। কিন্তু ১৯১৩-১৪ সনে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি শাসন কার্য্যে মোট ১২৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ২১ হাজার ২৮০ টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু ১৯৩১-৩২ সনে একমাত্র ভারত সরকারের ব্যয়ই ১৩২ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে ভারতের সামরিক ব্যয় ৩১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা আর এখন ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে ৫১ কোটী টাকা। এই সব অতিরিক্ত টাকা ট্যাক্স বাড়াইয়া সংগ্রহ করা হইতেছে আর তাহার ফলে লোকের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। অবশ্য ভারত-সরকার এ বৎসর একটা ব্যয় সংক্ষেপ কমিটী বসাইতেছেন, কিন্তু উহাতে কোন ফল হইবে কিনা সন্দেহ। গবর্ণমেণ্টের এই সব কার্য্য কলাপের ফলেই জনসাধারণ দাবী করিতেছে যে, আগামী শাসনতন্ত্রে ভারতের আর্থিক অবস্থা পরিচালনার ভার

ভারতীয় মন্ত্রিগণের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এতদিন যে প্রকার অযোগ্যতার সহিত আর্থিক অবস্থার পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের আর একথা বলার জো নাই যে, ভারতবাসীর হাতে এই ভার দিলে তাহারা উহা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের বিবৃতিপত্রে একথা সমর্থন করিয়াছেন। আর্থিক বিলি-ব্যবস্থার ভার ভারতবাসীর উপর না দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না।

অনেক বৃটিশ ব্যবসায়ী বলিতেছেন যে, ভারতবাসীকে এই অধিকার দিলে তাহারা ব্রিটিশ বণিকদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, ভারতবাসীর হাতে এই ক্ষমতা না আসিলে কিছুতেই ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইয়া ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ ঘুচিবে না এবং কোন আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন স্বদেশ প্রেমিক কোন শাসনপদ্ধতি সমর্থন করিবেন না। আর উহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, ইংরাজ ব্যবসায়িগণ যতই শাসনগত অধিকার লাভ করুন না কেন, ভারতে ইংরাজদের বাণিজ্য বিনষ্ট হইবে। সন্তুষ্ট ভারতবাসীই ভারতে ইংরাজদের বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় প্রতিভূ হইতে পারিবে।

ভারতের জাহাজের ব্যবসায় সম্বন্ধে বড়লাট একটা মিটমাট করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গোল টেবিল বৈঠকে অনেক ধনী ইংরাজ ব্যবসায়ী ভারতবাসীর জাহাজের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগের পথ একেবারে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মা সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থনে যে ঐশ্বর্য্যের উদ্ভব হয় তাহা আমরা কিছুতেই বিদেশীয়গণকে লুণ্ঠন করিতে দিব না।

উপসংহারে আমি ভারত সরকার ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতীয় বণিকদের প্রকৃত মনোভাব জানাইতে চাই। বর্ত্তমানে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। এখনও আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। সুখের বিষয়, এখানে সেখানে মেঘ কাটিবার একটু লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যদি আগামী গোলটেবিল বৈঠকে একটা মীমাংসা হয়, তবেই আকাশ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হইবে। কিন্তু যদি মীমাংসা না হয় যদি গবর্ণমেণ্ট দেশের আর্থিক ব্যাপারে লোককে স্বাধীনতা না দেন, তবে দেশের জনসাধারণের কোন উপকারই হইবে না। তাহা হইলে পুনরায় সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। ভগবান সেই দিন হইতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন। আমাদের উদ্দেশ্য কি তাহা পরিষ্কারভাবে বলিতেছি। আমরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের বেশী কিছু চাই না; কিন্তু উহা অপেক্ষা কিছু কমে আমরা সন্তুষ্ট হইব না। আমি বড়লাট লর্ড আরুইনকে অনুরোধ করি—তিনি এদেশে যে ভাবে কাজ করিয়াছেন, অবসর গ্রহণের পরেও যেন তিনি ভারতের ন্যায্য অধিকার লাভের পক্ষে প্রবৃত্ত করেন।

হিন্দু মহাসভার কথা

হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি বাহির করিয়াছেন:—

হিন্দুমহাসভা বলিতে চাহেন যে, সাম্প্রদায়িক ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহারা বরাবরই সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, কোন প্রকার জাতীয়গবর্ণমেণ্টেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা দ্বারা সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণ হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেরা সম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত এবং আশা করেন যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ও অনুরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া এমন একটি পূর্ণ গবর্ণমেণ্ট গড়িয়া তুলিবেন, যাহা একই রাজনৈতিকদলের লোকদ্বারা একযোগে পরিচালিত হইবে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি হইতে হিন্দু মহাসভার মতামত বুঝা যাইবে— (১) সমস্ত সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের ভোটারগণকে লইয়া নাগরিক ও জাতীয়তা বাদী হিসাবে একটি সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সৃষ্টি হইবে। (২) কোন পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা থাকিবে না। (৩) ব্যবস্থা পরিষদে কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্য কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। (৪) কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। (৫) একই প্রদেশে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ব্বাচনাধিকার একইরূপ থাকিবে। (৬) কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাপরিষদের জন্য সমগ্র ভারতে নির্ব্বাচনাধিকার একইরূপ থাকিবে। (৭) সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম্ম, জাতিগত আচার প্রভৃতি রক্ষাকল্পে আইন করিয়া সাবধানতামূলক ব্যবস্থা রাখা হইবে—তুর্কী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। (৮) সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রশ্নই থাকিবে না। (৯) ভাষা, শাসন, অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কিত ব্যাপারের অনুসন্ধান না করিয়া প্রদেশ সমূহের বর্ত্তমান সীমা রেখা পরিবর্ত্তন করা হইবে না (১০) সরকারী চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি লইয়া যদি কোন মতবিরোধের সৃষ্টি হয় সেজন্য ভারতের নিজের জন্য প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে চূড়ান্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টে ন্যস্ত থাকিবে।

মুসলিম সম্মেলনের কথা

মুসলমান সম্মেলনে জিন্নার ১৪ দফার সঙ্গে এই প্রস্তাবগুলিও করা হইয়াছে।

১। ধর্ম্মসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে মুসলমানেরা ব্যক্তিগত আইনের আমলে থাকিবেন।

২। ব্যবস্থাপক সভায় যদি কোন মুসলমানের ব্যক্তিগত আইনের সম্পর্কে খসড়া উপস্থিত করা হয়, তবে তাহাতে কেবলমাত্র মুসলমানদেরই ভোট দিবার অধিকার থাকিবে।

৩। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা যে পরিমাণে মুসলমান প্রতিনিধি থাকিবেন, মুসলমান প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দে উক্ত পরিমাণ অর্থ ই ব্যয়িত হইবে।

৪। ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা যে কয়জন মুসলমান সভ্য থাকিবেন শিক্ষাবিভাগেও উক্ত পরিমাণ মুসলমান সভ্য থাকা চাই।

৫। সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, শাসন ব্যাপারে ভারত সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অধিকারের সীমা নির্দ্দেশের পর যে ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা প্রয়োগ করিবার অধিকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির হস্তে প্রদান করিতে হইবে।

৬। সিন্ধু প্রদেশকে পৃথক করা হউক এবং বেলুচিস্থানকে একটী পূর্ণ অধিকারযুক্ত প্রদেশে পরিণত করা হউক।

৭। এই সম্মেলন পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর এবং বাঙ্গালা ও পঞ্জাবের নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দাবী করিতেছে।

মুসলিম দাবী

কুমারী সফিয়া খাতুন

মুসলমানগণ জাতির মুক্তি সাধনায় এত সামান্য স্বার্থবলি দিয়াছে যে সাম্প্রদায়িক দাবী করিবার তাহার কোনই অধিকার নাই। মিঃ জিন্নার চৌদ্দদফা দাবী কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমর্থন করেন নাই। কেননা জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, হিন্দুমুসলমানের মিলিত দাবী কার্য্যকরী হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাতন্ত্র্য জাতিকে হীনবীর্য্য করিয়া তোলে। কেবলমাত্র 'মুসলমান' হওয়ার সুবিধাটুকু লইয়া, আদুরে খোকার মত বায়না ধরিলে জগতের সম্মুখে মুসলমান উপহাসাস্পদ হইবে। ভিক্ষার অন্নে জীবনধারণ করা অপেক্ষা এতবড় দুর্গতি মানুষের আর কিছু নাই। যোগ্যতা অর্জ্জনে অক্ষমতাই আমাদের মানসিক বৃত্তিকে পশুর অপেক্ষা হেয় করিয়া তুলে। আমরা আজ তাই গুণ্ডামী করে, জোর করে চোখরাঙ্গিয়ে পরের হাতের ক্রীড়নক হয়ে, চৌদ্দদফা ভিক্ষার ভাণ্ড হস্তে অপরের অর্জ্জিত সম্পদে বিত্তশালী হ'তে চাইছি। হজরৎ সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে নিজের শক্তিতে আরবের রাষ্ট্র ও সমাজ স্বাধীন ক'রে গড়ে তুলেছিলেন। আজ হজরতের অনুচর বলে নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা করে। মুসলমান ভিক্ষুক নহে। মুসলমান কথাটার অর্থ হচ্ছে স্বাধীন। জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিগ্রহ সহ্য করেছেন। হজরতের এই সমস্ত যথার্থ অনুচরগণ যখন পাষাণ কারাগার মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, সেই সময় এই সমস্ত চৌদ্দ দফাদার মুসলমানরা খানাপিনা, আমোদ-আহ্লাদ ক'রে "নিউ দিল্লীর" রাজতক্তে সেলাম ঠুকে আনন্দে দিন যাপন ক'রেছেন। বুরোক্রেসীর দল বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, কংগ্রেসই একমাত্র শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। স্বার্থপর সম্প্রদায় হ'য়ে জগতে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। মনুষ্যত্বের লেশমাত্র যাহাদের মধ্যে নাই, তারাই চৌদ্দ দফাদার হ'য়ে গুণ্ডামি ক'রে ভিক্ষা লয়। এই দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে দেখুন, হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ কেমন অভিন্ন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ ক'রে দেখুন 'মুসলমান' কাকে বলে। ইরাকের হোম সেক্রেটারী সিমি বে, ভগৎ সিংহের শোক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, "এই কেপটাউনে যে সমস্ত ভারতীয় মুসলমান আছেন, তাঁদের সঙ্গে স্বাধীন দেশের মুসলমানদের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে একদল ভিক্ষুক মুসলমান নীচের মত পরের দ্বারে হাত পাতে। ইত্যাদি"

ডাঃ আলমের অভিমত

আমি দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, যে, সমস্ত মুসলমান ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে কিছু কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই বিষয়ে একমত যে, মিলিত ও স্বাধীন নির্ব্বাচকমণ্ডলির ভিত্তি না করিয়া যদি কোন সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হয় তবে তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের মত এই যে, পৃথক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় এই উভয় প্রকার স্বার্থের ঘোর বিরোধী। যদি সমস্ত হিন্দু জাতিও পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দাবী করে, তথাপি ব্যক্তিগতভাবে আমি উহা গ্রহণ করিব না। এই কথা দ্বারা আমি আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মীদের মনোভাবই ব্যক্ত করিতেছি। আমার মনে হয় যে, মিলিত নির্ব্বাচক মণ্ডলীই দুর্ব্বল পক্ষের অস্ত্র এবং মুসলমানেরা দুর্ব্বল বলিয়াই তাহাদের সাম্প্রদায়িক সার্থকতার জন্য এই মিলিত নির্ব্বাচক মণ্ডলী প্রথা প্রয়োজন। অনেকের ভুল ধারণা এই যে, মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ফলে দুর্ব্বলপক্ষের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। কার্য্যতঃ দুর্ব্বলপক্ষ তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য মাত্র এই অস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারে। যদি অন্যান্য সম্প্রদায় পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনও করে, তাহা হইলেও আমি উহার বিরুদ্ধে লড়িব।

জাতীয় দলের মুসলমানদের বহু সমর্থক আছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই সমগ্র মুসলমান সমাজের নেতা। উঁহাদের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে ১২ হাজারেরও অধিক

মুসলমান বিগত আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন। উহা হইতেই জাতীয় দলের মুসলমানের প্রভাব বুঝা যায়। উহাই চরম নহে। আমাদিগকে আমাদের প্রভাবের আরও পরিচয় হিসাবে একথা প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে যে, মুসলমান সমাজ রাজভক্তদের দ্বারা গঠিত তথাকথিত সর্ব্বদল মুসলমান সম্মেলনের সমর্থন না করিয়া আমাদিগকেই সমর্থন করে। যে নীতির ফলে নিজেদের মধ্যে শোচনীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ও নিষ্ঠুর রক্তপাত হইয়া থাকে, তাহার মূল্য কতটুকু তাহা আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মুসলমান সমাজ বুঝিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে মীমাংসা করিবে। ভেদ নীতির ফল কি তাহা বর্ত্তমানে এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব নাই। মুসলমান জনসাধারণ মিলিত স্বাধীন নির্ব্বাচকমণ্ডলী প্রায়ই সমর্থন করে। কিন্তু তাহারা কি ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা জানে না এবং তাহাদের কথা কেহ শুনিতে পারিতেছে না। যদি তাহাদের সহকর্ম্মিগণ এই বিষয়ে আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করে, তবে তাহারা সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেদের মত ব্যক্ত করিতে পারিবে এবং যে সব লোক তাহাদের স্বার্থসাধনের অছিলায় অন্য স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছে তাহারা তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

অভিমান

শ্রীবিমলা দেবী

প্রভাতের আলো, সন্ধ্যা শ্যামলরাত্রি অন্ধকার
ধরণীর ধূলি, শ্যাম কিশলয়, বসন্ত সম্ভার,
ওগো পল্লব চঞ্চল বাহু, নির্জ্জন বনভূমি
দূর নীহারিকা, হে মহা আকাশ নত প্রান্তর চুমি,—
চপল নির্ঝর, প্রবাহিনী ধারা, উন্নত হিমালয়
জনম প্রভাতে তোমাদের সাথে, হ'য়েছিল পরিচয় ;
রুদ্র দুপুরে দুরন্ত বায়ু, ঝঙ্কার কলরোল,
শ্রাবণের গাঢ় স্নেহবারিধারা, বসন্ত চঞ্চল,
বন্ধু যে আমি, সাথী ছিনু সাথে, ভুলে যাবে চিরতরে
মনে জাগিবে না স্মরণ আমার চঞ্চল ব্যথা ভরে ?
ভুলে যাও যদি, ভুলে যেও তবে, কোন ক্ষোভ নাই আর
ঘুম পাড়ানীয়া গান গাবে যবে, মরণের আঁধিয়ার,
সে সুপ্তি মাঝে ক্ষণে ক্ষণে মোর চমকি জাগিবে চিতে
তোমাদের প্রেম—হয়ত সে ভুল ক্ষণিক—আচম্বিতে।

Gobin Shaw

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসে অশান্তি

নওযোয়ান ভারত-সভা ও কোন কোন যুবাদলের অত্যাচারে মহাত্মাকেও বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীতেই এইসব যুবদল বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং শান্তির প্রতীক মহাত্মার গলায়ও ইঁহারা কৃষ্ণমাল্য পরাইয়াছিলেন ও মহাত্মাবাদ্ নিপাত যাউক্ চীৎকার করিয়াছিলেন। মহাত্মা ইঁহাদের ব্যবহারে অসম্ভব কিছু দেখেন নাই—শান্ত স্থির প্রেমভরা চিত্তে ইহাদের মনের বিক্ষোভ ঘুচাইয়া দেশের সার্ব্বজনীন মঙ্গলকার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেসে বামপন্থীদের ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠিতেই মিলাইয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্র মহাত্মারই জয় বিঘোষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অসহযোগ সংগ্রামের আরম্ভ, দিল্লীর সন্ধির সূচনা, করাচী কংগ্রেসের সকল ব্যাপারে মহাত্মা একাকীই (অবশ্য সকলেরই সহযোগে) পরিচালনা করিয়াছেন, কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নিয়োগ পর্য্যন্তও ইনি সবই নিজ দায়িত্বে Dictatorএর মতই করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ বিস্মিত হইতেছেন এবং যিনি কায়মনে গণতন্ত্রের সাধক তাঁহাকেই এরূপ করিতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইতেছেন। সন্ত্রস্ত হইবার কিছু নাই—পুরা গণতন্ত্রের আদর্শ লইয়া বিশ্বে যে সব রাষ্ট্র চালিত হইতেছে তাহার মূলাধার এখন প্রায় সর্ব্ব রাষ্ট্রেই এক্ একজন ডিক্টেটর। আর যে দেশে পুরা অধীন রাষ্ট্র সেই দেশকে আবার নিজেদেরই সহস্র বিক্ষোভের ভিতর দিয়া একটা স্বাধীনতার রূপ দিবার চেষ্টা হইতেছে—এই স্বাধীনতা মুখে ও মনে উচ্চ আদর্শ হিসাবে অনেকে ভাবিলেও তাহাকে হাতে কলমে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিতেছেন মহাত্মা। সুতরাং জনগণের জন্যই যে তাঁহাকে জনগণ অধিনায়ক হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর জনগণ-মন-অধিনায়ক কেহ স্বেচ্ছাচার করিয়া সাজিতে পারে না—জনগণ স্বেচ্ছারই কোন ভাগ্যবানকে এই অসীম অধিকার দেয়। মহাত্মার নামেই প্রকাশ তিনি ভারতীয় জনগণের নায়ক হইয়াছেন—করাচী কংগ্রেসের এই অশান্তি আগমে কার্য্যতঃ তিনি আরও প্রমাণ করিয়া দিলেন—যে একমাত্র তিনিই যুগপৎ ভারত মহাসাগরের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাৎ, চোরা পাহাড়ের আক্রমণ ও হিমালয়ের হিম প্রবাহকে স্বচ্ছন্দে অঙ্গে ধারণ করার শক্তি রাখেন। নেতৃত্বের দাবী মহাত্মা করেন নাই, ভারতই তাঁহাকে ইহা উদ্ধার পাইবার জন্য দিয়াছে,—কংগ্রেসে ঝটিকা উঠিবে, ওঠে যদি উঠুক—মহাত্মা তাহা ধামা-চাপা দিয়া রাখিতে চাহেন নাই, নির্ভীক সত্যাগ্রহীর মত তাহার সম্মুখীন হইয়াছেন—অপর কেহ হইলে বানচাল হইয়া যাইত, ভারতও স্বখাত-সলিলে এই মুহূর্ত্তেই হাবুডুবু খাইত—স্বাধীনতার স্বপ্ন বিংশ হইতে ত্রিংশ শতাব্দীতে চলিয়া যাইত। কিন্তু মহাত্মার প্রেমে এ অশান্তি শান্তি আনিয়াছে—আবার সত্যাগ্রহী ভারতের অখণ্ড সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আপন অধিকার বুঝিয়া লইবার অটুট জোর আসিয়াছে।

করাচী কংগ্রেস—বিষয় নির্ব্বাচনে মহাত্মা

এই ইতিহাস বিশ্রুত কংগ্রেসের ৪৫শ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা ও গোলটেবল বৈঠকে যোগদান সমস্যার আলোচনা প্রথম কথা ছিল। কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসী হওয়ায় একদল দেশবাসী দিল্লীচুক্তি নাকচ করিবারও প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু মহাত্মা তাঁহার অসীম ব্যক্তিত্বে ও যুক্তি প্রভাবে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় কি কর্ত্তব্য ও মঙ্গল তৎসম্বন্ধে প্রতিনিধিদের প্রভাবান্বিত করেন। মহাত্মা বলেন—'পূর্ণ স্বরাজই আমাদের লক্ষ্য।

গোলটেবল বৈঠকে আমাদের যাহা দিবার কথা হইয়াছে তাহা পূর্ণ স্বরাজ এমন কি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারও নহে। কিন্তু আগামী গোলটেবলে পূর্ণ স্বরাজই দাবী করা হইবে। বর্ত্তমানে তাঁহারা আমাদের পরামর্শে আহ্বান করিতেছেন ও আমাদের দাবী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে বলিতেছেন। আমরা কি চাই, এ কথা বলিতে আপত্তির কোন কারণ দেখি না।' মহাত্মাজীর প্রস্তাবে কেহ কেহ আপত্তি ও উষ্মা প্রকাশ করিলেও অধিকাংশ তাহাতেই মত দেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গোলটেবল আলোচনায় যদি সুফল পাওয়া সম্ভব হয় তবে তাহা পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি গোলটেবলে যোগদান করা হয় তবে সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধী একাই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহযোগে কথাবার্ত্তা চালাইবেন।

সভাপতির অভিভাষণ

কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত ও কাজের কথায় পূর্ণ হইয়াছে। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল ও মৌলানা মহম্মদ আলির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া সেই সমস্ত বীরদের প্রতিও সশ্রদ্ধ সমবেদনা জানাইয়াছেন—যাঁহাদের কোন খ্যাতি ছিল না—যাঁহারা খ্যাতির জন্য লালায়িত না হইয়া গত ১২ মাসের অহিংস সংগ্রামে প্রাণ দিয়াছেন।

ভগতসিং প্রভৃতি ফাঁসী

ইহাঁদের ফাঁসীতে দেশময় গভীর ক্ষোভ সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহাদের অবলম্বিত পথ আমি সমর্থন করি না, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড আমার মতে অন্যান্য হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা কম নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তাঁহাদের দেশপ্রীতি, আত্মত্যাগ ও সাহসের প্রশংসা করি। তাঁহাদের প্রাণদণ্ড রদ্ করিবার জন্য সমগ্র জাতির আকুল আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের ফাঁসী দেওয়ায় বিদেশী গবর্ণমেণ্টের হৃদয়হীনতার চরম পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা যেন ক্ষোভে, ক্রোধে আমাদের অভীষ্ট হইতে বিচ্যুত না হই। সশস্ত্র শক্তির এই ঔদ্ধত্য প্রাণহীন শাসন পদ্ধতিরই পরিচায়ক। যদি আমরা আমাদের সরল সহজ পথ হইতে বিচ্যুত না হই তবে তাঁহাদের কার্য্যে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।...

অহিংসা স্বপ্ন নহে

ক্রটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও কার্য্যতঃ ভারত জগৎকে দেখাইয়াছে—যে, সার্ব্বজনীন অহিংসা স্বপ্ন নহে। ই[illegible] অসীম সম্ভাবনায় পূরিত অতি বাস্তব সত্য। মানব আ[illegible] বিশ্বাসের অভাবেই হিংসার ভারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিয়াছে। অহিংস কার্য্যে কৃষক সংঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, নারী এবং বালক-বালিকারাও সাহায্য করিয়াছে। অহিংসার দিক দিয়া আমাদের সংগ্রাম সমগ্র পৃথিবীর সংগ্রাম বলা যায়। বিভিন্ন জাতি বিশেষতঃ আমেরিকা আমাদের সহানুভূতি দ্বারা সাহায্য করিয়াছে।

গান্ধী আরউইন চুক্তি

এ সম্পর্কে সভাপতি এই মর্ম্মে বলেন—'আমরা যদি এ আপোষ না করিতাম তবে দোষী হইতাম ও গত বর্ষের ত্যাগের সুফল নষ্ট করিতাম। সত্যাগ্রহীর মত বরাবর বলিয়াছি যে আমরা শান্তির জন্য ব্যগ্র, সুতরাং শান্তির পথ উন্মুক্ত দেখিয়া সেই পথই ধরিয়াছি। যুদ্ধ বিরতির সর্ত্তানুযায়ী আমরা পূর্ণ স্বরাজ দাবী করিতে পারিব। দেশরক্ষা, সৈনিকদের উপর এবং অর্থবিভাগ প্রভৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব দাবী করিতে পারিব। আমাদেরই স্বার্থের জন্য কতকগুলি সাবধানতা সংরক্ষণ থাকিবে!' এই ব্যাপারগুলি বিষদভাবে বুঝাইয়া সর্দ্দার বল্লভ ভাই বলিতেছেন—আমরা লাহোরের প্রস্তাব হইতে ভিন্ন প্রস্তাব করিতেছি না। কেননা স্বাধীনতার অর্থ ইংরেজ বা অন্য কোন জাতির সহিত খামখেয়ালীভাবে অসহযোগিতা বর্জ্জন নহে। স্বাধীনতার অর্থ পরস্পরের মঙ্গলের জন্য, সম্পূর্ণ সমান হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ইহাও হইতে পারে। এই সহযোগিতা ইচ্ছা করিলেই যে কোন পক্ষ বর্জ্জন করিতে পারিবে। ভারতকে যদি আলোচনা ও চুক্তির মধ্য দিয়া স্বাধীনতা পাইতে হয় তবে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা স্বাভাবিক।'

ফেডারেশন

যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ চিত্তাকর্ষক হইলেও উহাতে শাসন যন্ত্রে নূতন জটিলতা সৃষ্টি সম্ভব। সামন্তরাজগণ কোন অধীনতার প্রস্তাবে রাজী হইবেন না। কিন্তু ঠিক আদর্শ লইয়া ইহাতে আসিলে তাঁহাদের সাহায্যে গণতন্ত্রের আদর্শ খাটো না হয় তাহাও তাঁহাদের দেখিতে হইবে।

তাহারা স্বেচ্ছায় যুগধর্ম্ম পালন করিলে ও প্রজাগণকে ভারতের অন্যান্য প্রজাদের সমান অধিকার দিলে যুক্ত-রাষ্ট্রের সকলের অধিকারই সমান হইবে। সামন্তরাজদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে তাহা মীমাংসার জন্য একটি সর্ব্ব-ভারতীয় আদালত গঠন করিতে হইবে।

ব্রহ্ম দেশ

ব্রহ্মদেশ ভারতেই থাকিবে না বিচ্ছিন্ন হইবে এ প্রশ্নের মীমাংসা ব্রহ্মবাসিরাই করিবে। একদল মিলিত থাকিবারই পক্ষপাতি এবং তাহাদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে সমগ্র ব্রহ্মের অভিমত জানার ব্যবস্থা দরকার।

সম্প্রদায়িক সমস্যা

সকল সমস্যার বড় এই সমস্যা। লাহোর কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছেন যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি যে মীমাংসায় রাজী না হইবেন সে মীমাংসা কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইবে না। যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহারা যদি সাহস অবলম্বন করে এবং নিজেরা সংখ্যা লঘিষ্ঠদর স্থান অধিকার করে তবে প্রকৃত একতা হইতে পারে। যে ভাবেই হউক এই একতা না হইলে লণ্ডন সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া কোন লাভ নাই। একতার জন্য কোন চেষ্টার বাকী রাখিলে চলিবে না।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

ইহা না করিলে ভারতের কোটি কোটি লোক না খাইয়া মরিবে। জিনিষ পত্রের অভাবের জন্য নহে কাজ পায়না বলিয়াই ভারতের কোটি কোটি লোক অনাহারে থাকে, যদি দেশী মিলগুলিও খদ্দরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে তবে তাহাদের বিরুদ্ধেও বিলাতী কাপড়ের মতই জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন একটা রাজনীতিক মন্ত্রই নহে, আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য উহার স্থায়ী মূল্য আছে। ভারতকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা থাকিলে ব্যবসায়ীদের বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা ছাড়িতে হইবে।

পিকেটিং

এ ব্যাপারে কেহ কোনরূপ জোর জবরদস্তি করিতে পারিবে না। লোককে বুঝাইয়া কাজ করিতে হইবে। এ কার্য্যে মেয়েদের কৃতিত্ব বেশী। ইহাতে তাঁহারা জাতির কৃতজ্ঞতা ও অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।

বৃটিশপণ্য

আলোচনা ও মীমাংসা দ্বারা দেশে শান্তি আনিতে হইলে বৃটিশপণ্য বর্জ্জনে ঝোঁক না দিয়া স্বদেশী প্রচারেই মনোযোগী হইতে হইবে। স্বদেশীতে প্রত্যেক জাতিরই জন্মগত অধিকার আছে। দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহা দেশীই ব্যবহার করিতে হইবে।

সমানাধিকার

উন্নত ও অবনতের মধ্যে সমানাধিকারের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এরূপ স্থলে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে বড় তাহাকে একটু নামিয়া ছোটর সঙ্গে মিলিত হইবে। ইংরেজদের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমরা অনেক পশ্চাতে আছি। সুতরাং তাহাদের হাত হইতে যদি আমরা দেশী ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষার অধিকার না পাই তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব থাকিবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেও ইহা নূতন কিছু নাই। প্রত্যেক উপনিবেশই প্রয়োজনমত এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

মাদক বর্জ্জন

দেশের কোটি কোটি লোকের অন্নের জন্য যেমন বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন দরকার তেমনি জাতির নৈতিক উন্নতির জন্য মাদক দ্রব্য বর্জ্জন দরকার। ইহার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই।

স্বরাজের মূল

কংগ্রেস স্বর্ণাক্ত কলেবর কোটি কোটি লোকের স্বার্থের জন্যই কাজ করিতেছে। লোভ বা ক্ষমতার বশবর্ত্তী না হইয়া মানব জাতির সেবার জন্য কাজ করিলে উহা বিপুল শক্তিশালী হইবে। হিন্দুধর্ম্ম অস্পৃশ্যতা দ্বারা মলিন থাকিলে স্বরাজের কোন মূল্য নাই। সভাপতি মহাশয় প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ভারত শীঘ্রই তাহার অধিকার ফিরিয়া পাইবে—সুতরাং প্রবাসী ভারত-বাসীদের প্রতি সুবিচার করিলে সকল দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক। আমরা স্বাধীন হইলে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ লোকেরা আমাদের নিকট যে ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের দেশেও ভারতীয় সেই অধিকারই চায়। ইহা আমাদের বেশী কিছু দাবী নয়।

অভ্যর্থনার অভিভাষণ

কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ চৈৎরামের অভিভাষণ অতি সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট কাজের কথায় পূর্ণ। ইনিও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন —'আমরা কি হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক বা একাধিক সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি পাইব না, যাঁহারা এই দেশকে স্বীয় মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতে পারেন, যাঁহার বিচার বুদ্ধির পরিপক্কতার উপর ও পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টি শক্তির উপর আমরা অবিচলিত বিশ্বাস রাখিতে পারি। এমন লোকের নিকট আমাদের দাবী উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থির চিত্তে মানিয়া লইয়া এ সমস্যার সমাধান করি।'

নূতন কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি—

এবারকার কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ইহাঁদের লইয়া গঠিত হইয়াছে :—মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ আন্সারী, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, এম, এস, এ্যানে, কে, এফ্‌ নরিম্যান, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং, ডাঃ আলম, ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, জয়রাম দাস, দৌলতরাম, ও সৈয়দ মামুদ জেনারেল সেক্রেটারী ও যমুনালাল বাজাজ কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

নমাজের ছুটি

কোন সাধারণ কাজেও নমাজের সময় ছুটি লইয়া সেকাজ তখনকার মত বন্ধ রাখা মুসলমানদের একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্পর্কে বিগত করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য—মৌলানা বলেন—সে দিন নমাজের জন্য সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রস্তাব করিয়া মৌলানা জাফর আলি সভা ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার দাবী ন্যায় সঙ্গত ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মৌলানার দাবী সভার অধিবেশন স্থগিতের দাবীরই অনুরূপ হইয়াছিল। সভাস্থগিতের দাবী আমার মতে ইস্লাম ধর্ম্ম বিরোধী। ইস্লাম কখনই মুসলমানকে অন্যের কাজে বাধা দিতে প্ররোচিত করে না। বরং, ইশলামের নির্দ্দেশ এই যে অন্যের কাজের সুবিধার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া প্রার্থনার সময় ঠিক করিয়া লইতে হইবে এবং ঐ প্রার্থনাই পবিত্রতর হইবে। প্রত্যেকের প্রার্থনার সময়ই যদি সভার অধিবেশন স্থগিতের দাবী করা হয় তবে উহা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপারই হইবে। মহাত্মার প্রার্থনার সময়ও প্রেসিডেন্টের সভাধিবেশন স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য নহে!

ভগৎ সিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ড

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়া কয়েকজন সদস্য সামান্য আহত হন, এই সম্পর্কে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত গ্রেপ্তার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন! ঐ অবস্থায়ই তাঁহারা লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর লাহোর পুলিশের স্যাণ্ডার্স ও চন্দন সিং গুলিতে নিহত হন। এই সম্পর্কে ১০ই এপ্রিল লাহোরের এক বোমা কারখানায় শুকদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজগুরুও ধৃত হন গত ৭ই অক্টোবর ইহাঁদের ফাঁসীর হুকুম হয়। এলাহাবাদে পুলিশের গুলীতে নিহত চন্দ্রশেখর আজাদও এই মামলার ফেরারী আসামী ছিলেন। ভগৎ সিংয়ের পিতৃব্য সর্দ্দার অজিৎ সিং ব্রেজিলে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসী না হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, ইহারই জন্য দেশের জনমত বহু আবেদন নিবেদন করিয়াছিল। ভগৎ সিংয়ের ফাঁসীর কথা শুনিয়া মহাত্মা বলিয়াছেন—"ভগৎ সিংয়ের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের কথা আমি আর কোথাও শুনি নাই।... তাঁহার মৃত্যুতে আজ বহু সহস্র লোক ব্যক্তিগত বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিবেন। এই সব যুবক স্বদেশ প্রেমিকের স্মৃতিতে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইতে পারে তাহার সহিত আমিও যোগ দিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিতে আমি দেশের যুবকদের সতর্ক করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ, অধ্যবসায় ফলাফলে ভ্রূক্ষেপহীন দুর্দ্দম সাহস অনুকরণীয়। কিন্তু ঐ ক্ষমতাকে তাঁহারা যে ভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমরা যেন তাহা না করি! নরহত্যার পথে এ দেশের স্বাধীনতা কখনই লভ্য হইতেপারে না। ...গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে বিপ্লবীদলকে হাত করিবার বড় সুযোগ হারাইলেন। ......কিন্তু জাতির

কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। কংগ্রেস তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা হইতে এতটুকু বিচ্যুত হইবে না ......ক্রোধান্ধ হইয়া আমরা যেন ভ্রান্ত পথে পতিত না হই।' ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীতে প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও জাতি মহাত্মা কথিত ভ্রান্ত পথে পতিত না হইয়া করাচী কংগ্রেসে মহাত্মা-প্রদর্শিত পন্থাই মানিয়া লইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানের দান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব হয় কিনা এই প্রসঙ্গে বাংলা কৌন্সিলে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—১৯০৬ সন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুদের নিকট হইতে ৫০ লাখের উপর টকা পাইয়াছে। অথচ ঐ সময় মধ্যে মুসলমান সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকাও দিয়াছে কিনা সন্দেহ। সাধারণ কলেজগুলির ২০,০০০ ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ২,৮০০ মাত্র! হিন্দু বালিকার সংখ্যা ৩০০ মুসলমান বালিকা মাত্র ৫ জন। ডাক্তারী বা আইন কলেজে হিন্দুছাত্র সংখ্যা ৪,৫০০, আর মুসলমান মাত্র সংখ্যা মাত্র ৮০০! ১৬৬ জন এম-বি পাশ করিয়াছে তার মধ্যে ১০ জন মাত্র মুসলমান। ১ জন মাত্র মুসলমান বি-ই পাশ করিয়াছে। কোন মুসলমান ছাত্র বি-কম বা এম-এস্-সি পাশ করে নাই।

কানপুর দাঙ্গা

যুক্ত প্রদেশের কয়েকটি সহরে পর পর যে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে সম্প্রতিকার কানপুরের দাঙ্গা তার মধ্যে সব চেয়ে ভয়াবহ। যে কারণেই এই দাঙ্গার উদ্ভব হউক পরিশেষে ইহা হিন্দু-মুসলমান বিরোধেই রূপান্তরিত হইয়া বহু হিন্দু মুসলমাম হতাহত হইয়াছে! এ সব দাঙ্গা কাহারা বাধায় জানি না—কিন্তু যাহারা দাঙ্গা করে তাহাদের চেয়েও ইহারাই বেশী দোষী তাহাতে সন্দেহ নাই। দু'সম্প্রদায়ের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইলেই এরূপ দাঙ্গা বন্ধ হইতে পারে তাহা সত্য কথা—কিন্তু এ হৃদয়ের পরিবর্ত্তনেও যাহারা দাঙ্গা করে তাহাদের চেয়ে অন্তরালে যে সব উস্কানোর জন্য নেতা বিরাজ করেন তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দরকার। কারণ এরূপ দাঙ্গার মূল তাহারাই। এই সব প্রচ্ছন্ন নতাদের কবল হইতে দু'সম্প্রদায়ের জনসাধারণকেই রক্ষা করিতে হইলে দু'সম্প্রদায়ের সত্য নেতাদের আরো আলোকে আসিয়া দাঁড়ানো কর্ত্তব্য। সম্প্রদায়গত কোন স্বার্থ এইরূপ দাঙ্গা ও খুন জখমে সাধিত না হইলেও ব্যক্তিগত হীন স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। দেশের স্বার্থও ডুবানো যাইতে পারে। আর এক কথা এসব দাঙ্গা হাঙ্গামা অবিলম্বে দমন সম্ভব পুলিশ প্রভৃতি দ্বারা—কারণ রাজ-তক্‌মা তাহাদের আছে—কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা জটিল হইবার সময় প্রায়ই তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় না—এ কথা অনেক স্থান হইতেই শোনা যায়। এ সম্বন্ধে সরকারের আরো অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

গনেশশঙ্কর বিদ্যার্থী

কানপুরের দাঙ্গায় 'প্রতাপ' সম্পাদক মহামনা গনেশশঙ্কর নিজ জীবনাহুতি দিয়াছেন। পণ্ডিত গনেশশঙ্কর হিন্দু মুসলমান সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন। দাঙ্গা থামাইতে গিয়া, আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। করাচী কংগ্রের মণ্ডপ হইতে দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পণ্ডিতজীর এই আত্মদানে সকলেই অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে। গনেশ-শঙ্করের প্রাণদানে দেশের হিন্দু-মুসলমান এই হীন সাম্প্রদায়িক কলহ মিটাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও তাঁহার আত্মা শান্ত হইবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া মহাত্মার মত পূর্ণ আশাবাদী লোকও আশা-নিরাকার মধ্যে দোল খাইতেছেন। করাচীতে জমিয়ৎ-উল-উলেমা-হিন্দের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের বলিয়াছেন—সাদা কাগজে তাঁহাদের কি দাবী তাহা লিখিয়া দিলে তাঁহারা তাহাই পাইবেন। উলেমার সভাপতি মৌলানা আজাদও বলিয়াছেন তাঁহারা মহাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা বাণী মানিয়া চলিবেন। তারপর দিল্লীতে মুসলিম্ সম্মেলন হইয়াছে মৌলানা সৌকত আলীর সভাপতিত্বে! ইহাতে মিঃ জিন্নার ১৪ দফা সাম্প্রদায়িক দাবী সমর্থিত হইয়াছে ও অনেক উষ্ণ বক্তৃতা হইয়াছে।

মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—গত ৪ঠা তারিখ মুস্লিম দলের সম্মেলনে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের নিকট যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় তাহা সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে নিম্নদাবী নহে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ বলিয়াছেন—যুক্ত

নির্ব্বাচন প্রথা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তির উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে আমি তেমন কিছু যেন মানিতে রাজী না হই। খোলাখুলি ভাবে সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করিয়া সমস্যার যে সমাধান, অথচ তাহাতেও কোন সম্প্রদায়ের সর্ব্বাদিসম্মত সমর্থন নাই, তাহার সঙ্গে আমি কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারি না।...সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হইলে আন্দোলনের পরবর্ত্তী গতি ভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে—কিন্তু লক্ষ্য একই থাকিবে।' ভারতের এই জাতীয়-সঙ্কট-সমস্যার সময় জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ কোনরূপেই কি সম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না ?

ডগলস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্

প্রসিদ্ধ অভিনেতা ডগ্‌লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্ক্‌স্ ভারতে আসিয়া সামান্য কিছুদিন থাকিয়া বিপুল অভ্যর্থনা পাইয়া আবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। জাহাজে উঠিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন এবার সস্ত্রীক আসিতে পারেন।

আর্ণল্ড বেনেট

প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যেক আর্ণল্ড বেনেট সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি বহু বিখ্যাত উপন্যাসের লেখক ও সংবাদপত্রের নানাবিষয়ের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলায় সবাক্ চিত্র

ম্যাডান কোম্পানী সবাক্ বায়স্কোপ ক্রাউন সিনেমায় দেখাইতেছেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাকে সার্থক বলিতে হইবে এবং ক্রমশঃ ভারতীয় অভিনেতারা সবাক চিত্রে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন আশা হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক সার সি-ভি রমণও প্রথম টকিতে টকির উজ্জল ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পেসেন্স কুপার ও দু'একজন পার্শী অভিনেতার ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জল মনে হইল। টকিতে কণ্ঠের স্বর ও সঙ্গীতে যতটা দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে ভাবাভিব্যক্তির দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই—তাই দু'চারজন ছাড়া কাহারও কণ্ঠ শুনিলেও জীবন্ত মনে হয় না। ভবিষ্যতে ম্যাডান কোম্পানী ও অভিনেতৃগণ এদিকে দৃষ্টি দিবেন আশা করি

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় সংবাদপত্র

সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইবার জন্য অথবা তাহাতে ইন্ধন না দেওয়ার জন্য বাংলার সংবাদপত্র-সেবী-সমিতি সম্প্রতি কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বা ঐ ধরণের রাজনৈতিক বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত ধীর ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। কোন সম্প্রদায়কে আঘাত করিয়া কোন কথা বলা হইবে না, কোন সম্প্রদায় ভীষণ অপরাধ করিলে তাহা অপক্ষপাত ভাবে আলোচিত হইবে। সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার উপর কোন মন্তব্য করা হইবে না। সংবাদের শিরোনাম সাবধানে দিতে হইবে ইত্যাদি। এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান বহু সাংবাদিক একত্র হইয়াছিলেন। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংবাদপত্রগুলির সহযোগিতায় দেশে হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইলে ভাল। সংবাদপত্রসেবী-সমিতিএজন্য ধন্যবাদার্হ।

মেদিনীপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের হত্যায় মহাত্মাজী

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্টেট্ মিঃ জেমস্ পেডি আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্ক মহাত্মাজী বলিয়াছেন—যে সব যুবক এইরূপ নরহত্যা সাধন করে তাহার দেশের কোন উপকার করে না। তাহাদের বুঝা উচিত যে গত অহিংস সংগ্রামে দেশ অসামান্য লাভবান হইয়াছে। যদি কোন হিংসাত্মক কার্য্য ও হিংসা প্রচার না হইত তবে দেশ আরো উন্নতি লাভ করিতে পারিত। যাহারা রাজনীতিক হিংসা কার্য্যে বিশ্বাসী তাহাদিগকে আমি বলি—যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস অহিংস ও সত্যের নীতিতে দৃঢ় থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের হস্ত সংযত রাখুক। যদি তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়া থাকে তবে তাহাদের সময়ের একটা মেয়াদ বাঁধিয়া দিক, তাহারা যেন সেই সময়ের মেয়াদ ধর্ম্ম বিশ্বাস সহকারে মানিয়া চলে।

"সুরের প্রাণ"

(Wynne O Apperley R. I. অঙ্কিত)

৫ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ | ২য় সংখ্যা

সঙ্কট-কালে

গত বর্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারত অসামান্য সাফল্য লাভ করিলেও আর্থিক ভাবে তাহাকে সর্ব্বদাই বিশেষ বিব্রত থাকিতে হইয়াছে। সাময়িক সন্ধির সঙ্গে অনেকেই আশা করিতেছে এই সন্ধি যদি স্থায়ী সন্ধি হয় তবে অবস্থাও ক্রমশঃ উন্নত হইবে আর তাহা যদি না হয় তবে ব্যবসায়-বণিজ্য সব তো রসাতলে যাইবেই, ভারতীয়দের অবস্থা তখন এখনকার চেয়েও আরও সঙ্কটাপন্ন হইবে। অবশ্য ভারতে এই রাজনৈতিক অশান্তি-বিক্ষোভ চলাতে ভারতের অর্থ-সঙ্কটের সঙ্গে জাগতিক অর্থসঙ্কটও চলিয়াছে—বিশেষত ইংলণ্ডের যে সব ব্যবসায়-পণ্য ভারতের উপর নির্ভর করিয়াই চলে তাহাদের অবস্থা তো অতি সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের সঙ্গে সে সব দেশের তুলনা ঠিকমত হয়না—কারণ তথাকার লোকজনের অর্থসঙ্কটে গবর্ণমেণ্টকে যেমন রীতিমত বিব্রত হইতে হয়,—এখানে তেমন মোটেই হইতে হয় না। তাহা ছাড়া অর্থসঙ্কট তেমন ব্যাপকভাবে দেশব্যাপী হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই বা কতটা কি করা সম্ভব?

দেশে রাজনৈতিক অশান্তির সূত্রপাত হইতে মহাত্মা গান্ধী বারংবার দেশবাসীকে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। বিলাস্-ব্যসন একেবারে বর্জ্জন করিয়া যাহা একান্ত না হইলে নয় তেমনি ভাবে খাওয়া-পরা চালাইয়া জীবনধারণ করিতে লোককে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু গত রাজনৈতিক সংঘর্ষেই দেখা গিয়াছে যেমন-তেমন ভাবে চলিয়াও অর্থের পীড়ণ কষ্ট হইতে অনেকে মুক্তি পান নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে আরও সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা দেশ-নেতাদের দেওয়া কর্ত্তব্য—যাহাতে ভারতের সকল শ্রেণীই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া এই সংঘর্ষের ভিতরেও চলিতে পারে। অবশ্য কষ্ট আসিবেই কিন্তু তাহাতে ডুবিয়া যাইতে না হয় এই জন্যই নির্দ্দেশ প্রয়োজন।

এবার দেশে অর্থ-সঙ্কটের সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রায় সব রকম দ্রব্যাদির মূল্যই কমিয়া গিয়াছিল—অনেক স্থলে পুরাণো কালের অর্থের পরিবর্ত্তে বিনিময়ে দ্রব্যাদি লওয়াও আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে ক্ষতির কিছু নাই, এ-দিক দিয়াও আমাদের দেশ আত্মতৃপ্ত থাকিতে পারে। কিন্তু ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি না দিয়া তো উপায় নাই—এদিকে কি উপায় অবলম্বনীয় তাহাও বিশেষ চিন্তার বিষয়। বাংলায় প্রজা ও জমিদারবর্গের এ-বিষয়ে সম্মিলিত বৈঠক হওয়ায় প্রয়োজন, এবং যাহাতে কেহ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াও বাঁচিতে পারে তাহা দু'য়েরই দেখা কর্ত্তব্য।

রাজনৈতিক আন্দোলন দেশের স্বাধিকার না আসা পর্য্যন্ত চলিবেই—ইহা যদি আপোষে আসে তবে ভাল, যদি না আসে, তবে রাজনৈতিক বিক্ষোভ আরও বিপুলভাবে আসিয়া ভারতকে বিক্ষুব্ধ করিবে সন্দেহ নাই। বিলাসিতা প্রভৃতি বর্জ্জন এদিকে পূর্ণ জোর রাখিতে হইবে—তা ছাড়া অন্যান্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সে সম্বন্ধেও দেশের লোককে প্রতিদিন সতর্ক করা প্রয়োজন।

প্রভাতের আলোক

—গল্প—

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ

শরতের প্রভাত।

তখনও অরুণোদয় হয় নাই। স্নিগ্ধ শুভ্র শিশির তখনও তৃণের উপর ফুলের মত ফুটিয়া আছে; কাহারও চরণের ঘায়ে, রৌদ্রের তাপে গলিয়া মাটিতে লুটায় নাই। বিন্দু বিন্দু শিশির বৃক্ষের উপর দিবসের রৌদ্রতপ্ত কিশলয়কে সারারাত্রি স্নিগ্ধ রাখিয়া প্রভাতে বিদায়ের অশ্রুবিন্দুর মত পত্রপ্রান্তে ছল ছল করিতেছে ও মাঝে মাঝে দুই একটি করিয়া তৃণাস্তীর্ণ মৃত্তিকার উপর নীরবে ঝরিয়া পড়িতেছে।

দেশপ্রাণ দীনদাস গ্রামে গ্রামে পদব্রজে যাইতেছেন। ধনী নির্ধন, অভিজাত কৃষক, বালক যুবা—সকলকে আহ্বান করিয়া দেশ সেবা সম্বন্ধে অতি সরল কথায় দুই একটি উপদেশ দিয়া যাইতেছেন।

সুপ্তিগ্রামে তাই সকলে আজ এত প্রভাতে জাগিয়াছে। গ্রামপ্রান্তে বৃক্ষলতা বেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সকলে একত্রিত হইয়াছে।

দীনদাস বলিলেন, "তোমাদের নূতন কথা শুনাইব এমন জ্ঞান আমার নাই। শুধু কয়েকটি পুরাতন কথা তোমাদের বলিতে আসিয়াছি। অলস হইওনা, কাহাকেও অলস হইতে দিও না। মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিও না—যাহাতে কেহই ব্যবহার না করে তাহার জন্য স্নেহের সহিত প্রীতির সহিত চেষ্টা করিবে। তোমার ভাইকে অন্যায় করিতে নিষেধ করিবার অধিকার যখন তোমার আছে, তোমার দেশবাসীর উপরও সে অধিকার তোমার কেন থাকিবে না? তোমার দেশের তাঁতি, দেশের কামার, দেশের মুচি অন্নাভাবে তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে। তাহাদের মুখের গ্রাস বিদেশীকে দিওনা। যে দিবে তাহাকে নিষেধ কর।

"অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু করিও না। বীরের মত তাহার প্রতিবাদ করিবে। বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া সরল জীবন যাপন কর। দেশের হিতের জন্য প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবে—আন্তরিক প্রার্থনায় সব হয়। প্রতিদিন নিয়ম করিয়া-যত সামান্য ক্ষণই হউক্—দেশের কথা ভাবিবে, দেশের কাজ করিবে। আপনার সন্তানদের দেশকে ভালবাসিতে শিখাইবে।

"স্মরণ রাখিও এপথ ত্যাগের পথ, শক্তির পথ, প্রেমের পথ। এপথ মহিমামণ্ডিত হইলেও কুসুমাস্তীর্ণ নহে। এপথে আঘাত সহিতে হইবেই - সেজন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিও। হয় ব্রহ্মচারী থাকিয়া দেশের সেবা করিবে, না হয় বিবাহিত হইয়া দেশের কাজ করিবে।

"মরণের ভয় রাখিও না—বাঁচিতে চাহিলেই বাঁচিয়া থাকা যায় না।

সাধারণ উপদেশ—অসাধারণত্ব কিছুই নাই, বাগ্মিতা বা বলিবার কোন আড়ম্বর নাই। তথাপি এমনই আন্তরিকতার সহিত কথাগুলি দীনদাস বলিলেন যে, তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল। অনেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক তাহারা দেশের সেবা করিবে। কেহ বাড়ী ফিরিয়া তাহা ভুলিল, কেহ কিছুদিন পরে ভুলিল, কেহ বা চিরকাল মনের মধ্যে তাহা গাঁথিয়া রাখিল

২

সুপ্তি গ্রামের একটি বালকের মনে এই উপদেশ চিরকালের মত গাঁথা হইয়া গেল। সে বালক ধ্রুব।

ধ্রুবের বয়স ১৬ বৎসর—ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। পাঠে সে সতীর্থদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্ম্মে পরম উৎসাহী, সেবায় সর্ব্বদা উদ্যত।

ধ্রুব মধ্যমাকৃতি, গৌরবর্ণ, শান্ত কিশোর মূর্ত্তি, মুখে সর্ব্বদা দৃঢ়তা ও প্রসন্নতা ফুটিয়া আছে।

ধ্রুব বাড়ী আসিয়া মায়ের কাছে সভার সব বর্ণনা করিয়া বলিল, মা, তুমি যদি অনুমতি দাও আমি দেশের সেবা করিব।'

মাতা পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'বাবা, ইহাতে যে বিপদ্ আছে; যদি তোর বিপদ্ ঘটে?

ধ্রুব বলিল, "মা, অলস ও অকৃতজ্ঞ হইয়া বসিয়া থাকিলেও তো বিপদ ঘটিতে পারে। তোমার দুঃখে দুর্দ্দিনে

তোমার সেবা না করিলে যেমন পাপ হয়, দেশের দুরবস্থায় দেশের সেবা না করিলেও তেমনি পাপ হইবে। আমি জানিয়া শুনিয়া এই পাপ করিব ?'

মা বলিলেন, 'না বাবা, পাপ করিও না।

সেইদিন হইতে ধ্রুব দেশের কার্য্যে ব্রতী হইল।

বিলাতী কাপড়ের দোকানের সম্মুখে আসিয়া ধ্রুব অবাক্ হইয়া গেল। এত লোক অম্লানবদনে বিলাতী কাপড় কিনিতেছে ? কোন কষ্ট ইহাদের মনে হইতেছেনা ? দীনদাস এই যে সেদিন এত করিয়া বলিয়া গেলেন,—যাহা এখনও তাহার কানে বাজিতেছে—তাহা কি এত সহজে লোকে ভুলিয়া গেল ? দেশের শীর্ণ, ক্ষুধার্ত্ত শিল্পিগণ এক মুষ্টি অন্নের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে সকলের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে—আর এই রাশি রাশি অন্ন হাসিমুখে সবাই হৃষ্ট-পুষ্ট বিদেশীর বিরাট মুখের কাছে ধরিয়া দিতেছে ; একটুও ব্যথা বাজিতেছে না ?

ধ্রুবের চোখে জল আসিল। সে সকলের কাছে করযোড়ে বিনয় করিয়া বলিল, লোকের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া অনুরোধ করিল—বিলাতী জিনিষ তাহারা যেন আর না কেনে।

পরণে মোটা খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের চাদর জড়ানো, নগ্নপদ, গৌরবর্ণ স্থির অচঞ্চল বালকের ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া কাহারো কাহারো মায়া জন্মিল। দুই একজন সত্যই স্বদেশী কাপড় কিনিতে সুরু করিল

মদের দোকানে অসম্ভব ভীড়। কতজন আসিতেছে, দোকানে বসিয়া নির্লজ্জভাবে মদ খাইতেছে। তাহারা চলিয়া যাইতে না যাইতে সে স্থান অপরের দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। কি তাহাদের মুখ, কি তাহাদের ভাষা, কি তাহাদের বলিবার ভঙ্গী—দোকানের ভিতর প্রবেশ করিবার কি সে দুর্দমনীয় আগ্রহ।

ছেলেরা নিষেধ করিতে বিদ্রূপ শুনিল, হাতযোড় করিতে গালি খাইল। তখন তাহারা পথ জুড়িয়া শুইয়া পড়িল। দুই একজন ফিরিয়া গেল। বেশীর ভাগ লোক ছেলের দলকে ডিঙ্গাইয়া, তাহাদের দলিত করিয়া ব্যাকুল আগ্রহে দোকানের মধ্যে ঢুকিল।

ক্রমে দোকানীদের অসহ্য হইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিয়া ছেলেদের রাগাইয়া তাহারা একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল।

পুলিশ আসিয়া ছেলেদের ধরিয়া লইয়া গেল।

(৩)

বিচার হইল। অনেকেই আর কখন এরূপ করিবে না বলিয়া নিষ্কৃতি পাইল। ধ্রুবও তাহারই মত ৪।৫টি ছেলে এ প্রতিজ্ঞা করিল না। তাহারা হাসিমুখে কারাবাসে গেল।

ছয় মাসের কারাবাসে ছেলেদের সেই নবীন উৎসাহ ও দীপ্ত তেজ ম্লান হইল না। কারাগার হইতে ফিরিয়া আবার তাহারা নূতন উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হইল। সহরে যাহাও বা স্বদেশী দ্রব্যাদির সামান্য কাট্‌তি আছে, পল্লীগ্রামে তাহাও নাই। তাহারা মাথায় স্বদেশী কাপড়ের ছোট ছোট মোট্ লইয়া গ্রামের পথে গাহিতে গাহিতে চলিল

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী তো সাধ্য নাই।"

লোকের দুয়ারে, পথের মাঝে, হাটের মধ্যে, গাছের ছায়ায় সুকুমার কিশোরগুলি এই গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘরের সম্মুখে কাপড় পাইয়া কেহবা কিনিল, কেহবা ফিরাইয়া দিল, কেহবা শুধু গান শুনিয়া লইল, কেহবা তাহাও শুনিতে চাহিল না।

আবার তাহারা ধরা পড়িল। আবার কারাগার বরণ করিয়া লইল। ফিরিয়া আসিয়া এবার ধ্রুবের সঙ্গীরা সকলেই একে একে সে পথ ত্যাগ করিল।

তখন ধ্রুব একাকী এই পথে চলিল। আপনার সাধ্যমত দুইচারিখানা কাপড় লইয়া সে পল্লীর পথে পথে ঘুরিল, হাটের মাঝে বসিল। যেখানে জনকয়েক লোককে একত্রিত দেখিল, সেখানেই সে তাহাদের ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "দেশকে ভালবাস। দেশের জিনিষ মাথায় কর। দেশের দুঃখ দূর কর। কত মহাপুরুষ দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, প্রাণ দিতেছেন—তোমরা একবার চাহিয়াও দেখিবে না ?"

অলক্ষ্যে কে তাহার বক্ষে শক্তি দিলেন, কে তাহার কিশোর কণ্ঠে ভাষা দিলেন কেহই বুঝিল না।

ধরা পড়িতে ধ্রুবের দেরী হইল না! এবার দুই বৎসরের জন্য তাহার সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

সশ্রম কারাবাসেও ধ্রুবের মুখের হাসি ম্লান হইল না। তাহার মধুর স্বভাবে কঠোরহৃদয় প্রহরী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। যাহার সহিত দেখা হইত তাহারই সহিত সে হাসিমুখে কথা কহিত। আপনার কার্য্য শেষ করিয়া প্রহরীর অনুমতি লইয়া—যে পারিতেছে না ধ্রুব তাহার কার্য্য করিয়া দিত। কেহ মাটি কাটিতে কাটিতে হাঁফাইয়া উঠিয়াছে, ধ্রুব তাহার হইয়া মাটি কাটিতে লাগিল। জল তুলিতে তুলিতে কেহ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, সে পাত্র লইয়া তাহার বদলে জল তুলিতে লাগিয়া গেল।

জেলখানার বন্দিগণের কদর্য্য আহার, তাহাদের প্রতি প্রহরীগণের হৃদয়হীন ব্যবহার ও সর্ব্বোপরি তাহাদের নিরাশার ভাব ও পাপের প্রসার দেখিয়া ধ্রুবের কোমল হৃদয় অবিরত ব্যথিত হইতে লাগিল।

একদিন এক বৃদ্ধ পীড়িত বন্দীর চোখে জল দেখিয়া ধ্রুব অস্থির হইয়া পড়িল। কারাধ্যক্ষ ধ্রুবকে তাহার মধুর স্বভাবের জন্য ভালবাসিতেন। ধ্রুব তাঁহার নিকট অনুমতি লইয়া পীড়িত বন্দীর শুশ্রূষায় রত হইল।

বৃদ্ধ বলিল যে, তাহার একমাত্র পুত্র বাড়ীতে অসহায় হইয়া পড়িয়া আছে। প্রথমে সে লোভে পড়িয়া চুরী করে; মুক্তি পাইয়া ভাবে আর কখন চুরী করিবে না। কিন্তু দাগী বলিয়া কোথাও চাকুরী না পাওয়ায় অভাবের জন্য আবার চুরি করিয়া জেলে আসে। দুই বৎসর পরে সেবারও মুক্তি পাইল। কিন্তু সেবার চাকুরী দূরে থাক মজুরের কার্য্য পাওয়াও তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। শেষে রাগে নিরাশায় আবার সে চুরী করে। এইবার পাঁচ বৎসর জেল হইয়াছে। এইবার যেরকম তাহার শরীরের অবস্থা, পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া আর তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইবে না।

ধ্রুবের শুশ্রূষা তুচ্ছ করিয়া বৃদ্ধ পুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে একদিন মরিয়া বাঁচিল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ধ্রুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর বৃদ্ধের রোগ ছিল একপ্রকার সংক্রামক। ধ্রুব ক্রমে বৃদ্ধের রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। শেষে তাহার আর জীবনের আশা রহিল না।

কারাধ্যক্ষ বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। একদিন তিনি ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও সহিত তোমার যদি দেখা করিবার ইচ্ছা থাকে, কিম্বা কাহাকেও যদি কিছু বলিতে চাও আমাকে বল।

ধ্রুব বলিল, আমি মরিয়া গেলে আমার মাকে সংবাদ দিবেন যে আমি কোন কষ্ট পাই নাই, সুখে মরিয়াছি। বলিবেন, আবার আমি ফিরিব, আবার ঐ মায়ের কোলে জন্মিব, মায়ের কাছে দেশকে ভালবাসিতে শিখিব। শিখিয়া দেশে জন্য মরিব।"

বলিতে বলিতে ধ্রুব উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "আমি সব কথা বলিব, তুমি শান্ত হও তুমি যদি আরো কিছু আমাকে করিতে বল, তাহাও আমি তোমার জন্য করিব।"

কক্ষের চারিদিকে একবার চাহিয়া ধ্রুব ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে একটু বাহিরে লইয়া চলুন; একটু আলোকে একটু মুক্তির মাঝে মরিতে দিন্।"

কারাধ্যক্ষের আদেশে কক্ষ হইতে শয্যাসহ ধ্রুবকে অতি সাবধানে প্রাঙ্গণে আনা হইল।

প্রাঙ্গণের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে ধ্রুবের মুক্তিপ্রয়াসী দৃষ্টি আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। ধ্রুব ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, এখানেও যে আমি নিঃশ্বাস পাইতেছিনা। যদি একটিবার আমাকে বাহিরে লইয়া যান!—আমি তো আর ইচ্ছা করিলেও বাহিরে পলাইতে পারিব না।"

ইহা নিয়মের বহির্ভূত। কারাধ্যক্ষ একটু ভাবিলেন; পরে আপনি সঙ্গে থাকিয়া ধ্রুবকে বহিরে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বাহিরের মুক্ত বায়ু অঙ্গে লাগিতে ধ্রুবের মুখে প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিল।

মাথার উপর অনন্ত বিরাট নীলাকাশ, পায়ের দিকে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতী, পরপারে সুদূর প্রসারিত শস্যশ্যামল প্রান্তর—দূর দূরান্তরে চক্রবালপ্রান্তে রক্তসূর্য্য অস্তপ্রায়।

ধ্রুব একবার মেঘলেশহীন মুক্ত আকাশের পানে চাহিল, একবার দুকূল প্লাবিনী নদীর শুভ্র বারিরাশির পানে চক্ষু মেলিল, একবার পশ্চিমাকাশের শেষ প্রান্তে তরঙ্গায়িত স্বর্ণ সমুদ্রের উপর শেষ দৃষ্টি রাখিল। একবার বলিল, "ভগবান্ আরো আলো, আরো মুক্তি দাও।"

তারপর তাহার স্নিগ্ধ শান্ত নয়নছটি ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল—বুঝি দীপ্ততর আলোক ও প্রিয়তর মুক্তির উদ্দেশে ধাবিত হইল।

সূর্য্য অস্ত গেল। ম্লান সন্ধ্যা ধীরে নামিয়া আসিল। ক্রমে আকাশ, বাতাস, প্রান্তর, নদীতট—সব অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের বক্ষঃ ভেদ করিয়া কতক্ষণে আবার প্রভাতের আলোক ফুটিয়া উঠিবে?

হে আমার কল্পলোক বিলাসী সুন্দর

শ্রীঅমলা দেবী

জীবনের সাথী নহ ক্ষণিক স্বপনে
কখন রাঙালে ওগো আমার গগনে!
হে আমার কল্প লোক বিলাসী সুন্দর
তোমার কল্যাণ হস্ত মোর বাহু পর
কখন রেখেছ ওগো আজো নাহি জানি!
মানস সুন্দর ওগো স্বপনে দেখানী
তোমার অরূপ রূপ। সুদূর গগনে
তোমারি লেখনি যেন কবে আনমনে
কি কথা লিখিয়া দেছে তারকা আখরে।
তোমার আহ্বান ওগো বনে বনান্তরে
বসন্তের মঞ্জরিত শাখায় শাখায়
ছ'বাহু বাড়ায়ে যেন খুঁজিছে আমায়।
সন্ধ্যার বিনম্র শান্ত ম্লানিমা আলোকে
গাঁথিছ বসিয়া মালা কোন দূর লোকে
আমার লাগিয়া। বৃথা গাঁথা মালা, শেষে
তারার কুসুম গুলি ম্লান হাসি হেসে
ছিঁড়ে ফেলে দাও এই ধরিত্রীর পানে।
হে চির বিরহী মোর, বিরহের গানে
এবার সমাপ্তি দাও। আন আর বার
তোমার পরশ খানি শান্ত সান্ত্বনার
নিদ্রাতুর আঁখি। দাও গো নয়নে
চিরতরে মহাঘুম অতি সযতনে।

ক্ষণিকা

শ্রীঅমলা দেবী

সেত নহে অজিকার কালিকার কথা!
কত যুগ যুগান্তের বিস্মৃত বারতা
ভোলা সে কাহিনী। আজ কেন মনে হয়
ঘুরে ফিরে, সেদিনের ক্ষণ পরিচয়
ক্ষণিকের মায়া। বসন্তের সাঁঝে
'হবনা বিস্মৃত তোমা' মিলনের মাঝে
হয়ত বলিয়াছিনু। হে মোর কল্যাণী
তবুত ভুলিয়া গেছি সেদিনের বাণী।
রজনী ঘনায়ে আসে ঘোর অন্ধকার
তোমার কোমল স্পর্শ আজি বার বার
মনে পড়ে! হে মোর ক্ষণিকা
কোন সে সুদূরলোকে তব দীপ শিখা
জ্বালায়ে তুলেছ ওগো। কোন দিন শেষে
নবীন পথিক আমি সে নূতন দেশে
অজানা সে তীর্থে যদি পথ খুঁজে মরি,
তব মন বন মাঝে উঠিবে গুঞ্জরি
ক্ষণিকের পরিচয়? অথবা স্বপন
নিমেষ নিদ্রার কোলে লীলা অগণন
জাগরণে গেছ ভুলে! তাই যদি হয়
আমারো স্বপন মোহ ভাঙিবে নিশ্চয়!

সূচনা

শ্রীবিমলা দেবী

—"পাঠশালা পালায় জানি, স্কুল পালানও শুনেছি, কিন্তু কলেজ অফিস পালানটা তোমারই প্রথম আবিষ্কার" পরিহাস সূচক কণ্ঠে কলহাস্যে বিজলী বল্লে।

স্বামী অপরেশ স্ত্রীর কথার সুরে, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, বই খাতাগুলো এলোমেলো ভাবে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে মৃদুহাস্যে বল্লে "কি আশ্চর্য্য, মাথাটা যে ধরা ধরেছিল তাই চলে এলাম।"

অপরেশ শয্যার উপর বসে পড়ল. বিজলী পাশে এসে দাঁড়াল, "সত্যি! ভাগ্যিস মাথা ধরাটা সম্বন্ধে লোকে প্রমাণ চেয়ে বসে না। কিন্তু ভাবছি, তোমার মাথা ধরার কৈফিয়ৎটা আমার কাছে যতই সহজ সচল হোকনা বাড়ীশুদ্ধ সাবারি কাছে সেটা আড়ষ্ট অচলই হয়ে রইবে, বিশেষ সেজ ঠাকুরঝির যে মুখ!"

আবরণটা খসেই যখন গেল, সেটাকে আর টানাটানি করে, ঢাকা দেবার বৃথা চেষ্টা না করে-অপরেশ হেসে উঠল। বিজলীর একখানা হাতধরে নিজের পাশে আকর্ষণ করে বল্লে "কে মিনু ত? আচ্ছা ঠাট্টা যখন, করবে আমাকে ডাক দিও, আমি অচলকে সচল করে দেব। আমিত মাথা ধরলে বাড়ী আসি, নরেশ শ্বশুর-বাড়ী আসত যে।"

—"আহা কি সচলই হ'ল। যাও!"

—"খুব যে তেজ করছ, যেতে পারিনা যেন! আচ্ছা দেখ।" অপরেশ একটু খানি নড়ে বসল। বিজলী তাড়তাড়ি তার একখানি হাত চেপে ধরে বল্লে—"যাওনা, কেমন যেতে পার—এখুনি এমনি বিষ্টি আসবে।"

অপরেশ এইবার লম্বা হয়ে-বিছানায় শুয়ে পড়ল, হেসে বল্লে—"আচ্ছা সত্যি কথা বলতে তোমাদের এত কষ্ট হয় কেন বলত? স্বামীরা যদি কলেজ অফিস পালায়, স্ত্রীরা তাতে বেশ রীতিমত খুসি হয়ে ওঠে, অথচ বলবার সময় ঠিক উল্টোটি বলে বসে থাক।"

—"তোমরা কোন সত্যি কথা বল!"

—"বলি না!"

—"না"

—"যথা—"

—"যথা তোমার মাথা ধরেনি।"

—"না তাত ধরেইনি—তুমি যে রকম মাষ্টারী করছিলে, বেচারীর না ধরে উপায়?"

বিকেল বেলায় ভাঁড়ার ঘরে বসে মিনু ফল কাটছিল, বিজলী এসে দাঁড়াল -"আমি কুটবো ঠাকুরঝী!"

—"না থাক আমি কুটে দিচ্ছি, ছোড়দার বুঝি আজো একটা কোন রকম বিপর্য্যয় অসুখ করেছিল?"

কৌতুক হাস্যে মিনু প্রশ্ন করলে।

অপরেশ সেই পথে বাইরে যাচ্ছিল—মিনুর কথায় দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াল—"কি জিজ্ঞেস করছেন শুনি?"

অপরেশ হাসলে।

—"তোমার অসুখ করেছিল বুঝি?"

—"হুঁ।"

—"মাকে বলি।" কৃত্রিম ব্যস্ততায় মিনু বলে।

—"আজ্ঞে না মাকে আর বলতে হ'বে না, হয়েছে। তোর ত ভারি বাড় বেড়েছে দেখতে পাই, বলে দেব সেই নরেশের কথাটা?"

মিনু অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে পড়ল—

—"যাও ছোড়দা; কি যেন—হ্যাঁ! ও বৌ ফলগুলো তুলে রেখ ত ভাই।" মিনু হাসি মুখে বেরিয়ে গেল।

নির্জ্জনতার সুযোগে বিজলীর মাথাটী একবার নেড়ে দিয়ে অপরেশ চলে গেল।

২

—"কোথায় যাওয়া হয়েছিল! রাত তেরটা অবধি তোমাদের আড্ডা আর ভাঙ্গেনা।" বিজলী এসে বসল।

অপরেশের তখন তন্দ্রা আসছিল; বল্লে "হুঁ"। বিজলী হাতের পানগুলো টীপায়ের ওপর রেখে একবার বিনিদ্রিত খোকার দিকে, একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বামীর দিকে চাইল; পাশের খোলা জানলা দিয়ে, শীতের বাতাস আর চাঁদের

আলো একসঙ্গে ঘরে ঢুকছিল। বিজলী বল্লে—"তুমি কি কেবলি ঘুমুবে ?"

—"না"

—"ওকি রকম হল! আচ্ছা দাঁড়াও না দিচ্ছি খোকাকে জাগিয়ে।"

তন্দ্রা ব্যস্ত হয়ে উঠল—অপরেশ বল্লে—

"লক্ষ্মীটি না দোহাই তোমার—ভারি ঘুম আসছে।

—"আমার যে আসছেনা, দেখনা কি সুন্দর চাঁদের আলো, কী তুমি!"

শীত করছিল বেশ—অপরেশ লেপটাকে কান অবধি টেনে নিল, চোখ মেলে চাইল,—

—"বুড়ো হয়ে গেছি, কেন আর জ্বালাও? লেপের মধ্যে ঢুকে শুয়ে শুয়ে যত পার চাঁদের আলো দেখ! এখুনি মাতা পুত্রে এমনি যুদ্ধ বাধাবে যে আপনিই ঘুম পালাতে পথ পাবেনা।"

—"আচ্ছা বেশ।"

বিজলী রাগ করে উঠে দাঁড়াল।

অপরেশ চোখ বুজেই বল্লে—"রাগ কোরনা লক্ষ্মিটী, ভারি ঘুম আসছে।"

বিকেলে বিজলীরা কোথায় বেড়াতে যাচ্ছিল; ছোট ননদ রাণী বেরিয়ে এল—"ওমা ওকি, না বৌদি তবে আমিও এমন সং সেজে যাব না। তুমিত বেশ!"

—"নে নে বুড়ো হচ্ছি না, এখন কি তোর সঙ্গে সমান হ'লে মানায়? এই বেশ হয়েছে।"

—"আমি বুঝি খুকি? না বৌদি ওকি ভাই, আমার লজ্জা করছে।"

বিজলী হাসলে—"নতুন বিয়ে হয়েছে না! এখন লজ্জা সজ্জা তুই মানাবে।"

অপরেশ সেই পথে যেতে যেতে একবার বিজলীর দিকে চাইল—"পুরোণতেও বিশেষ বে মানান হ'বেনা।"

—"আচ্ছা থাক হয়েছে; বোক না! তোমার চা ঘরে রেখে এসেছি বুঝলে? আর হ্যাঁ আর আমাকে কিছু টাকা দিতে হ'বে শুনছ?"

—"শুনছি, নাওগে।"

অনেক কাল পরে। রাত্রে অপরেশ আহারে বসেছে—বিজলী এসে বসল—"দীনুর কলেজ খুলতে এখনও ত দেরী আছে, ওর বন্ধুরা সব দল করে পশ্চিমের দিকে বেড়াতে যাচ্ছে দীনুও যেতে চাইছে, যাক না; যাবে?"

অপরেশ মুখ তুলে চাইল—"কে কে যাবে?"

—"তা কি জানি, সন্তোষ, শৈলেশ, মিহির—ওরাও যাবে শুনেছি, তোমার আপত্তি আছে?"

—"না আমার আর—আপত্তি কিসের, যাক।"

—"মাছের ডালনাটা আরটু এনেদি?

দুখানা লুচি আরো নাও, কিছু খাওয়া হ'লনা যে। ও বুলু মিষ্টির রেকাবীখানা নিয়ে আয়ত। বিন্দু ঠাকুঝি, সেদিন বুলুর সম্বন্ধের কথা বলছিল, নিতাই বাবুর ছেলের সঙ্গে, ছেলেটিত ভালই না? বেশ পড়শুনো করছে।"

প্রশ্নোত্তর বিজলী আপনা আপনিই করছিল। রাত্রের আহারাদি সেরে, বিজলী পান চিবুতে চিবুতে বারাণ্ডায় এসে বসল।

গ্রীষ্মকাল অন্ধকার প্রায় বারাণ্ডা—

ইজিচেয়ারের উপর অপরেশ চুপ করে শুয়েছিল, —"তোমার পান দেয়নি! বুলুকে বল্লাম যে।"

—"দিয়েছে ত।"

—"দেখ মণ্টুটা এমনি দুষ্ট হয়েছে রোজ ইস্কুল পালিয়ে আসে।" চিন্তিত বিরক্ত সুরে বিজলী বল্লে।

অনেক কালের হারান দিনের একটী স্মৃতি অপরেশের মনে পড়ে গেল, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল

—"ছেলে মানুষ এখনও।"

—"হুঁ"

ছেলেমানুষ! এখন থেকে শাসন না করলে শেষে, কোন কালে বুড়ো মানুষ হ'বেনা।"

অপরেশ সশব্দে হেসে উঠল—"হ'বে হ'বে ওর বাপও কলেজ পালাত কিনা! ওটা বুড়োমানুষির সূচনা।"

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)

"আচ্ছা দাদা, আসার আগে কি একখানা পত্র দিয়েও আসতে নেই?"

শশাঙ্ক টেবলের উপর ঝুঁকিয়া ফুলদানিতে রক্ষিত গোলাপ ফুলের তোড়াটী হাতে তুলিয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "শোন, হঠাৎ আসায় কি তোমায় কোন অসুবিধা ভোগ করতে হল?"

তাহার কণ্ঠস্বরে রাগের আভাস পাইয়া মনীষা হাসিল, বলিল, "কি যে বল দাদা, অসুবিধা বিশেষ তো নেই বরং কথা বলবার মত একটী লোক পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলুম মনে হচ্ছে।"

শশাঙ্ক কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "তোমামোদে তোমরা—মেয়েরা যতটা পারদর্শীতা দেখাও ততটা যদি আর কিছুতে দেখাতে, হয় তো একটা কাজের মত কাজ হতো।"

মনীষা তাহার চেয়ে বেশী গম্ভীর হইয়া বলিল, "হ্যা, ইতিহাসে হয় তো নামও থাকত। ঠাট্টা তামাসা ছেড়ে দাও, বল দেখি কত কাল এখানে এস নি?"

শশাঙ্ক হিসাব করিয়া বলিল, "তা বছর চার পাঁচ হবে।"

মনীষা বলিল, "বাবা কি কম দুঃখ করেন! বলেন শশাঙ্ক আমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক তুলে দিলে, আর সে আসবেও না, পত্রও দেবে না।"

"আর তুমি কিছু বল নি, কিছু ভাব নি মনীষা?—শশাঙ্ক কপট গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া হাসিমুখে মনীষার পানে তাকাইল?

মনীষা বলিল, "বলি বই কি দাদা, তোমার কথা আর মনে হবে না? আমি তো ভাই নই, আমি যে বোন, বোনের স্নেহ মায়া যে বড় বেশী রকমই হয়। মাঝে একবার একদিনের জন্যে তোমায় পুরীতে দেখেছিলুম, বললে শিগ্‌গীরই এখানে আসবে, তার পরে আর তো এলে না। আজ যদি দিদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে কি এমনই করে আমাদের সকলের মায়া কাটাতে পারতে? আজ দিদি নেই কিনা, সেই জন্যে আমাদের সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্কই নেই।"

শশাঙ্ক বলিল, "ঠিক তাই নয় মনীষা, অনেক দূরে ছিলুম, এবার আবার ফিরে তোমাদের কাছেই এসেছি, বোধ হয় এবার তোমাদের কাছেই থাকতে পারব। প্রতি সপ্তাহে একবার করে আসবই আর রবিবার দিনটা যে এখানেই কাটাব এ ঠিক কথা।"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় এসেছ?"

শশাঙ্ক বলিল, "এই খড়্গপুরে।"

মনীষা আনন্দিত হইয়া বলিল, "বাবা একথা শুনে ভারি আনন্দ পাবেন। বাস্তবিক তাঁর কথা ভাবলে আমার বড় দুঃখ হয়। যাঁর আজ উপযুক্ত ছেলে উপযুক্ত মেয়ে জামাই বর্ত্তমান থাকবার কথা—তাঁর রয়েছে বিধবা পুত্রবধূ—আর রয়েছে জামাই। নিজের যা তা তাঁর কেউই রইল না—রইল কেবল পর।"

অন্যমনস্কভাবে শশাঙ্ক বলিল, "তাই বটে।"

মনীষা বলিল, "নিজে একলাই এলে দাদা, বউদিকে আনলে কি ক্ষতি হতো? এবার যেদিন আসবে বউদিকে সঙ্গে করে এনো। বাবার তাতে একটু দুঃখ হবে না, বরং আনন্দেই হবে। আর সেখানে নতুন জায়গা, কোথায় এখন রাখবে, এখন দিনকত এখানে আমার কাছে থাক না কেন?"

শশাঙ্ক চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, "তাকেও তো তোমারই মত আদর্শ হিন্দু মেয়ে করে গড়ে তুলবে, অমনি করে পুতুল পূজো শেখাবে? এর পরে আমি যখন মরব তখন আমার ফটোখানা নিয়ে বসে থাকবে তো?"

মনীষা মুখ ভার করিয়া বলিল, "ভয় নেই গো ভয় নেই,

তোমার বউকে আমি কিছু শেখাব না, তাকে মেমসাহেব করেই না হয় রেখে দেব। তুমি এক হপ্তা তাকে রেখে দেখ—সে বদলায় কিনা, যদি বদলানোর ভাব দেখতে পাও - তাকে নিয়ে যেতে তোমার কতক্ষণ লাগবে ?"

শশাঙ্ক গম্ভীরমুখে বলিল, "হ্যাঁ, ওসব আমি মোটেই ভালবাসি নে, দিব্যি মেমসাহেব হয়ে থাকবে, কেবল ইহ-কালটাই দেখবে - পরকাল মোটেই দেখবে না—আমি তাই চাই। এখন যে যুগের হাওয়া বইছে, এ হচ্ছে স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ, এ যুগে মেয়েদের মনে দাসত্ব ভাব জাগিয়ে রাখা কোনমতেই উচিত নয়। আমরা শিক্ষিত সংঘ, আমরা ইচ্ছা করি নে—যদিই আমরা মরে যাই, আমাদের স্ত্রী আমাদের ফটো নিয়ে পুজো করে তার জীবন দারুণ ক্লেশে ক্ষয় করবে। আমরা বলি—পুরুষের যেমন পূর্ণ মাত্রায় অধিকার আছে নারীরও তেমনি আছে। স্ত্রী মারা গেলে কয়জন পুরুষ তার ফটো দিনরাত পুজো করে জীবন কাটিয়ে দেয় বল দেখি ? তারা যখন তা করে না তখন নারীই বা কেন করবে ? তাদের মনের বাসনা কামনা বৃত্তিগুলো সমূলে উৎপাটিত করে সংসারে লক্ষ অভাব অনাটন, দুঃখ কষ্টের মধ্যে জোর করে সংযম নিষ্ঠা বজায় রেখে নারীদের আমরা দেবী সেজে থাকতে বলি নে।"

মনীষা বিস্ময়ে শশাঙ্কের পানে তাকাইয়া রহিল, শশাঙ্কের কথা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

তাহার মুখের উপর অবিচল দৃষ্টি রাখিয়া, শশাঙ্ক বলিল, "আমি বেশ বুঝেছি তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি। কিন্তু আমিও ঐ কথাটা তোমায় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে চাই। আমাদের দেশে অকালমৃত্যুর সংখ্যা কত বেশী তা তুমি জানো ; অল্পবয়স্ক যে সব ছেলে মারা যায় তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিবাহিত। যাদের তারা পেছনে ফেলে রেখে যায়, সেই সব তরুণীদের কথা ভাব দেখি। এদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই মেটে না, উন্মেষেই ধ্বংস হয়ে যায়। জোর করে এই সব তরুণীদের দিয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করালেও সেটা কি প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয় ? এমনই কত তরুণী বিধবা নিঃশব্দে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যাচ্ছে শুধু দেশাচারের মর্য্যাদা রাখতে—নিজেদের ধর্ম্ম বা ব্রত বলে নয় এটা বোধ হয় তুমি আজ স্বীকার করবে মনীষা ?"

মনীষা অন্যমনস্কভাবে জানালা-পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল, এইবার মুখ ফিরাইল, বলিল, "কিন্তু সকলেই কি বাস্তবিক দেশাচারের মর্য্যাদা রাখতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যায় দাদা ? আমি যদি আজ জোর করে বলি তুমি ভুলের পথে চলেছ, সত্য পথ দেখতে পাওনি, সত্যকে চিনবার চেষ্টাও করনি, তুমি তর্ক করতে পার ?"

শশাঙ্ক বলিল, "যতক্ষণ না প্রমাণ পাব ততক্ষণ তর্ক করতেই হবে। তুমি বলবে এই সব মেয়েরা বাস্তবিক আন্তরিকতার সঙ্গেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, কিন্তু সে প্রমাণ আজকে দাও নইলে আমি বিশ্বাস করব কি করে, কেমন করে জানব যে তারা কেবল দেশাচার রাখতেই ব্রহ্মচর্য্যে পালন করছে কিনা।"

ক্ষুণ্ণস্বরে মনীষা বলিল, "আমি বলছি বাস্তবিক আন্তরিকতার সঙ্গে একটা কাজ সকলেই করতে পারে না। ধর্ম্ম বিশ্বাস বাবার আছে, তোমার নেই কেন, অবশ্য তোমারও তো থাকা উচিত ছিল কারণ ধর্ম্ম মানুষমাত্রেরই নিজস্ব জিনিস। তা যে রকম নেই, সেই রকম ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালনের প্রতিজ্ঞা ও সকলের মধ্যে নেই। কিন্তু তাও আবার বলি দাদা শিক্ষিত ছাত্রকে যে বিষয় শিক্ষা দেন সে বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকা চাই, তাঁর নিজেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ করা চাই। এতটুকু যে সব মেয়েরা বিধবা হয় তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, তাদের সামনে আদর্শ ফুটিয়ে তুলবার জন্যে এখনকার দিনে কয়জন লোক আমার শ্বশুরের মত নিজের ভোগ বিলাস ত্যাগ করে নিস্পৃহ থাকতে পারে বল দেখি ? বিধবাদের মনে এভাব কয় জন লোক জাগিয়ে তোলে ? তারা আর কেউ নয়, তারা দেবতার উৎসৃষ্ট ফুল, তারা মা, তারা সংসারের হিতের জন্যে সৃষ্ট, সংসারের হিতই করে যাবে। আমার মনে হয় অনেক বিধবা কেবল দেশাচারের বশেই তাদের ব্রত পালন করে না দাদা, বাস্তবিক ধর্ম্ম ব্রত জেনেই আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যায়। ওদের এই ব্রহ্মচর্য্যের কষ্টের পেছনে যে মহান ত্যাগ আছে তার মধ্যে কতখানি শুভ কামনা নিহিত আছে তা তুমি বুঝতে পারবে না। তবে একদিন হয় তো বুঝতে চেষ্টাও করবে, সত্য যেদিন তোমার সামনে প্রকাশ হবে সে দিন সবগুলোর আসল মূর্ত্তি দেখতে পাবে।"

শশাঙ্ক খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "যাক্, এতকাল পরে প্রথম দর্শনেই মনান্তর ঘটে গেল। কিছু মনে করো না নণি, ও সব কথা যেতে দাও এখন অন্য কথা বলা যাক্ এসো।

মনীষা প্রসন্ন মুখে বলিল, "মনান্তর যাই হোক না, তুমি যদি কথাটা বুঝতেও পারতে তোমার মনের ধারণা যদি একটুও বদলে যেত, সত্যিই আমি সুখী হতুম। থাক, ওসব কথা, তা হলে বউদিকে তুমি এখানে আনতে চাও না, আমার কাছে রাখতে চাও না কেমন?"

শশাঙ্ক হাসিমুখে বলিল, "বিয়েই করিনি বউ পাব কোথায়? কেন তোমাদের স্বামী মারা গেলে তোমরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পার আমাদের বউ মরে গেলে আমরা বুঝি ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারিনে? তবে এটা ঠিক কথা তোমাদের মত তার ফটো সামনে রেখে বসে থাকিনে, পূজোও করিনে, ওগুলো তোমাদের মেয়েদের একচেটে পুরুষের নয়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল। মনীষা বিস্মিত হইয়া বলিল, "বিয়ে করনি? তোমাদের পুরুষদের মধ্যে যখন বিয়ে করার নিয়ম আছে।"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল, "ওই দেখ, আবার সেই ভুল করছ। শোন মনীষা, মনে করো না তোমাদের শাস্ত্রগুলো আমি কিছু পড়ি নি—সব উদরস্থ করেছি, বাকি কিছু রাখিনি। সেকেলে যোগী ঋষিরা যে আইন তৈরী করে গেছেন, সেগুলো কেবল যে মেয়েদের জন্যে নয় পুরুষদের জন্যও বটে একথা তো অস্বীকার করতে পারবে না। তখন মেয়েরা বিধবা হলে যার ইচ্ছে হতো বিয়ে করত, অর্থাৎ আজকালকার মত বিধবা বিবাহ সেকালেও প্রচলিত ছিল, পুরুষদেরও তেমনি ছিল, কেউ কেউ আর বিয়ে না করেও জীবন কাটিয়ে গেছে। তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যাচ্ছ, আমার বেলায় কি সেটা দোষের হবে?"

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "দোষের নয় বরং গৌরবের, কিন্তু যে তুমি একটু আগে এতবড় বক্তৃতাটা দিয়ে ফেললে—"

শশাঙ্ক মাথা দুলাইয়া বলিল, "ঠিক কথাই বলেছি, ওর মধ্যে বেঠিক কিছু পাবে না। আমি যা করি বা করছি তা খুসির খেয়ালে মাত্র, হয় তো কোনদিন আবার বিয়েও করে বসতে পারি—আমার বেলায় সেটা কিছু দোষের নয়, কিন্তু তুমি যদি বিয়ে কর সেটাই বা কেন দোষের হবে? তুমি কি বলতে চাও না তোমার সমাজ তোমার চারিদিকে সংস্কারের বেড়া দিয়ে বাইরে বসে চোখ রাঙিয়ে তোমার পানে চেয়ে নেই, বেড়া ভাঙ্গবার চেষ্টা করলেই সে তোমার গায়ে লাফিয়ে এসে পড়বে না? কিন্তু আমি পুরুষ, আমার জন্যে যদিও আইন আছে তবু সে আইন ভাঙ্গলে কেউ আমায় একটী কথাও বলবে না; দেখ দেখি তোমার আমার মধ্যে কতখানি পার্থক্য আধুনিক সমাজ জাগিয়ে রেখেছে?"

মনীষা কি বলিতে যাইতেছিল, শশাঙ্ক বাধা দিয়া বলিল, "না, আর কথা নয়। বুঝেছি তুমি এখনও জল পর্য্যন্ত খাও নি, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। বেলা আড়াইটে বেজে গেছে, যাও খেয়ে এসো।"

মনীষা হাসিল, "ও আমার সহ্য হয়ে গেছে,—জল খাওয়ার জন্যে বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না।"

শশাঙ্ক মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, তাতো সহ্য হচ্ছে, যাদের মাসে দুটো করে একাদশী করতে হয় তাদের সহ্য না করা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু যাও মনীষা, তোমার কোন কথা আর আমি শুনতে চাই নে, আমি ততক্ষণ খানিক বিশ্রাম করি, তুমি খেয়ে এসো।"

সে একখানা সোফার উপর শুইয়া পড়িল।

মনীষা বলিল, "তুমি খেয়েছ?"

শশাঙ্ক বলিল, "তোমার মত পূজো আহ্নিক নিয়ে তো থাকি নে, দশটা না বাজতে অগ্নিদেব জলে ওঠেন, কিছু উদরস্থ করতেই হয়। তোমার গীতাখানা বরং খানিকক্ষণের জন্যে আমায় দিয়ে যাও, একটু নেড়ে চেড়ে দেখি যদি কিছু উদরস্থ করতে পারি,—তাতে বোধ হয় বিশেষ দোষ হবে না।"

মনীষা গীতা আনিয়া তাহাকে দিয়া গেল।

৮

বৈকালে প্রবল বৃষ্টি হইয়া আকাশের ঘনঘটা প্রায় দূর হইয়া গিয়াছিল, এখনও দুই এক খণ্ড মেঘ বাতাসের বেগে আকাশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদখানি পশ্চিমের আকাশে ভাসিয়া উঠিয়া পৃথিবীর

গায়ে আলো ছড়াইয়া দিয়াছে। চাঁদের উপর দিয়া মেঘের টুকরা মাঝে মাঝে ভাসিয়া চলিতেছিল, মুহূর্তের জন্য ধরার গায়ে তাহার ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল; মেঘ সরিয়া যাইতেই চাঁদের হাসি আবার ভাসিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবী ও চাঁদে আজ যেন লুকোচুরী খেলা চলিতেছে, দর্শক পৃথিবীর অধিবাসী এবং চাঁদের রাজ্যে যদি কেহ থাকে তবে এই লুকোচুরীর আনন্দ উপভোগ করিতেছে তাহারাই।

রতিনাথ ছাদে শুইয়া পড়িয়াছিলেন, মনীষা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। অনতিদূরে শশাঙ্ক বসিয়াছিল, ইউরোপীয়ান পোষাক ছাড়িয়া এখন সে বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়াছে।

মনীষা বলিতেছিল, "যাই বল দাদা, যার যা জাতীয় পোষাক তাকে তাতেই মানায়, বাঙ্গালী কেউ যদি ইউরোপীয়ান পোষাক পরে আমার তাই দেখে কথামালার সেই ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের কথা মনে পড়ে।" বলিতে বলিতে সে হাসিয়া উঠিল।

রোষের ভাব দেখাইয়া শশাঙ্ক বলিল, "আমায় তা হলে তুমি তাই মনে কর? তুমি তো তা ভাববেই। তুমি যে সেকেলের ঠাকুরমা, চিরন্তন নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে মনে কর—সব গেল, ধর্ম্ম আর রইল না।"

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেওয়ায় বুঝি পৌরুষত্ব আছে? কি জান দাদা মানুষের বাইরের আবরণটাকে আমরা শুধু খোলস বলে উড়িয়ে দিতে পারি নে, ভেতরের ভাবটাই বাইরে প্রকাশ হয়ে যায় বলে মনে করি। তুমি সন্ন্যাসীর পোষাক পর, ত্যাগের পথে অন্ততঃ ভাণ করেও চল দেখি—তোমার মনের ভাবও আস্তে আস্তে তোমার অজ্ঞাতসারে বদলে যাবেই।"

ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে শশাঙ্ক বলিল, "ও, সেকেলের মুনি ঋষিরা বাইরের ত্যাগ দ্বারা সংযম শিক্ষার জন্যেই তা হলে গাছের বাকল পরতেন, ফল মূল খেয়ে জীবন ধারণ করতেন?

মনীষা শান্ত স্বরে বলিল, 'সত্যই তাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে, তিন রকম ভাব আছে, সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক, খাওয়া-পরা জীবন ধারণ সবাই এই ভাবে চলতো। যাঁরা সাত্ত্বিক ভাবে দিন কাটাতেন তাঁরা গাছের বাকল পরতেন, ফল মূল খেতেন, তা বলে তাঁদের মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর হয় নি, বরং তাঁরা যে সব জ্ঞান লাভ করেছিলেন তারই কতকটা আমরা আজ জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তাঁরা অনেককাল বাঁচতেন, অনেক কিছু তাঁরাই শিখতেন, যা কিছু মানবের হিতকর কাজ তা তাঁরাই করতেন। আজ তোমরা বল যারা মাছ মাংস খায় না তাদের জীবনীশক্তির হ্রাস হয়ে যায়, সেকালের মুনি ঋষিরা রীতিমত গাঁজাখোর ছিল, গাঁজায় দম দিয়ে তাঁরা যাতা লিখে গেছেন—"

শশাঙ্ক বাধা দিল,—"থাম," রতিনাথের পানে তাকাইয়া বলিল," আপনার মত কি বলুন দেখি?"

রতিনাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ও ওসব বিষয় নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাই নি শশাঙ্ক, যা শুনি তা শুনেই যাই মাত্র, তা নিয়ে কোনদিন ভাবি নি।"

শশাঙ্ক বলিল, "হ্যাঁ, তুমি যা বলছ তা ঠিক তবু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ বলেই আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

কৃষ্ণ আসিয়া খবর দিল মিঃ চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন, শীঘ্র একবার দেখা করিতে চাহেন।

রতিনাথ আড়ামোড়া ছাড়িয়া উঠিলেন, "নাঃ, আমার অদৃষ্টে এতটুকু বিশ্রাম নেই। তোমরা কথাবার্ত্তা বল, আমি চট্ করে আসছি।"

তিনি চলিয়া গেলেন; শশাঙ্ক নির্ব্বাকে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল! পশ্চিম আকাশের শেষে টুক্‌রা টুক্‌রা মেঘগুলা জমিয়া বিরাটরূপে পরিণত হইতেছিল, চুম্বকের মত ছোট ছোট মেঘগুলাকে টানিয়া লইয়া আরও বড় হইয়া উঠিতেছিল।

মনীষা জোৎস্নাধারায় সিক্ত প্রকৃতির পানে তাকাইয়াছিল। চাঁদের স্ফুট আলো যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে তাহাই হাসাইয়া তুলিয়াছে।

"দাদা—"

মনীষার আহ্বানে চমকাইয়া শশাঙ্ক মুখ ফিরাইল; চাঁদের আলো স্ফুটতর হইয়া মনীষার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার উপর পড়িয়াছিল।

মনীষা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার পরে রাগ করেছ দাদা?"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া শশাঙ্ক বলিল, "রাগ করব কেন মণি, তুমিত রাগ করবার মত কিছু করনি।"

মনীষা বলিল, "করেছি বই কি, তোমায় অনেক কথা বলেছি। আমি বুঝতে পেরেছি আমার কোন ব্যবহারে বা কথায় তোমার মনের কোনও নিভৃতস্তরে আঘাত করেছে, নইলে যখন এলে তখন তোমার মধ্যে যে সহজ সরল উচ্ছ্বাস ছিল, সে উচ্ছ্বাস চলে গেল কেন? তুমি বলবে, না, আমি তো কোন আঘাত পাইনি, কিন্তু সে কথা বললে কি আমি শুনি দাদা? কিন্তু আমি যে তোমার বোন দাদা, যদিই কিছু অন্যায় করি বোন বলে ক্ষমা করবে না?"

তাহার চোখ হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল, চাঁদের আলোয় তাহা চকচক করিয়া উঠিল।

"একি মনীষা, কাঁদছ তুমি—? ছি ছি, একটা সামান্য ব্যাপারে অমনি চোখের জল এল?"

মনীষা চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "সামান্য ব্যাপার নয় দাদা, সামান্য হলে তোমার মনের সে সরল উচ্ছ্বাস দূর হয়ে যেত না। কাল সকালেই তুমি চলে যাবে তাই আজকের মধ্যেই আমি এর মিটমাট করে নিতে চাই, নইলে তুমি যে আর আসবে না তা আমি বেশ জানি।"

জোর করিয়া হাসিয়া শশাঙ্ক বলিল, "ক্ষেপেছ মণি, আমি আসব না এমন কথাই হতে পারে না। এবার এসে আগের আলাপ ঝালিয়ে গেলুম, দেখবে প্রতি সপ্তাহ এসে বিরক্ত করব।"

মনীষা খানিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আবার তুমি কবে আসবে?"

শশাঙ্ক বলিল, "এইতো জুন মাস যাচ্ছে, জুলাইয়ের প্রথম হপ্তা হতে নিয়মিত আসা সুরু করব যাতে তোমাদের বিরক্ত হয়ে উঠতে হবে। এরপরে নিজেই কোন দিন বলবে, বাপ রে আপদটা গেলেই বাঁচি।"

বলিয়া সে অপর্য্যাপ্ত হাসিতে লাগিল। মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "ভগবানের ইচ্ছায় এ রকম মনের ভাব আমার কোনদিনই হয়নি মনে হয়, হবেও না, তুমি যদি বারবাস এখানে থাক তাতেও সত্যি আমি ভারি খুসী হব দাদা।"

"কিন্তু পূজোর সময়ে—"

মনীষা এবার স্পষ্ট হাসিয়া ফেলিল, বলিল "পূজোতে লুকানোর তো কিছুই নেই দাদা, তবে পূজোর সময়ে তুমি থাকলে মুস্কিলই বা হবে কিসে?"

শশাঙ্ক বলিল "যাক্ ও সব বাজে কথা। তোমার গীতাখানা অর্দ্ধেকটা পড়ে ফেলেছি, বাকি অর্দ্ধেকটা এইবার গিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দেই। আজকের মধ্যেই ওখানা শেষ করা চাই তো—"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম লাগছে, নিশ্চয়ই রাবিসের মত—?"

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বলিল, "কি জানি, এখনও ঠিক বলতে পারিনে, নাস্তিকের মনে প্রত্যয় জন্মানো বড় শক্ত কিনা। হয়তো পড়তুম না কিন্তু তোমার কাছে ও বইখানা কি গুণে এতখানি শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন করলে দেখে ওর পরে দারুণ হিংসা হয়েছিল—সেইজন্যেই পড়তে নিয়েছি?"

মনীষা গম্ভীর মুখে বলিল, "কিন্তু চোখের পড়া আর মনের পড়ায় অনেক পার্থক্য আছে—তা মানো?"

শশাঙ্ক বলিল, "মানি বই কি? আমি রীতিমত মন দিয়ে পড়ছি, চোখের পড়া নয়।"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "যতটুকু পড়েছ তার মধ্যে কতটুকু কি পেলে আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

শশাঙ্ক বলিল, "আমি আগেই তো বলেছি এখনও আমি সম্যক ধারণা করতে পারি নি। আমি সবখানি পড়ব, তোমার মতের সঙ্গে নিজের মত মিলানোর চেষ্টা করব, তাতে যা ফল হয় তোমায় জানাব। আমার নিজের যে ব্যক্তিত্ব আছে তাকে তো মানতেই হবে—উড়িয়ে দিলে তো চলবে না। আমার নিজের জ্ঞান আমায় যা সত্য বলে দেবে আমি তাই মানব, আর সেই সত্যই অসঙ্কোচে ব্যক্ত করব।"

পশ্চিমের কোল বহিয়া সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় ছুটিয়া আসিতেছিল, সমস্ত আকাশ তখন নিকষ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, চাঁদ তারা অন্ধকার আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মেঘখানা এত শীঘ্র সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, অন্যমনস্ক থাকার জন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দে চমকাইয়া মনীষা আকাশের পানে চাহিল—"ইস, বড় ঝড় এসে পড়ল যে দাদা, নীচে চল।"

শশাঙ্ক বলিল, "এই তো বেশ আছি মনীষা, ঝড় আমার ড় ভাল লাগে। তুমি নীচে যাও, আমি এখন খানিক ময় এই খোলা ছাদে থাকি।"

মনীষা বলিল, "এখনই বৃষ্টি আসবে যে।"

চোখ ঝলসাইয়া আকাশের এককোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল, সোঁ সোঁ শব্দে একটা ভীষণ দমকা আসিয়া নিমেষে সমস্ত পৃথিবীর বুকে প্রলয়-কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল।

মনীষা শিহরিয়া উঠিল—"দাদা—"

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিল, "ওতে আমি ভয় পাই নে। জানতো বিলেতে থাকতে ফ্রান্সের যুদ্ধে গিয়েছিলুম, অনেক গোলাগুলি এড়িয়েও বেঁচে আছি, বাজ বা বিদ্যুৎ ঝলসানি আমার একটী চুলও কাঁপাবে না। তুমি ঘরে যাও মনীষা, এখানে থেক না।"

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার জীবনের ভয় নেই, জীবনের ভয় হবে কি আমার মত বিধবার? তবে বস, দুজনেই এখানে থেকে মেঘের খেলা ঝড়ের নাচ দেখি।"

চোখ ধাধিয়া আর একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠিল এবং সম্মুখে একটু দূরে নারিকেল গাছের উপর বজ্র পড়িল। গাছের মাথার উপর শুভ্র বিদ্যুতের রেখা দেখা গেল, তাহারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক পাতা জ্বলিয়া উঠিল।

শশাঙ্ক শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল, "ঘরে চল মনীষা।"

মনীষা বলিল, "আমার ভয় হয় নি দাদা, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

শশাঙ্ক বলিল, "আর সাহসে দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে, এখন চল।"

অন্ধকারের বুকে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল, সেই আলোকে তাহারা অগ্রসর হইল।

(৯)

মিস্ ইরাদাস নিয়মিতভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছিল।

সে ঠিক সাড়ে দশটার সময় আফিসে উপস্থিত হইত, কোন দিন তাহার আসার সময়ের এতটুকু এ-দিক ও-দিক হইত না। কাজ শেষ হইতে কোন দিন চারটা কোনও দিন পাঁচটাও বাজিয়া যাইত, পাঁচটার পরে যতই কেন না কাজ থাক সে আর একমিনিট আফিসে অপেক্ষা করিত না।

যাইবার সময়ও সে নিরঞ্জনকে বলিয়া যাইত, নিরঞ্জন সন্ধ্যার পরে সকলকে বিদায় দিয়া আফিস বন্ধ করিয়া বাসায় চলিয়া যাইত।

নিরঞ্জনের সহিত ইরার বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছিল, উভয়েই ছিল গরীব, যদিও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তথাপি গরীব ছিল বলিয়াই তাহাদের আলাপের মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ জমিতে পারে নাই। ইরার সরল মার্জ্জিত আচরণে কথাবার্ত্তায় নিরঞ্জন বড় খুসি হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাকে নিজের ভগিনীর মত ভাবিয়াছিল। নিজের কাজ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই সময়াস্তে ইরাকে সে গম্ভীরভাবে সংসার সম্বন্ধে, ধনী লোকেদের অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে সতর্ক হইবার জন্য অনেক উপদেশ দিত।

ইরাও তাহাকে নিজের জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত দেখিত, অসঙ্কোচে তাহার কাছে বসিয়া তাহার উপদেশ শুনিত; যাহা বুঝিতে পারিত না তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত।

ইরার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ সুশীলের হয় নাই। বিশেষ কার্য্যে তাহাকে রেঙ্গুণে যাইতে হইয়াছিল, মাসখানেক পরে সে কলিকাতায় পদার্পণ করিল।

পত্র পাইয়া সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য নিরঞ্জন তাহার বাড়ীতে গিয়াছিল।

স্নানাহার শেষ করিয়া সুশীল তখন বিশ্রাম করিতেছিল, নিরঞ্জনকে দেখিয়া সাগ্রহে তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে বসাইল।

"তারপর খবর কি, সব ভাল তো?"

নিরঞ্জন মৃদু হাসিয়া বলিল, "মালিক যদি অনুপস্থিত থাকে কি করে সব ভাল হবে বল দেখি?"

সুশীল হাসিল, বলিল, "প্রকৃত মালিক তবু এখনও কিছুই দেখেন নি, আমি তো তাঁর পরিবর্ত্তে মালিক হয়ে রয়েছি। যাক গিয়ে, আফিস ভাল রকম চলছে তো, কাজকর্ম্ম বেশ হচ্ছে?"

নিরঞ্জন বলিল, "বেশ চলছে, সে জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। কাল আফিসে গিয়ে সব নিজের চোখে দেখতে পাবে, কাজেই আজ বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি তোমায় প্রতি হপ্তাতেই তো পত্র লিখে জানাতুম কখন কি রকম বাজার দর উঠছে নামছে।"

সুশীল ইজিচেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা হাই তুলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কর্ত্তব্য পালনে তুমি কিছুমাত্র অমনোযোগী হও নি, প্রাণপণে যে মনিবের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করেছ, এর জন্যে ভারি খুসি হয়েছি—বুঝলে?"

তাহার কথার ভিতরে যে খোঁচাটুকু ছিল তাহা অতি সহজেই নিরঞ্জন ধরিতে পারিল; কিন্তু সে ধৈর্য্য না হারাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি, রাগ করেছ। কিন্তু শোন সুশীল, যদিও আমরা বন্ধু কিন্তু সে বন্ধুত্ব আফিস সীমার বাইরে থাকাই শ্রেয়, বলে মনে করি, অফিসের সীমানায় তুমি আমার মনিব, কাজেই আফিস সংক্রান্ত কাজে আমি তোমায় মনিব জেনেই পত্রাদি লিখে থাকি। আমার মতে এ কাজ কখনই খারাপ হয় নি।"

সুশীল খানিকক্ষণ মুখ ভার করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "যাক ও সব কথা, মিস দাস রোজ আসেন, কাজকর্ম্ম কেমন করেন?"

নিরঞ্জন বলিল, "তাঁর কাজ তিনি রোজই শেষ না করে ওঠেন না, কাজের তাড়া তাঁর এক একদিন এত বেশী হয় যে বাধ্য হয়ে আমাকেই তাঁকে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে দিতে হয়। মেয়েটী বেশ, হাসি খুসি সর্ব্বদাই মুখে আছে, কয়দিনের মধ্যে অফিসের সকলকে বাধ্য করে ফেলেছে।"

সুশীলের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই সে স্বাভাবিক সুরে বলিল, "ভালই হয়েছে। আমি প্রথমটা তাঁকে দেখে ভেবেছিলুম অন্য রকম।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "কি কষ্টেই যে এই একটা মাস কেটেছে সেখানে তা আর বলতে পারি নে। ওদের দেশের ভাষাও বুঝি নে—আর এমন নোংরা সব বাড়ী ঘর যে বলা যায় না। কয়েকজন বাঙ্গালীর সহায়তা পেয়েছিলুম, তার পর সাহেবদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, ওদিকে মিঃ রায় বড় সাহেবকে পত্র দিয়েছিলেন, কাজেই যে কাজে গিয়েছিলুম সে কাজটা শেষ হল।"

নিরঞ্জন বলিল, "মিঃ রায় এখানেও পত্র দিয়েছেন, শুনলুম তিনি এই সেপ্টেম্বর মাসেই দেশে ফিরে আসছেন।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া সুশীল বলিল, "কই তাতে ত তিনি কিছুই আমায় লেখেন নি, বরং লিখেছেন—কবে আসতে পারবেন তার কিছু ঠিক নেই।"

নিরঞ্জন বলিল, "হয় তো তোমায় যখন পত্র লিখেছিলেন তখন আসার স্থিরতা ছিল না, কিন্তু রতিনাথ বাবুকে যে পত্র দিয়েছেন—ডাকে সেখানা এসেছে, তাতে লিখেছেন তিনি শিগগীরই কন্যাসহ চলে আসছেন।"

মিঃ রায়ের পরিচয় নিরঞ্জন পাইয়াছিল। মিঃ দেবনারায়ণ রায় সুশীলের পিতার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, সেই জন্যই অতুলবাবু মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্রের ভার মিঃ রায়ের হাতে দিয়া যান। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল মিঃ রায়ের কন্যা ইন্দিরাকে পুত্রবধূ করিবেন, মিঃ রায়েরও বড় ইচ্ছা ছিল, সুশীলের সহিত ইন্দিরার বিবাহ দিয়া তাহাকে একেবারে আপনার করিয়া লইবেন। সুশীল দরিদ্র পিতার পুত্র ছিল, মিঃ রায় তাহার অর্থ সম্পদের দিকে কোনদিন চাহেন নাই; তিনি তাহার সুন্দর শক্তিশালী আকৃতি দেখিয়াছিলেন, তাহার শিক্ষা ও গুণ চাহিয়াছিলেন। অর্থের অভাব তাঁহার ছিল না, কমলা তাঁহার ভাণ্ডারে স্বয়ং বাঁধা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিশাল সম্পত্তি সকলই তাঁহার কন্যা জামাতা পাইবে, সকলেই তাহা জানিত।

সুশীল ইন্দিরা বাল্য হইতে জানিত তাহারা একদিন বিবাহিত হইবে। বাল্য হইতে একত্রে প্রতিপালিত হওয়ায় উভয়েই উভয়কে বড় ভালবাসিত।

মিঃ রায় সুশীলকে আই-এ পর্য্যন্ত পড়াইয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক ছিল, নিজের সামর্থ্যে কিছু হয় নাই, এই ক্ষোভটা তাঁহার মনে জাগিয়া ছিল, সেই জন্যই তিনি সুশীলকে ব্যবসা শিখিতে দিয়াছিলেন। চাকরী করা তিনি ঘৃণা করিতেন, স্পষ্টই বলিতেন চাকরী করিয়াই এ

দেশবাসী উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, দেশের ধ্বংস হইতেছে।

মিঃ রায় আসিতেছেন শুনিয়া সুশীলের যতটা উৎসাহিত হওয়ার আশা নিরঞ্জন করিয়াছিল, সুশীল ততটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে পারিল না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "সেপ্টেম্বর মাস, তার এখনও অনেক দেরি আছে। আমি ভাবছি তিনি আমায় একখানি পত্র দিয়ে জানালেন না, অথচ রতিনাথ বাবুকে পত্র দিলেন। জানি নে তাঁর মনের ভাব কি—"

নিরঞ্জন বলিল, "হয় তো তোমার পত্র কালই এসে উপস্থিত হবে।"

আর খানিক বসিয়া কথাবার্তা বলিয়া নিরঞ্জন বিদায় লইল।

পরদিন এগারটার সময় সুশীল অফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

অফিসের কাজ তখন নিয়মিত চলিতেছে। চারিদিক ঘুরিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সুশীলের মুখ আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল, সে নিরঞ্জনের পিঠ চাপড়াইয়া হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠে বলিল, "আমি ঠিক বলছি নিরু, তোমায় যদি না পেতুম আমার কাজ এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারত না। কি সৌভাগ্য যে সেদিনে অভাবনীয় রূপে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল, নইলে আমার কল্পনা কল্পনাতেই মিশিয়ে যেত, সত্য হতে পারত না।"

নিরঞ্জন মৃদু হাসিল, বলিল, "সেটা আমার যোগ্যতা কিনা তাই আগে দেখ তারপর প্রশংসা কোর। এটা সত্যি কথা—কাজ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেয়ে আমাদের মত গরীব লোকদের উৎসাহ চিরকালের মতই নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের মাথায় যে বুদ্ধি থাকে আমরা তার চালনা না করতে পারায় তা ধ্বংস হয়। মনে করে দেখ—যদি দিনরাত অন্নের চেষ্টায় হাহাকার করে ঘুরে বেড়াতে হয়, আমাদের শিক্ষা কোন কাজে তখন লাগে? গরীব ছেলেরা হয়তো মহৎ হতে পারত—তারা অনেক কাজই করতে পারত যদি তারা উপযুক্ত ক্ষেত্র পেত। তাদের প্রতিভা দাসত্বের যাঁতায় পিষে কাদা হয়ে যাচ্ছে, তারা অবশেষে জানাচ্ছে—শিক্ষার দরকার কেবল মাত্র চাকরীর জন্যে—কোনরকমে ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করার জন্যে—আর কিছুর জন্যে নয়।"

সুশীল একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "ঠিক, তোমার কথাই সত্যি মেনে নিচ্ছি। বনের মধ্যে কত সুন্দর ফুল ফুটে বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে ঝরে পড়ে যায়, সাগরের অতল গর্ভে কত মণি উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করে, কিন্তু কেউ তা দেখতে পায় না, আমাদের দেশের ছেলেদের প্রতিভা চাকরীর যাঁতায় কাদা হয়ে যায়, যে অসাধারণ কোন কাজ করবার কল্পনা কোনদিন করেছিল, তার কল্পনা অবশেষে স্বপ্ন হয়েই মিলিয়ে যায়।"

অন্যমনস্ক ভাবে সে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাগজপত্র দেখিতে বসিল; নিরঞ্জন নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘড়িতে অবিশ্রান্ত টিক টিক শব্দ হইতেছিল, উপরে ফ্যান চলিতেছিল, সুশীল নিবিষ্ট মনে নিজের কাজ করিতে লাগিল।

দরজার পর্দা একটু সরাইয়া ইরা একবার উঁকি দিল, মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি একবার ঘরে আসতে পারি?"

সুশীল মুখ তুলিল, হাতের কলমটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আসুন।"

গৃহে প্রবেশ করিয়া কতকগুলা কাগজপত্র সুশীলের সামনে টেবলের উপর নামাইয়া রাখিয়া ইরা কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আজ অনেক টাইপ করবার কথা ছিল, কিন্তু আমি সব শেষ করতে পারলুম না, মাত্র অর্দ্ধেক করতে পেরেছি। আজ আমায় এখনই বাড়ী যেতে হবে, কাল আমি নটার সময় এসে বাকিগুলো টাইপ করে দিলেই চলবে বোধ হয়।"

সুশীল আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "এই দুপুরে রোদে আপনি বাড়ী যেতে চান? ঘরের মধ্যে রয়েছেন বুঝতে পারছেন না বাইরে কি রকম গরম, কিন্তু একবার—"

ইরা একটু হাসিল, বলিল, "কিন্তু আমার না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই মিঃ মুখার্জ্জি। রোদকে অতটা ভয় করতে গেলে কি আমাদের চলে, পরের কাজ করতে গেলে রোদ বৃষ্টি সবই সইতে হয়। যারা পরিশ্রম করে

জীবিকার্জ্জন করে তাদের রোদ বৃষ্টিতে সুখ দুঃখ বোধ করা চলে না মিঃ মুখার্জ্জি—"

তাহার কণ্ঠস্বর বড় করুণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সুশীল ক্ষণকাল নীরবে সামনের কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, তাহার পর বলিল, "কিন্তু এই দুপুর বেলায় কেন চলে যাচ্ছেন সে কথা শুনতে পাব কি?"

ইরা বলিল, "আমার মায়ের বড় অসুখ সেই জন্যেই যেতে হবে। আজ কয়দিনই তাঁর অসুখ করেছে কিন্তু আজ বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। আগে ভেবেছিলুম আসব না কিন্তু আপনি আসছেন জেনে আসতে হয়েছে। বাড়ীতে আর কেউ নেই, আমি যাব তবে মা ঔষধ পথ্য পাবেন।"

তাহার চোখ দুইটী ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

সুশীল বলিল, "আপনার না আসাই উচিত ছিল মিস দাস, একখানা পত্র লিখে পাঠাইলেই হতো। আমি আপনাকে এখনই ছুটি দিচ্ছি, যে কয়দিন আপনার মায়ের অসুখ থাকবে সে কয়দিন আপনার আসার দরকার নেই। আমি টাইপ জানি, দরকারী কাজগুলো চালিয়ে নিতে পারব।"

অভিবাদন করিয়া ইরা প্রস্থানোদ্যত হইল, সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাসা কোথায়? এখান হতে কাছে কি?"

ইরা বলিল, "আমার বাসা কলুটোলায়।"

সুশীল বলিল, "বাসে বা ট্রামে যাবেন তো, এক কাজ করুন, আমার মোটরে যান, আমি শোফারকে বলে দিচ্ছি।"

তাহাকে উঠিতে দেখিয়া মিস দাস ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আপনি বসুন, আমি বাসে সোজা চলে যাব এখন।"

সুশীল বলিল, "আমাকেও এখনি একবার খিদিরপুর ডকে যেতে হবে, বিশেষ দরকার। আপনাকে কলুটোলায় নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।"

নিরঞ্জনকে ডাকিয়া দুই একটা কথা তাহাকে বলিয়া দিয়া মিস দাসকে সঙ্গে লইয়া সে মোটরে উঠিল। কলুটোলায় মিস দাসের বাসার সামনে তাহাকে নামাইয়া দিয়া সে বলিল, "নমস্কার, আমি চললুম।"

প্রতি নমস্কার করিয়া ইরা বলিল, "আপনাকে নামতে বলবার যোগ্যতা আমার নেই নইলে---"

বাধা দিয়া একটু হাসিয়া সুশীল বলিল, "বন্ধু হিসাবে যোগ্যতা যথেষ্ট আছে, যদিও মনিব হিসাবে নেই। বাসা চিনে গেলুম, আবার একদিন আসতে বিশেষ কষ্ট করতে হবে না। চাইকি কালও আসতে পারি, সে জন্যে অনুরোধ করতে হবে না।"

শোফার মোটরে ষ্টার্ট দিল।

(১০)

ইরার পিতা এককালে হিন্দু ছিলেন। এক সময়ে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ তাঁহার কেবলমাত্র ঝোঁকের বশে কিনা তাহা আজ বলিতে পারা যায় না।

ইরার আজও স্বপ্নের মত বাল্যের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কোন একটা লতায় পাতায় ঘেরা শান্ত পল্লীতে সে মায়ের সহিত আত্মীয় স্বজনের নিকটে ছিল। তাহার পিতা তখন কলিকাতায় ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ইরার মনে পড়ে তখন তাহাদের দিনগুলো কি আনন্দে দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাটিয়া যাইত। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে পার্শ্বের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত, অন্য দশ জনের মত সে ও তাহার মাও সেখানে যাইত, সমাজের দ্বার তখন তাহাদের সামনে চিররুদ্ধ হইয়া যায় নাই, কারণ ইরার পিতা খ্রীষ্টান হইলেও তাহারা মাতাপুত্রী হিন্দু ছিল।

কিছুদিন বাদে ইরার পিতা গ্রামে আসিয়া যখন স্ত্রী কন্যাকে নিজের কাছে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন ইরার মাতা সম্মত হন নাই। নিজের আজন্মার্জ্জিত সংস্কার ধর্ম্মজ্ঞান ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান স্বামীর সঙ্গ তিনি চান নাই। ইরার পিতা জোর করিয়া কন্যাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন, কন্যার ভবিষ্যৎ তিনি এখানে রাখিয়া নষ্ট করিতে চান নাই।

স্বামীকে ছাড়িয়াও স্ত্রী নিজের ধর্ম্মমত লইয়া তফাতে ছিলেন, কন্যাকে ছাড়িয়া মা থাকিতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সমাজ ছাড়িয়া স্বামীর নিকটে কলিকাতায় আসিতে হইল।

তিনি কলিকাতায় রহিলেন, ধর্ম্মান্তরও গ্রহণ করিলেন, এই পরিবর্ত্তন তাঁহার কেবল মনে নয় আকৃতির উপরও দাগ রাখিয়া গেল। তাঁহার মনের আনন্দ মুখের হাসি সব ঘুচিয়া গেল, নিজের সব বিসর্জ্জন দিয়া তথাপিও তিনি বাঁচিয়া রহিলেন।

স্ত্রীর পরিবর্ত্তন স্বামী লক্ষ্যও করেন নাই, মায়ের পরিবর্ত্তন সন্তান লক্ষ্য করিল, কিন্তু প্রতিবিধানের কোনও উপায় সে লইল না।

ইরা স্কুলে পড়িতে লাগিল, ম্যাট্রিকে সে উচ্চ প্রশংসার সহিত বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হইতে সেই দিনটিই কেবল সে মায়ের মুখে আনন্দের হাসি বিকসিত হইয়া উঠিতে দেখিয়াছিল।

ইরা পিতার ইচ্ছানুসারে আই এ পড়িতে আরম্ভ করিল, এই সময়ে তাহার পিতা মিঃ দাস হঠাৎ মারা গেলেন।

লোকটী জীবিতাবস্থায় উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বড় কম নয়, কিন্তু পানদোষের জন্য এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পত্নী ও কন্যাকে পথের ভিখারিণী করিয়া তিনি নিজে সরিয়া গেলেন।

ইরা ও তাহার মাতা অকূল পাথারে পড়িলেন। মিঃ দাস যথেষ্ট দেনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারেরা আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া মিসেস দাস মিশনের শরণাপন্ন হইলেন। মিশন হইতে যে সামান্য সাহায্য পাওয়া গেল তাহাতে মিঃ দাসের দেনা কতকটা শোধ হইল।

মিসেস ব্রাউনিং মিশনারী মিশনের কর্ত্রী ছিলেন। তিনি ইরা ও তাহার মাকে মিশনারী ঢোকে আসিয়া থাকিতে বলিলেন কিন্তু ইরা তাঁহার সে প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিল না।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও এককালে সে যে হিন্দু ছিল সে সংস্কার তাহার মন হইতে যায় নাই। খৃষ্টান হইয়াও সমাজ হইতে অনেক দূরে সরিয়া ছিলেন! খৃষ্টানদের আচার ব্যবহার আহার বিহার কিছুই তাঁহারা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

লেখাপড়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ইরা মিশনারী স্কুলে সামান্য বেতনে টিচারের কাজ লইল এবং মিসেস ব্রাউনিংয়ের পরামর্শে সকালের দিকে টাইপ শিখিতে লাগিল। কিছুদিন মধ্যেই টাইপ করা সে বেশ ভাল রকম শিখিয়া ফেলিল, ঠিক এই সময় মিসেস দাস পীড়িতা হইয়া পড়িলেন।

সে ধাক্কা তিনি কোনক্রমে সামলাইয়া উঠিলেন বটে, স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। ইহার পর প্রায়ই তাঁহার অসুখ হইতে লাগিল, আজকাল তিনি চলচ্ছক্তিবিহীনা হইয়া পড়িয়াছেন। ইরার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।

একখানি মাত্র ঘর, পার্শ্বে আর একখানি ছোট ঘর আছে, সেখানিতে রন্ধনাদি হয় ও জিনিসপত্র থাকে। দাসদাসী রাখিবার ক্ষমতা ইরার নাই তাহাকে নিজের হাতেই সব কাজ করিতে হয়।

সেদিন সুশীল যখন হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইল তখন ইরা মায়ের পথ্য তৈয়ার করিতেছিল। সদর দরজায় আঘাত ও সুশীলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সুশীল তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তিতে দেখিল। স্নানান্তে ভিজা চুলগুলি এলোমেলো ভাবে পিঠে বুকে লুটাইতেছে; পরণে একটা সাদা সেমিজ ও একখানি সরু কালাপেড়ে ধুতি মাত্র। তাহাকে এই স্বাভাবিক বেশে সত্যই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

সুশীল একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তখনই চোখ নামাইয়া লইল, একটা নমস্কার করিয়া কুণ্ঠিত হাসিয়া বলিল, "বড় অসময়ে এসেছি, হয় তো বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। কাল বিকেলে আসব ভেবেছিলুম কিন্তু জরুরী দরকারে এণ্ডারসন কোম্পানীর কাছে যেতে হল, ইচ্ছা থাকলেও এখানে আসা হয়ে উঠল না, আজও একটা কাজে এই পথ দিয়ে যেতে মনে হল—সেদিন কথা দিয়ে গিয়েছিলুম আজ সে কথাটা রাখা যাক, আপনিও কয়দিন অফিসে যান নি, আপনার মা কেমন আছেন, সে খোঁজটাও নেওয়া যাবে।"

ইরা সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "মায়ের অসুখ এখনও নরম পড়ে নি, মিঃ মুখার্জ্জী। এমন কেউ নেই যে যার কাছে রেখে কাজে যাই। বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকরা তো ডেকেও সাড়া নেন না, দেখছেন না—মায়ের দরজাটা বন্ধই থাকে।

পাছে এদিকে এলে ওঁদের হিন্দুয়ানীর শুচিতা নষ্ট হয়ে যায়, সেটাও তো বড় কম কথা নয়।"

বলিয়া সে হাসিল।

সুশীল বলিল, "যেতে পারেন নি সে জন্যে অত সঙ্কুচিত হওয়ার কারণ তো দেখছি নে মিস দাস। অসুখ-বিসুখ সবারই আছে, আর প্রত্যেকের সে দিকটা বিবেচনা করেও দেখা দরকার। আর ওই যে হিন্দুয়ানীর শুচিতার কথা বললেন ওটা বাস্তবিক সত্য। আমিও নিজের চোখে এরকম ঢের কাণ্ড দেখেছি—যাতে বুঝতে পেরেছি হিন্দুর হিন্দুত্ব বড় কম জিনিষ নয়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল।

ইরা বলিল, "ঘরে চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে হয় তো এখনই চলে যাবেন।"

সুশীল বলিল, "না, এসেছি যখন তখন আপনার মাকে না দেখে যাচ্ছি নে। আপনি একটা ঝিও রাখেন নি বোধ হয়, কিন্তু আমার মনে হয় একটা ঝি দিনরাতের জন্যে রাখা উচিত। সংসারের কাজ, রোগীর সেবা করে আবার পয়সার চেষ্টায় বাইরের কাজ করতে যাওয়া মানে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলা। আর দেখুন, আপনার মা না সারা পর্য্যন্ত আপনার কাজে যাওয়ার দরকার নেই। কাজের জন্যে গোলমাল হবে না, আমি অস্থায়ী ভাবে আর একজন টাইপিষ্ট রেখে চালিয়ে নেব এখন। আপনার বেতন তা বলে কাটব না যেমন সম্পূর্ণ বেতন পান তেমনই পাবেন।"

ইরা মাথা নত করিয়া বলিল,—"ধন্যবাদ, ঘরে আসুন।"

সামান্য এই একটা "ধন্যবাদ" কথার মধ্যে তাহার অন্তরের যে উচ্ছ্বাস ঝরিয়া পড়িল তাহা অনেকখানি কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশের চেয়েও বেশী।

ইরা সুশীলকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

একখানি ক্যাম্পখাটে রোগিণী মিসেস দাস শুইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘরখানি যদিও ছোট তথাপি বেশ পরিষ্কার, ঝর ঝরে, কোথাও এতটুকু ময়লা নাই, ছোট এই ঘরখানির পানে চাহিলে গৃহস্বামিনীর সুরুচির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একপার্শ্বে একটী ছোট গোল টেবল, তাহার উপর খানকত বই, দোয়াতদানি, প্যাড প্রভৃতি, নিকটে একখানি মাত্র চেয়ার। তাহারই পার্শ্বে একটী আলমারি, তাহাতে বই ঠাসা রহিয়াছে; ইহাতে বুঝা যায় গৃহস্বামিনীর পাঠে অনুরাগ আছে।

চেয়ারখানা সরাইয়া দিয়া ইরা বলিল, "বসুন"—তাহার পর মায়ের কাছে সরিয়া গিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল।

মিসেস দাস উঠিবার চেষ্টা করিলেন,; সুশীল ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, আপনাকে উঠতে হবে না, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি বসছি।" চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সে মিসেস দাসের সম্মুখে বসিল।

শীর্ণ হাত দুখানা কপালে উঠাইয়া মিসেস দাস ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিলেন, "আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন। ইরার কাছে আপনার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে শুনেছি আপনার হৃদয় অতি উচ্চ, কিন্তু আমার—" তিনি থামিয়া গেলেন, দুর্ব্বলতায় হাঁফাইতে লাগিলেন।

ইরা বলিল, "একটু আস্তে আস্তে কথা বল মা, জান তো, ডাক্তার তোমায় বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন, ওতে তোমার হাঁপানি আরও বাড়বে।"

সুশীলের পানে তাকাইয়া সে বলিল, "ক্ষমতায় কুলায় নি বলে বেশী ঘরও নিতে পারি নি মিঃ মুখার্জ্জি, একটা ছাড়া আর ঘর নেই বলেই আপনাকে এঘরে আনতে ইতঃস্তত: করছিলুম রোগীর ঘরে রোগীর কাছে—"

সুশীল একটু হাসিয়া বলিল, "সে জন্যে আপনাকে এতটা কুণ্ঠিত হয়ে উঠতে হবে না—মিস দাস আমি আপনার অবস্থা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। জগতে সবাই কিছু ধনীর ঘরে জন্মায় না, সবাই অট্টালিকায় বাস করে না। আমিও আপনারই মত দরিদ্রের সন্তান, ভাগ্যবলে বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ করলেও দারিদ্র্যের স্মৃতি মন হতে মুছে যায় নি। আমি দরিদ্র ছিলুম বলেই দরিদ্রের কষ্ট বুঝি, নইলে হয় তো বুঝতুম-না।"

ইরা বলিল, "কিন্তু অনেকের সাংসারিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের অবস্থাও পরিবর্ত্তন হয় এটা বোধ হয় জানেন?"

সুশীল বলিল, "খুব জানি, কিন্তু আমায় যেন তাদের দলে কোনদিন ফেলবেন না; বিপুল সম্পত্তি আমার হাতে

এলেও আমি জানি এর কিছুই আমার নয়। একটা শাপ আছে জানেন পরের সম্পত্তিতে কোটিপতি হওয়া ভাল নয়, পরের প্রাসাদে বাস করাও শান্তিপ্রদ নয়, যতটা শান্তি পাওয়া যায় নিজের কুঁড়ে ঘরে বাস করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার্জ্জন করতে পারায়। যারা মানুষ তারা প্রার্থনা করে আমরা যেন মানুষ হয়েই যেতে পারি— আমরা যেন নিজে খেটে খাই, পরের ধন নিয়ে বড়মানুষ না হই। আপনি কায়িক পরিশ্রম করে যে উপার্জ্জন করছেন তাতেও আপনি সুখী মিস দাস, আর আমি— আমার কথা ভাবলে আমার কষ্টের শেষ থাকে না। জীবনটাকে স্বেচ্ছায় পরের হাতে তুলে দিয়েছি, নিজের এরপর কিছুমাত্র অধিকার নেই।"

তাহার কথার মধ্যে এমন এমন একটা সুর বাজিয়া উঠিল যাহা অতি সহজে ইরা—এমন কি রুগ্না ইরার মাও ধরিতে পারিলেন। পীড়িতা নারী বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

ইরা খানিক সুশীলের পানে তাকাইয়া থাকিয়া চক্ষু ফিরাইল, বলিল, "একটু বসুন মিঃ মুখার্জ্জি, আমি চট করে মার খাবারটা নিয়ে আসি।"

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। মায়ের দুধ উনানে বসানো ছিল, উথলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে সেই বিশ্রী দুর্গন্ধটা ও ঘর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি দুধ নামাইয়া জলন্ত উনানে ভাতের হাঁড়ি বসাইয়া দিয়া দুধ সাগু লইয়া বাহির হইল।

ফিরিয়া দেখিল মিসেস দাস ও সুশীল তাহাদেরই পারিবারিক কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সুশীল বলিল, "আপনার এখনও রান্না হয় নি শুনলুম, আমার জন্যে আপনার কাজের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তো?"

মায়ের পাশে বসিয়া চামচে করিয়া তাঁহাকে দুধ সাগু খাওয়াইয়া দিতে দিতে ইরা বলিল, 'কিছু ক্ষতি হয়নি— আমি রান্না চড়িয়ে দিয়ে এলুম, ভাত হতে অনেকটা দেরী লাগবে।"

সুশীল বলিল, "আপনি একটা কাজ করুন মিস দাস, একটা ঝি রাখুন, নইলে এত খাটলে শীগগিরই বিছানায় পড়বেন এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

মিসেস দাস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি বারবার ওকে সে কথা বলছি বাবা, নইলে কি করে চলবে?"

সুশীল বলিল, "ওঁর কথা শুনুন মিস দাস—"

ইরা বাধা দিয়া বলিল, "আমায় ইরা বলে ডাকবেন।"

উঠিতে উঠিতে সুশীল মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেই ভাল কথা। আজ আমি যাচ্ছি, পারি যদি আবার একদিন আসব, সে দিন যেন দেখতে পাই কাউকে কাজে রেখেছেন।" (ক্রমশঃ)

ব্যর্থতা

—কবিতা—

জেবুন্নেসা খাতুন

তোমার তরে-দুয়ার খুলি-
রাখিনু-সারারাতি-।
তোমারই-তরে-আঁধার ঘরে
জালিয়ে ছিনু বাতি-।
সদ্য ফোটা যূথীর রাশে-
ভরানু-গৃহ-কোণ-
তাহারই-মাঝে-পাতিনু তব-
স্বর্ণ-সিংহাসন-।
উঠিল শত ধূপের ধোঁয়া-
সারাটি-গৃহমাতি-
কনক মণি পাত্র পুটে-
জালিনু শত বাতি-।
নিশীথরাতে কীচকবন
মর্ম্মরিয়া উঠে—
তোমার পায়ের নুপুর শুনি'
চলিনু আমি ছুটে।
গহীন রাতে একতারাতে
বাউল গাহে যেন—
"দুয়ারে তব বাজিছে বাঁশী
শুনিছ নাকো কেন?"
ছুটিয়া দেখি শূন্য দ্বার
গুমরে আকুলতা।
বুকের পরে আছাড়ি মরে
হিয়ার যত ব্যথা।
হৃদয় মাঝে আশার দীপ এখন নিবু নিবু
ব্যর্থ আমার সকল সাজ আসিলে না গো প্রভু।

বিজয় সিংহ

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

—ইতিহাস—

বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন এ কথা সত্য, তবে তিনি বাঙ্গালার বীর বিজয় সিংহ না সিন্ধু দেশের বিজয় সিংহ ছিলেন তাহা লইয়া কথা উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে, লঙ্কা-বিজয়ী বিজয় সিংহ সিন্ধু দেশের অধিবাসী ছিলেন। আবার অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেন যে, বিজয় সিংহ কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যা এবং বাঙ্গালার রাজা সিংহবাহুর পুত্র ছিলেন এবং তিনি বাঙ্গালা হইতে জাহাজে চড়িয়া গিয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের এই দ্বৈত মতের সমাধান এখনও হয় নাই।

দ্বিতীয় কথা কোন্ সময় বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তাহার তারিখ লইয়া নানা গোল যোগ বাধিয়াছে। নানা মুনির নানা মত। কোনটা মানিব আর কোনটা মানিব না এই হইল বিষম সমস্যা। মিষ্টার রোলিনসন বলেন যে, বিজয় সিংহ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলে যে, খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করেন। কানিংহাম সাহেব বলেন যে খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে যে দিন ভগবান বুদ্ধ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া যান সেই দিন বিজয় সিংহ লঙ্কা যাত্রা করেন।

বিজয় সিংহ সম্বন্ধে নানা মত আছে। কানিংহাম বিজয় সিংহ কোন দেশের রাজা ছিলেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলেন, তিনি বঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন। রোলিনসনও বলেন যে তিনি বাঙ্গালারই রাজা ছিলেন।

"In the story of the invasion of Ceylon probably in the Sixth centruy B. C. by the Bengal king Vijaya and his followers, we hear of a ship large enough to hold over seven haudred people."

বিজয় সিংহের লঙ্কা জয়ের ঘটনা যে সকল পুস্তকে উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে সিংহলী পুস্তকই প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে খুব কম বই-ই আছে। এত দিন সকল ঐতিহাসিকই সিংহলের প্রাচীন গ্রন্থ মহাবংশের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এখন অন্য একখানা পুস্তকের বিশেষ সাহায্য লওয়া হয়। ইহার নাম "রাজা বলিয়া" পুস্তকখানা কখন লেখা হইয়াছে তাহা লইয়া মত ভেদ আছে। কেহ বলেন যে, এই পুস্তক প্রাচীনকালে কোন এক খৃষ্টান দ্বারা লেখা হইয়াছিল; কিন্তু ইহার কোন মৌলিকতা নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাবংশের তুলনায় পুস্তকখানি নূতন। নূতন হইলেও ইহাতে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব সংগৃহীত আছে। বিজয় সিংহ সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক পুস্তকে সংবাদ পাওয়া যায় সত্য: কিন্তু তাহা কোন কার্য্যেই আসে না—মহাবংশে সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস যেখানে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, 'রাজাবলি'তে তাহার স্পষ্ট চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিজয় সিংহ কে ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম কি, কেন তিনি লঙ্কায় গেলেন, তাহার লঙ্কায় পদার্পণ করিবার সময় ইত্যাদি দুই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। দুই পুস্তকের মধ্যে বিশেষ কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিজয় সিংহের পূর্ব্ব পুরুষগণ কেমন করিয়া বাঙ্গালা দেশে আসিলেন, কেমন করিয়া তিনি পিতার বিরাগভাজন হইলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় পরিস্কার ভাবে রাজাবলিতে দেওয়া আছে। কিন্তু যে সকল ঘটনা রাজাবলিতে বর্ণনা করা হইয়াছে, আজ কাল তাহা কেহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। সত্য হওয়া যে একেবারে অসম্ভব তাহাও নহে; তবে যাহাই হোক—অর্থাৎ রাজাবলিতে বর্ণিত ঘটনা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক সে বিচার করিব না। আমরা দেখিব যে, এই সকল ঘটনার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আছে। মোট কথা এই সকল ঘটনার মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা দেখাইবার পূর্ব্বে ঘটনাগুলি বলিতে চাই। আমাদের মনে হয়, এই সকল ঘটনা হইতে এমন সব ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যাইবে যাহা হইতে প্রমাণ হইবে যে বিজয় সিংহ বাঙ্গালার রাজকুমার ছিলেন, তিনি লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন ইত্যাদী। ইহা ভিন্নও বিজয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থাও সম্যক উপলব্ধি করিব।

কলিঙ্গ দেশে শকভিতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে বঙ্গের এক রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দেন। এই রাজকুমারীর গর্ভে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে জ্যোতিষগণ বলিলেন যে, এ কন্যার সহিত এক সিংহের বিবাহ হইবে। লোহার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহাকে এই বিবাহ হইতে বাঁচান যাইবে না। কন্যার রাশি নক্ষত্র দেখিয়াই পণ্ডিতগণ এই কথা বলিলেন।

ধীরে ধীরে কন্যা বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে পিতা মাতা মহা চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। তাহাকে সাত তালা দালানে রাখা হইত এবং চারিদিকে উপযুক্ত রক্ষকগণ পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। একদিন রাত্রিতে রাজকন্যা কামাতুর হইয়া সাত তালা হইতে পালাইয়া আসিয়া একদল বণিকের সহিত মিলিত হইল। রাজ বাড়ীর কেহই একথা জানিতে পারিল না। অবশেষে রাজকন্যা বণিকদের সহিত যখন লাতা নামক বনে প্রবেশ করিল, তখন এক সিংহ বণিক দলকে আক্রমণ করে। বণিকের দল ভীত হইয়া রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সিংহ রাজকুমারীকে হত্যা না করিয়া তাহার আবাসে লইয়া আসে। তাহার পর হইতে রাজকন্যা সিংহের সহিত একত্রে বাস করিতে থাকে। এই ভাবে কিছুদিন বাস করিবার পর সিংহের ঔরসে রাজকন্যার দুইটী সন্তান হয়, একজন বালক ও একজন বালিকা। সিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও রাজকুমারীর সন্তানদ্বয় দেখিতে মানুষের মত হইয়াছিল। সিংহের পুত্র বলিয়া এই রাজকুমারের নাম হইল সিংহব। আস্তে আস্তে রাজকুমার ও রাজকুমারী বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজকুমারের শরীরে সিংহের মত বল হইল। একদিন সিংহ শীকার অন্বেষণে প্রায় পঞ্চাশ যোজন দূরে চলিয়া যায়, তখন সিংহব তাহার মাতা ও ভগ্নিকে পিঠে তুলিয়া লইয়া বঙ্গ রাজ্যে চলিয়া আসে। তথায় আসিয়া দেখিল যে, তখন তাহার মামা সে দেশে রাজত্ব করিতেছেন। রাজা ভগ্নীর সন্তানগণকে উপযুক্ত উপহার দিয়া সহরে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। সিংহব মাতা ও ভগ্নীকে লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

সিংহ শীকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা কেহই সেখানে নাই। সে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয়ানক রাগও হইল। সে বনের চারিদিক ঘুরিতে লাগিল এবং যাহাকে পাইতে লাগিল তাহাকে মারিতে লাগিল। এইভাবে বহু জন-প্রাণীর প্রাণ নাশ করিয়া বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। বঙ্গে আসিয়াও সে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং লোক জন মারিতে লাগিল। অনেকেই বহু চেষ্টা করিল কিন্তু সিংহকে কেহই মারিতে পারিল না বরং যাহারা মারিতে গেল তাহারা আর ফিরিয়া আসিল না। রাজা প্রজাদিগের বিপদ দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন। নানা চিন্তার পর সহরে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে সিংহ মারিতে পারিবে সে রাজ্যের এক অংশ পাইবে।

সিংহব রাজার ঘোষণা শুনিয়া তীর ধনুক লইয়া সিংহকে বধ করিতে বাহির হইল। বনে গিয়া সিংহকে দেখিতে পাইল এবং এস বলিয়া সিংহকে আহ্বান করিল। সিংহ তাহার পুত্রকে দেখিতে পাইয়া যেন সুধাভাণ্ড হাতে পাইল, সে আনন্দে গদ গদ হইয়া পুত্রের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু পুত্র তিনটী বাণ সিংহের প্রতি নিক্ষেপ করিল, বাণের অগ্রভাগ বক্র থাকাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মাটীতে গিয়া বিদ্ধ হইল চতুর্থ বাণ নিক্ষেপ করাতে তাহা সিংহের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিল। সিংহ গর্জ্জন করিতে করিতে মাটীতে পড়িয়া গেল। অবশেষে সিংহব পিতার নিকট গমন করিলে সিংহ পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া স্ত্রী ও কন্যার কথা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ প্রাণত্যাগ করিলে সিংহব তাহার মস্তক কাটিয়া আনিয়া রাজাকে উপহার দিল

রাজা তাঁহার প্রতিজ্ঞামত লাতা নামক দেশ সিংহবকে ছাড়িয়া দিলেন। সিংহব সেখানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। সে সিংহওয়ালী নাম্নী এক রাজকুমারীকে বিবাহ করে তাহার গর্ভে বত্রিশ জন রাজকুমার জন্মগ্রহণ করে। ইঁহাদের মধ্যে বিজয় সিংহ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। কথিত আছে যে বিজয়ের জন্মদিনে আরও সাত শত বীর জন্মগ্রহণ করে। পরে এই সকল বীর বিজয়ের সৈন্য ও সহচর হইয়াছিল।

বিজয় সিংহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যে সাত শত লোক তাঁহার জন্মের দিনে সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া বিজয়ের

সহিত মিলিত হইল। তাহারা বিজয়ের নায়কত্বায় রাজ্যে নানা প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। রাজ্যের লোক বিজয় সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার কাছে গিয়া নালিশ করিল যে, যুবরাজ এরূপ করিলে তাহারা দেশে থাকিতে পারে না। রাজা সিংহব যুবরাজের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ যখন কুশীনগরে দেহ রক্ষা করিলেন তাহার সাতদিন পর বিজয় তাঁহার সাত শত সহচর লইয়া সমুদ্র যাত্রা করিলেন। জাহাজ চলিতে চলিতে এক দ্বীপে আসিয়া লাগিল, এই দ্বীপের নামই লঙ্কা দ্বীপ। তাহারা সিংহলের "তাম্বরট্টা" নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সে দেশ সবুজ বৃক্ষে পূর্ণ, শীতল ছায়ায় ঢাকা, নিবিড় বনে আচ্ছন্ন, লতায় পাতায় ঘেরা, জমি উর্ব্বর এবং ফল মূল যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়া তথায় "কলোনী" করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। যখন বিজয় সিংহ লঙ্কায় পৌছিয়াছিলেন তখন দ্বীপটী ভূত প্রেত রাক্ষস প্রভৃতিতে পূর্ণ ছিল। সেখানে কোন মানুষ বাস করিত না। রাম রাবণের যুদ্ধ এবং বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক হাজার আট শ চুয়াল্লিশ (১৮৪৪) বৎসর পর্য্যন্ত লঙ্কা রাক্ষস রাজত্ব ছিল।

ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর তিনবার লঙ্কা ভ্রমণ করিয়াছেন। প্রথম বুদ্ধত্ব লাভ করিবার দিন, দ্বিতীয় বুদ্ধত্ব লাভ করিবার ছয় বৎসর পর এবং তৃতীয় বার বুদ্ধত্ব লাভ করিবার নয় বৎসর পর। সেখানে গিয়া তিনি অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া লঙ্কার রাক্ষসদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ঝগড়া মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

যখন চতুর্থ তীথিতে ভগবান বুদ্ধ কুশী নগরে দেহ রক্ষা করেন, তখন তাঁহার বন্ধুগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, মহেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি সিংহলে "বৌ-বৃক্ষ" স্থাপন করিবে। বুদ্ধদেব তখন শক্কালা নামক এক ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার উপর লঙ্কার ভার অর্পণ করেন। এবং কথিত আছে যে, বিজয় সিংহকে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্যই নিযুক্ত করেন এবং বিজয়কে "রক্ষা-জল" ও "রক্ষা-সূত্র" দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সিংহল সেই সময় 'উপলবন' নামক দেবতার তত্ত্বাবধানে ছিল।

রাজকুমার বিজয় সিংহ যখন অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া বিশ্রাম করিতে ছিলেন, তখন উপলবন নামক দেবতা ঋষির বেশে আসিয়া বিজয়কে "রক্ষাসূত্র" পরান এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সহচরগণকে 'শান্তি জল' ছিটাইয়া দেন। বিজয়ের আগমনে নিকটস্থ দানব দৈত্য প্রভৃতি পালাইয়া অন্য বনে গমন করেন।

কুবেনী নাম্নী এক সুন্দরী দৈত্যকন্যা তখন সিংহলে বাস করিত। তাহার বুকে তিনটী স্তন ছিল। এই তিনটী স্তনের জন্য তাহার বুকের সৌন্দর্য্যের অনেকখানি হানি হইয়াছিল। কিন্তু সে দেশের বৃদ্ধরা বলিত যে, যদি কোন দিন তাহার কোন বর আসে এবং সে আসিয়া তাহার বুকের মধ্যম স্তনটী স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। বিজয় সিংহলে পদার্পণ করিলে পর কুবেনী মনে করিল যে, সেই তাহার বর। সেই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া যাদু মন্ত্র দ্বারা সে নিজে একটী কুত্তা সাজিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে বিজয়ের পায়ে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। কুকুর দেখিয়া বিজয় মনে করিলেন যে, লঙ্কায় মানুষ থাকা অসম্ভব নহে। তাঁহার সহচরদিগকে তিনি সংবাদ লইতে বনের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা একটী পুকুরের নিকট আসিলে কুবেনী মন্ত্রবলে পুকুরের পদ্ম পাতার নীচে তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিল। সারাদিনের মধ্যেও যখন তাহারা ফিরিয়া আসিল না, তখন বিজয়ের মনে সন্দেহ হইল। তিনি বনের মধ্যে সেই পুকুরের নিকট গিয়া দেখিলেন যে, মানুষ, জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে তাহার পদ রেখা দেখা যায় কিন্তু উঠিয়া আসিবার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ইতিমধ্যে তিনি কুবেনীকে দেখিতে পান এবং তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া অপমান করিবার ভয় দেখান। কুবেনী বলে যে যদি বিজয় তাহাকে বিবাহ করিয়া রাণী করে তবে তাঁহার সাত শত সহচরকে মুক্তি দিবে। কুবেনীর কথায় বিজয় সিংহ রাজী হইলেন। কুবেনীর অনুরোধে তাহার বুকের মধ্যস্থিত স্তন স্পর্শ করিলেন; ফলে স্তনটী অদৃশ্য হইয়া গেল। কুবেনী বিজয়ের সাত শত সহচরকে মুক্তি দিয়া বিজয়ের রাণী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন রাত্রিতে হঠাৎ কিসের একটা গণ্ডগোলে বিজয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কুবেনীকে জিজ্ঞাসা

করিলে কুবেনী বলিল যে, এক দৈত্য কন্যার বিবাহ। আরও বলিল যে এই সকল দৈত্যদের মধ্যে বিজয়ের বাস করা ঠিক নহে। এই সকল দৈত্যদিগকে মারিতে পারিলে আর কোন ভয় নাই। অবশেষে কুবেনী ঘোড়া সাজিল, বিজয় তাহার পিঠে চড়িয়া দৈত্য ধ্বংস করিতে চলিলেন, এবং তাঁহার সাত শত সহচর তাঁহার সহিত চলিল। তাহারা অনেক দৈত্য বধ করিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিল এবং কুবেনী তাহাদের জন্য চাউল প্রভৃতি খাদ্য আনিয়া দিল।

সমস্ত ঠিক হইলে বিজয়ের সহচরগণ বিজয়কে রাজমুকুট পরিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু কুবেনীকে রাণী করিয়া রাজমুকুট পরা চলিবে না। অনেক পরামর্শ করিয়া পিণ্ডিদেশের রাজাকে এক বহুমূল্য মণি উপহার পাঠাইয়া দিলেন এবং রাজার নিকট এক রাজকুমারী, সাতশত পরিচারিকা এবং পাঁচ প্রকার বণিক পাঠাইতে প্রার্থনা করিলেন। শীঘ্রই পিণ্ডিদেশের রাজকুমারী সাত শত সহচরী ও পাঁচ প্রকার বণিক লইয়া লঙ্কায় আসিলেন। বিজয় রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া সিংহলের রাজা হইলেন এবং রাজকুমারীর সাতশত সহচরীকে তাঁহার সাতশত সহচরের নিকট বিবাহ দিলেন। এবং কুবেনীকে তাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে কুবেনী ক্রোধিত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিতে আসিল কিন্তু দেবতাদের আশীর্ব্বাদে বিজয় তাহাকে পরাজিত করিলেন। দেবতাদের চক্রান্তে কুবেনী পাষাণ মূর্ত্তি হইয়া রহিল। বিজয় সিংহ সিংহলে আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

আমরা বিজয় সিংহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। যেখানে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই সেখানে সংক্ষেপে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি। এখন আমরা এই বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখানে বিজয় সিংহের যে কাহিনী বর্ণনা করিলাম তাহা ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। তবে সে বিভিন্নতা তেমন বেশী নয় এবং এই অল্প বিভিন্নতার জন্য কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্য নষ্ট হইবে না।

প্রথমতঃ কাহিনী পড়িয়া অনেকেই মনে করিবেন যে, ইহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিব না। একজন রাজকুমারীর সিংহের সহিত বিবাহ হওয়া যেন উপকথার পাতালপুরীর রাজকুমারীর ঘুমভাঙ্গান কাহিনীর মত মনে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, অনেকেই জীব-জন্তুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেকেই অনেক পশু প্রসব করিয়াছেন; কাজেই এদিক দিয়া কথাটা অবিশ্বাস যোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ রাশী নক্ষত্রের একত্র সমাবেশ যে মানুষের চরিত্রের উপর অনেক খানি প্রভাব বিস্তার করে তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই এদিক দিয়া আমরা কাহিনীর সত্যতা দেখিতে পাই কাহিনীর ভিতর ঐতিহাসিক সত্য ভিন্ন আরও অনেক সত্য নিহিত আছে; কিন্তু আমরা তাহার বিচার না করিয়া কেবল ঐতিহাসিক সত্যটুকুই বাহির করিয়া আনিবার চেষ্টা করিব।

এই গল্প হইতে আমরা একটা নূতন সত্য বাহির করিতে পারি। গল্পের একস্থানে লেখা আছে যে, বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের সময় হইতে এক হাজার আটশত চুয়াল্লিশ (১৮৪৪) বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়াছিলেন।

After the war of Ravana, and before the attainment of Budhahood by our Budha, the teacher of the three world, lanka had been the abode of demons for the space of 1844 years"—"Rajavaiiya"

কথাটা একটু ভাবিবার বটে। রামায়ণের কাল নির্ণয়ের জন্য এই তারিখ আমাদিগকে সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করিলে বোধ হয় অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এই তারিখ লইয়া যদি আমরা বিচার করিয়া দেখি, তাহাহইলে বোধহয় রামায়ণের কাল নির্ণয় করিতে পারিব এবং হয়ত তাহাই রাম রাবণের যুদ্ধের ঠিক তারিখ। বুদ্ধদেব ৫৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ তখন খৃঃ পূঃ ৫১৫ অব্দ। ইহার সহিত যদি আমরা ১৮৪৪ বৎসর যোগ করিয়া দেই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র খৃঃ পূঃ ২৩৫৯ অব্দে লঙ্কায় গিয়াছিলেন। কথাটা উড়াইয়া দিবার মত নহে। মহাভারতের অনেক পূর্ব্বে রামায়ণের কাল। পণ্ডিতগণ

অনুমান করেন এবং পুরাণ হইতে আমরা যে সকল রাজাদের নাম সংগ্রহ করিতে পারি তাহা হইতে দেখা যায় যে খৃঃ পূঃ ১৪৩৮ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৯২১ বৎসর পূর্ব্বে রাম রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, এই তারিখটা অযৌক্তিক নহে।

এখন কথা হয় যে, বিজয় সিংহ বাঙ্গালা রাজকুমার ছিলেন কি না? অনেকে বলেন যে, তিনি সিন্ধু দেশ হইতে গিয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। কথাটার সত্যতার সম্বন্ধে প্রমাণ তেমন কিছু নাই। কেহ কেহ বলেন, বিজয় সিংহের পিতা সিংহব সিংহল দখল করেন। এবং তাঁহার ভগ্নী জাহাজে চড়িয়া পশ্চিম দিকে যান। তিনি পারস্য সাগরে পৌঁছিলে পারস্যের রাজা তাঁহাকে বন্দী করিয়া বিবাহ করেন। যাহারা বিজয় সিংহকে সিন্ধুদেশের রাজকুমার বলেন তাহারা কোন কোন গ্রীক লেখকদের দোহাই দিয়া থাকেন মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে বিজয়সিংহ সিন্ধুদেশের রাজকুমার ছিলেন না – তিনি বাঙ্গালারই রাজা ছিলেন। যে সমস্ত পুরাতন পুস্তকে বিজয়ের সিংহল যাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার সকল পুস্তকই স্বীকার করে যে, বিজয় বাঙ্গালার বীর। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিজয়কে মগধের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি যখন পুস্তক লেখেন, তখন বিজয় সম্বন্ধে নানা বিবরণ জানা সুবিধার ছিল না। দ্বিতীয়তঃ মগধ আর বাঙ্গালা পাশাপাশি প্রদেশ ছিল; কখন কখন বাঙ্গালা মগধের মধ্যে, আবার কখন কখন মগধ বাঙ্গালার সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কাজেই দত্ত মহাশয়ের বিবরণে অযৌক্তিকতা নাই। এখন কথা হইল যে, আমরা বিজয় নামে একজন রাজা দ্বিতীয় শতাব্দীতে অন্ধদেশে রাজত্ব করিতে দেখি কিন্তু তিনি লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না।

বিজয় কোন সময় সিংহল জয় করেন তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। অনেকের মতে দেখা যায় যে, তিনি ৪৪৩ খ্রী পূঃ অব্দে সিংহল জয় করেন; আবার অনেকে নানা গোলযোগে পড়িয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখ না দিয়া মোটা-মুটি একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বুদ্ধের মৃত্যুর ছয় দিন পর বিজয় লঙ্কা যাত্রা করেন। বুদ্ধের জন্ম ৫৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে হয় আর ৮৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে দেখা যায় খৃঃ পূঃ ৪৭৪ অব্দে বিজয় সিংহল জয় করেন। যাহারা খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দ সিংহল জয়ের সময় নির্ণয় করেন, তাহাদের সহিত আমাদের মাত্র ৩১ বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জ্জি বুদ্ধের মৃত্যুর ছয় বৎসর পর বিজয় লঙ্কা যাত্রা করেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আবার তিনিই বিজয়ের লঙ্কা যাত্রার দিন ৪৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ১১২ বৎসরের ব্যবধান। অর্থাৎ তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুদ্ধের জীবন কাল ১১২ বৎসর, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। এক্ষণে বিজয়ের লঙ্কা যাত্রার দিন ৪৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দ কি ৪৭৪ খৃঃ পূঃ অব্দ তাহার বিচারের ভার সুধিগণের উপর রহিল।

পথের শেষে

(চিত্র)

শ্রীমতী ইন্দুবালা রায়চৌধুরী

এঁকাবেঁকা পল্লীপথ—নদীর কোল ঘেঁষে ধনুকের মত বেঁকে এসেছে। তারপর খেয়াঘাট, হাটখোলা, গাজীর দরগার পাশ কাটিয়ে, আম বাগানের মধ্যে দিয়ে, মাঠের উপর এসে পড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। গাছপালায় ঘেরা খোড়োচালার মধ্যে আলোর লুকোচুরি অনেকক্ষণ সুরু হয়েছে। সেই পথে একলা আপন মনে বাড়ী ফিরে চলেছি। সাদা পথ চাঁদের আলোয় মাজা—এমন সাজানো, আচম্‌কা পা ফেলতে ভয় হয়। পায়ের ধূলা তার সাজানো অঙ্গে তুলে দেব কি করে! ছিঃ! কিন্তু সে যে পথ—পায়ের ধূলাই তার মাথার শিরোপা। এই রকম ভুলই আমার বেশী করে হচ্ছিল।

হঠাৎ পিছনে কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইতেই দেখি, বিমলদা আসছে। আমার দিকে চেয়ে' বড় স্নিগ্ধ স্বরে বিমলদা ব'ললে, "আঁচলটা যে ভূঁয়ে লুটোচ্ছে, খেয়াল নেই?

—বাস্তবিকই ত! অন্যমনস্কতায় আঁচলটা কখন যে কাঁধ থেকে খ'সে প'ড়েছিল, সেদিকে আমার একটুও হুঁস্ ছিল না। সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি আঁচল তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরলুম। বিমলদা আমার পাশ দিয়ে চ'লে গেল। পরণে তার মোটা খদ্দরের ধুতী-পাঞ্জাবী। মাথায় গান্ধী-টুপী! আমার কেবলই মনে প'ড়তে লাগলো আমার-ই প্রতিবেশী আমার-ই একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী অগাধ স্নেহশীল এই অদ্ভুত দাদাটীর কথা। কলকাতার কলেজের পড়া শেষ হ'তে না হ'তেই বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ ক'রে স্বদেশী-আন্দোলনে সে কি অসাধারণ উৎসাহ নিয়েই নেমে প'ড়েছে। পরিজনের কোনো উপদেশ-অনুনয় সে একটুও মনে নেয় নি। কর্তব্যকে বেছে নেওয়ার ফলে পূরো এক বৎসরের জন্য তাই তাকে কঠোর কারাবরণ ক'রতে হ'য়েছে। কারা-মুক্তির পর কি-জানি কি মনে ক'রে সে একবার তার বাপ-মাকে দেখতে এসেছে! সে ত আবার চ'লে যাবেই। কিন্তু কি পবিত্র সঙ্কল্পে ভরা তার মন! এটা যখনি আমি ভাবি, তখনি আমার অন্তর আনন্দে নেচে ওঠে! এর কারণটা কিন্তু আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারি না!...

হঠাৎ একদিন আমার জীবনের ধারা একেবারে ঘুরে গেল। বাবা আমার অত্যন্ত গরীব। এত গরীব যে, আমার উপযুক্ত বয়স হ'লেও, আমাকে পাত্রস্থ ক'রতে পারছিলেন না। বাবার বার্‌বার্ আশাহত অতি-করুণ মুখখানি দেখে, আমার বুকখানা যেন ফেটে যেতো। এক এক সময় ভাবতুম, হায়, কেন আমি আমার অভিশপ্ত জীবন নিয়ে জন্মেছি। আর জ'ন্মেছি-ই যদি, বিধাতা বাবাকে কেন অর্থ দেন নি! গরীবের ঘরে আমার মতন অভাগী যে বিষম বোঝার মতো।...

সেদিন বিকেলে বউদিদি আর মা গা'ধোবার জন্য পুকুর-ঘাটে গিয়েছেন। আমি বাবার বিছানা পেতে ঠিক ক'রে রাখছিলাম। এমন সময় বিমল-দা হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে এসে বললে, "জ্যেঠাইমা কোথায়, অরুণা?"

বিমল-দার কণ্ঠস্বর রীতিমত গম্ভীর। আমি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলুম—মাকে ডেকে দেবার জন্য। বিমল-দা আগেকার মতন স্বরেই আবার বললে, "তুমি যেয়োনা, অরুণা। তোমার সঙ্গেই আমার একটু কথা আছে।"

আমি নতমুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার দিকে চেয়ে' অভিমান-ভরা স্বরে বিমল দা ব'ললেন, "অরুণা, তোর ছেলেবেলা থেকে তোকে আমি নিজের হাতে মানুষ ক'রেছি। আমার কাছে তোর লজ্জা করবার কোনো কারণ নেই। শুনলুম, তোর কিছুতেই বিয়ে হচ্ছে না ব'লে তুই নাকি কাল আত্মহত্যা করবার—"

আমার চোখের কোণে বেদনার দু'ফোঁটা অশ্রু ভ'রে উঠলো। বড় স্নেহের স্বরে বিমল-দা বললে, ছি! বোন্। আত্মহত্যায় কি বিয়ের পথ পরিষ্কার হয়? তোর মতন আরও কত মেয়ে আছে জানিস, যাদের বিয়ে হ'তে পারছে না? তাদের কথা ভেবেছিস? তারা কি ক'রবে? জানিস,

পৃথিবীতে পুরুষগুলো কেবল স্বার্থপর। মেয়েরা তাদের কাছে সুলভ ব'লেই, তারা মেয়েদের বাপের ওপর জুলুম করবার সুযোগ পায়। কেন, মেয়েদের কি কোনো আত্ম-মর্য্যাদা নেই? তাদের কি কোনো মূল্য নেই—হোকনা তাদের বাপ গরীব? অরুণা, নিজেকে সুলভ করিস্‌নি! তোর আত্ম-সম্মান রক্ষার গৌরব যেদিন অর্থ-লোলুপ পুরুষ-সমাজকে পদাঘাত ক'রতে পারবে, ঘৃণা ক'রতে পারবে, সেইদিন স্বার্থপরেরা তোর মূল্য বুঝবে। তোমার রুদ্ধ অভিমান সেইদিনের অপেক্ষায় যেন ঈশ্বরের কাছে শক্তি চায়!...অরুণা, আজ দেশের জাতীয় যুদ্ধে ঘরের বাইরে কত নর-নারী আত্মবলি দিচ্ছে, জান? এ-বিষয়ে ঘরের ভেতরে তোমাদের কাছে,—বিশেষ ভাবে তোমার কাছে আমাদের গরীব দেশ কি কিছুমাত্র আশা ক'রতে পারে না? আজ গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে কত মেয়ের মতো তুমিও দেশকে সাহায্য করো। চর্‌কা কাটো! বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে খদ্দরের পূজা ক'রতে বলো! মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে বর্ত্তমানে এইকায-ই বেশী দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। আমাদের-ই এই গ্রামের দিকে চেয়ে ত্যাখো! তোমাকে সাহায্য করবার মতো ঘরে-ঘরে এমন অনেক মহিলা আছেন, যারা ইতিমধ্যেই দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। সাড়া দাওনি কেবল তোমরা এবং তুমি! তোমার বিয়ে হচ্ছে না ব'লে, তুমি আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলে। যদি জানতুম, দেশের কাজ ক'রতে না পারার জন্যে অভিমানে তুমি আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলে, তা হ'লে আমি সুখীই হতুম!..."

বিমল-দার চোখে-মুখে কী এক পুণ্যোজ্জ্বল তেজ-দীপ্তি ফুটে উঠলো। তার সামনে শ্রদ্ধায় আমার মাথা যেন আপ্‌নি-ই নুয়ে প'ড়লো।

* * * *

কখন পুকুর-ঘাটে এসেছি মনে নেই—সন্ধ্যার অন্ধকার গাছে-গাছে নেমে এসেছে হুঁস্ নেই। পিছন থেকে হঠাৎ কে গায়ে হাত দিলে। ফিরে দেখি বউদিদি দাঁড়িয়ে। তিনি আমার হাতটা ধরে বল্লেন "একি অরুণা! এই ভরা-সন্ধ্যায় তুমি এখানে দাঁড়িয়ে—এই পুকুর ঘাটে? আর তোমাকে সারা গাঁ খুঁজে বেড়ান হচ্ছে। এক মনে কি অত ভাবা হচ্ছিল, শুনি?" একটু নীরব থেকে গম্ভীরভাবে আমি বল্লুম "বউদিদি, দেশকে সাহায্য ক'রতে হবে। আজ, থেকে আমার কর্ত্তব্য—চরকার পুজো করা। এর দ্বারা বাবা-ও মুক্তি পাবেন। তোমরা আমার সঙ্গী হবে ত?" বউদিদি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বল্লেন "তার মানে?" বৌদির একখানা হাত ধ'রে রুদ্ধ স্বরে কম্পিত গলায় আমি বললুম, "চরকাই যে গরীবের বন্ধু, বৌদি! আমার জন্যে তোমরা কেউ ভেবো না!"

কষ্টি-পাথর

শ্রীগোপেন্দ্র বসু (গল্প)

দার্জ্জিলিংয়ে সকাল সাতটারও অনেক পর—প্রায় আট ঘটিকা।

মাউণ্ট প্লেসেণ্ট্ রোডস্থিত নব-বিলাত প্রত্যাগত মিষ্টার এ, কে, সেন, বার-এট-ল, পুরানাম শ্রীঅশোক কুমার সেনের প্রাতঃকালীন চা পান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, রঙ্গিন খদ্দরের একখানি পুরু চাদর আবক্ষ জড়াইয়া কুমারী ঊর্ম্মিলা চায়ের টেবিলের নিকট আসিয়া একখানি গদি আঁটা চেয়ারে বসিতেই অশোক হাস্ত করিয়া কহিল, "Beware of tea। টেবিলের অত কাছে বস্‌লে দেখো ছোঁয়া না লাগে।" অশোকের কথায় চা-পানরতা ঊর্ম্মিলার জ্যেঠা ভগ্নী প্রতিমা দেবীও হাস্ত করিল।

ঊর্ম্মিলা চা পান করে না। সেইজন্ত অত্যধিক চা-প্রিয়

অশোক প্রায়ই এইরূপ বিদ্রূপ করিয়া থাকে। পরপর দু'কাপ চা পানান্তে অশোক উর্ম্মিলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "By jove, কাল তোমার জন্যে যে সব জিনিষগুলো এনেছিলাম সব পছন্দ হয়েছে ত? সব একেবারে খাঁটি স্বদেশী।" মৃদু হাস্য করিয়া উদ্ভিন্ন যৌবনা উর্ম্মিলা বলিল, একটু ত্রুটি আছে।" আর এক কাপ চা'র জন্য আদেশ করিয়া অশোক কহিল 'may I have the fortune to hear যথা', উর্ম্মিলা হাস্য করিয়া কহিল, যথা একটি একটি হারমোনিয়াম ও একটি স্কুটার আন্‌তে ভুল হয়েছিল।' অশোক কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার ঠিক পার্শ্বের অপর একটি চেয়ার হইতে তাহার স্ত্রী প্রতিমা বলিয়া উঠিল 'কাল তুমি কতকগুলো ক্রেকার এনেছ তাই বোনটির আমার মান্যের হানি হয়েছে।' ভগ্নীর কথায় উর্ম্মিলা ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের স্বরে কহিল 'মান্যের হানি হবে নাত কি? আমি বুঝি এখনও কচি খুকিটি আছি যে ঐ ক্রেকার নিয়ে সারাদিন পট্ পট্ করবো?' মুখগহ্বর-স্থিত পাইপটাকে দাঁত দিয়া চাপিয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে অশোক কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল 'Here you are, আমারি ভুল হয়েছিল তা Pretty miss, I should apologise first of all, কিছু মনে করো না ঝলে উর্ম্মিলা। আমার খেয়াল ছিল না যে তুমি বড্ড বড় য়েছ এবং ক্রেকার নিয়ে খেলতে তোমার মন বসবে না। t is very natural, যাক্ তুমিই যখন মনে করিয়ে য়েছ তখন তোমার যাতে মন বসে তার ব্যবস্থা শীঘ্রই ছি, অভয় দাও ত এই আশ্বিন মাসেই হিন্দু সমাজে ধা থাকলেও 'Oh what a fool I have been,' ীপতির কথায় উর্ম্মিলা বিশেষ কুপিত হইয়া প্রতিমার তি লক্ষ্য করিয়া অনুযোগের স্বরে কহিল, 'দেখ্‌লে দিমণি আমি যেন সেই ভেবে বলেছিলুম", অশোক পাইপ ষ্কার করিতে করিতে কহিল 'স্পষ্ট করে বলনি বটে ut the cat is out আর white wash করলে হবে '। প্রতিমা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল, রাগান্বিতা উর্ম্মিলা বন পুষ্পিত দেহলতাটি লীলায়িত করিয়া দ্রুতপদে কক্ষ-াগ করিল। প্রতিমা ও অশোকের সম্বোধনে কোন ত্তর সে দিল না।

দুই

উর্ম্মিলা চলিয়া যাইলে অশোক প্রতিমাকে কহিল, "ঠিক কথা, তোমার বোনটির কি ব্যবস্থা করলে সত্যাই ত বয়স হতে চল্ল। she is no more within her teens'। প্রতিমা কহিল "ব্যবস্থা ত তোমার হাতেই'। অশোক ধূম ত্যাগ করিয়া বলিল 'ব্যবস্থা ত আজই কর্ত্তে পারি কিন্তু তুমি যে বলছিলে উর্ম্মিলা betrothedকে একজন মুনসেফের নিকট বাগদত্তা'। প্রতিমা মৃদু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, বাগদত্তা ঠিক নয় তবে বাবা বেঁচে থাকতে তার সঙ্গে কথাটা অনেক দূর এগিয়েছিল, ছেলেটির নাম অসীম চৌধুরী—গেল বছরে ল পাশ করে মুনসেফ হয়েছে। বাপের সম্পত্তিও অনেক সে পেয়েছে, তার বড্ড ইচ্ছে উর্ম্মিলাকে বিয়ে করে—উর্ম্মিলারও তার প্রতি খুব টান। অসীম এই কিছুদিন আগেও আমাকে চিঠি লিখেছে। উর্ম্মিলাকে তার না হলে প্রাণে বাঁচবে না...শুধু চক্ষের নেশা নয় হৃদয় দিয়ে সে উর্ম্মিলাকে ভালবেসেছে ইত্যাদি। আর কতকি কাব্য-কাব্য আমি ভাল বুঝি না—তাই সব লিখেছে," রবার পাউচ হইতে মিক্সচার বাহির করিতে করিতে অশোক বলিল 'তবে আর কি? পাত্র যখন ভাল আর উর্ম্মিলাও যখন তাকে ভালবাসে তাহলে শুভস্য শীঘ্রং। প্রতিমা কহিল "উর্ম্মিলা যে তাকে কিছু কিছু ভালবাসে সে কথা ঠিক, তবে ও দোটানায় পড়েছে'। অশোক মুখ হইতে পাইপ বাহির করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া কহিল 'দোটানায় কি রকম?" টেবিল ক্লথ গুছাইতে গুছাইতে প্রতিমা বলিল 'তোমাকে বুঝি এর আগে শৈলেশের কথা বলিনি? শৈলেশ উর্ম্মির বাল্য বন্ধু বললেও হয়—দুজনে এককালে খুব ভাব ছিল। তখন ওরা দুজনেই ছোট, তার কথা ও প্রায়ই ভাবে। তার প্রভাব ওর জীবনের উপর খুবই বিস্তার করেছে। তাই ও চা খায় না, বিলাতী জিনিষ ছোঁয় না। শৈলেশ লোকটা খুব বিদ্বান ও দেশ-প্রেমিক হলেও কেমন একটু খাম্‌খেয়ালী। দুবিষয় এম এ তে ফার্ষ্ট, দ্বিতীয় বার এম এ পাশ করবার পর যখন কি একটা বিষয় নিয়ে থিসিস লিখছিল সেই সময় তার মামা কোথাকার এক সরকারী কলেজের প্রফেসারী তার জন্যে ঠিক কর্লে, কিন্তু তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গভর্ণমেন্টের গোলামী সে কখনই করবে না, তাই নিয়ে মামার সঙ্গে মনোমালিন্য করে মামার অগাধ সম্পত্তি ও সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে কোথায় গিয়ে খবরের কাগজ বার কল্লে।"

অশোক দাঁত দিয়া পাইপটাকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল "how strange!" প্রতিমা দেবী বলিতে লাগিল 'শৈলেশের মামা ছিলেন বাবার বন্ধু, শৈলেশের মামার অন্য কেহ ছিল না শৈলেশ ছিল তার সকল সম্পত্তির একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারী। সেই জন্যই বাবা মনে মনে শৈলেশকেই উর্ম্মিলার যোগ্য পাত্র বলে ঠিক করেছিলেন। শৈলেশের আমাদের বাড়ীতে অবাধগতি ছিল। সেই সময় উর্ম্মিলা ও শৈলেশে খুব ভাব হয়, কিন্তু মামার সঙ্গে মনোমালিন্য ও সকল সম্পর্ক রহিত হবার পর বাবা তাকে আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করে দেন। তারপর অনেকদিন আর তার দেখা নেই—কোন খবরও তার পাইনি, গেল বছরে বাবা মরে যাবার পর উর্ম্মিলার যখন টাইফয়েড হয় তখন একদিন হঠাৎ ঝড়ের মত এসে হাজির—বল্লে, উর্ম্মির টাইফয়েড শুনে লাহোর থেকে ছুটে এসেছে শুধু উর্ম্মিলাকে চক্ষে দেখতে চায়, তারপর দুদিন থেকে উর্ম্মিলাকে একটু ভাল দেখেই আবার চলে গেল, যাবার সময় অনেক জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে সে লাহোর ট্রিবিউন কাগজে সাব-এডিটারি করছে—মাইনে দুশ টাকার কিছু বেশী পায়, ব্যাস্ তারপর আর কোন খোঁজ নেই তার এই পুরো এক বছর। মনে হয় উর্ম্মিলাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, উর্ম্মিলাও যে তাকে কম ভাল বাসে না তা নয়, তবে ও খুব ভাব-সংযমী খুব চাপা শৈলেশের উপহার দেওয়া বইগুলোও কি যত্নেই না রাখে। ওর কাছে সেগুলো যেন এক একটা কহিনুর।" প্রতিমা চুপ করিল। অশোক কেশ হইতে একটা সিগার বাহির করিয়া টেবিলের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল 'শৈলেশের কথা শুনলুম। তুমি বলছিলে অসীমের সঙ্গেও ওর খুব ভাব হয়—'প্রতিমা কহিল, "হাঁ উর্ম্মিলা তার গানের একজন বড় ভক্ত। লোকটীর সব গুণ আছে। এদিকে মুনসেফ্ আবার গানের গলাও খুব চমৎকার পিয়ানোও খুব ভাল বাজায়; বাবার সঙ্গে সেবার পুরী গিয়ে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, উর্ম্মির গানের ঝোঁক চিরকাল বেশী তাই ওদের দুজনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাব হয়, বাবা শেষে এই পাত্রই মনোনীত করেন কিন্তু তুমি তো জান কিরূপ হঠাৎ তিনি পরলোকে চলে যান, সেই থেকে সব কথা চাপা পড়ে আছে, উর্ম্মিলা বেচারী বড় দোটানায় পড়েছে"। অশোক কহিল 'তাইত কঠিন সমস্যা। এ দুজনের কাকে পেলে ওযে বেশী সুখী হবে আর কে যে ওকে বেশী ভালবাসে তা উর্ম্মিলাও জানে না। সত্যই ও দোটানায় পড়েছে। যাকে বলে parallelogram of forces'। প্রতিমা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—'মীমাংসা কর দেখি কি রকম ব্যারিষ্টার সাহেব বোঝা যাবে'। অশোক উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল 'হাজার গিনি ফি দিতে হবে।" কটাক্ষ করিয়া প্রতিমা বলিল 'তোমাদের না ফি নিতে নেই'। অশোক একটী সিগার ধরাইয়া বলিল 'থাক্ এক্ষেত্রে ফি নোবো না শুধু তোমার শ্রীহস্তের এক কাপ ভাল রকম চা পেলেই' বাধা দিয়া প্রতিমা কহিল, 'ভাল রকম চা মানে খুব বেশী চিনি দিয়ে' অশোক হাস্য করিয়া কহিল "চিনি! তুমি যদি নিজের হাতে কর ত তাতে চিনি মোটেই দিতে হবে না, সেদিন সেই novelটাতে পড়েছিলুম না when lovely Susi sits by my side, I want no sugar in my tea"

হাঃ হাঃ! অশোক হাস্য করিতে লাগিল। প্রতিমা কহিল 'চা দেবো কিন্তু সে বিষয় কি করবে?" হাস্য থামাইয়া অশোক কহিল 'আচ্ছা অসীম বা শৈলেশ কতদিন তোমাদের খবর পায়নি?" প্রতিমা উত্তর দিল 'তুমি land করবার পর অর্থাৎ দুই তিন মাস মধ্যে তারা কেউ কোন খবর পায় নি অন্ততঃ আমাদের দিক থেকে' অশোক কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল 'আচ্ছা ব্যবস্থা হবে।'

* * * *

তিন

সত্যব্রত রায়, স্বীয় চেষ্টায় ও পরিশ্রমে অতি সামান্য অবস্থা হইতে বিশেষ ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, অশ্বিনী কুমার মজুমদার ও তিনি একত্রে বিগত মহাযুদ্ধের কালে কাট চালানের ব্যবসায় অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। এই ব্যবসায় বহুপূর্ব্ব হইতেই অশ্বিনী বাবুর সহিত সত্যব্রত বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শৈলেশ এই অশ্বিনী বাবুর ভাগিনেয়। সত্যব্রত বাবুর পুত্র ছিল না। প্রতিমা ও উর্ম্মিলা তাহার দুই কন্যা, তিনি কন্যাদ্বয়কে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেন। অশোক সত্যব্রতবাবুর এক দরিদ্র বন্ধুর পুত্র, তিনি বন্ধু-পুত্র অশোকের সহিত স্বীয় কন্যা প্রতিমার বিবাহ দিয়া তাহাকে বিলাতে ব্যারিষ্টার

হইবার জন্য পাঠান। সত্যব্রতবাবু প্রথমা কন্যার বিবাহের পর দ্বিতীয় কন্যা উর্ম্মিলার জন্য বহুদিন যাবৎ মনে মনে শৈলেশকেই পাত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মাতুলের সহিত শৈলেশের সম্পর্ক রহিত হইবার পর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পুরীতে পরিচিত মুনসেফ অসীম চৌধুরী নামক একটি যুবকের সহিত সে বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে নব বিলাত প্রত্যাগত জামাতা অশোকের উপর সাংসারিক যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া অকস্মাৎ ওপারে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। অসুস্থতার জন্য অশোক এখনও প্রাক্‌টিস আরম্ভ করে নাই এবং সেই জন্যই স্ত্রী প্রতিমা ও প্রতিমার ভগ্নী উর্ম্মিলাকে লইয়া দার্জ্জিলিং আসিয়াছে। উর্ম্মিলা মার্টিনেয়ার হইতে এবার সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়াছে।

* * * *

পরদিন অশোক কুমার দুইখানি পত্র লিখিল, পত্র দুটির ভাব ও ভাষা একই।

মাননীয় মহাশয়—

আপনি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিবেন না আমি স্বর্গীয় সত্যব্রত রায়ের প্রথম জামাতা, অদ্য আমার স্ত্রী প্রতিমা দেবীর বিশেষ ইচ্ছায় আপনাকে এই পত্র দিতেছি। আমার শ্বশুর মহাশয়ের জীবিতকালে উর্ম্মিলার সহিত আপনার বিশেষ ভাব হয় শুনিয়াছি—আপনাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। সেই হেতু আজ আপনাকে একটী অনুরোধ করিতে সাহসী হইলাম। গত মাসে উর্ম্মিলা ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়, আমরা তাহার আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, বহু ভাগ্যক্রমে বহু অর্থব্যয়ে, সুচিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় তাহার প্রাণ অতিকষ্টে ফিরাইয়া পাওয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ দুষ্ট রোগে তাহার সকল বাহ্য সৌন্দর্য্য চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে উর্ম্মিলার অন্য কোন উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দেওয়া একেবারে অসম্ভব। অপর কোন সুপাত্র উহাকে স্ত্রী করিতে স্বীকৃত হইবে না। তবে আপনার কথা অন্য, যেহেতু আপনি উর্ম্মিলাকে ভালবাসিয়াছেন। শুনিয়াছি প্রেমিকের চক্ষে বাহ্য সৌন্দর্য্য কিছুই নহে যেহেতু তাহারা চখের নেশা দিয়া ভালবাসে না—তাহাদের প্রেম অন্তর লইয়াই কারবার করিয়া থাকে, যাহা হউক আমরা উর্ম্মিলার বিবাহের কথাবার্ত্তা এই মাসেই স্থির করিতে ইচ্ছা করি, আপনার মতামত সত্বর জানাইলে বাধিত হইব। আপনার পত্রের অপেক্ষায় আমরা সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত চিত্তে রহিলাম, আপনি বিবেচক ও প্রেমিক। আপনার নিকট হইতে আনন্দজনক উত্তর পাইব ইহা আশা করি। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শুক্রবার বশংবদ
দি টাওয়ার শ্রীঅশোক সেন
মাউণ্ট প্লেসেণ্ট রোড

পত্র দুটি লেখা হইলে অশোক প্রতিমাকে দেখাইল। প্রতিমা উহা পড়িয়া বলিল এতও মিথ্যে কথা বানাতে জান, কোথায় বসন্ত রোগ আর কোথায় বাহ্য সৌন্দর্য্য আরও কত কি! তুমি shine করবে শীগগিরই। বলতে নেই উর্ম্মিলার সেই বড় অসুখটার পর হোটেলে থাকলেও এই এক বছরে কোন দিনের জন্যও জ্বর হয় নি আর দেখতেও কেমন নিখুঁত সুন্দরী হয়েছে। যাক্ এতে আসল প্রেমিক কে ধরা যাবে।

সিগার টানিতে টানিতে অশোক বলিল 'The idea'!

চিঠি দুটিখানা খামে আঁটিয়া প্রথম খানিতে অশোক কুমার ঠিকানা লিখিল।

Mr Sailaish Sen Gupta M. A.
Sub-Editor The Tribune
Third Road
Lahore
The Punjab.

অন্য খানির বহির্ভাগে লিখিল—

Mr. Asim Chowhury, Munsiff
P 302/3 Lake Road
Ballygaunge
Calcutta.

পত্রদুটি পাঠাইবার এক সপ্তাহ মধ্যেই উভয় পত্রের উত্তর আসিল। অশোক কলিকাতা হইতে আগত পত্রটি প্রথমে খুলিয়া পড়িতে লাগিল :—

মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। সামান্য কয়দিনের আলাপে কুমারী উর্ম্মিলা দেবীকে যে কিরূপে

ভালবাসিয়া ছিলাম তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার জানা নাই, সেই সময় হইতেই উর্ম্মিলাকে পাইবার জন্য আমার প্রাণ মন বিশেষ আগ্রহান্বিত কিন্তু এ বিবাহে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর আপত্তি আছে। জগতে এই ভগ্নীটি ব্যতীত, আর আমার কেহ নাই, অতএব তাহার একান্ত অনিচ্ছায় নিজের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্বেও এস্থলে মত দিতে পারিলাম না। আশা করি আপনারা সকলেই আমাকে ক্ষমা করিবেন। একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে ও অধিক অর্থের লোভ দেখাইলে উর্ম্মিলার জন্য আপনারা সুপাত্র পাইবেন।

ইতি

আপনাদের চিরবন্ধু অসীম চৌধুরী

অশোক প্রথম পত্রটি পাঠ সমাপ্ত করিয়া মনে মনে হাস্য করিতে করিতে একটি সিগার মুখে দিয়া লাহোর হইতে আগত পত্রটি খুলিল,

পুজনীয় অশোক বাবু,

সবই জ্ঞাত হইলাম, তথাপি উর্ম্মিলাকে পাইলে আমার এ জীবন সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব। আপনারা আমার মত নিস্বব্যক্তির হস্তে তাঁহাকে দিবেন কিনা জানিনা, যাহা হউক আপনাদের নিকট হইতে দ্বিতীয় পত্রের আশায় বিশেষ আগ্রহান্বিত রহিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র উত্তর দিবেন। ইতি—

আপনাদের

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত

সম্পূর্ণ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

'তোমারে বাসিনু ভালো' এইটুকু এতটুকু শুধু
পূর্ণ করে ছিল প্রাণ মর্ম্ম মাঝে সঞ্চারিয়া মধু—
আলোকে আঁকিল হাসি ; অন্ধকারে অপূর্ব্ব বিরাম
দিনেরে সৃজিল লিপি নব নব পরিচ্ছেদ নাম।
ঋতুর নুপুর হ'তে ঝরে পড়া কুসুমে পল্লবে,
মধুর মৃদঙ্গ রবে, মর্ম্মর গুঞ্জিত কলরবে,
শুনায়ে সঙ্গীতে সুরে, সম্ভাষণ কথা কত বার,
ত্রিভুবন ভরি মোরে অপরূপ পরিচয় তার।
কখন বারতা এলো হয়ে গেছে সারা সে সঞ্চয়
এবারে ফিরিতে হবে, এবারে নূতন পরিচয় ;
কোটী গ্রহ নক্ষত্রের আঁকা বাঁকা আলো-ছায়া পথ,
নন্দাতিথি হারায়েছে ; রিক্ত যাত্রা এবারের কত,—
সে দিবস সাঙ্গ হ'ল, এবারে নূতন অহরহে,—
স্বপনে চিনিতে হবে, মূক স্তব্ধ একান্ত বিরহে ;
মৃত্যুতে চিনিতে হবে, বিচ্ছেদে বাসিতে হবে ভালো
অজানা সীমান্ত চাহি পথপ্রান্তে জ্বালি সন্ধ্যা আলো।

নামহীন এদিনের ঋতু পত্রে আজ লিখে রাখি,
সেদিনের ভালবাসা এদিনের বিরহেতে আঁকি ;—
—মধুর বিন্দুর চেনা, নাম নাই সীমা নাই যার—
'নন্দা' রিক্তা পূর্ণ যাত্রা অপরূপ সম্পূর্ণ আমার।

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

উপন্যাস

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(৫)

প্রভাতের চিঠিটা পড়তে খুব বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু পড়ে প্রকৃতিস্থ হতে তার একটু সময় লাগ্‌ল। মাথার ওপরে পাখাটা খোলা থাকা সত্ত্বেও তার চোখ মুখ দিয়ে অসম্ভব গরম বের হয়ে, সমস্ত মুখখানাকে সিন্দুঁর করে তুলেছিল।

খোলা চিঠিখানা সামনের টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সে কাছাকাছি একটা সোফায় বসে পড়ল। ভাবতে লাগ্‌ল, কোথা থেকে কিসের সংঘটন! সে তো বিয়ের কোন কথা এখনও মনেও আনতে পারেনি। তার ওপর পিতার কথায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যদি বিয়ে করতেই হয় তো সে কি এই মীনার মত মেয়ে! যে শুধু বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনো ও আদব কায়দাই শিখেছে! এ কি তার বাবাকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি বা শান্তি দিতে পারবে? একি তার মাতৃহীন ছোট ছোট ভাই কটীকে 'ভাই' বলে টেনে নিতে পারবে? উদ্যানলতা কি বনলতা হতে পারে? একে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখা চলে, শিউলী, অতসী কুন্দর মত একে যেখানে সেখানে রাখা চলে না—ভাবনা তো অনেক। মনে মনে হেসে বল্‌লে "ছিলাম কল্‌কাতায়, মার্চ্চেণ্ট আপিসের বড়বাবু, দশটা, চারটা আফিস করি। চার দিনের ছুটি পেয়ে আর ৮ দিন আদায় করে বেড়াতে এলাম এখানে। দামোদরের উংপত্তি দেখ্‌ব বলে। 'রাজরূপায়' গেলাম, ফিরতে পথে মোটর ভেঙে কি দুর্ভোগেই পড়েছি! অতিথি হয়ে এদের বাড়ী এসে, অতিথির সংকার তো যতদূর হবার হলো, বিদায়কালে দক্ষিণারও দেখ্‌ছি ভাল রকম ব্যবস্থা হচ্ছে—একেবারে কন্যাদান! এ যে রীতিমত আরোব্যপন্যাস!

প্রভাত যখন এই রকম ভাবনায় ভোর, বন্ধ দরজা ঠেলে রমাপতিবাবু ঘরে ঢুকে পেছনে দরজটা বন্ধ করে এসে প্রভাতের সামনে একটা চেয়ার সরিয়ে বস্‌লেন। তাঁর এসে বসায় এবং পরের কথাগুলি কি হবে তাই ভেবে সে নিজেকে প্রস্তুত করছিল। চেয়ারে বসে বিনা ভূমিকাতে তিনি বল্‌লেন "তোমার বাবার চিঠিখানা কি পড়েছ প্রভাত?""

মাথা নীচু করে সে বললে 'হাঁ'।

"তোমার কি মতামত এ সম্বন্ধে? আমার মেয়েকে তো দেখ্‌লেই—পড়াশুনা সে আই,এ পর্য্যন্ত করেছে। আর আচার-ব্যবহার—তা সে কথা তো ঘরে না নিলে বুঝ্‌তে পারবে না বাবা। ওর মন যে কত কোমল ও কত দৃঢ় তা একমাত্র আমিই জানি—আর জানি বলেই আমার সঙ্গে ওর যত বনে, এত ওর মায়ের সঙ্গেও বনে না। আর তুমিও তো ক'দিন ধরে ওকে দেখ্‌ছ বাবা" প্রভাতের হাসি এল। ভাব্‌লে, বলে যে 'কতটুকু আর কিই বা আমি দেখেছি?' কিন্তু কিছু না বলে চুপ করেই রইলো। তার কাছে কোনো সম্মতির কথা না পেয়ে রমাপতিবাবু হঠাৎ যেন কি আবিষ্কার করলেন, এইভাবে বললেন "তবে হ্যাঁ, তুমি যদি আর কোথাও বিবাহ করতে ইচ্ছা করে থাক বা বাগদত্ত হয়ে থাক, তবে আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মনস্তাপ পেতে দেবো না। আমাকে তুমি, তোমার বিশেস হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই জেনো।" তাঁর কথার সুরে বিচলিত হয়ে প্রভাত বললে "না, না, ওসব কোনো কথা নয়। আসলে আমি বিয়ে সম্বন্ধে এতদিন কিছুই ভাবিনি—হঠাৎ সেটা অপ্রত্যাশিত রকমে আসন্ন হয়ে পড়ায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি মাত্র। আর কিছুই নয়।"

হো হো করে হেসে রমাপতিবাবু বল্লেন "এইতো বাবা বুদ্ধিমান হয়ে বোকার মত কথাটা বল্লে! পাগল ছেলে! বড় হয়েছ, পয়সাকড়ি ঘরে আন্‌ছ—আর বিয়ে করবার কথাটা মনে করনি তাই কখনো হয়? আমার মেয়ে কে বিয়ে

করবে তা না হয় ভাবোনি—কিন্তু কারো না কারো মেয়েকে বিয়ে করে তোমাকে সংসারী হতে হবে, তা ভাবা তো উচিত ছিল।

প্রভাত নতমুখে বসে রইলো।

রমাপতিবাবু বলেই যেতে লাগলেন—"তারপর তোমার বাবার যখন এতে বিশেষ সম্মতি আছে, উপযুক্ত ছেলে তুমি, তোমার কি তাঁর ইচ্ছামত কাজ করা উচিত নয়? বিশ্বাস করো আমি কথা দিচ্ছি, আমার মেয়ে তোমাকে কখনো দুঃখু দেবে না। কি বল বাবা, তোমার মত আমাকে জান্‌তে দাও"—বলে তিনি প্রভাতে হাতদুখানি চেপে ধরলেন।

প্রভাত একটু বিব্রত হয়েই বল্‌লে 'বাবার ইচ্ছায় ইচ্ছা—তিনি দুঃখু পাবেন বলে এ পর্য্যন্ত তাঁর অমতে কোনো কাজই করিনি। কিন্তু মতটা যে একলা আমার হলেই হ'বে না—আপনার মেয়েরও মতটা জানা দরকার। তিনি উচ্চ শিক্ষিতা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করবার ইচ্ছা বা অধিকার তাঁকে আপনার দেওয়া উচিত। এতো নিরক্ষরা পল্লীবালিকা নয় যে যাকে ধরে আপনারা বিয়ে দেবেন, তাকেই সে খুসীমনে মানিয়ে নেবে!"

রমাপতিবাবু প্রভাতের সম্মতি পেয়ে এবারে জোর গলায় হেসে উঠলেন। বল্লেন, 'মেয়েকে উচ্চ শিক্ষাই দিই আর যাই করি, হিন্দু নামটা তো আর মুছে ফেলতে পারছিনে!—তাই বাইরে যতই অহিন্দুয়ানী করি ভেতরটা আমার ঠিক আছে। ছেলেমেয়ের বিয়েথাওয়া সবই আমার মতে থাকে। একি সাহেব বাড়ী, যে বিয়ের আগে 'কোর্টশিপ' চাই, 'প্রোপোজ' চাই তারপরে 'এনগেজড্' হয়ে তখন মা বাবা জান্‌তে পারবেন"—না, না তুমি ওসব কিছুই মনে কর না। তোমাকে স্বামী পেয়েও যদি মনে সুখী না হতে পারে তবে বুঝবে সেটা তার কপালের দোষ। তার অদৃষ্টে সুখ ভোগ নাই তাহলে। লোক চেনার ক্ষমতা আমার আছে। তাইতে প্রথম তোমাকে দেখেই আমার মাথায় যে প্ল্যানটা এসেছিল তা প্রায় শেষ করে এনেছি। কুলি মজুর খাটাই বলে বুদ্ধিটাও আমার তাদের মত মোটা নয়, বুঝলে?" বলে তিনি আবার তাঁর সেই সরল হাসি হাস্‌লেন।—

প্রভাত ধীরে ধীরে বল্‌লে "আপনাদের সকলের মতে আমি যদি একান্ত সুপাত্র হয়ে থাকি তবে আমার নিজের আর কোন আপত্তি নাই।"

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রমাপতি বাবু বল্লেন "বড় নিশ্চিন্ত করলে আমায়। যাই এখনও কাউকে জানানো হয়নি। সবাইকে সুখবরটা জানাইগে। প্রভাত তুমিও এস।"

"যাচ্ছি একটু পরে।" রমাপতি বাবু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেলেন।

প্রভাত তাঁর পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় বসে পড়ে ভাবতে লাগল, তার অদৃষ্ট তাকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিয়ের কথায় বিশেষ আপত্তি তো সে করল্‌না, কেন? পাত্রী মীনা বলে? না, তাই বা কেন? মীনাকে সে ক' মুহূর্ত্তই বা দেখেছে? তার কতটুকু কথাই বা সে জানে? তবে, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ বিয়ে করতে রাজী হওয়ার কি কারণ? পিতৃভক্তি না নিজের দুর্ব্বলতা? সে যাই হোক; ভাগ্যে বিষ বা অমৃত যাই থাক নীলকণ্ঠের মত তা পান করতেই হবে।

প্রভাতের এই ভাবনায় বাধা দিয়ে, শুভ্রাংশু স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। একলা তাকে বসে থাকতে দেখে বল্লেন "একি আপনি যে এখানে একলা! অথচ আপনাকে কেন্দ্র করেই আজকের নিমন্ত্রণটা হয়েছে! স্বরটা কিছু স্নেহের বলেই প্রভাতের মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়্‌ল যে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই সে এবাড়ীর বিশেষ আত্মীয় হবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে, আর শুভ্রাংশু নিশ্চয়ই সেই আত্মীয়তার দাবী করতে এসেছেন। পুরুষ হলেও নতুন বিয়ের কথাটা মনে করতেই তার সারা দেহ মনে একটা শিহরণ চলে গেল। শুভ্রাংশু তার এই বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে বল্‌লেন "চলুন, চলুন, বাবা ডাকছেন আপনাকে কার সঙ্গে যেন আলাপ করিয়ে দেবেন।"

এ আহ্বানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝ্‌তে প্রভাতের একটুও দেরী হল না। ভবিষ্যতের ভাবনা ঝেড়ে ফেলে সে এখন বর্ত্তমানকেই নিতে চল্‌ল।

শুভ্রাংশুর সঙ্গে প্রভাতের ঘরে ঢোকা মীনার চোখ এড়াল না। তার গান তখন চলছে—

একলা চলা পথটী আমার করব রমণীয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিও

অনেক দূরে সকলের আড়ালে, নিজেকে লুকিয়ে প্রভাত বসে পড়্‌ল। গানের লাইন ছটী তার মনে যেন গভীর দাগ দিয়ে যাচ্ছিল। এ গান তো সে আগে আরো কতবারই যে পড়েছে, কিন্তু তার ভিতরের রূপটা তো এমন করে তখন ধরা পড়েনি। নিজের মনের ভাবান্তর হয়েছে বলে কি গানের কথাগুলি ধরা দিচ্ছে? হবেও বা। মীনা গেয়েই চল্‌ল—

হৃদয় আমার চায় যে দিতে কেবল নিতে নয়
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে, তার যা কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে।
ধরবো তারে, ভর্‌বো তারে, রাখবো আমার সাথে।
একলা পথের চলা, আমার কর্‌ব রমণীয়। '
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিও।

প্রভাত ছই কাণ ভরে শুনেই যেতে লাগল। গান শেষ হলে মীনা বাজনাটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রমাপতি-বাবু প্রভাতের হাত ধরে সামনে এনে বল্লেন "এই প্রভাত আমার সতীর্থ ও বাল্যবন্ধুর ছেলে। এম, এ পাশ করে মার্চ্চেন্ট আফিসে বেরোচ্চেন—শীগ্‌গীরই চাকরীটা পাকা হয়ে যাবে। এঁরই সঙ্গে আমি মীনার বিয়ের ঠিক করেছি। পাত্রের রূপ তো আপনারা দেখছেন, গুণও শুন্‌লেন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন মীনা কোনও দিন অসুখী না হয় বা এঁদের অসুখের কারণ না হয়। হঠাৎ বিয়ের কথা শোনায় সবাই প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন; তার পর দেখ্‌লেন 'ভোলানাথ' রমাপতি বাবু বেশ সস্তায় ও অনায়াসে একটী সুপাত্র বের করেছেন। মনে যাঁর যাই থাক্‌ —বাইরে কিন্তু আশীর্ব্বাদ ছাড়া, করবার তাঁদের আর কিছু রইল না।

এই কথা শোনার পরে মীনার সেখান থেকে চলে যাওয়া বা থাকা ছুইই সমান অসুবিধা বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু যায়ই বা কি করে? এখন যে ঘরের সব লোকগুলিরই চোখ তার উপরেই আছে, এই সামান্য কথাটা সে চোখ না তুলেই বুঝ্‌তে পারছিল। প্রভাতের অবস্থা আরও শোচনীয়। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সে যেন মীনার কাছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? এই সঙ্কট থেকে তাদের মুক্তি দিলেন রমাপতি বাবু। এক হাতে প্রভাতের হাত অন্য হাতে মীনার হাত নিয়ে তিনি বল্লেন, "মীনা, আমি তোমার পিতা ও প্রভাতের পিতৃ-স্থানীয়। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমাদের মিলিত করে সুখে ও শান্তিতে রাখুন। দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অনটন কিছুই যেন তোমাদের আত্মাকে মলিন না করে।" মীনা ধীরে ধীরে তার বাবার হাত ছাড়িয়ে মাথাটা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রভাতের অজ্ঞাতে তার চোখ ছটী মীনার গমন পথে চেয়ে দেখলো। হঠাৎ অনেক দিনের পুরোণো কথা একটা তার মনে এল "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" কথাটা কবিরা ঠিকই বলেছেন।

৬

বিয়ের কথা পাকাপাকি হবার পরে প্রভাত সেখানে আর কিছুতেই থাক্‌তে চাইল না। রাত্রেই যদি যাওয়ার সময় থাক্‌তো, তবে সে চলেই যেত। কিন্তু ট্রেণের সময় না থাকায় বাধ্য হয়ে সে-রাত্‌ অপেক্ষা কর্‌তেই হল. একে তো নিজের লজ্জাকর অবস্থার জন্য সে বিশেষ অস্বস্তি ভোগ কর্‌ছিল, তার ওপর সকলের সসম্ভ্রম 'জামাই বাবু' সম্বোধন তাকে আরো লজ্জিত করে তুল্‌ছিল।

যে ঘরটায় সে থাক্‌ত সেটা বাইরের বাগানের গা ঘেঁষেই ছিল। ছদিন আগে কোজাগর পূর্ণিমা হয়ে গিয়েছে। শরতের ধব্‌ধবে্‌ জ্যোৎস্নায় সারা আকাশ ভেসে যাচ্ছে। তারই ছায়া পৃথিবীর, মাটী, গাছপালা, ফল-ফুল, বাড়ী-ঘরের ওপরে পড়ে তাকে যেন মায়াপুরী করে তুলছিল। প্রভাত আজ আর ঘরে থাক্‌তে পার্‌ছিল না। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনাগুলি, একে একে বায়স্কোপের ছবির মত তার মনের ভিতর ঘুরে চল্‌ছিল। কোথায় ছিল সে, আর কোথায় ছিল এই মীনা! কি সূত্র অবলম্বন করে যে বিশ্বশিল্পী এই ফুল ছটী গাথ্‌ছেন তিনিই জানেন।

ঘরের সব জানালা ক'টী খুলে দিয়ে, সে বেড়াতে আরম্ভ কর্‌ল, তার আর শেষ নাই। জানালার ফাঁক পেয়ে জ্যোৎস্না যেন হাসিমুখে, তার বিছানায়, ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়্‌ল। মনের পূর্ণতায় সে যেন অধীর হয়ে উঠ্‌ল —এত আবেগ তার মনে আর ধর্‌ছিল না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আলনা থেকে সবুজ রংয়ের আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে বাহিরে বাগানের জ্যোৎস্না সমুদ্রে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রমাপতিবাবু কনট্রাক্‌টারী করেন; পয়সার কোনো

অভাব নাই। বাগানখানি এমন করে সাজিয়েছেন যে, যে-কোন লোকেরই সেখানি দেখে লোভ হয়। হাজারিবাগের মত জায়গায় পাহাড় কেটে যেন নন্দন কানন তুলে এনে বসিয়েছেন। বাগানের মধ্যে যে পাথরের মূর্ত্তিগুলি ছিল, তার ওপরে জ্যোৎস্না পড়ে সে গুলোকে যেন আরও শাদা করেছে। অন্যমনস্ক হয়ে তারই একটার নীচে সে বসে পড়ে ফের গোড়া থেকে সন্ধ্যার ঘটনাগুলি মনে করতে চেষ্টা করলে। মীনা কি এসব জানত? জানলে কি আর আসতে পারতো? কিংবা এদের সাহেবী কায়দায় হয়তো বাধে না। কিন্তু মেয়েটী যে কেমন তাতো একটুও বোঝা গেল না। সুন্দরী, তা তো দেখাই গিয়েছে—তার ওপর সযত্নে পরা হেলিওট্রোপ শাড়ী, মুক্তার মালা ও নীল মীনাকরা চুড়ি দুটীতে তার সৌন্দর্য্য যেন আরো ফুটে বেরোচ্ছিল। আচ্ছা, হেলিওট্রোপ না পরে যদি অন্য রংএর শাড়ী পরত, তা হলেও কি এ রকম সুন্দর দেখাত? দেখাত বোধহয়, যে সুন্দর তাকে সব জিনিষেই সুন্দর দেখায়। চোখের কোণের টানটী, ঠোঁটের বাঁকান ভাবটী, ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়া এলো খোঁপা, তার ফাঁক দিয়ে আধ ফুটন্ত গোলাপের কলিটী, চাঁপার কলির মত লতানে আঙুলে এঁটে বসা আংটীটী, বাঁ হাতের ঘড়িটী সবই তার মনে এখন রং ধরিয়ে দিচ্ছিল। মুহূর্ত্তের দেখায় প্রভাত এতটাই দেখে ফেলেছিল। কাপড় পরার ভঙ্গি, পায়ের লাল ভেলভেটের উপর রূপালী কাজের শ্লিপার, কাণের, অশ্রু বিন্দুর মত টলটলে মুক্তা দুটী তার মনে মায়াজাল বিছিয়ে দিচ্ছিল। চারদিক নিস্তব্ধ, মাথার ওপরে আকাশে জ্যোৎস্না ঢলঢল, চারি পাশের যতদূর চোখ যায় সব সাদা ফোয়ারার জলে লক্ষ লক্ষ হীরার কুচি, প্রভাত ভাবলে অতি সন্তর্পণে একবার অক্ষর দুটি বলে দেখি নিজের কানে কেমন শুনতে লাগে! বলেই ধীরে ধীরে 'মীনা' 'মীনা' বলতে চারিদিকে একবার দেখে নিলে কেউ শুনেছে কিনা। তারপর হেসে বললে "আমার আজ হল কি! পাগল হলাম নাকি?—"

বাগানে একটা 'সামার হাউসও' ছিল। তার ভিতরে দুখানি হেলান বেঞ্চি ফেলা ছিল। অন্য মনে সেই "সামার হাউসের" দিকে যেতে যেতে প্রভাত দেখলে যে একটা পাথরের মূর্ত্তি যেন বড়ই শাদা দেখাচ্ছিল। ভাল করে চোখ মুছে দেখলে যে, সেখানে মানুষের মত একটা কি ছায়া আলোতে মিশে সেই মূর্ত্তিটাকে আরো শাদা করে তুলেছে একবার দেখেই সে মুহূর্ত্তে পিছন ফিরলে। ভাবলে বো হয় অন্তঃপুরের সীমানায় এসে পড়েছে। বাড়ীর মেয়েদে কারো বোধহয় জ্যোৎস্নায় এই অপরূপ মায়ালোকে, তার মত বেড়াতে সাধ হয়েছে। ছি! ছি! তার আজ হে কি? মনের আবেগে সে সীমানার বাইরে চলে এসেছে যদি ওই নারী, কারণ তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব ন তাকে দেখে থাকেন তো না জানি কি মনে করছেন। আত্ম গ্লানিতে মন তার পূরে উঠল।—

দু এক পা যেতে না যেতেই সে পিছন থেকে মৃদু অথ তীক্ষ্ণ আহ্বান শুনলে। শোনার ভুল মনে করে এগিয়েই যেতে লাগল। আবার সেই আহ্বান "একটু শুনুন।"—এবারে আর ভুল নয় বুঝে সে ফিরে প্রশ্নকারিণী দিকে গেল। চাঁদের উপর তখন একটুকরো কালো মেঘ এসে তার জ্যোতিকে ঢেকে ফেলছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সে শুনলে; কে বলছে, "আপনার সঙ্গে কথা বলছি বলে আমাকে প্রগল্‌ভা ভাববেন না; খুব দায়ে পড়েই আমি এরকম করতে বাধ্য হয়েছি জানবেন। আর কাউকে দিয়ে একাজ হতে পারলে আমি আর নিজে এ লজ্জা ভোগ করতাম না।"

কথার স্বরে প্রভাত বুঝলে যে মীনাই এখানে আছে। যে মীনার চিন্তায় তার এতক্ষণ কাটছিল যে মীনাকে দুদিন পরেই একান্ত আপনার বলে মনে করতে পারবে সেই মীনাকে হঠাৎ এই নির্জ্জনে নিজের এত কাছাকাছি দেখে সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ভয়ও যে না হল তা নয়। বিয়ে তো হয়নি এখনও, মীনার কাছে এখনও সে পর মাত্র—এই নিশীথ নির্জ্জনে যদি কেউ তাদের দেখে?' কোনো কথা শোনার আগেই দোষের ভাগী হতে হবে। একবার সে ভাবলে চলে যাই। আবার ভাবলে ভয়ই বা কি? দুদিন পরে যাকে বিয়ে করব বলে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তার সঙ্গে যদি নির্জ্জনে দুটো কথা বলি, তাতে দোষ এমন কি হবে? হিন্দু সমাজ ছাড়া, আর সব সমাজেই তো এই-ই নিয়ম। কেউ যদি কিছু ভাবে বা দেখে, দেখুক—মীনা কি বলতে চায় আমাকে, সেটা আমার শোনা কর্ত্তব্য। মেঘের ছায়াটা চাঁদের ওপর

থেকে সরে গিয়ে চারিদিক আবার শাদা জ্যোৎস্নায় ভরে উঠ্‌ল। প্রভাত মীনার দুহাত তফাতে দাঁড়িয়ে বললে, "বলুন"। উত্তর শুনে মীনার হাসি এল। ভাবলে ঠিক্ আর্য্য প্রথামত আলাপ চল্‌বে নাকি! হাসিটা সাম্‌লে নিয়ে সে বল্‌লে "বাবার কাছে, আমার সম্বন্ধে বোধহয় অনেক আজগুবী কথা শুনেছেন, কিন্তু আসলে আমি তা নই। আমার কথা বাবা বড় বেশী করেই বলেন! আমি যা, তা আমি নিজেই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আর বছরে ম্যাট্রিক পাশ করেছি, ছোটবেলা থেকে বোর্ডিংএ থেকে থেকে সাংসারিক বুদ্ধি বা কর্ম্ম-প্রবৃত্তি আমার মোটেই নেই। সকলের কাছে যত্ন পেয়ে পেয়ে অন্যকে যত্ন করাটা আমার আদৌ আসে না। এরকম সব গুণ থাকাতে কি আপনাদের সংসারে আমাকে চল্‌বে? তারপরে আমি মনে করেছি, অন্ততঃ বি-এ পর্য্যন্ত পড়ে নামের পাশে একটা ডিগ্রী বসাব। কিন্তু বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পড়েছি এবং ভবিষ্যতে যে অবস্থায় পড়ব, তাতে করে আমার কিছুই হবে না।"

"কিছুই হবেনা বল্‌ছেন কেন? ভবিষ্যতে আপনি যেভাবে থাক্‌লে খুসী হবেন, আমরা আপনাকে সেইভাবে রাখার চেষ্টা কর্‌বো। কিন্তু এতো সামান্য কথা—এইটাই এত বড় বলে মনে কর্‌ছেন কেন?—"

"না, এর পরেও আমার আরো কথা আছে। বিয়ে করাটাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—এ ছাড়াও করবার আরো ঢের কাজ আছে। আপনি শিক্ষিত ও কৃতী; কিন্তু ভেবে দেখুন তো বিয়েটা কি সকলের পক্ষে দরকারী? আপনার হয়তো দরকার, কিন্তু আমার চেয়েও সর্ব্বাংশে ভাল মেয়ে আপনি খোঁজ করলে ঢের পাবেন।"

গম্ভীর স্বরে প্রভাত বল্‌লে "তা হয়তো যেতে পারে। কিন্তু দেখুন, যে জিনিসটা আপনার বাবা ও আমার বাবা দুজনে মিলে ঠিক বলে মেনে নিয়েছেন, সেটার ভিতরে যে কিছু না কিছু সু ও শুভ আছেই এটা আমি অস্বীকার করতে পারছি না। যে বন্ধন মানুষ থেকে আরম্ভ করে সামান্য পশু, পাখী পর্য্যন্ত স্বীকার করে নিচ্ছে স্বেচ্ছায়, তাতে আপনার এত আপত্তি কেন?"

"কারণ তো আপনাকে বলেইছি। দূর থেকে যে জিনিস ভালো দেখায় কাছে গেলে তখন আর তত ভাল দেখায় না।—"

"আচ্ছা, ধরুন, আপনার যা' কিছু অসুবিধা তা যদি দূর করে দেওয়া যায়, তা হলেও কি আপনার মত বদলাতে পারে না?"

"হাঁ, পারে। কিন্তু কেনই বা আপনি এত করবেন? চেষ্টা কর্‌লেই তো ভাল মেয়ে পেতে পারেন।—"

আকাশে কোথাও আর মেঘের ছায়া ছিল না। হেনার গন্ধ চারিদিকের বাতাসকে ভারী করে তুল্‌ছিল। প্রভাত দেখলে মীনা তখনও তার সেই সন্ধ্যার সাজ খোলে নি। কাণের মুক্তা দুটী ও গলার মালাটী চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠ্‌ল। একবার মীনার দিকে দেখেই আত্মহারা হয়ে হঠাৎ সে বলে ফেল্‌লে "বারে বারে—তুমি আমাকে সরিয়ে দিও না মীনা। মন যাকে একাগ্র হয়ে পেতে চাইছে, মিথ্যা ছলনায় তাকে আর ঘুরিও না। তোমার বাবার যখন সম্মতি পেয়েছি, তখন পৃথিবীর আর কোনো বাধাই আমি মান্‌বো না। পাহাড় ধ্বসে যখন ঢল নামে তখন তার গতি রোধ কর্‌তে পারে, এমন কিছু পৃথিবীতে নেই—আপন গতি বেগে, পথে-বিপথে সে পথ করে চলে। আমার মনের যে সুপ্ত বৃত্তিকে তোমার বাবার সাহায্যে জাগিয়েছি, সে আর নিবৃত্তি হবেনা—সুবিধা পাই তো দেখিয়ে দেব। তোমাকে ফুলই দেব মীনা, কাঁটা দেবনা।"—

"কিন্তু কেন?—কেন আপনি আমার জন্যে এত অসুবিধা ভোগ করবেন?—"

"কেন করব? কেনই বা কর্‌বনা? বিজয়-যাত্রা করে বেরিয়ে ছিলাম, জয়শ্রী সঙ্গে নিয়ে ফিরব। এখানে আসা আমার সার্থক হলো। আমি সুখী হব—কিন্তু তুমি তো —"

একটু এগিয়ে এসে মীনা বল্‌লে "মাপ কর্‌বেন। আমি আপনাকে পরখ কর্‌ছিলাম। জানেন না কি যে, হিন্দু মেয়ের বিয়ের কোনো কথায় থাক্‌তে নেই—মা, বাবা ও অভিভাবকে যা করেন তাই শিরোধার্য্য!—দেখ্‌ছিলাম যে দায়ে পড়ে বিয়ে না অন্য কিছু!—কলেজেই পড়ি আর বোর্ডিং এই থাকি, বাবার আদেশেই আমার সব চেয়ে বড়।

আপনার ঘরেই আমার শেষ আশ্রয় তা ভাল করে জেনেই কথা বলতে এগিয়েছি—না হলে বল্‌তাম না।—”

“মীনা, এতক্ষণ তুমি ছলনা কর্‌ছিলে?—কিন্তু দরকার ছিল কি?—”

“না, কিছুই না। শুধু একটা খেয়াল।” বলে উঠে দাঁড়িয়ে সে বাগানের পথ ধর্‌ল। সরে দাঁড়িয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে প্রভাত বল্‌লে “একটা কথা; কালই আমি চলে যাচ্ছি। আবার ঠিক সেই সময়ে হাজির হব। গত কাল যা মনেও কর্‌তে সাহস করিনি, আজ তা ঘটে গেল, আগামী কাল এমন সময়ে আমি ট্রেনে যাচ্ছি। একটু কিছু চিহ্ন তোমার দেবে না মীনা, যাতে করে এই প্রতীক্ষার দিনগুলো আমার কেটে যায়!”

চল্‌তে চল্‌তে মীনা ফিরে দাঁড়াল। একটু কি ভাব্‌লে তারপর হাতের আঙুল থেকে মীনার অক্ষরে ‘মীনা’ লেখা আংটীটা খুলে হাতে ধরে বল্‌লে “এটা ছাড়া দেবার মত আমার আর কিছু নেই।—আর কিছু দিলে জানা-জানি হবে।”—

লোভীর মত প্রভাত তার সবুজ আলোয়ানের ভিতর থেকে হাত বের করে বল্‌লে “তুমি পরিয়ে দেও।—”

মীনা লজ্জায় ও সঙ্কোচে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রভাত আবার বল্‌লে “আজকের রাতের স্মৃতি স্বর্ণাক্ষরে আমার মনে লেখা থাক্‌বে—দাও মীনা পরিয়ে তোমার দান, আমি মাথায় করে রাখবো।” প্রভাতের উঁচু করে তুলে ধরা আঙুলের মধ্যে—আংটীটা গলিয়ে দিয়েই মীনা পিছন ফিরল। প্রভাতের গায়ের রংএ আংটীর সোনার রং বুঝি মিশে গেল।

প্রভাত বল্‌লে “যে ক’দিন ঘুরে না আস্‌ছি—চিঠি লেখায় কি তোমার আপত্তি হবে?

“না, না, সে কি?—সে বড় বিশ্রী হবে।” বলেই মীনা একরকম ছুটে পালিয়ে গেল।—

প্রভাত ধীরে ধীরে তার এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘরে চলে গেল।—

বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠতেই সিঁড়ির মুখের দরজা খুলে মলিনা বের হয়ে এসে মীনাকে বল্‌লে “এস, এস, অভিসারিণী! বিয়ের-নামে-জ্বলে-উঠনী। ধরি-বিজে-ধরা-পড়্‌নী!—তোমার জন্যে দরজা খুলে আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। দুঘণ্টা ধরে কথাই ফুরোয় না! কিসের এত কথা রে!—আমরা তো ফুল-শয্যার দিনেও এত কথা বলিনি তুই আজ যত বল্‌লি!—”—

“বড়দা বুঝি আজ শুতে আসেনি এখনও?—”—

“আস্‌বেন না কেন?—তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। রাত কি কম হল?—তোমার কি সে হুঁস আছে? মীনু, বল্‌বিনে ভাই কি কথা বল্‌ছিলি?”—

সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে মীনা হেসে বল্‌লে “কিছুই নয় ভাই বৌদি’ তুই শুতে যা।—মানুষটাকে একটু যাচাই কর্‌ছিলাম।”—

মলিনা তার ঘরে চলে গেল। মীনা গুন্‌ গুন্‌ করে গাইতে গাইতে গেল

“হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।”

৭

যতীশ্বর ছিল রমাপতি বাবুর স্বজাতি। গরীবের ঘরে জন্মালেও অনেক লোকের যেমন উঁচু দিকে নজর থেকে যায় যতীর ছিল ঠিক তাই। দেশ থেকে যখন যতীকে সঙ্গে করে তিনি হাজারিবাগে ফির্‌লেন, তখন সন্তুষ্ট হওয়ার চেয়ে অসন্তুষ্টই হয়েছিল সকলে বেশী। রমাপতি কিন্তু বাড়ীর সকল লোকের সঙ্গে বিদ্রোহ করেই—যেন এই অনাথ ছেলেটীর ওপর খুব মনোযোগ দিলেন। এই মন দেওয়াই হল সকল অনিষ্টের মূল। ফলে, তিনি যখন বাড়ী থাকৃতেন যতীর আদরটা তখন সকলের কাছের বেশী হ’ত আর না থাকার সময়ে ঝি চাকরেও তাকে গ্রাহ্য কর্‌ত না।

যতীর নিজের, কিন্তু এসবে কোনও ক্ষতি হত না, ঝি-চাকরের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সে গ্রাহ্যই করত না। কর্‌লেও এসব নিয়ে কোনো হাঙ্গামা করা তার আদৌ আস্‌ত না।—

রমাপতি বাবু নিজের সঙ্গে রেখে রেখে, যতীকে তাঁর কাজের অংশীদার করে তুললেন। বুদ্ধিমান্‌ যতীও নিজের ভাগ্য ফেরাবার একটা পথ এতদিনে যেন খুঁজে পেল। শতদলের কাছে প্রথম যেদিন তিনি বল্‌লেন যে মীনার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যেই তিনি যতীকে এমন করে হাতে গড়ে মানুষ করেছেন; সেদিন শতদল অবাক্‌ হয়ে বললেন, “সেকি? কোথাকার কোন্‌ হাঘরের ছেলে নিজের বুদ্ধি ও ভাগ্যের জোরে একটু পায়ের ভর করে দাঁড়িয়েছে বলেই

সে কি মীনুর যোগ্য স্বামী হল? দিনরাত্ মিস্ত্রী খাটিয়ে খাটিয়ে বুদ্ধিও তোমার সেই রকম হয়েছে!"—

বাধা দিয়ে রমাপতি বল্লেন "আহা! বুদ্ধির দোষ আর আমাকে দিওনা। তা হলে এই হাজারিবাগের মত জায়গায় আর ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জল্ত না। কেন, যতী, পাত্র হিসেবে মন্দ কি?—পুরুষের শ্রী হল বুদ্ধি, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, সুস্থ সবল দেহ। তাদের দুএক পোঁচ গায়ের রং ফরসা কালোতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয়না বুঝলে? সে ধরতে গেলে যতীর মত সুপাত্র কোথায় পাব?—"

হ্যাঁ তোমার এক কথা; জন্মে কখনও মেয়ে শ্বশুরঘরে যাবে না। ঘরজামাই হয়ে জামাই চিরকাল এখানে থাক্‌বে—মেয়ের মন তাতে থাক্‌বে না। যে মেয়ে বিয়ের পরে বাপের বাড়ীতেই বেশী থাকে, বাপের বাড়ীর লোকের কাছে তার আর কোন সম্মান থাকে না বুঝ্‌লে? যতীর সঙ্গে বিয়েতে মীনুর আমার সেই অবস্থা হবে। যে অভিমানী! ও যে অমনি করে ঘর-জামাইএর বৌ হয়ে মুখ কালি করে বেড়াবে তা আমি এই চোখে দেখ্‌তে পার্‌বো না। তার চেয়ে ওর বিয়েই দিও না।"

"শোন, শোন, তুমি যে চটেই খুন হলে!—'স্ত্রীণাম চরিত্র পুরুষস্য ভাগ্যম্, দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা।"—বলে একটা প্রবচন আছে জানো? কে বলতে পারে যে, এই কুড়িয়ে আনা যতীশ্বরই একদিন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হবে না?"—

একটু নরম স্বরে শতদল বল্‌লেন "তা, হয়তো, হতে পারে। কিন্তু মীনু আর যতীতে মোটে বনে না। বিয়ে হয়েই কি আর বন্‌বে।"—

"ও সব মিটে যাবে বুঝ্‌লে গিন্নী! বিয়ের আগে আমাদের তো কই আধুনিক প্রথামত 'কোর্টশিপ' 'লভ্' কিছুই হয়নি! দিন কি মন্দ কাট্‌ছে? সময়ে ওসব ঠিক হয়ে যাবে।—একটা কথা আছে না—

'নূতন প্রেমে, নূতন বঁধু, আগা গোড়া কেবল মধু,

পুরাতনে অম্ল মধুর, একটু ঝাঁঝালো।—"—

ঠিক তাই। মীনা এখন জানে, যতী একজন চাল-চুলাহীন কুড়োনো ছেলে। কাজেই খুব কর্ত্তৃত্ব করে; আর যদি জানে যে ওর ভাবী স্বামী; তবে দেখ্‌বে যতীর কোনো খুঁতই আর ওর চোখে ঠেকবে না। সংসারের নিয়মই এই।

"কাহারো এমন পড়িল না চোখে আমার যেমন আছে"—এই হল সংসারের বীজ মন্ত্র।—"—

"জানিনে বাপু, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। মেয়েটা কষ্ট না পেলেই হল।—"—

"বেশ, বেশ, পথে এস। মীনু কষ্ট পেলে কি সেটা আমারও বাজ্‌বে না? আমি কথা দিচ্ছি, যতী, তোমার মেয়ের সকল অভাব দূর করবে। এর চেয়ে বেশী প্রমাণ আর কিছু আমি জানিনা।"—

সেদিন এই পর্য্যন্ত হয়েই রইলো।

যতীর নিজের কিন্তু এসব নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিল না। মীনা সব সময়ে বাড়ীতে থাকে না—যখন বোর্ডিং থেকে আসে, তখন অবিশ্যি যতীর কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও তার অসঙ্গত আবদার পুরোতে হ'ত। কারণ দীর্ঘকাল ধরে মীনাদের বাড়ী থেকে সে এটুকু বুঝেছিল যে রমাপতি বাবুকে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে গেলে মীনাকে চটানো হবে না। তাই সে বোর্ডিং থেকে বাড়ী এলেই নিজের বিশ্রামের সময়টুকুও যতীর জুট্‌তো না।—

ধনবান পিতার একমাত্র কন্যা হয়েও বরাবর সকলের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে খেয়ালেরও তার শেষ ছিল না। হঠাৎ আচমকা কোনদিন বলে বস্‌ল "চল রাজ রপ্পায় বেড়াতে।"—প্রায় সমস্ত দিনের ধাক্কা। কিন্তু 'না' বলারও যো ছিলনা; কারণ রমাপতি বাবুর ঢালা হুকুম ছিল যে মীনা যেন তার যা' ইচ্ছা, তাই করতে পায়। বাড়ীর কেউ তো নয়ই, এমন কি স্বয়ং শতদলেরও এ নিয়ে কোন কথা বলার উপায় ছিল না।

মীনার বাবা ভাব্‌তেন যে শেষ পর্য্যন্ত যখন দুটীকে একসঙ্গে গাঁথতেই হবে, তখন পরস্পরে যত কাছাকাছি এসে পড়ে, পড়ুক, আরও জানাজানি হোক। মীনাকে নিয়ে যতী এ পর্য্যন্ত কোনই কথা ভাবেনি, বাগানে ভাল ফুল ফুট্‌লে যেমন সকলেই সেটা দেখ্‌তে বা গন্ধ পেতে ইচ্ছে করে, মীনার সম্বন্ধে এর বেশী কোন কথা তার মনে হয়নি। তা ছাড়া, ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাকায় তার ওপর যতীর একটা সরল ও সহজ সস্নেহ ভাব এসে পড়েছিল। কিন্তু যখন থেকে রমাপতিবাবু তাকে ভাবী সম্বন্ধের আভাস দিলেন, তখন থেকে সে আর একটু ভাব্‌তে আরম্ভ করল যে শেষ পর্য্যন্ত যদি মীনা আমাকে বিয়ে করে,

তা হলে বুঝ্‌তে হবে যে আমার ভাগ্য আমাকে তার চরম পুরস্কার দিয়েছে। সাহস করে সে মনে আন্‌তে পারলে না যে মীনাকে বিয়ে করতে তার দিক থেকে কোন আপত্তি থাকতে পারে।

শতদলের স্নেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। শুভ্রাংশুও সময়ে অসময়ে তার ঘরটীতে গিয়ে গল্প জুড়ে দেন। মীনার আর দুটী ভাই সুধাংশু ও হিমাংশু যারা ঐখানেই স্কুলে পড়ছিল তারা সময়ে অসময়ে তাকে জামাইবাবু বলে ক্ষেপায়, লজ্জায় তার কাণ লাল হয়ে উঠে। কাছে এসে বলে "ছিঃ! ও বল্‌তে হবে না। আমি তোমাদের যতীদা।"

দিন যখন এমনি কাটছে তখন প্রভাত এলো। সমস্ত উল্টে গেল।

স্থির হয়ে সে সমস্ত দেখে গেল। বিরুদ্ধে একটী কথাও বল্‌লে না। মনে মনে কিন্তু ঠিক করে ফেল্লে যে এখানের পাততাড়ি এবার গুটাতে হবে এরপরে আর থাকা চলে না।

নিজের ঘরে বসে প্রায় ষোল বৎসর পরে সে আপনার ভাগ্যের কথা ভাবছিল। এতদিন যেন তার এ অবসরও মেলে নি। ভাবলে সে যদি গরীব না হয়ে কিছু পয়সা-ওয়ালা হতো তা হলেও কি মীনার বাবা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন? এক পয়সা ছাড়া কিসে প্রভাত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! নিজের ব্যায়াম পুষ্ট কর্ম্মিষ্ঠ দেহখানার দিকে একবার দেখে সে বল্‌লে "না, এ অপমানের পরে আর থাকা চলে না এখন আমি যেমন করে হোক নিজের ভাত করতে পারব। অসময়ে এঁর আশ্রয়ে এসেছিলাম, খুব দয়া পেয়েছি, প্রভু যিনি, তিনি চিরদিন প্রভুই থাকুন। অন্য সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে করতে যাওয়াই ভুল।" বলেই হেসে বল্‌লে "কিন্তু কেনইবা গাছে তুলে মই কাড়লেন? আমার আশার যা অতীত ছিল, তা কেন আমার চোখের সামনে ধরলেন?—"

প্রভাত যে রাত্রে গেল, সে রাত্রে যতী তার নিজের ঘরে বসে এই রকম নানা চিন্তায় ডুবে ছিল। সে আগের রাত্রে প্রভাত ও মীনার বাগানে কথা বলা শুনেছে, এখন সেইগুলো তার মনে আরো জ্বালা ধরিয়ে দিলে।

ভেবে ভেবে সে ঠিক করলে যে, যেতেই হবে, এটা ঠিক! চুপি চুপি যেতে হবে, কাউকে জানিয়ে যাওয়া হবে না। নিঃসম্বল হয়েই সে তো এদেশে এসেছিল, এখন তো তাও অর্থকরী একটা বিদ্যা তার সম্বল রইলো। নিজের সামান্য যা দু' চারখানি কাপড় ছিল, সেগুলি গুছিয়ে রেখে রমাপতিকে একটা চিঠি লিখলে এই মর্ম্মে যে একটু দূরে একটা কাজ পাওয়ায় সে যাচ্ছে—অসময়ে খবর পাওয়াতে তাঁকে কিছু বলতে পারেনি। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। মীনার বিয়ের জন্যে সে শীগ্‌গীর ফিরবার চেষ্টা করবে। চিঠি লেখা হলে, ব্লটিং ছেপে সেখানার ওপর ঠিকানা লিখে একটা পেপারওয়েট চাপা দিল।

অনেকক্ষণ ধরে এই সব চিন্তা করায় তার মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। ঠিক আগের দিনে প্রভাত নিজের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে, বাগানে পায়চারী করতে বেরিয়েছিল, যতীও নিজের বিরূপ ভাগ্যের চাপে পিষে গিয়ে, অবসন্ন মন ও দেহ নিয়ে বাগানে বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়ে দেখলে মীনাও তত রাত্রে বাগানে এসে আছে। সে নিজের ভাবে এত তন্ময় যে তার আসা-যাওয়া কিছুই লক্ষ্য করলে না। একটা গানের দু চার লাইন ঘুরে ফিরে তার কাণে আসতে লাগ্‌ল।

রঙিয়ে দিয়ে যাও, এবার যাবার আগে,
আপন রাগে, গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে, অশ্রুজলের করুণ রাগে;
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে,
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যা-দীপের আগায় লাগে
গভীর রাতের জাগায় লাগে॥

যতী চোরের মত নিঃশব্দে নিজের ঘরে গেল। বাগানে বেড়ান তার আর হোল না। ঘরে বসেও সে মীনার গানের কথাগুলি শুন্‌তে পাচ্ছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি কাণে লাগিয়ে দিয়ে সে শুন্‌তে লাগ্‌ল, মীনা বল্‌ছে—

"যাবার আগে যাওগো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার, চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে যেমন নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে
বিশ্ব নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,

তেমনি আমায়, দোল দিয়ে যাও, যাবার পথে,
আগিয়ে দিয়ে।
কাঁদন বাঁধন ভাসিয়ে দিয়ে॥"

দুবার তিনবার ফিরে ফিরে মীনা একই সুরে এই গান গাইলো। যতী দুহাতে নিজের কাণদুটো চেপে তার বিছানায়শুয়ে পড়ল। সারাদিনের অবসাদ ও মনের ক্লান্তি তাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে দিলে।

পরদিন ঘুম ভেঙে যখন উঠল, দেখলে ঘরে রোদের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর হাস্যমুখী মীনা তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলছে। "যতীদা, তুমি কি আজ কুম্ভকর্ণের চেলা হয়েছ নাকি? লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে হয়রাণ, শেষে নিজেই এলাম। বাবা বললেন, তোমার শরীর ভাল নেই, সত্যি নাকি যতীদা?"

যতী কিছু বলতে পারলে না—বিছানায় থেকে উঠেই সে বরাবর টেবিলের কাছে গেল—দেখলে পেপারওয়েট কাৎ হয়ে গড়াচ্ছে, চিঠিটা সেখানে নাই।

রেশমী

গল্প

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রেশমীর স্বামী ফয়জাবাদে চাকরী করে। দুষ্ট লোকে বলে, সে দরওয়ানী করে। রেশমী বিশ্বাস করে না; প্রতিবাদ করিয়া কহে, "কক্ষণ না, কক্ষণ না। সে——" বলিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। আর বলিতে পারে না। সে নিজেও জানে না, স্বামী কি কাজ করে।

শ্বশুরবাড়ীতে কেউ নাই। আছে শুধ্ একখানি মেটে অতি জীর্ণ ঘর। তাও নাকি আবার সবিনয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। তাই, রেশমী বাপের কাছে থাকে। বাপের বাড়ী গোগা।

গ্রামের উত্তরে ছোট নদীটিতে রোজ রেশমী বিকালে কলসী হাতে গা ধুইতে যায়। ফিরিতে বড় দেরী হয়। মা রাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুই কি নদী খুঁড়ে জল আনছিলি নাকি যে এত দেরী?"

রেশমী কাঁকের কলসী নামাইয়া রাখিয়া মুখ টিপিয়া হাসে। কি যেন একটা উত্তর ঠোঁটের কোণে আসে; কিন্তু কিছু বলে না।

মা আরও রাগ করিয়া কহে, "তোর ঢং দেখে আর বাঁচিনে। কথার গ্রাহ্যিই নেই। ধাড়ী মেয়ে গাঁয়ের পাঁচটা লোক——" বলিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে কাজে চলিয়া যায়। মায়ের রকম দেখিয়া বড় হাসি পায়; কিন্তু সুমুখে হাসে না। ছেলেবেলাকার মারধরের কথা এখনও সে ভোলে নাই। আর সেদিন নাকি তাহার গালের উপর কি একটা ঘটিয়া গিয়াছিল।

রেশমী অবশ্য তা স্বীকার করে না। পাশের বাড়ীর বিণ্টুর কিন্তু রেশমীর উপর বড় লোভ। সেদিন কি একটা রসিকতা করিতে আসিয়া রেশমীর কাছে ধমক খাইয়া সে এখন আড়ালে আবডালে উঁকি মারে; কিন্তু সামনে আসিয়া কিছু বলিতে সাহস করে না।

বিকালবেলা নদীর ঘাট যখন প্রায় শূন্য হইয়া আসে, রেশমী তখন একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের রাঙ্গা মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া ভিতরটা হয়ত তাহার তেম্‌নি রাঙ্গা হইয়া ওঠে। হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়ে। আশ-পাশের লোকের কথা ভুলিয়া যায়। চোখের জল তেমনি ধারা বহিয়া নদীর বুকে পড়িতে থাকে। বিণ্টু লুকাইয়া রেশমীর মুখের পানে একমনে চাহিয়া থাকে। তারপর রেশমীর চোখের জল দেখিয়া তাহারও চোখে জল আসিয়া পড়ে; কিন্তু ভরসা করিয়া কাছে আসিয়া কিছু বলে না। রেশমীর বড় রাগ। তাই, সে দূরে দূরে থাকে।

সন্ধ্যা যখন নামিয়া আসিয়া নদীর বুক কালো করিয়া দেয়, তখন রেশমীর চমক ভাঙ্গে। চাহিয়া দেখে চারিদিক তেম্‌নি ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া, কলসী কাঁকে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরে। বিন্টু অলক্ষ্যে পিছু পিছু আসে। আর সন্ধ্যার আঁধারে ভিজা কাপড়ের ভিতর দিয়া রেশমীর যে রূপের আলোটুকু বাহির হইয়া আসে, তাই যেন সে দু'চোখ দিয়া পান করিতে থাকে।

বাড়ী ফিরিয়া রেশমী আবার মায়ের গালি-মন্দ খায়। গভীর রাত্রে ছোট জানালার বাহিরে অন্ধকারের ভিতর দিয়া খোলা মাঠের দিকে চোখ মেলিয়া থাকে। কি যেন দেখিতে চায়, কিন্তু পায় না। বুকের ভিতরটা হা হা করিতে থাকে! তারপর চোখ মুছিয়া, বুকে হাত রাখিয়া সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

(২)

চিঠি আসিয়াছে, রেশমীর স্বামী ৭ দিন পরে আসিবে। লুকাইয়া চিঠিখানা সে একশবার পড়িয়াছে। তবু যেন পড়া শেষ হয় না ; যেন অফুরন্ত কত মধু, কত রস তাতে রহিয়াছে।

সে দিন গুণিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাছে ভুলিয়া যায়, তাই খড়ি দিয়া দিনের শেষে একটি করিয়া দাগ অতি গোপনে কাটিয়া রাখে।

আজ ৭ দিন পূর্ণ হইয়াছে। রাত ৭টার গাড়ীতে স্বামী আসিবে। সকাল হইতেই রেশমীর বড় কাজ পড়িয়া গেল। নিজের হাতে কখনও ঘর ঝাঁট দেয় না, নিকায় না, গরুকে খড় দেয় না—কিছু করে না। আনে শুধু বিকালবেলা এক কলসী ছোট নদীর মিষ্টি জল। তাও আবার আনিতে রাত হইয়া যায়।

আজ সকালে উঠিয়া সে নিজের হাতে ঘর ঝাঁট দিল, উঠান মুছিল, গরুর খোঁজ-খবর নিল. পিতাকে তামাক কাটিয়া 'খৈনি' প্রস্তুত করিয়া দিল। এবং শেষে রান্নাঘরে গিয়া উনান জ্বালিয়া বসিল।

মা গোবর হাতে ঘুঁটে দিতেছিল। বেড়ার ফাঁকে হঠাৎ আলো আর ধোঁয়া দেখিয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া অবাক হইয়া গেল। তারা জানে না, আজ কে আসিবে। রেশমী নিজে গ্রামের ছোট পোষ্টআফিসে গিয়া চিঠি লইয়া আসিয়াছে। রেশমী একটু আধটু লিখিতে জানে। চিঠির কথা তো কাহাকে কিছু বলে নাই—মাকেও নয়। বিন্টুর চোখে কিন্তু সে ধুলা দিতে পারে নাই। সে রেশমীর কাণ্ড দেখিয়াছে। রেশমীর হাতে চিঠি দেখিয়া তাহার বুক শুকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এতদিনেও যখন কেউ আসিল না, কিছু ঘটিল না, তখন সে একথাটা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। নিজের জানালার ফাঁক দিয়া সে রোজ সকালে চোখ মেলিয়া থাকে। রেশমীর চলা-বলার ভঙ্গী দেখিয়া তাহার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করিতে থাকে। ইচ্ছা হয় এখনি কাছে যায়। কিন্তু সাহস হয় নাই। মনকে বলে, "যাক্ না ক'দিন! যাবে কোথায়। আস্‌তে বয়ে গেছে ঝিমনের। সে বিদেশে চাকরী কচ্ছে না ছাই কচ্ছে।

বিন্টু কার কাছে যেন শুনিয়াছিল, ঝিমন দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার সময় রামটহলের মেয়ে বিনিকে ফুস্‌লাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাই তার মনে মনে বেশ একটা জোর ছিল।

কিন্তু, আজ সকালে রেশমীর ব্যাপার দেখিয়া বিন্টুর মুখ শুকাইল, বুক শুকাইল, চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। তবু সে চুপ করিয়াই রহিল।

এখন রেশমীর মার বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া একটু সাহস করিয়া আসিয়া কহিল, "জান না মাসী, আজকে আসবে? আজ যে——" বলিয়া সহসা সে 'হা হা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু, সে হাসি যেমন রুক্ষ তেমনি ব্যথায় ভরা।

মাসী আরও অবাক হইয়া, গোবর হাতে বিন্টুকে প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল্‌না বাছা, কে আস্‌বে?

"তোমার জামাই গো—রেশমীর বর।" বলিয়া বিন্টু আবার তেমনি শুক্‌নো হাসি হাসিতে লাগিল।

রান্নাঘরের ভিতর বসিয়া রেশমী সব শুনিল ; কিন্তু কিছু বলিল না। শুধু একটা কাঠ রাগ করিয়া উনানের মধ্যে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া ধপ্ করিয়া ভাতের হাঁড়িটা উনানে চড়াইয়া দিল। ভাগ্যি ভাল হাঁড়িটা ভাঙ্গিল না।

খবর শুনিয়া রেশমীর মা শুধু "হুঁ" বলিয়া আবার ঘুঁটে দিতে সুরু করিল। খুসি হইল, কি রাগ করিল, বোঝা গেল না। বিন্টু মাসীর এই উদাসীনতায় একটু আশ্চর্য্য হইল। মাসী আর কথা কয় না দেখিয়া তাহার মনে বড়

রাগ হইল। কতকটা যেন সে নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "বর আসবে না ছাই আস্‌বে।"

মাসী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

তখন সে একগাল হাসিয়া কহিল, "শোন নি বুঝি মাসী ?"

তাহার এই হাসি দেখিয়া মাসী শুধু হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। মাসীর মুখ দেখিয়া বিণ্টু মনে মনে খুসী হইল! এবং ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল, 'মাসী তুমি এত খবর রাখ; শুধু এ-টাই জান না। বলি রামটহলের মেয়ে বিবি কোথায়? কে না জানে করিয়া তাকে—" হঠাৎ তাহার চোখ রান্না ঘরের দ্বারের উপর পড়িতেই—বিণ্টুর মুখ যেন চড় খাইয়া বন্ধ হইয়া গেল।

রেশমীর অগ্নিদৃষ্টির সুমুখে সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। একদৌড়ে পাশের বাঁশ ঝাড়টা ঘুরিয়া নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইল।

রেশমীর মা সে কথা জানিত। লজ্জায়, অপমানে সে মুখ নীচু করিয়া মনের ভুলে, এই এতটুকুর বদলে, এই এত বড় বড় ঘুঁটে দিতে লাগিল।

রেশমী রাগে, ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিল, "কখ্‌খন না, কখ্‌খন না। সব মিছে কথা। তুমি ওকথা শুনোনা।" বলিয়া পুনঃ উনানের সামনে গিয়া বসিল; কিন্তু চোখ দিয়া তাহার তেমনি জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আজ বিকালে নদীতে আসিয়া রেশমী গায়ে সাবান দিল, হাত-পা ভাল করিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিল। তারপর বেশ করিয়া গা ধুইয়া কলসী কাঁকে সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পশ্চিমের সোনার আকাশ আজ আর তাহাকে স্পর্শ করিল না। নিজের ভিতরে আজ তাহার অনেক সোনা গলিয়া, বহিয়া যাইতেছে। বাহিরের সোনা, বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

বাড়ী ফিরিয়া, সে যুঁই ফুলের তেল মাখিল এবং ছোট আরসি সামনে রাখিয়া চুল বাঁধিল। শেষে আয়নায় নিজের মুখের দিকে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

সন্ধ্যার পর নিজে রাঁধিতে বসিল; কিন্তু বড় ভয় পাছে হাত খারাপ হইয়া যায়, মুখ কালি হইয়া ওঠে এবং চুল শুকাইয়া আসে।

রাত ৭টা বাজিয়া গিয়াছে। এইবার স্বামী আসিবে। রেশমী বাহিরের দিকে কান পাতিয়া রান্নাঘরে বসিয়া নিজেকে কোন মতে স্থির রাখিয়াছে। অদূরে কুকুর 'ঘেউ ঘেউ' করিয়া উঠিল। বাঁশ কাঁঠাল পাতার মড় মড় শব্দ—এই বার নিশ্চয় সে আসিয়াছে। রেশমী তাড়াতাড়ি দুয়ারে আসিশা অন্ধকারে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল—কৈ কেউ না। ফস্‌ করিয়া কে একজন যেন চলিয়া গেল। রেশমীর মনে হইল বিণ্টু। ঠিক বলিতে পারিল না; বাইরে বড় অন্ধকার।

রেশমী নিশ্বাস ফেলিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া রাঁধিতে লাগিল। আঁচলে ঘন ঘন চোখ মুছে। আবার জল আসে আবার মোছে।

রাত ৮টা, ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। রেশমীর আর রাঁধিতে ভাল লাগিল না।

সকাল হইতেই রেশমীর মার মন ভাল ছিল না। বিণ্টুর কথা শুনিয়া আরও তাহা বিগড়াইয়া গেল। অবশ্য বিণ্টু প্রায়ই সত্য কথা বলে না। অথচ অনেক সময় তা মিথ্যাও হয় না। তারপর রেশমীর মা ত মনে মনে সব বোঝে। নিজেও ত রেশমীর বাপের সঙ্গে স্বামী ছাড়িয়া নাথ নগর হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। লোকে জানে, স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু, নিজের কাছে ত নিজের লজ্জার সীমা থাকে না। শেষে জামাইএর এই কাণ্ডে প্রথম যৌবনের সেই তাহার লজ্জার কথা মনে পড়িয়া একেবারে মরমে মরিয়া গিয়া চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আজ তাহার বয়স হইয়াছে। তাই, তাহার অশান্ত যৌবনের সেই রস, আনন্দ এখন শুধু লজ্জায় পরিণত হইয়াছে।

রেশমীর মা আর থাকিতে পারিল না। সমস্ত রাগটা পড়িল গিয়া রেশমীর উপর। দুম্‌ দুম্‌ করিয়া রান্না ঘরে ঢুকিয়া রেশমীর পিঠের উপর সজোরে এক কিল বসাইয়া দিল। বাঁধা চুল টান মারিয়া খুলিয়া দিয়া, তাহাকে রান্না ঘর হইতে ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দিল।

রেশমী তাহার ছোট্ট ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল। রাতে

কাহারও খাওয়া হইল না। বাপ শুধু 'খৈনি' আর তাড়ি খাইয়াই বেহুঁস হইয়া রহিল।

(৩)

কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। রেশমী আর নদীতে যায় না। কাহারও সঙ্গে মিশে না, কথা কয় না। বিণ্টু তেম্‌নি তাহার জানালা দিয়া চোখ মেলিয়া থাকে। আগের মত আর সব সময় রেশমীর দেখা মিলে না। তাহার বড় দুঃখ হয়। সে-ই ত সব প্রকাশ করিয়া দিয়া, রেশমীকে দুঃখী করিয়াছে। একথা মনে করিয়া তাহার চক্ষে জলে আসিয়া পড়ে।

এক একবার বিণ্টুর ইচ্ছা হয়, রেশমীর কাছে মাপ চাহিয়া আসে; কিন্তু সাহসে কুলায় না। তাই, ঘরের ভিতর বসিয়াই শুধু নিশ্বাস ফেলে আর চোখ মোছে।

সেদিন দুপুর বেলা বাপ মাঠে গিয়াছে। মা মুড়ি বিক্রী করিতে গাঁয়ে বাহির হইয়াছে। রেশমী একা। মাঝে মাঝে বিণ্টুর কথা মনে পড়ে। বড় 'দুষ্টু' ছোঁড়া সে। তবুও দেখিতে বেশ। কথাও মন্দ কয় না। কিন্তু তাহার যে স্বামী রহিয়াছে। তাই, বিণ্টুর কথা মনে হইলেই লজ্জায় মরিয়া যায়। মনে মনে 'ছি ছি' করিতে থাকে। তবুও বিণ্টুর মুখখানি মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারে। আজ দুপুর বেলা তাহার আর কিছুই ভাল লাগিল না। আস্তে আস্তে বাহির হইয়া একটু দূরে একটা কাঁঠালের ছায়াতলে বসিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

বিণ্টু সব দেখিয়াছে। কিন্তু যেন কিছুই জানে না, এম্‌নি ভাবে ও দিকের মাঠ ঘুরিয়া সহসা কাঁঠালতলায় আসিয়া যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিণ্টুর কিছু সাহস বাড়িয়াছিল।

তেমনি বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "আরে, রেশমী যে? দুপুর বেলা কাঁঠাল তলায় বসে কি কচ্ছিস? যা যা, বাড়ী যা, রোদে মাথা ধরবে।"

রেশমী আজ আর বিণ্টুকে দেখিয়া রাগ করিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "রোদ কোথায়? ছায়ায় ত বসে আছি। তুমিই ত রোদে ঘুরে এলে। একটু জিরিয়ে বাড়ী যাও।"

বিণ্টু যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। আনন্দের আবেগে কিছুক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। ছেলে বেলায় রেশমী এমনি কথা বলিত বটে; কিন্তু আজ সে অনেক দিনের কথা। সে তা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। এই কাঁঠাল তলায়ই তাহার খেলিত, মারা-মারি করিত। পরদিন আসিয়া আবার ভাব করিত। তারপর এক দিন রেশমীর বিবাহ হইয়া গেল। বিণ্টুও পাট-কলে চাকরি করিতে গেল। পাঁচ বছর পরে ফিরিয়া দেখিল, রেশমী আর সেই ছোট রেশমী নাই। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রূপ ঝরিয়া পড়িতেছে। আর রেশমী দেখিল, বিণ্টু টেরি কাটে, শিস্ দেয়, আর রাত্রে তাড়ি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া গান সুরু করে।

বিণ্টুর টেরি কাটা, শিস্ দেওয়া রেশমীর ভাল লাগিত, কিন্তু তাড়ি-টাড়ি সে পছন্দ করিত না। তা ছাড়া, তাহার যে স্বামী রহিয়াছে। কাজেই সে ভাল করিয়া বিণ্টুর সঙ্গে কথা বলিত না। বরঞ্চ বিণ্টুর যা-তা পরিহাসে তাহার রাগই হইত।

আজ বিণ্টুর ছেলে বেলাকার কথা মনে পড়িয়া গেল। রেশমীও বোধ হয় তেমনই কিছু ভাবিতেছিল।

বিণ্টুর গলা ধরিয়া আসিল। কহিল, "তোর কাছে একটু বস্‌ব রেশমী? রাগ করবিনে ত?"

রেশমী শুধু একটু সরিয়া বসিল; উত্তর দিল না।

বিণ্টু আসিয়া পাশে বসিল।—তারপর আস্তে আস্তে রেশমীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া রেশমীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রেশমী কিছু আপত্তি করিল না, কথা বলিল না।

কিছুক্ষণ পরে বিণ্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "রেশমী তুই কি আমায় ভুলে গেছিস্?"

রেশমী নিরুত্তরে মুখ নত করিয়া রহিল।—ক্ষণকাল পরে বিণ্টু আবার ডাকিল, "রেশমী?"

রেশমী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন?"

"তুই কি আমায় ভুলে গেছিস্?"

"না।"

"তা হলে তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস্ নে কেন, দেখা করিস্ নে কেন?"

"আমার যে স্বামী আছে।"

"ওঃ।" বলিয়া বিণ্টু চুপ করিল।

রেশমী এক মুহূর্ত্ত বিণ্টুর শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়াই

মুখ নীচু করিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিল, "তুমি তাড়ি খাও কেন?"

"না খেয়ে কি করব? আমার ত কেউ নেই।"

"কেউ না থাকলে বুঝি তাড়ি খেতে হয়?"

বিন্টু শুধু নিশ্বাস ফেলিল। সে কেমন করিয়া বুঝাইবে, কেন সে তাড়ি খায়। যাহার আছে, সে বুঝিতেও পারে না, বুঝিবার দরকারও হয় না। তাই, বিন্টু চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ মাঠের তপ্ত হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া উপরের পাখীগুলা পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ।

রেশমীর একটা কথা মুখে আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া যায় বলিতে পারে না। অতি কষ্টে রেশমী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তাড়ি ছাড়তে পার?"

বিন্টু সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কেন বলত?"

"আমার ইচ্ছে। কেন, মনে নেই, ছেলে বেলায় আমার ইচ্ছেয় তুমি অনেক কাজ করতে?"

বিন্টুর মনে পড়িল। কহিল, "পারি। নিশ্চয় পারি।"

"ঠিক?"

"ঠিক।"

"আমাকে আর যা-তা পরিহাস করবে না?"

"না।"

তারপর দুজনেই চুপ চাপ। রেশমী যেন কি ভাবিতে ছিল। সহসা তাহার চোখের কোণ বহিয়া এক ফোঁটা জল নীচে পড়িয়া গেল।

বিন্টু তাড়াতাড়ি নিজের হাতে রেশমীর চোখ মুছিয়া দিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিল। রেশমী কিছু বলিল না। বিন্টু আস্তে আস্তে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। রেশমী তেমনি নীরবে তাহার বুকে মুখ লুকাইল। তারপর চারিদিকে চাহিয়া সহসা মুখ নীচু করিয়া একটী চুমা খাইল। রেশমী বাধা দিল না, কথা কহিল না; শুধু চোখ দিয়া তাহার অনেক অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কিছুকাল পরে বিন্টু বলিল, "চল্ রেশমী, আমরা গাঁ ছেড়ে যাই।"

রেশমী মুখ তুলিয়া চক্ষু মুছিল। তারপর কহিল, "না বলে-কয়ে কি করে যাবে?"

"কেন পালিয়ে?"

"ছিঃ।"

"পারবে না তুমি?" বলিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় এক করিয়া বিন্টু রেশমীর মুখের উপর ব্যাকুলদৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

রেশমী ভাবিতে লাগিল।

বিন্টু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে না রেশমী?"

রেশমী তেম্‌নিই চুপ করিয়া রহিল। তারপর অতি অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন যাবে?"

বিন্টু আবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া কহিল, "কাল রাত্রে।"

রেশমী চক্ষু বুজিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

"সত্য?"

প্রত্যুত্তরে রেশমী শুধু একটা চুমা ফিরাইয়া দিল।

(৪)

পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া বিন্টু ভিন্ন গাঁয়ে গিয়া নিজের ঘরের সমস্ত বিক্রী করিয়া ২০৲ টাকা সংগ্রহ করিল। একটা ছোট টিনের বাক্সে খান দুই কাপড়, একটা জামা, আর খান দুই ছবি বাক্সে বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। আজ আর জানালায় বসিয়া সে চোখ পাতিয়া রহিল না। রেশমী সন্ধ্যার পর আসিবে, তাহা নিশ্চয়।

বেলা যতই পড়িয়া আসিতে লাগিল, ততই বিন্টু ঘরের ভিতর ছটফট করিতে লাগিল। সন্ধ্যার আর বড় বাকী নাই। বিন্টু একবার বসে, একবার ওঠে, একবার বাইরের সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া দেখে। তারপর নিজের ছোট বাক্সটি কোলে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

বিন্টু বাক্স কোলে করিয়া মাঠের দিকের জানালায় বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। সহসা একটু ক্ষীণ পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রেশমী বড় সন্তর্পণে, এদিক-ওদিক চাহিয়া ঘরে ঢুকিতেছে।

বিন্টু তাড়াতাড়ি বাক্স ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া আবেগে রেশমীকে ধরিতে গেল। রেশমী একটু সরিয়া দাঁড়াইল। বিন্টুর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইল, ভয় পাইল, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রেশমী ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া গড় হইয়া বিন্টুর

পায়ের কাছে নমস্কার করিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে কহিল, "আজ যাচ্ছি।"

"সে কথা তো জানি গো।" বলিয়া আনন্দের আবেগে বিন্টু রেশমীকে বুকের মধ্যে লইতে যাইতেছিল।

রেশমী আবার সরিয়া দাঁড়াইল। বিন্টু আবার আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যাবে না?"

"হাঁ, যাব বৈকি।"

"কখন? সন্ধ্যার পর ত?"

রেশমী বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, "হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরেই; কিন্তু—" বলিয়া থামিয়া গেল।

"কিন্তু কি?" বলিয়া বিন্টু বিস্ময়ের ব্যথায় অস্থির হইয়া উঠিল।

রেশমী আরও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তোমার সঙ্গে নয়। আমার স্বামীর সঙ্গে। সে এসেছে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি আর একবার বিন্টুর পায়ের সুমুখে ভূমিতলে মাথা ঠেকাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অগ্নিধারা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

একাঙ্ক নাটিকা

রাঘব	গুরু
রঞ্জিৎ	প্রিয় শিষ্য
অগ্নি	রাঘবের পালিতা কন্যা

আশ্রমবাসিনিগণ, শিষ্যগণ, রাজা—প্রতিহারী ইত্যাদি

পুষ্পোদ্যান

প্রভাতের আলোক স্পষ্ট হইয়াছে;—বহুদূরে—আশ্রমে সকলে জাগিয়াছে। পুষ্প আহরণোদ্যতা অগ্নি।

রঞ্জিতের প্রবেশ।

রঞ্জিৎ—অগ্নি!

অগ্নি (চমকিয়া)—কে? রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—হাঁ—

অগ্নি—এমন সময়ে তুমি এখানে কেন? জান আশ্রম বালিকারা যখন বাগানে আসবে তখন এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ? গুরুর আদেশ!

রঞ্জিৎ—জানি।

অগ্নি—তবে?

(রঞ্জিৎ নীরব)

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? উত্তর দাও।

রঞ্জিৎ—কি উত্তর দেব?

অগ্নি—যা তোমার ইচ্ছা।

রঞ্জিৎ—ইচ্ছার উপরে কি সমস্তই নির্ভর করে অগ্নি?

অগ্নি—আজকে তোমার কথাগুলো শুনতে যেন কি রকম বোধ হচ্ছে। স্পষ্ট করে বল রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—স্পষ্ট ক'রেই তো ব'লছি অগ্নি, ইচ্ছার পরেই কি সমস্ত নির্ভর করে? তাহ'লে—

অগ্নি—তাহ'লে কি? চুপ করলে কেন? বল—বল—

রঞ্জিৎ—ব'লছি তুমি ফুল তুলতে এসেছ?

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—আর সব আশ্রম বালিকারা কোথায়?

অগ্নি—তার প্রত্যেকেই যে এক একটা কাজে ব্যস্ত আছে সে কথা কি ভুলে গেছ? এক একদিন এক এক জনের ওপর ফুল তুলবার ভার পড়ে এ নিয়মও কি তোমার মনে নেই?

রঞ্জিৎ—আছে।

অগ্নি—তবে?

রঞ্জিৎ—কিছু নয়। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) না, আমার কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না অগ্নি, কোর' না কোর'

রাজা কহে শুন রে কোটাল
নিমকহারাম বেটা আজি বাচাইবে কেটা
দেখিবি করিব সেই হাল ।

না—; আর করলেও সে উত্তর আমি দেব না। ইচ্ছা করেই উত্তর দেব না।

অগ্নি—তবে এখন এ ফুল বাগানে এসেছিলে কেন?

রঞ্জিৎ—ব'লেছি তো, উত্তর দিতে পারব' না, দেব না।

অগ্নি—তবে গুরুকে এসংবাদ জানাব কিন্তু তা'হলে কি কঠিন শাস্তি পাবে তা কি একটিবার ভেবে দেখেছ রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—ভেবেছি,—নির্ব্বাসন। ভাল সেও আমার পক্ষে ভাল। যদি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পাই, এই নির্জ্জনে এই লতাকুঞ্জে—

অগ্নি—একি? তোমার কথাগুলো আজ এমন শুনতে লাগছে কেন? তোমার মুখই বা আজ অমন কেন?—কেন—কেন? রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—ডাক, আজ আবার আমায় ডাক অগ্নি, ডাক। মরুভূমিতে একটু ছায়া, একটু জল যে কতখানি ক্লান্তি দূর করে পথ চলবার উৎসাহ শক্তি বাড়িয়ে তোলে তা তুমিও জান না অগ্নি। কিন্তু আমি জানি। ডাক, তুমি আমায় ডাক অগ্নি, আমি চুপ করে শুধু তোমার ডাক শুনি।

অগ্নি—পথ ছাড় রঞ্জিৎ, আমি আশ্রমে যাব; গুরু ফুলের খোঁজে লোক পাঠাবেন, সরো পথ ছাড়।

রঞ্জিৎ—কোথা যাবে অগ্নি?

অগ্নি—আশ্রমে।

রঞ্জিৎ—না।

অগ্নি—তুমি আমায় বাধা দেবার কে?

রঞ্জিৎ—কেউ নই।

অগ্নি—তবে?

রঞ্জিৎ—(অগ্নির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) প্রার্থনা, অনুরোধ, দাবী।

অগ্নি—রঞ্জিৎ! রঞ্জিৎ!! তুমি কি পাগল হয়েছো? ওঠ, পথ ছাড়, আমি যাই।

রঞ্জিৎ—না, না যেও না, যেও না; ভগবান যদি এমন সময় মিলিয়ে দিয়েছেন তবে একটা কথা, শুধু একটা কথা শুনে যাও।

অগ্নি—উঃ! রঞ্জিৎ তোমার চোখে ওকি দৃষ্টি? মুখেও কোন কথা লেখা দেখতে পাচ্ছি? আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে আছ কেন? উঃ, চোখ যে ঝলসে গেল।

রঞ্জিৎ—অগ্নি! অগ্নি!! আমি তোমায় ভালবাসি।

অগ্নি (চমকিয়া) রঞ্জিৎ—

রঞ্জিত—কোনও কথা নয়; আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার রূপকে ভালবাসি। অগ্নি! তোমার ঐ ভুবন ভুলান রূপকে ভালবাসি।

অগ্নি—রঞ্জিৎ! মনে কর গুরুর দণ্ডাদেশ।

রঞ্জিৎ—করেছি। নির্ব্বাসন তারপরে মৃত্যুদণ্ড।

অগ্নি—নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করবে?

রঞ্জিৎ—তা হোক; মরণকে বরণ করেও তাকে জয় করা যায়।

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

অগ্নি—(সভয়ে) ঐ বুঝি সকলে আসছে। রঞ্জিৎ পালাও, পালাও।

রঞ্জিৎ—কিন্তু, পালাবার ফল?

অগ্নি—পালাতে চাও না? তবে সর, আমায় পালাতে দাও।

রঞ্জিৎ—ভয় করছে?

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—তবে যাও।

অগ্নি—কিন্তু—তুমি?

রঞ্জিৎ—আমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি যাও।

অগ্নি—তুমি যাবে না? তবে আমি একাই যাই। গুরুর দণ্ডাদেশ মনে পড়ে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর। পালাই পালাই।

(দ্রুতপদে প্রস্থান ও অন্য দুয়ার দিয়া অন্যান্য আশ্রম বালিকাগণের প্রবেশ।)

১ম বালিকা—গুরুর পূজার সময় হয়ে এল, কই? যে পূজার ফুল তুলতে এসেছিল? (চারিদিকে অন্বেষণ) না—বোধ হয় চ'লে গেছে (সহসা রঞ্জিতের উপর দৃষ্টি পড়িতে) একি এখানে কে ব'সে? রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ, আমি রঞ্জিৎ।

২য়া বালিকা—এখানে এমন সময়ে কেন? জান এসময়ে আশ্রম বালিকারা ফুল তুলতে আসে?

রঞ্জিৎ—জানি।

৩য়া বালিকা—গুরুর দণ্ডাদেশ?

রঞ্জিৎ—জানি।

১মা বালিকা—তবে।

রঞ্জিৎ—প্রশ্ন কোর না ভগিনীরা, যাও আশ্রমে ফিরে যাও।

৩য়া বালিকা—কিন্তু।

রঞ্জিৎ (হাসিয়া)—শাস্তির কথা আমার বেশ মনে আছে, দণ্ড নেবার জন্যে আমি প্রস্তুত হ'য়ে আছি, একথা গুরুকে জানাও গে।

১মা বালিকা—তবে তাই চল সকলে। ভাই! আজ প্রভাতের নমস্কার গ্রহণ কর।

(প্রস্থান)

রঞ্জিৎ—আমি উঠি, যাই। শাস্তি নেবার আগে সকলের সঙ্গে একবার দেখা করিগে। না, আমার মন এতটুকু খারাপ হয়নি, হয়নি, নীরব পূজা আজ আমার ব্যক্ত, আজ সার্থক।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাঘবের কক্ষ

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রঞ্জিতের প্রবেশ।

রঞ্জিৎ (প্রণাম করিয়া)—দাসকে স্মরণ করেছেন প্রভু?

গুরু—হ্যাঁ বৎস। উপবেশন কর।

(রঞ্জিৎ বসিল; কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব)

গুরু—বৎস রঞ্জিৎ!

রঞ্জিৎ—প্রভু।

গুরু—আমি তোমায় শিশুকাল হ'তে পালন করেছি; পুত্রের অধিক স্নেহ করেছি, ভালবেসেছি; কিন্তু আজ তোমার নামে একি কথা শুনছি বৎস? একি সত্য? সত্যই কি তুমি—

রঞ্জিৎ—প্রভু—

গুরু—কি বলছিলে রঞ্জিৎ? নীরব হ'লে কেন? বল, বল, একি সত্য?

রঞ্জিৎ—সত্য।

গুরু (কতক্ষণ নীরব থাকিয়া) আমি কিন্তু একথা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে পারিনি।

রঞ্জিৎ (জানু পাতিয়া) দেবতা! শাস্তি চাই।

গুরু (স্বগত) শাস্তি দেবার কে আমি? আমিই কি কোনও দিন কোনও পাপ করিনি? (প্রকাশ্যে) শাস্তি? শাস্তি?

রঞ্জিৎ—হাঁ, প্রভু শাস্তি। আপনার আদেশ অবমাননা-কারীর শাস্তি।

গুরু (কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিলেন) বৎস রঞ্জিৎ!

রঞ্জিৎ—আদেশ করুন গুরু।

গুরু—তোমায় ক্ষমা করেছি বৎস, ওঠ।

রঞ্জিৎ (চমকিয়া) ক্ষমা?

গুরু—হ্যাঁ, ক্ষমা।

রঞ্জিৎ—কিন্তু ক্ষমা তো আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করিনি, গুরু।

গুরু—ক্ষমা তো কারও মতামতের অপেক্ষা রাখে না। ওঠ, মন্দিরে চল, আজ মন্দিরে আমার একজন সম্মানীয় অতিথি আসবেন। তোমরা তাঁর অভিভাষণ পাঠ করবে, আর আশ্রম বালিকারা তাঁর বরণের মঙ্গলগীতি গান করবে। চল দেবারতির সময় হয়ে এসেছে, এখনি তিনি আসবেন।

রঞ্জিৎ—আশ্রমে বালিকারা বরণের মঙ্গলগীতি গান করবে। অগ্নিও সেখানে উপস্থিত থাকবে।

গুরু—হ্যাঁ চল, চল, আর বিলম্ব নয়।

রঞ্জিৎ—তবে চলুন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

দেব মন্দির। রাজা আসীন, পার্শ্বে গুরু রাঘব। চতুর্দ্দিকের উজ্জ্বল আলোকে রাজার বহুমূল্য মুকুট ঝক ঝক করিতেছে। চতুর্দ্দিকের চামর দুলিতেছে ও মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের মৃদু মৃদু ধ্বনী শুনা যাইতেছে।

(শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা অভিভাষণ পাঠ শেষ হইবার পরে বরণডালা হস্তে প্রথমে রক্ত বস্ত্র পরিহিত অগ্নি ও তৎপশ্চাৎ আশ্রমবালাগণের প্রবেশ)

গান

এস হে এস, এস হে এস এসহে সুন্দর—
এস হে নব কল্যাণ! ওগো এসহে মনোহর।
মোরা এনেছি বরণ ডালা,
এনেছি কুসুম মালা,

এনেছি দেব আশীষ বহিয়া যতনে হে ধর ধর।
আজিকে এ শুভ লগনে
কার আঁখি জাগে গগনে,
আশীষের মালা ঝরিয়া পড়িছে যতনে হে পর পর।
এসহে এস! এসহে এস! এস হে সুন্দর।

(বালিকাগণের রাজার চতুস্পার্শে ঘুরিয়া বরণ ডালা নামাইয়া প্রণাম)

রাজা—(স্বগতঃ) রক্তবস্ত্র পরিহিতা ওকে? উঃ কি রূপ, চোখ যেন ঝল্‌সে যেতে চায়!—অথচ তাকিয়েও আশা যেন মিটতে চায় না। কে, এ বালিকা কে?

রঞ্জিৎ—(স্বগত) রাজার চোখে ও কি ভীষণ দৃষ্টি! অগ্নির দিকে ও কী ভীষণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

গুরু—বৎস রঞ্জিৎ, এবার তুমি তোমার আশ্রম ভ্রাতাদের বিশ্রামের জন্য নিয়ে যেতে পার।

রঞ্জিৎ—(স্বগতঃ) ভেবেছিলাম দেবীকে পূজা নিবেদন করেই বুঝি ভক্তের সব আশার সব আকাঙ্ক্ষার সমাধা হয়ে যায়। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তা হয় না। মনের মধ্যে কে যেন ধীরে ধীরে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে! রাজার চোখে ও কী দৃষ্টি? ও কিসের শিখা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি? অগ্নি! অগ্নি!!—

গুরু—রঞ্জিৎ, রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—গুরু!

গুরু—তোমার আশ্রম ভ্রাতাদের সঙ্গে বিশ্রাম করতে যাও।

রঞ্জিৎ—যাই।

(গুরুর পদবন্দনা করিয়া শিষ্যগণের প্রস্থান)

রাজা—(অগ্নির হাত ধরিয়া) বালিকা।

গুরু—(ব্যস্তভাবে) রাজা! ও আশ্রমবাসিনী।

রাজা—তাহোক। একে আমার চাই, গুরু। এর রূপ আমায় পাগল করেছে, আমায় উন্মত্ত করেছে।

গুরু—(চীৎকার করিয়া) অগ্নি! অগ্নি!!

রাজা—বল গুরু কিসের বিনিময়ে একে আমি পাব? বল, বল—এর রূপ আমায় পাগল করেছে।

গুরু—তোমার ঐ অমূল্য মুকুট চাই।

রাজা—যা চাও তাই পাবে। (মুকুট খুলিয়া দিতে উদ্যত ও অগ্নির বাধাপ্রদান)

অগ্নি—রাজা কি করছো?

রাজা - তোমায় আমার চাই—। তার বিনিময়ে সব দিতে পারি।

অগ্নি—প্রাণ?

রাজা—প্রাণও।

অগ্নি—গুরু! গুরু! আদেশ দাও—আদেশ দাও।

গুরু—রাজা! আজ তুমি শ্রান্ত, চল, পৌঁছে দিয়ে আসি।

রাজা—পৌঁছে দিয়ে আসবে গুরু? কিন্তু অগ্নি... অগ্নিকে যে আমার চাই-ই।

গুরু—চাই-ই?

অগ্নি—চাই।

রাজা—চাই-ই—আমার চাই-ই।

গুরু—চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রাজা—অগ্নি?

গুরু—ফাল্গুন পূর্ণিমার দিনে তাকে পাবে।

অগ্নি—(আর্ত্তস্বরে) পিতা! গুরু! পিতা।

গুরু—(স্বগত) একী? মন কেঁপে উঠে কেন? (প্রকাশ্যে দৃঢ়স্বরে) না কোনও কথা শুনতে চাইনে, ফাল্গুন পূর্ণিমা আগত প্রায়, ঐ দিনে তুমি রাণী হবে। যাও, বিশ্রাম করতে যাও। রাজা! চল—।

(রাজাকে লইয়া গুরুর প্রস্থান ও অন্য দুয়ার দিয়া আশ্রমবালিকাগণ সহ ধীরে ধীরে অগ্নির প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর রাত্রি। গুরু রাঘবের বিশ্রাম কক্ষ।
ধীরে ধীরে অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি—পিতা! কন্যাকে স্মরণ করেছেন?

গুরু—(স্বগত) মন এত চঞ্চল হও কেন? পিতা! পিতা! এ ডাক তো আর কখনও শুনিনি। না, ও ডাক শুনতে চাইনে—আর ও ডাক শুনতে চাইনে।

(প্রকাশ্যে)

বৎসে!—উপবেশন কর।

অগ্নি (উপবেশন করিয়া)

পিতা!—কন্যাকে স্মরণ করেছেন?

গুরু (স্বগত) মন! স্থির হও। (প্রকাশ্যে) হাঁ বৎসে। (স্বগত) পিতা! এ ডাকে মন দোলে কেন?

আমি গুরু, এই আশ্রমের মালিক, এই আশ্রমবাসিদের হর্ত্তা কর্ত্তা—জীবনে কোনও পাপ করিনি। পাপ করিনি? কে বল্‌লে? যে দিন সেই বিধবা পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ব'লেছিল ও আমার—আমার কন্যা...উঃ, না, না। ও দেবতার কন্যা, রূপের কন্যা! আর আমি, আমি জিতেন্দ্রিয়, আমি সাধু।—

(প্রকাশ্যে) বৎসে!

অগ্নি—আদেশ করুন পিতা।

গুরু—রাজার রাণী হতে তোমার আপত্তি আছে?

অগ্নি—আপত্তি না, কিছুমাত্রও না।

গুরু—তুমি ফাল্গুনি পূর্ণিমার দিন রাণীর আসনে ব'সবে।

অগ্নি—এ আদেশ শিরোধার্য্য।

গুরু (উঠিয়া)—আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর কন্যা। (আশীর্ব্বাদ শেষে) এইবার তুমি যাও আর আমার সম্মুখে দাঁড়িও না—দাঁড়িও না।—

অগ্নি—পিতা!

গুরু—ডেক না! তুমি যাও, তুমি যাও।

(অগ্নির ধীরে ধীরে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

পদ্মানদীর তীর। জ্যোৎস্না রাত্রি। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ অগ্নি উপবিষ্টা।

রঞ্জিতের প্রবেশ

রঞ্জিৎ—ডেকেছ অগ্নি?

অগ্নি (চমকিয়া)

কে রঞ্জিৎ?—ব'স

রঞ্জিৎ (তৃণদলের উপরে বসিয়া)

ডেকেছ অগ্নি?

অগ্নি—খবর শুনেছ বোধ হয়, কেমন রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—খবর কই না?

অগ্নি (হাসিয়া) সেকি? এতবড় খবরটা তোমায় কেউ দিলে না? আশ্চর্য্য তো!

রঞ্জিৎ—না, আমি কিছু শুনিনি।

অগ্নি-শোননি? তবে শোন আমি শীঘ্রই রাজার রাণী হ'তে চ'লেছি।

রঞ্জিৎ (কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া) এই কথা শোনবার জন্যে ডেকেছিলে?

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—কিন্তু আশ্রম বালিকাদের নিয়ম তো তা নয় অগ্নি!

অগ্নি (হাসিয়া) নিয়ম আর সকলের বেলাতেও উল্টে যেতে পারে—যদি কেউ রাজার মত—

রঞ্জিৎ—রাজার মত কি অগ্নি?

অগ্নি—অমূল্য কিরীট উপহার দেয়।

রঞ্জিৎ—রাজা দিয়েছেন?

অগ্নি—হ্যাঁ, রাজা আমার বিনিময়ে মুকুট দিয়েছেন।

রঞ্জিৎ—তবে তুমি রাণী হ'তে চলেছ।

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—আনন্দের সঙ্গে।

অগ্নি—আনন্দের সঙ্গে।

রঞ্জিৎ—(কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) না, তোমার সে আনন্দ আমি চূর্ণ ক'রবো অগ্নি, আমি তোমায় রাণী হ'তে দেব না।

অগ্নি (হাস্য) হা হা হা হা। পাগল!

রঞ্জিৎ (শিহরিয়া) কী ভীষণ হাসি! কী সুন্দর হাসি!

অগ্নি—শিউরে উঠছো? হাসি শুনে শিউরে উঠছো?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ, তুমি বড় ভয়ানক।

অগ্নি—আর?

রঞ্জিৎ—সন্ধ্যা।

অগ্নি—পতঙ্গ আগুনকে সুন্দর দেখেই পুড়ে মরে। তুমিও পুড়ে মরতে চাও কেমন?

রঞ্জিৎ—সে পোড়াতে সতর্কতা আছে।

অগ্নি—আচ্ছা, পুড়বে, তুমিও পুড়বে। কিন্তু রঞ্জিৎ, ও কি? সরে আসছ কেন?

রঞ্জিৎ—স্পর্শ করবো, একবার তোমায় স্পর্শ ক'রব।

অগ্নি—পাগল! পাগল!!

রঞ্জিৎ—সরে যাচ্ছ? দূরে স'রে যাচ্ছ? অগ্নি সরে এস, ধরা দাও, আজ নিবিড়ভাবে ধরা দাও।

অগ্নি—পাগল! পাগল!

(নদীকূল দিয়া অগ্রে অগ্নি ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ রঞ্জিৎ

ছুটিতে লাগিল। অগ্নি দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাজতোরণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল) (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) কে আছ? কে আছ?

(দ্রুতপদে এক বর্ম্মাবৃত পুরুষ মূর্ত্তির প্রবেশ)

মূর্ত্তি—আমি আছি।

অগ্নি—আশ্রয় চাই।

মূর্ত্তি—আমার কাছে?

অগ্নি—হ্যাঁ,, তোমার কাছে।

মূর্ত্তি—তবে এস।

(পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে একটি সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিতেই অগ্নি চমকিয়া উঠিল)

অগ্নি—এ কি? রাজা?

রাজা—হ্যাঁ, আমি রাজা।

অগ্নি—তোমার প্রহরীবৃন্দ কোথায় গেল?

রাজা—তাদের আজ ছুটি দিয়েছি, তুমি আসবে বলে।

অগ্নি—আমি আসব, তা জানতে?

রাজা—গুরু খবর দিয়েছিলেন।

অগ্নি—উঃ—

রাজা—কাল প্রভাতেই তুমি রাণীর আসনে বসবে।

অগ্নি—স্মরণীয় দিন। কিন্তু তুমি আমায় কি উপহার দেবে রাজা?

রাজা—কি চাও তুমি?

অগ্নি—যা চাই, তা পাব?

রাজা—তাই পাবে।

অগ্নি—তাই পাব? তবে শোন রাজা, আমি আমার স্মরণীয় দিনে উপহার চাই—

রাজা—কি?

অগ্নি—চাই গুরু রাঘবের ছিন্ন শির।

(রাজা চমকিয়া উঠিলেন)

অগ্নি—চমকিও না রাজা, চমকিও না। চাইই, রাঘবের ছিন্ন শির আমার চাই, ওই আমার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপহার। কাল প্রভাতে রাণীর অভিষেকের পরেই আমি দেখতে চাই গুরুর ছিন্ন শির। বল রাজা, পাব? পাব?

রাজা (অভিভূতভাবে অগ্নির চোখের দিকে চাহিয়া)

অগ্নি—পাব?

রাজা—পাবে।

অগ্নি—(হাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কাল আমার জীবনের স্মরণীয় দিন—স্মরণীয় দিন'

রাজা—অগ্নি! অগ্নি!!

অগ্নি—চুপ করো রাজা; চুপ কর। আমি আমার অভিষেকের বাজনা শুনতে পাচ্ছি, আর শুনতে পাচ্ছি কি জান?

রাজা—না।

অগ্নি—শুনতে পাচ্ছি গুরুর কাতর ক্রন্দন। রাজা! রাজা!! চল বাগানে যাই, জ্যোৎস্নার আলোয় যাই, এ বন্ধ ঘর আর ভাল লাগছে না। চল, চল।

(হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরদিন প্রভাত। রাণীর বেশে অগ্নি সিংহাসনে উপবিষ্টা। ক্রোড়ে স্বর্ণপাত্রে রঘুনন্দের ছিন্ন শির।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী—(অভিবাদন করিয়া) মহারাণী! এক রমণী আপনার সাক্ষাৎ প্রত্যাশী।

অগ্নি—নিয়ে এস।

(প্রতিহারীর সহিত নারীসাজে রঞ্জিতের প্রবেশ ও প্রতিহারীর প্রস্থান। রঞ্জিৎ অগ্নির ক্রোড়স্থিত গুরুর ছিন্ন শিরের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল)

অগ্নি—(হাসিয়া) চিনতে পারব না ভেবেছিলে, নয় রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ।

অগ্নি—তাই নারীবেশে এসেছেন? কিন্তু দেখছো আমার কোলে এটা কি? আজ আমি কে! আর আমার একটা কথায় আজ কি হতে পারে?

রঞ্জিৎ—(ঘৃণা ভরে) জানি, আজ তুমি রাণী আর—

অগ্নি—(হাসিয়া) ঘৃণা হচ্ছে? আর কি?

রঞ্জিৎ—পালক হন্ত্রী, বিশ্বাসঘাতিনী।

অগ্নি—(সক্রোধে) জান, তোমারও এই মুহূর্ত্তে গুরুর দশা হ'তে পারে?

রঞ্জিৎ—জানি। কিন্তু তার আগে তোমাকেও ক্ষমা করতে পারিনে। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল, অগ্নি নড়িল না, মৃদু হাসিল মাত্র)

শোধ নেব অগ্নি, প্রস্তুত হও।

অগ্নি—(রক্ষাবস্ত্র উন্মোচিত করিয়া) এই যে।

(রঞ্জিতের হাত কাঁপিয়া অস্ত্র গালিচার উপর পড়িয়া গেল)

রঞ্জিৎ—(চীৎকার করিয়া) অগ্নি! অগ্নি!!

অগ্নি—ছিঃ এত দুর্ব্বল চিত্ত তোমার? রঞ্জিৎ! তুমি না পুরুষ? তুমি না গুরু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলে? তবে পিছিয়ে পড় কেন? অস্ত্র নাও, আমায় খুন কর, আমি বাঁচি; পিতৃহত্যার পাতক থেকে আমায় বাঁচাও, আমায় এ যন্ত্রণা হতে মুক্তি দাও।

(কাতরভাবে রঞ্জিতের হাত জড়াইয়া ধরিতেই রঞ্জিৎ শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল)

রঞ্জিৎ (সগর্জ্জনে) রাক্ষসী! পিশাচি!

অগ্নি—হ্যাঁ, আমি তাই। একদিন না একদিন পুড়ে মরতে চেয়েছিলে? ভুলে গেছ?

রঞ্জিৎ—হাঁ, ভুলেছি। অগ্নিকেও আর মনে পড়ে না।

অগ্নি—তবে তোমার সম্মুখে ব'সে কে?

রঞ্জিৎ—রাণী! আজ আমার সম্মুখে ব'সে আছে এক রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী নারী।

অগ্নি—তাকেই আজ তুমি খুন করতে এসেছিলে।

রঞ্জিৎ—ভুল করেছিলাম। পালাই, পালাই; এখনি কেউ দেখতে পাবে।

দ্রুতপদে প্রস্থান

অগ্নি—(রুদ্ধস্বরে) রঞ্জিৎ! রঞ্জিৎ!!

সপ্তম দৃশ্য

রাজার শয়ন কক্ষ। রাজা বহুমূল্য পালঙ্কে নিদ্রিত; সম্মুখে শূন্য গরলাধার হস্তে দাঁড়াইয়া অগ্নি।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। নহবৎ বাজিতে সুরু করিয়াছে; পুরবাসী তখনও কেহ জাগে নাই।

অগ্নি—(হাসিয়া) ঘুমাও রাজা, সুখে ঘুমাও; এ ঘুম আর তোমার কেউ ভাঙ্গাতে পারবে না। নহবৎখানায় নহবতে সুরের নানা হেরফের চলছে, তুমি ঘুম ভেঙ্গে শুনবে ব'লে, কিন্তু আজ আর তুমি শুনতে পাবে না। আগুনের ধারার মত ব'য়ে চলেছি। রাজা! রাজা!! ঘুমাও, ঘুমাও!! তোমার রূপের রাণী আজ যে তোমায় ঘুম পাড়িয়েছে। সে ঘুম আর কেউ ভাঙ্গাতে পারবে না। গুরুকে ঘুম পাড়িয়েছ, তোমায় ঘুম পাড়িয়েছি, আর এক জনের ঘুমের অভিসারে চলেছি।

অনেক কাজ, আজ আমার অনেক কাজ। যাই তবে, ঘুমাও রাজা, ঘুমাও।

(কক্ষ হইতে বাহির হইয়া রাজপুরীর বাহিরে পড়িল ও চলিতে চলিতে পূর্ব্বের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটী কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া) রঞ্জিৎ। দুয়ার খোল। (ভিতর হইতে দুয়ার খুলিয়া রঞ্জিৎ বাহিরে আসিল।)

রঞ্জিৎ—(চমকিয়া) রাণী তুমি?

অগ্নি—হ্যাঁ, আমি রাণী। তোমার সঙ্গে কথা আছে রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—আমার সঙ্গে কথা আছে—তোমার?

অগ্নি—হ্যাঁ, আমার।

রঞ্জিৎ—বিশ্বাস হয় না।

অগ্নি—অবিশ্বাস হবার তো কোনও লক্ষণ দেখি না। যাক্ আর কাউকে জানিয়ে কাজ নেই; পদ্মানদীর কূলে চল, দেখবে নদীতে কেমন ভাঙ্গন ধরেছে, আর ঢেউয়ের কি তাণ্ডব নৃত্য।

রঞ্জিৎ—সে আমি দেখেছি।

অগ্নি—ভাল কোরে দেখেছ?

রঞ্জিৎ—ভাল করে দেখেছি।

অগ্নি—তা হোক্ চল রঞ্জিৎ, শুধু আজকের এই রাতের অন্ধকারটি যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ; তারপরে তুমি ফিরে এস, আমি বারণও করব না, চল।

রঞ্জিৎ—তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া সাজে না, তুমি রাণী।

অগ্নি—তোমায় রাজা সাজাব ব'লেই তো নিয়ে যাচ্ছি রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ (চমকিয়া) কি? কি ব'ললে?

অগ্নি—না, কিছু নয়। তুমি যে রঞ্জিৎ, আর দেরী নয়, এখনই সূর্য্য উঠবে। ঐ শোন, পাখীদের অস্ফুট কাকলী শোনা যাচ্ছে। রাজবাড়ীর নহবতের রাগরাগিণীও থেমে এসেছে।

রঞ্জিৎ—(অগ্রসর হইতে হইতে) তবে চল কিন্তু তুমি যে

রাজবাড়ী থেকে চলে এলে রাণী। নহবতের রাগরাগিণী শুনছে কে?

অগ্নি—(হাসিয়া) রাজা।

রঞ্জিৎ—উঃ, রাণী আজ তোমার হাসিটাও অত ভীষণ দেখাচ্ছে কেন? এমন তো আমি কোনও দিনই দেখিনি!

অগ্নি—যেদিন গুরুর ছিন্ন শির লয়ে বসেছিলাম, সেদিনও নয়?

রঞ্জিৎ—ঠিক মনে পড়ে না, সে প্রায় এক বৎসর আগের কথা।

অগ্নি—হ্যাঁ, আজ আবার এক বৎসর পরে সেইদিন ফিরে এসেছে। আর ফিরে এসেছে সেইদিনটি, যেদিন বলেছিলে আমি তোমার ভালবাসি অগ্নি, তোমার ভুবন-ভোলান রূপকে ভালবাসি! (কথা কহিতে কহিতে উভয়ে পদ্মানদীর তটে আসিয়া দাঁড়াইল)

নীরব কেন রঞ্জিৎ, উত্তর দাও, একদিন ব'লেছিলে মরণকে বরণ করে অমর হ'তে চাও, আজ তা পারবে।

রঞ্জিৎ—একথা আজ কেন?

অগ্নি—উঃ, অনেকদিন হ'য়ে গেছে নয়? দিনের পর দিন গত হ'লে প্রবৃত্তি যে একরকম থাকে না, তুমিই তার জলন্ত প্রমাণ, কি করব? নীরব কেন রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—বল।

অগ্নি—(শাণিত কৃপাণ হস্তে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) প্রস্তুত হও রঞ্জিৎ; সেদিন তুমি আমায় যা দান করতে পারনি, আজ আমি তাই তোমায় দান ক'রবো। যদি ভগবানকে কোনওদিন মেনে থাক, তবে তাঁকে স্মরণ কর, না হ'লে—

রঞ্জিৎ—না হ'লে কি?

অগ্নি—যদি কাউকে কোনওদিন ভালবেসে থাক তাকে ভাব।

রঞ্জিৎ—(হাসিয়া ঘৃণাপূর্ণ স্বরে) ভয় পাব' ভেবেছ? কিছু না। ভগবান আছেন কি না জানি না; কিন্তু ভালও আমি কাউকে বাসিনি।

অগ্নি—কোনওদিন না?

রঞ্জিৎ—না, কোনওদিন নয়।

অগ্নি—তবে আমায় মিথ্যাকথা বলেছিলে?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ।

অগ্নি—(রুদ্ধস্বরে) উঃ এতদিন—এতদিন পরে আমায় কাঁদালে? রঞ্জিৎ,—রঞ্জিৎ—

(রঞ্জিৎ উত্তর দিল না, অগ্নির হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া আপনার বিশাল বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় লুটাইয়া পড়িল)

অগ্নি—(চীৎকার করিয়া) রাজা, রাজা আমার!!

(উভয়কে লইয়া খানিকটা স্থান মহাশব্দে পদ্মাবক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়িল)

নানা কথা

লক্ষ্ণৌ মুস্লিম জাতীয় সম্মেলনে সভাপতি স্যার আলী ইমামের বক্তৃতা

অদ্যকার এই বিপুল জনসমাবেশ দেখিয়া পার্লামেন্টের শাসন-সংস্কার যুগের কথা আমার মনে হইতেছে। তৎকালে মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথার সমর্থকের সংখ্যা বোধ হয় অঙ্গুলীতে গণিয়া শেষ করা যাইত। যাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবল সমর্থক ছিলেন, আমি নিজেও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, এবং প্রকৃত পক্ষে গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিন্টোর সঙ্গে ঐ সম্পর্কে যে ডেপুটেশন সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, আমি সেই ডেপুটেশনের একজন সদস্যও ছিলাম। কিন্তু ১৯০৫ এবং ১৯০৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আমি ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনার অবসর লাভ করি এবং সুনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা শুধু ভারতের জাতীয়তারই বিরোধী নহে, উহা নিঃসংশয়িতরূপে মুস্লিম সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর। ১৯০৯ সালেই এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত করি, কিন্তু তৎকালে মুসলমানেরা প্রায় সকলেই সংবাদপত্রে এবং জনসভায় আমার মতের নিন্দাবাদ করেন।

২২ বৎসর পরের অবস্থা

তৎপরে ২২ বৎসর কাল কাটিয়া গিয়াছে, এই ২২ বৎসর পরে, আমি আমার সম্মুখে শুধু ভারতের সকল প্রদেশের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিদিগকে মাত্র নহে পরন্তু কয়েকটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শিক্ষিত মুসলমানসমাজের প্রতিনিধিদিগকে সমবেত দেখিতে পাইতেছি। অদ্যকার এই সভায় মুস্লিম ন্যাশনালিষ্টগণ, অন্য কথায় যাহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতির অনুরাগী নহেন, তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছেন। গত ২০ বৎসরে অভীষ্টপথে আমরা অভাবনীয়রূপে অগ্রসর হইয়াছি। এই সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতিরূপে আমি ভারতের সকল অংশ হইতে এবং বিভিন্ন নেতৃগণের নিকট হইতে অসংখ্য বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারা সকলেই মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথার দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। ঘটনাচক্রের এই যে গতি, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়, এবং এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সঙ্ঘবদ্ধ এবং সম্মিলিত ভারতীয় জাতীয়তার পতাকা ঊর্দ্ধে ধারণ করিতে ভারতের মুসলমানগণ অপর কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নহেন।

অদম্য শক্তি

আমি আপনাদের নিকট সাহস করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে, ভারতের মুসলমানদের এই আন্দোলন, উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং জগতের কোন শক্তিই তাহাকে রুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। নিরাশার কোনই কারণ নাই। কালের গতি আমাদেরই অনুকূলে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান

ভারতের বর্ত্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে গত দুই বৎসর কাল মুস্লীম ন্যাশনালিষ্টগণ যে সব দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন, শুধু তাহা লক্ষ্য করিলেই কালের গতি কোন্ দিকে বুঝিতে পারা যাইবে। অদ্যকার এই মহতী সভায় এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা অদম্য দৃঢ়তার সহিত এবং প্রফুল্লচিত্তে অন্যান্য স্বদেশ প্রেমিকগণকে যে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তাঁহারাও তৎসমুদয় সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের এই আত্মত্যাগ কখনই বৃথা যাইতে পারে না।

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতের জাতীয়তার প্রতি আমার এইরূপ অবিকল শ্রদ্ধা কেন, তদুত্তরে আমি বলিব উহা ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতি জাতীয়তার অভাবেরই দ্যোতক। রাজনীতিক সমস্যাসমূহ সামাজিক নীতিসমূহের প্রতিঘাত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আপনারা যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি লোহার প্রাচীর তুলেন, তাহা দ্বারা আপনারা সমাজের সংস্থানসূত্রকেই ধ্বংস করিবেন। আপনারা যদি রাজনীতিক ব্যবধান সৃষ্টির উপর জোর দিতে থাকেন, দিন দিন আপনাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। রাষ্ট্র শাসনতন্ত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর গণ্ডী নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য কি বিবেচনা করিয়া দেখুন।

তৃতীয় পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতির পথে এই যুক্তি দেখান হইয়া থাকে যে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, শিক্ষায় পশ্চাৎবর্ত্তী এবং আর্থিক হিসাবে অনুন্নত। এই যুক্তি দৃঢ় করিবার জন্য বলা হয় হিন্দুদের প্রবল বিরুদ্ধতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহারা কখনই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভে সক্ষম হইবে না ইহাতে ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, প্রত্যেক হিন্দু মুসলমানদের চির-শত্রু। আমি এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশে বিশ্বাস করি না, কিন্তু যদি ঐগুলি সত্য বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইতে কি সিদ্ধান্ত আসে? প্রথমে এই কথা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, মুসলমানেরা অত্যন্ত দুর্ব্বল, নিজেদিগকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের নাই। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের শত্রুস্বরূপ হিন্দুরা অতি নিষ্ঠুর এবং দুর্দ্দমনীয় এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

ঐ সব সংরক্ষণ ব্যবস্থার পশ্চাতে যদি কোনরূপ শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঐ গুলির দ্বারা যে বাস্তবিক পক্ষে স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে, আমি ইহা বিশ্বাস করি না। মুসলমানেরা যদি নিজদিগকে রক্ষা করিতে না পারে এবং হিন্দুরা তাহাকে রক্ষা না করে, তাহা হইলে সে শক্তি নিশ্চয়ই তৃতীয় পক্ষের হাতে গিয়া বর্ত্তিবে। ইহা কি জাতীয়তার বিরোধী নহে? ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, এ দেশে যে সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে না, সেই সমর্থনের উপরই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদীদের ভরসা? ইহার অর্থ চিরন্তন শিক্ষানবিশীতে অবস্থান করা। ন্যাশানালিষ্ট মুসলমানগণ, স্বাধীনতার আশা অন্তরে পোষণ করেন, এমন অবস্থায় তাঁহারা যে শাসনতন্ত্রে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতির প্রবর্ত্তন করিতে ঘৃণা বোধ করিবেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? একদল লোক আছেন যাঁহারা যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথার সহিত কতকগুলি সর্ত্ত বরাদ্দ করিয়া দিতে ইচ্ছুক। আইন সভায় আসন'রিজার্ভ' বা স্বতন্ত্র রাখিবার দাবী প্রভৃতিতে তাঁহাদের মত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ফাঁদে পড়িবেন না

এ সম্বন্ধেও আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, ঐগুলি ফাঁদস্বরূপ এবং বিশেষভাবে ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, বাহিরের কোন শক্তির উপস্থিতির আবশ্যকতাই উহার ফলে অনিবার্য্য প্রতিপন্ন হইবে। কোনরূপ সর্ত্ত বা বাধা-নিষেধ বিনির্ম্মুক্ত অবিকৃত যুক্তনির্ব্বাচননীতিকে সোজা-সুজিভাবে সমর্থন করাই আজ একান্ত আবশ্যক; ইহাই আপনাদের নিকট আমার নিবেদন। স্বার্থ সুবিধা লুঠের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমান-দের ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, কোন বিধি-বিধানের দ্বারা যে, এই ভাগ বাঁটোয়ারা স্থিরীকৃত হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমি করি না। ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে এবং সে স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে মুসলমান সমাজের অবদানের অনুপাতেই মুসলমান-সমাজ ঐ সব সুখ সুবিধার ভাগী হইবে। মুসলমানদের ভয় করিবার কিছুই নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বীর মুসলমানগণ, বাঙ্গলা এবং পূর্ব্ব-সীমান্তের

মুসলমানদের সংখ্যাবাহুল্য স্বাধীন ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্ব্বিঘ্নতার পক্ষে অধৃষ্যশক্তিস্বরূপ থাকিবে। ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দুরাজ অথবা মুসলমানরাজ বলিয়া কোন কিছুর স্থান হইবে না। স্বদেশ প্রেমের উদার ভিত্তির উপর ভারতের জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক-কালিমার স্পর্শ তাহাতে থাকিবে না। ভারতের তেমন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই আপনাদের লক্ষ্য হউক এবং সেই লক্ষ্য সাধনে আপনারা আত্মত্যাগে অগ্রসর হউন।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে জাগরণ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে রাজনীতিক নব-জাগরণ সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতের জাতীয় সংহতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, উহা তাহার সু-নিশ্চিত লক্ষণ। আশার আর একটি কারণ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়, বণিকসভা প্রভৃতি যে সব স্থলে গণ্ডীবদ্ধভাবে যুক্তনির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত আছে, সে সব স্থানেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ ক্রমশঃই বিলোপ হইয়া যাইতেছে। আমার নিজের প্রদেশে—বিহারে মৌলবী আবদুল হাফীজ এবং মিঃ আলী মনজার সম্প্রতি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়াছেন। তাহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সদস্যপদপ্রার্থীদের চরিত্র এবং যোগ্যতার বিবেচনা সাম্প্রদায়িক সংস্কারকে পরাভূত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় এবং অপর ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের ভোটের জোরে প্রভাবশালী হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে পরাস্ত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যুক্তনির্ব্বাচনপ্রথা একবার প্রবর্ত্তিত হইলে সদস্যপদপ্রার্থীদের চরিত্রবল, যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত প্রভাব নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক সংস্কারের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে। জগৎ অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে, এখন রাজনীতিতে অন্য কোন বিচার আর চলিতে পারে না।

ইহা সত্য যে, এই সেদিন বেনারস, মীর্জাপুর, আগ্রা এবং কাণপুরে ভীষণ শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে। অনেকে আছেন, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, এজেণ্ট প্রভোকেটর বা প্ররোচক গুপ্তচর দ্বারা ঐ সব হইতেছে।

অন্যেরা বিশ্বাস করেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরাই এই সমস্ত দাঙ্গা বাধায়। এই সমস্ত সর্ব্বনাশকর আত্মকলহের মূল কি, তাহা এখানে স্থির করা সম্ভবপর নহে। আমি সাগ্রহে আশা করি যে, এই সমস্ত দুর্ঘটনা অতীতের বিষয়ই হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কেহ কেহ এই সমস্ত দাঙ্গাগুলিকে রাজনৈতিক কুমতলব সিদ্ধির জন্যই প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য যাহাতে দূরীভূত হয় তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে হইবে। এক্ষণে ভারতের পরমসন্ধিক্ষণ—কাজেই সমস্ত ভারতবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য সাম্প্রদায়িক মিলন দৃঢ় করা এবং চার্চ্চিলের দলকে ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কারে বাধা দেওয়ার সুযোগ না দেওয়া।

ডাঃ আনসারী

আমরা যে সমস্যার সমাধান করিতে এস্থলে সমবেত হইয়াছি, তাহার উপর ভারতের ভাগ্য এবং মুসলমানদের সত্যতাগত অধিকার জড়িত রহিয়াছে। স্বাধীনতার জন্য ভারত যে অহিংস সংগ্রাম করিয়াছে, তাহা জগতে অতুল, এই সংগ্রামে প্রথম স্তরে সে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা প্রাথমিক স্তর মাত্র। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া ঐ সংগ্রামের ফল হইতে ভারতভূমিকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে। একথা এখন আর চাপা নাই যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিছুর মধ্যে কিছু না এমন অবস্থাতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিতেছে। বিপজ্জনকভাবে আজ অনেক লোকের ভাবোচ্ছ্বাসের ছড়া-ছড়ি আরম্ভ হইয়াছে। এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইতেছে, যাহাতে হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী এবং সহযোগিতা সম্ভব না হয়, ভারতের সমস্যা দিন দিনই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। যাহাতে ভারতের এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকিতে পারে, সেজন্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমাজের বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিকদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌছিতে চেষ্টা করিতেছেন।

দেশ ও সমাজ :—

দেশ এবং সমাজ এই দুইটি বিষয়ের উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। কারণ এক দল লোক নিতান্ত ধৃষ্টতাসহকারে এই অভিযোগ করিতেছে যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ ইস্লামের স্বার্থ দেখেন না। তাঁহাদের ঐ অভিযোগ যে কতদূর মিথ্যা, আমি তাহা দেখাইতে চাই। যাঁহারা এই অভিযোগ করেন, ইস্লামের আধ্যাত্মিক উদারতার কথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত; ইস্লাম জগতের মানব-সৌভ্রাত্রের আদর্শকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছে এবং তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, সেই সৌভ্রাত্রের স্থান সর্ব্বদা সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামীর উপরে। দেশের জন্যই হউক, আর সমাজের জন্যই হউক, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের দাবী ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে জাতির এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে সংঘাত কোথায়, আমি বুঝিতে পারি না। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ অন্যান্য রাজনৈতিক মতাবলম্বী মুসলমানদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে বারংবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা অপর দলের মত কতকটা মানিয়া লওয়া সম্ভব বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নির্ব্বাচননীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব লইয়া ঐ আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তা গঠনের পক্ষে যুক্তনির্ব্বাচন প্রথার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিবার যে কোন আবশ্যকতা আছে, তাহা আমি মনে করি না। বিশিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই উহার অনুকূল মতাবলম্বী। রাজনীতির দিক হইতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা যে সাম্প্রদায়িক ভেদবিদ্বেষ এবং বিরোধকে চিরস্থায়ী করিবার একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৌশল, একথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে প্রদেশের মুসলমানেরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ, সেই সব স্থান এবং মোটের ওপর সমগ্র ভারতে তাহারা

যে অযোগ্য এবং অক্ষম, ঐ প্রথাতে তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং উহার ফলে বিদ্বেষভাব এবং নৈতিক অধোগতি অনিবার্য্য।

সভ্যতার দিক হইতেও ঐ প্রথা দারুণ অনিষ্টকর। মুসলমানগণ ঐ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার প্রাচারের দ্বারা নিজদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ভ্রান্ত নির্বিঘ্নতার একটা বিশ্বাসে তাহাদের সভ্যতার অন্তর্হিত তেজোবীর্য্য নষ্ট হইয়া পড়িবে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদী পুরাতত্ত্ব রাখিবার যাদুঘরে মুসলমান সভ্যতাকে রাখিতে চাহিতেছেন। আমি নিজে এই বিশ্বাস করি যে, ভারতের মোস্লেম সভ্যতা এক প্রাণবান জিনিষ, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনকে ভারত এবং মুসলমানসমাজ উভয়ের পক্ষেই দারুণ ক্ষতিকর মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিছুতেই ইহার সমর্থন করিতে পারিবেন না।

বোম্বাই করপোরেশন ও মহাত্মা

কর্পোরেশনের অভিনন্দন

এক বৎসর পূর্ব্বে আপনি জাতীয় জীবনে যে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন উহা অপূর্ব্ব এবং অদম্য শক্তিশালী। গত এক বৎসরের রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানে জগতের সমক্ষে ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতকে আর জগতের জাতিসঙ্ঘে স্বাধীনতা ও আত্ম-সম্মানের আসন হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারা যাইবে না। আপনি জগতকে যে অহিংসার মন্ত্র দিয়াছেন, উহা আজ দিকে দিকে মানবতার বহুধা কল্যাণ সাধন করিতেছে। এতদ্দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার মহনীয় উদ্যমের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতজ্ঞতায় শির নত করিতেছি। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির সমৃদ্ধি ও উন্নতির পক্ষে নিপীড়িত অস্পৃশ্য সমাজের উন্নয়ন প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। যাহাতে ভারতের প্রতি সন্তান, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকার ভোগ করিতে পারে এজন্য আপনার মহান প্রচেষ্টার আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সাফল্য কামনা করিতেছি।... ...

মহাত্মার উত্তর

'আমি চিরদিনই দরিদ্র নারায়ণের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিয়া থাকি, আমার কাছে স্বরাজের অর্থ হিন্দুস্থানের ৭ শত পল্লীর অধিবাসী জনসাধারণের উন্নতি বিধান, নগরগুলিকে যদি তাহাদের নিজেদের অস্তিত্বের যুক্তিযুক্ততা সপ্রমাণ করিতে হয় তাহা হইলে নগরসমূহকে দারিদ্র্য-পীড়িত পল্লীবাসীদের অবস্থার উন্নতি করিয়া দিতে হইবে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্তের অন্ন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে—উহাই হইতেছে পূর্ণ স্বরাজ। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, উহা হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্ক। উহা অপসারিত না করা পর্য্যন্ত আমরা স্বরাজের যোগ্য হইতে পারিব না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যে কর্ত্তব্যভার আমি বরণ করিয়া লইয়াছি, উহা এক আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, আমি এজন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করি। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান সকলের সাহায্য চাই এবং উহাদের সকলকেই নিজকে সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় বলিয়া ভাবিতে শিখিতে হইবে।"

নারী সম্মেলনে

সরলা দেবী চৌধুরাণীর অভিভাষণ

বাংলার নারীদের জন্য একটি পৃথক কংগ্রেসের কি প্রয়োজন ছিল—এই প্রশ্ন আজ চারিদিক হইতে জিজ্ঞাসিত হইতেছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, এই কংগ্রেস বঙ্গনারীর আত্মচেতনার মূর্ত্ত বিকাশ, বাঙ্গালার পুরুষের আত্মচেতনার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। বাংলার নারী তাহার জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে, তাহার ফলেই এই আত্মচেতনার উদ্ভব। সামাজিক আচার-নিয়ম তাহার আত্মবিকাশের পরিপন্থী, গার্হস্থ্য নীতির আদর্শ পুরুষের পক্ষে একরূপ, নারীর পক্ষে অন্যরূপ এবং উত্তরাধিকারের আইনগুলি চিরকালের জন্য তাহাকে পুরুষের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছে।

পরস্পর প্রয়োজন :—

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর পরস্পর প্রয়োজন আছে। কিন্তু পুরুষ তাহার নিজ স্বার্থোদ্দেশ্যেই নারীকে ব্যবহার করিয়াছে—নারীর নিজ প্রয়োজন পূরণ করিতে বিশেষ কোন সাহায্যই সে করে নাই। সমাজের বুকে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাঙ্গলার নারীগণ আজ ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের সহিত সমভূমে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

পুরুষের উৎপীড়ন :—

এক শতাব্দী পূর্ব্বে মার্কিণ রমণীরা তাহাদের 'মনোভাবের' বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, পুরুষ চিরদিনই নারীকে তাহার অধিকার হইতে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে; পুরুষের মূল লক্ষ্য ছিল নারীর উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করা; সে যত প্রকারে পারিয়াছে নারীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নষ্ট করিতে, তাহার আত্মসম্মান খর্ব্ব করিতে এবং তাহাকে পরাধীন ও ঘৃণিত জীবন যাপনে রাজি করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ক্রমশঃ অধিকার প্রতিষ্ঠা :—

তথাপি পাশ্চাত্যের নারীগণ দীর্ঘদিনের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের পর তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। সহস্র অত্যাচার, অনাচার ও দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া আজ তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয় নারীদিগের পক্ষে প্রত্যেকবার নূতন শাসন সংস্কারে কোন-না-কোন প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটি, সিনেট, আইনসভা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। ভারতে সামাজিক জীবনে পুরুষের সহযোগীরূপে নারীর যে মূল্য তাহা পুরুষদের

প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ ভাবে মানিয়া লইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারী পিকেটিং-এর কার্য্যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু নারীকে এখনও বহু দুর্গ সম্মুখসমরে জয় করিতে হইবে, পুরুষ এই সকল দুর্গের চাবি আজিও দৃঢ় মুষ্টিতে আপন করায়ত্ত রাখিয়াছেন। নারীরা বুঝিয়াছেন যে, ভারতের উন্নতির প্রতিপদক্ষেপে নারীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। নারী-শক্তি যাহাতে জাতীয় উন্নতির কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে হইবে। জাতীয় মহাসভা অদ্যাবধি নিজেদের কর্ম্মসমিতি প্রভৃতি শুধু পুরুষের দ্বারাই গঠিত করিয়া চলিয়াছেন, যদিও বহু ক্ষেত্রে এই সকল পুরুষ অনেক নারী অপেক্ষা কার্য্যক্ষমতায় ও বুদ্ধিতে হীন।

নারীর আর্থিক দুর্দ্দশা :—

জাতির মঙ্গলের জন্য যদি বিশেষ কাহারও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, তবে সে নারীর। স্ত্রীলোকের নীতিবিগর্হিত বৃত্তি গ্রহণ অথবা দুর্নীতিপরায়ণ জীবনযাপনের মূল কারণ আর্থিক দুর্দ্দশা। পুরুষের বেকার-সমস্যা অপেক্ষা নারীর বেকার-সমস্যা আরও গুরুতর। আর্থিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত স্ত্রীলোক অনেক সময়ই পুরুষের লালসা-বহ্নিতে পতিত হয়—ইহার ফল ব্যভিচার, ইহার ফল বেশ্যালয়। সুতরাং কোন আদর্শ রাষ্ট্রে একজন বেকার কিম্বা জীবিকাহীন স্ত্রীলোক থাকিবে না; আদর্শ সমাজে পুরুষ যদি কোন নারীকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায়, তবে আইনানুসারে তাহার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকিবে।

ব্যভিচার দোষ দূর :—

শৌণ্ডিকালয়গুলি পুরুষের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু বেশ্যালয়গুলি নারী-জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অপমানজনক। বিগত শীতকালে লাহোরে নিখিল ভারত এবং নিখিল এসিয়া নারী-সম্মিলনী নামক দুইটি মহিলা সভার প্রত্যেকটিতেই মদ্য নিবারণের দাবী উপেক্ষা না করিয়াও বেশ্যালয় ধ্বংসের প্রচেষ্টাকেই কার্য্যসূচীর একটী প্রধান বিষয় বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস মদ্য নিবারণের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেও বেশ্যালয়গুলি রাখার কুফল সম্বন্ধে এতটুকুও দৃষ্টি দেয় নাই। পুরুষচালিত গবর্ণমেন্ট যখন বেশ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়া নিজ তহবিল পূর্ণ করে, আর পুরুষদের পরিচালিত ভারতের জাতীয় মহাসভা যখন তাহাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ বাণীও উচ্চারণ করে না, তখন ভারতের নারীদের উচিত অবিলম্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া মিলিত চেষ্টায় চৈনিক কবি ডাঃ লিউয়ের প্রস্তাবিত একটি নিখিল-বিশ্ব গণতন্ত্র সভা গঠন করা। পৃথিবীর পবিত্রতা এবং শান্তি রক্ষার জন্য এই গণতন্ত্রের পরিষদ সমূহে নারীরই থাকিবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা।

স্বরাজের মর্ম্ম ও নারী :—

বাঙ্গালার নারীগণ এই মহিলা-কংগ্রেসে সমবেত হইয়া ঘোষণা করিতেছে যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসভা যে রাষ্ট্রতন্ত্রেই সম্মত হউক না কেন তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে অথবা সেগুলির ব্যবস্থার জন্য স্বরাজ গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে

নারীর মূল অধিকার :—

১। স্ত্রীলোকদের মূল অধিকার, যথা—

(ক) সধবা অবস্থায় স্বামীর আয়ে সমান অংশ এবং বৈধব্যের পর স্বামীর সম্পত্তিতে সন্তানসন্ততিদের সহিত সমান উত্তরাধিকার।

(খ) পিতামাতা, ভ্রাতা অথবা ভগ্নীদের সম্পত্তিতে পুত্র এবং ভ্রাতাদের সহিত কন্যা এবং ভগ্নীদের সমান উত্তরাধিকার।

(গ) সন্তানসন্ততির উপর মাতার সমান অভিভাবকত্বের অধিকার।

(ঘ) বিচার, শাসন, চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা, বিমান, নৌ এবং অন্যান্য বিভাগে চাকুরী পাইতে অথবা ব্যবস্থাপরিষদ সভা, মিউনিসিপ্যালিটি এবং জেলা বোর্ডে সদস্যপদ পাইতে কিম্বা মন্ত্রীপদ, শাসন-পরিষদের সদস্যপদ অথবা গবর্ণর পদ প্রাপ্তিতে স্ত্রীলোকের স্ত্রীলোক বলিয়াই কোন অনধিকার থাকিবে না।

(ঙ) সমস্ত প্রকার নাগরিক বিষয়ে সমান অধিকার এবং সমান বাধ্যবাধকতা। স্ত্রীলোক বলিয়া কোন বাধা থাকিবে না।

২। লাম্পট্য, বেশ্যাবৃত্তি, স্ত্রীলোক সংগ্রহ এবং তাহাকে প্রলুব্ধ করা—আইনে তুল্যরূপে দণ্ডার্হ হইবে।

৩। বেশ্যালয়গুলি সমস্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

৪। উত্তরাধিকার-পত্র না লিখিয়া মৃত এমন বেশ্যার সম্পত্তির মালিকানা দাবী করিয়া গবর্ণমেন্ট তাহার আয় বাড়াইতে পারিবে না।

৫। (ক) স্ত্রীলোক-মজুরের ভালরূপ জীবিকা-উপযোগী বেতন।

(খ) কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা।

(গ) কাজের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি।

(ঘ) বৃদ্ধ বয়স এবং পীড়িতাবস্থায় আর্থিক কষ্ট হইতে রক্ষার ব্যবস্থা।

(ঙ) প্রসূতি অবস্থায় বেতনসহ ছুটীর বিশেষরূপ ব্যবস্থা।

৬। স্ত্রীলোকদের বেকার অবস্থা এবং আর্থিক দুর্দ্দশা হইতে তাহাদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্র হইতে বিশেষ ব্যবস্থা।

৭। বালিকাদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

৮। বয়স্কা স্ত্রীলোকদের শিক্ষার সুবিধা।

৯। যে সমস্ত স্কুলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই পড়ে, তথায় শিক্ষক এবং কমিটির সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রীলোকের স্থান রাখা।

১০। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার।

নারীর কর্ত্তব্য :—

এতক্ষণ আমরা ভারতের নারীদের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা ভারতের নারীগণ এক মহান সভ্যতার উত্তরাধিকারিণী। আমরা তাহার আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক কৃষ্টি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি। আর্থিক এবং রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার তুমুল ঝড়ের মধ্যে বসিয়া ভারতের নারীকে আজ সমাহিত চিত্তে চিন্তা

করিতে হইবে এবং বলিতে হইবে—"যেনাহং অমৃতো ন স্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম" যাহা আমাকে অনন্ত জীবন দান করে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ? বন্দেমাতরম

হিন্দুদের আত্মসমর্পণ জাতির কল্যাণকর হইবে কি ?

মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন—'সত্যাগ্রহী স্বরূপে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ফলোপধায়কতায় আমি বিশ্বাস করি। সংখ্যার দিক হইতে হিন্দুদের প্রাধান্য রহিয়াছে। মিশরের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কি করিয়াছে, সে কথা না তুলিয়া তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যাহা চাহে, তাহাদিগকে তাহা দিতে পারেন ;কিন্তু হিন্দুরা যদি সংখ্যালঘিষ্ঠও হইতেন, তাহা হইলেও আমি একজন সত্যাগ্রহী স্বরূপে, একজন হিন্দু হিসাবে বলিতাম পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য পরিণামে হিন্দুদের কোন ক্ষতিই ঘটিবে না।

"আমি যে আত্মসমর্পণের কথা বলিতেছি, তাহা মানমর্য্যাদার ক্ষেত্রে নহে, পার্থিব বিষয়ে। আইন সভার আসন, প্রতিপত্তি, অথবা চাকরী প্রভৃতির বেলায় আত্মসমর্পণ করাতে মর্য্যাদার হানি ঘটে না।"

মহাত্মাজী হিন্দুদিগকে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছেন যে, ঐ ভাবে আত্মসমর্পণ করিলে, পরিণামে তাহাদিগকে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। এইভাবে আত্মসমর্পণে হিন্দুদের কোন ক্ষতি হইবে কিনা সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। ঐরূপ আত্মসমর্পণের ফলে সমগ্র দেশের ও জাতির কি লাভ বা ক্ষতি হইবে, সেই বিষয়ের বিবেচনাতেই আমার আগ্রহ অধিক।

আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন—

"অপর দেশ শাসন করিবার মত যোগ্যতা কোন জাতিরই নাই ; সেইরূপ একথাও বলা যাইতে পারে, কোন একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিবার যোগ্যতা অপর একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাই।" কাজেই সমগ্র জাতির কল্যাণ দেখিতে হইলে, সকল সম্প্রদায় এবং সকল শ্রেণীর ভিতর যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং জনহিতপরায়ণ, তাহাদের হস্তেই দেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত রাখা উচিত। এক সম্প্রদায় অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিলে, এই ফললাভ করা যাইতে পারে না।

মহাত্মাজী সত্যই বলিয়াছেন—আইন সভার আসন, চাকুরী প্রভৃতি ছাড়িয়া দেওয়াতে মর্য্যাদার হানি ঘটে না ; কিন্তু তাহাতে কার্য্যকারিতার হানি ঘটে, কর্ত্তব্য পালন এবং দেশসেবার অধিকার ত্যাগের জন্য ক্ষতি ঘটে। বর্ত্তমানের অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, স্বরাজের অধীনে আইন সভা এবং অপরাপর প্রতিষ্ঠামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যগিরি, ছোট বড় চাকুরী বিভিন্নরূপে দেশসেবারই সুযোগ রূপে গণ্য হইবে। দেশসেবার কর্ত্তব্য, অধিকার এবং সুযোগ হইতে কোন সম্প্রদায়কেই বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নহে।

অন্যান্য প্রদেশের কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালার সম্বন্ধে এই কথা বলিব যে, এই প্রদেশে ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি, স্বাস্থ্য বিধান এই সব দিক দিয়া যে উন্নতি ঘটিয়াছে, তৎসমুদয় বলিতে গেলে সবই করিয়াছে হিন্দুরা। এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী প্রভৃতিতে যাহারা বিপন্ন হইয়াছে, হিন্দুরাই জাতিধর্ম্ম-বর্ণনির্ব্বিশেষে তাহাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করিবার নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, অর্থ, সময় এবং উৎসাহ এবং মস্তিষ্কের শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের মুসলমানেরা শিক্ষার দিক হইতে হিন্দুদের ন্যায় উন্নত নহে এবং হিন্দুদের ন্যায় তাহারা সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণকল্পে বিনা পয়সায় জনহিতকর কার্য্য করিতে অভ্যস্তও নহে।

নিজেদের বড়াই করা কিংবা বাঙ্গলার মুসলমানদিগের মনে কষ্ট দান করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এতদ্দ্বারা আমি শুধু এইটুকু দেখাইতে চাই যে. বাঙ্গলাদেশের কল্যাণের জন্য বিনা পয়সায় এবং পয়সা লইয়া যে সব কাজ দরকার, একা মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বারা সেগুলি সুদক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কাজেই অবিসংবাদিত চিত্তে গান্ধীজীর পরামর্শ মানিয়া চলিলে বাঙ্গলার কল্যাণ হইতে পারে না, অন্যান্য প্রদেশে এবং সমগ্র ভারতের বেলায়ও তাঁহার ঐ উপদেশ সর্ব্বোত্তম হিত বিধায়ক হইতে পারে কিনা এ বিষয়েও সন্দেহ আছে।

ডগ্‌লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্

—অভিনেতাকাহিনী—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

আমেরিকার "কোলোরাডা" রাজ্যের রাজধানী ডেন্‌ভার" সহরে ডগ্‌লাস্ প্রথম পৃথিবীর আলো-বাতাসের সঙ্গে পরিচিত হন তেইশে মে, আঠারো-শো-তিরাশী সালে। ছেলেবেলায় পড়াশুনার দিকে এঁর মন ছিল। "ডেন্‌ভার সিটি স্কুলে" পড়াশুনা শেষ করে ইনি "কোলোরাডা স্কুল অব্ মাইন্স"এ ভর্ত্তি হন খনিজ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করবার জন্য। কিন্তু পড়াশুনা বেশী দূর অগ্রসর হোল না।

(ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্ক ও বিলি ডভ্—'ব্ল্যাক্ পাইরেটের" দৃশ্য)

এক বন্ধু এঁকে নিমন্ত্রণ করলেন—তাদের আমেচার ক্লাবে থিয়েটার দেখবার জন্য। সেই প্রথম এঁর থিয়েটার দেখা।

থিয়েটার দেখে এঁর মনের মধ্যে এমনি একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেল যে কয় রাত্রি তাঁর কেটে গেল বিনিদ্র অবস্থায়। তারপর অভিভাবকদের লুকিয়ে ইনি অভিনয় করতে সুরু করে দিলেন- এর আগে ইনি কোনদিন কল্পনাও করেন নি যে অভিনেতা হবেন।

কিছুদিন অভিনয় করবার পর এঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল জনসাধারণের মুখে মুখে—তখন এঁর বয়স কুড়ি বছরও পেরোয়নি। কিন্তু রাত জেগে অভিনয় করবার কালে পড়াশুনায় অসুবিধা হতে লাগলো অত্যন্ত, কাজেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে ইনি বাধ্য হলেন। কিন্তু অভিনয়ের বৈচিত্র্যহীনতা এঁকে আকৃষ্ট করতে পারলে না বেশীদিন, ইনি রঙ্গালয় ছেড়ে দিয়ে আবার 'স্কুল অব্ মাইন্সে' ভর্ত্তি হলেন।

কিন্তু পড়াশুনাও বেশীদিন চললো না, আবার ঢুকলেন রঙ্গালয়ে—এই হোল এঁর প্রথমবার রঙ্গালয় ছাড়বার ইতিহাস।

এমনিভাবে ইনি তিনবার রঙ্গালয় ছেড়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিদ্যাশিক্ষা করবার জন্য কিন্তু শেষবারও—যদিও খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ইনি রঙ্গালয় ত্যাগ করলেন—তবু আবার এঁকে ফিরে আসতে হোল রঙ্গালয়ে—কেন না ছ'মাস একাগ্রচিত্তে পড়াশুনা করবার মত মনের অবস্থা

তখন এঁর ছিল না—অতনু স্বপ্নকে রূপ দেবার নেশা, অপূর্ব্ব কল্পনাকে অভিব্যক্তি দেবার কামনা, এঁর রক্ত তখন চঞ্চল করে তুলেছিল।

ইনি এই সময়ে সেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটক অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন যথেষ্ট, তারমধ্যে "টু লিটল্ অরফ্যান বয়েজ্" "মেসার্স জ্যাক" ও "দি পিট"—এই তিনখানির নামই উল্লেখযোগ্য। তার পর সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা 'হারি ক্যারে'র লেখা "ম্যান্টন্" নামক নাটকে অভিনয় করতে করতে ইনি অভিনয় ছেড়ে দিলেন দালালি করবার ঝোঁকে।

দালালিতে ইনি বিশেষ কিছু সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। কেননা এ ব্যবসায় তাড়াতাড়ি সুনাম হয় না—যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। ক দিন পরে নিজের চেষ্টায় একটি লৌহ ফ্যাক্টরীর প্রধান সাহায্যকারীর পদ পান, কিন্তু তাতেও ইনি বিশেষ কিছু সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। কাজেই এঁকে আবার ফিরে আসতে হোল অভিনয়-জীবনে,—এর দ্বিতীয়বার অভিনয় জীবন ছাড়বার ইতিহাস এইটুকুই।

ইনি তৃতীয়বার পাদপীঠ ছেড়ে চলে আসেন ওকালতী করবার জন্য কিন্তু ওকালতী ব্যবসায় এঁর প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেলেনা, ইনি আবার ফিরে এলেন রঙ্গমঞ্চে—দৃঢ় সঙ্কল্প করে যে এবার হতে অভিনয়ই এঁর জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হবে।

এই তৃতীয়বার পাদপ্রদীপের তলে দাঁড়িয়ে দর্শকদের নমস্কার জানাবার কিছুদিন পরে ইনি বিয়ে করেন "বেথ্ সালী"কে—এঁরই গর্ভে কনিষ্ঠ (জুনিয়র) ডগ্লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কসের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ ডগ্লাস্ও আজ অভিনয় জগতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছেন—পিতারই পুত্র তো! কনিষ্ঠ ডগ্লাসের জন্মদিন হচ্ছে উনিশ-শো-দশ সালের নয়ই নভেম্বর।

স্বনামধন্য প্রযোজক "ডি, ডব্লু গ্রিফিথ"এর নাম আজ চিত্রজগতে কারুরই অজ্ঞাত নয়। এঁর বিচক্ষণ দৃষ্টি যে ক'জন নট-নটীর উপর পড়েছে, এঁর সুশিক্ষার কল্যাণে তাঁরা প্রত্যেকেই আজ চিত্রজগতে প্রথিতযশা। এই গ্রিফিথ সাহেব সেই সময় অনেক অর্থব্যয় করে "ইন্টলারেন্স্" নামক একখানি ফিল্ম তুলছিলেন। অনেক ছোটখাটো অভিনেতা অভিনেত্রী এসে জড় হন এই ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবার আশায়—তাদের মধ্যে গ্রিফিথ সাহেবের শ্যেনচক্ষু ডগ্লাস্কেই পছন্দ করেন। এই বইখানিতে এক বেবিলোনবাসী সৈনিকের ভূমিকায় ইনি

(ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ ও মেরী এষ্টর)

নামেন গ্রিফিথ্ সাহেবের প্রযোজনায়। এই ছবিখানিতে ইনি তিন সপ্তাহ উপরি-আর্টিষ্ট হিসাবে অভিনয় করেন দৈনিক এক পাউণ্ড বেতনে।

চিত্রাভিনেতা রূপে এঁর জীবন সুরু হয় উনিশ-শো-চোদ্দ সালের গ্রীষ্মকাল হতে। এই সময়ে ইনি প্রথম নামেন "দি ল্যাম্ব্" ছবিতে গ্রিফিথ সাহেবের প্রযোজনায়। পরপর আরো কয়েকখানি ছবিতে ইনি গ্রিফিথ সাহেবের

প্রযোজনায় অভিনয় করেন—সেগুলির মধ্যে "হিজ পিক্‌চর্স ন্‌ দি পেপার্স," "ডবল্ ট্রাবেল্" "দি আমেরিকানো" রেক্সী মিক্‌সেস," "হেবিট্‌স্ অব্ হাপিনেস্"—প্রভৃতির াম করা যেতে পারে।

কিছুদিন পরে ইনি "ট্রাঙ্গস্ ফিল্ম কোম্পানীতে" যোগ ন এবং তাদের হ'য়ে তিনখানি ছবিতে অভিনয় রেন"—"এগেন্ আউট্ এগেন," "ডাউন্ টু দি আর্থ", ওয়াইল্ড্ উলী।"

"ওয়াইল্ড্ উলীতে" অভিনয় করবার পর ইনি ফেমাস্ পিক্‌চার্স" এর চুক্তি সই করেন। তারপরে "থ্রি মাস্কেটিয়ার্স," "মিষ্টার কিক্‌স্ ইট্," "নিকার বুকার বকারু" এই তিনখানি ফিল্মে ইনি অসাধারণ সাফল্য ভ করেন—চিত্রনট বলে এঁর যশ তখন ছড়িয়ে পড়ে া ছায়াজগতের বুকে।

'মেরী পিক্‌ফোর্ড' ও সেই সময়ে 'ফেমাস্‌পিকচার্সের' দলভুক্ত ছিলেন। সু-অভিনেত্রী বলে খ্যাতিও অর্জ্জন করেছিলেন। তখনও ইনি ছিলেন বিবাহিতা, এঁর প্রথম স্বামীর নাম "ওয়েন মূর।"

কেউ তখন ভাবেওনি যে এঁদের দুজনের মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করছে। তবে অনেকেই জানতো এঁরা দুজন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেন না অবসর সময়ে প্রায়ই এঁদের দুজনকে একত্রে দেখতে পাওয়া যেত 'লস এঞ্জেলেসের' সমুদ্র-তীরে।

হঠাৎ যেদিন ডগ্‌লাস তাঁর স্ত্রী "বেথ সালী"কে 'ডাইভোর্স' করলেন সেদিন হতে হোলিউড বাসীদিগের সজাগ দৃষ্টি পড়ল এই দুটি 'নক্ষত্রর' উপরে। কিন্তু এই ডাইভোর্সের সময় থেকে কিছুদিন আর এই দুটী চিত্রনট নটীকে একত্রে দেখতে পাওয়া গেল না—কাগজে দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা বেরুতে লাগলো এঁদের দুজনের ভবিষ্যত আশা নিরাশার কথা নিয়ে।

পূর্ব্বের ঘটনাই পরবর্ত্তী ভবিষ্যতের সূচনা করে। যা' জনা কল্পনা-চলছিল, তাই ঘটলো—পিকফোর্ড তাঁর স্বামীকে ডাইভোর্স করলেন।

দুজনের বিয়ে হোল উনিশশ-কুড়ি সালের আটাশে মার্চ্চ।

বিবাহের পরে এঁরা "ইউনাইটেড আর্টিস্ কর্পোরেসন্" নামে একটী ফিল্ম কোম্পানী খোলেন—চার্লি চ্যাপলিনের সহযোগীতায়। চার্লি এই কোম্পানীর একজন প্রধান অংশীদার। যতগুলি ভাল আমেরিকান ছবি অবিমিশ্র খ্যাতি অর্জ্জন করেছে, তার অনেকগুলো এই কোম্পানীর তোলা—সেই কারণে 'ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টস্' আজ সাফল্য অর্জন করেছে যথেষ্ট।

ডগলাস যে কয়খানি ফিল্ম অভিনয় করে অবিমিশ্র সুখ্যাতি লাভ করেন, সেগুলির মধ্যে "দি নট" "মোলী কড্‌ল্" "হোয়েন ক্লাউডস্ রোলড্ বাই," "এ্যামেরিকান্‌স্," এ্যামেরিকান্ এ্যারিষ্টোক্রেসী," "সিন্দবাদ দি সেলার," "থিফ্ অব্ বাগ্‌দাদ্," "মার্ক অব জোরো," "সান্ অব জোরো," "ব্লাক পাইরেট," "দি থ্রি মাস্কেটীয়ারস্," "গোচো," "দি আয়রণ মাস্ক"—সব ক'খানিই এঁর নিজের কোম্পানীর তোলা। এঁর এই সব ছবির পরিচয় আজ নতুন দেবার কিছু নেই, যাঁরা এঁর ছবি একবার দেখেছেন এঁর অসামান্য অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা করেছেন একবাক্যে। এঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী আছে, যা দর্শকদের আকৃষ্ট করে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত ভাবে।

এঁর প্রথম সবাক ছবি হচ্ছে "টেমিং অব দি স্রু।" এর নায়িকার ভূমিকায় নামেন 'মেরী পিকফোর্ড'। মুখর ছবিতেও এঁর অভিনয় যে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ছবিখানিতে।

মেরীকে বিয়ে করবার পর মধুযামিনী যাপন করবার সময় ইনি ভারতে এসেছিলেন বেড়াতে কিন্তু নানা কারণে সেবার তাড়াতাড়ি এদেশে থেকে তাঁদের ফিরে যেতে হয়। এই ক' সপ্তাহ হোল তিনি আবার ভারতে এসে গেছেন। এখানে বিশেষভাবে কোলকাতায় তিনি যে সম্বর্দ্ধনা পেয়েছেন তা তাঁর পক্ষে গৌরবের—গর্ব্বের বিষয়। একথা তিনি নিজেই বলেছেন সংবাদপত্রের মারফৎ। কোলকাতায় কদিন থেকে দর্শন লিপ্সু সহরবাসীদের আকাঙ্ক্ষা মিটাবার আগেই ইনি কুচবিহারে চলে গেলেন শীকার করবার আনন্দ উপভোগ করবেন বলে। কুচবিহারের জঙ্গলে ইনি কটা বাঘ শীকার করেছেন।

ইনি বলেন—যতগুলি দেশ আমি বেড়িয়েছি ভারতবর্ষ তাদের সকলের চেয়ে সুন্দর। প্রাকৃতিক শোভায়

সভ্যতার আদর্শে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনা হয় না!

ইনি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি। চোখ দুটো এঁর কটাশে হলেও চুলগুলো মিশ্ কালো, স্বাস্থ্যবান বললেই সব বলা হোল না—শক্তিও এঁর দেহে আছে সুপ্রচুর পরিমাণে। এঁর দেহের ওজন এক-শো-পঁয়ষট্টি পাউণ্ড।

ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে ইনি "রিচিং টু দি মুন্" নামে একখানি মুখর চিত্র অভিনয় করবেন' 'বিবি দানিয়েল্‌সে'র সঙ্গে—এই ছবিখানির জন্য ইনি সপ্তাহে পাঁচ হাজার ডলার করে পাবেন ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টস্ কর্পোরেশনের কাছ থেকে। এই ছবিখানিতে ইনি প্রাতীচ্যের অনেক নতুন বিষয় দর্শকদের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। এঁর এই অভিযান সফল হোক—

মোগলের প্রাসাদে ও শ্মশানে

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ভ্রমণ স্মৃতি

১

উত্তর পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করিতে গিয়া মুসলমান রাজাদের অনেক কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়াছি। বহু স্থানেই মসজিদ ও সমাধি মন্দিরের বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। মোগলদের এসব জিনিষের প্রশংসা করিলে কোন কোন বন্ধু মত প্রকাশ করিয়াছেন—মুসলমানদের মসজিদ আর সমাধি মন্দির ছাড়া আর কি-ই বা আছে। আর কিছু থাক বা না থাক, দীর্ঘ-কাল-জয়ী হইয়া যাহা এতকাল সগৌরবে বিশ্বের বিস্ময়রূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার গৌরবও তো সামান্য নহে।

তাজ-তোরণ

লাহোরের জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমাধিও যেমন অপূর্ব্ব, সালিমার বাগানও তেমনি বিস্ময়ের। আবার মসজিদটিও সামান্য নহে। লাহোরের দুর্গটিও মুসলমান আমোলেরই—এ দুর্গটি আধুনিক উন্নত ধরণের দুর্গের পর্য্যায়ে পড়িতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু এখনো এখানে বৃটিশ সৈন্যেরা আরামে নিশ্চিন্ত মনে বাস করে এবং দুর্গ নামেই ইহাকে অভিহিত করা হয়। আর এই দুর্গটিকে রাবী নদের ধ্বংসলীলা হইতে যে ভাবে মোগল যুগে রক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা আজিকার উন্নত যুগের ইঞ্জিনিয়ারদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান বাদসাহ জাহাঙ্গীরের কবর নিজে পছন্দ করিয়া সাজাইয়াছিলেন। বাদসাহ সাজাহান সালিমার বাগ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সালিমারের মত একটি বাগান নাকি মোগল সম্রাটদের গ্রীষ্মাবাস ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে আছে; আর কোথাও আছে কিনা জানিনা। অতীতের একেবারে ধ্বংসাবশেষে পরিণত না হইলেও সম্পদ-হারা এই বাগান এখনো বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া দর্শকদের আনন্দ দেয়। যে বাদশাহ সাজাহান তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মতি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—তিনিই এই বাগানও তৈরী করাইয়াছিলেন। সাজাহানের সৌন্দর্য্য-বোধ আজ বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য্য তাজমহলরূপে যেমন পরিচিত, তাঁর মতি মসজিদ, সালিমার বাগানও তেমনি আশ্চর্য্যই বটে। আরো একটী জিনিষ সাজাহান যাহা তৈরী করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ

হইলে কত সুন্দর যে হইত কে বলিবে! শ্বেত মার্ব্বেলের সমাধিতে তিনি প্রিয়তমা তাজকে শয়ন করাইয়া নিজে

'দেওয়ানী খাস' অদূরে তাজ

কৃষ্ণ মার্ব্বেলের অমনি সমাধিতে তাজের ছায়া হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন—এতখানি সৌন্দর্য্য রসজ্ঞ মানুষ বিশ্বের ইতিহাসে আর ক'জনা আছে?

লাহোর অঞ্চলে মোগল বাদসাহের কবর, মসজিদ ও বাগান দেখা গেল বটে, কিন্তু যে বাগান একদিন সম্রাটের প্রমোদ উদ্যান ছিল—আজ সেথায় যে সব প্রাসাদে সম্রাট সম্রাজ্ঞীরা জীবন উপভোগ করিতেন, তাহার সন্ধান মেলে না।

দেখিবার আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। লাহোর তো মোটেই নয়—দিল্লীও আমার সে ইচ্ছা যেন পুরাইতে পারিল না।

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ পার হইয়া আগে প্রাসাদ বা ফোর্ট দেখিতেই গেলাম, কিন্তু বেলা দশটা বাজিয়া গেছে—ফোর্টের দ্বার বন্ধ, দ্বারে বৃটিশ সৈন্য পাহারা দিতেছে, অসময়ে প্রবেশ নিষেধ। তিনটার পর দর্শনের অনুমতি। প্রাসাদের পরিবর্ত্তে মসজিদই আগে দেখিতে হইল;—প্রকাণ্ড চত্বর, উপাসনা স্থান যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রশস্ত;—কি বিচিত্র গঠন কৌশল, এ যেন কালজয়ী বিরাট বিচিত্র সৌধ। জুম্মা মসজিদ হইতে মোগলের প্রাসাদ দেখা যাইতেছে—এ মসজিদের সম্মুখের একটা ভাগ সিপাহী বিদ্রোহের সময় শান্তি স্থাপনের জন্য কামানে দাগা হইয়াছিল।

মসজিদ হইতে ক্রমাগত সমাধিস্থানের দিকেই যাইতে হইল। প্রথমেই দেখিলাম 'খুনীকা গেট', এখানে নাকি এখনো সন্ধান করিলে ঔরংজেবের ভ্রাতৃবধের রক্তধারার সন্ধান মেলে।

—পাণ্ডবের শ্মশান হস্তিনাপুরী সেও এই দিল্লীতেই।

'বিচার বেদী' দিল্লী

'দেওয়ানী খাস' ভিতরের দৃশ্য

মোগল সম্রাটদের প্রাসাদ কক্ষগুলি কেমন ছিল, তাঁহাদের শয়ন ঘর, বসিবার ঘর, পাঠ কক্ষ কেমন ছিল, তাহা
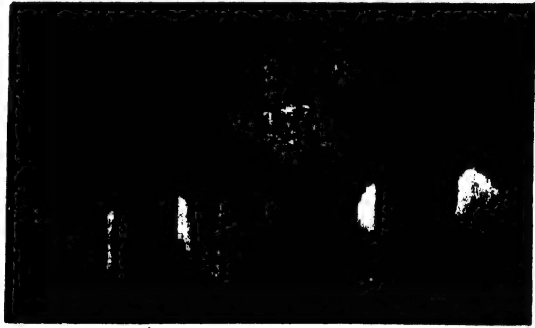
এ শ্মশানেও পাঠান-মোগলের মসজিদ উঠিয়াছে, তবে দ্রৌপদীর পাতাল-স্নানের নিদর্শন ও কুন্তীদেবীর মন্দির এখনো আছে। ময়দানবের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব পুরীর চিহ্ন স্বরূপ আজ ভগ্নাবশেষ প্রশস্ত প্রাচীর ও গেটগুলিই দেখা যায়। ইট-পাথরের কীর্ত্তি, মানুষের শিক্ষা-সভ্যতা-জ্ঞানের

পরিচয় দেয়—দীর্ঘকালজয়ীও হয়—কিন্তু কালের গ্রাসে তাহারও ধ্বংস হয়।

তারপর হুমায়ুনের কবর। কবর যেন রাজপ্রাসাদ—এখানে বেগমেরা সব লুকোচুরী খেলিতেন উপরে অলিন্দগুলি এমনি ভাবে সাজান যে একদিক দিয়া উঠিলে আর সেদিক দিয়া সহজে বাহির হইবার উপায় নাই—
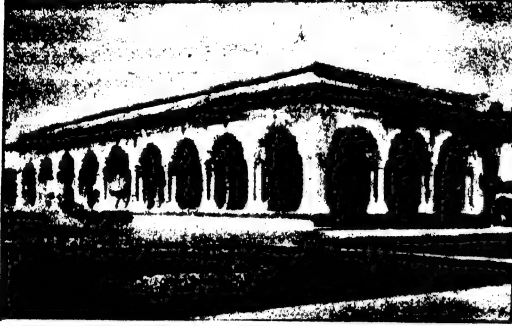
'দেওয়ানী-আম' আগ্রা

গোলকধাঁধাই বটে। কবর যে এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় হইতে পারে তাহা বাংলার লোকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এ-সব সমাধি না দেখিলে বুঝিতেই পারিবে না। এইখান হইতেই অন্ধ বাদশাহ শাহ আলমকে ইংরাজেরা ধরিয়া নেন। তারপর আরো কত কত সমাধি মন্দির যে দেখিলাম তাহার সংখ্যা নাই। সবগুলি যেন অতীত-স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। যাহারা দেখিতে যান তাহাদেরও দূর অতীতের মোহ অভিভূত করিয়া ফেলে।

মোগলের রাজপ্রাসাদ—আধুনিক ফোর্ট আগের মতই তেমনি পরিখা ও গেট পার হইয়াই যাইতে হয় তারপর ক্রমশঃ দেওয়ানী আম, খাস—প্রাসাদের অন্যান্য স্থল। দিল্লীর প্রাসাদে বাদশাহদের সিংহাসন তেমনি পাতা রহিয়াছে। প্রাসাদও ঠিকই আছে। পিছন দিকটা যেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। বহিরাঙ্গণ পার হইয়া বিরাট চত্বর—তারপর অন্দরের প্রাসাদ। এখানকার স্নানাগার প্রভৃতি অপূর্ব্ব। যমুনা হইতে এখানে কলে, জল আসিত ও সে-জল ঠাণ্ডা, গরম, নাতিশীতোষ্ণ ভাবে কলে, ফোয়ারায় পড়িত,—অথচ কি করিয়া যে যমুনার জল এ-ভাবে তখন এখানে আনিতে পারা যাইত তাহা আজিও বিস্ময়ের বিষয়ই হইয়া আছে। এ প্রাসাদও দেখিবার মত। সব চেয়ে দেখিবার বেগমদের প্রসাধন কক্ষ। এখনো কোন ঘরে গরম, কোন ঘরে ঠাণ্ডা, কোথাও বা বসন্তের প্রাকৃতিক ভাব; এই সব কক্ষেই বেগমেরা কোথাও স্নান করিতেন, কোথায় চুল বাঁধিতেন। সব জয়গা তেমনি রহিয়াছে। যত দেখি ততই যেন দেখিবার ইচ্ছা হয়। এখানেও ঔরঙ্গজেবের ছোট একটি মসজিদ আছে। বাদশা ঔরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান হইয়াও মসজিদের সময় পর্য্যন্ত উদার ভাবে বৃহৎ মসজিদ কোথাও করিতে পারেন নাই, এ মসজিদ সুন্দর হইলেও তাই মনে হয়।

প্রাসাদের নীচেই এককালে যমুনা ছিল—যমুনার ঢেউ আসিয়া প্রাসাদের প্রাচীরে লাগিত। কি সু-উচ্চপ্রচীর, কি বিরাট—বিচিত্র তাহার গঠন কৌশল। কোথাও বাদশাহ বেগমদের বসিবার স্থান। এই প্রাসাদ ভবনে অন্ধকারে, কত আলোতে মানে অভিমানে সে যুগের ভাগ্যবান নর-নারীরা চলিয়াছে। আজ স্মৃতি ছাড়া তাহাদের চিহ্নও নাই। মানুষের চিহ্ন নাই কিন্তু তাহাদের হাতে গড়া ইটপাথর আজও অতীতের স্মৃতি হইয়া আছে।
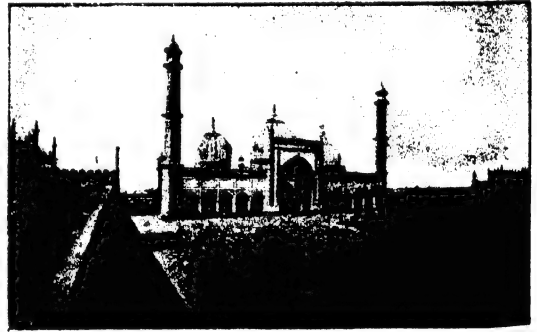
'জুম্মা মসজিদ' ভিতরের দৃশ্য

এসব দেখিয়াও তেমন যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল, কই বাদসাহদের বাসভবন তো দেখিলাম না। কেমন তাহারা শুইতেন, বসিতেন—কেমন অন্দরমহল, বাহির-মহল ছিল তাহা তো দেখিলাম না। দিল্লীতে যাহা দেখিতে পাইলাম না আগ্রায় তাহা দেখিলাম।

লক্ষ্মীর ছেলে

শ্রীকেশব সেন

—গল্প—

কেরাণীবাগানের অপরিসর একটা গলি—পর পর গুটী দুই-তিন ডাষ্ট্‌বিন্ আর প্রায় তাহারি সাথে সাথে এক-একটী পান ও সোডা-ওয়াটারের দোকান। সন্ধ্যার পর বুভুক্ষিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নারী-মূর্ত্তিগুলি যখন দরজাগুলিতে দাঁড়াইয়া থাকে, গলিতে পথিকদলের যাওয়া-আসার সাথে সাথে তাহাদের হৃদয় আশা-নিরাশার তরঙ্গ-দোলায় দুলিতে থাকে—সে একরকম। দিনের বেলায় পানের দোকানগুলিও বন্ধ—ডাষ্ট্‌বিন্‌গুলির চারিদিকে মক্ষিকাকুলের যে বাজার মিলিয়া যায় এবং পরস্পর বিবাদমান কুকুরের পাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে—সে এক অভিনব দৃশ্যই বটে।

ইহারি একটী বাড়ীর বাহিরের দিক্‌কার ঘরে একরকম সদর দরজা আগ্‌লাইয়া থাকে যে মেয়েটী তার নাম ধরুন লক্ষ্মী। সন্ধ্যার অন্ধকারে মেয়েটীর বয়স হয়তো পনেরো ষোল অনুমিত হইতেও পারে, কিন্তু দিনের আলোয় পরিষ্কার বুঝা যায় যে অন্ততঃ কুড়ির কোঠায় সে পা দিয়াছেই। দেহের বর্ণ তার ঘনশ্যাম, মুখশ্রী নেহাৎ মন্দ নয়, বিশেষতঃ চঞ্চল চোখদু'টী—মহাকবি কালিদাস যাহাকে মনসিজের পঞ্চশরের শ্রেষ্ঠতম দুইটী শর বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন, সমজদার ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে হয়তো বলিত—এ তাই।

—দুই—

লক্ষ্মীর ঘরের দরজার কাছে শিক্‌লীতে বাঁধা একটী কুকুর—সারা গায়ে বড় বড় রোঁয়া, চোখ দু'টী প্রায় ঢাকিয়াই রাখে, লম্বা ও ভাঁজ-করা কান দু'টীও তাই। লক্‌লকে জিভটী চলন্ত মোটরের ড্রাগন-মুখো হর্ণের জিভটীর মতো কাঁপিতেছেই। লক্ষ্মীর ঘরের নতুন আগন্তুক হরবিলাসকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া থাকে—হরবিলাসের ভীরু চোখ সে দৃষ্টির সম্মুখে স্থির থাকিতে পারে না। লক্ষ্মীকে সে বলে—ওকে সরাও।

লক্ষ্মী হাসে। বলে, কিছু কর্‌বে না।

কিন্তু সে তীক্ষ্ণ দু'টী চোখ—

হরবিলাস থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া ওঠে। বলে—ওকে বাইরে রেখে এস না।

লক্ষ্মী আবার হাসে। হাসিয়া ডলিকে আদর করে। কুকুরটাই ডলি। তার গায়ে গলায় হাত বুলাইয়া দেয়।

হরবিলাস ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। আদরে আদরে ডলি এলাইয়া পড়ে—লক্ষ্মীও।

তারপর—হরবিলাসের চোখের ওপরে চোখ পড়ায় লক্ষ্মী সরিয়া আসে, ওর কাছে আগাইয়া বসে। ডলিও উঠিয়া আসে—লক্ষ্মীর বসনাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করে, তার ওপরে একাধিপত্য, সে একাধিপত্যে বাধা জন্মাইতে দিতে চাহে না।

লক্ষ্মী হাসে—দেখেছো? হাসিয়া আবার ডলির কাছে যায়। হরবিলাসের চোখ দু'টা টাটাইয়া ওঠে। সে চলিয়া যাইবার সময়ে লক্ষ্মী তার হাত দুটী ধরিয়া মিনতির ভঙ্গীতে শুধায়—আবার আসবে তো?

হরবিলাস উত্তর করে—কি জানি।

লক্ষ্মীর মুখখানি ম্লান হইয়া ওঠে। দরজাটী ভেজাইয়া দিয়া আবার ডলিকে লইয়াই বসিয়া পড়ে।

ডলি! ডলি! ডলি!

কুকুরটা ওর কোলে, তার মাথা ওর বুকের মধ্যে। দেখিয়া কেনা বলিবে—ডলি ওর পেটের ছেলে নয়, ওরা দু'টী মায়ে-বেটায় নয়?

—তিন—

কি জানি কি মনে করিয়া হরবিলাস পরদিন আসে, আসিয়া দেখে—ঘরে লক্ষ্মী একা, ডলি নাই।

শুধায়—ছেলে কোথায়? একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

ও বলে—বেড়াতে গেছে কাছের পার্কে।

হরবিলাস তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। লক্ষ্মী তার কাছটীতে ঘেসিয়া বসে।

কয়েক মিনিট পরে।

লক্ষ্মী বলে—একটু বস্‌বে ?

পাল্টা প্রশ্ন আসে—কেন ? কোথাও যাবে নাকি ?

জবাব আসে—ডলিটাকে নিয়ে আস্‌বো।

প্রতিবাদের অবসরমাত্র না দিয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়।

বেচারী হরবিলাস !

একা বসিয়া ঘরের কড়িকাঠ গণিতে তার ভালো লাগে না। সাম্‌নের কাচের আলমারীতে যে সব চীনা-মাটীর বাসন ও পুতুল, তাও ছ'মিনিটেই পুরাণো হইয়া যায়।

দেয়ালের ছবিগুলো সবই ঠাকুর-দেবতার। বৈচিত্র্য-হীন। লক্ষ্মীর নিজ হাতে তৈরী কালো কাপড়ের ওপরে ঝিনুকের অক্ষরে লেখা "শিব-দুর্গা"—তাও দু দণ্ড ধরিয়া দেখিবার মতো নয়।

দেয়ালের ঘড়ীতে টং করিয়া একবার বাজিয়া ওঠে—সাড়ে আটটা। হরবিলাস মনে মনে বলে—একটা কুকুর নিয়ে এত ! তাহ'লে দোকান সাজিয়ে বসা কেন বাপু ?

সে উঠিয়া দাঁড়ায়। গলি ছাড়াইয়া বড় রাস্তায় গিয়া পড়ে।

ডলিকে লইয়া ওদিকে লক্ষ্মী ঘরে ফিরিয়া আসে। আসিয়া দেখে—খালি ঘর। কেহ নাই। অপেক্ষা করিয়া হরবিলাস চলিয়া গিয়াছে। দুয়ার আগ্‌লাইয়া বসিয়া তার মকর' হরিমতি। হরিমতি বলে—ঘর খালি রেখে কোথায় চলে গিয়েছিলি ? কি বলিস্‌ ? ঘর খালি ছিল না ? মানুষ ছিল ? বাবুটীকে একা ঘরে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলি বুঝি ? বসে বসে বাবুটী চলে গেলেন ? যাবেন না ? ডলিকে নিয়ে যা ঢলাঢলি সুরু করেছিস্‌—কাউকে রাখ্‌তে পার্‌বি নে। নৈলে আর দুঃখ ছিল কি ? রাজরাণীর হালে থাক্‌তিস্‌—এত অভাবে পড়্‌বি কেন ?

হরিমতির কথাগুলির কোনটা ওর কানে যায় আর কোনটা যায় না বলা শক্ত। মনে পড়িয়া যায়—এখনি বাড়ীওয়ালী আসিবে ভাড়ার টাকা চাহিতে। চৌদ্দ টাকার জোগাড়, দু'টী টাকা হরবিলাসের কাছে পাইত—ভাড়াটা চুকাইয়া দিতে পারিত। রাগের মাথায় ডলিকে মারিতে যায় ; হাত কি আর ওঠে ? উল্টা ডলিকে বুকে চাপিয়া ধরে।

ডলি জানাইয়া দেয় তার ক্ষুধা পাইয়াছে। ডলির জন্য বিশেষ করিয়া রাঁধা টুক্‌রা টুক্‌রা মাংসের ঝোল আর ভাত লইয়া হেঁসেলের দিকে যায়।

সদর হইতে মেয়েরা এক সঙ্গে ডাকিয়া ওঠে—লক্ষ্মী !

হেঁসেল হইতেই উত্তর আসে—যাচ্ছি।

ওরা আবার ডাকে—লক্ষ্মী !

লক্ষ্মীর 'মকর' নিজে চলিয়া আসে ; বলে—ডলি নিজেই পাবে'খন। শীগ্‌গীর আয়, সেই চক্‌দিঘীর বাবু।

লক্ষ্মী বলে—বাবুকে ঘরে বস্‌তে বল ভাই, আমি যাচ্ছি এখ্‌খুনি।

যাচ্ছি যাচ্ছি করিয়াও গোটা পাঁচেক মিনিট কাটিয়া যায়। সদরে যাইতেই মেয়েরা একসঙ্গে বলিয়া ওঠে—এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখিনি বাপু। ঐ এক কুকুরের জন্যে সব খোয়ালে। চক্‌দীঘির বাবু মোটর নিয়ে এসেছিল, দশ-বিশ টাকা কোন না পেতে ? বস্‌লে তো হারিয়ে ? ঐ দেখ মোটর আঠারো নম্বরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেয়ালে কপাল ঠুকে মর আর কি ?

মনে যাই থাক্‌, মুখে লক্ষ্মী বলে—কপাল ঠুকে মর্‌তে যাব, গরজ ? পাঁচটা মিনিট যার সবুর সয় না, তাকে বেঁধে রাখ্‌বার প্রবৃত্তিও আমার নেই, রাখ্‌তে চাইনেও তা।

শুধু এই নয়—আঠারো নম্বরের উদ্দেশে আরো দু'চারিটা কটু উক্তি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া গুম্‌ হইয়া বসিয়া থাকে। ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌ব তার চোখের সুমুখে আগুনের গোলাগুলি বর্ষণ করে যেন। সুইচ্‌ টিপিয়া বাতিটা নিভাইয়া দেয়।

বাড়ীওয়ালী আসে ভাড়ার টাকার তাগাদায়—দু' চারিটী বক্র উক্তি করিয়া দু' টাকা বাকী রাখিয়াই ফিরিয়া যায়।

পরদিন হাঁড়িতে হাত দিয়া দেখে—চাল বাড়ন্ত। মুদি আর ধারে দিতে চায় না। পাওনা-গণ্ডা তো আর কম নয় ?

—চার—

সেদিনও কিন্তু জোটে না—সাড়ে দশটা অবধি এক ঠাঁই বসিয়া বসিয়া কোমরটা কন্ কন্ করিয়া ওঠে। তারপর দেখা হয় হরবিলাসেরই সঙ্গে। মিনতির চোখে ডাকে তাকে, সে সদরে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে—এসে আর কি করবো? তোমার তো আর মানুষকে দিয়ে প্রয়োজন নয়! মরে আবার কুকুর হ'য়ে জন্মাতে পারতুম, তা'হলে তোমার কাছে কিছু যত্ন-আত্তি পেতুম। কিন্তু কপালের দোষে যখন মানুষ হয়েই জন্মেছি, তখন—

হরবিলাসের কথায় আর আর মেয়েরা হাসিয়া ওঠে। ওর চোখের কোণে আগুনের শিখা দেখা দেয়। বলে—মরণ আর কি?

হরবিলাস চলিয়া যায়! আর আর মেয়েরাও যে যার ঘরে যায়। একা সদরে বসিয়া থাকে লক্ষ্মী কিছু রোজ্‌গার তার করা চাই।

ছুইটী টাকা এবং গণ্ডা তিনেক পয়সা আঁচলে বাঁধিয়া ওপরে খাটের বিছানায় নয়—নীচের চিকণ মাদুরে ঢাকা তোষকে নয়—ঘরের মেজেতে লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে রাত প্রায় দু'টায়।

এমন করিয়া দিন আর চলে না।

শনিবারের বাবুকে সব কথা খুলিয়া বলে। ছ'দিন নির্ব্বান্ধব লইয়া ঘাঁটাঘাঁটির পরে বান্ধবের সাক্ষাৎ পায় এই একটী দিন। মনের কথা খুলিয়া বলা চলে তাঁর কাছে—পরামর্শ দিতেও তিনিই। তিনি বলেন—সব্‌ চেয়ে ভালো হ'ত যদি ওকে বিদেয় করে দিতে পারতে।

লক্ষ্মীর বুকের ভেতরটায় ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। ভাব দেখিয়া বাবু বলেন— কিন্তু সত্যি তো আর তা পারছ না! দিন-রাত যে অকারণ ওকে নিয়ে মাতামাতি করছো, সেটুকু একটু কমিয়ে নাও।

বাবুটীর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া শুধায়—তার মানে?

বাবু বলেন—মানে আর কিছুই নয় লক্ষ্মী, সারা দিন তোমার ছেলেকে নিয়ে যা খুশী কর; রাতটা শুধু অন্যদিকে মন দাও। দেখ্‌ছোই তো আমার আজকাল বড্ড টানা-টানি, তবু তো পাঁচটাকা বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু তা নিয়ে তো আর চল্‌বে না তোমার? অন্তত গোটা ত্রিশেক টাকা এদিক-সেদিক করে জোগাড় করতে হবেই।

লক্ষ্মী শুধায়—তা ওকে রাখি কোথায়?

বাবু বলেন—সন্ধ্যে থেকে ভেতরের দাওয়ায় বেঁধে রাখ্‌লেই পার?

ও বলে—ছেলে আমার তেমনি বটে! দাওয়ায় নোংরার মধ্যে এক দণ্ড টিকে থাক্‌তে পার্‌লে তো! ধব্‌ধবে বিছানাটী নইলে ওর ঘুম হবে, না একটু বস্‌বেই? মাঝে মাঝে নীচের বিছানাটা তুলে রাখি দিনের বেলায়, ও ওপরে উঠে শোয়।

বাবু বলেন—কিন্তু সত্যি যদি তোমার পেটের ছেলে-মেয়েই কিছু থাকতো, তাকেও তো দূরে রাখ্‌তে হ'ত?

লক্ষ্মী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার মনে পড়িয়া যায় অনেক কথাই। সে কথা সে শনিবারের বাবুর কাছেও খুলিয়া বলে না।

পাঁচ

কিন্তু আমরা কথাটা জানি এবং তা এই—

বছর পাঁচেক আগে লক্ষ্মী যখন বজ্‌বজের কাছাকাছি কি-একটা গ্রামে মণ্ডলদের ঘরের বৌ ছিল, এ তখনকারই কথা। স্বামী তার কলিকাতা কোন বড় লোকের বাড়ীর মোটর ড্রাইভার—আয় খুব বেশী না হইলেও দেশে যখন যাইতেন, খুব চালের উপরই যাইতেন। যে ফুট্‌ফুটে কন্যাটী তাঁর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিল, তার নাম রাখিলেন—ডলি।

বাপের তাঁর তেজারতির কারবার, শ্বশুরের মুদি-দোকান। নামটা শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশী তো বটেই মণ্ডল পরিবারেরও সকলে হাসিয়াছে—ডলি! এ আবার কি নাম গো।

কিন্তু ঠাট্টা টিটকারীতে বিচলিত হ'বার লোক তো নয়—যে বাঙালী সাহেবের বাড়ীর মোটর চালাইতেন, তাঁরই ছোট নাত্নীটীর নাম নাকি ডলি এবং কন্যা-সন্তান জন্মিলে নাম রাখিবেন ডলি এ তাঁর বহুদিনের সাধ।

মানুষের কোন্ সাধ ভগবান পূর্ণ করেন এবং কোন্ সাধ করেন না, মানুষ তা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অভিপ্রেত কন্যাসন্তান জন্মিল, অভিপ্রেত নামও রাখা হইল—কিন্তু কন্যার যিনি জনক তিনি এক অশুভ অবসরে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

লক্ষ্মীর হাতের নোয়া খসিল, সিঁথির সিঁদুর মুছিল, কিন্তু মাছ আর বিকেলের পাওয়া ঘুচিল না। এ অঞ্চলে

পাড়া-গাঁয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়, লক্ষ্মীর বরাতে তার চেয়ে বেশী কিছু হইল না—বাপের বাড়ীতে ভাই, ভাইএর বৌর অনাদর ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে আশ্রয় পাইল।

ওর শক্ত হাড়—ঝঞ্ঝাবাতেও টিকিয়া গেল। টিকিল না মেয়েটী—ঠাণ্ডা লাগিয়া ব্রঙ্কাইটিশ এবং একরকম বিনা চিকিৎসাতেই মৃত্যু।

স্বামী হারাইয়া লক্ষ্মী কাঁদে নাই স্বামীকে চিনিবার অবসর তার হয় নাই। স্বামীরও উপসর্গ জুটিয়াছিল বহুৎ—দেশে কম যাইতেন, গেলেও লক্ষ্মীর সঙ্গে যে রকম ব্যবহারটা করিতেন লক্ষ্মীর স্মৃতির কোঠায় তা খুব উজ্জ্বল নয়।

কিন্তু মেয়েকে দিয়া হয়তো স্বামীকে সে ফিরিয়া পাইত, কারণ মেয়ের ওপর তাঁর টান পড়িতেছিল। কিন্তু এমনি সময়ে পরকালের ডাকে জবাব দিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

মেয়ে হারাইয়া লক্ষ্মী কাঁদিল—খুবই কাঁদিল। শেষে চোখের জল চোখে মিলাইল—মনের দাগ মিলাইল কি কে জানে?

স্বামী থাকিতেই পতন ঘটিয়াছিল, বাপের বাড়ী আসিয়া আরো বাড়িল। দ্বিতীয় সন্তান যখন তার উদরে তখন দাদার এক বন্ধু তাকে কলিকাতায় রাখিয়া যান—কেরাণী বাগানের এই বাড়ীতে এই ঘরেই।

এখানে আসিয়া অল্পদিনেই নিজেকে নতুন করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। নতুন? তা নতুন আর কতটুকু? সতীত্বের সংস্কার তো কবেই লুপ্ত হইয়াছে—মদের নেশাটা নতুন বটে। পতিতা জীবনের প্রথম ছ'বছরে তার যা আয়, সঞ্চয় করিলে হয়তো একটা জীবন কাটাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মদের নেশায় সব যে উপিয়া গিয়াছে।—

সুদিনের অংশ গ্রহণ করিতে তার ভাইএরা ছাড়ে না; সবচেয়ে ছোট ভাই মাঝে মাঝে দিদির কাছে আসে, টাকা কড়ি জিনিষ-পত্তর কিছু কিছু লইয়া যায়।

এখনো ওর মনে জাগে ছোট্ট মেয়েটীর স্মৃতি। ডলির ওপরে ওর যা আকর্ষণ তার পূর্ব্বেতিহাস এই।

—ছয়—

লক্ষ্মীরই এক বাবু—আসল নামটা প্রকাশ করা চলেনা, নকল না-হয় ধরিয়া লইলাম—প্রকাশ, শনিবারের বাবু যখন আসিয়া জুটেন নাই, তখন তিনিই ছিলেন "ইনার সার্কেল্"এর।

প্রকাশ বাবু ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্টের "আর্ম্মি" ডিপার্টমেণ্টে কেরাণী—কলিকাতা হইতে বদলী হইয়া যখন দিল্লী যান, কাচের আলমারীটা, আবলুস কাঠের সো-কেশটা আর অর্গান-টিউন হারমোনিয়মটার সঙ্গে ডলিকে রাখিয়া যান লক্ষ্মীর ঘরে।

আরো ছ'তিন মাস আগেকার কথা। বাবুর সহিত ডলি আসে লক্ষ্মীর বাড়ীতে। ওকে দেখিয়া লক্ষ্মীর যতটা না ভাবান্তর ঘটে, তার বেশী ঘটে ওর নাম শুনিয়া। প্রথম দিন বাবু যখন বলেন, ওর নাম ডলি, লক্ষ্মীর বুকের ভেতরটা কাঁপিয়া ওঠে। ডলি! আহা! সেই একটু খানি মেয়ে গো!

ডলি! ডলি! আঃ—

কুকুরটাকে বুকে চাপিয়া ধরে, আদরে ডলি এলাইয়া পড়ে। বাবুকে বলে—ওকে আমায় দেবে?

বাবু বলেন—পাগল! ও আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে কখনো?

কুকুরটার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চায়। বাবুর হাত ধরিয়া বলে—একটা কথা রাখবে?

বাবু বলেন—কি কথা? হ্যামিণ্টনের—

ও বলে—না গো না হ্যামিণ্টনের দোকানে নতুন গয়নার বায়না দিতে হবে না। আমি বুঝি সেই আবদারই শুধু করি?

বাবু শুধান—তবে?

বলে—ওকে কাল নিয়ে আসবে তো?

বাবু বলেন—আসবো।

আবার বলে—পরশু?

বাবু বলেন—আসবো

বলে—রোজ নিয়ে আসবে?

বাবু হেসে বলেন—আচ্ছা ফন্দীবাজ তো তুমি লক্ষ্মী! ওকে নিয়ে আসার ছলে আমাকেও রোজ টেনে আনতে চাও?

আহত হইয়া লক্ষ্মী বলে—তা বলিনে। তুমি যেদিন যেদিন আসবে, ওকে নিয়ে তো আসবেই, যেদিন না আসবে—সেদিনও পাঠিয়ে দেবে। কি বল?—

বলেন—অর্থাৎ আমার চেয়েও ওকে দিয়ে তোমার বেশী প্রয়োজন ?

হরবিলাস তো এই কথাটারই পুনরুক্তি করিয়াছিল মাত্র। আরো কতজনে যে এই কথাটাই বলিয়াছে, তার কি হিসাব আছে ? তবে কথাটা প্রথমে লক্ষ্মী কানে তোলে এই। মনে একটু খচ্ করিয়া ওঠে—কিসের যেন কাঁটা বিঁধে।

ওর কালো মুখ বাবু সহিতে পারেন না। আবার বলেন—আচ্ছা, দেব পাঠিয়ে—নিশ্চয় দেব।

এর বেশী লক্ষ্মী আশা করে না। নিজেরটাই সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই—ওতো পরের।

রোজ যখন বাবুর সঙ্গে আসে, ডলিকে সে খাবার দেয়। আদর করে কত। থাকিয়া থাকিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

অবশেষে একদিন ডলিকে সে আপনার করিয়া পায়।

প্রকাশবাবুর ওপরে অনেকটা নির্ভর করে সে, তাঁর বদলীতে আসন্ন আর্থিক ক্ষতির সাম্ভবনায় দুঃখিত হইবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় না—ডলিকে লইয়া এতই মত্ত।

প্রথম প্রথম ডলি বলিয়া ডাকিতে বুকে তার বেদনার চোরকাঁটা বিদ্ধ হয় ; শেষে আর হয় না।

মানুষ-ডলির স্মৃতিটুকুও কি কুকুর-ডলির মধ্যে তলাইয়া যায় ? অন্তরে বাহিরে ফাঁকী দিয়াই নিজেকে ভরিয়া তোলা যাহাকে বলা হয়, একি তাই ?

তারপর ?

তারপর সে আর একটী মানুষ।

ডলিই তাকে মদ ছাড়ায়। কবে মাতাল হইয়া ডলিকে লাথী মারে, ডলির আর্ত্তনাদেই নেশা টুটিয়া যায়—আর মদ খায় না।

যে-সব পুরাণো বন্ধু মদ খাইতে ভালবাসে, ঠাঁই না পাইয়া তারা ফিরিয়া যায়। শনিবারের বাবু মদ খান না, তাই। নৈলে তাঁকেও হয়তো হারাইত !

আগন্তুকের সংখ্যা কমিয়া আসে।

—সাত—

মকর আসিয়া বলে—বীণাকে তো আর ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারিনে ভাই।

লক্ষ্মী চুপ করিয়া থাকে।

মকর বলে—বছর ঘুরে এল, এক পয়সা স্নদের গেল না। বলে, সাম্‌নে চৈত্ সংক্রান্তি, এর মধ্যে স্নদের টাকাটা অন্তত দিয়ে দিক্ সব, নইলে জবাব দিক্।

লক্ষ্মীর বুকটা কাঁপিয়া ওঠে—নতুন হার ছড়া ! ছ'মাস সে পরিতে পারে নাই।

মকরকে শুধায়, সংক্রান্তির আর ক'দিন ?

মকর বলে—আজ সতেরোই, আর তের দিন।

লক্ষ্মীর মুখে আঁধারের কালিমা ঘনাইয়া আসে—সতেরো ? আর তো তের দিন বাকী, এরই মধ্যে কি করিয়া সে জোগাড় করিবে ? স্নদের টাকা তো কম নয়, কম হইলেও সাতাশ টাকা। মকরকে বলে—তুই-ই বল্ না ভাই, কি করি ?

মকর ভাবিয়া পায় না।

ও বলে—শনিবারের বাবুর টাকাটা ওবেলায় পাব। কিন্তু তা যে মুদিকেই দিতে হবে।

মকর বলে—চক্‌দিঘির বাবুর কাছে একটা চিঠি লিখে দেনা।

বলে—তা কি আর দিইনি। দু'তিন খানা চিঠি দিয়েছি।

মকর শুধায়—জবাব পেলি কিছু ?

উত্তর আসে—দু'খানার তো জবাবই নেই। শেষের-খানির ছোট্ট একটী জবাব পেয়েছি। তাও দু'ছত্র—

মকর আবার প্রশ্ন করে—কি ?

উত্তর দেয়—সময় আর সুযোগ হ'লেই আস্‌বে, এই মাত্র।

মকর বলে—তার মানে—আস্‌বে না। স্পষ্ট জবাব। তা এখন কি কর্‌বি ?

বলে—সো-কেশটাই বেঁচে ফেল্‌বো অর্দ্ধেক দামে দিলেও গোটা ত্রিশেক টাকা হবেই। তা থেকে স্নদের টাকাটা তো দিয়ে দেই—

বলিয়া আর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। সো-কেশটার পানে ফিরিয়া চায়—কত দিনের কত প্রসাধনের, বিকশিত যৌবনের বিজয়াভিসারের সাক্ষী ঐ সো-কেশটা। আঃ—

আর একদিনের কথা—

লক্ষ্মীদের বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া যায়, বড় বাজারের এক ভাটিয়া বাবু পাইক পাড়ায় গার্ডেন পার্টি দিবেন ! লক্ষ্মীদের বাড়ীর চারিটী মেয়ের নিমন্ত্রণ—লক্ষ্মীরও।

প্রত্যেকের জন্ম নতুন বেনারসী শাড়ী, এক একছড়া সরু হার আর নগদে পঁচিশ টাকা বরাদ্দ। মকর বলে—ওলো, তোর সো-কেশটা এবারে রক্ষা পেল।

লক্ষ্মী খুসী হইয়া বলে—আমার ডলির ভাগ্যি।

আর আর মেয়ে আগে থাকিতে মোটরে উঠিয়া বসে। ডলিকে মাজিয়া ঘষিয়া রূপার ঘুঙুর আর দামী বগ্‌লাস্‌টা গলায় দিয়া লক্ষ্মী ডলিকে লইয়া যায় মোটরে।

বাবুর ড্রাইভার অবোধ্য হিন্দিতে যা বলে, তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে— বিবিজান্ একা গিয়া মোটরে উঠুন, কুকুরকে নেওয়া চলিবে না।

লক্ষ্মী শুধায়—কেন?

ড্রাইভার বলিয়া যায়—বাবুকে একবার কুকুরে কাম্‌ড়াইয়া প্রায় ছ'মাস ভোগাইয়াছিল, সেই জন্ম বাবুর কড়া নিষেধ—মেয়েমানুষের সঙ্গে কুকুর কিছুতেই তার বাগান বাড়ীতে ঢুকিতে পারিবে না।

লক্ষ্মীর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দেয়। মেয়েরা বলে—কুকুরটাকে বাড়ীতেই রেখে আয় না লক্ষ্মী?

হরিমতি মোটর হইতে নামিয়া আসে—ডলির গলা ধরিয়া আদর করিয়া বলে—লক্ষ্মী ডলি, তুমি আজ ঘরে থাক। তোমার মা বেড়িয়ে আসুক একটু।

লক্ষ্মীর হাত হইতে শিকলটা ছিনাইয়া লয়। লক্ষ্মী দুয়ার খুলিয়া দেয়, হরিমতি জানালার শিকের সঙ্গে শিকলটা বাঁধিয়া দেয়। বলে—চল্ মকর।

লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া আনিয়াই মোটরে উঠায়। ড্রাইভার তখন হাঁটু গড়িয়া মাটীতে বসিয়া পাম্প্ দিতেছে, বলে—এই তো ভালো বিবিজান, কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে কি হবে?

লক্ষ্মী একপাশে চুপ্ করিয়া বসে—

ঘরের মধ্যে হইতে ডলির কান্না শুনা যায়। দারুণ আর্তনাদ—

একটী মেয়ে বলে—আঃ ডলি কী কান্নাটাই না কাঁদছে!

আর একটী মেয়ে বলে—কেঁদে কেঁদে যে ম'লো।

ড্রাইভার তখন ষ্টার্ট দেয় কেবল। লক্ষ্মী বলে—থামাও।

মেয়েরা চমকিয়া ওঠে। হরিমতি বলে—কেন?

ও বলে—আমি নেমে যাব।

সকলকে বিস্ময়ের চরমে তুলিয়া দিয়া ও নামিয়া আসে। ঘরের দরজা খুলিয়া ডলিকে গিয়া জড়াইয়া ধরে।

ডলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্ত হয়।

সে রাত্রে আর খাওয়া-দাওয়া হয় না, মায়েরও না—ছেলেরও না।

—আট—

পরদিন সকাল আটটা আন্দাজ।

লক্ষ্মীর মহাজন বীণাই আসে ফার্ণিচারওয়ালাকে লইয়া। দুইটা কুলী সো-কেশটা ধরিয়া ঘরের বাহির করে। সো-কেশ সহ কুলীরা যখন সদরের ফটক পার হইয়া নীচে নামিবার উদ্যোগ করে, বাধা পায় তারা—সাম্‌নেই ভাটিয়া বাবুর মোটর আসিয়া দাঁড়ায়।

মোটর হইতে নামে হরিমতি এবং আর আর মেয়েরা। প্রত্যেকের পরণে নতুন বেনারসী, গলায় সরু সোনার হার—কেহ ভাঁজ করিয়া গলায় দিয়াছে, কেহ বা সখ করিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

হরিমতি সরাসর লক্ষ্মীর ঘরে ঢোকে। ডাকে—মকর!

লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া—চোখ দু'টী তার জবা ফুলের মতো লাল। যেখানে সো-কেশটা ছিল, সেই খালি জায়গা-টারই পানে চাহিয়া সে।

মকরের পানে ফিরিয়া চায়—চোখের আগে ঝল্‌সাইয়া ওঠে নতুন বেনারসী আর সরু হার ছড়াটা।

মকর আবার ডাকে—লক্ষ্মী!

ও উঠিয়া দাঁড়ায়। মকরের কাঁধে হাত রাখিয়া বলে—নতুন শাড়ী আর নতুন হার দেখাতে এসেছিস্ বুঝি ভাই?

হরিমতি হা করিয়া চাহিয়া থাকে। ও আবার বলে—বেশ ভাই, বেশ। ভারী সুন্দর মানিয়েছে তোকে। কিন্তু তা বলে দেমাকে মাটীতে পা ফেলতে পারিস্ যেন।

হরিমতি আহত হইয়া চলিয়া যায়।

সারাদিন আনমনা বসিয়া ভাবে।

রাত্রে দু'তিনজন লোককে ফিরাইয়া দেয়।

—নয়—

গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা আসে।

বারনারীদের সব চেয়ে দুঃসময় নাকি এইটেই।

বাইরে জলের ঝাপ্‌টা পড়ে, ডলিকে এক দণ্ড বাইরে

রাখিতে পারে না—দিন-রাত থাকে সে ঘরেই। মেঘের ডাকে ডলি চম্‌কাইয়া ওঠে—বিদ্যুতের ঝলকে লাফালাফি করে। এ কীরকম মেজাজ তার!

একে বাদ্‌লায় লোকে পথে বাহির হয় না, গলিতে সাঁঝের যাতায়াত নাই বলিলেই চলে। তার ওপর ডলির উৎপাৎ। সাথে সাথে লক্ষ্মীও যেন ক্ষেপিয়া যায়।

দু'দিন অপেক্ষার পরে একটী অতিথ্‌ জুটিয়া যায়। ভদ্রলোক ডলির চীৎকারে অতিষ্ঠ। লক্ষ্মীকে বলেন—ওকে বাইরে রেখে এস।

লক্ষ্মী বলে—বিষ্টিতে যাবে কোথায়?

লোকটী বলেন—কিন্তু অমন বিদিকিচ্ছি চীৎকারও সইতে পরি নে বাবু।

শেষে বাবুটীই উঠিয়া যান—

দুয়ারের কাছে গিয়া লক্ষ্মী তাঁর হাতখানি ধরে—টাকা?

ঝনাৎ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বাবুটী চলিয়া যান। লোকটাকে এক রকম সেই তাড়াইয়া দিল, এক টাকার বেশী দাবী করে কি করিয়া?

বাড়ীওয়ালী আসে ভাড়ার টাকার তাগাদায়। দু'মাসের ভাড়া জমিয়াছে—একত্রে বত্রিশ টাকা কি করিয়া দেয়! তাহা ছাড়া ইলেক্‌ট্রিক চার্জও দু'মাসে পাঁচ টাকা—সাঁইত্রিশ। বাড়ীওয়ালী গালাগালি করে; শেষে বলে—ভাড়ার টাকা দেওয়া সামর্থ্য যার নেই, সে আবার হাতে তাগা পরে কেন?

হাড় হাভাতে জন্মের শোধ গিয়াছে, তাগা জোড়ার ওপরে বাড়ীওয়ালীর বড় সাধ। হয়তো হাত হইতে খুলিয়া উহাকেই দিতে হইবে। ভাবিয়া আঁত্‌কাইয়া ওঠে। বলে—আর দু'চারদিন দেখ, শেষ আদায়ের উপায় তো আছেই।

ডলির জন্ত আর মাংস কেনা হয় না, গয়লাকেও জবাব দেওয়া হয়—ডলি খালি ভাত বা ডাল-ভাত খাইতে পারে না—প্রায় উপোসী থাকে—

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও। ছেলেকে না খাওয়াইয়া মা কি খাইতে পারে? একি রাক্ষসী—পেটে পুরিলেই হইল?

শরীরটা শুকাইয়া কাঠ। পাণ্ডুর মুখে পাউডার ঘসিতে বসে—আয়নায় নিজের মুখ দেখিয়া শিহরিয়া ওঠে—নিজেকে নিজে চিনিতে পারে না যেন।

শনিবার রাত্রে আসিয়া বাড়ীওয়ালী টাকা চায়—লক্ষ্মী জানে না, তার মকরের শিক্ষা এ।

নিজের দৈন্যের কথা এমন করিয়া পাড়ার বাবুর কাছে প্রকাশ করিতেও তার বাধে, দরজার কাছে আসিয়া বাড়ীওয়ালীর হাতে তাগা জোড়া খুলিয়া দেয়। আগুনের হল্‌কার মতো দৃষ্টি হানিয়া চাপা গলায় বলে—আর বোকোনা, চুপ কর।

কথাটা বাবুর কানে যায়। হাতের দিকে চাহিয়া বাবু বলেন—তাগা!

সব কথা খুলিয়া বলিতে হয়। বাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া ওঠে। ওর অসাক্ষাতে বাবু আসিয়া হরিমতির সহিত পরামর্শ করেন। হরিমতি বলে—কুকুরটাকে না তাড়ালে ও শোধ্‌রাবে না।

বাবু বলেন—কিন্তু তাড়াইবা কি করে মকর?

হরিমতি বলে—আমি একদিন না হয় ছেড়ে দেব, আপনি যদি ধরে নিয়ে যান্‌।

বাবু সায় দেন। আরো পরামর্শ চলে।

—দশ—

অবশেষে একদিন সত্যই লক্ষ্মী ডলিকে খুঁজিয়া পায় না। দু'দিন দু'রাত যায়, কত খোঁজাখুঁজি—কিছুতেই ডলির সাক্ষাৎ মেলে না।

লক্ষ্মী এ দু'দিন উপোসী, নির্জ্জলা উপোসী—ডলিকে না পাইয়া সে জল-গ্রহণ-করিবেনা, এ তার ধনুর্ভঙ্গ পণ

বাবুর কাছে খবর যায়, বাবু আসেন—খোঁজেন এবং জবাব দেন—পাওয়া গেল না,

সন্ধ্যার সময় একগাল হাসি হাসিয়া বাড়ীওয়ালী তাগা-জোড়া আর দু'মাসের ভাড়ার রসিদ্‌ দিয়া যায়। ও অবাক্‌ হইয়া প্রশ্ন করে—টাকা দিলে কে?

জবাব পায়—বাবু।

আঙুল নির্দ্দেশে বাড়ীওয়ালী শনিবারের বাবুকেই দেখায়।

ও বলে—তুমিই টাকা দিয়েছো?

বাবু বলেন—দিয়েছি আমিই।

বলে—অতোগুলো টাকা দিলে, ধার করে বুঝি?

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বাবু বলেন—না লক্ষ্মী, ধার করে দিইনি।

শুধায়—তবে ?

বাবু মুচ্‌কি হাসি হাসেন। বলেন—ধার করে দিয়েছি কি ঘর থেকে এনে দিয়েছি, সে খবরে তোমার কাজ কি লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী ভাবে কি মনে মনে।

খানিকপরে পান-বিড়ী আর সোডাওয়াটারওয়ালা পরমেশ্বর আসিয়া বলে—মাঈজী, সব টাকা পেয়েছি।

তারপর বাবুর দিকে ফিরিয়া বলে—বাবু যখন আছেন, তখনকি আর টাকার জন্তে ভাবনা করি ?

পরমেশ্বর চলিয়া গেলে লক্ষ্মী বাবুকে শুধায়—ওর পাওনা ছিল সাড়ে সাত টাকা, তাও তুমি দিয়েছো ?

বাবু হাসি গোপন করিয়া বলেন—দিয়েছি।

হরিমতি হাসিয়া হারছড়াটা ছুঁড়িয়া ফেলে ওর গায়। বলে বীণা এসে দিয়ে গেল।

ও বলে—তার মানে ?

হরিমতি বলে—মানে আর কি ? সুদে আসলে সব টাকা বুঝে পেয়েছে সে, হার দেবে না ?

হরিমতি চলিয়া যায়। ও বাবুকে বলে—এটাকাও তাহলে তুমি দিয়েছো ?

বাবু বলেন—দিয়েই যদি থাকি লক্ষ্মী, তাহলে কি অন্যায় করেছি ?

বলে—কিন্তু এত টাকা পেলে কোথায় ?

বাবু কোন জবাব দেন না—পাশ ফিরিয়া শুইয়া থাকেন।

ও ঝড়ের মতো বাহির হইয়া যায়। হরিমতি তখন নিজের ঘরে মেয়েদের শুধায়—তোরা কিছু জানিস্ ?

একটা মেয়ে হরিমতির নামে জলিয়া উঠে, বলে—কি জানি ভাই ! তবে দেখছি তো ক'দিন ধরে হরিমতির সঙ্গে ফিসির ফিসির করে কি বল্‌ছেন।

হরিমতির ঘরের দরজা ঠেলিয়া তীক্ষ্ণস্বরে ডাকে—মকর !

এমনি শক্ত করিয়া ধরে যে হরিমতি কথাটা অস্বীকার করিতে পারেনা।

ঘরে ফিরিয়া বাবুকে বলে—বাবু !

বাবু বলেন—কেন ?

বলে—আমার ভুলিকে বেচে আমার সাহায্য করছো ? এমন সাহায্য তোমার কাছে কখ্‌খনো চাইনি তো।

বাবু বলিতে যান—লক্ষ্মী, চুপ কর, কথাটা শোন—

কিন্তু কোন কথাই আর শুনিতে চায় না। বলে—কোন কথা শুনতে চাইনে আমি আমার ছেলেকে পর করে দিয়ে আমাকে হাতে রাখবার চেষ্টা ! তা নইলে হবে কেন ?—বলিয়া ছু'একটা অশ্রাব্য কথাই বলিয়া ফেলে। বাবু কানে আঙুল দেন।

আবার বলে—কারু সাহায্য চাই নে আমি, তোমরা কেউ এসো না আর।

বাবু হাসিতে হাসিতে বলেন— আর না-হয় আস্‌বো না কিন্তু আজকে ?

বলে—আজ কি ? একটা দিনও থাক্‌তে পার্‌বেনা আমার ঘরে, এক দণ্ডও না—যাও বেরোও—

বাবু বলেন—মদ না খেয়ে—

বলে—মদ না খেয়ে এমন মাতাল কেউ হয়, এ তোমার অজানা ? বেশ তাই হয়েছি আমি। নেশা যদি মনে কর তবে তাই। কিন্তু আমার এ নেশা আজ বাদে কাল ভাঙ্‌বে বলে যদি আশা কর তবে ভুল। আমার ছেলেকে যে বিক্রী করে, তাকে আমি কোনো কালেই আমার ঘরে ঠাঁই দো'বো না। যাও বেরিয়ে যাও।—

একটু থামিয়া আবার বলে—যাও। নইলে পুলিশ ডাক্‌বো।

লক্ষ্মী যদি মদের ঝুকিতে এ ধরণের কথা কহিত বাবু অবশ্যই তা গায়ে মাখেন না। কিন্তু সজ্ঞানে দৃঢ়স্বরে যখন এ আদেশ করে—বিশেষতঃ রাগের মাথায় পুলিশ ডাকিলে কেলেঙ্কারী কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তার তো ঠিক নেই, তাই বাবু উঠিয়াই পড়েন।

সদর হইতে নামিলে লক্ষ্মী শুধায়—কার কাছে বেচেছো ? সেই পার্শী সাহেবের কাছে ?

একটীমাত্র কথা শোনা যায়—হ্যাঁ।

খালি ঘরে বসিয়া সেই অর্দ্ধশিক্ষিত মেয়েটী যা ভাবে, শুদ্ধ ভাষায় গুছাইয়া বলিলে তা দাঁড়ায় এই—

আর নয় ! আর নয় ! পতিতা গৃহের বিষাক্ত বাতাস যেভাবে আমার প্রতি মুহূর্ত্তের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে আর এখানে তিলার্দ্ধও অপেক্ষা

করিতে পারি না। যেখানে ছেলের ওপর মায়ের আর মায়ের ওপর ছেলের আকর্ষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য, নির্ম্মম নৃশংস রাক্ষস-রাক্ষসীদের বিদ্রূপ ও টিট্‌কারীর বিষয়, সেখানে মন টিঁকাইয়া থাকিতে আর যেই পারুক, আমি পারিব না। আমার কোল হইতে আমার ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিবার স্পর্দ্ধা পর্য্যন্ত যাহারা রাখে, তাহাদের মন জোগাইয়া চলিতে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য নিজেকে সু-সজ্জিত করিয়া, নিজের রূপ-যৌবন উন্মুখ ও অনাবৃত করিয়া রাখিতে আমি পারিব না—পারিব না—পারিব না।

—দশ—

পরদিন সকালে উঠিয়াই লক্ষ্মী পরমেশ্বরকে দিয়া ফার্ণিচারওয়ালাকে ডাকে। ডাকিয়া বলে—এই ঘরের খাট, আলমারী, বিছানা-পত্র, আলনা, ছবি—মায় পেতল ও রূপার বাসনগুলোর জন্যে কত দেবেন আপনি?

ফার্ণিচারওয়ালা কোন কথা না বলিতেই ঘরের মধ্যে ঢুকিল হরিমতি। সে বলে—আপনি সত্যই এসবের দর করবেন না দাশুবাবু, ও পাগল হয়েছে।

জিনিষগুলি দেখিয়া দেখিয়া দাশুবাবু লুব্ধ হইয়া উঠেন। হরিমতির কথায় বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তিনি বলেন—তাই তো ভাবি, এত বৈরাগ্য এল কবে!

শুনিয়া ও আরো জলিয়া ওঠে। বলে—না দাশুবাবু, আমি পাগল হইনি। সত্যই আমি সব বিক্রী করবো। আপনি কত দিতে পারবেন বলুন?

দাশুবাবু ছুঁতা-নাতা না করিয়া সময় কাটাইয়া দেন। হরিমতি ঘরের বাহিরে গেলে চুপি চুপি বলেন—জিনিষ-গুলো পুরাণো, আলাদা আলাদা করে দর করলে হয় তো কমই পড়বে। তা তোমার টাকার দরকার, আড়াইশো টাকাই না-হয় নিও।

ও উৎফুল্ল হয়—ডলির দর কি আর আড়াইশো টাকার বেশী হইয়াছে? সকল জিনিষের তালিকা লিখিয়া তার নীচে লক্ষ্মীর নাম সই করিয়া লইয়া দাশুবাবু আড়াইশো টাকার নোট তার হাতে গুঁজিয়া দেন।

লক্ষ্মী বাড়ীর বাহির হইয়া পড়ে—এক বস্ত্রে। বড় রাস্তায় পড়িতেই গয়নার দোকান। হার, তাগা, রুলী, আংটী এবং অল্প-স্বল্প আর যা গয়না ছিল, একত্র করিয়া দোকানদারের হাতে তুলিয়া দেয়। বলে—এই গয়না নিয়ে কত টাকা দিতে পারবে?

দোকানী গয়নাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলে—শ' চারেক।

আচ্ছা, তাই দাও—বলিয়া টাকা লইয়া লক্ষ্মী আগাইয়া যায়। নেবুতলার মোড়ের ওপাশে সেই পার্শীর বাড়ী—যে একদিন ছ'শো টাকা দিয়া ডলিকে কিনিতে চাহিয়া-ছিল। সাহেব বাড়ীতেই ছিলেন, লক্ষ্মী গিয়া বলে—আমার কুকুরটা ফিরিয়ে দিন।

সাহেব বলেন—ফিরিয়ে দেব, সেকি? ওটাকে কত টাকা দিয়ে কিনেছি তা জান?

সাড়ে ছ'শো টাকার নোট সাহেবের সুমুখে ছড়াইয়া ধরিয়া লক্ষ্মী বলে—এর বেশী দিয়ে নিশ্চয় নয়। এগুলো সব নাও, আমার ছেলেকে দাও।

সাহেবের মেয়ে ডলিকে আনিয়া দেয়, ডলি লক্ষ্মীকে পাইয়া হাতে হাতে স্বর্গ পায় যেন—লক্ষ্মীই কি তার কম? নোটগুলি ড্রয়ারে ভরিয়া সাহেব চাহিয়া দেখেন—মায়ে ছেলেতে মনের আনন্দে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ভাবিয়া মেয়েকে দিয়া সাহেব একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট পাঠাইয়া দেন।

লক্ষ্মী ছল ছল চোখে বলে—ও নোট আমি নিতে পারবো না। যেখান থেকে এসেছি, সেখানকার কোনো স্মৃতিই আর রাখবো না। মায়ে-বেটায় নতুন করে সংসার পাতবো।

ডলিকে আদর করিয়া বলে—কি বলিস্ ডলি, পারবিনে আমার সঙ্গে কষ্ট করে থাকতে?

নারীর পুরস্কার

ডাক্তার শ্রীঅমূল্যধন ঘোষ

আমার নাম সুধাহাসিনী। শুনিয়াছি নামের সঙ্গে মানুষটার অনেক সময়ে অনেক মিল থাকে। আমার ভাগ্যে কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। চিরজীবনটা যাহাকে কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে, তাহার নামকরণের সময় ভগবান আমার পিতার মনে এমন বিপরীত নামটা কেন যে জোগাইয়া দিয়াছিলেন তাহা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার দুরদৃষ্টের উপর করুণাময় বিধাতারও কি নিষ্ঠুর পরিহাস ছিল?

চিরকাল ধরিয়া এই প্রবাদবাক্য শুনিয়া আসিতেছি, "দুঃখের কপালে সুখ নেই।" আমারও দুঃখের কপালে সুখ হইল না। অথচ এই দুঃখের কপালটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবার জন্য আমি নিজে যথেষ্ট চেষ্টাই করিয়াছি। অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষকারের নিত্য যে লড়াই হইয়া থাকে তাহা কেবল পুরুষেরই জীবনে ঘটে। নারী নিজের অদৃষ্ট নিজে গড়িয়া তুলিতে পারে না, সারাজীবন পরের অদৃষ্টের উপরই তাহাদের নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। আমি তবুও নিজের অদৃষ্ট গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে ছাড়ি নাই।

সে সকল কথা পরে বলিব,—এখন আগের কথা আগে বলি। যখন একঘর ছেলেমেয়ে হারাইবার পর, বৃদ্ধ বয়সে, সন্তান লাভের বয়স প্রায় অতিক্রম করিয়া, আমার পিতামাতা আমায় লাভ করিলেন, তখন বড় আদরে আমার নাম রাখিলেন,—সুধাহাসিনী। তারপর আমার ছয়মাসমাত্র বয়সে আমার বাপ মা দুজনেই এক দিনে কলেরা রোগে মারা গেলে, জগতে আমার আপনার লোক রহিলেন, শুধু হারা মরার অবশিষ্ট, বড় দাদা।

বড়দাদার বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র। হারা-মরার ধন বলিয়া বাবা তাঁহাকে লেখা পড়া সেখান নাই। সম্পত্তিহীন কায়স্থ ঘরের মূর্খছেলে দাদা আমার, পিতৃহীন হইয়া দারুণ কষ্টে পড়িলেন বটে, কিন্তু তাহার কষ্ট বাড়াইবার মূল কারণ হইলাম, আমি। তখনও দাদার বিবাহ হয় নাই। পিতামাতা তাহাকে আদর করিয়া মূর্খ করিয়া রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকাল সকাল বিবাহ দিয়া আরও বেশী আদর দেখাইয়া যান নাই। কিন্তু বাপ-মা মরিতে না মরিতেই আমারই জন্য দাদাকে বিবাহ করিতে হইল। গরীব বাবা দাদার জন্য যদিও কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তবুও একা দাদা যে কোনও উপায়ে সহজেই নিজেকে চালাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু, আমাকে মানুষ করিবার জন্য পাঁচজনের পরামর্শে দায়ে পড়িয়া দাদাকে বিবাহ করিতে হইল। গ্রামেরই একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি দাদাকে তাহার অধীনে সামান্য বেতনে একটা চাকুরি দিয়া তাহার বাড়ীর পাচিকার একমাত্র অরক্ষণীয়া কন্যার সঙ্গে দাদার বিবাহ দিয়া, একদিকে আমার বাঁচিবার ও অপরদিকে অসহায়া বিধবার কন্যাদায় উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন।

জগতের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে দাদার লক্ষ্মীভাগ্যের অভাবে ষষ্ঠভাগ্যটা খুব প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে আমিও বড় হইয়া উঠিলাম। আমার বিবাহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। একটু ভালঘরে বিবাহ না দিলে চিরকালই আমায় টানিয়া বেড়াইতে হইবে, এই আশঙ্কা করিয়াই দাদা অনেক সন্ধানের পর অতিকষ্টে বেশ ভাল ঘরে আমায় পার করিলেন।

কপালগুণে দুই বৎসরের মধ্যেই আমি বিধবা হইলাম। শ্বশুরের তখনও পাঁচ ছেলে বর্ত্তমান। শাশুড়ী অল্পকালের মধ্যেই শোক ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছেলে কয়টীর উপায় করিবার জন্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। আমি শ্বশুরের বিষয় লাভে বঞ্চিত হইলাম।

কিন্তু, স্বামী হারাইয়াও যেমন, বিষয় হারাইয়াও তেমনই, কোনওটাতেই আমার বিশেষ দুঃখবোধ হইল না। আমি বেশ স্বচ্ছন্দমনে দাদার কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার বুদ্ধিহীনতার এবং হৃদয়হীনতার কথা শুনিয়া

কেহ যেন আশ্চর্য্য হইও না। স্বামীগৃহের কতটুকু আমার ছিল? স্বামীপ্রেমের কতটুকু আমি পাইয়াছিলাম, একটা মস্ত গৃহস্থালী আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির অপেক্ষায় বন্দোবস্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। সে বাড়ীতে একমাত্র স্ত্রীলোক ছিলেন, আমার শাশুড়ী। আমাকে বিয়ের ক'নে লইয়া গিয়াই তিনি আমার ঘাড়ে সমস্ত ভার চাপাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন! তাঁহারই বা দোষ দিব কি! তিনিও নয় বৎসর বয়সে সেই যে আসিয়া সেখানে ঢুকিয়াছিলেন, সেই অবধি একটা মুহূর্ত্তের জন্য রাগে শোকেও তাঁহার খাটুনির বিরাম ছিল না। ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার গালের হাড়গুলি এমন উঁচু হইয়াছিল যে সহসা তাঁহাকে তেষট্টি বৎসরের বলিয়া মনে হইত। আমি তবু সেখানে গিয়া পেটভরা অন্নের সংস্থান দেখিতে পাইয়াছিলাম;—শুনিয়াছি তিনি যখন আসিয়াছিলেন, তখন অর্দ্ধেক দিন তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হইত। আমার দেহে তবু শীত বর্ষা ছেঁড়া নেকড়ার উপর দিয়া কাটে নাই! কাজেই আমাকে পাইয়া তাঁহার একেবারে হাত পা ছাড়িয়া দেওয়ার অপরাধ কি?

যাহা হউক স্বামীগৃহে আমার এই অধিকার ছিল! স্বামীপ্রেমে আমার অধিকারের দাবি যে কতটুকু, তাহা আমি সে বয়সে ঠিক জানিতাম না। তবে যেটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা কেবল মাঝে মাঝে আমার কাজের খুঁত ধরিয়া নেপথ্যে তিরস্কার ও মায়ের কাছে অভিযোগ!

এরূপ স্থলে শ্বশুরবাড়ীর সৌভাগ্য হারাইয়া দুঃখিত না হওয়া কি এতই অস্বাভাবিক?

দাদার নিজের অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি ভাল ঘরে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু, সে ভাল ঘরে আমার ছিল কি? দিন রাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, ধান ভানিয়া, দাল কাঁড়িয়া, জনমজুরের জন্য পর্য্যাপ্ত কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত তরকারি রাঁধিয়া,—সামান্য মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান! আরাম উপভোগের জিনিস সেখানে কিছুই ছিল না। আমার শ্বশুরবাড়ীর সকলে যখন গর্ব্ব করিতেন যে, পরের চাকুরি না করিয়া, পরের দোরে না গিয়া, তাঁহাদের রাজার হালে চলিয়া যায়,—তখন আমার গা জ্বালা করিত। পুরুষরা চাষের কাজে হাড় মাটি করিবে, আর স্ত্রীলোকেরা ঘরের কাজে গতর জল করিবে,—অতটা পরিশ্রমের দাম কি শুধু পেটের জন্য কয়টি অন্ন ও বৎসরে এক জোড়া কাপড়? অতটুকু পাইবার জন্য কতটুকু পরিশ্রমের দরকার হয়?

পরিশ্রমে আমি কখনও কাতর ছিলাম না। দাদার ঘরেও অনেক পরিশ্রম করিতাম, পরের ঘরে অতটা পরিশ্রম করিলে যে আমি অতি সহজেই অনেক বেশী উপার্জ্জন করিতে পারি, এ বিশ্বাস আমার খুবই ছিল। তবে দাদার ঘরে আমার খুব একটা স্নেহের বন্ধন ছিল, তাই সেখানে আমার খাটুনির পরিমাণ হিসাবে দাম পাইবার কথা আমার মনে হইত না। কিন্তু, স্বামীগৃহে আমার কোনও আকর্ষণ না থাকায় আমার উৎকট পরিশ্রমের পরিমাণানুযায়ী কিছুই পাইতাম না বলিয়া হতাশায় বড়ই ম্রিয়মানা হইয়া থাকিতাম।

বিধবা হইবার কিছুকাল পরে একদিন নিজেই চেষ্টা করিয়া আসিয়া দাদার কাছে হাজির হইলাম। শাশুড়ী বিশেষ কোনও আপত্তি করিলেন না। আমার স্বামীই ছিল তাহার বড় ছেলে। সে মারা যাওয়াতে মেজর বিবাহের জন্য একটু তাড়াতাড়ি আয়োজন হইতেছিল। শীঘ্রই সংসারে আর একটি খাটিবার লোক পাইবার আশায় বোধ করি, শাশুড়ী আমায় রাখিবার জন্য বেশী টানাটানি করিলেন না।

দাদা আমায় দেখিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া থাকিবার পর যেন দারুণ দুঃখে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, 'জানিস্ ত' সুনা, আমার অবস্থা—ভাব্‌ছি—"

আমি তাড়াতাড়ি উৎসাহের সহিত উত্তর দিলাম "কোনও ভাবনা নেই, দাদা তোমার। আমি নিজের পেটের ভাত নিজে যোগাড় ক'রে নিতে পারবো। আমি চরকায় সুতো কেটে আমার খরচ খুব চালিয়ে নিতে পার্ব্বো।"

কথাটা, বোধ হয়, দাদার তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হইল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন! আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চরকার ততটা প্রচলন ছিল না। তখন গান্ধী মহাত্মার দিন আসে নাই, সবে সুরেন্দ্রবাবুর দিন সুরু হইয়াছিল। তখনও কেহই লজ্জা নিবারণের উপায় ভাবিয়া চরকা ধরে নাই—তখন শুধু আমাদের জিনিস

বলিয়াই যেন কেহ কেহ অতি অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়াও চরকার আদর করিতেছিল। কিন্তু, আমাদের মত অবস্থার লোক সেরূপ আদর করিতে পারিত না। যাহারা দেশের অতীত গৌরবের কথা লইয়া কবিত্ব হিসাবে বড় বড় কথা কহিতে পারে, তাহারাই শুধু ওরূপ জিনিসের আদর করিতে পারে। দাদা বুঝিতেন যে উহাতে পেট ভরিবে না। তাই তিনি আমার উপর উৎসাহপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে খুসী হইতে পারেন নাই। আমি, কিন্তু প্রাণপণে চরকা চালাইয়া পেট ভরিবার উপায় করিয়া ফেলিলাম।

আমার নিজের ক্ষুদ্র পেটের জন্য যতটুকুর দরকার সময়মত কাটনা কাটিয়া তাহা অতি সহজেই সংগ্রহ হইতে লাগিল। তাহার উপর আরও বেশী করিয়া কাটিয়া আমি কিছু বেশীও উপায় করিতে লাগিলাম। পুকুরের কল্‌মি শাক তুলিয়া, উঠানে তরি তরকারির গাছ পালা দিয়া ঘরে একটা গরু পুষিয়া সংসারের কিছু খরচও বাঁচাইতে লাগিলাম।

দাদা সংসারের খবর কিছুই রাখিতেন না। যাহা কিছু রোজগার করিতেন, সমস্তই বৌদিদির হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহার যাহা আয় তাহাতে অতিকষ্টে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইতেছিল, ইহাই তিনি জানিতেন। আমি আসিয়া ভার বাড়াইলে নিশ্চয়ই তাহার দেনা হইয়া পড়িবে এই ভয়েই তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে কোনও দেনার সংবাদ তাঁহার কানে উঠিল না,—তখন আবার নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিসে যে কি হইতেছে, তাহার কিছুই খোঁজ রাখিলেন না।

বৌদিদি আমার মায়ের মত ছিলেন। তিনি যখন তখনই বলিতেন, সুধা অত খাটিস্‌নে—ভগবান আমাদের অবিশ্যি চালিয়ে দেবেন। অত খাটলে মারা যাবি—'

মারা যাইবার ভয়েতে আমার ঘুম হইতেছিল না! আমি মনে মনে ভাবিতাম, আমি মরিলেই বা কাহার কি ক্ষতি? কিন্তু, যতই খাটি, যতই কষ্ট পাই, আর যতই যাহা মনে করি, ইহাও আমার মনে হইত যে, আর কাহারও জন্য না হউক, দাদার ছেলে মেয়েদের জন্য আমার বাঁচিবার ও আরও পরিশ্রম করিবার আবশ্যক আছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর একএকদিন রাত্রি জাগিয়া পাট কাটিয়া হয়ত তাহাদের জন্য সামান্য গোটাকতক মুড়্‌কি কিনিয়া দিতে পারিতাম,—তাহাই পাইয়া তাহারা যেরূপ আমোদ করিত, তাহাতে আমার বুকের মধ্যে তাহাদের জন্য দারুণ অভাব বোধ হইত। মনে হইত, যদি কোনও উপায়ে তাহাদের নিত্য ভাল ভাল খাবার জিনিস কিনিয়া দিতে পারিতাম! জগতে তাহারাই ত' আমার যা' কিছু! পরিশ্রমে আমার কষ্ট বোধ হওয়া দূরে থাকুক তাহাদের মুখের পানে চাহিলেই আমার মনে হইত আরও আমি পরিশ্রম করিতে পারিতাম!

গরীবের ঘরের বিধবা মেয়ে আমি, দাদার ঘাড়ে বোঝা হইয়া যে পরিশ্রম করিতাম তাহাতে লোকের কাছে আমার কিছু বাহাদুরী ছিল না। আমারও পরিশ্রম যখন আমার অভাব সম্পূর্ণ মোচন করিতে পারিত না, তখন আমিও সেরূপ বাহাদুরী পাইবার প্রত্যাশা করিতাম না। কিন্তু একদিন গিরীন্‌দা আসিয়া আমার সুখ্যাতি গাহিয়া আর বাঁচে না!

গিরীন দা' আমাদেরই গ্রামের ছেলে। কয়েক বৎসর হইল তাহারা কলিকাতায় গিয়া বাস করিয়া আছেন। এখন দেশ-ঘর বড় মাড়ায় না। গিরীন্‌-দা এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। আমি ছোট বেলায় তাহার সহিত কত খেলা করিয়াছি। কিন্তু, সেদিন আমার ষোল বৎসর বয়সের কোথাকার প্রচ্ছন্ন লজ্জা হঠাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত গিরীন দা'র সম্মুখে কিছুতেই আমায় অগ্রসর হইতে দিল না। আমি নিজের ঘরের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। অথচ গিরীন্‌-দা' কেমন সহজে নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা কহিয়া আমার সে লজ্জা ঘুচাইয়া দিলেন! বৌদিদির কাছে আমাদের সংসারের সুখ দুঃখের পরিচয় লইতে লইতে আমার সম্বন্ধে সমস্ত পরিচয় পাইয়া তিনি মড় মড় করিয়া আমার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কইরে, সুধা, তোর চরকা কাটা দেখি।"

অগত্যা দেখাইতেই হইল। তিনি দেখিয়া বৌদিকে বলিলেন, 'বাঃ সুধা ত অল্পবয়সে শিল্পকলা বেশ শিখেছে!'

ওমা কে জানিত যে ইহারই নাম আবার শিল্পকলা!

...মি পেটের দায়ে গরু চরাই, ঘুঁটে দিই, 'কাটনা কাটি,' ...টে কাটি',—শিল্পকলার কি ধার ধারি? এখন ...নিলাম যে ইহার মধ্যেও শিল্পকলা থাকিতে পারে। ...ধু তাই নহে,—তাহাতে আমার আমার নৈপুণ্যও নাকি ...ন্মিয়াছে!

কিন্তু, এই জানাই আমার কাল হইল। এতদিন ...গাবর মাখিয়া, কাদা ঘাঁটিয়া, রাত্রি জাগিয়া চরকা ...রাইয়া, দাদার সংসারে দিনরাত্রি খাটিয়া, অবসাদ আসিলে প্রায়ই যে মনে করিতাম, পৃথিবীতে আমার বাঁচিয়া কোনও ...ল নাই,—আজ গিরীনদা'র মুখের প্রশংসাটুকুতে সে চিন্তা ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, আরও ...াচিয়া আরও ভাল করিয়া আরও সব শিল্পকলা অভ্যাস ...রি না কেন?

সে অবধি গিরিন্‌দা প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসিয়া ...নাইতে লাগিলেন যে আরও অনেক প্রকার শিল্পবিদ্যা ...াছে যাহা শিখিয়া কলিকাতায় অনেক স্ত্রীলোকে খুব ...হজে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বেশ সুখ ...াগ করিতেছে! কথাটা শুনিয়া শুনিয়া সেই সব বিদ্যা শিখিবার জন্য আমার লোভ জন্মিতে লাগিল। ভাবিতে ...াগিলাম, আমার দুঃখের কপালে আমি নিজের কোনও ...খের প্রত্যাশা না করিলেও চেষ্টা করিলে ছেলেমেয়ে ...য়টাকেও সুখে রাখিতে পারি।

কিছুদিন পরে কলিকাতায় যাইবার সময়, গিরীন্‌দা' ...ামার তৈরী সূতা খানিকটা চাহিয়া লইয়া গেলেন! ...রপর আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়া আমায় বলিলেন যে, ...াহার বড়ই ইচ্ছা হয় যে আমি নিজে হাতে তাঁহাকে ...েশ সরু সূতা কাটিয়া দিই, তিনি তাহার কাপড় তৈরী ...রাইয়া পরিয়া পাঁচজনকে দেখান।

আমি পেটের দায়ে সূতা কাটিয়া বেচিতাম, তাহাতে ...মন কাপড় হয়, কে তাহা পরে, এসব কথা একদিনও ...াবিয়া দেখি নাই। আজ গিরীন্‌দার এই প্রস্তাব ...নিয়া আমার মনে হইল, তবে আমার এই সূতাকাটারও ...র্থকতা আছে! আমার তৈরী সূতায় নির্ম্মিত কাপড় ...াহাকে পরিতে দেখিয়া আমি আমার চরকা ঘুরানো ...র্থক বোধ করিতে পাইব!

গিরীন্‌দার জন্য আমি প্রাণপনে ভাল সরু সূতা কাটিতে লাগিলাম। হায়! আমি মোটা সূতা বেচিয়া মোটা ভাত রোজগার করিতেছিলাম,—সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের মোহে ডুব দিলাম কেন? চরকা বিদ্যা আমার অভাব মোচনের অবলম্বন ছিল, আমি তাহাকে সখের শিল্প-কলা বলিয়া জানিলাম কেন?

শীঘ্রই আমি গিরীন্‌-দাকে একজোড়া কাপড়ের মত সূতা কাটিয়া দিলাম। সূতা দেখিয়া তাঁহার আমোদ দেখে কে? আমায় দাম দিতে আসিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হওয়ায় অনেকবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বৌ'দির কাছে গেলেন। বৌ'দি কিছুতেই দাম লইতে রাজী হইলেন না। গিরীন্‌দার একান্ত পীড়াপীড়িতে শেষে বলিয়াদিলেন দাম যদি দিতেই হয় তবে সুধার কাছে দিবেন।

খুব চেষ্টায় গিরীন্‌দা আমার কাছে একবার দামের কথা তুলিতেই, আমি বলিয়া ফেলিলাম "গিরীন্‌-দা' আপনি কি আমাদের এতই পর মনে করেন?"

গিরীন্‌-দা' লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন। কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার বি-এ পাশ করা বুদ্ধিতে এ উত্তর জোগাইল না, সত্যই ত তুমি আমার পর। তুমি মজুরি করিয়া দিনপাত কর, তোমার একি অন্যায় বদান্যতা!

এসব কিছুই না বলিয়া তিনি শুধু আমার মুখের পানে একবার চুপ করিয়া রহিলেন মাত্র।

ফিরে বারে কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তিনি আমার জন্য ভাল একজোড়া সরুপেড়ে মিহি কাপড় কিনিয়া আনিলেন। বিধবা হইলেও তখনও আমি পান পরিতে আরম্ভ করি নাই। পাড়ওয়ালা ধুতি পরিতাম, মাঝে মাঝে সরুপেড়ে শাড়ীও পরিতাম। আবশ্যক হইলে কখনও কখনও বৌদির চওড়াপেড়ে কাপড়ও পরিয়াছি। কিন্তু এই গিরীন্‌দার দেওয়া এই সরুপেড়ে ধুতি কোনওমতে লজ্জায় পরিলাম না অথচ এই কাপড় পাইয়া আমার এত আমোদ বোধ হইল যে, তাহা আমার প্রদত্ত সূতার মূল্য-স্বরূপ জানিয়াও, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

তারপর হইতে গিরীন্‌-দার পরামর্শমত আমি মিহি সূতাই কাটিতে লাগিলাম। বরাবর আমি মোটা সূতা

কাটিয়াই বেচিয়া আসিতেছিলাম, সরুস্থতায় কিরূপ লাভ দাঁড়াইবে জানিতাম না। তবু গিরীন্-দা' যখন বলিলেন যে, তাহা কলিকাতায় তিনি খুব বেশী দরে বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন তখন তাহাই বিশ্বাস করিলাম। তাঁহার কথায় আমার খুবই বিশ্বাস ছিল। ফলে প্রকৃতই তিনি আমার অসম্ভব লাভ দাঁড় করাইয়া দিলেন। কিন্তু, অত দিয়া কে যে তাহা কেনে, এবং কেন যে কেনে, একদিনও তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম না।

অনেকদিন ধরিয়া এইরূপ চলিল। আমার অভাবও ঘুচিল। তারপর একদিন গিরীন্-দা' কলিকাতা হইতে আসিয়া বলিলেন, 'সুধা তোর সুতাগুলো পেয়ে আমার বন্ধুরা বড়ই খুসি হ'য়েছে, সমস্তটা তা'রাই কিনে নিচ্ছে।'

কাহারা যে গিরীন্-দা'র বন্ধু,—তাঁহারা যে কেমন,—কিছুই আমি জানিতাম না। তবুও তাঁহাদের অপরিচিত মুখে আমার সুখ্যাতির কথা শুনিয়া আমার বড়ই আমোদ হইল। আমি ত' আমার জীবনে কোনও কাজের জন্য কখনও কাহারও কাছে কোনওরূপ সুখ্যাতি পাই নাই! ইদানিং কোনও কাজে গিরীন্দা'র কাছে সুখ্যাতি পাইলেই আমার সকল শ্রম সফল মনে হইত। কর্ম্মময় এই বিশ্ব-জগতের কোনও কাজ যেদিন আমার অস্তিত্বটুকুরও আমি সন্ধান পাই নাই, সেদিন গিরীন্-দার চোখের দ্বারাই আমি আমাকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। আজ সেই গিরীন্-দার বন্ধুদের মুখে আমার সুতার সুখ্যাতির কথা শুনিয়া কি জানি কিসের উৎসাহে আমি সহসা বলিয়া উঠিলাম, 'গিরীন্-দা, আপনি যে আরও সব শিল্পবিদ্যার কথা বলে ছিলেন, সেগুলো কি আমি অভ্যাস কর্‌তে পারি না?

গিরীন্-দা'র কৃপায় সুতা বেচিয়াই তখন আমার অভাব বেশ দূর হইয়াছিল, তবুও কেন যে আবার নূতন বিদ্যা শিখিবার সখ হইল, বলিতে পারি না। গিরীন্-দা'র মুখেও ত' ও-কথা সেই গোড়ায় গোড়ায় শুনিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে ত' আর একদিনও শুনি নাই। তবে আজ হঠাৎ নূতন করিয়া সে কথা মনে পড়িল কেন? আমার প্রাণের ভিতর কি তবে ও-চিন্তা সেই অবধি নিত্যই লুকাইয়া খেলা করিতেছিল? কই আমিত' সে সন্ধান জানিতাম না।

যাহাহউক, নূতন নূতন বিদ্যাভ্যাসে আমার উৎসাহ দেখিয়া গিরীন্-দা' বড়ই খুসি হইলেন। মহা উল্লাসে স্ফীত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই ত' চাই! এই উৎসাহের অভাবেই ত' আমাদের শিল্পের আজ এতদূর অধঃপতন হইয়াছে!' একটা ইংরাজী পদ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে করিতে বলিলেন, "কত ভাল ভাল ফুল বনে আপনি ফুটে আপনিই শুকিয়ে যাচ্ছে, কেউ তার খোঁজ রাখছে না! আমাদের দেশেও যেসব মেয়ে জন্মায় তা'দের দিয়ে শুধু ভাত রাঁধিয়ে না নিয়ে, যদি তা'দের কিছু কিছু শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত, তা'হলে আজ আমাদের জাতীয় শিল্পের এতদূর অধঃপতন হ'ত না।'

জন্মদুঃখিনী আমি যে আজ চেষ্টা করিলে দেশের বিনষ্ট শিল্পের অন্ততঃ খানিকটা উদ্ধার করিতে পারি, গিরীন্-দা'র হিসাবে যে আমি এত বড়, একথা মনে করিতে আমারও মনে একটু গর্ব্ব আসিল। আমি উৎসাহের আবেগে মুখরা হইয়া গিরীন্-দা'র কাছে ও-সম্বন্ধে অনেক খোঁজ লইলাম। যে সকল মেয়েরা শিল্পবিদ্যাবলে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সুখ ভোগ করিতেছে, তাহারা কেমন, তাহাদের আহার-বিহার কিরূপ, তাহারা একএকজন কত টাকা করিয়া উপার্জ্জন করে—এই সকল বিষয়ে খোঁজ করিয়া আমি যাহা জানিলাম, তাহার আমি হাতে হাতেই গিরীন্-দা'র কাছে আমার মত প্রকাশ করিলাম, তাহারা ত' বেশ! আমাদের মত হাত-পা থাকিতে খোঁড়া হইয়া পরের ঘাড়ের বোঝা হইয়া না থাকিয়া বেশ স্বাধীনভাবে নিজের জোরে, নিজেও সুখে থাকিতে পারে, অপর পাঁচজনকেও সুখে রাখিতে পারে।'

আমার উৎসাহ দেখিয়া গিরীন্-দা আমার দাদাকে সকল কথা জানাইলেন। সে সকল শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে যে আমার কলিকাতায় থাকিবার আবশ্যক হইবে। একথা গিরীন্-দা আমাকেও বলিলেন, দাদাকে জানাইলেন। আগে এমন কথা কেহ আমায় বলিলে, আমি মনে করিতাম যে হয়ত সে আমায় গালি দিতেছে; কিন্তু আজ আমি ইহাতে খুব রাজী হইলাম।

দাদারও কোন আপত্তি হইল না। গিরীন্-দা'র মতেই দাদার মত! তাঁহার উচ্চ-শিক্ষার উপর দাদার একটা
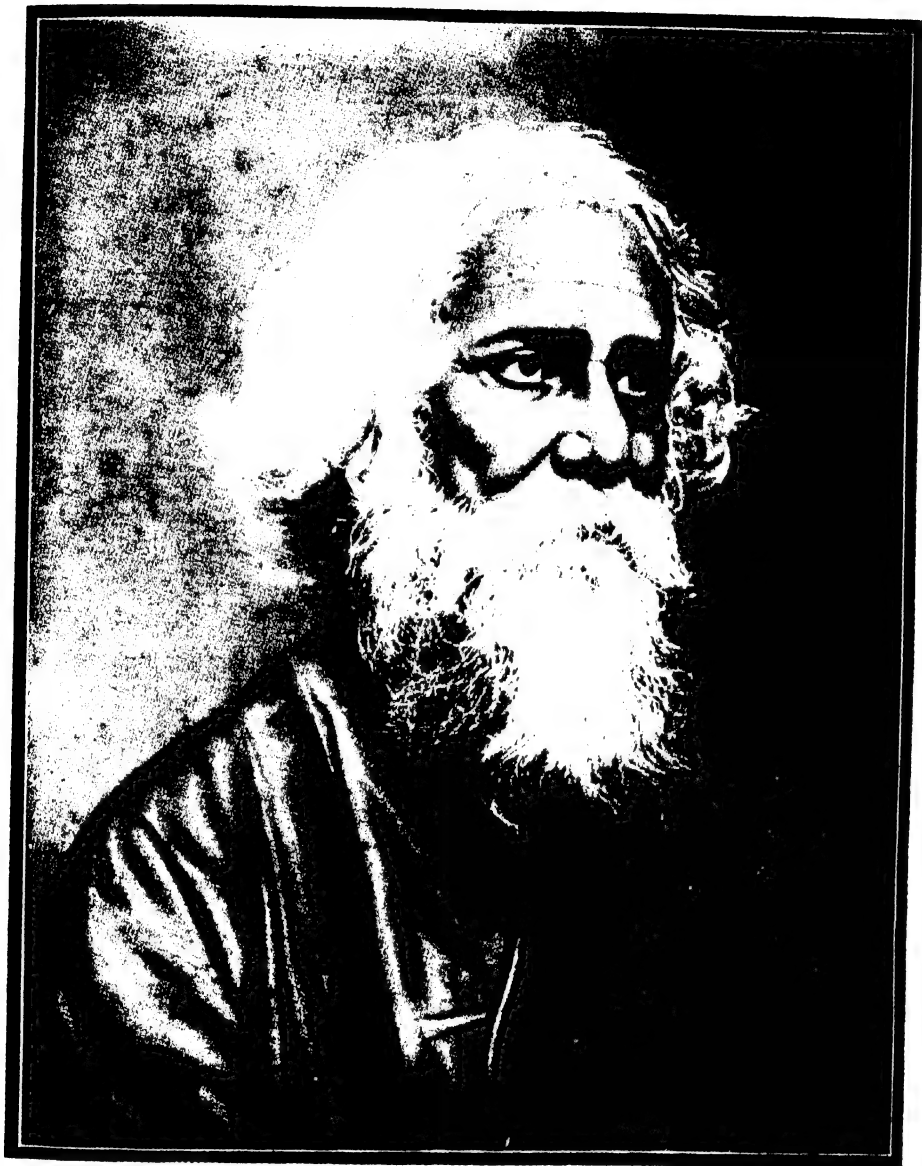
"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ"

শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা, গিরীন্‌-দা'র পিতাকে আমরা জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম এবং ছেলেবেলায় তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল ও অনেকদূর টানিলে একটু জ্ঞাতিত্বও ছিল। তাঁহারা বড়লোক। কলিকাতায় একটু উন্নত ধরণে বাস করেন,—এই কারণে দেশে সকলে হিংসা করিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্ম বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মেশা-মেশা বন্ধ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলিত, সত্যই তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন যখন গিরীন্‌-দা'র মা পর্য্যন্ত দাদাকে পত্র লিখিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন দাদা বলিলেন, 'সুধার ত' ছেলেমেয়ে নেই, যে আমাকে এনে তাদের বিয়ে দিতে হ'বে, ওর যদি আখেরের উপায় হয়ত' ও স্বচ্ছন্দে সেখানে থাক্।'

বৌদিদি অনেক আপত্তি করিলেন। কিন্তু দাদার এ বিষয়ে এত উদার হওয়ার একটা কারণ ছিল। তিনি যখন তখন দুঃখ করিয়া বলিতেন যে আমাদের ঘরের মেয়েরা যদি এমন কিছু শিক্ষা পাইত যে দরকার হইলে পরের বাড়ীতে রাঁধুনী বৃত্তি না করিয়াও কিছু রোজগার করিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক গরীবের উপায় হইত। গিরীন্‌-দা'ও এ বিষয়ে দাদার সহিত একমত ছিলেন। তিনি দাদাকে সঙ্গে করিয়া আমায় কলিকাতায় লইয়া গেলেন।

যাইবার সময় বাড়ীর সকলের জন্যই আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু মনকে বুঝাইলাম আমি ত তাহাদেরই সুখের জন্য যাইতেছি; সেখানে গিরীন্‌-দা'র কাছে থাকিয়া কত ভাল উপদেশ পাইব, দেশের কাজে লাগিতে পাইব, এ আশায় আমার একটু অবসাদও হইতে লাগিল।

গিরীন্‌-দা'র বাড়ীতে পৌঁছিয়া আমি চোখের উপর অনেক নূতন জিনিষ দেখিতে পাইলাম। মাঝে মাঝে আমার অনেক পুরাতন মত বদলাইয়া যাইতে লাগিল। আমরা গরীবের ঘরের মেয়ে,—অভাবের পীড়নে আমাদের এত করিতে হয় যে, সেই খাটুনীর জন্য অনেক সময়ে আমরা মনে করি, এ জীবনে আর দরকার নাই,—অনেক সময়ে মনে করি যে যদি আমাদের ভাল অবস্থা হইত ত' দিনরাত [illegible] থাকিয়া [illegible] করিয়া জীবনটা উপভোগ করিয়া লইতে পারিতাম কিন্তু, গিরীন্‌-দা'র ছোট বোন সুকুমারীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিলাম। এত বড় লোকের মেয়ে সে রাত্রিদিন এতটা পরিশ্রম করে যে তাহা দেখিয়া তাহার উপর আমার একটা শ্রদ্ধা জন্মিল।

সুকু' আমারই সমবয়স্কা ছিল। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। আমরা চিরকালই জানি যে বড়লোকের মেয়েরা বাপের বাড়ীতে, বিশেষ বিয়ের আগে, একেবারে নড়িয়া বসে না। কিন্তু, সুকু' রাত্রি জাগিয়া পড়ে, দেশের উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইয়া কত প্রবন্ধ লেখে, আবার মহিলা-সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেগুলি মুখস্থ করে। সারাদিন আলমারি সাজাইয়া কাপড়-চোপড় গোছাইয়া, নিজের বেশবিন্যাস করিয়া, সাবান ও পাউডার মাখিয়া, জুতা পালিস করিয়া, সে সর্ব্বদা একটা-না একটা কাজে এমনই ব্যস্ত থাকে যেন কাহারও কাছে তাহার সারাদিনকার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। একটা ছুঁচের, কিম্বা একটা উলের কাজে সে অনেক সময় এমন নিবিষ্ট থাকে যে হয়ত ঘাড়-পিঠ টন্‌টন্ করিতেছে, বাড়া ভাত শুকাইয়া যাইতেছে, ঝি আসিয়া খাইবার জন্য ডাকাডাকি করিতেছে, তবুও কোনও দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই থাকে না।

সখের ব্যসন কাহাকে বলে, তখন তাহা জানিতাম না। সুকুর আদর্শে নিজেকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। সুকুর সঙ্গে ভাব করিয়া, আমি তাহার শেখাবিদ্যা নিজে আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেও আমাকে বেশ যত্ন করিয়া শিখাইতে লাগিল। বোধহয় তাহার প্রতি গিরীন্‌-দা'র এইরূপ উপদেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু যতই আমি তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া যাইতে চেষ্টা করি না কেন, আমার মনে হইত, আমাদের উভয়ের মাঝখানে কি-একটু যেন ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে। সে ব্যবধানটুকু সে যে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিতেছে, এরূপ সন্দেহ না করিয়া আমি তাহার সঙ্গে সমানভাবে চলিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তবুও আমার মনে হইত যে কিছুতেই আমি তাহার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

শীঘ্রই ইহার একটা কারণও আমি বুঝিয়া ফেলিলাম। জ্যেঠাইমা (গিরীন্‌-দা'র মা) আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিতেন।

সেই পরিমাণে ভালবাসিতেন কি না জানি না। তবে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আমি যত্ন ও ভালবাসা, এদুটী জিনিসকে কখনও পৃথকভাবে ভাবিতে পারিতাম না। যাহা হউক, খাওয়া-পরার বিষয়ে তিনি নিজের মেয়ের মতই আমাকে যত্ন করিতেন। অতটা যত্ন আমি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিয়া যাইতে পারিতাম না। একটা ভাল জিনিস মুখে তুলিতে গেলেই আমার মনে হইত যে দাদা, বৌদি' ও ছেলেপিলেরা এমন জিনিস কখনও চোখেও দেখিতে পায় না। ভাল কাপড়-চোপড় পড়িতেও আমার লজ্জা ও কষ্টবোধ হইত, বাড়ীতে আমাদের অনেক সময় ভিজা গামছা পরিয়াই কাটে। কাজেই আমি যতটা সম্ভব নিজের দৈন্য লইয়া কাটাইতে চাহিতাম কিন্তু, এক্ষণে সহজেই লক্ষ্য করিলাম যে আমার ওরূপ ভিখারিণীর চাল-চলন লইয়া আমি যে সুকুর সঙ্গে সমানে চলিতে চেষ্টা করিতেছি, ইহাতে বাড়ীর দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আমার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করে। ক্রমশঃ জ্যেঠাইমাও বলিতে লাগিলেন যে কলিকাতায় অমন পাড়াগেঁয়ে অসভ্য চালে থাকিলে লোকে বড়ই ঠাট্টা করে। একটু সভ্যভাবে চলিবার জন্য তিনি আমায় বিস্তর জেদও সুরু করিলেন। কাজেই আমি বুঝিলাম যে সুকুমারীর সঙ্গে সমানে চলিতে হইলে, আমার তদনুযায়ী বাহিক পরিবর্ত্তনও করিয়া লইতে হইবে।—নচেৎ লোকেও উপহাস করিবে এবং সুকুমারীও ঠিকভাবে ঘেঁসিতে দিবে না।

দেশে যেভাবে বাস করিতাম, লোকে তাহাতে আমায় নিন্দা বা বিদ্রূপ করিবে না,—বরং এখানকার মত চাল চলন দেখিলে অবশ্য যথেষ্ট নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতে পারিবে, সেখানে এমন চালে চলিবার মত অবস্থাও আমাদের ছিল না। কিন্তু, এখানে জ্যেঠাইমার কাছে যখন সহজেই সমস্ত পাইতেছিলাম, তখন অনর্থক লোকাচার বহির্ভূত কাজ করিয়া নিজের ক্ষতি করি কেন? নিজের হীনাবস্থা ছাড়া কোনও নিষ্ঠার বশে আমি দীনতা অবলম্বন করি নাই লোকের উপহাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারি, এমন শিক্ষাও আমার জীবনে কখনও হয় নাই। কাজেই আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তনের দিকে নিজেকে ফিরাইতে বাধ্য হইলাম।

কিন্তু, মন একবার ফিরিল, অমনি দ্রুতগতিতে আবার পরিবর্ত্তন চলিয়া শীঘ্রই এতদূর পূর্ণতা লাভ করিল যে যাহারা চিরকাল ধরিয়া সহরে চাল-চলনে মানুষ হইয়াছে তাহারাও সর্ব্বদা আমার মত খুঁটিনাটি ঠিকমত বজায় করিয়া চলিতে পারিব না।

বৎসরখানেক পরে দাদা আমায় দেখিতে আসিয়া সহসা ত' চিনিতেই পারেন না। এতদিন আমায় না দেখিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, দাদা দুঃখিতভাবে আমায় জানাইলেন যে আমি গিরীন্‌-দার বাড়ীতে আসিয়া থাকায় দেশের সমাজে আমার স্থান ঘুচিয়াছে, এবং আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের কথা জানিতে পারিলে তাঁহারও দুর্গতির সীমা থাকিবে না, এই ভয়ে গোপনে তিনি আমায় দেখিতে আসিয়াছেন। আমার সম্বন্ধে আরও এমন সব নিন্দা সেখানে রটিয়াছে যাহা দাদা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলেন না,—আমি আভাষে বুঝিয়া লইলাম।

আগে হইলে এ সংবাদে আমি লজ্জায়-ঘৃণায় মরিয়া যাইতাম। কিন্তু, আজ আমার সম্মুখে যে জীবনটার আস্বাদ আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম, সামান্য লোকনিন্দা তাহার কাছে কিছুই নহে।

দাদা আমার উন্নতি দেখিয়া খুব খুসি হইলেন। জ্যেঠাইমা'র কাছে থাকায় একে ত' নিজে দাদার ঘাড়ের উপর বোঝা হইতেছিলাম না, তাহার উপর আবার ছেলেদের জলখাবারের খরচ বলিয়া জ্যেঠাইমা মাসে মাসে গোটাচারেক করিয়া টাকা দাদাকে পাঠাইতেছিলেন। দেশে যথেষ্ট খাটিয়াও দাদাকে মাসে চার টাকা করিয়া নগদ হাতে দিতে পারিতাম না। অথচ এখানে ত' আমার কোনও খাটুনিই ছিল না। যা' দুই একটা কাজ আমায় করিতে হইত, তাহাকে আমরা কাজই বলি না। এই সামান্য কাজের জন্য জ্যেঠাইমা আমায় রাখিয়াছিলেন এবং মাসে মাসে আমার জন্য অত টাকা খরচ করিতেছিলেন।

দেশে অত পরিশ্রম করিয়াও আমার কি উন্নতি ছিল? এখানে গোড়াতেই এই,—আবার পরে আরও অনেক উন্নতির আশা ছিল। তবে অবশ্য এখানে আমার খাটুনি না থাকিলেও বুঝিতাম যে এটা আমার চাকুরি। চাকুরি? হাঁ, চাকুরি বই কি! তবুও চাকুরি সম্বন্ধে আমার বরাবর যে ধারণা ছিল যে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মনিবের মতলব মত, নাকে দড়ি দেওয়া খাটুনির নাম চাকুরি এবং

তাই দেশে খাটিয়া খাটিয়া কখনও কখনও বিরক্ত হইয়া যে বলিতাম, 'ভাল চাকুরি হয়েছে, আমার?'—এখানে চাকুরির উপর আমার সে ধারণা উল্টাইয়া গিয়া একটা শ্রদ্ধাই জন্মিয়াছিল।

যাহা হউক, দাদা বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অনেকদিন কাটিয়া গেল। আমি মন দিয়া অনেক প্রকার শিল্পবিদ্যা অভ্যাস করিলাম। কিন্তু, তখনও আমার লেখাপড়া শেখা হইল না। তবুও শিক্ষিতা মেয়েদের চালচলনে আমি নিজেকে এমনই অভ্যস্ত করিয়া লইয়াছিলাম যে আমায় দেখিয়া সহজে কেহই বুঝিতে পারিত না যে আমিই সেই পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা মেয়ে সুধাহাসিনী নিজেকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়া পরিচয় দিতেও আমি লজ্জাবোধ করিতাম। মাঝে মাঝে আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হইত। সকলেই সহানুভূতি করিয়া বলিত, 'পাড়াগাঁয়ে অমন হয়,—এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে সেরে যাবে।'—আমি আপ্যায়িত হইয়া যাইতাম। কিন্তু, আজকাল আমার জ্বর হইলে যদি কেহ তাহাকে ম্যালেরিয়া বলিত, তাহা হইলে রাগে ও লজ্জায় আমি খুন হইয়া যাইতাম,—কিছুতেই ম্যালেরিয়া বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতাম না।

গিরীন্‌দা' বরাবরই আমার পক্ষপাতি ছিলেন এবং আমার সকল আচরণই প্রশংসার চক্ষে দেখিতেন, 'সুধা ঠিক কল্‌কেতার শিক্ষিতা মেয়েদের মতন হয়েছে।' তাঁহার এরূপ প্রশংসাবাদে আমি আহ্লাদ ও গর্ব্বে ফাটিয়া যাইতাম। কিন্তু, ইদানিং একদিন তিনি ঐরূপ সুখ্যাতি করিলে সহসা আমার প্রাণে কষ্ট হইল। 'ঠিক কল্‌কেতার শিক্ষিতা মেয়েদের মতন।'—কথাটায় যে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় যে, 'ঠিক তাহাই নহে'! এতকালের প্রশংসাবাদটা আজ হঠাৎ অপবাদ মনে করিয়া গৌরবের পরিবর্ত্তে দারুণ লজ্জাবোধ করিলাম।

সেইদিনই এক সময়ে গিরীন্‌দা'কে বলিলাম, 'গিরীন্‌-দা, আমায় যে লেখাপড়া শেখাবেন ব'লেছিলেন, তা'র কি ক'র্‌লেন?'

গিরীন্‌-দা' একটু বিস্মিত ভাবে আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, 'কই, তুমি ত' এতদিনের মধ্যে একবারও আমায় ওকথা মনে ক'রে দাওনি!—আজ হঠাৎ যে তোমার ও ইচ্ছা হ'ল!'

আমি বলিলাম, 'লেখাপড়া না শিখলে আমার উন্নতি হবে কিসে?—আপনি যে বলেছিলেন, লেখাপড়া শিখলে বেশ ভাল চাকরি হ'তে পারে!"

গিরীন্‌-দা' একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা তোমায় এইবার লেখাপড়া শেখাবো।"

তাঁহার হাসির অর্থটা ঠিক বুঝিলাম না। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'এত উন্নতিতেও তোমার হচ্চে না! কিম্বা হয়ত মমে মনে বলিয়াছিলেন, 'তোমার আবার লেখাপড়া!'

যাহাই কেন ভাবুন না তিনি, আমি ছাড়িব কেন? দেশে আমার নিন্দা রটিয়াছে, রটুক,—আমি তাহা সার্থক করিয়া না লইব কেন? আমি আমার উন্নতির পথ ছাড়িব কেন? যে উন্নতির প্রথম সোপানে উঠিতেই গিরীন্‌-দা' আমায় 'তুই' ছাড়িয়া 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে উন্নতির চরমটা দেখিতে ছাড়িব কেন? ঘনিষ্ঠতায় 'তুমি', 'তুই' হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু যাহাতে 'তুই' 'তুমি' হইয়া দাঁড়ায়, তাহা ত' ঘনিষ্ঠতা নয়,—তাহা নিশ্চয়ই আমার উন্নতির সম্ভ্রম!

খুব উৎসাহের সহিত গিরীন্‌-দা'র কাছে লেখাপড়া শিখিতে লাগিলাম। অল্পকাল মধ্যে শিখিলামও অনেক। গিরীন্‌-দা' আশা দিলেন যে, কিছুকাল এইরূপে শিক্ষা করিলেই, শীঘ্রই একটা মেয়ে স্কুলে মাষ্টারি করিবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিব।

কিন্তু, অল্পদিনেই যখন লক্ষ্য করিলাম যে গিরীন্‌-দা' আমাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার কাছে পড়ার আর তেমন সুবিধা হইতে লাগিল না।

গোড়ায় গোড়ায় গিরীন্‌-দা'কে যেরূপ ভয় ও ভক্তি করিতাম, ইদানিং তাহা খুব কমিয়া গেল। ভুলিয়া দুই একবার তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া ফেলিতেও লাগিলাম। আগে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া পড়া জানিয়া লইতে পারিতাম না। এখন পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া পড়া বুঝিতে বুঝিতে প্রায়ই কখন বাজে কথা আসিয়া পড়ে, পড়া থামিয়া যায়, হয়ত সব কথাই থামিয়া যায়, শুধু মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া কতক্ষণ যেন একটা ঘোরে কাটিয়া যায়;—তারপর হঠাৎ এক সময় কিসের লজ্জায় সজাগ

হইয়া দু'জনেরই মাথা নিচু হইয়া পড়ে,—তখনকার মত পড়া বন্ধ করিয়া দু'জনেই পলাইয়া বাঁচি।

অল্পদিনের মধ্যেই জ্যেঠাইমা' বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমার জন্য একটা মেয়ে স্কুল শিক্ষয়িত্রীর কাজ যোগাড় করিলেন। পূর্ব্বে অনেকবার তাঁহারই কাছে শুনিয়াছিলাম যে বোর্ডিংয়ে থাকিয়া 'গুরু-মা'-গিরি করা তিনি পছন্দ করেন না। অথচ ঠিক এইরূপ একটা চাকুরিতেই তিনি জোর করিয়া আমায় ঢুকাইলেন।

বেতন যদিও আমার আশাতীত বেশী ছিল, এবং এইরূপ চাকুরির আশাই আমি করিতাম,—তবুও জ্যেঠাই-মা'র বাড়ী ছাড়িয়া সেখানে গিয়া থাকিতে আমার এখন আর আদৌ উৎসাহ ছিল না।

গিরীন্-দা'র সঙ্গেই গিয়া কাজে ভর্ত্তি হইলাম। সেখানে কেহ কেহ গিরীন্-দা'র কাছে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমাদের দেশের একটী বিধবা মেয়ে—আমাদের আশ্রিতা!'

পরিচয়ের বহর শুনিয়া গিরীন্-দা'র উপর আমার ভারি রাগ হইল। ছিঃ ছিঃ, এই কি আমার পরিচয়? গিরীন্-দা'র সঙ্গে এই কি আমার সম্বন্ধ? সেখানে কে আমায় চিনিয়া রাখিয়াছে?—গিরীন্-দা কি আর কিছু বলিতে পারিতেন না?

কিন্তু, কি পরিচয় দিলে ঠিক হইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবুও আজও আমার মনে হয় যে তিনি আমায় খাটো করিয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হউক চাকুরিতে ঢুকিয়া আমার এত টাকা রোজগার হইতে লাগিল যে দেশে তাহা হইলে অমন পাঁচটা দাদার সংসার একলা চালাইতে পারিতাম। খবর পাইয়া দাদার খুব আনন্দ হইল। তিন চারি মাস আমি দশ বারো টাকা করিয়া দাদাকে পাঠাইলাম। পত্র লিখিলাম যে নূতন স্থানে সমস্ত নূতন করিয়া কিনিয়া গোছ বিলি করিতে হইতেছে বলিয়া উপস্থিত বেশী পাঠাইতে পারিলাম না, শীঘ্রই আরও বেশী পাঠাইতে পারিব।

কিন্তু, ক্রমশঃ আমার নিজেরই খরচ এত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে আমি প্রায় আর কিছুই পাঠাইয়া উঠিতে পারিলাম না।

নিজের জন্য নূতন নূতন পোষাক পরিচ্ছদ কিনিতে সভ্য ফ্যাসানের বিছানাপত্র করাইতে, ও দাদার ছেলে-পিলেদের জন্য গোটাকয়েক জামা কিনিতে, আমার যাহা দেনা হইয়া গেল, তাহাই শোধ করিতে আর ছয় মাসের মধ্যে দাদাকে কিছুই পাঠাইতে পারিলাম না।

তার পর হইতে যখন কোনও মাসে হয়ত দুই টাকা কোনও মাসে হয়ত পাঁচ টাকা হাতে থাকিত, তখন ভাবিতাম, 'এই সামান্য টাকা কেমন করিয়া দাদাকে পাঠাই? ফিরে মাসে হাতে আর কিছু হইলে একেবারে পাঠাইব।' কিন্তু, আর কিছু হাতে হওয়া দূরে থাকুক, হয়ত এমন একটা খরচ পড়িয়া যাইত যে উপরন্তু আরও কিছু দেনা দাঁড়াইয়া যাইত।

যখন দেশে ছিলাম তখন আমার নিজের জন্য কিইবা খরচ ছিল? যখন জ্যেঠাইমার কাছে ছিলাম, তখন আমার সমস্ত খরচ তিনিই চালাইতেছিলেন। উপরন্তু, দাদার জন্য মাসিক চার টাকা তিনি নিজেই পাঠাইয়া দিতেন,—আমার হাতেও তাহা আসিত না। কিন্তু এখানে আমার খরচ অনেক। আমার পদের মর্য্যাদা ত' আমায় রাখিয়া চলিতে হইবে!—কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে, কত লোকের সঙ্গে আমায় আলাপ রাখিতে হয়,—কত জায়গায় আমায় যাইতে হয়!

সকল রকমেই আমার বিস্তর খরচ।—দাদাকে পাঠাইবার মত আমার কিছুই থাকে না। একটা চাঁদার খাতায় আমি পাঁচ টাকার কম সই করি না—আমি নিজের দাদাকে পাঁচ-সাত টাকা পাঠাই কেমন করিয়া? আমার মনে হইত, এই সামান্য টাকায় দাদার কি বা উপকার হইবে এবং তিনি ইহা পাইয়া মনেই বা করিবেন কি? যখন দাদার ছেলেদের জামা পাঠাইয়াছিলাম, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, ছেলেরা ত' জামা কখনও পরেই না। অনর্থক এত টাকা নষ্ট করিয়া এত ভাল ভাল জামা পাঠাইয়াছ কেন? আমি তাঁহার পত্র পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম, পাড়াগাঁয়ে থাকিলে মানুষের অমন বুদ্ধি-শুদ্ধিই হয় বটে! ইহাকে কি টাকা নষ্ট করা বলে? জামা না পরিলে কি ছেলেপিলেদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে? আর ও-জামার চেয়ে আরও কিরূপ জামা ভদ্রলোকের ছেলেরা পরিতে পারে? এবং পরিলেই বা আমি এখানে লোকের সামনে তাহা পাঠাই কেমন করিয়া?—এই যে এখানে আমি কত

ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরি, তবুও যে কত লোকে তাহার কত দোষ ধরে।

যাহা হউক, সেই অবধি দাদার ছেলেদের আর জামা কাপড়ও পাঠাইতে পারি নাই। পূজার সময় কিছু দিবার জন্য ঝুঁকিয়াছিলাম; কিন্তু টাকায় কুলাইতে পারিলাম না। স্থকুকে একটা সাঁচ্চা জরির জামা উপহার দিতেই আমার এত বেশী খরচ হইয়া গেল যে, আমার হাতে অতি সামান্য টাকাই রহিল। যে টাকা ছিল, তাহাতে একটু সামান্য রকম পোষাক কিনিয়া ছেলেদের দেওয়া চলিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ পোষাক আমার সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহ পছন্দ করিলেন না, আমারও পাঠাইতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। স্থকুর জামাটা পূজার মধ্যে না দিলে খারাপ দেখায়, কিন্তু ঘরের ছেলেদের দু'দিন পরে দেওয়া চলে। এই ভাবিয়া আগে বাহিরের মান বজায় রখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আর ঘরের ছেলেদের কিছুতেই দিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আজও মনে আছে যে বাড়ীতে থাকিতে দ্বাদশীর দিন দু'খানা বাতাসা খাইয়া জল খাইবার সময় যদি একটী ভাইপো কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ত' তাহার হাতে একখানা দিয়া নিজে একখানা খাইয়াছি। কিন্তু এখন কলিকাতায় আসিয়া মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইয়াও কদাচিৎ দু'টাকার খাবারও তাহাদের পাঠাইতে পারি না। এখন মান রক্ষার জন্য যতটা ব্যস্ত হইয়াছি তখন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যও তাহার সিকি পরিমাণ ব্যস্ত ছিলাম না। লোকে আমাকে কত দরের মনে করে তাহা ঠিক মত খতাইতে না পারিয়া আমি নিজের দরটা এত বেশী করিয়া ধরিয়া আনিয়াছি যাহার কল্পিত সম্ভ্রম বজায় রাখিতে গিয়া আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছি। আমার রোজগারের হাত যত শীঘ্র যে পরিমাণে বাড়িয়াছে,—খরচের হাত তাহা অপেক্ষা অনেক দ্রুত, অনেক বেশী পরিমাণে বাড়িয়াছে। গরীব ভাইপোদের কথা মনে ছিল না। যদি তাহারা নিজের গর্ভজাত সন্তান হইত তাহা হইলে কখনই এমনটা হইত না।

যাহা হউক, এখন বৃথা আক্ষেপে ফল নাই। এখন আমার কাহিনীটাই বলি। যখন বোর্ডিংয়ে আসিয়া থাকিলাম, তখন আশা করিয়াছিলাম গিরীন্-দা' মাঝে মাঝে আমায় দেখিতে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু অনেকদিন কাটিয়া গেলেও তিনি বা তাঁহাদের বাড়ীর কেহই আমার কোনও খোঁজও লইলেন না। আমায় ভর্ত্তি করিয়া দিবার সময় গিরীন্-দা আমার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনের মধ্যে অনেকটা অভিমান থাকায় আমিও তাঁহাদের কোনও খোঁজ লই নাই। শেষে নিজেই জ্যেঠাইমাকে একখানি পত্র লিখিয়া অনেক খোঁজ জানাইয়া গিরীন্-দাকে একবার পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম।

অনেক পরে পত্রের উত্তর আসিল যে বোর্ডিংয়ে আমাকে দেখিতে আসা তিনি নিন্দনীয় মনে করেন বলিয়া গিরীন্-দা'কে পাঠাইতে পারেন না, বরং আমি যেন তাঁহাদের বাড়ী গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করি।

এই উত্তরের মর্ম্ম আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কাহার পক্ষে নিন্দনীয়? আমার পক্ষে না, গিরীন্-দার পক্ষে? কেনই বা নিন্দনীয়? এমন অনেক ত' অনেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে!

নিজে যাওয়াই সাব্যস্ত করিলাম। আমাদের পরস্পরের অবস্থার পার্থক্যই গিরীন্-দা'র এখানে আসিবার আপত্তির কারণ মনে করিয়া, আমি খুব জাঁকালো রকমের সাজ-সজ্জা করিয়া বেড়াইতে গেলাম যে আমার অবস্থা এখন আর হীন নহে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া প্রথমেই গিরীন্-দা'র সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিজের সাজ-সজ্জার জন্য একটু লজ্জা বোধ হওয়ায় একটু হাসিয়া ফেলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেই তিনি গম্ভীরভাবে দুই একটা জবাব করিয়াই, কি কাজের জন্য, (তাচ্ছিল্য করিয়া কি না জানি না) বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমার পূর্ব্ব পরিচিত একটা সঙ্গী আমায় দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া সরিয়া গেল। আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গেলাম। জ্যেঠাইমাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি শুধু 'কিরে সুধা, ভাল আছিস ত?' এই কথাটুকু জিজ্ঞাসা করিয়া পার্শ্বের ঘরে ঢুকিয়া যাইতেই সেই দাসীটা কোথা হইতে আসিয়া আমার গায়ের উপর ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আমার জামা-কাপড়গুলিতে হাত দিয়া দেখিতে দেখিতে, আমার ব্রোচটা হাতে করিয়া ধরিয়া বলিল, "হ্যাগা, এটা বুঝি গিল্টি করা?"

আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। ব্রোচটা প্রকৃতই রোল্ড-গোল্ডের ছিল। যদিও দাসীটার উপর আগে হইতেই যথেষ্ট রাগ হইয়াছিল এবং তাহার কথার উত্তর দিতেই ইচ্ছা হইতেছিল না, তবুও লাজ-লজ্জা চাপা দিবার জন্য প্রকৃত কথাই স্বীকার করিয়া ফেলিলাম। ফিরিয়া আসিয়াই এমন একটা ব্রোচ্ গড়াইতে দিলাম যে সুকুমারীরও তেমন একটীও নাই। এই ব্রোচ্ গড়াইতে আমার যে টাকা দেনা হইল তাহা শোধ করিতে প্রায় এক বৎসর আমার খোরাকে টান পড়িল।

এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে গিরীন্-দা'র বাড়ীতে যাই। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা আজও আমাকে আমার অবস্থার এত উন্নতিসত্বেও সেইরূপ হীন মনে করেন। আমিও সাধ্যমত তাঁহাদের দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম যে এখন আমি আর সেরূপ হীন নাই। কিন্তু, ফলে আমারই খরচ বাড়িয়া যাইতে লাগিল, আর কিছুই হইল না।

এমন সময়ে গিরীন্-দা'র বিবাহ উপস্থিত হইল। আমার নিমন্ত্রণ হইল। আমি আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে এই বিবাহে এমন সব উপহার দিব যে নিমন্ত্রিত সকলের মধ্যে আমার বেশ একটু বিশেষত্ব দাঁড়াইবে।

সেই মত আয়োজন করিয়া খুব জাঁকজমকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। পূর্ব্বোক্ত সেই দাসীটা আমায় গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া গেল। আমার উপরহারগুলি সেই দাসীটাই অতি সামান্য জিনিসের মত ঘরের কোণে লইয়া গিয়া রাখিল। কেহই উৎসুক হইয়া তাহা দেখিতে আসিল না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, আমি স্বহস্তে সর্ব্বসমক্ষে সেগুলি সভার মাঝখানে ধরিয়া দিব; কিন্তু দসৌটা যেন সেগুলি আমার হাত হইতে একপ্রকার কাড়িয়াই লইয়া গেল,—আমিও লজ্জায় আর তাহা কাড়াকাড়ি করিতে পারিলাম না।

বাড়ীর একজন নিকট আত্মীয়া জিনিসগুলি তুলিতে আসিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া, নিকটস্থা সুকুমারীকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই, পার্শ্বস্থিতা সেই দাসীটা তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "সেই যে, পিসীমা, তিনি দিদি-মণির কাছে আগে ছেলে, এখন স্কুলে চাক্‌রি করে।—" তারপর তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া আমার নূতন ব্রোচটায় হাত দিয়া বলিল, 'হ্যাগা, এইটা বুঝি দিদিমণির দেখাদেখি এবার গড়িয়েছে?"

আমি মাথা তুলিতে পারিলাম না। সুকু দাসীটাকে ধমক দিয়া বলিল, 'তুই নিজের কাজে যা।'

সেই অবধি আর গিরীন্-দা'র বাড়ীতে যাই নাই। গিরীন্দা'র বাড়ীতে থাকিতেই তাঁহার অনেক বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই মাঝে মাঝে বোর্ডিংয়ে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বিজলী-দা'র সঙ্গে ইদানিং আমার খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। আমার মনে হইত যে, তিনি আমায় খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। গিরীন্-দা'র সম্পর্কে পদে পদে অপমান লাভ করিয়া তাঁহার উপর হইতে আমার মন সরিয়া আসিয়া বিজলী-দা'র কাছে তাঁহার শ্রদ্ধার মূল্যে বিক্রিত হইতে চাহিল। বিজলী-দা'কে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও আমি কুণ্ঠিত হইলাম না। আমি স্বেচ্ছায় আমার রোজগারের অনেক পয়সা তাঁহার জন্য ব্যয় করিতে লাগিলাম। তিনিও সদাসর্ব্বদা আসিয়া আমার সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিলেন।

ক্রমে আমার অবৈধ আলাপনের সংবাদ স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের কাণে উঠিল। আমার কৈফিয়ৎ তলব হইতেই আমি বিজলী-দা'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্বন্ধের দোহাই দিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যখন তাহা সমর্থন করিবার জন্য বিজলী-দা'কে হাজির করিয়া দিবার হুকুম হইল, তখন আর কিছুতেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন; তাই ভিতরে ভিতরে খবরটা পাইয়াই, হিন্দু ললনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করিবার ভয়ে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

অসচ্চরিত্রের অপবাদে আমার চাকুরি গেল। চরিত্র সম্বন্ধে আমি যে খুব সাঁচ্চা ছিলাম, এমন কথা যদিও শপথ করিয়া বলিতে পারি না, তবুও আমার সহযোগিনী অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদিগের চরিত্র যে আমার চেয়েও অনেক বেশী কলুষিত ছিল,—তাহা আমিও জানিতাম, কর্ত্তৃপক্ষও জানিতেন। কিন্তু, সে অপরাধে তাঁহাদের চাকুরি না যাইবার কারণ এই ছিল যে, বাহিরে তাঁহাদের কোনওরূপ ধরা-ছোঁয়ার উপায় ছিল না।—যাঁহাদের সহিত তাঁহারা

আলাপ করিতেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা না একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করিয়া লইতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

আমি হিন্দু ঘরের দরিদ্রা বিধবা,—নিজে যাহা নহি তাহা সাজিয়া, যাহাদের আমি কেহই নহি, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া,—ভাবিয়াছিলাম যে আমিও তাহাদের একজন হইয়াছি, ভাবিয়াছিলাম তাহারাও আমার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! আমার ভুল এতই শক্ত ছিল যে গিরীন্-দা'-দিগের আচরণ চক্ষের উপর দেখিয়াও তাহা ভাঙ্গিল না। বারে বারে একই ভুল করিলাম। আমার দাদা আমার ব্যবহারে আমার উপর চটিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহার স্নেহ ফিরিয়া পাইতে কিন্তু আমি কোনও চেষ্টাই করিলাম না।

আজ দশ বৎসর কলিকাতায় আসিয়া আছি। ইহার মধ্যে আমার জাতি গিয়াছে, কলঙ্ক রটিয়াছে, নিজের সমাজে আমার স্থান গিয়াছে, যাহাদের সঙ্গে মিশিতে এত চেষ্টা করিয়াছি, তাহাদের সমাজে আমার জন্য শুধু উপহাস ও ঘৃণা মাত্র আছে, আমার আপনার যাহারা তাহারা আমায় ত্যাগ করিয়াছে। বনের পশুর মত মানুষ কি সমাজ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারে? সমাজে ঢুকিয়া আমার কোনও ক্রিয়া-কলাপ করিবার আবশ্যক নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও, সমাজের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। এখনও সেই সমাজে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পাইবার জন্য আমার প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। সেই সব প্রতিবেশী, যাহারা আমার মত সামান্য প্রাণীরও নিত্য খবর রাখিত,—আমার নিজের ঘরে আমার সেই সব আপনার জন, যাহারা আমার তুচ্ছ জীবনের মায়ায় আমার সামান্য একটু পীড়া হইলেও মুখের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া থাকিত,—সেই তাহাদের স্নেহ যত্ন রচিত নীড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।

স্বাধীন জীবিকা আমি এখানে অর্জ্জন করিতেছি, সেখানেও করিতাম। এখন চাকুরি যাওয়ায় শিল্পকলা ফলাইয়া খাইতেছি, পরিতেছি; সেখানেও চরকা ঘুরাইয়া খাইতাম পরিতাম।—তবে পার্থক্য এই যে, নিজের খরচপত্র এত বাড়াইয়া ফেলিয়াছি যে আগেকার চেয়ে এত বেশী টাকা রোজগার করিয়াও আমার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, দেনা হয়। গিরীন্-দা'র বিবাহে অনর্থক চাল দেখাইয়া নিজের সম্ভ্রম বাড়াইতে গিয়া যে দেনা করিয়াছি, আজও তাহা শোধ হয় নাই। অথচ সেখানে আমার পরিচয়, সেই 'পুরাতন দাসী' ছাড়া আর কিছুই বাড়িল না।

দেশে সামান্য রোজগার করিয়াও নিজের অভাব ত' দূর হইতই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের জন্যও কিছু খরচ করিতে পারিতেছিলাম। তাহাতে আমার এত তৃপ্তি ছিল যে, কখনও নিজের জন্য অভাব বোধ করিতাম না। যাহাদের জন্য অভাব বোধ করিতাম, এবং যে অভাব দূর করিবার আশায় নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম—তাহাদের সে অভাব ঘুচাইতে পারা ত' দূরের কথা, সে চিন্তা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম, বরং নিজের জন্য নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া বসিলাম।

সম্প্রতি একদিন আমার একজন শিক্ষিত বন্ধুর সঙ্গে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছিলাম। তিনি আমায় বুঝাইলেন যে, মানুষ নিত্য নূতন অভাব অনুভব না করিলে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে না। সামান্য পাইয়া যথেষ্ট পাইয়াছি মনে করিয়া তৃপ্ত থাকাও ঘোর অজ্ঞানতার পরিচায়ক। শিশু যে এক পয়সা দামের একটা পুতুল পাইলে একশত টাকা দামের একটা নোটকে সামান্য কাগজ মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়,—তাহাও ঐ নোটের মূল্য সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতার কারণে।

আজ কিন্তু, আমি সেই অজ্ঞতাকেই বরণ করিয়া লইয়া পরিতৃপ্তি লাভের কামনা করিতেছি। আজ আমার এমন বন্ধু কে আছে যে আমার কাগজের দামি নোটখানা কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আমার সেই সস্তার ভালবাসার পুতুল ফিরাইয়া দিবে?

অনেকদিন পূর্ব্বে আমার সমাজের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখ করিয়াছিলাম বলিয়া আমার নব্যতন্ত্রের সেই বন্ধুটী আমায় বলিয়াছিলেন, 'আপনার সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত' শুধু ঘাড়ে করিয়া গঙ্গায় দিবার জন্য!—তা' মরিয়া গেলে যে যেমন করিয়া যেখানে ইচ্ছা ফেলিয়া দিউক না কেন, তাহাতে কি আসে যায়?'

তখন বুঝিয়া দেখিয়াছিলাম যে, কথাটা কতকটা ঠিক বটে! কিন্তু, আজ আমার মনে পড়ে যে, যখন আমারই মত কাহারও মৃতদেহ আমাদের গ্রামের প্রান্তস্থিত শ্মশানে আসিত, এবং পথের যত লোক বলিতে বলিতে যাইত,

'আহা, অমুকের বিধবা বোনটীকে ঘাটে এনেছে!'—তখন আমিও মনে মনে বলিতাম, 'আহা, আমায় কবে অমন করে ঘাটে নিয়ে যাবে?'

আমার একান্ত আশাহীন জীবনেও 'অমন' করিয়া ঘাটে যাওয়ার আশা আমি মনে মনে পোষণ করিতাম। অথচ সে 'অমন', যে কেমন, তাহা ভাবিয়া বুঝিয়া সে আশা করিতাম না। যদিও তেমন মৃত্যুতে কোনও ঘটা ছিল না, তবুও আজ বুঝিতেছি যে, সে তেমনি করিয়া, তাহাদের রাখিয়া, তাহাদের কাঁধে চড়িয়া ঘাটে যাওয়া, যাহারা আমাকে চেনে, আমার খবর রাখে, আমার মৃত্যুতেও একবার 'আহা' বলে, আমার তুচ্ছ মৃতদেহটা কাঁধে করিয়া গঙ্গায় দেওয়া পুণ্য কাজ মনে করে।

তেমন করিয়া ঘাটে যাওয়ার আশায় বঞ্চিত হইয়া, আমার প্রাণে মরণের জন্য আর সে উৎসাহ নাই। আজ যদি আমি সোণা দিয়া পেট ভরাই, রত্নখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করি, তবুও আমার মরণে আর তেমন জিনিস কখনও ঘটিতে পারে না। যুক্তি দিয়া মনকে যতই বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, মরণের পর আর কিছুরই সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তবুও মন তাহা বুঝে না। যে পাশ্চাত্য দেশের আলোক পাইয়া আজ এরূপ যুক্তি মনে আনিতে সক্ষম হইতেছি, পুস্তক পড়িয়া বুঝিতেছি যে সে দেশের লোকেরাও মনের মত মরণ মাগিয়া মরে।

পথহারা

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল

তরুণী কিশোরী, তোমার জীবন যে-জন ভরেছে লাজে,
ছিঁড়িয়া লতিকা, দলি পদতলে, ফেলে গেছে পথমাঝে,
সরল হৃদয়ে তুমি তারে হায়! বেসেছিলে বড় ভালো,
ভেবেছিলে তুমি, হবে বুঝি সেই, তোমার নয়ন আলো!
অবোধ বালিকা, কেন করেছিলে, এত বড় মহাভুল,
কেন দিয়েছিলে' তনুমন তব, নাহি যার সমতুল?
দস্যু-অধম, ঘৃণিত সেজন, তোমারে ভুলাল হায়!
লোকালয়ে তবু, আছে তার ঠাঁই, সমাজ ঠেলেনা তায়;
জগতের চোখে, দোষ নাহি তার, দোষ শুধু অবলার,
কঠোর বচনে, তোমারে শাসায়, করি গুরু অবিচার!
অনাবিল প্রেমে, তোমার জীবন, দিল নাত' কেহ ভরি,
এসেছিল যারা, লয়ে গেল শুধু, মধুটুকু সব হরি'!
সোনার স্বপন, এল নাক আর, তোমার জীবন মাঝে,
উষা না উদিতে, ঘেরিল তোমায়, আলোক বিহীন সাঁঝে!
যদিও হেথায়, অবহেলা শুধু, তোমার পাথেয় সার,
তোমার গলায়, পাতকীর হরি, দুলাবে কুসুম হার!
একদিন আসি, মৃদু মধু হাসি, দিবেই সে তোরে দেখা,
তাঁহার মধুর, কোমল পরশ, হরিবে কালিমা লেখা!

নিকষ পাথর

ভারতবর্ষ—বৈশাখ—১৩৩৮

শরৎবাবুর "শেষ প্রশ্ন" এবার শেষ হইল, বাকী কেবল "বিপত্তি"। কিন্তু ইহার শেষ কোথাও সহসা দেখা যায় না; একবার ঘটিলেই মুস্কিল।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে মাত্র দু'টি। প্রথম গল্প শ্রীপ্রণব রায়ের "মর্ম্মর"। এক আঠাশ বছরের বিগত যৌবনা নারীর চরিত্র বর্ণনা—কারুণ্য ও শ্লেষ ইহাতে পরিস্ফুট। তবে রচনাটিকে গল্প না বলিয়া চিত্র বলিলে ঠিক মানায়। আর বিদেশী গল্পের একটু তীব্র গন্ধ ছাড়িলেও গল্পটি বেশ হইয়াছে! কিন্তু যে সংসারে ভাত কাপড়ের দুঃখটা তেমন নাই ও যে নারীর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা মাত্র তিনটিতে কায়েমী থাকে মাত্র বারো বৎসরে তার দেহের সকল সৌন্দর্য্য ও শ্রী এবং মনের সবটুকু রস যে নিঃশেষিত হইয়া মাত্র রিক্ত, রুক্ষ, কঠিন পাত্রটিকে রাখিয়া যায়, এ কথা অনভিজ্ঞতা দিয়া বলা গেলেও, অভিজ্ঞতায় অন্যরূপ দাঁড়াইবে। নারী যখন আপনাকে বৃদ্ধা ভাবে, তখনই তার নারীত্বের মৃত্যু। আর এই কথাটা সে সহজে স্বীকার করিতে চাহে না। আয়ুষ্মতী বৃদ্ধার সযত্ন প্রসাধনই তার সাক্ষ্য।

গল্পটি কলিকাতারই চলিত ভাষায় লিখিত এবং কয়েকটি ক্রীয়ার বানানে এমন খাস "কোলকাতাই" রূপ আছে যে সোণা মুগ আর মটর দালের মিশ্রণের মত অদ্ভুৎ দেখায়। যেমন "গ্যালো, গ্যাচে, ত্মাখে" ইত্যাদি। উচ্চারণই যদি এগুলির আগুক্ষরের য ফলার বেণী ও আকারের ষষ্ঠী ধারণের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে "বল্লে", "চল্ল", "করব" প্রভৃতি ওকার চক্রে বন্দী না হইয়া উচ্চারণের আশায় ভূমিসাৎ হইয়া থাকিবে কেন? এবং "ছিল", "করছিল",—প্রভৃতি "ছেল", "কোরছেল" হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "বড়বাবুর বিপত্তি।" একটী অর্থলোলুপ পুরুষের চরিত্র কথা। ইহারও মনের সবটুকু রস খামোখা উড়িয়া যায়, যার ফলে তাঁর তরুণী স্ত্রী সোহাগরসাভাবে শুষ্ক, শীর্ণ ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠে। পরিশেষে ভদ্রলোকটীর শ্যালক-পত্নী বি-এ পাশ স্ত্রী এণার বাক্-চাতুর্য্যে মুগ্ধা হইয়া গৃহিণী তার কথামত কায করে. এবং গঙ্গার ঘাট হইতে ঘরে ফিরিয়া স্বামীকে তার হাতের নূতন সোণার চুড়ী ও গলার হার দেখাইয়া বুঝাইয়া দেয় যে "পয়সাকে একমাত্র ধ্যানের বস্তু না করে আমার পানে একটু চেয়ো গো...মন আমার সত্যি আজও মরে যায় নি!"

ইহার উত্তরে "বড়বাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়াটা টানিয়া তাহাতে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।" এই নিশ্বাসটা "বিরক্তি", "দুঃখ" কি "তৃপ্তির" সে কথা রসগ্রাহী পাঠক অনুমান করিবেন। গল্পটী উপেক্ষিতা তরুণী ভার্য্যার অর্থলোলুপ কৃপণ স্বামীগণের অবশ্য পাঠ্য। রচনাটিতে নূতনত্ব কিছুই নাই; "সৌরীন্ বাবুর" হাত হইতে না বাহির হইলেই ভাল হইত। ইহার মধ্যে তাঁর লিপিকুশলতা ও সহজসিদ্ধ রস খুঁজিলে তবে মেলে; পাঠককে তা আপনা হইতেই অভিসিঞ্চিত ও তৃপ্ত করে না।

বড়বাবুর গৃহিণীর মুখে দু'একটা পরিষ্কার ইংরাজী শব্দ ও চমৎকার বাংলা শোনা যায়। কিন্তু শ্রীমতী এণার বিদ্যার দৌড় দেখাইয়া গৃহিণীর সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই যাতে বোঝা যায় তার মুখের এই শব্দগুলির পিছনে আছে আধুনিক ইংরাজী বিদ্যায়তনের শিক্ষা।

মনে হয় সৌরীনবাবু গল্পটি মন দিয়া লেখেন নাই।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়ের "গায়ত্রী"। ব্রহ্মার মুখখানি

অবশ্য চৈনীক; দক্ষিণ পদের পল্লবখানি চীনা নারীরই মত এবং বাহনটিও কুক্কুট, শ্যেন ও হংসের সংমিশ্রণ। তবে ছবিখানিতে ভাবের দ্যোতনা আছে।

দ্বিতীয় ছবি তারাস্বামী আসারীর "শিবদুর্গা"। (পর্ব্বতগাত্রে) মন্দ লাগে নাই।

তৃতীয় ছবি শ্রীচিত্রসেন বড়ুয়ার "ভজন।" শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে এক বৈরাগিণী ভজন গাহিতেছেন। তাঁর বাম হাতে তানপুরা, দক্ষিণ হাতে খঞ্জনী। হাত ছুটির গতি আছে, কিন্তু ভজন তো কেবল বাজাইলেই গাওয়া হয় না, কণ্ঠস্বরও নিঃসৃত হওয়া চাই। ছবিতে বৈরাগিণীর অধর ছুখানি অবশ্য পরস্পর সংলগ্ন দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে হয়, তানের ফাঁকে গায়িকা একটু দম লইতেছেন। ছবিখানি ভাল লাগিল না।

প্রবাসী—বৈশাখ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে; সেগুলির মধ্যে প্রমথবাবুর "পাঠান-বৈষ্ণব রাজপুত্র বিজুলী খাঁ" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের "আমাদের দেশে প্রথম সংবাদপত্র" পাঠে সংবাদপত্রের ক্রমোন্নতির সূত্র ও একটা নূতন কথা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার "সমাজ ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখিতেছি "কাশীপুর ইনষ্টিটিউটে পঠিত" লেখা আছে। কিন্তু লোক পরম্পরায় শোনা গেল, লেখক ইহা রবিবাসরের একটী অধিবেশনে বিশেষ করিয়া রবিবাসরের জন্য লিখিত বলিয়াই পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা ছাপার ভুল না শ্রোতাগণকে ঠকাইবার বক্তাগণের স্বভাবসিদ্ধ চালের একটা?

এ সংখ্যায় ছুইখানি উপন্যাস আছে। একখানি পূর্ব্বের সেই "অপরাজিত"; অন্তর্দ্ধানের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, অপরখানি শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের "পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা"—জাপানী গ্রন্থের অনুবাদ।

ছোট গল্পও আছে চারিটি। প্রথম গল্প শ্রীসীতাদেবীর "বিষে বিষক্ষয়।" স্ত্রীর প্রতি শাশুড়ী ও স্বামীর অত্যাচার কাহিনী।

স্বামী মাত্র আই-এ পাশ করিয়া "ছুশো" টাকা মাহিনার চাকরী করিতে করিতে যখন সর্ব্বগুণভূষিতা ম্যাট্রিক-ক্লাস-অবধি-পড়া সপ্তদশী তরুকে বিবাহ করিয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করে, তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। পুরুষজাতি স্বভাবতই আরাম প্রিয়। কাজেই স্বামী বিবাহের অব্যবহিত পরেই দস্তরমত স্ত্রীর প্রতি সোহাগ-ভালবাসা ঢালিয়া দিলেও তিন বৎসর যাইতে না যাইতে আত্ম-স্বভাব প্রকট করিতে থাকেন। স্ত্রীর মনেও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ছিল না—"সে খানিকটা নিরাশ হইল বটে, তবে মর্ম্মান্তিক বেদনা কিছু পাইল না। যেমনই হউক, ইহাকে লইয়াই তাহার চিরদিন ঘর করিতে হইবে, অতএব স্বামীকে ভালবাসিতে সে যথা সম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিল।" তার চেষ্টা বোধহয় তখনও চলিতেছিল, শেষ অবধি সে বোধহয় স্বামীকে ভালবাসিতও কিন্তু "তরুর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। সারাদিন কাজ আর শাশুড়ীর খোঁটা। * * * স্বামী যদি আগের মতই থাকিতেন, তাহা হইলে তরু কোনোমতে সহিয়া যাইত, তাহার জ্বালা জুড়াইবার একটা স্থান থাকিত। কিন্তু * * * এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, অর্থাৎ এই বিষের জ্বালা জুড়াইতে তরু আর এক বিষ পান করিল—সে গেল জেলে। প্রিজন্ ভ্যানে উঠিবার সময় সাহেব-ঘেঁষা অত্যাচারী স্বামীকে কহিল "স্বামিত্বের দাবী যত বড়ই হোক, পুলিসের দাবী তার চেয়েও বড়।" ইহাই গল্প।

কিন্তু জেলে যাওয়াটা স্বামীর ও শাশুড়ীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার একটা উপায়স্বরূপ না করিয়া সত্যই দেশের কাজকে উপলক্ষ্য করিলে তাহা সঙ্গত হইত নিশ্চয়। যাঁদের স্বামী ভালবাসে, শাশুড়ী স্নেহ করে, তাঁদের পক্ষে জেলে যাওয়া অবিবেচনার কাজ কি? ইহাই কঠিন এবং মহৎ। আর সেই কারণেই ভারতের নারীগণ আজ যে শ্রদ্ধা কুড়াইতেছেন, নিজেদের যথার্থ অধিকার ও আসন গ্রহণ করিতেছেন, তাহা আধুনিক কালের ইতিহাসে অভিনব। নতুবা ঐভাবে যা লাভ করা যায় তার পিছনে শ্রদ্ধা থাকে না, সম্মান থাকে না এবং আন্তরিকতার অভাবটাও হইয়া পড়ে প্রকাণ্ড। তবে আশা করা যায়, এই ক্ষুদ্র আদর্শটিকে সহসা কেহ গ্রহণ করিবেন না এবং এই রচনাটি শেষের দিকে এত তরল ও লঘু যে মনের উপর একটী আঁচড়ও ফেলিবে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীশান্তাদেবীর "মোটবাহী।" গল্পটি বড় করুণ। সমগ্র রচনাটির মাঝে একটী গভীর অনুভূতি

সুস্পষ্ট। শতপাকে বন্দিনী এক অসহায় নারীর গভীর অন্তর বেদনা এমন সংযত বাক্যে ও স্বাভাবিক রঙে ব্যক্ত হইয়াছে যে মনকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে। তারপর, একখানি চিত্র ইহাতে এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, যা নিপুণতায় উজ্জ্বল। নিশীথে চোর স্বামীর সহিত স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ—স্বামী স্ত্রীর পিতৃগৃহেই চুরি করিতে আসে—তার সহিত স্ত্রীর কথোপকথন এবং পরদিন সকলের কাছে পরপুরুষাসক্ত কুৎসায় স্ত্রীর অপমানিত হওয়া, একটী প্রকাণ্ড Tragedy! নারীর সহনশীলতার আশ্চর্য্য রূপ ইহাতে সুপরিস্ফুট।

তৃতীয় গল্প শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের "অজানা"। গল্পটিতে সুরু হইতে শেষ অবধি বেশ জমাট ভাব আছে; গতিও বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ ও বেগবতী। গল্পটি মনের উপর একটু ছাপ রাখিয়া যায়। সুন্দরী তরুণী "শেয়াস্তি দেবী" বা শান্তি দেবীকে কেন্দ্র করিয়া যে রস সৃষ্টি হইয়াছে, তা অতি উপাদেয়। কিন্তু গোয়ালার ছেলে বদ্‌রিকে সময় সময় মনে হয় যেন ঝুমঝুমিওয়ালার বেশে এক "নব্য কবি।" সে মানস-লোকের স্বপ্নময় পথে বিচরণকালে এই সুদূর পঞ্জাববাসিনী টাটানগর যাত্রিণীকে চকিতে চলিয়া যাইতে দেখে, তার রূপের সুষমা বদ্‌রির চোখে অঞ্জন-রেখা আঁকিয়া দেয়। তাই এই অজানা তরুণীকে সে "চিনি" বলে। কল্পনার এমন মোহন দীপ্তিতে কি সত্যই "গাঁওয়ার" তরুণের মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে? এইখানে সত্যদৃষ্টির অভাব ঘটিয়াছে।

চতুর্থ গল্প শ্রীমনোজ বসুর "বাঘ।" গল্পটি মন্দ নয়—ইহার সমপদী একটী গল্প আছে—ডডের Mistrie's of Cornie

এ সংখ্যায় রঙীন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীকনু দেশাইয়ের "রামচন্দ্র ও কাঠবেড়ালী।" কিন্তু কাঠবেড়ালীটা হইয়াছে খরগোসের মত। হয়ত গুজরাতের কাঠবেড়ালী এমনিই দেখিতে।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের "গালার কাজ।" গালার মিস্ত্রী তার সামান্য যন্ত্র-পাতি লইয়া খেলনা ও পুতুল গড়িতেছে।

তৃতীয় ছবি শ্রীইন্দুভূষণ রক্ষিতের "চাষীর ঘর।" একেবারে অন্দর মহল। কিন্তু ছবিখানিতে বেশ একটী শ্রী আছে। বাংলার নিরালা পল্লীকে মনে করাইয়া দেয়।

বসুমতী—চৈত্র—১৩৩৭

বসুমতীর পঞ্চ উপন্যাসের বিপুল যজ্ঞ যথারীতি চলিতেছে।

এ সংখ্যায় ছোট গল্পও আছে পাঁচটি। প্রথম গল্প শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর "ঝাঁপান খেলা।"

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "সত্য ও মিথ্যা।" গল্পটি বেশ; কিন্তু মাণিকবাবুর সবটুকু রচনা-বৈশিষ্ট্য ইহাতে নাই। মানুষ বাহিরের সত্যকে বজায় রাখিতে গিয়া অন্তরের সত্যকে ক্ষুণ্ণ করে ইহাই গল্পটির ভিত্তি।

তৃতীয় গল্প শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "সুখে-দুঃখে।" গল্পটি বড় চমৎকার কিন্তু মার্কিন গাল্পিক O' Henryর একটী গল্পের মাল-মশলা ও ছাপ ইহাতে এত বেশী যে পাদটীকায় তাঁরই রচনা বলিয়া স্বীকারোক্তি করিলে শোভন হইত। অবশ্য ইহাও হইতে পারে যে "Great minds think alike" কিন্তু O' Henryকে অন্ততঃ Great mind বলা চলে না। তা ছাড়া তিনি সৌরীন্ বাবুর এই গল্পটি লেখার বহু পূর্ব্বে গল্পটি রচনা করেন।

চতুর্থ গল্প শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "সহধর্ম্মিণী।" লেখক ইহাতে একটী বড় সত্য কথা বলিয়াছেন—"মিস্ রায় আপনাদের সমাজের একটা প্রধান দোষ দাঁড়িয়েছে এই যে, কোন একটা বিষয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করবার ক্ষমতা সকলের থাক্‌ছে না। প্রজাপতির মত একটা চঞ্চল অস্থিরতা তাঁদের মন ছেয়ে ফেলেছে।" সমাজের পক্ষে, জাতির পক্ষে ইহা যে বড় ভয়ের কথা।

গল্পের বিষয়টুকু নূতন না হইলেও বলিবার ভঙ্গিমায় মন্দ লাগে না।

পঞ্চম গল্প কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের "নবগ্রহ।" গল্পটিতে হাসি কান্না-শ্লেষ-রঙ্গের উপাদান যথেষ্ট আছে। কিন্তু রচনাটি এত দীর্ঘ যে সুরু হইতে শেষ অবধি পাঠে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। ফলে মনে যে ভাবটুকু টানিয়া আনে তা অবশ্য তৃপ্তি নয়। লেখনী সংযমে রচনা সুন্দর, উপাদেয় ও চিত্তগ্রাহী হইয়া উঠে।

ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে লেখকের অলসতা দেখা যায় এবং গল্পের সুরুতেই তার সূত্রপাত। রমেন কৃপণ পিতার পুত্র—সে পিতার "কড়া শাসন" ও "যথেষ্ট চেষ্টার"

বিদ্যায়তনের তৃতীয় শ্রেণীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না ; ফলে, তার লেখাপড়া এইখানেই শেষ হয়! "সে পিতৃ-বন্ধুর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিত যে, সে সৃষ্টি করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সৃষ্ট হইতে আসে নাই।" রমেনের এই উত্তর, টুকুর অর্থ আশা-করি পাঠকগণ কুভাবে ধরিবেন না। তারপর "সৃষ্টি-ক্ষমতা প্রতিভার মারফতেই আসিয়া থাকে, এমন কথার উল্লেখ কেহ করিলে, রমেন নজীর দেখাইয়া বলিত রবীন্দ্র নাথ, অমৃতলাল প্রকৃতির বরপুত্র! ইত্যাদি।" এতবড় নজীর দেখাইবার বুদ্ধি তার ছিল ; সে কবিতাও লিখিত, কিন্তু "দারুণ গ্রীষ্মে শাল, কম্ফর্টার ও মোজা ব্যবহার করিত" কোন্ নিতান্ত গ্রাম্য বুদ্ধির বলে যা হউক, রচনাটি সংযত হইলে, চমৎকার হইত।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় একটী শিকার কাহিনী অনুবাদ করিয়াছেন। কাহিনীটি মিঃ আর্ সমারভিলষ্টগ কর্তৃক রচিত ও বিলাতের কোন প্রসিদ্ধ মাসিকে প্রকাশিত। কিন্তু খুব লোমহর্ষকভাবে কাহিনীটি রচিত নয় এবং অনেক আজগুবি কথাও ইহাতে আছে। সেজন্য ইহাতে সত্য যে কতখানি আছে পাঠক তাধরিতে পারিবেন এদেশীয় নরনারী সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাঁর কতখানি তাও জানা যাইবে। তার আরও এক নিদর্শন ছবিতে নৌকার বাঙালী আরোহী দুটির চেহারা। কাহিনীটিকে Adapt করিলে বোধহয় ভাল হইত।

এ সংখ্যায় রঙীন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের "সিক্তা কুসুম"। কুসুম কথাটি অবশ্য ক্লীবলিঙ্গ। জলে ভিজিয়া বোধকরি লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করায় "সিক্তা" হইয়াছে। ছবিখানি অনেকেরই ভাল লাগিবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্তের "ওমর-খৈয়াম" ও "পূজার ফুল।" দুইখানি পট ; অবশ্য কালিঘাটের নয়, জগন্নাথের নয়, বৃন্দাবনেরও নয় বহুবাজারের বসুমতী কাগজের চৈত্রসংখ্যার পটেরও শ্রী আছে। ইহাও শ্রীহীন নয়—রঙে রঙে রামধনু।

রবীন্দ্র প্রশস্তি

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নমস্কার! করি নমস্কার!
কবিতা-কমল-কুঞ্জ-উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত হ'ল স্ফূর্ত্তি-পারাবার
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!
ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে ;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধাপান ;
তন্ত্রের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—

নমস্কার! করি নমস্কার!
চন্দন তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
আকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী যার ধ্বনি সুষমার,
চিত্ত প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!
প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার নিশি,
আবেদনে আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি' মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম অরাতি,
শোণিত নিষেক-শূন্য নৈষ্কর্ম্ম্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—

নমস্কার! করি নমস্কার!

রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার,
নমস্কার! করি নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্যভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা।"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত-পারা
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আশে শান্তিবারি-ধার—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশদিক্,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত চমৎকার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যায়,
নিশীথে মশাল জেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতারে
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার
হুন্দ্রভূমি "হুণ" "গল্" যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার
নমস্কার! তারে নমস্কার!

নয়নে শান্তির কান্তি, হাস্য যার স্বর্গের মন্দার;
পক্ক কেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য সহচর,
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর,
বিশ্ব যোগে যুক্ত যে গো "বাণী-মূর্ত্তি স্বদেশ আত্মার"—
বারম্বার তারে নমস্কার!

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তি নিবেদন,
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্ব্বন্ধ সাধনায়—
নমস্কার! নমস্কার! বারম্বার তারে নমস্কার!

গান

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

নতুন করে গাইব আজি গান!
দুখের ধূলো ঝেড়ে ফেলে, সুখের সুরে—
(আমার) বাঁধব বীণাখান॥
আলোকের এই বিমল বিভায়,
কিশলয়ের রঙীন শোভায়,
অজানা-মোর কোন্ প্রেয়সী আনলে পুলক বাণ॥
আকাশ আজ দেখে চাঁদে
তারে স্মরেই পরাণ কাঁদে,
গানের চুমায় ভাঙব তার আজ সকল অভিমান॥

"পান্থ"

শ্রীসুধীর কুমার সেন

আমার হৃদয় দুয়ারখানি রেখেছি খুলিয়া,
এতকাল পরে পান্থ; তোমারি লাগিয়া;
নৈরাশ্যের কশাঘাতে পড়ি আঁখিলোর,
বিধৌত করেছে এই কুঁড়ে ঘর মোর!

গাঁথিয়াছি ফুলমালা তব অনুরাগে,
পরাব তোমার গলে কতই সোহাগে;
এস তুমি প্রিয়তম! ললিত নর্ত্তনে—
প্রাণ মন বিকাইব, তব ও চরণে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের কবি হইয়াও বিশ্ব-কবিরূপে সম্মান অর্ঘ পাইতেছেন—স্বাধীন, অ-স্বাধীন সকল দেশেরই শ্রেষ্ঠ কবি, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ্ সকল স্তরের গুণীরাই কবিকে শ্রদ্ধা অর্ঘ দিয়া ধন্য হইতেছেন—তাঁহার সহিত নিজেদের মত সামঞ্জস্য করিয়া লইতেছেন। সাহিত্যের সাধনার মধ্য দিয়া নিজের বাণীকে কতটা মূর্ত্ত করা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীরও প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দেশের চিন্তা ও ভাবধারা লইয়া বিশ্বব্যাপী যে খেলা খেলিয়া যাইতেছেন তাহাতে বিশ্বের চিন্তা-জগতে নূতন সুর আসিতেছে—চলিত মানব-সভ্যতার ধারায়ও একটা বিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তাঁহার ব্যক্তিত্বকে আড়ালে ফেলিয়া ভাব-মূর্ত্তিকেই উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন। কবি নিজে বেশী ধরা ছোঁয়ার মধ্যে না গিয়া—এক স্তর উর্দ্ধেই চলিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি—কাব্যে-উপন্যাসে গল্পে ভাবধারার বিন্যাসে তাহা অতুলনীয়। শান্তি-নিকেতনে কবি তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শকে রূপময় করিতে চাহিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথই—অপর কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা চলে না, এমনি অতুলন মানব তিনি। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর গৌরব। জীবনের সত্তর বৎসর চলিয়াছে কবি এখনও নবীন—যেমন চির-নবীন তিনি চিরদিনই রহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে জগৎ এখনও অনেক আশা রাখে—জাগতিক সভ্যতার যোগাযোগে তাঁহার দান যে অমূল্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই বিভিন্নমুখী সভ্যতা জগতে একটা মহামারী কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সভ্যতার নামে মানবের হাহাকার বাড়িয়া যাইতেছে—মানুষ অমানুষিক কাণ্ড করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষণজন্মা প্রতিভাই ইহার যোগাযোগে সক্ষম—অন্ততঃ ইঁহাদের সভ্যতার বাণীতেই তাহার ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে—তাই রবীন্দ্রের বাণী শুনিতে বিশ্বজগৎ উন্মুখ। বাংলার গৌরব, বিশ্বের গৌরব কবি রবীন্দ্র আরো দীর্ঘকাল সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিয়া জগতকে অমৃতের সন্ধান দিন—

অনুন্নতদের প্রতি মহাত্মা

বোচাসাল গ্রামে বাড়িয়া নামক অনুন্নত শ্রেণীর একটি বিদ্যালয় স্থাপনকালে মহাত্মা বলিয়াছেন—"আমি আশা করি সাময়িক এই যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদের পর আমরা পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিব এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সে স্বরাজ সকল সম্প্রদায়ের এমন কি ভাঙ্গিদের ও মেথরদেরও স্বরাজ হইবে। সকল সম্প্রদায় যে স্বরাজে যোগ দিবে না, সে স্বরাজ স্বরাজই নহে।" সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে মহাত্মা কি আশা করেন এবং পূর্ণ স্বরাজে সকল শ্রেণী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে তাহা এই উক্তিতে সুস্পষ্ট।

খৃষ্টধর্ম্ম ও মহাত্মা

সর্ব্বধর্ম্মে সম আস্থাবান মহাত্মা ভারতে খৃষ্টানী-প্রচার সম্বন্ধে মন্তব্য করায় কোন কোন মিশনারী উক্ত হইয়াছেন—

উত্তরে মহাত্মা বলিয়াছেন—'খৃষ্টধর্ম্মই একমাত্র সত্য এবং অন্যান্য ধর্ম্ম মিথ্যা এ দাবী আপত্তির বিষয়। খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত ভারতের প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মও খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা অসত্য নহে। ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রণালীর আলোচনা করা সত্ত্বেও মিশনারীরা জানেন খৃষ্টানদের মধ্যেও আমার চেয়ে বড় বন্ধু তাঁহাদের কেহ নাই।'

অহিংসার শক্তি

মহাত্মা লিখিয়াছেন—"অহিংসায় যদি আমাদের অবিচলিত বিশ্বাস থাকে তবে ইহা ক্রমে সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিবে। অহিংসার প্রসার জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচার কার্য্য করিবে। সময়ের গতির সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারিব, অহিংসা ব্রহ্ম-শক্তির উৎস।'

কানপুরের দাঙ্গা

কানপুরের অতি শোচনীয় দাঙ্গায় বহু হিন্দু-মুসলমান খুন জখম হইয়াছে, মন্দির-মসজিদ ধ্বংস হইয়াছে, গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে—এসব হইবার পর দাঙ্গার ব্যাপার সম্বন্ধে যে তদন্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত সরকারী কর্ত্তৃপক্ষেরা দাঙ্গা বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই—পুলিশ প্রভৃতি নির্লিপ্ত দর্শকের মত এই বীভৎস তাণ্ডব দেখিয়াছে। ঢাকায় যেমন হইয়াছিল কানপুরেও তেমনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা সাহায্য প্রার্থীদের গান্ধীর কাছে যাইয়া সাহায্য চাহিবার উপদেশ দিয়াছেন। দাঙ্গা নানা প্ররোচনায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাহাদেরও দ্বারা ঘটিতেও পারে—যতটা সম্ভব এ তদন্তে তাহার উদ্ধারও সম্ভব—দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান যাহারা করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা করিয়াছে তাহারা অতি দুর্ভাগ্য সবই সত্য—কিন্তু যাহাদের উপর দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ন্যস্ত, যাহাদের হাতে শক্তি প্রয়োগের সম্পূর্ণ সুবিধা রহিয়াছে, তাহাদেরও দেশবাসীর সর্ব্বনাশ চোখের উপর দেখিয়াও এরূপ ঔদাসিন্যে কি মনে হয়? ভারতে এরূপ সম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখিয়া রাজপুরুষেরা কেহ স্বরাজের আমলের ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া সজাগ করিতে পারেন, আমরা স্বরাজের যোগ্য নহি বলিয়া হিতোপদেশ দিয়া নিজেদের সু-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু এসব ভারতহিতৈষীদের নিজেদের নয়ন ও মনের দুয়ার একটু সরলভাবে খুলিয়া বোঝা উচিত যে এসব হাঙ্গামা স্বরাজ-রাজে ঘটিতেছে না—ঘটিতেছে বৃটিশ-রাজেই—ভারতীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই যাহারা ভারতীয় রাজস্বের শ্রেষ্ঠ অংশ সৈন্য ও পুলিশেই ব্যয় করিয়া আসিতেছেন তাহাদের রাজেই।—এরূপ শোচনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতীয়দের স্বরাজ-প্রাপ্তির অন্তরায়, তাহাদের ধন, প্রাণ, মান সব বিসর্জ্জন দিবার পথ তাহা সত্য—এবং এ সত্য কঠোরতম ভাবে হিন্দু-মুসলমান দু'য়েরই উপর কতবার আপতিত হইবার পরও যে এখনও তাহাদের তেমন চৈতন্য হইল না, ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কানপুরের দাঙ্গার তদন্ত এ সম্বন্ধে দেশের হিন্দু-মুসলমানকে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আরও সজাগ করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। এই দাঙ্গার পর 'ইদের' সময়ও অনেক স্থানে দাঙ্গার আশঙ্কা করা গিয়াছিল, কিন্তু 'ইদে'র পূর্ব্ব হইতেই কানপুর দাঙ্গার তদন্তে যে সব মজার রহস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাও বোধহয় দাঙ্গার ছোঁয়াচ অনেকটা নিবারণ করিতে পারিয়াছিল। এই সব আত্মঘাতী ব্যাপারের পর হিন্দু-মুসলমানকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন স্বার্থপর প্ররোচকের উত্তেজনায়ই যেন দাঙ্গা করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব বাড়াইতে যাইও না—তাহাতে নিজেরাই মরিবে—প্ররোচক তখন দূরে দাঁড়াইয়া হাসিবে ও নিজের স্বার্থ বুঝিয়া লইবে। এসব দাঙ্গা ক্রমাগত দেখিয়া আরো একটা কথা জোর করিয়া বলা যায় যে ভারতের আভ্যন্তরিণ শাসন-ব্যবস্থার ভার অবিলম্বে ভারতবাসীর হাতে আসা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এরূপ শোচনীয় দাঙ্গা আর বিস্তারলাভ করিতে পারিবে না সম্ভব।

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় সংবাদপত্র

বাংলার সাংবাদিক সংঘ 'Indian Journalists Association' এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। হিন্দু-মুসলমান প্রায় সকল সংবাদপত্রসেবীই 'ইদে'র দুই দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের ভবনে সমবেত হইয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সকলে মিলিয়া

হিন্দু-মুসলমান সব সংবাদপত্রেই দু' সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন জানাইয়াছিলেন। কোন সম্প্রদায়কে উস্কাইবার জন্য কাগজে উত্তেজক লেখা যাহাতে না বাহির হয় সেজন্যও 'সাংবাদিক সঙ্ঘ' চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহা ফলপ্রদও হইতেছে। সাংবাদিকগণ সংবাদপত্র দ্বারা দেশের হিতকর অনেক কিছুই করিতে পারেন—এবিষয়ে সংবাদিক সংঘ যে সব কার্য্যে এখন হাত দিতেছেন তাহাতে দেশের পূর্ণ সহানুভূতি তাঁহারা পাইবেন সন্দেহ নাই।

জাতীয় মুসলমান সম্মেলন

দিল্লীর মুসলেম সম্মেলনের মনোভাব দেখিয়া হতাশা আসিতেছিল; লক্ষ্ণৌ জাতীয় মুসলেম সম্মেলনের মনোভাবে আবার আশার সঞ্চার হইতেছে। এই সম্মেলনের সভাপতি সার আলী ইমাম ভারত বিদিত ব্যক্তি—ইনি বলেন 'স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন নীতি জাতীয়তার অভাবেরই দ্যোতক।··· মুসলমানেরা যদি নিজেদের রক্ষা করিতে না পারে এবং হিন্দুরা তাহাদের রক্ষা না করে, তাহা হইলে সে শক্তি নিশ্চয়ই তৃতীয় পক্ষের হাতে বর্ত্তিবে। ইহা কি জাতীয়তার বিরোধী নহে—ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে এ দেশে যে সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে না তাহার উপরই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদীদের ভরসা? ইহার অর্থ চিরন্তন শিক্ষা-নবিসিতে থাকা। জাতীয় মুসলমানগণ স্বাধীনতার আশা পোষণ করেন—এ অবস্থায় যে তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে ঘৃণা বোধ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।··· কোনরূপ সর্ত্ত বা বাধা নিষেধ ছাড়া অধিকৃত যুক্ত নির্ব্বাচন-নীতি সমর্থন করাই একান্ত আবশ্যক।···স্বার্থ সুবিধা লুটের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছে। কোন বিধানের দ্বারা যে এই বাটোয়ারা স্থির হইতে পারে এ বিশ্বাস করি না। ভারতের স্বাধীনতা লাভে এবং রক্ষাকল্পে মুসলমানদের দানের অনুপাতেই তাহারা সে সুখ সুবিধার ভাগী হইবে।··· ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দু বা মুসলমান রাজ বলিয়া কিছুর স্থান হইবে না। স্বদেশ প্রেমের উদার ভিত্তির উপর ভারতীয় জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক স্পর্শ তাহাতে থাকিবে না।'

যুক্ত নির্ব্বাচন ও পৃথক নির্ব্বাচন এই ব্যাপারই এখন মুসলমানদের মধ্যে মহা সমস্যার বিষয়। সুতরাং যুক্ত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে স্যর আলি ইমামও যেমন বলিয়াছেন ডাক্তার আনসারীও তেমনি বলিয়াছেন—'রাজনীতির দিক হইতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিরোধ চিরস্থায়ী করিবার একটি সর্ব্বোত্তম কৌশল এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।' ডাঃ সৈয়দ মামুদও এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উল্লেখ যোগ্য—তিনি বলেন "কতিপয় মুসলমান গৃহে আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া মুসলমানের অধিকার গেল বলিয়া চীৎকার করিতেছেন বটে কিন্তু হাজার হাজার প্রকৃত কর্ম্মী মুসলমান জাতীয়-সংগ্রামে মৃত্যু ও কারা-যন্ত্রণা বরণ করিয়া লইয়াছেন।···ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতকেই মাতৃভূমি মানিয়া লইয়াছে। এবং তাহারা বুঝিয়াছে মাতৃভূমির মঙ্গলের সহিতই তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল জড়িত। ভারতের কোন সম্প্রদায় কাহাকে ছাড়িয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সমবেত উন্নতি প্রচেষ্টা দ্বারাই সকলের উন্নতি সম্ভবপর।···" জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের স্বদেশিকতা ও ভারতীয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উদার অভিমতের কাছে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থতন্ত্রবাদ যে অদূর ভবিষ্যতেই পরিম্লান হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কিছু নাই।

নারী সম্মেলনের প্রস্তাবাদি

কলিকাতা টাউনহলের এই সম্মেলনে নারীরা কতকগুলি প্রস্তাব করেন, তাহার কয়েকটি গৃহীত ও কয়েকটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। নারীরা ভাবী রাষ্ট্রতন্ত্রের নির্ব্বাচনে পুরুষদের সমান ভোটাধিকার চাহিয়াছেন। এ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। নিখিল বঙ্গ-নারী-প্রতিষ্ঠান ও সেবিকাদল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বাসন্তী মজুমদার প্রস্তাব করেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও আদান-প্রদান আবশ্যক। এজন্য ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে বাধা না দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন অস্পৃশ্যতা নিবারণে আপত্তি করিবার কিছু নাই কিন্ত বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে বাধা না

দেওয়ার যে কথা বলা হইয়াছে উহার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না কেহ ঐরূপ বিবাহ করিলে কার্য্যতঃ কেহই তাহাতে বাধা দেয় না। ভোটে দিলে অনেকেই বলেন 'আমরা ঐরূপ বিবাহের পক্ষপাতিনী নহি।' শ্রীমতী শান্তি দাস এই প্রস্তাবের সমর্থনে এই মর্ম্মে বলেন যে, 'এ সমস্যাটি সাধারণ ও ক্ষণস্থায়ী নহে। যাহারা সবদিক বিবেচনা করিয়া অপর সম্প্রদায় হইতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী গ্রহণ করিতে চান ইহাতে তাহাদের সেই স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। এরূপ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ সামাজিক উৎপীড়নের ভয়ে ইচ্ছামত বিবাহ করিতে না পারিয়া অনেকের জীবন দুঃখময় হইতেছে, আরও একটি কারণ আছে—বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির নরনারীর রক্তের মিশ্রণের ফলে শক্তি ও সাহস সম্পন্ন বংশধরের সৃষ্টি হইতে পারিবে এবং এই সব নরনারী সমগ্র দেশকে সম্প্রদায়ের ও জাতিভেদের উর্দ্ধে ভাবিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং এই ভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতিকার হইবে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ইহার উত্তরে বলেন—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিবাহ হইলেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল হইবে এমন নহে। এভাবে মিলন করিতে গেলে হয়ত সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান হইতে হইবে নয় সমস্ত মুসলমানকে হিন্দু হইতে হইবে কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু কেহ এরূপ বিবাহ করিলেও কেহ বাধা দেয় না সুতরাং ঐরূপ আইনের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্তা অনুরূপার সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে ৮০ ও বিপক্ষে ১৪ ভোট হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায় তাঁহার প্রস্তাবে বহু বিবাহপ্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন পর্দ্দা ও পণপ্রথা তুলিয়া দেওয়া ও অবস্থা বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সাব্যস্তের কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ইহারও সংশোধন করিয়া বলেন—অবস্থা বিশেষে হিন্দুনারীর অধিকার সাব্যস্তের কথা বর্জ্জন করা হউক। ইহা আমাদের সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী, দুশ্চরিত্র হইলেও আমরা যেমন পিতা ও ভ্রাতা ত্যাগ করিতে পারি না তেমনি স্বামীকেও পারি না। শ্রীযুক্তা অনুরূপার সংশোধন গৃহীত হয়। নারী সম্মেলনের সামাজিক বিষয়ে বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-ব্যাপারে যে মনোভাব পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বিদ্রোহের ভাব বিবেচিত হইলেও এ সম্বন্ধে পুরুষের ভাবিবার কথা আছে সামান্যই। আর এই ছোটখাট মহিলা মজলিসের কতিপয় ১২।১৪ জন মহিলামাত্র এই সব সম্পর্কে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে অন্ততঃ বাংলার নারীদের মনোভাব নহে তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। ঘরোয়া ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে যাহার যেমন মনোভিলাষই থাকুক না কেন তাহা এ ভাবে কোন বৈঠকে বিশেষতঃ বাংলার নারী মহাসম্মেলন নামে যাহা চালান হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ করা সঙ্গত হইয়াছে কি? ব্যক্তিগতভাবে কাহারও যদি ভিন্ন ধর্ম্মীকে বরণ না করিলে জীবন একান্ত দুঃখময়ই হইয়া ওঠে তবে স্বচ্ছন্দে তিনি তাহা করিতে পারেন—তবে সে জন্য হিন্দু সমাজ তাহাকে নাও নিতে পারে এজন্য আক্ষেপ করিবারই বা কারণ কি? বাঙ্গালীর মধ্যে সাহসী ও শক্তিসম্পন্ন লোকের অভাব আছে একথা সত্য নহে—আর ভিন্ন ধর্ম্মে বিবাহ করিলেই যে তজ্জাত সন্তান এই সব গুণসম্পন্ন হইবে একথা যে নারী একান্ত বিশ্বাস করেন ও বীর জননী হইবার যাহার একান্ত সাধ তিনি ভিন্ন ধর্ম্মীকে বিবাহ করিয়া বীর-জায়াও হইতে পারেন! নারীর আর্থিক স্বাধীনতা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ইহা না থাকাতেই নারীর যতপ্রকার দুর্দ্দশা আসা সম্ভব আসে, তাহাও সত্য কিন্তু আর্থিক স্বাধীনতা কি ভাবে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে কেহ কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই। সভানেত্রীর বক্তৃতায় পুরুষের উপর আক্রোশের ভাব সমধিক দেখা যায়—কিন্তু ইহার সঙ্গত কোন কারণ পাওয়া যায় না। পুরুষ ও নারীর পূর্ণ সহ-যোগেই সুখের সংসার-জীবন সম্ভব—রাজনৈতিক বিষয়ে নারীরা যে সব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ফল প্রসব করে দেখা যাইবে।

মইমনসিং গুণ্ডামী

মইমনসিংহে দেশনেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপর আক্রমণ হইয়াছিল। প্রকাশ কংগ্রেসী দলাদলির জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। দেশোদ্ধারের জন্য যখন অহিংস সংগ্রাম চলিয়াছে এবং কংগ্রেসই যখন তাহা চালাইতেছে তখন একজন কংগ্রেস নেতার উপর কংগ্রেস উপলক্ষেই এ আক্রমণ দেখিবার মত বটে!

সামরিক শিক্ষা

আমাদের সামরিক শিক্ষা পাওয়া এবং সমর বিভাগে অধিকার থাকা যে অতি প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নাই, ডাঃ মুঞ্জে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, সম্প্রতি কলিকাতায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—বাংলায় সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন ৩ লাখ টাকা হইলেই হইতে পারে এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এ ভার লইতে পারেন।

মহাত্মা কটিবাস কেন পরেন ?

খদ্দরের অত্যধিক মূল্য জানিয়া মহাত্মা প্রমাণ ধুতি ত্যাগ করিয়া কটিবাস গ্রহণ করেন। মহাত্মা বলেন—কটিবাস পরিধানে ভারতীয় সভ্যতার সরল জীবন আনয়ন করে। অভাবের প্রাবল্যের জন্যই আজ মানবজাতির এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার দরুণই আজ মানব সমাজ এমন দোষ দুষ্ট হইযাছে। ইওরোপ ঐহিক ঐশ্বর্য্যের মোহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আবার তাহার সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে বাধ্য হইবে। ভারতের পক্ষে স্বার্থের পেছনে ধাবমান হওয়া আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। এই দারুণ অভাবের দিনে মহাত্মার বাণী লোককে হৃদয়ঙ্গম করিতেই হইবে।

কলিকাতায় খুন জখমের প্রাবল্য

রাজধানী কলিকাতায় কয়দিন হইতে খুনের বেশী প্রাবল্য হইয়াছে। অর্থ লোভে দুইজন সম্ভ্রান্ত মহিলা খুন হইয়াছেন—তারপর দিবা দ্বিপ্রহরে কলেজ ষ্ট্রীট এলবার্ট হলের প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী সেন ব্রাদাসের ভোলানাথ সেন ও দু'জন কর্ম্মচারী একসঙ্গে ছোড়ার আঘাতে দোকানের মধ্যে নিহত হইয়াছেন। দু'জন মুসলমান এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে। এমন ভয়াবহ কাণ্ড কি উপায়ে বন্ধ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে কলিকাতা পুলিশ বিশেষ তৎপর হইতেছেন এমন আশা করিতে পারি।

নারী ফিল্ম পরিচালিকা

ইংলণ্ডের চলচ্চিত্র জগতে কুমারী ডায়না সারেই একমাত্র মহিলা পরিচালিকা। ইনি এইচ-ভি এসমণ্ডের সেক্রেটারী থাকা কালে তাঁর নাট্যগুলির ফিল্ম অভিনয়ের বন্দোবস্ত নানা ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে করিতেন। তারপর এসমণ্ডের মৃত্যু হইলে তিনি ফিল্মকেই ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন—এইভাবে ইনি বৃটানিয়া ফিল্মস্ লিমিটেড নামে নিজের কোম্পানী গড়িয়া তোলেন। আধুনিক ধরণে ফিল্ম তুলিবার খরচা অনেক তাই অর্থের বন্দোবস্ত করিতে তাঁকে অনেক ভুগিতে হইলেও এখন ধনী পৃষ্ঠপোষকের সহায়তায় তিনি ফিল্ম ব্যবসায় দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিতে পারিয়াছেন।

'Every mother's Son' ও 'Second to None' তাঁর অন্যান্য ফিল্মগুলির মধ্যে খুব নাম পাইয়াছে। এঁর 'carry on' জল যুদ্ধ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় চিত্র। ইনি শুধু যে নিজ কোম্পানীর চিত্র পরিচালনই করেন তা নয় অধিকাংশ 'সিনারিও' ইনিই লিখিয়া থাকেন।

বার্ণার্ডশ ও অভিনেতা

জগৎপ্রসিদ্ধ লেখক বার্ণার্ডশ তাঁর অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যও অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, এই খেয়ালী প্রতিভার সঙ্গে আবার একজন অভিনেতা কেমন খেয়ালে চলে বাজিমাৎ করিয়াছিলেন শুনুন—একজন অভিনেতার ভারি ইচ্ছা যে তিনি শ'র you never can Tell' অভিনয় করেন, কি বন্দোবস্তে অভিনয় হইতে পারে সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে তিনি গেলেন বার্ণার্ডশ'র বাড়ীতে। নানা কথাবার্ত্তার পর শ' এমন টাকা চেয়ে বসিলেন যে অভিনেতা একেবারে হতভম্ব, তিনি ভাবিতেই পারেন নাই যে এত টাকার কথা উঠিতে পারে। তাই অভিনেতা নিরাশ হয়ে বেড়িয়ে এলেন।

বাইরে এসে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁর মাথায় কেমন খেয়াল চাপিল তিনি পোষ্টাফিসে গিয়ে শ'র কাছে 'তার' পাঠালেন—

'নাটকখানা আমায় অমনি দিন না কেন ?'

এই তারখানা পেয়ে বার্ণার্ডশ তো একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন।

এই অবাক্ বিস্ময়ের মধ্যেই শ' তাকে তার করে দিলেন যে সেই বন্দোবস্তেই তিনি রাজী।

এই অভিনেতা হচ্ছেন বিখ্যাত James Welch।

স্পেন রাজের রাজ্য ত্যাগ

স্পেন রাজ আলফাঙ্গো রাজ্য ছাড়িয়া ফ্রান্স হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছেন। স্পেনে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে। স্পেনের রাজতন্ত্রের পতন বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। রাজা সময়ে জন-মত মানিয়া লইলে তাঁহার স্বৈরাচার সংযত করিতে হইত কিন্তু হয়তো সিংহাসন হারাইতে হইত না।

বাংলায় অন্নাভাব

অর্থাভাবে বাংলা এখন বিশেষ বিব্রত। অন্নাভাবও এখন এমন প্রকট হইয়াছে যে প্রায়ই কোননা কোন স্থান হইতে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এখন হইতে জন সাধারণ ও সরকারের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

নূতন মেয়র

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রত্যেকবারই মেয়রের কাছে কলিকাতা বাসীরা এই নিবেদন করে যে তাঁহার আমোলে যেন কর্পোরেশনে দলের স্বার্থের চেয়ে কলিকাতার জন-সাধারণের স্বার্থ ই বিশেষ করিয়া দেখা হয়। এবারেও অবশ্য কলিকাতা বাসীরা তেমন ইচ্ছাই করিতেছে। মেয়র ডাক্তার রায়কে আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র করপোরেশনে অভিনন্দিত হইয়াছেন—ইহা অতি আনন্দের কথা।

রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জানাইতেছেন—'২৫শে বৈশাখ কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি যে এই শুভ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটী আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ঐ সংবর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য, আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় কালিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হইবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

বৈজয়ন্তী—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল প্রণীত; রঘুনাথ পুর, বসিরহাট হইতে শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত ১০৪ পৃষ্ঠা—মূল্য একটাকা। প্রকাশকের নিকট এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল 'মাসিক বসুমতী' ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। 'বৈজয়ন্তী' তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা সমষ্টি। ইহাতে তাঁহার প্রায় ৪৫টি স্বরচিত কবিতা স্থান পাইয়াছে।

বিজয় বাবু শক্তি শালী কবি—তাঁহার কাব্য আবেগ-প্রধান এবং তাঁহার বলিবার ভঙ্গীটি বলশালী। 'বৈজয়ন্তী'তে তাঁহার নানা শ্রেণীর কবিতা স্থান পাইয়াছে। ঠিক একটি সুরকে ইহার মধ্য হইতে পাওয়া যায় না—অনেকগুলি তারে আঘাত করিয়া কবি তাঁহার বীণা বাজাইয়াছেন। কাব্যামোদী পাঠক বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া নানা সুরের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইবেন। বিজয় বাবুর এই শ্রেণীর দুই একটি কবিতার নমুনা এখানে তুলিয়া দিতেছি—

"ফুলটি বড়ই ভালো বাসো নাকি—
এনেছি তাই ফুলশয্যার ফুল,
দিতে পার—কি তুমি এর লাগি—
এমন কুসুম—পরশ তুষাকুল?"
—ফুলের মূল্য

"আজি পহেলা আষাঢ়!
নীলমেঘ মন্থর ধূসরিত অম্বর

[illegible] গাহছে—
আজি পহেলা আষাঢ়।

কৈলাসে বিরহিণী ওগো বিধুরা—
যক্ষ দয়িতা তুমি কোথা আতুরা!
গবাক্ষে দেখ চেয়ে এনেছে অকাশ বেয়ে
'রাম গিরি' হতে দূত সংবাদ কার—
আজি—পহেলা আষাঢ়!"

—পহেলা আষাঢ়

"রূপরে ঝরিবে চাঁদের তারার কিরণ-অলকামন্দা,
ঝুরুঝুরু লুটাবে সমীর, মদির সুরভি-ভারে—
আমি প্রেমালোকে তারি মাঝখানে ফুটিব রজনীগন্ধা,
নিশি তোরে হিয়া রিক্ত করিয়া দিয়ে যাব দেবতারে!"

—অভিশাপ

"আঁধার সাগরে তব বিশ্বব্যাপী আসে যে জোয়ার,
মিলনের সেতু কাল অলক্ষেতে রচে তার বুকে;
মিলনের মহালয়া। মর্ত্ত্যে নর অর্পে তোর-ধার;
ঊর্দ্ধ স্বর্গে পিতৃলোক ছায়া পথে ফিরে তৃপ্তসুখে।

—অমাতিথি

উদ্ধৃত কবিতাংশ কয়টি হইতে পাঠক সহজেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইবেন। ভাষা ও ছন্দে কবির অধিকার আছে একথা নিঃসন্দেহ;—কাব্যে আবেগ-আন্দোলিত কবি হৃদয়ের পরিচয় ও যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সেই আবেগই যেন তাঁহাকে কয়েকটি সুন্দর কবিতার পথ ভ্রষ্ট করাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভাষা বিন্যাসের সংযত রূপ সত্ত্বেও যেন তাঁহার কয়েকটি ভালো কবিতার শেষ-রক্ষা হয় নাই।

বিজয় বাবু অনেকটা প্রাচীন রীতির পথানুসারী; তাঁহার অক্ষর বৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলি পড়িলে কবি নবীন সেনের কবিতার পদগুলি মনে আসে—

"লক্ষ্মী পূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে—
…প্রভাসের তীরে বসি কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়
শিলাসনে ধ্যানমগ্ন।"

বাংলা কাব্য সাহিত্যের পূর্ব্বাকাশে যে নবারুণ-রশ্মি দেখা যাইতেছে, যে [illegible] বোধহয় তাহা [illegible]।

উৎকৃষ্ট কাব্য-পাঠের অনুশীলন করিতে করিতে অবহিত সাধনায় কবি বিজয়মাধব উত্তর কালে নিঃসংশয়ে যশস্বী হইবেন-একথা আমরা তাঁহার বৈজয়ন্তী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ভ্রমণের নেশা—শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখুজ্জী। প্রকাশক মেসার্স এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ কলিকাতা।

বাঙালীর ছেলেদের যে Adventure স্পৃহা কতখানি, ঘোর বিপদের মাঝেও তাঁরা যে চিত্তের ধৈর্য্য, সাহস ও বুদ্ধি হারান না; সর্ব্বোপরি পরিহাস-রস-পিপাসা যে তাঁদের মনে পরিপূর্ণ-রূপে উচ্ছলিত থাকে, পুস্তকখানি তার একটী চমৎকার উদাহরণ।

কয়েকটি বাঙালীর ছেলে বাইসাইকেলে কলিকাতা হইতে চিল্কা, পুরী, দার্জ্জিলিং, বারাণসী, ভারতের সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ও কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। ইহাতে ভ্রমণের আনন্দটুকু যেমন পরিপূর্ণ ভাবে ইহারা ভোগ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার বিপদ ও বিপত্তির মাঝেও পড়িয়া ছিলেন কম নয়। পুস্তকে পথের ও বনের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় মন যেমন উধাও হইয়া চলে তেমনি আবার আঁধার রাতে বাঘের জ্বলন্ত চোখ, বনের ধারে মত্ত করীর দল ও গাছের ডালে দোদুল্যমান অজগরের কথায় থমকিয়া দাঁড়ায়। বর্ণনা-ভঙ্গী ও দৃশ্য-বৈচিত্র্যে পুস্তকখানি বার বার পড়িয়াও আশা মিটে না।

এই-তো গেল এক দিক। আর একটী দিক, যেটিকে আমরা বাঙালীরা উপেক্ষা করিয়া চলি—ইহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা। এই গুণটি যে সকল কাজের ধারা সুনিয়ন্ত্রিত করে, এই-কথাটি সম্যক্ বুঝিয়া ইহারা কয়েকটি অতি সাধারণ ও সহজ নিয়মে নিজেদের সুশৃঙ্খলিত করিয়া চলিয়াছিলেন। সেই কারণেও বোধ করি ঘোর বিপদ ও বিপত্তি ইহাদের পক্ষে কাটাইয়া উঠা সম্ভব হইয়াছিল। পুস্তক-শেষে যে পথ ধরিয়া ইহারা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তার চমৎকার একখানি মানচিত্র আছে যাহা পদ-চারী বা মোটর-চারী-সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। পথের বিশেষ বিশেষ স্থানের অনেকগুলি ছবিও আছে।

পুস্তকখানি বিশেষ করিয়া প্রত্যেক কিশোর ও যুবকের পাঠ করা উচিত। এবং ইহা ঘরে রাখিবার মত সামগ্রী। ছাপা ও কাগজ ভাল; কাপড়ে বাঁধা প্রচ্ছদ পটে ভ্রমণকারীদের সজ্জের—ক্যালকাটা হইলার্স—একটী নিদর্শন আছে। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

মিলন

বিদ্যাসুন্দর

শিল্পী— চারু সেনগুপ্ত

৫ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩৮ | ৩য় সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধী ও বর্ত্তমান সভ্যতা

—প্রবন্ধ—

শ্রীভারত কুমার বসু

মহাত্মা গান্ধী ভারতের বস্তুতান্ত্রিকতার একান্ত বিরোধী ; অর্থাৎ, তিনি মোটেই চান না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা অন্ধ হ'য়ে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন সভ্যতাকে হারায়। তাই তিনি বলেন, "মিল্," রেলপথ, মোটর ইত্যাদি ইত্যাদির কোনোই দরকার নেই এখানে। এস্থলে এই রকম প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, মোটর-ইত্যাদির দ্বারা ভারতবাসীদের তা হ'লে কি কোনোই সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছে না ? এর উত্তরটি-ই আলোচনা করা হবে :—

প্রথমতঃ জানা উচিৎ, মোটর-ইত্যাদি প্রধানতঃ কাদের সুবিধার জন্ত সৃষ্ট হ'য়েছে ?—নিঃসন্দেহে ধনীদের জন্ত ; —গরীবদের জন্ত নয়। মহাত্মা গান্ধী বার্‌বার্ ঐই গরীবদের কথাই উল্লেখ করেন। বর্ত্তমান-সভ্যতা আমাদের দেশকে যে কত উন্নত ক'রেছে, তার প্রকৃত পরিচয় পেতে হ'লে, প্রত্যেক দরিদ্র-পল্লীতে ভাল ক'রে ঘুরে আসা দরকার। মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের অনেকগুলি দিন এই দরিদ্র-পল্লীতে কাটিয়ে যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। তিনি গরীবের চির-বন্ধু। গরীবদের জন্ত তাঁর গৃহ-দ্বার সদাই উন্মুক্ত। এইজন্তই, গরীবের ব্যথা কোথায়, ধনীরা তা না জানলেও, মহাত্মাজীর কাছে তা অজানা নেই। তিনি আরও জানেন যে, ভারতবর্ষে ধনীর চেয়ে গরীবের' সংখ্যাই বেশী। সুতরাং গরীবদের উন্নত করা মানেই ভারতের উন্নতি করা।

বর্ত্তমান সভ্যতা হয়ত আপত্তি তুলে ব'লতে পারে যে, মোটর-ইত্যাদি এখানে চ'লবে না কেন ? কিন্তু এর উত্তরে, কোটি-কোটি অভাব-ক্ষুণ্ণ অর্দ্ধোপবাসী গরীবের কণ্ঠ সাড়া দেবে, "আগে আমাদের অনাহার থেকে বাঁচাও ! তারপর তোমার বিলাসিতা !"—নিরন্ন দুঃখীর আত্মা যেখানে অশ্রু ফেলছে, সভ্যতার ধনিক-বাদ সেখানে কতখানি অপরাধী, সে-কথা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। এবং যত দিন পর্য্যন্ত এই ধনিক-বাদ দেশে বর্ত্তমান থাকবে, গরীবের দুঃখও ততদিন একটুও ক'মবে না ; রাস্কিন, টলষ্টয়, রোমাঁ রোলাঁ, এইচ্, জি, ওয়েলস্,

আনাটোল্ ফ্রাঁস্ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও এই ধারণা এবং বিশ্বাস।......

বর্ত্তমানে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের বিষয় আলোচনা ক'রতে গেলে, কেবল যে এই জানতে পারা যাবে যে, ধনতান্ত্রিক সভ্যতা সেই দেশে যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি ক'রেছে, তা নয়। জানতে পারা যাবে যে, উক্ত সভ্যতা একমাত্র বিংশ শতাব্দীতেই জন্ম গ্রহণ করেনি ;—তা ক'রেছে বহু—বহু বছর আগেই। ক্ষয়, ধ্বংস এবং মৃত্যুকে পিছনে-আনা রোগের মতো উক্ত সভ্যতা এক কালে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মিশর-দেশের ফ্যারাও-'সভ্যতা' ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই সভ্যতা একদিন যখন মিশরের নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল, সেই সময়ে সেই-খানকার-ই অবিশিষ্ট অসংখ্য লোক জীবিকার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতো এবং প্রত্যহ প্রায় অনাহারেই থাকতো। এই সময়েই সেখানে অভ্যুত্থান হয়েছিল—গরীবের বন্ধু এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির। নাম তাঁর মুশা (Moses)। ফ্যারাও-রাজতন্ত্রের প্রতি অসাধারণ ঘৃণা নিয়ে তিনি তথা-সভ্যতা'র বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। উৎপীড়িত হিব্রুদের উন্নতি ও মুক্তি বিধান করাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লো। এইজন্যই, বর্ত্তমান কালে ফ্যারাও-দের নাম বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেলেও, আজও পর্য্যন্ত কি-খৃষ্টান, কি-মুসলমান—উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদের-ই কাছে ঈশ্বরের প্রেরিত ব'লে এক ব্যক্তি যার-পর-নাই শ্রদ্ধা ও সম্মান পান। বাইবেলে এই পুণ্যাত্মার-ই সম্বন্ধে লেখা আছে :—

"বয়স্থ হবার পর মুশা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে ফ্যারাও-র দৌহিত্র ব'লে অভিহিত হ'তে চাইলেন না। পাপের আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষদের সঙ্গে অনাচার সইতে চাইলেন। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে তিনি মিশর ত্যাগ ক'রলেন। রাজার ক্রোধের জন্য তিনি ভয় ক'রলেন না, কারণ, যে-মহাপুরুষ লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান ক'রছেন তাঁর-ই দেখা পাবার জন্য তিনি ধৈর্য্য ধ'রেছিলেন।"

আর-একটী দৃষ্টান্ত ধরা যাক। দরিদ্র প্রজাদের প্রতি অবহেলা করার জন্য রোম্যান্ সাম্রাজ্যের পতন হ'য়েছিল। এবং এ-পতনের একমাত্র কারণ, ব্যাবিলন্ ও মিশর-দেশের সভ্যতার মতো উক্ত সাম্রাজ্যের সভ্যতা-ও অসংখ্য শ্রমিক ক্রীতদাসের অশ্রু এবং রক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। রোম্যান্ সাম্রাজ্যে অল্প-সংখ্যক লোক-ই স্ফটিক-ভবনে বিভিন্ন প্রকারের আমোদ-সুখ উপভোগ ক'রতো। ক্রীতদাসেরা তাদের হাতের কাছে রাতদিন-ই থাকতো—আদেশের অপেক্ষায়। কিন্তু সেই সময়ে সাম্রাজ্যের দরিদ্র ব্যক্তি যারা, তাদের রুটির টুকরো খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'তো। নেপ্‌ল্‌স্-উপসাগরের তীরে পম্পিয়াই ও হার্‌কিউলেনিয়ামের সমুদ্র-তীরস্থ ভবনে প্রাচীন রোমের লক্ষপতিরা সম্পদ ও পাপ-কার্য্যের জাঁক-জমকে ফেটে প'ড়তো। ঠিক এই সময়েই দূরস্থ জুডা-প্রদেশে একটি মহা-মানব কৃষকের অভ্যুত্থান হয়। নাম তাঁর যিশু,—নাজারেথের যিশু। গ্যালিলি-সাগরের তীরে ধন-গর্ব্বিত গ্রীসো-রোম্যান্ সহরগুলির মধ্যে মনুষ্যত্ব-ধ্বংসকারী এই সভ্যতার পরিচয় পেয়ে, তিনি তাঁর দুঃখ এইভাবে জানালেন :—

"হায় বেথ্‌সাইদা! হায় কেপার্‌নেয়াম্! আকাশ-স্পর্শী প্রাসাদ নিয়ে তোমরা কি উন্নত হ'য়েছ? নরকে তোমাদের অধঃপতন হবে!"

স্বর্ণ, স্ফটিক, বিলাসিতা এবং উৎসব-প্রধান দেশগুলির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যিশু শেষে গরীবদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শান্তির বাণী দিলেন :—

"এস, যত শ্রমিক! এস যত ব্যথাতুর! এস আমার কাছে! আমি তোমাদের শান্তি দেবো! তোমরা আমার ভার নাও এবং আমার কাছে দীক্ষা নাও! আমার অন্তঃকরণ সরল ও বিনম্র। তোমরা অন্তরে শান্তি পাবে।"

যিশুর এই বাণীতে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের ইঙ্গিত ছিল না ;—ইঙ্গিত ছিল—আত্মিক আনন্দের। যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, তারা যেন ঈশ্বরের পূজা করবার সুযোগ খোঁজে এবং অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে "ম্যামন্‌কে" অর্থাৎ, উপরোক্ত সম্পদ-গর্ব্বিত বিলাসী সহরগুলির আরাধ্য ধন-দেবতাকে। অক্ষুণ্ণ মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যিশুর যা-আদেশ, তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন এই কটী বাণীর সাহায্যে :—

"মাঠের ওই পদ্মফুলগুলি কি-ভাবে জ'ন্মেছে, সে-কথা একবার ভেবে দেখ'! তারা পরিশ্রম করে না, সুতা-ও কাটে না। তবুও আমি তোমাদের ব'লছি যে, জুলেমান

(Solomon) তার সমস্ত গৌরব নিয়ে থাকলেও, ওদের একটার মতন-ও তার পরিচ্ছদ ছিল না। সুতরাং, ঈশ্বর যদি মাঠের তৃণকে ওই রকম পরিচ্ছদ দেন, যে-তৃণ আজ আছে, কিন্তু কাল-ই উনুনের মধ্যে যাবে, তা হ'লে, হে নাস্তিকের দল! তিনি তোমাদের আর কত বেশী পরিচ্ছদ দেবেন? সুতরাং, আমরা কি খাবো, কি পান ক'রবো, অথবা, কোথা থেকে পরিচ্ছদ পাবো, এ-সব কথা ব'লে ব্যস্ত হ'য়ো না!...ঈশ্বরের রাজত্বের খোঁজ করো! তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠার অনুসন্ধান করো! তা হ'লেই, উক্ত জিনিষগুলি তোমরা পাবে!"

—যিশুর মুখ থেকে এই কথাগুলি উচ্চারণ হবার কিছুদিনের মধ্যেই রোম্যান্-সাম্রাজ্য ধূলিতে মিশিয়ে গেল। বড়-বড় রোম্যান্ সম্রাটদের নাম আজকাল বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সেই সময়কার এক ব্যক্তির নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে ফুটে আছে—অমর হ'য়ে। পৃথিবীর এ-পার হ'তে আরম্ভ ক'রে ও-পার পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক লোক-ই তাঁকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে, সম্ভ্রম করে, ভক্তি করে—দেবতার মতো। দেবতাত্মা এই মহা-মানব-ই ছিলেন—নাজারেথের সেই দরিদ্র-বন্ধু কৃষক—খৃষ্ট,—যিশু খৃষ্ট। মানুষের কাছে তিনি-ই ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রচার ক'রেছিলেন।...

আর-একটী দৃষ্টান্ত ধরা যাক :—

বাইজ্যান্টাইন্-সাম্রাজ্যও "সভ্যতা"র চরমে উঠেছিল। এর রাজধানী ছিল আড়ম্বরপূর্ণ সহর কন্‌ষ্ট্যাণ্টিনোপ্‌লে। এর বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল এ্যালেক্‌জেণ্ড্রিয়া ও এ্যাণ্টিয়ক্-নামক স্থানে। এক-হাতে সম্পদ এবং আর-এক হাতে গরীবের রক্ত নিয়ে এই সাম্রাজ্যের "সভ্যতা" গ'ড়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়েই সুদূর আরব্যে এক মানব-ঋষির অভ্যুত্থান হয়। প্রকৃতির উন্মুক্ত হাওয়ার মধ্যে দারিদ্র্যকে বন্ধু ক'রে সমস্ত প্রকার বিলাসিতাকে তিনি দূরে রেখেছিলেন। ত্যাগী ফকির এই মহাত্মার নাম-ই মহম্মদ,—ইস্‌লাম্-ধর্ম্মের হজরৎ মহম্মদ। অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ ক'রে থাকেন যে, সিরিয়া ও মিশর-বিজয়ের জন্ত আরবেরা অত চমৎকারভাবে তাদের অভিযান সুরু ক'রেছিল কি ক'রে! কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, তাদের জীবনের সারল্য, পরিশ্রমের সময়ে হাসি-মুখে তাদের সহগুণ, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে তাদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, বাইজ্যান্টাইন্-সভ্যতার বিলাসিতা হ'তে তাদের বিরতি এবং দরিদ্র-পীড়নের অনিচ্ছা—এই জিনিষগুলির মধ্যেই তাদের চরিত্র-গত বিশেষত্ব এবং আদর্শের পবিত্রতা লুকিয়ে ছিল। তারা সিরিয়া ও মিশর জয় ক'রলে। কিন্তু জয় ক'রলে—দেশ-শাসন ক'রতে নয়,—দেশের লোককে মুক্তি দিতে।

সমস্ত পার্থিব সাহায্য ও আশা থেকে বঞ্চিত হবার পর হজরৎ মহম্মদ গুহার ভিতরে ধর্ম্মপ্রাণ আবু বকর্-এর সঙ্গে একদিন যা কথা ক'য়েছিলেন, তা মনে রাখবার উপযুক্ত :—

আবু বকর্ হজরত্‌কে বললেন, "আমরা দুজনে এক পাশে প'ড়ে রইলুম।"

হজরৎ মহম্মদ বললেন, "না, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিই তৃতীয় ব্যক্তি।"

মহম্মদ ব'লতে চেয়েছিলেন যে, মানুষের সত্যকার শক্তি পৃথিবীর জড়-সম্পদের মধ্যে থাকতে পারে না। তা থাকে—অ-পার্থিব আশীর্ব্বাদের মধ্যে, যে-আশীর্ব্বাদ ঈশ্বর নিজের হাতে সর্ব্বদাই বর্ষণ ক'রছেন। মানুষের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের দূরে, পরমেশ্বরের পূজার মধ্যে এমন একটী বড় সম্পদ আছে, যা বাইরেকার কোনো জিনিষই এনে দিতে পারে না। বাহ্যিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেদিন বিদায় নেবে এবং মানুষের আত্মা যেদিন মুক্ত হবে, সেদিন মানুষ যে কী পবিত্র বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ ক'রবে, বর্ত্তমান সভ্যতার স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়ার মধ্যে তা ধারণা করা যায় না। 'বোধি'-বৃক্ষের তলে বুদ্ধের ত্যাগ,—গুহার মধ্যে মহম্মদের সাধনা,—এগুলি দ্বিতীয় বারের জন্য পৃথিবীতে আত্ম-প্রকাশ করে খুব কম। এবং এই প্রকাশের মধ্যে যে-প্রেরণা, যে-শক্তি ঘুমিয়ে থাকে, তা অনন্ত।...

এরই অন্তর্নিহিত সত্যটাকে মহাত্মা গান্ধী চিনেছেন এবং তারই কথা তিনি প্রচার ক'রছেন—সম্পূর্ণ এক অশ্রুতপূর্ব্ব উপায়ে। নাজারেথের যিশুর মতোই যেন তাঁর বাণী সমান গাম্ভীর্য্যে ফুটে উঠছে,—"তোমরা ঈশ্বর এবং ম্যামনের (ধন-দেবতার) পূজা ক'রতে পারবে না!" —"ঈশ্বর ত আমাদের সঙ্গেই আছেন।"—"আগে ঈশ্বরের রাজ্যের অনুসন্ধান করো!"—ধর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রত্যেক যুগই

সত্যের এই স্বর্গীয় বাণীকে জাগ্রত শক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের কাছে এনে দেয়। যাঁরা সমস্ত জিনিষ ত্যাগ ক'রে এই সত্যের বাণীকে একান্তভাবে গ্রহণ করেন, তাঁদের প্রায়ই 'উন্মাদ' ব'লে উপহাস করা হ'য়ে থাকে। স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগী জগতের কাছে যারপর নাই "নির্ব্বোধ" ব'লে তাঁরা আখ্যা পান। কিন্তু তাঁদেরই এই "নির্ব্বুদ্ধিতা" ঈশ্বরের সেই "নির্ব্বুদ্ধিতার" সঙ্গে সমান, মানুষের বুদ্ধির গর্ব্বকে যা ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। এবং তাঁদের "দুর্ব্বলতা," ঈশ্বরের সেই "দুর্ব্বলতার" সঙ্গে সমান, মানুষের দাম্ভিকতার তেজকে যা ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। মহাত্মা-সাধুদের সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতিরই ধর্ম্ম-পুস্তকে লেখা আছে :—"ঈশ্বরের প্রতি তাঁরা বিশ্বাস রাখেন।···ঈশ্বরই তাঁদের শক্তি।"—লোক-লোচনের অন্তরালে সেই পরম-পুরুষের সাক্ষাৎ পাবার জন্যই এই মহাত্মারা কী কষ্টই না সহ্য ক'রে থাকেন!···এইতেই ভগবদ্ভক্তি প্রকাশ পায়। মহাত্মা গান্ধী, কথার দ্বারা নয়, কাজের দ্বারা এই পবিত্র ভক্তির বাণীই প্রচার ক'রছেন,—"ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করো! তাঁর উপর নির্ভর করো! তাঁকে বিশ্বাস করো!"—এই বিশ্বাসের দ্বারাই মুশা, মহম্মদ, বুদ্ধ কিম্বা যিশুকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারা যাবে, এবং তাঁদের কার্য্যকে আর "উন্মত্ততা" ব'লে অপমান করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে থাকবে যে, পৃথিবীর ইতিহাস তাঁদের 'উন্মত্ততা'কেই সার সত্য ব'লে প্রমাণ করে দিয়েছে!···

রোম-দেশের মতো গরীবের রক্তলেহী সভ্যতার অস্তিত্ব ভারতে থাকা মনেই, রোমের সেই স্মরণীয় দুরদৃষ্টের সম্ভাবনা এখানে আশা করা নয় কি?···এইজন্যই, কৃত্রিমতা-পুষ্ট বর্ত্তমান যুগের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঋষি-গান্ধীজীর পুণ্যাত্মা যেন ছুটে যেতে চাইছে ঠিক সেইখানে, যেখানে মরুভূমির উন্মুক্ত বাতাস—মহম্মদের সারল্য ও দেব-ভক্তিকে সযত্নে গ'ড়ে তুলেছিল;—যেখানে উদার আকাশের তলে গ্যালিলির মাঠের তৃণকে ধন্য ক'রে নাজারেথের যিশু তাঁর প্রথম-শিষ্যদের কাছে ঈশ্বরের মানব-প্রীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন;—যেখানে প্রাচীন ভারতের তপোবন-আশ্রমে মানবের অন্তরে সত্যকার আত্ম-প্রকৃতির বিকাশ হ'য়েছিল;—যেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠে লোকেরা শিক্ষা ক'রতো—অনিষ্টের প্রতিদানে ইষ্ট দিতে এবং ঈশ্বরের সৃজিত সকলেরই প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'তে।

বর্ত্তমান-ভারতের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ কি শিখছে? শিখছে কেবল কতকগুলি কু-আদর্শ। শিখছে কেবল গরীবের রক্ত-শোষণ করবার ঘৃণ্য কৌশল। এই শিক্ষার দ্বারা সরলতা, কোমলতা এবং সত্যের অপমান হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে।

বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সাড়ম্বর বিলাসিতা যখন সুপ্রচুর মূল্যে এখানে ক্রয় করা হচ্ছে, অভাগা এই দেশের কত গরীব যে তখন নিরন্ন হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে তাদের অশ্রু-সজল প্রার্থনা নিবেদন ক'রছে, কে তার গণনা ক'রবে? গরীবের বন্ধু মহাত্মা গান্ধী তা গণনা ক'রেছেন। এবং তা ক'রে রক্ত-লোলুপ উক্ত সভ্যতার প্রতি দারুণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে, অসহায়ের আশ্রয় সেই পরম-পিতার কাছে অ-মনুষ্যত্ব-ধ্বংসকারী ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য চাইছেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যিশু-জননী মেরীর মুখ থেকে যে-কথা একদিন গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র প্রেরণায় উচ্চারণ হ'য়েছিল, গান্ধীজীর সারা অন্তর যেন তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে ব'লছে,—"আমার আত্মা সেই পরম-পিতার প্রশংসায় মুখর। আমার প্রাণ, আমার পরিত্রাতা পরমেশ্বরের ধ্যানে আনন্দ-বিভোর। তিনি আমার ক্ষুদ্রত্বকে মর্য্যাদা দিয়েছেন। তাঁর বাহুর দ্বারা তিনি শক্তি দেখিয়েছেন। গর্ব্বিত ব্যক্তিদের অন্তরের কল্পনাকে তিনি বিক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছেন। ক্ষুধার্ত্তদের তিনি সুখাদ্য দিয়েছেন, এবং ধনীদের তিনি ক'রেছেন নিঃস্ব!"

বিগত 'সভ্যতা' ও সাম্রাজ্যগুলির পতনের কারণ জানতে পারার জন্য, এবং উক্ত 'সভ্যতার' সেই প্রাচীন-পন্থী অসাধুতাকে বর্ত্তমান জগতে জয় করার জন্য, এবং প্রকৃতি-অনুগত মানব-জীবনের সরলতা ও সত্যকে চিনতে পারার জন্য, মহামানব গান্ধী আজ ভারতকে নবীন আশায় উদ্দীপিত ক'রেছেন। শক্তি তাঁর, আত্ম-বিশ্বাস! বন্ধু তাঁর—ভক্তির ভগবান!···

মহাত্মা গান্ধী-প্রার্থিত সরল এবং স্বাভাবিক জীবন একদিন অতীত-ভারতেরই সকলের চেয়ে বড় সম্পদ ছিল। তখনকার লোকেরা এই জীবনকেই ভালবাসতো,—বড় ভালবাসতো, এবং এর মধ্যেই সুখ পেতো, আনন্দ পেতো,

শান্তি পেতো। আক্রমণের ঝড় তাদের মাথার উপর দিয়ে যতই ব'য়ে যাক না কেন, তারা আবার এই শান্তিময় জীবনের মধ্যে ফিরে আসতো। দেশের প্রত্যেক নদী, সরোবর এবং পর্ব্বতকে তারা সশ্রদ্ধ প্রীতির চোখে দেখতো। জন্মভূমির মাটী তাদের কাছে কী পবিত্রই না ছিল। কত বিজেতা রাজাই তাদের দেশকে উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে যেতো। কিন্তু তারা বরাবরই তাদের একান্ত-প্রিয় সারল্য-ভরা জীবন অবলম্বন ক'রে সুখী হ'তো, প্রীত হ'তো।···কিন্তু তাদেরই দেশ এই ভারতবর্ষ যেদিন থেকে পাশ্চাত্যের প্রভাবাধীন হ'য়ে প'ড়লো, সেইদিন থেকেই তাদের কোমল এবং সারল্যভরা জীবন আহত হ'য়ে প'ড়লো। এইজন্যই, আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক শক্তির দ্বারা প্রাচীন ভারতের হাতে-তৈরী যে-বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হ'তে চ'লেছে, তাকে রাহু-গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে রকম আ-প্রাণ চেষ্টা ক'রছেন, ঠিক সেই রকমই তিনি চেষ্টা ক'রছেন—আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষার দ্বারা প্রাচীন ভারতের প্রায়-ধ্বংসশীল কোমল ও সরল জীবনকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্য। তাঁর এই পবিত্র প্রচেষ্টাকে, ঘৃণ্য মনোবৃত্তিযুক্ত কোনো কোনো লোক যে অবাঞ্ছনীয় স্পর্দ্ধায় উপহাস ক'রছেন না, তা নয়। তাঁরা "গান্ধী টুপী"কেও আক্রমণ ক'রতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। এমন কি, তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি (ব'লতে ঘৃণা হয় যে, ইনি ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ ক'রে, ভারতেরই অন্নজলে বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট হ'য়েছেন। ইনি হিন্দু এবং ডাক্তার।) এ রকম কথাও লিখতে (১৯২১ সালের একখানি ইংরাজী পত্রিকায়) কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নি যে, "গান্ধীর সাধারণ-তন্ত্রের জগৎ হচ্ছে টলষ্টয়ের সাধারণ-তন্ত্রের জগতের মতো। তার মধ্যে প্রত্যেক লোক, জঙ্গলের সুখী, বুনো জন্তুর মতো প্রকৃতির অবস্থায় বসবাস করে।"

"জঙ্গলের সুখী, বুনো জন্তুর মতো"—এই ঘৃণ্য কথা-গুলো ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর। এই অপমানকর কথাগুলোর সার্থকতা কোথায়, তা বিচার করবার প্রয়োজন এখানে নেই। উক্ত শ্রেণীর লেখকদের কাছে, মহাকবি গ্যেটের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত কালিদাস-লিখিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"-এর তপোবন-আশ্রমের পবিত্র, স্নিগ্ধ চিত্র কি-রকম বরদাস্ত হবে, তা জানবারও দরকার নেই। এখানে শুধু এইটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে, লক্ষ্মণকে সঙ্গী ক'রে, সীতাকে নিয়ে অরণ্যের মধ্যে রামের নির্ব্বাসিত জীবনের কাহিনী, প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রাণে বন-আশ্রম-জীবনের যে-মধুর আদর্শটিকে এনে দেয়, তা অতুলনীয়। এই আদর্শকেই মহাত্মা গান্ধী ভালবাসেন। এ-ভালবাসাকে তিনি কাজের দ্বারা গৌরবান্বিত ক'রতে চান। এদিক দিয়ে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা—দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস্‌বার্গ্ থেকে একুশ মাইল দূরস্থ একটী স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত "টলষ্টয়-আশ্রম"। বাস্তবিকই এই আশ্রম যেন টলষ্টয়ের-ই চিন্তা-ধারার অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত ছিল। সরল জীবন-যাত্রা এবং উন্নত চিন্তাই ছিল এই আশ্রমের আদর্শ। মহাত্মা গান্ধী তখন জোহানেস্‌বার্গে আইন-ব্যবসা ক'রতেন। কিন্তু আধুনিক সহরের তথা-কথিত সভ্যতা তাঁর কাছে স্রেফ্ ফাঁকা এবং মূল্যহীন ব'লেই প্রতিপন্ন হ'লো, এবং হিন্দুর আদর্শ অনুযায়ী, সে-সভ্যতাকে তিনি অপরাধী ব'লেই মনে ক'রলেন। এরপর-ই তাঁর কর্ত্তব্য সুরু হ'লো। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক উচ্চ-শিক্ষিত এবং স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগী ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত এসে, "টল্‌ষ্টয়-আশ্রমে" তাঁর সঙ্গে লাঙ্গল ধ'রলেন এবং জমি চাষ ক'রতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই রেল ও অন্যান্য বিলাসিতা-ও বর্জ্জন ক'রলেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর দ্বিতীয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন—নেতালের মধ্যে ফিনিক্স-নামক স্থানে। চারিদিকে সুন্দর পাহাড়-ঘেরা এই আশ্রমটীর কাছেই সাগর ব'য়ে গেছে। বাণিজ্য-প্রধান আধুনিক সহর ডারবানে-র কর্ম্ম-কোলাহল হ'তে প্রায় ১৭ মাইল দূরে, ধ্যান-মগ্ন তপস্বীর মতো শান্তি ও শুচিতা ছড়িয়ে এই আশ্রমটী অবস্থিত। আশ্রমটীর সীমানার মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ কতকগুলি বাস-ভবন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে চাষের জন্য জমি সংযুক্ত। মাঝখানকার বাড়ীটী কেবল সৎ গ্রন্থের পাঠাগার। এই পাঠাগারের মধ্যে উপাসনার কাজও হ'য়ে থাকে। কিন্তু এ-আশ্রমের সকলের চেয়ে সুন্দর এবং পবিত্র জিনিষ—সাম্য-ভাব।···শ্বেতাঙ্গী না হওয়ার জন্য নেতালের "জুলু"-মেয়েরা খৃষ্টীয় গির্জ্জায় প্রবেশাধিকার পেতো না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম ছিল শান্তি ও প্রেমের স্বর্গ। সেখানে মানুষ এক। জাতিগত কিম্বা

ধর্ম্মগত পার্থক্য সেখানে নেই। "অস্পৃশ্য"-মেয়েদের জন্য সে-আশ্রমের দুয়ার নিত্য-উন্মুক্ত থাকতো।

মহাত্মা গান্ধীর তৃতীয় আশ্রম—সবরমতি। কারখানার ধোঁয়ায়-ভরা, কর্ম্ম-কোলাহল-মুখর আধুনিক সহর আমেদাবাদের অনতিদূরেই এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত। এইখানে দুটী পরস্পর-বিরোধী জিনিষ লক্ষ্য করবার মতো। একদিকে নিষ্ঠুর কারখানা-দানবের কবলে কত-শত পুরুষ ও নারী জীবন্মৃত হ'য়ে নিরানন্দ দিনগুলি কাটাচ্ছে;—আর একদিকে, স্নিগ্ধ, পবিত্র, শীতল-সলিলা সবরমতি-নদীর তীরে হাতের সাহায্যে কত নীরবে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চরকায় সুতা-কাটা চ'লেছে—কী স্বাভাবিক এবং আন্তরিক আনন্দের অনুপ্রেরণার ভিতর দিয়ে। এই সবরমতি-আশ্রমে লোকে কৃষি, মাতৃভাষা, হিন্দী-ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা পায়। উপাসনার সময়ে "গীতা"র গুঞ্জন প্রত্যহ এখানকার আকাশ-বাতাসকে পবিত্র করে, ধন্য করে। এখানেও প্রেমের সেই সাম্য ভাব, এবং সারল্য ও শ্রম-মর্য্যাদার প্রতি বিশ্বাস অটল হ'য়ে আছে। এখানেও প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবন-যাত্রা অভিপ্রেত, এবং সমস্ত প্রকার বিলাসিতা পরিত্যজ্য। তার একমাত্র কারণ, প্রকৃতি দেয় আত্মিক শিক্ষা, কিন্তু বিলাসিতা দেয়—মানুষের কাছ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবার এবং সত্যকার ভ্রাতৃভাবকে বিনষ্ট করবার কু-শিক্ষা।...

অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সবরমতি-আশ্রমের অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর উপরি-উক্ত পবিত্র আদর্শকে যাঁরা "জঙ্গলের সুখী, বুনো জন্তুর" জীবনের সঙ্গে তুলনা করেন, অর্থাৎ বিদ্রূপ করেন, তাঁদের এই ঘৃণ্য জঘন্য বিদ্রূপের কি-রকম বিচার হওয়া উচিৎ? তাঁদের ওই বিদ্রূপ কি একান্তভাবেই বিদ্বেষ, অথবা, গাত্রদাহ, অথবা, মনুষ্যত্বহীনতা, অথবা, নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয়? প্রকৃতি-জীবনের সঙ্গে যে বন্য-জন্তুর জীবনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, তা সদ্যজাত শিশু পর্য্যন্ত-ও জানে।...গান্ধীজীর উক্ত প্রকৃত প্রকৃতি-জীবনের মধ্যে দুঃখ নাই,—আছে ত্যাগের আনন্দ, ধ্যানীর সুখ, আত্মিক তৃপ্তি।...গান্ধীজীর আদর্শ ধ্বংসকারী নয়,—তা রক্ষা করে। তাঁর আদর্শ ফাঁকা, অলীক স্বপ্ন নয়;—তা নূতন এবং পবিত্র এক জীবনের সাড়ায় শক্তিমান। এই নূতন জীবন আধুনিক সভ্যতাকে ঘৃণা করে, তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় এবং ঈশ্বরের কাছে মনুষ্যত্বের প্রার্থনা করে।

আজ থেকে বহুদিন আগে ভারতের-ই এক শ্রেষ্ঠ মানব, ত্যাগী তপস্বী—স্বামী বিবেকানন্দ-ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ঘৃণা ক'রতেন। তাই তিনি তাঁর মূল্যবান বাণী দিয়েছিলেন:—

"একদিকে, নব্য ভারত ব'লছেন, 'পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন ক'রলেই, আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের মতো বলবীর্য্যবান হবো।'—অপর দিকে, প্রাচীন ভারত ব'লছেন, 'মূর্খ! অনুকরণের দ্বারা পরের ভাব নিজের হয় না। অর্জ্জন না ক'রলে, কোনো জিনিষ-ই নিজের হয় না। সিংহের চর্ম্মে ঢাকা হ'লেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?'—একদিকে, নব্য ভারত ব'লছেন, "পাশ্চাত্য জাতিরা যা করে, তা-ই ভাল। ভাল না হলে, তারা এত প্রবল হ'লো কি করে?'—অপর দিকে, প্রাচীন ভারত ব'লছেন, 'বিদ্যুতের আলো অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। বালক! তোমার চক্ষু প্রতিহত হচ্ছে, সাবধান!'—"

পাশ্চাত্য "সভ্যতার" কৃত্রিম আলোয় ভারতের স্বাভাবিকতা, ভারতের বৈশিষ্ট্য যাতে না আহত হয়, মহাত্মা গান্ধীও তাই ব'লেছেন, "এখনও সময় আছে, সাবধান!"—আত্মরক্ষার জন্য এই উপদেশ, শুধু ভারত কেন, অবনতির পথে নেমে-যাওয়া পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের কাছেই অমূল্য।

লীলাশেষ

—গল্প—

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম্-এ

ভাদ্র মাস। পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র ভাসা ভাসা মেঘের উপর এক এক বার আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল এবং পর মুহূর্ত্তেই ত্রস্ত-পদা হরিণীর ন্যায় মেঘরাশির মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া ফেলিতেছিল। মর্ম্মর প্রস্তরের প্রাসাদস্থিত কেলিগৃহে সম্রাট স্বর্ণ-পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া নব-বিবাহিতা সম্রাজ্ঞীর রূপ-রাশির হিল্লোল দর্শন করিতেছিলেন। তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। নিশাচরগণ ব্যতীত পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীই নিদ্রা-দেবীর শান্ত-শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিভোর। সম্রাটের চক্ষে কিন্তু নিদ্রার লেশ নাই। আজ কয়েক দিন হইল সারা বিশ্ব মন্থন করিয়া যে অনিন্দ্য-সুন্দরীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, সম্রাট তাহাকে দাম্পত্য-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার স্বর্ণ বিমণ্ডিত প্রাসাদের জয়ধ্বজা হিসাবে বরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। কয়েক দিবস গত হইয়াছে, কিন্তু মোহের এখনও অবধি কোনই নিবৃত্তি হয় নাই। সুরার আবেশ আসিলে সমস্ত পৃথিবীকে যেমন রঙ্গিন করিয়া দেয়, এই রূপসীর রূপ সম্রাটের নিকট সেই-রূপ এক নব-সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল। সে সমস্ত রত্ন-রাজী তাঁহার নিকট অর্থহীন হইয়া ভারবহ-রূপে প্রতীয়মান হইতেছিল সেই সমস্ত রত্ন হঠাৎ কেমন মন-মাতানো আকর্ষণে সম্রাটের দেহ ও মন উভয়ই আকর্ষণ করিতে লাগিল। যে প্রাসাদ মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার নিকট একরূপ অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, সেই প্রাসাদেই কে যেন মন্দার পুষ্পের গন্ধ বহিয়া আনিয়া তাকে পরম উপভোগ্য বস্তুতে পরিণত করিয়া দিল। যে সমস্ত সহচর তাঁহার নিকট বিদূষক মাত্র জ্ঞানে ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিতেছিল, তাহারা যেন হঠাৎ কি সম্মোহন মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত হইয়া পূর্ব্বকার পরমাত্মীয়ের সিংহাসন দখল করিয়া বসিল। কয়েকদিন হইতে রাজধানীতেও অবিশ্রান্ত উৎসব-স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। রাত্রে প্রত্যেক গৃহ হৈম দীপে দীপান্বিত হইয়া অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিতেছিল। নানা প্রকার পুষ্পদাম দিয়া নগরের তোরণ দ্বার-গুলি বিভূষিত হওয়ায় সমস্ত সহরে অমরাবতীর দেব দুর্লভ সুগন্ধ উদ্ভাসিত হইয়া যাইত। নাগরিকগণের উচ্ছ্বাসে, বিলাসিনীগণের বিবিধ সঙ্গীত আলাপনে, সন্ধ্যায় অব্যবহিত পরেই সমস্ত নগর এক বিরাট কেলিগৃহে পরিণত হইয়া পড়িত।

সম্রাট দেখিতেছিলেন তাঁহার প্রিয়ার রূপ। তাঁহার মনে হইল যেন দেব-কল্পিত তিলোত্তমা আর কবির কল্পনার সামগ্রী নাই, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার ভোগের জন্য সশরীরে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সম্রাটের স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিল যে শতদলবাসিনীর শ্বেত শুভ্র বর্ণের সহিত, বিষ্ণু-প্রিয়ার নিরবদ্য মুখ মণ্ডলীর অপূর্ব্ব সংযোগে এই অভিনব রূপের উৎস সৃষ্ট হইয়াছে। পদ-যুগলের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার মনে হইল এই যে সুন্দরী এখন শায়িতা ও নিদ্রিতা কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সে যখন নৃত্য করিতেছিল তখন তাহার হাব-ভাবের নিকট যে কোন সুর-সুন্দরী পরাস্ত স্বীকার করিত। মৃদুমন্দ পবন-তাড়িত অলক-রাজির দিকে দৃষ্টি পড়ায় সম্রাট স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুন্দরীর কুন্তল দাম তাঁহার মনে হইল ভ্রমরের বর্ণ অপেক্ষাও কৃষ্ণ এবং বহুমূল্য রেশম অপেক্ষাও কোমল। ভুজ বল্লরী দুইটী বিবিধ রত্না-ভরণে সুশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল—তাহার যথার্থ রূপ প্রকাশের ভাষা না পাইয়া সম্রাট আত্ম-হারা হইয়া পড়িতেছিলেন। রূপ এবং ভোগ সম্রাটের নিকট মূর্ত্তিমন্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

কেলি-গৃহটী ক্ষুদ্র হইলেও বেশ প্রশস্তই ছিল। উহারই সন্নিকটে একটী গোলাপ জলের ফোয়ারা অনবরত বহিয়া যাইতেছিল। কেলি গৃহের বাহিরে রাণীর বয়স্যারা দণ্ডায়-মান হইয়া প্রবল বেগে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছিল, তাহাতেই কেলিগৃহ মধ্যে বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতে-ছিল। হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সম্রাট সম্রাজ্ঞীকে বাহুপাশে

আবদ্ধ করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। প্রেমিকের দীর্ঘ নিশ্বাসে মহারাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আপনাকে সম্রাটের বাহুপাশ মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনী কয় প্রহর হইয়াছে?' লজ্জিত সম্রাট একটুখানি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, 'মহারাণী মাপ করিও, তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিলাম। এখনও রজনী গাঢ়ই আছে, এইমাত্র এক প্রহর অতীত হইয়াছে।" রাণী একটুখানি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ কি তবে জাগ্রতই আছেন?" সম্রাট একটু আত্ম-হারা ভাবে উত্তর করিলেন, "সত্য মহারাণী, তোমার রূপ আমাকে পাগল করিয়াছে, যতই ভোগ করি, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়, দিবাভাগকে যদি রাত্রিতে পরিণত করিতে পারিতাম তা হইলে হয়ত আরও কত সুখী হইতাম। রজনী প্রভাতে আবার কার্য্য, চিন্তা, কর্ত্তব্য, কতকগুলা বিসদৃশ্য দৃশ্য আসিয়া দেখা দিবে, অপেক্ষা করিতে হইবে এই মধুর রজনীর জন্য। কিন্তু রজনীর ঘণ্টাগুলি দিনমান অপেক্ষা কত অল্প'।

মহারাণী হাসিলেন, কিন্তু কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি রাজার চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া দেখিলেন, সমগ্র ধরিত্রীর সম্রাট তাঁহার নিকট আজ কেমন ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় সমাসীন হইয়া আছেন। নয়নে দারুণ ক্ষুধা, হৃদয়ে ভীষণ আকাঙ্ক্ষা, তাই মস্তিষ্কের কোন সত্ত্বা পাওয়া যাইতেছে না। মহারাণীকে নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, 'মহারাণী তুমি কত সুন্দর। আমি এই মাত্র ভাবিতেছিলাম তিলোত্তমা সুন্দরী ছিল সত্য, কিন্তু তাহা বোধহয় কবির কল্পনা মাত্র। কিন্তু তোমার দেহে সরস্বতীর রং, লক্ষ্মীদেবীর মুখ-গরিমা, স্বর্গ-বিলাসিনিগণের মত্ততা, সব একত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমার এই রাজ্যে এমন কোন চিত্রকর নাই যে, তাহার নিপুণ তুলিতে তোমাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, এবং এমন কোন ভাস্করও নাই যে সে পাথরে তোমার আদর্শকে খোদিত করিয়া অমরত্ব দান করিতে পারে। মাত্র কোন মহাকবির লেখনীর মুখে তোমার রূপ ব্যাখ্যাত হইতে পারে, অন্যভাবে হওয়া অসম্ভব। দেখ দেখ, তোমার স্বর্ণখচিত নীলাম্বরী মৃদু মৃদু বাতাসে ঈষৎ চালিত হইয়া তোমার মুক্ত কেশদামের উপর পড়ায় কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে।' মহারাণী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজার বাহুপাশে আবদ্ধ থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু মহারাজ যাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না জানিতেছেন, তাহাকে আরও ব্যগ্রতার সহিত ধরিতে যাওয়া কি উন্মাদের কার্য্য নয়। মাটীর মানুষ রূপে রসে, গন্ধে ফুটিয়া উঠে ঐ বাগানের পারিজাতেরই মত, ঐ ফুলও একদিন ঝড়িয়া পড়বে মাটীরই উপর, মিশাইয়া যাইবে ঐ মাটিরই সহিত; আমিও ত তাই যাইব, মহারাজ।" একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাজ বলিলেন, "সাম্রাজ্যের বিনিময়ে যদি তোমাকে অমর করিতে পারি, তাহাতে আমি রাজী আছি, কিন্তু তাকি সম্ভব।' সম্রাট-রমণী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যদি সম্ভবই হয়, তাতে কি ভোগ বাসনা মাখানো থাক্‌তে পারে। সমস্ত জিনিষের জন্ম, বিকাশ, ঝড়িয়া পড়া ও মৃত্যু আছে। রমণী জন্মায় পিতৃগৃহে, ভরা যৌবন লইয়া আসে স্বামীর ভোগের জন্য, যৌবনান্তে পুত্রের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া, ঐ পারিজাতেরই মত ঝরিয়া পড়ে। মদিরায় নেশা আনয়ন করে, নেশা কাটিয়া গেলে অন্তরে বিষাদ টানিয়া আনে। ভোগে আশঙ্কা বৃদ্ধি করে মাত্র—ভোগের দ্বারা উহার নিবৃত্তি করিতে গেলে, বাসনার বৃদ্ধি হয়; ত্যাগই মুক্তির পথ দেখায়,—মানুষকে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও চির যৌবনের মধ্যে লইয়া যায়।' মহারাজ বলিলেন, 'রাণী, তোমার বাক্যগুলা আজ আমার নিকট কেমন বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হইতেছে। তোমার সহিত বাক্য-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কোন ইচ্ছা নাই; চল ঐ জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত উদ্যান বাটিকায় যাই। ঐ ফোয়ারার ধারে বসিয়া তোমার অপ্সরী-নিন্দিত কণ্ঠে একটা গান গাহিবে চল'। মহারাণী বলিলেন, 'চলুন, মহারাজ'।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। রাজদম্পতীর উৎসবময় দিনগুলি বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল। মহারাণী এখন আর মাত্র বিলাসের সামগ্রী ন'ন, তিনি রাজার উপদেষ্টার পদও অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রাজ্যের তাবৎ সুখ-দুঃখের কথা এবং পরামর্শ মহারাজ মহারাণীর সহিত নিয়মিত ভাবে করেন। একদিন দ্বিপ্রহরের ভোজনান্তর মহারাজ শয়ন কক্ষে শায়িত আছেন, মহারাণী সন্নিকটে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজনী সঞ্চালনে হাওয়া করিতেছেন, তখন মহারাণী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ

তোমার সাম্রাজ্যটা আমি একবার পরিদর্শন করিতে চাই।” রাণীর কথার উত্তরে মহারাজ একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, ‘সে ত একটা বিরাট কারখানা মাত্র, সেখানে ভোগের দ্রব্য সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে কোন সৌন্দর্য্য নাই, কোন গীত নাই, কোন তাল নাই, আছে খালি কাজ, নির্ম্মম কাজ, হৃদয়হীন কর্ত্তব্য এবং রক্ত শীতলকারী উৎসাহ। সেখানে তুমি গমন করিলে, তোমার বিশেষ কষ্ট হইবে, মহারাণী।’ মহারাজার কথার কোন উত্তর না দিয়া মহারাণী বলিলেন, ‘আমি চাই তাদেরই দেখিতে, যারা আমাদের এই ভোগের দ্রব্যগুলা সৃজন করিতেছে। আমি চাই একবার তাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে। সাম্রাজ্যের মহারাণী তাহার পুত্র সম প্রজাদের সযত্নে নির্ম্মিত বিবিধ ভোগ করিবার সামগ্রী উপভোগ করিয়া আসিতেছি, আমি এই প্রাণ-প্রিয়তম প্রকৃতিপুঞ্জকে একবার দেখিতে চাই।’ মহারাজ একটুখানি বিব্রত হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে ; কল্যই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। কিন্তু আমি বলিতেছি মহারাণী সে রাজ্যে আলো' নাই, হাওয়া নাই, গন্ধ নাই, রূপ নাই ; সত্যই সে একটা বিরাট কারখানা ; সুতরাং তোমার শরীর ও মনের স্বচ্ছন্দতা রক্ষার জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন অনুভব করিবে, তাহাদের সকলগুলিই সঙ্গে লইও ; কোনটী লইতে ভুলিলেই কষ্ট হইবে এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার প্রবৃত্তি আসিয়া দেখা দিবে।’ মহারাণী মহারাজার দিকে মুখ রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, ‘প্রয়োজন বোধ করি ত সঙ্গে লইব।’

পরদিন মহারাণী তাঁহার যন্ত্রকলা ও সোমলতা নামক সখীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া রাজ-প্রহরী প্রদর্শিত পথে পদব্রজে চলিলেন। মহারাজার আদেশ ছিল যে, মহারাণী যেরূপ আদেশ করিবেন রাজভৃত্য তাহাই পালন করিবে, তাই মহারাণীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজ-প্রহরী একটা প্রকাণ্ড লৌহ-দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দরজার বিশালতা যেমন ভয়াবহ, উহার আকৃতিও সেইরূপ ভীতি-প্রদ। রাজ-ভৃত্যের আদেশে মুহূর্ত্তের মধ্যে দ্বার আপনা-আপনি সরিয়া যাইয়া উন্মুক্ত হইয়া গেল, সম্মুখেই এক প্রশস্ত রাজপথ নয়ন-পথে ভাসিয়া আসিল। মহারাণী প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া সখী দ্বয়ের সহিত সিংহ দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রশস্ত রাজপথে পড়িলেন। এই রাজপথের দুই ধারে বড় বড় কারখানা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া অনবরত ধূম বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। রাণী প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহগুলি কিসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে ? প্রহরী উত্তর করিল উহারাই কারখানা গৃহ। কোথাও বা লৌহ তৈয়ারী হইতেছে, কোথাও বা খানি হইতে তৈল উত্তোলন করা হইতেছে, আবার কোথাও বা পরিধেয় বস্ত্র ও পাদুকা নির্ম্মিত করিতেছে।’ প্রহরীর কথায় রাণীর কৌতূহল উত্তেজিত হইয়া উঠায় তিনি বলিলেন, “দৌবারিক আমাদিগকে ঐ একটী গৃহের মধ্যে লইয়া চল।’ কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহারাণী দেখিলেন দানব-তুল্য কতকগুলা যন্ত্র কি এক ভীষণ আর্ত্ত-নাদ করিয়া অনবরত প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে। কতকগুলা মানব কালিমধি মাখিয়া তাহারই সন্নিধানে কি টানিয়া লইতেছে এবং টানিয়া দিতেছে। একটু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এই যন্ত্রগুলা কেবলই কাপড় বয়ন করিয়া তাহার গাট বাঁধিয়া বাঁধিয়া বস্ত্রের কৃত্রিম পাহাড় রচনা করিয়া যাইতেছে। সেখান হইতে বহির্গত হইয়া অন্য কারখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পৃথিবীকে মথিত করিয়া কি এক যন্ত্রে অনবরত তৈল উত্তোলন করা হইতেছে, এই কার্য্যে স্বয়ং ধরণী দেবী যেন এক অরন্তুদ শব্দে ভীষণ চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু বিরাট দেহ দানবগুলা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাহাকে মন্থন করিয়া চলিয়াছে। সেখান হইতে নির্গত হইয়া রাণী আর তাহার সখিদ্বয় অন্য কারখানায় প্রবেশ করিয়াই ভীষণ চমকাইয়া উঠিলেন। শত সূর্য্যের তেজকে অগ্রাহ্য করিয়া এক ভীষণ অগ্ন্যুৎসব চলিয়াছে। লৌহ গলিত হইয়া জলের ন্যায় বহির্গত হইয়া আসিতেছে। কর্ম্ম-নিরত মানবগণ তাহা হইতে বিবিধ সামগ্রী উৎপন্ন করিতেছে। রাণী এই দারুণ গরমে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া সখীদিগকে চামর দুলাইয়া তাঁহাকে হাওয়া করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সন্নিকটে একজন কর্ম্মচারী রাণীকে এইরূপ বিপদগ্রস্তা দেখিয়া একজন সঙ্গিকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহা-দিগকে ‘হাওয়া-ঘরে’ লইয়া যাইতে আদেশ করিল। উক্ত সঙ্গি অভিবাদন করিয়া রাণী এবং তাঁহার সখীদের লইয়া হাওয়া ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণীর মনে হইল,

তিনি যেন সহসা বরুণের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথিবীর তাবৎ হাওয়াই যেন এখানে একত্রে বিশেষ করিয়া স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। মহারাণী কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর প্রহরীকে মহারাজ যেখানে অবস্থিত সেখানে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। প্রহরী আদেশ প্রাপ্তিমাত্রই মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া মহারাজার বিরাট কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাণী দেখিলেন, সমস্ত কক্ষটা বিবিধ অংশে বিভক্ত এবং মহারাজ উহারই একটী অংশে একটী প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে একটী সিংহাসনে উপবিষ্ট। টেবিলের উপর স্তূপাকারে বিবিধ কাগজ সাজান আছে। তাঁহার কর্ম্মচারীরা অনবরত মনোযোগ সহকারে রাজাদেশ লিখিয়া লইতেছেন। রাণীকে হঠাৎ তাঁহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া চলিলেন। রাণী ধীরে ধীরে রাজার আসনের নিকট আসিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি হস্ত দিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা রাণীর প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, মহারাণী।' নিকটেই একটী আসন দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ঐখানে বস; আমাকে এই পত্রগুলি শেষ করিতে দাও।' বিনা বাক্যব্যয়ে রাণী ও তাঁহার সখীরা রাজারই সন্নিধানে এক একটী আসনে উপবেশন করিয়া দেখিতে লাগিলেন রাজার কাজের শেষ নাই। মস্তবড় এক একটী আধারে নানা প্রকার কাগজ তাঁহার টেবিলে আসিয়া স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং মহারাজ একে একে সে সমুদায়ই পরীক্ষা করিয়া ও তাহাদের উপর আপনার আদেশ লিখিয়া দিয়া আবার ঐ আধারেই নিক্ষেপ করিতেছেন। এক একটী আধার আবার কাগজে ভরিয়া উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। মহারাণী কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থকিবার পর একটু বিরক্তা হইয়া আবার উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "মহারাণী আমার এই বিশেষ অমাত্যকে তোমার সহিত দিতেছি এখনও যে সমস্ত স্থল পরিদর্শন করিতে তোমার বাকী আছে ইনি সেইগুলি তোমাকে দেখাইয়া দিবেন। তুমি একটু ঘুরিয়া আইস, তাহার পর উভয়ে একত্রে যাত্রা করিব।' মহারাণী এই কথার কোন উত্তর না দেওয়ায় মহারাজের আদেশানুযায়ী তাঁহার অমাত্যশ্রেষ্ঠ রাণীর অনুগমন করিল। সভাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া মহারাণী মন্ত্রীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই যে লোকগুলা কার্য্য করিতেছে, এরা কোথায় বাস করে? ইহাদের কি গৃহ নাই; স্ত্রী-পুত্র পরিবার নাই? অমাত্যবর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, উহারাও যখন মানুষ তখন উহাদেরও গৃহাদি না থাকিবে কেন? মহারাজ তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে স্থান যদি দেখিতে চাহেন ত তথায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারি।' ঈষৎ মস্তক হেলাইয়া তথায় যাইবার অভিলাষ জানাইলে অমাত্যবর মহারাণীকে সঙ্গে করিয়া এক সুরঙ্গ পথে পাতাল পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হয়না সত্য, কিন্তু সেখানে আলোকের ও বাতাসের কোন অভাব নাই। হাওয়া কোথা হইতে আসিতেছে জিজ্ঞাসা করায় অমাত্যবর উত্তর করিলেন "উপরে যে হাওয়া ঘর আছে সেইখান হইতে এখানে বাতাস সঞ্চালন করা হইতেছে। রাণীকে অমাত্যবরের সহিত প্রবেশ করিতে দেখিয়া কতকগুলা অস্থিচর্ম্মসার বালক-বালিকা দৌড়াইয়া আসিয়া কেমন হতভম্বভাবে মহারাণীর দিকে তাকাইয়া রহিল। পুত্রস্বাদ বিবর্জ্জিতা মহারাণী তাহাদের একজনকে কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের মা কোথায়?' ভীত-বালক মহারাণীর ভাষা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেমন যেন এক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। মহারাণীও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বালককে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন। বালকটীও যেন ভয় পাইয়া দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। তাহার ভীতিভাব দেখিয়া অপরাপর বালক-বালিকারাও দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। বিস্ময়-বিহ্বলা মহারাণী অত্যন্ত কাতর ভাবে অমাত্যবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক তাঁহার সহিত কথা কহিলনা কেন

অমাত্যবর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মহারাণী উহারা মানব হইলেও উহাদের ভাষা বিভিন্ন। যাহারা আমাদের সহিত অনবরত মেলমেশা করে তাহারাই আমাদের ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। উহারা বালক, আপনার ভাষা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় কিছু ভীতই হইয়াছিল সুতরাং উত্তর কি দিবে।'

রাণী একটুখানি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'উহারা সকলেই অত ত্রস্তপদে পলায়ন করিল কেন?' অমাত্য শ্রেষ্ঠ উত্তর করিলেন, 'মহারাণী, উহারা মানব-শিশু সত্য, সকলেই জননীর সন্তান তাহাও ঠিক, কিন্তু উহারা মাতার ক্রোড় কি তাহা জানে না। অতি শৈশবে মাতৃ-স্তন্য পান করে সত্য, তাহা শয্যায় শয়ন করিয়া। কাজেই মাতৃ-প্রেমে আত্মবিহ্বলা যখন আপনি উহাদেরই একজনকে ক্রোড়ে করিলেন, তখন সে দৃশ্যে উহারা সম্ভবতঃ ভয়ই পাইয়াছিল, তাই আপনার ক্রোড়স্থ বালকটীকে মাটীতে অবতরণ করাইয়া দিলেই সকলেই দলবদ্ধভাবে পলাইয়া গেল।' মহারাণী একটুখানি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'উহাদের জননীরা কোথায়?'

অমাত্যশ্রেষ্ঠ বলিলেন, 'এখন তাহারা সকলেই ঐ উপরের কারাখানাগুলিতে গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কারখানা ছুটি হইলে তাহারা আবার আসিবে।' মহারাণী এই মন্তব্যে একটুখানি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'চলুন বাহিরে যাই, যেখানে আপনাদের সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য একত্রিত হইতেছে সেইখানে লইয়া চলুন'।

শীঘ্রই অমাত্যবরের সহিত মহারাণী এক বিস্তৃত ময়দানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নানা প্রকার স্তূপীকৃত দ্রব্য একত্রিত ভাবে সজ্জিত দেখিয়া বলিলেন, 'এই সমস্ত দ্রব্যের কিরূপে বণ্টন হইবে।' মহারাণীর প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অমাত্যবর বলিলেন, "মহারাজই তাবৎ দ্রব্যের একমাত্র মালিক। যে সমস্ত মজুর এই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে, তাহারা তাহাদের ভরণ-পোষণ পাইতেছে। মহারাজের কারখানা না থাকিলে পৃথিবী হইতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইত। মহারাজ স্বয়ং ভগবানের ন্যায় তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।' মহারাণী বলিলেন, 'তা হইলে ঐ লোক গুলাকে আপনারা খাটাইতেছেন—ঐ একজন মহারাজের সেবার জন্য।' অমাত্য স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "লোকগুলা একমাত্র মহারাজের অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করিয়া এখনও জীবিত আছে।"

রাত্রে মহারাজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহারাণী দক্ষিণের দরজা খুলিয়া দিয়া কেমন একটু অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার বেশ-বিন্যাসের পারিপাট্য নাই। সামান্য একখানি ঈষৎ গোলাপী রঙের সাড়ী পরিধান করিয়া, অযত্ন-বদ্ধ চিকুররাশি গ্রীবার উপর দিয়া বক্ষোপরি ও পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া দিয়া আনমনে বাহিরে কি যেন দেখিতেছিলেন। মহারাজ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মহারাণীর নিকট আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত স্থাপন করিলেন। চকিতা মহারাণী পশ্চাৎ ভাগে চাহিয়া কান্তের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইয়া যাওয়ায় একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'দেখুন মহারাজ, ঐ দূর আকাশে মেঘগুলার উপর চন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। আরও দেখুন, ঐ নক্ষত্রগুলা গগনমার্গে বিকশিত থাকিয়া কেমন মনোরম আকার ধারণ করিয়াছে।' মহারাজ দেখিলেন, দৃশ্যটা সামান্যই। অপরাপর দিন ইহা অপেক্ষাও অধিক মনোরম দৃশ্য আকাশপটে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; রাণীর মনোভাব খানিকটা যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, 'আরও কত সুন্দর তুমি আমার প্রিয়া। সারা আকাশটা যেন চাঁদ ও নক্ষত্ররূপ শত শত চক্ষু বাহির করিয়া তোমাকে অবিশ্রান্ত দেখিয়া চলিয়াছে, যেন এ দেখার বিরাম নাই, এ ভোগ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, এ মোহের নিবৃত্তি নাই। আরও দেখ, সঙ্কুচিত পবন কেমন ধীরে ধীরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার কেশদামগুলিকে নাচাইয়া নাচাইয়া তোমার গ্রীবার ও স্কন্ধের উপর ফেলিয়া দিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিতেছে। এ সৃষ্টির কল্পনা করিতে গেলে আদিম নরের চক্ষে নগ্ন-দেহা আদিম নারীর যে মূর্ত্তি ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহাকেই রূপ দিতে হইবে।" মহারাণী মহারাজার নিকট আত্মপ্রশংসা শুনিতে বেশই অভ্যস্তা ছিলেন। অন্যদিন হইলে কৃত্রিম বিরক্তিও হয়ত প্রকাশ করিতেন; কিন্তু অদ্যকার এই বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে তিনি মহারাজের হৃদয়ের এক অভূতপূর্ব্ব সরলতার আভাষ পাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ আপনার রাজ্যের তাবৎ প্রজাই যদি আমাদের মত সুখী হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী কত সুখের হইত।' মহারাজ রাণীর এই বাক্যে ঈষৎ চমকাইয়া বলিলেন, 'সুখী সকলেই, ভোগজ্ঞানের তারতম্য আছে মাত্র! তুমি

যাহাতে সুখ অনুভব কর, অপর কেহ তাহাতে সুখের সন্ধান না পাইতে পারে; সুখ ও সৌন্দর্য্য চর্চ্চাই মানব-জীবনের ধ্রুবতারা দেবী, এক অনাদিকাল হইতে ইহারই পিছনে সমগ্র মানবজাতি ছুটিয়া আসিতেছে।" রাণী আপনার অলকদাম গ্রীবার উপর হইতে সরাইয়া লইয়া অশ্রুপূর্ণ ভাসা ভাসা চক্ষু মহারাজের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'আমাকে অনুমতি দিন মহারাজ, আপনার রাজ্যের তাবৎ প্রজামণ্ডলীকে আমি সুখের সেবা করিতে ও সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় অভ্যস্থ হইতে শিক্ষা দিব।' মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "রাণী তোমার ছাঁচে যদি জগৎটাকে গড়িতে দাও, তবে নিশ্চয় জানিও শৃঙ্খলার স্থলে বিশৃঙ্খলাই আসিয়া দেখা দিবে, শান্তির জায়গায় অশান্তি আসিয়া আপন শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে।' মহারাণীও রাজার কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন, 'সেই ভাল মহারাজ; অশান্তির মধ্যে যদি অমৃতভাণ্ড পাওয়া যায় তাহা হইলে কি ভোগের চূড়ান্ত হইবে না, এবং কলহের মধ্যে যদি তিলোত্তমা আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলে কি সেই সৌন্দর্য্য চর্চ্চার শেষ হইবে না?' মহারাজ একটু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, 'তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই। তোমার যাহা অভিরুচি তুমি তাহাই করিতে পার, কিন্তু স্থল-বিশেষে যদি প্রয়োজন বোধ কর ত আমার পরামর্শ গ্রহণ করিও।'

মহারাণী তাঁহার কল্পনানুযায়ী কার্য্য করিয়া চলিলেন। যে সমস্ত মানব অন্ধকারময় পাতাল-পুরীতে বাস করিত তাহাদিগকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া রাজধানীতে সুরম্য আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তাহাদের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার জন্য বিবিধ পাঠশালা স্থাপন করিলেন। সন্তানের জননীরা যাহাতে সন্তানগণের তত্ত্বাবধান করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করাইলেন। ক্রমশঃ শীর্ণকায় মানবগুলি স্থূল কলেবর বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত জন-সমাজে পরিণত হইয়া আসিল। ভীত ও সচকিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব শিশুগুলি শান্ত ও ধীর অধ্যয়নশীল বালকে পরিণত হইল। ভগ্ন-হৃদয় জননী তাহার সন্তানের সেবা করিতে যাইয়া ক্রমশঃই উৎফুল্ল-বদনা হাস্যময়ী রমণী মূর্ত্তিতে বিকসিত হইয়া উঠিল। অন্ধকার ও দরিদ্রতা দূর হইয়া গিয়া আলোক ও স্বচ্ছলতা আসিয়া দেখা দিল। সমগ্র রাজধানী একটা বিরাট জনসমাবেশে হাস্যমুখরিত হইয়া নাট্যশালায় পরিণত হইল।

একদিন মহারাণী মহারাজকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, 'দেখুন ত মহারাজ আপনার প্রজামণ্ডলী কত সুখী হইয়াছে। তাহাদের হাস্যময় মুখ দেখিলে কি আপনার আনন্দ হয় না? আপনি পূর্ব্বে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই এতগুলা লোকের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে গেলে আমাদের নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দতার অনেকটা হ্রাস হইবে, কই আমারত তাহা মনে হয় না'। মহারাজ সপ্রেম দৃষ্টিতে প্রিয়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "স্বর্গ সৃষ্টি করিতে গেলে দেবতা সংগ্রহ করা প্রয়োজন; নরক সৃজন করিতে গেলে, পাতকীর দরকার, মর্ত্তালোকে মানবেরই আবশ্যক; তুমি স্বর্গ রচনা করিতে চাহিতেছ দেবী, স্বর্গ মর্ত্ত্যে কিন্তু কখনই সৃষ্টি হইবে না।' মহারাণী হাসিয়া বলিলেন, 'মানবই দেবতা হয় তুমি একথা জাননা মহারাজ'। মহারাজ বলিলেন, 'দেবতা যাহারা তাঁহারা দেবতা বলিয়াই জানিতাম'। মহারাণী বলিলেন, তোমার ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিব, আর একটু অপেক্ষা কর মানবগুলাকেই দেবতায় পরিণত করিব।'

ক্রমশঃ কারখানার কলগুলা বিগড়াইয়া আসিল। সন্তুষ্ট জনমণ্ডলী পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিতে লাগিল সত্য কিন্তু আশানুযায়ী ফল পাওয়া যাইতে লাগিল না। মহারাজ বিশেষ চিন্তিত হইয়া স্বয়ং ইঞ্জিন ঘর, ও কারখানার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন কিন্তু কোথায় যে কলটা বিগড়াইয়া গিয়াছে তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসায় জনমণ্ডলীর বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। মহারাণী আপনাদের তাবৎ অনাবশ্যক বিলাস-ব্যসন কমাইয়া দিলেন। প্রতি ঘরে ঘরে গমন করিয়া জনমণ্ডলীকে উপস্থিত বিপদে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মহারাণীর আশ্বাস বাক্যে সকলেই বিপদকে জাপটাইয়া ধরিয়া তাহার সহিত লড়াই করিয়া চলিল। এদিকে মহারাজের কার্য্যের বিরাম রহিল না। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গলদ ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার প্রজামণ্ডলীর তাবৎ আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে একদিন হতাশ

হইয়া মহারাণীকে বলিলেন, 'মহারাণী, আমার মনে হয় এই সমস্ত সাম্রাজ্য প্রকৃতিপুঞ্জের হস্তেই অর্পণ করিয়া আমাদের বানপ্রস্থ গমন করার সময় আসিয়াছে।' মহারাণী একটুখানি সপ্রেম হাস্য মুখমণ্ডলে বিকসিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ আমি জনমানবের সহিত মরিতে চাই, তাহাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া স্বর্গও চাহি না।'

ক্রমশঃ বিদ্রোহ ভাব দেখা দিল। কারখানার মজুররা তাহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সহিত সমানভাবে সুখ-সাচ্ছন্দ্য বণ্টন করিয়া লইবার অধিকার জ্ঞাপন করিল। চির ভোগ সুখে লালিত পালিত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর দল এই বিদ্রোহ মূর্ত্তি দেখিয়া বেশ শিহরিয়া উঠিল। তাহারাও ক্রমশঃ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাজধানী হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া আবার পাতাল-পুরীতে পুরিল। বিদ্যালয় গৃহ উঠাইয়া দিয়া শিক্ষা-প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। নির্দ্দিষ্ট ভরণপোষণমাত্র দিয়া তাহা-দিগকে আবার কলের সহিত গাঁথিয়া দিল। কলগুলাও যেন নূতন উৎসাহে পূর্ব্বকার তেজ ফিরিয়া পাইল। তাহারা স্ফীত বক্ষে অনর্গল ধূম উদ্গীরণ করিয়া আবার আবশ্যক দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া চলিল। রাজধানীতে পূর্ব্ব সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পাতালপুরীতে অশান্তি ও অত্যাচার স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল।

মহারাণী কেমন একটু হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি চাহিতেছিলেন মানবকে দেবতায় পরিণত করিতে, অগ্রসরও অনেকটা হইয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার আশা কেমন করিয়া নিরাশায় পরিণত হইল তাহা তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না। মহারাণী একদিন নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, 'তবে তাহাই কি সত্য। স্বর্গ দেবতার জন্য; মর্ত্ত্য মানব জাতির জন্য সৃষ্ট। মহারাণী বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, তিনি পাতালপুরীতে গিয়াই বাস করিবেন। যেখানে পাপ পুঞ্জিকৃত হইয়া গগনস্পর্শী হইয়া উঠিতেছিল, সেখানেই তাঁহার বাসস্থান হওয়া উচিত স্থির করিয়া তথায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সমস্তদিনের কার্য্য শেষ করিয়া মহারাজ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহারাণী, আবার কলগুলা পূর্ব্বকার মতই চলিতেছে, হারাণ শান্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।' মহারাণী বলিলেন, 'সে ত স্তূপীকৃত অশান্তি সৃজন করিয়া, পাপের বোঝা অসম্ভব রূপ বাড়াইয়া।' মহারাজ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ রাণী, ধ্বংসেরই উপর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত, অনেক সময় শ্মশানই বাসর-ঘর রচনা করিয়া দেয়।

অবশেষে একদিন অতি ভীষণ ভাবে বিদ্রোহ আত্ম-প্রকাশ করিল। তাহার কারণ যে কি, তাহা নির্ণীত হইতে না হইতেই মহারাণী দেখিলেন, কারখানা গৃহগুলিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বিরাট জনতা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে। মহারাজ এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সহচরেরা একে একে সকলেই অগ্নি-কুণ্ডে পড়িয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে লাগিল; উত্তেজিত জনতা তাহাদের মৃতদেহগুলি লইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আকাশের উপর মৃত্যুর নগ্নমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। জলের মধ্যে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিল। গৃধিণী, শকুণী প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী-কুল মনের আনন্দে নর-মাংস ভোজন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ, বেলা অবসানের সহিত রজনীর গাঢ় অন্ধকার মূর্ত্তি গাঢ়তম হইয়া আসিল কিন্তু প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য সমান ভাবেই চলিল। কারখানা গৃহগুলি ক্রমশঃ ভস্মীভূত করিয়া দিয়া উদ্ধত জনতা রাজধানীতে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক নাগরিকের গৃহ জ্বলিয়া উঠিল। উভয় দলে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া গেল। বিশিষ্ট কর্ম্ম-চারীরা অস্ত্রহীন মজুরদলকে বিনাশ করিয়া চলিল। কিন্তু কর্ম্মচারীদের সংখ্যা তাহাদের তুলনায় মুষ্টিমেয় মাত্র। কাজেই মজুরদল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া কর্ম্মচারীদের বংশ সবংশে নির্ম্মূল করিয়া দিল। প্রসাদ ভস্মীভূত হইয়া ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িল। রঙ্গালয় নিমিষে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল। মানব মানবকে দেখিয়া বন্য জন্তুর ন্যায় বধ করিয়া চলিল। অগ্নি তাহার বহুদিনের বুভুক্ষা জ্বালা মিটাইবার জন্য তাবৎ সৃষ্ট পদার্থের উপরই লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিল।

উদ্যান বাটিকার একটী গৃহে দাঁড়াইয়া মহারাণী দেখিলেন এই ভীষণ প্রলয়ে সকলেই ধ্বংস পাইতেছে। মহারাজ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন সত্য কিন্তু ক্ষিপ্ত

জনতা তাঁহার কোন বাক্যেই কর্ণপাত করিতেছে না। ক্লান্ত দেহ মহারাজ অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে ঢলিয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। মহারাণী তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। এই দৃশ্য দর্শনান্তর তিনি হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন। হত্যা ও ধ্বংস কার্য্য সমান ভাবেই চলিতে লাগিল।

মহারাণীর যখন জ্ঞানোদ্রেক হইল, তখন চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন সমস্ত সাম্রাজ্যটা এক বিশাল ভস্মের সাহারায় পরিণত হইয়াছে। তথায় মানবের কোন সাড়া শব্দ নাই। কোন জীবিত প্রাণী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক বিরাট ঘূর্ণী বায়ু প্রকৃতির দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত বালুকাস্তূপ উড়াইয়া বহিয়া যাইতেছে। মহারাণী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই ভগ্ন ও ভস্ম এবং নরকঙ্কালের স্তূপ। প্রাণী নাই, স্মৃতি নাই; মূর্ত্তিমান ধ্বংস অট্টহাস্তে হাহাকার করিতেছে। প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ বহুক্ষণ নির্ব্বাক ও নিশ্চল থাকিবার পর মহারাণী দেখিলেন, কোন অমাত্য এক সামান্ত কুলির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে ভীষণ ভাবে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। কুলীটাও তাহার বংশগত হীনতা ভুলিয়া অমাত্যকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। মহারাণী চক্ষু মুছিয়া দেখিলেন, এই বিরাট শশ্মানে কচিৎ দুই একটা মনুষ্য দেখা যাইতেছে এবং তাহারা পরস্পরকে দেখিলে এমনভাবে জাপটাইয়া ধরিতেছে যেন, বহুদিন তাহারা কোন মানবের মুখদর্শন করে নাই। ক্লান্ত দেহ ও ভগ্ন-মন লইয়া মহারাণী ভাবিলেন, স্বর্গ কি তবে ভস্মেরই উপর নির্ম্মিত হইব; ধ্বংসের মধ্যেই কি মাহমানব অমৃতের আস্বাদ পাইবে? ক্রমশঃ জ্ঞানহীন হইয়া তাঁহার শরীর সেই বালুস্তূপের উপর ঢলিয়া পড়িল।

"মিলন"

শ্রীমতী রাণু দেবী

অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় মুক্ত বনপথ আলোকিত, সন্ধ্যার আগমনে আকাশের প্রান্তসীমায় একদল বলাকা শুভ্র রেখার মত উড়িয়া যাইতেছিল। গাছে গাছে যেন আবির মাখিয়ে দিয়েছে। তারই একটী গাছের ডালে পরম নিশ্চিন্তে দুটী পাখী মধুর আলাপনে পরস্পরের তৃপ্তি সাধন করছে। তাদের মধুর গুঞ্জন, পরস্পরকে সুখী করবার কি আকুল আগ্রহ, সুখে তারা মাতোয়ারা, এই পরম সুখ-সম্মেলনে বাধা পড়তে পারে আনন্দের আতিশয্যে তারা ভুলে গেছে।

সমস্ত দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে, নিষ্ফল ব্যাধ যখন রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরছিল তখন দূরে গাছের ডালে একজোড়া পাখী দেখে লোভে তার চক্ষু উজ্জল হয়ে উঠলো। না ভেবেই সে শর ক্ষেপণ করলে, চকিতে মিলন-সুখরত পাখী সাবধান হবার আগেই তীর বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল, তার বুকের সমস্ত লাল রক্ত, অস্তাচলগামী সূর্য্যের আরক্ত আভাকে অভিনন্দিত করল। বেদনার ভারে ব্যথিত দিবাকরও লজ্জায় মুখ লুকালেন।

প্রিয়র মৃত্যুতে কাতরা, আর তার মরণের ভয় নেই, করুণ বিলাপে দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে, ব্যাধের চারিপাশে ঘুরতে লাগল, বিলাপের মূর্চ্ছনায় ইহাই সে ব্যক্ত করতে লাগল, ওগো দাও আমায়ও শেষ করে দাও, আমরা নিরীহ প্রাণী কি তোমার ক্ষতি করেছিলাম যে আমাদের এই মিলন সুখের এমনি পরিণতি করিলে।

অভিভূত ব্যাধ ছুটে চলে এলো, সমস্ত রাত তার কুটীরখানিতে প্রিয়হারা পাখীটির বিলাপের ধ্বনি যেন দূর অতি দূর হতে ভেসে আসতে লাগলো। সে যন্ত্রণা অনুশোচনায় ছটফট করতে লাগলো।

স্তব্ধ জমাট অন্ধকার ভেদ করে বিরহিণীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে জগত মুখরিত করছে।

রাতের জাগরণে, অনুতাপে অতিষ্ঠ হয়ে ভোর হতে না হতেই ব্যাধ নিজের অজ্ঞাতে বনের সেই গাছতলায় এসে দেখলে, নিষ্ফল বিলাপে কাতরা, তার সেই প্রিয়র প্রাণহীন বুকে চির মিলন উদ্দেশ্যে চলে গেছে।

মহান প্রেমের-মিলনে নির্দ্দয় ব্যাধের চোক দিয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। সে তার ধনুর্ব্বাণ ফেলে বনের পথে অদৃশ্য হলো।

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১১

জরুরী কাজের জন্য দিন দশেকের জন্য সুশীলকে ডায়মণ্ড হারবারে আসিতে হইয়াছে।

কাল সকালেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে, এখানকার কাজ সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া শেষ করিয়াছে।

প্রথমে সে এখানে নিরঞ্জনকে পাঠাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু নিরঞ্জনের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সে আসিতে অসমর্থ হইয়াছিল, অগত্যা সুশীলকেই আসিতে হইয়াছে।

সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, যতদূর দেখা যায় সব চাঁদের আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। দূরে সমুদ্র সৈকতে সর্ব্বাঙ্গ চাঁদের আলো মাখিয়া বাতাসে দোলা খাইতেছে।

সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত সুশীল বিশ্রাম লাভাশায় ডাকবাংলোর খোলা বারাণ্ডায় চাঁদের আলোয় একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল।

সুশীলের মনটা কখনও কলিকাতায় একটী অপরিচ্ছন্ন গলিতে একটী বাড়ীর ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কলিকাতায় আছে ইরা, জাপানে আছে তাহার ভাবী বধূ ইন্দিরা।

কোনদিন যে ইন্দিরার সঙ্গে কাহাকেও একই পর্য্যায়ে রাখিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা জীবনে কোন দিনই করে নাই আজ সে তাহাই করিতেছিল।

জীবনের মধ্যে অনেক সময়ই তাহাকে অনেক সুন্দরী তরুণীর সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, তাহাকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য কেবলমাত্র ভারতীয় মেয়েরাই নহে অনেক সুন্দরী ধনবতী ইউরোপিয়ান মহিলাও উৎসুক ছিলেন, সে চিরদিনই এই সব মেয়েদের অবহেলা করিয়াই আসিয়াছে ইহাদের পানে চাহিয়া হাসিয়াছে। কোনদিন কাহারও কথা ভাবিতে গিয়া ইন্দিরার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানিই তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, সে আর কাহারও নহে—সে ইন্দিরার, এই কথাটা ভাবিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মাঝখানে ইরা কোথা হইতে কেমন করিয়া ভাসিয়া আসিল কে জানে, কেমন করিয়া সে যে সুশীলের অন্তরে স্থান পাইল, কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সেখানে নিজের প্রতিষ্ঠা করিল তাহা আজ সুশীল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না।

সুশীল অস্থির হইয়া উঠে, ইরার কথা ভুলিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তবু তাহার কথাই মনে জাগে।

সে যে তাহার অন্তরে এতখানি স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে তাহা কলিকাতায় থাকিতে সুশীল জানিতে পারে নাই। কলিকাতা ত্যাগ করিবার দিনে সে বুঝিতে পারিল ইরাকে সে ভালবাসে, ইরাকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

এই কয়েকটা দিন হাজার কাজের মধ্যে ইরার কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া সে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

একটা কথা আছে করুণা সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলি হইতে অনেক সময় প্রেমের উদ্ভব হয়। একি তাহাই, সুশীল তাহা বুঝিতে পারে না। সে মনকে প্রশ্ন করে সত্যই কি সে ইরাকে ভালবাসিয়াছে? কিন্তু ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইরাকে ভালবাসার মত কিছু কি ইরার মধ্যে আছে? মানুষ প্রথমেই যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হয় সেই রূপ তাহার কোথায়? ইরা সাধারণ একটী মেয়ে

মাত্র, নিসর্গ সুন্দরী সুশিক্ষিতা ইন্দিরার পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্যতা তাহার কতটুকু আছে? তাহার উপরও যদি তাহার অর্থ থাকিত,—কিন্তু সে তো দরিদ্র, নিজের জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাকে বেড়াইতে হয়। আর ইন্দিরা, সে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালিনী, সে তাহার ঐশ্বর্য্য দিয়া সুশীলকে ধনবান করিয়াছে।

কিন্তু কে ইহা চাহিয়াছিল? সুশীল পরের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে চাহে নাই, সে চাহিয়াছিল যেন সে দরিদ্র পিতার সন্তান রূপেই পরিচিত হয়, যেন সে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করিতে পারে। সেই অশুভ মুহূর্ত্তে তাহার পিতা তাহার ভার মিঃ রায়ের হাতে দিয়া গিয়াছেন, আজ সুশীল ভাবে—তিনি তাহার কেবল বাহিরের দিকটাই দেখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে যে চির দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গেলেন তাহা তিনি ভাবেন নাই।

সে ইরার এই দিকটাই কেবল দেখিয়া ছিল। দারিদ্র্য-দুঃখ তাহাকে কষ্ট দিলেও সে স্বাধীন; দৃঢ়ভাবে সে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজেকে অটুট রাখিতে পারিয়াছে। সে ইরার ঐশ্বর্য্য, রূপ কিছুই দেখে নাই, সে শুধু দেখিয়াছিল ইরার সাহস, শক্তি, দৃঢ়তা।

এই দৃঢ়তা, সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিবার শক্তি, ইহাই সুশীলকে তাহার পানে আকর্ষণ করিয়াছিল। সুশীল এ কয়দিন অবিরত নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে; নিজের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে ইন্দিরার প্রতি অবিশ্বাসী হওয়াটাই শুধু মহা পাপ নয়, ইহাতে ইন্দিরার পিতার নিকটও কৃতঘ্ন হইতে হইবে। কেবল মাত্র এই একটী আশা লইয়াই তিনি তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, তাহার হাতে সব ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজ সে যে কৃতঘ্নতা করিল, ইহার জবাব সে কি দিবে?

কিন্তু মন তো মানে না। অন্তরে কে আঘাত দেয়, কে বলে—পরের অর্থে ধনবান হইয়া থাকা পুরুষের কাজ নয়, পুরুষ আত্মবিক্রয় করিয়া এত হীন হইয়া থাকিতে পারে না। সে যখন নিজের হীনাবস্থা বুঝিয়াছে তখন মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে না কেন?

মিঃ রায়ের যে পত্র কলিকাতা হইতে রিডাইরেক্ট হইয়া এখানে আসিয়াছে তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন, তিনি আগামী বুধবার কন্যাসহ কলিকাতায় আসিবেন, মাসখানেক পরে তাহার হাতে ইন্দিরাকে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন।

আজও সে ইন্দিরাকে ভালবাসে, ইন্দিরার জন্য সে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে। আজও তাহার মনটা সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী জাপান দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়ায়, দিনের মধ্যে শতবার ভাবে—এতক্ষণ ইন্দিরা কি করিতেছে, সেও কি তাহার মত তাহার কথা ভাবিতেছে?

কোথা হইতে আসিল ইরা, কেমন করিয়া ইন্দিরার স্থান খানিকটা চুরি করিয়া সে দখল করিয়া বসিল?

ইরার উপর সে রাগ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাগ করাও তো যায় না, ইরার আর্ত্ত মুখখানা মনে জাগিয়া উঠে, মনে পড়ে, প্রত্যহ সে কুণ্ঠিতভাবে আসে, কাজ করে—চলিয়া যায়। নিরঞ্জন একদিন তাহার কাজের মধ্যে এতটুকু ক্রটী পাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে যে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে।

ইদানীং সে সুশীলের সঙ্গ এড়াইয়া চলিতে চায়, তাহা সুশীলও বুঝিয়াছিল। সেও সতর্ক হইয়াছিল, ইরাকে এড়াইয়া চলার চেষ্টা করিত, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে ইরার সম্মুখে আসিত না।

সুশীল অন্তর যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিতেছিল,—সে ইন্দিরার নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছে। আজ এই জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতির পানে চাহিয়া সে ভাবিতে-ছিল—ছি ছি, সে করিয়াছে কি,—ইন্দিরা যে তাহাকে বই জানে না, সেও যে ইন্দিরাকে প্রাণ মন ঢালিয়া ভাল-বাসিত, আজ সে এ কি করিতেছে?

সুশীল আর্ত্তভাবে দুই হাতে বুকখানা চাপিয়া ধরিল—ইন্দিরা, যত শীঘ্র পার তুমি এসো, তোমার স্বামীকে রক্ষা কর, পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া তোল।

যদি ইন্দিরা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে, সুশীলের অন্তর কলুষিত হইয়াছে, সে ইরাকে ভালবাসিয়াছে, সে কি তাহাকে ক্ষমা করিবে?

না, সে ক্ষমা করিবে না। সুশীল ইন্দিরাকে চেনে, তাহার অভিমানকে চেনে, সে কিছুতেই সুশীলকে ক্ষমা করিতে পারিবে না তাহাও সে জানে।

সুশীল মুহ্যমান ভাবে পড়িয়া রহিল, তাহার মনের মধ্যে তখন ইন্দিরার দৃপ্তমূর্ত্তিখানা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

১২

কলিকাতায় ফিরিয়াই সে নিরঞ্জনকে জানাইল মিঃ রায় কন্যাসহ আগামী কাল এখানে আসিয়া পৌঁছাইবেন। নিরঞ্জনকে আজ একবার সন্ধ্যার দিকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইবে, সুশীলও সেখানে থাকিবে, উভয়ে মিলিয়া বাড়ীটিকে সুসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

সারাটা দিন এদিক-ও দিক ঘুরিয়া সুশীল সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ইরার বাসায় গিয়া পৌঁছাইল। নিজেকে সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, ইরার নিকটে সে সব কথা বলিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

ইরা দ্বার খুলিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল, "আসুন।"

মিসেস দাস উপস্থিত কতকটা সামলাইয়া লইলেও এখনও উঠিতে পারেন না। ডাক্তার থাইসিসের আশঙ্কা করিয়াছেন। দু'পাঁচ দিন একটু নরম থাকিলেও যে কোন মুহূর্ত্তে ব্যারাম আবার বাড়িয়া উঠিতে পারে, তিনি একথা বলিয়া দিয়াছেন।

সুশীল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা নমস্কার করিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "আজ আবার এসেছি মা, সেদিন আপনার চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ নিতে পারিনি, এর জন্যে বড় লজ্জা পেয়েছি।"

মিসেস দাস বলিলেন, "তার জন্যে আমি কিছুই মনে করি নি বাবা, তোমার চাকর বলে গেল কাজেই আমি আর কোনও উদ্যোগ করি নি। বড় ইচ্ছা ছিল মায়ের মত তোমায় একদিন সামনে বসিয়ে খাওয়াব, কিন্তু সে আশা যে মিটবে সে আশা আমি করিনে। তুমি নিজে জোর করে চা খেয়েছ, কোন কুসংস্কার মানো না বলে সেই সাহসেই তোমায় চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলুম।"

সুশীল বলিল, "এর পর একদিন এসে নিশ্চয়ই খাব মা, খাওয়া তো পালাবে না আমিও পালাব না। আপনার যেদিন খুসি সেইদিন আমায় খাইয়ে দেবেন, আজ চা পেলেও হয়।"

ইরা বলিল, "একটু বসুন, আমি এখনি চা করে নিয়ে আসছি।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুশীল বলিল, "থাক, আর এখন চা দিতে হবে না। এর জন্যে তোমায় এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, আমি চা খেয়ে এসেছি।"

সে আর আপনি বলিত না, তুমি সম্বোধন করিত।

ইরা বলিল, "এক কাপ চা তৈরী করতে আমার একটুও কষ্ট হবে না; আপনি একটু বসুন, আমি এখনই আসছি।"

সুশীল আর বাধা দিল না, ইরা চলিয়া গেল।

কে বলিতে পারে আজই এখানে আসা এবং চা খাওয়া শেষ হইল কিনা। মনের মধ্যে আশঙ্কা জাগিতেছিল, হয়তো আজ রাত্রিটা মাত্র সে স্বাধীন আছে, কাল সকাল হইতে সে পরাধীন হইয়া পড়িবে।

ইরা রন্ধনগৃহে গিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টোভ ধরাইয়া তাহার উপর কেটলী বসাইয়া দিল। ষ্টোভের সোঁ সোঁ শব্দে ও ঘরের কোন কথা আর তাহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল না।

হঠাৎ পিছনে দরজার উপর শব্দ শুনিয়া সে সভয়ে মুখ ফিরাইল বিস্মিত চোখে চাহিয়া দেখিল দরজার উপর দাঁড়াইয়া সুশীল।

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুশীল যে এই ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবে ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। আজ হঠাৎ তাহাকে এই অপরিষ্কার ঘরে আসিতে দেখিয়া ইরা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়া গেল।

বিস্মিত কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি এ ঘরে এলেন যে, ও ঘরে বসতে না পারেন বারাণ্ডায় বসবেন চলুন, আমার চা হয়ে এল বলে।"

শান্তকণ্ঠে সুশীল বলিল, "যাচ্ছি ও ঘরে। রোগীর কাছে বসতে পারিনি বলে যে এ ঘরে এসেছি তা নয়, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে ইরা। ওঘরে মায়ের সামনে সে সব কথা বলা চলে না বলেই এ ঘরে এসেছি, আফিসে নির্জ্জনতা খুঁজে ছিলুম পাইনি, সেইজন্যে আজ ওদিকে অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও এখানে এসেছি।"

বিস্মিত চোখ তুলিয়া ইরা তাহার মুখের পানে মুহূর্ত্তের জন্য তাকাইয়াই দৃষ্টি নামাইল; তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সুশীল কি বলিবে তাহা যেন সে অনুভবে

কতকটা বুঝিতে পারিল। মৃদুকণ্ঠে বলিতে গেল, "এই অপরিষ্কার ঘরে আপনি—"

"তা হোক অপরিষ্কার ইরা, তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি এইখানেই বসছি, আমার কথাটা শেষ করে এখনি চ'লে যেতে চাই, সন্ধ্যার পরে আমার অন্য অনেক কাজ আছে।"

সুশীল দরজার উপরই বসিয়া পড়িল। অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিয়া ইরা বলিল, "ওখানেই বসে পড়লেন, এই আসনখানা পেতে দিচ্ছি, এর পরে না হয়—"

সুশীল মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার অত ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে না ইরা, আমি নিজে ইচ্ছা করেই এসেছি, ইচ্ছা করেই বসছি, তুমি তো আমায় নিমন্ত্রণ করে আন নি যে এতে লজ্জা পাবে।"

জল ফুটিতেছিল, ইহা জল নামাইয়া তাহাতে চা দিল।—

সুশীল বলিল, "চা ততক্ষণ হোক, আমি, তোমায় ততক্ষণ যা বলবার আছে বলে যাই।"

ইরা জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, সুশীল খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি একটা দারুণ ভুল করে ফেলেছি ইরা, সেই ভুলটা সুধরাবার জন্যে এখন অস্থির হয়ে পড়েছি। জানিনে সে ভুল আর সুধরানো যাবে কিনা, আর এখন সুধরাতে গেলেই বা তুমি কি মনে করবে, কিন্তু তবু—তুমি যাই মনে করনা কেন, আমার তা না করা ছাড়া আর উপায় নেই।"

ইরা ঘামিয়া উঠিল, এত ভূমিকা কিসের জন্য তাহা সে বুঝিতে পারিল না, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "কি ভুল করেছেন?"

সুশীল একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে তাহার মুখখানাই বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র, সে বলিল, "আমার মনে হচ্ছে, কেবলমাত্র সাময়িক একটা ঝোঁকের বশে তোমাদের সঙ্গে এতটা মেলামেশা করা আমার উচিত হয়নি। ভবিষ্যতে যখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় দিতে গেলে কেবলমাত্র প্রভু কর্ম্মচারী ছাড়া আর কিছুই বলা চলবে না, তখন হঠাৎ মাঝখানে কয়দিনের জন্যে এই আত্মীয়তা করে যাওয়া কি আমার পক্ষে উচিত হল?"

ইরার মুখখানা শবের মুখের মতই মলিন হইয়া উঠিল। সুশীল তাহার মুখে একটি কথা শুনিবার প্রত্যাশায় রহিল, কিন্তু ইরা তাহার পানে চাহিল না, নতমুখে থাকিয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল।

সুশীল বলিল, 'তুমি বলতে চাও আগেই তুমি এ জানতে, অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের মিলতে গেলে শেষটায় যে এমনই একটা ব্যাপার ঘটে তা জানা কথা। কিন্তু না কথাটা সে ভাবে ধরো না ইরা, কেবল এইটুকু ভাব আমার নিজের 'পরে নিজের কোনও অধিকার নেই, আমার দরিদ্র বাপ আমার স্বাধীনতা চিরকালের মতই বিক্রী করে গেছেন, সেই জন্যেই আমি ধনীর জাঁকজমক সহ্য করতে পারিনে, প্রাসাদে বাস করা আমার কাছে অভিশাপ বলেই মনে হয়।"

ইরা চায়ের কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে একবার চোখ তুলিয়া তাকাইতে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর যন্ত্রণার যে ছাপটা পড়িয়াছে তাহা স্পষ্টই সে দেখিতে পাইল।

অধীরভাবে সে বলিল, "আপনার মোট কথাটাই আপনি বলুন যে আপনি ভবিষ্যতে আর এখানে আসবেন না আর আমার সঙ্গে আপনার যে বন্ধুত্ব আছে বা ছিল সে যেন আর কেউ না জানতে পারে কেমন, এই তো?"

হঠাৎ তাহার রূঢ় কণ্ঠস্বর সুশীলকে যেন বড় বেশী রকমই আঘাত দিল। ইরা যতখানি রূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিল, সে ততখানি নরম হইয়া বলিল, "কতকটা তাই বটে।"

ইরার যেন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে ছিল, সুশীল যে এমনভাবে তাহাকে অপমান করিবে তাহা সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই। সুশীল নিজেই সাধিয়া আসিয়া তাহাকে বন্ধু বলিয়াছে, সে চা দিতে চায় নাই, সুশীল জোর করিয়া কেবল চা নয়, তাহার হাতে লুচি তরকারী পর্য্যন্ত খাইয়া গেছে, আজ সেই কিনা জানাইতে আসিয়াছে তাহার সহিত একদিন সে খেয়াল মত বন্ধুভাবে চলিয়াছিল, তাই বলিয়া সে যে তাহাকে বরাবর বন্ধু বলিবে তাহা হইতে পারে না। ইরাকে মনে রাখিতেই হইবে, ইরা কর্ম্মচারী সুশীল তাহার মনিব—প্রভু।"

বেদনা ভরা সুরে ইরা বলিল, "কিন্তু আমি একটা কথা জানতে চাই মিঃ মুখার্জ্জী, আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি আপনি দয়া করে আমায় বন্ধু বলে ভাবলেও আমি কোনদিন আপনাকে মনিব ছাড়া ভাবিনি? আপনি দয়া করে আমার বাড়ীতে এসেছেন, আমার মাকে মা বলেছেন, আমার তৈরী চা খেয়েছেন আপনি হয়তো এ ব্যবহারগুলোকে আপনার বন্ধুত্বের নিদর্শন ভেবে খুসী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমি বা আমার মা আপনার এ ব্যবহারগুলোকে কেবলমাত্র দয়ার দান বলেই জেনে নিয়েছি।"

বিস্ফারিত চোখে তাহার পানে তাকাইয়া সুশীল বলিল, "দয়ার দান—?"

বড় দুঃখেও মানুষ হাসে, তাই ইরাও হাসিল, "তা নয় তো কি মিঃ মুখার্জ্জী? আপনি বন্ধুত্ব করতে এলেই আমরা কি তত সহজে আপনার মত লোককে নিতে পারি? আমরা কি জানি না ধনী দরিদ্রে প্রভেদ কতখানি? আপনি যে জানেন না তা নয়, আর তা জানেন বলেই না আজ আমায় এমনভাবে অপমান করতে পারছেন?"

হঠাৎ তাহার চোখ ছাপাইয়া দুই ফোঁটা জল পড়িয়া গেল, লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

"অপমান—তোমায় অপমান করতে এসেছি—?

আত্মবিস্মৃত সুশীল ইরার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল, "না, না অপমান করতে আসি নি ইরা সেকথা যদি ভেবে থাকো জেনো বিষম ভুল করেছ। কিন্তু আমার অবস্থা যদি জানতে ইরা, যদি বুঝতে—আমার বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী হয়েও তুমি কতখানি স্বাধীন, কতখানি মুক্ত, তার তুলনায় আমি কতখানি পরাধীন তাহ'লেও ঐ রকম কথা বলতে পারতে না।"

ইরা আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়াইয়া লইল, চায়ের কাপ সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "অধৈর্য্য হবেন না, চা খান।"

সুশীল বলিল, "খাচ্ছি, কিন্তু শোন ইরা, তুমি বুঝতে চেষ্টা কর আমি কতখানি অসহায়। আমি তোমায় একথা কেন বলছি, সেটা এখন তুমি শোননি। কাল সকালে মিঃ আর মিস রায় আসছেন আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে, আর সেইজন্যেই মিঃ রায় আমার হাতে লক্ষ লক্ষ টাকার ভার দিয়েছেন। তাঁরা এসে যদি শুনতে পান তোমার সঙ্গে আমার—"

এক মুহূর্ত্তে সুশীলের অসহায় অবস্থাটা ইরার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল, সে গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বুঝেছি।"

সুশীল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "মুখের কথায় বুঝো না ইরা, অন্তর দিয়ে বুঝো। আমার কোন কথাই বোধ হয় তোমার কাছে অজানা নেই, তাই বলছি আমায় ওঁদের সামনে অকম্পিতপদে দাঁড়াতে দিয়ো। আজ আমি উঠলুম, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, নিরঞ্জন এখনিই আসবে।"

শূন্য চায়ের কাপ নামাইয়া সুশীল উঠিয়া পড়িল।

সে চলিয়া গেল, ইরা আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া তাহার পথের পানে তাকাইয়া রহিল।

সে কি কাজ ছাড়িয়া দিবে? সুশীল যেখানে আছে সেখানে তাহার আর না যাওয়াই ভাল, হয়তো তাহাকে দেখিয়া মিস রায় কি বলিবেন। সে সব সহ্য করিতে পারিবে, মিস রায়ের কথা সহ্য করিতে পারিবে না।

কিন্তু এখনই তো কাজ ছাড়া চলে না, নিজের জন্য তাহার ভাবনা নাই, রুগ্না জননীর ঔষধ পথ্য সে যোগাড় করিবে কি করিয়া?

ও ঘর হইতে মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল,—"ইরা—"

ইরা তাড়াতাড়ি মুখে চোখে জল দিতে দিতে উত্তর দিল—"যাই মা—"

(১৩)

পরদিন নিয়মিত সময়েই ইরা অফিসে গিয়া পৌঁছাইল। ব্যাগ্র চোখে সে একবার চারিদিকে চাহিল কিন্তু সুশীল বা নিরঞ্জন কাহাকেও দেখিতে পাইল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

দেয়ালের ঘড়িতে যখন টুং টুং করিয়া বারটা বাজিল, তখন সে শ্রান্তভাবে হাত তুলিয়া লইল মুখ ভাসাইয়া ঘামের স্রোত ছুটিতেছিল, রুমালে ঘাম মুছিতে মুছিতে সে কান পাতিয়া শুনিল বাহিরে কয়েকজন লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে সুশীলের কণ্ঠস্বরই তাহাকে বেশী রকম আকৃষ্ট করিল।

দরজার সামনে কাহারা আসিয়া দাঁড়াইল, সুশীল পর্দা সরাইয়া দিয়া বলিল, "আসুন--"

ইরা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

সুশীলের পশ্চাতে ছিলেন সৌম্যমূর্ত্তি একটি বৃদ্ধ, তাঁহাকে দেখিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার পার্শ্বে একটী তরুণী দাঁড়াইয়া, তাহার পানে তাকাইয়া ইরা চোখ ফিরাইতে পারিল না।

জীবনে সে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন সুন্দরী সে বোধহয় আর দেখে নাই। ইরা মুগ্ধ নয়নে এক পলকের দৃষ্টিতে তরুণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল, যেন একখানি নিখুঁত ছবি।

সুশীল পরিচয় দিল, "মিস দাস ইনিই মিঃ দেবনারায়ণ রায় আর ইনি মিস ইন্দিরা রায় মিঃ রায়ের মেয়ে।"

মিঃ রায়ের পানে ফিরিয়া সে বলিল, "ইনি আমাদের টাইপিষ্ট মিস ইরা দাস।"

মিঃ রায় কন্যার পানে তাকাইয়া কি বলিলেন ইরা তাহা বুঝিতে পারিল না। সুশীল মৃদুকণ্ঠে কি বলিল তাহাও ইরা বুঝিতে পারিল না।

মিঃ রায় বলিলেন, "ওঁকে এত ছোট বন্ধ ঘরে দেওয়াটা উচিত হয়নি সুশীল, একটা কোন বড় ঘরে দিলেই ভাল হোত। এ ঘরে ভয়ানক গরম, যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

সুশীল বলিল, "ওদিকার সব ঘরগুলোতে অনেক পুরুষ কাজ করে, সেইজন্য ওঁকে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। উনি ভদ্রলোকের সামনে কাজ করতে রাজী নন, নিজেই এন ঘরটা বেছে নিয়েছেন।

ইন্দিরার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে একটু হাসির রেখা মুহূর্ত্তের তরে জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, সে সুশীলের হাতটা ধরিয়া টানিয়া বলিল, "ও ঘরে চল, এই ছোট ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

তাহারা প্রবেশ করিবার সময় সুন্দরী ইন্দারার পানে তাকাইয়া ইরা অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, যাওয়ার সময় সে অভিবাদন করিল। মিঃ রায় প্রত্যভিবাদন করিলেন কিন্তু গর্ব্বিতা ইন্দিরা কেবল মাথাটা একটু নত করিয়া সুশীলের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

ইরা স্থাণুর মত দাঁড়াইয়াছিল, কতক্ষণ পরে যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন সে ব্যস্তভাবে আবার টাইপ করিতে বসিল।

কিন্তু আজ সকল কাজেই গোলমাল হইতেছিল। ইরা খানিক চেষ্টা করিয়া অবশেষে কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবসন্নভাবে টেবলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া ভাবিতে লাগিল।

এত সুন্দর—এত সুন্দর কখনও মানুষে হয়? ওই সদ্য প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের বন, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত চুলগুলি, কি সুন্দর চোখ ভ্রূ, নাক, ঠোঁট, এত সুন্দর মানুষ হয়? সে যে হাতখানা দিয়া সুশীলের হাত খানা ধরিয়া টানিল সে হাত খানিই বা কি সুন্দর, সে আঙ্গুলগুলি কি চমৎকার। তাহার কানে দুইটা সবুজ পাথরের ইয়ারিং, আঙ্গুলে সবুজ পাথরের আংটী, হাতের তিনগাছি করিয়া চুড়িতে সবুজ পাথর বসানো; পায়ে সবুজ সু, পরনে সবুজ সাড়ি,—পরিচয় দিতেছিল, এই মেয়েটি সবুজ রংটাই বেশী পছন্দ করে।

কিন্তু কি সুন্দর দেখাইতেছিল যখন সে সুশীলের পানে চাহিয়াছিল, সুশীল তাহার পানে চাহিয়াছিল।

জগতে সে সুশীলের—সুশীল তাহার, সুন্দর সুন্দরের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, অসুন্দরের জন্য নয়।

সুশীল মিঃ রায় ও ইন্দিরাকে নিজের প্রশস্ত অফিস রুমে লইয়া গিয়া বসাইয়াছিল। শ্রান্ত ভাবে বসিয়া পড়িয়া একগ্লাস লেমনেডজল খাইয়া কতকটা সুস্থ হইয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আফিসের কাজ চলছে ভাল, সে খবর আমি বম্বেতে থাকতেই আগরওয়ালার কাছে শুনেছি। তবুও বলি আমি যে প্ল্যান করে দিয়েছিলুম যদি সেই ভাবে কাজ করতে হয় তো আরও উন্নতি হতো। কতকগুলো নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি, যেটা একেবারেই অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। দেশবিদেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা চালাতে হবে, দেশবিদেশের লোক অফিসের কাজে রাখা চাই; কিন্তু তুমি তা না করে কেবল ভারতীয়দেরই কাজে রেখেছ। এই সব ভারতীয় কর্ম্মচারী রেখে জগতের প্রত্যেক জাতির সঙ্গে ভাবের বা কাজকর্ম্মের আদান-প্রদান চলতে পারে কি তাই জিজ্ঞাসা করি?"

সুশীল খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কেন চলতে পারবে না? ভারতীয়েরা এমন কোন কাজ

াছে যে কাজে অপারগ হবে ? আমি দেখছি যত যা কিছু কারবার ব্যবসা বাণিজ্য সবই বিদেশীরা নিজেদের একচেটে করে নিয়েছে, ভারতীয়দের মধ্যে আমাদের নিজের জাতি বাঙালীরা এর মধ্যে, এতটুকু অধিকার পায়নি, আধিকার পাওয়ার যোগ্যতাও তাদের নেই—কিন্তু ওদের শিখিয়ে দিতে হবে তো! আমরা পয়সা খরচ করে বিলাত হতে অনেককিছু শিখে এসেছি, আমাদের গরীব দেশের গরীব ছেলেরা অত পয়সা ব্যয় করে শিখতে যেতে পারবে না; কাজেই আমরা যেটা শিখে এসেছি, সেটা যদি ওদের শিখাই তা হলে অন্যায় কিছু হবে না বলেই আমি মনে করি। আমি যা শিখতে পেরেছি তা আপনার দয়ায়, কিন্তু আমার মত গরীব ঢের ছেলেও তো আছে যারা লেখাপড়া শিখছে, কিন্তু শেষকালটায় তাদের অদৃষ্টে চাকরী করা ছাড়া আর কিছুই জুটছে না। আজ আমি যদি আমার জাতি—এই বাঙ্গালীদের মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই, সেটা কি আপনার মতে খারাপ বলে প্রতিপন্ন হবে?"

ইন্দিরা জোর করিয়া বলিল, "বাবার কথার উত্তর আমি দিচ্ছি, তাতে খারাপই হবে।"

সুশীল ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি জানতে চাই কেন খারাপ হবে—তার উত্তরটাও বোধ হয় পেতে পারি?"

ইন্দিরা বলিল, "উত্তর সোজা, যেহেতু বাঙ্গালী বড় নেমকহারাম জাত, ওদের মত হিংসুক পরশ্রী কাতর জাত দুনিয়ায় আর নেই।"

সুশীল তাহার মুখের উপর শান্ত চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল, পূর্ব্বের মতই ধীর কণ্ঠে বলিল, "একথা বলবার আগে নিজের দিকেও তাকাতে হয় ইন্দু, মনে করতে হয়—পরিচয় দিতে গেলে নিজেকে বাঙ্গালী ছাড়া আর কিছুই বলতে পারবে না। কোনও ইউরোপীয়ানের সঙ্গে কথা বলবার সময় জানিনে—তুমি বাঙ্গালীর সম্বন্ধে এই মন্তব্য কোনদিন প্রকাশ করেছ কিনা, আর তোমার এই মন্তব্য শুনে তাঁর মনের ভাবটা কি রকম হয়েছিল তাও বলতে পারি নে। যাক সে কথা, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কি করে তুমি জানলে বাঙ্গালী পরশ্রী-কাতর, হিংসুক, বিশ্বাসঘাতক? কোন বাঙ্গালী তোমার সঙ্গে কোনদিন এরকম কোন ব্যবহার করেছে কি?"

ইন্দিরা বলিল, "হয় তো করে নি, কিন্তু তুমিই কি জোর করে বলতে পার বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতক নয়?"

সুশীল বলিল, "হ্যাঁ, হাজারে একজন থাকতে পারে। তুমি কি বলতে পার ইন্দু, যে সব সভ্যদেশে তুমি বেড়িয়ে এলে, সে সব দেশে কেউ কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে নি? তা যদি হতো—তা হলে রোমের ধ্বংস হতো না, আরও অনেক দেশ আছে—"

বাধা দিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আঃ, যেতে দাও ওর কথা; ছেলেমানুষ, বুঝতে না পেরেই একটা কথা বলে বসে, ওর কথা ধরতে গেলে কি চলে?"

শান্তকণ্ঠে সুশীল বলিল, "না, ওঁর কথা আমি ধরছি নে, তবে নিজের জাতের সম্বন্ধে এই ভুল ধারণাটা আমি নেষ্ট করে দিতে চাই। একথা---বলতে পার তুমিই ইন্দিরা, আর বলতে পারে তারাই যারা বিদেশের বাহ্যিক আড়ম্বর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে,-নিজেদের ব্যক্তিত্ব বোধ, জাতিত্বজ্ঞান যারা বিসর্জ্জন দিয়েছে। আমি জানি—যতই কেন শিক্ষা পাওনা তবু নিজের মনের মধ্যে জাতীয়তা জাগিয়ে রেখে দেওয়া সকলেরই উচিত, আর সেইটাকেই মনুষ্যত্ব বলে।"

উত্তেজনাবশে তাহার সুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দিরা কি বলিবার জন্য উদ্যোগ করিতেই মিঃ রায় বাধা দিলেন, "চুপ, যাক ইন্দু, বেশী কথা বলবার দরকার নেই, এর পর এ সব নিয়ে কথাবার্ত্তা চলবে। আমি দুদিন থেকে ব্যাপার সব দেখি শুনি, তারপর যা হয় বিবেচনা করা যাবে।"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আর দেখ, এত বড় অফিসটাতে একজন মেয়ে টাইপিষ্ট, তার ওপর সেও বাঙ্গালী—রাখাটা ঠিক হয় নি। আমাদের দেশে আজকাল ইউরেশীয়ান, ইউরোপীয়ান টাইপিষ্টের অভাব তো নেই কাজেই—"

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে সুশীল বলিল, "আপনি তা বিবেচনা করবেন।"

মিঃ রায় একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিলেন, "অবশ্য আমি যে মেয়েদের শিক্ষা বা কাজের পক্ষপাতী নই তা নয়; তবে এ যে আমাদের দেশ। যে দেশে ছেলেরাই অনেক পেছিয়ে পড়ে আছে সে দেশে মেয়েরা

যে কতটা এগিয়েছে তাই হচ্ছে ভাব্‌বার কথা। আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখব, যদি দেখি কাজের উপযুক্ত, তা হলে থাকবে, নইলে একটা মেম রাখা যাবে। কি বলিস ইন্দিরা?"

ইন্দিরা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ঘড়ির পানে তাকাইয়া বলিল, "এবার ওঠো বাবা, বেলা দুটো বাজল।"

মিঃ রায় সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "হাঁা, হাঁা, এবার উঠতে হবে বটে। বিকেলের দিকে আমার ওখানে যেয়ো সুশীল, তোমার চা খাওয়া ওখানেই হবে। কয়েকটা কাজ আছে, যাওয়া চাই-ই।"

তিনি উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরাও উঠিল।

১৪

সেদিন রবিবার ছিল।

ছুটি পাইয়া রতিনাথ দুপুর সময়ে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে একটু দিবা-নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

তিনি ঘুমাইয়াছেন ভাবিয়া মনীষা আস্তে আস্তে দরজার পরদা সরাইয়া উঁকি দিল, তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া রতিনাথ চাহিয়া দেখিলেন, তিনি জাগিয়া আছেন দেখিয়া মনীষা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

"আপনি ঘুমোচ্ছেন বাবা? আমি উঁকি দিয়ে দেখছিলুম—জেগে আছেন কিনা।"

একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া রতিনাথ আলস্য জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "ভেবেছিলুম ঘুমোব, তা আর হয়ে উঠল না দেখছি।"

তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মনীষা বলিল, "থাক, দিনের বেলা ঘুমিয়ে আর দরকার নেই। এই তো বলে থাক দিনের বেলা ঘুমোলে তোমার অসুখ করে, চোখে দেখতেও পাই তাই।"

রতিনাথ হাসিমুখে বলিলেন, "কি দেখতে পাও মা জননী?"

মনীষা বলিল, "বাঃ, কিছু দেখতে পাইনে? আমি যে আপনার মা, আপনি আমার ছেলে, ছেলের প্রকৃতি মায়ের জানতে কি কিছু বাকি থাকে বাবা? বিশেষ যে ছেলে মায়ের ওপরই সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে, কোন সময়ে তাকে খেতে হবে, কোন সময়ে ঘুমাতে হবে, কোন সময়ে বেড়াতে যেতে হবে এ সব যে মায়ে ঠিক করে দেয়, সে মা ছেলেকে চিনবে না?"

রতিনাথ গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলেন, "তা বটে, আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে আবার আমার ছোটবেলা ফিরে এসেছে, আবার আমি মায়ের কোলে ছোট্ট খোকা হয়েছি। তবে উঠেই বসি—কি বল মা, শুলে আবার মাথা ভার হয়ে উঠবে।"

কর্তৃত্বের ভাবে মনীষা বলিল, "না, খানিকটা বরং শুয়ে থাকুন, ওতে শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ হবে। শুয়ে বরং খানিক গল্প করুন, মনটাও ভাল থাকবে।

রতিনাথ কেবল হাসিতে লাগিলেন।

মনীষা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, খানিক নীরবে থাকিয়া বলিল, "একটা কথা আছে বাবা—"

রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল মা যা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছ?"

মণীষা বলিল, "আমি একটা কাজ করব ভাবছি, আপনি এতে আপত্তি করবেন কি না তাই ভাবছি।"

হাতের কাগজখানা পাশে ফেলিয়া রতিনাথ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "বিলক্ষণ, এমন কি কাজ করবে যাতে আমি আপত্তি করব?

সঙ্কোচের সহিত মনীষা বলিল, "আমি বাংলার মেয়েদের জন্যে একটা সংঘ গড়ে তুলতে চাই এতে আপনার অনুমতি চাই।"

রতিনাথ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মনীষা দৃঢ়তার সহিত বলিল, "আমি জানি আমার ঐ উদ্দেশ্য মহৎ জেনেই আপনি এতে অমত করবেন না, সেই জন্যে ওদিককার ব্যবস্থাও সব ঠিক করে ফেলেছি।"

রতিনাথ বৃথাই হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "যদি ঠিকই করে ফেলে থাক মা তবে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করতে এসেছ কেন বল দেখি?"

মনীষা এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাঃ, আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না তো জিজ্ঞাসা করতে যাব কি পথের লোককে? আপনি মত দেবেন তবে তো কাজ করতে পারব, যদি মত না দেন তবে—"

সে কথা শেষ না করিয়া ব্যগ্রদৃষ্টিতে রতিনাথের পানে চাহিল।

রতিনাথ মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "ধর, আমি মত দেব না।"

মনীষা বলিল, "আমি কৈফিয়ৎ চাইব কেন মত দেবেন না।"

রতিনাথ বলিলেন, "দেব না এই জন্যে, আমি এক নম্বর স্বার্থপর লোক—তাই। আমি আমার মায়ের একটী মাত্র ছেলে, আমি চাই আমার মা আমাকেই খাইয়ে পরিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে খেলা দিয়ে শান্তি পাবে, বাইরের পানে চাইবে কেন? মা যদি বাইরের দশটা কাজে হাত দেন, আমার পানে চাইবে কে, আমায় দেখাশোনা করবে কে?"

কথাটা সমাপ্ত করিয়া তিনি প্রচুর হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু সে হাসির মধ্যে প্রকৃত আনন্দ যেন ছিল না, অন্তরের জমাট ব্যথা যেন সেই হাসির মধ্যে গলিয়া পড়িতেছিল।

মনীষা হাসিতে গিয়া হাসিতে পারিল না, মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "আমি বাইরের কাজ নিলে আপনার কথা ভুলে যাব এইটেই কি আপনি ধরে নিয়েছেন বাবা?"

হাসি থামাইয়া রতিনাথ বলিলেন, "ধরে যে নিতেই হয় মা, প্রায়ই যে এই রকমই হয়। মেয়ে পুরুষ সবাই যদি বাইরের কাজ নিয়ে থাকে, ঘরের কাজ কে করবে বল দেখি? যদি তুমি আর আমি দুজনেই কর্ম্মক্লান্ত দেহভার কোন রকমে বয়ে একই সময়ে বাড়ীতে ফিরে আসি, কে কার শ্রান্তি ঘুচাতে ছুটবে বল দেখি?"

মনীষা মুখ নত করিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার পর ধীর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বাবা, আমার দিন যে কাটতে চায় না। এই যে সারাদিনই আপনি বাইরে থাকেন, আমি কেবল সেলাই নিয়ে বই পড়ে কি করে দীর্ঘ দিনগুলো কাটাব?"

হঠাৎ যেন রতিনাথকে কে আঘাত করিল, অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিয়া রতিনাথ একবার বিস্ফারিত চোখে মনীষার পানে তাকাইলেন।

সত্যই তো,—কি আত্মসুখী লোক তিনি, নিজের আরাম ও শান্তির আশায় অন্ধ হইয়াছেন, আর একজন যে তাঁহার সেই আনন্দ পাওয়ার মূলে নিজের সুখ আনন্দ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া নিঃস্ব হইতেছে, তাহা তো তিনি একদিনও ভাবিয়া দেখেন নাই।

সত্যই তো, সমস্ত দিনমানটা তাঁহার বাহিরে কাটিয়া যায়, এই এতবড় বাড়ীটার মধ্যে কেবল মাত্র কয়েকটী দাস দাসীর সাহায্যে মনীষার দীর্ঘ দিন কাটিবে কি করিয়া?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "বড় স্বার্থপরের মত কাজ করছি—না মা? তোমার বিশ্বের উপর ছড়ানো স্নেহ গুটিয়ে এনে একটীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাই। না মা, আমি যতদিন তোমার বেদনা বুঝি নি, তোমায় বদ্ধ করে রেখেছি, এবার তোমায় মুক্তি দেব। তুমি যাতে শান্তি পাও কল্যাণি—তাই কর।"

মনীষা মাথা নাড়িল, "না বাবা, আর যাব না।"

রতিনাথ বিস্মিত হইয়া গিয়া বলিলেন, "কেন?"

মনীষা বলিলেন, "এ কথা সত্যি যে বাইরের কাজে হাত দিলে ভেতরের কাজ কিছু করতে পারব না। তার চেয়ে আমি যেমন আছি তেমনই থাকি।"

স্নেহভরে তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া রতিনাথ বলিলেন, "পাগলী মা, অমনি রাগ হয়ে গেল? না হয় আমি যতক্ষণ বাড়ী থাকব ততক্ষণ তুমিও বাড়ী থাকবে, আমি যখন বার হব তখন তুমিও বার হবে, তা হলে আমার তো কোন ক্ষতিই হবে না।"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু এই নারীসংঘের ব্যাপারটা কি আমায় একটু বুঝিয়ে দাও দেখি মা, তোমার কাজটা কি রকম চলবে একটু দেখা যাক। শেষটায় যেন খুব আড়ম্বর করে দশজনকে জানিয়ে কাজে নেমে যেন লোক হাসিয়ো না; এর পর দশজনে যে তোমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে সে কিন্তু আমি সহ্য করতে পারব না।"

মনীষা উৎসাহিতা হইয়া বলিল, "না বাবা, আপনি দেখে নেবেন এ কাজ আমি দশজনকে জানিয়ে করব না, চুপি চুপি আরম্ভ করব, পরে যদি ভাল ফল হয় তখন সকলেই জানতে পারবে। এ যে দরিদ্র মেয়েদের নিয়ে কাজ বাবা, ওরা আড়ম্বর করবে কি করে?"

"দরিদ্র মেয়েদের—মানে?"

মনীষা বলিল, "আপনি বুঝি ভাবছেন বাবা আমি বড়লোকদের নিয়ে কাজ করব, কিন্তু তা নয়, আমি গরীব অসহায়া মেয়েদের জন্যেই এই আশ্রয়টা গড়ে তুলব।

যাদের দেখতে কেউ নেই, একদিন যারা সমাজের মধ্যে স্থান পেয়ে আজ হয় তো পরের অত্যাচারে কিম্বা নিজেদের সামান্য ভুলে পথ হারিয়ে ফেলায় সমাজ যাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, যাদের আত্মীয় স্বজন কেউ থেকেও নেই, আমার এই প্রতিষ্ঠান কেবল তাদের জন্যেই হবে। যে সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বিশ্বের ঘৃণিত ত্যক্ত, যাদের জীবন কেবল অন্ধকারেই থাকবে বলে ভাবা যায়, যারা কোন দিন সৎ হবে আশা করাও ভুল বলে মনে হয়—আমার এ আশ্রমে সেই সব অভাগা ছেলে মেয়ে আশ্রয় পাবে। তারা জন্মেছে এই মাত্র তাদের অপরাধ, তাদের মা বাপের পরিচয় তারা জানে না, এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্যেই তৈরী হবে। বাবা, আপনি চিরদিন উঁচু দিকে নজর রেখেছেন, একবার ঘৃণা না করে এদের দিকে চান দেখি। একদিন হয় তো ওরাই মানুষের মত কাজ করবে, ওদের মধ্যে হয় তো এমন প্রতিভা আছে যাতে তারা বিশ্ববাসীকে চমকে দিতে পারবে, তাদের কি ভাবে ধ্বংস করা হয় দেখুন দেখি। এদের মত হতভাগা দুনিয়ায় আর নেই ; এদের জীবন এরা নিতান্ত দুর্ব্বহ বলে মনে করে, ভালো হওয়ার কল্পনা এরা মনেও আনতে পারে না। আবার এরাই এই রকম কতগুলি ঘৃণিত জীবকে জগতে টেনে আনে, এমনি করে দেশ যে ক্লেদে ভরে উঠছে। আমি ওদের ওই ছন্নছাড়া জীবনগুলোকে একটা স্থতোয় গেঁথে ফেলতে চাই, ওদের সৎ করতে চাই, ওরাও যে মানুষ, জগতে ভাল কাজ করবার অধিকার যে ওদেরও আছে সেই শিক্ষা ওদের দিতে চাই।”

ধীরে ধীরে রতিনাথের মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটী নিজের অজ্ঞাতে কখন অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল ; অতি গোপনে কখন তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, মনীষা তাহা দেখিতে পাইল না।

তেমনই গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রতিনাথ বলিলেন, “তোমার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ; আশীর্ব্বাদ করছি সফলতা লাভ কর।

আহ্বান

শ্রীবাণী রায়

তোমার আহ্বান
অশান্ত সাগর বক্ষে ঝটিকার গান
বিদ্যুৎ চকিত দৃষ্টি,
ধ্বংসের মাঝারে সৃষ্টি ;
কৃপণের সব দেওয়া মহিমার দান
তোমার আহ্বান।

তোমার আহ্বান,
কিশোরীর সহসা সে জেগে ওঠা প্রাণ।
বালিকার লাজ হাসি
পথিকের ভাঙ্গা বাঁশী
কোয়েলার সকরুণ মুখরিত তান
তোমার আহ্বান।

তোমার আহ্বান
দূর হতে ভেসে আসা পুণ্য অবদান।
ভয়ে ভয়ে থাকি কাছে
আমার যা কিছু আছে
বিলাইয়া তব পদে হব অবসান
শুনি ও আহ্বান।

বিশ্রাম

শ্রীঅমলা দেবী

সুদূর নীলিমা তল দিগন্ত বিস্তারি
সজল কাজল মেঘে গেছে আজ ভরি।
চমকে বিজলী ঘন উতলা পবন।
ঘুমাও ঘুমাও ওগো শ্রান্ত প্রাণ মন।
যতনে উজল করা সন্ধ্যা দীপ খানি
বাতাসে নিভিয়া গেছে। উতলা শ্রাবণী
নিশীথ গগন তলে দেছে ফেলে তার
দিগন্ত বিস্তার করি কালো কেশ ভার।
সাথী হীন শূন্য গৃহ শুধু পথ দেখি—
ঘুমাও ঘুমাও ওগো ক্লান্ত দুই আঁখি।

"প্রথম দান"

রাণী শ্রীসুরুচি বালা চৌধুরাণী

কেগো তুমি, এলে আজি, তরুণ সুন্দর !
অজানা অচেনা মোর নবীন অতিথি,
দ্বারে এসে দাঁড়াইলে বুকে ল'য়ে ব্যথা,
তুলিয়া নূতন সুরে গাও মধু গীতি ?

হে নবীন ! নিদ্রালস আঁখি-কোণে তব
এখনো জড়ায়ে আছে স্বপন মাধুরী,
মুছাইতে চাও কেন আধ ঘুম ঘোর
এনেছ কি ওই তব পাত্রখানি ভরি ?

অথবা কমল-করে শুধু ডালি লয়ে
কি দান দিবার ছলে হে চির-ভিখারী,
লুটিয়া ল'বে কি মম জীবনের সার,
নিঃস্ব করিয়া মোর এ বুক নিঙারি ?

সাথে লয়ে ফাগুনের মদির জীবন
এসেছো কি দিতে মোরে নবীন আশ্বাস,
খুলিয়া কি এ দুয়ার করিব বরণ।
মিটাবে কি পরাণের অসীম তিয়াস ?

কিবা আশা আধ সুরে জাগায়ে তুলিলে,
গোপন কথায় কও আধ পরিচয়
আধ খোলা দুয়ারের আলো-ছায়া পথে,
কি মোহন রূপে আজি তোমার উদয় ?

মরমের আধ ভাঙা তারে তুলি তান
কি নব আবেশে মোর হরিলে হে চিত,
ভাঙিলে স্বপন জাল এক লহমায়
কিসের পিয়াসী তুমি হে অপরিচিত ?

জানো কিহে এ জীবনে কত সুধা বহি,
কত ভাব কত ভাষা নাহি তার শেষ
আকুল এ হিয়া মাঝে কত আছে গান
জানাতে কাহারে চাই বেদনা অশেষ ?

যুগ যুগ ধরি' প্রিয় কাহার লাগিয়া
জীবনের অফুরাণ যত মাধুরিমা,
বিরহের ব্যথা ভরা অপূরিত আশা,
। লন মাগিয়া কভু পায় নাই সীমা ?

ওগো সখা ! কৌমার্য্যের পীত বাস পরি,
আজি কি এ শুভ লগ্নে দিলে মোরে দেখা।
কে বাজালো শঙ্খে ওই শান্ত উলু ধ্বনী
সাজাইয়া দীপ দেয় আলিপনা রেখা ?

হে কুমার ! তোমারি ও মোহময় আঁখি
প্রথম মিলন কি সে যাচে মোর সনে,
মিলনের মধুমাখা এ সুখের স্মৃতি
র'বে কি উজল সদা তোমারি ও মনে ?

তোমার অরুণ রঙে আমারে রাঙায়ে
প্রথম সোহাগ হার পরাইলে গলে,
প্রথম তিলক সাথে, বরণ-মালায়
অভিষেক করিলে কি নয়নের জলে ?

চাইনা তোমার কিছু লও মোর দান,
শূন্য হোক মোর এই ভরা ঘর খানি,
তোমাতেই মিশাইয়া যত কিছু মম
ফুটাইব চির মধু প্রণয়ের বাণী।

তোমার হিয়ার পাতে প্রথম লিখন,
লিখিনু উজাড় করি সব ভাষা মোর,
তোমারই বীণার তারে প্রথম রাগিণী
বাজাইনু প্রিয়তম ! মুছি' আঁখি-লোর।

সুধা

শ্রীহরিপদ গুহ — গল্প —

এক

স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

স্ত্রী মন্দাকিনী বলিল—'আর কতদিন মেয়েকে এমন করে পুরুষের সাজে রাখ্‌বে? এদিকে যে সুধার বারো বছর বয়স হতে চল্‌ল, সে খেয়াল কি তোমার আছে? মেয়ের যা বাড়ন্ত গড়ন, চৌদ্দয় বে দিতেই হবে;—আর মেয়েই বা কি, ওতো কিছুতেই শাড়ী-সেমিজ পর্‌তে চাইবে না!'

স্বামী হেমেন্দ্রনাথ হাসিল।

বলিল—'ভালই তো; ঠিক্‌ই তো কর্‌ছে ও। তুমি ওকে মেয়ে মনে কর্‌ছ কেন? ধরেই নাওনা কেন—ও আমাদের ছেলে। আমি তো কিছুতেই ভাব্‌তে পারি না যে, সুধা আমার মেয়ে। ছেলেতে-মেয়েতে কিছু প্রভেদ আছে বলে তো আমার মনে হয় না। আমরা জোর করে মেয়েদের কতকগুলি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখি বলেই না তারা মেয়ে! আমি সুধাকে দিয়ে সেটা দেখাতে চাই।—'

মন্দাকিনী আশ্চর্য্য হইয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'সে কী গো? লোকে তা' হলে বল্‌বে কি? সুধার বে দেবে না?'

হেমেন্দ্রনাথ হাসিল; বলিল—'আমি তো বলিনি যে, সুধার বে দেবো না!'

মন্দাকিনী আগ্রহ ভরে ব্যগ্রস্বরে বলিল—'দেবে? কার সঙ্গে? ছেলে, না মেয়ে?'

হেমেন্দ্রনাথ সহাস্য বদনে বলিল—'ধর যদি মেয়েই হয়; কেমন হয় তবে?'

মন্দাকিনী এইবার হো-হো শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—'বেশ হয়। শীগ্‌গিরই তবে নাতির মুখ দেখ্‌তে পাবে।'

হেমেন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলিল—'তা আর আশ্চর্য্য কি। তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণে ভগীরথ যখন একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে।—'

সহসা সুধা সেখানে উপস্থিত হওয়ায় আলোচনাটা চাপা পড়িয়া গেল।

সুধা বলিল—'বাবা, এক্ষুণি আমার বাইকের ব্রেক্ ঠিক্ করে দাও।। ওটা একেবারে বেঁকে গেছে।'

হেমেন্দ্রনাথ বলিল—'সে কীরে সুধা, নতুন সাইকেল, এরি মধ্যে ব্রেক বেঁকে গেছে কীরে? পড়ে গিয়েছিলি বুঝি?'

সুধা কহিল—'না বাবা, আমি পড়্‌ব কেন, অত আনাড়ী তোমার সুধা নয়! পড়ে গেছে রায়েদের শিবু। আমি কত বারণ কর্‌লুম;—ও তা শুন্‌লে না, বল্‌লে—'দে ভাই, একটিবার চড়ি।' তারপর যেই দিয়েছি,—ওই মোড় থেকে ফিরে আস্‌বার সময় মার্‌লে এসে গ্যাস্‌পোষ্টে এক ধাক্কা। হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে সে পড়ে গেল। ছুটে গিয়ে দেখি—ব্রেকটা একেবারে বেঁকে গেছে আর ষ্টুপিড্‌টার কাপড় ছিঁড়ে হাতটা অনেকখানি ছড়ে গেছে।'

হেমেন্দ্রনাথ প্রশংসমান-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চাকর নিধেকে ডাকিয়া দিল—তখনই যেন সে ব্রেক্‌টা ঠিক করিয়া আনিয়া দেয়।'

দুই

হেমেন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান। পিতা খুব অল্প বয়সেই মন্দাকিনীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার পর সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

স্নেহময় পিতা এবং মাতা উভয়েই পুত্রের মায়া কাটাইয়া ধরণীর এই পান্থশালা হইতে বিদায় লইয়া নূতন জগতে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন।

মন্দাকিনী অনেকদিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিল। একটি

সন্তানের জন্য স্বামী-স্ত্রীতে কী আকুল প্রার্থনাই না করিয়াছিল! ব্রত, উপবাস, কবচ ধারণ যে যখন যাহা বলিয়াছে, মন্দাকিনী তখনই তাহা করিয়াছে। কিন্তু কোন ফলই ফলে নাই। মন্দাকিনী নিজে তো একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলে যখন বলিতেছিল যে, সন্তান হইবার আর কোন আশা নাই, ভগবানের এমন লীলা,—ঠিক্ তখনই কিন্তু আশার লক্ষণ দেখা গেল। অধিক বয়সে মন্দাকিনী সন্তান-সম্ভাবিতা হইল। তাহার সমস্ত দেহে এক নূতন লাবণ্য দেখা দিল। মাতৃত্বের বিকাশের সূচনা হইল।

স্বামী-স্ত্রীর মনে আনন্দ আর ধরে না। তাহারা রাতদিন কত জল্পনা-কল্পনা করিত; কত ভাঙ্গিত, কত গড়িত।

কি সন্তান হইবে তাহা লইয়া দুইজনে বাদানুবাদ চলিত।

হেমেন্দ্রনাথ বলিত—'ছেলে।'

মন্দাকিনী বলিত—'মেয়ে।'

তখন হইতেই এই অনাগতের জন্য দুই সেট্ করিয়া সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়া গেল।

তারপর সেই শুভ আসন্ন কালের জন্য এক বুক আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া উভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পর তাহাদের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন সুধার জন্ম হইল। অনেকেই ভয় দেখাইয়াছিল যে, অধিক বয়সের সন্তান, প্রসবের সময় আশঙ্কা আছে। কিন্তু মন্দাকিনীর খুব সু-প্রসবই হইয়াছিল।

সুধা ছিল একাধারে তাহাদের ছেলে এবং মেয়ে। এক মুহূর্তও তাহারা তাহাকে চোখের আড়াল করিত না। শিশুকাল হইতেই হেমেন্দ্রনাথ সুধাকে ছেলের মতো পোষাক পরাইয়া ছেলের মতোই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। সুধার মুখখানিও ছিল অবিকল পুরুষের ছাঁচে ঢালা। সে কোন দিনও মেয়েদের মতো বউ-বউ কিম্বা ঘর-সংসার পাতিয়া পুতুল লইয়া কোন খেলা খেলে নাই। মার্বেল, লাট্টু, ফুটবল ইত্যাদি ছিল তাহার ক্রীড়নক, আর খেলার সাথী ছিল পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলেরা। তাহার বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল, হাইজাম্প লঙ্ জাম্প ইত্যাদিও শিখিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার চলাফেরা, কথাবলার মধ্যেও পুরুষালী ভাব্‌টা এমন প্রবল ছিল যে, কোন অপরিচিতের পক্ষে তাহাকে মেয়ে বলিয়া অনুমান করা বড়ই কঠিন।

শৈশবে মন্দাকিনী কয়েকবার কন্যার নাক-কান ফুঁড়িয়া তাহাকে গহনা পরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সুধার চীৎকারে ও হেমেন্দ্রনাথের আপত্তিতে তাহা কাজে লাগাইতে পারে নাই। মাথায় মেয়েদের মতো বড় চুল রাখিতেও সুধার ঘোর আপত্তি। প্রথম প্রথম বব্‌ড ছিল, এখন দশ আনি ছ' আনি করিয়া ছাঁটা।

প্রতি ঘটনাতেই বাপ ও মেয়ে একদিকে আর মা একা একদিকে থাকিত। কাজেই মন্দাকিনী কোনটাতেই বিশেষ সুবিধা করিতে পারিত না। তাহার কোন যুক্তি-তর্কই টিকিত না। ইদানীং তাই সে প্রায় একেবারে নীরবই থাকিত।

তিন

বছর খানেক পরেই কিন্তু হেমেন্দ্রনাথের মতের পরিবর্তন ঘটিল।

সুধার দেহ-লতা বর্ষার নদীর মতো কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এখন সুধার নিজেরও ছুটাছুটি করিতে সময় সময় কেমন একটু লজ্জা করে। মন্দাকিনী তো প্রায় সকল সময়ই তাহার উপর খড়্গ হস্ত। বাহিরের ছেলেদের সহিত খেলা তো একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে শাড়ী-সেমিজ-জ্যাকেট পরাও অভ্যাস করিতে হইতেছে। এমন কি কানে এক জোড়া দুল পর্যন্ত পরিতে হইয়াছে। এত করিয়াও কিন্তু মন্দাকিনী তাহার দেহে নারীর মাধুর্য্যটুকু ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। শাড়ী-সেমিজ পরিলে কি হয়, তাহার চলা এখনও ঠিক্ পুরুষের মতো। গলার স্বরে, মুখের হাসিতে, চোখের চাহনিতে রমণীসুলভ কমনীয়তা-টুকুর একান্ত অভাব।

হেমেন্দ্রনাথ আজকাল মধ্যে মধ্যে সুধাকে সতী, সীতা, সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়িয়া শোনাইয়া বলে—'তুমিও ওদের মতো স্বামীকুল উজ্জ্বল করে নারীর গৌরব অটুট রেখো কিন্তু।'

সুধা হাসিয়া বলে—'বিয়ে করলে তো! বয়ে গেছে।

মন্দাকিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া ওঠে—'বে করবে কেন? বি-এ, এম্-এ পাশ দিয়ে বিলেত যাবে।—'

হেমেন্দ্রনাথ বাধা দেয়। বলে—'তুমি চুপ কর না।' তারপর সুধাকে কাছে টানিয়া আনিয়া উপদেশ দিতে থাকে। বলে—'তুমি তো এখন বড় হয়েছ সুধা! ছেলেদের সঙ্গে আর খেলতে যেও না! তোমাকে এক সেট্ ভাল পুতুল এনে দেবো, তাই দিয়ে খেলো। সঙ্গে সঙ্গে মার কাছ থেকে ভাল করে রান্না-বান্নাটাও শিখে নিয়ে আমাকে দিন কতক রেঁধে খাওয়াও দেখি! তোমার মার হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে একেবারে অরুচি ধরে গেছে!'

সুধা কোন কথা কহে না মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে।

চার

পূর্ণোদ্যমে ঘটক লাগিয়া গিয়াছে।

নানাস্থান হইতে দুই-একটি করিয়া সম্বন্ধও আসিতে লাগিল। মেয়ে দেখিয়া পছন্দ না হওয়ায় আবার ফিরিয়াও যাইতে লাগিল। আবার নূতন সম্বন্ধ আসিতে থাকে।

সুধাকে সু-সজ্জিত করিয়া আসরে আনিয়া বসাইয়া দিলে বরপক্ষ যখন তাহাকে কোন প্রশ্ন করে,—সে তখন হয় দুলিতে থাকে, না হয় শিস্ দেয়, কিম্বা আশেপাশে পরিচিত কোন সখীকে দেখিতে পাইলে—'হাঁ করে দাঁড়িয়ে তোরা এখানে কী দেখছিস্?' বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে।

বরপক্ষ পরক্ষণেই পলাইবার পথ খুঁজিতে থাকে।

হেমেন্দ্রনাথ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। সুধাকে এতো করিয়া বুঝাইয়াও কোন ফল হইল না। সে কিছুতেই বালক-সুলভ চপলতা ছাড়িতে পারিল না।

মন্দাকিনী তর্জ্জন করিয়া বলিল—'কেমন, তখনই বলেছিলুম না,—এখন ঠ্যালা সামলাও!'

হেমেন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিল না।

* * * *

প্রজাপতির খেলা; ফুল ফুটিলে নাকি বিবাহ হইবেই। সুধার বিবাহ সম্বন্ধে যখন সকলেই একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখন অন্তরীক্ষে দেবতা হাসিলেন। শীঘ্রই একটী সম্বন্ধ আসিল। বড় লোকের একমাত্র মেয়েকে দেখিয়া খুব সহজেই পছন্দ হইয়া গেল।

পাছে এমন দাঁও হাত ছাড়া হইয়া যায়, তাই বরপক্ষ তখনই পাকা-পাকি বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

হেমেন্দ্রনাথ কিন্তু চট্ করিয়া তাহাতে রাজী হইতে পরিল না। বলিল—'বেশ তো ভেবে-চিন্তে দেখি, উভয় পক্ষের মত হলে পরে একটা ভাল দিন ঠিক্ করে পাকা দেখ্‌লেই চলবে'খন!' অগত্যা বরপক্ষ আর কি করেন! তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

পাঁচ

মন্দাকিনী হেমেন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিল—'অমত করো না; এখানেই সুধার বিয়ে দাও! যাহোক্, ছেলেটি তো ভাল; এবার বি-এ দিয়েছে। জমীদারীর অবস্থা খারাপ;—তার আর কি করবে বল? সুধার অদৃষ্ট তো কেউ আর নিতে পারবে না! আমাদের আর কেই বা আছে? যা আছে, তা তো ওরাই পাবে। ছেলেটি বি-এ পাশ দিয়ে আর কোন্ বড় কাজ-টাজ না করবে। এদিকে মেয়ে যা গুণবতী; এখানে যদি না দাও, তবে জেনো ওর বরাতে আর বিয়ে নেই!'

হেমেন্দ্রনাথও এই বিষয়টা খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতেছিল। কয়েকদিন চিন্তার পর সে মত করিয়া পাত্রের পিতার নিকট এক পত্র দিল।

তাঁহারা একটা দিন ঠিক্ করিয়া একদিন পাকা-দেখা করিয়া সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

* * * *

বৈশাখের এক শুভ দিনে নলিনী মোহন চৌধুরীর সহিত শ্রীমতী সুধার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বে সুধা বায়না ধরিয়া বসিল—সে বড় করিয়া ঘোম্‌টা দিতে পারিবে না কিন্তু!

মন্দাকিনী হাসিয়া বলিল—'অত বড় করে তোমাকে

ঘোমটা দিতে হবে না। মাথার কাপড়টা সাম্‌নের দিকে একটু টেনে দিলেই চল্‌বে 'খন!'

পরদিন হেমেন্দ্রনাথ বৈবাহিককে ডাকিয়া বলিল—'দেখুন, আমাদের একটি মাত্র সন্তান সুধা, বড় আদরের। একে তেমন করে শিক্ষা দিতে পারি নি। বড় অভিমানী সে, পদে পদে হয় তো ভুল কর্‌বে;—দয়া করে সব ক্ষমা করে সংশোধন করে নেবেন!'

বৈবাহিক নরেন্দ্রবাবু জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—'তা তো বটেই। তা নেব বৈকি। সব জেনে, দেখে-শুনেই তো বধূমাতাকে ঘরে নিলুম। আপনি সে জন্য কোন চিন্তা কর্‌বেন না!'

বৈকালে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া জনক জননী স্নেহের দুলালীকে বিদায় দিল। সুধাও আজ অশ্রু রোধ করিতে পারিল না।

ছয়

নলিনী খুব আপ-টু-ডেট্‌ ছেলে। সুধাকে খুব ফরওয়ার্ড দেখিয়া তাহার বেশ ভালই লাগিল। সে তাহাকে চট্‌ করিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল। সে যে জিনিষটা পছন্দ করিল, বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা ঠিক সেটাকেই বেয়াদপি ও লজ্জাহীনতা আখ্যা দিয়া বসিল।

নলিনী মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকায় লিখিয়া থাকে। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে সে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিল। তাহাতে সে দেখাইয়াছে যে, এদেশের মেয়েরা কাপড়ের বস্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে; নিজের কোন সত্ত্বা নাই। কাজেই সে সুধাকে পাইয়া সুর ফেরতা ধরিল এবং মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করিল। এখন হইতে সে নূতন উদ্যমে প্রবন্ধ লিখিয়া নীচে নাম সহি করিতে লাগিল—শ্রীসুধানলিনী চৌধুরী বি-এ।'

বন্ধু-মহলে এই যুগল নাম লইয়া খুব হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল।

* * *

নলিনীর মা এবং বড়দিদি সুধাকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল। বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই হোক্‌ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক প্রথম প্রথম সুধাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু, যখন তাহারা দেখিল—নলিনী তাহার বড় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে;—নিজের ছেলে পর হইয়া যায়—তখন যত রাগ গিয়া পড়িল কালনাগিনী ধিঙ্গী মেয়ে সুধার উপর। সুযোগ পাইলে তাহাকে তাহারা কুট্‌ কুট্‌ করিয়া কামড়াইতে লাগিল। তাহার পিতামাতার নিন্দা করিতে লাগিল।

সহ্য করিবার মেয়ে সুধা নয়। তবুও বিদায়কালীন মায়ের অনুরোধ স্মরণ করিয়া অনেক দিন সে নীরবে সহ্য করিয়াছে; কিন্তু, ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। একবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহাকে আর আটকান যায় না।

একদিন মা-বাপ তুলিয়া গালি-গালাজ করাতে সুধাও তাহাদের কড়া-কড়া দুই কথা শুনাইয়া দিল। ইহাতে তাহার শাশুড়ী ও ননদ কাঁদিয়া-কাটিয়া একেবারে বিভ্রাট বাধাইয়া ছাড়িল। পাড়ার আশে-পাশের বাড়ীতে সত্য-মিথ্যা নানা কথা বলিয়া সুধাকে সকলের কাছে একেবারে হেয় করিয়া দিল।

সুধা তাহার মাকে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া জানাইল। মন্দাকিনী মেয়ের লাঞ্ছনার সংবাদে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। হেমেন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিল—'কিছুদিনের জন্য সুধাকে এখানে নিয়ে এসো!'

হেমেন্দ্রনাথ বৈবাহিককে পত্র দিল—যে, একটা ভাল দিন দেখিয়া সুধাকে দিন কতকের জন্য এখানে লইয়া আসিবে।

নরেন্দ্রবাবু পত্রোত্তরে জানাইলেন—'বধূমাতা সন্তান সম্ভাবিতা; এই অবস্থায় এখন পাঠান অনুচিত।'

হেমেন্দ্রনাথ মন্দাকিনীকে ডাকিয়া শুভ-সংবাদটা শুনাইয়া বলিল—'দেখো, এইবার কেউ আর সুধার কোন নিন্দা কর্‌তে পার্‌বে না। মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণ বিকাশ!'

মন্দাকিনী স্বামীকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল—'তুমিই কিন্তু একদিন এর বিরুদ্ধে বলেছিলে।'

সাত

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। মন্দাকিনী সুধার ছেলের জন্য একখানি নক্সী-কাঁথা শেলাই করিতেছিল।

সহসা চির-পরিচিত কণ্ঠের ডাক আসিল—'মা !'

তারপরই সে ঘরে প্রবেশ করিল সুধা; কোলে ফুলের মতো ফুটফুটে একটি সুকুমার শিশু।

মন্দাকিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া নিল। সুধা মাতার পদধূলি লইয়া বলিল—'কতদিন তোমাদের দেখিনি, আমার মন কেমন কর্‌ছিল তাই কোন খবর না দিয়েই হঠাৎ চলে এলুম। ওঁরা এখন আমাকে খুব ভালবাসে। সেই সুধা আর এখন নেই মা, একেবারে বদ্‌লে গেছি !'

মন্দাকিনীর মুখ খুসীতে ভরিয়া উঠিল।

নলিনী আসিয়া মন্দাকিনীকে প্রণাম করিতেই, সুধা ঘোমটা টানিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

সত্য সত্যই সুধার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমস্ত দেহে তাহার এমন একটা লালিত্য আসিয়াছে, যাহা অতি সহজেই সকলে মুগ্ধ করে। তাহার সেই রূঢ় ভাবও আর নাই। এখন সে একেবারে শান্ত, অনেক কিছু সে এখন সহ্য করিতে পারে! যেন কোন সোনার কাঠির স্পর্শে তাহার নূতন জীবন লাভ হইয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ সস্নেহে কন্যাকে পাশে বসাইয়া হাসিয়া বলিল—'ওরে সুধা, তোর সেই সাইকেলটায় একবার চাপ্‌বি না ?'

সুধা—'যাও।' বলিয়া হাসিতে লাগিল।

দৈবাৎ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল, [দৃশ্য গল্প]

পরিচয়

পরিতোষ বাবু—ভদ্রলোক, অবস্থাপন্ন, বিপত্নীক, নিঃসন্তান।

শৈলেন—যুবক, উচ্চ শিক্ষিত, মাতৃ পিতৃহীন, মাতুল পরিতোষ বাবু কর্ত্তৃক পুত্রবৎ পালিত।

উষা—শৈলেনের কনিষ্ঠা ভগিনী।

ফটিক—বালক ভৃত্য।

ভাগিনেয়—আগন্তুক

সকলেই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে আসিয়াছেন।

প্রথম দৃশ্য

জসিডি জংসন। ডিগড়িয়া পাহাড়ের প্রায় পাদমূলে। সন্ধ্যা হইয়াছে; বৃষ্টি হইতেছে, জোরে ঝড় বহিতেছে। কিছুই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। কেবল মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল জমিয়া একটা মলিন শ্বেতাভার সৃষ্টি হইয়াছে।

উষা অতি সাবধানে পা ফেলিয়া পাহাড়ের দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহার গা ওয়াটার প্রুফে ঢাকা—পায়ের শাদা চাম্‌ড়ার জুতা জল ও কাদায় অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। উহাকে দেখিয়া মোটেই ভীত বা উৎকণ্ঠিত বোধ হইতেছে না। বরং সে যেন এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পথ হারাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করিতেছে।

বিদ্যুৎ চমকিল এবং পরক্ষণেই বজ্রের একটা বিকট আর্ত্তনাদ উঠিল।

উষা হঠাৎ ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল;—'মামা—মামা—'

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। পিচ্ছিল জমির উপর পা হড়্‌কাইয়া পড়িতে পড়িতে দু'বার সামলাইয়া লইল। কিন্তু তৃতীয়বার আর পারিল না—হঠাৎ তিন চার হাত দূর পর্য্যন্ত পিছ্‌লাইয়া গিয়া কাদার মধ্যে উপুড় হইয়া

পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে তাহার মাথার টুপীটা দমকা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া ব্যোম-পথে অদৃশ্য হইল।

উষা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া ছুটিয়া কাছে আসিয়া ডাকিল ;—'মামা—'

সে ব্যক্তি উঠিয়া বসিল। নাসিকার অগ্রভাগ হইতে কর্দ্দম মুছিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল। তারপর বলিল ; 'আমি মামা নই—আমি ভাগ্নে।'

উষা অবাক হইয়া গেল।

উষা।—ভাগ্নে?

ব্যক্তি। হ্যাঁ—ভাগ্নে। কিন্তু মামা আমার সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করেন নি। আমাকে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফেলে তাঁর অস্ত যাওয়া মোটেই উচিৎ হয়নি।

উষা।—আপনার মামা কে?

সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি।—আমার মামা—সুয্যি মামা।

কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া উষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উষা।—সুয্যি মামা—(হাসি)

সুয্যিমামার ভাগ্নে ঘাড় বাঁকাইয়া বীরদর্পে দাঁড়াইল। চক্ষু পাকাইয়া বলিল ;—হাসি! এই ঝড় বৃষ্টির সময় হাসি! আমি পা পিছ্‌লে কাদার মধ্যে হেঁড়েভুডু খেল্‌ছি আর হাসি! (পদদাপ)

পদদাপ করিতে গিয়া আবার পদস্খলন ও চিৎ হইয়া পড়ন। উষার উচ্চ হাস্য। সে ব্যক্তি শয়ান অবস্থাতেই হস্তভঙ্গী করিয়া ক্রুদ্ধভাবে কহিল ;— 'হাসি! ফের হাসি! আমি পড়ে গেছি তাই— তুম্ কোন হায়? কে তুমি? তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি বাঙালী কি বেহারী কি মারাঠী কি গুজ্‌রাটী কি উড়ে—

উষা।—আমি বাঙালী।

সে ব্যক্তি অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিল।

ব্যক্তি।—বাঙালী? ঠিক! বেহারী কিম্বা উড়ে হলে 'মামা' না বলে 'মামু' বলতে।—কিন্তু তোমার অত হাসি কিসের? তুমি কি জাতি?

উষা।—আমি স্ত্রীজাতি।

সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি।—স্ত্রীজাতি? আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি! (টুপী তুলিবার জন্য মাথায় হাত দিয়া) আমার টুপী কোথায়?

উষা।—আমি তাকে উড়ে যেতে দেখেছি।

সহসা সে ব্যক্তি ভীষণ চটিয়া উঠিল।

ব্যক্তি।—কি! আমার টুপী উড়ে যেতে দেখেছ? (আত্মসম্বরণ করিয়া) ওঃ আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি! তা—ইয়ে হয়েছে—আপনি এখানে কি মনে করে।

উষা।—আমি আর আমার মামা পাহাড়ে বেড়াতে এসেছিলুম। তারপর এই দুর্য্যোগে মামাকে আর খুঁজে পাচ্ছিনা।

ব্যক্তি।—আপনার মামা—ই'য়ে—তাঁকে আর খুঁজে পাবেন না।

উষা।—অ্যাঁ! সেকি!

ব্যক্তি।—দিঘরিয়া পাহাড়ে ভয়ানক বাঘ—আপনার মামা বোধ হয় তাদের সঙ্গেই রাত্রি যাপন করবেন।

উষা।—[ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] অ্যাঁ—না না—মামা মামা—

ব্যক্তি।—[নিজমনে] হাসি! হাসি! আমি কাদায় আছ্‌ড়া পি্‌ছড়ি খাচ্চি আর হাসি! [উষার নিরুপায় ভাব লক্ষ্য করিয়া] না—এটা উচিৎ হচ্চে না—নেহাত বর্ব্বরতা হচ্ছে।—[প্রকাশ্যে] ই'য়ে—তা কোনো ভয় নেই। বাঘেরা আপনার মামার সন্ধান নাও পেতে পারে।

উষা নীরব মিনতির চক্ষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

ব্যক্তি।—দেখছেন না এই পেছলে বাঘ কখনো বেরুতে পারে? আর যদি বা বেরোয় আর কোথাও যেতে পারবে না সড়াৎ করে এইখানে এসে হাজির হবে।

উষা।—কিন্তু কৈ এসে হাজির হচ্ছে না ত!

ব্যক্তি।—তার মানে তারা বেরোয়নি। আমাদের চেয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বেশী।

উষা।—কিন্তু মামা—

ব্যক্তি।—তিনি ত নিশ্চয় বেরোন নি নিরাপদেই আছেন। অথবা হয়ত আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছেন।

উষা।—ষ্টেশন কোন দিকে?

ব্যক্তি। সেটা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের অভাবে বলা শক্ত। খুঁজে নিতে হবে।

উষা। তাহলে—

ব্যক্তি।—হ্যা—ডিঙ্‌ড়িয়া পাহাড়কে পেছনে রেখে যেদিকে হোক এগোনই ভাল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলে নিউমোনিয়া হতে পারে হাঁটলে সে ভয় কম।

সে ব্যক্তি অগ্রসর হইল। একাকিনী দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা ইহার সঙ্গে যাওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিয়া উষা তাহার অনুসরণ করিল।

ব্যক্তি [যাইতে যাইতে সহসা থামিয়া] মাফ্‌ করবেন—[ইতস্ততঃ] ওর নাম কি—

উষা।—আমার নাম উষারাণী দত্ত।

ব্যক্তি। না না সে কথা নয়। আপনি কি জংসনেই থাকেন?

উষা। না। দেওঘরে বম্পাস টাউনে। আপনি?

ব্যক্তি। আমিও।

উষা। [সাগ্রহে] বম্পাস টাউনে!

ব্যক্তি।—হুঁ।

উষা। আপনার নাম?

ব্যক্তি। আমার নাম [মাথা চুলকাইয়া] শ্রীভাগিনেয় বসু।

এই বলিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া প্রস্থান। উষার অনুগমন। উভয়ে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী আর একজনের প্রবেশ। প্যান্টালুন কর্দ্দমাক্ত, মাথার টাকের উপর হইতে বৃষ্টির জল চারিদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। ইনি উষার মামা পরিতোষ বাবু।

পরি। ঘোড়ার ডিম! ভারী পেছল। [পা পিছ্‌লাইল] উঃ ঘোড়ার ডিম—গিয়েছিলুম আর একটু হলে। উষা—উষা! [হতাশভাবে] ঘোড়ার ডিম! [দাঁড়াইয়া টাক হইতে জল মুছিলেন] কোথায় গেল মেয়েটা! কেন তাকে একলা ছেড়ে দিলুম! ঘোড়ার [উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন] ঐ যে কে 'মামা' 'মামা' করে ডাকছে! কিন্তু ওত উষার গলা নয়। ঘোড়ার ডিম—আরও মামা এখানে আছে নাকি!

দূর হইতে শব্দ হইল—'মামা'—'মামা' পরে। ঐ যে উষার গলা! উষা—উষা কিছু দেখবার যো নেই। ঘোড়ার ডি—বিদ্যুৎ চমকিল।

পরে। ঐ যে সামনে কিছু দূরে দুজন লোক দেখলুম না! একজন ওয়াটার প্রুফ পরা উষা বলেই বোধ হল। ঘোড়ার ডিম—বিদ্যুৎ আর একবার চম্‌কালে হত যে। একে পেছল তায় অন্ধকার ঘোড়ার ডিম—(নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেওঘর। বম্পাস টাউনে একটি সুদৃশ্য কুটির। নাম—প্রেম কুটির। তাহারে পাঁচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে বাঁধানো চাতালের উপর টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি সজ্জিত। সূর্য্য এই মাত্র অস্ত গিয়াছে—আকাশে বৃষ্টির কোনও লক্ষণ নাই। হাওয়া ঝরঝরে।

পরিতোষ বাবু একটি বেতের মোড়ায় বসিয়া একটি চুরোটের অতি ক্ষুদ্র শেষাংশ চুষিতেছিলেন। পরিধানে কোঁচানো ধুতি ও পিরান কিন্তু গলায় উলের গলাবন্ধ, পায়ে মোজা এবং চটিজুতা।

পরিতোষ বাবুর মোড়ার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বালক ভৃত্য ফটিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। সে কিছু হৃষ্টপুষ্ট—গালদুটি উঁচু হইয়া নাসিকার বিশেষ খর্ব্বতা সাধন করিয়াছে। কপাল নাই বলিলেই হয়। বর্ণ নিকষকৃষ্ণ।

অন্য কেদারায় বসিয়া একটি যুবক;—সান্ধ্য ভ্রমণের উপযুক্ত সাজ—চেহারা সুশ্রী ও গম্ভীর কিন্তু অধরোষ্ঠ ঈষৎ চপলতার পরিচায়ক। সে নিবিষ্ট মনে সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে বাদ্য সংযোগে সঙ্গীতের আওয়াজ আসিতেছিল। উষা গাহিতেছিল;—

'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'—যে যুবকটি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিল তাহার নাম শৈলেন। সে উষার দাদা।

পরিতোষ বাবু চুরোটের দগ্ধাবশেষ হইতে আর কিছুমাত্র ধূম বাহির করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া সেটা ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন;—'আজ্‌কের খবর পড়লে?'

শৈলেন।—(কাগজখানা মুড়িয়া রাখিয়া) হ্যাঁ।

পরি।—জাপানের ব্যাপারখানা দেখেছ?

শৈলেন।—(একটু হাসিয়া) হ্যাঁ।

পরি।—এমন ফন্দিবাজ জাত আর পৃথিবীতে নেই—ঘোড়ার ডিম—ওরা ভয়ানক ধূর্ত্ত। এই যে জাহাজের পর জাহাজ তৈরী করছে সেকি মিছিমিছি? ঘোড়ার ডিম—মোটেই নয়। ভারতবর্ষ যদি না জাপানীরা আক্রমণ করে ত বোলো তখন। ওই যে সব জাপানী ফেরিওয়ালা বস্তা ঘাড়ে করে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা কি সাধারণ লোক মনে করেছ। ওরা সব ঘোড়ার ডিম—সিপাই—দেশের প্ল্যান করে বেড়াচ্ছে। সুবিধে পেলেই আক্রমণ করবে।

শৈলেন। তা যদি করে আমাদের বেশ সুবিধে আছে—ওদের বস্তাগুলো কেড়ে নিলেই হবে।

পরি।—তারা কি ঘোড়ার ডিম—বস্তা নিয়ে লড়াই করতে আসবে? সঙীন উঁচিয়ে—কামান দাগ্‌তে দাগ্‌তে এসে হাজির হবে।

'ওঃ' বলিয়া শৈলেন এমনভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিল যেন এ সম্ভাবনা সে কল্পনাই করে নাই।

উষার প্রবেশ।

উষা।—কৈ, মিঃ বোস এখনো এলেন না?

পরি।—ফটিক! ফটিক! ঘোড়ার ডিম—ঘুমিয়ে পড়েছে। (উচ্চ কণ্ঠে) ফটিক!

জাগরণের চিহ্নস্বরূপ ফটিক প্রথমে বাম চক্ষু পরে দক্ষিণ চক্ষু সাবধানে উন্মীলন করিল এবং পরক্ষণেই কাঁদিয়া ফেলিল।

পরি। গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াগে যা। একটি বাবু আস্‌বেন, এইখানে নিয়ে আস্‌বি।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফটিকের প্রস্থান। উষা অন্যমনস্কভাবে আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; একটা ফুটনোন্মুখ গোলাপের কুঁড়ি ছিঁড়িয়া একবার তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিল। শৈলেন আড় চোখে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া খুব গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল;—উষা, কালকের ঘটনাটা কবিতায় লিখে ফেল—তারপর সেটা 'মন্দাকিনী'তে পাঠিয়ে দিলেই হবে। একে তোমার লেখা, তার ওপর নায়কের নামটি যে রকম চিত্তাকর্ষক—

উষা দাদাকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রূকুটি করিল তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

পরি।—কেন শৈলেন তুমি ওকে ক্ষেপাও। ওর বাস্তবিক লেখবার ক্ষমতা আছে—তুমি ঘোড়ার ডিম—তুমি ওর 'অস্ফুট' পড়ে যতই হাসো না কেন, তার বুঝ্‌বে কি? তার মধ্যে বাস্তবিকই ভাল কবিতা আছে। এই ধরনা কেন 'প্রার্থনা', 'আশ্রয় যাচ্ঞা,—এগুলো ঘোড়ার ডিম উৎকৃষ্ট রচনা। ওইটুকু মেয়ের হাত থেকে অমন লেখা বেরোন কি যে-সে কথা! তুমি হাজার চেষ্টা করলেও অমন একটা পদ্য লিখতে পারো না।

শৈলেন।—'মন্দাকিনী'তে তার যে রকম প্রশংসা বেরিয়েছিল তাতে সে রকম লেখবার উচ্চাশা আমার বড় একটা—

উষা আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। ছেলেবেলার প্রথম লেখা ছাপানোর লজ্জাকর অধ্যায়টা এমনিই উষাকে ত্রস্ত-সঙ্কুচিত করিয়া রাখিত,—তার উপর শৈলেন যখন সেই কথা লইয়া তাহাকে বিঁধিতেও ছাড়িত না তখন তাহার দাদার প্রতি রাগ ও নিজের বিগত নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকিত না। এক এক সময় শৈলেনের জ্বালায় সত্য সত্যই তাহার লোক-সমাজে মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিত।

উষার বয়স এখন উনিশ; তাই সে পনেরো বছর বয়সে লেখা নিজের কবিতার মধ্যে অক্ষমতা ও ছেলে-মানুষী ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না, এবং লজ্জায় মরিয়া গিয়া ভাবে—কেন মরিতে এগুলাকে ছাপিতে গিয়াছিলাম!

ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ ও সকলের পরস্পর অভিবাদন। পরিতোষ বাবু মোড়া ছাড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। শৈলেন আগন্তুককে কিছুক্ষণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। উষা পূর্ব্বদিনের সেই কাদা মাখা অদ্ভুত জীবটির পরিবর্ত্তে এই সুবেশ সুশ্রী অতিথিটিকে দেখিয়া সহসা সম্ভাষণ করিবার মত উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পাইল না এবং মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

ভাগিনেয়।—আপনাদের গেটের কাছে একটি বালক দেখলাম যার প্রকৃতি কিছু অস্বাভাবিক বলে বোধ হল। আমাকে দেখেই সে কেঁদে ফেল্লে; তাই দেখে আমার মনে দয়া হল, আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। পরক্ষণেই দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরি।—ওটি আমার বেয়ারা ফটিক!

ভাগি।—ভারি আশ্চর্য্য! বাস্তব জগতে ফ্যাট্ বয়্ এবং বব্ ট্রটারের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রন বোধহয় আর কোথাও নেই। ওকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দিন।—(উষার দিকে ফিরিয়া) কাল আপনার সঙ্গে আমি সদ্ব্যবহার করিনি। সে জন্যে মাপ চাইছি। মনুষ্য সমাজে যে ব্যবহার একেবারে অমার্জ্জনীয় ডিঘরিয়া পাহাড়ের ধারে হয়ত ততদূর নাও হতে পারে এই মনে করে এই দুষ্প্রাপ্য জিনিষ চাইতে সাহস কর্চ্ছি।

উষা।—(সস্মিত মৃদুস্বরে) সাহসের বলে মানুষ অনেক জিনিষ লাভ করে—আপনিও করলেন।

ভাগি।—আমাকে বেশী সাহসী মনে করবেন না। প্রথমতঃ আমি বাঙালী, সুতরাং বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মতে আমার ভীরু হওয়া একটা জাতীয় কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ—

শৈলেন।—কিন্তু আপনার নামটি অসম সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

ভাগি।—কি ভাবে?

শৈলেন।-নাম করণ সম্বন্ধে সামাজিক বিধি বাঁধন গুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ভাগি—(কিয়ৎ কাল ভাবিয়া) দেখুন—আমার নামটা একটা মহামুহূর্ত্তের প্রেরণার ফল। ওটির জন্য আমাকে ঈর্ষা করবেন না।

উষা।—আচ্ছা ভাগিনেয় বাবু, এ নামটি আপনার কে রেখেছিল?

ভাগি।—আমি স্বয়ং। ছেলেবেলা থেকেই মামাদের প্রতি আমার একটু পক্ষপাত আছে।

শৈলেন।—তাই নিঃসংশয়ে পৃথিবী সুদ্ধ লোকের ভাগ্নে হয়ে বসে আছেন। কিন্তু এতে কোন কোনও লোকের কিছু অসুবিধা হওয়া সম্ভব।

ভাগি।—কি করে?

শৈলেন।—(ইতস্ততঃ করিয়া) আপনার মহিলা বন্ধুরা সকলে এ সম্বন্ধ স্বীকার করতে রাজি না হতে পারেন।

ভাগি।—আমার জানিত একটি লোক আছেন—তাঁর নাম প্রাণেশ্বর! তাঁর বান্ধবীরা, তাঁকে প্রাণেশ্বর বলে ডাকতে দ্বিধা করেন না।

সকলে স্তব্ধ। পরিতোষ বাবু অভিভূত, শৈলেন পরাজিত, উষা লজ্জাহত।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। পরিতোষ বাবু দু' একবার কাশি চাপিবার চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন;—'ঘোড়ার ডিম—কাল জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। আর বাইরে থাকা ঠিক নয়। উষা, তোমারও ত—

উষা। না মামা, আমার কিছু হয়নি। তুমি বরং ভেতরে যাও আমরা আর একটু পরে—

পরি। আচ্ছা। ভাগিনেয় বাবুকে ছেড়ে দিও না। আমি তোমাদের জন্যে ড্রইং রুমে অপেক্ষা করব। উষা, একবারটি শুনে যাও।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

শৈলেন। [উত্তেজিত ভাবে] বিজন তুমি—?

ভাগি। চুপ—ব্যস্। আমি ভাগিনেয়। সব মাটি করে দিও না। পরিতোষ বাবু তোমার—?

শৈলেন।—মামা।

ভাগি।—মেয়েটি?

শৈলেন।—বোন।

ভাগি।—[উৎকণ্ঠিত] 'অস্ফুট'র—?

শৈলেন:—লেখিকা!

ভাগি। [মাথায় হাত দিয়া] উঃ—চুপ!

উষার প্রবেশ

উষা।—মামা বল্লেন আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে তবে বাড়ী যেতে পাবেন। কিন্তু ডিনারের এখনো ঢের দেরী আছে। ততক্ষণ না হয় এখানে বসে—

শৈলেন। কাব্য আলোচনা করা যাক। কি বলেন ভাগিনেয় বাবু? আপনি বোধ হয় জানেন না, আমার ভগিনী খুব একজন উঁচুদরের—

উষা। আঃ দাদা—চুপ কর।

শৈলেন।—কবি। বাঙলা ভাষার সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় থাকে, এমন কি মুখ দেখা-দেখিও থাকে তাহলে নিশ্চয় আপনি 'অস্ফুট' নামক অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থের নাম শুনেছেন। তার মধ্যে 'প্রার্থনা' 'আশ্রয় যাচ্ঞা' প্রভৃতি যে সব উচ্চ অঙ্গের কবিতা আছে তা পড়লে চোখের জল সজোরে বেরিয়ে পড়ে। অন্ততঃ আমার পড়ে। আপনি বল্‌বেন ভগিনীর কাব্য সম্বন্ধে ভ্রাতার মনে একটু দুর্ব্বলতা থাকা সম্ভব। প্রত্যুত্তরে আমিও বল্‌তে পারি যে ফটিক উষার ভাই নয় তথাপি সেও কেঁদে ফেলেছিল।

উষা।—দাদা—তুমি—

শৈলেন। আমি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করছি না। দরকার হয় আমি এখনি ফটিকের ঘুম ভাঙিয়ে তার সামনে তোমার একটা কবিতা আবৃত্তি করে একথা প্রমাণ করে দিতে পারি। তাছাড়া 'মন্দাকিনী'র সম্পাদক বিজন বোস এই কাব্যখানির যে মর্ম্মস্পর্শী সমালোচনা করেছিলেন—

উষা। তবে যাও—[প্রস্থানোদ্যতা]

ভাগি। ওর নাম কি—যাবেন না। দশানন সীতা-হরণ করেছিল সেই অপরাধে সাগরের বন্ধন হল। আপনার দাদার ধৃষ্টতার জন্যে আপনি আমাকে শাস্তি দিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন?

উষা।—[ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া] বেশ যত ইচ্ছে বল। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।

ভাগি। এইত চাই! সমালোচনা গায়ে মাখতে নেই; সমালোচককে জব্দ করবার ঐ একমাত্র উপায়।—আমার যখন বয়স অত্যন্ত কম তখন একবার নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে একটা আস্ত ডিম খোলাসুদ্ধ কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলেছিলাম। তার পর থেকে আমার সামনে ডিমের নাম উচ্চারণ করলেই আমার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করত এবং নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করত। কিন্তু এখন দেখুন, আমার চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মুর্গী এবং হাঁস অনবরত ডিম পাড়তে থাক্‌লেও আমি অবিচলিত হয়ে তা দেখতে পারি। আমার মনে কোনও বিকার উপস্থিত হয় না।

শৈলেন।—আচ্ছা উষা, বিজন বোসের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় তাহলে তুমি কি কর?

উষা কুঞ্চিত ভ্রূ, নীরব।

ভাগি।—একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি যত বড় দুর্ব্বৃত্তই হোক না কেন উনি তাকে ক্ষমা করবেন।

উষা। কখ্‌খনো না—কখ্‌খনো না। আমি আপনাকে বলছি ভাগিনেয় বাবু। দাদা যদি রাতদিন এই কথা নিয়ে আমাকে জ্বালাতন না করতেন তাহলে হয়ত আমি এই বিজন বাবুকে ক্ষমা করতে পারতুম। কিন্তু—শুনেছি বিজন বাবু দাদার বন্ধু—এঁরা দুজনে মিলে আমাকে পাগল করে দেবেন।

উষা রোদনোন্মুখী।

ভাগি। [উষার পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া] আপনার দাদা যখন সেই নরাধমের বন্ধু তখন আপনার দাদার সম্বন্ধেও আমার ধারণা বদলে গেল। বুঝ্‌লাম, উনিও একজন পাষণ্ড। কিন্তু পাপী এবং পাষণ্ডদের ক্ষমা করাই হচ্ছে ধর্ম্ম। ভেবে দেখুন, ইংরেজদের যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত ঐ কথা বলে গেছেন।

উষা। যীশুর উপদেশ ইংরেজরা যেমন মানে আমিও তেমনি মান্‌ব।

ভাগি। সেটা কি ভাল দেখাবে? আপনি একজন খাঁটি আর্য্যনারী, নিমাই নিতাই শুক সনকের দেশে আপনার জন্ম। আপনিও যদি কতকগুলো অস্পৃশ্য কদাকার ইংরেজের দেখাদেখি যীশুকে অবহেলা করেন—তাহলে প্রভু নিত্যানন্দ কি মনে করবেন এবং আমাদের এই সনাতন উদার হিন্দুধর্ম্মেরই বা কি গতি হবে?

উষা।—হয়ত সদ্গতি হবে না; কিন্তু সেজন্য আমি চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত হচ্ছি, আপনি এদের জন্য এত ওকালতি কর্চ্ছেন কেন?

ভাগি। নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করার যে মহৎ আনন্দ আমি তাই উপভোগ করছি। যে হতভাগ্য নরপিশাচ আপনার কবিতার নিন্দা করে তার লেখনীর মুখ কালিমালিপ্ত করেছে তার ইহকাল এবং পরকালের অসীম দুর্গতির কথা ভেবে আমি আপনাকে সদয় হতে অনুরোধ করছি।

উষা। ভাগিনেয় বাবু, আপনার অনুরোধ এক্ষেত্রে নিষ্ফল! এতখানি বাগ্মিতা অনর্থক অপব্যয় করলেন।

ভাগি।—আচ্ছা সে ব্যক্তি অর্থাৎ সেই বিজনবাবু যদি স্বয়ং এসে আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে—তাহলে কি—?

উষা। তাহলেও না। বিজন বাবুকে আমি কথনো দেখিনি আর দেখ্‌তেও চাইনে।—আসুন ভেতরে যাই। ফটিক বোধ হয় আমাদের ডাকতে আসছিল, রাস্তার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উষা নিষ্ক্রান্ত। ভাগিনেয় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

শৈলেন। কি ভাব্‌ছ?

ভাগি। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] ভাব্‌ছি যীশুর কথা—Repent For the kingdom of Heaven is at hand.

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

পরিতোষ বাবু ও শৈলেন ড্রয়ং রুমে আসীন। দুজনের হাতে চায়ের বাটি। কাল প্রভাত। উষা একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায় তাই এখনো যোগ দিতে পারে নাই।

পরি। সেদিন ঘোড়ার ডিম তোমার ভাব দেখে ত এমন কিছু বোধ হলনা যে তুমি ওকে আগে থাক্‌তেই চেন!—তা কথাবার্ত্তা যদিও একটু অদ্ভুত রকমের তবু ছোকরাটি মন্দ বলে বোধ হল না। বড় ঘরের ছেলে পয়সা আছে বলছ। বদ্‌ খেয়ালের মধ্যে বাঙলা কাগজ চালায়। তা সে ঘোড়ার ডিম বড়মানুষের ছেলেদের একটা বাতিক না থাকলে সময় কাটবে কি করে? আমি কিছুদিন থেকে 'জাপানী গুপ্তচর' বলে একটা প্রবন্ধ লিখবো ভাব্‌ছিলুম তা সেটা না হয় ওর কাগজেই লিখব। কি নাম বল্লে কাগজখানার?

শৈলেন। উষার কাছে এখন ফাঁস করে দিওনা 'মন্দাকিনী'।

পরি।—তা দেবনা। কিন্তু তোমরা দুই বন্ধুতে মিলে ঘোড়ারডিম—মেয়েটারি বিরুদ্ধে কোন রকম বড়যন্ত্র আঁটছো না ত?

শৈলেন। তুমি কি পাগল হয়েছ মামা! আসল কথা, বিজন ভয় কচ্চে যে, উষা যদি আগে জানতে পারে যে ওই বিজন বোস তাহলে হয়ত—যাক, তোমার অমত নেইত?

পরি। ছোকরা দেখ্‌তে শুন্‌তে ত মন্দ নয়—তা উষার যদি ওকে পছন্দ হয় তাহলে—

শৈলেন। থামো—উষা আসছে।

দুজনে চায়ের বাটিতে মনোনিবেশ করিলেন।

উষার প্রবেশ।

উষা। বড্ড দেরী হয়ে গেছে-না? কি যে আমার ঘুম সাতটার আগে কিছুতেই ভাঙে না। ফটিক কৈ?

শৈলেন। তাকে পাঠিয়েছি ভাগিনেয় বাবুকে ডেকে আনতে। ওর পাগ্‌লাটে ধরণের কথাবার্ত্তা আমার বেশ লাগে।

উষা।—(ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) পাগ্‌লাটে ধরণের!

শৈলেন।—তা নয় ত কি! আমার বোধহয় লোকটির মাথায় একটু ছিট্‌ আছে।

উষা (মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া) ভারি ত জানো তুমি! তোমা—তোমার বন্ধু ঐ অজিত গুহ'র চেয়ে ঢের ভাল।

শৈলেন।— (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) অজিতের চেয়ে ভাল! কিসে শুনি? রূপে না গুণে না বিদ্যেয়?

উষা।—সব তাতেই। তোমার বন্ধুদের মধ্যে এমন একটাও নেই—

বলিতে বলিতে হঠাৎ মহালজ্জায় থামিয়া গেল।

পরি।—কি বলে ভাল, যদি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনাই করতে হয় শৈলেন, তাহলে ঘোড়ার ডিম একথা না মেনে উপায় নেই যে ঐ অজিত গুহটা আস্ত জিরাফ্‌, অশোক সাণ্ডেলটা নিরেট গুণ্ডা, হসিত সামন্তটার যেমন ভাল্লুকের মত চেহারা তেমনি উল্লুকের মত বুদ্ধি—আর ঐ কিংশুক গুপ্তটা—ওটাকে দেখ্‌লে আমার গা জ্বলে যায়।

উষা।—(সোৎসাহে) আমারও—

শৈলেন।—আসল কথা, তোমরা আমার বন্ধুদের দেখতে পারো না।

উষা।—আর মামা—সেই মীনধ্বজ হালদার—

পরি।—সেটাকে ঘোড়ার ডিম শিম্পাঞ্জি বল্লে শিম্পাঞ্জির মানহানি করা হয়।

উষা।—আর জানো মামা, এঁরা সব কেউ এক বর্ণ বাঙলা লিখ্‌তে জানেন না।

ারি।—সব ঘোড়ার ডিম আন্‌কোরা গোরার বাচ্চা কনা!

শৈলেন।—ওরা সব ইংরাজী শিক্ষা পেয়েছে—তাই—

পরি।—আমরাও ত ইংরিজী শিক্ষাটা-আস্‌টা পেয়েছি র বাপু; উষাও ত ঘোড়ার ডিম জুতোটা মোজাটা রে, চা বিস্কুটও খায় আর ইংরিজীতে তোমার ঐ বেকটা বন্ধুর ঘোড়ার ডিম কান কেটে নিতে পারে কিন্তু কৈ অমন ট্যাঁস্‌ ফিরিঙ্গি ত হয়ে যায়নি। তুমিও ত ঘোড়ার ডিম টেব্‌লে বসে খানা ডিনার খেয়ে থাকো কিন্তু তাই বলে কি বাঙ্‌লা কথা ভুলে গেছ?

উষা দাদার বন্ধুদের এই লাঞ্ছনা খুব উপভোগ করিতেছিল। দাদার উপর প্রতিশোধ তুলিবার এত বড় সুযোগ সে বড় পায়না তাই তার এত আমোদ।

সে গম্ভীর মুখে বলিল;—'এক কথায় দাদার বন্ধুগুলো সব একদম রদ্দি।'

শৈলেন।—সব বন্ধু—একটাও বাদ নয়?

উষা। একটাও বাদ নয়।

শৈলেন। [দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া] আচ্ছা বেশ, এর বিচার পরে হবে।

ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ।

ভাগি। মাফ্‌ করবেন, আপনারা বোধ হয় আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

শৈলেন।—বোধ হয় কি রকম—নিশ্চয় ডেকে পাঠিয়েছিলুন।

ভাগি। ঠিক ধরেছি তাহলে। চা খাবার আগে একটু বেড়িয়ে আস্‌ব বলে বেরুচ্চি দেখি আপনার ফটিক আমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘুমচ্চে। আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝে নিলুম। পাশ কাটিয়ে সটান এখানে চলে এসেছি। তার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে দেবার আর প্রবৃত্তি হল না। সে বোধ হয় নিদ্রিত অবস্থায় এখনো আমার সিংহদ্বারে পাহারা দিচ্ছে।

পরি। বোসো বোসো ভাগিনেয়—উষা চা দাও।

ভাগিনেয় উপবিষ্ট হইল।

শৈলেন। (সহসা) আপনি বাঙলা জানেন?

ভাগি। (অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া) ওর নাম কি, এতক্ষণ কি আমি না-জেনে চীনে ভাষায় কথা কইলাম!

উষা।—দাদার যত সব অদ্ভুত কথা।

শৈলেন।—অর্থাৎ আমি জানতে চাই, আপনি বাঙলায় পদ্য লিখ্‌তে পারেন কিনা?

ভাগি।—একবার এক বন্ধুর বিয়েতে লিখেছিলাম কিন্তু ছাপা হয়নি।

উষা।—[সাগ্রহে] কি পদ্য বলুন না!

ভাগি।—তার প্রথম দু'ছত্র কেবল মনে আছে—

'গজুর অদ্য বিবাহ
পদ্ম বনে ঢুকিবে একটি বরাহ—"

পদ্য শুনিয়া উষা মুখ ফিরাইয়া গেল।

শৈলেন।—[খুসী হইয়া] খাসা পদ্য ত! আপনিও দেখছি তাহলে একজন কবি। অবশ্য ঠিক উষার সঙ্গে এক শ্রেণীর না হলেও—

উষা।—দাদা—ফের—

শৈলেন।—না না তোমার সঙ্গে যে ভাগিনেয় বাবুর তুলনাই হয় না সে আমি জানি—

উষা। দাদার কথা শুনবেন না, খালি আপনাকে জ্বালাতন করবার চেষ্টা। আপনি নিশ্চয় ভাল কবিতা লিখ্‌তে পারেন। দাদার বন্ধুরা কেউ এক অক্ষর বাঙলা লিখতে জানে না। আচ্ছা, আপনার লেখা একটা ভাল পদ্য বলুন না।

ভাগি।—দেখুন, আমি যে ভাল পদ্য লিখ্‌তে পারি এটা আজ আপনার মুখ থেকে শুন্‌লাম বলেই সত্যি বলে বিশ্বাস হচ্ছে। এবং আপনার দাদার বন্ধুরা যা পারে না আমি তাই পারি এ কথা প্রমাণ করবার জন্য যদি আমাকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত আছি—পদ্য বলা ত দূরের কথা।

উষা। [সোল্লাসে] আচ্ছা বেশ। তাহলে একটা বেশ ভাল—এই—ভালবাসার পদ্য বলুন।

শৈলেন। ভাগিনেয় বাবু, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি যদি আর কোনও কবির কাব্য নিজের বলে এখানে চালিয়ে দেন, তাহলে তস্কর বলে আপনাকে সনাক্ত করবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই এক উষা ছাড়া। অতএব আপনাকে একটি কাজ করতে হবে।

ভাগি। কি বলুন। সকল রকম পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে আজ আমি বদ্ধ পরিকর।

শৈলেন। আপনাকে একটি ইংরিজী কবিতা তর্জ্জমা করতে হবে।

ভাগি। বেশ কথা। কবিতা বলুন।

শৈলেন। উষা, বিষয় নির্ব্বাচনের ভার তোমার ওপর। তুমি একটা কবিতা বল।

উষা। [কিছুক্ষণ ভাবিয়া তারপর লজ্জিত নতমুখে]

When we two parted
In silence and tears
Half broken-hearted
To sever for years—তারপর আর—

তারপর আর মনে পড়ছে না -

শৈলেন।

Pale grew thy cheek and cold
Colder thy kiss;
Truly that hour foretold
Sorrow to this!

ভাগি। কঠিন পরীক্ষা। আচ্ছা কাগজ কলম দিন।

পরি।—ঘোড়ার ডিম! এইখানে বসে বসেই পদ্য লিখবে নাকি?

ভাগি। আজ্ঞে হাঁ। ফটিক যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমতে পারে তখন আমি বসে বসে পদ্য লিখ্‌ব এ আর বিচিত্র কি?

উষা কাগজ পেনসিল আনিয়া দিল ও উৎসুক হইয়া লিখনরত ভাগিনেয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল।.........

ভাগি। হয়েছে। ঠিক যে বায়রণের যোগ্য হয়েছে তা বলতে পারিনা—তবু, আচ্ছা শুনুন,—

'যখন মোরা দোঁহে বিদায় নিয়েছিনু
নীরব নীর-নত চোখে,
আধেক ভাঙা বুকে সুখের স্মৃতি ল'য়ে
সাঁঝের ম্লান দিবালোকে;
কপোল হ'ল তব পাংশু হিমবৎ
অধর হ'ল হিমতর —
তখনি জানিলাম সুখের বিভাবরী
পোহাবে ব্যথা-জরজর!'

উষা। [মুগ্ধভাবে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] চমৎকার হয়েছে। এমন কি ছন্দটি পর্য্যন্ত!

শৈলেন। ও কিছুই হলনা,

Truly that hour foretold
Sorrow to this—ওর কি এই তর্জ্জমা!

উষা। আপনি দাদার কথা শুনবেন না, সত্যিই ভারী সুন্দর হয়েছে!

ভাগি। [পরিতোষ বাবুর দিকে ফিরিয়া] আপনি কি বলেন?

পরি। ও ইংরিজী বাঙলা কোনোটারই ঘোড়ার ডিম কিছু মানে হয় না।

ভাগি। যাক, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমালোচনা দুই ভাগে বিভক্ত, একজন বল্‌ছেন চমৎকার হয়েছে আর একজন বলছেন কিছুই হয়নি। এ ক্ষেত্রে যিনি কবি আমি তাঁর মন্তব্যটিই গ্রহণ করলাম। কারণ শাস্ত্রে বলেছে 'কবিতারস মাধুর্য্যং কবি বেত্তি

শৈলেন। উষার মন্তব্য কিন্তু অন্য রকম হত যদি আপনি না লিখে আমার কোনও বন্ধু ঐ কবিতাটি লিখ্‌তেন।

উষা। [আরক্তিম হইয়া] তার মানে?

ভাগি। মানে অতি সহজ—কবিকে না জান্‌লে তাঁর কাব্য বোঝ্‌বার সুবিধা হয় না। আপনি আমাকে জানেন বলেই এত সহজে আমার কবিতাটি উপভোগ করতে পারলেন। ধরুন, আপনাকে জান্‌বার আগে যদি আমি আপনার 'অস্ফুট' নামক ঐ অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থটি পড়তাম হয়ত ভাল না বুঝতে পেরে, সম্যক রসগ্রহণ না করে আমি ওটির নিন্দা করতাম। কিন্তু সে সমালোচনা কি যথার্থ হত? কখনই না!

শৈলেন। আপনার যুক্তির মধ্যে একটুখানি গলদ রয়ে গেল। তা থাক, আমাকে এবার একবার উঠ্‌তে হবে, গোটা কয়েক চিঠি লেখা দরকার। মামা তুমিও উঠ্‌ছ নাকি?

পরি। ঘোড়ার ডিম হাঁ। কোমরটাতে মালিশ করাতে হবে সেই ব্যথাটা এখনো গেল না। দেখি ফটিক এলো কি না।

প্রস্থান করিলেন।

শৈলেন। উষা, ভাগিনেয় বাবু তাহলে তোমার জিম্মায় রইলেন। তুই কবিতে যত ইচ্ছা কাব্য-চর্চ্চা হোক কিন্তু আমার বন্ধু বাঙলা লিখতে পারে না একথাটা ভবিষ্যতে আর বোলো না।

নিষ্ক্রান্ত।

উষা ও ভাগিনেয় কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। উষার বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করিতে লাগিল। এই লোকটির সহিত একলা থাকিলেই উষার ঐ রকম হয়।

ভাগি। কাল পরশুর মত চলুন আজ বিকেলেও কোনও দিকে বেড়িয়ে আসা যাক।

উষা। [নিম্নস্বরে] আজ কোনদিকে যাবেন?

ভাগি। যেদিকে হয়। সোজা একটা রাস্তা ধ'রে সহর বাজার পার হয়ে এমন কোথাও গিয়ে পৌছনো যাক যেখানে মানুষ নেই, গরু-ভেড়া নেই শুধু আমি আর-শুধু দুজন পথিক—

উষা। - আর বাঘ যদি থাকে?

ভাগি।—থাকুক বাঘ। বাঘ না থাকলে পথিক দুজনের আনন্দ যাত্রার পথে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে? বাঘ থাকাই চাই।

উষা।—সেদিন ডিঘড়িয়া পাহাড়ে বাঘের নামে কিন্তু বৈচিত্র্যের বদলে আতঙ্কই এসেছিল।

ভাগি।—(কিছুক্ষণ সুখ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া) ওঃ—ডিঘড়িয়া পাহাড়! চলুন আজ সেইখানেই যাওয়া যাক।—আচ্ছা উষা—(বলিয়াই সহসা থামিয়া গিয়া) রাগ করলে নাকি? (উষা ঘাড় নাড়িল) আমি তোমার চেয়ে বয়সে অন্ততঃ সাত আট বছরের বড়, তার ওপর তোমার দাদার—ইয়ে—সমবয়সী। আর আমাদের আলাপও হল প্রায়—ক'দিন হ'ল উষা?

উষা।—(মৃদুস্বরে) আজ নিয়ে ন'দিন।

ভাগি।—ন' দিন! দুদিন নয়, চারদিন নয়, এক হপ্তা নয়—পুরো ন'দিন! সুতরাং তোমাকে আমি উষা বলেই ডাকবো এবং আর 'আপনি' বলতে পারব না। —হ্যাঁ কি কথা হচ্ছিল?

উষা।—ডিঘরিয়া পাহাড়।

ভাগি।—হ্যাঁ ডিঘরিয়া পাহাড়। চল আজ সেইখানেই যাওয়া যাক।

উষা।—এত যায়গা থাকতে আজ সেখানে কেন?

ভাগি।—সেখানে—আমার টুপীটা হারিয়ে গেছে খুঁজে দেখতে হবে।

উষা।—(হাসিয়া) আপনার টুপী আর খুঁজে পাবেন না।

ভাগি।—পাবনা? বেশ, কিন্তু আর কিছু যদি হারিয়ে থাকে সেটা ত খোঁজা দরকার।

উষা।—(আরক্তিম নতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, আমি ওখানে যাব না। আমার বড্ড ভয় করবে। কি জানি যদি ফের কোনও রকম দুর্ঘটনা হয়?

ভাগি।—(অনেকক্ষণ উষার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া) সম্প্রতি তোমার ভাগ্যে একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোনও আশু বিপদ ত আমি দেখ্‌ছি না।

উষা। (সকৌতুকে) আপনি হাত গুণতেও জানেন নাকি?

ভাগি।—জানি বৈকি।

উষা।—(করতল প্রসারিত করিয়া) কৈ গুণুন দেখি আমার হাত। কি দুর্ঘটনা হবে শুনি।

ভাগি।—(উষার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে) শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে—

উষা।—(হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া) যান্!

ভাগি।—তোমার দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে—

উষা।—(রাগ করিয়া) ছেড়ে দিন—আমার হাত দেখ্‌তে হবে না।

ভাগি।—বেশ ছেড়ে দিচ্ছি—(উষার করতলে একটি চুম্বন করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল)

উষা।—(ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া) আর আমি আপনার সঙ্গে কথ্‌খনো—

ভাগি।—কথ্‌খনো ছেলে মানুষী কোরো না। যেটা নিলাম ওটা গণৎকারের দক্ষিণা।—উষা, একটা ভারী গোপনীয় কথা তোমায় বলব?

উষা।—আমি শুনতে চাই না—

ভাগি।—তুমি না চাইলেও আমি বলবই।—উষা, আমাকে বিয়ে করবে?

উষা।—যাও!

উষা দুহাতে মুখ ঢাকিল।

ভাগি।—উষা—

উষা।—যাও।

ভাগি।—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বারবার যাও বল্‌ছ? বেশ, চললাম। (দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া) একটা গুরুতর অপরাধ স্বীকার করবার ছিল—তা আর হল না।

উষা। কি অপরাধ শুনি!

ভাগি।—(ফিরিয়া আসিয়া) আগে বল আমায় বিয়ে করবে?

উষা।—না।

ভাগি।—করবে না?

উষা।—না।

ভাগি।—দুবার না বল্লে। বারবার তিন বার বল্লেই বুঝব মনের কথা বল্‌ছ। বিয়ে করবে না?

উষা নীরব। ভাগিনেয় দুহাত ধরিয়া উষাকে জোর করিয়া তুলিল।

ভাগি।—উষা—

উষা।—আগে শুনি কি অপরাধ।

ভাগি।—আগে বল রাগ করবে না।

উষা।—আগে শুনি।

ভাগি।—আচ্ছা বলছি। রাগ করলে এখন ত আর কথা ফিরিয়ে নিতে পারবে না—বিয়ে করতেই হবে। উষা আমার নাম ভাগিনেয় নয়, আমার নাম—বিজন বোস।

উষা।—(বিস্ফারিত নেত্রে) তুমি—আপনি—তুমি আপনি—

ভাগি।—তুমি—তুমি। 'আপনি' নয়।

উষা।—তুমি—দাদার বন্ধু—

বিজন।—হ্যাঁ। বলেছিলাম কিনা গণনা করে যে তোমার দাদার বন্ধুর সঙ্গে শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে?

উষা। তুমি 'মন্দাকিনী'র—

বিজন।—হতভাগ্য সম্পাদক!

উষা।—যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর একটা কথাও কইব না।

বিজন।—কথা কইবে না? তুমি জানো এই ক'দিনে আমি 'অস্ফুট' থেকে সমস্ত কবিতা আগা গোড়া মুখস্থ করে ফেলেছি! সত্যি বলছি উষা, তোমাকে যতদিন না চিনতাম ততদিন তোমার কাব্যের সৌরভ আমার প্রাণে গিয়ে পৌঁছায়নি। এখন বুঝতে পেরেছি, আধ-ফুটন্ত অপরিণত প্রাণের কি তরল-মধুর সীধু ঐ বইখানির মধ্যে ভরা আছে। শুনবে? আচ্ছা—'আশ্রয় যাচ্ঞা' কবিতাটি আবৃত্তি করছি—

উষা। (বিজনের মুখ চাপিয়া ব্যাকুল ভাবে) না—না তুমি থামো—

সহসা শৈলেনের প্রবেশ। উষা লজ্জায় জড়সড়।

শৈলেন।—একি! কবি আর সমালোচকে দিব্যি ভাব হয়ে গেছে দেখছি যে!

বিজন।—কবি এবং সমালোচকে যেখানে মিলন হয় সে স্থান মহাপুণ্য তীর্থে পরিণত হয়—মানো কি না?

শৈলেন।—নিশ্চয় মানি।

বিজন।—ব্যস। আজ থেকে দেওঘরও এক মহাতীর্থ হল।

উষা।—দাদা, কি দুষ্ট তুমি! আগে যদি জানতে পারতুম—তাহলে কিন্তু—

শৈলেন।—(উষার গালে আঙুলের টোকা মারিয়া) আগে জানলে সমস্ত ভেস্তে যেত—না? উষা, আমার সব বন্ধুরাই একদম রদ্দি—কি বলিস?

উষা (বিনত ভুবনবিজয়ী নয়না) একদম রদ্দি!

শৈলেন।—আমাকে একবার পোষ্ট-অফিস যেতে হবে। বিজন, আস্‌ছ নাকি?

বিজন।—তুমি এগোও। সামান্য একটু কাজ সেরে আমি এই এলাম বলে। শৈলেন প্রস্থান করিল।

বিজন।—(উষার খুব কাছে গিয়া) সামান্য কাজটুকু সেরে নিতে পারি?

উষা।—(বুকে মুখ গুঁজিয়া) না—

বিজন দুই আঙুল দিয়া উষার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া গভীর স্নেহদৃষ্টিতে ক্ষণকাল সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

বিজন। —পারি?

উষা চোখ খুলিল না, অনুমতিও দিল না। সহসা পরিতোষ বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আবার দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। অস্ফুটস্বরে কহিলেন; ঘোড়ার ডিম!

মোগলের প্রাসাদে ও শ্মশানে

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ভ্রমণ স্মৃতি

(২)

আগ্রায়ও প্রথমে সমাধি। সেকেন্দ্রার বিরাট প্রান্তরে আকবর নিজের সমাধি নিজে নির্ম্মাণ করান। মোগল বাদশারা অনেকেই নিজের সমাধির সব যোগাড় নিজেরাই করিয়াছেন। আকবর যাহা করিয়া গিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর তার উপরে এই সমাধির বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড প্রান্তর দেয়াল দিয়া ঘেরা, চারিদিকে চারটা ফটক—একটি সত্য তিনটি মিথ্যা—প্রায় মাঝখানে বিরাট সমাধি সৌধ। প্রধান ফটকটির গায় কত আরবি, পার্শি বয়ানে আকবরের কীর্ত্তিগাথা লেখা রহিয়াছে—সে লেখার আর্টও দেখিবার জিনিষ! ফটক হইতে সমাধি মন্দির প্রত্যেকটি ভাস্কর্য্যের চরম নিদর্শন। প্রাঙ্গণে নির্ভয়ে হরিণগুলি চড়িয়া বেড়াইতেছে। আকবর বাদশাহের সমাধি—বিরাট মন্দিরের সম্মুখেই বিরাট অন্ধকারে রহিয়াছে—আলো নিয়া দেখিতে হয়—সামনের প্রবেশ কক্ষের প্রস্তর সন্নিবেশ—ও রংএর খেলা অপূর্ব্ব অতুলনীয়। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের আগমন সময়ে লর্ড কার্জ্জন এই কক্ষের হাতখানেক স্থান সংস্কার করিতে গিয়া অসম্ভব খরচা দেখিয়া পিছাইয়া পড়েন। লর্ড কার্জ্জন পুরাতন কীর্ত্তি রক্ষা আইনে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি তাড়াতাড়ি লোপ করিতে না দিয়া ভারতের অতীত স্মৃতি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে কিন্তু ভারতীয়দের তরফ হইতে সে ব্যবস্থাকে উন্নত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ভারতের এই সব অতীত কীর্ত্তি রাখা যে কত প্রয়োজন তাহা ভারতীয়দের বোঝা কর্ত্তব্য। অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি কার্জ্জনের আইনে রক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু অর্থাভাবে অধিকাংশই অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত—উপযুক্ত সংস্কারাভাবে ধ্বংসের মুখে যাইতেছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলি দিল্লী সিমলা ঘুরিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির দিকে একটু তাকাইবার অবসর পান না কি? এসব কথা সভ্যদের প্রাণে একটুও জাগে না কি?

জাহাঙ্গীর মহল

আগ্রার প্রাসাদেও পরিখা, তোরণ ইত্যাদি পার হইয়া যোধবাইয়ের মহলে পড়িতে হয়—আকবরের হিন্দু রাণী—জাহাঙ্গীর বাদশাহের মায়ের ঘরে ও মহলে অসংখ্য দেবদেবী ছিল; সম্রাট ঔরংজেব তাহা ধ্বংস করেন। এ মহলের সৌন্দর্য্য ঔরংজেব নষ্ট করিয়াছিলেন। রাণী যোধবাইয়ের শয়নকক্ষ, বসিবার কক্ষ, ছেলেদের নিয়া খেলিবার চত্বর সব রহিয়াছে, এখানেও প্রাসাদের নীচ দিয়াই যমুনা বাহিয়া যাইত। পরে খাল কাটিয়া যমুনার বেগ ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। মহল হইতে পাতালপুরের সিঁড়ি দিয়া যমুনায়

যাওয়া যাইত। অলিন্দে বসিয়া বেগমেরা গীতবাদ্য শুনিতেন।

জাহাঙ্গীরের পাঠকক্ষ, নূরজাহানের শয়ন কক্ষ—সাজাহানের সেইকক্ষ যে কক্ষে বসিয়া, শুইয়া তিনি পরপারের তাজ দেখিতেন সবই তেমনি রহিয়াছে। অনেক কক্ষে কপাট নাই—খোলা, তাঁহারা যখন বাস করিতেন তখন নিশ্চয়ই ছিল। অনেক কক্ষ যেন গুপ্তধনাদি পাইবার জন্য খোঁড়া হইয়াছে মনে হয়।

আকবর বাদশাহের সাধের নওরোজের আনন্দ-বাজারের স্থান এখনো তেমনি আছে। ঔরংজেব

মোতি মসজিদ

পিতাকে যে কক্ষে বন্দী রাখিয়াছিলেন, সে কক্ষও রহিয়াছে। বাদশাহের বাহিরের ও অন্দরের বিচারের সিংহাসনও রহিয়াছে। বেগমেরা বিচার দেখিতেন—তাঁহাদের স্থান অন্তরালে রহিয়াছে। এখানেও স্নান কক্ষে আলো জালিলে এখনো বিচিত্র বর্ণ সম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। ছাদের উপরে প্রকাণ্ড একখানি কৃষ্ণপ্রস্তর রহিয়াছে—তেমন প্রস্তর আর দেখি নাই—এখানিং বাদশাহের বসিবার প্রিয় আসনই ছিল।

জনশ্রুতি ভরতপুরের জাঠ মহারাজ প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয় যখন এই সিংহাসনে পা রাখেন তখন এই সিংহাস ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল! এই প্রাসাদেই সাজাহানে
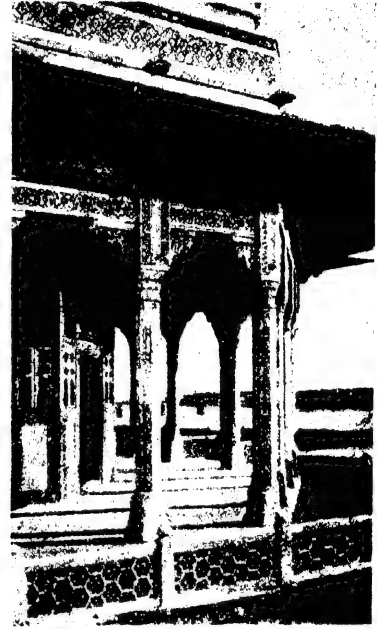
সামন বুরুজ

মোতিমসজিদ। সমস্ত মার্ব্বেলের তৈরী—মসজি বসিবার চত্বর, মেয়েদের বসিবার স্থান কত সুন্দর একদিন, সুদিনে এই মসজিদে আমিরওমরাওরা নমা করিতে পারিলে ধন্য হইতেন, আর আজ এ মসজি নামাজ দিবার ভক্ত জোটে না। মোল্লা কত দুরবস্থ কথা জানাইয়া অতি ভদ্র ও বিনীতভাবে কিছু সাহা চাহিলেন—এই সব সমাধি ও মসজিদের রক্ষক মোল্লাদের যেখানে যাহা দিয়াছি তাঁহাই তাহারা অ হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তাজের নকল কব দোতালায় মোল্লারা বোলেচালে বিভ্রম জন্মাইয়া কি ঠকাইল মনে হইয়াছে। আগ্রার প্রাসাদে সাজাহা বাদশাহের পায়খানাটি পর্য্যন্ত রহিয়াছে, তাহাও দেখিলা

—সেই হারেম, সেই প্রাসাদ—স্বপ্নের সেই কল্প লোক আজ কত জনে দেখিতেছে—মরমীর মনে এ সব দেখিয়া কি কথা জাগে তা সেই জানে।

এসব দেখিয়া তাজ দেখিতে গিয়া ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি জানি না। কিন্তু বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য্যের
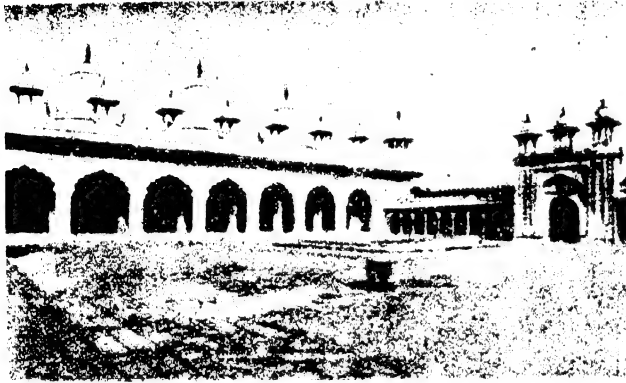
মোতি মসজিদ

চেয়েও যেন আমার মন আগ্রার সেই মোগল প্রাসাদই বেশী অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্বেত প্রস্তরের বিরাট সে সৌধ কত প্রকাণ্ড জিনিষটি দেখতে কত ছোট ও কোমল। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনার মূর্ত্ত বিকাশ তাজ,—কিন্তু এর উৎস ছিল আগ্রার প্রাসাদ। মমতাজ সাজাহান এঁদের জীবনের সব লীলা-খেলা তো ঐ আগ্রার প্রাসাদেই হইয়াছে। প্রাসাদও যেমন স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িতেছে তাজেরও দু'চার স্থানে তেমনি দেখা গেল। তাজের গা খসা এ যে কত বড় কলঙ্কের চিহ্ন যে চোখে পড়ে! এর সংস্কারে অনেক খরচ—তাজের জন্যেই যখন তা জুটছে না তখন অন্য কোন কীর্ত্তির জন্যে তা জুটাও যে কত মুস্কিল তা সহজেই বোঝা যায়।

মোগলের প্রাসাদ ও শ্মশান বিচরণ করে মনে হয় প্রাসাদই যেন চিত্তকে বেশী অভিভূত করে রেখেছে। এসব প্রাসাদ ইংরেজ জয় করবার আগে জাঠ ও রোহিলারা বার বার জয় করে। মসজিদের, প্রাসাদের মহার্ঘ কারুকার্য্যমণ্ডিত কক্ষগুলিতে তাদের সৈন্যেরা সব রান্না করে খেত—এতে অম্লান কারুকার্য্য ম্লান হয়েছে, কত স্থানে নষ্টও হয়েছে। রোহিলারা অবনত মোগল বাদশাকে অন্ধও করে দেয়। আর প্যানইস্লামিক ভাই সব আবদালী, নাদীর শা প্রভৃতি যা করেছেন সে তো কহতব্যই নয়। মোগল যুগের শেষে ভারতে এমন একটা অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল যে, তখন একটা তৃতীয় শক্তি প্রাধান্য না নিলে ভারতের অতীত কীর্ত্তি আজ একটিও থাকতো কিনা সন্দেহ।

সিকান্দ্রা
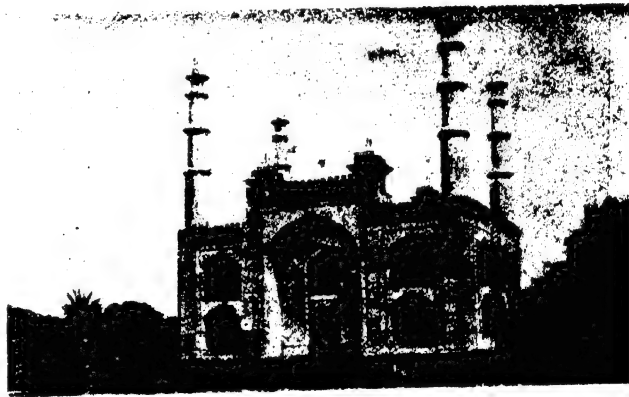
মোগলের প্রাসাদ ও শ্মশানের স্মৃতি যখন মনে আসে, তখন রাষ্ট্রীয় সমস্যা, হিন্দু মুসলমান সমস্যা, ভারতের উন্নতি অবনতি অনেক কথাই মনে পড়ে। মোগলের প্রাসাদে ও শ্মশানে যারা আমার মত ভ্রমণ করেছেন, তাদের মনেও একথা আমার মতই কখনো কখনো জাগে বোধ হয়।

আছে। ইনি নাচেন নৃত্যশাস্ত্রের বাঁধাধরা কোন বিধিনিয়মকে মেনে নয়—স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৃষ্টির আনন্দে, প্রাণের উচ্ছ্বসিত আবেগে। এর স্বতঃ উৎসারিত সে নৃত্যের উচ্ছ্বল গতি সকলেরই মনে সাড়া জাগায়। সেদিন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের কত রুদ্ধ দ্বার খুলে গিয়েছিল এই অমরকান্তি যুবকের নৃত্য সুষমায়। সেদিনের সে স্বর্গীয় সুষমার স্বপ্ন আজও আমাদের চোখ থেকে মুছে যায় নি।

ভারতের নানা স্থানে মনোক্ষুণ্ণ হয়ে কলিকাতার কলারসিক দর্শকদের কাছ হ'তে ইনি যে আন্তরিক সমাদর পেয়েছেন তার জন্য বিদায় কালে কলিকাতা-বাসীকে ইনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আরো বলেন যে উনিশ-শো বত্রিশ খৃষ্টাব্দে ইনি সদলবলে আবার এখানে আসবেন।

কিছুদিন হতে এক নূতন আদর্শ এঁর মনে জাগে। ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের অর্কেষ্ট্রা কেমন যেন বিসদৃশ লাগে—কোথায় যেন অসামঞ্জস্য রয়ে যায়, তাই ইনি চান ভারতীয় বাদ্যশিল্পী নিয়ে একটা অর্কেষ্ট্রা গড়ে তুলতে। তারই জন্য ইতিমধ্যে ছোট বড় দেড়শো রকমের বাদ্যযন্ত্র ইনি সংগ্রহ করেছেন এদেশ হতে। এই বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দেবার জন্য বারো জন শিক্ষিত বাঙালী যুবককে ইনি সঙ্গে নিয়েছেন। নিজে বাঙালী বলে বাঙালীদের উপর সহানুভূতি এঁর একটু বেশী।

ভারতে আসবার সময় প্যারীর প্যাথী কোম্পানী এঁকে একটি প্যাথী মেশিন উপহার দেন আর অনুরোধ করেন ভারতের বিভিন্ন সাংসারিক অবস্থা আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলে আনতে। তাদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে ইনি ছবি তুলেছেন অনেক। এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ যথেষ্ট ভারতের আসল রূপ প্রতীচ্যের কাছে দেখাবার জন্য।

কলিকাতা থেকে ইনি যাত্রা করেন উত্তর ভারতের দিকে। কাশী, সেখান হতে অজন্তা তারপর বোম্বাই হয়ে ইনি গিয়েছেন প্যারীতে। এঁর এক খুড়তুতো বোনকে ইনি সঙ্গে নিয়েছেন নৃত্যে তাকে মনের মত করে তৈরী করবেন বলে—এই চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকাটির নাম শ্রীমতি কনকলতা দেবী—দেখতে সুশ্রী, নৃত্যোপযোগী দেহ।

আমরা শুনেছিলাম এঁর নাচ ধরা হবে চলচ্ছবিতে এম্পায়ার থিয়েটারে এঁর নৃত্য প্রদর্শনীর দিন, কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টির জন্য তা হতে পারে নি—এ বড় ক্ষোভের কথা। আমাদের দেশে ভাল ষ্টুডিও দুর্লভ তাই এমন হোল।

উদয়শঙ্কর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ হতে প্যারীতে ভারতীয় নাচ দেখানো সুরু করে দিয়েছেন। গেল বারে য়ুরোপ ভ্রমণে গিয়ে ইনি ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের অভাবে ভারতীয় নাচের রূপ ফোটাতে গিয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেছিলেন—এবার তাঁর সে অসুবিধা আর নেই। কারণ এবার তাঁর সহযাত্রী তিমির বরণ ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় যে নূতন ধরণের ভারতীয় অর্কেষ্ট্রার দলে গড়ে তুলেছেন সেই দলের নৈপুণ্য উদয়শঙ্করের নাচের সঙ্গে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে—এরই মধ্যে প্যারীর রসিক সমাজে এই ভারতীয় অর্কেষ্ট্রা সম্প্রদায় প্রচুর আনন্দ চাঞ্চল্যের সঞ্চার করতে পেরেছেন।

প্যারিতে কিছুদিন নাচ দেখিয়ে মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি উদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণ সদলবলে জেনেভা যাবেন। টিউনিক্, ভিনিস, ভিয়েনা, বুডাপেষ্ট, ষ্টাটগার্ট, হামবার্গ, বার্লিন লিপ্‌জিগ্, ন্যুরনবার্গ, ড্রেস্‌ডেন, আমষ্টার্ডাম, ব্রুসেল্‌স্—প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন সহরে নাচ দেখাতে যাবেন। এঁর জয়যাত্রার পথ পুষ্পাকীর্ণ হোক!

প্যারিতে এঁর রাধাকৃষ্ণের নাচের সবাক্ ছবি তোলা হয়েছে—ছবি শীঘ্রই এদেশে আসবে। প্যারিসিয়ানদের কাছে এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই রাধা-কৃষ্ণের নাচের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে এতে উদয়শঙ্কর সেজেছেন রাধা আর এঁর সহযোগী নর্ত্তকী 'সিমকি' কৃষ্ণ সেজে নৃত্য করেছেন।

এদেশ থেকে প্যারিতে যাবার কদিন পরেই পৃথিবী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 'সিল্‌ভা লেভি' এঁর নৃত্য দেখতে যান। তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন—এঁর সেদিনকার শিব-নৃত্য দেখে আর তিমিরবরণের স্বরোদ শুনে। বিস্মৃত প্রায় অতীতের কোন একদিনের গৌরব স্মৃতি নর্ত্তক শ্রেষ্ঠ উদয়শঙ্কর ভারতের বুকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন—পাশ্চাত্যকে ইনি জয় করেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানিয়ে—ধন্য এঁর মনীষা।

নৃত্যকলা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারত সুদীর্ঘকাল চর্চ্চার অভাবে এই অতুলনীয় শিল্পকে হারাতে বসেছিল, শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর তাঁর ঐকান্তিক সাধনা আর অধ্যবসায়ের গুণে সেই মৃতপ্রায় কলাবিদ্যাকে পরিপূর্ণ গৌরবে পুনরুদ্দীপিত করেছেন। সমস্ত ভারত এজন্য এঁর কাছে ঋণী, বিশেষ করে বাংলা দেশ—সেই অক্ষয় সম্মান মুকুটের জন্য, যা ইনি স্বজাতীয় শিরে আজ পরিয়ে দিয়েছেন এর তপস্যার সুমহান সিদ্ধির দ্বারা, ভগবান এঁকে দীর্ঘজীবি করুন, এঁর যশোপথ পুষ্পাকীর্ণ হোক—এই আমাদের প্রার্থনা।

—

সেখ ইফ্‌তেখর্‌ রাসূল্‌ :—

মূলতানের একটি অতি সাধারণ পরিবারে রাসুলের জন্ম হয়। লাহোর হতে মূলতান সহরটি একশো ছয় মাইল দূর। লেখাপড়া শেখবার জন্য একে চলে আস্‌তে হয় লাহোরে। লাহোর বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করে ইনি কলেজে প্রবিষ্ট হ'ন। কিন্তু কলেজে পড়া এঁর সুবিধা হোল না—ছায়াছবির প্রতি এঁর জন্মগত একটা ঔৎসুক্য ছিল প্রাণে, তাই দু-বছর পড়ে একে কলেজ ছেড়ে দিতে হোল। উনিশ-শো-তেইশ সালে ইনি বিলাতে গেলেন ছায়াছবি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতে।

বিলাতে পৌছেই বিভিন্ন চলচ্চিত্রের প্রযোজকদের কাছে ইনি ছবি পাঠাতে সুরু করে দিলেন, ছবির পিছনে নিজের পরিচয় দিয়ে লিখতেন—দীর্ঘাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, সুঠাম সুপুষ্ট দেহ এবং প্রেমাভিনয়ে বিশেষ দক্ষ—যদিও এ সম্বন্ধে তখন এঁর কোন জ্ঞান ছিল না।

কিন্তু ছবি পাঠিয়েও কোন ফল হোল না। একখানা উত্তরও আসতো না। সব দেখে শুনে রাসুল হতাশ হয়ে পড়লেন।

ইনি ইংলণ্ড ত্যাগ করলেন; কিছুদিন ফ্রান্সের উপকূলে অবস্থিত 'নাইস্' সহরে বাস করবেন এই উদ্দেশ্যে।

নাইসে এসে পৌছুবার কদিন পরেই বিখ্যাত প্রযোজক 'রেক্‌স্ ইন্‌গ্রামের' সঙ্গে এঁর দেখা হোল। ইন্‌গ্রাম তখন 'আল্লার উদ্যান' ছবিখানির প্রযোজনা করছিলেন তাতেই রাসুল একটি ছোট অংশ অভিনয় করবার জন্য নিযুক্ত হন, ক' পাউণ্ড মাইনেও পান কয়েকদিনের জন্য। পাশ্চাত্যের ছায়া জগতে অভিনয় করবার এই সুযোগে সাফল্য অর্জ্জন করবার জন্য ইনি ঐকান্তিক চেষ্টা করেন।

অভিনয় এঁর বেশ ভালই হোল, প্রশংসাও হোল খুব। একজন ফরাসী প্রযোজকের দৃষ্টি পড়লো তখন তাঁর উপর। তিনি তখন "নীল নদের সর্প" নামে একটি ছবির প্রযোজনার আয়োজন করছিলেন এবং কয়েকজন শিল্পীরও সন্ধানে ছিলেন। রাসুল এর সঙ্গে প্যারীতে এলেন এবং এই ছবিখানিতে "শাহজাদা হাসানের" ভূমিকা অভিনয় করলেন বেশ সাফল্য গৌরবে।

এই সময়ে ইনি ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু চর্চ্চা করতে সুরু করেন। "নীলনদের সর্প" ছবিখানির তোলবার পর প্রযোজক মহাশয় একে অনুরোধ করেন প্যারীর রঙ্গমঞ্চে এর নৃত্য দেখবার জন্য, সাহস করে ইনি নেমে পড়লেন প্যারীর রঙ্গমঞ্চে—এঁর নৃত্য প্রশংসা অর্জ্জন করলো অতিরিক্ত ভাবে। তারপর একে একে বার্লিন, বুডাপেস্ত, ভিয়েনা এবং লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় নৃত্য দেখিয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করেন।

তখনো কিন্তু চলচ্চিত্রে একটি ভাল ভূমিকায় নামবার জন্য ইনি উৎসুক হয়েছিলেন। হঠাৎ সে সুযোগ ইনি

পেলেন, আরবে৷পন্যাসের একটি শ্রষ্ঠাংশ এঁকে দেওয়া হোল অভিনয় করতে। এই ছবিখানি অভিনয় করবার পর অভিনেতা হিসাবে এঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এই সময়ে হোলিউড থেকে এঁর ডাক এল। কিন্তু আমেরিকা ইনি গেলেন না য়ুরোপেরই বিভিন্ন চলচ্চিত্র কোম্পানী কর্ত্তৃক ইনি কয়েকবার নিযুক্ত হলেন প্রাচ্য প্রথায় ছবিগুলির প্রযোজনা করবার জন্য। কয়েকটি ছবি প্রযোজনা করবার পর ইনি "প্রাচ্যের ভ্যালান্টিনো" এই আখ্যা পান—এর চেয়ে বড় সম্মান বোধ হয় প্রাচ্যে কোন অভিনেতার ভাগ্যে য়ুরোপে ঘটে না।

তারপর এল সবাক চিত্রের যুগ। মুকছবি তখন আর লোকের মনে কোন সাড়াই জাগাতে পারছে না দেখে ইনিও একখানি সবাক চিত্রের প্রযোজনা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেকগুলো বই পড়বার পর "লালা রুক্" বইখানি এঁর বিশেষ পছন্দ হয়। সকল উদ্যোগ আয়োজন শেষ করে ইনি ছবিখানির প্রযোজনা দিবার জন্য এঁর দল নিয়ে কাশ্মীরে চলে এলেন—কেননা এই গল্পটি কাশ্মীরেরই। এই সবাক ছবিখানিতে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে সেতার, জলতরঙ্গ, তবলা প্রভৃতি এদেশীয় বাদ্যযন্ত্র ইনি ব্যবহার করেন—একেবারে প্রাচ্যের আবহাওয়ার মধ্যে ইনি এই ছবিখানি তোলেন।

ছবিখানি তোলবার পর ইনি আবার য়ুরোপে ফিরে গেছেন। ছবিখানি সেদেশে দেখবার জন্য এঁর ইচ্ছা আছে। প্রাচ্যের ক'খানা সবাক চিত্রের প্রযোজনা করে পাশ্চাত্য দেশবাসীর চোখের সামনে মেলে ধরবেন প্রাচ্যের সব কিছু গৌরবের সঙ্গে।

বিলাত সম্বন্ধে ইনি বলেন—"ও দেশটা প্রাচ্যকে বোঝবার কোন চেষ্টা কখনো করে না—আমেরিকার মত ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল মতামত নিয়েই এরা থাকে। বেশ উত্তেজক গোয়েন্দা কাহিনী কিম্বা ডাকাতির ছবি দেখতেই এদের আগ্রহ খুব বেশী—এমন কি এই ধরণের বইগুলোরও বাজারে কাটতি অত্যন্ত বেশী।"

নিজের সম্বন্ধে ইনি বলেন—বিলাতের এই রকম হাবভাব দেখে শুনেও প্রতিভাবান শিল্পীর একদিন আদর হবেই—এই বিশ্বাস নিয়েই আমি ছায়াছবিতে প্রবেশ করি।

রাস্থল এখন প্রাচ্যের একমাত্র প্রবাসী 'নক্ষত্র' এঁর অভিনয় নৈপুণ্য পাশ্চাত্যে এত সমাদৃত হয়েছে যে সকলেই এঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বিশেষ উৎসুক—বড় বড় ডিউক, প্রিন্স পর্য্যন্ত। ভোজ সভায়, সমিতিতে, থিয়েটারে বায়োস্কোপে—যেখানে ইনি যান, সেখানেই অসম্ভব রকম জনতা জমে ওঠে এঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য।

অবসর সময়ে ইনি পাশ্চাত্য-দর্শন অধ্যয়ন করতে ভালবাসেন। তা না হলে সিনারিও লেখেন ও প্রযোজনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন অধিকাংশ সময়, এইসব বিষয়ে এঁর অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্যের অনেক প্রযোজকের চেয়ে বেশী।

চিত্তবিনোদনের জন্য পিয়ানো বাজাতে ইনি ভালবাসেন—পিয়ানো বাজানোতে এঁর হাত ভারি সুমিষ্ট—যিনি একবার শুনেছেন তিনি আর ভুলতে পারবেন না।

প্রাচ্যকে যে সম্মানের মুকুট ইনি পরিয়ে দিয়েছেন—তারই এই কৃতিত্বের জন্য প্রাচ্য ধন্য। এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

অদ্ভুত হত্যা

কুমারী বিজনপ্রভা দেবী

গল্প

১

অনেক দিনের কথা। বি, এ পাশ করার পর আমি তখন সবেমাত্র সরকারী তদন্ত বিভাগে ঢুকেছি, তদন্ত কার্য্যে আমি তখন পর্য্যন্ত তেমন পারদর্শিতা লাভ করিতে পারি নাই, তবে নেহাৎ যে একেবারে ফেলনা তাও নয়।…

সেদিন সাহেবের খাস কামরায় বসে আছি, সাহেব আমায় তাঁর জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনাগুলো এক এক করে বলছিলেন, আর মাঝে মাঝে তদন্ত সম্বন্ধে আমায় উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমিও মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলুম। তিনি বল্‌তে আরম্ভ করলেন :—

বুঝেছ বাবু, যখন আমি খুব পারদর্শিতা লাভ করলুম এই তদন্ত বিভাগে আমি তখনকার কথা বল্‌ছি, বয়স আমার তখন বিশ কি বাইশ। একদিন বসে বসে ভাবছি এমন সময় বড় সাহেব আমায় ফোনে ডেকে বল্‌লেন, জন্‌ তোমায় একবার চীনা মুলুকে যেতে হবে, একটা খুনের তদন্ত করতে হবে, খুনটা খুবই অদ্ভুত।…খুনের তদন্তে আমি খুব চট্‌পটে ছিলুম, কাযেই সাহেব আমাকেই মনোনীত করলেন।

আমিও তখন নূতন দেশ দেখবার আশায় কোন বিবেচনা না করেই সম্মতি দিলুম, কিন্তু তখন কি জানতুম বাবু, সে এই চীনা দেশটা কি এক রহস্যময় দেশ।…

এই চীনে লোক গুলো যেমন ধূর্ত্ত তেমনি কুট, আবার একধারে তেমনই সরল। এমনই একটা দৃঢ়তা এদের মধ্যে প্রকাশ পায় যে, যখনই এরা কোন কাজে হাত দেয় সেটা ভাল হ'ক মন্দ হ'ক, তা তারা প্রাণপনেই শেষ করে থাকে। সাহেব আমায় এই লোকগুলো সম্বন্ধে একটা বাহ্যিক রকমের মোটা-মুটি কিছু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ওদের সঙ্গে মিশে গেলুম তখন দেখলুম, ওদের ভেতর ও বাহির উভয়েই উভয়ের নিকট পৃথক্‌।…যে যে ঘটনাগুলো প্রধান ওপর ওপর আমি তোমায় সে গুলোই বলে যাচ্ছি, কেন না সব ঘটনা বলা সম্ভব নয়।…

বছর সাতেক পূর্ব্বে সাংহাইর কোন এক জনবহুল অংশে কোলুন নামে একজন চীনা এসে কিছু দিনের জন্য ছিল। চীনা রাজত্বের মধ্যে সাংহাইর নাম জানে না এমন লোক খুব কমই আছে। এখানে কোকো, তামাক, চাল প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি খুব বহুল পরিমাণেই হয়ে থাকে। ঐ সময়ে চেংফু নামে একজন চীনা বণিক নগরের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী নামে পরিচিত ছিল।

হুফ্‌ ষ্ট্রীটের এক দ্বিতল বাটীতে ছিল তার অফিস, সে নিজে তারই পার্শ্বে একটা বাড়ীতে বাস করত, অফিসের কাজ থেকে সে নিজেকে সর্ব্বদা পৃথক রাখতে চেষ্টা করত এবং সে নিজে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকৃত।

অত বড় কারবার থাকৃতেও সে কৃপণ স্বভাব ছিল, কিন্তু লোকে বল্‌ত যে লোকটার অগাধ টাকা, নানা রকম দুর্লভ মাণিক্যের সে মালিক, সে সব জিনিষ সব সময়েই তার কাছে কাছে থাকে।…

যাহা হউক, অতগুলো দোষ থাকা সত্বেও গুণের মধ্যে সে ছিল খুব বিনয়ী, নম্র স্বভাব ও শান্ত। এবং এই জন্যই সে যত কিছু অভিসন্ধি গোপনে পূর্ণ করত, চীনা পুলিশ তা বুঝ্‌তে পারত না।

যাক্‌ এবার আসল ঘটনা বলা যাক্‌। একদিন কোলুন এসে এই সাংহাইতে তার আস্তানা গাড়লে, শুনা যায় সে পাডাং থেকে এসেছিল, ডি রয়টার

এভিনিউতে সে এক খানা ছোট বাংলা ভাড়া নিলে, এই কোলুন একজন পাকা জহুরী ছিল। সাংহাইতে তার খুব বড় একটা দোকান খোলার ইচ্ছা ছিল এবং এই জন্তই সে রোজ হুক্ ষ্ট্রীটে যাতায়াত করত। হুক্ ষ্ট্রীটে একটা বড় রকমের ঘর তৈয়ার হতে লাগল, প্রত্যহ কোলুন এই দোকানে যেত, কোথায় কি করতে হ'বে তার পরামর্শ দিত, আর রাত্রে সহরের ধনীদের কাছে গিয়ে আড্ডা দিত, ক্রমে ক্রমে কোলুন এই ধনী চেংফুর সঙ্গেও বেশ আলাপ জমিয়ে ফেল্‌ল।...

তারপর থেকে সে রোজই চেংফুর অফিসে যেত, অবশ্য চেংফুর অফিসেরই একজন কেরাণীর কাছ থেকে আমরা এটা জান্‌তে পেরেছিলাম...।

যদিও চেংফু খুব ভাল ভাল দামী হীরা জহরত কিন্‌ত, ছোটখাট অল্প দামী হীরা-জহরত সে মোটেই পছন্দ করত না, কেননা তার বিশ্বাস ছিল ছোট খাট জিনিসে কোন লাভ নেই।...

কিন্তু কোলুন সেরূপ ছিল না, তাঁর মতলব ছিল অন্য রকমের। সে হুক্ ষ্ট্রীটে বেশ বড় রকমের দোকান খুলবে, ছোট বড় সব রকমের জিনিস থাকবে, সহরের ছোট বড় ধনী গরীব সবার কাছ থেকে সে টাকা চায়, কোলুন ছিল ব্যবসায়ী, আর চেংফু যা কিন্‌ত তা নিজের জন্য।

ক্রমে ক্রমে কোলুন জান্‌তে পারল যে চেংফু সমস্ত মূল্যবান জহরতগুলো তার নিজের কাছেই রাখে, তখন সে এক ফন্দি করল, প্রায় প্রত্যহই সে চেংফুর কাছে গিয়ে নানারকমের জহরতের আলোচনা করত। একদিন কোলুন চেংফুকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলে, এবং আরও বল্‌লে, বাড়ীতে আরও অনেক প্রকার জহরত আছে, যা সে গেলে তাকে দেখাবে।

চেংফুর না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না, কাজেই সে যেতে সম্মত হল, এবং একদিন বিকেলে যাবে বলে স্বীকার করল।

কোলুন বার বার তাকে যেতে অনুরোধ করে, এবং যেন ঠিক বৈকালেই যায়, বার বার তাহা স্মরণ করাইয়া নমস্কার করে চলে গেল। চেংফু তার কথা রেখে ছিল।

২

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সে ট্রামে এসে উঠল, সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখন মেদিনী আবৃত করছিল, সাংহাইয়ের পথে লোক চলাচল তখন ক্রমেই কমে আসছিল। স্থানে স্থানে দোকান পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যাদের দোকান পাট কেবল মাত্র রাত্রের জন্য তারা সবেমাত্র দোকান খুলতে আরম্ভ করেছে।..

কিছুক্ষণ পরে চেংফু একেবারে কোলুনের বাটীর সামনে এসে নামল্। এই রয়টার এভিনিউর উপরিস্থিত বাড়ীগুলি পরস্পর পৃথক, এবং প্রত্যেক বাটীর ভিতরই নানারূপ ফুল ফল বৃক্ষে পরিপূর্ণ বাগান আছে, কিন্তু কোলুন যে বাংলোয় থাক্‌ত, তার ভিতরকার বাগানটী তত্ত্বাবধানাভাবে এক প্রকার জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল, এবং যে কেহ নূতন এই স্থানে প্রবেশ করত সেই একবার ভয় পেত।

চেংফু আস্তে আস্তে বাগান পার হ'য়ে কোলুনের বাটীর ফটকের ভেতরে ঢুকল, কোলুনের একটী ভৃত্য ছিল, তার নাম ছিল ওয়াঙ্। এই লোকটা ছিল বেঁটে, স্থুলকায়, কদাকার ও বদ্‌রাগী—একটা জানোয়ার বিশেষ ছিল। ওয়াঙ্ যদি কখনও কারও উপর রাগত তাকে খুন না করে ছাড়ত না।...

ওয়াঙ্ এসে দরজা খুলে চেংফুকে ভিতরে নিয়ে গেল, চেংফু যে কোলুনের বাড়ীতে গিয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা এই ওয়াঙের মুখে শুনেছিলুম।

৩

যেদিন আমি সাংহাই পৌছেছিলুম তারপর দিন আমি থানায় বসে বড় সাহেব মিঃ হ্যারিপিলের সঙ্গে বসে কথাবার্ত্তা বলছিলুম, তখন টেবিলের উপর টেলিফোনটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। মিঃ হ্যারি টেলিফোন ধরলেন, কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাড়াতাড়ি মোটর তৈরি করতে আদেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—মিঃ জন্, যে ঘটনার জন্য তুমি তদন্তে এসেছ এ সেই ঘটনা, কিছুদিন পূর্ব্বে কোলুন নামে একটা চীনা জহুরী এই সাংহাইতে এসে বাস করতে থাকে, কয়েকদিন হ'ল সে কাহারও দ্বারা হত হয়েছে,

আমি এখুনি যাচ্ছি, ইচ্ছা করলে তুমি আমার সঙ্গে আস্তে পার।"

যাহ'ক, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলুম, গিয়ে দেখি, একজন পুলিশ ফটকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি আরও একজন পুলিশ, দেখে আমার মনটা একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌ল, কারণ আমার অভিজ্ঞতায় এটুকু বুঝেছিলুম যে, হত্যাকাণ্ড হ'বার পর যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, তারা শুধু হত্যাকারীকে পলায়নের সুযোগ দিয়ে থাকে।

রাগ করে আর কি করব, আমি চুপ করে হ্যারির সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগলুম। সামনেই একখানা বড় ঘর, এই ঘর দিয়ে আমরা উভয়েই একটা বারেণ্ডায় এসে উপস্থিত হ'য়ে যা দেখলুম তাতে তিন হাত পেছিয়ে গেলুম।

দেখলুম, বারাণ্ডার উপর একটী মৃতদেহ, মাথাটা তার চূর্ণ বিচূর্ণ, দেহ দেখে চিনবার কোনও উপায় নাই, ইহাই নাকি প্রসিদ্ধ চীনা জহরী কোলুনের শবদেহ। কোলুনের ভৃত্য ওয়াঙ্‌ প্রভুর দেহ সনাক্ত করেছে। হত্যাসম্পর্কে ওয়াঙ্‌কেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু সে বলল যে সে ইহার কিছুই জানে না। তার প্রভু তাকে গতকল্য সাংহাই হতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী পালীনগরে যেতে হুকুম করিয়াছেন, সেখানে কোলুন একটী বাংলো ভাড়া করেছেন প্রতি শনিবার সে এই বাংলোয় গিয়ে বাস করে, সেদিনও ওয়াঙ ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য গিয়েছিল···

ওয়াঙ যখন পালী যাত্রা করে তখন বণিক চেংফু তার প্রভুর নিকট আসে, সে তাহার প্রভু ও বণিক চেংফুকে একত্র রেখে চলে যায়, পরদিন সকাল বেলা ফিরে এসে দেখে তাহার প্রভু মৃত এবং যে সিন্ধুকে তাহার বহুমূল্য জহরতাদি থাকত তা খোলা, তখনই সে ছুটে পুলিশে খবর দেয়।··

ওয়াঙ যে কথাগুলো বল্‌ল তা সম্পূর্ণ সত্য বলেই মনে হ'ল, অন্ততঃ যতক্ষণ না প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়, মিঃ হ্যারি তাকে তদন্ত শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখলেন। ওয়াঙও কোনরূপ আপত্তি করল না, শুধু সে অনুরোধ করল যে পালী গিয়া তার কথা সত্য কিনা তা দেখতে।···

যাহ'ক একজন পুলিশ তাকে নিয়ে গেল, আমরা তখন ঘরটী পরীক্ষা করতে লাগলুম, ঘটনাটী খুবই সোজা, সিন্দুক খোলা তাতে চাবি লাগানই ছিল, কোলুন কাকেও কিছু দেখাবার জন্য সিন্দুক খুলেছিল, মিঃ হ্যারি অস্ফুটস্বরে চীৎকার করে উঠলেন—"চেং ফু" খুনী?

আমরা উভয়ে তৎক্ষণাৎ হুফ্‌ ষ্ট্রীটে চেংফুর বাড়ীতে গেলুম, কিন্তু শুনলুম সে কাল থেকে এখনও ফিরে নাই, তার ভৃত্য এইমাত্র পুলিশে খবর দিয়েছে যে তার প্রভুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন বুঝতে পারছ বাবু যদি কোন লোক একজন জহুরীর কাছে যায়, তারপর উধাও হয়, এবং সেই জহুরীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ও তার সিন্দুক খোলা থাকে। তাহলে কে খুনী। কাজেই মিঃ হ্যারি প্রথমেই এই কাজ করলেন—

তিনি তৎক্ষণাৎ চেংফুর নামে একখানা ওয়ারেণ্ট বার করে তার ফটো নগরের পথে ঘাটে টাঙিয়ে দিলেন, যদি কেও তাকে ধরে দিতে পারে। উপরন্তু তিনি একজন লোককে পালী পাঠিয়ে দিলেন, ওয়াঙ যা বলেছিল তার কতটা সত্য কি না তাই পরীক্ষা করতে, তারপর আমরা পরস্পর বিদায় নিলুম, মিঃ হ্যারি তাঁর মোটরে চলে গেলেন।

৪

নিজের ঘরে ফিরে এসে ঘটনাটা একবার ভাল করে আগাগোড়া ভেবে দেখলুম, তারপর ভাবলুম আচ্ছা, চেংফু একজন প্রসিদ্ধ ধনশালী বণিক, সে এই সাংহাইতে ছোটবেলা থেকে বাস করে আস্‌ছে, আর কোলুন সবেমাত্র সেদিন এসেছে, সহরের দু একজন ছাড়া আর কেউ কোনদিন জীবনে তাকে দেখেনি। অথচ এই কোলুন, চেংফুকে নিমন্ত্রণ করেছিল, আবার এই কোলুনই মৃত, ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয়েছিল, এখন দেখলুম ততটা সহজ নয়।···

খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর ভাবলুম, আচ্ছা মৃত দেহটার মস্তক ওরূপ চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল কেন, ওটা চেং-

ফুর মৃতদেহ নয় তা শুনেছি চেংফু তাঁর সঙ্গে বহুমূল্য জহরতাদি সদাসর্ব্বদা রাখত. এমনও ত হ'তে পারে কোলুন তাকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে হত্যা করেছে, মৃতদেহে কোলুনের পোষাক ছিল, ওয়াঙ্ প্রভুর দেহ বলে শনাক্ত করিয়াছে, কিন্তু একজন, একজনকে হত্যা করে পরিচ্ছদ বদল করতে পারে। ওয়াঙ হয়ত মিথ্যা বলিয়াছে।···

আমি তৎক্ষণাৎ, মিঃ হ্যারিকে আমার মন্তব্য ফোনে জানালাম, তারপর কোলুনের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে বললাম, মিঃ হ্যারি বলিলেন—"উত্তম, তুমি যদি ভাল মনে কর তবে তাই হ'ক তবে বিশেষ ফল হবে না।" তার বিশ্বাস চেংফুই খুনী। আহত কোলুনের জন্যও বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। তার কোন বিশেষত্ব ছিল না, ফলতঃ সে এই সাংহাইতে নূতন অনেক লোকেই তাকে চেনে না, তবে এইটুকু ঠিক যে কোলুন একজন চীনা ও প্রায় চেংফুর সমবয়সী।···

কিন্তু চেংফু সকলেরই পরিচিত, যাঁরা তার বিশেষ পরিচিত তারাও মৃতদেহ শনাক্ত করে গেল, ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হল।···

আমি আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য টম্‌কে ওয়াঙ্ ও কোলুনের বাড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলেছিলুম।

কয়েকদিন পরের কথা, একদিন ঘরে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় টম্ এসে যা বলল তাতে ব্যাপারটা আরও গভীর হ'য়ে উঠল। সে বলল, ওয়াঙ্ কোলুনের গৃহে মাত্র দশদিন কাজ করেছে। তার পূর্ব্বে মাপো নামে একটা লোক তার কাছে কাজ করত, ওয়াঙ্ বলেছে সে যেদিন পালী যায় সেদিন সে এই মাপোকে একটা লোহার দাণ্ডা হাতে কোলুনের বাড়ীর দিকে আসতে দেখেছে।" টমের নিকট উক্ত ঘটনা শুনে তৎক্ষণাৎ মাপো কে নিয়ে আসিলাম, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলতে লাগল, "তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন কোলুন প্রথম এই সাংহাইতে আসে তখন সে আমাকে তার জন্য রান্না-বান্না করতে রাখে, আমি আমার প্রাণপণ শক্তিতে এই কার্য্য করতুম, একদিন আমি একটা কাপ ভেঙ্গে ফেলায় আমায় খুব মার ধোর করে ও তাড়িয়ে দেয়, সেইদিন থেকে আমি আর কিছু জানিনে এবং তার হত্যা সম্বন্ধেও কিছু জানিনে, ওয়াঙকে আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি বা কালকে আমি কোলুনের বাংলোর নিকটে ছিলুম না।"

টম্‌কে দিয়ে এই মাপোকে থানায় পাঠিয়ে দিলুম, তারপর টমকে কোলুনের বাড়ী যেতে বলে আমিও বেরিয়ে পড়লুম।

আমি যখন কোলুনের বাড়ী গেলুম তখন মধ্যাহ্ন— কয়েকজন পুলিশ বাড়ীখানা পাহারা দিচ্ছে।

পথে যেতে যেতে ভাবলুম, আচ্ছা যদি এই মাপোই খুন করে থাকে, কোলুন ও চেংফু যখন বসে গল্প করছিল তখন হয়ত এই মাপো চুপি চুপি বাড়ীতে প্রবেশ করে, তারপর উভয়কে হত্যা করে, জহরতগুলো আত্মসাৎ করে, চেংফুর মৃতদেহ হয়ত কোন কূপে ফেলে দেয়। কিন্তু কোলুনকে সরাবার আর সুযোগ না ঘটায় পলায়ন করে, যাহ'ক বাড়ীর আশপাশ একবার খুঁজে দেখতে হ'বে, ইতিমধ্যে টম্ এসে উপস্থিত হ'ল।

আগে থেকেই আমার মন নিশ্চিন্ত হ'য়ে গিয়েছিল, যে চেংফু খুনী নয়, তার কারণ কেউ যদি কাউকে খুন করে ত সে হাত মুখধুয়ে আপন ঘরে ফিরে যায় যেন সে কিছুই জানেনা, কিন্তু এমন বোকা খুবই কমই আছে যারা খুন করেই পালিয়ে যায়, খুনের প্রমাণটা স্পষ্ট করে নিজের ঘাড়ে নিয়ে·

* * *

যাহ'ক মাপোর গল্পটা আমার অনেক কাজে এল, এখন বোঝা গেল যে চেংফু কিংবা কোলুন কেহই খুনী নয় এর মধ্যে এমন একজন আছে যে এই উভয়কে হত্যা করেছে যে এই বাংলো চিনে এবং কোথায় জহরত থাকত তা জানে, কিন্তু কে এই লোকটা? মাপো কি?···

কিন্তু তার প্রমাণ কি, মৃতদেহ কার, চেংফুর না কোলুনের—ওয়াঙ্ ও মাপোর গল্পের কতটা সত্য এই সম্পূর্ণ ঘটনায় মাত্র একটা উপায় আছে, কিন্তু মাপোকে ত খুনী মনে হয় না, তাকে দেখলে সাধারণতঃ দয়ার উদ্রেক হয়, আর যদি সে প্রকৃত খুনী হ'ত তাহ'লে সে অতটা খোলা-খুলি থাকতে পারতনা, কাজেই মাপোর গল্পটায় বিশ্বাস না করে, আবার একেবারে ছেড়ে না দিয়ে মনের এক কোণে চাপা দিয়ে রাখলুম।

সেদিন সন্ধ্যে হ'য়ে যাওয়ায় কোলুনের বাড়ীর ভিতর বা বাগান অনুসন্ধান করা হল না, কাজে কাজেই ফিরে আসতে হল, টম্‌কে ওয়াঙের গল্পের সত্যতা আর পরদিন কোলুনের বাগান বাড়ী অনুসন্ধানের ভার দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম, টম্‌ও আমাকে সান্ধ্য প্রণাম জানিয়ে একদিকে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় শুতে গেলাম।······

৫

কাজ অনেক দূর গড়িয়ে গেল। রহস্য আরও গভীর হয়ে উঠল পরদিন মিঃ হ্যারির খাস কামরায় বসে খুন সম্বন্ধে আলোচনা করছি এমন সময় টমের প্রেরিত লোক পালী হইতে ফিরিয়া আসিল, সে বলিল- পালীতে কোলুনের একটা কুঁড়ে আছে সত্য এবং সে ঘটনার আগের দিন বিকেলে কোলুন ঘরটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে গিয়েছিল তাও সত্য, সে রাত্রে সে পালীতেই ছিল এবং পরদিন সকালে সে পালী হইতে ফিরিয়া আসে।

মিঃ হ্যারি সত্য তা কি অস্বীকার কর্ছি, কিন্তু সে নিজেও খুনী হতে পারে। মিঃ হ্যারী "কি রকম তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি?" শুনলে জন, ওয়াঙের কথা সত্য কিনা।'

জন—"না এখনও হয়নি, তবে হ'বার যোগাড়ে আছে, আচ্ছা হ্যারি, মনে কর ওয়াঙ্‌ বিকেলে চেংফু ও কোলুনকে হত্যা করে তারপর পালী যায়।······

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল; রিসিভার কানে দিয়া বুঝিলাম টম্‌ কথা কহিতেছে, সে কহিল— "মিঃ জন, আমি সকাল বেলা কোলুনের বাড়ী অনুসন্ধান করিতে আসি, সেখানে কিছু না পাইয়া বাগানের দিকে যাই, সেখানে একটা অব্যবহার্য্য কূপের মধ্যে কেহ কিছু পূর্ব্বে কোন কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, আপনি কি দয়া করিয়া একবার আসিবেন।"

আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম, গিয়ে দেখলাম টম যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক। তৎক্ষণাৎ আগাছাগুলি সাফ্‌ করিয়া ফেলা হইল, একটা দড়ী ধরিয়া এক জন লোক নীচে নামিয়া গেল। কূপের ভিতর এক ফোঁটাও জল ছিল না। লোকটা একটা কাপড়ের পুটলী লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল, পুটলিটা খুলিয়া তার ভিতরে কতগুলি কাপড় ও রক্তমাখা একটা লোহার ডাণ্ডা পাওয়া গেল, ইতিমধ্যে হ্যারির মটর গিয়া চেংফুর ভৃত্যকে লইয়া আসিল, সে কাপড়গুলি দেখিয়া সনাক্ত করিল যে ইহাই তাহার প্রভুর পোষাক। আর লোহার রড্‌টা গভীরভাবে আপনার কার্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল।

হ্যারি বলিল, "ব্যাপার অতি সোজা, যদি চেংফুকে হত্যাকরা হইয়াছে তবে নিকটেই কোথাও তাহার মৃতদেহ পাওয়া যাইবে, কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত খুঁজিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন হ্যারি বলিল—"ওহে জন ঠিক হইয়াছে, চেংফু, কোলুনকে হত্যা করিয়া নিজের কাপড়চোপর এই স্থানে ফেলিয়া ছদ্মবেশে বাহির হইয়া গেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম, "মিঃ হ্যারি আপনার কথা হয় ত সত্য, কিন্তু এই লোহার রড্‌ সম্বন্ধে আপনার মত কি? ওয়াঙ্‌ বলিয়াছে সে এই মাপোকে এই রড্‌ হাতে বাংলোর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে, আবার এই লোহার রড্‌ দ্বারাই হত্যা করা হইয়াছে, এই রক্ত তার প্রমাণ, আশ্চর্য্য নয় কি? মাপো লোহার রড্‌ হাতে বাংলোর দিকে আসিতেছে আর চেংফু সেই সময়ই কোলুনকে হত্যা করিয়াছে, তাও আবার একই যন্ত্রের সাহায্যে।······

তারপর আরও শুনুন, চেং নিশ্চয়ই এ বাগান জানত না। এবং দুর্গম স্থানে একটা জল শূন্য কূপ আছে তাও জানত না, উপরন্তু সে লোহার রড্‌ কোথা পেল, সে কি ইহা নিজ হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আপনি বলিতে চান যে চেংফুর মত একজন প্রসিদ্ধ বণিক একজন জহুরীর সঙ্গে দেখা করতে ওরূপভাবে সশস্ত্র হইয়া গিয়াছিল।···না, শুধু এই বোঝা যায় ওয়াঙের কথা হয় সত্য নয় মিথ্যা; যদি তার কথা সত্য হয় তবে মাপো হত্যাকারী বা খুনীর সহকারী, আর মাপো সমস্তই জানত, এবং সে এই লোহার রড্‌ হাতেই আশে পাশে ছিল।

অন্যদিকে যদি ওয়াঙের কথা মিথ্যা হয় তবে, সে নিজেই দূষী।

"বেশ তোমার কথাই মেনে নিলুম, মনে কর তোমার কথাই ঠিক তাহ'লে তুমি বলতে চাও সে খুনী নয়, যতক্ষণ না এই মাপো বা ওয়াঙ্ কাওকে দোষী প্রমাণ না হয়, চেং খালি নিমন্ত্রিত হয়েছিল, সে ইহার কিছুই জানে না, কিন্তু এই চেংফু কোথায়? সে যদি মৃত তবে তার দেহ কোথায়, আর সে যদি খুনই না করবে তবে কেন সে পলায়িত?...

"তার উত্তরও আমি তোমায় বলছি হ্যারি, যে মৃত দেহ আমরা কোলুনের বলে জানি, মনে কর এই মৃত দেহই চেংফুর; কেবল মাত্র কোলুনের পোযাক পরিহিত ছিল, ওয়াঙ্ নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা কহিয়াছে, নয় সে, প্রভুর দেহ সনাক্ত করিতে ভুল করিয়াছে, আমার বিশ্বাস এইই চেংফুর দেহ; কোলুন নিশ্চয়ই জীবিত, হয় সে হত্যাকারী, নয় সে এই ওয়াঙ্ ও মাপোর সঙ্গে জড়িত; এই লোহার ডাণ্ডা সম্বন্ধে উভয়েই জানে।...

উপরন্তু এই মাপোও কিছুই জানে না, ঘটনাবলী প্রকাশ কচ্ছে যে কোলুন ও ওয়াঙই হত্যাকারী। মনে কর কোলুন ও ওয়াঙ্ উভয়ে চেংকে হত্যা করিয়াছে, তারপর পোষাক বদল করিয়া, মৃতদেহের মস্তক এমনভাবে চূর্ণ করিয়াছে যে তাহা চেনা না যায়, তারপর ওয়াঙ্ পালী চলিয়া গিয়াছে, আর কোলুন ভগবান জানে কোথায়?"

ওয়াঙ্এর কার্য্য ছিল পালী যাওয়া, ফিরে এসে প্রভুর দেহ সনাক্ত করা তারপর খুন মাপো ও চেংফুর ঘাড়ে ফেলিয়া পলায়ন করা, কোলুন এখন মস্ত বড় লোক হইয়াছে, আমরাত তাকে চিনিনা, মাত্র জানি সে অল্প দিন হইল সাংহাইতে আসিয়াছে।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপল, আমি বললাম—"মিঃ হ্যারি, আমরা খুব মস্ত বড় ভুল করেছি, আমরা পদচিহ্ন অস্ত্র অথবা এই জহরত যা এই হত্যার কারণ, কিছুইত অনুসন্ধান করিনি।

যদিও আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা জহরতগুলো এক রকম চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যদি এক টুকরাও এই বাড়ীতে অথবা বাগানে পাওয়া যেত তবে আমাদের কাজে লাগত।"

মনে মনে আমি ভাবতে লাগলুম, "মনে কর এই বাংলোয় অথবা বাগানে কোথাও নেই, তাহ'লে কোথা যদি বাংলোয় না থাকে তবে নিশ্চয়ই কোলুনের অথবা ওয়াঙ্এর কাছে, অথবা এমন কোন স্থানে লুকান আছে যা এই কোলুন বা ওয়াঙ্ উভয়ে জানে।...

কিন্তু এমন কেউ বোকা নেই যে এগুলো কোন স্থানে লুকিয়ে রাখবে জেনে শুনে যে সে স্থান উদ্ধার করা আবার কত কষ্ট হ'বে।

যাক, হত্যার পর কোলুন কোথায় কি ভাবে আছে তা জানিনা, কিন্তু ওয়াঙ সে কোথায়, তাকে ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, আমরা জানি সে পালী গিয়েছিল, ফিরে ত এসেছে, পুলিশ তার কাছে সন্দেহের মত এমন কিছু পায়নি। কিন্তু এখন ওয়াঙ্ কোথায়?

"কিহে ব্যাপার কি চুপ করে রইলে যে?"

ব্যাপার কিছু না, আমি তোমার মটর নিয়ে পালি যাচ্ছি, কিছু মনে কর না।" বলিয়া দ্রুত বেগে বাহির হইয়া গেলাম।

* * * *

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি একজন পুলিশ লইয়া পালী উপস্থিত হইলাম। মাত্র দশ মাইল পথ, কিন্তু রাস্তা বড়ই খারাপ, কাজেই বিলম্ব হইতে লাগিল।

আমরা সন্ধ্যার শেষে গিয়ে পৌছুলুম, দেখলুম, সব চীনা জেলে তাদের নৌকোগুলো টেনে ডাঙ্গায় তুলে আপনাপন কুটীরে প্রবেশ কচ্ছে।

একজন লোক আমাকে কোলনের কুটীরে নিয়ে গেল, যা অন্যান্য সব ঘর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

বাড়ীর ভিতর ঢুকে ঘর পরীক্ষা করতে লাগলুম, কিছুনা, মাত্র দুখানা ঘর পুলিশের লোক দেখে আর কেও আপত্তি করলেনা, আমি তন্ন তন্ন করে সব খুঁজে দেখলুম, দেওয়াল ছবি, চেয়ার টেবিল, মায় জমি পর্য্যন্ত খুঁজে দেখলুম, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না, মনটা খুবই দমে গেল, এতটা পথ তবে আসা বৃথায় গেল।

যাক্ তারপর বাইরে বেড়িয়ে এলুম, চাঁদের আলো পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, আমি আস্তে আস্তে বালি খুড়িতে

ঘুড়িতে দেওয়াল ঘেষিয়া চলিলাম, পেছনের দরজায় যখন গেছি তখন দেখলুম বালির উপর কিছু নীচে একটী সিল্কের ব্যাগ, মনে হ'ল যেন কিছু ভরা।

ব্যাগ খুলে দেখলুম, আটটী মাণিক, চারটী ডায়মণ্ড, দুইটী রুবি, ও বাকী দুটী বিড়ালের চক্ষু, সবগুলিই খুব বড় ও দামী, অবশ্য পরে দাম জানা গিয়েছিল প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।···

ঐ ব্যাগটীর গলায় একটি কাগজে চীনা অক্ষরে লেখা আছে, "চেংফু," ব্যাগটীর মুখ চারটী লাল ও হলদে সূতায় বাঁধা।

আনন্দে আমি তখন পাগল হ'বার উপক্রম হলুম, মনে মনে বললুম কোলুন, তুমি খুব চালাক; কিন্তু তোমার থেকেও একজন চালাক আছে, যার নাম, জন্ ষ্টুয়ার্ট, যে সুদূর ইউরোপ থেকে তোমাদের দেশে এসেচে তোমাদেরই মত চালাক লোকদের ঘোল খাওয়াতে···সে প্রথম থেকেই সব বুঝতে পেরেছিল। কে খুনী, কোলুন, এখন দেখবে সে আরও কত চালাক, এতদিন সে কেবল সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কোলুন এইবার তোমার জীবন মরণ সমস্যা!

৭

পরদিনই আমি সাংহাইতে ফিরে এলুম।

তারপর দিন আমি হ্যারির কাছে গেলুম, ঘটনাটা শুনে সে খুবই খুসি হ'ল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, কি কার্য্য তাকে পালীতে নিয়ে গেল। আমি তখন তাকে সব ঘটনা বেশ করে বুঝিয়ে দিলুম। তারপর তাকে বললুম, প্রথম থেকে এই ওয়াঙ্ আমাদের সন্দেহের চক্ষে ছিল, এমন দেখছি এই ওয়াঙ্ই কর্ত্তা। সে সবই জানে। আচ্ছা ভেবে নেও, কোলুন, হত্যা করে ওয়াঙের হাতে ঐ জহরতগুলো দিয়ে বললে, পালী যাও এবং এগুলো লুকিয়ে রেখে এসে পুলিশ ডেকে বলবে এই মৃত দেহ আমার। তুমি কি মনে কর তখন কোলুন এটা ভাবে নি সে এই জহরতগুলো ওয়াঙের হাতে ছেড়ে দিয়ে হয়ত সে তা নিয়ে আমাদের কদলী প্রদর্শন করতে পারে।···

অন্যদিকে কিন্তু সবই মিথ্যে. ঘটনাটা এই যে ওয়াঙ্ পালী গিয়ে এগুলো লুকিয়ে রেখে, ফিরে এসে নিজেকে একজন বলে প্রচার কল্লে যেন সে কিছুই জানে না।

কিন্তু হ্যারি বলতে পার, ওয়াঙ্ কে, আর কোলুনটা কে। বা কোথায়?"

হ্যারি বল'ল—"বোধ হয় এই ওয়াঙ্ ও কোলনকে হত্যা করিয়াছে কাজেই তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।"

এক চোট হাসিয়া লইয়া আমি বলিলাম, "মিঃ হ্যারি, এতদিন পুলিশে কাজ করে দেখছি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি মোটেই হয়নি, আচ্ছা চল গারদ ঘরে তোমায় দেখাচ্ছি কোলুন কোথায়।" আমরা তখন সবাই মিলে থানায় গেলুম, চেংফুর চাকর, মা পো, চেংফুর কেরাণী সকলকেই তখন থানায় নিয়ে গেলুম, কেননা এরাই কোলুনকে চাক্ষুষ চেনে।

অল্পক্ষণ পরেই ওয়াঙ্কে দুই জন পুলিশ সমভি-ব্যহারে আমাদের সামনে আনা হইল। আমি প্রায় এক ঘণ্টা ওয়াঙ্কে দেখলুম। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে জানে কিনা, কোলুন কোথায়, তখনও সে বলল যে কোলুন মৃত ও ঐ দেহই তাঁর প্রভুর।

আমি তখন তাহার কাছে গিয়ে তার দাঁত দুপাটী বাহির করিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল "কি আশ্চর্য্য কোলুন!"

বুঝলে বাবু চীনারা কত চালাক, ভগবানের সৃষ্টি হ'তেও তারা কাল্পনিক সৃষ্টিতে ওস্তাদ। তারা যদি কোন কুকর্ম না করে মাত্র ভোল বদলে থাকে ত দুনিয়ায় কেও তাকে সন্দেহ করেনা বা কেও তাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চিনতে পাবে না।···

* * * *

যা হ'ক পরে সে সবই স্বীকার করলে। এখন শোন বাবু কেমন করে কোলন এমন কাজ করলে, আর কোলুনের ভোল বদলে গেল, এই কোলুন একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত। হংকংএ একে চেনে না এমন লোক নেই। এর কাজ হচ্ছে, ধনী লোকদের সঙ্গে জহুরী সেজে আলাপ করা, তারপর সুযোগ বুঝে বুকে ছুরি বসিয়ে চম্পট দেওয়া। এমনি সে জীবনে অনেক করেছে, কিন্তু ধরা পড়ে সে জীবনে এই প্রথম।

সেখানেও সে সাংহাইতে এসে বাংলো ভাড়া করে, একটা চাকর রাখে, তাকে চেন নাম মাপো। এর সঙ্গে একটা অন্তঃসার শূন্য বড় বাক্স থাকত যাতে তাকে খুব বড় জহুরী বলে ভ্রম হ'ত। খুনের কিছুদিন পূর্ব্বে সে মাপো কে জবাব দেয়, তারপর যখন চাকরের দরকার হয় তখন নিজেই নিজের কাজে লেগে যায়, তখন তার নাম হল ওয়াঙ্।

সে আগে নিশ্চিত জেনে নিয়েছিল যে চেংফু সর্ব্বদাই জহরত নিয়ে চলাফেরা করে, সুযোগ বুঝে সে চেংকে নিজবাটীতে নিমন্ত্রণ করে তারপর হত্যা করে ঐ জহরতের জন্য, এবং সে পায়ও, ঐ পূর্ব্বোক্ত জহরতগুলিই তার প্রমাণ। চেংফুকে হত্যা করার পর কোলন পোষাক বদল করে, চেংএর পোষাক কূপে ফেলে দেয়, তারপর ওয়াঙ্ সেজে পালী গিয়ে জহরতগুলো লুকিয়ে এসে পুলিশ ডাকে। নিজে সাধু সেজে মাপোর ঘারে সমস্ত দোষ দেয়। দেখ লোকটা কি ধূর্ত্ত।...

যদি আমি ঘটনাটা না দেখে চুপ করে থাকতুম, তাহলে এই নির্দ্দোষী মাপোর যাবজ্জীবনের জন্য শ্রীঘর বাস হ'ত।

৮

যথাসময়ে বিচারে কোলনের ফাঁসী হয়ে গেল, ফাঁসি পূর্ব্বক্ষণে সে আমায় উদ্দেশ করে বলেছিল—"শুন টিকটি তুমি সুদূর দেশ থেকে এসে আমার সাথে বাদ সেধেছ আমি চল্লুম, কিন্তু তুমি আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্য তোমার অনুসরণ কর্ব্ব। তারপর সবশেষ।...

বাবু, সেই থেকে আমি এই পঁচিশ বৎসর তা অপেক্ষায় আছি। কত দেশ, কত গ্রাম, কত নগ ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু এই লোকটার কোনও সন্ধা পেলুম না, জানি সে মরে গেছে, কিন্তু তার আত্মা যে আমায় প্রতিশোধ নেবে বলেছিল; আমি অশরীরি আত্মা খুবই বিশ্বাস করি।...

যাক্ বাবু, তুমি এই লাইনে নূতন ঢুকেছ। অনেক কিছু দেখেছ, আরও কত কি দেখবে, হয়ত এমন কত বি দেখবে। দেখে আমার কথা তোমার মনে হবে।

যখনই কোন কাজ কর্ব্বে ভাল করে আগে ভেবে তবে কর। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

রাত্রি অধিক হওয়ায় আমি বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম।...

* The taies of the Amayat N : 6 হইতে অনুবাদিত।

"অচিন দোসর"

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক।

কি যেন পেয়েছি, কি যেন হারাই,
মনে-মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই,
ভাবি কারে নিতি, সে কোন্ অতিথি—,
এই আসে আর এই যে নাই।
মনে মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই॥

* * *

করুণ সুরেতে বাঁশী কার বাজে—
তরুণ-অরুণ স্বপনের মাঝে,
ঘুম-ঘুম-ঘুম নয়ন-কুসুম,—
ফুটে মুদে যায়, দিশা না পাই।
মনে-মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই॥

* * *

আঁধারে আঁধারে কে আসে কে যায়
উষার চুমায় কোথায় লুকায়,
খুঁজি সব ঠাঁই খুঁজিয়া না পাই,
প্রাণে প্রাণে তবু তারেই চাই।
মনে-মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই॥

আবহাওয়া

শ্রীবিমল মিত্র

গল্প

(এক)

ঘুমটা চট্‌ ক'রে ভেঙে গেল।

কাল তো সারা রাত ঘুম হয়নি ভোরের দিকে যা' একটু তন্দ্রা এসেছিল, এমন হঠাৎ ভাঙ্‌বে আশা করিনি।

পাশে মায়া তখনও তেমনি অঘোরে ঘুমোচ্ছিল;... বালিশ থেকে মাথাটা নেমে এসে আমারি বুকের কাছে পড়েছিল; মনে হোল মাথাটা তুলে বালিশের ওপর রেখে দি'—কিন্তু যদি ঘুম ভেঙে যায়! চুলগুলো রোদে রেশ্‌মি রঙ্‌ ধরেছে—গালের ওপর আমার ঠোঁটের দাগ যেন তেমনি স্পষ্ট; ঘুমের ঘোরে আবরণের স্বল্পতা বোধহয় অনুভব করেনি—তাই একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে বালিশটা জড়িয়ে শুয়ে রয়েছে!...বেশ দেখাচ্ছে।

কাল রাতে ও অনেক তর্ক করেছে।...ওর স্বামীর কাছ থেকে ওকে এখানে নিয়ে এসে আমি নাকি খুবই খারাপ কাজ করেছি!...যেন ওর এতটুকু ইচ্ছা ছিল না... যেন কেবল আমার জুলুম কিংবা অত্যাচারে ও আমার সঙ্গে চলে' এসেছে!

ও বল্‌ছিল—আমার না হয় একটু ইচ্ছে ছিল—কিন্তু তুমি তো পুরুষ মানুষ—বিদ্বান, একটু ভেবে বিবেচনা করে' দেখে তবে আন্‌লে না কেন? দেখ, তখন স্বামী শাশুড়ী আমায় হাজার অত্যাচার করুক—কিন্তু তবু শান্তি ছিল—তখন ছিলুম গেরস্ত ঘরের বউ—আর এখন?...

বললুম—তুমি তো অবুঝ নও মায়া—যখন তা'রা অত্যাচার করতো—তখন সত্যিই তোমার কি মনে হোত বল দিকিনি? মনে হোত না কি যে যদি তুমি দুর্ব্বল না হ'তে—তা' হলে' ওই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে? এখন অবশ্য একথা স্বীকার নাও করতে পার—কারণ—কষ্টের সময় তা'র নির্ম্মমতা ভীষণ লাগে—আর কষ্ট চলে' গেলেই আর তা' মনে থাকে না—তাই বলছি—তুমিও তো মানুষ—তোমার স্বামীও মানুষ—ভাগ্যক্রমে সে লেখাপড়া শিখে চাকরী করে টাকা আনে—তোমাকেও লেখা-পড়া শেখালে তুমি যে চাকরী করে' টাকা আনতে পারতে না—এমন কথা কে বললে?—তাই বলে যে সে তোমাকে বিনা অপরাধে কিংবা নামমাত্র-অপরাধে অমানুষিক শাস্তি দেবে—এর কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে?...তুমিও কি দেখাতে পার না—তোমারও প্রাণ আছে, অত্যাচার করলে তোমারও লাগে—তুমিও মানুষ!

কতকটা শান্ত হোল;...খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা!... তারপর বললে—কিন্তু তবু সে যে আমার স্বামী—একমাত্র সে-ইত' আমার গতি!

বললুম—সে কথা যদি বল—তাহলে' আমার কিছু বলবার নেই।

ও কাঁদতে লাগলো; কাঁদুক!—মনুষ্যত্বের কাছে যে স্বামী-ভক্তি বড় নয়—এ কথা ওকে কেমন কোরে বোঝাই? পুরানো যুগের শাস্ত্র যে আজকার যুগে অচল—সে কালের প্রথা অনুযায়ী যেমন সে কালের শাস্ত্র গড়া হয়েছিল—একালেও তেমনি কোরে আমাদের যে নতুন শাস্ত্র গড়তে হবে—একথা ওর কুসংস্কার-বদ্ধ মন বিশ্বাস করতে চাইবে কি?

আকাশে চাঁদ উঠেছিল,...জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে—একফালি আলো এসে পড়েছিল বিছানায়। ওর আধখানা গাল সে আলোয় হীরে হ'য়ে উঠেছে... চোখ্‌ বেয়ে জল গালের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল।... পাশের নিম গাছের ডালে একটা পাখী ডেকে উঠলো;... হয়ত চাঁদের আলোয় হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে তাই! নিঝুম রাত—গাছের পাতায় কাঁপুনি শোনা যায়!...ঘাসে ঘাসে সৃষ্টির স্বপ্ন। নতুন পাতা গজাবার শব্দ কাণ পেতে

শুনি...সারা পৃথিবীময় যেন সৃজনের মহান ষড়যন্ত্র চলছে—অজ্ঞাতসারে। একটা পাখী ডানা ঝাপ্‌টা দিয়ে ছাদের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে' উড়ে চলে' যায়। সৃষ্টিদেবতার পেছন পেছন যেন মৃত্যু দূত কালো ছায়া বিস্তার করে' বেড়াচ্ছে।...বাঁচবার তবু কী আগ্রহ!

মায়াকে টেনে নিয়ে বললুম—কিন্তু সত্যি বল মায়া—বিয়ে হবার আগে কখনও কি তুমি স্বামী সম্বন্ধে কল্পনা করনি?...এমনি একজন যে কিনা তোমাকে সবচেয়ে ভালবাসবে—চিরকাল—চিরজীবন—আর তুমিও তা'কে তেমনি প্রতিদান দেবে?

মায়া যেন আরও কাছে সরে' এলো।—মানে—কেনা করে?

বললুম—কিন্তু বিয়ের পর যখন সব কল্পনা মিলিয়ে গেল—তখন কি তোমার সব আশা চলে' যায়নি?—তখন কি মনে হয়নি এ জীবনটা এমনিই যাক্—পরজীবনে আবার সব হবে?

ও আমার দিকে বিস্ময়-ভরা চোখে চাইলে।—এতটা সত্যি কথা কি করে' জানতে পারলু'ম—ও এই ভাবলে!

বললুম—কিন্তু মায়া পরজীবন কি সত্যিই আছে?...নেই আমার মতে—যদি থাকেই সে যখন আসবে তখন দেখা যাবে—এখন থেকে অনিশ্চিতের জন্যে বর্ত্তমান ত্যাগ করি কেন?—হ্যাঁ-যা' বলছিলুম—বিয়ের আগে তোমার কল্পনা করা স্বামী কি আমি হ'তে পারি না?—বল মায়া। ভুলে যাও—তুমি আর একজনের স্ত্রী;—নতুন করে' তোমাতে আমাতে বিয়ে হবে।...আমার কি ভালবাসার শক্তি নেই?...

মায়া বলে' উঠলো—তা' হতে পারে না গো—তা' যে হয় না। আমিতো ভুলতে পারি না যে আমি গেরস্ত ঘরের বউ ছিলুম—এখন বেরিয়ে এসেছি!—এখন কেউ আমায় দেখতে আসবে না—আমি যে এখন...শতকরা নিরেনব্বুই জন মেয়ে যা'—মায়াও তাই।—তফাৎ যা'—তা' হচ্ছে বেরিয়ে আসবার দুঃসাহস—স্বামীর অত্যাচার সহ্য করবার শক্তির অভাবে।...নইলে ভেতরে ভেতরে তেমনি দুর্ব্বলতা অনুশোচনা! আজ মাস দুই দু'জনে একসঙ্গে বাস করছি...মনের দ্বন্দ্ব ওর আজও ঘুচলো না।...রাতে আমি ঘুমোলেও ও জেগে জেগে কাঁদে!

কথা বলতে বলতে মায়া কখন ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর আমিও।...মায়ার চুলগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।...রেশমের মত চুলগুলো সিল্কের চেয়েও পাতলা।...মাথার সিঁদুরের দাগটা এখনও জল্‌জল্‌ করছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙেই—যেন চম্‌কে উঠ্‌লো।

বললুম—ওকি চম্‌কে উঠলে যে?

বললে—একটা স্বপ্ন দেখছিলুম—কেন জাগালে?—কি দেখছিলুম জান?—দেখছিলুম—ফুলশয্যার দিন যে সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে...আমার তন্দ্রা এসেছে—এমন সময় একটা ভীষণ আওয়াজে যেন ঘুম ভেঙে গেল—তাই আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম।—কেন জাগালে?

বললুম—আমিই তো তোমার মাথায় হাত বুলোচ্ছিলুম শব্দ তো কিছু করিনি।...তুমি বড় বেশী ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করছ। এখন ও সব ভেবে কিছু লাভ নেই—কেন আমরা কি দু'জনে সুখে থাকতে পারি না?...এত টাকা রয়েছে—বাড়ী রয়েছে—কিসের ভাবনা?

ও কোনও কথা বললে না। উঠে বাইরে গেল বললে—চা আনিগে।

বুঝতে পারি না সত্যিই খারাপ কাজ করেছি নাকি সমাজ হয়ত এ কাজ অনুমোদন করবে না—কিন্তু সমাজের জন্যে তো মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই সমাজ। মানুষের সুবিধা অসুবিধায় ব্যবস্থা বুঝে সমাজ বদলাতে বাধ্য। আমি হয়ত একাজের দায়িত্ব প্রথম নিলাম—হয়ত ব্য... হবে, যা'র জন্যে আমার এত সব—সে তো কই অনুমোদন করে না! আমার আকাশ যে আলোর ধ্যানে রাত্রির অন্ধতাকে বরণ করেছে—সে অন্ধতা যদি চিরস্থায়ী হয়?

দুই

বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে একটা ছবির বই দেখছিলুম।

দূর আকাশে সূর্য্যের শেষ যাওয়ার ছবি বইয়ের ছবির চেয়ে মুগ্ধকর। একটা বাড়ীর ছাদের পাশ দিয়ে ধোঁয়া উঠেছে। রান্না ঘরের ধোঁয়া। একটা মেয়ে ছাদ থেকে শুকনো কাপড় তুলতে এসে চারিদিকের শোভায় নিজেকে

হারিয়ে ফেললে।...ছু'মিনিট দাঁড়িয়ে আকাশের দিকটা ভাল করে' দেখে নিলে।—মেয়েটির বোধ হয় বিয়ে হয়নি, মাথায় ঘোমটা নেই! পাশের অশথ্ আছে একটা কোকিল অনবরত ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো;... আনন্দেরও ক্লান্তি আছে তা' হ'লে?...মায়া হয়ত এই কথাটা বিশ্বাসই করত না।

মায়া গা ধুতে গেছে; নিজে যেতে চায়নি; আমিই পাঠিয়েছি। কোন কাজটাই বা ও ইচ্ছে কোরে করে! সবই আমায় করিয়ে দিতে হয়। ও যখন ঘুমোয়—পাশের গাছে কাকের শব্দে পাছে ঘুম ভেঙে যায় তাই নিজে উঠে কাক তাড়িয়ে দিই; ও যখন ক্লান্তি বোধ করে আস্তে আস্তে বিছানায় ধরে' এনে শুইয়ে দিই।

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ও আসছে।... পেছনে কালো কালো লম্বা চুল পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে... কপালে সিঁদুরের টিপ্—রঙিন্ কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করেছে—বললুম—বোস—মায়া।

একটা চেয়ার টেনে নিজে নিয়ে ওকে ইজি চেয়ারটা ছেড়ে দিলুম!

বাইরের সন্ধ্যার সঙ্গে ওর অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ-শ্রী কি সুন্দর মানিয়েছে! ওর আকাশের আজ সূর্য্যাস্ত নাকি?... আমি কি ওর বুক চন্দ্রদীপে মহিমময়ী করে' তুলতে পারবো না?...আমার আলো তো আজো ফুরোয়নি!

মায়া বললে—দেখ, সেখানে সারা দিন কাজ করতুম, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট্ দেওয়া, রান্না করা—সব তো আমিই করতুম আর এখানে রাণীর মত বসে' বসে' মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে—শরীরও খারাপ হচ্ছে। আমায় কাজ করতে দাও—কাজ না করতে না দিলে আমিতো ভাল থাকব না—চাকর বাকর সব ছাড়িয়ে দাও।

বললুম—কেন মায়া কাজতো অনেক রকম হ'তে পারে—তুমি তো সামান্য পড়তে জান—একটু একটু বই পড় না। আমার কত বড় লাইব্রেরী রয়েছে—বাঙলা বইও কত রয়েছে—তোমার যা' ভাল লাগে তুমি পড়তে পারো। ওই গুলোই কি কাজ এগুলো কিছু নয়, চাকর বাকর ছাড়িয়ে দিয়ে কি হবে, তা'রা থাক্ তুমি সমস্ত ব্যবস্থা কর। আসল কথা তুমি ভাবনা ছেড়ে দাও।

ও চুপ করে' রইল।—

রাস্তা দিয়ে গান গাইতে গাইতে এক দল খোট্টা চলে' গেল—আজ হোলি!

চারিদিকে আনন্দ; আকাশে বাতাসে মাটিতে। পথিকদের কাপড়ে লাল রঙ, মাথায় কপালেও তাই। সারা জগৎ আজ একটি দিনের জন্যেও জীবনের দুঃখ দৈন্য বুঝি ভুলতে চায়!—কেবল আমাদের আকাশ আজ বিবর্ণতার বিষাদে ম্লান!

ও খানিক পরে বললে—সত্যি বলছি—আমি সেখানে না গিয়ে বাঁচব না। এখানে থাকলে তুমি আমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।...আমায় সেখানে নিয়ে রেখে এস।

চমকে উঠলাম। একবার বেরিয়ে আবার ফিরে যাওয়া! লোকে বলবে কি? বুঝি—ও সেখানে ফিরে যেতে চায় স্বামীর ভালবাসার জন্যে নয় কেবল সংসারের মিথ্যা মোহে!

বললাম—ফিরে তো যেতে চাইছ মায়া, কিন্তু তোমার স্বামী কি তোমায় আর ফিরিয়ে নেবে?—সমাজের চোখে তুমি তো দোষী! এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া কি তোমার ভাল হবে?

ও বললে—বাড়ীর ঝি হ'য়ে থাকবো তা'ও দেবে না? বলব তোমাদের সব কাজ করে' দেব—শুধু বাড়ীতে থাকতে দাও।

বললাম—একই কথা—যা'দের ভয়ে তুমি এখানেও স্বস্তিতে থাকতে পাচ্ছ না—তা'রা তো তোমায় কাছে পেয়ে আরও গঞ্জনা দেবে? দূর থেকে বরং কিছু সহ্য করা যায়—কাছে থেকে সাম্‌না সাম্‌নি অপবাদ সে অসহ্য মায়া!

ও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। পরে বললে—তবু আমায় দিয়ে এস তুমি, আমি সেখানে সেই বাড়ীর মাটিতে মরব।...আমায় সেখানে তুমি দিয়ে আসবে চল।

বলতে পারতাম—সে বাড়ীতে তোমার তো মরবারও অধিকার নেই মায়া—তা'রা এখন তোমার সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দের বাইরে—তুমি যে এখন পর মায়া!

কিন্তু তা' বলতে বাধ' বাধ' ঠেকল! আমি তো ওকে আঘাত দিতে চাই না। বললাম—তোমার এখন বিশ্রাম দরকার মায়া—চল শোবে চল—ঘুমোও। না ঘুমোলে তুমি কেবল ভাববে—ভাবলে তোমার শরীর খারাপ হবে মায়া—আমার কথা একটু শোন।

ওকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে এলাম। ও ঘুমোল। আজ আমার ভাবাচ্ছন্নতা এসেছে! ওকে নিয়ে আর কতদিন এমনি ভাবে কাটাব? আমার জীবনটা এমনি ভাবে ব্যর্থ করে' দিতে তো পারি না। একজনের জন্যে আমার স্বার্থত্যাগ সে আমার দ্বারা হবে না। হ্যাঁ, ওকে আমি ভালবাসি—তা' বলে ওর অভাবে আমি আত্মহত্যা করব না নিশ্চয়ই!

তিন

ও এসে বললে—চল।

ও আজ আমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। ওকে ওর স্বামীর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েই আমার ওর সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ; তবে তাই হোক্। ওর পৃথিবীতে যদি আমার আশ্রয় না থাকে—জোর করে' সে আশ্রয় আমি পেতে চাইনা। অন্যায় যদি আমি করেই থাকি—সে অন্যায়ের তবে আজ শেষ হোক্। ওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি স্বামীর কাছে ওকে গিয়ে দিয়ে আসব।

ওর পোষাক আজ দেখবার মত। কালো একটা ময়লা আটপৌরে সাড়ী কোথা থেকে আবিষ্কার করে' গায়ে জড়িয়েছে। আর কিছু গায়ে নেই। সিঁথের সিঁদুর যেন বড় বেশি রকমের জলজ্বলে!

বললাম—এতটা বাড়াবাড়ি করবার কোনও দরকার ছিল না মায়া—না আমার জিনিষ আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাও!—যদি তাই হয় তা' হলে' তোমাকে বলি—ও জিনিষগুলো এখানে না রেখে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেলেই তো হোত! ওসবের তো দরকার আমার নেই!

আঘাত দিলাম নাকি?···ও হয়ত এতটা আশা করেনি। কিছু উত্তর না দিয়ে ও চুপ করে' রইল। চোখের দৃষ্টিটাও যেন স্বাভাবিক নয়!

সোফেয়ারকে গাড়ী হাজির করতে আদেশ দিলাম।

আমার ক্যাডিলাক্ সবেগে ছুটলো। সন্ধ্যে হয়েছে। চেৎলার একটা গলির ভেতর ওদের বাড়ীটা। রাস্তার গ্যাস এখনও জ্বালা হয়নি। অন্ধকারে সরু রাস্তায় যাওয়াই মুস্কিল। পথের মধ্যে নর্দ্দমার উপর দিয়ে ক্যাডিলাক্ নিঃশব্দে চলল।

ওর হাত স্পর্শ করে' দেখলাম ও কাঁপছে। ভয়ে [illegible] করোচে?···ওর মুখে মোটে কথা নেই পাথরের মূর্ত্তির মত একপাশে ও বসেছিল। বাইরের দিকে জ্যোতিহীন দৃষ্টি—ওর মাথায় যেন চিন্তার পাহাড়! সে বাড়ী থেকে ও স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেছিলে সেই বাড়ীতে ও আজ আবার স্বেচ্ছাতেই ঢুকছে, ওর গা হিম! এক মিনিট পরেই যেন ওর ভাগ্য নির্ণীত হবে! আদালতে জজের রায় দেবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে খুনে আসামীর মত ওর মনের অবস্থা! জীবন মরণের সমস্যা ওকে আজ নির্জ্জীব করে' রেখেছে।

কি একটা প্রশ্ন করলাম, ও তা'র উত্তর দিলে না।

বাড়ীর একটু দূরে আসতেই ও গাড়ী থামাতে বললে! থামল।

ও বললে—তুমি চলে' যাও—আমি এটুকুন্ হেঁটেই যেতে পারব।

আমি কিন্তু সত্যিই গেলাম না। ··অন্ধকারে ও মিলিয়ে যেতেই আমি ওর পেছন নিলাম।

বাড়ীর সামনে এসে ও খানিকক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল!···কিন্তু কি ভেবে আবার ঢুকে গেল!

সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি তেমনি দাঁড়িয়ে। এখনও ও বাইরে এল না। মনে মনে অনেক কিছু কল্পনা করতে লাগলুম। ও হয়ত বাড়ীতে ঢুকতেই স্বামীর সঙ্গে দেখা, তারপর স্বামী ওকে দেখে হয়ত চিনতে পারলে না—তারপর যখন চিন্‌লে তখন হয়ত লাঠি নিয়ে মারতে এল। মায়া কি করলে? কি আর কি করলে! হয়ত ওর স্বামীর পায়ে মাথা রেখে বললে—আমায় মেরে ফেল—তাই ভালো!

কিন্তু স্বামীটি তা'কে না মেরে হয়ত রাস্তার বাইরে ফেলে দিতে এসেছে—এই এল বোধ হয়! কিন্তু কই—কারো'র তো সাড়া শব্দ নেই।

বাইরে দাঁড়িয়ে অনেক রকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করতে লাগলুম—একবার ভাবলুম ও হয়ত আস্তে আস্তে ঢুকছে দেখে চোর চোর বলে কেউ চেঁচিয়ে উঠলো। ঘরের থেকে বেরিয়ে এল ওর স্বামী—এসে ওকে দেখেই চিনতে পারলে! তারপর? তারপর হয়ত···হয়ত··· হয়ত কিন্তু কি যে তা নিজেই কল্পনা করতে পারলুম না।

চারদিকে একটা বীভৎস আবহাওয়া নিঃশ্বাস বন্ধ

প্রতীক্ষায়

শিল্পী- শ্রীহরেকৃষ্ণ সা।

করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা'য়ে ব্যথা ধরে গেল। দূরে লোকেরা কি ভাবছে জানিনে; বাবুর এই অস্বাভাবিক অবস্থা ও কি ভাবে গ্রহণ করছে কি জানি! হেড লাইট নিভিয়ে দিয়ে ও একটা বিড়ি ধরিয়েছে।

শাদা কাপড় পরা কে একজন এদিকে আসছে না? ··· একি এযে মায়া! আনন্দে বলে' উঠলাম—যা বলেছিলাম—তাই তো হোল?

ওর মুখে কিন্তু আনন্দের রেখা, কেন? বললে—আমি যা' বলেছিলুম—তাই হয়েছে; ওদের বাড়ী ঝিএর দরকার ছিল···কাল থেকে কাজে লেগে যাব, চার টাকা মাইনে—খাওয়া পরা! কিন্তু তুমি এখনও দাঁড়িয়ে কেন?

ওর কথায় কান না দিয়ে বললুম—তোমায় চিনতে পেরে কি বললে মায়া?

—চিনতে তো আমায় পারেনি। রাত্তির বেলা এই পোষাকে চিনবে কেন? কাল সকালে আসতে বললে—ভোর ছ'টায়; তার আগে আমায় এখানে হাজির হ'তে হবে। তুমি এখনও দাঁড়িয়ে কেন—যাও! কাল থেকে তো আমি এ বাড়ীর ঝি!

বললুম—আজ রাত্তিরটা না হয় আমার ওখানেই কাটাবে—কাল ভোর বেলা আবার পৌছে দিয়ে যাবে।

ও প্রথমটা আপত্তি করেছিল কিন্তু আমার পিড়াপিড়িতে বোধ হয় শেষকালে ব্যথা দিতে চাইলে না। গাড়ীতে ও উঠে এল। এখানে আসার সময় মুখে যে আঁধারের আবিলতা দেখেছিলুম—তা' এখন আলোর উৎফুল্লতায় পরিণত হয়েছে।

গাড়ী চলল; বললাম,—ওরা কিছু তোমায় জিগ্যেস করলে না? কে, কি কয়, এই সব?

বললে—হ্যাঁ, বললুম—ভদ্রলোকের মেয়ে অবস্থার বিপাকে প'ড়ে পরের বাড়ী চাকরী করতে হচ্ছে। স্বামী আছে কিন্তু চরিত্রহীন—বাড়ীর বাইরেই তাঁর দিন কাটে।

যাক্—ও তবে সন্তুষ্ট! যে বাড়ীতে একদিন ও বউ হ'য়ে ঢুকেছিল সে বাড়ীতে ঝি-গিরী করতেও যদি ওর দ্বিধা না হয়, তবে—ওর যা ইচ্ছে তাই হোক্! ওকে বাধা দেব না। ওর পৃথিবীতে ওর স্বামী ছাড়া আর কোনও পুরুষ নেই কিন্তু আমার পৃথিবীতে মায়া ছাড়া অন্য নারী অনেক আছে যে!

*

পরদিন ও মাথায় তেল মাখলে না; চেহারাকে যে কত পরিবর্ত্তন করা যায়—তা' ওকে দেখে বুঝলুম! হাতের একগাছা শাঁখা ছাড়া আর কিছু রইল না। ময়লা ছিট্ কাপড়—চুল রুক্ষ—গায়ে ময়লা। ওকে যেন আমিই চিনতে পারলুম না। তা'র ওপর যদি ঘোমটা দায়—অতি পরিচিত জনেরও তা' হলে' ওকে চেনা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে!

পরদিন ওকে সেই জায়গায় পৌছে দিলাম।

নামবার সময় ও বললে—আমার সঙ্গে কখনও দেখা করতে এস না। আমার নাম এখন থেকে মায়া নয়—সৌদামিনী!

চলে এলুম। কিন্তু খুব বেশী যে দুঃখ পেয়েছিলাম তা' বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। আমার ভালবাসা অত সঙ্কীর্ণ নয়; মায়া ছাড়া অন্য নারীও যে পৃথিবীতে আছে এ কথা ভুললে চলবে কেন?

চার

অনেক দিন বাদে—

একটা কাজে আবার মায়াদের গলির ভেতর দিয়ে মোটর চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সন্ধ্যে বেলা; গ্যাস জ্বালা থাকলেও অন্ধকার যেন অনুভব করা যায়।

ওদের বাড়ীর সামনে এসে যেন চমক ভাঙলো। আলোয় আলো জায়গাটা! সামনে একটা মোটর দাঁড়িয়ে আমার পথরোধ করেছে। আমাকে বাধ্য হ'য়ে থামতে হোল। ওটা না চলে' গেলে আমার যাবার উপায় নেই।

বিবাহ-উৎসব নিশ্চয়ই। মোটরটি ফুলে ফুলময়।··· সবই প্রস্তুত; বর এলেই হয়—বর যাত্রীর দল ভীড় করে' চারদিকে দাঁড়িয়ে।

একটা গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। আজ বোধ হয় মায়ার দেখা মিলতে পারে।

বর এল—ওকি?·· ও যে মায়ারই স্বামী! তবে

এ কি দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবস্থা নাকি?...বর উঠে বসলেন। পাশে সঙ্গীরূপে আরও দু'তিন জন।

অন্দর মহলের মেয়েরা উঁকি দিচ্ছে। শাঁখের আওয়াজে কর্ণকুহর ব্যতিব্যস্ত; উৎসুক-দৃষ্টি দিয়ে ওদের সকলকে দেখতে লাগলাম। কিন্তু মায়া কই?...অনেক খোঁজার পর দেখি মায়া আড়ালে দাঁড়িয়ে শাঁখ নিয়ে ফুঁ দিচ্ছে! চোকে জল কই?...মুখে অকাল বার্দ্ধক্যের ছায়াপাত হয়েছে এরি মধ্যে!...ওর আনন্দ বিচ্ছুরিত নয়নে কবেকার স্মৃতি হয়ত জাগছে;...সেদিনও তো ও এমনি সমারোহের মধ্যে এ বাড়ীতে নববধূর বেশে এসেছিল!...তা'রই জায়গায় আজ আবার যে আসছে—তা'র ভাগ্যে কি লেখা আছে কে জানে? আজ ও এই কথাই ভাবছে নাকি?

আমার হর্ণ বেজে উঠলো।

বরের গাড়ীর পেছন পেছন আমার ক্যাডিলাকও চলল!

বংশ-রক্ষার অছিলায় পশুবৃত্তি-চরিতার্থের যে মহা আয়োজন আজ দেখলাম—তাতে বিস্মিত হবার কি আছে?

হিন্দুসমাজে নারীর স্থান

শ্রীচারুপ্রভা দেবী

প্রবন্ধ

সৃষ্টির আদিম কাল হইতে বিশ্বনিয়ন্তা পুরুষ ও নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষ ও প্রকৃতিই হইতেছে সৃষ্টি লীলার মূল উপাদান। অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি দুয়ের মঙ্গল সমন্বয়ে রচনা হইয়াছে। ক্ষুদ্র পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ, জাতি ও বিশ্বমানবতা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নারীর স্থান আছে ও দিতে হইবে।

মহামানবতারূপ বিহঙ্গের দুইটি পক্ষ। একটী হইতেছে পুরুষ অপরটী হইতেছে নারী। কাজেই যতদিন মানবতা থাকিবে, জাতি ও সমাজ থাকিবে ততদিন পুরুষকে যেমন আবশ্যক, নারীকেও সমান ভাবেই আবশ্যক হইবে, এ কথা বিশ্বের ইতিহাসে চিরন্তন সত্য। যখন পুরুষ ও নারী দুয়ের সমন্বয় লইয়া সমাজ ও জাতীয়তার সৃষ্টি, তখন ন্যায়ের দিক হইতে পুরুষ ও নারীর স্থান সমান হওয়া উচিত, কিন্তু হিন্দুসমাজের সৃষ্টির প্রথম হইতেই নারীকে পুরুষজাতির সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন করা হইয়াছে। সর্ব্ব প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদিগের ন্যায়তঃ প্রাপ্য না দিয়া তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার জবাবদিহি আজ পুরুষকেই করিতে হইবে। পুরুষ জাতিই চিরদিন সমাজের আধিনায়কতা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা সুবিধা লইয়া নারীকে আজ এত কোণ-ঠেসা করিয়া রাখিয়াছে।

বহু শতাব্দী ধরিয়া নারীজাতির প্রতি এই নির্য্যাতনের ফলে—তাহাদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার ফলে হিন্দু নারীর স্থান জগতের আসনে এতদূর পিছাইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার মুক্ত দ্বার তাহাদের নিকট রুদ্ধ, শিক্ষার দ্বার তাহাদিগের জন্য দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। সমাজ-শাসন তাহাদিগের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছে। মনুষ্যত্ব পরিপুষ্ট হইবার ও জ্ঞানার্জ্জন করিবার যতগুলি উপায় আছে প্রায় সবগুলিই তাহাদের নিকট অবরুদ্ধ রাখা হইয়াছে। এখন তাহাদিগকে জগতের অন্যান্য সভ্যজাতির পারগতা ও জ্ঞানগরিমার মাপকাঠিতে বিচার করিতে গেলে কি তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না?

বর্ত্তমানে এই মরণাপন্ন হিন্দুজাতি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে যে, নারীজাতি তাহাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে,—যদি একথা সত্য হয় তবে তাহার জন্য দায়ী কে? পুরুষগণ দায়ী নহে কি? নারীজাতিকে পঙ্গু করিয়াছে কাহারা? তাহাদের

মনুষ্যত্বকে এমন করিয়া পিষিয়া মারিয়াছে কাহারা? এখন যে নারীজাতি একটা অবহনীয় বোঝা হইবে ইহা কি অস্বাভাবিক?

এতকাল ধরিয়া নারীকে কেবল পুরুষের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপাদান বলিয়াই মনে করিয়া আসা হইয়াছে। এতদিন নারী কেবলমাত্র ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কাহারও ভাবিবার অবসর আসে নাই যে, ইহাই পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বাভাবিক ও সহজ সম্বন্ধ নহে। পুরুষ ও নারী উভয়ের গোপন অন্তরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সুর আছে। সেই সুরই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সহজ ও সরল সম্বন্ধ স্থাপন করে, আর সেই সম্বন্ধই হইতেছে চিরন্তন। পুরুষের সাধারণ ধর্ম্ম ও তাহাদের যে জগৎ আছে তাহা নারীর জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দুই জনেরই দুইটী পৃথক প্রাচীর ঘেরা রাজ্য আছে। একজনের অপর জনের রাজ্যে যাতায়াতের কোন সুগম পথ সমাজের অধিনায়কগণ রাখেন নাই, রাখিবার আবশ্যকতাও মনে করেন নাই। যতই সুদৃঢ় প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া পুরুষ ও নারীর রাজত্বকে পৃথক করিয়া দেওয়া হউক না কেন, উভয়েরই অন্তরতম স্থলে যে একটা সামঞ্জস্যের সুর আছে, একথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। পুরুষের পুরুষত্বের বিশেষত্ব ভিন্ন তাহার সাধারণ ধর্ম্ম হইতেছে সে মানুষ; নারীরও নারীত্বের বিশেষত্ব ভিন্ন তাহার সাধারণ ধর্ম্ম হইতেছে সে মানুষ। কাজেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে মনুষ্যত্ব রূপ সেতু যে মহা সাম্যের সুর বহাইয়া দিয়াছে, সে সুরকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুবিধার জন্য পুরুষ ও নারীর মাঝখানে যে অস্বাভাবিক প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া একের অন্য হইতে বিভিন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, একের চিন্তাধারাকে অন্যের চিন্তাধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একের জগতকে অন্যের জগৎ হইতে বহুদূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে—ইহা কি স্বাভাবিক? —ইহা কি সত্য? - ইহা কি চিরন্তন?

পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে এ কথা সত্য, কিন্তু তবুও ইহাদের মধ্যে সহজ ও সরল সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। নারীকে শুধু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপকরণ এবং ভোগ ও বিলাসিতার আস্বাদের মত দেখিলে চলিবে না। তাহাদের ভিতরের মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, চিন্তাধারাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; বাহিরের জীবন, যাহা প্রায় আমাদের দেশে শুধু পুরুষদেরই একচেটিয়া সেখানেও তাহাদিগকে স্থান দিতে হইবে।

নারীর কথা ও নারীর জগতের কথা মনে করিলে আমাদিগকে শুধু গৃহের নিভৃত কোণের চিত্র দেখিতে হয়। হাতা বেড়ী খুন্তি সম্মার্জ্জনী তাহাদের জগতের উপাদান ও ঘরকন্নার কথা—তাহাদের চিন্তাধারা। এই যে গণ্ডী, ইহার বাহিরে যাইবার অধিকার তাহাদিগের নাই। ইহা কি নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ? গৃহের নিভৃত প্রাঙ্গণে ও গৃহকর্ম্মের গণ্ডী ছাড়াইয়া কি নারীর চিন্তাধারা বাহিরে যাইবার উপযুক্ত নহে?

এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশে যে পুরুষ ও নারীর মিলন হইয়াছে সে শুধু অন্ধকারের মধ্যে, প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির তাড়নায়। এই যে মিলন, ইহার মূলে শাস্ত্রকারগণের ভাষায় কোন আধ্যাত্মিক ভাব থাকিলেও আমরা বলিব, সে মিলন এতদিন ধরিয়া পুরুষের মনে একটা অস্বাভাবিক হীন ধারণা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, পুরুষ প্রভু আর নারী দাসী। পুরুষ ও নারীর মধ্যে সহজ ও সরল মিলন নাই। তাহাদিগের অবরুদ্ধ চিন্তাধারাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। বাহিরের মুক্ত আলো ও বাতাসে তাহাদিগকে অবাধ গতি দিতে হইবে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন চিন্তাধারার আদান-প্রদান হইবে, ভাবের বিনিময় চলিবে, কর্ম্মজগতে উভয়ে যখন পাশাপাশি চলিতে পারিবে, তখনই আসিবে তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন।

"পুরুষ মনময় আর নারী হইতেছে প্রাণময়।" পুরুষ ভাব, চিন্তাধারা inference ও theoryর মধ্য দিয়া সত্যে উপনীত হয়, আর নারী প্রাণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও অনুভূতির মধ্য দিয়া সত্যে পৌছায়। পুরুষ শুধু সংলগ্ন চিন্তা ও ভাব লইয়া ব্যস্ত, নারী কিন্তু প্রাণের অনুভূতি দিয়া সে ভাব যাচাই করিয়া একেবারে fact এ পরিণত করে। পুরুষ চায় ভাব, আর নারী চায় অনুভূতি, পুরুষ চায় theory আর নারী চায় fact।

কাজেই কর্ম্মজগতে নারীর স্থান পুরুষের অপেক্ষাও উপরে। পুরুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও লুকায়িত শক্তি ও প্রতিভা পূর্ণভাবে বহিঃপ্রকাশের প্রেরণা পায় নারীর মঙ্গলময় স্পর্শে। কর্ম্মে নারীই প্রেরণা আনিয়া দেয়। জলকে যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে নারীও তেমনি পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া পুরুষেরই স্বভাবকে প্রতিফলিত করিয়া নিজেকে গঠন করিয়া লয় ও প্রাণময় সত্ত্বার সহজ ও স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ দ্বারা পুরুষের মধ্য দিয়া কর্ম্ম রচনা করে।

এতক্ষণ আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া মহামানবতার মধ্যে নারীর স্থান কোথায়, নারীর সহিত পুরুষের কি সম্বন্ধ? এখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, নারীকে হিন্দুসমাজ কোথায় স্থান দিয়াছে।

হিন্দু-সমাজপতিগণ নারীকে যাচাই করিবার জন্য নারীর পবিত্রতা ও সতীত্ব রূপ যে কষ্টিপাথর আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই কষ্টিপাথরের কৃপায় পুরুষরা এতকাল ধরিয়া নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মম্ভরিতা বজায় রাখিয়া বেশ আরামে কাটাইয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহা চলিতেছে না, কারণ কষ্টিপাথরের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কষ্টিপাথরের দোহাই দিয়া খাঁটী সোনাকে মেকি বলিয়া নাস্তানাবুদ করিবার সময় আর নাই। এখন যে যেমন জিনিষ তাহার তদনুরূপ দর দিতে হইবে। নারীর কথা উঠিলেই সমাজের নেতাগণ অমনি বিচার করিতে বসিলেন, কোথাও কোন মুহূর্ত্তে সমাজের দেওয়া পর্দ্দা বাহিরের মুক্ত বায়ুর দোলনে সরিয়া গিয়াছে কিনা—যদি সামান্য বায়ু-প্রবেশের পথ দৃষ্ট হইয়া থাকে তবেই সর্ব্বনাশ, অমনি নারীর ভাগ্যবিধাতা তাহার গায়ে পতিতার ছাপ দিয়া দূরে, বহুদূরে ঠেলিয়া দিলেন! সেখানে সমাজের সহানুভূতি পৌঁছায় না, আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা নাই, এমন কি মাতাপিতার স্নেহ-ভালবাসাকেও সেখানে যাইবার হুকুম সমাজ দেয় নাই।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে দিন দিন যে পতিতার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার জবাবদিহি ন্যায়ের দিক হইতে দেখিতে গেলে পুরুষগণকেই করিতে হইবে। পুরুষরাই নারীজাতির সম্মুখে প্রলোভনের পসরা সাজাইয়া ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগকে ভোগের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। দুই দিন পরে বাসি ফুলের মত তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবহেলার সহিত দূরে নিক্ষেপ করে। যদি পুরুষগণ নারীজাতিকে শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির খোরাক বলিয়া লইয়া থাকে, তবুও দুই দিন ভোগের পর তাহাদিগকে এমন ঘৃণা ও অবহেলা করিয়া সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ও দূরে সরাইয়া দিবার অধিকার কোন্ ন্যায়ের বিধানে আছে? সাত সহস্র হিন্দু-নারী যে পুরুষদের লালসার আগুনে ইন্ধন যোগাইতেছে ও ভোগের উচ্ছিষ্ট স্বরূপ পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহার জন্য সমাজ কি কোন মুহূর্ত্তে ভাবিবার অবসর পাইয়াছে?

সমাজপতিগণ পতিতার গন্ধমাত্র পাইলেই নাসিকা কুঞ্চন করিয়া খবরদারি করিতে আরম্ভ করেন ও সতীসাবিত্রী প্রভৃতির নজির আওড়াইয়া প্রাচীরের উপর প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া সমাজ হইতে তাহাদিগকে ছাটিয়া দেন। সমাজপতিগণ কি কখনও ভাবিবার অবসর পাইয়াছেন, তাহাদের এ অবস্থা করিবার কারণ কাহারা? তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন, কাহারা তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া কিম্বা বলপূর্ব্বক তাহাদের নারীত্বের অবমাননা করিয়াছে ও নির্য্যাতন করিয়াছে?

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যাহারা পতিতা ও হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে হিসাব করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব, তাহাদিগের মধ্যে কয় জন মাত্র স্ব-ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নারীত্বকে হীন করিয়াছে। বার আনা কিম্বা তাহারও বেশী সংখ্যা নারীকে নষ্ট করিয়াছে পুরুষগণ তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। নারীজাতি সাধারণতঃ হীনবল। পুরুষদের চাতুরি, প্রলোভন ও নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র ও নারীত্বের গৌরব কত কাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারে? যদি কোথাও একটু অসাবধান হইয়া পড়িল কিম্বা কোথাও একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল, আর রক্ষা নাই; তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিবার পাত্র পুরুষেরা নহেন। মানুষকে যেমন হিংস্র জন্তুর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিতে হয়, তেমনি আমাদের সমাজেও নারীজাতিকে পুরুষদের ভয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিতে হয়। কোথাও যদি একটু সুবিধা পায় তবে আর শিকারীদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবার যোটী নাই।

নাম-মহিমা

চিত্র

শ্রীবিমলা দেবী

বড় মেয়ের নাম সিক্তা, ছোটটির রিক্তা, খোকার নাম নীরব।

মা বাপের অদূরদর্শিতা ছিল!

সিক্তা চব্বিশ ঘণ্টা কেবলি কাঁদে, কারণে অকারণে, আঁখি-পল্লবের সিক্ততা আর ঘোচে না কিছুতেই।

রিক্তার রিক্ততার ঠেলায় মা অস্থির, মায়ের সঞ্চিত খেলনা, খাবার, কাপড়, জামা, বাপের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই তার হস্তগত হ'তে এবং পর মুহূর্তে অন্তর্হিত হ'তে বিলম্ব হয় না!

মা বলেন—"মেয়েটা কি ডোকলাই' হয়েছে।"

নীরবের কণ্ঠস্বর, গৃহ সংযুক্ত প্রাচীরের উপর বিশ্রাম লাভার্থী বায়সকেও হার মানায়।

দিনে রাত্রে তার স্বর সাধনার বিরাম নেই!

পাশের বাড়ীতে থাকেন হরিচরণবাবু, তাঁর স্ত্রী, বড় ছেলে কেষ্ট, ছোট মেয়ে টেঁপি।

সিক্তার মায়ের সঙ্গে টেঁপির মার সই পাতান; ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে বেরিয়ে এসে রাগ করে টেঁপির মা ডাকেন—"টেঁ—পি—ই—!"

সিক্তার মা তখন নীরবকে চুপ করাবার ব্যর্থ চেষ্টায় স্তুতি জুড়ে দিয়েছেন "দেখ নীরব, তোমার মত লক্ষ্মী ছেলে কি আর আছে—"

উঠানের আস্তাকুড়ে খাদ্য সংগ্রাহক কাক হার মেনে মাঝে মাঝে ডাকে—"কা—!"

আফিসের কাজ পড়েছিল বেশী, সিক্তার বাবা স্নান করে এসে ব্যস্ত ভাবে ডাক দিলেন—"ওগো, ভাত দিয়ে যাও, শীগগির, বড্ড দেরী হয়ে গেছে।"

—"এই যে যাই, তোমার কামিজটার বোতামটা লাগিয়েই যাচ্ছি।"

—"ও থাক গে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে; রান্না হয় নি?"

—"রান্না হ'বে না কেন, কবে হয়ে গেছে। ও সিক্তা, সিক্তা, একটা ঠাঁই করে দে ত। কি হ'ল—"

একটা বিকট কর্ণবধিরকারী কোলাহলে, দুজনেই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

সম্মুখেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই সমস্ত ভুলে নির্বাক স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন! রান্নাঘরের দুয়ার হাট করে খোলা; চৌকাঠের কাছে বসে নীরব সরবে কোলাহল জুড়ে দিয়েছে, পরাজিতা সিক্তা মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে অশ্রুর বন্যায় দুকূল ভাসিয়ে চলেছে; আর রিক্তা একান্ত মনোযোগ সহকারে হেঁসেলে ঢুকে জননীর প্রস্তুত মাছের বড়ার পাত্রখানি রিক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে; সঙ্গে ভোলা কুকুরটাও আছে!

ধাতস্থ হয়ে সিক্তার মা চড় উঁচিয়ে ছুটে এলেন, ভোলা কুকুরটা অকস্মাৎ জবাবদিহির শঙ্কায়—"কেঁউ" করে একটা শব্দ করেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

রান্নাঘরে মায়ের তর্জ্জন গর্জ্জন ও ছেলেমেয়েদের ক্রন্দনের উচ্চ কলরোলে যেন বিপ্লব বেধে গেল।

সিক্তার বাবার মুখ দিয়ে কোন কথাই ফুটল না, বড় সাহেবের রক্ত চক্ষু চোখের সম্মুখে নৃত্য করে উঠল; তিনি হতাশ ভাবে রোয়াকের উপর বসে পড়লেন।

হরিচরণবাবু আফিসে যাবার জন্যে বেরিয়েছিলেন, সহসা কোলাহল শুনে প্রতিবেশীদের বিপদাশঙ্কায় তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। ব্যাপার জানতে বিলম্ব হ'ল না; হরিচরণ খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন, পরে একটা বিষম খেয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লেন—"তখুনি বলেছিলাম মশায়, নাম গুলো বদলে রাখুন।"

ভারতে আর্য্যরমণীর সভ্যতা

৺রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ **প্রবন্ধ**

ভারতের বৈদিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতে রমণীগণের সভ্যতা অতুলনীয় ও অনুকরণীয় ছিল! রমণীরা তখন কেবল সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন না। তখন একান্নবর্ত্তী পরিবার রমণীরাই রক্ষা করিতেন। ঋষি যুগেও আমাদের নারীগণের এইরূপ অবস্থাই ছিল। ভারতের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্ব্ব সর্ব্বত্রই ঋষি-প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। পৌরাণিক যুগেও আমরা কম সম্পদশালী ছিলাম না। রামায়ণে আমাদের সীতা, মহাভারতে আমাদের কুন্তী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, চিন্তা কাহাকেও বাদ দিলে চলে না। বশিষ্ঠ পত্নী এক সময়ে বহু অতিথির স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিতোষ রকমে সেবা করিয়াছেন। কলিযুগে এ সকল উপন্যাসের রূপকথার ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। তৎকালের রমণীগণের বিলাস-ভূষণ ছিল না। সধবার চিহ্নটুকুই তাঁহারা গৌরবের মনে করিতেন।

ঋষিদিগের ঘর-গৃহস্থালীও ছিল, তাঁহারা ছাত্র পড়াইতেন, বনজাত ফলমূলাদি আহার করিয়া তুষ্ট থাকিতেন। তপস্যা তাঁহাদের আদরের ও সাধনার ধন ছিল। রমণীগণ তৎকালে ঋষিগণের সহায় ছিলেন। স্বামীর জন্য সীতা, দময়ন্তী, চিন্তার কষ্টের কথা ভাবিয়া দেখ। এমন নারী কি পৃথিবীর কোন দেশে জন্মিয়াছে? সীতার জন্য লঙ্কা দগ্ধ হইল, দময়ন্তী স্বামীহারা হইয়া বনে বনে ঘুরিলেন, চিন্তার কথা চিন্তা করিলে তাঁহাকে দেবীর আসনে বসাইতে হয়। শৈব্যা কি স্বামী হরিশ্চন্দ্রের জন্য কম দুঃখ ভোগ করিয়াছেন?

রমণীর সভ্যতার জন্য ভারত চিরদিন প্রসিদ্ধ। আজিও রমণীগণ পুরুষের ধর্ম্মকার্য্যে সহায়। সস্ত্রীক হইয়া এখনো ধর্ম্ম কার্য্য করিতে হয়। তাই স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী। পুরুষের ধর্ম্মভাব এখন আর নাই, ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন আমাদের রমণীগণ। পুরুষের অন্তঃপুরের রাণী রমণীরাই, অন্তঃপুর রাজ্য তাঁহারাই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আর্য্যরমণীগণের পূর্ব্বাদর্শ এখনো জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এ দেশ সতীর দেশ, এখনো সতী রমণীর অভাব হয় নাই। ভারতের সতীদাহ এখন না থাকিলেও, দেশ হইতে সতীর উচ্ছেদ সাধন হয় নাই। সতীর আদর্শ লইয়া ভারতের রমণী-চরিত্র গঠিত হইয়াছে। ভারতরমণীর সতী-চরিত্র জগতে দুর্ল্লভ বস্তু, এ জিনিষ ক্রয় করিবার নহে; এ জিনিষ ভোগ করিবারই। প্রাচীন আদর্শে ভারতের রমণী চরিত্র গঠিত হইয়াছে। পুরুষ পরিবারের রাজা আর রমণী সে পরিবারের রাণী। এমন রাণী জগতে দুর্ল্লভ, কোন রাজ্যে এ জিনিষ খুঁজিয়া পাইবে না। আমাদের আদর্শ চরিত্রের রমণীরা কলঙ্কিনী নহেন, তাঁহারা যে জগতপূজ্যা, দেবীস্থানীয়া। দেবী পূজিবার জন্য আমাদের গৃহের বাহিরে যাইতে হয় না। আমাদের গৃহের রমণীরা জননী হইবার জন্য তেমন ব্যস্ত নহেন, তাঁহারা দেবী হইতে চান, দেবী হইয়া তাঁহারা জগৎ পূজ্যা হইতে চান। এরূপ আদর্শ রমণী জগতে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। এ যে আমাদের স্বর্গভূমি।

বর্ত্তমান যুগে মেয়ের বিবাহেতে যেরূপ পণ ও ব্যয় বাড়িয়াছে, অনেকে তাই মেয়েদের হতাদর করেন, উচিত শিক্ষা দানে বিরত থাকেন, কিন্তু এই মেয়ে যখন গৃহিণী সাজিয়া দেবী হইবে তখন আমাদের গৃহ তাহারাই আলো করিবে। প্রাচীন আদর্শকে আমরা এখনো ঠেলিয়া ফেলি নাই। সেই আদর্শে রমণীগণকে শিক্ষিতা কর, গৃহ উজ্জ্বল হইবে। সেই মেয়েই আমাদের গৃহে জননী হইয়া গৃহ আলো করিয়া জগত পূজ্যা হইয়া উঠিবে, সতী সাবিত্রীর ন্যায় তাহারাই আমাদের

মুখোজ্জ্বল করিবে। আজ কিনা আমরা এসব ভুলিয়া গৃহজাত মেয়েদের অবহেলা করি। আমাদের এ সংকীর্ণতা কবে দূর হইবে? যেদিন নারীজাতিকে মর্যাদার চক্ষে দেখিব সেদিন আমাদের সমাজ উন্নত হইবে। আমরা মাতৃজাতির সম্মান, মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

নারীশক্তি জাগ্রত না হইলে আমাদের দুর্গতি দূরীভূত হইবে না। কবি বলিয়াছেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।" ফলেও দেখা যায় ভগবতী দশ হস্তে প্রহরণ লইয়া, জাগ্রত হইয়া অসুর বধ করিয়া পৃথিবী রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা হইল সত্যযুগের কথা, ত্রেতাতে সীতা রাবণ বধে রামের সহকারী ছিলেন, লক্ষ্মণ তাঁরই বলে বলীয়ান হইয়া সূর্পণখার অপমান করিয়াছিলেন, দ্বাপরে দ্রৌপদী অর্জ্জুনাদির সহচরী হইয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমর ঘটাইয়াছিলেন। কলির কথা ভাবিলেও মনে হয় রাণী লক্ষ্মীবাই, দুর্গাবতী প্রভৃতি যে বীরত্ব দেখাইয়া ভারতের নারীশক্তি জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এ যুগে আমাদিগকে জাগাইয়া রাখিবে।

অতএব আমাদের মাতৃজাতি নারীকুলকে তদ্রূপ শিক্ষা দান কর, যাহাতে তাঁহারা বীরত্বে শক্তিশালিনী হন। নারীর জাগরণে আমাদের শক্তি জাগ্রত হইবে। আমাদের গৃহে তদ্রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কর, যাহাতে বীরত্বে বালিকাগণ বুক ফুলাইয়া চলিতে পারে। বালিকাদিগকে গৃহে রাখিয়াই উপযুক্ত শিক্ষা দান করিতে পারা যায়। শৈশব হইতে তাহাদের হৃদয়ে সত্যের বীজ বপন কর; রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক যুগের আদর্শ রমণী-চরিত্র কাহিনী শুনাইয়া তাহাদিগকে তদ্রূপ চরিত্রে গড়িয়া তোল। মাতৃজাতিকে এইভাবে শিক্ষিতা করিলে—এইভাবে গড়িয়া তুলিলে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মাতৃশক্তির উদ্বোধনে নূতন ভারত গড়িয়া উঠিবে—ইহা আজ আমাদের ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

আলোচনা

শ্রীবিমল মিত্র

হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ কোনও কালেই ধর্ম্মসম্মত নয়। সম্প্রতি কলিকাতায় বাঙ্গালী মহিলাদের একটি অধিবেশনে কিন্তু এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল এবং ইহাকে স্ত্রীলোকের সাধারণ অধিকার তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল। যাই হউক্ অধিক ভোট না পাওয়াতে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। তথাপি বিস্ময়ের বিষয় এই যে প্রায় ৫০ জন মহিলা ইহার স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।

কিন্তু বিষয়টি তেমন তাচ্ছিল্যের নয়। কারণ ইহার স্বপক্ষে এখন অনেকে ওকালতি করিতেছেন—তাই পত্রান্তরে (Statesman) এই সম্বন্ধে যে কয়েকজন খ্যাতনামা মহিলার মতামত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠকপাঠিকা বর্গের অবগতির জন্য আমারা এখানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

নিম্নলিখিত মতাবলী পড়িয়া সহজেই বুঝা যাইবে যে সকলেই যদিও এই সম্বন্ধে কোনও খোলাখুলি মত

দিতে দ্বিধা করিয়াছেন তথাপি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দু মহিলাদের বর্ত্তমান অবস্থা এমনি দাঁড়াইয়াছে যে কোনওরূপ সংস্কারের প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সিনেট"র সভ্য মিসেস্ পি, কে, রায় এইরূপ মত দিয়াছেন :—

"আমার পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট মত দেওয়া শক্ত। প্রাচীন কালের বিধি নিষেধ ইত্যাদি হিন্দু রমণীকে স্বভাবতঃই বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। কিন্তু শতাব্দীব্যাপী প্রথা, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক গঠন ইত্যাদিই এই সমস্ত বিধিনিষেধের মূল।

কিন্তু এখন হিন্দু-সমাজ আরো বহুদূর আগাইয়া আসিয়াছে। সেকালের "গৌরী দান" প্রথা আজ সার্দ্দা আইনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। আজকালকার সমাজে এমন অনেক উদাহরণ দেখা যায়, যেখানে কন্যাদের কুড়ি এমন কি পঁচিশ বৎসরে পাত্রস্থ করা হইতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু মহিলারা সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে লেখা পড়া শিখাইলে স্ত্রীলোক বিধবা হইয়া যায়।

আজকাল অনেক সংসারে শ্বশ্রু ঠাকুরাণীরা তাঁহাদের নূতন গ্রেজুয়েট পুত্রবধূদের লইয়া গর্ব্ব করেন। সুতরাং যখন সামাজিক প্রথা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তখন বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কেও কিছু পরিবর্ত্তন দরকার একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেনা।

পুরাকালে সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে প্রতিপালিত আট দশ বৎসর বয়স্ক কন্যার পক্ষে অত্যাচারী স্বামীর দুর্ব্যবহার সহ্য করা সম্ভব হয়ত হইত কিন্তু আধুনিক কালে একটি শিক্ষিতা বালিকার কাছে নিষ্ঠুর মাতাল এমনকি ধনী স্বামীরও অত্যাচার অসহ্য।

আজকাল চারিদিকে "সমান নৈতিক অধিকারের" যে দাবীর কথা শুনা যায় তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে আধুনিক হিন্দু স্ত্রীলোকের মনের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে। উল্লিখিত দাবীর বিরুদ্ধে আমি কখনই নহি এবং ইহা স্বীকার্য্য যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন কিংবা পুনর্ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে আমাদের চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত।

ভারতীয় নারীর কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর আমি খুব আস্থা স্থাপন করি। তাহাদের আত্মত্যাগ, সহনশীলতা, মাতৃত্ব বৃত্তি ইত্যাদি অতুলনীয়। হইতে পারে ঐ গুণগুলি পূর্ব্বকালের অমানুষিক কঠোর অত্যাচারের ফলস্বরূপ, কিন্তু তথাপি ওগুলি গুণ পদবাচ্য এবং ভাবিয়া দেখিলে ওগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা মিলে। বিশেষতঃ ওই গুলি বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলে কি ফল প্রসব করিবে এবং উহার দ্বারা কতদূর সুবিধা হইবে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

যদি এমন কোনও বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের সংস্কার হয় তাহা হইলে তাহা জাতির প্রকৃতিগত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হিন্দু মহর্ষি পরাশর পাচটি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্মতি দিয়াছেন। সেই গুলি ও আবশ্যকমত আরও কতকগুলি যোগ করিয়া এই সংস্কার সাধন করিতে হইবে নতুবা আদালতের সাহায্য লইয়া সমাজের বুকে কলঙ্ক লেপন করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ না হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। প্রবৃত্তি চরিতার্থতা ও তাহাদের স্বাভাবিক কোমলতা ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট করাই যদি স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থ হয় তাহা হইলে সে স্বাধীনতা আমরা চাই না। পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই "সমান নৈতিক অধিকার ভাল— কিন্তু তাহা যেন "সমান পাশবিক অধিকারে" রূপান্তরিত না হয় তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

কবি শ্রীমতী ইন্দীরা দেবী এই মত দিয়াছেন :—

আমার পাশ্চাত্য শিক্ষা সত্ত্বেও আমি এই সম্বন্ধে মনে প্রাণে এখনও ভারতীয়ই আছি। কিন্তু এ কথাও স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না যে দুরূহ দুর্গম পথে সহযাত্রী যদি শত্রুর মত ব্যবহার করে অন্য যাত্রীটির পক্ষে সহযাত্রীর সঙ্গ, যে কোন প্রকারে এমন কি কৌশলেও ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু সেই ত্যাগ করার স্বাধীনতার সর্ত্তগুলি কিন্তু সুলভ হইলে চলিবেনা কারণ তাহা হইলে হয়ত সেগুলি বিবাহ বিধি ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে· সত্য সমাজের ভিত্তিই হইল ওই বিবাহ বিধি।

অন্য দেশে এই সমস্ত সর্ত্তগুলি যাহাই হউক না কেন ভারতবর্ষে যেখানে স্ত্রীলোক—কন্যা, স্ত্রী ও মাতা রূপে পূজা পাইয়া থাকে—পাশ্চাত্য দেশের ওই ব্যক্তিক-মতবাদ (individualistic ideas) কখনই চলিবেনা ইহা নিঃসন্দেহে

বলা যাইতে পারে। আমরা ভারতীয়রা ভাবের আদান প্রদান করিতে পারি কিন্তু আদর্শের পারি না।

আবার বলি—যেখানে বিধবা-বিবাহ প্রথা আজও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া সময় সাপেক্ষ। এখন ইহা অবিবেচনার কার্য্য। আমার মতে এখন কোনরূপ আইন সঙ্গত বিচ্ছেদ এর ব্যবস্থাই গ্রহণ যোগ্য এবং তাহাই প্রয়োজন। কার্য্যক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠায় যে পুরাতনের উচ্ছেদ কেবল ইহাই প্রতীয়মান হইবে তাহা নহে ইহাতে নূতন অনেক বিধি-বন্ধনের মাঝেও পড়িতে হইবে। যদি আমরা নূতন বিধি-বন্ধনের বিপাকে পড়িবার বদলে কতকগুলি রক্ষা-কবচ সহ পুরাতনের মধ্যেই মিটমাট্ করিয়া চলিতে পারি তাহাই আমাদের আধুনিক সামাজিক-স্তরের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু সরস্বতী এই মত দিয়াছেন :—

বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয় ১৯২৯ সালে কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় নারীর সামাজিক অধিবেশনে। কিন্তু সে সময়ে ইহা অত্যন্ত অধিক ভোটে পরাজিত হয় কিন্তু এইবার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জনও ইহার স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় বাতাস কোন দিকে প্রবহমান।

আমি এমন অনেক উদাহরণ জানি যেখানে স্ত্রী মাতাল স্বামী দ্বারা অপমানিত, প্রহৃত এমনকি নিহত হইয়াছে। আমি অনেক ক্ষেত্র জানি যেখানে স্বামী স্ত্রীকে অমানুষিক অত্যাচার করিবার পর ত্যাগ করিয়া পুনর্বিবাহ করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকা উচিত। যদি এই বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে গোঁড়ামীর সৌধ হইতে আর একটি থাম খসিয়া যাইবে, যাহা এখন অত্যাচার পীড়িতা নারীর রোষ বহ্নিতে স্বল্লায়ু হইয়া আসিয়াছে।

পুরুষ ও নারী দু'জনের জন্ত দু'রকম বিভিন্ন বিবাহ-সম্বন্ধীয় আইন যে থাকিতে পারে না ইহা এখন সকলে বুঝিতে পারিয়াছে। স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর'ও বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। ন্যায়-সঙ্গত রূপে অপমানিতা স্ত্রী ইহা দাবী করিতে পারে—এবং যে সমাজ তাহা অস্বীকার করে—সেই সমাজ নিজের বক্ষেই নিজের ধ্বংস-বীজ বহন করিয়া থাকে।

সেই শুভদিনের আগমনের কিছু বিলম্ব হইবে হয়ত—কিন্তু তাহা আসিবেই ; মহিলা-কংগ্রেসে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব উত্থাপন হইতেই বোঝা যায় যে দিনের আর দেরী নাই। প্রস্তাবটি পরাজিত হইয়াছে বটে কিন্তু দেখিতে হইবে ইহার স্বপক্ষে চল্লিশ জনেরও অধিক ভোট দাতৃ ছিলেন।

"বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কৌন্সিল অব্ উইমেন" এর সহ-সভানেত্রী মিসেস্ এ, এন্. চৌধুরী বলিয়াছেন :—

হিন্দু মহিলার কাছে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা সংস্কারে বাধে। হিন্দু-বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন—ব্যক্তিগত চুক্তির কথা ইহাতে মোটেই আসে না। কিন্তু একটি পুরুষ যখন ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া পুনর্বিবাহ করিতে পারে—ওদিকে স্ত্রীর সে স্বাধীনতা নাই—ইহাতে নারীর প্রতি অন্যায় এবং অবিচার করা হয়। যদিও স্ত্রী স্বামীর দ্বারা নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচারিত হইলে তাহার সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে এবং ক্ষেত্রমত স্বামীর অর্থের দ্বারা তাহার অবস্থা অনুযায়ী প্রতিপালিত হইতে পারে কিন্তু তথাপি স্ত্রীকে এই বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনের অধিকার দেওয়া উচিত। অবশ্য এরূপ অবস্থায় স্বামীর অর্থসাহায্য সে না-পাইতে পারে কিন্তু পুনর্বিবাহ করিলে তাহার এ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

ইহা একটি সামাজিক বিধি সুতরাং চারদিক দেখিয়া বিবেচনা করিয়া ইহা বিধি-বদ্ধ করা উচিত। এই আইনকে প্রচলিত করিতে গেলে হিন্দু-সমাজকে নূতন রকমে পুনর্গঠন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমতী সারদা দেবী বলেন :—

হিন্দু-সমাজের আইন অনুযায়ী ভারতে অত্যাচারিতা স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গেলে—হয় তাহাকে ভাল অথবা খারাপ ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়। মাঝামাঝি কোনও আইন সঙ্গত পথ তাহার খোলা নাই। সমাজ তাহাকে ঐরূপ একাকী সুনির্দ্দিষ্ট জীবন যাপন করিতে দেয় না। যত শীঘ্র ওই প্রথা পরিবর্ত্তন হয় এবং আইনের বেড়াজালে তাহা রক্ষিত হয়—ততই নারীর পক্ষে তথা সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

সরোজ নলিনী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী বলেন—

প্রথমে আমাদের এই কথাটি বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যে কারণগুলির জন্য য়ুরোপে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও মুসলমানদের "তালাক" প্রথা প্রবর্ত্তিত কবিবার দরকার হইয়াছিল সেগুলি আমাদের হিন্দু-সমাজেও উত্থিত হইয়াছে কিনা। হিন্দুস্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কত কষ্টে বসবাস করে—কারণ এমন কোনও আইন নাই যাহা তাহাকে সেই কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দেয়—তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আমরা যে বিবরণ পড়ি তাহাই ইহার প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ ওই সমস্ত আত্মহত্যা রহিত করিতে সমর্থ হইবে। এবং এই সমস্ত নারীরা যথার্থ শিক্ষা পাইলে পরে সমাজের কর্ম্মী হইয়া উঠিতে পারে এবং এখন তাহারই যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু আমার মতে এই আইনের মধ্যে এমন কতগুলি সর্ত্ত থাকা উচিত যাহাতে স্বামী স্ত্রী সামান্য কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ না ঘটায়।

কারাবন্দিনীদের মুক্তিতে অভিনন্দন

শ্রীনিস্তারিণী দেবী

(সহ সভানেত্রী—নারী সত্যাগ্রহী সমিতি।)

কে বলে দুর্ব্বল চিত্ত ভারতের নারী।
"শুধু খায়" "শুধু পরে" "থাকে শুধু রান্না ঘরে",
অজ্ঞান তিমির মাঝে, আপনা পাশরি॥
এ নয় এ নয় কভু ভারতের নারী॥
তাদেরো মহৎ প্রাণ, ক'রে শুধু আত্মদান
পরার্থে আপনা হারা, চিত্ত মনোহারী।
এমন ত্যাগের শিক্ষা, এমন ধর্ম্মের দীক্ষা,
আছে কিগো কোন দেশে, দেখহ বিচারি॥
আজি গো মায়ের ডাকে, নর নারী লাখে লাখে,
গৃহ ছাড়ি কারা বাসে আনন্দেতে ধায়।
মহাত্মার আবাহনে, স্বামী, পুত্র, পরিজনে
ফেলিয়া রমণীগণ চলিল কারায়॥

বালা, বৃদ্ধা, যুবাজনে, সকলেই প্রীত মনে
ধাইছে মায়ের ডাকে, না মানি বারণ।
সঙ্গে করি শিশুগণে, অপার আনন্দ মনে
যেন কোন মহাতীর্থে করিছে গমন॥
কিবা হিন্দু মুসলমান, শিখ, পার্শী, খিষ্টিয়ান
গুজরাটী, মারহাটী, চলে ভগিনী সমান।
কংগ্রেস পতাকা তলে, মিলিতেছে দলে দলে,
কি এক মহিমা বলে, এ দৃশ্য মহান্॥
মহাত্মার সন্ধিবলে, কারাবাসী নারী দলে,
মিলেছি সকলে আজি এ মহাসভায়।
এ মিলন ধন্য হোক্, ভারতের শান্তি হোক্
ক্ষুদ্র এ রমণী প্রাণ শুধু এই চায়॥

নানা কথা

বাঙ্গলার কংগ্রেস

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নিবেদন

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নিম্নলিখিত বর্ণনাপত্র সংবাদপত্রে প্রেরণ করিয়াছেন :—

বন্ধুগণ,

বাঙ্গলার কংগ্রেসের অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বিবেচনা করিবার পর আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি যে, বাঙ্গলা দেশের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসকে ভালবাসেন, এবং অন্তরে অন্তরে কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন করা আমার একান্ত অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এতৎসম্পর্কে আমি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিব, তাহার প্রত্যেকটি সফল পন্থা সেই সমস্ত মুষ্টিমেয় লোকের হাত হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করিবে, যাঁহারা উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা ব্যর্থ হইলে বাঙ্গলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত স্বার্থ, বঞ্চনা ও অনাচারের মধ্যে নিমজ্জিত হইবে এবং ফলে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি এই বিশ্বাস লইয়া বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিয়াছিলাম যে, বি-পি-সি-সির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যে ঘোষণা দিয়াছেন, তাহা অকৃত্রিম এবং আমার বিশ্বাস ছিল যে, কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহের জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হইবে ও নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হইবে এবং রিটার্নিং অফিসারদিগকে নিযুক্ত করণের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ বলিষ্ঠ নীতির অনুসরণ করা হইবে এবং এমন সমস্ত লোকদিগকে লইয়া একটি ইলেকশন কমিটি গঠিত হইবে, যাঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ উঠিতে পারে না। আমি ঐ বিশ্বাস ও ঐ আশ্বাস লইয়াই বি-পি-সি-সি হইতে পৃথকভাবে সদস্য সংগ্রহের ফর্ম্ম ছাপান বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, বি-পি-সি-সির প্রেসিডেন্টের প্রত্যেকটি আশ্বাসের বাক্য অতি নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে। সদস্য সংগ্রহের ফর্ম্ম একেবারে না দেওয়া এবং অনিয়মিতভাবে দেওয়া সম্পর্কে অনেক অভিযোগ বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী এবং বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত অভিযোগের সত্যতা ও প্রমাণ সম্পর্কে কোন বিতর্ক উঠিতে পারে না। যাঁহারা এখনও দুরাশা পোষণ করিতেছিলেন যে, বি-পি-সি-সির কার্য্যকরী সমিতির পরিচালকবর্গের মধ্যে সুবুদ্ধির উদয় হইবে, তাঁহাদের শেষ আশা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে রিটার্নিং অফিসারদের প্রকাশিত নামের তালিকা পাঠ করিয়া। বিশিষ্ট কংগ্রেস নায়কগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টগণই রিটার্নিং অফিসারের কার্য্য করিবেন, কিন্তু এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। যে সমস্ত নামের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অল্প কয়েকজনের নাম গ্রহণযোগ্য, কিন্তু এতৎ সম্পর্কে কাহারও তিলমাত্র সন্দেহ নাই যে এবং বাঙ্গলার জনসাধারণ জানেন যে, যাঁহাদিগকে রিটার্নিং অফিসার করা হইয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশই অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট। ইলেকশন কমিটির সদস্যদের অবস্থাও এই রকম এবং ইঁহাদের নামের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, একমাত্র একজন সদস্য ব্যতীত উঁহাদের মধ্যে আর কেহই কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন কার্য্যে যোগদান করেন নাই। (এবং এই সদস্যও এক্ষণে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসকে আক্রমণে ব্যস্ত আছেন)। বাঙ্গলার কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব এখন জনকয়েক লোকের হাতে পড়িয়াছে এবং যে বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অতীতের কীর্ত্তি অনুসারেই কার্য্য করিতেছেন। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, এক দিকে অন্যায় পন্থার দ্বারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে রাখা (কারণ স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ব্বাচন হইলে, ইহাদের সমর্থকগণ কংগ্রেসের নিকট ঘেঁষিতে পারিবেন না) এবং অন্য দিকে খাঁটি কংগ্রেস সেবকদিগকে কংগ্রেসের বাহিরে রাখা। অনাচারমূলক পন্থা অবলম্বিত না হইলে ইঁহারাই কংগ্রেস পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইতেন। আমি উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে খাঁটি কংগ্রেসী লোক বলি না, কারণ জনসাধারণ ইহা ভালই জানেন যে, যে-কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির হাতে এক্ষণে ক্ষমতা রহিয়াছে, তাঁহারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিয়মিতভাবে প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন।

বি, পি, সি, সির বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়াছেন। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টকে পর্য্যন্ত ইঁহাদের হাত এড়াইয়া কংগ্রেসের কার্য্য চালাইবার জন্য "কর্ম্ম-পরিষদ" গঠন করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গলার গবর্ণমেন্ট যখন বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করেন, তখন তাঁহারাও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার জনসাধারণের সমক্ষে এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে :— তাঁহারা কি বর্ত্তমান বি-পি-সি-সিকে এবং কংগ্রেসের নামে যাঁহারা উহাকে চালাইতেছেন তাঁহাদিগকে চাহেন? কিম্বা তাঁহারা সেই সমস্ত খাঁটি কংগ্রেস লোকদিগকে লইয়া কংগ্রেস কমিটি গঠন করিতে চাহেন, যাঁহারা সত্যকারের কংগ্রেস সেবক, যাঁহারা সততা ও সাহসসম্পন্ন

এবং যাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতিকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে এবং উহার প্রত্যেকটি বিষয় পালন করিতে প্রস্তুত? এই বিষয়ে পছন্দ করিবার ভার জনসাধারণের উপর। কিন্তু আত্মস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যে সমস্ত মিথ্যা চীৎকার ও দলগত মিষ্টকথা উচ্চারণ করিবেন, তৎবিষয়ে আমি জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। আমি তাঁহাদিগকে জালজুয়াচুরি, অনাচার ও জোট-পাকান লোকের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য আহ্বান করিতেছি এবং কংগ্রেসের কল্যাণ অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছি। ইহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নহে। বি, পি, সি, সির জোট-পাকান দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য আমি স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি। ইহা লইয়া যেন কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয়। যাহারা কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করেন না এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাদের সহিত আপোষ করার অর্থ হইতেছে—সম্মান ও নীতির সহিত রফা করা। যাহারা কংগ্রেসের লোক, তাঁহারা এবং যাহারা কংগ্রেসের সহিত একমত নহেন—এই দুই দলের মধ্যে কখনও আপোষ হইতে পারে না।

বি, পি, সি, সির বর্ত্তমান কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে অস্বীকার করিয়া, বাঙ্গলার কংগ্রেস সেবক ও কর্ম্মীদিগকে লইয়া সত্যকারের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠন করার ভার কংগ্রেসের লোক ও বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান-সমূহের উপর নির্ভর করিতেছে। এই উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা বর্ত্তমান বি, পি সি, সি কর্ত্তৃক নিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার-দিগকে অস্বীকার করিতে পারেন। এইজন্য, তাঁহারা কংগ্রেস নির্ব্বাচন চালাইবার জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটি সমূহের প্রেসিডেন্ট দিগকে কিম্বা সেক্রেটারীদিগকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাসমূহের অধিবেশনে রিটার্নিং অফিসাররূপে নির্ব্বাচন করিতে পারেন, কিম্বা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় সদস্যদিগকে রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করিতে পারেন। যে সমস্ত জোটপাকান লোকের হাতে বর্ত্তমানে ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া একটি নির্ব্বাচন কমিটি গঠন করিতে হইবে। কারণ ঐ সমস্ত লোকের জনসাধারণের নিকট হইতে সমর্থন ও সহানুভূতি পাইবার কোন অধিকার নাই। আমার বিশ্বাস, যদি বাঙ্গালার জনসাধারণ ও কংগ্রেসের লোক আমার আবেদনে সাড়া দেন, তবে ঘুষ ও প্রবঞ্চনার এই যন্ত্র শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। আমি অনিশ্চয়তা শেষ করিতে চাই এবং যে দলগত বিবাদ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কেবলই বিলম্বিত হইতেছে, উহাও অবিলম্বে দূর করিতে চাই। জনসাধারণ যদি তাঁহাদের মত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ ও প্রয়োগ করেন, এবং কৃত্রিম আপোষের জন্য দুর্ব্বলের মত চেষ্টা না করেন ও অন্যায় এবং অসঙ্গতভাবে যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে যোগদান না করেন, তবেই ঐ সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যায়। যে দেশের যোগ্যতা যেরূপ, সেই দেশের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সেইরূপই হইবে। বাঙ্গলা ও তাহার জনমণ্ডলীর উপর পরীক্ষা চলিতেছে। বাঙ্গলার কংগ্রেস বাঙ্গালীর নিজেদের, সুতরাং উহার চরিত্র ও সুনামের জন্য তাঁহারা দায়ী।

আমি কংগ্রেসের লোকদের নিকট আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের মন স্থির করুন এবং অবিলম্বে এই পথ বা অন্য পথ বাছিয়া লউন। আলাপ-আলোচনায় ও মৌখিক যুদ্ধে সময় নষ্ট করিবার কাল এখন আর নাই। এক্ষণে কাজের সময় আসিয়াছে। আমি যেমন করিয়া অনুভব করিতেছি, জনসাধারণও যদি তেমনই অনুভব করেন যে, বাঙ্গলা দেশের কংগ্রেসকে বাঁচাইতে হইবে, তবে তাঁহাদিগকে অবশ্যই কার্য্য করিতে হইবে এবং অবিলম্বে আমি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই পথ ধরিয়া দ্রুতগতিতে চলিতে হইবে।

আমি স্বীকার করি যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহকে বি-পি-সি-সির প্রেসিডেন্টের প্রতিশ্রুতি বাক্যের উপর নির্ভর করিতে বলিয়া এবং সদস্য সংগ্রহের জন্য নিজেদের রসিদ বই ছাপান বন্ধ করিতে বলিয়া আমি ভুল করিয়াছিলাম। আমি যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছি, যদি তাহা অনুসৃত হয় তবে, এই ভুল দূর করা যাইতে পারে। যদি কংগ্রেসের লোক এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ অচিরে এবং যথাযোগ্যভাবে আমার আহ্বানে সাড়া দেন এবং আমার বিশ্বাস তাঁহারা দিবেন—তবে, কংগ্রেস নায়ক এবং কর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া আমি এই বিষয়ে আরও উপদেশ প্রদান করিব।

আমি কংগ্রেসের লোক হিসাবে দেশবাসীর নিকট এই আবেদন করিতেছি। কারণ, আমি কেবল অনাচারপূর্ণ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যই কংগ্রেসে রহি নাই, আমি আমার দেশের সেই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যও কংগ্রেসে আছি, যাহার নিজেরা অনাচার দুষ্ট হইয়া সমগ্র দেশে অনাচার ছড়াইয়া দিতেছেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বহু সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার-কার্য্যে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কর্ম্মতৎপরতা আমাদিগকে অত্যন্ত বেদনা দান করিয়াছে। তাঁহার পক্ষে যদিও ইহা নূতন নহে, ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য কেমন করিয়া যে বারংবার এই অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, বিশেষতঃ বর্ত্তমানের এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে নিয়মানুবর্ত্তিতাভঙ্গের প্ররোচনা দান করিতে পারেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি দখল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবার পর তাঁহার আকস্মিক এই চাল, রাজনৈতিক চাতুর্য্যের সহিত যাহারা পরিচিত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে কতকটা বিস্ময়কর ব্যাপার। শ্রীযুত সেনগুপ্ত নিজেকে, নিজের পদমর্য্যাদা এবং তাঁহার কর্ত্তব্য একটা বিস্মৃত হইয়াছেন দেখিয়া আমি দুঃখিত। তিনি যে অনিষ্টকর পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্বারা অপরের চেয়ে নিজেরই ক্ষতি করিলেন বেশী। সে যাহা হউক, আমার মনে সত্যই এই আতঙ্ক হইতেছে যে, অকারণ তাঁহার এই আক্রমণের ফলে সম তীব্রতা সহকারে পাল্টা আক্রমণের প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া না উঠে। সেজন্য

আমি ত্বরিতভাবে আমার বন্ধু ও সমর্থকদের সকলকে এবং যে সব সংবাদপত্র আমাকে সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন, প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তিপরবশ না হন। শ্রীযুত সেনগুপ্ত তাঁহার দল অথবা তাঁহার পক্ষের সংবাদ-পত্র যাহাই বলুন, যাহাই করুন না কেন, তাঁহারা যেন তাহা লক্ষ্যের মধ্যে না আনেন। আমরা যেন শান্ত চিত্তে এবং সহিষ্ণুতা সহকারে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাই এবং ফলাফল ভগবানের হাতে সমর্পণ করি। ন্যায় আমাদের পক্ষে এবং আমরা সঙ্গত কার্য্য করিতেছি বলিয়াই আমরা বিশ্বাস রাখি। এক্ষেত্রে যদি কেহ আমাদিগকে আক্রমণ করে বা আমাদের নিন্দাবাদ করে, আমরা যেন তাহাদিগকে বাধা না দেই। অপ্রতিরোধের দ্বারা আমরা আমাদের বিরোধীদিগকে নিরস্ত্র করিতে সক্ষম হইব।

সম্প্রতি আমি সমগ্র বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি, এবং তাহাতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে দেশ আমার এবং আমার দলেরই পক্ষে। যাঁহারা আমাকে এবং আমার দলকে নিন্দাবাদ করিতেছেন, তাঁহারা আমার ক্ষতি করার অপেক্ষা নিজেদেরই ক্ষতি বেশী করিবে। কিন্তু মাঝে মাঝে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আমাদের বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, এজন্য আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে বিদ্বেষের বিষোদ্গারে অচঞ্চল থাকিয়া তাঁহাদের নিজেদের কাজ চালাইয়া যাইতে বলিতেছি।

আমরা মাসখানেকের মধ্যে সদস্য সংগ্রহের জন্য তিন লক্ষ ৮০ হাজার মেম্বরসীপের ফরম বিলি করিয়াছি; ১৯২১ সালে ৯৫ হাজারের অধিক কংগ্রেস সদস্য সংগৃহীত হয় নাই।

রিটার্ণিং অফিসার এবং নির্ব্বাচন বোর্ডের লোকেরা কাজ আরম্ভ না করিতেই তাঁহাদের নিন্দা করা শ্রীযুত সেনগুপ্তের উচিত হয় নাই।

ঐরূপ বিদ্রোহের সম্বন্ধে অতীত অভিজ্ঞতা বাঙ্গলা দেশের আছে। আমার অনুগামীদিগকে শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং প্রেমপূর্ণ আচরণ করিতে বলি।

মৌলবী মুজিবর রহমানের অভিভাষণ

২৮শে মে বরিশাল জেলা মুসলিম সম্মিলনের অধিবেশনে মৌলবী মুজিবর রহমান তাঁহার অভিভাষণে বলেন :—

সমবেত ভাইগণ,

দেশে এত উপযুক্ত ব্যক্তি থাকতেও যে আপনারা আমাকেই নির্ব্বাচিত করেছেন তার কারণ, বোধ হয় আপনারা আপনাদের একজন পুরাণো খাদেমের মতামত সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান। গত পঁচিশ বছর ধরে আমি কংগ্রেস, মোসলেম লীগ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে কিছু সম্বন্ধ রেখে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং তার ফলে আমার যে ধারণা জন্মেছে, আজ তারি কিছু আপনাদের শোনাব।

এই সম্মিলনীতে বিশেষভাবে সেই সকল বিষয়েরই উত্থাপন করা হবে, যার সঙ্গে আপনাদের জেলার লোকের স্বার্থ প্রধানতঃ জড়িত আছে। কিন্তু যতই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ হোক, একটা জেলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা ও তার উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে সমস্ত প্রদেশের, এমন কি সমগ্র দেশের অবস্থার কথাও আপনা থেকেই উঠে পড়ে। সুতরাং বরিশালের মোসলেম সমাজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-রক্ষা করতে হলে, সাধারণভাবে বিশাল ভারতবর্ষের মোসলেম সমাজের স্বার্থের বিষয়ও চিন্তা করে দেখা দরকার। কারণ তা না করলে কনফারেন্সের উদ্দেশ্য সফল হবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতিরই জন্মগত অধিকার। কথাটা পুরাণো কিন্তু একান্ত সত্য। যথেষ্ট স্বাধীনতা না পেলে মানুষ কখনো বড় হতে পারে না। যেমন হাত-পা ও সমস্ত দেহের দরকার মত চালনা না হলে শরীর সবল ও পুষ্ট হয় না, তেমনি মনের জন্যও এ কথা সমানভাবে সত্য। যে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে মানসিক বিকাশের সুযোগ না পায় তার আত্মা প্রতি মুহূর্ত্তে নিষ্পেষিত হতে থাকে। চিন্তা দ্বারা সে কখনো নিজের বা জগতের উন্নতি করতে পারে না। পরাধীনতার বিষ যার অন্তরে এতটুকু স্থান পেয়েছে, তার দেহ ও আত্মা সেই বিষে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে। তার কর্ম্মে ও চিন্তায় সহজ ও স্বচ্ছন্দভাব কখনো দেখা যায় না।

দীর্ঘকাল পরাধীনতার আওতায় বাস করে আমরা ভারতীয়েরা আজ এমন দুরবস্থায় পড়ে গিয়েছি যে আমাদের উত্থানের জন্য সহজ, সরল ও উৎকৃষ্ট পথ চিনে নিয়ে চলা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখন আমরা অনেকটা বুঝতে আরম্ভ করেছি, কোন্ দিকে গেলে বা কি করলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারি। আজ দুনিয়ার বুকে যে বিরাট সংগ্রাম চলছে, এক দেশ যে অন্য দেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রে জগতের শান্তি নষ্ট করছে, তার সব চেয়ে বড় কারণ ধন-সমস্যা। আমার দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি পেট ভরে খেতে পেয়ে সুখে থাকবে—প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, বিশেষ করে এই চিন্তাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে তুলেছে; এই সমস্যা কেবল প্রাচ্য বা কেবল প্রতীচ্যকেই বিব্রত করে তোলেনি, শুধু রুশিয়া বা চীনকেই এই সমস্যার সমাধানের চিন্তায় বিব্রত দেখা যায় না, পৃথিবীর সকল দেশের সামনেই কোন না কোন মূর্ত্তি ধরে এই অর্থসমস্যা প্রকট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ভারতের দৈন্য ও দারিদ্র্য এত উৎকট যে দুনিয়ার মধ্যে অতি অল্প দেশই তার মত হীন অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে।

এই সমস্যার সমাধানের উপায় দেশের ধনবৃদ্ধি করা।

সেজন্য দেশের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া দরকার। কিন্তু ব্যবসা বলতে আজকাল মুদীর বা তরিতরকারীর দোকানই বোঝায় না। এ যুগের ব্যবসার অবলম্বন দেশবিদেশের মধ্যে আমদানী রপ্তানীর সম্বন্ধ বিস্তার ও উহাকে সহজসাধ্য করা। সেজন্য মুদ্রাবিনিময়ের হার নির্দ্দেশ করা ও আদান-প্রদান সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত হওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু এসকল বিষয়ের কোনটাতেই আমাদের হাত নাই, আমরা নিজেদের প্রয়োজন-

মত দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি না—আর্থিক আদানপ্রদানের জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করাও আমাদের ক্ষমতার অতীত। আমাদের দেশের বিদেশী সরকার বিদেশীদের সুখ-আরামের জন্য যত বেশী চিন্তিত, আমাদের দেশের অনশনক্লিষ্ট লোকের দুঃখ দূর করবার জন্য তারা তত চিন্তিত নয়। বিদেশী ধনিক ও ব্যবসাদার ভারতবাসীর বুকের রক্ত শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, দেশ-শাসনে আমাদের বিশেষ কোন হাত না থাকায় আমরা উহার কোন প্রতিকার করতে পার্‌ছি না।

কৃষি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলা দেশের আর্থিক উন্নতির একটা প্রধান অবলম্বন কৃষি। এই বরিশাল জেলাকে বাংলার শস্যভাণ্ডার বলা হয়। বাংলার যে পাট জন্মে তা সমগ্র জগতের পাটের অভাব মিটিয়ে থাকে। কিন্তু যে দেশের কৃষিজাত দ্রব্য এত প্রচুর ও এত মূল্যবান, সেই দেশের লোক আজ অনাহারক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষরাক্ষসী আজ তাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। তারা শুধু পরিশ্রম করবে, কিন্তু পরিশ্রমের যথাযোগ্য মজুরী তারা পাবে না লাভ ত দূরে থাকুক দুটো ভাতের কাঙ্গালী হয়ে হয় তারা আত্মহত্যা করবে, না হয় তিলে তিলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে থাকিবে। এখন সরকারের যে কৃষি-বিভাগ আছে তার দ্বারা দেশের কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য হয় না।

কিন্তু এ দুরবস্থা হয় কেন? এবং হয়েছে বলেই কি তাকে চিরদিন থাকতে দিতে হবে?

দেশবাসীর দুর্দ্দশা দেশবাসী যেমন ভাবে বুঝতে পারে বিদেশী কখনো তেমনভাবে পারে না। ভারতীয়ের হাতে যদি ভারতের শাসনভার এসে পড়ে তাহলে ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্য সকল প্রকার সম্ভবপর উপায় অবলম্বন করা হবে বলে আশা করা যায়। কারণ তখন বিদেশী বণিকের মুখ তাকিয়ে সরকার কোন কাজ করতে বাধ্য থাকবে না। তখন বিভিন্নদেশের সঙ্গে ব্যবসার পথ যথেষ্ট সুগম হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াবার জন্য চেষ্টা চলবে।

দেড় শত বছরের বেশী হবে, আমরা বৃটীশ শাসনের অধীনে শান্তশিষ্ট-ভাবে বাস করে আসছি। কিন্তু এই দেড়শত বছর আমাদের শাসকরা শিক্ষার দিক থেকে আমাদিগকে কিরূপ দাবিয়ে রেখেছেন তা আজ কারুর জানতে বাকী নাই। এদের কল্যাণে আজ আমাদের শতকরা প্রায় ৯০ জন নিরক্ষর। কিন্তু যদি দেশের রাষ্ট্রীর অধিকার আমাদের হাতে থাকত, তা হলে শিক্ষার দিক থেকে আমাদের দেশ কি এত পিছিয়ে পড়ত? নিশ্চয়ই না। আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রভুদের ন্যায় সৈন্য বিভাগের বা অন্যান্য বিভাগে কোনরূপ অনর্থক বা অনাবশ্যক অর্থব্যয় না করে দেশের রাজস্বের যথেষ্ট অংশ শিক্ষা বিভাগে ব্যয় করতাম। অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাঙ্গলার গরীব চাষীদের ঘাড়ে যেরূপ করভার চাপান হয়েছে, তখন সেরূপ হত না। প্রাথমিক শিক্ষার সব ভার রাষ্ট্রই বহন করত।

কিন্তু সকল কথার অর্থ এই যে, দেশকে প্রথমেই স্বাধীন করা আমাদের কর্ত্তব্য। যতদিন দেশ স্বাধীন না হয় ততদিন আমাদে বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর হবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। কি দেশকে স্বাধীন করতে হলে সভাসমিতিতে কয়েকটা প্রস্তাব পা করিয়ে নিলেই কর্ত্তব্য শেষ হবে না। সেজন্য দেশের লোককে দুঃখক ভোগ ও ত্যাগস্বীকার করতে হবে। তা না করলে শুধু মুখের ক শুনে বা চোখের পানি দেখে দেশ আপনি স্বাধীন হবে না।

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের সামনে প্রধানতম রাষ্ট্রীয় সমস্যা হচ্ছে নির্ব্বাচন সমস্যা।

যতক্ষণ না বিভিন্ন সমাজের রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান এবং রাষ্ট্রীয় স্বা একজাতীয় হয়, ততক্ষণ তারা পরস্পরকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখতে পা না। কিন্তু অবিশ্বাস থাকলেই বিরোধ বাড়বে আর মিলনের প সংকীর্ণ হতে থাকবে। এক সমাজ অন্য সমাজের সুখ দেখে সু হবে না, তার দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে আসবে না। এ হচ্ছে স্বভাবের নিয়ম। আর এই সন্দেহ, অবিশ্বাস বা বিদ্বেষের জন্য পৃথ নির্ব্বাচন দায়ী; কারণ এই প্রথাই বিভিন্ন সমাজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক জাতীয় বা একমুখী হতে বাধা দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ক্রমে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

এই সম্পর্কে কানাডার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা বোধ হ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কানাডায় বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠি হবার পূর্ব্বে সে দেশের ফরাসী ও ইংরেজ অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগ বৈষম্য ছিল এবং এই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ বাধত। শু বয়স্ক লোকই নয়, ছেলেরাও যখন আপোষের মধ্যে কলহ-বিবাদ কর তখন তারা ইংরেজ ও ফরাসী হিসাবে নিজেদের দল বাঁধত। সময় সে দেশে পৃথক নির্ব্বাচন চলিত ছিল। দীর্ঘকাল ধরে এ ব্যবস্থা সেখানে চলেছিল। কিন্তু পরে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করব সময় মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা জারী করা হয় এবং আশ্চর্য্য এই যে, এ প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জাতিবিদ্বেষ একেবারে মি যায়। এখন ইংরেজ ফরাসী নির্ব্বিশেষে তারা সকলেই কানাড অধিবাসী হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে সুখে বাস করছে।

পৃথক নির্ব্বাচন মুসলমান সমাজকে শক্তিমান করে না তুলে তাদের শক্তির অপচয়ই ঘটিয়েছে। শক্তি অর্জ্জন করার উপায় হ সংগ্রাম করা। কিন্তু সহজে আরাম পাওয়া গেলে কেউ সংগ্রা কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। এই সত্য কথাটা আমরা আমা সামাজিক জীবনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে দেখিছি; অ যে বাংলার ও ভারতের মুসলমান সমাজ সহায়হীন, শক্তিহীন, সম্পদহ বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে, তার কারণ কি? আ বোধ হয়, তার কারণ এই যে, আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়া প্রবৃত্তি হারিয়ে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে, পরের দ্বারে উপযাচক নিজেদের জীবন যাপন করতে চাই!

মূল প্রস্তাবের যে অংশে এই কথাগুলি ছিল, তাহা এই :—

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে দেশের সকল অধিবাসীর জন্য সভ্য

না, বা মালা, শিক্ষা ও ধর্ম্মের আচরণ সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করা হবে।

যাঁরা মিশ্র-নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী, তাঁদের মধ্যে অনেকের মত এই কাউন্সিলের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যপদ মোসলমানদের জন্য 'রিজার্ভ' রাখা হোক। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি অন্ততঃ বাংলা দেশের জন্য এভাবে সিট রিজার্ভ রাখার পক্ষপাতী নই।

এই উপলক্ষে আমি কিন্তু আর একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। কংগ্রেস হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত বলে বহু মুসলমান কংগ্রেসের নিন্দা করেন। কিন্তু এ ভাবে কংগ্রেসের নিন্দা করার চেয়ে যদি আমরা খুব বেশী সংখ্যায় এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি, তা'হলে বোধ হয় এর নিন্দা করবার কারণ থাকে না। একথা সত্য যে, গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মোসলেম সমাজ কংগ্রেসে যোগদান করেছিল, সেজন্য প্রায় বারো হাজার মুসলমানকে সরকারী কোপে পড়তেও হয়েছিল। এই সকল কংগ্রেস কর্ম্মীর মধ্যে বাংলার মোসলমানও অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে বোঝা যায়, বাংলার অতি অল্প মুসলমানই কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছিল। কংগ্রেসই এখন সমগ্র ভারতের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান।

আমরা যদি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সকল সমাজের সঙ্গে সমানভাবে সংগ্রাম করবার জন্য কংগ্রেসে যোগদান করি, তা'হলে আমাদের ন্যায্য দাবী কেউ অগ্রাহ্য করবে না, কংগ্রেসের নিন্দা করবারও আর আমাদের কারণ থাকবে না।

মাধবী রাতি

মাহ্‌মুদা খাতুন (ছিদ্দিকা)

মাধবী রাতি
গগনে গগনে জ্বলিছে তারার
হাজারো বাতি
দিবা ভ্রমে ডাকে শাখে শাখে পাখি
কেমনে মুদিব এ আতুর আঁখি
চাঁদিমা জাগে
জোছনা পুলকে জাগিছে ধরণী নবানুরাগে
কুসুম কলি
অলস সমীর পরশ লাগি
পড়িছে ঢলি
কল কল তান তটিনী তুলায়ে
ছুটিছে মানব-মরম ভুলায়ে
নীরবে শশী
ভুবন গগন আকুল করিয়া হাসিছে হাসি
এমন নিশা
ধরণী হারাল গগনের পায়ে
আপন দিশা
আমিই রহিনু শুধু পথ চাহি
তোমারি গীতিকা আঁখি-জলে গাহি'
জুড়াতে ব্যথা
চরণে তোমার মোর কোনো ঠাঁই হলনা কোথা।

কুসুম বাসে
বিরহী এ হিয়া দ্বিগুণ করিয়া
কাঁদে হুতাশে।
রহিবে জাগিয়া সুখের স্বপন
এ মরমে রবে ব্যাকুল বেদন
নয়ন ঝরে
আসিবে কি আর এমন রজনী জীবন পরে ?
উথলে প্রীতি
গগনে-পবনে ঝরিছে হরষে
অমরা গীতি
তোলে হিয়া ভরি অযুত বাসনা
আসিবে বলিয়া কেন আসিলে না ?
কত বা কাঁদি
ব্যাকুল এ মোর বাহুডোর দিয়া
কাহারে বাঁধি
চাঁদিমা ঢলে
থাকিবে না আর এ মধু যামিনী
প্রভাত হলে
আসিলে না তুমি বাসিলে না ভালো
ঢালিলে না চোখে প্রণয়ের আলো
আসিবে বলে
গেঁথেছিনু মালা আসিলে না তুমি নিলেনা গলে।

নূতন বাসায় প্রথম দিন

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ গল্প

(১)

স্বামী-স্ত্রীতে অনেক বাদানুবাদের পর শেষে দেওঘর যাওয়াই স্থির হইল।

সারাবৎসর নাকে দড়ি দিয়া অফিসে খাটিয়া, শরৎ পূজার এই একটি মাস উপভোগ করিবার জন্য দিন গণিয়া আসিতেছিল। পনের দিন আগে হইতে জিনিষ-পত্র কেনা চলিতেছিল, মোট-ঘাট বাঁধা হইতেছিল, আর দিনের মধ্যে পঁচিশবার 'টাইম টেব্‌ল্' খোলা তাহার যেন একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় নেওয়াও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। এখন বাকি কেবল টিকিট কেনা!

ইত্যবসরে যেদিন সাহেব ডাকিয়া 'বাজার মন্দা' অজুহাতে পূরা মাসের স্থলে অর্দ্ধমাসের বেতন 'বোনাস' স্বরূপ হাতে তুলিয়া দিল, সেদিন শরতের চক্ষের সম্মুখে আশ্বিনের মাঝা-মাঝিতে বিস্তৃত পুষ্পিত সর্ষপক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই দ্রষ্টব্য রহিল না। হায়, এই জন্যই কি সে রবিবার পর্য্যন্ত অফিসে বাহির হইয়া 'লেজার' 'আপ-টুডেট' করিয়া 'ব্যালেন্স সিট' প্রস্তুত করিয়াছিল! বলিবার কিছু নাই,—অফিসের অবস্থা ত কিছুই তাহার অজ্ঞাত নাই! কত লোকের যে পূজার পূর্ব্বে 'রিডাক্‌সান' হইয়া গেল!

শরত বরাবরই একটু সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাই এবার সিমলা শৈলে যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন! মাহিনার অনেকগুলি টাকাই আগে হইতে সে খরচ করিয়া বসিয়াছিল—তারপর সাহেবের এই নির্ম্মম বদান্যতা! তাহার যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল! একবার ভাবিল 'যাত্রা নাস্তি' করিয়া দেয়, তারপর ভাবিল স্ত্রী ত শুনিবেই না, তার উপর বাহিরে মুখ দেখানও শক্ত দাঁড়াইবে। তাই সে লাটাই গুড়াইতে লাগিল! সিমলা থেকে মুশৌরী, দিল্লী, আগরা, এলাহাবাদ, বেনারস, ডিহিরি-অন-শোন্, দার্জ্জিলিং, সে যত উপর হইতে বেগে সানুদেশে অবতরণ করিতে লাগিল, পত্নী ইরার মেজাজ তদনুরূপ বেগে উর্দ্ধগামী হইতে লাগিল।

ইরা বলিল—"বছরে একবার; তাও যদি একটু বাইরে গিয়ে ঠাকুর দেবতার মুখ না দেখ্‌লুম, দুদিনের জন্য একটু হাঁফ্ না ছাড়লুম ত তেমন জীবনের দরকার কি?"

শরত বলিল—"আমার কি তাতে অসাধ? ঠাকুর দেবতার মুখ পরে অনেক দেখা যাবে কিন্তু এই সময় পাহাড়ের যা শোভা"—

সগর্জ্জনে ইরা বলিয়া উঠিল—"তোমার শোভার নিকুচি করেছে! শোভা নিয়ে ধুয়ে খাবেন! মনিষ্যি হয়ে জন্মেছি, যদি পুণ্যি ধর্ম্ম একটু না করলুম, পরকালে জবাব দেব কি? পুরুষ বটে ও পাড়ার পালেদের বট্‌ঠাকুর! বাড়ীশুদ্ধ সব নিয়ে বেরিয়েছে, এখন দু'মাস আর ফিরবে না কোন তিথ্যি বাদও দেবে না।"

রাগিয়া শরত বলিল "তবে গেলে না কেন বট্‌ঠাকুরের সঙ্গে তীর্থ করতে—বাঁচতুম!"

গর্জ্জন ও বর্ষণ একত্রীভূত হইল।

ইরা বলিল "তা বাঁচবে বই কি! আমি ম'লে তোমার হাড় জুড়োয় তাকি আমি জানি না। খুব হয়েছে—আর যদি কোথাও যাবার কথা বলি ত—। বাব্বাঃ, মা বলেছিল 'কক্ষণো বাইরে বেরুইনি মা, যদি তোরা বাস আমায় সঙ্গে নিস,' ভাগ্যি আসবার কথা বলিনি!"

ধূমায়িত অগ্নির আশঙ্কায় শরত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সুর খাদে নামাইল। বলিল "সে কথাত হচ্ছে না। আসল কথা হচ্ছে টাকার; অবস্থাত এবার সব বুঝ্‌ছ! আজও যদি ছেলে মানুষী কর আমি নাচার। বলছিলুম কি, দেওঘরেই যাওয়া যাক। তোমার ঠাকুর দেখাও হবে আমার পাহাড় দেখার সাধও মিটবে। আসছে বছর যদি ভাগ্যে থাকে ত—"

আসছে-বছরের পুজাবকাশের প্রোগ্রামটা বোধ হয় শরত বিস্তারিত ভাবেই বিবৃত করিয়া যাইত যদি না ইরা বিনা বাক্যব্যয়ে কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইত!

পাঁচজনের কাছে চক্ষুলজ্জা এড়াইবার জন্য শরতের পকেটের উপরই নির্ভর করিয়া শেষে ইরাকে 'বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে' 'মণ্টী' কোলে শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া দেওঘর উদ্দেশ্যেই রওনা হইতে হইল। সঙ্গে চলিল চতুর্দ্দশবর্ষীয় উৎকল নন্দন ভৃত্য 'কিরপা' ও পাড়ার হাবুলের মা; এখানে হাবুলের মার যাওয়ার ইতিহাসটা একটু বলিয়া রাখি।

অল্প বয়সে বিধবা হইয়া হাবুলের মা দুঃখ-মেহনত করিয়া একমাত্র সন্তান হাবুলকে 'মানুষ' করিয়াছিল। ভাল দেখিয়া তাহার বিবাহও দিয়াছিল। হাবুলের উপার্জ্জনে সংসারের দুঃখ ঘুচিয়া তাহার মাকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়াছিল। কিন্তু কপাল মন্দ বলিয়া হাবুলের মা'র অদৃষ্টে সুখ সহ্য হইল না। একমাসের আড়া-আড়িতে কলেরায় বৌ-বেটা দু'জনে তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইল। যাইবার সময় রাখিয়া গেল কিছু নগদ টাকা আর এগার বছরের ছেলে খোকাকে। চোরের ভয় দেখাইয়া পাড়ার হিতৈষীরা হাবুলের মার কাছ হইতে টাকাগুলি ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিল। খোকাকে মানুষ করিবার জন্য আবার হাবুলের মাকে গতর খাটাইতে হইল।

খোকা মানুষ হইল বটে কিন্তু ঘরবাসী হইল না। যে বছর সে তিনটে পাস দেয় সেই বছর উত্তর পাড়ার উমাচরণ অনেক বলিয়া কহিয়া মায় হাবুলের মার পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়া খোকাকে জামাই করিয়াছিল। উমাচরণের পয়সায় খোকা এখন উকিল হইয়াছে এবং শ্বশুর বাড়ীতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। বাজারে 'কেষ্টবাবু' বলিয়া তাহার নাম ডাক খুব। কিন্তু তাহাতে হাবুলের মার কি? সে সেই ভাঙ্গা ঘরে বুড়হাড়ে পরের বাড়ী গতর খাটাইয়া দু'বেলা দুই মুঠা ভাত খায় আর নাতি-নাতবৌ দেখিবার ইচ্ছা হইলে ময়লা তালি দেওয়া কাপড় খানায় অঙ্গ ঢাকিয়া উমাচরণের বাড়ী হাজির হইয়া 'কেষ্টবাবু'র ইজ্জত নষ্ট করিয়া খোকার নিকট হইতে গাল খায়!

সেদিন বিকালে শরতের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া যখন ইরার মুখে শুনিল তাহারা 'বদ্যিনাথে' হাওয়া খাইতে যাইতেছে, কিরপা উড়েটা সঙ্গে যাইতেছে বটে কিন্তু রান্না-বান্নার জন্য তেমন একটি লোক পাওয়া যাইতেছে না, বাড়ীতে বারমাস হেঁসেল ঠেলিতেছে বলিয়া দু'দিনের তরে বাহিরে বেড়াইতে গিয়াও সে ঠেলিতে হইবে ইরার আদৌ ইহা ইচ্ছা নাই। হাবুলের মা আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দু চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া ইরাকে বলিল "নিবি মা আমায় সঙ্গে? তোর রান্না-বাড়া থেকে ঘরকন্নার সব আমি দেখব—তোর মণ্টিকে নিয়ে থাকব—তোকে কিছু করতে হবে না—আমায় নিয়ে চ' মা! জগতে খাটতে এসেছিনু—জীবন ভোর খেটে যাই—কবে ম'রে যাব ঠাকুর দেবতার মুখ আর দেখা হবে না। শরতকে বল মা, তোর মণ্টীকে আমার চুলের প্রেমাই দিয়ে আশীর্ব্বাদ করব।" হাবুলের মা'র আবেদন ইরার চট্‌ করিয়া নিজের মার আবেদন মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিন শরতের সহিত কথা কাটা-কাটির পর আর সে কথা পাড়িতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল। উপরন্তু নিজের গর্ভধারিণীকে দিয়া বিদেশে জামায়ের সাক্ষাতে ঝি-চাকরের কাজ-কর্ম্ম করাইতে সে কিছুতেই পারিবে না। তার চেয়ে হাবুলের মাই ভাল। শরতকে সে কথা বলিতে, কি ভাবিয়া শরতও রাজী হইল।

শরতের এক ভগ্নিপতির দেওঘরে একখানি ছোট্ট বাড়ী ছিল—বলা-বাহুল্য শরত ছুটীর একমাস সেই বাড়ীর দখলীকার স্বত্ব সুবন্দোবস্তে আয়ত্ব করিয়াছিল।

(২)

গাড়ীতে চড়িয়া মণ্টির কি আমোদ! একবার বাপের কোলে উঠিয়া, জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া, হাত মুখ চোখ নাড়িয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যায়, তার পরই নামিয়া মার দুই হাঁটুর মধ্যে পড়িয়া ঘোমটার পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া শরতকে ডাকিয়া বলে "বাবু—দেখ্!"

ইরা হাসিয়া তাহার দুই গালে দুইটি চড় জোড়ে উঠাইয়া আস্তে বসাইয়া দেয়!

মণ্টী—প্রাণপণে নিজেকে ইরার কবল হইতে মুক্ত করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট একটি অপরিচিতা কিশোরীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। যেন তার কত দিনের চেনা!

হাবুলের মা কিরপার সহিত থার্ডক্লাশেই আশ্রয় লইয়াছিল। মণ্টি শরতকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু—কিল্পা কই?'

শরত বলিল "সে বাড়ীতে।"

"বুল থাক্মা?"

"বুড় ঠাকুমাও – বাড়ীতে।"

তারপর মণ্টি বাড়ীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "বাবু এটা কাদেল্ বাড়ী?"

শরত বলিল "তোমার শ্বশুরদের।"

প্রশ্ন হইল "শ্বশুরা কোতা?"

"যমের বাড়ী।"

মণ্টি নিশ্চিন্ত হইল। খানিক পরে—শরতকে চুরুট টানিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল "কি খাচ্ছ বাবু—?"

"তামাক খাচ্ছি।"

প্রশ্ন হইল "কেন?"

শরত বলিল "ক্ষিদে পেয়েছে।"

মণ্টি বলিল "আমি খাব বাবু—আমাকে খিদে পেয়েছে—?"

হাসিয়া শরত বলিল "তুমি ছেলে কিনা, তোমার খেতে নেই।"

বুদ্ধি করিয়া মণ্টি জিজ্ঞাসা করিল "মাল্ খেতে আছে? মা ত বল হয়েছে—"

গাড়ী-শুদ্ধ সবাই হাসিয়া উঠিতে ইরা অপ্রস্তুত হইয়া তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। মণ্টি পার্শ্বের যাত্রীদের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বুঝিল তাহার অপমানটা তাহারা সকলে উপভোগ করিতেছে। মনের দুঃখে করুণ নেত্রে পিতার মুখের পানে চাহিয়া হাঁ করিয়া টানিয়া কান্না আনিল "এ্যাঁ—এ্যাঁ।

তাহার অভিমান বুঝিয়া শরত আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল; মণ্টি-কোলে উঠিয়া দেখিল ইরা স্বল্পাব-গুণ্ঠনের ভিতর হইতে হাসিতেছে। মণ্টি রাগিয়া একটি চোখ দুই হাতে চাপিয়া অপর চক্ষুটির ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে ছোট্ট জিভখানি বাহির করিয়া মাকে মুখ ভেঙ্গাইল।

পার্শ্বের একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিল "আপনার খোকার বয়স কত হল?"

শরত বলিল—"বছর তিনেকের হবে।"

ইরা ঘোমটার ভিতর হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া শরতকে বলিল "ফাগুনে চার বছরে পড়বে।"

একটু পরেই সবার কথার মাঝখানে মণ্টি বাপের কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ট্রেণের বিরাম নাই। মাঝে মাঝে এক একটা—ষ্টেশনে থামিয়া, দু'পাশের সীমাহীন মাঠের মধ্য দিয়া আপন মনে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া ছুটিয়াছে—চিহ্নিত লৌহপথের উপর দিয়া।

ক'ঘণ্টার-ই বা পথ!

ষ্টেসনে নামিয়া মণ্টিকে ইরার কোলে দিয়া শরত কিরূপা ও হাবুলের মাকে নামাইয়া এবং একখানা গাড়ি ভাড়া করিয়া বাসার উদ্দেশে চলিল! মণ্টি তখন জাগিয়াছে।

(৩)

নূতন বাসাটি সকলেরই পছন্দসই ছিল। খান তিন-চার শোবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, পায়খানা, ছোট্ট উঠানের ভিতর একটি কুয়া মায় আশে পাশে দু'চারটি ফলফুলের গাছ পর্যান্ত লাগান। বাড়ীর পাহারাদার 'ভিখন' ত ছিলই!

পৌছিবার খানিক পরে শরত তেল মাখিয়া ভিখনকে দু'বাল্টি জল তুলিয়া দিতে বলিলে, ভিখন সসম্ভ্রমে শরতকে বসাইয়া এমন ভঙ্গীতে তাহার মাথায় জল ঢালিয়া, গা

রগড়াইয়া স্নান করাইতে লাগিল যে চিরকাল পুকুরস্নানে অভ্যস্ত শরত হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল।

ইরার পরামর্শে সেদিনের মত আহারাদি পর্ব্ব সংক্ষেপ করিবার জন্য হাবুলের মা খিচুড়ি চড়াইয়াছিল। গরম গরম খিচুড়ি পরম আগ্রহে ভাজা, তরকারী ও চাটনি সংযোগে উদরস্থ করিয়া সকলেই সেদিন পরিতৃপ্ত হইল কিন্তু মন্টির মুখে রুচিল না। একে গরম তার উপর হাবুলের মার অকুণ্ঠ হস্তের প্রসাদাৎ লঙ্কার পরিমাণ একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। মন্টি খাইবে কি, একটু গরম খিচুড়ি গালে তুলিয়াই ফেলিয়া দেয়, তারপর ঠাণ্ডা তরকারী খানিকটা গালে তোলে তাহাও ঝাল মায় চাটনি পর্য্যন্ত! তাহাও ফেলিয়া দেয়। লোভে পড়িয়া মুখে তুলিল অনেক কিছু কিন্তু কিছুই উদরস্থ করিতে পারিলনা। অধিকন্তু চোখের জলে, নাসিকা নির্গত জলীয় পদার্থে তাহার সারা বুক-পেট ভিজিয়া গেল। শেষে বেচারী হতাশ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং আহার স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পলাইল।

শেষে দুধ ও দোকান হইতে খাবার আনাইয়া ইরা তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল।

বেড়াইতে আসিয়াছিল বটে কিন্তু ইরা গৃহস্থের অমর্য্যাদা করে নাই। বিছানাপত্র ও পোষাক পরিচ্ছদাদিতে সে পুটলি ও বাক্সের সংখ্যা এত বাড়াইয়াছিল যে শরতকে অনেকগুলি রেজকী ট্রেণে টিকিট চেকারের পকেটে তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। বাসায় পৌছিয়া সে-গুলি ইতস্ততঃ অবিন্যস্ত ভাবেই পড়িয়াছিল। বৈকালের দিকে অবসর মত গুছাইবে ভাবিয়া ইরা সেগুলিতে হাত দেয় নাই, মাত্র—সকলের উপস্থিত ব্যবহারের জন্য একটি বড় ট্রাঙ্ক হইতে কাপড় গামছা চাদর প্রভৃতি বাহির করিয়া লইয়াছিল।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কিরণা—ভিখনের সহিত বাহিরের বারান্দায় একখানি মাদুর বিছাইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। হাবুলের মা অক্লান্ত হইয়া একখানি খালি ঘরের মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নাক ডাকাইয়া একটু গড়াইয়া লইতেছিল এবং অন্য ঘরে শরত ইরাকে লইয়া পড়িয়াছিল এক মহাসমস্যার সমাধানে। বিকালে বেড়াইতে যাইবার কথা উঠিতে ইরা বলিল"ভিখন আর খুড়িমা বাড়ীতে থাকবেখ'ন কিরণা মন্টিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবেখন—"

"তাই হবে—" বলিয়া শরত উঠিয়া গিয়া পুঁটলির ভিতর হইতে একটি কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া আনিয়া ইরার হাতে দিল। সাগ্রহে খুলিয়া তাহার ভিতর একজোড়া জরির নাগ্‌রা জুতা দেখিয়া ইরা হাসিয়া বলিল "আমার পুজার বকশীষ নাকি?"

অপ্রস্তুত হইয়া শশব্যস্তে শরত বলিয়া উঠিল ধোৎ,—দেখ দেখি পায়ে ঠিক হয় কি না—"

অবাক হইয়া ইরা বলিল "কার পায়ে গো—?"

শরত বলিল "আমার এ গোদা পায়ে ও জুতো ঢুকবে না নিশ্চয়ই তারপর যার পায়ে লাগে তাকেই পরতে হবে।

ঠাট্টা করিয়া ইরা বলিল "যদি কিরণার পায়ে লাগে?"

শরত ফাঁপরে পড়িল; ছোড়াটার পায়ে লাগিলেও লাগিতে পারে। কথার মোড় ফিরাইয়া শরত বলিল "না না তামাসা নয়, দেখ না পায়ে দিয়ে—"

ইরা বলিল "পাগল হয়েছ; আমি জুতো পায়ে দেবো কোন দুঃখে—"

শরত বলিল "দেখবেখন বিকেল বেলা রাস্তায় মেয়েরা পিপড়ের সারে চলেছে কারো পা খালি নেই—!"

ইরা বলিল যারা পরে তারা পরে আমি পরবো না; বলে জীবন গেল গোবর ঘেঁটে আজ পদ্মগন্ধ বাসি! লজ্জা করবে না বুঝি আমার?

হাল না ছাড়িয়া শরত বলিল "এখানে তোমার চেনা লোক কে আছে যে লজ্জা করবে? যারা কক্ষণো পরে না তারাও এখানে এসে জুতো পরে—দুদিন থাকলে সব দেখতেও পাবে।"

মুখ ঘুরাইয়া ইরা বলিল—হ্যাঁ, আমি এখানে জুতো-মোজা পরে নাচি আর খুড়িমা দেশে গিয়ে ঢাক পিটুক। তোমায় ত শুনতে হবে না—হবে আমাকে!"

গম্ভীর হইয়া শরত পাশ ফিরিয়া শুইল!

ইরা বুঝিল স্বামী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সে আড় হইয়া শরতের গায়ের উপর পড়িয়া তাহার মুখখানা সোজা করিয়া বলিল—"অভিমান হ'ল বুঝি?"

শরত বলিল "না"—

শরত বলিল "ঘুম পাচ্ছে—"

ইরা তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "না ঘুমুতে হবে না—আমি জুতো পরি দেখ—"

শরত উঠিয়া বসিতে ইরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"ইঃ—বাবুর অভিমান কত!"

শরত বলিল "কই পায়ে দাও—"

ইরা তাহাকে ঠেলিয়া শোয়াইয়া দিয়া নিজে পাশে শুইয়া বাঁ হাতে শরতের গলাটি জড়াইয়া বলিল "বেড়াতে বেরুবে তো বিকেলবেলা—এখন জুতো পরে আর কি করবো, সেই সময়ে দেখা যাবে'খন। ধন্যি কোট্ যাহোক তোমার!—এখন একটু ঘুমুই এস—"বলিয়া হঠাৎ ইরা তড়াক্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। শরত ব্যাপার না বুঝিয়া উঠিয়া বসিল। শুনিল বারান্দায় দাঁড়াইয়া ইরা ভিখণ ও কিরপাকে মণ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। শরতের মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। সে বাহিরে আসিতে ইরা ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "ওগো মণ্টি কোথা?"

শরত দমিয়া গিয়া বলিল "সেকি?—"

চোখের পলকে—ইরা ছুটিয়া যে ঘরে হাবুলের মা ঘুমাইতেছিল সে ঘরে ঢুকিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "খুড়িমা মণ্টি?—"

কাঁচা ঘুম ভাজিয়া যাওয়ায় হাবুলের মা প্রথমে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া লালা নিঃসৃত মুখ মুছিয়া বস্ত্র সংযত করিয়া যখন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিল তখন সে চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

তাহার চীৎকারে ইরা চীৎকার করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। শরত মণ্টির উপর নজর না রাখার জন্য কিরপার গালে এক প্রচণ্ড চাপড় বসাইয়া দিয়া ভিখনকে লইয়া প্রতি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাড়ীর আস্‌পাশ্‌ খুঁজিতে ছুটিল! মুহূর্ত্তে ব্যাপার বিষম হইয়া দাঁড়াইল! কিন্তু মণ্টিকে পাওয়া গেল না।

ইরা ও হাবুলের মা'র চীৎকারে আসেপাশের অনেক স্ত্রীপুরুষ জমা হইল। অনেকে শরতকে পুলিশে খবর দিতে উপদেশ দিল, অনেকে ছেলে ধরার ভয় দেখাইল, অনেকে প্রথম দিন আসিয়াই বেচারীদের এই বিপদে পড়িতে দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন! আবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই—সেই বিশাল জনতার চিহ্নমাত্র রহিল না।

বাড়ীর মধ্যে ইরার অবস্থা দেখিয়া শরত আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না—বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শরতকে কাঁদিতে দেখিয়া ইরার ও হাবুলের মা'র ক্রন্দনবেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিরপা ত চড় খাইয়া অবধি কাঁদিতেছে। একা ভিখন কাহাকে প্রবোধ দিবে আর কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিবে! এতকাল দেশে বাস করিতেছে কই এমন ব্যাপার ত পূর্ব্বে কখনো ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। যেন ভৌতিক কাণ্ড! ভয়ে তাহারও যেন হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল। মধ্যে সে একবার তার এক বন্ধুকে ডাকিয়া কুয়ার ভিতর পর্য্যন্ত নামাইয়াছিল, যদি কোন প্রকারে দামাল ছেলে বুক বহিয়া জলে পড়িয়া থাকে কিন্তু সেখানেও কোন ফল হইল না! এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ীর অবস্থা যেন শ্মশানে পরিণত হইল!

ক্লান্ত হইয়া ভিখন একেবারে শেষের দিকের ঘরের দরজায় বসিয়া পড়িল। সেই ঘরখানিতেই ইরা তাহার বাক্স-প্যাটরা রাজ্যের পুঁটলি-পোটলা জড় করিয়াছিল ইচ্ছা ছিল অবসর মত যথাস্থানে সব গুছাইয়া রাখিবে। উৎ হইয়া দুটি হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া ভিখন বসিয়াছিল হঠাৎ কিসের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। উঠিয়া ঘরের চারিদিক ভাল করিয়া দেখিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না অথচ শব্দটা যে ঘরের ভিতর হইল সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। শেষে কি সত্য সত্যই তাহাকে বুড়া বয়সে ভৌতিক ব্যাপার বিশ্বাস করিতে হইবে, ভাবিয়া ভিখন চুপ করিয়া ঘরের ভিতর উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় মিনিট তিন চার পরে আবার একটা শব্দ হইল কিন্তু এবার ভিখন ঠকিল না, ছুটিয়া ইরার বড় ট্রাঙ্কটির ডালা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে যাহা দেখিল তাহাতে বুড়া লাফাইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড খালি ট্রাঙ্কটার ভিতরে মণ্টি কাত হইয়া পড়িয়া আছে। ঘামে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে যেন এইমাত্র পুকুর হইতে ডুব দিয়া আসিতেছে। মিট মিট করিয়া চাহিতেছে বটে কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলিতেছে টানিয়া টানিয়া। তাহাকে দেখিয়া ভিখনের কোটরস্থ খোলা চোখের কোণ বহিয়া

হু হু করিয়া জল গড়াইতে লাগিল, সে ভাবিল সীতারামজী তাহার ডাক শুনিয়াছেন! একবার ভাবিল চীৎকার করিয়া বাড়ীর সবাইকে এখানে জড় করে, আবার কি ভাবিয়া দৌড়িয়া নিজের ঘর হইতে একখানা পাখা আনিয়া মন্টিকে সযত্নে ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে কোলে তুলিয়া বাতাস করিতে লাগিল। মন্টি ভুরু কামান চুলপাকা বুড়টিকে ত আগে দেখে নই তাই তাহার কোলে থাকিতে অসম্মতি জানাইল। ভিখনকে ঘর হইতে ছুটিয়া পাখা আনিতে দেখিয়া কিরপাও পিছনে পিছনে আসিতেছিল ঘরের ভিতর মন্টিকে দেখিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল—"ইয়ে কপাল জগড়নাথ—অ—"

তাহাকে এক ধমক দিয়া ভিখন, যেখানে ইরা মেঝেয় পড়িয়া চেঁচাইতেছিল সেখানে গিয়া বলিল খোকা যখন ওঘরে বসিয়া রহিয়াছে তখন বহুজীর এত রোতার দরকার কি?

কথাটা কাণে গেলে ইরা তীর বেগে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা খোকা?"

ভিখন কহিল "ও ঘরমে—"

বাপের বয়সী বৃদ্ধের কথা বিশ্বাস করিয়া ইরা নিমেষে সেই ঘরে গিয়া মন্টিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র চুমায় তাহার বায়ুবদ্ধ রক্তিম মুখখানিকে ভরাইয়া দিল। তখন শরত আসিল, হাবুলের মা আসিল, সংবাদ পাইয়া আর একবার প্রতিবেশীরা জড় হইল!

শরত জিজ্ঞাসা করাতে ইরা চোখে জল মুখে হাসি লইয়া বলিল "ঠিকই হয়েছে, বড় বাক্সটা থেকে আমি কাপড় চোপড় সব বার করে নিয়ে যাই—যাবার সময় তাড়াতাড়িতে ডালাটা বন্ধ করিনি; আর ঘট্‌ঘটে ছেলে তোমার তার ভেতর নেমে খেলা করতে গেছলো, নাড়া পেয়ে ডালাটা প'ড়ে—বাক্সবন্দি!"

বহির্ব্বাটিতে কারণ শুনিয়া একটা হাসির রোল উঠিল। সকলে শরতের সুপ্রসন্ন অদৃষ্টের দোহাই দিয়া খোকার উপর বিশেষ নজর রাখিতে বলিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

সব কাজ ছাড়িয়া কিরপার উপর মন্টির পাহারার ভার পড়িল। শরত হাসিয়া ইরাকে বলিল—"তোমার ছেলে যে এই বয়সে এমন লোক হাসাবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!

ইরা জবাব দিল "নতুন জায়গায় এসে একদিনেই আমার ছেলে তোমায় বিখ্যাত করে দিলে! ভয় নেই, ভবিষ্যত তোমার ভালই বোঝা যাচ্ছে!"

হাবুলের মা আসিয়া ইরাকে বলিল "অ বৌমা, ঘরে গিয়ে সত্যনারাণের সিন্নি দিস্, আর শেতলা পঞ্চানন্দ বুড় শিবের চিনির নৈবিদ্যি মানসিক্ করিছিনু দিস্, আর স-পাঁচ আনার পয়সা তুলে রাখ্ মা—হরি সভায় নোট্‌ দিতে হবে—"

ইরা হাসিয়া মন্টির মুখের পানে চাহিয়া সস্নেহে তাহার গাল দুটি ঈষৎ টিপিয়া দিয়া বলিল "দেব বইকি খুড়িমা!

কে?

শ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

নন্দনেরি গন্ধভরা ফাগুন-গানের সুর তুলে
কে তুমি মোর এলে মনের বনে
স্পর্শ ক'রে মর্ম্মখানি নিদ্রা-বিহীন চোখ খুলে;
আল্‌তা-পায়ের নূপুর-গুঞ্জরণে।

কে গো তুমি মানবী না কবির সাধের কল্পনা,
ছবির রাণী,—বুকের বধূ!
হৃদয়-তারে সঙ্গীতেরই সুরের শুধু মূর্চ্ছনা;
প্রেমিক কবির সব ভোলান মধু।

নারায়ণী সেনা

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় **প্রবন্ধ**

আচ্ছা, জগৎটা কি আপনি হয়েছে বোলে বোধ হয়?

আপনি হওয়া মানে?

অর্থাৎ, যাকে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, fortuitous concourse of atoms।

শুধু মিলনই fortuitous না পরমাণুসমূহের অস্তিত্বও fortuitous?

তা, তা, তা, যাই হোক্ না।

সে কথাটা স্পষ্ট কোরে জিজ্ঞাসা কোরে নিও।

আচ্ছা, মেনে নেওয়াই যাক্ না যে, পরমাণুসমূহের অস্তিত্বও accident—দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথা যায়।

বেশ। কিন্তু তাদের মিলনকে যে accidental বোলছো, অথচ বৈজ্ঞানিকগণই বলেন যে, এই মিলনের ভিতর একটা আইন আছে। আইনের অস্তিত্ব এবং accident—এ দুটো পরস্পর বিরোধী কথা।

মিলনের আবার আইন কি?

Law of attraction—এই আকর্ষণ না থাকলে মিলন সম্ভবপর হতো না।

কিন্তু এই আকর্ষণটাও ত accident হোতে পারে।

পারে, নাও পারে।

তা হোলে কি দাঁড়ালো?

কিছুই না।

আচ্ছা, জগৎটা যে পরমাণুসমূহের সমষ্টিমাত্র, এ পর্য্যন্ত ত ঠিক?

সমষ্টি নয়, মিলন। সমষ্টি একটা mechanical জিনিস, তার ভিতর কোনও প্রাণ নেই। কিন্তু মিলন প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত।

আচ্ছা, মিলনই না হয় হলো। কিন্তু এই মিলনের কোন উদ্দেশ্য আছে কি?

নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝ্‌তে চেষ্টা কর।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে থাই পেতেই পারে না।

কেবল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের objective অভিজ্ঞতা থাই না পেতে পারে। মনকে ইন্দ্রিয় বোল্‌তে হয় বল বা Subject বোল্‌তে হয় বল, এই মনেরও অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে জুড়্‌তে হবে।

তাতেও যে বেশীদূর এগুতে পারা যাবে বোলে বোধ হয় না।

এগিয়েই দেখ না, কতদূর যেতে পার।

দেখেছি। সৃষ্টির ভিতর একটা law খুঁজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোন moral বা intelligent উদ্দেশ্য সব-সময় পাওয়া যায় না।

কেন?

আগুনে হাত পোড়ে, পুড়ুক্,—তাতে আমার আপত্তি নেই, যদি তোমার আমার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতাহীন কচি ছেলেও যদি আগুনে হাত দেয়, তার হাতও পোড়ে। এটা কি নিতান্ত জড় আইন নয়?

কিন্তু কচি ছেলে ত ভুঁইফোঁড় নয়। তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে তার আগেই তার বাপ-মার সৃষ্টি হয়েছে। এইখানেই জড়শক্তির উপর প্রেমের আধিপত্য।

মানি। কিন্তু সকলের মা-বাপ থাকে না। সুতরাং সেই সকল ক্ষেত্রে জড়শক্তির নিকট প্রেমের পরাজয়। সৃষ্টির উপর কোন স্রষ্টা বা নিয়ন্তা আছেন কি না সন্দেহ হয়। থাক্‌লেও তিনি প্রেমময় নন্, নির্মম যন্ত্রবিশেষমাত্র।

স্থূলদৃষ্টিতে তাই বটে। আবার একটু তলিয়ে দেখ্‌লে এইখানেই প্রেমের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা বা সম্পূর্ণতা।

কি রকম?

যদি সকলেরই মা-বাপ থাক্‌তো, কেউ নিজের ছাড়া পরের ছেলে-মেয়ের মা-বাপ হবার অবসর পেত না। সুতরাং প্রেমের গণ্ডী সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হোয়ে

পোড়ত। আমার ক্ষুদ্র প্রাণে প্রীতির যে ক্ষীণ স্রোতটুকু বইছে, অনন্ত বিশ্বপারাবারের সঙ্গমলাভ কোরে আপনাকে সার্থক কোরে তুলতে পারত না। moral অথবা physical, যে-দিক দিয়েই দেখ না কেন, এই বিশ্বের constitution এরূপ যে, কেউ কারও হ'তে পৃথক নয়, প্রতি অণু-পরমাণুই একসূত্রে গাঁথা। "গ্রহের ফেরের" কথা প্রসঙ্গে এর একটা দিক তোমাকে বুঝিয়েছিলাম। কথাটা আরও অনেক রকমেই বোঝান যায়।

কি রকম ?

এই বিরাট সৃষ্টি, এটা কি ? সংখ্যাতীত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর মিলন ছাড়া কিছুই নয়। এই মিলন সম্ভব হয় কেবল পরস্পরের প্রতি তাদের একটা আকর্ষণ আছে বোলেই। সুতরাং এই আকর্ষণই সৃষ্টির একমাত্র final বা ultimate কারণ।

শুধু আকর্ষণ নয়। আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ, এই দুয়ে মিলে সৃষ্টি এবং লয় অর্থাৎ নবসৃষ্টি ঘটাচ্ছে।

যেটাকে বিকর্ষণ বলি, বাস্তবিক সেটা আর-একটা জিনিসের আকর্ষণ। যখন যার আকর্ষণ প্রবলতর হয়, তারই সঙ্গে মিলন হয়। সুতরাং আকর্ষণই একমাত্র শক্তি। অন্তরের আকর্ষণকে প্রেম বলি। বাহিরের আকর্ষণকেই বা এ-নামে অভিহিত কোরতে দোষ কি ? এই আকর্ষণই প্রেম, এবং প্রেমই ঈশ্বর—God is Love। প্রতি অণু-পরমাণু একসূত্রে গাঁথা বোলছিলাম না ? সে সূত্রও এই প্রেম বা ঈশ্বর।

ভগবান কেবল সূত্রমাত্র, এ-কথা বোললে কি তাঁকে খেলো করা হলো না ?

তিনি নিজেই বোলেছেন—সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত। বাইবেলেও আছে, In Him all things consist—একই কথা। তবে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, উপমামাত্রই অসম্পূর্ণ, যেখানে যেটুকু খাপে সেইটুকু খাপিয়ে নিতে হয়।

বিশ্বের উপাদানীভূত অণু-পরমাণুগণকে তিনি কি কেবল গ্রথিত কোরেছেন মাত্র ? তিনি কি সৃষ্টি করেন নি, তিনি কি এদের কারণ নন ?

হ্যাঁ।

পিতা যেমন পুত্রের কারণ, সেইরূপ ?

হিন্দুশাস্ত্রমতে পিতা যেমন পুত্রের কারণ, সেইরূপ।

তার মানে ?

হিন্দুশাস্ত্রমতে পিতা জায়ার গর্ভে নিজেকেই উৎপাদন করেন। তিনিও তেমনি প্রকৃতির মধ্যে নিজেকেই প্রকাশ করেন।

প্রকৃতি কি ?

পূর্ব্বোক্ত অণু-পরমাণু বা শক্তিসমূহের সমাবেশ।

অণু-পরমাণুগণ কি abstract শক্তি ? তাদের কোনও concrete অস্তিত্ব নেই ?

শক্তির concrete অস্তিত্ব দর্শন বা বিজ্ঞান বা কিছুরই বিরোধী নয়। এবং শক্তি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।

তা হোলে তুমি বোলতে চাও—A thing is a permanent possibility of sensations ? এটা তোমার idealism এর উপর অযথা পক্ষপাত।

না। Idealism বা materialism, কারও উপর আমার কোনও পক্ষপাত নেই। জড় চৈতন্য হতে উদ্ভূত বা চৈতন্য জড় হতে উদ্ভূত কিছুই আমি বলি না। আমি শুধু বলি, এ দুয়ের মধ্যে কোনও fundamental difference নেই, যদি কোনও তফাৎ থাকে, it is one of degree।

প্রকৃতি তা হলে শক্তির সমাবেশ ?

হাঁ। আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি প্রভৃতি অনেক নামে তাকে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতি কি কোরে শক্তি হোতে পারে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

যেমন কোরে দাহিকাশক্তি আগুনের প্রকৃতি।

এটা যুক্তি না উপমা ?

উপমা।

কেন ?

বোলেছি ত উপমায় যেটুকু খাপে সেটুকু খাপিয়ে নিতে হয়। সব দিক দিয়ে খাপান যায় না। দাহিকাশক্তি আগুনের ইচ্ছাপ্রসূত নয়, উভয়েই তৃতীয় শক্তির অধীন।

প্রকৃতি যে শক্তিসমূহের সমাবেশ, Spinozaর ভাষায় একে "natura naturata "অথবা natura naturans" কি বলা ঠিক ?

বোল্‌তে পারি না। কপচান বুলি নিজেই বুঝতে পারি না, পরকে কি বোঝাবো ?

বেশ। তুমি তোমার নিজের ভাষাতেই বোঝাও।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা মনে কর। একদিকে নারায়ণ, অপর দিকে তাঁরই সৃষ্ট অসংখ্য নারায়ণী সেনা। এই অসংখ্য সেনাই প্রকৃতির অসংখ্য শক্তিসমূহ। সাম্রাজ্যবাদী চায় এই সকল শক্তির উপর আধিপত্য লাভ কোরে তাদের সাহায্যে নিজের মহিমা, নিজের প্রভুত্ব বিস্তার কোরতে, ছুনিয়া জয় কোরতে। বর্ত্তমান ইয়ুরোপের কথা মনে কোরে দেখ। কিন্তু প্রকৃতির শক্তিসমূহ যতই অসংখ্য, অজস্র, রক্তবীজের ঝাড় এবং অজেয় হোক্ না কেন, তাদের উপর তাদের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা আছেন। নিরস্ত্র নারায়ণের কাছে তাদের পরাজয়।

নারায়ণ নিরস্ত্র ?

সুদর্শন চক্র তাঁর অস্ত্র। কিন্তু তাঁকে অস্ত্র ধারণ কোরতে হয় না।

কেন ?

কালের চক্র আপনিই ঘুরছে, আর ভগবান হইতে উদ্ভূত প্রকৃতির শক্তিসমূহ সেই চাকাতে আপনিই নাশ প্রাপ্ত হোচ্ছে।

সুদর্শন চক্র তা হলে কাল ?

কাল, যম, নিয়ম, যা ইচ্ছে-তাই বল।

তা হলে প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভের, তাকে জয় করার চেষ্টা বিড়ম্বনা ? এ বিষয়ে তুমি সংখ্যাকারের সঙ্গে একমত ?

সাংখ্য—বেদান্তের কথা তুল্‌তে চাই না। কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যদি কোনও moral থাকে, সেইটুকু বুঝতে চাই।

কি বুঝলে ?

প্রকৃত শক্তি যোগী, বৈষ্ণব—হৃদিস্থিত পার্থসারথি নারায়ণের দ্বারা যে আপনাকে চালিত করে। যুদ্ধে তারই জয়।

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

(৮)

প্রভাতের সঙ্গে মীনার বিয়ে যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন থেকেই রমাপতি যতীকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। প্রভাতের সঙ্গে যতীর মেলামেশা, আলাপ-পরিচয় সবই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল—যতীকে তিনি যতই দেখ্‌ছিলেন, ততই দুঃখিত হচ্ছিলেন। কেবলই ভাব্‌ছিলেন প্রভাত যদি না এসে পড়তো তবে তো এই যতীই তাঁর 'আপনার জন' হতে পারতো। দশ বছরের ছেলে তিনি তাকে এনেছিলেন, আর এই ষোল বচ্ছর ধরে হাতে ধরে গড়ে-পিটে, ছাব্বিশ বছর বয়সে এসে দাঁড়াল। তাকে মানুষ করা তাঁর সার্থক হয়েছে। হয়তো এই রকম ভাবেই সারাজীবন সে কাটিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু শুধু একটুখানি অবিবেচনার ফলে তাঁর হাত দিয়েই তাকে মনস্তাপ পেতে হল। কিন্তু যা' হয়েছে তার তো আর চারা নেই, আঘাত তিনি দিলেন, সুস্থও তিনি করবেন।—

প্রভাত চলে যাবার পরদিন সকালে, খুব দরকারী কি একটা কাজের কথা বল্‌তে গিয়ে রমাপতি বাবু যতীর সাড়া না পেয়ে দরজাটা, অল্প ঠেলে ভিতরে ঢুক্‌লেন। তাড়াতাড়িতে রাত্রে আর দরজা বন্ধ হয়ে ওঠেনি। একটু আশ্চর্য্য হয়েই রমাপতি বাবু দেখ্‌লেন যে তখন পর্য্যন্তও সে ঘুমিয়ে—সাধারণতঃ খুব ভোরেই সে উঠে থাকে। হয়তো অসুখ হয়েছে ভেবে তিনি তাকে না ডেকেই চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু টেবিলের ওপর ভাঁজ করা কাপড়ের গোছ ও চাপা দেওয়া চিঠিখানি তাঁকে সেখানে টেনে নিয়ে গেল। নিঃশব্দে টেবিলের ধারে গিয়ে তিনি চিঠিখানা তুলে নিলেন—পড়ে দেখ্‌লেন। পড়ার পরে দু-এক মিনিট সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে, ঘুমন্ত যতীর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। দেখ্‌লেন গভীর ক্লান্তি সমস্ত মুখ খানাতে ছাপ দিয়েছে—মাথায় বালিশ নাই সেটা খাটের এক কোণায় পড়ে আছে—মশারি ফেলা হয়নি—গায়ে যে ফিরোজা রংএর আলোয়ানখানা ছিল, সেইখানাই জড়ান, পরিশ্রান্ত ক্লান্ত যতী গভীর বিষাদে ঘুমিয়ে আছে।

একবার তিনি ভাব্‌লেন উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কেন সে বাড়ীতে থাক্‌ছে না! আবার ভাবলেন থাক্—'দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে একটু শান্তিতে ঘুমিয়েছে ঘুমাক্। ঘুমাও 'যতী ঘুমাও' বলে চিঠিটা নিয়ে তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে চলে গেলেন। এই সহায় সম্পদ হীন ছেলেটীর ওপর স্নেহের তাঁর শেষ ছিল না। তাই তার ব্যথা অনুভব করে, দুফোঁটা জল চোখেই চেপে বেরিয়ে গেলেন।

বাগানে এসে দেখ্‌লেন, তত সকালেই মীনার স্নান হয়ে গিয়েছে—সে ছোট মেয়ের মত অকারণ আনন্দে সবুজ শাড়ীর আঁচল ভরে ফল তুলেই যাচ্ছে। ফুটন্ত, আধ-ফুটন্ত লাল গোলাপগুলি তার আঁচল থেকে হাসিমুখে উঁকি দিচ্ছিল। মেয়ের সদ্যস্নাত স্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি রমাপতির বড় ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝ্‌লেন যে আজকের এই আনন্দের মূলে প্রভাতের স্মৃতি আছে। যতীর জন্যে ব্যথার তাঁর শেষ ছিল না। কিন্তু মেয়ের শান্ত মুখখানি দেখে ভাব্‌লেন, যতী হয়তো এ মুখে এমন শ্রী ফুটিয়ে তুল্‌তে পারতো না। সে যাই হোক যা হয়ে গিয়েছে, তা গিয়েছে। যতী 'ইয়ংম্যান' সে অনায়াসে এ ব্যথা কাটিয়ে উঠ্‌বে।

রমাপতিবাবুকে বাগানে তত সকালে আস্‌তে দেখে মীনা খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তার ফুল তোলার

উৎসাহ যেন নিভে গেল। একটা আধফুটন্ত গোলাপ নিয়ে তাড়াতাড়ি তার গায়ে একটা পাতা জড়াতে জড়াতে সে বললে "বাবা, তোমার 'বটন হোলে' এটা পরিয়ে দিই ?"

"দেও" বলে রমাপতি বাবু এগিয়ে এসে মীনার একখানি হাত ধরে বল্লেন "মা, মীনু, বড় একটা সঙ্কটে পড়েছি, তুমি ছাড়া উদ্ধারের তো উপায় নেই দেখ্ছি।"

ফুলতোলা স্থগিত রেখে মীনা বল্লে "কি এমন বিপদ বাবা, যাতে বড়দার থেকে আমার সাহায্য—দরকার হোল ?

"বোস মা বোস্।—সবই বল্ছি—হ্যাঁ বলতে আমায় হবেই—পাপ যে করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তো ? বলে তিনি মীনাকে নিয়ে বাগানে ফোয়ারার ধারে যে দুটো কাঠের বেঞ্চি পড়েছিল, তাইতে বসলেন।—

চোখে মুখে একরাশ ঔৎসুক্য ও আগ্রহ নিয়ে মীনা বসল—রমাপতি বল্‌তে লাগ্‌লেন।—

"অনেকদিন আগের কথা—জগমোহনের যে ছেলে আছে, তা তখন আমি জান্‌তাম না। একবার দেশে যাওয়ার দরকার হয়। ফিরবার সময় আমি যতীকে এক রকম নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় দেখে নিয়ে চলে আসি, তুই তখন চার বছরের আর যতী দশে পা দিয়েছে। সুস্থ, সবল, সুন্দর বুদ্ধিমান ছেলে—চোখে বুদ্ধির আলো ঠিকরে পড়্‌ছে—ভাবলুম—শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু তিন ছেলে, আর একটী তার সঙ্গে মানুষ করবো। যাক্—নিয়ে তো এলাম—কিন্তু দু'চার দিন যেতে না যেতেই দেখলাম কেউই ওর ওপর সন্তুষ্ট নয়। দেখে আমি ওর সম্বন্ধে খুব সতর্ক হলাম—সামনে—কেউ আর কিছু করতে পেত না। যতী বুঝতো সবই কিন্তু মুখ ফুটতো না—কিছুতেই। তার এই ভাব আমাকে মুগ্ধ করলে।

ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে সে কাজে-কর্ম্মে আমার প্রায় ডান হাত হয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছা ছিল, তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত তাকে 'আপনার' করে রাখি। আভাসও তাকে আমি দিয়েছিলাম, সে কিন্তু সব জেনে-শুনেও সীমা কোনদিন অতিক্রম করেনি। প্রভাত যদি না আসতো তবে হয়তো শীগগির বিয়ে দিয়েও ফেলতাম—কিন্তু এখন তা তো আর হয় না। যতী আমার প্রিয় এ আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি—আর প্রভাত!—সে আমার মন কেড়ে নিয়েছে।—'

বাধা দিয়ে মীনা বল্লে "এতে আমার কি হাত আছে বাবা ? আমায় কি করতে হবে ?—

"কি ই বা বলি!—যতী জেনেছে, খুব ভাল করেই জেনেছে যে তার জায়গায় প্রভাত এসেছে। এত বড় আঘাত সহ্য করতে তাকে, আমাদের সাহায্য করতে হবে।—"

"বাবা, তুমি তো আমাকে আগে কিছুই বলনি! তা হলে আমি কখখনো—"

"মা মীনু! তুই আমাকে দোষ দিস্‌নে মা।—যতীর আজ সকালের ঘুমন্ত বিষণ্ণ মুখ আমাকে কেবল খোঁচাচ্ছে তার মনে এ দুরাশা কে জাগিয়ে দিয়েছিল ?—আমিই তো ? তার মন থেকে এ আঘাতের কথা মুছে ফেল্‌তে, তার মুখে আবার অমলিন হাসি ফুটোতে তুই আমাকে সাহায্য কর্ মা!—

"তুমি বলে দিও বাবা, কি করতে হবে!—

"দেখ্ মা, তার টেবিলের ওপরে এই চিঠিটা আজ সকালে পেলাম, পড়ে দেখ সে আমাকে কি জানিয়েছে। যতী, আমার শুভ্রাংশু, সুধাংশুর চেয়ে কোন অংশে কম নয় আমার কাছে।"—

মীনা তার বাবার হাত থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়ল।—ভাবলে যে শুধু তার জন্যে যতী এক কথায় বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারে সে এমন কি জিনিস ?—যতীর মনের এ দিকটা তো সে কোনদিন লক্ষ্যই করেনি। ছেলে বেলার খেলুড়ে ছাড়া আর কোন ভাব যে যতীর মনে থাকতে পারে, এটা যেন নেহাৎ অবিশ্বাসের কথা। বাবার সঙ্গে এসব নিয়ে আর আলোচনা করতে তার মাথা কাটা যাচ্ছিল।—

মেয়েকে সঙ্কট থেকে মুক্তি দিয়ে রমাপতি বল্লেন "আমি তাকে আরও কাছে ডেকে নেব, তুইও যেন বাদ দিয়ে চলিস্‌নে মীনু, তোর কাছে আমি এই চাই।—"

"তাই হবে বাবা—কিন্তু যতীদাকে এড়িয়ে চলতেই বা হবে কেন?—সে যে আমার ছেলে-বেলার খেলার সাথী, একথা সে ভুললেও, আমি ভুলব কেন বাবা?"—

"ভুলিসনে, মা ভুলিসনে"।—বলে রমাপতি সেখান থেকে উঠে ব্যস্ত ভাবে চলে গেলেন।

মীনা সেই ফুলগুলি আঁচলে গুছিয়ে নিয়ে যতীর ঘরে গিয়ে দেখলে সে তখনও ঘুমোচ্ছে। দেখে সে দুঃখিতা হয়ে ভাবলে না জানি কাল কত রাত্তির বসে বসে এই ছাই এর ভাবনা ভেবেছে!"—

টেবিলের ওপর চিঠি যখন পেলে না, তখন বাধ্য হয়ে যতী মীনাকে বল্‌লে, "আমার ঘরে আর কেউ এসেছিল, জান?"—

"বাবা, বোধহয় এসেছিলেন কারণ তিনি এই ঘরে থেকেই গেলেন দেখলাম।"—

"আর গিয়েই বুঝি তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন? তাই বলি, হঠাৎ তোমার শুভাগমন এ ঘরে হল কেন? তার পর আজ সকাল বেলাই অনুগ্রহ কেন? বকুনি দিতে সাধ হয়েছে বুঝি?…"

"আচ্ছা যতীদা!—ওই জন্যে তোমার সঙ্গে আমার বন্‌ল না কোনদিন!—আমি বুঝি কেবলই তোমাকে বকি আর ফরমাস্—করি?"

"বন্‌বে না ও কোনদিন!—অত ফুল তুলেছ কেন? কি হবে? মালা হবে? কাকে পরাবে?—প্রভাত বাবু তো এখানে নাই।"—

"তা আমি জানি।—কিন্তু যতীদা গোলাপে কি মালা হয়? গোলাপ তোড়া বেঁধে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখ্‌তে হয়। মালার ফুল হ'ল বেল, কুন্দ, যুই, বকুল এই সব।—"

"ঠিক—গোলাপ সুন্দর হলে কি হবে?—ফুলদানীতে রাখা ছাড়া আর কিছু হয় না, তা ছাড়া আনাড়ী মালী হলে, তুল্‌তে হাতে কাঁটা ফুটে রক্ত পাত!—"

মীনা চুপ করে রইলো। বুঝলে ফুলকে উপলক্ষ্য করে যতী অন্য কথা বলে যাচ্ছে।—যতীও একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে, "তারপর, আপ-টু-ডেট মহিলা!—বিয়ের দিন করে ঠিক করলে কিছু জানালে না আমাকে এতদিনের বন্ধু আমি—তোমার! একদিন খাওয়ালেও না। তোড়-জোড় করে আমিই তো এনে জোটালাম। আর এখন পরামর্শের সময় বুঝি আমি বাদ!—তা হ'বেই তো!—কলিকাল কি না?—তোমার গতিক দেখে মনে হচ্ছে, বিয়ের রাত্রের লুচিটাও বোধহয় বাদ যাবে।—"

মীনা দেখলে যতী ক্রমশঃ সহজ হয়ে আস্‌ছে—সেও পরিহাস তরল কণ্ঠে বললে "আমার বিয়ে হচ্ছে বলে, তোমার খুব হিংসে হচ্ছে, না যতীদা? আচ্ছা বাবাকে বলব তোমারও একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। তা হলেই তো সমান হল?—

'কি করে? তুমি বিয়ে করবে প্রভাত বাবুকে—যার টাকা নিয়ে নবাবী করবে।—আর আমি বিয়ে করব কোনো মেয়েকে যার জন্যে শেষে হয়তো আমায় ফকিরি নিতে হবে। কি করে সমান হল?—বরং প্রভাত বাবুর ও আমার অবস্থা সমান বলতে পার।—"

"সকাল বেলা অত করে নাম করো না—বিষম লাগবে।—"

"ও বাবা—এত দরদ এখনি?"

"হবেনা?—হিন্দুর মেয়ে যে!—জন্মান্তর মান না?—"

এবার গম্ভীর হয়ে যতী বল্‌লে "খুব মানি।"—বলে ঘর থেকে সাইকেলখানা বের করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মীনা ওপরে তার ঘরে গিয়ে ফুলগুলো টেবিলের ওপর ঢেলে জানালার ধারে বসে রইলো।—

৯

একমাস পরে।—মীনার বিয়ের আর দুদিন বাকী। রমাপতি বাবুর বাড়ীর কাজ! তাতে আবার তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে! আয়োজন, অভ্যর্থনার আর শেষ ছিল না। সারা হাজারিবাগ সহর খানাই যেন তাঁর বাড়ীতে দিনরাত হাজির। জগমোহন বাবু মীনাকে তাঁর স্ত্রীর সিঁদুরের কৌটা ও মুক্তার মালা এক গাছি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে গিয়েছেন। বিয়ের জন্যে তিনি তাঁর আত্মীয়-কুটুম্ব সব নিয়ে রমাপতিরই একটা ভাড়া বাড়ীতে উঠেছেন। প্রভাত ছাড়া তার ভাই ক'টী এসেছে; প্রভাত বিয়ের দিন সকালে আস্‌বে।—

হাজারিবাগের মত জায়গায় এ রকম বিয়ে প্রায়

হয় না বল্লেই চলে—নিমন্ত্রিত ও অতিথিদের তো সীমা নেই। শতদল এতদিনের পর যেন করবার মত একটা কাজ পেয়ে একাই একশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মলিনা কাজের মধ্যে অবসর পেলেই এক একবার এসে মীনাকে ক্ষেপিয়ে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যার পরে মীনার বন্ধুরা এসে পড়লো। মাধবী এর আগে আর দু একবার মীনার সঙ্গে এসেছিল বলে সেই ছিল দলের পাণ্ডা। শতদলকে কোনমতে দায়-সারা গোছের এক একটা প্রণাম করে মীনার খোঁজে গেল। কয়েকটী সমবয়সী তরুণীর আনন্দ-চঞ্চল পদক্ষেপে সারা বাড়ীখানি সজীব হয়ে উঠ্‌লো।

মাধবীর দল যখন মীনার কাছে গিয়ে পৌছল সে তখন তার নিজের চিন্তাতেই অন্যমনস্ক ছিল।—ভাবছিল বিয়ে ব্যাপারটা প্রথম সৃষ্টি কে করেছিল এর সার্থকতা বা অসার্থকতা কি? সে যে বিয়ে করতে চলেছে তার থেকে কি উঠবে?—বিষ না অমৃত?—প্রভাত লোকটী কেমন?—তার আত্মীয়-স্বজনই বা কেমন?—কেমন ভাবে তার ১৬।১৭ বছরের জীবনটা উল্টিয়ে আবার আবার নতুন জীবন আরম্ভ হবে। এই রকমের নানা কথায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল।—পা টিপে টিপে তার বন্ধুরা একেবারে তার কাছে গিয়ে বললে, "হলা শকুন্তলে!—"

হঠাৎ চমকে মুখ ফেরাতেই সে দেখ্‌লে, তার প্রিয় বন্ধু ক'টী সব এসে হাজির। ভাবনার বোঝা তখনকার মত চাপা দিয়ে সে হাসিমুখে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলে; রাস্তায় কষ্ট হয়েছে কিনা সে খবরও নিলে।

হাস্‌তে হাস্‌তে সুপ্রীতি বল্‌লে "মীনুর আতিথেয়তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।"

"তারপর—কিগো মীনারাণী, চেলী আর সিঁথি-ময়ুর পর্‌তে হলো কিনা? আমরা কোন্ কথার কি অর্থ তা খুব আগে থেকেই ধরে নিতে পারি—দেখ্‌লি তো?"

বাধা দিয়ে অনীতা বল্‌লে "তুই থাম্, মাধু, তুই না হয় এবার থেকে "ফরচুন টেলার" হোস্—আমার কথা গুলো বল্‌তে দে দেখি।"

"বল্‌না তুই—আমি কি তোর মুখ আট্‌কে রেখেছি?

"মীনু, তোর "উড্ বি হাজ্‌বেণ্ডের' (would be husband) ব্যাখ্যানা আমাদের একটু শোনা।"

"শোনাব? তবে পয়সা হাতে কর্। তাঁর রূপ!—" "দরজার কাছে মলিনার শাড়ী দেখা যেতেই জিভ্ কেটে সে চুপ কর্‌লে। দেখে সুপ্রীতি বল্‌লে "বৌদি, আপনি মাটী কর্‌লেন—আমরা মীনুর কাছে গোটাকতক প্রাইভেট কথা জেনে নিচ্ছিলাম, আপনি এলেন, আর তো ও বলবে না।"

হেসে মলিনা বল্‌লে "তোমরা এত জনে মিলে প্রাইভেট কথা শুন্‌ছ? আমি জানি প্রাইভেসি দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সত্যি মিথ্যে মীনুকেই জিজ্ঞাসা করো। অনেকটা পথ এসেছ, কিছু খেয়ে সুস্থ হয়ে নেও; তারপর বিছানাও তোমাদের এখানেই করে দেব—সারারাত্ ঘরে যত কিছু প্রাইভেসি আছে ওর, তোমরা তিন জনে মিলে সব বের করে নিও। যেখানে যেখানে ও ভুলে যাবে বা বাদ দেবে, আমি ধরিয়ে দেব।"

"তুমিও কি এখানেই মরবে নাকি?"—বলে মীনা হাস্‌লে।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য—তোর দাদাটী তো বেশ ভাল মানুষের মত ঘরখানি অপরের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন—কিন্তু ঘরের লোকটীর কথা ভাবলেন না। কি আর করি! ভেবে ভেবে ঠিক করলাম কৃষ্ণ অভাবে, তুলসী পাতায় কৃষ্ণ নাম লিখে কাজ চলে—অতএব তোর দাদার বদলে তোর বিছানাতে জায়গা করে নেব।"—

"কী ফাজিল তুমি বৌদি!"—

"হা—তা তো বল্‌বেই—নিঃস্বার্থপরের মত ঘর, বর, দুইই তোমার বিয়ে বলে ছেড়ে দিলাম কিনা, তুমি তো বল্‌বেই। এস। মাধবী, সুপ্রীতি ও অনীতাকে নিয়ে, মলিনা চলে গেল।

বিয়ের দিন সকাল। বিছানা ছেড়ে উঠবার সময় মলিনা মীনাকে বলে গেল, আজ যেন কিছু খেয়োনা—"বুঝ্‌লে।"

"কেন বৌদি?—"

আহা ন্যাকা—জানেন না যেন! এই দিনের ভাবনায়

চোখে ঘুম নেই, পেটে ভাত নেই—আবার এখন ন্যাকামী হচ্ছে "কেন বৌদি?"—

"ও, এবার কতকটা বুঝলাম। আচ্ছা ভাই বৌদি, এ তোদের কি নিয়ম! বিয়ে হবে আমার, সেই উপলক্ষে কত জনেই না এ বাড়ীতে পাতা পাত্‌বে—আর বেচারী আমিই শুকিয়ে মর্‌ব? দিস্ না ভাই গরম গরম এক পাতা—এই ঘরে খেলে কেউ জানতে পারবে না।—"

"সর্ব্ব রক্ষে!—মায়ের চোখ এড়িয়ে তোমায় কিছু খাওয়াব! তবেই হয়েছে।—বড় জোর দই-সন্দেশ পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারি—তার বেশী নয়। খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত কেন? খেয়ো একেবারে এক সঙ্গে।—"

"তুমি বুঝি তাই খেয়েছিলে?—আচ্ছা কি করে খেলে লজ্জা হলো না?"

"আমি কেন খেতে যাব!—আমার তো আর বিয়ের আগে গোপন সাক্ষাৎ বা আংটী দান হয় নি—কোনো রোমান্সই হয়নি—একেবারে নিরিমিষ্যি!—বাবা, কতই দেখ্‌লাম—আবার কতই দেখ্‌ব!—আগে একেবারে বিয়ের নামে যেন তেড়ে আস্‌তে—দুদিন না যেতেই সে বুলিও নেই, আওড়ানও নেই। প্রভাত বাবুর নামে সব জল!—আগে থেকেই তুই নিশ্চয়ই চিন্‌তিস্ ওকে আর এখানে আস্‌তেও নিশ্চয় তুই বলে দিয়েছিলি—কেননা বাবার চোখে একবার পড়্‌লেই তিনি যে তাঁর এই এই রত্নটীকে বেচারীর ঘাড়ে না চাপিয়ে ছাড়্‌তেন না তা তুই বুঝ্‌তে পেরেছিলি!—বাবা, পেটে পেটে এত!"

"তা থাকবে না? তোমারই তো বল যে যার স্বামী বা স্ত্রী, জন্ম জন্ম ধরেই তারা তাই হয়।—তবে আমার বেলাতেই বা উল্টোলে চল্‌বে কেন? সত্যবানকে খুঁজে বের করতে সাবিত্রী রাজার মেয়ে হয়ে বনে গিয়েছিলেন—আমি যে কল্‌কাতা থেকেই মানুষটী খুঁজে বের করলাম, তার জন্যে তোমরা কোথায় আমাকে বাহবা দেবে তোমাদের পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলাম কতটা! তা না আবার দোষ চাপানো।—"

"একেবারেই গোল্লায় গিয়েছ? মুখে যে বাধে না কিছুই দেখি।"

"তা আমার সঙ্গে সকাল থেকে লেগেছ কেন?"

মলিনা কি বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময়ে শুভ্রাংশু তাকে খুঁজ্‌তে সেইখানে এলেন। মলিনাকে দেখে "এই যে! শুনে যাও তো একবার!" বলে আগেই তিনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। মুখরা মীনা বল্‌লে "যাও, 'এই যে'র ডাক পড়েছে।"—

ঘর থেকে যেতে যেতে মলিনা বল্‌লে "যাবই তো। এই দেখ, আমি সকলের সাম্‌নে দিয়েই যাচ্ছি। আমি কি তোর মত লুকিয়ে যাব নাকি?"—

মীনা কিছু না বলে শুধু একটু হাসলে।

সন্ধ্যা বেলা মলিনা মীনাকে বিয়ের 'সাজ' পরাতে বসেছিল—আর সুপ্রীতি ও মাধবী তার হাতের কাছে সব গুছিয়ে দিচ্ছিল। অনীতা জান্‌ত যে তার এখানে থাকাটা হয় তো সকলে পছন্দ করে উঠ্‌বে না। তাই মঙ্গলাচারের নাম গন্ধ যেখানে নাই সেইখানে থেকে সে মীনার বাসর ঘর সাজাবার ব্যবস্থা করছিল। তার হাতে পড়ে শ্রীহীন ঘরখানি যেন নবজীবন পেয়ে হাস্‌ছিল।

মীনাকে সাজান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বাকী শুধু চন্দন পরান ও এখানে-ওখানে হিমানী আর পাউডারের দুটো একটা টান দেওয়া। হাতের তেলোয় চন্দন তুলে নিয়ে মলিনা তাকে পরাতে যাবে দরজার কাছ থেকে রমাপতি বাবুর খুড়ী ওরফে সকলের রাঙা ঠান্‌দি বল্লেন "অ বৌদি! ননদকে নিয়ে মেতে রইলে—এদিকে নন্দাই যে দরজায় এসে পড়্‌লো। 'আচারের ছিরি' আর 'বরণডালা' কই?"—

হাসিমুখে মলিনা বল্‌লে "সে সব আমি ছাতে গোছ করে রেখে এসেছি—মায় আপনার 'মাকু' পর্য্যন্ত। 'ভ্যা' তো আপনিই আগে করাবেন?"

খুসী হয়ে একমুখ হেসে রাঙা ঠান্‌দি বল্লেন "আর ভাই! সে কাল কি আর আছে হে, আমদের মত বুড়ো ঠান্‌দিকে বর আগে দেখ্‌বে—হয় তো আমাদের ঠেলে ঠুলে 'কনে কই' বলে এসে দাঁড়াবে।—কি বলিস্ মীনু?"

"ঠান্‌দিদের সময়ে বুঝি তাই হ'ত?"

মুখে আক্ষেপ সূচক একটা উক্তি করে রাঙা ঠান্‌দি বল্লেন "আমাদের আবার সময়!—কোন্‌কালে 'বে' হয়েছে—মনেও জানিনে। জ্ঞান হওয়া থেকে এই ঘরই করছি।"

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে ব্যস্ত ভাবে রমাপতি বাবু এসে বল্লেন "খুড়ীমা! তুমি এখানে! আর আমি তোমাকে সারা বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্ছি! এস, এস শীগ্‌গীর এস—তোমাদের যা করবার তাড়াতাড়ি করে নেও। প্রথম লগ্নেই আমি সম্প্রদান কর্‌ব।—

"মলিনার হাতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। সুসজ্জিতা মীনার দিকে একবার চেয়ে রমাপতির বুকের ভিতর থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। মনে মনে তিনি মীনাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন "যেখানে তোমার স্থান, সেইখানে তুমি অচলা হয়ে থাক মা।"

ক্রমশঃ

নিকষ পাথর

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় একখানি মাত্র উপন্যাস আছে "বিপত্তি" তাও আবার শেষ হইয়াছে—অবশ্য "অ—পার্থিব" অবস্তুজাত সুরার "প্রবল নেশায়।" ইহাও এক বিপত্তি বৈ কি, তবে আধিদৈহিক নয় অধ্যাত্মিক। কাজেই দেবগণ সাম্‌লাইবেন।

ছোট গল্পও আছে চারটি। প্রথম গল্প শ্রীনির্ম্মলা দেবীর "আলো ও আঁধার।" সচরাচার বালক-বালিকা মহলে যে ধাঁধাটি শোনা যায়—"জ্বললে আঁধার, নিবলে আলো" রচনাটি ঠিক ততখানি জটিল ধাঁধার সৃষ্টি না করিলেও ইহার "কাণ্ড" "পর্ব্ব" ও সৃষ্টি দেখিয়া চোখে প্রথমে একটা ধাঁধা লাগে বটে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে অবশ্য সেই পুরাতন ছবি, মামুলি কথা আছে একজন বড় লোক, আর একজন গরীব। বড় লোকের বাড়ী বিবাহ; তোরণ শীর্ষে নহবতের করুণ তান সাহানা আর গরীবের বাড়ী এক পতি পরিত্যক্তা, অনাদৃতা তরুণীর পুত্র বিয়োগ ব্যথার সকরুণ কান্না। অবশ্য এই দুই কাণ্ডের মাঝখানে একজন প্রতিবেশী আছেন যিনি নিরপেক্ষ। দরকার হইলে উভয়ের সুখে দুঃখেই সমান ভাবে কাঁদিতে ও হাসিতে পারেন।

রচনাটিতে "একচক্ষু মুদিয়া" "গেরস্থর থাকবার" "বাড়ীর সাম্‌নে লেন বলিতে যাহা বুঝায়" বাঁ দিকের বারাণ্ডা হইতে "দুটা পায়খানা" ও "হলহলা-শব্দ" প্রভৃতি থাকিলেও ভাবা মোটের উপর ঝরঝরে। গল্পটিতে প্লট বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু শেষে একটি দৃশ্য আছে, যাকে "প্রলাপ দৃশ্য" বলা যাইতে পারে। পড়িয়া মনে হয় রচয়িতা বা রচয়িত্রী যিনি হৌন, তাঁর "প্রলাপের" শক্তি আছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীঅমিয়ভূষণ বসুর "নিরাশ্রয়ে।" রচনাটি করুণ কিন্তু অসম্পূর্ণ। শেষটুকু আবার এমন আলগা যে মনের উপর হইতে সমস্ত effect নষ্ট করিয়া দেয়। যে একটা অদ্ভুত বিষয়কে ভিত্তি করিয়া গল্পটি রচিত হইয়াছে তার চরিত্রগুলি শ্যালা,—ভগ্নিপতি ও ননদ-ভাজ হইলেও গল্পটাকে "শ্যালা-ভগ্নিপতির লড়াই" নামে অভিহিত করিলে বেশ মানাইত। তবে গল্পটির ভাষা বেশ ঝরঝরে ও লঘু।

তৃতীয় গল্প শ্রীবিজয় রত্ন মজুমদারের "নারী। ইহাও একটী করুণ রচনা। বঙ্কিমী ভাষায় বঙ্কিমী চালে ছোট খাট দু' একটী বক্তৃতা থাকিলেও এবং গল্পটির বিষয় বস্তু নূতন না হইলেও বেশ জমিয়াছে বলা চলে।

জেকব বিশ্বাস "নেটিভ ক্রীশ্চান," তার স্ত্রীর নাম স্বর্গের সুষমা—এক ক্রীশ্চান ধর্ম্মযাজকের মেয়ে—এবং তাদের কন্যার নাম স্বর্গের শোভা। ইহাদের লইয়াই গল্প। জেকব বড় গরীব; কিন্তু তার লক্ষ্মীস্বরূপিনী স্ত্রীর প্রযত্নে সংসার চক্রটি নিয়মিত করিয়া চলে। সে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া স্বামী কন্যাকে সুখী করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। পরিশেষে তার কর্ম্মক্লিষ্ট অনশন ক্ষিন্ন দেহ একদিন অচল হইয়া পড়ে; এবং তার প্রাণ বিহঙ্গ সেই ভগ্ন পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই গল্প।

ইহার মধ্যে স্বর্গের সুষমা ক্রীশ্চান ধর্ম্মযাজকের কন্যা হইয়াও নিজেকে বলিয়াছিল "হিন্দু।" কথাটা বোধকরি লিখিবার সময় লেখক ভাবিয়া লেখেন নাই। এক পুরুষে ক্রীশ্চান হইলেও ঐ কথাটি বলিবার মত করিয়া শিক্ষা কোন পরিবার তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে দিবেন যে এই সন্দেহ করিবার কোনই হেতু নাই। আচারে ব্যবহারে স্বভাবগত কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও এত বড় একটী কথা কেহই স্বীকার করিবেন না, তা সে হিন্দুয়াণীর মাহাত্ম্য যতই বিরাট হোক্। ন্যায়ের এ যুক্তি যেমন সত্য,—পিতার পূর্ব্বে, তার পূর্ব্বে, তারও পূর্ব্বে এবং আরও পূর্ব্বে ইহা ছিল; অতএব ইহা ঠিক আবার ইহাও ঠিক তেমনি করিয়াই বলা চলে পিতার পর, আমার পর, তারপর, তারও পর এবং আরও পর ইহা চলিবে, অতএব ইহাই কর্ত্তব্য। এই হিন্দুর দেশেই-ক্রীশ্চানগণ দেড়শত বৎসরোর্দ্ধে যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছেন তাতেই হিন্দুয়াণী পাকশালা ও ছানলা তলা হইতেও পলাইবার উপক্রম। এ সংখ্যায় একটী ভ্রমণ কাহিনী আছে শ্রীহরিপদ মৈত্রেয়ের "আমাদের সিকিম যাত্রা।" বর্ণনা ভঙ্গীতে রচনাটি অতি উপাদেয় হইয়াছে—সকলেরই ভাল লাগিবে।

কাব্য রসিকগণের জন্য কবিতা আছে চারটি। তার মধ্যে শ্রীরাধা চরণ চক্রবর্ত্তীর সেবার অভিশাপে 'ভারতীর' প্রতি 'চাহি না যশ—বর দে মা,

অন্ন দে মা দু' মুঠি।"
নিবেদন—"চাহিনা অর্থ, চাহিনা
মান—"পাঠক যদি মিলাইয়া পাঠ করেন ত শেষোদ্ধৃত কথাগুলির আড়ালে যে সত্যটুকু প্রচ্ছন্ন আছে ধরিতে পারিবেন।

শ্রীদীলিপ কুমার রায়ের "গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে" কবিতাটি আড়ষ্ট ও নীরস। তবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা বলিয়া সমীহ করিয়া পড়িতে হয়।

শ্রীনরেন্দ্র দেবের "তাশের প্রাসাদ"—তাশের ও প্রসাদের" মাঝে একটী হাইফেন। খুব সম্ভব "তাশ" ও "প্রাসাদ" বলিয়াই ষষ্ঠী বিভক্তির পরও একটী "জোড়" দিয়া দুটিকে একত্রে করিয়া রাখা হইয়াছে। নতুবা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা! কবিতাটি একটী নারীর খেদোক্তি পুরুষজাতির স্বভাব বর্ণনা করিতে করিতে বলা হইতেছে—"প্রাণহীন সেই প্রণয় গীতের
সুর ভাঁজি মোরা অন্ধ হয়ে!"

লাঠি ভাঁজা মুগুর ভাঁজা, ড্যাম্বেল প্রভৃতি ভাঁজা পুরুষের একচোটিয়া হইলেও প্রতারিত নারী অতি করুণ ভাবে সুর ভাঁজেন।" যা হৌক কবিতাটিতে বিশেষত্ব কিছু নাই নারীর তরফের খেদোক্তি সত্ত্বেও।

রঙিন ছবি এ সংখ্যায় আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার রায়ের "গায়ত্রী"।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মল্লিকের "প্রলয়ের সুর।" নটরাজ নাচিতেছেন—কিন্তু ভঙ্গী দেখিয়া মনে ভয় বা আনন্দ কিছুই জাগে না।

তৃতীয় ছবি শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কিস্তী" মহাজনের নয়—"দাবা বোড়ের"। কাজেই দেখিয়া আমোদ পাওয়া যায়।

চতুর্থ গল্প শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর "রাণী"—রচনাটি না গল্প, না পঞ্চতন্ত্রের হিতোপদেশ কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত ও হিন্দীর বুকনী এবং উপদেশের ঘটা আছে—এইটুকুই বিশেষত্ব। তবে ভাষায় বেশ "বাঁধনী" আছে।

বসুমতী—বৈশাখ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় উপন্যাস আছে চার খানি—"ধর্ম্মদাস", "তিব্বতের বিভীষিকা", "মাটীর স্বর্গ" ও "রহস্যের খাসমহল"। এবং এই গুলির মধ্যে শেষ হইয়াছে শেষোক্ত খানি।

ছোট গল্প ও আছে ছয়টি। প্রথম গল্প শ্রীমতিলাল দাস (এম-এ, বি-এ) এর "পাখীর প্রেম।" "বুড়ো" শালিক নয়—তরুণ শালিক ও শালিকার প্রেম। রীতিমত Faithlessness এর ব্যাপার। শালিক পত্নী ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহা হইতে ছানা বাহির হইবার দিন কয়েক পরেই পতি ও সন্তান ছাড়িয়া আর একটী তরুণ শালিকের প্রেমে মজে। পক্ষীমাতা তার সন্তানগুলিকে অবহেলা করিয়া প্রেমিকের সহিত বাহার দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় আর সন্ধ্যাবেলা নীড়ে ফেরে। কিন্তু তার পতি এত কাণ্ডের—"কিছুই জানিতে পারিল না।" এদিকে "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে" একদিন আগন্তুক শালিকের সহিত 'শালিক পিতার' বিপুল বিরোধ লাগিল। আর পাড়ায় "দোয়েল, টুনটুনি" তারাও মার মার শব্দে বাহির হইয়া "শালিক-পিতার পক্ষে যোগ দিল। ফলে রীতিমত দাঙ্গা ও প্রেমিক শালিকের পুচ্ছ তুলিয়া পলায়ন। পাখীদের চোখের জল পড়ে না, তাই "শালিক বধূ নীরবে দোলনচাঁপার শাখায় বসিয়া রহিল।" তারপর একদিন শালিকা প্রেমিকের সহিত একেবারে নীড়ত্যাগ করিয়া উধাও হইল। এমন কাণ্ড কেবল যে মনুষ্যসমাজেই ঘটে, তা নয়। যাহোক, অগত্যা পক্ষী পিতা ছানাগুলিকে আহার দিতে লাগিল। সে বেচারার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তারপর, পাঠক শুনিয়া খুসী হইবেন, পক্ষীমাতা একদিন একাকিনী নীড়ে ফিরিয়া সন্তান-পালনে যত্নবতী হইল। কিন্তু তাও বেশী দিনের জন্য নয়—"শ্যামের বাঁশরী রাধাকে গৃহ-কর্ম্ম ভুলাইল", "মুনি ঋষিরা পর্য্যন্ত যে আহ্বানকে জয় করিতে পারেন নাই—" শালিক ত কোন্ ছার। (পক্ষীমাতা যে তার সন্তানকে অবহেলা করে, এমন ভিত্তিহীন কথার সপক্ষে একটু কৈফিয়ৎ) সে প্রেমিক শালিকের সহিত "উড়িয়া পলাইল।" "তাহার পর ছানাগুলি অযত্নে মারা পড়িল। শালিক মনের দুঃখে ওলট কম্বলের বীচি খাইয়া পাগল হইয়া গেল। ইহাই গল্প। ইহার তলে তলে আবার মনুষ্য দম্পতীর প্রেমের বুকনী আছে। এক যায়গায় বলা হইতেছে—"দুর্ণাম বড় দুরন্ত জীব, মরিয়াও সে মরে না।" কিন্তু এজীব গর্ত্তে থাকে না, সংসার অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় আর বাগে পাইলেই রক্ত চক্ষু মেলিয়া লোককে তাড়া করে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "নূতন খাতা"—লিখিবার ভঙ্গীতে ও ভাষার গুণে চলনসই।

তৃতীয় গল্প শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়ের "অন্ধকারের মানুষ।" গল্পের বিষয়টি ভাল; কিন্তু শক্তির অভাবে সবটুকু জমিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রারম্ভে জমীদার ও ধীবর বংশের সুদীর্ঘ ইতিহাসটা নিতান্ত অনাবশ্যক। ঐ অংশটুকু ছাটিয়া ফেলিলে নিশ্চয়ই সৌন্দর্য্য হানি ঘটিত না। বিষয়টি নিপুণ হস্তে পড়িলে চমৎকার একটী Tragedy রচিত হইতে পারিত। ভাষাও তেমন খর খরে নয়। তবে বিষয় নির্ব্বাচন তারিফ্ করিবার মত।

চতুর্থ গল্প শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসুর "অভিসম্পাত..."

রচনাটিতে নিতান্ত সেকালের ঢঙ্ থাকিলেও স্থানে স্থানে ইহার চরিত্রগুলি স্পষ্ট ও জীবন্ত।

পঞ্চম গল্প শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শাসন।" সমাপ্তিটুকু বেশ ;—একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু গল্পটি এত দীর্ঘ যে সবটুকু পাঠে ধৈর্য্য থাকে না এবং ভাষায় বেগ ও বাঁধনী নাই।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীচারু চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের "সুবর্ণ গর্দ্দভ।" পাকা হাতের খাসা রচনা ;—সারা মন প্রাণ দিয়া লেখা।

আরও একটী গল্প আছে, যেটিকে বসুমতী গল্প না বলিয়া বলিতেছেন "সত্য ঘটনা।" কিন্তু আমরা বলি উহা গল্প। কেননা ইহার মধ্যে গল্পের মাল-মসলা সবই আছে এবং রসেরও অভাব নাই। এই "সত্য ঘটনাটির" নাম সাধুর যোগবল না ইন্দ্রজাল।" এক সাধু জন করেক সংশয়বাদী ইংরেজকে একটী অলৌকিক ব্যাপারে চমৎকৃত ও জব্দ করেন। ঘটনাটি সত্য হৌক মিথ্যা হৌক কিন্তু পড়িতে বেশ লাগিল। এই ধরণের রচনায় দীনেন্দ্র বাবুকে হারায় কে ?

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীচারু চন্দ্র সেন গুপ্তের "প্রলয় নাচন ইত্যাদি······চারুবাবুর আঁকিবার হাত আছে, কিন্তু এমন পট যে তিনি কেন আঁকেন, তিনিই জানেন। ছবিখানি দিয়াশলাইয়ের বাক্সের উপর চমৎকার মানায়।

তৃতীয় ছবি শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহের "প্রতিবিম্ব।" ছবি খানি দেখিয়া মেয়েটীর মত আমরাও হতভম্ব—এমন চেহারা! কিবা রঙ আর কিবা ভঙ্গী! কিন্তু মেয়েটির পরিধানে ডুরে সাড়িখানি বেশ—এমন সাড়ী বাজারে সচরাচর পাওয়া যায় না।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৭।

এ সংখ্যায় একখানিমাত্র উপন্যাস আছে, সেই "অপরাজিত।"

ছোট গল্প আছে চারটি প্রথম গল্প শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "মৃত্যু-বিজয়।"

গল্পটি বর্ত্তমান স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া অতি স্নিগ্ধ ভাষায় লিখিত। গল্পটির সুরু হইতে শেষ অবধি বেশ একটী Serene ভাব আছে। বর্ত্তমান আন্দোলন সুকুমার মতি বালকগণের অন্তরে সহসা যে ভাব ধারার সৃষ্টি করিয়া সমাজ-ভিত্তির মূলে এক প্রবল নাড়া দিয়াছে তাহারই বিবৃতি।

মানুষের নাড়ীর সঙ্গে দেশ-মাতৃকার যোগ চিরন্তন ও সত্যকারের। সেই যোগ-সূত্রে নাড়া পাইয়া যে চিদ্‌বৃত্তিগুলি জাগিয়াছে, সেগুলির কাছে পুরাতন যুক্তি আজ অচল—সমষ্টির স্বার্থের কাছে ব্যষ্টির স্বার্থ আজ ম্লান। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ত্যাগ ও কর্ম্ম, সর্ব্বোপরি প্রেম কিশোর হইতে বৃদ্ধ সকলকে পথ দেখাইতেছে। গল্পটি ভাল ; পড়িয়াও আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সাময়িক রচনা।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "জীবন ও মৃত্যু।" একটী বিদেশী গল্প, কিন্তু অতি চমৎকার।

তৃতীয় গল্প শ্রীসত্যরঞ্জন সেনের "প্রতীক্ষা"। মন্দ নয়। ইহার খানিকটা নাটকীয় ঢঙে রচিত ; তার কিন্তু মাত্রাটা যেন একটু বেশী। কিশোরী গৌরী একাকিনী রুদ্ধদ্বার গৃহে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছে—স্বামী তখন পথে। তার নিকট পৌছিতে হইলে একটী নদী পার হইতে হয়। কিন্তু কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝা-বাত্যায় সে আসিতে পারিতেছে না। এই সময়টিতে কিশোরীকে যে ভাবে আঁকা হইয়াছে তাতে মনে হয় যেন সে কৈশোরের সীমানা কবে কোনকালে পার হইয়া গিয়াছে—তার অতি পরিণত দেহের মাঝে যে জাগিয়া উঠিয়াছে সে এক পূর্ণ যৌবনা নারী। গল্পের শেষে লেখকের ছোট রকমের একটী হৃদয়োচ্ছ্বাস আছে যাহা অবশ্য আধুনিক গল্পে ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছে। ইহার কিছুমাত্র যে আবশ্যক ছিল, তা উপলব্ধি করা গেল না।

চতুর্থ গল্প শ্রীসীতা দেবীর "আক্কেল সেলামী।" কষ্ট-কল্পিত রচনা ;—প্রাণ নাই।

এ সংখ্যায় রঙিন-ছবি আছে মাত্র দুইখানি। প্রথম ছবি শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের "স্বাধীনতার ঊষা।" মন্দ লাগে নাই।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীরবিশঙ্কর রায়লের "সূর্য্য ও কমল।" ছবিখানিতে একটী চমৎকার স্নিগ্ধ ভাব আছে ;—পরি-কল্পনাটিও বেশ।

একখানি একবর্ণ ছবিও আছে—রবীন্দ্রনাথের।

কবি এ সংখ্যায় একটী কবিতা লিখিয়াছেন—"নীহারিকা।" শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রদত্ত একটী বক্তৃতা, বিদেশ হইতে লেখা একখানি ছোট চিঠি এবং সপ্ততিম জন্মোৎসবের অভিভাষণটিও আছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাত্মাজী কি বৈঠকে যাইবেন ?

মহাত্মা কি Structural Committee বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য বিলাত যাইবেন ? এই কথা অনেকেরই গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ সরকার মহাত্মাকে Structural কমিটির বৈঠকে লইয়া যাইতে চাহেন। এই কমিটী ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতির একটা খসড়া প্রস্তুত করিবে। এবং সেই খসড়াই যখন পরে কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যবৃন্দ বিলাত গমন করিলে তাহাদের সম্মুখে উত্থাপন করা হইবে তখন মহাত্মাকে এই কমিটীর বৈঠকে উপস্থিত রাখিতে পারিলে যে ভবিষ্যতে কার্য্যের সুবিধা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ইংরাজ সাংবাদিকগণ বলিতেছেন যে মহাত্মা হিন্দু-মুসলমান মিলনের কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্ধারিত না হইলে বিলাত যাত্রা করিবেন না যখন বলিয়াছেন তখন ভবিষ্যতে শেষ অবধি মহাত্মাজী বিলাত গমন করিবেনই কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। কেননা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোন প্রতিবিধান হওয়া দূরে থাকুক উহার গোলমাল ত দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। এই ত সেদিন কলিকাতা বৈঠকে মৌলানা সৌকৎআলি জোর গলায় বলিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে যদি হিন্দুগণ মুসলমানগণের ন্যায্য দাবী গ্রাহ্য না করেন। সংরক্ষণশীল মুসলমানগণ সংঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁহাদের বক্তব্য যেরূপভাবে প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় মহাত্মাজী শেষ অবধি হয়ত কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে Structural Committeeর বৈঠক আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বসিবে। সেখানে মহাত্মাজী উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই খবরটী হয়ত অনেকেরই মুখরোচক হইবে না। কংগ্রেসে একদল মুসলমান আছেন তাঁহারা মহাত্মাজীর সহিত একমত। ভারতে যাহাতে Joint electorate হয় তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু অপরদল তাঁহাদিগকে তোষামদকারী, স্বার্থান্বেষীদল বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। এখন এই দলের উপর নির্ভর করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিতে গেলে পরে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেই হইবে। সেইজন্য মধ্যস্থের দল বলিয়া থাকেন মুসলমানদের দাবীতে স্বীকৃত হইয়া ইংরাজদের হাত হইতে ভারতকে উদ্ধার কর।

মহাত্মাজী আজ অবধি এ সম্বন্ধে আত্ম-মত প্রচার করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্যে কতটা অগ্রসর হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেই বা কিরূপভাবে কার্য্য করিতে চাহেন তাহাও আমাদিগকে জানান নাই। দুই একটা বৈঠকে যোগদান করা ব্যতীত প্রকাশ্য ভাবে এই সম্বন্ধে কোন মতামত প্রচার করেন নাই। কাজেই Structural Committeeতে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে অনেক বিষয়ে মতামত দিতে হইতে পারে। তজ্জন্য সময় সাপেক্ষ বলিয়াই কমিটীর বৈঠক জুন হইতে সেপ্টেম্বরে করা হইয়াছে। আমরাও কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, মহাত্মার উদ্দেশ্য সফল হউক, বিশ্ববাসী আবার ভারতকে নব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে দেখুক।

ভারতশাসন-সমস্যায় হিন্দু-মুসলমান !

Joint electorate মিলিত নির্ব্বাচন প্রণালী ও separate electorate পৃথক নির্ব্বাচন-প্রণালী লইয়া বিশেষ মতান্তর যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের জানিয়া রাখা দরকার যে কোন শাসক-সম্প্রদায়ই প্রবল হইয়া অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় অল্প বা অজ্ঞ ভ্রাতৃবৃন্দকে চিরকালই পদানত রাখিতে পারেন না। ইংরাজ যখন ভারতবাসীকে স্বরাজ দিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন স্বরাজ পাইবার পর হিন্দু জননেতাগণ তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের কি করিয়া পদানত করিয়া রাখিবেন ? মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধতা এই যুগে ফলাইতে গেলে মহা ভুল করা হইবে। হিন্দু নারী যখন মুসলমান যুবাকে বিবাহ করিতে দ্বিধা করে না এবং উপযুক্ত হইলেই যখন নব্য ও তরুণদের মধ্যে হৃদয়-বিনিময় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তখন শুধু গোঁড়ামীর দোহাই আর চলিবে কি ? তারপর, আমরা দেখিতে পাই যে, যেখানে মুসলমান নেতারা সংখ্যাধিক্যের জোরে জেলাবোর্ডে নিজ ধর্ম্মাবলম্বী অধিক সদস্য পাইয়াছেন সেইখানেই তাঁহারা মোক্তাব বা মাদ্রাসা চলনের প্রয়াস

পাইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুনেতাগণ হিন্দু-মুসলমানের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। ইস্‌লামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা কালে বলা হইয়াছিল ইস্‌লাম কাল্‌চার যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই এই কলেজ স্থাপিত হইতেছে। এইরূপ করিয়া চলিলে দেশের মধ্যে উদার মত কোনকালেই প্রকাশ পাইবে না। কূপ মণ্ডুকের ন্যায় চিরকালেই আমাদিকে ক্ষুদ্র কূপে মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ অনেক সময় সন্দেহ করেন যে, হিন্দুগণ অগ্রসর হইয়া পড়িলে তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া যাইবেন। সেটা কিন্তু খুবই সত্য। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে মুসলমানগণ ইংরাজ সরকারের সহিত একরূপ অসহযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের উর্দ্দ ভাষা ও ভাবকে জাপটাইয়া রহিলেন। এই সভ্যতা মধ্যযুগের। উহা নূতন যুগের সহিত খাপ খাওয়ান হয় নাই বলিয়াই ইংরাজগণ ভারতবর্ষে মুসলমানগণকে হটাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ কিন্তু ইংরাজজাতির সহিত সহযোগীতা করিয়া উন্নততর হইয়া উঠে। মুসলমান নেতাগণ যখন তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন তখন হিন্দুগণ বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্যার যে অনৈক্য দেখা যায় তাহার মূল ইতিহাসই এই। আবার এই স্বাধীনতার যুদ্ধে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ যদি হিন্দুদের সহায়তা করা দূরে থাকুক তাহাদের এই সংগ্রামে পদে পদে বাধা আনিয়া দেন, তাহাতে সংগ্রামের দিন বৃদ্ধি পাইতে পারে মাত্র কিন্তু বিজয় একদিন আসিয়া দেখা দিবেই, তখন তাঁহাদিগকে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আবার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। ইংরাজ ভারতবর্ষকে চাহে অর্থাৎ ভারতবাসীর ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের করতলগত রাখিতে চায়। হিন্দু-ব্যবসায়ী ও গ্রাহকগণ তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। শীঘ্রই মিটমাট না হইলে অসহযোগ আন্দোলন জোর চলিবে। উহার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। ইংরাজ কখনই তাহার মৃত্যু বরণ করিয়া লইবে না। সন্ধি তাহাকে করিতেই হইবে। মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত মিলিতে রাজী না হইলে শুধু হিন্দুদের লইয়া সন্ধি করিবে, যেমন ভারত শাসনের প্রাকালে শুধু হিন্দু লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের শাসন-যন্ত্র পরিচালন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বিষয়টী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

বাংলার কংগ্রেসী দ্বন্দ্ব!

বাংলায় কংগ্রেসী খেয়ুড় আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার খেয়ুড় বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি। শুনা যায় দুই পাঁচালী কোন জমিদার গৃহে উপনীত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যে বিবিধ সঙ্গীত রচনা করিত, তাহা তৎকালিক বাংলাদেশ উপভোগ করিত, কবির লড়াই, তর্জ্জাও বাংলার নিজস্ব সম্পদ। এই কংগ্রেস-কলহ বাংলার বিশেষত্ব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের সহিত বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে নানা স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে দুইটী রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। মহাআজীর অনুরোধে এবং অন্যান্য কারণে এই যুযুধমান সম্প্রদায় দুইটী পরস্পর স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়া কয়েক বৎসর একত্র কার্য্য চালাইয়া ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি না থাকার দরুণ তাঁহাদের স্বার্থ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিতেছে। কথাটা আমরা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছি। দেশবন্ধু দাশ যখন মহাআর সহিত ভিন্নমত হইয়া 'স্বরাজ' দল সংগঠন করেন তখন কংগ্রেস গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত No-changerদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটে। তাহার পর স্বরাজদল কংগ্রেস বিদ্রোহী হইয়া কংগ্রেস অধিকার করিলে No-changer দল ঠিক কংগ্রেস বিদ্রোহী না হইলেও তাঁহারা কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়ান এবং অনেকে স্ব স্ব আত্মমর্য্যাদা লইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর মেদিনীপুরের কর্ম্মীনেতা শাসমল No-changerদের হস্তগত করিয়া কংগ্রেস দখল করিয়া বসেন। কাজেই দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তাঁহার শিষ্যবৃন্দদের মধ্যে যে দুইটী দলের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ-বিবাদ স্থগিত রাখিয়া শাসমল পরিচালিত কংগ্রেসী দলের সহিত বিবাদ চালাইতে হয়। শাসমলী দল পরাস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলে, উহাদের স্ব স্ব স্বার্থ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে থাকে। তাহারই উৎকটভাব আজ বাংলাকে চমকাইয়া দিতেছে। কাজেই কংগ্রেস বিদ্রোহী বলিয়া আজ যে কথা উঠিয়াছে, সেটা বহু পুরাতন, বাসী কথা মাত্র। কংগ্রেস বিদ্রোহী হইয়াই দেশবন্ধু কংগ্রেস জয় করিয়াছিলেন আবার কংগ্রেস বিদ্রোহী হইয়াই দেশবন্ধুর সহচরগণ শাসমল দলকে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দেন। সেই অস্ত্র অবলম্বন করিয়াই শ্রদ্ধেয় সেনগুপ্ত অপরদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন! ৩০শে মে তারিখে কলিকাতার একটা সাধারণ সভায় জনপ্রিয় নেতা সেনগুপ্ত নাকি বলিয়াছেন, তিনি কংগ্রেস বিদ্রোহী নন, তবে বর্ত্তমান কংগ্রেসী দলের বিরুদ্ধবাদী। তিনি কংগ্রেসের পরিচালন প্রণালীর সংস্কার করিতে চাহেন। উত্তরে আমরা যদি তাঁহাকে বলি এই সংস্কার করিবার ইচ্ছা যখন তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন তখন হয় নাই কেন? তখন কি কংগ্রেস মধ্যে এখন যে সব অনাচার হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন তাহা ছিল না? একেবারেই যে

ছিল না বলিলেও অনেকেই বিশ্বাস করিবে না? তবে কংগ্রেস তাঁহার হস্তে যাইলে তিনি যে আবার বজ্রহস্তে চালাইবেন তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার চেলা চামুণ্ডরা যাহারা আজ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লড়িতেছে তাহারা যে কতকগুলি আবদার না করিবে সে কথা কে বলিল! আমরা বলি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্রই আছে। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রেও এটা নূতন নয়। কাজেই পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করিয়া উভয়েই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে দেশবাসীকে জানান না কেন? তাহার পর বিজয়মাল্য যাঁহার বক্ষে শোভা পায় পাউক।

ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টা

দিল্লীতে ব্যয় সংক্ষেপ কমিটী সংগঠিত হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, এই কমিটীকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া সব কমিটী গঠন করা হইয়াছে। তাহারা তাহাদের বিষয়গুলি বিশেষভাবে গবেষণা করিয়া সকলে একত্র মিশিয়া তাহার পর বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিবেন। বাংলার কেরাণীবৃন্দ ইহাতে বিশেষ ভীত হইয়াছেন। গুজব উঠিয়াছে যে, তাহাদের শতকরা দশ টাকা করিয়া মাহিনা কমাইয়া দেওয়া হইবে। কোন বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করা হইবে সে বিষয়ে এখনও স্থির নির্দ্ধারিত না হইলেও সকল কর্ম্মচারীরই যে কিছু কিছু করিয়া মাহিনার হ্রাস পাইবে তাহা প্রায় এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার ব্যয়-সংক্ষেপে কিছু যে খরচ কমিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বহু বারই বলিয়া আসিতেছি যে ভারতবর্ষে সরকারী কর্ম্মচারীগণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বড়ই অধিক হারে বেতন পাইয়া আসিতেছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকার মতন ধনী দেশসমূহে রাজমন্ত্রীরা যদি বার্ষিক ছয় হাজার টাকা বেতনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন, তবে আমাদের দেশে সে স্থলে দুই হাজার টাকা হইলেই কি যথেষ্ট হয় না? এই অনুপাতে মাহিনা কমাইলে Departmental Headদের মাসিক এক হাজার টাকা হইলেই যথেষ্ট। ব্যয় সংক্ষেপ কমিটীকে আমরা আর একটী কথা অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। সরকারী অফিসসমূহে Stationary বাবদ অযথা বহু খরচ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলে ক্ষতি কি?

রবীন্দ্র জয়ন্তী

কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের ৭০তম জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এই তিথির সভাপতিরূপে শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনেক কথারই আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে শুধুই কবি তাহা নহেন, তিনি ভাগ্যবান ও বটেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিষ্ঠা আজ সমস্ত জগতে একটী নূতন সত্য বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্ব-জগতে এত আদর। কিন্তু এই বরেণ্য পুরুষকে আমরা আজ অবধি কি দিতে পারিয়াছি? পূর্ব্বে কবিগণ সমাজের, রাষ্ট্রজগতের উচ্চ আসনে অভিষিক্ত থাকিতেন সত্য। অনেক কবিই মুসলমান জগতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইয়া গিয়াছেন। ফার্দ্দসী তাদৃশ সম্মান না পাইলেও বিপুল অর্থ ও রাজসম্মান পাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতেও কবিগণ ঈশ্বরবৎ সম্মান পাইয়াছেন। কথিত আছে, কোন মহিলা Shakespeare এই নামটী দশ হাজার বিবিধ প্রকারে বানান করিয়াছিলেন। Shakespeareএর গ্রন্থাবলী ইংরাজী সমাজে বাইবেলের পরেই অধীত হইয়া থাকে। Wordsworth Tennyson রাজকবি হইয়াছিলেন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত Kipling রাজনীতিতে ধ্রুব নক্ষত্র ছিলেন। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ তাঁহারই ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরলোকে মহারাজ মামুদাবাদ

যুক্তপ্রদেশের পুরুষসিংহ মহারাজ মামুদাবাদ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা বিশেষ দুঃখিত কেননা তাঁহার দেহ রক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়ের এখনও অনেক দেরী ছিল। ইহা ছাড়া এই সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কংগ্রেস একজন পরাক্রমশালী উদার-নৈতিক মুসলমান হারাইলেন। তিনি আজীবন ন্যায় ও সত্যেরই সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে লক্ষ্ণৌ সহরে বিখ্যাত হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট সংঘটিত হয়। অসহযোগে আন্দোলনে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করেন। নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করিবার জন্য তিনি মুসলমান প্রধানদের বিশেষ বিরাগভাজন হন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও মৌলানা শৌকৎ আলির সহিত যুক্তি-তর্কে যুঝিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

মুসলিনীকে আক্রমণ

মুসলিনীর উপর আবার আক্রমণ হইয়াছিল, আক্রমণ-কারী আবার বিফলমনোরথ হইয়াছে। জনপ্রিয় দেশ-নেতার উপর আক্রমণ কেমন করিয়া হইতে পারে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বহুবার ঘাতকের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। রুসিয়ার প্রধান পচালক রুসিয়ার সম্রাটের অপেক্ষাও অধিক সতর্কভাবে অবস্থান করেন। তিনি নাকি ঘরের মধ্যে ঘর তাহার মধ্যে যে ঘর সেই ঘরে বাস করেন। প্রত্যেক ঘরটী লৌহ কবাট দ্বারা কঠিনরূপে সুরক্ষিত। সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র এই ঘরের দরজায় পাহারা দেয়। কাজেই অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন তবে তাহাদের জন নায়ক বলিব কেন? শাসন করিতে গেলেই অপ্রিয় হইতে হয়। শাসক চিরকালই লোকসমাজের ত্রাসের বস্তু বলিয়া

কখনই পূজা পান পাই। বর্ত্তমান কালে যত প্রকার শাসন যন্ত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার কোটাই শাসক সম্প্রদায়কে জনপ্রিয় করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে শাসক-সম্প্রদায় জনপ্রিয় হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা কি রাজনীতি-বিৎ পণ্ডিতগণ করিতে পারেন না?

বর্ত্তমানের ব্যবসায়

ইংরাজের ব্যবসাবাণিজ্য মন্দা যাইতেছে বলিয়া প্রিন্স অফ্ ওয়েলস দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার ব্যবসায়ীমণ্ডলী রাজপুত্রকে সাদরে আহ্বান করিয়া বহু সভা-সমিতিতে তাঁহাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা যে সমস্ত কথা যুবরাজকে বলিয়াছেন তাহার মধ্যে দুই একটী কথা বিশেষ করিয়া প্রণিধান যোগ্য। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা বুঝিয়া থাকেন যে কোন দ্রব্য মজবুত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই উত্তম দ্রব্য হইল। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে চলিত ফ্যাসান অনবরত বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। অদ্য প্রচলিত মটর; কল্য আর চলিবে না; কাজেই এক্ষেত্রে কারখানার মালিকগণ যদি মূল্য হ্রাসের দিকে নজর রাখিয়া দেখিতে সুন্দর কিন্তু কম মজবুত জিনিষ তৈয়ারী করান তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইংরাজ পণ্য জগতের অনেক স্থলেই প্রতিযোগীতা করিতে পারিবে। মাল বহিবার জন্য পূর্ব্বকার প্রথা অপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে, একথাও তাঁহারা খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন। যেখানে এখন শুধু ভারবাহী পশুর দ্বারা মাল চলাচল করা হয়, তথায় মোটরের সাহায্য লইতে হইবে। যেখানে রেলে মাল প্রেরণ সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়-সাপেক্ষ সেখানে এরিয়াল রোপওয়ে বা এরোপ্লেনের সাহায্য লইতে হইবে। কথাগুলি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য, আমাদের ভারতের ব্যবসায়ীগণকে এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

সর্ব্ব দেশগত স্বার্থ

বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার্স অফ কমার্সের সহকারী সভাপতিরূপে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার কয়েকটী সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কথাটা সত্য যে বাংলা অন্যান্য দেশের সহিত সহযোগীতা করিতে গিয়া বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াই আসিতেছে, ১৯০৫ সালে স্বদেশীর প্রচলন হইলে বাংলা বোম্বায়ের কাপড় মাথায় তুলিয়া লয়, ইহারই পুরস্কার স্বরূপ মহাযুদ্ধে নগ্ন বাংলাকে বোম্বাই হইতে ৩।৪ গুণ বেশী মূল্য দিয়া বস্ত্র খরিদ করিতে হইয়াছিল। বোম্বায়ের ইনসিওর কোম্পানী গুলিতে জীবন বীমা করিতে বা বোম্বায়ের ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা গচ্ছিত রাখিতে বাঙ্গালী কখনই দ্বিধা করে না। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাঙ্ক বা জীবন বীমা কোম্পানীগুলিতে দায়ীত্ব পূর্ণ সমস্ত কার্য্যগুলিই বোম্বাইবাসীদের হস্তে ন্যস্ত, বাঙ্গালীকে তথায় শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। বর্ত্তমান এক্সেঞ্জ লইয়া যে গোলমাল তাহারও মূলে বোম্বায়ের স্বার্থ নিহিত আছে। মাদ্রাজের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আসিয়া বাংলায় করিয়া খাইতেছে। সারা রাজপুতনার মারওয়ারী মহল কলিকাতায় প্রাসাদ উত্তোলন করিয়া চলিয়াছে। অথচ বাঙ্গালীর বাংলার বাহিরে স্থান নাই। প্রত্যেক প্রদেশই প্রত্যেক প্রদেশবাসীর জন্য ' বাংলা কন্তু সকল জাতির জন্য মুক্ত। জাতীয়তার দিনে এইরূপ যুক্তি অনেক সময়েই অযুক্তিকর বলিয়া মনে হইয়া থাকে সত্য। কিন্তু সকল বিষয়ের যখন মীমাংসা হইতে চলিল, মাইনরটী সমস্যা যখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ইহারই বা একটা মীমাংসা না হইবে কেন? স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বাস করা উচিত নয়, তবে এই উপদেশ সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে দেখিলেই আমরা সুখী হইব। এই জন্যই প্রত্যেক প্রদেশের নেতাগণকে আমরা অনুরোধ করিতেছে, যে স্বার্থের গণ্ডি ভগ্ন করিয়া দিয়া, বেহার কেবল বেহারীদের জন্যই, মাদ্রাজ কেবলমাত্র মাদ্রাজীদেরই জন্য ইত্যাদি নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করুন।

স্বদেশিকতা।

প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে পৃথিবীতে এমন কোন দেশই নাই যেখানে তথাকার অধিবাসীদের আবশ্যকীয় তাবৎ দ্রব্যই উৎপন্ন হয়। অন্তর্জাতিক বাণিজ্য এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ প্রত্যেক দেশ দেখিল যে সঙ্কটকালে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে গেলে স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়। ইটালী যতই আস্ফালন করুক না কেন কয়লা ও লৌহের জন্য তাহাকে বাহিরে তাকাইতেই হয়। ইংলণ্ড নানা প্রকার পণ্য সম্পদে শ্রীমান হইলেও তেলের জন্য অন্য দেশের নিকট হাত পাতিতে হয়। এমন যে আমেরিকা তাহাকেও টেলিফোনের সরঞ্জাম, রবার ও ইস্পাতের জন্য বাহিরে তাকাইতে হয়। এই পরস্পর নির্ভরভাব কাটাইবার জন্য প্রত্যেক দেশই এখন তোড় জোড় করিতেছে। লর্ড রদারফোর্ড তাহার দেশবাসীকে বলিয়াছেন যে তৈল আমাদের দেশে নাই সত্য কিন্তু চেষ্টা করিলে কয়লা হইতে তৈল পাওয়া যাইতে পারে। কয়লা হইতে যে তেল প্রস্তুত হইবে উহার মূল্য নিশ্চয়ই স্বাভাবিক তৈল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। কিন্তু প্রত্যেক ইংরেজের উচিত অধিক মূল্য দিয়াও এই তেল খরিদ করা।

“বিভোরা”

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিমিটেড কলিকাতা

৫ম বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৩৮ | ৪র্থ সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক দার্শনিকতা

শ্রীভারত কুমার বসু

—প্রবন্ধ—

ভারতীয় মতানুসারে গুণ এবং কর্ম্ম অনুযায়ী পৃথিবীর ।াকদের চারটী প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে ; গীতা", ১৮—৪১) যথা :—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং ূদ্র। ব্রাহ্মণ অর্থে আত্মিক শিক্ষক, ক্ষত্রিয় অর্থে যোদ্ধা, বৈশ্য অর্থে বণিক ও কৃষক,এবং শূদ্র অর্থে দাস ও শ্রমিককে বোঝায়। শূদ্রের চেয়ে বৈশ্যের, বৈশ্যের চেয়ে ক্ষত্রিয়ের, এবং ক্ষত্রিয়ের চেয়ে ব্রাহ্মণের স্থান বরাবরই ঊর্দ্ধে। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ধ্যান-ধারণা আছে এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রতে চায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন লোক গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে শূদ্র থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কখনোই জীবনের চরম শান্তি এবং আশীর্ব্বাদ পেতে পারে না। তা পেতে হ'লে, নিজেকে খাঁটী ব্রাহ্মণের সমান ক'রে তোলা চাই। হ'লেই বা সে শূদ্র। ব্রাহ্মণত্ব ত মনুষ্য-জাতির কোনো নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে নেই। (শান্তি-নিকেতনের পণ্ডিত বিধুশেখর (ভট্টাচার্য্য) শাস্ত্রী এবং অনেক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণও এ-কথা স্বীকার ক'রেছেন।)

কিন্তু ব্রাহ্মণের সমান হ'তে হ'লে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি, তা জানা উচিত। বহু-বহু বছর আগে থেকেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র-জাতি অনেকগুলি ছোট-বড় যুদ্ধ ক'রে আসছে। প্রাচীনকালের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের সকলের চেয়ে বড় যুদ্ধ ছিল—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কেবল ক্ষত্রিয়দেরই মধ্যে হ'লেও, কতকগুলি ব্রাহ্মণও তাতে যোগদান ক'রেছিলেন। একজনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আচার্য্য দ্রোণের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু ওই সব ব্রাহ্মণ ত সেই যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করেন নি। পালন ক'রেছিলেন খাঁটী ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। সুতরাং ওই নামে-মাত্র ব্রাহ্মণদের কাছে ব্রাহ্মণ্য-স্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে না।—তাঁদের ধর্ম্ম ছিল খাঁটী ক্ষত্রিয়ের সেই ধর্ম্মের অনুরূপ, ভগবান কৃষ্ণ "গীতায়" যার ব্যাখ্যা ক'রে গিয়েছেন।...

বৈশ্য এবং শূদ্র জাতির (বণিক-সম্প্রদায়, তাদের প্রজা এবং ভাড়া-করা সৈনিকের) মিলিত-শক্তি সকলের চেয়ে বড় যে-যুদ্ধ ক'রেছিল, তা হচ্ছে ইউরোপের বিগত মহাসমর, যে-মহাসমর নিট্‌শের (Nietzsche‑র) মতো

ব্যক্তিদের আদর্শে পরিচালিত হ'য়েছিল। কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত পৃথিবীর লোক আর একটা বিরাট যুদ্ধের—খাঁটী ব্রাহ্মণ্য-যুদ্ধের (Brahmanic warএর) কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সে-স্বপ্ন আজ ভারতে মূর্ত্তি ধ'রে উপস্থিত হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ্য-যুদ্ধের এই মূর্ত্তির মধ্যে চোখের বদলে চোখ উপ্‌ড়ে নেবার এবং দাঁতের বদলে দাঁত ভেঙে ফেলবার ইঙ্গিত নেই। ইঙ্গিত আছে—পুণ্য পুস্তক "ধম্মপদে"-রক্ষিত, দু হাজার বছরেরও বেশী দিন আগেকার গুরু-বুদ্ধের পবিত্র বাণীর :—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনং॥

ম্যাক্সমুলার এর অর্থ করেছেন,—"লোক যেন প্রেমের দ্বারা ক্রোধকে জয় করে, সাধুতার দ্বারা অ-সাধুতাকে জয় করে, দানের দ্বারা কদর্য্যকে (অর্থাৎ লোভীকে) জয় করে এবং সত্যের দ্বারা অসত্যকে জয় করে।"—পৃথিবীর মধ্যে যাঁরা আধুনিক সভ্যতা এনেছেন, তাঁরা এককালে শোষক এবং বিজেতা, অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ের অতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বৌদ্ধ-সঙ্ঘের যে-সব লোক ভারতের বাইরে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা কেবল ভগবান-বুদ্ধের পুণ্য-বাণীর আত্মিক অস্ত্রের দ্বারাই অধিকাংশ এসিয়া-বাসীরই বর্ব্বর এবং পশু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। বুদ্ধের সেই পুণ্য বাণীর প্রতিধ্বনি মহাভারতেও পাওয়া যায় :—

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্॥"

(—মহাভারত (প্রতাপ রায় সংস্করণ) উদ্যোগ পর্ব্ব ৩৮-৭৩)

—অর্থাৎ, "প্রেমের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা উচিৎ," ইত্যাদি।...

ঈশ্বরের অবতার যিশুখৃষ্টেরও উপদেশ ছিল এই,—"যে-কোনো ব্যক্তিই তোমার ডান-গালে মারুক্ না কেন, তার দিকে বাঁ-গালটিও ফিরিয়ে দিয়ো!"—"তুমি যে তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে এবং শত্রুকে ঘৃণা ক'রবে, তা হবে না।"—"তোমার শত্রুদের ভালোবাসো এবং যারা তোমাকে অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্ব্বাদ দিয়ো! যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাদের উপকার কোরো এবং প্রার্থনা ক'রো তাদের জন্যে, যারা তোমাকে তিরস্কার করে, নির্য্যাতন করে!—"

এইটাই হচ্ছে খাঁটী ব্রাহ্মণের আদর্শ-ধর্ম্ম। এবং খাঁটী ব্রাহ্মণ যিশুর দ্বারা এই ধর্ম্ম প্রায় দু হাজার বছর আগে ভারতের বাইরে মনুষ্য-সমাজে প্রচার হ'য়েছিল। যিশু তাঁর কথা-অনুযায়ীই কাজ ক'রেছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছিলেন এবং পেয়েছিলেন বিজয়ের গৌরব-মুকুট। শত্রুর রক্ত পাতে তিনি জয়-লাভ করেননি। তিনি জয়ী হ'য়েছিলেন—নিজের রক্ত-পাতের দ্বারা। নির্ভীক হৃদয়ে পৃথিবীর দুঃখকে জড়িয়ে ধ'রে তিনি কর্ত্তব্য করেছিলেন, এবং তার ফলে, শুধু তাঁর শত্রুরা নয়, সারা-জগৎ তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়েছিল।

চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত নেওয়ার পদ্ধতিকে ব্রাহ্মণরা কু-পদ্ধতি ব'লেই মনে ক'রতেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, অনিষ্টের দ্বারা অনিষ্টের অপসারণ, অসত্যের দ্বারা সত্যের প্রাপ্তি এবং মন্দের দ্বারা মঙ্গলের আগমন কখনো সম্ভব হ'তে পারে না। তাঁদের আরও বিশ্বাস ছিল এই যে, দেহের চেয়ে আত্মা অনেক বড়, এবং আত্মার তুলনায় দৈহিক স্বাধীনতার কোনোই মূল্য নেই; এইজন্যই, আত্মিক শক্তির কাছে দৈহিক শক্তি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসতে পারে না।

কিন্তু আত্মিক শক্তিকে অর্জ্জন করা যায় কি ক'রে?—ত্যাগের দ্বারা।—"ত্যাগাৎ নান্যত্র মর্ত্ত্যানাং গুণাস্তিষ্ঠন্তি পুরুষে।" ত্যাগ না থাকলে কোনো লোকের মধ্যেই ভাল গুণ থাকতে পারে না। মহাভারতেও লেখা আছে :—

"ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ।
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ॥
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপো যঃ পাপং কর্ত্তুমিচ্ছতি॥

—অর্থাৎ, আর্থিক কষ্টের সময়ে মুহ্যমান হ'য়ে পড়া এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। যাতে কল্যাণ হয়, তার চিন্তা এবং তাতেই আত্ম-নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। পাপের প্রতিদানে পাপ করা উচিৎ নয়; সর্ব্বদা সৎ এবং সদয় থাকাই কর্ত্তব্য। যে-ব্যক্তি পাপ-কাজ ক'রতে ইচ্ছা করে, সে পাপের দ্বারা নিজেই নিহত হবে।...

এইটাই খাঁটি ব্রাহ্মণদের চিন্তার সামগ্রী এবং তাঁরা এই অনুযায়ীই কার্য্য করেন। সুতরাং এটাকে কোন মতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। তারপর, এটা যে কেবল পরমাত্মিক উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-জীবনেই অবলম্বনীয়, তা নয়। প্রত্যেক কাজের প্রত্যেক বিভাগেই সমানভাবে এটা প্রযোজ্য হ'তে পারে।

রাজনীতি,—শাণিত, কঠোর, উগ্র রাজনীতি,—তার মধ্যে ধর্ম্ম কিম্বা আধ্যাত্মিকতার কোনো গন্ধও নেই। কিন্তু এই রাজনীতিকেই ক'রতে হবে আধ্যাত্মিক এবং ধর্ম্ম-প্রবণ। এই ধর্ম্ম-প্রবণ রাজনীতিই ব্রাহ্মণের একমাত্র অস্ত্র। এই অস্ত্রের দ্বারাই পৃথিবীর সকল প্রকার অনিষ্টের সঙ্গে নিরাপদে যুদ্ধ ক'রতে পারা যাবে। এবং যেহেতু, যেখানেই ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়, এই কারণে, সকলের শেষে ইষ্টের অভ্যুত্থান হবে নিঃসন্দেহে। আধ্যাত্মিক রাজনীতি-অস্ত্রের দ্বারা খুব বড় দরের ব্রাহ্মণ্য যুদ্ধের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। আজ বহুদিনের পর পৃথিবীর অজ্ঞাত সেই পবিত্র মহাযুদ্ধ হিন্দুস্থানে আত্ম প্রকাশ ক'রেছে—পশু-প্রবৃত্তিকে জয় করবার বিপুল উচ্ছ্বাসে। বিশ্ব-বন্দিত তাপস, পুণ্য-প্রাণ মহাত্মা গান্ধী এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধ-যজ্ঞের ধ্যানী পুরোহিত। এ-যুদ্ধের আদর্শ—অহিংসা। কিন্তু তবুও তা সকল প্রকার হিংসা-মূলক অনিষ্টকে দূর ক'রে দেয়, অর্থাৎ, তা রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং চরিত্র-নৈতিক—সব রকমের বিপত্তির নাশ করে। এ-কথা সত্য যে, উক্ত যুদ্ধ ধ্বংসকারী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও ঠিক যে, তা রক্ষাও করে। বরং ধ্বংস করার চেয়ে তার রক্ষা-করার পরিমাণ অনেক—অনেক বেশী। এই যুদ্ধের আদর্শের দ্বারা মানুষ ভুলের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং সত্যের উজ্জ্বল আলো দেখতে পায়। এই আদর্শের দ্বারা মানুষ কাল্পনিক ভয়, কাপুরুষতা এবং ভীরুতাকে দূর ক'রে, আত্ম-বিকাশের প্রথম এবং প্রধান বাধা—বন্দীত্ব অথবা দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রতে পারে। এই আদর্শের দ্বারা পরাধীন জাতি অত্যাচারী বিজেতার কাছে নির্ভীক হৃদয়ে ব'লতে পারে, "হ্যাঁ, আমরা তোমাদের সঙ্গে আর কোনো সংস্রব রাখতে চাই না। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পার। ইচ্ছে ক'রলে, আমাদের মাথা-ও নিতে পার। কিন্তু যত-ই তোমরা শক্তিশালী হও না কেন, মনে রেখো, আমাদের আত্মার গায়ে আঁচড়টা দেবার-ও ক্ষমতা তোমাদের নেই!"

এই সত্যের প্রচারের দ্বারা মহাত্মা গান্ধী তাঁর কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সারা ভারতবাসীকে ব্রাহ্মণের সত্তা দান ক'রতে চান। সে দান মানুষের চোখের সাম্‌নে নূতন এক পবিত্র স্বর্গের স্বর্ণ-তোরণ খুলে দেয়। তার মধ্যে এই ক'টা আদর্শ পাওয়া যায়:—

১। মানুষ যেন কোনো দেশের কোনো জাতির কোনো ধর্ম্মের কোনো সম্প্রদায়স্থ লোকের প্রতি হিংসা এবং অনিষ্টের ইচ্ছা পোষণ না করে। এমন কি, জীবিত কীট-পতঙ্গের-ও ক্ষতির ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে অবাঞ্ছনীয়।

২। কোনো কারণেই কেউ মিথ্যাকথা ব'লতে পারবে না, এবং মিথ্যার সঙ্গে সংস্রব রাখতে পারবে না।

৩। সাধুভাবে পরের জিনিষ না পেলে, তা নিশ্চয় গ্রহণ ক'রতে পারবে না।

৪। দেহ এবং জীবন-রক্ষার জন্য কেবল যেটুকু জিনিষের দরকার, তার বেশী কেউ কিছুই নিতে পারবে না।

৫। সকলকেই খাঁটী ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে থাকতে হবে।

—মহাত্মা গান্ধীর ব্রাহ্মণ্য-যুদ্ধের সেনানী যাঁরা, বিশেষতঃ তাঁদের কাছে উক্ত আদর্শ একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। সত্যের পথে শয়তানের অনেক বাধা আছে। জাতির নির্জীব-হওয়া আত্মাকে গান্ধীজী তাই প্রস্তুত ক'রে নিতে চান,—শক্তিমান ক'রে নিতে চান। মৃত্যু? সেত আছেই। জন্ম এবং মৃত্যু হাত-ধরাধরি ক'রে আসে। এই মৃত্যুর ভয়কে দূর করাই মহাত্মাজীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।—মহান্ যোগী গান্ধীজীর অ-সাধারণ আত্মিক শক্তি-ই তাই আজ সারা ভারতের মিলিত শক্তির জীবন্ত প্রেরণা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে "গীতায়" সঞ্জয়ের যা-উক্তি আছে, তার মাত্র কয়েকটা কথার পরিবর্ত্তন ক'রে, মনে হয়, সঞ্জয়ের আত্মা যেন মূর্ত্তি ধ'রে এসে, গান্ধীজীর পবিত্র ব্রাহ্মণ্য-সংগ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পীড়িত, নিঃস্ব, বন্দী হিন্দুস্থানের হতভাগ্য নর-নারীকে বিশ্বাস-দৃঢ় কণ্ঠে শোনাতে চাইছে:—

"যত্র যোগোজ্জ্বলো গান্ধী
যত্র চৈতে ধনুর্ধরাঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি-
র্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

—"যেখানে যোগে-উজ্জ্বল গান্ধী র'য়েছেন, যেখানে র'য়েছেন এত ধনুর্ধর (অর্থাৎ পশু-প্রবৃত্তি-ধ্বংসকারী ধর্ম-যুদ্ধের সেনা) সেখানে আমার মনে হয়, শ্রী, বিজয়, বৈভব এবং স্থিরনীতি আসবেই আসবে"।

দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বাধীন যুক্ত-রাষ্ট্রের মূল-কারণ—বিখ্যাত বোয়ার-যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মিঃ Erskine Childers তাঁর "War and the Arme Blanche"—নামক পুস্তকের ২১৫-র পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন :—

"The truth came like a flash......that all along we had been conquering the country, not the race; winning positions, not battles."

—বর্তমান ভারতেরও জাতীয় যুদ্ধের দিক দিয়ে, লক্ষকোটি চাইল্ডার্সের মুখ থেকে কি ওই উক্তি পুনরাবৃত্তির যোগ্য নয়?—কিন্তু কেন যোগ্য? তার একমাত্র কারণ, মহাত্মাজীর আত্মিক শক্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আসুরিক পশু-শক্তিকে পরাজিত করে, ধ্বংস করে। মহাত্মাজীর ধর্ম—আদর্শ হিন্দুধর্ম। এবং হিন্দুজাতি মরবার নয়; যা সত্য এবং সত্য-প্রতিষ্ঠ তার মৃত্যু নেই;—তার জয় অবশ্যম্ভাবী।" সত্যমেব জয়তে নানৃতং"!—স্বামী বিবেকানন্দ ব'লে গিয়েছেন, "আমরা ভারতবাসী যে এই দুঃখ-দারিদ্র্য, এবং ঘরে-বাইরে উৎপাত স'য়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে; সেটা জগতেরও জন্য দরকার।"

—কিন্তু ওই "জাতীয় ভাব"টা কি?—নিঃসন্দেহে ধর্ম ভাব। সর্ব্ব কর্ম্মের শেষে "ব্রহ্মার্পণমস্তু"—বলার প্রেরণা, ধর্ম-ভাবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। এই ধর্ম-ভাবই শত বাহুর দ্বারা গান্ধীজীকে আগ্‌লে রেখেছে, তাঁকে শক্তি দিয়েছে, মহান্ হ'তেও মহান্ ক'রে তুলেছে।

কিন্তু আসুরিক শক্তি সাধনার যে-প্রেরণা, পরব্রহ্মে তার বিশ্বাস নেই। সে প্রেরণাকে মহাত্মাজী ঘৃণা করেন,—অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন।

নিট্‌স্কের (Nietzysche) "এ্যান্টি ক্রাইষ্ট" গ্রন্থে লেখা আছে :—

"শুভ কিসে? ক্ষমতার প্রসারে;—ক্ষমতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা যাতে প্রবল হয় তাতে;—মানুষের শক্তি-প্রতাপে। আনন্দ কিসে? ক্ষমতা-প্রসারের অনুভূতিতে;—বাধা-বিঘ্নের অতিক্রমে,—তৃপ্তিতে নয়, অধিকতর শক্তি-অর্জ্জনে;—সর্ব্বস্ব বিনিময়ের শক্তি-লাভে নয়, সংগ্রামে;—ধর্ম্মবলে নয়, কর্ম্মবলে!"

নিট্‌স্কে জার্ম্মাণীকে এই শিক্ষা দিতেন। আসুরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে জার্ম্মাণীর সত্তা তাই ব'লতো, "আমার শক্তি আছে। আমি সেই শক্তির উপর নির্ভর করি। আমার পথে যে প'ড়বে, তাকে দমন ক'রবো। যার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধবে, তার উচ্ছেদ ক'রবো। যুদ্ধই আমার জীবন। বাধা-বিঘ্ন সহ্য ক'রবো না। আমার শক্তির বিস্তার চাই!" আজ সেই জার্ম্মাণীর অবস্থা কি?

এই রকম আসুরিক ভাব প্রবল হ'লেই পৃথিবী দানব-রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু দানব-শক্তিকে শান্ত করবার জন্য, উর্দ্ধে অলক্ষ্য দেবতা সেই বজ্রপানীর সৃজিত ধর্ম-শক্তি শেষে আত্ম-প্রকাশ করে। ইউরোপের বিগত মহাসমরের শেষে, আসুরিক বলের দমনের জন্য আমেরিকার যোগদান তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমেরিকার উক্ত যোগদানের মধ্যে কোনো স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল না। আমেরিকার যোগদানের মধ্যে ছিল ধর্ম-ভাবের প্রেরণা। ক্রুসেডের সময়ে যেমন "God wills it! God wills it!" ব'লে বিভিন্ন জাতি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে, ঈশ্বরের-ই আদেশ পালনের জন্য একত্রিত হ'য়েছিল, আমেরিকা-ও তেম্‌নি ঈশ্বরের কর্ম্ম-ভার নিয়ে ধর্ম্মানুপ্রেরণায় উক্ত মহাযুদ্ধে যোগদান করে। তার ফলে, পৃথিবীর বুকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হ'লো যে, ঐশী শক্তি-ই রিপু-দমনে সক্ষম এবং ঐশী শক্তি-ই প্রাণ-শক্তি। এই ঐশী শক্তির শেষ নেই, কারণ, তা সারা জগতের সকলকার জন্যই অপেক্ষা করে। কিন্তু ঐহিক শক্তি, ঐহিক প্রতিপত্তি কেবল স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অথবা, স্বতন্ত্র জাতির পিছু পিছু ঘোরে। এইজন্যই এর সীমা খুবই সঙ্কীর্ণ, এবং এই কারণেই এর আয়ু স্বল্পকাল স্থায়ী।

জার্ম্মাণ-জাতি অস্ত্র-শক্তিকেই (অর্থাৎ ঐহিক শক্তিকেই) মানব-জাতির শ্রেষ্ঠ সাধনা ব'লে জার্ম্মাণীর শিক্ষা-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করেন। জনৈক জার্ম্মাণ-সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যারণ্ ভন্ ফ্রেট্যাগ্ লরিংহোভেন্ বলেন যে, যুদ্ধের ইচ্ছা মানব-প্রকৃতিগত। সুতরাং যুদ্ধের চেষ্টা করা এবং যুদ্ধের শিক্ষা নেওয়া মানব-জীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া দরকার।

—এই উদ্দেশ্য যে পশু প্রবৃত্তিরই পরিচায়ক, ট্রাইস্কে-ও (Treitschke-ও) সে কথা বোঝেন। তাই তিনি বলেন,—

"কি-সুসভ্য, কি বর্ব্বর, উভয়ের-ই মধ্যে পশুবৃত্তি আছে। মানব-চরিত্রের পাপ যে মানুষের সৃষ্টির সময় থেকেই জন্মগ্রহণ ক'রেছে, বাইবেলের এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। সভ্যতা সে-পাপ দূর ক'রতে পারে না। যতই কেন সভ্য হওয়া যাক না, তা যাবার নয়। পশু-প্রবৃত্তিকে দমন ক'রতে মানুষ কখন-ই পারবে না।"

কিন্তু ট্রাইস্কে-ই বলেন, যে, মানুষের আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন না হ'লে, শক্তি-পূজাতে কোনো মঙ্গল হবে না; ধর্ম্ম-ভাব ভিন্ন আত্মার সংস্কার অসম্ভব! এ-উক্তি, বহুকাল-হ'তে-শোনা, মহাত্মা গান্ধীর অর্থাৎ সারা ভারতের ধর্ম্ম-প্রবণ মর্ম্ম-বাণীর-ই প্রতিধ্বনি নয় কি?

ম্যাট্‌সিনি (Mazzini) তাঁর "Duties of man" ("মানব-ধর্ম্ম)-নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, ধর্ম্ম বন্ধন না থাকলে, বিরোধ ও স্বতন্ত্র-ভাব ঘ'টবেই ঘ'টবে। নির্ব্বিরোধ হ'তে হ'লে লক্ষ্য এক এবং একীভূত হওয়া চাই। এই লক্ষ্য-ই ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত অধিকার আছে সত্য, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাকে ধর্ম্ম-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রতে না পারা যায়, ততদিন সেই অধিকার-রক্ষার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে স্বভাবত-ই অন্য জন বা অন্য জাতি শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়। জাতীয় কিম্বা সামাজিক সংস্কারে ধর্ম্ম-ভাবের দরকার। আমরা এক পিতার সন্তান—এই বোধ জীবনের মধ্যবিন্দু হওয়া চাই। এই ভাব, জীবনের প্রত্যেক অংশে ব্যাপ্ত হওয়া দরকার।……

ইটালীর ম্যাট্‌সিনি ফ্রান্সের Lamennais-এর উপদেশের কথা উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন, "অধিকার-লিপ্সা ও কর্ত্তব্য-পালন—এই দুটী স্বতন্ত্র জিনিষ।"—প্রাপ্তির চেষ্টাতে ত্যাগের ভাব না থাকলে, জাতিগ বিরোধের ইতি হয় না। স্বাধিকার-চেষ্টায় বাধা-বি অতিক্রম করা যায় বটে, কিন্তু তাতে বৈষম্যের সামঞ্জ ক'রতে পারা যায় না,—জাতীয় একতা গ'ড়ে তুলতে পারা যায় না। যে-জাতি স্বাধিকার-প্রসারে আত্ম নিবিষ্ট, সে-জাতির জীবন শোণিত-সিক্ত। এই চেষ্টা শেষ কোথায়? নিবৃত্তি কিসে?…যতদিন বলবান ও দুর্ব্বল—উভয় জাতি জগতে থাকবে, ততদিন স্বাধিকারের প্রসার চ'লতে থাকবে! নির্জ্জীব জাতি ততদিন-ই দলিত হবে!

এই অবদলনের দ্বারা যে-ঐহিক প্রতিপত্তির স্পৃহ জেগে ওঠে, তার-ই সম্বন্ধে ম্যাট্‌সিনি বলেন, "যদি একেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে মেনে নেওয়া হয় তবে বিরোধ নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের ফলে প্রেম-প্রীতি ও আনন্দ-লাভ হয় না।"

বলবান জাতির স্বার্থ-সিদ্ধির প্রধান কৌশল—মুখে বন্ধু-ভাব, কিন্তু, কার্য্যে বৈরী-ভাব দেখানো। এই ঘৃণ্য কৌশলের দ্বারা-ই দুর্ব্বল জাতি দলিত হয় উৎপীড়িত হয়, অপমানিত হয়।……ম্যাট্‌সিনি তাই ব'লেছেন, "যদি মানব মনের অধীশ্বররূপে একটী মহা-মন না থাকেন, তবে অধিকতর বলবান ব্যক্তির আমাদের উপর অত্যাচার ক'রলে, কে সেই অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা ক'রতে পারে? মানুষের রচিত নয় এমন-কোনো পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য নীতি যদি না থাকে, তবে কোন্ আইনের দ্বারা আমরা ন্যায়-অন্যায় বিচার ক'রবো? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার বলে প্রতিবাদ ক'রবো? আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়ে জন-সাধারণকে কি ক'রে আত্মবলি দিতে, স্বার্থত্যাগ ক'রতে আহ্বান ক'রবো? যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের স্বতন্ত্র বুদ্ধি-প্রসূত মতামতের উপর দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে থাকবো, ততদিন আমরা কথায় মিল পেতে পারি। কিন্তু কাজে পাবো না!"

তাই, জন-সাধারণকে পরিচালিত করবার জন্য যে-মহামনের প্রয়োজন, তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে কোথায়?—একমাত্র সেই রাজ্যে, যার অস্থি-মজ্জায়

ধর্ম্ম-ভাব বর্ত্তমান,—অর্থাৎ ধর্ম্ম-রাজ্যে,—দানব-রাজ্যে নয়।......

জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ভাবতেন যে, তিনি যিশু-খৃষ্টের পদ পেয়েছেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁর প্রজাদের ব'লতেন, "আমি তোমাদের রণ-দেবতা। আমি যদি তোমাদের আজ্ঞা দিই, পিতা-মাতাকে হত্যা কর', তোমাদের তৎক্ষণাৎ তা ক'রতে হবে! সে-কাজ ভাল, কি, মন্দ—তা তোমাদের বিচারাধীন নয়। তোমাদের শক্তিতে আমার রাজশক্তি। কিন্তু আমার ওপরে আর কেউ নেই। আমার আজ্ঞা-পালন-ই তোমাদের প্রধান ধর্ম্ম!"

—কাইজারের অভিমত ছিল এই যে, রাজা রাজ্যের জন্য, এবং রাজ্য কেবল রাজা ও রাজনীতির শাসনাধীন থাকবে,—ধর্ম্মনীতির নয়।...

কিন্তু ও-সব হচ্ছে দানব-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য। হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান কিন্তু যুগ-যুগ ধ'রেই ধার্ম্মিক দেশ ব'লে প্রখ্যাত। এখানকার সাধনার চরম লক্ষ্য যিনি, তিনি "একমেব অদ্বিতীয়ম্" সেই পরম পুরুষ। তিনি-ই হিন্দু জাতির নায়ক ও নিয়ন্তা। দুর্জ্জনের সংহারের জন্য যুগে যুগে তিনি মহা-মানবের হৃদয়ে অবতার রূপে আবির্ভূত হন। ম্যাটসিনি এই কথা ইটালীতে প্রচার ক'রেছিলেন। তিনি বলেন :—

"সমস্ত বড় বিপ্লবের ভিতর যে ধ্বনি বেরিয়েছিল, তা ছিল ক্রুসেডের ধ্বনি—"ঈশ্বর সহায় আছেন। ঈশ্বর সহায় আছেন।"—এই ধ্বনি-ই নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ক'রতে পারে।...স্মরণ রেখো, ফ্লরেন্সের শিল্পীরা মেডিচিদের অধীনে নিজেদের জনতান্ত্রিক স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার ক'রে যিশুখৃষ্টকেই জনতান্ত্রিক রাজ্যের নেতা ব'লে অভিষেক ক'রেছিল।"

ফ্লরেন্সের শিল্পীদের মতো সমস্ত ভারতবাসী-ও আজ গান্ধীজীর মধ্যে খৃষ্টের সত্ত্বা অনুভব ক'রে তাঁকেই ভারতের নেতা ব'লে অভিষেক ক'রেছে' কারণ তারাও চায় জন-তান্ত্রিক স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার অর্জ্জনের জন্যই মহাত্মাজী আজ বিদ্রোহী। এ-কথা তিনি নিজেই স্বীকার ক'রেছেন। ইমার্‌সনের-ও একটী বিখ্যাত বাণী আছে—"Wherever a man comes, there comes revolution,"—অর্থাৎ যেখানেই কোনো মানুষ আসে, সেইখানেই আসে বিদ্রোহ। মহাত্মার এ-বিদ্রোহ কিন্তু রাজদ্রোহ নয়। রাজাকে তিনি বন্ধুর মতোই ভালবাসেন। তবে তিনি দুর্নীতি-দ্রোহী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে-ই তাঁর পবিত্র বিপ্লব। হুইটম্যান বলেন, "Produce great persons; the rest follows,"—"মহৎ ব্যক্তিদের সৃষ্টি করো; অবশিষ্টরা অনুসরণ ক'রবে।"...মহাত্মার অহিংস বিদ্রোহকে প্রচার করবার জন্য, জয়যুক্ত করবার জন্য, আজ ভারতের-ও অবশিষ্ট প্রায়-সকলেই মহাত্মাজীকে অনুসরণ ক'রেছেন। মহাকবি গ্যেটে বলেন, "Fortune's greatest gift to man is personality alone."—এই অ-সাধারণ ব্যক্তিত্ব-ই গান্ধীজীর অতুলনীয় সম্পদ। এ-ব্যক্তিত্ব-প্রভাবের কথা শুনলে, 'আসিসি-'র (Assisi-র) ধর্ম্মাত্মা ফ্রান্সিস্-ও বোধ হয় হিংসা না ক'রে পারতেন না। এই ব্যক্তিত্বের দ্বারাই মহাত্মা গান্ধী দুর্নীতির বিরুদ্ধে', পশুত্বের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁর জয়-যাত্রা সুরু ক'রেছেন—ঠিক 'গোলিয়াথে'র বিরুদ্ধে এগিয়ে-চলা ডেভিডের-ই মতো। তাঁর এই কার্য্য কেবল যে ভারতের-ই জন্য, তা নয়;—সারা পৃথিবীর-ও জন্য। ভারতের-ই মাটীতে হয়ত অর্জ্জিত হবে জগতের মুক্তি;—চণ্ড-নীতির উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি; আত্ম-পাপের অনিষ্ট থেকে মুক্তি।

এই মুক্তি-মন্ত্রের দীক্ষা-গুরু তপস্বী গান্ধীজীকে যারা বন্দী করে, ব্যথিত করে, তাদের বিচার কী "তীক্ষ্ণ"! ১৯২২ সালের পবিত্র দোল-পূর্ণিমার দিনে "বিচারের" দ্বারা ছয় বৎসরের জন্য গান্ধীজী কারা-বন্দী হন নি কি? ঠিক এই রকমই আর-এক বিচারার্থীর কথা "বাইবেলে" পাওয়া যায় :—

"লোকেরা যিশুকে বিচারকের (Pilate-এর) কাছে নিয়ে গেল। তারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত ক'রতে লাগলো এই ব'লে,—'আমরা দেখলুম, এই লোকটা জাতিকে কু-পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং সিজারের রাজকর দিতে নিষেধ ক'রছে।' সেই লোকেরা তারপর অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তি নিয়ে ব'ললে, 'এই লোকটা দেশবাসীকে উত্তেজিত করে!'—"

জাতির ধর্ম্ম যত-ই খাঁটী হবে, তত-ই তা উৎপীড়কের ধ্বংস আনবে। এইটাই সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বকালীন সত্য। উৎপীড়করা তা বিলক্ষণ-ই বোঝে। এবং এইজন্যই তারা ধর্ম্ম-সংস্কারককে কারা-বন্দী কিম্বা ক্রুশ-বিদ্ধ না করা পর্য্যন্ত স্থির থাকতে পারে না। দু হাজার বছর আগেও তাই যিশু-খৃষ্ট ক্রুশে হত হ'য়েছিলেন এবং দু হাজার বছর পরেও তাই মহাত্মা গান্ধী কারা-প্রাচীরের আড়ালে বন্দী হন। গান্ধীজীর এ-বন্দীত্ব সাধারণ-বন্দীত্ব নয়। তা বুঝতে পেরেই, গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীর, বিশেষভাবে, আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের দিক থেকে এই রকম প্রশ্ন ও উত্তর ভেসে আসে,—"Does not this prove him to be the Christ of our age?…I should dare to assert that Gandhi was J sus come back to Earth."—(Reverend John Haynes Hol nes, Newyork.)

যিশুর সত্তায়-উজ্জ্বল গান্ধীজী হচ্ছেন কর্ম্মের অবতার। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত যোদ্ধ-কর্ম্মী স্পার্টাকাস্ কিম্বা অলিভার্ ক্রম্ওয়েলের তুলনা হ'তে পারে না,—যেমন হ'তে পারে—জেনারেল্ বুথের সঙ্গে জেনারেল্ ফচের (Foch-এর)। এর একমাত্র কারণ, গান্ধীজীর সারা অন্তর ভ'রে আছে বেদ ও বাইবেল্,—কৌশল নয়। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, কৌশল অর্থাৎ মস্তিষ্ক-শক্তির দিক দিয়ে, রুষ-বিপ্লবের নেতারা মহাত্মাজীকে ছাপিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা-ও আর-ও সত্য যে, নৈতিক শক্তির দিক দিয়ে, উক্ত নেতাদের স্থান—মহাত্মাজীর অনেক নীচে।…নৈতিক শক্তি ও মস্তিষ্ক-শক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। নৈতিক শক্তি জাতিকে মহৎ ক'রে তোলে। কিন্তু মস্তিষ্ক-শক্তি জাতির অন্তরে নিয়ে আসে কুটিলতা, চক্রান্ত, পাপ। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি প্রজা-শাসনের ব্যাপারে এই পাপ থেকে মুক্ত নয়। তার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :—

একবার "রয়টারের" খবরে বেরিয়েছিল,—"আকালী-দের (Jakakil tribe-এর) বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কার্য্যগুলি খুব-ই সফল হ'য়েছে। উক্ত লোকদের দিকে ষোলোটি "এরোপ্লেন" বোমা ফেলেছিল এবং কলের কামান ছুঁড়েছিল। তাতে পুরুষ (men) এবং গৃহ-পালিত পশু প্রচুর-পরিমাণে নষ্ট হ'য়ে যায়।…এরোপ্লেন্-গুলো শেষে তাদের আশ্রয়ে ফিরে গেল—সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়।"

—বোমা এবং কলের কামানের দ্বারা কেবল যে পুরুষ ও পশুরা-ই হত হয়,—নারী ও ছোট ছেলে-মেয়েরা হয় না,—"রয়টারের" খবরে এইটাই কি তা হ'লে বুঝতে হবে?…যাই হোক, রাষ্ট্রীয় শাসনের অন্যতম রূপ এই রকম-ই? এইজন্যই ধার্ম্মিক সত্তা যুগে-যুগে ব্যথিত হয়, চঞ্চল হয়, "বিদ্রোহীও" হয়। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ কোন্ অ-সতর্ক মুহূর্ত্তে-নেওয়া তাঁর খেতাব ব্রিটিশ-রাজকে ফিরিয়ে দেন। এইজন্যই দু'হাজার বছর আগে থেকে আরম্ভ ক'রে আজও পর্য্যন্ত যিশু-খৃষ্টের বাণী, ভর্ৎসনার স্বরে ব'লে বেড়ায়, "Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell!"—"হে সর্পের দল! বিষধরের বংশধর! কি ক'রে তোমরা নরকের অনন্ত শাস্তি এড়িয়ে যাবে!"

মহাত্মা গান্ধী বলেন, "অ-প্রতিরোধ (Non-resis tance) সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজনীয়। লোকেরা যদি হিংসাশ্রয়ী হয়, তা হ'লে সমস্তই নষ্ট হবে, কারণ, তখন-ই হবে ভারতের মৃত্যু!" এইজন্যই অমৃতসর-হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল্ ডায়ারের জন্য তিনি শাস্তি প্রার্থনা করেন নি। তাঁর মহান্ আদর্শ হচ্ছে এই, "আমরা অবশ্যই আমাদের শত্রুকে ভালবাসবো।"—এই পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়েই, মহাত্মা গান্ধী উপবাস করেন, ঈশ্বরের কাছে সক্ষণ প্রার্থনা জানান ঠিক সেই সময়ে, যখন তাঁর কোনো অনুচর হিংসার পথে যায়, পাপ করে। পৃথিবীতে এ-জিনিষ কি কোনোদিন ইতিপূর্ব্বে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছিল? স্বর্গ ব'লে যদি কোনো-কিছু থাকে, ত, তা কি এর মধ্যেই নেই?

…মহাত্মাজীর অহিংসা-নীতি তাই আজ পৃথিবীর কাছে এত বড় হ'য়ে উঠেছে। এই অহিংসা-নীতিরই প্রধান অঙ্গ অসহযোগ-পদ্ধতির দ্বারা ব্রিটিশ-দ্রব্য কিম্বা বিদেশী-দ্রব্য-বর্জ্জনের কথাকে বোঝায়,—তা ব'ললে, ভুল বলা হবে। অসহযোগ'-অর্থে অ-সম্মতিকে বোঝায় না। 'অ-সহযোগ' জাতির মধ্যে নিয়ে আসে আত্ম-চেতন,—যে-আত্ম-চেতন যে-কোনো বিদেশী আক্রমণ-

কারীর সঙ্গে মেলামেশা ক'রতে অনিচ্ছা জানায়। বিগত মহা সমরের সময় জার্মানীর "কাইজার" যদি বাকিংহাম-রাজপ্রাসাদে এসে থাকতেন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টারে তাঁর মন্ত্রী আইনের উপর কর্ত্তৃত্ব ক'রতেন, তা হ'লে, ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁদের সঙ্গে কি-রকম সম্বন্ধ রাখতেন? নিঃসন্দেহে যে-সম্বন্ধ বর্ত্তমান ভারত ব্রিটীশ-গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রেখেছে, তা-ই। এইটাই 'অসহযোগ'-কথাটার একমাত্র ব্যাখ্যা। এর-ই সচেতনতায় বষ্টনের এক চায়ের "পার্টি"-তে আমেরিকান ঔপনিবেশিকেরা একদিন ব্রিটিশ-চা বষ্টন-বন্দরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এরই সচেতনতায় ফ্রান্সের জন-সাধারণ অত্যাচারী নৃপতি চতুর্দ্দশ লুই-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। এর-ই সচেতনতায় আমেরিকায় যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়, রাশিয়ার "জার্" রাজ্যচ্যুত হয়, দক্ষিণ-আফ্রিকার নিপীড়িত ভারতীয়রা তাদের প্রার্থিত অধিকার ফিরে পায়। এবং এর-ই সচেতনতায় আজ ভারতের ঘরে-ঘরে মাতৃ-পূজার মতো চরকার পূজা চ'লেছে—পবিত্র প্রেরণার ভিতর দিয়ে। এই চরকা-ই গান্ধীজীর রাজনৈতিক অর্থাৎ ধর্ম্মনৈতিক শক্তি।—"কারখানার বিপুল ব্যবস্থা তুলে দিয়ে কোনো রকম কুটীর-শিল্পের আয়োজন করা ভাল'—এই যুক্তির চিন্তাশীল দার্শনিক জন্ রাস্কিন বেঁচে থাকলে, আজ গান্ধী-আশ্রয়ী ভারতবাসীর তেত্রিশ কোটী চর্কার কাজ দেখে' নিশ্চয়ই বিস্মিত, বিমুগ্ধ এবং প্রীত না হ'য়ে পারতেন না! এই চরকার কাছেই আত্মবল পাওয়া গিয়েছে ব'লেই, ভারতের আত্মা আজ দৃঢ় স্বরে আব্রাহাম্ লিনকনের স্মরণীয় বাণীর পুনরাবৃত্তি ক'রে ব'লতে পারছে:—"This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing Government, they can excercise their constitutional right of amending it, or their revolutionary right to dis-member or overthrow it."—"সমস্ত বিধি-বিধান সমেত—এই দেশের অধিকারী তারাই, যারা এখানে বসবাস করে। যখনি তারা বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর প্রতি বিরক্ত হ'য়ে উঠবে, তখনি তারা তার সংশোধনের জন্ত নিয়ম-তান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ক'রতে পারবে, কিম্বা তাকে ছিন্ন-বিছিন্ন অথবা বিনষ্ট করবার জন্ত প্রয়োগ ক'রতে পারবে বিদ্রোহাত্মক অধিকার।"

ওই নিয়ম-তান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ক'রেও, আয়ারল্যাণ্ডে প্রতিশ্রুত গ্ল্যাড্ষ্টোনী সেলফ্ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয় নি ব'লে, আইরিশ "সিন্ফিন্" দলের সৃষ্টি হয়। এবং ওই নিয়ম-তান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ক'রেও, ভারত বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সংশোধন ক'রতে পারেনি ব'লেই আজ বিদ্রোহী! ভারতের এই বিদ্রোহ-বাদই গান্ধীবাদ। পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ যে-ছুটী জিনিষ সকলের চেয়ে বেশী ভেবে দেখবার যোগ্য হ'য়েছে, তার একটী—বল্শেভিক্-বাদ, এবং আর একটী—এই গান্ধীবাদ। মার্কের নীতি রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর যেটীর জন্ম হয়—তার নাম বল্শেভিক্-বাদ;—এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজীর যে-পন্থায় অপমানকর "এসিয়াটিক্ নীতির" উচ্ছেদ হয়, তার নাম—গান্ধীবাদ। ছুটীর-ই আদর্শ এবং লক্ষ্য—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। কিন্তু ছুটীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথমটী চায়—শত্রুর ধ্বংস; দ্বিতীয়টী—শত্রুর সংশোধন! প্রথমটী—নাস্তিক; দ্বিতীয়টী—ঈশ্বরে পরম বিশ্বাসী! প্রথমটী রণক্ষেত্রে রক্ত নিয়ে মুক্তি পেতে চায়; দ্বিতীয়টী—ধর্ম্মক্ষেত্রে রক্ত দিয়ে মুক্তির আশা করে।

জার্ম্মাণীর ভন্ মল্কি (von Moltke) এক "শান্তি-বৈঠকে" ব'লেছিলেন,—"যুদ্ধ পুণ্যকার্য্য, বিধাতার বিধান। এই পুণ্য-বিধানে জগতের শাসন চ'লছে। যুদ্ধ হচ্ছে মানব-প্রকৃতির মহত্ত্ব ও উন্নতির উপায়। তাতেই মনুষ্যত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, সাহস, বদান্যতা-প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এক কথায়, অত্যন্ত নীচ, হেয়, বৈষয়িক ভাব থেকে তা মানুষকে উদ্ধার করে।"

—জার্ম্মাণ-সংস্কারক মার্টিন্ লুথার্-ও বলেন, "......it (war) is a business, divine in itself, and needful and necessary to the world as eating or drinking, or any other work."—("Germany and the next war" By General F. von Bernhardi. Page 54) অর্থাৎ, "যুদ্ধ জিনিষটী আপনাতে-আপনি স্বর্গীয়, এবং এটী,

খাওয়া, পান করা কিম্বা অন্য-কোনো কাজের মতো পৃথিবীর কাজে প্রয়োজনীয়।"

জার্ম্মাণ-জেনারেল্ বার্ণহার্ডি আর-ও স্পষ্ট ক'রে বলেন,—'ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বোচ্চ সাধনা' এবং 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো দেখ'—এই দুটী কথা রাজ-তন্ত্রে খাটে না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি নিজের জন্য। তা কখনোই শাসন-তন্ত্রের জন্য হ'তে পারে না। যিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী।"

বর্ত্তমান-অষ্ট্রিয়া-ও এই ভাবাপন্ন। সেখানকার-ও মত এই যে, "Human communities have no conscience" এবং "উদ্দেশ্য-সাধনে সব পন্থাই সাধু।" ...জার্ম্মাণীর বার্ণহার্ডি যেমন বলেন যে, যুদ্ধ হচ্ছে biological necessity অর্থাৎ জৈবিক প্রয়োজন, অষ্ট্রিয়ার নীতি-বৈজ্ঞানিক-ও তেমনি বলেন যে, রাজনীতিক্ষেত্রে বল-প্রয়োগ অনিবার্য্য।

এই সব আসুরিক মনোভাবের কি উচ্ছেদ হবে না? দানবীয় মনোবৃত্তির পাপে-পঙ্কিল জার্ম্মাণীর ভিতরে ঈশ্বরের ধর্ম্ম-নিয়ে-আসা মহামন কান্টে-র (Kant-এর) বাণী কি পাশব-পৃথিবীর চারিদিক থেকেই শোনা যাবে না,—"ঐশী-প্রকৃতির পূর্ণ সাগর থেকে প্রকাশ-হওয়া অন্তর্নিহিত এক পবিত্র উৎস থেকে মানুষ নিজের শক্তি-লাভ করে, তাই মানুষ কর্ত্তা। তাই সে নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছা পরিচালনের নিয়ম পায়। মানব-হৃদয়ের জ্ঞান-ই ঈশ্বর-উদ্ভূত। যা ন্যায়, তা-ই পবিত্র। এই নীতিধর্ম্ম রাজার-ও প্রাপ্য। তাঁকে তা নতজানু হ'য়ে নিতে হয়।"

ঈশ্বরকে উপেক্ষা ক'রে দানবকে প্রাধান্য দেওয়া, মূর্খতা হতেও মূর্খতার কাজ। যে-ইটালীতে ম্যাট্‌সিনী জ'ন্মেছিলেন, সেই ইটালীতেই জ'ন্মেছিলেন গ্যারিবল্ডি। ম্যাট্‌সিনী ইটালীকে দিতে চেয়ে ছিলেন ঈশ্বরের ধর্ম্ম,—অহিংসা, প্রেম, আত্মিক উন্নতি। কিন্তু গ্যারিবল্ডি ইটালীকে দিয়েছিলেন, অস্ত্রের আসুরিক প্রবৃত্তি,—হিংসা, ক্রূরতা, সামরিক উন্নতি। গ্যারিবল্ডির কাছে ইটালী ব'লতে বোঝাতো কেবল ইটালীর রাজা ও রাজার অনুচরবর্গকে। কিন্তু ম্যাট্‌সিনীর ইটালীতে ছিল—ইটালীর গরীবরা, চাষারা, শ্রমিকরা—সাধারণ সকলেই; —ইটালীর রাজা-প্রভৃতি সেখানে প্রজাদের দাস মাত্র। কিন্তু গ্যারিবল্ডির অস্ত্র-দীক্ষায় ইটালীর বাহ্যিক অর্থাৎ বহিঃশত্রুর বিপদ কাটলেও, তার অন্তরের বিপ্লব থেমেছে কি? আজও সেখানকার অবহেলিত শ্রমিক-শ্রেণীর ক্রুদ্ধ-অভিমান থেকে' থেকে' গর্জ্জন ক'রে ওঠে, বিদ্রোহী হয়। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির দীক্ষার ফল, অবহেলাকে আনে না; বিদ্রোহ তাই তখন প্রেমের মূর্ত্তি ধ'রে উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইটালী ম্যাট্‌সিনীকে উপেক্ষা ক'রেছিল।

ম্যাট্‌সিনী ব'লতেন,"আমাদের জাতির ভিতরে ধর্ম্মভাব ঘুমিয়ে আছে; তা জাগ্রত হবার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। রাশি রাশি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার করার চেয়ে যিনি সেই ঘুমন্ত ধর্ম্মভাবকে জাগিয়ে দিতে পারবেন, তিনি-ই জাতির অধিকতর উপকার ক'রবেন।"—এই কথার দ্বারা ম্যাট্‌সিনি প্রকারান্তরে জানাতে চেয়েছিলেন যে, ধর্ম্মনীতির মধ্যেই রাজনীতি কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আছে; এবং রাজার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য; সুতরাং ধার্ম্মিক না হ'লে, অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিশ্বাসী না হ'লে, রাজনীতি-ই হোক, আর যে-কোনো নীতি-ই হোক, কিছুর-ই জ্ঞান অর্জ্জন করা যাবে না।

আজ মহাত্মাজীর কণ্ঠ-ও সারা ভারতে কেবল একটী বাণী-ই প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।"—"তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্।"—"জ্ঞান সত্য; ব্রহ্ম অনন্ত।"—"তাঁকেই সাধনা কর, তাঁকেই সাধনা কর।"—"নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ":—ভক্তদের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়াদির ভেদ নেই। জাতি যদি সেই ব্রহ্মের কাছে সত্যকার প্রার্থনা জানায়, তা হ'লে,

'সিদ্ধো ভবতি
অমৃতো ভবতি
তৃপ্তো ভবতি'।

এই আদর্শ-ই গান্ধীজীকে মহৎ ক'রে তুলেছে। এই আদর্শের-ই মধ্যে আছে গান্ধীজীর রাজনৈতিক আধ্যাত্মিকতা। ১৯৩০ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকাতে ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে

সভাপতি মিঃ এ, আর, ওয়াদিয়া, গান্ধীজীর দার্শনিকতা সম্বন্ধে যা ব'লেছিলেন, তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই :—

"ভারতীয় দার্শনিকতার দিক দিয়ে যে-জিনিষটী আজকাল সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হ'য়ে প'ড়েছে, তা হচ্ছে—ভারতীয় ও ইউরোপীয় দার্শনিকতার একত্র-সমন্বয়। এই সমন্বয় আমরা পাই—মহমানব গান্ধীর কাছে। বহু শতাব্দীর পর আমরা আমাদের মধ্যে গান্ধীজীকে পেয়েছি—গুরুর মত, যিনি কেতাব থেকে বাক্য উল্লেখ ক'রে আনন্দ পান না; কিন্তু জীবনের সামনে এগিয়ে যান এবং চিন্তা করেন ও শিক্ষা দেন। আজকালকার দিনে রাজনীতি সকলের চেয়ে দরকারী জিনিষ হ'য়ে প'ড়েছে। এবং আরও দরকার হ'য়েছে এমন-একটী গুরু, যিনি দেশের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে রাজনীতিকে উচিৎ-পথে নিয়ে আসবার বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। রাজনীতিকে নৈতিক আকার দেওয়া অধিকাংশ রাজনীতিবিদের কাছে স্বপ্নের মতো ছিল। আজ এটীকে বাস্তবে পরিণত করা-ই মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য হ'য়ে প'ড়েছে। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা স্বল্পকাল-স্থায়ী নয়; তা সার্ব্বভৌমিক!

"আমাদের অতি পুরাণো শাস্ত্রগুলি যদি মহাত্মা গান্ধীর কাজে না আসে, তা হ'লে গান্ধীজী বোধ হয় শাস্ত্রের সমস্ত মাহাত্ম্যের কথাকেই উড়িয়ে দেবেন; এবং এইদিক দিয়ে তিনি সনাতন হিন্দু-'দর্শন'-শাস্ত্রের "শব্দ-প্রমাণ"কেও ছাপিয়ে অনেক দূরে চ'লে গেছেন। গান্ধীজী জন্মদান ক'রেছেন—চিন্তা করবার এক অভিনব যুগের! এই যুগের তিনি সৃষ্টি ক'রেছেন এমন একটী শ্রদ্ধা-নম্র ভক্তের প্রেরণায়, যে-ভক্ত কেবল যে বেদের মহিমা-ই বিশ্বাস করেন, তা নয়।—বাইবেল, কোরাণ এবং জেণ্ড্ আভেস্টাকে-ও (Zend Avesta) বেদের মতো ঈশ্বরের প্রেরণা উদ্দীপ্ত ব'লে মনে করেন।

"ঠিক মতো কাজ ক'রলেও যে তার উপর বিশ্বাস করা যায় না' এ-ধারণা গান্ধীজীর কাছে অমূলক হ'তেও অমূলক। কাজ-করার এই সাহস নিয়েই তাই তিনি ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়েছেন, এবং ভারতের জন্য তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে-কাজ ক'রেছেন, তা হচ্ছে এই যে, তিনি ভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রেছেন এবং নিজের মধ্যে এটীকে জয় ক'রেছেন, ও অপর সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন—এটীকে জয় করবার জন্য। আমাদের দেশে পুলিস, সৈন্য, জনমত, সমাজ-চ্যুতি ভূত, ছায়া ইত্যাদি জিনিষ থেকে উদ্ভূত ভয়ের-দ্বারা-কম্পিত লোকদের কাছে উক্ত শিক্ষা বড় কম কাজ করেনি। গান্ধীজীর স্নেহ-প্রবণ অন্তরের প্রগাঢ়তা, তাঁর শান্তিমাখা হাসি যেন জীবন্ত চুম্বকের মতো সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধাকে তাঁর কাছে টেনে আন্‌ছে। ঈশ্বরের আনন্দ তাঁর মুখে ঝল্‌মল্ ক'রছে এবং তাঁর অন্তরে পূর্ণ হ'য়ে আছে।

"খাটী নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার দিক দিয়ে, বৌদ্ধ যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে একমাত্র কবীর ছাড়া আর-কোনো ভারতীয়-ই গান্ধীজীর মতো অত প্রাধান্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। কর্ম্ম-ই হচ্ছে গান্ধীজীর ধর্ম্ম। এই কর্ম্ম-ই হচ্ছে ব্যবহারিক আদর্শ-স্থল, যা কেবল সাধু-যোগীদের-ই জন্য তৈরী হয়নি,—সর্ব্ব সাধারণের-ও জন্য।

"ধর্ম্ম-জগতে গান্ধীজীকে কোনো মৌলিক প্রতিভা রূপে ধ'রতে পারা যায় না। কিন্তু তা হ'লেও, ধর্ম্মের ভিতরকার সত্যটীর জন্য তাঁর আন্তরিক অনুসন্ধান-ই হচ্ছে একটী প্রেরণা-দীপ্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর হিন্দুত্ব, সাধারণ হিন্দুয়ানী হ'তে অনেক গভীর, অনেক বিনীত! তা থেকে চারটী প্রধান জিনিষ পাওয়া যায় :—

"হিন্দু-ধর্ম্মকে গ্রহণ; রীতিমত বৈদিক ভাবাপন্ন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে বিশ্বাস; গো-রক্ষায় বিশ্বাস; চতুর্থতঃ তিনি বলেন যে, প্রতিমা পূজায় তাঁর অবিশ্বাস নেই। মানুষের ভিতরে তিনি ঈশ্বরকে দেখেন। তিনি চান, লোক যেন পাপ্‌কে ঘৃণা করে, পাপীকে নয়। জেনারেল্ ডায়ারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাই তিনি বলেন, 'তিনি যে-কাজ ক'রেছেন, সেটাকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু তিনি যদি কখনো অসুস্থ হ'য়ে প'ড়তেন, তা হ'লে আমি তাঁর কাছে যেতুম এবং তাঁর সেবা করতুম।'

"সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা-বৃত্তি গ্রহণের উপদেশের মধ্যে গান্ধীজীর একটী রাজনৈতিক দার্শনিকতা আছে। জাতীয় সঙ্ঘের (League of Nations) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ বড় সুন্দর স্থান পাবে, কারণ, যে-কোনো "ষ্টেট্"-ই অনবরত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকবে, "লীগ্" তার সঙ্গে

সহযোগীতা বন্ধ ক'রে দেবে। কলহকারী অত্যাচারীদের সঙ্গে "লীগে"র প্রত্যেক সভ্য ব্যবসা বন্ধ ক'রে দেবে, ঋণ-দেওয়া কিম্বা মাল-সরবরাহ বন্ধ ক'রবে এবং তাদের সামনে এগিয়ে আসবে—বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ভাব নিয়ে। এই ব্যাপার ঘটবার প্রভাতোদয় খুব শীগ্‌গির-ই হবে। তখন জাতির সঙ্গে জাতিকে যে-নৈতিক সূত্র জড়িয়ে রাখে, তা বাণিজ্যের দ্বারা যেন-তেন প্রকারেণ ধনী হবার ইচ্ছার চেয়েও মানুষের চোখে অনেক মূল্যবান ব'লে বোধ হবে। এবং এই বিষয়ে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও দার্শনিকতা ভবিষ্যতে রীতিমত কাজ ক'রবে।

"গান্ধীজীর নির্ভীকতা ও অত্যাচার-থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টা বাস্তবিক-ই একটা জীবন্ত প্রেরণা।

"যে-আচারানুগত ধর্ম্ম, মানুষকে পরমাত্মা থেকে দূরে রেখেছে, সেই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য মানব-জীবনের চরমোদ্দেশ্য নৈষ্ঠিক জীবনের প্রতি-ই মহাত্মা বেশী জোর দিয়েছেন। এইটী-ই মঙ্গলের কারণ; এবং এই সবের জন্যই ইতিহাসে গান্ধীজী বীর-বরেণ্য হ'য়ে থাকবেন।"

...এই নৈষ্ঠিক জীবন গঠনের জন্যই যিশুর বাণী একদিন মধুর নম্রতায় ঝ'রে প'ড়েছিল। এইজন্যই আরবের মহম্মদ, মিশরের মুশা, ভারতের বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ শুদ্ধির মন্ত্র বিলিয়ে ছিলেন। কিন্তু সারা জগতের দিক দিয়ে তাঁরা যে-কাজ অ-সমাপ্ত বা অর্দ্ধ-সমাপ্ত ক'রে গিয়েছেন, গান্ধীজী সেইটীকেই আজ সম্পূর্ণ ক'রতে এগিয়ে চ'লেছেন। দু' হাজার বছর আগে 'সারমন্ অন্ দি মাউণ্ট্'—যা কেবল আদর্শের-ই সামগ্রী ছিল, দু হাজার বছর পরে মহামানব গান্ধী সেটীকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ ক'রেছেন—শুধু নিজের জন্য নয়,—শুধু ভারতের জন্য নয়,—সারা বিশ্বের-ও জন্য। মুখে তাঁর এক-মন্ত্র :—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

—রাজনৈতিক ধর্ম্মনীতি, অথবা, ধর্ম্মনৈতিক রাজনীতির দিক দিয়ে গান্ধীজীর এ-আদর্শ বেদের মতোই পবিত্র নয় কি? *

আগমন

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

কবিতা

পথ মাঝে দেখা হ'ল ছায়ার তলে।
আঁখি তার অনিবার মায়া উথলে।
কণ্ঠেতে ছিল তার
একখানি ফুল হার,
দিল সেটী উপহার
আমারি গলে।
বীণা মোর ছিল ম্লান,
যেন সে আকুল-প্রাণ
ভুলে গেছে সব গান
নয়ন-জলে।
তারে নিল কম-ক'রে,
রাখিল বুকের 'পরে
বাজালো নিপুণ স্বরে
লীলার ছলে।
এসেছিল ক্ষণ তরে
বিদ্যুত-রূপ ধ'রে—
আলো ঢালি থরে থরে
পলে-বিপলে।

---

* লেখকের যন্ত্রস্থগ্রন্থ 'গান্ধীজী' হইতে।

বেসুরা গান

গল্প

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়

মিউনিসিপ্যালিটির দেওয়া পথের ওপর আবর্জ্জনা জমা করবার পাত্রটি সেদিন বেশ রীতিমত ভাবেই ভরে উঠেছিল, পাশের বাড়ীর উৎসবে, আনন্দভোজের স্মৃতিচিহ্ন উচ্ছিষ্ট পাতা, খুরী আর মাটীর গেলাসে। সকালবেলাতেই একটা কুকুর এসে সেই আবর্জ্জনার পাত্রটির ওপর সামনের পা দুটি তুলে দিয়ে, দুখানা পাতা আর একটা গেলাস নিয়ে টানাটানি করছিল। পাশে দাঁড়িয়ে একটা বছর বারোর ছেলে আর বছর দশেকের একটী মেয়ে সেই কুকুরের মুখের কাছ থেকে লুচির টুকরো কিংবা খুরী নিয়ে তাতে যে একটু ক্ষীর লেগেছিল, পরম আনন্দে তাই জিভ দিয়ে চেটে খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে সেই কুকুরটীকে তাড়িয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল।—

হঠাৎ একসময়ে একখানা আলুর সঙ্গে একটা মাছের টুক্‌রো পেয়ে মেয়েটী আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বলে উঠল—"এই দেখ বিশে, আমি একখানা কত বড় মাছ পেয়েছি—ভাঙ্গা নয় একেবারে আস্তো···"ধূলো কাদামাখা কালো মুখখানার চেহারা, তার বিস্মিত চোখের দীপ্তিতে একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিশে একবার লোলুপ দৃষ্টিতে মঙ্গলার হাতের মাছের টুকরোর দিকে চাইতেই মঙ্গলা সেখানা একগালে পূরে, মুখখানাকে বিকৃত করে, সেই কাঁটা শুদ্ধ মাছখানা পরম তৃপ্তিভরে চিবোতে সুরু করে দিলে।

আধখানা পটোলভাজা খেতে খেতে, বিশে সেই আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্য থেকে আবিষ্কার করলে সন্দেশ-মাখা আধ-গেলাস দই।

"এই ত্যাখ্ সন্দেশ" বলে সে একহাতে মাটির গেলাসটি ধরে, আর এক হাত দিয়ে অল্প করে দই নিয়ে মুখে দিতে লাগল। মঙ্গলা একটু কাতর সুরে একবার বললে—"আমায় একটু দে না ভাই,—একটু সন্দেশ—শুধু আমি তোকে একটা মাছ পেলেই দেব······

'বয়ে গেছে আমার—তুই তখন দিয়েছিলি ?'···বলে সে বাকী দই টুকুতে চুমুক দিয়ে গেলাসটা মঙ্গলাটার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—"নে,যা লেগে আছে ঐটুকু খেয়ে নে··"

মঙ্গলা ক্ষুন্নমনে গেলাসটী তুলে নিলে।—মধ্যে মধ্যে লুচি, আলুর টুকরো আর যা কিছু পাওয়া যায়, তাই সংগ্রহ করে দুখানা পাতায়, দুজনে জমা করছিল। একটু মাছ আর তরকারীলাগা মাছের একটা মোটা কাঁটা নিয়ে মঙ্গলা যেই পাতে রাখতে যাচ্ছিল, বিশে বলে উঠল—এইবার ত পেয়েছিস মাছ—কৈ দিলি না···

"এটা ত কাঁটা···মাছ পেলেই দেব'···

'যাঃ আর চাই না···এই ত্যাখ আমি কতটা ক্ষীর পেয়েছি" বলে দুহাত দিয়ে একখানা কলাপাতা নিয়ে সে-বিপুল উৎসাহে চাটতে লাগল।

এই নে তুই মাছের কাঁটা···আমার একটু ক্ষীর

আচ্ছা আবার যদি পাই বলে সে নিজের কাজে ব্যাপৃত হল।

ঝন ঝন করে ময়লা-ফেলা গাড়ী এসে হাজির হল। ক্ষুন্ন মনে সংগৃহীত উচ্ছিষ্ট নিজের নিজের ময়লা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে তারা সেখান থেকে চলে গেল। পথে যেতে যেতে বিশে বল্‌লে, দুপুর বেলায় দুটি গরম ভাত পেলে, তার সঙ্গে এই সব তরকারী যা লাগবে······"

'আমায় কিন্তু তুই একটুও ক্ষীর দিলি না···আচ্ছা ক্ষীরটা কি খুব ভালো—দইএর চেয়েও ?"

'ও সে যা ঢের বেশী ভালো···আচ্ছা আজ ত বেশী খরচ হবে না—গোটাকতক পয়সা পেলে বিকাল বেলা না হয় তোকে দু-পয়সা ক্ষীর কিনে দেব খন কেমন ?

সত্য দিবি ত তাহলে ?···মঙ্গলার মুখে আশার আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠ্‌ল।

* * *

ভিক্ষা করে দুজনেই.—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। ঘুরে বেড়ায় পথে পথে লোকের দ্বারে দ্বারে, পথের কুকুরের মত, আর সন্ধ্যাবেলা গিয়ে ওঠে একটী বস্তীতে। এই বস্তীই তাদের ঘর-বাড়ী। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক দূরসম্পর্কের মাসী। এই বস্তীরই আশে-পাশে দু' এক বাড়ীতে কাজ করে যা' কিছু পায় আর এই বিশে-মঙ্গলার ভিক্ষা-করা পয়সা নিয়ে কোনওভাবে অনাহারে অর্দ্ধাহারে তাদের দিন কেটে যায়।

লোকে কিন্তু বলে বিশের এই মাসীর হাতে পয়সা আছে। বুড়ী থাকে দিনরাত একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে—নূতন কাপড় আর তার বরাতে জোটে না। মঙ্গলা বিশে যা আনে, তার মধ্য থেকেই বুড়ী কিছু সরিয়ে রাখে তার ভবিষ্যতের আশায়। সর্ব্বদাই মনে এই ভয় কোন দিন হয় ত এই বিশে-মঙ্গলা তার দিকে আর চাইবে না—তাকে ছেড়ে অন্য কোথায় চলে যাবে।

ভিক্ষা করার সেদিন আর বিশেষ চাড় ছিল না। নেহাৎ মাসীর ভয়···তাই চারটি মাত্র পয়সা হতেই দুজনে বাড়ী ফিরল—কাপড়ের খুঁটে তখনও তাদের সেই আদরের সংগ্রহ করা সামগ্রী। বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই বিশে বলে উঠল—"ও মাসী ভাত হয়েছে, ভাত দে শীগ্‌গির—"

মাসী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"নবাবপুত্তুর বাড়ী এলেন! ভাত দে না! কোথায় পাবো ভাত ? কাল পয়সা বিকেলে এনেছিলি ? খাবি কি দিয়ে ?

বিশের আজ বুক বাঁধা। সে আজ আর মাসীর কথায় বিচলিত না হয়ে বললে—"তুই শুধু ভাত দে না—তরকারী,—দেখ না-আজ কতকি এনেছি তোর জন্যে··· মাছ ডাল-অম্বল—লুচিও আছে···

মাসীর স্বরটা হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে নরম হয়ে গেল সত্যি, নাকি ? তা বললি না কেন আগে—তাহলে ত···

মঙ্গলা ভরসা পেয়ে বললে—আমিও অনেক এনেছি মাসী এই ছাখ আবার তোর জন্যে একখানা আস্তো লুচি এনেছি—

মাসীকে প্রসন্ন দেখে, বিশে মঙ্গলাকে কানে কানে বললে "এই আজ যে পয়সা পেয়েছিস, সে কথা আর মাসীকে বলিস নি। মাসী এবেলা পেলে আবার বিকেলে বেলা পয়সা চাইবে···

মঙ্গলা চাপা গলায় পরম উৎসাহে বলে উঠল—"বিকেল-বেলা আমায় ক্ষীর কিনে দিবি ত ঐ পয়সায়···"

'আচ্ছা' বলে সে তাকে একেবারে চুপ করতে আদেশ করলে।—

উপাদেয় তরকারী দিয়ে, মহা আনন্দে তাদের তিন-জনের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব্বটা সমাধা হয়ে গেল।

সন্ধ্যা তখনও হয় নি।

সবে মাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে, রাস্তায় কাদা হয়েছে। মটরের চাকা থেকে কাদা উঠে, পথের লোকের জামা-কাপড় চিত্রিত হয়ে উঠছে। ট্রামের ধারে দাঁড়িয়ে বিশে ভিক্ষা করে মঙ্গলাও থাকে কাছে-কাছেই। একটি বাবু ছুটে এলেন একখানা ট্রাম ধরতে; বিশে তাকে সামনে পেয়ে বলে উঠল, "বাবু একটি পয়সা··· তোমার ভালো হবে বাবু—সারাদিন কিছু খাই-নি বাবু," একটি পয়সা বলে তার পিছনে ছুটতে লাগল।

তাকে পাশ কাটিয়ে ট্রামে চড়তে গিয়ে, পাশের একখানি বাসের চাকা থেকে একটু কাদা এসে লাগল বাবুটির পায়ে—রাগটা কাজে কাজেই পড়ে গেল সামনের ওই ছেলেটার উপর—তার অদৃষ্টে জুটল বাবুটির ছড়ির একটি আঘাত।—বিশে গজ গজ করতে করতে ফিরে গেল।

রাস্তার আলো সবে জলে উঠেছে। দুজনে বাড়ী ফেরবার জন্য উদ্যোগ করলে। ভালো জামা-কাপড় পরা একটি ছোকরা বাবুকে দেখে, মঙ্গলা নাচতে নাচতে তার কাছে গিয়ে একেবারে তার পাম্প-সু-টাকে দুহাতে চেপে ধরে বলে উঠল—"একটি পয়সা দাও, দোহাই

রাজাবাবু—তোমার চাঁদের মত ছেলে হবে রাজাবাবু—হে বাবু……

দু' একবার সে লোকটি আপত্তি জানিয়ে আগাবার চেষ্টা করলে কিন্তু পা ছাড়িয়ে যেতে পারলে না। শেষে বিরক্ত হয়ে পকেটে হাত দিয়ে, যা পেলে সেটা মঙ্গলার হাতে দিয়েই বললে, নে—দে ছেড়ে দে শীগগির…

তোমার ভালো হবে রাজাবাবু—বলে পা ছেড়ে দিয়ে হাতে পয়সা নিয়ে সেটাকে একবার দেখেই বিপুল বিস্ময়ে সে একবার চীৎকার করে উঠল, "ওরে বিশে—এই স্থাখ্, এটা একটা আধুলি বোধ হয়, চক্ চক্ করছে…পয়সার বদলে বাবু ভুলে দিয়েছে…

'তাই নাকি' বলে শ্যেনদৃষ্টিতে তার হাতের দিকে বিশে চেয়ে দেখলে। তারপর 'দেখি' বলে বিশে মঙ্গলার হাত থেকে আধুলিটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিতেই, সে এমন এক তীব্র আর্ত্তনাদ করে উঠল, যাতে পাশের লোক মনে করলে, তার যেন একটা কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

ভয় নেই তোর, নেব না - চল্—ক্ষীর কিনে দেব… আমার পয়সা থেকে আবার সেই কিনবো—সেই যে রাবড়ী না কি বলে,—বলে আধুলিটা সে তাড়াতাড়ি ট্যাকে গুঁজলে।

"না, আমি ক্ষীর চাই না, আমার আধুলি—ই—ই…।

বিশে আধুলিটা নিয়ে ছুটে পালালো। রাস্তার ওপারে খাবারের দোকানে—মঙ্গলাও ছুটল তার পিছনে - একখানা ট্রাম এসে সামনে দাঁড়ালো। সেটা চলে যেতেই সে আবার ছুটতে চেষ্টা করলে—চোখে তার তখনও কান্না…

কিন্তু তার ছোটা আর হল না। একখানা মোটর ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ সেই পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল আর তার গতি বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই মঙ্গলার ছোটার গতিও তার চাকার তলায় পড়ে বন্ধ হয়ে গেল…

রাস্তার কাদার দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে, মটরখানি ঘিরে, পথের জনতা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। একটা গোলমাল…বিশেও ও-ধারের ফুটপাত থেকে চার পয়সার রাবড়ি হাতে করে ফিরে এই ভিড়ের মধ্যে মজা দেখতে এল। পথের ওপর মঙ্গলার দেহটা তখন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রয়েছে—নাক দিয়ে একটু রক্ত বেরুচ্ছে…

তার এই অবস্থা দেখে, বিশে চীৎকার করে উঠল —ওরে মঙ্লা রে…অজ্ঞাতসারেই হাত থেকে তার রাবড়ির ছোট্ট ভাঁড়টি রাস্তার কাদার ওপর পড়ে গেল।

পুলিশ আর রাস্তার অন্য লোকে মোটরের নম্বর নিলে—তারপর খোঁজ পড়ল ও মেয়েটির বাড়ী কোথা…নাম কি…এই সব—

বিশে মঙ্গলার পাশে সেই কাদার ওপর বসে কাঁদতে লাগল—একবার ইচ্ছা হচ্ছিল, মঙ্গলার মাথাটা কোলে তুলে নেয় কিন্তু একটি ভদ্দর লোকের কোলে তার মাথা দেখে সে আর ভরসা করে তার মনের সাধ কাউকে জানাতে পারলে না।

অনেকে তাকে সান্ত্বনা দিলে—ভয় কি, ও আবার সেরে উঠবে তেমন লাগে নি—শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ··

বিশের কাণে সে কথা প্রবেশ করলে বলে মনে হল না। অ্যাম্বুলেন্স এসে মঙ্গলাকে তুলে নিয়ে গেল—বিশেও চলল সঙ্গে—চোখ তার জলে ভরা।

মোটরের ড্রাইভারকে নিয়ে পথের লোক তখনও ব্যস্ত করছিল।

* * * *

ভোরবেলা হাঁসপাতাল থেকে মঙ্গলার মাসীর কাছে খবর গেল, তার ছোট্ট জীবনের সব লীলা শেষ হয়ে গেছে।

বুড়ীর কান্নায় বস্তীখানা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। জানাশোনা দুচার জন বস্তীরই ছেলে হাঁসপাতালে গেল, শুধু বুড়ীর কান্নায়—তার নিতান্ত অনুরোধে।

বিশে হাঁসপাতালের দরজায় বসে কাঁদছিল—তার আর বিরাম ছিল না।

শ্মশানে গিয়ে মঙ্গলার মৃতদেহটা যখন চিতার ওপর রাখা হল, বিশে তখন আর নীরব থাকতে পারলে না।

'ওরে মুঙলী রে, কোথা গেলি রে—' তার বুক ফাটা কান্নায় শ্মশানের বাতাসও যেন ভারী হয়ে উঠল।

মৃতদেহ যারা সৎকার করতে এসেছিল, তাদের একজন তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে।

কিছুক্ষণ পরে তার কান্নার চীৎকারটা ধীরে ধীরে কমে এল।

চিতার আগুনটা খুব জোরে জ্বলে উঠল।

বিশের হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গলো। ট্যাঁক থেকে মঙ্গলার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া সেই আধুলিটা বার করে সে একবার দেখলে, তারপর আর কালবিলম্ব না করে সেই চিতার ওপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

চিতা জ্বলতে লাগল—সে আস্তে আস্তে সেখানে থেকে সরে গিয়ে এক কোণে বসে রইল; চোখ দিয়ে তার কেবল বইতে লাগল—বুকফাটা কান্নার অফুরন্ত ধারা…।

রোদের তেজ বেড়ে চলেছিল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার মত মনের অবস্থা ছিল না। তার দৃষ্টি পড়ে রইল সেই চিতার ওপর যেখানে…মঙ্গলার দেহ ধীরে ধীরে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

---

* পুষ্প প্রয়াণ

শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ এম-এ

কোন্ দূর নন্দনের গন্ধরাজি ল'য়ে বয় আনন্দের স্রোতে
ভাসিতে ভাসিতে
স্বর্গের সুষমা সাথে ফুটেছিল কোমল কলিকা
শাপভ্রষ্টা কোন্ সে বালিকা।
সেদিনো জানেনি কেহ যৌবনের প্রথম দোলায়,
মুছিবে সে জগতের স্নেহ আপনার নিষ্ঠুর হেলায়।
ধরার সৌন্দর্য্য ল'য়ে দিবে ফিরাইয়া
চিতার মলিন ভস্ম নিদারুণ হিয়া।
আজো তার সঙ্গীতের সুর বাজে কাণে,
নীরব এ হৃদয়ের সকরুণ তানে।
আজো তারে যে যেখানে চাই,
প্রতিধ্বনি ব'লে যায়, নাই—ওরে নাই॥

* কুমারী পুষ্পরাণী চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে লিখিত।

বৈদিক যুগের নারী

শ্রীআভা গুপ্তা বি, এ

—প্রবন্ধ—

মনু বলেছেন :—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি ॥"

"স্ত্রীলোকের বাল্যকালে পিতা রক্ষক, যৌবনকালে স্বামী রক্ষক এবং বৃদ্ধবয়সে পুত্রেরা রক্ষক :—স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্যা নয়।"

মনুর উক্ত শ্লোক পাঠে এই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে আমাদের সমাজে নারী জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া হ'ত না। পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে আমরা আমাদের নারীদের যতখানি স্বাধীনতা দিয়েছি বা তারা আমাদের কাছ থেকে আদায় করেছে—ইংরেজ আসবার আগে ভারতবর্ষের সমাজে নারীরা ততখানি অধিকার ভোগ করতেন কিনা তা' দেখা যাক।

বৈদিক যুগে আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা ছিল? বৈদিককালে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষরূপেই অনুমোদিত ছিল। অথর্ব্ববেদে আছে, "ব্রহ্মচর্য্যেন কন্যাং যুবানং বিন্দতে পতিং"—কন্যা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই যুবা পতি পান। এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ইন্দ্রিয় সংযমের সঙ্গে বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করান হ'ত—এর প্রমাণ শ্রুতি ও মহাভারতে আছে। বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকদের বেদ অধ্যয়ণ করাতেন এবং পুরুষের ন্যায় বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতে শিক্ষা দিতেন। তখন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা একটা নিয়মিত প্রথা ছিল। এরকম নিয়মিত প্রথা বৈদিককালের শেষভাগেও প্রচলিত ছিল—যার ফলে আমরা বৃহদারণ্যোকপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদ পেয়েছি।

আমাদের স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ মনুসংহিতায় স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বিধি-নিষেধ দেখা যায় না। সুতরাং এতে এই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিককাল থেকে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যে মত চ'লে আস্‌ছিল, মনু তার বিরোধী ছিলেন না।

সংহিতা-গ্রন্থ ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি পুরাণের মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানেও দেখতে পাই যে, স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী কোনও কথাই নেই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ ব'লেই সর্ব্ববাদিসম্মত। মহাভারতে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্টই কোনও বিধি নিষেধ নেই। কিন্তু এতে মহামতি ব্যাসদেব দৃষ্টান্ত দিয়ে স্ত্রী-শিক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র আলোচনা করলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি অতিশয় বিদুষী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিক স্থানে পণ্ডিতা বলে অভিহিত হ'য়েচেন। বনপর্ব্বের এক স্থানে আছে—"অত্র শর্ব্বো শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদ পারগা।"

বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সকলেতেই স্ত্রী-শিক্ষার পরোক্ষ বিধি ও উপদেশ আছে। কিন্তু একটীতেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুশাসন দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অভাব পূর্ণ করেচে। মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকে যে-ভাবে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়েচেন, কন্যাকে তা'র অপেক্ষা এতটুকু নূন ক'রে শিক্ষা দিতে উপদেশ দেন নি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে—"কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনিয়াতি যত্নতঃ"—অর্থাৎ "কন্যাকেও অতি যত্নসহকারে এই প্রকার অর্থাৎ পুত্রদিগের ন্যায় পালন করিতে ও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।"

সংস্কৃত কাব্য-নাটক অলোচনা করলে দেখতে পাই যে, তদুল্লিখিত অধিকাংশ স্ত্রীলোকই কোনও না কোন প্রকার বিদ্যা আয়ত্ত করেচেন।

পূর্ব্বকালে যদি আমাদের স্ত্রী-জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকত, তবে আমরা লীলাবতী, অরুন্ধতী,

না, গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী নারীর নাম শুনতে পেতাম না।

সুতরাং এ'তে প্রমাণিত হ'ল যে, পূর্ব্বে আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষার পরই বিবাহের কথা আসে। আজকাল আমাদের যে-রকম প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হচ্ছে, বৈদিক-যুগে এরকম পূর্ণবিকাশ প্রাপ্তা কুমারীর বিবাহ দেওয়া হ'ত, না, নারীদেহের পূর্ণবিকাশের আগেই বিবাহ দেওয়া হ'ত, তা শাস্ত্রপাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়। বেদে আছে (১০ম, ৮৮সূ), "যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহ-লক্ষণযুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকট গমন কর।" "যুবতী জায়া পাইলে গুণী ব্যক্তিও তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না" (৮ম, ২য় সূ); নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিত নারীর নিকট যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামী সংসর্গিণী করিয়া দাও" (১০ম, ৮৫সূ)।" এই সকল উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিককালে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল। গোভিল গৃহ্যসূত্রে বিবাহের যেরূপ বর্ণনা আছে, তা'তে তখনকারকালে স্ত্রীলোকের যৌবন-বিবাহ যে প্রচলিত ছিল তা প্রমাণিত হয়। গোভিল বলেন, "বিবাহকালে বামপার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যা স্বীয় দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বরের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবে এবং হোমের পর উভয়ে উপোত্থান করিবে।" অর্থাৎ "উপোত্থান-কালে বরের বামহস্ত কন্যার পিঠে হইয়া বরের দক্ষিণ কাঁধে থাকিবে।" বর্ত্তমানকালে অনেকে মনে করেন যে, ব্যভিচার প্রভৃতি দোষের একটা প্রধান কারণ, স্ত্রীলোকের যৌবন-বিবাহ। আমার তাহা ঠিক বলে মনে হয় না। যে সকল কুমারীর হৃদয় দূষিত তাঁদের বাল্যবিবাহই হো'ক আর যৌবন-বিবাহই হো'ক, তারা অসৎ চরিত্র যে হবেই তা ঠিক। অনেকে বলেন যে, বাল্যবিবাহে, ভগ্নী যেরূপ ভ্রাতাকে প্রীতি করে, সেই রকম স্ত্রী স্বামীকে প্রীতি করতে শেখে। আমার মতে, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা আরও প্রগাঢ় হওয়া আবশ্যক। যৌবনের প্রথম উন্মেষে যখন হৃদয়ে নব অনুরাগের সঞ্চার হয়, সেই সময় বিবাহ হ'লে সেই নবোন্মেষিত হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ স্বামীর দেহ-মন পূর্ণ ক'রে বর্দ্ধিত হ'তে থাকে।

এখন মনু বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ বিধান দিয়েছেন, তা দেখা যাক্। তিনি বলেন,—"যদি উৎকৃষ্ট ও রূপগুণাদি-সম্পন্ন পাত্র পাওয়া যায় তবে কন্যার বিবাহের যোগ্য বয়স না হইলেও, তার সহিত সেই অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবে।" এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কন্যাকে কখন বিবাহের উপযুক্ত ব'লে গ্রহণ করা যাবে? এর উত্তরে মনু বলেন যে, "যৌবনের সূত্রপাত হবার তিন বৎসর পরে বিবাহের উপযুক্ত বয়স জানতে হবে।"

"ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥

"কুমারী-কন্যা প্রাপ্ত যৌবনা হ'বার পর তিন বৎসর প্রতীক্ষা পূর্ব্বক কালযাপন করিবে; তাহার পর সদৃশ পতি লাভ করিবে।"

ভাষ্যকারের মতে, যৌবন সঞ্চারের কাল দ্বাদশ বৎসর। "যৌবন দর্শক দ্বাদশবর্ষাণামিতি সূচ্যতে।" মনু বলেন, "ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং" —অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে; কিন্তু সেই কন্যার হৃদ্যা অর্থাৎ বাড়ন্ত হইয়া হৃদয়ের প্রীতি উৎপাদক হওয়া আবশ্যক।" তিনি আরও বলেছেন যে "ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।" এতেই বোধ হয় যে ষোল বৎসরই মনুর মতে কন্যা সম্প্রদানের উপযুক্ত কাল। কিন্তু যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত ও কন্যার ষোড়শ বৎসরের বয়সও হয়েছে অথচ বাপ-মা অর্থের লোভে সেই পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করছেন না, তখন কন্যা স্বয়ং বিয়ে করলেও পাপ কার্য্য করবে না এবং যাকে বিয়ে করবে সেও পাপ কার্য্য করবে না।

"অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি।"

তবেই বিয়ের বয়স নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মনুর মত এই যে, অন্যূন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ, ষোড়শ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করবে। সম্বর্ত্তসংহিতায় দেখি যে, প্রাপ্ত যৌবনা হবার পূর্ব্বেই দশ বৎসরে কন্যার বিবাহ দিবে। তিনি "দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা"—সূত্রে কন্যার পারিভাষিকত্ব উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "প্রাপ্তযৌবনা হবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবে।" পরাশরের মতে, "দশ থেকে বার বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই কন্যার বিবাহ দেওয়া

কর্ত্তব্য।” এই সম্পর্কে পরাশরের লিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী তুলে দিলাম। শ্লোকটী পাঠ করলে আজকাল যে যে সমস্ত বিংশবর্ষীয়া বা ততোধিক বয়স্কা মেয়েরা অবিবাহিতা রয়েচেন, তাঁরা হাস্যসম্বরণ করতে পারবেন না।

“অষ্টাবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতউর্দ্ধং রজস্বলা।
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি
মাসি মাসি রজস্তস্যাং পিবতি পিতরম্ স্বয়ং।”

বশিষ্ঠ বলেন, “কুমারী প্রাপ্তযৌবনা হইয়া তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। তিন বৎসরের উর্দ্ধে উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবে।” এখন দেখতে পাওয়া যাচ্চে যে, প্রামাণিক কোনও সংহিতা-গ্রন্থে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিয়ে গৌরীদানের ফললাভ করবার কোনও কথাই নেই। গৌরীদানের মাহাত্ম্য এই দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে আরও দুর্ব্বল করবার জন্য কিরূপে তাদের অন্তরাসন গ্রহণ ক’রে এখনও জাগ্রত আছে, তা বলা বড় সহজ নয়। মরীচি-সংহিতানামক একখানি-মাত্র সংহিতায় আছে যে, গৌরীদানের ফল স্বর্গধাম, রোহিণী-দনের ফল বৈকুণ্ঠধাম এবং কন্যাদানের ফল ব্রহ্মধাম। আমরা তিন ধামের কোনও ধামই চাই না, আমাদের এই পৃথিবী ধামই ভাল।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা ছেড়ে দিলেও প্রাচীন কালের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব’লে গেছেন। যে অস্ত্র-চিকিৎসা বিশারদ সুশ্রুত-ঋষির গ্রন্থ পাঠ ক’রে পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা মুগ্ধ হ’য়ে গেছেন, তিনি বলেচেন “পঁচিশ বৎসরের কম-বয়স্ক পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যাতে সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান গর্ভেতেই বিপদ্‌গ্রস্ত হয় এবং যদি বা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অদীর্ঘজীবি হয়। অতএব অত্যন্ত বালিকাবস্থাতে গর্ভাধান করিবে না।” রঘুনন্দনও বলেচেন যে, “কুড়ি বৎসরের পুরুষ পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে উত্তম সন্তান হয়, তাহার ন্যূন বয়স হইলে অধম সন্তান হয়।”

আজ এইখানেই শেষ করলাম। বারান্তরে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু বলবার ইচ্ছে রইল।

যাত্রাকালে

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ

অচিন্ দেশে অনেক দূরে যাচ্ছ তুমি যাও
বাধা তোমায় দেব নাক ‘আমি,
সেথায় নূতন সঙ্গী সাথীর মাঝে
ক্ষণেক মোরে স্মরণ ক’রো স্বামী।
তোমার পাশে সুখে দুখে নিত্য আমি রব’
ভাগ্যে আমার নেই তা জেনে নিও,
তাইত’ শুধু কর জোড়ে ভিক্ষা আমি মাগি
আমায় তুমি ভুলো নাক’ প্রিয়।

নানান্ কাজের মাঝে থেকে আমার কথা তুমি
কল্পে স্মরণ ব্যথাই যদি পাও,
কান্ দিওনা—কান্ দিওনা আমার কথায় তবে
যাও আমারে ভুলেই তুমি যাও।
কিন্তু যদি ভাগ্য দোষে দুঃখ আঘাত আসে
এই কথাটি মনেতে ঠাঁই দিও,
আমি আছি সুখে দুখে আমি তোমার আছি
তখন আমায় ভুলো নাক’ প্রিয়।

দার্জ্জিলিংয়ের স্মৃতি

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় বি-এ

সুইজারল্যাণ্ড শুধু ইউরোপের ক্রীড়াভূমিরূপে অভিহিত হয় নাই। বিচিত্র পত্রপুষ্পে চির-সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন হইয়া রহিয়াছে আমাদের দেশের দার্জ্জিলিং সহরকেও সুধীজনেরা ঐ নামানুকরণ করিয়া সৌন্দর্য্য রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন—

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মাতা পিতা সহকারে একবার দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলাম;—তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, সেদিন নাগাধিরাজের প্রীতিস্নিগ্ধ মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া 'গ্রাম্য ফুটবলের' আকর্ষণে আমরা দুই ভ্রাতা একরূপ পলায়ন করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম! আজ ছাত্র-জীবনের শেষে দাঁড়াইয়া সেদিনকার কাহিনী আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতেছে—রৌদ্রালোকিত দার্জ্জিলিং শহরের বিচিত্র দৃশ্যগুলি অবসর সময়ে স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিয়া মনে মনে কেমন একটা আকুলতার সৃষ্টি করিতেছিল তাই পুনরায় শৈল রাজের দুর্জ্জয় আকর্ষণে সাড়া দিতেছিলাম। সুযোগও মিলিয়া গেল—অধ্যাপনা কার্য্যে আমার সহযোগী শ্রীযুক্ত অমূল্যকান্ত বসু একদিন ভূমিকা না করিয়া বলিলেন "এবার গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং যেতে পারলে হতো"—আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলাম। যাত্রার দিন ঠিক হইল—বহুপূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা যাইবেন বলিয়া বিস্তর শপথ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নির্দ্দিষ্ট দিনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। রাত্রি সাড়ে আটটায় মেল ট্রেন ছাড়ে; বালিগঞ্জ হইতে শিয়ালদহ আসিতে হইবে। সুতরাং সাতটায় বাড়ী হইতে বাহির হইলাম ষ্টেশনে আসিয়া দেখি অমূল্য বাবু প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু তিনিও 'না যাইবার দলে', মন নিরাশ হইয়া গেল; নিঃসঙ্গ প্রবাসের চিত্র ভাসিয়া উঠিল।

মধ্যম শ্রেণীর একটি টিকিট কাটিয়া বাঙ্কের উপর শুইয়া আছি—৩০.৩৫ বৎসরের দীর্ঘকায় শীর্ণ শরীর একটি ভদ্রলোক সশব্দে দরজা খুলিয়া আমার অন্যদিকের বাঙ্কের উপর তিনি লম্বমান হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। তাঁহার চাদরটি বিনা কারণে অতর্কিত রূপে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিলেন "উঠে বসুন—শীগ্‌গির্‌ ওঠুন" ভদ্রলোক ব্যাপার কি হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় মামুলি ধরণে উত্তর করিলেন" "কেন কি হয়েছে?" "আর দেরী করা যায় না, মারামারি হবে মশায়"—এই বলিয়া ভদ্রলোক তাঁহার বিশীর্ণ হস্তের আস্তিন্ গুটাইয়া অগ্রসর হইলেন। বাঙ্কের নীচে বেঞ্চির উপর একটি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তিনি এই সম্মুখসমর রোধ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "মারতে হবে না আমি আপনাকে একটি চুমো খেতে
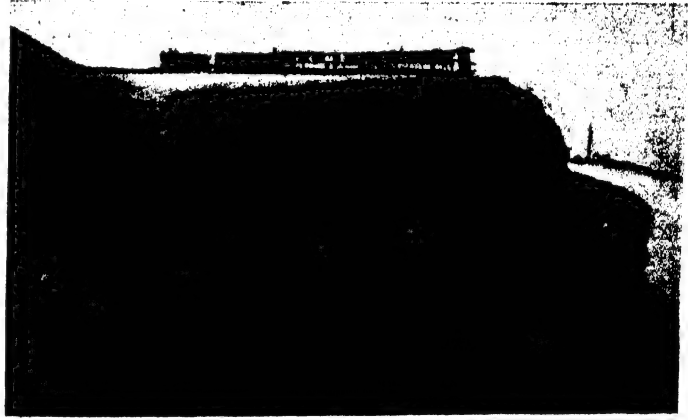
দার্জ্জিলিং হিমালয়্যান্ রেল্‌ওয়ে

চাই" এইরূপ অহেতুক ইচ্ছায় এবং কলিযুগেও নিত্যানন্দের আবির্ভাবে কামরাখানিতে একটি সরসতার হিল্লোল বহিয়া গেল। আমি মুখ বাহির করিয়া দেখি, দীর্ঘকায় ভদ্রলোকটির অবনত মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়া আমাদের পরিচিত কুমিল্লা অভয় আশ্রমের চৌধুরি মহাশয়। সে যে ইহার মধ্যে এতবড় প্রেমিক হইয়া উঠিয়াছে, জানিতাম না। বাঙ্ক হইতে নামিতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল; চৌধুরী সাহেবের সহিত ইতিমধ্যে 'সমর প্রয়াসী' ভদ্রলোকটির একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যে সব শব্দ-বাণ হানিতে লাগিলাম তাহার প্রচলন সাধারণতঃ বিবাহ বাসরেই বেশী। ঈশ্বরদি এবং তাহার পরবর্ত্তী ষ্টেশন আব্দলপুরে ট্রেণ প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিল, কারণ পথিমধ্যে একখানি যাত্রীগাড়ী উল্টাইয়া গিয়াছিল—কিন্তু এ সময় অতিবাহিত করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর বোধ হইল না। চৌধুরিকে লক্ষ্য করিয়া যে হাস্য পরিহাস চলিতেছিল, তাহা ক্রমশই গভীর হইয়া উঠিতেছিল এবং ইহারি উচ্চ কলরব রেলের কর্ম্মচারিদের পর্য্যন্ত চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। পথে-প্রবাসে এইরূপ সম্পর্ক উঠিলে পথশ্রম যে অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে একথা আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি।

লুইস্ জুবিলি স্যানিটোরিয়ম্

শিলিগুড়িতে যখন গাড়ী আসিল তখন প্রায় একটা বাজে—অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে আগুন যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। উঠিবার সময়ে 'বাসে' যাওয়াই সুবিধা—মুদ্রার পরিমাণও কম এবং ট্রেণ অপেক্ষা অগ্রে পৌছান যায়। দার্জ্জিলিং হিমালায়ান রেলওয়ে ইংরাজজাতির একটি গর্ব্বের জিনিষ বলিয়া চিরদিন সম্মান পাইবে, দুর্গম পাহাড়ের গা খোদাই করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া লাইনগুলি চলিয়া গিয়াছে—ক্রমশই উপরের দিকে উঠিতেছে; মাঝে মাঝে আবার 'রিভার্স' অর্থাৎ একেবারে উপরের দিকে উঠিতে না পারিয়া পশ্চাতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার সম্মুখে অগ্রসর হইতে হয়। প্রায় চারখানা করিয়া কামরা লইয়া এক এক খানি গাড়ী চলে—এবং অগ্রে একখানি ইঞ্জিন ও পশ্চাতে একখানি ইঞ্জিন।

দার্জ্জিলিং-সহর

আমরা এক "বাসওয়ালার" সহিত বন্দোবস্ত করিলাম; তাহাকে কুড়িটাকা দিতে হইবে, আমরা সাতজন লোক—মরসুম বুঝিয়া পাহাড়ী মালিকটি চার্জ্জ একটু বেশী করিল—অসময়ে শিলিগুড়িতে আসিয়াছি উপায় নাই। বাস যখন তিনদেরিয়া ষ্টেশনে পৌছিল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা হইবে শীতের বেশ আমেজ পাওয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে বাস আসিলে আমরা নামিয়া নিকটস্থ পানের দোকান হইতে পান ও লেবু সংগ্রহ করিয়া লইলাম—আমাদের সঙ্গে বর্দ্ধমানের স্কুলে পড়ো দুইটি ছাত্র আসিতেছিল, শৈলরাজের বক্ষে তাহাদের এই প্রথম অভিযান। অনেক বুঝাইয়াও তাহাদিগকে ট্রেণে আহার করাইতে পারা যায় নাই—এখন তাহাদের তীব্র বমনোদ্রেক দমন করিবার জন্য আমাদের চৌধুরী মহাশয় বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। আমি কিন্তু প্রকৃতির এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের বিচিত্র নব নব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। নিম্ন দিয়া রেলের লাইন আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, বহুদূরে অস্পষ্ট ছায়ার মত সবুজ সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। বাঁদিক দিয়া গাঢ় কালো মেঘের মত সারির পর সারি পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে এবং ডান দিকে গভীর অরণ্যানী বহুল-খাদ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের বুক চিরিয়া গভীর শব্দে ঝরণার জল আসিয়া পড়িতেছে। কার্সিয়াং পৌছিতে প্রায় সাড়ে চারটা হইল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল—এখানকার স্বাস্থ্যবান পাহাড়ী রমণীরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে না। পিঠের উপর সাল লইয়া আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলে-মেয়েগুলি দেখিলে কোলে করিতে ইচ্ছা করে। তাহাদের সাদা আনন্দিত রক্তিম মুখশ্রী, বলিষ্ঠ শরীর পাহাড়ী রমণীদের বাৎসল্যের উৎস যোগাইয়া দিয়াছে। "সোনাদায়" বাস আসিল, চারিদিকে গাঢ় কুয়াসা, সম্মুখে এক হাত দূরে কি আছে ভালরূপে বোঝা যায় না—সমস্ত দিন অনাহার এবং পথশ্রমে সঙ্গীদের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হাস্য-পরিহাস জমিতেছে না। "সোনাদাকে" Hope Town বলা হয়; কারণ দার্জ্জিলিং আবিষ্কারকেরা প্রথমে ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বাস্ ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়া "ঘুমের" অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল—"ঘুমের" পরের ষ্টেশনই দার্জ্জিলিং। পৃথিবীর মধ্যে পাহাড়ের উপর যতগুলি ষ্টেশন আছে, "ঘুমই" সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। শুনিলাম, এখানকার অধিবাসীরা বৎসরে দুই মাসের অধিককাল সূর্য্যালোক উপভোগ করিতে সুযোগ পান না। আমাদের জামাগুলি ভেদ করিয়া তীব্র শীত প্রবেশ করিতেছে—হস্তের অগ্রভাগগুলি বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, অনন্ত কুয়াসাচ্ছন্ন "ঘুমে" বাস প্রবেশ করিল—দার্জ্জিলিং 'ঘুম' অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত। এখান হইতে রেলের লাইনটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচে গিয়াছে—বহুদূর হইতে সাপের মত মনে হয়। পাহাড়ের গায়ে লতাপাতা খচিত দার্জ্জিলিং সহরের সুন্দর লাল বাড়ীগুলি ছবির মত প্রতীয়মান হইতেছে। প্রায় ছয়টার সময় ষ্টেশনের নিকট বাস আসিল—জড়তাভঙ্গ করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলাম। আমার থাকিবার স্থান লুইস্ জুবিলি স্যানিটোরিয়াম—ষ্টেশনের পাশের

ভিক্টোরিয়া ফল্স্

রাস্তা ধরিয়া কিছু নীচে নামিতে হয়। দার্জ্জিলিংএ সাধারণের থাকিবার জন্য যে কয়েকটি হোটেল আছে, তন্মধ্যে এই স্যানিটোরিয়ামই অপেক্ষাকৃত ভাল। তবে ইহার একটি অসুবিধা (আর একটি অসুবিধার কথা পরে বলিতেছি) হইতেছে যে ইহা নিম্নে অবস্থিত। সমতলবাসী বৃদ্ধ এবং শিশুর পক্ষে উপর নীচ করা একটু কষ্টকর। নচেৎ ইহার খাদ্যাদি এবং সাধারণ ব্যবস্থা চমৎকার বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। এই স্যানিটোরিয়ামের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, রোগে পড়িলে এখানে চিন্তার কারণ নাই—ইহার অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শিশির কুমার পাল মহাশয় একজন প্রবীণ চিকিৎসক, বিনা আহ্বানেও তিনি রোগীদিগকে বহুবার

কাঞ্চনজঙ্ঘা

দর্শন দিয়া থাকেন এবং মুদ্রা ব্যতিরেকেই ঔষধাদির সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়। স্যানিটোরিয়ামের মধ্যে লাইব্রেরী ও Common Room এর বন্দোবস্ত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন টেনিস্ খেলিবার কোর্ট ও প্রকাণ্ড একটি অঙ্গন থাকায় সাধারণের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। লতাপাতা বেষ্টিত বিবিধ পুষ্প শোভিত এই স্যানিটোরিয়ামকে জ্যোৎস্নালোকে দূর হইতে আনন্দময় স্বপ্নমণ্ডিত গৃহের মত বোধ হয়।

আমি যে গৃহে স্থান পাইলাম তাহাতে দুইজন বৃদ্ধ আছেন দেখিলাম; 'হংস মধ্যে বকো যথা' রূপে বিরাজ করিতে হইবে—এখানকার একঘরে চারিজন করিয়া থাকিতে হয় সুতরাং 'বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার' এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া জামা খুলিতে খুলিতে বৃদ্ধদ্বয়ের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। একজন ভাগলপুরে থাকেন —কঠোর কর্ম্মস্থল হইতে পেন্সন লইয়া দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন আমার দার্জ্জিলিংএর কর্ম্মবিহীন অলস নির্জ্জন রাত্রিগুলি তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনার আনন্দে অতিবাহিত হইত।

গরমজলে হাত মুখ ধুইয়া চা-সমেত জলযোগ করিবার পর শরীর সুস্থ বোধ হইল। রাত্রি প্রায় সাতটা হইবে, বাহিরে আসিয়া দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—ষ্টেশনের রাস্তা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া দেখি মেল এখনও আসে নাই; বহুউৎকণ্ঠিত নরনারী আশানেত্রে চাহিয়া আছেন। একটু অগ্রসর হইয়া দেখি আমার পূজনীয় পিতৃদেব একটি বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন—তিনি একসপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছেন এবং Snow View Hotel এ আছেন। দার্জ্জিলিং মেল বিলম্ব হইবার কারণ ইত্যাদি তাঁহাকে বলিলাম।

দার্জ্জিলিং সহরে বাস করা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে কষ্টকর—এখানকার জাঁক-জমক ও খাদ্যদ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্য, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পথ রোধ করিয়াছে। সহরটি নির্ম্মাণ করিতেও খরচ কম হয় নাই, কার্ট রোডের প্রতি ফুট রাস্তা প্রস্তুত করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। কার্ট রোড দিয়া উঁচু রাস্তা ঘুরিতে ঘুরিতে "চৌরাস্তায়" মিশিয়াছে—মাঝে ম্যালের রাস্তাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; প্রাতে এবং অপরাহ্নে এই রাস্তা ধরিয়া ক্ষুধাসঞ্চয়কারীর দল বিচিত্র পোষাকে আচ্ছাদিত হইয়া 'চৌরাস্তা' অভিমুখে চলিয়া থাকেন—চৌরাস্তার চারিপার্শ্বে অনেকগুলি বেঞ্চি আছে, সেখানে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই আসন গ্রহণ করিতেছেন।—অনতিদূরে কতকগুলি Pony রহিয়াছে, ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া হইয়া থাকে। প্রথিতযশা রূপদক্ষ শ্রীযুক্ত চারু রায়ের দুইটি পুত্রকে প্রায় প্রতি

অপরাহ্নেই Ponyর উপর দেখিতাম—ছোটটির নাম "মীনাকেতু," বয়স ৮।৯ বৎসর হইবে। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার সহিত তাহার আলাপ জমিয়া উঠিয়াছিল—এই নিরীহ ছেলেটিকে Ponyর উপর মোটেই মানাইত না; আমি তাহাকে বলিতাম তুমি "জ্যাকি কুগান" হইতে পারিবে না।

চৌরাস্তা হইতে কিছু দূর উপরে উঠিলেই "Observatory Hill পাওয়া যায়—ইহা দাজ্জিলিংর একটি উচ্চতম স্থান—এখানে একটি বাক্সের মধ্যে ম্যাপ আছে, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র সিকিম পর্ব্বত শ্রেণী উজ্জ্বল দেখা যায়।

এখানকার বাজারটি কার্ট রোডের উপর অবস্থিত—বাজারে প্রায় সব জিনিষই পাওয়া যায়, প্রথমে মাছের বাজার, পরে তরিতরকারী; তরকারীর দোকানের মালিকেরা অধিকাংশই রমণী। বাজারের নিকটেই মেয়েরা ঝাঁকা লইয়া অপেক্ষা করে এবং বাজার অভিমুখী গমনশীল ব্যক্তিদিগের তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অনেক সময় দুরূহ হইয়া উঠে। বাজারের রাস্তা ধরিয়া নামিয়া নীচে গেলে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখিতে পাওয়া যায়—এই উদ্যানটি বিচিত্র লতাপাতায় আবৃত, মাঝে মাঝে নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়া আছে। কঠিন পর্ব্বতগাত্রে এরূপ শ্যামায়মান কোমলতা উপভোগ্য।

দার্জ্জিলিং হইতে দূরে আর দুইটি চিত্তাকর্ষক স্থান আছে—একটি সিঞ্চল হ্রদ ও অপরটি "টাইগার হিল" হইতে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য। ঘুম ষ্টেশন হইতে তিন মাইল হাঁটিয়া আমরা একদল সিঞ্চলে গিয়াছিলাম—সেখানে যাইয়া হ্রদের দৃশ্য যাহা দেখিলাম—তাহাতে মন তিক্ত হইয়া উঠিল। পাঠকের অবধানের জন্য ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে 'visitor's book' এ পুঞ্জিভূত মানসিক 'ম্যালেরিয়ার মধ্যে' জনৈক সত্যপরায়ণ ব্যক্তি লিখিয়াছেন—'বালীগঞ্জের লেক ইহা অপেক্ষা মনোরম'। স্যানিটোরিয়ামে শুনিলাম 'টাইগার হিলে উঠিবার রাস্তা দুর্গম, শীতকালে যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন সৌভাগ্যবানেরা ভিন্ন সূর্য্যোদয় অন্য কেহ দেখিতে পারেন না। সেদিনও একদল গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই
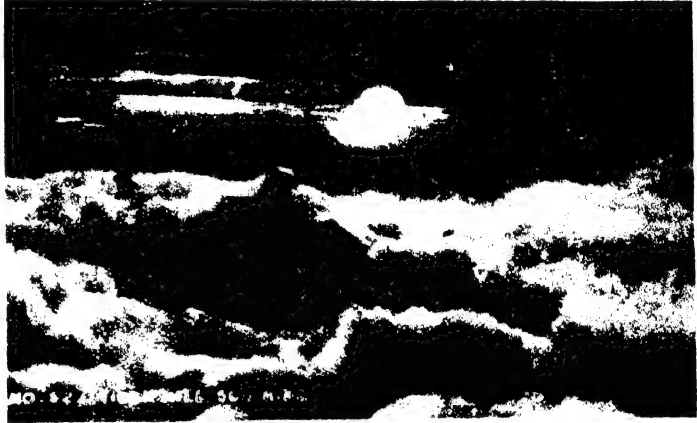
টাইগার-হিল্ হইতে সূর্য্যোদয়

অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলেন ইত্যাদী ইত্যাদী। কিন্তু কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে আমাদের মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল—আমরা taxiর উদ্দেশ্য করিয়া আসিলাম। ঠিক হইল, রাত্রি আড়াইটার সময় গাড়ী ষ্টেশনের নিকট আসিয়া থাকিবে।' ঘুম পর্য্যন্ত আমরা গাড়ীতে যাইব-তারপর তিন মাইল উপরে উঠিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে দেখি দরজায় ঢং ঢং শব্দ—দরজা খুলিয়া দিলাম, চৌধুরী সাহেব ছাতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রবেশ করিলেন। তারপর আমরা দুজনে মিলিয়া নিদ্রিত সকলকে উঠাইলাম—অমূল্যবাবু অল্পদিন হইল আসিয়াছিলেন, তাঁহার লেপের আরামটুকু গভীর হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহাকে উঠাইতে বেগ পাইতে হইল। গাড়ী যখন ছাড়িল তখন ঠিক তিনটা বাজিয়াছে। জনমানবশূন্য নির্জ্জন রাস্তার অন্ধকার যেন পুঞ্জিভূত হইয়া রহিয়াছে—অসংখ্য নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল—চালক পাহাড়ী, আমাদিগকে আশ্বাস দিল "দেখা যাইবে"।

রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতেছে—কিছুদূর অগ্রসর হইলে দেখা গেল, কয়েকজন Ponyতে চড়িয়া চলিয়াছেন, উঁহারাও Tiger hillএ যাইবেন অনুমান করিয়া আমাদের মধ্যে একজন গলা বাড়াইয়া বলিল—'Are you going to Tiger Hill'? ইহার উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই আমাদের মোটর অনতিদূরে চলিয়া গিয়াছিল। যতই ঘুমের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই কোথা হইতে যেন কুয়াসা আসিয়া ঘিরিতে লাগিল—অন্ধকার রাত্রি তার উপর কুয়াসা—সম্মুখের কিছুই দেখা যাইতেছিল না; চালক খুব সাবধানে এবং ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতে লাগিল—প্রায় তিনটা কুড়ি মিনিটের সময় ঘুমের জড়ো বাংলোর নিকট আসিয়া পৌছিলাম, এখান হইতে Tiger Hillএর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আমরা ছয়জন প্রাণী আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর যাইবার পরই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—কুয়াসায় চারিদিক আবৃত হইয়া গেল। বামপার্শ্বে পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে—ডান দিকে গভীর খাদ্ মাঝে তিন হাত চওড়া রাস্তা। সূচিভেদ্য অন্ধকারে সম্মুখের বস্তু দেখা যায় না, অতর্কিতরূপে একবার পা পিছলাইলেই শত সহস্র যোজন নিম্নে, অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের নিকট 'Torch' ছিল নচেৎ সেদিন আমাদের অদৃষ্টে দুঃখ লেখা ছিল। রাস্তার আর বিরাম নাই—এক ঘণ্টা এইরূপে চলিবার পর অন্ধকারের গাঢ়তা কাটিয়া গেল—চারিদিক যেন অল্প অল্প করিয়া ফর্সা হইতে লাগিল। দূরে বাম দিকে নিস্কল deserted barrack এর থামগুলি প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে—এইখানে golf খেলার জন্য সমতল ভূমি আছে। এখান হইতে রাস্তা ঠিক সিঁড়ির মত খাড়া হইয়া গিয়াছে। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমরা তাড়াতাড়ি উঠিতে লাগিলাম—পা আর চলিতে চাহিতেছিল না, ঠাণ্ডার মধ্যেও সমস্ত শরীর ঘামিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ অর্দ্ধমৃত হইয়া যখন 'টাইগার হিলের' শীর্ষ দেশে উঠিলাম তখন দেখি ঘুমের নিকট যে কয়েকটি Pony দেখিয়াছিলাম, তাহারি দুইদিকে দুইজন বাঙ্গালী মহিলা! যে জাতিকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের কবি আক্ষেপভরে বলিয়াছেন তাহারা আমাদিগকে স্নেহাঞ্চল দিয়া বেষ্টন করিয়া বাঙ্গালী করিয়াছেন মানুষ করেন নাই, তাঁহাদেরই দুইজনকে এই দুর্গম গিরিপ্রান্তর অতিক্রম করিতে দেখিয়া শ্রদ্ধায় আমার মস্তক অবনত হইয়া গেল।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'Love's labour lost' ইহার সার্থকতা জীবনে এই প্রথম অনুভব করিলাম এত পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণের পর এতদূর আসিয়া দেখিলাম যে সাদা মেঘে সর্ব্বত্র ঢাকা! এখানে একটি ছোট গোলঘর আছে, তাহার উপরে একটি ছাদ আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা ছাদে উঠিলাম—তীব্র-শীতে সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতেছে—সেই টিপ টিপে বৃষ্টি যেন অসহ্য বোধ হইল। ছাদের উপর কয়েকটি বেঞ্চি ছিল; অমূল্য বাবু সৌখিন লোক, কাজেই তাহার উপরে ছুরি দিয়া নিজের নামের নক্সা কাটিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা আকাশের দিকে চাহিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। "মেঘের পর মেঘ জমেছে"—হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য কোন অদৃশ্য শক্তিমান হস্ত যেন সেই পুঞ্জিভূত মেঘরাশিকে একত্র করিয়া আস্তে আস্তে পর্দ্দার মত সরাইয়া দিল, পূর্ব্বদিকের রক্তিমচ্ছটার মধ্যে 'কাটাপাহাড়ের' উপরস্থিত দার্জ্জিলিংয়ের লাল বাড়ীগুলি অনন্তরহস্যময় বলিয়া বোধ হইল—এবং ঘনকৃষ্ণ গাছগুলি প্রহরীর মত রহস্যময় রাজ্যের দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। মনে মনে বলিলাম, হে সূর্য্যদেব, তোমার উদয়ের রূপ আমাকে দাও নাই সত্য কিন্তু পরিবর্ত্তে যাহা দিয়াছ—তাহাতেই আমার সৌন্দর্য্যপিপাসু অন্তঃকরণ ভরিয়া গিয়াছে।

ঘুমে যখন আমরা নামিলাম তখন বেলা প্রায় সাতটা হইবে—ষ্টেশনের তাপমান যন্ত্রে ৫০ ডিগ্রি উত্তাপ উঠিয়াছে দেখিলাম। 'টাইগার হিল' হইতে নামিয়া আসিয়াছি তাই ঘুমের এই গাঢ় ঠাণ্ডায় শীত বোধ হইল না। কিন্তু পেটের তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ অসম্ভব তীব্র বোধ হইল। ষ্টেশনের পার্শ্বেই একটি পাহাড়ীর সজ্জিত Restaurant ছিল। সেইখানে আমরা প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কাচের বয়ম হইতে 'কেক' রুটি, ইত্যাদি মুখে গুজিতে লাগিলাম, ডিম সমেত চা পান করিবার পর শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইল। গাড়ীতে উঠিয়া আমরা ঘুমের বৌদ্ধবিহার দেখিতে চলিলাম—ঘুম হইতে এক মাইল দূরে নির্জ্জনতার মধ্যে স্থাপিত শুভ্র এই মন্দিরটি

বৃষ্টিতে যেন স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে—মন্দিরের পুরোহিত আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গেলেন, অগণিত কারু কার্য্যশোভিত ঘরের মধ্যে ধ্যানমূর্ত্তি বুদ্ধদেব স্তিমিত নয়নে চাহিয়া আছেন—সম্মুখে সারির পর সারি প্রভাত বন্দনার ঘৃত প্রদীপ জলিতেছে এবং পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ-মূর্ত্তি বিরাজমান—এই বিহারে যেন পুরাতন দিনের বিপুল কাহিনী লুক্কায়িত আছে,ধ্যান নেত্র বুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, ধনজন অসত্য। বাহিরে আসিয়া যখন গাড়ীতে উঠিলাম তখন হঠাৎ পাচবৎসর পুর্ব্বেকার কথা মনে হইল—সেদিনও ঠিক এমনি সময়ে কলিকাতা বৌদ্ধবিহারের সম্পাদক আমার সিংহল নিবাসী বন্ধুর সহিত একত্রে এখানে আসিয়াছিলাম—আজ সে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে; ছাত্রজীবনের সমস্ত স্মৃতি অনির্ব্বচনীয় গন্ধভার লইয়া প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের মত আমার নিকট পরিস্ফুট হইল।

স্যানিটোরিয়ামে ফিরিয়া আর কোথায়ও যাই নাই—অপরাহ্নে বেড়াইতে বেড়াইতে একবার ভিক্টোরিয়া ফলস্ এ গিয়াছিলাম। স্যানিটোরিয়ামের রাস্তা ধরিয়া কিছু নীচে নামিলেই দেখা যায় নিম্নাভিমুখী জলধারা শৈলাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সরোষে ছুটিয়া চলিয়াছে—বর্ষাকালে এ দৃশ্য উপভোগ্য।

অদ্য আমার দার্জ্জিলিং হইতে বিদায়ের দিন। সকাল-বেলা জানলা খুলিয়া দেখিলাম, সোনার রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বরফাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর রৌদ্রকিরণ পড়িয়া রজতশুভ্র আকার ধারণ করিয়াছে—মেঘগুলি তাহার নিম্নে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে এবং রৌদ্রালোকিত দার্জ্জিলিংসহর যেন স্নানের পর বাসন্তীরঙের সাড়ী পরিধান করিয়া সমৃদ্ধ তরুণীর মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

এই ফটোগুলির জন্য শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদারের নিকট লেখক কৃতজ্ঞ।

হিন্দু-বিবাহ ভঙ্গ আইন

বরোদা রাজ্যে সম্প্রতি হিন্দু বিবাহ আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহিত জীবনের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য মহারাজা একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটিতে রাজ্যের কতিপয় বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। তাঁহারা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন। তদনুসারে আইনের খসড়া প্রস্তুত হয় এবং জনমত সংগ্রহের জন্য উহা প্রচারিত হয়। সনাতনী ও গোঁড়া হিন্দুগণ আপত্তি করিলেও মহারাজা আইনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আইন অনুসারে বিবাহিত পুরুষ বা নারী তাহার স্ত্রী বা স্বামীর ৭ বৎসর কোন সন্তান না পাইলে অথবা স্ত্রী বা স্বামী অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বা তিন বৎসর কাল নির্দ্দয়-ভাবে ব্যবহার করিলে, অথবা পরিত্যাগ করিয়া যাইলে বা সর্ব্বদা মাদক দ্রব্যে বা অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত হইয়া থাকিলে বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত স্বামী বা স্ত্রী যদি প্রমাণ করিতে পারে যে, বিবাহের সময় তাহার স্ত্রী বা স্বামী দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, অথবা অন্ধ, মূক, উন্মাদ বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল অথবা বয়স লুকাইয়া বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলেও বিবাহ অসিদ্ধ হইতে পারিবে। এই আইন অনুসারে আদালতে যদি কোন স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ হয় অথবা তাহার বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয় তাহা হইলে বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণার তারিখ হইতে ছয় মাস পরে উক্ত স্ত্রীলোক পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে।

"জলখেলা ও কিছুমিছু"

শ্রীবিনয় কৃষ্ণ ঘোষ

—পরিচয়

আজ আমি ব্রহ্মদেশের জলখেলা সম্বন্ধে কিছু ব'লবো। এ জলখেলা এরা কোথায় পেল? এ তো সেই কেষ্টো ঠাকুরের যুগের উৎসব। সেই যুগেই তো কেষ্টোঠাকুর গোপীগণ সহ যমুনাতে জলখেলা ক'রতেন। আমরাও তাঁরই উপাসক; কৈ আমরা ত এ জলখেলা উৎসব করিনা। কিন্তু এরা এ উৎসব কোথায় পেল? বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে বা পরে এদেশে আর কেহ ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়ে আসেন নি। আর এদের ইতিহাস খুললেও তেমন কোন মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায় না।

আমাদের পুরাকালীন ইতিহাসের সঙ্গেও একটু সাদৃশ্য দেখা যায়। কপিল মুনির শাপে যখন সগর বংশ একেবারে ধ্বংস প্রায় ভগিরথ তখন অনেক দিন যাবৎ কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মার আরাধনা ক'রে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মাও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য গঙ্গাকে পাঠালেন। গঙ্গা দেবীও মাতৃত্বের গর্ব্ব নিয়ে সন্তানের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য দেবার জন্য পাহাড় পর্ব্বত, গিরি, শৃঙ্গ ভেদ ক'রে ভীম বেগে ছুটে আসছেন। পথে স্বয়ং মহাদেবের সঙ্গে দেখা, কিন্তু গঙ্গা দেবীর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আকুল হ'য়ে ছুটে যাচ্ছেন। মহাদেবেরও যজ্ঞের সামগ্রী সব ভেসে যাচ্ছে। মহাদেব তখন রেগে অস্থির হয়ে বল্লেন—"কি সামান্য মেয়ে মানুষের এত স্পর্দ্ধা"? তাই তাঁর গতিরোধ ক'রবার জন্য চেষ্টা করেন। কিছুতেই পেরে উঠেন না দেখে বাধ্য হয়ে মস্তকোপরি জটার ভিতর গঙ্গাকে লুকিয়ে রাখেন। ভগিরথ তাঁকেও সন্তুষ্ট ক'রে গঙ্গা দেবীকে মর্ত্তে ল'য়ে আসছেন, তখন দেবতাদের প্ররোচনায় একটা ভীষণাকার ঐরাবৎ তাঁকে বাধা দেবার জন্য সামনে এসে দণ্ডায়মান হ'ল। সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর মহাদেব যাঁর গতি রোধ করতে অসমর্থ, সামান্য একটা ঐরাবৎ তাকে বাধা দিবে। মা গঙ্গা তাঁর প্রবল বাহু বিস্তার ক'রে সে দাম্ভিক ঐরাবৎটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। মায়ের আগমনে মরুসম উত্তপ্ত দেশ ঠাণ্ডা হ'ল। পাপীরা সব পরিত্রাণ পেল। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।

এরাও যেন ঠিক সেই আদর্শ নিয়ে ভগিরথের সেই পালাটির অভিনয় করে। এদেশের জলখেলাটা চৈত মাসের শেষাশেষি হয়। সে সময় সূর্য্য ঠাকুর তাঁর প্রখর কিরণের সাহায্যে পৃথিবীর যেন সব রসটুকু টেনে নিয়ে যান। মৃত্তিকা ফেটে চৌচির। গাছ পালা গুলিও যেন তৃষ্ণায় কাতর। তাদের যৌবন সৌন্দর্য্য সবুজ রংয়ের পত্রগুলি রস শূন্য, আশাহীন। তাহারা তাদের যে দাম্ভিকতা ও রসিকতা নিয়ে পবনের সাথে নৃত্যে পরাস্ত হ'য়ে এক একটা ক'রে ঝ'রে পড়ে প্রকৃতিরও যেন সেই অবস্থা। সবাই যেন রস শূন্য। প্রাণিগুলি মাঝে মাঝে জল খেয়ে তাদের সে অভাবটা পূরণ করে। সে সময় এদেশের অনেক কুয়া ও ইদারার জল শুকিয়ে যায়—Upper Burma side এ তো মহামারি কাণ্ড বেধে উঠে।

ব্রহ্মদেশের শস্যাদির জীবনী শক্তি বৃষ্টির উপর। বৃষ্টি যদি না হয়, শস্যাদি হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই, তাই সবাই যেন ভগিরথ হয়ে বারি ধারার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনার আকৃতিটাই জলখেলা উৎসব।

ভগীরথ যেমন তপস্যা ক'রে ব্রহ্মার নিকট হ'তে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য পেয়েছিলেন, এরাও যেন সেই আদর্শ নিয়ে দল বেঁধে নিজেরাই নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য বারি বর্ষণ করে। এদের এ বারি বর্ষণ ব্যাপারে স্বয়ং শিবও আসেননি, বা দেবতাদিগের প্ররোচনায় ঐরাবৎও আসেন না, বা দেবতাদিগের প্ররোচনায় ঐরাবৎও আসে না। তবে নিজেদেরই প্ররোচনায় কাষ্ঠখণ্ড

ও বংশ দণ্ড দ্বারা ভীষণ আকারের ঐরাবৎ তৈরি করে। তার উপর কাগজ ও কাপড় লাগিয়ে নিপুণভাবে রং মাখিয়ে চিত্রকলার এমন পরিচয় দেয় যে, দূর হ'তে সত্য সত্যই একটা ভীষণ আকারের ঐরাবৎ বলে ভ্রম হয়। আবার তাদের পায়ের নীচে কাঠের চাকা লাগান থাকে ও দড়ি বেঁধে সবাই সেটাকে টেনে নিয়ে বেড়ায়। আর চারি পার্শ্বস্থ সকল যুবক-যুবতী পিচ্‌কারীর সাহায্যে জল ছুড়াছুড়ি খেলে, তাতে মনে হয় যেন ঐরাবৎটী তাদের এ বারি বর্ষণ নিবারণ ক'রতে অক্ষম হ'য়ে নীরবে চ'লে যাচ্ছে।

আমাদের ধর্ম্মের দিক দিয়েও এদের অনেক বিষয়ের মিল দেখা যায়। এরা যেন সত্য সত্যই ভগিরথের গঙ্গা-আনার পালাটা অভিনয় করে; তবে ভগিরথ প্রবল বারিধারা গঙ্গার আরাধনা ক'রেছিলেন, এরা প্রবল না হক ক্ষুদ্র বারিধারা বৃষ্টির আরাধনা করে।

আর দ্বাপর যুগের দিক দিয়ে দেখ্‌লেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপীগণ সহ বৃন্দাবনে জলকেলি ক'রতেন এরাও যেন সেটার কতক অংশ অভিনয় করে। তবে স্বর্গের জিনিষ মর্ত্তে এলে যতটুকু পার্থক্য হতে পারে এতে তার চেয়ে বেশী কিছু দেখা যায় না।

এখন ব্রহ্মদেশের জলখেলার জলন্ত ইতিহাসটা একটু খুলে দেখাই। এ উৎসবটা মাত্র তিন দিন স্থায়ী। ব্রহ্মদেশে এটা একটা মস্ত বড় উৎসব। সমস্ত যুবক-যুবতী সেজে-গুজে দল বেঁধে জলখেলা ক'রতে বাহির হয়। ব্রহ্ম মহিলাদের পরিচ্ছদের বিবরণ আমার পূর্ব্বের রচনা ফুঙ্গিদাহনে পেয়েছেন। এখানেও একটু দিয়ে যাই। মহিলারা তাঁদের মন ভুলান রূপ ও প্রাণ মাতান যৌবন নিয়ে কাচের মত স্বচ্ছ ব্লাউজ গায়ে দিয়ে চোক-ঝল্‌সান রংয়ের লুঙি প'রে পিচ্‌কারী বা কারুকার্য্য শোভিত রৌপ্য ও কাষ্ঠ পাত্র হাতে ক'রে জল খেল্‌তে বাহির হয়েছে। এ যেন সত্য সত্যই সেই কেষ্টো ঠাকুরের আমল। যুবক-যুবতীরা নিঃসঙ্কোচে পরস্পর পরস্পরের গায়ে জল সিঞ্চন কচ্ছে। যুবতীদের একেতো স্বচ্ছ কাচের মত ব্লাউজ তাতে আবার জলসিক্ত। একেবারে সোনায় সোহাগা। কিন্তু এত আর সে শ্রীকৃষ্ণের আমল নয় বা সত্যযুগও নয় তাই যে যার প্রাণের মানুষকেই যেন জলসিঞ্চন বেশী ক'রে কচ্ছে। মোট কথা যুবতীদের আপাদমস্তক জলসিক্ত। এটা যে একটা খুব আমোদের উৎসব তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আকাঙ্ক্ষিত জিনিষকে যে-ভাবে পেতে ইচ্ছা হয় তাকে যদি ঠিক সেই ভাবেই পাওয়া যায় তবে আনন্দ কার না হয়? এইরূপ আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য পেলে যে কিরূপ আনন্দ হয় তা সেই বুঝ্‌বে যে তার বাঞ্ছিত জিনিষ ঠিক সেই ভাবেই পেয়েছে।

এ উৎসবে তাদের অনেক কিছু আয় হয়; তবে তার সবই ফায়ার জন্য ব্যয় ক'রে। বাস্তবিক মহিলাদের একটা মোহিনী শক্তি আছে; এ শক্তির প্রভাবে এরা যাতে হাত দিবে তাতে জয়ী হ'বে। মহিলারা তাদের মোহিনী শক্তি নিয়ে যে কাজে হাত দিয়েছেন তাতেই জয়ী হয়েছেন। এখানে আর সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তীর কথা তুলে উঁচুর দিকে উঠ্‌তে চাইনা। নীচের দিক দিয়েই একটা জলন্ত উদাহরণ দেখাই।

ব্রহ্মদেশের কোন এক জেলাতে একজন শ্বেতাঙ্গ বিচারক ছিলেন। যুবতীরা একবার জল খেল্‌তে খেল্‌তে তাঁর উদ্দেশ্যে ধাবমান হ'য়ে তাঁর গায়ে জল-সিঞ্চন করেন। প্রথমে মহিলাদের ভয়ই হয়েছিল কিন্তু ফলে তিনি আকুল হ'য়ে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ জলখেলা ক'লেন। জানিনা তিনি প্রাচ্য দেশীয় প্রেম কি আধুনিক যুগের প্রেম কি সত্যযুগের প্রেম লয়ে তাদের সঙ্গে মিশেছিলেন। মহিলারা তাঁর কাছ হ'তে বেশ মোটা কিছু টাকা আদায় করে নিয়েছিল, তবে তার সবই বৌদ্ধফায়ার জন্য ব্যয় ক'রেছিল।

কিন্তু এ কাজটা যদি মহিলাদের দ্বারা না হ'য়ে যুবকদের দ্বারা হ'ত, তাহ'লে হয় তো পুরস্কারটা আইনের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে দেওয়া হত।

ব্রহ্মদেশবাসীর গুরুর প্রতি ভক্তি অসীম। এজন্য তারা বহু টাকাও ব্যয় করে। এ দেশে যে কত গুলা ফায়া ও ফুঙ্গিচোং আছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে তার ভিতর তিন, চারটী ফায়া আছে যার মূল্য বড় একজন ইঞ্জিনিয়ার, বড় একজন চিত্রকর ও বড় একজন জুয়েলার একত্রিত না হ'লে নির্ণয় করা যায় না।

আগ্রার তাজমহলের মত অবস্থা পরাধীন দেশের প্রাচীন কালের বড় বড় সব জিনিষেরই। তথাপি গত ভূমিকম্পে রেঙ্গুনের সোয়েডাগণ প্যাগোডার চূড়াটী ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি তা নিজেই একবার দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা ক'রতে পারলাম না যে এর মূল্য কত? মূল্যবান মণি মাণিক্য ত আছেই তবে আন্দাজ সোনা প্রায় ৫।৬ সের আছে। পরে শুনতে পেলাম এর মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। তা' ছাড়া নানারূপ কাজ করা, মনুমেন্টের মত উঁচু মন্দির যার উপর হ'তে Bay of Bengal নাকি দেখা যায়। এর মূল্যটাও ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য ব্যতীত নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আজ জলখেলার শেষ দিন। বেলা তখন প্রায় ২টা হ'বে। সূর্য্যঠাকুর তাঁর ভাণ্ডারের সমস্ত কিরণটুকু পৃথিবীকে বিতরণ ক'রে দিয়েছেন। এখন তিনি গৃহাভিমুখে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন। এমন সময় দূর হতে নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও কোলাহল বাতাসের সঙ্গে ভেসে এসে আমার কানে বাজ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দুটীও আপনাহতেই যেন সেই দিক পানে ছুটলো। চেয়ে দেখি সূর্য্য কিরণ তাদের সেই চকচকে পরিচ্ছদের উপর প'ড়ে ঝিকিমিকি করছে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও একটু আকৃষ্ট হ'য়ে পড়'ল। বাসা হ'তে বেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। দেখ্‌লাম বহু রমণী তাঁদের সব চেয়ে মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে মাথায় একটী ক'রে জলভরা মৃত্তিকা ভাণ্ড নিয়ে আসছেন আর তাঁদের পিছু একদল বাদক নানা ভঙ্গিমায় বাজ্‌না বাজাচ্ছে। তাঁদেরই পিছে পিছে একদল যুবক। কেউ মুখে মুখস্ পরেছে, কেউ বা সাপুড়ে সেজেছে, আর কেউ বা হনুমানের মত কি একটা জানোয়ার সেজে লাফালাফি ক'রতে ক'রতে আস্‌ছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও চল্লাম। নিকটেই একটা ফায়া ছিল। তারা সবাই সেখানে ঢুক্‌লো এবং খুব মাতামাতি ক'রলো। সমস্ত কয়টি জলভরা ভাণ্ড ফায়ার ঠাকুর দেবতা বুদ্ধদেবের জন্য রেখে দিল। আস্তে আস্তে পূজার সাজ-সরঞ্জাম এসে হাজির হল। সরঞ্জামের মধ্যে দেখ্‌লাম ঠাকুরের সামনে একটী জলঘট দুপাশে দুটী প্রদীপ জলছে। পাশেই একখানা ধুনোচী রয়েছে। সে সুধু ধূমই উদ্গীরণ কচ্ছে। আর লাইন দিয়ে ছোট বড় রেকাবী কলা, কেক্, বর্ম্মা দেশীয় চুরোট, গৈরিক রংয়ের মোটা মোটা কাপড় ও চাদর, দুই একখানা ক'রে তোয়ালে, বর্ম্মা দেশীয় খাদ্য ইত্যাদি দিয়ে সাজান রয়েছে। ফুঙ্গীরা সব উচ্চ গলায় পালি ভাষাতে পূজা শেষ করে দিল। মহিলারা সব জোড়হাত করে, হাঁটু গেড়ে, চোক বুজে ব'সেছিল হঠাৎ সবাই উচ্চরবে কি একটা শব্দ ক'রে উঠে দাঁড়াল।

সন্ধ্যা হয়েছে। পাশেরই একটা ঘরে Electric dianemo চল্‌ছে। হঠাৎ Electric light এ ফায়াটা ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠ্‌লো। সবারই বিবিধ রংয়ের পরিচ্ছদ ঝিলিক্ খেয়ে উঠ্‌লো। বাইরের মঞ্চের উপর Burmese Theatre পোয়ে আরম্ভ হ'ল। আমোদের ফোয়ারা ছুটতে লাগ্‌লো। ফূর্ত্তীর ভাণ্ডার নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সবাই মিলে আমোদ ক'রতে লাগ্‌লো। রাত্রিও শেষ হয়ে এল। আকাশের পূর্ব্ব কোণে লাল আভা দেখা দিল। যে যার বাড়ীতে চলে গেল।

সবাই ঘরে ফিরল কিন্তু একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক ও একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা আর ঘরে ফিরল না। তারা দুজনাই স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রী। তাদের খোঁজ পড়ে গেল, কিন্তু কোথাও তাদের আর সন্ধান হ'ল না। একদিন, দুদিন কেটে গেল। তারা একেবারে নিরুদ্দেশ।

আজ তৃতীয় দিবস। রবিঠাকুর যেন সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ ক'রে শান্ত মনে আকাশের পূর্ব্বকোণে লাল আকারের ভীষণ একখানা থালার মত ভেসে উঠ্‌ছেন। তাঁর সেই মধুর সোণালি কিরণ ইরাবতীর বক্ষে ছড়িয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন তার সঙ্গে মিশে আমোদে নৃত্য কচ্ছে। এক জোড়া যুবক-যুবতী দুনিয়ার কোথাও শান্তি না পেয়ে এই ইরাবতীর বক্ষে ঢেউয়ের গদীর উপর সোনালি রংয়ের আলোকে আরামে ঘুমুচ্ছে। সূর্য্যঠাকুরও যেন তাদের সে আরামের ঘুমে বাধা দিতে চাচ্ছেন না। তিনি তাঁর ভাণ্ডারের স্নিগ্ধ সোনালি কিরণ বিতরণ ক'রে তাদের আরও আরাম দিচ্ছেন। মা ইরাবতীও যেন তাঁর ভাণ্ডারের সমস্তটুকু মাতৃস্নেহ দিয়ে ঢেউয়ের গদীর উপর তাদের ঘুম পাড়াচ্ছেন।

ছোট ছোট ঢেউয়ের মৃদু মৃদু নৃত্য যেন তাহাদিগকে স্প্রিংয়ের গদীর মত আরাম দিচ্ছে।

তারা দুজনেই পাশা পাশি শায়িত। ছেলেটীর বাম হাত ও মেয়েটীর ডান হাত দিয়ে উভয় উভয়কে আকড়ে ধরে আছে। আর সে হাত দুখানা একখানা রুমাল দিয়ে বাঁধা। রুমালখানা যেন তাদের এই মিলন বন্ধনকে সহায়তা কচ্ছিল।

এ ঘটনাটা যে শুনেছিল তারই প্রাণে বোধ হয় একটু আঘাত লেগেছিল। কিছুক্ষণ পরে তাদের সব কিছু Romance শুন্‌তে পেলাম।

শুন্‌লাম ছেলে বেলা হতেই এরা উভয়ে উভয়কে খুব ভাল বাস্‌তো। এমন্‌কি একদিন কেউ কারো না দেখে থাকতে পারতো না। ক্ষণিকের চখের দেখাতেও যেন এরা খুব শান্তি পেত। আস্তে আস্তে এদের ভালবাসা খুব গভীর হয়ে পড়ে। এখন আর ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে তাদের প্রাণ আর চায় না।

দুর্ভাগ্য তাদের! মা বাপ তাদের ভালবাসার গভীর বেগটা বুঝলনা। মেয়ের মা কিছুতেই ও ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে চাহে না। ছেলের বাপেরও বিশেষ মন নেই। অবশ্য ছেলের বাপের মতামতে এদেশে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ এদেশে মেয়েরাই প্রধান ও অর্থশালী। মায়ের সমস্ত জিনিষই মেয়েতে পায়। ছেলের ইহার উপর বিশেষ কোন অধিকার নেই। মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই এনে নিজের ঘরেই রাখেন—যাকে বাংলা দেশে ঘরজামাই বলে।

কিন্তু তাদের এ নবযৌবনের নব উৎসকে কে বাধা দেবে? এযে বন্যার মত প্রবল। সে তো কোন বাধাই মান্‌তে চায় না। তারাও তাই সকল বাধার বাইরে চলে গেল।

তাদের সে স্বেচ্ছায় সহমরণের দৃশ্যটা দেখে মনে হ'ল তারা যেন রুমালের সাহায্যে হাতে হাতে বেঁধে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কচ্ছে—হে ভগবান! ইহ-জীবনে আমাদের আর মিলনের সম্ভাবনা নেই; তবে পরজন্মে যেন আমাদের এই বন্ধন অটুট থাকে।

ক্ষণ-প্রভা

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

ওগো ক্ষণিকের বন্ধু, এসেছিলে যেন,
বিনা-মেঘ আকাশের বিদ্যুতের হেন,
　　কবে দীপ্তি জ্বালিলে আলোকে,
　　সে মহিমা পড়িল না চোখে,
　　　　অকস্মাৎ বজ্র-রবে কম্পিত ভুবন,
　　　　বধির শ্রবণ হায়, মূর্চ্ছাহত মন!

"সাথী"

কুমারী রেণুকা মিত্র   চিত্র

১

"রেবা, রেবু!"—ব'লে মলিনা তাঁর কন্যাকে পরম স্নেহে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু এত ডাকেও রেবা নাম্নী ছোট্ট সাতবছরের বালিকাটির কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পরিশেষে মলিনা বিরক্ত হ'য়ে গলার স্বরটা আর একটু উঁচু পর্দ্দায় চড়িয়ে ডাকলেন,—"রেবা, কোথায় গেলি, এত যে ডাকছি শুনতেও পাস্ না?" রেবা তখন তার "টেবির" সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল; মায়ের বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি এসে পিছন দিক্ থেকে তাঁর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "হ্যাঁ মা শুনতে পেয়েছি; কি করব বলো আমার "টেবি সোণা" যে আমায় কিছুতেই ছাড়ছিল না, তাই তো তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি।"

কন্যার এই সরলতামাখান মিষ্টিকথাগুলোতে মায়ের বিরক্তি নিমেষের মধ্যে দূরীভূত হ'য়ে গেল; তিনি তাকে আদর ক'রে কোলের কাছে টেনে এনে গভীর স্নেহে তার পাতলা ঠোঁটদুটিতে একটি চুমা খেলেন। রেবাও তার একটী প্রতিদান দিয়ে ছুটে তার টেবির কাছে চলে গেল। মলিনা কন্যার চঞ্চল পদক্ষেপের দিকে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলেন।

২

কলিকাতার একটি সরু গলির ভিতর, একটি দ্বিতলবাটীতে এই ছোট্ট পরিবারটীর অবস্থান। বাটীর কর্ত্তা নরেনবাবু কলিকাতার একজন বড় অফিসার; তাঁ'র স্ত্রী মলিনা দেবী ও একমাত্র কন্যা রেবা। তাঁর উপার্জ্জনেই দিনগুলি বেশ স্বচ্ছলভাবে অতিবাহিত হ'য়ে যায়। তদুপরি আরো দুইটী প্রাণীও এই পরিবারভুক্ত; একটি, চাকর "হরে" এবং অপরটী, তুলোর মত শাদালোমে ঢাকা কুকুরছানা "টেবি।" টেবি রেবার অতি প্রিয় এবং একমাত্র খেলার সাথী। সে স্কুলে যা'বার সময় এর সঙ্গে দেখা ক'রে, আদর ক'রে যায়, আবার স্কুল থেকে এসেই সর্ব্বাগ্রে তার কাছে গিয়ে বসে।

প্রত্যহ বেলা ১০টার সময় স্কুলের বাস আসে; সহিসটা নেমেই চীৎকার ক'রে ওঠে "গাড়ী আয়া বাবা"; রেবা আগে থেকেই খেয়ে-দেয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে; সহিসের উচ্চরব শুনে সে টেবির কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে "টেবি, আমি আসি, আবার স্কুল থেকে এসে তোমার সঙ্গে খেলা কোর্‌ব, কেমন?" টেবি তার পা হাত চেটে যেন সম্মতি জানায় "এসো।"

৩

সেদিন সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল; ঝুপ্ ঝুপ ক'রে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল।

সর্ব্বাঙ্গে কাদামেখে স্কুলের বাস নিয়মমত দশটার সময় আস্‌তেই সহিসের চীৎকারে রেবাও যথারীতি টেবিকে আদর ক'রে স্কুলে চলে গেল। সাড়ে তিনটার সময় যখন সে স্কুল থেকে ফির্‌ল, তখন তার ভয়ানক মাথা ব্যথা কর্‌ছে, বেশ জরও হ'য়েছে। মলিনা বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। নরেনবাবু পাঁচটার পর অফিস থেকে ফিরে কন্যার অসুখ শুনেই তখনি ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন। ডাক্তারবাবু এসে দেখে বল্লেন "খুব সম্ভব টাইফয়েড—ফিভার'।"

রাত্রে রেবার জর খুব বেড়ে ১০৫° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠ্‌ল। সে বল্‌তে লাগল "মা, আমার টেবি কোথায়? তাকে আমার কাছে এনে দাও না মা।" টেবিকে তার কাছে বিছানায় এনে দেওয়া হোল; সে তার লোমভরা গায়ে পরম আদরের সহিত হাত

বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। টেবি তার ছোট্ট প্রভুর ম্লান মুখখানির দিকে ছলছল চোখে চেয়ে রইল।

এই রকমভাবে দু'দিন কেটে গেল; অসুখ ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ল। অতঃপর তিনদিনের দিন ডাক্তারবাবু এসে তাকে পরীক্ষা ক'রে মুখভার কর্‌লেন। তার নাড়ীর গতি ক্রমশঃই ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের শেষরশ্মি জগতের বুক থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেল, সন্ধ্যাদেবী তাঁর ধূসর বর্ণের আঁচলখানি ধরণীর বুকে বিছিয়ে দিয়ে ধরাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লেন; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ছোট্ট পরিবারটীও শোকের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। একটি কুঁড়ি ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই পৃথিবীর বুকে শুকিয়ে ঝরে পড়্‌ল।

৪

"টেবি" পশু হ'লেও সে বুঝি বুঝ্‌তে পেরেছিল যে, তার প্রভু তাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেল। তাই সেও তার জলভরা চোখ দুটী প্রিয় প্রভুর স্বর্গীয় জ্যোতিঃমাখা মুখের উপর স্থাপিত ক'রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল।

শতচেষ্টা ক'রেও টেবিকে কেউ কিছু খাওয়াতে পারে না; দুধের বাটী দিলে, দুধ সেইভাবেই পড়ে থাকে; সমস্তক্ষণ তার চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল ঝরে। তিনদিন তার অনাহারে কেটে গেল।

চতুর্থদিনের দিন সকালে উঠে দেখা গেল যে, টেবির প্রাণহীন, নিস্পন্দ দেহ পড়ে রয়েছে; তার জলভরা চোখ দুটী যেন তারই প্রভুর পানে আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে। রেবার বড় আদরের সাথী টেবি আজ অনাহারে তার কাছে চলে গেল! বুঝি রেবা ছাড়া তার ইহজগতে কোন সাথী ছিল না; তাই সঙ্গীহারা, মৌন হ'য়ে সে থাক্‌তে না পেরে তার প্রিয় সাথীর কাছেই চলে গেল।

সর্পদংশনের প্রতিষেধ

বর্ষাকাল আসিয়াছে এ ঋতুতে সর্পের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং কেহ কেহ সর্প দংশনে জীবন ত্যাগ করেন। তাই পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত। শ্বেত করবীর শিকর ধারণে সর্প ভয় থাকে না। সর্পে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ দ্রোণ পুষ্প (দণ্ড কলসী) গাছের পাতার রস কিঞ্চিৎ তালুতে দিবে এবং এক ড্রাম আন্দাজ রস সেবন করাইলে রোগী মরিতে পারে না। ঢাকা সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন) মহাশয় জানাইয়াছেন যে, 'আকন্দ' গাছের ডালেতে ছুরিদ্বারা আঘাত করিলে বা পাতার বোটা ছিড়িলে দুগ্ধের মত যে সাদা রস বাহির হয় তাহার অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ সর্পদষ্ট রোগীকে খাওয়াইলে ও যতটা সম্ভব পরিমাণ দষ্ট স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে যে কোন বিষধর সর্পের বিষ অবসারিত হইয়া দষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবে। তিনি বহু রোগীরদ্বারা পরীক্ষার পর ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। দেশবাসী একবার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

নম্বর '৫৫৫'

শ্রীঅনিল কুমার মুখোপাধ্যায়

গল্প

রাত বারটা।...

প্রকাণ্ড জংসন ষ্টেশন—লাইনের ওপর লাইনের গোলক ধাঁধাঁ।...চারিদিকে আলো—লাল, সবুজ, সাদা। যেন মায়ারাজ্যের মায়াপুরী, দিনান্তে সহসা ভেসে উঠেছে।...

একটী আধা বয়সী ষ্টেশন মাষ্টার প্রকাণ্ড ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসে ঢুলছেন—আর মাঝে মাঝে তাঁর ঘুমে ভরা চোখ দু'টো দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় রেলওয়ে ঘড়িটার ওপর পড়ছে।..... ঢং ঢং ক'রে বারটা বাজলো। আর পনর মিনিট পরে শেষ ট্রেণখানা এসে পঁহুছিলেই তাঁর ছুটী।...

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে ট্রেণ ছুটে আসার শব্দ আসে দূর থেকে। মাষ্টার বাবু সজাগ হ'য়ে ওঠেন।... তকমা আঁটা মোটা কোর্টটা আবার একবার তখন গায়ের ওপর ওঠে। কিছু পরেই নং ৫৫৫ গর্জ্জন করতে করতে প্লাটফর্ম্মে ঢুকে হঠাৎ থেমে গিয়ে হাঁপাতে থাকে। চারিদিকে সোরগোল পড়ে যায়—আর চোয়াড়ে চেহারা ছেঁড়া কোর্ত্তা পরা বৃদ্ধ গফুর মিঞা ইঞ্জিন থেকে তার ছোট লণ্ঠনটা হাতে করে নেমে আসে...

রাতের মত এ গাড়ী রোজ এখানেই থাকে।... গফুরের কয়লামাখা শির বেরনো মুখের ওপর একটা তৃপ্তির ছায়া ফুটে ওঠে।.. ...বড় বড় দাঁত বার করে ষ্টেশন মাষ্টারকে সে সেলাম ঠোকে। ...সমস্ত দিন ছিল কাজের নেশায় মশগুল—এখন কার্য্যান্তের অবসরে একটা কচি মুখ চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে।...... আজকের মত ছুটী......আবার কাল। ছোট লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে—ষ্টেশনের হদ্দা ছাড়িয়ে,—মাঠ পার হয়ে অদূরের বস্তির পথে পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে সে চলে।......

বৃদ্ধ গফুরের জীবনের শেষ পঞ্চাশটা বছর কেটেছে —লোহা-লক্কড়, ধোঁয়া—আগুনের সঙ্গে। পনর বছর বয়সে সে ঢোকে—ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান হ'য়ে—এখন লোকাল ট্রেণের ড্রাইভার সে।...আর জীবনের প্রায় শেষ সীমায় এসেও এ কাজে কোনদিন তার আলস্য নেই—অবসাদ নেই, ক্লান্তি নেই।...অসীম তৃপ্তি আর উৎসাহের সঙ্গেই সে তার জীবন-তরী একটানা বেয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে।...কিন্তু পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও তার শরীর অপটু হয়নি। তার মত লম্বা পাকানো হাত, চওড়া কব্জি অনেক যুবকেরও নেই।...কাজে সে যা সুখ পায় আর কিছুতেই বোধহয় তা পায় না।...রেলের সাহেবেরা যখন তার পিঠ চাপড়ে বলে,—"গফুর, তোমার মত বিশ্বাসী আর পাকা লোক আর হবে না।" তখন তার প্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভ'রে ওঠে।.. এইটুকুই তার সব। এর বেশী সে আর কিছু চায়ও না—আশাও করে না।—ইঞ্জিনের কাজ ছাড়বার কথা সে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। '৫৫৫' এর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার কথা মনে হলেই বৃদ্ধের সকল আনন্দ, সকল উৎসাহ নিমেষে যেন নিভে যায়।... '৫৫৫' এর হাতলে অপর একজন যে এসে হাত দেবে—এ সে কোনমতেই সহ্য করতে পারবে না। '৫৫৫' যে তারই শুধু।...তার প্রত্যেক খোঁজখাঁজ—প্রত্যেক কল কব্জা—প্রত্যেক স্ক্রীউটুকু পর্য্যন্ত যে তার একান্ত পরিচিত। "৫৫৫" ই তার জীবনের সম্বল ...

বিবাহ হোয়েছিল তা স্বপ্নের মত মনে পড়ে।...তখন তার বয়স মাত্র উনিশ।...তারপর একটী পুত্রের জন্ম দিয়ে আমিনা বিবি ওপারের ডাকে চ'লে যায়।...রহমত এখন যুবা। তার বিবাহও হ'য়েছে; গফুর একটী ফুটফুটে

নাতিরও মুখ দেখেছে।...গফুর রহমতকেও ঢুকিয়ে নিয়েচে রেলেরই কাজে।...তার ইচ্ছে দাদুটীও তার রেলেরই কাজ শেখে।...গফুরের বাইরের সম্বল ৫৫৫ আর ঘরের সম্বল এই পাঁচ বছরের দাদুটী।...বৃদ্ধের অবসর সময়টুকু কাটে দাদুটীর সঙ্গে রেলের গল্প করে।.. এ রকম উৎসাহী ও ধৈর্য্যশালী শ্রোতা সে আর পায়না। হাঁটুর উপর বসিয়ে—হাত নেড়ে কত কথা গফুর তাকে বলে যায়।...পাঁচ বছরের ছেলে,—শুনতে শুনতে ঠাকুরদাদার গলা জড়িয়ে—কখন খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠে—আবার কখন বা অবাক হয়ে শোনে—বৃদ্ধের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার কথা।...

প্রত্যেক বছরেই শীতকালে গফুর ছুটী পায় তিরিশটা দিন।.. এবারেও পেয়েছে।...শীতের কনকনে সন্ধ্যাটা তার কাটে আগুনের ধারে বসে বস্তির আর পাঁজজনের সঙ্গে রেলের গল্প ক'রে। গল্প করতে করতে তার জীর্ণ মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফুটে উঠে।.. হাত মুখ নেড়ে সে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার গল্প বলে যায়। কোন সময়ে হয়তো তাদের কাছ থেকে একটু উৎসাহ পায়-আবার কখন বা তারা এই একঘেয়ে গল্প তার শুনতেও চায় না।..অন্তরালে কেউ বলে, বাচাল—কেউ বলে, পাগল।...

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ কুয়াসায় ঢাকা ছিল। আর মাঝে মাঝে ঝুর ঝুর করে দু-এক পশলা বৃষ্টিও ঝরছিল।...বস্তির সকল পুরুষই কাজে বেরিয়েচে—কেউ কলে—কেউ রেলে—কেউ নূতন পোলের মাটী কাটতে।...আছে গফুরই কেবল একা।...আজিকার বাইরের আবহাওয়াটার সঙ্গে তার মনের ভিতরকার আবহাওয়াটা একেবারেই একাকার হোয়ে পড়েছিল।... থেকে থেকে একটা অজানা ব্যথার সুর তার হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার দিয়ে একটা বে-সুরো গৎ বাজাচ্ছিল।...অতীত দিনের হাসি-কান্নার ছোট-বড় অনেক কথাই আজ তার মনের পর্দ্দায় একটীর পর একটী এসে উদয় হচ্ছিল।... কুয়াসার ভিতরে ভিতরে সূর্য্যদেবকে তাড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যারাণী কখন যে তাঁর আসন নিয়েচেন-একথা গফুরের খেয়ালই ছিল না—চমক ভাঙলে দূরের পাট কলের ছুটীর বাঁশীর ক্ষীণ আওয়াজ বাতাসে ভেসে এসে কাণে ঢুকতে।...

ক্রমে ক্রমে দুপুরের শূন্য বস্তিগুলি আবার গুলজার হয়ে উঠলো।...কিন্তু রাত অনেক হ'ল তবু রহমত—আর ফেরে না। বস্তিতে খবর নেওয়া হ'ল, সকলেই এসেছে।—রহমত? কই রহমতকে ত তারা দেখে নাই।...ক্রমে রাত গভীর হয়ে উঠলো।...গফুরের শক্ত অন্তঃকরণটাকেও একটা অজানা ভয় এসে কাঁপিয়ে দিতে লাগলো।...

রাত প্রায় শেষাশেষির সময়—অদূরে একটা সোরগোল শুনতে পাওয়া গেল।...গফুর উৎকর্ণ হ'য়ে—শোনে ভিড়ের ভেতর তার নাম শোনা যায়।...... আগড় ঠেলে ছুটে গিয়ে দেখে রেলের লোক।...... তারা বললে,—"মিঞা, যেতে হবে তোমায় এক্ষুণি—ইষ্টিসানে,—ছেলে তোমার ডাউন ট্রেণের তলায়......"

সাহেনা আছাড় খেয়ে পড়ল—গফুর শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।...দাদু কিছুই বুঝতে পারলে না—না বুঝেই সে কাঁদতে লাগলো।...

মাসখানেক পরে ছেলেটীকে বুকে ক'রে সাহেনা চলে গেল তার বাপের বাড়ী—বৃদ্ধের ছোঁয়াচ থেকে ছেলেটীকে বাঁচাবার জন্য। বুড়োই নাকি রহমতকে মেরে ফেলেছে—সেই ত রেলের কাজে ঢুকিয়েছিল তাকে।...নইলে কি রহমত আজ এমন ক'রে ইঞ্জিনের তলায়..

সাহেনার যাবার দিন গফুর দাঁড়িয়ে রইল—পাথরের মূর্ত্তিটীর মত তার দাদুটীর দিকে চেয়ে,—একটি কথাও মুখ থেকে বেরুল না; কোন আবেদন নয়, কোন নালিশ নয়—এক ফোঁটা চোখের জলও বোধ হয় শুষ্ক গণ্ডবেয়ে তার গড়িয়ে পড়ল না।...

সকলেই গফুরকে ছেড়ে গেছে—এমন কি তার দাদুও। সেই জন্যে সে তার ইঞ্জিনখানাকে আরও বেশী ক'রে যেন আঁকড়ে ধরলে।...ভাবে এও যদি রহমতের মত, তার দাদুর মত হঠাৎ কোনদিন ফাঁকী দিয়ে পালায়!—

কিন্তু আগেকার গফুরের সঙ্গে আজকালকার গফুরের অনেক তফাৎ হ'য়ে গেছে।...আগেকার মত আনন্দ উৎসাহে কাজ কর্ত্তে সে পারে না। চেষ্টা ক'রে, জোর করে—মনটাকে মিশিয়ে দিতে চায়—লোহা-লক্কড়ের মধ্যে।..কিন্তু সব ঠেলে সামনে ভেসে ওঠে একখানি

কচি মুখ।...যেন তার গলা জড়িয়ে,—টানাটানি—ক'রে বলছে,—"দাদু তারপর ?"

ইঞ্জিন ছোটে তার নিত্যকার ছোটার পথে।—আর শূন্য দৃষ্টিতে গফুর বসে থাকে তার হাতল ধ'রে।...বসে ব'সে কি সব আকাশ-পাতাল ভাবে।...একদিকে বন, প্রান্তর, ঝোপ-ঝাড়, নদী-নালা অতিক্রম ক'রে '৫৫৫' ছুটে চ'লে উদ্দাম গতিতে।...আর একদিকে শত শত আরোহীর জীবনকাঠি হাতে নিয়ে গফুর বসে বসে ভাবে।...ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ পরে এক একবার সে খালি চমকে ওঠে।...তখন গফুরের হাত অবশ হোয়ে আসে—হঠাৎ চোখে—অশ্রুর বন্যা নেমে আসে।...চারিদিক ঝাপ্‌সা দেখে।...বাইরের সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ ক'রে কিছু আর সে দেখতে পায় না।...পঞ্চাশ বছরের পরিচিত রাস্তাটাই তখন একেবারে তার অপরিচিত বলে মনে হয়।—

হঠাৎ সেদিন গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে চোখের সামনে নিমেষে ভেসে উঠলো দু'—দুটো লাল সাঙ্কেতিক আলো। একেবারে সামনা-সামনি।...গফুরের মাথা ঘুরে বুক কেঁপে উঠলো।...সেই সাঁকোটা...বোধ হয়—আবার ভেঙেছে।...শরীরের সমস্ত শক্তি এক কোরে সে ইঞ্জিনের ব্রেক চেপে ধরলে।...কিন্তু তার আগেই কাজ শেষ।...

দুর্ঘটনার পর গফুর হাঁসপাতালে।...সেইখানেই খবর পেলে যে—তার কাজ গিয়েছে। অপরাধ গুরুতর। পুরানো চাকর বলেই তাই—নইলে বড় রকমের অন্য কিছু একটা শাস্তিই হয়তো হোয়ে যেত।...শুনে বৃদ্ধের জরাজীর্ণ শরীরটা খালি একটু কেঁপে উঠলো—চোখের কোণে এক ফোঁটা জলও বোধ হয় বা এসে জমলো কিন্তু আর কিছু নয়।...

* * * *

হাঁসপাতাল থেকে যেদিন গফুর তার ক্ষীণ দেহটাকে টেনে নিয়ে বাইরের মাটিতে পা দিলে সেদিন তার মনে হ'ল—পৃথিবীটা যেন একেবারে বদলে গেছে।...ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধারে তার শূন্য কুটীরের প্রাঙ্গণে এসে সে দাঁড়ালো।...দু'টো শেয়াল পায়ের শব্দে ছুটে পালিয়ে গেল। কি মনে ক'রে সে বেরিয়ে আবার এক পা এক পা ক'রে প্রকাণ্ড রেলওয়ে কারখানাটার ধারে এসে দাঁড়ালে। উৎসুক চোখ দু'টো ভিতরে কি যেন অনুসন্ধান করতে লাগলো।...হঠাৎ এক যায়গায়—তার চোখ দু'টো পড়ে স্থির হ'য়ে রইলো।—অত্যুজ্জ্বল বিজলী বাতির আলোয় সে দেখলে, তার আদরের ভাঙ্গা ৫৫৫কে আবার নূতন ক'রে সংস্কার করা হোয়েছে এবং আর একজন নব নিযুক্ত চালক ফুল্ল মনে—তার কলকব্জা পরীক্ষা করছে।...

গফুর বাহিরে এসে অন্ধকারের মধ্যে এক স্থানে বসে পড়ল।...

স্মৃতি

শ্রীসুবাসিনীবালা বসু

পল্লীর বুকে আঁকাবাঁকা পথের পাশে একখানা ভাঙ্গা দোতলা বাড়ী। ঝোপে ঢাকা জঙ্গলে ঘেরা। নানান রকম গাছ তার দেহে শিকড় গেড়ে, আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে কত যুগযুগান্তর হতে দাঁড়িয়ে আছে এম্‌নি করে। দিনে বাদুড় চামচিকে ও পেঁচার বাথান। রাতে শিয়াল ডাকে। বাড়ীটা সচরাচর পথিকের চোখে পড়ে না।

এ বাড়ীতে বাস করে একজন বৃদ্ধা।

বয়েস তার অনেক। তার জীবনের উপর দিয়ে কত ঘাতপ্রতিঘাত চলে গেছে, রঙ্গিন বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ একে একে নিজনিজ ক্ষমতা বিস্তার করে চলে গেছে। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে হেমন্তের কুহেলিকায় জীর্ণ মনপ্রাণকে ধরে বসে আছে শীতের প্রতীক্ষায়।

গভীর রাতে শিয়ালের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায়। সমস্ত রাতে আর ঘুম আসে না। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাল্য, কৈশোর, যৌবনের ম্লান স্মৃতি-গুলি ভেসে ওঠে মনের জীর্ণ মন্দিরে সুদূর স্বপনের মত। ভাবে যা চলে গেছে তা কি আর ফিরে আসে না?

মনে পড়ে তরুণ-যৌবনে একজনের হাত ধরে, শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মাঝে এই গৃহে প্রবেশ। দু'টি বৎসর সেই লোকটির উপর অকারণে কান্নাহাসি, অযথা মানাভিমান। আবোল-তাবোল বাজে কথা। তারপর নবাগতের আগমনে সে কি আনন্দ। ধীরে ধীরে সংসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়া। শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু। সংসারে একেশ্বরী কর্ত্রীত্ব।

পুত্র-কন্যার বিবাহ। কত উৎসব রজনী একে একে চলে গেছে।

তারপর প্রিয়তম সঙ্গীর মৃত্যু। সে কি বিষাদময়ী রজনী।

* * * *

চিত্র

পুত্রগণ আজ বিদেশে।

মার খোঁজখবর বড় রাখে না। মা কিন্তু পাড়ার ছেলেদের ধরে চিঠি লেখায়। বলে লেখ, এবার পূজার সময় বাড়ী আসতে।

অনেকদিন উত্তর আসে না। কখন যদি আসে লেখা থাকে,—অফিসের কাজের এত ভীড় যে, চিঠি লিখবার সময় নেই। বাড়ী যাওয়া হবে না; গেলেই তো ম্যালেরিয়া ধরবে। তার চেয়ে না যাওয়া ভাল। আবার অন্য আর একজন লেখে, এবার আমরা পূজার সময় গিরিডিতে বেড়াতে যাবো। আর তোমার বৌমার শরীরটাও তত ভাল নেই।

বৃদ্ধার দুচোখ বেয়ে জল আসে। পুত্রের অমঙ্গলের ভয়ে তাড়াতাড়ি আঁচলে মুছে ফেলে। মনে মনে বলে আহা তাই যাক্—তাতে যদি তারা আনন্দে থাকে তাই যাক্।

কন্যারা সব সংসার নিয়ে ব্যস্ত, কেমন করে আসে।

দীর্ঘনিশ্বাসে পাজরা ভেঙে যায়।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালে। কিন্তু মনের প্রদীপ আর জ্বলে না। যতটা পারে ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়ীটায় প্রদীপ দেখায়। এযে তার স্বামীর ভিটে, তার যে তীর্থস্থান। নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে, শিউরে ওঠে ভাবে সেই কি আমি এই।

* * * *

আহ্নিকে বসে।

কিন্তু সমস্ত প্রাণ জুড়ে সেই স্মৃতি। চমকে ওঠে। যেন শুনতে পায়, এক বালিকা ভীতকণ্ঠে বলছে, দেখ মা, ছোড়দা আমায় মারছে।

বৃদ্ধা চীৎকার করে ওঠে, এই ধীরেন আবার লীলাকে মারছিস্?

তারপর একটা বালিকাকে দৌড়ে পলাতে দেখে পশ্চাতে একটা বালক।

মালা হাতেই থেকে যায়। বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ায় আকুল আগ্রহে, হস্ত প্রসারিত করে কাকে যেন বুকে চেপে ধরবার জন্য ছুটে যায়। দেওয়ালে আঘাত পেয়ে চৈতন্য ফিরে আসে। অন্তরাত্মা হাহাকারে কেঁদে ওঠে। মাটিতে লুটিয়ে কাঁদে, মনে পড়ে তাকে তো কত দিন কেউ মা বলে ডাকেনি।

থেকে থেকে সুদীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণ আকুল উচ্ছ্বাসে প্রশ্ন করে ওঠে শুধু

আরো-আরো-কতদূর!

এই দুর্বিসহ বোঝা নেমে যাবে, সমস্ত ক্লান্তি ভরা বেদনার সমাধি হবে সে শুভ মাহেন্দ্র যোগ—

আরো-আরো-কতদূর!

মাটির ধরণী

শ্রীবিজয় মাধব মণ্ডল সাহিত্য সরস্বতী বি.এ

বিচিত্র সঙ্গীত ময়ী, আলোছায়া ভরা,—
এই নাকি ব্যথা-ময়ী ধরা!
হৃদি-হীন বিধাতার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
রুদ্র-অভিশাপ-সম ভরি এর আকাশ বাতাস,
ফিরে নাকি এরি বুকে শ্বসিয়া শ্বসিয়া
হাহাকারে দশদিক মুখর করিয়া!

তারা বুঝি দেখেনি এ ধরণীর মোহিনী মূরতি!
সুললিত গতি
শোনেনি সঙ্গীত তার,—ছন্দোময়ী আনন্দের বাণী
জীবনের পূর্ণ পাত্র খানি
তুলিয়া ধরেনি বুঝি কোনো দিন প্রাণের নেশায়
তৃষাতুর অধর-রেখায়!

এই এর মাটি—
এ-যে নিজ রূপে রসে পড়িতেছে ফাটি
কুসুমে পল্লবে,—নীল দিগন্ত-বিসার
তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝার!

এরি পাষাণের বুক ধূসর বন্ধুর,
ভেদিয়া যে নামে নিত্য সুধাদ্রব সঙ্গীতের সুর
উপলে উপলে তার নৃত্য-তালে মঞ্জীর শিঞ্জনে
অশ্রান্ত-আনন্দ গানে,—পুলকের অসহ স্পন্দনে!

বজ্রগর্ভ এরি মেঘ মালা
বুকে নিয়ে বিজলীর তীব্র বহ্নিজ্বালা
ফিরে কে গভীর কণ্ঠে গান গেয়ে গগনে গগনে,-
পুলকাশ্রু-পূর্ণ দুনয়নে!
তালীবনে বর্ষানামে,—ঝর ঝর ঝর!
লতিকা শিহরি উঠে আনন্দের পরশ-কাতর;

সর্ব্ব হারা
বালুকা কঙ্করাকীর্ণা এরি মরু ধূসর সাহারা
আনন্দের রচে ইন্দ্রজাল—
মরিচীকা হেসে উঠে বক্ষে তার বালুকা বিশাল!
কি প্রচণ্ড আনন্দের সুরের সংঘাত
জাগায় বিচিত্র ছন্দে প্রাণে কত সৃষ্টির প্রভাত!

* * *

এই যদি ব্যথাময়ী ধরা—
তোমরা মাগিয়া লও তোমাদের সুপ্তি শান্তিভরা
সুখ-স্পর্শ, কল্পলোক, মন্দাকিনী—আনন্দনির্ঝর
কল্পবৃক্ষ, সুখের আকর।
ধূসর বরণী—
এ ধরণী, মাটির ধরণী—
এই মোর ভালো,
এরি বুকে, এরি প্রেমে জ্বলেছিল জীবনের আলো

পথের আলো

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

গল্প

প্রমোদ কুমার রায় ওরফে পি, কে, রায়, বালুরঘাটের উকীল। সবে বছর পাচক হইল ইউনিভার্সিটীর সিঁড়ী পার হইয়াই বালুরঘাটে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে। স্থানীয় বারে উকীল হিসাবে তাহার নাম যতটুকু থাকুক আর নাই থাকুক, তাহার চাইতে বেশী নাম ছিল তাঁর স্বদেশ প্রেমিকতায়—সে একজন আদর্শ যুবক বলিয়া। কুড়ি বৎসর বয়সে প্রমোদ পিতামাতা হারাইয়াছে। একমাত্র জ্যেষ্ঠ সহোদর কলিকাতার কোন এক মার্চ্চেণ্ট অফিসের দুইশত টাকা বেতনের বাবু—কেরানী নন্।

ইউনিভার্সিটীর সিঁড়ি পার হইতে না হইতেই প্রমোদের সহিত নমিতার সাক্ষাৎ হয়। নমিতা প্রমোদের স্ত্রী—বর্ত্তমানে বালুরঘাটের বাসার গৃহিণী। নমিতা ষোড়শী, মৃগনয়না, সুকেশা গায়ের রঙ্‌ও ফর্সা;—একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা বা কুন্দের মত কল্প রূপসী না হইলেও সুন্দরী! আর তাহাকে সুন্দরী বলিলে সব চাইতে অধিক আনন্দ গর্ব্ব হইত প্রমোদের।...

প্রমোদ, উকীল হইলেও আপ্-টু-ডেট্ যুবক—তারুণ্যের ভক্ত। সে চাহিয়াছিল, তাহার স্ত্রীকে নম্র বিনয়ী—আধুনিক মতে আইডিয়াল লেডী করিয়া তুলিতে। নানা সভা সমিতিতে নমিতাকে অনেক সময় লইয়া যাইত। আর নমিতা ও ভাবিয়াছিল, স্বামীকে নিজের বশে রাখিয়া তাহার নারীত্বকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে—স্বামীর মত সেও চাহিয়াছিল, তাহার সুপ্ত স্বাধীন বাসনার পূর্ণ জাগরণ।

তখন আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে। সাধারণ লোকে সিগারেট—স্থানবিশেষে বিলাতী কাপড়ও—বর্জ্জন করিয়াছে। যে পারিয়াছে সম্পূর্ণ স্বদেশী হইয়াছে; যে না পারিয়াছে এই সুযোগে খদ্দর পরিয়া অধিকতর ভদ্র হইয়াছে—অবশ্য গোপনে সিগারেট-সেণ্টের শ্রাদ্ধ করিয়াই।

এমনি একদিনে প্রমোদকে অসময়ে কোর্ট হইতে বাসায় ফিরিতে দেখিয়া নামিতা বলিল,—"আজ যে এক্ষুনি বড়............"

"তোমারই টানে"

—নমিতা মুখ গম্ভীর করিয়া বাইরের বারাণ্ডার দিক্‌টায় তাকাইল।

প্রমোদ বলিল,—"বিশ্বাস হ'লনা বুঝি নমিতা!"

"হবে না কেন........."

"—নমিতা!"

"কেন?"

"ব'লছি যে, আজ তোমাদেরই মত কত গৃহলক্ষ্মী কোর্টে এসে পিকেটিং ক'চ্ছেন;—কিছুতেই কাছারীতে ঢুকতে পেলাম না।.........কি ক'রে আজ আর কোর্টে যাই বল?"

"তাদের আবার এমন ক'রে কপাল পুড়লো কেন?"

"—নমিতা!.........কি ব'লছো?"

"ব'লছি, তাদের স্বামীগুলোকে ঘরের বার ক'রে দিয়ে তারা মর্দ্দানী ক'ত্তে বেরুলো কি দুঃখে?"

বিস্ময়ে লজ্জায় প্রমোদের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

নমিতা বিদ্রূপ কণ্ঠে কহিল,—"কি দেখ্‌ছো?......আমাকেও নিয়ে গিয়ে পথে দাঁড় করাবে নাকি?"

"দরকার হ'লে আজই........"

"—থাক্ থাক্.........একটুও লজ্জা ক'রলনা ব'লতে? ....আজ নিজের ঝোঁকে, শেষে মা-বোন্‌কে ঘরের বার ক'রে মুখ উজ্জ্বল কর্ব্বে নাকি?"

"ছি!.......নমিতা, তুমি না শিক্ষিতা! তুমি না আমাদের কুললক্ষ্মী!"

"কুললক্ষ্মী বটে;—কিন্তু তোমাদের এই বঙ্গজাতির পথ-লক্ষ্মী নয়!"

একি যা তা বল নমিতা!"

"বলছি, তোমাদের মত পুরুষের কথা!………… এদের পুরুষেরা কি যে………"

প্রমোদ কি যেন বলিতে চাহিতেছিল—বলিতে পারিল না। বিস্ময়ে ক্ষোভে আপনা হইতেই তাহার মাথা নত হ'য়া আসিল। আত্মস্থ হইয়া একবার নমিতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। পর মুহূর্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় গেল, কেহই দেখিল না।

লবণ আইন অমান্য করিয়া স্থানীয় বহু যুবক সসম্মানে রাজদ্বারের অতিথি হইয়াছে। দেশময় তখন—"আইন অমান্য কর, আইন অমান্য কর—অসহযোগের পথে অগ্রসর হও"—কলরবে একটা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রমোদ কুমার কোন্ আইন অমান্য করিবে স্থির করিতে না পারিয়া সহসা কোর্টে যাওয়া বন্ধ করিল এবং বাসায় স্ত্রী-আইনের কূট তর্ক আরম্ভ করিল—স্ত্রী নমিতার সঙ্গে।

যেদিন প্রমোদ কোর্টে যাওয়া বন্ধ করিল সেদিন নমিতা কিছুই খাইল না—বিছানা হইতে উঠিল না। পরদিন বিছানা হইতে উঠিল বটে কিন্তু কিছুই খাইল না। এমনি করিয়া কয়েকদিন হইতে ভাবী অশুভ ঘটনার সূচনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছিল।

স্থানীয় আইন অমান্য পরিষদের চতুর্থ দলের অধ্যক্ষের নাম করা হইল—পি, কে, রায়। প্রমোদও এই উৎসাহী মৃত্যু-কল্প যুবকদের আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারিল না—করিবার বিশেষ কারণও তখন সম্মুখে দেখিতে পায় নাই। আত্মীয়-স্বজন এমন কী স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবকদলের অধ্যক্ষ পদগ্রহণ করিয়া আইন অমান্যে যোগ দিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার ইচ্ছা ছিল, দেশের দশের, এই পরাধীন জাতির একটা কিছু করিবে। কিন্তু এতদিন স্ত্রী-আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাকে সে সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইতে হইয়াছিল, আজ সেই সুযোগ আসিল—সে স্থানীয় আইন অমান্য পরিষদের প্রধান স্বেচ্ছাসেবক—চতুর্থ বাহিনীর অন্যতম অধ্যক্ষ।

বিদেশে স্বামীর হাতে পড়িয়া এতটা হইবে নমিতা তাহা পূর্ব্বে কখনও ভাবে নাই। কলিকাতায় বাপের বাড়ীতে বাবা নাই। ভাইদের চিঠি লিখিল, তাহাকে ওখান হইতে লইয়া যাইবার জন্য—কিন্তু চিঠির জবাব আসিল না। ভাইরাও লক্ষ্মীছাড়া—ঘরের লক্ষ্মী ছাড়িয়া—মুখে আগুন—স্বরাজের হুজুকে পথে পথে কখনও দ্বারে দ্বারে ধন্না দিতেছে।

চতুর্থ দলের লবণ আইন অমান্য চলিতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে পাগ্‌লা গাঁধীর হুজুকে বাচ্চা-পোষা গৃহস্থের সযত্ন রক্ষিত তালগাছগুলিও রহিল না। পুলিশ আসিয়া শান্তি-স্থাপনের জন্য নুনের হাঁড়ি ভাঙ্গে—কখনও হাড় ভাঙ্গে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই লক্ষ্মীছাড়ার দল! হাড় ভাঙ্গাতেও হাঁড়ি ছাড়িল না—লক্ষ আঘাতেও লক্ষ্যহারা হয় না।

স্বেচ্ছাসেবক দলের এই আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা এবং আইন অমান্য অপরাধে শীঘ্রই তাহাদিগকে রাজদ্বারের অতিথি হইতে হইল। কাহারও এক মাস, কাহারও কাহারও দুই মাস, আড়াই মাসও আতিথেয়তার বন্দোবস্ত হইল। এদের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ—পালের গোদা—প্রমোদ রায়ের হইল পূর্ণ তিন মাস।

দুই

একাধিক্রমে তিন মাস বাপের বাড়ীতে পড়িয়া থাকা নমিতার কিছুতেই ভাল লাগিতেছিল না। অধৈর্য্য হইয়া একবার অভিশাপ দেয় গান্ধীজীকে—একবার দেয় দেশের এই বয়াটে ছেলেগুলাকে… স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া ইহারা আকাট মূর্খ হইবে নাকি? দেশ-নেতাদের প্রশংসায় বলে, "নেতা নয়তো—আঁস্তাকুড়ের ন্যাতা!"—এই নমিতাই শিক্ষিতা……উচ্চ শিক্ষিতা—বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব scholar! এই নমিতাই চাহিয়াছিল একদিন তাহার নারীত্বকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে।

সত্যই নমিতা নারীত্বকে বুঝিয়াছিল, চিনিয়াছিল—মাতৃত্বের মহান্ আদর্শকে উপেক্ষা করিয়াই। নারীত্বে এবং মাতৃত্বে কোথায় সাদৃশ্য, কোথায় পার্থক্য—এই দুইএর মিলনে কী স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিলে নমিতা নারী স্বেচ্ছাসেবিকাগণকে পথলক্ষ্মী বলিয়া ঘৃণা করিত না—উপহাস করিত না, মা হওয়ায় যে কী ক্ষম

কত যাতনা, কী লোভ—কত দায়ীত্ব তাহা বুঝিয়াছে যাহারা গৃহলক্ষী ও পথলক্ষী দুইই।

যৌবনের প্রথম স্পর্শেই নমিতার জীবনে এতটা হইয়া গেল, তবুও সে মনে করে, স্বামীকে হাতে পাইলে এতটা হইতে দিত না—অন্ততঃ রাজার অতিথির পরিবর্ত্তে তাহারই একনিষ্ঠ উপাসক করিয়া রাখিত। সে এক মুহূর্ত্তও ভাবেনা স্বামী তাহাকে এই কয় বৎসর হাতে পাইয়াই বা কত কী করিলেন।

ক্ষণিকের উন্মাদনায় সে নিজেকে কৃত্রিম বিদ্রোহা করিয়া তোলে,—ভাবে, একটা পুরুষের ইঙ্গিতে দেশের এই শোচনীয়, লজ্জাজনক অবস্থায় নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিয়া ঠিক করিয়াছে! ·····

বর্ষার এক বাদল উদাস সন্ধ্যায় নমিতা পিতৃগৃহে দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যেরও ভাঙ্গা ভাঙ্গা কয়েকটা রং-বেরংএর মেঘের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। ঠিক সৌন্দর্য্য নয়—কী যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা তার চোখে। প্রদোষে ঝিল্লীর ঝিঁ, ঝিঁ রব তাহার কাণে অস্বস্তি উৎপাদন করিতেছিল। ঘরে আসিয়া আল্‌মারী হইতে রবীন্দ্রনাথের একখানি অতি আধুনিক উপন্যাস বাহির করিল এবং খাটের উপর শুইয়া, পড়িতে লাগিল। রবীবাবুর উপন্যাস ভাল লাগিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পড়িবার পর "ভারী কল্যাণী চরিত্র এঁকেছেন বঙ্কিমবাবু"—বলিয়া বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিল; আনন্দমঠ আনন্দ দিতে পারিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর নমিতার বড় বৌদি শৈল ঘরে আসিয়া কহিল, "কী গো, দিন গুণ্‌ছো নাকি?"

"—ব'য়ে গেছে আমার দিন গুণবার? কত মজা, জেলখেটে, দেখুন না এইবার!······গান্ধী কবে যে মর্ব্বে বৌদি।"

"—ও কথা ব'লনা ঠাকুরঝি!······যার নামে আজ ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত······যাকে দেখবার জন্যে কোটী কোটী লোক আকুল, যিনি"—

"রেখে দাও তোমার বক্তৃতা,······হ্যাঁ সবই হ'য়েছে, এখন পাগ্‌লা গাঁধী অগে্‌গে তুলে দেবে সবাইকে।··· কী যে খেয়াল তোমাদের···"

শৈলজায়া কিছুতেই এতদিনে এই মেয়েটাকে চিনিতে পারে নাই। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সুখে দুঃখ—দৈনন্দিন ঘটনাবলী পর পর আলোচনা করিয়া থাকে কিন্তু কী আশ্চর্য্য মেয়ে এই নমিতা! কলিকাতায় আসা অবধি যেন কী হইয়াছে তার!···কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে গেলে প্রথমেই প্রকাশ করিতে চায় তাহার সমান শিক্ষিতা দেশে ঘরে আর দুইটা নাই।

ছোট বৌদি নীহার প্রায় নমিতার সমবয়সী। নীহারের স্বামী—নমিতার ছোটদাদা—কলিকাতার কোন এক বে-সরকারী কলেজের প্রফেসর। নীহার উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও বাঙ্গালী ঘরের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী—স্বামী-দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করিতে হয়—তাঁহার আত্মীয় পরিজনবর্গের প্রিয় হইতে হয় ইহাই সে ভাল বুঝিয়াছিল। স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করে সে—বন্ধুর মত ভালবাসে। নীহারের স্বামী সমীরও স্ত্রীকে বাঙ্গালী ঘরের আদর্শ বধূ করিতে চান—এই লক্ষ্মী প্রতিমা যেন তাঁহাদের সংসার চিরদিন আলো করিয়া রাখে।

পরদিন প্রাতে—

সকালে ভিতর বাড়ীতে সকলের মধ্যে আলোচনা হইতেছিল, কারাবন্দী প্রমোদ কুমার সম্বন্ধে—আর আলোচনাটা বিশেষ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, সম্মুখে নমিতাকে দেখিয়া - তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই।

কথা প্রসঙ্গে ছোট বৌ নীহার নমিতাকে কহিল,—"ঠাকুরঝি, দেখেছ আজকের খবরের কাগজে লিখ্‌ছে, জামাইবাবু দুই এক দিনের মধ্যেই জেল থেকে বেরুবেন,—তাঁর শরীরও তত ভাল না।"

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া নমিতা কহিল,

"—তা আমাকে শুনিয়ে কী লাভ?······আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর স্বরাজ ব'য়ে নিয়ে আস্‌বো নাকি?··· পোড়া কপাল আর কী!···"

"রাগ্‌ছো কেন?···এত' ভাল কথা,······তুমি তাঁর স্ত্রী তাঁর আসায় কত আমোদ-আহ্লাদ ক'র্ব্বে;····· আমরাই লোকের কাছে তাঁর আদর্শের কথা বলি, মনটা কত উঁচু হয়;—তুমি ত তাঁর স্ত্রী!

নমিতার মনটা হঠাৎ দুলিয়া উঠিল, কথার জবাব না দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। সকলেই অবাক্ হইয়া উহার দিকে তাকাইয়া থাকে, বলে—'মেয়েটা কী!'

তিন

শ্রাবণের শেষে একদিন প্রমোদ প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্ত হইয়া সিমলা ষ্ট্রীটে ভাইএর বাসায় আসিল। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই প্রমোদকে পাইয়া খুবই গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল। প্রমোদের শ্বশুরালয়ের সকলেই একে একে আসিয়া প্রমোদকে অভিনন্দিত করিয়া গেল,—আসিল না শুধু নমিতা; বৌদিরা তাহাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছে কিন্তু গর্ব্বিতা নমিতা বসিয়া আছে, স্বামীর অপেক্ষায় নিজ বাপের বাড়ীতে। সে ভাবিয়াছে, স্বামী আগে আসিয়াই তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন—এ বয়সে মান-ভঞ্জন মন্দ লাগিবে না। কিন্তু তাহা হইল না;—নমিতার গর্ব্ব অভিমান যেন দিন দিন বাড়ীয়াই চলিল, প্রমোদ জেল হইতে ভাইয়ের বাসায় ফিরিয়াছে শুনিয়া।

শ্যালক এবং শ্যালকবধূদের অনুরোধে প্রমোদ একদিন শ্বশুর বাড়ী যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু তাহা ভাগ্যচক্রে ঘটিয়া উঠিল কই?......সকলের নিষেধ, অনুরোধ, উপরোধ স্বত্বেও সেই অসুস্থ শরীর লইয়া আবার ছুটিয়া চলিল পূর্ব্ববঙ্গের কোনও এক দাঙ্গা-হাঙ্গামায়।

সিমলা ষ্ট্রীটে ভ্রাতা সতীশের বাসায় থাকিতে কিছুই যেন প্রমোদের আর পূর্ব্বের মত ভাল লাগিত না; দিবারাত্র শুধুই ভাবিত, বালুরঘাটের কয়েকটা দিনের কথা। মনে পড়িত, তাহার সেই দুপুরের কথা—নমিতার সহিত সেই বাদ বা প্রতিবাদ। তারপর আর নমিতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। কখনও কখনও ভাবে এইবার বোধ হয় নমিতা বুঝিয়াছে—পুরুষ ও নারীর মিলিত শক্তি ছাড়া স্বরাজলাভ একান্ত অসম্ভব। কিন্তু কই? এই পাঁচদিনের মধ্যে আত্মীয়, অনাত্মীয়,—পরিচিত, অপরিচিত সকলে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গেল, কিন্তু নমিতা কী তাহাকে একবারও দেখিয়া যাইতে পারিত না!...যাহার জন্য পা-চ-টা দিন প্রমোদ গৃহে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিল—সে কোথায়?

পূর্ব্ববঙ্গের কোনও এক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতে তখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা পূর্ণ মাত্রায় চলিয়াছে; সরকার পক্ষ হইতে যতদূর সম্ভব তত্ত্বাবধান লওয়া হইতেছে কিন্তু শান্তি কোথায়? স্থানীয় বহু নর-নারী, স্বেচ্ছাসেবক হত-আহত হইয়াছে। যাহারা প্রাণ দিবে বলিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, তাহারা বিপন্নের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে—কোনও কোনও ক্ষেত্রে আহত অবস্থায় শত শত নর-নারীর মান ইজ্জত রক্ষাপূর্ব্বক হাঁসপাতালে গিয়া নিজেদের প্রাণ দিয়াছে।

সেদিনকার দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রমোদ রাখিয়াছিল শত শত নর নারীর প্রাণ, কিন্তু মধ্যে কী যে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিতেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে। ক্ষণিকের অসাবধানতায় প্রমোদকে ভূতলশায়ী হইতে হইল—হাঁসপাতালে গিয়া দুই দিন পরে তাহার চৈতন্য হয়।

স্বেচ্ছাসেবকদলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শুশ্রূষার গুণে প্রমোদ ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতেছিল—কিন্তু তখনও জীবন সংশয়। আঘাতের পরিমাণ কিছু বেশী হইয়াছিল, ডাক্তাররা বলেন, ভয়ের কারণ নাই তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে দীর্ঘ সময় লাগিবে।...কলিকাতা হইতে দাদা ও আরও কয়েকজন আত্মীয় আসিয়াছিলেন পূর্ব্বেই।...সেদিনের হাঙ্গামায় একদিকে তাহার অসীম সাহস, ধৈর্য্য অন্যদিকে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়া বিপন্ন নর নারীর হৃদয় আজও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে!

চার

আসন্ন শরতের এক প্রভাতে কলিকাতায় প্রমোদের শ্বশুরালয়ের সকলেই কী এক অজানা অশুভ আশঙ্কার ভয়ে ভীত। দোতালায় একটা নির্জ্জন ঘরে নমিতা একটা চেয়ারে ঠেস দিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপরের খবরের কাগজটা দেখিতেছিল। কাগজের শিরোনামায় বড় বড় টাইপে লেখা, "মুক্তি সংগ্রামের একনিষ্ঠ বীর প্রমোদ কুমার হাঁসপাতাল হইতে শীঘ্রই ফিরিতেছেন।"... একটু নীচে—একটা বৃহৎ ছবি প্রমোদের;—শায়িত অবস্থায় হাঁসপাতালে, একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথায়—বহু নর-নারী তার আশে-পাশে।—কী এক অশুভ আশঙ্কায় নমিতার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, আর সে ছবির দিকে চাহিতে পারিল না। চোখে আঁধার দেখিল, পদদ্বয় টলিয়া আসিল, দাঁড়াইতে পারিল না—মেঝের উপর

পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল—আঘাতও পাইল কিছু।… কোথায় রহিল এখন নমিতার শিক্ষার অভিমান!—কোথাই বা রহিল তাহার স্বতন্ত্র নারীত্বের গৌরব।

কিছুক্ষণ বাদেই জ্ঞান হইলে নমিতা চাহিয়া দেখিল, তখনও যেন তাহার চোখের সম্মুখে জমাট আঁধার—কী যেন অস্পষ্ট… ঘোলাটে। পার্শ্বে নীহারকে দেখিয়া কহিল, "—বৌদি, বেঁচে আছেন তিনি?"

"ষাট্! অমন অমঙ্গল ডেকে আন্‌তে আছে?… আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সিঁথেই সিঁদুর বজায় থাক্!"

"বৌদি, তাঁকে একবার দেখতে পাবো?"

"…কী যে বল, ঠকুরঝি বল্লাম চুপ কর—আজই তিনি কোলকাতায় আস্‌ছেন।"

"সত্যি?

"সত্যি আস্‌ছেন আজ! এখানকার সব গণ্যমান্য লোক্‌রা তাঁকে অভ্যর্থনা ক'ত্তে কোন্ পার্কে মিটিং-টিটিং কী…ব'ল্‌ছিলেন ভাসুর ম'শায় এসে;…বিকেলেই তিনি সিম্‌লে ষ্ট্রীটের বাসায় আস্‌বেন।"

নমিতা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। এই চার পাঁচ মাসের মধ্যে তার জীবনে কত বড় একটা আলোড়ন হইয়া গেল। সে স্বামীকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সত্যই কখনও তাঁহার অমঙ্গল কামনা করে নাই,—স্ত্রী হইয়া কেই বা করে?—কোর্ট হইতে ফিরিতে একটু দেরী হইলেই ঘর বাহির করিত—কালীর কাছে সওয়া পাঁচ আনা মানত করিত; পরে প্রমোদকে আসিতে দেখিলেই অভিমানে কথা কহিত না—লুকোচুরি খেলিত। একদিনের জন্যও ভাবে নাই,—সুখে হ'ক, দুঃখে হ'ক—চার পাঁচ মাস স্বামী ছাড়া হইয়া ভাইদের গলগ্রহ হইতে হইবে। কিন্তু এ কী হইল? কখনও তাঁহাকে অবহেলা করে নাই—কখনও শিক্ষার অভিমানে, গর্ব্বে তাঁহাকে ত অবজ্ঞা করে নাই; তবে হাঁ একাধিকবার তাঁহার সহিত তর্কাতর্কী হইয়াছে বহুবিষয় লইয়াই কিন্তু তাহাত আবার দু'জনের মধ্যে আপোষে সন্ধি হইয়া গিয়াছে!……কে যেন নমিতার মুখে কতকটা আলকাতরা লেপিয়াছিল—দুই চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল ভাদ্রের ভরা নদীর মত। তাহার সকল অভিমান, গর্ব্ব এখন দিন দিন অনুশোচনায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দিন রাত ভাবে, 'কেন তাঁর কথার অবাধ্য হ'য়েছিলাম!……কেনই বা এ শাস্তি! কিসের আমার মান-অভিমান—তাঁর মানেইত আমার সব! আজ তিনি আমাকে ছেড়ে যে কাযে নেমেছেন তাতে তাঁর কী ক্ষতি?—ভগবান করুন, তিনি আজই ফিরে আসুন দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল ক'রে—আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবো। খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া সর্ব্বক্ষণই তাহার একই চিন্তা—রাত্রে ঘুম হয় না। সমস্ত রাত ছটফট করে—স্বপ্নে যেন প্রমোদের স্পর্শ অনুভব করে—আবার স্বপ্নেতে উপাধান অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে।

দুপুর বেলায় নমিতা বড় বৌ শৈলবালাকে বলিল, "বৌদিদি আজ সিম্‌লে ষ্ট্রীটে গেলে হয় না?"

"তোকে কী তাই ব'লতে হবে বোন্,……বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আমরা তোকে ব'লতে যাচ্ছিলুম—সেজে-গুজে আয় শীগ্‌গির!"—কী এক অব্যক্ত আনন্দে নমিতার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, দৌড়িয়া উপরে উঠিয়া গিয়া একখানা দামী ফিরোজা রংএর শাড়ী পরিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কী মনে করিয়া একটা লাল পেড়ে শাড়ী পরিয়াই নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ীতে নীহার কহিল,

"এটা কেন গো?……সেই যে দামী শাড়ীটা?"

"কোথায় আছে, পেলাম না এখন……এইই ভাল।"

সন্ধ্যার কিছু আগেই সকলে সিম্‌লা ষ্ট্রীটের বাসায় পৌঁছিল। বাসার সামনে লোকে লোকারণ্য, ভীড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা যায় না,—সকলেই দেখিতে চায় রণ-প্রত্যাগত বিজয়ী বীর এই প্রমোদকে। সকলেরই হাতে ফুলের মালা-চন্দন।……স্বামীর অভ্যর্থনার এত আয়োজন, এত ধুমধাম দেখিয়া আনন্দে নমিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

বেলা পাঁচটার সময় ভীড় ঠেলিয়া সজ্জিত একখানি প্রাইভেট কার বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদ গাড়ী হইতে নামিতেই সকলে তাহাকে পুষ্পমাল্যে এবং চন্দনে ভূষিত করিয়া ফেলিল—চারিদিকে সজীবতা, আনন্দের অফুরন্ত উৎস। প্রমোদের মন একাধারে গর্ব্বে এবং কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল, ভাবিল—এই আমার ভাই বোন! এদের ছেড়ে এতদিন মিছে আঁধারে ঘুরে বেড়িয়েছি।

দোতলায় নমিতা দাঁড়াইয়াছিল, সবারই অজ্ঞাতে বারান্দার একটী কোণে? আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না;......পোড়া চোখে জল আসিয়া তাহাকে ক্ষণিকের জন্য অন্ধ করিয়া দিল।......সে স্ত্রী, আজ একবার—আলাপ করা দূরে থাকুক—স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবার শক্তি হারাইয়াছে।

আত্মীয়-অনাত্মীয়, অপরিচিত সকলেই শত মুখে প্রমোদের প্রশংসা করিল, আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল, তাহাকে দীর্ঘজীবি হইবার জন্য, কিন্তু নমিতার দেখা নাই। বাড়ীময় খোঁজাখুজি, কোথায় যে লুকাইয়াছে!

সন্ধ্যার কিছু পরেই প্রমোদ বাড়ীর বাহির হইল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কোথায় সভার আয়োজন হইয়াছে—সেখানে যাইতে হইবে, সকলের বিশেষ অনুরোধ..... কলিকাতার বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি সভায় প্রমোদের বীরত্বের, স্বদেশ-প্রীতির প্রশংসা করিলেন ও তাহার মত আদর্শ, সাহসী মৃত্যুকল্প বীর হইবার জন্য বাংলা তথা ভারতের আশা-ভরসা ভাবী তরুণ-তরুণীকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন। সভায় প্রমোদ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, তাহার ভাই বোন্‌কে আহ্বান করিল, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য স্বদেশের কল্যাণ সাধনার্থে। সভাভঙ্গের পর পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া যখন গৃহে ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। ......খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইবার ঘরে গিয়া খাটের উপরে বসিতেই নমিতা আসিয়া বিপন্ন আশ্রয় প্রার্থীর মত তাহার দুই পা-ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। চোখের জলে প্রমোদের পদদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, প্রমোদ তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই উঠিল না। অনবরত কাঁদিতে লাগিল, ক্ষুদ্র শিশুর মত কী এক হারানো সম্পদের পুনঃ প্রাপ্তির আশায়। নমিতা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল,

"বল আমাকে ক্ষমা ক'র্ব্বে......

প্রমোদ জোর করিয়া তাহাকে খাটের উপর তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,

"লক্ষ্মী, কেঁদ' না......"

"আমি মোটেই লক্ষ্মী নই, তোমার অযোগ্যা স্ত্রী।.. বল, ক্ষমা ক'রেছ"—তখনও নমিতা অশ্রুসিক্তা, দুঃখে, ক্ষোভে তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

প্রমোদ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "কেঁদনা নমিতা, তুমি যে আমার......

গভীর ঝড় বৃষ্টিতে নীড়হারা বিপন্ন পাখী সহসা আশ্রয় পাইলে যেমন যুগপৎ নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হয়, নমিতা তেমনি প্রমোদের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার জীবনের ঝঞ্ঝা-বাদলের কথা ভুলিয়া গেল—অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনা রাশি মুহূর্ত্তে স্বামী দেবতার অমৃতস্পর্শে ঘুচিয়া গেল।

পরদিন নমিতা নিজে গিয়া নারী স্বেচ্ছাসেবিকাগণের দলভুক্ত হইল এবং স্বামী স্ত্রীতে স্বদেশের কাজে—জগতের কাজে উৎসৃষ্ট হইল।

পুরুষ ও নারীর মিলিত শক্তি ব্যতিরেকে পরাধীন জাতির মুক্তির আশা কোথায়?

*

প্রমোদ এখনও মাঝে মাঝে পথে স্বেচ্ছাসেবিকা নমিতাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে,

"কী, গো; গৃহলক্ষ্মী, এখন যে বড় পথলক্ষ্মী হ'লে? ...মা, বোন্‌কে ঘরের বার করা"...নমিতা গম্ভীর অথচ সলজ্জ কণ্ঠে উত্তর দায়,

"যাও তুমি ভারী ই'য়ে......

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের পরাংশ

রমাপতিবাবুর পিছনে পিছনে যেতে যেতে রাঙা ঠান্‌দি বল্লেন "কেমন, তোমার জামাই বাছা? চুপি চুপি বিয়ে করতে এল! বাজনা নাই, আলো নেই,—চোর নাকি?"

একটু হেসে তিনি বল্লেন, "জামাইএর মা তো নেই। তার ওপর বড় সড় হয়েছে বলে ও সব আলো-বাজনায় সে লজ্জা পায়। আলো করে না এসেছে তাতে কি, দেখ্‌বে চলো কি রকম সভা—আলো করা জামাই হয়েছে আমার! তুমি আশীর্ব্বাদ কর—মীনু আমার, চিরদিন যেন হেসে-খেলে কাটায়।"

"ষাট্—তা আবার বল্‌তে! ওলো, ও নাত্‌বৌ—যা হয় একখান পাটের শাড়ী পরে শীগ্‌গির আয় ভাই—জামাই বরণ করতে হবে।"

* * * *

ফুল বিছানো পথ—ফুলের ভিতর দিয়ে মীনাকে এনে প্রভাতের সামনে বসিয়ে রমাপতি বাবু যথারীতি সম্প্রদান করে দিলেন। সম্প্রদানের সময়ে এক ফোঁটা জল তাঁর চোখে এসে পড়ল—সেই পিতৃ-হৃদয়ের চির-দিনের দুর্ব্বলতা! "আমার ছিল, তোমাকে দিলাম।" ফুলের মালা দিয়ে বাঁধা মীনার হাতখানাকে, নিজের হাতের ওপরে প্রভাত. সর্ব্ব কল্যাণময়ী বলেই ধরে-ছিলো। বিয়ের শাস্ত্রীয় সমস্ত অনুষ্ঠান হয়ে গেলে প্রভাত উঠে তার পিতাকে প্রণাম করলে। জগমোহন তার মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে একেবারে নিশ্চিন্ত হলেন—এগিয়ে এসে মীনাকে কোলে টেনে নিয়ে বল্লেন "মা, যে হতভাগার মা হ'তে তুমি চল্‌লে, সে সত্যি বড় হতভাগা—তাকে মায়ের স্নেহ দিয়ে তার দুঃখ দূর করে দিও—আর এ ক'টী তোমার ছোট ভাই—শৈশবে মাতৃহীন; এদের অভাবও তোমায় দূর করতে হবে মা" বলে তিনি প্রণব, প্রশান্ত ও প্রভাসকে দেখিয়ে দিলেন। মীনা মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে প্রথমে শ্বশুরকে পরে বাবাকে প্রণাম করলে। দুজনেই নীরবে আশীর্ব্বাদ করলেন। শাঁখ বাজিয়ে, হুলুধ্বনি করে মীনা ও প্রভাতকে রাঙা ঠান্‌দি বাসরে নিয়ে গেলেন।

বাসরে ঢুকে প্রভাত দেখলে, সে ঘরটীতে শুধু বিছানাটী বাদ দিয়ে চারিদিকে সুন্দরীর মেলা বসে গিয়েছে। তাদের রঙ-বেরঙের শাড়ী ও গহনার জৌলুষে তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। কাউকেই সে বিশেষ করে চেনেনা!—এক বিয়ের গোটা কয়েক আচার অনুষ্ঠানে রাঙা ঠান্‌দির সঙ্গেই তার সামান্য পরিচয় হয়েছে। অসংখ্য সুন্দরীর মেলার মাঝে, কি করে সেখানে চল্‌তে হবে তার উপায় কিছু ভেবে বের করতে না পেরে, সে মুখ নীচু করে শীতের মাঝেও ঘেমে উঠলো। কতক্ষণ সে এই অবস্থায় থাকৃত তার ঠিক নেই, তার সুকৃতি বলে শতদল এসে তাকে কিছু মুক্তি দিলেন। খাবারের রেকাবীখানা সামনে সাজিয়ে দিয়ে মৃদুভাষিণী শতদল বল্‌লেন "কিছু খাও বাবা।" অনুমানে প্রভাত বুঝলে ইনি শাশুড়ী হবেন—সে আর কিছু না বলে খাবারের থালাটা টেনে নিলে। তার খাওয়া হলে শতদল প্রভাতকে ঘুমোতে দেওয়ার জন্যে

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে ঘরের আলো কমিয়ে দিলেন। একটী নতুন বিয়ে হওয়া মেয়ে বললে, "তুমি যাওতো মামীমা, একটা দিন শোবার অনিয়ম হলে আর তোমার জামাই 'গলে' যাবে না। বাসরে বুঝি কেউ ঘুমোয় ?

সস্নেহে প্রভাতের দিকে চেয়ে শতদল অনুযোগকারিণীকে বললেন "তা হোক্ মা। আজ একটু ওকে ঘুমোতে দে মা—এখন তো কিছুদিনই রইলেন। এরপর তোরা আমোদ-আহ্লাদ করিস্। কাল সারারাত রেলে এসে আজ আবার এই হাঙ্গামা, শেষে অসুখ-বিসুখ না হয়।"

"কেন মামীমা ? মীনু এখন শ্বশুরবাড়ী যাবে না ?"

"না বাছা, বেয়াই দিনকতক পরে মীনুকে নেবেন। প্রভাতের দিন দশেক ছুটী—ও এখান থেকেই ওর কাজের জায়গায় ফিরে যাবে।

"আচ্ছা, বেশ মামীমা—তোমার কথাই রাখ্ছি আমরা—কিন্তু ফুলশয্যার দিনে আমরা তোমার কোন কথাই শুনব না।" বলে মেয়েটী তার দলবল ডেকে নিয়ে চলে গেল।

ঘরের আলো খুব কমিয়ে দিয়ে শতদল বল্লেন, "সারাদিন হট্টগোল গিয়েছে, এইবার একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর বাবা। আজ আর কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।" প্রভাত শুয়ে পড়ে গায়ের ওপর শালটা ভাল করে টেনে দিলে। তা দেখে, শতদল নতুন লেপ দুখানা এনে মেয়ে ও জামাইএর গায়ে ঢেকে দিলেন। রাঙা ঠান্‌দি তখনও বসে বসে ঢুলছিলেন—শতদলকে যেতে দেখে তিনি বললেন, "অমনি আমাকেও গায়ে দেবার একখানা কিছু দিও তো বৌমা। বাসরে বর কনের একলা শুতে নেই—আমি এইখেনেই শোব।"

"বেশ তো খুড়ীমা—গায়ের কাপড় আমি এনে দিচ্ছি।" বলে শতদল অন্দরে গেলেন। লেপ থেকে মাথা বের করে প্রভাত ঠান্‌দিকে একটু রসিকতা করার লোভ ছাড়তে পারল না। এ বাড়ীতে আসার পর থেকে ঠান্‌দি তাকে একাই নানা রকমে জ্বালাতন করছিলেন। সে একটু হেসে বললে, "একাই শুলেন ঠান্‌দি—ঠাকুরদাকে আনিয়ে নিন—তাহলে ডবল বাসর হয়ে যাবে। কবে বাসরে শুয়েছিলেন তা তো আর মনে নেই!"

ঠান্‌দি হেসে বল্লেন "তার যে, কি আছে দাদা বুড়ো বড় শীতকাতুরে! কিছুতেই নিজের ঘর ছেড়ে নড়ল না। না হলে এই যুগল-মিলন দেখতে আসে না!"

"ওঃ বুঝেছি। তাহলে আপনার বিরহ-শয়ন। আজ ঠান্‌দি, অত কষ্টতে কাজ কি ? ঠাকুরদা উপস্থিত নেই আমি তো আছি। আপনি না হয় বাসরটা আমার সাথেই করুন।

"ও! বড় যে সাহস দেখ্ছি—পাশে যে মুগুর আছে, তা খেয়াল নেই বুঝি ? অ মিনি, তোর বেয়াড়া বর সাম্‌লা বাপু! শেষে কি 'বগীবিন্দির' ঝগড়া সুরু হবে ?"

"মাভৈঃ! ঠান্‌দি! 'বগীবিন্দির' ঝগড়া আপনারা করলেও তাদের স্বামী হওয়ার দুর্ভাগ্যটা স্বীকার করে নিতে আমি মোটেই রাজী নই। অতএব সন্ধি। এই আমি ফের লেপ-চাপা দিলাম।" বলে প্রভাত আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে পড়ল। অন্য লেপের ভিতরে মীনা অগ্রহায়ণের শীতেও ঘেমে উঠ্ছিল—ঘুম তার মোটেই হল না।

১০

রাত প্রায় ১টা হবে। প্রভাত সবেমাত্র অসংখ্য উপদ্রব সহ্য করে একটু মুক্তির নিশ্বাস ফেলার সময় পেয়েছে। বাড়ীর কোলাহল প্রায় থেমে এসেছে—দরজাটা বন্ধ করে প্রভাত তার শোওয়ার জায়গায় ফিরে আসছিল। বন্ধ দরজায় বাইরে থেকে মৃদু আঘাতের সঙ্গে শোনা গেল, "দরজাটা একবার খুলে দেওনা মীনু।" কথা যে বলছিল, তার বলার ভঙ্গীতে, সে যে অতি ভয়ে ভয়ে, প্রার্থনার মত করে, কথা ক'টা বলছিল তা বোঝা যাচ্ছিল। প্রভাত আবার ফিরে গিয়ে দরজা খুলে দিলে—দেখলে বাইরে যতী দাঁড়িয়ে। যতীও একটু যেন কুণ্ঠিত হয়ে বললে "ও! আপনি! মীনু কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?"—

কি বলবে তা প্রভাত ভেবে পেল না। কারণ মীনা ঘুমিয়েছে কি জেগে আছে তা সে জানে না

বাসরে প্রভাত, শতদলের কৌশলে ঘুমিয়ে নিয়েছিল বলে, আজ ফুলশয্যার দিনে তারা তাকে মোটেই শুতে দেয়নি। সন্ধ্যা থেকে এতক্ষণ ধরে নানা রকমে তাকে জ্বালাতন করে মেয়ের দল পরিশ্রান্ত হয়ে চলে গেল। সে তখন উঠে দরজা বন্ধ করে মীনার পরিচয় নিতেই যাচ্ছিল, এমন সময়ে যতী তাকে এই প্রশ্ন করায়, সে কিছুই বল্‌তে পারল না। উত্তর দিতে দেরী হচ্ছে দেখে যতী তাকে আবার বল্‌লে "একটু অনুগ্রহ করে ডেকে দেবেন কি? ওকে আজই আমার একটু দরকার আছে।"

কপালের ওপর থেকে লম্বা চুলগুলো এক ঝট্‌কায় পিছন দিকে সরিয়ে প্রভাত বল্‌লে "আপনি ডাকুন না। আমার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয় নি।"

যতী একটু হাসলে। এদের বিয়ের আগে, বাগানের সেই রাত্রির কথা মনে পড়ল। ভাব্‌লে অতক্ষণেও 'পরিচয়' হয় নি? না, এ বোধ হয় নতুন বিয়ের পর, তৃতীয় প্রাণীর উপস্থিতির লজ্জা। কিন্তু সেই বা ডাকে কি করে? যদি মীনা সত্যিই ঘুমিয়ে থাকে, তবে তাকে তার স্বামীর সাম্‌নেই নাম ধরে ডেকে জাগানো বোধহয় শিষ্টাচারের বাইরে। কি করবে ভেবে না পেয়ে সে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ফিরেই যাচ্ছিল—তা দেখে প্রভাত বললে "কই, ডাকলেন না?"

যতী "না, আপনি তো আমাকে সাহায্য করলেন না ডাকতে"—বলে পিছন ফিরতে মীনা নিজেই ঘরের অন্য দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। এ দরজা ধরে প্রভাত দাঁড়িয়েই ছিল।

মীনাকে বাইরে আস্‌তে দেখে যতীর মুখটা একবার আলোময় হয়ে উঠ্‌ল—পরক্ষণেই সে এগিয়ে এসে তার হাতে গোলাপের দুটো বড় তোড়া ও গহনার ছোট একটা 'কেস্‌' তুলে দিয়ে বললে, "তোমার বিয়ের দিন তোমাকে কিছু দেওয়া হয় নি বলে তুমি নিশ্চয়ই মনে করেছ যে যতীদা বেশ ত ফাঁকি দিলে—ফাঁকি কিন্তু দিই নি, এই জিনিসটার আস্‌তে দেরী হ'ল বলেই দিতে দেরী হল।" বলে সে গহনার কেসটা দেখিয়ে দিলে।

মীনা তাড়াতাড়ি কেসটা খুলে দেখলে ছোট একটী সোনার আংটী, এক ফোঁটা চোখের জলের মত পবিত্র ও টলটলে একটুকরা হীরা বুকে নিয়ে রয়েছে। হীরার আংটীর দাম সে দু রকমেই বুঝ্‌লে। মনে পড়ল যতীর কিছুদিনের আগের কথা, "গোলাপে বড় কাঁটা—তুলতে না জেনে তুল্‌তে গেলে কাঁটা ফুটে রক্তপাত হয়।" আজ যতী সেই কাঁটাওয়ালা গোলাপের তোড়া বেঁধে, আর নিজের দুঃখের অশ্রু, আংটীতে বসিয়ে মীনাকে উপহার দিয়ে গেল। সমস্ত বুঝেও মীনা কিছুই তাকে বলতে পার্‌ল না। নিজের আহরিত জিনিসগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে সন্তুষ্ট মনে যতী তার নিজের ঘরে চলে গেল।

মীনাকে একই রকমে, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, প্রভাত একটু অবাক হয়ে গেল। এমন কি ঘট্‌ল যাতে করে মীনার চলার শক্তি হারিয়ে গেল! কোনদিকে কেউ নেই দেখে সে এক পা বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে টান দিতেই তার হাত থেকে ফুল ও কেস গড়িয়ে গেল। নীচু হয়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিতে নিতে প্রভাত বললে "বাঃ! বেশ আংটীটা তো?—দেখি তোমার আঙুলে পরিয়ে দিই।" বলে মীনার হাতটা ধরতেই সে হাত টেনে নিলে।—"কেন পরবেনা?"—মীনা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালে।—আর কোন কথা না বলে প্রভাত মীনাকে ডেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ফুলের বিছানায়, ফুলের গ- গন্ধে নিশ্বাস ভারী হয়ে আস্‌ছিল। প্রভাত খুব ধীরে যেন শুধুই মীনা শুনতে পায় এই রকম স্বরে বল্‌লে "তুমি খুসী হয়েছ তো মীনা? তোমাকে বিয়ে করে অন্যা- করি নি তো তোমার ওপর? যেভাবে তুমি চাইবে বাবা তোমাকে সেই ভাবেই রাখ্‌বেন—থাক্‌বে যে মীনা খুসী হয়ে আমাদের ঘরের অচপল লক্ষ্মী, আর আমার ধ্রুবতারা হয়ে?" লজ্জিতা হয়ে মীনা বল্‌লে "ওকথা আর বল্‌বেন না। সেদিন আমি সব বাজে কথা বলে- ছিলাম। সেদিনকার প্রগল্‌ভতার জন্যে আজ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

"ক্ষমা! কিসের ক্ষমা! যাক্‌—ভালই করেছিলে সেদিন। আমি কিন্তু তোমার কাছে ঋণী হয়ে আছি সেদিন থেকে—আজ আমি ঋণমুক্ত হব বলে তোমার কাছে অনুমতি চাচ্ছি।" বলে প্রভাত শোবার বালিশে

নীচ থেকে সরু চেনে ঝুলানো একটা হীরার 'পেণ্ডেণ্ট' বের করে মীনার মাথার কাপড়টা খুলে সেটা পরিয়ে দিয়ে ঘাড়ের কাছে চেনের টিপকল এঁটে দিয়ে খুব সন্তর্পণে হাতটা সরিয়ে নিলে। পেণ্ডেণ্ট মীনার গলায় দুলতে লাগলো, যতীর দেয়া আংটীটা কিন্তু কেসেই রইলো, এখন আর তার কথা মীনার মনে ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থেকে প্রভাত বল্লে ভাগ্যিস এখানে বেড়াতে এসেছিলাম আর মোটরটা কি সুক্ষণেই ভেঙে ছিল! নাহলে!—"

"না হলে কি হত!"

'না হলে তোমাকে পাওয়া যেত না। জানি কি আগে যে এই বাঘ-ভালুকের রাজ্যে আমার প্রেয়সীর খোঁজ পাব? তোমার কিন্তু খুব রাগ হয়েছিল, না?—"

"যা-ন্।—কখন?"

"সেই যখন তোমার গাড়ীতে যতীবাবু আমাকে তুলে নিলেন?—হয় নি? যদিও হবারই কথা।"

"হুঁ"। আপনার যেমন ধারণা?—রাগ করতে যাব কেন?"

"সে যাক্।—রাগই কর আর যা-ই কর—ব্যাপারটা কিন্তু আগাগোড়া আমারই—অনুকূল। যেমন করেই হোক্ তোমাকে তো পেয়ে গেলাম।—এখন তুমি যতই রাগ করনা কেন—সে রাগ ভাঙ্গাতেও আমি জানি।—"

"আমি মোটেই রাগ করিনি ও কখন করবও না।—"

"ঠিক্ তো? মনে থাকে যেন।"—বলে প্রভাত ঘরের আলোটা আরো কমিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে বসলো!—দেওয়ালের গোলাপী আভা, ফুলের মিষ্ট গন্ধ, আলো-অন্ধকারের খেলা তার মনকে যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল।—মীনার কাছে সরে গিয়ে তার হাত দুখানা চেপে ধরে সে বল্লে, "মীনু, রাণি আমার, আজ থেকে তুমি আমার জীবনের সকল সুখ-দুঃখের নিয়ন্ত্রী হলে—আমার এই ছন্ন-ছাড়া জীবনটাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি একে সুন্দর করে তুলো।—

মৃদুস্বরে মীনা বল্লে "সেই আশীর্ব্বাদ তুমি আমাকে করো।"—

* * * *

সকাল হয়ে গেল। রমাপতিবাবু যতীর খোঁজে তার ঘরে গিয়ে দেখ্লেন, জিনিস-পত্র বিছানা সবই পড়ে আছে—নেই কেবল যতী। যতীর শূন্য ঘর তাঁর মনে গভীর ব্যথা দিলে বিছানার ওপর এক টুকরা কাগজে লেখা "আমার জন্য বৃথা খোঁজ করিবেন না—মন বড় বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আমি বাহির হইলাম—কিছুদিন পরে ফিরিব। আর যদি মরিয়া যাই তো এই শেষ। প্রণাম লইবেন।—আপনাদের দয়া কখনও ভুলিব না।—প্রণত যতী।"—

কাগজের টুক্‌রাটী পড়ে রমাপতি নিরুপায় ক্ষোভে বল্‌তে লাগলেন, "একদিন আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম যতী, আজ আবার আমিই তোমাকে আশ্রয়চ্যুত করলাম, কাগজ টুকু হাতে করে তিনি যখন শতদলকে গিয়ে দিলেন, তখন শতদল প্রভাতের জল খাবারের যোগাড় করছিলেন। পড়ে তাঁর মাতৃ-হৃদয় কেঁদে উঠ্‌লো। হায়!—যতী ছাড়া এবাড়ীর যে কিছু চলেনা। কী গভীর বৈরাগ্যেই যে যতী বাড়ী ছেড়ে গেল, সে কথা মনে হয়ে শত কাজের মধ্যেও তাঁর আর চোখের জলের শেষ থাকল না।—

অনীতা, সুপ্রীতি ও মাধবী তিন জনে অবাক্ হয়ে শতদলের কান্নার কথা মীনাকে জিজ্ঞাসা করায় চোখ মুছে ধরা গলায় সে বললে "যতীদা, কোথায় চলে গিয়েছে তার খোঁজ নেই।"—আজ এ বাড়ীর সকলেই যতীর জন্যে লালায়িত—অহর্নিশি কাছে থেকে যতী তার দাম কাউকে বোঝাতে পারে নি—আর একদিনের দূরে যাওয়াতেই বাড়ীর প্রতি লোকটীর কাছে সে তার মূল্য চোখের জলে আদায় করে নিলে।—

শুধু মীনার কাছে বিদায় নিয়ে মাধবীরা সেইদিনই বোর্ডিংএ ফিরে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

দোলের ছুটীতে প্রভাত আবার হাজারিবাগে এল। মীনার আর শ্বশুর বাড়ী যাওয়া হয়ে ওঠেনি, কারণ জগমোহনবাবু তাঁর বাড়ীখানাকে তখন ভেঙে চুরে নতুন করে তৈরী করতে আরম্ভ করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল, একটা বড় ছুটীতে প্রভাত মীনাকে নিয়ে আসবে এবং তার উপ-

স্থিতির মধ্যে তিনি মীনার "বউ ভাত'টা সেরে দিবেন। বাড়ীতে বউ আসবে আর ছেলে অনুপস্থিত থাকবে এটা তাঁর বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছিল—তাইতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্বেও দেশের বাড়ীতে বউ নেওয়া, তাঁর হয়ে ওঠেনি।

বিয়ের পর প্রায় মাস আড়াই পরে প্রভাত আবার মীনার কাছে এল। দেখলে, বিয়ের পরে মীনা কিছুই বদ্‌লায় নি। তার আসার দরুণ যে আনন্দ সেটাকে সে মনেই চেপে রাখলে—শুধু "কেমন আছ?" "ভাল আছি" ছাড়া আর কোনো কথাই কেউ জিজ্ঞাসা করলে না।

রাত্রের গাড়ীতে এলেও প্রভাত 'বার্থ' একটা রিজার্ভ করে বেশ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসেছিল। দিনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, সে তবুও একটু গড়িয়ে নেবে ভাব্‌ছিল। শুধু কর্‌বার কিছু নেই বলে, আর মীনাকেও তখন পাওয়া যাবে না বলে। ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে, স্যুটকেস থেকে একখানা 'ওমর খৈয়াম' বের করে নিজের কলমটি নিয়ে মীনার নাম লিখতে বসল।

নাম লিখতে বসে তার কিন্তু খুব মুস্কিল হল। কি লেখে! যেটা লিখ্‌ব বলে মনে করে, দেখে যে সেটা পুরাণো হয়ে গিয়েছে। অনেক ভেবে ভেবে ঠিক কর্‌লে যে কিছুই না লিখে, শুধু "মীনা" এই অক্ষর দুটোই বসিয়ে দেবে। প্রভাতের হাতের লেখা ছিল সুন্দর। তার পরে সে আরও সুন্দর করে বইটার শেষ পাতাতে "মীনা" এই অক্ষর দুটি বসিয়ে দিয়ে বারে বারে, দূরে রেখে, কাছে এনে, নানা রকমে ধরে নিজের হাতের লেখাটি দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর দেখতে ভাল লাগল না। কি করে যে এই অলস দুপুর কাটানো যায়, এ যেন তার কাছে দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠল।

প্রভাত ছিল সেই প্রকৃতির, যে প্রকৃতির লোকে স্বভাব গম্ভীর, অথচ স্নেহ-প্রবণ হয়। তাদের স্নেহ উপ্‌চে পড়ে না, কিন্তু খুব গভীর; তারা কথা বলে কম, কাজ করে বেশী। নতুন বিয়ে হলেও প্রভাতের চঞ্চলতা ছিল না। এটা-সেটা নাড়া-চাড়া করেও সময় যখন মন্থর গমনেই চলতে লাগল, তখন ওমর-খৈয়ামখানা খুলে সে পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। কিন্তু সবে মাত্র

"জাগো, জাগো রাত্‌ পোহালো,
তরুণ প্রাতের অরুণ আলো
তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে—"

পড়্‌তে পড়্‌তেই ঘুমে তার চোখ ঢুলে এল—হাত থেকে অত আদরের বইটা খসে বিছানায় লুটোতে লাগল। ঘুমিয়ে প্রভাত স্বপ্ন দেখ্‌লে, তার মা যেন তাকে বলছেন "প্রভাত কতদিন তুই আমার কোল ছাড়া—আয় আমার কাছে।" এ দিকে মীনাও যেন শাশুড়ীর উপস্থিতিতে স্বামীকে কিছু বলতে পারছে না—কিন্তু কাতর চোখে তার পানে চেয়ে আছে। মা ও স্ত্রীর মধ্যে কার কথা শুনবে তাই ভেবে সে আকুল হয়ে উঠছিল—এমন সময়ে গায়ে মৃদু ঠেলা পেতেই উঠে বসে স্বপ্নটা একবার আগাগোড়া ভেবে নিলে। দেখলে স্বপ্ন, স্বপ্নই হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে আর তার ছোট শালা হিমাংশু তাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে ডাকছে। বলছে "জামাই বাবু, উঠুন না, কত ঘুমোবেন আর! সাঁওতালদের নাচ দেখতে যাবেন?"

প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে প্রভাত বললে "চল। মুখ হাত ধুয়ে আসি। কে কে যাবেন? –"

বিজ্ঞের মত হেসে হিমাংশু বল্‌লে "আপনি, আমি বৌদি, দিদি আর হীরা সিং। মা কোনদিন কোথাও যান না। আর বড়দার কোথায় "কলে" যেতে হবে। আর ছোড়দা যদি যেতে চায় তো যাবে—কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি খবর্দ্দার ওকে 'গাইড' হতে দেবেন না—ও হাজারিবাগে জন্মেছে বটে, কোথায় কি আছে কিচ্ছু জানে না—আপনাকে দেখাবে কি করে? ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে আপনিই ঠক্‌বেন—ওতো যা' তা একটা নাম বলে দেবে আর আসল জিনিসটা আপনি জান্‌তে পারবেন না। ওই যে ছোড়দা আস্‌ছে—ওর নামে আপনার কাছে কিছু বলেছি, তা যেন ওকে বলে দেবেন না। তা হলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না। যা জোর হয়েছে ওর গায়ে—ডাম্বেল করে করে।—"—

ছোট শালা হিমাংশুর এই সব কথা শুনে প্রভাতের খুব হাসি এল। তার ইচ্ছে হল, তাকে নিয়ে আর একটু মজা করতে! কিন্তু সুধাংশুকে আস্‌তে দেখেই হিমাংশু সামনে যে খোলা দরজাটা পেলে তাই দিয়ে ছুটে পালালো—যাওয়ার সময়েও সে ইঙ্গিতে একবার অনুনয় করে নিষেধ করে গেল।

সুধাংশু এসেই বিনা ভূমিকাতেই বললে "চলুন

আমাই বাবু, সকলে তৈরী, সাঁওতালদের পাড়ায় যাব। ওদের নাচ একটা দেখবার জিনিস।"

প্রভাত তাকেও বললে "কে, কে যাচ্ছেন?—"

হিমাংশুর চেয়ে সুধাংশু ৬/৭ বছরের বড়—বুদ্ধিও তার তাই একটু পেকেছে। বল্লে "বাবা তো বাড়ী নেই, আর থাকলেও তিনি এ সবে কোনদিন মেশেন না—আর বড়দা ডাক্তারী করতে গিয়েছে। মা, বাবা, বড়দা বাদে আমরা সবাই যাব। বড় মোটরটা বের করিয়েছি। আমি 'ড্রাইভ' করব।—চলুন তাড়াতাড়ি।"

প্রভাত আর দেরী না করে উঠে তাড়াতাড়ি তার বেশ-ভূষা শেষ করে নিলে। গাড়ীতে উঠবার জন্যে বের হয়ে এসেই সে দেখতে পেলে মীনা, মলিনা সেখানে অপেক্ষা করছে। মীনার পরণের 'হেলিওট্রোপ' রংয়ের শাড়ী ও ব্লাউসে, শাড়ীর পাড়ের রূপোলী জরিতে পায়ের লাল নাগরাতে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদের সোনালী আভা তার মুখে, ঠোঁটে ও সমস্ত গায়ে পড়ে তাকে আরো জ্যোতির্ম্ময়ী করে তুলেছিল। বুকের কাছে যে পিনটা কাপড় আটকে ছিল তার মধ্যে দুটো আধ ফুটন্ত গোলাপের কলি বেঁধানো ছিল। ঠিক তার পাশেই প্রভাতের প্রথম উপহার পেণ্ডেণ্টটা দুল্‌ছিল। এক চোখ চেয়েই প্রভাত মীনার এই সৌন্দর্য্য দেখে নিল—তার চোখ যে তৃপ্ত হয়েছে তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। মীনাও বুঝতে পেরে লাল হয়ে উঠতে লাগল।

তাদের এই অবস্থায়, মলিনার খুবই হাসি পাচ্ছিল। সে শেষে বলেই ফেললে, "উঠুন প্রভাত বাবু, বিকেলটা যদি দাঁড়িয়েই কেটে যাবে তো কখন বেড়াবেন!—"

চকিত হয়ে প্রভাত গাড়ীতে উঠে বসল। মীনাকে একটু ঠেলা দিতেই সে মলিনার কাণে কাণে বললে, "আমি ওখানে বস্‌তে পারব না ভাই!"

বিরক্ত হয়ে মলিনা বল্লে, "মরণ আর কি! প্রভাত বাবুর পাশে আমি না বস্‌লে দেখতে সুশ্রী হবে কেন? নে যা, ঢের ন্যাকামী হয়েছে, এবার উঠে বসগে যা।"

অগত্যা মীনা উঠে প্রভাতের পাশে বসল, তার পাশে মলিনা বসল। হিমাংশু বাইরে বস্‌বার জন্যে ঝুঁকেছিল—কিন্তু সুধাংশুর তাড়া খেয়ে শেষে মলিনার কোলেই বসল।

বিয়ের প্রায় আড়াই মাস পরে মীনাকে এত কাছে পেয়ে, প্রভাতের সমস্ত দেহ মনে আনন্দ যেন আর ধরছিল না। কিন্তু গাড়ীতে লোক অনেক, তা ছাড়া দিনের বেলা—সে চুপ করেই রইলো। সামান্য কোন কথাও মীনাকে বল্‌তে পারলে না।

ফাল্গুন মাসের গোড়া—কিন্তু শীত তখনও অল্প অল্প ছিল। তাই প্রভাতের গায়ে একখানা শাল ছিল—মীনাও শাল নিয়েছিল, কিন্তু গায়ে দেয় নি। চল্‌তে আরম্ভ করলে হাওয়ায় শীত করতে লাগল—প্রভাত বল্লে "বৌদি, আপনারা শালগুলো-গায় দিয়ে নেন্—অন্ততঃ পাগুলো ঢেকে বসুন।" মলিনা একটু হাসলে; কিন্তু শালখানা হাঁটু থেকে জড়িয়ে নিলে। মীনার শাল তার হাঁটু ঢেকেও প্রভাতের কোলে গিয়ে পড়ল। সকলের চোখ এমনি করে এড়িয়ে প্রভাত তার হাতখানা দিয়ে মীনার একখানা হাত অতি কোমল ভাবে মুঠো করে ধরলে। পাশেই মলিনা রয়েছে, অতি সামান্য নড়া-চড়াও সে বুঝতে পারবে—তাই মীনাও প্রভাতের হাতের মধ্যে ধরা নিজের হাতখানাকে একেবারেই ছেড়ে দিল। প্রভাত, ফুলের মত নরম, প্রিয় হাতখানাতে নিজের হাতের স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছিল। তার লতানো আঙুলগুলো মীনার আঙুলের সঙ্গে কি কথা বল্‌ছিল তা তারাই জানে। তার নিজের কিন্তু খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, সেই হাতখানাতে একবার ঠোঁট দুটো ছুঁইয়ে নিতে!—কিন্তু গাড়ীতে যে লোক! বাইরের দৃশ্যই সে দেখছিল বটে, হাত কিন্তু তার মীনার হাতখানা ধরেই রইলো। মনে মনে ভাবছিল, "চক্ষে পেয়েও, তবু কেন বক্ষে পেতে দেরী!—"

গাড়ী আস্তে আস্তে সাঁওতালদের পাড়ার মধ্যে এসে পড়ল। তাদের নাচ-গান তখন পুরো মাত্রাতেই চল্‌ছে। দুজন সাঁওতাল যুবা মাদল বাজাচ্ছে আর একদল সাঁওতাল-মেয়ে সেই তালে তালে নাচ্‌ছে। কথা তাদের কিছুই বোঝা যায় না—শুধু একটা সুর। সুধাংশু গাড়ী থেকে নেমে তাদের হিন্দী বাংলা মিশিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে গাড়ীতে 'মায়িজী'রা তাদের নাচ দেখ্‌তে এসেছেন। ভাল করে দেখালে 'বকসিস' পাবি। 'বক্‌সিসের' লোভে যারা দর্শক হয়ে সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে ছিল তারাও দেখতে দেখতে কোথা থেকে বনের ফুল জোগাড় করে, মাথার

গুঁজে, কাণে পরে, হাতে নিয়ে, পরণের কাপড়গুলিকে নাচের ভঙ্গিমায় পরে একেবারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। কাছেই একটা ঘর থেকে আর একজন বলিষ্ঠ সাঁওতাল যুবা মাথার বাবরি দুলিয়ে মাদল বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে এল। তার পর সকলে মিলে ভাঙা বাংলায় গান আরম্ভ করলে

"এখনও তারে, নজরে দেখি নাই—
দেখি নাই গো—"—

সঙ্গে সঙ্গে নাচ। গান কিন্তু ঐ এক লাইনই—ঘুরে ফিরে, সামনে, পিছনে কত রকম যে সেই সাঁওতালের মেয়ে ক'টী, শরতের মেঘের মত, স্বচ্ছন্দ লঘুগতিতে নেচে গেল তার ঠিক নেই। গান আরম্ভ হওয়ার পরে প্রভাত এবার সকলের সামনেই মীনার দিকে চেয়ে একটু হেসে ধৃত হাতখানায় একটু চাপ দিলে, যেন বল্‌তে চাইলে "শুন্‌চ ?"—মীনার মনেও তখন এদেরই কাছে শোনা আর একটা বাংলা গানের একটা লাইন ঘুরে যাচ্ছিল। ভাব্‌ছিল, তাদের বলে যে

"তুমি এসেছ কি এস নাই
এখনও নজরে দেখি নাই, বঁধুগো !"

এই গানটা করতে। কিন্তু কেমন মুখ চেপে গেল—মীনার বলা আর হল না। গান শোনা হলে দুটো টাকা ফেলে দিয়ে প্রভাত সুধাংশুকে উঠতে বল্‌লে। সুধাংশু উঠে গাড়ীখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। সাঁওতালদের গানের একটানা সুর ও মনের মত কথাগুলি প্রভাত ও মীনার মনে মায়াজাল রচনা করলে।—

২

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নতুন জামাই বিকেলে যে কিছু না খেয়েই বেড়াতে চলে গেল, এটা শতদলের কাছে মোটে ভাল লাগছিল না। কিন্তু কি বলবেন তিনি! স্বামী, পুত্রের কাজে বা কথায় বাধা দেওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ! তাই মায়ের প্রাণ নিয়ে তিনি শুধু অপেক্ষাই করছিলেন কখন এরা ফিরে আসে। যথেষ্ট সময় পেয়ে খাবার তিনি অনেক তৈরী করে রেখেছিলেন—আহা! বারমাস বিদেশে থাকে, ঘরেও মা, বোন কেউ নেই, কে বা সময়ে খাবার দেয়! জামাই-য়ের এমনি সব ভাবনায় মন তাঁর [illegible] উঠ্‌ছিল। দুদিন আগে যাকে চিন্‌তেন না, আজ তার সঙ্গে প্রাণাধিকা মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি যেন অজাংশু, সুধাংশু, হিমাংশুর চেয়েও বড় করে, আপনার করে দেখতে ইচ্ছা করছিলেন।

চায়ের জল ফুটে ফুটে উনুনটা নিভে যাবার যোগাড় হচ্ছিল। শতদল সেই একই ভাবে এক চিন্তায় বিভোরা। রমাপতি এসে তাঁর পাশে বসে পড়েই বল্‌লেন "বাইরে কাউকে দেখলাম না, ছেলেরা, প্রভাত সব গেল কোথায় ?"

শতদল তাঁর স্বভাব ধীর স্বরে বললেন "কোথায় বেড়াতে গিয়েছে, মীনু, বৌমাও গিয়েছে।"

"মোটর নিয়ে গিয়েছে।—হীরা সিংকে দিয়েছ তো সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ।"

"ও! তাই বুঝি তুমি রান্নাঘরে একলা? কেন, তুমিও গেলে পারতে ওদের সঙ্গে!"

শতদল শান্ত চোখে একবার স্বামীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, পরে বল্‌লেন "সেই কোন্ সকলে তুমি এক রকম না খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছ, আর এই সারা দিনটা গেল, তুমি বাড়ী আসার সময় পেলে না, আমি বেড়াতে কি করে যাই? তা ছাড়া, কবে সখ করে বেড়াতে গিয়েছি বল ?"—সময়টা সন্ধ্যা—বাড়ীটাও নির্জ্জন। রমাপতি দরজার কাছে এসে একবার মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখে নিয়ে ডান হাতটা স্ত্রীর গলায় জড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তাঁর কপালে যে চুলগুলো লতিয়ে নেমে পড়ে ঘামে ভিজে একেবারে কপালের সঙ্গে এঁটে গিয়েছিল, সেইগুলি সরাতে সরাতে বল্‌লেন "সামান্য 'রাজমিস্ত্রী'র এত আয়াসের দরকার? ঝি, চাকর তো ছিল, তাদের দিয়েই না হয় একদিন চালিয়ে নিতাম, লতা, তুমি গেলে না কেন ?"

প্রায় বছর তিরিশ থেকে "ওগো", 'শুনছ', শুনে শুনে শতদল প্রথম যৌবনের স্বামীর আদরের ডাক প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ আবার বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে স্বামীর নিজ মুখে ব্যক্ত হতে দেখে তাঁরও যেন এই প্রৌঢ় বয়সে মতিভ্রম হল। নিজের গলায় যে হাতটী জড়ান ছিল, সেটী আরও একটু দৃঢ় করে

জড়িয়ে নিয়ে অসঙ্কোচেই স্বামীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন "হ্যাঁ 'রাজমিস্ত্রীই' হও, আর যা-ই হও না কেন, আমার তো রাজা তুমি—তাঁর আরাম, বিশ্রামের 'ভার' বেঁচে থাকৃতে আমি কার হাতে ফেলে দিয়ে ক্ষণিক আমোদ করৃতে যাব? তা ছাড়া ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষেই যায়. ওদের মা হয়ে আমি কি করে 'এখন' প্রভাত মীনুর সঙ্গে যেতাম! ওদের এখন পরস্পরের সঙ্গই তৃপ্তিকর।"

রমাপতি স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন "হ্যাঁ, এ কথাটা আমার মনেই হয় নি।"

"তোমরা ভুলে যাও—কিন্তু আমরা ভুলি না; তাই স্মৃতিসর্ব্বস্বা হয়ে আমরা বেঁচে থাকি।"

"আচ্ছা, মীনু কি সুখী হয়েছে? আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। এক একবার ভাবি যতীর হাতে দিলেই কি ঠিক হ'ত? যতীর অভিশাপ মীনুকে স্পর্শ করবে না তো এসে? আহা! যতীও ভাল ছেলে! আমার যদি আরো মেয়ে থাকৃতো তবে আমি যতীকেও 'আপনার' করে নিতাম! কতদিন হল যতীকে দেখিনি, তার কোনো খবর জানিনে। সময় সময় তার জন্যে মন এত খারাপ হয়, কোথা যে গেল! একটু যদি আমাকে জানিয়ে যেত!"

স্নেহময়ী শতদলের চোখ দুটীও ছলছলিয়ে এল। বললেন, "শুভ্রাংশু, সুধা, খোকার চেয়ে আমি যতীকে কোনদিন অন্য ভাবিনি। মীনুকে সে বরাবরই খুব ভালবাস্‌তো—তার পরে বিয়ের কথাটা জানাজানি হয়ে পড়াতে সে যে কত খুসী হয়েছিল, তার আর কি বলব! তার সে সময়কার হাসি মুখখানি যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে। আবার যেদিন প্রভাতের সঙ্গে মীনার বিয়ে ঠিক করৃলে, তার সেদিনকার ব্যথাকাতর মুখ, সারারাতের জাগরণ, কিছুই আমার চোখ এড়ায় নি। কিন্তু কি সংযমের সঙ্গে সে মীনুর বিয়ে পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিয়ে গেল—কি সহজভাবে অত বড় একটা বিপর্য্যয় ঘটার পরেও সেই মীনুর সঙ্গেই সে সরলভাবে ভাই-বোনের মত হাসি-খেলা করত তা আমার জান্‌তে বাকী ছিল না। কিন্তু সে যে চলে যাবে এটা আমিও বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম, মীনুর বিয়ের হাঙ্গামাটা মিটে গেলে তার বিয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে যত্ন করে চাইবার, 'আপন' বলে কাছে টেনে নেবার একজন লোক করে দেব—কিন্তু সবই ভেস্তে গেল। যতী চলে গিয়ে আমার প্রভাতকে পাওয়ার আনন্দটা মাটী করে দিলে একেবারে। সখেদে রমাপতি বল্‌লেন, "কি ব্যথাই মনে পেল যে একেবারে দেশত্যাগী হয়ে গেল! মীনু কি এখনও ওর কথা ভাবে?

"তা আবার ভাববে না? বিশেষ করে যখন শুনেছে যে তার বিয়েই যতীর দেশ ছেড়ে পালাবার কারণ। তবে যতীকে সে 'যতীদা' ছাড়া আর কিছুই কোনদিন ভাবেনি—তাই নিরুদ্দিষ্ট ভাইএর জন্যে বোনের যেমন স্নেহ-মমতা থাকা দরকার তার বেশী সে কিছুই করে না। প্রভাতের স্নেহ যে তাকে শান্তি দিয়েছে, তা আমি বুঝ্‌তে পারি। তাই হোক, প্রভাতকে সে চিনে নিয়ে যেন, তার ঘরকেই আপন করে নেয়!"

রমাপতি স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে বল্‌লেন "তা পারৃবে। তোমার মেয়ে যে।"—

"তুমি সেই আশীর্ব্বাদই ওকে কর। ভগবান্ ওকে বড় করে দিয়েছেন—বড়র মত মন নিয়ে, নিজের বলে কিছু না রেখে, মাতৃহারার মা হয়ে, নিরন্নকে অন্ন দিয়ে, দুঃখীর চোখের জল মুছিয়ে, হেসে, খেলে যেন ওর দিনগুলো কেটে যায়।"

"আমি বল্‌ছি, নিশ্চয় বল্‌ছি, দেখো লতা, মীনু ঠিক তোমারই মত সুগৃহিণী হবে। তোমার"—বাইরে 'হর্ণ শোনা গেল। রমাপতি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই, শতদল তাঁর হাতটা চেপে ধরলেন। বাধ্য হয়ে তিনি বসে পড়ে শতদলের কাণে কাণে বল্‌লেন, "আমাকে কি এই রান্নাঘরেই ধরে রাখ্‌তে চাও, ছেলে মেয়েদের সামনে?"

"না, ধরে আমি তোমাকে রাখ্‌তে চাইনে—তুমি যেটুকু সময় খুসী হয়ে আমার কাছে থাকতে চাও, সেই আমার ভালো—বারণ করৃছি শুধু এখন গেলে মীনা ও প্রভাত লজ্জা পাবে বলে। ওদের মুখখানা এখুনি শুকিয়ে যাবে? লজ্জায় ওরা অস্থির হয়ে পড়বে।"

"আচ্ছা, তবে একটু বসি, তোমার এখানে ওরা কেউ তো আর আসছে না?"

"সম্ভব তো নয়। তবে কাপড় ছেড়ে মলিনা বোধহয় আসবে। এখখুনি কেউ আসছে না।"

"তবে আমিও আমার ভুলে যাওয়া যৌবনকে মনে করে, স্মৃতির দিনের আর একটু সঞ্চয় বাড়াই" বলে প্রৌঢ় রমাপতি তাঁর যৌবনের প্রিয়া, প্রৌঢ়ত্বের গৃহিণী, শতদলের চোখের পাতা দুটীর ওপরে একে একে চুমো দিলেন। অনেক দিন ভুলে যাওয়া, এই স্পর্শে শতদল শুধু একটু কেঁপে উঠলেন; বুঝি চোখ দুটী বন্ধ হয়েও এল। পরক্ষণেই রমাপতির হাতটা ছেড়ে দিয়ে তাঁকে এক রকম জোর করে তুলে দিয়েই বললেন "এইবার, তুমি বাইরে যাও। আমি তোমার খাবার ঠিক করে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

রমাপতির মনে, তখন পঁয়ত্রিশ বছর আগের যুবা রমাপতি জেগে উঠেছিল—আগুনের আঁচে শতদল কেবলই ঘেমে উঠছিলেন—তাঁকে একটু সরিয়ে কাছে টেনে নিতেই ব্যস্ত হয়ে শতদল বলে উঠলেন, "তুমি ওঠ, তোমার খাবার দেরী হয়ে যাচ্ছে—তা ছাড়া ছেলে-মেয়েরা কে এসে পড়বে! রমাপতি হেসে উঠে পড়লেন। শতদল তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারতে আরম্ভ করলেন।

মীনা তার সেই ওপরের ঘরখানিতে গিয়ে একটু ক্লান্ত ভাবে বসে পড়ল। কাপড় তখুনি ছাড়া হল না। গাড়ীতে প্রভাত যখন মীনার হাতখানি ধরে ছিল, অনেক বারই তার মনে হচ্ছিল যে আঙুলে যেন কি পরাণ হচ্ছে—কিন্তু পাশেই মলিনা বসে! হাতটা বের করে দেখতেও পারে না অথচ জিনিসটা দেখবার আগ্রহ তার মনকে ব্যস্ত করে তুললে। চেয়ারে এখন বসেই সব প্রথমে সে বাঁ হাতটা বের করে দেখলে সত্যিই প্রভাত তার অনামিকাতে হীরার আংটীটার পাশেই আর একটা "হার্ট সেপ" মীনা করা আংটী পরিয়ে দিয়েছে। প্রভাতের এই আত্মসমর্পণ জানতে পেরে মীনা তার কবি-মনের প্রশংসা না করে থাকতে পারলে না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে সেই আংটীটা দেখতে লাগলো—খুলে দেখতে ইচ্ছা হলোনা, মনে হল, প্রভাতের স্পর্শ তার সেই আঙুলে জড়িয়ে আছে। রাত্রে যদি প্রভাত এই আংটীর কথা কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে তাকে কি বলবে সেটাও যেন সে এখন থেকেই ভেবে রাখছিল।

অনেকক্ষণ থেকে মীনার কোন সাড়া না পেয়ে মলিনা একবার তার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে মীনা চেয়ারের ওপর বসে একদৃষ্টে নিজের আঙুল দেখছে। দূর থেকে মলিনা ব্যাপার কি তা বুঝতে না পেরে ঘরের ভিতরে এল। অল্প এগিয়ে এসেই শাদা হীরার পাশে নীল রংএর মীনে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।—হাসিমুখে এগিয়ে এসে মলিনা বললে "ও তাই বলি! মীনুরাণীর দেখা নেই কেন? এ উপহার কখন্ এসে পৌঁছোল?—বাবা, খুব মেয়ে যা-হোক সকলের চোখ এড়িয়ে এটা কখন হাতে এল?—এদিকে চুপ চুপ করে থাকা ওদিকে সব ঠিক আছে!—"

"দেখ্ বৌদি, তুই যে ষাঁড়ের মত চেঁচাতে আরম্ভ করলি একেবারে!—আমি তো আর 'কালা' নই যে আস্তে বল্লে শুনতে পাবনা!"—

"ওগো জানি গো জানি। এখন তুই যে চিন্তায় মগ্ন, তার কাছে আমার কথা ও উপস্থিতি যে তোর কাণে ও প্রাণে মধু বর্ষণ করবে না তা তো জানিই।"

"তোর উপস্থিতি বা কথা আমার কাণে, প্রাণে মধু বা গরল যা-ই বর্ষণ করুক, এই সন্ধ্যায় তুই সে কথা জানতে আমার কাছে মরতে এলি কেন? যার কাছে জিজ্ঞাসা করলে ঠিক উত্তর পাবি, রাত্রে তার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিস্।"

"রাত্রে কেন?—এখুনি করব।"

"কর্ গে যা।—আমাকে জ্বালাতে এলি কেন?"

"যাব, যাব, তার আগে জেনে যাব 'সুন্দর' কোন সদুপায়ে 'বিদ্যার' হাতে আংটী পৌঁছে দিলেন?"

"বড়দাকে জিজ্ঞাসা করিস্। যে উপায়ে বড়দা মা-বাবার চোখ এড়িয়ে ঘন ঘন তোর ঘরে কাজের ছুতোয় যাওয়া-আসা করেন, ঠিক সেই উপায়ে।—"

"বুঝেছি। দেখি আংটীটা কেমন?"

মীনা তার আংটী শুদ্ধ হাতখানা মলিনার দিকে বাড়িয়ে দিলে।—মলিনা আংটীটা খুলে দেখতে গেল।

মীনা একবার বারণ করতে গিয়ে থেমে গেল। আংটী দেখা হয়ে গেলে ফিরিয়ে দিতে দিতে মলিনা বললে—

"তুমি বিনা কেহ নাই,
মাতা, পিতা, ভগ্নি ভাই,
তুমি মম ধ্যান তুমি জ্ঞান।"—

হেসে মীনা বল্‌লে তুমি যা-তা বল্‌ছ বৌদি—"আমি কি চেয়েছি!"—

"আহা!—এ বুঝি চাইতে হয়? আচ্ছা বল্‌তো, না চেয়ে পেয়ে তোর কি মনে খুব আনন্দ হয় নি? চেয়ে পাওয়ার থেকে না চেয়ে পাওয়ার মাধুর্য্য বেশী, এ তো আর অস্বীকার কর্‌তে পারবিনে?—নে চল্ এখন, সারা বিকেলটা তো বেশ বুড়ো মা'র ঘাড়ে সংসারটা ফেলে দিয়ে মজা করে বেড়িয়ে এলাম, দেখি গে করবার মত কোন কাজ মা মনে করে বাকী রেখেছেন কি না?"—

"যাওনা, বারণ কে কর্‌ছে?—আমি একটু পরে যাব।—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই যেও মশা'য়। এখন বসে বসে ভাবো বিছানাটা কোন্ মুখো হওয়া দরকার, আলোটা কোনদিকে রাখা দরকার, ফুল বেলি ভাল না যুঁই ভাল, এই কর।—অনুগ্রহ করে চা নীচেই খাবে, না সে আবার এই অধমা দিয়ে যাবে?"

"আমি মিনিট পনর'র মধ্যেই যাচ্ছি।—কাপড় খুলেই। তুল্‌তে আজ আর পারছি না সব এখানেই পড়ে থাকবে।—চা'টা ঠিক করে রাখিস্ ভাই—নেমেই যেন পাই।"

"যো হুকুম" বলে মলিনা চলে গেল।

নীচে নেমে দেখলে শুভ্রাংশু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। দালানে মলিনাকে দেখ্‌তে পেয়ে তিনি বললেন "খুঁজে খুঁজে হয়রান!—কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

গম্ভীর মুখে মলিনা বল্‌লে "সফরে।—"

শুভ্রাংশু নীরবে কথাটা হজম করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। রান্নাঘরে শতদলকে জল-খাবারের রেকাবী গোছাতে ব্যস্ত দেখে মলিনাও এসে যোগ দিলে।—কথায় কথায় প্রভাতের আংটী দেওয়ার কথাও সে শতদলকে জানিয়ে দিলে। শুনে তিনি শুধু একটু হাসলেন।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে, শুভ্রাংশু, প্রভাতকে সঙ্গে করে দোতলার সেই ঘরখানিতে গিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন।—রাজনীতি,—অর্থনীতি, সামাজিক, লৌকিক সব আলোচনাই তাঁদের হতে লাগল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই রকম গল্প করার পর শুভ্রাংশু "আচ্ছা, রাত হ'ল তুমি শোও" বলে উঠে পড়লেন।—একটু পরেই ছাত, পার হয়ে সিঁড়িতে তাঁর চটির শব্দ শোনা গেল।—

মাসটা ফাল্গুন হলেও শীত অল্প ছিল। খোলা দরজাটা ঠেসিয়ে দিতে গিয়ে প্রভাত দেখ্‌লে মীনা ঠিক দরজার পাশেই ও মলিনা ফিরে যাচ্ছে।—মলিনার একেবারে চ'লে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে প্রভাত মৃদু আকর্ষণ করে মীনাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল।—বাঁ হাতে তার একটা হাত ধরে রেখে, ডান হাতটা দিয়ে দরজায় খিল লাগাতে লাগাতে প্রভাত বল্‌লে "বেশ তো তুমি এই হিমে দাঁড়িয়েই রয়েছ! ভাগ্যে আমি দরজা বন্ধ করতে উঠেছিলাম, না হলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে?" দরজা বন্ধ করে মীনার কোমরটা জড়িয়ে ধরে সে টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল। মীনার বুকের ভিতর লজ্জায় তখন দুরু দুরু করে উঠছিল। কথা কি বল্‌বে তা দুজনের কেউই কিছু ভেবে পেলে না।—একটু পরে প্রভাত বললে, "আমি এসেছি বলে, তুমি খুসী হয়েছ? আমার কথা তোমার মনে আসে?" বারে—বারে জিজ্ঞাসা করাতে মীনা শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে "হ্যাঁ।"

"আংটীটা তোমার পছন্দ হয়েছে?—"

"হয়েছে। কিন্তু তুমি আনলে কেন?—এই তো বিয়ের সময় সেদিন 'পেজেণ্ট' দিয়েছ!—"

"আমার ভাল লাগ্‌ল, তাই এনেছি। দেখি, কি রকম দেখাচ্ছে?—"

মীনা প্রভাতের হাতটা ছাড়িয়ে বিছানার নীচে থেকে আংটীটা বের করে প্রভাতকে দিয়ে বল্‌লে "পরিয়ে দেও"।—

"খুলেছিলে কেন?—"

মৃদুস্বরে মীনা বল্‌লে "আংটীটা ভাল করে দেখ্‌বে বলে বৌদি খুলে নিয়েছিল, তোমার কাছ থেকে আবার পরে নেব বলে আমি আর পরি নি।" প্রভাত আবার মীনার হাতটা সযত্নে তুলে নিয়ে আংটী পরিয়ে দিল। মীনার গৌরবর্ণের সঙ্গে মীনের নীল রংটা খুবই মানিয়ে গিয়েছিল। প্রভাত মীনার আংটী-পরা হাতখানি খুব ধীরে আল্‌গা ভাবে ঠোঁটের ওপর ধরেই ছেড়ে দিল পাছে কোন আঘাত লাগে।—ঘরের ঘড়ীতে ১২টা বেজে গেল। প্রভাতের কাঁধের ওপর নিজের হাতটা রেখে মীনা বল্‌লে, "রাত অনেক তো হল।—এইবার ঘুমোবেনা!"—

"হুঁ। চল।"—বলে প্রভাত তার সঙ্গে বিছানায় এল। দোলের জন্য তখন সাঁওতালদের পাড়ায় খুব নাচ গান হচ্ছিল—তারই মাদলের শব্দ অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আসছিল।—

ক্রমশঃ

রাশিয়ার নব্যতন্ত্রে লেনিন ও ষ্টালিন

শ্রীশম্ভুচন্দ্র সেন গুপ্ত

প্রবন্ধ

রাশিয়ার নব্যতন্ত্রে ষ্টালিন কতখানি স্থান অধিকার ক'রে আছেন,—তা আর নতুন করে বলতে হবে না। এই পৃথিবী বিখ্যাত বলশেভিক নেতার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হ'য়েছিল—যখন তিনি টাইফ্লিসের একটী থিয়োজফিক্যাল স্কুলের ছাত্র মাত্র। এই স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি বলশেভিষ্ট্‌দের দলে যাতায়াত আরম্ভ করতে থাকেন। এইরূপে ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে তাঁর অনেকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টতা হ'য়ে উঠ্‌ল। ক্রমে ক্রমে তিনি বলশেভিকদলের এক প্রধান পাণ্ডা হ'য়ে উঠ্‌লেন। ষ্টালিনের চরিত্রের একটী বিশিষ্টতা আছে—সেটী হচ্ছে তাঁর অদম্য উৎসাহ। কোনও কার্য্যে বারবার হতাশ হ'লেও তিনি কখনও ভগ্নোদ্যম হ'তেন না। তার এই অপূর্ব্ব গুণটী অনেক আগেই লেনিনের চক্ষে ধরা পড়েছিল—তখন তিনি এত বড় নামজাদা নেতা নন—সামান্য একজন কর্ম্মী মাত্র। তাঁর এই 'ষ্টালিন' নাম লেনিনের নিজের দেওয়া। রুশ ভাষায় 'ষ্টেলের' (Stal) অর্থ হচ্ছে ইস্পাত। তাঁর ইস্পাতের মত ইচ্ছাশক্তি লেনিনের দেওয়া এই 'ষ্টালিন' নাম সার্থক হয়েছে। ষ্টালিনের আসল নাম হ'চ্ছে—জোসেফ ভাইমারোনেভিচ্ জুগাম্‌ভিনি। কিন্তু তাঁর এই আসল নাম অনেকের কাছেই অজ্ঞাত—ষ্টালিন নামেই তিনি সকলের কাছে সুপরিচিত।

ষ্টালিন জর্জ্জিয়া প্রদেশে জুতা সেলাইয়ের কাজ করতেন। তাঁর অনুচরবর্গের মধ্যে যখন তাঁর কার্য্যকলাপ নিয়ে আলোচনা চলত—তখন দু'একজন তাঁর চরিত্রকে বাষ্পীয় রোলারের সঙ্গে তুলনা করতেন। রাস্তা তৈয়ারীর সময় বাষ্পীয় রোলার যেমন মন্থর গতিতে চলে—অন্যান্য গাড়ীর ন্যায় সচরাচর পথবিচ্যুত হয় না—যা সম্মুখে পায় তাই নিষ্পেষণ ক'রে যায়—ষ্টালিনের চরিত্র নাকি এই রকমই। যে পথে তিনি একবার অগ্রসর হ'তেন, শত বাধাবিঘ্ন এ'লেও সে পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হ'তেন না। কিন্তু এই অপূর্ব্ব চরিত্রের তিনি অধিকারী হ'লেন কিরূপে? সকলের এ বিষয়ে একটা কৌতূহল জন্মাতে পারে। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে তাঁর কারাজীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই বল্‌তে হয়। কারণ এই কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ও কঠোরতাই তাঁর চরিত্রের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল—যার ফলে তিনি আজ এতবড় নেতা হ'তে সমর্থ হ'য়েছেন। কত কঠোর, কত ধৈর্য্যশীল হ'তে পারলে এত বড় হওয়া যায় তা তাঁর কারাজীবনের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে জানাচ্ছি।

১৯০১ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বৎসর—সেই থেকে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সতের বৎসর তিনি বিদ্রোহীরূপে দ্বাদশ বার গ্রেপ্তার হ'ন্ ও আর্ক্‌টীকের (Arctic) নিকটবর্ত্তী ভীষণ শৈত্য প্রধান ও নির্জ্জন স্থানে তাঁকে দ্বীপান্তরিত হ'তে হয়। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি কারাগার থেকে পলায়ন করেন। পলায়নের সময় তাঁকে যে কি অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ও হীনতা সহ্য করতে হয়েছিল তা ধারণাতীত। দ্বাদশবার যখন তিনি গ্রেপ্তার হ'য়ে সাইবেরিয়ার নির্জ্জন প্রদেশে নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন—তখন কেরেন্‌স্‌কি (Kerensky) তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। জারের পুলিসের কাছে তিনি প্রহেলিকাস্বরূপ ছিলেন। কখন কিরূপে যে তিনি এ'দের চক্ষে ধূলি দিয়ে পালিয়ে যেতেন—তা এরা বুঝতে পারত না। এই চাতুরীবিদ্যা তিনি শিখেছিলেন জর্জ্জিয়া প্রদেশের 'কিন্‌টো'দের কাছ থেকে—বাল্যকালে তাদের সঙ্গে একত্র অবস্থানের ফলে। এই 'কিন্‌টো'দের (Kinto) জর্জ্জিয়া প্রদেশেই দেখতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে রাস্তায় ফেরী করা ছাড়া

এদের আর কোনও কাজ নেই। সেখানকার লোকেরা এদের 'ভবঘুরে' আখ্যা দিয়ে থাকে। ষ্টালিন এই 'কিনটো'দের কাছ থেকে যে চাতুরী শিখেছিলেন—সেই বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ ক'রে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক বিশিষ্ট নেতাদেরও হতভম্ব ক'রে দিয়েছিলেন।

অনেকেরই মনে হ'তে পারে, ষ্টালিনের মত নেতা নিশ্চয়ই খুব পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু তা' নয়। একমাত্র কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিট্যাল' ও লেনিনের গ্রন্থগুলি ছাড়া ষ্টালিন আর বেশী কিছু বই পড়েন নি। এই বইগুলি রুশ ভাষায় লেখা। অথচ শুনলে আশ্চর্য্যান্বিত হ'বেন ১৫ বৎসর বয়সে 'টাইফ্লিসে'র স্কুলে ভর্ত্তি হ'বার পূর্ব্বে তিনি রুশ ভাষাতে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারতেন না। এখনও তাঁর কথাবার্ত্তার উচ্চারণে জর্জ্জিয়া প্রদেশের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তিনি কার্লমার্ক্সের কতকগুলি বইয়ের টীকা করেছেন। এই ব্যাখ্যা পুস্তকগুলিতে তিনি অতি সরল ও সহজ ভাষায় কার্লমার্ক্সের নীতিগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ষ্টালিনের পরিবারের মধ্যে তিনি, তাঁর স্ত্রী ও তিনটী পুত্র ছাড়া আর কেহ নাই। মস্কোর কাছাকাছি গর্কী নামক একটি ছোট নগরে তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে লেনিনের বাটীতে বাস করেন। এই বাটীতেই লেনিন তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে গেছেন। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র অবকাশের সময় তিনি ক্রীমিয়া প্রদেশে বেড়াতে যান। এ ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও বিষয়ে অনুরাগ নেই। আমোদ-প্রমোদের স্থানগুলিতে তিনি মোটেই পদার্পণ করেন না। কাজকেই তিনি তাঁর একমাত্র আমোদের বিষয়ে পরিণত ক'রেচেন। দিনের মধ্যে চৌদ্দ থেকে ষোল ঘণ্টা তাঁকে কাজে ব্যস্ত দেখতে পাওয়া যায়। অনেক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র দুবার বলশেভিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি দেশভ্রমণে বাহির হয়েছিলেন। একমাত্র রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে তিনি খুব অল্পই খবর রাখেন। একমাত্র রুশ ভাষা ব্যতীত আর কোনও বিদেশীয় ভাষায় তার ব্যুৎপত্তি নেই। ষ্টালিন বড় অল্প কথা কন। এই জন্য তিনি কোনও সাধারণ সভায় যোগ দেন না বা বক্তৃতা করেন না। খুব প্রয়োজনীয় সভার অধিবেশন হ'লে তিনি বৎসরের মধ্যে হয়ত দুবার কি তিনবার এ সব সভায় উপস্থিত থাকেন।

এই ত গেল ষ্টালিনের দৈনন্দিন জীবনের কথা। রাজনৈতিক জীবনে তিনি কিরূপে অগ্রসর হয়েছিলেন—তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কাউন্সিলে ষ্টালিন একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। সে-সময় রুশিয়ার চারিদিকে যে সমস্ত বিদ্রোহীদল বর্ত্তমান ছিল—তা'দের প্রত্যেক দলটীর সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর আর একটী জিনিস ছিল—সে হচ্ছে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। এর দরুণই তিনি "কমিটী অফ্ সেভন্" (Committee of Seven) এর সভ্য হ'তে পেরেছিলেন। এই কমিটী অফ্ সেভেন্ই পরে কেরেন্সকিকে বিতাড়িত করে ও ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের পর কিছুদিনের জন্য বলশেভিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ষ্টালিনের আর একটী গুণ ছিল—সেটী হচ্ছে তাঁর আদেশকে কার্য্যে পরিণত করবার অসাধারণ ক্ষমতা। এর দরুণ লেনিন তাঁকে তাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে একটী বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিলেন।

অনেকেরই জানতে ইচ্ছা হ'তে পারে ষ্টালিন সম্বন্ধে লেনিনের কি মত ছিল। ষ্টালিন সম্বন্ধে লেনিন কি মত পোষণ করতেন তা' তাঁর মৃত্যুশয্যায় কমিউনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটীকে লিখিত একটী পত্রে জানতে পারা যায়। এই পত্রে তিনি ষ্টালিনের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে বলশেভিকদলের জেনারেল সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারিত করবার জন্য বিশেষ ক'রে লিখেছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার নেতার পদে ষ্টালিন তাঁর মতে একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু লেনিন ষ্টালিনের এই অভ্যুদয়কে বাধা দিতে সমর্থ হন নি। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ও শয্যাশায়ী না হ'তেন, তা'হলে বোধ হয় তিনি এ বিষয়ে সফলকাম হ'তে পারতেন।

লেনিনের মৃত্যুর পরই ষ্টালিন বহির্জগতে এসে দাঁড়ালেন। যে দুই বৎসর লেনিন অসুখে শয্যাগত হ'য়ে পড়েছিলেন, সেই সময় ষ্টালিন অতি চতুরতার সহিত মতলব আঁটছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারল

সেক্রেটারীরূপে তিনি এইবার সেণ্ট্রাল কমিটীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্ত তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। এই সেণ্ট্রাল কমিটীই বলশেভিকদলের সমস্ত কার্য্য-কলাপ পরিচালনা করত। পূর্ব্বে এই কমিটীতে বলশেভিষ্টদলের সেরা সেরা ১৯ জন নেতা সভ্য ছিলেন। ষ্টালিন এই কমিটীর সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণ করেন ও পরে এর সভ্যসংখ্যা একাত্তর জন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করেন। বলাবাহুল্য নতুন সভ্যগণকে তিনি নিজেই নিযুক্ত করেছিলেন। এর পর তিনি উক্রেনে (Ukrain) ও অন্যান্ত সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্রে কমিউনিষ্ট দলের সেণ্ট্রাল কমিটীগুলি সংগঠনে মনোযোগ দেন। যারা তাঁর মতের বিরুদ্ধে যেতেন তাদের তিনি ছলে কৌশলে অপসারিত করতে লাগলেন। এইভাবে যখন তাঁর দল বেশ সুগঠিত হ'য়ে উঠ্‌ল ষ্ট্যালিন স্বপক্ষীয় ব্যক্তিদের একে একে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করতে আরম্ভ করলেন।

দলের ভেতর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর ষ্টালিন অন্যান্ত বিষয়ে মন দিলেন। তিনি ভালরকমই জানতেন, বলশেভিকবাদ দেশের আর্থিক ব্যাপারে যে নীতি প্রচলিত করেছেন দেশের জনসাধারণের পক্ষে তা দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেচে। ১৯২১ সালে লেনিন অর্থ সম্বন্ধে যে-আইন প্রবর্ত্তন (New Economic Policy) করেন তাতে prvatie trade অনুমোদিত ছিল। এর দ্বারা জনসাধারণের জীবন সুসাধ্য ক'রে দিয়েছিল। গম, মাখন, মাংস ও অন্যান্ত খাদ্যদ্রব্য সমবায় সমিতিতে এসে হাজির হ'ত। প্রজারা যথেষ্ট পরিমাণে পেতে পেত। পূর্ব্বের অবস্থার তুলনায় এখন তাঁদের স্বর্গবাস বল্‌লে অত্যুক্তি করা হবে না।

তাদের মতে রাজ্যের প্রচলিত অবস্থাই বেশ সুবিধা-জনক মনে হ'য়েছিল এর কোনও পরিবর্ত্তন তারা চায় নাই। কিন্তু ট্রট্স্কির মত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উল্টা ছিল। তার মতে লেনিনের এই অর্থ-আইন সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন দেশের যেরূপ সঙ্কট অবস্থা হ'য়েছিল—তারই প্রতিবিধানে এই আইনের আবশ্যক ছিল—এখন এই আইনের রদ আবশ্যক—এই ছিল লেনিনের অভিমত। কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের কয়েকজন ট্রট্স্কির এই মতকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু দলের বেশীর ভাগই ওই আইন প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। এদের মধ্যে রিকভ, বুখারিন্, ট্রটস্কি প্রভৃতি নেতারা একটা দল গঠন করলেন। লেনিন তাঁর জীবিতকালে বলশেভিষ্টদলের মধ্যে যে একতা এতদিন বজায় রেখে এসেছিলেন—এতদিনে তার অন্তিমকালে এর ভাঙন সুরু হ'ল ও ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর মৃত্যুর পর এই মনোমালিন্ত এরূপ চরম অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে দুই দলে ঝগড়া সুরু হয়।

এই সময় ষ্টালিন খুব বিবেচনা ও কৌশলের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। এ সময় যে পক্ষেরই জয় হোক না কেন এটা তাঁর পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—কারণ এতে তাঁর সমস্ত মতলব ব্যর্থ হ'তে পারে। দলের মধ্যে 'ট্রট্স্কিই' তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় হ'ল। এর পর তিনি নিজেকে মধ্যপন্থী ব'লে ঘোষণা করলেন ও 'রাইট উইং' দলের কাছে মিলন প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তাঁর এই প্রস্তাব রাইট উইং দলের নেতা রিকভ ও তাঁর সহকর্ম্মীগণ গ্রহণ করেছিলেন। এর পর ষ্টালিন ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে ট্রট্স্কিকে নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত করেন।

এর পর ষ্টালিনের কার্য্যকলাপে সকলেই বিস্ময় অনুভব করেছিলেন। কারণ যে ট্রট্স্কিকে তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, পরে সেই ট্রট্স্কিরই প্রধান প্রধান নীতিগুলিকে তিনি গ্রহণ করে কার্য্যে পরিণত করতে আরম্ভ করেন।

Forced collectivization. militarization of labour, accelerated tempo of industrialization. প্রভৃতি ট্রট্স্কির প্রধান নীতিগুলিকেই ষ্টালিন গ্রহণ করলেন। ১৯২৮ সালে তিনি Five-year plan প্রবর্ত্তন করেন, লেনিনের অর্থ-আইন বদলাইয়া দেন ও Private Trade বন্ধ ক'রে দেন।

ষ্টালিনের এইরকম কার্য্যকলাপে যখন 'রাইট উইং' নেতারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেচেন, তখন তাঁরা 'লেফ্‌ট্ উইং' দলের সহিত গুপ্তভাবে মন্ত্রণা করতে আরম্ভ করলেন—ষ্টালিনকে বিতাড়িত করবার জন্ত। কিন্তু তাঁদের এই চেষ্টা ঠিক সময়োপযোগী না হওয়ার দরুণ ফলবতী হয় নি। কারণ

ট্রট্‌স্‌কি তখন আলমাটায় (Almuata) নির্ব্বাসিত অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন এবং দলের ভেতর ষ্টালিন বেশ সুদৃঢ় ভাবে অবস্থান করচেন। ট্রট্‌স্‌কির অনুচর-বর্গের মধ্যে জিনোভিফ, ক্যামিনি প্রভৃতি নেতার ট্রট্‌স্‌কির ন্যায় তেজস্বিতা ছিল না। একমাত্র ব্যাক্‌ভ্‌সবি ছাড়া দলের সকলেই ষ্টালিনের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে নিযুক্ত করে দেন।

ষ্টালিন কিরূপ দক্ষতার সহিত সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট্ ও পুলিসকে নিজ করায়ত্ব করেছিলেন তা' বুখারিন কর্ত্তৃক ক্যামেনিভকে লিখিত একটী পত্রে বেশ বুঝতে পারা যায়। এই চিঠিতে বুখারিন লিখেছিলেন,—"আমাদের সভার খবর যেন কেহ সন্ধান না পায়। টেলিফোনে আমার সহিত কথা কহিবেন না। আমাকে গুপ্তচর সদা সর্ব্বদা অনুসরণ করিতেছে। আমি আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাহারও মধ্যস্থতায় নয়। রিকভ ও টম্‌স্‌কি ব্যতীত আর যেন কেহ আমাদের কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে কিছু জানিতে না পারে"।

এই চিঠি পাঠানোর ইতিহাস বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক। মোকলনিকভ—যিনি বর্ত্তমানে লণ্ডনে সোভিয়েট রাজদূতের পদে অবস্থান করচেন—তিনিই এই চিঠি আদান-প্রদান করেছিলেন।

এর পর ষ্টালিন 'প্রাভদা'র সম্পাদক্ পদ থেকে বুখারিণকে বিতাড়িত করেন। এই 'প্রাভদা' পত্রিকাখানি কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল। তারপর টমসাককে সোভিয়েট ট্রেড্ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এই সোভিয়েট ট্রেড্ ইউনিয়ন' কমিউনিষ্ট্ সম্প্রদায়ের পরই একটী বিশেষ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। টমস্‌বের স্থানে তিনি কাগানাউচ্‌কে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি ষ্ট্যালিনের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। এইরূপে দু'বৎসর ক্রমাগতঃ কৌশল প্রয়োগ ক'রে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ষ্ট্যালিনকে আজ আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ন্তারূপে বিরাজিত দেখতে পাচ্চি। সোভিয়েট রাজনীতি বিশারদগণের মধ্যে এখন তিনি সর্ব্বোচ্চশাখায় অবস্থান করচেন। সামান্য অবস্থা থেকে তাঁর এই শক্তির চরমশিখরে আরোহণ—এ বড় কম বাহাদুরীর কথা নয়। কারণ তাঁকে এর জন্য তাঁর অপেক্ষা শতগুণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞদের সহিত প্রতিনিয়তই যুঝতে হয়েচে। ষ্ট্যালিন যখন ক্রমে ক্রমে এক একটি ক্ষমতা হস্তগত করছিলেন, তখন ট্রট্‌স্‌কি, ব্যাকভ্‌সবি, জিনোভিফ্ ক্যামোনভ্ রিক্‌ভ, টম্‌স্‌কি প্রভৃতি রাজনীতি বিশারদ নেতারা দুর্গের মধ্যে পরামর্শে পরস্পর নিযুক্ত ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ষ্ট্যালিনের অপেক্ষা রাজনীতিতে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেক বড় ছিলেন। এই নেতারা যখন বিদ্রোহের বিভিন্ন পথ নিয়ে আলোচনায় রত ছিলেন—ষ্ট্যালিন তখন নিজের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে ব্যস্ত ছিলেন।

"পুষ্প" বিয়োগে *

নন্দন-বন-"পুষ্প" সে যে গো
ফুটেছিল ধরণীতে।
সৌরভ তার ছড়ায়ে আছিল
বিশ্বের চারি ভিতে।
সুমধুর তার কণ্ঠের গীতি
সুললিত তার বাণী।
মরতে কাহারও অভিশাপে সে কি
এসে ছিল বীণা-পাণি!
ক্ষণিকের তরে এসেছিল হেথা
বিলাতে অমিয় রাশি।

রাঙা ঠোঁটে তার খেলিয়া বেড়াতো
মধুর চটুল হাসি।
কমনীয় তাঁর অঙ্গ-সুষমা
কোমল তাহার প্রাণ—
ধরার রোদনে ব্যথিতা, তাইকি
অকালেতে অবসান!
ত্রিদিবের দেবী ফিরিল ত্রিদিবে
বাজিল শঙ্খ সেথা।
বিরহে তাহার ভরে উঠে জলে
সবার নয়ন হেথা।

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

* কুমারী পুষ্পরাণী চ্যাটার্জ্জীর বিয়োগ-ব্যথায়।

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৫

মিঃ রায় নিজের গৃহমধ্যে চেয়ারে বসিয়া সেই দিনকার সংবাদপত্রখানা পাঠ করিতেছিলেন ; ইন্দিরা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া পথের অগণিত জনতার পানে তাকাইয়া ছিল।

সেদিন জনৈক বিখ্যাত দেশনেতা কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিবেন, দলে দলে খদ্দর-পরা ছেলের দল কলেজ স্কোয়ারের দিকে চলিয়াছে, মাঝে মাঝে সকলে মিলিয়া চীৎকার করিতেছে—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

ইন্দিরার চোখে এ দৃশ্য একেবারেই নূতন। দেশ-সেবা—দেশপ্রেমের কথা সে বইতে পড়িয়াছে, ইউরোপ-জাপান প্রভৃতি স্থানে থাকিতে সে সব দেশের লোকের দেশকে ভালবাসা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসী যে কোনদিন দেশকে মা বলিয়া ডাকিতে পারে, দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তাহা সে জানে না বলিয়াই এ দৃশ্য তাহার নিকটে একেবারে নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল।

দলের পর দল চলিয়া গেল, তাহাদের মুখ দৃপ্ত, তাহাদের কণ্ঠে বিজয়ধ্বনি, বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

শ্রান্ত ইন্দিরা ফিরিয়া আসিয়া পিতার পার্শ্বের চেয়ার খানায় বসিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কি আজকের কাগজ বাবা—"

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "হ্যাঁ, আজকের কাগজই বটে ; তুই পড়বি ইন্দু, আচ্ছা পড়।"

ইন্দিরা বলিল, "না, তুমি পড়। আজ ব্যাপারটা কি হবে তাই জানতে চাচ্ছিলুম। দেখলুম, দলে দলে ছেলে বুড়োর দল পথ দিয়ে কলেজ স্কোয়ারের দিকে চলেছে, সব খদ্দর পরেছে, কোথায় কি হবে বুঝি ?"

মিঃ রায় বলিলেন, "হ্যাঁ, এই যে লিখেছে আজ কলেজ স্কোয়ারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ দেশনেতা বক্তৃতা দেবেন। এখানে যোগ দেওয়ার জন্তে দেশের সকলকেই বিশেষ করে ছাত্রদের, উপস্থিত হওয়ার জন্তে বলা হয়েছে।"

রুষ্ট হইয়া ইন্দিরা বলিল, "আর কিছু নয় এ কেবল ছেলেদের মাথা-খাওয়া। এই সব হুজুগে পড়ে লাভে হচ্ছে ছেলেরা লেখা-পড়া ছেড়ে দিচ্ছে, এই তো হচ্ছে এদের উন্নতি। এরা যেটুকু লেখাপড়া শিখতে পেরেছে এতে শিখবে কেবল জোচ্চুরী, চুরি ডাকাতি, মানুষ হতে কোনদিনই যে পারবে না, এ আমি লিখে দিতে পারি। এই সব ছেলেরা দেশের সেবা করবে—তবেই হয়েছে। দেশের সেবা করবে নাম নিয়ে করবে কেবল জোচ্চুরী নয় ডাকাতি, এ ছাড়া আর কিছু করবার যোগ্যতা এদের হবে না।"

মিঃ রায় কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বেহারা একখানা কার্ড আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দিরা কার্ডখানা তুলিয়া লইয়া তাহার উপর দৃষ্টি ফেলিয়া মুখখানা বিকৃত করিল মাত্র।

মিঃ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইন্দু ?"

ইন্দিরা উত্তর দিল, "মিঃ মুখার্জ্জি।"

মিঃ রায় বেহারাকে আদেশ দিলেন "বাবুকে নিয়ে এসো।" সে চলিয়া গেল।

ইন্দিরা বলিল, "আমার কাজ আছে বাবা, আমি ও ঘরে গেলে হতো না ?"

মিঃ রায় বলিলেন, "কাজ হবে এখন মা, এখনও তো বেলা ঢের পড়ে আছে।"

পর্দ্দা সরাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুশীল মিঃ রায়কে অভিবাদন করিল।

মিঃ রায় বলিলেন, "বসো সুশীল, আমি সকালেই বেয়ারাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলুম, কাগজপত্রগুলো

দেখা শোনা চাই, বুঝে নেওয়া চাই নইলে, অফিসের কোন কিছুই বুঝতে পারব না। সেই জন্ম তোমায় বিশেষ করে—''

বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি থামিয়া গিয়া বিস্ফারিত নেত্রে সুশীলের পরিচ্ছদের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

তাঁহার দৃষ্টির সামনে সুশীল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

মিঃ রায় একটু থামিয়া বলিলেন, "আজকাল তুমিও খদ্দর ধরেছ দেখছি সুশীল, দিন দিন তোমাদের সব হচ্ছে কি বল দেখি? তোমাদের ব্যাপার দেখে আমি যে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।"

ইন্দিরা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমিও দেশোদ্ধারে নামছ নাকি?"

তাহার কথার উত্তর না দিয়া সুশীল মিঃ রায়ের পানে তাকাইয়া বলিল, "একটা মিটিং ছিল, সেখানে গিয়েছিলুম, সেইজন্যে ভারতীয়ের জাতীয় পোষাক পরে গিয়েছিলুম!''

"ভারতীয়ের জাতীয় পোষাক কি খদ্দর" ইন্দিরা এবার প্রকাশ্যেই হাসিয়া ফেলিল,

সুশীল গম্ভীরভাবে বলিল, "যদি বলি তাই—"

ইন্দিরা বলিল, "আমি ত বলি, এই খদ্দর পরার মূলে কিছু নেই, আছে শুধু একটা উদ্দামভাব, যেটাকে পাগলামী বলা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।"

মুখখানা লাল করিয়া ফেলিয়া রুদ্ধশ্বাসে সুশীল বলিল, "পাগলামী?—"

ইন্দিরা বলিল "সত্যিই তাই। আপনারা চান খদ্দর পরে দেশ উদ্ধার করতে, কিন্তু তাই কি হতে পারে আমি তাই জিজ্ঞাসা করি? এই খদ্দরে দেশকে উন্নত করবে—স্বাধীন করবে, এ স্বপ্ন যারা দেখে তারা পাগল ছাড়া আর কি হতে পারে?"

দৃঢ়কণ্ঠে সুশীল বলিল, "আমি তোমার কথায় প্রতিবাদ করছি, আমি জানি খদ্দরে দেশকে অনেকটা ক্ষতির হাত হতে বাঁচাতে পারবে। তুমি বলছ, এ কোনদিন হবে না, কিন্তু যদি কোনদিন হিসেব করে দেখতে ইন্দু, দেখতে পেতে,—এক এই কাপড়েই কত টাকা বিদেশে চলে যায়। অবশ্য আমি এ কথা জোর করে বলব না যে এক এই খদ্দরেই আমাদের এই ভারতবর্ষের পরাধীনতা ঘুচিয়ে একে স্বাধীনতা দেবে, তবে খদ্দরও যে একটা প্রধান অভাব দূর করবে এ কথা জোর করে বলতে পারা যায়। তুমি হয়তো কোনদিন জানতে চেষ্টা কর নি আগে আমাদের দেশের অবস্থা এ রকম ছিল কি না। তুমি জন্মে জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখছ, এ দেশের লোকেরা পরাধীন হয়ে আছে। কোনদিন তারা মুখ ফুটে নিজেদের অভিযোগ পর্য্যন্ত রাজদ্বারে করতে চায় না। সে রকম বরাবর দেখে এসেছ বলেই মনে করে এসেছ চিরদিনই এ দেশ এমনি ছিল, দেশবাসী চিরকালই এমনি করে পরের হাততোলা দানে তাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে এসেছে। সত্যি যদি কোনদিন এ দেশের অতীত জীবনের ইতিহাসখানার দিকে একটী বারের জন্যেও তোমার চোখ পড়ত ইন্দু, দেখতে পেতে—চিরদিন এ দেশ এমনই দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে ছিল না, এ দেশ একদিন স্বাধীন ছিল, এদেশের লোকেরা একদিন নিজেদের ভাত-কাপড়ের যোগাড় নিজেরাই করেছে, সেদিন বিদেশী এসে তাদের শিল্প, বাণিজ্য, দেশ সবই নিজের হাতে নেয় নি।"

একটু থামিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল, "বড় কম কৌশলে এরা তো এ দেশকে সহজে জয় করতে পারে নি। আজ ভারতবর্ষ দীনা কাঙালিনী হয়ে পড়েছে, নিজের বসন ভূষণে অন্যকে সাজিয়ে সে আজ রিক্তা হয়ে এক পাশে পড়ে রয়েছে; আজ তাকে পেটের ভাত যোগানের জন্যে পরের দরজায় চাকরী করতে হয়, পরণের কাপড়ের জন্যে লোকের কাছে হাত পাততে হয়। আমি আজ খদ্দর পরেছি বলে তুমি আমায় বিদ্রূপ করছো ইন্দিরা, কিন্তু তোমার পরণে ওই সুন্দর কাপড় আমার জন্যে যে তুমি বিশ্বের চোখে বিদ্রূপের পাত্রী হয়েছ তা কোনদিন ভেবে দেখেছ কি? আজ তুমি একজন ইউরোপীয়ের কাছে যাও, সে ভদ্রতার খাতিরে মুখে তোমায় আপ্যায়িত করলেও মনটা কি তার ঘৃণায় ভরে উঠে না, সে কি তোমায় পদানত কুকুর বলেই মনে করবে না?"

বিচলিত হইয়া উঠিয়া ইন্দিরা বলিল, "তুমি ও কি বলছো?"

জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া সুশীল বলিল, "হ্যাঁ, যা সত্যি তাই বলছি ইন্দিরা, অতিরিক্ত

এতটুকুও বলি নি। মানুষ বিশ্বাস করে, কিন্তু সে বিশ্বাস যদি একবার কোন রকমে ভেঙ্গে যায়, আর কি তার পরে বিশ্বাস রাখতে পারা যায় ?"

ইন্দিরা উত্তর দিল না।

সুশীল বলিল, "বল, কেউ যদি তোমার বিশ্বাস ভেঙ্গে দেয়, তুমি কি আর কখনও তাকে বিশ্বাস করতে পারবে ?"

ইন্দিরা নীরবে কেবল মাথা নাড়িল, মুখে একটী কথাও বলিল না।

একটু হাসিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আমি বলছি সুশীল, যে বিশ্বাসের পাত্র একবার বিশ্বাস হারায় তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না।"

সুশীল বলিল, "সত্য কথা। আমাদের দেশের রাজা ইংরেজ, যাদের কাছে আমরা মান চাই, প্রতিষ্ঠা চাই, তারা কি সত্যই আমাদের বিশ্বাস করে ? কাজের সময় ওরা আমাদের গায়ে হাত বুলায়, সে সময় ওরা আমাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু কাজ ফুরিয়ে গেলে তারা আমাদের হয় তো চিনতেই পারে না, কেননা ওরা যে রাজার জাতি আমরা যে ওদেরই অধীন।"

ইন্দিরা নরম সুরে বলিল, "ধরছি—না হয় তোমার কথাই সত্যি, ওরা আমাদের অতি হেয় অতি অপদার্থ বলে মনে করে, কিন্তু খদ্দর পরলেই যে তারা আমাদের মানুষ বলে ভাববে এমন কি কথা আছে ?"

সুশীল হাসিল, বলিল, "অন্ততঃ পক্ষে এই কথাটুকুই আজ জোর করে বলতে পারি ইন্দিরা, আজ আমাদের কাজেই তারা জানতে পেরেছে, যতটা হেয় বলে তারা ভারতীয়কে ভেবেছিল তা আর ভাবতে পারছে না। তুমি এখনও নিজের দেশকে—নিজের দেশবাসীকে চিনতে শেখনি, কিন্তু আশা করছি—শিগ্‌গিরই চিনবে, সেদিন আজকের দিনের কথা ভেবে লজ্জিতা হয়ে উঠবে।"

ইন্দিরার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, আর একটী কথা না বলিয়া সে সেদিনকার কাগজখানা টানিয়া লইল।

মিঃ রায়ের পানে ফিরিয়া সুশীল বলিল, "অনেক অকাজের কথা এসে পড়েছে, এর জন্যে আমায় মাপ করবেন। যে কথা বলবার জন্যে ডেকেছিলেন সে কথা এবার বলুন।"

মিঃ রায় ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "সে কথা বলতুম, যে প্রশ্ন করতুম তার উত্তর তোমাদের এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যেই পেয়ে গেছি সুশীল।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া সুশীল বলিল, "কি প্রশ্ন করতেন আর তার কি উত্তর আপনি পেলেন ?"

মিঃ রায় বলিলেন, "আমি প্রশ্ন তুলতুম—অফিসে কেন কেবল ভারতীয় লোকই রয়েছে, ইংরেজ কেউ নেই কেন ? এখন বুঝছি মনের মধ্যে ভারতীয়দের সম্বন্ধে এই মহান আদর্শ রেখেই তুমি কোন যোগ্যতম ইংরেজকে অফিসের কাজে রাখনি।"

জিজ্ঞাসুনেত্রে সুশীল তাঁহার পানে তাকাইয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি তোমার কথা শুনে এখন বেশ বুঝতে পারছি—ইংরেজ আমাদের ঘৃণা করে এই কল্পনাটা মনের মধ্যে রেখে তুমিও ওদের তেমনই ঘৃণা করছ, ওদের কোন কাজ দাও নি, কিন্তু—"

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, "আপনিই বুঝতে ভুল করছেন। ওদের হয় তো আমি পছন্দ করিনে কিন্তু তাই বলেই যে কাজ দিচ্ছি নে তা নয়। আমাদের এই "না পছন্দ করা" ওদের কতটুকু ক্ষতি করতে পারে ভাবুন দেখি, আমরা ওদের হুকুমে চলতে যখন বাধ্য, তখন আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ওদের কতটুকু আসে যায় ? এ দেশে "খয়ের খাঁর" তো অভাব নেই, ওরা যদি ভুলের বশেও একটা কাজ করে যায়, এই খয়ের খাঁয়ের দল বলে উঠবে—ঠিক হয়েছে, ভাল হয়েছে। ওদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারি আমার ক্ষমতা কি ? তবু যে বলবেন আমি ভারতীয়দেরই কেবল কাজ দিয়েছি, সেটা কেবল ওদের জানিয়ে দিচ্ছি—ওরাও পারে, ওদেরও সে শক্তি আছে। আপনি এতে আমার দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি একবার ভাল করে বুঝে দেখলে এতে আমার দোষ পাবেন না।"

সুশীলের কথা শুনিতে শুনিতে মিঃ রায়ের মুখখানা দু' তিনবার বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, কথা যখন ফুরাইল—যখন তিনি মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার মুখ দিব্য প্রশান্ত।

১৬

মিঃ রায় কি ভাবিতেছিলেন, সুশীল ইন্দিরার হাতের কাগজখানার পানে চাহিয়া রহিল।

চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া মিঃ রায় বলিলেন, "তুমি কিন্তু গোড়াতেই একটা দারুণ ভুল করেছ সুশীল। ইন্দিরা অবশ্য আগে তোমার সঙ্গে তর্ক করবার জন্যেই নেমেছিল কিন্তু তর্ক করার মত প্রচুর শক্তি তার নেই তাই সে চুপ করে গেল। আমি নতুন কথার অবতারণা করছি নে, সেই কথারই জের টেনে চলেছি মাত্র। এই দেশের লোকেরা অনেককাল ধরে দাসত্ব করছে, দেড়শো বছরের ওপর পৌণে দুশো বছর হবে তারা এই শিকলে বাঁধা পড়েছে। দাসত্ব তাদের এমন মজ্জাগত হয়ে পড়েছে যে দাসত্ব করব না বললেও কেউ শোনে না। এই যে এদেশের ছেলেরা স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখছে—এর মূল লক্ষ্য কি বল দেখি,—দাসত্ব নয় কি? ওদের মনে আশা আছে ওরা লেখাপড়া শিখবে উঁচু চাকরী পাবে। এ দেশের মায়েরা ছোট বেলায় ছেলেদের ঘুম পাড়ানোর ছড়া বলেন—তাতেও বলে থাকেন—খোকা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরী করবে। কই, কোন মা বলতে পারেন না—তাঁর খোকা বড় হয়ে স্বাধীন থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মুটেগিরি করেও জীবিকার্জ্জন করবে? কই এত দেশে গেছি, এত দেশ বেড়িয়েছি, কোন মায়ের মুখে এ গান তো শুনিনি যে তাঁর ছেলে—"

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, "আমাদের দেশে কি কোন বীর জন্মায় নি যে চাকরী-করা ঘৃণা করেছে? আপনি বলতে চান অন্য দেশের মায়েদের কথা, কিন্তু আমাদের দেশেও কি তেমন মা জন্মান নি যিনি স্তন্য দুধের সঙ্গে ছেলের মনে স্বদেশপ্রীতির বীজ বপন করেছিলেন? না না, আমি আর সে সব কথা বলব না, তবে এইটুকু আপনাকেও বলি—নিজে ভারতীয়—বাঙ্গালী হয়ে—ভারতীয়ের মুখে বাঙ্গালীর মুখে এমন ভাবে চুণকালি লেপে দেবেন না।"

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আমি তোমার উদ্দেশ্য বেশ বুঝেছি সুশীল; কিন্তু বুঝলেও আমি এখন তোমায় কিছু বলব না, শেষ পর্য্যন্ত আমি দেখতে চাই। তুমি এ দেশের লোকদের যোগ্যতা পরীক্ষার স্থান নির্দ্দেশ করেছ আমার অফিস, কিন্তু সেটা সে ছেলেখেলার জায়গা নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা ওর পেছন ঢালা হয়েছে—হচ্ছে সে কথা মনে রেখো। অবশ্য আমি এ কথা বলিনে যে আমার অফিস কেবলমাত্র ইউরোপীয়ানদের দ্বারাই চলবে, এ দেশের লোকও থাকবে বই কি, না থাকলে চলবে কেন? তুমি বলছো—এদেশের লোকদের মাথাতেও বুদ্ধি আছে,—তা যদি বল—তবে আমিও বলি—গরুরও তো বুদ্ধি আছে, তবে সে কেন বোঝা বয়, কেন গাড়ী টানে? এ দেশের লোকেরা গরুর মত শুধু বোঝা বইতে জানে, আর কিছু জানে না। এরা কি নিজের জাতিকে জগতে শ্রেষ্ঠ করে তুলবার জন্যে হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন করতে পারে?"

সুশীলের চক্ষু দুইটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, আর্দ্র কণ্ঠে সে বলিল, "হ্যাঁ পারে। ভারতীয় কতখানি ত্যাগ করতে পারে, কেমনভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে—অতখানি ত্যাগ করতে আর কোন জাতি কখনও পারবে না, অমন ভাবে মরণকে আলিঙ্গন করতেও আর কেউ পারবে না!"

মিঃ রায় মৃদু হাসিলেন, তাঁহার সে হাসিতে স্পষ্ট ভাবে অবজ্ঞাই ফুটিয়া উঠিল, সুশীলের চক্ষুতে তাহা এড়াইল না, কিন্তু সে নাকি অত্যন্ত আহত হইয়াছিল বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

মিঃ রায় বলিলেন, "ধরলুম ভারতবাসী মরতে পারে অসাধ্য সাধনও করতে পারে। হ্যাঁ, মরতে যে পারে এ কথায় অস্বীকার করব না—করতে পারব না। বাঁচার সহস্র উপায়ে থাকতেও এরা কেমন সহজে অদৃষ্টের পর নির্ভর করে বসে থাকে, খেতে পেলে বলে—অদৃষ্ট জুটিয়েছে না খেতে পেলে বলবে—অদৃষ্ট জুটায় নি, কাজেই খাওয়া হল না।"

সুশীল একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান জগতে যে না শ্রেষ্ঠ জাতি আছে তারা কোনদিনই অদৃষ্ট মানে না, পুরুষকারটাই মেনে চলে।

তাই যদি হল, নেপোলিয়ান কেন অদৃষ্ট মানতেন, তিনি কেন—"

বাধা দিয়া হাসিয়া উঠিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "ওই তো, নেপোলিয়ান অদৃষ্টকেই মূলাধার বলে খুসি থাকার জন্যেই না তাঁকে শেষকালটায় সেণ্ট-হেলেনায় থাকতে হয়েছিল। অত বড় একজন মহান সম্রাটের শেষ জীবনের পরিণামটাও যে তোমার কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে তা তো নয়। আসল কথা বোঝ সুশীল—অদৃষ্টের পর নির্ভর করে বসে থাকে কাপুরুষে পুরুষে নয়। আমাদের এই ভারতবর্ষ অদৃষ্টবাদী, তাই না যুগে যুগে যে কোন জাতি এসেছে, অবাধে প্রভুত্ব করে গেছে, নির্জ্জীব ভারতবাসী কপালে হাত দিয়ে শুধু বলেছে—অদৃষ্ট। তারা নির্য্যাতন সয়েছে, পরের প্রভুত্ব সয়ে গেছে, তবু তারা নিজেদের পদে নির্ভর করে দাঁড়ায় নি। তুমি ভারতীয়দের যে ত্যাগ যে মরণের কথা উল্লেখ করছ সুশীল তা তারা স্বেচ্ছায় করে নি, দায়ে পড়ে করতে বাধ্য হয়, কাজেই ও কথাটা যেখানে-সেখানে আর বলো না, ওতে তোমায় উপহাসাস্পদই হতে হবে মাত্র।"

সুশীলের সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল সে মুখ নত করিল।

মিঃ রায় কোমল সুরে বলিলেন, "জানি, আমার মুখ হতে হয় তো এমন অনেক শক্ত কথা বার হয়েছে যাতে তোমার মনে আঘাত লেগেছে কিন্তু এখন ওসব কথা ছেড়ে দাও সুশীল, আমরা নিজের কথায় আবার আসি। আমার অফিসের কথা হচ্ছিল, সেই কথাই হোক। আমার অফিসে সকলেই ভারতীয় থাকতে পারে না, কয়েকজন উপযুক্ত শিক্ষিত ইউরোপীয়ান থাকবে আর জন কতক উচ্চপদস্থ ভারতীয়কে বিদায় দিতে হবে।"

"আমাকেও তো তা হলে বিদায় নিতে হবে, আপনি আমাকেও তো নামিয়ে দিতে চান ?"

তাহার বিকৃত কণ্ঠে চমকাইয়া উঠিয়া ইন্দিরা কাগজ হইতে মুখ তুলিল!

মিঃ রায় বলিলেন, "আরে না না, তাও কি হয় সুশীল ? তুমি যেমন আফিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে আছ তেমনিই থাকবে, তোমার অধীনে আর সব থাকবে—এটা কি তোমার পদমর্য্যাদা নয়।

সুশীল উত্তর দিল না।

মিঃ রায় তাহার শুধু মুখখানার পানে তাকাইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি এতে এত ভাবছ কেন বল দেখি ? একটু ভেবে দেখ -আমি যা ব্যবস্থা করছি এতে অফিসের উন্নতি হবে কিনা। এই কয়টা বছর দেশে দেশে ফিরেছি, দুনিয়ার সকল জাতের সঙ্গে মিশেছি, সকলকে পরীক্ষা করে ব্যবসাকাজে কে উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত ঠিক করেছি। আমার সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ হবে তা তো তুমি একমাস পরীক্ষা করে নিজেই জানতে পারবে সুশীল।"

সুশীল উন্মনা ভাবে বলিল, "আপনি তা'হলে অফিসে এ ব্যবস্থা জানিয়ে দেবেন, আমার বলার চেয়ে আপনার বলা ভাল বলে মনে করি।

মিঃ রায় হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওহে ইয়ং ম্যান রক্ত অত গরম হতে দিয়ো না, ঠাণ্ডা হয়ে কথাগুলো আগে শোন। অমি অফিস হতে কাউকেই দূর করব না, অফিসটাকে আর একটু বাড়াব, আর কয়েকটা বড় বড় পোষ্ট তৈরী করে তাতেই ইউরোপীয়দের রাখব। অবশ্য তারা সকলের পরেই হুকুম চালাবে, তাই বলে কি তোমার পরে হুকুম চালাবে তাই মনে করেছ ? জীবনের একটা শুভকাজের প্রারম্ভে সামান্য একটা কাজের অছিলায় লোকের অভিশাপ কুড়াতে আমি তোমাদের কাউকেই দেব না।

সস্নেহ দৃষ্টি একবার কন্যা ও সুশীলের উপর দিয়া তিনি বুলাইয়া লইলেন।

"ম্যানেজার লোকটীকে অন্য কাজে বাহাল করতে হবে, আর বাপু, ওই টাইপিষ্ট মেয়েটাকে বিদায় করে দিতে হবে, ওকে আমার অফিসে রাখা চলবে ন।"

সুশীল বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ রায়ের মুখের পানে তাকাইল, তাহার মুখখানা যে মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ইন্দিরার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

সুশীল মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইল। শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বিনা অপরাধে তো তাকে ছাড়ানো চলবে না, তার একটা কোন দোষ তো বার করতে হবে।'

একটা মোটা সিগার ধরাইতে ধরাইতে মিঃ রায় বলিলেন, "সে আমি দেখে নিয়েছি। খাতাপত্রে দেখেছি সে কাজে জয়েন করা হতে এ পর্য্যন্ত অনেকদিনই অ্যাবসেন্ট থেকে গেছে। যদিও তুমি অন্য লোক দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছ, আমার অফিসের কোনও ক্ষতি হয় নি, তবু আমি জানতে চাই—কেন এ রকম হবে? এটা বড় কম অফেন্স নয়, আর এর জন্যেই যে তাকে কর্ম্মচ্যুত করা যায় তা তুমি জানো নিশ্চয়ই।"

সুশীল নত মুখে একখানা কাগজের পানে চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল না।

মিঃ রায় নরমস্বরে বলিলেন, "একটা কথা কি ানো আমি এই নেটিভ খৃশ্চানগুলোকে ঘৃণা করি। ই সব অল্পবয়স্কা খৃশ্চান মেয়ে, ওদের কখনও িশ্বাস করতে আছে, ওরা না পারে এমন কাজই াই। ভেবে দেখ, খৃশ্চান হয় কারা যারা লো-কাষ্ট, ারাই খৃশ্চান হয়, হিন্দুধর্ম্মে বৈষ্ণব হয়। বৈষ্ণবদের ু পথ আছে, ওরা নিজের ধর্ম্মেই থাকে, কিন্তু াটিভ খৃশ্চানদের সে পথও নেই। যারা এক ায়ে নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে তারা না াতে পারে কি? ধর্ম্মটা কি নেহাৎ ছেলেখেলার িনিস, গায়ের কাপড় যে যখন খুসি বদলানো যাবে? েই বুঝে দেখ এই সব নেটিভ খৃশ্চানদের এ কুলও ই ও কূলও নেই; হিন্দুরাও ওদের বিশ্বাস করে , সাহেবেরাও ওদের বিশ্বাস করে না। ওই সব ।-কাষ্ট খৃশ্চান—"

বাধা দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সুশীল বলিল, "মানুষকে ষ হিসাবেই ধরা উচিত, জাতি হিসাবে ধরতে েল অনেক সময় চলে না। আজ আপনি যেমন ানকে ঘৃণা করছেন, খৃশ্চানও কি আপনাকে মনই ঘৃণা করছে না? প্রত্যেক জাতিই প্রত্যেক তকে নিজের চেয়ে হীন চোখে দেখে এটা তো ার করতে পারবেন। আপনি বলছেন, কেউ নিজের ত্যাগ করে পরের ধর্ম্ম নিয়েছে, অতএব তাকে দিনই বিশ্বাস করতে নেই। কথাটা যে খুবই দামী তা আমি জানি, কারণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ যে করতে পারে সে যে সবই করতে পারে লোকে সেই কথাটাই ধরে রেখে দেয় কিন্তু যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলে তারও যে একটা দিক আছে সেটা কি কেউ কোনদিন দেখে? হয় তো কোনও কারণে বড় মনোকষ্ট পেয়ে কেউ ধর্ম্মত্যাগ করেছে, কেউ বা বিশ্বাস হারিয়ে করে, কিন্তু সকলেই যে খেয়ালের বশে ধর্ম্মত্যাগ করে এ কথায় মনে ভাবাই অন্যায়। সে যাই হোক—যে যাই করুক, আমাদের তাতে কতটুকু যায় আসে? আমরা কেবল একটা দিক দেখব সে ধর্ম্মত্যাগী, আর কোন দিক দেখব না? তার শক্তি সাহস, তার দৃঢ়তা, তার স্বদেশ প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি ইত্যাদি সুকোমলবৃত্তি যে আছে তা কিছুই দেখব না, দেখব একমাত্র দোষ তার ধর্ম্মত্যাগ, না, এতখানি সঙ্কীর্ণতা হয় তো মনের মধ্যে জাগাতে পারব না, আমায় মাপ করবেন।"

মিঃ রায় একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ধরলুম, মিস দাস না হয় কোন সম্ভ্রান্ত ঘর হতেই এসেছে, তবুও আমি তাকে এখানে কাজে রাখা অনেক কারণে ভাল বলে মনে করি নে। টাইপিষ্টের জন্যে ভাবনা নেই, আজ যদি কাগজে জানাই, কালই দেখতে পাবে—টাইপিষ্টে আমার অফিস ভরে গেছে।"

ইরা যে কতখানি কষ্টে ও অভাবের মধ্যে পড়িয়া কাজ করিতে আসিয়াছে তাহা জানে একমাত্র সুশীল, আর কেহই না। এই কাজটীর উপর তাহাদের মা ও মেয়ের জীবন নির্ভর করে। আজ এ কাজ গেলে কাল তাহাদের কি অবস্থা হইবে তাহা সুশীল জানে বলিয়াই সে ইহার পক্ষ লইয়া একটা কথাও বলিল না। সে বুঝিতেছিল কোথায় ইহারা গলদ দেখিয়াছেন, কেন তাঁহারা ইরাকে তাড়াইতে চান।

খানিক চুপ-চাপ বসিয়া থাকিয়া সে উঠিয়া পড়িল, ভাল কথা মিস্ দাসকেও "আপনি জানিয়ে দেবেন।"

মিঃ রায়ও উঠিলেন, "তুমি যদি না বল তবে আমাকেই অগত্যা জানাতে হবে।"

সুশীল একটা শুষ্ক অভিবাদন দিয়া চলিয়া গেল, আর পিছন পানে ফিরিয়াও চাহিল না।

স্রোতের মুখে

ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী এম-এ-ডিলিট

গল্প

পোষ্ট কার্ডে লেখা সামান্য কয়েকটি ছত্র! তাতেই সঞ্চুর মন খুসীতে ভরে উঠে।

একবার—দুবার—তিনবার—প্রতিবারেই যেন কেমন নতুন লাগে। নীল জামাটার বুক পকেটে রেখে দেয়, টেনে বের করে! পড়ে আবার সস্নেহে পকেটে পূরে বোতামটা আস্তে আস্তে এঁটে দেয়।

হাতের লেখাটা কার? রামলালের? তা হোক, কথাগুলো ত দুলারীর;

সঞ্চুর চোখ মুখের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলে যায়!

তিন, তিনটে বছর! বাপরে! মন্থরতায় তিনটী যুগও যেন পেছিয়ে পড়েছে!

সঞ্চু ভাবে।

তের বছরের একটী কিশোরী, বালিকা বললেই হয়! চঞ্চলা হরিণীর মত ঘাটে, মাঠে, ছুটোছুটি করে বেড়ায়। পাকা ডালিমের রংএর শাড়ীখানা বাবলা গাছের ফাঁক দিয়েও বেশ দেখা যায়। তোড়ার "ঝুমুর ঝুমুর" আওয়াজ পাখীর ডাক ছাপিয়ে এসেও কাণে মিষ্টি লাগে। গম তুলতে মন আর বসে না। নানা ছুতো-নাতা করে বাড়ীর দিকে আসতে চায়। বুড়ো বাপ আপন মনে বকে "বহুটা এসেই ছেলিয়াটাকে মাটী করে দিলে।"

গেট্‌ম্যান্ রাম কিষাণের বৌ চেরা সিঁথির মাঝে টকটকে সিন্দুরের তিলক এঁকে, পায়ের পাজোর আর কাঁকণের রিনি-ঝিনি শব্দ করতে করতে ভাজনের ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরে। সোনালী রোদের আভা এসে তার মুখের উপর পড়ে। সঞ্চু অপলকে চেয়ে থাকে—বুভুক্ষুর ক্ষুধা ভরা দৃষ্টি সে নয়—তার চোখে মাখান থাকে এক মায়ালোকের বিভোরতা।

দুলারী। এতদিনে সেও এত বড়টী হয়েছে। তার নাকের পাশে সেই ছোট তিলটী ঠিক্ তেমনিই আছে কি? ঘাড় নাড়লে ছোট নথটীও নড়ে উঠে?

স্বপ্নের জাল বোনাই চলে—শেষ তার হয় কই? দুলারীর চিঠি!

সঞ্চুকে সে দেখতে চায়! অনেক দিন দেখিনি।

তাজব ব্যাপার! কাছে থেকেও যে ছিল দূরে দূরে-- দূর থেকে সে কাছে টানতে চায়!

সঞ্চু ভাবে। খেই হারিয়ে যায়।

কুয়াশায় ঢাকা মাঘের আকাশে এত নীলের ছড়াছড়ি এত দিন ছিল কোথায়। বউলের কুঁড়ির কাঁচা গন্ধটুকু বেশ মিঠে লাগে! রোদের মাঝে এতখানি দরদ মাখিয়ে রাখলে কে?

কঠিন মাটী। মন এসে যেন ঠিক্‌রে পড়ে।

ঠিকাদারের এখন অনেক কাজ। ছুটি হয়ত মিলবে না। তিন, তিনটী বছর! শ্বাসের জোরে বুকখানা ফুলে ফুলে উঠে। বাল-বিধবার অস্ফুট আর্ত্তনাদ যেন বুকের মাঝে গুমরে বেড়ায়।

মাড়োয়ারী ঠিকাদার। রাজপুতনার মরুভূমির মত বুকখানাতেও কোন রসের সন্ধান মিলে না। বোঝে শুধু লাভ লোকসানের খতিয়ান—চায় কেবল কাজ। ছুটি চাইতে গেলে—ভীষণ চটে যায়।

সঞ্চু কিছু ঠিক করতে পারে না।

ভাবে পাঁচটী টাকা এখন পাঠিয়ে দি। পাটের আমদানীটা একটু মন্দা পড়লেই ছুটী চাওয়া যাবে।

রেললাইনের ধারে সারি সারি ছোট গুমটী—কুলি লাইন।

খাটিয়ার পাশে ইটের পর ইট সাজিয়ে তার পর রাখা আছে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। তুলসী থেকে

চাবি কাঠি নিয়ে খুট্ করে খোলে একটা চার পয়সা দামের মিলারের তালা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এক কোণ থেকে বেরোয় একখানা চকচকে নতুন পাঁচ টাকার নোট্।

দশবছর আগেকার পুরাণো ছেয়ে রংয়ের রেলের খাতা খুলে একখানা মণি অর্ডারের ফারম হাতে নেয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকখানাকে আবার তোলপাড় করে তোলে।

বাইরে আসতেই গায়ে লাগে দুই একফোঁটা টিপ্‌টিপে বৃষ্টি। আকাশের দিকে চায়! এরই মধ্যে রংএর বদল হয়ে গেছে। ঘোলাটে মেঘে সমস্ত আকাশখানাকে কে লেপে দিয়েছে। ছাতা নেওয়ার আবশ্যক আর হয় না। কম্বলখানাকে টেনে গায় দিয়ে সামনে এগিয়ে চলে।

*

মালঘর। এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ঠাসা কত কি—পাটের গাঁট্, তিসির বস্তা, করগেট শীট্ আরও অনেক সব।

দোরের এক পাশে খানদুই ভাঙ্গা চেয়ার ও একটা নড়বড়ে টেবিল। টালি ক্লার্কের আফিস।

অশ্বিনী একটা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উদাস ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। সামনের খাতা খোলা আছে—কলমটায়ও রয়েছে কালিমাখানো। মেঘলা আকাশের ছায়া বুকে এঁকে পদ্মা চঞ্চল হয়ে উঠিছে। কলকল ছল ছলের বিরাম নাই।

থেকে থেকে খুলনা জেলার একটা দূর পল্লীর স্মৃতি মনের মধ্যে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে—পাটের হিসাব রাখবার দিন আজ নয়।

ফারম হাতে সঞ্জু এসে দাঁড়ায়। অশ্বিনী চুরুটে জোরে টান দেয়, হাসে।

"কি রে বহুকে 'রূপেয়া' ভেজ দিবি নাকি।"

সঞ্জুর মুখেও হাসি ফুটে ওঠে—বড় কোমল ও করুণ।

ঠিকানা লেখা হয়।—

উত্তরে বাতাস একটু জোরে বইছে। বৃষ্টি একটু জোরে পড়ছে। ফরমখানিকে ভাঁজ করে সঞ্জু বুক পকেটে সেই চিঠিটার পাশেই রাখে—মনটা হাল্কা লাগে। তাতে লেখা আছে দু'লারীর নাম।

শীতের দিন। তার উপর আবার বাদলা। বেলা থাকতেই অন্ধকারের আঁচল এসে পৃথিবীর মুখ ঢেকে দেয়।

ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে ওঠে। ফেরী ষ্টীমারের বিজলি বাতি পদ্মার জলে সোনার তাল গাছের সৃষ্টি করে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তাকে ভেঙে চুরে চুরমার করে দেয়।

ষ্টেশনের বাতি ঝিক্ মিক্ করছে। এখনি ক'লকাতার ট্রেণ এসে পড়বে! গেলে দু'পয়সা রোজগার হত।

খাটিয়ার উপর সঞ্জু উঠে বসে। হাই তোলে, তুড়ি দেয়, কম্বলখানাকে সরিয়ে রাখে।

আলো জ্বালার কথা আজ আর মনে হয়নি। আঁধারের মাঝেই দু'লারীর ছবি বেশ লাগে।

ঘাট লাইনের পাশ দিয়ে জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ করতে করতে কে আসে। আরও কাছে মিঠে মিঠে কাঁকণের আওয়াজ কানে আসে।

রাম কিষাণের বৌ একটা বাছুর কোলে করে চলেছে। ভিজে যাচ্ছে সে দিকে খেয়াল নেই। আপন মনে গুণ্ গুণ্ করে কি গাইতে গাইতে চলেছে। খয়ের রংএর শাড়ীখানা জলে ভিজে ভাজে ভাজে গায়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে।

ভোঁস ভোঁস্ শব্দ কাছে শোনা যায়। ট্রেণ এসে প্লাটফরমে দাঁড়ায়।—

সঞ্জুর তাড়া নেই। আবার কম্বলটাকে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে। বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখে। সেখানে আছে দু'লারীর চিঠি আর তাকে টাকা পাঠানর ফরম।

আবার পায়ের শব্দ শোনা যায়।—রাম কিষাণের বৌ কি? দামাল বাছুরটা আবার পালানো না কি?

সঞ্জু উঠে বসে।

দোরের গোড়ায় দেখা দেয় মাড়োয়ারী ঠিকাদারের বিশাল বপু। জলের ছাটে পাগড়ীটা প্রায় ভিজে গেছে। বর্ষাতির গা বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়াচ্ছে।

সঞ্জু ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

ভারী গলায় হেঁকে ঠিকাদার বলে, "সঞ্জু, কাল বেলা ১০ টার আগেই ১২নং বোটখানাকে মহেশতলার ঘাটে

পৌছে দিয়ে আসা চাই-ই—তিসির বস্তা জলে ভিজছে—বুঝলি!"

সঙ্কু বোঝে, কিন্তু বুঝানর আগেই ঠিকদার বেরিয়ে পড়ে—কত কাজ তার! জলের মাঝেও রেহাই আছে কি?

সামনে ওই পদ্মা, মেঘ আর বাতাস দুই সঙ্গীকে পেয়ে আনন্দ আর চেপে রাখতে পারছে না! দশ হাত উঁচু পাড়কেও এই শুভ-সংবাদ জানাবার জন্য নিজের কোলে টেনে নিতে চায়।

সঙ্কু আকাশের দিকে যায়! কে বলে মাঘ মাস! ভাদ্র ফিরে এসেছে বুঝি!

পারাপারের ফেরী আবার ফিরে এসেছে। ঝড়-বাদল এখনও থামে নি। কখন থামবে কেই-বা জানে!

সঙ্কু ভাবে, যেতেই ত হবে। রাতারাতিই বেরিয়ে পড়ি। সাত আটটার মধ্যে পৌছান যাবে।

বাতাসটাও পিছেন' আছে। হাল ধরে বসে থাকলেই চলবে।

দু'লারীর নামে টাকাটা না হয় মহেশতলার ডাক-ঘর থেকেই পাঠান যাবে।

নীলজামাটার নীচে একটা কালো কোর্ত্তা পরে। খাকী রঙের বর্ষাতিটা তার উপর চড়ায়। বুক পকেটে আছে সেই চিঠিখানা, টাকা পাঠানর ফারম আর সেই ঝক্‌ঝকে নোটখানা।

পদ্মার চরের বাবলা গাছে কাক-শালিক ডেকে ওঠে। পূব আকাশে সিন্দুরের আভা দেখা দেয়। বাতাসের বেগ কিন্তু বেড়ে ওঠে।—

এবার আর পিছনে নয়, উজান দিকে। সঙ্কুর হাতের হাল ঘুরপাক খায়। সে জোরে চেপে ধরে। নৌকার মুখ তবু ঠিক থাকতে চায় না।

উত্তরে হাওয়ায় হাড়ের মাঝে কাঁপুনি লাগে। বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষাতি ভেদ করে গায়ে ছাট মারে। চোখে মুখে সূচ বিঁধিয়ে দেয়।

পদ্মার জলে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। বড় বড় ঢেউএর উপর বোটখানা আছাড় খেয়ে পড়ে।

চারদিকে সঙ্কু দৃষ্টি হানে। একটা জেলে ডিঙিও চোখে পড়ে না। খাল, নালাও কোথাও কাছে নেই। এ বোধ করি সেই চটকাতলার ঘাট।

বোটের এক পাশে একটু ছোট ছৈ। হাল ছেড়ে সঙ্কু গিয়ে তার মাঝে সেঁদোয়। কাণ্ডারীহীন নৌকা ঢেউএর তালে তালে ছুটে চলে। প্রলয় নাচন তার সুরু হয়ে গেছে।

ঝড়ের ঝাপ্টায় ছৈও আর টেঁকে না। নির্ম্মম হস্তে ঝটিকা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। পদ্মার বুকের উপরকার আকাশটুকুতে দুর্দ্দান্ত ছেলে ঘুড়ি উড়িয়ে খেলা করে।

সঙ্কু গিয়ে লুকোয় বোটের মাল বোঝাই করবার খোলের ভিতর। ঝলকে ঝলকে মাথার উপর দিয়ে জল গড়িয়ে চলে। চেতনা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। বুক পকেটটাকে তবু মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে ধরে। দেহের সমস্ত শক্তি সেই মুঠোটার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে আছে দুলারির চিঠি!

* * * *

দুপুরের পর ঝড় জল থেমে গেছে। মাতামাতির পর পদ্মা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে! তখনও কিন্তু তার বুকের উপর সন্ধান চলছে মানুষের হারাণো ধনের।

ঠিকাদারের লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে দেখে ১২নং বোটখানা এক চড়ার পাশে কাত্‌ হয়ে আটকে পড়ে আছে।

দু'চার জন গিয়ে তখনই লাফিয়ে নৌকার উপর উঠে। নৌকার খোল জলে একেবারে ভর্ত্তি। বর্ষাতি ভাসতে দেখে হিড় হিড় করে টেনে তুলে।

যাকে দেখতে পায় সে সঙ্কু।

পাথরের চেয়েও শক্ত ও ঠাণ্ডা তার সমস্ত দেহ। বুক পকেটটা মুঠোর মধ্যে তখনও ধরা রয়েছে।

অস্তবেলার এক ঝলক সোণালী রংএর আভা এসে পড়ে তার জলে-ভেজা মৃত্যু-শীতল মুখখানার উপর!

কুলী

মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা

গল্প

হাবড়া ষ্টেসনের অনতিদূরে নদী সৈকতে বসিয়া একজন কুলী একজন ভদ্র যুবককে বলিতেছিল, "বাবু, বল্‌বো কি আমার দুঃখের কথা অকালে মা মারা গেল, নানীতে কত দুঃখে কষ্টে মানুষ কর্‌লো। মা-হারা ছেলে বলে অন্যায় করলেও কখনো মার-টার কোর্‌তো না। বড় হলে বাপ স্কুলে দিল, কিন্তু জন্মাবধি যে পড়া শুনার মর্ম্ম শোনেনি ও আলোচনা কোর্‌তে কাউকে দেখেনি তার সহজে পড়া শুনায় মন বস্‌বে কেন? তাতে শাসনহীন আব্দারে ছেলে ছিলাম পড়াশুনায় মন বস্‌তে চাইত না এ জন্য অনেক সময় মাষ্টারের হাতে বেত খেতাম, তাতে আমার মন স্কুলের উপর আরোও বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো। মাষ্টারের মারের কোন হিসাব ছিল না, নানীর তা সহ্য হল না। তিনি স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বাবা তাতে খুবই চটে ছিলেন কিন্তু নানীর জিদই বজায় রইল। বাবারও হয়ত ছেলের পিঠের মারের দাগগুলি মনে বসেছিল—তিনিও ত লেখা পড়া করেন নি, তত গরজ রইল না। আমিও বনের পথে বাঁশি বাজিয়ে মার্ব্বেল খেলে দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু বাবা যেন লেখা-পড়ার মর্ম্ম বুঝেছিলেন তাই বছর তিন পরে নানী মারা গেলে আবার আমায় ভর্ত্তি করে দিলেন আর বুঝিয়ে দিলেন যে আমি যদি ভালো করে লেখা-পড়া করি আমার খুব ভালো হবে। সংসারে বাপ ছাড়া আর কেউ ছিল না তাই বাপের কথামত আবার স্কুলে যেতে লাগ্‌লাম। কিন্তু একবার যার ইয়ার বন্ধু জুটে গেছে, যে বদসঙ্গীর স্বাদ পেয়েছে তার আর লেখা-পড়ায় মন বস্‌বে কেন? আর বদসঙ্গীরাই বা তাকে লেখা-পড়া কোর্‌তে দেবে কেন? আড্ডা দেওয়ার লোভ যে ছেলে পেয়ে গেছে সে কি আর সামলাতে পারে, অন্ততঃ যার ভালো-মন্দের জ্ঞান পরিপক্ক হয়নি সে পারে না। আমি ছুটি পরই তাদের সঙ্গে মিশতাম আর ঘুড়ি উড়িয়ে মার্ব্বে খেলে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরতাম, কিন্তু লেখা-পড় করতাম বলে বাবা কিছু বল্‌তেন না। আমি বাধহী অবস্থায় মিশ্‌বার সুযোগে তাদের কৃপায় ক্রমে সিগারে তার পর আফিং ধরলাম। তাদের সঙ্গে ঘোরার ফ বেশ্যালয়ের অনেক চিত্রই আমার চক্ষে পড়্‌ত আ অবসর কালে সেই সব কল্পনা আমার খেলত। এমনি করে বছর দুই তিন যেতেই আমি কিশোর হ উঠ্‌লাম।

গানের নেশা আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল। অনেক সময় বেশ্যালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের গান-বাজনা শুনতাম। শেষে একদিন দেখলাম সেখানে আমার একজন বন্ধুকে, সে দেখ্‌তে পেয়েই আমাকে বল্‌লো এতে কিছু দোষ নেই। মন্দ ছেলেরা বাবু ভালো ছেলেকেও মন্দ করে, মন্দ বুঝে করে না তারা মনে করে এমন স্ফুর্ত্তি এমন সুখ, এ কী মন্দ? এর চাইতে আবার কি সুখ আছে? স্ত্রীলোকের স্নেহ-যত্ন অনেক দিনই হারিয়ে ছিলাম তারা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্‌লে সে কী বল্‌বো? তাদের আদর আপ্যায়ন ভারী ভালো লাগ্‌লো। এমনি করে তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চল্‌লো। বল্‌বো কি বাবু। তারা যেন হতে করে লোককে মন্দ করে। নইলে তাদের রোজগার হবে কি করে? তাদের উদ্দেশ্যই টাকা রোজগার করা। তাদের কৃপায় লোকের যে সব গুণ ধরে আমারও তা ধর্‌লো, আমিও মদ ধরলাম—সঙ্গে সঙ্গে আমার ফাঁকি দেওয়ার বুদ্ধিও বেড়ে চল্‌লো। এমন করে চলতাম যে আমার এ সব গুণ বাবা একদিনও টের পেতেন না। আমি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য একদিনও লেখা-পড়ার কামাই করতাম

না। প্রথম প্রথম ও বেশী মদ খেতাম না কাজেই কেউ জানতে পেল না, আর ছেলে কি কোর্‌ছে না কোর্‌ছে বাবাও তার খোঁজ রাখার দরকার মনে কোর্‌তেন না।

যাক্ এমনি করে কিছুদিন গেল, কিন্তু ওসব পথে যারা পা দিয়েচে তারা সীমা রাখ্‌তে পারে না তার নেশা জিনিস বেড়েই চলে, তাই একদিন যখন ঘোর মাতাল হয়ে বাড়ী এলাম প্রথমে বাবা হতভম্ভ হয়ে গেলেন। পরেই তাঁর শাসন যেন গর্জ্জন করে উঠ্‌লো। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মার গাল খেলাম। মুখ ফুটে বল্‌তে ইচ্ছা হল, এতদিন কি ঘুমিয়েছিলে? কিন্তু প্রথম অপরাধীর মুখে কথা ফুট্‌লো না। তিনি আমায় ঘাড় ধরে বাড়ীর বার করে দিলেন তারপর আর হুঁস ছিল না।

ভোরে উঠে দেখি পায়খানার ধারে ড্রেণের ভিতরে পড়ে আছি। নিজের অবস্থা দেখে মনটা বড় ভেঙ্গে গেল। অসীম স্নেহময় পিতার কাছে ফিরে যেতে আর ইচ্ছা হল না। বরঞ্চ তা'কে শাস্তি দেবার জন্য জিদ্ করে গায়ের কোট বিক্রি করে কল্‌কাতা চলে এলাম। বাবু ওই বয়সে অত শাসন সহ্য হয় না—ভাবনা চিন্তাও আসে না। তাই কুলীগিরির পয়সাতেও ফুর্ত্তির সঙ্গেই দিন কাটিয়ে এসেছি, কিন্তু আজ আর ভালো লাগে না, ভদ্রঘরে জন্মে জীবনটাকে কোর্‌লেম কি? এ জীবনের সার্থকতা কোথায়?

যুবক বিস্মিত ব্যথিত চক্ষে চাহিয়া বলিলেন "তুমি ভদ্র লোকের ছেলে?"

কুলী সজল চক্ষে কহিল "হাঁ বাবু ভদ্র লোকের ছেলে" কুলী চুপ করিল, তাহার অন্তর্বেদনায় কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। যুবক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—একটী ভদ্র সন্তান তাহার এই পরিণাম? ক্ষণকাল পরে কহিলেন "আজও তুমি মদ খাও?"

কুলী উত্তেজিত হইয়া কহিল "হাঁ বাবু খাই, পেট ভরে খেতে পাই না যে পয়সাটী পাই তা দিয়ে মদ খাই এমনি করেই আমার জীবন শেষ হয়ে আস্‌ছে ও যে সর্ব্বনাশের নেশা।

যুবক করুণ কণ্ঠে কহিল "কিন্তু আজ যদি আবার ভদ্র ভাবে থাকার সুযোগ পাও ও সব ছাড়্‌তে পার তুমি!"

কুলি উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল "হাঁ বাবু হাঁ! আজ যদি আবার মানুষ হবার সুযোগ পাই তবে প্রাণপণ করে মানুষ হই, এই প্রাণহীন আনন্দ যে বিষ এ বিষ পান করার হাত থেকে অব্যাহতি পেলে আমি বাঁচি।"

যুবক গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন "চল তবে আমার সঙ্গে তোমাকে মানুষ হবার সব সুযোগ দেবো—তারপর যা হয় উপার্জ্জন করে ভদ্র ভাবে চল্‌তে পার্‌বে। কৃতজ্ঞতায় কুলী নির্ব্বাক হইয়া গেল কিছুক্ষণ পরে সহসা চেতনা লাভ করিয়া দুইহাতে যুবকের পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইল—"বাবু বাবু মানুষ—আপনিই মানুষ। যুবক সসব্যস্তে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার রক্ত-কিরণ তখন মিলাইয়া আসিতেছিল কিছুক্ষণ পরে লোকেরা বিস্মিত হইয়া দেখিল হাওড়া ষ্টেসনের চির পরিচিত কুলী একজন যুবকের সহিত ট্রেণে চলিয়া গেল।

ইহারই কিছুকাল পর, একজন লেখকের জীবনী সমালোচনায় লোকে বিস্মিত হইয়া জানিল—এ সেই হাওড়ার কুলী।

নানাকথা

নিখিল-বঙ্গ জাতীয়তাবাদী মুস্‌লিম সম্মেলন

সভাপতি ডাঃ আন্সারীর অভিভাষণ

নিখিলবঙ্গ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি ডাক্তার আন্সারী নিম্নলিখিত অভিভাষণ প্রদান করেন :—

"ভদ্র মহোদয়গণ,

অদ্যকার সভায় যে সমস্ত গুরুতর বিষয় আলোচিত হইবে ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনে তাহার বিশেষ প্রভাব পড়িবে। আপনারা আমাকে এই সভার সভাপতিত্ব করিতে আমন্ত্রিত করায় আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গত বৎসর হইতে ভারতবর্ষের লোকেরা বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের লোকেরা যেরূপ বীরত্ব সহকারে সংগ্রাম করিতেছে, তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করার আবশ্যকতা নাই। আপনারা সকলেই তাহা জানেন এবং যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সেই সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে শত্রু-মিত্র সকলেই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে এবং বিদেশীর কবল হইতে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার চেষ্টায় ইতিহাসে এক নবীন অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

আমাদের স্বধর্ম্মীরা এই সংগ্রামে তাহাদের অতীত শৌর্য্যের তুলনায় যথোচিত অংশ গ্রহণ করে নাই বটে তথাপি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব এবং স্বার্থপর লোকের বিপরীত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের স্বধর্ম্মীরা এই সংগ্রামে যে, অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা একেবারে নগণ্য নহে। সীমান্তের মুসলমানেরা এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে।

জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দল এবং সর্ব্বদল সম্মিলন দলের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি এই তথাকথিত সর্ব্বদলের অসারতা এবং জাতীয় দলের শক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ভারতবর্ষে মুস্লিম জাতীয়দলের মত প্রতিনিধিমূলক মুস্লিমদল আর একটিও নাই। সর্ব্বদলে যে কাহারা আছেন তা বলা শক্ত। অল-ইণ্ডিয়া মুস্লিমলীগ এবং সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটিকে বাদ দিলে আপনারা দেখিবেন যে, আর কোন দলই এই সর্ব্বদলের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুস্লিমলীগের প্রকৃত অস্তিত্ব বহুদিনই লোপ পাইয়াছে। উহার অস্তিত্ব কেবল কাগজে কলমে। এলাহাবাদে গতবার যে শেষ সভা হইয়াছিল তাহাতে সভা হইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় ১৫ জন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন না। যে সেনট্রাল খিলাফৎ কমিটি একদিন খুব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল আজ তাহার ছায়ামাত্র বিদ্যমান। সুতরাং কোনটি মুসলমানদের প্রতিনিধি-মূলক সঙ্ঘ তাহা স্থির করিতে আপনাদের কষ্ট হইবে না।

জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দলের শাখা ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ইহার ৭টি প্রাদেশিক এবং ৭১টি জিলা শাখা আছে। বহু প্রদেশে এবং জিলায় এই দলের সম্মিলনী হইয়াছে। এবং দলে হাজার হাজার সদস্য আছে। লক্ষ্ণৌতে এই দলের যে সর্ব্বভারতীয় সম্মিলনী হইয়াছিল, খিলাফৎ আন্দোলনের পর মুসলমানদের এত বড় সভা হয় নাই। সমগ্র ভারত হইতে সম্মিলনীতে ৬১৯ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন।

গত এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে নিখিলভারত জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা স্বসম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বার্থ বিকাইয়া না দিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃহত্তর মিলনের চেষ্টাই করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌতে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব্বে দিল্লীতে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর প্রস্তাব দিল্লীর প্রস্তাবের অর্দ্ধাংশ মাত্র। আমরা সর্ব্বদলের সহিত আলোচনায় লিপ্ত ছিলাম বলিয়া সকল কথা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ করি নাই। আজ আমি আপনাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি দাখিল করিতেছি। আমাদের মনে হয়, উহাই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপায়। ইহা গণতন্ত্র এবং জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে গণতন্ত্র ও জাতীয়তা সংখ্যা গরিষ্ঠের আক্রমণাত্মক প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য হিন্দু সভার ছদ্মবেশী গণতন্ত্র ও জাতীয়তা নহে। মুস্লিম সর্ব্বদল এবং শিখদের মত জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতাও নহে, যে অন্যান্য সম্প্রদায়কে চরমপত্র দিয়া তাহাদের আত্মসমর্পণ দাবী করা হইতেছে। আমরা যে প্রস্তাব আপনাদের নিকট দাখিল করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা সংখ্যায় অধিক তাহারা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে না এবং লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমাদের প্রস্তাব এই :—

(১) ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি হইবে বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটাধিকার সমন্বিত যৌথ নির্ব্বাচক মণ্ডলী।

(ক) প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার থাকিবে। যে সমস্ত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থেরও কম সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদে তথা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় পরিষদে সংখ্যানুপাতে সদস্য পদ সংরক্ষিত রাখিতে হইবে এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত সদস্য পদের জন্য প্রতিযোগিতার অধিকার দিতে হইবে।

(খ) যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার

এক-চতুর্থাংশেরও কম, সে সমস্ত প্রদেশে তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে সদস্যপদ সংরক্ষিত রাখিতে হইবে ও তাহাদিগকে অতিরিক্ত সদস্যপদের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে দিতে হইবে। কিন্তু যদি অন্য কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যানুপাত অপেক্ষা অধিকতর সদস্যপদ প্রদত্ত হয় তবে মুসলমানদিগকেও সেই সুবিধা দিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে তাহারা যে সুবিধা পাইতেছে, সেই সুবিধা বজায় রাখিতে হইবে।

(গ) যদি প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার না প্রদত্ত হয় অথবা এমন ভাবে ভোটাধিকার প্রসারিত না করা হয় যাহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় জনসংখ্যার অনুপাতে ভোটাধিকার পাইতে পারে তবে যতদিন পর্য্যন্ত বয়স্কের ভোটাধিকার বা এরূপ ভাবে সংখ্যানুপাতিক ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত না যে, সংখ্যাধিক মুসলমানেরা ভোটাধিকারে অপরাপর সম্প্রদায় অপেক্ষা দুর্ব্বল বা সমান না হইয়া পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত পঞ্জাবে এবং বঙ্গদেশে মুসলমানদের জন্য সদস্য সংখ্যা সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষৎদ্বয়ে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা হইবে মোট প্রতিনিধি সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।

(৪) পাব্লিক সার্ভিস কমিশন সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ করিবেন। চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার একটা নিম্নতম যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সেই নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতা এরূপ হওয়া চাই, যে কোন সম্প্রদায়ই যেন যথোচিত সংখ্যক চাকুরী হইতে বঞ্চিত না হয়। নিম্নতম চাকুরীগুলি কোন সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া থাকিতে পারিবে না।

(৫) যুক্ত রাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলে, বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভার সকলদলের সম্মতি ক্রমে একটি নিয়ম করিয়া তদনুসারে মুসলমানদের স্বার্থ প্রকৃষ্ট ভাবে রক্ষা করিতে হইবে।

(৬) সিন্ধু দেশকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে।

(৭) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বেলুচিস্থানে ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

(৮) দেশে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইবে, উদ্ধৃত ক্ষমতা প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে।

(৯ক) রাষ্ট্রব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে যে, কোন লোকেরই সভ্যতা, ভাষা, বর্ণমালা, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও আচার, দেবোত্তর সম্পত্তি এবং বৈষয়িক স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

(খ) রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট বিধান দ্বারা লোকের মূল অধিকার এবং ব্যক্তিগত আইন সুরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় উভয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশের মত না লইয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট কোন মূল অধিকারের পরিবর্ত্তন হইবে না।

আমার মতে সংখ্যা গরিষ্ঠের প্রাধান্য বজায় রাখা যেমন গণতন্ত্রের পক্ষে আবশ্যক, সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ-সংরক্ষণও তদনুরূপ আবশ্যক। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানেরা কদাপি তাহাদের সংখ্যাধিক্যের অধিকার বিসর্জ্জন দিতে পারে না। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মুসলমানেরা এই ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে যে, সংখ্যাধিক হিন্দুরা তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, যে সমস্ত প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কম সে সমস্ত প্রদেশে হিন্দুরাও সেরূপ ব্যবহার পাইবে। এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিলে চাকুরি বা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য পদের জন্য রেষারেষি দূর হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের দিনকানারা একথা ভুলিয়া গিয়া 'ইস্‌লাম ডুবিল' বলিয়া রব তুলিয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠকে মাইনরিটি কমিটিতে স্যার মহম্মদ সফী বাঙলা ও পঞ্জাবের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় পাঞ্জাবে শতকরা ৪৯টি আসন এবং বাংলায় শতকরা ৪৬টি আসন মুসলমানদের জন্য থাকিবে; আর তা ছাড়া বিশেষ নির্ব্বাচক মণ্ডলীতেও সকলের সহিত সমানভাবে নির্ব্বাচন পদপ্রার্থী হইতে পারিবে। ফলে যদিও মুসলমানেরা বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহা হইলেও তাহাদিগকে চিরকালই ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘিষ্ঠই থাকিতে হইবে। বিশেষ নির্ব্বাচক মণ্ডলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পদ পাইলেও বাংলার মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকিয়াই যাইবে। ভদ্র মহোদয়গণ, পঞ্চনদের এই বীর পুঙ্গবের বাংলার প্রতি এইরূপ অহেতুক প্রীতির কি কারণ ঘটিল? বাংলা তাঁহার কি করিয়াছে? যে বাংলায় আপনারা সংখ্যায় অধিক এবং যেখানে আপনাদের অতীতের গৌরবপূর্ণ ইতিহাস রহিয়াছে এবং যাহার ভবিষ্যৎ গঠনে আপনাদের ন্যায্য দাবী রহিয়াছে, তাহার জন্য কিনা এই ব্যবস্থা! ইহার অর্থ এই দাঁড়াইতেছে যে, আপনারা আপনাদের সমস্ত স্বার্থ ও অধিকার বিসর্জ্জন দিয়া "সংখ্যা লঘিষ্ঠে কায়েম" হইয়া থাকুন, কারণ তাহা হইলেই কতিপয় স্বার্থান্বেষী গবর্ণমেন্টের মনোনীত গোলটেবিল বৈঠকের তথাকথিত মুসলমান প্রতিনিধিদের স্বার্থ সিদ্ধি হইবে। যদি স্যার সফীর প্রস্তাবানুযায়ী ভবিষ্যতে শাসন সংস্কার গঠিত হয়, তবে মনে রাখিবেন, বাংলায় চিরকালই আপনাদিগকে সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকিয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত সদস্যদের উপর আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ও বিরোধ থাকিয়াই যাইবে এবং আপনাদের মধ্যে গোঁড়া সাম্প্রদায়িকেরই উদ্ভব হইবে। ব্যবস্থাপক সভা সাম্প্রদায়িক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইলে এবং প্রত্যেক প্রশ্নই সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়া বিচার করিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবেই মীমাংসিত হইবে। ফলে আপনাদের দেশের শান্তি লোপ পাইবে। কাজে কাজেই কৃষ্টি ও সভ্যতায় আপনারা কোন কিছুই দান করিতে পারিবেন না। আপনারা স্বসম্প্রদায় বা দেশের কোন উপকারই করিতে পারিবেন না।

এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিয়া এবং গত বিশ বৎসর যাবৎ পৃথক নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিয়া এবং সমগ্র দেশে যে দেশাত্মবোধ জাগিয়াছে, তাহাতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সম্বোধে

প্রতিনিধি প্রেরণের ভিত্তি হইবে "পূর্ণ বয়স্কের ভোটাধিকার দিয়া মিশ্র-নির্ব্বাচন।" একমাত্র এই ব্যবস্থা দ্বারাই আপনারা আপনাদের অতীত গৌরবময় কীর্ত্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়া স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক হইতে পারিবেন। আমরা চাই স্বাধীনতা। আমরা শ্বেতাঙ্গের বা কৃষ্ণাঙ্গের কাহারও ক্রীতদাস থাকিতে চাই না। আমরা চাই গণতন্ত্র—এবং ইহা সম্ভবপর করিতে হইলে, যাহা কিছু জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইবে এবং উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব থাকিলেই ইহা একমাত্র সম্ভবপর। আমার বিশ্বাস যে এসম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী, মুস্লিমদলের যে নীতি, তাহা গ্রহণ করিলেই আপনারা ইহা লাভ করিতে পারিবেন। এরূপ করিলেই আপনারা দায়িত্বমূলক গবর্ণমেণ্টের সুবিধা ও উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারিবেন—সংখ্যালঘিষ্ঠে কায়েমী হইতে পারিবেন না। পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের উপর ভিত্তি করিয়া একমাত্র মিশ্র-নির্ব্বাচন দ্বারাই আপনার দেশের ও নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন, ভোটাধিকার যতই বিস্তার করিবেন ততই সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হইবে। এইরূপ করিলে এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের নিকট যাইতে বাধ্য হইবে, কারণ তাহা না হইলে নির্ব্বাচনে জয়লাভ সম্ভবপর হইবে না এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভোটের জোরে নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় গেলে সেখানে জাতীয়তার দিক ছাড়া অন্য কোনদিকে কাজ করা যাইবে না।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে স্থির করিয়াছেন. ভারতের নূতন শাসন-সংস্কার তৈয়ার হইতে চলিয়াছে। জাতির পক্ষে ইহা পরম সন্ধিক্ষণ; কারণ একদিকে যেমন সুবিধা হইবে, আর একদিকে তেমন বিপদেরও কারণ আছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকেও এই দুশ্চিন্তার ভাগ লইতেই হইবে। আমরা মাতৃভূমির স্বাধীনতাকামী এবং আমরা চাই ন্যায়সঙ্গতভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান।

ভারতের মুসলমানেরা গত দশ বৎসরের উপর স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে ব্যবস্থানুসারে চলিয়া ইহার ব্যর্থতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, ই। তাঁহাদের জাতীয় জীবন শক্তি হরণ করিয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ও কৃষ্ণ আমলাতন্ত্রের অনুগ্রহপ্রার্থী করিয়া তুলিয়াছে।

বাংলায় আপনাদের লোকসংখ্যা আড়াই কোটি এবং আপনাদে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। ইচ্ছা করিলেই আপনারা ইহার পু সদ্ব্যবহার করিয়া আপনারা ধনে, মানে ও ক্ষমতায় এই প্রদেশে বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারেন।

দেশাত্মবোধ জাগরিত হইলেই দেশের অর্থোন্নতি অনিবার্য্য। যদি বাংলার মুসলমানেরা জাতীয়তাভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ না হন, তবে আমার ভয় হয়, তাঁহাদিগকে কৃত্রিম সংরক্ষণ ও সুবিধা সুযোগের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। একমাত্র দেশাত্মবোধ ও সঙ্ঘবদ্ধতা দ্বারাই আপনারা স্বাধীন ভারতে বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইতে পারিবেন। বাংলা ও বাঙ্গালীরা সমস্ত ভারতের স্বাধীনতার যাত্রীদের পথপ্রদর্শক এবং আমি আশা করি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এই প্রদেশ ভারতের সমস্ত মুসলমানকে প্রকৃতপথে পরিচালনা করিবে।

আমার একান্ত অনুরোধ যে, সময় থাকিতে আপনারা হাল ধরিয়া প্রকৃত ইসলামের সন্তান বলিয়া পরিচিত হউন।

"ইসলাম ডুবিল" বা "সংখ্যালঘিষ্ঠেরা রসাতলে গেল"—এই রব শুনিয়া ভীত হইবেন না। মুসলমানেরা বীরের জাতি। তাহারা প্রতিবেশীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ইসলাম আপনাদিগকে বিদেশীর কবলে আসিতে শেখায় নাই। ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ইহাই আপনাদিগকে মুক্তির বাণী শুনাইয়াছিল। দাসত্বের শৃঙ্খল আপনারা নিজেরা পরিয়াছেন। ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ভারতের মুক্তিদাতা বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত হউন।

গ্রন্থ পরিচয়

'নেক-নজর'

উপন্যাস। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক দি মুসলমান পাবলিশিং কোঃ লিঃ, ১১-২, কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা। গ্রন্থকার 'নেক-নজর' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন 'আপনার মন্দিরের আরতি আমার মসজিদের নামাজে বিঘ্ন উৎপাদন করে না। আপনার দেওয়ালীর দীপ আমার শবে-বরাতের চেরাগে অবজ্ঞার রেখাপাত করে না। আপনার বিজয়ার কোলাকুলি এবং আমার ইদের আলিঙ্গন আপনার মনে সমভাবে প্রীতি উৎপাদন করে।' উৎসর্গের এই অল্প কয়টি কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায় লেখক তাঁহার আড়াইশত পাতার বইখানি লিখিয়াছেন কি উদ্দেশ্য লইয়া। একটি হিন্দু পরিবার ও একটি মুসলমান পরিবারের বংশপরম্পরায় চলিত সখ্য ও প্রীতির বন্ধন ও উভয় পরিবারের কিশোর-কিশোরী মনির ও সুন্দরীর মেলা-মেশা ও আবাল্য প্রীতির-বন্ধনের উপরই গ্রন্থখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার সুনাম দুর্নাম ও ইহা লইয়া নানা কথা কি ভাবে বর্ত্তমান সমাজে রাষ্ট্র হয় লেখক কৃতিত্বের সহিত তাহাও দেখাইয়াছেন। আশৈশব সাহচর্য্যের প্রীতি-বন্ধন এবং বয়ঃ-সন্ধিকালে এ বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়াস, ইহা হইতে তরুণ তরুণীর মনে যে বিক্ষোভ আসে সেই বিক্ষোভই 'নেক-নজরের' বেশীর ভাগ পৃষ্ঠার উপর দিয়া বহিয়া গেলেও ইহার কোথাও কাম-লালসার ইন্ধনে এতটুকু অপবিত্র হয় নাই অথচ তাহাতেও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্যের হানি হয় নাই। মনিরের ও সুন্দরীর মা দুইজনার চরিত্রও হইয়াছে আদর্শ মাতৃ-চরিত্র। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লার উচ্চ আদর্শ, মানবতার প্রতি অসীম দরদ, হিন্দু-মুসলমানের মিলন-বন্ধন গাঢ় করিবার প্রয়াস এ-সব দিক্ দিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। গ্রন্থের ভাষায় একটু নূতনত্ব আছে—কোন কোন বইয়ের মত অপ্রচলিত শব্দকে চালাইবার প্রয়াস লইয়া নয়—সে নূতনত্ব হইয়েছে সমগ্র পদটির বিন্যাসে। কথোপকথনে অনেক স্থানে এইরূপ পদবিন্যাসই চলিত বেশী, তবে পড়িবার সময় প্রথম দু'চার পাতায় একটু অসুবিধা বোধ হইতে পারে, কিন্তু পরে তাহা কাটিয়া যায়। মুসলমান লেখক-লেখিকারা তাঁহাদের উচ্চভাব আদর্শ ও দেশপ্রীতি লইয়া বাংলা সাহিত্যের সেবায় যত বেশী আসেন ততই ভাল। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা তাঁহার অল্প-অবসর সময় এই ভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী। আশা করি তিনি অদূর ভবিষ্যতে মাতৃভাষাকে আরো সুন্দর রত্নরাজিতে সাজাইতে পারিবেন। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল—উপন্যাস প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে ইহার সমাদর হইলে সুখী হইব।

সত্য প্রিয়

রমণী-হৃদয়

শ্রীসত্য রায়

গল্প

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এক সপ্তাহের ছুটি পাইয়া টেরিটেরিয়াল সৈন্যদলের কয়েক জন কর্ম্মচারী ইংলণ্ড যাইতেছিলেন। পথে রেল গাড়ীতে বন্ধুদের মধ্যে নানাবিধ গল্প চলিতেছিল। মেজর ডেরিক জ্যাকসন বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা কি সব বাজে কথা বলিতেছ—এবার একটি বালিকার ধৈর্য্য ও মনের জোরের কথা হাঁসপাতালের ডাক্তারের কাছে শুনিলাম, তার কাছে আমার মনে হয় পুরুষের সহশক্তি সব ছেলেখেলা"।

তোমরা—অক্সফোর্ড পদাতিক সৈন্যদলের নতুন লেফটেনাণ্ট হেনরীকে ত জানিতে। ছোকরা যেমন সুদর্শন তেমনি সাহসী ও মিশুক ছিল। আমাদের পাশের গ্রামের এক পাদ্রীর ছেলে সে—কলেজ ছাড়িয়া সৈন্যদলে সে ভর্ত্তি হইয়াছিল। যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতে তার এমন আগ্রহ যে, সে শিক্ষা-নবিশীর কয়েকটা মাস অতি কষ্টে কাটিয়াছিল। তারপর যে দিন তার দলের সঙ্গে সে ফ্রান্সে রওনা হইল, তখন তার আনন্দ দেখে কে? সে আমাদের সকলেরই বড় প্রিয় ছিল;—তার সুন্দর চেহারা, সদা প্রফুল্লভাব তার অমিত সাহস এবং হাসি মুখে কষ্ট সহিবার ক্ষমতার জন্যে সকলেই তাহাকে বড় ভালবাসিত।

বয়সে হেনরী বালকমাত্র;—তার মনে যে কোন লুকান দুঃখ থাকিতে পারে, তাও আবার ব্যর্থ প্রেমের জন্য, একথা আমাদের মনেও আসিত না, যদি না সে নিজে আমার কাছে কথাটা প্রকাশ করিত। সেদিন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর আমাদের ও হেনরীর দলের সে রাত্রির সব বিশ্রামের ছুটি ছিল। হেনরী ধীরে—ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিল;—এমন বিমর্ষ গম্ভীর ভাব হেন্‌রীর কখনও দেখি নাই। আমি উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি হে? হেন্‌রী বলিল "তুমি হয়ত শুনে হাসবে, কিন্তু আমার মনে একটা দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধেই আমার জীবন শেষ হইবে। তাই আজ তোমার কাছে লুকান পাপের কথা সব খুলিয়া বলিতে চাহি। য্যানী আমার ছেলেবেলার সাথী ছিল; শৈশবে, কৈশোরে যৌবনে দুজনে একত্র বড় হইয়াছি; আমাদের ভালবাসা ক্ষণিকের মোহ মাত্র ছিলনা—তাহা আমাদের জীবনেরই এক অংশ ছিল। আমি মহাপাপী; একান্ত নির্ভরশীলা সরলা য্যানির সর্ব্বনাশ করিয়াছি। সে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু আমার বিমাতার মত হইল না। আর আমিও পরাধীন। ক্ষোভে দুঃখে সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, কোনো সন্ধান পাইলাম না। তারপর আমি কলেজ ছাড়িয়া সৈন্য দলে যোগ দিলাম। আমি বেশ জানিতেছি যে, আমার দিন, ফুরাইয়া আসিতেছে, এখন তার কাছে ক্ষমা না চাইলে আমি মরণেও শান্তি পাইব না। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। যদি য্যাণীর দেখা পাও, বলিও যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তাকেই ভালবাসিতাম; সে যেন আমার সেই প্রথম এবং এই শেষ অপরাধ মার্জ্জনা করে।" বলিয়া হেন্‌রী চুপ করিল। আমি কি বলিব ভাবিয়া না পাইয়া বসিয়া বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

(২)

ইহার পর পনর দিন হেনরীর কোন সংবাদ পাইলাম না,—তখন তাহাদের দল আরো অগ্রসর হইয়াছিল। আমাদেরও কদিন একটুও সময় ছিল না—দিনরাত্রি যুদ্ধ চলিতেছিল। সে যে কি ভীষণ ব্যাপার তা তোমরা সবাই জান—আমি আর কি বলিব। দুই সপ্তাহ পরে আমাদের ছুটি হইল—এক নূতন দল আমাদের স্থান অধিকার করিল। সেই সময় খবর পাইলাম যে হেনরী

গুরুতর আহত হইয়াছিল—তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাদের দলের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা হইল। হেনরীর বীরত্বের কথা বলিতে বলিতে সেই কঠোর হৃদয় বৃদ্ধ কাপ্তেনেরও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি শেষে বলিলেন, "হেনরীর এ যাত্রা রক্ষা নাই;—কিন্তু আমার যদি ছেলে থাকিত তবে আমি তার হেনরীর মত বীরের মৃত্যুই কামনা করিতাম। সে তোমার বন্ধু ছিল;—যদি পার হাঁসপাতালে একবার তার খবর নিও।"

ছুটিতে আসিবার সময় তাই আমি হাঁসপাতালে গিয়াছিলাম। সেখানে ডাক্তারের কাছে যা শুনিয়াছিলাম তাহাই তোমাদিগকে বলিব।

ডাক্তারকে হেনরীর কথা বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, "হেনরী যখন হাঁসপাতালে আসে তখন তার অবস্থা খুবই খারাপ। তার দুটি চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এক প্রায় সর্ব্বাঙ্গেই আঘাত লাগিয়াছিল. তার ফলে খুব জর এবং প্রলাপ। প্রলাপের মধ্যে একই কথা "য়্যানী আমাকে ক্ষমা কোরো,' "য়্যানী আমাকে ক্ষমা করো" যতক্ষণ একটুও জ্ঞান থাকিত ততক্ষণ সে এই কথাই বলিত। তার অবস্থা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইত। এক দিন ভাবিলাম যে, যদি কোন নার্সকে য়্যানী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে ক্ষমা করার কথা বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তবে হয়ত বেচারার শেষ ক-টা দিন শান্তিতে কাটিতে পারে। এই হাঁসপাতালে নার্স এড্‌নার মত রোগীর সেবা করিতে কেহ পারে না। সে যে অক্লান্ত হৃদয়ে সমস্ত মন দিয়া আহত সৈনিকের সেবা করে তাহা দেখিলে তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হয়। সে কাছে দাঁড়াইলে অতি বড় অসহিষ্ণু রোগীও শিশুর মত মাতার ক্রোড়ে শান্ত হইয়া থাকে। জানি না কি কুক্ষণে আমি হেনরীর কথা তাহাকে বলিলাম এবং তার সেবার ভার লইতে বলিলাম। সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে গম্ভীর ভাবে নার্স এডনা হেনরীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে এবং নিজেকে য়্যানী বলিয়া পরিচয় দিতে স্বীকার করিল। আমি হেনরী সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলাম, কেন না তার অবস্থা দেখিয়া আমার মনেও শান্তি ছিল না। তার পর সাতদিন হেনরী জীবিত ছিল। নার্স যে ভাবে তার সেবা করিত, তাহা তার মাতা কিম্বা তার প্রণয়িনী য়্যানীও করিতে পারিত না। তার উপর সে য়্যানী সাজিয়া হেনরীর জরতপ্ত হাত দুখানি ধরিয়া সান্ত্বনা দিত যে, সে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়াছে। এই সাত দিনের মধ্যে আমি একবারও নার্স এড্‌নাকে হেনরীর কাছ ছাড়া হইতে দেখি নাই, সে যেন তাহার নিদ্রার উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিল। যদিও হাঁসপাতালের নিয়ম অনুসারে তার বিশ্রামের ছুটি ছিল এবং সেই সময়ে রোগীর পরিচর্য্যা করিবার জন্য অন্য নার্সও ছিল, এড্‌না কিন্তু আর কাহাকেও হেনরীর সেবা করিতে দিত না। অনেক সময় দেখিয়াছি, নার্স এড্‌না হেনরীর হাতখানি ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে—তার চোখদুটি ছল ছল করিতেছে। আমি আশ্চর্য্য হইতাম—কারণ আমি তাকে আর কখনও বিচলিত হইতে দেখি নাই, ভাবিতাম করুণ হৃদয় এডনা বুঝি এই সুন্দর যুবকের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। আমি মনে তার অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করিতাম;—সে যদি নার্স না হইয়া অভিনেত্রী হইত তাহা হইলে সে খুব কৃতকার্য্য হইত সন্দেহ নাই। এমনি করিয়া সাত দিন সাত রাত্রি কাটিল। একদিন ভোরে প্রিয়তমা য়্যানীর নিকট শেষ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নার্স এড্‌নার বুকে মাথা রাখিয়া হেনরী পরলোকের পথে যাত্রা করিল। হেনরীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গেলে আমি নার্স এডনার ঘরে গিয়া দেখিলাম সে গম্ভীর ভাবে কাগজপত্র গুছাইতেছে। আমিও একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। নার্স এড্‌না কোন কথা কহিল না দেখিয়া হেনরীর কথা পড়িলাম,—শেষে বলিলাম—"দেখ এড্‌না, তুমি যদি নার্স না হইয়া অভিনেত্রী হইতে তাহা হইলে তোমার খুব নাম হইত। এ কদিন তুমি যে ভাবে হেনরীর কাছে তার প্রণয়িনী য়্যানীর অভিনয় করিয়াছিলে তাহাতে তোমার এ বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছিলে। সেত অন্ধ হইয়াছিল, তোমার মুখ দেখিতে পায় নাই,—কিন্তু সে শান্তিতে মরিয়াছে।" মরণাহতা হরিণীর করুণতার চক্ষুর মত তার বড় বড় ঘন নীল চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এড্‌না বলিল,—

'অভিনয়, হা জগদীশ্বর! ডাক্তার আমি অভিনয় করি নাই, আমিই সেই য়্যানী।" আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ডাক্তারের সে কাহিনী শুনিয়া আমার মনে যে কি হইতেছিল তাহা ভগবানই জানেন। ভাবিলাম, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দশটা লোক মারিয়া বীর বলিয়া প্রশংসা লাভ করি, কিন্তু এই যুবতীর মনের বলের কাছে তাহা কি সামান্য। "ভিক্টোরিয়া ক্রসও" তাহার পূর্ণ সম্মান দিতে পারে না। গল্প শেষ করিয়া মেজর ডেরিক চুপ করিয়া চুরুট টানিতে লাগিল। তার সঙ্গীরা বিস্মিত হইয়া দেখিল, তার দুটি চক্ষুতে অশ্রু ভরিয়া উঠিয়াছে। —মেজর ডেরিককে সকলেই অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক বলিয়া জানিত।*

* ইংরাজী হইতে

ব্যায়ামবীর বিধুভূষণ
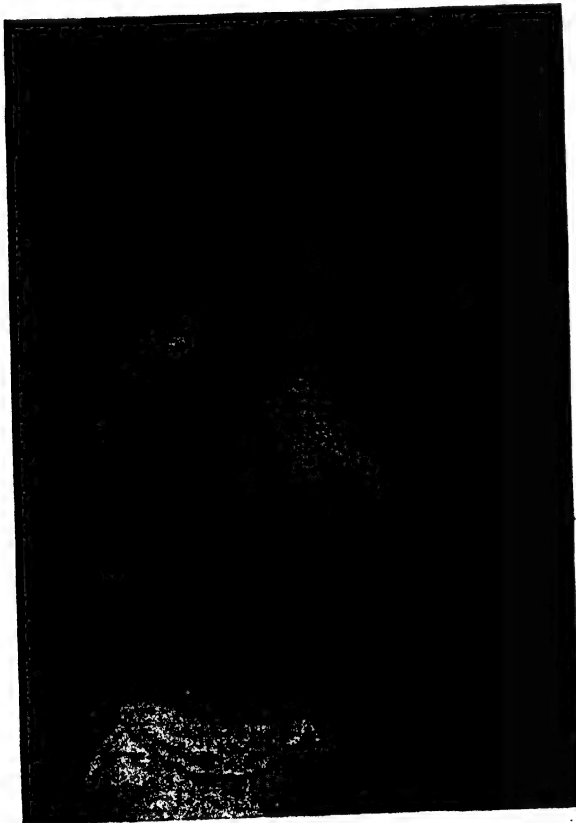
শ্রীমান বিধুভূষণ জানা তমলুকের অধিবাসী। তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। এই অল্প বয়সেই তিনি লাঠি, তরোয়াল, বন্দুকছোঁড়া, মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing) প্রভৃতিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৯২৮ সালে Calcutta Boys Schoolএর বর্ত্তমান Principal C. Fritchley Esqr. তাঁহার মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing) দেখিয়া তাঁহার যৎপরোনাস্তি সুখ্যাতি করেন। ঐ সময় Colonel B. K. Bose কর্ত্তৃক Hyderabad Regimentএর জন্য তিনি আমন্ত্রিত হ'ন। কিন্তু তিনি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২৯ সালে Dist. Magistrate এর আগমনে তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে যে Physical fits দেখান হয়, শ্রীমান বিধুভূষণ তাহাতে সর্ব্ব-প্রথম স্থান লাভ করেন। এই অল্প বয়সেই শ্রীমান বিধুভূষণ অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছেন ও 'খাদ্য', 'ব্যায়াম', ও 'স্বাস্থ্য', সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। শেষোক্ত পুস্তকখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

বিহার প্রদেশগত ঘটনা নগরীর ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে ইতিহাস বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষে অবস্থিত! ইংরাজী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকারের ঘন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে এই স্থান ঘন করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়!

১নং

৩নং স্তূপের একটি দৃশ্য

নালন্দার বিষয়ে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। উহার ঘটনা ইতিহাসের ছাত্রদিগের নিকট অবিদিত নেই। চীন পরিব্রাজক হীয়েন চাঙের বিস্তৃত বিবরণ পড়িলে বুঝা যায় সে প্রাচীন কালেও ভারতে শিক্ষার কোনও অভাব ছিল না বরং ভারতবাসীরা এখন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না পাইলে যেরূপ তাহাদের শিক্ষার পরিপূর্ণতা রহিল বলিয়া মনে করেন সেইরূপ তখনকার দিনে বিদেশীরা ভারত হইতে কোন শিক্ষা না পাইলে তাহাদের কোন শিক্ষাই হয় নাই বলিয়া মনে করিতেন! জগতের ইতিহাস বদলাইয়া গিয়াছে! এখন ye East! thou art the mother of Culture কেহ স্বীকার করে না!

২নং

৩নং স্তূপের বিভিন্ন দৃশ্য

জগতের সৌভাগ্য সূর্য এমন "পশ্চিমে" উদিত-আলো সেই দিকেই, কিন্তু "পূব" সে সব সময়ে

৩নং
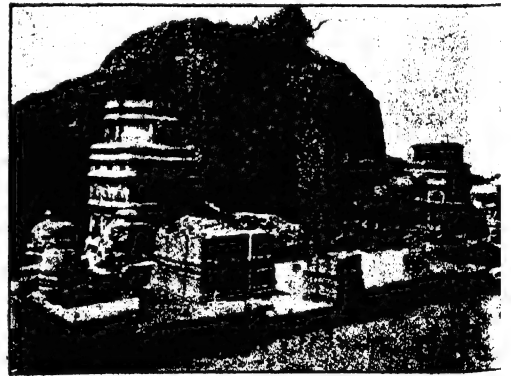
৩নং স্তূপের আর একটি দৃশ্য

'সন্ধ্যায় ছিল না এই কথা স্বীকার করিতে যাহাদের কষ্ট বোধ হয় তাহাদের নিকট নলন্দর ধ্বংসাশেষে একটা চরম দৃষ্টান্ত স্বরূপ!

এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলাভদ্র নামে একজন উদাসীন পণ্ডিতের অধ্যাপনায় বেদ, ব্যাকরণ চিকিৎসা,

৪নং

১নং মঠের দৃশ্য

অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। দূর দেশ হইতে হাজার হাজার লোক এই শিক্ষা লাভ করিবার জন্য কতই না কাউক স্বীকার করিত। এখানে

৫নং

মিহি সরু কাঁকড় দিয়া তৈয়ারি সিঁড়ি
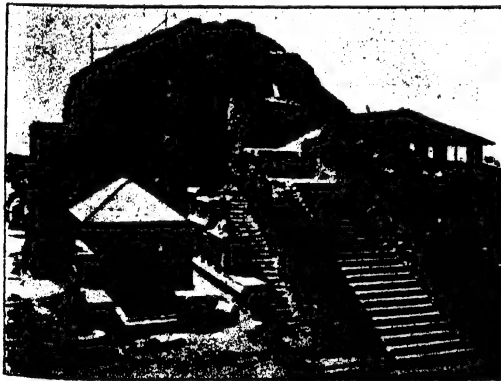
একটী পুরাতন "যত্নদধি" নামেতে পুথিভরা নালন্দার "নতলীয়া"ঘর আবিষ্কৃত হয়। প্রকাশ এখানে একশ' রকম বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায়।

সপ্তম শতাব্দীতে হীয়েন-চাঙ্‌ যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগশাস্ত্র শিক্ষা করিতেছিলেন তখন বর্ম্মাই কুমার ভাস্কর এই চীন পরিব্রাজককে নিজের দেশে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র দেন। এবং একটী কুমার ভাস্কর নাম অঙ্কিত মোহের নাকি যে সব অসংখ্য জোরামাটির মোহর এই খনন কার্য্য করিয়া সরকার পাইয়াছেন তাহার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং অনুমান এইটী সেই নিমন্ত্রণ পত্র।

নালন্দার আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কেবলমাত্র স্তূপাকার করা ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাকা ঘর পাওয়া যায়।

অনুমান এই সকল পাকা ঘরগুলি সাধারণতঃ স্তূপ ও মঠ হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং বৌদ্ধ সভ্যতার এই একটী বিশেষত্ব যে যে মঠ আছে সে সে স্থলে স্তূপও আছে।

৬নং

স্তূপের উঠিবার সিঁড়ি

উত্তর দক্ষিণ দুদিকে এই সকল স্তূপ ও মঠ অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেন যে সপ্তম ও দ্বাদশ শতাব্দীর ভিতর অনেক কিছু ভগ্নাংশের উপর এই মঠ আর স্তূপ সকল নির্ম্মিত হয়।

মঠগুলি সাধারণতঃ ছোট ছোট কুঠরীতে সার সার নির্ম্মিত। এই সকল মঠগুলি চারিদিকে সরু সরু ঘর আছে ও উহার সম্মুখস্থ বারান্দার একপাশ দিয়ে জল যাতায়াতের জন্য নর্দ্দামা রহিয়াছে।

স্তূপের চারিপাশে পাকা দালান স্থান আছে।

পাকা ঘরগুলির চাল বড় বড় কাঠ লোহা ও মাটিতে পাকা করা হইয়াছে!

৩ নম্বর স্তূপ ও ১ নং মঠের দৃশ্য অতীত চমৎকার।

১ নং মঠের ভিতর নতলীয়া বা নমহলীয়া ঘর থাকার চিহ্ন দেখা যায়! এই ঘরেরই বোধ করি রত্নদধি নামে পুথিটী ছিল!

৭নং
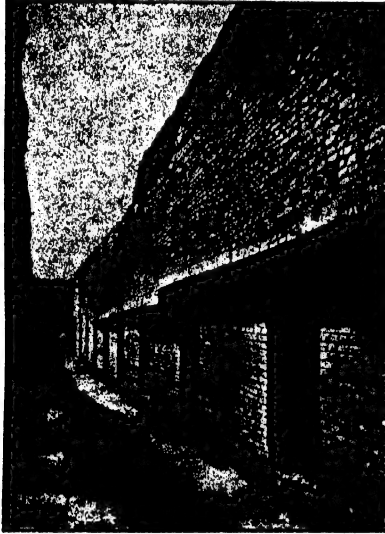
১নং মঠের দক্ষিণদিকের বারান্দা

স্তূপ বা মঠে উঠিবার জন্য আঁকাবাঁকা সিড়ি আছে। এই সকল সিড়ি সাধারণতঃ সরু মিহি কাঁকড়-মাটিতে গাঁথা এই সিমেণ্ট এত ভালও মজবুত যে উহা আজকালকার বিলাতী মাটীর চেয়ে অনেক শক্ত, মিহি ও চকচকে। এই ভগ্নাংশের ভিতর arch or অর্দ্ধগোলাকৃতি খিলান বা ইটের গাঁথনি আবিষ্কৃত হইয়াছে!

অনেকের ধারণা ছিল যে মুসলমান আগমনে পূর্ব্বে এইরূপ গাথনি আমাদের দেশে জানা ছিল ন কিন্তু এখন ইহা প্রমাণিত হইল যে এই ধারণ

৮নং

স্তূপের আবিস্কৃত মূর্ত্তি

সম্পূর্ণ ভুল! সপ্তম শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে এইরূপ খিলান করবে Technique জানা ছিল।

মঠের ভিতর সুন্দর সুন্দর বুদ্ধ মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে দেখা যায়!

নলন্দার খনন কার্য্য (Nalanda Excavitoin) প্রাগঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা সংরক্ষণে লর্ড কার্জ্জনের মনস্তত্বের পরিচায়ক রহিবে ও প্রাচীন যুগের সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ জগতের নিকট সকল সময়েই সমাদৃত থাকিবে।

স্মৃতি-পূজা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নিকষ পাথর
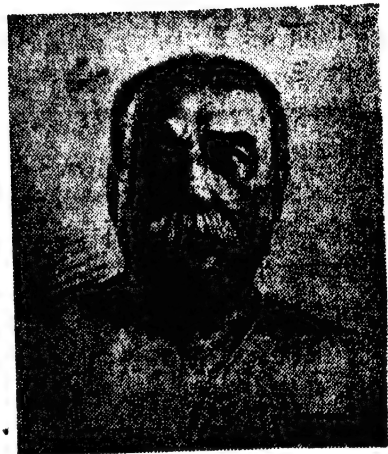
ভারতবর্ষ—আষাঢ়—১৩৩৮

আষাঢ়ের ভারতবর্ষে দুইখানি উপন্যাস সুরু হইয়াছে। একখানি ডাঃ শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের "তারপর" অপর খানি শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "দূরের আশায়।" নামের বহরে মনে হয়, ইহার শেষ অনেক দূরে।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে মাত্র দুইটি। প্রথম গল্প শ্রীনির্ম্মল কুমার রায়ের "একালের রূপকথা।" গল্পটির বিষয়-বস্তু প্রেম, স্থান অবশ্য আধুনিক গল্প সাহিত্যের দস্তুর মত বাংলা দেশ নয়—রাঁচি। কিন্তু নায়িকা-নায়করা সকলেই বাঙালী এবং প্রায় প্রত্যেকেই এক একটা ধোপ দেওয়া অর্থাৎ কেহ বিলাত-ফেরতা, কেহ বা ইটালী-প্রত্যাগত এবং যিনি বোম্বাইও ছাড়েন নাই, তিনিও কায়দা-কেতায় ধোপ-দোরস্তদের প্রায় ধর-ধর। কাজেই ঘটনাটা উচ্চাঙ্গেরই বলিতে হইবে। গল্পটির সাজ-সজ্জা এবম্প্রকার হইলেও লেখক অবশ্য ধোপ-দোরস্ত বাঙালীদের প্রতি যে সংযত অথচ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া ধোপের তলায় মলিনতার সন্ধান দিয়াছেন, তাহা তারিফ করিবার মত। অশোকও ইটালি-প্রত্যাগত সুনিপুণ চিত্রশিল্পী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় পূর্ণ শিক্ষিত তথাপি সে নিজের জাতীয়তা ভুলিতে পারে নাই। তাহার শিষ্ট সরল, মধুর ব্যবহার ও অনাড়ম্বর অথচ পরিষ্কার খদ্দর বেশই পরিশেষে "নবীন ব্যারিষ্টার কমল গুপ্তকে" পরাস্ত করিয়া সুন্দরী রমার হৃদয়ে তাহাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। আর একটু কথাও এই সঙ্গে না বলিলে চলে না;—তাহার চেহারাটা অবশ্য ছিল নারী হৃদয়ে শেল হানিবার মতই। নতুবা—যাক্ সে কথা। গল্পটি বেশ;—বিশেষতঃ শেষটুকু। ভাষাও বেশ ঝর ঝরে, ছোট গল্পেরই উপযোগী। কিন্তু ইহা রূপকথা মাত্র। ধোপদোরস্ত বাঙালী পাড়ায় "খদ্দর বস্ত" যে, সে কিন্তু অশোকের মত এমন "ভাগ্যমন্ত" নয়।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের—

"দুঃস্বপ্ন";—আষাঢ়ের নয়, উন্মাদ ফাল্গুনের। গল্পটি দীর্ঘ; স্বপ্নও অনেকগুলি। কিন্তু অতি সুখপাঠ্য;—কাহারো মনে এই দুঃস্বপ্ন চাপিয়া না বসিলেই রক্ষা। চির কুমার বৈজ্ঞানিকের চিত্তবনে ফাল্গুনের পিক যে একদিন সহসা ডাকিয়া উঠে এবং তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে ও সংযমের সীমাতিক্রম করিয়া একটি হৃদয়ের দিকে প্রধাবিত করে, গল্পটিতে সে কথা অতি উৎকটরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গল্পটির নায়ক—"এক প্রৌঢ় ডাক্তার—শহরের সিভিল সার্জ্জেন। বাঙ্গালী ক্রিশ্চান।" "বিবাহ তিনি করেন নাই। কেন করেন নাই কে জানে। হইতেও পারে বা, হয়ত তিনি তাঁহার মনের মত মেয়ে খুঁজিয়া পান নাই, কিম্বা হয়ত কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলেন। যাই হোক, সেজন্য মনে তাঁহার কোন ক্ষোভ বা দুঃখ আছে বলিয়া ত বিশ্বাস হয় না। দিব্য নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার, সদানন্দময় পুরুষ; নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের মত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দেহ, প্রশস্ত ললাট, সমুন্নত নাসিকা, আয়ত দুইটি চক্ষু;—দূর হইতে সহসা দেখিলে ধূম্র-লেশহীন জ্যোতিঃশিখা বলিয়া ভ্রম হয়। অথচ ইহার জন্য কোনও নারীচিত্ত কোনোদিন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া উঠে নাই,—ইহাই আশ্চর্য্য।"

এই "ধূম্রলেশহীন জ্যোতিঃশিখা" একদিন সহসা প্রচুর কৃষ্ণ ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া তাঁহার "পাচক সদানন্দের"

"অসামান্যা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, যুবতী" দ্বিতীয় পক্ষের কচি ও সরস হৃদয়খানি জ্বালাইয়া যে গাঢ় রস বাহির করিয়া দিলেন, তাহা পান করিয়া "নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের মত' পুরুষ আপনি ত মরিলেনই, ঐ যুবতীটিকে অবধি রেহাই দিলেন না। তবে ইহার মধ্যে একটু কথা আছে এই যে, রসের খোলা অগ্নির সান্নিধ্য লাভ না করিলে উষ্ণ হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে "ধূম্রলেশহীন জ্যোতিঃ শিখা" অবশ্য জিহ্বা মেলিয়া অগ্রসর হয় নাই, সুন্দরী "আরতিই" প্রথমে তাঁহার নিকট ঘনাইয়া আসে। ডাক্তারবাবু সংযমী পুরুষ তাই রক্ষা। তিনি একদিন সদানন্দকে সস্ত্রীক তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেই কি নিস্তার আছে? রাত্রে ঘুমের ঘোরে তিনি আরতীকে স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন। একদিন স্বপ্নে, "তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া" ধরিলেন। "আরতি বলিল, "লোকে কি বল্‌বে?" কিন্তু সে সময়ে কে কার কথা শোনে? ডাক্তারবাবু তাহাকে একেবারে বুকে জাপ্টাইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বলুক?" আর একদিন শুনিলেন, আরতি "বাঁচাও, বাঁচাও" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এই দুষ্ট স্বপ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে "ধূম্রলেশহীন জ্যোতি-শিখা" সদৃশ "নিয়ত সংযত" পুরুষটি পরদিন "রাত্রে আর কিছু খাইলেন না", শুইবার আগে হাত-পা মুখ চোখ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন। শয়নের পূর্ব্বে দেবতার নাম স্মরণ করিয়া" ঘুমাইয়া পড়িলেন। এমনি করিয়া দিন কয়েক তিনি ছিলেন ভাল;—দিনের বেলায় থাকিতেনও বেশ। কিন্তু রাত্রি হইলেই যত গোলমাল! তবুও ইহা তাঁহার বেশ লাগে। যাহা হউক, তিনি তৃতীয় দিন ঘুমের ঘোরে যে দুষ্ট স্বপ্ন দেখিলেন, তাহাই চরম। সেদিন আরতি সুরাপাত্র হাতে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী নৃত্যপরা নটী। তাহার পায়ে পায়ে ঘাঘ্‌রা দোলে, ওড়নাতলে চারুকটাক্ষে বিজুরী হানে আর সেই সঙ্গে স্ফূর্ত্তির মজ্‌লিশে শব্দ শিহরিয়া উঠে—লে হর্‌রা—ছারা রা রা!!! কিন্তু মজলিশের মাঝখানে বোধ হয় ডাক্তার বাবুর লজ্জা করিতেছিল, তাই সেদিন আর তিনি তাহাকে আগে জাপ্টাইয়া ধরিলেন না, ধরিল আরতি। তারপর যাহা করিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিই। "আরতি মুখে কোন কথা বলিল না; ঈষৎ হাসিয়া শুধু সে তাঁহার দুটি আতপ্ত ওষ্ঠপুটে নিজের দুটি সুচারু আরক্তিম ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া আনমিত মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিল।" এ দৃশ্য নিলজ্জের মত চোখ মেলিয়া দেখিবার নয়; তাই আমরাও চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

আর একটি দৃশ্য আছে —ইহা স্বপ্ন নয় বাস্তব। অপঘাত মৃতা আরতির শবদেহের উপর ডাক্তারবাবু যখন ছুরি চালাইতে যাইতেছেন তখনকার। তিনি শবব্যবচ্ছেদাগারের দরজা অর্গলবদ্ধ করিয়া গোপনে সে কাযটি সারিলেও পাঠক-পাঠিকার দাঁড়াইয়া দেখিবার ব্যবস্থা আছে। না দেখিলেই ভাল হইত; কিন্তু তাহাতে যে বাঙালীর আকণ্ঠ গল্প-রসপিপাসার নিদারুণ পীড়ার উপশম হয় না।

টেবিলের উপর সুন্দরী যুবতী আরতির মৃতদেহ। ডাক্তার বাবু পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেনকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া দরজা অর্গলবদ্ধ করিলেন। তারপর আরতির দেহাবরণখানি উন্মোচন করিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। "সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ঠোঁট, সেই দেহ"···"ডাক্তার বাবু কম্পিত হস্তে তাহাকে স্পর্শ করিলেন"···তারপর তাহার "প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত শতদলের মত অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এক সময় তিনি ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।" কিয়ৎক্ষণ পরে দরজার বাহিরে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া আওয়াজ হইতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতক্ষণ?"

"ডাক্তার বাবু দেখিলেন, জ্ঞানহীন উন্মাদের মত তিনি তখন তাহার সেই নিঃসাড় নিঃস্পন্দ হিমশীতল মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া তাহারই অনাবৃত নগ্নবক্ষে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন।"

ইহার পর আরও একটু আছে। কিন্তু সেখানি ইহারই মত "অনাবৃত নগ্নবক্ষে" মাথা-রাখা ব্যাপার। দেখিলে দুঃস্বপ্ন বাড়িবে বৈ কমিবে না তাহাতে মানসিক স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা আছে। কাজেই চাপা দিলাম।

এ সংখ্যায় কবিশেখর কালিদাস রায় একটী কবিতা লিখিয়াছেন—"কর্ম্ম শুধু ঘর্ম্ম নয়।" অর্থাৎ তাহাতে মজাও আছে। যেমন—

"গ্রাম ঢুকিতে দেখি কে ঐ নেচে নেচে সান্‌ছে কাদা
নেইক সরম, দেওয়াল পরে হয়ত বসে তারই দাদা॥"

দেওয়ালের উপর দাদা বসিয়া থাকে, আর তাহার সম্মুখে "কে ঐ" নাচে—একি কম মজা! আরও মজা লাগে পরের বাড়ীর বেড়ার ফাঁক দিয়া "ঢেঁকির পরে বধূর "কোমরে গোট দুলিতে দেখিয়া। আবার মজার সেরা মজা, যখন দেখা যায় "পল্লীবধূ চলছে নেচে ঘোম্‌টা মাথায় দুলছে মাজা।" তাই বিস্মিত কবি বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ঠাকুর, তুমি এমন মজাদার, তোমার রাজত্বের চারিদিকে মজার এত ছড়াছড়ি অথচ মোর কপালে—?"

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে তিনখানি। "গায়ত্রী," "মস্‌লিনের জন্মকথা" ও "মেঘদূত।" তিনখানি ছবিতেই ভাবের দ্যোতনা আছে। মন্দ লাগে নাই।

প্রবাসী—আষাঢ়—১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ এ সংখ্যায় দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন। "বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে" ও "বালক বয়স যখন ছিল।"

এ সংখ্যার চারটি ছোট গল্পের মধ্যে চতুর্থটির সবটুকুই একটী বিদেশী গল্প। এগুলি ছাড়া দুইখানি উপন্যাস আছে, সেই "অপরাজিত" ও "পোর্টআর্থারের ক্ষুধা।"

এবার আষাঢ়ে রথযাত্রা নাই, কিন্তু গল্পের বাজারে পরশুরামের "মহেশের মহাযাত্রা" আছে। ইহাই প্রবাসীর প্রথম গল্প।

গল্পটিতে হাস্যরসের সহিত আর একটী ক্ষীণ সুর আছে—দূর দূরান্ত থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—ও সাতকড়ি—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি—"

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—আছে, আছে···পরশুরামের গল্পে ইহা একটী নূতন সুর। গণিত অধ্যাপক মহেশ মিত্তির ভূত-ভগবান কিছুই মানিতেন না; কিন্তু তিনি মৃত্যুর পর এ গুলির অস্তিত্ব স্বীকার করেন! কথাটায় কেহ যেন না হাসেন।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমনোজ বসুর "প্রেতিনী।" ইহাও ভূতুড়ে গল্প—কিন্তু ইহাতে ব্যঙ্গ নাই, রঙ্গ-রস ও কান্নার কারুণ্য আছে। গল্পটিতে প্লট কিছু নাই, এবং যে ছত্রটিতে গল্পটিকে শেষ করা হইয়াছে, সেখানে শেষ হওয়া উচিত ছিল না। লেখকের আলস্য বশতঃই এরূপ হওয়া সম্ভব। তথাপি রচনাটিতে একটী চমৎকার শ্রী আছে। যে দুইখানি চিত্র ইহাতে অঙ্কিত করা করা হইয়াছে, তাহাও অতি পরিষ্কার। আর একটা জিনিষ ইহাতে স্পষ্ট চোখে পড়ে—আমাদের বঙ্গ-পল্লীর রূপ। আধুনিক গল্পে ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করা একটা সুকঠিন ধাঁধার উত্তর দেওয়ার সমান। গল্পটির ভাষা বেশ ঝর ঝরে ও মিষ্ট।

হরিচরণ তাহার দ্বিতীয়া তরুণী স্ত্রী প্রভাকে লইয়া নদীপথে নৌকায় যাত্রা করিয়াছে। যাত্রাপথে দুইজনের প্রেম সম্ভাষণ ও হরিচরণের প্রথমা স্ত্রীর বিষয়ে প্রভার আগ্রহপূর্ণ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে পুরুষের ভালবাসার প্রতি তাহার মৃদু ব্যঙ্গোক্তি, ইহাই গল্পটির প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাঙ্গলার রূপ ও তাহার সহিত হরিচরণের বিগত দিনগুলির ইতিহাস ও প্রথমা স্ত্রী সরযুর বিস্মৃত সুন্দরী মূর্ত্তি। এই শেষের ভাবটিকেই আশ্রয় করিয়া গল্পের নামকরণ হইয়াছে—"প্রেতিনী।" নামটা কিন্তু আদৌ মানানসই নয়।

তৃতীয় গল্প শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "টেলিগ্রামের দৌত্য।" গল্পটিতে হাস্য রসের উপাদান বেশ আছে। সবটুই বেশ জমাট ও সংযত।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে চারখানি। প্রথমখানি প্রাচীন ছবি—"দীপক রাগ"; দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি যবদ্বীপের "বেডয়ো" নৃত্যের। চতুর্থ ছবি শ্রীবিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের "চড়াই উৎরাই।" মন্দ লাগে নাই। "কিন্তু জায়গাটা কোথায় জানিতে পারিলে সুবিধা হইত। অনেক কবিচিত্ত এই দুস্তর ক্ষেত্র একবার পারাপার করিয়া ভাবঘাম ছুটাইয়া সুস্থ হইতে পারিতেন।

বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় চারখানি উপন্যাস আছে—"জীবন স্বপ্ন", "ধর্ম্মদাস", "মাটীর স্বর্গ" ও "তিব্বতের বিভীষিকা।" ছোট গল্প আছে পাঁচটি।

পুষ্পপাত্র

পুষ্পরানী

জন্ম ২৪শে শ্রাবণ ১৩২১ ইং ৯ই আগষ্ট ১৯১৪ মৃত্যু ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ ইং ৫ই জুন ১৯৩১

এসেছিলে, পুষ্পভার নিঃশেষে উজাড়

ধরণীরে দিতে উপহার

সে ফুল যে দেবতা বাঞ্ছিত

ধরণীর কোথা অধিকার?

— প্রতিভা ঘোষ

প্রথম গল্প শ্রীসরোজ নাথ ঘোষের "প্রতিক্রিয়া।" গল্প হিসাবে ইহার মূল্য কিছু না থাকিলেও বিষয়-বস্তু অত্যন্ত চিন্তোদ্দীপক। বাংলাদেশের নারী-সম্মেলনে কিছুকাল পূর্ব্বে বিবাহ-বিষয়ক যে প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত হয়, প্রচ্ছন্নভাবে সেগুলির দুই একটাকে ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ অধুনা মানসিক বৃত্তিগুলির অবাধ চরিতার্থতাই নর-নারীর মিলনের সত্যকারের ভিত্তি বলিয়া যে শিক্ষা দান করিতেছেন তাহাকে প্রতিরোধ করিতে, প্রাচ্যের মহান্ শিক্ষার মূলনীতিকে গল্পটিতে কয়েকটি বক্তৃতায় অল্প-স্বল্প ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই মহা সান্ধক্ষণে যেন এই কথাটি বেশ গভীর করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে;—প্রতীচ্য পৃথিবীময় যে সভ্যতার বাণী ছড়াইয়াছে, তাহা মানুষকে সত্যের পথে কতটুকু অগ্রসর করিয়া দিতেছে। নর-নারীর মিলনের ভিত্তি কোনটি হওয়া উচিত—ব্যষ্টির চিদ্‌বৃত্তির অবাধ চরিতার্থতা, না সমষ্টির সুখকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া সংযম, ত্যাগ ও প্রেমে মনুষ্যত্বের পরিস্ফূর্ত্তি? প্রেমের স্থান উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা পূর্ণ হইলে জাতির জীবনে কল্যাণ নাই। কিন্তু লেখক কেবলমাত্র বাংলাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কথাগুলি বলিলেন কেন? ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তে যে প্রতীচ্যের ঐ শিক্ষার ঘূর্ণী-হাওয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "দীপ ও ধূপ।" যথার্থ প্রেমিক যে বাঞ্ছিতার সুখের জন্য "দীপের মত আপনি জ্বলিয়া তাহার অন্তরের অন্ধকার দূর করে, ও "ধূপের মত আপনি পুড়িয়া গৃহ পবিত্র ও সুরভিত" করিয়া তোলে গল্পটির পরিশেষে একটী চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপে তাহা সুব্যক্ত। কিন্তু গল্পটির আসল কথা যেন "পরম হিন্দু মানে যে নারী-নির্য্যাতনকারী ও অবিচারক, একথা আমার জানা ছিল না" রমেশ ইহাই। কথা কয়টি বড় চমৎকার, বড় সত্য, বড় আশাপ্রদ। "ধর্ম্মগ্রন্থ, সৎসঙ্গ, হরিসভা ইত্যাদি লইয়া থাকেন" চন্দ্রনাথের মতন এমন মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া কথাগুলি এত ভাল লাগে। ইহার পিছনে কত বড় প্রাণ আছে! এমনিতর মানুষই সমাজের আদর্শ।

তৃতীয় গল্প শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী (বি-এস্ সির) "মাতৃহীনা" চলন সই।

চতুর্থ গল্প শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সরলা"। চতুর্থ পর্য্যায়ের।

পঞ্চম গল্প শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" একটী শিক্ষিতা তরুণীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখিয়া এক উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত শিক্ষিত তরুণ তাহার পিছু লইয়াছিল। ইহার মত নির্লজ্জ ও নির্ব্বোধ তরুণের অভাব পথে ঘটে নাই। যাহা হউক, গল্পে তাহার প্রতি যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে তরুণটীর চেতনা ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু গল্পটি পাঠ করিয়া আরাম পাওয়া গেল না। যাহা হইতে গল্প সৃষ্টি ইহার মধ্যে সেই আনন্দ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেন গুপ্তের "ঝরাফুল।" বেশ লাগিয়াছে। একটী সকরুণ ভাব মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় ছবি শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের "অরুণোদয়।" রঙের খেলা। বেশ। আর তৃতীয় ছবি জি, এম, রাজিদের "দিবা ও সন্ধ্যা।" একটী পুরুষ, একটী নারী। হায় কি মূর্ত্তি, মরি কি ভাব! দুটীতে আবার মিলন হইয়াছে ডোবার ধারে, দেউলের পাশে, গাছের তলে। তবুও ছবি ত বটে, আর কাচ ও ফ্রেমের দোকানে বিকায়ও।

বন্ধু-বিয়োগে

কুমারী রেণুকা মিত্র

এ জগৎটা যেন 'পান্থশালা'। মানবরূপী পান্থ এসে এখানে ক'দিনের জন্য ঘর বাঁধে, সুখ, দুঃখের খেলা খেলে, আবার তার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ফুরিয়ে গেলে; সে তার নিজের গন্তব্যস্থানে ফিরে যায়।

জীবনের কঠোর সত্য মৃত্যু হঠাৎ এসে কোন কাকুতি-মিনতির অপেক্ষা না করে মানুষের আত্মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়; আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব রক্তমাংসের শরীরখানাকে শ্মশানঘাটে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে শোকসন্তপ্ত অন্তর নিয়ে বাড়ী ফেরে।—যে যায়, সে চলে যায়, যাবার পথে ফিরেও চায়না; কিন্তু পিছনে ফেলে রেখে যায় মধুর স্মৃতিটুকু,—যা' দিয়ে বন্ধু ও আপনজন তাদের অন্তর ভরিয়ে রাখে।

আজ যার কথা বল্‌তে বসেছি সেও ঠিক এমনি করে মরণের হাতে ধরা দিয়ে এ জগতের সমস্ত জিনিষের সঙ্গে নিজের দেনা-পাওনা চুকিয়ে কোন্ এক নিরুদ্দেশ অভিযানের পথে চলে গেছে। জীবনের শেষপ্রান্তে সে এসে পৌছোয়নি, জীবনের আস্বাদ তিক্ত কি মিঠা, তা' জানবার মত বুদ্ধি বা বিবেচনা তার হয়নি; ঠিক "পুষ্প" ফোট্‌বার মুখেই এল ওপারের ডাক,—এপারের সমস্ত খেলা ছেড়ে দিয়ে চিরপরিচিত ঘরে ফের্‌বার একটা নিষ্ঠুর তাগিদ, কোনদিন স্বপ্নের ঘোরেও সে ভাবেনি যে, এই ডাকে, তার একান্ত অনিচ্ছায়, সাড়া দিতে হ'বে—তার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।—

"পুষ্পরাণী" ছিল আমার বন্ধু। তার সম্বন্ধে বল্‌তে গেলে অনেক কথাই মনে হয়, সবকথা আমি গুছিয়ে স্পষ্ট করে লিখ্‌তে পারবোও না, তা' আমার পক্ষে এখন সম্ভবও নয়।—তার কথা ভাবতে গেলেই, তার সেই সরলব্যবহার, সুন্দর হাসিমাখান মুখ—এইগুলোই চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে।—সত্যই সে "পুষ্প" নামের যোগ্যা ছিল। তার অন্তরটা ছিল "পুষ্পেরই" মত মধুর, সৌরভে ভরপুর। তার সমস্ত সৌরভ বিলিয়ে দিয়ে, সে অতি অকালে শুকিয়ে ঝরে পড়ল। কবির কথাই বুঝি সত্য—"Whom God loveth dies young." অল্পদিনের আলাপে তার যে সকল গুণের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তা' চিরদিন আমার অন্তরকে স্মৃতি-সুধায় ভরিয়ে রাখবে। তার অসুখে তাকে আমি দেখ্‌তে যেতাম, তখনও তার সেই শীর্ণ অধরে হাসির রেশটুকু লেগে থাক্‌তো,—নিজের রোগযন্ত্রণা ভুলে গিয়ে সে কতক্ষণ প্রাণ খুলে আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তো।—

পুষ্প অতি শৈশবেই মাতৃহীনা হ'য়েছিল। তার স্নেহময় পিতা একাধারে পিতামাতার স্নেহে আপ্রাণ চেষ্টায় তাকে এত বড় করে' তুলেছিলেন; আজ তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে, তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সে পরপারের যাত্রী হয়েছে।—তার ঠাকুমা, বড়মার কাতর-কান্না এখনো মনে পড়ে,—তার পিতা ও জ্যেঠার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস শুন্‌লে সমস্ত মনপ্রাণ ব্যথায় ভরে ওঠে; মাতৃহারা তার একমাত্র ছোট ভাইটীর কথা মনে কর্‌লে চোখে জল আসে।

পুষ্প চলে গেছে। তার একলার জন্যে যে কতগুলি মানুষের জীবন দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠেছে, সে হিসেব সে যাবার আগে তো নেয়নি; তার আসার আশায় আজ ত্রিশটা দিনরাত কেটে গেল, কই সে তো পুরানো পথ দিয়ে আর ফিরে এল না।—আর তার সেই সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীতধারায় "বেতার" ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌বেনা।—

আজ সে নেই, তাই তার বিয়োগের ব্যথা এম্‌নি করে আমাদের বুকে বেজে ওঠে। আজ সে যে অমৃতময়ের রাজ্যে গেছে, সেখানে তার অমর আত্মা যেন চিরশান্তিতে বাস করে,—এইটুকুই আমার প্রার্থনা।—

প্রিয় বন্ধু, বিদায়ের পথে আমার অন্তরের প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ কর।*

---

* কুমারী পুষ্পরাণী চট্টোপাধ্যায়ের অকাল-প্রয়াণে—

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা কতদূর

গোল টেবিল বৈঠকে কে যাইবে তাহা লইয়া এরই মধ্যে আমাদের মধ্যপন্থীদের মধ্যে বেশ একটু আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে। বাজারে গুজব যে যাঁহারা গত বৎসর বিলাত গিয়াছিলেন, তাঁহারা ত যাইবেনই তা ছাড়া আরও ছ চারি জন সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। এই অতিরিক্ত সভ্যদের মধ্যে বাংলার তরফে স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও হিন্দুস্থানের শ্রীযুত নলিনী রঞ্জনের নাম শুনা যাইতেছে। কংগ্রেস পক্ষ হইতে বোধ হয় একমাত্র মহাত্মাজী ব্যতীত অন্য কেহই যাইবেন না—শেষ পর্য্যন্ত তাহাতেও সন্দেহ আছে। এই জন্য এই তরফের ধুরন্ধরদের কোন নাম শুনা যাইতেছে না। এংলো ইণ্ডিয়ানি পত্রগুলি সকলেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি স্থাপন করিবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তাহার চেলা-চামুণ্ডেরা যাহাতে সন্ধি না হয় তাহারই কামনা করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বলিতে চাহেন সর্দ্দার পাটেল বা শ্রীযুত নেহেরু এখনও স্থানে স্থানে জ্বালাময়ী অভিযানের দ্বারা মাত্র ইহাই জ্ঞাপন করিয়া বেড়াইতেছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থা যুদ্ধ-স্থগিতের ক্ষণিক অবস্থা, ইহাই শক্তি সংগ্রহের উপযুক্ত কাল, কিন্তু শীঘ্রই ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে তাহাতেই প্রকৃত ফলাফল নির্ণীত হইবে। কতকটা যেন এই জনশ্রুতির প্রতিধ্বনী করিয়াই মহামান্য বড়লাট বাহাদুর সিমলার চেমস্ ফোর্ড ক্লাবে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন ইংরাজ যুদ্ধ-স্থগিত চাহে না, তাহারা প্রকৃত শান্তি চাহে, তাহারা ভারতবাসীর সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহে।

বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে গেলে আমাদের এই কথাই স্বাভাবিক ভাবে মনে উদিত হয় যে, ডিপ্লোমাটিক চাল চালিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। ইংরাজের শিল্প-বাণিজ্য জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পণ্য বিক্রয় করিবার প্রায় তাবৎ ক্ষেত্রগুলিই একের পর এক করিয়া তাহাদের হস্তচ্যুত হইতেছে। এই সময়ে ভারত ও স্বাধীন হইতে পারুক আর নাই পারুক, এখানে ভীষণ অরাজকতা বিরাজ করিলে তাহাদের পণ্য-বিক্রয়ের ভীষণ বাধা-বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। শিল্প-প্রাণ ইংরাজ তাহা কখনই কামনা করিতে পারে না। এই জন্যই তাহারা এখন ভারতকে কতকটা স্বায়ত্ত শাসন দিয়া ঠাণ্ডা করিতে চায়। তবে কতটা প্রদান করিবে এবং কি কি বিভাগ আবার হস্তান্তরিত হইয়া আমাদের নেতাদের শাসনাধীন হইবে তাহা বিশেষ বিবেচ্য।

ভারতের শাসন-সংস্কারের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দুই-একটী জিনিষ বেশই উপলব্ধি করিয়া থাকি, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। সিপাহী-বিদ্রোহের পর যখন বর্ত্তমান হাইকোর্ট ও আইন-সভাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও ইংরাজ একদিকে সামন্ত রাজাদের কখনই রাজ্যচ্যুতি ঘটিবে না বলিয়া তাহাদিগকে যেমন আশ্বস্ত করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ রাজ্যহীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বর্গকে ইংরাজ-শাসিত প্রদেশগুলির আইন-পরিষদ-গুলিতে মনোনীত করিয়া লইয়া তাহাদের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রাজ্যহীন সম্ভ্রান্তরা ও সামন্ত নৃপতিরাই

সিপাহী-যুদ্ধের প্রবর্ত্তক ও নেতা ছিলেন। তাহার পর ইংরেজী-শিক্ষার প্রচলনের সহিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান ও কর্ম্মদক্ষ তাঁহারা তাঁহাদের দাবী জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিলে লর্ড লান্সডাউন আইন-পরিষদ গুলিতে কতকটা নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাদিগকে তথায় প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়া দেন। পরে মিনটো-মলি রিফর্ম্ বা মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার প্রণালীতে এই সম্প্রদায়কেই যথেষ্ট কার্য্য করিবার ক্ষেত্র দেওয়া হইয়াছিল। এদিকে আবার অভিজাতদের প্রভাব জনমণ্ডলীর উপর হ্রাস হইতেছে দেখিয়া তাহাদের ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সন্ধিক্ষণে এখন ইংরাজ যদি কোন ডিপ্লোমাসি চালিতে চাহেন ত সেই কথাই ভাবিতেছেন। চার্চ্চহিল ও তাঁহার অনুচরগণ চাহেন পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াই চলা হোক। আর অগ্রসর হইতে গেলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে হইবেই। অপর দল দেখিতেছেন যে, জোর-জবরদস্তি করিয়া পূর্ব্বাবস্থা রক্ষা করিতে গেলে এক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সারা ভারতে ভীষণ অশান্তি বিরাজ করিবে। ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার পক্ষে সেই অবস্থা কখনই লোভনীয় হইতে পারে না, সেই জন্য তাঁহারা চাহেন শান্তি, কাজেই কিছু স্বায়ত্ত শাসন দিতে হইবে। কতটা পাওয়া যাইবে এবং কতকটা না পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভর করিতেছে—আমাদের নেতৃবর্গের উপর।

ডাঃ আনসারী ও হিন্দু-মুসলমান মিলন

ফরিদপুর কন্‌ফারেন্স হইয়া গেল। ডাক্তার আন্‌সারি তাঁহার প্রাণের কথা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ঐ কথাগুলি ডাক্তার আন্‌সারির মুখে শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক ছত্রেই আমরা মিষ্টার জিন্নার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান এক মহা সমস্যা—এবং জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে মহা অন্তরায় স্বরূপ। এইরূপ হয় কেন? বিভিন্ন ধর্ম্ম মত এবং বিভিন্ন জাতি পাশাপাশি সমস্ত দেশেই আছে। চীন দেশেও প্রায় দুই কোটী মুসলমান বাস করে। সোভিয়েট রুশিয়ায়ও মুসলমান জন-সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু ধর্ম্ম বা জাতি লইয়া ত কোন গোলমাল দেখা যায় না।

ভারতের মুসলমানগণ যদি হিন্দুদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া এক জাতি হিসাবে বাস করিতে চাহেন, তাহা হইলে মীমাংসা হওয়া কি সহজ হয় না? কিন্তু তাঁহারা যদি শুধু পশ্চিমের দিকেই তাকাইয়া থাকেন এবং আর্য্য সভ্যতাকে পদদলিত করিয়া তাঁহাদের সভ্যতা চালাইতে যান, তবে মিলনের কথা বলিতে গেলেই বিবিধ সর্ত্তের অবতরণা করিতে হয়। ডাক্তার আন্‌সারিকে আমরা এই কথাই স্পষ্টভাবে বলিতে চাহি যে, তিনি এবং তাঁহার সম্প্রদায় যে বলেন যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সংখ্যায় গরিষ্ঠ হিন্দুজাতি মুসলমানদিগকে পদদলিত করিবে। তাঁহাদের সু-চিন্তিত সর্ত্তগুলি দেখিলে হিন্দুরাও কি বলিতে পারেন না, আমাদেরও সন্দেহ হয় যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় মুসলমানগণ পশ্চিমের মুসলমান শক্তিগুলিকে হস্তগত করিয়া ভারতে ইসলামবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আর এটা শুধু অনুমানই বা বলি কেন? দুই একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান নেতা ত স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন। এইরূপ যুযুধমান সম্প্রদায় যুগলের মিলন হইতে পারে না বলিয়াই মহাত্মাজী অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

সন্দেহকে ভিত্তি করিয়া মিলন-প্রাসাদ তৈয়ারী করিতে গেলে ভুল করা হইবে। সখ্য ও হৃদ্যতা সকল মিলনের মূল মন্ত্র। ভারতের মুসলমান যদি ভাবেন ভারতের হিন্দু তাহারই একজন ভাই, তবে মিলন সংঘটন করিতে বিলম্ব হয় কি? কিন্তু মুসলমান যদি ভাবেন আফগান, তুরস্ক, পারস্য তাঁহার আপন জন, এবং হিন্দুরাও যদি অনবরত তাহাই সন্দেহ করে তবে মিলনের জন্য সূক্ষ্মদর্শী এটর্ণির ন্যায় যতই তর্কের বন্ধন দিয়া 'মিলনের বেষ্টনী' তৈয়ারী করা হউক না কেন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবেই।

বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলায় কংগ্রেসীদ্বন্দ্বের কোন অবসানই হইল না। কোন একটা সভা-সমিতি প্রকাশ্যভাবে হইতে গেলেই গুণ্ডার আবির্ভাব ঘটে এবং পরে দক্ষ-যজ্ঞের অভিনয় হয়। শ্রীযুত সেন গুপ্তের দল ইহাতে যে অনেকটা বিব্রত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি কাউন্সিল নির্ব্বাচন লইয়া যে সমস্ত সভা-সমিতি হইত এবং সেগুলিতে দেশমান্য মধ্যপন্থী নেতাদের যা-সব লাঞ্ছনা হইত, সে সমস্ত কি তাঁহার স্মরণ আছে, বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাড়ীতে, কলেজ স্কোয়ারে আলবার্ট হলে যে সমস্ত দক্ষযজ্ঞ সংঘটিত হইয়াছিল, তখন তিনি কংগ্রেসের প্রধান পরিচালক। অমৃতবাজার প্রভৃতি নিরপেক্ষ কাগজগুলিতে তাহার প্রতিবাদ বাহির হইলে, তিনি তাহার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন কি? প্রত্যুত্তরে বরং বলা হইত দেশবাসী তাঁহাদের উপর বিরূপ, কলিকাতার নাগরিকগণ তাঁহাদিগকে মুখ খুলিতে দেন না তা আমরা কি করিব? প্রকৃতির প্রতিশোধ রূপে সেই সমস্ত অস্ত্রই আজ তাঁহার উপর ব্যবহৃত হইতেছে, সহ্য করিতে হইবে। তবে আমরা এ কথা অবশ্যই বলিব যে, প্রতিপক্ষ এইরূপ দুর্ব্যবহার করিয়া ক্রমশঃ জনসাধারণের সমস্ত সহানুভূতিই হারাইতেছেন। এ কথা হয়ত সত্য হইতে পারে যে, শ্রীযুত সেনগুপ্তকে অপদস্থ করিয়া শাসমলের ন্যায় তাঁহাকেও কংগ্রেস হইতে হটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং শ্রীযুত বোসের প্রভাব কিছুদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতেও পারে, কিন্তু বর্ত্তমান এই সন্ধিক্ষণে এইরূপ করিয়া শ্রীযুত বোস এবং তাঁহার সমর্থকগণ কি পরে ডুবিয়া অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত যাইবেন না?

কেহ কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কংগ্রেস মহলে এইরূপ আত্ম-বিনাশ কেন চলিতেছে? কংগ্রেসের শত্রুপক্ষে বলে যে স্বায়ত্ত-শাসন আগত প্রায়। ভবিষ্যতে কে প্রধান মন্ত্রী হইবে বর্ত্তমান কলহের মূল কারণই তাই। কথাটা ভাবিবার বটে! কিন্তু মহাত্মা গোল-টেবিল বৈঠকে কতটা সফলকাম হইবেন এখনও তাহার স্থিরতা নাই। শ্রীযুত নেহেরু বা সর্দ্দার পেটেলকে বিশ্বাস করিতে গেলে আমাদের অন্ন ধারণাই হয়, অর্থাৎ হয়ত বা আবার পূর্ণ উদ্যমে অসহযোগ আন্দোলনে নামিতে হইবে। তবে এখন হইতেই কালনেমীর লঙ্কা ভাগ কেন?

চীন ও ভারতবর্ষ

চীন ও ভারতবর্ষ এশিয়ার দুইটী অভিশপ্ত দেশ। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দুইটী বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় থাকায় এখানে জাতীয়তা সংগঠন করা যেমন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, সেইরূপ চীনেও উত্তর ও দক্ষিণের কলহ মিটিয়াও মিটিতেছে না।

কাইসেক চীনের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, দক্ষিণ আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাদেরই নেতাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে। চীনও ভারতবর্ষের মত একটি বিস্তৃত মহাদেশ। সেখানকারও জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি। উহারও বিস্তৃতি ভারতবর্ষ অপেক্ষাও অনেক অধিক। সকলেই মঙ্গলীয়, সভ্যতাও একই চৈনিক সভ্যতা। তবু তথাপি ও সেখানকার কলহ ও আত্মদ্রোহ মিটিতেছে না কেন? ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এক আমেরিকার যুক্তরাজ্যগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রায়ই যেখানে কোন দেশ রাজ-শাসন অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেইখানেই ভীষণ আত্মদ্রোহ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। বহু রক্তপাতের পর ফ্রান্সে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। আজও পর্ত্তুগালের কোন প্রকার মীমাংসা হয় নাই। দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্য-গুলিতে একে একে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও রাজ-দ্রোহ, ভ্রাতৃ-দ্রোহ সেখানে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া রহিয়াছে। আজকাল যেরূপ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে প্রায়ই সেখানকার কোন একটি সম্প্রদায় প্রবল হইয়া তাহার নেতাকে অগ্রণী করিয়া রাখে। অপর দল-গুলি যতক্ষণ না মাথা তুলিতে পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকে, অবসর বুঝিলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতালীতে মুসলিনী এবং তুরস্কে কামাল পাশা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, যে হেতু তাঁহাদের সমর্থক সংখ্যা এখনও প্রবল আছে।

যে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সংখ্যা হ্রাস হইবে সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিবে। মধ্যে মধ্যে কামাল পাশা বা মুসলিনীর উপর আক্রমণ যখন শুনা যায় তখন এই কথাই আমাদের মনে পড়ে।

বিশ্বঋণ ও আমেরিকা

প্রেসিডেণ্ট হুভার জাতি-সঙ্ঘের নিকট এ বৎসরের জন্য যাহাতে পৃথিবীর জাতিগণকে পরস্পর পরস্পরকে ঋণ না দিতে হয় তাহার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইংরাজ সাগ্রহে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইংরাজ অধ্যুষিত উপনিবেশগুলিও ইংরেজকে অনুকরণ করিতে রাজী হইয়াছে। প্রধান সচিব ভারতবর্ষকে তাহার ঋণ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

ষ্টক এক্সসেঞ্জের বাজার একটু বেশ সুবিধা হইয়াছে। ভারতবর্ষে অনেক স্থলেই দেখিতেছি তাহাতে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ধন্যবাদ দিবার কিছুই নাই। আমেরিকা বা বিলাত শিল্প-প্রধান দেশ। সারা পৃথিবী উহাদের পণ্যক্ষেত্র হইলে তবে উহাদের কারখানা গুলির খোরাক হইতে পারে। জাতিগুলি ঋণজালে জড়িত থাকিলে, ব্যবসায় ক্ষেত্রগুলি মন্দা যাইবেই। দুশ-একশ কোটি টাকায় সরকারি তহবিলে কিছু স্বচ্ছলতা হইলে জাতির কর কিছু হ্রাস করা যায় সত্য কিন্তু তাহাতে ত জাতির অন্ন-সমস্যার মীমাংসা হয় না। এই জন্যই আমেরিকা ও ইংরেজ পৃথিবীর দেশগুলিতে যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টিত। ফ্রান্স তাহার শিল্পের এখনও তেমন উন্নতি করিতে পারে নাই। তাহার সরকারী ব্যয় গত যুদ্ধ হইতে অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই ফ্রান্স এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে নাই। ফ্রান্সে অন্ন-সমস্যা থাকিলেও তথায় উহা তত সাংঘাতিক ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে নাই। সেখানকার সকল প্রজারই ভরণ-পোষণের জন্য সামান্য জমি আছে। কাজেই 'ভাত' তাহার ঘরে বাঁধা আছে। আন্তর্জাতিক ঋণ প্রত্যাহার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে গেলে তাহার শাসন ব্যয় অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইবে, প্রকৃতি-পুঞ্জ তাহাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে, কাজেই ফ্রান্সকে উক্ত প্রস্তাবে খুব দৃঢ়তার সহিত 'না' বলিতে হইয়াছে।

এদিকে এংলো ইণ্ডিয়ান সহযোগীরা যতই বলুন না কেন, ভারতকে এ বৎসরের জন্য ঋণ হইতে অব্যাহতি দিয়া খুব মহানুভবতা দেখান হইয়াছে, আমরা কিন্তু বলিব উহাও খুব একটা বড় রাজনৈতিক চাল হইয়াছে। কেন না, ভারত-সরকারকে ঋণের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছিল এবং শাসন-ব্যয় অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সর্ব্বরকমেই ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হইতেছিল, এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে ভারত-সরকারের শুধুই যে ঋণ-গ্রহণের সুবিধা হইল তাহা নয়, ভারত সরকারের তহবিলেও অনেকটা স্বচ্ছলতা ঘটিবে।

উপাধি বর্ষণ

মহামান্য সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে এবার বাংলায় উপাধি বর্ষণ বাংলার বড় লোকদের মতে বেশ ভাল রকমই হইয়াছে। এডভোকেট জেনারল হইলেই স্যার হয়, এই হিসাবে বাংলার প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ স্যার হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগিরি করিলেই নাইট হয়, এই হিসাবে ডাক্তার সুরাবর্দ্দি নাইট হইয়াছেন। ঠিক এই প্রকার কুলগত-প্রথানুযায়ীই মিষ্টার ট্রাভার্স্ নাইট হইয়াছেন, কেন না তিনি ইউরোপীয়ান এসোসিয়নের সভাপতি ছিলেন। তবে কর্ণেল গিড্নী ও অধ্যাপক রাধাকিষণ কিন্তু একটু অতিরিক্ত কারণেই ঐ একই উপাধি পাইয়াছেন। শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি-আই-ই হইয়াছেন। এই পুরস্কার আমরা কি হিসাবে লইব; তাঁহার যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ না সহযোগীতার প্রতিফল বলিয়া, শেষোক্ত কারণই যদি প্রকৃত হেতু হয় তবে পি-এন-জীকেও একটা উপাধি দেওয়া উচিত ছিল। তিনি ত বহু গবেষণা করিয়া তাঁহার 'কন্‌ট্রিবিউসন্' বাহির করেন। আমাদের মনে হয় উপাধি প্রদান করিবার হাত বাংলার মন্ত্রী মণ্ডলের নাই, তাহা না হইলে মন্ত্রী মণ্ডলের প্রবর্ত্তক ও রক্ষক মিঃ গুহ এই বিরাট

উপাধি-দান-যজ্ঞে বাদ পড়িলেন কেন? ইহা কি অনেকটা শিবকে বাদ দিয়া শিবহীন যজ্ঞ তুল্য হইল না।

ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি

ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটীর কার্য্য শেষ হইয়াছে। তাঁহাদের লিপিবদ্ধ রিপোর্টও বোধ হয় শীঘ্রই বাহির হইবে। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে দুই একটা গুজব যাহা বাজারে বাহির হইয়াছে এখানে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই কমিটী স্থির করিয়াছেন যে ভারতে অচিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লইয়া যে গোলমাল এতদিন চলিতেছিল এই বিশেষজ্ঞদের মতে তাহা অনর্থক ও মিথ্যা কলহ। তবে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যর সুবিধার জন্য ইন্‌ডষ্ট্রীয়াল বা শিল্প-বাণিজ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ইউরোপীয় সহযোগীগণ তাহাতে ভীষণ আপত্তি করিয়াছেন, তাঁহারা বলিলেন যে কোন প্রকার সহানুভূতি করিবারই প্রয়োজন নাই। সাধারণের বিবৃতির জন্য কথাটা আমরা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে সমস্ত বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে, সেগুলি সমস্তই ইউরোপীয় বা বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত। টাকা গচ্ছিত রাখিয়া কোন কারবার করিতে গেলে আমরা আমাদের গচ্ছিত টাকার উপর এক পয়সাও ঋণ পাইনা। কিন্তু যখনই উহাদের কোন স্বদেশবাসী কোন নূতন কারবার খুলিবার জন্য বা পুরাতন কারবার বাড়াইয়া তুলিবার জন্য ঋণ চাহেন, তিনি তাঁহার গচ্ছিত অর্থের অনেক বেশী ঋণ পাইয়া থাকেন। তাহাতেই ব্যবসা জোর চলিয়া থাকে। আমাদের যে সব প্রতিনিধি উক্ত কমিটিতে ছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যে সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাদিগকে তাহাদের বিবেচনানুযায়ী দেশী শিল্পের উন্নতির জন্য ঋণ প্রদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন।

সুন্দর দেহ

দেহকে কি সুন্দর করা যায় না। ইহাই এখন পশ্চিমের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। এই বিষয়টী লইয়া তথায় ভীষণ আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতেছে। আমরা এই কথাই এখানে বলিয়া রাখি যে, দেহ ও মনের সহিত খুবই নিকট সম্বন্ধ এবং একের অসুস্থতায় অপরের অসুস্থতা সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই জন্যই হিন্দু-শাস্ত্রে মনের যাহাতে সর্ব্ববিধ উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য বা সাময়িক ব্রহ্মচর্য্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। এই ব্রহ্মচর্য্য হইতে চ্যুত হইয়াই বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ তাহাদের স্বাভাবিক কমনীয় ভাব হারাইতেছে।

সমর বিভাগ ও বাঙ্গালী

সামরিক কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয়গণকে হয়ত শীঘ্রই কতকগুলি সামরিক কাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে কিন্তু বাঙ্গালীর আমোদ করিবার কিছুই নাই। আজ অবধি যে কয় জন সামরিক বিভাগে উচ্চপদ পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে এক রয়েল ইন্‌জিনিয়ারী একটী মাত্র পদ একজন পাইয়াছে—আর সকলেই অবাঙ্গালী। এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে এ কথা কি ভাবিবার নয়।

সহযোগী ষ্টেট্‌স্‌ম্যান হিন্দু-জাতিকে লইয়া এত মাথা ঘামান কেন? সামরিক কমিটীর অধিবেশন সুরু হইলে সহযোগী একদিন বলিলেন, উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারীর পদগুলি ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলে, যাহারা চিরদিনই ভারতের সৈনিক জাতি অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাববাসী হিন্দু-মুসলমানরাই ঐ পদগুলি পাইবে। এবং প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়াছেন যে, আজ অবধি যতগুলি পদ ভারতবাসীকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহারাই তাহা পাইয়াছে।

কংগ্রেসী দলভুক্ত ভদ্র পদবীধারী সম্প্রদায়দের উক্ত পদ পাওয়া বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিবে। আমরা প্রত্যুত্তরে বলিব, কিছুই দুরূহ হইবে না। এখন যেরূপভাবে উহা উন্মুক্ত করা হইয়াছে তাহাতে ঐ সব সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রবেশ বড়ই কঠিন ব্যাপার। স্বরাজ লাভের পর যখন উহা বেশ ব্যাপক ভাবে উন্মুক্ত করা হইবে তখনই অন্যান্য সম্প্রদায় বেশ ভালভাবেই প্রবেশ করিবে।

ই কি অনর্থের মুল !

'কজন নৈতিক পণ্ডিত ঠিকই বলিয়াছেন যে সমস্ত ।১ অনর্থের মূল। সমস্ত ismরই মূলে আর্থিক পরিবর্ত্তন ইচ্ছা নিহত আছে। এবং ismই যখন বলবৎ হয় তখন বিশ্বে রক্তপাত সংঘটিত হইয়া থাকে। আমাদের রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ কি বলেন ?

ট্রাম ও বাস

সহরে যখন বাস চলিতে আরম্ভ হয় তখন লোকে মনে করিয়াছিল যে সহর হইতে ট্রাম কোম্পানীকে কারবার তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ট্রাম কোম্পানী ত তাহাদের কারবার তুলিলই না, পরন্তু নিত্য নূতন ব্যবস্থা করিয়া অধিক সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করিতেছে। ট্রাম কোম্পানীর নূতন নূতন ব্যবস্থাগুলি বাস্তবিকই জনসাধারণের বিশেষ উপকারী হইয়াছে। শুনা যাইতেছে কোম্পানী সত্বরই সহরে এক প্রকার গাড়ী বাহির করিবেন তাহা অনেকটা composite carর মতন, ফাষ্ট ক্লাশ ও সেকেণ্ড ক্লাশ একই গাড়ীতে থাকিবে এবং মধ্যে একটী দরওয়াজা থাকিবে! এই ব্যবস্থায় মাত্র একটী কণ্ডাক্টর রাখিলেই চলিবে। দেখা যাক্ এই গাড়ী সহরে কেমন চলে। আমাদের বাস সিণ্ডিকেট হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার ক্রমোন্নতি বিশেষ কিছু এ পর্য্যন্ত উপলব্ধি হইতেছে না ইহা দুঃখের বিষয়। বাস ও ট্রাম এক সঙ্গে কালীঘাট হইতে ছাড়িলে অনেক সময়ই চৌরঙ্গীতে ট্রামই আগে আসে, ইহা কিন্তু হওয়া উচিত নয়। বাসের কণ্ডাকটারেরা অনেক সময় আরোহীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে না, বাস যেখানে এক মিনিট থামাইলে চলে সেথায় ইচ্ছামত ৫।৭ মিনিট দাঁড়ায়। রাত্রে অনেক সময় কালিঘাটগামী গাড়ী বেশী যাত্রী না পাইলে ধর্ম্মতলা বা ওয়েলিংটন হইতে আরোহী নামাইয়া ফিরিয়া যায়—গ্রাহ্যও করে না,—এ সব বিষয়ে এখন সিণ্ডিকেটের কঠোর দৃষ্টি দরকার। আমরা বাস সার্ভিস ও সিণ্ডিকেটের উন্নতিকামী—কিন্তু তাহা অব্যবস্থায় হওয়া তো সম্ভব নয়। তার পর আর এক কথা—বাস সিণ্ডিকেটের স্রষ্টা, মান্থলী সিষ্টেমের সেক্রেটারী এস-কে-ব্যানার্জ্জি বা শ্রীযুত সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আর দেখা যাইতেছে না, সে স্থানে আর-এস সিন্নার নাম দেখা যাইতেছে। তবে কি এমন বিরাট ব্যাপার গঠন করিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে সরিয়া পড়িতে হইল ? ব্যক্তিগত হইলেও সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বাস সিণ্ডিকেট এতটা জড়িত—যে প্রয়োজন বোধে একথার উল্লেখ করিতে হইল। বাসগুলি ইচ্ছামত চলিবার অনিয়মে অতিষ্ঠ হইয়া সিণ্ডিকেট সম্প্রতি নিজ তত্ত্বাবধানে এক্সপ্রেস সার্ভিস করিয়া তাড়াতাড়ি কতকগুলি বাস চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

মাইকেল স্মৃতি

খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর উদ্যোগে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিস্থানে মাইকেল স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর সভ্যগণ রেডিওতেও গীত আবৃত্তি প্রভৃতি করিয়াছিলেন।

চিত্রকর

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গল্প

পরিতোষ সারা মন দিয়া ছবি আঁকিতেছিল। দ্বিতলের ছোট একখানি ঘর, পরিপাটি ভাবে সাজান। গৃহকোণে একটি মাকড়সার জাল বা মেঝের ধূলিকণার চিহ্নমাত্র নাই। দেওয়ালে কয়েকখানি মূল্যবান ছবি এবং নীচে এদিকে-ওদিকে নিজকৃত কতকগুলি সমাপ্ত, কতকগুলি অসমাপ্ত চিত্র। হাতের কাছে তুলি, ব্রাস, রঙ ও একটা পাত্রে জল। মেজের উপর একটি ছোট ধবধবে সাদা বিছানা বিছানায় থান দুই ছবির বই।

পরিতোষের বয়স কুড়ি বাইস হইবে। দিব্যি সুন্দর গৌরকান্তি চেহারা। চক্ষু দুইটি বেশ টানা, মাথায় এক-রাশ কোঁকড়া চুল। গভীর মনোযোগের সহিত ছবিখানা আঁকিতেছিল। একটি তরুণী হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল।

"হ্যাগা, শুন্‌ছ ?"

বোধ হয় যুবকের কানে সে স্বর, প্রবেশ করে নাই। যেমন নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকিতেছিল তেমনি আঁকিতে লাগিল। তরুণী তখন আরও নিকটে যাইয়া আপেক্ষিক উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—

"কিগো শুনতে পাচ্ছ না নাকি একেবারে কালা হয়েছ ?"

"কে, সুষি ? দেখতেই ত পাচ্ছ কাজে ব্যস্ত রয়েছি। এ অসময়ে কি মনে করে !"

"কাজ ত তোমার লেগেই আছে ! দিন রাত কি যে হিজিবিজি আঁক, ভাল লাগে না আমার। দুদণ্ড গল্প ক'রব তা না। ঘরে এসে, বলত কে বোবার মত বসে থাকতে পারে ?"

"ব'কো না—লক্ষীটি আমার,—কাজটা শেষ হতে দাও, তারপর—"

"তা হলেই হয়েছে ! না, আমার আসাই ঝকমারী !

পরিতোষ মাথা ঝাকিয়া বলিল,—"হু"।

"মাথা ঝাকলে হবে না। আজ রোববার, থিয়েটারে ম্যাটিনী আছে। ষ্টারে 'রমা' দেখিয়ে আনতেই হবে।"

"হাতের কাজ না সেরে কোথাও যেতে পারব না। আজকের মত মাপ কর, আর একদিন নিয়ে যাব।"

"এত তোমার বাঁধা বুলি ! যেদিনই বলি, ঐ এক কথা। না, আজ আর তা শুনছি নে।

"লক্ষীটি, যাও দেখি এখনকার মত, কাজটা সারতে পারি যদি।"

"যদি টদি শুনছি নে যেতেই হবে আজ। তা না হ'লে একটা ভয়ানক হাঙ্গামা বাধাব।"

এই বলিয়া পরিতোষের নব পরিণীতা স্ত্রী সুষী ওরফে সুষমা দেবী দুপ-দাপ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

কিছুই যেন হয় নাই,—পরিতোষ তেমনি নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকিতে লাগিল।

সুষি নীচে যাইয়া একবার এটা নাড়ে, ওটা নাড়ে, একবার বা বসে। পরক্ষণেই উঠিয়া জানালার পরদা সরাইয়া রাস্তার দিকে তাকায়। সেখানে লোকের চলাফেরা দেখে। চক্ষের সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে জগতের কত বৈচিত্র্য দেখিতে পায়। একটি পাখী গাছের উপরে বসিল, পরক্ষণেই আর একটি আসিল। উভয়ে কত গান গাহিল, আবার তখনি নীচে নামিয়া আসিল। গলাগলি, কাণাকাণি, মুখোমুখী উভয়ের কত খেলা ! জীবনের কি বিচিত্র সুর। দেখিলেও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। আর তার,—একি দুর্ব্বিসহ জীবন। দুটি কথা কহিবে, তাহার লোক নাই। স্বামীর কাছে যখনই যায় সর্ব্বদাই ছবি আঁকায় ব্যাপৃত। কথা কহিতে গেলে বিরক্ত হন। তার এই নূতন যৌবন, জীবনের গাঙ্গে এই প্রথম জোয়ার। এ সময় প্রাণের সঙ্গীতে সারা

বিশ্ব মুখরিত করিতে ইচ্ছা হয়, তার মধ্যে এ কি মর্ম্মন্তুদ কঠিন নীরবতা!

তাই সে মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে ঝির সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, আবার মুহূর্ত্তপরেই তাহাকে হাসিতে পাগল করিয়া দেয়। ঝি বুঝিতে পারে না, তাহার এই ঠাকুরাণীটির এ কি অভিনব ব্যাধির সৃষ্টি হইল!

এদিককার রান্না বান্না শেষ করিয়া সুষি আবার তেমনি দুপ-দাপ করিয়া উপরে উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল,—"কি গো মশাই,—আপনার হয়েছে? আমি ত সব সেরে-সুরে এলাম। উঠে পড়ুন; সময় আর মোটেই নাই। এর পর গেলে জায়গা মিলবে না।"

"আ কি গোল বাধালে! এই না বল্লুম—হাতের কাজ শেষ না করে আমি যেতে পারব না।"

"হরি,—সে বুঝি এখনকার কথা! তারপর এক যুগ চলে গেল যে। বলি দিন রাত ত ঐ ভস্মে ঘি ঢালছ,—ফল ত দেখি না কিছুই।"

"ভারি বিরক্ত আরম্ভ করলে ত! যাও বলছি, আমায় এমন করে উৎপাত করলে।"

"ধরে মার লাগাবে, না তাড়িয়ে দেবে?"

"হয়ত শেষে তাই করতে হবে।"

"বটে—এতদূর।"

এই বলিয়া গরগর করিয়া সে তখনই নীচে চলিয়া গেল। তখনকার সেই রোষদীপ্ত রক্তোৎপল সদৃশ লাল টুকটুকে সুন্দর মুখখানি দেখিলে অপর যে কাহারও মাথা ঘুরিয়া যাইত নিশ্চয় এবং তখনই পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া এই রূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

কিন্তু পরিতোষ ছিল ঐ এক ধাতের। যেমন ছবি আঁকিতেছিল, তেমনই আঁকিতে লাগিল;—কিছুই যেন হয় নাই। ছোটবেলা হইতেই তাহার ঝোঁক ছিল এই ছবি আঁকার দিকে এবং মনে মনে আশা ছিল যে, কালে সে একজন র‍্যাফেল বা একজন ভ্যানডাইক, নিদেন অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর বা নন্দ লাল বসুর মত হইবেই হইবে। এবং যে পর্য্যন্ত না সেরূপ না হইতে, পারে সে পর্য্যন্ত আর কোন বিষয়ের ধার ধারিবে না। উদ্যোগ ছিল তার যথেষ্ট, সহিষ্ণুতার অভাব ছিল না এবং কাজও করিতে পারিত অসাধারণ। কিন্তু যে চক্ষু থাকিলে বিশ্বের সমস্ত জিনিষ সৌন্দর্য্যময়, প্রাণময় হইয়া উঠে, তাহার চক্ষে সে দৃষ্টি, সে সূক্ষ্মানুভূতি, সে পরম বিশ্লেষণী শক্তি ও নিগূঢ় প্রেম ছিল না। কাজেই চিত্রগুলি সজীবতা লাভ করিতে পারিত না।

সে না যাইত কোন আমোদ প্রমোদে, না যাইত কোন খেলা-ধূলায়। ঘরের কোণটিতে বসিয়া নিবিষ্ট মনে নিজের কাজ করিয়া যাইত। কোন মেসে স্বতন্ত্র একটি ঘর লইয়া থাকিত। কখন এখানকার বা ওখানকার প্রদর্শনীতে দু একখানা ছবি দিত। কিন্তু এ পর্য্যন্তও উহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইল না। মাতা স্বর্গলাভ করেন অতি শিশুকালে ও যখন তাহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর তখন পিতৃ-বিয়োগ হয়। ভাগ্যক্রমে পিতা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রাখিয়া যান। তাহারই সুদ হইতে তাহার একার ভরণ পোষণের কোন কষ্ট হয় না। আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন বলতে ছিলেন একমাত্র পিসী নতুবা সংসারে আপনার জন আর কেহই ছিল না। সেই পিসীও থাকিতেন বাগবাজার কম্বুলীটোলা। ক্বচিৎ কালে ভদ্রে সে তাঁহার ওখানে যাইত। সেই-খানেই একদিন সুষমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং বার কয়েক ঘন ঘন যাতায়াত করে। কোন দিক হইতে কোন বাধা না থাকায় পিসিমাই উদ্যোগী হইয়া এই বিবাহ দেন। সুষমা তখন সবে প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। বিবাহান্তে কয়েক দিন পিসিমার বাড়ীতেই কাটাইল। পরে ধীরে সুস্থে হরতকী বাগানে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে সুষমাকে লইয়া আসিল।

বিবাহের যে এত ঝঞ্ঝাট তা তার জানা ছিল না। সাংসারিক জ্ঞান মোটেই ছিল না। সুতরাং পদে পদে অসুবিধা হইতে লাগিল। সুষমা প্রত্যেক কাজেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তাহার পরামর্শ চায়। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তা জানিতে চায়। পরিতোষ উহা ভালবাসে না। সে চায় তেমনি পূর্ব্বের মত একনিষ্ঠ হইয়া চিত্রাঙ্কণে রত থাকিত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া একটী বয়স্থা ঝী আনিয়া হাজির করিল। স্ত্রীকে বলিল, যদি কোন বিষয়ে কিছু জানিবার প্রয়োজন হয়,

উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে। তাহাকে যেন বিরক্ত না করে।

তাই ছবি আঁকিবার আলাদা ঘর হইল। সে চায় সর্ব্বতোভাবে পৃথক হইয়া থাকিতে। যেমনটি পূর্ব্বে ছিল ঠিক তেমনটি।

কিন্তু তা যে আর হয় না, তা সে বুঝিতে পারে না। বসন্তের নবমুকুলিত আম্র মঞ্জরীর ন্যায় নবযৌবন সমাগমে সুষি উদ্‌ভ্রান্ত। সে চায় নিত্য আদর, নব নব সোহাগ। ভ্রমর যেমন পুষ্পকোরকের চারিদিকে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায় সে চায় তার স্বামী তেমনি মধুর আলাপনে তাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। তাই বার বার ছুটিয়া যায় তার কাছে, কিন্তু সেদিক হইতে কোন সাড়াই মিলে না,—ফিরিয়া আসে একান্ত হতাশ প্রাণে।—

এমন অবস্থা অনেকদিন চলে না।—দূরত্ব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। এক ছবি আঁকা খেয়াল ভিন্ন স্বামীর বিশ্ব সংসারের কোন দিকে দৃষ্টি নাই। সত্য, টাকা সে মাসের প্রথমেই সুষির হাতে দিত। পেটের ক্ষুধা মিটিতে কোন বেগ পাইতে হইত না, কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা ত মিটিত না। বিবাহের পূর্ব্ব হইতে সে কত আশা করিয়াছে। তার সমবয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিবাহ হইয়াছে, তাদের কাছে কতই না সুখের সংবাদ শুনিয়াছে। তাদের স্বামীরা কত আদর, যত্ন, সোহাগ করে, কত হাসি, ঠাট্টা, আমোদের শেষ নাই। নিত্য আনন্দের হাট লাগিয়া আছে। স্বর্গ সুখ তার কাছে কোন ছার!

আর তার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল! বিধাতার এ কোন অভিশাপ! ভাবিয়া আর কূল পায় না। এক একবার স্বামীর কাছে যায়, সময়ে আব্দারও করে কিন্তু সে যেন ভাস্কর খোদিত প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমা। কেবলি প্রত্যাখ্যান। যৌবনের এই প্রথম সময়ে এ অপমান কি সহ্য করা যায়? ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া চলিল এবং এক ছাতের নীচে বাস উভয়ের পক্ষেই পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল।

সেদিন বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারায় চারিদিক প্লাবিত। আকাশের মেঘগুলি ধরার বক্ষে নামিয়া আসিয়াছিল। সেই ঘন বারিপাতে চারিদিক তমসাবৃত, কোথাও কিছুই দেখা যাইতেছিল না। পরিতোষ বসিয়া বসিয়া মেঘের এই সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল এবং চিত্রে তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এমনি সময়ে সুষি একেবারে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং বলিল,—

"ওঠ, শীগগির ওঠ, খিচুড়ী রান্না করেছি। গরম গরম খাবে এস। এই জলে খিচুড়ী খেতে ভারি মজা। সঙ্গে ইলিস মাছ ভাজা, আলু ছেঁচকী ও ডিমের মামলেট। ঠাণ্ডা হলে সব মাটী হয়ে যাবে কিন্তু।"—

সে ধ্যানস্তিমিত লোচনে দেখিতেছিল বর্ষার মুক্তকেশী রূপ; তার মধ্যে এ কি বাস্তবতা! একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। পূর্ব্বে যাহা কখনও করে নাই, আজ তাহাই করিল। স্ত্রীকে অপমান করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল ও ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল।

খিচুড়ী সেদিনকার মত কাহারও মুখে উঠিল না। নর্দ্দামায় গড়াগড়ি গেল।

বাহিরের মেঘ কাটিয়া গেল, কিন্তু মনের মেঘ কাটিল না।

পরিতোষ পরদিনই গাড়ী করিয়া স্ত্রীকে বাগবাজারে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিল।

ইহার পর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীতে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। একজন তাহার ছবির খেয়াল লইয়া রাত দিন কাটাইয়াছে।—আর একজন কেবল ভাবিয়াছে যে, সে এমন কি করিয়াছে যার জন্য তার ভাগ্যে বিধাতা এমন গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।

পরিতোষকে এখন কেউ আর বিরক্ত করে না। আপন খেয়াল মত ছবি আঁকে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আহার্য্য ঢাকা থাকে। ইচ্ছা হয় খায়, নতুবা যেমন তেমনি পড়িয়া থাকে। আজ জীবনের ভাঁটার মুখে পৌছিয়া একবার ভাবিতে হইল। এই যে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সে চিত্রের সাধনা করিল, জীবনের সকল সুখ, সকল সম্ভোগ ত্যাগ করিয়া, একাগ্রচিত্তে ইহার তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছে তাহার ফল কি দাঁড়াইল? কোন প্রদর্শনীতে সে নাম করিতে পারিল না—তার একখানি ছবিও বিখ্যাত হইল না। অর্থাগম দূরে থাকুক, তাহার পিতৃদত্ত যে পুঁজি-পাটা ছিল তাহাও প্রায়

নিঃশেষিত। তাহার বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, জগতে সে একাকী। সুখ দুঃখের ভাগী একমাত্র যে স্ত্রী তাহাকেও সে নিজ হইতে ত্যাগ করিয়াছে। আজ যৌবনের সে উৎসাহ নাই মনের সে দৃঢ়তা নাই। জগৎ আজ আর রঙীন স্বপ্ন দেখায় না।

একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাহিরে যাইয়া দেখিল, বর্ত্তমান জগতের সহিত সে পরিচিত নহে। উহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চলন সমস্তই ভিন্নরূপ। যেন সেই কোন সুদূর প্রাচীন কালের নিদর্শনস্বরূপ একা রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানের সহিত তার কোন যোগই নাই।

আজ বহুদিন পরে তার স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। এই আশাভঙ্গ নিঃসঙ্গ অবস্থায় মনে হইতে লাগিল, তার সেই সদা হাস্যময় প্রফুল্ল মুখখানি, তাহার সেই চঞ্চল গতি, প্রতি কার্য্যে তাহার কাছে ছুটিয়া আসা, তাহার খাওয়া-পরা প্রভৃতি সর্ব্ব কার্য্যে তার প্রাণের গভীর ব্যাকুলতা। পৃথিবীর আর সবারই মত যে সুখ তার করায়ত্ব ছিল আজ তাহা সুদূরে।

সে ভাবিতে লাগিল। চিত্রাঙ্কণে তাহার আর উৎসাহ রহিল না! যে নেশায় ভরপুর হইয়া সে থাকিত তাহা আজ কাটিয়া গিয়াছে। দিন আর কাটে না। চারিদিকের কোন কিছুই তাহার সহিত খাপ খায় না। এমন জীবন যে কি দুর্ব্বিষহ তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে কল্পনাও করিতে পারে না। যদি আত্মহত্যা করিবার মত সাহস তাহার থাকিত তবে বোধ হয় তাহাই করিত।

তবে কি বিনাদোষে পরিত্যক্ত তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিবে? তাহার সেই রূঢ়, হৃদয়হীন ব্যবহারের পর আর কি সে ফিরিয়া আসিবে? কে জানে আজও জীবিত আছে কি না। এক দিনের তরেও ত তাহার সংবাদ লয় নাই। এই সব ভাবনায় সে পাগলের মত হইয়া উঠিল। এক একবার উঠিয়া দাঁড়ায়, দুচার বার পায়চারী করে, মোহাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া পড়ে। চিন্তার বিরাম নাই, শেষ নাই।

তাহার স্ত্রীর কাছে যাওয়াই শেষে স্থির করিল। তাহার নিকট অকপটে ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। যদি সে ক্ষমা না করে, যদি তাহার মত পশুর সহিত আসিতে স্বীকৃত না হয়?

সে আর ভাবিতে পারে না। যাহা হয় হইবে। সে যাইবেই। পরের কথা পরে ভাবা যাইবে।

সে জামা গায় দিয়া বাহির হইল। ফটকের বাহির হইয়া একবার গৃহপানে ফিরিয়া দেখিল। প্রথমে ধীরে ধীরে চলিল, পরে দ্রুত পদে যাইতে লাগিল।

কতকাল সে বাগবাজারে যায় নাই। যদিও এদিকে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই তথাপি যেন সবই নূতন বলিয়া মনে হইল। কম্বুলী টোলায় আসিয়া তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। গলিতে ঢুকিতেই সমস্ত দেহ যেন অসাড় হইয়া আসিল। একটি বাটীর রোয়াকে বসিয়া জিরাইয়া লইল। একবার মনে করিল আর কাজ নাই, ফিরিয়াই যাই। তাহাও পারিল না। উঠিয়া আবার চলিল। যখন তাহার শ্বশুর বাড়ীর দোর গোড়ায় পৌছিল তখন বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে!

কাহাকে ডাকিবে? সে বাটীতে তাহারাই আছে কিনা কে বলিবে? তাহার স্ত্রীর ছোট ভাই নরু—সে তখন মাত্র চার বছরের। এখন সে রীতিমত জোয়ান হইয়াছে নিশ্চয়। তাহাকেই চিনিতে পারিবে কি? না, ডাকা আর হইল না। ফিরিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ফিরিয়াই বা যাইবে কোথায়!

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংগ্রহ করিয়া ডাকিল—,

"নরু, বাড়ী আছ?"

ভাগ্যক্রমে সে তখন গৃহেই ছিল এবং দিদির সহিত গল্প করিতেছিল। সহসা বহুদিন বিস্মৃত সেই পুরাতন স্বরের সাড়া পাইয়া সুষমা চমকিয়া উঠিল,—ভাবিল নিশ্চয় শুনিতে ভুল হইয়াছে। সে আজ কত দিন! এও কি কখন সম্ভব?

আবার ডাক পৌছিল,—

"নরু, বাড়ী আছ কি?"

না, সেই পরিচিত কণ্ঠই ত মনে হয়। আর কেই বা ডাকিতে আসিবে? নরু সাড়া দিয়া বলিল,—

"কে?"

অজ্ঞানিতে দিদি তার হাতখানি ধরিল। সহসা কথা জোগাইল না। কেবল বলিল,—

"নরু, ভাই"

"দিদি—"

"যাত ভাই নীচে, তুই বোধহয় চিন্তে পারবি না। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে—হয়ত হরতকী বাগান থেকে এসেছেন। হয়ত বা আমারই ভুল। তবুও যেন তাঁরি স্বর বলে মনে হচ্ছে। ভাই, সাবধানে পরিচয় নিস্। কোন রকম অনাদর করিস্ নে যেন। কি মনে করে যে এলেন জানি না। আর দেরী করিস্ নে, যা ভাই, কিন্তু দেখিস্ খুব সাবধান। তখন তুই এইটুকু, তোর ত চেনবার কথা নয়।"

আজ কত কথাই মনে হইতে লাগিল। কত আশা উৎসাহ লইয়া সে জীবন আরম্ভ করিয়াছিল আর এই দীর্ঘ কুড়ি বাইস বৎসর তাহার উপর দিয়া কি ঝড়ই না প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া গিয়াছে। কি নিদারুণ নিষ্ফলতা!

নরু নীচে যাইয়া পরিতোষকে চিনিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই আপনার?"

তুমি নিশ্চয় নরু, কারণ মুখের সেই সাদৃশ্য স্পষ্টই দেখছি। তুমি আমায় চিনতে পারবে না। তখন তুমি কতটুকুই বা ছিলে! পরিতোষ বাবুর কথা বোধ হয় অনেকই শুনেছ, আমিই সেই গুণধর নরাধম পশু। তোমার দিদির সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছি। যদি দয়া করে দেখা করেন—আচ্ছা, তিনি বেঁচে আছেন ত? ভাল আছেন ত? এই কথা বলিতে বলিতে তিনি একেবারে হাঁপাইয়া উঠিলেন।

"আপনি যে হাঁপিয়ে উঠলেন। বসুন এখানে একটু, এই যে একখানা পাখাও রয়েছে; আপনি চিন্তা করবেন না—তিনি বেঁচে আছেন সত্য তবে ভাল যে নাই তাত বুঝতেই পাচ্ছেন?"

—"ভাল নেই! তবে একরকম মেরেই ফেলেছি। হে ভগবান্!"

তিনি দুই হাত মুখে ঢাকিয়া আরও বেশী হাঁপাইতে লাগিলেন।

"আপনি যে একেবারে অস্থির হলেন। একটু ঠাণ্ডা হন, আপনাকে উপরে নিয়ে যাচ্ছি।"

"ঠাণ্ডা হব! আর কি ঠাণ্ডা হবার উপায় রেখেছি? এই ছাখ—"এই বলিয়াই নরুর হাতখানা টানিয়া আনিয়া তাহার বুকের উপর রাখিলেন।

নরু দেখিল—হৃৎপিণ্ডের কি দ্রুত স্পন্দন হইতেছে!

উহাদের দেরী দেখিয়া সুষমা উপরে আসিতে পারিল না। এক পায়ে, দু পায়ে নীচে নামিয়া আসিল। উহাদের কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারিল, তাহার স্বামীই আসিয়াছেন। যখন নরুর হাত ধরিয়া বুকের উপর লইলেন, তখন আর আড়ালে থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া একেবারে স্বামীর পায়ের উপর পড়িল।

পরিতোষ তাহাকে তখনই উঠাইয়া বলিল,—

"এ তুমি কি কচ্ছ? আজ আমি এসেছি তোমার পায় ক্ষমা ভিক্ষা করতে। তোমার উপর যে নির্য্যাতন, যে অবিচার করেছি তার জন্য মাফ চাইতে—

"এ সব তুমি কি বলছ? তুমি স্বামী, চিরনমস্য।"

"হ্যা যে স্বামী তোমার জীবন বিষময় করেছে, যে স্বামী তোমায় বিনা কারণে গৃহবহিষ্কৃত করেছে, যে স্বামীর অপরাধের শেষ নাই—"

"তবুও তুমি স্বামী! আজিও তোমারই অপেক্ষায় তোমারই পথপানে চেয়ে এ জীবনের ভার বইছি! ভেবেছিলাম, হয়ত তুমি একদিন আসবে। আজ তুমি কি সত্যই এসেছ? এ সুখ কি আমার সইবে? আজীবন দুঃখী আমি।"

"আমি যে এসেছি তাতে কি এখনও সন্দেহ আছে? কিন্তু তুমি কি এই পাষাণ-প্রাণ অপদার্থ স্বামীকে গ্রহণ করতে পারবে? তার সকল দোষ মার্জ্জনা করে তার অবশিষ্ট জীবনকে ধন্য করবে?

"আবার ঐ কথা! আমি যে চিরদিনই তোমারি।"

পৃথিবীর মঙ্গল সাধনায় মহাত্মা গান্ধী*

অদ্য রাত্রিতে আমরা এখানে মিলিত হইয়া জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য মানবের নিকট গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমরা আশা করি, আমাদের জীবন-কালের মধ্যে তাঁহার দর্শনলাভ করিব। আমাদের এ-যুগে অন্তঃসার শূন্য লোকের সংখ্যা বহু হইলেও প্রকৃত মহাপুরুষের সংখ্যা অতি অল্পই। যেমন বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, ডারুইন, নেপোলিয়ান ও লিঙ্কন বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনই কোনও মহাপুরুষ তাহার যুগকে চমৎকৃত করিয়া দেন। মানবের চিরন্তন স্বভাব এই যে, সাধু, দয়ালু ও অধ্যাত্মশক্তি সম্পন্ন মানব, হীন, ও রক্ত-পিপাসু বড়লোকের অপেক্ষা তাঁহার সমসাময়িক জন-গণকেই অধিকতরভাবে চমৎকৃত করেন।

অতএব আমরা, যাহারা ভারতবর্ষের এই মহামানবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, যদি জগতের বহুলোকও তাঁহাকে করুণার চক্ষে দেখে, কখনও বিচলিত হইব না। এই সকল লোক, যাহারা তাঁহার প্রতি এখন অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের পুত্র-কন্যাগণ তাহাদের সঙ্কীর্ণচেতা পূর্ব্বপুরুষগণের উপর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ন্যায় মহাপুরুষের যুগে বসবাস করিবার জন্য হিংসা প্রকাশ করিবে।

ভারতবর্ষের জন্য গান্ধীজী যে বিরাট কার্য্য করিয়াছেন, জগতের দ্বিতীয় জনবহুল মানব সমাজকে অর্থনৈতিক একতায় আবদ্ধ করিয়া যে কি বিরাট জাতিতে পরিণত করিতেছেন, আজ তাহা সমগ্র পাশ্চাত্যবাসীর অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা এখনও জানি না যে, এই বিরাট মস্তিষ্ক ও তেজোময় আত্মা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য কি গভীর সাধনাই করিতেছে এবং আমরা ইহাও জানি না যে, এই শ্রেষ্ঠ মানবের হৃদয়ে কি গভীর শক্তিই নিহিত রহিয়াছে।

গত ১৯২২ সালে সংবাদপত্র পাঠে আমরা প্রথমতঃ গান্ধীজীর নাম জানিতে পারি। তখন এক নূতন মহাদেশের সূচনা এবং পাশ্চাত্য জগতের স্থাপিত অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দুইটি দেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে; একটি চীনদেশে পুরাতন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং অপরটি দক্ষিণ আফ্রিকায় দাসত্বের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর নিষ্ক্রিয় শান্ত সংগ্রাম। আমরা শুনিয়াছিলাম যে, অক্সফোর্ডের একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় আইন ব্যবসায়ী দেশময় অদ্ভুত শক্তিতে সহস্র সহস্র নরনারীকে এমন-ভাবে চালিত করিতেছিলেন যে, গভর্ণর জেনারল স্মাটস্ স্বাধীনতার চুক্তিপত্রে সহি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমরা বহুদিন পর্য্যন্ত আর গান্ধীজীর নাম শ্রবণ করি নাই, পুনরায় যখন তাঁহার নাম শুনিলাম, তখন বৃটিশ জাতি তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহাদের স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া গান্ধীজী যেন ভারতের প্রজাবৃন্দকে বিরাট যুদ্ধে বৃটিশের ন্যায়পরতা বুঝাইয়া দেন এবং জার্ম্মাণীকে পরাজয় করিবার জন্য ভারতবাসীকে অর্থ ও প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রবুদ্ধ করেন।

অতঃপর ১৯২২ সালে আবার শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহারই প্রেরণায় সমগ্র ভারতবর্ষ বৃটিশের সাময়িক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য, সেনাপতিগণের দ্বারা নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য এবং মানবজীবনের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার ন্যায়-সঙ্গত দায়িত্বের উপর পদাঘাত করিবার জন্য ভীমগর্জ্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহারা দেশের বে-সরকারী জাতীয় কংগ্রেস তাঁহার উপর অধিনায়কত্ব প্রদান করেন এবং জাতীয় সেনাদল তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ

* বিখ্যাত লেখক মিঃ আপ্টন স্রোজের মহাত্মা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা।

হন। অতঃপর সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ চমকৃত হইয়া পড়িল যখন তাহারা শুনিতে পাইল যে, এই মানবশ্রেষ্ঠ এই সর্ত্তে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে গোলা গুলি অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি হিংসাপূর্ণ দ্রব্যের ব্যবহার চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিতে হইবে। তিনি বৃটিশ সম্রাটের নিকট তৎপ্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যর্পণ করিয়া এই শেষ ঘোষণা প্রকাশ করেন,—

"আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দ্বারাই আমরা আপনাকে জয় করিব।"

তাঁহার এই বাণীতে তদানীন্তন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেমসফোর্ড তাঁহাকে শুধু "নির্ব্বোধ" আখ্যাই প্রদান করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, আজ যাঁহারা এখানে গান্ধীজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে মিলিত হইয়াছি, আমরাও আমাদের রক্ষাকর্ত্তাগণের অমোঘ বাণী—'যাহারা তরবারি ধারণ করিবে, তাহারা তরবারি আঘাতেই বিনষ্ট হইবে' অথবা আমাদের বংশ-সম্ভূত মহাপুরুষের বাণী—'তরবারি অপেক্ষা লেখনীর শক্তি অধিকতর' অন্তর হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছি। বেশী-দিনের কথা নহে, যখন আমরা শুনিতে পাইলমে যে, গান্ধীজী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, আমাদের সংবাদ পত্র সদম্ভে প্রচার করিল যে, ইহা আধ্যাত্ম শক্তির বিরুদ্ধে বিফল সংগ্রাম।

গত কয়েক মাসের মধ্যে আমরা আরও সংবাদ পাইয়াছি, সম্ভবতঃ আমাদের হৃদয় গান্ধীর অপেক্ষাও সরল ও পুরাতন। সাদা টুপী-পরিহিত নিরস্ত্র জনমণ্ডলীর নিকট সুশিক্ষিত সৈনিকদলের ও বৈজ্ঞানিক ধ্বংসকারী যন্ত্রাদির পরাজয়ের পর আমাদের আর তাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল বিশ্বাস নাই। আমরা এখন আর রাজকীয় পরিচ্ছদ ও রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের জাঁকজমক দর্শন করিয়া গর্ব্ব বোধ করি না। কারণ এই সকল জাঁকজমকের অধিকারীবৃন্দকে সমভাবে এমনই একজন মানবের সমক্ষে যাইতে হইবে, যাঁহার পরিধানে কটিবাস, যিনি ভ্রমণ করেন তৃতীয় শ্রেণীতে। আজ যে সকল ব্যক্তি আমাদের এই বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

আজ আমরা আমাদিগকে লইয়া ভীষণ ভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। আজ গান্ধীজী যদি আমেরিকায় আগমন করিতেন সমগ্র আমেরিকাবাসী শ্রদ্ধায় নতশির হইয়া কি বিরাট বিপুলভাবে যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিত, তাহা বোধ হয় আমেরিকার ইতিহাসে কখনও সম্ভবপর হয় নাই।

গান্ধীজী আমাদের বৃটীশ ভ্রাতৃগণের উদ্দেশ্যে কি বাণী প্রচার করিতেছেন? এই বৃটীশ জাতিই তাঁহার মহাদেশে যিশুখৃষ্টের অহিংসা প্রচার করিয়াছিল, আবার এই জাতিই সেই মহাদেশে হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কি ভীষণ বৈজ্ঞানিক উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন! গান্ধীজী সমগ্র জাতির মধ্যে এক নূতন বিপ্লব সৃষ্টি করিবার জন্য এই ব্রহ্মাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন। আজ ভারতবর্ষে আমরা এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, দেশের অস্ত্রশস্ত্র আত্মার অস্ত্রের নিকট তাহার বিরাট সাধকের সমক্ষে সম্পূর্ণভাবে পরাজয় স্বীকার করিতেছে।

শরতের প্রারম্ভে বৃটিশ কারামুক্ত ব্যক্তিগণ, লণ্ডনে এক সম্মেলনে মিলিয়া ইংরাজ জাতি ও ভারতবাসীর মঙ্গলার্থে যে সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন, তাহার আলোচনায় যোগদান করিবেন। অদ্য রাত্রিতে আমরা এখানে মিলিত হইয়া এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি যে, ভারতের মহান্ আত্মা যেন সেই ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মহা সম্মেলনে শক্তি ও বুদ্ধি বজায় রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে এবং আমরা আরও আশা করি যে, তাঁহাদের সাহস যেন বৃটিশ রাজনীতির নিকট কখনও পরাভূত না হয়।

ইংলণ্ড যদি বিচক্ষণতার সহিত ভারতের এই দাবীতে ত্যাগ স্বীকার না করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় তাহার সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে।

সমগ্র বিশ্বের নিকট গান্ধীজীর কি বাণী? অথবা আমাদের নিকটই বা তাঁহার কি বাণী? মানব ধর্ম্ম সম্বন্ধে রুশিয়ার মহান্ আত্মা টলষ্টয়ের নিকট হইতে তিনি প্রেরণা গ্রহণ করিয়াছেন। নব ইংলণ্ডের নিকট হইতে তিনি গুণ্ডামির ও রাজকর্ম্মচারীদের হীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে গান্ধীজী এই

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে খৃষ্ট ও টলষ্টয়কে আনয়ন করিয়াছেন।

গান্ধীজীর সংগ্রাম শুধু ভারতীয় জাতি ও তাহার বিজেতাগণের মধ্যে নহে। এই সংগ্রাম মানবত্ব ও সমাজতান্ত্রিক অত্যাচারের মধ্যে। ইহা পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এশিয়ার বিরাট অভিযান। ইহা আমেরিকা ও ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার, যে কৃষি ও শ্রমের মধ্যে মিলন স্থাপিত না হইলে তাহারা আর বাঁচিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষ ও আয়র্ল্যাণ্ড—মহাত্মা গান্ধী এবং জর্জ্জ রাসেলই গ্রাম্য কৃষি ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্য প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। সমগ্র জগতের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ—যিনি রাজনীতিক সততা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই মহাপুরুষের বাণী দিকে দিকে প্রচারিত হউক, তিনি বলিয়াছেন—"জয়ের মঙ্গল মুহূর্ত্ত সমাগত, যখন ক্ষমতাপন্ন দলের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে আর কোন শব্দও উচ্চারিত হইবে না—যখন ভারতের সমস্ত ধ্বংসকারীর অস্ত্র শস্ত্রে মরিচা পড়িতে থাকিবে।"

ইহা ব্যতীত আরও কোন সত্য বাণী আছে কি?

আজ জগতের মধ্যে তিনিই নূতন জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, কারণ তিনি এমন পন্থা অবলম্বন করিয়া জাতিকে গঠন করিতে চাহেন যাহাতে শাসিত জনগণ সাধু হইয়া সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সাম্য অর্জ্জন করতঃ শাসন শক্তির সহিত প্রেমের বন্ধনে মিলিত হইতে পারে। তিনি প্রকৃতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি জাতির স্বাধীনতার আশাও পরিত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে একটি অতি সামান্য হিংসাবৃত্তিও অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহেন। গান্ধী ভারতবর্ষ ও গ্রেট বৃটেনে যিশুখ্রীষ্টের ন্যায় জীবিত রহিবেন।

অভিমানিনী

শিল্পী — শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা (রায়) সৌজন্যে

৫ম বর্ষ | ভাদ্র—১৩৩৮ | ৫ম সংখ্যা

বাঁচিবার অধিকার

ভারতে আজ যে স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ চেষ্টা চলিতেছে—ইহার মূলে মানবের জন্মগত অধিকার লাভ তথা মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইবার চেষ্টাই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আজ ভারত যদি তাহার এ বাঁচিবার অধিকার ঠিক করিয়া লইতে না পারে তবে অ-দূর বা সু-দূর ভবিষ্যতে ভারতীয়দের চিহ্ন কি ভাবে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে তাহা ভবিষ্যতজ্ঞ বলিতে পারেন।

আজ ভারতবাসী এই সন্ধি-মুহূর্ত্তে তাহার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আপ্রাণ নিয়োগ না করিয়া অন্য কোন ভাবে যদি নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে যায় তবে বিশ্বের চোখে সে তো নিন্দিত হইবেই তা-ছাড়া ভবিষ্যতে নিজের নিশ্চিহ্ন হইবার পথও মুক্ত করিয়া দিবার সহায়তা করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

আজ যে অন্ন-সমস্যায় ও অর্থ-সঙ্কটে সারা-বিশ্ব টলটলায়মান ও যাহার তাড়নায় অন্যান্য দেশ রাজনীতিতে তোলপাড় সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে—বিশ্ব-রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিরাট সংঘাত আরম্ভ হইয়াছে—ভারতীয়দের অবস্থা এই সঙ্কট-কালে আরো সঙ্কটাপন্ন হইলেও তাহারা এ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার কি উপায় আজ পর্য্যন্ত রাজনীতি বা দেশনীতিতে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে—কি সু-ফল সে ইহা হইতে লাভ করিয়াছে?

দেশের হাহাকার—অন্নাভাব—অর্থাভাব কোন বিশেষ সম্প্রদায় লক্ষ্য করিয়া আসে না—ইহা আসে সার্ব্বজনীন ভাবে—দেশে যে বাস করে তাহারই উপর দিয়া। বিপদ্‌কালে সাপে ভেকে, বাঘে গরুতেও শত্রুতা থাকে না—মিত্রভাবে সকলেই বিপদ্‌মুক্ত হইবারই চেষ্টা করে।

ভারতের এ সঙ্কট-কালে এই সন্ধিক্ষণে আজ সম্প্রদায় বা জাতিগত স্বার্থ ভুলিয়া ভারতবাসী হিসাবেই একত্র হইয়া ভারতীয় ভাবে পরিচিত যদি ভারতবাসী হইতে পার তবেই হাহাকার-মুক্ত, সুস্থ সবল জাতি হিসাবে স্বায়ত্ত-শাসন তথা বাঁচিবার দাবী তোমরা করিতে পারিবে, বাঁচিতেও পারিবে—কিন্তু তাহা যদি না পার তবে ভারতকে মরুভূ করিয়া কিম্বা অগাধ সলিলে ডুবাইয়া—জাতি নহে সম্প্রদায়ের কঙ্কাল হিসাবে ভারত-শ্মশানে ভ্রমণের অধিকারই তোমার থাকিবে—ভারতীয় জাতি হিসাবে বিশ্বের সম্মুখে উন্নত মস্তকে কোন দিনই দাঁড়াইতে পারিবে না—বাঁচিবার অধিকার হারাইতে হইবে।

স্মৃতির পূজা

গল্প

অধ্যাপক—শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

মানুষ যে কোথা হতে কোথায় চলে যায়, তাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রা যে উপন্যাসের মতই রহস্যপূর্ণ, তা আমার জীবন দিয়েই বুঝতে পারি। এতদিন মনে করতাম উপন্যাসের ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই মনগড়া, ওর ভেতর সত্যের কোন সন্ধান পাবার উপায় নেই; আজ আমার নিজের জীবনের কথা থেকেই সে ভ্রম দূর হয়েছে। একদিন ছিলাম জ্যোতিঃদির বন্ধু;—জ্যোতিঃদির কাছে জগদীশবাবুর সব কথা শুনেছি; শুনে মনে করেছিলাম, যদি জগদীশ বাবুর সহিত কোনদিন দেখা হয়, তবে তাঁকে এক চোট বকে দিব; মেয়েদের মনে কষ্ট দেওয়ার যে কি মজা তা বুঝিয়ে দিব। কিন্তু একথা ভাবতেই পারি নাই, একদিন সত্যি সত্যি জগদীশ বাবুর সহিত দেখা হবে। কালের এমন পরিবর্ত্তন, বিধাতার এমন লিখন যে, জ্যোতিঃদির বন্ধু "বেলা" আজ জগদীশ বাবুর বৌদি হয়ে এসেছি।

জ্যোতিঃদির সহিত আমার যেমন বন্ধুত্ব ছিল, দুদিনের মধ্যে জগদীশ বাবুর সহিতও আমার তেমনি বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এমন সহজ সরল মানুষ জগদীশবাবু! না আছে তার মান অপমানের জ্ঞান, না আছে খাওয়া পরার খেয়াল, না আছে নিজের শরীরের দিকে নজর, কেবল দেশসেবার একটা খেয়াল তার মাথায় চেপেছে। খদ্দর পরেন, খদ্দরের সাধারণ বেশভূষা। বাড়ীতে কিছুরই অভাব নেই। মাসে হাজার টাকা ব্যয় করে বাড়ীতে বসে খেলেও তার কোন দুঃখ নাই, তবু সে তা করবে না। বড়লোকের ছেলে হয়েও সাধারণ মানুষের মত সে থাকবে। মান-অহঙ্কার একদম তার নেই। এই জন্যই দশ জনের মধ্য হতে তাকে বেছে নেওয়া চলে সহজে। এই সহজ সরল ভাবের জন্য সবাই তাকে ভালবাসে। এই জন্যই বোধ হয় জ্যোতিঃদি তাকে এমন করে ভালবেসেছে।

টাকা পয়সা খাওয়া-দাওয়া কিছু দিয়েই কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু সে ভালবাসার কাঙ্গাল। যে তাকে ভালবাসবে সেই তাকে ধরে রাখতে পারবে। এই জন্যই জ্যোতিঃদির মা তার কাছে এত প্রিয়। জ্যোতিঃদির মা বাস্তবিকই প্রাণ ঢেলে ভালবাসে জগদীশবাবুকে, এই জন্য জগদীশবাবু জ্যোতিঃদির মাকে অবহেলা করতে পারে না; এই জন্যই জ্যোতিঃদির মা তার কাছে সব চেয়ে বেশী আপন। জ্যোতিঃদির মার পরে আর কেউ যদি জগদীশবাবুকে ভালবেসে থাকে, তবে সে জ্যোতিঃদি। জ্যোতিঃদি জগদীশবাবুকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আর জগদীশবাবুও তাকে হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে ভালবাসে। আমি আজ বলব, জ্যোতিঃদির যদি কেউ বর হবার উপযুক্ত হয়, সে জগদীশবাবু। কেন যে জ্যোতিঃদির মা ওদিগকে বিয়ে দিচ্ছেন না, তা আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। জ্যোতিদির মা কি বুঝছেন না যে, সামাজিক যত বাধাই থাক না কেন,—প্রেমের কাছে তার মূল্য নগণ্য। এরা দুটি প্রাণী একে অন্যকে কেমন করে ভালবাসে তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। যদি সামাজিক নিয়ম মেনে ওদের জীবন দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তবে কি এরা জীবনে আর সুখী হতে পারবে! হয়তো জ্যোতিঃদি তার স্বামীকে জীবনে ভালবাসতেই পারবে না; আর জগদীশবাবু—সে হয়ত বিয়েই করবে না, জীবনে।

বিয়ে হওয়ার পর প্রথম শ্বশুর বাড়ী আসার পর জগদীশ বাবুর সহিত বন্ধুত্ব হল। তাই নূতন জায়গায় এসেও কোন কষ্ট হল না। কিন্তু জগদীশবাবুকে পেয়ে আমি খুব খুসী হয়েছিলাম এবং জ্যোতিঃদির সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারব বলে, তাকে আরো বেশী করে আপন করে নিলাম। মাঝে মাঝে দেখ্‌তাম, জগদীশবাবু একা একা বসে যেন কি করেন। অবশেষে জানালার ফাঁক দিয়ে একদিন দেখতে পেলাম জ্যোতিঃদির ছোট একখানা ফটো চুপে চুপে বের করে চুমু খাচ্ছে—আর বিহ্বল হয়ে ফটোকে বুকে চেপে ধরছে।

আবার ফটোকে মালা পরিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। বুঝলাম, এ জ্যোতিঃদিকে ধ্যান করা হচ্ছে।

আমি যে জ্যোতিঃদির বন্ধু একথা এখনও জগদীশ-বাবুকে জানতে দেই নাই। জগদীশ বাবুর কাছ হতেই সব কথা একে একে বের করে নেব বলে জাল পাততে লাগলাম।

একদিন বিকাল বেলা বাগানে গিয়ে দেখি জগদীশ বাবু বসে বসে বকুল ফুলের একটি মালা গাঁথছেন, আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে বললাম, "কে এমন ভাগ্যবতী যার গলায় এমন নিপুণ হাতের গাঁথা নিপুণ মালাটি পরবে?"

"ও-কথাটি আমি যদি আপনাকে বলতাম তবেই শোভা পেত।" এই বলে জগদীশবাবু হেসে উঠলেন।

"আমাকে আর বলতে হবে না। আমরা মালা পরালেও পরাই, না পরালেও পরাই, তার ভেতর বিশেসত্ব কিছু নেই ঠাকুর-পো। ভয় হয় এই সব অবিবাহিত ঠাকুরপোর দল দেখলে। আর দুঃখও হয়, —তা বলুন, কোন স্বপ্ন-সুন্দরীকে অভিসারে ডেকে এনে এমালা গাছটি পরাবেন?"

জগদীশ বাবু কোন কথা বললেন না। চুপ করে মালা গেঁথে চললেন, যেন এসবে তার কোন রুচি নেই, তাই আমি তাকে বললাম, "অতি সাধুতা চোরের লক্ষণ।"

"একথা বলছেন কেন বৌদি?" মালা গাঁথা তার ক্ষণেকের জন্য বন্ধ হল।

"আপনাকে দেখে জ্যোতিদির কথা মনে পড়ে গেল। সেও আপনার মত চুপটি করে থাকত, একদম সোজা শান্ত মেয়ের মত। কিন্তু একদিন জানতে পারলাম, এই সোজা শান্ত মেয়েটি ত কম নয়।" আমার মুখে জ্যোতিঃদির নাম শুনে সে সম্বন্ধে আরও জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মালা গাঁথা তার বন্ধ হল।

আমি তার কথায় কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে জ্যোতিঃদির বিষয় চাপা দিতে চেষ্টা করতেই জগদীশবাবু বললেন, "কে আপনার জ্যোতিঃদি?"

"সে সম্বন্ধে শুনে আর লাভ কি হবে! আপনার মতই সে একটি চাপা মেয়ে। কোন একটি যুবককে সে ভালবাসে। ভদ্রঘরের মেয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল।" আমি একটু মুচকে হেসে জগদীশ বাবুর মালা গাঁথায় সাহায্য করতে লাগলাম। জগদীশবাবু কিন্তু আমার এ হাসির অর্থ বুঝতে পারলেন না।

জগদীশবাবুর প্রাণে একটা চঞ্চলতার ঢেউ খেলে গেল। তিনি বললেন, "তার বিয়ে হয়েছে বৌদি?"

"তা তো বলতে পারলাম না। হয়ত হয়েছে!"

"যাকে ভালবাসত তার সাথে?"

"সে খবরত আমি পাইনি।" বলেই জগদীশ বাবুর মুখের দিকে তাকাতেই দেখি, তার মুখখানা অনেকটা মলিন হয়ে গেছে।

"কাকে ভালবাসত আপনার জ্যোতিঃদি?"

"তা আপনার জেনে লাভ কি?" একটু মুচকে হাসলাম।

"বলুনইনা বৌদি! তাতে আর দোষ কি?"

"যাকে সে ভালবাসত তার নাম জগদীশ বাবু।"

জগদীশবাবু চমকে উঠে বললেন, "কোন জগদীশবাবু?"

"তা দিয়ে আপনার দরকার কি? আপনি ত আর নন্!"

"তবু বলুন না।"

"আপনার এত জানবার আগ্রহ কেন ঠাকুরপো! তবে আপনি কোন জ্যোতিঃকে ভালবাসেন বুঝি?"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখে চোখে একটা ব্যাকুলতার ছায়া এসে পড়ল। চুপ করে থাকতে দেখে বললাম, "বলুন না, ভালবাসাত একটা খারাপ কথা নয় যে, বলতে লজ্জা পেতে হবে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জগদীশবাবু বললেন, "তাকে আমি ভালবাসি কিনা বলতে পারি না, তবে এক জ্যোতিঃকে আমি জানি।"

"বলুন না, কে সে ভাগ্যবতী জ্যোতিঃ—যদি সে আমার জ্যোতিঃ দিদি হয় তবে ঘটকালীর টাকাটা আমরাই প্রাপ্য হবে।"

জগদীশ বাবু জ্যোতির যে পরিচয় দিলেন, সে জ্যোতিঃ আমারই জ্যোতিঃদি। আমি তার কথা শুনে বললাম, "এযে আমারই জ্যোতিঃদি, তবে জ্যোতিঃদি আমায় যা বলেছেন, সব সত্য।"

"কি বলেছে আপনার জ্যোতিঃ দি?" জানবার জন্য

জগদীশ বাবু আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। জ্যোতিঃ দি আমায় যা যা বলেছিল, তা সবই জগদীশ বাবুকে বললাম। তার পর জিজ্ঞেস করলাম, "আমি যা বললাম, সব ঠিক ঠাকুর পো ?"

"সব ঠিক, এর ভিতর কিছুই অসত্য নেই। কিন্তু এর পর যে আরো অনেক হয়েছে, তা আপনি শুনেন নি বুঝি। আচ্ছা আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব।"

"তা শুনব। কিন্তু আপনি তাকে বিয়ে করেন না কেন ? সে যে আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছে !"

"বিয়েতে আমার কোনই অমত নাই বৌদি, তার মারও কোন অমত নেই। একথা তার মা মুখ ফুটে না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, জ্যোতিঃ আপনাকে যা বলেছে তার পরের কথাগুলি বললেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।"

* * * *

"কেমন করে জ্যোতির সহিত আমার পরিচয় হল, কেমন করে আমাদের দুটি হৃদয় ধীরে ধীরে বিনাসূতার মালা গেঁথে চলছিল হৃদয়ের বিনিময়ে, তা আপনি শুনেছেন। জ্যোতিকে আমি ভালবাসতাম কিনা তা আমি জানিনা। হয়ত মনের কাছে থেকে তার কোন সাড়াও পাইনি। বিয়ে আমি করব না এটি ছিল আমার পণ, কিন্তু জ্যোতিঃকে দেখে কেন যেন আমার ভাল লাগত। ওর হরিণ-চোখ দুটি যখন আমার চোখের উপর ফেলত, তখন কি আনন্দ না আমার হত। মনে হত ওর চোখ দুটি সারা জীবন এমন করেই দেখি।

"বিয়ে করতে না চাইলেও কত সুন্দরী মেয়ের সাথে যে আমার পরিচয় হয়েছে, আলাপ হয়েছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা সৌন্দর্য্য হয়ত নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা করলে জ্যোতির চেয়ে শতগুণ বেশী, তাদের মাতা-পিতা আমার অগোচরে, গোপনে বিয়ের কথাও বলেছেন। অনেকে তাদের স্কুলে পড়া মেয়েকে আমার সাথে মিশতে দিয়েছেন, উদ্দেশ্য, আমাকে আপন করে নিতে চান তাদের মেয়ে দিয়ে। কত মেয়ের সাথেইত মিশেছি—কেউ কিন্তু আমার মনকে দোলা দিতে পারে নাই,—হাজার মিশামিশিতেও। তাদের মেয়ের সাথে বিয়ে হতে আমার কোন বাধাও ছিল না,—সমাজের দিক থেকেও না আমাদের নিজের দিক থেকেও না ; এত সুযোগ সত্বেও সেই সব সুন্দরী যুবতী মেয়েদিগকে আমি উপেক্ষা করে এসেছি। আর জ্যোতিঃকে যখন এগার বছরের দেখি, তখনই ভাল লেগেছিল—সবচেয়ে ভাল লাগত তার হরিণ-চোখ জোড়া।

হয়ত তাকে ভাল বাসতাম নিজেকে নিস্ব করে দিয়ে, হয়ত বিয়ে করে তাকে পাব একথা আমার মনে একদিনও উঠত না, যদি তার মা সেই কথাটা আমায় একদিন না বলতেন, "নেন না আমার জ্যোতিঃকে—যাবি জ্যোতিঃ !"

এই একটি কথা আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় খুলে দিল। ধীরে ধীরে শত চেষ্টা করেও মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম না। মনে হত, জ্যোতিঃ আমার হবে। সেই দিন হতে আর কোন মেয়ের সাথে আমি আর তেমন করে মিশতে পারি নাই। কেউ বিয়ের কথা বললেই গা জ্বালা করে উঠত। যে মন দিয়ে জ্যোতিঃকে ভাল বেসেছি, সে মন দিয়ে আবার অন্য মেয়ের কথা ভাবব কি করে ? মেয়েরা যেমন এক পুরুষ ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা ভাবলে ব্যভিচারিণী নাকি হয়, পুরুষের বেলায় বুঝি আর তা ঠিক নয়।

"জ্যোতিঃকে ভালবাসি ভালবাসার জন্য, তাকে পাবার জন্য হয়ত নয়। ভালবাসা পেয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। যাকে ভালবাসা যায়, তার নিকট হতে কিছু প্রত্যাশা করে ভালবাসলে সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়। তবে যদি সে কিছু দেয়,—নিজেকে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয় আমার কাছে তবে গ্রহণ না করেও উপায় নাই। নইলে তার প্রাণ যে ব্যথায় ভরে উঠবে। তার প্রাণও ত চায় দিতে। আমি কিছুই চাই না তার কাছ থেকে বৌদি, আমি চাই কেবল দিতে, কিন্তু তাকে দিবার আমার কি আছে, আমার যা কিছু নিজের মন, প্রাণ, জীবন, মান, সবই যে দিয়ে ফেলেছি তাকে, তার অজ্ঞাতে ; আমার বলতে যে আমার কিছুই নেই। এত করেও আমার মনে হচ্ছে তাকে বুঝি কিছুই দেওয়া হয় নাই, বুঝি তাকে তেমন করে ভালবাসতে পারি নাই,—তাই দুঃখ হয়।

"জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃকে কেমন করে ভালবাসি, তা

কেমন করে বলব বৌদি। তার সাথে হয়ত আমার বিয়ে হবে না, হয়ত জীবনে তাকে আর দেখব না, হয়ত জীবনে আর তার কথা শুনব না, তবু তাকে ভালবাসব আজীবন; যদি অন্যের সাথে বিয়ে হলে জ্যোতিঃ সুখী হয়, আমার কোন দুঃখ হবে না, বুঝব জ্যোতিঃ আমার সুখী,—আমিও সুখী হব। কিন্তু যেদিন শুনব জ্যোতিঃ আমার ক্ষণেকের জন্য দুঃখী হয়েছে, তবে সেদিন আমার আর দুঃখের সীমা থাকবে না। তাই ভবিষ্যতের দুঃখের কল্পনা করে অনেক সময় মুষড়ে পড়ি, তাই ইচ্ছা হয়, জ্যোতিঃকে চিরকাল বুকে করে সব দুঃখ কষ্ট হতে তাকে আড়াল করে রাখি।

"অনেক বাজে কথা বলে ফেললাম বৌদি, রাগ করবেন না। তারপর জ্যোতিঃর মা কেমন করে আমাকে জ্যোতির সহিত মিশবার সুযোগ দিয়েছেন, তা জ্যোতিঃর কাছ থেকেই আপনি শুনেছেন। সে সব বলে আর লাভ নাই। জ্যোতিঃ যা বলেছে তার পর আবার যে জ্যোতির সাথে আর তার মার সাথে দেখা হয়েছিল, সেই কথাই বলব!

দু' বছর পরে আবার হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত তাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। সবাই দেখে অবাক। জ্যোতিঃ সরল সহজ বালিকাটির মত তেমনি কাছে এসে দাঁড়াল, মুখে তার আনন্দের ছাপ, মনে তার উথলিয়ে উঠা বেদনার ফেনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার সুটকেসটা ও যা কিছু ঘরে নিয়ে এল, কাউকে তা ছুঁতে দিল না। তার কাছে তা যেন কত পবিত্র!

জ্যোতিকে দেখলাম এবার নূতন রূপে। চেহারাখানা অনেকটা লম্বা হয়েছে,—কিন্তু পরিণত; কৃশ অনেকটা হয়েছে,—মন যেন তার শুকিয়ে গেছে। তাই যখন জিজ্ঞেস করলাম, "জ্যোতিঃ তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন? অসুখ করেছিল নাকি?"

তার চোখ মুখ যেন জ্বলে উঠল, একটা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, "তুমি তার কি বুঝবে নিষ্ঠুর?"

জ্যোতিঃর এমন কথার জবাব দিতে পারলাম না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তার মুখের দিকে চেয়ে। সে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল তার নিজের কাজে,—কাজ হয়ত তার কিছুই ছিল না। মনে মনে বললাম, নিষ্ঠুর আমি না তুমি? না তোমার মা! চিঠি লিখলে একখানা চিঠিরও জবাব দেওনা, হয়ত বা তোমার মা মানাই করেছেন চিঠি লিখতে। নিষ্ঠুর বললে তোমার মাকেই বলতে হয়। তিনি কেন এমন করে আমাদিগকে মিশতে দিলেন, কেন তিনি এমন করে আমাদের প্রাণে আগুন জ্বেলে দিলেন। তিনি কি বুঝেন না, আমাদের প্রাণে কি দারুণ পিপাসা।

কয়দিন থাকব তাদের ওখানে একথা জানিয়ে দিলাম। জ্যোতিঃর মা শুনে আনন্দিত হলেন। জ্যোতিঃকে বুঝতে পারলাম না। সে চেপে যাচ্ছিল সব কথা; যেন আমার থাকা না-থাকায় তার কিছু আসে যায় না। কয়দিন মেলা মেশাতেও তাকে বুঝতে পারলাম না,—যেন তার সবই হেয়ালী। আগের জ্যোতিঃ আর সেদিনকার জ্যোতিঃতে অনেক প্রভেদ। সে যেন আমায় ভুলে গেছে, আর আমি যেন তার কেউ নই এই ভাবটা দেখাতে লাগল। এ তার গুমরে মরা অভিমান, আর কেবল আমাকে কষ্ট দেওয়া। কেবল কি তাই, আমার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করাই তার কাজ। আমার সব তাতেই সে বিরোধিতা করবে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তার জবাব দিবে না; আর সে যে কথা জিজ্ঞাসা করবে তার জবাব না দিলেই অমনি রাগ,—অমনি অভিমান।

তাকে কাছে খুঁজে পাওয়া আবার মুস্কিল। জ্যোতিঃর মার কাছে একথাটা ধরা পড়'ল যে, জ্যোতিঃ আমাকে এড়িয়ে চলছে, তাই তিনি জ্যোতিঃকে পাঠিয়ে দিলেন আমার সাথে একা, কোন কাজ উপলক্ষে বেড়াতে। বাড়ীর বাহির হতেই যেন সে তার প্রাণটা খুলে দিল; তার গোপন হৃদয়ের দ্বার ভেঙ্গে গেল। তাই সে অধীর হয়ে সে দিন কত কথাই বলল; আজ আর আমি তা বলতে পারবনা বৌদি! সেদিন ছিলাম আমি আর সে একা।

জ্যোতিঃর মাকে আজও আমি বুঝতে পারলাম না বৌদি! তিনি আমায় ভালবাসেন সবটুকু হৃদয় দিয়ে, ইচ্ছা হয় তার কোলে মাথা রেখে শান্তিতে পড়ে থাকি নিরিবিলিতে। তিনি আমায় এত স্নেহ করেন যে, জ্যোতিঃ তা দেখে আমায় হিংসা করে। জ্যোতিঃর

কথা না শুনে যখন তিনি আমার কথা শুনেন, অভিমানে জ্যোতিঃর মন তখন ভার হয়ে উঠে। জ্যোতিঃর মা যে আমায় কেমন করে ভালবাসেন তা আমি আপনাকে কেমন করে বুঝাব বৌদি! তাকে যে আমি বুঝে উঠতে পারিনা। আমি জগতে সবার কাছেই জিতে গিয়েছি, জ্যোতিঃর কাছেও জিতেছি, কিন্তু হার মানতে হয়েছে জ্যোতিঃর মার স্নেহের কাছে। তিনি আমাকে যতটা বুঝেন জ্যোতিঃ এত আপন হয়েও আমাকে ততটা বুঝেনা। তিনি আমার কষ্ট দেখতে পারেন না, আমার একটুখানি দুঃখ বা কষ্ট হলে তাঁর প্রাণও কেঁদে ওঠে। সেদিন আমার যেন কেন রাগ হয়েছিল, তাই বিছানায় পড়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলাম। আজও আমার মনে পড়ে কেমন করে কোলে টেনে নিয়ে আমার হৃদয়ের সব জ্বালা যন্ত্রণা, রাগ অভিমান ধুয়ে দিলেন। আমার দুঃখ হবে বলেই হোক বা জ্যোতিঃকে আমার হাতে দিয়ে আমাকে আপন করে নেবার জন্যই হোক কত অছিলায় জ্যোতিঃকে পাঠিয়ে দেন আমার সাথে একা। বুঝিনা তার এই ভাবে পাঠিয়ে দেবার অর্থ। আবার খুলেও বলেন না জ্যোতিঃকে চিরদিনের জন্য আমার হাতে তুলে দিবেন কিনা?

সেদিন ছিল থিয়েটার। বাড়ীতে আরো লোক ছিল, তারাও যাবেন থিয়েটারে—তবু নানা অছিলায় তাদিগকে পরে যেতে বলে জ্যোতিঃকে আর আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আগে। যাবার কালে কতবার করে বলে দিলেন জ্যোতিকে, সে যেন আমার কাছে পুরুষদের সাথে বসে। জ্যোতিঃ লজ্জাতেই হোক বা আমার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করবার জন্যই হোক বলে বসল সে আমার কাছে বসবে না। বসলও না। সেখানে গিয়ে মেয়েদের ভিতরই বসল। তার মা যদি এমন কথা না বলতেন, তবে হয়ত সে নিজে ইচ্ছে করেই আমার কাছে, আমার বাহু বন্ধনে, আমার বুকের কাছে এসে বসত।

নারী অভিমান করে বিরোধিতা করে কতক্ষণ থাকতে পারে, তাকে হার মানতে হবেই, জ্যোতিঃকেই হার মানতে হল। অর্দ্ধেক থিয়েটার তখন হয়ে গেছে, পূর্ণিমা রাতের চাঁদ মাথার উপর এসেছে, জ্যোতিঃ আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে বলল, "রাগ করেছ আমার উপর?"

কি করুণামাখা তার কথা কয়টি, তারপর বলল, "চল, বের হয়ে কিছুক্ষণ জ্যোৎস্নায় বেড়িয়ে আসি।"

তারপর আর মানা করতে পারলাম না। তার হাত ধরে লোকের ভিড় ঠেলে বের হয়ে পড়লাম। আমাদিগকে এমনি ভাবে যেতে দেখে যুবকের দল মুখ চাওয়া-চাওই করতে লাগল। জ্যোতিঃ সে সব ভ্রূক্ষেপ না করে আমার হাতখানায় একটু জোরে চাপ দিয়ে বের হয়ে এল আমার সাথে। তারপর চা খেয়ে আবার গিয়ে বসলাম ভিতরে। এবার জ্যোতিঃ আমার বুকের কাছে না বসলেও খুব কাছে বসেছিল।

এমান করে জ্যোতিঃ অনেকবার আমার কাছে হার মেনেছে। কতদিন জ্যোতিঃকে বলেছি নৌকায় বেড়াতে যেতে। কেবল আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মানা করেছে। সেদিন নদীর তীরে অনেকে মিলে বেড়াতে গিয়েছি। সঙ্গে ছেলে মেয়ে বৌ, অনেকেই ছিল। নৌকায় যাবনা তা আগেই ঠিক ছিল। নদীতে উত্তাল তরঙ্গ নেচে নেচে খেলা করছে। তীর হতে সবাই তা দেখে ভয় পাচ্ছে। যে জ্যোতিঃকে শত বলেও রাজি করতে পারিনি, নদীর তীরে এসে আমার চোখের উপর তার চোখ দুটি ফেলে বলল, "চল, নদীতে বেড়াতে।"

তার ঐ চাহনীর ভিতর দিয়ে তার অন্তরটা বুঝতে পারলাম, কি ঝড় বইছে তার হৃদয়ে। বললাম, "এই ঢেউর মধ্যে কেউত যাবে না।"

আবার তার গভীর দৃষ্টি আমার চোখের উপর ফেলে বলল, "কেও না গেল, তুমি আর আমি।"

সেই আগ্রহ করে আমাকে নৌকার কাছে নিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকেই গেল দেখে তার মনটা আবার ভার হয়ে উঠল। সে চেয়েছিল, সেদিন আমাকে নিয়ে নদীর উপর ঢেউর সাথে দোল খেতে। হয়ত সেদিন আমরা বাহু বন্ধনে নদীর অতলে মিলন রাজ্যে চলে যাব এই ছিল তার ইচ্ছা।

অমনি মান-অভিমান ও বিরোধের সৃষ্টি করেই কাটল তাদের বাড়ীতে। সে যেমন আমাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত আমিও তার প্রাণে আঘাত দিয়ে তাকে দূরে রাখবার চেষ্টা করতাম। তারপর এল যাবার

দিনের কথা। সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে, আর এক দিন পরই আমি চলে যাব। কথাটা জ্যোতিঃর কানে যেতেই জ্যোতিঃর একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। চোখ মুখ যেন তার ভার হয়ে উঠল। আমি কিন্তু তার সাথে কথা বন্ধ করেছি,—তাকে আঘাত দেওয়ার জন্য।

জ্যোতিঃ কেবল জানতে চাচ্ছিল, আমি সত্যি যাব কিনা? কেন এত শীঘ্র যাব? আরো কয়দিন থাকব না কেন? কিন্তু যখন কিছুতেও আমার যাওয়া সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন হল না, তখন জানতে চাচ্ছিল আবার আমি কখন তাদের বাড়ী আসব। আমি কথা বলিনা তার সাথে তাই অভিমানিনী জ্যোতিঃও অভিমান করে কথা বলে না। কিন্তু বুঝলাম, মন তার হার মেনে কাঁদছিল আমার সাথে কথা বলবার জন্য। সন্ধ্যায় যখন জ্যোতির ছোট বোনকে বললাম, "বল না তোমার দিদিকে একটা গান গেতে?"

জ্যোতিঃ তার ছোট বোনের কাছেই ছিল। অবসর পেয়ে সে নিজেই বলল, "আমার গলা বসে গেছে, আজ আর গাইতে পারব না। আবার যখন আসবে তখন গান গেয়ে রাত ভোর করে দিব। তোমাকে ঘুমাতেও দিব না। কবে আসবে?"

"আসব না আর। আর কেনই বা আসব?"

"কেন আসবে?" বলে জ্যোতিঃ আমার মুখের দিকে তীব্র করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, "আচ্ছা, না এলে!"

চোখে তার জল ছল্ ছল্ করে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছ্তে মুছ্তে চলে গেল অন্য ঘরে।

চলে আসার আগের দিন জ্যোতিঃ আমার কাছে এসে বলল, "আজ তোমায় ঘুমাতে দেবনা।"

"আমাকে ঘুমাতে দিবে না। খানিকক্ষণ বাদে তুমিই যে ঘুমিয়ে পড়বে!" জ্যোতিঃ রোজই শত কাজ থাকলেও সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ত।

"রোজ ঘুমাই বলে আজ আর ঘুমাব না। তোমারও ঘুমাতে দিব না, রাত ভোর বসে গল্প করব।

রোজ জ্যোতিঃর মা সন্ধ্যা হলেই তার কাছে ডেকে বসান। সেদিন তিনি যেন কত কাজে যেতে গেলেন, তাই ডাকলেন না। জ্যোতিঃর সাথে গল্প চলল। সেদিন যেন সে মুক্ত কলিকা। কত কথাই বলল। জীবনে কি করবে—ম্যাট্রিক পাশ করার পর ডাক্তারী পড়বে। এখন স্কুলে তার পড়াশুনা ভাল চলছে, গৃহ-বিজ্ঞান ভাল করে পড়ছে, ড্রইংএ তার ভাল হাত হয়েছে, আরও কত কি? এমনি গল্প করতে করতে রাত একটা বেজে গেছে। আমি আর পারলাম না, শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল বেলা ছয়টায় আমার গাড়ী। জ্যোতিঃ রাতভোর ঘুমিয়েছে কিনা তাও জানি না। ভোর চারটার সময় আমি জেগেছি। জেগে দেখি, তখন জ্যোতি বসে বসে আমার জন্য চা করছে। কাছে গিয়ে ডাকলাম, "জ্যোতি!"

জ্যোতি আস্তে উঠে এসে আমার খুব কাছে দাঁড়াল। তার অন্তর কি যেন চাচ্ছিল,—বলতে পারল না, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডালিম ঠোঁট দুটি দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগল। আমার তৃষিত পরাণ কেবল বলছিল, তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুমুতে চুমুতে গোলাপী গাল দুটি ভরে দেই। সেও হয়ত তাই চাচ্ছিল আমার কাছ থেকে। পলকহীন দৃষ্টিতে আমরা দুজন দুজনের মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। তারপর তাকে বুকের কাছে বাহু-বন্ধনে টেনে নেব এমন সময় তার মা এসে ডাকলেন, "চা হল জ্যোতিঃ?"

জ্যোতি আবার চা করতে বসল।

আমার সময় হল। গাড়ী এল। জ্যোতিঃ আমার কাছে কাছে ঘুরতে লাগল। হয়ত আমার ঠোঁটের একটুখানি ছোঁয়াচ পাবার জন্য যা তার অন্তরে স্মৃতি হয়ে থাকবে, কিন্তু তা আর হল না। আমি টাঙ্গায় গিয়ে বসলাম। জ্যোতি আর এগিয়ে আসতে পারলনা, কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি তার দিকে আর তাকাতে পারছিলাম না। তার মুখ চোখ অন্তর যেন আমাকে বলছিল, গোপন ভাষায়, "ওগো আমায় নিয়ে চল তোমার সাথে। তোমায় ছাড়া আমি থাকতে পারবনা।

আমি আর তাকে কোন কথা বলতে পারলাম না। একটা সান্ত্বনার বাণীও না। গাড়ী ষ্টেশনে ছুটে চলল।

চলে এসেছি নিষ্ঠুরের মত, আর দেখা হয় নাই। হয়ত আর জীবনে দেখা হবেও না। কিন্তু তার স্মৃতি যে আমার অন্তরের কানায় কানায় ভরে আছে তার পূজা করেই আমার এজীবন-রাত ভোর করতে হবে।"

* * * *

শেফালী

ডাঃ অমূল্যধন ঘোষ

গল্প

তরু।—কেন তুমি অমন করে আমার পানে চেয়ে র'য়েছ?—তোমার হয়েছে কি?

ফুল।—তোমার ওই ন্যাকা-পনা আমার সহ্য হয় না।

তরু।—কেন, আমার কি একটা কথা জিজ্ঞেসা করবারও আর অধিকার নেই?—তুমি ত' আমারই ছিলে।

ফুল।—ওই চিন্তাই ত' আমায় মর্ম্মান্তিক বাজে। বাতাসে নেচে নেচে উন্মত্ত হ'য়ে তুমি যে আমার পানে ফিরেও চাও না,—তা' ত' আমার প্রাণে তত অসহ্য হয় না; কিন্তু যখন তুমি আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞেসা কর, তখন আমার বুক ফেটে যায়। আমি যে তোমারই ছিলুম, এই চিন্তাই ত' আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখের। তোমারই ত' ছিলুম, তবে সত্যিই কি তুমি আমার দুঃখটা কিছুই বুঝ্‌তে পারো না?

তরু।—তোমার ওই মিছে কান্না আমার ভাল লাগে না। তুমি ঝরা-ফুল!—তোমার ইচ্ছে হয় ত' উড়ে কোথাও যেতে পার,—না হয় ত' শুকিয়ে মরে যেতেও পার। তুমি লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘেমে, আমার পানে আড়চোখে যে আছ ওতে আমায় অন্য ফুলেরা কি মনে করে, বলতো। ও'র চেয়ে, তোমার যতদূর ক্ষমতা আছে, আমায় শাস্তি দিয়ে সরে যাও।

ফুল।—তোমায় শাস্তি দেবার ক্ষমতা ও অহঙ্কার আমার মোটেই নেই;—অমন ইচ্ছেও আমার মনে আসে না। আমার কান্না যদি তোমার বুকে বাজতো ত' তোমায় শাস্তি দিতে আমি পারতুম। তবুও যখন আমার বড় কষ্ট হয়, তখন ইচ্ছে হয় তোমারই বুকের ওপর মাথা রেখে, তোমারই মুখের পানে চেয়ে চেয়ে প্রাণভোরে কাঁদি। যখন বাতাস বইতে থাকে, আর তুমি অন্য ফুলদের সঙ্গে আনন্দে নাচ্‌তে থাকো,—তখন পাছে আমি চোখের ওপর তা' সহ্য ক'রতে না পারি এই ভাবনায় বাতাস আমায় উড়িয়ে তফাতে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, রোদ্দুর আমায় শুকিয়ে শেষ ক'রে ফেলে, আমার যাতনা একেবারে ঘুচিয়ে দিতে চায়। কিন্তু, তোমায় ছেড়ে মর্‌তেও আমার ইচ্ছে হয় না,—উড়ে যেতেও আমার প্রাণ চায় না। তোমার পানে চেয়ে র'য়েছি ব'লে তোমার অন্য ফুলেরা যদি কিছু মনে করে ত' তাদের ব'লো, যে তুমি আমায় ঘেন্না ক'রে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছ,—তা'দের কোনও ক্ষতি আর আমার দ্বারা হতে পার্‌বে না।

তরু।—তুমি বিস্বাদ পরিণামের বিকট ছবি তা'দের চোখের ওপর এঁকে ধরে নিয়ে ব'সে থেকে, তা'দের মধুময় জীবনের সুস্বাদ সুখে উপভোগ ক'র্‌তে দিচ্ছো না।

ফুল।—তা'দের এ উপভোগ ত' চিরস্থায়ী নয়! সে আশা যদি তা'রা ক'রেও থাকে ত' আমারই মতন আবার শেষে ত' ভুগ্‌বে।—তা'র চেয়ে আমার দশা চোখের ওপর সর্ব্বদা দেখ্‌লে, তা'রা আগে থাক্‌তে পরিণাম ভেবে নিয়ে সাবধান হ'তে পার্‌বে;—তা' হ'লে যে-টুকু সময় তোমায় পাবে, সেটুকু সময়ও প্রাণভ'রে ভালবেসে নিতে পার্‌বে:—আমার মতন আগা গোড়াই ঠ'কে যাবে না। তা' ছাড়া তোমার অন্য ফুলেরা কিছু মনে কর্‌বার কথা যা' তুমি ব'ল্‌ছো সে তোমার মিছে কথা!—তুমি নিজেই আমায় দেখ্‌লে এখন বিরক্ত হও, তা'ই-ই বল না।

তরু—তা'ই—ই যদি হয়, তা'তেও ত' তোমার কোনও জোর নেই।

ফুল।—আমার কোনও জোর নেই জানি ব'লে ত' আমার বেশী দুঃখ হয়। আমার আবার জোর কোথায়? যখন তোমার বুকের ওপর স্থান পেয়ে ছিলুম, তখনই আমার জোর খাট্‌তো না,—আর এখন পায়ের তলায়

ছুড়ে ফেলে দিয়েছো, এখন আমার কিসের জোর খাটবে?

তরু—বুকের ওপর থেকে নামিয়ে দিয়েছি ব'লেই বুঝি তোমার অত অভিমান হয়েছে! চিরকালের মত আমার বুকের ওপর ফুটে থাকবে, এই আশাই তুমি ক'রেছিলে নাকি?

ফুল।—আমি ত' সেই রকম আশাই ক'রেছিলুম।—যতদিন না একেবারে শুকিয়ে যায়, ততদিন গোলাপ যেমন গাছের বুকের ওপর ফুটে থাকতে পায়,—আমি ত' সেই রকম ফুটে থাকবার আশাই ক'রেছিলুম।—শুধু এক রাত্তিরের জন্যে যে ফুটবো, এ কথা ত' আগে ভাবিনি'।

তরু।—গোলাপ গাছের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না!—সে ছোট গাছ।—তা' ছাড়া তা'র কাঁটার জ্বালাও মাঝে মাঝে গোলাপ-সুন্দরীকে বেশ সইতে হয়।

ফুল।—ছোট গাছের কাঁটা স'য়েও যদি আমি অমনি সোহাগে ফুটে থাকতে পেতুম সে যে আমার ভাল ছিল। এ একরাত্তিরের আদর সোহাগ,—রাত পোহাতেই ফুরিয়ে গেল!—এ'তে আমার কি সুখ হ'ল?—কেবল কেঁদে কেঁদেই জীবনটা কেটে গেল।—সে তবু হাসি-কান্নায় কাটতো।—

তরু।—গোলাপ-কামিনী কেমন সুন্দরী!—তার কত গুণ!—আর—

ফুল।—আর তোমায় গোলাপের গুণ গাইতে হ'বে না—গোলাপের সঙ্গে আমার তুলনা করা তোমার সাজে না। তা'র সঙ্গে আমার সমান অবস্থা হ'লে, আমিও যে কেমন হতুম, তা' ব'লতে পারি না। জীবনে কখনও ভালবাসা হারাতে হবে না, এতটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে যদি মনের শান্তিতে কাটাতে পারতুম, তা' হ'লে আমারও মুখে অমন গোলাপী আভা ফুটে উঠতো।—তুমি শুধু 'পরের সুন্দরীর' রূপই দেখতে পাও; কিন্তু আমার রূপের মাথাটা যে তুমিই খেয়ে দিয়েছো, সে কথাটা ত' একবারও ভাবো না! কেবল হতাশে, আকাশপানে চেয়ে চেয়ে আমার সবটুকু রক্ত শুকিয়ে গিয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলুম,—দেহের বাড়টুকু একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল,—সেটা কখনও মনে করো কি?—মিলনসুখের আ'বেশভরা নরম গালের রং ফলানি কেবল তোমার মিষ্টি লাগে,—আর বিদায় বেলার ঠোঁট ফুলোনি দেখলে তুমি বড়ই বিরক্ত, হও!—যাক্!—আমার সুখের রাত্রি শেষ হয়ে গেছে,—আর সুখের আশা আমি করি না।—এখন, দয়া ক'রে, শুধু তোমার পায়ের তলায় আমায় প'ড়ে থাকতে দাও।—তোমার নির্দ্দয় আচরণ চোখের ওপর দেখছি, আর চুপ ক'রে চেয়ে প'ড়ে র'য়েছি,—একটী কথাও ত' তোমায় বলিনি'! ক্ষুদ্র কুসুমের একমাত্র আশা-তরু, ওগো, নিতি সুখের নব-নাগর! তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রছি, আমায় বিরলে ব'সে একটু চুপ ক'রে কাঁদতে দাও।—তোমার মত ধনীর কাছে এটা যত বড় উপহাসের জিনিসই হোক না কেন, আমার মত গরীবের যখন চোখের জল ছাড়া আর কোনও সম্বলই নেই, তখন সেটা শেষ ক'রে ঢেলে দিতে দাও। আমি যে তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে শুকোবার জন্যেই ফুটে'ছিলুম তা' তুমি যদিও জানতে বটে,—আমি তা' আগে কিছুই জানতুম না। তবে কেন এখন আমায় বিদ্রূপের বাণে এমন খুঁচিয়ে' মারছো? তুমি রোজ রোজ তোমার সখের খেয়ালে নতুন নতুন আশা দিয়ে, আমার মত অমন কত ফুল ফুটিয়ে তুলছো,—আর ঝরিয়ে দিচ্ছো! কিন্তু, আমি ফুল হ'য়ে, জন্মের মত একবারই পৃথিবীতে ফুটতে এসে ছিলুম,—তাই তোমার মুখের মিছে আশাকেই সত্যি ব'লে বুকে ধ'রে নিয়ে, অনন্ত বিশ্বাসের একান্ত নির্ভরে ফুটে উঠেছিলুম। কিন্তু, এত নিষ্ঠুর তুমি, যে তোমার সখের খেলা খেলতে গিয়ে আমার প্রাণটাই নিয়ে নিলে,—পরিবর্ত্তে একটু দয়াও দিলে না! যে-বাতাসে রোজ তুমি উন্মত্ত হ'য়ে নাচো, সেই বাতাসেই যে তুমি একদিন হতাশায় ভেঙ্গে পড়বে,—সে ভাবনা ত' তুমি ভাবো না! তবে আমি ফুল হ'য়ে জন্মেছি,—তোমার সে পরিণাম ভাবতেও আমার প্রাণে দারুণ বাজে!

তরু।—সত্যিই যদি তুমি আমায় এত ভালবাস যে, আমার সে দুর্গতি ভাবতে তোমার মনে কষ্ট হয়,—তবে অমন আশা বুকে ক'রে নিয়ে প'ড়ে আছ কেন?

ফুল।—কেন?—জানোনা, কি যে তা'তে আমার যে স্বার্থ র'য়েছে, তা' ছাড়তে গেলে, জন্মান্তরেও তোমার

আশা ছেড়ে দিতে হয়?—তোমায় পেয়ে যে আমার কত সুখ, তা' কি আমি ভুলতে পেরেছি? মনে পড়ে কি তোমার সেই গত রাত্তিরের কথা?—আমার জীবনের সেই একটী মাত্র মিলন রাত্তির?—সন্ধ্যেবেলায় আমাদের মিলন হোল,—এই ফাঁকা মাঠের মাঝখানে —মনে ক'রলুম, বুঝি বা শরতের নির্ম্মল চাঁদ একা আমাদের বিয়ের সাক্ষী হ'ল। কিন্তু, একটু পরেই বুঝ্‌লুম, তা' নয়,—সকলেই টের পেয়েছে। দেখ্‌লুম, বাতাস কোথা হ'তে চুরি ক'রে দেখ্‌তে পেয়ে, পাশ দিয়ে হেসে চ'লে গেল;—আমি সরমে তোমারই বুকে মুখ লুকালুম। চারিপাশের গাঁয়ের বৌয়েরা চারিদিক থেকে আলো জ্বেলে দিয়ে, শাঁকের মঙ্গলধ্বনি ক'রে, আমাদের বাসর সাজিয়ে দিয়ে গেল,—আর সন্ধ্যাবধূ হাস্‌তে হাস্‌তে ঘোমটা খুলে বাসর জাগ্‌তে নেমে এ'লো! সে সুখের মিলনের কথা কি জীবনে আর ভুল্‌তে পার্‌লুম? তাই আবার মিলনের মিছে-আশা নিয়ে প'ড়ে আছি। সত্যি-মিছে, কি সব সময় আমরা বুঝ্‌তে পারি! নিশ্চিন্ত নির্ভরের গভীর শান্তিতে, স্তব্ধ নিশীথে যখন আমি তোমার আলিঙ্গনের মাঝে সুষুপ্ত হ'য়ে পড়েছিলুম,—তখন কি কিছু বুঝেছিলুম? তারপর রাত্রি শেষে সাধ মিটে যাওয়ায় অবসাদে তোমার বাহুবন্ধন শিথিল হ'য়ে প'ড়্‌ল, তখনও না বুঝে আমি তোমার বক্ষলগ্ন হ'য়ে রইলুম। কিন্তু, যখন প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতল সমীরণ আমার গায়ে ঠেলা মেরে জাগিয়ে তুলে সহানুভূতির ভাষায় তোমার হেলা-ফেলার বার্ত্তা জানিয়ে, আমার দুর্দ্দশার বিষয়ে আমায় সচেতন ক'রে দিয়ে গেল তখনই কেবল দারুণ দুঃখে আমি ভেঙ্গে ঝ'রে পড়্‌লুম। তবুও আমার মনে হয়, আমার এত আশা কি নিস্ফল হবে, নিশ্চয়ই আবার আমাদের মিলন হবে,—এই পৃথিবীরই কোলে। সেদিন আমরা মিশে একেবারে এক হ'য়ে যাবো—সেদিনও বাতাস আমাদের মিলনের সহায়-সাথী হবে;—আমাদের বিয়ের ঘটক হবার আনন্দে সে বেগে ছুটে আস্‌বে। তবে সে মিলন আর তেমন হাস্‌তে হাস্‌তে হবে না,—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই আমাদের মিল্‌তে হবে। আকাশভরা জ্যোছনার মাঝে পরিতৃপ্ত অন্তরে তোমার বুকে আলস্যে গা' ঢেলে দিয়ে আমার গত মিলন হয়েছিল,—কিন্তু এবার যেদিন মিলন হবে, সে দিন আমার তৃষিত অন্তর, ধ্বংসের রেণু-মাঝে তোমায় খুঁজে পেয়ে সকল সঞ্চিত তৃষা মিটিয়ে নেবো। ভরা প্রাণে, না চাইতেই তোমায় পেয়েছিলুম ব'লে, এত শীঘ্র হারালুম,—এবার শূন্য প্রাণে, চেয়ে চেয়ে তোমায় পাবো ব'লে চিরদিন ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বো।

কবি

শ্রীপ্রতাপ সেন বি-এস্-সি

অনন্ত ঘেরি' প্রথম যেদিন সুধুই আঁধার ছিল,—
স্তব্ধ শূন্যে, নিঝুম বিশ্বে কে প্রাণ সঞ্চারিল?
যেদিন সবিতা-কর-সম্পাতে, হাসিল সকল দিক্—
জান কি তখন তার সাথে কার সুরু হ'ল আহ্নিক?
বিশ্বের এত শোভা-সম্পদ কার যাগে দিল হবি!
সাগর ভূধরে সুপ্ত সে জন—কবি, সে যে সেই কবি।

পূত আশ্রম ভেদিয়া যেদিন উঠিল সামের গান;
নির্জ্জন তরু, বন-লতিকায় সমীরণ দিল প্রাণ;—
বসন্ত এল দুলায় মুকুল, নীল-অঞ্চল-তল,
একে একে সব ঋতু সুন্দরী হাতে লয় শতদল।
এত আয়োজন প্রকৃতি রাণীর কার তরে এত ছবি?
সৃষ্টির প্রতি কণিকার মাঝে—কবি, সে যে সেই কবি।

সমাজের যত অনুগৃহীত দুনিয়ার দূরে ফেলা—
তুচ্ছ যাহারে জ্ঞান করে সবে—সকলের অবহেলা;
কুমারীর ঐ হৃদ্ কোকনদ—নহে সেত' সুধু খেলা—
প্রাণের সহিত বহে সেথা যেগো, ভাসে প্রেম-নীরে ভেলা
এ সবের তবু আছে একজন—তুচ্ছ নহেক' সবই,
বিশ্বের চির-ভ্রুকুটি-ভাজন—শাশ্বত সেই কবি।

জগতের প্রতি নর-নারী তার প্রীতির আধার যেন;—
কৈশোর সেত কুসুম-কলিকা স্নিগ্ধ-রসের হেন।
যৌবন তার রুদ্র-রসের আকর লইয়া হাতে—
মানব-জাতির কল্যাণ তরে প্রেমাশীষ দিল মাথে।
সাম্যবাদের প্রচারক সেই স্বাধীন-বহ্নি-রবি—
মুক্তি-পথের যাত্রী সে যেগো-কবি, সে যে সেই কবি।

স্বাস্থ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

—স্বাস্থ্যতত্ত্ব

বাংলার নষ্ট-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আজকাল নানাভাবে নানা স্থানে বহু আলোচনা হইতেছে। সত্য-কথা বলিতে কি, বাঙ্গালী দিন দিন যে ভাবে নষ্ট-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহার পরিণাম চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়ের মুখ হইতে প্রফুল্লতা ও সজীবতার মাধুরিমা লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালার মাতৃ-জাতির অঙ্গ হইতে যৌবনের উজ্জ্বল-লাস্য ফুটিয়া উঠিয়াই পর মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইতেছে। বাঙ্গালী পুরুষগণ যৌবনেই নত-দেহ ও বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া পড়িতেছে। এ-অবস্থার পরিণাম ভয়াবহ সন্দেহ নাই। সুতরাং, ইহার প্রতিকার উপায় উদ্ভাবন করিতে সকলেরই একান্ত চেষ্টা করা উচিত।

নানা দিক হইতে বাংলার এই স্বাস্থ্য-সমস্যা সমাধানে চেষ্টা হইতেছে, একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে পুষ্টিকর উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, দারিদ্র্য ও মানসিক দুশ্চিন্তা এই অবস্থার জন্য দায়ী; কেহ বা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় প্রাথমিক নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও শরীর-পালন বিধি ও sanitationএর অভাব হইতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই দুইটি কারণ প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-নাশের জন্য দায়ী হইলেও ইহাদের পশ্চাতে আরও একটি প্রচ্ছন্ন কারণ বিদ্যমান। সেটি আবিষ্কৃত না-হওয়া পর্য্যন্ত বাংলার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য-সম্পদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। সে কারণটি আমরা ধরিতে পারি না, তাহার কারণ "স্বাস্থ্য" বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণার অভাব। এই কারণেই আমাদের আলোচনা ও অনুশোচনা অরণ্যে রোদন মাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা স্বাস্থ্যের ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

ইংরাজি শিক্ষা-প্রসারের ফলে স্বাস্থ্য ও Health শব্দ প্রায় এক অর্থ বাচক ও প্রতিশব্দে পরিণত হইয়াছে। আমরা বাংলা-শব্দ 'স্বাস্থ্য' ব্যবহার করিলেও তাহার দ্বারা Health. শব্দের অর্থের অতিরিক্ত কিছু ধারণা করিতে পারি না। ফলে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যখন কিছু বলি, তখনই Health. এই ইংরাজি শব্দটার দ্বারা যতটুকু অর্থ প্রকাশ পায়, তাহার অধিক কিছু বুঝাইতে বা বুঝিতে পারি না। Health এই শব্দটা একটি পুরাতন ইংরাজি শব্দ হইতে গঠিত, ইহার অর্থ সুস্থ ও নিরাময় অবস্থা। সুতরাং, ইহার আভিধানিক অর্থ "ব্যাধির অভাব।" বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন স্বাস্থ্যের এই সঙ্কীর্ণ অর্থকে ইংরাজিতে Common Place বলিয়া নিন্দা করা হয়। H. C. King তাঁহার Rational Living পুস্তকে স্পষ্টই বলিয়াছেন Health বলিতে যদি এই মাত্র বুঝায় তাহা হইলে সেই অবস্থা এত সাধনার অবস্থা নয়, এবং মানব জীবনের মহান ও ব্যাপক উদ্দেশ্য সাধন করিবার পথে একমাত্র সম্বল যে, স্বাস্থ্য তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। একথা সত্য সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতে দূরদর্শী ঋষিরা যে স্বাস্থ্য-সুখ ও মানব-জীবনের চরম লক্ষ্যজ্ঞান করিতেন, তাহা জীবনের পথে ক্লিষ্ট, ক্ষিন্ন, অবসাদযুক্ত শরীরকে কোন মতে ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত রাখিয়া, টানিয়া লইয়া যাওয়া মাত্র বুঝাইত না। হাসপাতালের বাহিরে থাকিতে পারিলেই যাঁহারা সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা স্বাস্থ্যের প্রকৃত ও ব্যাপক অর্থের সহিত পরিচিত ন'ন। "স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল" এই প্রবাদ বাক্য তাঁহাদের নিকট অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট, তাঁহারা ইহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত অবস্থা স্বাস্থ্যের মোটা অর্থ। ইহাকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 'স্বাস্থ্য এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সেই অবস্থাকে বুঝায় যে অবস্থায় মানব সম্পূর্ণ আত্মস্থ। সেই অবস্থা মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও কাম্য অবস্থা, তখনই মানব মন ও

দেহ একযোগে কর্ম্মক্ষম। এক কথায় শরীর ও মনের সুস্থ ও কর্ম্মপটু অবস্থাকে স্বাস্থ্য নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কবি রবীন্দ্র নাথ যে "আনন্দ উজ্জল পরমায়ু" ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহা মানব-জীবনের সেই অবস্থা, যে অবস্থায় মানব শুধু নিরাময় নয়, কিন্তু মহিমা-মণ্ডিত মহৎ জীবন যাপন করিয়া, দশ ও দেশের সেবায় তাহা ব্যয় করতঃ জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ। ইহাই স্বাস্থ্যের প্রকৃত ও ব্যাপক অর্থ। যে য়ুরোপীয় জগৎ আজ জীবনের সকল মধু পান করিয়া তৃপ্ত, তাহা আজ স্বাস্থ্যের এই সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়া, চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে—Health may be defined as the quality of life which renders the individual fit to live most and to serve best (Jesse Feiring William M.D.) স্বাস্থ্য বলিতে আর্য্যরা ইহাই বুঝিতেন। সেইজন্য তাঁহারা স্মৃতি (সমাজবিধি,) নিদান, আহার, বিহার এমন কি দৈনন্দিন জীবনকে এই লক্ষ্যমুখী করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা শুধু ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত ছিলেন না, বিরাট জীবনের বিকাশ দেখাইয়া জগতকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই সেকালে লোকে শুধু সুস্থ দেহ ও দীর্ঘজীবী ছিল না, কিন্তু স্বাস্থ্যের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত এই অন্নভোজী বাঙ্গালীর ঘর আলো করিয়া শ্রীচৈতন্য বিরাজ করিতেন। আর আমরা স্বাস্থ্যের এই ব্যাপক অর্থ ভুলিয়াছি বলিয়াই, জগতের চক্ষে হেয় এবং দুর্ব্বহ জীবন বহন করিয়া কাতর এবং য়ুরোপ আজ ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই, সেখানে Roosevelt, Pastor, Wagner বিরাজ করিতেছেন।

য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান একটা বড় সত্য আবিষ্কার করিয়াছে। সেটা ঋষিদের শিক্ষার একান্ত অনুবর্ত্তী। জীবন বলিতে এই রক্ত-মাংস দেহ মাত্র বুঝায় না। ইন্দ্রিয়ের বাহিরে এক অতিন্দ্রিয় শক্তি আছে, যাহা শরীর-যন্ত্রের সমতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। এই দেহের কোন যন্ত্র বাহিরের কোন কারণে পীড়িত হইলে, সেই শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় সত্য, আবার মনের সংযম ইত্যাদির অভাবে, সেই শক্তি ব্যাহত হইলে শরীর অপটু ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। বাহিরের যে সকল শত্রু শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর আধিক্য বা অসমতা এবং Bactria, microbes প্রভৃতি প্রতিনিয়ত শরীরের পীড়া উৎপাদন করিতেছে, তাহাদিগকে দূর করিবার জন্য শরীর পালন, মুক্তবায়ু পুষ্টিকর খাদ্য sanitation প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই Bacilii, বা Bacteria দুই ব্যক্তির শরীর সমান ভাবে আক্রমণ করিলেও, এক ব্যক্তি অসুস্থ হয় এবং অপর ব্যক্তি কেন সুস্থ থাকে, তাহার কারণ আজও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। Immunity, Re sisstance প্রভৃতি শব্দগুলি দুর্বোধ্য বা অর্থহীন। ইহাদের মোটা অর্থ এই যে পেশী, শরীরের Defence প্রভৃতির পশ্চাতে এমন কোন প্রচ্ছন্ন শক্তি আছে, যাহা শরীরের বিষ দূর করিবার পক্ষে অপটু হইলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে সমর্থ। এইজন্য একজন সবল-পেশী ব্যক্তিও কলেরার আক্রমণ এড়াইতে পারে না, আবার অপর একব্যক্তি অল্পতর দেহ-বল লইয়া কোমা Bacilii অবাধে পান করিয়াও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিতে পারে, এই প্রত্যক্ষ সত্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে—বিশাল দেহ, সুস্থ, সবল পেশী, অব্যাহত রক্ত চলাচল এবং দেহ-যন্ত্র সমূহের প্রকৃতিস্থ অবস্থাই সুস্থ থাকিবার একমাত্র উপায় নয়। এগুলি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি কেন্দ্রনিহত প্রচ্ছন্ন শক্তি কোন কারণে কার্য্যকারিণী না হয়, তাহা হইলেও আমরা সুস্থ থাকিবার আশা করিতে পারি না। পবিত্রভাবে জীবন যাপন, মনের প্রফুল্লতা উৎপাদন এবং মনের উদারতা সম্পাদন, যাবতীয় স্নায়ুরোগের প্রথম ও প্রধান চিকিৎসা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এই সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, মনকে সুস্থ রাখিতে না পারিলে অনেক ক্ষেত্রে শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারা যায় না। মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য সদ্‌কার্য্য, সদ্‌চিন্তা, প্রফুল্লতা, সাহস প্রভৃতির প্রয়োজন। এ-কথা য়ুরোপও আজ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। R.C. Cabot তাঁহার What men live by পুস্তকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, মন ও আত্মার বিষয় চিন্তা না করিয়া, কেবলমাত্র দেহের উন্নতির জন্য যত চেষ্টা কর না কেন, তোমার সকল চেষ্টাকে ব্যাহত করিয়া এই সত্যই প্রতিপন্ন হইবে যে, মানব-জীবন বলিতে এই দেহ মাত্রকে বুঝায়

না ;—দেহ, মন ও আত্মার অব্যাহত প্রশান্ত সমাজ-মুখিনী গতিকে বুঝায়, সুতরাং যে কার্য্য (স্বার্থপরতা) এমন কি, যে চিন্তা সেই গতিকে প্রতিহত করে, সেই কার্য্য (স্বার্থপরতা) সেই চিন্তা মন ও আত্মার অশান্তি ঘটাইয়া শরীর ও মনকে পীড়িত করে। সুতরাং, যিনি প্রকৃত সুস্থ থাকিতে চান, দেহের উন্নতি ও মনের উৎকর্ষতা সম্পাদন করিবার চেষ্টা করা তাঁহার একান্ত উচিত।

বাঙ্গালী আজ জীবনের মহৎ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ফলে রোগ, শোক, জরা, বাঙ্গালীর জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইবার হেতু থাকা সত্ত্বেও, আমি একথা বলিতে বাধ্য, যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জীবনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মশুদ্ধির দ্বারা মানব-জীবনকে সমাজ ও ধর্ম্মের অংশরূপে কল্পনা করিতে না শিখিতেছে এবং আপনাকে সমস্ত জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন না করিয়া অংশরূপে জ্ঞান করিবার শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং মন ও আত্মার পরিপুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ হইতেছে, ততদিন চিন্তা-মসীলিপ্ত বাঙ্গালীর মুখে স্বাস্থ্যের অরুণালোক ফুটাইয়া তুলিবার আশা-দুরাশা মাত্র। দুর্নীতি, দুশ্চিন্তা, নীচতা, সর্ব্ববিধ কুকার্য্য ও কুচিন্তা পরিহার করিয়া, বাঙ্গালীর নিকট জীবনের মহৎ লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আসিয়াছে। যদি বাঙ্গালী শরীর পালন ও স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৈনন্দিন ও সমাজ-জীবনকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে, যাহাতে তাহার মন ও আত্মা শান্তির পরম আনন্দ লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে এই মরা গাংয়ে বান আসিবে, শতাব্দী সঞ্চিত, পুঞ্জীভূত পঙ্কিলতা ভাসিয়া গিয়া, বাঙ্গালার পূত প্রান্তরে মানবতার রত্ন বেদী গড়িয়া উঠিবে, এবং শান্ত, সবল, বাঙ্গালী তাহার তলে অর্ঘ্য লইয়া যেদিন উপস্থিত হইবে, সেদিন দেবতার হস্ত হইতে অপার আনন্দ ও স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, তাহার মলিন মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিবে!

অসমাপিকা

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

তোমার কথাটি হয়নিক' শেষ
আজো মোর মনে জাগে!
শাশ্বত হ'ল ক্ষণিক নিমেষ
অশেষের অনুরাগে।
কাজল আঁখির মায়াজাল মিলে
যে স্বপন মোর আকাশে আঁকিলে
তেমনি সে আজো রহে অচপল,
আনীল-তন্দ্রা-ভোর!
ঝরালে যে তব শেষ আঁখিজল
সে হ'ল প্রথম মোর!

ভোলা কথা গেঁথে ফিরি নিশিদিন
স্মৃতির সায়র-কূলে ;—
আকাশ কুসুম সুষমা বিহীন,
স্যাজোনা বকুলফুলে!
ঝরা-মালিকার মরমের পুটে
রুদ্ধ-কামনা গুমরিয়া লুটে,
বাসক বনের কিশলয় দল
মর্ম্মরে কাঁদি উঠে?
বুকের মুকুল বিকাশ-বিভল
কুসুম হইয়া ফুটে!

অন্ধকারে

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল গল্প

বছর কয়েক আগে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি একটা রাত্রিতে যে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া কলিকাতা সহরটা দেখিতে দেখিতে দুই হাত জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা বোধ করি এখনো অনেকের স্মরণ আছে। অবশ্য কলিকাতার জলনিকাশের যেরূপ সুব্যবস্থা তাহাতে সহরের কোনও কোনও অংশে আধ ঘণ্টা বৃষ্টি হইবার পরই এক হাঁটু জল জমিয়া যাওয়া কিছু নূতন নয়। কিন্তু সেবারের দুর্য্যোগ এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে, বোধ করি গত চল্লিশ বছরের মধ্যে এমনটা দেখা যায় নাই। ইলেকট্রিক তার ছিঁড়িয়া রাস্তার গ্যাস বাতি নিভিয়া সমস্ত রাত্রির জন্য মহানগরী একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। সত্যমিথ্যা বলিতে পারিনা, কিন্তু শুনিয়াছি সেই এক রাত্রের জন্য একটা মোম বাতির দাম পাচ পয়সা হইতে দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

বাদুড় বাগানে আমার বাসা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটা জরুরী কাজে সহরের উল্টাদিকে হাওড়ার অভিমুখে গিয়াছিলাম। কাজ শেষ করিতে সাতটা বাজিয়া গেল। ফিরিবার পথে চা খাইবার জন্য দর্মাহাটার কাছাকাছি একটা ছোট্ট দোকানে ঢুকিলাম। বাহিরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তায় গ্যাসের আলো কাচের উপরকার বৃষ্টি বিন্দু ভেদ করিয়া ঝাপসা ভাবে বাহির হইতেছে। আমার দুর্ভাবনার বিশেষ হেতু ছিল না—সঙ্গে ছাতা ছিল। আরাম করিয়া বসিয়া চা খাইতে লাগিলাম।

দোকানে বেশী লোকজন ছিল না। দুটি লোক—একজন আধ-বয়সী ও একজন কর্ণমূল পর্য্যন্ত জুলপি বিশিষ্ট যুবক—অয়েলক্লথ মোড়া টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া দানীবাবু এবং শিশির কুমার ভাদুড়ীর পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করিবার আপেক্ষিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে উত্তাপ্তভাবে আলোচনা করিতেছিল। চা খাওয়া অনেকক্ষণ তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তর্কের ভালরকম নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্যই বোধ করি, তাহারা উঠিতে পারিতেছে না।

যুবক বলিল; 'জানেন মশায়, শিশির ভাদুড়ী আগাগোড়া বুড়ো আলমগীরের পার্ট করে একবারও দাঁত বেরোয় না।'

আধবয়সী লোকটি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, 'ভারী কেরামতি! দাঁত নেই ত বেরুবে কোত্থেকে? আর দাঁত না বেরুলেই বড় অ্যাক্টর হয় নাকি?'

যুবক চটিয়া উঠিয়া বলিল, 'আপনিও ত বুড়ো হয়েছেন, দাঁত না বার করে একটা কথা বলুন না দেখি!'

তর্ক শুনিতে শুনিতে ও চা খাইতে খাইতে প্রায় মিনিট পনের কাটিয়া গেল। চা শেষ করিয়া দাম দিয়া দোকান হইতে বাহির হইতেছি—যুবক তখন দানীবাবু সম্বন্ধে অত্যন্ত মানহানিকর কথাবার্ত্তা বলিতেছে—এমন সময় সোঁ সোঁ করিয়া একটা উন্মত্ত হাওয়া কোথা হইতে আসিয়া দরজা জানালাগুলাকে আছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আকাশের দিকে চোখ তুলিতেই নীল রঙের ভয়ঙ্কর আলোতে দু'চোখ একেবারে ধাঁধিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় শব্দে বাজ পড়িয়া কানদুটাকে যেন বধির করিয়া দিল। তাহারি মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইলাম, আকাশের গায়ে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। দিগন্ত ব্যাপিয়া নিকষ-কালো মেঘের উপর আরো কালো মেঘ জমিয়া যেন নিরেট নিভাঁজ হইয়া গিয়াছে—অন্য জিনিষের একতিল সেখানে যায়গা নাই।

এইবার ভীষণ বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড় বড় ফোঁটা তির্য্যক্‌ভাবে নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে পড়িতে সুরু করিল। রাস্তার আলোগুলা জলের পুরু পর্দার অন্তরালে

পড়িয়া নিস্তেজ হইয়া গেল, শুধু তাহাদের চারিদিক হইতে একটা মণ্ডলাকার প্রভা বাহির হইতে লাগিল।

দোকানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম; চাকরটাকে ডাকিয়া বলিলাম; 'আর এক পেয়ালা চা দাও ত হে!'

মেঘের আকস্মিক ধমকে তার্কিক দুজনের বিসম্বাদ সহসা থামিয়া গিয়াছিল। তাহারা আবার আরম্ভ করিল, 'দানী ঘোষ যদি ইচ্ছে করে, অমন পাঁচটা শিশির ভাদুড়ীকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে!'

জুলপি বিশিষ্ট ছোকরা কড়া রকম একটা যুক্তি প্রয়োগ করিতে যাইতেছিল, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'থাক না মশায়! পৃথিবীতে দানী ঘোষ আর শিশির ভাদুড়ী ছাড়া আর কি লোক নেই? অন্য কিছু আলোচনা করুন না।'

জুলপি সিংহবিক্রমে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'চা খাচ্চেন চা খান। মেলা ক্যাচ্‌ক্যাচ্ করবেন না।'

আমি চা খাইতে লাগিলাম।

ক্রমে আটটা বাজিল। বৃষ্টির বিরাম নাই—সমভাবে সতেজে চলিয়াছে। তার সঙ্গে ঠাণ্ডা এলোমেলো বাতাস। রাস্তার লোক চলাচল কমিয়া আসিল।

নয়টা বাজিল। বাহিরে বৃষ্টি ও ভিতরে তর্ক একভাবে চলিয়াছে। অদ্ভুত একনিষ্ঠা এই দুটি লোকের, তখনো দানী ঘোষ ও শিশির ভাদুড়ীকে লইয়া কামড়া কামড়ি করিতেছে। পৃথিবীতে যেন অন্য প্রসঙ্গ নাই।

সাড়ে নয়টার সময় আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যে করিয়া হোক রাত্রে বাড়ী পৌঁছিতেই হইবে। কিন্তু যাই কি করিয়া? ছাতায় এ বৃষ্টি আটকাইবে না—পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিজিয়া কাদা হইয়া যাইব। একে আমার সর্দ্দির ধাত—তখন নিউমোনিয়া ঠেকাইবে কে? এই সময় বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল; হঠাৎ হাওয়ার বেগ যেন বাড়িয়া গেল।

একবার বাহিরের দিকে উকিঝুঁকি মারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

দোকানের চাকরটা নিশ্চল নিস্পন্দভাবে নিবন্ত উনানের পাশে উপু হইয়া দেয়াল-ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। মাথার উপর ধুঁয়ায় মলিন ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা পীতবর্ণের আলো বিকীর্ণ করিতেছে। বাহিরে আশেপাশের দোকান-পাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে—মোটরের হর্ণ ও ট্রামের ঢং ঢং আর শুনা যাইতেছে না।

যুবক বলিল;—শিশির ভাদুড়ী—

ঠিক এই সময় হঠাৎ আলো নিভিয়া গেল।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

দোকানের চাকর ভাঙা গলায় বলিল;—বাজ পড়ে তার ছিঁড়ে গেছে—আজ রাতে আর মেরামত হবে না। দেশালাই দেবেন বাবু—লাম্পোটা জালি!

অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেশালাই দিলাম। ল্যাম্পো জ্বলিল। মিটমিটে আলো ও দুর্গন্ধ ধুঁয়ায় ঘর ভরিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এতক্ষণে প্রথম অল্প কথা কহিলেন, বলিলেন;—নীলমণি, কেটলীটা আর একবার চড়াও—আর এক পেয়ালা চা হোক।

জুলপিধারী যুবক তীব্রভাবে আমার দিকে আবার তাকাইয়া গর্ব্বিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল; 'সিগারেট আছে?'

আমি পকেট হইতে সিগারেট কেসটা বাহির বাহির করিয়া দিলাম। গোটা কয়েক সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া যুবক কেসটা তাচ্ছিল্য ভরে আমায় দিয়া দিল। তারপর এমনভাবে আমার দিকে পিছু করিয়া বসিল, যেন আমার বাঁচিয়া থাকার সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে—আর আমি কাহারও কাজেই লাগিব না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি বাহিরের দিকে একটা উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন;—'এ বিষ্টিতে বেরুনো যাবে না। গ্যাসগুলোও নিভে গেছে দেখচি যে! বা বাবা! বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে আবার সেই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

আমিও বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলাম,—সত্যই ত! রাস্তার গ্যাসবাতী একটাও জ্বলিতেছে না। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথাও জনমানব নাই। কেবল অবিশ্রান্ত বারি পতনের ঝুপঝুপ ঝম্ ঝম্ শব্দ।

আর এক পেয়ালা চা খাইলাম। প্রৌঢ়লোকটি বলিলেন;—আজ রাত্রে বাড়ী যাওয়া হলনা দেখছি। নীলমণি, বিষ্টি থামলে আমাকে তুলে দিও।' বলিয়া বেঞ্চির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। যুবক

কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সিগারেট টানিতে লাগিল।

কিন্তু আমার ত বেঞ্চির উপর রাত্রি কাটাইলে চলিবে না—বাড়ী যাওয়াই চাই। বাড়ীতে স্ত্রী দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে লইয়া একলা আছেন। ঝিও হয়ত বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অথচ বৃষ্টি না ধরিলে যাই বা কেমন করিয়া?

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি—এগারোটা!

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাকের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে একটা অনৈসর্গিক শব্দ বাহির হইতেছে। যুবক স্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাঁহার ঘুম ভাঙিলেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।

রাত্রি যত গভীর হইতেছে, আমার মনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা ততই বাড়িতেছে। এদিকে ঝড়বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্যে কিছুমাত্র শ্রান্তির লক্ষণ নাই।

ঘড়ির কাঁটা সরিয়া সরিয়া পৌনে বারোটায় পৌছিল। নীলমণির ল্যাম্পোর জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। সে উঠিয়া বাতিটা একবার নাড়িয়া বলিল;—'তেল ফুরিয়ে গেছে—আর পাঁচ মিনিট।'

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাসিকা-নিঃসৃত একটি ধ্বনি অর্দ্ধপথে রুধিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন;—অ্যাঁ থেমেছ?

নীলমণি বলিল;—'না বাবু, আলো নিভে যাচ্ছে।'

'ওঃ' বলিয়া নিরুদ্বেগ প্রৌঢ় আবার শুইবার উপক্রম করিলেন।

শিকার ফস্কায় দেখিয়া যুবক বলিল;—'আমি তখন বলছিলুম শিশি—'

আমার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিলাম;—'খবরদার বলছি! ফের যদি ওদের নাম করেছ ছোকরা, তোমার জুলপি ছিঁড়ে নেব।'

আমার এই আকস্মিক উগ্রতায় যুবক ও প্রৌঢ় দুজনেই শুম্ভিতবৎ আমার মুখের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল।

নীলমণি ভগ্নস্বরে কহিল;—'বিষ্টি ধরে আসছে বাবু, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন। আমি দোকান বন্ধ করি।'

সাগ্রহে বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখি সত্যই বৃষ্টির বেগ প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে—ঝড়ও যেন থামিয়াছে। একাদিক্রমে পাঁচ ঘণ্টা দাপাদাপি করিয়া বুঝি তাহারা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ছাতাটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আর দেরী নয়। যাইতে হয় ত এই সময়!

পশ্চাত হইতে যুবকের কণ্ঠস্বর আসিল;—'মশায়, দেশালাইয়ের গোটাকয়েক কাঠি দেবেন কি?'

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। এই সময় পিছু ডাক! পকেট হইতে দেশালাইএর বাক্সটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ল্যাম্প দপ দপ করিয়া দু'বার খাবি খাইয়া নিভিয়া গেল।

* * * *

কি অন্ধকার! একটা প্রকাণ্ড সহর বর্ষার রাত্রিকালে সহসা আলোকহীন হইয়া গেলে যে কিরূপ ভয়ানক অন্ধকার হয়, তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। খুব শক্ত করিয়া চোখ বাঁধিয়া দিলে কিম্বা অন্ধ করিয়া দিলেও বোধ করি এর চেয়ে বেশী অন্ধকার হয় না। নিষ্পলক চক্ষুদুটা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বিস্ফারিত হইয়া থাকে—এবং অন্য ইন্দ্রিয়গুলা অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সতর্ক হইয়া উঠে।

প্রথম ঝোঁকে খুব খানিকটা চলিয়া আসিয়া থমকিয়া পড়িলাম। কোথায় যাইতেছি—কোনদিকে যাইতেছি? বাড়ী গিয়া পৌছিবার একান্ত আগ্রহে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু এই বিদ্‌ঘুটে অন্ধকারে পথ চিনিয়া যাইব কি প্রকারে? দোকান হইতে বাহির হইয়া ঠিক যে, কোন মুখে আসিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। হয়ত বা যেদিকে বাড়ী তাহার উল্টা পথেই গিয়াছি। এখন উপায়!

কিন্তু পথের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। যেদিকে হোক চলা দরকার, যদি এমনি ভাবে চলিতে চলিতে কোথাও একটা আলো বা মানুষের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং আবার সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বৃষ্টি ও ঝড় ক্রমে কমিয়া কমিয়া একটা বিষাদপূর্ণ

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া থামিয়া গেল। তখন এই অন্ধকারের বুকের উপর আর একটা জিনিস চাপিয়া বসিল—সেটা এই মধ্য রাত্রির ভয়াবহ নীরবতা। এতক্ষণ বৃষ্টির ছপ্ ছপ্ ঝর ঝর শব্দ ও বাতাসের গোঙানিতে যাহা চাপা ছিল, এখন তাহা উলঙ্গ মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। পৃথিবীর সব মানুষ যেন মরিয়া গিয়াছে শুধু আমি একা বাঁচিয়া আছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি একা—একেবারে নিঃসঙ্গ।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিলাম। মনের গূঢ়তম প্রদেশে বোধকরি এই আকাঙ্ক্ষাটাই দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল যে মানুষ চাই, সঙ্গী চাই, কোনও প্রকারে এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না। খানিক দূর গিয়াই প্রচণ্ড একটা হোঁচট্ লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া একেবারে এক কোমর জলের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। ছাতাটা হাত হইতে কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম, —না, এক কোমর নয় তবে জল এক হাঁটু বটে। আন্দাজে বুঝিলাম বোধ হয় এতক্ষণ ফুটপাথে চলিতে ছিলাম এবার রাস্তায় নামিয়াছি। কিন্তু এই অবতরণটি যেমন সুখকর নয়, ফুটপাথে ফিরিয়া যাওয়াও তেমনি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ ফুটপাথ যে কোন দিকে তাহা জলে পতনের সঙ্গে সঙ্গে গুলাইয়া গিয়াছে।

পাঁচ ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হইবার পর যে, রাস্তায় জল জমিতে পারে এ সম্ভাবনটা তখন পর্য্যন্ত মাথায় আসে নাই। কিন্তু ভগবান যখন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন দুশ্চিন্তা হইল—না জানি কোথায় অথৈ গভীর জল আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, হয়ত একপা অগ্রসর হইলেই হুস করিয়া ডুবিয়া যাইব।

এক হাঁটু জলের মধ্যে এক পা এক পা করিয়া সাবধানে অগ্রগামী হইতে লাগিলাম। বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। হায় ভগবান! এ আমার কি দুর্দ্দশা করিলে। কেন মরিতে আজ ঘরের বাহির হইয়াছিলাম। যদি বাহির হইয়াই ছিলাম তবে চায়ের দোকানে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম না কেন?

কিন্তু পশ্চাত্তাপে কোনও ফল হইবে না। আমি মাথা ঠাণ্ডা করিয়া একটু ভাবিতে চেষ্টা করিলাম—এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিৎ। প্রথমত কোনও রকমে ফুটপাথে ওঠা চাই—মাঝ রাস্তায় জলের মধ্যে দিয়া দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গেলেও কোনও একটা লক্ষ্যে পৌছানো যাইবে না। ফুটপাথে উঠিতে পারিলে, কোনও একটা বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিয়া লোক জাগাইয়া রাত্রির মত আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে কিম্বা অন্য কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব। মোট কথা যে উপায়েই হোক, নরলোকের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করা দরকার। এই অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে বেশী নয়, আপাততঃ একটা মানুষের দেখা পাইলেও যে সাক্ষাৎ চাঁদ হাতে পাইব তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

শামুকের মত হাঁটিয়া-হাঁটিয়া কিন্তু কোনও দিকেই এমন একটা বিশিষ্ট কিছু ধরিতে পারিলাম না যেখান হইতে আমার যাত্রাটাকে সুনিশ্চিত করিতে পারি। এক হাঁটু জল কখনো কমিয়া আধ হাঁটুতে নামিতেছে, আবার কখনো উরুত পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে। এ ছাড়া, দিগ্‌দর্শন করিবার কিম্বা যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার আর কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিহ্নই নাই।

সৃষ্টির প্রথম জীব বোধকরি এমনি অন্ধভাবে প্রলয়পয়োধির অতলতলের মহা শূন্যতার মধ্যে অদৃষ্ট পরিচালিত হইয়া হাঁটিয়া বেড়াইত; এবং আবার মহাপ্রলয়ের দিন যখন সূর্য্যচন্দ্রের আলো নিভিয়া যাইবে, তখন সৃষ্টির শেষ জীব এমনি নিরুপায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।

এই ভাবে কতক্ষণ চলিয়াছিলাম বলিতে পারি না—সময়ের ধারণাও এই ঘোর নীরবতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের আঙুলে একটা শক্ত বস্তু ঠেকিল। অনুভবে সিঁড়ির ধাপের মত বোধ হইল। তাহার উপর উঠিয়া দু'চার পা এদিক ওদিক ঘুরিবার পর বুঝিলাম এতক্ষণে আমার সেই ঈপ্সিত ফুটপাথে পৌঁছিয়াছি।

যাক—তবু ত কিছু পাইয়াছি! দুই হাত বাড়াইয়া হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে কিছুক্ষণ চলিলাম। একটা ভিজা দেয়াল হাতে ঠেকিল। তখন সেই দেয়াল ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুকাল এইভাবে যাইবার

পর কাঠের দরজায় হাত পড়িল। সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিলাম—এতক্ষণে বুঝি এই দুঃখ সাগরে কূল মিলিল।

দরজায় সজোরে ধাক্কা দিলাম। তারপর চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম.—'কে আছ দোর খোল' 'মশায় দয়া করে একটিবার দোর খুলুন' 'ওহে কেউ শুনতে পাচ্ছ, একবার দরজাটি খুলবে?' কিন্তু কোথায় কে? দরজা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি বন্ধই রহিল। বাড়ীর ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না। শুধু আমার আগ্রহ ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া একটা নিঃসঙ্গ প্রেতযোনির মত এই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে গুমরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পূর্ব্ববৎ দেয়াল ধরিয়া আবার আর একটা দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি করিলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না। দরজা খুলিল না,—এমন কি দরজার অন্তরালে কোথাও যে লোক আছে, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। আরও দুই তিনটা দরজা এমনিভাবে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং—ফলের কোনও তারতম্য হইল না।

শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল,—মনও উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন হইয়া গেল। যদি কলিকাতার সকলেই মরিয়া গিয়া থাকে, তবে আমার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি? এখন কোথাও একটু শুইবার জায়গা পাইলে আর কিছুরই আমার দরকার নাই। জলের মধ্যে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পা দুটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে—যদি মরিতেই হয় তবে কোনও একটা শুষ্ক স্থানে পা ছড়াইয়া শুইয়া মরিতে পারিলেই ভাল।

কিন্তু পা ছড়াইয়া শুইবার মত স্থান এই প্রলয়-প্লাবিত কলিকাতা সহরটার মধ্যে কোথায় পাওয়া যায়, ফুটপাতের ওপরেও ত প্রায় এক ফুট জল!

যাহোক, এরকমভাবে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। মন যতই অবসাদে ডুবিয়া যাইতে চাহিল, ততই তাহাকে জোর করিয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিতে লাগিলাম। একটা কিছু সুরাহা হইবেই। এমন কখনো হইতে পারে যে কোনও বাড়ীর লোক সাড়া দিবে না? হয়ত এখনই একটা বিলম্বিত ভাড়াটে গাড়ী কিম্বা একজন আলোকধারী পথিক আসিয়া পড়িবে।

হঠাৎ আমার মনে একটা দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কোনও অভাবনীয় উপায়ে অন্ধ হইয়া যাই নাই ত! নহিলে একি সম্ভব যে এতক্ষণ ধরিয়া এই দুই চক্ষে একটা কোন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না? এত অন্ধকার কি হইতে পারে? হয়ত সেই যখন জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম—

দুই চক্ষু সজোরে কচ্‌লাইতে আরম্ভ করিলাম—কিন্তু চক্ষুর দুর্ভেদ্য তিমির দূর হইল না। হঠাৎ মনে হইল দেশালাই জ্বালিয়া দেখিনা কেন! দু'পকেট খুঁজিলাম দেশালাই নাই। দেশালাই যে জুলপিকে দিয়া আসিয়াছি, তাহা তখন কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না।

যেন পাগলের মত হইয়া গেলাম। অন্ধ হইয়া গিয়াছি কিনা এ সন্দেহটা তখনি যেমন করিয়া হোক ভঞ্জন করিতেই হইবে—মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহেনা! আর একটা দরজার সম্মুখে গিয়া দু'হাতে তক্তার উপর চাপড়াইতে লাগিলাম;—'ও মহাশয়, কে আছেন একটিবার দোর খুলুন না। ও মশায়!'

পিছন হইতে শান্তস্বরে কে বলিল;—'মিছে চেঁচামেচি করছেন—এখানে কি লোক আছে যে উত্তর দেবে! এ গুলো সব দোকান।'

আমি যেন আঁতকাইয়া উঠিলাম; 'অ্যাঁ—কে—কে —কে?'

'কোনও ভয় নেই, আসুন আমার সঙ্গে। আমার হাত ধরুন।'

আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। একখানা হাত—বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা—আমার আঙুলগুলা চাপিয়া ধরিল। আমার পা হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত যেন একবার অসহ্য শীতে কাঁপিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁতে ঠুকিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতে লাগিল।

আমি বুদ্ধি-ভ্রষ্টের মত জিজ্ঞাসা করিলাম;—'আমি কি অন্ধ হয়ে গেছি?'

ছোট্ট একটি হাসির শব্দ হইল।

'না ভারি অন্ধকার তাই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।'

আমি বলিলাম,—'আমার বাড়ী বাদুড় বাগানে।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। অদৃশ্য আগন্তুক স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে আমাকে সব রকম বাধা-বিঘ্ন বাঁচাইয়া লইয়া চলিল। আমার বুদ্ধিশক্তি ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম ;—'আচ্ছা, এই অন্ধকারে আপনি ত বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছেন!'

কোনও উত্তর পাইলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম ;—'আমি দর্মাহাটার একটা দোকানে চা খেতে ঢুকেছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে কোথায় এসে পড়েছিলাম, বলতে পারেন!'

উত্তর হইল ;—'আপনি নিমতলা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।'

নিমতলা ঘাট! সর্ব্বাঙ্গের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ দুজনেই নিস্তব্ধ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম ;—'আপনি কে? আপনার নাম কি?'

'আমার নাম—শুনে আপনার লাভ নেই।—এদিক দিয়ে ঘুরে আসুন, ওখানে একটা ম্যান্‌হোল্‌ খোলা আছে। জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? ওর মধ্যে যদি আপনি গিয়ে পড়েন। তাহলে আর—,

সভয়ে সরিয়া আসিলাম।

অল্পকাল পরে আমার দিব্য চক্ষুষ্মান পথ-প্রদর্শক বলিল ;—'অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। সহরের মাঝখানে, ঠন্‌ঠনের কালীবাড়ী ঘিরে প্রায় দেড় মানুষ জল জমেছে। আপনি সে পথ দিয়ে যেতে পারবেন না।'

আমি নিঃশব্দে পথ চলিলাম। মিনিট পাঁচেক পরে বলিলাম,—'কলকাতা সহরটা মনে হচ্ছে যেন শ্মশান হয়ে গেছে। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, মানুষ নেই —'

'ও রকমটা মনে হয়। সহরের প্রাণ হচ্ছে তার রাস্তাঘাট। সেখানে মানুষ না থাকলে শ্মশানে আর সহরে কোনও তফাৎ থাকেনা।'

আমি কতকটা নিজের মনেই বলিলাম ;—'মনে হচ্ছে যেন এটা ভূতের রাজ্য।'

হাসির শব্দ হইল।

'এই রকম রাত্রে ভূতেদের ভারি ফুর্ত্তি হয়—কি বলেন?—আচ্ছা, আপনি যখন একলা দরজা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন যদি একটা ভূতের সঙ্গে দেখা হত, আপনি কি কত্তেন বলুন দেখি?'

'কি করতাম? বোধহয় দাঁত কপাটি লেগে মারা যেতাম!'

'হা হা হা হা! ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল! আচ্ছা, ভূতকে এত ভয় কিসের বলুন দেখি? একটা লোক মরে গেছে বৈ ত নয়?'

'বলেন কি মশায়! ভূত হল গিয়ে একটা—প্রেতাত্মা। তার চালচলন রীতি-নীতি স্বভাবচরিত্র কিছুই জানা নেই—ভয় কর্ব্বে না?'

'তা বটে।—আচ্ছা মনে করুন—না থাক—'

আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ গুরগুর করিয়া উঠিল। এ কাহার হাত ধরিয়া চলিয়াছি?

তবু মনে সাহস আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম ;—'আপনার নাম ত বল্লেন না। কোথায় থাকেন বল্‌বেন কি?'

'কোথায় থাকি? যেখানে দেখা হয়েছিল, তারই কাছাকাছি থাকি।'......

'আজ আমার যে উপকার করলেন, জন্মেও তা ভুলব না। আবার আমাদের দেখা হবে নিশ্চয়!'

'দেখা—বোধহয়—আর হবে না...তবে যদি আবার কখনো এমনি বিপদে পড়েন—হয়ত ...'

'আচ্ছা আপনি কি করেন? কোনও কাজকর্ম্ম করেন নিশ্চয়—তাও কি বল্‌তে দোষ আছে?'

'আমি কিছু করিনা, এমনি ঘুরে বেড়াই—বেকার।'

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ।......

'আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব ভাল আছে—কোন ভাবনা নেই।'

আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম।

'আপনি আমার মনের কথা জান্‌লেন কি করে?'

আবার হাসির শব্দ হইল।

'এ রকম অবস্থায় পড়লে মানুষের মনে স্বভাবতঃ কি চিন্তা আসে তা আন্দাজ করা কি খুব শক্ত?'

'না—তা বটে। কিন্তু—কিন্তু—আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে আছে, আপনি জানলেন কি করে?'

'ওটাও আন্দাজ।'

দীর্ঘ নীরবতা। এ কে? কোন জগতের অধিবাসী?

আমি মরিয়া হইয়া আরম্ভ করিলাম,—'দেখুন—'

'ওকথা জিজ্ঞাসা কর্বেন না।'

আমার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম;—'আ—আ—আমায় ছেড়ে দিন—আমি—'গলা দিয়া আর আওয়াজ বাহির হইল না।

'ভয় পাবেন না—এতক্ষণ যখন এসেছেন, তখন আরও খানিকটা আসুন। আপনার বাড়ী প্রায় এসে পড়েছে।'

পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল, গলা এমন ভাবে বুজিয়া গেল, যেন শত চেষ্টা করিয়াও একটা কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিব না। বরফের মত হাতখানা আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।......

হঠাৎ শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিল। সে দাঁড়াইল; আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

'এইবার আপনি একলাই যেতে পার্বেন। এখান-থেকে গুণে একশ' পা এগিয়ে যান, গিয়ে ডানদিকে ফিরলে সামনেই দরজা পাবেন—সেই আপনার বাড়ী। ভোর হয়ে আসছে,—এবার আমাকে যেতে হবে।'

আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের মত নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পুনরায় হাসির শব্দ হইল; কিন্তু এবার যেন শব্দটা বড় ব্যথাপূর্ণ।

সে বলিল,—'আপনি বড় ভয় পেয়েছেন। আচ্ছা চল্লাম তবে; এই নিন আপনার ছাতা জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। ভোর হতে আর দেরি নেই—আচ্ছা—বিদায়।' শেষ কথাটা যেন গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত মিলাইয়া গেল।

আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম;—'আছেন কি?'

উত্তর আসিল না।

আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম—অতি দূরে আকাশের পুঞ্জিত মেঘ ভেদ করিয়া অল্প একটুখানি ফ্যাকাশে আলো দেখা দিয়াছে।

"এস"

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

অতিথির বেশে এসেছিলে যদি চলে গেলে কেন ফিরে?
স্নেহ দিয়ে মোর হিয়া জয় করে বেঁধে গেলে প্রীতি ডোরে।
এস—কিশোর অরুণে, তরুণ তপনে,
এস—প্রভাতীর গানে, কানন শোভনে,
এ নব প্রভাতে, মরমের ব্যথা,
মুছাও সোহাগ আদরে।
এস—জ্যোৎস্না হাসিতে, চাঁদিনী নিশীথে,
এস—শেফালী যূথীতে, মধুর বাসেতে,
ঢাল সুধাধারা, তাপিত এ প্রাণে,
পথ চেয়ে আছি বাহিরে।

এস প্রভাত সমীরে, সুনীলম্বরে,
এস—শিশিরে শিশিরে, নব তৃণ পরে,
ফোটে নাই মম, কাননের কলি
ফুটাও আজি হে তাহারে।
এস—ছায়া বীথি তলে, আজি এ নিরালে,
ভরেছি আঁচলে, শেফালী বকুলে,
পেতেছি আসন, ঝরা এই ফুলে
এস সখা মোর বাসরে॥

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

উপন্যাস

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

৩

রমাপতি ছোট বেলাতে মা, বাপ দুজনকে হারিয়ে, পরের আশ্রয়ে দিন কাটিয়ে পরের অনুগ্রহে ভাগ্য অন্বেষণ করতে হাজারিবাগে এসে হাজির হন। তখন সেখানে 'মোটর বাস্' চলত না, ষ্টেশন থেকে সহরে যাওয়ার একমাত্র 'যান' পুস্‌পুস্ এবং তা প্রায় আট দিনে পৌছত।—লোক বসতি এত ছিল না, তার ওপর প্রায় চল্লিশ মাইল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া! কাজেই উপযুক্ত রকম সঙ্গী না জুটলে, দুএকদিন ধরে একই জায়গায় থাক্‌তে হতো।—এমনও শোনা গিয়েছে যে, যেসব একরোখা লোক বারণ না শুনে, নিজের জেদে সেই দুর্গম বনের ভিতর দিয়ে গিয়েছে, তারা বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে।—এখন আর তত ঘন জঙ্গল নাই, বাঘ ভালুকও শিকারীদের সখের শিকারের জ্বালায় প্রায় লোপ পেয়েছে বল্লেই হয়।—শীতের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেশী, বিদেশী, স্থানীয়, দূরাগত কত যে শিকারী এই জঙ্গলে শিকারের আশায় ঘুরে বেড়ায় তার ঠিক নেই। যার ভাগ্যে কিছু জুটে যায়, সে অহঙ্কারে ফুলে ওঠে।

এই রকম সময়ে, রমাপতি 'মরিয়া' হয়েই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করতে হাজারিবাগে এলেন। দেশে যে আত্মীয়ের বাড়ী চাকরের খাটুনী খেটে দুবেলার ভাত ও মাথা গুঁজ্‌বার ঠাঁই জোগাড় করেছিলেন, তা সামান্য একদিনের অসহিষ্ণুতায় কর্পূরের মত উবে গেল। আহার ও আশ্রয় দুটীর অভাব যখন একসঙ্গেই ঘট্‌লো, রমাপতি তখন দেশের মাটী কামড়ে আর পড়ে না থেকে, বিদেশে বের হবেন ঠিক কর্‌লেন।—আত্মীয়ের ঘরে মিষ্টি কথা, মিষ্টি ব্যবহার এর অভাব খুবই ছিল; কিন্তু তাতে করে একদিকে যেমন রমাপতির দুঃখের শেষ ছিলনা, অন্যদিকে তেমনি বন্ধু, বান্ধব না থাকায় তাঁর কাজ-কর্ম্ম করে উদ্বৃত্ত সময়টুকু লেখাপড়ায় কাটিয়ে সুখেরও শেষ ছিল না। পড়ায় অনুরাগ তাঁর এত বেশীই ছিল যে, কোলে ছোট ছেলে নিয়ে কিংবা দোকানে যাবার পথেও তাঁর পাঠ অভ্যাসের বিরাম হ'ত না।

সততা, পড়ায় অনুরাগ ও দারিদ্র্য মাথায় করে [illegible] বৎসর বয়সে তিনি চেয়ে, চিন্তে, ভিক্ষে করে কল্কা[illegible] হাজির হলেন। কল্‌কাতা তাঁর কাছে সমুদ্রের মত বোধ হল। কোথায় যাবেন, কি করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে একটা রাস্তা ধরে বরাবর গঙ্গার ধারে হাজির হলেন। দেশের নাম, আনন্দপুর, কিন্তু খাওয়ার অভাবে লোকে সেখানে বেশীর ভাগ নিরানন্দেই থাকে।—দেশ থেকে কলকাতা একদিনের পথ, সেই পথ তিনদিনে এসে, চেনা লোক কাকেও দেখ্‌তে না পেয়ে আর আহার, আশ্রয়ের ভাবনাতে, তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষুধাও খুব, কিন্তু পয়সা না ফেল্‌লে খাওয়ায় যো নাই। এ তিনদিন যা তা' খেয়ে কাটালেও, এখন এই প্রচণ্ড ক্ষুধার সময়, আনন্দপুরের আত্মীয়কে প্রথমবার মনে পড়ল। সেখানে থাক্‌লে তার খাওয়ার জন্যে ভাবতে হত না, এখন সেটা প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে লাগলো—রমাপতি উঠে আঁজলা ভরে জল নিয়ে খেয়ে চোখ, মুখ, মাথা, সব ধুয়ে ফের এসে বস্‌লেন।

তাঁর এই ভাব, কিছুক্ষণ আগে থেকে একজন প্রবীণ লোক লক্ষ্য কর্‌ছিলেন। তাঁকে ফিরে বস্‌তে দেখে তিনি ধীরে এগিয়ে এসে বল্লেন, "তোমার নামটী কি বাবা ?"

"শ্রীরমাপতি মিত্র"। বলে রমাপতি লোকটীর দিকে তাকালেন, দেখ্‌লেন স্নেহ-মমতায় কোমল একখানি মুখ, তার জন্তে অসীম করুণা চোখে মুখে ফুটিয়ে তাঁকে সম্বোধন করছেন।

আবার তিনি বল্‌লেন, "এখানে কি পড়া শুনা করা হয় ?—"

"আজ্ঞে না—করি না কিছুই।—আজই এখানে এসে পৌঁছেছি। থাকৃব কোথায়, খাব কি এই চিন্তা এখন আমার প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে।—কারণ আমি কপর্দ্দক শূন্ত।"

"আমি যদি তোমাকে এই ত্নটী ভাবনা থেকে মুক্তি দিই, তবে তুমি কি আমার কাছে থাকৃতে পারবে ?"

"নিশ্চয় থাকৃব। রমাপতি এত অকৃতজ্ঞ নয় জান্‌বেন।"

"বেশ, তবে আমার সঙ্গে এস।" বলে সেই লোকটী আগে যেতে লাগলেন আর রমাপতি পিছনে পিছনে যেতে লাগ্‌লেন।—গঙ্গার খুব কাছেই তাঁর বাড়ী—ছোট বাড়ী খানিতে লক্ষ্মীশ্রী যেন ফুটে বের হচ্ছিল। কড়া নাড়্‌তেই আর একটী ছেলে এসে দরজা খুলে দিলে। রমাপতি চেয়ে দেখ্‌লেন যে, ছেলেটী তাঁরই বয়সী হয়তো ত্ন'চার বছরের বড়ও হতে পারে। তার দিকে চেয়ে লোকটী বল্‌লেন, "দেখ, পথ থেকে তোমার আর একটী ভাই নিয়ে এলাম। ডেকে নিয়ে যাও।—"

লোকটীর নাম অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিজের ছেলে পিলে কিছুই নেই—স্ত্রীও অনেক দিন মারা গিয়েছেন। কিছু টাকাকড়ি ছিল, তা তিনি অনাথ ছেলে-পিলেদের মানুষ করতে খরচ কর্‌ছিলেন। কোনো ছেলেদের মলিন মুখ দেখ্‌লেই তার পরিচয় নেওয়া, তাঁর মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। এমনি করে কত যে ছেলেকে তিনি মানুষ হবার পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তার ঠিক নেই। এখনও কত ছেলে তাঁর আশ্রয়ে নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছিল। রমাপতিও এই দলে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন।

কথায় কথায় অনাথ বাবু রমাপতিকে একেবারেই নিঃস্ব জেনে তাঁর লেখাপড়া বা জীবিকার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। ষোলো বৎসর বয়স পার হয়ে যাওয়ায়, রমাপতি আবার 'পড়ো' ছেলে হ'তে চাইলেন না। নিজের শক্তির আর মনের জোরের ওপর তাঁর খুব বিশ্বাস থাকায়, তিনি বললেন যে, হাতে-কলমে কাজ শিখে তিনি ঠিকাদার (কনট্রাক্টর) হবেন, এই-ই তাঁর মনের ইচ্ছা। চার পাঁচ দিনের সাহচর্য্যে অনাথবাবু রমাপতির এতটা পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন যে, রমাপতির ইচ্ছাতে কোন বাধা না দিয়ে তিনি তার সুব্যবস্থা করে দিলেন।—

প্রথম কাজ করতে রমাপতি হাজারিবাগে এলেন, সেখানের বড় কনট্রাকটর ক্ষিতিমোহন দে অনাথ বাবুর বিশেষ বন্ধু। তাঁরই অধীনে কাজ করবেন বলে অনাথবাবু রমাপতিকে পাঠালেন, বলে দিলেন ভাগ্য যদি বদলায় তো এই হাজারিবাগেই বদ্‌লাবে। তখন তাঁর তেইশ বছর বয়স। হ'লও তাই—ক্ষিতি মোহন বাবু বছর ত্নয়েকের মধ্যেই মারা গেলে, ও অঞ্চলে এক রমাপতি ছাড়া কন্‌ট্রাকটর কেউ আর থাক্‌লো না। জগমোহন, ক্ষিতি বাবুর একমাত্র ছেলে, বাবার মত রৌদ্রে কুলিমজুর খাটাবেনা বলে কলেজে তখন পড়ছিল। বাবা মারা যেতেই কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখেই, মা, বোন ও স্ত্রী নিয়ে তাকে হাজারিবাগ থেকে সরে পড়্‌তে হল। কারণ অধিকাংশ কনট্রাক্‌টরের যা হয়, 'যত্র আয় তত্র ব্যয়' হওয়ায়, ক্ষিতি বাবুরও সঞ্চয় কিছুই ছিল না। যখন টাকা ছিল, তখন আত্মীয়েরও অভাব ছিল না, এখন টাকার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়ের ডাল-পালা, সরে গিয়ে অন্ত আশ্রয় খুঁজতে গেলেন।

হাজারিবাগে আসার এই ত্নবছরের মধ্যেই জগ-মোহনের সঙ্গে রমাপতির খুবই বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর নিজের কেনা একটা ছোট বাংলোতে তিনি জগমোহনকে সপরিবারে আজীবন থাকবার জন্তে অনুরোধ করেছিলেন। (কারণ তাঁর বাড়ীটা তখন ভাড়া দিয়ে কিছু আয়ের ব্যবস্থা হচ্ছিল) কিন্তু জগমোহন মৃত্ন হেসে বলেছিল "বন্ধুর কাছে কখনো ঋণী হতে নেই, বুঝ্‌লে ? তা'হলে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা থাকে না, তাছাড়া সিংহের বাচ্চা সিংহই হয়, শিয়াল হয় কি ?" রমাপতি চুপ করে রইলেন। বন্ধুকে মনক্ষুণ্ণ হতে দেখে তিনি আবার বল্লেন "ভেবোনা,

উপায় যা হয় একটা বের করবই তবে আপাততঃ দেশের বাড়ীতে এঁদের রেখে আসি, তাহলে ঘাড়টা হাল্কা হলে, উপায়টা শীগ্‌গীরই বের হবে।"—সেই থেকে রমাপতি ও জগমোহনের ছাড়াছাড়ি। হাজারিবাগে বেশ ভাল করে গুছিয়ে বসার পর অনাথবাবু একবার রমাপতিকে ডেকে পাঠান। তিনি সেখানে পৌছাবার দুদিন পরে সন্ন্যাস রোগে অনাথবাবু মারা গেলেন। তাঁর উইলে লেখামত তাঁর সমস্ত ত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করে হাজারিবাগে ফির্‌বার আগে তাঁর মনে হল যেন, জগতের সঙ্গে সকল বন্ধন তাঁর শেষ হয়ে গেল :—এই সময়ে দেশে থাকৃতে যে আত্মীয়ের বাড়ী তিনি ছিলেন, কার কাছে খোঁজ পেয়ে তিনি সঙ্গে একটী পনের বছরের মেয়ে নিয়ে রমাপতিকে দেখ্‌তে এলেন। মেয়েটীর নাম বল্লেন, শতদল। পরিচয় দিলেন, শালীর মেয়ে বলে। তার পরেই হঠাৎ রমাপতিকে বিয়ে করবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন।

রমাপতি তখন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও হিতকামী বন্ধু, অনাথবাবুকে হারিয়ে সত্যিই যেন ভেঙে পড়েছিলেন। আপন বল্‌তে কেহই আর তাঁর তখন ছিলনা। অনেক ভেবে দেখ্‌লেন যে, বিবাহ তো করতেই হবে কারণ, রোগে, বিপদে তাঁকে দেখ্‌বার কেউ নেই! আর সংসারী হতে গেলে, প্রধানতঃ যে জিনিসের দরকার অনিবার্য্য, সেই টাকা, এখন তাঁর হাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আস্‌ছে এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকলে আরও আসবার আশা আছে, তবে বিয়ে না করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আর কিছুই নেই।

দু চারদিন ধরে ভেবে তিনি তাঁর সেই আত্মীয়কে বিয়ের সম্মতি জানিয়ে দিয়ে যেন দায়মুক্ত হলেন। তারপরে এক শুভদিনে, (হাঁ শুভ দিনই বটে, কারণ শতদল ঘরে গিয়ে পর্য্যন্ত তাঁকে অর্থ কষ্ট কোন দিনই পেতে হয় নি) শতদলকে তাঁর হাতে দিয়ে পাথেয় এবং সাহায্য স্বরূপ কিছু টাকা নিয়ে শতদলের 'মেসো' সেই যে পিছন ফিরলেন আর কোন দিন তাঁদের খবর নিলেন না।

শতদল চিরকাল পরের আশ্রয়ে এবং অনুগ্রহে থেকে থেকে দুঃখ বা আনন্দকে খুব সহজ ভাবেই নিতে শিখেছিলেন। বেশী দুঃখেও ভেঙে পড়তেন না, আনন্দেও অধীর হয়ে উঠতেন না। তাই হাজারিবাগে নিয়ে গিয়ে রমাপতি যখন তাঁর বাড়ীর প্রত্যেকটী কোণা পর্য্যন্ত দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেসা করছিলেন, "বাড়ী, ঘর, লোকজন ও আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো? তুমি খুশী হয়েছ তো?"

উত্তরে শতদল মুখে কিছু বল্‌তে পারেন নি বটে, কিন্তু মনের দর্পণ মুখে, তাঁর যে ছবি ফুটে উঠেছিল, রমাপতি তা দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, পেয়ে তাতেই তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। শতদলের মুখে ভালবাসা জানাবার ভাষা ছিল না, কিন্তু দু'টী ছন্নছাড়া জীবন যে এক আগ্রহ, এক লক্ষ্য নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে শুধু তাঁর মধুর স্বভাবে। বিয়ের পর পঁয়ত্রিশ বছর এক নিয়মে একই জনের কর্ত্তৃত্বে রমাপতির সংসার চলে আসছে, কোথাও একটু বিশৃঙ্খলা হয়নি।—

মেয়ের বিয়ে দিয়ে এবং ছেলেদের নিয়ে সংসার করা বোধ হয় রমাপতির ভাগ্যে ছিল না, তাই মীনার বিয়ের ছয় মাস পরে সন্ন্যাস রোগে তিনি মারা গেলেন। মরবার সময় কোনো কথাই স্পষ্ট করে বল্‌তে পার্‌লেন না। হঠাৎ মৃত্যু, তাঁর মনের সকল ইচ্ছাকে অপ্রকাশিত রেখে দিল।

শুভ্রাংশুর টেলিগ্রাফে প্রভাত যখন এই খবর পেলে, তখন সবার আগে তার মনে হল, মীনার চতুর্থী-শ্রাদ্ধের আর দেরী নেই। তার বাবাকেও সে একখানা জবাবী 'তার' করে জানতে চাইলে, মীনা কি করবে?—'

জবাবে জগমোহন লিখ্‌লেন, মীনা যে ভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌বে, সেই ভাবেই তাকে করানো হয় যেন। প্রভাত টেলিগ্রামের উত্তর পেয়েই কিছু টাকার ব্যবস্থা করে আফিসে 'ক্যাজুয়েল লিভের' একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে সাহেবের কাছে সোজাসুজি ব্যাপারটা বলে তিনদিনের ছুটী চাইলে।

প্রভাতের ভাগ্যক্রমে 'সাহেবটী' সহৃদয় ও সদাশয় ছিলেন। মন দিয়ে শুনে ব্যাপার বুঝে তার কাজ নিজের হাতে নিয়ে তার তিনদিনের ছুটী মঞ্জুর কর্‌লেন কিন্তু কথা রইলো তিনদিন পরে ফিরে এসে 'ওভার টাইম' খেটে এ তিনদিনের কামাই পূরিয়ে দিতে হবে প্রভাত তাতেই রাজী হয়ে, যাওয়ার উদ্যোগ কর্‌বার জন্যে বেরিয়ে গেল।

ম্যানের গাড়ীতে হাজারিবাগ,' 'বার্থে,' শুয়ে প্রভাত কত কিই যে ভাব্‌ছিল,'—দোলের ছুটীর পরে ফিরে এসে সে আর হাজারিবাগে আসতে পারে নি। মন অনেক সময় চঞ্চল হয়ে ছুটে যেতে চাইলেও, যাওয়ার সুবিধা কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। মীনার সেই হাসিমুখের বদলে এখন শোকের এই কালোছায়ার সামনে যেতে তার ভয় হচ্ছিল। প্রায় দুমাস মীনার সঙ্গে দেখা নাই। এখন শোককে সামনে রেখে কি ভাবেই যে দেখা-শুনা হবে সে ভাবনাটাও তার কম ছিল না। হঠাৎ মনে হল, এখন মীনার অশৌচ। হয়তো মোটেই দেখা হবেনা —এ কথাটা তার মনে একদিক দিয়ে স্বস্তি দিলেও আর এদিকে অস্বস্তি দিতে লাগ্‌ল। এই সব নানারকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভেঙে দেখ্‌লে 'নিমিয়াঘাট' ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে। আর ঘুমোন ঠিক হবেনা, কারণ একটু পরেই হাজারি-বাগ; এই ভেবে সঙ্গের সুটকেসটী পাশে রেখে দিয়ে সে উঠে বস্‌লো। একটু পরেই হাজারিবাগে এসে গাড়ী থাম্‌লো।

আগে খবর দেওয়া ছিল না বলে প্রভাত মোটর বাসে করে প্রায় দেড়টার সময় শ্বশুরবাড়ী পৌছল। নেমে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে তার পা দুটো কেঁপে উঠ্‌লো— দেখ্‌লে সারা বাড়ীর ওপর দিয়ে যেন একটা ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে।

গেট্ খুলে ভিতরে ঢুকতেই রমাপতির প্রিয় কুকুরটা ডেকে উঠ্‌লো—তার ডাকে ঘর থেকে হীরা সিং বেরিয়ে এসে প্রভাতকে দেখে বিষণ্ণমুখে এগিয়ে এসে তাকে একটা সেলাম ঠুকে সুট কেসটা হাত থেকে নিলে। তারপর বল্‌লে, "রামজীর ইচ্ছা, দেব্‌তার মত মনিব আমার এক লহমায় চলে গেলেন। যত সব ডাগদর দব নিয়ে এলাম, সকলেই এক কথা বল্‌লে—রামজীর ইচ্ছা।" বুড়ো দারোয়ান জামার হাতায় চোখ দুটো মুছে নিলে।

ভিতর দিকে একটা জান্‌লা খোলার শব্দ হল—কে জিজ্ঞাসা করলে, "কার সাথে কথা বলচ হীরা সিং?"

"জী হুজুর, জামাইবাবু।" জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। একটা অস্পষ্ট কান্নার শব্দ প্রভাতের কানে ভেসে এল—

একটু পরেই খালি পায়ে, থান পরা, কাচা গলায় শুভ্রাংশু বিষণ্ণমুখে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। বড়খালার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকেও প্রভাত যেন মুখ তুল্‌তে পার্‌ছিল না— এই গভীর শোকে কি সান্ত্বনা সে দেয়! একেই তো এসব সামাজিকতা তার আদৌ আসে না, তার ওপর এদের সঙ্গে একটু চেনা-শোনা হতে না হতেই এই বিপদ! শুভ্রাংশুর সঙ্গে আলাপ করাটা খুবই সমীচীন বলে মনে হলেও, মুখ দিয়ে তার একটা কথাও বেরোল না।

একটু পরে শুভ্রাংশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার' কখন্ পেয়েছিলে?—"

নতমুখে প্রভাত বললে, "কাল দুপুরে, তার পেয়ে ছুটী মঞ্জুর করিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। হঠাৎ এরকম হল! আগের বারে এসে দেখে গেলাম, স্বাস্থ্য তখন তো বিশেষ খারাপ বলে বোধ হয় নি!"

বিষাদ ভরা সুরে শুধাংশু বল্‌লেন "হ্যাঁ—ভাই, হঠাৎই হ'ল পরশু এমন সময়েও তিনি কাজ কর্ম্ম করেছেন, বিকেল বেলাতে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হওয়াতে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসেন, তারপরে এ্যাপোপ্লেকিসর যা নিয়ম —বল্‌বার, কইবার অবসর না দিয়েই প্রাণত্যাগ। এতটা বয়েস হল, কখনও কিছু হাতে করে করিনি— পর্ব্বতের আড়ালে ছিলাম—কি করে যে দায়মুক্ত হব, সেই আমার ভাবনা।"

এইবার প্রভাতের কথা ফুট্‌লো, বল্‌লে, "কোন ভয় বা ভাবনা নেই দাদা! কাজ যাঁর তিনিই কর্‌বেন— আপনি তো উপলক্ষ্য!—"

কপালে হাত ঠেকিয়ে সবিষাদে তিনি বল্‌লেন, "কি জানি! এস, তোমার বিশ্রামের একটু ব্যবস্থা করে দিই। হীরা সিং, জামাই বাবুর জন্যে তুমি কিছু রসুই কর।" বলে তিনি অগ্রসর হলেন—পিছনে যেতে যেতে প্রভাত যেন দ্বিধার সঙ্গে বল্‌লে, "একেবারে মা'র সঙ্গে দেখাটা করে নিলে হ'ত না?—"

"হ্যাঁ—মার কাছেই তো যাচ্ছি।" যে ঘরে প্রভাতকে নিয়ে শুভ্রাংশু হাজির হলেন, সে ঘরখানা বাড়ীর এক নির্জ্জন প্রান্তে। মাটীতে কম্বলের বিছানায় শতদল শুয়ে ছিলেন আর তাঁর পাশে মলিনা বসে ছিল—আরও কেউ যে এ ঘরে ছিল তা অন্ত পাশের খোলা মহাভারতটা

দেখেই বুঝা যাচ্ছিল। প্রভাত ঘরে ঢুকেই একেবারে শতদলের পায়ের কাছে বস্‌ল। শাশুড়ীর এই দীনা মূর্ত্তি দেখে, তারও মনের ভিতর যেন কেঁদে উঠ্‌ছিল। শতদল একবার ফুঁপিয়ে উঠেই একেবারে স্থির হয়ে গেলেন। কাঁদ্‌বার ক্ষমতাটুকুও তাঁর রমাপতি যেন নিঃশেষ করে নিয়ে গেছেন। ঘরের আর ক'টী প্রাণীর চোখে, তখন জলের বিরাম ছিল না। একটু পরেই শুভ্রাংশু ইসারা করে প্রভাতকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় প্রভাতের খাওয়ার কি ব্যবস্থা তিনি করেছেন তা-ও মলিনার কাণে কাণে জানিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার একটু আগে খেয়ে প্রভাতের আর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। রাত্রের জলযোগ সেরে, শুভ্রাংশু তাকে নিয়ে নিজের ঘরে শুলেন। সেইখানেই প্রভাত, মীনা যে চতুর্থী শ্রাদ্ধ করবে, তার সব জোগাড় করে দেওয়ার জন্য শুভ্রাংশুকে বল্‌লেন। তিনি সকালে সব ঠিক করে দেবেন বল্‌লেন।

পরদিন প্রভাতের ও শুভ্রাংশুর চেষ্টায় মীনা রমাপতির বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলে। নিমন্ত্রিত লোকদের খাওয়ার ব্যাপারটাও সুশৃঙ্খলায় হয়ে গেল। সেই দিন মীনা প্রভাতের কাছে এল—তারপর দিন তার যাওয়ার কথা।

প্রভাতের বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, এই শোকার্ত্তা তরুণীকে সে কি বলে সান্ত্বনা দেবে?—বল্‌তে তার ইচ্ছা হচ্ছিল, অনেক কথাই, কিন্তু কথাগুলো তার নিজের কানেই কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেক্‌ছিল।

মীনা ঘরে এসেই প্রভাতকে দেখবামাত্রই কেঁদে ফেল্‌লে। প্রভাত ধীরে ধীরে তার পাশে বসে, তার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিলে। মীনা সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো—তার মাথায়, পিঠে হাত বুলোনো ছাড়া প্রভাত একটী কথাও তাকে বল্‌তে পারলো না। কেঁদে কেঁদে মীনা শান্ত হল। তখন প্রভাত বললে, "আমার 'মা' নাই, তোমার 'বাবা' নাই। তোমার মা ও আমার বাবাকে আমরা ভাগ করে নেব। তুমি তো অবুঝ না, তোমাকে বোঝাব আর কি? ভেবে দেখ, এ তো প্রতি ঘরে, প্রতি মুহূর্ত্তে হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সময় হয়েছিল, তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কত অসমাপ্ত কাজ তাঁর পড়ে রইলো। মাকে দেখা এখন আমাদের একটা প্রধান কাজ।—"

"মাকে যে এমন করে আমি আর দেখ্‌তে পারছিনে।"

"কিন্তু দেখ্‌তেই যে হবে মীন—তুমি তাঁর মেয়ে—তাঁর এ ব্যথা তুমি খুব সহজেই বুঝ্‌তে পারবে। যে ক'দিন বাবা তোমাকে না নিয়ে যাচ্ছেন, সে ক'দিন তুমি মাকে দেখ।" বাবার কথা মনে হওয়াতে মীনার চোখ দুটী ছলছলিয়ে এল। প্রভাত তা দেখ্‌তে পেয়ে, চোখ দুটীতে একে একে চুমো দিয়ে বল্‌লে "না, মীণু, তুমি অত ভেঙে পড়্‌লে চলবে না তো? আজ যদি আমিও মরে যাই তো তুমি কি কর?"

সভয়ে দু'হাত দিয়ে প্রভাতকে জড়িয়ে ধরে মীনা বল্‌লে "না, না, ওকি কথা? অমন অলক্ষুণে কথা কেন বল্‌লে? আচ্ছা, আর আমি কাঁদ্‌ব না।"

মীনার আলিঙ্গন আরও দৃঢ় করে প্রভাত বল্‌লে, "কিছু ভয় পেওনা—আমি কথার কথা বল্‌ছি বলে সত্যি আজ কিছু আমি মর্‌ছিনে।—"

"না, না, ও কথাটা তুমি আর বলোনা। ওটা আমার কাণে বিষম বাজ্‌ছে।"

একটু হেসে প্রভাত বল্‌লে, "কিন্তু জগতে এইটাই সত্যি কথা। না? চল, তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছ—আজ—শুয়ে পড়া যাকৃগে।"—

পরদিন সন্ধ্যায় যাওয়ার আগে প্রভাত মীনাকে ডেকে পাঠালে। সে এলে নিজের শরীরের ওপর দৃষ্টি রেখে, মাকে দেখ্‌বার কথা বার বার বল্‌লে। যেতেই হবে, ছুটী নাই। না হলে যেতে প্রভাতের একটুও ইচ্ছা ছিল না। দেরী করে করে সময় যখন আসন্ন হয়ে এল, তখন সে মীনার মুখখানা দু'হাতে চেপে ধরে অনেকখানি আদর ঢেলে দিয়ে চলে যেতে যেতে বল্‌লে, "ভাল থেক মীনা—তুমি ভাল থাকলে আমিও ভাল থাক্‌ব।"

এত বড় শোকের পরে স্বামীকে একদিনের জন্যে কাছে পেয়ে মীনার মন অনেকটা স্থির হয়ে এসেছিল—তারও প্রভাতকে এত শীঘ্র ছাড়্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল না—কিন্তু পরের চাকরী; তা ছাড়া আবার হয়তো আস্‌তে হবে—শ্রাদ্ধের সময়। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে মীনা স্বামীর এই চলে যাওয়া ব্যাপারটাকে খুব হাল্কা ভাবে নিতে চাইলে—কিন্তু মন হাল্কা হলনা। তার মুদিত চিত্ত কমল, প্রভাতের আদর স্পর্শে তখন সবেমাত্র দল মেল্‌তে আরম্ভ করেছে।

(৪)

রমাপতির শ্রাদ্ধের আর আট দিন বাকী আছে। শুভ্রাংশু দু'চার দিন থেকেই ভাব্‌ছিলেন যে, শ্রাদ্ধটা একটু বিশেষ রকম ঘটা করেই কর্‌বেন। পরামর্শই বা কার সঙ্গে কর্‌বেন—উপদেশই বা কে দিবে? এখন পিতার অবর্ত্তমানে যিনি তাঁর মত হয়ে তাঁকে উপদেশ বা উপায় বলে দিতে পারেন, এমন লোক এক শতদল ছাড়া আর তো কেউই নেই। মীনু তো নেহাৎ ছেলে মানুষ, কোনো কথা বলবার আগেই সে কেঁদে ভাসায়; তার সাথে পরামর্শ চলে না—সুধাংশু, হিমাংশু তো খুবই ছোট—কি বিপদ যে হয়েছে, তা ভাল করে বুঝবার ক্ষমতা তাদের হয় নি। শুধু রমাপতি মারা গেলেন, তাঁকে শ্মশানে নিয়ে গেল, তাঁকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না কোনদিন, এইটুকুই তারা বুঝ্‌লে—তার পরের ভাবনাগুলো বড়দার ঘাড়ে চাপিয়ে তারা আগের মতই খেলা করে বেড়াতে লাগ্‌ল।

হবিষ্যি সেরে শুভ্রাংশু ঠিক কর্‌লেন, আজই দুপুরে যেমন করে হোক্ মায়ের কাছে কথাটা পাড়্‌বেন। কষ্ট হবে, কিন্তু হলেই বা কি করা যাবে? যে কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে বেশী তো হবে না। বাবার সঙ্গে একপথে চলে তাঁর মতামত তিনি যতদূর জান্‌তে ও বুঝ্‌তে পেরেছেন এত আর কে পেরেছে? এ কাজে তাঁকে পরামর্শ দিতেই হবে। এই রকম ভাব্‌তে শুভ্রাংশু মায়ের ঘরটায় উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন, মা শুয়ে আছেন কিনা—দেখ্‌লেন কেউই নেই—কম্বলটা পাতা রয়েছে, পাশে একখানা মহাভারত, পরমহংস দেবের কথামৃত দু'খানা, আর একটা ঘটী। দেখে শুভ্রাংশু ফিরে আবার বাইরে চলে গেলেন।—

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে, হাতে কতকগুলি লম্বা সরু সরু কাগজের ফালি একটা ফাউণ্টেন পেন ও একখানা ব্যাঙ্কের খাতা নিয়ে শুভ্রাংশু আবার সেই ঘরের দরজায় এলেন। দেখ্‌লেন, মীনা মহাভারতের 'শান্তি পর্ব্ব' পড়্‌ছে, আর মলিনা মাথার কাছে বসে শতদলের রুক্ষ চুলগুলোর জটা ভেঙে দিচ্ছে। একটু ইতস্ততঃ করে তিনি মীনাকে ডাক্‌লেন।

মহাভারতটা বন্ধ করে মীনা বাইরে এল। দু ভাই-বোনে অনেকক্ষণ ধরে কি কথা হ'বার পরে মীনু হঠাৎ ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "মা, বড়্‌দা একবার এখানে আস্‌তে চায় তার কি দরকার আছে তোমার কাছে।"

শুনে শতদল মৃদুস্বরে বল্‌লেন, "আস্‌বে আসুক। তার আবার জিজ্ঞাসা কি?" মীনা ইসারা করতেই শুভ্রাংশু ঘরে ঢুকে এলেন। মায়ের কম্বলের এক ধারে বসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শুভ্রাংশুর মনের ভিতর কান্না গুমরে উঠ্‌লো—শুধু অস্পষ্ট স্বরে বল্লেন "মা!" তাঁর কান্না আর বাধা মান্‌তে চাইছিল না।

উপযুক্ত ছেলের এই অসহায় ডাকে, শতদল শুধু "বাবা" ছাড়া আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লেন না। রমাপতির বিদায়ের পরে ছেলের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎ! শুভ্রাংশু এসেছেন, বসেছেন, সমস্ত খুঁটি-নাটি খবর নিয়েছেন, কিন্তু সবই শতদলের অসাক্ষাতে, অজ্ঞাতে। শতদলও শুভ্রাংশুর সমস্ত খবর পড়ে থেকেও নিয়েছেন। আজ শুভ্রাংশু সরাসরি তাঁর কাছে এসে বসতে তাঁর যেন বৈধব্যের প্রথম দিনের মতই যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ কেঁদে দুজনে শান্ত হলেন—কেউ কাউকে থামাবার চেষ্টাও কর্‌লেন না। চোখ মুছে, গলা ঝেড়ে নিয়ে শুভ্রাংশুই আগে কথা বল্লেন। "মা, তুমি যদি এ বিপদে আমাকে বুদ্ধি না দেও, তবে আমি কার মুখ চাইব? কি করে আমি এ দায় থেকে মুক্ত হব, তুমি বলে দেও মা।"

রাঙা চোখ দুটো তুলে শতদল বল্লেন, "তোরাই বল্ না বাবা, আমি কি করি।"

"ও কথা বল্লে হবে না তো মা—কাঁদ্‌বার দিন আমরা তো অনেক পাব। বাবার পারলৌকিক কাজের এতটুকু অঙ্গহানিও আমার সইবেনা মা—তুমি শুধু বলে দেও কি কর্‌তে হবে। তাঁরই টাকায় তাঁর কাজ কর্‌ব, এত বড় অযোগ্য সন্তান আমি! আমাদের সুখ বা তৃপ্তির জন্যে তিনি তো কম ব্যবস্থা করে যাননি! তাঁর তৃপ্তি কিসে হবে তাই শুধু তুমি বলে দেও।"

"তুই বল্ বাবা, কি করবি? আমি শুনি—আমার হাত পা যে সর্‌ছে না—আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা সবই চলে গিয়েছে। না হলে তুই এমনি শুকনো

মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্, আর আমি তা চুপ করে দেখ্ছি! কথাটাও আমার আর যোগায় না রে!"

"মা, আমাদের তো কোনো হাত নেই। এ ভগবানের মার, মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় নেই মা। সুধা, হিমু ওরাও তোমার কাছে আস্তেই সাহস পায় না—তুমি এত ভেঙে পড়্লে, আমরা কোথায় যাই?"

"তাই তো মলিনা মা, ওদের একবার ডাকো তো। বাছাদের কতদিন দেখিনি আমি! তাই তো, আমাকে উঠ্তেই হবে ঝেড়ে।" মীনা এ সব আলোচনা আরম্ভ হ্তেই পালিয়েছিল, মলিনাও এখন সুধাংশু, হিমাংশুকে ডাক্তে উঠে গেল। গায়ের ওপর যে চাদরটা দেওয়া ছিল, সেটাকে সরিয়ে দিয়ে শতদল উঠে বসে বল্লেন, "তুই কি করবি মনে করেছিস্ খোকা? বেশী আড়ম্বরে দরকার কি বাবা? তিনি গরীব, গরীবের বন্ধু ছিলেন। বেশী আড়ম্বর করে সে টাকাগুলো ব্রাহ্মণদের পেটে না দিয়ে, দরিদ্র-নারায়ণের ভোগ দিস্।"

শুভ্রাংশু একটু কি যেন ভাব্লেন, পরে বল্লেন "মা, এইখানে তোমার সঙ্গে আমার মিল্লো না মা! বাবার শ্রাদ্ধ বারে বারে কি ভাবে করে উঠ্তে পারব জানিনে! কিন্তু এই প্রথম বারের কাজটায় আমি একটু আড়ম্বরেই করতে চাচ্ছি মা! আর কাঙালী বিদায় তো হবেই—"

বাধা দিয়ে শতদল, বল্লেন "বিদায় নয় বাবা! কাঙালী-ভোজন! এই সব গরীবেরা দু'বেলা পেট পূরে হয়তো ভাত খেতেও পায় না—ভাত, তরকারী রেঁধে এদের বসিয়ে খাইয়ে দিতে হবে। তাতে যদি কিছু এধারে কম করতে হয় তো তাও ভাল।"

"আচ্ছা, মা, তাই হবে। আর আমার বৃষোৎসর্গ, ওদের দুভায়ের ষোড়শ হবে এটা স্থির। দেশের থেকে কি পুরুত আনাবো না এখানের পুরুতেই হবে?"

"দেশে আমাদের কিছু নেই বাবা? আর বার-মাসই এ দেশের পুরুতে ষষ্ঠী, মাকাল-পূজো করলে, এখন, এ ব্যাপারে, দেশ থেকে পুরুত আনালে এঁরাও মনক্ষুণ্ণ হবেন। বাবা, তুই বেশী হাঙ্গামা করিস্নে—কে এস... ...বে? মীনু, বৌমা দুজনেই ছেলেমানুষ, বিশেষ বৌমার এখন বেশী পরিশ্রম করা উচিত নয়—কি হিতে বিপরীত হবে শেষে! আর তো তিনি নেই যে সব ভাবনা মাথায় করে তুলে নেবেন!"

শুভ্রাংশু মাথাটা একটু নীচু করে কি ভাব্লেন, বল্লেন, "বেশী পরিশ্রম না হোক্ একটু একটু করতে হবে বৈকি মা। আর তুমি যদি বল তবে না-হয় আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে আস্তে বল্তে পারি। দু' এক দিনের মধ্যেই আমাকে তো একবার কল্কাতা যেতে হবে, জিনিস-পত্তর কিনতে রিষ্ড়ে থেকে ঐ সময় তাঁকে সঙ্গে করে আন্তেও পারি। আর না হলে লোক তো কাউকে দেখি নে।"

"তাই যা হয় কর্ বাবা। আর দেশে মাসীমাকে আস্বার জন্য একখানা চিঠি লিখে দিস্। তিনি বুড়ো মানুষ, এলে বেয়ানে আর তাতে মিলে তাও খানিকটা সুবিধা হবে। না হ'লে মীনু আর বৌমা কি পারে? আমার যে হাত পা একেবারেই ভেঙে গেছে।"

শুভ্রাংশু দরজার দিকে চেয়ে দেখ্লেন, সুধাংশু, হিমাংশু দরজার পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে—দেখে একটু বিষাদের হাসি হেসে বল্লেন, "দেখ মা, সুধা, হিমু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—ঘরে আস্তে পারছে না—তুমি ওদের ডাক মা।"

শতদলের চোখে দুফোঁটা জল এসে পড়লো—ভাব্লেন আজ ওদের চেয়ে অসহায় বুঝি আর কেউ নেই। পিতৃহীন তো ওরা হয়েছেই—মাতৃহীনও বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছে, না হলে এই সব দুধের ছেলে ফেলে আজ ২০।২২ দিন তিনি কি করে আছেন? ওরাও বোধহয় ভেবেছে, ওদের 'মা' নেই—না হলে এসে ভয়ে ভয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেন?" বাঁ-হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জলটা মুছে ফেলে তিনি ঘরের বাইরে এসে দুই ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন।

মায়ের এই নতুন বেশ, ময়লা কাপড়, শাদা হাত, রুক্ষ মাথা যেন তাদের মনে নিচ্ছিল না—হিমাংশু বার বার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কি যেন দেখ্তে লাগ্ল। দুজনের হাত ধরে শতদল ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর

কম্বলের ওপর বসালেন। তারপর বল্লেন, "তোমরা আর বিকেলে বেড়াতে যাও না? খেলা কর না?"

সুধাংশু বল্লে, "কেউ আর আমাদের বেড়াতে নিয়ে যায় না, তাই আমরা দুজনে বাড়ীতে একা-একাই খেলি।"

"বিকেলে তোরা কি খেয়েছিস্? না খেয়ে থাকিস্ তো যা বৌদির কাছে খেয়ে আয়।"

"আমরা খেয়েছি। এখানে আসবার আগে বৌদি আমাদের দুধ, মিষ্টি দিয়েছেন।"

"তবে যা এখন বাইরে খেলা কর্‌গে। সন্ধ্যে বেলা আবার আসিস্ আমার কাছে।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে শুধাংশু, হিমাংশু চলে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে দেখে শুভ্রাংশু উঠ্‌তে বল্‌লেন "যাই আমিও। মীনুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল তাহলে কল্‌কাতা যাব আর ফির্‌বার সময় রিষ্‌ড়ে থেকে ওঁকে আন্‌ব তো? হীরা সিং থাক্‌বে আর দয়াল বাবুদেরও বলে যাব, তিন চার দিন পরেই আবার ফির্‌ব। আঃ! এ সময়ে যতীটা থাক্‌লে যে কী সুবিধেই হ'ত! আচ্ছা, এক কাজ কর্‌লে হয় না? কাগজে কাগজে বাবার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে, যতীকে ফিরে আসবার জন্যে একটা বিজ্ঞাপন দিই। আমার বিশ্বাস, যদি সে বেঁচে থাকে, তবে, এ বিজ্ঞাপন দেখ্‌লে নিশ্চয় আস্‌বে।"

যতীর কথা যে শতদলেরও মনে হয় নি তা নয়, কিন্তু খবর তার কেমন করে পাওয়া যাবে, সেইটাই তাঁর মাথায় আস্‌ছিল না। এখন শুভ্রাংশুর এই কথায়, তিনি কাঙালের মত বলে উঠ্‌লেন, "তাই দে বাবা, আহা! মনে কী দুঃখ নিয়েই যে দেশান্তরী হ'ল! আমারও বিশ্বাস, এ খবর জান্‌তে পারলে সে কখনো স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। ভগবান্ যদি যতীকে মিলিয়ে দেন, তবে তোর পাশে সে থাক্‌লে আমার কোনো ভাব্‌না থাক্‌বে না। ওরে সে যে সব পারে। মীনুর বিয়ের সময় কি খাটুনীটাই না খেটেছিল সে!"

"তবে তাই করিগে।" বলে শুভ্রাংশু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অবশ হয়ে শতদল বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভাব্‌লেন যাঁর সুখ, সুবিধায় সামান্য ত্রুটীও তাঁর সহ্য হ'তনা, আজ বাইশ দিন তাঁর সম্বন্ধে যাবতীয় ভাবনা, চিন্তা, বিদায় দিয়ে তিনি কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন! ভগবানের এ কি বিধান! সংসারে এনে, একজনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জীবনটা গেঁথে দিয়ে তার পরে অতর্কিতে কি করে যে পরম প্রিয় সাথীটীকে তুলে নিয়ে জোড় ভেঙে বিজোড়া করে চলার পথ থামিয়ে দেন, তা তিনিই জানেন। এত স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন, আদর, কিছুই কি আর বাকী থাকে না? একেবারেই সব শেষ হয়ে যায়? আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও আর তাঁকে দেখা যাবে না—না স্বপ্নে, না জাগরণে; এই চিন্তাই যে বড় যন্ত্রণার, বড় দুঃখের, বড় হতাশার। আর যে ক'দিন বাঁচা, সে শুধু স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকা। যখন সুখের দিন আসে, তখন স্মৃতির কথা আমাদের মনেও আসে না—কিন্তু যখন দুঃখের ভারে মন নুয়ে পড়ে, সুখের আলো কিছু দেখা যায় না, তখন স্মৃতিগুলো কিন্তু ঠিক সময়েই, আপনা থেকেই মনে আসা-যাওয়া করে, তাই তারা এত অমূল্য, এত অপূর্ব্ব, এত সুন্দর, এত মধুর? মন যখন বিরাম চায়, যখন নিজের মাঝে শামুকের খোলায় লুকিয়ে থাকার মত, নিজেকে লুকিয়ে রাখ্‌তে চায়, সংসার তখনও তার দাবী, পাওনা কর্‌তে ছাড়ে না। দেহটাকে কোনমতে টেনে বেড়াতে হয়, তাঁর ফেলে-যাওয়া প্রিয় জিনিসগুলি গুছিয়ে রাখ্‌তে হয়, অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করার ব্যবস্থা করতে হয়—না হলে, শুভ্রাংশু যখন অসহায় হয়ে পরামর্শ নিতে তাঁরই কাছে ছুটে এল, তিনি তো কই তাকে ফেরাতে পার্‌লেন না! চোখের জল, আপনিই আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—ঘরে আলো জাল্‌তে মীনা এসে ঢুক্‌লো।

আলো জালার মৃদু শব্দেই শতদল চোখ খুলে চাইলেন, দেখলেন, আলো জেলে দিয়ে জান্‌লার একটা গরাদ ধরে মীনা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কাছে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোর শ্বশুরের, প্রভাতের, সব চিঠি পেয়েছিস্? কেমন আছেন তাঁরা?

"ভালই আছেন?"

"প্রভাত কবে আস্‌তে পার্‌বে কিছু লিখেছে কি? খোকা যে বড় ছেলেমানুষ! আমি যত দূর বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সে একটা বৃহৎ কাজে নাম্‌তে চাচ্ছে—এই সময়ে

পল্লী দৃশ্য

শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা (রায়) চৌধুরী

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিমিটেড
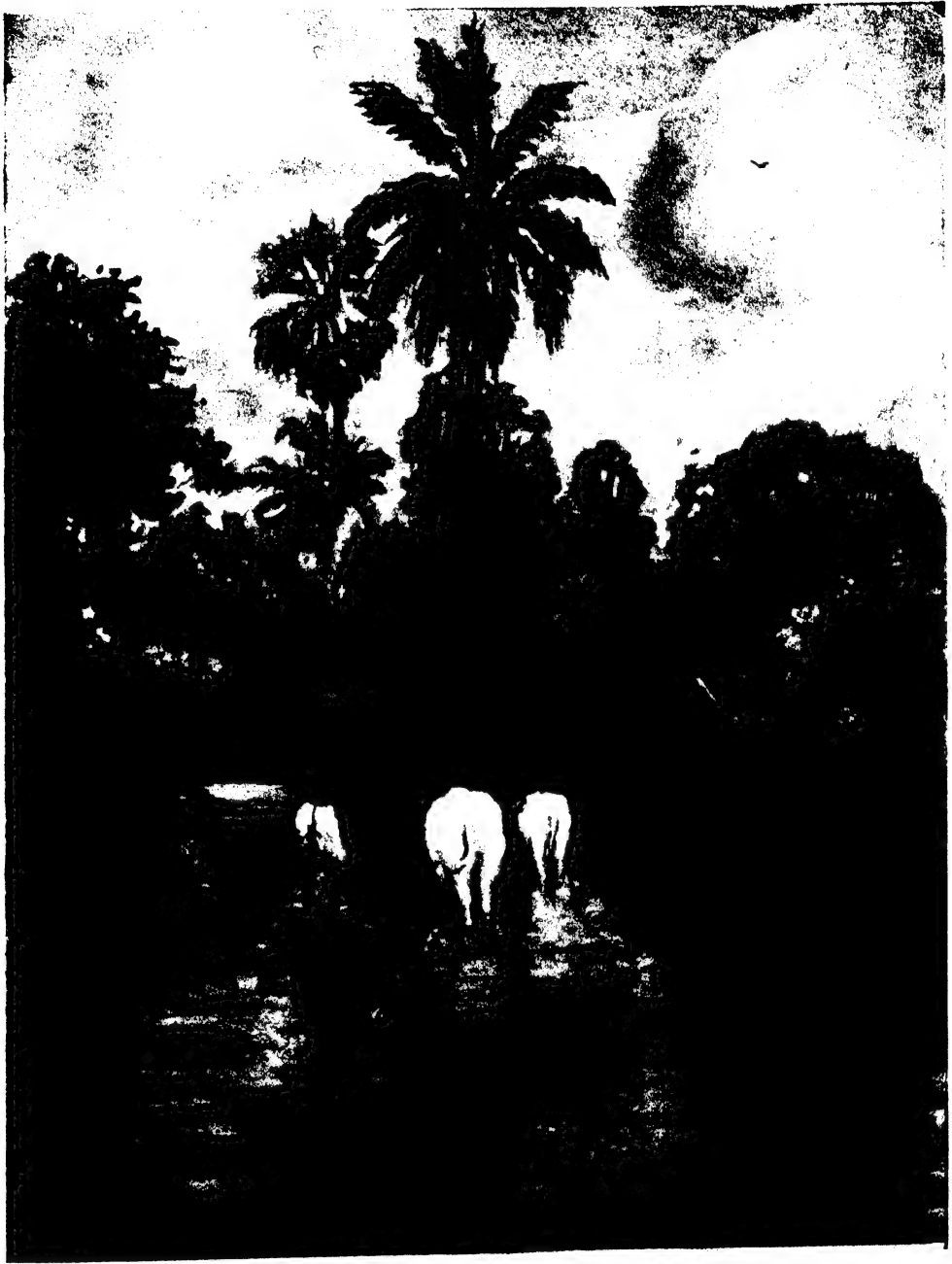
লোকের সাহায্য যে বড্ড বেশী দরকার! সবার আগে আজ আমার যতীকেই মনে পড়ছে। তার মত খাটবার ক্ষমতা, খাটবার ইচ্ছা, আগ্রহ আমি আর দেখিনি বললেই চলে। মা, তোর কি যতীকে মনে পড়ে না রে?

হাঁ মা, পড়ে বই কি। কেন যে যতীদা গেল, বাবাকে শেষ একবার দেখতেও পেলে না। আমার মনে হয় সে কোথাও কাছাকাছিই লুকিয়ে আছে।"

কপালে হাত ঠেকিয়ে শতদল বল্লেন, "হবেও বা। সে যে বড্ড অভিমানী।"

এমন সময়ে মলিনা ঘরে ঢুকে মীনার কানে কানে কি কথা বলাতে সে বেরিয়ে গেলে, তার জায়গায় মলিনা বসল। শতদল ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। মলিনার কথাটা তাঁর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন, "আহা, চুলগুলোতে যে জটা ধরে গেল, হাত দিয়েও কি ছাড়াতে পারিস্‌নে মা। কবে যে আমি আবার উঠব, তা জানিনে। আমার পাগলা ছেলের কথা শুনে তুমিও যেন বেশী পরিশ্রম করো না। মীনু তো আছে, যা করবার ওকে দিয়েই করিয়ো। এই বিপদের সময় আবার তোমার যদি কিছু হয়, তবে আর আমি বাঁচব না। আমি তো বেশী খাটি নে। যা করি মীনুকেও ডেকে নিই।"

"আর এতদিন যদি চালালে, তবে আর দু' দশ দিনও চালিয়ে দেও। তারপরে সবই ঠিক হবে, কেবল যে মহাপ্রাণ চলে গেল, তাই গেল। আমার আর আমার ভবিষ্যৎ বংশধর, আসছে, তার জন্যে কত আনন্দ করবো, কত কল্যাণ কামনা করব তা না সব সাধে বাদ সেধে এই অকূল দুঃখ সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি সরে পড়লেন। শুনেই গেলেন দেখা আর, এ জন্মে হ'ল না।" শতদলের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। মলিনা কি বলবে ভেবে না পেয়ে মাথা নীচু করে বসেই রইলো।

মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে মীনা দেখলে, শুভ্রাংশু সেখানে পায়চারী করছেন।

তাকে আসতে দেখে তিনি বললেন "মীনা যতী এসেছে।"

"কই, কোথায়?" বলে মীনা অস্থির হয়ে উঠলো। "মা যে তারই কথা আজ কত বলছিলেন। কোথায় ছিল, কি করে শুনলো!"

"ছিল এলাহাবাদে। সেখান থেকে কি দরকারে কাশী আসে। সেখান থেকে এখানে আসবার জন্যে বোধ হয়, তারপরে একেবারে ষ্টেশনে এসে সব শোনে। তখন বরাবর এখানে চলে এসেছে—মার ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে দেখি হীরা সিং কার সঙ্গে কথা বলছে দেখে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই ঘরে গেলাম, একটু পরেই দেখি যতী ঘরে ঢুকে একেবারে ছোট ছেলের মত কাঁদতে লাগল—অনেক করে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু ও মা'র সঙ্গে এখুনি দেখা করতে চায়—তার আগে ওকে কিছু খাইয়ে দিই। তুই চট্ করে একটু চিনি কি বাতাসা ভিজিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দে দিকি।" বলে শুভ্রাংশু চলে গেলেন।—তার একটু পরেই এক গ্লাস সরবত নিয়ে মীনা বাইরে গেল।

ঘরে শুভ্রাংশু ও যতী ছাড়া আর কেউ ছিল না। যতী তখন শুভ্রাংশুর কাছে রমাপতির শেষ সময়ের সব কথা শুনছিল, মীনা এসে সরবতের গেলাসটা যতীর হাতে দিয়ে বললে "খাও যতীদা! ওসব কথা শুনবার সুযোগ ঢের পাবে।—আগে একদিন যদি আসতে! বাবা যে তোমার জন্যে কত দুঃখু নিয়ে গেছেন, আজ তিনি নেই, তুমি এসেছ, তিনি থাকলে যে কত সুখী হতেন! এলেই তো, আর একটু আগে কেন এলে না যতীদা?—"

মীনার এই আক্ষেপে যতী মুখ আর তুলতে পারলেন না। তার দেওয়া সরবতটা খেয়ে শুভ্রাংশুকে লক্ষ্য করে বললে, "উঠুন তা হলে।—"

"হ্যা—চল।" বলে শুভ্রাংশু তাকে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

যে ঘরে শতদল মলিনার সাথে গল্প করছিলেন, সেইখানে শুভ্রাংশু যতীকে নিয়ে বল্লেন, "মা, চেয়ে দেখ কে এসেছে!—"

"কে?"—বলে শতদল মুখ ফিরিয়ে যতীকে দেখেই কান্নায় ফেটে পড়ে বল্লেন "এলে বাবা যতী?—এতদিনে তোমার অভিমান ভাঙল? তিনি থাকতে যদি আসতে তবে যে কি সুখেরই হ'ত, তোমার চলে যাওয়াটা তাঁর বড্ডই লেগেছিল যে!—"

অপরাধীর মত মুখটা নীচু করে যতী বসে বসে কাঁদতে

লাগ্‌লো। ঘরে তখন শুধু চাপা কান্নার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না।—অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে শতদল যতীর হাত দুটী ধরে বল্লেন "বাবা, এসেছ তো যেওনা। খোকা বড় একা, কি করে যে উদ্ধার হবে ভেবে পাচ্ছে না—দুটো ভাল কথা তাকে বলে এমন কেউ নেই; তোমাকে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন বাবা—আজ আমরা তোমার কথা যে কত বল্‌ছিলাম!—"

এইবার যতী মুখ তুলে ভাঙাগলায় বল্‌লে, "আপনি ওকথা বলছেন কেন কাকিমা? আমি আর কোথাও যাবনা।—কাকাবাবু আমাকে খুব শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। যে ক'দিন আপনি আছেন, সে ক'দিন আপনাকে 'মা' বলে ডেকে, আপনার সন্তান হয়ে এখানেই থাকব।"

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে শতদল বল্লেন "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও বাবা"।—

সেদিনের মত বিদায় নিয়ে যতী ও শুভ্রাংশু চলে গেলেন।—তার পরের দিন শুভ্রাংশু যতীকে বাড়ীতে কর্‌বার যে কাজগুলি ছিল, বুঝিয়ে দিয়ে কলকাতায় রওনা হলেন। যতী আগের মত বাড়ীর ছেলে হয়ে সুধাংশু, হিমাংশুকে সঙ্গে নিয়ে কাজগুলি একে একে শেষ করতে লাগ্‌লেন।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাড়ীর পেছন পরিষ্কার হয়ে সেখানে একখানা চালা ঘর বাঁধা হয়ে গেল। ভিতরের আঙিনাটী পার হয়ে সেখানে যাওয়ার জন্যে একটা অস্থায়ী পথও তৈরী হল!—মস্ত মাঠটা ঘিরে বেশ মজবুত করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে একটা তাঁবু খাটানো হলো।—যতী ভূতের মত খাটছিল। মুখে তার একটী কথাও ছিলনা। এই খাটুনীর ভিতর দিয়েই সে বোধহয় অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা রমাপতির ওপর তার কর্ত্তব্য শেষ করে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে মীনা এসে বল্‌তো "যতীদা, এতটা বেলা হল, একটু সরবৎও মুখে দিলেনা, খেটে খেটে মরে গেলে যে ভাই!"—

বিষণ্ণ মুখ তুলে যতী শুধু একটু হাসতো—কিন্তু তার কাজের বিরাম হ'ত না।— ক্রমশঃ

চা-বাগানের কুলি

শ্রীঅমলা দেবী

এ শুধু চায়ের দেশ।
চারিদিকে এর চায়ের বাগান,
মাটীর নাইকো লেশ।
হেথা নিতি মোরা ধূলি-রেণু মাখি'
তুলি পাতা, আর বিধাতারে ডাকি;
চিত্ত-ভুবন অশ্রু-মগন,
রহি' রহি' সহে ক্লেশ।
কোথায় চিহ্ন জন্ম-ভূমির!
জননী-পরশে পূণ্য কুটীর!
কুলীর জীবনে স্মৃতিটুকু শুধু
আছে হায় অবশেষ!

—

হত্যার দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে না

মাহাত্মা গান্ধী

"বোম্বায়ের অস্থায়ী লাটের প্রাণ লইবার চেষ্টার উদ্দেশ্য কি? এ ভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পাইয়া ছাত্রটি শত্রুতার ভাব বৃদ্ধি করিয়াছে। নিজের ছাত্র-জীবনের অপব্যবহার করিয়া সে ছাত্র-জীবনের উপরই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে। এই উপদ্রবের পশ্চাতে আবার বিশ্বাসঘাতকতাও রহিয়াছে। লাট সাহেব ফার্গুসন কলেজের অতিথি ছিলেন। অতিথি সর্ব্বদা রক্ষণীয়। অতিথি যদি শত্রুও হয় তথাপি আরবরা তাহাকে হত্যা করে না। হিংসায় বিশ্বাসী সঙ্ঘগুলির কার্য্যের কি কোন সীমা নাই? আমাদের বিরুদ্ধে কেহ এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে আমরা ব্যথিত হইতাম। আমাদের প্রতি যাহা করা অনুচিত মনে করি অপরের প্রতি তাহা করি কি করিয়া? এই ধরণের কার্য্যে ভারতের গৌরব নাই, বরং হ্রাসই পায়। আমাদের মত একটা মহান প্রাচীন দেশে বিশ্বাসঘাতকতামূলক হত্যাকাণ্ডদ্বারা স্বরাজ লাভ সম্ভব নহে। স্বরাজের অর্থ দেশের লোকের হিতার্থে দেশের লোকের ক্ষমতা প্রাপ্তি। শুধু ইংরাজরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেই অথবা তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিলেই সেই ক্ষমতা লাভ হইবে না। অগণিত মূক কৃষকের সেবার দ্বারাই সেই ক্ষমতা লাভ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক যে, কয়েক হাজার হত্যাকারীর চেষ্টায় ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ নির্ম্মূল হইল, তাহা হইলেই কি তাহারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবে? হত্যার মদিরায় প্রমত্ত হইয়া তাহারা যাহাকে পছন্দ করিবে না তাহাকেই হত্যা করিতে থাকিবে।"

ড্যালটন শিক্ষা-প্রণালী ও বঙ্গ-দেশে তাহার প্রবর্ত্তন

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

প্রবন্ধ

ম্যাসাচিউসেট্‌সের অন্তর্গত ড্যাল্‌টন্‌ নামক স্থানে মিস্ পার্কাষ্ঠ প্রথম এই প্রণালীর উদ্ভাবন ও প্রবর্ত্তন করেন। ড্যালটনে প্রথমে ইহার প্রবর্ত্তন হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'ড্যালটনে শিক্ষা প্রণালী'। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়েই শিক্ষকমহাশয়গণ ছাত্রদের শুধু পড়াইয়া যান ও তাহারা কেবল শুনিয়াই যায়। প্রত্যেক বালক সমস্ত পাঠ ঠিক বুঝিতে পারিতেছে কি না কিম্বা সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব কি না, ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারণ করিবার অবকাশ শিক্ষকমহাশয়দের প্রায়ই হয় না। এই অসুবিধা দূর করিতে এবং প্রত্যেক বালক যাহাতে তাহার আপন ইচ্ছা ও সুবিধামত প্রত্যেক বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রণালী উদ্ভাবিত হয়।

ছাত্র ও শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক ইহাতে আর প্রায় পূর্ব্বের মত থাকে না। পূর্ব্বে শিক্ষকমহাশয়গণ ছিলেন দাতা এবং ছাত্রেরা ছিল মৌন-গৃহীতা। কিন্তু এখন মাত্র তাঁহারা ছাত্রদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন—আবার তাহাও যখন তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজন হইবে কেবলি তখন। প্রত্যেক ছাত্রই প্রায় পৃথক ভাবে কিম্বা কখনও বা দলবদ্ধ হইয়া এক একটি বিষয়ের অনুশীলন করে। শিক্ষকগণ সেখানে উপস্থিত থাকেন তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহাদের কার্য্যে যাহাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার সম্যক্ ব্যবস্থা করিতে। প্রত্যেক পৃথক বিষয়ে বিশেষরূপে পারদর্শী এক একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকেন। প্রত্যেক ছাত্র স্বেচ্ছায় এবং আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসারে পৃথক পৃথক বিষয়ের অনুশীলনে ব্যস্ত থাকে। কতক্ষণ তাহারা এক বিষয়ের অনুশীলন করিবে তাহা তাহাদের নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহার জন্য বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। প্রত্যেক পৃথক বিষয়ের জন্য এক একটি নির্দ্দিষ্ট ঘরের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই বিষয়ের অনুশীলন করিতে যাহা যাহা প্রয়োজন হওয়া সম্ভব, সেই সমস্ত দ্রব্যই সেই গৃহে রক্ষিত হয়।

মাত্র চারটি কি পাঁচটি বিষয় (যথা ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) এই প্রণালীদ্বারা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ছাত্রগণ যখন ভালরূপে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে, তখনই তাহারা এই শিক্ষাপ্রণালীদ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রত্যেক গৃহেই তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে পারদর্শী এক একজন শিক্ষক উপস্থিত থাকেন। ছাত্রদের প্রয়োজনমত তাহাদিগকে সাহায্য করাই তাঁহাদের কার্য্য। পৃথক পৃথক বালকগণ নিজের ইচ্ছামত আসিয়া তথায় কার্য্য করিতে থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ের মত তথায় ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা পৃথক পৃথক পড়িবার সময় বিভাগ হয় না। যতক্ষণ এক বিষয়ে কাজ করিতে ভাল লাগে, ততক্ষণ তাহারা সেই বিষয়ে কাজ করে। যখন আর সে বিষয়ে কাজ করিতে ভাল লাগে না, তখন তাহারা প্রয়োজনমত অপর বিষয়ে নিযুক্ত হইবার জন্য অপর ঘরে চলিয়া যায়।

একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রত্যেক বিষয়েই এক একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। এই নিমিত্ত প্রত্যেক বৎসরকে দশভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক এক মাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক ঘরের বাহিরে এক একটি বোর্ডে সেই সেই বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলী লাগাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেক ছাত্র আপন আপন খাতায় তাহা লিখিয়া লয়। একবৎসরের কার্য্যাবলীর নাম "Contract" (কন্‌ট্র্যাক্ট)। প্রত্যেক পৃথক মাসের কার্য্যের নাম "assignment" (য়্যাসাইন-মেন্ট)। প্রতি মাস চারি সপ্তাহে বিভক্ত হয় এবং

প্রত্যেক সপ্তাহের কার্য্যের নাম দেওয়া হয় "Period" (পিরিয়ড্)। প্রত্যেক দিনের কার্য্যের নাম'unit'(ইউনিট্)।

ছাত্রেরা তাহাদের আপন আপন কার্য্য নিয়মিত ভাবে করিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক বিষয়ে কতখানি কাজ তাহারা প্রতিদিন করিতেছে, তাহা নিজেদের খাতায় এবং শিক্ষকগণের খাতায় লিখিয়া রাখে। প্রত্যেক পাঠের সঙ্গে কতকগুলি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া থাকে। সেই পাঠ শেষ করিয়া সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হয়। শিক্ষকগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের ফলাফল পৃথক খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। কোনও বিষয়ের উত্তর সন্তোষজনক না হইলে ছাত্রদের পুনরায় সেই পাঠ পড়িতে হয়, যতদিন না তাহারা সন্তোষজনক উত্তর লিখিতে পারে। সুতরাং প্রতি মাসের শেষে প্রত্যেক বালক কতখানি কাজ করিয়াছে এবং কোন্ বিষয়ে কোথায় তাহাদের সাহায্য করা প্রয়োজন, তাহা সহজেই নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। এই সমস্ত "Assignment"গুলি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশিষ্ট এবং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। কেননা "Assignment" এর উপরেই এই প্রণালীর সফলতা নির্ভর করে। এই "Assignment" গুলি হইতেছে পৃথক পৃথক বিষয়ের এক একটি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা এবং তাহাদের সম্বন্ধীয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন।

এই প্রণালীর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। অনেক স্থলেই ইহার সাফল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রণালীদ্বারা পড়াইয়া বাঙ্গালা দেশে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই। এই প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইলে, ছাত্রগণকে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। "ক্লাশ প্রমোশন" এর কোনও কথাই ইহাতে নাই। তাহাদিগকে পৃথক পৃথক বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য দেওয়া হয়। আপন আপন সুবিধামত তাহারা নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ঐ সমস্ত কার্য্য শেষ করে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাজ করে বলিয়া সমস্ত বিষয়েরই এক সময়ে নির্দ্দিষ্ট অংশ শেষ করিতে পারা যায় না। সুতরাং বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী কাজ করিতে গেলে, ইহাতে বিশেষ বাধা পড়ে।

একজন ছাত্র সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী কিন্তু গণিত শাস্ত্রে সে সন্তোষজনক ফল দেখাইতে পারে না। সাহিত্যে সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইলেও গণিতের জন্য সে 'প্রমোশন' পাইবে না। গণিতের জন্য তাহাকে পিছাইয়া থাকিতে হইবে। ইহার জন্যই সে সাহিত্যে নূতন পাঠ পাইতে পারিবে না। পরে অধিকতর পরিশ্রম করিয়া যদি সে গণিতে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারে, তখনও তাহাকে উপরের ক্লাশে যাইতে দেওয়া হইবে না। অনর্থক তাহাকে বাৎসরিক 'ক্লাশ প্রমোশনের' সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। এই বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালাদেশে ড্যাল্‌টন্ শিক্ষাপ্রণালী কার্য্যকর হইতে পারে না। ইহাকে আমাদের বাঙ্গালাদেশে কার্য্যকরী করিতে হইলে, বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হয়। অবশ্য বাহ্যতঃ কাজ চালান যাইতে পারে বটে, কিন্তু এই প্রণালীমতে প্রকৃত কার্য্য করিতে গেলে, তাহাতে বিশেষ বাধা পড়ে।

আর একটি প্রধান অন্তরায় হইতেছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। এই প্রণালীমতে কার্য্য করিতে গেলে, শিক্ষকের কার্য্য সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও উপদেশ দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষককে বিশেষরূপে পারদর্শী হইতে হয়। প্রত্যেক ছাত্র সম্বন্ধে তাঁহাকে সবিশেষ সংবাদ রাখিতে হয়। তাহাদের কৃত কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিয়া কোনস্থলে তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রের সম্বন্ধে সঠিক বিবরণের হিসাব তাঁহাকে তাঁহার একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতে হয়। প্রত্যেক অমনোযোগী ও অপকৃষ্ট বালকের উন্নতির জন্য পৃথক পৃথক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালাদেশের শিক্ষকের এত অবসর কোথায়? নিজ পরিবারিক অভাব-অভিযোগের চিন্তায় হৃদয় তাঁহার বিশেষরূপে ভারাক্রান্ত। বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত সামান্য বেতনে তাঁহার অভাব মোচন হয় না। সুতরাং সৎপথে থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, তাঁহাকে অবসর সময়ে কার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলের মতই তিনি কাজ করিয়া চলিয়াছেন—বিশ্রাম উপভোগ করিবার সময় তাঁহার ভাগ্যে লিখা

নাই। এইরূপ অবস্থায় স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া নূতন কোনও প্রণালীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর? সুতরাং আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে বিশেষভাবে শিক্ষিত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ও বড় সামান্য নয়। তাহা ছাড়া বাঙ্গালাদেশে শিক্ষার বাহন হইতেছে প্রধানতঃ বিদেশী ইংরাজি ভাষা, বিদেশী ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে, সেই ভাষায় কথোপকথন ও সেইভাষায় অপরের কথোপকথন শ্রবণ করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বাঙ্গালাদেশে এই শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পথে বাধা অনেক।

এই প্রণালীদ্বারা শিক্ষার সফলতা সম্বন্ধে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও বিশেষ আস্থা নাই। কিন্তু এই প্রণালীতে যে প্রভূত পরিমাণ উপকার হইতে পারে, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শিক্ষকের অনাবশ্যক কঠোরতা ও তাড়না হইতে ইহা ছাত্রগণকে মুক্ত করিয়াছে। বিদ্যালয়কে তাহারা আর 'তাড়নাগার' মনে করে না। আপন ইচ্ছামত এবং আপন অভিরুচিমত তাহারা আপন আপন কাজ করিয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাধা করিতে হইবে অথচ তাহা সমাধা করাইতে শিক্ষকের রক্তবর্ণ চক্ষু তাহাদের উপর নাই—তাহারা নিজের দায়িত্বেই সব করিবে, নিজের শক্তির উপরই তাহারা নির্ভর করিবে এবং তাহাদেরই স্বাধীনচিন্তা তাহাদিগকে পরিচালিত করিবে। এই সাফল্যে আনন্দ আছে—আত্মমর্য্যাদা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র ইহাতে নিহিত আছে। ইহারদ্বারা সমস্ত ছাত্রই আপন আপন শক্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে—ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও সম্মুখের ডাক অগ্রাহ্য করিয়া পড়িয়া থাকিতে হয় না। সময়মত আগে চলার এবং জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিত্য নূতন রসাস্বাদন করার আনন্দ হইতে কেহই তাহাদের বঞ্চিত করিতে পারে না। সুতরাং এই প্রণালীর মূলমন্ত্র সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষকগণ যদি আপন ব্রত-সাধন করিতে থাকেন তবে এই প্রণালীর মতে অক্ষরে অক্ষরে কার্য্য না করিয়াও ছাত্রগণকে তাঁহারা নূতন আশায় এবং নূতন উদ্যমে প্রবুদ্ধ করিতে পারিবেন। তাহা যদি তাঁহারা করিতে পারেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, শিক্ষার আদর্শ তাঁহার চিরকাল অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রহিয়াছে।

গান

শ্রীঅলক রায়

বাজিয়ে মাদল নাম্‌ল বাদল
আকাশ ছেয়ে।
তালের বনে পাখীরা সব
উঠল গেয়ে।

কদম গাছের মাথায় আজি
বর্ষা-মৃদঙ্ উঠল বাজি
শালের বনে শাঙন-ধারা
নাম্‌লো ধেয়ে।

মেঘ ডাকে ঐ গুরু গুরু
ঝ'রছে বারি ঝুরু ঝুরু
আষাঢ় এলো ধরায় মাঝে
আকাশ বেয়ে।

ভক্ত কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য

ভক্ত কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য

"ইটালী শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের" প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রিয়তম ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য—আজীবন্ ব্রহ্মচর্য্য পালনে, শ্রীগুরুসেবায় ও জন সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ৪১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গত ১৫ আষাঢ় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

তাঁহার বিদুষী ও ধর্ম্মপ্রাণা মাতার আদর্শেই কৃষ্ণকুমারের চরিত্র গঠিত হয়। কৃষ্ণকুমার সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর এবং আবৃত্তিশক্তি অতি সুন্দর ছিল।

অতি শৈশবকাল হইতেই কৃষ্ণকুমারের দেবদেবীর প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইত। কখনও সঙ্গীদের সহিত নির্জ্জন স্থানে ঠাকুরদের পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, কখনও নিজহস্তে গঠিত মৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন এবং কখনও বা সুললিত কণ্ঠে দেবদেবীর স্তুতিগানে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি শৈশব হইতেই কৃষ্ণকুমারের উপর পতিত হয়। তিনি কৃষ্ণকুমারকে খুব ভালবাসিতেন। নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারকে নিকটে পাইয়া উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তাঁহাকে "মানুষ" করিয়া তুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমার উক্ত মহাত্মার আদর্শে গঠিত হইয়া—সত্যপ্রিয়তায়, সকলকে আন্তরিক যত্ন ও ভালবাসায়, পরদুঃখ নিবারণে যত্নশীলতায়, এবং একনিষ্ঠ গুরুসেবায় সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। যিনি কৃষ্ণকুমারের সহিত একদিন মাত্র আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার সহাস্য সরল মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁর সংসর্গলাভ ও তাঁর সহিত বাক্যালাপ করিতে সকলেই যেন অবসর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত।

গোল টেব্‌লের সদস্যবৃন্দ

মহাত্মা গান্ধী

সরোজিনী নাইডু

সার আকবর হয়দারী

সার মহম্মদ সাফি

মৌলনা ফজলল হক

মিঃ গজনর্ভী

ভারতীয় শিল্পকলা

বুনিয়াদি জাতি, সভ্যতাই স্বতন্ত্র।

এই জন্যই গ্রীক্ ও ভারতীয় শিল্পের বোধ হয় এত তফাৎ!

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বে আর্ট স্কুলের ছাত্রদের চিত্র নিপুণতা পাশ্চাত্যদেশসমূহে দেখাইবার জন্য আলড্‌উইচ সহরে একটী প্রদর্শনী খোলা হয়। এই স্কুলটী প্রায় ৭০ বৎসরাধিক কাল জীবিত থাকিয়া ছাত্রদের শিল্পকলা শিক্ষাদান করিতেছে। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক রুডইয়ার্ড কিপ্‌লিঙের পিতা এই স্কুলের একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী ও ডিরেক্টর ছিলেন এবং ঐ স্থানেই কিপ্‌লিঙের জন্ম হয়। এই স্কুলের ছাত্রদের উন্নতি এখন সকলকার ঈর্ষার বিষয় হইয়াছে। ইহাদের চিত্র নিপুণতার নিদর্শন স্বরূপ ইহাদিগকে নূতন দিল্লীর ভারত সরকারের অফিসের গম্বুজের উপর ছবি আঁকিতে দেয়া হয়েছে। এই গম্বুজটী আটকনা তজ্জন্য প্রত্যেক কোণে ভারতীয় চিত্রযুগের একটী চিত্র আঁকা হইয়াছে—চিত্রগুলি এইরূপ :—
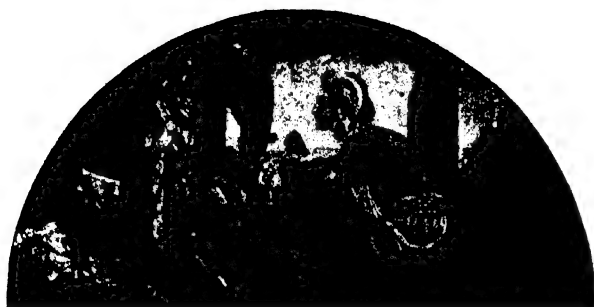
ভু-প্রদক্ষিণ পথে

(কলিকাতা হইতে লণ্ডন)

ভ্রমণ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

শেষ বিদায় !

খিদিরপুরে ডকের ১১ নং বার্থ (berth) থেকে আমাদের জাহাজ মধ্য রাত্রে ছাড়্‌বে। বেলা তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে যাত্রীদের জাহাজে উঠবার সময়। কারণ বেলা পাঁচটার সময় ডাক্তার সমস্ত যাত্রীদের পরীক্ষা করবেন। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে বেলা ৪টার সময় জাহাজে ওঠা গেল। ইহার পূর্ব্বে কখনও বিলেতের জাহাজে ওঠা হয় নি, সুতরাং যে ধারণা ছিল বা শোনা গিয়েছিল জাহাজ ঠিক বাড়ীর মত পরিষ্কার —তা জাহাজে উঠে বোধ হ'ল না। এমন অপরিষ্কার—চারদিকে কয়লা ছড়ান, এখানে খানিকটা কাছি পড়ে রয়েছে, ওখানে গোটা কতক লোহা লক্কর আর এমন ধূলো যে মনে হ'ল, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাপড়-চোপড় সব ময়লা হয়ে গেল—আর এত গোলমাল ! এখান দিয়ে কয়লা তুল্‌ছে, ওখান দিয়ে মাল ওঠাচ্ছে, মজুরেরা মাঝে মাঝে জাহাজের গর্ভের (hold) ভেতর থেকে হেঁইয়ো হেঁইয়ো কচ্ছে। কখনও বা ষ্টেভেডোর মশায় কোনও লিকে গালাগালি দিচ্ছেন আবার জাহাজের ব্রিজের ওপর থেকে কখনও 1st Officer বা 2nd Officer শিঙে ফুঁকে দূরের খালাসীদের সঙ্গে কথা কইচেন—চারদিকেই গোলমাল এই গোলমাল ও ধুলোর মধ্য দিয়ে কুলি আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজার কাছে নিয়ে যেতেই একজন গোরা (পরে জানা গেল 2nd Steward) টিকিট দেখ্‌তে চাইলে। তারপর টিকিট দেখে সে আমাদের একটা ঘরে (State-Room) নিয়ে গেল। এই State-Room এ দুটো বিছানা (Berth) ছিল। Steward আমাকে বল্লে ওপরের বিছানাটা বা (berthটা) আমার।

ডাক্তারের পরীক্ষা

ঘরে (Cabin) তোরঙ্গটী রেখে আমরা ডেকের ওপরে ধুমপানের ঘরে (Smoking Room) এসে সকলে গল্প-গুজব কচ্ছি এমন সময় Steward এসে বলে গেল যে, ডাক্তার এসেছে এবং এখনি 1st class saloon বা first class এর খাবার ঘরে যাত্রীদের পরীক্ষা করবেন। 1st class saloon এ গিয়ে দেখি পুরুষ যাত্রীরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং মেয়ে যাত্রীরা বসে রয়েছে। এইবার ডাক্তার মশায় পরীক্ষা কর্ত্তে আরম্ভ করলেন। প্রথমে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের টিকিট অনুযায়ী নাম ডাকতে লাগলেন—মিঃ ব (Mr. B) ব মশায় অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রথমটা বুঝতে পারলুম না যে এ কি রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা, তারপর মনে হ'ল সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে সুতরাং ডাক্তার মানুষ লোকের চলন দেখে কেন জানতে পারবে না, যে লোকটা রোগী কি না। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। ক্রমে "ঘ" মশায়ের নাম ডাকা হ'লে "ঘ" মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং "ঘ" মশায়ের পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেল। এই রকমে জন কুড়ি যাত্রীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা মিনিট তিনেকে সম্পন্ন হ'য়ে গেল।

লোকটা পাগল নাকি !

ডাক্তারের পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হবার পর আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্পে যোগদান করতে

যাচ্ছি এমন সময় ডেকের ওপর একটী ছোকরা ডেকে বল্লে "Are you Mr. Ghose ?" My name is B.

ঘোষ মশায়—"Well glad to meet you."

বে—"So am I."

বে—You are going alone ?

ঘো—Why, aint you going ?

বে—No, no, I don't mean that I mean none of your folks are going.

ঘোষ—(স্বগতঃ—লোকটা পাগল নাকি ! দেখ্‌তে পাচ্ছে ওরা সব ধুতি চাদর পরা। তারপর তাকে বল্লাম কোনও লোক কি ধুতি চাদর পরে বিলেত যায় নাকি ?

ব—So I thought they must have come to say sou good-bye.

ঘ—That's what it is.

তারপর বন্ধু বান্ধবদের কাছে এসে ঐ কথা ব'লে ত খুব খানিকটা আমোদ করা গেল।

শিবের বাহনের লেজ

ক্রমে ৬টা বাজিবার পূর্ব্বে অন্য যাত্রীদের যাঁরা বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁরা চলে যেতে লাগলেন। এই সময় একটা আরতির ঘণ্টার মত আওয়াজ কানে গেল। প্রথমটা মনে হ'ল, জাহাজে আবার আরতি কি। ঘড়ি খুলে দেখি ৬টা! তারপরেই একটা খানসামা এসে বল্লে—'আপনি Tableএ যাবেন না।' 'যাব বৈকি' বলে Saloon বা খাবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসা গেল। বসে দেখি সকলে আরম্ভ করে দিয়েছে। তারপর একজন বাবুর্চ্চি কাছে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "কি এনে দেব ?" Table এর ওপর থেকে menuটা নিয়ে দেখি গোড়াতেই Oxtail Soup! ঐ খানেই খাওয়ার শেষ হয়ে গেল। কারণ খাব কি ? কেবলই শিবের বাহন মশায়ের লেজের দিকটার আকৃতি মনে পড়্‌তে লাগল।

তারপর বাবুর্চ্চিকে বল্লুম "আমাকে এক কাপ্‌ কফি এনে দাও" ঐ এক cup Cofee ও খানকতক বিস্কুট খেয়ে table থেকে উঠে এসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়া গেল।

জন্মের মত বিদায়

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ডেকের ওপর বেড়াচ্ছি, এমন সময় সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে অস্তমিত হচ্ছেন। আকাশে কত রকমের আলোকছটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে দিঙ্মণ্ডলকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছে। কতদিন কতবার এই গঙ্গার ওপর থেকেই সূর্য্যাস্ত দেখেছি, কিন্তু সে ত এমন নয়। বুঝিবা ইহাই আমার জন্মভূমিতে শেষ সূর্য্যাস্ত দেখা। ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে এল ; বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই আমার শুভ কামনা করে বিদায় গ্রহণ করলেন—কে জানে তাঁরা আমায় জন্মের মত বিদায় দিলেন কি না!—কতবার কত জায়গায় গেছি কিন্তু মন ত কখন এত চঞ্চল হয় নি—"সার্থক জনম মোর তোমায় ভালবেসে।" কতক্ষণ জানিনা জাহাজের সিঁড়ির ধারটিতে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আর দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা বিবেচনা করে, নিজের Cabinএ আসা গেল। এসে দেখি, দ্বিতীয় berthটার জন্য কোনও যাত্রী নাই। সুতরাং সমস্ত কেবিনটিই আমার।

State Room (কেবিন)

হাড় মড়-মড়ানি অসুখ

ঘরটা লম্বায় ফুট আষ্টেক ও চওড়ায় ফুট পাঁচেক। Berthগুলো অনেকটা Trainএর bunk এর মতন ; তবে ঝোলান নয় কাঠের দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা। এক একটা berth লম্বায় সাড়ে ছয় ফুট ও চওড়ায় আড়াই ফুট হবে। আমার তাতে কষ্ট হ'ত না কারণ ৬ ইঞ্চি চওড়া হ'লে, আমার মতন লোকের পক্ষে যথেষ্ট—তবে যাঁরা চওড়ায় ফুট তিনেক তাঁদের কষ্ট হ'তে পারে। বিপরীত দিকের দেওয়ালের সঙ্গে একটা বেতের adjustable chair লাগান, যখন ইচ্ছা তাকে দেয়াল থেকে টানলেই সুন্দর বেতের চেয়ারের কাজ করে। আর একটা দেয়ালে অর্থাৎ কেবিনে ঢোকবার দরজার বিপরীত দিকের দেয়ালে একটী ছোট আলমারির মতন জিনিষ দেয়ালের সঙ্গে ফিট করা রয়েছে। আলমারির ওপরে একটা ছোট আয়না ফিট করা ছিল ও তার ওপরে একটা খাবার জলের কুঁজো (কাঁচের) বা pitcher ও দুটী গ্লাস ছিল। আলমারির মতন জিনিষটার একটা হুক ধ'রে টানলেই একটা Sink বেরিয়ে

আসে। এই Sink এর ধারে দুটী ক'ল লাগান আছে। একটা ঠাণ্ডা জল ও আর একটা গরম জলের জন্য। এই Sink মুখ ধোবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আলমারীর ওপর দিকটায় এই Sink থাকে এবং নীচের দিকে বা তলায় এক দিকে একটা pan থাকে। রাত্রে প্রস্রাব করবার জন্য বা Sea-Sick হ'লে প্রস্রাব করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অন্যদিকে একটী পাত্র থাকে। সেই পাত্রটীতে Sink এর জল এসে পড়ে। Sink বা pan ময়লা জিনিষের জন্য ব'লে উহাদের ঐরূপ আবৃত ভাবে চোখের অগোচর স্থানে রেখে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে যখন যাত্রীরা প্রাতর্ভোজনে টেবিলে যান তখন মেথর এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। এ ছাড়া একটা ছোট Electric fan ও Electric light আছে। যে দিকে adjustable চেয়ার সেই দিকে একটা গোল ১ ফুট ব্যাসের গর্ত্ত ছিল। ইহাকে port-hole বলা হয় এবং ইহা Cabin এর জানালার কাজ করে। এই জানালা দিয়ে ঘরে বায়ু সঞ্চারণ করে। ঘরের সমস্ত জিনিষই, এমন কি, কব্জাটীও পেরেকটা পর্য্যন্ত গিল্টি করার মত ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করছে। Berth এর ওপর যে বিছানা সেটা কিসের তৈরি ঠিক বলতে পারি না—বোধ হয় খড় বা ঐ জাতীয় কোনও জিনিষের হবে। কারণ পদ্মলাভ করবার সময় মনে হ'ত যেন হাড় মড়মড়ানির অসুখ হ'য়েছে। ঐ রকম খড় খড় আওয়াজ হ'ত কিন্তু খুব নরম। আর বিছানার চাদর ধপ ধপ কর্চ্ছে ফরসা। মাথার বালিস দুটো ক'রে বটে তবে পাশ বালিশ নেই কারণ berth এর ওপর পাশ বালিশ রাখলে যাত্রীকে ভূমিশয্যা আশ্রয় কর্ত্তে হবে। মাথার শিয়রের কাছে Electric bell আছে। যখন Cabin boy কে ডাকবার বা কোনও attendanceর দরকার হয়, তখন ঐ bell টা টিপলেই কেহ না কেহ Cabin এসে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে কি দরকার। অর্থাৎ এক কথায় মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধার জন্য যে যে জিনিষের প্রয়োজন তা ঐটুকু—৮ ফুট × ৫ ফুট ঘরে কোনটারই অভাব নাই।

রাত্রে ভাল রকম ঘুম হয় নি। একে মাথা ধ'রেছে (মনে কর্ব্বেন না যে কেঁদে মাথা ধরেছিল কাঁদতে যাব কেন?) তার উপর সেই জাহাজের ডেকের ওপরের গোলমাল সুতরাং এক রকম অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে থাকা গিয়েছিল। রাত্তির চারটার সময় জাহাজের চেনের ঘড়-ঘড়ানি আওয়াজ সুরু হ'তে আরম্ভ হ'ল এবং ঘণ্টা দুই তিন সেই আওয়াজে বিরক্ত হ'য়ে ওঠা গিয়েছিল। পরদিন ভোর ছয়টার সময় দরজায় knock শোনা গেল এবং একজন বাবুর্চ্চি সেই adjustable চেয়ারের ওপর এক cup চা ও একটা Toast রুটী রেখে গেল। সেই boyটাকে জিজ্ঞাসা কলুর্ম "হাঁহে, অত চেনের ঘড় ঘড়ানি আওয়াজ হচ্ছিল, কেন?" সে ব'ল্লে যে, জাহাজ ডক থেকে বেরিয়ে আসবার আগে চারদিকে যে সব বড় বড় চেন দিয়ে জাহাজ বাঁধা থাকে সেই সব চেন গোড়ান হচ্ছিল। আমাদের জাহাজ কিছুক্ষণ হ'ল ডক থেকে বেরিয়ে এখন গঙ্গার ওপর পড়েছে। আমি জিজ্ঞাসা কলুর্ম জাহাজ ছেড়েচে কখন? সে বল্লে যে রাত ৪টার সময় তবে ডক থেকে বেরুতে দুই তিন ঘণ্টা লাগে। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে ডেকের ওপর গিয়ে দেখা গেল যে জাহাজ মেটে বুরুজের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। খানিক বাদেই সেই আরতির ঘণ্টা। ঘড়ি খুলে দেখি, আটটা বোঝা গেল breakfastএর ঘণ্টা। Saloonএ যাব ব'লে সিঁড়ি দিয়ে নামচি এমন সময় একটা বদখদগন্ধ নাকে এসে লাগল—এ অবশ্য খাবারের গন্ধ। তখনই আবার শিবের বাহন মশায়কে মনে প'ড়ে গেল—একি তারিরই গন্ধ নাকি! যা হোক দমটা বন্ধ ক'রে (কারণ ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং) Saloonএ গিয়ে টেবিলে বসা গেল।

Dining Saloon বা খাবার ঘর

Saloonটী কি সুন্দর ভাবে সাজান! একটা ছোট খাট হ'ল Hall বল্লেই চলে। দু দিকে দুটো Dining table রয়েছে। আমরা যাত্রী ছিলুম, জন দশ বারো। সুতরাং একটা tableএই কুলিয়েছিল আর একটা table এ ছোট ছোট টবে ক'রে ফুল গাছ সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। মেজেটা সমস্ত carpet দিয়ে মোড়া আর প্রত্যেক দরজায় curtain দেওয়া। ঘরটার কাঠের দেয়ালের এক দিকে আলমারি লাগান আছে এবং

তাতে নানা রঙের বাঁধান বই সাজান। ইহাই দ্বিতীয় শ্রেণীর লাইব্রেরী। ঘরের এক কোণে একটা ছোট table আছে ও তার ওপরে একটা letter-box আছে, তাতে note-paper ও envelope থাকে। যাত্রীরা এইখানে ব'সে চিঠি পত্র লেখেন। ঘরটার চারিদিকেই কেমন একটা গোছান ভাব।

কুকুরের বমি

যা হো'ক table এর ওপর থেকে menuটা নিয়ে গোড়াতেই দেখা গেল porridge (পরিজ বা পায়েস) বাবুর্চ্চিকে পরিজ আন্‌তে বললুম। সে কিছুক্ষণ বাদেই একটা Dish এ ক'রে খানিকটা কুকুরের বমি জড় করে সাম্‌নে রেখে দিলে। দেখেই ত খাওয়া হ'য়ে গেল; porridge কি দিয়ে খেতে হয় তা জানা ছিল না (cream বা দুধ দিয়ে খেতে হয়) যা হোক কি রকম আস্বাদটা দেখে নেওয়া যাক্ মনে ক'রে নিশ্বাস বন্ধ করে এক চামচ খাওয়া গেল। বোধ হ'ল যেন পেটের ভেতর গিয়ে আবার বেরিয়ে আসবার জন্যে গলার কাছে একটা ডেলা মতন হ'য়ে অপেক্ষা কর্চ্চেন। তার পরে breakfast ক'রে ওপরে আসা গেল। জাহাজ এতক্ষণে বজ বজ উলুবেড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কারণ জাহাজের ওপর থেকে বজ বজের petrol oil এর সাদা রঙ্‌ করা—reservoirগুলিকে বেশ দেখা যাচ্ছিল। এক এক বার মনে হচ্ছিল, কই এতক্ষণ ত জাহাজে রইচি sea-sick হ'লুম না, তবে বুঝি ওসব বাজে কথা! আমাদের জাহাজ যখন গঙ্গার ওপরের কোনও কলকারখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সেই কলকারখানা থেকে অনেক European রুমাল উড়িয়ে আমাদের cheer কচ্ছিল। আমাদেরও জাহাজের ওপর থেকে রুমাল উড়িয়ে তাদের cheer করা হচ্ছিল। এই রকমে গঙ্গার এপাশ ও-পাশ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাওয়া হচ্ছে, এমন সময় আবার আরতির ঘণ্টা হ'ল। ঘড়ি খুলে দেখি একটা। তখন ঠিক করা গেল lunch এর সময়। Lunch খেয়ে ওপরে আসা গেছে খানিক বাদে ৩॥০টার সময় একটা বাবুর্চ্চি এসে বল্‌লে afternoon tea is ready। আবার নীচে গিয়ে বিস্কুট চা খেয়ে আসা গেল।

আমি কি রাক্ষস নাকি

খানিক বাদেই আমাদের জাহাজ Diamond Harbour এর কাছে এসে নঙ্গর ক'র্‌লে এবং শোনা গেল জাহাজ আর আজকে চল্‌বে না। খানিকটা ডেকের ওপর বেড়িয়ে ঘুর্‌তে-ফিরতেই ৬টা বাজল। আবার সেই আরতির ঘণ্টা Table এ যাওয়া। ওপরে এসে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে রাত্তির ৯।০টা হয়ে গেছে—Cabin এ গিয়ে জামা-কাপড় খুলছি এমন সময় boy এসে বল্‌লে যে, Supper ready। এই খানিকক্ষণ হ'ল এক পেট খেয়ে এসেছি এর মধ্যেই আবার Supper। Supper এর নাম শুনেই রাগ ধরতে লাগল, ভাবলুম আমি কি রাক্ষস নাকি!

রাত্তিরে শুতে যাবার সময় মনে হ'তে লাগল এই রকম লম্বা লম্বা ৩০টা দিন কি ক'রে কাটবে।

Sea-Sickness

পরদিন ভোরে ঠিক ৬টার সময় Boy এসে দোরে knock করে আবার Toast ও চা রেখে গেল। চা ও Toast খেয়ে Toilet বা পায়খানায় যাচ্ছি মাথাটা কি রকম ঘুরছে ঘুরছে ব'লে বোধ হ'তে লাগল। ঠিক ঠাওর কর্ত্তে পারলুম না কি জন্যে। Breakfast শেষ হয়ে গেছে। Steward এসে বল্‌লে যে কারুর যদি কোনও চিঠি ফেলবার থাকে, তা হ'লে চিঠিগুলো তাকে যেন শীঘ্র দেওয়া হয়। আমি প্রথমটা ঠাওর কর্ত্তে পারলুম না, এই সমুদ্রের মধ্যখানে আবার চিঠি ফেলবে কোথায় (আমাদের জাহাজ সকাল থেকেই সমুদ্রে পড়েছে) তার পর Steward কে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে যে, pilot এখনি নাম্‌বে ও ঐ pilot এর boat এ mail যাবে। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখ্‌ছি, এমন সময় এমনি গা বমি বমি করে এল যে, কোনও গতিকে চিঠিটা শেষ ক'রে Stewardকে দিয়ে Cabin এ আস্‌তে না আস্‌তে বমি—এই বমির সুরু। শোবার পর যতক্ষণ জেগেছিলুম কেবল বমি শেষকালে যখন আর পেটে কোনও জিনিষ ছিল না তখন কেবল পিত্তি উঠ্‌তে আরম্ভ হ'ল। দু' ঘণ্টা আগে যে Sea-Sickness কাকে ব'লে জান্‌তুম না তা এখন বেশ মালুম পাওয়া গেল। ক্রমাগত বমি ও মাথা কামড়ানি।

শেষকালে ক্লান্ত হ'য়ে বেহুঁস হয়ে পড়া। সমস্ত দিনের পর যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গা বমি বমি করছে মাথা খাড়া ক'রে তুলতে পাচ্ছিনা। যা হোক Steward এসে knock করলে ও ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা কর্লে "Mr. ঘ কেমন আছ?"

ঘ মশায়—বড়—গা-বমি বমি কচ্ছে ও মাথা কামড়াচ্ছে

Steward—ডাক্তার এই কটা বড়ি খেতে বলেছে এই—পাচটা বড়ি এক সঙ্গে খাও।—

ঘ মশায়—বড়ি কটা ঐ-খানে রাখ থাচ্ছি।—

তারপর steward চলে যাবার পর আমি ভাবলাম পাচটা বড়ি এক-সঙ্গে এ—নিশ্চয় গোরার Dose। ২টা খেলুম ও তিনটা port hole দিয়ে ফেলে দিলুম। যাই হোক, ওষুধ খাবার পরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা যখন পরদিন ঘুম ভাঙ্গল, দেখি বেলা দুপুর বেজে গেছে। এই দুটো বড়িতেই যখন এতক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল তখন বোধ হয় পাঁচটা বড়ি খেলে ঘুম আর ভাঙ্গত কিনা সন্দেহ। গা আর তত বমি বমি কচ্ছেনা বটে কিন্তু মাথা কট-কটানি বড্ড বেড়েছে।—মাথায় মনে হচ্ছে, কিছু নেই—এত হালকা হালকা ব'লে বোধ হচ্ছে। মনে করলুম ডাক্তারের বড়ি খেয়ে ভাল করিনি। ওত sea siakness এর বড়ি নয় ও হচ্ছে ভবলীলা সাঙ্গ করবার বড়ি।—তিনদিন আর বিছানা থেকে উঠ্‌তে হয় নি। Boy এর মধ্যে রোজই ২।৩ জনের নাম কর্ত্ত। আজকে সেই মোটা লোকটা পড়েছে, কাল সেই দুটো বাচ্ছা ছোঁড়া পড়েছে।—এ-খবরটা রাখবার প্রয়োজন এই যে শুধু—আমিই Sea. Sick হইনি আর আর সকলেই কমবেশী Sea-Sick হয়েছে। সুতরাং দুঃখ করবার আর কিছুই ছিল না।—তবে অপরে একবেলা আধ-বেলা Sea-Sick থাকৃত আর আমার তিন-তিনটে দিন, আমারও বোধ-হয় অতদিন থাক্‌ত না যদি না ডাক্তার মশায়ের বড়ী খাওয়া হ'ত।

বারোয়ারী পূজা

Sea-Sick হ'লে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। খাওয়া-ত দূরের কথা খাওয়ার নাম কল্লে গা বমি বমি কর্ত্ত।—কিছু না খেয়েও-ত থাকা যায় না, তাই অল্পে নম্‌কি বিস্কুট, শিরকা বা pickles এবং একটু আধটু ফলমূল। ইহাই তখন যেন যথেষ্ট ব'লে বোধ হ'ত। চতুর্থ দিনে (সমুদ্রে-পড়ে) অর্থাৎ ৬ষ্ঠ দিন (কলিকাতা ছেড়ে) Boy বল্লে "আপনি ডেকের ওপর যান না—সমুদ্র খুব ভাল। ঢেউ টেউ কিছু নেই—আর রাতদিন Cabin এর ওপর বসে থাকলে কি Sea-Sickness সারে—জাহাজে পাইচারি কর্ত্তে হয়—পেট ভ'রে খেতে হয়; কখনও পেট খালি রাখতে নেই—আজ কি কাল সকালে আমাদের জাহাজ Colombo পৌছবে।"

পটাপট আরও কত কি ব'লে গেল। যা হোক, Dress ক'রে কোনও রকমে দেয়াল ধ'রে ধ'রে ওপরে যাওয়া গেল। দেখি, ডেকের ওপর সুন্দর ক'রে পাল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে ও ধুয়ে মুছে থট্‌খটে করে রেখেছে একটা ময়লা এবড়ো-খেবড়ো অপরিস্কার মাঠকে বারোয়ারী পূজার উপযুক্ত করলে মাঠের যে অবস্থা হয়—আমাদের ডেকের এখন ঠিক সেই অবস্থা। যেদিন প্রথম জাহাজে উঠি, সেদিন যে Deck দেখেছিলুম এখন আর তাকে চেনবার জো নেই।—যাত্রীরা এক একটা Deck-chair এ ব'সে বই পড়ছে আর কেউ কেউ বা ডেকের ওপর পাই চারি কচ্ছে। আমাকে হঠাৎ ডেকের ওপর দেখে, সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। সকলেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগ্‌ল "How do you feel to day Mr. G"

G—Well, a little better thank you.

"Mr, G, is n't it a very fine day

G—Indeed, the pond is very calm

তারপর চেয়ারে ব'সে গল্প হচ্ছে, আমরা কত মাইল এসেছি। একজন এক map খুলে ঠিক আমরা কোন জায়গায় সেইটে দেখাচ্ছে।—আর সকলেই যেন একটু খুসী খুসী ভাব, কারণ কাল সকালে পাঁচ দিন বাদে (কলিকাতা থেকে ৭ দিনের দিন) আমরা জমি দেখ্‌তে পাব ও বেলা ১০টার সময় আমাদের জাহাজ Colombo পৌছবে।

ভগবানের চিঁড়িয়াখানা

আমরা যে কজন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলুম সকলেই এক এক রকমের। একজন ছিল বেশ লম্বা দোহরা গোছের, দেখলেই মনে হয়, military department এর। তিনি রাত্তির দিন কেবল গোঁফেই চাড়া

দিচ্ছেন। ইনি একজন Lt. Col. একজন ছিলেন একটু প্রৌঢ় গোছের। মুখের ভাব-ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোঝা যায় কি রকম সন্দিগ্ধ সন্দিগ্ধ গোছের। ইনি একজন পুলিসের লোক। একজন ছিলেন, কাপড়ে বাবু—বোধ হয় লোকটার ভিন্ন ভিন্ন রকমের গোটাকতক সুট ছিল। প্রথম দিন সকাল বেলাই দেখি বেশ মোটা Scotch Tweedএর একটা সুট পরে ডেকের ওপর বেড়াচ্ছে। বোধহয় গরমটা কিছু বেশী মনে হ'তে খানিক বাদে এক এড়ির সুট ও Straw hat প'রে ওপরে এলেন। আবার খানিক বাদে বোধহয় তাও সহ্য হ'ল না তাই একটা সাদা সিদে সুট ও মাথায় একটা Golf cap প'রে এলেন, লোকটা কেবল ঐ সুটই বদলাচ্ছে আর পাইচারি করবার সময় এক এক-বার নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছে যেন তাকে কিছুতেই ভাল দেখাচ্ছে না। একজন এমন মোটা গোছের ছিল যে লোকটা রাত দিন deck chairএর ওপর লম্বা হ'য়ে cigaretteএর বংশ ধ্বংস কর্ত্ত। যখনই দেখ লোকটার মুখে হয় cigarette নয় পাইপ নয় cigar—একটা না একটা আছেই। দুজন কেরাণীমশাই ছিলেন, একজন ইংরেজ ও আর একজন Anglo-Indian বা Eurasian-এঁদের ঠিক কেরাণীর উপযুক্ত চেহারা বটে, অল্প বয়সে বুড়ুটে বুড়ুটে গোছের চেহারা। একজন মহিলা ছিলেন, তাঁকে দেখ্‌লে ইংরাজ মহিলা ব'লে বোধ হয় না, কারণ ও রকম লম্বা ছাঁচের মুখ ইংরাজ মহিলার বড় দেখা যায় না অনেকটা Scandinavian গোছের। দেখ্‌লেই গম্ভীর ভাব মনে হ'ত। তিনি রাত দিন গালদুটো ফুলিয়েই থাকৃতেন। আর ছিলুম আমরা তিনজন সঙ্গী বা বন্ধু—একজন Australian, একজন Anglo-Indian বা ৮।১০ পুরুষের British Born আর একজন খাঁটি (full-blooded) হিন্দু। আমরা এই তিন জনে বিভিন্ন জাতীয় হ'লেও আমাদের বেশ মিল হয়েছিল। আমরা তিন জন একসঙ্গে বেড়ান গল্প-গুজব এবং মন খুলে প্রাণের কথা (আমার কিছু ছিল না অবশ্য) পরস্পরের মধ্যে বলাবলি হ'ত। ইহাই ভগবানের চিড়িয়াখানা।

জাহাজ হইতে কলম্বো

আজ ৭দিনের দিন আমাদের জাহাজ Colombo Harbourএ নঙ্গর কর্‌লে। জাহাজ নঙ্গর করবার খানিকবাদে ডাক্তারের lunch দূরে দেখা গেল। আমাদের জাহাজ থেকে অমনি একটা সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। ডাক্তার মশাই জাহাজে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে একজন লাল পাগড়ী Deckএর উপর উঠে সেই কাঠের ঝোলান সিঁড়ির পথটায় চৌকি দেবার জন্তে দাঁড়িয়ে রইলেন কি উদ্দেশ্যে বল্‌তে পারিনা—বোধহয় কেউ জাহাজ থেকে যেন না পালায়।

ডাক্তার এসে খালাসীদের রোগ পরীক্ষা করবেন এবং যে যে passenger পারে যাবে বা Colombo সহর দেখ্‌তে যাবে তাদের পাশ দেবেন। আমরা Shoreএ যাব সুতরাং ডাক্তারের কাছে পাশের জন্তে যেতে হ'ল। তিনি 1st. class saloon থেকে pass issue কর্‌ছিলেন। ডাক্তার একবারটী মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখ্‌লে, তারপর একখানা ছাপা পাশ দিলে। ডাক্তারের কাছ থেকে পাশ নিয়ে এসে দেখি 2nd. class এর Deck রীতিমত বাজার হয়ে গেছে। কালে কালো লোক মাথায় খোঁপা বেঁধে চিরুণী গুঁজে শুধু পায়ে কোমরে একটা ক'রে লুঙ্গি জড়িয়ে ও শুধু গায়ে উল্টান কলার কোট গায়ে দিয়ে সারি সারি Deckএর ওপর ব'সে গেছে।—সাম্‌নে একএকখানা কাপড় বিছান ও সেই কাপড়ের ওপর যে যার পণ্য দ্রব্য সাজিয়ে রেখেছে। অধিকাংশ জিনিষই হাতির দাঁতের কিম্বা পোকরাজ জাতীয় পাথরের। passengerরা অনেকেই অনেক জিনিষের দর-টর করলেন কিন্তু কাউকে বিশেষ কিছুই কিন্‌তে দেখলুম না। আমার বোধ হয়, যদি এরা জান্‌তে পার্‌ত যে সব খরিদ্দার তা হ'লে ॥০ আটআনা বাজে খরচ করে (Shore থেকে যাতায়াতের boat ভাড়া) বোধ হয় বৃথা সময় কাটাতে কেউ আস্‌ত না।—এই সব ফোড়েরা অনর্গল মা-বাপ-মরা ইংরেজী বল্‌তে পারে ও Europeanদের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা-বার্ত্তা কয়, তাদের জুজু মনে ক'রে দূরে থাকৃতে চায় না। তার

কারণ আছে—Colombo তে রোজই ২।৪ খানা boat লাগেই—আর এদের কাজই হ'চ্ছে passengerদের মাল গছান। সুতরাং লাল মুখ passenger দেখে দেখে জুজুর ভয় কেটে গেছে। এদের মাল গছাবার বাহাদুরী আছে। আমাদের দলের সেই Australian ছোকরাটাকে একজন আংটীওয়ালা বেশ পাকড়াও করেছে। দোষের মধ্যে সেই ছোকরাটা আঙ্‌টী দেখ্‌তে চেয়েছিল। সে ছোকরাও কিছুতে কিন্‌বে না আঙ্‌টীওয়ালাও কিছুতেই ছাড়বে না। শেষকালে আঙটীওলা বল্‌লে যে, যাহোক একটা দর ব'ল (আঙ্‌টীওলা চেয়েছিল ৫০৲ টাকা) ছেলেটা বল্‌লে পাঁচ টাকা। কিছু পরে সে রাজী হ'ল। আমার বোধ হয়, আসল আঙ্‌টীর একটা নকল দিয়ে থাকবে।

কলম্বোতে আমাদের জাহাজ থেকে তিন জন passenger একেবারে নেমে যাবে। সেই Lt. Col. পুলিশ ও মোটা লোকটা। তারা নেমে যাবার সময় বাকী সব passenger দের সঙ্গে কর মর্দ্দন করে আমাদের যাত্রা শুভ হউক বলে বিদায় নিয়ে গেল। দেশে থাকতে এই সব লোকেরাই কি রকম কি রকম থাক্‌তেন কিন্তু জাহাজে চেপে অবধি যেন একটু অন্য রকম অন্য রকম ঠাওর হচ্ছে। যেন কত অমায়িক ও—ভদ্র।

তারপর, আমরা দুই—বন্ধু আমি ও সেই australian দুজনে Shore এ-যাব বলে সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে লাল পাগড়ী মশায় কে পাশ দিয়ে নাম্‌তে হ'ল।

এরা প্রায় দুজনের বেশী একসঙ্গে কোথায় ও যায় না কারণ Two is a company three is a crowd.

Colombo harbour টা হচ্ছে artificial বা কৃত্রিম harbour। Breakwater দিয়ে তৈরী।—জীবনে এই প্রথম breakwater দেখা গেল। Breakwater হ'চ্ছে একটা পাথরের পাচিলের মত বরাবর ডাঙ্গা থেকে গেঁথে এসে সমুদ্রের মধ্যে খানিকদূর পর্য্যন্ত গাঁথা। জলের label থেকে অনেকটা উঁচু বলে বড় বড় ঢেউ গুলো এসে এতে ধাকা লেগে ভেঙ্গে যেত আর চারদিকে জলগুলো অনেক উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ত। যদি এই Breakwater না থাকৃত তা হ'লে Harbour এর জল স্থির থাক্‌তে পারত না এবং জাহাজ থেকে তীরে এ-নৌকা চলাচলের অসুবিধা হ'ত।

বৃহৎ ফাঁড়া

আমরা জাহাজ ছেড়ে নৌকা ক'রে খানিকদূর এসেছি এমন সময় আমাদের নৌকা Tuticorin এর mail Steamer এর ঠিক সামনে পড়ে গেছে।—mailটা ঠিক তখনই ছেড়েছে আর কি। আমার মনে হ'ল ধাক্কা লাগল বলে কারণ আমাদের নৌকা ও mail Steamer এর মাঝে মাত্র হাত ১০।১৫ ব্যবধান। মোটে দুজন দাঁড়ী ছিল ও আমি ছিলুম হালে। দাঁড়ীরা চেঁচিয়ে উঠ্‌তে জাহাজ থামিয়ে ছিল কিনা ব'লতে পারি না তবে জাহাজের force এ harbour এ-তে যে ঢেউ উঠেছিল সেই ঢেউতে আমাদের নৌকাকে অনেকদূর তফাতে সরিয়ে ফেলেছিল।

ক্রমশঃ

পুষ্পপাত্রের গল্প প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব কি আগে দেওয়া নিয়মাবলীতে দেখুন

অঙ্গুরী

শ্রীকমলাকান্ত বসু

রায় বাহাদুর প্রভাতকুমার বসুর বাটীতে লতা কাজ করে। লতার মত প্রিয়ম্বদা, মধুরস্বভাবা, ধীরপ্রকৃতির ঝী আজকাল খুব কমই দেখা যায়। তাই লতার নাম এই তিন মাসে বাহাদুর বাড়ীর ঝী-মহলে একটা বিরাট হৈ-চৈ সৃষ্টি করেচে। অন্দর-মহলেই লতার রাজ্য, কিন্তু পারত পক্ষে তার এলাকা ছাড়িয়ে আরও বহুদূর সে একতন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এতে অপর পরিচারিকাদের হিংসার এক শেষ।

সে যাই হ'ক্, রায় বাহাদুর প্রভাতবাবুর দৃষ্টি লতা কখনো এড়াতে পারেনি, যদিও লতা কত সময় (তাঁর কাছে অন্ততঃ) আত্মগোপন করে থাক্‌তেই ভালবাস্‌ত। কেন জানি না, প্রভাতবাবুর সকল ঝী অপেক্ষা এই তরুণী নবীনা আয়াটীর প্রতি স্বতই একটু অনুরাগ দেখা যেত। বড়লোকদের বাড়ী দাসী চাকরাণী যে কিরূপ সম্মান পায় তা বলাই বাহুল্য। তবু অনুমানে বোঝা যায় যে, প্রভাতবাবুর কাছে লতা কোনো স্নেহের দাবী-দাওয়া না ক'রলেও, প্রভাতবাবু তার অসামান্য গুণ আর অপরূপ রূপের আদর করে তাঁর চরিত্রের একটু আলোর আভার পরিচয় দিয়েচেন। সাধারণ (?) ঝী হয়েও লতার পক্ষে এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু ঈর্ষান্বিত কিঙ্করীর দল এতে বেশ একটু ক্ষেপে উঠ্‌ত, হিংসাপরবশে পরোক্ষে তার সর্ব্বনাশ ক'রতেও পেছপাও হ'ত না। কিন্তু পরিচারিকাদের আদর্শ (?) লতা যে সবাইকে তার কল্পনা-কৌশলে আগে থেকেই জয় ক'রে রেখেছে।

সন্ধ্যা হয়-হয়। এই একটু আগে কার্য্যান্তে প্রভাতবাবু বাড়ী ফিরেছেন। কলতলায় অঙ্গপ্রক্ষালন-অভিপ্রায়ে তিনি সবেমাত্র নেমেছেন। হৌজের (চৌবাচ্ছার) পাড়ে প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি গেল, একটি বহুমূল্য উজ্জ্বল পরকলা প্রস্তরের উপর! সচকিতে ত্বরিত হস্তে তিনি তা কুড়িয়ে নিলেন,—তিনি অবাক্ স্তম্ভিত বজ্রাহত! নিমিষের মধ্যে অলক্ষ্যে যে কি অপূর্ব্ব ছলনার অভিনয় হয়ে গেল, তা অন্তর্য্যামীই জানেন!

"লতা?"

অদূরেই আন্‌মনা লতা আপনমনে তার পিতলের শান্‌কিখানা মাজিতে তন্ময়। কোমরে খানিকটা কাপড়-জড়ানো—মলিন ছাইমাখা হাতে চপলপদে লতা সামনে এসে দাঁড়াল,—"আজ্ঞে"!

"এ হীরার আঙ্‌টীটা কা'র জানো?"

সহসা মাথায় বজ্রাঘাত হ'লেও কেউ বোধ হয় এরূপ ঘাব্‌ড়ে যেতো না। প্রভাতবাবু কি জিজ্ঞাসা করেচেন তা তাঁর মনে নেই। তিনি বিপুল-বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে ডাক্‌লেন,—"লতা?"

লতা থতমত খাবার আগেই প্রভাতবাবু ব'লতে লাগ্‌লেন,—"দেখ লতা, আংটীতে লেখা রয়েছে 'ল—লি—তা'; কে হ'তে পারে, আচ্ছা চেনো তাকে? এখানে তো ও নামে কেউ নেই, তবে ও কোত্থেকে এলো ··আশ্চর্য্য!"

প্রভাতবাবুর কণ্ঠ যেন জড়িয়ে গেল। তিনি এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন লতার মুখের পানে। দিবা-নিশির সন্ধিক্ষণ উপস্থিত;—প্রভাতবাবু যেন কি মহাসমস্যার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে যেন আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি; কিম্বা যেন ঊর্দ্ধে অসীম নভোপটে ধ্যানমগ্ন নিশ্চল নক্ষত্রের প্রায় আজ স্বপ্ন-মগ্ন যোগী তিনি। ললিতা,—এই তিনটী অক্ষর যেন ত্রিস্রোতা ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁর মর্ম্মতন্ত্রীর তিনটী মিশে একটী অতীত সুর। ললিতা,—এই তিনটী অক্ষর যেন

বিস্ময়-সংশয়-স্মৃতির ত্র্যহস্পর্শ যুগপৎ তাঁর মনের মাঝে উঁকি দিল। বাইরে ধরণী রাকার রোশ্‌নায় হাস্‌চে, কিন্তু ভিতরে যেন লুকোচুরি খেলা। প্রভাতের বুকে তুমুল ঝড়—লতার চোখে বাঁধভাঙা বান্‌।

"জান লতা, এ কা'র জিনিষ? কেউ কি আজ এসেছিল? কেউ কি ফেলে গেছে? বল্‌তে পারো—" প্রভাতবাবুর স্বর আরও গম্ভীর আরও জড়। জিজ্ঞাসু নেত্রে তিনি তাকিয়ে, আজ এর চূড়ান্ত মীমাংসা চাই-ই চাই।

লতার অধর-পল্লব যেন তিলেকের তরে কেঁপে উঠ্‌ল। কিন্তু প্রভাতবাবুর চোখে তা চাপা পড়্‌ল না;—পড়্‌ত যদি বা চাঁদের আলো সেদিন দেখা না দিত। আজ সে হাতে হাতে ধরা পড়ে' গেছে—সব খোলা তবু পলায়নের রন্ধ্‌টী অবধি নেই। হায় লতা, আগুন যে চিরদিন আঙ্‌রা ঢাকা থাকে না!

"অ্যাঁ লতা, তুমি কাঁদ্‌ছ—প্রভাতবাবু আরও অবাক্‌!

অবাঙ্মুখী লতা তখনই অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছে সরে' দাঁড়াল,—"বাবু—"

"কি লতা, বল বল। জান তুমি কে—?"

"ও আমার আঙ্‌টী"...

কথাটা বল্‌ব-না-বল্‌ব-না ক'রেও বলে' লতা যে কতখানি অপ্রতিভ। সেই জানে। তবু উপায়ান্তর নেই যে।

"কি বল্লে, তোমার—

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

অপ্রত্যাশিত জবাব পেয়ে প্রভাতবাবু যেন আকাশ থেকে পড়্‌লেন। "লতা, এতে যে ললিতা লেখা। তুমি কি ক'রে—"...

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"বল লতা, সব খোলসা করে' বল। ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি চুরি করেছ...তবে?"—

নিস্তব্ধ আঙিনায় আলোছায়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'টী মূর্ত্তি। এ কোন্‌ মায়া-কাঠির কুহক-পরশে নিস্তব্ধ নিথর।

সে গভীর স্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে' গেল লতা তার অশ্রু-ভেজা ব্যথাভরা মৌন-কাহিনী সশঙ্কোচে ধীরে ধীরে,—

"বিয়ের বছর দুই আগেকার কথা বল্‌ছি। একবার বারাসতে বেড়াতে যাই আমরা। সেখানে যে বাড়ীতে ছিলুম আমরা ঠিক্‌ তারই পাশের বাড়ীর একটী যুবকের সঙ্গে কিছুদিন যেতে বেশ চেনা হয়। সেই অকপট ভালবাসার আঁখরই এই অমূল্য অঙ্গুরী; আপনার চোখে সামান্য হলেও, এ বড় উচ্চ স্মৃতির জিনিষ।—"

বিচলিতভাবে শ্রোতা জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"আহা, কে সে যুবক, কি নাম লতা?—"

লতার বুক ঠেলে নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। সে বল্লে'—"প্রভাতকুমার বসু"! লতা শঙ্কিতা ত্রস্তা, হয়তো 'বাবু' তার এ জবানবন্দী তাচ্ছীল্যে উড়িয়ে দিয়ে তাকে অম্লান-বদনে অপহারিণী সাব্যস্ত ক'রবেন। কিন্তু নিজের নাম শুনেই প্রভাতবাবু বিপুল বিস্মিত।

লতা বলে' গেল:—

"তারপরই আমার বে' হয়ে যায়। এখনো সে সুখস্মৃতি মন থেকে ঝরে যায় নি। প্রথম ক'টা দিন কত সুখেই গুজরাণ হয়। তখন ভাব্‌তুম, দুনিয়ায় দু'জন না হলে প্রকৃতির সম্যক্‌ উপভোগ হয় না...

কিন্তু কে জানে নিয়তির নিষ্ঠুর নীতি? স্বামী আমায় নিয়ে এলেন কল্‌কাতায়। তারপর রেশের ঝোঁক হ'ল, নেশার টান হ'ল, সমস্ত অলঙ্কার আসবাব-পত্র খোয়া গেল, ভাড়াবাড়ীর দেনা জমে গেল, স্বামী সেই থেকে নিরুদ্দেশ। সেই থেকে তাঁর চরিত্রে দুরপনেয় দুর্ণামের ছাপ পড়্‌ল। তাঁর বন্ধুর কাছে শুনেছি এ সব; কিন্তু প্রত্যয় হয় না। যাক্‌ সে কথা। অভাগী আমি এখনও কত আশা করি স্বামীকে ফিরিয়ে আন্‌তে, কিন্তু তিনি কি আর এ-মুখো হবেন? পূর্ণেন্দু তিনি—কলঙ্কের আবছা পশরার আতঙ্কে আজও কি তিনি আকাশে কুয়াশাচ্ছন্ন থাক্‌বেন? সে দিব্য জ্যোতি কি আর পাব না এ আঁধার জীবনে?—"

লতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

প্রভাতবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন—"তোমার স্বামীর নাম কি লতা..."

লতা একটু ভ্রূভঙ্গী ক'রলে। প্রভাতবাবু আপনার এই অন্যমনস্কতায় একান্ত অপ্রতিভ হয়ে সে-কথা চাপা দিলেন! "তারপর লতা, এ আংটীতে যে 'ললিতা' লেখা তার কি—"

নিজেকে যথাসাধ্য সাম্‌লে নিয়ে লতা বল্লে,—"কৈফিয়ৎ ? দেখুন, এতদিন আপনার কাছে আত্মগোপন ক'রে চলেছিলুম, কিন্তু আজ যখন বল্‌তে বসেছি তখন সবই খুলে বল্‌ব। দেখুন, আমারই আসল নাম ললিতা; আর যে নামে আমি এখানে পরিচিত, ওটা আমার নিজের দেওয়া জাল নাম। আসল নামের একটা অক্ষর বাদ দিয়ে আজ আমি ক্ষুদ্র এক অঙ্গুরীর বিরাট্ বিচিত্র ইতিহাসের তাজমহল সৃষ্টি করেচি। দেখুন, কোন্ সাহসে প্রকৃত পরিচয় দেব আমি ? আমি নিজেই স্বপ্ন দেখি, এ যেন সব অবাস্তর, ভিত্তিহীন, খেয়ালীর হেঁয়ালি।"

প্রভাতবাবুর ঝটিকা-অবসাদ অবসান হ'ল। যেন শীতল প্রাণজুড়ানো মলয়মারুত শিরায় শিরায় বয়ে গেল। বাতাসের স্তরে স্তরে ভেসে আস্‌তে লাগ্‌ল একটা বেশ মনমজানো স্বরের রেশ যন্ত্রের সহযোগে—

"যদি এমনি চাঁদের জ্যোছনা,
অন্তরে তবে কিসের শোচনা।"

সেই আলো-আঁধারের মিলন-ছায়ায় প্রভাত ব্যাকুল-আবেগে জড়িয়ে ধর্‌তে গেল লতাকে বুকের মাঝখানে। "ললিতা, যে স্মৃতির দানকে আজও তুমি হারাও নি—সেই স্মৃতির স্মৃতি যে আ—মি।"...

"আমার ছোট্ট প্রিয়া"

শ্রীসুধীর কুমার সেন

১

আমার ছোট্ট প্রিয়া,—
জল আন্‌তে চল্‌লো ঘাটে, কলস কাঁখে নিয়া;
বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে পথে, নেইকো সাথে কেউ,
ছোট্ট মনে জাগলো তাহার, নূতন প্রেমের ঢেউ।
ঘাটের পথে একলা যেতে, দেখে আমার বেশ,
সেইখানেতেই হ'ল যে তার, ঘাটে যাওয়ার শেষ;
কয় সে কথা আমার সনে, কলস কাঁখে নিয়া;
সে মোর ছোট্ট প্রিয়া।

২

আমার ছোট্ট প্রিয়া,—
হেসে হেসে এগিয়ে এসে, কাঁপায় গো মোর হিয়া;
উজল তাহার আঁখি দু'টী, আমার পানে চায়,
মধুর তাহার মুখখানিতে, প্রেমের বিকাশ পায়।
প্রিয়া আমার কইলো কত, মনের ব্যথা তার,
ব্যথার টানে তাই ত ছুটে, আসে বারংবার;
অবশ সে তার হিয়াখানি, আমায় সঁপে দিয়া
খেল্‌তো হেসে প্রিয়া।

৩

আমার ছোট্ট প্রিয়া,—
মিট্‌তো না তার আশাগুলি, হৃদয় সঁপে দিয়া;
মধুর স্বরে গাইত গো সে কত করুণ গাথা,
মনের মায়া এতই বেশী—এতই বুকে ব্যথা।
প্রিয়া আমার শিখ্‌লো কোথা—গোপন ভালবাসা ?
বুঝি "প্রণয়" বেঁধেছিল তার মন্মতে বাসা;
যাবার বেলা, বিদায় নিত, মর্ম্মটী মোর নিয়া,
সে মোর ছোট্ট প্রিয়া।

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭

মনীষা বসিয়াছিল। এমন সময় শশাঙ্ক আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। মনীষা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ মস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল, "স্নানাহার হয়ে গেছে দেখছি।"

শশাঙ্ক একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা হয়ে গেছে। এক বন্ধুর সঙ্গে এসেছি, তিনি জোর করে তাঁর বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়ে সেখানেই খাইয়ে-দাইয়ে তবে ছেড়ে দিলে।"

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া মনীষা বলিল, "তার চেয়ে সোজা কথায় বল যে, নিরামিষ খাওয়া তোমার পছন্দ হয় না তাই তুমি কোনও হোটেলে—"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল, "নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলো মনীষা, সত্যের গলা টিপে মেরে ফেলেছি আমি না তুমি? তুমি জানোনা আমি উপস্থিত এই এক'বছর হতে নিরামিষ খাই। তোমাদের এখানে গত বছর এসে আমিষ ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে গেছি, এখনও নিরামিষই খেয়ে আসছি।"

বিস্ফারিত যুগল চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মনীষা বলিল, "কিন্তু সত্যই যদি তা করে থাক, আমি সে জন্যে তোমার এতটুকু প্রশংসা করব না, বরং নিন্দেই করব।"

শশাঙ্ক বলিল, "নিন্দে করাও অন্যায় হবে—কেন না তুমিই একদিন আমিষ খাওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই বলেছিলে সে কথা বোধ হয় ভুলে যাওনি মনীষা!"

মনীষা বলিল, "বলেছিলুম কেন—এখনও বলি। আমিষ ছাড়াও মানুষ বাঁচে, তাদের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে, অন্যায় রকমে জীবহত্যাও করতে হয় না। নিরামিষ সব রকমেই ভাল, কিন্তু সেটা অনেক আগে হতেই অল্পে অল্পে অভ্যাস করতে হয়। যাদের মাছ মাংস না হলে খাওয়া হয় না, তারা যদি হঠাৎ পরম বৈষ্ণব হয়ে যায়, তাতে তাদের ত্যাগের সংযমের প্রশংসা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু যে ত্যাগ করলে তার স্বাস্থ্যের কতটা ক্ষতি করলে সেটা ভাবা উচিত।"

শশাঙ্ক হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "ওঃ, পাছে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তাই? কিন্তু চেয়ে দেখ মনীষা, আমার শরীর তো একটুকু রোগা হয় নি, আমার মানসিক শক্তিও যে কমে নি তাও আমি বেশ বুঝতে পারছি। এখানে যে রকম খাটনি পড়েছে, তাতে বরং আমার আরও রোগা হওয়ার কথা, কিন্তু সে রকম আমার কি দেখছ?"

মনীষা মাথা নাড়িয়া বলিল, "দৈহিক ক্ষতি না হোক মানসিক ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়েছে, এ আমি ঠিক বলব।"

বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া শশাঙ্ক বলিল, "মানসিক ক্ষতি কি রকম?"

জিজ্ঞাসুনেত্রে সে মনীষার পানে তাকাইয়া রহিল হাসিয়া মনীষা বলিল, "তোমার মুখখানা শুদ্ধ যখন ওরকম বদলে গেল দাদা, তখন ক্ষতি যে, তোমার হয়েছেই এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতেই হবে।"

শশাঙ্ক অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে লাগিল।

মনীষা বলিল, "তবে স্বীকার করছ, তোমার এ

ত্যাগের ফলে তোমার অনেকখানি ক্ষতি হয়েছে, তা হলে আমি জিতেছি।"

শশাঙ্ক মৃদু হাসিল, বলিল, "হয়তো জিতেছ, আর নিজের মনটাকেও তাই বলে উৎফুল্ল করে তুলতে পার মনীষা, আমি কিন্তু এখনও নিজের হার-জিত ঠিক করতে পারি নি। তুমি বল্‌বে—আমি হেরেছি, কিন্তু নিজের মনে সে হার ঠিক বোঝা চাই তো—কেবল তোমার কথা মেনে নিলেই তো আমার চলবে না।"

মনীষা বলিল, "নিশ্চয়ই নয়, আমিও তা বলি নে। আমার মোট কথা কি জান দাদা, অতিরিক্ত ভোগ ও ভাল নয়, অতিরিক্ত ত্যাগও ভাল নয়, যা রয়-সয় তাই ভাল। আজ তুমি জেদের বশে আমায় দেখানোর জন্যই আহারে-বিহারে অতিরিক্ত রকম সংযমী হয়ে উঠেছ, আবার এমন দিন আসবে যেদিন এই সংযম দূরে যাবে—আগে পর্য্যন্ত তোমার যা ছিল তাও যাবে। আসল কথা কি জানো, মানুষকে যখন ঠিক মানুষের সঙ্গে মিশেই থাকতে হবে, তখন কিছুরই বাড়াবাড়ি করে অতি মানুষ বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা মিছে।"

শশাঙ্ক উত্তর দিতে যাইতেছিল, এই সময়েই সুশীলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"দিদি—"

মনীষা উত্তর দিল, "এই যে, এই ঘরে আছি ভাই—এসো।"

সুশীল প্রবেশ করিয়াই শশাঙ্ককে দেখিতে পাইল, অভিবাদন করিয়া বলিল, "শশাঙ্ক বাবু যে, কখন এলেন?"

বন্ধু-বান্ধবেরা শশাঙ্কের নাম ধরিয়া ডাকিত।

মনীষা উত্তর দিল, "এই খানিক আগে এসেছেন। তোমার কি অসুখ করেছে সুশীল, চেহারাটা ভারি বিশ্রী দেখাচ্ছে।"

সুশীল একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া শ্রান্তভাবে বলিল, "সবাই এই একই কথা জিজ্ঞাসা করছে, কি যে আমার হয়েছে তাও জানিনে। উত্তর যে কি দেব তাই ঠিক করতে পারছিনে।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া মনীষা বলিল, "তবে থাক, আমি না হয় উত্তরটা নাই শুনলুম।"

অধীর হইয়া সুশীল বলিল, "উঁহু, সেটী হচ্ছে না, তোমাকেই তো সব কথা বলতে এসেছি। আর যখন এসেছি তখন সব কথা নিশ্চয়ই বলে যাব।"

শশাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইল, "আচ্ছা, তোমাদের কথা হোক, আমি ততক্ষণ ও ঘরে যাই।"

সুশীল তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, বলিল, "না, সেটি হচ্ছে না শশাঙ্ক বাবু, ভগবান যখন আপনাকে এনেই দিয়েছেন, আমার আর আপনার কাছে খড়্গপুর পর্য্যন্ত দৌড়তে হল না, নচেৎ দৌড়াতে হতো। বসুন, আপনার জন্যেই আমার দিদিকে দরকার।"

আবার বসিয়া বিস্মিত হইয়া শশাঙ্ক বলিল, "আমার কাছে আপনার দরকার?"

সুশীল মাথাটা কাত করিয়া মনীষার পানে তাকাইয়া বলিল, "তুমি যে নারী আশ্রমটী করেছ দিদি, সেটা দিয়ে আমার যে কোন কাজই হবে না, নচেৎ আমি আর কোথাও যেতুম না। দেশের কাজ দেশের ছেলে মেয়েরা করবে, দেশের লোকই সে আশ্রমে আশ্রয় পাবে, এ কাজে যোগ দিতে পারবে, কোন লোকে না এ ইচ্ছে করে শশাঙ্ক বাবু?"

শশাঙ্ক উৎসাহিত ভাবে উত্তর দিল, "সবাই করবে, সবাই অর্থাৎ যাদের হৃদয় আছে।"

সুশীল বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কেউ কেউ এমন লোকও আছে, যাদের এ রকম একটা মহৎ কাজের প্রতি মোটেই সহানুভূতি নেই। আমাদের কোম্পানিটাকে নিয়ে আমি এই রকম একটা দারুণ মুস্কিলে পড়েছি, শশাঙ্ক বাবু।"

শশাঙ্ক বলিল, "কিসের মুস্কিল বলুন তো? আপনাদের কোম্পানীর নাম আজকাল খুব বিখ্যাত হয়ে পড়েছে; সকলেই বলছে ভারতীয়ের দ্বারা এমন একটা কাজ যে হতে পারে এটা সকলেরই অবিশ্বাস্য ছিল, আপনারা নতুন এই বিশ্বাসটা লোকের মনে এনে দিয়েছেন। আজকাল অনেক বিদেশীয় আপনাদের হিংসে করছে, আর কিসে যে আপনাদের কোম্পানীকে অচল করে দেবে তারই চেষ্টায় ফিরছে।"

দিন পনের কুড়ি আগে এই কথাটা শুনিলে সুশীল যতটা আনন্দ পাইত, আজ তাহার শতাংশের এক অংশও পাইল না, তাহার মুখে মলিন একটু হাসির রেখাই ভাসিয়া উঠিল মাত্র।

সে বলিল, "অচল করতে পারবে—তবে সে রকম

ভাবে নয়, ভারতীয়দের হাত হতে এ কোম্পানী ওদের হাতে গিয়ে পড়ল বলে। আজ যেখানে গেলে ভারতীয়দের মুখই কেবল দেখতে পাবেন, আর দুদিন বাদে সেখানে গিয়ে দেখতে পাবেন—শ্বেতাঙ্গে ভরে গেছে।"

বিস্মিত শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

সুশীল বলিল, "কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ভারতীয়দের বিশ্বাস করেন না, তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস শ্বেতাঙ্গদের পরে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, এই কোম্পানী এর পর শ্বেতাঙ্গদের হাতেই থাকবে, ভারতীয়েরা তাদের অধীনে থাকবে, কেন না ওরা বণিকজাতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ওরা যত বুঝবে ভারতীয়েরা তার এতটুকু বুঝবে না।"

উষ্ণ হইয়া উঠিয়া মনীষা বলিল, "তিনি ভারতীয়—বাঙ্গালী নন্?"

সুশীল বলিল, "কিন্তু এইটুকুই যা কলঙ্ক, নইলে তাঁদের পিতাপুত্রীর শিক্ষায়, আচারে-ব্যবহারে কেউ ধরতে পারত না, তাঁদের মাতৃভূমি এই দেশ।"

একটু নীরব থাকিয়া সে বলিল, "এ দেশের পুরুষদের সম্বন্ধে যা ধারণা তাতো স্পষ্টই বুঝলে দিদি, মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আরও চমৎকার। তিনি স্পষ্টই বলেন, এ দেশের মেয়ের মানসম্ভ্রম নেই, এরা নিজেদের ইজ্জত রাখতে জানে না—"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া মনীষা বলিল, "এ কথা বলতে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় নি, তাঁর গলার স্বর কেঁপে ওঠে নি, তিনি কি ভুলে গেছেন, এই দেশের মেয়েই বুকের রক্ত দুধের আকারে পরিবর্ত্তিত করে তাঁকে বাঁচিয়েছে? বুঝতে পারছ কি দাদা, মিস মেয়ো এ দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে যে সব অকাট্য সত্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন সে সব প্রমাণ কাদের কাছ হতে পেয়েছেন?

শশাঙ্ক একটা লঘু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই সামান্য ব্যাপারে এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠলে কি চলে মনীষা?"

উত্তেজিত সুশীল বলিল, "ব্যাপারটাকে আপনি সামান্য বলে উড়িয়ে দিতে চান শশাঙ্ক বাবু আমি উড়াতে পারিনে। যে আমাদের দেশের সাধ্বী পতিব্রতা দেবীদের সম্বন্ধে এমন নীচ ধারণা রাখে, তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো দূরে থাক, তাঁর অফিসে কাজ করাও আমি ঘৃণাকর বলে করি।"

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তিনি ভুলে যেতে পারেন তাঁর মা এই দেশের মেয়ে, তাঁর বোন এই দেশের মেয়ে, এমন কি তাঁর স্ত্রীও এই দেশের মেয়েই ছিলেন; তাঁদের সৌভাগ্য যে তাঁরা মরেছেন—তাই এই দুর্ভাগ্যের এমন সব কথা তাঁরা শুনতে পেলেন না। তিনি অসঙ্কোচে এমন একটা কথা বলে যেতে পারলেন, কিন্তু আমি তো সে কথা ভুলি নি শশাঙ্ক বাবু। বাংলার এই সব মেয়েদের পানে তাকিয়ে আমার স্বর্গগতা মায়ের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে—সেই মা আমার বুকের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়েছেন, আমার চোখে আঙুল দিয়ে জগৎ চিনতে শিখিয়েছেন। আমার বোনের কথা মনে পড়ে; মনে পড়ে, আমার সেই ছোট বোনটী দুই হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মাথা দিয়ে পড়ে থাকত, দাদা নইলে তার খাওয়া হতো না, ঘুম হতো না, খেলা হতো না। আজ তাঁরা কেউ জগতে নেই, কিন্তু এই সব মেয়েদের মুখই তো আমার মায়ের কথা, বোনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজ তাঁরা নেই বলেই না তাঁদের স্মৃতি আমার কাছে এত মূল্যবান বলে মনে হয় শশাঙ্কবাবু।"

তাহার কথা গুলি সকলেরই হৃদয় বেদনায় পূর্ণ করিয়া দিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া মনীষা কি বলিতে যাইতেছিল, সুশীল বলিল, "আমি ঠিক করেছি কি জানো দিদি—যে মাতৃজাতির অবমাননাকারী—দেশের কলঙ্ক তার সঙ্গে আর কোনও সংস্রব রাখব না, আমি এ কোম্পানির সংস্পর্শ ছেড়ে দেব। কিন্তু শশাঙ্ক বাবু, আমি দুজন লোকের দায়ীত্ব নিজের মাথায় নিয়েছি, একজন নিরঞ্জন—দিদি তাকে চেনেন, আর একজন আমাদের টাইপিষ্ট মিস দাস, এদের কাজের ভার আপনি নিন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "মিস দাসের কাজ যাবে কেন?"

সুশীল ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, "তার চরিত্রকে ওরা বিশ্বাস করেন না। ওঁরা বলেন, যারা খৃষ্টান তারা সব করতে পারে, ওঁরা নেটিভ খৃষ্টানদের আন্তরিক ঘৃণা করেন।"

শশাঙ্ক বলিল, "আমারই উপস্থিত একজন টাইপিষ্টের দরকার কাজেই মিস দাসকে আমি এখনই নিচ্ছি। আর যে ভদ্রলোকের কথা আপনি বলছেন, আশা করছি তাঁকেও কাজ দিতে পারব।"

সুশীলের বুক হইতে একটা ভারি বোঝা নামিয়া গেল।

১৮

অফিসে গিয়াই সুশীল ইরাকে ডাকিতে পাঠাইল। মিনিট পাঁচ পরে মিস দাস দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পর্দ্দা সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আসতে পারি কি?"

সুশীল অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে কাগজ পত্র দেখিতেছিল, ইরার কথা শুনিয়া চমকাইয়া মুখ তুলিল, বলিল, "এসো—"

ইরা প্রবেশ করিল।

সামনের চেয়ারখানা দেখাইয়া সুশীল বলিল, "বস, তোমার সঙ্গে অনেকগুলো কথা আছে।

আজ মাস খানেক সুশীল সর্ব্বপ্রকারে ইরার সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিয়াছে, তাহার ভাব বুঝিয়া ইরাও দূরে দূরে থাকে, সেও স্বেচ্ছায় কোনদিনই সুশীলের সামনে আসে না। আজ দিন বার চৌদ্দ হইল ইরার মা ইরাকে একা ফেলিয়া জগতের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এ সংবাদও সুশীল পায় নাই।

ইরা চেয়ারে বসিল।

দেওয়ালের ক্লক ঘড়িটায় অনবরত টক টক শব্দ করিতেছিল, ঘরের মধ্যে যে দুজন মানুষ রহিয়াছে উভয়েই সম্পূর্ণ নির্ব্বাক। সুশীল অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিল তাহা সেই জানে, ইরা অনর্থক এভাবে বসিয়া থাকায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। দৈবক্রমে এই সময়ে যদি মিঃ রায় আসিয়া পড়েন সেই কল্পনা করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিতেছিল।

নিজের জন্য সে এতটুকু ভাবে না, তাহার কিসের ভয়? নিজের ভয়ের কথা মনে করিতে গেলেই তাহার হাসি পাইত। যে সমুদ্রে শয্যা পাতিয়াছে, সামান্য শিশিরে তাহার কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে? ভয় হইত সুশীলের জন্য, পাছে সে মিঃ রায়ের বিরাগভাজন হয়।

স্ত্রীলোকের কৌতূহল বড় বেশী, সে তাই মিস রায় সম্বন্ধে সকল কথাই জানিয়া ফেলিয়াছিল। সুশীলের সহিত মিস রায়ের বিবাহ সম্বন্ধ যে বহুকাল হইতেই স্থিরীকৃত আছে, ভাবি জামাতাকে তিনিই যে মানুষ করিয়াছেন এবং তাহাকেই সমস্ত সম্পত্তি যৌতুক দিয়া যাইবেন, ইহা তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না।

সে ইহাও শুনিয়াছিল, সুশীল ও মিস রায় উভয়েই উভয়কে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসে। প্রথম যে সময় সুশীলের হাতখানা মিস রায়কে টানিয়া লইতে দেখিয়াছিল সেই সময়টায় তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সে অন্তরে বেশী রকম একটা আঘাত অনুভব করিয়াছিল, পরমুহূর্ত্তে নিজের কথা ভাবিয়া নিজেই সে না হাসিয়া থাকিতে পারে নাই।

সে কে, মিস রায় ও সুশীলের মাঝখানে দাঁড়াইবার অধিকার তাহার কি? ইহাই ভাবিয়া নিজের অসারত্ব বুঝিয়া সে অল্পে অল্পে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল।

মাতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছাড়িয়া দিবার অদম্য বাসনা তাহার অন্তরে জাগিয়া ছিল, কিন্তু ছন্নছাড়া জীবনটাকে আবার সে টানিয়া লইয়া যাইবে কোথায়? যেখানেই যাক, আহার্য্য সংগ্রহের জন্য আবার তো তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে, আর এখানে নয় ওখানে, ওখানে নয় সেখানে করিয়া লাভ কি?

মিঃ রায় প্রায়ই তাহার প্রতি কার্য্যের ত্রুটী বাহির করেন, সুশীল সে সব ত্রুটী নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। সাময়িক ভাবে তাহাকে সে বাঁচাইয়া গেলেও তাহার ব্যবহারে মিঃ রায় ইরাকে কতখানি সন্দেহের চোখে দেখিতেছেন তাহা সে জানিতে পারে নাই। পিতার আদরিণী কন্যা মিস রায়ও পিতার সহিত সে প্রায়ই অফিসে আসে, কিন্তু নিতান্ত ঘৃণাভরেই এই তরুণী টাইপিষ্টের সহিত আলাপ করে নাই। অথচ ইরা বেশ বুঝিতে পারে, মিস রায়ের বড় বড় দুইটী চোখের দৃষ্টি নিয়ত তাহাকেই অনুসরণ করিতেছে, তাহার কাজ দেখিতেছে। ইহা মনে করিতে ইরার সমস্ত অন্তরখানা কুণ্ঠায় লজ্জায় একেবারে এতটুকু হইয়া যায়,

তাহার কর্ম্মপ্রবণ হাতখানা অবশ হইয়া আসে, তবুও সে কাজ করে, তবুও সে নিয়মিত অফিসে আসে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়াও যখন ইরা দেখিল সুশীল মুখও তুলিতেছে না কথাও বলিতেছে না তখন সে নিজেই কথা বলিল।

"আমায় কি জন্যে ডেকেছেন, মিঃ মুখার্জ্জি ?

সুশীল মুখ তুলিল।

তাহার সেই মুখখানার পানে তাকাইয়া ইরা বিস্মিতা হইয়া গেল। সুশীলের এমন অসহায় করুণভাব সে কখনও দেখিতে পায় নাই। আজ এই প্রথম ইরা লক্ষ্য করিল, সুশীল অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে।

সুশীল খানিক তাহার মুখের পানে লক্ষ্যহীনভাবে তাকাইয়া রহিল, ইরা সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া মুখ নামাইল।"

মুখ ফিরাইয়া সুশীল বলিল, "একটা বিশেষ দরকারে তোমায় ডেকেছি ইরা তুমি বোধ হয় জানো না, আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি ?"

"চলে যাচ্ছেন—?"

ইরা চমকাইয়া উঠিয়া বিবর্ণ হইয়া গেল।

শান্তভাবে সুশীল বলিল, "হ্যাঁ, আমি দুই চার দিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি; আর এই যাওয়াই হয় তো আমার শেষ যাওয়া, আমি আর কোনাদিনই এ দেশে ফিরব না বলেই ভাবছি, তারপর আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই, ঘটবে।"

ইরা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছেন ?" তাহার কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

সুশীল অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "খুব সম্ভব জয়পুরে যাব। সেখানে আমার এক আত্মীয় আছেন, তিনি একাই থাকেন, বিয়ে করেন নি, তাঁর কাছেই গিয়ে থাকব। তাঁকে একটা কাজ ঠিক করে রাখতে বলেছি, এর মধ্যে কাগজ পত্রগুলো মিঃ রায়কে দেখিয়ে শুনিয়ে কাজ দেখিয়ে দিয়ে যেতে চাই।"

একটু থামিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "হিসাব-নিকাশ না দিয়ে তো একপা নড়বার ক্ষমতা নেই, কাজেই ওটা আগে দেওয়া দরকার। সব বদনামই তো নিয়েছি, নেই নি কেবল চোর বদনামটা, তা অদৃষ্ট যে রকম দেখছি তাতে কোনদিন যে ও বদনামটাও নিতে হবে তাই ভাবছি। অবশ্য এ নামটা নেওয়ার জন্যে কেউই কোনদিন আকাঙ্ক্ষা করে না। ডাকাত হতে সবাই চাইলেও চাইতে পারে—কেন না ওর মধ্যে শৌর্য্য-বীর্য্য আছে, ডাকাতের মধ্যেও মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখা যায়, কিন্তু চোরের মধ্যে ও সব বালাই কোনদিনই নেই, কি বল ইরা ?"

কথা কয়টা শেষ করিয়া সে প্রচুর হাসিতে লাগিল, কিন্তু ইরা তাহার হাসিতে যোগ দিল না, বিষণ্ণমুখে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

সুশীল বলিয়া চলিল, "অবশ্য আমি যাওয়ার আগে তোমাদের ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি, সে জন্যে কিছু ভাবতে হবে না।"

মিস্ দাসের কানে হঠাৎ এই কথাটাই আসিয়া লাগিল, সে ব্যগ্রচোখে তাহার পানে তাকাইয়া বলিল, "কিসের ব্যবস্থা ?"

সুশীল বলিল, "তোমাদের কাজের।"

ইরা বলিল, "আপনি কেন এমনভাবে হঠাৎ চলে যাচ্ছেন সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

সুশীল বলিল, "সে অনেক কথা, এর পর যদি সময় পাই জানাব, আজ সে সব কথা থাক। আমি এখন তোমাকে বলতে চাই কি তুমি আজই পদত্যাগ পত্র লিখে দাও, ওঁরা তোমায় ছাড়িয়ে দেওয়ার আগে তুমি নিজেই কাজ ছেড়ে দাও, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই।"

ইরা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "যদি এখন না দেই—?"

সুশীল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তোমায় দিতেই হবে, দেব না বললে তো তোমায় ছাড়ব না ইরা। তুমি এখনও বুঝছ না এখানে কাজ করার জন্যে তোমায় কতখানি নীচু হয়ে পড়তে হয়েছে, তোমার সম্ভ্রম পর্য্যন্ত ওদের পায়ের তলায় দলিত হচ্ছে। আমি তোমায় এমনভাবে অপমানিতা হতে এখানে রাখব না; আমি জানি সে জোর আমার আছে, কারণ আমিই তোমায় এখানে এনেছি।"

ইরা হাসিল, সে হাসিতে ঝরিয়া পড়িল তাহার বুকের পুঞ্জিকৃত বেদনারাশি।

সে বলিল, আপনি বলার আগেই আমি কাজ ছেড়ে দেব ঠিক করেছি মিঃ মুখার্জ্জি। যে অপমানের কল্পনা আপনি আজ করছেন, আমি সে কল্পনার আভাস অনেককাল আগেই পেয়েছি।"

সুশীল ব্যগ্রভাবে বলিল, "পেয়েছ তবু ছাড় নি ?"

ইরা নতমুখে বলিল, "না, কেন না আমার চাকরী করার দরকার ছিল, আমার মা বর্ত্তমান ছিলেন। মিঃ মুখার্জ্জি, চাকরী করতে এসেছিলুম কেবল আমার মায়ের জন্যে, মায়ের চিকিৎসার জন্যে, পথ্যের খরচ যোগানোর জন্যে, সে দরকার আমার মিটে গেছে, কাজেই আমার এখন চাকরী করার দরকারও নেই। আমার একটা লোকের জীবন, যেমন করেই হোক কেটে যাবে, নিজের জন্যে কোনদিন ভাবি নি, ভাববও না।"

উৎকণ্ঠিতভাবে সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমার মা—মিসেস দাস—"

বাধা দিয়া ইরা বলিল, "তিনি আজ তের দিন হল সংসার ত্যাগ করে গেছেন।"

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, নতনেত্র কোণ বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

সুশীল নির্ব্বাকে শোকাকুল নারীর পানে তাকাইয়া রহিল, একটি কথাও তাহার মুখে তখন আসিল না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু সে কথা তো আমায় একটা দিনও জানতে দাও নি ইরা, তুমি তো ছুটিও নাও নি তার জন্যে ?

মুখ তুলিয়া শুষ্ককণ্ঠে ইরা বলিল, "কি দরকার ছিল মিঃ মুখার্জ্জি ; যারা চাকরী করতে আসে, তাদের যে সব স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাতো আপনার অজানা নেই।"

পরক্ষণেই সে একটু হাসিয়া বলিল, "আর আমার মা তো মরেই ছিলেন, জীবনটা ছিল এইটুকু, কিন্তু জীবিতের কোন চিহ্নই তো তাঁর ছিল না।"

সুশীল নতমুখে সামনের কাগজ কয়খানা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

খানিক পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "ভাল কথা—হয় তো আমায় জানানোর দরকার হয়নি বলেই জানাও নি, কিন্তু আমার মনে হয়—জানালেই ভাল হতো। যাক, যা তোমার নিজের কাজ তার জন্যে আমি মিথ্যে অনুযোগ করব না, এখন তোমার আমি কাজের ঠিক করেছি, তুমি সেখানে কাজ করতে পারবে।"

মিস দাসের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল, সে জোর করিয়া মুখের উপর একটুকরা হাসি ফুটাইয়া বলিল, "সঙ্গে সঙ্গেই কাজের ঠিক করেছেন, কোথায় কাজ করতে হবে ?"

তাহার সে হাসি দেখিয়া সুশীল থতমত খাইয়া গেল, একটু থামিয়া বলিল, "আমার এক বন্ধুর অফিসে তুমি টাইপিষ্টের কাজ করবে। কিছু ভেব না, মিঃ বোসের মত ভাল ছেলে আমি বাস্তবিকই আর দেখতে পাই নি। তাঁর চরিত্র, লোকজনের পরে নম্র আচরণ, এ সবই তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। তোমার বেতন সম্বন্ধেও আমি বন্দোবস্ত করেছি, সেখানে তুমি মাসিক আশি টাকা করে পাবে, তারপরে—"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ইরা বলিল, "ধন্যবাদ! কিন্তু কি হবে আমার আশিটাকা বেতন নিয়ে কাজ করে? আমার পায়ের শিকল খসে গেছে, আমি কোনও হোমে আমার জীবন কাটিয়ে দেব, আমি মুক্ত, স্বাধীন। কাজ না করলেও আমার দিন কেটে যাবে।"

সুশীলের মুখখানা পাংশু হইয়া উঠিল, সে বলিল, "হোমে থাকা বলচ সহজ, কিন্তু আজও যাদের সংস্কার মজ্জাগত হয়ে রয়েছে, হোমে গেলে সে সংস্কার কি যাবে? আমি তাই ভাবছি ইরা, তোমার শুচিতা সংস্কার বাঁচিয়ে সেখানে থাকতে সমর্থ হবে তো ?"

বেদনাপূর্ণ হাসি হাসিয়া ইরা বলিল, "এখন এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, বুঝেছি খৃষ্টান যদি তার পূর্ব্বপুরুষের আচার সংস্কার বাঁচিয়েও চলে, তবুও সে খৃষ্টান। খৃষ্টান যে সে চিরকালই খৃষ্টান, সে হিন্দু হবে না—হতে পারবে না।"

সুশীল কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না। দরজার দিকে তাকাইয়া সে সন্ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দরজার উপর দাঁড়াইয়া মিঃ রায়—তাঁহার মুখে দারুণ ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৯

শরীরটা অসুস্থ হওয়ায় রতিনাথ বাবু আফিসে গিয়া ঘণ্টাখানেক বাদেই বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিলেন।

মনীষা তখন বাড়ী ছিল না, রতিনাথ বাহির হইবার পরই সে তাহার নারীরক্ষা সমিতিতে প্রত্যহ যেমন যায়, তেমনই চলিয়া গিয়াছিল।

মাথার যন্ত্রণায় রতিনাথ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার এই মাথার ব্যারামের সূত্রপাত হয়। কোনও দিন বেশী কাজ পড়িলে বা বেশী রকম ভাবিলে মাথার যন্ত্রণা বড় বেশী রকম হয়।

রতিনাথ বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিলেন, ভৃত্য বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ডাক্তার বাবুকে ডাকব বাবু?"

শুষ্ক হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "না দরকার নেই, মাথার যন্ত্রণা ঘণ্টাখানেক বাদেই নরম পড়ে যাবে এখন।

পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণ মনীষাকে সংবাদ দিতে একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রতিনাথের অসুস্থ সংবাদ পাইয়া আধঘণ্টার মধ্যেই মনীষা আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন রতিনাথের মাথার যন্ত্রণা একটু নরম পড়িয়াছিল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণ মনীষাকে দেখিয়া হাতের পাখাখানা রাখিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

রতিনাথের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া বড় বেশী রকম আলো আসিতেছিল দেখিয়া মনীষা জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রতিনাথ উঠিতে যাইতেছিলেন, মনীষা বাধা দিল, আর একটুখানি শুয়ে থাকুন বাবা, এখনি উঠবেন না।

বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন এলে মা?"

মনীষা বলিল, "আমি দেড়টার সময় এসেছি আপনাকে আর জানালুম না, সেই পর্য্যন্ত আমি এই ঘরেই রয়েছি।"

রতিনাথ উঠিয়া বসিলেন—চিন্তিত ভাবে বলিলেন, দেখ দেখি কেষ্ট বেটার আক্কেলখানা, একটু মাথা ধরেছে কি—না, অমনি তোমায় খবর দিয়ে বসে আছে। হতভাগাটা ডাক্তার ডাকবার কথাও বলেছিল, ধমকে তবে থামিয়েছি। আরে বাপু, একটু মাথা ধরবে, গা ব্যথা করবে সব তাইতে সকলকে অস্থির করে তোলাই বা কেন, ডাক্তারই বা ডাকা কেন? এ তো আমার সঙ্গের সাথী, যে দিন চিতায় শেষ সেদিন এ আমার একেবারে মরবে, তার আগে কারও সাধ্য নেই যে একে দূর করে। এর জন্যে অনর্থক লোককে জ্বালাতন করা, ভাবিয়ে তোলা কেন?

ক্ষুণ্ন হইয়া মনীষা বলিল, "কিন্তু বাবা, এর জন্যে কেউ যে কোন দিন বড় বেশী রকম জ্বালাতন হয়েছে তা বলে তো মনে হয় না, তবে আপনি যদি মনে করে থাকেন—সে স্বতন্ত্র কথা। যখন আপনার লোককে পর বলে মানুষ ভাবে তখনই মনে করে হয়তো তার স্নেহের টানটাও—"

"পর" ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া রতিনাথ বলিয়া উঠিলেন, "সে মা, আর যাই বল ও কথাটা বলো না, তোমায় কোনদিন পর বলে ভাবতে পারি কি? আমার যে মেয়ে চলে গেছে, তারই প্রতিমূর্ত্তি বলেই তোমায় জানি। আমার তো সে দিনের কথা মনে আছে মা, যে দিন তোমায় আমি প্রথম গৃহলক্ষ্মীরূপে আমার ঘরে বরণ করে নিয়ে আসি। সেদিন তুমি ছিলে এতটুকু একটা মেয়ে, দুইহাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমার কানের কাছে কচি মুখখানা এনে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি আমার বাবা, আমায় আর ভবানিপুরে পাঠিয়ে দেবেন না তো? সে দিনে সেই যে তোমায় কোলে নিয়েছিলুম মা—"

বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "তারপর কতই যে ঝড়-ঝাপ্টা আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল মা, আমার সংসারের একমাত্র অবলম্বন ছেলে গেল, মেয়ে গেল, আমি সব হারালাম। তবু আমি বেঁচে রইলুম, আবার উঠলুম, আবার নিয়মিত কাজ করতে লাগলুম,

সে কার মুখ চেয়ে মা, কাকে অবলম্বন করে? আজ— এই ষাট বছর বয়সেও আমি যুবার মত খাটছি সে কি শুধু নিজের জন্যই, কেবল চাকরী বজায় রাখার জন্যই, তার মূলে আর কাউকে সুখী করবার কামনা নেই কি মা?"

মনীষা এক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "হয় তো আছে। কিন্তু বাবা, আমি বলি, আপনি এ রকমভাবে বয়সের অতিরিক্ত খেটে শরীরটা আর নষ্ট করবেন না। আর ভেবেও দেখুন, ষাট বছর যাঁর বয়েস হয়েছে তাঁর এখন খাটবার সময় নয়, বিশ্রামের সময়। সেকালে যাদের বয়স পঞ্চাশের উপরে হতো, তারা সংসারের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে ভগবানের নাম করত। আপনি এখন কাজ করা ছেড়ে দিন বাবা, আর কেন? আমাদের যা কিছু আছে তাতেই দিন বেশ স্বচ্ছন্দে রাজার হালে কেটে যাবে।"

একটু থামিয়া রতিনাথ বলিলেন, "সে কথা হয়তো সত্য, কিন্তু কাজ ছাড়লেই তো চলবে না মা, কাজের নেশা ছাড়ব কি করে; ওযে এতটুকু বয়স হতে আমায় পেয়ে বসেছে। ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে বেকার জীবনটা ভারি খাপছাড়া বলে মনে হয়, চিরন্তন নিয়মের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না।

জোর করিয়া মনীষা বলিল, "খাপ খাওয়াতে হবেই, না হলে চলবে না। আপনি কাজে জবাব দিন দেখি, আমি আপনাকে এত কাজ দেব যে আপনি নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাবেন না, অথচ সেগুলো ঠিক সত্যি কাজই হবে।"

মাথাটা একদিকে হেলাইয়া রতিনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ তা হতে পারে কিন্তু একটা কথা কি জানো মা, তুমি যে কাজ দেবে তাতে আমি কতখানি তৃপ্তি পাব? আচ্ছা, আর দুদিন যেতে দাও তারপর দেখি কি করব। শরীর যদি ভাল না বুঝি, অগত্যা কাজে জবাব দিতেই হবে।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আজ তোমার বাবা আমার সঙ্গে দেখা করতে অফিসে গিয়েছিলেন। শুনলুম, কাল তিনি এখানেও এসেছিলেন কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। বলেছেন কাল সন্ধ্যার পর তিনি এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

পিতার কথা শুনিয়া মনীষার প্রফুল্ল মুখখানা শুকাইয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি হঠাৎ কেন আপনার কাছে গিয়েছিলেন?"

রতিনাথ শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "সে অনেক কথা মা, সব বলছি।"

মনীষা বলিল, "তবে একটু পরে বলবেন বাবা, আমি আহ্নিকটা সেরে আসি, সান্ধ্য হয়ে গেছে। আপনি যেন এখন উঠবেন না মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন।"

তাঁহাকে বার বার সতর্ক করিয়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া দিয়া মনীষা বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, বৃদ্ধ রতিনাথ তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

ক্রমশঃ

আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ

শ্রীবিমল মিত্র

আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ (Inter communal marriage) লইয়া চারিদিকে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। সহযোগী পত্রিকার কোনও এক প্রতিনিধি কয়েক জন খ্যাতনামা লোকের নিকট হইতে যে মতাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহা আমরা এখানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এইরূপ বিবাহের ঘোর বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে কোনও বিরুদ্ধ-মত দেওয়া দূরে থাক—তিনি এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিতেই রাজী হন্ নাই।

শ্রীমতী কামিনী রায়—

কামিনী রায়ের মতে আন্তর্সাম্প্রদায়িক এবং পরস্পর বর্ণজাতের মধ্যে বিবাহ দুই-ই প্রচলন হওয়া আবশ্যক। তিনি আশা করেন এটি প্রচলিত হইলে, ভারতের জাতিত্বের বৃদ্ধি হইবে এবং তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ় হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহার মতে এই আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের প্রচলন করিতে হইলে, পূর্ব্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত; প্রত্যেক বিবাহেই বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যদি দম্পতি-যুগলকে সমান ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং যদি জীবন-সম্বন্ধে তাহাদের মত সমভাবাপন্ন হয়—তাহা হইলে এইরূপ বিবাহে বিপদের সম্ভাবনা কম। অবশ্য, তিনি বলেন, এইরূপ বিবাহ "সিভিল-ম্যারেজ" পদবাচ্য হইবে।

অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র—

অধ্যক্ষ বলেন যে একজন ব্রাহ্ম হিসাবে তিনি সম্প্রদায় অথবা বর্ণজাতের পার্থক্য মানেন না, তাঁহার এই মত যে যাহাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ অসন্তোষের সৃষ্টি না হয় এই জন্য পাত্র এবং পাত্রী উভয়কেই ভাল করিয়া বাছাই করা উচিত।

ডাঃ এ, সুরবার্দ্দি এম্-এল্-এ—

ডাঃ বলেন :—আমি এই কঠিন সমস্যায় কোনও রূপ নির্দ্দিষ্ট মত দিতে পারি না। এ সম্বন্ধে আমার যুবক বয়সের মত হইতে এখনকার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যখন Legislative Assemblyতে সার হরি সিং গৌরের Special marriage Amendment Bill লইয়া আলোচনা হয় তখন এই সম্বন্ধে আমাকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মত জানাইতে হয়; আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ কেন প্রচলন হওয়া উচিত নহে, তাহার আইন সঙ্গত কারণ সার বি, এল মিত্র ও রাজা বাহাদুর জি, কৃষ্ণমাচারিয়ার সুন্দর বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। গোঁড়া মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দু সর্ব্বদা এক্ট এর বিরুদ্ধে এত ভীষণভাবে দাঁড়াইয়াছে—ইহার উপর যাহা তাহাদের ব্যক্তিগত ও ধর্ম্মগত আইনকে আঘাত করিতে আসে, তাহা তাহারা কখনই সহ্য করিবে না। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রেম ও ভালবাসা এই ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থাকে অমান্য করিতে চায় সে রূপ অবস্থায় আইনসঙ্গত পন্থা এবং অন্যান্য অনেক পন্থা মুক্ত আছে।

কুমার শিব শেখরেশ্বর রায়—

কুমার আন্তর্সাম্প্রদায়িক ও পরস্পর বর্ণজাতের মধ্যে বিবাহ—এই দু'য়েরই ঘোরতর বিরুদ্ধে। আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ হিন্দুসমাজের গঠন ধ্বংস করিবে—ইহাই তাঁহার মত। কিন্তু তিনি বলেন, হিন্দুসমাজের সামাজিক ক্রম বিবর্ত্তনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ-প্রথা পরে দরকার হইতে পারে।

মিসেস্ আয়েষা আহ্‌মেদ

তিনি বলেন :—ভারতবর্ষে বহু জাতি ও সভ্যতার সংমিশ্রণ সাধিত হইয়াছে। মানব-বিজ্ঞানে বলে বাঙালীরা—হিন্দু ও মুসলমান—সমস্তই এক। আমরা স্বীকার করি কিংবা না করি, সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ নিয়তই

হইতেছে। চলতি ঘটনার উপর সোজাসুজি নজর দিলে আমরা বুঝিতে পারিব—আমরা চাই অথবা না-ই চাই —আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ-প্রথা আসিবেই। সেই শুভ দিন আরও আগাইয়া লইয়া আসাই মঙ্গল। এই মঙ্গল বিধান করিতে হইলে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বালক-বালিকার একত্র-শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে সকল সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বীরাই পাশাপাশি বসিয়া শিক্ষা পাইবে; সকলের স্বভাবের উগ্রতা ও তীক্ষ্ণতা চলিয়া যাইবে; যৌন-সম্বন্ধের অতি-বোধ ক্রমে লুপ্ত হইবে এবং বাকীটুকু করিবে প্রণয়। আমার মনে হয়, আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের পরাজিত করিতে হইলে, এই উপায়ই বিজ্ঞ-অনোচিত।

আমি ভবিষ্যতে সমস্ত জাতি ও সভ্যতার সমাবেশে, পারস্পারিক ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে এক উন্নত ভারতবর্ষ দেখিতে চাই। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারত-বর্ষেই এইরূপ পরীক্ষায় সুফল প্রদান করিবে। আমি এই অন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের স্বপক্ষে, এবং ইহা প্রচলন করিতে হইলে, প্রণয় ও পারস্পারিক সম্মানের উপরই নির্ভর করিতে হইবে—পূর্বাহ্ণে ঘটকালি-রূপ ব্যবস্থার দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে না। শেষে সুফল হইবে এই যে—আজকাল আমাদের দেশের সর্বত্র যে সাম্প্রদায়িক অ-মিলন দেখা যাইতেছে, তাহা দূরীভূত হইয়া যাইবে। এইরূপ বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হইলে— উৎকৃষ্টতর জাতি ভারতে সৃষ্ট হইবে এবং তাহা হইতেই ভারতবর্ষে একতা আসিবে।

মিসেস্ এন, সি, সেন—

ইনি বলেন, আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে ইহা তাহার মিলন-সেতু স্বরূপ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও মনে করেন যে, ইহা আইনে লেখা থাকা উচিত এই ভাবে বিবাহিত দম্পতি-যুগলের প্রত্যেকে তাহাদের পূর্ব্ব-ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত—

ইনি বলেন:—আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—দেশে যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দেখা দিয়াছে আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের দ্বারা ইহার সমাধান হইবে, কি না। আমার মনে হয় না যে যদি এইরূপ বিবাহে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং ইহা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে উক্ত সমস্যার সমাধান হইবে; বর্ত্তমানে যে আইন আছে তাহা এইরূপ বিবাহে কিছু মাত্র বাধা দেয় না—এবং ইহার সন্তান সন্ততিগণকেও সমধর্ম্মাবলম্বী দম্পতি-যুগলের সন্তানদিগের মতই আইন-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা হয়।

বর্ত্তমানেই ইণ্ডিয়ান সিভিল ম্যারেজ য়্যাক্ট আইন পুস্তকে লেখা আছে এবং বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য কোনওরূপ আন্দোলনের আবশ্যক নাই।

অনেক রকম সামাজিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কারণ দেখিয়া আমি এইরূপ বিবাহের বহুল প্রচলন পছন্দ করি না। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণজাতের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের কথার সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ইহাতে শাস্ত্রের কোনও নিষেধ নাই। পুরাকালে এইরূপ বিবাহের প্রচলন ছিল। স্মৃতি ও নিবন্ধ এই বিবাহ স্বীকার করে এবং এই বিবাহে দ্বারা উৎপাদিত সন্তান-সন্ততিগণের ভিন্ন হইবার সময় প্রত্যেকের অংশ ভাগ করিবার বিশেষ আইন-পদ্ধতিও জানাইয়া দিয়াছে।

এখন যে বিবাহ-প্রচলিত আছে, ইহা আমার মতে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; হিন্দুজাতি যখন বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, তখন যেরূপ বিবাহপ্রথা ছিল, সেই প্রথা আজকাল প্রচলিত করিতে হইবে।

অধ্যাপক আবদুল কাদির—

ইস্লামিয়া কলেজের অধ্যাপক আবদুল কাদির বলেন:—এই আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের প্রচলন দুইটি প্রধান সমস্যার সহিত যুক্ত আছে। আমাদের জীবনে ধর্ম্ম অনেক প্রকার সুখ-সুবিধা আনয়ন করে। স্বামী ও স্ত্রী যদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হয়—তাহা হইলে সংসারে সুখ আসিতে পারে না; কিন্তু শিক্ষা আমাদের পথের সমস্ত বাধাকে অনেক কমাইয়া দিতে পারে। ইস্লাম ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যদি কোনও দম্পতিযুগল সুস্পষ্ট ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করে—তাহাদের জীবনে অসন্তোষ সৃষ্টি হইবার আশা কম। এই কারণেই ইস্লাম-বাহিরে

পুষ্পপাত্র ফটো-প্রতিযোগিতা—শ্রাবণ

প্রথম পুরস্কার

টি, এন, ঘোষ

কলিকাতা

প্রথম পুরস্কার "প্রমোদ বিহার" —১০৲

দ্বিতীয় পুরস্কার

এ, টি, মজুমদার

কলিকাতা

২য় পুরস্কার "দিগ্ দিগন্তে" —৫৲

মুসলমানের সহিত ইহুদিদিগের এবং পরে মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের বিবাহে বাধা নাই।

কিন্তু ইহাতে একটি প্রধান সামাজিক অসুবিধা আছে; মুসলমান নারীর যে অধিকার আছে, অন্য ধর্মাবলম্বী নারীর হয়ত সে অধিকার নাই, যথা—বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌতুক উত্তরাধিকারসূত্র ইত্যাদি! এখন মুসলমান নারী অ-মুসলমান কাহাকেও বিবাহ করিলে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। অপর পক্ষে অ-মুসলমান কোনও নারী কোনও মুসলমানকে বিবাহ করিলে, অনেক সুবিধার অধিকারী হইবে—যথা উত্তরাধিকার-সূত্র ছাড়াও যৌতুক সমেত যখন ইচ্ছা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে।

সুতরাং যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক নিয়ম ঐরূপ ভাবে তৈয়ার করা যায়—তাহা হইলে, আমি বিশ্বাস করি, আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ অতি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রেভারেণ্ড্ বি, এ, নাগ—

ইনি বলেন:—স্কুল-কলেজে বালক-বালিকার একত্র শিক্ষাদেওয়ার রীতি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে যুবক-যুবতী একত্র কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রচলিত হইবে ;...ইহাতে বাধা প্রদান করিতে গেলে ইহার ভিত্তি আরও দৃঢ় হইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এইরূপ বিবাহ চলিতে দেওয়া উচিত কিনা—তাহা হইলে আমি ইহাই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে সামাজিক ও ব্যক্তিগত বহু বিপদের সম্ভাবনা আছে। যদি দেখা যায়, যুবক অথবা যুবতী পরস্পর পরস্পরের ধর্ম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয় তাহারা অত্যন্ত ধর্মভীরু, নয় তাহারা ধর্ম লইয়া বেশী কিছু চিন্তা করে না। যদি শেষেরটাই সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানগণ কোনও ধর্মাবলম্বীই হইবে না। ইহা সমাজের এবং দেশের পক্ষে বিপদজনক। আর যদি প্রথমটিই সত্য হয় (অর্থাৎ যদি তাহারা উভয়েই অত্যন্ত ধর্মভীরু হয়) তাহা হইলে কথা উঠিবে—কোন ধর্মমতে তাহাদের শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হইবে—এবং এই লইয়া স্বামী ও স্ত্রী-মধ্যে হয়ত বিবাদ উঠিয়া তাহাদের সংসারিক জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট করিতে পারে—এবং তাহাদের শিশুসন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে পারে। ইহা সকলেই জানেন যে রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী নারী অ-রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী পুরুষকে বিবাহ করিয়া যদি শপথ করে যে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণকে রোমান ক্যাথলিক মতে শিক্ষা দিবে—তাহা হইলে সেই নারী রোমান ক্যাথলিক চার্চের নিকট হইতে কিছু সুবিধা (dispensation) প্রাপ্ত হয়—কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা কখনও সুফলপ্রসূ হয় নাই। উপরন্তু এমন অনেক যুবক আছে যাহাদের ধর্মমত বহু-বিবাহ করিবার অনুমতি দেয়, এইরূপ কোনও যুবকের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শুধু নিজের নহে—সমাজেরও বিপদ ডাকিয়া আনা হয়।

শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন—

তিনি বলেন:—আমি এইরূপ বিবাহের ঘোরতর বিরুদ্ধে। প্রধানতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এত তফাৎ যে বিবাহিত জীবনে কখনও সুখ আসিতে পারে না। আমি সত্যই ইহা বিশ্বাস করি যে বর্তমান অবস্থায় এইরূপ বিবাহ হিন্দুসমাজের বহুল পরিমাণে ক্ষতি করিবে। কিন্তু আমি বিভিন্ন বর্ণ-জাতের মধ্যে পরস্পর বিবাহ অনুমোদন করি—কারণ ইহা ভবিষ্যতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বর্ণজাত ও শ্রেণীতে প্রাণ-সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবে।

বিজয়া

শ্রীললিতমোহন কুণ্ডু

গল্প

সেদিনকার বাহিরের ঝড় অপেক্ষা বড় ঝড় বহিয়া গিয়াছিল উমাচরণের মনের মধ্যে, যখন সে প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই শুনিতে পাইল যে লতিকাকে পাওয়া যাইতেছে না। ফুটন্ত যৌবনা লতিকা যে তাহার বড় আদরের কন্যা; তাহাকে সকাল হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, কোথায় গেল সে? বৃদ্ধ যেন পাগলের মত হইলেন। এই যে তাহাকে এত স্নেহ, ভালবাসা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে সে, তাহাকে না পাইলে সে বাঁচিবে কি করিয়া, তাহার যে এক পা চলিবার উপায় নাই। তিনি আজ হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন যে কখন তাঁহারই অজ্ঞাতসারে তাঁহার সমস্ত ভার পড়িয়াছে লতিকার উপর। লতিকাই যে বৃদ্ধের সমস্ত কাজ করিত, সে যে মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতে পারিত। তাঁহার এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে লতি না থাকিলে, তাঁহার এক পা নড়িবার সাধ্য নাই, সেই ভয়েই না উমাচরণ এখনও লতিকার বিবাহ দেয় নাই? কিন্তু আজ? লতি যদি আর না ফেরে? বৃদ্ধ আর ভাবিতে পারিলেন না, মাথাটা যেন বন বন করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

বাহিরে প্রবল ঝড়। আকাশ-বাতাস পাগল করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, এরূপ তাণ্ডবনৃত্য যেন আর কখনও হয় নাই, কিন্তু উমাচরণের মনে তখন যে ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা ইহা অপেক্ষা ঢের প্রবল, যেন কখন থামিবে না। উমাচরণের তখন খেয়াল নাই যে, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে—মুখে কথা নাই, প্রশ্ন নাই, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর নাই। তাঁহার মন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে চায়, "ওরে ফিরে আয়, লতি ফিরে আয়" - কিন্তু মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হয় না।

"বাবা!"

শশাঙ্ক তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র, উমাচরণ চমকিয়া উঠিলেন। "কে কে এলি রে? লতি আয় আয় মা, ছুটে আয়, আমি যে আর পারি না।"

শশাঙ্ক ডাকিল, "বাবা"

"কে শশাঙ্ক?" উমাচরণ শশাঙ্ককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। শশাঙ্ক রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাবা! দিদি কোথা গেল বাবা?"

"বল্, বল্ শশাঙ্ক! তোর দিদি কোথা গেল। ওরে খুঁজে নিয়ে আয়। আর যে পারি না শশাঙ্ক?"

শশাঙ্ক পিতার এইরূপ ব্যস্ততায় অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। কোথা গেল তার দিদি? এই ত কাল রাত্রে দিদির কাছে শুইয়াছিল সে? রাত্রে সে স্বপন দেখিয়াছিল, তাহার দিদিকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, সে চীৎকার করিতে চাহিল, কিন্তু একটু শব্দ তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া বাহিরে আসিল না।

শশাঙ্ক চমকিয়া উঠিল, দিদিকে কেহ চুরি করে নাই ত?

শশাঙ্ক চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবা!"

শশাঙ্ক পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"শশাঙ্ক কাঁদিসনি, তুই যদি এরকম ক'রে কাঁদিস, ওরে আমি পাগল হ'য়ে যাব।"

"বাবা দিদিকে বোধ হয়, ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গেছে, আমি চীৎকার ক'রে তোমাদের ডাকলুম, তারা আমার গলা টিপে ধ'রলে বাবা, আর কথা কইতে পারলুম না।"

"কি বললি শশাঙ্ক! লতি মা আমার!"

বৃদ্ধ উমাচরণ মূর্চ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন গভর্ণমেণ্ট অফিসার, প্রথম বয়সে তিনি মন্দ রোজগার করেন নাই। লোকে বলিত, তিনি নাকি বেশ দুপয়সা জমাইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে রোজগার করিয়াছিলেন, সে পরিমাণে

জমাইতে পারেন নাই। তাহা কিন্তু কেহই জানিত না। তিনি ছিলেন অমায়িক, দয়ালু, দানী। নিজে স্বচ্ছলভাবে বাস করিয়া, কন্যাকে শিক্ষা দিয়া, দান করিয়া, বিশেষ কিছু রাখিতে পারেন নাই। তিনি দান করিতেন, স্ত্রীর হাত দিয়া দরিদ্র গৃহস্থদিগকে, যাহাদের দুঃখের দায়ে পথে বাহির হইবার উপায় নাই, পরের নিকট হাত পাতিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথা অন্যলোকে জানিতেই পারিত না। বৃদ্ধ বয়সে তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া পেন্সন লইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি যাহা পেন্সন পাইতেন, তাহাতেই তাঁহাদের বেশ চলিয়া যাইত, তাহার কারণ তাঁর বাটীতে লোক চার পাঁচটী।

লতিকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তাই তিনি তাহাকে যথাক্রমে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। পাছে লতিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়, সেই জন্য তিনি স্ত্রীর বারবার কান্নাকাটী এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে চান নাই। তিনি বলিতেন, দেখো সরো, মেয়ের বিয়ে দিলেই সে আমার কাছ থেকে চ'লে যাবে, তাহলে আমি থাকব কি ক'রে? আমি জানি আজ না হয় কাল তার বিয়ে দিতেই হবে, তবুও তাকে শিক্ষা দিই বেশ ভাল ক'রে তারপর তার উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দোব। আর একটা লাভ যে কটা দিন আমার কাছে থাকে।"

বৃদ্ধের মনে একটী বড় আশা ছিল, তিনি একটী উপযুক্ত পাত্র মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে হরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অরুণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অরুণ বাইশ বৎসর বয়স্ক স্বাধীনচেতা যুবক। তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়িতেছিল। অরুণের একটা মস্ত গুণ ছিল এই যে, সে যাহা ভাল বুঝিত তাহা করিত, কোন বাধা-বিঘ্ন সে মানিত না। কাহারও দোষ দেখিলে সে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিত না। সে নিজে ছিল বিশেষ নীতিবাদী।

তাহাদের বাটী ছিল উমাচরণের বাটীর কাছেই এবং তাহাদিগের পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল। অরুণ তাহাদের বাটীতে ঘন ঘন যাতায়াত করিত এবং দুই গৃহকর্ত্তার মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল। উমাচরণের মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে, অরুণ তাহার সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যাকে অপছন্দ করিবে না। আর তিনি লতিকার কথাবার্ত্তার ধরণে মনে মনে বুঝিয়াছিলেন যে লতিকা অরুণকে ভালবাসে। কিন্তু এ কথা স্ত্রীর নিকটে পর্য্যন্ত বলেন নাই। কিন্তু তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই যে অরুণও লতিকাকে ভালবাসিতে পারে। অরুণ ছুটীতে বাটী আসিলেই তাহাদিগের নিকট আসিত। অরুণ সর্ব্বসমক্ষে লতিকার সহিত এমন মেলামিশা করিত যে, কেহ তাহার সরলতার উপর সন্দেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু লতিকা তাহার পিতার স্নেহের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। উমাচরণ এই সব বুঝিয়াই স্থির করিয়াছিলেন যে, ইহাদের বিবাহ দিবেন। উমাচরণ একদিন কথায় কথায় তাঁহার উদ্দেশ্য হরিশের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে হরিশবাবু বলিয়াছিলেন, "অমন মা লক্ষ্মীকে আমার ঘরে আনার চেয়ে সুখের বিষয় আর কিছু নেই, তবে এখন ত অরুণের বিয়ে দোব না ভাই, আগে বি, এ পাশটা করুক তারপর বিয়ে দোব।"

তাহার পরই কথাটা একপ্রকার পাকা-পাকি হইয়া যায়, কিন্তু কথাটা আর কেহই জানিল না। হরিশ বলিয়াছিল, "দেখো ভাই, এখন কথাটা প্রকাশ হ'য়ে কাজ নেই—অরুণের কানে গেলে ব্যাটার মাথা বিগড়ে যাবে, পাশ করতে পারবে না।" কাজেই ইহা অপ্রকাশিত রহিল। এইমাত্র স্থির হইল যে অরুণের পরীক্ষা শেষ হইলেই তাহাদের বিবাহ হইবে।

ক্রমে ক্রমে আটদিন কাটিয়া গেল। লতিকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, বৃদ্ধ উমাচরণ অনুসন্ধানের ত্রুটী করেন নাই কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। বড় আশা ছিল তিনি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন—কিন্তু যখন দিনের পর দিন তিনি নিষ্ফলতার খবর ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না, তখন মনকে ধরিয়া রাখিবার আর কিছুই রহিল না। কত আশা করিয়াই না কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন! অরুণের ন্যায় জামাতা লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন সারা সংসার কালো হইয়া গেল। এই

যে জলের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, তাহাকে আর সে আটকাইবে কি দিয়া। কন্যাকে ফিরাইয়া না পাওয়ার এই যে দুঃখ তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা আর যাহারই থাকুক না কেন, বৃদ্ধ উমাচরণের ত নাই। বৃদ্ধ পাগলের মত হইলেন—আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত চিন্তা, চিন্তা, চিন্তা। কি জানি লতি এখন কি ভাবে আছে, কিরূপ কষ্টভোগ করিতেছে সে, সে যে, তাহার পিতাকে ছাড়িয়া একদণ্ডও থাকিতে পারিত না। আর এখন? ওরে লতি। তুই কি তোর বুড়ো বাপকে ভুলে গেলি মা? ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয়।

বৃদ্ধের মনে নানাপ্রকার এলোমেলো চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, লতিকা তাহার নিকট আসিয়াছে—উমাচরণ তাহাকে ধরিতে গেলেন, লতিকা অমনি অদৃশ্য হইল। বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিলেন। এইরূপে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। তাঁহার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এইরূপভাবে ইনি আর কতদিন বাঁচিবেন।

আরও দু একদিন গড়াইয়া গেল। সন্ধ্যা হয় হয়। উমাচরণ তাঁহার রোয়াকের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। শশাঙ্ক বাহিরে কোথায় খেলা করিতে গিয়াছে। গৃহিণী সরোজিনী তখন রাত্রের আহারের উদ্যোগে ব্যস্ত।

বৃদ্ধ ভাবিতেছিলেন, "হে কাঙ্গালের ঠাকুর। তুমি এই কাঙ্গালের ধনকে ফিরিয়ে এনে দাও। কোনদিন তোমায় অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু আর যে বিশ্বাস রাখতে পারি না ঠাকুর। লতি ত ফিরে এল না। তবে লতি কি বেঁচে নেই? ভগবান……"

"বাবা"!

উমাচরণ চমকিয়া উঠিলেন। কে কে এলিরে? লতি ফিরে এসেছিস মা? দ্যাখ দ্যাখ তোর বুড়ো বাপের অবস্থা দ্যাখ। লতি মা আমার?

"বাবা"।

লতিকা ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উমাচরণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি লতিকাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলেন। দুজনারই চোখে জল, মুখে কথা নাই। কথা কহিয়া এ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই। লতির ফিরিয়া আসাতেই আনন্দ। এইরূপে কতক্ষণ কাটিল ঠিক নাই। অবশেষে উমাচরণ চক্ষু মুছিয়া ডাকিলেন "লতি"?

"কি বাবা"?

"কোথা ছিলিমা এতদিন? তোর জন্যে যে বড় কষ্ট মা"

লতি বলিতে পারিল না। কেবল তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন। লতিকা বলিল, "এতে আমার কোন দোষ নেই। সে দিন রাত্রে প্রদোষ আর দু একটা লোক আমার ঘর থেকে চুরি ক'রে নিয়ে যায়।"

"প্রদোষ চুরি করেছিল? কেন?"

"হ্যাঁ বাবা প্রদোষ চুরি করেছিল। তোমার কাছে আজ কোন কথা গোপন ক'রব না বাবা, সমস্ত অকপটে ব'লব। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে। প্রদোষ ইদানিং কিরকম ঘন ঘন আমাদের বাটী আস্‌ত। তুমি যেন মনে কোরনা সে তোমাদের জন্য আসত—সে আসত আমার জন্যে। আমি জানতুম, তার চরিত্র খারাপ তাই তার কাছে বড় একটা ঘেঁসতুম না, কিন্তু সে আমার সঙ্গে প্রায়ই নির্জ্জনে কথা কইবার চেষ্টা কোরত। অরুণদা আমাদের বাড়ী আসত ব'লে সে তাকে বড় হিংসা কোরত। অনেকদিন তাকে এড়িয়ে চলার পর একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ একলা তার সামনে প'ড়ে যাই, সে আমার পথ আগলে আমায় কাছে ডাকলে, তার কাছে যেতেই সে আমার হাতটা ধ'রে ফেল্লে। আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিতেই সে বল্লে, "রাগ ক'রনা লতি, আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি আমায় বিয়ে ক'রবে। কি না বল?" আমি সে কথা অস্বীকার করায় সে অরুণদার নাম নিয়ে অনেক কটু কথা ব'লে শাসিয়ে যায়। আমিও তাকে অনেক কটুকথা ব'লে বিদায় দিই।"

"কিন্তু এসব কথা আমায় আগে কেন বলিস্‌নি মা? তাহলে হয়ত সে তোকে নিয়ে যেতে পারত না।"

"আমি জানতুম সে ছোট, কিন্তু সে যে এত ছোট তাত জানতুম না বাবা। আমি মনে করেছিলুম সে আমায় ভয় দেখাচ্ছে মাত্র।"

"আচ্ছা এর প্রতিকার আমি করব। তারপর কি হ'ল ?"

"তারপর অনেকদূরে এক যায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে আমায় বিয়ে করবার জন্যে পীড়াপীড়ি ক'রে, আমায় মেরে ফেলবার ভয় পর্য্যন্ত দেখায়।"

"কিন্তু সে ত এখানে ছিল, এখান থেকে ত যায়নি ?"

"হ্যাঁ, সে সারাদিন এখানে থাকত, পাছে কেউ সন্দেহ ক'রে। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যায় সেখানে যেত।"

"ও বুঝেছি। আচ্ছা তারপর।"

"তারপর তার বামুনকে আমার গয়না দিয়ে হাত করলুম। সে আমায় আসবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। বাবা ?"

"কেন মা ?"

"আমার কি হবে ?"

"ভয় কি মা। আমি কখন কারও অনিষ্ট করি নি। বিনাদোষে ভগবান আমায় শাস্তি দেবে না। ওরে ভগবানই ত তোকে ফিরিয়ে এনে দিলে। আর সমাজ যদি তোকে থাকতে না দেয়, তাহলে স্থির জানিস মা আমারও স্থান এ সমাজে হবে না। আমি তোকে ছেড়ে সমাজকে নিয়ে ত থাকতে পারব না মা। আচ্ছা তুই বিশ্রাম করগে যা।"

লতিকা তাহার মাতার নিকট চলিয়া গেল, আর উমাচরণ ভাবিতে লাগিল তাহার ভবিষ্যতের কথা। যদি সমাজ একথা অস্বীকার করে, যদি কন্যাকে গৃহে স্থান দেওয়ায় আপত্তি করে। তাহা হইলে তাহার কি হইবে। পুত্রের উপনয়ন আছে, লতিকার বিবাহ আছে। আর বাড়ুয্যে একজন সমাজের মাথা সেই কি সকলের কথা ঠেলিয়া তাহার কন্যাকে পুত্রবধূ করিতে রাজী হইবে? তিনি যদি লতিকাকে লইতে না চান তাহা হইলে তাহাকে এতদিন ধরিয়া রাখিবার সার্থকতা কোথায়? বৃদ্ধের চিন্তা করিবার শক্তি লোপ হইল, এমন সময় স্ত্রীর কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল, তাহার স্ত্রী তখন বলিতেছিল, "হাঁ গা এত ক'রে ডাকচি শুনতে পাচ্ছ না? ঘুমুচ্ছ নাকি? খাবার যে জুড়িয়ে গেল।"

পরদিন লতিকা তাহার ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিল, সে যে শশাঙ্ককে দিয়া অরুণকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে, সে আসিবে কিনা, যদি না আসে তাহা হইলে তাহার কি হইবে? না না আসিবে বৈকি, তাহা না হইলে প্রদোষকে শাস্তি দিবার কি হইবে? সে যে একান্তে অরুণের উপর নির্ভর করিয়া আছে।

অরুণ কাল বৈকালে কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, আসিয়াই সে উমাচরণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে কিন্তু লতিকার সহিত দেখা হয় নাই। তাই শশাঙ্ককে লতি পাঠাইয়াছিল অরুণকে ডাকিয়া আনিতে। তাহার বিশ্বাস অরুণ্ দা নিশ্চয়ই আসিবে ইহা সহ্য করিবে না। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সে মাত্র অরুণের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিল, কি সুন্দর, উন্নত গঠন। ..

"কি লতিকা ব্যাপার কি বলত?" হঠাৎ অরুণ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল

"অরুণ্ দা" লতিকা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"কি বল, কাঁদ্‌ছ কেন?"

"বল অরুণ্ দা তুমি আমায় অবিশ্বাস কর না?"

"এ কথার অর্থ কি লতি?"

"তবে শোন, রাগ কোরো না, তুমি আমার ব্যাপার সব শুনেছ ত? আমি যে নির্দ্দোষ তার ত কোন প্রমাণ নেই অরুণ্ দা, কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করতে পারবে?"

"এ কথা বলবার কোন প্রয়োজন ছিল না লতি, তোমার শিক্ষা আমার হাতেই সুরু, আমি ত জানি লতি তুমি কি, তোমাকে আমি যেমন তেমন আর কেউ চেনে না ভাই, তাই সকলেই যদি অবিশ্বাস করে আমি ক'রব না, আমারই হাতে গড়া লতি ত এত নীচ হতে পারে না। আর একটা কথা আজ তোমায় বলি যা আমি ব'লব না ঠিক করেছিলুম, তুমি লজ্জা পেও না—আমি তোমায় ভালবাসি।"

সঙ্গে সঙ্গে লতিকার গণ্ডদ্বয় লাল হইয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে মাথা নীচু করিল।

অরুণ বলিতে লাগিল, "এ কথা ব'লে যদি কোন দোষ ক'রে থাকি লতি তাহলে তুমি কিছু মনে কোর না। আর এই জন্যই তোমায় আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।"

অরুণ সহসা লতিকার হাত ধরিয়া ফেলিল, "বল লতি তুমি আমার উপর রাগ করনি ?"

লতিকার সমস্ত শরীরের ভিতর একটি বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, প্রত্যেক শিরা-উপশিরার মধ্যে জোর রক্ত চলাচল করিতে লাগিল। অরুণ কতবার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে তাহার হাত ধরিয়াছে। কই লতি ত কখন এমন ভাবে অনুভব করে নাই তাহাতে তাহার এত আনন্দ হয় কেন ? লতিকা হাত ছাড়াইবার কোন চেষ্টা করিল না, বলিল, না অরুণ্‌দা আমি রাগ করিনি। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস, তাই ত তোমায় ডাকতে সাহস করিচি, তাই মনে হয় অরুণদা কপালে এ সইবে কি না। আমার মত তুচ্ছ একটা মেয়ে এ-বে আশা ক'রতে পারে না। একটা কথা শুনবে অরুণদা আমি তোমায়......"

"বল্, বল্ লতি আর দেরী করিস্ না তাহ'লে দম বন্ধ হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ"

"আচ্ছা তবে আয় লতি আজ আমাদের ভালবাসার প্রথম নিদর্শন রেখে দিই—"

এই প্রথম অরুণ "তুই" সম্বোধন করিল। লতিকা একটু মুখ তুলিতেই অরুণ লতিকাকে বুকে টানিয়া লইয়া গভীর ভাবে চুম্বন করিল।

লতিকা বলিল, "আর আমার কোন ভয় নেই অরুণ্‌দা, আচ্ছা অরুণদা যদি কেউ দেখতে পেত আমায় কি মনে কোরত বলত ? এই এতদিন বাইরে কাটিয়ে এলুম আবার আজকে এই..."

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই লতিকা একটু হাসিল।

অরুণ বলিল, "হ'ত আবার কি আমাদের বিয়েটা টপ্ ক'রে হ'য়ে যেত। যাক সে কথা, আমায় ডেকেছিলে কেন ?"

"বোধ হয় এই জন্যে।"

"ধ্যেৎ—ঠিক ক'রে বল্ কেন ডেকেছিলি।"

লতিকা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল, ক্রোধে তাহার শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল ; বলিল, "আমায় যে এরকম ক'রে অপমান ক'রলে অরুণদা তার শাস্তি দেবে না ? তার শাস্তি না হ'লে আমি যে স্থির হ'তে পাচ্ছি না।"

"তুই নিশ্চিন্ত হ লতি, তার পাপের শাস্তি ভগবান দেবেন। আর তাতে তোর যদি বিশ্বাস না হয়, তাহ'লে বিশ্বাস কর—এই লোহার মত শক্ত হাত দুটোকে যে কখন কারুকে ভয় করেনি।"

কিরূপভাবে অরুণ যে প্রদোষকে শাস্তি দিয়াছিল সে খপর লতিকা পাইয়াছিল। অরুণ কাহারও কাছে নালিস করে নাই, কাহাকেও সাহায্যের জন্য ডাকে নাই, নিজে একা সন্ধ্যার সময় সে প্রদোষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া, আর যতক্ষণ না প্রদোষ চৈতন্য হারাইয়াছিল, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়ে নাই। তাহা না হইলে তাহাকে যে লতিকার নিকট অবিশ্বাসী হইতে হইবে। সে যে তাহাকে অনেক বিশ্বাস করিয়াছে—সে যে লতিকাকে কথা দিয়াছিল ; প্রদোষকে স্বহস্তে শাস্তি দিবে বলিয়া।

লতিকা এই সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়াছিল। সে যে অরুণকে ভালবাসিয়াছে, সে ত তাহার মান রাখিয়াছে তবে আর তাহার ভাবিবার কি আছে ? সে যে তাহার উপর নির্ভর করিয়াছিল এই নির্ভরতার মান তো সে সম্পূর্ণভাবেই রাখিয়াছে। কিন্তু......

এই কিন্তু লইয়াই সে বড় বিপদে পড়িয়াছিল। সে জানিত, তাহাদের সমাজ বড় কড়া। সমাজ যদি তাহাকে শাস্তি দিতে চায়, যদি বলে তাহাকে ঘরে স্থান দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে তাহার গতি কি হইবে, কোথায় দাঁড়াইবে সে ? কেন সমাজ তাহাকে এত শাস্তি দিবে কেন ? কি দোষ করিয়াছে সে ? সে ত স্বইচ্ছায় গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় নাই। যদি কোন চোর ডাকাত তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকে তবে দুর্ব্বল সে কি করিতে পারে ? যাহার দ্বারা সে এইরূপ অপমানিত, লাঞ্ছিত সমাজ হইতে তাহাকে শাস্তি দিবার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

এতকথা সে ভাবিতে শিখিয়াছিল অরুণের কাছে। এই চিন্তা তাহার আরও প্রবল হইয়াছিল যখন গ্রামের মাতব্বরগণ মধুমণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে পঞ্চায়েৎ বসাইয়া তাহার পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইল। লতিকা এত ছেলেমানুষ নয় যে ইহার অর্থ বুঝিতে পারে নাই। তাই গৃহে বসিয়া ছটফট করিতে লাগিল কি ফল হয় শুনিবার জন্য। সে

অস্থির হইয়া উঠিল, না জানি তাহার পিতাকে কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে; অতগুলি লোকের সম্মুখে তাহার বৃদ্ধ পিতা কি বলিবে। সকলে যদি তাহাকে দোষী বলে তাহা হইলে তাহার পিতা তাহাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবে কি দিয়া, প্রমাণস্বরূপ তাহার হাতে কিছুই ত নাই? সকলেই ত আর তাহার স্নেহময় পিতা নয়, সকলেই ত অরুণদা নয় যে, তাহার কথা তাহারা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইবে। হঠাৎ সে পায়ের শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিল, দেখিল হাসিতে হাসিতে অরুণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র অরুণের হাসি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। লতিকার চক্ষু লাল, কপালে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কেশ দাম। অরুণ প্রশ্ন করিল, "লতি তোর কি হ'য়েছে রে? কোন অসুখ করেনিত? চুপ ক'রে রইলি কেন? কাকাবাবু কোথা? ছি-ছি কাঁদছিস? কি হ'য়েছে বল দিকি?"

"অরুণদা তুমি এখনও শোননি? আজকে আমার পাপের বিচার হবে। তারপর ঠিক হবে আমি এখানে থাকতে পাব কিনা। আচ্ছা অরুণদা?"

"কি?"

"আমাকে তারা থাকতে না দেয়, আমি না হয় চ'লে যাব কিন্তু তুমি বাবাকে দেখবে বল?"

"এসব কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, লতি। তুমিই বা যাবে কেন আর তোমার বাবাকেই বা দেখতে হবে কেন? প্রদোষকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছি. আবার কিসের জন্তে তুমি যে এত উতলা হোয়েচ তা'ত বুঝতে পাচ্ছি না।"

"শোন, আজ মধুমণ্ডলের ওখানে পঞ্চায়েৎ, আর আমিই তার আলোচনার বিষয়।" এই বলিয়া লতিকা কাঁদিয়া ফেলিল। অরুণের এখন অন্তদিকে লক্ষ্য ছিল না। এই এতটুকু দুর্ব্বল সমাজ—যার এতটুকু উপকার করিবার ক্ষমতা নাই, লোকের সর্ব্বনাশ করিবার, জাতি-নাশ করিবার তাহার এত আগ্রহ কেন? কেবল এইটাই কি সমাজের প্রধান কাজ? আর সমাজ বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহারা যে সকল বিষয়ে এক একটি জটায়ু তাহাতে তাহাদের হুঁস নাই।

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চলিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়? মধুমণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে? আচ্ছা যা হয় ব্যবস্থা আমি কোরব। হ্যাঁ তোকে যদি ডাকতে আসে খবরদার তুই যাবিনা," বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

মধুমণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে হারাধন শিরোমণি, উপেন্দ্র তর্কবাগীশ, তর্কচুড়ামণি, শিরোরত্ন, কাব্যতীর্থ, স্তায়কচকচি প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণ থেলো হুকা লইয়া স্ব স্ব পুঁজি হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া লতিকার এইরূপ অপরাধ যে কখনও ক্ষমা করা যাইতে পারে না বার বার তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। আর উমাচরণ সভার একধারে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, যদিও লতিকার নিজের কোন দোষ নাই তথাপি সে কলঙ্কিণী। কাজে কাজেই তাহাকে আর গৃহে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। বৃদ্ধ উমাচরণ অনেক অনুরোধ অনেক কান্নাকাটী করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না! শিরোমণি মহাশয় তাঁহার বৃহৎ সপুষ্প শিখাটি আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "ভাখ উমাচরণ তোমাকে আমরা যথেষ্ট স্নেহ ক'রে থাকি সেই জন্তেই আরও বলছি যে কন্তা তোমার এমন বংশে কালি দেয় তাকে আবার তুমি গৃহে স্থান দেবে কি ক'রে বলত? তাহলে আমাদের এই যে হিন্দুসমাজ এতে ব্যভিচার ঢুকবে। সমাজটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে। সমাজে ও সব স্ত্রীলোকের স্থান হ'তে পারে না।"

"ও সব স্ত্রীলোকের স্থান হ'তে পারে না আর তোমাদের মত পাষণ্ড পুরুষের স্থান হ'তে পারে—না ভট্‌চায্যি?" চমকিয়া উঠিয়া সকলে দেখিল, উগ্রমূর্ত্তি অরুণ চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিতেছে। শিরোমণি রাগে ফুলিতে লাগিলেন। প্রথমে তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না, হাত হইতে কলিকা পড়িয়া গেল। অবশেষে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি আমায় পাষণ্ড! দুপাতা ইংরাজী প'ড়ে তোরা কি মনে করিস? আমি ভণ্ড?"

"নিশ্চয়ই"

"তোমাদের মুখদর্শন কর্ত্তে নাই ভণ্ড তোমরা। পাষণ্ড এমন অভিসম্পাত কোরব জানিস তোর জিহ্বা খ'সে প'ড়ে যাবে। এঁ্যা আমি কিনা··"

"থাম পণ্ডীতজী, অভিসম্পাত দেবার তেজ তোমাদের আর নেই, আমি তোমাদের কাছে মুখ দেখাবার জন্যে বিশেষ লালায়িত নই। কিন্তু কথা এই, তোমাদের মত লোকের সমাজের মাথা হ'য়ে থাকা আর চ'লবে না, হয় তোমরা যাবে, না হয় আমরা যাব। মনে পড়ে না ভট্টচাষ্যি সেদিন রাত্রিবেলা মাতাল অবস্থায় বাড়ীতে এনে দিয়েছিল কে? আমি। সে দিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে কার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে বলত ঠাকুর? তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ তা আমি জানি। আর তা আমি সকলের নিকট প্রচার করব আর তুমি এখন এসেছ আর একজনকার বিচার কোরতে?"

শিরোমণি ভয়ঙ্কর রাগিয়া উঠিলেন। তিনি একটী খড়ম তুলিয়া বলিলেন, "বেরিয়ে যা অর্ব্বাচীন। কে তোকে এখানে আমাদের বিচার কর্ত্তে ডেকেছে ম্লেচ্ছ? এ তোর অনধিকার প্রবেশ। বেরিয়ে যা।"

অরুণ একহাতে খড়মটী ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "বেরিয়ে আমি যাব, কিন্তু ব'লে যাই তোমাদের মত লোকের হাতে একটা মেয়ের জীবন আমি নষ্ট হ'তে দোব না। আপনারা তাকে স্থান না দেন, তার ভয় নেই আমি তাকে বিবাহ কোরব। চাই না সমাজ যেখানকার মাথারা "নর" শব্দের রূপ পর্য্যন্ত ক'রতে জানে না। আসুন কাকা বাবু আপনার কোন ভয় নেই আমরা অন্য যায়গায় গিয়ে বাস ক'রব।"

"অরুণ?"

"বাবা?"

"একি ছেলেমানুষী কোরছ, অরুণ?"

"কেন বাবা?"

"ত্যাখ বাস্তবিকই লতিকা কলঙ্কিনী, সে ওর ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক। কাজেই তার শাস্তি হওয়া দরকার, তা যদি না হ'ত অরুণ আমিই তাহ'লে তোমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করতুম। কিন্তু এখন এ মতলব পরিত্যাগ কর। তুমি একজন শিক্ষিত তোমার বিবেচনা করা উচিৎ।"

"আমি অনেক ভেবেছি বাবা, তা হ'তে পারে না। যদি এর কোন সামাজিক কলঙ্ক না থাকত তাহ'লে হয়ত আমি বিবাহ নাও ক'রতে পারতুম কারণ অন্যে একে বিবাহ কোরত। এ আপনাদের কাছে কলঙ্কিনী কিন্তু আমি লতিকে খুব জানি সে ঠাকুরের ফুলটীর মত পবিত্র। কিন্তু যে সমাজে যথার্থ পণ্ডিত নেই, যেখানে নির্দ্দোষ স্ত্রিলোকের শাস্তি হয়, যে সমাজ পুরুষের সকল প্রকার ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয়, তাকে শাস্তি দেওয়া দূরে থাক্ নিজেরাও সেই ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, আর যে কোন স্ত্রীলোকের সময়ই তারা পুঁথির পাহাড় নিয়ে বসে—না না বাবা আমি সে সমাজে থাকতে পারব না। অন্যায়ের পোষকতা আমি কোরতে পারব না। আসুন কাকা বাবু, আমরা এখানে আর থাকতে চাই না কোথাও দূরদেশে চলে যাই যেখানে এই সব শিরোমণি নেই, তর্কচূড়ামণি নেই, সেখানেই আমরা সুখে বাস করব। বাবা আমায় বিদায় দিন।"

বৃদ্ধ উমাচরণ দাঁড়াইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শেফালিকা

গল্প

শ্রীপুলিনবিহারী পোদ্দার বি, এল

সেবার জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতায় খুব গরম পড়িয়াছিল, তাই ভোলানাথ বাবু দুই মাসের ছুটী লইয়া সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গের পৈতৃক বাটীতে চলিয়া আসিলেন। কলিকাতার প্রাচীর-ঘেরা ক্ষুদ্র বাটীর গণ্ডী এড়াইয়া যখন তাহারা পল্লীরাণীর মুক্ত আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন সকলেই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। পাথরে বাঁধান এক ঘেয়ে রাস্তায় চ'লে চ'লে আর পোড়া মাটীর বড় বড় ইমারত দেখে দেখে দৃষ্টি তাদের শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। আজ চারিদিকে প্রকৃতিদেবীর এই অফুরন্ত শ্যাম সজ্জা দর্শনে প্রাণ তাদের নাচিয়া উঠিল বিপুল আনন্দে। দুই বৎসর পরে কর্ম্মক্লান্ত কেরাণীজীবনের এই অবসরটুকু যে সোনার কাঠীর স্পর্শ তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না—বিশেষতঃ যারা ভুক্তভোগী। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে, আমোদ আহ্লাদেই এই পরিবারের দিন কাটিতে লাগিল।

ভোলানাথ বাবুর এক মাত্র কন্যা শেফালিকা যে চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ করিতে চলিয়াছে, তাহাকে যে বিবাহ দিয়া পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে, কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াই হউক অথবা কন্যার প্রতি অত্যধিক স্নেহ বশতঃই হউক, সে কথা ভোলানাথ বাবুর এতদিন মনে হয় নাই। পূর্ব্ব প্রথার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন পল্লী-সমাজদারদিগের নিকট হইতে পরোক্ষে একটু একটু খোঁচা খাইয়া ভোলানাথ বাবু গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া কন্যার বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ভোলানাথ বাবুর সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না; কাজেই ভালমন্দ সম্বন্ধও ৪।৫টি আসিয়া জুটিল। এদিকে শেফালিকারও অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীতে গোলাপী আভা ধরিয়াছে, তার পরিপুষ্ট অবয়বে পূর্ণতার ঢেউ লাগিয়া উঠিয়াছে। ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ কেশরাশি এলাইয়া সে যখন আনন্দোৎফুল্ল মরালগতিতে চলিয়া যায় "মেয়েটী বেশ" এই প্রশংসাটুকু সকলেই একবাক্যে তাহাকে দিয়া যায়।

১০।১৫ দিন ধরিয়া বর বাছাই, দেনা-পাওনা এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর রাজনগরের অমল চৌধুরীর ৩য় পুত্র সুরেশের সহিত শেফালিকার শুভ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। সুরেশ এবার মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম, বি পাশ করিয়া পাটনায় প্রাকটিস্ আরম্ভ করিয়াছে। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে ভোলানাথ বাবু দরখাস্ত করিয়া আর কিছুদিন ছুটী বাড়াইয়া লইলেন শেফালিকার জীবন ইতিহাসের রঙ্গীণ পাতাটার উপর প্রজাপতি একটা যুগল মূর্ত্তির ছাপ মারিয়া দিলেন। যথোচিত সমারোহের সহিত সুরেশ ও শেফালিকার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

তিন বৎসর শেফালিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাটনায় সুরেশের ব্যবসা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাটীর দিকে মনটা তত জমে নাই। শেফালিকাকে পাটনা লইয়া যাওয়ার জন্য সকলেই সুরেশকে অনুরোধ করিয়াছে; কিন্তু প্রতিবারেই সুরেশ একটা না একটা বাজে কৈফিয়ৎ দিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নূতন পশারের সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের যে চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে একথা সকলেরই কাণে উঠিয়াছে। অঙ্কুরেই বাধা পড়িলে হয়তো সুরেশ অধঃপাতের পথে বেশী নামিয়া যাইতে পারিত না কিন্তু অভিমানিনী শেফালিকা মুখ ফুটিয়া সুরেশকে কোনদিন কোন কথাই বলে নাই। ভাদ্রের ভরা নদীর মত দেহে তাহার যৌবন, মুখশ্রী তাহার অনিন্দ্যসুন্দর, নয়নে হরিণীর দৃষ্টি, বুকে অদম্য ভালবাসা, লেখাপড়ায়ও সে সাধারণ গৃহস্থবধূর

চেয়ে কোন অংশে কম নহে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ তো তার উপর পূর্ণ মাত্রায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সে আবার নূতন করিয়া কি করিবে এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া সে কোন দিনের জন্যই তার আত্মাভিমানকে সুরেশের নিকট খাটো করিয়া ধরে নাই। স্বামী যদি তার অলোকসামান্য রূপরাশির মর্য্যাদা না রাখিয়া, তার যৌবনের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্য রমণীতে আসক্ত হয়, তবে সে দোষ কার? স্বামী যদি গৃহের সুশীতল বারি উপেক্ষা করিয়া মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিয়া যায় সে কেন নিজের আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া ফিরাইতে যাইবে? পাপের পথ এমনি পিচ্ছল যে, এক পা বাড়াইয়া দিলে পথ তোমাকে টানিয়া লইবে। বাধা না পাইয়া, স্ত্রীর ঔদাসীন্যে সুরেশও পাপের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মাঝে মাঝে একবার বাটী আসিত। কথা উঠিলে নিজের দোষটা চাপা দিতেও চেষ্টা করিত কিন্তু পাপের মোহে এখন সে শেফালিকার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, লোক লজ্জা জিনিসটাকে একবারে হজম করিয়া ফেলিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা শেফালিকার অন্তরাত্মা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় সে দিন দিন শুকাইতে লাগিল, তার ফুল্লশতদল দেহ দেবপূজার অযোগ্য বিবেচনায় নিজের উপর তার একটা ধিক্কার আসিল, নারীজীবনের কৌস্তুভরত্ন স্বামী-প্রেম লাভের আশায় তার ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। বার বার চিঠি লিখিয়াও সুরেশের নিকট হইতে যখন কোনই জবাব পাইল না শেফালিকা দেবর রমেশকে সঙ্গে করিয়া একদিন পাটনায় সুরেশের বাসায় গিয়া হাজির হইল।

রমেশ শেফালিকাকে পাটনায় রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। মানুষ যে জিনিসটা নিজের প্রাণ দিয়া বোঝে সেটাকে সে একটু ব্যগ্র আলিঙ্গনেই জড়াইয়া ধরে। শেফালিকাও আজ নিজেকে যেন নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছে, স্বামীর উপেক্ষাটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁর ভালবাসা পাইবার আশায় সমগ্র অন্তঃকরণ দিয়া সে আজ সুরেশকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। স্বামীর নিকট স্ত্রীর যে আত্মম্ভরিতা চলে না তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে আজ তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। সুরেশকে সে সেবা দিয়া বেষ্টন করিয়াছে। সুরেশের ভিতরকার পশুটা যতই প্রবল হউক, শেফালিকার সেবামন্ত্রে সে অনেকটা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্বন্ধ তার দাবী অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা স্বয়ং দেবরাজেরও নাই, সুরেশ তো সামান্য মানুষ মাত্র। সে এখন শেফালিকাকে ভয় করিয়া চলে—প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিবার মত সাহস তাহার আর নাই। স্বভাব শীঘ্র বদলাইবার নহে। অপরাধী যেমন কাতর দৃষ্টিতে বিচারকে সম্মুখে দাঁড়ায় সুরেশও তেমনি গোপনে অনুষ্ঠিত পাপ কার্য্যের জন্য ধরা পড়িয়া কৈফিয়ৎ দিতে আসিয়া শেফালিকার সম্মুখে শঙ্কিত দৃষ্টি লইয়া দাঁড়ায়। শেফালিকার নিকট সুরেশ কতবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সে আর বাহিরে যাইবে না কিন্তু প্রতিজ্ঞা সে রাখিতে পারে নাই। সুযোগ পাইলেই অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। অনুনয় করিয়া, অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া কিছুতেই যখন সুরেশকে করায়ত্ব করিতে পারিল না, শেফালিকা রোগের বিষময় পরিণাম চিন্তা করিয়া কতকটা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পাশের বাড়ীর উকীল পঙ্কজবাবুর সহিত সুরেশের খুব ভাব ছিল। নারী ভিন্ন নারীর ব্যথা বুঝিতে পারে না, তাই পঙ্কজের স্ত্রী নীহারিকাও শেফালিকার এই নূতন অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। দুজনের প্রায় একই বয়স, তারপর বিদেশে এই পাশাপাশি বাসের জন্য বন্ধুত্বটা সহজেই খুব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। জরুরী একটা মোকর্দ্দমা থাকায় পঙ্কজ ১০॥টা বাজিতেই বাহির হইয়া গিয়াছে। বাটী ফিরিতেও রাত্রি হইবে বলিয়া গিয়াছে। কাজেই নীহারিকা বামুন ঠাকুরকে প্রয়োজন মত উপদেশ দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই বিকালের দিকে প্রিয় সখী শেফালিকার নিকট গিয়া হাজির হইল। দুইবন্ধুতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, সুরেশকে জব্দ করিবার অনেক মত্‌লব্ আঁটা হইল। কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই ভাবিয়া আবার তাহা পরিত্যজ্য হইল। শেষে নীহারিকার মাথায় নূতন

রকমের একটা খেয়াল চাপিল। সেটা হইতেছে এই—নীহারিকা পুরুষবেশে শেফালিকার সহিত অন্য সন্ধ্যার পর প্রেমের অভিনয় করিবে। শেফালিকাও সোহাগভরে কল্পিত প্রেমিকের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িবে। দরজা খোলা থাকিবে, সুরেশ ঘরে ঢুকিলে তার লক্ষ্য পথে পড়িয়াই নীহারিকা খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়ন করিবে। তারপর সুরেশের সহিত শেফালিকার কিরূপ কথাবার্ত্তা হইবে এবং শেষে কিরূপ ভাবে সমস্যার সমাধান হইবে তারও একটা খসড়া হইয়া থাকিল। শেফালিকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নীহারিকার পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিল "পোড়ার মুখি, এত আজগুবি ফন্দিও তোর মাথায় আসে?

নীহারিকা—যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হ'লে কি চলে ভাই? নেমকহারাম পুরুষ জাতটাকে হাতে রাখতে হ'লে রাশ সব সময়ই টেনে রাখতে হয়। একটু আলগা পেয়েছে কি বিপথে চলতে সুরু করেছে। ক্যোচ্‌ম্যান কি ক'রে বেয়াড়া ঘোড়াকে চাবুক মেরে মেরে কাজে লাগায় তা বুঝি তুই দেখিস্ নি?

শেফালিকা—তোর ঘোড়াতো ভাই বিপথে যায় না, তবে তুই এ চাবুক মারা বিদ্যেটা শিখলি কোথায়?

নিহারীকা—ইস্! ফাঁক পেলে ঘোড়া যে বিপথে যেতে পারে না তা তুমি মোটেই বিশ্বাস করোনা বলে রাখ্‌ছি। রাশ আমি জোরে টেনেই রাখি, ঘোড়ার সাধ্য কি বিপথে যায়! আমি তো আর তোর মত বোকা নই যে রাশ আলগা করে দিয়ে ঘোড়ার সহিত পীরিত্ত করতে যাব।

শেষে ঐ কথাই ঠিক হইল। সন্ধ্যার পর নীহারিকা নূতন অভিসারের জন্য রমণীমোহন বেশে শেফালিকার কুঞ্জে আসিয়া হাজির হইবে। সন্ধ্যার পর পঙ্কজ বাটী আসিলে নীহারিকা তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। পঙ্কজ হাসিতে হাসিতে নীহারিকাকে কাছে টানিয়া লইয়া তার গোলাপীগণ্ডে চুম্বনের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া বলিল, "এটা তোমার নূতন আবিষ্কারের পুরস্কার। পঙ্কজের নিকট হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত নীহারিকা পরদিন সন্ধ্যার পরই মদনমোহন বেশে শেফালিকার কুঞ্জে গিয়া হাজির হইল। নীহারিকাকে দেখিয়াই শেফালিকা বলিয়া উঠিল "এস এস ওগো আমার রসিক নাগর, তোমার অধরসুধা পানের জন্য আমার চিত্তচকোর যে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছে।"

নী—চুপ কর পোড়ারমুখি! ঝী এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে।

শে—বাঃ রে। আমার যে উৎকট বিরহ জেগেছে তাতে লজ্জা-মান-ভয় এ তিনের কোনটাই তো থাকার কথা নয়। এরকম সম্ভাষণ না হ'লে আমার শ্যাম নটবর বংশীবাদন যে অভিমানেই ফিরে যাবে।

নী—ওগো আমার প্রেমময়ী রাধে, তোমার প্রেমে যে শ্যাম চাঁদ হাবু ডুবু খাচ্ছে। এবার "দেহি পদ-পল্লব" ছাড়া উপায় নাই। এখন দয়া করে একটা পান দাও তো, তাড়াতাড়িতে সাজা পানটা ফেলে এসেছি।

শে—আজ যদি তুমি তোমার প্রেমানুরক্তা শেফালিকার পান ছেড়ে অন্য কারও সাজা পান খেতে তা হ'লে তো আমি দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম।

নী—ভাগ্যিস তা হ'লে ভুলটা হয়েছিল, নচেৎ আবার তো সতীদেহ কাঁধে নিয়ে ত্রিভুবন তোলপাড় করতে হোতো।

সখিদ্বয়ের কথাবার্ত্তা আর বেশী সময় চলিল না! বাইরের ঘরে ডাক্তার বাবুর জুতার শব্দ শোনা গেল। নীহারিকা তাড়াতাড়ি পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বাম হস্তের উপর গণ্ডস্থল ন্যস্ত করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা শেফালিকার একখানা হস্ত ধারণ করিয়া হাসিমুখে প্রেম নিবেদন সুরু করিয়া দিল। শেফালিকাও মাঝে মাঝে প্রেমিকার সোহাগ ভরে নীহারিকার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। ঘরে ঢুকিবার মুখেই ভিতরে ঐরূপ কথা-বার্ত্তার শব্দ পাইয়া সুরেশ থমকিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। একটুখানি শুনিয়াই তাহার গোলাপী নেশার ঝোঁকটা কাটিয়া গেল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল, এখনই দুটিকে কাটিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। প্রেমিক যুগলও সুরেশের দরজার পার্শ্বে আগমন বুঝিতে পারিয়া প্রেমের বহরটা একটু বাড়াইয়া দিল। সুরেশের আর সহ্য হইল না, সবেগে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, "প্রাণ ভরিয়া সব মিটাও,

তাইতো সুবর্ণ সুযোগ” নীহারিকা তাড়াতাড়ি খিড়কীর খোলা দরজা দিয়া ছুটিয়া পলাইল। শেফালিকা ভয়ের ভান করিয়া, ধরা পড়িয়াছে বলিয়া যেন তাহার উত্তর দিবার সাহস নাই এই ভাবই প্রকাশ করিল। সুরেশ ক্রোধদীপ্ত কণ্ঠে বলিল, সতী শিরোমণির ক্ষুধা মিটাইবার এরূপ সুযোগ কতদিন হইতে জুটিয়াছে জিজ্ঞাসা করি ?

শে—সে দিন হইতে যেদিন তোমার পায়ে ধরিয়াও দুলালী বাইজীর বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিতে পারি নাই। (অবশ্য স্বামীর মুখে মুখে এইরূপ উত্তর দিতে যাইয়া শেফালিকা লজ্জায় ও ভয়ে ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিতেছিল।)

সুরেশ—সতীত্বের অহঙ্কারে যে আর মাটীতে পা দিতে চাইতে না। আজ তোমার ভুয়ো সতীত্বটা রাস্তার ধূলায়ও স্থান পাবার যোগ্য নয়।

শে—আমার উপর যত পার দোষারোপ কর। কারণ আমি হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছি। কিন্তু সাধারণ ভাবে হিন্দুরমণীর সতীত্বের উপর দোষারোপ করিবার অধিকার তোমার নাই। গৃহলক্ষ্মীদের সতীত্বই এই হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড। হিন্দুরমণীর সতীত্বের উপরই নির্ম্মিত হয়েছে সনাতন ধর্ম্মের এই অভ্রভেদী চূড়া—শত ঝঞ্ঝা শত প্রলয়েও যাহা হিমাদ্রীর মত অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সু—পর পুরুষের সহিত ঢলাঢলিতেও সতীত্বটা বজায় থাকে নাকি ?

শে—পরনারীর সহিত ঢলাঢলিতে পুরুষের পবিত্রতা যদি বজায় থাকে, তবে নারীর-ই বা থাকিবে না কেন জিজ্ঞাসা করি ? সমাজের আদরের দুলাল পুরুষও অগ্নি সাক্ষী করিয়া বৈদিক মন্ত্রে বিবাহিত স্ত্রীর সকল দাবী অগ্রাহ্য করিয়া সারারাত্রি বারাঙ্গনার সজ্জিত নরকে ডুবিয়া দানবীয় লীলা করিবেন, তাহাতে কোন দোষ নাই। নেশার ঘোর কাটিয়া গেলেই তাহারা পূজার পুষ্পের মত পবিত্র, আর নারী পরপুরুষের দিকে চাহিলেই সে সমাজের পতিতা সকলের কাছেই ঘৃণ্য। জগতে তার আর মুখ দেখাইবার ও অধিকার নাই। বিবাহের মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে পুরুষের কোন কর্ত্তব্য নাই, সমস্তই তাহার খেয়াল অথবা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেই আর সমস্ত কর্ত্তব্যের বোঝা, শাস্ত্রবাক্যের সমস্ত বিধি নিষেধ অবাধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই দুর্ব্বল নারী জাতটার উপর। পুরুষের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার নারীর নাই। পুরুষ নির্ব্বিবাদে তার স্বেচ্ছাচারিতার বিজয় শকট অবলার প্রাণের উপর দিয়া চালাইয়া দিবে, এই তো তোমাদের শাস্ত্রের বিধান ?

সুরেশ—শাস্ত্রটা তোমাকে জব্দ করিবার জন্য আমি হিংসাপরবশ হ'য়ে লিখে রাখি নি।

শে—তুমি না হইলেও তোমাদের পুরুষ জাতেরই লেখা শাস্ত্রের অধিকাংশ বিধান। শাস্ত্রকার যদি নারী হইত, তাহা হইলে হয়তো বিধানটা অন্যরূপ হইত। মানুষ ছবি আঁকে তাই মানুষের পদতলে সিংহ; আর সিংহ যদি ছবি আঁকিত তাহা হইলে সিংহের পদতলেই মানুষ দেখা যাইত। বলিতে বলিতে শেফালিকার চক্ষে অগ্নির দীপ্তি ছুটিয়া বাহির হইল। একটা মহিমাময় তেজ যেন তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। শেফালিকার শেষকথাগুলি সুরেশের কাণে গেল কিনা বলা যায় না। সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “ভূতের মুখে রামনাম শোনার প্রবৃত্তি আমার নাই; ভাল চাও যদি এই মুহূর্ত্তে আমার গৃহ ত্যাগ করে তোমার প্রবৃত্তির কাহারো অন্য সন্ধান দেখ গে।” ঠিক সেই সময়ে পঙ্কজ পুরুষ বেশী নীহারিকাকে ধরিয়া আনিয়া সুরেশের সামনে হাজির করিয়া বলিল—“দেখ দেখি ভাই এই দুর্ব্বৃত্তই কি তোমার সর্ব্বস্ব হরণের চেষ্টায় ছিল ?” ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেমন ছুটিয়া যাওয়া শিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর বিপুল বিক্রমে লাফাইয়া পড়ে, সুরেশ সেইরূপ আক্রোশেই নীহারিকার দিকে অগ্রসর হইলে একদিক হইতে পঙ্কজ অন্যদিক হইতে শেফালিকা তাহার গতিরোধ করিয়া দিল।

রহস্যটা যখন উদ্ঘাটিত হইল, সুরেশ লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নীচু করিয়া রহিল। নীহারিকা হাসিয়া সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “ঠাকুরপো পরধনে লোভ করার চেয়ে নিজের ধন আগলে বসে থাকাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। আর দেখ শেফী এখন থেকে রাশটা একটু জোরে টেনে রাখিস”।

জাতির বৈরী

—গাথা—

শ্রীভারত কুমার বসু

[প্যারিসে ভুবন-বিখ্যাতা সুন্দরী নর্ত্তকী মাতাহারির নৃত্যাভিনয়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে পাবার জন্য কেবল ফ্রান্সের ধনী-বিলাসীরা নয়,—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, স্পেন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের উচ্চ-পদস্থ অনেক রাজ-কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আত্ম-মর্য্যাদা হারাতে ব'সেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সারা ইউরোপে মহাসমরের দামামা বেজে উঠলো। চতুর জার্ম্মাণী তখন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মাতাহারিকে হস্তগত ক'রে তাঁকে গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত ক'রলে। কিন্তু যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর ১৯১৫ সালের প্রথম দিকেই ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে মাতাহারির সমস্ত কৌশল ধরা প'ড়ে গেল। নৃত্যের বিলাস মঞ্চ থেকে তাঁকে এনে কারাগারের রুদ্ধ কক্ষে বন্দী করা হয়। কোর্ট-মার্শাল্-বিচারে ঐ বছরেই (১৯১৫ সালেই) ১৫ই অক্টোবর তারিখে সকাল বেলায় বন্দুকের 'গুলি'তে তাঁকে হত্যা করা হ'লো। এই সত্য ঘটনার উপরেই নিম্নলিখিত কবিতাটীর ভিত্তি।]

(১)

নিখুঁৎ রূপসী লীলা-পটিয়সী অভিনয়ে অভিরাম,—
কপোলের লালে ভুলাতে যুবায় পথ খোঁজে অবিরাম।
পীবর-বক্ষে কণক-কান্তি,—আঁখিতে উন্মাদনা;
চরণে বিলালো কোমল হৃদয় কত-না বেপথু জনা।
প্রেমের পসারী রূপসীর রূপে যৌবন-বিনিময়।
নটীর নয়ন-শায়ক করিল ভুবন-চিত্ত জয়।

(২)

জাতির তীর্থ পুণ্য নিত্য, স্বাধীন সোনার দেশ
তখনো সহেনি বিষের বাতাসে ব্যাকুল বেদনা-লেশ।
তখনো বাহুর প্রীতির বাঁধন বাঁধা ছিল গলে-গলে,
মিলিত সবাই মুক্তি-প্রতীক পতাকার তলে-তলে।
তখনো সবাই আদরে কুসুম চুমিত সুবাস শুঁকে।
কেহ না জানিত, কীটের আবাস গোপন, ফুলের বুকে!

(৩)

বিজাতি-বৈরী রূপসী নারীর হেরি' ছল্-সুচাতুরী
উৎকোচে দিল রমণীর হাতে গুপ্তঘাতীর ছুরী।
ঘৃণ্য পাপের কৌশলে যারা সয়তান হ'তে ক্রুর,—
ভা'য়ের অস্ত্রে অনুজের করে আঘাতে অস্থি চুর,—
বীর্য্য যাদের পটের আড়ালে,—ভীরু ও ফেরুর পাল,—
তাদের হ'তেও রূপসী ছড়ালো কুটিল কাঁটার জাল!

(৪)

অযুত-লক্ষ ছেলের রক্তে যে-দেশে এসেছে জয়,—
যার মাটী বুঝি আজো লালে-লাল্—পথ-ঘাট বনোময়,—
স্মৃতির শ্মশানে আজো যেথা স্বর ভেসে আসে প্রতি-কানে
"ভালবেসো মোর জন্মভূমিরে, ভালবেসো প্রাণে-প্রাণে!"—
সে-মাটী-মাতায় শিকল পরাতে গোপন তথ্যগুলি
চলিল নাগিনী, বৈরীর হাতে একে-একে দিতে তুলি'!

(৫)

ভাবেনি স্বপনে 'প্যারী'র পিয়ারী, একদা যাহারা ভুলে
রঙিলা হাসির মূল্য দিয়েছে নিমেষে হৃদয় খুলে,—
হ'য়েছে বিভোল,—আঁখির বিলোল্ দিঠির ইন্দ্রজালে,—
অলির মতন আঁকিয়া চিহ্ন কোমল কমল-গালে,—
তাদের বক্ষে জাতির চেতন সহসা অট্টহাসে
জাগিয়া উঠিবে বিলাস ত্যেজিয়া বিপুল তেজোচ্ছ্বাসে!

(৬)

নগরে-নগরে শুনিল সবাই, কারায় রূপসী-নারী!
বিচারে, অগ্নি-অস্ত্র-আঘাতে জীবনের শেষ তারি!
...বীরেরা বিকল হয়নি নটীর নয়নের ছলনাতে!
বীরের প্রণয় নারী সাথে নয়,—তীক্ষ্ণ অসির সাথে!
মুক্ত, দৃপ্ত বক্ষে যাহারা কামান-গোলক ধরে,
পারে কি রমণী তাদের হৃদয় ভেদিতে আঁখির শরে?

(৭)

বধ্যভূমিতে হাসিল রূপসী;—অদূরে সেনার দল।
বন্দুকে বুঝি ছুটিল অগ্নি;—সব ধির ভূমিতল!
সহসা রূপসী ত্যেজিয়া বসন চকিতে নগ্ন দেহ!
হায় সে ক্ষণিক! ছুটিল শস্ত্র;—বিকল হ'লো না কেহ!
নটীর রক্তে ভিজিল পৃথ্বী;—বাণী গেল ভেসে ভেসে,—
"জাতির বৈরী এ ভাবে ঘুমায় যুগে-যুগে দেশে দেশে!"

নানা কথা

ভারতের ঋণ সম্পর্কে কংগ্রেস

ভারত গভর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত বহু টাকা ঋণ করিয়াছেন। ন্যায়তঃ ভারতবাসী এই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য কিনা এই প্রশ্ন উঠিয়াছে।

অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয়ে মত প্রকাশের জন্য করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। রিপোর্টখানি তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাতে প্রথমে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার আলোচনা আছে। তারপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট যে টাকা ধার করিয়াছেন, তাহার হিসাব দেওয়া হইয়াছে। সদস্যগণ একমতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ন্যায়সঙ্গত উপায়ে এবং ভারতবাসীর উপকারের জন্য যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার দায়িত্ব ভারতবাসীরই গ্রহণ করা উচিত।

কোম্পানীর আমল :—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া সদস্যগণ বলিয়াছেন, ব্যবসা ও রাজশাসন এই দুইটি কার্য্যে কোম্পানী ব্যাপৃত ছিলেন। গোড়ার দিকে এই দুই কাজের পৃথক হিসাব রাখা হয় নাই। সুতরাং সে হিসাব পাইবার উপায় নাই। তবে ১৮৮১ সালে সার জর্জ্জ বেলফুরের প্রস্তাব অনুসারে কোম্পানীর ঋণের একটি তালিকা পার্লামেণ্ট সভায় দাখিল করা হইয়াছিল। তাহা হইতে জানা যায়, ১৮৫৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কোম্পানীর ঋণ ছিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড। নিম্নলিখিত কাজের জন্য এই ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল :—

প্রথম আফগান যুদ্ধ	১৫,০০০,০০০
ব্রহ্মদেশের দুইটি যুদ্ধ	১৪,০০০,০০০
চীন, পারস্য ও নেপালে অভিযান প্রেরণ প্রভৃতি	৬,০০০,০০০
১৮৩৩-১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূলধনের সুদ ইত্যাদি	১৫,০০০,০০০
পাউণ্ড	৫০,০০০,০০০

ভারতের বাহিরে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার ব্যয় বহন করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য নহে, কমিটির সদস্যগণ, বিশিষ্ট ইংরাজের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া এই মন্তব্য সমর্থন করিয়াছেন।

"ভারত গবর্ণমেণ্টের সৈন্য বল ও অর্থবলের দ্বারা এশিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কোন কোন স্থলে একমাত্র বৃটিশের স্বার্থেই এই সমস্ত যুদ্ধ করা হইয়াছে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার নির্দ্দেশ ক্রমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারত গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত যুদ্ধের জন্য বৃটিশ জাতিই সম্পূর্ণ দায়ী। দৃষ্টান্ত স্থলে আফগান যুদ্ধের কথা বলা যাইতে পারে। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।......ইদানীং পারস্যের সহিত যে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার সহিত ভারতবাসীর স্বার্থের কোন সম্পর্ক নাই।" সার জর্জ্জ উইংগেট।

"......আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের কথা বলিয়াছি। ইংরাজের উপরই এই ব্যয়ভার অর্পণ করা উচিত ছিল। কারণ বৃটিশের স্বার্থের জন্যই বৃটিশ মন্ত্রিসভা এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।......" মিঃ জন্ ব্রাইট।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত করিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন, এই ৫১,০০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ পরিশোধ করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১৮৩৩ সালের এক আইন অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূলধনের টাকা শতকরা ১০ টাকা হিসাবে সুদসহ পরিশোধ করা হয়। এই বাবদে মোট ৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থ প্রদান করা হয়। ভারতের রাজস্ব হইতেই এই অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর তাহাতে কোনই উপকার হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে অধিকার ও সম্পত্তি ছিল, তাহা বৃটিশ জাতির প্রতিনিধি হিসাবে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ক্রয় করেন। অর্থ ভারতের হইলেও এই ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে ভারতীয় সম্পত্তির মালিক হন বৃটিশ জাতি। সুতরাং ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ এই অর্থের জন্য ভারতবাসীকে দায়ী করা যায় না।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিতে প্রায় ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনও এদেশ শাসন করিতেছিলেন। কমিটী মন্তব্য করিয়াছেন, সেই কোম্পানীর কুশাসনের ফলেই সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল। সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহ দমনের ব্যয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বহন করা উচিত।

এই সম্পর্কে ১৮৭২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে তদানীন্তন ভারত-সচিব এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন, ১৮৫৭-৫৮ সালে ভারতবর্ষে যে ভীষণ বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব। ইহাতে প্রাচ্য-দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়াছিল। রাজ্য-রক্ষার জন্য বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তখন আপ্রাণ চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতীয় করদাতাগণই এই বিদ্রোহ-দমনের ব্যয়ভার বহন করিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপর কোন অংশে এরূপ ব্যাপার ঘটিলে অন্ততঃ এই ব্যয়ের একটা মোটা অংশ বৃটিশ জাতিকেই বহন করিতে হইত।

তদানীন্তন ভারতসচিবের এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়া কমিটী আবার বুয়র যুদ্ধের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার

বহন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু বিপর্য্যস্ত কৃষিক্ষেত্রগুলি পুনরায় কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত বুয়রদিগকে ৩০,০০,০০০ পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

মোটের উপর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে সমস্ত ঋণ করা হইয়াছিল, তাহার ফলে ১১,২,২০০,০০০ পাউণ্ড ঋণের বোঝা ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপিয়াছে। তন্মধ্যে –

বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানের জন্য	৫১,০০০,০০০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূলধন ও লভ্যাংশ ইত্যাদির জন্য	৩৭,০০০,০০০
সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য	৪০,০০০,০০০
মোট	১১,২,২,০০,০০০

পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের আমল :—সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ পার্লামেণ্ট স্বয়ং ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করেন। এই পার্লামেণ্টারী শাসনের ব্যয় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ—(১) ভারতের বাহিরে যুদ্ধ বিগ্রহ। ইহাতে ৩,৭০,০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। কমিটী বলেন, আবিসিনিয়ায় অভিযান প্রেরণ, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, মিশরে সৈন্য প্রেরণ, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ এবং ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ প্রভৃতির সহিত ভারতবাসীর সম্পর্ক নাই। বৃটিশের স্বার্থে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন। লর্ড সেলিসবারি, লর্ড নর্থব্রুক, সার চার্লস ট্রেভিলিয়ান, লর্ড লিটন, মেসার্স ফসেট, গ্লাডষ্টোন, গোখলে প্রভৃতির অভিমত উদ্ধৃত করিয়া কমিটি দেখাইয়াছেন, এই অর্থ প্রদান করিতে ভারতবাসী ন্যায়তঃ বাধ্য নহেন।

ইউরোপীয় মহাসমর :—বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় গ্রেট বৃটেনকে মোট ১৮৯ কোটী টাকা দান করা হইয়াছে। আইন অনুসারে ভারতীয় রাজস্ব হইতে কোন অর্থ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দান করিবার অধিকার ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই। সুতরাং এই টাকা ফিরাইয়া দেওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কমিটি আরও বলেন যে, এরূপভাবে অর্থদান করা ভারতবাসীর আর্থিক সামর্থ্যের অতীত। তারপর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশের ন্যায় অনুরূপ সাহায্যও দিয়াছে। মহা যুদ্ধ উপলক্ষে ভারতের সামরিক ব্যয় হইয়াছে ১৭১ কোটী। মোটের উপর দান ও সামরিক ব্যয় বাবৎ মহাযুদ্ধ উপলক্ষে ভারতের ৩৬০ কোটী ব্যয় হইয়াছে। ইহার বিনিময়ে ভারতবাসী উপকৃত হয় নাই। সুতরাং কমিটির মতে, এই অর্থ বৃটিশের নিকট দাবী করা যাইতে পারে।

(২) বিবিধ ব্যয় বাবৎ ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড। বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিস, এডেন, পারস্য ও চীনের দূতাবাস এবং ধর্ম্মযাজকদের ব্যয় বাবৎ এই অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভারতের কোন স্বার্থ নাই বলিয়া কমিটি এই অর্থ দাবী করিয়াছেন। মেজর জেনারেল বলেন, ওয়েলবি কমিশনের রিপোর্ট এবং মিঃ ষ্টিফেন জেকোবের মন্তব্য দ্বারা এই দাবী সমর্থন করা হইয়াছে।

(৩) ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে মোট ৮২ কোটী ব্যয় হইয়াছে। ভারতের রাজস্ব হইতে এই টাকা দেওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন। তবে কমিটির একজন সদস্য বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ যদি ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন না হয় তাহা হইলে এই অর্থ দাবী করা সঙ্গত হইবে না।

(৪) দুর্ভিক্ষের সাহায্য দান সম্পর্কে যে অর্থ ঋণ করা হইয়াছে, তাহা অনেক স্থলে যথারীতি ব্যয়িত হয় নাই। অনেক অর্থের অপব্যয় হইয়াছে। তথাপি কমিটি স্বীকার করিয়াছেন, এই ঋণ পরিশোধ করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

(৫) মুদ্রা বিনিময়, বাট্টার হার নির্দ্ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কমিটী, ভারত গবর্ণমেণ্টের বাট্টা নীতির নিন্দা করিয়াছেন। তথাপি এই ক্ষতির অর্থ ভারতবাসীর পক্ষ হইতে দাবী করা হয় নাই।

(৬) রিভার্স কাউন্সিল বিল সম্পর্কে ৩৫ কোটী ক্ষতি হইয়াছে। কমিটী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, এই ক্ষতির জন্য গ্রেট বৃটেনই দায়ী। সুতরাং এই ক্ষতি পূরণ করা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

(৭) রেলপথ নির্ম্মাণে ব্যয় বাহুল্য এবং গবর্ণমেণ্টের নীতির আলোচনা করিয়া কমিটী মন্তব্য করিয়াছেন, সামরিক প্রয়োজনে এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে অনেক রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং এডেনে রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া ৫৩ কোটী ব্যয় করা হইয়াছে। অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ভারতের কোন কোন রেলপথ ক্রয় করা হইয়াছে। ইহাতে ৫০ কোটী ব্যয় হইয়াছে। এই সমস্ত ঋণের জন্য ভারতবাসীকে দায়ী করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ—ডাক বিভাগ, টেলিগ্রাফ বিভাগ, সেচ বিভাগ, পূর্ত্ত বিভাগ প্রভৃতির জন্য অনেক টাকা ধার করা হইয়াছে। কমিটী এই সমস্ত ঋণের কথাও আলোচনা করিয়াছেন। নূতন দিল্লী নির্ম্মাণ করিয়া যথেষ্ট অর্থের অপব্যয় করা হইয়াছে। তথাপি স্বীকার করা হইয়াছে যে, এই সমস্ত ঋণের দায়িত্ব মানিয়া লওয়া ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

মোটের উপর কমিটি, এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়ে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার জন্য ভারতবাসী দায়ী নহে। সুতরাং এই টাকা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরই দেওয়া উচিত।

কোম্পানীর আমল –

যুদ্ধ বিগ্রহ	৫১ কোটী পাউণ্ড
মূলধন ও সুদ	৩৭ "
সিপাহী বিদ্রোহ	৪০ "
	১১২ কোটী পাউণ্ড

পার্লামেণ্টের আমল –

যুদ্ধ বিগ্রহ	৩৭ কোটী পাউণ্ড
ইউরোপীয় যুদ্ধে দান	১৮৯ "
" ব্যয়	১৭১ "
	৩৯০ কোটী

বিবিধ	২০ কোটী পাউণ্ড
ব্রহ্মদেশ	৮২ "
রিভার্স কাউন্সিল বিলের ক্ষতি	৩৫ কোটী পাউণ্ড
রেলপথ সমূহ	৮৩ "

সর্ব্বসমেত ৭২৯ কোটী পাউণ্ড

কমিটীর মূল কথা :—বর্ত্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ ১১০০ কোটী পাউণ্ড। ভারতবর্ষ দখলে থাকায় নানা দিক দিয়াই গ্রেট বৃটেনের প্রচুর লাভ হইতেছে। পক্ষান্তরে ভারতের শিল্প বাণিজ্য চাপিয়া রাখা হইতেছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া কমিটি এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, আয়র্ল্যাণ্ডের বেলায় গ্রেট বৃটেন যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন,ভারতের বেলায়ও তাহাই করা কর্ত্তব্য। আয়র্ল্যাণ্ড এক সময়ে গ্রেট বৃটেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনকার ঋণের বোঝা, আয়র্ল্যাণ্ডকে স্বাধীন করিবার সময়,তাহার ঘাড়ে চাপান হয় নাই। তাহাকে সমস্ত ঋণের দায় হইতে মুক্তি দিয়া গ্রেট বৃটেন নিজ স্কন্ধে সমস্ত ঋণভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমিটি মনে করেন, ভারতের রাজস্ব দ্বারা যদি পূর্ব্বকৃত ঋণ শোধ করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্ম যথোচিত অর্থ পাওয়া যাইবে না। সুতরাং ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করিবার সময় তাহাকে পূর্ব্বকৃত ঋণমুক্ত করিয়া দেওয়াই উচিত। সমস্ত ঋণভার গ্রহণ করিতে রাজী না হইলেও অন্ততঃ পক্ষে ৭২৯ কোটী পাউণ্ড ঋণভার গ্রহণ করিতে রাজী না হইলেও অন্ততঃ পক্ষে ৭২৯ কোটী পাউণ্ড ঋণের জন্ম দায়ী হওয়া গ্রেট বৃটেনের কর্ত্তব্য।

স্বতন্ত্র মন্তব্য :—মিঃ জে, সি, কুমারাপ্প দুইটী স্বতন্ত্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, প্রতি বৎসর ভারত সরকার যে অর্থ সৈন্য সামন্তের জন্য ব্যয় করেন, তাহার কিছুটা অন্ততঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বহন করা উচিত। কেননা এত সৈন্য সামন্ত রাখার প্রয়োজন ভারতবাসীর নাই, বৃটীশের স্বার্থের জন্য এই বিরাট বাহিনী রক্ষা করা হয়। এ পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট মোট ২১২৮ কোটী পাউণ্ড সামরিক ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে অন্ততঃ ৫৪০ কোটি পাউণ্ডের জন্ম দায়ী হওয়া বৃটীশের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, রিপোর্টের মধ্যে যে সমস্ত ঋণ বৃটীশের স্বার্থে করা হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তাহার সুদ বাবদ প্রায় ৫৩৬ কোটী পাউণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছে। এই অর্থের জন্যও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করা যাইতে পারে। এই দুইটী দাবী যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রায় সমস্ত ঋণ—অর্থাৎ ১০৫০ কোটী পাউণ্ডের দায়িত্বই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা উচিত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে

সভাপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দীর

অভিভাষণের মর্ম্ম

হিন্দু-ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী

একদিন হিন্দুত্বের দাম্ভিকতা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কার আমাদিগকে নষ্ট করিতে বসিয়াছিল, ইহার সত্যতাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে আন্দোলন প্রচলিত হয় আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যুবক সেই আন্দোলনের শেষ ফল। দাম্ভিক হিন্দুত্ববোধ ও তাহার গোঁড়ামী ও কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে গিয়া সে আজ হিন্দুত্বের সত্যকার মাহাত্ম্যবোধ ও গৌরবানুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছে। কেবল যে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাই নহে,—হারাইয়া ফেলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছে—ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি আছে জানি না।

আত্ম-বিস্মৃতির এই অতলতার মধ্যে ডুব দিয়া হিন্দু যুবক আজ কি রত্ন খুঁজিয়া মরিতেছে? তাহার নিজের খনিতে কি রত্ন নাই? মণি-মাণিক্যের সন্ধানে কি তাহাকে আজ ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে?

চিন্তায় বিশ্বানুভূতি

হিন্দু চিন্তাধারার একটি বিশেষত্ব—ব্যক্তি ও সমষ্টির একাত্মানুভূতি। হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে তাই আমরা ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখি না। সমষ্টির মধ্যে পাই—জ্ঞান ও আনন্দের চরম বিকাশ এই সমষ্টির জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির পরিপূর্ণতায়। ব্যক্তি বলিতে হিন্দু শুধু মানুষকেই বুঝে না সমুদয় জীবকেই বুঝে। ব্যক্তি-মানুষে নহে—সমষ্টিজীবে হিন্দু চিন্তার ধারা প্রবাহিত, প্রস্তরে যাহা সুপ্ত, জীবে যাহার স্বপ্নাবস্থা, মানুষে তাহাই জাগ্রত।

বাস্তবিক হিন্দুদর্শন কোনও দিন তুচ্ছ করে নাই, dignity of labour, work is worship—এই সব সস্তা ইংরাজী বুলি আজ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া আজ আমরা নিজেদের বিচার করিতেছি—এ লজ্জা রাখিবার স্থান আমাদের কোথায়?

মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারা বলিতে পারিবেন—কি করিয়া কশাইএর কর্ত্তব্যকেও হিন্দু পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়াছে।

কোন সঙ্কীর্ণতা হিন্দুর নাই; আজ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার রীতি-নীতির শৃঙ্খল আমাদের পায়ে পায়ে বাজিয়া উঠিতেছে, তাহার একটিও হিন্দু দর্শনের নির্দ্দেশ নয়; পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে তাহাদের জন্ম, সাময়িক হিসাবে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া সমাজ-পতিরা সেগুলির প্রচলন করিয়াছিলেন মাত্র—শৈবালের মত তাহারা কূলে আসিয়াছিল স্রোতের টানে, আবার অপ্রয়োজনের মধ্যেই তাহারা

ভাসিয়া যাইবে; প্রবহমান বিপুল জলস্রোতে তাহাদের স্থান নাই। আজ বদ্ধজলায় তাহারা পাঁক জমাইয়া তুলিয়াছে, সে পাঁকে ডুবিয়া নিজেরা মরণযন্ত্রণা অনুভব করিতেছি—প্রতিপক্ষ সে সুযোগ উপেক্ষা করিবে কেন? মুমূর্ষুর মত পড়িয়া না থাকিয়া সবল বাহুতে যদি এই শৈবালদলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, তবে নিজেরাও মরি না—বিপুল জলস্রোতের অব্যাহত প্রবাহ আবার ফিরিয়া আসে।

যাহা চাই, তাহা এই বিপুল বল, অমিত তেজ পৌরুষের অনতিক্রম্য প্রভাব। চাই ঋজু মেরুদণ্ড, সাহসবিস্তৃত বক্ষস্থল সত্যভাষণের অকুণ্ঠ কণ্ঠ।

অস্পৃশ্যতা

অস্পৃশ্যতা আজ হিন্দু ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। শূদ্র নাকি ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য! মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৪৮ অধ্যায়) দেখিবেন—রাজসূয় যজ্ঞে কি কাণ্ডটাই না ঘটিয়াছিল—রাজারা ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করিতেছেন এবং সেই পরিবেশক রাজন্যবর্গের মধ্যে চীন, যবন, পারসীক, শক, হূন, তুষার, রোমক প্রভৃতি কেহ বাদ যায় নাই।

গুণবিভাগ করিয়া চতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, কোনও বর্ণ কোনও বর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এ বোধ ছিল না। সমাজরক্ষার জন্য সকল গুণ, সকল কার্য্য অপরিত্যাজ্য বলিয়া ধরা হইত। চারি বর্ণের উপরই শাস্ত্রের সমান শ্রদ্ধা ছিল। চারি বর্ণই শাস্ত্র কর্ত্তৃক দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে—ব্রহ্মণ্যদেব, নৃদেব, আর্য্য বা গুপ্ত দেব, দাস দেব (ঋক, পুরুষ সূক্ত, দ্বাদশ মন্ত্রের সায়ন ভাষ্য)। শান্তি পর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে দেখি কর্দ্দম ব্রাহ্মণের পুত্র বেণ হইলেন রাজা, তাঁহার দুই পুত্রের একজন নিষাদ হইলেন ব্যাধ, আর একজন পৃথু হইলেন রাজা। এই উদার সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে অস্পৃশ্যতার স্থান কোথায়?

অসবর্ণ বিবাহ

বিবাহের মূল সূত্র হইতেছে—দম্পতিযুগলের মধ্যে এক প্রাণতা। প্রেমসঞ্জাত বিবাহে প্রাণের একটা মিল থাকা সম্ভব কিন্তু আচার-ব্যবহারে ও সভ্যতায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনের সহিত পুরাপুরি মিল না হইবারই সম্ভাবনা বেশী। নারীর মধ্যে মিশ খাইয়া চলিবার একটা স্বভাবগত শক্তি আছে—কিন্তু সে শক্তিরই ত সীমা আছে।

এই সীমারেখা অতিক্রম করিবার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত কারণ কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতের স্ত্রী পর্ব্বের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দেখি ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা দুঃশলার স্বামী জয়দ্রথের যবনী-স্ত্রীর কথা। ইহাতে মারাত্মক অপরাধ বলিয়া জয়দ্রথকে সমাজচ্যুত করিবার কথা কোথাও পড়ি নাই। সমষ্টির মধ্যে এইরূপে ব্যষ্টি স্বাতন্ত্র্যকে হিন্দু চিরকালই মর্য্যাদা দিয়া আসিয়াছে। প্রয়োজন হইলে আজও তাহা না দিবার কোনও হেতু নাই।

যেখানে অসবর্ণ বিবাহ কোনও নরনারীর পক্ষে একান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে, সেখানে—হিন্দুসমাজের উচিত নিরপেক্ষ থাকা। সামাজিক অনুশাসন বর্ত্তমানে অসবর্ণ বিবাহের অনুকূলে প্রচার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে কিনা তাহা স্থির করিবেন সমাজ সংস্কারক—ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার হইতে কয়েকটি কথা এখানে বলিয়া রাখিলাম।

নারী-প্রগতি

নারী-প্রগতির কথা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নারী সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্র বলিতেছেন—

নারী যেখানে থাকেন সেখানে দেবতা বিরাজ করেন। "গৃহলক্ষ্মী" আখ্যা দিয়া হিন্দু নারীকে দেবীর সম্মান দিয়াছে। কোনও দেশের কোনও জাতির বা সমাজের মধ্যে এমন গৌরবাত্মক নামে নারীকে কেহ সম্মানিত করে নাই। নারীকে হিন্দু তাহার যোগ্য সম্মান দিতে কখনই কার্পণ্য করে নাই—নারীকে দেবতার আসনে বসাইয়া হিন্দু পূজা দিয়াছে—গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দিয়া হিন্দু তাহাকে মহিয়সী করিয়া তুলিয়াছে—কল্যাণ কর্ম্মে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নারীকে সহধর্ম্মিনী করিয়া হিন্দু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে—নারীর যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে হিন্দুর দান চিরদিনই অকৃপণ। কিন্তু নারী আজ বিদ্রোহিণী। আজ কেবলই শুনিতে পাই পুরুষ স্বার্থপর, অত্যাচারী, কামুক, হৃদয়হীন পশু ইত্যাদি।—যাহারা তাহাদের জীবনে পুরুষকে তাহার প্রকৃত স্বরূপে দেখিবার সুযোগ বা অবসর পাইল না—তাহাদের কথা আলোচনার যোগ্য নহে। কিন্তু সমাজে নরনারীর আদর্শ জীবনের উদাহরণের ত অপ্রতুল নাই। অন্ধ সংস্কার ও কদাচারের মোহে নারীকে দুর্গতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইতেছে একথা বলিলে খুব মিথ্যা কথা বলা হইবে না। শ্বশুরালয়ে বধূর প্রতি অত্যাচার কাহিনীর কথা স্মরণ করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়—অনেক হৃদয়বিদারক পাশবিক অত্যাচারের মধ্যে "স্বামী-দেবতার" যে সংশ্লিষ্ট হাত আছে—এরূপ ঘটনাও বিরল নহে। অধিকাংশক্ষেত্রে শিক্ষার অভাবে, আজ নারী যে অন্নদাত্রী ও ধাত্রী, গৃহ-সংসারে প্রয়োজনের দাসী হইয়া পড়িতেছে—ইহাও কদাচ সমর্থনীয় নহে।—কিন্তু দৈহিক গঠন ও মনের স্বাভাবিক গতিকে উপেক্ষা করিয়া আজ আধুনিক নারী যদি পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া চলিতে চায়, তাহা হইলে হিন্দু সমাজের শেষ দিন উপস্থিত হইয়াছে মনে করিব।

যোগ্যতা অনুসারে অধিকারের দাবীর মূল্য আছে—অন্যথায় তাহা করুণ বা হাস্য রসের উদ্রেক করে। দেহ ও মনের অনুপযোগী কোনও অধিকারের দাবী নারীর পক্ষে একান্ত অবান্তর।

—নারীর আসন হিন্দু যথাযোগ্য স্থানেই পাতিয়া রাখিয়াছে—তিনি সেখানে ধৈর্য্যে ও ক্ষমায়, স্নেহে ও সেবায়, প্রেমে ও পুণ্যে,—নারীর সকল প্রকার স্বভাবগত মহত্ত্বে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন, কিন্তু বিদ্রোহ করিবার সাধু ইচ্ছার ভাণ করিয়া নারী-শক্তির অপমান যেন তাঁহারা না করেন।

বিধবা-বিবাহ

বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে এযাবৎ বহু আলোচনা হইয়াছে। তবুও দুই একটি কথা এখানে বলার প্রয়োজন মনে করি। স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—হিন্দুর ঘরে বিধবারা অলঙ্কার স্বরূপ।—কথাটা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। আমরা প্রত্যেকেই জানি এক একটি পরিবারের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব লইয়া এক একজন বিধবা আজীবন ত্যাগের মহান ব্রত সাধন করিতেছেন—নিজের ঐহিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিবারের স্বার্থে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা যে সংযমের আদর্শ জীবন যাপন করিয়া থাকেন, তাহা অন্য কোনও দেশের সমাজে আছে কিনা জানি না। যখনই আমাদের হিন্দু-গৃহাশ্রমে এইরূপে এক একটি দয়াবতী ত্যাগব্রতচারিণী মহিয়সী নারীকে দেখি, তখনই মনে হয় ভূদেবচন্দ্রের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কিন্তু তাই বলিয়া অল্পবয়স্কা বালিকা, যুবতী বিধবা—প্রোষিতভর্ত্তৃকা প্রভৃতি যে সব নারীর বিবাহের বিধান শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহাদের পুনর্ব্বিবাহের প্রথা যাহাতে সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য। সমাজের জনবলের দিক হইতে ইহার একটা সার্থকতাও আছে, অধুনাতম মনীষীবর্গ তাহা স্বীকার করিতেছেন। তাই আমার মনে হয় এ বিষয় সামাজিক অনুশাসনের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা রাখিয়া যতখানি ঔদার্য্য দেখান দরকার, তাহার জন্য যেন হিন্দুসমাজ প্রস্তুত থাকেন।

প্রাদেশিক সীমা নির্ণয়

প্রাদেশিক সীমানির্ণয় সমস্যা আর একটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এই সীমানির্ণয় সমস্যা লইয়া হিন্দুগণ—শুধু হিন্দু কেন যাঁহারাই ভারতের ভাবী শাসন পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারাই বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন। আমার মনে হয়, যাঁহারা সম-ভাষাভাষী এক জাতি হিসাবে ও শিক্ষা-দীক্ষা হিসাবে এক পর্য্যায়ভুক্ত তাঁহাদিগকে লইয়া এক একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা কর্ত্তব্য। আমাদের ভবিষ্যত ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ত্তমানে যে কমিশন গঠিত হইয়াছে, সেই কমিশনও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তনসাধনের পূর্ব্বে একটি "সীমানির্ণয় কমিশন" গঠন করা কর্ত্তব্য। এই কমিশনই যাহারা সমভাষা-ভাষী ও যাহারা শিক্ষা দিক্ষা হিসাবে এক, তাহাদিগকে লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের সীমানির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এবিষয়ে আমাদের বাঙ্গালা দেশ বহু দিন হইতে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী বঙ্গ-ভঙ্গের বেদনা ভুলিতে না ভুলিতে মানভূম, সিংভূম, পুর্ণিয়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলাকে বাঙ্গালা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য দেশের সহিত সংযুক্ত করা হইল। আমাদের আশা ছিল, সীমা নির্দ্দেশ কমিশন গঠিত হইলে ইহার সুমীমাংসা হইবে, কিন্তু আমাদের সে আশা ব্যর্থ হইল। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা কোনরূপ সীমানির্দ্দেশ কমিশন নিযুক্ত করিবেন না; তাঁহারা মাত্র বিহার ও সিন্ধু দেশের জন্য দুইটি পৃথক কমিটি নিযুক্ত করিবেন। এ সমস্যা সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যা। এরূপ গুরুতর সমস্যাসমাধানের জন্য এবং এই সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের অবিলম্বে এক সীমা-নির্দ্দেশ-কমিশন গঠিত করা কর্ত্তব্য।

শুদ্ধি ও সংগঠন

শুদ্ধি ও সংগঠন হইবে কিনা, ধর্ষিতা নারীকে সমাজে স্থান দেওয়া উচিত কিনা সে বিচারের আজ প্রয়োজন হইয়াছে।

বেদের তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞের বিবরণে দেখা যায়, কেবল দু'একটি নয়, গোষ্টিকে গোষ্টি হিন্দুধর্ম্মভুক্ত করা হইয়াছে। 'দেবল স্মৃতি' বলিতেছেন—বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত, কলুষিত বা আবদ্ধ স্ত্রীলোক এবং ঐশ্বর্য্য লাভে ধর্ম্মত্যাগীকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চৈতন্যদেবের কীর্ত্তি কাহিনী হিন্দু মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়া তিনি যে সর্ব্বজাতি সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই আমার মনে হয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে তাঁহার পূর্ণ মহিমা প্রকট করিলেন। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ শূন্য হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে যেমন প্রসাদ পাইবার রীতি আছে—সেইরূপ ঠিক বাহিরের সমাজে ছুঁৎমার্গ দূর করিবার জন্য চাই চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম ও সেবানুরাগ। হিন্দু প্রধানতঃ উদার-ধর্ম্ম কাল-ধর্ম্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া হিন্দুকে উহার হৃদয় ও ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইতে হইবে।

অাধুনিকতা গর্ব্বী বলিবেন সব বুঝিলাম কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, একথা আমরা এতবার শুনিয়াছি—যে ইহা শুনিয়া আমাদের আর লাভ নাই। আমি বলি—ইহা শুনিয়া যদি লাভ নাই, তবে কিসে লাভ আছে?

আমি মহৎ, আমার ধর্ম্ম মহৎ, আমার ইতিহাস গৌরবময়, এ সকল ভাবিয়া বুঝিয়া যদি মাহাত্ম্যের প্রেরণা না পাই, তবে পাইব কিসে?

নির্ব্বাচন-সমস্যা

হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কে আজ কোনও কথা বলিতে গেলে, নির্ব্বাচন সমস্যা সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিলে চলে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের জাতীয় দল বা Nationalist Party ছাড়া অনেকে শাসন পরিষদে স্থান সংরক্ষণ ও পৃথক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের এই দাবীর মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার পরিপন্থী দুইটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম—স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মুসলমান-ভারতবর্ষের কল্পনা এবং দ্বিতীয়—কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে পাঞ্জাব এবং সিন্ধু পর্য্যন্ত একটি নিখিল মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত রাজ্যসংগঠনের ধারণা। একথার আভাষ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

প্রকাশ্যভাবে একথা বলা না হইয়াছে তাহা নহে। শুধু হিন্দু-জাতির নহে—রাজনীতিজ্ঞ প্রত্যেক রাজপুরুষেরই ইহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রকার দাবীর সমর্থন শুধু যে জাতিহিসাবে ভারতের

ভাগ্যবিপর্য্যয় আনিবে তাহা নহে, কোনও কালে সম্মিলিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে উদ্ভব হইবে সে আশাও সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষ হিন্দুর নহে, মুসলমানেরও নহে—ভারতবর্ষ ভারতবাসীর—এই চিন্তায় যেদিন আমরা হৃদয়ে বল পাইব, সেদিন সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথাও আর থাকিবে না। জাতিহিসাবে ভারতবাসী যদি সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভুলিয়া স্বাধিকারের দাবী করিতে পারে, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যদি ভারতবাসী সম্মিলিত শক্তিতে আপনার দাবী উপস্থিত করিতে পারে—তবেই জাতীয়তার স্বপ্ন সফল হইবে। আমার মনে হয়, ভারতের শাসনতন্ত্র যদি কোনও দিন দেশের অনুকূলে গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথম সূত্র হওয়া উচিত—অসাম্প্রদায়িকতা। শতধাবিচ্ছিন্ন জাতির কোনও শক্তি নাই, স্বায়ত্তশাসনের দাবী করিবার অধিকারও তাহার নাই। হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যেকেরই একথা আজ মনে রাখিতে হইবে যে, একহাতে স্বার্থলাভ হইবে না—ঘরের কলহ ও স্বার্থের কাড়াকাড়িতে আজ আমরা সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়া আছি।

—রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য দুই সম্প্রদায়কে একসঙ্গেই চেষ্টা করিতে হইবে—দুই জাতির উত্থান ও পতন ভাগ্যবিধাতা একই অবিচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। যে সম্প্রদায় আজ শুধুমাত্র অসম্ভবের আশায় বিরোধ পোষণ করিবে, সে শুধু স্ব-সমাজের নহে—স্ব-দেশেরও ভীষণ ক্ষতি করিবে। সমগ্র জাতির অনিষ্ট করিয়া সমাজসেবার আত্মপ্রসাদলাভ ভ্রমাত্মক মাত্র।

প্রচার শীল হিন্দু

ভবিষ্যৎ হিন্দুকে প্রচারশীল হইতে হইবে। নিজের জন্য নহে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অনুদার সঙ্কীর্ণতার আবর্জ্জনা দেশবিদেশে জমিয়া উঠিয়াছে,—তাহারই উচ্ছেদকল্পে ভারতবাসী হিন্দুকে আজ প্রচারে বাহির হইতে হইবে। হিন্দুত্বের গণ্ডীতে অন্যকে আবদ্ধ করিবার জন্য নহে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বমানবকে পুনসঞ্জীবিত করিতে।

পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদ আজ মানবকে ক্লিষ্ট, ক্লান্ত ও অন্ধ করিয়াছে—পাপে-পুণ্যে আস্থাহীন হইয়া পরলোকে বিশ্বাস হারাইয়া, বিশ্বমানব আজ নিজের আঘাতে নিজেই ক্ষতবিক্ষত—সেই ক্ষত নিরাময় করিবার মহান কর্ত্তব্য নব্য হিন্দুর সারল্য, বিশ্বাস ও নির্ভরতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সদসৎ জ্ঞান সমস্তই তাহাকে পুনর্ব্বার ফিরাইয়া আনিতে হইবে;—যে কল্যাণ একদিন হিন্দু দর্শন প্রচার করিয়াছিল, সেই কল্যাণ আজ বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে নব্য হিন্দু প্রচারককে বহন করিয়া ফিরিতে হইবে। একদিন যেমন যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, শক, কাম্বোজ প্রভৃতি সম্পর্কে সে দরদী হইয়াছিল—আজও তাহাকে সেইরূপ দরদ পোষণ করিতে হইবে।

হিন্দু তুমি ভুলিও না—

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দু সভ্যতার অন্তরে। তুমি হিন্দু! তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। অটল অচল বিশ্বাসের শক্তিতে অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয় হইতে জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দু-সমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার মথুরা, তোমারি কৈশোরে মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগরসৈকত।"

দেশে দেশে তোমাকে তপোবনের সেই বাণী বহন করিয়া ফিরিতে হইবে...

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

গ্রন্থ-পরিচয়

রূপ-সায়র—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ প্রণীত গল্পগ্রন্থ, মূল্য দুই টাকা। প্রধান প্রাপ্তিস্থান এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স—২৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই গ্রন্থে 'মহাকাব্য রচনা', 'ডানপিটে', 'প্রেমের অভিষেক', 'অদৃষ্টের পরিহাস', 'রূপ-দেওয়ালী', প্রভৃতি কয়টি গল্প আছে। এই গল্পগুলি পূর্ব্বে পুষ্পপাত্রে বাহির হইয়াছিল। প্রথম দু'টি গল্পের সুর বাংলায় অনেকটা নূতন। বেপরোয়া জীবনকে সংসার-বন্ধন-মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলে প্রকৃতির কত নিগূঢ় বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে, কি ভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা কি ভাবে সম্ভব ও করায়ত্ত হয়, তাহারই পরিচয় এই গল্পের নায়কদের অসীম সাহসিকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। শেষের তিনটি গল্প প্রেমের,—প্রেমের হইলেও ইহা গতানুগতিক সাধারণ প্রেম নহে, এ প্রেমের গল্পে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও বাস্তবতা আছে—এবং ইহার মধ্যে ভাবিবার, শিখিবার ও চিন্তা করিবারও বস্তু আছে, নূতনত্বও আছে। পুষ্পপাত্রে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহার বেশী প্রশংসা পুষ্পপাত্রে করিয়া লাভ নাই—পাঠক-পাঠিকা পড়িয়া দেখিলেই এই সুন্দর গল্পগুলির বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইবেন। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর হইলেও গ্রন্থের আয়তন হিসাবে মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে।

'বিপ্লবের পরে রাশিয়া'—শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, দাম ছয় আনা। এই ৪৯ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানির মধ্যে 'সোভিয়েটের জয়যাত্রা', 'সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমজীবিগণের অবস্থা', 'সামরিক শক্তি', 'মধ্য এসিয়াতে বোলশেভিক নীতি', 'রাশিয়ার লোক শিক্ষা', 'উচ্চশিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ আছে। বইখানি পড়িলে বর্ত্তমান রাশিয়ার অবস্থা কেমন, সে সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মিবে। বইখানিতে বর্ণশুদ্ধি প্রচুর রহিয়া গিয়াছে।

পরাজয়

শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর

গল্প

সংকীর্ণ স্থান আর অবরুদ্ধ আলো বাতাসের মধ্যে জীবনের চারটি বছর কেটে গেছে এই ছাব্বিশ জনের। ছাব্বিশ জন মানুষ ছাব্বিশটা 'মেশিন' যেন। জীবনটা এদের কাছে মামুলী একঘেয়ে, এ পথে চলবার মোহ এদের নেই যেতে হয় তাই যাওয়া।

প্রকাণ্ড বাড়ীটার নীচের তলাটা কারখানা—রুটি তৈরী হয়। চারিদিকে জাল দেওয়া, আগে রুটি আর বিস্কুট চুরী হোত তারই জন্য এই ব্যবস্থা।

পাঁচ আনা মূল্যে আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিনকার জীবনটা এখানে ক্ষয় করে দিচ্ছি। মুখের শ্যামল লাবণ্য পাণ্ডুর হয়ে গেছে। হাতের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে আগুন আর ময়দার সঙ্গে লড়াই করে করে। বুকের বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসের ওপর ঘনিয়ে এসেছে অবসাদ, চোখে যে তারুণ্যের স্ফূর্ত্তি জেগেছিল মৃত্যুর কালিমা ঘনিয়ে এসেছে তার ওপর। পেষণ ক্রিয়া চলেছে সারাদিনই মালিকের সিন্দুকটাকে ভরিয়ে তোলবার জন্য।

প্রকাণ্ড উনানটা—তারই সাতটা বড় বড় খুপরি। সর্দ্দার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই আগুনে রুটি সেঁকে, আর আমরা সারাদিন ময়দা মাখি সর্দ্দারকে যোগান দেবার জন্য। মালিক সময় সময় চড়াগলায় জিজ্ঞেস করে যান—কত রুটি তৈরী হোল।

দিনের মধ্যে বাইরে যাবার দরজাটা তিনবার মাত্র খোলা হোত রুটি বাইরে চালান দেবার জন্য। নাহ'লে দিনরাত আমরা বন্দী। তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ীটা আমাদের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে যেন।'

বাইরের দোকানঘরে আরো চারজন কাজ করতো। অবসর পেলে আমাদের সঙ্গে একটু আড্ডা জমিয়ে যেত। মুখে তাদের হাসি, চোখে চঞ্চল দৃষ্টি, প্রাণে বসন্তের নেশা—আমাদের চেয়ে তাদের অবস্থাটা ভাল। তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে আমাদের কোথায় যেন বাধতো।

আমাদের চোখে বসন্তের আমেজ জাগিয়ে দিয়েছিল ঐ তরুণী মেয়েটা। রোজ সকালে এসে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে সে আমাদের কাছ থেকে বিস্কুট চেয়ে নিত। সে এসে দাঁড়ালেই তাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করতো—ভাল আছ তো?

—তোমার চুলে আজ আর ফুল পরনি কেন?

—এলোচুলে তোমায় বেশ মানিয়েছে কিন্তু!

—এখনো চা খাওয়া হয় নি?

—নীল সাড়ীখানায় তোমায় বেশ মানিয়েছে!

এমনিভাবে অনর্গল তারা কথা কয়ে যায় ঝরণা ধারার মত।

ও শুধু একটু হেসে দু-একটা জবাব দেয় তারপরই বিস্কুটগুলো নিয়ে চলে যায়। হাসিটা ওর মুখে কিন্তু ভারি সুন্দর মানায়।

ও চলে গেলেই আমাদের মনে হয়, যেন জীবনের উৎস শুকিয়ে আকাশের বুকে সোনালী প্রভাত যেন মিশিয়ে গেছে। আবার সুরু হয় সেই আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ, সেই অশ্লীল আলোচনা, সেই গলদঘর্ম্ম—

কিছুক্ষণ পরে সর্দ্দার বলে—ও আমাদের দেবতা—

সুখন বলে—ও যদি আমার বোন হোত—

লছমন বলে—আমি যদি ওর ছোট ভাই হতুম—

ওকে ঘিরে আমাদের যত কিছু কামনা বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা সবই যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতো। মূর্ত্তিমতী বসন্ত শ্রীর মত যখন সে এসে দাঁড়াতো আমাদের জানালার সামনে, প্রভাতী রোদের মত তখন আমাদের মন সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়তো। মনে হতো আমাদের যেন আর কোন কষ্টই নেই, সব দুঃখই যেন আমাদের শেষ হয়ে গেছে।

* * *

হঠাৎ মালিক একজন নতুন লোক নিযুক্ত করলেন, কারখানার দেখাশুনা করবার জন্য। একদিনের আলাপেই সে আমাদের সঙ্গে বেশ জমে গেল।

ভারি ফুর্তিবাজ আমুদে লোক, বয়স প্রায় বছর ত্রিশ হবে, নাম রহমন। সে নাকি যুদ্ধের ফেরতা, তার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ চেহারাটাই তার সাক্ষী।

কেবল মেয়েদের কথা বলতেই সে ভালবাসে—বসোরা দিয়ে মেসোপটেমিয়া যাবার সময় ক'টা মেয়ে তাকে ভালবেসেছিল, যে বাড়ীতে সে গত চারমাস ছিল সেখানকার চারটে মেয়ের সঙ্গে সে এমন ভাব করে ফেলেছিল যে, তাদের মধ্যে নাকি খুনোখুনি বেধে গিয়েছিলো—কেবল এই সবই কথা। মাঝে মাঝে হা-হা করে হেসে উঠতো—সে সঙ্গে আমাদের বুকটা জখম হয়ে উঠতো।

সব সময়েই সে থাকতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর মুখে তার একটা বিজয় গর্ব্বের হাসি লেগে থাকতো সর্ব্বদাই।

*　　*　　*

সে দিনটা ছিল ভারি মেঘলা।

কাজ করতে আমাদের ভালো লাগছিল না। এমন সময় রহমন আমাদের ঘরে এসে আলাপ জমিয়ে দিলে—সেই মেয়েদের কথা।

গোঁফটা দু-আঙ্গুলে পাকাতে পাকাতে রহমন বললে—এ তোমার রুটি সেঁকা বিদ্যে নয় সর্দ্দারজি—সব আওরাৎই আমার কাছে হার মেনে যাবে—হাহাঃ—

—সর্দ্দার বলল—পল্‌কা বাঁশের সঙ্গে লড়েছো কি? পাকা কঞ্চীর সঙ্গে তো কখনো লড়নি!

রহমন জিজ্ঞেস করলো—তার মানে?

—মানে টানে কিছু নেই—ব'লে সর্দ্দার খুপরীর মধ্যে রুটিগুলোকে সাজাতে লাগলো।

রহমন কিন্তু নাছোড়বান্দা; সর্দ্দারের কথার হেঁয়ালী তাকে বুঝিয়ে বলতেই হবে। অনেক কথা কাটাকাটির পর বিরক্তকণ্ঠে সর্দ্দার বললো—বলছিলুম মনিয়ার কথা।

হা হা হাঃ—এই, আচ্ছা আমায় এক মাস সময় দাও!

—তার চেয়ে একবছর নাও না কেন!

—আচ্ছা দেখো পনেরো রোজ বাদে—পনেরো রোজ সময় দাও—

পকেট থেকে ছোট একখানা খাতা বার করে লিখতে লিখতে রহমন বললে—এ রুটি ভাজা বিদ্যে নয় সর্দ্দার—এ দস্তুর মাফিক হাতে-নাতে শেখা বিদ্যে—

তারপর খাতাখানা পকেটে রেখে গুণ্‌ গুণ্‌ করে গাইতে গাইতে সে বেরিয়ে গেল।

আমাদের রাগ হোল সর্দ্দারের ওপর—এভাবে মনিয়াকে জড়াবার কি দরকার ছিল।

—আরে তোরা কি বুঝিস বলতো? মনিয়ার কাছে গেলেই লাথি খাবে—সর্দ্দার বললো।

আমাদের মনে একটা জোর এল, বুকের রক্তে একটা বিশ্বাসের তুফান জেগে উঠলো—রহমন বলে কি! পাথরের কেল্লাই না হয় সে জয় করেছে, তা বলে কি হাওয়ার কেল্লা দখল করা এতই সোজা—মনিয়া যে হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা, স্বপ্নের মত!

মনের সন্দেহটাকে চাপা দেবার জন্য এ পনেরো দিন আমরা অবিশ্রান্ত কাজ করতে লাগলুম। এতরুটি আমরা তৈরী করে ফেললুম যে, আমাদের একদিনের ছুটি দেওয়া হোল।

মনিয়াকে আর একদিন দেখিনি।

ছুটির দিনটা আমরা সকলে বসে তারি কথা আলোচনা করছিলুম। মেঘে মেঘে আকাশ সেদিন অন্ধকার হয়ে উঠেছে; মাঝে মাঝে মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথাবার্ত্তার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের মনে সন্দেহের কুয়াসা জমে উঠেছিল।

হঠাৎ গুণ্‌ গুণ্‌ করে গান গাইতে গাইতে রহমন এসে হাজির হোল—এ তোমার রুটি সেঁকা নয়, সর্দ্দারজী দেখবে মজা—হাহাহাঃ—

রহমন দরজার পাশ থেকে মনিয়াকে টেনে আনলো—হাতে তার একগোছা ফুল, চোখে আবেশ মাখা!

আমাদের ভাবগতিক দেখে রহমন হেসে উঠলো—হাহাহাঃ। মনিয়ার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো।

যে আমাদের মানসপটে এতদিন দেবী হয়ে ছিল, সে আজ পাঁকের চেয়েও অধম হয়ে গেছে। কেমন যেন একটা অনুভূতির জ্বালা আমাদের চোখে ফুটে উঠলো। সে শুধু বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল আমাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির দিকে—তেমনি প্রশান্ত, স্নিগ্ধ অপরূপ সুন্দর ভাবে!

আমরা সুরু করলাম, নানা রকম অশ্লীল ঠাট্টা একান্ত নির্দ্দয় ভাবে।

সব শুনে মনিয়া একবার ঘৃণাভরে আমাদের পানে—তাকিয়ে বললে—জানোয়ার শয়তানের দল! বলেই সে ছুটে চলে গেল—

সেই থেকে মনিয়াকে আমরা আর কখনো দেখিনি! তেমনি প্রভাতী রোদ এসে আমাদের আশীর্ব্বাদ করে যায়—কিন্তু মনিয়া আর আসে না। দিন আমাদের কাটে তেমনি বৈচিত্র্যহীন ভাবে, নবপ্রভাত আমাদের কাছে বহন করে আনে ক্লান্তি—দিন তবু চলে।

* Maxim Gorky, লিখিত Twenty Six and One নামক গল্পের মর্ম্মানুবাদ

তৃতীয় ছবি শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবীর "রাত্রি এসে যেথায় মেশে। দিনের পারাবারে—"পরিকল্পনাটি পাওয়া গিয়াছে রবীন্দ্রনাথ হইতে, উৎসাহ দিতেছেন ভারতবর্ষ। একদিন ফল ভালই হইবে আশা করা যায়।

চতুর্থ ছবি শ্রীযুক্ত কুলজারঞ্জন চৌধুরীর "মাছধরা।" বাংলার প্রায় সকল নদীতেই এই দৃশ্য দেখা যায়। দৃশ্যটি অতি সাধারণ কিন্তু ইহার মধ্যেকার ভাবটি বেশ। কিন্তু মাছরাঙাটাকে মনে হয় যেন পায়রা আর ধীবরটির হাত কয়েক নীচে নৌকাখানাকে ধীবর ও জালের অনুপাতে মনে হয় যেন একটা মোচার খোলা।

প্রবাসী—শ্রাবণ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে চারটি—তাহাদের মধ্যে একটা ইটালিয়ান হইতে।

প্রথম গল্প শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায়ের "সাধ"—মেয়ের নয় একটী নিঃসঙ্গ পুরুষের অন্তরের। রচনাটিকে চিত্র বলাই ঠিক! মন্দ হয় নাই। পড়ার পরে মনে একটু ছাপ থাকে। ভাষা পরিষ্কার।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরীর—"চুরির দায়।" এইটিই ইটালিয়ান হইতে।

তৃতীয় গল্প শ্রীসত্যভূষণ সেনের "দেড়টাকা।" চলনসই।

চতুর্থ গল্প শ্রীসুবোধ বসুর "মামার মোটর।" রচনাটি লঘু—পড়িতে মন্দ লাগে না। মধ্যে যে দু'একখানি চিত্র আছে, বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে অঙ্কিত। চালিয়াৎ তরুণটিকে পরিশেষে যে ভাবে লজ্জা দেওয়া হইয়াছে, তাহা Dra atic করিলে বেশ হইত।

এ সংখ্যায় রঙিণ ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি—"একটী প্রাচীন চিত্র হইতে।"

দ্বিতীয় ছবি "আর তুর্ক অঙ্কিত "ইস্পাহান।" ছবিখানিতে বেশ একটা ঔদার্য্য ও শান্তি আছে।

তৃতীয় ছবি শ্রীরমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর "দোকান।" আড়ষ্ট।

বসুমতী—আষাঢ়—১৩৩৮

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে পাচটি।

প্রথম গল্প শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "অকিঞ্চনের দাদা।" গল্পটির কয়েকটি দৃশ্য রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না—বাক্য কৌশলে তাহা সুস্পষ্টই। বরং কাঁচা হাতের চিত্রগুলি যেন একটু রস-ভঙ্গ করিয়াছে। গল্পটি দীর্ঘ, কিন্তু পড়িতে একতিলও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, প্রথম হইতে শেষ অবধি কৌতুকে ভাসিয়া চলে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমনীন্দ্র লাল বন্দোপাধ্যায়ের "নারায়ণীর অদৃষ্ট।" গল্পটি অনাবশ্যক দীর্ঘ,—স্থানে স্থানে মনে হয় কোন দৈনিক সংবাদ-পত্রে হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গা বিবরণ পাঠ করিতেছি। তাহা ছাড়া, পাপ করিলে শাস্তি এবং পুণ্য করিলে সুখ, এ কথাটা এমন মোটা ভাবে বলা হইয়াছে যে সমস্ত রচনাটি একেবারে ব্যর্থ। লেখাটি পড়িতে আরম্ভ করিলে, গল্পের আমোদ অপেক্ষা হিতোপদেশের পীড়নই মনে অনুভূত হয়। এ ধরণের গল্প বটতলারই বিশেষত্ব বলিয়া এতদিন জানা ছিল।

তৃতীয় গল্প শ্রীগিরীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "সুধা-কণা।" গল্পটির প্রারম্ভে এই মর্ম্মে ক্ষুদ্র একটী সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে যে, ইহা ভগবানের অপূর্ব্ব প্রকাশের একটী সত্য কাহিনী। কাজেই পরিসমাপ্তিটুকু অপূর্ব্ব! একজন কিছু না-খাইয়াই ত্রিশ বৎসর রূপলাবণ্যযুক্ত সুস্থ দেহে দিব্য বাঁচিয়া আছে। কিন্তু লেখাটি মানুষের কেরামতি বলিয়া একদম রদ্দি। লেখক বলিতেছেন—"বাঙ্গলার গৃহে আজ তৃতীয় ব্যক্তির স্থান ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে. বিশেষ সে তৃতীয় ব্যক্তি যদি দুভর বিধবা হয়।" হায় বাঙালী! তোমার গৃহে অনেক প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, তুমি এমন জঘন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত; আর চাহিয়া দেখ, ঐ বিহারের যব-ভূট্টার ক্ষেত শুকাইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে, তবু সেখানে গৃহে গৃহে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এমন কি সপ্তম পুরুষও দিব্য আরামে খৈনি ডলিয়া একজনের রোজগারে পেট ভরিয়া দাল-রুটি সেবন করিতেছে। যাহা হউক, বসুমতীর দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে। পর পর দুইটি গল্পেই তাহা অতি স্থূলভাবে প্রকাশিত।

চতুর্থ গল্প শ্রীমতিলাল দাশ (এম-এ, বি-এল) র "স্বামী ও স্ত্রী।" মনে করিয়াছিলাম, বুঝি রঙ্গ-কৌতুক অথবা কোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান বা উত্থাপন। শেষে দেখি হায়! বড়লোকের মেয়ে ও গরীবের ছেলের

একটা আজগুবী ব্যাপার। লেখকের স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আচরণ এমন হৃদয়হীন ও আজগুবি যে মনে হয়, লেখক গল্পটি লিখিবার কালে, অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। স্বামী সংসার চিন্তায়, পরিশ্রমে দিন দিন শুকাইয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে অথচ স্ত্রী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে, এ কথাটা এ দেশের মেয়ের সম্বন্ধে একটুও লজ্জা বোধ হইল না, ইহাই আশ্চর্য্য!

পঞ্চম গল্প শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের "তপশ্চর্য্যা" —বিষোদ্গার। আশা করি, যোগাক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী (বি-এস সি)র "মরীচিকা।" পরম নিষ্ঠাবান্, শিক্ষিত ও ধনী পিতা এবং তাঁহার পশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী পুত্রের মধ্যে বিরোধ। গল্পে বিরোধের কারণটা স্পষ্ট নয় কিন্তু পিতার ক্রোধ ও পুত্রের আত্মাভিমান সুপ্রকট। পুত্র এক বিলাতি তরুণীর পাণী-পীড়নে সচেষ্ট থাকিয়া পরিশেষে পিতার কঠিন রোগ-সংবাদে সেই সদিচ্ছা ত্যাগ করিয়া পিতার কাছে ফিরিয়া যায়। মরীচিকার মায়াজাল ইহার মধ্যে কোথাও সুস্পষ্ট নয়—কাজেই নামটিও ঠিক হয় নাই। "কেঁচেগণ্ডুস" নামটি কেমন মানায়?

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে তিনখানি।

প্রথম ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেন গুপ্তের—বিরহিণী যক্ষী। দেখিলে মনে হয় যেন এক পারসীক সুন্দরী। ছবিখানি করুণ হওয়া উচিত ছিল, আর হওয়া উচিত ছিল চাঁদের আলো ঠিক চাঁদের আলোর মতই। ইহা অবশ্য শিল্পীর ত্রুটি নয়—খোদার উপর খোদকারী।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহের "অপরাহ্নে"—ভরা কলসী মাথায় এক পশ্চিমা তরুণী, বোধ হয় মহুয়া গাছের তলা দিয়া যাইতেছে। দেহে তাহার ভরা যৌবন, মুখে তাহার মুচ্‌কি হাসি—ভাল না লাগিয়া যায় কোথায়?

তৃতীয় ছবি এ, কে, চ্যাটার্জ্জীর "আব্দার।" শিল্পী নিশ্চয়ই বাঙালী, নামে সাহেবী ঢঙ্ থাকিলে কি হয়। আর ছবি, থাক, সে কথা আর নাই বলিলাম। বাঁচিয়া থাক্ বাংলার মাসিক-পত্রিকা—ছবি প্রকাশের ভয় কি?

স্মৃতি পূজা

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
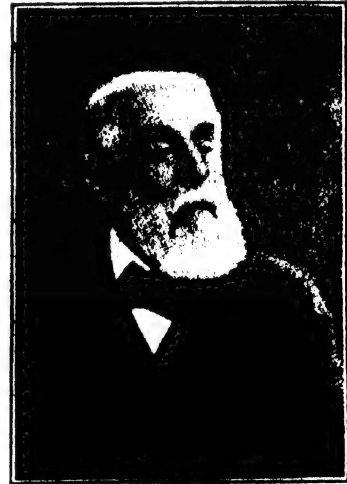
৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার বিরুদ্ধে একটী বেশ শত্রুদল গঠন করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী কি হইবে তাহা ভবিতব্যই জানেন। ইউরোপের ও আমেরিকার বর্ত্তমান সমস্ত শাসন প্রণালীগুলিই পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। যে দল কোন রকমে দেশের অপরাপর জন সম্প্রদায়কে কোন রকমে হস্তগত করিতে পারে, তাহারাই দিনকতক শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকে। পতিতের উপর অত্যাচার তাহাদের অস্থি-মজ্জাগত। ভারতকে দিয়া হয়ত ভগবান এমন শাসন-প্রণালী গঠন করাইতে চাহেন, যেখানে প্রবলের অত্যাচার চিরকালের জন্য শাসন-নীতির ইতিহাস হইতে দূরীভূত হইবে। জাতির উপর জাতির হিংসা অন্তর্হিত হইবে। সমগ্র মানব-জাতি আপনাকে এক পরিবার ভুক্ত বলিয়া মনে করিবে। এগুলি অবশ্য যুগ ধর্ম্মের কথা। সোভিয়েট রসিয়া অনেক আশা দিয়াছিল, কিন্তু তাহা পুরণ করিতে পারিলনা। কামাল শাসিত তুর্কি ও মুসোলিনী শাসিত ইটালী 'টিরানীর' নামান্তর মাত্র। তাই আজ সমগ্র জগৎ দারুণ যন্ত্রণায় ও ভীষণ উৎকণ্ঠা বক্ষে পোষণ করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র মহামানবটীর দিকে তাকাইয়া আছে।

একদল বলিতেছেন, ডারহাম সাহেব কানাডায় যেমন সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন কিম্বা কারসন্ সাহেব যেমন আয়র্লণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ঐ রকম একটা ব্যবস্থা ভারত-সম্বন্ধে প্রণয়ন হইলেই যথেষ্ট। আমরা কিন্তু বলি, তাহা হইলেই ভারতের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। মহাত্মা যীশু জন্মাইবার পূর্ব্বে পুরাকালে ইহুদি জাতি যেমন শতধা বিভক্ত হইয়া সহস্র সহস্র নেতার অধীনে চালিত হইয়া বিবিধ প্রকারের শিকল দেহের সর্ব্বাঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে। এখানে বর্ণের সমাধান হওয়া যেমন দুরূহ, বিবিধ ধর্ম্মবাদের সমন্বয় করাও তেমনি কঠিন। স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতও ভীষণ। শুধু কতকগুলি রচা কথার সাহায্যে কানাডা বা আয়র্লণ্ডকে নকল করিয়া কোন শাসন-প্রথা প্রচলন করিতে গেলে ভুল করা হইবে। মহাত্মাজী ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতির ন্যায় সাধারণ রাজ-নৈতিক ন'ন, তাঁহার কার্য্য-প্রণালীও তাঁহাদের ন্যায় গতানুগতিকতার বশ্য নয়, সেইজন্যই তাঁহার নিকট আমরা একটা অভিনব কিছু চাই, যাহা প্রকৃত নূতন যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নিকট আশা করা যায়।

বাংলার কংগ্রেস-সালিসের খবর কি?

মিঃ আনি পালাইয়াছেন। দুই পক্ষই বস্তা বস্তা কাগজ আনিয়া তাঁহার এজলাস ভর্ত্তি করিয়াছিল। বড় বড় কৌন্সিল তাঁহাদের মক্কেলদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। হাকিমী করিতে অনভ্যস্ত মিষ্টার আনির তাহা ভাল লাগিবে কেন, তাই তিনি ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। এখানে আমাদের একটা শোনা কথা মনে পড়িয়া গেল। স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষকে কোন একটা খুনি মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বর্দ্ধমানের কোন এক এজলাসে একবার হাজির হইতে হইয়াছিল। মোকদ্দমার অবস্থা সঙ্গিন দেখিয়া ব্যারিষ্টার প্রবর তাঁহার পুস্তকালয়ের যাবতীয় পুস্তক গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া এজলাসে হাজির করেন। মফস্বলের হাকিম মিঃ ঘোষের পুস্তক-রাজি দেখিয়া একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া মিঃ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐগুলি আনিবার প্রয়োজন কি? মিঃ ঘোষ গম্ভীরভাবে রুমালে মুখ মুছিয়া বলেন, তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার মক্কেল নির্দ্দোষ, ঐ বইগুলি পাঠ করিলে যে-ধারায় তাহা প্রমাণ হইবে তাহা তিনি জানিতে পারিবেন, এই জন্যই ঐ পুস্তকগুলি তিনি কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে লইয়া আসিয়াছেন। হাকিম মহোদয় তখন একটা লম্বা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন—মিঃ ঘোষ, বই রাখুন, আপনি যখন বলিতেছেন তখন আসামীকে আমি নির্দ্দোষী বলিয়াই ছাড়িয়া দিতেছি। মিঃ অ্যানির অবস্থাও বোধ হয় অনেকটা তদ্রূপই হইয়াছিল।

তাহাতো হইল। কিন্তু বাংলার রাজ-নীতি ক্ষেত্রে যে বিষ্ঠার পূতিগন্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে তাহার নিরাকরণ হইবে কি? আমাদের মনে হয় বরং বাড়িয়াই চলিল। ১লা আগষ্ট কোন কাগজে একটা ফর্দ্দ ছাপা হইয়াছে। আমরা যাহা সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলাম অর্থাৎ গত দুই সংখ্যায় যে কথার অবতারণা করিয়াছিলাম, তাহাই এবার ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইলাম। গত চারি বৎসর যখন মিঃ সেনগুপ্ত কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র

ছিলেন, তখন যাহাদিগকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছিল, কাগজখানি তাহারই একটা লিষ্ট দিয়াছে। আমরা বলিব, উহা কিছু নূতন কথা নয়। কোন একটা অন্যায় জিদ বজায় রাখিবার জন্য অন্যায় যুদ্ধে যাহারা সাহায্য করে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ দেখাইতে হইবেই, ইহা তো সনাতন সত্য। পৃথিবীতে এমন কোন মহাপুরুষ নাই যিনি আপনাকে ইহারও উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। কোন কোন কাগজ দুই পক্ষের হইয়া যে গাল আরম্ভ করিয়াছে তাহা দাশরথির পাঁচালীকেও হার মানাইয়াছে। উহার অবসান হইবে না! কেন না, নেতারা স্বয়ংই উহাদের আস্কারা দিয়া আসিতেছেন, সারা বাংলা আজ কোথায় দাঁড়াইল, দলাদলি থামাইয়া একবার সে কথা ভাবিবেন কি ?

কর্পোরেশন ও ভবিষ্যৎ বাংলার শাসন

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, কলিকাতা করপোরেশন স্বরাজীদের হাতে না থাকিলে, উহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে দলাদলি চলিতেছে, এত্র উৎকটভাবে উহা কখনই আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না। আবার ভবিষ্যতে এই দলাদলি আরও বৃদ্ধি পাইবে, যখন বাংলার সরকার কংগ্রেসের হস্তগত হইবে। এই কথার উত্তর কি, তাহা আমরা ঠিক না জানিলেও তবে একথা সত্য যে বাংলায় বর্ত্তমানে যেরূপ ভ্রাতৃদ্রোহ চলিতেছে, যদি তদ্রূপই চলে তবে অন্যান্য প্রদেশে যাহাই হউক না কেন, বাংলার কংগ্রেস প্রধানকে কখনই প্রধান মন্ত্রী হইবার জন্য আহ্বান করা হইবে না। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান জন সংখ্যা প্রায়ই সমান। বাংলার কংগ্রেসী দল যদি মুসলমান নেতাদের হস্তগত না রাখিতে পারেন তাহা হইলে হয়ত মুসলিম লিগের সভাপতিকেই প্রধান মন্ত্রী করিয়া, সরকার পক্ষ ও অ-কংগ্রেসী দল লইয়া রাজ্য-শাসন চালান হইবে। সুতরাং কালনেমীর লঙ্কা-ভাগের মতন তাঁহাদের সমস্ত আশাই বৃথা হইয়া যাইতে পারে। এই বিষয়টী যেন বিশেষ করিয়া মনে রাখেন।

ভারতীয় ঋণ

ভারতীয় ঋণ লইয়া আবার গোলমাল উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের সমস্ত ঋণের পরিমাণ ১, ১০০ কোটী। কংগ্রেস ঠিক করিয়াছেন যে, উক্ত ঋণের ৭২৯ কোটী টাকা অযথা ভাবে খরচ করা হইয়াছে। উহাদ্বারা ভারতের বা ভারতবাসীর কোন উপকার হয় নাই! সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ তাঁহার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য উক্ত অর্থব্যয় করিয়া ঋণ-ভার ভারতের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে, ভারতের ঋণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে গেলে যেটুকু ইতিহাসের প্রয়োজন আমরা এখানে সেইটুকুই আলোচনা করিতেছি।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে ব্যবসা করিতেই আসিয়াছিলেন, রাজ্য-স্থাপন করিবার কোন উদ্দেশ্যই প্রথমে তাঁহাদের ছিল না। ব্যবসার কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়া দেশীয় শাসন-কর্ত্তাদের নিকট হইতে বাধা পাইয়া মোগল সরকার হইতে কতকগুলি বাণিজ্য-কেন্দ্র খাস ভাবে দখল করিতে সুরু করেন। তখন মোগল রাজত্বের অবসান হইয়া আসিতেছে, কাজেই ইংরাজ বণিকগণ তাঁহাদের পরওয়ানার বলে কতকটা স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির শাসনভার গ্রহণ করিল। সে সব প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কর্ণগোচর হইলেও সামান্য নজর গ্রহণ করিয়া বা একটু তদ্বির করিতে পারিলেই তাঁহারা নিরস্ত থাকিয়া যাইতেন। স্বাধীন বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন ব্যাপার লইয়াই ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের কর্ণাটে ও বাংলায় সংঘর্ষ ঘটে। কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া লস্কর সৈন্য ও গোরা সৈন্য সংগ্রহ করিতে হয়। একবার সৈন্যদল গঠন হইলে উহাকে বিদায় দেওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। রণক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্য দেশীয় সৈন্যের তুলনায় আকাশপাতাল তফাৎ প্রমাণিত হইয়া যাওয়ায়, দেশ-জয়ের আশা ক্রমশঃ তাহাদের মাথায় ঢুকে। তাহার পরই ভারতের এক একটী প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন শাসন কর্ত্তাদের পরাজিত করিয়া দখল করিতে থাকে। ইংরাজ প্রধানগণ ভারতে যে ব্যবস্থা করিতেন, ইংলণ্ডের বোর্ড অফ্ ডিরেক্টর তাহা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা ভারতে ব্যবসায়ী হিসাবেই থাকিতে চাহিতেন, এইজন্য অনর্থক যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের খরচা বৃদ্ধি করিতে চাহিতেন না। মোটকথা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারত সরকারকে মারহাট্টা, টিপু সুলতান, শিখদের সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য ঋণ করিতে হইয়াছিল।

তাহার পর সিপাহী যুদ্ধের সময় এই ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৬খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিস্‌রেলী যখন স্বর্গীয়া মহারাণীকে ভারতের সাম্রাজ্ঞী হিসাবে ঘোষণা করেন, তখন ভারতের ঋণ-ভার দেখিয়া তিনি বেশ খানিকটা চমকাইয়া ছিলেন। তাহারপর আফগান যুদ্ধ, বর্ম্মা-যুদ্ধ ইত্যাদিতে এই ঋণ-জাল বাড়িয়া যায়। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের কর্ণধার নিযুক্ত হইয়া আসেন, তখন তিনি বলেন যে, পৃথিবীর তাবৎ সভ্যদেশেই জাতীয়-ঋণ নামে একটা ঋণ আছে। উহা সাধারণ প্রজার পক্ষে বেশ উপকারী। কেননা, তাহার নির্ভাবনায় তাহাদের সঞ্চিত অর্থ উহাতে গচ্ছিত রাখিতে পারে। এই জন্য তিনি ভারতীয় ঋণকে নূতন জীবন দিবার জন্য উহার সুদের হার কমাইয়া কতকগুলি জন-হিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিবার জন্য নূতন ঋণ গ্রহণ করেন। মহাত্মা গোখেল এক সময়ে ঋণ করিয়াই ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন ভারতের ঋণের পরিমাণ চার হইতে পাঁচ শত কোটীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারত সরকার ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য ইউরোপে সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাতে উক্ত ঋণ-ভার বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ১, ১০০ কোটীতে পরিণত হইয়াছে।

কংগ্রেস বলিয়াছেন যে, ইষ্ট-কোম্পানী তাহাদের রাজ্য-বিস্তারের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, তাহার জন্য যদি কেহ লাভবান হইয়া থাকে ত তাহা ইংলণ্ড। গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড তাহার স্বার্থ-রক্ষার জন্যই ভারতকে অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল কাজেই উক্ত ঋণ প্রকৃত পক্ষে ভারতের নহে। চীনে বৃটিশ বণিকের সাহায্যে জন্য যে অভিযান করা হইয়াছিল কিম্বা বৃটিশ-শিল্পের বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রসার অভিলাসে বর্ম্মা দখলে আনিবার জন্য যে সমস্ত অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল, উহাদের সকলেরই মূলে বৃটীশ স্বার্থ নিহিত ছিল। সুতরাং ভারত উহা কখনই দিবে না। কংগ্রেসের এই অভিমত প্রকাশ হইবার পর ক্যাপিটাল উহার সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিল। তাহাদের যুক্তির মধ্যে মৌলিকতা না থাকিলেও উহা একেবারেই সারহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ভারতীয় ঋণকে দুইভাকে ভাগ করা যাইতে পারে, ভারতে যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, উহাকে রূপী-লোন বা ভারত হইতে সংগৃহীত ও টাকার দ্বারা পরিমাণিত ভারতীয় ঋণ; আর একটী ষ্টারলিং লোন বা ইংলণ্ড হইতে উত্তোলিত পাউণ্ডে সংগৃহীত ভারতীয় ঋণ। প্রথমোক্ত ঋণটি ভারত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহার হিসাব ভারতীয় অর্থ টাকায়ই রাখা হয়। শেষোক্তটী বিলাত হইতে উত্তোলিত এবং উহার হিসাব বিলাতি অর্থ পাউণ্ডে রাখা হয়। ভারতীয় রাজনীতিবিৎ নেতৃবর্গ যদি মনে করেন যে, রূপীলোনটা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন এবং ষ্টারলিং লোন দিব না বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে ষ্টারলিং লোনেরও অনেক খরিদদার ভারতেরই অধিবাসী এবং ভারতবাসী এবং রূপীলোনের অনেক খরিদ্দার ইউরোপীয়ও আছেন। সুতরাং এ চালে চলিতে গেলে তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে। তাহার পর যদি পূর্ব্বমত বজায় রাখিবার জন্য যে টাকাটা তাঁহাদের মতে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইয়াছেন সে টাকাটা বাদ দিতে চান, তবে উহার কত অংশটা ষ্টারলিং লোন এবং কত অংশটাই বা রূপী-লোন তাহা নির্ণয় করা যেমন কঠিন হইবে উহার অনুপাত করিয়া দেশীয়দের বাদ দিয়া বিদেশীয়দের উপর চাপানও সেইরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, নূতন শাসন-প্রণালীকে দেশ ও বিদেশের নিকট সম্মানিত ও পূজ্য রাখিতে গেলে, সোভিয়েট সরকারের অনুকরণে ভারতীয় ঋণ অগ্রাহ্য করিতে যাওয়া আমাদের বিবেচনায় বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে না। সরকারের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়া অনেক গরীব গৃহস্থ যেমন নিশ্চিন্ত আছেন, সেইরূপ অনেক রাজা মহারাজারাও বেশ শান্ত আছেন। ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া লর্ড ডালহৌসী দেখিলেন, দেশীয় রাজন্যবৃন্দ ভারতের সমতা আনিবার অনেকটা অন্তরায়স্বরূপ। সেই জন্য তিনি Doctrine of lapse প্রবর্ত্তন করিয়া রাজ্যগুলির অস্তিত্ব নাশ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পণ্ডিত-

গণ যদি ভাবেন যে স্বরাজ্য স্থাপিত হইলেই ভারতের ধনিক সম্প্রদায়কে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন তবে তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে তাহাতে তাঁহারা ভারতের গৃহ-বিবাদের পথই প্রশস্ত করিয়া দিবেন। কি ধনী, কি গৃহস্থ যাহারা তাঁহাদের প্রস্তাবিত প্রথানুযায়ী তাঁহাদের মূলধন হইতে বঞ্চিত হইবেন, সিপাহী-বিদ্রোহের রাজ্যচ্যুত সীমান্তদের মতন তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেই। ভারতের বাহিরে তাঁহাদের শত্রু-পক্ষ ন্যায়ের আচরণে প্রবল ভাব ধারণ করিবে। কোন নূতন শাসন প্রণালীর পক্ষে তাহা কখনই মঙ্গল-জনক হইতে পারে না।

ভারতের ঋণ সম্বন্ধে মহাত্মা

এ সম্বন্ধে মহাত্মা বলিতেছেন—"ব্রিটেন এবং ভারত-বর্ষের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষতঃ এ সময়। পল্লবগ্রাহী রাজনৈতিক-গণ কর্ত্তৃক এই রিপোর্ট রচিত নহে, খ্যাতি ও জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই এই রিপোর্ট লিখিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতের মধ্যে যে সমস্ত আর্থিক লেন-দেন হইয়াছে, এই রিপোর্টে তাহারই সমালোচনা করা হইয়াছে। এই রিপোর্টকে কেহ যেন কংগ্রেসের চরম দাবী বলিয়া মনে না করেন। রিপোর্টখানিতে কংগ্রেস অনেক তথ্য পাইবেন, ইচ্ছা করিলে কংগ্রেস যে কোন দাবী উপেক্ষা করিতে পারেন আবার আবশ্যক হইলে যে-কোন দাবী যোগ করিতে পারেন। কংগ্রেস কখনও বলে নাই যে, তাহার দাবী পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এবিষয় বিচারের ভার মধ্যস্থের উপর প্রদান করাই প্রকৃষ্টতম পন্থা; আইরিশ ফ্রী-ষ্টেটের বেলায় সেইরূপই করা হইয়াছিল। গয়ায় এবং লাহোরে কংগ্রেস যখন অধিক বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল, তখন এরূপ একটি কমিটী গঠন করারই সঙ্কল্প ছিল, সুতরাং কংগ্রেস স্বভাবতঃই সেই সংকল্প অনুযায়ী চলিবে। ভারতবর্ষ যাহাতে অন্ধকারে ঝাঁপ না দেয় কংগ্রেস তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ভারতবর্ষের স্কন্ধে যে ঋণের বোঝা পড়িবে, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে দরিদ্র অধিবাসীদের। এই দরিদ্রদের উপর খরচার বোঝা চাপাইয়া ভারতবর্ষ উদারতা দেখাইতে পারে না।"

বিব্রত ইউরোপ

জার্ম্মাণিকে লইয়া সারা ইউরোপ ও আমেরিকা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ যে হইবে তথাকার মহারথীরা কি জানিতেন না? স্বার্থ তাঁহাদিগকে এমন ভাবে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে তাঁহারা তাহা সম্যকভাবে বুঝিতে পারিলেও বুঝিতে চাহিতেন না। আমরা পূর্ব্বকার সংখ্যায় স্পষ্টই বলিয়াছিলাম যে আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি শক্তি সমূহ যাহারা শিল্প-সম্ভারের উপর নির্ভর করে তাহারা কখনই জার্ম্মাণকে নষ্ট হইতে দিবে না। কিন্তু ফান্সের স্বার্থ তাহা নয়। তাহাদের কৃষিগত জীবন। জার্ম্মাণির নিকট হইতে অর্থটা সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের কম রাজস্বে চলিতে পারে। কাজেই তাহাদের স্বার্থের সহিত অপরাপর শক্তি পুঞ্জের স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। জগৎ-ব্যাপী অর্থ-বিপ্লবে ও তাহারা যদি শিল্পজীবিই থাকিতে চাহে তবে তাঁহারা আর সন্ধির ও শান্তির কথা মুখে আনিবেন না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা যখন সভ্য ইউরোপের কাছে শিল্পের জন্য তাকাইত তখন ইউরোপের শিল্পজীবি হওয়ায় লাভ হইয়াছিল। বর্ত্তমানের এই বিরাট সভ্যতাকে রক্ষা করিতে যাইয়া তাহারা নানা রূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে একের পর একটী করিয়া তাঁহাদের পণ্য করিবার কেন্দ্রগুলি হস্ত চ্যুত হইতেছে। যে জাপান চীন তাহাদের বস্ত্রের জন্য মানচেষ্টারের দিকে তাকাইয়া থাকিত, আজ তাহারা তাহাদের তাবৎ অভাব মোচন করিয়া ভারতের বাজার ও দখল করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। যে আমেরিকার তুলা বিশ্ব-বিখ্যাত ছিল, ভারত ও জাপান হইতে উৎপন্ন তুলা তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া অনেক স্থলেই হঠাইয়া দিয়াছে। কলকজার একচেটিয়া কারবার ও পাশ্চাত্যদের হস্তচ্যুত হইয়া আসিতেছে। প্রতীচ্যের ব্যাঙ্ক ও ইনসিওর কোম্পানীগুলিও মাথা তুলিতেছে। পাশ্চাত্য যদি এই সময়ে কতকটা সামঞ্জস্য করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নূতন প্রথায় চালিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে তবেই পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়া আসিবে, নতুবা তাহা সুদূর পরাহত।

কালের দুন্দুভি

'কালের দুন্দুভি আবার বাজিল ভারতে।' কবি যাহা গাহিয়াছিলেন চিরকালই ভারতে তাহা সত্য হইয়া রহিল। এবার এমন সু-জন্মা বৎসরে বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে খবর আসিতেছে যে তথাকার প্রজারা খাইতে পাইতেছে না। চাষীর গৃহে পয়সা নাই, জমিদার কপর্দ্দকহীন এ অবস্থায় আর কতদিন চলিবে। সহরে চাঁদার তদ্বির চলিতেছে কিন্তু চাঁদা দিবে কে? আর যাহা সংগৃহীত হইবার তাহার সমস্ত অংশটাই কি প্রকৃত স্থলে গিয়া পৌছাইবে। সরকারে পক্ষ হইতে অনেক স্থলে খাজনা রেহাই দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু উহাত রিপু কর্ম্ম, প্রকৃত রক্ষাকার্য্য কতদিনে সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইবে।

বাংলা কাউন্সিল

বাংলার আইন সভায় এবার বিলের শ্রাবণের ধারা বহিয়া গেল। সরকারী ও বে-সরকারী বিলের সংখ্যা প্রায় ষোলটী ছিল। একদিকে যেমন গরম আইন সভায় তেমনি আইনের তর্ক। ব্যাপারটা মন্দ নয়। কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে একটু তারিফ না করিয়া থাকিতে পরিতেছি না। তিনি না বহু দিন কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। তাঁহার একটী প্রস্তাবিত বিলে মোটরের উপর ট্যাক্স বসাইবার কথা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে আইন আছে, তাহাতে লোকাল বোর্ড-গুলির মধ্যে একমাত্র কলিকাতা করপোরেশন ব্যতীত অন্য কেহই মোটরের উপর ট্যাক্স বসাইতে পারে না। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ঐ টাক্সটা বাংলা সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইবে এবং উহার এক একটা অংশ এক একটা লোকাল বোর্ডকে দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে কলিকাতা করপোরেশন চারি লক্ষ টাকা মোটর টাক্স বাবদ পাইয়া থাকে, সুতরাং করপোরেশনের ভাগে ৪ লক্ষ টাকা রাখিয়া বাকী টাকা ভাগ করিয়া দিবেন। তিনি কি জানেন না যে, মোটর ব্যবসায়ীরা নানা প্রকারে সরকার পক্ষকে টাক্স দিয়া আসিতেছে। সেণ্ট্রাল রোড কমিটী তাহাদের উপর এক প্রকার কর ধার্য্য করিয়াছে। পেট্রল ও টায়ার-টিউবের উপর শুল্ক বাড়াইয়া পরোক্ষভাবে তাহাদের আয় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার নূতন ট্যাক্স বসিলে তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করা হইবে এবং পরোক্ষভাবে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীকে সাহায্য করা হইবে। সমস্ত স্বাধীন দেশেই দেশী প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে চলে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে এখানে তাহার ব্যতিক্রম কেন হইবে আমরা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

ডাক্তার নরেশচন্দ্র তাঁহার জুটবিলটী নাকি আইন-সভা হইতে গৃহীত না হওয়ায় সমধিক দুঃখিত হইয়াছেন। জুট-বিলটী কি আমরা তাহা পড়ি নাই। তবে শুনিলাম উহাতে নাকি প্রত্যেক গ্রাম কতটা করিয়া পাট চাষ করিবে ইউনিয়ন বোর্ড তাহাই নির্ণয় করিয়া দিবে। অর্থাৎ পাট চাষটাকে তিনি প্রয়োজনানুযায়ী সংক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাই যদি সত্য হয়, সরকার পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদ হইল কেন? তাঁহারা কি জানেন না যে কোন পণ্য কে তাহার চাহিদা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে তাহার মুল্য বৃদ্ধি হয়। তবে একথা যদি সত্য হয় যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদের সমর্থকগণ কতিপয় ইংরাজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ হানি হইবে বলিয়া উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে উহা খুবই দুঃখের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আর একটী বিল পাশ হইয়াছে, উহা Industry বিল বা দেশের শিল্প প্রসার বিল। উহার দ্বারা দেশে শিল্প প্রচার ও বৃদ্ধি হইতে দেখিলে সুখী হইব। কিন্তু এমন কি মনে হয় না যে প্রাথমিক শিক্ষা বিলের ন্যায় উহা সরকারী দপ্তরের মধ্যেই থাকিবে। অর্থাভাবে যদি বিলের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে আরম্ভ করিতে না পারা যায়, তবে অতটা মেহনৎ করিয়া উহার প্রস্তাব আনয়ন করা হয় কেন? সবটাই কি eye-wash? স্বাধীন দেশ হইলে মন্ত্রীদিগকে নিশ্চয়ই কৈফিয়ৎ দিতে হইত, তবে এখানে এ কথা স্বতন্ত্র ইহা সত্য।

কাশ্মীর দাঙ্গা

হিন্দু-মুসলমানী দাঙ্গা অতি ভীষণ ভাবে কাশ্মীরে আত্মপ্রকাশ করিল কেন? ভারতবর্ষে দুইটী বিভিন্ন,

প্রকৃতির সামন্ত নৃপতি শাসিত দেশ আছে। হায়দ্রাবাদ হিন্দু প্রধান দেশ কিন্তু তথাকার শাসক একজন মুসলমান সামন্ত, সেইরূপ কাশ্মীর মুসলমান প্রধান জনপদ, কিন্তু তথাকার কর্ণধার একজন হিন্দুরাজা। কয়েকদিন ধরিয়া কাশ্মীরে যে নাটকের অভিনয় হইল, তাহা দেখাইয়া অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক বলিতেছেন, ঐ দেশ ভারত যদি হিন্দু প্রধান হইয়া একমাত্র কংগ্রেস কর্ত্তৃক শাসিত হয়, তাহা হইলে যে সমস্ত দুঃখ ঘটিবে তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ কাশ্মীরে অভিনীত হইল। ব্যাপারটা খুব দুঃখের। নিরপেক্ষ তদন্তের একান্ত প্রয়োজন। গোপনে গোপনে যদি কোন উত্তেজনা থাকে, তাহার সাজা হওয়ায় খুব দরকার।

বয়সের গাছ পাথর নাই!

তুর্কির জেরা আগার বয়স বর্ত্তমানে ১৫০ বৎসর। আমরা এতদিন তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া জানিতাম। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ আর একজন আছেন, তাঁহার নাম বাইসিন, নিবাস চীনে। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ২৫০ বৎসর। তাঁহার স্বাস্থ্য এখনও অটুট আছে, তিনি প্রত্যেক দিন ৩৪ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টী বিবাহ করিয়াছেন।

বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ

সম্প্রতি গণিতজ্ঞ শ্রীযুত সোমেশ চন্দ্র বোদের নাম বেশ জমকালো ভাবে শুনা যাইতেছে। ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে ইনি ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুটে গণিতজ্ঞতা দেখাইয়া কলিকাতায় বিশেষ খ্যাতি পান। পরে আমেরিকায় গিয়াও খ্যাতি অর্জ্জন করেন। শোনা যায় ইঁহার মত গণিতজ্ঞ এখন পৃথিবীতেও আছেন কিনা সন্দেহ। তিনি বড় বড় অঙ্কের উত্তর খুব তৎপরতার সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে দিয়া থাকেন। তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, ৩১৯৯৩ ৭১২০৬১৯৯১৯১২৩ ইহার কিউবিক্ রুট কত। তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন, ৬৮৩৯৪৭। প্রত্যহ মাত্র খানিকটা দুগ্ধ খাইয়াই নাকি তিনি জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে তিনি শুদ্ধাচার যোগীর জীবন যাপন করিতেছেন এবং প্রত্যহ স্বর্গস্থ স্ত্রীর সহিত ধ্যানে নাকি তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

অস্পৃশ্যতা পরিহার

অস্পৃশ্যতা দিনে দিনে হিন্দু সমাজকে কত হীনবল করিয়া ফেলিয়াছে চিন্তাশীল হিন্দুমাত্রেই এখন তাহা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী বরাবর হিন্দু সমাজকে অস্পৃশ্যতা পরিহার করিতে বলিতেছেন। —সম্প্রতি আমেদাবাদ সাহীবাগে একটি মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন কালে মহাত্মা বলিয়াছেন—'অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তব্য রাজনৈতিক ব্যাপারের চেয়ে কম নহে। সমাজ সংস্কারে রাজনীতি যাহাতে বাধা না জন্মাইতে পারে আমি সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখি। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নিকট হিন্দুসমাজ বহুঋণে ঋণী—এ ঋণ সমাজকে পরিশোধ করিতে হইবে। সত্যই—অতীতে হিন্দুসমাজ অন্ত্যজদের উপর দানবের মত ব্যবহার করিয়াছে। সে কলঙ্ক হিন্দুসমাজের গৌরবোজ্জ্বল নাম কলঙ্কিত করিয়াছে, আমরা যদি এতদিনও স্বরাজ না পাইয়া থাকি, ঐ কলঙ্কের জন্যই পাই নাই। হিন্দু সমাজ অসঙ্কোচে অস্পৃশ্যদের তাহাদের সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে গ্রহণ করে নাই। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের এখন নিজেদের ভিতরকার এই উচ্চ-নীচ-ভেদ বিচার বিস্মৃত হইতে হইবে। তখনই হিন্দুরা প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হইবেন, কারণ সমাজের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ রাখিতে গেলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ব্বর সাম্প্রদায়িকতায় পর্য্যবসিত হয়। বর্ণাশ্রমে সংযম ও সাম্য থাকিতেই হইবে। অস্পৃশ্যদের কেহও যেন মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের জন্য বলপ্রয়োগ না করে। শান্তিপূর্ণ ভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া মতি গতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাহাদেরও মন্দিরের উন্নতি করিতে হইবে ও বিশুদ্ধ চরিত্র হইতে হইবে। অস্পৃশ্যরা যে দিন হিন্দুধর্ম্মে সমানাধিকার পাইবে সেই দিনই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ঘটিবে।' অস্পৃশ্যতা যেখানে যেমনভাবে যতটাই থাক্ না কেন হিন্দুমাত্রকেই ইহা দূর করিতে অগ্রণী হইতে হইবে। নতুবা উত্থানের আশা নাই—সঙ্কট ক্রমেই ঘনাইয়া আসিবে।

এ বৎসরে কি হইবে ?

গত বৎসরে দেশে সু-জন্মা ছিল, খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য যথেষ্ট সুলভ ছিল তবু একমাত্র পাটের দাম কম হওয়ায় জমিদার, কৃষক সকলেরই দুরবস্থার শেষ গিয়াছে, অন্নাভাবেও অনেকস্থল হইতে আত্মহত্যার খবর শোনা গিয়াছে। এবার আরো সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে। পাটের দাম ত কম আছেই তাহার উপর আবার সমগ্র বাংলা ও আসামে ভীষণ বন্যা হইয়া গেল। এই বন্যায় আউস ও আমন ধান ও পাটের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। কোথাও বা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশময় হাহাকার এখনই পড়িয়া গিয়াছে, ইহার পর তো অবস্থা ক্রমেই আরো শোচনীয় হইতে থাকিবে। প্রকৃতির মারের উপর কাহারো হাত নাই কিন্তু বাংলার আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে এখন হইতে দেশের শাসক-সম্প্রদায় ও নেতাগণ এ বিপদ হইতে যথাসম্ভব পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিয়া তদ্মত ব্যবস্থা করিতে থাকিলে বিশেষ সুখের কারণ হইবে।

অহিংসা নীতি

ভারত-স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় অহিংসনীতিই গ্রহণ করা হইয়াছে—এবং মূলতঃ সর্ব্বত্রই এই নীতি অনুসৃত হইতেছে। তবু কোন স্থলে হিংস নীতির প্রভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিলে, ভারতীয় সকলেই তাহাতে দুঃখিত হন ও রাজনৈতিক অগ্রগমন প্রচেষ্টায় এরূপ কার্য্যে বাধা পড়িল মনে করেন। কিন্তু এইরূপ হিংস ব্যাপারে জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সায় আছে, এইরূপ কল্পনায় ধরিয়া কোন কোন ইঙ্গ-কাগজ কংগ্রেসকে তথা মহাত্মাকে দোষী করিয়া আত্মতৃপ্তি পান। তাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি আবার ঘোষণা করিয়াছেন—'যাহারা গোপনে বা প্রকাশ্যে ঐ সব হত্যাকাণ্ড অনুমোদন করে কিম্বা উৎসাহ দেয়, তাহারা জাতির উন্নতিতে অন্তরায়ই ঘটাইতেছে। নিখিল-ভারত-সমিতি সকল প্রতিষ্ঠানকে ঐরূপ হিংসামূলক কার্য্যের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে প্রচার কার্য্য চালাইতে আহ্বান করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহকেও এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রভাব প্রয়োগের অনুরোধ করিতেছেন।' মহাত্মাগান্ধীও আবার বলিয়াছেন—"অহিংসাই আমাদের মূলনীতি, কায়মনোবাক্যে আমাদের ঐরূপ কার্য্য করিতে হইবে।' মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—বিশেষতঃ যাঁহারা অহিংস অসহযোগ লইয়া আইন অমান্য চালাইয়াছেন, তাঁহাদের হিংসা-পন্থী বা হিংসার সাহায্যকারী বলিয়া দোষী করিবার চেষ্টা একান্তই হাস্যকর। কিন্তু তবু সব বুঝিয়াও যাহারা ইহা করে তাহারা করিবেই।

পণ্ডিত মালব্য

মালব্যজী গোঁড়া হিন্দু, অবশেষে তিনিও কালাপানি পার হইয়া বিলাত চলিলেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে, তিনি তাঁহার প্রিয়তম ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেও সর্ব্বদা প্রস্তুত।

বিদেশী কাপড়

ভারতীয়েরা বিদেশী বর্জ্জন করিতেছে, এই সুযোগে জাপান যথাসম্ভব ভারতের কাপড়ের বাজার অধিকারের চেষ্টা করিতেছে, কাপড় কিনিবার সময় এদিকে সকলেরই দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে জাপানী কাপড় না কিনিতে হয়। জাপানের এই অন্যায় প্রতিযোগীতা বন্ধ করিবার জন্য, মিঃ এইচ্-পি-মোদী প্রয়োজন হইলে বৃটনকে কিছু শুল্ক-সুবিধা দিবার জন্য মহাত্মাকে লিখিয়াছিলেন—মহাত্মা জানাইয়াছেন—যদি প্রতিযোগীতা না থাকে, এবং বিদেশী কাপড় না হইলে আমাদের না চলে এবং স্বাধীন ভারত যদি বৃটনের সমপর্য্যায়ের রাষ্ট্র হয় তবে অন্যান্য সকল দেশের চেয়ে বৃটনকে সুবিধা দেওয়াই আমার অভিমত।

নূতন প্রজাসত্ত্বে কার লাভ!

নূতন প্রজাসত্ত্ব আইন অনুযায়ী জমি হস্তান্তরে জমিদারের নজরটা যাহা প্রাপ্য ছিল তাহা এখন গবর্ণমেণ্টের তহবিলে যায়, গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে নিজাংশ রাখিয়া বাকী জমিদারদের দেন। ১৯২৯ সালের এপ্রিল হইতে ৩১ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এ বাবদ জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৪৬০৭৪৭২৲ টাকা পাইয়াছেন। এখনও ৩৭৪০৭৩২৲ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা

আছে। এই টাকাগুলি জমিদারেরা এখনো পান নাই, কবে পাইবেন তাহারও নিশ্চয়তা নাই। দেশের যে রকম দুর্বৎসর এবং জমিদারের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে এ টাকাগুলি অবিলম্বে তাহাদের দেওয়া কর্ত্তব্য। এই নজ্‌রান্‌ টাকা জমিদারদের একটা বড় আয় ছিল, এখন তাহার একটা অংশ তাঁহারা পান মাত্র। সে অংশ পাইতেও এত হায়রাণ। প্রজাসত্বে জমিদারের হাত ছাড়াইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিয়া যে প্রজার কি হিত হইয়াছে, তাহা বুঝি না—তবে জমিদারের অ-হিত ইহাতে যথেষ্ট হইয়াছে বটে!

সিগারেট

স্বদেশীতার বোধেই হউক, অ-সহযোগের প্রভাবেই হউক বা যে-কোন কারণেই হউক না কেন, সিগারেট জিনিষটার মুখে মুখে প্রচলন ক্রমেই কম হইয়া আসিতেছিল, মাঝে এমনও হইয়াছিল যে, কাহারও মুখেই ও বস্তুটি দেখা যাইত না। আবার সাময়িক সন্ধি-চুক্তির পর হইতে সিগারেট জিনিষটির চল ক্রমশঃ বাড়িতেছে মনে হইতেছে—এবার বিলেতী বা আমেরিকান নহে, একেবারে গ্যারাণ্টিড্‌ চাইনিজ। এই চাইনিজ খাইয়া কি যে আত্মতৃপ্তি বাবুরা লাভ করিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। কিন্তু এখন একটু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আর কি ইহাতে পয়সা খরচ করা সঙ্গত?—অপ্রাপ্তবয়স্কদের তো এই ধূমপানের অভ্যাস বিষবৎ পরিত্যজ্য।

গোল টেব্‌লের মুসলমান প্রতিনিধি

গোলটেব্‌লে মুসলমান প্রতিনিধি যে ভাবে লওয়া হইয়াছে তাহাতে এক শ্রেণীর মুসলমান যে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমানেরা হয়তো এ ভাবের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে খুসী হইতে পারেন কিন্তু ভারতে তাঁহারাই একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায় নহেন, জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলিয়াও ভারতে কিছু মুসলমান আছেন এবং তাঁহারাও ভারতের চক্ষে নিতান্ত নগণ্য নহেন। বিশেষতঃ ডাঃ আনসারীর গোলটেব্‌লে যোগ দেওয়ার কথা শেষ পর্য্যন্তও শোনা যাওয়া সত্বেও শেষ কালে তাহা হয় নাই। অথচ মৌঃ সৌকৎ আলি হইতে, দাউদি সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার জয়-জয়াকার হইয়াছে—এখন শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় তাহা ভবিতব্যই জানেন।

হাস্যকর উল্লাস!

ল্যাঙ্কাসায়ারের দুঃখে বিগলিত শোকে কোন কোন মুসলমান বিলাতী কাপড় চালাইতে চাহিতেছেন, কেহ বা আবগারীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বিলাতী মদ্য পর্য্যন্ত চালাইতে চাহিতেছেন, এ সব সংবাদ কোন কোনও ইঙ্গ কাগজ বড় অক্ষরে ছাপিতেছেন এবং একটা উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছেন—কিন্তু ইহা কাহার গৌরবের ও কাহার অগৌরবের? আর এত উল্লাসই বা কেন? এই করিয়াই তবে ল্যাঙ্কাসায়ার রক্ষা পাইবে ও আবগারী বাঁচিবে না কি?

পরলোকে কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ

সিটি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ গত ১০ই আগষ্ট পরপারের যাত্রী হইয়াছেন। চট্টরাজের 'এলজাব্রার' সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। তাঁহার ছাত্র শিষ্যও কম নহে। চট্টরাজ মহাশয়ের পরিবারবর্গকে আমরা সমবেদনা জানাইতেছি।

'ষ্টেট্‌সম্যানের' নূতন কর্ম্ম

বিখ্যাত 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' আজকাল পুনঃ পুনঃ তাহার সম্পাদকীয় 'টুকরায়' একটি কর্ম্ম করিতেছেন। কোন্‌ দেশীয় পরিচালিত কাগজ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও হত্যাকারীর কতটুকু সংবাদ কেমন ভাবে প্রকাশ করিল তাহারই পরিচয় দিতেছেন। সংবাদ প্রকাশের দোষাদোষ দেখিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারী আছেন তাহা স্বত্বেও ষ্টেট্‌স্‌মানের এই উৎসাহ দেখিবার জিনিষ। অবশ্য কোন সংবাদপত্রের কথা কোন সংবাদপত্র দোষজনক মনে করিলে তাহা অন্য ভাবেও দেখানো যাইতে পারে—কিন্তু ষ্টেট্‌স্‌ম্যান যে ভাবে এই কার্য্য করিতেছেন তাহা কি সংবাদপত্রের রীতি অনুমোদিত?

পরলোকে মিঃ খুদাবক্স

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যারিষ্টার মিঃ এস্ খুদাবক্স গত ৯ই অগষ্ট পরলোকের যাত্রী হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স মাত্র ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। পাটনার বিখ্যাত খুদাবক্স লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ খুদাবক্স ইঁহার জনক ছিলেন। ইনি বিলাতে শিক্ষা লাভ করেন—কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম ইতিহাস ও আইনের অধ্যাপক ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যও ছিলেন। পণ্ডিত খুদাবক্স সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক ছিলেন—কি ধর্ম্ম কি সমাজ সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার মত বিশেষ উদার ছিল। ইস্লাম কৃষ্টি সম্বন্ধে ইনি বহু মূল্যবান রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। এমন একজন বিদ্বানের অকাল তিরোধানে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার পত্নী ও কন্যাকে সমবেদনা জানাইতেছি।

গান *

ভূপালি—একতালা

শ্রীসরলা দেবী

তোমরা ভাষার রাজা,
ভাবের যে গো মালিক!
এনেছ কি পত্রপুটে
সাতরাজার ধন মাণিক!

তোমরা দেশের মাথা,
জাতির তোমরা মান,
মাথা যদি উচ্চে রাখ
বাঁচিয়ে আত্ম-অপমান!

ওহে ভাবের মালিক
দাও হে দাও
সাতরাজার ধন মাণিক!

তোমরা মুখোজ্জ্বল,
দেশের মানুষ সেরা
মানুষতা-পাঠটি যদি
পড়াও পত্রনবীশেরা!

ওহে ভাবের মালিক
দাও হে দাও
সাতরাজার ধন মাণিক!

আজকে উৎসবেতে
আসিয়ে তীর্থকাক,
শুধাইছে—পাই গো কোথা
সেই সে নিত্য খোরাক!

ওহে ভাবের মালিক
দাও হে দাও
সাতরাজার ধন মাণিক!

---

* ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত। ২রা আগষ্ট, ১৯৩১।

"গোষ্ঠবিহারী"

শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথের সৌজন্যে

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিমিটেড

৫ম বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৩৮ | ৭ম সংখ্যা

"তোমার মন্দির দ্বারে"

শ্রীঅমলা দেবী

ভিক্ষার্থী হৃদয় লয়ে আসি নাই দ্বারে।
ভরিয়া আনিনি সাজি পুষ্পের সম্ভারে,
তোমারি মন্দিরে দ্বারে। আকুল পিয়াসে
গোপন হৃদয় মোর শঙ্কিত উল্লাসে,
চাহে নাই তোমা পানে। ক্ষণিক কৌতুক
আসিয়া দাঁড়ানু দ্বারে নয়ন উৎসুক,
দেখিতে তোমার সভা। তব গুণী জনে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি শত আয়োজনে
চরণে সাজায়ে ছিল, তাহাদের মাঝে
রিক্ত হস্তে দাঁড়াইব তব পূজা কাজে,
হেন দুরাশার ভার সারাদিন ধরি
হৃদয় বীণার তন্ত্র ওঠেনি ঝঙ্কারি।
যখন ভাঙিল সভা সন্ধ্যার আলোকে
কণ্ঠ হ'তে মালা খুলি ক্ষীণ দীপালোকে
মোর কণ্ঠে—দিয়ে গেলে। কোন্ আশা ভরে
আহ্বান করিলে মোরে। ব্যাকুল অন্তরে
বিস্মিত হৃদয় মোর সারা দিন মান
অজানা কাহিনীটুকু করিছে সন্ধান।

শারদা

প্রবন্ধ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

জলে কুমুদ নীল পদ্ম, স্থলে স্থল পদ্ম, বোশেখী চাঁপা এখনো দু একটা গাছে আছে; শিউলী যেন আঁচল ভরে ফুল এনে পথে ছড়িয়ে দিয়েছে;—আনন্দাশ্রুতে তার মুখ উদ্ভাসিত,—মার আসার সময় এলো, মা চলে যাবেন তাঁর চরণ স্পর্শ ওরা পাবে।—

আকাশে সোনার আলো, কল্কে ফুলে তার রং লেগেছে; অঞ্জলির সময় মার পায়ের পাতার রংয়ে—তার রং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

জ্ঞান, সম্পদ,—সহায় সিদ্ধিকে মূর্ত্তিময় করে নিয়ে শক্তি আসেন, তাঁর সঙ্গে সমস্তর-মাঝে, পেছনে সবের উপরে—অন্তরে—শিব আছেন।

শিব ভোলানাথ। মঙ্গল অন্তর্নিহিত বস্তু, তাই আপনভোলা; সকল কাজের মাঝে, সমস্ত কিছুর ভেতরে, উদ্দেশ্যে—তিনি আছেন—আত্মবিস্মৃত হয়ে, আত্মবিস্মৃত করে অপরকে; রিক্ত-সর্ব্বস্ব, ভেদজ্ঞানহীন, আপনাতে আপনি লীন, মুক্ত, আনন্দময়। আপনাভোলা তাই তাঁর 'পর' নাই; রিক্ত তাই—লজ্জা নাই, দৈন্য নাই; মুক্ত তাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই; শ্মশানচারী, সর্ব্বশেষ অন্তিম আশ্রয় দাতা; সকলের আপন তাই পূজার বিধি নাই, নিষেধ নাই, জাতিভেদ নাই; মঙ্গলমূর্ত্তি তাই, বিষ অমৃত সমান তাঁর কাছে; নীলকণ্ঠ হয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছেন; ইন্দ্রত্ব যাঁর অভিলষিত নয়, লক্ষ্মী যাঁর কাম্য নয়, জ্ঞান যার আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ, তন্ময়; মহামায়া শক্তি তাঁর সহধর্ম্মিণী। সিদ্ধি সহায়তা জ্ঞান সম্পদ গণেশ কার্ত্তিকেয়, বাণী কমলা যাঁর সন্তানের মত—স্নেহের উপেক্ষার প্রণয়ের ধন,—সাধনার বস্তু নয়; সকলের পৃথক অস্তিত্বের মধ্যে আত্মগোপন করে তিনি শিব, কল্যাণ মঙ্গলরূপে বিরাজ করছেন।

মার বাহন সিংহ—নির্ভীক পশুরাজ। তাঁর বামে জ্ঞান মূর্ত্তিমতী; মরাল বাহিনী; যাঁর অঙ্গে মালিন্য দাঁড়াতে পারেনা—জ্ঞানের সাগরে যে স্বচ্ছন্দে ভাসমান; যাঁর হাতে বীণা পুস্তক আনন্দের প্রতীক, আপনার আনন্দে আপনি তন্ময়; বীণা আর পুস্তক ছাড়া আর কিছুই তাঁর ধ্যেয়, জ্ঞেয়, প্রেয় নেই।

মার দক্ষিণে লক্ষ্মী, মূর্ত্তিমতী সম্পদ। যিনি কমলালয়া—শ্রী শোভা সৌন্দর্য্য রূপিণী, নিখিল যাঁকে অন্বেষণ করে বেড়ায়, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার পরম সম্পদ—কামনার ধন।

মার ঐ দক্ষিণেই সিদ্ধিদাতা গণেশ, বামে সহায়দাতা বীর কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে আছেন।

ঐশ্বর্য্য বিদ্যা কর্ম্ম সিদ্ধি নিয়ে সমস্তর মধ্যে অন্তর্নিহিত মঙ্গল শিবকে নিয়ে তিনি আসেন। আকাশ তাঁকে আলোর অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করে; ফুলেরা ফলেরা তাঁর অর্চ্চনার উপচার সাজায়; নদীর জলে তাঁর আঙিনা ধোয়া হয়; বাতাসে তাঁর আগমনী সুর বাজে।

প্রতি বৎসর আমরা মহামায়ার পূজা করি, আবাহন করি, সমস্ত বৎসর এই উৎসবের অপেক্ষায় তাঁর সন্তানদের কাটে। কিন্তু তাঁর ঐশ্বর্য্য, তাঁর শক্তি, তাঁর জ্ঞানের, সম্পদের, সিদ্ধির প্রসাদ আজো তারা পেলেনা।

তাঁর সন্তানদের দুর্ব্বলতার তুলনা নেই, তাই আমাদের ঘরে ঘরে ঘরের লক্ষ্মী লাঞ্ছিতা অপহৃতা হ'ন প্রবলের পশুবলের কাছে; মার শক্তি তাদেরও মনে নেই। তাদের রক্ষাকর্ত্তাদেরও হাতে নেই। আমরা নিরন্ন দীন, কমলার অর্চ্চনা মাত্র সার করি; তাঁকে ঘরে রাখতে পারিনা, জানি না। আমাদের জ্ঞান শুধু বোঝা মাত্র, তাই তার সার্থকতাও জানে না। আমাদের সাহস নেই, তাই সিদ্ধিও নেই; ঐক্য নেই, তাই সহায়ও নেই; তাই মা শুধু আসেন প্রতিমার মধ্যে,—ফিরেও যান প্রতিমার মধ্যেই ঐ দশমীতেই। তিনি জানেন আমাদের আবাহন তিন দিনের জন্য; বিসর্জ্জনী সম্বৎসর ধরে।

তাঁকে আমরা মহামায়া বলি তিনিও মহামায়া রূপেই আমাদের ভুলিয়ে চলে যান। তাঁর ষড়ৈশ্বর্য্যে আমাদের মন মুগ্ধ হয়, লাভ করবার চেষ্টা কিন্তু করেনা। মা শুধু বছরের বছর হেসে ফিরে যান।

কবে কমলাকান্তের দুর্গোৎসব ধ্যান সফল করে

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

সুজলাং সুফলাং তারিণীরূপে মাকে সারদা বরদারূপে শারদাকে আমরা পাব।

আমরা জগজ্জননীকে মেয়ের মত আনি, সমাদর করি, তাঁর আগমনী জাতির মনে মেয়েরি বিরহের বিলাপ, কিন্তু মার মতন করে এবারে আন্‌বার দিন এসেছে—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

ভুলের জের

গল্প

শ্রীপ্রভা দেবী সরস্বতী

প্রিয় সতীশ,

তোমার পত্রখানা দিন কয়েক আগে পেয়েছিলুম, কিন্তু আজ উত্তর দিচ্ছি কাল দিচ্ছি, বলে আর লেখাই হয়ে ওঠে নি।

হঠাৎ সেদিন প্রবোধের সঙ্গে দেখা হল।

প্রবোধের কথা মনে আছে কি? আমাদের ক্লাসে একদিন সে সকলের চেয়ে ভাল ছেলে ছিল। প্রতি বিষয়ে সে সকলের ওপরে জায়গা নিত, অবলীলাক্রমে সকলকে সে পরাজয় করত। কেবলমাত্র পড়ায় নয়, সে কি সাঁতারে, কি ফুটবল খেলায়, কি নৌকাচালানোয়, কি টেনিসে ব্যাডমিন্টনে, সব তাইতেই সে সকলকে পরাস্ত করত। কি স্কুলে, কি কলেজে কেউ তার সমকক্ষ হ'তে পারত না।

কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ সিংহ তাকে কি রকম ভালবাসতেন তা জানো। প্রবোধের জগতে মা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না, যথেষ্ট জমীদারীও ছিল, সে সব দেখা শুনা করতেন তার মা, শুনেছিলুম তার মাও খুব শিক্ষিতা মেয়ে ছিলেন। তুমি আই-এ পড়তে চ'লে গিয়েছিলে পুনায়, তারপর যে কি ব্যাপার হল তা তুমি জানো না।

মিঃ সিংহের বাড়ীতে প্রবোধের নিত্যই চায়ের নিমন্ত্রণ হতো। এক একদিন খাওয়ার নিমন্ত্রণও তার হতো। মিঃ সিংহের মেয়ে নর্ম্মদা বা নমিকে দেখেছিলে কি—সেই ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটী? আমাদের কলেজে সে রোজই আসত—আমরা সবাই তাকে ভালবাসতুম,—সেও আমাদের সবারই সঙ্গে মিশত।

কিন্তু বেশ লক্ষ্য করেছিলুম, সে প্রবোধকে বড় বেশী রকম পছন্দ করে, তার সব কাজেই সে উৎসাহ দেয়। দেখতুম—যে দিন যে খেলায় প্রবোধ উপস্থিত না থাকত সে খেলায় নমিকেও যোগ দিতে দেখতুম না।

যখন আমরা বি-এ দিলুম, ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল প্রবোধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে।

সত্যিই আমরা তার কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলুম, কেন না আমাদের কলেজ থেকে একটী ছেলে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে পেরেছে এ আমাদের বড় কম গৌরবের বিষয় নয়।

এর পরই শুনতে পেলুম, নমির সঙ্গে প্রবোধের বিয়ের কথা হচ্ছে।

প্রবোধের মা শিক্ষিতা মেয়ে হলেও তিনি হিন্দু ছিলেন, হিন্দুর আচার-ব্যবহার তিনি সর্ব্বাংশে রক্ষা করে চলতেন। তিনি যে খৃশ্চান কন্যা নমিকে নিজের পুত্রবধূ করবেন, সেটা আমরা কেউ হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারলুম না।

প্রবোধকে মাসখানেক দেখতে পেলুম না, শুনলুম সে নাকি তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মামার বাড়ী গেছে। নমিকেও এই এক মাস কোথাও যেতে দেখি নি। এক দিন গার্ল'স স্কুলে প্রাইজ দিতে মিঃ সিংহ যখন গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে নমিকে দেখতে পেলুম।

নমিও এবার বি-এ পাশ করেছে, সেও খুব ভাল হয়ে পাশ করেছে, কিন্তু সে তাতে নিজে এতটুকু গৌরব অনুভব করেনি।

এই সময়টায় নমিকে বেশ ভাল করেই যেন দেখলুম। তার মা বহুকাল আগে মারা গেছলেন তা জানো, মিঃ সিংহ একধারে তার মা-বাপ দুইই ছিলেন। নিজে তিনি যেখানে যেতেন মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন তাকে এক দণ্ড কাছ ছাড়া করতে পারতেন না।

নমিকে সেদিন যতটা সুন্দরী দেখেছিলুম এমন সুন্দরী কোনদিন দেখতে পাইনি। সে যেন একটী আধ ফুটন্ত গোলাপ, তার রং আর সুমধুর গন্ধে সকলকে তার পানে আকৃষ্ট করছে।

মাস খানেক বাদে প্রবোধ তার মার সঙ্গে দেশ হতে ফিরে এল।

সে দিন সন্ধ্যায় আমাদের কয়টী ছেলের মিঃ সিংহের বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল। নমি আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা করে বসালে। আজ তার কাপড় জামার পানে

তাকিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, দেখলুম সে খদ্দর পরেছে।

তার মুখে আজ হাসি ধরছিল না, অন্তরের আনন্দ তার যেন উপচে পড়ছিল চোখে-মুখে, সে আর কিছুতেই সে আনন্দ চাপা দিয়ে রাখতে পারছিল না।

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "একি মিস্ সিংহ, খাটি বিলিতি ছেড়ে একেবারে খদ্দর পরে ফেললে? তোমাদের কোমল অঙ্গে খদ্দর কি ব্যথা দেবে না?"

প্রবোধ হঠাৎ তীব্র ভাবেই বলে উঠল, "এ কথা বলা অন্যায় মনীষ, আমি মিস্ সিংহের হয়ে উত্তর দিচ্ছি। উনি বাঙ্গালী, ইংরাজ মহিলা ন'ন, কষ্ট সহ্য করতে মেয়েরা চির-অভ্যস্ত বলেই ওঁর গায়ে খদ্দর ব্যথা দেবে না।"

মিস সিংহের মুখখানা দৃপ্ত হয়ে উঠল, সে শুধু কৃতজ্ঞ চোখে প্রবোধের পানে তাকিয়ে রইল।

সেদিন ফিরবার পথে বললুম, "তারপর বন্ধু, নিমন্ত্রণটা আমাদের কপালে জুটছে কবে? শুনলুম তোমার মায়েরও এতে মত আছে, তবে আর দেরী করছ কেন? শুভকাজ শীগ্‌গির কোরে ফেললেই ভাল নয় কি?"

যেন আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে প্রবোধ জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের নিমন্ত্রণ, কি শুভকাজ, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে।"

তার এই গোপনতা দেখে সত্যিই রাগ হয়ে গেল, বললুম, "আহা, যেন কিছুই জানো না। মিস সিংহের সঙ্গে তোমার বিয়ের দেরী কত তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

প্রবোধ খানিক আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল—"ক্ষেপেছ, নমিকে বিয়ে করব—এ কখনও সম্ভব হতে পারে? এ সব কথা কে বললে শুনি?"

আমি বললুম—"মিঃ সিংহ তোমার মায়ের কাছে প্রস্তাব করায় তোমার মা তাতে মত দেন নি? তুমি কি বল কথাটা আমরা নিজেরাই মনে গড়ে তোমায় বলছি?"

প্রবোধ মাথা দুলিয়ে বললে, "না, তা বলিনে, তবে এটা যে একেবারে অসম্ভব সেটাও বোধ হয় কোনদিন মনে কর নি?"

বললুম—"অসম্ভব কিসে?"

উত্তেজিত হয়ে প্রবোধ বললে, "অসম্ভব নয় কিসে? তুমি কি মনে করছ হিন্দুর ছেলে হয়ে আমি খৃষ্টানকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাব? আর এ কথাও সকলে জানে নমির মা ইউরোপীয়ান মহিলা ছিলেন, তিনি যদিও নমিকে মাত্র তিন বছরের রেখে মারা যান এবং মিঃ সিংহ আমাদের দেশের উপযুক্ত শিক্ষাতেই নমিকে শিক্ষিতা করেছেন, তবু একথা বলা চলে ইউরোপীয়ানদের রক্ত নমির শরীরে আছে, সেই জন্যেই নমিকে আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারিনে।"

প্রবোধ যে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে একথা জানতুম, সে একটী পুরা স্বদেশী; এখানে সে জোর পিকেটিং চালিয়ে বিলাতি জিনিস কেনা-বেচা প্রায় বন্ধ করে ফেলেছে, নিজেদের গ্রামেও সেই উদ্দেশ্যে গেছল।

আমি তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলুম—কেবলমাত্র এই কারণেই যে নমিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা যায় না তা হতে পারে না। যতদূর দেখা যাচ্ছে, নমি তাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, তবে কেন সে তাকে গ্রহণ করে সুখী হতে পারবে না?

প্রবোধ হাসি মুখেই জানালে, সে বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, নিজের প্রতিজ্ঞা সে কিছুতেই বিসর্জন দেবে না। নমির উপযুক্ত পাত্রের অভাব নেই, তাকে স্ত্রীরূপে পেলে অনেকেই নিজেকে ধন্য মনে করবে।

হয় তো সে কোন রকমে কথাটা মিঃ সিংহকে জানিয়ে দিয়েছিল, কারণ এরপর হতে দেখতে পেলুম, মিঃ সিংহের সদা হাসিমাখা মুখখানা শুকিয়ে গেছে, সর্ব্বদাই তিনি যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছেন। যে সব ছেলেদের এত ভালবাসতেন তারা সামনে গেলে, তিনি আগেকার মতই কথা বলতে যেতেন, হাসতে যেতেন, কিন্তু ওরই মধ্যে ফুটে পড়ত একটা অতি ক্ষীণ সুর,—স্পষ্ট ধরা যায় না, অথচ তা আছেই।

আর নমি,—সে যেন একেবারেই বদলে গেছে, তাকে দেখে যেন আর চেনা যায় না। দিন কত বাদে একদিন তাকে দেখলুম—সে ভারি রোগা হয়ে গেছে, তার চোখে মুখে যেন অবসন্ন ভাব জেগে উঠেছে।

বুক ঠুকে একদিন এগিয়ে গেলুম।

সবিনয়ে মিঃ সিংহের কাছে নমিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করলুম।

আমার উন্নত অবস্থার কথা মিঃ সিংহ জানতেন; তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহও করতেন। আমার প্রস্তাব শুনে খানিক

চুপ করে থেকে বললেন, "প্রবোধ আমায় যে রকম আঘাত দিয়েছে তাতে আমার বুকটা ভেঙে গেছে। আমি যদি জানতুম শেষ পর্য্যন্ত সে এই রকম ব্যবহার করবে, তা হলে আমি আমার মেয়েকে কখনই তার সঙ্গে মিশ্‌তে দিতুম না। তুমি যে নিজেই আমার নমিকে গ্রহণ করতে এসেছ এর জন্যে তোমায় কি বলব তা আমি ভেবে পাচ্ছি নে। কিন্তু আমার মেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে—সে বিয়ে করবে না, যদিই বিয়ে কোন দিন বাধ্য হয়ে তাকে করতে হয়, সে কোন ভারতীয়কে করবে না।"

এরই কিছুদিন বাদে মিঃ সিংহ নমিকে নিয়ে বিলাত চলে গেলেন।

আমি কলকাতায় এলুম, এম-এ পাশ করলুম, তার পর একটা কলেজে প্রফেসারী নিয়ে সেখানেই থেকে গেলুম।

প্রবোধ ও এম, এ, দিলে, এবারেও সে সকলের প্রথম স্থান অধিকার করলে। আশ্চর্য্য শক্তি তার, যে কাজে সে হাত দিত সেইটাই সর্ব্বসুন্দর করে তুলত, কোন কাজই তার অসম্পূর্ণ থাকত না।

এম-এ পাশ দিয়ে সে কোথায় তলিয়ে গেল কে জানে? তার মা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছিলেন, তার বিষয়-সম্পত্তি সব সে তার ভাগিনেয়ের হাতে দিয়েছিল, নিজে সে শুধু ঘুরেই বেড়াত।

দীর্ঘ সাত বছর বাদে হঠাৎ একদিন দেখা হল নমির সঙ্গে।

সে আজ ইউরোপীয়ান পোষাকে সুসজ্জিত হলেও আমার চোখ দুটোকে এড়াতে পারে নি। আমি কৃষ্ণনগর গিয়েছিলুম, যেদিন সেখান হ'তে কলকাতায় ফিরে আসছিলুম, সেই দিনই ফার্ষ্ট ক্লাসের কামরায় তাকে দেখতে পেলুম।

সেও কৃষ্ণনগর হতে উঠেছিল, একই কামরায় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না।

সে বিজাতীয় পোষাকে সুসজ্জিত ছিল, তার চোখে চশমা ছিল, তবু আমার মনে হচ্ছিল তার মুখটা আমার চেনা, সে যেন ঠিক আমাদের সেই নমি।

হঠাৎ তার হাতের পানে নজর পড়তে এন অক্ষরটা দেখতে পেলুম, বাঁ হাতের কব্জিতে সে ইচ্ছা করেই এই অক্ষরটা লিখে নিয়েছিল।

আমি কতকটা আপনা আপনিই বলে উঠলুম, "নমি না? হ্যাঁ, সেই তো।"

সে হেসে উঠল, তারপর এগিয়ে এসে আমাদের ভারতীয় প্রণালীতেই নমস্কার করলে।

একে একে সব কথাই শুনলুম। শুনলুম, আমাদের সহৃদয় ছাত্রপ্রিয় প্রিন্সিপাল মিঃ সিংহ আর ইহলোকে নেই, আজ তিন বছর হল তিনি লণ্ডনেই মারা গেছেন। নিজের দেশে নিজের আত্মীয়-স্বজনের মাঝখানে মরার ইচ্ছা তাঁর মনে ছিল, কিন্তু এদেশবাসীর কৃতঘ্নতার কথা ভেবে তিনি আর আসেন নি। নমি এক ইউরোপীয়ানকে বাধ্য হয়েই বিয়ে করেছে। স্বামীর সঙ্গে সাত বছর পরে আবার ভারতবর্ষে এসেছে। তার স্বামী পাটনা হাইকোর্টের জজ, তিনি পাটনায় চলে গেছেন, নমি দিন পনের কলকাতায় থেকে সকলের সঙ্গে দেখা শুনা করে পাটনায় তার স্বামীর কাছে চলে যাবে।

কৃষ্ণনগরে সে দুপুরের ট্রেণে এসেছিল, একবার তার বাপের বহুকালের বাসস্থানটী দেখে সে আবার ফিরে চলেছে।

এই সেই নমি—সে মনে-প্রাণে এই দেশেরই মেয়ে, স্ত্রী, মা হতে চেয়েছিল, সকল বিলাসিতা ছেড়ে সংযত হতে চেয়েছিল। হতোও তাই, তার জীবন স্রোত আর একদিকে বয়ে যেত, সে আমাদের মেয়ে—আমাদের মেয়ে হয়েই থাকত।

অনেক কথাই হতে লাগল, কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম—নমি সকলের কথা জিজ্ঞাসা করলে—প্রবোধের কথা একটী বারের জন্যেও মুখে আনলে না! সে যেন ভুলে গেছে প্রবোধ নামে কেউ ছিল, সে তার জন্যে কোনদিন পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে থাকত। আমিও প্রবোধের কথা তুললুম না, তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলুম।

কথায় কথায় কংগ্রেস স্বদেশী সব কথাই উঠে পড়ল। দেখলুম কংগ্রেসকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে, সে স্পষ্টই বললে এই কংগ্রেসই এ দেশের সর্ব্বনাশ করছে—করবে। কংগ্রেসের নেতারা স্ব স্ব মত প্রকাশ করবেন, মারামারি করবেন, মাঝখান হতে যারা খাটতে আসে তারাই মরবে। এমনি করে দেশের ছেলেগুলো মরছে, মরবে।

শেষটায় সে বললে—অনেক ভেবে-চিন্তে একজন ইউরোপীয়কেই বিয়ে করে ফেললুম। ভাবলুম, ভারতীয়-

দের মাথার ঠিক নেই, ওরা কথা রাখতে পারে না, মানুষের অন্তরের পানে চায় না, কাজেই ওদের সঙ্গে সংস্রব রেখে লাভ নেই। আপনি বলবেন, ইউরোপীয়েরাই কি রাখে? তা যদিও রাখে না তবুও মনে একটা সান্ত্বনা থাকবে ওরা ভিন্ন জাতি, ওরা বরং আমাদের সঙ্গে জুয়াচুরি করতে পারে, কিন্তু নিজের দেশের লোকের কাছে প্রতারিত হওয়া বড় কষ্টকর, সে ক্ষতের কোন প্রলেপ মেলে না।"

শিয়ালদহতে সে নেমে চলে গেল, আশ্চর্য্য সে যাওয়ার সময় আর একটীও কথা বলে গেল না।

প্রায় মাস ছয়েক বাদে প্রবোধের একখানা পত্র পেলুম, সে লিখছে পাটনা জেল হতে। একবার সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সংবাদপত্র বড় একটা পড়তুম না, প্রবোধের পত্র পেয়ে সে কি অপরাধে জেলে গেল জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে নন্দ মৈত্রের কাছে গেলুম। সে ছিল উকিল, অবসর যথেষ্ট থাক বা না থাক, সে নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ত।

তাকে প্রবোধের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—আরে যা: তুমি দেখছি কোনই খবর রাখ না। শোন নি প্রবোধ বোস পাটনার জজ মিঃ ইলিয়টকে খুন করতে গিয়ে ধরা পড়েছে, ওরা নাকি চারজন লোক ছিল, চারজনেই সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সাহেবের আর্দ্দালী প্রবোধের গুলিতে খুন হয়েছে, মেম সাহেব নিজে দেখেছেন। দুজন পালিয়েছে, শুধু প্রবোধ আর ভকতরাম নামে আর একজন লোক প্যালাতে পারে নি।

মিঃ ইলিয়ট—?

এই যে নমির স্বামী, তা হলে নমিই প্রবোধকে সনাক্ত করেছে।

সেদিনকার সংবাদপত্রখানা নিয়ে পড়লুল। যেদিন এই কাণ্ড হয় সে দিন মিঃ ইলিয়ট বাড়ী ছিলেন না, আক্রমণকারীরা তা জানত না, তারা তাঁর শয়ন কক্ষে উপস্থিত হয়। মিসেস ইলিয়ট এই সময় যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোনও মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। তিনি রিভলভার নিয়ে গুলি করতে আরম্ভ করেন। ভকতরামের হাতে ও পায়ে গুলি লেগে অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে, প্রবোধের পায়ে গুলি লাগায় সে পালাতে পারে নি, অপর দুজন পালিয়েছে।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে সত্যিই মনটা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, তাই কয়দিনের ছুটি নিয়ে একদিন পাটনা যাত্রা করলুম।

আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছালুম তার আগের দিন বিচার শেষ হয়ে গেছে। শুনলুম ভকতরামের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ও প্রবোধের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়ে গেছে। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্রবোধের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

আমায় দেখেই সে লাফিয়ে উঠল—দুই হাতে আমার হাত দুখানা চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "তুই এসেছিস মনি? আমি ভেবেছিলুম হয় তো আসবি নে, তবুও এতটুকু আশা নিয়ে পত্র দিয়েছিলুম—যদি আসিস্।"

আমি চেয়ে দেখলুম সে যেন অনেকটা রোগা হয়ে গেছে, তবু তার আশ্চর্য্য সেই চোখের দীপ্তি কমে নি।

বললুম—"সাহেবকে খুন করতে গিয়েছিলি কেন, এই কি তোর দেশের কাজ করা—?"

সে হাসলে, বললে, "সে সব অনেক কথা, তোকে বললে বুঝতে পারবিনে। যাক তোর সঙ্গে যে দেখা হল এই আমার বড় সান্ত্বনার বিষয়; ভেবেছিলুম আমার তো কেউ নেই, কে আর এই ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে আসবে? তুই যে ভয় না করে এসেছিস, এই ভেবেই আশ্চর্য্য হচ্ছি।"

আমি বললুম, "ও কথা ছেড়ে দে, অমূল্য প্রাণটাকে এমন করে বিসর্জ্জন দিচ্ছিস আমি কেবল তাই ভাবছি।"

প্রবোধ একটু হাসলে মাত্র, পায়ের ব্যাণ্ডেজটা দেখিয়ে বললে, "কেউ ধরতে পারত নারে, গুলি যদিও লেগেছিল তাও পালাতে পারতুম, কিন্তু কি যে তখন একটা দুর্ব্বলতা এল, পালাতে পারলুম না, তাই না ওরা অত সহজে ধরতে পারলে!"

শুনলুম, নমিকে সে চিনেছিল, নমি হয় তো তাকে চিনিতে না পেরেই প্রথমে গুলি করেছিল, কিন্তু তারপরই তাকে চিনতে পেরে নমির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রবোধ স্বপ্নেও ভাবেনি সেই নমি—যে একদিন সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে তাকেই ভালবেসেছিল, সে আবার একদিন তাকেই ফাঁসিতে ঝুলাতে চাইবে। একমাত্র নমির সাক্ষ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে আর্দ্দালীকে খুন প্রবোধ

ছাড়া আর কেউই করে নি। বরং নমি আরও বাড়িয়ে বলেছে—প্রবোধ তাকেও গুলি করেছিল, কিন্তু সে সাবধান হয়ে যাওয়ায় গুলি গায় লাগে নি; তারপর প্রবোধ নাকি তার গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল, সেই জন্যেই নমি গুলি চালায়।

প্রবোধ বললে—প্রথম হতে শেষ অবধি নমি ঠিক এই এক কথাই বজায় রেখে চলেছে। কালও সে ঠিক এই কথাই বলে গেছে। প্রবোধ তার মুখের দিকে চেয়েছিল, দেখেছিল তার মুখ শবের মতই মলিন হয়ে গিয়েছিল, অথচ সে একবারও চোখ তুলে প্রবোধের পানে চায় নি।

সব শেষে প্রবোধ বললে—"মরছি তাতে দুঃখ নেই কারণ আমি তো মরব জেনেই এসেছি, কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি মেয়েদের পরিবর্ত্তন দেখে। একদিন যে নমি আমার জন্যে নিজের জীবন পণ করেছিল, সেই নমিই কিনা আমার জীবন নেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।"

আমিও তাই ভাবছিলুম। ঠিক করলুম আজই একবার মিসেস ইলিয়ট অথবা আমাদের নমির সঙ্গে দেখা করব। হোক সে জজের স্ত্রী, তবু সে আমাদেরই সেই নমি তো, তাকে সঙ্কোচ করে এড়িয়ে যাওয়ার কারণ আমার নেই।

বিকেলে মিঃ ইলিয়টের কুঠিতে দেখা করতে গেলুম।

নিজের নামের কার্ডখানা মেমসাহেবকে পাঠিয়ে দিতেই ভেতর হতে আহ্বান এল।

দেখলুম নমি চুপ করে একখানা চেয়ারে বসে আছে, তার মুখখানা অস্বাভাবিক রকম মলিন।

জিজ্ঞাসা করলুম—"ভাল আছ তো নমি?"

বাংলাতেই কথা বললুম।

সে চমকে উঠে আমার পানে চাইল, তারপরই হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে লাগল।

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হয়েছে নমি—হঠাৎ কাঁদতে লাগলে কেন? মিঃ ইলিয়ট কিছু বলেছেন কি, অথবা—"

"মনি দা, আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছি যে—তুমি কি তা জান না, আমি জানি তুমি কার ডাকে এসেছ, কোথায় গিয়েছিলে? মনি দা, আমি—"

সে এ রকম ভাবে কাঁদতে লাগল যাতে বাস্তবিকই আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

বললুম, "শুনলুম একমাত্র তোমার সাক্ষ্যেই প্রবোধের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে? তুমি যদি না বলতে তা হলে তার দণ্ড হলেও ফাঁসি হতো না?"

নমি চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'হ্যাঁ, সে আমিই মনি দা,—বুঝতে না পেরে—কেবল মাত্র হাতে পেয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার লোভ সামলাতে না পেরেই এই সর্ব্বনাশ করে বসেছি। এখন বুঝছি কি কাজ করেছি, যা করেছি তা আর ফিরানো যাবে না যে।"

আমি বললুম, "আর কি তা ফিরানো যায় নমি, হাতের যে ঢিল ছুঁড়েছে তা ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়েছে, সে কি আর ফেরে? কাল এমন সময় প্রবোধের নামটাই থাকবে মাত্র, ওর চিহ্ন ধরাবুক হতে মুছে যাবে—অভাগা—"

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললুম।

নমি মুখখানা লুকিয়ে ফেলে ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

"মনি দা, সে আমায় চিনেছে, সে জেনেছে আমি সেই নমি, তাই সে বার বার আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। মৃত্যুদণ্ড পেয়েও তো তার মুখের হাসি মিলায় নি, মনে হল, সে যেন আমায় বিদ্রূপ করেই হাসছে, সে তো জেনে গেল মনি দা, আমি তার পরম শত্রু, আমি তাকে কোন দিনই ভালবাসিনি, স্নেহ করি নি—"

তার কণ্ঠস্বর একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল।

অনেক কষ্টে বিদায় নিয়ে উঠলুম, নমি কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

পরদিন ভোরে জেলের সামনে যেতে যেতে শুনতে পেলুম—সব শেষ হয়ে গেছে, প্রবোধের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

শুনলুম, সে একটা আংটী রেখে গেছে, বলে গেছে আমার হাতে যেন দেওয়া হয় আর আমি যেন সেই আংটীটা নমির কাছে পৌঁছে দেই।

এই আংটীটি নমিই নাকি একদিন প্রবোধকে দিয়েছিল।

জজ সাহেবের কুঠিতে গিয়ে শুনলুম, মেমসাহেবের অসুখ, তিনি কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

অনেক কষ্টে কার্ডখানা পাঠিয়ে দিলুম, তার সঙ্গে একটা স্লিপে লিখে জানালুম, আমি আজই কলকাতায় ফিরব, যাওয়ার আগে একবার তার সঙ্গে শেষ দেখা করে যেতে চাই।

ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পেলুম।

আজ যে নমিকে দেখলুম তাকে যেন চিনতে পারা যায় না, এক দিনেই তার যেন সম্পূর্ণ বদল হয়ে গেছে। তার আর উঠবার ক্ষমতা যেন নেই, তার সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

তার চোখে আজ জল ছিল না, যেন সে মনের মধ্যে কি একটা মতলব ঠিক করেছে, তাই সে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে। চোখ দুটো তার উজ্জ্বল, চক চক করছে।

"আজই চলে যাবে মনি দা ?"

উত্তর দিলুম—"হ্যা, আজই যাব। প্রবোধ একটা আংটী দিয়ে গেছে, এটা তোমার হাতে পৌঁছে দিতে আমায় অনুরোধ করে গেছে।"

"অনুরোধ—তার অনুরোধ—"

হঠাৎ সে চুপ করে গেল, তারপরই বললে, "দাও দেখি।"

আংটীটা নিয়ে সে বুকের উপর রাখলে।

আর সে একটীও কথা বললে না, আমিও সোজা চলে এলুম কলকাতায়।

এ আজ মাত্র সাতদিন আগেকার ঘটনা, খবরের কাগজে পড়েছ নিশ্চয়ই, তবে এতটা বিশদ বিবরণ নিশ্চয়ই পাওনি।

কালকের কাগজে পড়লুম আর একটা নূতন ঘটনা—পাটনার জজপত্নী মিসেস ইলিয়ট ভুলক্রমে মালিসের ঔষধ খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। এ রকম ভুল আর যেন কারও না হয় সে জন্যে সকলকে সাবধান করা হচ্ছে।

বড় হাসি এল।

ভুলই বটে, কিন্তু ভুল যে কোথায় হয়েছে তা জানি আমি একা, আর কেউই জানে না।

বন্ধু, সব কথাই তোমায় জানালুম,—বিচার করে দেখ দেখি,—নমির দোষ কতখানি। সে যে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, এইটাই কি তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নি? প্রবোধের পরে দারুণ অভিমান করেই সে মিঃ ইলিয়টকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু বিবাহিত জীবনে প্রতিদিন সে যে যন্ত্রণা সহ্য করেছে সেই যন্ত্রণাটা অনুভব করো।

অত্যন্ত ক্ষোভে ও দুঃখেই সে প্রবোধের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখাতে চেয়েছিল সেও প্রবোধকে ঘৃণা করে, উপযুক্ত প্রতিহিংসাই নিতে গিয়েছিল, তার ফল যে এ রকম হবে তা সে ভাবে নি।

জানিনে পরজন্ম আছে কিনা। যদি থাকে তবে নমি সেখানে তার প্রিয়তমকে অনুসরণ করে যাবে, সেখানে সে তার ভুলের সংশোধন করবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

গৃহ-লক্ষ্মী

গল্প

শ্রীপ্রমীলা রায় চৌধুরী

(১)

লেক্ রোডের ওপরেই একখানা বাড়ী। এই বাড়ীতে বিপত্নীক প্রফেসর কুমুদ কান্ত রায় থাকেন—বাড়ীখানি তাঁর নিজেরই। দক্ষিণ খোলা, বাগানের মধ্যে ছোট দোতলা শাদা বাড়ী। ঝি, চাকর, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্রে বাড়ীখানি সাহেব বাড়ী বলেও মাঝে মাঝে ভুল হয়।

কুমুদ বাবুর চল্লিশ বৎসরে পত্নী-বিয়োগ হয়; অন্য কেউ হলে হয়তো, আবার বিয়ে করে ফেল্‌তো; কিন্তু একে তিনি দুবার বিয়ের ঘোর বিরোধী. তাতে তিনি তখন তাঁর চার বছরের মেয়ে চাঁপাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে বিয়ের কথাটা মোটে মনেই আসেনি।

স্ত্রী বিয়োগের পর খাস কল্‌কাতা সহরে তাঁর যে বসত বাড়ী ছিল, সেখানাকে বেশ চড়া দামে বিক্রী করে জমান যে টাকা ছিল তা উঠিয়ে নিয়ে এই বাড়ীখানা কিনে, মা-হারা মেয়ে চাঁপার মা, বাবা দুই হয়ে একে একে ষোলটা বছর কাটিয়ে দিলেন। চার বছরের চাঁপা এখন কুড়ি বছরের তরুণী—তাকে একটী সুপাত্রে বিয়ে দিতে পারলেই কর্ত্তব্য তাঁর শেষ হয়। পাত্র তো অনেকেই ছিল। বন্ধু পুত্র সমীর, প্রিয় ছাত্র মন্মথ, সমীরের দু'চারটী বন্ধু—কিন্তু কে যে তাঁর সযত্ন-পালিতা চাঁপার সুযোগ্য স্বামী হবে, তা তিনি নিজে ভেবে ঠিক করতে না পেরে, মেয়ের ওপরেই সে ভার দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর মতে মন্মথই যেন যোগ্যতর, কিন্তু মেয়ের টানটা যেন সমীরের পরেই দেখা যায়।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল—এই বাড়ীরই ড্রইং রুমে বসে দুটী তরুণ, তরুণী গল্প কর্‌ছিল. গল্পের কোন ধারা বা সূত্র কিছুই ছিল না; তবুও তারা আবোল-তাবোল বকেই যাচ্ছিল···এতে বক্তা বা শ্রোতা কারোরই ধৈর্য্যের অভাব ছিল না। হঠাৎ তরুণী, তার চাবীর গোছাটা পিঠের ওপর থেকে টেনে নিয়ে, বাজাতে বাজাতে বল্লে, "সমীরদা, ও সব পচা পুরোনো তর্ক থাক্, তুমি 'তাল' দেও দিকি, আমি গান করি।"—বলেই সমীরের উত্তরের অপেক্ষা না করে, ঝন্ ঝন্ করে চাবীটা বাজাতে বাজাতে গা ধরলে,—

"সুন্দরী ক্ষণিকা, পলালে দূরে,
নন্দিত কোন্ গান, গাহিলে সুরে—
নিস্বর গুঞ্জন, আনমনা নিস্বন্
কম্পিত প্রাণ তবু উঠিল পূরে।
ওগো প্রিয়, চঞ্চল রূপসি!
গেলে চলে, অশ্রুত মন্দিরে।"

এই খেয়ালী মেয়েটীর খেয়ালের পাল্লায় পড়ে সমীরকে টেবিলের ওপর হাত দিয়ে 'তবলার' বোল ধর্‌তে হল বাইরের লোকের চোখে এই দুটী তরুণ তরুণীর মিলিত সঙ্গীত হয়তো হাসির উদ্রেক কর্‌ছিল···এদের কিন্তু সে সবের বালাই ছিল না। ঘুরে-ফিরে গানটীর একটা কলি গেয়ে তরুণী চাঁপা যখন থাম্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছে, ঠিক সেই সময়েই ঘরের পর্দ্দার একটা পাশ সরিয়ে ধরে আর একটী তরুণ,—হয়তো বয়সে সমীরের চেয়ে একটু বড়ই হবে, হাসিমুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ভিতরে আসতে পারি কি?"—

চাঁপার গানের মৃদু 'রেশ' তখনি থেমে গেল। সমীরের মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো···ইচ্ছে করেই চেয়ারখানায় সে একটু ঘুরে বসলো। চাঁপা এতটা কিছু না কর্‌লেও বেশ বোঝা গেল যে, সেও বিশেষ প্রসন্ন হয় নি। মুখে মৃদু হাসি টেনে এনে সমীর বল্লে, "আসুন, আসুন মন্মথবাবু! ঘরে ঢুক্‌বার 'পারমিশান্' পর্দ্দার বাইরে থেকে জান্‌তে হয়···বুঝ্‌লেন? আপনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তার আর কোনো দরকার ছিল না। তারপর, আপনার খবর ভালো?—বাড়ী গিয়েছিলেন না?"—

মন্মথর অলক্ষ্যে চাঁপা সমীরকে ভীষণ ভ্রুকুটি কর্‌লে। সমীর কিন্তু তা দেখ্‌তে পেলেও গ্রাহ্য না করে বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হলে, আপনারা বসুন মিস্ রয়· আমি আসি এখন।" বলে উঠবার উপক্রম করতেই, ত্রস্তা হরিণীর মত চাঁপা সমীরের হাত দুখানা চেপে ধরে বল্লে, "এখুনি যাচ্ছ কেন সমীরদা? বাবা আসুন, তবে না যাবে?"

অগত্যা সমীর বসে পড়ল ; কিন্তু বল্লে, "আমার একটু কাজ ছিল···যেতে পারলেই ভাল হ'ত! তোমার বাবার আস্‌তে তো এখনও দেরী আছে না?"

অন্যমনস্কের মত চাঁপা বল্লে, "হ্যাঁ—তা আছে বইকি! এই তো সবে সাতটা। ..আটটা স' আটটার কম তিনি তো ফিরবেন না।"

চিন্তিত মুখে সমীর বল্লে "তাই তো!"

ঘরের মধ্যে মন্মথের উপস্থিতিটা যেন তারা লক্ষ্যের মধ্যেই আন্‌ছিল না···সমীর তো তার ওপর একেবারে খড়্গ-হস্ত। চাঁপা মনে মনে দারুণ বিরক্ত হলেও বাইরে মন্মথকে তাচ্ছিল্য করতে পারতনা কারণ সে জান্‌তো যে মন্মথ তার বাবার কত প্রিয়! তাই এবারে যেন অসহিষ্ণু হয়েই মন্মথকে জিজ্ঞাসা করলে, "কবে ফিরলেন?"

মৃদুস্বরে মন্মথ বল্লে, "আজই, এখনই।"

"বাসায় যাননি?"

নীচু মুখখানি উঁচু করে তুলে মন্মথ চাঁপার দিকে একবার চেয়ে দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে, "না—যাওয়া হয়নি···আপনাদের খবরটা নিয়ে একেবারে যাব ভেবেছিলাম!"···

সমীর তার চেয়ারখানা ঘুরিয়ে এমন ভাবে রেখেছিল যে যাতে করে মন্মথর দিকে পেছন ফিরে বসা যায়। মন্মথর কথা শুনে সে এমন ভাবে ভ্রূকুটি করলে যে চাঁপা না হেসে থাকতে পারলে না।—হাসতে হাসতে বল্লে, "আপনার সদিচ্ছাকে ধন্যবাদ! আমরা কিন্তু বিদেশ থেকে এলে আগেই বাড়ী গিয়ে স্নান-টানগুলো সেরে নিয়ে পেট ঠাণ্ডা করি···তারপর সময় থাকলে ও শরীরে পোষালে, অর্থাৎ ঘুম না এলে, তবেই বন্ধু-বান্ধবের খবর নিতে বের হই।"—

চাঁপার কথায় মন্মথ একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখলে···দাঁড়া আরসীতে, তার সমস্ত দেহখানার ছায়া পড়ে, তাকে বুঝিয়ে দিলে, ট্রেণ থেকে নেমেই ধূলোমাখা চেহারা নিয়ে, এখানে আসাটা উচিত হয়নি · কিন্তু ফিরেই বা যায় কি করে যখন কুশল প্রশ্নের ছুতায় এসে পড়েছে! মাথাটা নীচু করে সে বল্লে, "স্যর কখন ফিরবেন? তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা কাছে, তাহলে সেই সময় আসব!"

মন্মথর কথায় চাঁপার একটু লজ্জাবোধ হ'ল—বল্লে, "বাবার একটু রাত্‌ হবে, আপনি বসুন না···চা দিতে বলি। এই বেয়ারা!"—

মৃদু হেসে মন্মথ বল্লে, "ধন্যবাদ, এই ধূলোমাখা শরীরে স্নান না করে আমি সুস্থ হতে পারছিনে! সুতরাং খাওয়ার প্রবৃত্তি একেবারেই নেই। আচ্ছা, এখন, চলি। স্যর এলে তাঁকে বলবেন একটু অনুগ্রহ করে। আচ্ছা, নমস্কার!"—আর কোনো কথা শুনবার অপেক্ষা না করেই ঘরের পর্দ্দা ছেড়ে দিয়ে দৃঢ় পদে সে বেরিয়ে গেল।

দরজার বাইরে তার দীর্ঘমূর্ত্তি অদৃশ্য হবামাত্র সমীর ফিরে বল্লে, "বাব্বা! হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম, অতিষ্ঠ করে তুলেছিল!"—

চাঁপাও হেসে বল্লে, "আচ্ছা সমীরদা! তুমি বড় অসভ্য কিন্তু! একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল্‌ছি দেখ্‌ছ, আর তুমি একেবারে এমন কাণ্ড আরম্ভ করলে! ছিঃ! মন্মথবাবু কি মনে করলেন?—তারপর বাবার কানে যদি এসব ওঠে তো বকুনি খেতে হবে খুব, তুমি তো তা জান? তবু, তুমি যে বড় ঐ রকম করলে?"—

সমীর তার 'পাঁস্‌নে' জোড়া খুলে নিয়ে মুছ্‌তে মুছতে বল্লে,"তাই বলে কি ওঁকে সমীহ করে চল্‌তে হবে নাকি? ফুল! (fool) এটিকেট জানে না, কিছু না, না হয় আমার চেয়ে পড়া-শোনাই কিছু বেশী আছে, তাই বলে অত খাতির আমি ওকে করতে পারবনা। এ তুমি জেনো চাঁপা! আমার মনে হয়, তোমার বাবার কাছে সে ছাত্রের চেয়ে আরো কিছু নিকটতম বন্ধনের আভাস পেয়েছে, না? না হলে শুধু নিছক্‌ যে তোমার বাবার ছাত্রত্বের লোভে ও আসা-যাওয়া করে এ আমার মনে হয় না।"

"হেসে ফেলে চাঁপা বল্লে, "বাবার তো নিকট বল্‌তে এক আমি ছাড়া আর কেউ নেই, তা আমাকে দিয়েই যদি কোনো বন্ধন মন্মথবাবুকে বাবা স্বীকার করান তো সেটা আমিই আগে জান্‌তে পারব। এটা তুমি স্থির জেনো যে বাবার মাথায় যদিই সেই রকম উদ্ভট্‌ কল্পনা জেগে থাকে, তাহলে সেটা কাজে পরিণত করবার আগে, বাবা আমাকে নিশ্চয় জানাবেন। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, তুমি কেন ওর ওপর এত চটেছ বল দেখি?"—

"চটেছি কেন? কিন্তু থাক্‌ চাঁপা—আমার মনে

হচ্ছে এ ব্যাপারের যবনিকা এইখানে ফেলাই ভাল, না হলে এর পরে আমি যা বলব তা হয়তো তোমার প্রীতিকর না হতেও পারে।"

"এমনই বা অপ্রীতিকর কি তুমি বলবে সমীরদা? আর অপ্রীতিকর বলেই যদি মনে কর, তো না বলাই উচিত। আমি বল্‌ছি মন্মথর ওপর আমার কিছু 'পার্সিয়ালিটি' নেই, কিন্তু তাই বলে অন্যায় কথা আমি কারো বিরুদ্ধেই সহ্য করব না।"

কথাগুলো বোধ হয় সমীরের কানে গেল না, কারণ সে ভ্রুকুটী কুঞ্চিত করে বসেই রইলো... রাজ্যের চিন্তা তখন এসে তার মনে বাসা বেঁধেছিল।

চাঁপা আড় চোখে সমীরের মুখের ভাবটা একবার দেখে নিলে সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে, সমীরের মনোভাবের পরিচয় পেয়ে একা তার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে তার ভয় কর্‌ছিল... চলে যাওয়ার খুব ইচ্ছা হলেও, হঠাৎ চলে যাওয়ার কোনো সদুপায় সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না...একটু পরেই সমীর বল্লে "তোমার বাবা, যদি পাগল হন, তবেই তোমাকে মন্মথর হাতে ফেলে দেবেন। কি আছে ওর? বাড়ী আছে, ঘর আছে, টাকা পয়সা আছে? সম্বলের মধ্যে এক তো লেখাপড়া!..... "

"লেখা পড়াটাই কি ফেল্‌না জিনিস হলো? জানো তো চাণক্য কি বলেছেন "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"...।

"জানি বইকি! আরো জান্‌ছি যে তোমার মনটীও আজকাল মন্মথ-রূপী শরে বিদ্ধ হয়েছে...তা বেশ, ম্যাডাম, না জেনে আমি তো অনেক কটু কথা বলে ফেলেছি—পারো তো ক্ষমা করো...তা হ'লে বিয়ের ভোজটা কবে দিচ্ছ?"

"আঃ সমীর দা!—তোমার সঙ্গে মেলা-মেশাটা একটু বেশী করি বলেই কি তুমি এই অনুচিত কথাগুলি আমাকে শোনাচ্ছ? যে কথার কোনো ভিত্তি নেই, তাই নিয়ে এত নাড়া চাড়া করা তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না সমীর দা...তা ছাড়া বাবার কাণে যদি কোনো ক্রমে এসব কথা একবার ওঠে তো, হয় তো তিনি এই মেলা-মেশা বন্ধ করে দিতেও পারেন...তাই বল্‌ছি সমীরদা, কথা বলবার আগে ভেবে দেখো—"Think before you leap."...

মুখটা বিকৃত করে সমীর বল্লে, "বুঝেছি, বুঝেছি... সমীর দা এখন পচে যাবে বৈ কি! আর তোমার বাবার কাণে তুমি এ সব না তুললে, কেউ তুলবে না...সে জন্তে আমি একটুও ভয় করিনে...তোমার যা খুসী তাই বানিয়ে বলো তাঁর কাছে আমার নামে। খরগোস আর কচ্ছপের গল্পের মত ঘুমিয়ে নিতে গিয়েই দেখ্‌ছি আমি হেরে গেলাম! আচ্ছা, এখন তবে আসি মিস্ রয়...চালাকী বুদ্ধিতে আমিও কম যাইনে...দেখি, বিজয়লক্ষ্মী কাকে মালা দেন!"...বলে ঝড়ের মত সমীর বেরিয়ে গেল।

চাঁপা আপনা মনে বল্লে 'অদ্ভুত মানুষ! যেই দেখেছে, মন্মথর দিকে একটু টেনে কথা বলেছি, এমনি হিংসেয় ফেটে পড়্‌লো! বেশ হয় বাবা যদি সমীরদাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওই মন্মথর সঙ্গেই আমার বিয়ে দেন! তা খারাপই বা এমন কি হবে? মানুষ যে পরিমাণে বিদ্বান্ সেই পরিমাণে চালাক বা কেতা দুরস্ত নয়। তা না হোক গে, আমার হাতে যদি পড়ে তো সব ঠিক করে নিতে পারব। সমীরটা তাহলে খুব জব্দ হয় কিন্তু...ওঃ! ভেবেছে ওই আমাকে বিয়ে করবে। বাবা যদি বলেনও তাহলেও আমি ওকে বিয়ে করব না...ইস্! মন্মথর সাথে বিয়ে না হয় না হবে...তাই বলে আমি ওকেও বিয়ে করব না..."

নীচের গাড়ী বারান্দায় গাড়ী থামার শব্দ পেয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "বাবা, আজ যে তুমি এত সকাল সকাল ফিরলে?—

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ—মা, একটু সকাল করেই ফির্‌লাম...মন্মথর আজ ফিরে আস্‌বার কথা...যদি এসে আমার অপেক্ষায় বসে থাকে? জানি তো যে সে এখানে এলে, আমার সঙ্গে আগে দেখা করবে! হ্যাঁরে খুকি! মন্মথ কি এসেছেন? এখানে এসেছিলেন?"

একটু আগের মন্মথবিষয়ক চিন্তার রংএর একটী পোঁচ তখন চাঁপার মনে রঙীন হয়ে বেড়াচ্ছিল...তার মনে হোল, তার বাবার এই জিজ্ঞাসার ভেতরে ওই ধরণেরই কি একটা প্রশ্ন লুকিয়ে আছে...অজ্ঞাতে তার চোখ মুখ একটু লাল হল...কাণ দুটী গরম গরম ঠেকতে লাগ্‌ল...কোন মতে বল্লে, "হ্যাঁ—বাবা, এসেছিলেন... ট্রেণ থেকে নেমেই...তাই আর অপেক্ষা করতে পারেন নি...আবার আসবেন বলে গেছেন...।"

ওপরে পৌঁছে, হাতের লাঠিখানা চাঁপার হাতে দিয়ে তিনি বারান্দার আরাম কেদারাখানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌লেন নীচে মন্মথর গলা শুন্‌তে পেয়ে চাঁপা বল্লে, "আসুন মন্মথবাবু···ওপরে আসুন···বাবা এখানেই আছেন···।"

আহ্বান শুনে মন্মথ আহ্বানকারিণীর দিকে একটু আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখ্‌লে, বিকেলের চাঁপা আর এখনকার চাঁপা একই লোক কিনা··মুখে সে কিন্তু কিছুই বল্লে না···। মন্মথর এই চেয়ে দেখার অর্থ বুঝ্‌তে পেরে চাঁপা মনে মনে খুবই লজ্জিতা হল। সে যখন তার বাবার কাছে পৌঁছে গেল, তখন বিকেলের অনাতিথেয়তার ত্রুটীটুকু সেরে নেওয়ার জন্যে বল্লে, "বসুন, আমি আপনাদের দুজনের জন্যে দু'গেলাস ঘোলের সরবৎ আনি গে·· বেশী দেরী হবে না···পালাবেন না যেন···"বলে লঘুপদে সে একরকম ছুটেই সেখান থেকে চলে গেল।

(২)

চাঁপার সঙ্গে খুব খানিকটা কথা কাটাকাটি করে সমীরের মন ও শরীর দুইই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল; তার ফাঁকায় সে একেবারে ঈডেন্ গার্ডেনে গিয়ে দম নিলে। জলের ধারে বস্‌বার যে জায়গা আছে; তারই একটার ওপর বসে পড়ে, সে সব ব্যাপারটা আগা-গোড়া ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লে···গুছিয়ে সব কথা মনেও এল না··· এলোমেলো দু একটা কথার টুক্‌রা যা' মনে এল, তাই বিশ্লেষণ করে সে ঠিক কর্‌লে যে, তার দিক দিয়েও কথাগুলো বলা অন্যায় তো হয়ইনি ··বরং সঙ্গত হয়েছে। চাঁপা তার সঙ্গে যে সুরে কথা আরম্ভ করেছিল, তাতে এ কথাগুলো না বলে চুপ করে থাক্‌লেই বরং তার 'মর্‍যাল কারেজে' ঘা লাগ্‌তো · সে যা হোক, যা হবার, তা তো হয়েই গিয়েছে···এখন যদি ঐ ক্ষেত্রে চাঁপার ওপর রাগ করে সে সরে দাঁড়ায় তো 'চম্পা-লাভ' তার পক্ষে দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়···ভেবে ভেবে সে ঠিক কর্‌লে, যাওয়া-আসা সে কমাবে না···তারপরে সুবিধা বুঝে, একদিন মুকুন্দবাবুর কাছে কথাটা পেড়ে দেখ্‌বে···। তা না হলে এই যে দুতিন বছর ধরে এদের সঙ্গে মেলামেশা হয়েছে, সেটা কি এতই পল্‌কা যে সামান্য একটা কথায় ছিঁড়ে যাবে? কল্পনায় সে দেখ্‌লে যেন চাঁপার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, সে তাকে বল্‌ছে, "বড় যে ঝগ্‌ড়া করেছিলে এখন কি হয়?" তার এই কথা শুনে চাঁপা যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ছে।

এই ভাবনার মধ্যেও আর একটা কালো ছায়া, তার মনে উঁকি দিতে লাগ্‌লো। কথাটা হল, তার এই কথাগুলো তার মা ও বড় ভাইকে জানানো—তাঁদের কাছে সব জানানো হয়ে গেলে, তবে ওদিক্‌কার সম্মতি বা অসম্মতি কথা···। রাস্তায় ও বাগানের মধ্যে মধ্যে তখন আলো জ্বলে উঠেছে···এদিকে ওদিকে সকলে ঘুরে বেড়াচ্ছে···রাস্তায় লোক চলাচল ট্রাম বাসের হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে···। আশে পাশে কত লোক কত রকমারি কথা বল্‌ছে তা কাণ করে শুন্‌লে মনের দুঃখ লাঘব হয়ে যায়···। কিন্তু এ সব তার কিছুই ভাল লাগ্‌ছিল না··· আস্তে আস্তে উঠে সে বাড়ীমুখো চল্‌বে বলে একটা চল্‌তি বাসকে সঙ্কেত করে উঠে পড়্‌লো···টিকিটের জন্য একটা টাকা ফেলে দিয়ে সে টিকিটখানা হাতে করে নিলে, কিন্তু পয়সার কথা তার আর মনে রইলো না···। টাকার ফেরত পয়সাগুলি তার পাশে বেঞ্চির ওপরে পড়ে রইলো···। খানিক পরে নেমে গেল···।

সে বাড়ী গিয়ে যখন পৌছলো, তখন বাড়ীর সকলে খেতে বসেছে···তার মা সত্যবতী সেখানে বসে খাওয়ার তদারক কর্‌ছেন···। তাকে অসময়ে শুকনো মুখে ফির্‌তে দেখে তিনি তাকে খেতে ডাক্‌লেন···আহারে অপ্রবৃত্তি জানিয়ে সে গিয়ে শুয়ে পড়লো। তার কথাগুলো গুছিয়ে বল্‌বার জন্যে সে ভিতর থেকে তাগাদা অনুভব কর্‌ছিল···।

অনেক রাত্রে, সকল কাজ সেরে শুতে যাওয়ার আগে, সত্যবতী তার ঘরে আলো জ্বল্‌ছে দেখ্‌তে পেয়ে, ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়্‌লেন · দেখ্‌লেন তত রাত্রেও সমীর ঘুমায়নি···কাছে গিয়ে বস্‌তেই সমীর চোখ খুলে দেখ্‌লে ·· তার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে সত্যবতী বল্লেন, "এখনও ঘুমোস্ নি? তোর কি অসুখ করেছে সমী?···

"না-না···"বলে বলে সমীর আবার চোখ বুজ্‌লে।— সত্যবতী আবার বল্লেন তবে রাত্রে কিছু না খেয়ে এসে শুলি যে! কারো সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করেছিস্ বুঝি?"

"না—ঝগড়া আর কার সঙ্গে কর্‌ব—মনটা আমার ভাল নেই···।"

আক্ষেপের সঙ্গে সত্যবতী বল্‌লেন "হ্যাঁ···তা আমি আগেই বুঝেছি···কিন্তু মনটাই, তোমার কেন ভাল নেই জানতে চাচ্ছি···।"

বিছানার ওপর উঠে বসে মাথাটা এক হাতে টিপে ধরে সমীর বল্লে "মা, তবে শোনো, সব কথা তোমাকে খুলেই বলি···আমাদের সেই কুমুদবাবু প্রফেসরের একটী মেয়ে আছে, তাকে আমি বিয়ে কর্‌ব ভেবেছিলাম...।"

বাধা দিয়ে সত্যবতী বল্লেন "সেই, 'হাফ-ব্রাহ্ম' কুমুদ বাবু ?"—

"হ্যাঁ—অমন চম্‌কে উঠলে যে ! সব না শুনেই চমকাচ্ছ ?—সে মেয়ে যদি তোমার ঘরে বৌ হয়ে আসে তো শুধু আমার একার ভাগ্যি নয়—তোমার ভাগ্যি··· তোমার বংশের ভাগ্যি···যাক্‌, আগেই চটিয়ে দিও না, তা'হলে হয়তো সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব না···।"

কিছু না বলে সত্যবতী গুম্ হয়ে বসে রইলেন···।

"স্থির হয়ে শোনো আগে তারপর মতামত দিও···। কুমুদবাবু তাঁর মেয়েকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা করেছেন··সে মেয়ে একাধারে যেমন টেবিলে বসে ছুরি, কাঁটা নিয়ে খেতে পারে···টেনিস্‌, ব্যাড্‌মিণ্টন খেলতে পারে··ইংরাজী গান, বাজনা, নাচ অবহেলায় করে যেতে পারে··অন্যধারে তেমনি রান্না করে, দশ পাঁচ জন লোককে খাওয়াতে পারে···বুড়ো মানুষদের মনস্তুষ্টি করে রামায়ণ মহাভারত মুখস্ত বলে যেতে পারে ·· হয়তো বা ঘর-দুয়োর ধোওয়া-মোছা কর্‌তেও পারে। হয়তো বা সে বউ তোমার ঘরে নেহাৎ বেমানান্ না হতেও পারে···। আমি তাকে দু'তিন বছর ধরে দেখছি— দেখ দিকি যা বল্লাম, তাতে তোমার চল্‌বে কিনা ?..."

মুখটা ভার করে সত্যবতী বল্লেন, "আমি আর তার কি কর্‌ব ? তোমার দাদা কে বলো··সে যদি খুসী হয়ে মত করে তো আমার নিজের কোনো অমত নেই···। আমি আর ক'দিনই বা বাঁচ্‌ব···তাই যে তোমাদের সুখে বা সুবিধায় বাধা দিতে যাব ? ··

মায়ের এই প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুরটা সমীরের কাণে যে বেশী হয়েই বাজ্‌লো···একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লে "না মা তুমি অমন করে কথা বল্‌তে পাবে না···তুমি যদি খুসী হয়ে মত না দেও তো আমি ও মতলব একেবারেই ছেড়ে দেব···কিন্তু আশ্চর্য্য হবার বা অমত করবারই বা আছে কি এতে ? কুমুদবাবু আমাদেরই জাত্‌···তবে হয়তো তোমাদের মত শুদ্ধ না হতে পারেন···তাতে আর কিইবা হয়েছে···? দোষ আছে কিছু ? ··"

সত্যবতী ক্ষীণ একটু হেসে বল্লেন, "কিছুতেই কিছু আটকায়না বাবা···কিন্তু একটা কথা বলি···আগুন-ঝাঁপা হয়ে কিছু করোনা···।"

"সে জন্যে তুমি কিছু ভেবোনা মা···আমি খুব ভেবে চিন্তেই এগোচ্ছি···আমার দিক থেকে তুমি কোনো অসুবিধাই পাবে না···অসুবিধা যদি হয়তো তোমাদেরই ·· আর সেই জন্যেই তো এত বলছি, তোমাকে না হলে বল্‌বার দরকারই বা কি ছিল ? দাদাকে বল্‌তে হয় তুমি বলো···আমি পার্‌বনা···। তোমাকে যদি আমি আমার দলে পাই তবে আর ভয় কিছুরই করি নে···।"

ঘরের ভেতরে যখন এই রকম কথাবার্ত্তা চল্‌ছে, ঘরের বাইরে তখন আর একজন অন্ধকারে লুকিয়ে খোলা জান্‌লার পাশে দাঁড়িয়ে সব কথাগুলি যেন গিল্‌ছিল··· সে সমীরের বৌদি প্রতিমা···। অতরাত্রে সমীর কিছুই না খেয়ে শুতে গেল, সত্যবতীও নিজের ঘরে না গিয়ে, সেই যে তার ঘরে ঢুকেছেন···আর বেরোচ্ছেন না··· অথচ ঘরে আলো জ্বল্‌ছে, কথারও শব্দ শোনা যাচ্ছে·· এই সবগুলি মিলে তার কৌতূহলী স্বভাবকে আরো কৌতূহলী করে তুলেছিল···।

কথাগুলো সব শোনা হয়ে গেলে, প্রতিমা যখন বুঝ্‌লে যে আর কোনো কথা হচ্ছে না ··তখন সে একটু মৃদু হেসে, আপন মনে বল্‌তে বল্‌তে চলে গেল, "ওঃ !— বুঝেছি··'লভ্‌'—"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—

কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে !"—

সমীরের দাদা শিশির জেগেই ছিল···প্রতিমার শেষের কথা ক'টা তার কাণে গেল··জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কে ধরা পড়ল প্রতিমা ?"

ঘরের খিল বন্ধ কর্‌তে কর্‌তে প্রতিমা বল্লে "কে আবার—তোমার ভাই !"

"আমার ভাই কোথায় ধরা পড়ল ?—"

"কেন ? জাননা ? কুমুদ বাবুর বাড়ী···।"

"হেঁয়ালী রাখ···সত্যি কথা বলতো শুনি···

"এর আবার হেঁয়ালী কি ? যা সবাই অনেক আগে জেনেছে—সেটা তুমিই সব শেষে শুন্‌বে···। শোনো···

কুমুদ বাবুর সেই যে একটী মা মরা মেয়ে আছে না তাকে বিয়ে করবার জন্যে ঠাকুরপো মায়ের কাছে বায়না নিচ্ছেন···এই তো শুনে আস্‌ছি···।"

"বায়না নিচ্ছে, কি রকম !···"

"এই বল্‌ছেন আর কি···ওই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেও মা···মেয়ে নাকি নাচ্‌তে, বাজাতে, গাইতে জানে···।"

"তা হলে, বায়না নেওয়ার কথা বটে···অত ভাল মেয়ে—।"

"ঈস্‌···তোমার যে শুনেই হয়ে এল দেখ্‌ছি···তা ঠাকুরপো যদি সুবিধা করে উঠ্‌তে না পারেন তো তুমিই না হয় একবার উঠে পড়ে চেষ্টা করে দেখ···।"

"নাঃ! সে আর হয় না···বিয়েটা যদি অত সকাল সকাল না হয়ে যেত—তবে না হয় একবার চেষ্টা করে দেখা যেত···কিন্তু এখন যে না—সে একেবারেই অসম্ভব !

মুখখানাকে ঘুরিয়ে প্রতিমা বল্লে "খুব সম্ভব গো খুব সম্ভব···। তোমার দোষ আর কি দেব · তোমাদের জাতটাই এমনি···।"

হাস্‌তে হাস্‌তে শিশির বল্লে "ধীরে ধীরে···একলা আমাকে দেখেই সমস্ত জাতটাকে বিচার করতে বসোনো···ঠকে যাবে। এই জাতের মধ্যেই সাজাহান বাদ্‌শা জন্মেছিলেন···তাঁর মত পত্নী-প্রেমিক আর কেউ, আছে কিনা সন্দেহ···। সুতরাং ঝোঁকের মাথায় কিছু তর্ক করোনা হেরে যাবে।·· যাক্‌গে···আসল কথাটা বল না। সমী কি ওই মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায় ?—"

"হ্যাঁ—চায় !"

"তা করুক না ক্ষতি কি ! বিয়ে করে বিষ বা অমৃত যা উঠ্‌বে তা গলাধঃকরণ ওই করবে !···আমাদের তাতে ক্ষতি কি ? তোমারই বা তাতে রাগ কি ? আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছিনা যে তুমি সতীনের ঝালে অস্থির হয়ে উঠ্‌ছ ?—যদিও ওই রকম একটা কিছু করা দরকার হয়ে পড়েছে···তুমি বড্ড বেড়েছ···!"

"করে একবার মজাটা দেখনা !—"

"মজা দেখ্‌বার লোভ মনে প্রবল থাক্‌লেও, তোমার স্বামীর ট্যাঁক এত ভারী নয় যে, শুধু মজা দেখ্‌বার লোভে, দুটী বউয়ের সম্মিলন করি···একটীর মান-অভিমানের চোটেই তো ঘায়েল হবার যোগাড় !···"

"কি এমন করি বা বলি যার জন্যে তুমি একেবারে ঘায়েল হয়ে পড়েছ ?—"

"হইনি···হবার যোগাড় হয়েছি···যাক্‌ রাত তো অনেক হ'ল···এখন নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে হবে না সমীর ভাবী-বউয়ের মুণ্ডুপাত চল্‌বে ?—"

ঠোঁটটা উল্টিয়ে প্রতিমা বল্লে, "বয়ে গেছে আমার মুণ্ডুপাত করতে···যার মুণ্ডু সেই পাত করুক গে।"

এদিকে সত্যবতী ছেলের কথাবার্ত্তা শুনে একেবারে কাঠ মেরে গিয়েছিলেন··কোলের ছেলে সমী, এই সেদিন পর্য্যন্তও না খাইয়ে দিলে যার খাওয়া হত না সে আজকের এই কথাগুলো শিখ্‌লে কোথায় ? কি এমন সে মেয়ে যার জন্যে মায়ের স্নেহও তার কাছে বিস্বাদ ঠেক্‌ছে ? ছেলে ঘুমিয়েছে দেখে, তিনি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন···। নিজের ঘরে গিয়ে যেখানে তাঁর স্বামীর একখানা ছবি টাঙানো ছিল, সেইখানে গিয়ে বল্লেন, "দুঃখ, কষ্ট যা-ই পাইনা কেন সহ্য করার ক্ষমতা দিও। আমার ইষ্টও তুমি···দেবতাও তুমি··· দেবতাকে দেখিনি···তোমাকে দেখেছি তাই আমার বেদনা তোমাকেই জানাচ্ছি···।" এই আত্ম-নিবেদনে, মন তাঁর অনেক হাল্কা হয়ে গেল···। ধীরে ধীরে তিনি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌লেন।···

সকালে উঠ্‌তেই শিশিরের সাথে তাঁর দেখা···বল্লে "মা, সমীর নাকি কোথায় কি গোলযোগ ঘটিয়াছে ?—"

ছেলেকে এসব বলার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ—সেই যে কার কাছে পড়তে যেতো··তাঁর বুঝি একটী বিয়ের মত মেয়ে আছে · তাকেই বিয়ে করবে বল্‌ছে···।

"হুঁ ! বুঝেছি···ভায়ার আমার বিয়েতে তাই এত বিরাগ ! ওধারে কোর্টশিপ চলছে কিনা···পাঠচর্চ্চা, প্রেমচর্চ্চা দুই-ই চলছে কিনা···আহার ও ঔষধ দুই-ই হচ্ছে···।"

শিশিরের এই শ্লেষোক্তিতে সত্যবতী অন্তরে ব্যথা পেলেও, চুপ করে থাক্‌লেন না। থেকেই বা উপায় কি ? কিছু কি বলবার আছে ? খানিক চুপ করে থেকে শিশির আবার বল্লে, "তুমি কি মত দিলে ?"

সত্যবতীর রুদ্ধ অভিমান এইবার উথ্‌লে উঠ্‌ল··· বল্লেন, "আমি মতও দিই নি, অমতও দিই নি···আমার

মতামতের আবার মূল্য কি শিশির ?—যে সংসারে একদিন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলাম সেই সংসারেই পরের মত একধারে সরে আছি…তবে তোমার আমার সন্তান, গ্রাহ্য কর বা না কর, তোমাদের সুখ দুঃখে, আমি সমানেই সুখী দুঃখী…তোমাদের ভালমন্দ আমাকে হাসায়, কাঁদায়…খোকা যদি ঐ মেয়েকে বিয়ে করে, সুখী হবে মনে করে থাকে, তবে কেন বাধা দেব আমি ? যতদিন ছোট ছিলে তোমরা, তোমাদের ভালমন্দ দেখবার ভার আমাদের ওপরেই ছিল…এখন তোমরা বড় হয়েছ… নিজেদেরটা নিজেরাই দেখ্‌বে · আমার দেখ্‌বার কথা নয় তো ?"

মায়ের সুগভীর অভিমানের কথায় শিশির একটু লজ্জা বোধ করে বল্লে, "সমী যদি এ মেয়েকে বিয়ে করে তো দেখো, তুমি আরও একধারে পড়ে যাবে…ব্যবধান তাতে বাড়্‌বে ছাড়া কম্‌বে না…তার চেয়ে তুমি একটু বুঝিয়ে বল, হয়তো তোমার কষ্ট হবে বলে, এ বিয়ে না করতেও পারে—। সে মেয়ে যে আবহাওয়ায় 'মানুষ', তাতে সে তোমার একাদশী, দ্বাদশী বুঝবে না…।"

সখেদে সত্যবতী বল্লেন, "না বুঝুক। বুঝতে তো কাকেও আমি বলিনে বাবা। ভগবান্ আমাকে এ ব্রত দিয়েছেন, উদ্‌যাপনও আমি কর্‌বো · একাদশী ! পরের মেয়ের কথা ছেড়ে দেও। তুমি যে আমার ছেলে… আশা ভরসা সবই…। আমার কাছ থেকে ঐ দেহ পেয়েছ, কই তুমিও তো বোঝ না…"

"বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকি ঘরের খবর জান্‌তেই পারিনে…।"

ম্লান হেসে সত্যবতী বল্লেন, "তা বেশ ! তোমরা বাইরের কাজ কর…বৌমা ঘরের কাজ করুন…তবে আর একাদশীর খবর কে নেবে ? সে যাক্—এ বিয়েতে আমার মতও নেই…অমতও নেই…হয়তো বা খোকা তোমাকেও সব কথা বল্‌বে, তুমি কিন্তু বলে দিও আমার মত নেই …।"

"আমি পার্‌বনা · যা বলার হয় তুমি বলে দিও। করুক না বিয়ে…সে বউ তোমার মোটা ভাত কাপড়ে ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে না…তার ম্যাচ করা কাপড় জামা চাই…সিনেমা থিয়েটারে চাই…'এ্যাট হোম' চাই। হুঁ ! বলে ঘুঘু দেখেছ—ফাঁদ দেখনি ?" বলে শিশির নেমে চলে গেল। চিন্তিত মুখে সত্যবতী পূজার ঘরে গেলেন।

(৩)

চাঁপার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে সমীর তাদের বাড়ী যায়নি…যতবারই যেতে গিয়েছে…নিজের দিক থেকে সে একটা বিষম লজ্জা অনুভব করে পেছিয়ে এসেছে…। এমনিকরে প্রায় মাসখানেক হয়ে এলে একদিন নিজে খুব শক্ত হয়ে, সে ধীরে ধীরে আবার কুমুদ বাবুর বাড়ী হাজির হল।

ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পা দিয়েই, চাপার উচ্ছলিত হাসির শব্দ পেয়ে তার কারণটা জান্‌বার জন্য সে একটু দ্রুতপদে সিঁড়ি ক'টা পার হয়ে এল…।

ওপরে এসে যা দেখলে…তাতে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল…বিকেলের ম্লান আলো এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে… একটা বড় কোচে চাঁপা আর মন্মথ বসে, কি একটা ছবির বই দেখছে ও তার সমালোচনা করছে…। হাসিটাও বোধ হয়, এই ছবি সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়ে…চাঁপার মুখে অপূর্ব্ব লাবণ্য…মন্মথর মুখেও শান্ত শ্রী, পরিতৃপ্তির ছায়া…।

সমীর দেখতে লাগ্‌ল, আর ভাবতে লাগ্‌ল, যে এত হাসি, এত গল্প, এত সুষমা, কোথায় পেলে ওরা ? বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা তার মনে হয়ে, সমস্ত শরীরে মনে বিছার কামড় ধরিয়ে দিলে…প্রায় ছুটে গিয়ে সে কুমুদ বাবুর বস্‌বার ঘরে ঢুকে পড়ল·· সেখানে তখন কেউ ছিল না…। কাছেই একটা গদীআঁটা চেয়ার দেখ্‌তে পেয়ে, সে তাতে বস্‌ল…প্রিংয়ের চেয়ারখানা তাকে যেন গ্রাস করে করলে…। কতক্ষণ কেটে গেল ঠিক নেই…সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল··। ঘরে আলো জ্বালাতে গিয়ে চম্‌কে উঠে যে ছুটে পালালো সে চাঁপা…। তার একটু পরেই কুমুদ বাবুর গলা শোনা গেল "তুই, অমন করে এ ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেলি কেনরে খুকি ?…"

"আমার মনে হল, ঘরে কে ঢুকে আছে !…"

"কই, আয় তো…দেখি।" বলে কুমুদ বাবু, তাঁর বস্‌বার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাতেই সমীর চেয়ার খানার ওপর সোজা হয়ে বস্‌ল। কুমুদ বাবু তাকে দেখেই হা হা

করে হেসে উঠলেন…বল্লেন, "খুকি, দেখে যা রে ঘরে কে বসে আছে!…"

"কে বাবা? বলে ঘরে ঢুকে বল্লে "ওঃ আপনি! যা ভয় পেয়েছিলাম!—আমাদের কাছে না গিয়ে এখানে চুপি চুপি একা একা বসে আছেন যে! একি সমীর বাবু! আপনার অসুখ করেছে নাকি?"

সমীর তার চশমার ভেতর দিয়ে চাঁপার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বল্লে, "অসুখ তো আমার হয়নি… কিন্তু তুমি তো খুব বদলে গেছ দেখ্‌ছি।…

আশ্চর্য্য হয়ে চাঁপা বল্লে "আমি? আমি বদলিয়েছি? কই কিসে বলুন তো!…স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে সমীর বল্লে "বদলাও নি? আমাকে এত খাতির করতে শিখেছ?—মাস খানেক আসা যাওয়া না করায় আমার খাতির মাত্তি দেখ্‌ছি তোমার কাছে খুব বেড়ে গিয়েছে…"

"বড় হচ্ছি না কি? চিরকালই কি সমান থাকব?…"

"নিশ্চয়ই নয়…বড় হচ্ছ বলেই তো এই ক'দিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয় করতে শিখেছ…'আপনি' 'সমীরবাবু' এই সব বলে সম্মান করতে শিখেছ… বেশ, বেশ খুসী হলাম।…

কুমুদ বাবু এতক্ষণ চুপ করে বসে এদের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন…এইবার হেসে উঠ্‌লেন…বল্লেন "ও পাগ্‌লীর কথা ছেড়ে দেও…ও যে কখন্ কি ভাবে থাকে বোঝা ভার…আমি যে চব্বিশ ঘণ্টাই দেখছি, আমিই সব সময় বুঝে উঠ্‌তে পারি নে…মন্মথর কথা নিয়েও কি আমাকে কম ভুগিয়েছে? ভাবতাম বুঝি মন্মথর ওপর ওর নজর নেই…"

বাধা দিয়ে সমীর বল্লে, "নজর থাক্‌বে না কেন?—বরাবরই তো আছে…।"

"ঐ দেখ…এই সহজ ভাবটা তোমরা ধরতে পেরেছ… অথচ আমি ধরতে পারি নি…তাই মন্মথ যখন আমার কাছে চাঁপাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে…আমি হঠাৎ তাকে কিছু বলতে পারিনি…বল্লাম 'পরে বল্‌ব'। মেয়ে আমার যে মানোয়ারী গোরা…কত ভেবে ভেবে শেষে কথাটা তুলে ফেল্লাম ওর কাছে…দেখ্‌লাম মতও নেই, বিশেষ অমতও কর্‌লে না…তাড়াতাড়ি মন্মথকে সম্মতি জানিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি…তখন কি জানি যে মন্মথ বাঘিনীকে বশ করে আমার কাছে এগিয়েছেন? হ্যাঁ—মা…মন্মথ আজ এসেছিলেন?"

মুখটা নীচু করে চাঁপা বল্লে "হ্যাঁ…এসেছিলেন। কিন্তু বাবা, তোমার কি আর অন্য কোন বল্‌বার মত কথা নেই?…"মন্মথর নামে সমীরের নাক যে সিঁট্‌কে উঠছিল তা চাঁপা অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিল।

হাতের পাখাখানা নাড়তে নাড়তে কুমুদ বাবু বল্লেন "সমীর আমাদের ঘরের লোক, তাঁকে একবার আমাদের ঘরের কথাগুলো বলতে হবে বৈকি…। হ্যাঁ—সমীর তুমি যেন অনেক দিন এখানে এসোনি মনে হচ্ছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ…বাড়ীতে কিছু কাজ ছিল…আচ্ছা এখন তা হলে উঠি।"

"সেকি? কিছু খেয়ে যাও। ওমা খুকু…সমীর যাবেন বল্‌ছেন…তাঁকে কিছু খাবার দেও।"

'হ্যাঁ দিই…"বলে চাঁপা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল… কিছুক্ষণ বসে থেকে কুমুদবাবু ইজি চেয়ারটাতে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন…এই সুযোগে সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে…যেখানে চাঁপা ষ্টোভে চায়ের জল বসিয়ে, খাবার সাজাচ্ছিল… সেইখানে হাজির হল…। বিদ্যুতের আলোয় চাঁপার মুখের শান্ত সৌন্দর্য্য সমীর আজ যেন প্রথম দেখ্‌লে…। এমন করে বুঝি সে কোনও দিন দেখ্‌তে পায়নি…বিনা ভূমিকাতে সে চাঁপাকে বল্লে. "তোমার ঐ চা আর খাবার গিল্‌বার জন্যে আমি এতক্ষণ হাঁ করে বসে নেই…তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে শুন্‌বার অবসর হবে কি?"

সমীরের কথাবার্ত্তার ধরণ দেখে, চাঁপা একটু ভয় পেলে…বল্লে, "চলুন…বাবার কাছে যাই…যা বল্‌বার আছে সেখানেই বল্‌বেন…।"

কঠোর ভাবে সমীর বল্লে "তাঁর সাম্‌নে বল্‌বার কথা হলে, এতক্ষণ কবে বলে আমি চ'লে যেতাম…কিন্তু তা নয় বলেই, আমায় এতক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে হয়েছে আর দেরী কর্‌তে চাই না…'কাজ কর্ম্ম' আমাদেরও কিছু কিছু থেকে থাকে।"

চাঁপা চুপ করেই রইলো…। ঝড়ের মত সমীর বলে গেল "মন্মথকে তুমি আমার চেয়ে কিসে যোগ্য দেখলে… আমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি চাই-ই। আজ মাসাবধি আমার পেটে ভাত নেই, চোখে ঘুম নেই…সম্ভব অসম্ভব

সকল রকম উপায়েই আমি তোমাকে লাভ করতে চেয়েছি ...আমার সমস্ত মন প্রাণ কি ব্যাকুল একাগ্রতায়, উন্মুখ হয়ে তোমাকে পেতে চাইছে।...এই এক মাসের একটী মুহূর্ত্তও আমার তোমার চিন্তা ছাড়া কাটেনি...আর আজ যখন সে সমস্যার কতকটা সমাধান করে এনেছি...তখন শুনছি কি যে মন্মথর সাথে তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছে? এ বিয়ে ঘটালে কে? তুমি না তোমার বাবা?"

ধীরে শান্তস্বরে চাঁপা বল্লে "এ কথার উত্তর তো আপনি বাবার কাছেই পেতে পার্‌তেন! এর জন্যে নির্জ্জনতার দরকার ছিল না ..আর কে যোগ্য বা অযোগ্য, সে কথা যদি আমার কাছ থেকে শুনতেই আপনার ইচ্ছে হয়ে থাকে তো শুনুন যে, আচারে ব্যবহারে, আমরা অহিন্দুয়ানী করলেও জাতে তো হিন্দুই আছি কিনা... সুতরাং এ সব ব্যাপার, মা, বাবা বা সেই রকম অভিভাবকের মতেই হয়ে থাকে। নির্ব্বাচন বাবা নিজেই করেছেন, পরে আমাকে জানালে আমি অসম্মতি দিই নি...দেওয়ার যে কোনও কারণ নেই...এটা যে কতদূর সঙ্গত তা আপনিও জানেন।...ব্যস্, এইবার বোধহয় আপনার কথার উত্তর পেয়েছেন!"—

সবিদ্রূপে হেসে সমীর বল্লে, "বটে? এতদূর"! লেখাপড়া আর ক'টাচামড়ার এত আদর? আচ্ছা! আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—চাল-চুলোহীন মন্মথকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে ক্ষেপে তো উঠেছ...কিন্তু থাকবে কোথায়? খাবে কি? এত প্রেম শেষ পর্য্যন্ত টিঁকবে তো?"...

অপমানে চাঁপার সুগৌর মুখ, একেবারে জবার মত লাল হয়ে গেল.. দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সে এই অপমানের শোধ নেওয়ার জন্যে যে কথাগুলো জিভের গোড়ায় এসেছিল তা রোধ করলে।...তার একটু পরেই বল্লে, "চাল-চুলোহীন হবেন কেন? কল্‌কাতাতেই তাঁর তিনখানা বাড়ী ভাড়া খাটছে...নগদ টাকাকড়িও আছে .. আর তা না থাকলেই বা, থাকা-খাওয়ার ভাবনায় আপনার কিছু মাত্র প্রয়োজন নেই...ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ভদ্র ভাবেই কথা বলতে হয়...কে ভদ্র, কে অভদ্র ব্যবহারেই তা প্রকাশ পায়!"

"হ্যাঁ—এখন তো আমি অভদ্র হবই। কিন্তু এমন দিনও ছিল যে সমীরদা না হলে এক মিনিটও চলত না... বলি এ রকম আর ক'জনকে করেছ?"...

অবজ্ঞা দৃষ্টিতে সমীরের দিকে চেয়ে, চাঁপা বল্লে, "বন্ধুত্ব আর ভালবাসা এক জিনিস নয়—আপনার মত মূর্খ লোকেরাই তার দর যেখানে সেখানে যা' তা' দিয়ে কর্‌তে বসে...যান্! যান্! আপনার সঙ্গে আমি আর কথা বল্‌তে চাইনা...এটা রাস্তা নয় ভদ্রলোকের বাড়ী...এত নীচ মন আপনার? ঈস্! আগে এই মন কোথায় লুকিয়ে ছিল?"

"আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি সব সময়ে মনে রেখো... তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু বেঁচে রইলো...নিশ্চিন্ত আরামে ঘর বাঁধা তোমার, বের কর্‌ছি আমি! আমি যা বলি...তাই-ই সাধারণতঃ করে থাকি।" বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। কাঠের মত বসে, এসব কথা চাঁপা কুমুদবাবুকে বল্‌বে কিনা তাই ভাব্‌তে লাগ্‌ল।...

ছোট বেলায় মন্মথর বাবা, মা, দুজনেই মারা যাওয়ায়, তাকে আপন বলে টেনে নিতে আর কেউই ছিল না... তার বাবা ছিলেন কারবারী...হঠাৎ মারা গেলেও কল্‌কাতায় খান তিনেক বাড়ী ও হাজার দশেক টাকা তিনি ছেলের নামে এটর্ণীর কাছে...আগেই রেখে দিয়ে ছিলেন...তাই তাকে একেবারে পথে বসতে হয়নি। ছোট বেলাটা এর, ওর কাছে কাটিয়ে যখন একটু বুদ্ধি হল; তখন সে তার এটর্ণীর কাছে তার সম্পত্তির সন্ধান পেলে।...তাঁদেরই ব্যবস্থামত বাড়ী কখানাকে ভাড়া আর টাকাগুলিকে ব্যাঙ্কে দিয়ে...সামান্য কিছু টাকা নিয়ে সে মেসে থাকতে লাগলো। ছোট থেকে পরের কাছে থেকে...দুঃখের সঙ্গে পরিচয়টাই তার বেশী হয়েছিল।... এতে করে তার স্বভাব হয়েছিল সংযত, গম্ভীর আর বিলাসিতা তার ত্রিসীমানাতেও ছিল না, এই স্বভাবের ফলেই সকলে তার বাহির দেখে ভিতর বিচার করতো।...

এম. এ. পড়ার সময় প্রফেসরের প্রয়োজন হওয়ায় সে কুমুদ বাবুর সন্ধান পায়—কুমুদবাবু প্রফেসরি ছেড়ে দিলেও প্রাইভেট পড়ান ছাড়েন নি—বাড়ীতে—তাঁর মস্ত লাইব্রেরী ছিল—তারই সাহায্যে তিনি নিজে পড়তেন ও পড়াতেন। সমীর ও মন্মথকে এই পড়ার সূত্রেই তিনি কাছে পেয়েছিলেন।—

মন্মথকে পড়াতে আরম্ভ করে তিনি বুঝেছিলেন, সে একটা রত্ন বিশেষ—তার যেন জানবার আগ্রহ ও ইচ্ছার

শেষ ছিলনা—তিনি তার খুবই সমাদর করতেন বলে, বাড়ীর কেউই তাকে বিশেষ পছন্দ করত না—ক্রমে কুমুদ বাবুও এই ভাব বুঝতে পেরে চাঁপাকে বলেছিলেন, "মন্মথ যে কত ভাল, তা তোমরা এখন বুঝছনা—পরে বুঝবে।—আমি চাইনে যে, কেউ তাকে বেখাতির করে—সে আমার ছেলের মত।"

লজ্জা পেয়ে চাঁপা বলেছিল, "বেখাতির তো কেউ করেনা বাবা—তবে মন্মথ বাবুর চাল চলন দেখে, সমীরদা ঠাট্টা তামাসা করে—চাল-চলন যে একেবারে গেঁয়োদের মত।"

গম্ভীর ভাবে কুমুদ বাবু বলেছিলেন "তা হোক গেঁয়োদের মত—তোমার সমীরদাকে বারণ করে দিও। দরকার বুঝলে আমিই বলব—সমীরের মত অনুকরণকারী কেতাদুরস্ত ছেলেদের চেয়ে মন্মথর মত, সরল শান্ত ছেলে আমার ঢের বেশী পছন্দ। ময়ুর পুচ্ছধারী দাঁড়কাক আমার দু চোখের বিষ!"

সেই থেকে আর এসব কথা কোনদিন ওঠেনি—তারপরে সমীর হঠাৎ এই সব ঝগড়া করে ফেলায়, চাঁপার বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পরে, চাঁপা বিশেষ সুখীও হয়নি, অসুখীও হয়নি।—সুখী হয়নি এই ভেবে যে মন্মথকে "আপ-টু-ডেট্" করতে তাকে অনেক খাটতে হবে—না হলে মান থাকবেনা—আর অসুখী হলনা এই ভেবে যে সমীরের মত কায়দা সর্ব্বস্ব লোকের হাতে তাকে পড়তে হলো না।—তার এখন মন্মথকে অনেকটা সয়ে এসেছিল—চাঁপা তার স্ত্রী হবে জেনেও সে কোনও দিন তার ব্যবহারে উচ্ছৃলতা দেখায়নি—এই দেখেই বোধহয় চাঁপা আজকাল তাকে একটু ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল।—

(৪)

মাসখানেক হল চাঁপার সঙ্গে মন্মথর বিয়ে হয়ে গিয়েছে·· সমীর সেই যে চলে গিয়েছিল···আর এ মুখো হয় নি···এমন কি চাঁপার বিয়ের সময়েও না···। সে বাড়ীতেও ছিল না···কোথায় যে চলে গিয়েছিল তার ঠিক নেই···! হঠাৎ একদিন বাড়ী ফিরে এসে সত্যবতীকে বল্লে, "মা···ভেবে দেখলাম··যেখানে যেটা খাপ খায়···সেটা খাপিয়ে দেওয়া ভাল·· কুমুদ বাবুর মেয়ে যতই শিক্ষিতা হোক্ না কেন···তোমাদের মধ্যে এসে তোমাদের একজন হয়ে সে কিছুতেই থাক্‌তে পারত না···আমারও সাপে ছুঁচো গেলা হ'ত।"

সত্যবতী সকৃতজ্ঞে মনে মনে বল্লেন, "ঠাকুর! কে বলে তুমি নেই? আমার এত দিনের চোখের জল তাহলে তোমাকে গলিয়েছে? তাইতে খোকার এই হঠাৎ সুমতি···প্রকাশ্যে বল্লেন, "তা তো বুঝলে এখন··· এইবার তাহলে আমাদের মধ্যে চলবার মত মেয়ে দেখি? তোমাকে সংসারী করতে পারলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়! হাঁ রে! সে মেয়ের বুঝি এখন বিয়ে হল না?"

"না মা···বিয়ে তার হয়ে গিয়েছে···সে এখন মস্ত বড় লোক···তিনটে বাড়ী। নগদ টাকা···এই সবের মালিক···। সে যাক্‌গে···এবারে তোমাদের কথামত চলব ভেবেছি···।"

"তবে বিয়ের ঠিক করি?"

"কর" বলে সমীর সেখান থেকে চলে গেল···। সত্যবতী আশস্ত হয়ে শিশিরকে সব কথা জানাতে গেলেন···। সব শুনে সে বল্লে, "অনেক দিনই জানতাম যে এই রকম একটা কিছু হয়ে তবে এ ব্যাপারের 'যবনিকা পতন' হবে—হলও তাই···যাক্·· যা হল তা ভালই হল··· তুমি বাঁচলে···আমিও বাঁচলাম···আমরা সবাই বাঁচলাম" ···বলে একটু হেসে সে ঘরের দিকে চাইলে· ·সেখানে দরজার আড়ালে প্রতিমা দাঁড়িয়েছিল···।

বিয়ের ঠিক হয়ে গেলে···সমীর একদিন কুমুদ বাবুর বাড়ী গিয়ে উঠলো···নতুন দরোয়ান্ বিনা কার্ডে তাকে ওপরে যেতে দিলে না ··অগত্যা যথারীতি কার্ড দেখিয়ে সে ভেতরে গেল··। কুমুদবাবু সেই আগের মতই বারন্দায় বসে ছিলেন···সে আশা করেছিল, চাঁপাকেও সেখানে দেখতে পাবে···কারণ কুমুদ বাবুর আর দ্বিতীয় সন্তান না থাকায় ··সে ভেবেছিল হয়তো তাঁর জীবন পর্য্যন্ত তিনি চাঁপাকে কাছ ছাড়া করবেন না···কিন্তু জিজ্ঞাসা করাতে কুমুদ বাবু বল্লেন, "বিয়ে হবার দু একদিন পরেই মন্মথ বাবাজী চাঁপাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছেন ·· তবে মাঝে মাঝে তারা আসে···হয়তো বা এক আধদিন রাত্রেও তারা থাকে···বেশ আছে ওরা··ওদের দেখে আমিও বড় শান্তি পাই···।"

সমীর অবাক্ হ'য়ে শুনছিল···এও কি সম্ভব·· যে,

মন্মথ চাঁপার চোখের বালি ছিল…ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলেই কি সে আগের কথা সব ভুলে গিয়ে শান্তিতে আছে?…বিশ্বাস তো হয় না · একি সত্যি কথা না বৃদ্ধের 'প্রলাপ…চোখের ওপরেই সে দেখ্‌তে পাচ্ছিল যে চাঁপা তার বুড়ো বাবার স্নেহ-চক্ষুকে ফাঁকি দিয়েছে!…সে যে কেমন ভাবে ঘরকন্না করছিল সেটার পরিচয় নিতে তার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল…কুমুদ বাবুর কাছে চাঁপার ঠিকানা জেনে নিয়ে সে একদিন তার বাড়ীতে গেল…।

সন্ধ্যার তখনও দেরী ছিল · মন্মথ চা খাবার পরই বেরিয়ে গিয়েছে…চাঁপাও বিকেলের খাওয়া সেরে, সবেমাত্র 'টুর্গেনিভের নভেল নিয়ে বসেছিল…জুতার শব্দে মুখ তুলে দেখ্‌লে· সমীর ঢুকছে। এমন সময় অকস্মাৎ সমীরকে ঢুক্‌তে দেখে…তার মনটা বিয়ের আগের সেই একদিনের কথা মনে করে কেঁপে উঠ্‌লো!…মন্মথ বাড়ী ছিল না…এটা যেন তার অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠ্‌ছিল…তবুও মুখে হাসি টেনে এনে বল্লে, "সমীর বাবু যে! আসুন…তারপর খোঁজ পেলেন কি করে?"

একটা চেয়ার টেনে বস্‌তে সমীর বল্লে "আমাকে আস্‌তে দেখে· তুমি যে আশ্চর্য্য হয়েছ…তা আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি…যদিও আশ্চর্য্য হবার কথাই বটে…তবু দেখ, আমি কেমন চলে এলাম!"

"তা আশ্চর্য্য আর হব না? শুন্‌লাম নাকি কোথায় চলে গিয়েছেন · মোটে কেউ দেখাই পায় না;—এতবড় নিরুদ্দিষ্ট মানুষ হঠাৎ যদি উদ্দিষ্ট হয়তো যে কেউই আশ্চর্য্য হয়!"

"হুঁ! ভেবে-চিন্তে দেখ্‌লাম—তুমি যখন নাগালের বাইরে যেতেই বসেছ, তখন আমি আর কেন শুধু শুধু তোমার জন্তে বৈরাগ্যের বোঝা বয়ে মরি? তুমি বেশ মজায় সংসার কর্‌বে—আর আমি বুঝি হাঁ করে তাই দেখ্‌ব?"

এই অপমানে চাঁপার কাণ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল—তবুও সে প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত করে বল্লে—"দয়া করে আমাকে আর ও কথাগুলো বলবেন না…আপনিও কেন একটা বিয়ে করে ফেলুন না!—"

"ফেল্‌বই তো! নয়তো কি তোমার ধ্যান করেই এ জন্মটা কাটাব? এমন বোকা আমাকে পাওনি!"

হেসে চাঁপা বল্লে "ধ্যানের বস্তুকে মানুষে ধ্যান করে—আমি তো কি নগণ্য! বিয়েটা আপনার করে ফেলাই উচিত – এখন যেটা অসম্ভব ঠেক্‌ছে—পরে হয়তো সেটা আর তত অসম্ভব না হতেও পারে।"

"ওঃ! এটা বুঝি তুমি তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বুঝেছ? সাধু! কিন্তু এও বলি তোমাকে—যার ওপর অত বীতরাগ—শেষে তাকেই আবার অনুরাগিণী হয়ে বিয়ে করাটা কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে—।"

হাস্‌তে হাস্‌তে চাঁপা বল্‌লে, "সে অতীত কথায়, আর কাজ কি··? তার পর, এ সব শুধু আমার নিজেরই কথা ··এ নিয়ে আলোচনা, অনধিকার চর্চ্চা করারই সামিল!"

"আজ তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে…কিন্তু এমন দিন কি ছিল না চাঁপা, যেদিন তোমার কোনো কথায় আমার অধিকার আছে কিনা··তা সাব্যস্ত কর্‌তে হত না?"

"আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে মিসেস মিত্র বলে ডাকবেন…জানেন নাকি যে কোন বিবাহিতা নারীকে…তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো লোকেরই নাম ধরে ডাক্‌বার অধিকার নেই…?

"তা জানি। কিন্তু কেন নেই চাঁপা?…আমারও কি নেই? আমিও কি সেই সাধারণের দলভুক্ত হলাম? আমার সম্বন্ধেও তুমি কি তোমার 'এটিকেট' ধরে বিচার কর্‌বে? ·তোমার বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ তোমার থাক্‌…অতীত তুমি আমাকে দেও…'অতীত যে আশাতীত ধন…।'

"তা যে হয় না…হতে নেই সমীর বাবু। আপনার এই প্রলাপ শুনে আমি যে কত পাপ সঞ্চয় কর্‌ছি…তার ঠিক নেই। কিন্তু কিছুই আমি আপনাকে বল্‌তে পার্‌ছিনে…শুধু আপনি অতিথি হয়ে এ বাড়ীতে এসেছেন বলে…! আমার ভাই নেই…আপনাকে আমি ভাইএর মত স্নেহ কর্‌তে…যত্ন কর্‌তে…ভালবাস্‌তে পারি। ব্যস্‌…তার পরের' এই সব কথাগুলো আমার শুনতেও নেই…শুন্‌লেও পাপ হয়…তা ছাড়া আপনি ভুলছেন কেন যে আমি আর এখন কুমারী নই…একজন ভদ্র-লোকের স্ত্রী তাঁর মানসম্ভ্রম…সামাজিক প্রতিপত্তি অনেকটা এখন আমার ওপরেই নির্ভর কর্‌ছে…"

"দু বছর আগে, কোথায় ছিল ওই মুখচোরা মন্মথ? তুমি আমার সুখ শান্তির হন্তারক হয়েছ…আমিও তোমার তাই হব…।"

সদর্পে চাঁপা বললে, "কি করবেন শুনি ? এমন কোন ব্যাপার আমি ঘটাইনি যাতে আপনি আমার জীবনের শান্তি নষ্ট করবেন ?"

"কিন্তু এই নিশীথের অন্ধকারে…যদি তোমাকে নিয়ে elope করি "কি করিতে পার তুমি, সংযুক্তা সুন্দরী ?"

সমীরের কথাগুলো চাঁপার সমস্ত গায়ে যেন হুল ফুটিয়ে দিলে…চারিদিক চেয়ে দেখ্‌লে দরজার পাশেই বারান্দায় তাব দরোয়ান্ বাহাদুর সিং লাঠি হাতে করে খাড়া আছে…। দেখে তার সাহস হলো রাগ ও ভয় দুটোকেই সংযত করে নিয়ে সেও জবাব দিলে—

"শত সূর্য্যসিংহ, নাহি ধরে শক্তি,

কভু, স্পর্শিবারে কেশাগ্র আমার"—বুঝলেন ? কিন্তু কেন ? এ সব মতলবই বা আপনার মাথায় ঘুরছে কেন ? সুখে শান্তিতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে আমার… আপনার কি তা সহ্য হচ্ছে না ? কেন ভুলে যাচ্ছেন যে আপনার এই অসংযত রসনাকে এক মুহূর্ত্তেই আমি ইচ্ছে করলে সংযত করতে পারি ?"

"কি করবে ? দরোয়ান ডেকে বের করে দেবে ?"

"হয়তো বাধ্য হয়ে আমায় তাই করতে হবে…কিন্তু না সমীরদা…চাকর বাকরদের সামনে তোমাকে আমি এতটা অপমানিত করতে চাইনা…তাতে শুধু কেলেঙ্কারী করা হবে মাত্র…তোমাকে দাদা বলেছি…দাদার মতই মনে করি…আমার কাছ থেকে তোমার যেন কোন আঁচড় না লাগে—এইটাই আমি চাচ্ছি। তুমি মনে কর্‌বোনা যে আমি ভয় পেয়েছি তাই তোমার সঙ্গে সন্ধি কর্‌ছি বা অন্য কিছু—"

বোমার মত ফেটে পড়ে সমীর বল্লে, "কোথায় ছিল তোমার এ ডাক এতদিন ? সমীর বাবু, সমীর বাবু, করে যে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে ? কি বীতরাগ এসে গেল ! হঠাৎ শুনলাম 'সমীর বাবু', 'আপনি' ! বেশ, আমি কি এতই সুলভ ? আমার কি কিছুই মূল্য নেই ? এম-এ পাস আমিও করেছি—আর নেহাৎ উপোস্ করেও থাকি নে।"

"এই আবার আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—। এ সমস্ত কথা এখন আমার কাছে বলা একেবারে নিষ্প্রয়োজন—আপনি অতিরিক্ত ভাল—অত ভাল নিয়ে চলা-ফেরা করা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার—আপনি আমার সন্ধান পেলেন কি করে ? বাবাকে আমি বারে বারে বারণ করে এসেছিলাম—যাতে করে আমার ঠিকানা না পায় কেউ ? আপনার ভয়েই আমি বাবার বাড়ী ছেড়ে এসেছি—আবার এ পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছেন ! শেষে কি দেশ ছেড়ে যেতে হবে আমায় ?"

সমীর কি বল্‌তে যাচ্ছিল—এমন সময়ে পর্দ্দা ঠেলে ঘরের ভেতর মন্মথ ঢুকে পড়্‌ল—সমীরকে একটা ছোট নমস্কার করে—সে একটা চেয়ার টেনে বস্‌তে যাবে—চাঁপা একেবারে ছুটে এসে তার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বল্লে, "এখুনি আসছি—বলে সেই যে বেরিয়ে গেলে—আমি একলা এতটা সময় কি করে থাকি বল ? প্রায় দু আড়াই ঘণ্টা ধরে সমীর বাবুর যত অবান্তর কথা ! আমার বুঝি ভয় করে না একা থাকতে ?"

সমীরের উপস্থিতি অগ্রাহ্যের মধ্যে এনে, মন্মথ চাঁপার পিঠে মৃদু আঘাত করে বল্‌লে, "এসেছি তো আমি অনেকক্ষণ…ওঘরে বসে তোমাদের কথা—শুনছিলাম… তোমাকে বেশীক্ষণ একা রেখে যেতে পারি কি আমি ?…

অভিমানের সুরে চাঁপা বল্‌লে "খুব পার…। এসে ছিলেই যদি তবে এঘরে এলে না কেন ? তুমি সাম্‌নে থাকলে সমীর বাবু আমায় কখনও ওই যা'তা কথাগুলো শোনাতে সাহস করত না…! ওরই ভয়ে আমি বাবার অত অনুরোধ সত্ত্বেও সে বাড়ী ছেড়ে এলাম !—আবার এখানেও সেই ভয় ?…"

"কেন ভয় বা কিসের ? তুমি কি মনে কর যে ওর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবার ক্ষমতাটুকুও আমার নেই ! কি চায় ও তোমার কাছে ? আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, আমার বাড়ীতে ঢুকে…আমারই স্ত্রীকে অপমান করবার অধিকার ওকে কে দিলে ? বন্ধু ভাবে আসে, আসুক…শত্রুভাবে এলে ওর পক্ষে বিশেষ সুবিধা-জনক হবে না…।

একটা কথাও না বলে সমীর দাঁড়িয়েই রইলো… বলবার তার ছিলই বা কি ?—

মন্মথ বলে যেতেই লাগ্‌ল "সমীরকে আমি খুব চিনি ‥ কিন্তু না চেনার ভাব করেই কাটিয়েছি এতদিন—। যেদিন তোমার বাবার কাছে জানতে পার্‌লাম যে আমাকে তাঁর ভাবী জামাতার পদে বরণ করতে তাঁর নিজের কিছুমাত্র আপত্তি নেই‥ শুধু তোমার সম্মতির

অপেক্ষা···সেইদিন থেকে ধীর ভাবে অপেক্ষা করে গিয়েছি কখন তোমার মনের খবর পাওয়া যাবে বলে···। শেষে···রাত্রির শেষে দিনের উদয়ের মত তুমি নিজেই ধরা দিলে আমি আমার অপেক্ষার ফল পেলেও সেটা মনেই চেপে রাখ্‌লাম···তার পরেই শুনলাম, সমীর আবার তোমার কাছে গিয়েছিল,—কিন্তু ওকি মনে করে না যে ইচ্ছে করলে আমি তখনই ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম !···কিন্তু আমি তা করিনি কারণ 'ডুয়েল' লড়্‌বার ইচ্ছে বা প্রবৃত্তি আমার মোটেই ছিল না—সমীরের কাজ ও কথা সবই আমি নজর করে আস্‌ছি সেই থেকে—বলিনি কিছু—ভেবেছিলাম ওর এই পাগলামী, এই প্রেমব্যাধি—আমার বিয়ে হলেই সেরে যাবে—। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সারা তো দূরে থাক্—ব্যাধির প্রকোপ, 'ডিলিরিয়ম' আরম্ভ হয়েছে—। এখন উপযুক্ত রকম অষুধ না দিলে না দিলে "কোলাপ্স" কর্‌বার সম্ভাবনা—। বাহাদুর! "জী হুজুর!" বলে ছ' ফুট লম্বা বিশাল দেহ আর বিরাট্ লাঠি গাছা নিয়ে বাহাদুর সিং দরজার কাছে দাঁড়াল—।

সমীরের দিকে দৃক পাত মাত্র না করে মন্মথ তার দরোয়ানকে বল্লে "হামরা বিনা হুকামসে—এহি বাবুজীকো অন্দরমে কভি নেই আনে দেগা—আওর অভি উন্‌কো রাস্তা দেখ্‌লাও—। সমঝ গিয়া?"

"জি হাঁ" বলে একটা সেলাম ঠুকে সমীরের দিকে চেয়ে সে বল্লে, "আইয়ে" বেত্রাহত কুকুরের মত ছুট্‌তে ছুট্‌তে সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জান্‌লা দিয়ে তাকে রাস্তায় চল্‌তে দেখে একটু অনুকম্পার সঙ্গে মন্মথ বল্লে "আস্ত পাগল!"

চাঁপা তখনো কাঠ হায় দাঁড়িয়েই ছিল—ঘরে কেউ নেই দেখে সে মন্মথর কোলের উপর নিজের মুখটা লুকিয়ে বল্লে, "তুমি আমাকে ক্ষমা করো—তুমি যে এত মহৎ তা আমি আগে যে মোটে বুঝ্‌তে পারিনি—।

ধীরে, তার বড় চুলের খোঁপাটা ধরে নাড়তে নাড়তে মন্মথ মৃদু হেসে বল্লে, "এতে আর ক্ষমা করার কি কথা আছে চাঁপা? ক্ষমা তখনই করা উচিত যখন কোনো মহৎ দোষের সন্ধান পাওয়া যায়—কিন্তু তুমি এমন কোন দোষ করনি যার জন্যে ক্ষমা চাইবে?—সমীরের ভয় এখন তোমার গিয়েছে তো? মুখটা যে তুল্‌ছই না—এত লজ্জা হয়ে গেল—"

সেই রকম ভাবে থেকেই চাঁপা বল্লে, "আমার কি একটু পুণ্যির জোর ছিল—তাই বিয়ের সময় মতিভ্রম না হয়ে ঠিক মানুষকেই চিন্‌তে পেরেছিলাম! না হলে কি হত যে ভাব্‌তেও ভয় হয়!—"

জোর করে কোলের ভেতর থেকে মুখটা তুলে মন্মথ বল্লে "পুণ্যি? ছিল নাকি? আমি জানি, ও জিনিষটা বুঝি আমারই একচেটে—ভগবানের কাছে প্রার্থনা আমিও কম জানাইনি চাঁপা! জানো কি বল্‌তাম কেবল? 'ভার্য্যা মনোরমা দেহি মনো বৃত্তানুসারিণীম্' তা প্রার্থনার ঘুষ খেয়ে ভগবান্ সেটা দিতে কার্পণ্য করেন নি দেখ্‌ছি—। আমি গৃহলক্ষ্মী ও মনোরমা ভার্য্যা দুই-ই পেয়েছি—। যাক্ গে এসব, তোমার মনের মেঘটা উড়িয়ে দেওয়া দরকার—পিকচার প্যালেসে আজ ভাল ফিল্ম আছে—যাবে?"

"যাব—কিন্তু পিকচার প্যালেসে নয়—অন্য কোথাও চল—বেড়িয়ে আসি—।"

"তাই হবে 'যথা আজ্ঞা মহারাণী'।

"আহা"! বলে এতক্ষণ পরে চাঁপা হেসে উঠ্‌লো।

— - —

দেশের ডাক

গল্প

শ্রীগিরিবালা দেবী

প্রতিবারের ন্যায় এবারেও বিভূতি চাকুরীর চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু একটু অভিনব বেশেই ফিরিল।

বিভূতির পিতা তারিণীচরণ প্রতিবেশী গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন; মা ভুবনমোহিনী নিবিষ্টমনে মালা জপ করিতেছিলেন, শ্যামা অঞ্চলের আড়ালে সন্ধ্যা প্রদীপটি প্রজ্জলিত করিয়া তুলসীতলার দিকে যাইতেছিল; এমন সময় প্রাঙ্গণে বিভূতিকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা, এলে নাকি? ওমা, দাদার একি সাজ!"

বিভূতি বাহিরে অপরের ভগিনীর প্রতি ভ্রাতৃস্নেহে যতই বিগলিত হোক না কেন, কিন্তু ঘরে সে সবের উপদ্রব ছিল না। ভগিনীর স্নেহস্নিগ্ধ বাক্যে সে ঝাঁজের সহিত কহিল, "দাদার একি সাজ, কিছুই যেন চেনেন না। খদ্দরের জামা কাপড় পরেচি তার আবার সাজ কোথায়? তোমাদের সাতগোষ্ঠীর কল্যাণে দাদার আবার সাজ সজ্জা।"

কি কথার কি উত্তর, শ্যামার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি নিমেষে ম্লান হইল। একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্যামা তুলসীতলার দিকে চলিয়া গেল।

ছেলের কণ্ঠস্বরে মা জপের মালা কপালে ঠেকাইয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভূতি এসেচিস? শরীর ভাল আছে তো? মাসীমারা সব কেমন?"

বিভূতি হাতের স্যুটকেশটা বারান্দায় নামাইয়া মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া উত্তর দিল, "মাসীমারা ভাল আছেন। আমার আবার ভাল মন্দ! মাসদেড়েক তোমাদের পেটের চিন্তায় আফিসে ঘুরে ঘুরে হাড় কালি হয়ে গেচে, হা ভাতের ঘরে জন্ম নেওয়া কত বড় মহাপাতক, তা এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেচি। বাবা কোথায়?"

ভুবনমোহিনী স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তিনি নোটনদের বাড়ী রামায়ণ শুনতে গেছেন। তুই বিশ্রাম করে হাত-মুখ ধুয়ে একটু জল খা। কোন সকালে ছুটি খেয়ে বেরিয়েছিলি, সারাটা দিন গাড়ীতেই কেটে গেচে। আফিসে ঘুরে হাড় যেন কালি করলি; কিন্তু কিছু সুবিধা হলরে?"

"এত সহজে সুবিধা হলে দুঃখ ছিল না। সুবিধার আশাতেই তোমার মাকড়ী দুটো বেচে কাপড় জামা কিন্‌তে হল। তাতেও তোমার মেয়ে আমার সাজ দেখচে।" বলিয়া বিভূতি গায়ের খদ্দরের চাদরখানা সুটকেসের উপর রাখিয়া কুয়াতলায় হাত ধুইতে গেল।

শ্যামা দাদার মুখ ধোয়ার জল তুলিয়া গামছা রাখিয়া মার কাছে আসিতেই মা বলিলেন "বিভূতির একটু জল খাবার গুছিয়ে আনত শ্যামা। রান্নাঘরের শিকেয় নারকেলের নাড়ু আছে, দুধের সরটুকু তুলে ক'খানা বাতাসা দিয়ে নিয়ে আয়।"

শ্যামা নিরুত্তরে মায়ের আদেশ পালন করিতে ছুটিল।

ছেলেকে বারান্দায় আসনে বসাইয়া গৃহজাত দ্রব্যে রেকাবী সাজাইয়া মা প্রসন্নমনে তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেও বিভূতি খুসী হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। কলিকাতায় মাসীর বাড়ীতে বাজারের কচুরী, সিঙ্গাড়ায় সে এত দিন তৃপ্ত হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে বাতাসা নাড়ু প্রভৃতি দেখিয়া তাহার চিত্ত জলিতে লাগিল। মুখ বিকৃত করিয়া বিভূতি কহিল, "খেতে ত খুব আদর করছিলে? খাবারের ব্যবস্থা দেখলে ক্ষিধে শুদ্ধ পালিয়ে যায়। মাসীমার ওখানে জল খাবারের কি ঘটা? গন্ধেই খেতে ইচ্ছে করে, সে সবের কিছুই তোমরা জান না?"

মা হাসিয়া কহিলেন, "জানবো কি করে বিভূতি, জানতে গেলেই যে পয়সা চাই। তুই রোজগার করে টাকা আন, তখন দেখিয়ে দেব, জানি কিনা? পেটের ভাতই জুটতে চায় না, যে দুঃখে সংসার চলচে তা ভগবান জানেন।"

"তোমাদের যদি এতই দুঃখ মা, তবে শ্যামাকে এনে জোটালে কোন হিসাবে? শ্বশুর বাড়ীতে বেশ ছিল। একটা মানুষের খাওয়া পরা ত কম নয়। আমি যেন রোজগার করে পয়সা আনলাম, কিন্তু বোঝা ক্রমে বাড়ালে পারবো কেন?"

পুত্রের কঠোর প্রকৃতির সহিত মার বিলক্ষণ পরিচয় থাকিলেও মেয়ের প্রসঙ্গে তাঁহার চোখে জল আসিল।

শ্যামা যে বড় দুঃখিনী। বছর দুই পূর্ব্বে যথাসর্ব্বস্ব সাজাইয়া তাঁহারা শ্যামার বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্যামার বিবাহিত জীবনের সুখ সৌভাগ্যে পিতামাতার স্নেহভরা হৃদয়ে অভাবের দুঃখ মুহূর্ত্তের জন্যও স্পর্শও করিতে পারে নাই। মা হৃদয়ের নিভৃতে একটি মনোরম ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন—শ্যামা অক্ষয় সুখ সম্পদ লইয়া শশুরঘর আলো করিয়া রহিয়াছে। বিভূতি চাকুরী করিয়া যে অর্থ আনিতেছে, তাহাতেই তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসারে অভাব-অনাটনের চিহ্নও নাই। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধানে হয় অন্যরূপ। শ্যামার বিবাহের বছর না ঘুরিতেই ভুবনমোহিনীর আশার মালা শোকের ঝড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ষোল বছর বয়সে শ্যামার সুখ শান্তি জন্মের মতন ফুরাইল।

পিতামাতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া শতধা হইলেও তাঁহারা শ্যামাকে কাছে আনিলেন না। তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভাসুরদের আশ্রয়ে রাখিয়া দিলেন। যাহার সৌভাগ্যের প্রাসাদ চূর্ণ হইয়াছে, তাহার ভাগ্যে মাথা গুঁজিবার নীড়-টুকুও রহিল না। বৎসরাধিক কাল অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়া শ্যামাকে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহার ফিরিবার মধ্যে যে কত মর্ম্মান্তিক বেদনা আকুল অশ্রুজল লুকান ছিল—বিভূতি তাহার খবর রাখিত না। খবর না রাখিলেও ভুবনমোহিনী নীরব থাকিতে পারিলেন না।

বিভূতির মুখের পানে সজল চোখ তুলিয়া কহিলেন, শ্যামাকে সাধ করে ত আনিনি বিভূতি, বাছা যে আমার কি কষ্টে ছিল তা ভগবান ভিন্ন মানুষে জানে না। তুইও যদি ওকে বোঝা মনে করিস, তাহলে ও দাঁড়াবে কোথায়?"

বিভূতি নাড়ু চিবাইতে চিবাইতে প্রত্যুত্তর করিল বোঝাকে বোঝা ছাড়া কি মনে করতে বল মা? দেখ— "একটা কাজ করতে পারলে শ্যামা কারুর ভার না হয়েও নিজের ভাত নিজে করে খেতে পারে। সেই সব পরামর্শ করতেই আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম। বাবাকে নোটনদের বাড়ী থেকে ডেকে আনচি তারপর সব শুনো।' বলিয়া বিভূতি জলযোগ সারিয়া উঠিয়া গেল। ভুবন-মোহিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

(২)

রাত্রে তারিণীচরণ বাড়ী ফিরিলে বিভূতি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবার প্রস্তাব করিল। কেবল প্রস্তাব করিয়াই সে ক্ষান্ত হইল না—দুই একবার দেশ-সেবার নামে জেল না খাটিলে যে এ বাজারে কাহারও চাকুরী হইতে পারে না, ইহার অনেক উদাহরণ দিল।

পুত্রের সাধ ও সংকল্প জানিয়া নিরীহ তারিণীচরণ কথা কহিলেন না। দেশ-সেবা তিনি ভালবাসিলেও জেলের নামে আতঙ্কে সারা হইয়া যাইতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র তুচ্ছ পেটের দায়ে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিবে, ইহা তাঁহার প্রীতিপ্রদ হইল না।

স্বামীকে মৌন দেখিয়া ভুবনমোহিনী শান্ত মুখে কহিলেন, "জেল খেটে চাকুরী পাওয়া আমি পছন্দ করিনা বিভূতি। জেলের নামে আমার গা শিউরে ওঠে। তুই ওসবের ভেতর যাসনে, বাবা। এখন দুবেলা খাচ্ছি, না হয় একবেলা খাব। কোন কাজের ভাব ভাল নয়। আন্তরিক যা তাই সত্যি। বোসেদের সেজ বৌয়ের কাছ থেকে খবরের কাগজ এনে শ্যামা আমাকে রোজ প'ড়ে শোনায়। কোনের বৌ-ঝিরা পর্য্যন্ত জেলে যাচ্ছে, দেশের হ'ল কি?"

বিভূতি রাগতঃ স্বরে কহিল, "খবরের কাগজ পড়ে তোমাদের খুব জ্ঞান হচ্ছে বলেই জেলের নামে শিউরে ওঠ। তোমরা এজন্মেও মানুষ হবে না মা, তোমাদের কোন জ্ঞান নাই। এও কি জান না যে, আজ-কালকার দিনে যত জনা বড় হচ্ছে জেল খেটে; দেশের নাম করে। আমাকেও বড় হ'তে হ'বে, জেল খাটতে হ'বে। আমি এম্‌নি এম্‌নি খদ্দর পরিনি। আচ্ছা মা, শ্যামা যে রোজ কাগজ পড়ে তাতে ওর কি শিক্ষা হ'য়েচে বলতে পার?"

শ্যামা প্রদীপের সাম্‌নে বসিয়া তুলা পিঁজিয়া কাটুনার ডালায় রাখিতেছিল। দাদার প্রশ্নে সে নত মুখখানি আরো একটু নত করিল।

ভুবনমোহিনী কিছু বলিবার পূর্ব্বে তারিণীচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন "ওর অনেক শিক্ষা হয়েচে বিভূতি, কিন্তু তা দেখাবার ক্ষেত্র কোথায়? সংবাদপত্র পড়ে পড়েই শ্যামা দেশ ভক্ত হ'য়ে উঠেচে। দিনরাত চরকা তুলো নিয়েই আছে। আমার পরণের ধুতিটা ওর হাতের সুতো দিয়েই তৈরী। তোর জন্যেও একখানা

কাপড় করিয়ে রেখেচে। হ্যাঁ মা, বিভূতির সে কাপড়-খানা দিস্ নি ?"

শ্যামা নিরুত্তরে ঘাড় নাড়িয়া উঠিয়া গেল।

ক্ষণেকপর একখানি লাল পাড় খদ্দর আনিয়া বিভূতির পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল।

বিভূতি কাপড়খানা আলোর নিকটে ধরিয়া সূতার সূক্ষ্মতা পরীক্ষা করিতে করিতে সোল্লাসে কহিল, "বাঃ সুন্দর কাপড় হয়েচে তো। আমি মনে করতাম শ্যামাটা বুঝি একেবারেই অকেজো, এখন দেখচি তা নয়। এবার আমি কলকাতায় যাবার সময় শ্যামাকে নিয়ে যাব। কলিকাতায় কি আন্দোলন, কোন রকমে একবার কাগজে নাম উঠ্‌লে আর রক্ষা নাই। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের কত ইস্কুল বসে গেছে, তার একটা ইস্কুলে শ্যামাকে ঢোকাতে পারলে মস্ত একটা কাজ হয়।" তারিণীচরণ নির্ব্বাক হইয়া কয়েকটা হাই তুলিলেন।

ভুবনমোহিনী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "না বিভূতি, শ্যামার ওসবে কাজ নেই। সহরের মেয়েরা যা হোক করুক, গাঁয়ের মেয়েরা ওসবের মধ্যে গেলে পাঁচ জনা পাঁচ কথা বল্‌বে।"

"পাঁচ কথা বলবে না, ছাই বল্‌বে। কত গেঁয়ো মেয়ে গরীবের মেয়ে দেশনেত্রী হয়েচে, তোমরা তার জানবে কি? আমি নিয়ে যাব, সেখানে মাসীমা আছেন, তবু তোমাদের আপত্তি। থাক, তোমাদের আদরিণী মেয়ে আঁচলের নীচে লুকান থাক।" বলিয়া বিভূতি রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

গভীর নিশীথে শ্যামা মা'র কোলের কাছে শুইয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দাদার কথায় তুমি অমত ক'রচ কেন মা? আমি ত কারুর কোন কাজে লাগি না। সকলের গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে দেশের কাজ করা কি ভাল নয়? কোন কাজে লাগলেই যে আমার জীবন সার্থক হয় মা?"

"অমন করে বলিস না। তোর মা এখনও পাথর হয়ে যায় নি। দিন রাত খাটুনি, বাপ, মায়ের সেবা একি তোর কাজ নয় শ্যামা?" বলিয়া মা মেয়ের মুখখানি বুকে টানিয়া লইলেন। মার অবাধ্য অশ্রুজল শ্যামার মাথায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। শ্যামার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। কিন্তু সে চোখের জল মাকে জানিতে দিল না।

জানিতে না দিলেও তাহার সংকল্প অপ্রতিহত রহিল। তাহার জীবনপথ অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, যে অন্ধকারে এতটুকু আলোর চিহ্নও পরিলক্ষিত হইত না। আজ সেই গাঢ় তামিস্রা ভেদ করিয়া দূরে কোন সুদূরে এতটুকু আশার আলো জ্বলিতেছে। সে কাজ করিবে—জননী জন্মভূমির সেবায় এ ব্যর্থ জীবন ধন্য করিবে; সফল করিবে। পিতামাতা এখনও অক্ষম দুর্ব্বল হন নাই। এখনও তাঁহারা সেবার প্রত্যাশী নহেন। ক্ষুদ্র সংসারের কাজই বা কতটুকু, ইহারি নিমিত্ত শত অভাবের ঘরে সে আর অভাব বাড়াইতে চায় না। দেশের আহ্বান দেশজননীর ডাক তাহার বক্ষে মহা প্লাবনের সৃষ্টি করিতেছে। সুপ্তির ঘোর ভাঙ্গাইয়া কে যেন কাণে কাণে কহিতেছে, "আয়, আয়, কালের বিষাণধ্বনির সহিত দ্রুততালে চলিয়া যায়।" এ ডাকে শ্যামা সাড়া না দিয়া পারে কি!

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মা বুঝিলেন—তাঁহার অশ্রুজল কাতর বিলাপ কিছুতেই শ্যামাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। মা কত বুঝাইলেন, কত চেষ্টা করিলেন কিছুতেই শ্যামাকে আপনার নিরাপদ বক্ষনীড়ে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

শান্ত প্রকৃতি তারিণীচরণ সেকালে জন্মিয়াছিলেন, তাই একালের শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত পুত্রটিকে খুব সমীহ করিয়া চলিতেন। বিভূতির দেশ সম্বন্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ছেলের মতের উপর নিজের মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। বিভূতি বলিয়াছে, তাহার সহিত গেলে শ্যামার ভাল হইবে, এই বিশ্বাসে আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে সম্মতি দিতে হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্যাম শীতল পল্লী মায়ের কোল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্যামা বিভূতির সহিত কলিকাতা রওনা হইল।

(৩)

শূন্য জীবন লইয়া তারিণীচরণ ও ভুবনেশ্বরী দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন। শ্যামার নিমিত্ত মার মনে উদ্বেগের সীমা ছিল না। যে মুখ তুলিয়া কাহারো সহিত কথা কহিতে পারে না, সে কেমন করিয়া নিজের অন্ন নিজে করিয়া খাইবে, শত উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইবে।

শ্যামা কিছুই জানে না, কিছুই পারিবে না, এ ভুল ধারণা তিরোহিত হইতে আর বেশী বিলম্ব হইল না।

দিন পনেরো পর মাসী চিঠি লিখিলেন "মহিলা সঙ্ঘে ভর্ত্তি হইয়া বড়বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিতে গিয়া শ্যামার জেল হইয়াছে। কাল সন্ধ্যায় বিভূতিও ধরা পড়িয়াছে।"

যে জেলের নামে পিতামাতার এত আতঙ্ক পুত্র কন্যা দুইটিই সেই দুঃখের কারাবরণ করিয়াছে, জানিয়া বাপ মা হতাশায় বসিয়া পড়িলেন। সেদিন তাঁহাদের নিরানন্দ কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিল না। উনুনে হাঁড়ী উঠিল না।

মাসখানেক পর—সেদিন সন্ধ্যায় তারিণীচরণের পায়ের কাছে বসিয়া ভুবনমোহিনী ছেলেমেয়ের গল্পই করিতেছিলেন। এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ হইল।

ভুবনমোহিনী সবিস্ময়ে চোখ তুলিয়া দেখিলেন বিভূতি আসিতেছে। বিহ্বলা জননী দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ছেলের দিকে ছুটিয়া গেলেন।

স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে তারিণীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে মুক্তি পেলি বিভূতি? আজ আসবি তা তো জানতাম না। শ্যামার খবর পেয়েছিস, সে কেমন আছে।"

বিভূতি পিতামাতার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া হাসি মুখে কহিল, "তিন সপ্তাহ জেল খাটার পর আজ সকালে আমায় ছেড়ে দিয়েচে বাবা। দেশের কাজের জন্যে ত আমি জেলে যাইনি কাজ বাগাতে গিয়েছিলাম। পঞ্চাশ টাকা মাইনের আমার চাকুরী হয়েচে। ক'দিন জেলে রাজভোগ মেরে নামটিও মন্দ হয়নি।"

ছেলের কথায় বাপের মনে কি হইল তাহা অন্তর্যামী জানেন। মা'র চিত্ত কিন্তু বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। তাঁহার শিক্ষা বেশী না থাকিলেও ভাল-মন্দের জ্ঞান ছিল বিলক্ষণ, সত্য এবং ধর্ম্মকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করিতেন। প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা সহিতে পারিতেন না।

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে সন্তানের দেশসেবায় অভিনয়ে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল।

তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তোর চাকরী হ'ল বিভূতি। জেল না খেটে এম্নি চাকরী হ'লেই আমি বেশী খুসী হ'তাম। তুই একা আমার শ্যামাকে কোথায় রেখে এলি?"

"শ্যামা জেলে রয়েচে মা। আমি বরাবরই জানি ও আস্ত বোকা। কাজ বাগাতে, নাম কিনতে ওকে ধরা দিতে বলেছিলাম, তা ভুলে গিয়ে বিচারের সময় বলে বস্‌লো "আমি মুক্তি পেলে আবার দেশের কাজ করবো। যতদিন বেঁচে থাকবো দেশের কাজই আমার প্রধান, কাজ। এ থেকে কেউ আমায় নিবৃত্ত করতে পারবে না।" যেমন দর্প, তেমনি শাস্তি।' তিন মাসের জেল; পূজোর সময় ওদের ছেড়ে দেবে।"

মা নীরবে ভাবিতে লাগিলেন—সেই শ্যামা সে আজ এতকথা বলিতে শিখিয়াছে। সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। দেশ-সেবার নামে বিভূতির প্রতারণা শ্যামার অকৃত্রিম প্রীতির ধারায় ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

(৪)

কয়েকদিন পাড়ায় পাড়ায় জেলের গল্প ও চাকুরী প্রাপ্তির গল্প করিয়া বিভূতি কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। বিষাদের অশ্রুজলে অভিসিক্ত হইয়া ভুবনমোহিনী দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ধীর মন্থর গমনে বর্ষার পর শরৎ আসিল। তীরে নীরে গগনে পবনে বিকশিত কাশবনে শরতের মধুর হাসি ঝলমল করিতে লাগিল।

জননী গিরিরাণীর ন্যায় তনয়া বিধুরা ভুবনমোহিনী শ্যামার সহিত আসন্ন মিলনের আশায় পুলকে রোমাঞ্চিত হইলেন।

বিভূতির পত্রে শ্যামাদের মুক্তির দিন জানিয়া স্বামীর সহিত ভুবন মোহিনী কলিকাতায় বোনের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামার কঠোর দণ্ডের পর মা কারার দ্বারে দাঁড়াইয়া মেয়েকে যে বুকে তুলিয়া লইতে চান।

সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া প্রভাতে মা পতিপুত্রের সহিত আলিপুর জেলের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

চতুর্দ্দিকে বিপুল জনতা, সেবক সেবিকার দল জাতীয় পতাকা উড়াইয়া বন্দিনাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছে। প্রিয়জন প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। কাহারো হস্তে পুষ্পমালিকা, পুষ্পগুচ্ছ। প্রভাতের বায়ুহিল্লোলে সকল কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে 'বন্দেমাতরম'!

ভুবনমোহিনী বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

দুইটি মহিলার সহিত শ্যামা ধীরে ধীরে বাহিরের উন্মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাছে গিয়া ব্যাকুল বাহুর বেষ্টনে কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

দীর্ঘদিন পর পিতা, মাতা, ভ্রাতা পরিজনদের নিরীক্ষণ করিয়া শ্যামা আনন্দে উৎফুল্ল হইল। মা'র বুকের নিবিড় স্পর্শটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া কিয়ৎকাল পর শ্যামা মা'র স্নেহপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া একে একে সকলের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

ভুবনমোহিনী কহিলেন, "চলমা, গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবেলা তোর মাসীমার ওখানে উঠে আজকেই আমরা বাড়ী ফিরবো।"

শ্যামা মাথা নাড়িয়া বলিল, "এখন ত আমার বাড়ী যাওয়া হবে না মা। যে দুটি মহিলা আমার সাথে বেরিয়ে এলেন ওঁরা মহাত্মাজীর আত্মীয়। ওঁদের সঙ্গে আজকেই আমাকে সবরমতী আশ্রমে যেতে হবে। সেখানে অনেক কাজ আছে।"

বিভূতি শ্যামার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "ওসব কাজ তোর করতে হবে না শ্যামা। আমি তোর জন্যে ইস্কুলে একটা ভাল কাজ ঠিক করে রেখেছি। তাতে সুবিধা হ'বে।"

"না দাদা, দেশের কাজ ছাড়া আমার নিজের জন্যে আমি কোন সুবিধা চাই না। তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন মা'র কাজ করতে করতে মার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ি।"

ভুবনমোহিনী আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন "তোর বুড়ো বাপ-মায়ের সেবা কি কাজ নয় শ্যামা! আমাদের ফেলে কোথায় যেতে চাস্?"

শ্যামা বলিল "যখন তোমাদের সেবার দরকার হবে তখুনি আবার আমি ফিরে আসবো মা। এখনো তোমরা কারুর সেবার প্রত্যাশী হওনি যখন হবে তখন আমাকে ডাকতে হবে না। আজ আমি আমার একমার কাছ থেকে আর এক মায়ের সেবা করতে যাচ্ছি; তোমার অভাগী মেয়ের এর চেয়ে আর বড় কাজ কি আছে? তুমি দুঃখ ক'রো না। এতদিনে আমার জীবন সার্থকতার দিকে যাচ্ছে। তাহলে এখন আমি যাই মা! ওঁরা আমার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

পিতামাতাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া শ্যামা জনতার ভিতর মিশিয়া গেল।

ভুবনমোহিনী সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল! দেশমাতা যাহাকে ডাকিয়া লইলেন, মা তাহাকে রাখিতে পারিলেন না।

বেদনা

কবিতা

শ্রীনীর বালা মিত্র

বিশ্ব-মাতা বিশ্বে আসে, সারাবিশ্ব আনন্দে মগন,
কাঁদে প্রাণ,—নবমীতে "দেবতা"য় দিছি বিসর্জ্জন।
আগমনী গানে কেন হাহাকারে ভরিছে পরাণ!
সে-গানের সুরে যেন বিজয়ার ঝরে অশ্রু-বান।

শরতের স্নিগ্ধ নভে ঘোর মেঘ ঘন হ'য়ে আসে,
প্রাণ মোর যেতে চায় চিরারাধ্য "দেবতা"র পাশে।
অতীতের ছবি সব ভেসে ওঠে নয়নে আমার,
ছিঁড়ে গেছে লক্ষ্যহারা জীবনের এ বীণার তার।

জীবনের উষাকালে হারালাম কত প্রিয়জন,
স্নেহের পরশে তাঁর মধুময় হইল জীবন।
সুখনীড় রচি' হায়, যে-আসন দিলেন আমায়,
হয়েছিনু যোগ্য কিনা, দেখিবার আসেনি সময়।

নিষ্ঠুর দুরন্ত কাল অকালেতে প্রবেশিল ঘরে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হানিল যে আমার উপরে।
ভবনায় অন্ধকার; শূন্যময় হেরি চারিধার,
ব্যাকুল বেদনাহত হৃদি ভেদি ওঠে হাহাকার!
নিভে গেছে সুখ-দীপ, চন্দ্রতারা-ঢাকা আকাশ মোর
বেদনায় কাঁদে প্রাণ, অবিরল ঝরে আঁখি লোর

স্বামী-স্ত্রী

গল্প

রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী

স্বামী, স্ত্রী। সকলে বলিত আদর্শ দম্পতি, বে-দাগ, নিখুঁত। মেয়েরা হিংসায় ফাটিয়া মরিত, বলিত, "দেখেছ একবার মাধুরীর স্বামী ভাগ্য, যেমনি রূপ তেমনি গুণ! তার উপর স্ত্রীকে কেমন ভালবাসে।" পুরুষরা বলিত "মিঃ রায়ের মত সুখী বোধহয় খুব কমই দেখা যায়, যেমনি পয়সা তেমনি স্ত্রীটী।"

সত্যই বলিবার মত, আলোচনা করিবার মত দম্পতি বটে। মিঃ অনিল রায়ের মস্তবড় পাটের কারবার, অগাধ টাকা—ড্যালহউসী স্কোয়ারে অফিস, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে বড় কল-কারখানা। পাট হইতে সূতা, কাপড় সব রকম তৈয়ারী হয়, টালিগঞ্জে মস্তবড় প্রাসাদ সদৃশ বাড়ী, রূপে সেকেলে মহলে কার্ত্তিক, একেলে মহলে এ্যাপোলো—যুবক। স্ত্রী মাধুরী উচ্চ শিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনীর কন্যা। দুটী যেনো মাণিকজোড়, বিধাতা বহুদিন হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝি দুইজনার গাঁট-ছড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ঘড়ির কাঁটার মত দুইজনে চলে, কোনখানে এতটুকু ব্যতিক্রম নাই, কাঁটা এক সেকেণ্ড ফাষ্ট অথবা স্লো হয় না। ঠিক ছটার সময় প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীতে দুইজনে বেড়াইতে বাহির হয়, ছটা কুড়ি মিনিটে রোজ কালো মোটরখানা দ্রুত-গতিতে চৌরঙ্গী অতিক্রম করিয়া গঙ্গার ধারে চলিয়া যায়। কোন নিমন্ত্রণে বাটীতে ঠিক সময় মত দুইজনে আসে, আধঘণ্টা পরেই আবার চলিয়া যায়। সকলে বলে "ওরা কিন্তু মিশুক নয়", কেউ বলে—"টাকা আছে ব'লে অহঙ্কার আর কিছু না।" কিন্তু আর একদল সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলে—"আহা! এই তো সবে বিয়ে হয়েছে, এখন কি আর অন্যদের সঙ্গে মিশ্‌তে ভাল লাগে?"

অনেক সময় বাহির দেখিয়াই ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া বসে অনেকে; লৌকিক বাহিরে যে যাহাই বলুক না কেন, অনিল রায়ের ও মাধুরীর ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিলেও অন্তর তাহাদের একেবারে শূন্য ছিল, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহাদের সে শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারে কিনা, তাহা তাহারা নিজেই বুঝিতে পারিত না। বাহিরে দুইজনে কথা বলিলেও, দুইজনে দুইজনার অনুগত এরূপ ভাব দেখাইলেও, বাড়ীতে তাহারা পরস্পরের কাছে অত্যন্ত অপরিচিতের মত থাকিত, নেহাত দরকারী কথা তাও হইত কই? কারণ দরকার বলিয়া কোন জিনিস কখনো, তাহাদের ভিতর আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করে নাই। সুদীর্ঘ চার বৎসর এই ভাবে কাটাইয়াছে তাহারা কেনো ও কাহার দোষ কে জানে? বাপ মা জোর করিয়া অনিলের বিবাহ দেয় নাই, অথবা কোন প্রণয় ব্যাপারও অনিলের কিশোর জীবনে কোন ছাপ আঁকিয়া দেয় নাই। তবু কেনো এ বিড়ম্বনা? মাধুরীও তো কলেজ পালাইয়া কাহারো সঙ্গে প্রেম করে নাই, সম্পূর্ণ নূতন নির্ম্মল প্রাণটী লইয়াই সে আসিয়াছিল স্বামীর ঘর করিতে। কিন্তু তবুও কাহার অভিশাপ তাহাদের জীবনটা এমন ভারবহ করিয়া তুলিল তাহা কে বলিবে?

অনিল গম্ভীর, স্থির, ধীর। শান্ত ভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করা তাহার স্বভাব। সে সহজে উত্তেজিত হয় না, অল্পে বিব্রত হয় না, ভীষণ বিপদেও সে অটল ভাবে নীরবে বিপদের ভিতর দিয়া পাড়ি মারিয়া চলিয়া যায়। তাই যখন ২৩ বৎসর বয়সে সে পিতার মৃত্যুতে বিরাট কারবারের মালিক হইয়া বসিল, তখন সে বেশ শান্ত ভাবেই নিজের পদভার গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার অটল চিত্তও বিচলিত হইয়া উঠিল সেদিন, যেদিন সে দেখিল যে তাহার পিতা তাহার ভবিষ্যৎ পথ একেবারে সুগম করিয়া রাখিয়া যায় নাই, বরং তাহা বহু কণ্টক দিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যাহা তাহার পক্ষে পরিষ্কার করা একেবারে সুকঠিন।

সে দেখিল, পিতার সম্পত্তি, কলকারখানা সমস্তই বহু লক্ষ টাকায় বন্ধক, এমন কি বসত বাড়ীটী পর্য্যন্ত। একটী পয়সাও তাহার নিজের নহে, সমস্তই বিখ্যাত ধনী মাধব ঘোষের

অনিল স্তম্ভিত হইল। কাগজ-পত্র ঘাঁটিয়া সে বাহির করিল তাহার পিতা প্রথম কারবার আরম্ভ করেন ঋণের টাকা দিয়া। কলকারখানা, কলের ঘর বাড়ী সবই ঋণের টাকায়। সেই বাড়ী ঘর পুনরায় বন্ধক দিয়া অন্যান্য সম্পত্তি করেন এমন কি নিজের প্রাসাদের মত বসত বাড়ী, চেয়ার, টেবিল, মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত। তাহার ইচ্ছা ছিল ক্রমে কারবার ও সম্পত্তির আয়ের টাকা হইতে ঋণ পরিশোধ করিয়া মুক্ত হইবেন, কিন্তু হিসাবে ঠিক থাকিলেও কার্য্যে তাহা ফলবতী হইয়া উঠিল না। সে বাহিরে খুব আড়ম্বর করিয়া বাড়ী করিল। ৩।৪ খানা মোটর, অনাবশ্যক কর্ম্মচারী, কুলি মজুর প্রভৃতি রাখিয়া, জাঁকজমক করিয়া, আয়ের টাকা খরচেই ব্যয় করিয়া ফেলিতে লাগিল, ও-দিকে ঋণের টাকা যেমন তেমনি রহিয়া গেল। উপরন্তু সুদের টাকাও আসলে মিশিয়া বিরাট একটা অঙ্কে পরিণত হইতে লাগিল। অনিলের পিতা বুঝেন নাই যে কারবারের প্রথম অবস্থাতেই তাহার এ ব্যয় বাহুল্যতা কত অনাবশ্যক। এ ব্যাপার কিন্তু জনসাধারণের কাছে চিরকাল গোপন ছিল। অত বড় দিল দরিয়া হাত-খোলা, ব্যয়ী কিরণ রায়ের এ বিরাট আড়ম্বর ও উপকথার মত ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি যে একেবারে শূন্যের উপর তাহা কেহ জানিত না, সকলে জানিত শুধু তাহার ব্যয়ের পরিমাণ। মাধব বোস হুঁসিয়ার ও হিসাবী লোক—সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, চুপ করিয়া বসিয়া শুধু সুদের অঙ্কে যোগ দিয়া যাইতেছিল এবং সময় বুঝিয়া শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে কোন সুযোগে সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঐ সময়ে অনিলের পিতার মৃত্যু হইল। অনিল এখন কি করিবে? সে বহুরাত্রি জাগিয়াও চিন্তা করিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। এই ধন, মান, এত বড় নাম সবই এক মুহূর্ত্তে কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহাকে নিঃসম্বল গৃহহীন হইয়া পথে পথে ঘুরিতে হইবে, চিরকাল ঐশ্বর্য্যের কোলে পালিত হইয়া অবশেষে পথের ভিখারী হইবে? অনিল ভাবিল সমস্ত ব্যয় বাহুল্যতা কমাইয়া, যে রকমে হউক এই কারবারকে ঋণদাতাদের কবল হইতে মুক্ত করিতে হইবে, প্রাণপণ করিয়া খাটিতে হইবে।

কিছুদিন পরে মাধব বোস অনিলকে চিঠি লিখিল—"সুদে আসলে অনেক টাকা হইয়া গিয়াছে, এতদিন ধরিয়া আসল দূরের কথা সুদের একটা পয়সাও সে পায় নাই, আর তো সে অপেক্ষা করিতে পারে না। অনিল আরো এক বৎসর সময় চাহিয়া লইল। তারপর চলিল প্রাণপণ যুদ্ধ, অনিল আহার নিদ্রা ভুলিয়া কল ঘরে বসিয়া থাকিত, নিজে খাটিত কিন্তু এতো চেষ্টা করিয়াও সব শ্রম বিফল হইল। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে কুলীরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজকর্ম্ম সবই বন্ধ করিয়া দিল। কি করিবে অনিল? সে শ্রান্ত ভাবে সেদিন বাড়ী আসিয়া বিছানায় হতাশ ভাবে শুইয়া পড়িল, আর আশা নাই; এত চেষ্টা করিয়াও পিতার মর্য্যাদা রাখিতে পারিল না।

অনেক চিন্তা করিয়া সেদিন অনিল মাধব বোসের সঙ্গে দেখা করিতে গেল, যদি আরো কিছু সময় চাহিয়া লইতে পারে। মাধব বোস প্রাচীন লোক, পাকা হিসাবী ও সংসারী, কিছু দিন হইতে সে রোগে ভুগিতেছিল, মাথার চুলগুলি সমস্ত পাকিয়া গিয়াছে, শীর্ণ মুখে কর্কশ ভাব খানিকটা থাকিলেও, মেজাজটা বেশ মোলায়েম ও কথাবার্ত্তা মিষ্ট। সে বেশ ভালো ভাবেই অনিলকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার আপাদ মস্তক আগাগোড়া বিশেষ ভাবে দেখিল। একদিনেই কাজের কথা শেষ হইয়া উঠিল না, অনিল সে দিন একটু আশান্বিত হইয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসিল—মাধব বোস হয়তো আরো বছর দুয়েক সময় দিবে তাহা হইলে সে একবার নিজের শক্তি দেখিয়া লইবে। এইরূপ একটা বিষম ঝড়ে নৌকা ঠিক রাখিয়া হাল ধরার একটা আনন্দ আছে—জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সুখ আছে গৌরব আছে। দুইদিন পরে কাগজ-পত্র লইয়া অনিল আবার মাধব বোসের বাড়ী গেল। সেদিন সে কাজের কথাই তুলিল না—কতগুলা বাজে কথা বলিয়া খানিক সময় কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তো দেখছি বেহাৎ ছেলে মানুষ—পড়েছ কত দূর?" অনিল হঠাৎ এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, মাথার ভিতর তখন তাহার ঘুরিতেছিল কলের চাকা আর টাকার চাকতি, সে বলিল "বি, এ, পাশ করেছি—"

"তা বেশ বেশ, বিলেত টিলেত যাবার ইচ্ছে আছে? তোমার বাবা তো পাকা সাহেব ছিলেন"।

"হাঁ—এই বিলেত থেকে ঘুরে এসেছি—"

"বেশ কোন কিছু পড়েছ?"

"ইঞ্জিনীয়ারিং"—

"তা বেশ বেশ, তোমার বয়স কত ?"

আশ্চর্য্য হইয়া অনিল, "২৫ বৎসর বোধ হয়।"

"তা বেশ বেশ,বোধ হয় কেন ?" মাধব বোস অনিলকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "তা ২৪।২৫ এর বেশী মনে হয় না। বাড়ীতে কে কে আছে ?"

অনিল একটু অধীর হইয়া উঠিল, সে আসিয়াছে বিষয় কার্য্যে তাহাকে এ সব অনাবশ্যক প্রশ্ন কেন ? সে বলিল—"কেউ নেই বাড়ীতে—"

"তা বেশ বেশ, জাতি, কুটুম, আত্মীয় স্বজন তারা—"

অনিল বলিল—"দেখুন, আমি সেদিনের কথামত কাগজ পত্র নিয়ে—"

বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিল—"তা বেশ বেশ, সে হবে এখন,—বলি আর জাতি, কুটুম, তারা সব কোথায় ?"

অনিল অগত্যা বলিল—"জাতি কুটুম্বের কথা জানি না, থাক্‌লেও তারা কেউ আমার সঙ্গে মিশে না।"

"কেনো মেশে না ?"

"তা জানি না, তবে বাবার সময় থেকে আমি কাউকে দেখিনি—"

"তোমার বাড়ীতে কেউ নেই ?"

"না"

"বিয়ে টিয়ে হয়নি বোধ হয় ?"

"না"

"করবার ইচ্ছেও নেই ?"

অনিল বিরক্তি দমন করিয়া উত্তর করিল "না"—

মাধব বোস হাসিয়া বলিল—"তা বেশ বেশ জলটল খাও—তোমার বাপের সঙ্গে খাতির ছিল বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা তো তেমন ছিল না, তা হ'লেও—"

অনিল বলিল—"যে কাজের জন্য এসেছিলুম—"

মাধব বোস সে কথায় কান না দিয়া বলিল—"সে হবে এখন, জলটল খাও—ওরে কে আছিস ?" অনিল সেদিন ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিল—সে ভাবিল—"এ বুড়োর মতলব কি, কাজের কথা তো কিছুই বলে না, আর কে পথে বসাবে না কি ?" কিন্তু মাধব বোস চাল চালিল অন্য রকম। সে অনিলকে আর একদিন ডাকাইয়া কাজের কথাই বলিল। বলিল—"দেখো, আমার লোক-জন নাই, বয়স হয়েছে, সংসারে আর কেউ নেই—শুধু একটী মেয়ে, সুন্দরী শিক্ষিতা, মেহাৎ ফেলে দেবার নয়—এই আঠারোয় পড়েছে তাকেই আমি সর্ব্বস্ব দিয়ে যাবো—তা তোমার যত কিছু আছে সব ধ'রতে গেলে আমার, তা আমি তোমাকে পথে বসাতে চাইনা, তুমি ছেলে মানুষ, এক কাজ করলে সব দিকই পরিষ্কার হয়ে যায়—"

"অনিল বিস্মিত প্রশ্ন করিল—"কি ?"

"তুমি মাধুরীকে বিয়ে কর—"

সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া বা দায়ে পড়িয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছা অনিলের মোটেই ছিল না, এবং এ প্রস্তাব তাহার ভাল লাগিল না, সে বলিল—"কিন্তু আমার তো এখন বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই—"

একটু বিরক্ত হইয়া মাধব বোস বলিল—"ইচ্ছে নেই,—তবে আমাকে দুষোনা বাপু, আমার মেয়ের দিকই আমাকে দেখতে হবে, আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে সব কাজই আমি শীগ্‌গির শেষ করতে চাই, তোমাকে অত সময় তো আমি দিতে পারবো না,—তবে তাকে যদি বিয়ে কর তবে সব গোল মিটে যায়,—তোমাদের জিনিস তোমাদেরই রইল—আমি আর ক'দিন।"

অনিল সেদিন অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা জীবনে সংগ্রাম করিয়াই আনন্দ পায় এবং যাহারা আত্মবলকেই সবার চাইতে উঁচু করিয়া দেখিয়া যেন আত্মবলেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। অনিলের সেই উৎসাহে বাধা পড়িল। সে ভাবিল, খানিকটা অংশ বিক্রি করিয়াও যদি দেনা তাহা হইলেও তো সম্পূর্ণ শোধ হয় না, অথচ এতো অল্প সময়ের ভিতর অতটাকাই বা কে বাহির করিবে ? ওদিকে মাধব বোস বিরক্ত হইয়া অনিলকে জানাইল ; একমাসের ভিতরই সে নালিশ রুজু করিবে, তাহার কাগজ-পত্র ঠিক। এখনো যদি সে সম্মত হয় ! অনিল আর উপায়ান্তর না দেখিয়া মেয়েকে সম্মতি পাঠাইয়া দিল সেদিন মাধব বোস নিজেই তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, "সব কাজ-কর্ম্ম তাহলে মাধুরীর নামেই চলুক ;" অনিল তাহাতে রাজি হইল না। পিতার নামে এত বড় কলঙ্ক সে তুলিয়া দিতে পারিবে না। অনিল বলিল "না। তবে আমার যা কিছু আপনার নামে আছে সব আপনার মেয়েকে

নামে বন্ধক থাকুক, আমি যতদিনে পারি সে সব শোধ ক'রে ছাড়িয়ে আবার আমার ক'রে নেবো।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "তা বেশ বেশ কিন্তু বিয়ের পর দেখবে সব সমান হ'য়ে যাবে বাপু, অত তোমার-আমার ভাব থাকবে না।"

কিন্তু তাহা হইল না, বিবাহ হইল কিন্তু অনিলের মাধব বোসের উপর পূর্ব্বেকার বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার ভাব সমান রহিয়া গেল। তাহাকে বাধ্য করিয়া, তাহার অবস্থার আনুকূল্য লইয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিয়াছে সে। স্ত্রীর ও শ্বশুরের অনুগ্রহের দান লইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে অনিল, অনুগ্রহের দানেই তাহার অস্তিত্ব, কি দীনতা তাহার! তাই সে সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যতদিন সে তাহার স্ত্রীর টাকা সুদে আসলে পরিশোধ করিয়া তাহার সম্পত্তি না ছাড়াইয়া লইবে, ততদিন সে ভিন্ন অস্তিত্ব লইয়া থাকিবে। তাহার পিতাকে ঋণ-মুক্ত করান তাহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য, এবং যাহার কাছে তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রীত হইয়া রহিল, তাহাকেও সে স্ত্রী ভাবে দেখিতে পারিবে না। তাই অনিল যৌবনের প্রারম্ভেই বিরাট কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় লইয়া অন্তরে বাহিরে ব্রতধারী সন্ন্যাসী সাজিল। কেবল বাহিরে কেহ কিছু জানিল না। সকলে বলিল, "অনিল বেশ পাকা ছেলে কেমন কাজ বাগিয়ে বিয়েটা করলো।"

বিবাহে অনিল আড়ম্বর করিতে একেবারে বারণ করিয়াছিল—কিন্তু ধনী মাধব বোসের একমাত্র কন্যার বিবাহ চুপি চুপি করিলেও হাজার পনেরো টাকা খরচ হইল শুধু আমোদে-প্রমোদে। অনিল কিন্তু শূন্য বাড়ীতে শুধু ইলেকট্রিক জ্বালিয়া বধূ ঘরে তুলিল, কেহ শঙ্খ বাজাইল না, উলুধ্বনিও দিল না! ফুলশয্যার দিন ফুলের গহনা ডালায় শুকাইয়া রহিল, বধূ একাকী প্রকাণ্ড পিতলের পালঙ্কের একপাশে পড়িয়া বিনিদ্র রাত্রি কাটাইয়া দিল, আর বর নীচের ঘরে ছোট একটী লোহার খাটে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইল।

বিবাহের রাত্রেই অনিল স্ত্রীকে বলিয়া ছিল—"দেখো, তোমার আমার বিয়েটা চুক্তি মাত্র, একটা কারবার, ব্যাবসা তোমার কাছে ধরতে গেলে আমি নিজেকে বন্ধক রেখেছি, আমার বাবার নাম পর্য্যন্ত তোমার কাছে বন্ধক। তোমার বাবা—অত বড় হীনতায় আমাকে টেনে না আনলেও পারতেন। হয়তো আমাকে কঠোর ভাবতে পার, অমানুষ ভাবতে পার, কিন্তু যতদিন না তোমার ঋণ শোধ করেছি, ততদিন আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না, তোমার অনুগ্রহের দান নিয়ে বেঁচে আছি। বাড়ী ঘর যা কিছু ধূলার কণাটী পর্য্যন্ত এখানকার তোমার। আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার বাবাকে ঋণ মুক্ত করা ও এখানে আমার নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করা, তার আগে তোমার কাছ থেকে স্বামীর কোন অধিকারই দাবী করবো না তুমিও আমার কাছ থেকে কিছু দাবী করো না।"

মাধুরী চুপ করিয়া সব শুনিয়াছিল কোন উত্তর দেয় নাই। অভিমানাহত বেদনায় তাহার সারা অন্তর ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সে ভাবিল, এ কোন দেশী বিচার? স্ত্রীর কি স্বামী হইতে ভিন্ন সত্ত্বা আছে? সে যে প্রথম দিন তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই অন্তরে বরণ করিয়া রাখিয়াছিল। এমন অবস্থাধীন বিবাহ হইতেছে জানিলে সে যে কিছুতেই এ বিবাহে স্বীকৃত হইত না। টাকা পয়সা লইয়া সে কি করিবে? পিতা তাহার কেন সাংসারিক ব্যবসায়ে লাভ করিতে গিয়া, জীবনের ব্যবসায়ে এতখানি ক্ষতি করিয়া দিয়া গেল? স্বামী বা কি? সে কি জানেনা নারীর প্রাণের ব্যবসা টাকা-পয়সা চায় না, সে চায় আরো অন্য কিছু যাহার মূল্য বুঝি সম্রাটের সাম্রাজ্য দিয়াও ধার্য্য করা যায় না। এই তাহার বাসর ঘর, এই তাহার বিবাহ। সে উত্তর দিল না। অনিল ভাবিল, "বেশ বুঝে নিয়েছে তাহলে।" সে আবার বলিল "তা তোমাকে লোকসমাজে আমি কোনরকম হেয় করবোনা—বাইরে তুমি স্ত্রী আমি স্বামী, আর বাড়ীতে আমাদের ব্যবসার সম্পর্ক। তুমি পাওনাদার আমি দেনাদার"—

মাধুরীর সমস্ত হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "আমার কি দোষ? আমার উপর কেনো এ ভীষণ শাস্তি?" কিন্তু তাহার মুখ ফুটিয়া একটা শব্দও বাহির হইল না।

...কয়েক দিন পরেই মাধব বোসের অসুখ খুব বাড়িয়া গেল। মাধুরী একবৎসর বাপের বাড়ী কাটাইল—অনিল ততদিন বেশ নিশ্চিন্ত মনেই নিজের কাজ লইয়া রহিল। কারণ মাধুরীর সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে হইতেছে না এই ভাবিয়া। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞাবত সে

প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল নিজেকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য। মাধব বোস সব কাজ হিসাব করিয়া করিত, তাই সে জীবনের হিসাবও আগে থাকিতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, বিবাহের বছর খানিক পরেই তাহার মৃত্যু হইল। অনিল শ্বশুরের অসুখের সময় ও মৃত্যুর পরও কয়েকদিন লোক দেখাইয়া নিয়মিত ভাবেই শ্বশুর বাড়ী যাইত, এবং মাধুরীর সহিতও দেখা করিয়া ২।১টা মামুলি কথাও বলিত কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। তারপরে সে আবার তাহার কাজের ভিতর ডুবিল, আর মাধুরী একমাত্র স্নেহের আশ্রয়, সংসারের অবলম্বন হারাইয়া চারিদিকে হতাশ হইয়া চাহিয়া দেখিল তাহাকে হাত বাড়াইয়া ডাকিয়া লইতে আর কেহ নাই—নাই কেন? তাহার থাকিয়াও নাই, সুন্দর স্বামী তাহার? ভাবিতে গিয়া মাধুরীর চোখে জলের বান দ্বিগুণ ডাকিয়া উঠিল। বাড়ীতে তখন তাহার মামা, মাসী মামি প্রভৃতি আত্মীয়, আত্মীয়া অনেক ছিল, কিন্তু তাহাদের সংসার আছে, তাহারা তো বসিয়া থাকিতে পারে না, তাই একমাস পরে আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া তাহারা যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল। সেইদিন মাধুরীকে অনিল কহিল—"এখন আর খালি বাড়ীতে বোধহয় একলা থাকাটা ভাল দেখাবে না, লোকেও খারাপ বলবে, সেইজন্য, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে ও বাড়ীতে গিয়ে থাকলেই ভাল হয়, ওটাও তো তোমারি বাড়ী কারণ এখনো আমার বলবার অধিকার আমার হয়নি।"

মাধুরী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা হেলাইয়া সম্মতি দিল "যাবো।"

অনিল বলিল—"আচ্ছা বেশ, কাল সকালে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো—আমায় আসতে হবে কি?" মাধুরী তাহাকে অব্যাহতি দিয়া বলিল "না।" তারপরে মাধুরী ফিরিয়া আসিল নামে মাত্র শ্বশুর বাড়ীতে শূন্য প্রাণমন লইয়া। অনিল সেদিন অফিস হইতে ফিরিয়া স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গেল। মাধুরী তখন প্রশস্ত বারান্দায় একা বসিয়াছিল, অনিল ড্রইংরুমে বসিয়া আয়াকে দিয়া মেমসাহেবের কাছে সেলাম পাঠাইল। মেমসাহেব আসিলে সে বলিল—"তোমাকে আমার যা বলবার আগেই বলেছি, তুমি আমার অতিথি না আমি তোমার অতিথি বুঝতে পারছি না, যাক্ আমি যেমন নীচের ঘর কয়েকটা নিয়ে আছি সেই রকমই থাকবো আর সমস্ত বাড়ী ঘর তোমার, ধূলোর কণাটা পর্য্যন্ত। তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমাকে তোমার স্বাধীনতার বা আমোদ প্রমোদের বাধা ব'লে মনে করো না,—এবং এ বিষয়ে আমিও স্বাধীন।" অনিল উঠিয়া ২১ পা অগ্রসর হইয়া আবার থামিয়া বলিল—"আর একটা কথা, আমি লোককে কিছু জানাতে চাই না, সারাদিন পরে একবার তুমি আর আমি যদি একসঙ্গে বেড়াই, তাহলে সব দিক পরিষ্কার থাকে, তোমার আপত্তি আছে কি?

মৃদুস্বরে মাধুরী বলিল—"না।

অনিল একটা যেন মস্ত বড় দায়ীত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সারিয়া লঘুভাবে নীচে চলিয়া গেল।—

এই ভাবে কিছুদিন চলিল। মিঃ ও মিসেস রায়ের নামে নিমন্ত্রণ অসিলে অনিল সে চিঠি উপরে পাঠাইয়া দেয়, মাধুরী তারিখ ও সময় লিখিয়া সে চিঠি আবার নীচে পাঠাইয়া দেয়, তারপরে নির্দ্দিষ্ট দিনে দুইজনেই সাজিয়া বাহিরে আইসে, এবং এক গাড়ীতে বসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যায়। দুই জনার ভিতর কোন কথা হয় না, এমন কি একটা দৃষ্টির বিনিময়ও না। কখনো কোথাও অনিল হাত বাড়াইয়া স্ত্রীকে গাড়ী হইতে লয়, অনিলের স্পর্শ ভাবহীন শীতল, আর মাধুরীর ঈষদুষ্ণ হইয়া একটু কাঁপিয়া হিম হইয়া যায়।

অনিল রোজ ৯টার সময় খাইয়া অফিসে যায়, সেখান হইতে কারখানায় যায় এবং আবার অফিসে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত সেইখানেই কাটায়। মাধুরী সন্ধ্যা ঠিক ৬টার সময় মোটরের একপাশে বসিয়া অফিসের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, এক মিনিটও তাহাকে বসিতে হয় না, অনিল নামিয়া আসে। গাড়ীতে সে একটী কথায় বলে না, চুপ করিয়া একপাশে বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া শেষ করে। গভীর তাহার চোখের দৃষ্টি ও অতল তাহার মন কিছু দেখে না বোঝে না, দৃষ্টি তাহার চিন্তা সাগরে ডুবিয়া কোন অতলে হারাইয়া যায় কে জানে! মাধুরীও একপাশে বসিয়া থাকে অতি সন্তর্পণে, পাছে সাড়ীর প্রান্ত বা আঁচল তাহার স্বামীকে স্পর্শ করিয়া তাহার ব্রত ভঙ্গ করিয়া দেয়, এই ভয়ে। মাধুরী ব্যথিত হইয়া ভাবে। "এতো কি ভাবনা আমার টাকা শোধ করিবার জন্য, এতো কি

চিন্তা, আমি কি পর ?" কিন্তু সে মুখ টিপিয়া বসিয়া থাকে পাছে মনের ভাষা মুখ দিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া যায়। বাড়ী ফিরিবার পথে অনিল আবার নামিয়া যায়।

এতদিন সে সুন্দর ভাবে সাজিয়া আসে, কিন্তু অনিল একবারও তাহার সে সৌন্দর্য্যের দিকে ফিরিয়া দেখে না। শত শত চক্ষু যাহাকে দেখিয়া প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে সে সম্পদ যাহার তাহার কি এতটুকু প্রলোভন হয় না ; একদিনও শুধু একটিবার চোখের দৃষ্টি দিয়াও তাহা উপভোগ করিতে ? মাধুরী বাড়ী ফিরিয়া যায়। এতাবৎ বাড়ীটী বিরাট শূন্যতায় হাহাকার করে, সুসজ্জিত ঘরগুলি কাহার আশাপথ চাহিয়া হতাশ আক্ষেপে গুমরিয়া উঠে, বাতাস কাহার দীর্ঘশ্বাস বহিয়া ঘুরিয়া ফিরে। মাধুরীর শূন্য বুকটীও বেদনায় ভরিয়া যায়। ওগো, এসবের সার্থকতা কি আছে ? তাহার শুইবার ঘরে এতাবৎ আয়নার সামনে সে দাঁড়ায়, খানিকক্ষণ নিজের সুন্দর ছায়ার প্রতি চাহিয়া থাকে ; তারপরে চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া যায়। সে ধীরে সরিয়া আসে।

এইভাবে ঠিক চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—, অনিল দিবারাত্রি এই সুদীর্ঘ দিনগুলি কাটাইয়াছে—শুধু চিন্তায় ও কাজে কিন্তু তবুও এক একটী বছর তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া যখন কারবারও ঋণ যেমনকার তেমনি রাখিয়া চলিয়া গেল, তখন অনিল অস্থির হইয়া সব ভুলিয়া মাতিয়া উঠিল কাজের নেশায়। তাহার মন ক্রমে আরো কঠিন হইয়া উঠিল স্ত্রীর উপর,—যেন সমস্ত দোষই নিরপরাধিনী মাধুরীর !

এই ভাবে কাটিবার পরে, অনিলের প্রাণপাত যত্ন ও পরিশ্রমের ফলেই বুঝি সেই বৎসর খুব একটা মোটা আয় হইল। খরচখরচা বাদেও অনিল যখন সেদিন সমস্ত সুদ ছাড়াও কিছু টাকা আসল ঋণে দিয়া, হিসাব-পত্র শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি অনেক। মানুষ সর্ব্বদা কাহাকেও দুঃখের না হউক আনন্দের সমভাগী করিতে চায়, তাই সেদিন তাহার এত বড় আনন্দ সংবাদ শুনিবার কেহ নাই, ভাবিয়া ক্ষণেকের জন্য সে নিজেকে একটু একেলা, নিঃসঙ্গ ভাবিল। নিজে খানিকক্ষণ নিজের সুখচিন্তায় বিভোর হইয়া সে যখন কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইল তখন জয়ের উল্লাস, সাফল্যের গৌরব তাহাকে একেবারে নূতন মানুষ করিয়া দিয়াছে। এতদিন পরে সে নিজেকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল, খুঁজিয়া লইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক জনার কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার ভারাক্রান্ত মনটী অনেকটা হাল্কা হইয়া গিয়াছে, সে ভাবিল, এইভাবে যদি চলে তাহা হইলে ৫।৬ বছরেই সে বোধ হয় সমস্ত ঋণ শোধ করিতে পারিবে। তারপরে ? তারপরে কি করিবে সে ? মাধুরীকে লইয়া সুখের সংসার পাতিবে কি ? তাহার অপরাধ যাহা সে কল্পনা করিত শুধু, তাহা সে আজ অনেকখানি লঘু করিয়া দেখিল। আর সে দেখিল মাধুরী সুন্দরী, সত্যই সুন্দরী। কিন্তু তাহাকে সে কি আরো সুদীর্ঘ ৫।৬ বৎসর ধরিয়া উপেক্ষা করিবে এই ভাবে ? অমানুষ সে, কেনো হঠাৎ এত বড় একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল ? কেনই বা বিবাহ করিল, নিজের স্বার্থের পাদমূলে একটা নারীর জীবন উৎসর্গ করিয়া সে তাহার অপ্রয়োজনীয় ব্রত সফল করিতে চলিয়াছে কেন শাস্ত্রের অনুশাসনে ?—ইহার চাইতে না হয় পথের ভিখারী হইতই, আবার হয়তো সে নিজের বাহুবলে উন্নত হইতে পারিত, ধনী হইতে পারিত, এ সংগ্রামে যে বেশী সুখ, বেশী গৌরব। তবে কেনো সে কোন পথই বাছিয়া নিল না ? আবার তাহার মাধুরীর উপর রাগ হইল—মাধুরী যদি না থাকিত তবে ঘটনাচক্র নিশ্চয় অন্যদিকে ঘুরিয়া যাইত। সে যাহাই হউক, কিন্তু মাধুরী কই, সেও তো নিজের মনের ভাব এতটুকু কথায় বা কাজে কোনদিন ব্যক্ত করিতে চায় নাই। কেমন তাহার নারী হৃদয়, সেও কি তাহাই চায় যে স্বামী তাহার দেনদার হইয়া, অধমর্ণের দীনতায় তাহার ঐশ্বর্য্যে ভরা রত্নভাণ্ডারের বাহিরে জীবন রাত্রি বৃথা কাটাইয়া দিবে ? কই সে তো একবারও বলে নাই—"চাই না তোমার টাকা, আমি তোমায় চাই"। "তবে তাহাই হউক—অনিলের রক্তে ভরা অর্থে মাধুরীর লক্ষীর ভাণ্ডার পূর্ণ হউক, তাহার হৃদয় তাহাতেই ভরিয়া উঠুক, সে মাধুরী ছাড়াও নিজেকে লইয়া মনের শান্তিতে থাকিতে পারিবে। ভাবিতে ভাবিতে অনিল দেখিল পূর্ব্বাকাশ ধূসর হইয়া উঠিয়াছে—সে জোর করিয়া মন হইতে সব চিন্তা দূরে সরাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন অনিলের ঘুম ভাঙিল একটু দেরীতে। সে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া খাইয়া নিয়মমত আফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বর্ষার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে

চারিদিক ধুইয়া গিয়াছে—সামনেই বাগানের সুন্দর ফুলগুলি নূতন আবেশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনিল রেলিঙে ভর দিয়া খানিকক্ষণ সে শোভা দেখিয়া বেয়ারাকে বলিল "মেমসাহেবকে সেলাম দাও।" মিনিট পনেরো পরে মাধুরী আসিয়া দাঁড়াইল। সন্তস্নাত নির্ম্মল সৌন্দর্য্য তাহাকে ঠিক ঐ বাগানের ফুলগুলির মতনই যেনো কি আবেশে ভরিয়া দিয়াছে। অনিল এক মুহূর্ত্তের জন্য স্ত্রীর দিকে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। মাধুরী সুন্দরী, কিন্তু কেমন একটা উদ্ধতভাব তাহার মুখে ফুটিয়া উঠে মাঝে মাঝে, কিসের একটা চাপা অবাধ গতি তাহার সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া যায়। তবু মাধুরী সুন্দর। অনিল বলিল "কাল ৫ লাখ টাকা তোমার ঋণ শোধস্বরূপ ব্যাঙ্কে তোমার নামে জমা দিয়েছি।" মাধুরীর মুখ কঠিন হইয়া উঠিল—সেই টাকা, টাকার কথা। সে বলিল—"রসিদ দিতে হবে?" "নিয়মমত রসিদ একটা দেওয়া উচিত তো।"

মাধুরী বেশ শান্ত স্বরেই বলিল—"বেশ, রসিদ লিখে দেবো, কাগজ, ষ্ট্যাম্প আমার কাছে নেই।"

"সে সব আমি পাঠিয়ে দেবো এখন, তোমার ব্যাঙ্কের বই আর হিসাবও সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো, তুমি ভাল করে দেখে শুনে তারপরে রসিদ লিখে দিও।"

মাধুরী নিম্নস্বরে একটী "আচ্ছা" বলিয়া যেমন ধীর পদে আসিয়াছিল তেমনি ভাবে চলিয়া গেল। একবার স্বামীর আর কোন কথা বলিবার আছে কিনা তাহার জিজ্ঞাসা বা প্রতীক্ষা না করিয়াই। সে চলিয়া যাইতেই অনিল অসহিষ্ণুভাবে কয়েকবার সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া, খানিক সেই দিকে চাহিয়া অফিসে চলিয়া গেল।

অনিলের যত অন্য চিন্তা কমিয়া আসিতেছিল, তত তাহার নিঃসঙ্গ প্রাণটা সঙ্গসুখের আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিল "কাহাকে—কাহার সঙ্গ চায় সে?" আবার পরক্ষণেই প্রতিবাদ করিয়া নিজেই বলিল,—না, না মাধুরীর সঙ্গ সে চাহে না—তবে কাহার? তাহারও কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। তবুও সে কোন কোন দিন কোন বন্ধু বা পরিচিত কাহারাও বাড়ীতে যাইতে লাগিল। কিছুদিন পর তাহাও ভাল লাগিল না। যতক্ষণ কাজের ভিতর ডুবিয়া থাকিত ততক্ষণ বেশ থাকিত কিন্তু তার পরেই—সে খুঁজিত একটা বিশ্রামের স্থান, একটা স্বচ্ছন্দতা—অথবা গৃহ সুখ কি? কয়েকদিন ক্লাবে গিয়া তাহাও বন্ধ করিয়া দিল।

অনিল বাড়ীতে; তাহার নীচের ঘরে কয়েকখানি মাত্র বই আনিয়া রাখিয়াছিল—এ ছাড়া আর নেহাৎ আবশ্যকীয় কয়েকটী আসবাব-পত্র ছাড়া সে আর কিছুই ব্যবহার করিত না। সেদিন কি একটা দরকারী বই খুঁজিতে সে অফিস যাইবার সময় বহুদিন পরে উপরে লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিল। উপরে উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সব সেই রকমই আছে। যেখানে যে জিনিসটী দেখিয়া সে প্রথম দিন স্ত্রীকে সমস্ত সমঝাইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছিল, সে সবই ঠিক সেই ভাবেই রহিয়াছে। তখন বেলা ১০টা। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। কারণ পূর্ব্বের মত সাহেবী আদব-কায়দা এখনো এই বাড়ীতে পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত ছিল। মাধুরী পূর্ব্ব রীতির কিছুই পরিবর্ত্তন করে নাই। পাশের বারান্দায় সকালের রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, মৃদু বাতাস ফুলদানী হইতে বাসি ফুলের গন্ধ বহিয়া ফিরিতেছিল উদাস হইয়া। অনিল ড্রইংরুম পার হইয়া লাইব্রেরীতে ঢুকিয়াই কয়েক পা পিছাইয়া গেল, যেনো কোথায় অনধিকার প্রবেশ করিয়া হঠাৎ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সে দেখিল তাহার স্ত্রী মাধুরী দেওয়ালের গায়ে আঁটা বড় একটী আলমারী খুলিয়া কি একখানা বই দেখিতেছে। পদ শব্দে মুখ তুলিয়া স্বামীকে দেখিয়া সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। কোন কথা বলিল না। অনিল বলিল "একটা বই খুঁজতে আসতে হ'ল বিরক্ত করলুম কি?—

মাধুরী শুধু ছোট একটু "না" বলিয়া অন্যদিকে সরিয়া গেল। অনিল আবার বলিল, "আলমারীর তাল খুলে দেখতে পারি কি?"

মাধুরী উত্তরে কোন কথা না বলিয়া দামী রুমালে বাঁধা এক থোকা চাবী অনিলের সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনিল বিরক্ত হইল। এত দম্ভ, এতো অহঙ্কার! একটা কথা পর্য্যন্ত বলিল না। যেনো সে তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী, এই ভাবে অবহেলা ভরে চাবিটা তাহার সামনে ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল? টাকা, টাকাই সংসারে সব, সেই টাকার জন্যই এত অহঙ্কার তাহার! অনিল

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার ইচ্ছা হইতেছিল চাবিটা মাটির উপর ফেলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু, বইটা না হইলেই নয়। সেই জন্ম সে ব্যাপারটা লঘুভাবে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া রুমালশুদ্ধ চাবিটা তুলিয়া লইল, কিন্তু এইটুকু ভাবিল না যে মাধুরী তাহারই আজ্ঞা এবং প্রতিজ্ঞা নতমস্তকে পালন করিয়া চলিতেছিল মাত্র! অনিল কাজ সারিয়া চাবিটা আবার সেইখানে রাখিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আফিসে সারাদিন কাজের মাঝখানে একটা দামী সেণ্টের মৃদু গন্ধ বার বার তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিতেছিল। অনিল বিরক্ত হইয়া মনে মনে ভাবিল কিসের এ গন্ধ? হঠাৎ নিজের হাত শুঁকিয়া কারণ বুঝিতে পারিল। এ গন্ধ মাধুরীর রুমাল হইতে নিঃসৃত হইয়া লাইব্রেরী ঘর মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি বেশ ভালো করিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া আবার কাজে মনযোগ দিল।

মাধুরীর দিনগুলিও অসহ্য মনে হইতেছিল। ঊর্দ্ধতন এক পুরুষ হইতে যাহা করা হইয়াছে সব কর্ম্মের ফলই কি পুঞ্জীভূত হইয়া, তাহারই ভোগের জন্ম পাহাড় হইয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছে?—কিরণ রায় কারবার করিল, মাধব বোস টাকা ধার দিল, অনিল মুক্তি পাইল, আবার সেই মুক্তির ঋণ শোধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু এ সবের জন্ম দায়ী হইল অবশেষে মাধুরী! তাহার বুক ভরা আশা, প্রাণ ভরা বাসনা সবই কি নিষ্পেষিত হইয়া ধূলায় মিশাইবে তাহাদের কলের প্রকাণ্ড দৈত্যের মত লোহার চাকার নীচে? জীবনের এতোগুলা দিন যে তাহার ক্ষতি হইয়া গেল, কে তাহার কি দিয়া ইহার ক্ষতি পূরণ করিবে?—স্বামীরই বা এ অন্যায় অবিচার কেন? এতখানি প্রাণহীনতা সহ্য করা যায় না তো! তাহার চাইতে সে যদি একেবারে ঘৃণা করিত, অথবা যদি আর কাহাকেও ভালবাসিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিত তাহা হইলেও সে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাইত, যাহার সঙ্গে মনোযুদ্ধে যুঝিয়া, জয়ের উল্লাস বা পরাজয়ের দুঃখ অনুভব করিতে পারিত প্রাণ দিয়া। তবুও তাহার একটা জীবনের উত্তেজনা থাকিত। তাহার শক্তির সামর্থ্য সে দেখিয়া লইতে পারিত। কিন্তু এ কি? নির্জীব, অবসাদগ্রস্ত মন লইয়া এই ভাবে সে বাঁচিয়া থাকিবে কতদিন? সে যুঝিবে কাহার সঙ্গে কাহাকে লইয়া? একটা প্রাণহীন কলের পুতুলের সঙ্গে সে কতদিন এই ভাবে কাটাইবে? সুদীর্ঘ চার বৎসর কাটিয়াছে—আরো কতদিন—কতদিন? এ নিত্যনৈমিত্তিক একঘেয়ে জীবনযাত্রাও তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। তাই সে সেদিন নিত্য-প্রথা লঙ্ঘন করিয়া বেড়াইতে গেল না। অফিসের সামনে শুধু গাড়ী গিয়া থামিল। অনিল শূন্য গাড়ী দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। যতই তুচ্ছ হউক না কেন, কোন কিছুতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে তার অভাবটা খুব বেশী করিয়া অনুভব করাইয়া দেয় অন্তরে অন্তরে। অনিলও মাধুরীর অনুপস্থিতিটা সেই ভাবেই অনুভব করিল। রোজ গাড়ীর বাঁ দিকটা ভরিয়া থাকে। কথা না বলিলেও একটা মৃদু সৌরভ সে বেড়াইতে বেড়াইতে উপভোগ করে, সুদৃশ্য সাড়ীর উপর একখানি সুন্দর নিটোল হাত পড়িয়া থাকে, আর একখানি বাম দিকের দরজার উপর অবশ ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখে, কিন্তু আজ—গাড়ীটা, বেড়ানোটা, সব কিছুই কেমন যেনো ফাঁকা ফাঁকা মনে হইল। সে মুখে কিছু বলিল না, নীরবে নিয়মিত ভাবে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। পরের দিনও মাধুরী গেল না, এইরূপে ৯।১০ দিন তাহাকে না দেখিয়া অনিলের মনে হইল—"আহা বেচারী! অসুখ করেনি তো?—যাই হোক একটা কর্ত্তব্য তো আছে, খোঁজ নেওয়া উচিত।"

সে সেদিন বেড়াইয়া অফিসে না গিয়া সোজা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সমস্ত বাড়ী অন্ধকার! কোথাও কাহারও সাড়া শব্দ নাই। শুধু বাহিরে গাড়ী বারান্দায় একটা বাতি জ্বলিতেছে। সে বারান্দায় উঠিয়া দেখিল তাহার বেয়ারাটা সিঁড়ির নীচে মাধুরীর আয়ার সঙ্গে খুব কাছ ঘেসিয়া বসিয়া বিশ্রম্ভালাপে মত্ত। সামনে বাজার ঠোঙা ভরা খাবার, দুই বাটী চা আর এক দোনা পান। অনিল মনে মনে হাসিল, তাহার বেয়ারা আর মাধুরীর আয়া, বেশ প্রেম সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে, আর তাহাদের মুনিব? ভাগ্য বিপর্য্যয় আর কাহাকে বলে? সাহেবকে অসময়ে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া আয়া ও বেয়ারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল; আয়া ভীত হইয়া উপরে পালাইয়া বাঁচিল আর বেয়ারা তাড়াতাড়ি জলযোগের সরঞ্জাম সিঁড়ির নীচে ঠেলিয়া রাখিয়া সাহেবের টুপি হাত হইতে লইয়া ষ্ট্যাণ্ডে ঝুলাইয়া রাখিল। অনিল বাতির সুইচ টিপিয়া

ভাবিল, মাধুরী অন্ধকারে একা কি করিতেছে? অথবা সে কোথায়? কিন্তু চাকর চাকরকে প্রশ্ন করা তাহার স্বভাব নহে তাই সে অন্যভাবে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিল —"আজ কাল বাড়ীতে বাতি জ্বলে না কেন?"

বেয়ারা ভয়ে ভয়ে বলিল, "হুজুর বাতিতো জ্বলছে।"

"এখন তো জ্বলছে কিন্তু ওপরে যে অন্ধকার—"

"মেমসাহেব যে মানা কোরেছেন হুজুর, হুজুর না থাকলে নীচের বাতি নিবিয়ে রাখতে বোলেছেন হরদম—"

"উপরের বাতিও তো নেই"—

"আছে তো হুজুর—"

অনিল বিরক্ত হইয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল—সে বুঝিল বোকাটাকে প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই। একটু পরেই বেয়ারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হুজুর সব বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছি।" অনিলের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে মেমসাহেব অসুখ হইয়াছে না কি। কিন্তু চাকরের সামনে দুর্ব্বলতা দেখাইল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। তাহার মন আজ বার বার উৎসুক হইয়া জানিতে চাহিতেছিল, মাধুরী কি করিতেছে, এই প্রকাণ্ড শূন্য বাড়ীটির এক প্রান্তে বসিয়া বিজনবাসিনী উপেক্ষিতা সে কি তাহার কথা একবারও ভাবে? না না সে তাহার কথা ভাবিবে কেন? যে তাহার জীবনের উপর অত বড় একটা অভিশাপের বোঝা তুলিয়া দিয়াছে, সে কি তাহাকে এতটুকু প্রীতির চক্ষে দেখে, না সে তাহাকে তাহার চির জীবনের শত্রু বলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু মাধুরী বড় দাম্ভিকা, তাহার নিজের স্থান যে এ বাড়ীতে কোথায় তাহা সে বেশ বুঝিতে পারে, এবং সে অধিকারের প্রতিষ্ঠাও সে খুব সহজে করিয়া লইয়াছে। সে নীচে থাকে। কিন্তু কই মাধুরী একবারও তো বলে নাই "উপরে এসে থাকো।" একদিন সে বলিয়াছিল—"খাওয়াটা এক সঙ্গে হ'লে বোধ হয় ভাল হয়, তা নইলে চাকর বাকরেরা কি ভাববে?" কিন্তু মাধুরী উত্তর দিয়াছিল—"না আমি, ঠাকুরের রান্নাই আলাদা খাবো।" সে নিজের খরচে খাইত, নিজের চাকর আয়ার নিজেই মাহিনা দিত। তার মানে মাধুরী অনিলের একটা পাইও গ্রহণ করে না। তাহা হইলে সেও চায় যে তাহারা পাওনাদার ও দেনাদার হইয়াই থাকুক।

সেই জন্যই তো অনিল শুধু বাড়ীতে ব্রেকফাষ্ট খাইত, আর লাঞ্চ এবং ডিনার আফিসেই খাইয়া আসিত, এমন কি রবিবারের ছুটিটাও সে বাহিরে কাটাইয়া হোটেলে খাইয়া আসিত। দোষ কাহার? সব দোষ কি মাধুরীর না তাহার নিজের? অনিল ঘড়ী দেখিল ৯টা বাজে। সে তাড়াতাড়ি গাড়ী ডাকাইয়া অফিসে চলিয়া গেল। ডিনারের জন্য।

পরদিন সকালে অনিল বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাড়ীতে কারো অসুখ হয়নি তো?" বেয়ারা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তা তো জানি না হুজুর।" অনিল মুখ ফুটিয়া মাধুরীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। একবার মনে হইল, দরকার কি তাহারই বা অত ভাবিয়া,যে ইচ্ছা করিয়া দূরে থাকিতে চায় তাহার জন্য সে কেন ভাবিয়া নিজের সময় নষ্ট করে! আরো ৭.৮ দিন কাটিয়া গেল। মাধুরীর কোন খবরই সে পায় না! কি বিড়ম্বনা! এক বাড়ীতে থাকে স্বামী স্ত্রী, অথচ একজন অন্যজনের খবর জানেনা। অনিল অনেক ভাবিয়া স্থির করিল নিশ্চয় মাধুরীর কোন অসুখ করিয়াছে। সে তাই সেদিন দুপুর বেলা আফিসে বসিয়া মাধুরীর নিজের টেলিফোনের নম্বর ডাকিল। খানিকক্ষণ ঘণ্টা বাজিবার পর প্রশ্ন হইল "হ্যালো?" স্বর মাধুরীর। অনিল বলিল "তুমি? কেমন আছ?" খানিকক্ষণ কোন উত্তর আসিলনা, দারুণ অভিমানে মাধুরীর স্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল কি? কেমন আছ। কেনো এ প্রশ্ন? তাহার যাহাই হউক না কেন তাহাতে কাহার কি আসে যায়? বিশেষতঃ অনিলের? কেন বিবাহের দিনই তো সে তাহার সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলিয়াছে, পাওনাদারকে কোন দেনাদার এমন করিয়া প্রশ্ন করে কেমন আছ? মৃদুস্বরে উত্তর হইল "ভালো আছি।" অনিল আবার প্রশ্ন করিল "কোন অসুখ হয়নি তো?" উত্তর হইল"না।" অনিল আবার বলিল "দেখো, অসুখ-বিসুখ হ'লে ডাক্তারকে খবর"—

খট্ করিয়া শব্দ হইল—অনিল খানিকক্ষণ "হ্যালো", "হ্যালো"বলিয়া উত্তর না পাইয়া সজোরে রিসিভার নামাইয়া রাখিল। এত বড় অভদ্র মাধুরী! তাহার কথা শেষ হইবার অপেক্ষা না রাখিয়াই চলিয়া গেল? সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—রাগে, দুঃখে, অপমানে। ভাবিল, একটা সামান্য স্ত্রীলোক তাহাকে এই ভাবে পদে পদে তাচ্ছিল্য করিতেছে, কিসের জন্য, শুধু টাকার জন্য

নয় কি ? শুধু অনিলের সর্ব্বস্ব আজ তাহার কাছে বন্ধক সেইজন্য নয় কি ? অনিল দেনাদার আর সে পাওনাদার, সেইজন্য নয় কি ? অনিল মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল আর না—থাক্ মাধুরী, সে মরিয়া যাউক, সে আর তাহার খোঁজ লইতে গিয়া এ-ভাবে অপমানিত হইবে না। আর তাহার ঋণ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত অনিল নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাউক। সর্ব্ব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া শুধু এক চিন্তা তাহাকে জীবনের পথে চালিত করুক, তাহা টাকা-টাকা।

সেদিনও খানিকক্ষণ একলা বেড়াইয়া অনিল অফিসে না গিয়া বাড়ী ফিরিল। দূর হইতেই সে দেখিল আর একদিনের মত সমস্ত বাড়ী অন্ধকারে ডুবিয়া নাই। বাতাস ব্যথাহত প্রাণে কাঁদিয়া ফিরিতেছে না। উপরের সমস্ত ঘরগুলি উজ্জ্বল আলোকে সাজিয়া হাসিতেছে। অনিল মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল। আজ কিসের প্রচ্ছন্ন উৎসবে তাহার বিষাদ পুরী উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে ? না এ বেয়ারার কীর্ত্তি ? সেই দিনের ঘটনার পর হয়তো সে রোজই সব বাতি জ্বালাইয়া রাখে কিন্তু তাহা হইলে মাধুরী কি ভাবিতেছে—কেজানে। সে বাতি জ্বালুক কি না তাহাতে অনিলের অত আসিয়া যায় কেন ? তাহার উপরের তলার ইলেক্‌ট্রিক বিল মাধুরী নিজে দেয়। অনিল একটু অপ্রস্তুত হইল। খানিক পরে তাহার বেয়ারা ঘরে ঢুকিয়া মুনিবকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত ভাবে তাহার জুতা খুলিতে অগ্রসর হইল। অনিল পা টানিয়া লইয়া বলিল, "না থাক্ আমি আবার যাবো।" উপরে মাধুরী ভালই আছে, সে অন্ততঃ এইটুকু জানিয়াছে, আর তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই। আর বাতি জ্বলিল কি নিভিল, সে বিষয়ে খোঁজ নিয়া আর তাহার কি দরকার ? বেয়ারাকে কি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তাহার মুখে কথা বাধিয়া গেল, সে হঠাৎ উঠিয়া সেখান হইতে সুরকী ঢালা পথে খানিকটা হাঁটিয়া গিয়া মোটর আনিতে বলিল এবং মোটরের অপেক্ষা করিয়া সেইখানে পায়চারী করিতে লাগিল। এমন সময় মাধুরীর মহলের গাড়ী বারান্দা হইতে তাহার "ল্যামুজিন" বডি গাড়ীখানি তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। গাড়ীর ভিতর বাতি জ্বলিতেছিল, অনিল সেই আলোকে দেখিল, গাড়ীতে ৩।৪ জন মহিলা, সুবেশা এবং তাহাদের সঙ্গে মাধুরী। তাহার মনে হইল, বিবাহের সময় সে ইহাদিগকে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে দেখিয়াছিল। তাহা হইলে মাধুরী তাহার আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব লইয়া বেশ সুখেই আছে। তাহার সব আছে ধন, ঐশ্বর্য্য, বন্ধু, আত্মীয় শুধু সংসারে সেই একা। দারিদ্র্য ও দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাহাকেই, আর কেহ তাহাকে সাহায্য করিতে আসিবে না,—সে একা—একা। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল সমস্ত বাতি নিবিয়া গিয়া আবার সমস্ত বাড়ী অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। সে বুঝিল সেদিনও মাধুরী বোধহয় বাড়ী ছিলনা, বাহিরে গিয়াছিল, মাধুরী তাহা হইলে পূর্ণ স্বাধীনতা পূর্ণ ভাবেই ভোগ করিতেছে!

অনিল কয়েকদিন হইতে সব চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিল, ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য এবং এই বৎসরেই যাহাতে সে মাধুরীর ঋণ অনেকটা পরিশোধ করিতে পারে। সেদিন সে আফিসে বসিয়া কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছিল, এমন সময়ে তাহার টেলিফোন বাজিয়া উঠিল, রিসিভার তুলিয়া লইয়া সে আশ্চর্য্য হইল, মাধুরী কথা বলিতেছে। কি চায় সে তাহার কাছে ? সে বলিতেছিল, সেই রাত্রে সে তাহার দুই ভগিনীকে ও কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, অনিল উপস্থিত না থাকিলে ভাল দেখায় না, সে আসিতে পারিবে কি ? অনিল ভাবিল মাধুরী নিজে ডাকিতেছে না শুধু ভাল দেখাইবে না সেইজন্য। হঠাৎ তাহার মনে আর এক দিনের টেলিফোনের কথা জাগিয়া উঠিল, প্রতিশোধের এত বড় সুযোগ সে হাত ছাড়া করিতে পারিল না। রুক্ষস্বরে "সময় হবে না" বলিয়া রিসিভার রাখিয়া দিল।

মাধুরী লজ্জায়, অপমানে, অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া টেলেফোনের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। অন্যায়-কারী হইয়া বার বার তাহারই উপর অন্যায় করিতেছে সে, কেন কোন অপরাধে ? কাজে কথায় ব্যবহারে এতখানি অশ্রদ্ধা এতখানি তাচ্ছিল্য সে তাহাকে করে কেন ? মাধুরীর চোখ ফাটিয়া জল আসিল, সে দ্রুতপদে তাহার ঘরে গিয়া বড় জোড়া পালঙ্কের উপর লুটাইয়া পড়িল, ক্ষোভে, ব্যথায়, দুঃখে। সে ভাবিল; কিসের জন্য কাহার প্রতীক্ষায় সে সারাজীবন কাঁদিয়া কাটাইবে ? কি দরকার তাহার ? যাহার সহিত তাহার মাত্র দেনা-পাওনা

সম্পর্ক, তাহার সহিত অন্তরের সম্বন্ধ রাখিয়া কি হইবে? তাহার চাইতে ভালো সে তাহার নিজের পথে নিজেই চলিবে। পরের মুখ চাহিয়া থাকিয়া তাহার কোন প্রয়োজন নাই। সেইদিন রাত্রে তাহার নিমন্ত্রিত বান্ধবী ২।৩ জন, তাহার মাস্তুতো বোন দুইটী ও তাহাদের স্বামী সকলে আসিল।

অনিল রিসিভার নামাইয়া রাখিবার পরই ক্ষণকালের জন্য একটু অনুতপ্ত ইইল। সে নিজেই তো একটী দুর্লঙ্ঘনীয় প্রাচীর দুইজনার মাঝখানে তুলিয়া দিয়াছে—মাধুরীর তো কোন দোষ নাই—দোষ,—তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িয়া গেল—দরজায় কাহার আঘাত শুনিয়া সে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল "come in". তার পরেই সেক্রেটারীর সঙ্গে কাজের কথা বলিতে বলিতে কাগজ-পত্র সহি করিতে করিতে কাজের ও টাকার চিন্তার ভিতর মাধুরী কোথায় লুকাইয়া গেল তাহা অনিল নিজেই বুঝিতে পারিল না। সেদিন ডিনার শেষ করিয়া রাত্রে প্রফুল্ল মনে অনিল মোটরে উঠিল। আজ সে একটী খুব বড় লাভের কারবার শেষ করিয়াছে, কোন বড় ব্যবসায়ীর কাছ হইতে সে বড় রকমের একটি "order" পাইয়াছে,সে আশা করিল এইবারে ঋণে আরো কিছু টাকা দিতে পারিবে। ব্যবসা জিনিষটী ভৌতিক চক্রের উপর যেন ভর দিয়া আছে, তাহা এক দিনে সোণার পাহাড় আনিয়া দিতে পারে, আবার বন্যার জলেও তাহা ভাসাইয়া দিতে পারে। ভাগ্যবশতঃ অথবা ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহাকে একদিন সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, আবার সেই ভাগ্যে অথবা ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে সে নিজেকে মুক্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে। তারপর মাধুরীকে—মাধুরীর কথা মনে হইতেই তাহার টেলিফোনের কথা মনে হইল। মনে হইল—উত্তরটা বড়ই কর্কশ হইয়া গিয়াছে। অন্ততঃ যাহার সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই; তাহার সহিত তাহার অভদ্রতা করিবারও কোন অধিকার নাই, একজন মহিলার সহিত তাহার ভদ্রতা রাখিয়া চলা উচিত। তাহার মনে একটু লজ্জা হইল—ছি! শেষে সে কি মাধুরীর সহিত মান অভিমানের পালা আরম্ভ করিয়া দিল? কিন্তু লোক-জনের সামনে তাহার সহিত সে কেমন ব্যবহার করিবে ইহাও তাহার কাছে সমস্যা হইয়া উঠিল—তবুও সে ড্রাইভারকে আদেশ দিল—"ঘর চলো।"

দূর হইতে সে দেখিল, সেদিনও তাহার বাড়ীটী আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের ঘরে গিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আফিসের কাপড় ছাড়িল। তারপর আবার বহুদিন পরে উপরে উঠিয়া মাধুরীর সুসজ্জিত ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। তখন মাধুরী সকলের অনুরোধে হারমোনিয়মের সামনে বসিয়াছিল মাত্র। সকলে অনিলকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া বলিল—"বা! এই যে এতক্ষণে পূর্ণ হ'ল, হাজার হোক, host না হলে—এসো—।" মাধুরীর ভগিনীপতি নিখিল বাবু অনিলকে টানিয়া বসাইল। মাধুরী স্বামীকে দেখিয়াই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, অনিলেরও দৃষ্টি মাধুরীর মুখের উপর ক্ষণিক থামিয়া আবার সরিয়া গেল। দামী ইভনিং সুটে তাহাকে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল, মাধুরী সব ভুলিয়া ভাবিল—তাহার স্বামী সুন্দর। নিখিল বাবু বলিল—"মাধুরী বলছিল, তোমার কি engagement আছে, আসতে পারবে না,—যাহোক এসেছ তবু"—মাধুরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল—সে শুনিল অনিল বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দিতেছে, "সেটা তত impo tant ছিল না, তাই আর গেলাম না।" মাধুরীর একজন বন্ধু বলিয়া উঠিল "ওকি! উঠলে কেন মাধু? মিঃ রায়কে দেখে বুঝি সব গুলিয়ে গেল?"

মাধুরী লজ্জায় লাল হইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিল "না তা নয়—আজ গলাটী—"

দুই তিনজন সমস্বরে বলিল "তা বই কি? এই যে বেশ গিয়ে বসেছিলে, আর মিঃ রায় আসতেই—গলাটী—হয়ে গেল; না না গাও লক্ষ্মীটী—।"

মাধুরীর ভগিনীপতি একজন বলিল, "গেয়েই ফেল না—কি হয়েছে আর? অনিল যেনো আর তোমাকে গাইতে শোনেনি কখনো। বলো না হে অনিল, তোমার হুকুম না হলে গিন্নী গাইবেন না।"

অনিলও একটু বিব্রত হইয়া উঠিল, সে কি বলিবে, আর মাধুরী গান গাহিতে পারে একথা সে জানিত না, কখনো ভাবেও নাই। মনে ভাবিল, আসিয়া এই রকম বিপদে পড়িতে হইবে জানিলে সে কখনো আসিত না। মাধুরীর উপর তাহার একটু রাগও হইল—অত ঢংই বা কিসের? গাহিতে জানে তো গাহিয়া ফেলিলেই তো হয়। কিন্তু বাহিরে হাসিয়া সহজ ভাবেই বলিল—"আমার হুকুম

দেওয়া আছে—এখন আপনার হুকুমই যথেষ্ট।" সকলে অনিলকে ধরিল—"গাইতে বলুন না মিঃ রায়!" অবশেষে মাধুরী অনিলকে অব্যাহতি দিয়া গাহিল—"ওহে সুন্দর! মরি মরি, তোমায় কি দিয়ে বরণ করি" অনিল বেশ একটু বেশী করিয়াই অবাক হইল সেদিন। মাধুরীর স্বর অতি মিষ্ট; সুন্দর, প্রাণ মতানো। গান শেষে সে নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া গানের মোহ হইতে নিজেকে একটু জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইল। তারপরে মাধুরীর বন্ধু ভগিনীরা সকলেই গাহিল। কিন্তু সকলের সুর ছাপাইয়া অনিলের কানে শুধুই বাজিতে লাগিল—"তোমায় কি দিয়ে বরণ করি।" সকলে খাইতে উঠিয়া গেল। অনিল তখন প্রশস্ত বারান্দায় পায়চারী করিতেছিল একমনে। সে নিজের উপর বিরক্ত হইল, কেনো মাধুরীর স্বর তাহাকে পাইয়া বসিয়া এভাবে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে বার বার? সে আসিয়াছিল, না আসিলে ভাল হইত। এইভাবে সকলের সামনে সব দিক সামলাইয়া চলা অত্যন্ত কঠিন। তার পরে এইভাবে মাধুরীর সাহায্যে, মাধুরীর গান মাধুরীর হাসি মাধুরীর কথা কেমন করিয়া সে উপেক্ষা করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে? সে বুঝিতে পারিয়াছে যে সে দুর্ব্বল। মাধুরীকে এভাবে, এরূপে সে কখনো দেখে নাই। সে কেনো, কোন উদ্দেশে এ মোহময় জাল তাহার সামনে পাতিয়া দিল? সে কি খেলা করিবে তাহাকে লইয়া? কখনো অপমান করিয়া, কখনো তাহার অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্যের গরিমা দেখাইয়া, আবার কখনো হাসিয়া গাহিয়া সে কি তাহাকে কলের পুতুলের মত নাচাইয়া তুলিবে? অবশেষে সে কি বিজয়িনী—রাজ্ঞীর মত তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিয়া, তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া জয়ের হাসি হাসিবে তাহারি মুখের উপর? না না তাহা কখনো হইবে না। সে মনে মনে ভাবিল, আর সে এইরূপ ঘরোয়া মজলিসে কখনো যোগ দিবেনা, নিজেকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার নিজের অটল প্রতিজ্ঞা। ততক্ষণে সকলে খাইয়া আসিয়াছে। অনিল ভিতরে গিয়া মাধুরীর বন্ধু অলকার সহিত অনেকক্ষণ গল্প করিয়া মনটা হাল্কা করিয়া লইল।

একে একে সকলে বিদায় লইল। সকলে মিঃ রায় ও মাধুরীকে নিমন্ত্রণ করিল নিজেদের বাড়ীতে। বাসন্তী বলিল—"বিয়ের পর থেকে মাধুরীর টিকিটি দেখতে পাইনি—যাহোক তবু এতদিন পরে আমাদের কথা মনে করেছে সে।"

মাধুরীর বোন সুমতি বলিল—"সত্যি মাধুরী একেবারে চরম প্রেম দেখিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছিস। সকলে বিয়ে করে, কিন্তু এমন ক'রে আত্মীয়-বন্ধু ভুলতে দেখিনি কাউকে। যাক্ আবার ডুব মেরোনা দয়া করে।"

মাধুরী লজ্জায় সঙ্কোচে বেশী কিছু বলিতে পারিল না—সে বলিল—"তোমরাই বা কোন্ আমার খোঁজটী নিয়েছিলে?"

সুমতি বলিল—"হ্যাঁ—আমরা কি করতে তোমার খোঁজ নেবো? শুনি, তোমরা নাকি দুটীতে মাণিকজোড় হ'য়ে থাক রাতদিন—কি দরকার আমাদের উপর-পড়া হয়ে আসবার? যাক, পরশু এসো কিন্তু, অনিল, এসো ভাই তুমিও।" সকলের সঙ্গে অনিলও নীচে নামিয়া গিয়া সকলকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। সকলে অনিলকে উইস্ করিল—"Good night. Happy dreams."

পরদিন সকালে অনিল মাধুরীর কাছে একটী কাগজে লিখিয়া পাঠাইল—"আমি যেতে পারবো না কারো বাড়ী, ইচ্ছে হ'লে তুমি যেতে পারো।" মাধুরী তাহা পড়িয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল,—তারপরে টেলিফোনে সুমতিকে ডাকিয়া বলিল—"কাল যেতে পারবো না ভাই, আর একটী engagement আছে মনে ছিল না।" ইত্যাদি। সুমতি ঠাট্টা করিয়া বলিল—"আরে বাবা! ছেড়ে তো আসবে না, মাণিকজোড়েই তো আসবে"—কিন্তু মাধুরীর মুখে কোন উত্তর জোগাইল না, তাহার চোখদুটী তখন সজল হইয়া উঠিয়াছে। সুমতি ছাড়িবার পাত্রী নয় সে অনেক করিয়া বলিল—"দেখ, আমি আরো কয়েকজন বন্ধু বান্ধবকে বলেছি, তোমাদের meet করতেই এই পার্টি, না এলে কি হয়? ও engagement cancel ক'রে দাও। এমন ক'রে আমাকে অপদস্থ করো না।" অবশেষে মাধুরী বলিল "উনি তো মোটেই পারবেন না, তাহলে আমি একাই যাবো।"

পরদিন মাধুরী সাজিয়া-গুজিয়া সুমতির বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, সুমতি তাহাদের সম্মানার্থে খুব বড় আয়োজনই করিয়া ফেলিয়াছে। অনেকে অনিল আসিল না বলিয়া অনেক

অনুযোগ করিল। মাধুরী মুখে সকলকে "ওর engagement আছে আর এক খানে" বলিলেও মনে মনে গুমরিয়া মরিল। সেখানে তাহার দেখা হইল, মিঃ মিটারের সঙ্গে। মিঃ মিটার সন্ত বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার, খুব চট্‌পটে এবং কায়দা দুরস্ত। সে বলিল—"By jove, অনিল বিয়ে ক'রেছে। সেই জন্ত last দুই বছর সে একটীও চিঠি লেখেনি। আমরা বিলেতে great pa's ছিলুম, সে এলোনা কেন?" মাধুরী তাহাকেও সেই এক কথা বলিল। মিঃ মিটার বলিল—"আমি পরশু দিন Bombay থেকে এসেছি, অনিলের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি, ঠিকানা মনে ছিল না—Fortunately আপনার সঙ্গে এখানেই দেখা হয়ে গেল, ভালই হ'ল। আপনি বলবেন আমার কথা, আর বলবেন আমি কাল ওর আফিসে দেখা করবো—কি বললেন? Dalhousie? Right O!" মিঃ মিটার সেদিন মাধুরীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া বিদায় লইয়া পথে যাইতে যাইতে ভাবিল—"By jove! Anil is a lucky dog."

পরদিন মিহির মিটার অনিলকে তাহার অফিসে অতর্কিতে আক্রমণ করিল। অনিল আশ্চর্য্য হইলেও এতদিন পরে বন্ধুকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। দুই জনে অনর্গল কত বকিল, কত কথা, কত ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ। মিহির নাচিয়া লাফাইয়া চীৎকার করিয়া অনিলের অফিস তোলপাড় করিয়া তুলিল। অনিল বলিল—"এখনো সেই রকম tom boy আছ দেখছি।"

মিহির বলিল…" By jove! নিশ্চয়, তোমার মত old fellow হয়ে তো লোহার কলের চাকা ঘাড়ে করিনি। কিন্তু তুমি নাকি multimillionaire হয়েছ হে! By jove. lucky dog! জিতেছ সব দিকেই, তোমার pretty wifeকে কাল দেখলুম, তিনি বলেন নি তোমাকে আমার কথা?

অনিল বলিল—"না বলেনি তো, বোধ হয় ভুলে গেছে, কোথায় দেখলে তাকে?"

"(Mrs Ghose) মিসেস্ ঘোষের বাড়ীতে পার্টিতে।"

অনিল "তিনি গিয়েছিলেন নাকি?" জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া থামিয়া শুধু একটু ছোট "ও" বলিয়া চুপ করিল।

মিহির বলিল "By jove! অনিল, তুমি এমন cold হ'য়ে ব'সে থেকোনা! চল কোথাও গিয়ে চা খাওয়া যাক্…Firpo? অথবা Grand?" অনিলের ইচ্ছা হইল একবার সে নিজের বাড়ীর কথা বলে, কিন্তু বাড়ী তাহার কই? তাই সে শুধু বলিল—"আমি এইখানেই চা খাই।"

মিহির লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"By jove! এই dingy office room এ চা? অনিল তুমি একেবারে hopeless."

অনিল অগত্যা বলিল—"আচ্ছা, তাহ'লে চল, Firpoই ভালো।"

দুই বন্ধুতে চা খাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াইল। মিহির অনিলের কারখানা দেখিয়া বলিল—"By jove! অনিল তুমি এত কাণ্ড করেছ, আমার idea ছিল না।"

অনিল বলিল—"আমার করা নয় হে, সমস্তই বাবার। আর একটু বেড়াবে?"

মিহির বলিল—"না, রাত্রে একটি dinner আছে—কাল তোমার বাড়ীতে দেখা করবো।"

অনিল জিজ্ঞাসা করিল "কোন সময়—"

"Any time—৬টা?"

অনিল বলিল—"তা'লে একেবারে ৪টের সময় এসে চা খেয়ো।"

অনিল সোৎসাহে বলিল "By jove! splendid. charming Mrs. Roy as hostess. আচ্ছা with pleasure. তাঁকে জানিয়ে রেখো, আর আমার compliment দিও। আমাকে এইখানেই drop ক'রে দাও। That's all right, thanks.

পরদিন অনিলের অত্যন্ত ভাবনা হইল, মিহিরকে লইয়া কি করিবে সে? সে নিজে বলিয়াছে, তোমার বাড়ী যাবো. বারণ করিবে সে কি বলিয়া, ভদ্রতার খাতিরে চায়েতেও ডাকিতে হইল। মিহিরের সামনে মাধুরীর সঙ্গে কথা না বলা একেবারে বিসদৃশ হইয়া পড়িবে যে। তবু মিহিরকে নিজের বন্ধু বলিয়া মাধুরীর কাছে পরিচিত করিতে হইবে না এইটুকুই যা তাহার সান্ত্বনা—মিহির মাধুরীরও পরিচিত। অনিল ভাবিল, ঘটনাচক্রে কেন তাহাকে বার বার মাধুরীর সামনে নিয়া ফেলিতেছে। সে কি করিয়া এড়াইয়া চলিবে? সে স্থির করিল, এইবারে

কিছুদিনের জন্য একেবারে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। সে একটা কাগজে মিহিরের চা খাওয়ার কথা লিখিয়া মাধুরীর কাছে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু মাধুরী কোন উত্তরই দিল না। অনিল খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চিন্তিত মনে অফিসে চলিয়া গেল। সেখানে বসিয়া তাহার অনেকবার মনে হইয়াছিল, একবার টেলিফোনে মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিবে না কি চায়ের বন্দোবস্ত করিল কি না, কিন্তু সেদিনের ঘটনা মনে করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া লাঞ্চের একটু পরেই অনিল বাড়ী গিয়া চায়ের জন্য প্রস্তুত হইল। সে ভাবিল মাধুরী যদি চায়ের যোগাড় না করিয়া থাকে। তাহা হইলে কোন ওজর দেখাইয়া মিহিরকে লইয়া হোটেলে চলিয়া যাইবে। ঠিক ৫টার সময় মিহির দেখা দিল। "By jove! অনিল what a magnificent house. চমৎকার garden."

অনিল বলিল, "হ্যা বাগানের সখ বাবার খুব ছিল, আমি কিন্তু আর ওদিকে নজর দিতে পারিনি।"

মিহির চারিদিকে চোখ বুলাইয়া বলিল—"তাহলে Credit দিতে হবে Mrs. Roy কেই—কৈ হে—চা কৈ—? Mrs. Roy কই?

অনিল বলিল—"চল উপরে।"

সামনের প্রকাণ্ড বারান্দায় মাধুরী চায়ের আয়োজন করিয়াছিল পরিপাটিরূপে। দূর হইতে অভ্যাগতদের গলার স্বর শুনিয়া সে সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। একখানী গেরুয়া রংএর জর্জ্জিয়েট তাহার সুন্দর শরীর আদর করিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। সে মৃদু হাসিয়া মিহিরকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল, অনিলের দিকে ফিরিয়া দেখিল না।

চা খাইতে খাইতে মিহির ও মাধুরী খুব গল্প জমাইয়া তুলিল, কত আলোচনা, কত তর্ক। মিহির বলিল "By jove! অনিল you are a lucky dog, এমন intelligent wife"

অনিল মৃদু হাসিয়া বলিল। "thank you." মিহির কথা বলিতে বলিতে মাঝে অনিলকে বলিতেছিল "অনিল, তুমি এত চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন? Mrs. Roy কি তোমার সব voice down ক'রে দেন?"

অনিল অবাক হইয়া দেখিতেছিল মাধুরীকে। সেদিনের সে লজ্জা বিজড়িত ভাব কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সে অনিলকে উপেক্ষা করিয়া বেশ সহজ সরল ভাবে হাসিয়া কথা বলিতেছে। এও কি মাধুরীর আর একরূপ? তাহার মুখে সে কঠিন ভাব নাই, কোথাও দাম্ভিকতার চিহ্ন মাত্র নাই। এ যেন ঠিক রমণীসুলভ কোমল সৌন্দর্য্যে মণ্ডিতা নারী মূর্ত্তি, চঞ্চলা, আবেগময়ী। অনিলের হাতে সে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া দিল বেশ সহজ ভাবে, যেন প্রতিদিনই দেয়। কেক, মিষ্টি সব খাবারই এক এক করিয়া সামনে ধরিল। তাহার এক পেয়ালা চা শেষ হইলে, পেয়ালা লইয়া আর একবার তাহা ভরিয়া দিল। কোন একটু বিব্রত বা সঙ্কুচিত ভাব নাই। মাঝে মাঝে অনিলের দিকে চাহিয়া "মামলেট্ দেবো কি? "আরো চিনি চাই" জিজ্ঞাসাও করিতেছিল। তাহা অনিলকে এক অজানা সুখে ভরিয়া দিতেছিল সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিল না। মাধুরী কি মিহিরের কাছে তাহাদের অন্তরের দীনতা ঢাকিবার জন্য এ অভিনয় করিতেছে? সে মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিল। না হইলে সে অন্য রকম ব্যবহার করিলে মিহিরের কাছে সব ধরা পড়িয়া যাইত। চা খাওয়া শেষ হইলে মিহির বলিল "Mrs. Roy আপনার beautiful garden দেখে অমি charmed হয়ে গেছি। অনিল বলে সে এসব দেখে না, তার মানে আপনার fine taste এর উপরেই এর foundation."

মাধুরী বলিল—উনি সব সময়ে কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই আমাকেই দেখতে হয়। তা এমন আর কি? আশ্চর্য্য হবার কিছুই নয়। চলুন না দেখবেন, ২।৩ টে Summer houseও করেছি। কতগুলো rare ফুলও আছে। Gardening টা আমার খুব ভাল লাগে।"

মিহির লাফাইয়া উঠিল—"Splendid! চলুন বাগানেই যাই। কি হে অনিল তোমার idea কি?" অনিল কিছু বলিবার আগেই মাধুরী বলিল "কতগুলো fern আমি এতো চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারিনি, সেজন্য আমার ভারি দুঃখ হয়েছিল, চলুন মিঃ মিটার!"

মাধুরী আগাইয়া গেল, মিহির মাধুরীর সঙ্গে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দেখিল, অনিল বসিয়া সিগারেট টানিতেছে। সে বলিল—By jove অনিল! lazy ass get up."

অনিল বলিল—"তোমরা যাও হে, আমি একটু rest করে নি। তুমিই যাও বাগানে আমার বেশী interest নেই।"

অনিল বসিয়া বসিয়া ৪টী সিগারেট শেষ করিল। মাঝে মাঝে মিহিরের ও মাধুরীর উচ্চ হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল বাতাসের সঙ্গে। অনিল ভাবিল, মাধুরীর এও এক রূপ। এতো হাসি, এত কথা মাধুরী জানে তাহা অনিল স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে মাধুরীর মূর্ত্তি মানসে ভাবিয়া একবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল। সত্যই সে প্রশংসার যোগ্য। আজ কিন্তু তাহার নিজের উপর বিরক্তি আসিল না, তাহার মনে হইল, মাধুরী যদি তাহারও সহিত এভাবে হাসিয়া কথা বলিত তাহা হইলে? তাহা হইলে কি? অনিল চমকিয়া উঠিল। তাহা হইলে সে কি তাহার সঙ্কল্প ভঙ্গ করিয়া বসিত? না তাহা হয় না। মাধুরীর হাসি, কটাক্ষের বাণ অনিলের প্রতিজ্ঞার বর্ম্মে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে। আর কাহাকেও সে যদি বিঁধিতে পারে বিঁধুক—না অনিলের মন তাহাতেও সায় দিল না। মাধুরীর কটাক্ষের বাণ অন্যের গায়ে বিঁধিবে ইহা বড়ই বিসদৃশ হইয়া উঠিবে যে। আর যাহাই হউক, তাহার কাছে তাহার বংশের মান মর্য্যাদা সবই যে গচ্ছিত আছে, তাহা সে পায়ের ধূলায় লুটাইয়া দিবে ইহাই বা কেমন কথা? কিন্তু অনিল আবার নিজকে প্রশ্ন করিল। শুধু কি বংশ মর্য্যাদা। আর তাহার অন্তরের কোন আর কোথাও কি অন্য আপত্তি নাই? সিঁড়িতে তাহাদের স্বর শুনিয়া অনিল উঠিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্যের লাল আলো বারান্দার দেয়ালে আবির মাখাইয়া দিয়াছে, মাধুরীর মুখখানি ঘামিয়া ঈষৎ লাল হইয়াছে—তার উপর সে হাসিতেছিল মিহিরের দিকে চাহিয়া। অনিল মুখ ফিরাইয়া লইল। মিহির অনিলের কাছে আসিয়া বলিল—"By jove, অনিল Gardening সম্বন্ধে আমার great idea হয়ে গেছে। Botany তে Mrs. Roy একেবারে perfect."

মাধুরী হাসিয়া বলিল—"অতটা compliment দেবেন না মিঃ মিটার! আমি spoilt হ'য়ে যাবো।"

মাধুরী আর মিহির অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যা মিলাইয়া আকাশে তারা জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা বলিতেছিল—সাহিত্য, সঙ্গীত, বাজনা, বেটোভেন, সোঁপে—। মাঝে মাঝে গম্ভীর প্রকৃতি অনিল নিজের চিন্তাস্রোতে ডুবিয়া তাহাদের কথার খেই হারাইয়া ফেলিতেছিল। খানিক পরে মিহির বলিল—"রাত্রে আপনাদের কারো engagement নেই বোধ হয়?"

মাধুরী বলিল—"না—"

মিহির বলিল—"তাহলে আমার সঙ্গে Dinner এ এসো না অনিল! তুমি আর মিসেস রায়—।"

মিহির মাধুরীর দিকে চাহিল। মাধুরী বলিল—"আমার আপত্তি নেই।"

অনিল একটু ইতস্ততঃ করিল। মিহির বলিল—"অনিল! Don't be silly বলো হ্যাঁ—।"

সত্যি কথা বলিতে অনিলের এই ভাবে উপেক্ষিত হইয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। সেই জন্য তাহার ডিনারে যাইবারও ইচ্ছা হইল না, অথচ বাগান দেখার মত মিহিরের সঙ্গে মাধুরীকে একলা যাইতেও বলিতে পারে না। অত্যন্ত শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হয়। মাধুরীর উপর একটু রাগ হইল, সে কিনা চট্ করিয়া সম্মতি দিয়া ফেলিল। তবে তাহারি বা কিসের ত্রুটি, অনিলের সঙ্গে তো তাহার কোন সম্পর্ক নাই। অনিল অনিচ্ছা স্বত্বেও বলিল—"আচ্ছা।" মিহির খুসী হইয়া বলিল—"That's like a good boy. তাহলে I run for a change, তোমারাও dress ক'রে নাও, আমি এখুনি আসছি।"

মিহির Au revoir বলিয়া টুপী লইয়া, শিশ দিতে দিতে এক রকম দৌড়িয়া চলিয়া গেল। অনিলও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল।

ডিনারের পর মিহিরকে বাড়ীতে নামাইয়া মাধুরী আর অনিল তাহাদের প্রকাণ্ড "ক্যাডিলাকে" বাড়ী ফিরিতেছিল। মিহির নামিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—সে পরিশ্রান্ত ভাবে গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া বসিয়াছিল। তাহার উষ্ণ নিশ্বাস, তাহার অঙ্গ নিঃসৃত তীব্র সেণ্টের গন্ধ, গাড়ীর ফুলদানীতে সাজানো ফুলের সৌরভের সঙ্গে মিশিয়া অনিলের স্যাম্পেনের নেশাকে আরো রঙিন করিয়া তুলিল। হাওয়ায় উড়িয়া মাধুরীর সাড়ীর একপ্রান্ত অনিলের হাতে লাগিল। মাধুরী তাহা জানিতে পারিল না, সেই জন্য সে তাহ

টানিয়াও নিল না। অনিলের ইচ্ছা হইল, কথা বলে—সে বলিল—"মিহির খুব jolly না? তোমার কেমন লাগলো?" মাধুরী খানিক পরে শুষ্ক স্বরে শুধু উত্তর দিল—"বেশ।"

অনিল একটু মর্ম্মাহত হইল। মাধুরীর হাসি, কথা তাহার জন্য নহে। পৃথিবীর আর সকলের জন্য তাহা ঝরিয়া পড়িতে পারে—কিন্তু তাহার জন্য নহে। তাহার মনে একটু অভিমান হইল কি? সে একটু সরিয়া বসিয়া নিঃশব্দে সিগারেট্ টানিতে লাগিল। আর একটা কথাও তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না।

মিহির তারপর হইতে প্রায় আসিত। সবদিন সে অনিলের দেখা পাইত না, মাধুরীর সঙ্গে দেখা করিয়াই চলিয়া যাইত। অনিল যখন জানিতে পারিল, মিহির প্রায় তাহার বাড়ীতে আসে; তখন সেও তাহার চিরনিয়ম ভঙ্গ করিয়া অফিসে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত না কাটাইয়া সকাল সকাল বাড়ী ফিরিতে লাগিল। কারণ তাহার ভয় হইল পাছে মিহির তাহাদের অন্তরের খবর জানিয়া ফেলে। অনিল ক্রমে বাড়ীতে ডিনারেরও ব্যবস্থা করিল। কিন্তু মিহির চালাক, সে অতি অল্প দিনেই বুঝিতে পারিল, যে মাধুরীর সহিত অনিলের কিসের একটা মনোমালিন্য আছে। যাহা স্বামী স্ত্রীর ভিতর থাকা স্বাভাবিক নয়। সেটা কি বা কেনো তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সঙ্কোচ করিয়া সে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারিল না, শুধু তাহার দুঃখ হইল মাধুরীর জন্য। এমন সুন্দরী স্ত্রী, শুধু রূপে নয়, অন্তরে বাহিরে সে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী, সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যশালিনী, তাহাকে কিনা অনিল চিনিল না, এমন রত্ন সে হেলায় ফেলিয়া রাখিয়াছে! মিহির ভাবিল, "By jove! Anil is an unlucky dog. কিন্তু কেনো? অথচ অনিলের আর কারো প্রতি আকর্ষণ নাই। মাধুরীর তো নাই-ই বরং তাহার কথায়-বার্ত্তায় মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন একটা হতাশা মিশ্রিত দুঃখের আভাস পাওয়া যায় ও তাহা যে অনিলকেই উপলক্ষ করিয়া তাহা বেশ বুঝা যায়, তবে কি এ রহস্য?—মিহির আবার ভাবিল—"By jove!"

মিহির ক্রমে খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মাধুরী মিহিরকে লইয়া অনেকটা শান্তি পাইল। তাহার সঙ্গে সে আলোচনা করিত, গল্প করিত এবং তাহাকে সে স্নেহ, প্রীতি অন্তরের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব দান করিয়া তাহার উপর অনেকখানি আত্মনির্ভর করিয়া বসিল। মিহির দুইদিন না আসিলে সে টেলিফোনে ডাকিত। মিহির মাধুরীকে ঠিক সেই চক্ষেই দেখিল। যাহাতে মাধুরীর স্নেহ বিশ্বাসের ও অনিলের বন্ধুত্বের মর্য্যাদা পুরামাত্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। আর অনিল—! অনিল ভাবিল, কোথা হইতে ঘটনাচক্র কোন দিকে ফিরিয়া গেল সে নিজেই এখন বুঝিতে পারিতেছে না। মাধুরীর মিহিরের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহার উচ্ছ্বাস, আনন্দ, মিহিরের জন্য উৎসুক প্রতীক্ষা কিছুই তাহার চক্ষু এড়াইয়া যায় না, সে সবই তাহার দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, মনকে ব্যথিত করিয়া তুলে, কিন্তু কেন? সে তো মাধুরীকে বলিয়াই দিয়াছিল, "তোমার আনন্দ উৎসবের যেন আমি কোন বাধা না হই।" তাই তো করিয়াছে সে। সে তো তাহাকে বাদ দিয়াই তাহার আনন্দ উৎসবের বাসর সাজাইয়াছে, তাহারি নিজ হাতে তুলিয়া দেওয়া প্রাচীরের অন্তরালে সে তো সুখের ঘর বাঁধিয়াছে। তবে অনিলের তাহাতে কি? নিজ হাতে গড়া প্রাচীর সে কি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়? অনিলের চির স্থির চিত্ত—যে চিত্ত তাহার পথের ভিখারী হওয়ার সম্ভাবনায়ও বিচলিত হয় নাই, যে চিত্ত তাহার সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে গিয়া যাহাকে উপেক্ষা করিয়াছিল, আজ সেই উপেক্ষিতার জন্যই তাহার সে চিত্ত বিচলিত হইয়া, সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইতে চায় কি? যে টাকার জন্য, কাজের জন্য অনিল মাধুরীকে ভুলিয়াছিল, সেই মাধুরীর জন্য সে আজ টাকা আর কাজ ভুলিতে চলিল। এ কি বিড়ম্বনা! কিন্তু এখন তো আর ভুলিয়া লাভ নাই। লোহার কল শতগুণ ভারি হইয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে তাহার চারিদিকে, আর তো অনিল শত চেষ্টায়ও তাহা একচুল সরাইতে পারিবে না। তাহার এ কি হইল? তার উপর মাধুরীর সহিত মিহিরের জন্য তাহারও ঘনিষ্ঠ মিলামিশা যাহা সে এতদিন এড়াইয়া চলিয়াছিল তাহাই তাহার নিত্য কাজ হইয়া উঠিল। অনিল সেদিন আফিসে বসিয়া ইহাই ভাবিতে ভাবিতে, কতগুলা কাগজ সজোরে টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ভাবিল অন্য কোন দেশে চলিয়া যায়, না তাহাতেও শান্তি কই! মাধুরী তো তাহার হাসি,

তাহার সঙ্গ মিহিরকে দিতে বিরত হইবে না। কি কুক্ষণে মাধুরীর সহিত মিহিরের দেখা হইয়াছিল! সেদিন কেনো সে তাহার সহিত সুমতির বাড়ী গেল না—কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি হইত? অনিল হতাশ হইয়া মোটর ডাকিল।

সে যখন বাড়ী আসিল তখত বেলা ৫টা। বাহিরে দেখিল মিহিরের "টু সিটার শেওরলে" দাঁড়াইয়া আছে। সে মনে মনে ভাবিল "মিহির Vagabond টার আর কি অন্য কাজ নেই?" সে আর সেদিন উপরে গেল না। কাপড় ছাড়িয়া নীচেই ইজিচেয়ারে একখানি বই লইয়া বসিল। মাধুরী আর মিহিরের উপর তাহার অভিমান হইয়াছিল কি? খানিকক্ষণ পরেই মিহির তাহাকে পাকড়াও করিল, "Hallo old chap! By jove! তুমি আমার উপর jealous হয়েছ না কি?" অনিল মুখে শুষ্ক হাসিয়া বলিল "Don't be a fool. jealous হব কেন?"

"তবে এখানে ব'সে আছ কেন? চল উপরে, মিসেস রয় কি মনে করবেন?"

অনিল জানিত মিসেস রয় কিছুই মনে করিবেনা। সে বলিল "না হে ব'সে বইটা পড়ছি।" মিহির অনিলের হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া—বলিল, "Hang it—তোমার বই, চল!" অনিল আর বেশী কিছু আপত্তি না করিয়া মিহিরের সঙ্গে উপরে চলিয়া গেল। মাধুরী অধীর প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল মিহিরের জন্য। অনিল দেখিল তাহার সারা মুখখানি মিহিরকে দেখিয়া আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না। মিহিরের দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল—"মিঃ মিটার আপনি বড় চঞ্চল, একখানে স্থির হয়ে বসতে পারেন না।"

মিহির বলিল—"মিসেস রয়, ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি এই দেখুন,—কার জন্য—By jove"—বলিয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই অনিলকে টানিয়া একটু কাছে আনিল। মাধুরী বেশ সপ্রতিভভাবে অনিলের দিকে একটু চাহিয়া বলিল "ওঃ" তারপরে মিহিরের দিকে ফিরিয়া বলিল—"চলুন আজ Cinema যাওয়া যাক্—ভালো film কোথায় আছে?"

মিহির ঘড়ি দেখিয়া বলিল—"Globeএ Lady of the Pavement হচ্ছে! Grand! চলুন, বেশী কিন্তু সময় নেই· we can just be in time—তাহলে run along and dress." মাধুরীর যেন শ্বাস কত কাময়া গিয়াছে, সে এক রকম দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। অনিলের অন্তর তখন জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে বলিল—"মিহির! আমি যাবো না।"

মিহির আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"By jove! কেন? অনিল you are an unlucky dog—কেনো যাবে না?"

অনিল বলিল—"ভাল লাগছে না"

মিহির তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল "Old boy! don' be sentimental" অনিল দাঁড়াইয়া একগুচ্ছ বড় বড় সুন্দর গোলাপ ভরা ফুলদানীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিল সে অন্যমনস্ক ভাবে ডাঁটা শুদ্ধ একটী গোলাপ হাতে লইয়া, পাঁপড়ী ২।১টী ছিঁড়িয়া, মাটীতে ফেলিয়া দিল—তাহার সমস্ত মুখখানি কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—"না মিহির Sentimet আমার কিছু নেই—।" মিহির একটী কোচের হাতের উপর বসিয়া অনিলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য সমবেদনায় কোমল হইয়া আসিল—সে কি বলিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব চাপিয়া উঠিয়া অনিলের হাত হইতে পড়িয়া যাওয়া গোলাপ কয়টি ফুলদানীতে রাখিতে রাখিতে বলিল—"By jove অনিল Mrs. Ray এর এমন fascinating Company miss করতে চাও? মিহির যেনো অনেক কিছু গোপন করিতে গিয়া সজোরে হাসিয়া উঠিল। আবার fascinating, charming, মিহিরের মুখে মিসেস রায় সর্ব্বদা লাগিয়া আছে। অনিলের এবারে রাগ হইল নিজের উপর, মিহিরের উপর। কেন তাহারা তাহাকে লইয়া এ খেলা খেলিতেছে—? সেই বা কেন নিজেকে এমন করিয়া নির্দ্দয় ভাবে বাঁধিল, যে বাঁধন এখন কঠিন হইয়া তাহার মর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিতে চায়? মাধুরীরও মিহিরকে, এড়াইয়া চলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব, অথচ এই সঙ্গেই যে তাহার অন্তর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছারখার করিয়া দিতেছে। অনিল একটা কঠিন উত্তর দিতে গিয়া থামিয়া গেল, সে নিজেকে সংবরণ করিয়া ভাবিল "ছি, ছি, মিহিরের সামনে এতখানি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়া অন্যায় হ'য়ে গেছে—"। সে একটী সিগারেট ধরাইয়া বেশ নিজেকে সহজ করিয়া বলিল—"মাথাটা বড় ধরেছে, তাছাড়া Cinema আমার ভাল লাগেনা—still বলছ যখন তখন চল।"

একটু পরেই মাধুরী সুন্দর ভাবে সাজিয়া বাহির হইল, আবার সে চাহনি, সে হাসি মিহিরের উদ্দেশে। অনিলের ইচ্ছা হইল, জোর করিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি তাহার নিজের উপর ফিরাইয়া দেয়। জোর করিয়া তাহার মুখের হাসি কাড়িয়া লয়। কেনো করিবে না সে? আর যাহাই হউক, মাধুরী তাহার, তাহার। সিনেমায় বক্সে মিহির আর মাধুরী সামনে বসিল, অনিল বসিল পিছনে। তাহাদের অবিরাম হাসি গল্প দেখিয়া দেখিয়া অনিলের সমস্ত দেহ মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

একদিন বিকালে চায়ের পর পাশাপাশি পায়চারী করিতে করিতে মিহির মাধুরীকে বলিল—"মিসেস রায়! কোন রকমে অনিল rascal টাকে আপনার পায়ের উপর এনে ফেলে দিতে পারি—unlucky dog. By jove. আমি যদি বিলেতে Fannyকে ভাল না বাসতুম, তাহলে নিশ্চয় এতদিনে আপনাকেই ভালবেসে ফেলতুম। কিন্তু অনিল—! সত্যি—I am—well I never—" মিহিরের রাগ, দুঃখ অথবা বেশী আনন্দ হইলে কথা অসমাপ্ত রহিয়া যাইত। মাধুরী করুণ চোখে পাশে একটী মার্শেল নীলের ঝোপের দিকে চাহিয়া চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"পারবেন না মিঃ মিটার! তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন, তাঁর অটুট সঙ্কল্প—।" মিহির অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—"Hang—I beg your pardon, ওসব trash বাজে কথা অনিল শিখলো কোথা থেকে—By jove, fool টিকে shoot করতে ইচ্ছে করে। What a shame! well——"

মিহির রাগিয়া কতগুলা দুর্ব্বোধ্য কথা বলিয়া গেল। মাধুরী হাসিয়া উঠিল, তারপরে শান্তস্বরে বলিল—"মিঃ মিটার! আপনি যাই করুন, কিন্তু দেখবেন ওঁর কাছে আমার জন্য কোন রকম ওকালতি বা আপিল কখনো করবেন না—। এতে আমার অমর্য্যাদা করা হবে। আর এই করে যদি আপনি আমাকে স্বামীর ভালবাসা দান দিতে চান, তবে সে দান আমি ফিরিয়ে দেব,—আপনি নিজেই অপ্রস্তুত হবেন শেষে।"

মিহির মাধুরীর দিকে চাহিয়া বলিল…"By jove! আপনারা দুজনেই সমান! ভয় নেই আমি আপনাকে অতটা humiliationএ টেনে আনবোনা—কিন্তু mark করছেন আজকাল, অনিল কি রকম jealous হ'য়ে উঠেছে। ওর indifference ভাব গেছে, ও এখন regular jealous husband হয়েছে। He must come round"

মাধুরী বলিল—"না উনি jealous নন। কারণ তিনি আমাকে বহুদিন আগেই সব বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছেন।"

"মিসেস রায়! আমি বলছি আপনাকে সে জন্য সে রীতিমত repent করছে—যদিও দুঃখে কিছু বলেনা কিন্তু আমি খুব বুঝতে পারি, ওকে বিলেতে আমি অনেক দেখেছি। আর আপনি কি বুঝতে পারেন না সে অনিলে আর এ অনিলে vast difference—হ'য়ে গেছে? আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি।"

মাধুরী একটী ছোট টি রোজের কুঁড়ি তুলিয়া মিহিরের কোটে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল "মিঃ মিটার! এতটা আশা করতে ভয় হয় পাছে ভেঙ্গে যায়—" তাহার স্বর কাঁপিল, হাত কাঁপিল।

অনিল তাহার নীচের বসিবার ঘরের জানালা হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল—সে বেগে জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া টেবিলের উপর সজোরে একটী ঘুসি মারিয়া বলিল, "উঃ অসম্ভব!" ঘণ্টা খানিক পরে অনিল আবার জানালা পানে চাহিয়া দেখিল একটী বড় গাছের নীচে কাঠের বেঞ্চে বসিয়া মাধুরী ও মিহির। সন্ধ্যা হয় হয় তবু সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মিহিরের মুখে আপন-ভোলা ভাব। সে এক মনে কত কথা কহিয়া যাইতেছে, আর মাধুরী স্থির দৃষ্টিতে আবেশমাখা চোখে চাহিয়া আছে মিহিরের মুখের দিকে। অনিল সহ্য করিতে পারিলনা—।

আর মিহির তখন তাহার বিদেশিনী প্রিয়ার প্রেমের কাহিনী বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া বলিতেছিল—"By jove! মিসেস রায়! ওদেশের মেয়েরা ভালবাসতে জানে, atleast আমার Fanny জানতো। একটী স্বপ্ন একটী স্বর্গ সুখ তখন আমাকে ঘিরে রেখেছিল, আমি জানি, আমি জানি কতখানি ভালবাসা সে আমাকে দিয়েছিল। আর আমিও—আমি তাকে পূজা করতুম—simply worship—adore—

"মাধুরী স্নিগ্ধ স্বরে বলিল,—"ছেড়ে এলেন কেনো?"

মিহির উচ্ছ্বাস ভরে বলিল—"কেন ছেড়ে এলাম, By jove! মিসেস রায়!—মৃত্যু—যদি cruel death

Photo Competition.

পুষ্পপাত্র ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা ৩নং

মা

১ম পুরস্কার— ১০

শ্রী[illegible] ঘোষ, কলিকাতা

Photo Competition.— –

পুষ্পপাত্র ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা ৩নং

"মুখ স্মৃতি তন্ময়"

২য় পুরস্কার ৫৲

শ্রী ডি, এন, সাহা
পাবনা,

এসে আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে না নিত, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি এক হলেও যে আমার Fanny কে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারতোনা— "By jove! Fanny! sweet old girl!—" মিহিরের স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কখন মাধুরী মিহিরের বেদনায় গলিয়া গিয়া, তাহার একখানি হাত আদরে স্নেহভরে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহা সে নিজে বুঝিতে পারে নাই। মিহির একটু পরে আবার বলিল —"আপনার সঙ্গে কথা বললে আমি Fannyর শোক ভুলে যাই, সেইজন্য এখানে আসি, আর সেইজন্যই আমি আপনাকে এত শ্রদ্ধা করি—"

মাধুরী কোমল স্বরে বলিল—"মিঃ মিটার! আমিও আপনাকে সঙ্গী পেয়ে আমার জীবনের চরম দুঃখ ভুলতে পেরেছি, আপনার বন্ধুত্ব আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান— !"

তখন আকাশে মেঘের আড়ালে চাঁদ লুকোচুরী খেলা পাতিয়াছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না রাশি ফুলের গায়ে, ঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে, তাহারই একটুখানি মাধুরী ও মিহিরের গায়ে আবেশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মাধুরী আর মিহির তখনো সেখানে বসিয়া।

অনিল অনাবশ্যক অধীর প্রতীক্ষা করিতেছিল—উঃ! এখনো—এখনো তাহারা ঐখানে বসিয়া? অনিল জ্ঞান হারাইল। না, না সে তাহার স্ত্রীর সর্ব্বস্ব এভাবে আর একজনার কাছে বিলাইয়া দিতে দিবে না, এ সমস্ত তাহারি প্রাপ্য। মাধুরী তাহার—মাধুরী অনিলের। মিথ্যা—মিথ্যা প্রতিজ্ঞা সব যাক্—প্রাণের বিরুদ্ধে যুঝিয়া পারা যায় না—তাহার সর্ব্বস্ব এখন মাধুরী, সে আর কিছুই চায় না। অনিল ড্রইং রুমের সেল্‌ফ হইতে একটা বোতল লইয়া খানিকটা "র" ব্রাণ্ডি খাইয়া সেইখানে হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল—কিন্তু বাহিরে মাধুরী আর মিহির! অনিলের সমস্ত দেহে মনে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল। মিহির যাহা ভাবে ভাবুক, মাধুরী যাহা ভাবে ভাবুক, কিন্তু সে আজ মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে, আর একবার শেষবার সে বোঝা-পড়া করিয়া লইবে। অনিল বাগানে নামিল। পিছন হইতে নিঃশব্দে সে কাছে গিয়া দেখিল মিহির নাই, মাধুরী একাই বসিয়া আছে। অনিল বলিল—"মিহির এখানে ছিল না?" বেশ সহজ ভাবে মাধুরী বলিল—"হ্যাঁ, তিনি একটু ভিতরে গেছেন - আমিও যাই"—মাধুরী উঠিল—অনিল হঠাৎ সজোরে মাধুরীর হাত চাপিয়া ধরিয়া ভগ্নস্বরে বলিল—"না—না—তুমিও যাবে না" মাধুরী আশ্চর্য্য হইল, শিহরিয়া উঠিল। অনিল আবার বলিল—"মাধুরী—তুমি, তুমি আমার! ও ভাবে তোমাকে আমি আর এক জনার হ'তে দিতে পারবো না বুঝলে? তুমি মিহিরের নও তুমি আমার!"

মাধুরী মৃদুস্বরে বলিল—"মিহির আমার বন্ধু—আমার আর কিছু না—"

অনিল তাহাকে আরো কাছে টানিয়া বলিল—"তা হোক। মিহির মরুক, কিন্তু তুমি মাধুরী আমাকে তোমার স্বামী ব'লে গ্রহণ কর"

মাধুরী—"আমি তো তা কখোনো অস্বীকার করিনি—প্রতিজ্ঞাও তো আমি করিনি"

অনিল তাহাকে দুই বাহুর ভিতর আনিয়া বলিল, "আমি তোমাকে ভালবেসেছি মাধুরী? প্রতিজ্ঞা ভেঙে যাক্—কল কারখানা ভেঙে যাক্—সর্ব্বস্বের বিনিময়ে তুমি .. তুমি—আমি আর সইতে পারছি না।"

মাধুরী নিমেষের জন্য কাঁপিয়া উঠিয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল "আমিও সইতে পারছি না—"

অনিল আনন্দে অধীর হইয়া বলিল—"সত্যি—? "সত্যি—?"

অনিলের মুখ নত হইয়া আসিল।

একটু পরে উচ্চে হাসির শব্দে দুই জনেই ফিরিয়া দেখিল—মিহির বলিতেছে -

"By jove! you rogue! অনিল! Three cheers for you lucky dog."

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা"

শ্রীঅমলা দেবী

গল্প

—"আঃ, কি বিরক্ত করছ সবাই মিলে। রাত যে প্রায় বারোটা বাজল খেতে দেবে না?"

মনোরঞ্জন কৃত্রিম বিরক্ত সুরে বল্লে।

বেশ বড় ঘরখানি, পাশের দিকে খাটের সুশুভ্র শয্যার ওপর ফুল ছড়ান, মশারীর চারিদিকে ফুলের মালা ঝুলছে। ঘরের মেঝেতে বৌদিদিরা সব মনোরঞ্জন এবং নব বধূ মৃণালকে ঘিরে বসে আছেন। ভগ্নী সম্পর্কীয়ারা একটু দূরে বসে দেখছেন।

মনোরঞ্জনের কথার উত্তরে বড় বৌ বল্লেন—"একটু তরস্থ হ রাঙ্গা বৌ, আজকের দিনে ফুলঠাকুরপোর মন বলছে—গাছের গোড়ায় সন্ধ্যে জ্বলল। আর তুই তত দেরী করছিস।"

রাঙ্গাবৌ তার শ্যাম বর্ণ মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল করে বল্লে—

"দেখনা বড়দি। ফুল বৌ কখন হাতের সুতো খুলে দিয়েছে, আর ফুলঠাকুরপো এখন খুলে দিলে না; কেবল বলছে ছিঁড়ে দিই।" ওপাশে ন বৌ তাঁর বিশাল বপু নিয়ে বসে বসে দেখছিলেন, এবার তিনি একটু এগিয়ে এসে বল্লেন—"না, না, ও সুতো ছিঁড়লে চিরকাল ঝগড়া হয়। আস্তে আস্তে খুলে দাও না ফুলঠাকুরপো।"

—"দাও কি খুলতে হ'বে, যত সব—।"

মনোরঞ্জন নববধূ মৃণালের হাতখানা ধরে সুতোটা খুলে দিলে। তারপর মালা বদল করতে হ'বে—মেজবৌ মালা দুছড়া দুজনের হাতে দিয়ে মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বল্লে—"দাও বৌয়ের গলায়।"

মনোরঞ্জন দেয়ালের দিকে চোখটা রেখেই উত্তর দিলে—"মালাত সেদিন বদল করে এসেছি, রোজ মালা বদল করতে হ'বে নাকি?"

—"হ্যাঁ গো আজ ফুলশয্যের দিনও একবার করতে হয়; তারপর আর আমরা কেউ বলবো না, তখন নিজেই মালা এনে বৌয়ের গলায় দেবে।" বড়বৌ বল্লে।

মালা বদল শেষ হ'লে বড়বৌ এগিয়ে এলেন খাবারের থালা হাতে করে, থালাখানা দেবরের সম্মুখে রেখে বল্লেন—"আগে মিষ্টি মুখে দাও।" মনোরঞ্জন একটা মিষ্টি তুলে মুখে দিল সেজবৌ ওদিক থেকে তাড়া দিয়ে উঠল—

"সবটা খেয়ে ফেল না, দাও ফুলবৌর মুখে।"

—"আঃ কি যন্ত্রণা; কেন, ইনি কি নিজে খেতেও পারেন না, এতই শিশু।"

মনোরঞ্জন বলতে বলতে মিষ্টিটা মৃণালের মুখের কাছে ধরে বল্লে—"তোমাদের কথা না শুনলে ত তোমরা ছাড়বে না তখন প্রতিবাদ না করে শোনাই ভাল; কিন্তু তোমাদের বৌকে বলে দিও যেন কামড়ে না দেন আঙুল কটা।"

ঘরের একপাশে বসে ন বৌ কনের বাপের বাড়ীর দেওয়া সমস্ত জিনিষের সমালোচনা করছিলেন—"তা মন্দ হয়নি কিন্তু ঐ কাপড়খানা বড্ড খেলো ধরণের দিয়েছে; আর ফুলশয্যের জলখাবার সাজিয়ে দিতে হয় সেটাও জানে না; মা না হয় নেই কিন্তু খুড়ি জ্যেঠি সব আছে ত? তারাও কি জানে না, অবিশ্যি হ্যাঁ আমাদের বাড়ীর মত বনেদী বংশ আর একান্নবর্ত্তী পরিবার ত সব বাড়ীতে নয়, কে কার বল না।"

ওপাশ থেকে মনোরঞ্জনের খুড়তুত বোন ন বৌর আপনার ননদ যোগমায়া ফোঁস করে উঠলেন—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আর বেশী বাক্যে বোক না, আমাদের ভাগ্যই ঐরকম, বাবারা তিন ভাইর এই এতগুলি ছেলে মেয়ে তা মেয়েদের বিয়ের সময় যত পেরেছেন দিয়েছেন কিন্তু ছেলেদের বিয়েতে কিছু পাননি, শুধু পেয়েছিলেন জ্যাঠামশায় বড়দার বিয়েতে, বড়বৌদির বাপ দিয়েছিলেন বটে দেখবার মত। তাছাড়া আর কেউ দেননি কিছু, শুধু এই ফুলবৌর বাপ যা দিয়েছেন, আর কেউ দেননি।"

অপ্রিয় কথা! নবৌর পৈত্রিক অবস্থা ভাল নয়, বিয়ের সময় বেশী কিছু তিনি দেন নি অতএব আর কথা না কওয়াই সঙ্গত মনে করে তিনি চুপ করে গেলেন।

এবার বড় বৌ উঠে দাঁড়ালেন—"কি আজকের দিনে কথা কাটাকাটি করছিস ভাই মেজ ঠাকুরঝি! নে ওঠ

অনেক রাত হ'ল ; রাঙা বৌ ফুলবৌকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে চল আমরা যাই।"

একে একে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। নববধূ মৃণাল দেখতে সুন্দরী, বয়স চৌদ্দ পনের হ'বে ; শৈশব ওর বিদায় চাইছে, যৌবন দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বামী নামের বাঁশীটী ওর কানে এসেছে—কিন্তু এখনও চেনা হয় নি।

শয্যার ওপর মৃণাল চুপ করে বসে ছিল, মনোরঞ্জন এসে দাঁড়াল—"মুখখানা অত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের মত কেন ?"

মৃণালের অবগুণ্ঠনটা সরিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

অপ্রস্তুত মৃণাল গুণ্ঠনটা আরো একটু বাড়িয়ে খাটের ওপাশে গিয়ে বসল।

সমস্ত রাত্রি মান, অভিমান, প্রেম ভালবাসা পূর্ণ বহু প্রশ্নের ঝটিকাঘাতেও মনোরঞ্জন মৃণালের মুখ হ'তে একটিও উত্তর পেল না।

হতাশ হ'য়ে সে শুয়ে পড়ল।

ভোর হ'য়ে আসছে, মৃণাল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ; মনোরঞ্জন তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"উঠছ ?"

মৃণাল ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল সে উঠছে।

মনোরঞ্জন উঠে বসে তার হাত দু'খানা ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে, তার কাঁধের ওপর রেখে বল্লে—

"ওগো মৌন না যদি কও নাই কইলে কথা
বক্ষ ভরি বইব আমি তোমার নীরবতা
স্তব্ধ হয়ে রইব পড়ে
রজনী রয় যেমন করে
জ্বালিয়ে তারা নিমেষ হারা ধৈর্য্যে অবনতা
হ'বে হ'বে প্রভাত হ'বে আঁধার যাবে কেটে
তোমার বাণী সোনার ধারায় পড়বে আকাশ ফেটে
তখন আমার পাখীর বাসায়
জাগবে কি গান তোমার ভাষায়
তোমার তানে ফোটাবে ফুল আমার বনলতা।"

আবৃত্তি শেষে সে মৃণালকে ছেড়ে দিল। মৃণাল অবগুণ্ঠনটা একটু বেশী করে টেনে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

(২)

কর্ত্তারা তিন ভাই ছিলেন—বড় বিজয়চন্দ্রের তিন ছেলে ; নিখিলরঞ্জন, প্রিয়রঞ্জন, সতীশরঞ্জন—মেজ মহেশচন্দ্রের ; মনোরঞ্জন, নিরঞ্জন ছোট ভবেশচন্দ্রের দুই ছেলে ; সুধীরঞ্জন, বিশ্বরঞ্জন ; তিন মেয়ে যোগমায়া, মহামায়া, সুবর্ণলতা। একান্নবর্ত্তী পরিবার, কর্ত্তাদের মধ্যে দুজন গত হয়েছেন শুধু মহেশচন্দ্র জীবিত। গৃহিণীদের মধ্যে বড় নেই অন্য দুজন বর্ত্তমান।

রান্নাঘরে বসে কনিষ্ঠা গৃহিণী কুটনো কুটছিলেন ; বড় বৌ উনানের কাছে বসে ঠাকুরকে রান্না বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। রাঙা বৌ রান্নাঘরের সম্মুখের বারান্দায় বসে পান সাজছিল, ফুল বৌ মৃণাল বড়বৌর খোকাকে কোলে নিয়ে রাঙাবৌর কাছে বসে গল্প করছিল তার বাপের বাড়ীর ; কবে তার ছোড়দি কি সুন্দর একটা কুশনে এমব্রয়ডারী করেছিল যা দেখে তার বাপের বাড়ীর দেশের সমস্ত লোক প্রশংসায় আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিয়েছিল।

রাঙাবৌ বল্লে—"তোর ছোড়দির হাতের সেলাই বুঝি খুব পরিষ্কার ?"

মৃণাল ঘাড় নেড়ে বল্লে—"হ্যাঁ।"

আরও একটা কি বলতে যাচ্ছিল মনোরঞ্জন এসে দাঁড়াল—"রাঙাবৌদি দুটো পান দাও।"

রাঙাবৌর হাত থেকে পান নিতে নিতে সে জিজ্ঞেস করল—"তোমাদের কি গল্প হ'চ্ছিল ? ভূতের।"

রাঙাবৌ তার শ্যামবর্ণ মুখখানা উজ্জ্বল হাসির ছটায় ভরিয়ে বল্লে—"হ্যাগো মশাই, আমরা ত সারাদিন ভূতের গল্পই করি, আর কোন কথা ত আমাদের নেই, না। একটু রাত্তিরে ভয় পাই বলে বিদ্রূপ হ'চ্ছে, বেশ, বেশ।"

মনোরঞ্জন মুখখানা খুব ভাল মানুষের মত করে জিজ্ঞাসা করল—"আমি ত আর হাত গুণতে জানি না যে তোমাদের কি কথা হ'চ্ছিল জানতে পারব ; জিজ্ঞেস করছি কি গল্প হ'চ্ছিল মহাশয়াদের ভূতের না অন্য কিছু ?"

—"ফুলবৌ ওর ছোড়দির সেলাইর কথা বলছিল—একটা কুশন বুঝি খুব সুন্দর করেছিল তাই।"—

"তোমাদের ফুলবৌর এক বিশ্বকর্ম্মা ছোড়দি হয়েছেন তিনি যা করেন তাই অপূর্ব্ব। তাঁর সেলাই আমি দেখেছি—কি আর এমন ! তার চেয়ে নবৌদি ঢের ভাল

সেলাই করেন।" মৃণাল রাঙাবৌর কাছে ছোড়দির প্রশংসা করতে গিয়ে স্বামীর দ্বারা অপ্রস্তুত হ'য়ে ম্লানমুখে ঘোমটাটা আরো একটু বাড়িয়ে খোকাকে নিয়ে উঠে গেল।

বিয়েটা যখন হ'য় তখন কোষ্ঠীর অপূর্ব্ব মিল হয়েছিল; যারা কোষ্ঠি বিচার করেছিলেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন যে এমন অপূর্ব্ব মিল সচরাচর হয় না। আর লগ্নের সপ্তম ঘরেও শুভগ্রহ অধিষ্ঠান করছিলেন, কিন্তু তবু মৃণালের সঙ্গে মনোরঞ্জনের কেন যে অমিল হ'ত তা বোঝা যেত না। ভাঁড়ার ঘরে বসে মৃণাল ছেলে মেয়েদের খাবার সাজাচ্ছিল; একপাশে বসে কনিষ্ঠা গৃহিণী আহ্নিক করছিলেন, মাঝে মাঝে মৃণালকে কোন কোন খাবার কাকে কি রকম দেওয়া হ'বে সেই বিষয় উপদেশ দিচ্ছিলেন; মৃণাল সব ছেলেদের হাতে খাবার দিয়ে ফিরে এসে করে বল্লে—"খুড়িমা, ধনা পটল আর ছবি এরা তিন জনে কোথায় গেল খুঁজে পেলুম না, কি করব?"

তাঁর আহ্নিক শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আসনখান ভাঁজ করে তুলে রাখতে রাখতে ডাকলেন—"ছবি। অ ছবি, পটলা, ওরে ও ধনা আঃ কি যন্ত্রণা সব গেল কোথায়!"

তিনি বেরিয়ে গেলেন তাদের খুঁজতে। চারিদিক খুঁজে তাদের উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না, বড়বৌর ছেলে শঙ্করকে দেখতে পেয়ে তিনি বল্লেন—"হ্যারে ছবি, পটলা, ধনা সব গেল কোথায়।"

শঙ্কর খানিকটা ভেবে নিয়ে বল্লে—"তারা রায়েদের বাড়ী খেলা করতে গেছে।"

কনিষ্ঠা গৃহিণী ফিরে এসে বল্লেন—"ফুলবৌমা ওদের খাবার এখন রেখে দাও ওরা নেই। কোথায় খেলা করতে গেছে।"

মৃণাল খাবার ভাঁড়ার ঘরে তুলে রেখে বেরিয়ে এল।

রাঙাবৌ ওপাশের বারান্দায় বসে নিজের কেশ বিন্যাসে ব্যাপৃত ছিল, মৃণালকে দেখে ডাক দিলে—"মাথাটাত টোকা হয়ে রয়েছে আয় চুলটা বেঁধে দিই।"

বড়বৌ পাশে বসে ছেলেমেয়েদের জামা কাপড় পরাচ্ছিল, মৃণাল এসে রাঙাবৌর পাশে কাঁটা ফিতে রেখে সম্মুখে বসে পড়ল।

সেদিন কিসের একটা ছুটি ছিল, মনোরঞ্জন তার বন্ধু যতীন্দ্রের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল।

যতীন্দ্ররা দুই ভাই, বড় যতীন্দ্র, ছোট ক্ষিতীন্দ্র। ছোট্ট শান্তিপূর্ণ সংসার, বড় বৌ কমলা, ছোট বিজলী, দুজনেই খুব শিক্ষিতা না হ'লেও আলোকপ্রাপ্তা বলা চলে। কমলার গলাটি খুব মিষ্টি, সুন্দর গান করে।

মনোরঞ্জনের সমস্ত সময়টা কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল তা সে যেন বুঝতেই পারছিল না। নানা রকম কথার মধ্যে যতীন্দ্র বল্লে—"সে কি হে, রবীন্দ্রনাথের এ বই খানা পড়নি!"

বিজলী, কমলা উভয়েই হেসে উঠল—"না, আপনার সঙ্গে আবার সাহিত্য আলোচনা!"

যতীন্দ্র বিজলীকে উদ্দেশ্য করে বল্লে—"ক্ষিতি, এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি ত! যাও ত বৌমা ততক্ষণ সে বইখানা এনে মনোরঞ্জনকে দাও।"

বিজলী উঠে গিয়ে বইর ঘর থেকে বইখানা হাতে করে ফিরে এল।

মনোরঞ্জনের হাতে দিতে যাচ্ছিল, সে বল্লে—"আপনিই পড়ুন না আমি শুনছি।"

কমলা মুখ ফিরিয়ে বিজলীর দিকে চেয়ে বল্লে—"পড়না তুই-ই।"

বিজলী দু'একটা এদিকে ওদিকে পড়তে পড়তে শেষে বল্লে—"দেখুন এ কবিতাটা আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।"

বলে পড়তে লাগল—

"জ্বালো ওগো, জ্বালো ওগো সন্ধ্যা দীপ জ্বালো,
হৃদয়ের এক প্রান্তে ঐটুকু আলো
স্বহস্তে জাগায়ে রাখো। তাহারি পশ্চাতে
আপনি বসিয়া থাক আসন্ন এ রাতে
যতনে বাঁধিয়া বেণী, আজি রক্তাম্বরে
আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তরে
জীবনের জাল হ'তে। বুঝিয়াছি আজি
বহু কর্ম্ম কীর্ত্তি খ্যাতি আয়োজন রাজি
শুধু বোঝা হয়ে যায় সব হয় মিছে
যদি সেই স্তুপাকার উদ্যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি। নানা দিক হ'তে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শান্ত নত শির।"

পড়া শেষে বিজলী মনোরঞ্জনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস রল—"কেমন লাগল আপনার ?"

—"সত্যি সুন্দর কবিতাটি, আর শেষের ঐ লাইন কটা ব চেয়ে সুন্দর।

একগৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শান্ত নত শির।"

মনোরঞ্জন বল্লে।

ক্ষিতীন্দ্র এসে ঘরে ঢুকল, সবারি মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্লে—"আমার নিন্দে হ'চ্ছে নাকি ?"

বিজলী হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল—"হ্যাঁ মন্দলোক হ'লেই লাকে নিন্দে করে তার—অতএব এর থেকে প্রমাণ 'চ্ছে যে তুমি ভাল লোক নও।"

ক্ষিতীন্দ্র উঠে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল, বিজলী নোরঞ্জনের দিকে ফিরে হাত জোড় করে বল্লে—"মাপ রবেন এবার আমি কিছুক্ষণের জন্যে চল্লাম।"

আরো কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর মনোরঞ্জন উঠে পড়ল, তীন্দ্রর দিকে চেয়ে বল্লে—"চল্লাম ভাই।"

কমলাকে একটা হাত তুলে নমস্কার করে সে বেরিয়ে পড়ল।

রাঙাবৌ মৃণালের চুলের বিনুনীটা করে খোঁপা করছিল এমন সময় ধনা, পটলা, ছবি খেলা সাঙ্গ করে ফিরে এসে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল—"মাগো, ওমা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

নবৌ—চেঁচিয়ে উঠল—"কেন সব ছেলে মেয়েরাত খেয়েছে তোদের বুঝি দেয়নি !"

বাইরে বেরিয়ে যেখানে মৃণালের কেশ প্রসাধন হ'চ্ছিল সেইখানে এসে দাঁড়াল—"কি গো ফুল গিন্নী। বলি ধনা পটলা ছবি এদের খাবার দেওনি যে ?"

মৃণাল মুখ তুল্ল—"ওরা ছিল না বাড়ীতে !"

—"না ছিল না, ওরা ত এই গিইছিল 'ঘাসে মুখ দিয়েত আর চলিনে'। বুঝতে সবই পারি।"

ছেলেমেয়েদের পেছনে একটা ঠেলা দিয়ে বল্লে—"চল মুখপোড়ারা, হতভাগা, ভাল মানুষ মুখ করে কথা কইলে অমনি আমি সব ভুলে যাব তাই ভেবেছিস, মারে ভাল-মানুষের মুখে সাত ঝাঁটা।"

বকতে বকতে নবৌ চলে গেল।

রাঙাবৌ মৃণালের কেশ প্রসাধন শেষ করে চিরুণী পরিষ্কার করে তুলে রাখছিল, মৃণাল একটা প্রণাম করে উঠে—দাঁড়াল।

মনোরঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল, তার মনের মধ্যে তখনও সেই কবিতার রেশ ঘুরে মরছিল। ঘরে ঢুকে বারকতক বারান্দার দিকে চেয়ে দেখল। ওর মনটা তখন চাইছিল, ক্ষিতীন্দ্রকে দেখে বিজলীর মুখে যে দৃষ্টি, যে হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসি সেই দৃষ্টি-টুকু মৃণালের মুখে দেখতে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল—মৃণালের হাসি মুখ ত সুদূর, তার আগমনেরও কোন চিহ্ন সে দেখতে পেলনা। শেষে অধৈর্য্য হ'য়ে ডাক দিল—"আমার গোটাকতক পাণ চাই।"

নবৌয়ের বাক্যবাণে আহতা মৃণাল চোখ ভাল করে আঁচলে ঘসে পাণ হাতে করে ঘরে গিয়ে ঢুকল। মনো-রঞ্জন ঘুরে দাঁড়াল—"বোস একটু।"

—"না, আমার কাজ আছে।"

বলে মৃণাল মুখটা ফিরিয়ে জানালার দিকে চেয়ে রইল।

মনোরঞ্জন আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে মৃণালের কাঁধের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে ?"

—"কিছু হয়নি।"

মৃণালের চোখে জল ভরে আসছিল।

মনোরঞ্জন মৃণালের যে মুখ দেখবে আশা করছিল তার বিপরীত দেখে, রাগে দুঃখে ভরে উঠছিল,—"যাও, যাও, এ ঘর থেকে, নেকীর মত অমন পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থেক না।"

মৃণাল কোন প্রতিবাদ করলে না, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

মনোরঞ্জন মনে মনে একবার সেই লাইনকটা আবৃত্তি করে, চুরুট ধরিয়ে ইজিচেয়ারের ওপর শুয়ে পড়ল, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল।

দিন যায়, মনের ভার ওদের কিছুতেই সহজ হয় না, সেটা কেবলই বেসুরে বেজে চলে।

* * * *

দেবর নিরঞ্জন কতকগুলো কাপড় এনে জননীর সম্মুখে রাখল।

—"মা বলত কোনখানা তোমার পছন্দ।"

মা কাপড়গুলো নাড়া চাড়া করে সরিয়ে দিলেন—"আমি কি ভাল বুঝতে পারব বাবা, যেটা বেশ পছন্দসই হয় তাই নে।"

নিরঞ্জন মৃণালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে—"বৌদি তুমি বল না ভাই।"

মৃণাল সেগুলো টেনে নিয়ে দেখছিল, মনোরঞ্জন ঘরের এক পাশে টেবিলের সম্মুখে বসে কি লিখছিল, ঝুঁকে পড়ে। এবার সে মাথা তুলে কলমটা রেখে উঠে এল—"হ্যাঁ তোর বৌদিই পছন্দ করবে বটে! বাপের বাড়ীতে অনেক দেখেছে, ওর মত আর কে পছন্দ করতে পারবে বল না।"

মৃণাল তার আহত মুখখানা নীচু করে কাপড়গুলো সরিয়ে দিল। হয়ত ওর পৈত্রিক অবস্থা হীন, তবু সে কথাটা মনোরঞ্জনের মুখে শুনে বড় মর্ম্মান্তিক হ'ল।

অপ্রস্তত নিরঞ্জন তাদের স্বামী স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সেগুলো তুলে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

* * * *

কালো ছোট্ট মাস ছ'তিনেকের মেয়ে কোলে নিয়ে মৃণাল পিত্রালয় থেকে ফিরে এল।

সবারি প্রণামের পালা শেষ করে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। মনোরঞ্জন খাটের ওপর শুয়ে বই পড়ছিল—সে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—"একবার উঠে বোস।"

"—কেন? প্রণাম করবে! আর থাক, এক কালিন্দি মেয়ে নিয়ে এলেত, আর প্রণাম করতে হবে না।" মনোরঞ্জন ভ্রূ কুঞ্চিত করে তার দিকে বিরক্ত ভাবে চেয়ে রইল।

অভিমানে, রাগে মৃণালের চোখ ফেটে জল আসছিল—"কি করব বল, ভগবান ত বাছাই করে নেবার উপায় রাখেন নি! যাকে যা দেন তাই মাথা পেতে নিতে হয়।"—

"আচ্ছা থাক থাক তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না।" এর পর আর কথা চলে না, মৃণাল নীরবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মৃণাল বসে বসে খুকীর জামা সেলাই করছিল, নিরঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল—"বৌদি ভাই একটা কাজ করবে?"

মৃণাল হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বল্লে—"কি কাজ বল, না বল্লে কি করে করবো?"

—"আমার গোটাকতক টাকার দরকার, তুমি যদি দাদাকে বল।"

—'বলবো'খন।"

নিরঞ্জন বসে খানিকটা গল্প করার পর উঠে গেল।

মৃণাল খুকীকে নিয়ে আদর করতে লাগল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মৃণাল স্বামীকে ডাকল—"ওগো শুনছো।"

মনোরঞ্জন তখন কি একখানা ইংরাজী নভেল গভীর মনোযোগে পড়ছিল, সে শুধু বল্লে—"হুঁ, বল।"

—"ঠাকুরপোর গোটা কতক টাকার দরকার।"

এবার মনোরঞ্জন মুখ তুল্‌ল—"কি বলছো?"

—"ঠাকুর পোর গোটা কতক টাকার দরকার, কাল তুমি দেবে?"

"—কার নিরঞ্জনের? তার যদি দরকার হয় সে নিজে বলবে। মেয়ে মানুষদের গিন্নীপনা করতে দেওয়া মানে তাদের মাথায় তোলা, সে যেমন পাগল তাই তোমাকে বলেছে টাকার কথা। মেয়েদের স্পর্দ্ধা আমার দু'চক্ষের বিষ।"

মৃণাল আর কোন কথা কইলে না, খুকীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

৩

বধূ মৃণাল এখন বধূত্ব এবং গৃহিণীত্বর সন্ধিক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে। পল্লবিনী সঞ্চারিণী এখন আর নেই—মোটা হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

শ্বশুর শাশুড়ীদের মধ্যে আর কেউই নেই, সবাই গত হয়েছেন।

রান্নাঘরে বসে মৃণাল ছেলেমেয়েদের জন্যে খাবার তৈরী করছিল, মনোরঞ্জন এসে দাঁড়াল—"গিন্নী আজ উনানের গোড়ায় কেন মাথা ধরবে যে।" ওপাশে বসে ছেলে মেয়েরা জলযোগ সাঙ্গ করছিল। মনোরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বল্লে—"কি গো দ্রৌপদী আমায়ও কিছু দেবে, না সব ছেলেমেয়েদের জন্যই হয়েছে।"

এবার মৃণাল ভ্রূ কুঞ্চিত করে মুখ তুল্‌ল—

"মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েদের সামনে আমায় দ্রৌপদী। কথা শুনলে অন্য কেউ ভাববে বুঝি মুখে গয়লা কথা কইছে!"

—"আহা কি উপমা!"

রাগে মনোরঞ্জন ঘর ছেড়ে চলে গেল। বেফাঁসে কথাটা বলে ফেলে অপ্রস্তত মৃণাল মুখটা নীচু করে ফেল্লে।

সকাল বেলায় মৃণাল দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে পড়াতে

বসেছে। মনোরঞ্জন ওপাশে চেয়ারে বসে খবরের কাগজে মনোনিবেশ করেছে।

ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়ার হট্টগোলে তার পড়ার ব্যাঘাত হচ্ছিল—কিছুক্ষণ মন দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে মুখ তুল্লে—"ওরে মণ্টু, রাণি তোরা সব কি পড়ছিস? তারচেয়ে ল্যাথ ল্যাখ গুরুমহাশয়ের ঠ্যাং ল্যাখ।"

তারপর মৃণালের দিকে মুখটা ফিরিয়ে বল্লে—"কি গো, ছেলেমেয়েকে আজ স্যার আশুতোষ আর সরোজিনী নাইডু না করে যে ছাড়বে না দেখছি।"

রাগে মৃণালের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল—"হ্যা তোমার ছেলে মেয়ে আর স্যার আশুতোষ, সরোজিনী নাইড় হ'বে না, সে ভয় পেও না। ওরকম ছেলেমেয়ে পেতে হ'লে অনেক পুণ্যির দরকার, তোমার মত স্বার্থপর লোকের আর পেতে হ'বে না।" প্রতি কথায় মৃণালের ইচ্ছে করত মনোরঞ্জনকে খোঁচা দিতে, তা সে ন্যায্য হোক আর নাই হোক। অপ্রস্তুত মনোরঞ্জন তার দিকে চেয়ে বল্লে—

"আহা চটো কেন, আমিত পাপী মানুষ সে কথা কি আমি অস্বীকার করছি।"

—"তবে আর বলছো কেন?"

—"আমি কিছুই বলিনি, শুধু লিখতে বলছি, ওরকম স-রবে পড়লে আমার যে পড়া হয়না।"

—"পড়া ওঃ কি আমার P. R. S. Ph. D. এলেন গো, যাও সদর ঘরে গিয়ে পড়গে।"

বিকেলে মেয়েকে কাপড় ছাড়াতে বসে, মেয়ে তার বহু পুরাতন রং ওঠা ফ্রকটা দেখে বায়না ধরল—"ওটা নয় মা, আর একটা দাও, ওটা বিচ্ছিরী।"

মনোরঞ্জন চা খেতে খেতে কাপটা নামিয়ে রেখে বল্লে —"দাও না গো অন্য একটা ফ্রক বার করে।"

মৃণাল জ্বলে উঠলো—"হ্যাঁ উনি পরবেন না ওর জন্যে রোজ একটা করে ভাল ফ্রক চাই। আমার বাপ আমার নামে একটা তালুক লিখে দিয়েছে—তার আয় থেকে আমি ওকে ভাল জামা রোজ যোগাব।"

—"কেন আমি কি এতই অক্ষম যে আমার মেয়ে একটা নূতন জামার বায়না ধরলে দিতে পারবো না!"

"ওঃ মেয়ের আদর দেখে যে বাঁচিনা, আজ রাণী না হ'ট ফেল করে।"

মৃণাল বল্লে। ওদের জীবন এমনি ভাবেই চলে।

মৃণাল প্রথম জীবনে প্রেমের চিতা সাজিয়ে তাতে পুড়েছে, তাই ওর অতৃপ্ত প্রেম-প্রেতাত্মা আজ ওর প্রেম প্রত্যাশির জন্যে শুধু প্রেম চিতানলই সাজায়। প্রেমের অর্ঘ্য সাজানর কথা ওর মনেই নেই, জানে তার আগুন-টুকু। তাই আজ যখন প্রৌঢ় মনোরঞ্জন চায় সঙ্গির শান্তি পুষ্পমালা ও তখন সাজিয়ে দেয় আগুন।

শীতের রাত। ছেলে মেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে মৃণাল মনোরঞ্জনের আহারের সুমুখে গিয়ে বসল—"ঠাকুর বাবুকে আর দু'খানা লুচি দিয়ে যাও।"

মনোরঞ্জন একবার মুখ তুলে তার দিকে চাইল—"আর দরকার নেই।"

—"পারবে, পারবে ও দু'খানা খেতে।"

খাওয়া শেষে মনোরঞ্জন নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

মৃণাল ঠাকুরকে ডেকে বল্লে—"দাও ছোটবাবুর খাবার।"

—"ছোটবাবু বল্লেন একটু পরে খাবেন।"

—"হ্যা একটু পরে কেন! রাত সাড়ে দশটা বাজে, দাও তুমি আমি ডেকে আনছি।"

মৃণাল গিয়ে নিরঞ্জনের ঘরে ঢুকল।

—"ঠাকুর পো খাবে এসো, রাত হয়েছে।" নিরঞ্জন তখন গভীর মনোযোগে নব পরিণীতা স্ত্রী—নিভাকে চিঠি লিখছিল, সে সযত্নে ভাবে চিঠি খানা ব্লটিঙের তলায় চাপা দিয়ে বল্লে—"যাচ্ছি ভাই আর দশ মিনিট বুঝলে!"

—"না, না—আর এক মিনিটও নয়, আগে খেয়ে এস, শীতে ঠাকুর বেচারা রান্নাঘর আগলে আর কতক্ষণ বসে থাকবে।"

বলতে বলতে মৃণাল টেবলের ওপাশের চেয়ারে বসে পড়ল—"কাকে লিখছ ভাই, নিভাকে?"

নিরঞ্জন একটু অপ্রস্তুত ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল, কোন উত্তর দিল না।

মৃণাল একবার তার অপ্রস্তুত মুখের দিকে চেয়ে হাসি মুখে বল্লে—"দেখি না ভাই, কি লিখলে।"

—"কি আর দেখবে!"

হঠাৎ ওপাশ থেকে মৃণাল ফস্ করে চিঠিখানা টেনে

নিল। তাতে—প্রথমেই লেখা ছিল রবীন্দ্র নাথের কবিতা

'—ওগো মৌন না যদি কও নাই কইলে কথা।'

আগা গোড়া সমস্তটা।

মৃণালের পড়তে পড়তে ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

হয়ত একটা দীর্ঘশ্বাস ও পড়ল।

পর মুহূর্ত্তে সশব্দে হেসে গোলাপী কাগজের সযত্নে লেখা চিঠিখানা কুচিকুচি করে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল।

হতভম্ব নিরঞ্জন এতক্ষন তার কার্য্য কলাপ দেখছিল, এবার বল্লে—"ওকি করছো, মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ?"

—"হুঁ মাথা আর খারাপ হবে না, মৌন যদি সে থাকে থাকগে, তুমি আর অত বক্ষ ভরে তার নীরবতা বয়ে বেড়িও না' কারণ বাণী যখন সোণার ধারায় আকাশ ফাটবে সে দিন লোটা কম্বল নিয়ে তোমায় বনে যেতে হ'বে। অত লম্বা লম্বা প্রেম পত্র দেওয়ার চেয়ে কাল শনিবার আছে, একবার নিভাকে দেখে এস। চল চল, রাত এগারটা বাজে খেতে চল।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম

প্রবন্ধ

শ্রীকনকলতা ঘোষ

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে
জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহা মানবের
সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়া'য়ে দু বাহু বাড়ায়ে
নমি নর দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দনা করি তাঁরে।
ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'ল হারা।
হেথায় আর্য্য হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক-হুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন।

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহা মানবের
সাগর-তীরে। ই :..................

"ভারত-তীর্থ" গীতাঞ্জলি।

এই অপূর্ব্ব অমর কবিতা যাঁহার লেখনী নিঃসৃত, তাঁহার স্বদেশ প্রেমের পরিমাপ করিতে যাওয়া আমাদের মত লোকের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, সুতরাং তাহা আমি করিব না। আমি শুধু দেখাইব যে রবীন্দ্র নাথের অন্তরের যথার্থ স্বদেশ প্রেম তাঁহার কাব্যে কিরূপ স্বতঃস্ফুরিত হইয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে,

আর দেখাইব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণে, তাঁহার স্বদেশকে উন্নত করিবার বিশ্বের দরবারে উচ্চাসন দিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহা, যে কোনো স্বদেশ প্রেমিক রাজনৈতিক ব্যক্তি অপেক্ষা অল্প নহে। তাঁহার সাহিত্য হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনৈতিক নেতা নহেন, তিনি বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক, সুতরাং তিনি তাঁহার মনোভাব জন-সমাজে প্রচারের জন্য বক্তৃতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা মনে করিতে পারি। দেশনেতাকে বুঝিতে হইলে যেমন তাঁহার কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিতে হইবে, তেমনি কবিকে বুঝিতে হইলেও তাঁহার কবিতাবলী অনুধাবন করিয়া পড়িতে হইবে।

সাহিত্য-জীবন ব্যতীত কর্ম্মজীবনেও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমের পরিচয় আমরা পাইয়াছি—এই স্থানে তাহার একটী প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিব। তাহা জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মরণীয় নৃশংস কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্যার" উপাধি পরিত্যাগ।

যদি কবি আর কোনো স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা না লিখিয়া মাত্র ভারত-তীর্থ ও "আগে চল্ আগে চল্ ভাই" রচনা করিয়া তারপর অনুরূপ কারণে উপাধি পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেও অবশ্যই জন-সমাজ তাঁহার স্বদেশ প্রেমের গভীরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিত। সন্দেহ নাই।

জীবন পথে চলিতে চলিতে যখন আমরা পড়ি—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই" ?......

তখন মনে হয়, সত্যই ত সাহসের সঙ্গে সম্মুখ পথে অগ্রসর হয়ে গিয়ে কর্ম্ম জগতে আপনার জয়-পরাজয় নির্ণয় করে নিতেই যদি না পারলাম, বাঁচার মত বাঁচতেই যদি না ক্ষমতা হইল তবে বেঁচে থাকায় লাভই বা কি আর বাঁচা-মরায় পার্থক্যই বা কি ?

মানুষের মনে এরূপ প্রশ্নে স্বতঃই একটা উৎসাহের ভাব আসে, বাঁচার মত বাঁচ্তে সাধ হয়, আর সেজন্য স্বীকার করতে হয় এই ভাবের কবিতায় শিক্ষার যথেষ্ট অবসর আছে। এবং সে শিক্ষা আপনার সঙ্গে সঙ্গে জাতি-কেও জীবনের পথে আগাইয়া আনিতে চেষ্টা করে। আবার যখন পড়ি—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হ'তে হ'বে তাহাদের সবার সমান।" ইত্যাদি......

তখন বুঝিতে পারি, অজ্ঞতা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি আমাদের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করতে কতখানি সহায়তা করতে পারে বা করেছে। "পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে," ঠিকই ত, আপনার শিক্ষাভিমান নিয়ে গর্ব্ব অনুভব করা যেতে পারে, কিন্তু যে আবেষ্টনে প্রতিনিয়ত বাস করতে হয়, তার আকর্ষণ মুক্ত হওয়া ত সম্ভব নয়। তাই যদি যথার্থ বড় হওয়ার বাসনা থাকে তাহলে আপনার শিক্ষার সঙ্গে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতেই হবে একথা আজিকার দিনে অস্বীকার করবার উপায় নেই। দেশের দুর্ভাগ্যে দুঃখিত কবি তাই নিজের দেশকে সাবধান হইতে বলিতেছেন,

"দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে
অভিশাপ আনি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে
সবারে না যদি ডাকো
এখনো সরিয়া থাকো
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান
মৃত্যুমাঝে হ'বে তবে চিতা ভস্মে সবার সমান।"

অতি সুন্দর কথা, মানুষ যদি তাহার জীবনে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন করিতে, আপনাকে সকলের সমান বলিয়া স্বীকার করিতে না পারে, তাহ'লে মরণের মধ্য দিয়া এই মহাসত্যকে তাহার উপলব্ধি করিতেই হইবে।

প্রভাত সঙ্গীতে, "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায় যখন দেখিতে পাই বিস্ময় ভরে কবি বলিতেছেন—

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধার
প্রভাত পাখীর গান,
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।........

তখন বুঝিতে পারি, কবি আপনার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন, আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—তাই উচ্ছ্বলিত আনন্দের আবেগে উন্মত্ত হইয়া কবি বলিতেছেন,

"আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া
দিবরে পরাণ ঢালি,
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল গেয়ে কল কল
তালে তালে দিব তালি।

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান
যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবেনা আর প্রাণ।"

কবি রবীন্দ্রনাথের এই উদ্দাম কল্পনা তিনি তাঁহার জীবনে পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, দেশে দেশে গিয়া আপনার গান শুনাইয়া স্বদেশের বারতা বহিয়া তিনি বিশ্বসভায় আপনার তথা ভারতের গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বরেণ্য কবি ত মাত্র আপনার মধ্যেই এই উদ্দাম যৌবন-চঞ্চল ভাবকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন নাই, তিনি বুঝেছিলেন একটা দেশকে জাগাইতে হইলে একটা জাতিকে উন্নত করিতে হইলে, তাহা দুই একজনের চেষ্টায় বা সাধনায় সম্ভব নয়,

তাই তিনি সাগ্রহে মুক্ত কণ্ঠে সমস্ত নবীনকে আহ্বান করিয়া যৌবনের জয়গান গাহিয়াছেন —

ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটী তোর উচ্চে তুলে নাচা
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।
খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়
আর তো কিছু নড়েনারে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়,
ঐ যে প্রবীন ঐ যে পরম পাকা
চক্ষু কর্ণ দুইটী ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত আয়রে আমার কাঁচা।

* * *

সংখ তোর উঠবে ওরা রেগে
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাচায়।

* * *

কবির এ আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া নবীনের পক্ষে স্বাভাবিক, সেজন্য বর্ত্তমানের তরুণ আন্দোলনের প্রসার দেখিয়া মনে হয় রবীন্দ্রনাথের আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু কবি শুধু নবীনকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই, তাহাদের কর্ম্মপথ দেখাইয়া দিবার জন্য দায়ীত্ব স্মরণ করাইবার জন্য তিনি তাঁহাদের কানে "স্বাজ মন্ত্র" শুনাইয়াছেন—

রাজা তুমি নহ হে মহা তাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়
ভিক্ষা ভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি বচন
তাই আমাদের দিয়ো
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।

* * *

যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত দীপ্ত সে মহা জীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব
মৃত্যু তারণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

আর দেখাইয়াছেন "নেতা" নামক কবিতার মধ্য দিয়া সেই ত্যাগের আত্মবিশ্বাসের চিত্র, যাহার অত্যন্ত প্রয়োজন তাঁহাদের, যাঁহারা জাতির প্রতিনিধি রূপে দেশের কর্ণধার রূপে দেশ সেবায় অগ্রণী হইয়া অন্যান্য সকলকে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া "নেতার" কবিতায় কবি বলিতেছেন—

"এমনি কেটেছে দ্বাদশবরষ
আর কতদিন হ'বে
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে ?
কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব
পেয়েছি আমার শেষ
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।"........

তারপর দেশহিতে আত্মোৎসর্গকারী কর্ম্মীদের উৎসাহ দিয়া আবার বলিতেছেন—

সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিড়িতে হ'বে,
....

আবার অন্যত্র দেখি—

পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন,
মিছে নয়নের জল তাই।
....

আবার বলিতেছেন—

কিসের জীবন কদিনের প্রাণ ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান
অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে।

যাঁহারা দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারাও এই মায়াময় ধরণীতে সহসা পিছনের মায়ার শিকল কাটিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়েন না, সম্মুখে আগাইয়া আসিতে আসিতেও বার বার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতে

ইচ্ছা হয়। তাহা বুঝিয়াই কবি দেশকর্ম্মীকে উৎসাহের সঙ্গে সান্ত্বনার বাণীও শুনাইয়াছেন।

"বঙ্গমাতা" কবিতায় কবি মাতৃভূমিকেও অনুরোধ করেছেন তিনি যেন তাঁর নিরীহ শান্ত ছেলেদের স্নেহাঞ্চলে ঢেকে গৃহের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়ে রেখে না দেন, তাদের যেন মানুষ হবার জন্ত দেশ-দেশান্তরে ছেড়ে দেন, অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করতে দেন—

"পুণ্যে পাপে সুখে দুঃখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি তব গৃহক্রোড়ে
চিতশিশু করে আর রাখিওনা ধরে।"

* * *

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।

বাঙ্গালীর মধ্যে কর্ম্মোৎসাহের, একটা নূতন কিছু করিবার আগ্রহের অভাব দেখিয়া বড় দুঃখেই কবিকে বলিতে হইয়াছে, "রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি"।

"শিক্ষা" কবিতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর নিকট স্বদেশের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ, বৈরাগ্য ক্ষমা ও আতিথ্যের মহিমা প্রচার করিয়াছেন,—

"হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,"

* * *

"গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছে মঙ্গল।

"সুখস্তবিশেষ", "বিষদেব", "অতীত" প্রভৃতি কবিতায় কবি তাঁহার স্বদেশের গৌরবময় অতীতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, দেশের চিরন্তন ভাবধারার প্রতি তাঁহার প্রাণের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। "দুরন্ত আশা", 'বঙ্গবীর',"দেশের উন্নতি", পরিত্যক্ত" প্রভৃতি কবিতার হাস্যরসের মধ্য দিয়া কবি তাঁহার দেশের উন্নতি কেন হইতেছেনা তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যে সকল কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি, ও নাম করিয়াছি তাহা ব্যতীত আরও কতগুলি গান ও কবিতায় বিশ-কবির অকপট স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে যাইলেও এই প্রবন্ধের কলেবর আরো বৃদ্ধি করিতে হইত সে জন্ত বাসনা ত্যাগ করিলাম। কবিতা ছাড়া গদ্য সাহিত্যে ও প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "ভারত-তীর্থের" কবির স্বদেশ প্রেমের পরিমাণ করিবার মত শক্তি আমারই নাই। তবে, রবীন্দ্রসাহিত্য গান ও কবিতাকেই আমরা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি বলিয়া তাহার মধ্যেই যে-সকল উৎকৃষ্ট, জাতির অগ্রগমনে পথ প্রদর্শক স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা ও গান দেখিয়াছি পড়িয়াছি ও পড়িয়া অন্তরে উৎসাহ ও আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা লইয়া কিছু আলোচনা করিলাম।

আর একটা কথা এইখানে বলিতে ইচ্ছা করি, আমার মনে হয়, বর্ত্তমান যুগে তরুণ প্রাণে যে কর্ম্মোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, দেশে স্বদেশ প্রেমের বন্যা বহিয়াছে তাহার মূলে, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখাৎ বিখ্যাত বঙ্গ কবিগণের স্বদেশ প্রেমপূর্ণ কাব্যের প্রেরণা অবশ্যই আছে। আজিকার স্বনামখ্যাত স্বদেশ সেবিগণের অনেকের বক্তৃতা মধ্যে ও সংবাদ পত্রাদির লেখার ভিতর ঐসকল কবিদের দেশ প্রীতিপূর্ণ কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে, ঐ কবিতাগুলির লোক প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

সশ্রদ্ধচিত্তে কবিবর রবীন্দ্রনাথের আর একটী সুন্দর কবিতা এইখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করিব। দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট সঙ্কুল সময়ে, আমি রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্ব্বের রচিত হইলেও সময়োপযোগী "মা বলিয়া ডাক" কবিতার সুরে সুর মিলাইয়া আমার দেশবাসী সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলী
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।

ত্রিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে
ত্রিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশ দিক সুখে হাসিবে,

সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।

আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে
সব পাপ তাপ দূরে যায় চ'লে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে,
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিষাদ
ঘুচে অপমান জেগে ওঠে প্রাণ
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

নূতন যুগের নূতন আলোয় যাহারা পথ খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, আশাকরি আজিকার দিনে তাঁহাদের নিকট, কবির এই অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না।

ভারত-মহিলাদের প্রতি মহাত্মার বাণী

শ্রীমতী সরোজিনী বসু অনুদিত

ভারত-মহিলা উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী বলেন :—

"মাতৃভূমির জন্য ভারতের নারীরা আশ্চর্য্য রকম কাজ ক'রেছেন। করুণার দেবদূতীর মতো আপনারা (নারীরা) নীরবে কর্ত্তব্য ক'রে এসেছেন। আপনারা আপনাদের অর্থ এবং সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ত্যাগ ক'রেছেন। অর্থ-সংগ্রহের জন্য আপনারা বাড়ী বাড়ী ঘুরেছেন। এমন কি, আপনাদের মধ্যে অনেকে 'পিকেটিং'য়ে সাহায্য ক'রেছেন। আপনাদের কেউ কেউ নানাবর্ণের সুক্ষ্ম পোষাক ব্যবহার ক'রতেন, যে সব পোষাক দিনের মধ্যে বহুবার বদ্‌লানো হ'তো। কিন্তু এখন তাঁরা সাদা, নিষ্কলঙ্ক এবং ভারী খাদির সাড়ী প'রছেন। এইটাই লোককে নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আপনারা এ সমস্তই ক'রেছেন—ভারতের জন্য।...আপনাদের কথার কিম্বা কার্য্যের মধ্যে প্রতারণা নেই। আপনাদের ত্যাগ সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ। রাগ কিম্বা ঘৃণার দ্বারা তা কলঙ্কিত নয়। আপনাদের কাছে এই কথাটা আমি ব'লতে চাই যে, ভারতের চারিদিক থেকে আপনাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্নিগ্ধ সাড়া, আমার মধ্যে বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের সংগ্রাম যে আত্ম-শুদ্ধির সংগ্রাম, এর জন্য অন্য কোনো প্রমাণের দরকার নেই। ভারতের লক্ষ লক্ষ নারী যে কার্য্যতঃ এ বিষয়ে সাহায্য ক'রছেন, এইটাই বড় প্রমাণ।

"আপনারা অনেক ত্যাগ ক'রেছেন। কিন্তু আপনাদের আরও ত্যাগ ক'রতে হবে।...যতক্ষণ না আপনারা আপনাদের সমস্ত বিদেশী বসন ত্যাগ ক'রতে পারছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'বয়কট' অসম্ভব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'রুচি' জিনিষটা বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণ মুক্তি অসম্ভব। 'বয়কটে'র অর্থ—পূর্ণ মুক্তি। ভারতবর্ষ যে রকমই কাপড় তৈরী করুক না কেন, আমরা তাইতেই অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকবো,—ঠিক যেমন আমরা ধন্য হ'য়ে সন্তুষ্ট থাকি সেই সব সন্তানদের নিয়ে, ঈশ্বর যা আমাদের দান করেন। আমি এমন কোনো মাকে জানি না, যিনি অন্যের দৃষ্টিতে কুৎসিত শিশুকে ফেলে দিতে পারেন। ভারতীয় শিল্পগুলির প্রতি ভারতের দেশ-প্রেমিকা নারীদের এই ভাবই থাকা উচিৎ। এবং কেবল আপনাদেরই জন্য হাতে-কাটা ও হাতে-বোনা জিনিষ, ভারতীয় শিল্প ব'লে সম্মান পেতে পারে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময়ে আপনারা প্রচুর পরিমাণে কেবল মোটা খাদি পেতে পারেন। আপনাদের রুচি অনুযায়ী আপনারা হাতে সব রকমের কারুকার্য্যও ক'রে নিতে পারেন। কিছু মাসের জন্য আপনারা যদি মোটা খাদিতে সন্তুষ্ট থাকেন, তা হ'লে, প্রাচীন ভারতের যে সব সুন্দর, মূল্যবান ও বর্ণবিচিত্র পোষাক, যা এককালে পৃথিবীর বিদ্বেষ ও নৈরাশ্যের বস্তু ছিল, তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখবার বিষয়ে ভারতবর্ষকে হতাশ হ'তে হবে না। আমি আপনাদের এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, ছয় মাসের আত্ম-ত্যাগই আপনাদের দেখিয়ে দেবে, বর্ত্তমানে আমরা যেটাকে সুন্দর বলি, তার সৌন্দর্য্য—মিথ্যা সৌন্দর্য্য। আমরা দেখতে পাবো যে, সত্যকার শিল্পের বিশেষত্ব, কেবল আকারে নয়,—আকারের অন্তরালে যেটা থাকে, তার মধ্যেও আছে। এক রকমের শিল্প আছে, যা ধ্বংস করে। আর এক রকমের শিল্প আছে, যা দেয় প্রাণ। যে-সব সুন্দর বস্ত্র আমরা পাশ্চাত্য কিম্বা সুদূর-প্রাচ্য থেকে আমদানী ক'রেছি, সেগুলো সত্য সত্যই আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন্‌কে হত্যা ক'রেছে, এবং আমাদের হাজার হাজার ভগ্নীকে লজ্জাকর জীবনের পথে নিয়ে গেছে। সত্যকার শিল্প নিশ্চয়ই হবে—শিল্পীর আনন্দ, শান্তি এবং পবিত্রতার পরিচায়ক। আপনারা যদি আমাদের মধ্যে এই রকম শিল্পকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে চান, তা হ'লে, বর্ত্তমান সময়ে খাদির ব্যবহারকে প্রাণপণে অবশ্য-কর্ত্তব্য ক'রে তোলা চাই। স্বদেশী কার্য্য-তালিকাকে জয়যুক্ত করবার জন্যই যে কেবল খাদি ব্যবহার করা দরকার, তা নয়,—আপনাদের প্রত্যেকের পক্ষেই অবসর-সময়ে সুতা-কাটা হচ্ছে একটা অবশ্য-করণীয় কাজ। আমি বালক বৃদ্ধ সবাইকে ব'লেছি যে, তাঁদের সুতা-কাটা উচিত। আমি জানি, তাঁদের মধ্যে হাজার-হাজার লোক প্রত্যহ সুতা কাটছেন। কিন্তু সুতা-কাটার আসল বোঝা অবশ্যই, প্রাচীন কালের মতো, আপনাদেরই ঘাড়ে এসে প'ড়বে। দু'শ' বছর আগে ভারতের রমণীরা কেবল যে স্বদেশের চাহিদার জন্যই সুতা কাটতেন, তা নয়,—বিদেশেরও জন্য। তাঁরা কেবল মোটা সুতাই কাটতেন না;—পৃথিবী যা কখনো কাটতে পারেনি, সেই সূক্ষ্মতম সুতা-ও কাটতেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের-কাটা সুতার সূক্ষ্মতার কাছে আজও কোনো যন্ত্র পৌঁছোতে পারেনি। কাজেই, খাদির চাহিদা যদি আমাদের যোগা'তে হয়,...তা হ'লে, আপনাদের অবশ্যই সুতা-কাটার অনেক সমিতি গ'ড়তে হবে, সুতা-কাটার প্রতিযোগিতা ক'রতে হবে, এবং হাতে কাটা সুতায় ভারতের বাজারে বন্যা আনতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আপনাদের মধ্যে কয়েকজনকে সুতা-কাটায়, তুলো-পেঁজায় এবং চরকা বানানোর বিষয়ে নিপুণ হ'তে হবে। এর মানে অবিরাম কর্ম্ম। সুতা-কাটাকে আপনারা জীবিকা-অর্জ্জনের পন্থারূপে ভাববেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এটা পরিবারবর্গের বাড়্‌তি-আয় হওয়া উচিত, এবং অত্যন্ত দরিদ্রা নারীদের পক্ষে এটা নিঃসন্দেহভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের উপায়। চরকা-যন্ত্রটা, আগে যেমন ছিল, বিধবার প্রিয় সঙ্গী হওয়া উচিত। কিন্তু আপনাদের কাছে, যাঁরা এই প্রার্থনাটা প'ড়বেন,—চরকা হচ্ছে একটা কর্ত্তব্য,—ধর্ম্ম। যদি ভারতের অবস্থাপন্ন রমণীরা সকলেই প্রত্যহ কিছু-পরিমাণ সুতা কাটেন, তা হ'লে তাঁরা সুতার মূল্য সস্তা ক'রতে পারবেন, এবং অন্য যে-কোনো উপায়ের চেয়ে অনেক অনেক শীঘ্রই সুতার প্রয়োজনীয় সূক্ষ্মতা আনবেন।

ভারতের নৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি এইভাবে প্রধানতঃ আপনাদের উপরেই নির্ভর ক'রছে। ভারতের ভবিষ্যৎ আপনাদের পদতলে প'ড়ে র'য়েছে, কারণ, ভবিষ্যৎ বংশধরদের যে আপনারাই পালন ক'রবেন। আপনারা ভারত-সন্তানদের সরল, ধর্ম্ম-ভীরু এবং সাহসী নর-নারী ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন, কিম্বা, তাদের এমন অতিরিক্ত আদর দিতে পারেন, যাতে তারা দুর্ব্বল হ'য়ে জীবনের ঝঞ্ঝার সামনে সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতেও সমর্থ হবে না, এবং তারা বিদেশী বিলাস দ্রব্যে এমনি অভ্যস্ত হ'য়ে পড়বে যে, পরবর্ত্তী জীবনেও সেগুলোকে ত্যাগ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে উঠবে।.........আপনাদের রুচির বিষয়ে আমার সন্দেহের ছায়াটিও নেই। ভারতের ভাগ্য আপনাদের হাতে অনেক-বেশী নিরাপদে আছে—সেই গবর্ণমেন্টের হাতে থাকার চেয়ে,—যে-গভর্ণমেন্ট ভারতের ধন-ভাণ্ডারকে এমনভাবে শোষণ ক'রেছে যে, সে (ভারতবর্ষ) নিজের ই মধ্যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। প্রত্যেক মহিলা-সভাতেই জাতীয় কার্য্যের জন্য আমি আপনাদের আশীর্ব্বাদ চেয়েছি, এবং তা চেয়েছি এই বিশ্বাসে যে, আপনারা পবিত্র, সরল ও দেবীতুল্যা;—আপনার যে আশীর্ব্বাদ দেবেন, তা ফলপ্রসূ হবে। আপনাদের আশীর্ব্বাদের সাফল্য সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয়তা দিতে পারেন—আপনাদের বিদেশী বসন ত্যাগ ক'রে, এবং অবসর-সময়ে জাতির জন্য অবিরামভাবে সুতা কেটে।"—("Young India" 11 8. 21.)

চাঁদিনী রাতের নেশা

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

—গল্প

হাম্বর্গ।
২২শে মাঘ।

ভাই রেণু!

সেদিন খোকার বিয়ের নেমন্তন্নয় গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা হল, বড় অপ্রত্যাশিত ভাবে।

শুনেছিলুম খোকার দাদার এক বড়লোক বন্ধু—এ বিয়েতে আসবেন সস্ত্রীক, কিন্তু তিনি যে আমার বান্ধবী পতি দেবকুমারবাবু, তা কি করে জানব?

এ রকম দেখায় আনন্দ আরো বেশী হ'বার কথা,—হয়েছিলও তাই,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সংশয় বিমিশ্র বিস্ময় ও ব্যথার ভাব আমাকে ব্যাকুল, ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল তোর অভাবিত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে। সত্যি বলছি,—দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন সেই রেণুই নয়!

অথচ তোর না ছিল কি?

অটুট স্বাস্থ্য, অম্লান রূপ, গা-ভরা জড়োয়া গহনা, সিঁথী ভরা সিঁদুর, যে বাহারে দামী বেনারসীখানা তুই পরেছিলি, তার জৌলস বিয়ে-বাড়ীর মেয়েদের চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছিল, সুখ-সৌভাগ্যের নিদর্শন তোর সবই তো ছিল, ছিলনা শুধু সেই গালভরা, কারণে অকারণে চোখে মুখে উছলে পড়া সরল মিষ্টি হাসি, যা নইলে তোকে মোটেই মানায় না, যার জন্যে আমরা তোকে হাসির ঝর্ণা বলতুম।

বাস্তবিক, অত হাসি তোর গেল কোথায় ভাই? কি যেন হয়ে গেছিস—দেখে মনে হল যেন কত যুগের পাকা গিন্নি! বাব্বা!

"চিরদিন কি ছেলেমানুষ থাকতে হবে নীলাদি!"

বলে আমার কথা তুই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলি তখন, কিন্তু আমি তা মানলুম না।

তোর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়—এই [illegible] মাসে না? বেশীদিন তো নয়। তখন তোর ছেলেমানুষী একটুও কমে নি তো? চিঠিপত্রও তখন পর্য্যন্ত [illegible] পেয়েছি, কিন্তু তারপর—এই মাস আটেকের মধ্যে এক-খানি পরিবর্ত্তন তোর কেমন করে হল ভাই? [illegible] একেবারে—না রেণু! এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্লেও আমি একথা বিশ্বাস করতে পারব না, তোর মনের কোণে নিশ্চয়ই কোনো দুঃখ চাপা আছে, যা তোকে অন্তরে অন্তরে ব্যথা দিচ্ছে। কিন্তু দুঃখটা যে কিসের—ভেবেই পাই না যে!

শুধু ধনৈশ্বর্য্যের কথাই বলছি না, তোর মত স্বামী সংসারে ক'জন মেয়ে পায়? দেবকুমার তো দেবকুমারই! তোর প্রতি তার গভীর ভালবাসার পরিচয় আগেও পেয়েছি যথেষ্ট, এবারেও পেলুম, যখন 'কনে'র গা—কনে সাজাবার ভার তোকেই দিলেন—অনুরোধ উপরোধ করে,—বিয়ে-বাড়ীর মেয়েরা একজোট হয়ে তোকে ধরে নিয়ে গেল "হাই আমলা" বাটতে,—"বৌ তোর মত স্বামী সোহাগিনী হবে বলে। এর বাড়া সৌভাগ্য মেয়েমানুষের আর কি হতে পারে?

ভগবানের দয়ায় নারীর কাম্য—সবই তো পেয়েছিস, তবে অমন 'মন-মরা' দেখলুম কেন ভাই? তোর অভাব কিসের—বল্‌তো? ও! বুঝেছি—একটী খোকার চাঁদের!—না?

কিন্তু তার সময় তো এখনো যায়নি,—[illegible] হুক্তি হয়নি, সুতরাং দুশ্চিন্তা হবার কিছু—[illegible] বিয়ে হয়েছে—এই তো মোটে দু'বছর। এরি মধ্যে [illegible]

শুনে কি মনে করবি জানি না. কিন্তু আমি নিজে ভুক্তভোগী তাই বলছি, স্বামীর প্রেম, স্বামীর সোহাগ, আর দু'টো দিন নিশ্চিন্তে নির্ব্বিবাদে উপভোগ ক'রে নে ভাই.—সোনার চাঁদের আবির্ভাব হলে এ সুযোগ আর পাবি না—এমন করে কপোত-কপোতী হয়ে... মুখ টিপে হাসছিস ? তা হাস, যা সত্যি, যা' সম্ভাবিত তাই বল্‌ছি।

এই যে নারীত্বের বিকাশ পূর্ণ হতে না হতে মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে এসে পড়া—এটাই কি ভাল মনে হয় ?

আমাকে দেখ দেখি—একুশ না পেরোতে চারটী সন্তানের জননী। ওদের হাসি-কান্না, খাওয়া-দাওয়া, অসুখ-বিসুখ নিয়ে সর্ব্বক্ষণ এতই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় যে আর যে৷ আর—স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যও যেন আমি ঠিক মত করে উঠতে পারি না,—তাঁর যত্ন-সেবার ভুল হয়ে যায়—ত্রুটী থেকে যায় পদে পদে। উনি একদিন স্পষ্ট করেই বলছিলেন—

"ছেলের মা হলে বুঝি ছেলের বাবা বেচারাকে এমনি করেই অবহেলা করতে হয় নীলা।"

ঠাট্টা করে হেসে বল্‌লেও সে কথাটার মধ্যে যে একটা সত্যিকার ক্ষোভ ও অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল—আমাকে তা কম ব্যথা দেয়নি।

তাই বলছিলুম, -বেশ তো আছিস রেণু, পরিপূর্ণ সোনার সংসারে, সর্ব্বময়ী হয়ে, পরম স্নেহবান্ অনিন্দ্য-চরিত্র স্বামীর প্রিয়তমা অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিনী হয়ে—নির্ঝঞ্ঝাট—নিশ্চিন্ত! কোনোখানে এতটুকু ফাঁক নেই। তবে অমন উদাসভাব দেখলুম কেন ? তোর অশান্তির কারণ আমাকে বল্‌বি না ভাই ?

সেই ছোট বেলা থেকে এখন পর্য্যন্ত আমরা পরস্পরের কাছে বোধ হয় সুখ দুঃখের কোনো কথাই গোপন রাখিনি—রাখা উচিতও মনে করি না, কিন্তু—কি বলব ? বিয়ে-বাড়ীর হট্টগোলে তোকে এক মুহূর্ত্ত নিরিবিলিতে পাইনি, তাহলে দেখে নিতুম তুই কত বড় চাপা মেয়ে!

খোকাটা এই সবে নিউমোনিয়া থেকে উঠেছে, তার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে বর-ক'নে বাসরে যেতেই বিদায় নিতে হল।

ভেবেছিলুম, পরদিন নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তোর সব কথা সুস্থির হয়ে শুনব—যত বড় গোপনীয় কথাই হোক না কেন—

কিন্তু সে আশায় আমার ছাই পড়ল—যখন শুনলুম, দেবকুমারবাবু সাত তাড়াতাড়ি—ভোরের গাড়ীতেই তোকে নিয়ে চলে গেছেন—তখন মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল—মাইরী !

কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলি না ?—আমার ওপর তোর সে 'টান' আর নাই রেণু! তাহলে আর এতদিন পরে চকিতে দেখা দিয়ে চলে যেতে পারতিস্ না। কিন্তু আমি তোকে ধর্ম্মতঃ বলছি—আচ্ছা থাক্—এর বোঝা-পড়া পরে করা যাবে, এখন, আমি শুধু জানতে চাই—তোর এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের হেতু কি?

মানুষের মনে এমন অনেক কথা থাকতে পারে, যা মুখে বলতে বাধে—অথচ কলমে বাধে না, তাই বলছি, তোর মনের কথা,—প্রাণের ব্যথা—যা সেদিন মুখে বলতে পারিস্‌নে, আমাকে লিখে জানা। লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার! এমন কোরে আমায় উদ্বেগে, সংশয়ে ফেলে রাখিস্ নি। সেদিন থেকে এমন অস্বস্তি ধরে আছে কি বলব ? সর্ব্বক্ষণই মনে পড়ছে সেই বিষাদ ছায়ায় ম্লান ব্যথিত মুখখানি, আর সেই কুণ্ঠিত, করুণ হাসিটুকু!

নেতি পেতি নিয়ে এত কাছে থেকেও যাবার উপায় নেই—কাজেই অবাক্ হয়ে শুধু ভাবছি—এ কেমন করে কি হয় ?

সেই রেণু হাসির ঝরণা—আনন্দের ফোয়ারা, তার এমন দশা...না ভাই,—আমার মাথা খাস্—বল্। যত বড় গূঢ় গোপনীয় কথাই হোক্, তোর অন্তরঙ্গ বন্ধু সুখে সুখী, ব্যথার ব্যথী নীলাদির কাছে লজ্জা সঙ্কোচ করবার কোনোই কারণ নেই—বুঝলি ?

উত্তরের আশায় পথ চেয়ে রইলুম, পরম আগ্রহে।

ভালবাসা নিস্—অজস্র আশীষ। ইতি

তোর ভালবাসার নীলাদি।

আলিগড়।
১লা ফাল্গুন।

অভিন্ন হৃদয়াসু—

নীলাদি, মানুষ ঘোরতর দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে যখন বুঝতে পারে এ সত্য নয় স্বপ্ন,—তখন তা'র মনটা যেমন হাল্‌কা হয়ে যায়, তোমার চিঠিখানা হাতে পেয়ে আমার প্রথমটা সেই অবস্থা হয়েছিল।

উদাসী চিত্ত—দূর অতীতে ফেলে আসা নিঃশঙ্ক, সরল যাত্রাপথে যেন অনেকখানি পেছিয়ে গেল, মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই তাকে ফিরে আসতে হল—যেখানকার সেইখানে,—একটা প্রবল ধাক্কা খেয়ে।

তোমার আদর দরদের স্নিগ্ধ পরশ মাখা চিঠির অক্ষরগুলো দেখতে দেখতে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠল।

সেদিনও এমনি অবস্থাই হয়েছিল, যখন বিয়েবাড়ীর গোলমালের মধ্যেও এক সময় অধৈর্য্য হয়ে আমায় আদর করে গলা ধরে—এই প্রশ্ন করেছিলে, তখন অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিলুম, ভেবেছিলুম যাবার আগে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব, কিন্তু সাহস হল না। কেন?—তা কি করে বলব? কোন্‌খান থেকে বলতে আরম্ভ করব? প্রথম থেকেই? আচ্ছা, তাই বলি, কিন্তু অতি সংক্ষেপে, নইলে—একখানা ছোট খাট উপন্যাস হয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, ভাগ্যনিয়ন্তা—আমায় সুখ-সৌভাগ্য দিতে কোনো কার্পণ্য করেন নি, এ কথা সত্যি। কিন্তু আমার অন্তরের গূঢ় বেদনা, যা তোমার অন্তর্ভেদী স্নেহ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে—তা'ও ভ্রান্ত নয়।

হতে পারে, এ দুঃখ এ ব্যথা আমার নিজের সৃষ্ট, আমার মনের দোষেই হয় তো এমন ধারা·····

যাই হোক্‌,—

নীলাদি, ভাই! কথাটা শুনে হয়তো তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, কিন্তু সত্যি কথাই বলছি—তোমরা যা মনে করছ...তা নয়,—আমার বিবাহিত জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের হয়নি, এর কোথায় যেন একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে। এ শূন্যতা, এ অভাব যে কিসের—তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি নি, অন্যকে বুঝাব কি করে? একি মাতৃত্বের ক্ষুধা? অপত্য স্নেহের লিপ্সা? না ভাই, এ ধারণা তোমার ভুল। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, কিন্তু বর্ত্তমানে...'মা'—হবার আকাঙ্ক্ষা আমার মোটেই নেই। তবে এ ক্ষোভ, এ অতৃপ্তি কেন? শুনবে?

আমার স্বামীকে আমি অন্তরে আজও পাইনি, আমার প্রাণের সাড়া তাঁর প্রাণের ভেতর আজও জাগেনি। সর্ব্বক্ষণ কাছে কাছে থেকেও কিসের একটা দুরত্ব আমাদের দুজনকে তফাৎ করে রেখেছে। সে ব্যবধান জোর করে সরিয়ে তাঁর অন্তরের নাগাল পেতে একবার নয়, কতবার চেষ্টা করেছি,—প্রতিবারই নিষ্ফলতার তীব্র বেদনা মর্ম্মান্তিক যাতনা দিয়েছে। আহত ক্ষুব্ধ চিত্ত তা'র অবরুদ্ধ হৃদয় দুয়ারে মাথা কুটে, হায়! হায়! করে ফিরে এসেছে। মনে হয়েছে আমার স্বামী-সুহৃদের এই ঐশ্বর্য্য সম্পদ, গৌরব সম্মান সমস্তই প্রকাণ্ড ফাঁকি, একটা নির্ম্মম উপহাস!

কথাগুলো হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে—না? তাহলে সোজা করেই বলি, আমার স্বামীর কাছে আমি—না চাইতে সবই পেয়েছি—পাইনি, শুধু নারী জীবনের একমাত্র কামনার ধন—ভালবাসা! যার অভাব রাজরাণীকেও কাঙালিনী করতে পারে।

হায়! নীলাদি! আমার মর্ম্ম ব্যথা হয়তো তুমি বুঝবে না, হয়তো একথা বিশ্বাসও করবে না, কেই বা করবে? আমি যে নিজেই প্রত্যয় করতে পারিনি, আজ পর্য্যন্ত। মনে হয় এ শুধু অনুমান, শুধু সংশয়!

কিন্তু তা'কি সম্ভব? এতদিন এই দীর্ঘ দুটী বৎসর ধরে, যে অজানা ব্যথা, অব্যক্ত ক্ষোভ, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি, সে অনুভূতি কি ভ্রান্তি হতে পারে?

না, না, এ ভ্রান্তি নয় ভুল নয়, সত্য, পরম সত্য! আমার স্বামীকে আমার হৃদয়-সর্ব্বস্বকে আমি পাওয়ার মত পাইনি। আমার অপরিতৃপ্ত তরুণ প্রাণের কাঙালপণা তাই দিনের দিন বেড়ে গিয়েছে, সেই জন্যেই না আজ এই বিপত্তি—উঃ! থাক্‌, আগে যা বলছিলুম তাই বলি।

আমার স্বামীর মত স্বামী লাভ বহু পুণ্যের ফল, আমার প্রতি স্নেহ যত্ন ও অপরিমিত, অসাধারণ একথা

স্বীকার করতে আমি বাধ্য। তাঁর করুণা ও মমতার পরিচয় এত বেশী পেয়েছি যে সেটা সময় সময় আমার নিজের চোখেই অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ি ঠেকেছে।

চোখের আড়াল করে আমাকে দু'দিন বাপের বাড়ী রাখতে চান না। আমি খালি পায়ে মাটীতে হেঁটে যেতে যেন তাঁ'র বুকে ব্যথা বাজে মনে হয়।

আগুন তাতে মাথা ধরবে বলে রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় যেতে দেন না, একদিন সখ করে ওঁর জন্যে মাছের কাটলেট ভাজ্‌তে গিয়ে অনভ্যাসের ফলে হাতে ফোস্কা পড়িয়েছিলুম, তারি জন্যে বেচারা বামুনটা অনর্থক মার খেয়ে ম'ল! তাতে করে বলেছিলুম—

আমাকে অমন পুতু পুতু করে রাখো কেন বল দেখি? আমি কি কাগজের ফুল না মোমের পুতুল? যে এতটুকু আঁচে—

তাতে আমার মুখপানে চেয়ে উনি হেসে বলেছিলেন "সে আমি জানি—তুমি ও দুটোর একটাও নয়, কিন্তু রক্তমাংসে গড়া শরীর তো বটে? নইলে ঐটুকুতে ফোস্কা পড়বে কেন?"

রক্তমাংসে গড়া হলেও শরীরে স্বাস্থ্যভঙ্গের কোনো লক্ষণ নেই, তবু রাত্রি জাগরণ একদম নিষিদ্ধ—পাছে স্বাস্থ্য খারাপ হয়!

আমার শরীরের দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি—আমার স্বাস্থ্য-রক্ষায় তিনি অতিমাত্র যত্নশীল—কিন্তু মনের......আঃ!

সে অনেক দিনের কথা—কিন্তু আজও প্রাণে গাঁথা আছে, আমার জ্বর হয়েছিল, সর্দ্দী জ্বর, ডাক্তার বলে গেলেন সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভয়ের কিছু কারণ নেই। তাতেই উনি কি রকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন—কি বলব?

জ্বরের ঘোরেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুম ভাঙ্গল শেষ রাত্রে তখন জ্বরটা প্রায় ছেড়ে গিয়েছে। চোখ মেলে দেখি মানুষটা আমার বিছানার পাশে চেয়ার পেতে তখনো তেমনি ঠায় বসে! এতটুকু ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই—

আমার বুকের ভেতর যেন মোচড় দিয়ে উঠল। অন্তরের কোন্ অদেখা নিভৃত কোণ থেকে—কে যেন চাপিয়া বল্লে—

আর কি চাস্? ওরে অভাগিনী! আর কি চাই তোর?—

ওঁ'র দিকে পাশ ফিরে—আমি...

"সেই অবধি বসে আছ? একটুও শোওনি? কি অন্যায় দেখা দেখি!"

বল্‌তে বল্‌তে—উদ্বেলিত প্রেমে, উচ্ছ্বসিত-পুলকাবেগে আকুল হয়ে উঠে, একখানি হাত বুকের কাছে টেনে নিয়ে ধরা গলায় বল্লুম, আমার জন্য তুমি এত কর—কেন বলতো?

আমার কপালে এসে পড়া এলোমেলো চুলগুলো অতি যত্নে সরিয়ে দিয়ে, কল্যাণ বর্ষী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে তিনি সেই রকম মৃদু মিষ্ট হাসি হেসে সচপল শান্তভাবে উত্তর দিলেন—

"কি আশ্চর্য্য! তোমার জন্য আমি করব না তো কে করবে রেণু? এ যে আমার কর্ত্তব্য!"

কর্ত্তব্য? হায়! শুধুই কর্ত্তব্য! আর কিছুই নয়?

ওগো করুণাময়! ওগো দাতা! আমাকে দেবার কি আর কিছুই নেই তোমার? শুধু সেবা, শুধু যত্ন—তোমার কর্ত্তব্যের বুঝি এইখানেই শেষ!

কথাগুলো চাপা কান্নার মত আমার বুকখানাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলুম না।

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে একটা মর্ম্মভাঙা উদ্বেল দীর্ঘ-নিঃশ্বাস—নিঃশব্দে চেপে নিয়ে—আমি আবার চোখ বুজিয়ে নিলুম।

হায়! স্নেহ আর প্রেম—এ দুইয়ে, পার্থক্য আছে একটু নয়—অনেকখানি! এই যে এত মমতা এত দরদ—কিন্তু এতে সেই প্রাণ গলানো অনুরাগ, বুক জুড়ানো মাধুর্য্য কই—যাতে পোড়া নারীর প্রাণ তৃপ্ত হতে পারে!

তার কাঙাল মন যে আরো চায়—আরো চায়!

আর একবারকার ঘটনা বলি। গ্রীষ্মের বন্ধে এ বছর নৈনিতালে যাওয়া হয়েছিল বেড়াতে, অবশ্য আমারই আগ্রহে। উনি কাজের লোক, কাজ নিয়ে ঘরের কোণে থাকতেই ভালবাসেন। এবার ঘর-ছাড়া হয়েছিলেন কেবল আমার সন্তোষের জন্য।

"হরগৌরী"

শিল্পী শ্রীসুকুমার বসু
(স্কেচ)

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিমিটেড

বাস্তবিক কাজের বাইরে—ঘরের বাইরে, নূতন দেশে নূতন দৃশ্যের মধ্যে ওঁকে সারাক্ষণ কাছে কাছে পেয়ে আমার অন্তরের কুয়াশা যেন অনেকখানি কেটে গিয়েছিল। ওঁর সঙ্গে মনের সাধে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম।

তখন পড়ন্তবেলায় রঙীন্ আলো পাহাড়ে পাহাড়ে হোলীর লাল আবীরের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সে আলোর ঝরণায় জল গলানো সোনার মত ঝিকমিক্ করছে দেখে রূপকথায় সোনার ঝরণা মনে পড়ে।

গরমের দিনেও পাহাড়ী বাতাসে বেশ একটু স্নিগ্ধ শৈত্য ছিল, যাতে শীত বোধ হয় না—অথচ মাঝে মাঝে গা'টা কেমন শিরশিরিয়ে ওঠে একটা অব্যক্ত মৃদু পুলক-কম্পনের মত।

আমাদের 'কার'খানা একাবেঁকা, উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ বেয়ে হু হু করে ছুটছিল। ভিতরে আরোহী মাত্র আমরা দুটি প্রাণী, দুজনেই নীরব বাক্যহীন!

উনি একধারে গদীতে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন নিবিষ্ট মনে। আশ্চর্য্য মানুষ—নয়? খবরের কাগজ পড়বার এইতো সময়!

আমি এ ধারে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে—অবাক্ হয়ে দেখছিলুম—শোভাময়ী পার্ব্বত্য প্রকৃতির বিচিত্র মধুর বায়স্কোপের মত দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যগুলি, সে দেখায় আগ্রহ ছিল, কিন্তু তন্ময়তা ছিল না।

আমার অবাধ্য কুতুহলী দৃষ্টি বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে কেবলি ওঁর কোলের উপর প্রসারিত সংবাদপত্রে এসে পড়ছিল।

সেই সত্যকালের মুনি-ঋষিদের মত যদি মানুষের দৃষ্টিতে আগুন থাকা সম্ভব হত—তাহলে কাগজখানা কোনকালেই ভস্মস্যাৎ হয়ে যেত! কিন্তু এযে কলিযুগ—

গোধূলির শেষ লালিমা পাহাড়ের শিখরে শিখরে সন্ধ্যারতির পঞ্চপ্রদীপ দেখিয়ে, প্রথমে হলদে, তারপর ফিকে গোলাপী হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল নিঃশেষে। কেবল পশ্চিম আকাশের খানিকটা তখনও সিঁদুরের মত লাল টক্ টক্ করছিল, সে যেন কার দীন মরমের গোপন গভীর ক্ষত,—কত ব্যথা, কত অপরিতৃপ্ত কামনাই সেখানে গাঢ় রক্তের মত জমাট বেঁধে রয়েছে, কি জানি কত যুগ যুগ ধরে।

অন্তদিকে—গম্ভীরা, ধীরা, সন্ধ্যারাণীর শিথিল ধূসর আঁচলখানি অলসে লুটিয়ে পড়ল। গাছপালা ঝাপ্‌সা হয়ে এলো।

কাগজ মোড়ার খস্‌খসানি শুনে ওঁর দিকে তাকাতেই উনি স্মিত প্রফুল্লমুখে বল্লেন—

ভারি সুন্দর লাগছে না?—বাস্তবিক পাহাড়ের 'সিনেরি'গুলো কি চমৎকার! অপরূপ! এইজন্যেই লোকে...

তবু ভাল! এতক্ষণে দেখবার ফুরসৎ হল।

তাড়াতাড়ি বল্লুম—

"সুন্দর জিনিস সুন্দর লাগবেই, সবার চোখে, কিন্তু এত সৌন্দর্য্যের মধ্যে শুক্‌নো কাগজে যার মন মুগ্ধ তন্ময় হয়ে যায়, তার মত আশ্চর্য্য লোক'...

উনি হা হা করে হেসে উঠলেন। হাস্‌তে হাস্‌তে—আমার মুখের পানে চেয়ে সকৌতুকে বললেন—

সৌন্দর্য্য দেখবার মত চোখ চাই রেণু! বুঝলে? তোমার দৃষ্টি ঐ উঁচু নীচু পাহাড়—গাছপালা, ঝরণা নিয়েই। পাথরগুলার মধ্যেও যে সৌন্দর্য্য যে মাধুর্য্য দেখছে,—চোখ ফাটিয়ে অন্ধ হয়ে গেলেও আমি তা দেখতে পাব না। কারণ তোমার মত কবিত্ব বা সৌন্দর্য্য বোধ নেই আমার,—নেহাৎ একটি অরসিক লোক—

শুধু দুঃখ অভিমান নয়—কথাটা শুনে আমার রাগও হল একটু। কবে সেই দু ছত্র কবিতা লিখেছিলুম বা লেখবার চেষ্টা করেছিলুম—তাই নিয়ে এখনো ঠাট্টা!

একটা নিঃশ্বাস নিঃশব্দে ফেলে গম্ভীর হয়ে বল্লুম—

"সন্ধ্যে হল, আর কেন? ফেরা যাক এবার।"

"এরি মধ্যে? আরো একটু ঘুরে"—

"না, ঢের তো হল! আর ভাল লাগছে না।"

বাস্তবিক আর ভাল লাগছিল না। কেমন একটা অলস বিষণ্ণতা, সেই আসন্ন সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা ছায়ার মতই মনকে উদাস মন্থর করে তুলেছিল।

"তাহলে চলো"—

সোফারকে ফিরতে বলে উনি একটা সিগার ধরিয়ে টানতে লাগলেন, তারপর আমার সুদূর-নিবদ্ধ দৃষ্টির অনুসরণ করে বল্লেন—

"পাহাড়ের গোড়া উপর থেকেই দেখতে বেশ, ঠিক

ওর তলে তলে যে 'খদ্'গুলো কি ভয়ানক। একবার পড়লে আর রক্ষে নেই"—

বাস্তবিক, গভীর গিরিকন্দরে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে বড় ভয়ানক দেখাচ্ছিল—যেন রাক্ষসের বিকট হাঁ! মাগো! আপনা-আপনি শিউরে উঠে আমি ওর দিকে একটু সরে ঘেঁসে বসলুম। উনি আমার পিঠের উপর হাত রেখে অনাগ্রহের ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন "কি হল! ভয় করছে নাকি! তাহলে বল্লে না কেন—আগে সকাল সকাল—

"নাঃ, ভয় করবে কেন? তবে একটা কথা মনে এলো—"

"ও!"

কথাটা কি জিজ্ঞ'সা না করে উনি নিভে যাওয়া সিগারটা ধরাতে লাগলেন, অসহিষ্ণু হয়ে বল্লুম—

"আচ্ছা আমি যদি, যদি ঐ খদের মধ্যে পড়ে যাই—তাহলে"—

"সে কি। কেমন করে। মোটর এক্সিডেণ্ট হয়ে।—"

"তা কেন। কেবল আমি, কোনোরকমে যদি দৈবাৎ"

উহুঁ। সে যে হতেই পারে না,—রেণু! পড়তে হলে হুড়মুড়িয়ে সবশুদ্ধই যেতে হয়—"

আমার মুখপানে তাকিয়ে উনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। আমায় ঘনস্পন্দিত ব্যাকুল হিয়ার আবেগ তাতে শান্ত হল না। বরং আরো উদ্বেল হয়ে উঠল। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে বল্লুম—

"ঠাট্টা নয়, সত্যি, সত্যি করে বলো, আমি যদি মরে যাই তাহলে তুমি কি—

"অসম্ভব! তোমার চেয়ে আমি বয়সে ঢের বড়—সুতরাং আমার আগে তুমি কি করে যেতে পারো।"

"কেন। অকাল মৃত্যু মানুষের হয় না কি! আমার ভাগ্যে তাই যদি ঘটে, তুমি তখন কি করবে।"—

"কি মুস্কিল! এ যে তোমার অদ্ভুত প্রশ্ন রেণু! তখন আমি কি করব, না করব, তা এখন সশরীরে বাহাল তবিয়তে তোমার পাশে বসে কি করে বলি বলো। সে তখনকার তখন দেখা যাবে—ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে!"

আমার পিঠ চাপড়ে উনি এবার মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠলেন। সে হাসি আমার অভিমান ক্ষুব্ধ আহত চিত্তে যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধে গেল। চোখ দুটো ছল-ছলিয়ে এলো। ভাগ্যে গাড়ীর মধ্যে আবছা অন্ধকার ছিল—নইলে হয়তো ধরা পড়ে যেতুম। মনের এই দুর্ব্বলতা মাঝে মাঝে কেন যে প্রকাশ করে ফেলি! অনর্থক—

আমার মৌনভাবে—উনি হাসির মধ্যেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

"নাঃ! তুমি এখনো ছেলেমানুষ রেণু! শুধুই ছেলে মানুষ নয়—সেণ্টিমেণ্টেল—নইলে হঠাৎ এমন সব বিদকুটে খেয়াল মনে করে—"একি! গরম জামা গায়ে দাওনি? বলেছিলুম অন্ততঃ হালকা সোয়েটারটা সঙ্গে নিতে...ঠাণ্ডা পড়ে গেল যে! এ পাহাড়ী দেশ—

উনি শশব্যস্ত হয়ে গায়ের ওপর ফেলে রাখা শালখানা আমার সমস্ত গায়ে বেশ করে জড়িয়ে দিলেন—যেন এটুকু ঠাণ্ডা লেগেই আমি মরে যাব!

ইচ্ছে করছিল শালখানা খুলে তক্ষুণি দূর করে ছুঁড়ে, ফেলে দিই—কিন্তু কেন? কিসের জন্য? তা'র বাক্যে, আচরণে নিষ্করুণতায় আভাস মাত্র ছিল না তো বরং...

কিন্তু এতটুকু আবেগ উচ্ছ্বাস, এতটুকু চাপল্যও থাকতে নেই কি? যাতে পিয়াসী প্রাণের অধীর আকুলতা কিঞ্চিৎ শান্ত হতে পারে।

আঃ। আমার গোপন হৃদয় ক্ষত—আবার নূতন করে ব্যথায় টন্‌টনিয়ে উঠল। মনে হল আর কেন যেখানে পাবার আশা নেই, সেখানে বৃথা কাঙালপণা করতে যাওয়া?

স্বামী আমায় গ্রহণ করেছেন গৃহলক্ষ্মীরূপে, প্রেয়সী রূপে নয়।

হায়! দাম্পত্য-জীবনের এই কি সার্থকতা?

এ শুধু দুটী দিনের ঘটনাই বল্লুম, এমনি আরো ছোট বড় কত ঘটনা আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত করেছে,—কত বলব। যাই হোক্ তবু ছিলুম একরকম। দিন-গুলো সুখে না হোক, স্বস্তিতেই কাটছিল; কিন্তু তারপর একদিন অকস্মাৎ যে বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল—উঃ! কি করে বলব নীলাদি। সে কথা মনে হলে আজও

মরমে মরে যাই—সে কথা মুখ ফুটে কেমন করে বলি।

তুমি লিখেছ 'যে কথা মুখে বলতে বাধে তা লিখতে বাধে না কিন্তু কলমও কেঁপে যাচ্ছে যে! মনে হচ্ছে তোমার চির আদরিণী রেণুর এই অতিবড়, দুর্ভাগ্যের ইতিহাস তার নারীত্বের এই লজ্জাজনক লাঞ্ছনার কাহিনী শুনে যদি তুমি তাকে ক্ষমা করতে না পারো, আবাল্যের আন্তরিক বন্ধুত্বের দাবীতেও যদি সে এতটু করুণা কি সহানুভূতি তোমার কাছে না পায় তবে···

তা হোক্, যা বলছি, তা আমাকে বলতেই হবে। আর পারি না—অপরাধের এই গুরুভার এমন করে বুকে রেখে রেখে কতদিন হয়ে গেল—মাস ছয়েক হবে, হা তার কম নয়। তখন বর্ষার শেষ, শরতের আরম্ভ। বাগানের শিউলী ফুলের গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে।

পূজাপোলক্ষে কোর্ট বন্ধ হবে শীগগিরি, তার উপর একটা ভারি মোকদ্দমা এসে পড়েছে, উনি মহা ব্যস্ত।

নিঃসঙ্গতায় আমার অন্তরের দৈন্য যেন আরো বেড়ে গেছে। সেদিন প্রতিবেশিনী মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে পাল' সিনেমায় শিরি ফরহাদের টকি দেখতে গিয়েছিলুম, ইভনিং সো তে, ফিরে এসে দেখি উনি তখনও মোকদ্দমার কাগজ পত্র নিয়ে ঘাড়-গুঁজে—কি মানুষ বাপু! কেবল কাজ আর কাজ! এতটুকু ক্লান্তিও কি নেই? বল্লে খানি হাসেন বলেন—

"পয়সা কি আর অমনি আসে রেণু মণি?"

জগতে পয়সাই যেন সব! আমার সাড়া পেয়ে ক্ষণেকের জন্য মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—

এরি মধ্যে যে? ভাল লাগ্‌ল না বুঝি?"

"এরি মধ্যে? ঘড়ির দিকে চাও দেখি!"

"উঃ! তাইতো দশটা বাজে! আমি টেরও পাইনি—"

"টের কেমন করে পাবে—হুঁস থাকলে তো? খাওয়াও বোধহয় এখনো—"

নাঃ, তা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, খাওয়ার বেলায় আমার হুঁস ঠিক থাকে। তোমার খাবার—"

"আমার ক্ষিদে নেই মোটে। মিসেস্ চৌধুরী কিছুতে ছাড়লেন না, তার উপরোধে পরে আর এক পত্তন চা খেতে হল—"

"তবে থাক্ ক্ষিদের ওপর খেয়ে কাজ নেই। তাহলে তুমি কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ো আমার একটু দেরী হবে"

বলেই উনি আবার কাজে মন দিলেন, এখন কোনো দিকে চাইবারও ফুরসৎ নেই তার! আস্তে আস্তে তার সুমুখ থেকে সরে দাঁড়ালুম। কাপড় তো ছাড়বই—কিন্তু—এই ফিকে ভায়লেট রঙের সূক্ষ্ম বেনারসীখানা উনি নিজেই পছন্দ করে কিনে দিয়েছিলেন। সেদিন এ কাপড়খানা আমায় পরতে দেখে ব্যারিষ্টার গাঙ্গুলী কি সুখ্যাতিই না করেছিলেন! উচ্ছ্বসিত মুগ্ধ কণ্ঠে তিনি একবার নয় বার বার বলেছিলেন "বাস্তবিক্, আপনাকে এ কাপড় পরে কি চমৎকার মানিয়েছে, কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে, কি বল্‌ব? ঠিক যেন পরীদের রাণী!"

আবার আজ মিসেস চৌধুরীও কত তারিফ করলেন, কিন্তু তাতে কি! কাগজের ফুল জীবন-হীন শোভা—

একটা উচ্ছ্বসিত গাঢ় দীর্ঘশ্বাস নিঃশব্দে ফেলে, বেহায়া হয়ে বল্লুম "এত শীগ্‌গির ঘুম আসবে না তো। চলো না, একটু বাগানে গিয়ে বসি, সেই অবধি ঘরের কোণে—আজ এমন সুন্দর জ্যোছনা"

"হোক্, আমার এখন জ্যোছনার শোভা দেখবার সময় নেই রেণু, যা কাজের হিড়িক পড়েছে দেখ্‌ছ তো?"

"থাক্ তাহলে। আমি যাই একটু? যতক্ষণ ঘুম না আসে—"

"স্বচ্ছন্দে! আমি যাব না বলে তোমাকেও যেতে নেই সেকী? আরে!—"

উনি মুখ তুলে আমার পানে চকিতে তাকিয়ে বল্লেন—

"এই তো ঘরের পাশে বাগান, ডাক্ দিলে শোনা যায়, তবু তোমার যদি ভয় করে—

"ভয় কিসের? ভয় আমি পাই না—"

অস্বাভাবিক জোরের সহিত কথাটা বলেই আমি

হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, শুনলুম উনি বলছেন—

"বেশী ক্ষণ হিমে থেকো না রেণু! 'দোরস। সময় একটুতেই"

থাক্ আর টান দেখিয়ে দরকার নেই—গো! ঢের হয়েছে! ঢের হয়েছে! একরাশ অভিমান আর অতৃপ্তির বেদনা বুকে নিয়ে বাগানে চলে এলুম, কেন এলুম কে জানে! অন্তরের মেঘ বাহিরের জ্যোৎস্নায় কাটে কি?

কিন্তু কি চমৎকার কি মধুর জ্যোৎস্নাই আজ হয়েছে! যেন গলানো মুক্তাধারা! কি উজ্জ্বলতা, কি মাদকতা আজকের চাঁদিনী রাতে! চাঁদিনী রাত আমার জীবনে আরো কত বার এসেছে গিয়েছে, কিন্তু এত মধুর, এমন ব্যথা-করুণ, এমন মোহনীয় রাত্রি বুঝি আর কখনো আসেনি! শরতের শুভ্র চাঁদের আলোয় এ কোন কুহকীর কুহক মায়া?

সদ্য ফোটা শেফালীর মধুর সুবাসে রজনীগন্ধার মদির নিঃশ্বাসে বাতাস যেন একেবারে মাতাল!

কিসের একটা অপূর্ব্ব আবেশময় অনুভূতি আমার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয়কে স্বপ্নাবিষ্ট, আচ্ছন্ন করে তুলেছিল।

মুগ্ধ আঁখির দৃষ্টিতে কেবলি ফুটে উঠছিল খানিক আগে দেখা শিরিফরহাদের সুমধুর করুণ চিত্রগুলি। হায়! কি স্বর্গীয় আত্মবিসর্জ্জী প্রেম তাদের! অমন ভালবাসা বুঝি এ সংসারে—না, তা কেন? ও চিত্র তো শুধু কাল্পনিক নয়, একটা সত্যিকার রোম্যান্স্, কবে কি জানি ঘটেছিল কোন্ যুগ-যুগান্তরে ঠিক কবির সরস কল্পনা, শিল্পীর মোহন তুলিকা তাকে অতো সজীব অমর করে রেখেছে। আজও শত সহস্র দর্শকের মুগ্ধ চিত্তে প্রেমের স্বপ্ন ফুটিয়ে চক্ষে ব্যথার অশ্রু ফুটিয়ে বিহ্বল করে তুলছে! প্রেম মানুষকে অমর করে, প্রেম যে অমৃত! এ অমৃতে যে বঞ্চিত তার মত অভাগা—

একটা উতল উচ্ছ্বল দীর্ঘশ্বাস মর্ম্মস্থল বিমথিত করে বুকের উপর ঝরে পড়ল। সে তপ্ত স্পর্শে আমার সাধের মোতির মালা দুলে উঠল।

এই পাটের শাড়ী আর মুক্তোর মালা সেকালে রাজ রাণীদেরও নাকি পরম আকাঙ্ক্ষার জিনিস ছিল। আমি রাণী না হয়েও তা পেয়েছি, তবুও অতৃপ্ত অন্তরের এ কাঙালপণা এতটুকু ঘোচেনি তো! হায়!

ব্যথিত ব্যাকুল হিয়ার তলে আজ একি সুর বাজছে? বেহাগের উন্মাদনাময় করুণ মূর্চ্ছনার মত?

সেই যে, বাদশাহ খুস্রুর প্রিয়তমা বেগম ছদ্ম-বেশিনী শিরির সহসা আত্মপ্রকাশে বিহ্বল বিভ্রান্ত পাষাণের শিল্পী ফরহাদ্ যখন তার মানসী প্রেয়সীর চরণ প্রান্তে সংজ্ঞাহারা হয়ে পরে গেল, তখন রূপের রাণী, রাজার রাণী শিরি, কঠিন শিলাতলে বসে, মূর্চ্ছিত প্রেমিকের শিথিল বাহুতে মাথা লুটিয়ে আকুল পুলকে অসহনীয় বেদনায় ফুলে ফুলে কেঁদে কেঁদে, বেহাগ রাগিণীতে যে গানটি গেয়েছিল সেই সকরুণ বিলাপগীতির অশ্রুভেজা মোহময় মিষ্ট সুরধারা আমায় ভাবাবিষ্ট, স্বপ্নাচ্ছন্ন তরুণ চিত্তকে বিগলিত উদ্বেল করে তুলেছিল। যেমন কণ্ঠ তেমনি গান! সবখানি মনে নেই শুধু দুটী কলি—

"ইশক্ করনা হয় গুনাহ্ ইয়ে মুঝে মালুম না থা।
ইশক্ বাজি কা ইয়ে নতিজা—হায়! মালুম না থা!"*

অকুণ্ঠিত জ্যোৎস্নালোকে,—পাহাড়ী গোলাপ লতার জাফ্রীর ধারে হেলান দেওয়া বেঞ্চের যত্ন প্রসাধিত শ্রান্ত শ্লথ তনুখানি এলিয়ে দিয়ে আমি সেইটুকুনি আবৃত্তি করছিলুম আপন মনে গুণ্ গুণ্ করে।

হঠাৎ কাঁধের ওপর কা'র করস্পর্শ অনুভব করে চমকে দেখি একি? ব্যারিষ্টার গাঙ্গুলি! আমার স্বামীর বন্ধু, এবং আমার একনিষ্ঠ ভক্ত—না না, স্তাবক, এঁর স্তুতি ও গায়ে-পড়া ভাব অনেক সময় আমার আনন্দের না হয়ে বিরক্তির কারণ হয়ে উঠত। তা হলেও ও লোকটা বেশ সদালাপী, সুপুরুষ, মেয়ে মহলে এর বেশ প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু এত রাত্রে নির্জ্জন উদ্যানে ইনি যে কি মতলবে—

শ্লথ বেশ-বাস সংযত করে নিয়ে আমি ত্রস্তে উঠে বললুম। "বাঃ! সুন্দর! অতি সুন্দর! চাঁদের আলোয়

* ভালবাসা যে এত অপরাধ মোর ছিল না জানা
এই ব্যর্থ প্রেমের পরিণাম হায় ছিল না জানা।

আপনাকে আজ কি চমৎকার দেখাচ্ছে মিসেস চ্যাটার্জ্জী! যেন নিকুঞ্জকাননচারিণী বনদেবী!"

বলতে বলতে আমার বলবার অপেক্ষা না রেখেই তিনি আমার পাশে, একেবারে গা ঘেসে বসে পড়লেন। তোমার কাছে মিথ্যে বলব না নীলাদি, মিঃ গাঙ্গুলীর আকস্মিক আবির্ভাব আর তা'র মুগ্ধ কণ্ঠের সেই উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাণী আমাকে এমন অভিভূত করে তুলেছিল যে এক মুহূর্ত্ত আমার মুখে কথা ফুটল না।

"আমি মনে করেছিলুম আপনারা হয়তো শুয়েছেন—"

—না, আপনি যে আজ এমন সময়ে......

কি করি বলুন, শূন্য ঘরে কিছুতেই টিকতে পারলুম না,—এমন ফুট-ফুটে চাঁদনী রাত।

মিঃ গাঙ্গুলীর কথার সুরে সত্যকার ব্যথার আভাস ছিল। বেচারা বিপত্নীক। আমি সহানুভূতি ভরে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম বাধা দিয়ে, আমার পানে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে তিনি মৃদু মিষ্ট কণ্ঠে বল্লেন......

"এমন রাতে...আপনি যে আজ একলাটী...মিঃ চ্যাটার্জ্জী ঘুমিয়েছেন নাকি?"

"না, তিনি...কাজ করছেন।"

"কাজ করছেন? করতে পারছেন তো? উঃ! কি নিষ্ঠুরতা! আপনাকে এমন সময়ে একলা ছেড়ে...

"তাতে কি?...এরকম একলা থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে মিঃ গাঙ্গুলী! সে জন্যে আপশোষ করবার...

"ওঃ! পুওর গার্ল! আই পিটি, আই পিটি ইউ—

মিঃ গাঙ্গুলী...চক্ষের পলকে আমার শিথিল হাতখানি হাতের মুঠোয় চেপে অতি কোমল সহানুভূতির করুণ সুরে বলে উঠলেন "আপনার অবস্থায় আপশোষ করবেন না, এত বড় নির্দ্দয় বোধহয় জগতে আর কেউ জন্মায় নি মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী! আঃ! বলেন কি? এ যে সব থাকতেও বঞ্চিত থাকা! আমার ভারাক্রান্ত মনটা ভিজে আরো ভারি হয়ে গেল। ব্যথিত অন্তরের গোপন গহন তলে উদ্বেল হয়ে উঠল—উনিশ বছরের ক্ষুব্ধ ব্যর্থ যৌবনের নীরব আকুল রোদন।"

হাতখানা টেনে নিতে পারলুম না, একটা আর্ত্ত নিশ্বাস ফেলে মৃদু কণ্ঠে আর্দ্র স্বরে বল্লুম—

কি করা যায়? ভগবান যাকে বঞ্চিত করেছেন—"

"কক্ষনো না! আপনার মত নারীরত্নকে ভগবান বঞ্চিত থাকবার জন্য সৃষ্টি করেন নি, আপনি নিজেই নিজেকে বঞ্চিত রেখে তার সৃষ্টির অবমাননা করছেন, জীবনের উপচে পড়া সুধাপাত্র ঠোঁটের কাছে থাকতে—

মিঃ গাঙ্গুলী আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে, মুখের পানে চেয়ে রইলেন। সেই আবেশময়, চাঁদের আলোয় ঢল ঢল চক্ষু দুটীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে কি সম্মোহন শক্তি ছিল জানি না, যা আমাকে বিশেষ আত্মবিস্মৃত, বিমূঢ় করে তুলে। আমার আপাদমস্তক তড়িৎ স্পৃষ্টের মত শিউরে কেঁপে উঠল, তবু নড়তে পারলুম না।

পারি না, আর যে আমি পারি না রেণু! এমন করে আকণ্ঠ পিপাসায় পলে পলে বুকে শুকিয়ে মরতে...উঃ! তুমি আমাকে দয়া করো, আমাকে...

উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত গাঙ্গুলী বাধা দেবার অবকাশ না দিয়েই চক্ষের পলকে আমাকে ব্যাকুল বাহুবেষ্টনে টেনে নিয়ে—আমায় কম্পিত অধরে...ওঃ! আমি কি তখন পাগল হয়েছিলুম? আমার কি মতিচ্ছন্ন ধরে ছিল সত্যি সত্যি? নইলে তার কি এত বড় স্পর্দ্ধা ...না দোষ আমারি। আমি অপরাধী। সে শুধু মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি তবু পাপ তো বটে! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি জানি না। কিন্তু সেই আমি বুকের মধ্যে তুষানলের জ্বালা নিয়ে তিলে তিলে পলে পলে নীরবে যে যাতনা ভোগ করছি, কি বলব? জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। স্বামীর মুখের পানে আজও চোখ তুলে চাইতে পারি না, তা'র আদর সোহাগ আমাকে আনন্দ দেয় না ব্যথিত করে, অসহ্য ব্যথা!

উনি যখন আমার মুখের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে শঙ্কাকুল স্বরে বলেন—

তুমি দিনের দিন এমন হয়ে যাচ্ছ কেন রেণু? এ দিকে বলো কোনো অসুখ নেই, ডাক্তার ডাকতেও দেওনা, তবে...তখন ইচ্ছা করে ওর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরি! একবার মুখ ফুটে বলি—ওগো! তুমি আমাকে ছেড়ে দেও, আমাকে মরতে দেও, আমি তোমার ক্ষমার অযোগ্য—"

কিন্তু পারি না, বুক ফেটে যায়, তবু মুখ ফোটে না। হায়! ভগবান্ আমার অদৃষ্টে এত বিড়ম্বনাও লিখেছিলেন!

নীলাদি, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু আমার! জীবনের সব চেয়ে গোপনীয়, সব চেয়ে বড় লজ্জার কথা যা এ পর্য্যন্ত স্বামীর কাছেও বলতে পারিনি, কোনোদিন পারবও না, তা আজ প্রথমে তোমাকে জানালুম, দোহাই তোমার! এ কথা কাউকে বলো না, তোমার অর্দ্ধাঙ্গকেও না। শুধু নিজের মনে বুঝে বুঝে বিচার করো আমার এ স্বেচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলুম—এ প্রতীক্ষা ব্যর্থ হবে না আশা করি। ইতি

দুর্ভাগিনী রেণু।

আলিগড়। ১১ই ফাল্গুন।

নীলাদি, ভাই!

তোমার চিঠি পেয়েছি। এ চিঠি নয়, হৃদয়ের অনুজ্ঞা, প্রাণের প্রেরণা। কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্তের একি কঠিন বিধান দিলে ভাই? ওর সাক্ষাতে এ লজ্জাকর পাপ কাহিনী নিজের মুখে ব্যক্ত করবো কি করে পারব? ছিঃ। ছিঃ! জিভ্‌খানা তখুনি আড়ষ্ট হয়ে যাবে যে;

তোমার বিশ্বাসে নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করলে স্বামী আমায় ক্ষমা করবেন, অসম্ভব নয়। তাঁর হৃদয়ে উদারতার অভাব নেই, দয়ার অন্ত নেই। বাড়ীর দাস-দাসী পর্য্যন্ত তাঁর দয়ায় বঞ্চিত থাকে না—সেই করুণা বলেই হয় তো আমার এত বড় অপরাধ মার্জ্জনা করতে পারেন অকুণ্ঠিত চিত্তে, কিন্তু অমন মার্জ্জনা আমি তো চাই না। স্বামীর শ্রদ্ধাপ্রীতি জন্মের মত হারিয়ে শুধু করুণার পাত্রী, অবজ্ঞার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকা...না, না, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। মৃত্যুদণ্ডই আমার পক্ষে প্রশস্ত, কিন্তু সাহস হয় না মরতে, ভয় করে, আর মায়া হাঁা, তাও একটু করে বইকি? লোকে বলে প্রাণের মায়া বড় মায়া। তাতে এই তরুণ বয়সে, জীবনের কোনো আকাঙ্ক্ষাই যে এখনো তৃপ্ত হয়নি আমার। এরি মধ্যে আচ্ছা. ছুটো দিন—ভেবে দেখি, আমার বিবেক কি বলে।

১৭ই ফাল্গুন।

নীলা, লক্ষ্মী দিদি আমার।

তোমার জয় জয়কার হোক। ভগবান তোমার সর্ব্বসুখে সুখিনী করুন, তোমার অশেষ কল্যাণ করুন! আর কিছু বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, আজ, তোমার অব্যর্থ সঞ্জীবনী মন্ত্র মরণাহতাকে নবজীবন দান করেছে। তোমার দয়ায় রেণু তার হারিয়ে যাওয়া হাসি আনন্দ আবার ফিরে পেয়েছে, তোমার পুণ্য আলোয় তার অন্তরের সমস্ত গ্লানিমা কেটে গেছে নিঃশেষে।

থাক্ কাব্য রেখে আগে সেই কথাটাই বলি, যে কথা তোমাকে বলবার জন্ত প্রাণটা আমার আকুলি-বিকুলি করছে। স্বামী আমায় ক্ষমা করেছেন।

শুধু দয়া পরবশ হয়ে নয়, দরদী দয়িত রূপে তিনি হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত স্নেহানুরাগ ঢেলে দিয়ে আমার অনুতপ্ত চিত্তের সকল ব্যথা ক্ষোভ গ্লানি মুছিয়ে দিয়েছেন নিশ্চিহ্ন করে। জীবনে যা কোনো দিন পাবনা ভেবেছিলুম, তা পেয়েছি, শুধু তোমার সৌহার্দ্দ বলে। তোমার স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য।

কি করে কথাটা মুখে আনব, কদিন ধরেই ভাবছিলুম ভেবে কূল পাচ্ছিলুম না। যদিও তুমি সান্ত্বনা, সাহস, ভরসা যথেষ্ট দিয়েছিলে, তবু বলব মনে করে ওর কাছে গেলেই বুকের ভেতর যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ে, গলার কাছে কান্না ঠেলে আসে, বলি বলি করেও বলা আর হয় না। এমনি অবস্থা। প্রাণ যায় আর কি। শেষে আর থাকতে পারলুম না। চুপি চুপি ভরি খানেক আফিমের যোগাড় করে. মন থেকে সমস্ত দুর্ব্বলতা জোর করে ঝেড়ে ফেলে, 'মরিয়া' গোছ হয়ে—পরশু রাত্রে উনি যখন লাইব্রেরী ঘরে পড়া শোনা করছিলেন, তখন তোমার চিঠিখানা ওর কোলের ওপর ফেলে পালিয়ে এলুম।

শোবার ঘরে ঢুকতে সাহস হল না, মনে হল এ যে অনধিকার প্রবেশ। পাশের ছোট কামরাটা কাপড় পরার ঘর,—বিপর্য্যস্ত চিত্ত, বেপথু দেহ নিয়ে সেই অন্ধকার ঘরের মেঝেয় সটান উপুড় হয়ে পড়লুম, কেঁদেই যাওয়া

বুকখানা দুহাতে চেপে ধরে। হৃৎপিণ্ডের ঘন স্পন্দনে যেন নিঃশ্বাস রোধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল—এইবার সব শেষ! দুঃখের শেষ,—সুখের শেষ, অপরিতৃপ্ত তরুণ জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি এখনি হয়ে যাবে। তারপর...যাকে একদিন লোকে রাজরাণী রাজ-সোহাগিনী বলত,—তাকেই দেখে এখন...উঃ। না না, সে লাঞ্ছনা, সে অপমান আমি সইতে পারব না—তার আগেই...আঁচলে বাঁধা আফিমটা হাৎড়ে দেখলুম—ঠিক আছে কিনা, ঐ তো আমার শেষের সম্বল!

শোবার ঘরের ঘড়িতে ঢন্ ঢন্ করে এগারোটা বেজে গেল। চিঠিখানা এখনো পড়া হয়নি কি? ওঃ। কি কষ্টকর দীর্ঘ প্রতীক্ষা এই। এক একটা সেকেণ্ড যেন এক যুগ মনে হচ্ছে। হয়তো চিঠি পড়া হয়ে গেছে এতক্ষণ. এইবার আমার ফাঁসীর হুকুম নিয়ে...ওকি? ও কার পায়ের শব্দ, অন্ধকার ঘর আলো হয়ে উঠল। কে এলো? মুখ তুলে দেখতে সাহস হয় না যে।

যে এলো সে আমার কাছে এসে পরিচিত প্রিয়কণ্ঠে ডাকলে "রেণু।"

সে স্নিগ্ধ কোমল স্বরে বিরক্তি বা তিরস্কারের লেশ-মাত্র ছিল না। তবু মুখ তুলতে পারলুম না। এ পোড়া মুখ কেমন করে দেখাব গো।

পাশে বসে, আমার মাথার ওপর—দরদ-ভরা হাতের স্পর্শ বুলিয়ে উনি ব্যস্ততার সহিত বল্লেন—

"কি আশ্চর্য্য। তুমি এখানে? আর তোমাকে শোবার ঘরে না দেখে এতক্ষণ আমি...

হে দেবতা। তাহলে এখনো আশা আছে? অভাগিনী রেণুকে তোমার এখনো...

সংশয়, সরম, সঙ্কোচ সব ভুলে গিয়ে তাঁর পা দুখানিতে মুখ গুঁজড়ে আমি মরমের রুদ্ধ ব্যথার উৎস মুক্ত করে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলুম

"এ কি করছ রেণু? আহা। পাগল হলে নাকি?"

আমার ভূলুণ্ঠিত লাঞ্ছিত শির কোলের উপর তুলে তিনি গাঢ় স্বরে আর্দ্র কণ্ঠে বল্লেন—"কেঁদোনা রেণু, লক্ষীটী। তোমার চোখের জল আমাকে বড় ব্যথা দেয়..."

"কিন্তু চোখের জল তো আমার এ জীবনে ফুরোবে না, এমনি করে কেঁদে কেঁদেই..."

"কেন কাঁদবে? কাঁদতে আমি দেব কি না?"

পোড়া চোখের জল যেন সত্যি সত্যি অফুরন্ত হয়েছিল আদর করে যত মুছিয়ে দেন, ততই হু হু করে বেয়ে পড়ে। কিন্তু কি আরাম, কি তৃপ্তি সে কান্নায়। স্বামী আমার কাতর হয়ে বল্লেন, "আঃ কি করছ? তুমি যে এত ছেলে মানুষ, তা আমি জানতুম না রেণু।"

এখনো ছেলেমানুষ। হায়। এত বড় অপরাধকে যে ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দিতে পারে—তার মত...

ওর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে—আমি অতি কষ্টে বল্লুম—আমাকে ছেড়ে দাওগো। যেতে দাও,—আমি তোমার ক্ষমার অযোগ্য—"

ক্ষমা তো আমি অনেকক্ষণ করেছি, তোমার বলবার অনেক আগেই—

"সব জেনেও..."

"হ্যাঁ, এতদিন জানালেই হ'ত—তাহলে এত ভোগা-ন্তিক হত না আর।"

"কিন্তু সেই রাত্রির দুর্ঘটনা..."

ওঃ। সে কিছু না—কিছু না, শুধু সেণ্টিমেণ্টালিটি আর মোহ, ওকে বলে—চাঁদনী রাতের নেশা।"

এ কি মানুষ না দেবতা? এতক্ষণ পরে আমি মুখ তুলে চাইলুম—দেখলুম—সেই সৌম্য প্রশান্ত বদনে সেই চিরপ্রসন্ন মধুর হাসি। চোখের জল উদ্বেল হয়ে উঠল, রুদ্ধকণ্ঠে কাতরভাবে বল্লুম—"আমাকে ছুঁতে তোমার ঘৃণা করবে না?"

"কই দেখি? এ মুখে তো ঘৃণা করবার মত কিছুই নেই, শিশির ধোয়া ফুলটুকুর মত..." বলতে বলতে আমার অশ্রুসিক্ত মুখখানা দুহাতে তুলে ধরে সে মুখে পরম আদরে অজস্র ধারে ঢেলে দিলেন তাঁর নিস্তরঙ্গ অতল স্পর্শ প্রেম সিন্ধু মথিত করা অমৃত। আঃ! এ যে আমার আশার অতীত। এমন প্রেমের সাগরকে অপ্রেমিক বলে কি সাংঘাতিক ভুলই করেছিলাম আমি। যাক্, ভুল ভ্রান্তি সব ঘুচে গেছে। আমার অন্তরে আর এতটুকু দৈন্য নেই। তোমার রেণুর জীবন এখন পরিপূর্ণ সার্থক। এই সার্থকতার আনন্দ আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারছি না ভাই, একদিন যাব, শীগ্‌গিরি তোমার পায়ের ধুলো নিতে তখন সবিশেষ...

হ্যাঁ, আফিমের ডেলাটা বুড়ী ভজনার মাকে দিয়ে দিয়েছি, বুড়ী মহা খুসী। আফিম-খোর কিনা? আজ তবে আসি। ভালবাসা নিও—অসীম অনন্ত। ইতি

তোমার আদরের রেণু।

সঙ্গীতকলা

শ্রীআভা গুপ্ত বি-এ

—প্রবন্ধ

পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ অপৌরুষেয় "বেদে" ("বেদ" যে পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ এবং অপৌরুষেয়,—এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাই হোক, তার মধ্যে) চৌষট্টি কলার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এই চৌষট্টি ললিতকলার মধ্যে সঙ্গীতকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হ'য়েচে। গানের পরই নৃত্য; তারপর নাট্যকলা ও চিত্রকলা। অর্থাৎ এই চৌষট্টি ললিতকলার মধ্যে সঙ্গীতকলা, নৃত্যকলা, নাট্যকলা ও চিত্রকলা—এই চতুর্ব্বিধ কলাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গানই হচ্চে চৌষট্টি ললিতকলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা। কেননা এর মত মনমোহিনী শক্তি পৃথিবীতে আর কোনো জিনিষেরই নেই। সুন্দর গান শুনলে যে বিমল আনন্দ পাওয়া যায়, তার তুলনা জগতে নেই। সেইজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েচে—"গানাৎ পরতরং ন হি"—গানের চেয়ে বড় কিছু জগতে আর নেই।

গানের পরই নৃত্যের কথা আসে। কারণ গান ও নৃত্য এই দু'টী কলা মানুষের দেহ ও মনের ন্যায় অতি নিকট সূত্রে আবদ্ধ। এইজন্যই 'সঙ্গীত' কথার সৃষ্টি হয়েচে। সঙ্গীত বলতে অনেকে গান মনে করেন। কিন্তু সঙ্গীতের আসল অর্থ হচ্চে—গান ও নাচ দুই-ই। শুধু এই 'সঙ্গীত কথা থেকেই বেশ প্রমাণ হয়ে যায়—গানের সঙ্গে নৃত্যের কি মধুর সম্বন্ধ আছে। গানের মত নৃত্যেরও অপূর্ব্ব শক্তি আছে। সুদক্ষ নটের অপরূপ নৃত্যে মানুষের মনকে পাগল ক'রে তোলে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেচেন,—"নৃত্য-রসে চিত্ত মম উছল হ'য়ে বাজে"। রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা, তিনি কবি; কবির কল্পনা-মণ্ডিত চক্ষে নৃত্যের অপরূপ শক্তি তিনি ভাষায় প্রকাশ করেচেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নৃত্যকলার যথেষ্ট চর্চ্চা হ'ত। আজকাল এটা একপ্রকার বিলুপ্ত হ'য়ে গেচে। বর্ত্তমানে উদয়শঙ্কর ভারতীয় নৃত্যকলার সাধনা করে পৃথিবী বিখ্যাত হ'য়েচেন।

নৃত্যের পরই নাট্যকলা। নাট্যকলা পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশের সমাজে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। প্রত্যেক সভ্যদেশেই নাট্যকলার যথেষ্ট অনুশীলন হ'য়ে থাকে। রাজা স্বয়ং এই কলাকে সাহায্য করেচেন—এরূপ প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষে এর প্রমাণ আছে। রাজা শূদ্রক নাট্যকলার প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং 'মৃচ্ছকটীক' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেছিলেন। পৃথিবীর বিখ্যাত কবিগণ অনেকেই নাট্যকার। মহাকবি কালিদাস ও সেক্সপীয়ার তার প্রমাণ। কালিদাস শকুন্তলা নাটক লিখে অমর হ'য়েচেন। নাট্যকলার চর্চ্চা ক'রে শিশিরকুমারের যশ আজ সাগরপারে গিয়ে পৌঁছিয়েচে।

নাট্যকলার পরই চিত্রকলার নাম করা যেতে পারে। অন্যান্য কলার ন্যায় এই চিত্রকলাও মানুষের কাছে বিশেষ আদরের জিনিষ। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে এই চিত্রকলার চরমোৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছিল। ইতিহাস বিশ্রুত অজন্তাই তার প্রমাণ। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে অজন্তার পাহাড়ের গা কেটে রং ফলিয়ে যে চিত্র আঁকা হ'য়েচে—আজও তা ঠিক নূতনের মত আছে। ইউরোপের মধ্যে ইটালীতে এই চিত্রকলার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছিল। আমাদের দেশের অবনীন্দ্রনাথ এই চিত্রকলার সাধনা করে আজ পৃথিবী বিখ্যাত হ'য়েচেন। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথও চিত্রকলার সাধনায় মনোযোগ দিয়েচেন।

এই প্রবন্ধে আমার সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং অন্যান্য কলার কথা স্থগিত

রেখে এ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলবার আমি চেষ্টা করব।

সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই শাস্ত্রের কথা এসে পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে চৌষট্টি ললিতকলার উল্লেখ আছে। সঙ্গীত তার মধ্যে একটী বিশিষ্ঠ কলা। এখন দেখা যাক কোন্ কোন্ শাস্ত্রে এই চৌষট্টি ললিত-কলার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

সকলেই চৌষট্টি ললিতকলা বা শিল্পকলার কথা শুনে আস্‌চেন। কিন্তু কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—আচ্ছা চৌষট্টিকলার নাম করুন দেখি—তখন আর তিনি উত্তর দিতে পারেন না। এ বিষয়ে আমাদের দেশে খুব কম আলোচনা হয়েচে। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া দরকার—যাতে সাধারণের দৃষ্টি এদিকে পড়ে।

আপনারা অনেকেই হয়ত বলবেন, শিল্পকলার কথা শিল্পশাস্ত্রেই থাকা উচিত। এ নিয়ে আবার শাস্ত্র ঘাঁটাঘাঁটি কেন? কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্রগুলির পরস্পরের সঙ্গে এমন একটী সংযোগ আছে যে, একটীর আলোচনা করতে গেলে অপরটীতে টান পড়ে। তাই বলছিলাম শিল্পশাস্ত্র ছাড়া হিন্দুর পুরাণগুলিতে ও কামশাস্ত্রে এই চৌষট্টি ললিতকলার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দু পুরাণের মধ্যে "বিষ্ণুপুরাণ" ও "শ্রীমদ্ভাগবত" পুরাণের নাম আপনারা অনেকেই শুনেছেন। ঐ দু'খানি বইয়ে চৌষট্টি কলার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া "হরিবংশে" ও এই ললিত-কলা সম্বন্ধে দু'একটি কথা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু "বিষ্ণুপুরাণে" বা "হরিবংশে এই চৌষট্টি কলার নাম বা কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এই বই দু'খানিতে শুধু চৌষট্টি কলার আভাষ মাত্র আছে। ভাগবতের টীকাকার সনাতন গোস্বামী এ সম্বন্ধে এক ইঙ্গিত মাত্র করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্দের তেত্রিশ থেকে ছত্রিশ শ্লোক পড়লে জানতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম চৌষট্টি দিনে এই চৌষট্টি ললিতকলা শিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু এই চৌষট্টি কলার কোনো নাম বা বিবরণ অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতে নেই। সুদর্শনসূরি, বিজয়রাঘবাচার্য্য, জীবগোস্বামী এই তিনজন টীকাকার ললিতকলা চৌষট্টি প্রকারের বলে ছেড়ে দিয়েচেন। শ্রীধর গোস্বামী "শৈবতন্ত্র" নামে এক অনির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ থেকে চৌষট্টি কলার নাম দিয়েচেন। শুকদেব "বিদ্যা-সংগ্রহ-নিবন্ধ" থেকে চৌষট্টি কলার নাম তুলেচেন। সনাতন গোস্বামী চৌষট্টি কলার উল্লেখ ছাড়া কতকগুলি নতুন কলারও নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে তিনি একটু একটু বিবরণ ঐ সঙ্গে জুড়ে দিয়েচেন। কিন্তু এঁদের পরস্পরের মতের কোনো মিল দেখতে পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধদের "ললিত বিস্তার" নামে একখানি প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক আছে। তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে বোধিসত্ত্ব যত্নের সঙ্গে অনেক শিল্পকলা শিক্ষা করেছিলেন। বিখ্যাত জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বাহাত্তরটী ললিতকলা শিখেছিলেন। বৌদ্ধদের ও জৈনদের কথা ছেড়ে দিয়ে হিন্দুদের কথাই আলোচনা করা যাক।

বাৎস্যায়ন মুনির লেখা "কামসূত্র" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। বইখানি খুব পুরানো—অন্ততঃ দু'হাজার বছর আগেকার লেখা। কেউ কেউ আবার বলেন, বাৎস্যায়ন আর চাণক্য একই লোক। অতএব তিনি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। বিলাতের পণ্ডিত-দের মতে তিনি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কামসূত্র রচনা করেছিলেন। যাই হোক, তাঁর এই বইখানিতে চৌষট্টি ললিতকলার নাম দেওয়া আছে। এ ছাড়া আরও চৌষট্টি রকমের অন্তরকলারও বিবরণ কামশাস্ত্রে আছে। তবে সেগুলিকে শিল্পকলা বলা যেতে পারে না। তাদের নাম "পাঞ্চালিকী"। এই বইখানিতে চৌষট্টি মূল শিল্পকলাকে নানাভাগে ভাগ ক'রে পাঁচশবারটী অন্তরকলাতে দাঁড় করান যায়—এরও উল্লেখ আছে। এই চৌষট্টি ললিতকলার মধ্যে গীত বা গানের কথাই আজ আলোচনা করব।

এই সঙ্গীতকলার বিষয় জানবার অনেক কথাই আছে। আপনাদের কাছে বিশেষ করে এর পরিচয় দেবার কোনো আবশ্যক আছে বলে মনে হয় না। কারণ প্রায় রোজই এই কলাটীর চর্চ্চা আপনারা কেউ না কেউ করে থাকেন। তবে মোটামুটি দু' চারটী প্রাথমিক কথা আপনাদের সকলেরই জানা উচিত—যখন এই কলাটীর আস্বাদন অল্প বিস্তর সকলেই করে থাকেন।

আপনারা ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর নাম শুনেছেন। একটী রাগ থেকে ছ'টী রাগিণীর উৎপত্তি হ'য়েছিল। এইরূপে ছ'টী রাগ থেকে ছত্রিশটী রাগিণীর উৎপত্তি। কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—"বলুন ত' ছয় রাগের নাম কি ও কিরূপে এদের উৎপত্তি হ'ল ?"—তখন অনেকেই বলতে পারেন না। আপনাদের আমি এই ছয় রাগিণীর নাম ও উৎপত্তি সম্বন্ধে জানাবার চেষ্টা করব।

রবিঠাকুর বলেছেন—"মানুষ যখন চিন্তা করতে পারত না, চীৎকার করত; সেই থেকেই হ'য়েচে সঙ্গীতের উৎপত্তি।" কথাটা খুবই সত্য। এই যে চীৎকার, এর দুটো রূপ—সবাণী আর অবাণী। চীৎকারে যখন কথা থাকে না, থাকে শুধু গোঙানি, তখন সে—রাগ বা রাগিণী। এই রাগ বা রাগিণীদের শেষ নেই। এরা অনন্ত, চালিয়ে যেতে পারলেই হ'ল। সভ্যতার আদিমতম যুগে, সে সময় মানুষ যে চীৎকার করত তার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য্য ছিল না। এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্জ্জিত বিকট ভীষণ কোলাহল থেকে জেগেছিল **ভৈরব**। এই ভৈরবই হচ্ছে প্রথম রাগ। কিন্তু এটী পরিণত নয়, কাজেই একটানা, একঘেয়ে।

মানুষ তখন অতটা সভ্য হয়নি যে বাড়ীঘর তৈরী ক'রে বাস করবে। কাজেই সে বনে জঙ্গলে বাস করত। বনে জঙ্গলে বাস করতে হলেই গাছের আশ্রয় নিতে হয় ও তার দরুণ গাছের ডালে দোলন লাগে। এই দোলন খাওয়া জনিত আনন্দ থেকে সহজেই যে শব্দ বা চীৎকার ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যেও জাগ্‌ল একটা দোলনিমা।

চীৎকার থেকে জন্ম নিল **হিন্দোল**। এটী হচ্ছে দ্বিতীয় রাগ। এই ঢেউ খেলানো সুরের আনন্দরসে বুকটা তার উঠ্‌ল নেচে। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটোও উঠ্‌ল কেঁপে। আরম্ভ হ'ল নাচন। নাচনের সঙ্গে সঙ্গে গলাটাও দোলন খেতে লাগল। এই বিচিত্র নৃত্য-পরায়ণ অভিনব চীৎকার ভঙ্গীর নাম **নট-নারায়ণ**। এটী হচ্ছে তৃতীয় রাগ।

তারপর বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যখন চেতনার দিক দিয়ে নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন সে লক্ষ্য করলে, ঋতুবিশেষে প্রাণটা যেন নেচে ওঠে; তখন চীৎকার করতে গেলে গলাটাও কদমফুলের মত কণ্টকিত হয়ে পড়ে। চীৎকারের এই নবতর রূপটীর নাম **বসন্ত**। এটি হচ্ছে চতুর্থ রাগ।

তারপর সম্ভবতঃ একদিন কোনো মানুষ পথ চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। একটু পরেই তার মনে হ'ল যেন তার চোখের সাম্‌নে থেকে একটা পর্দ্দা সরে গেল, সামনে দাঁড়াল দুনিয়ার এমন একটা রূপ যেটা ফুটফুটে গোলাপী। এই স্বপ্নরঙীন রূপটীকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল্ আনন্দের আতিশয্যে। ঐ মোলায়েম চীৎকার, তাতে একটু আবেশ, একটু আলস্য, একটু লীলাবিলাস, একটু জড়িমা। চীৎকারের এই সুঠাম সুন্দর রূপটীর নাম **শ্রী**। এটী হচ্ছে পঞ্চম রাগ।

তারপর ভৈরবের গৌরব, হিন্দোলের দোলনিমা, নটনারায়ণের লাস্যলীলা, বসন্তের শিহরণ, শ্রীর গোলাপী আবেশ—এই পাঁচে মিলে যার জন্ম হ'ল তার নাম **পঞ্চম**—পঞ্চভির্মিলিতে যঃ সঃ। এটী হচ্ছে ষষ্ঠ রাগ। এই রাগ ও তস্য ভার্য্যা রাগিণী হচ্ছে চীৎকারের অবাণী মূর্ত্তি।

এইরূপে ভৈরব, হিন্দোল, নটনারায়ণ, বসন্ত, শ্রী ও পঞ্চম প্রভৃতি ছয় রাগের উৎপত্তি হ'ল। এইবারে সুর, পদ্, লয় ও তাল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

গানের অঙ্গ প্রধানতঃ চারটী—সুর, পদ্, লয় ও তাল। বিশুদ্ধ গান গাইতে হ'লে—আগে এই চারটী অঙ্গ বিশুদ্ধ হওয়া চাই। অর্থাৎ এ গুলি বিশুদ্ধ না হোলো, সে গানকে গানই বলা চলে না। গান রচনা করা, গলা সেধে গান শেখা, রাগরাগিণীর ভেদ বোঝা, নানা রকম সুরের আলাপ, তান, মাত্রা প্রভৃতি ঠিক রাখা, বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী সুরের জ্ঞান—এ সবই এই কলার মধ্যে পড়ে।

সুর সাতটী—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। সংক্ষেপে এদের নাম স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, বা চলতি কথায় সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। শুদ্ধ সুর এই সাতটী। কোমল নিয়ে সুর

বারটা। সাতটা প্রাণীর গলার আওয়াজের সঙ্গে এই সাতটা সুরের মিল আছে বলে শোনা যায়। ময়ূরের কেকাধ্বনি হ'তে ষড়জ সুর নেওয়া হ'য়েচে; এই রকম ষাঁড়ের ডাক থেকে ঋষভ, ছাগলের আওয়াজ থেকে, গান্ধার ক্রৌঞ্চ পাখীর সুর থেকে মধ্যম, কোকিলের সুর থেকে পঞ্চম, ঘোড়ার ডাক থেকে ধৈবত ও হাতীর আওয়াজ থেকে নিষাদ প্রভৃতি সুরগুলি অনুকরণ করা হ'য়েচে। নাক, গলা, বুক তালু, জিব ও দাঁত—এই ছয়টা জায়গা থেকে যে সুর উঠে গলায় ও মাথায় ধাক্কা দিয়ে ঋষভ বা ষাঁড়ের আওয়াজের মত আওয়াজ করে, তার নাম 'ঋষভ'। ঐ রকম নাভি থেকে উঠে গলায় ও মাথায় ধাক্কা দিয়ে যে সুর নাকের মধ্যে সুগন্ধ বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি করে, তার নাম গান্ধার; প্রকৃত সাধক না হ'লে গান্ধারের এই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম গন্ধ অনুভব করা যায় না। নাভিতে যে সুর ওঠে তার নাম মধ্যম। এই সুরটা নাভি থেকে উঠে বুক ও গলায় ধাক্কা পেয়ে আবার নাভির দিকেই ফিরে যায়। নাভি, বুক, হৃদয়. গলা ও মস্তক—এই পাঁচটা জায়গায় যে সুর ঘুরে বেড়ায় তার নাম "পঞ্চম"। ধৈবত সুরের জন্ম ললাটে। ধীমান ব্যক্তিরা এই সুরে গান করেন ব'লে এর নাম "ধৈবত"। আর স, ঋ, গ, ম, প, ধ এই ছয়টা সুর যাতে 'নিষণ্ণ' অর্থাৎ একসঙ্গে মেশান আছে তার নাম "নিষাদ"।

এই সাতটা মূল সুরের মাঝে মাঝে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুর আছে। তাদের নাম শ্রুতি। এই শ্রুতিগুলির নাম পর পর দেওয়া গেল। স হতে ঋর মাঝে তিনটা যথা—(১) দয়াবতী, (২) রঞ্জনী (৩) রক্তিকা; 'ঋ' হতে 'গ' র মাঝে চারটা যথা—(১) বজ্রিকা (২) প্রসারিণী (৩) প্রীতি (৪) মার্জ্জনী; 'মা' থেকে 'প' র মাঝে চারটা যথা—(১) ক্ষতি (২) রক্তা (৩) সান্দীপনী (৪) আলাপিনী; প থেকে 'ধ' র মাঝে তিনটা যথা—(১) মদন্তী (২) রোহিণী (৩) রম্যা; ধ থেকে 'নি' র মাঝে দুটী যথা (১) উগ্রা, (২) নিভা; নি থেকে 'স' র মাঝে চারটা যথা (১) তীব্রা (২) কুমুদ্বতী (৩) মন্দা (৪) ছন্দোবতী। এই ত গেল স্বর।

গ্রাম তিনটা—ষড়জ গ্রাম, গান্ধার গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম। এই স্বর ও গ্রামের চলতি নাম হচ্চে—"সা র গা ম।"

প্রত্যেক গ্রামে সাতটা সুরের ওঠা নামাকে বলে "মূর্চ্ছনা।" সুরের এক একটা টানকে বলে তান। তানের সময় হৃদ্‌যন্ত্রের দ্রুত স্পন্দনের ফলে একটা কাঁপুনি আসে। এই কাঁপুনির নাম গমক। তিনটা গ্রামে মোট একুশটা মূর্চ্ছনা। এ ছাড়া তান প্রত্যেক সুরে সাতটা। সুতরাং সাতটা সুরে মোট উনপঞ্চাশটা তান। কিন্তু ভরতমুনির লেখা নাট্যশাস্ত্রে দু'টা গ্রাম, চোদ্দটি মূর্চ্ছনা ও চুরাশিটা তানের উল্লেখ আছে।

সঙ্গীতে যখন সুকুমারতা ও লালিত্যের অভাব ছিল, তখন তার নাম ছিল ধ্রুপদ। যেমন বিকট, তার বাজনও তেমনি ভয়ঙ্কর। প্রলয় গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সে দানবের মত পা ফেলে চলত। নামগুলোও তেমনি—ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, বীরপঞ্চ, পঞ্চম সওয়ারী, ইত্যাদি।

সঙ্গীত কলা সম্বন্ধে আলোচনা আজ এইখানেই শেষ করলাম।

গান

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বন্ধু! তুমি আসবে বলে দুয়ার খুলে রেখেছি আজ,
কইব বলে সকল কথা, সেরেছি মোর দিনের কাজ।
নীরব নিরজন রেতে, আজ রেখেছি আসন পেতে,
ওগো আমার পথিক সখা। ওগো আমার রাজাধিরাজ।

আজ দিবসের কাজের শেষে শ্রান্ত তনু ক্লান্ত মনে
তোমার আশায় আছি বসি, আঁধার ভরা গেহের কোণে।
এই যে নীরব অসীম কালো,
বন্ধু! আমায় এই যে ভালো,
এরই বুকে লুকাব মোর এই জীবনের যা কিছু লাজ।

প্রতিশোধ

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

—গল্প—

১

সেদিন সান্ধ্যভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, বিকাশ টেবিলের উপর একখানা খামে আঁটা পত্র দেখিল। সে তখনই চিঠিখানা পড়িতে লাগিল।

কাকীমা অনেক কথার মধ্যে লিখিয়াছেন, তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত যাও, কিন্তু তার আগে যাতে তোমার বিয়েটা হয়ে যায় এই আমার ইচ্ছা। আমার বোন্‌ঝি সীতা এখানে এসেছে, সে খবর তোমাকে দিয়েছিলুম। এই চার বছর বাদ সীতাকে দেখছি, এতদিন দেখিনি, এখন দেখছি "সীতা" তোমার উপযুক্ত। দেখতে শুনতে বেশ, লেখাপড়াও একরকম জানে, বেশ কাজ-কর্ম্ম জানে, সংসার বেশ গুছিয়ে চালাতে পারবে। ওকে তোমার অপছন্দর কিছুই নেই। তুমি হয়ত জান, সীতা হিন্দুর ঘরের মেয়ে, তবে আমি বল্‌লে, তোমার মত ছেলের হাতে, ওরা মেয়ে দিতে রাজী হবে; যাক্ তুমি পত্র পেয়েই বাড়ী আসিও। আর যদি ওরা বিশেষ পীড়াপীড়ি করে, তবে হিন্দু মতে বিয়ে হতে আপত্তি কি? আচ্ছা, তুমি বাড়ী এসো, তারপর যা হয় ঠিক করা যাবে।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে বিকাশের মুখ বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। সে কোথায় বিলেত যাওয়ার একরকম ঠিকঠাক করিয়া বসিয়াছে, এর মধ্যে কিনা এমনতর একটা বাধা। কাকীমা অনেকদিন থেকেই বিয়ের কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু সে কথা এতদিন কাণে বড় তোলে নাই, ভাবিয়াছে, ক'নে নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তার নিজের মতটাই প্রবল থাকিবে, এবং যে পর্য্যন্ত না সে তা করে, সে পর্য্যন্ত কাকীমা কেবলই বকিয়া যাইবেন, সেও পছন্দমত কোনও মেয়ে না পাওয়া অজুহাতে কাকীমাকে রীতিমত ফাঁকী দিয়া জাহাজে চড়িয়া বসিবে। কাকীমা যে তার সমস্ত চালটাকে এমনিভাবে বেচাল করিয়া বিয়ের পাত্রী পর্য্যন্ত স্থির করিয়া বসিবেন, বিকাশ এতটা ভাবিতে পারে নাই। তাও যদি কোনও জানাশোনা শিক্ষিতা ষ্টাইলিস মেয়ে হোতো, তবু না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু এ যে একেবারে পাড়াগাঁয়ের হিন্দুঘরের অশিক্ষিত মেয়ে—না জানে চালচলন, না জানে কথাবার্ত্তা কহিতে, তার জন্য আবার হিন্দুমতে বিয়ে।

কেন ওই একটা বিশ্রী মেয়ের জন্য কি দায় তার! কেন সে নিজের মত, এমন কি আশৈশব সংস্কারটা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে যাইবে।

বিকাশের পিতা ও কাকাবাবু ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেও, তার কাকীমা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে কোনদিন সুনজরে দেখিতেন না, ইহা বিকাশ বেশ জানিত। কাকাবাবুর মৃত্যুর পর দেশের বাড়ীতে গিয়া, হিন্দুধর্ম্মের বাতাসে, তিনি যে একজন গোঁড়া হিন্দুবিধবা হইয়াছিলেন, ইহাও বিকাশের জানা ছিল। বংশের ওই একটী পিতামাতাহারা ছেলে বলিয়া কাকীমা তাকে কত আদরে মানুষ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজের মতামত বিকাশকে গ্রহণ করিতে বলেন নাই। আজ কেন যে তিনি অন্যায় অভিযোগ করিতেছেন, বিকাশ তাহা ভাবিয়া পাইল না।

বিকাশের নিঃসন্দেহে ধারণা হইল, কাকীমার যেই না কাজকর্ম্ম, তার দুঃখ বাছিয়া বাছিয়া ঐ সাহায্যকারিণীটাকে আনার একমাত্র উদ্দেশ্য—জোর করিয়া তাকে বিকাশের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। তাই বিকাশের যেমন রাগ হইল কাকীমার উপর, তেমনি রাগ হইল নিরীহ বোনঝিটীর উপরে। আবার ওদিকে কাকীমার অবাধ্য হইলে তার বিলাত যাওয়ার আশা-ভরসা ত্যাগ করিতে

হয়। সে আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিল, এ কিছুতেই হইতে পারে না। বাড়ী গিয়া কাকীমার সঙ্গে যা হয় একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

২

কাকীমার ওপর বিপুল অভিমান ও সীতার ওপর দারুণ বিতৃষ্ণা লইয়া বিকাশ বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাকীমাকে প্রণাম করিতেই, তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "কিরে কেমন ছিলি? চেহারা যে বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্ছে।"

বিকাশ অসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সহিত কেবল, "হ্যাঁ", "না" জবাব দিয়া যাইতে লাগিল। তার অপ্রত্যাশিত ভাবভঙ্গির কারণ নির্ণয় করিতে কাকীমার বিলম্ব হইল না। তিনি মনে মনে হাসিয়া, মনেই বলিয়া লইলেন, "এত রাগ কিসের? আগে একবার দেখ্।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "নে জামা কাপড় ছাড়, একেবারে যে ঘেমে গিয়েছিস্। ও সীতা একবার এদিকে আয় না।"

কাকীমার আহ্বানে সে এখানে আসিবে তার কল্পনা করিতেই বিকাশের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। এ কয়দিন ধরিয়া যতই সে কাকীমার চিঠির আলোচনা করিয়াছে—ততই সে কাকীমার নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। এ যে বিয়ে করিবার অনিচ্ছায় তা নয়, কেবল তার নির্ব্বাচিতা মেয়েটির গ্রাম্যতা ও অযোগ্যতা কল্পনা করিয়া। বিকাশ তার মানসপটের সামনে তার জানাশুনা উন্নত পরিবারের মেয়েদের পাশে যতবার পল্লীবাসিনী সীতাকে দাঁড় করাইয়াছে, ততবারই সীতার হীনতা অতি কদর্য্যভাবে তার কাছে দেখা দিয়াছে, তারপর এই মেয়েটাই ত ধূমকেতুর মত আশান্তরা বিরাট হৃদয়গগনে উদিত হইয়া বিকাশের সারা জীবনটাই মাটী করিতে বসিয়াছে। কাজেই কোন রকমেই বিকাশ সীতাকে সুনয়নে দেখিবার উপযুক্ত মনে করিল না। এখন কাকীমার ডাকে সেই চৌদ্দ পনের বছরের মেয়েটী নেহাত সাদাসিধাভাবে একখানা লালপাড় শাড়ী পরিয়া একেবারে জড়সড় হইয়া কাকীমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, দারুণ ঘৃণাভরে অন্ধ বিকাশ সামান্য একটু কৌতূহল বশে আড়-নয়নে তাহার পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইল, ভালমত চাহিবার প্রবৃত্তিও আর হইল না। বিকাশ যা মনে করিয়াছে তাই তার সামনে উপস্থিত দেখিয়া আরও বিতৃষ্ণ হইল। কাকীমার এই বিষম রুচি বিকারে বিকাশ মনে মনে ঘোরতর অসন্তুষ্ট ততধিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কাকীমা সীতাকে বলিলেন, "লজ্জা কি মা, এ-ই ত আমাদের বিকাশ, যা তাড়াতাড়ি ওর চানের ব্যবস্থা করে দিতে বল।" সীতা নতমস্তকে কাকীমার আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর বিকাশ তার ঘরে বসিয়া আপন মনে তার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য বিষয়ে একটা স্থির আলোচনা করিয়া লইতেছিল। ওই পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে নিয়া যে তার চলিবে না ইহা সে আগে থেকেই জানিত। এখানে আসিয়া সে কথাটা আরও পরিষ্কার বুঝিয়াছে। ওরূপ একটা দুর্ব্বহ বোঝা লইয়া সারাটী জীবন কাটাইতে হইবে, ইহা মনে আনিতেও বিকাশ ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করিয়াছে। অথচ সেই ত কাকীমার মনের মত পাত্রী। তিনি যখন ধরিয়াছেন হয় বিকাশকে তাঁরই কথামত চলিয়া জীবনটাকে ব্যর্থ ও জ্বালাময় করিতে হইবে, নতুবা তাহার বহুদিনের সঞ্চিত অভিলাষটী ত্যাগ করিতে হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া বিকাশ মহাসমস্যায় পড়িল। এমন সময় কাকীমা আসিয়া বলিলেন, "একলাটী চুপ করে শুয়ে কি কচ্ছিস্ বিকাশ? রাস্তায় আসতে শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছে না?" বলিয়াই একখানা পাখা হাতে লইয়া খাটের উপর বেশ জাঁকাইয়া বসিলেন।

বিকাশ এ বসার কারণ বুঝিল, এখনই যে তাকে একটা বিষম পরীক্ষার সামনে উপস্থিত হইতে হইবে ইহা বুঝিয়াই সে তার প্রক্ষিপ্ত মনটাকে একটু গুছাইয়া লইতে লইতে বলিল, "কেমন কিছু না কাকীমা। তবে ভাল লাগছিল না তাই, বলিয়া কাকীমার উদ্দেশ্যটা জানিবার জন্য তার মুখের পানে চাহিল। কাকীমা বলিলেন, "ভাল থাকলেই ভাল, দেখ্ বিকাশ আমি আর কদিন আছি, আজ আছি কাল নেই। চারটে পাশ দিলি, বয়স হল এখন তোর সংসার তুই বুঝে নে এই আমি চাই, এইজন্যই তোকে বাড়ী আসতে এত

করে লিখেছিলাম। এখন কি তোর উচিৎ নয় আমাকে এই সংসার হতে মুক্তি দেওয়া ?"

বিকাশের হৃদয়ে তখন একটা ছোটখাট ঝড় বহিতেছিল। সে কেবলমাত্র একটু ঘাড়টা হেলাইল। কাকীমা তার পানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"তা যাই বলিস বিকাশ এখন তোরটা তোকেই বুঝে নিতে হবে। আমি এমন কথা বলছি না যে তুই বাড়ীতে বসে থাক, বিলেত যাওয়া তোর দরকার নেই। বরং আমি ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা বলি তিনি যেন তোকে দশের মধ্যে একজন করেন, তুই যেন তোর বাপ কাকার মুখ উজ্জ্বল করতে পারিস। তুই বিলেত যাবি সে ত ভাল কথা যাওয়াই ত তোর উচিৎ। তোর কাকাবাবুরও এইরকম ইচ্ছা ছিল তা তিনি অসময় চলে গেলেন।"

একটু থামিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন, "তোকে আমিই বলতাম বিলেত যাওয়ার জন্য যদি তুই নিজে থেকে না উদ্যোগ করতিস। কেননা তোর কাকাবাবুর ইচ্ছা আমি কি অপূর্ণ রাখতে পারিরে!"

বিকাশ শেষের দিকটার ভাবে একটু ভরসা পাইল, বলিল—তাই যখন তোমার ইচ্ছা তবে যাবার বেলায় বাধা দিচ্ছ কেন কাকীমা?

কাকীমা যেন কতকটা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোর বিলেত যাওয়ার বাধা দিলাম কই ? আমি শুধু বলছি, যাওয়ার আগে তোর বিয়েটা করে যাওয়া উচিৎ। এটা যে তোর কর্ত্তব্য এর মধ্যে ত কোনও সন্দেহ নেই। আমি বুড়ো হয়েছি, আমি কি এখন পারি সংসারের দেখাশুনা করতে। আমার পানেও ত একবার চাওয়া উচিৎ! আচ্ছা তা যেন হল,—কিন্তু কথা কিনা—অর্থাৎ আমি সীতার সঙ্গে কেন বিয়ে দিতে চাইচি এই ত? সে তোর ভালর জন্যই বিকাশ! মেয়েটী বড় লক্ষ্মী এই জন্যেই ওকে তোর বৌ করে ঘরে রাখতে চাই। দেখ বিকাশ, আমি ত ব্রাহ্ম-মেয়েদেরও দেখেছি। সকল দিক দিয়ে দেখে আমার ধারণা—এসব ঘরের মেয়েরা ঐ মেয়েদের চাইতে ঘর-সংসার বিষয়ে কিছু ভাল। এরা কাজ নিয়েই থাকতে চায়। আমার বোনঝি বলে বলছি না, আমি ত এ কয়মাস ধরে ওকে পরখ করে দেখছি! এ মেয়ে যেমন রূপে তেমি গুণে। তারপর লেখাপড়াও কিছু মন্দ জানে না। শুধু আজকালকার বাজে আদবকায়দাগুলো শেখেনি বলেই ত মন্দ হয়ে গেল না। বাস্তবিক আমি তোকে বলছি এইরকম মেয়েই আমাদের সংসার গুছিয়ে নিতে পারবে। আমার যা মত, আমি ত তাই বললাম। এখন তুই সবদিক দেখে-শুনে ঠিক করে ভেবে দেখ।

এই সবদিকটা যে কি এবং সেদিকে যে দেখিবার মত কিছু নাই তাহা বিকাশ আগে থেকেই জানে। তার বন্ধুদের মধ্যে যারা বিয়ে করিয়াছে তাদের দুচার জনের স্ত্রীকেও সে দেখিয়াছে। তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অমায়িক স্বাধীন অথচ সুসংযত বাক্যালাপ, তাদের শিক্ষাদীক্ষা চালচলন—কোনও দিক দিয়াই ত সীতা তাহাদের সমকক্ষ নয়! বিকাশের মত শিক্ষিত লোক এই জবুথবু মেয়েটাকে নিয়া বন্ধুপত্নীদের মধ্যেই বা দাঁড় করাইবে কি রকমে। আর সাংসারিক কর্ম্মপটুতা ত এর তুলসী তলায় গড় হইয়া প্রণাম করা—আর ঘরে ঘরে ধূপবাতি নিয়া ঘোরা! বিকাশের বরাবর ইচ্ছা হইল সে কাকীমার মুখের উপরই বলিয়া দেয় এমন মেয়েকে সে কোনমতেই বিয়ে করিতে পারিবে না। বিলেত যাওয়ার জন্য ত নয়-ই, কাকীমার অগাধ সম্পত্তি পাওয়ার লোভেও নয়। এই কথাটা বলিবার অনেক কল্পনা করিলেও, বিকাশের অতটা বিদ্রোহী হইতে ভরসা হইল না। তবু একটু উত্তেজিত ভাবেই সে বলিল, "অত তাড়াতাড়ির কি কাজ কাকীমা, আমি ত আর কাল বিলাত যাচ্ছিনা। একটু ভেবে চিন্তে আমি কলকাতা গিয়ে লিখে তোমায় আমার মতামত জানাব।"

কাকীমাও কি ভাবিয়া সেদিন এ-কথা আর বেশী ঘাটাইলেন না। বলিলেন "তাই দিস্ তবে এটা কিন্তু মনে রাখিস, এ বিষয়ে তোদের চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা ঢের বেশী। এ মেয়েকে বিয়ে করলে যে তোর সুখ-শান্তি খুবই হবে একথা ও বলে রাখলাম। এরকম সুখ-শান্তি তোকে সহরে শিক্ষিতা মেয়েরা দিতে পারবে বলে আমার বোধ হয় না।" আরও দুচার কথার পর কাকীমা উঠিয়া গেলেন।

৩

এর দিন দুই পরে সীতাকে তার বাবার অসুখ বলে বাড়ী লইয়া যাইতে আসিল। এ দুই দিন সীতাকে দেখিলেই; বিকাশ যে ভাবটা দেখাইত, তাহা কোনও রকমেই সীতার কাছে প্রীতিদায়ক ছিল না। সীতা তার মাসীমার আদেশে বিকাশকে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে গেলে, সে নেহাত তাচ্ছিল্যের সহিত কথাটার জবাব দিত, মুখ তুলিয়া সীতার পানে চাহিতও না। বিকাশের কাছে গেলেই সীতার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিত। বিকাশের সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা আরও তার উপরে বিকাশের এই বিরাগ ভাবটা সীতার অজানা ছিল না। দুচার দিন পর সীতাও একটু দূরে দূরেই থাকিতে চেষ্টা করিত। এটাও তাহার নেহাৎ গ্রাম্যভাব মনে করিয়া, বিকাশ আরও বেশী করিয়াই সীতার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

বাড়ী যাইবার সময় মাসীমার কথামত সীতা যাইয়া ঢিপ করিয়া বিকাশকে একটা প্রণাম করিল। বিকাশ সেই প্রথম তার মুখের পানে একটা প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এই দুইদিন সীতার প্রতি কিছু বেশী রুষ্ট ভাব দেখাইলেও,যাইবার বেলায় সে তার মনের গ্লানি অনেকটা দূর করিতে চেষ্টা করিল। আর সীতারই বা দোষ কি ? সে ত আর যাচিয়া এখানে আসে নাই বা বিকাশকে বিবাহ করিবার জন্য তার মাসীমাকে আসিয়া ধরে নাই। তবে কেন সে যাইবার বেলায়ও তাকে অনর্থক কষ্ট দিবে। বিকাশ তার মন থেকে সীতার প্রতি তীব্র বিদ্বেষের অনেকখানি মুছিয়া ফেলিল।

সীতা নতমুখে বলিল,—"আমি এখন যাচ্ছি। আপনি কবে কলকাতা যাচ্ছেন ?"

বিকাশ কতকটা প্রসন্নতার সুরেই উত্তর দিল—এইত আর দুচার দিনের মধ্যেই যাব। এখন কাকীমা যেতে দিলেই হয়।

সীতা একটু দ্বিধার স্বরে কহিল—আপনি ত কলকাতাই যাচ্ছেন ? যদি দয়া করে শ্যামবাজারে আমার বোনের কাছে এই চিঠিটা পৌঁছে দেন, তা হলে বড় আমার উপকার হয়।

বিকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার আর এক বোন সেখানে থাকে, নাকি ?

হাঁ, আমরা যমজ বোন কিনা। আমি প্রায় বাড়ীতেই থাকি আর সে শ্যামবাজারে আর এক মাসীর কাছে থাকে। বাবার অসুখের কথা তাকে জানান হয়েছে তবু জরুরী বুঝে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।"

"এ আর কষ্ট কি ? আমি নিজে গিয়েই দিয়ে আসবখন, রেখে যাও ঐ টেবলের উপর। সীতা চিঠিখানা রাখিয়া আবার একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

বিকাশ চিঠিখানা সুটকেশে রাখিবার সময় দেখিল, বাংলায় ঠিকানা লেখা রহিয়াছে শ্রীগীতা দেবী ব্যারিষ্টার মিঃ সেনের বাড়ী শ্যামবাজার। এরপর যে পাঁচ ছয়দিন বিকাশ বাড়ীতে ছিল,কাকীমার সঙ্গে বিয়ের প্রসঙ্গে বিশেষ কোনও কথা হয় নাই। কিন্তু কলিকাতা যাইবার সময় আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া তিনি বিশেষ রকমে বিকাশকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, সে যেন সেখানে গিয়াই সীতার সহিত বিয়ের মতামত লিখিয়া জানায়। বিকাশও তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া চলিয়া আসিল।

৪

কলিকাতা আসিয়াই বিকাশের মনে হইল সীতার চিঠি শ্যামবাজারে মিঃ সেনের বাড়ী দেওয়ার কথা। সীতার একান্ত অনুরোধ যে ইহার প্রধান কারণ তা নয়। বিকাশ অনেকদিন থেকেই বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ সেনের নাম শুনিয়া আসিতেছিল। তাঁহার সহিত আলাপের কোনও সুযোগ এ পর্য্যন্ত সে পায় নাই। এখন এই পত্র দেওয়ার সময় তাঁর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আসিবে এবং বিলাতের সম্বন্ধেও নানাকথা জানিয়া আসিবে, প্রধানতঃ এই ইচ্ছা লইয়া সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে শ্যামবাজারের দিকে রওনা করিল।

বিকাশ মিঃ সেনের বাড়ীর প্রকাণ্ড ফটকটার কাছে যাইতেই শুনিল, অতি মধুর মেয়েলি সুরে সেই চির সুন্দর গান—

"হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে
কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।"

সেই সুরের লহরে বিকাশের প্রাণ পুলকে নাচিয়া উঠিল। বেয়ারা যখন তাকে লইয়া বৃহৎ হলঘরটায় প্রবেশ করিল তখনও সুরের রেশটুকু মিলায় নাই। পায়ের শব্দে পাশের ঘরের সুবেশা কিশোরী গায়িকাটি মুখ তুলিতেই বিকাশ যেন অকারণে কেমন লাল হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে ইজিচেয়ারে হেলান দেওয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির পানে চাহিল। বিকাশের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে ইনিই ব্যারিষ্টার মিঃ সেন। মিঃ সেন তখন একাকী বসিয়া একটা বৃহৎ চুরুটের সহিত ঐ মেয়েটির গান উপভোগ করিতেছিলেন। অপরিচিত এক তরুণকে দেখিয়া তিনি পরিচয় জানিতে চাহিলেন, এবং বসিতে অনুরোধ করিলেন।

বিকাশ তার পরিচয় দিলে, মিঃ সেন হাসিয়া বলিলেন ওঃ হয়েছে হয়েছে তুমি ত আমার অচেনা নও।" তুমি যখন খুব ছোট তোমায় তখন তোমার কাকাবাবু ও কাকীমার সঙ্গে দেখেছিলাম বটে কিন্তু সে অনেক দিনের কথা কিনা তাই ভুলে গিয়েছিলাম। বেশ বেশ তোমায় দেখে ভারী খুসী হলাম। তারপর তোমার কাকীমা ত বেশ ভাল আছেন?

আজ্ঞে হাঁ তিনি ভালই আছেন আমি আজই তাঁর কাছ থেকে এলাম আপনার বাড়ীতে একখানা চিঠি নিয়ে।

চিঠি? কার চিঠি হে?

আজ্ঞে গীতা দেবীর নামে। বলিয়া বিকাশ চিঠিখানা মিঃ সেনের হাতে দিল। তিনি চিঠিখানি এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে ডাক দিলেন "ও গীতা এদিকে আয়, তোর একখানা চিঠি আছে। এর পরেই যে মেয়েটী আসিয়া ইজিচেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া একটু সলজ্জ মধুর হাসি হাসিয়া চিঠিখানা হাতে লইয়া খুলিতে লাগিল, তাহার লজ্জায় রাঙা মুখখানির দিকে চাহিয়া বিকাশের সমস্ত রক্ত যেন তার সুন্দর মুখখানিতে জমাট বাঁধিল। উভয়ের এই বিবর্ত্তন যেন নেহাৎ অকারণ নয়, তাহা মিঃ সেনের সুপটু চক্ষু আড়চোখে ধরিয়া ফেলিল। বিকাশ মনে মনে তখন দুই বোনের মধ্যে যে কত পার্থক্য তারই আলোচনা করিতেছিল। এর মুখখানা ঠিক সীতারই মত কিন্তু প্রতিভায়, আর প্রসাধনে তাহার চেয়ে কত উজ্জ্বল আর সুন্দর। সীতার মতই এর দেহের গঠন সত্য কিন্তু, কি সুন্দর লাবণ্যে পূর্ণ আর বেশভূষার পারিপাট্যে সেই লাবণ্য কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে। রুচির বিভিন্নতাই যে দুই বোনের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান করিয়াছে ইহা বিকাশ সহজেই অনুমান করিল। এ সুন্দরী কিশোরী যে সীতারই বোন্ একথাটা স্বীকার করিতে বিকাশের মন সায় দিল না।

মিঃ সেন গীতাকে বলিলেন,—চিঠিতে কি লিখেছে রে গীতা?

"বাবার অসুখের কথা লিখেছে তিনি তা সেরেই উঠেছেন।"

মিঃ সেন সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বিকাশকে বলিলেন, —তুমি এখন কি করছ বিকাশ।

"এম-এ টা হয়ে গেছে, এখন একবার বিলেত গিয়ে যা হয় একটা ভাল বিষয় পড়ব মনে করছি। যাবার আগে যে আপনার মত লোকের পরামর্শ উপদেশ পাবার সুযোগ ঘটল এটা আমার মস্ত লাভ। "এখানে আসিয়া বিকাশের যে এর চেয়েও বড় আর একটা লাভ হইয়াছে, তাহা বিকাশ গীতার পানে একটী কটাক্ষ হানিয়াই মনে মনে বলিয়া লইল।

ইতিমধ্যে বেয়ারা চায়ের সেট রাখিয়া গেল। গীতা চা তৈয়ার করিতে করিতে, বিকাশ ও মিঃ সেনের বিলাত ও তথাকার পড়াশুনার সুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে লাগিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়া বিকাশ যেন তার মধ্যেও গীতার কত নৈপুণ্য দেখিতে পাইল। উভয়ে হিন্দুঘরের মেয়ে হইলেও স্বতন্ত্র আবেষ্টনের জন্যই যে দুই বোনের শিক্ষাদীক্ষার এতখানি পার্থক্য তা বিকাশ স্পষ্টই বুঝিল। গীতার চালচলনের অপরূপ ভঙ্গীমায় বিকাশ ক্রমেই মুগ্ধ হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মিঃ সেনের ওখানে থাকিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিল। মিঃ সেনও বিকাশের কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট প্রীত হইলেন। নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিষ্টতার অনুরোধে বিকাশকে সেদিন উঠিতে হইল যখন, মিঃ সেন তাহাকে বলিলেন; "কালকে রাত্রিতে এখানে এসে খেও, বিকালে মোটর পাঠিয়ে দেব।" গীতাও

প্রতিধ্বনির মত বলিয়া উঠিল, কাল কিন্তু নিশ্চয় করে আসবেন। কথাটা বলিয়াই গীতা মিঃ সেনের পিছনে গিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

বিকাশও মনে মনে খুসী হইয়া মিঃ সেনকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। এরপর কয়দিন, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে বিকাশের অনেক সময় মিঃ সেনের বাড়ী কাটিয়া যাইতে লাগিল। এ কয়দিনের মেলামেশায় বিকাশ ও গীতার মধ্যে যে জড়িমার আবরণটুকু ছিল, তাহা ছিন্ন হইল। তাহাদের নানারকমের আলাপের মধ্যে কোনওদিন বা মিঃ সেন ও তাঁহার পত্নী যোগ দিতেন কোনও দিন বা দিতেন না! এই সরল আলাপের মধ্য দিয়া গীতা বিকাশের হৃদয়খানা জয় করিয়া বসিল। বিকাশ যেন তার জীবনটাকে মধুর সুরে বাজাইয়া তুলিল। সে ভাবিল যায় যাক সবআশা, হন কাকীমা বিরক্ত, তবু তাঁর অনুরোধ রাখতে গিয়া সে জীবনটাকে ব্যর্থ করিতে পারে না। তার জীবন সঙ্গিনী হইবে গীতারই মত মার্জ্জিত রুচি সম্পন্না, আলাপে ব্যবহারে, গানে, সুরে, সে তার জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিবে! নিত্য নূতন প্রেম অভিনয় করিয়া সে তার জীবন সরস করে ফেলিবে। দুজনার জীবন হইবে একটা অশ্রান্ত রাগিণীর মত বিলাসে আবেশে পূর্ণ। কেন কাকীমা কি তাঁর এই বোনঝিটিকে দেখিতে পাননি। তিনি কিনা তার গলায় গাঁথিয়া দিতে চান একটা—থাকগে, তিনি তাঁর পছন্দ নিয়াই থাকুন। বিকাশ স্থির করিল সে স্পষ্ট কাকীমাকে ইহার জবাব লিখিয়া দিবে। বিকাশ একয়দিনে গীতার কাছে এসব কথাই বলিয়াছে এমন কি সীতাকে যে তার পছন্দ হয় নাই এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তবে যতটা ঘৃণা সীতার প্রতি ছিল সেটা বলিতে ভরসা পায় নাই। গীতা এ বিষয়ে অনেক তর্ক করিয়াছে কিন্তু তার বিমুখ মনকে বোনটির দিকে ফিরাইতে পারিল না।

সেদিন কাকীমার কাছে সীতাকে বিবাহ করার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া সেখানা পকেটে ফেলিয়াই গীতাদের বাড়ী গেল। সেখানে গিয়া ঐ বিষয় লইয়াই গীতার সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গীতা বলিল দেখুন বিকাশবাবু, সীতা খুবই ভাল মেয়ে, আমি জানি। আপনি যে কেন তাকে বিয়ে করতে অমত করছেন তাত আমি বুঝলাম না। আপনি একটু ভেবে-চিন্তে চিঠি খানা লিখবেন অত তাড়াতাড়ির কি কাজ।

বিকাশ বলিল "দেখুন আপনারা বুঝবেন না, আপনি হলেন অন্য রকমে প্রতিপালিত। আপনার বোন হলেও তার চালচলন দেখে আপনি যে খুঁৎ খুঁৎ করবেন না এবং করেন নি একথা ঠিক করে বলুন ত? অবশ্য আপনার কাছে বসেই আপনার বোনের সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা করে হয় ত আপনাকে ব্যথা দিচ্ছি; কিন্তু আপনিইত এসব আলোচনা কেবল খুঁটিয়ে তুলছেন। আমি সরল ভাবেই সব বলছি অপরাধ নেবেন না!

গীতা হাসিয়া বলিল এতে অপরাধ আর কি আছে। তবে কিনা সকলেই বলে, সীতা আমার চেয়ে বেশী সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি।

সকলে বলুক আর নাই বলুক অন্ততঃ আপনিত আমাকে রোজই বলছেন, কিন্তু এ সকলটাকে তাত আপনার মুখে কোন দিন শুনলাম না।

বিকাশের কথা শুনিয়া বলিল, কত জনের নাম করব, তবে যারা আমাদের দুইজনাকে দেখেছে তাদেরই এই মত বেশ জানি।

তা' বলুক আপনার সকলের পছন্দের আমি একটুও তারিফ করতে পারলাম না। আমি ত দেখছি আপনাদের দু'বোনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

তা হতে পারে বিকাশবাবু, আমি হয়ত ভাল করে একটু টয়লেট করতে পারি আর একটু গান-বাজনা করতে পারি. এগুলো জানে না বলেই যে সীতা একেবারে খারাপ হয়ে গেল তা নয়।

হাসিমুখে বিকাশ—ধরে নিন আমি ওগুলো ভালই বাসি—ও আমার চোখের দোষ।

হাসির সহিত যতটুকু সম্ভব, গাম্ভীর্য্য আনিয়া, গীতা বলিল,—চোখ থাকলে ত তার দোষ হবে, এ কেবল আপনি নন বিকাশবাবু। এ রকম চোখহারারদল আজ-কালকার দিনে অনেকই দেখতে পাওয়া যায়। চোখ যদি থাকে দেখুন ত আমিই আপনার সেই ঘৃণার পাত্রী সীতা

কিনা। যাকে আপনি এ কয়দিন ধরে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা কচ্ছেন।

বিকাশ একেবারে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল, স্তম্ভিত হইয়া বলিল,—তুমি,—এঁ্যা—তুমি সীতা—

আজ্ঞে হ্যাঁ অত চমকাবার কিছু নেই।

চোখ থাকলে প্রসাধন, বেশের পারিপাট্যে বেশী কিছু এসে যায়না, আমার এখানকার নাম গীতা, আর বাড়ীতে সববাই ডাকে সীতা, এই সুবিধাটুকু পেয়েই আমায় ঘৃণা করবার প্রতিফলটুকু আপনাকে বেশ করে দিতে পারলাম।

বিকাশ ধীরে ধীরে অমনস্কভাবে কাকীমার কাছে লেখা চিঠিখানা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

সখীর সান্ত্বনা

শ্রীসুলতা সেন

বাদলে বসিয়া গাঁথিয়াছ ফুল হার
এ মালা কি সখী শুকায়ে যাইতে পারে ?
সাগরেরও পারে রহিলে তোমার বঁধু
এ মালা আজিকে পাঠাবো তাহার দ্বারে।
ওই বাঁধ ভাঙা শ্রাবণ ক্ষ্যাপার সনে,
আকুল অশ্রু ঢালিওনা তুমি বালা
সাগর পারের বন্ধুরে তব আজি
মালা পঁহুছিয়া দিবেরে উর্ম্মিমালা।
যে ফুলের মালা গাঁথিয়াছ আজ তুমি
দলিয়া সিক্ত সুশ্যামল বনতলে
বাঁধিয়া মলিন করিতে দিব না তারে
ধুলায় লুটানো ওই তব অঞ্চলে।
তব বাঞ্ছিত থাকুক যতই দূরে
মেঘের আড়ালে থাকেও যদি সে আজ
তবু তারই গলে পরাইতে এই মালা
উড়ায়ে লইয়া যাইবে মলয় রাজ।

তোমার হাতের সুরচিত মালখাকা,
সাথে লয়ে যাবে তোমার আলিঙ্গন,
বুকে বয়ে নেবে তোমার চোখের চাওয়া
তব অধরের কম্পিত চুম্বন।
দিতে সাধ যদি প্রিয়তমে উপহার,
পথ যদি হয় দুর্গম বহুদূর,
মালা গাছি আমি পাঠাইব নিশ্চয়
উদাসিনী, তব প্রাঙ্গণে বন্ধুর !
আহা—সই যদি তোর মালা হয় বাসি,
অবহেলে যদি ঝরে যায় সব ফুল,
এত ভালবাসা হোয়ে যায় যদি মিছে
তবে জগতের সব বৃথা, সবই ভুল !
জীবন কাব্য রচিছ যাহারে ভাবি
দর্শন তার নাই যদি পাও কভু
তারই উদ্দেশে রেখে যেতে হবে তব
চির জীবনের সঞ্চিত মধু তবু।

পথের সাথী

শ্রীহাসিরাশি দেবী —গল্প—

শ্রাবণের বেলা ;

ঝিমি ঝিমি বৃষ্টির শব্দ ও ট্রেণের শব্দ শুনিতে শুনিতে যে মেয়েটি একটি জনবিরল কামরায় পাশাপাশি জানলা কয়েকটা বন্ধ করিয়া দিয়া কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহার বয়স বেশী নহে সতের হইতে উনিশের মধ্যে; দেখিতে সুশ্রী না হইলেও মুখে চোখে এমন কোমল একটা মাধুর্য্য মাখান আছে যাহার দিকে চাহিলে হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়া যায় না।

সাজ পোষাক বিশেষ কিছু নাই, গায়ে একটা সেমিজ, পরণে লাল পাড় শাড়ী, নীচের হাতে শাঁখা, এবং সিঁথিতে উজ্জল সিন্দুর রেখা তাহাকে আয়ুষ্মতী প্রতিপন্ন করিতেছে।

কোলে একটি মাস কয়েকের সুন্দর শিশু, এবং পার্শ্বে যে ছেলেটি বসিয়া ক্রমাগত ক্রন্দনের সুর ভাঁজিতেছে তাহার বয়স চার হইতে পাঁচের মধ্যে, বড় রোগা, চোখ দুইটা যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহে, গায়ের ময়লা কোট হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, হাতে একখানা আধখাওয়া বিস্কুট। ঠিক এমনি সময়ে ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই যে মেয়েটি আসিয়া উঠিল এবং পূর্ব্বের যাত্রীটির ঠিক সম্মুখের বেঞ্চটি রুমালে ঝাড়িয়া অধিকার করিল, তাহার বয়সও খুব বেশী নয়।

একখানা ঢাকাই কাপড় পেঁচ দিয়া পরা,—গায়ে গহনার বাহুল্য খুব বেশী না থাকিলেও যাহা ছিল তাহা যে মূল্যবান তাহাতে সন্দেহ ছিল না।

তাহার চোখে মুখে যেন হাসির রাশি উছলাইয়া পড়িতেছে। ক্ষণকাল সম্মুখোপবিষ্টার ও তাহার সন্তান দুইটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া—নবাগতা প্রশ্ন করিল—

"কোথা থেকে আসছেন ?"

"আসছি অনেকদূর থেকে ভাই, যেতেও হবে অনেক দূর।"

নবাগতা ইহারই মধ্যে বোধ হয়, পূর্ব্ব-যাত্রীদের এই দশা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, কহিল—

তাহ'লে তো বড় কষ্টই পাবেন দেখছি, বিশেষ এই ছোট ছেলে দুটিকে নিয়ে।

তাহার কণ্ঠস্বরে যেন সমবেদনা ঝরিয়া পড়িল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিল,—

বিশেষ এই ছোট ছেলে। তাতে যাবেন এখনও অনেকদূর। বাপ্ রে; আমি হ'লে তো কখনও পথেই বার হতুম না, তা'তে যে যাই বলুক না কেন!—তা যাক, আপনার সঙ্গে কে কে আছেন? এতগুলি লটবহর নিয়ে যাওয়াও ত বড় সুখের কথা নয়।

কোলের ছেলেটিকে বুকের উপরে ফেলিয়া তাহার কানের উপরে ঘুম পাড়াইবার ভঙ্গিতে মৃদু আঘাত করিতে করিতে খোকার মা ম্লানমুখে উত্তর দিল,—

"আমার স্বামী, তাও তাঁর শরীর তেমন ভালো নয়; নেহাৎ মেয়ের বিয়ে তাই দিন কতকের জন্ম ছুটী নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে।"

"মেয়ের বিয়ে? আপনার?—"

খোকার মার মুখের উপরে সলজ্জ হাসি ভাসিয়া উঠিল। কহিল—

"আমার ছাড়া এখন আর কারই বা ব'লবো ভাই; তবে আমার পেটের নয়, সতীনের। আমার এখন ঈশ্বরের কৃপায় এই দুটিই; আর যে দুটি তার হতভাগিনী মার কাছে এসেছিল, তাদের রাখতে পারিনি, ভগবান ফিরিয়ে নিয়েছেন।"

নবাগতার মুখের উপরে বিস্ময়ের চিহ্ন ভাসিয়া উঠিল; ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া বড় ছেলেটির দিকে চাহিয়া কহিল—

"আহাঃ!"

ছেলেটির সুর ভাঁজা, তখন নবাগতার দিকে চাহিয়া থামিয়া গিয়াছিল, এই সময়ে অসাবধানতার

অন্ত হাতের বিস্কুটটি পড়িয়া যাইতেই পুনরায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল;—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতা সগর্জ্জনে পুত্রের পৃষ্ঠে একটি কিল বসাইয়া দিয়া আরও জোরে চীৎকার করিয়া কহিলেন—

"মরতে পারিসনি হতভাগা। বাঁচবিনে তো জানিই, তবু যে কয়দিন আছিস সে কয়দিনই বা জ্বালাস কেন?"

নবাগতা উঠিয়া আপনার স্যুটকেসটি খুলিয়া ফেলিল; খোকার মার সজল চোখের দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে কহিল "যদি কিছু না মনে করেন তা হ'লে...

তাহার কথার মাঝখানে বাধা দিয়া খোকার মা ভগ্ন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"আর পারিনে ভাই পারিনে—, জ্বালাতন হ'য়ে ম'লাম; এক এক সময়ে মনে হয় গলায় দড়ী দিয়ে সব যন্ত্রণার হাত এড়াই। আর ভালো লাগে না, এ ভারও আর বইতে পারিনে,—মরণ হ'লে বাঁচি। তা পোড়া যমও কি আমাকে ভুলে আছে!"

ট্রেনের বেগ কমিয়া আসিয়াছিল, এই সময়ে ষ্টেশন আসিয়া পড়িতেই খোকার মার গলার স্বর চড়া পর্দ্দা হইতে কোমল নামিয়া ট্রেনের শব্দের সহিত মিশাইয়া গেল; নবাগতা কতকগুলি দামী বিস্কুট খোকার হাতে দিয়া কমলানেবুওয়ালাকে ডাকিল—।

ট্রেন পুনরায় ছাড়িতেই খোকার মা ঘোমটা খুলিল; কহিল এতক্ষণ তো নিজের কথাই পঞ্চমুখে ব'লে গেলাম, কিন্তু তোমার কথা তো জিজ্ঞেস করলাম না! কোথায় নামবে ভাই?"

মেয়েটি হাসিল। কহিল—"বেশী দূর নয়, আর কয়েকটি ষ্টেশান পরেই।"

খোকার মাও একটু হাসিল। কহিল—

"পথের আলাপ হ'লেও ভাই এক এক সময়ে এক এক জনের স্মৃতি মনের মধ্যে বড় দাগ দিয়ে রাখে; আজ আমাদের দেখাইবা কতটুকু সময়ের, তবু মনে হ'চ্ছে যেন অনেকদিনের জানা শোনা আছে। যাক্ গে, তোমার নামটি কি ভাই?

মেয়েটির মুখের হাসি মিলাইয়া আসিতেই আবার একটু হাসিয়া কহিল—

"নামটা কিছু অদ্ভুত, কিছু মনে ক'রোনা ভাই, পাপিয়া।

খোকার মা হাসিল—

"মনে করবার কি আছে! খাসা নামটি তো!—

"হ্যাঁ, ভালো অনেকেই বলে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় ও নামের বদলে যদি 'কালী' 'তারা' কি এমনিতর কোনও নাম আমার রাখা হ'তো তাহ'লে—

কথাটা মধ্যপথে থামাইয়া দিয়া সে জানালার কাচের মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। বাহিরের আকাশ তখন মেঘে ঢাকা থাকিলেও আর বৃষ্টি পড়িতেছিল না; দৃষ্টির সম্মুখে মেঘে ঢাকা আকাশ, জাউষের ধান ভরা ক্ষেত, ও দূর বনরাজি ছায়া-চিত্রের মত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া তাহার স্থানে পুনরায় নূতন দৃশ্য ভাসিয়া উঠিতেছিল। খোকার মা প্রশ্ন করিল—

"শ্বশুর বাড়ী না বাপের বাড়ী যাচ্ছ ভাই?"

পাপিয়া মুখ ফিরাইল; গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল "কারুর বাড়ীই নয়, নিজের বাড়ী।—"

"নিজের বাড়ী? মানে?—

কোলের ছেলেটি বহুক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কথায় কথায় এতক্ষণ সেদিকে খেয়াল ছিল না; এইবার তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া খোকার মা তাহারই পাশটায় নিজেরও একটু শুইবার স্থান করিয়া শুইয়া পড়িয়া কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখোপবিষ্টার মুখের দিকে চাহিতেই সে মুখ ফিরাইয়া পুনরায় বাহিরের দিকে চাহিল, কহিল—

"জানালা কয়টা খুলে দেব? যদি না তোমার আপত্তি থাকে তাহ'লে—"

"না আপত্তি আর কি? তবে কিনা বড় ছেলেটার বড় সর্দ্দির ধাত ভাই, তাই একটু ভয় লাগে।"

একটা বিছানার মোটা চাদর একটি পুঁটলি হইতে খুলিয়া খোকার মা তাহার বড় খোকার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া মাথার উপরেও উঠাইয়া দিল, তাহার পরে শুইয়া পড়িয়া পুনরায় পূর্ব্ব প্রশ্নেরই পুনরুক্তি করিল "নিজের বাড়ী? মানে?"

পাপিয়া মুখ ফিরাইল; ক্ষণকাল খোকার মার কৌতুহল দীপ্ত মুখের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া তরল স্বরে উত্তর দিল—

আমার মা আমার জন্যে অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাই দিয়ে বাড়ী কিনেছি। শ্বশুর বাড়ী নয়—বাপের বাড়ীও নয়।

খোকার মার কৌতুহল নিবৃত্ত হইল না। কহিল—

"বিয়ে হয় নি?"

পাপিয়া উত্তর দিল—

"হয়েছিল ছেটেবেলায়,—স্বামীর কথা, শ্বশুর বাড়ীর কথা মনে নেই।"

খোকার মা সদুঃখে বলিয়া উঠিল—

"আহা! তা এখন কার কাছে থাক?"

"একা!"

"এ...কা? ভয় করে না? বাপরে! তা ভাই তোমার সাহস তো কম নয় ভাই?"

"হ্যাঁ সাহস একটু বেশী আছে বটে।

পাপিয়া হাসিতেই খোকার মা একটু তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল—

"তুমি তা হ'লে বিধবা? কিন্তু আমাদের সমাজে তা বিধবার সাজসজ্জা করা নিষেধ।"

উত্তর আসিল—

"তোমাদের সমাজে তা না চললেও আমাদের সমাজে চলে, তোমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে অনেক প্রভেদ।"

খোকার মা উঠিয়া বসিল, কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—

"তুমি তাহ'লে...'

একটা অসম্পূর্ণ প্রশ্ন তাহার কণ্ঠস্বরে বাজিয়া উঠিতেই পাপিয়া উত্তর দিল—

"হ্যাঁ, আমি তাই...।"

কণ্ঠস্বরে যেন অনাবশ্যক কতকটা জোর ছিল।

খোকার মা যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল,

"ওমা! তা এতক্ষণ বলতে হয়! কি করে জানব যে তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে নও! তা জানলে কি এতক্ষণ আমি···বিস্কুট এবং পাপিয়ার দেওয়া নেবুর কথা স্মরণ হইতেই খোকার মা তাড়াতাড়ি পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিল সে ততক্ষণ সবগুলি উদরস্থ করিয়া দিব্য ভালো মানুষটির মত বসিয়া পাপিয়ার দিকে চাহিয়া আছে;—আর বেঞ্চের নীচে চারিদিকে ছড়াইয়া আছে—নেবুর খোসা, বিচি ইত্যাদি। খোকার মার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। একটা ঠেলা দিয়া কহিল—

"এই হতভাগা জেগে জেগেও ঘুমুচ্ছিস নাকি?"

ছেলে ক্রন্দন ভরা স্বরে চিঁ চি করিয়া কি উত্তর দিল ভালো বুঝা গেল না।

খোকার মা আর কথা কহিল না—বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্ব্বাকে বসিয়া রহিল, আর তাহার সম্মুখে যে নারী মূর্ত্তিটি বসিয়া রহিল, তাহার মুখেও তখন কোন কথা ছিল না, শুধু মুখের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছিল গভীর বেদনার একটুখানি আভাস মাত্র।

... ...

ট্রেণ পর পর কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আর একটা ষ্টেশনে থামিতেই পাপিয়া আপনার সুটকেশটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল;—নামিতে নামিতে একত্রিত হাত দুইখানি একবার ললাটে স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল—নমস্কার বোন্! তোমাদের কথা মনে থাকবে।"

খোকার মা উত্তর দিল না—যখন মুখ ফিরাইয়া ষ্টেশনের দিকে চাহিল তখন প্লাটফর্ম্মের উপরে জনস্রোত যে যাহার গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে দ্রুতপদে চলিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিমলা দেবী

—উপন্যাস—

১

"আচ্ছা সত্যি তুমি আমাকে ভালবাস?"

মুখের জলন্ত চুরুটটা বাঁ হাতে নামিয়ে ধরে খুব সাগ্রহ সুরে প্রশ্ন করে অনিল পত্নীর দিকে চাইল।

রেবা তখন হস্তধৃত ব্লাউসের বাঁহাতটায় সবে রং মিলিয়ে ফুলের কোঁড় তুলতে আরম্ভ করেছিল; একাগ্র মনোযোগে সেইটেকেই পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে একান্ত উদাসীন সুরে বল্লে—

"উঁহুঁ; কে বল্লে?"

মনোযোগটা কিন্তু রইল না; কথাটা শেষ করেই সে মুখ তুলে স্বামীর দিকে চেয়ে কৌতুক ভরে হেসে উঠল। অনিল অপ্রতিভ ভাবে জানলার বাইরে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; রেবার হাসির ঝঙ্কারে ফিরে চাইল,

—"ভারি হাসি হচ্ছে না?"

—"বাঃ রে হাসব না? হাসি কি আমি বাঁধা দিয়েছি?"

—"হু"—অনিল একটুখানি চুপ করে থেকে, নিজেও হাসলে—

—"তুমি মনে কর অপ্রতিভ করতে তুমিই শুধু জান তা কিন্তু নয়, আমিও পারি—ছেড়ে দি, ইচ্ছা করে।"

"আহা কি দয়া। নামটা বদলে ফেল, দয়ার সাগর কি করুণা সাগর এমনি একটা কিছু রাখ, রাখবে?"

অনিল উত্তর দিল না, পত্নীর পর্য্যবেক্ষণস্পৃহা তার নিজের মধ্যেও সংক্রামকরূপে দেখা দিল। সে এক দৃষ্টে জলন্ত চুরুটের দিকে চেয়ে রইল।

রেবা যেন নিতান্ত অনিচ্ছাভরে হাতের সেলাইটা পাশে ফেলে উঠে এল—

—"আঃ কি রাগ করতেই পার। বাপরে বাপ। এমন জানলে কে তোমায় বিয়ে করত।"

—"সত্যি। বড্ড ভুল হয়ে গেছে নয়?"

"গেছেই ত। কিন্তু আরত উপায় নেই। নগেন বাবুকে করলেই হত।"

—"হতই ত। কথা কোয় না আমার সঙ্গে" রেবা রাগ করে জানলার পাশে গিয়ে সরে দাঁড়াল।

অনিল এবার খুব জোরে হেসে উঠল। "কেমন! আর লাগবে আমার সঙ্গে?" রেবা উত্তর দিল না—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনিল চেয়ারের পিঠের দিকে হাত বাড়িয়ে পত্নীকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করল, কিন্তু পত্নীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব দেখা গেল না, তিনি তৎক্ষণাৎ বিকর্ষিতা হয়ে সরে দাঁড়ালেন!

—"উঃ কি রাগ বাস্ রে!"—

—"কথা কোয় না।"—

—"একটাও না?"

রেবা এবার হেসে ফেল্লে,—"এমনি রাগ হচ্ছে আমার।"

—"তা বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু দোহাই তোমার রাগ কোরনা, রাগ করলে তোমাকে আমার মাষ্টারণী বলে ভ্রম হয়।"

—"ভাগ্যিস কথা কইতে শিখেছিলে।"

—"নইলে?"

—"নইলে অনেক ইতিহাসই উল্টে যেত।" বলে রেবা বেরিয়ে গেল।

অনিল আপন মনেই একটুখানি হাসলে—তারপর আস্তে, আস্তে, আপনার হস্তচ্যুত অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটের সদ্‌গতি করতে মন দিল।

২

অনিলের পিতা অনন্তকুমার সান্যাল, বিরাট পুরুষ, বিরাট গোষ্ঠী। পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন; বোনেরা সবাই নিজের নিজের সংসারে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। অনন্তবাবু জ্যেষ্ঠ, স্ত্রী অন্নপূর্ণা, তিন ছেলে, এক মেয়ে, জ্যেষ্ঠ অনিল বিবাহিত, আর দুটী এখনও কলেজে পড়ে, মেয়ে সকলের

ছোট, সকাল বেলায় পিঠের ওপর বেণী দুলিয়ে বাড়ীর গাড়ীতে করে ইস্কুলে যায়।

অর্থবল, লোকবল, মান, সম্ভ্রম, অনন্তবাবুর সবই অনন্ত।

এক বাড়ীতে বাস, এক হাঁড়িতে অন্ন। এ যুগের সঙ্গে, ওদের বিরোধ নেই, কিন্তু বিভেদ আছে।

বুড়ো কর্ত্তারা পাঁচ ভাই, বৈঠকখানায় ফরাসপাতা বিছানার ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক টান্‌তে টানতে আরামে গল্প করেন।

কলেজ যাত্রী ও কলেজ ফেরতারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সাধিত ড্রয়িংরুমে চা-চুরুটের ধূমের সঙ্গে অর্গানের সুর তোলেন।

স্কুল-যাত্রীরা, সরকারি পড়ার ঘরে আবহমানকালের নিয়মানুসারে চিনেবাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বিশ্বচকিত সুরে পড়া করে R—a—m = Ram, Ram মানে ভেড়া। A sly fox met a hen ;—

মেয়েদের মধ্যে আশ্রিতাদের কমিটি বসে ভাঁড়ারের সম্মুখে; রান্নাঘরের মধ্যে। কর্ত্রীদের বসে সৌখিন বাসন মিষ্টির ভাঁড়ারে, শোবার ঘরের বারাণ্ডায়। বধূদের বসে ছাতে, নিজেদের ঘরে।

সন্ধ্যায় কর্ত্তারা খান শ্বেত পাথরের গেলাসে করে, বেলের, ঘোলের সরবৎ, ছেলেরা খান রূপার ট্রেতে বসিয়ে চা বিস্কিট; গিন্নিরা মিষ্টি মুখে দেন, বধূ ও কন্যার দল চা ও খান, মিষ্টিও খান, সরবতেও বাদ পড়েন না।

কর্ত্তারা পরেন বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ধুতী, হাত কাটা ফতুয়া। ছেলেরা পরে, শান্তিপুরী, ঢাকাই, সৌখীন ধুতী, গরদের মটকার পাঞ্জাবী, বিলিতি সুট।

গিন্নিরা পরেন ঝাঝা হাতের সেমিজ, চওড়া পাড় শাড়ী।

বধূ ও কন্যারা দুটো সাজেরই এটা-ওটা নেন, আলতাও পরেন, চটিও পায়ে দেন।

স্বামী, ভাসুর, দেবর, ননন্দা সম্মিলিত 'পিকনিকে'ও যোগ দেন, আবার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীদের শেতলষষ্ঠির আমন্ত্রণেও বাদ পড়েন না।

পরস্পরের মধ্যে ওদের মতের মিল নেই, সামঞ্জস্য আছে। কালো, সুন্দর, লম্বা, বেঁটে, যেমন পাঁচটি বিভিন্ন রূপ, তেমনি বিভিন্ন মতবাদ, তবু ওরা স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। ওদের হাতে ছুরী, কাঁচি, নেই, আছে সূচ সুতা, যেখানেই ছিঁড়ে যায় চট করে রিপু করে নেয়।

প্রধানা কর্ত্রী অনন্তবাবুর স্ত্রী, সংসারের চাকাখানাকে তিনিই মেরামত করেন, আর সবাই ঘোরায়।

তিনি নির্ব্বিবাদী মানুষ, বোঝেন সব, বলেন না কিছু। আপন পথে চলে যান। তর্ক করেন না, সায়ও দেন না, চুপ করেই থাকেন।

হিন্দুধর্ম্মে তাঁর ঘোরতর নিষ্ঠা। রবিবারে নতুন কাপড় পরা, বুধবারে পোড়া খাওয়া, বৃহস্পতিতে তেত, জলপড়া, তেলপড়া হাজারো সংস্কারের, সহস্র শৃঙ্খলে, তিনি আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্দী। শয্যাত্যাগের পর শয্যাসম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ সতর্কতা। কিন্তু সবই নিজের মধ্যে গণ্ডিটানা; তাঁর সাধারণ, অসাধারণ নিষ্ঠা সংসারকে অভিযোগ করে, অভিসম্পাৎ দেয় না, অতিক্রম করে আশীর্ব্বাদ করে।

মেজ গিন্নির মেজ মেয়ে স্কুল থেকে এসে চট করে বিছানার ওপর লম্বা হ'য়ে পড়ে। আলগোছে জলখাবারের রেকাবী নামিয়ে বলেন—"আহা ছেলে মানুষ; খিদেয় মুখ-চোক কালী হ'য়ে গেছে। কাপড় কেচে—ঠাকুর ঘর থেকে সত্যনারায়ণের পেসাদ আছে নিসরে।"

তাঁর সকল বিষয়ে শুচিতা আছে, নেই কেবল শিশু সম্বন্ধে। বৌমাদের ছেলেরা জুতো পায়ে টলমল করে ঠাকুর ঘরে ঢোকে, অস্পৃশ্য পাদুকা স্পৃষ্ট থেকে যেখে বাঁচিয়ে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ঢোকেন, তর্জ্জনরতা মায়েদের দিকে চেয়ে হেসে বলেন—"এ-ও ঠাকুর ও-ও ঠাকুর তাতে দোষ নেই।"

— ৩ —

বাড়ীর মধ্যে বড় ছেলে অনিল, বড় বৌ রেবা।

মেজ কর্ত্তার তিন ছেলে বিবাহিত, তিনটী মেয়ে পড়ে।

সেজ কর্ত্তার এক ছেলে এক মেয়ে, মেয়েটী বড়, বিয়ে হ'য়েছে, ছেলে কলেজে পড়ে।

ন কর্ত্তার চার ছেলে, চার মেয়ে সবাই এখনও ছোট।

ছোটর সবে হয়েছে একটী মেয়ে, মাস দশ বয়েস, শুয়ে শুয়ে হাত পা ছোঁড়ে, মাঝে মাঝে হামা দিয়ে জ্যেঠাইমার ঠাকুর ঘর আক্রমণ করে।

অনিলের ছেলে একটী, ঠাকুমার ঠাকুরের প্রসাদ ভাগ নেয়।

সেজ কর্ত্তার ছেলে জিতেন অবিবাহিত, কলেজে পড়ে, অবসর সময় বৌদিদিদের ক্ষেপিয়ে দেয়! বৌমারা কর্ত্রীর কাছে নালিশ করেন—"ঠাকুরপোর! এবার বিয়ে দিন মা!"

অনিল সবারি বড়, কেমন আলগা স্বভাব, আল-গোছ ভাব। চুল আঁচড়াবার সময় চিরুণীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে সে প্রত্যহ যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করে। খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে শুতে গিয়ে অতর্কিতে শয্যার মধ্যে থেকে তাকে আবিষ্কার করে। রেবা গোছাল ধারাল ও। স্বামীকে এই নিয়ে সে অষ্ট প্রহর চব্বিশ ঘণ্টা অভিযোগ করে।

এসট্রের দূর অবস্থিতির দোহাই দিয়ে চুরুটের ছাইটা অনিল মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাতেই ঝেড়ে ফেল্লে।

রেবা আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সিঁদুরের টীপ পরছিল, ফিরে চেয়ে অতিরিক্ত বিস্ময়ের সুরে বল্লে—"ওটা কি হ'ল?"

শীতকাল, গায়ে শাল জড়িয়ে কোলের মধ্যে বই রেখে বসে বসে অনিল পড়ছিল। মুখ না তুলে বল্লে—

—"কোনটা?"

—"কোনটা? চেয়েই দেখ না!"

অনিল চাইল, কিন্তু কৃতকর্ম্মের দিকে নয়, পত্নীর মুখের দিকে; ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস খেলে গেল—

"বাঃ! বেশ দেখাচ্ছে।"

রেবা এবার সত্যিই চটে গেলে, বল্লে—

—"আমি যেন আমাকে দেখবার জন্যে বল্লাম।"

—"বলনি তবে!"

—"যাও সব সময় ঠাট্টা!"

—"তাইত ভারি অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা এবার খোট্টা হয়েছি বল।"

"—কি আবার বলব!"

—"তা' কি জানি, বলছিলে যে।"

—"বলছিলাম চুরুটের ছাই ফেলবার কাজটা যখন বিজ্ঞাপনেই চলে যায়, তখন আর এসট্রের হ্যাঙ্গামা কেন।"

—"বাসরে! এই! আমি ভাবলাম না জানি কি!"

অনিল হাসলে,—

—"অন্ততঃ ভেবেছিলাম বলবে—"

—"পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি?"

—"অতটা না হোক, কাছাকাছি বটে!"

—"আচ্ছা হয়েছে, ভাগ্যিস কথা কইতে শিখেছিলে!"

রেবা বেরিয়ে যাচ্ছিল, অনিল সেই দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

—"উঠিতে কিশোরী
বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়ন তারা—"

— ৪ —

—"আচ্ছা বড়দি দেখত ভাই, এই পচা কাপড়ের দাম, সাড়ে পাঁচটাকা গজ! তিন টাকা আড়াই টাকা করে হয়ত নিতে পারি না বড় দি।"

মেজ বৌ সুষমা ডেকে বল্লে।

রেবা বেরিয়ে এল, হেসে বল্লে—

"নিতে ত বিনামূল্যেও পারি, দিতে পারি কিছু বলছে?"

—"ছাই বলছে! ঐ ত সব খোট্টাই-মোট্টাই বুলি ওর, বুঝিও না ছাই। আর চেহারা দেখেছ, ঠিক যেন মর্কট!"

—"যা' বলেছিস মেজ বৌ, লাখ কথার এক কথা! জামাই করবি না কি?"

রেবা হেসে উঠল।

মেজ দেবর নীরেশ বেরিয়ে যাচ্ছিল, বল্লে—"জান না বৌদি, চেহারারও ত একটা দাম আছে, দেখতে যদি মানুষের মত হ'ত, না হয় দুটো টাকা ওর মাপ করা চলত; কিন্তু মর্কটের মত রূপে—অসম্ভব—গিন্নি আমার দূরদর্শী আছেন।"

চেহারা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা সুষমার একটা মুদ্রা দোষ, কথার মাত্রা! স্বামীর মন্তব্যে

অপ্রস্তুত সে বোধ করল, কিন্তু দমল না, বল্লে—"দূরদর্শী ত বটেই, তোমাদের মতন!"

—"আমরা আবার কবে কি করলাম!" নীরেশ চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল! "তোমার চেয়ে সুন্দর আমি ভুলেও কখন কাউকে বলেছি! কারুর রূপ সম্বন্ধে দুঃশ্চিন্তা প্রকাশ করেছি? কই বল, চুপ যে! একদিন শুধু জান বৌদি ভুলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, নন্দ ঘোষের পঞ্চম পক্ষ সুন্দরী বটেন! তিন দিন কথা কননি—"

—"আবার—"সুষমা রেগে উঠল।

—"আহা রাগ কোরছ কেন? কিই বা তোমায় বলেছি।"

—"কবে আমি তোমার সঙ্গে তিন দিন কথা কইনি শুনি!"

—"কবে তাকি আমার মনে আছে যে তারিখ দিয়ে বলব! কথা কইছ, কইছ, না কইতে কতক্ষণ! ধর আজই যদি বলি দেখে এলাম—"

—"অপ্সরা কি কিন্নরা! বলবে বল না আমারত বড় বয়ে গেছে! আচ্ছা বাইরে যাও ত আমাদের কাজ আছে।"

—কাজ ত কতকগুলো টাকা নষ্ট করা! দোহাই বউদি কিন না বুঝলে, বিশ্রি চেহারা লোকটার, দেখেছ ত!"

—"আচ্ছা বকুনি রেখে বাইরে যাবে?"

—"কোথায় রাখব?"

সুষমা তাড়া দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল, কিন্তু বিক্রেতার ডাকে অপ্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়ে গেল।

ওদের সংসারের চাকাটা সহজ সম্বন্ধেই ঘুরে চলেছিল। গোল কিন্তু বাধল। কর্ত্তাদের সেজ বোন তরঙ্গিনী অকস্মাৎ সংসারের শোকতরঙ্গে অবিশ্রান্ত দোলা খেয়ে এসে পড়ল অনন্ত বাবুর সংসার তটে।

যেন মূর্ত্তিমতী অসামঞ্জস্য, শ্রীমতীদের মাঝখানে শ্রীহীনা নারী! সংসারের মাঝখানে নিঃশব্দ আতঙ্ক!

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে—ও যেন উত্তর হারা প্রকাণ্ড একটা প্রশ্নের চিহ্ন!

তরঙ্গিনীর ছেলে দুটী, মেয়ে একটী। দুটী ছেলে বাপের কোলেই গেছে, মেয়েটি মায়ের কোলে আছে; মা আড়ষ্ট হয়ে ভাবে—"ওকি আমার কোলে যাবে!" ও থাকবে তার বুকের মাঝে, একান্ত হয়ে সে বিশ্বাস আর হয় না।

শুনলে চোখে জল ভরে আসে, প্রলাপ যেন। তেতলার প্রান্তের ঘরে রৌদ্রোজ্বল মধ্যাহ্নে দূরে বহুদূরের আলো ছায়ায় আলিম্পন আঁকা, শ্যাম বনানীর দিকে চেয়ে পল্লবের মর্ম্মর রব শোনে। মেয়ের দিকে চাইলে আশা আর হয় না, শুধু মধ্যাহ্নের নিবিড় স্বপ্নে কেমন করে একটা সোনার রেখায় পায়ে চলা পথের চিহ্ন মেলে! নিজের হারানো দিনের আভরণে সাজিয়ে কোলের কাছের ঘুমন্ত মেয়ে মঞ্জরীকে সেই পথে পাঠিয়ে দেয়, মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকে!—

"ওরে মঞ্জু খোকা কাঁদছে যে। 'বামুন ঠাকুর ডাকছে কখন থেকে' 'জামাই ফিরবেন এখুনি কি নাম হ'বে জামাইয়ের! রমেশ! ছাই। যোগেশ! পুরোন। সুকুমার! তাই থাক। অত বড় নাম? ছোট করা যায় না! কি করে ছোট হ'বে! সুকু! কুমু! না! সুকুমারই বেশ।" ঘুমন্ত মেয়ে ঘুমের ঘোরে কেঁদে ওঠে, স্বপ্ন ভেঙে যায়, মুগ্ধভাব কাটে না।—"ষাট ষাট" বুকের কাছে মঞ্জরীকে টেনে নেয়।

দিন কেটে চলে, অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, আশাতীত স্বপ্নে রাঙা হয়ে!

রেবা এসে দ্বারের কাছে দাঁড়ায়,—

"পিসিমা কাল তোমার একাদশী?"

মন যেন চমকে ওঠে, চঞ্চল হয়ে নিরাশ্রয় নয়ন চারিদিকে চেয়ে কি যেন ধরতে চায়! উচ্ছ্বল কান্না ঠেলে আসে, মনে হয়—"কেন বলে ওরা অকল্যাণ হয় যে, বোঝে না।" ওযে পথিককে বুকের মাঝে বন্দী করে ভুলতে চায় সে পথিক। অন্যমনে আপন অজ্ঞাতেই নিরাভরণ হাতখানা ললাটের ওপর ঘুরে এল! আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল "হ্যাঁ"

— ৫ —

পূজো এসে পড়ল, পূজোর কাপড়ের প্রকাণ্ড পোঁটলা মাথায় দুপুর বেলায় পাঁচী ঝি এসে তরুণী সভায় হাজির হ'ল—"এই নাও গো পছন্দ কর, বাবু পাঠিয়ে দিলেন।"

পোঁটলা নামিয়ে সে পাশে বসে দুই হাত দিয়ে পা দুটোকে ধরে বাড়াবাড়িরকম দলন-মলন আরম্ভ করে দিল। কন্যার দল হেসে উঠল, "দেখেছ বৌদি পেঁচোর কাণ্ড যেন কতদূর হেঁটে এল!—

"হেই দিদি ঠাকরুণ অমন কথাটী বলুনি বাছা, পূজোর কাপড়ত নয় সারা বাজার মাথায় করে নিয়ে এনু।"

তাসের আড্ডা চলছিল; মেয়ের দল আনাড়ি সব. রেবার তাড়া দেওয়ার আর বিরাম নেই, সেজ ননদ মাধবী রেবার সঙ্গিনী হয়ে বসেছে। রেবার টেক্কার পিঠে দুম করে এক তুরুপ দিতেই ঘরশুদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠল, পাঁচী ঝি এতক্ষণ উদাসিনী ভাবে চেয়েছিল তাসের 'মর্ম্ম' সে 'বোঝেক' নাই বাছা। কিন্তু এমন অঘটন ঘট্‌তে দেখে সে ও উঁচু হ'য়ে উঠে বসে এমনি ভাবে রেবার দিকে চাইল, মনে হ'ল রেবা যেন দেউলে হয়ে গেছে!—

"দূর মেয়ে দেখছিস তোদের পিঠ যাচ্ছে—দুম করে রং দিয়ে বসলি কেন?" অপ্রস্তুত মাধবী নিরুপায় হ'য়ে সবারি মুখের দিকে চাইতে লাগল, কেন যে দিয়েছে সে কথা আর বলে হ'বে কি? মনে মনে আপশোষের আর অন্ত নেই! তাসের যদি চলৎশক্তি থাকত, অনেক দুঃখেই মাধবীর মনে হয়!

কিন্তু ভাব্‌বার সময় ছিল না, পাঁচী ঝি তাড়া দিল—"নাও বাছা, দেখে শুনে নাও সব; আমার আবার ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে!"

—"তা তুই যানা, তোকেত কেউ বসে থাকতে বলেনি।"

—না তা' কেউ বলেনি, আর বল্লেও যে পাঁচী ঝি কাজ ফেলে নিঃশব্দে আদেশ পালন করে এমন দুর্ণাম তার শত্রুতেও দিতে পারবে না। পাঁচী নিজের ইচ্ছাতেই বসে ছিল মনের অদম্য কৌতুহল তাকে নড়তে দিচ্ছিল না। পূজোর সময় তার কাপড় আর কি! একখানা সাধারণ বইত নয়! কিন্তু প্রকাণ্ড পোঁটলার মধ্যে বন্দী অবস্থায় যে সব নানা বর্ণের শাড়ীর আভাস দেখা যাচ্ছিল, পাঁচীর পক্ষে তারা নববধূর মুখ দেখার পূর্ব্বে অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে তার দুটি চোখের কাজল দৃষ্টির চাওয়ার মতই কৌতুহলোদ্দীপক হ'য়ে উঠেছিল। সুতরাং মাধবীর মন্তব্যে সে নিজের স্বভাবসিদ্ধ মুখ বাঁকিয়ে না উঠে, অস্বাভাবিক ভাবে হেসেই ফেল্লে—"তা, খোলই না কেনে বাবু আমি ও দেখে যাই।"

—"দাঁড়া দাঁড়া আসছি, যা' তুই পিসিমাকে ডেকে আন গে দিকিন-ততক্ষণ।"

তাস ফেলে রেবা উঠল।

মাধবী বল্লে—"হ্যাঁ বউদি, পিসিমা কি করবেন!"

—"সাড়ী পছন্দ করবেন"

মাধবী অনেকখানি হ্যাঁ করেই রেবার দিকে চেয়ে রইল। ক্ষেপেছে নাকি! না ঠাট্টা! ও!

—"তোমার দিনরাত্তির শুধু ঠাট্টা!

—"ঠাট্টা কিসের?"

রেবা অবাক হয়ে ননন্দার দিকে চাইল। মাধবীর সহজ নিঃশ্বাসটা আবার ভারি হ'য়ে উঠল, গলার সরু হারটাতে ক্রমাগত গেরো দিতে দিতে সে বিস্মিত হ'য়ে রেবার দিকে চেয়ে রইল!

এতদিন পর্য্যন্ত পিসিমার রুচি সম্বন্ধে তার মনে করুণার অন্ত ছিল না, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বৈধব্য যোগ না ঘটলে পিসিমা তাঁর অপরূপ মেটো সেমিজটার ওপর একটা গাঢ় গোলাপী রংয়ের লেশ দেওয়া সাটীনের ব্লাউজ পরতে মুহূর্ত্ত দ্বিধা করতেন না! মুখ দিয়ে বেরিয়েই এল—"পিসিমা পারবেন না।" ঠিক সেই সময় তরঙ্গিনী এসে ঘরে ঢুকল। মাধবীর মন্তব্য কানে এসেছিল, তরঙ্গিনী থমকে দাঁড়াল।

মাধবীর মুখে বিস্ময় আর অপ্রসন্নতার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে!

ফিরে যাবার পথ ছিল না, তাই এগিয়েই এল, বল্লে—"আমায় ডেকেছ বৌমা?"—

"পূজোর কাপড় এসেছে দেখত পিসিমা পছন্দ করত।"

পিসিমা পাশে এসে বসল।

সুষমা বল্লে—"বাবা পূজোর কাপড় ত নয় যেন বাজার উঠে এসেছে, তবুত পিসিমার কাপড় এখন আসে নি, মজুর জন্যেত আবার কিনতে হ'বে না বড়দি?" অতর্কিত আঘাত! হয়ত কথার মাত্রা—

এই ধরণের কথা শ্বশুর বাড়ীতেও তরঙ্গিনী শুনেছে, লাগেনি; তখন ভাগ্যচিহ্ন ছিল সোজা; বাঁকা ভাগ্যে বাঁকা আঘাত কেবলি এসে লাগে। তরঙ্গিনী মুখ নীচু করে নিল।

— ৬ —

মন ছিল দাতার, ভাগ্য হ'ল গ্রহিতার। অন্তরের গৃহিনী পায়ে পায়ে আঘাত পায়, অপমানে সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকে। ভিক্ষার থালা হাত কেঁপে কেবলি পড়ে যায়। অনেক কালের অভ্যাস, সবই গেছে, আছে শুধু ব্যাকুল অভিমান! যে সাজিয়ে ছিল, সে চলে গেছে, যারা তাকে ঘিরে সেদিন উৎসবের কোলাহল তুলেছিল তারাও ভুলে গেছে, কিন্তু যে সেজেছিল সে মরেনি, নিরুপায় ক্ষোভে বুকের মাঝে আজো সে কেঁদে কেঁদে ওঠে!

—"চারটে ফ্রকেই মঞ্জুর বেশ চলে যাবে।"

—"সেখানে ও রোজ ডাল দিয়ে ভাত খেয়েছে, মাছের ঝোল দেবার কি দরকার! 'দুধ আবার কেন—থাক্না' 'খাবারের হাঙ্গামা করতে হবে না, সকালের রুটী থাকে তো তাই দাওনা মঞ্জু ত রুটী খেতে ভালই বাসে।" তরঙ্গিনী সীমার মাঝে কেবলি সীমা টানে!

পূজোর জামা নিয়ে রেবা এল।

—"দেখত পিসিমা মঞ্জুর জন্যে কিনলাম কেমন হয়েছে?"

মনে হ'ল কে যেন তরঙ্গিনী মুখে একরাশ কালী ছিটিয়ে দিয়েছে!

—"কেন এত খরচ করলে!" তরঙ্গিনী শুধু বল্লে।

বুঝতে রেবা পারলে, বল্লে—"মঞ্জু কি আমার পর পিসিমা?"

দিন রাত্রি আসে যায়।

শরতের দিগন্ত বিস্তৃত সুনীল আকাশ। রৌদ্রোজ্জ্বল ধরণী, মাঝে মাঝে নীলাঞ্জনের পরশলোভী দু একটা হালকা সাদা তুলোর মত মেঘ ভেসে যাচ্ছে; দূর বহু দূরের শ্যাম বনানী, শ্রেণীবদ্ধ তরুর তলে ধরিত্রীর আলো ছায়ার মাণিক গাঁথা আঁচলখানি আনমনে খসে পড়েছে যেন।

ফেরিওয়ালার দল মাঝে মাঝে হেঁকে যাচ্ছে।

গেটের পাশের ছায়াচ্ছন্ন অশ্বত্থের শাখায় কি একটা পাখী ক্রমাগত একই সুরে ডেকে চলেছে।

ছাতের কার্ণিশের ওপর দুটো পায়রার গুঞ্জন ধ্বনি মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতাকে চকিত করে তুলেছে।

বাহিরে তরুণী মায়েদের কোলাহল শোনা গেল!

—"আঃ খোকন। কি হচ্ছে দাঁড়াও, আগে দাম করি তারপর নিও।"

—"এই খুকি নিসনে দাঁড়া।"

—"কত দাম এটার? দশ আনা! আর ঐ হাতিটার! না না অত ছোটটা নয়, ঐ বড়টার। ঐটুকু হরিণের দাম পাঁচ আনা। ঠিক করে বল?—"

বহু যুগের রুদ্ধ মন সব দিক থেকেই যেন সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে! তরঙ্গিনীর একবার মনে হ'ল বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু—না থাক্।

পূর্ব তোরণের আলোকরেখা মুছে গেছে, পশ্চিমে অস্ত রশ্মির আভাস ফোটেনি, সব কিছুরই মাঝখানে এসে ওর গতি শুব্ধ হয়ে গেছে। উচ্ছ্বলিত আনন্দে মঞ্জুরী এসে দাঁড়াল—"মা"

—"কি রে?"

তরঙ্গিনী ফিরে চাইল।

হাতে তার একটা মস্ত সেলুলয়েডের পুতুল, দাম তার অনেক—তরঙ্গিনীর পক্ষে।

—"আমি এটা নেব।"

মঞ্জুরী বল্লে।

—"কোথায় পেলি দেখি?"

তরঙ্গিনী আস্তে আস্তে উঠে এল।

দ্বারের ওপাশে বিক্রেতাকে গোল হ'য়ে ঘিরে ছেলে মেয়ে, মায়েরা দাঁড়িয়েছিল। অগ্রসর হতে ইচ্ছা হ'লনা, বাধল! তরঙ্গিনী বল্লে—

'কোথায়?'

—"ওটা দিয়ে এস, দাম না দিয়ে নিতে আছে?"

চোখের কোণে জল ছল ছলিয়ে এল—মঞ্জুরী বল্লে—"আমি এটা নেব মা।"

চায় না ত কিছু—তরঙ্গিনীর মনে হ'ল নিক না, কতই বা দাম হ'বে।

কিন্তু—!

"মঞ্জু" মঞ্জুরী দুই হাতে খোকাটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ছিল, মায়ের ডাকে মুখ তুলে চাইল।

—"দিয়ে এস লক্ষ্মী মেয়ে।"

তরঙ্গিনী চট করে মেয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ওর যে সামর্থ্য নেই, তবু বেদনার অনুভূতিটুকু আজো মরে না।

মঞ্জুর চোখের কোণে জল উচ্ছ্বসিত হয়ে এল, কিন্তু ঝরল না।

ও যেন বোঝে সব।

ধীরে ধীরে গিয়ে পুতুলটাকে বিক্রেতার ঝুড়ির মধ্যে নামিয়ে রাখল।

—"ওকি খুকি নেবে না?"

সাশ্চর্য্যে বিক্রেতা মুখ তুলে চাইল। নিষ্প্রভ ম্লান মুখে আনন্দ কলরোলের একপাশে দাঁড়িয়ে মঞ্জু ঘাড় নাড়ল—"না।"

ন'গিন্নির খোকা হাতে একটা সদ্যলব্ধ দম দেওয়া মোটর গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বল্লে—"ও নেবেনা, আমি ত জানতাম!"

— ৭ —

অগ্রহায়ণের রৌদ্রস্নাতঃ উজ্জ্বল প্রভাতে ন'গিন্নি তেতলার ছাতে দাঁড়িয়ে নিজের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তৈলমর্দ্দন নিয়ে রীতিমত খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়ে তুলেছিলেন। খর্ব্বকায় প্রশস্ত দেহ নিয়ে ছুটো-ছুটি করা তাঁর পোষায় না, বড় ছেলেটার নড়া ধরে মাথায় এবং সেজ মেয়েটার কান ধরে মুখে আচমকা খানিকটা তেল মাখিয়ে দিয়ে, ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাপাতে ন'গিন্নি বল্লেন—"হতচ্ছাড়াদের নাওয়ান, খাওয়ান নয়ত, যেন কুরুক্ষেত্তর! এত লোক মরে, তোরা মরিসনে যে দুদণ্ড নিশ্চিন্দি হ'য়ে পা ছড়িয়ে বসি! কবে মরবি রে হতভাগাগুলো কবে মরবি?"

হতভাগাদের নিজেদের মৃত্যু দিবস সম্বন্ধে মাতাকে স্থির সময় নির্দ্দেশের কোন প্রকার চেষ্টা প্রকাশ পেল না, উপরন্তু জল-জীবন্ততার প্রমাণস্বরূপ তারা চটপট ছুটে পালাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠল।

ন'গিন্নির খাস ঝি সত্য দাসী সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, নগিন্নির মন্তব্যে সাড়া দিল—"কি যে কও মা, সময় নেই, অসময় নেই ফস্ করে মুখদে বার করে দিলেই হ'ল। ষাট—ষাট।"

ষষ্টির দাসেরা, দাসীর সহানুভূতির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সত্য দাসী সহজ সতর্কতায় তাদের ধরে ফেল্লে।

—"কি ছেলে মেয়েই হয়েছ বাবা তোমরা। খুরে খুরে দণ্ডবৎ করি মা! সাধে আর চোপর দিন গাল মন্দ খাও! চল ওদিক পানে চান করিয়ে দি।"

—"চান করে পিণ্ডি গিলে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করবেন। মর মর শীগ্‌গির করে মর্।

উত্তেজিত মুখে নগিন্নি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। রৌদ্দুর তাঁর সয় না, তামাটে গায়ের রং কালসিটে মেরে যাবার ভয়ে তিনি সদাই তটস্থ।

ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখের বারাণ্ডায় বসে তরঙ্গিনী বড়ির ডাল ফেনাচ্ছিল। নগিন্নি কোমরে বাঁ হাতখানা রেখে সমজদার ভঙ্গিতে সেখানে দাঁড়ালেন।

—"একা পারবে? আর কাউকে সঙ্গে নিলেই হ'ত!"

—"কে আসবে বৌদি? সবাইত জোড়া—সকাল সকাল না দিলে, কতটুকুনই বা রদ্দুর পাবে।

—"তা সত্যি সকাল বেলায় কি কারুর হাঁপ ফেলবার অবসর আছে। এই ত এতক্ষণ গেল ওদের চানের জোগাড় করতে, এখন আবার যাই দেখিগে ঘর-দোর পোস্কার করি! চব্বিশ ঘন্টা এটা ওটা আছেই। যদি দু দণ্ড বসতে পাই! তোমার দাদা ত বকে বকে সারা করেন, অত খাটুনি সইবে কেন, ডালওত কম নয়। পারবে? আমিত বাপু মোটে ওসব পারি না! আর কেমন করেই বা পারব, কখন কি করিছি! ছোট বেলা থেকে অভ্যেস থাকে, ত হয়। পারবে একা! তা' পারবে তোমরা ত আমাদের মত নও, আমার যেন সকল কাজেই হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে আসে! পারি না বাপু ও সব শত জন্মে করিনি।"

তরঙ্গিনী শান্ত হাসিতে ঘাড় নাড়ল।

—"আমার অভ্যেস আছে বৌদি।"

ন'গিন্নি একটু যেন অপ্রতিভ হ'লেন, এক মুহূর্ত্ত,—"হ্যাঁ তা পারবে বই কি—সবাই কি আমার মত। বল্লে কে বড়দি, ওঃ তুমিই! নাঃ তাই শুধোচ্ছিলাম

বড়দি বলেন কিনা মাঝে মাঝে, সেদিনকে সত্যদাসীকে বলছিলেন, তা' সত্যদাসী আবার তেমনি! তাই ভাবলাম তোমায় বল্লে বুঝি।" তরঙ্গিনীতে সত্য দাসীতে খানিকটা প্রভেদ আছে, নগিন্নী ইচ্ছে করেই সেটা ভুলে গেলেন!

তরঙ্গিনী হঠাৎ মুখ তুলে নগিন্নীর মুখের দিকে চাহিল!

— ৮ —

এত বড় বিরাট সংসারে অতিথি অভ্যাগত, আশ্রিত-আশ্রিতার অভাব নেই, তারা যখন আসে একটা সাময়িক কোলাহল জাগে—তারপরে দিনের পর দিন ক্রমে ক্রমে তাদের ভুলে যেতে কারুরই কষ্ট হয় না। তারা থাকে একদিকে, এক পাশে। তরঙ্গিনী কিন্তু এল, অনাথা আশ্রিতা হয়েও নয়, অতিথি হ'য়েও নয়। ওর আগমনী কোলাহল জাগায়নি, একটা নিরুত্তর প্রশ্নের মত স্তব্ধতা বয়ে এনেছিল। কোথায় ওকে মানায়, কোন পাশে, কোনদিকে!

খুড়তুত ভাই হরিচরণ রোজগার করে না, অনন্ত বাবুর ভাণ্ডারে তার অন্নের অভাব হয়নি; সে এ বাড়ীতে প্রায় খায়, পাশের বাড়ীতে তাস খেলে। বধূ মনিমালা সংসারের কাজকর্ম্ম করে, বৎসরান্তে নিত্য নূতন শিশুর জন্ম দান করে। গোল সে বাধাতে পারেনি বাধাল তরঙ্গিনী! ওর সম্বন্ধে উদাসী হতে বাধে, তাই মন আপন অজ্ঞাতেই বিদ্বেষী হ'য়ে ওঠে।

মেয়ে মানুষ, বোকার জাত! কেউ বা বুকে করে নিয়ে যায়, কেউ বা পায়ে ঠেলে! প্রভাতী তারা নয়, সন্ধ্যা তারা নয়, ওরা যেন অনন্ত মহাকাশে মৃত নিৰ্জ্জীব চাঁদ! ওরা অরুণালোকে উজ্জ্বল হ'য়ে জেগে থাকে, সে আলোকে পৃথিবীর লাভ নেই, শোভা আছে! তরঙ্গিনী অবাক হয়ে ভাবে।

কিন্তু কেন, কেন এমন হয়।

যোগ্যতার অভাব! শক্তির অপ্রাচুর্য্য? কেন! এমনি। ওরা যেন খেয়ালীর আনন্দ, শক্তির কল্যাণ নয়!

বিশ্রি! বেঁচে থাকার সহজ নিঃশ্বাস নেই, মৃত্যুর গভীর শান্তি! তাও না। শ্বাস টেনে টেনে বেঁচেই আছে, যুগ-যুগান্তর ধরে। ওরা মূক, কিন্তু বধির নয়, অনুভূতিও আছে! পঙ্গু, অন্ধ নয়।

নগিন্নী এসে দাঁড়ালেন।

—"অ ঠাকুরঝি, তোমার মেয়ে কি কাণ্ড করেছে দেখসে।"

—"কি করেছে ভাই!"

তরঙ্গিনী শঙ্কিত—সঙ্কোচে প্রশ্ন করলে।

—"দেখবে না, চান করে ঘরে ঢুকে দেখি তোমার দাদার কাগজ পত্তরের ওপর একরাশ কালি ফেলেছে, ঢেলে কি সব আমার পিণ্ডি ছেরাদ্দ করছে। মা, মা, এমন মেয়ে কোথাও দেখিনি। আমার ছেলেরা জিনিষ পাঁটা ত দূরে থাকে, ঘরে ঢুকে যেন কাঁটা হ'য়ে থাকে, আর ও মেয়ে কিনা চিঠি ঘেঁটে ঘুঁটে মেরে করে করে রেখেছে। একটু থির হয়ে বসতে জানেনা, দিন রাত্তির ছুটো-পাটী, মেয়ে মানষের অত কিসে বাপু! ছেলে হয়ে জন্মালনা কেন! মঞ্জু ব্যাকুল হয়ে ভাবে হয়ত! মুখ তার শুকিয়ে ওঠে। শুধু কি কর্ম্মের অপরাধ জন্মের ওযে অপরাধ আছে।

—"কেন গিইছিলি মঞ্জু?"

তরঙ্গিনী কঠিন হয়ে জিজ্ঞাসা করে। অপরাধী মেয়ে! ঠোঁট ছুটো কেঁপে উঠে,—"আর যাব না মা।"

—"হাঁ যাবে না, তুমি তেমনি মেয়ে কিনা বাছা!"

—"কি হয়েছে ন'দি?" ছোট গিন্নী এসে দাঁড়ালেন।

—"দেখসে না আমার ঘরে কি কাণ্ড করে এয়েছে। মা শুধোচ্ছে বলে 'কেন গিছলি' মেয়ে চোট পাট উত্তর করছেন 'যাব না! আমাদের ছেলেরা একটা হাঁকে কাঁটা হয়ে যায়। তা যেমন আকি—আমরা হলে অমন মেয়ে কেটে দুখান করে দিতাম।

মঞ্জু যে ছেলে নয়, এ অপরাধ ওরা ভুলতে পারেনা কোন মতেই! বক্তৃতা তরঙ্গিনীর অসহ্য মনে হয়। বলে—"যাবিনা ত, কিন্তু কেন গিইছিলি শুনি?

কেন? তার কি কোন উত্তর আছে? মঞ্জু তা জানে না। বলে, 'আর যাবনা মা,' ভুল মানুষ করেই গাছ পাথরে নয়! নগিন্নী কিন্তু তা মানতে চান না, ভুল তিনি ও করেন কিন্তু তাঁর ভুল ধরা পড়ে না। তাঁর হিসাবের খাতায় সংশোধনের স্থান নেই। বলেন—"চোট-পাট উত্তর দিতে ত খুব শিখেছিস বাছা। অন্যায়কে

স্বীকার করা মহাপাপ ; অস্বীকার করা আরো। তরঙ্গিনী জলে উঠে মঞ্জুর গালে সশব্দে একটা চড় মেরে বলে—"বসে থাক ঐ কোণে গিয়ে,ঘর ছেড়ে বেরুলে-খুন করে ফেলব। নগিন্নীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নগিন্নী আকাশ থেকেই পড়েন। গালে হাত দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে বলেন —"অমন সব রাজা উজির মেজাজ নিয়ে পরের ঘরে আসা কেন বাপু!"

৯

সহিষ্ণুতার চেয়ে বড় ধর্ম্ম নেই, ন গিন্নী বলেন। নিরুপায় দুর্ব্বলের? সবিদ্রূপ হাস্যে তরঙ্গিনীর ঠোটের কোণে প্রশ্ন জাগে, কিন্তু বলে না, চুপ করেই থাকে।

ন গিন্নীর মনে নারী ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ভীড় করে ঠোঁটে আসে, বলেন—"কেন ঐ যে নিতাই বুড়ো নিজের চোক্ষে দেখা, কাণে শোনা নয়—নিত্যি ধরে ধরে বউটাকে মারত—একদিন দুটী ঠোঁট ফাঁক করেছে? কোনদিন অচ্ছেদা করেছে? চুপ করে থাকত, যেন কাঠ। এখন দেখ সে ঘরনী গিন্নী, ফুটোটী নেড়ে দুখানা করে না—সোয়ামীকে এখন উঠতে বল্লে ওঠে—বসতে বল্লে বসে, কেন? সে ত চুপ করে পড়েছিল বলেই। তা না কেষ্টার বৌ'র মত ধিনিক ধিনিক করে চোপা করলে, হাজার হোক পুরুষ মানুষ ত' দিলে শেষ করে, যোল ছুঁড়ি অপঘাতে।"

তরঙ্গিনী চুপ করে শোনে, সবাই। ইচ্ছে করে বলতে 'নিতাই'য়ের বৌ, সেও ত অপঘাতেই মরেছে, কিন্তু তিলে তিলে।"

ন গিন্নী আঙুলের ডগায় করে চুন নিয়ে মুখে দেন, বলেন—"আর কেন এই ত সেদিনকে নরেশের বৌটা, ছেলে রেখে সোয়ামী রেখে কোন চুলোয় গেল! ছিঃ ছিঃ শুনে কি লজ্জায় মরে যাই! ওমা কি ঘেন্না।

"কিন্তু বড্ড সে কষ্ট পেইছিল ন'দি।"ছোট গিন্নী বলে।

—"হুঁ, পেয়েছিল! পেয়েছিল তাই বেরিয়ে যাবে!"

—"বেরিয়ে ত সে যায়নি খুড়িমা।" রেবা বল্লে।

—"হ্যাঁ—হ্যাঁ--জানি জানি, ঐ হ'ল। আর ওকে ঘরে নেবে ওরা? তবে! সোয়ামী না হয় কষ্ট দিইছিল— কিন্তু ছেলে। ঐটুকু দুধের বাছা। ছিঃ ছিঃ। হাজার হোক মা ত।"

হাজার হোকই বটে। বধূ সে হয়নি, মা কিন্তু ছিল। হাসি আর ফোটে না, তরঙ্গিনী চুপ করে ভাবে!

মেয়েদের সবচেয়ে বড় সম্মানিত পরিচয় সে মা? কিন্তু সবচেয়ে বড় অসম্মানিত পরিচয়ও কি তাই নয়!

বিচার করে তারাই, যারা বিচারে পড়ে নি। নরেশের স্ত্রী, মা একথা ওরা কিছুতেই ভুলতে পারছে না, কিন্তু নরেশের পিতৃত্বকে ওরা ভুলেও মনে করেনি।

ওর মাতৃত্ব, মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে কবে মরে গেছে, নরেশের পিতৃত্ব কিন্তু প্রতিদিনকার অনাচারে, অবিচারে, অত্যাচারে আজো বেঁচে আছে। যার জীবনের স্পন্দন কোন দিন ফোটেনা, তার মৃত্যু নেই, বলতে বাধা কি! সেযে চিরজীব! অত্যাচারে জর্জ্জরিত নরেশের স্ত্রী যদি বিষ খেয়ে মরত, নগিন্নী শুধু তাকে ক্ষমাই করতেন না, উচ্ছ্বসিত সহানুভূতিতে নরেশের সম্বন্ধে খুব তীব্র ভাষায় কটুক্তি করতেও ইতঃস্তত করতেন না! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উনি জীবনকে দেখেন নি, তাই মৃত্যু সম্বন্ধে ওঁর বিলাস আছে! যমের বাড়ী সম্বন্ধে মামার বাড়ীর মাধুর্য্য ওঁর মনে লেগে থাকে! বলেন—"আমরা হলে কবে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।"

অসহ্য অত্যুক্তি! তরঙ্গিনী মুখ ফিরিয়ে নেয়। দিন কাটে, কেমন করে কে জানে!"

নিবিড় ক্লান্তিতে রাত্রে যখন শয্যা গ্রহণ করে,তরঙ্গিনীর কোন ভাবনা মাথায় আসে না। নিত্য নিয়মিত প্রতিদিন, প্রতিদিনেই তার সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যায়, ক্লান্ত মন ঘুরে বেড়ায়, কোন আদি যুগের হারান দিনের বেলাভূমে সুখ দুঃখ, হাসি, অশ্রু, তুচ্ছ ক্ষুদ্র, চেয়ে দেখার অকারণ চাউনি-টুকু কুড়িয়ে কুড়িয়ে অন্তরের আঁচল পূর্ণ হয়ে উঠে!

মঞ্জু ইস্কুলে যায়; টিফিনের ছুটির ঘণ্টা পড়ে, মেয়ের দল হুড়ো হুড়ি করে বেরিয়ে এসে খেলা আরম্ভ করে, মঞ্জু পথের ধারের ছায়াচ্ছন্ন জাম গাছটার তলায় শিশু শিক্ষাখানা খুলে বসে থাকে। স্কুলটী ছোট, সম্মুখে খানিকটা খেলার মাঠ, পিছনে রাজপথ, এঁকে বেঁকে এ-মোড়, ও-মোড় ফিরে কোন দিকে হারিয়ে গেছে কে জানে। রাজ পথের ওপাশে চৌধুরীদের বাগান সম্বলিত তিনতলা বাড়ী, গাছের ফাঁকে, ফাঁকে, দেখা যায়।

ক্রুটোনের সার বেড়ায় ঘিরে একখানা একতলা বাড়ী তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন, মন্থর বাতাস রূপকথার গুঞ্জন তুলে শাখায় শাখায় চাঞ্চল্য তুলেছে।

রাস্তায় মোটরের ভীড় নেই, ঘোড়ার গাড়ীর গতায়াত আছে। গরুর গাড়ীর অবিশ্রান্ত আর্ত্তনাদ যেন বিশ্বের আদি যুগের ঘুমন্ত দেবতার পায়ে নিষ্ফল আবেদনে অনির্দ্দিষ্ট ভুবনের দিকে ভেসে চলেছে।

অনেক দূরের একখানা বাড়ীর বারাণ্ডা থেকে লাল পাড় সাড়ীর অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বাড়ীখানা দেখা যায় না, কোন তরুণী বধূ হয়ত স্নানের শেষে সেখানা দ্রুতহস্তে রৌদ্রে মেলে দিয়ে গেছে।

মঞ্জুরী চুপ করে চেয়ে থাকে, অনেক দূরে আকাশে চিলের উড়ে যাওয়া গতির দিকে! ওখানে ওর যেতে ইচ্ছে করে, ঐ যেখানে সূর্য্যাস্তের সুবর্ণ আলোকের ছোঁওয়া গায়ে মেখে নীল জগতের আমন্ত্রণে ঝাঁকে, ঝাঁকে বলাকা উড়ে যাচ্ছে। মঞ্জুর অস্ফুট মন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

১০

—"ও মাগো, অ পিসিমা সত্যি তোমার মাথায় পাকা চুল!" বিস্ময়ের সুরে রেবা বল্লে।

তরঙ্গিনী চোখ বুঁজেই হাসলে, বল্লে—"বুড়ো হচ্ছিত।"

—"আহা তোমার ঐ এক কথা হয়েছে। না সত্যি দেখ পিসিমা।"

সন্তর্পণে চুলটাকে সে তরঙ্গিনীর চোখের কাছে ধরলে।

তরঙ্গিনী একবার চোখ খুলেই বন্ধ করে নিল—"বল্লাম যে বুড়ো হয়ে গেছি।"

রেবা কথা কইলে না, অন্যমনে তরঙ্গিনীর চুলের মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল।

ন গিন্নী ও-পাশের ঘরে যাচ্ছিলেন, তরঙ্গিনীর খোলা দুয়ারের কাছে এসে স্বভাবসিদ্ধ সন্তর্পণতায় একটা উঁকি দিয়ে চলে যাবার সদ্‌উদ্দেশে ঝুঁকে পড়েই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—"কি হয়েছে গা বৌমা ঠাকুরঝির? মাথা ধরেছে?" পৃথিবীর মধ্যে অকারণ বা অহেতুক কোন কিছু ঘটতে পারে নগিন্নীর পক্ষে সে শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, অস্বপ্নেয়ও বটে। পথহীন মাঠের ঘাস ফুলের নাম শুনলে গায়ে তাঁর জ্বর আসে।

অনাবশ্যক সৃষ্টির জন্যে বিধাতাকেও তিনি ক্ষমা করতে রাজী নয়।

সংসারের জীব গুলোর ঝগড়া-ভাবের তিনি মানে বোঝেন, কিন্তু অকারণ চুপ করে থাকা দেখলে তাঁর সহ্য হয় না। তরঙ্গিনী সশব্যস্তে উঠে পড়লনা একটু খানি হাসলে শুধু, বল্লে—"শাশুড়ী হয়েছি ছেলের বৌর সেবা নেবনা বউদি?"

ঝড়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে নগিন্নী বল্লেন—"তা নেবে বই কি ভাই, কেন নেবে না! অদেষ্ট! নইলে মেয়ে না থেকে একটা যদি ছেলে থাকত! পরের ছেলে বৌ নিয়ে এত সাধ আহ্লাদ কর, পোড়া বিধেতা চোখের মাথা খেই ছিল না! সবই কর্ম্মফলরে ভাই।"

অতুগ্র সমবেদনায়, অযাচিত সান্ত্বনায়, অনিল যে তরঙ্গিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র এই অতি বাস্তব কথাটিকে প্রচার করে নগিন্নী প্রফুল্ল মনে, বিষন্ন আননে কর্ম্মফলের পথ দেখিয়ে চলে গেলেন। রেবার এতক্ষণের সচল হাত দুটী আপন হ'তেই আড়ষ্ট হয়ে এল।

তরঙ্গিনীও কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেল, মনে হ'ল যেন তার সাড়া জীবনের অভিনয়ের ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে। কেউ নয়, ওরা ওর কেউ নয়।

এমনি করে পরে পরে নিজেকে ও দীনই করেনি, উপহাসাস্পদও করেছে। এলো মেলো ভাবনায় মন আনমনে চেয়ে থাকে, মীমাংসার পথ খুঁজে পায় না, খোঁজেওনা তাই।

বাইরে ছেলেদের মিলিত কণ্ঠের কোলাহলের সঙ্গে নগিন্নির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—"কেন দিবিনি শুনি? ছেলে মানুষ মেয়েটাকে কাঁদাচ্ছে সেই তখন থেকে। মঞ্জু তোর ছোট বোন হয় না হতভাগী?

তরঙ্গিনীর ঠোঁটের কোণে একটু খানি বিস্ময় মিশ্রিত অদ্ভুত হাসির আভাস ফুটে ওঠে, নগিন্নী শুধু অনাত্মীয় তার আঘাতই দেন না, আত্মীয়তার বিলাস ও তাঁর আছে।

(১১)

রেবার ছোট ভাই এসেছে ওকে নিয়ে যেতে। তরঙ্গিনী ভাঁড়ার ঘরে বসে তার জন্যে খাবার গুছিয়ে রাখছিল। নগিন্নী এক পাশে বসে সুপারী কাটছিলেন, অন্নপূর্ণা কোণেরদিকে বসে ফল ছাড়াচ্ছিলেন।

রেবা এসে দাঁড়াল—"দেখত পিসি মা, কি সব যা-তা, বলছেন তখন থেকে।

—"কে অনিল ? পিসিমা হাসি মুখে মুখ তুলতেই রেবার ভাই বিভূতি আর অনিল এসে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়াল।

রেবার অভিযোগ অনিলের কানে গিয়েছিল, কিন্তু সে কোলাহল করে তার উক্তিকে খণ্ডন করলে না, শুধু কৃত্রিম বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রেবার দিকে চেয়ে রইল। বুঝতে তরঙ্গিনী পারলে, হেসে বল্লে—"কিরে ?"

—"পিসিমা !" অনিল প্রচণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে—"এ হ'ল কি সব !" পতী নিন্দা মহাপাপ যে ! শুনছ, পতী নিন্দা করতে নেই, হিন্দুর মেয়ে এটুকু জান না ! কেমন ধারা হিন্দুহে তোমরা, বোনকে এমন একটা বিখ্যাত শাস্ত্রও শেখাতে পারনি !

বিভূতি একটু খানি হাসলে ; রেবা কিন্তু চাপা তর্জ্জনে উত্তর দিল,—"আহা কি এলেন ভটচাজ মশাই !"

—"আবার উত্তর করে ! না এরা জাত ধর্ম্ম আর রাখবে না ! আর কি কি রাখবেনা পিসিমা ? বলে, দাওনা, আমি কি সব জানি ছাই !"

—"জিজ্ঞেস করনা তোর মাকে।" তরঙ্গিনী মৃদু-হাস্যে বল্লে।

—"মা আছেন বুঝি বসে ?" অনিল উঁকি মেরে ভেতর দিকে চাইলে, বল্লে—"দেখেছ মা কিরকম সব মেলেচ্ছ।" তোমার এমন সোনার চাঁদ ছেলে ভাবনা কি ! বেরিয়ে এসে দুটো তাড়া দাওত, বলে যাও ছেলের আমরা আবার বিয়ে দেব অমন করলে।

মা হাসলেন—"হ্যাঁরে চিরকালই অমনি পাগল থাকবি তোরা ?" দেখত ঠাকুরঝি !

তরঙ্গিনী মুখ তুলে চাইলে, বল্লে—"ছেলেত আমাদের সোনার চাঁদই, কিন্তু চাঁদের যে বাবা চিরকালই ধার করা আলো।"

বিভূতি এবার সজোরে হো হো শব্দে হেসে উঠল —"কি হল ?"

—"চল চল হে, তুমি ও যেমন ওর একটা গূঢ় মানে আছে, সে তুমি ছেলে মানুষ বোঝনাত !" বলে অনিল হাসতে হাসতে বিভূতিকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

নগিন্নী এতক্ষণ আড় ঘোমটায় বসেছিলেন। বিভূতির সম্মুখে উনি বেরোন। কিন্তু আবছায়া কথা কম, অস্পষ্ট, বলেন—"ঘরের ছেলেইত, কথা কইতে দোষ কি! লজ্জা করে তাই !"

তরঙ্গিনী মুখ তুলে চায়। নগিন্নী বলেন—"তোমরা কথা কও সবারির সঙ্গে তাই পার, আমি ভাই পারি না।"

—"ওত ছেলে মানুষ।" তরঙ্গিনী বলে।

—"ছেলে মানুষ বই কি, কথা কইলে কি আর পারি না ? কিন্তু কেমন যেন হয়।"

ন গিন্নির মুখ চোখ কেমন লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে যায়। মাথার কাপড়টা অকারণেই ললাট পর্য্যন্ত টেনে দেন !

তরঙ্গিনী হাতের কাজ সেরে উঠে পড়ল। অস্ত-মান অরুণের আভায় পশ্চিম আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে, নীল আকাশের গায়ে গায়ে নীড়ে ফেরা পাখীর পাখার শব্দ, কণ্ঠের মিলিত কাকলী গানের সুরে পথের আভাস জাগায়। তরঙ্গিনী আনমনে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে, ভাবে না কিছু, মনে পড়ে অনেক দিনের অনেক কথা। আস্তে আস্তে নগিন্নী ঘরে ঢোকেন।

—"ঠাকুরঝি।"

—"কি ভাই।" তরঙ্গিনী চকিতে মুখ ফিরিয়ে চায়।

"মঞ্জু কোথায় ?"

—"মঞ্জু ! জানি না ত, কেন ?"

—"না ভাই শুধোচ্ছি।"

অর্দ্ধ-কুটিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে নগিন্নী একটু থেমে বল্লেন—"মঞ্জু নাকি বৌমার সঙ্গে যাবে !"

—"কোথায় ?" তরঙ্গিনী অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলে।

—"কোথায় তা তুমিই জান।" বলে ন গিন্নী বেরিয়ে গেলেন।

১২

অন্নপূর্ণা এগিয়েই ছিলেন, অকস্মাৎ পেছিয়ে গেলেন, অনন্ত বাবুর ডাক পড়ল অতর্কিতে। অন্নপূর্ণার বেদনা আর অতিরিক্ত ক্ষীণ দেহ নিয়ে তিনি বিমূঢ় হ'য়ে চেয়ে রইলেন। লোহা সিঁদুরের মতই গৃহিণীত্বের উচ্চপদও আস্তে আস্তে খসে গেল। সংসারের নৌকা খানার সবাই হাল ধরে বসলেন, নাবিক সবাই যাত্রী—কেউ নয়!

সবাই সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু কেউ কাউকে স্বীকার করে না।

কর্ত্তার সঙ্গে কর্ম্ম গেল, রইল শুধু কোলাহল! তা যাক পরিবর্ত্তনই জীবনের লক্ষণ!

মঞ্জুরী বড় হয় দিনে দিনে। অনেক কথা বোঝে, অনেক বোঝেনা। ভোর বেলাকার সোণালী স্বপ্নে মন তার ছেয়ে থাকে। আকাশ মেঘে ঢাকাই, তবু ওর মনে হয় আকাশ নীল!

খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে ওঠে, আকাশে গত রজনীর দীপালি উৎসব শেষের তারকা প্রদীপ দু'একটা তখনও এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকে। মঞ্জু অবাক হ'য়ে চারিদিকে চায়! বুকের মাঝে ওর মাটীর মেয়ের ঘুম ভেঙে গেছে, তার নিদ্রা জড়িত মেলিত নয়নের দৃষ্টি চোখে ওর বিস্ময় মাধুর্য্যের অঞ্জন মাখিয়ে দেয়।

রাত্রির নিস্তব্ধ শয্যায় শুয়ে প্রহরের পর প্রহর কাটে, ঝরা পাতার মর্ম্মর রব শোনে, শাখায় শাখায়, পল্লবে পল্লবে, বাতাসের দুরন্তপনা। ক্লান্তি ওর আসে না কিছুতেই, ঘুমও না, ভাবেও না কিছু শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

বুকের মাঝে ধরার মেয়ে আঁখি মেলে চেয়েছে, সে খবর ও জানে না, আজো।

রাজপুত্রের পদধ্বনির আশায় ব্যাকুল হয়ে জেগে থাকে না; উৎসুক হয়ে চায় হয়ত।

ওর পথ আকাশের গায়ে গায়ে নীহারিকার পথ-চিহ্ন ধরে একে বেঁকে চলে গেছে, কোথায় দূরে কত—দূরে! ওর ভুবন আলোক সমুদ্রে ডুব দিয়ে এসেছে! ওর জগতে আকাশ নত হয়ে আসে; তারারা কথা কয়! ফুলেরা হাসে; পায়ের নীচের মাটি পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে! সেখানে ঝড় নেই, বাতাস বয়ে যায় ধীরে ধীরে!

ভাল লাগে—ওর সব ভাল লাগে! সংসার ওকে ঠাঁই দিতে চায় না, পৃথিবী ওকে শ্যামল বাহুর ব্যাকুল আলিঙ্গনে নিতে চায়। সংসার ওকে সরিয়ে দেয়, ধরণী ওকে কোল পেতে নিতে চায়!

তরঙ্গিনী নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে। দিনের পর দিন কাটে!

মঞ্জুরী কি কালা! নগিন্নী ভাবেন, দিন রাত এর এত লাঞ্ছনা ও কি তা' শুনতে পায় না?

শুনতে মঞ্জু পায়, কিন্তু বুঝতে পারেনা, বুঝতে চায়ও না।

ওর ভুবনে বসন্তের সাড়া জেগেছে, ওর পথ সংসারের সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে! সেখানে দ্বন্দ্ব নেই, প্রশ্ন নেই, উত্তর নেই, আছে শুধু নীরব বিস্ময়-মাধুর্য্য! ওর ঘুম কেবলি ভাঙছে!

অনিলের কাছে রোজই আসে প্রভাস, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কিন্তু অন্যমনস্ক। মঞ্জু হাসে, বলে—"দাদা, প্রভাসবাবু অমন কেন?"

নগিন্নী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মঞ্জুর দিকে চান, বলেন—"কাপড় গুলো তুলতে বলেছিলুম, তুলেছিস?"

—"যাচ্ছি নমাসী-মা।"

মঞ্জু অপ্রতিভ হ'য়ে চলে যায়। প্রভাসকে নগিন্নীর ভারি ভাল লাগে!

প্রভাস বলে—"আপনাকে আমি কি বলে ডাকব? মাসিমা?"

মুখখানা কালো হ'য়ে যায় মুহূর্ত্তের জন্যে, ঢোক গিলে নগিন্নী বলেন

— "না দিদি বলে!"

প্রভাস দিদি বলেই ডাকে।

বলে—"আপনার মত আমার একটি দিদি আছে।"

তা থাক; নগিন্নীর সে জন্যে বিন্দুমাত্র শিরঃপীড়া নেই; বলেন—"সমস্ত দিন একলা একলা প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে।" দুঃখ কি একটা? একটা ত নয়! সংসারে কি আর এসেছেন, নগিন্নী বলে চলেন একের পর এক—

—"তুমি আস তবু একটু কথা কয়ে প্রাণ বাঁচে!"

বিব্রত প্রভাস উত্তর খুঁজে পায় না, এদিক ওদিক চায়!

—"ওহে চা খাবে! এক কাপ!"

"হ'লেই বা একটুখানি খেতে দোষ ত নেই! মঞ্জু, এই মঞ্জু।"

অনিল ডাক দেয়।

নগিন্নী চঞ্চল হয়ে ওঠেন, প্রভাসও কিন্তু বিপরীত ভাবে!

মঞ্জু এসে ঘরে ঢোকে, নগিন্নী বাধা দিতে পারেন না। মুখ ওঁর কালো হয়ে যায়, প্রভাসের দিকে চান, একবার মঞ্জুর দিকে!

(১৩)

মঞ্জু সুন্দরী নয়, সুশ্রী। দীর্ঘ ঋজু দেহ, শ্যাম পল্লবিনী লতিকার মত; চঞ্চল আনন্দে হিল্লোলিত; মধুমালতীর বিতান যেন!

নগিন্নীর চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে, মঞ্জুর হাত থেকে বইখানা অতর্কিতে ছিনিয়ে নিয়ে বলেন—

—"কে চেয়েছে! অনিল, না প্রভাস! আচ্ছা আমি দিয়ে আসছি তুই ঘরে যা।"

নগিন্নী এগিয়ে যান, নিমেষ বিমূঢ়—মঞ্জু কিছু না বুঝেই সহজ হ'য়ে বলে—"খোকা যে কাঁদছে মামিমা।"

নগিন্নীর ইচ্ছে করে ফিরে দাঁড়িয়ে মঞ্জুর গালে দুটো চড় বসাতে; বলেন—"হাতে ত তোমার কুড়িকিষ্টি হয়নি মঞ্জু!"

না তা হয়নি; সে মঞ্জু জানে।

যা হয়েছে তা' মঞ্জু স্পষ্ট করে বলতে পারে না ত! খোকার বাঁধনে ও ন গিন্নীকে বাঁধতে গিয়েছিল, কিন্তু সে বাঁধনটা তার নিজের পায়েই শক্ত হয়ে চেপে বসল, দেখে শুধু হাঁ করে চেয়ে চেয়ে নিষ্ফল ক্রোধে চোখে জল ছাড়া আর মঞ্জুর কিছুই এল না।

—"এক গ্লাস জল দেবে মঞ্জু?"

প্রভাস বল্লে।

—"আমি পারব না।" মঞ্জু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে।

প্রভাস মঞ্জুর এ রকম উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, একটুখানি অপ্রতিভভাবে হেসে বল্লে—"রাগ হয়েছে।"

মঞ্জু উত্তর দিল না, উত্তর দিলেন ন গিন্নী,—"অত বড় মেয়ে কোন কথার ছিরি আছে। উঠে যা' মঞ্জু।

বলবার আগেই মঞ্জু উঠে যায়।

দিনে দিনে কেমন যেন হ'য়ে যায় সব। মঞ্জুকে দেখলে ন গিন্নীর অকারণে রাগ হয়; অথচ সেটা প্রকাশ করতে বাধে। শাসন করতে পারেন না, পীড়ন করেন কেবলি।

মঞ্জু ওঁর মস্ত বড় পরাজয়ের সম্ভাবনা। ন গিন্নী কিন্তু সে কথা মনে আনতেও সঙ্কুচিত হ'য়ে যান; বলেন "মঞ্জু দিনে দিনে যেন ধীঙ্গি হচ্ছে।"

বেদনাটা অনুভূত হয়, কিন্তু ব্যথা যে কোথায় বোঝা যায় না।

মঞ্জু মায়ের গলা দুইহাতে জড়িয়ে ধরে শুয়ে শুয়ে গল্প করে।

বাবাকে তার মনে নেই; কই মা, নেই ত। সে তখন খুব ছোট্ট ছিল বুঝি?

আচ্ছা মা কেন একবারও যান না সেখানে? তার ভারি দেখতে ইচ্ছে করে, সে দেশটা।

অন্ধকারে মায়ের পুকুর ঘাটে ভয় করত না? মাগো। মঞ্জুর এমনিতেই বলে গা শিউরে ওঠে।

আরো বেশী করে সে তরঙ্গিনীর কাছে ঘেঁসে শোয়।

তরঙ্গিনী ধীরে ধীরে মেয়ের কপালে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

আকাশ অন্ধকারই; তবু ওদের কেবলি মনে হয় আকাশ নীল।

(১৪)

বৃষ্টি আর বিরাম মানে না। ঝম, ঝম, টিপ, টিপ, কেবলি ঝরছে। কচি ছেলের মায়েরা আকাশের মুণ্ডপাত করেন; এমন করলে কাঁথা শুকোয়। বিধাতার বুদ্ধির স্থিরতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ পায়। সাতকেলে বুড়ো ভিমরথী ধরেছে হয়ত।

বেচারী স্রষ্টা। সাধে কি লুকিয়ে থাকেন।

ছোট ছোট ছেলেরা ক্রমাগত কাগজ টেনে টেনে নৌকা তৈরি করে উঠানের জমা জলে ভাসিয়ে দিয়ে হাততালি দিতে থাকে; সাত-সমুদ্রের নদী অতিক্রম করতে বেরিয়েছে যেন। অল্প বয়ঃজ্যেষ্ঠ দাদা শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে, কর্ত্তব্য বোধের খাতিরে উৎসাহী নাবিকের কাণ ধরে টান দেয়,—"জলে ভিজছিস যে বড়?"

—"কই ভিজছি!"

এবং পরমুহূর্তেই যে সুর বাজে, সেটা বিলক্ষণ বিপদ-

স্থাপক; দাদা তার দাদাও বাঁচিয়ে ঘরে ঢোকে। বৃষ্টি বিরাম মানে না; উতলা আকাশ নেমে আসতে চায় যেন।

বাতাসের আগ্রহ চঞ্চল আন্দোলন বনস্পতির শাখায় শাখায় কলরোল তোলে। শ্যামল তৃণ মাটির বুকে বারে বারে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানায়, কোন অজানাকে, কে জানে?

মঞ্জুর আকাশ নীল; বাদলের ঘনায়মান অন্ধকার সেখানে স্তব্ধতা বহে আনে না, আসে নিরুদ্দেশ যাত্রার চঞ্চল আনন্দ।

ঘরের মধ্যেই বসে থাকতে ভাল লাগে! মঞ্জু বারাণ্ডায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না। অকারণে সমস্ত মন আকুল হয়ে ওঠে।

—"ঐ শ্রাবণের বুকের মাঝে আগুন আছে—"

নীচের থেকে গানের সুর ভেসে আসে।

তা' আছে; কিন্তু সে খবর শ্রাবণ নিজেও জানে না হয়ত!

মঞ্জু তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে, "এই বিষ্টিতে আপনি কি করে এলেন?"

প্রভাস অল্প একটু খানি হাসে—

"উড়ে?"

—"আমি যেন তাই বলছি, আহা!"

মঞ্জু বল্লে।

প্রভাস এবার হেসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইল উত্তর দিলে না।

প্রভাসের মনের আনন্দে বিষাদের সজল হাওয়ার দোলা লেগেছে! মঞ্জু কিন্তু সহজ, প্রভাসকে ও ভালবাসে না, প্রভাসকে ওর ভারি ভাল লাগে!

একাদশীটা মাসে দুবার করে আসে, পাঁজীতে তার দিন স্পষ্ট করেই লেখা থাকে; তরঙ্গিনীর দলের জন্যে সংসার সেদিকে শাসনের ভঙ্গিতে আঙুল তুলে রাখে। ও-দিনটা তরঙ্গিনীর মনেই থাকে সংসারের কিন্তু ভুল হ'য়ে যায়! সেটা কর্ত্তব্য ত্রুটী নয়, অন্তরের অভাব। তা হোক বাস্তবের সঙ্গে অন্তরের কোন সম্পর্ক নেই। একাদশীটা শাস্ত্র মতে তরঙ্গিনীর অবশ্য পালনীয়, কিন্তু সংসারের অপর পাঁচজনের জন্যে সেটা অবশ্য স্মরণীয় শাস্ত্রে এমন কথা লেখে না!

তবু এই অতি বাস্তবতায় গঠিত হৃদয়ের কোন খানে একটা কোমল স্থান আছে; যেটা কেবলি আহত হয়! মঞ্জু অভিযোগ করে না, শুধু অশ্রুরুদ্ধ দুটী চোখের ম্লান দৃষ্টি তুলে প্রভাসের দিকে চেয়ে বলে "আমার বয়েসটা যদি আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত একরাত্রে বেড়ে যেত!"—

"তাতে লাভ হ'তো কিছু।"

প্রভাস বল্লে।

মঞ্জু এক ভাবে অন্য দিকে চেয়ে থাকে, ওর কল্পমন্দিরের শ্রেষ্ঠ আসন খানি তরঙ্গিনীর জন্যে ও কেবলি সাজায়। ওর মায়ের বেদনা ওর অজানা নেই, কামনা ও জানে, সাধনাও। কিন্তু দিন কাটে, কেমন যেন সোনার স্বপ্নে! মঞ্জু ভাবে কেমন করে সে ভবিষ্যৎকে রাঙিয়ে চলবে! ছোট গিন্নীর মেয়ে নীলা স্কুলে ভর্ত্তি হয়; পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে কিন্তু ওর রান্না ঘরে বসে বামুন দিদির পিতৃপিতামহের কুলজী শুনতেই লাগে ভাল। দুজন মাষ্টার আসে, একজন সঙ্গীত, অন্য জন বিদ্যা; বসে বসে ছাত্রীর প্রতীক্ষায় পেন্সিল কামড়ায়! নীলা প্রায়ই আসে না, তার শিরঃপীড়া আছে, পেট কামড়ানও বিচিত্র নয়ত, রক্তে মাংসে গঠিতইত দেহ! যথাসময়ে বেতন পায়। নীলা নীলমণি মাষ্টারের পক্ষে তাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা বিপজ্জনক, কাজেই তাঁরা বেতন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন! অনেক বার ইতঃস্তত করে মঞ্জু বলে—"ছোট মামিমা, নীলার সঙ্গে আমি যাব; মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়াটা বুঝে নিতাম?"

মঞ্জু কি "জজ ম্যাজিষ্টর" হ'বে!

অবজ্ঞা-মিশ্রিত বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি ছোট গিন্নীর মুখের উপর খেলে যায়! সুর টেনে বলেন—

—"ঐ কর বাছা, ঘর-কন্নার কাজ শিখে আর কি হ'বে!"

মঞ্জুর চেষ্টা আছে, ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু সুযোগ থাকতে হ'বে তার ত কোন মানে নেই!

স্কুল মঞ্জুকে ছাড়তেই হ'ল। তরঙ্গিনী কুণ্ঠিত আপত্তিতে বল্লেন—"বাড়ীতে বসে থাকবে"—

নইলে কি রাস্তায়? নগিন্নী রেগে উঠলেন, এম-

এ, বি-এ, পাশ করে মঞ্জু করবে কি? সেইত কেরাণীর ঘরে হাঁড়ি ঠেলা। ওঁদের মেয়েদের শিক্ষা শোভা পায়; দশ, পনের, কুড়ি হাজার খরচ করে ওঁরা সিভিলিয়ান জামাই করতে পারবেন। কেরাণীর ঘরের ভাবি বধূর পক্ষে জ্ঞান চর্চ্চা শুধু অনাবশ্যকই নয়, মহাপাপ!

ওঁদের জ্ঞানের পিপাসা নেই, শিক্ষার আন্তরিকতা নেই, বিলাস আছে শুধু! সে বিলাসের উৎপাতে নীলা পীড়িত হয়, মঞ্জু উপেক্ষিত হয়!

ঘর ভরা বড় বড় কাঁচের আলমারির বইগুলি ওদের অন্তরের মুক্তি নয়, অলঙ্কৃত অলঙ্কার। ব্রেসলেট পরার মত ওরা হাতে একখানা বইয়ের, পাতা উল্টে দেখবার প্রয়োজন বোধ করে না, কষ্ট ও স্বীকার করে না! আছে ভাল। সংসারের রঙ্গমঞ্চে ওরাই যথার্থ অভিনেতা। ওদের অভিনয়ে ওরা একান্ত হয়ে মিশিয়ে গেছে। তরঙ্গিনীর অন্তরে যে ঘুমন্ত দর্শক ছিল, সে এক আঘাতেই জেগে উঠেছে, ঘুমিয়ে পড়লে হ'ত ভাল, কিন্তু ঘুম তার কিছুতেই থাকে না। ওর ঠোঁটের কোণে তাই একটা মৃদু হাসি চাপা থাকে, সে হাসি সুখের নয় দুঃখের ও নয়, সে শুধু দর্শকের। ওর অন্তরের আহত অভিনেতা বোনে স্বপ্নের জাল, ওর জাগ্রত দর্শক থাকে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে। নীরব কিন্তু নিবিড় এক বোঝা অবজ্ঞার নীচে তরঙ্গিনী পথ কেটে কেটে এগিয়ে চলে।

— ১৫ —

মঞ্জুর বিয়ের সম্বন্ধ চিন্তায় নগিন্নী বাড়ী শুদ্ধকে চঞ্চল করে তুল্লেন।

মঞ্জু বল্লে—"মা আমি পড়ব।"

তরঙ্গিনী নিরুপায় ভাবে চাইলে শুধু! দিনে দিনে মঞ্জুর বয়েস বাড়ে, অনেক কথাই সে বোঝে এখন। শাশুড়ী বধূর চিরন্তনী বিদ্বেষের কাহিনী শুনলে সে আশ্চর্য্য হ'য়ে চায়। কেন এমন হয়? মঞ্জুর কিন্তু ও রকম হ'বে না, কিছুতেই না। অন্তরের কল্যাণী বধূ জেগে ওঠে। পর হাতের কল্যাণ কঙ্কন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে স্বামীর প্রেমে, শ্বশ্রূ সেবায় ননদার স্নেহে।

'অবসর কি আছে'—'আচ্ছা যাও' 'সর মা ডাকছেন' 'না মা আমার ঘুম পায়নি; পাকা চুল কত যে আছে,' 'আপনি ঘুমুন আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি।' 'সর না ভাই এই জামাটা' শেষ নেই, সীমা নেই, এ কোন আনন্দের ঝরণা তলায় মঞ্জুর দিন কাটে। স্বামী সম্বন্ধে মঞ্জুর মনে কোন স্পষ্ট মূর্ত্তি নেই; শুধু পূজারিণীর স্নিগ্ধ চোখের মাঝে জাগে, সুন্দর,—রূপহীন অপরূপ, রুদ্র, কোমল, গভীর, গম্ভীর স্নিগ্ধ সুন্দর, সুন্দর নীল আকাশের মতই সে যে অসীম।

দেহের সীমাকে ছাড়িয়ে, ধারণারও সীমাকে ছাড়িয়ে, সে যে কেমন তা কে জানে!

দিন চলে যায়, পায়ে, পায়ে, নূপুর বাজিয়ে, রাত্রির বীণা ধ্বনি অন্ধকার আকাশে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাচীনা ধরণী, তরুণী হ'ল কেমন করে। মঞ্জুর আঁচলের বাঁকা ভঙ্গিটি সে কেমন করে শিখে নিয়েছে। বাতাস কি ভাষা জানে?

"মা"—বাইরে থেকে কোন শিশু তার মাকে ডাকে; মঞ্জুর মনে হয় ও ডাক যেন ও চেনে। কবে সে কোন যুগান্তরের ওপার থেকে ওকে যেন কে ডাক দেয়। কচি সে হাত দুখানি, টল মল বাঁকা বাঁকা চরণ রেখা, কাজল পরা বড় বড় দুটী চোখের বিস্ময় ভরা দৃষ্টি। মঞ্জু তাকে জানে, মঞ্জুর সমস্ত অন্তর তাকে অনুভব করে। কোন যুগান্তে, কোন শ্যাম সন্ধ্যার তারার দিকে চেয়ে কোন সে নির্জ্জন কুটীরের ছায়ায় বসে ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে মঞ্জু তাকে ঘুম পাড়িয়েছিল, এত কাল পরে আজ বুঝি তার ঘুম ভেঙ্গেছে, তার টল মল পায়ের ধ্বনি মঞ্জুর অন্তরের পুষ্পিত আঙিনায় মর মর রব জাগায়। নিজের মনে নিজের মাধুরী আর ধরে রাখা যায় না।

জন্ম, মৃত্যু, হাসি কান্নার স্রোতের ধারা ওর ভুবনে থমকে থেমে গেছে।

মঞ্জু যেন শুধু তরঙ্গিনীর কন্যাই নয়, মহিয়সী নারী, কল্যাণী বধূ, স্নেহময়ী জননী, পূজারিণী প্রিয়া।

নিজেকে মঞ্জু ভাবে না, তা' যদি ভাবত বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে যেত। যে কিশোরী মঞ্জু সেদিন পর্য্যন্ত

গিরিশিরে, সমুদ্রপারে আকাশের গায়ে গায়ে তেপান্তরের মাঠ বেয়ে চঞ্চল হ'য়ে ছুটে চলেছিল, সেই মঞ্জু আজ যৌবনের সাড়া পেয়ে সমস্ত চলার পথ সঙ্কুচিত করে এনেছে একখানি অখ্যাত কুটীরের নির্জ্জন প্রাঙ্গণে। তার দুরাশার বিপুল জয় গৌরব আজ মাটীর প্রদীপালোকে তুলসী তলায় প্রণাম করে মুক্তি চায়।

কি করে এমন হয় মঞ্জু তা' জানে না; ভাবেও না।

ভবিষ্যৎকে ও দেখতে পেয়েছে যেন।

১৬

—"মঞ্জুদি বাবা তোমাকে ডাকছেন।"

মঞ্জু চাবিটা আঁচলে ঠিক করে বাঁধছিল, বলে—"যাচ্ছি।"

ন গিন্নির ঘরে গিয়ে মঞ্জু ঢুকল।

ন-কর্ত্তা তখন কন্যা নারায়ণীকে নিয়ে বিব্রত। আকাশের চাঁদ পেড়ে আনা সাধ্যাতীত, কিন্তু সোনার চাঁদ গড়িয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করছিলেন হয়ত। নারায়ণী কিন্তু সোনার চাঁদ লাভ করার চেয়ে বাপের কোলে হাত পা ছুঁড়ে তার সহিষ্ণুতাকে পরীক্ষা করতেই পছন্দ করে বেশী।

ন-কর্ত্তার সহিষ্ণুতা কিন্তু অসীম, পরীক্ষায় তিনি ফেল করেন না কখন! যে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তার স্নেহশীলতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে রায় দেবেন!

নারায়ণী চায় না কিছু, সে শুধু জানতে চায়, তার রাত্রে রাখা পুতুলের গোলাপী রংয়ের কাপড়খানা তাকের ওপর থেকে মেঝেতে লুটিয়েছে কার অপরাধে। নিজেও সে লুটোচ্ছে, কিন্তু মেঝেতে নয় বাপের কোলে!

এত বড় হৃদয়-বিদারক ঘটনার আসামীকে ন-কর্ত্তা চেনেন না, বিপদ এইখানেই!

—"লক্ষ্মী মেয়ে, মা আমার শোন ত"—

ন-কর্ত্তার কথার মাঝখানে মঞ্জু গিয়ে দাঁড়াল।

—"কোথায় ছিলি এতক্ষণ! তখন থেকে এক গ্লাস জল চেয়ে চেয়ে গলা শুকিয়ে এল। এত বড় বুড়ো মেয়ের কাজ কর্ম্ম কিছু নেই। যা এক গ্লাস জল নিয়ে আয়, হাঁ্যা করে দেখা হচ্ছে কি? একটা পান ও আনিস।"

কোলের ওপর কন্যা তখনও লুটোপুটী করে কাঁদছে।

স্নেহশীল পিতা সেইদিকে মন দিলেন।

এমন পরস্পর বিরোধী ঘটনার সঙ্গে মঞ্জুর পরিচয় আছে। আস্তে আস্তে জল এনে সে ন-কর্ত্তার কাছে রেখে, হাত বাড়িয়ে নারায়ণীকে সান্ত্বনা দেবার দুরাশায় কোলে তুলবার চেষ্টা করল। কোলে উঠবার বয়েস নারায়ণী অনেকদিন পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু সময় ত সে পেরিয়ে আসেনি।

—"দাঁড়া, দাঁড়া, লাগবে, ওরকম করে টানাটানি করিস নে, কি করিস!—থাক তুই যা।"

মঞ্জু বেরিয়ে গেল।

ন-গিন্নী বাইরে বসে একবাটী নারিকেল তেল নিয়ে বিলি কেটে কেটে মাথায় মাখতে মাখতে গল্প করছিলেন।

—"ওসব ব্রাহ্ম খিরিষ্টানের ঘরে অমনি ধারাই হয়! এইত সিদিনকে উনি বলছিলেন মেয়েদের ইস্কুলের সেই মাষ্টারনিটে লো, সাতকাল আইবুড়ো থেকে মোল! ওদের সব বিচ্ছিরি!"

ছোট গিন্নী মাথার ফিতে দড়ি খুলতে খুলতে হাঁ করে শুনছিলেন, বল্লেন—"হ্যাঁ ন'দি, আচ্ছা ঐ যে সুরমা বিধবা হ'ল ওত এখনও বিয়ে করলে না?"

—"করবে, করবে ওদের ত' আর করতে মানা নেই।"

তা নেই! কিন্তু সামাজিক নিষেধ ছাড়াও নিষেধ আছে, সে সংবাদ ওঁরা জানেন না।

ওদের অভিধানে অন্তরের কোন মানে নেই।

—"মেম মাগীদের আবার বিয়ে, ওদের আবার সব। ভালবাসাবাসি করে ত সব বিয়ে করবে, শেষে দুদিন পরে 'ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি' পোড়া কপাল!"

ন-গিন্নী মুখটাকে অনাবশ্যক বাঁকালেন। নিষ্ঠা ওদের আছে, কিন্তু সে নিষ্ঠা একখানা তেল চিটে জীর্ণ প্রায় কেটোর কাপড়কে আশ্রয় করেই বেঁচে আছে।

অন্তরের মত বালাই আর নেই!

মূর্খতার যদি কোন পুরস্কার থাকে শ্রীরাধারই সেটা প্রথম প্রাপ্য।

যুধিষ্ঠিরী ছিলেন পাঞ্চালী, অর্জ্জুনের ছিলেন তিনি প্রিয়া, যুধিষ্ঠিরের গৃহিণী, ভীমের রাঁধুনী, নকুল সহদেবের কর্ত্রী হয় ত।

ছোট গিন্নী বল্লেন—"আচ্ছা শান্তির দিদি যে বলছিল"—

কি বলছিল—সে কাহিনী শুনবার ধৈর্য্য ন-গিন্নীর রইল না—বল্লেন—

—"শান্তির আবার দিদি কে লো? সে ত পিসি।"

মুখখানা বিরক্তিতে বাঁকা হয়ে এল।

—"পিসি হ'তে যাবে কেন। তরু ওর দিদি হয় না?"

—"কে বল্লে শুনি? মুলে বোন নেই, তা' তরু আর মঞ্জু। সাতকাল পিসি বলেই ত জানি, দিদি হ'লে কবে থেকে জানি না ত।"

তুচ্ছ সমস্যা, পিসি, মাসি, খুড়ি, জ্যেঠি, দিদি, যাই হোক, কিন্তু ন-গিন্নী সেটা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন।

ছোট গিন্নী ও।

বেশ একটু মনোমালিন্যের আভাস ফুটে উঠল, অবশ্য ক্ষণস্থায়ী।

১৭

—"প্রভাস ত বেশ ছেলে।"

রেবা বল্লে।

ন-গিন্নী কি তা অস্বীকার করেন? কিন্তু মঞ্জুর সঙ্গে কি আর মানায়, যা নয় তাই।

বল্লেন—"তা' হোক, মঞ্জুর সঙ্গে মানাবে না।"

"—কেন ন খুড়িমা!"

মরণ নেই এই কেন শব্দটার, যে কোন প্রশ্নের সঙ্গে ওটাকে জুড়ে দিলেই হ'ল।

আষাঢ় শুধু আকাশেই নামে না, আননেও নামে—বল্লেন—

—"কেমন হ'বে শুনি? এই আজ অবধি মঞ্জু ওর সঙ্গে হুটোপাটি করছে, আর কাল অমনি বউ হয়ে ঘোমটা দিয়ে বসবে। যত কি অনাচ্ছিষ্টি।"

—"কিন্তু জানা শোনা; তা' ছাড়া মায়াও ত পড়েছে একটু।"

—"পারত যাওয়া বাছা, আমি তার পথ আগলে বসে নেই।"

প্রভাস সম্বন্ধে প্রশ্নটা ঐখানেই চাপা পড়ল, কারণ যোগ সূত্র এটা জীর্ণ হ'য়ে এসেছে বটে, তবু ত মঞ্জুর জন্যে সেটা ছিঁড়ে যাবে।

তরঙ্গিনীর ভয় ভাবনার অন্ত নেই। মঞ্জু যে তার সব আশা, আশ্রয়, উৎসব। বল্লে—"মিত্তির গিন্নী যে ছেলের কথা বল্লেন, সে কি সুবিধে হ'বে নবৌদি! ছেলের মার শুনেছি বড্ড বেশী খাঁই। তাছাড়া ওর কথা গুলো"—

—"বাংলাতেই বলেছে, ইংরিজীতে বলবে? তা' তোমার মেয়ে শিখিয়ে নেবেখন।"

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ হাস্যে রসিকতার আবরণে ন-গিন্নী হুল ফোটালেন।

তরঙ্গিনীর বলবার ত কেছু নেই, আশ্রয় এবং অর্থ দুটোর কোনটাই তার নেই; চুপ করে থাকাই একমাত্র উপায়।

কিন্তু মন চুপ করে থাকে না, কেবলি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সবই যখন যায়, মনটা তখনও থাকে, একি কম বিড়ম্বনা। এমন যে জন্ম-বোঝার জাত অন্তরের বালাই তাদের থাকে কেন!

রাত্রের আহার পর্ব্ব সারা হ'ল। তরঙ্গিনী সমস্ত দিনের কোলাহল থেকে মুক্তির আশায় তেতালার ছাতের একপাশে শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে এলোমেলো ভাবনায় ডুব দিল।

পূর্ণিমা বুঝি! উজ্জ্বল চাঁদের আলো ধরণীর বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে অনেকদূর—অনেকদূর অবধি। শুষ্ক গাছের পাতাগুলি মাঝে মাঝে চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে দুলে দুলে উঠছে, কোন্ পথিকের চরণ স্পর্শে কে জানে।

অনেকদূর থেকে গৃহহীন কোন পথিকের সুরহীন গান ভেসে আসছে। দিনের আলোয় যে সঙ্গীত শুধু বিস্ময়ই নয়—বিরক্তিরও উদ্রেক করত হয়ত, রাত্রির নির্জ্জন প্রহরে সে যেন তারার আলোয় পথ চিনে

চলেছে এমনি উদাস, এমনি গভীর। যত কিছু অনাবশুক, যত কিছু অকারণ রাত্রির বুকে তাদের বাসা বাঁধা আছে বুঝি। অকারণে চেয়ে দেখার আনন্দ এমনি রাত্রেই সত্য হ'য়ে ওঠে।

তরঙ্গিনীর সমস্ত ভাবনা এলোমেলো হ'য়ে যায়। জগতের সবচেয়ে পুরান, একমাত্র সত্য যেন নগ্ন হ'য়ে দেখা দেয়। মঞ্জুর ভাবনা নিজেকে ঘিরে ঘিরে দীর্ঘ-পীড়িত দিনের চিন্তা কোনটাই আর মনে আসে না, সংসারের সমস্ত, সবটাই তরঙ্গিনীর সীমা ত সে নয়, সে সংসারের সীমা, দিনের সীমা। সংসারকে অতিক্রম করেও যে তরঙ্গিনী বেঁচে থাকে, রাত্রির স্তব্ধ প্রহরে সে বেরিয়ে আসে। তার পথ অন্দরের রান্না ভাঁড়ারে মাথা ঠোকে না; সে ঐ অনন্ত আকাশে অসীম হ'য়ে এগিয়ে চলে, দূরে—দূরে—আরো দূরে। যে গৃহী হারিয়েছিল, পথিক হয়ে সে ফিরে আসে।

তরঙ্গিনী নিজের সবচেয়ে বড় পরিচয় খুঁজে পায়, সে পরিচয় সংসারের আশ্রিতার নয়, অবজ্ঞেয়ার নয়, সে পরিচয় ছায়াপথের উদাসিনী পথিকের। ধীরে, ধীরে, ধীরে, ঘুম নেমে আসে চোখের পাতায়।

১৮

তরঙ্গিনী সব কথাতেই একটুখানি হাসে শুধু।

সংসারকে বিদ্রূপ করতে না পারলে বেঁচে থাকা তার পক্ষে কঠিন হ'ত।

পরের সংসারকে ভালবাসবার অধিকার তার নেই; তাকে ভালবাসতে গেলে আঘাতই পেতে হয় না, অপমানও বহন করতে হয় দুস্তর।

অনন্তবাবু যখন ছিলেন, তরঙ্গিনী সম্বন্ধে কর্তব্য তখন ছিল; এখন আছে কৃপা। সে কৃপায় তরঙ্গিনীর অন্তরের গৃহিণী, শুধু আহতই হয় না, বিদ্রোহীও হয়ে ওঠে। কিন্তু সে বিদ্রোহ তাকেই পীড়িত করে, তাই সংসারকে সে বিদ্রূপ করেই এগিয়ে চলে।

দালানের আলোচনাটা তরঙ্গিনী সম্বন্ধেই চলছিল, খুব তীব্র অথচ চাপা।—"প্রভাসের কথা কি আর বৌমা নিজের মন থেকে বলেছেন, ওসব ঐ ওঁরই গুরু মন্ত্র জাননা। চুপ—আসছে। হ্যাঁ ভাই মন্দ বাজারে যাক?"

তরঙ্গিনী কোটা তরকারির থালা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, গৃহিণীদের পূর্বাপর সব কথাগুলোই তার কাণে এসেছিল, ইচ্ছে হ'ল একবার সে জিজ্ঞাসা করে তাদের একমুষ্টি অন্নের মূল্যে মঞ্জুকে কি সে বিকিয়ে দিয়েছে।

প্রভাস সম্বন্ধে কোন কথাই সে ভাবেনি। কিন্তু যদিই ভাবত মেয়ে ত তারই?

মঞ্জুর সম্বন্ধেও কোন কথা বলবার অধিকার তার নেই, একবেলার অন্নমুষ্টিতে এমনি করে সে নিজেকে বিকিয়েছে।

অনেক প্রশ্নই মনে আসে, কিন্তু অন্নের প্রয়োজন আজও ত ফুরোয়নি, পৃথিবীতে যতদিন থাকবে ফুরোবেও না।

ম-গিন্নীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সেই বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাস্যে তরঙ্গিনী নীরবে নিজের কাজে চলে গেল।

ন-গিন্নী চাপা কণ্ঠে বল্লেন—

—"শুনেছে বুঝি। বাবা কাণ নয় ত।"

কাণ থাকার বিড়ম্বনা তরঙ্গিনীকে সবচেয়ে বেশী ভোগ করতে হয়। বধির হ'লে ওকে মানাত, সেকথা ও নিজেও জানে।

খেতে বসে ন-গিন্নী বল্লেন—"মঞ্জুকে কাল যে ওরা দেখতে আসবে ঠাকুরঝি।"

—"কা'রা?"

তরঙ্গিনী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

—ঐ যে কেষ্ট নগরের সেই তারা গো।"

তরঙ্গিনী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—"সীতারামপুরের তাঁরা কি বল্লেন?"

—"সীতারামপুর? তা জানিনা বাপু! তারা কি দেখতে চেয়েছে নাকি! জানিনা ত আমি।—"

অল্প বিরক্তির সুরে ন-গিন্নী বল্লেন।

বড় গিন্নী চুপ করে শুনছিলেন, কারণ খাবার সময় কর্তা তাঁকে বধির করে যাননি! বল্লেন—"তারা ত কিছু বলেনি, তাদের বিয়ের যুগ্যি ছেলে আছে শুনলাম, হ'লে ভাল হয়।"

—"সে কি আর ঠাকুর ঝি পারে। তোমার দিদি এককথা, তারা হ'ল বড়লোক।"

—"কিন্তু শুনেছি তাঁরা পণ নেবেন না।" তরঙ্গিনী ধীরে বল্লে।

—"তা না হয় নেবেন না, কিন্তু কেষ্টনগরের কথা পাকাপাকি হ'য়ে গেছে প্রায়, এখন ঝপ করে কথা নেই বার্ত্তা নেই, অমনি না বল্লে চলে কখন। আগে ওরা দেখে যাক, শেষে যদি পছন্দ না করে, তখন আর পাঁচ যায়গায় খোঁজ করতে হ'বে বই কি।"

তরঙ্গিনী কথা কইল না, ভাবতে লাগল। বড় গিন্নী কথা কইলেন—

—"কেষ্ট নগরে কি এমন কথা এগিয়েছে নবৌ? তা' ছাড়া ঠাকুরঝির প্রথম থেকেই ওখানে তেমন মত নেই, চির জন্মের সম্বন্ধ, তা'ছাড়া বাপ নেই, মায়ের ও তেমন মত নেই, যদি কিছু অন্য রকম হয় লোকে বলবে 'মামা', মামিতে দেখে দেয়নি।"

—"তা' বেশ ত বড়দি দেখেই দিন না ঠাকুরঝি আমি তায় মানা করিনি। ভদ্রলোককে উনি কথা দিয়েছেন; এখন যদি সব তোমাদের পছন্দ না হয়, বলগে ওকে। আমাকে ত বাপু দু'খান করে কেটে ফেল্লেও আমি পারব না। উনি এসব শুনলে রক্ষে রাখবেন? না কোনদিন আর মধুর বিয়ের কথা কইবেন? যত সব অনাছিষ্টি—ছেলে কিসে খারাপ শুনি? বি-এ, পাশ চাকরী করছে, আর কি চাই?"

উত্তর হয়ত ছিল কিন্তু তরঙ্গিনীর পক্ষে ছিল না। বড় গিন্নীও ন-গিন্নীর এতটা উগ্রতার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই চুপ করে গেলেন।

রেবা শুধু অস্ফুট সুরে বধূত্বের আবরণে বল্লে—"সীতা-রামপুরের ওরা জানা ঘর।"

—"জানা ঘর ত অনেক আছে। তোমারও ত ভাই রয়েছে, নিয়ে যাওনা গা বৌমা।" বলে ভাতের থালা-খানা ঠেলে ফেলে ন-গিন্নী রাগ করে উঠে গেলেন।

অপ্রতিভ রেবা শুধু বল্লে—"ন-খুড়িমা রাগ করে উঠে গেলেন।"

একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবলে 'ছোড়-দা যদি বিয়ে করতেন।'

১১

কেষ্টনগরের ওদের দিকে ন-গিন্নীর ঝোঁক আছে ওরা ওর সইর ভাসুর-ঝির শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কীয়া। ওরা ঘোরতর হিন্দু, ছোট মেয়ে ছাড়া নেয় না, দয়া করে মঞ্জুকে নিতে পারে।

তরঙ্গিনীর কিন্তু সমস্ত মন সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে, দয়ার পরিণামও জানে। তা' ছাড়া অতখানি হিন্দুত্বের আবেষ্টনে মঞ্জুকে মানুষ করা হয়নি।

মঞ্জুকে ও দরিদ্র করে মানুষ করেছে, দীন করেত মানুষ করেনি। ওরা যে জ্ঞানপাপী। ওরা যে পথ চলে, ওরা ত চালিত হয় না।

কেষ্টনগরের ওদের কি মেয়ের অভাব? ওরা নাকি পরদুঃখ সইতে পারে না, তাই মঞ্জুকে দয়া করে নিতে চাইছে।

নিরুপায়ে ক্ষোভে তরঙ্গিনীর ঠোঁটের উপর হাসির আভাস খেলে যায়—ভাগ্যিস তরঙ্গিনী জন্মেছিল, নইলে এতখানি করুণা যে পাত্রী অভাবে মাঠে মারা যেত।

কিন্তু এ সম্বন্ধ ছাড়লে ভবিষ্যতে সম্বন্ধ পাওয়াই যে ভার হ'বে তাই নয়, এ বাড়ীর আশ্রয়ের আশাও তাকে ছাড়তে হ'বে।

তবু ত মেয়ের প্রাণ। মঞ্জুর দিকে চাইলে চোখে জল আসে কেবলি।

পেটে খেলে পিঠে সয়; এ মন্ত্র মঞ্জুর নয়, সে পেটে না খেতে রাজী আছে, কিন্তু অকারণে পিঠে সইতে রাজি নয়।

হরিচরণের ছোট ভাই চ্যানা অন্নের উমেদার; দিন-রাত্রি মুখখানা তার কেমন যেন অনাবশ্যক অনুগ্রহ প্রার্থীর মত হ'য়ে থাকে।

ন-কর্ত্তা উঠে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়; পা বাড়িয়ে চটী খুঁজতে হয় না, চ্যানা সেটা আগে থাকতেই এগিয়ে দেয়।

ন-গিন্নীর খোকার সানুনাসিক অনুরোধে দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে ঘোড়া সাজে।

ন-গিন্নীকে কোন্ পাড়ের শাড়ীখানা পরলে মারাত্মক রকম মানায় তারি হিসাব করে।

ন-গিন্নী খেটে খেটে হাড় বার করলেন তাই নিয়ে ন-গিন্নীর কাছে বসে দস্তরমত হা-হুতাশ করে।

বয়স তার বছর কুড়ি।

মঞ্জু ওগুলো পারে না, ন-গিন্নীর মাথার ফিতের গেরো খুলবার জন্যে সে মরে গেলেও ছুটোছুটি করতে পারবে না, ন-গিন্নী আছাড় খেয়ে না পড়লে হা-হুতাশ তার মুখ দিয়ে কোনক্রমেই বেরুবে না।

ন-গিন্নী চ্যানার সাহায্যে বাক্স গোছাতে গোছাতে তরঙ্গিনীকে শুনিয়ে বলেন—"পর পরই থাকে, আপন আপনই থাকে। সেদিন যে বেরুতে গিয়ে দোরে কপালটা ঠুকে গেল; সবাই একটু হাহা করে সরে গেলেন, চ্যানা আমার দু'দিন ধরে কি সেবাটাই না করেছে।

চ্যানা কিন্তু চ্যানাই, মঞ্জু, মঞ্জুই।"

সন্ধ্যেবেলায় ছাতে বসে মঞ্জু কালপুরুষের তারা গোণে, ধ্রুবকে খোঁজে, আর অন্যমনে মায়ের কথা ভাবে। এ বাড়ীতে মায়ের স্থান শুধু সঙ্কীর্ণই ত নয়, সন্ত্রস্তও বটে। ওর যদি কোন উপায় থাকত। ও যে বিধবা তরঙ্গিনীর মেয়ে স্বয়ং স্রষ্টা হয়ত সে কথা ভুলে গেছেন, কিন্তু অন্নদাতা বিধাতারা সে কথা স্বপ্নেও ভোলেন না।

কি ভাবে কে জানে। না আদি না অন্ত; আশার রঙিন আবরণে ঢাকা ভাবনার রাশি উন্মনা করে তোলে। চিন্তার ধারাবাহিকতা নেই এলোমেলো। বাবাকে তার মনে পড়ে না। না একটুও না। মৃত্যুর পর কি হয়? আবার জন্মায়। মঞ্জুর কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না, এর আগে সে কোথায় জন্মেছিল। পাঁচ বছরের জীবন, সেও স্বপ্নের মত মনে পড়ে, আবছায়া অস্পষ্ট। একটা দুপুর ওর খুব মনে পড়ে; মেঘলা আকাশ, অপরূপ দিন; বকুল তলায় একটা কাঠের বেড়ার ওপর বসেছিল চুপ করে; গাছের তলায় বকুল ফুল ঝরেছিল একরাশ, ও কিন্তু একটাও কুড়োয় নি, খোলা চুলগুলো পিঠে ছড়িয়ে চুপ করে শুধু বসেই ছিল। তার আগের ঘটনা ওর মনে নেই, পরের ঘটনাও না। নিতান্ত সাধারণ, প্রাচীনা ধরণীর কাজল দুপুর তেমনি করেই কতবার এসেছে; তার নিজের জীবনেও অনেক বার; হয়ত তেমনি থারা কোন দুপুরে সে অদৃষ্টপূর্ব্ব—অস্বপ্নের যেম পুতুল ও উপহার পেয়েছে, কিন্তু মনের খাতায়—সেই পাঁচ বছরের একটা দুপুর নিতান্ত রিক্ত হাতে এসে, রঙিন হ'য়ে রয়েছে। স্মরণের আভরণ নেই; আপনাতে আপনিই সে অপরূপ সুন্দর।

লক্ষ, কোটী, শিশুর মত তার শৈশব, সহজ সুন্দর ছিল না, তবু ত সে শৈশব।

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তিরস্কার, লাঞ্ছনা, স্নেহহীন, শ্রদ্ধাহীন, শুধু মনে পড়ে মায়ের করুণ মুখ। মুক্তি ছিল ওর অবধি, সে মুক্তি অবজ্ঞার। মানুষ যখন আঘাত পায়, সান্ত্বনাও তার হারায় না; কিন্তু নর্দ্দমার ঘোলা জলের গ্লানি, না আছে তার সান্ত্বনা, না বা বিস্মরণ।

মঞ্জু অবাক হ'য়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

২০

পরীক্ষার যেন শেষ নেই। রক্তমাংসের সৃষ্টি সে কথা যেন মনেই পড়ে না।

বিধবা তরঙ্গিনীর মেয়ে মঞ্জু আড়ষ্ট হ'য়ে বসে থাকে, বিধাতার সৃষ্টি অন্তরাগিনী মঞ্জু অপমানে স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিয়ে পরীক্ষক বলেন—

—"এতে নিজের নাম লেখ দিকি; ইংরিজীতেও লিখো।"

লেখা শেষ হয়, কাগজখানা আস্তে আস্তে পকেটে উঠল।

"চুলগুলো খুলে দাও দিকি; হ্যাঁ ঠিক হ'য়েছে; থাক।"

দেখা শেষ হ'ল; বাজারের দোকানীও তেমন করে তার বিক্রয়ের বস্তু পরীক্ষা করতে দিতে ইতস্ততঃ ক'রত হয়ত; কিন্তু ও যে মঞ্জু।

পছন্দ তাঁদের হয়েছে কয়েকদিন পরেই খোঁজ পাওয়া গেল—বাকি রইল দেনা পাওনা, বিধাতা নির্দ্দেশিত ধর্ম্ম-বন্ধনের প্রথম ধর্ম্ম বুঝি সেইটেই।

আশঙ্কা ছিল অনেক; যাক; অল্পেতেই রেহাই পাওয়া গেল, ন' গিন্নী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। অত্যুগ্র আনন্দের আতিশয্যে মঞ্জুকে কাছে বসিয়ে স্বভাব বিরুদ্ধভাবে হেসে বল্লেন—"হ্যা লো পছন্দ হয়েছে ত বর?"

ছোট গিন্নীর দিকে চেয়ে বল্লেন—"আজকাল সব বড় বড় মেয়ে শুধিয়ে নেওয়া ভাল বাপু। আমাদের দিন কি আর আছে; দশ বছরে বাপ মায়ে যাকে দিয়েছে। এখনকার সব বুদ্ধি হ'য়ে বিয়ে দেওয়া শেষে আবার মনে ধরবে না।"

মঞ্জুর মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না, শুধু মনে হ'ল, ন' গিন্নী বিদ্রূপ করতে জানেন ভাল।

রেবা হাসলে অল্প একটু, বল্লে—"মনে খুব ধরবে ন' খুড়িমা। বউর একটা মাপ আছে, সে মাপ এক রকম, মেয়ে তাতে পড়লেই খাপ খেয়ে যায়, তা রামের ঘরই কি আর শ্যামের ঘরই কি।"

রেবার কথার তাৎপর্য্য ন-গিন্নী বুঝলেন না, হেসে বল্লেন—"তা বই কি; হিঁদুর মেয়ে। ধর্ম্মের বন্ধন, ওত আর মেম সাহেবদের নিকে নয়।"

মঞ্জু বসে বসে একটা ফুলতোলা কাপড়ের টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল; ন-কর্ত্তা ব্যস্ত হ'য়ে সেইপথে কক্ষের দিকে যেতে যেতে অকস্মাৎ মুখ খিঁচিয়ে তাড়া দিলেন—

—"দিন রাত্তির মেম সাহেবদের মত হাতে রেশম, পশম। যা' যা' রান্না ঘরে গিয়ে রান্না শেখ দিকিনি কাজ দেবে।"

—"ওগো শোন শোন দাঁড়াও। মেয়েটা তখন থেকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'য়ে সেলাইটা ফেলে গেল আমার কাছে; মঞ্জু করেনি এটা মায়ারাণী করেছে। ওইটুকু মেয়ে কিন্তু কেমন পরিষ্কার হাত বাপু।"

বলে ন-গিন্নী ছোট গিন্নীর দিকে চাইলেন, ছোট গিন্নী ঘোমটার মধ্যে থেকে ঘাড় নেড়ে ফিস ফিস করে বল্লেন —"সত্যি ন'দি, কে বল্‌বে ঐটুকু মেয়ের কাজ।"

ন-কর্ত্তা কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন। মুহূর্ত্তের জন্যে হয়ত একটু সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল, কিন্তু কেটে গেল, প্রসন্ন সগৌরব হাস্যে মুখখানা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল— "কোথায় গেল মেয়েটা। দেখি। বাঃ সত্যি ঐ যে আসছে। ও রে আমার একটা কিছুতে করে দিবি আড়ি ?"

মায়ারাণী ঝাঁপিয়ে পড়ল বাপের ওপর, সানন্দ সানুনাসিক সুরে বল্লে—

—"হুঁ করেত দেবই; কিসে করে দেব বাবা ? তুমি আমাকে একটাও সেলায়ের বাক্স কিনে দিলে না।"

ন-গিন্নী মেয়ের দিক নিলেন—

—"সত্যি বাবু, মেয়েটাকে তুমি একটা সেলায়ের বাক্স কিনে দিতে পারলে না!"

—"আচ্ছা দেব দেব। তোর মায়ের কাছে চা— টাকা কি আর আমার কাছে থাকে ? আমিই বলে তোর মার কাছে চাই।"

বলে হাসতে হাসতে ন-কর্ত্তা ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ছোট গিন্নী ঘোমটা খুলে হেসে গড়িয়ে পড়লেন— "সত্যি ন' দি, ন'ঠাকুরের ত যথাসর্ব্বস্ব তুমি।"

ন'গিন্নী প্রসন্ন হাস্যে বল্লেন—

—"নে থাম বাপু ওঁর যেমন কাণ্ড! চাবির গোছা বয়ে বয়ে আমার প্রাণ গেল; নিজেও চাইবেন সে আমার কাছে, আবার মেয়েটিকেও ধুয়ো ধরিয়ে গেলেন।"

রেবা এতক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়েছিল। কন্যা বৎসল পিতা, পত্নী-প্রেমিক স্বামীর কোনখানে মঞ্জুর সম্বন্ধে এতখানি তিক্ততা লুকিয়ে থাকে, সেইটেই হয়ত সে ভেবে পাচ্ছিল না! হঠাৎ মঞ্জুর দিকে চোখ পড়তেই ওর সমস্ত মনটা ব্যথিত হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে মঞ্জুর হাতখানা ধরে রেবা উঠে পড়ল।

সন্ধ্যেবেলায় রেবা ঘুমন্ত খোকাকে বিছানায় শোয়াতে শোয়াতে মৃদু সুরে অনিলকে বল্লে—

—"মঞ্জুর বিয়ের ত সবই ঠিকঠাক হ'য়ে গেল।"

অনিল টেবিলের পাশে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল মুখ না তুলেই বল্লে..."হুঁ"

খোকাকে শুইয়ে রেবা আস্তে আস্তে স্বামীর কাছে উঠে এসে চেয়ারের হাতের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল—বল্লে —"দেখ আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্ছে না, পিসিমারও তেমন মত নেই; তার চেয়ে প্রভাসবাবুর সঙ্গে হ'লেই হ'ত।"

—"তা'ত হ'ত কিন্তু আমি কি করব রেবা। ন'কাকে কিছু বলতে গেলেই রেগে যাচ্ছেন; মেজ কা' সেজ কা' কেউ ন'কা'র মতের বিরুদ্ধে যাবেন না, এ অবস্থায় আমাদের কি করবার আছে!"

—"কিন্তু প্রভাস বাবুর ঘরে দিলে কি ওদের ক্ষেতি হবে ?"

—"কিছু না. কিন্তু বলে কে ? প্রভাসের সম্বন্ধে ন খুড়িমা যে আগেই আপত্তি তুলে রেখেছেন।

—"কি জানি বাপু ! ন খুড়িমার সবই যেন কেমনতর। এ এদিকে ত প্রভাস, প্রভাস, করে অস্থির হয়ে যান।" কিন্তু তুমি আপত্তি কর। শুনছ ! না হয় ওর বিয়ে নাই হবে। পিসিমার আর ছেলেও নেই মেয়েও নেই, ওই ত একটা। শেষে কি একটা হবে ওদের বাবু বড্ড নিজে আছে ; আমার সেজ মামীমার বাপের বাড়ীত ঐখানেই, আমারও গোড়াগুড়িই ভাল ঠেকছে না।"

—"আমারও ঠেকছে না রেবা, কিন্তু বাবা যদি থাকতেন বলতে পারতাম, এখন আমি কাকে বলব ? ওরা মামা আমি যে মামাত ভাই।"

—"তবে আমি বলি।"

—"বলেছিলে ত আগে।"

—"কিন্তু কি এমন তাড়া ? মঞ্জু ত বড় হয়নি বেশী। কি রকম সব বোঝেন জানিনা। বেশ পড়ছিল, না সাত সকাল পড়া ছাড়িয়ে ঘরে বসালেন। কেন মেজকাকার মেয়েরা পড়েনি, না ন কাকার মেয়েরা পড়বে না ? কোন মেয়ের তোমাদের কুড়ির এদিকে বিয়ে হয়েছে শুনি ? আমি ঠিক বলব আজকে, রাগ করেন করবেন খন।"

অনিল রেবার হাতখানা ধরে কাছে আকর্ষণ করে মৃদু স্নিগ্ধ সুরে বল্লে—"মেজকার মেয়েতে মঞ্জুতে তফাৎ আছে রেবা জাননা। আজ যদি আমরা বাধা দিতে যাই, শুধু যে গোলযোগ রাগারাগি হবে তাই নয়, পিসিমার অবস্থা আরো বিশ্রী হয়ে উঠবে।"

—"তবে এমনি ধারা হবে ?"

দুস্তর ক্ষোভে, নিরুপায় বেদনায় রেবা বল্লে।

—"কিন্তু কেন ভাবছ ? মঞ্জুকে তারা ইচ্ছে করেইত নিয়ে যাচ্ছে। আর বলাই কি আর এক রকমই হয় ?"

রেবা উত্তর দিলে না, শুধু চুপ করে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

২১

'হয়ত' সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা এখন ঐটুকুই। তরঙ্গিনী কেবলি ভাবে হয়ত ওরা মঞ্জুকে আদর করেই ঘরে তুলবে। ঐ মঞ্জুকে ঘিরে নিঃসঙ্গ জীবনের, দীর্ঘ তিক্ত দিন রাত্রির অনেক মধুর স্বপ্নেই একদিন জাল বুনেছিল, আজ সম্পূর্ণ অন্ধভাবে নিরুপায় হয়ে ভাগ্যের ওপর সমস্ত ভার নামিয়ে দিয়ে, মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল অক্ষম কল্যাণ কামনায় দুই চক্ষে জল পুরে উঠল।

ন-গিন্নীর প্রশ্নের উত্তরে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে তরঙ্গিনী বল্লে—"মঞ্জুর আমি মরা মা ভাই, আমাকে আর কেন। ও তোমাদেরই মেয়ে, যে রকম ভাল হয় কর।"

মুখের ওপর চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য্যের আভাস ফুটে উঠল, ন গিন্নী বল্লেন—

—"শুভ কাজে চোখের জল ফেল না ঠাকুর ঝি। আহা, কি করবে বল, কপাল, নইলে ঠাকুর জামাইর কি যাবার সময় হয়েছিল। লোকে যে যাই বলুক ঠাকুর ঝি আমি কিন্তু মঞ্জুকে কখন পেটের সন্তানের চেয়ে তফাৎ করে দেখিনি। আমার নারায়ণী যা মঞ্জুও তাই।"

একটুখানি দম নিয়ে নগিন্নী বল্লেন—"অশিক্ষিত লোকে অনেকেই অনেক কথা বলে। এই সেদিনকে বড়দি. যেমন খপ করে বল্লেন মঞ্জুকে নাকি আমরা না দেখে শুনে যা তা ধরে দিচ্ছি। তা' বলেননিত কি ? পষ্ট করে কি আর লোকে বলে, ওমনি করেই বলে ; যাক আর যাই না লো ছোট বৌ। তা যে যা বলে বলুক আমি আর মঞ্জুকে পর ভাবি না। যশঃ ভাগ্য কি আর সবারি থাকে ; আমারও নেই !"

—"তা' বই কি ন'দি।"

ছোট গিন্নী পাশ কাটিয়ে গেলেন।

তরঙ্গিনী কোন উত্তরই দিল না, একটুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল।

ন গিন্নী চাপা কণ্ঠে বল্লেন

—"দেখলি ত একবার ! তা' বাপু আই তাদের কাজ যখন পছন্দ নয়, নিজে খুঁজে দিলেই পারতেন ! ওঁর আর পছন্দ হয় না কিছুতেই ! এর চেয়ে ভাল পাত্তর উনি পাবেন কোথায় শুনি ? আর খরচ পত্তর

সেও ত আমাদেরই দেখতে হবে; জজ ম্যাজিষ্টর জামাই আর বিনা পয়সায় মেলে না রে বাপু!"

স্বার্থহীন অপ্রয়োজনীয় সমস্যা, ছোট গিন্নী বুদ্ধিমতী ও সব নিয়ে মাথা ঘামাবার পাত্রী তিনি নয়, বল্লেন—"তা বই কি···যত সব অনাছিষ্টি ঠাকুরঝির। দেখি ছেলেটা আবার কাঁদল বুঝি!"

ছোট গিন্নী তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। দিনটা কেটে যায়; তার শুধু কোলাহল! রাত্রি কিন্তু কাটতে চায় না; দীর্ঘ অবসর, অনাদি, অনন্ত! তরঙ্গিনী বিছানায় শুয়ে এ পাশ ওপাশ করে, বিছানা ছেড়ে উঠে সম্মুখের জানালাটা খুলে দিয়ে আবার এসে বিছানায় শোয়। ঘর অন্ধকার, তারার মৃদু আলোকে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে চায়, চোখ দুটো বারে বারে জলে ভরে ওঠে! সঙ্গিহীন প্রাণ, ভাবনায় আকুল হয়ে ওঠে, কূল পায় না, হাঁপিয়ে ওঠে যেন। চোখ দুটো সজোরে বন্ধ করে শূন্যে, শূন্যে, আশে পাশে হাত বাড়িয়ে কাকে যেন অনুভব করবার চেষ্টা করে। অনেকখানি কিছু নয়, শুধু একটুখানি আশ্রয়! ভাগ্য! তাকে এড়িয়ে যাওয়া ত যায় না তাকে বহন করতেই হ'বে!

খোলা জানালার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে দু'একটী তারা দেখা যায়, প্রসারিত অশ্বত্থের শ্যাম শাখার একটু-খানি বাতাসের দোলায় কেঁপে কেঁপে উঠছে! সবটা দেখা যায় না, একটুখানি শুধু; যেন রহস্যময়ী ধরিত্রীর ঘোমটা খোলা মুখ, আবরণ নেই, তবু দেখা যায় না! যেটুকু চোখে পড়ে বিস্ময়ে ভরা যেন! পথ ক্রমেই জন বিরল হ'য়ে আসে, দু'একটি পথিকের পায়ের ধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা যায়।

অন্ধকার পথ, বৈদ্যুতিক আলোকের ভূষণ এখনও তার সহজ রূপকে আচ্ছন্ন করে, নয়নকে পীড়িত করে তোলেনি। অমাবস্যার নিবিড় গভীর অন্ধকারে, জ্যোৎস্নার চপল হাসিতে আজো তাই তার সাড়া পাওয়া যায়। মানুষের সমস্ত হাসি কান্নাকে ধরিত্রী যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করেন। তরঙ্গিনীর তরুণ ভুবনে ঐ অশ্বত্থের মর্ম্মরিত শ্যামল পাতাই এসেছিল তরুণ হাস্যের কল ঝঙ্কার, নুপুরের মৃদু রিণি রিণি, আজ ঐ আবার বয়ে এনেছে সুগভীর নিস্তব্ধ সান্ত্বনা, পরমাত্মীয়ের মত।

ধরার ছেলে মেয়ে, তাই ধরিত্রী ভাষা বোঝে হয়ত ওদের।

২২

বিয়ের দিন এগিয়েই আসে, এক দুই, তিন, করে।

মঞ্জুর সুনীল আকাশে দোলা লাগে, ক্ষণ সংশয়ের। কি হবে? কি হতে পারে, মঞ্জু তা' জানে না। মন শুধু থেকে থেকে থমকে চায়। রেবার সহজ সান্ত্বনা। বলে—"কেন ভাবছ পিসিমা! মঞ্জুকে কেউ ভাল না বেসে থাকতে পারে!"

পারে বই কি! মঞ্জুর কি একটা রূপ, না একটা পরিচয়। মানুষ মানুষকে পূর্ণ করে ত দেখে না, খণ্ড করেই দেখে, সেই জন্যেইত, রেবা যে মঞ্জুকে দেখতে পায়, ন'গিন্নী তার বিপরীত মঞ্জুকেই দেখেন।

তা হোক। অত কথা তরঙ্গিনীর মনে আসে না; ভাবে সত্যি ত। মন যেন আশ্রয় পেয়ে বাঁচে।

প্রভাস আসে; ন'গিন্নী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। বলেন—"ও মেয়ে কি কেউ নিতে চায়, বলে 'অত বড় মেয়ে।' কত কষ্টে এ সম্বন্ধ পাওয়া গেল। তা ঠাকুরঝির আমার কিছুত পছন্দ হয় না। তুমিই বলত ভাই, ছেলে কিছু খারাপ। মেয়ে ওঁর কি এমন ডানা কাটা পরী। চিরকালইত দেখলাম, আমাদের কপালে সুখ্যাতি নেই। যাক গে, কি আর করব বলব।"

অনাত্মীয়ের অন্তরের মত বালাই আর নেই। প্রভাস নিঃশব্দে শোনে, উত্তর দেবার কিছু খুঁজে পায় না। মানুষ মানুষের অন্তরে নিজেরই প্রতিবিম্বকে দেখে হয়ত; নিজের পরিচয়কেই তার পরিচয় বলে সান্ত্বনা পায় বুঝি। ন'গিন্নী প্রভাসের উত্তরের জন্যে তাই বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ওঠেন না, উত্তর যেন পেয়েছেন, তেমনি সুরেই বলেন—"তুমি ভাই বুঝবে বই কি—দেখছত মঞ্জুকে, কে আর আসবে রাজপুত্তুর।

রাজার দুলাল এসেছিল বই কি, কিন্তু সিংহাসনের ওপর থেকে মণি-মাণিক্যের বিরাট ঐশ্বর্য্যে চাপা জড় রাজপুত্র নয়; সে তেপান্তর প্রবাসী রাজপুত্র প্রভাসের অন্তর পথে পথ কেটে কেটে বন-ফুলের বরণ মালা নিয়েই সাড়া দিয়েছিল; কিন্তু ফিরে তাকে যেতেই হয়েছে। মঞ্জু তাকে চায় কি না সে

প্রশ্ন নিষ্ফল, মঞ্জুর আত্মীয়রা তাকে চায় না, সেইটেই সবচেয়ে বড়।

মুহূর্ত্তের জন্তে শুভ্র ললাটে রেখা ফুটে উঠল; মুখ ফিরিয়ে নিতে হ'ল। রুমাল দিয়ে মুখখানা সজোরে ঘসে ফেলে প্রভাস বল্লে—

—"আমি যে বইগুলো পাঠিয়েছিলাম পেয়েছিলেন ?"

—"হ্যাঁ পেয়েছি; কিন্তু তুমি আর কতদিন আমাকে আপনি বলবে প্রভাস।"

প্রভাসের মুখের ওপর চেষ্টাকৃত একটুখানি হাসির আভাস ফুটে উঠল, বল্লে—"আপনি যে দিদি হ'ন।"

—"দিদিকে কি লোকে আপনি বলে ? তুমি আমাকে পর ভাব সে কি আমি জানি না!

এ রকম কথার কোমল উত্তর অনেক আছে; কিন্তু কঠিন উত্তরই মুখে আসতে চায়। প্রভাস কিন্তু ভদ্র উত্তরই দিল—"আচ্ছা এবার থেকে চেষ্টা করব, ভুলে যাই কেবলি। আজ আমি উঠি।"

—"এইত এলে, এরি মধ্যে উঠি। দিদি বলে আজ কাল আর মনেও পড়ে না। আমি শুধু একলা একলা হাঁপিয়ে মরি। কবে আসবে বল ?"

প্রভাস উঠে দাঁড়িয়েছিল, চলতে চলতে বল্লে—"সময় পাই না, আবার আসব, শীগ্‌গিরই।"

মঞ্জুর মনে কোন ভাবটাই স্থায়ী হয় না, ক্ষণ সংশয়ে ক্ষণে ক্ষণে মন উন্মন হ'য়ে ওঠে।

ওর চোখে ভালবাসার অঞ্জন মাখান আছে; সমস্ত পৃথিবীকে ওর ভাল লাগে, তুচ্ছ ধূলার কণা গুলিকেও। অফুরন্ত প্রাণের অন্তহীন মাধুর্য্য।

ওর গগনে রঙের আভাস ফোটে, সে রং রক্ত কমলের রাঙা রং। খসে পড়া সাড়ীর আঁচলখানা চাবি শুদ্ধ ঝনাৎ করে পিঠের ওপর ফেলে দিয়ে মঞ্জু প্রভাসের সম্মুখে এসে দাঁড়াল—"উঠলেন যে এখুনি। ছোট মামি মা আপনাকে খুঁজছেন. বৌদির সঙ্গে দেখা করলেন না।"

প্রভাস একবার শুধু থমকে দাঁড়াল। তারপরে চলে যেতে যেতে বল্লে—"আবার আসব বোল ওঁদের।" ধীরে ধীরে প্রভাস চলে গেল।

২৩

বিচিত্র অপরাহ্ন, অপরূপ সুন্দর।

ভিজে কাপড়খানা হাতে নিয়ে মঞ্জু ছাতে এসে দাঁড়াল।

অস্ত সূর্য্যের রশ্মি আভায় চারিদিকে রাঙা হয়ে উঠেছে; পূব আকাশের খণ্ড খণ্ড, সাদা মেঘের টুকরাগুলি অবধি। মঞ্জু নিজের হাতখানা চোখের সম্মুখে তুলে ধরে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে, ওর পরণের কাপড়খানায় অবধি লালের আভা লেগেছে!

কে একজন লোক ওদিকের কোন বাড়ীতে বসে দুপুর থেকে ক্রমাগত বেসুরো হারমোনিয়মের সাহায্যে সা, রে, গা, মা সাধছে। লোকটার সম্বন্ধে মঞ্জুর মনে অনুকম্পা জাগে, বেচারা।

ছাতে পদচারণ করে অন্যমনে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে। পঞ্চমীর চাঁদ আকাশের গায়ে হেসে ওঠে; একটা তারা, ও আরো একটা তারা, মঞ্জু থমকে দাঁড়ায়, দিন রাত্রির অপূর্ব্বতা।

মেঘেরা কোথায় ছিল, একে একে নীল প্রাঙ্গণে চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরী খেলতে বেরিয়ে আসে। কতক্ষণ কাটে, আকাশের দিকে চেয়ে, তারা গোণে হয়ত; একটা, দুটো, তিনটে। হঠাৎ একটা মিলিত তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ কাণে এসে বাজে, কে বুঝি চলে গেল। মঞ্জুর মাথার থেকে পা অবাধ আড়ষ্ট হয়ে যায়; নিঝুম। নিমেষের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির রূপ যেন বদলে যায়। চারিদিকে ঘিরে গভীর গাম্ভীর্য্যের গুরুতা নেমে আসে। কেমন হয়ে যায় সমস্ত মন, সমস্ত জগৎ। প্রশ্ন নয়, উত্তর নয়, দুঃখ ? ভয় ? তাও নয়। পরিপূর্ণ নব জীবনের মাঝে, মৃত্যুর যুগ যুগান্তর আকুল কান্নার দোলা লাগে।

হঠাৎ তরঙ্গিনীকে যেন নতুন করে মনে পড়ে. বৌদিদিকে, বৌদিদির ছোট্ট খোকা ও। মঞ্জু দ্রুতপদে নীচে নেমে আসে। দুইহাতে তরঙ্গিনীর কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।

ঐ দুটী ব্যাকুল বাহুর বেষ্টনে ও যেন ওর সমস্ত প্রিয়-জনদের মৃত্যুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখবে।

মঞ্জুর মাথাটা কোলের ওপর ভাল করে টেনে নিয়ে,

ওর কপালের ওপর থেকে এলো মেলো চুলগুলি ঠিক করতে করতে তরঙ্গিনী রেবার কথার উত্তরে বল্লে—

—"সত্যদাসীর কথা চিরকালই ওই ধরণের। যোগমায়াকে দেখেছ ত? ওরও যেন কেমন ধারা উল্টো পাল্টা ধরণ।"

—"আচ্ছা পিসি মা, সেই ভূতের গল্প বলেছিল কে তোমার মনে আছে? মাগো!"

রেবা তরঙ্গিনীর কাছ ঘেঁসে সরে বসে নিজের পিঠের দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিল।

মঞ্জুর মনটা উদাস হাওয়ার ছোঁয়ায় ভারি হয়েছিল অনেকক্ষণ, রেবার আচরণে তার হাসির ছোঁওয়া লাগল।

—"বৌদি তোমার পেছনে কে দাঁড়িয়ে।"

মঞ্জু সশব্দে হেসে উঠল।

—"ও পিসিমা দেখনা।" রেবা অনেকখানি আঁৎকে একেবারে তরঙ্গিনীর কোল ঘেঁসে সরে এল। তরঙ্গিনীর মুখে মৃদুহাসি ফুটে উঠল—"মেয়ে নয় ত ডাকাত। কেন ওকে ভয় দেখাচ্ছিস।"

মঞ্জু কিন্তু হেসে উঠল—

—"আচ্ছা সত্যি কেন তোমার ভয় হয় বউদি? আমারত হয় না।"

ন গিন্নী পাশে এসে জাঁকিয়ে বসলেন। বল্লেন—"তোমার মত ত সবাই মেমসাহেব নয়।"

"মেমসাহেবদের ভূতের ভয় নেই বুঝি।"

মঞ্জুর ঠোঁটের আগায় সকৌতুক প্রশ্ন জাগল, কিন্তু সে চুপ করেই রইল। মেমসাহেবদের ভূতের ভয় থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর ন গিন্নী কি ভাষায় দেবেন মঞ্জু তা জানে, সুতরাং চুপ করে থাকাই এক্ষেত্রে একমাত্র উপায়। মঞ্জুও চুপ করেই রইল।

—"ভূতের উপদ্রব সে একবার হয়েছিল বটে, মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

ন গিন্নী বল্লেন।

বহুবার শ্রুত কাহিনী, মৃতা সপত্নী কেমন করে ঈর্ষার পরিচয় দেয় তারই একটা উৎকট গল্প। ন গিন্নীর বাপের বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই যে ঘটনা ঘটেছিল বলে প্রচারিত, সুতরাং ন গিন্নীর গায়ে কাঁটা দেওয়ার কোন জবাবদিহীর প্রয়োজন নেই।

—"বাপ রে কি অন্ধকার।"

প্রভাসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে উঠে বসল।

—"এস। ওরে মোক্ষদা একটা আলো নিয়ে আয়ত।"

তরঙ্গিনী বল্লে।

—"থাক আলোর দরকার নেই, আমি অমনিই বসছি।"

প্রভাস এসে কাছে বসল

—"অনিল কোথায়?"

—"বেরিয়েছে বুঝি; বোস তুমি এখুনি ফিরবে।"

—"মঞ্জুর যে বিয়ে।"

ন-গিন্নী বল্লেন।

প্রভাস একটুখানি যেন থমকে গেল। বল্লে—"সত্যি নাকি। ঠিক হ'য়ে গেছে! ওঃ হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে আপনি সেদিন।"

মনে একটু যেন বিস্ময় জাগল, বারে বারে সংবাদ দেবার প্রয়োজন কি?

অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছিল না তবু প্রভাস একবার ন-গিন্নীর মুখের দিকে চাইল।

একটুখানি থেমে প্রভাস বল্লে—"অনিল ফিরবে কখন জানেন?"

—"অত ব্যস্তইবা হ'চ্ছ কেন! এখুনি ফিরবে বোস না একটু।"

প্রভাস কিন্তু বসল না; অনিলের প্রতীক্ষায় অন্ধকারে পায়চারী করতে আরম্ভ করলে।

-২৪

ত্রুটী হীন অনুষ্ঠানে মঞ্জুর বিবাহ শেষ হ'ল।

যেমন করে হয়।

বাসর ঘরে জামাই অমনতর করে বসে ছিল কেন? গম্ভীর কি বেশী? লাজুক? তা হ'বে ও রা! বিয়ের শেষে পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘরের মেঝের গড়াগড়ি দিতে দিতে মেয়েরা গল্প করেন।

শুধু তরঙ্গিনী নির্জ্জন ঘরে চুপ করে পথের পানে চেয়ে বসে থাকে। ওর যেন সংসারের সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

কতদিনকার কথা কথা একে একে মনে পড়ে।

চার বছরের ছোট্ট মেয়ে মঞ্জু কবে একদিন মুখ ধুতে আপত্তি করায় কতক্ষণ নির্জ্জন আবদ্ধ ঘরে ছিল; নতুন জামা পরবার অসাময়িক আব্দারে কবে তরঙ্গিনী তাকে কেমন করে মেরেছিল সেইগুলোই শুধু মনে পড়ে চোখে জল আসে। ব্যাকুল মায়ের অক্ষম স্নেহে কত রকমে সে মঞ্জুকে আড়াল করে রেখেছিল সে কথা একবারো মনে হয় না; শুধু মনে হয় এতদিন ধরে মঞ্জুকে সে শুধু অনাদরই করেছে হয়ত। খোলা জানলা দিয়ে চোখে পড়ে; সারি সারি সজনে গাছ, ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে; একটা অস্পষ্ট মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে, তারি থেকে হয়ত। দেবদারুর শ্যামপাতা পাঁচিলের স্পর্শ করে উঁচু হ'য়ে উঠেছে। মধ্যাহ্নে উদ্যানের শাখায় শাখায় দোলা দিয়ে দুরন্ত বাতাস ছুটোছুটি করছে।

শ্যামল পাতার ফাঁকে ফাঁকে অরুণের আলোক অঞ্জলী ছড়িয়ে পড়েছে, বনলক্ষীর বেনারসীর খসে পড়া আঁচলখানির মত।

ঘরের মেঝেয় বসে রেবা নিজের বাক্স গোছ করছে, বাক্সের ডালা ধরে চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কৌতুহলী দৃষ্টিতে একাগ্র হ'য়ে চেয়ে রয়েছে; মেয়েদের মনের কোণে লুব্ধ দুরাশায় কেবলি জাগছে—কবে ও বেনারসীখানা ছিঁড়বে, পুতুলের বিয়েতে শুধু সাড়ীর তত্ত্ব! আকাশের চাঁদের মতই দুর্লভ দীন কেরাণীর ডার্ব্বি জিতের মতই অসহ্য দুরাশার আনন্দ!

বিয়ের সময় গোলযোগ বাধেনি, গোলযোগ বাধল পরে। ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে যাঁ'রা গিয়েছিল, অনেক তত্ত্বই তারা ফিরে নিয়ে এল।

মঞ্জুর মাতুল গৃহ যে শুভ্রবেশী 'চামার' মঞ্জুর শাশুড়ী সেটা শুধু অন্তরেই বোঝেননি, বাইরেও প্রচার করেছেন।

এমন তত্ত্ব মানুষে করে। হাড়ি ডোমদের মধ্যেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

তরঙ্গিনী আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল; জ্বলে উঠলেন ন-গিন্নী। হীনতা যদি স্বীকার করতেই হয় তরঙ্গিনী করুক, ন-গিন্নী করবেন না। ন-গিন্নীর কর্ত্তব্যবোধ যথেষ্ট আছে, নইলে ভাগ্নীর জন্যে কে এত খরচ করে?

তরঙ্গিনী চুপ করে রইল, ভগবান না, কিন্তু ভাগ্য ওকে মূক করেছে।

২৫

বসন্তের দোলা লাগে শাখায় শাখায়। ঝরা পাতায় গাছের তলা ছেয়ে গেছে যেন। অশ্বত্থ গাছটার ডগায় দু একটী কচিপাতা সবে ফুটেছে; উদাস বাতাস বয়ে চলেছে; সমস্ত মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

নীল আকাশের ওপার থেকে ব্যাকুল বাতাসের বাঁশরী হাতে—পলাশে, শিমুলে করবী, কর্ণিকা শিরিষ সেউতির ফুলপথে রক্তকমল চরণ দুটীর রেখা এঁকে এঁকে কে বিদেশী ধরায় নামে।"

দিকে দিকে মর্ম্মরিত ঝরা পাতায় তার চরণের নুপুর ধ্বনি শোনা যায়।

উতলা উত্তরীয়খানি ব্যাকুল সৌরভে ছড়িয়ে পড়ে দিগদিগন্তরে।

হাসি, কান্নার মাণিক গাঁথা মালা নিয়ে সে ধরিত্রীকে বরণ করতে আসে।

সম্মুখের পথখানি এঁকে বেঁকে অগ্রসর হয়ে গেছে কতদূরে, কত দেশে।

এই পথ দিয়েই মঞ্জু গেছে।

তরঙ্গিনী কর্ম্মহীন দ্বিপ্রহরে পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে চুপ করে।

মঞ্জুর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে ন-গিন্নীদের মনান্তর ক্রমেই যেন প্রবল হ'য়ে উঠছে, মাঝখানে তরঙ্গিনী আড়ষ্ট হ'য়ে বসে থাকে।

তরঙ্গিনীর মেয়েকে ওরা বধূরূপে বরণ করেছে, একথা ওরা মানতে চায় না; এরা ভুলতে পারে না!

ওরা বলে আমাদের এমন সোনার চাঁদ ছেলে তার কিনা এমন অনাদর। এরা বলে—"ভাগ্নে জামাইকে কে কত করে থাকে শুনি?"

দুই পক্ষই প্রবল। ওরা বলে—"পাঠাব না মেয়ে।"

এরা বলে—"আনব না আমরা।"

তরঙ্গিনী নিরুপায়; এদের কাছে বলতে গেলে এরা বলে—

—"তা' ঠাকুরঝি তোমার হ'ল সে জামাই, তুমি কি আর দোষ দেখতে পাবে। তা' বেশ ত' তুমি কর না যা' ইচ্ছে, আমাদের সঙ্গে অমন ধারা ছোটলোকদের কোন সম্পর্ক নেই তা' বলে রাখছি।"

ওদের কাছে বলতে গেলে ওরা বলে—"দ্বিতীয় পক্ষে ত আর মেয়ে দাওনি বেয়ান।"

মঞ্জুকে আনবার জন্যে তরঙ্গিনী কথায় বলেছিল সভয়ে, সঙ্কোচে।

ন-গিন্নী উত্তরে মুখখানা অতিরিক্ত বাঁকা করে বল্লেন —"শুধু শুধু লোকের সম্মুখে আমাদের অপদস্থ করবার জন্যে মঞ্জুকে আনবার কথা বলা কেন ঠাকুরঝি, ওরা পাঠাবে?"

পাঠাবে বই কি; কিন্তু বিয়ের আগে ওরা থাকে পুরুষ, বিয়ের পর ওরা হ'য়ে যায় জামাই।

ন-গিন্নীদের দিক থেকে সেই জামাইকে আহত করা হয়েছে।

কিন্তু এরা সবাই বলতে চান "ও তরঙ্গিনীর জামাই।"

—"অ ঠাকুরঝি, দেখ ভাই তোমার বালা দুটী খাসা গড়িয়ে এসেছে।"

ন-গিন্নী ঘরে ঢুকলেন, হাতে তার ছোট্ট ছোট্ট ঝক-ঝকে দুটী সোনার প্লেন বালা।

ন-গিন্নীর বড় মেয়ের প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন, সবাই কিছু না কিছু দেবে; তরঙ্গিনী রিক্ত হাতে বসে বসে আলোচনা শুনছিল, ন-গিন্নী বল্লেন—"তুমি কি দেবে ঠাকুর ঝি?"

মনে হ'ল প্রচণ্ড বিদ্রূপ; কিন্তু ন-গিন্নী বিদ্রূপ করে বলেন নি।

বল্লেন—"বালা দেবে? তবে আমি না হয় শুধু হারই দি, তুমি বালা দাও, কেমন? আমি অবিশ্যি ভেবেছিলুম হার বালা দুটোই আমি দেব, কিন্তু সবাই সব দেবে; তাই মনে হ'ল তুমি কি দেবে? তা' তুমি বালা দিও আমি হার দেব।"

ন-গিন্নী ব্যবস্থা দিলেন।

শ্রোতারা ন-গিন্নীর কর্ত্তব্য বোধ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন।

ভগবানের দয়া থাকলে তবে লোকে এমন ভ্রাতৃজায়া পায়।

দুঃখী ননদের কথা কেই বা মনে রাখে? ন-গিন্নী এক নিমেষে দেবীর আসন পেলেন।

তরঙ্গিনী শুধু ঘাড় হেঁট করে কৃপার বোঝা তুলে নিলে।

বালা হাতে করে ন-গিন্নি ঘরে ঢুকলেন। তরঙ্গিনী মহাভারতখানা হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিল।

ন-গিন্নীকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমক ভাঙ্গল—"কি ভাই?"

—"তোমার বালা দুটী কি সুন্দর গড়িয়েছে ভাই। এই নাও রাখো। মেধো স্যাকরার গড়ন খুব পরিষ্কার; মেধোর বাপ আবার গড়াত আরো চমৎকার। আর শুনছ তোমার মেয়ে বালা দেখে কি বলছে? বলে 'মা এমন সুন্দর গড়ান হয়েছে আমার এমনি লোভ হচ্ছে, পিসিমা যদি বড় করে গড়িয়ে দিতেন; নাতি আর ওঁর, কদিন পরবে? মেয়ে বরং পরত!"

ন গিন্নীআনন্দাতিশয্যে হাসতে লাগলেন।

—"তা সত্যি কি সুন্দর হয়েছে।" তরঙ্গিনী হাতে করে বালা দুটী নিল। সহসা মনে পড়ল এক সপ্তাহ আগে মঞ্জুর চিঠি এসেছে, উত্তর দিতে পারেনি শুধু এক খানা খামের অভাবে।

* * * *

কতদিন গিয়েছে? বুঝি যুগ যুগান্তর!

ক্লান্ত দেহ মন মৃত্যুর যবনিকার এপার থেকে ব্যাকুল বাহুদুটী জড়ান, তরঙ্গিনী শ্রান্ত হয়ে চেয়ে থাকে; এপার ওপার একাকার হয়ে গিয়েছে।

দুরাশা আর কোন দিকেরই নেই; মৃত্যু যেন মৃত্যু হয়েই আসে সুখ দুঃখের সমাপ্তি নিয়ে; শুব্ধ অর্দ্ধরাত্রে ব্যাকুল চোখের জলে তরঙ্গিনী প্রার্থনা করে। বিজয়ার আনন্দ কোলাহলে বাইরে চাঞ্চল্য জাগে।

—"অ ঠাকুরঝি বেরিয়ে এস, শুভদিনে ঘরে বসে রইলে কেন?" ন গিন্নী ডাক দিলেন।

ছোট গিন্নীর দিকে চেয়ে চাপা কণ্ঠে বল্লেন— "ঠাকুরঝির আমাদের যত অনাছিষ্টি অলুক্ষুণে কাণ্ড! ওঁর মেয়েকে ডাকা হয়নি কি না তাই ঠাকরুণের গোসা হয়েছে!"

পুষ্পপাত্র—

জ্যোৎস্না

শিল্পী শ্রীহাসিরাণি দেবী

—আজকের দিনে চোখের জল ফেলে অলক্ষণ কোর না ঠাকুরঝি! এত আপ্তসুখ দেখলে চলবে কেন! আমাদেরও ত ভালমন্দ দেখতে হয়।"

বলতে বলতে নগিন্নী ঘরে এসে ঢুকলেন।

তরঙ্গিনী উত্তর দিলে না; আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে মঞ্জুর চিঠি খানা তখনও ধরা ছিল—"মাগো আমি আর পারছি না, আমাকে নিয়ে যাও—"

সমাপ্ত

ব্যথার গান

কুমারী রেণুকা মিত্র

শরৎ আবার এসেছে ফিরিয়া
পরিয়া তাহার স্নিগ্ধ বেশ;
চারিদিকে তাই শ্যামল মাধুরী,
আনন্দ রবে মেতেছে দেশ।
মা'র আগমনী গাহে সবে আজি,
ছেলেমেয়ে চলে নব বেশে সাজি',
আমার মনেতে জাগিছে সদাই
একটী দিনের কথা,
এমনি দিনেতে হারায়ে ফেলেছি
মোর স্নেহময় পিতা।
মহানবমীতে বিজয়ার মত,
ছেড়েছেন পিতা এ মর জগত
(এ) আনন্দ দিনে স্মৃতির ব্যথায়
ভরেছে ক্ষুদ্র এ হৃদিখান
জীবন-বীণায় ছিন্ন তারেতে
ঝঙ্কারে শুধু ব্যথার গান॥

প্রার্থনা

শ্রীশোভা দেবী সরস্বতী

মাগো! দুর্গতি নাশিনী দুর্গে দয়াময়ী লোকে বলে।
শুনি কালের ভয় থাকে না, অভয়া তোর কৃপা হলে।
আদ্যাশক্তি মহামায়া,
দেব কার্য্যে ধৃতা কায়া,
প্রমত্ত এই মন কেশরী মুগ্ধ যাঁহার পদতলে।
মানবের দশ ইন্দ্রিয় দশ হাতে যার আয়ুধ রূপে,
দিতে পশুভাবের বলি, মমতার অন্ধকূপে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,
স্নেহ প্রেম সেবা সখ্য,
সিদ্ধি শক্তি ধন ও প্রজ্ঞা আসে ঘরে তুমি এলে।
আঘাত ব্যথায় কাঁদায় যখন সবাই দেখি তোমায় ডাকে।
যা হবার তা হবেই যদি, তবে আমি জানাই কাকে?
সবই যদি কর্ম্মফলে,
নেই কো কিছু কৃপা বলে,
মিছে কেন তোমায় ডাকা, ভাসা এমন চোখের জলে?

"দিদি"

কুমারী রেণুকা মিত্র

যেদিন নলিনী তার ছোটদেওর সমীরের বিয়ে দিয়ে রমাকে গৃহে আনলে, সেদিন পাড়ার প্রতিবেশীরা সকলেই বলেছিলেন, "হ্যাঁ, সুন্দরী বউ হয়েছে বটে—যেন ঠিক লক্ষ্মীপ্রতিমা।" কিন্তু কি ক'রে যে হঠাৎ কোল্‌কাতায় এবং বিদেশে অবস্থিত দুই পরিবারের মধ্যে এ রকম একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল, সে বিষয়ে অনেকেই বেশ বিস্ময়প্রকাশ করেছিলেন। এর মূলে একটি ছোট্ট ইতিহাসও আছে।

* * * *

সমীরের বিয়ের প্রায় চার বছর আগে, নলিনী, তার স্বামী সুকুমারবাবু; বিধবা শাশুড়ী উমাসুন্দরী, দেওর সমীর প্রভৃতি সকলে ৺পূজার ছুটীতে পাটনায় বেড়াতে যান। সেখানে গিয়ে তাঁদের রমার বাপের বাড়ীর সঙ্গে পরিচয় হয়। রমা তখন মাত্র দশবছরের ছোট ফুটফুটে বালিকা।

ক্রমে এই দু'টী সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হ'য়ে গেল। রমা প্রায়ই নলিনীদের বাড়ীতে বেড়াতে আসত। তার মায়ের সঙ্গে উমাসুন্দরীর এবং তার বাবা,দাদার সঙ্গে সুকুমারবাবু ও সমীরের অতি অল্পদিনের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেল। নলিনীর খুব ইচ্ছে যে, সমীরের সঙ্গে রমার বিয়ে হয়; সে একদিন চুপিচুপি উমাসুন্দরীকে বল্লে, "মা, রমা মেয়েটি বেশ, না? ওর সঙ্গে ছোটঠাকুরপোর বিয়ে হলে সুন্দর মানায়।" উমাসুন্দরীরও রমাকে পুত্রবধূ করবার বাসনা ছিল, তিনি নলিনীর এই কথায় বেশ সন্তোষপ্রকাশ ক'রে বল্লেন, "হ্যাঁ, তা' বেশ ভালই হয়, তবে রমা এখন বড্ড ছোট, আমার 'সমু'ও তো সবে এখন বি, এ পড়ছে, কোন একটা পথে বেরিয়ে না গেলে বিয়ে দেবার আমার তেমন ইচ্ছে নেই। কারুর তো ইচ্ছেমত এসব কাজ হয় না মা, ভবিতব্যি থাকে তো নিশ্চয় হবে পরে।" নলিনী কিন্তু শাশুড়ীর এই কথায় তেমন সন্তুষ্ট হ'তে পারল না, বল্লে, "ভবিতব্যি আবার কি মা, আপনার যখন ইচ্ছে আছে, তখন বিয়ে হবেই।" উমাসুন্দরী হেসে বল্লেন, "পাগ্‌লি মায়ের কথা শোন একবার, ইচ্ছে হ'লেই যদি কাজ হ'ত, তাহলে তো সংসারে কারুর কোন ভাবনাচিন্তাই থাকত না।" এরপর আর বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হ'লনা। বিয়ের কথা কিন্তু উমাসুন্দরী, নলিনী এবং সুকুমারবাবু ভিন্ন কেউ জানতে পারল না।

তারপর সেখানে দু'মাস কাটিয়ে নলিনীরা সকলে তাদের কোল্‌কাতার ভবানীপুরের বাড়ীতে ফিরে এল। কিন্তু তাদের এই আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে দুই পরিবারের পরিচয়সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল, তা' নয়। সুকুমারবাবু মাঝে মাঝে রমার বাবার কাছে পত্র লিখে তাঁদের সংবাদ নিতেন। রমাও নলিনীকে পত্র দিত।

* * * *

তারপর চারটি বছর কেটে গেছে; এরি মধ্যে পরিবারটির কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে; উমাসুন্দরী চিরদিনের জন্য এ জগৎ ছেড়ে পরপারের যাত্রী হয়েছেন। নলিনী তার মাতৃসমা শাশুড়ীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে সমীরের সঙ্গে রমার বিয়ে দিয়ে তাকে বরণ ক'রে ঘরে আনলে।

উমাসুন্দরীর তিরোভাবে তাঁর স্থানটী পূর্ণ করবার জন্যে একটি নবাগত শিশু এই পরিবারভুক্ত হয়েছে। শিশুটি নলিনীর একমাত্র পুত্র "বিমল"। তিন বছরের শিশুর সেই সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মের মত সুন্দর ঢলঢল মুখখানি যে দেখে, সে-ই তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারে না। বিমলের সব চেয়ে বেশী আলাপ তার 'ছোট মা' ওরফে 'খোতমা'র সঙ্গে। রমাকে সে কাকীমা না ব'লে 'ছোটমা' বলতো; কারণ, বাড়ীর সব ঝি, চাকর রমাকে ছোটমা বলে সম্বোধন করত, তাই শুনে ছোট বিমলও তাকে 'ছোটমা' বলতে আরম্ভ করল, কিন্তু তার আধ আধ বুলীতে ছোটমা নামটী "খোতমা" রূপে রূপান্তরিত হয়ে যেত। রমা বিমলের মধুর 'খোতমা' ডাক শুনলেই তার সব কাজ ফেলে ছুটে এসে তাকে কোলে নিত এবং সরলপ্রাণা বালিকার মত তারসঙ্গে খেলা সুরু করে দিত। নলিনীর তা' দেখে আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। রমাকে সে ঠিক নিজের ছোট বোনটীর মতই স্নেহ করত, ভালবাসতো।

ক্রমে সুদীর্ঘ ৬টী বছর কেটে গেছে। বিমলএখন ৯ বছরের বালক; সে ভবানীপুরের কোন একটী হাইস্কুলের সপ্তমশ্রেণীর ছাত্র। সমীর এখানকারই কোন একটি কলেজের প্রফেসর। সুকুমারবাবু কোন একটী গভর্ণমেন্ট অফিসে চাকুরী করেন। ছোট পরিবারটির দিনগুলো একরকম বেশ সুখে শান্তিতেই অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু, যেখানে পরিপূর্ণ সুখ, সেখানে একটা না একটা দুঃখ না দিয়ে ভগবান বুঝি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন না;—এই সুখী পরিবারটিও তাঁর নির্ম্মম দৃষ্টির হাত থেকে মুক্তি পেল না।

নলিনী হঠাৎ দুরারোগ্য হার্টের অসুখে আক্রান্ত হ'ল। সে কোন কাজ করতে পারে না, একটু পরিশ্রমেই ভয়ানক হাঁফ ধরে।

সে ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌তে লাগল। বাড়ীর কর্ত্রী, শুধু কর্ত্রী বলেই নয়, সর্ব্বগুণসম্পন্না আদর্শ গৃহিণী নলিনীর এই আকস্মিক অসুস্থতায় সকলেই বড় বিচলিত হয়ে উঠলেন। রমা সংসারের প্রায় সব কাজকর্ম্ম চাকর, বামুনের হাতে ছেড়ে দিয়ে দিবারাত্র নলিনীর সেবা করে—সারাক্ষণ তার কাছেই থাকে।

সেদিন ছিল তৃতীয়া, কাস্তের মত সরু একফালি চাঁদ কালো আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে; তার শীর্ণ কলেবরে সেদিন সে তার জ্যোতিঃ বেশীদূর বিকীরণ করতে পারছিল না,—তার সেই ক্ষীণ আলোটুকুও আবার মেঘেরা মাঝে মাঝে দৈত্যের মত গ্রাস করে ফেলে কালো আকাশটাকে গাঢ়তর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

নলিনী তার রোগশয্যায় শুয়ে খোলা জানালার মধ্যে দিয়ে মেঘের ও চাঁদের এই লুকোচুরি খেলা দেখ্‌ছিল, বিমল খাটের ওপর তার পাশে বসেছিল। কিছুক্ষণ বাদে নলিনী তাকে কাছে টেনে এনে বল্লে "বিমল, তুমি আজ পড়তে গেলেনা?" সে বল্লে "না মা, কাল ছুটী আছে, তাই আজ আর পড়লুম না।" নলিনী তাকে আরো কাছে এনে তার সরল মুখখানিতে চুমো দিয়ে বল্লে, "বিমল, আমি মরে গেলে তুই তোর ছোটমার কাছে শুবি, কেমন?" বালক বিমল মায়ের এ সব কথা ভাল করে বুঝতে না পেরে শুধু মায়ের আরো কাছ ঘেঁসে বসে রইল। নলিনী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, "বিমল, তোর ছোটমাকে একবার ডেকে আন্‌তো বাবা।" রমা এতক্ষণ নলিনীর কাছে থেকে, একটু আগে বামুনঠাকুরকে খাবারদাবারের কথা বুঝিয়ে বলে দিতে গেছে। বিমল আস্তে আস্তে খাট থেকে উঠে রমাকে ডাকতে গেল। নলিনী শান্ত, সরল বালকের ধীরপদক্ষেপের দিকে অনিমেষনয়নে চেয়ে কত কি ভাবতে লাগল। চিন্তার ঘোরে যখন সে মগ্ন হয়ে রয়েছে, রমা সেই সময় ঘরে এসে ঢুকল। নলিনী ঘুমিয়েছে মনে করে সে কিছু বল্লেনা শুধু তার খাটের কাছে এসে দাঁড়াল। নলিনী কিন্তু ঘুমোয়নি, সে তার দিকে চেয়ে বল্লে, "রমা, এসেছিস্ ভাই, দাঁড়িয়ে কেন আমার পাশে এসে বোস্, তোর সঙ্গে আজ জন্মের মত শেষ গল্প করে' নিই——" রমা ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বল্লে, "ওসব কেন বল্‌ছ দিদি?—তুমি সেরে উঠ্‌বে, আবার আমরা দুইবোনে মিলে কত গল্প করে, কাজ করে দিন কাটাবো। এখন একটু চুপ কর, একসঙ্গে অত কথা কইলে হাঁফিয়ে উঠবে যে ভাই।" নলিনী এর প্রত্যুত্তরে শুধু একটু নিরাশার ম্লান হেসে বল্লে, "আমায় আজ আর চুপ করতে বলিস্‌নে বোন্! এ জীবনে আর হয়তো কথা কইবার সুযোগ পাবোনা।" রমা এর উত্তরে আর কিছু বল্‌তে পারলে না, শুধু তার বড় বড় চোখ দুটী বেয়ে টপ্‌টপ্ করে' জল গড়িয়ে পড়ল; ঘরের প্রদীপের স্তিমিতালোকেও তার চোখের জলে ভেজা পাতা দুটী চকচক্ করে' উঠলো। নলিনীর চোখও সজল হয়ে উঠেছিল, তবু সে তাকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করে বল্লে, "রমা কাঁদছিস্? ছি', কাঁদিস্‌নে বোন্! তোর ওপর আমি কত দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি বল্ দিকিনি। বিমলকে যা'তে 'মানুষ' করে তুল্‌তে পারিস্, তার যথাসাধ্য চেষ্টা করিস্ ভাই".........নলিনীর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল, কথা বল্‌তে তার অত্যন্ত হাঁফ ধর্‌ছিল, তবু সে জোর করে' বল্‌তে লাগল "আমারও কি তোদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছেরে, কিন্তু কী করবো বল? আমাকে কে যেন হাতছানী দিয়ে ডাক্‌ছে, তার সে ব্যাকুল ডাক্ আমি কিছুতেই এড়াতে পার্‌ছি না, আমাকে যে যেতেই হবে।" নলিনী এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে' অসম্ভব হাঁফাতে লাগল। রমা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল; কিছুক্ষণ বাদে নলিনী একটু শান্ত হ'লে, সে তাকে একদাগ ওষুধ খাইয়ে দিলে। সেদিন রাত্রিটা নলিনীর খুব বাড়াবাড়ি অবস্থাতে কেটে গেল ডাক্তারবাবু এসে রোগিণীকে পরীক্ষা করে, বল্লেন "হার্ট ভয়ানক 'উইক', যে কোন মুহূর্ত্তে এর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

সময় কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না; পরের দিন প্রত্যূষে যথারীতি সূর্য্যদেব চারিদিক আলো করে' পূর্ব্বাকাশে উদিত হ'লেন; কিন্তু রমাদের কাছে সেদিন বুঝি সূর্য্যের কিরণ বড়ই ম্লান বলে' মনে হচ্ছিল।

নলিনীকে সেদিন বড় সুন্দর, প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল—যেন তার কোন অসুখই নেই। প্রদীপ নেভবার আগে যেমন তার শিখাটী বেশী উজ্জ্বল বলে' মনে হয়, নলিনীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ বলেই তার দেহ-শিখাটী বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

ক্রমে সূর্য্যদেব তাঁর গন্তব্যপথের দিকে এগিয়ে চল্লেন; পশ্চিমাকাশের গায়ে কে যেন একমুঠো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। নলিনীর নাড়ীর গতি ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছিল। ক্রমে প্রকৃতি-সূর্য্যের অস্তাগমনের সঙ্গে তার জীবনসূর্য্যও চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে গেল। রমা "দিদি" বলে' কেঁদে উঠলো। কিন্তু তার সে আকুল, বাধাহারা ডাকে তখন সাড়া দেবে কে? হায় "দিদির" অন্তরাত্মা তখন তার দেহপিঞ্জর ছেড়ে কোন্ অজানা, অসীমের রাজ্যে চিরবিলীন হয়ে গেছে।

মা

শ্রীমতী সুবাসিনীবালা বসু

—গল্প—

১

"কি গো আজ আবার কি হ'ল?—এ রকম করে আর পারাও যায় না বাপু!"

রাত্রি আটটা। সতীশ আপনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া, স্ত্রী লেখাকে বিছানায় শায়িতা দেখিয়া বুঝিল, আজ আবার একটা কিছু কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। লেখা কোন জবাব দিল না। পাশ-বালিসটা অধিকতর জোরের সহিত কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল। সতীশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বল না ছাই কি হয়েছে? প্রাণটা একেবারে তিক্ত বিরক্ত করে দিলে।"

লেখা পাশবালিসটা দূরে ফেলিয়া দিয়া, স্বামীর দিকে মুখ করিয়া, বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল,"অত যদি আমি তোমার কাছে আপদ হয়ে থাকি, দাও না আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে,—যাক্ সব আপদ চুকে।"

"অমন যদি মুখ ভার করে থাক, তাহ'লে তাই করতে হবে বৈ কি।"

"ওগো তাই দাও,—তাই দাও, তোমার কাছে আমি হাতযোড় করে মিনতি করছি।"

লেখা এবার কাঁদিয়া ফেলিল। সুন্দরী স্ত্রীর চোখে জল দেখিয়া সতীশ সব ভুলিয়া গেল। সে লেখার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে লেখা, কি হয়েছে বল না?"

স্বামীর সামান্য মাত্র আদরে লেখা গলিয়া গিয়া বলিল, "আজ দুপুরে ও পাড়ার কতকগুলো মেয়ে এসেছিল, তাদের সঙ্গে কথা কয়েছিলাম বলে, তোমার দিদি আমাকে যাচ্ছেতাই করে বল্‌লে। বলে কিনা ওরা ভাল নয়; যার তার সঙ্গে কথা বলা ঠিক নয়। কি আস্পর্দ্ধা একজন চাকরাণী কি না আমাকে শাসন করতে চায়।"

"বাড়ীর চাকর চাকরাণী পুরাণো হলে এই রকম হয়। অনেক দিনের কিনা, তার উপর আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, কিছু অধিকার আছে। যাক্ ওর কথায় রাগ করো না, আমি ওকে বুঝিয়ে বলবোখ'ন।"

যাই বল বাড়ীর চাকরাণীর যে এতদূর আস্পর্দ্ধা হতে পারে, তা আমি এখানে দেখছি। আমাদের বাড়ীতেও তো চাকর-চাকরাণী আছে, কই তাদের তো এতদূর সাহস হয় না। আমাদের দেখ-লেই ভয়ে জুজু।"

"সত্যি, ও আমাকে খুব ভালবাসে কি না, তাই অমন করে। তোমার কি মনে নেই, সে বার আমার অসুখের সময় বেচারী কি রকম চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। দু'তিন দিন স্নানাহার পর্য্যন্ত করলে না।

এগুলো সব কিন্তু বাড়াবাড়ি। তুই বাপু দাসী-বাঁদী লোক সেই ভাবে থাকবি। বাড়ীর কর্তার জ্বর হল, কি না হল, তোর কি,—তোর অত মাথা ব্যথা কেন বাপু। দিন নেই—রাত নেই সব সময় শিয়রে বসে থাকা। লোকে দেখে হাসে, অন্য চাকর-বাকরেরাও মানতে চায় না। আমার কিন্তু এ সব ভাল লাগে না।"

"আমাকে মানুষ করেছে কিনা, তাই একটা মায়া পড়ে গেছে।"

"তা নয় হল, কিন্তু চাবি-পত্তর আবার কবে কোথায়, কোন চাকরাণীর কাছে থাকে, শুনি?"

সে সব আমি জানি না। আমার বাপ-মা'রা এরকম ব্যবস্থা করে গেছেন।"

"ও সব ভাল নয়, চাবি-পত্তরগুলো চেয়ে নিয়ো। চাকরাণীকে এত বিশ্বাস কি?"

"তা কেমন করে হয়। আমার বাপ-মা যা করে গেছেন, তা কেমন করে রদ করবো।"

"তোমার যদি অত চক্ষু লজ্জা হয়, আমি না হয় চেয়ে নেবোখন।"

সতীশ ভীত হইয়া বলিল, "না—না, তুমি চেয়ো না। আমি সময় মত চেয়ে নেবোখ'নে।"

"চাকরাণী নয় তো তো রাজরাণী—এত ভয়।"

লেখা বালিসটা আঁকড়াইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল। সতীশও আর কিছু না বলিয়া শয়ন করিল।

২

"সতীশ।"

"কি দিদি?"

রহিম এসেছিল। অনেক কাঁদাকাটি করলে। বল্‌লে এ বছরের অজম্মার জন্য খাজনা দিতে পারবে না। তার উপর মেয়ে-টার বিয়ে, হাতে একটা পয়সাও নেই। তাই পঞ্চাশটা টাকা তাকে দিলাম।"

"বেশ করেছ, তা আমাকে বলবার কি দরকার।"

লেখা সেই মুহূর্ত্তে, ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বা! বেশ জলের মত বুঝে গেলে তো। এ রকম দানছত্র খুলে দিলে জমিদারী কতদিন থাকবে শুনি? দাও,—চাবি-পত্তর-গুলো আমার হাতে দাও। তুমি দাসী বাঁদী লোক দাসী-বাঁদীর মত থাকবে। সব কাজে মাথা গলাতে এস কেন শুনি?"

মুহূর্ত্ত মধ্যে দিদির চোখ জ্বলিয়া উঠিল। কি একটা বলিতে যাইয়া থামিয়া গেল। আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বৌমা তুমি আপনার কাজে যাও। এখন সতীশের সঙ্গে আমার গো'টাকতক কথা আছে।"

"আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত না করে এখান থেকে যাচ্ছি না। দাসী-বাঁদীর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, সে যখন যা ইচ্ছে তাই করবে। হয় তুমি এ বাড়ী থেকে যাবে,—না হয় আমি।"

"দেখ বৌমা সব সময় দাসী-বাঁদী দাসী-বাঁদী করো না। অত নীচ মনের পরিচয় দিয়ে কোন লাভ নেই।"

লেখা বারুদের স্তূপের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,—"আমি নীচ, আমার বাপ-মা নীচ—"

"দিদি ভীত হইয়া বলিল; আমি তো তাঁদের কিছু বলিনি। তুমি নীচলোকের মত ব্যবহার করছো তাই বলেছি।"

"হারামজাদী ছোটলোকের মেয়ে,—তুই নীচ, তোর বাপমা নীচ,—তোর চৌদ্দপুরুষ নীচ। বেরো এখনি এখান থেকে—" বলিতে বলিতে লেখা ভূমিতে রক্ষিত ঝাঁটা গাছটা উঠাইয়া লইয়া, তার দিকে ধাবিত হইল। সতীশ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "ছিঃ, ছিঃ, কি করছো লেখা।" তারপর সে দিদির দিকে ফিরিয়া বলিল' "সত্যি, এ তোমার ভারি অন্যায়, তুমি যেমন লোক, সেই রকম থাকলে তো আর এ সব বিভ্রাট ঘটে না। চাবি-পত্তরগুলো ফেলে দিলেই তো সব গোল মিটে যায়।"

দিদি এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সতীশের কথা শুনিয়া তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে আপনার আঁচল হইতে চাবির থলেটা খুলিয়া লেখার হাতে দিয়া বলিল, "সত্যি বৌমা আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করো না। সত্যি তো আমি যেমন লোক তেমনি থাকা উচিৎ ছিল।"

তারপর নিঃশব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সতীশ তার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া গেলে, বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। তারপর ধীরে ধীরে আপনার ঘরে যাইয়া, কপাট বন্ধ করিল।

লেখা সগর্ব্বে চাবির থলেটা আপনার আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে সংসারের কাজে চলিয়া গেল।

৩

রাত্রি গভীর। সতীশের চোখে নিদ্রা নাই। সে কত কি ভাবিতেছিল। আজ দিদি সাতদিন হইল গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই হইতে কোন খবর নাই। কোথায় আছে, কি খায়, তার ঠিক নাই। আবার ভাবে দূর ছাই, একটা চাকরাণীর জন্য এত চিন্তা কেন। পার্শ্বে দৃষ্টি পড়িল, লেখা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। সেও নিদ্রিত হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল একবার দিদির ঘরে যায়। লেখা যদি জাগিয়া উঠিয়া জানিতে পারে, কি মনে করিবে? কেমন যেন একটা লজ্জা হইল। বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ গেল কিন্তু নিদ্রা আসিল না। একবার দিদির ঘরে যাইতে বড় ইচ্ছা হইল। এই তো দুইটী ঘরের পরে। লেখা জানিতে পারিবে? যদি জানিতে পারে দোষ কি?

সতীশ বিছানা হইতে উঠিল। হ্যারিকেনটা আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া দিল। অতি সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে চলিল। কিছুদূর আসিয়া একটা ঘরের সামনে দাঁড়াইল। ঘরের দরজাটা ভেজান ছিল। কিছুক্ষণ কি ভাবিল। তারপর আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল তক্তপোষের উপর মাদুরখানা ঠিকমত বিছানো রহিয়াছে, আল্‌নায় থান কাপড়খানা টাঙ্গানো রহিয়াছে; কিন্তু যার এসব জিনিস সে আজ নাই।

অশ্রু আর বাঁধন মানিল না। বর্ষার মত বুকের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। হ্যারিকেনটা মাটীতে রাখিয়া, তক্তপোষের উপর যাইয়া শুইয়া পড়িল। দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। আজ অনেক কথা তার মনে পড়িতে লাগিল। এই ঘরে, এই বিছানায়, দিদির বুকে জীবনের অনেকদিন কাটিয়াছে। তার মা'ও প্রায় সমস্ত রাত্রি এইখানে কাটাইয়া দিতেন। একদিনের ঘটনা আজ ছায়ার মত মনে পড়ে। যখন তার বয়স সাত-আট বছর, দিদি একদিন তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হাঁরে সন্তে; তুই বড় হয়ে কি আমাকে মা বোল্‌বি না? সে বলিয়াছিল, তুমি তো দিদি। তারপর মায়ের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল, ঐ মা। সেও মা'র শোনা-শুনি তাকে দিদি বলিতে শিখিয়াছিল।

মা দিদিকে বলিয়াছিলেন, ইস্ বড় যে সখ। চাকরাণীর আবার মা হবার ইচ্ছে।

দিদি মার মুখে ঠোনা দিয়া বলিয়াছিল, ও বড় যে কথা শিখেছিস্। দুইজনে হাসিতে লাগিল।

সতীশের জন্মাবার পর সতীশের মা'র নাকি ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। তাহাতে তাঁর স্তন দুগ্ধ শুকাইয়া যায়; দিদিই তো তাকে মাই দিয়া মানুষ করিয়াছিল।

সে আর থাকিতে পারিল না। বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। আল্‌না হইতে কাপড়খানা লইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া আবার রাখিয়া দিল। পায়চারি করিতে করিতে বাক্সগুলোর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। মনে পড়িল ছোটবেলায়, বাবার ভয়ে এই বাক্সের মধ্যে কত মার্ব্বেল, লাটিম লুকাইয়া রাখিত। খুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল সেগুলি আছে কিনা? ধীরে ধীরে একটা বাক্স খুলিল। কি আশ্চর্য্য, বাক্সের মধ্যে তখনো পর্য্যন্ত কতকগুলো লাটিম্ ও মারবেল রহিয়াছে।

সতীশ কি ভাবিতে ভাবিতে একটা বারবেল লইয়া—আঙুল দিয়া দেওয়ালে ছুড়িয়া মারিল। বারবেলটা দেওয়ালে বাধা পাইয়া, ফিরিয়া আসিয়া তার পায়ে লাগিল। কিছুক্ষণ সেগুলি লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বাক্সের মধ্যে আবার রাখিয়া দিল।

বাক্সের মধ্যে কতকগুলি চিঠি ও কয়েকখানা ফটো ছিল। প্রায় সবগুলি পুরাতন। সে একে একে ফটোগুলি দেখিতে লাগিল। তার বাবার মৃত্যুর সময় যে ফটো ওঠানো হইয়াছিল, সেও একখানা আছে। আরগুলি ভাল করিয়া বোঝা যায় না। প্রায় সাদা হইয়া আসিয়াছে। সে একখান ফটো লইয়া আলোর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। অনেক কষ্টে বুঝিল, একটি যুবক একখানা চেয়ারে বসিয়া আছে, পাশে একটী যুবতী তার কাঁধ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া বোধ হইল নূতন বিবাহ করিয়া ফটো উঠাইয়াছে। আর একটী ফটোতে দুইটী স্ত্রীলোক, মাঝখানে একটী পুরুষ, তার কোলে একটী শিশু। সতীশের মাথায় সব যেন কেমন এলোমেলো হইয়া গেল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল।

৪

সতীশ বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতে পারিল না। তক্তপোষ হইতে উঠিয়া ধীরে বাক্সগুলির নিকট যাইল। চিঠিগুলি পড়িতে লাগিল। পত্রের অনেকস্থান গলিয়া গিয়াছে, আবার অনেক স্থানে কালীর অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে একখানা পত্র পড়িল। তাতে এইরূপ লেখা ছিল—

রাজনগর।
রবিবার।

কল্যাণীয়া—

নির্ম্মলা! জীবনে আমি একটা মস্ত বড় ভুল করিয়াছি। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইল না। মানুষ চিন্তা করে এক, রকম আর ঈশ্বর করেন অন্য রকম। পিতার অমতে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি কিন্তু আশা ছিল, তাঁর হাতে পায়ে ধরিলে ক্ষমা করিবেন। তাঁকে আজ সব কথা বলিয়া, ক্ষমা চাহিলাম। তিনি তো শুনিয়াই আগুন। ক্ষমা করা দূরে থাক, উপরন্তু আদেশ দিলেন, আমি যেন তোমাদের কোন সংশ্রবে না থাকি। যদি তিনি জানিতে পারেন যে, আমি তোমাদের সংশ্রবে আছি তাহা হইলে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। যাহা হউক তুমি তোমার অক্ষম স্বামীকে ক্ষমা করিবে।

আমি অবসর মত তোমাকে দেখিয়া আসিব। তোমাদের কোন ভয় নাই। নিয়ম মত তোমাদের টাকা পাঠাইয়া দিব। লিখিতে লজ্জা করে, তবুও লিখিতেছি, তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার মাকে আমার প্রণাম জানাইবে। তোমাদের কুশল লিখিবে। ইতি

তোমার অধম স্বামী অমর।

চিঠিখানা পড়িয়া সতীশের মনের মধ্যে একটা ভীষণ সন্দেহের উদয় হইল। তারপর আর একখানি চিঠি লইয়া পড়িতে লাগিল সেখানা এইরূপ—

রাজনগর।
বুধবার।

কল্যাণীয়া—

নির্ম্মলা! তোমাকে আজ একটা দুঃসংবাদ দিতেছি। তুমি শুনিয়া নিশ্চয় দুঃখিত হইবে, কিন্তু কি করিব,—আমি নাচার। এ মাসের চব্বিশ তারিখে আমার বিবাহ। তবে তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারো। তোমার উপর আমার ভালবাসা কখনো শিথিল হইবে না। বাবার মৃত্যুর পর তোমাকে এখানে লইয়া আসিব। এ অপরাধের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে কি?

আজ আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। মন বড়ই অস্থির। তোমরা কেমন আছ লিখিও। আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদের কাছে যাইব।

তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার মাকে আমার প্রণাম দিবে। ইতি

তোমার অধম স্বামী অমর।

সতীশের কাছে সমস্তা যেন আরো জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্দেহ যেন আরো ঘন হইতে ঘনতর হইয়া আসিতে লাগিল। একে একে আরো কয়েকখানি চিঠি পড়িল। আর একখানি চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল,—

রাজনগর।
মঙ্গলবার।

কল্যাণীয়াসু!—

নির্ম্মলা। তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। অধিকতর আনন্দিত হইলাম তোমার ছেলে হইবে শুনিয়া। তুমি এজন্য একটুও চিন্তিত হইও না। আমি এক ফন্দি করিয়াছি। তোমার সতীন কমলাকে তোমার কথা বলিয়াছি। সেও খুব আনন্দিত হইয়াছে। তার সন্তান হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তোমার ছেলে হইলে তাহাকে দিতে হইবে।

শীঘ্র আমরা কাশী রওয়ানা হইব। যাইবার সময় তোমাকে সঙ্গে লইব। সেখানে তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করিব। দুই বৎসর সেখানে থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া, তোমার ছেলেকে কমলার ছেলে বলিয়া পরিচয় দিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না।

আর তোমাকে ঝি বলিয়া পরিচয় দিলে কেহ জানিতে পারিবে না। মা-বাবা তোমাকে দেখেন নাই, তাঁরাও জানিতে পারিবেন না। ইহা না করিলে উপস্থিত আমাদের মিলনের কোন আশা নাই। আর ভবিষ্যতে তোমার ছেলের বিষয় পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

আমার কথা শুনিয়া তুমি যেন রাগ করিও না। যদি তোমার মত থাকে আমাকে লিখিও। আশা করি তোমরা ভাল আছ। তোমার মাকে আমার প্রণাম জানাইবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। শীঘ্র পত্রের উত্তর দিয়ো। ইতি

তোমার অমর।

তারপর আর একখানি পত্র পড়িল,—

রাজনগর।

শনিবার।

শ্রীচরণ কমলেষু—

দিদি! এখান হইতে যাইবার পর, তোমার কোন সংবাদ পাই নাই। আশা করি কুশলে আছো। তুমি কবে আসিবে? আমার একলা ভাল লাগিতেছে না। তার উপর আর এক বিপদ, সতীশকে রাখা যাইতেছে না। সে সব সময় কাঁদে আর বলে, আমি দিদির কাছে যাবো। একেই বলে রক্তের টান। কিছুতেই তাকে ভুলানো যাইতেছে না। তোমার মার শ্রাদ্ধ কবে? কর্ত্তা বোধ হয় দুই একদিনের মধ্যে তোমার ওখানে যাইবেন। তুমি শীঘ্র চলিয়া আসিবে।

তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি—

তোমার ছোট বোন কমল।

এক মুহূর্ত্তে সতীশের চোখের সম্মুখ হইতে একটা পরদা সরিয়া গেল; একটা নূতন পট খুলিয়া গেল। সে পত্রগুলি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৫

বাড়ীর সকলে নিদ্রামগ্ন। সতীশ আপনার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "লেখা।"

স্বামীর আহ্বানে লেখা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সতীশ বলিল, "আমি মহেশপুরে যাচ্ছি বোধ হয় ফিরতে দু'একদিন দেরীও হতে পারে। তুমি খুব সাবধানে থাকবে।"

লেখা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহেশপুর,—সেখানে কেন?"

"সেখানে আমার মায়ের বাড়ী। মার কাছে যাবো।"

লেখা অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মায়ের বাড়ী মহেশপুরে, আর মা তো অনেকদিন মারা গেছেন?"

সতীশ কাতরকণ্ঠে বলিল, "না লেখা, আমার মা মরেন নাই।" পত্রগুলি লেখার হাতে দিয়া বলিল, "পড়।" লেখা পড়িতে লাগিল। সতীশ ততক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিল। সব পত্রগুলি পড়িয়া লেখা বলিল, "কখন যাবে?"

"এখুনি।"

"চাকর-টাকর সঙ্গে নেবে না?"

"না —কোন দরকার নেই।"

সতীশ যাইতে উদ্যত হইল। লেখা তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাও?"

লেখা মাথানত করিয়া উত্তর দিল, "তোমার সঙ্গে মহেশপুরে।"

"তুমি আমার সঙ্গে মহেশপুরে যাবে?"

"হাঁ।"

সতীশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা চলো।"

* * * * *

সন্ধ্যার সময় সতীশ ও লেখা ধূলিধুসরিত দেহে মহেশপুরে, একটা কুটিরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে সতীশ ডাকিল, "বাড়ীতে কে আছেন?"

কোন জবাব আসিল না। আবার ডাকিল কিন্তু কোন জবাব আসিল না। সতীশ আসিবার সময় পাড়ায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, নির্ম্মলা আসিয়াছে, তবে কয়েকদিন হইতে খুব অসুস্থ। কি ভাবিয়া সে এবার দ্বার ঠেলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সামনের ঘরের মধ্যে কে একজন মৃতপ্রায় বিছানায় পড়িয়া আছে। তারা ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিতেই চিনিতে পারিল, এ সেই, যার সন্ধানে তারা এতদূর আসিয়াছে। সতীশ ধীরে ধীরে বিছানায় যাইয়া বসিল। অতি সন্তর্পণে রোগিণীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল হস্তস্পর্শে রোগিণী চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।

সতীশ বলিল, "আমি এসেছি।"

রোগিণী বলিল, "কে, সতীশ?"

সতীশ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, এতদিন পরিচয় দাওনি কেন?"

রোগিণী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "দরকার হয়নি, যা কিছু আমার প্রয়োজন সব পেয়েছিলাম।"

সতীশ অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল, "দুঃখিনী মা আমার, আমায় ক্ষমা করো।"

আজ সন্তান জীবনে তাকে প্রথম মা বলিয়া ডাকিতেছে। তার সমস্ত দেহ-মনে কে যেন মধু ঢালিয়া দিল। চঞ্চলকণ্ঠে বলিল, "ও নয়, কেবল মা বল্।"

সতীশ ডাকিল "মা!"

"আবার ডাক।"

"মা—মা—"

সে কি আনন্দ! এত আনন্দ সে তো জীবনে আর কখনো পায় নাই। লেখা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল। সে নত নেত্রে এবার ধীরে ধীরে বলিল, "আমায় কি ক্ষমা করবে মা মা?"

রোগিণী চমকিয়া বলিল. "তুইও এসেছিস্, আয় মা, আমার কাছে আয়। ক্ষমা,—আমি কি তোদের কথায় রাগ করতে পারি? আমি তোদের মা।"

তারপর সে জীবনের শেষ শক্তিটুকু দিয়া দুইজনকে একসঙ্গে বুকে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। পরমুহূর্তে হস্ত শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িল।

তখন দূরে দূরে মাঠের শেষে; রাখাল বালক গাভী লইয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে গাহিতে ছিল—

এ সংসার একটা মায়ার বাঁধন,
হেথায় কেহ নয়কো আপন।

"দুঃখের নিশি"

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

(ও তোর) ফুরিয়ে গেছে দুখের নিশি
প্রভাত আলো স্পর্শে,
নয়নে মেলে দেখ্ রে চেয়ে
নবীন প্রাণের হর্ষে
(ও তোর) ব্যথার বাতি মলিন শিখা,
ললাটে আর নাই যে লিখা,
বিষাদ ব্যথার করুণ রেখা,
মুছল আলোর স্পর্শে
ও তোর, অন্তরে আজ মাতামাতি
বিষাদে আর হর্ষে।
ও তোর, মনের বীণা বাজছে রে শোন্
মিলন সুরে আজ
প্রাণ-বাগানে শুষ্ক তরু
পরল ফুলের সাজ।
ও তোর বসন্ত আজ পথ' ভুলে,
নামল যে তোর বন'তলে,
মলয় এল স্বপন যেন
আকুল হিয়ার মাঝ।
ও তোর মনের বীণা বাজছে শোনো
মিলন সুরে আজ।

ও তোর কুঞ্জ বনে হাওয়ার সনে
আসছে ধেয়ে ধেয়ে,
মধুপ অলি বনের ধূলি
উড়িয়ে গীতি গেয়ে।
ও তোর যতেক ফুলের মিষ্টি মধু,
ওদের তদের সৃষ্টি শুধু,
রং বেরঙের মেলিয়ে পাখা,
বাগান খানা ছেয়ে।
ও তোর কুঞ্জবনে হাওয়ার সনে
আসছে ধেয়ে ধেয়ে।
ও তোর তৃণের বুকে নীহার-কণা,
করছে টলমল
তরুণ প্রাতে আলোক লতা
করছে ঝলমল।
ও তোর মনের ব্যথা এই প্রভাতে
যাও ভুলে যাও ফুল-সভাতে।
আলোর গানে উঠবে দুলে
বিজন বুকের তল।
ভুলে যা রে সকল ব্যথা
মোছ্ রে নয়ন-জল।

পরিবর্ত্তন

— গল্প —

শ্রীকমলা ঘোষ

শ্রাবণের দুপুর সবেমাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ দুপুরে রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে দু একখানা মোটর ছুটে যাচ্ছে নিজেদের গন্তব্য স্থানে। ল্যান্সডাউন রোডের একখানি ছোট দোতলা বাড়ীর সামনে একখানা ট্যাক্সি এসে থামল। ট্যাক্সি থেকে একটী ১৫।১৬ বছরের ছেলে ও ১৮।১৯ বছরের মেয়ে নামল। মেয়েটির নাম রেবা, পরণে তার একখানি সিল্ক শাড়ী, পায়ে লাল ভেলভেটের স্লিপার, ছিপ্ ছিপে সুন্দর চেহারাখানিতে বেশ চমৎকার মানিয়েছে। সে গাড়ী থেকে নেমেই উপরে উঠে গেল এবং সামনেই বসবার ঘরখানাতে ঢুকে হঠাৎ একটু চমকে উঠল। তার নিজের মনের মত সাজান ঘরখানা এই দুরবস্থা দেখে তার ভয়ানক রাগও হচ্ছিল। ঘরের মেঝের কার্পেট উঠে গিয়ে সে জায়গায় একখানা সতরঞ্চি পাতা রয়েছে। ঘরের দেওয়ালে যে সব সুন্দর সুন্দর ছবি ঘরের শোভাবর্দ্ধন করতো, তার বদলে মহাত্মাজী ও আর কয়েকজন বড় বড় লোকের ছবি রয়েছে। টেবিল চেয়ার কুসন অর্গান কিছুই নেই শুধু গোটা আটেক চরকা ও কতকগুলো লাটাই এবং একবস্তা তুলো একপাশে পড়ে আছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ঘরখানাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে রেবা ভাবতে লাগল, এসব কি হল। তাকে না জানিয়ে তার অপেক্ষা না করেই রমেন সে এরকম করলে এর মানে কি? কেন? রেবা কি তার কেউ না, যে তাকে একবার জানাবার প্রয়োজন মনে করলে না। এই সব নানা কথা তার মনের মধ্যে হয়ে তাকে বিক্ষিপ্ত করে তুললে। সে যে কি করবে এখন তাই ভাবতে লাগল। তার উদ্ধতমন তার চেষ্টা সত্ত্বেও স্বামীর এ কাজের সমর্থন করতে পারলে না; সে আপনার মনেই বলে উঠল, না, কিছুতেই না, এর প্রতিশোধ আমি নেব। আমি এখনি বাবার কাছে আবার ফিরে যাব। সুধীর রেবার ছোট ভাই, সেই তার দিদিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এবং নীচে সে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বাইরে চাকর ঘুমিয়ে পড়েছিল তাকে ডেকে রেবার আগমন সংবাদ দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে এল, সেও একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেছল ঘরখানা এমন হলই বা কেন? আর দিদি এমন চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে কেন! আস্তে আস্তে সে দিদিকে ডাকলো চল আমরা স্নান টান সেরে নিইগে আমরা। রেবা তার দিকে ফিরে চেয়ে বললে, না সুধীর আমরা এখনি আবার ফিরে যাব। সুধীর রেবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠে ছ, চোখ ছল ছল করে উঠেছে, ব্যস্তভাবে সে বললে কি হল দিদি, কিছু না তুই ট্যাক্সি ডাক্ বলে রেবা তার অভিমানের উদ্গত অশ্রু কোনমতে চেপে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। সুধীর ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে উঠতে পারলে না, আস্তে আস্তে নেমে ট্যাক্সি ডেকে দিদিকে ডাকলে। রেবার চাকর তাড়াতাড়ি উঠে এসেছিল সেও অবাক হয়ে চেয়ে রইল। রেবা নেমে গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে হাওড়া যেতে আদেশ দিলে।

২

রেবার বাবা অমূল্যবাবু পাটনা হাইকোর্টের একজন বেশ বড় উকিল। দুটী পুত্র ও দুটী কন্যা, রেবা বড় এবং পিতার অত্যন্ত আদরে পালিত হয়েছিল বলেই একটু বেশী মাত্রায় অভিমানী হয়ে উঠেছিল। রেবার ছোট বোন রেখা বেথুন স্কুলে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ছে। রেবাও আগে বেথুন বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তো। এবং যখন সে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল সেই সময় তার মামাতো বোনের বিয়েতে মামার বাড়ী ভবানীপুর যায়। সেখানে সে দিনকতক ছিল এবং মামাতো ভাই অমিয়র বন্ধু রমেনকে দেখে এবং তার মিষ্ট ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় একদিন মামাতো বোনের কাছে সে বলেছিল রমেন বাবু বেশ লোক না ভাই? ভারি সরল তার মনটা, তার মামাতো বোন হেসে বললে, বেশতো পিসে-মশাইকে বলবো রমেনবাবুকে জামাই করতে, রেবা লজ্জায় লাল হয়ে বলে উঠল, না, ছি ছি—ক ছেলে মানুষি করিস্ তাই আমি কি তাই বল্‌ছি? লজ্জায় সেখান থেকে সে উঠে গেল। রেবা সেবার ম্যাট্রিক দিলে। রমেনও এম, এ দিলে; এবং রেবার মামাতো বোনের সাহায্যেই তাদের দুজনের বিয়ে হয়। রমেনের বাবা ল্যান্সডাউন রোডের একখানি বাড়ী ও কিছু কোম্পানীর কাগজ রেখে একবছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন রমেন চাকর বামুন নিয়ে একাই বাড়ীতে থাকতো, এম, এ, দিয়ে সে একটা প্রফেসারি কাজও পেয়েছিল, কিছু দিন পরেই এই জাতীয় আন্দোলনে তার মন মেতে উঠেছিল। রেবা তখন তার বাবার কাছেই ছিল। রমেন তার চাকরী ছেড়ে সেব ব্রত গ্রহণ করবে এই ভেবে সে তার কাজ ছেড়ে দিলে এবং নিজের বাড়ীর সবটাই মনের সঙ্গে বদলে ফেললে। সে এবং আরও কয়েকটি ছেলে তার বাড়ীতে নিয়মিত চরকা কাটতো। রেবাকে সে বিশেষ করে জানায় নি এইজন্যে যে রেবা সেখান থেকে তার কথাটা কি ভাবে নেবে, আর সে শীঘ্রই তো আসবে বলছে। এলে সব কথা খুলে বলবে এই ঠিক করে রেখেছিল।

সেদিন যখন সে বাড়ী ফিরে শুন্‌লে রেবা এসেছিল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই সে আবার ফিরে গেছে কোন কথা বলেও যায়নি। রমেনের বুঝতে দেরী হলনা কেন রেবা চলে গেল, ধনীর আদরিণী কন্যা সে, সেকি এত ত্যাগের মধ্যে সহজে আসবে। রমেন ক্লান্ত ভাবে বিছানার মধ্যে শুয়ে ভাবতে লাগল, রেবা কি একটু তার সঙ্গে দেখা করবার ধৈর্য্যও রাখতে পারলে না? রমেন যে বড় আশা করেছিল রেবাকেও সে নিজেও সহকর্ম্মিণী ভাবে তার পাশে পাবে। সে বড় আশাই করে রেখেছিল যে রেবার মধ্যে সে দেশের সমস্ত জাতির মাতৃভাব ফুটিয়ে তুলবে; ত্যাগের আদর্শ সে রেবাকে দিয়েই দেখাবে। কিন্তু একি হল। আশা ভরসা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সবই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ভাবতে ভাবতে চোখে তার ঘুমের আবেশ জড়িয়ে এসেছিল। আবেশের মধ্যে সে দেখলে রেবা বসে যেন চরকা নিয়ে সুতা কাটছে। আর গুণ গুণ করে গাইছে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই। মুখে তার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, পরে রয়েছে একখানি খদ্দরের শাড়ী। এ দৃশ্যে রমেনের মনের মধ্যে কি যে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগল সে যেন মুগ্ধ নেত্রে এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখতে লাগল। হঠাৎ চাকরের ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মুছে উঠে বসে ভাবতে লাগল স্বপ্ন দেখেই এত আনন্দ আমার মনে হচ্ছে সত্যি যেদিন রেবা চরকা নিয়ে বসবে সেদিন কতই না তৃপ্তি হবে তার। কিন্তু অভাবনীয় মনে হয়।

৩

একমাস পরে রমেন অমূল্য বাবুর কাছ থেকে একখানা পত্র পেলে রেবার অসুখ পত্রপাঠ তুমি নিশ্চয় আসবে। রমেন চিঠি পেয়েই পাটনা যাবার জন্য প্রস্তুত হল। রেবাকে সে অনেক অনুনয় করে ক্ষমা করে ফিরে আসবার জন্য লিখেছিল। কিন্তু কোন উত্তর পায় নাই।

রমেন যখন পাটনায় পৌঁছাল; রেবাদের বাড়ী গেল, অমূল্য বাবুকে সে জিজ্ঞাসা করলে কি হয়েছে। অমূল্য বাবু বললেন সেই যে কলকাতায় গিয়ে ফিরে এল সেই থেকে চুপ করেই থাকে বেশী কথাও বলে না, মন ভার করেই থাকে। হঠাৎ তিন চার দিন হল, জ্বর হল আর দু একবার ফিটও হয়েছিল। আমি তোমাকে খবর দিলাম। কেন যে ও চলে এল বিশেষ করে কিছু আমাকে বল্লেও না, কি জানি কি দুঃখ মনে হয়েছে। বড় অভিমানী মেয়ে হাঁ, তুমি চল মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছাড়।

রমেনের কাপড় ছাড়া খাওয়া হলে সে যখন রেবার ঘরে গেল। রেবা চোখ বুজে শুয়েছিল, মাথার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছিল। রমেন গিয়ে আস্তেআস্তে রেবার কপালে হাত রেখে খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করলে,মাথার যন্ত্রণা কি বড্ড বেশী হচ্ছে রেবা। রেবা চমকে চোখ খুলে চেয়ে সামনেই রমেনকে দেখে প্রথমে তার সুন্দর মুখ লজ্জায় ও আনন্দে লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মুখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিলে। সে সব কথা মনে পড়তেই তার মন আবার রমেনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াল. কোন কথা না বলে সে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

রমেন তিন চার দিন রেবাকে অনেক সেবা করে তাকে আরোগ্যপথে নিয়ে এল। এই সেবাই তার ব্রত, তার ধর্ম্ম, রেবাকেও এই পথে আসবার জন্য সে অনেক করে তাকে বোঝাল। রেবা এখন বেশ ভালই আছে। সেদিন সে তাদের গাড়ী করে খানিকটা বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করেছিল অমূল্যবাবু রমেনকে বল্লেন, যাওনা রমেন তুমিও ওর সঙ্গে একটু ঘুরে এস, তোমারও তো এ কয়দিন ভাল বিশ্রাম হয় নাই।

রমেন অমূল্যবাবুর কথায় গাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ী তাদের দুজনকে নিয়ে ছুটে চললো। কিছুক্ষণ দুজনেরই চুপ করে কেটে গেল। একটু পরে রমেন আস্তে আস্তে বললে রেবা, আমি কাল বা পরশু, এরমধ্যে কল্‌কাতা ফিরবো মনে করেছি; তোমার শরীর তো এখন বেশ সেরেছে। সেখানে আমার অনেক কাজ বাকী আছে। আমি তো আর থাকতে পারবো না।

রেবা আস্তে আস্তে বললে সে তোমার ইচ্ছা। আমি কি আর বলবো। রেবার মন এ কয়দিন থেকে রমেনের সেবায় ও তার কথায় অনেকটা নরম হয়েছিল। তবুও সে একেবারে মনকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারছিল না, সে ধনী কন্যা রূপা, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব ও যে তা'র ছিলনা তা নয়। সে চিরকালই তার পিতাকে যা বলেছে তিনি সেইমতই তাকে রেখেছিলেন। ছোট ভাইবোনেরাও কখনও তার কোন কথাই অমান্য করতে পারেনি। হঠাৎ রমেন যে তাকে না বলে এতটা করেছিল সেকথা সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল-না।

রমেন আস্তে বললে রেবা আমি যে বড় আশা করেছিলাম আমার ধর্ম্মে তোমাকে দীক্ষিত করবো, আমার সে আশা কি পূর্ণ হবেনা? বলে সে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে রেবার মুখের দিকে চাইলে রেবা কিছুতেই আর মনকে শক্ত করতে পারলে না। তার গলা ভারী হয়ে উঠেছিল। বল্লে তুমি আমাকে পথ দেখাও আমাকে সাহায্য কর নিশ্চয় তোমার ব্রত আমি গ্রহণ করবো। কিন্তু তুমি যে নিজেই সব আরম্ভ করেছিলে আমাকে একবার জানাবার দরকারও মনে করনি কেন? আমি তোমার পাশে কাজ করবার যোগ্য হতে পারবো না মনে করেছিলে। রমেনের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বললে না রেবা ভুল বুঝোনা, আমি তা মনে করি নাই তুমি কল্‌কাতায় গেলে তোমাকে বলব বলেই ঠিক করে রেখেছিলেম, রেবা আমার উপর রাগ করে তুমি তোমার দেশের ডাক উপেক্ষা কোরনা। আমাদের হাজার হাজার ভাই বোন, মা সকলেই এই ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। আমার স্বপ্ন সফল করো রেবা।

রেবা নত হয়ে তার পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে, ছল ছল চোখে বললে, সত্যই আজ আমার ভুল ভেঙে গেল। তোমার ধর্ম্মের মধ্যে আমায় দীক্ষা দাও; দেশের সেবা যেন করতে সমর্থ হই। সন্ধ্যার অন্ধকার ও দিনের আলো পশ্চিম গগনের কোলে মিলিয়ে এক হয়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটী মনের আবার নূতন করে মিলন পূর্ণ হল।

আগমনী

শ্রীনীহার দেবী

বরষের পরে মাগো—
বাংলায়, শ্যামলিমা তার এবার দেখিলে নাগো,
সেই কৃষকের পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধতা ভরা মুখ।
সোনার বরণ সেই মাঠ ঘাট বুকভরা শত সুখ।
গ্রামের প্রান্তে সেই তটিনীর কুলুকুলু মৃদু গান।
"মা আসিছে" বলি হর্ষ মগন অধীর কতনা প্রাণ।
আজি শুধু বার বার
আর্ত্তের উঠে মর্ম্মভেদি সে সকরুণ চীৎকার।
যেদিকে তাকাই শুধু জল—জল প্লাবনে ভেসেছে দেশ!
সুজলা সুফলা বাংলার আজি ছিন্ন রিক্ত বেশ।

এসো মাগো দশভুজা
কাঙালের যাহা শেষ সম্বল তাই দিয়ে করি পূজা
হৃদয়ের মাগো ভক্তি কুসুমে গাঁথিয়া রেখেছি মালা।
অন্তর দীপ জ্বালায়ে, লয়েছি শুভ বরণের ডালা।
নেত্রের নীরে ধৌত করিয়া কোমল চরণতল।
হৃদয় শোণিতে অর্চ্চনা করি দিয়া প্রেম শতদল।
এস মা দীনের ঘরে
তব আগমনে সব হাহাকার আজি যাক দূরে সরে।
উঠুক হাসিয়া বাংলা আবার তোমার পরশ পেয়ে।
স্বাগতঃ জননী আহ্বানে আজি বাংলা দেশের মেয়ে।

প্রসিদ্ধ গল্প লেখক

রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

সুপ্রসিদ্ধ গল্প লেখক রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আর ইহলোকে নাই। সুরেন্দ্র বাবু রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক লেখক—ইঁহার গল্পে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ছিল। বাংলায় এরূপ রসোজ্জ্বল ও করুণ গল্প বেশী পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সাহিত্য পত্রিকায়ই ইঁহার অধিকাংশ গল্প বাহির হইয়াছিল—ছুটছাট অপরাপর মাসিকেও কচিৎ দু'একটা গল্প দেখিয়াছি, পুষ্পপাত্রেও দু'একটা বাহির হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবুর 'পূজার আসর' প্রভৃতি গল্পের সুরে রেশ এখনও যেন কাণে বাজে। সুরেন্দ্র বাবু উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন—জীবনের অপরাহ্নে ইনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মত রসজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ বাঙ্গালীর মধ্যে তো খুব কমই ছিলেন সমস্ত ভারতেও বেশী ছিলেন কিনা সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথ অনেক গল্প লিখিয়াছিলেন—কিন্তু একখানিমাত্র গল্পের বই ছাড়া আর কিছু ছাপেন নাই। তাঁহার যোগ্য পুত্র যদি পিতার অপ্রকাশিত রচনাগুলি প্রকাশ করেন তবে ভাল হয়। এ ধরণের উৎকৃষ্ট নানারসের গল্প বাংলায় বেশী নাই—পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে গল্পগুলি কালজয়ী হইয়া বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লইয়া থাকিতে পারে—নতুবা পুরাতন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ক্রমশঃ লোক-লোচনের অন্তরালে চলিয়া যাইবে? সুরেন্দ্রবাবুর গল্পগুলি মাসিকের পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রণের যোগ্য, সেগুলি এখন যদি আবার মাসিকে মুদ্রিত করা যায় তবে আধুনিক লেখক ও পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন গত যুগের বাঙ্গালী লেখক বাংলা সাহিত্যে কি মহার্ঘ সম্পদ দিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য একজন বিশিষ্ট কৃতী সেবক হারাইল। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জানাইতেছি। আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদের ও লেখক লেখিকাদের সুরেন্দ্রবাবুর রচনা পাঠের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

শ্রীঅনিলা দেবী

চিঠি

মহিলা সংখ্যা পুষ্পপাত্রের জন্য কিছু লিখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কারণে লেখা কিছু সম্ভব হয়ে উঠলো না। শেষ পর্য্যন্ত অন্ততঃ মহিলা সংখ্যায় ছাপার হরপে নামটা দেখবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে সামান্য এই চিঠিটুকু পাঠাচ্ছি, যদি পারেন ছাপবেন।

বছর দুই হোল আপনি পুষ্পপাত্রের মহিলা সংখ্যা করে নারীদের যে গৌরব দিচ্ছেন এজন্য আমরা বিশেষ সুখী। ভাল লেখিকারা অনেকেই আপনার কাগজে বরাবরই লিখছেন; এজন্যে কেউ কেউ আপনাকে লেখিকাদের ওপর পক্ষপাতীও বলে থাকেন, কিন্তু আপনি যে মহিলাদের ভেতর সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক রত্ন আবিষ্কার করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আপনি যখন 'বাসন্তী' সম্পাদন করতেন তখন থেকেই লক্ষ্য করে আসছি—তখন যাঁরা আপনার সাহায্যে সাহিত্যক্ষেত্রে উৎসাহ-আশা-ভরে নেমেছিলেন আজ তাঁদের অনেকেই খ্যাতনামা হয়েছেন।

লেখকদের কথা ছেড়েই দি, তখন আপনার কাগজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন মহাশয় সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতেন, অধুনা বিখ্যাত শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠীর মল্ল করতেন। প্রভাদেবী সরস্বতী- শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন আপনার কাগজে নিয়মিত লেখিকা—তখনকার অনেক লেখিকাই আজ জয়মালা পেয়েছেন, কেউ কেউ বোধ হয় সংসারের চাপে আর সাহিত্যের দিকে নজর দিতে পারছেন না।

পুষ্পপাত্র সম্পাদন করতে এসেও আপনি পুরাণো লেখিকাদের অনেককে পেয়েছেন. প্রভাদেবী সরস্বতী আপনার নিয়মিত লেখিকা হলেও প্রভা গঙ্গোপাধ্যায়কে কমই দেখি, শৈলবালা ঘোষজায়াকে তো দেখতেই পাই না। তবে আর ক'জনা লেখিকাকে পুষ্পপাত্রে যা দেখছি তাঁদের লেখা পড়ে খুবই মুগ্ধ হয—শ্রীমতী বিমলা, অমলা ও প্রমীলাকে আপনি খুবই প্রাধান্য দিচ্ছেন—আর সত্যিই এঁরা প্রাধান্য পাবার যোগ্যও। এঁদের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, লেখবার ভঙ্গী, বিশেষ করে নারী জীবনের বলবার কথা গুলোকে এঁরা এমন সহজ সরল সুন্দর রূপে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলছেন যে তার তুলনা নাই। অদূর ভবিষ্যতেই এঁদের নাম বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহমাত্রও নাই।

বাংলার নবীনা লেখিকাদের সসঙ্কোচ-উৎসাহ-অভিযানকে সাফল্য মণ্ডিত করতে আপনি তাদের যে ভাবে সাহায্য করছেন সে জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুষ্পপাত্রের মহিলা সংখ্যা দিনে দিনে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠুক ও বিশেষ করে মহিলাদের সাহিত্য কৃতিত্বের নিদর্শন হোক এ কামনা করি।

শ্রীঅনিলা দেবী

গ্রন্থ-পরিচয়

জমা খরচ—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—রসচক্র-সাহিত্য সংসদ, পি ২৩০।৩ রসা রোড, হইতে শ্রীরাধেশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য—১।০

অসমঞ্জ বাবু কথা সাহিত্যে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন "জমা-খরচে"র গল্পগুলিতে তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তিনি গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ করেন নাই—সর্ব্বত্রই একটা মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার অভিনব আখ্যানগুলি স্বচ্ছ-সরল ভাষার আবরণে বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। "জমা খরচ" লেখকের গল্প রচনা করিবার সহজ শক্তির একটী অভিনব অভিব্যক্তি।

জগদীশের চরিত্রের পরিণতি যে কোন পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। "যাদুকরী", 'গুরুচরণের মুক্তি' ও 'ফল্গুধারা'য় যে চিত্র আমরা পাই, তাহাও লেখকের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বইখানির কোথাও এতটুকুও ভাব-ভাষার জড়তা নাই—আখ্যানভাগের ধারা সর্ব্বত্রই স্বতস্ফূর্ত্ত ও সাবলীল। গল্প কয়টী যে কোন রস-লিপ্সু পড়িয়াই আনন্দ পাইবেন। ছাপাও বাঁধাই বেশ ভালই।

স্বপ্নশেষ—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ হইতে শ্রীরাধেশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত; পি ২৩০।৩ রিসা রোড, কালিঘাট। মূল্য—১।০

বইখানিতে চারিটী গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'স্বপ্নশেষে'র মত চরিত্র, আমাদের দেশে বিরল হইলেও, অস্বাভাবিক নয়। যৌবনে যে প্রেম-লিপ্সাকে নিবারণ ঝঞ্ঝাটের ভয়ে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিশোরী সুভার সংস্পর্শে আসিয়া তাহা বিকৃত রূপ ধারণ করিল! কিন্তু বাস্তব মিলন সম্ভবপর হইল না—একটা sense of justice আসিয়া নিবারণের স্বপ্ন শেষ করিল। সমাজ সম্পর্কবিহীন নিবারণের এই ক্রম-বিবর্ত্তন বিশ্বপতি বাবুর স্বচ্ছন্দ ও সলীল ভাষায় চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তারপর দ্বিতীয় উপাখ্যান 'পথের বাঁকে'।

এখানেও কয়েকটি দুশ্চরিত্রের সম্মিলিত রহস্যের একটি অভাবনীয় পরিণতি। মা-হারা ভেলুর ক্ষণিক সংস্পর্শে পতিতা পটলীর অন্তরে যে মহত্ত্ব জাগিয়াছে তাহা পড়িতে পড়িতে চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠে।

'রাখালী' একটী স্বাভাবিক দাম্পত্য-মিলনের কাহিনী।

প্রথমতঃ গোকুল ও যশোদার কোলে অজ্ঞাত কুলশীল নীলমণির আবির্ভাব, এবং নীলমণির সঙ্গে রাখালীর যোগসূত্র লক্ষ্যণীয়। রাখালীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য নীলমণির উৎকণ্ঠা বড়ই মর্ম্মন্তুদ। মিলনের পূর্ব্বে রাখালী নীলমণির মনের খবর পায় নাই। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া গল্পের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিটী বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

'তরুণী ভার্য্যা'য় রমার বৃদ্ধের হাতে পড়িয়াও নানা ভাবে আত্মতৃপ্তির চেষ্টাটি বেশ স্বভাব সুলভ হইয়াছে।

যাহারা দেবরের জন্য তাহার নারী হৃদয় সদা ওতপ্রোত। দেবর ও দেবর-পত্নীর সমস্ত দোষ উপেক্ষা ও তাহাকে স্নেহের আতিশয্যে ভুলিতে হইল। একদিন সত্য সত্যই মাতৃত্বের দাবী করিয়া রমা চীৎকার করিয়া উঠিল, "এমনি করেই মাতৃঋণ শোধ করতে হয় নয় ঠাকুর পো?"

তারপর যখন তারিণী পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিল, তখন সমস্তই মধুময় হইয়া উঠিল। তখন রমাও একদিন শাশুড়ীর দায়িত্ব মাথায় লইয়া নতুন বৌকে বলিল "চল বোন, আরতি দেখে আসিগে।"

"স্বপ্ন শেষে"র প্রত্যেকটি গল্পেই একটা human interest নিবিড়ভাবে নিহিত। প্রত্যেকটি আখ্যানই অপরূপভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। problem ও f ctএর এরূপ যথাযথ মিলন বাঙ্গালা সাহিত্যে খুব বেশী নাই।

ঘূর্ণি—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, রস চক্র-সাহিত্য-সংসদ, পি ২৩০।৩ রসা রোড, হইতে শ্রীরাধেশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—১।০

আলোচ্য উপন্যাসে গ্রন্থকার যে সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা খুব নূতন না হইলেও, বস্তুতই প্রণিধান যোগ্য।

নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজের চিরাচরিত প্রথার আবর্ত্তে পড়িয়া অসহায়া পারুলের সরল শুদ্ধ জীবন ব্যর্থ হইল। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথিত বক্ষে অলক্ষ্যে তাহার যে বাসনা জাগিয়াছিল, নির্য্যাতিতা কামিনীর কাহিনীতে তাহা বাহির হইবার পথ পাইল। ক্রমে হিতে বিপরীত হইল। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ অথর্ব্ব নীলমণির লালসার কবলে তাহার ভরা যৌবনকে বিকাইয়া দিতে হইল, তাহার আর গত্যন্তর ছিল না, সে যে তাহার বিবাহিতা পত্নী!

তাহার স্বর্গগত পিতা কৌলিক মর্য্যাদা রক্ষার মোহে যে পাপ করিয়া গিয়াছিলেন, বৃদ্ধ কালীপ্রসন্ন ও স্নেহময় মহিমের অশ্রুতে তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইল না। ফলে তাহাদের চিরকাল অনুতাপ করিয়া ফিরিতে হইল। তারপর বলাই ও মণিমালার কথা।

দুজনেই দু'জনকে চায়, কিন্তু কোষ্ঠীর গরমিলের জন্য তাহাদের মিলন সম্ভবপর হইল না। বলাই বেপরোয়া যুবক; এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও সে মনিকে চায়! আর মণি তাহাকে মনে মনে পূজা করিয়াও কি যেন কিসের ভয়ে অন্তরের ব্যগ্রতাকে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। তারপর এক অজানা ঘূর্ণিপাকে যদিও সমস্যার একরূপ আশু প্রতিকার হইল—মণিকে মহিমের হাতে পড়িতে হইল—কিন্তু সরল অনভিজ্ঞ বলাই'র প্রণয় বেদনা চিরকালের জন্যই মর্ম্মন্তুদ রহিয়া গেল।

নির্ম্মম সমাজের ঘূর্ণীপাকে দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতায় যে চিত্র এই বই খানিতে আঁকা হইয়াছে, তাহা বেশ স্বাভাবিক।

বিশ্বপতি বাবুর ভাষায় একটি নূতন সুর আছে, বর্ণনা-বৈচিত্র্যে তিনি যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন তাহা বস্তুতই পাঠকের চিত্তাকর্ষক। তারপর বৃদ্ধ কালীপ্রসন্নর সংস্কার-বিরোধী স্নেহার্দ্র চিত্ত, অনাত্মীয় হইয়াও মহিমের অনাবিল ভ্রাতৃপ্রীতি, সতীন অন্নপূর্ণার জননী-সুলভ সতর্কতা ও সর্ব্বশেষে কুষ্ঠীগিয় বলাইর দিলদরিয়া ভাব—এইগুলি বেশ যথোপযুক্ত ও সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পরিশেষে সমস্ত উপাখ্যানটীর একটী sentimental unity আনিয়া লেখক অলক্ষ্যে এই কঠোর সমস্যার সমাধানের যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটী দিয়াছেন, তাহা যে কোন ঔপন্যাসিকের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

'বিশ্বজিৎ'

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাংলার কংগ্রেস

বাংলার কংগ্রেস সম্প্রদায়ের যুযুধমান দল দুইটীর একটা আপোষ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া বাংলার লোক স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এই যুযুধমান সম্প্রদায় দুইটী তাহাদের কলহ যতদিন বাংলার পত্রিকাগুলির মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, ততদিন লোকে ভাবিত যাহা হউক তবু ভাল ঘরের কথা সারা ভারতে রাষ্ট্র হইতেছে না। তাহার পর স্যর পি-সি রায়ের সহিত যখন শ্রীযুত বোসের মনান্তর ঘটিল তখন ইংরাজী পত্রিকাগুলির মারফৎ সেই কলঙ্ক কাহিনী সারা ভারতে এবং খানিকটা সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িল। ভারতবাসী জানিল বাঙ্গালী কেমন স্বার্থপর। আর্ত্তের ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া কেমন করিয়া সেই অর্থ দলের স্বার্থের জন্য ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না।

আমরা মিষ্টার আনীর সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে তিনি মিঃ সেন গুপ্তেরই হইয়া তাঁহার রায় দিয়াছেন সুতরাং উহা পক্ষপাতিত্ব শূন্য নয়। সেন গুপ্ত মহাশয় কয়েক বৎসর ধরিয়া বি-পি-সি-সিকে আক্রমণ করিয়া আসিতেছিলেন, উহার সংস্কারের জন্য কয়েক প্রকার পন্থাও বাতলাইয়া দিয়াছিলেন; আনী রায়ে সেই গুলিই বলবৎ রাখিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার রায়টাকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট না ভাবিয়া যদি উহা ন্যায়সঙ্গত দাবীর সমর্থন হিসাবেই ধরি তাহাতে ক্ষতি কি আছে? তবে এখন দেখিতে হইবে যে-দল প্রাধান্য লাভ করিবে তাহাদের শাসনদণ্ড কেমন করিয়া পরিচালন করে। তবে একথা সত্য যে শ্রীযুত বোস এবং তাঁহার দল অনেকটা tactless ভাবে চলিয়াছিলেন বলিয়াই আজ রাজনীতির কুটচালে পরাজিত হইলেন। শ্রীযুত সেন গুপ্ত শ্রীযুত বোসের দলের সাহায্য না লইয়া কখনও ক্ষমতা পরিচালনা করেন নাই এখন এই দলের সাহায্য না লইয়া ক্ষমতা পরিচালনা করিতে গেলে যে পরিমাণে নিঃস্বার্থ ভাবে জাতির নিকট আত্ম পরিচয় দিতে হয়, তাহা তাঁহারা পারেন কিনা দেখিবার সময় আসিয়াছে।

আমরা এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মৈত্র এবং ইন্দুবিদ মহাশয়ের অজস্র সুখ্যাতি করিব।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের অধ্যবসায়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দলের তিনি সুদক্ষ সেনাপতি। তাঁহার অধীনতায় পরিচালিত না হইতে পারিলে এই দল যে কতটা কৃতকার্য্য হইতে পারিত তাহাতে সন্দেহ আছে।

অবলাশ্রম

কয়েক বৎসর হইল যে সমস্ত রমণীর ক্ষণিক উত্তেজনায় সামান্য পদচ্যুতি ঘটে, কিন্তু যাহারা কুলটা বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে নারাজ এবং যাহাদের অভিভাবকগণও তাহাদিগকে ঠিক গৃহে রাখিতে সাহস না পাইলেও তাহাদিগকে স্নেহ-প্রীতির চক্ষে দেখেন, তাহাদিগের আশ্রয় দিবার এবং ভবিষ্যতে তাহাদের চরিত্র গঠনের জন্য একটী আশ্রম খোলা হয়, ইহারই নাম অবলাশ্রম। অবলাশ্রমটী হিন্দু রমণীদের জন্য স্থাপিত হয় এবং হিন্দুমাত্রেই উহার পরিচালনার জন্য আহুত হন। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মারওয়ারী ভদ্রলোক ও বাংলার কয়জন বিশিষ্ট নেতাকে এই আশ্রমের পরিচালক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি এই আশ্রম সম্বন্ধে কতকগুলি গুজব খুবই কঠোর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। উহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য নাকি একটী কমিটি সংগঠিত হইয়াছে। উহার তদন্তও নাকি শেষ হইয়াছে। তাহাই যদি সত্য হয় তবে মন্তব্য বাহির করিতে দেরী হইতেছে কেন? যে সমস্ত গুজব রটিয়াছে এবং দৈনিক বঙ্গদূত যাহা প্রকাশ করিতেছে উহাতে যদি বিন্দুমাত্রও সত্য নিহিত থাকে তবে ঐ সমস্ত পাপকার্য্যের জন্য যাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী তাহাদের প্রকৃত শাস্তি দিবার প্রয়োজন হয় নাই কি?

যাহারা পাপী তাহাদের পাপাচার সমাজ কতকটা সহ্য করিতে রাজী আছে কিন্তু ভদ্র-বেশধারী পাপীর উপদ্রব ভীষণভাবে সমাজ-ধ্বংসকর হইয়া দাঁড়ায়, এইজন্য তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করা দরকার।

হিজলীর অন্ধকূপেঃ—

হিজলীর লোমহর্ষক অত্যাচার সারা ভারতে অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর ন্যায় ইংরাজ-শাসনের কু-কীর্ত্তি বলিয়া চিরকাল ইতিহাসে ঘোষিত হইবে। আমরা বলি সরকার এখনও উহার প্রতিবিধান করুন। বিশ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথকে যখন প্রত্যক্ষভাবে বিরাট জনসভার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম, তখন উহার গুরুত্ব যে তাবৎ পৃথিবীবাসীই উপলব্ধি করিবে তাহাতে আর কি কিছু সন্দেহ আছে ?

ইংরাজজাতি জগতের ইতিহাসে অনেক পুণ্যময় কার্য্যের জন্য বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। 'ইংরাজ' এই নামটীও অনেকেরই প্রিয়। যে জাতি সমস্ত দাস-জাতির জন্য একদিন সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল যে জাতি সমস্ত বিশ্বের ছোট ছোট পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য ভীষণ সমরে যজ্ঞাহুতি দিয়াছিল, সেই জাতির অধীনস্থ কয়েকজন প্রজাকে বন্দী অবস্থায় তাহাদের সৈনিকরা গুলি করিয়া মারিল, মৃত শবকে অবমাননা করিল এই গুজবই যে অত্যন্ত আত্ম-সম্মান নাশকারী। যাহারা এই গুজব রটাইতেছে তাহারা নিরপেক্ষ কমিটীর দ্বারা অনুসন্ধান করিতে চহিতেছেমাত্র।

অর্থ-জগৎ ও স্বর্ণ মান

গত ২২, ২৩, ২৪ সেপ্টেম্বর সারা ভারতের উপর দিয়া ভীষণ অর্থ-বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

গতমাসে আমরা বলিয়াছিলাম যে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব মাত্র ক্ষণকালের জন্য ইংলণ্ডের সোসিয়ালিজম্ বন্ধ করিলেন উহা একেবারে বন্ধ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এই সূত্রে আমরা ইহাও বলিয়াছিলাম দেশে অর্থ সঙ্কট ভীষণভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে এবং এই সমস্যার মীমাংসা শুধু লেবার মেম্বারদের সাহায্যে কখনই হইতে পারে না এই ধারণার বশীভূত হওয়ায় ম্যাকডোনাল্ড সাহেব যে দলটী তিনি স্ব-হস্তে নির্ম্মাণ করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইয়া ছিলেন তাহাকেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

ইংলণ্ড উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ও আফ্রিকার স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধনী দেশে পরিগণিত হয়। ইংলণ্ডে স্বর্ণের পরিমাণ অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংলণ্ড ও তাহার অধীন ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে, যে কেহ প্রচলিত মুদ্রা লইয়া তাঁহাদের টাকশালে উপস্থিত হইবেন তাঁহাকে উক্ত মুদ্রা বিনিময়ে স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইবে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণের চাহিদা অসম্ভবরূপ বাড়িয়া যায় কেননা যুদ্ধের জন্য আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে স্বর্ণ বিনিময়ে যুদ্ধ সম্ভার সংগ্রহ করিতে হইতেছিল এইজন্য দেশের মধ্যে চলিত মুদ্রা বিনিময়ে ঐ মুদ্রার পরিমাণ স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর ইংরাজের ব্যবসা-বাণিজ্য হ্রাস পাইতে থাকে। ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা সভরিণের খ্যাতি বিশ্ব-বিখ্যাত ছিল। উক্ত মুদ্রায় যৎসামান্য খাতা থাকিলেও ইংলণ্ডের সরকার অর্থশালী হওয়ায় সারা বিশ্বে উহা প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রার সমষ্টি বলিয়া কেনা বেচা হইত। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড সমস্ত ইংরাজ ধনীগণের ব্যাঙ্ক হওয়ায় উহার প্রতিষ্ঠাও বিশ্ব-বিখ্যাত ছিল। ইউরোপের অনেক দেশেরই ধনীরা নিজেদের জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা গচ্ছিত রাখা অপেক্ষা এই ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে টাকা আমানত রাখা অনেকটা নিরাপদ ভাবিতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার ক্রমশঃ মন্দা হওয়ায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইংলিশ সভরিণের চাহিদা কমিতে থাকে এবং উহার প্রকৃত মূল্য যাহা তাহাতেই আসিয়া দাঁড়ায়। তখন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে অনেকটা অনিশ্চয়তা ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় ইংরাজ সরকার ঘোষণা করেন সভ্‌রিণের মূল্য যাহাই হউক না কেন, বিদেশী বণিকগণ তাহাদের দেশে অর্থ পাঠাইবার জন্য যখন ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে সভ্‌রিণ লইয়া আসিবে, উহাতে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে উহা সভ্‌রিণে থাকুক আর নাই থাকুক, উক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ দেওয়া হইবে। অর্থাৎ স্বর্ণকে মান করিয়া আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে অর্থের আদান প্রদান নির্ণয় করা হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ ঘোষিত হইল, ইহাকেই Gold Standard বা স্বর্ণ মান বলে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিলে ইংরাজ এই স্বর্ণমান রক্ষা করিয়া তাঁহাদের স্বর্ণমুদ্রা সভরিণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু ব্যবসার বাজার ক্রমশঃই মন্দা হইয়া চলিল; ভারতের অনেকটা কারবার হাত ছাড়া হইল, চীনের ব্যবসা প্রায়ই নষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু ইংরাজ তাহার প্রয়োজনানুযায়ী দ্রব্যাদি পূর্ব্ববৎ আমদানী করিয়াই চলিল; রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বাড়িয়া চলায় তাহাদের স্বর্ণমুদ্রার মূল্য হ্রাস হইতে লাগিল কাজেই ব্যাঙ্ক সমূহ হইতে অনবরত স্বর্ণ বাহির হইয়া যাওয়ায় ব্যাঙ্কসমূহ স্বর্ণহীন হইতে থাকে। ইংলণ্ডের এই সঙ্কট অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া দিল, অন্যদেশের ধনীগণ। ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা কাহিল হইয়া আসিতেছে

দেখিয়া তাহারা তাঁহাদের আমানত অর্থ উঠাইয়া লইতে সুরু করিলেন, ফলে ব্যাঙ্ক-অফ্ ইংলণ্ডের অবস্থা অধিকতর সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। যুদ্ধের পর এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীতে যত স্বর্ণ আছে তাহার অর্দ্ধেক আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূহতে এবং উহার এক-চতুর্থাংশ ফ্রান্সে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য খুব জোর চলিলে উক্ত স্বর্ণের গতিও অনেকটা সচল হইত, কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবসায় মন্দা চলায় স্বর্ণ-তালগুলি উক্ত রাজ্য দুইটীতে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে তাবৎ পৃথিবীতে ভীষণভাবে স্বর্ণের ঘাটতি পড়িয়াছে। ইংলণ্ড এইজন্য এখন এই নিয়ম করিলেন যে অতঃপর তাঁহারা আর স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ে স্বর্ণ-তাল দিবেন না, অর্থাৎ বৈদেশিক বণিকগণ বাজার হইতে স্বর্ণ খরিদ-বিক্রয় করিয়া তাহাদের কারবার চালান, তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার্থ গভর্ণমেণ্ট আর কোনপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। আন্তর্জাতিক ব্যবসা এই ব্যবস্থায় অনেকটা জুয়াখেলায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে কেননা মুদ্রার একটা নির্দ্দিষ্ট 'মান' নির্দ্দেশ না থাকিলে দেশীয় কত টাকার জিনিষ পাঠাইয়া অন্য দেশীয় মুদ্রায় উহার মূল্য কতটা ঠিক জানিতে না পারিলে ব্যবসা পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভবই হইবে। এইরূপ করিয়া ইংরাজ একপ্রকার ফ্রান্স ও আমেরিকার বিরুদ্ধে অর্থ-যুদ্ধেই ঘোষণা করিয়াছেন। কেননা বাজার হইতে স্বর্ণ কেনা-বেচা করিয়া ব্যবসা চালাইতে গেলে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ স্বর্ণ সারা বিশ্বে ছাড়া আছে উহার মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে উক্ত দেশে আবদ্ধ স্বর্ণ বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছাড়িতে হইবে, তখন খানিকটা স্বর্ণ আবার বাহির হইয়া আসিলে ব্যবসা-বাণিজ্য আবার অনেকটা শৃঙ্খলিত হইবে। সীতার উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, এই যুগে শৃঙ্খলিত স্বর্ণের উদ্ধার সাধনের জন্য ইংরাজ এই সমর ঘোষণা করিয়াছেন। যুদ্ধের ফলাফল ভবিতব্যের হস্তে।

আর একটা কথা উঠিয়াছে টাকার মান লইয়া। ইংলণ্ড যখন নিজে স্বর্ণমানের বহির্ভাগে বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখনই কিন্তু ভারতের মুদ্রা টাকাকে ইংরাজী স্বর্ণমুদ্রা সভারিনের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন ভারতের একটাকার মূল্য এক শিলিং ছয় পেন্স। ইংরাজ স্বর্ণ তাহার ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে বলিয়া ভয় পাইয়া নিজের দেশকে স্বর্ণ মানের বাহিরে বলিয়া ঘোষণা করিলেন কিন্তু ভারত সরকারকে অনেকটা স্বর্ণ মুদ্রার গণ্ডিতে রাখিলেন কেন? তাহার উদ্দেশ্য যে স্বার্থ-বিজড়িত তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? ভারত ইংলণ্ডের এক বিরাট বাণিজ্যক্ষেত্র। এখানকার ব্যবসা বাণিজ্যে অনিশ্চিত নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলে ইংলণ্ডের বিশেষ ক্ষতি হইবে এই জন্যই ভারতীয় মুদ্রা টাকাকে ইংলিশ মুদ্রার সহিত শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়া ভারতে ইংরাজ ব্যবসাকে অনিশ্চয়তার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। একজন অর্থ বিৎ পণ্ডিত বলিতেছেন যে টাকার পরিমাণ এক শিলিং ছয় পেন্স না করিয়া এক শিলিং চারি পেন্স করাই উচিত ছিল।

বিষয়টি খুবই জটিল। গত কারেন্সি কমিশনে এই বিষয়ে সমধিক ভাবেই আলোচিত হইয়াছিল। বোম্বাই চাহিয়াছিলেন টাকার পরিমাণ এক শিলিং ছয় পেন্স হউক। বাংলা চাহিয়াছিল উহার পরিমাণ এক শিলিং চারি পেন্স হউক। অর্থাৎ একই ভারতবর্ষে দুইটী প্রদেশের স্বার্থ পরস্পরের বিরোধী হইয়াছিল। ইহার কারণ কি ঠিক করিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে যে বোম্বাই প্রদেশ সাধারণতঃ বাহির হইতে তাহার ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া থাকে, কিন্তু বাংলা আমদানী অপেক্ষা তাহার উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানীই অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে। বাংলার চাউল, চা ও পাট সমস্ত পৃথিবীর পণ্য। টাকার মূল্য এক শিলিং ছয় পেন্স ধার্য্য করিলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে যাহারা আমদানী কার্য্যই বেশী করে তাহাদের লাভ বেশী কেননা তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প টাকা দিয়া অধিক দ্রব্য পাইবে। টাকার মূল্য এক শিলিং চারি পেন্স করিয়া দিলে টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। যে সমস্ত দেশ খালি রপ্তানীই করিয়া থাকে টাকার মূল্য হ্রাস হইলে তাহারা অল্প দ্রব্যই রপ্তানীই করিবে সুতরাং উহাই তাহার পক্ষে লাভজনক। এই জন্যই বাংলা চাহে এক টাকার পরিমাণ এক শিলিং চারি পেন্স হউক কিন্তু বোম্বে চাহে এক শিলিং ছয় পেন্স হউক। ভারত সচিব বর্ত্তমানে টাকার পরিমাণ এক শিলিং ছয় পেন্স করায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে, কেননা উহাতে বোম্বাই ব্যতীত ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

মহাত্মার স্পষ্ট কথা

মহাত্মার কার্য্যকলাপ সমস্ত বিশ্ব আজ বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত পরিদর্শন করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীও বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, যে সরকার পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে তাহার সহিত তিনি কোন সর্ত্তেই রাজী হইতে পারেন না, কেননা সর্ত্তে রাজী হইতে গেলে বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের অনেকটা দায়িত্বই নিজ স্কন্ধে লইতে হইবে, যদি না ইংরাজ সরকার কোনপ্রকার লুকোচুরি না

করিয়া ভারতকে কতটা স্বাধীনতা দিবেন তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন। হৃদয় খুলিয়া কথা কহিবার সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ডের বিপদে গুছাইয়া লইবার উদ্দেশ্য তাঁহার নাই। তবে তিনি বলিতে চাহেন যে তোমাদের সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছি বিনিময়ে অপমান ও তিরস্কার ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ হয় নাই। মহাত্মাজী এই কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝেন বলিয়াই বলিয়াছেন, তোমরা আমাদের কি দিবে বল, আমি পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, ইহাই আমার কথা, তোমরা রাজী থাক ত স্পষ্ট বল। যদি পূর্ণ স্বাধীনতা দাও তবে কৃতজ্ঞ ভারত তোমার বিপদ যে আপন বিপদ জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে সাহায্য করিবে।

মুসলিম দাবী

মুসলমানদের সহিত চুক্তির কতদূর? মুসলমান নেতাগণ বলেন সারা ভারতে তাহারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ জাতি হইলেও উহার শাসন দণ্ড উহারাই পরিচালনা করিবে, নতুবা ভারতে ইংরাজ থাকুক। মৌলানা সৌকত আলি মহাত্মাজীর সহিত এক জাহাজে সহবাস করিয়া, লণ্ডনে তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিয়াও ভুলিবার নয়, উৎকট সাম্প্রদায়িকতাকে অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছেন। মিঃ জিন্নাও তাঁহার ১৪টী পয়েনট লইয়া জেহাদ ঘোষণা করিয়া বসিয়াই আছেন। এই সমস্ত উৎকট সাম্প্রদায়িকরা কোন প্রকার যুক্তি তর্ক শুনিবে না মহাত্মাজী তাহা বেশ ভাল রকমই জানেন বলিয়াই, কনফারেন্সে ডাক্তার আনসারির উপস্থিতি চাহিয়াছিলেন। তিনি জগতকে দেখাইতে চাহেন যে, যে সমস্ত মুসলমান-প্রধান সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া লণ্ডনে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা ঘোরতর স্বার্থবাদী, নিজের স্বার্থের নিকট জাতির স্বার্থ অবলীলাক্রমে বলি দিতে উদ্যত; কিন্তু তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাণের কথা নহে। এই সংবাদ আসিয়াছে মুসলমানদের সঙ্গে কোন রফাই সম্ভব হইল না। এখন গোল টেব্‌লের ভাগ্য হইবে?

নিবেদন

পুষ্পপাত্রের উপন্যাস দুইখানি এবার প্রকাশিত হইল না, আগামী সংখ্যা হইতে যথারীতি বাহির হইবে। গল্প-প্রতিযোগীতার ফলাফলও আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।

—

নমস্কারঃ—

পুষ্পপাত্রের পাঠক-পাঠিকাদের শারদীয়া নমস্কার জানাইতেছি।

Printed & Published by D. N. Roy at the Kantik Press, 44, Kailash Bose Street,
Edited by Jnendra Nath Chakravaty.

৫ম বর্ষ | পৌষ—১৩৩৮ | ৯ম সংখ্যা

স্ত্রী-স্বাধীনতা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

— প্রবন্ধ —

শ্রীআভা গুপ্ত বি, এ

স্ত্রী স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে পূর্ব্বে আমাদের দেশে নারীরা সমাজে কতখানি স্বাধীনতা ভোগ করতেন তার আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। তার পর বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা কি আকার ধারণ করেচে ও পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় তাও জানা আবশ্যক। সুতরাং বৈদিক যুগে আমাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতার স্বরূপ কি রকম ছিল তা দেখা যাক।

আমাদের বিয়ের মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে মাতৃত্ববিকাশেরই ভাব সমগ্র বিবাহ পদ্ধতিকে আচ্ছন্ন রেখেছে; তাই আমরা অধিকাংশস্থলে চঞ্চলস্বভাবা, আত্মনির্ভরগর্ব্বিতা বিলাসনিমগ্না ভামিনীর পরিবর্ত্তে, "পৃথিবীর ন্যায় ধীরস্বভাবা, ছায়ার ন্যায় অনুগতা, স্বচ্ছহৃদয়া, হিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সখীর ন্যায় হিতকারিণী সহধর্ম্মচারিণী" পেয়ে থাকি। আমাদের বৈবাহিক মন্ত্র এরকম গভীর হবার প্রধান কারণ আমাদের আহ্নিক মন্ত্রের উচ্চতা ও গভীরতা। আমাদের আহ্নিক মন্ত্রের, কেবল আহ্নিক কেন সবপ্রকার মন্ত্রেরই মূল কেন্দ্র গায়ত্রী মন্ত্র, কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলচেন যে গায়ত্রী মন্ত্রের মত স্বল্পাক্ষর ও সারবান মন্ত্র আজ পর্য্যন্ত দেখা যায়নি।"

আমাদের দেশে নারীদের বাহ্যিক স্বাধীনতা খুব বেশী না থাকলেও আইনঘটিত প্রকৃত স্বাধীনতা যথেষ্ট ছিল। আমাদের দেশে আবহমানকাল থেকে স্ত্রীধনে স্ত্রীরই স্বত্ব চলে আসছে, স্ত্রীর ইচ্ছা ছাড়া তার জীবিতকালে অপর কাহারই তাহা গ্রহণ করবার অধিকার নেই, এমন কি স্বামীরও নেই। স্ত্রীর মৃত্যুতেও তাহাতে যথাক্রমে অবিবাহিতা কন্যা, পুত্রবতী বিবাহিতা কন্যা প্রভৃতির অধিকার আছে। বেদে স্ত্রীলোকের যথাযোগ্য পরাধীনতার কথাও আছে। আবার স্ত্রীলোককে সম্মান দেবার কথাও বিশেষভাবে লেখা আছে। ঋষিরা যথেচ্ছবিচরণে নারীর অন্তঃকরণ দূষিত হ'তে পারে ব'লে এর নিষেধ করেচেন বটে, কিন্তু একথা আমরা কখনই বলতে পারিনা যে তাঁদের পক্ষ হ'তে ভারত রমণীর অবরোধ প্রথার উৎপত্তি হয়েচে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার

জন্য স্বীয় দেবভাবপ্রমোদিত হয়েই তাঁরা এটা প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

এর পর বিবাহে আমাদের ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা কতখানি প্রচলিত ছিল তা দেখা যাক।

বিবাহ কি প্রাচ্যদেশে, কি পাশ্চাত্যদেশে, সর্ব্বত্রই প্রচলিত; বৈবাহিক অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আকার প্রকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হলেও সকল দেশেই বিবাহ প্রচলিত আছে। এর মধ্যে আমাদের বিবাহে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব ও পাশ্চাত্য বিবাহে প্রধানতঃ প্রাচ্য অবরোধপ্রথার অভাব দেখা যায়। এই কারণেই বোধ হয় প্রকৃত হিন্দু বিবাহে সংযমের একটা কমনীয় দৈবভাব ও পাশ্চাত্য বিবাহে দুর্দ্দমণীয় চাঞ্চল্যের দানবীয় ভাব বিশেষ ভাবেই দেখা যায়। হিন্দুর সকল অনুষ্ঠানেই এই দৈবভাব পাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহেই এর প্রকাশ ও প্রচার সবচেয়ে বেশী। নিরপেক্ষভাবে আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানটী আলোচনা করলে এতে ঋষিদের সৌম্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ না করে থাকা যায় না। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের বিষয়ে এত বলা যেতে পারে যে একটী দীর্ঘ বই হ'তে পারে। এই অনুষ্ঠানের কোন্ অংশ পরিত্যাগ করে ও কোন্ অংশ গ্রহণ ক'রে এই মধুর কোমল ও শান্তভাব বর্ণনা করতে পারা যায় তা ঠিক করতে পারা যায় না! যখন বধূ ধ্রুবনক্ষত্র দেখে বলেন, "ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং" অর্থাৎ তুমিও ধ্রুব, আমিও পতিকুলে ধ্রুব হই; যখন জামাতা বধূকে আশীর্ব্বাদ করেন, "ওঁ ধ্রুবা দৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং॥" অর্থাৎ দ্যুলোক ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্বজগৎ ধ্রুব। এই পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব॥ যখন বরবধূ মিলিতভাবে সপ্তপদীগমনে ভগবানের কাছে এক একটী প্রার্থনা সহকারে এক একটী পদক্ষেপে পরস্পরের সঙ্গে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন বর্ত্তমান কালের তীব্র কুটীলতার মধ্যেও সেই পুরাকালের পট্টবস্ত্রপরিহিতা সলজ্জা বধূর মধুর মুখচ্ছবি চোখের সামনে উপস্থিত হয়।

এইবার পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রী স্বাধীনতার সঙ্গে আমাদের দেশের স্ত্রী স্বাধীনতার পার্থক্য কি ও কোন্টা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক, তা দেখা যাক।

বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা শাস্ত্রাদিতে যে রমণী হৃদয়ের অনুকূল অনেক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, তা তাঁরা চোখ তুলে দেখ্তে চান না। অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে তাঁরা নিতান্ত অন্ধভাবে ব্যবহার করেন। শাস্ত্রে কিরকম অবরোধ প্রথা অনুমোদিত আছে তা বিবেচনায় আনা বোধ হয় তাঁরা আবশ্যকই বোধ করেন না। তাঁরা অতি মাত্রায় স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী হ'য়ে অপরিণামদর্শীর ন্যায় কাজ করচেন।

এই সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুসরণ করে চলেন তার শিক্ষাগুরু হচ্ছেন জন ষ্টুয়াট্ মিল। তাঁর হৃদয় যে অসহায় রমণীকুলের দুঃখ ও অভাব দেখে কেঁদে উঠেছিল ও তিনি তাঁর "Subjection of women" গ্রন্থে এই সকল দুঃখ ও অভাবের উল্লেখ করে দুর্ব্বল রমণীর উদ্ধারের জন্য নিজ হস্ত বিস্তার করে দিয়েছেন, এতে তাঁর মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হতে পারেনা। মিল তাঁর রচিত পুস্তকে রমণীর পরাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেচেন ও স্ত্রী পুরুষের সমান শিক্ষা ও সমান স্বাধীনতা সমর্থন করচেন। মিল তাঁর বইয়ে বলেচেন যে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা বা পরাধীনতা মানবের পশুত্ব হ'তে জন্মগ্রহণ করেচে অর্থাৎ ক্রীতদাসদের যে কারণে পরাধীন করে রাখা হত বর্ত্তমান কালে ঠিক সেই কারণে পুরুষেরা কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য মেয়েদের অবরোধের সৃষ্টি করেচেন।

তিনি তাঁর এই মতবাদকে এতদূর অকাট্য স্থির করেচেন যে এর ভুল দেখাতে পারলে তিনি স্বমত ত্যাগ করে অবরোধ প্রথার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবার অঙ্গীকার করেচেন। "I consent that established custom and thc general fceling, (about the subjection of women), should be deemed conclusive against me, unless that custom and feeling from age to age can be shown * * * to have derived their power from the

worse rather than tha better parts of human nature." (Subjection of women by John Stuart Mill Page Six). বলতে পারিনা তাঁর দেশে স্ত্রীলোকের পরাধীনতার উৎপত্তি মানবের পশুত্ব কি দেবত্ব থেকে, কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে অন্ততঃ এই দুর্ব্বল ভারতবর্ষে বৃদ্ধ ঋষিরা নিজেদের দেবত্ব হতেই ও ভারতের যোগবিদ্যায় অসিদ্ধ, কর্ম্মকোলাহলে লালিত পালিত পাশ্চাত্য জাতির অনভিগম্য ও শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাপেক্ষা সহস্রগুণে কমনীয় রমণীর দেবভাব রক্ষা করবার জন্যই নারী জাতির অবরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। এটা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যে নারীর মাতৃত্ব সুন্দর উপলব্ধি করেই ঋষিরা স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে সকল ব্যবস্থাই তদুপযোগী রূপে প্রবর্ত্তিত করে গেছেন। তাঁদের এই ব্যবস্থার ফলে আজও ভারতের দারুণ অবনতির দিনে,নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে,যারা মদ ও বিলাসিতাকে অঙ্গের ভূষণ করেনি, তারাও সহজে মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না—কেউ প্রহার করতে গেলেও অপর পাঁচ জনে এসে তাকে এই বলে নিরস্ত করে যে :স্ত্রী লোক লক্ষ্মী, স্ত্রীলোক মা, স্ত্রীলোকের গা কোন প্রকার অপবিত্রভাবে স্পর্শ করতে নেই।

মিলের একটা উক্তি দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়। তিনি লিখেচেন যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন নারী সন্তানের মা হ'তে চায় না। একথা অস্বীকার করলেও এটা স্বীকার করি যে পুত্র প্রসবে মায়ের যথেষ্ট কষ্ট হ'য়ে থাকে। এটা খুব সাহস ক'রে বলা যেতে পারে যে জগতের অধিকাংশ সুস্থ মেয়েই পুত্রের মা হবার গৌরব ও অধিকার প্রার্থনা করে; কেবল তাই নয়, ভগবান প্রসব কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে এমনি সুখের সংযোগ রেখে দিয়েছেন যে মা পুত্রের মুখ দর্শন করলেই সকল কষ্ট ভুলে যায়। শুধু সন্তান হবে বলে নয়, শারীরিক সুখবিধানের জন্য ও অজ্ঞানত মানুষ পুত্র উৎপাদনে উন্মত্ত হয়ে থাকে। আমরা মানুষ হ'য়ে জ্ঞানত সৎ পুত্রের জন্য যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করে থাকি। আমাদের দেশে শাস্ত্রের কল্যাণে ও শিক্ষার গুণে নারীদের মধ্যে মাতৃভাব এতদূর বিস্তৃত লাভ করেচে যে এখানে বিয়ের পর তারা কি পিতৃকুল কি স্বামীগৃহ কোন খানেই সহজে কষ্টদায়ক হয় না। যত দূর বইয়ে পড়া যায়, তাতে দেখি যে বিলাতেই বিয়ে অনেক স্থলেই কষ্টকর হয়ে ওঠে। সুবিখ্যাত এম ফিল বিলাতের "Review of reviews" পত্রিকায় ঠিক এই ব্যাপার সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"Nowhere is marriage as an institution more attacked, both from the inside and outside, than in England." ঐ দেশে বিয়ের পর লোকে মাতৃত্বের বিকাশ প্রার্থনা করে না। পাশ্চাত্য দেশের বিয়ের মন্ত্র স্বামী-স্ত্রীর আত্মসুখ প্রার্থনার ভাবই ব্যাপ্ত দেখতে পাওয়া যায়। মন্ত্রগুলি যেন স্ত্রী-পুরুষের উদরের দিকেই দৃষ্টি রেখে করা হয়েচে। আরও একটু ওপরে গেলে এরকম ভাবের কারণ দেখতে পাওয়া যায়—পাশ্চাত্য জাতির গীর্জ্জায় উপাসনার একটা প্রধান মন্ত্রে এই উদরের দিকেই দৃষ্টি রেখে তৈরী হয়েচে। এই রকমে সমস্ত পাশ্চাত্য জাত আত্মসুখ বৰ্দ্ধিত করতে শিখেচে, বলিদান করতে শেখেনি।

এই বার আমাদের বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্য বিবাহ পদ্ধতির তুলনা করা যাক।

পাশ্চাত্য বিবাহ পদ্ধতি আলোচনা করলে তার নিরস চুক্তি ভাবই প্রথমে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথমেই বর কন্যা বন্ধু-বান্ধবের সহিত গীর্জ্জায় উপস্থিত হলেই পুরোহিত গম্ভীরভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে প্রজাবৃদ্ধি, ভ্রূণহত্যা নিবারণ প্রভৃতির জন্যই বিবাহের সৃষ্টি ও এরূপর একবার সভায় উপস্থিত সভ্যগণকে, দ্বিতীয়বার বর ও কন্যা উভয়কে জিজ্ঞাসা করবেন যে তাঁদের এই বিয়ের বিরুদ্ধে কারও কোন আপত্তি আছে কিনা, অর্থাৎ সহজ কথায় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে বর ও কন্যা উভয়কে কামান্ধ মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিয়ে করচেন কি না। কিন্তু কে এমন মূর্খ আছে যে আপত্তি থাকলেও বিবাহ সভায় তা উত্থাপন করবে—বর ও কনে ত' নিশ্চয়ই নয়। আমাদের বিবাহে বর ও কনের অনুমতি গ্রহণ একটু পৃথক ভাবাপন্ন ও বিনয় নম্র। যাই হোক এই রকম বক্তৃতার পর বিয়ের চুক্তির সূত্রপাত হয়। পুরোহিত বরকে জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি কি এঁকে বিবাহিত পত্নীরূপে

গ্রহণ করিবে, প্রীতি করিবে এবং যাবজ্জীবন অন্য স্ত্রীলোক পরিত্যাগ ক'রে এঁতেই অনুরক্ত থাকিবে!" বর এই চুক্তিতে রাজী হলেই কন্যাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে ঠিক ঐ চুক্তিতে রাজী কি না। তবে কন্যাকে এইটুকু বেশী স্বীকার করতে হয় যে সে স্বামীর আজ্ঞাধীন থাকবে ও তাঁকে সম্মান করবে। কন্যার এরকম আজ্ঞাধীন থাকবার কথা শুনে যেন কেউ পাশ্চাত্য বিবাহকে শিরোধার্য্য করে না বসেন। কন্যা ঐ চুক্তিতে বাধ্য থাকতে স্বীকৃত হ'লে পুরোহিত বরকে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করাবেন যে, "আমি তোমাকে আমার বিবাহিত পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতেছি এবং অদ্য হইতে সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, রোগ নিরাময়ে ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী আমাদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভালবাসিতে ও পোষণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি।" পরে কন্যাও ঐ একই প্রতিজ্ঞা করেন—বেশী কেবল আজ্ঞাধীন থাকবার কথা। এই প্রতিজ্ঞা—বিনিময় শেষ হবার পর বরকে যা বলতে হয় তা' ঘোর আপত্তিজনক, কারণ তার বিনিময়ে বর কনের কাছ থেকে ঠিক ঐ রকম প্রতিজ্ঞা পায় না—বেচারা বর যেন কিছু ফাউ দিতে বাধ্য। বর কনের আঙ্গুলে বিয়ের আংটী পরিয়ে দিলে পুরোহিত বরকে বলবেন,—"এই আংটির দ্বারা আমি তোমাকে বিবাহ করিতেছি, আমার শরীরের দ্বারা আমি তোমাকে পূজা করি, এবং আমার সমস্ত পার্থিব ধন-সম্পত্তি তোমাকেই অর্পণ করিতেছি।" রাজা দুষ্মন্তও এইরূপে শকুন্তলার কোমল আঙ্গুলে আংটী পরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিও লোভ দেখাতে ছাড়েন নি যে তাঁকে বিবাহ করলে শকুন্তলা তাঁর অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী হবেন। কেবল তাই নয় শকুন্তলা তাঁর সপত্নীদেরও প্রভু হবেন।

পাশ্চাত্য বিবাহ পদ্ধতির আলোচনা দ্বারা আমরা দুটী জিনিষ পাচ্ছি। প্রথম এই বিয়ে কেবল চুক্তিমূলক; দ্বিতীয় এটা পার্থিব ভাবেই পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্যেরা বিবাহের আদর্শ এখনও ধরতে পারেননি। পাশ্চাত্য বিবাহ চুক্তিমূলক বলেই পাশ্চাত্য জাতি অর্থ দিয়ে সতীত্বের মূল্য নির্দ্দেশ করতে সক্ষম হয়। কোন নারীর সতীত্ব নাশে অপরাধীর বেশী অর্থদণ্ড করা হয়। কিন্তু তাঁদের বুঝতে বাকী আছে যে সতীত্বের পরিমাণ অর্থ দিয়ে হয় না। হিন্দুর কোমল প্রাণে চুক্তির একরকম নীরস ও কঠোর ব্যবস্থা সহ্য হয় না।

দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য বিবাহ কেবলই পার্থিব ভাবে পরিপূর্ণ। বরের শেষ প্রতিজ্ঞা যিনিই পড়বেন তিনিই একথা স্বীকার করতে বাধ্য। ঋষিদের ব্যবস্থাফলে স্বামী-স্ত্রীর এতদূর একতা সাধিত হয় যে, তাঁরা, "ওগো আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি তোমার" এরকম নীচ ও কঠোর কথা স্বামীর মুখ দিয়ে বার করা আবশ্যক মনে করেননি। এরূপ উক্তির দ্বারা এই বুঝিয়ে থাকে যে, "আমার ধন সম্পত্তি তোমার কিন্তু আমার হৃদয় তোমার নয়—এক কথায় তুমি আমার সহভোগিনী কিন্তু সহধর্ম্মিণী নও?" পাশ্চাত্য বিবাহ পদ্ধতির আঁতিপাঁতি খুঁজে দেখলেও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র সৌম্য ভাবের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য বিবাহের সঙ্গে আমাদের গান্ধর্ব্ব বিয়ের কতকটা মিল আছে। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা এই গান্ধর্ব্ব বিয়েকে ধর্ম্মানুমোদিত বিয়ের মধ্যে পরিগণিত করতলে একে কামজ বিবাহ বলে উল্লেখ করেছেন ও অতি নিম্নপদ প্রদান করেচেন।

স্ত্রী স্বাধীনতাই পাশ্চাত্য বিবাহের ও অবরোধ প্রথাই হিন্দু বিবাহের মেরুদণ্ড স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে মেয়েকে পিতা বা অপর কোন আত্মীয়স্বজন সম্প্রদান না করলে তার বিয়ে হওয়া দুর্ঘট হয়ে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা নিজের নির্ব্বাচিত বরের সঙ্গে পুরোহিতের নিকট গিয়ে বিয়ের চুক্তি করেন। এই স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছা-চারিতার ফলে মেয়েকে অনেক সময়ে প্রতারিত হতে হয়। কামান্ধ বুদ্ধিতে পড়ে স্বেচ্ছায় একজনের সঙ্গে বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়ে স্বামীর সঙ্গে মধুনিশি (Honey Moon) যাপন করতে চলল। মধুনিশি পোহাবার আগেই মেয়েও অনেক স্থলে দেখতে পায় যে, হয় স্বামী একেবারেই মন্দ বা সম্পূর্ণ মনের মত হয় নি। তখন মেয়েকে স্ত্রী স্বাধীনতার ফলভোগে

অনুতপ্ত হতে হয়। স্ত্রী এই ভাবে প্রতারিত হয়ে বিবাহ ভঙ্গের প্রার্থনা করে, আদালতে নালিস করে কিংবা পরস্পরের সম্মতি ক্রমে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে ও দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য পরস্পরের মরণ প্রার্থনা করে। এইরূপে পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আমরা ধর্ম্ম ও আইনের সামঞ্জস্য দেখতে পাই না। হিন্দুর ধর্ম্ম ও আইনের সামঞ্জস্য আছে বলেই ভারতে সামাজিক ও পারি-বারিক অশান্তির একান্ত অভাব।

হিন্দুর ধর্ম্মে বলে যে স্ত্রী সর্ব্বদা বিনয় নম্র ও স্বামী প্রভৃতির অনুগত হয়ে চলবে; বিয়ের সময়েও মেয়েকে সমস্ত বিষয়ে স্বামীর অনুগত হ'য়ে থাকবার অঙ্গীকার করতে হয়। এই কারণে হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদের নালিশ করবার দরকারও হয় না ও তদুপযোগী কোন আইনও নেই।

এইবার আমাদের পর্দ্দাপ্রথা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। মুসলমানী জেনেনা অথবা অবরোধ প্রথার ফলে সমাজের যেরূপ নির্জীব অবস্থা আসতে পারে, তা সকলেই প্রত্যক্ষ করচেন। যে হিন্দুজাতি পত্নীর নাম সহধর্ম্মিণী ও স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী দিয়েচেন ও যাঁরা শাস্ত্রগ্রন্থে ও আচার ব্যবহারে নারীজাতিকে মাতৃচক্ষে দেখতে শৈশব-কাল থেকে শিক্ষা পেয়ে থাকেন, তাঁদের পক্ষে নারী জ্যাতিকে প্রাচীর বেষ্টিত পুরীর মধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যা করে রেখে অজ্ঞানের অন্ধকূপে ফেলে রাখা কোন মতেই উচিত নয়। যখন রাজপুত বীররমণীরা ভাই, স্বামী, ও পুত্রদের অতুল উৎসাহে উৎসাহিত করে স্বদেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে কুন্ঠিত হতেন না, যখন বীর রাজপুত ও ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে স্ত্রীর কাছে মুখ দেখাতে সঙ্কোচ বোধ করতেন, সেই আপক্ষাকৃত আধুনিক কালেও হিন্দুনারী মুসলমানী জেনানা প্রথার পেষণ যন্ত্রের নীচে পতিত হন নি ও তখনও হিন্দুভারতের শরীরের বল ও মনের বীরত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। আর সেই পুরাতন বৈদিক কালে যে স্ত্রীজাতির কিরূপ স্বাধীনতা ছিল তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বৈদিক কালে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নারীর বিশেষ স্বাধীনতা ছিল এবং আবশ্যক হ'লে বৈদিক নারী যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহণে উপস্থিত হ'য়ে শত্রু পক্ষকে পরাজিত করতে পরাঙ্মুখ হতেন না। ঋষিরাও সেজন্য কিছুমাত্র অপ্রশংসা করেন নি এবং প্রশংসাই করেচেন অনুসন্ধানে যতদূর দেখা যায়, তাতে বোধ হয় যে মুসলমান প্রভাবের আগে ভারতের জেনানা নামে অপরূপ পদার্থের সৃষ্টি হয়নি। এইখানে মনে রাখা উচিত যে মুসলমানী জেনানা বা অবরোধ প্রথা ও শাস্ত্রীয় অবরোধ প্রথা অথবা বৈদিক স্ত্রী স্বাধীনতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে।

বর্ত্তমান স্ত্রী স্বাধীনতার ফল সম্বন্ধে বিবেচনা করতে গেলে গুহ্য অনুষ্ঠান, সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও অন্যান্য সাংসারিক কাজ এই চার বিষয়ে স্ত্রী স্বাধী-নতার প্রভাব দেখা দরকার। গুহ্য অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম প্রভৃতি এত সংশ্লিষ্ট যে অনেক যায়গায় এদের আলাদা ভাবে না নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

হিন্দু সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান হচ্ছে গর্ভাদান। এই অনুষ্ঠানকে অনেকে অশ্লীল বলে মনে করেন। এই অনুষ্ঠান বালকের অনুষ্ঠেয় নয় ও এর বিবরণ বালকের পাঠ্য নয় স্বীকার করি। কিন্তু যে বয়সে ও অবস্থার শরীর তত্ত্ব প্রভৃতি বই সম্পূর্ণরূপে পড়ান যায় ও কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার মত নাটক পড়লে দোষের হয় না, সেই বয়স ও অবস্থায় যে এটা অনুষ্ঠেয় তা বলা বাহুল্য ও তখন এর বিবরণ পাঠ করলেও দোষের বলা যেতে পারে না।

তন্ত্রে যেমন পাকা মাতাল ও বদ্‌মায়েসদের সুমতি ক্রমে ক্রমে ফিরিয়ে আনবার জন্য যতটুকু মদে বুদ্ধি বিচলিত হয় না, ঠিক ততটুকু মদের ব্যবস্থা ও শক্তি-সাধনায় পরস্ত্রীকে স্পর্শ না ক'রে ও কামুক ভাবে চিন্তা না ক'রে সাধন করবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে; সেই রকম মানুষের কামভাব দমনের জন্যই গর্ভাধান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েচে বলে মনে হয়। সন্তান জন্মাবার আগে পর্য্যন্ত সীমন্তোন্নয়ন পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান সকল আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে এই সব অনুষ্ঠান বাপ-মাকে কি রকম ধীরে ধীরে ধর্ম্মের পথে নিয়ে যেতে পারে, তাদের হৃদয় কি রকম উচ্চভাবে

পূর্ণ করতে পারে। সীমন্তোন্নয়নের একটী মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয় যে "আমাদিগকে সহস্রপোষী পুত্র প্রদান কর।" অনুষ্ঠান গুলি সমস্ত এখানে দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু পাঠক মাত্রেই দেখবেন যে এই অনুষ্ঠান গুলিতে কেমন একটী কোমলভাব, ধর্ম্মের কেমন একটী শান্ত ভাব ব্যপ্ত হয়েচে এবং সেটা যে অনুষ্ঠাতা বাপমার হৃদয়কেও সহজে সিক্ত করতে পারে, তা অনায়াসেই বোঝা যায়। আমাদের এই অনুষ্ঠান গুলির সঙ্গে তুলনা করা দুরে থাক -এদের সমান কোন অনুষ্ঠান পাশ্চাত্য-জাতির ভিতর প্রচলিত নেই।

উপসংহারে স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে আসা গেল তা' দেখা যাক। প্রথম আমরা দেখে এসেছি যে বেদ থেকে তন্ত্র পুরাণ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্র গ্রন্থেই মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার নিষেধ নেই। দ্বিতীয় পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রণালী ও পাশ্চাত্য স্ত্রী স্বাধীনতা মাতৃত্বের আদর্শ রক্ষার পক্ষে ও ভারতের হিন্দু রমণীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তৃতীয় মাতৃত্বকেন্দ্রকে স্ত্রীশিক্ষা ও বৈদিক কালের স্ত্রী স্বাধীনতা নিষ্কলঙ্ক সতীত্ব রক্ষার পক্ষে সুতরাং হিন্দু রমণীর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

গান

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ,
এম-এ, বি-টি।

অতল তলে ডুবেছে সব
বাকি আছি আমি শেষে,
যা ছিল আমার ফেলেছি হারায়ে
মোহন যাদুর দেশে।

এসেছি দুয়ারে তোমারি
সব-হারা আমি ভিখারী
(তুমি) নয়নের ধার মুছাবে আমার
সুমধুর হাসি হেসে।
জীয়ন কাঠির পরশে তোমার
সুপ্ত এ হৃদি উঠে জাগি—
নয়ন মেলিয়া হেরিবে সমুখে

পিপাসিত হিয়া যাহার লাগি।
মুছে যাবে মোর নয়নের ধার
ঘুচে যাবে গুরু বিষাদের ভার
সব দুখ নাশি আসিবে উজলি
করুণা তোমারি ভেসে।

গান

শ্রীঅলক রায়।

তোমার তরেই রাণী,
তুলেছিলাম আমি
মোর বাগানের যত
দোলন-চাঁপাফুল।
বাজিয়ে ছিলাম রাণী
আমার বাঁশী-খানি
যখন ফুটেছিল
ঐ আমের মুকুল।

* * *

খেয়া ঘাটের পারে বসে আমি,
তোমার তরেই কাটাই দিবস-যামী

* * * *

কুঞ্জে তোমার রাণী
পাই না কেনো বাণী;
পথের পানে চেয়ে
কতই হই ব্যাকুল।

আনন্দের বিজয়া

গল্প

শ্রীজগদীশ চন্দ্র গুপ্ত

চন্দর আর কনক স্বামী স্ত্রী। দু'জনায় খাটিয়া খায়। খাটিয়া খায় সবাই—কিন্তু সেই খাটুনির ভিতরেই "ইতর বিশেষ" থাকিয়া যায়; তাহার মূল্য, মর্য্যাদা আর লঘু গুরুত্বের মত তার চাহিদার মধ্যেও গায়ের জোর আর আক্রোশেরও কমি বেশী ঢের। প্রাণপণ করিয়া কেহ খাটে, কেহ মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া খাটে, কেহ খাটিয়া বিলাস ভোগ করে! কেহ আত্মসম্ভ্রম বিকাইয়া দিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া খাটে। উদরান্নের দাতা যিনি প্রভু তাঁর চক্ষু অনুক্ষণ নিজের স্বার্থটিকে আগ্‌লাইয়া জাগিয়া আছে—সেখানে মার্জ্জনা নাই, কৃপা নাই, অনুকম্পা নাই; সম্ভ্রম কার আহত হইল সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর নাই।

ক'দিন বড় রোদ্ পড়িয়াছে; পা পাতা যায় না—মাটির স্পর্শ এমনি গরম; আর চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া চাওয়া যায় না—এম্‌নি চারিদিককার বিবর্ণ রুক্ষ চেহারা। মাটির উপর বাতাস তরল হইয়া কাঁপে—যেন পৃথিবীর গর্ভের অগ্নি অসংখ্য ছিদ্রপথে লেলিহ অসংখ্য জিহ্বা নির্গত করিয়া আকাশের রং আর রস শোষণ করিয়া লইতেছে।

আকাশের এই অগ্নিবর্ষণ, আর পৃথিবীর এই অগ্ন্যুদ্গার—ইহার মাঝে পড়িয়া মনে হয়, জগদ্ব্যাপী এই অগ্নিকাণ্ডের অবসান কখনো হইবে না···

ধূলিস্তম্ভ বাতাসের মুখে ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিতে থাকে···

ইহারই ভিতর যারা অনাবৃত আকাশের নীচে কাজ করে, চন্দর আর কনক তাহাদেরই। কিন্তু এরা যেন একটু উচ্চ ধরণের, আর তার নিদর্শন তাদের ছেলেটি—অমূল্য। খেলার ভিতরেও অমূল্যর চোখের মুখের এই ভঙ্গীটিই বিস্ময় জন্মায় যে, সেই এখানে নেতা—বড় ছোট সবারই; সর্দ্দারিতে সে সক্ষম; সঙ্গীরা সবাই পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে আসিয়া দলপতির আসনে অবলীলাক্রমে বসিয়া গেছে। শাসন করিয়া, সাজা দিয়া, হুকুম তামিল করাইয়া অমূল্য তাহার দলটিকে শায়েস্তা রাখিয়াছে; কিন্তু অশোভন চাঞ্চল্য কি দুঃশীলতা তার বাক্যে ব্যবহারে কোথাও নাই।

দরিদ্র পিতামাতার একমাত্র সন্তান সে; কিন্তু ক্ষুধা তার পিত্তকে কখন জ্বালাইতে পারে নাই।

অমূল্যকে কনক ইস্কুলে দিয়াছে। ছেলে দ্বিপ্রহরটা ইস্কুলে থাকে—তাই কনক নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতে পায়; কিন্তু ইস্কুলের যেদিন ছুটি থাকে সেদিন মায়ের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না···ছেলে যে দুরন্ত—এই রৌদ্রে দল লইয়া বাহির হইয়া না পড়ে! চারিদিকেই নানা প্রকার অসুখের কথা শুনা যাইতেছে।

কনকের প্রতিবেশিনী রুক্মিণী চিররুগ্না—ছুটির দিনের দুপুরটা অমূল্যর তাহারি খবরদারিতে থাকিবার বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু ভগ্নদেহা রুক্মিণীর কণ্ঠস্বরও তলাইয়া গিয়াছে—অমূল্যকে ডাকিয়া ফিরাইবারই সাধ্য তার নাই। তবু এই বন্দোবস্তেই সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে।

* * * *

শুক্রবারে কাজ হইতে ফিরিল কনকই আগে—বেলা তখন তিনটে, কিন্তু রৌদ্রের তেজ তখনও কিছুমাত্র কমে নাই। দেবতারা যেন আকাশ জুড়িয়া আগুন জ্বালিয়া যজ্ঞ সুরু করিয়াছেন—আর এই পৃথিবীর রস তুলিয়া সেই যজ্ঞের অনলে আহুতি দিতেছেন।

অমূল্য ইস্কুল হইতে পলাইয়া আসিয়া রুক্মিণীর দাওয়ায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিল—কনক আঁচল দিয়া তাহার মুখের ঘাম মুছিয়া দিতেই সে জাগিয়া উঠিল···

একখানি ছোট্টঘর—তারই মধ্যে তাদের সব। ঘরে তালা লাগান ছিল; কিন্তু দরজা খুলিয়াই কনক ঘরে ঢুকিতে পারিল না···বদ্ধ বায়ু এমনি উত্তপ্ত হইয়া ছিল যে, তাহার হল্কা একটা হঠাৎ মুখে লাগিতেই কনক মুখ ফিরাইয়া পিছাইয়া আসিল···

ঘরে ঢুকিয়া চালের খোলার সঙ্গে আঙ্গুল ঠেকাইয়া কনক বলিল,—মাগো, যেন আগুন!

অমূল্য ঝাঁপাইয়া উঠিল,—মা, আমিও দেখব।

কনক তাহার ডানা ধরিয়া তুলিয়া ধরিল—

অমূল্যও মায়ের মত করিয়া চালের সঙ্গে হাত ঠেকাইয়া তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া লইয়া বলিল,—তাইত' মা; আমার আঙ্গুল একেবারে পুড়ে গেছে!

কনক তাহাকে নামাইয়া দিয়া তাহার কম্পিত দগ্ধ আঙ্গুলে একটা ফুঁ দিয়া দিল—

* * * *

কনকের দেহ আজ মোটেই ভাল নাই; কনকের শিরা দপ্ দপ্ করিয়া বড় বড় ঘামের ফোঁটা অবিরাম সেখানে দেখা দিতেছে—শরীর যেন মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে চায়। খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া কনক মাথা টিপিতে লাগিল—

অমূল্য মায়ের পায়ের তলায় মাটিতে বসিয়া তাহার হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া বলিল,—একটা মোষ্ আজ রোদে পুড়ে' মরেছে, মা; নেত্য বল্‌ছিল—তার বাবা দেখেছে।

—আমিও মরবো রে; সেই রকমই লাগছে আমার। একটু বাতাস নেই। বলিয়া একটা নিঃশ্বাস টানিয়া ফেলিয়া কনক অমূল্যর মাথার উপর হাত রাখিল।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন লাগ্‌ছে, মা, তোর? কপাল টাটাচ্ছে?

—হ্যাঁ। বলিয়া কনক উঠিয়া এক ঘটি জল গড়াইয়া এক চুমুকে খাইয়া ফেলিল।

ভিতরের দাহ তাহাতে কমিবার নয়, কিন্তু ঘাম চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল—

ঠাণ্ডায় খানিক্ চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিলে বোধ হয় গা জুড়ায়—কনকের চরম ক্লান্ত দেহ তাহাই চাহিতেছিল—

কিন্তু অসুস্থতার হেতুবাদেও এখনি বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ তার নাই—স্বামী কাজ হইতে প্রচণ্ড ক্ষুধা লইয়া ঘরে ফিরিবে—তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির আয়োজন তাহাকে করিতেই হইবে।

কনক অলস প্রকৃতির কোনোদিন নয়; গৃহিণী হিসাবে সে দক্ষ—পরিচ্ছন্নতা সে ভালবাসে। ক্ষুদ্র গৃহের স্বল্পায়তনের মধ্যেই তাদের জিনিষপত্রগুলি এমনি পরিপাটি করিয়া সে সাজাইয়া রাখিয়াছে যেন তাদের একটিও স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন তার কখনই হইবে না।—কাপড় বিছানা অপ্রচুর, কিন্তু নোংরা নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুরতা সে স্বামী পুত্রকে বুঝিতে দেয় না। সে চিরদিন সাবধানী—তারপর অমূল্য কোলে আসিতেই তার সশঙ্ক সতর্কতা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেছে—ছেলের ক্ষুধা যেন চোখে দেখিতে না হয়।

অমূল্যর জন্মের পর স্বামী স্ত্রীতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিয়াছিল—ভগবান্, ইহাকেই দীর্ঘজীবী করিয়া রাখি, আর দিও না—জীবাত্মা ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে। ভগবান্ দরিদ্রের সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছিল।

স্বামীর সঙ্গে কনকের কলহ নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু ইতরের মত কনক কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করিয়া পাড়া মাথায় করিয়া নাচিতে থাকে না।

* * * *

ছ'টার সময় চন্দর ঘরে ফিরিল—

ছ'ফুট লম্বা মানুষটা—খাটো করিয়া ছাঁটা চুল, মোটা গর্দ্দান, মজবুত হাড়, ত্বকের নীচে পেশীর খেলা চমৎকার, এবং সব মিলিয়া তার অসাধারণ বলিষ্ঠ চেহারা; কিন্তু নিজের এই আসুরিক শক্তি সম্বন্ধে সে যেন একেবারে অজ্ঞান, এম্‌নি পোষমানা নিরীহ তার চোখের মুখের ভাব।

চন্দর উঠানে দাঁড়াইয়া "মূল্য" বলিয়া ডাক দিতেই তার বিপুল কণ্ঠধ্বনিতে পাড়া যেন ভরিয়া উঠিল।

রন্ধনকার্য্যে অমূল্য মাকে ঘটি বাটি আগাইয়া দিয়া সাহায্য করিতেছিল; বাপের ডাকে সে বাহিরে আসিয়াই বলিল,—বাবা, মা'র শরীর ভাল নেই, মাথা ধরেছে আর পাশে ব্যথা হয়েছে, মা তবু বল্‌ছে, কিছুই হয়নি!

—চল্, দেখিগে। বলিয়া চন্দর নত হইয়া ঘরের

ভিতর পা বাড়াইতেই এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল—তাহার পায়ের ধাক্কা লাগিয়া তুয়ারের কাছেই জলের যে ঘটিটা রাখা ছিল তাহা কাৎ হইয়া পড়িল, এবং জল গড়াইয়া এক নিমেষেই কনকের পায়ের তলা দিয়া বহিয়া একেবারে টিন্—ট্রাঙ্কের গায়ে যাইয়া ঠেকিল—

চন্দর পা টানিয়া লইল—

কনক রাগিয়া উঠিল; বলিল,—ঘরে আস্‌ছ কি তামাসা দেখ্‌তে? বাইরেই বস। মূল্য, পাখাটা ওর হাতে দে।

তুয়ারের সম্মুখেই অবিবেচকের মত জলপূর্ণ ঘটি রাখা অন্যায়, কি কানার মত না দেখিয়া যেখানে সেখানে পা বাড়ানো অন্যায়, তাহাই লইয়া স্বামী স্ত্রীতে একটা বচসা সুরু হইয়া গেল—

খানিক আস্তে আস্তে বক্তব্য বলিয়া কনক চেঁচাইয়া বলিল,—আমার 'পরে আর দরদ দেখাতে হবে না, থামো।

চন্দর বলিয়াছিল, তাহারই অসুখের বার্ত্তা পাইয়া সে তাড়াতাড়ি দেখিতে আসিতেছিল—ইহাও যদি মানুষের বিধানে অপরাধ গণ্য হয়, তবে কল্কি-অবতারের আবির্ভাবের আর বেশী বিলম্ব নাই—

"তিনি এলেন বলে।" বলিয়া চন্দর অল্প অল্প হাসিতেছিল; কিন্তু কনকের মুখে ঐ কঠিন উক্তি শুনিয়া সে গম্ভীর হইয়া টুলের উপর বসিয়া রহিল—

কিন্তু বেশীক্ষণ বিমর্ষ হইয়া থাকিতে চন্দর পারে না—

মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া সে অমূল্যকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল,—মূল্য, নৌকায় বেড়াবি?

অমূল্য লাফাইয়া উঠিল,—বেড়াবো, বাবা।

—চুপ্। কা'ল, বুঝ্‌লি? তুই, আমি আর হেবোর বাবা কার্ত্তিক।

অমূল্য ব্যস্ত হইয়া বলিল,—মায়ের কাছে শুনে আসি?

চন্দর চোখ্ টিপিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইসারা করিল—যা।

কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল না—

পরামর্শ গোপনে হইলেও, কনকের কানে পিতা-পুত্রের গুপ্ত কথার যে ভগ্নাংশ প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতেই যথোচিত কাজ হইল—

ঘরের ভিতর হইতে কনক তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—আমার শুদনো দরকার? ছেলেকে নাচিয়ে তুলে ফুঁসলে' আবার আমার কাছে পাঠান' হচ্ছে! সেই মাতালটার সঙ্গে আমি ছেলেকে পাঠাবো না, তুমিও যেতে পাবে না।

চন্দর ধীরে সুস্থে বলিল, কার্ত্তিক মদ খায় বটে, কিন্তু মগজ তার ঠিক থাকে, বেগ্‌ড়ায় না।

মাতালের পক্ষ সমর্থন করায় কনক আরও জ্বলিয়া উঠিল এবং ব্রহ্মাণ্ডের মাতালের উদ্দেশ্যে এমন সব মর্ম্মান্তিক কটুবাক্য উচ্চারণ করিয়া গেল যে, নূতন নূতন কথা শুনিয়া চন্দর অবাক্ হইয়া গেল, এবং কার্ত্তিক সেখানে উপস্থিত থাকিলে পলাইবার পথ পাইত না, আর পলাইবার পূর্ব্বে শপথ করিত যে, জীবনে আর মদ স্পর্শ করিবে না।

*   *

চন্দর আহারে বসিল

এবং অমূল্যর কাঁদাকাটায় কনক তাহার নৌবিহারে সম্মতি দিল।

চন্দর বলিল, কাল শনিবার, সকাল সকাল ছুটি। আমি এসে তোকে নিয়ে যাব।…তারপর কনককে বলিল,—তুমি যেন কাল বেরিও না।

কনক বলিল, আমায় বেরুতেই হবে।

কিন্তু গা যে ভাল নেই!

—আছে, আছে। গতর পোষা হ'লে আমার চলে না। ও-ঘরের পিশি তু'দিন হ'ল খবর দিয়ে রেখেছে।

—আগে শরীর না আগে পয়সা?

কনক এই প্রশ্নের জবাব দেওয়াই দরকার মনে করিল না।

কার শরীর আগে তারপর পয়সা, এবং তা' কার নয় সেটি বিধাতা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন মানুষের ভাবিবার কথা তাহা নয়।

চন্দরের পাতের দিকে চাহিয়া কনক বলিল, আর তু'টি ভাত দি?

না। বলিয়া চন্দর উঠিয়া পড়িল।

অমূল্যর সর্ব্বশরীর আতঙ্কে শির্ শির্ করিতেছিল;

বাপের আঁচাইবার জলের ঘটিটা বহন করিয়া বাহিরে আসিতে আসিতে বলিল, বাবা, তুমি সাঁতার কাটবে?

কাটব' বই কি।

আমি?

উঁহুঁ। আমরা সাঁতার কাটব' মধ্যি গাঙে,—তোর মত পাঁচশোটা সেথা থই পায় না।

থই না পাওয়াটা তেমন বিঘ্ন বা ভয়ের কথা নয়; ভয়ের কথা উচ্চারণ করিল ওধার হইতে কনক—বলিল,—খবদ্দার, মূল্য; সাঁতারের বায়না নিলে যেতেই পাবে না বল্‌ছি। চুপ করে' নৌকয় বসে' থাক্‌বি। তোকে আমি চৌবাচ্চায় সাঁতার কাটাবো।

নদী আর চৌবাচ্চা!

অমূল্যর মুখ গোম্‌রা হইয়া গেল।

* * *

স্বামী-স্ত্রীতে কলহ না ঘটে এমন নয়; কিন্তু যথার্থ মনোমালিন্য, বিচ্ছেদের আশঙ্কা কোনোদিন জন্মে নাই। পুত্রটিকেই অবলম্বন করিয়া উভয়ের স্নেহরস মথিত হয়; তাহাকেই আশ্রয় করিয়া আনন্দ হয়, অনৈক্য ঘটে; কিন্তু সমস্ত বিরোধ আবার সন্তানের প্রতি প্রচণ্ড স্নেহের গভীরতার ভিতর তলাইয়া যায়—সংঘাতের কোনও চিহ্ন বাহিরে থাকে না। অজ্ঞতাবশতঃই হোক, কি ভগবান এবং অদৃষ্টের উপর অত্যধিক নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়াই হোক্‌, ইহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশী উর্দ্ধে উঠিতে জানে না, কেবল চাহে, কদাচ যেন পরনির্ভর হইতে না হয়।

প্রথম উপার্জ্জনের কড়ি যে-দিন অমূল্য তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি ভরিয়া আনিয়া মায়ের হাতে দিবে সেদিনকার সে আনন্দ আজই এই শ্রমিক-দম্পতির প্রাণের তট মাঝে মাঝে স্পর্শ করে···অমূল্যর প্রথম-উপার্জ্জনের সেই কড়ি বহু পূর্ব্বেই দেবতার পায়ে উৎসর্গিত হইয়া গেছে।

স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় শব্দ-বিলাসে উদ্দাম আর সাড়ম্বর নহে; ঘরে নিরালায় বসিয়া পারিবারিক সুখ একান্তভাবে দীর্ঘকাল উপভোগ করা ইহাদের মাথায় আসে না—দু'দণ্ড বসিয়া আলাপ করিবার বিষয় কিছু নাই।

* *

আহারান্তে চন্দর আড্ডা দিতে বাহির হইয়া গেল; অমূল্য একলম্ফে যাইয়া তাহাদের খেলিবার উঠানে পড়িল—এবং দেশ হইতে সদ্যঃ প্রত্যাগতা প্রতিবেশিনী সারদাকে ডাকিয়া কনক তাহাদের দেশের খবর লইতে পা ছড়াইয়া বসিল

এবং বসিয়া থাকিতে থাকিতে কখন কনক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সারদা তাহা জানে না।

* *

শনিবারে চন্দরকে সকাল আটটার মধ্যেই কাজে বাহির হইতে হয়।

কনক রাত থাকিতে উঠিয়া বাসি কাজ সারিয়া··· চন্দর উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া আসিতে আসিতেই খাবার প্রস্তুত হইয়া গেল। চন্দর খাইতে বসিল—

কনক তাহার সম্মুখে বসিয়া বলিল, এখন জলঝড়ের সময়; আকাশে মেঘ থাক্‌লে কিন্তু নৌকয় উঠো না।

চন্দর বলিল, আচ্ছা।

অমূল্য মায়ের কোল ঘেসিয়া বসিয়া ছিল; বলিল,—ঝড় হ'লে আরো মজা; নৌক কেমন নাচে—আমি দেখেছি। নয়, বাবা?

ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে নাচন্‌ দেখ্‌তেই মজা; যে নাচে সে বড় মজা পায় না। বলিয়া কনক ছেলের গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল।

চন্দর কাজে গেল—

যাইবার সময় তাহাদের বিদায় সম্ভাষণ কিছু হইল না—হওয়া দস্তুর নয়। প্রতিদিন সে এম্‌নি নিঃশব্দে বাহির হইয়া যায়—যাইতে যাইতে ফিরিয়া তাকায় না।

কনক কেবল বলিয়া দিল, দরজার মাথায় চাবি থাক্‌বে, দেখে নিও।

আজ একটার সময় ছুটি হইবে এই সুখকর চিন্তায় বিভোর হইয়া চন্দর চলিয়া গেল।

কনকের দেহ আজ একেবারেই ভাল নাই; রাত্রে মুখ বিস্বাদ হইয়া ছিল; মাথার দপ্‌দপানিটা আছেই দিনব্যাপী কাজের শুষ্ক কঠোরতা স্মরণ করিয়া সে যেন আরো অবসন্ন বোধ করিতে লাগিল রাত্রে ভাল

ঘুম হয় নাই গা ঘামিয়াছিল; কিন্তু অনিদ্রার যন্ত্রণাটা স্নান করিয়াও কাটিল না। অনিদ্রার যন্ত্রণা তাহা নয়।

* *

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে দুরন্ত রৌদ্রের উপর মেঘের ছায়া পড়িল। দূরে কোথাও বৃষ্টিপাত হইয়াছিল তাহারই ঠাণ্ডাটা বাতাসে কিছুক্ষণের জন্য ভাসিয়া আসিল

পৃথিবীর জীব একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে চাহিল কিন্তু সেখানে নারায়ণের নীলিমা আচ্ছাদিত করিয়া শিবের নেত্রাগ্নি জ্বলিতেছে।

* *

অমূল্য সারাক্ষণ ছটফট করিয়াছে—আজ পড়ায় তার মন বসে নাই।

ইসকুল হইতে বারটার সময়ই পলাইয়া আসিয়াও সে উদ্বেগে অস্থির হইয়া ঘর-বাহির করিতেছিল··· চন্দর ঘরে ফিরিতেই অমূল্য তাহার চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল···

জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, এত দেরী করে এলে যে?

কই দেরী হয়নি ত! বলিয়া চন্দর দরজা খুলিয়া কিছু খাইল, অমূল্যকেও খাওয়াইল।

* *

যখন তাহারা ঘাটে আসিয়া পৌছিল তখনো ঢের বেল আছে, তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই পিতা-পুত্রের মনে হইতে লাগিল, কার্ত্তিক বুঝি আসিল না।··· ঘন ঘন রাস্তার দিকে চাহিতে চাহিতে অসহিষ্ণু চন্দরের রসনায় যখন রাশিকৃত কটু ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তখন দেখা গেল, কার্ত্তিক আসিতেছে।

কার্ত্তিকের চলন আর চেহারা দেখিয়া অমূল্য অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করিতে পারিল না, কিন্তু চন্দর বুঝিয়া ভীত হইয়া উঠিল; বলিল, গিলে এসেছ! ডুবিয়ে না মারো।

কাঁচা ছেলে নই, বাবা। বলিয়া কার্ত্তিক একদিকে আঙ্গুল তুলিয়া বলিল, ঐ ডিঙ্গি।

মালিক?

মালিক এখন আমি। কিরে অমূল্য, দাঁড় টানতে পারবি ত?

পারবো। বলিয়া অমূল্য উভয়ের মাঝখানে লাফাইতে লাগিল।

কার্ত্তিক বলিল, না পারিস্ ত' হুঁ হুঁ। বলিয়া কিল দেখাইল।

* *

তিনটি আরোহী লইয়া ডিঙ্গি ভাসিয়া চলিল···

প্রাণপণে চীৎকার করা ছাড়া এই বিপুল আনন্দ প্রকাশের পন্থা তারা জানেনা, তিনজনের উল্লসিত তুমুল চীৎকারে নদীর দুই তীর উচ্চকিত হইয়া উঠিল··· আনন্দের আতিশয্যবশতঃ এক খোট্টা মাঝিকে ভাঙ্গা হিন্দীতে কিন্তু কুৎসিত ভাষায় গালি দিয়া কার্ত্তিক তার লগির খোঁচা খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল।

* *

নদীতীর ক্রমে নির্জ্জন আর শ্যামল হইয়া আসিল···

কার্ত্তিক বলিল,—চন্দর, নাইবিনা?

—নাইব। বলিয়া দাঁড় তুলিয়া গায়ের পিরাণ আর পরণের কাপড় ছাড়িয়া ফেলিয়াই একটা হে রে রে রে শব্দ করিয়া চন্দর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল···পড়িয়াই ডুবিয়া গেল···

ডিঙ্গি প্রবল বেগে দুলিতে লাগিল—

অমূল্য হাত তালি দিয়া চেঁচাইতে লাগিল···এবং চন্দর ভাসিয়া উঠিতেই সে বিস্ময়ে হঠাৎ অবাক হইয়া পরক্ষণেই দ্বিগুণ চীৎকার সুরু করিয়া দিল···

চন্দর ডিঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিল—

ভিতরের বহুদিনের সঞ্চিত উত্তাপ জলরাশি যেন চুষিয়া চুষিয়া রোমরন্ধ্র পথে বাহির করিয়া লইতেছে, জল ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করেনা—জলের ভিতর এমনি আরাম!

কার্ত্তিক হাঁকিয়া বলিল, চন্দর ওঠ্; এবার আমার পালা।

চন্দর উঠিল, কার্ত্তিক নামিল; কার্ত্তিক উঠিল, আবার চন্দর নামিল

চন্দর সাঁতরাইয়া দূরে গেলে কার্ত্তিক অমূল্যকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, নাইবি?

—নাইব। বলিয়াই একটানে কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া অমূল্য প্রস্তুত হইল।

কার্ত্তিক বলিল, আমি তোমার ডানা ধরে থাকি, তুই সাঁতার কাট্।

কার্ত্তিক ডিঙ্গির একেবারে ধারে উবু হইয়া বসিয়া ডানা ধরিয়া অমূল্যকে জলে নামাইয়া দিল—অমূল্য মহানন্দে কেবল পা ছুড়িয়া সাঁতার খেলিতে লাগিল।

হঠাৎ চন্দর একবার মুখ ফিরাইয়াই অমূল্যকে ঐ অবস্থায় জলে দেখিয়া ভয়ে ক্রোধে অস্থির হইয়া গেল—

চীৎকার করিয়া বলিল, তোল্ তোল্ ছেলেকে; খুনে নাকি তুই?

কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে বলিল, তুলছি, বাবা, তুলছি। ছেলের প্রাণে বুঝি সুখ চায়না?

চন্দর ডিঙ্গির দিকে অগ্রসর হইতে লগিল

অমূল্যর সাঁতার খেলা ভয়ে তখন বন্ধ হইয়া গেছে। তাহাকে আরো ভয় দেখাইয়া কার্ত্তিক বলিল, তোর বাবা রেগে' মেগে' এ দিকেই আসছে।

অমূল্য আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিল,—তোলো আমায় শীগগির—বাবা বকবে যে?

—তবে ওঠ্। বলিয়া কার্ত্তিক মাত্র দু'পায়ের আঙুল ক'টির উপর দেহের ভর রাখিয়া হেঁট হইয়া যে মুহূর্ত্তে অমূল্যকে টানিয়া তুলিতে যাইবে সেই মুহূর্ত্তেই অমূল্য নিজেই উঠিবার ব্যগ্রতায় শশব্যস্তে ডিঙ্গি ধরিতে হাত তুলিবার চেষ্টা করিতেই ডিঙ্গি দুলিয়া এবং সেই টানের বেগে উল্টাইয়া কার্ত্তিক জলে পড়িল···

পড়িলে ডুবিতেই হইবে—

অমূল্যকে লইয়াই সে ডুবিল—

কিন্তু ভাসিয়া যখন উঠিল তখন সে একা উঠিল—অমূল্য ছুটিয়া গেছে···

চন্দর দূর হইতে কার্ত্তিককে পড়িতে ও ডুবিতে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল···কার্ত্তিককে একা ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়া ত্রাসে তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিল—অবিশ্রান্ত সাঁতরাইয়া আগেই তার স্নায়ু পেশী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এখন স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়িয়া নিষ্ফল ব্যাকুলতায় কেবলি সে হাঁস্‌ফাস্ করিয়া মরিতে লাগিল

হঠাৎ কণ্ঠ খুলিয়া তাহার প্রবল উদ্যমের আর্ত্তস্বর উঠিল, হায়, হায়; করলি কি! ছেলেকে তোল্—ছেলেকে তোল্ * *

সেই বিপুল ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির মাঝে কার্ত্তিকের উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে এই বুদ্ধি খেলিল যে, ডিঙ্গিতে উঠিয়া অমূল্যকে তোলা ছাড়া উপায়ান্তর নাই

অমূল্য তখন ভাসিয়া চলিয়াছে—তার চুল দেখা যাইতেছে—জলের উপর চিক্‌চিক্ করিতেছে—

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বহন করিয়া সাঁতার কাটা কার্ত্তিকের পক্ষে অসম্ভব—নিরতিশয় আকুল হইয়া তাড়াতাড়ি ডিঙ্গি ধরিতেই তাহার হাতের আকর্ষণে হাল্কা ডিঙ্গি কাত হইয়া জল উঠিতে লাগিল···

সেই মুহূর্ত্তেই অমূল্যর মাথাটা জলের উপর ভাসিয়া উঠিল "বাবা" বলিয়া একবার সে ডাক দিল—অমূল্যর আর্ত্তকণ্ঠের সেই আহ্বানে কার্ত্তিকের গায়ে কাঁটা দিয়া, যেটুকু বিচারবুদ্ধি তাহার অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গেল—ডিঙ্গির অস্থির অবস্থাতেই সে উঠিতে গেল—ডিঙ্গি উল্টাইয়া উপুড় হইয়া গেল

কার্ত্তিক ডিঙ্গি ধরিয়া ভাসিয়া চলিল

অমূল্যর মাথাটা আরো দু'বার জলের উপর জাগিয়া উঠিল; চন্দরের তখন সকল ইন্দ্রিয় অসাড় হইয়া আসিতেছে—মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইতেছে না—

হাত দু'খানা উৎক্ষিপ্ত করিয়া অমূল্য শেষবার ডুবিল—চন্দরের চোখের সাম্‌নে। চন্দর চোখ বুজিল···—সে-ও শ্রান্তির চরম সীমায় আসিয়া নিশ্চেষ্ট অসাড় দেহে কেবল ভাসিতেছিল—অমূল্যর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহারও দেহ ধীরে ধীরে তলাইয়া গেল···

কার্ত্তিক একবার মুখ ফিরাইয়া কাহাকেও না দেখিয়া কি ভাবিয়া ডাকিল,—চন্দর? তাহার সে ডাক কোথাও পৌছিল না।

এত বড় কাণ্ডটা আরম্ভ হইয়া শেষ হইতে পাঁচ মিনিটও লাগিল না।

* *

কার্ত্তিক ডিঙ্গি ধরিয়া ভাসিয়া চলিল—

নিস্তরঙ্গ নদীর জল, নদীর নির্জ্জন তীর, নির্ম্মেঘ প্রসন্ন আকাশ, গোধূলির আলো, কার্ত্তিকের চোখের

সম্মুখে এমনই ভয়াবহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহার চেয়ে মৃত্যু ভাল

চলতি পান্সি একখানা কার্ত্তিককে উদ্ধার করিয়া ডাঙ্গায় নামাইয়া দিয়া গেল।

* *

কার্ত্তিক যখন ভিজা কাপড়েই চন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল রাত্রি তখন গভীর···

কার্ত্তিক নিঃশব্দে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল; দেখিল, চন্দ্রের ঘরে পাঁচ সাতটি স্ত্রী পুরুষ নিঃশব্দে বসিয়া আছে···লণ্ঠনের অত্যল্প আলোকেই তাহার লক্ষ্য হইল, খাটিয়ার উপর কনক শুইয়া আছে—তার শিয়রে বসিয়া সারদা তার মাথায় বরফ দিতেছে—

হঠাৎ গা ছমছম্ করিয়া কার্ত্তিকের সর্ব্বাঙ্গের রোঁয়া অকারণেই খাড়া হইয়া উঠিল···যেমন নিঃশব্দে সে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে আর পা টিপিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

আতঙ্ক

গল্প

শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
(শিক্ষা-সচিব কলিকাতা কর্পোরেশন)

তখন আমি সেই সবেমাত্র কলিকাতায় আসিয়া কলেজে পড়িতেছি। জন্ম স্থানটা এখানে হইলেও বাবার চাকুরীর কল্যাণে কলিকাতা ছাড়া বোধ হয় বাংলা দেশের বাকী জায়গাগুলিই আমার ভাল জানা ছিল। এই সময় একদিন আমার কেমিষ্ট্রীর যন্ত্রের ছবি আঁকিবার জন্য দুখানি ষ্টেন্সিল (ছাঁচ) (stencil) দরকার পড়িল। বাড়ীর কাছাকাছি দোকানে জানিলাম ও জিনিসটা খুচরা দোকানে পাওয়া যায় না। শুনিয়াছিলাম রাধা-বাজারে সব জিনিষ পাওয়া যায়। যেমনই মনে পড়া অমনই সন্ধ্যাবেলা সোজা রাধাবাজারে চলিলাম। রাস্তা ভাল চিনি না। কিন্তু সেটা স্বীকার করিবারও সাহস নাই। কাজেই বেশ খানিকটা ঘুরিয়া শেষে লাল-বাজারের থানার পাশে রাধাবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিলাম। এ দোকান ও দোকান ঘুরিতে ঘুরিতে সাড়ে আটটা হইয়া গেল কিন্তু যন্ত্র মিলিল না। যাহাকেই বলি সেই একটা ইস্পাতের উপর খোদাই করা কি একটা দেখায় আর আমি বলি না, না, আমার চাই কেমিষ্ট্রীর ষ্টেন্সিল। শেষ কালে নটার সময় এক দোকানদার আমার অবস্থা দেখিয়া বলিল মশায়, আপনি বোধ হয় জিনিসটার নাম ভুল করেচেন। ষ্টেন্সিল এই যা দেখাচ্ছি। তবে ও সব কেমিষ্ট্রীর জিনিস বটকেষ্ট পালের ওখানে ঠিক পাবেন। এ শুভ সংবাদে খুসী হইলেও একটা নূতন সমস্যা আসিল। বটকৃষ্ট পালের দোকানটা কোথায়? কাগজে ত বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি কত নম্বর একটা বনফিল্ড্ স্ লেন। সে আবার কোথা? কিন্তু এতটা ঘুরিয়া বৃথা ফিরিয়া যাওয়াটা মোটেই মনঃপূত বোধ হইতেছিল না। কাজেই আত্মগরিমা কিছু লাঘব করিয়া গন্তব্য স্থানের রাস্তার সন্ধান দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে লোকটা সৌভাগ্যক্রমে হাসিল না। বলিল, এই সোজা—চলে গিয়ে তারপর বাঁয়ে ঘুরে ডান দিকে বেশ অনেকগুলো বড় বড় দোকান, তারই কাছে।" আমিও তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বেশ জোরে সোজা চলিলাম। অনেকক্ষণ পরে যখন মনে হইল দোকানদারের কথা মত বেশ সোজা চলা হইয়াছে, তখন বড় বড় দোকানের মাঝে একটা গলিতে বাঁয়ে ঢুকিয়া পড়িলাম। একটু যাইয়া আবার নিজের উপরেই নির্ভর করিয়া বেশ ডাহিনে ঘুরিলাম। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই যখন বুঝিতে পারিলাম যে বড় দোকান দূরে থাকুক, এ অঞ্চলে দোকান জিনিসটারই বিশেষ অভাব, তখন খুব আরাম বোধ হইল না। কি করা যায় ভাবিয়া একটা মোড়ের গ্যাসের আলোর কাছে দাঁড়াইয়াছি এমন সময় দেখি একজন বেশ লম্বা ভদ্রলোক,—আমার চেয়ে ইঞ্চি দুই উঁচু। আমি নিজে ছকুট ছিলাম বলিয়া আমার একটা প্রায় বাতিক হইয়াছিল, আমার চেয়ে লম্বা লোক দেখিলেই বেশ ভাল করিয়া

লক্ষ্য করা। ভদ্রলোকটী আমার কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া কি মনে করিলেন জানি না; হঠাৎ দাঁড়াইলেন। আমিও বলিয়া ফেলিলাম মশায় বন্‌ফিল্ড্‌স্‌ লেন কোথায় বলতে পারেন কি? ভদ্রলোকটী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আসুন, আমিও সেদিকে যাচ্চি। আমি নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

কিছুদূর যাইয়া ভদ্রলোক একটা গলিতে ঢুকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বাড়ী কোথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি:? আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, কলকাতাতেই। ভদ্রলোক অবাক হইয়া বলিলেন, "বলেন কি? কল্‌কাতার ছেলে রাস্তা চেনেন না।" আমি যথাসম্ভব সপ্রতিভ ভাবে বলিলাম "অনেকটা সেই রকমই।" ভদ্রলোক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "এই রাস্তা না চিনে আপনি এত রাত্রে এ অঞ্চলে এসেছেন?" আমি হাসিয়া ফেলিলাম, "তাতে ক্ষতি কি?" গলিটা বেশ সরু ও অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। চারিপাশে শুধু ময়লার স্তূপ ও ছোট ছোট খোলার ঘর। ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "আপনার ভয় পাচ্ছে না? দিব্যি একজন অচেনা লোকের সঙ্গে টাকা কড়ি নিয়ে চলে এলেন?" গলিটা একেবারে অন্ধকার হইয়াছিল বলিলেও চলে। আমার একটু ভয় পাইল। ঈষৎ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলাম, "কিসের ভয় মশায়; পকেটে ত আছে আট আনা পয়সা। হাতে এই বাঁশের লাঠি। আর দেহটাও নেহাত দুর্ব্বল নয়।" জামার সোণার বোতামটা র‍্যাপারে যথাসম্ভব অগ্রান্তের ভাগে ঢাকা দিলাম। লোকটা উচ্চৈঃস্বরে একটা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উঠিল। ভয়ে আমার গা'টা ছম্‌ ছম্‌ করিতে লাগিল। অবজ্ঞার স্বরে ভদ্রলোকটী বলিলেন, "ভয় আপনার পাচ্চেই। তবে যদি না পায় তা বোধ হয় একলা নন্‌ বলে।" গলিটা সৌভাগ্য ক্রমে শেষ হইয়া গেল। আমি ও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভদ্রলোকটী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "তবে শুনুন, আমি নিজে একবার কি রকম ভয় পেয়েছিলুম।"

তখন আমি এক বড় উকীলের মুহুরী। সেবার শীতকালে কি একটা কাজে খুলনা অঞ্চলে একটা গাঁ'য়ে যেতে হয়েছিল। ষ্টেশন থেকে গ্রাম প্রায় ক্রোশ দু'য়েক তফাতে! মক্কেল এক ব্রাহ্মণ। যাবার সময় হেঁটে যেতে হ'ল দেখে, আমি রাত্তিরের আগে কাজ সারবার ঢের চেষ্টা কল্লুম; কিন্তু কোনো মতেই সন্ধ্যার আগে করে ওঠা গেল না। অথচ আপিসে তার পর দিন ফির্ত্তেই হ'বে। তখুনি বেরোতে যাই কিন্তু ব্রাহ্মণ কোনো মতেই ছাড়লেন না। বল্লেন অন্ততঃ কিঞ্চিৎ আহার করে যান। আমিও ভেবে দেখলুম গাড়ী বারটার সময়; তাড়া হুড়ো করে খালি পেটে ছুটে গিয়ে দুঘণ্টা বসে থেকে কিছু লাভ নেই। কাজেই আর আপত্তি কল্লুম না। খাওয়াটা বড় চমৎকার হয়েছিল; গরম লুচি, উত্তম রান্না আর শেষে এমনই চমৎকার পাতলা খেজুর গুড় দিলে মশায়——আহা—জিভে এখনও যেন সে তারটা লেগে রয়েছে। খেয়ে ত দুতিন বার গুড়ের খুব সুখ্যাতি কল্লুম। ফলে মুখ হাত ধুয়ে এসে দেখি ব্রাহ্মণ এক বিপরীত নাগরী নিয়ে এসে হাজির। মনে ভারী খুসী হলেও মুখে বল্লুম ও কি মশায়, করেন কি। ব্রাহ্মণ হাসি মুখে বল্লেন আজ্ঞে না, এটা আমারই গাছের। আপনার বড় ভাল লেগেছে তাই গরীবের এ সামান্য জিনিষটা যদি আপনি গ্রহণ করেন"—। আমি নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে আর একবার আপত্তি কল্লুম। কিন্তু মুস্কিল হ'ল সেটা বয়ে নিয়ে আসবার লোকের। পাড়াগাঁয়ে অত রাত্রে মুটে মেলে কোথা হ'তে? খানিকক্ষণ একে তাকে সাধ্য সাধনা করে ব্রাহ্মণ ত শেষে হতাশ হয়ে ফিরে এসে বল্লেন। নাঃ মশাই কেউ উঠতে চাইল না। আপনি আজ থেকে যান না?" একে এই করে দেরী হয়ে পড়ছিল, তার ওপর অতটা আশার পর অমন গুড়টা একেবারে হাতছাড়া হয়ে গেল শুনে মেজাজটা একেবারেই বিগ্‌ড়ে গেল। আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম্‌ না মশাই আমার কাজ কর্ম্ম আছে। ব্রাহ্মণ আর একবার মৃদু স্বরে বল্লেন জিনিসটাত আমি আর ব্যবহার কর্ত্তে

পার্ব্ব না। ওটা যে আপনাকে দিয়েছি। কথাটায় কোনও দোষ না থাকলেও রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল। মুখ ভেঙিয়ে বল্লুম "সে আপনার দুর্ভাগ্য।" অপমানে, অপ্রতিভ ব্রাহ্মণের চোখ ছল ছল কর্ত্তে লাগল; তিনি আর জেদ কর্ল্লেন না। আমিও আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল; আহা কি চমৎকার গুড়টা! আর এক নাগরী। ব্রাহ্মণের ওপর আমার রাগ হ'ল। তারই বা কোন আক্কেল; ভদ্রলোককে এত আশা দিয়ে, শেষে এমনি করে নিরাশ করা। সেই বা কোন নাগরীটা কাঁধে করে এই পথটুকু দিয়ে গেল। পাড়াগেঁয়ে বামুন লাঙ্গল ধর্ত্তে পারে আর অতিথির মনের খেদ নিবারণ কর্ত্তে এটুকু পারে না?" ভদ্রলোকের গুড়ের দুঃখ শুনিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। তিনিও আমার সহিত যোগ দিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

"এমনি ভেবে ভেবে বোধ হয় অর্দ্ধেকেরও ওপর রাস্তা চলে এসেছি এমন সময় দেখি বেশ মেঘ হ'য়ে এসেছে। বড় মুস্কিল ত; চাঁদনী রাত দেখে বেরুলুম আর কোথা হতে এ আপদ্ জুট্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেশ অন্ধকার হ'য়ে এল। রাস্তায় আর জোরে হাঁটা চল্‌ল না। রাস্তা ত ভারী; ধান জমীর মাঝের চওড়া আল বল্লেও চলে। সাবধানে না গেলেই হোঁচট্। তার ওপর হঠাৎ মনে হ'ল, এ অঞ্চলে অল্প স্বল্প বাঘের ভয় আছে। যতক্ষণ আলো ছিল, কথাটা যে মনে থাকে নি তা নয়; তবে তখন চারিদিক দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ একটা কিছু হয়ে পড়বে না এই ভরসা ছিল। কিন্তু আলো যেতেই যেমনি সেটা অনিশ্চিত হ'য়ে পড়্‌ল আর অমনি কোথা হ'তে যত রাজ্যের আতঙ্ক এসে জুট্‌ল। যতই ভয়টা ঝেড়ে ফেল্‌তে যাই ততই সেটা এসে চেপে ধরে। একবার পাশের আখের ক্ষেতে কি একটা জোরে ধড়মড় করে উঠ্‌ল। আমি একেবারে দুহাত লাফিয়ে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লুম। তারপর ঝাপসা আলোতে দেখি একটা শেয়াল পালাচ্ছে। নিজের ভয়ে নিজেই হেসে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে বেশ খানিকটা চলেছি, এমন সময় একটা আওয়াজ শুনে হঠাৎ আমার গায়ের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল। দূরে স্পষ্ট শুনতে পেলুম—থপ্ থপ্ থপ থপ্। কি একটা ভারি জানোয়ার যেন ছুটতে ছুটতে আসছে। ভয়ে আমার পায়ের বল চলে গেল। দৌড়ুতে সাহসও হ'ল না। জানোয়ারটা যদি আমায় না দেখে থাকে তাহ'লে ছুট্‌লে নিশ্চয়ই ধরা পড়ব। যথা সম্ভব পা চালিয়ে হাঁটতে আরম্ভ কর্ল্লুম। বোধ হ'ল জানোয়ারটাও বুঝতে পেরেছে; জোরে জোরে আসছে। দেখতে দেখতে আওয়াজটা কাছে এসে পড়ল। নিঝুম রাত্তিরে স্পষ্ট তার ঘড় ঘড়ে ভারী ভারী হাঁপের আওয়াজটা কানে এল। পা দুটো কেঁপে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে আর একবার চেষ্টা কর্ল্লুম পালাতে। তখন আর ছোট্‌বার সামর্থ্য ছিল না। একেবারে সোজা ধানের ক্ষেতে নেমে পড়লুম। পিছনে তাকিয়ে দেখ্‌তে সাহস হ'ল না। একবার উঁকি দিয়ে যা দেখেছিলুম, তাতেই প্রাণ উড়ে গেছল। কি বিপরীত আকার, ঝল ঝলে এতখানি, ছহাত লম্বা। খড়্‌খড়্ আওয়াজ হবার ভয়ে আর নড়্‌লুম না; বসে পড়লুম। ফের সেই থপ্ থপ্ থপ্ থপ্ আওয়াজ। একটু পরেই এগিয়ে এসে ঠিক আমার পাশের রাস্তাতেই এল। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আওয়াজটা সেখানে এসেই থেমে গেল; শুধু ভারী ভারী নিঃশ্বাসটা কানে আস্‌তে থাকল। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ কর্ত্তে লাগ্‌ল, দেহটা অবশ হ'য়ে গেল। কিন্তু কি একটা শক্তি যেন আমার চোখ দুটো টেনে সেই অন্ধকারের মাঝের অজানা বিকট মূর্ত্তিটার দিকে খাড়া করে দিলে। ভয়ে আমার দম বন্ধ হ'য়ে এল; জানোয়ারটা হঠাৎ একটা আওয়াজ করে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত মাথাটা যেন আলাদা হয়ে আমার দিকে ছুটে এল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভদ্রলোক হঠাৎ থামিলেন। আমি আগ্রহের সহিত তাঁহার দিকে চাহিলাম। ঈষৎ হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন "তারপর শুনতে পেলুম, সেই ব্রাহ্মণটী মশাই চেঁচিয়ে বলচেন, 'মশায়, এত রাত্তিরে ক্ষেতে নেমে করেন কি? সাপে খাবে যে!"

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৪

রতিনাথের জরুরী পত্র পাইয়া শশাঙ্ক আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল কেন না রতিনাথ তাহাকে কোনদিনই স্বহস্তে পত্র দেন নাই। একে তিনি স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার উপর জরুরী তাগাদা, তাহার আসা চাই-ই, অন্যথা যেন কিছুতেই না হয়, অন্ততঃপক্ষে একবেলার জন্যও তাহাকে আসিতে হইবে।

শশাঙ্ক পত্রপাঠ রওনা হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহারও কৌতুহল জাগিয়াছিল বড় কম নয়।

কিন্তু কলিকাতার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া সে যে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

বৃদ্ধ রতিনাথের এমনধারা পরিবর্ত্তনের আশা সে কোনদিন স্বপ্নেও করে নাই। যে রবিবার তিনি বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও এক পা বাহির হইতেন না, আজকাল সেই রবিবার দিনটাও তিনি সারাদিন বাহিরে থাকেন, সন্ধ্যার পরে নিঃশব্দে বাড়ী ফেরেন, নিঃশব্দে চলাফেরা করেন, বাড়ীর কাহারও সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই এরূপ ভাব দেখান। শশাঙ্ক নির্ব্বাক বিস্ময়ে কেবল চাহিয়াই রহিল। মাত্র চার মাস পূর্ব্বে সে যে সচ্ছন্দচিত্ত হাসিভরা মুখ লোকটীকে দেখিয়া গিয়াছিল, এত শীঘ্র তাহার এরূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হইল, তাহাই যেন সে ভাবিয়া ঠিক পাইতেছিল না।

শশাঙ্ক অন্য বারের মত এ বারেও আসিয়াই বাহিরের ঘরে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া যখন প্রণাম করিয়াছিল, তখন তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আশীর্ব্বাদ করিতেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, অনেক্ষণ পরে বৃদ্ধ হাসিয়া তাহার কুশলবার্ত্তা লইয়াছিলেন।

ভিতরে আসিয়া মনীষার পানে তাকাইয়া সে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া মনীষার মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। মনে হইল তাহার মুখের উপর কে যেন কালো পর্দ্দা টানিয়া দিল; মনে হইল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখের পাতা দুইটী চকচক করিয়া উঠিল, তাহার মুখখানা সুদ্ধ বিকৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল, সেই মুখেই হাসির রেখা ফুটাইয়া সে নত হইয়া শশাঙ্কর পায়ের ধূলা লইয়াছিল।

শশাঙ্ক সারাদিন রহিল। রতিনাথ ও সে যখন আহার করিতে বসিল, তখন মনীষা একবার মাত্র আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরই ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

শশাঙ্ক কোনকথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না কিন্তু ইহাদের ভাব দেখিয়া সে বিস্মিত হইতেছিল বড় কম নয়। সে বুঝিতেছিল ভিতরে কোন রকম গোল বাধিয়াছে যাহাতে রতিনাথ মনীষাকে অনেকটা দূরে রাখিয়াছেন এবং মনীষাও ঠিক ততখানি ব্যবধান রাখিয়া চলিয়াছে। সংসার ছাড়া জীব শশাঙ্কের মনেও বেশ একটু খটকা লাগিয়াছিল।

বৈকালের দিকে মনীষাকে নিকটে পাইয়া শশাঙ্ক সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি মনী, এবার তোমাদের বাপ মেয়ের মধ্যে এরকম ভাব দেখছি কেন, মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "কি রকম!" শশাঙ্ক চিন্তিত মুখে বলিল" তুমি আর তোমার বাবা

দুজনেই কেন দুজনকে এড়িয়ে চলতে চাচ্ছো আমি বুঝতে পারছি নে—হঠাৎ আমায় এ রকম ভাবে পত্র দিয়ে আনবারই বা কারণ কি, এসেই বা এ রকম দেখছি কেন?

অন্যমনস্ক ভাবে মনীষা বলিল, "এখন বলবার তো সময় নেই দাদা, হাতে ঢের কাজ আছে। সন্ধ্যের ও দিকে সময় পাব এখন তখন সব বলব।

তাড়াতাড়ি সে নীচে চলিয়া গেল। রতিনাথের বাড়ী আসার সময় হইয়াছিল, তাঁহার জলখাবার মনীষা নিজের হাতে প্রস্তুত করিত। এই সব সাংসারিক গোলযোগে আজ কয়েক দিন হইতে সে আশ্রমে যাইতে পারে নাই, সেখানকার কিছুই দেখিতে পারে নাই।

প্রতিদিন রতিনাথ ঠিক পাঁচটার সময় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, শশাঙ্ক কোনদিনই এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পায় নাই। আজ সে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল সন্ধ্যারও খানিক পরে রতিনাথ বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন।

শশাঙ্ক উপরে ছিল, নীচে রতিনাথের তর্জ্জন-গর্জ্জন ও প্রহারের শব্দ শুনিয়া ত্রস্তপদে নীচে নামিতে দেখিতে পাইল বহু পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণ আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া, তাহার সম্মুখে রুদ্র মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া, তখনও তিনি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছেন। দরজার উপরে দাঁড়াইয়া মনীষা, দুইহাতে সে দরজা চাপিয়া ধরিয়াছে, তাহার সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মুখখানা শবের মতই বিবর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে।

"কি হয়েছে মনীষা—?"

শশাঙ্কের প্রশ্ন শুনিয়াই সে চমকাইয়া মুখ ফিরাইল—সেই মুহূর্ত্তে দরজা ছাড়িয়া দিয়া চাপা সুরে সে কেবল উত্তর দিল, "না, কিছুই হয়নি।"

পাশ কাটাইয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল, আর একবারও পিছন ফিরিয়া চাহিল না

শশাঙ্ক দেখিল অকস্মাৎ রতিনাথের আরক্ত মুখখানা সাদা হইয়া গেল, তিনি হাতের বেত মাটীতে ফেলিয়া সমীপস্থ কৌচের উপর বসিয়া পড়িল। কৃষ্ণ অবনত মুখে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপারটা কি তাহা শশাঙ্ক বুঝিতে পারিল না। এ বাড়ীতে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে সে কখনও দেখে নাই। বাড়ীতে অনেকগুলি দাস-দাসী আছে, রতিনাথ কোনদিন কাহাকেও একটা কড়া কথা পর্য্যন্ত বলেন নাই; চিরদিন দাস-দাসী; আত্মীয় স্বজন, এমনকি যাহারা প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে তাহাদের পর্য্যন্ত আপনার মত ব্যবহার করিয়াছেন।

বিশেষ কৃষ্ণ রতিনাথের দক্ষিণ হস্ত। রতিনাথ কোনদিনই সংসারের কোন কিছু দেখেন নাই, কোনও বিষয়ে কোনদিন ভাবেন নাই, কৃষ্ণের উপরেই সব ভার অর্পিত ছিল, কৃষ্ণও নিজের বাড়ীর মত এই বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া করিত, অপরকে দিয়া করাইত। আজ হঠাৎ তাহার কার্য্যে রতিনাথ এমন কি ত্রুটী পাইলেন যাহার জন্য তাহাকে প্রহার সহ্য করিতে হইল তাহা শশাঙ্ক ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

রতিনাথ চুপচাপ বসিয়া রহিলেন দেখিয়া সে আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিয়া মুখে একটু কড়া হাসি টানিয়া আনিয়া রতিনাথ বলিলেন, "চলে যাচ্ছ কেন শশাঙ্ক,—এসো।"

শশাঙ্ক ফিরিল।

পার্শ্ববর্ত্তী একখানা চেয়ারে বসিয়া সে বলিল, "আজ আপনার ফিরতে এত রাত হল যে?"

রতিনাথ বলিলেন, "অফিসে অনেক কাজ পড়েছে, কিছুতেই আর সময় করে উঠতে পারিনে। সাহেব আবার হুকুম দিয়েছে এবার অফিস সিমলেয় উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তা হলে আমার দ্বারা আর কাজ করা পোষাবে না। যতদিন সামর্থ্য ছিল দৌড়াদৌড়ি করেছি, এখন এই বুড়ো বয়সে একবার কলকাতা; একবার সিমলে ছুটোছুটি করা পোষাবে না।"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "মনে করছি এবার কাজ ছেড়ে দেব। আর কেন বাপু, চির জন্মই ভূতের মত খাটছি, গাধার ভার আর বইতে পারি নে, যা,

করেছি তাই যথেষ্ট, এবার বাড়ী-ঘর সব বিক্রি করে দিয়ে কাশীধামে গুরুদেবের কাছে যাব ইচ্ছে আছে।"

শশাঙ্ক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "একেবারে চলে যাবেন—মানে বুঝতে পারলুম না।"

যেন একটু উত্তেজিতভাবে রতিনাথ বলিলেন, "তা নয়তো কি, এখানে আমার আছে কে যার জন্যে বাড়ী-ঘর রাখব, টাকাকড়ি রাখব? ভোগ করবার লোক থাকলেই মানুষ রাখে, যার ভোগ করার লোক নেই তার আর এ সব রাখা কেন?"

সন্তর্পণে প্রহারিত কৃষ্ণ একখানি ডিসে কতকগুলি কাটা ফল ও মিষ্টান্ন, এবং গ্লাসে করিয়া সরবৎ আনিয়া গোল টেবিলটার উপর রাখিয়া তেমনিই সন্তর্পণে সরিয়া গেল।

আজ মনীষা নিজের হাতে খাবার লইয়া আসিল না, তাহা লক্ষ্য করিয়া শশাঙ্ক নিজেই যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

রতিনাথ অবহেলার চোখে জল-খাবারের পানে একবার তাকাইলেন মাত্র, পূর্ব্ব কথার জের টানিয়া তিনি বলিয়া চলিলেন, "একা মানুষ, কোথায় কখন কি ভাবে থাকি তার ঠিক নেই, হয় তো কোথায় কোনদিন মরে যাব কেউ সে খবরটাও পাবে না। সেই জন্যেই মনে করেছি বেঁচে থাকতে কিছু দান করে যাই, তবু পরকালের কাজটা তো হবে।"

মহোৎসাহে তিনি হিসাব দিতে বসিলেন কি কি কাজে তিনি কত করিয়া টাকা দিবেন। জল খাবার পড়িয়া রহিল, সেদিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

কৃষ্ণ দরজার পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, আবার আস্তে আস্তে প্রবেশ করিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "জলখাবারটা খেয়ে নিয়ে কথা-বার্ত্তা বলুন বাবু, সেই সকালে কখন দুটো খেয়ে গেছেন—"

রতিনাথ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, "নেরো,—আবার তুই এসেছিস বেটা, কে তোকে এখানে আসতে হুকুম দিয়েছে? যে বাড়ীর ঝি-চাকর কেউ মনিবের কথা রাখে না সেই বাড়ীতে—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন। কৃষ্ণ শশাঙ্কর পানে তাকাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমার কোনও দোষ নেই দাদাবাবু, আমি তখনি বাবুর চিঠি নিয়ে ভবানীপুর যাচ্ছিলুম কিন্তু বউমা আমায় নিষেধ করলেন।"

"ফের কথা বলছিস্ কেষ্টা? সত্যি করে বল দেখি কে তোর মনিব, আমি না তোর বউমা যে তুই আমার কথা না শুনে—"

ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি সোজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যাপার আবার গুরুতর হয় দেখিয়া শশাঙ্ক তাঁহার হাত ধরিল, সান্ত্বনার সুরে বলিল, "মনিব আপনিই তাতে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ও তো বলছে যে আপনার হুকুম পালন করতে যাচ্ছিল কিন্তু মনীই ওকে যেতে দেয় নি।"

পরিত্যক্ত আসনে পুনরায় বসিয়া পড়িয়া রতিনাথ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন, "দেখেছ একবার তারও আক্কেলটা? আজকাল বউমার স্পর্দ্ধা কতখানি বেড়েছে আমি তাই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। আমার কথার ওপর কথা বলা, আমার হুকুমের ওপর হুকুম চালানো, আমি যে একটা মানুষ বউমা তা আর ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না। আমি বরাবরই জানি, পরের মেয়েকে বেশী প্রশ্রয় দিলে ঠিক এই রকমই হয়। হতো যদি আমার নিজের মেয়ে, তার পরে আমার জোর খাটত, কিন্তু পরের মেয়ের 'পর জোর কিসের বল দেখি? মিথ্যে পরকে নিজের বলে মনে করি, মনকে মিথ্যেই ভুলিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু আসলে কেউ আমার নয়। তাই তো বলি—হতো আমার নিজের মেয়ে, জোর করে এই বুকের মধ্যে তাকে চেপে রাখতুম, কারও ক্ষমতা হতো এই বুড়োর বুক হতে তাকে ছিনিয়ে নেবার?"

শেষের দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আচ্ছা, একটু বসো, আমি চট করে আসছি।"

তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

২৫

শুক্ল দশমীর রাত্রি। ত্রিতলের প্রকাণ্ড বড় খোলা ছাদটা অনাবিল শুভ্র চাঁদের আলোয় ভরিয়া গিয়াছে।

ফাগুন মাসের মাঝামাঝি, শীত একেবারেই ছিল না। ঝর ঝর করিয়া বসন্ত বাতাস বহিয়া যাইতেছে। বাড়ীর সামনে কয়েকটা আমগাছ মুকুলিত হইয়াছিল, স্ফুট মুকুলের সুমধুর গন্ধ ত্রিতলের খোলা ছাদেও ভাসিয়া আসিতেছিল।

রাত্রি বাড়িয়া উঠিতেছিল, পথে জন-সমাগমও অনেক কমিয়া আসিতেছিল। কদাচিৎ দুই একখানা গমনশীল মোটরের শব্দ শুনা যাইতেছিল।

শশাঙ্ক অন্যমনস্ক ভাবে ছাদে পদচারণা করিতেছিল, নীচে সকলেই তখন শুইয়া পড়িয়াছে।

শশাঙ্ক ঠিক করিতেছিল সকাল হইলেই সে এ বাড়ী ত্যাগ করিবে, এ রকম অশান্তির মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহার প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠিতে ছিল। মাথার উপর নীলকাশে সুন্দর চাঁদের মধুর হাসি, চারিদিককার জ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতির সুন্দর মনোমোহন দৃশ্য, মুকুলের সুমিষ্ট গন্ধ অন্যদিন হইলে হয় তো তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিত, আজ আকৃষ্ট করিতে পারিল না।

হঠাৎ এক সময়ে পিছনে কাহার পদশব্দ পাইয়া সে দাঁড়াইল, ফিরিয়া দেখিল মনীষা।

চাঁদ তখন পশ্চিমের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার আলো সরল ভাবেই আসিয়া মনীষার মুখের উপর পড়িয়াছিল, সে আলোতে শশাঙ্ক দেখিল সন্ধ্যার সময় মনীষার মুখ যেমন বিবর্ণ মলিন হইয়াছিল, এখনও ঠিক তেমনই রহিয়াছে।

মনীষা ভাবে নাই শশাঙ্ক এখনও বিনিদ্র ভাবে ছাদে পদচারণা করিতেছে, তাই সে প্রথমটায় সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইল, থাকিবে কি চলিয়া যাইবে তাহাই ঠিক করিতে তাহার কয়েক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইয়া গেল।

শশাঙ্ক বলিল, "ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন মনী, এদিকে এসো, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।"

তাহার স্বর স্নিগ্ধ-কোমল।

মনের সকল দ্বিধা-সঙ্কোচ দূর করিয়া মনীষা অগ্রসর হইয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা আছে দাদা।"

শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে তোমারও কথা আছে? ভাল—বসি, তারপর শোনা যাক তুমি কি বলবে, তার পরেই না হয় আমার কথাটা বলব।"

ছাদের উপর কয়েকখানা বেঞ্চ ছিল, শশাঙ্ক তাহারই একখানাতে বসিয়া পড়িল। মনীষা বসিল না, দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিল, "তোমার কি কথা আগে শুনি। বুঝেছি, তুমি আজকের এই সন্ধ্যাবেলার কথাই বলবে তো?"

সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

শশাঙ্ক বলিল, "কতকটা তাই বটে। ওঁর সঙ্গে তোমার হঠাৎ এ রকম মনান্তর হল কেন? আজ ওঁর মুখে তোমার সম্বন্ধে যে রকম কথা শুনলুম তাতে—"

বাধা দিয়া ধীর কণ্ঠে মনীষা বলিল, "আমি শুনেছি।"

তাহার কণ্ঠস্বর এরূপ বিসদৃশ বোধ হইল যাহা শুনিয়া শশাঙ্ক চমকাইয়া তাহার পানে চাহিল।

বিকৃতকণ্ঠে মনীষা বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি উত্তর দাও দেখি দাদা, যে মেয়েকে দান করা গেছে তারপর বাপ মায়ের কোন সর্ত্ত থাকে কি?"

শশাঙ্ক মাথা নাড়িল, "তাও কি থাকতে পারে? যা দান করা যায় তার 'পরে আর অধিকার কি, সে তো তখন পরের হয়ে গেছে।"

উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া মনীষা বলিল, "তা হলে বল বিধবার 'পরে কারও অধিকার থাকতে পারে কি? যদি আমার স্বামী বেঁচে থাকতেন, তাঁর অধীন হয়ে আমায় থাকতেই হতো, তাঁর কথামত আমায় চলতেই হতো। যখন তিনিই বর্ত্তমান নেই তখন আমি কি স্বাধীন নই, আমার স্বাধীন মতটা কি—?"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল,—"ওই,—ওইখানেই তো ভুল করছ মনীষা, আর সে ভুলটা বড় কম নয় জেনো। স্বামী নেই বলেই যে তুমি স্বাধীন হয়েছ তা নয়, বরং রক্ষকহীন হয়ে পড়ায় রক্ষকস্বরূপ অন্য অভিভাবকের অধীনে তোমায় থাকতে হবে। তোমার স্বাধীন মত থাকতে পারে, কিন্তু অভিভাবকের মত তোমায় চাইতেই হবে।"

ম্লান হইয়া গিয়া মনীষা বলিল, "ওঁরা যদি আমার ভালর জন্যে কিছু করেন অথচ আমি জানতে পারি তা ভাল নয়, তবু মেনে নেব তা ভাল?"

শশাঙ্ক উত্তর দিল, "মানতেই হবে।"

মনীষা মাথা নত করিয়া রহিল, আর একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

শশাঙ্ক বলিল, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলুম, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। তোমাদের দু জনকে এবার আমি কিছুতেই সহজভাবে ধরতে পারছিনে, তোমরা যেন সকলেই এবার দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছ। তোমার শুধু মুখের পরিবর্ত্তন নয়, মনের পর্য্যন্ত অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। আমি লক্ষ্য করছি তুমি এমন একটা নূতন কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছ যা কোনদিন তুমি কল্পনাতেও আননি, আর মনের ভাবনাটাই ঠিক তোমার মুখের পরে ফুটে উঠেছে। বাস্তবিক বলছি মনীষা, তোমার মুখের পানে আমি আগে যে রকম নির্ভীক ভাবে তাকাতে পারতুম আজ আর তা পারছি নে, কেননা আগে তোমার মুখে যে পবিত্র দেবীভাব ফুটে উঠতে দেখেছি, আজ আর তা দেখছিনে, তোমার চোখের দৃষ্টি পর্য্যন্ত যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এ কি সত্য মনীষা, সত্যই কি তুমি তোমার আসন হতে নেমে এসেছ, আবার পৃথিবীর ধূলোতেই কি তোমার আসন তুমি ঠিক করে নিয়েছ? কিন্তু আমি যে ভাবতেও ভয় পাচ্ছি, আমার অন্তর ঘৃণায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে। মনীষা তুমি জোর করে বল—তোমার পরিবর্ত্তন হয় নি, আমারই চোখের দোষ আমারই মনে গলদ জন্মেছে। জনশ্রুতি আমার কানে যে কথা এনে দিয়েছে তুমি একবার জোর করে বল সে মিথ্যা—একেবারেই মিথ্যা; বল—তুমি যা আজ তাই আছ, তুমি এতটুকু বদলাওনি, বল মনীষা—জোর করে একবার বল।"

মনীষা মুখ ফিরাইল, নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি শশাঙ্কের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বেদনাভরা কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু সে সত্য বলবার অধিকার আমি হারিয়েছি, আমার সত্যই পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমি আবার—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে বলিল, "ওদের ইচ্ছাই পূরণ হোক, আমার মা বাপ আমার শ্বশুর যাঁরা আমার অভিভাবক, তাঁরা আমায় নিয়ে যা খুসি করুন আমার তাতে একটা কথা বলবারই বা অধিকার কোথায়? আমি যদি আজ ওঁদের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াই তোমরাই না আমায় নিন্দা করবে—তোমরাই না আমায়—"

হঠাৎ সে চুপ করিয়া গেল,

শশাঙ্ক স্তম্ভিত হইয়া মনীষার পানে তাকাইয়াছিল, অনেকক্ষণ পরে মৃদু কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ঠিক—"

মনীষা চোখ মুছিয়া ফেলিল, "ঠিক, কিন্তু কাকে এই ধিক্কার দেবে,—আমার মা বাপকে? কিন্তু তাঁদেরই বা দোষ কি? কিসে তাঁরা ধিক্কারের পাত্র হবেন? সন্তানের পরে মা বাপের অধিকার নাকি চিরকালই থাকে, তাঁরা চিরকাল সন্তানের মঙ্গল কামনাই করে থাকেন; সে হিসাবে কেন তাঁরা আমার কষ্ট দেখবেন, কেন আমায় সুখী করবার চেষ্টা করবেন না? তারপর শ্বশুর,—তিনিও তাঁদের দ্বারা উত্যক্ত হয়েছেন বড় কম নয়, তিনিও তাঁদের মতে মত দিয়ে আমার বলিদানের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, কাজেই আমিও সকলকে খুসি রাখতে, বাধ্য মেয়ে হয়ে সকলের

'পরে—নিজেকে খুসী করতে—নারীর আকাঙ্ক্ষিত মা হতে রাজি হয়েছি।"

শশাঙ্ক দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

"পাত্র নির্ব্বাচিত হয়েছে? সে পাত্রটী কে শুনতে পাব কি?"

মনীষা মুখ ফিরাইল,—"সে পাত্র তুমি আর কেউ নয়। সেই জন্যেই আমার বাপ-মা আর শ্বশুর তোমায় এখানে আনিয়েছেন।"

শশাঙ্ক নড়িল না, একটা শব্দও তাহার মুখে ফুটিল না।

দশমীর চাঁদ একেবারে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। অন্ধকার পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল।

শশাঙ্ক মুখ তুলিল, "কাল একাদশী—নয়?"

মনীষা উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল, "একাদশী কর?"

মনীষা ক্লিষ্ট হাসিল, বলিল, "কি হবে একাদশী করে নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে? গত বার হতে করি নি, ব্রতনষ্ট করেছি।"

"তুমি নষ্ট করেছ, আমি নষ্ট করি নি, আমি একাদশী করি মনীষা, আর সে একাদশী ঠিক তোমাদেরই মত—এতটুকু জলবিন্দু মুখে দেইনে।"

শশাঙ্ক উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনীষা অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল, তাহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে শুধু টপ টপ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

উত্তেজনাবশে খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া শশাঙ্ক মনীষার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, স্থির কণ্ঠে বলিল, "জীবনভোর তাহলে মিথ্যেই দেহকে কষ্ট দিয়ে এসেছ মনীষা, কিছুই হল না, না এদিক না ওদিক? এতদিন ত্যাগের পথ বেয়ে এসে, নিজের সবটুকু নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে আজ আবার সব রিক্ততাটুকু ভরিয়ে নিতে চাও, আজ ভোগ করে নিতে চাও? সত্যিই তবে তুমিও নিজেকে আমার হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত হয়ে আছ মনীষা?"

মনীষা উত্তর দিতে পারিল না, নীরবে কেবল চোখ মুছিতে লাগিল।

"তবে দাও, আমি তোমার ওই হাত দুখানা গ্রহণ করছি। কিন্তু ওই তোমার শেষ দেওয়া, ওই আমার শেষ পাওয়া, ওর বেশী আর কিছু নয়—আর কিছু আমি চাই নে। আমার আদর্শ,—তোমায় আমি এমন করে ভেঙ্গে চূরে মাটি করতে পারব না। যদিও তোমায় আমি মাটি দিয়ে গড়েছি, তবু তোমায় আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তি দিয়েছি, রং ফলিয়েছি, আমার আশা বাসনা দিয়ে তোমায় সাজিয়েছি। তিলে তিলে যাকে গড়েছি' তার ধ্বংস করতে আমি পারব না। আমি তোমায় নিলুম, কিন্তু মনীষা—স্ত্রীরূপে নয়, বোনের মত—আমার পাশে চলবে—যেমন করে বোন ভাইয়ের পাশে চলে; আমার পরে ভর দেবে—যেমন করে বোন ভাইয়ের পরে ভর দেয়। পারবে না বোন, আমায় তোমার নিজের ভাই মনে করে, আমার পরে নির্ভর করতে পারবে না?"

"দাদা, তুমি এত মহৎ—"

মনীষা শশাঙ্কের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল, তাহার পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর মুখখানা রাখিয়া চোখের জলে আর্দ্র করিয়া দিল। শশাঙ্কের চোখ দুইটি জ্বালা করিতেছিল, সে শান্ত হাসিয়া বলিল, "মহৎ আমি নই দিদি, মহৎ ছিলুম না, তোমার দৃষ্টান্ত আমায় মহৎ কাজ করতে শিখিয়েছে। একদিন ছিল যে দিন ঠিক এমনই একটা দিন পাওয়ার আশা আমি করেছিলুম, কিন্তু আজ আর সে দিন নেই ভাই। সোনার সংস্পর্শে এসে কয়লাও নাকি সোনা হয়ে গিয়েছিল, তোমার সংস্পর্শে এসে আমার বুকের সে ভোগতৃষ্ণা শান্ত হয়ে গেছে; আমি বুঝেছি—কোনো শান্তি নেই, সুখ নেই, ভোগে শুধু পিপাসাই বাড়ে,—দেখেছি ত্যাগেই এর নিবৃত্তি হয়। আমি আজীবন ভোগেই কাটিয়েছি, দেখেছি যত খেয়েছি আরও লালসা বেড়ে চলেছে। আর তুমি—তুমি করেছ কি মনীষা? পরের কথা শুনে চিরজীবনের সাধনা, চিরজীবনের কামনা ত্যাগ করে কি নিতে

আসছিলে—ওর চেয়ে যে মরাই ভাল বোন? আমি কি তাই পারি? তোমায় তিলে তিলে হত্যা করতে আমি পারব না, আমি তোমায় বাঁচিয়ে রাখব।”

মনীষা মুখ তুলিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, “কাল সকালে আমার মা বাপ আসবেন—”

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল, “তখন তুমি বোন হয়ে ভাইয়ের পাশে দাঁড়াবে মণি, আসছে মাসে তোমার হাতের ভাই ফোঁটা নিয়ে আমি সগর্ব্বে ওঁদের সকলকে দেখিয়ে আসব। আমি আজ সত্যিকার ভাই হয়েছি, তোমায় রক্ষণ করার ভার আর কারও হাতে দেব না এবার হতে নিজের হাতে রাখব। যা কিছু বিপদই আসুক না, দুই ভাই-বোনে আধাআধি বখ্‌রা করে নেব। কাল সকালে আমার হাত ধরে তুমিই ওঁদের সামনে নিয়ে যেয়ো, আমার নূতন পরিচয় দিয়ো।”

মনীষা নীরবে শুধু এই দেবতার পানে তাকাইয়া রহিল; অন্তরের কৃতজ্ঞতা সে বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিল না, নীরবে তাহার চোখ দিয়া অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

প্রেরণা

শ্রী শ্বেত-কুমার মুখোপাধ্যায়

(১)

প্রেরণা! প্রেরণা!
নীল্‌-নব-ঘন-শ্যাম সুন্দরী বরণা—
মন্দার গন্ধে,
প্রাণবায়ু ছন্দে,
সুরলোক হ’তে হিয়ামাঝে তুমি ঝরোনা
প্রেরণা?

(২)

প্রেরণা? প্রেরণা?
তুমি না গো বাগ্‌দেবী—মূর্ত্তির প্রেরণা!
ছন্দের নৃত্যে,
স্বর্গের তীর্থে,
সিন্ধুর তরলিকা—তরঙ্গ ভরো না।
প্রেরণা?

(৩)

প্রেরণা? প্রেরণা?
প্রভাতের আলোকের রাঙা সুর ধরো না!
স্বর্গের মূর্ত্তি,
বিকশিত ফূর্ত্তি,
গৈরিক-অঞ্চলা চঞ্চল্‌-চরণা!
প্রেরণা!

(৪)

প্রেরণা? প্রেরণা?
পঙ্কজ-মুখ-ছবি প্রাণপটে আঁকো না?
আজ রাঙা মধুমাস,
স্বর্গের উচ্ছ্বাস,
অন্তরে ঢালি দিয়া নন্দিত কর না!
প্রেরণা!

শেষ প্রশ্ন

(শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শেষ প্রশ্নের আলোচনা)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

শরৎবাবুর "শেষ প্রশ্ন" সম্বন্ধে মতামত দুই একটি কাগজে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, পুস্তকখানি সম্বন্ধে আমাদের নূতন করিয়া কিছুই বলিবার প্রয়োজন হইত না যদি উহার লেখক শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু স্বয়ং না হইতেন। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বন্ধ করিলে কোন প্রশ্নেরই সমাধান হয় না, ইহাই ঐ পুস্তক সম্বন্ধে এক অভিযোগ। এই কথা আমি অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি। সাধারণতঃ যাঁহারা পুস্তক খানিকে রসের ভাণ্ডার বা কাব্য হিসাবে পাঠ করিতে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিফল মনোরথ হইয়াছেন। যোগাযোগ বা শেষের কবিতায় যে মাধুর্য্য, ও কবিতা আছে শেষ প্রশ্নে তাহা নাই। ভাষা অনেক জায়গায় আড়ষ্ট এবং উপমা বিহীন হওয়ায় উহার মধ্যে যে তর্কের স্রোত আছে তাহার বন্যায় ভাসাইয়া লইবার ক্ষমতার অভাব। এদিক দিয়া পুস্তক খানিকে বিচার করিতে গেলে আমি অন্যায় বিবেচনা করি। কেননা, আমার মনে হয় গ্রন্থকার উহাকে কাব্য শ্রেণীর মধ্যে ফেলিবেন না বলিয়াই যেন লেখনী ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীতে যে বর্ণনা পাই এখানিতে সে মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা নাই, কেননা কবিত্বের উচ্ছ্বাসে তাঁহার বক্তব্য চাপা দিতে যেন তিনি নারাজ।

নীতির দিক দিয়া কেহ কেহ পুস্তক খানির নিন্দা করিতেছেন। সনাতন পন্থীরা সতীত্বের আদর্শকে ক্ষুন্ন হইতে দেখিয়া অনেকটা ম্রিয়মান হইয়াছেন। ভারতের প্রাচীন গৌরবকে যাঁহারা যথা সর্ব্বস্ব বলিয়া আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহেন কমলের মুখ দিয়া তাহাকে ছোট করায় তাঁহারা অনেকে শরৎবাবুর উপর খড়্গ-হস্ত হইয়াছেন। যাঁহারা পাশ্চাত্যের খবর রাখেন এবং যাঁহাদের সংস্কার একটু মাজ্জিত হইয়াছে, তাঁহারা বলিতে চাহেন যে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা চরমে উঠিয়াছে তাহারাও এখন স্বীকার করিতেছেন যে জগতে যত প্রকার বিবাহ আছে সেগুলির মধ্যে হিন্দু বিবাহই আদর্শ এবং উহাই মানবকে প্রকৃত সুখের পথ দেখাইয়া দিয়া থাকে। জগতের ভাব-চিন্তা যখন এই সংশয়জনক পথে আসিয়া দোদুল্য-মান তখন সমস্ত আদর্শ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য এই যে ওকালতি, ইহা যেন খানিকটা তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য। আমার কিন্তু মনে হয়, শরৎবাবু উপরোক্ত কোন উদ্দেশ্যেই তাঁহার শেষ প্রশ্ন লেখেন নাই। কেননা, বিবাহ একটা সংস্কার মাত্র। উহা উঠিয়া গিয়া নর-নারীর যৌন-সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইয়া যাক এই মাত্র যদি তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তাঁহার মত শক্তিমান লেখককে ৪০০ পৃষ্ঠার সাহায্য লইতে হইত না। প্রাচীন আদর্শ ই আমাদিগকে মানুষ হইতে দিতেছে না কিম্বা এতদিন আমরা কেবল পুরাতনকে পূজাই করিয়া আসিয়াছি মানুষ হইবার চেষ্টা করি নাই এইটুকু মাত্র তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও তিনি একটা ছোট গল্পেই বেশ গুছাইয়া বলিতে পারিতেন। ৪০০ শত পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তকে গ্রন্থকার কোন একটা সত্যের মীমাংসার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে এটাই সত্য। সত্যটা কি? প্রত্যেক যুগ তাহার সভ্যতার বাণী দিয়া আর একটা নূতন যুগের বার্ত্তা আনিয়া দেয়। মানব সভ্যতা একযুগ হইতে অন্যযুগে লাফাইয়া চলিয়াছে, পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইবার তাহার সময়

নাই। ঐতিহাসিক ঘটনার কখনই পুনরাবৃত্তি ঘটে না। ইহাই যদি তাঁহার বক্তব্য বিষয় হইত তাহা হইলে তিনি একটী সুচিন্তিত দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেই পারিতেন, নিশ্চয়ই তাহার জন্য তাঁহাকে ৪০০ পৃষ্ঠার আশ্রয় লইতে হইত না। মহামতি বঙ্কিম তাঁহার শেষ বয়সে এইরূপ প্রবন্ধ অনেক গুলিই লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা লইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরিত রচনা করিয়াছেন, উপন্যাস লিখিয়া যান নাই।

আমাদের প্রথম একটু খট্‌কা লাগে শরৎবাবুর ভূমিকায়। তিনি বলিতেছেন, যে শেষ প্রশ্ন ভারতবর্ষে বাহির হইতেছিল এবং এখন যাহা প্রকাশ হইল তাহার সহিত উহার সাদৃশ্য কম কেন না অনেক অদল-বদল করা হইয়াছে। এই উক্তিতে আমাদের মনে হয় তবে কি এখনও তিনি বঙ্কিমী যুগেই বাস করিতেছেন। একরূপ লিখিয়া আবার ছাপাইবার সময় অন্যরূপে বাহির করায় art নষ্ট করে, গ্রন্থকারের Sincerity কমাইয়া দেয়, এযুগে এরূপ চলে না তাঁহার কি তাহা জানা ছিল না। প্রবন্ধে লেখকের মত বদলান স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় উপন্যাসে অদল-বদল করিলে আর্ট ও টেক্‌নিকের মাথায় লাঠি মারা হয় একথা তাঁহার মত প্রবীণ সাহিত্যিকের জানা উচিত ছিল।

তাহার পর বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়টী বোধ হয় ক্যামুনিজম্‌। কমল একজন পূরাদস্তর ক্যামুনিষ্ট। সে পশ্চাতের দিকে চাহেনা কেননা ক্যামুনিষ্টদের কোন প্রকার tradition নাই। উহা নূতন ভাব ধারা। জগতে যাহাদের ইতিহাস আছে, যাহাদের আভিজাত্য আছে তাহারা ক্যামুনিষ্টকে অন্তরের সহিত ঘৃণা ও ভয় করে, কমলও তাই জগতের ইতিহাস-প্রতিষ্ঠ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেই তাহার মত জ্ঞাপন করিয়া যাইতেছে। সাজাহানের বিশ্ববিখ্যাত তাজ—তাহার নিকট পাথরের ঢিপি, সতীত্ব নরী-জাতিকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য অসভ্য মানবের স্বকৃত কৌশল। তাহার নিকট কোন কাজই হেয় নয়। কেননা আজত যখন ভয় পাইয়া বলিল "মটর খানি যে আমার নয়।" কমল অম্লান-বদনে বলিল "তাহাতে কি হয়?" যাহার পশ্চাতে তাকাইবার কিছুই নাই, তাহার ভবিষ্যৎ সর্ব্বদাই পরিষ্কার ও দ্বিধাশূন্য। এইজন্য অজিত যখন কমলকে বলিল, 'চল'। কমল চলিল 'চল'। অজিত কিন্তু মনে প্রাণে ক্যামিউনিষ্ট নয়—কেননা সে ধনীর সন্তান, তাহার ইতিহাস আছে, কাজেই ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া পিছাইয়া গেল। কমল তাহাকে উপহাস করিল, কেননা কমল পূরাদস্তর ক্যামিউনিষ্ট। তাহার ইতিহাস নাই, তাহার পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইবার কিছু নাই, কাজেই ভবিষ্যৎ পরিষ্কার। কমল কিন্তু ভোগী। রাজেন্দ্রের সহিত মিশিয়া সে মেথর পল্লীতে দুঃস্থ পরিবারগুলির সেবার জন্য গিয়াছিল কিন্তু পারিল না। কমল জাতি মানে না কেননা তাহার জাত নাই। বিবাহ সম্বন্ধে সে সকল প্রকার সংস্কার বর্জ্জিত কিন্তু পুরুষের সহবাস সে কামনা করে। রাজেন্দ্র ও অজিতকে মোহ জালে ফেলার চেষ্টাই তাহার উদাহরণ। রাজেন্দ্র নির্লিপ্ত কর্ম্মী বলিয়া কমলের মোহ-জাল ছিন্ন করিতে পারিল, ভোগী অজিত কিন্তু উহার মোহ পাশে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়।

এতদূর বেশ সোজা, গ্রন্থকারের কমল চিত্র অনেকটা সার্থক। তাহাদের পর তিনি যে সমস্ত চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়াছিলেন তাদের কোনটায় এই ক্যামিউনিজমের আদর্শ ফুটিয়া উঠে নাই। মনোরমাকে গ্রন্থকার ছোটই করিয়াছেন। রূপ নারীকে তাহারা প্রথম যৌবনে মুগ্ধই করিয়া থাকে। শিক্ষিত ও রূপবতী রমণী মনোরমার মতই বিহ্বলা হয়, তবে তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া সরাইয়া দিয়া বা সমাজের একধারে ফেলিয়া রাখিবার কিছুই নাই। সনাতনী অক্ষয়ের পরাজয় ও সুপারম্যান আশুবাবুর চিত্র অনেকটাই অস্বাভাবিক। দীর্ঘ বক্তৃতাগুলি অসহ্য। যখনই শিবদাসের সহিত কমলের মনান্তর ঘটিল তখনই পুস্তক খানির স্বাভাবিক সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল।

এখন কথা হইতেছে যে ইহাই যদি শরৎ বাবুর বক্তব্য হয় তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে তাঁহার শেষ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়াছেন কি? পাশ্চাত্যের ক্যামিনিউ-

ত্রিম্ প্রাচ্যের সাম্যবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাম্যবাদ জগতের এক মাত্র সত্য। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন যে মানব জাতির বাস পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রায় ৩২০০ বৎসর হইয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০০ বৎসর হইতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০০০বৎসর পর্য্যন্ত মানব জাতির ইতিহাস তিমিরে আবৃত, উহার রহস্যভেদ আজও হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০০০ বৎসর হইতে মানব জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক রূপে না হউক কতকটা পাওয়া গিয়াছে। সেই সুদীর্ঘ প্রাচীন যুগে আসিরিয়া, বেবিলনিয়া মিশর, চীন ও ভারতবর্ষ নানা প্রকার সভ্যতার স্তর দিয়া আধুনিক সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়। প্রাচীনকালে প্রায় সমস্ত জাতিরই নিজেদের দেবতা ছিল। ইহুদিদের জেহোভা যেমন ইহুদীজাতিকে বড় করিয়া দিবেন বলিয়া শপথ করিয়া বসিয়াছিলেন, ভারতীয় আর্য্যদের ইন্দ্র, মিশরিয়দের আইসিসও সেই-রূপ পরস্পর উপাসকগণকে ধন-ঐশ্বর্য্য দিবেন বলিয়া অভয় দিয়াছিলেন। তাহার পর রাজার আদর্শ আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা দেবতা বলিয়া পূজা পাইতে থাকেন। প্রাচীন রোমীয় সভ্যতা ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। কাজেই সভ্য এবং পদস্থ নেতাগণ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় অধীনস্থগণের দোহন করিয়া আত্মোদর পূরণ করিয়া চলিতেন। ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতবাসী দ্রাবীড়গণকে অসভ্য ও দস্যু বলিয়া তাহাদিগকে বন্যপশুর ন্যায় হত্যা করিতেন। তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিলে তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখিতেন। গ্রাক আর্য্যগণ গ্রীক ব্যতীত সকলকেই বর্ব্বর বলিতেন, এবং পরাজিত বর্ব্বরগণকে Herlot বা দাস করিয়া তাঁহাদের সমাজভুক্ত করিয়া লয়েন। দাস-প্রথা রোমেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মানবের উপর মানবের অত্যাচার বোধ হয় ভারতবর্ষেই প্রথম অত্যন্ত লোমহর্ষক হইয়া দাঁড়ায়। কেননা এখানে ধর্ম্মের নামে যখন নর-বলি পর্য্যন্ত চলিতে আরম্ভ হয় তখন এই বিপুল পদদলিতদের পক্ষ হইয়া শাক্য মুনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। বুদ্ধের আধুনিক সোভিয়েট নেতাদের মতই ধর্ম্মকে বিশেষতঃ ভগবানকে সমস্ত অনর্থের মূল জানিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবাদ হইতে ভগবানকে বাহির করিয়া দেন।

আর্য্য-অনার্য্য এই বিচার বুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রকার জাতিভেদ তুলিয়া দেন। হিন্দুর দেব-দেবীর উপাসনা অর্থে ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার মত ক্ষমতার জন্য আবেদন, এই জন্যই তিনি তাঁহার মুক্তির নাম দেন নির্ব্বাণ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হীন নিষ্ক্রীয় কর্ম্ম। সমস্ত মানবই এক এবং মানবজাতির ধর্ম্ম মানব জাতির সেবা, মানব এই প্রথম শুনিল বলিয়াই উহাকে Revealed Religion বলা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের হস্তে পড়িয়া প্রাচীন স্বার্থ-বিজড়িত ধর্ম্মে পরিণত হয় এবং তখনই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল হয়। ভারতের ন্যায় রোমের অত্যাচারে সমগ্র ইহুদি জাতি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলে মহাত্মা যীশুখৃষ্ট ঐ অনাদি সত্যের পুনঃ প্রকাশ করেন। দেখিতে দেখিতে এই ধর্ম্ম সুসভ্য রোমে গিয়া স্বার্থ ধর্ম্মে পরিণত হয় এবং তখনই উহা অনেকটা ব্যর্থ হইয়া যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে মহাত্মা মহম্মদ কর্ত্তৃক আরবে এই ধর্ম্ম আবার প্রচারিত হয়। ইহার সত্যতা তখন সমস্ত জাতিবৃন্দ এত সুন্দর বুঝিতে পারে যে অতি অল্পকাল মধ্যে পৃথিবীর অনেক অংশই মুসলমান হইয়া যায়। খুব ব্যাপক ভাবে না হউক উহার মূল সূত্র চৈতন্যদেব, গুরুনানকও প্রচার করেন যখন এই ভারতে মুসলমান রাজত্বে পতিতদের উপর নির্য্যাতন অসহ্য হইয়া উঠে।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়। বিজ্ঞান-চর্চ্চার সহিত তাবৎ প্রহেলিকা সারিয়া যাইতে থাকে, কাজেই এই সার সত্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয় প্রকাশ্যভাবে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার ভাষায়। তাহার পর হইতে এই সনাতন সত্য মানবের সাধারণ চিন্তার মধ্যে আসন পাতিয়া বসিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য সাম্যবাদ আজ পৃথিবীতে নূতন কলেবরে আসিয়া দেখা দিলেও উহা বহু পুরাতন। যখনই পৃথিবীতে ছোট বড়র মধ্যে ভীষণ পার্থক্য আসে তখনি এই সাম্যবাদ আসিয়া সব সমভূমি করিয়া

দেয়। আধুনিক এই বৈজ্ঞানিক যুগে ধনিক ও শ্রমিক সমস্যা ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে, কাজেই সাম্যবাদও উৎকটভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। তবে একথা আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে সাম্যবাদই জীবনের শেষ সত্য নহে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৮০ বৎসর পূর্ব্বে Plato তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক Republicএ যৌন-সম্বন্ধের স্বেচ্ছাচার ঘোষণা করিয়া কোন প্রকার ক্লাশ বা শ্রেণী তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন লোক হাসিয়াছিল। প্রত্যেক যুগের সন্ধিক্ষণে শ্রেণী ভাসিয়া যায়, সব সমভূমি হয়, কিন্তু উক্ত সমভূমিতে আবার নূতন শ্রেণী চলে। বর্ত্তমান যুগেও ক্যামুনিজিমের একজন সহোদর আছে তাহার নাম ফেবিয়ানজিম্। উহার উদ্দেশ্য শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমশঃ স্বচ্ছল করিয়া দেওয়া, মনুষ্যত্বের আস্বাদ দেওয়া, কাজেই কেবিয়ানিজিম্ যদি সফল হয় তাহা হইলে ক্যমিনুজিম্ ভাসিয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে স্বয়ং ইউরোপ এই ক্যমুহ্নিজম্ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ায় ইহার পূরা প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হয়, কিন্তু এখন বুঝা যাইতেছে উহা বুঝি প্রকৃতিদেবীর অভিপ্রেত নয়। ইউরোপ যখন উহাকে পরিত্যাগ করিবে কিনা ভাবিতেছে তখন ভারতে উহা প্রচার করিলে একযুগ পিছাইয়া যাইবে না? ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যদি শেষ-প্রশ্ন বাহির হইত তখন না হয় বলিতাম উহার মতাবলীর সত্যাসত্য এখনও পরীক্ষিত হয় নাই, দেখা যাউক কি হয়, এখন যখন দেখা যাইতেছে যে উহা শুধু দারুণ অসামঞ্জস্তের দিনে সামঞ্জস্য আনিয়া দেয় মাত্র তাহা ছাড়া উহার আর কোন গুণ নাই তখন উহাকে বরণ করিয়া লইবার কি কারণ থাকিতে পারে।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা কি কখনই লেখা হইবে। অবশ্য তিনি যদি স্থির করিয়া থাকেন যে কামুনিউজিমই মানব ইতিহাসের শেষ ঘটনা, তাহা হইলে আমাদের এসম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস যুগে যুগে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে এই কথা সত্য আমি মানি, এইজন্যই মানবজাতির কোন যুগের ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা লিখিতে পারা গেলেও মানবজাতির ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা কখনই যে লেখা সম্ভব নহে ইহাই আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা।

দূর হ'তে

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

দূর হতে আমি নমিব তোমায়
হে মোর দূরের সাথী!
দূর হতে আমি হইব তোমার
সকল ব্যথার ব্যথী।
দূর হতে আমি হেরিব তোমার
নবীন মোহন কান্তি
দূর হতে বাণী শুনিয়া শুনিয়া
লভিব পরম শান্তি।
দূর হতে আমি পূজিব তোমায়
হৃদয়-অর্ঘ ভরি।

দূর হতে তব স্মৃতিকণাটুকু
রাখিব বক্ষে ধরি'।
দূর হতে আমি মুগ্ধ নয়নে
হেরিব তোমার তনু।
তোমার অধুর কুসুম-নধর
মায়ার ইন্দ্র ধনু।
দূর হ'তে লহ, হে নিঠুর প্রিয়,
আমার বরণ-মালা।
দূর হ'তে মোর সঁপিনু ব্যথার
অশ্রু-কমল-ডালা!

চার্লস রজার্স

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

১৯০৪ খৃষ্টাব্দর ১৩ই অগাষ্ট তারিখে ক্যান্‌সাস্ প্রদেশের ওলাদি নামক স্থানে জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা চার্লস রজার্স জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হতে তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতিতে এমন কমনীয়তা ছিল যে কেহ তাঁহাকে আদর না করে থাকতে পারত না।

তাঁহার পিতা মিঃ রজার্স "ওলাদি মিরর" নামক সংবাদ পত্রের প্রকাশক ছিলেন। সেই সূত্রে আট নয় বৎসর বয়সে চার্লস রজার্সকে টাইপ পরিষ্কার করা, গ্যালি প্রুফ্ নেওয়া প্রভৃতি ছাপাখানার যত 'ওঁচা' কাজ করতে হ'ত। ভয়ে কখনো না বলতে পারত না—যে 'রাশভারি' প্রকৃতির বাপ! মোট কথা বাল্যজীবন সাধারণ গেঁয়ো ছেলের মতই কাটাতে হয়েছে চার্লস রজার্সকে। সবাই তাকে "বুড়ি" বলে ডাকৃত।

কৈশোরে স্কুলের পড়া শেষ ক'রে রজার্স কলেজে ঢুকল! বাপ কিন্তু রজার্সকে বাইরে বার করে উপার্জ্জনক্ষম করবার চেষ্টায় ছিলেন বরাবরই। কাজেই কলেজের অবকাশ সময় একবার রজার্সকে কিছু টাকার জন্য পাউরুটির গাড়ী হাঁকিয়ে দোকানে পৌছে দিতে হয়েছে। সাধারণতঃ ৯৫টি চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীর পূর্ব্ব জীবন এমনি শ্রমলক্কারপুষ্ট। কিন্তু এমনি দেশ, এমনি কাল, এমনি পরিবর্ত্তনশীল ভাগ্য যে এই সব অখ্যাত, নগণ্য জীবনের ইতিহাস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য-কর্ণধারগণের নামের সহিত সারা জগতে সশ্রদ্ধায় উচ্চারিত হচ্ছে! বার্কেনহেড্ মারা গেলেন বৃটিশ ক্যাবিনেট দুঃখ প্রকাশ করলে, পার্লামেন্টের ধ্বজপতাকা অর্দ্ধনমিত হয়ে মৃতের উদ্দেশে শোক জ্ঞাপন করলে আর ভলান্টিনোর মৃত্যুসংবাদে তিনটি তরুণী আত্মহত্যা করলে!

রজার্স যখন স্কুলে পড়ত তখন একসেট jaz ব্যাণ্ড কিনেছিল এবং স্কুলেই এক অর্কেষ্ট্রা খুলেছিল। কোন জিনিষ শেখবার ইচ্ছা রজার্সের গোড়া থেকেই বলবতী। বাজনা বেশ ভাল করেই বাজাতে শিখেছে রজার্স। পিয়ানো ছাড়া সে পাঁচ রকম যন্ত্র ভাল করেই বাজাতে পারে। রজার্সের প্রথমসবাক চিত্র Close Hormonyতে সে সবগুলি বাজনাই বাজিয়েছে।

একবার গ্রীষ্মাবকাশে রজার্স ক্যানসাস্ য়ুনিভার্সিটির আর ১৪ জন ছাত্রের সঙ্গে ৮০০ অশ্বতর নিয়ে স্পেন দেশে হাজির হ'ল। তাতে অনেক টাকা হস্তগত ক'রে তারা ইউরোপ ভ্রমণে বেরুল। সদলবলে রজার্স প্যারিসেও দিনকতক অর্কেষ্ট্রা বাজিয়ে ছিল। কলেজ না খোলা পর্য্যন্ত তারা সারা ইউরোপ ঘুরে গিয়েছিল।...

এই বছরেরই শেষভাগে ওলাদি পিক্‌চার থিয়েটারে'র
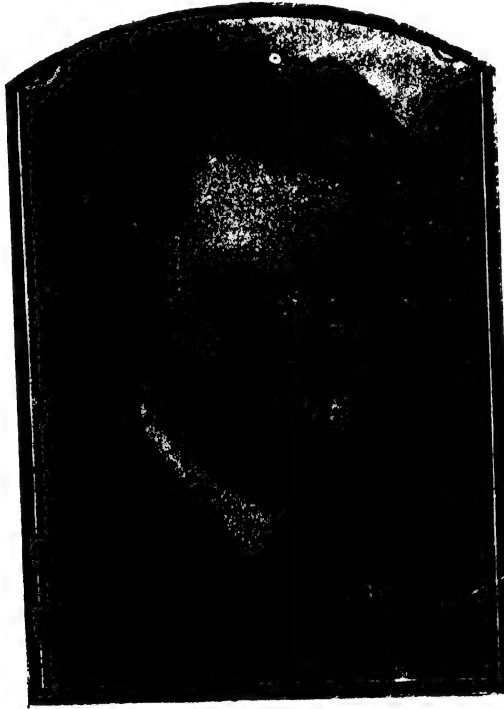
সত্বাধিকারী বিজ্ঞাপিত প্যারামাউণ্ট পিকচার স্কুলের কথা শুনে নিজের থিয়েটারের জন্য কতকগুলি লোক 'ভাঙাবার' জন্য ক্যানসাস্ সহরে এসে হাজির হলেন। তাঁর নজর পড়ল চার্লস রজার্সের ওপর। কিন্তু তখন প্যারামাউণ্টের জেসী, এল্, ল্যাস্কি ৪০০০০ হাজার আবেদনকারীর মধ্য হতে রজার্স প্রমুখ ১৮ জনকে লং আইল্যাণ্ড ষ্টুডিওতে পড়বার জন্য ভর্ত্তি করে নিয়েছেন—এবং এই ১৮ জনের মধ্যে রজার্স'ই সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিল। এ হচ্ছে ১৯২৫ সালের কথা।

এই বছরেই শেষ পরীক্ষা স্বরূপ "Fascinating youth" চিত্রে প্রধান ভূমিকা রজার্সকেই অভিনয় করতে হয়। এর পরেই ফক্স "More pay, Less work" ছবিতে মেরি ব্রায়েনের সঙ্গে অভিনয় করবার জন্য রজার্সের শরণাপন্ন হন। তারপর 'ফিল্ডের' কমিডি "So's your old man"এ প্রধান ভূমিকা। এই সময় থেকেই রজার্সের যাত্রাপথ কুসুমাস্তৃত হয়ে উঠল।

"Wings," "Get your man," "My best girl, "Abie's Irish Rose," "Varorsity," "Someone to love," "River of Romance," "Illusion," "Half way to Heaven" প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রনাট্যগুলিতে বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করে রজার্সের যশঃসৌরভ জগতময় ছড়িয়ে পড়ল!

রজার্সের বিবেচনায় "Wings" এর অভিনয়ই তাঁর নট-জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরবমণ্ডিত সাফল্য। শুধু বিস্ময়কর আকাশ-অভিযান ও সাহসিকতার জন্য নয়; এই নাটকেই তিনি ষ্টুডিও এবং নিজের কাছে পর্য্যন্ত নিজেকে যোগ্য চিত্রাভিনেতা রূপে প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলেন!

এই অভিনয়েই রজার্স রোমাঞ্চকর এরোপ্লেন চালনা শিক্ষা করেছিলেন। সে শিক্ষা তাঁকে নূতন ছায়াচিত্র 'Young Eagle" এর বিস্ময়কর আকাশ অভিযানে শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় বরেণ্য করেছে।

আধুনিক সবাক-চিত্রের যুগ তার কাছে আশাপ্রদ বলেই মনে হচ্ছে; কারণ সঙ্গীত-প্রিয়তা ও কলেজ জীবনের বিবিধ যন্ত্রাভিজ্ঞতা সবাক চিত্রাভিনয়কে তাঁকে কম সাহায্য করে নাই।

আজ রজার্স চিত্রগগণের উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্ক। যশ ও অর্থ যা' আধুনিক যুগে মনুষ্যত্বের মূল্যনিরূপক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, রজার্স তা প্রকৃত অর্জ্জন করেছেন। নিজেকে কিন্তু তিনি এত বিশ্বাস করেন না। তাঁর মনে হয় যে তিনি কিই-বা শিখেছেন, এখনো যেন তিনি কলেজের ছাত্রই আছেন!

সাধারণে কিন্তু তাঁকে খুব বড় করেই দেখে। যে লোক প্রতি মাসে বিশ হাজারের উপর অনুরক্তদের কাছ থেকে প্রশস্তি পত্র পান, প্রতি সপ্তাহ মাহিনা স্বরূপ "পাঁচজনার-চোখ-টাটানি অঙ্ক-যুক্ত-চেক" পান, তিনি নিশ্চয়ই অ-সাধারণ!

তাঁর নায়ক জনোচিত সুষ্ঠ দেহভঙ্গী, হাস্য-সুন্দর সৌম্য মুখ, লীলায়িত কণ্ঠস্বর, দর্শক সাধারণের মনে দৃঢ় রেখাপাত করেছে। সম্পাদকের নিকট একজনার কৈফিয়ত তলবেই আমরা তার কিছু প্রমাণ পাব :—

"I want you to tell me why film producers insist on choosing such terrible men as Charles Delaney, Richard Dix, Conway Tearle, Robert Armstrong, and others who haven't a scrap of acting ability or good looks about them ? Why dont they give us more of Charles Morton, Gary Cooper, Richard Arlen, and, above all, Charles Rogers ?"

সম্প্রতি হলিউডে পুরাতন ও প্রসিদ্ধ বইগুলির সবাক চিত্র সংস্করণের উদ্যোগ চলছে। রুডল্ফ ভলেন্টীনো অভিনীত সুপ্রসিদ্ধ "Monsieur Beaucaire" ফিল্মের সবাক সংস্করণে বর্ত্তমানে চার্লস রজার্সকেই ভলেন্টীনো গৃহীত ভূমিকা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে!

রজার্সের জন্মভূমিও তাঁর এই প্রিয় এবং কৃতী সুসন্তানের স্মৃতি সম্মানে সাধ্যমত অর্ঘ্য দিয়েছে। ক্যানসাস-ওলাদির নূতন বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের নাম হয়েছে—"Buddy Rogers Field."

রজার্স এখনো বিয়ে করেন নি।

বুনো মোষ আর সাদা ষাঁড় *

শ্রীপ্রফুল্ল কৃষ্ণ ঘোষ

গল্প

সবুজ সাগরের বুকে ঢেউএর উপর ঢেউ তুলে আফ্রিকার বিরাট মাঠ নীল আকাশের কোলে মিশে গেছে! একটী জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই—এই বিরাট জনহীন প্রান্তর নীরব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে—ঘুমন্ত নিঝুম!

সকাল থেকে আমার বাংলার বারান্দায় বসে সবুজ মাঠের ঢেউ দেখছি। দেখে দেখে চোখ ক্লান্ত হয়ে এল ঘরের ভেতর গিয়ে কাগজ-পত্র ঘাঁটছি। কিছু ভাল লাগছে না। দিনটা কেমন ঝিম ধরে আছে—রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, কুজ্ঝটিকাও নেই। প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি এক ঝিলিক্ আলো ঢেলেছিল মাত্র।

হঠাৎ একটা লোক আমার ঘরে ছুটে এসে বললে—"আপনার দূরবীণটা নিয়ে শীগগির বাইরে আসুন হুজুর,—ঐ দূরে কি যেন দেখা যাচ্ছে;—না?"

লোকটাকে চিনি—কিন্তু মোটেই পছন্দ করি না। অতি দুরন্ত লোক। তার অত্যাচারে সমগ্র ইউগাণ্ডা প্রদেশ কম্পমান। এমন যে দুর্জ্জয় কাফ্রী জাতি তারাও এই কালাবাস কেরীর নাম শুনলে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

ছুটে বারান্দায় গিয়ে দূরবীণ দিয়ে দেখলাম—সুদূর মাঠের ঐ প্রান্তদেশে একটা আলোর ঝলক দেখা গেল—বিদ্যুতের ঝিলিকের মত থেকে থেকে জ্বলে উঠছিল!

কিন্তু এ ত বিদ্যুতের ঝিলিক্ নয়। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে এলো—আমার ধমনীতে রক্ত-প্রবাহ হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল! কারণ ও আলো ত আলো নয়—ও যে বিপদেরই অগ্রদূত! ঝক্‌ঝকে বর্শা ফলকের উপর প্রভাতের সূর্য্য-রশ্মি ঐ বিদ্যুতের ঝিলিক সৃষ্টি করেছে।

সীমান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে কেরী বললে—'ওরা আসছে হুজুর! ঐ দিকেই আসছে! খুব বেশ! আপনি একটুও ভাববেন না হুজুর—আমি একলাই ওদের পিটিয়ে লম্বা করে দেবো—তা যদি না পারি আমি আর ব্রিশের বাচ্চা নই!'—

'আপনার দূরবীণটা নিয়ে শীগ্‌গীর বাইরে আসুন, হুজুর! ঐ দূরে কি যেন দেখা যাচ্ছে;—না?'

* দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব কাহিনী।

ইউনায়ানায়েস্বীর বর্বরগুলো বেরিয়েছে! ওরা যে লোবেংগিউলার কাফ্রী যোদ্ধাগুলির চেয়েও দুর্দ্ধর্ষ, দুর্বিনীত, অসভ্য! হাঁ, ওরাই ত আস্‌ছে—এই দক্ষিণ দিকেই আস্‌ছে। প্রলয় কালের অগ্নি শিখার মত এই হাস্তময় দেশটাকে পুড়িয়ে ছাড়-খার করে দিয়ে যাবে। উপায় নেই—উপায় নেই! এখান থেকে একশ মাইল দূরে যে আমাদের সেনানিবাস!

আমি সমগ্র ইউগাণ্ডা প্রদেশের ইংরেজ শাসন কর্ত্তা!—আমার প্রাণেও ভয়ের সঞ্চার হল! আশ্চর্য্য!

আগেই খবর পেয়েছিলাম কিন্তু গ্রাহ্য করি নি; এই ছোট্ট গ্রামখানিতে আমরা কুড়িটি ইংরেজ পরিবার কুড়িখানি কুটীর বেঁধে দুর্গ প্রাকারের আকারে বাস করছি; ছোট্ট একখানি কামানও অবশ্য আমার বাংলোর সামনে আছে; কিন্তু থাকলে হবে কি? ঐ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সাথে এ নিয়ে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারব?—কয়দিন? কয় ঘণ্টা? তার পর?—

আমার অবস্থা দেখেই যেন কেরী একটা বিকট হাসি দিলে—হাঃ হাঃ হাঃ! এক মুহূর্ত্ত সে বাহিরের আঙ্গিনার দিকে তাকিয়ে দেখলে—তার বড় বড় চোখ দুটোতে সূর্য্যের আলো ঝক্ ঝক্ করে জ্বলে উঠলো! বারান্দার রেলিংটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিতে বাড়ীটা কেঁপে উঠল। সে বললে—'ভয় পাবেন না হুজুর—আমি আছি!'

লোকটার স্পর্দ্ধা দেখ!

আমি উঁচু নেহাৎ কম নই কিন্তু কালাবাস আমার চেয়েও ছয় ইঞ্চি লম্বা! তার বিরাট বপু, তার এলোমেলো লাল দাড়ী, তার বিস্তৃত বক্ষ, তার সাদা ময়লা ড্রিলের পোষাক, খোলা মাথা আর সাদা সাদা দাঁতগুলোর ফাঁকে একটা প্রকাণ্ড চুরুটের পাইপ তাকে একটা বিকটাকার দত্যের মত দেখাচ্ছিল।

আগেই বলেছি লোকটাকে আমি পছন্দ করি না, কারণ ওর সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি রাহাজানি যেন অনুচরের মত ফিরছে। এই যে দারুণ কাফ্রী জুলু এরাও কালাবাস কেরীর অত্যাচারকে ভয় করে; ওরা কালাবাসকে ডাকে মম্ভো কেরী—কালাবাস শব্দের মানে হচ্ছে কুমড়ো।

এই কুমড়ো কেরীর বিরুদ্ধে কত অভিযোগই না শুনেছি—কত শাস্তিই তাকে দিয়েছি কিন্তু ওর মত বেহায়া আর দুটি দেখি নি!

আমাকে চিন্তাকুল দেখে লোকটা আমার হাতে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে—'যুদ্ধ করতে হবে না হুজুর—আপনি ভাববেন না।'

লোকটা কি বেয়াদব!

হোক গে বেয়াদব। আজকের দিনে মনে হচ্ছে ও-ই যেন আমার পরম মিত্র!—একমাত্র বন্ধু!

কেরী হাসতে হাসতে বললে—'আপনারা, যুদ্ধ করেন হুজুর শুধু মুখ দিয়ে—আমার ইচ্ছা করে আপনাদের জিভ্‌টাকে কেটে ফেলে দিই! হাঃ হাঃ হাঃ—ভয় পাবেন না! আপনাদের জয় হোক!'

কেরীকে কি বলব তাই ভাবছিলাম। শেষে বললাম 'হাঁ হে, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম—তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে—তার বিচারের জন্য নয়! ঐ অসভ্য বর্ব্বর কাফ্রীর দল লুট করতে বেরিয়েছেঅথচ আমাদের সেনা নিবাসে খবর দিতে গেলে অন্ততঃ সাতদিনের কমলাগবে না কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করা ত চলবে না; তোমার অসাধারণ বীরত্বের কথা, দুর্জ্জয় সাহসের কথা আমি শুনেছি—তোমায় আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছি,—এই অসভ্য বর্ব্বরদের দমন করবার ভার তোমার উপর।"

কালাবাস হাসলে। বললে—'আপনাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতে হবে—এই ত?

"হাঁ, তাই।'

'বেশ কথা—আমি হুজুরের সব আদেশ তামিল করব।'—এই বলে মিলিটারী কায়দায় আমাকে সেলাম করলে।

* * *

মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমাকাশে এলিয়ে পড়েছে। অসভ্য বর্ব্বরের দল যে আমাদের এই ইংরেজ পল্লীর দিকেই ছুটে আসছে তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। তাদের কোলাহল, তাদের চীৎকার বাতাসে ভেসে আসছে—আর ঘণ্টা খানেকের ভেতর হয় ত এসে পড়বে।

স্ত্রীলোকের আর ছেলেমেয়েদের একটা অপেক্ষাকৃত

নিরাপদ স্থানে রেখে পুরুষেরা সব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরবীণ দিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করছি। কি এক একটা চেহারা! একেবারে বাছা বাছা লোক! সবাই এক একজন মহা যোদ্ধা!

সর্দ্দারকে দেখেই মনে হ'ল চেনালোক! আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বললাম—'দেখ ত' হে, জুলুদের রাজার ছেলে ডেম্বা নয়?'—

সে বললে—'হাঁ তাইত।'

'দেখেছ কেমন একটা জানোয়ার?

'ভয় কি হুজুর? আমরা সব প্রস্তুত হয়েই আছি। কিন্তু ওরা বোধহয় সন্ধ্যার আগে আক্রমণ করবে না। আর ওদের রকম দেখে মনে হচ্ছে ওরা ত শুধু লুঠতরাজ করতে আসেনি—রীতিমত যুদ্ধই যেন করবে!—"

'তুমি ঠিকই বলেছ হে, কিন্তু ওদের সর্দ্দার ডেম্বাকে যদি কোন রকমে ঘায়েল করতে পার তবেই হয়—নইলে জয়ের আশা নেই।

* *

বেলা থাকতেই জুলু যোদ্ধার দল এসে আমাদের পল্লীটাকে ঘিরে ফেললে। ওরা এক একটা মানুষ ত নয়, যেন এক একটা জানোয়ার! কোনোটাই ছয় ফুটের নীচে নয়, কি তাদের মাংস পেশী, কি তাদের বুকের পাটা, আর কি তাদের চোখ মুখের ভঙ্গি! ওদের সামনে আমরা ত এক একজন ক্ষুদ্রাকার বামন। কিন্তু সবার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সর্দ্দার ডেম্বার মাথা—বাতাসে তার মাথার পালক উড়ছিল।

বাস্তবিকই ডেম্বার চেহারা দেখলে ভয় হয়—পুরো ছয় ফিট চার ইঞ্চি লম্বা, আবলুস্ কাঠের চেয়েও কালো কুচকুচে, মোষের মত গাট্টা, চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বল জ্বল করছে; যেন মূর্ত্তিমান মৃত্যুর দূত!

ঢালের শব্দ, বর্শার ঝনৎকার আর সবার উপর দিয়ে তাদের উল্লাস চিৎকার শোনা যাচ্ছিল—জুলুদের সেই রণোল্লাস "ইভুস্—ইভুস্!"

ভাবছিলাম—কি করা যায়! হঠাৎ মাথার ভেতর একটা বুদ্ধি গজালো। ছুটে গেলুম ঐ কেরীর কাছে—সে আমায় দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমি এক নিঃশ্বাসে তার কানে কানে যে-কথাটা বললাম তাতে সে আপত্তি করলে না—বরং মাথা নেড়ে তার সম্মতিই জানালে। তার হাতের মুষ্টি বজ্রের মত কঠিন হয়ে এলো, সোজা হয়ে সে দাঁড়ালো—গর্ব্বে যেন তার বুক ফুলে উঠল।

(‘ডেম্বা, আমি এসেছি—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।’)

আমি বেরিয়ে পড়লাম। যেদিক থেকে ইউনায়ানেম্বীর জুলুদের সেই বর্ব্বর চিৎকার ভেসে আসছিল—সেই দিকেই এগিয়ে চললাম হাতে কোনো অস্ত্র নেই—সঙ্গে কোন রক্ষী নেই।

আমি জানতাম ডেম্বা ছাড়া আর কোনো জুলুর সামনে পড়লেই আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। শুধু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে—আর বুড়ো কেরীর ভরসায়—

এতগুলি স্বজাতির জীবন রক্ষার চেষ্টায়ই আমার এ দুঃসাহস।

চল্লিশ গজ তফাতে থেকে হাত তুলে চীৎকার করে ডাকলাম—'ডেম্বা!—

ডেম্বা, আমি এসেছি—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

এক মুহূর্ত্তে সব নীরব—চুপ হয় হয়ে গেল। ডেম্বা শুনলে।—দু এক পা এগিয়ে এলে আমার দিকে—তারপর বর্শাটাকে মাটির বুকে বসিয়ে দিয়ে বললে—

'কি হে ধলা-বলদ? তুমি এসেছ?…'

'এ সাদর সম্ভাষণ, গালাগালি নয়!'

কেমন করে কথাটা বলব তাই ভাবছি—যদিও এর ভেতর একটু কাপুরুষতার ছায়া লুকিয়ে আছে—তথাপি এ ছাড়া আর উপায় নেই। যে বিপদ ডেকে আনতে যাচ্ছি কেরী ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই যে এ পরীক্ষায় নিষ্কৃতি পেতে পারব। কেরীই একমাত্র ভরসা।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে জুলু সর্দ্দার আবার তার বর্শাটা তুলে নিয়ে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে গর্জ্জে উঠল—ওরে সাদা বলদ—চুপ করে রইলি যে? কথা বল্।'

বাঘের বাচ্চার মত তার গর্জ্জন, গরিলার মত ঝক্ ঝকে তার দাঁত, সাপের মত উজ্জ্বল তীব্র দৃষ্টি! আমি ধীরে ধীরে বললাম:—

'ডেম্বা! তুমি ত বীর। বুনো মোষের মত তুমি জোয়ান,—চিতে বাঘের মত তুমি চতুর—নয় কি? তোমার ত অভাব নেই—গোয়াল ভরা গরু মোষ, খোঁয়াড় ভরা ছাগল ভেড়া, এত প্রচুর যে রাখবার ঠাঁই সব আমি শুনেছি কিন্তু এখানে কেন এসেছ, বল? লুঠবার মত কিছুত নেই আমাদের—আমরা যে গরীব তাত দেখতেই পাচ্ছ। আমাদের না আছে মোষ, না আছে ভেড়া। নয় কি?'

সর্দ্দার শুয়ারের মত গর গর করতে লাগল—আমি তার সে গর্জ্জন কানে না তুলে বলতে লাগলাম—'ওহে কালো চিতে বাঘ, তুমিত মস্ত জোয়ান—তোমার মত এত বড় সর্দ্দারও ত আর এ দেশে নেই কিন্তু তোমরা নাকি একটা লোকের নাম শুনলে ভয়ে কাঁপতে থাক? বড় লজ্জার কথা!'

গায়ের পেশীগুলিকে ফুলিয়ে বর্শাটাকে একবার শূন্যে ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আর একটা গর্জ্জন ছাড়লে। গলার অলঙ্কার গুলো ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল। আমি জানি ডেম্বা দুর্জ্জয় সাহসী, অসাধারণ বলবান। কত বার কত মল্লযুদ্ধই সে করেছে কিন্তু পরাজয় কাকে বলে তা সে জানে না। সুতরাং এবারও যে সে ভয় পাবে তেমন কোন কারণ নেই। শুধু তাকে উত্তেজিত করবার জন্য তার অহঙ্কার এবং আত্মম্ভরিতা জাগিয়ে তুলছিলাম।

('বাপ রে বাপ! কি বেদম প্রহার! কিন্তু তবু ত ডেম্বা হয়রাণ হয় না! সিংহের মত তার বিক্রম। চিতে বাঘের মত সে লাফাচ্ছে,—মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই।')
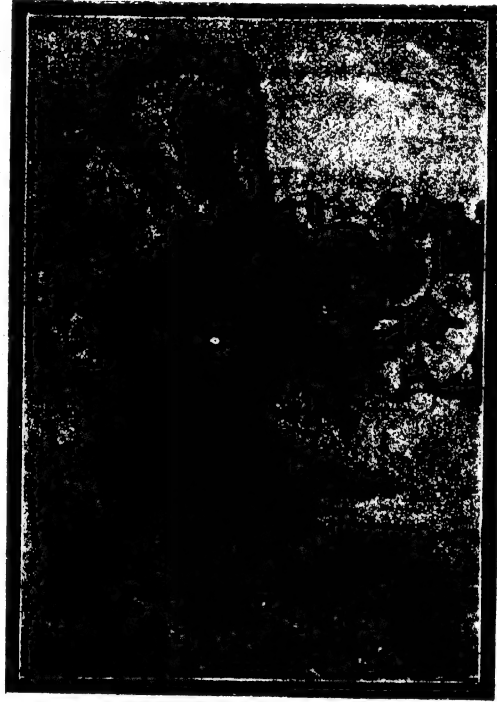
আমি বললাম—'তোমাকে মল্লযুদ্ধে আজ আহ্বান করছি—কার সঙ্গে তা পরে বলব।'

ডেম্বা মন দিয়েই আমার কথা শুনছিল—আমি বলে যাচ্ছিলাম—'যুদ্ধে যদি তোমার হার হয়, তবে তোমাকে তোমার দল-বল নিয়ে ফিরে যেতে হবে, আর যদি জয় হয় তোমার যা খুসি আমাদের এখান থেকে লুটে নিয়ে যেতে পারবে। বল? রাজী?

শুধু একজনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে সমস্ত দলের জয়-পরাজয়ের বিচার করবার রীতি জুলুদের ভেতর প্রচলিত ছিল, সুতরাং আমার এ প্রস্তাব নূতন কিছু নয়। আর একথা ভাল করেই জানতাম যে ডেম্বা যদি একবার কথা দেয় তবে আর তার নড় চড় কিছুতেই হবে না।

ডেম্বা বল্‌লে—'আচ্ছা তাই হোক। ওরে সাদা ষাঁড়, আমি সাত নরকের রাজা * কালীর নামে শপথ করে বলছি—তুই যা বললি শেষ পর্য্যন্ত যেন কথা ঠিক থাকে —আমি যা করবার তা করব।'—

ফিরে এলাম। মনের ভিতর কেবলই এই কথাটা জাগতে লাগল ডেম্বার মত অসুরের হাতে ওদের ঐ জাতীয় অস্ত্র, * নবকারী থাকলে সেই কি ভয়াবহ ব্যাপার দাঁড়াবে। ডেম্বার বর্ব্বর মস্তিষ্কে পরাজয় বলে কোন কিছুর ধারণা নেই! সে জানে না পরাজয় কাকে বলে কিন্তু ঘটনা চক্রে দৈব দুর্ব্বিপাকে যদি তা ঘটেই যায় তবে সে তার কথার খেলাপ করবে না।

কেরীকে সংক্ষেপেই সব কথা বললুম। সে উৎসাহে নেচে উঠ্‌ল—আজ তার শক্তির পরিচয় দেবার একটা সুযোগ পেয়েছে সে! তার দিকে চেয়ে চেয়ে তার প্রথম যৌবনের তেজ ও বিক্রমের একটা স্পষ্ট ছবি আমার মনে জেগে উঠল—যখন তাকে সবাই মিলে 'কুমড়ো কেরী' নাম দিয়েছিল। এখন ত সে প্রৌঢ়—তবু তার সাহস কমেনি। আমার কেবলি মনে হ'তে লাগল—দেহের শক্তিতে হয়ত কেরীও কম হবে না কিন্তু ঐ কালাপাহাড়ের হাতে ঐ 'নব্‌কারী' যে ইন্দ্রের হাতে তাঁর বজ্রের চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার।

আমি কেরীকে বললুম—'না হে, কাজ নেই। তোমাকে ঐ জানোয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠাবার কোন অধিকার ত আমার নেই। অস্ত্র হাতে ঐ কাফ্রী জুলু যে বজ্রের মত ভীষণ! এই মল্লযুদ্ধ আমি বন্ধ করে দিচ্ছি তার চেয়ে চল সবাই মিলে যুদ্ধ করেই মরব।'

কেরী কিছু বললে না, শুধু একটু মুচ্‌কী হেসে আমার কথার জবাব দিলে। একটা প্রকাণ্ড মুদগর তুলে আমায় দেখালে—বুঝ্‌লাম নব্‌কারীর পাল্টা অস্ত্রই বটে! একটু আশ্বস্ত হলুম।

যে লোকটাকে কোন দিনই আমি পছন্দ করিনি আজ তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার প্রাণ ভরে গেল—সত্যি ত, লোকটা জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলতে যাচ্ছে কার জন্য? নিজের জন্য নয়।—দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার ভেতর গৌরব আছে কিন্তু এত-গুলি ভাইকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ হারাণোর ভেতর গৌরবও কম নয়।

কেরী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে অবতীর্ণ হল—একেবারে সাদা-সিধে পোষাকে। গায়ে একটা সার্ট, পরণে হাপ প্যান্ট আর পায় রবারের জুতা।

ছোট্ট মাঠখানি ঘিরে দর্শকবৃন্দ সব দাঁড়িয়ে গেল। ডেম্বার অনুচরবর্গ রইল একধারে। আমাদের ভেতরেও সকলকে বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত থাকতে চুপি চুপি বলে এলুম, —কি জানি যদি সে বিশ্বাসঘাতকতা করে! কিন্তু সে আশঙ্কা খুবই কম। কারণ ডেম্বাকে আমি জানি—রাজার ছেলে সে,—অসভ্য বর্ব্বর হ'তে পারে কিন্তু ঐ বর্ব্বরের মুখ দিয়ে একবার যে কথা বেরোয় সে আর তা ফিরিয়ে নেয় না।

দড়ির বেড়া ডিঙিয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেরী একবার চারদিকে চেয়ে দেখলে—একদিকে কাল বর্শাধারী অসভ্যেরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর এক দিকে তারই জাত ভাই ফিরিঙ্গি বন্দুকধারী অনাগত শঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে। কেরীকে দেখে

---

*নরকের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন যে দেবতা জুলুরা তাকে কালী বলেই পূজা করে। কালী নরকের রাজা। আমাদের কালী নারী কিন্তু জুলুদের কালী পুরুষ।

* নবকারী দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রীদের এক প্রকার জাতীয় অস্ত্র লোহার ডাণ্ডার মাথায় প্রকাণ্ড একটা গোলা।

সকলে কোলাহল করে উঠ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে ডেম্বার বিরাট মূর্ত্তি সেইখানে দেখা গেল—এবার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গর্জ্জনও শোনা গেল।

সূর্য্য তখনো অস্ত যায় নি। দিন শেষের নিবন্ত রশ্মিটুকু কেরীর মুখে, চোখে, লাল দাড়িতে এসে পড়েছিল আর ওদিকে ডেম্বার মাথার পালকে, প্রকাণ্ড ঢালের বুকে আর বর্শার ফলকে এসে প্রতিফলিত হচ্ছিল।

লড়াই আরম্ভ হ'ল। একদিকে বর্ব্বর সর্দ্দার আর একদিকে লাল-দাড়ী কুমড়ো কেরী! ডেম্বা এসেই কেরীকে একটা 'নব্‌কারী' দিয়ে বল্‌লে—'এই নাও—আমার হাতে অস্ত্র থাকবে আর তুমি খালি হাতে আমার সঙ্গে লড়বে, এ হতে পারে না।'—

কেরী বললে—ও আমার দরকার নেই। এই মুগুরই আমার যথেষ্ট হবে।'

বাপ্‌রে বাপ্‌! কেরীটা কি ভীষণ জানোয়ার! কোথায় লাগে তার কাছে অসভ্য বর্ব্বর দুর্জ্জয় ডেম্বা।

দেখতে দেখতে কেরীর জামা ছিঁড়ে গেল—মাথা ফেটে বুক বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রথম যখন ডেম্বা তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল তখন ভয়ই পেয়েছিলুম কিন্তু চট্‌ করে সে সামলে নিলে—তারপর এম্নি ভাবেই সে ডেম্বার ঘাড়ে চেপে বসলে যে সে কিছুতেই আর সামলাতে পারছিল না। আক্রমণ করাত দূরের কথা কেরীর মুগুরের ঘা প্রতিরোধ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো! লড়াই দেখে মনে হ'ল যে কেরীর নাম যে 'কালাবাস' (কুম্‌ড়ো) দিয়েছে তা সার্থকই হয়েছে।

নেচে নেচে, ঘুরে ঘুরে, লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে তাদের লড়াই চলতে লাগল। ডেম্বা ত হটবার পাত্র নয়। একটু চালাকীর আশ্রয় নিলে ডেম্বা কেরীকে কাবু করতে পারত কিন্তু অধর্ম্মের পথে অসভ্যেরা কখনো যায় না। না হয় মরবে কিন্তু তাই বলে বিশ্বাসঘাতকতা কখনো করবে না।

নিজের শক্তির উপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল, নিজের বুদ্ধি কৌশলের উপরও তার ভরসা ছিল, তাই প্রথম দিকে সে আর আক্রমণ করে নি। শুধু প্রতিরোধই করে গেছে। ভেবেছিল, কেরী যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়বে তখন তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু কেরীটা কি অসুর! কিছুতেই আর ক্লান্ত হয় না! বৃষ্টিধারার মত মুশলের ঘা এসে ডেম্বার গায় মাথায় পড়তে লাগল—ঢাল দিয়ে কতক ফেরালে কিন্তু সবটা পেরে উঠলে না! ভরসা হ'ল বুঝি বা কেরীরই জয় হয়।

হঠাৎ চেয়ে দেখি একি বিপরীত কাণ্ড! ডেম্বা কেমন করে সামলে নিয়েছে। বন্য বেড়ালের মত এবার যেভাবে সে কেরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। —কামারের হাতুড়ী পেটার মত যেভাবে চারদিক থেকে তার উপর আঘাত পড়তে লাগল—কোন আশাই আর রইল না। জুলু যোদ্ধার দল ঘন ঘন 'হৈ হৈ', হৈ হৈ' শব্দে তাদের সর্দ্দারকে উৎসাহিত করতে লাগল!

কেরী আর আক্রমণ করবার ফুরসৎ পাচ্ছিল না। সাদা কুমড়োটা একটু একটু করে হটেই যাচ্ছিল—আর এক পা—আরো এক পা!—এখানেই বুঝি সব শেষ!!

আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। গরিলার মত ভীষণ এই ডেম্বা তার সঙ্গে কেরী পারবে কেন? কিন্তু হঠাৎ একি দেখ্‌ছি? কেরী লাফিয়ে উঠল না? ওকে যে আজ অসভ্য বর্ব্বরের চেয়েও মারাত্মক দেখাচ্ছে।

কেমন করে সে তার নষ্টশক্তি ফিরে পেলে! বাপরে বাপ! কি বেদম প্রহার কিন্তু তবু ত ডেম্বা হয়রাণ হয় না! সিংহের মত তার বিক্রম! চিতে বাঘের মত সে লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে,—মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই।

কেরী হঠাৎ পড়ে গেল—একেবারে এক হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে বসে পড়লে—বর্ব্বরদের দিক থেকে বিপুল জয়ধ্বনি ভেসে এলো। আমি ভাবলুম—সর্ব্বনাশ! কুমড়োটার মুখে সত্যি সত্যি পরাজয়ের কালিমা মেখে দিল!

আশ্চর্য্য! আবার সে লাফিয়ে উঠেছে! কুমড়ো যেন মাটি থেকে সুধারস পান করে নবজীবন লাভ করেছে। ডেম্বার অস্ত্র যেমন তার হাতে ভীষণ ভেরি

কেরীর হাতের মুগুরও নিতান্ত উপেক্ষার জিনিষ নয়।

কিন্তু একি? ডেম্বা পড়ে যাচ্ছেনা! বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! হাঁপাচ্ছে! হাঁপাচ্ছে! ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে —একেবারে নেয়ে উঠেছে। আহা হা, বেচারা!

সাদামহল থেকে করতালির ঢেউ উঠ্‌লে।

লড়াই শেষ হ'ল। সর্দ্দারকে কাঁধে করে জুলু যোদ্ধারা ম্লানমুখে ঘরে ফিরে গেল। ডেম্বার ললাটে পরাজয়ের ম্লানিমা এই বোধ হয় প্রথম।

* * * *

পরদিন হাসপাতালে কেরীকে দেখতে গেলাম। আমাকে দেখে সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলে! অর্থ বুঝলুম না।

এমন সময় একটা লোক ছুটে এলো।—

'খবর আছে—ডেম্বা সর্দ্দারের আজ মৃত্যু হয়েছে।'

হাসব কি কাঁদবো বুঝতে পারছি না। ডেম্বা বাস্তবিকই বড় বীর ছিল—তার জন্য একটু দুঃখ হচ্চে বই কি। কিন্তু দেশে শান্তি ফিরে এলো—বিদ্রোহীদল এবার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।

'কিন্তু বলত কেরী, কাল অমন ভাবে মাটিতে পড়ে গিছলে কেন! আমরা ত ভেবেছিলাম—একেবারেই বুঝি গেলে!

'হ্যাঃ—তোমরা কি বুঝবে—কি ঠেলা আমার ওপর দিয়ে গেছে—বেটা যে আমার মাজাটা ভেঙে ফেলেছিলে আর কি। আমি বলেই সেটা সামলে নিয়েছি কিন্তু আজ ত আর মোটেই নড়তে পারছি না।"

আমার মনে হচ্ছিল কেরীকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার সম্বর্দ্ধনা করি।—কেরী!—কুমড়ো কেরী!—কালা-বাস কেরী।—দস্যু কেরী! আমাদের পরিত্রাতা কেরী!

বিজয়ের গৌরব শ্রী আজ ঐ দস্যুর ললাটে।

[ইংরেজী অবলম্বনে]

বন্দীর বন্দনা

শ্রীশম্ভু চন্দ্র সেন গুপ্ত

আমি অন্ধকারে বন্ধ দ্বারে
ফেলবো আঁখি লোর,
তুমি জ্যোতির জালে জড়িয়ে দিয়ো
জীবন খানি মোর।
আমি নদীর মত হৃদয় মেলে
নিশায় গাব গান;
তুমি সুরের ভেলা ভাসিয়ে, তুলো
আলো-বীণার তান।

আমি জড়িয়ে যাব আশার গাছে
লতার মত উঠে;
তুমি ধন্য করো আমার তনু
ফুলের মত ফুটে।
আমি দূর্ব্বা হ'য়ে ঘুমিয়ে রবো
তোমার পরশ পেয়ে
তুমি রাতের শেষে শিশির হ'য়ে
আমায় ফেলো ছেয়ে।

শিশু-উদ্যান

—প্রবন্ধ—

অধ্যাপক—শ্রীযোগেশ চন্দ্র পাল

শিশু আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ বংশধর; তারাই আমাদের দেশের জীবন; আর তাদের উপরই নির্ভর করে আমাদের দেশের ভাল-মন্দ। যারা আমাদের বংশধর তাদের প্রতি আমাদের নজর দেওয়া সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য। আমরা, যদি শিশুদিগকে মানুষ তৈয়ার করিয়া না তুলি তবে শিশুদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য করা হইল না। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতাপিতার সমস্ত স্নেহ-মমতা শিশুর উপর গিয়া পড়ে; মাতা-পিতা আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। এই আনন্দই তাদের আনন্দ নয়, ইহা নিরানন্দে পরিণত হইয়া যায় যদি মাতা-পিতা শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে না পারে। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতা-পিতার্র ভাবা কর্ত্তব্য কেমন করিয়া বাগানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিশু-বৃক্ষটির মত তাদের স্নেহের শিশু দিন দিন দুনিয়ার প্রকৃতিকে লুঠ করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। কেমন করিয়া মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আকাশ, মুক্ত রৌদ্রের ভিতর শিশু ছুটাছুটি করিয়া খেলাইয়া বেড়াইয়া আনন্দে দিন কাটাইবে;—কেমন করিয়া প্রকৃতির অনাবিল নগ্ন সৌন্দর্য্যকে আপনার করিয়া পাইবে;—আর কেমন করিয়া খেলাধূলা, আনন্দ, স্বাধীনতা ও প্রেমের ভিতর দিয়া তাদের মন, বুদ্ধি ও শরীরের বিকাশ সাধন হইবে;—ইহা প্রত্যেক মাতাপিতার ভাবা কর্ত্তব্য; বিশেষ করিয়া যাহারা—শিক্ষিত তাদের ত এবিষয়ে বেশী নজর দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু দুঃখ হয় যাদের শিক্ষিত বলিয়া আমরা দাবী করি যারা নিজেরা শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেয়। তারাই এই সব বিষয় বেশী করিয়া অবহেলা করিয়া থাকে।

আমি এখানে গ্রামের কথা বলিব না, কেন না গ্রামে শিশুরা মুক্ত হাওয়া, মুক্ত রৌদ্র, মুক্ত আকাশ সমস্তই তার চারদিকে পাইয়া থাকে, তবে তার শিক্ষা হয় না, সে শিশু-বৃক্ষটির মত দিন দিন বৃদ্ধি পায় না, তার কারণ গ্রামের মাতা-পিতার অজ্ঞতা। কিন্তু আমার এখানে বক্তব্য সহরের শিশু ও মাতাপিতাকে লইয়া। সহরের মাতা পিতা যে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে কালের মুখে ছাড়িয়া দিয়া সহরের বিলাস-ব্যসনের মধ্য দিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া কাটাইয়া দেয়, তাই আমাদের দুঃখ হয়।—তাদের ঘরের মাণিক যেন সকালে শুকাইয়া না যায় সে দিকে লক্ষ্য করে না। যেমন মাতাপিতার নিজেদের শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য একটা কর্ত্তব্য আছে, তেমনি সহরের মিউনিসিপালিটি, কর্পোরেশন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহারা সহরের পিতা (মিউনিসিপালিটির সদস্য) সহরের শিশুদের জন্য তাহাদের একটা মস্ত বড় কর্ত্তব্য আছে। শিশুদের জন্য কেহই ভাবে না। না ভাবে তাদের মাতাপিতা, না ভাবে সহরের কর্ত্তারা না ভাবে দেশের নাম করা নেতারা।

সহরের মাতা পিতা নিজেদের জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়া নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ করিয়া সহরের একঘেয়ে জীবনকে সরস করিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু মরিবার বেলা মরে বাড়ীর শিশুরা, তারা যেন জগতের বাহিরে। মিউনিসিপালিটি বড় বড় বাড়ী তৈয়ার করে, বড় বড় রাস্তা করে, বড় বড় স্কুল করে, ড্রেণ পায়খানা করে, গাড়ী চলার জন্য পিচ দেওয়া রাস্তা করে, আমোদ প্রমোদ কোর্টসিপের জন্য সুন্দর সুন্দর বাগান করে, ডাক্তারখানা তৈয়ার করে, কলেজ করে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমাধি স্থাপন করে কিন্তু যারা ভবিষ্যতে সহরের মালিক হবে, দেশের মালিক হবে, তাদের স্বাস্থ্যের জন্য, বৃদ্ধির জন্য, শিক্ষার জন্য কি করে,—কিছুই না।

আমাদের ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ; এই

দেশে কত সহর আছে কত মিউনিসিপালিটি আছে, কত কর্পোরেশন আছে ইহার কেহই কিন্তু শিশুদের জন্য ভাবে না। কোন সহরে শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য শিক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটি কিছু করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

কথা উঠিতে পারে সহরের মাতা-পিতা বা সহরের নেতা বা সহরের মিউনিসিপালিটি শিশুদের জন্য কি করিতে পারে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে; অনেক কিছু শিশুদের জন্য করা যাইতে পারে। কোন সহরে শিশুদের পড়াশুনা এক কথায় তাহাদের মন, বুদ্ধি ও শরীরের বিকাশের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। কোন সহরে শিশুর খেলাধূলা বা পড়া শুনার জন্য শিশু লাইব্রেরী নাই। তারপর সবচেয়ে বড় কথা শিশু চায় মুক্ত বায়ু, শিশু চায় খোলা আকাশ, শিশু চায় নগ্ন সূর্য্যতাপ। ইহাই শিশুদের প্রকৃতির অনাবিল সহচর। এইজন্য ভারতের কোন সহরে কোন প্রকার বন্দোবস্ত আছে কি?—উত্তরে বলা যাইতে পারে, নাই।

সাধারণতঃ সহরের মাতাপিতার, নেতাদের এবং মিউনিসিপালিটির কর্ত্তব্য তিনটি জিনিস শিশুদের জন্য গড়িয়া তোলা। যাহাতে শিশু অনাবিল প্রকৃতির সহযোগে নিজদিগকে স্বাধীনতা খেলাধূলার ও আনন্দের ভিতর দিয়া তাদের মন, বুদ্ধি ও শরীর গড়িয়া তুলিতে পারে। এই জন্য প্রত্যেক সহরে চাই—

১। শিশু মন্দির।

২। শিশু উত্তান।

৩। শিশু লাইব্রেরী।

শিশু মন্দির কি? এর আবশ্যকতা কি? কোথায় হওয়া আবশ্যক, ইহার উদ্দেশ্য কি? কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় সে সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং তার জন্য একটা স্কিম দিয়াছি (লেখকের আদর্শ বালমন্দির শীর্ষক স্কিম দ্রষ্টব্য)। কাজেই সে সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলিব না।

শিশু লাইব্রেরী সম্বন্ধে পরে ভিন্ন প্রবন্ধে বলিব কাজেই আমার এখন বক্তব্য শিশু উত্তান লইয়া।

সহরের আবহাওয়া অতি দূষিত। সেখানে না আছে মুক্ত বায়ু, না আছে রৌদ্র, না আছে মুক্ত আকাশ। মানুষের হাতের পরশ পাইয়া সব যেন পচিয়া গিয়াছে। আর ভারতবর্ষের লোকের আয় অতি অল্প। আয়ের তুলনায় সহরের গরজ বেশী। আর ভাল সহর বলিতে আমরা যাহা বুঝি তার একটিও ভারতে আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আর সহরের যেটুকু ভাল অংশ সেখানে দুই চারজন বড়লোক আর বিদেশী সাহেবদের বাসস্থান। হিন্দুস্থানী বলিতে যাহাদিগকে বুঝা যায় তাহারা বোম্বাইতেই বাস করুক, কলকাতাতেই বাস করুক আর কানপুরেই বাস করুক আর পাটনা সিটিতেই বাস করুক, তারা সহরের আবর্জ্জনার মধ্যেই পড়িয়া থাকে। যে আবর্জ্জনার মধ্যে থাকিতে মরা মানুষেরও ঘৃণা হয় সেই আবর্জ্জনার মধ্যে নবাগত স্নেহের দুলাল, যে দুনিয়ার ভাল-মন্দ কিছু জানে না, জানে কেবল আনন্দ, সে কেমন করিয়া থাকিবে। সেখানে বাস অর্থ, মৃত্যুকে শীঘ্র শীঘ্র ডাকিয়া আনা। তারা যাহা চায় তাহা পায় না। তাই তারা অকালে শুকাইয়া যায় তাই শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের দেশে এত বেশী অবশ্য অন্যান্য কারণও আছে বটে। প্রকৃতির সহযোগ ত তারা পায়ই না, আলো বাতাস, পর্য্যন্তও পায় না। তারা বাঁচিবে কেমন করিয়া। আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটির কর্ত্তারা তাহা ভাবিয়াছে কি?—কাজেই সহরে সহরে চাই শিশু-উত্তান।

সহরের মিউনিসিপালিটির যেমন কর্ত্তব্য, মিউনিসিপালিটির কর্ত্তাদেরও তেমনি কর্ত্তব্য সহরে সহরে শিশু-উত্তান তৈয়ার করা। আবার সহরে যাহারা অর্থাৎ শিশুদের মাতা পিতারা বাস করে তাহারাই এক কথায় সহরের মালিক। তাদের কর্ত্তব্য সহরে শিশু-উত্তান তৈয়ার করিবার জন্য চেষ্টা করা এবং মিউনিসিপালিটি দ্বারা করাইয়া লওয়া। তাহারা যদি শিশুদের মঙ্গল চায় তবে মিউনিসিপালিটি তাহা করিতে বাধ্য। আর সহরের শিশুদের মাতা-পিতা যদি শিশুদের প্রতি কর্ত্তব্য না করে তবুও

মিউনিসিপালিটির উচিৎ শিশু-উদ্যান তৈয়ার করিয়া এবং লোককে ইহার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া।

সহরে সহরে মিউনিসিপালিটির আয়তনের ভিতর এরূপ বহু শিশু-উদ্যান গড়িয়া তোলা উচিৎ। মিউনিসিপালিটির কাজ যদি সহরবাসির স্বাস্থ্য, সুখ সুবিধা, তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করা প্রভৃতিই হয় তবে শিশু-উদ্যান গড়িয়া তোলা সর্ব্বাগ্রে উচিৎ। যারা অসুস্থ তাদের সুস্থ করিবার চেষ্টা করা ত কর্ত্তব্যই যারা সুস্থ তারা যাতে অসুস্থ হইয়া না পড়ে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া কোন অংশেই কম কর্ত্তব্য নহে। প্রতি সহরে প্রতি মাইলে একটি করিয়া শিশু-উদ্যান তৈয়ার করা আবশ্যক। আজকাল কোন সহরেই শিশু-উদ্যান নাই। প্রতি সহরে অন্ততঃ একটি করিয়া শিশু উদ্যান তৈয়ার করিয়া কতকটা সাময়িক অভাব দূর করা প্রত্যেক সহরবাসীর অনতিবিলম্বে কর্ত্তব্য।

এই সকল শিশু-উদ্যান কিরূপ হওয়া দরকার সে বিষয়েও ভাবিবার আছে। এবং কিজন্য এই শিশু-উদ্যান চাই তাও বিশেষ করিয়া বলিবার আছে। যাতে শিশুরা প্রকৃতির সর্ব্ববিধ অবাধ সহযোগের ভিতর দিয়া নিজেদের শরীর মন ও বুদ্ধিকে দিনের পর দিন বৃদ্ধি করিতে পারে তাহাই হইবে প্রধান লক্ষ্য। এবং এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া শিশু-উদ্যান তৈয়ার করিতে হইবে এবং ইহার রক্ষার জন্য নানাবিধ উপায় করিতে হইবে। এবং উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে ইহার যাবতীয় কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত চলিবে।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

সহরের বা গ্রামের শিশুদিগকে প্রকৃতির অনাবিল অবাধ সহযোগের ভিতর দিয়া তাহাদের শরীর মন ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করাই হইবে এই শিশু-উদ্যান গড়িয়া তুলিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

১। সহরের ভিতর ও গ্রামের ভিতর সুদৃঢ় প্রাচীরে ঘেরা বিস্তৃত মাঠের মধ্যে শিশু উদ্যান অবস্থিত হইবে। সহরের নিকট নদী থাকিলে সেই নদীর তীরে হইলেই বিশেষ ভাল হয়।

২। (ক) উদ্যানে সমস্ত দিন রৌদ্র থাকিবে।

(খ) খোলা হাওয়া প্রবাহিত হইবে।

৩। (ক) সমস্ত উদ্যান দুর্ব্বাঘাস (দুর্ব্বা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী) দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে।

(খ) নানা প্রকার ফুলের বৃক্ষ সুন্দরভাবে এবং কাতারে কাতারে রোপণ করিতে হইবে।

(গ) সম্ভব হইলে লুকোচুরী খেলিবার জন্য কুঞ্জ তৈয়ার করিতে হইবে।

(ঘ) ঝাউ, দেবদারু, নিম, আমলকি, বকুল, আম, নারিকেল, প্রভৃতি বৃক্ষ থাকিবে।

৪। সহরে জলের কল থাকিলে ফোয়ারার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৫। মাঝে মাঝে শিশুদের খেলার জন্য মাঠ থাকিবে।

৬। বার বৎসরের বালক বালিকা এই উদ্যানে আসিতে পারিবে।

৭। ছোট ছোট শিশুর সহিত তাহাদের ভাই বা অভিভাবকগণ আসিতে পারিবে।

৮। যাহারা হাঁটিয়া আসিতে পারে না অথচ শিশুর পিতা গাড়ী ভাড়া দিতে রাজি তাদের জন্য উদ্যান হইতে গাড়ী রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৯। শিশুর ইচ্ছামত খেলিতে বেড়াইতে পারিবে।

১০। উদ্যান কর্ত্তা তাহাদিগকে নানা বিষয়ে সাহায্য করিবে।

১১। বাহিরের খেলার (শিশুদের জন্য) যাবতীয় বন্দোবস্ত থাকিবে।

১২। শিশুদের বসিবার জন্য মাঝে মাঝে বেঞ্চ রাখিতে হইবে এবং দোলনা রাখিতে হইবে।

১৩। আখ্‌ড়ার বন্দোবস্ত থাকিবে।

১৪। সকাল পাঁচটা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং বিকাল ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। শীতকালে সকাল ৬টা হইতে ১১টা এবং বিকাল ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে।

১৫। শিশুরা ইচ্ছা করিলে দিনেও থাকিতে পারিবে,

তখন শিশুদের কোন ভার বা দায়িত্ব উদ্যান কর্ত্তার উপর থাকিবে না।

১৬। যাহারা চাঁদা দিবে তারাই খেলার সামগ্রী ব্যবহার করিতে পারিবে অন্যে কেবল বেড়াইতে পারিবে, অবশ্য যদি ফ্রী হয় তবে সবাই সমানভাবে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

১৭। সম্ভব হইলে উদ্যানের ভিতর শিশু লাইব্রেরী থাকিবে। (শিশু লাইব্রেরী কিরূপ হওয়া দরকার তাহা শিশু লাইব্রেরী শীর্ষক প্রবন্ধে বলিব।)

১৮। শিশুরা বাগানের ভিতর পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে না।

১৯। শিশু উদ্যানের একজন উপযুক্ত কর্ত্তা থাকিবেন, তাহার উপর উদ্যানের সমস্ত ভার থাকিবে।

২০। তিনি অমায়িক, মিশুক, সত্যবাদী ও দায়িত্বশীল হইবেন।

২১। তিনি শিশু মনস্তত্ত্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইবেন।

২২। বর্ত্তমান শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান থাকা চাই।

(ক) মণ্টেসারী।

(খ) কিণ্ডার গার্টেন।

(গ) প্রজেকট মেথড।

(ঘ) প্লে-ওয়ে ইত্যাদি।

২৩। তিনি সমস্ত শিশুদিগকে সমানভাবে ভালবাসিবেন এবং সর্ব্বভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

২৪। নূতন প্রণালীর সাহায্যে খেলার ভিতর দিয়া তিনি শিশুদের মন, শরীর ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিতে যত্নশীল হইবেন।

২৫। শিশু শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শী এমন কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে হইবে। কেননা তার উপর এই সকল শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন অনেকখানি নির্ভর করে।

২৬। তিনি মিউনিসিপ্যালিটি হইতে বেতন পাইবেন।

২৭। উদ্যানের নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি অবস্থান করিবেন—সম্ভব হইলে উদ্যানের ভিতর থাকিবেন।

২৮। তিন বৎসরের কমের কোন শিশুর দায়িত্ব তিনি লইবেন না।

২৯। সকালের জল খাবার শিশুরা বাড়ী হইতে লইয়া আসিবে।

৩০। বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং সমস্ত দ্রব্য উপযুক্ত স্থানে রাখিতে হইবে।

৩১। শিশুদের ব্যক্তিগত ডাইরী উদ্যান কর্ত্তাকে রাখিতে হইবে এবং প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি পনর দিনে শিশুর ওজন লইতে হইবে।

৩২। শিশুর ওজন কমিলে তাহার কারণ বাহির করিতে হইবে এবং শিশুর পিতাকে বা অভিভাবককে জানাইতে হইবে এবং যদি কোন ত্রুটীর জন্য হইয়া থাকে তাহা দূর করিতে হইবে।

৩৩। বাগানের অনেক কাজ (যেমন গাছ রোপণ করা, জল দেওয়া, পরিষ্কার করা প্রভৃতি) সম্ভব মত শিশুদের দ্বারা করাইতে হইবে।

৩৪। শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে হইবে।

৩৫। (ক) তাহারা বাগানে আসিয়া জুতা পরিতে পারিবে না।

(গ) আবশ্যকমত যত কম জামা পরিতে পারে ততই ভাল।

(গ) সম্ভব হইলে উদ্যানকর্ত্তার উপদেশ মত তাহারা খালি গায়ে থাকিবে।

(ঘ) সময় সময় শরীরে উপযুক্ত রৌদ্র ও বাতাস লাগানোর জন্য উলঙ্গ হইয়া বেড়াইবে। (অবশ্য এইজন্য ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকিবে)।

৩৬। ঠাণ্ডা পানীয় জলের বন্দোবস্ত থাকিবে।

৩৭। আট বৎসরের ছেলে-মেয়েদের উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে কোন ভেদ থাকিবে না।

৩৮। ছুটীর দিন উদ্যান রক্ষকের নির্দ্দেশমত অন্যত্র বনভাত খাইতে যাইবে। এইজন্য শিশুরা বাড়ী হইতে খাবার লইয়া যাইবে।

৩৯। মাঝে মাঝে অভিভাবকগণ বাগানে আসিয়া দেখা-শুনা করিবেন।

বিজয়ী

গল্প

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ননীগোপালের অন্তর্জীবনের গোপন ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটিত করিতে গিয়া কেবলি ভয় হইতেছে, তাহার ভিতর ও বাহিরের এই বিষম বৈষম্য লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিনা। প্রসন্ন হ্রদের গূঢ় তলদেশে যে সকল ভীষণ নক্র ঘুরিয়া বেড়ায় তীরে দাঁড়াইয়া তাহাদের কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। ননীগোপালের সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ও সুশ্রী কিশোর মুখখানা দেখিয়াও কেহ সন্দেহ করিত না যে কি দুর্জ্জেয় দুর্ব্বলতার সহিত সে অহরহ যুদ্ধ করিতেছে।

যে নক্রটি ননীগোপালের দেহ-মনের মধ্যে অটল আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল তাহার নাম—ভয়। আহার নিদ্রা ভয় ইত্যাদি কয়েকটা বৃত্তি জীবমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইতে বড় একটা কাহাকেও দেখা যায় না। কিন্তু ননীগোপালকে ঐ ভয় বস্তুটি ছেলেবেলা হইতে একটু বিশেষ করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল।

কি করিয়া কখন ইহার প্রথম উন্মেষ হইল তাহা বলা শক্ত। শিশু কখন তাহার একান্ত সহজ নির্ভীকতা বিসর্জ্জন দিয়া বিড়াল দেখিয়া বা অন্ধকারে ভয় পাইতে আরম্ভ করে তাহা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিশ্চয় বলিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস ননী মাতৃস্তন্য ও পিতৃরক্তের সহিত এই পরম পদার্থটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল। সে যাক। শুধু ননীর মাতাপিতার অকারণ গ্লানি করিলে চলিবে কেন?

ননীর যখন সাত বৎসর বয়স তখন তাহাদের সহরে একটা সার্কাস আসিয়াছিল। ননীর পরম বন্ধু বিশু আসিয়া চুপিচুপি বলিল;—ননে, বাঘ দেখতে যাবি? সার্কাসে অনেক বাঘ এসেছে। এক পয়সা দিলেই দেখতে দেয়। তোর মার কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে আয়—দুজনে দেখব।

ননী উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—আচ্ছা এক্ষুণি আস্‌ছি।

বিশু সাবধান করিয়া দিল, বাঘের নাম করিসনি তাহলে যেতে দেবে না। বলিস কাটি-বরফ খাব।

পয়সা লইয়া দুই বন্ধু বাহির হইল। তারপর যথা-সময় কাঁদিতে কাঁদিতে ননী একাকী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। জননী ননীর কাপড় চোপড়ের অবস্থা দেখিয়া প্রথমটা তাহাকে খুব ঠেঙাইলেন, তারপর সেই সন্ধ্যাবেলা স্নান করাইয়া দিলেন। জেরায় প্রকাশ পাইল যে একটা বাঘ ননীকে দেখিয়া গাঁক্ করিয়া শব্দ করিয়াছিল—তাহাতেই এই বিপত্তি।

ননীর জীবনে এই শেষ প্রকাশ্য লাঞ্ছনা, ইহার পর সে ভয় গোপন করিতে শিখিল।

কিন্তু ননীর প্রাণে আর সুখ রহিল না। যত তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল ভীতিপ্রদ বস্তুর সংখ্যাও জগতে ততই অগণ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে এমনি হইল যে গুরুজনের সম্মুখে যাইতে তাহার পা কাঁপে, হেড মাষ্টার মহাশয়ের মুখের পানে চোখ তুলিতে প্রাণ শুকাইয়া যায়। যে দিকে সে চোখ ফিরায় সেইদিকেই যেন একটা বিভীষিকা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যখন তাহার বয়স দশ বৎসর তখন একদিন সে স্কুল হইতে একাকী বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকিল। ননী ফিরিয়া দেখিল রতন। রতন ছেলেটা ননীর অপেক্ষা উঁচু ক্লাশে পড়ে বটে কিন্তু সে প্যাকাটির মত রোগা এবং অত্যন্ত পাজী। ননীর সহিত তাহার বড় সদ্ভাব ছিল না, তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। একবার ভাবিল দৌড়িয়া পালায়। কিন্তু ভয়ের বাহ্য বিকাশ সে অনেকটা দমন

করিয়াছিল তাই পলাইল না, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রতন কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া সটান বলিল,—'তোর এরোপ্লেনটা দে।'

ননী অনেক পরিশ্রম করিয়া বিস্তর মাথা খাটাইয়া একটি পিজ-বোর্ডের ছোট্ট এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়াছিল। সেটিকে ছুঁড়িয়া দিলে ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিত, আবার চক্রাকারে নামিয়া আসিত। এটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া আজ প্রথম সে স্কুলে আনিয়াছিল এবং চমৎকৃত বন্ধুবর্গের সম্মুখে এই অদ্ভুত যন্ত্রটির অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া নিরতিশয় ঈর্ষ্যা ও প্রশংসার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

ননীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রতন দাঁত-মুখ খিচাইয়া বলিল ;—দিবিনে ? শীগ্‌গির দে বল্‌ছি।

প্রবল রোদনোচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া ননী বলিল,—'আমি তৈরী করেছি, আমি তোমাকে দোব কেন ?'

দিবিনে ? আচ্ছা দাঁড়া তবে—বলিয়া রাস্তা হইতে একমুঠা ধুলা তুলিয়া লইয়া বলিল—এক্ষুণি চোখে ধুলো দিয়ে দোব, কানা হয়ে যাবি। ভাল চাস ত দে বল্‌ছি।

ননী এরোপ্লেনটা রাস্তার উপর ফেলিয়া দিয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল,—এই নে—ভারী ত জিনিস আবার আমি আর একটা তৈরী করে নোব।

সেটাকে তুলিয়া লইয়া দাঁত বাহির করিয়া রতন বলিল ;—খবরদার বল্‌ছি, জিভ টেনে বার করব ফের যদি এরোপ্লেন তৈরী করিস। আমি একলা এরোপ্লেন ওড়াব আর কাউকে ওড়াতে দোবনা।—এই বলিয়া কাটির মত হাতপা অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাড়িতে নাড়িতে শিস্ দিতে দিতে রতন চলিয়া গেল।

ননী বাড়ী ফিরিয়া বইগুলা ফেলিয়া দিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। শুধু যে এরোপ্লেনের শোকেই সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নয়, দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য ছেলের মত লড়াই করিবার ক্ষমতাও যে তাহার নাই,এই লজ্জাটাই তাহাকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দিয়াছিল।

এই সমস্ত ছোটখাট ব্যাপার ছাড়াও ননীর পক্ষে সব চেয়ে ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সাহেব। কি করিয়া এই ভয়ের সৃষ্টি হইল বলা যায় না কিন্তু লাল মুখ কিম্বা সাদা চামড়া দেখিলেই ননীর মুখ শুকাইয়া তুলসীপাতা হইয়া যাইত, অকারণে বুকের ভিতর দুরদুর করিতে থাকিত। ননী নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত ভয়ের কিছু নাই—সাহেব তাহাকে খাইয়া ফেলিবে না, কিন্তু কোনই ফল হইত না। কোন্ নীলকরের আমলের পূর্ব্বপুরুষের রক্ত তাহার সমস্ত যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধি বিবেচনাকে ভাসাইয়া দিত।

স্কুলের হেড্‌মাষ্টার যখন ননীর বাবাকে লিখিলেন,—ননীর মত শান্ত শিষ্ট নিরীহ ছেলে আমার স্কুলে আর নাই—আমি এ বৎসর উহাকে গুডকন্‌ডক্ট প্রাইজ দিব,—তখন ননী লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে যেন মরিয়া গেল। এই প্রাইজ যে তাহার আন্তরিক শিষ্টতার জন্য নয়, তাহার ভীরুতার, দুষ্কৃতি করিবার অক্ষমতার পুরস্কার, তাহা পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলেও উহার সুতীক্ষ্ণ লজ্জা তাহার বুকের মধ্যে বিঁধিয়া রহিল। নিজের যে দুর্ব্বলতাকে সে অতিযত্নে লোক-চক্ষু হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, এই প্রাইজটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে উহা সকলের কাছে প্রকট হইয়া পড়িবে, কাহারও জানিতে বাকী থাকিবে না তাহা ভাবিয়া তাহার নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকিয়া ছেঁচিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইল। সহিংসভাবে একটা কথা কেবলি তাহার মনে আনাগোনা করিতে লাগিল যে প্রাইজ না পেয়ে যদি রত্‌নার মত মিশনস্কুলের ছেলেদের ঢিল মারার জন্যে বেত খেতুম তাহলে কত ভালই না হত ?

এইভাবে ভয়সঙ্কুল ম্রিয়মান দিনগুলি ননীর কাটিতে লাগিল।

ননীর ষোল বছর বয়সে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাহার জীবনের উপর ধিক্কার জন্মিয়া গেল। আবার সহরে সার্কাস আসিয়াছে। এবার আর বাঘ দেখা নয়, স্কুলের ছেলেরা মিলিয়া আসল সার্কাস দেখিতে গেল। সেদিন ম্যাটিনে, স্কুলের ছেলেদের কন্‌শেশন্ ছিল, তাই ননীরা কয়েকজন আট আনার টিকিট কিনিয়া এক টাকার

চেয়ারে গিয়া বসিল। ননী একটা ভাল জায়গা দেখিয়া দল ছাড়িয়া একটু আলাদা হইয়া বসিল।

সার্কাস আরম্ভ হইতে আর দেরী নাই, দর্শকদের বসিবার স্থান সব ভরিয়া গিয়াছে, এমন সময় একজন ছোকরা সাহেব প্যাণ্টালুনের পকেটে দুই হাত পুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ননীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—'এই, ওঠ। এটা আমার যায়গা।'

ননী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সাহেব চেয়ারের পিঠে একটা নাড়া দিয়া বলিল; —শুনতে পাচ্ছ? এটা আমার চেয়ার—ওঠ।

ননীর মুখে তবু কথা নাই; তাহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

সাহেব তখন ঘাড়ের জামা ধরিয়া ননীকে তুলিয়া দিয়া নিজে চেয়ারটা অধিকার করিয়া বসিল।

সমস্ত পৃথিবী ননীর চক্ষে অন্ধকার হইয়া গেল। আচ্ছন্নভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হোঁচট খাইতে খাইতে বাহিরের দিকে চলিল।

সার্কাস শুদ্ধ লোক চক্ষু মেলিয়া এই দৃশ্যাভিনয় দেখিতেছিল। বিশু ননীর কামিজ ধরিয়া টানিয়া চাপা গলায় বলিল,—ছেড়ে দিলি—কিছু বল্লি নে? আমি হলে—

বিমল নিজের চেয়ারের একপাশে সরিয়া বসিয়া বলিল, —আয় ননী, এইখানে বস।

ননী অতি কষ্টে গলা হইতে আওয়াজ বাহির করিল,— না, আমি বাড়া যাই।

সে রাত্রে ননী ঘুমাইতে পারিল না। গভীর রাত্রে একবার তাহার ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া কাঁদে। কিন্তু বালিশ কামড়াইয়া অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা রোধ করিল। হঠাৎ একবার বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে হকি-ষ্টিকখানা তুলিয়া লইয়া দুই হাতে মড়াৎ করিয়া ভাঙিয়া দুখানা করিয়া ফেলিল। নিজের মনে পাগলের মত বলিতে লাগিল,—কেন আমি এমন—কেন আমি এমন? ভীতু—ভীতু! উঃ! সব্বাই দেখলে। সব্বাই হাসলে! কাল স্কুলে যাব কি করে?

এই ঘটনার পর ননী যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল, যেন কচ্ছপের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া ফেলিল। বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হাসি-গল্প প্রায় বন্ধ করিয়া দিল। সর্ব্বদা এক্‌লা এক্‌লা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নিজের মনে বিজবিজ করিয়া কি বকে!

বিমল একদিন লক্ষ্য করিয়া বলিল,—'ছাখ্ ননেটা কি রকম হ'য়ে গেছে—কথাও কয়না।'

বিশু বিজ্ঞভাবে বলিল,—একজামিনের পড়া পড়ছে তোর মত ফাঁকিবাজ ত নয়! ওর বাবা বলেছেন ফা[illegible] হয়ে সেণ্ট আপ্ হতে পারলে একটা সোনার রিষ্ট্ ওয়া[illegible] দেবেন।

বিশুর অনুমান কিন্তু সর্ব্বৈব ভুল। ননী রিষ্ট ওয়াচের লোভে পড়া মুখস্থ করিত না। সে বিড়বিড় করিয়া কেবলি বকিত,—আমি ভীতু নই! আমার সাহস আছে! আমি কাউকে ভয় করি না। এবার যে আমার সঙ্গে চালাকি করবে তাকে দেখে নেব। ইত্যাদি। যেন খাঁচার পাখী নিরন্তর ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া খোলা আকাশের মুক্তিমন্ত্র জপ করিতেছে।

মাসখানেক পরে একদিন বিশু আসিয়া বলিল;—ননী, মাঠে চল্, আজ মিশন স্কুলের সঙ্গে আমাদের ম্যাচ আছে।

জনসঙ্ঘ বা যেখানে অনেক লোকের সমাবেশ সেখানে যাইতেও ননী মনে মনে ভয় পাইত। তাই সে জোর করিয়া বলিল,—আচ্ছা চল।

মাঠে ভীষণ ভীড়। অন্যান্য দর্শক ছাড়াও দুই স্কুলের ছেলেরা দলে দলে আসিয়া মাঠ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফুটবল খেলায় এই দুই স্কুলে চিরদিন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। কোন স্কুল বেশী ভাল খেলে তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত কবে যে হইবে তাহা বলিবার ক্ষমতা বোধ করি ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিদের পর্য্যন্ত নাই।

খেলা আরম্ভ হইল। দুই পক্ষের দর্শকই নিজ নিজ খেলওয়াড়দের কখনো ভর্ৎসনাপূর্ণ উগ্রকণ্ঠে, কখনো মিনতিভরা করুণস্বরে উৎসাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু যুযুৎসু দুই দলই সমান দুর্দ্ধর্ষ—কেহই গোল দিতে পারিল না। খেলা দেখিতে দেখিতে দর্শকবৃন্দ ভীষণ উত্তেজিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

শেষে খেলা সমাপ্ত হইতে যখন আর মিনিট পাচেক বাকী আছে তখন ননীদের স্কুল একটা গোল দিল। 'গোল' 'গোল' শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ছাতা জুতা প্রভৃতির উৎক্ষেপ দ্বারা এই বিজয় কাণ্ডের আনন্দ নির্ঘোষিত হইল।

ননী যেখানে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছিল, তাহারই পাশে একটা বছর আটেকের ছেলে লাফাইয়া নাচিয়া ডিগ্‌বাজী খাইয়া চীৎকার করিতেছিল,—গোল! গোল! হুররে! আমার দাদা গোল দিয়েছে! হুররে! গোল! গোল! খেলা আবার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তখনো ছেলেটা অক্লান্তভাবে চেঁচাইয়া চলিয়াছে।

তাহার কাছে দাঁড়াইয়া মিশন স্কুলের একটি ফিরিঙ্গি ছেলে খেলা দেখিতেছিল। গোল খাইবার পর সে বিশেষ একটু মুষ্‌ড়িয়া গিয়াছিল, তাহার উপর এই পুঁটে ছেলেটার উৎকট আনন্দ তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ছেলেটার চুলের মুঠি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল;—'এই, চুপ কর্‌—পাজী কোথাকার!'

ছেলেটা তাহার উদ্দাম উল্লাসে হঠাৎ বাধা পাইয়া আরও জোরে চেঁচাইয়া উঠিল,—অঁ্যা—অঁ্যা—আমায় মারছে—

ফিরিঙ্গি ছেলেটি আচ্ছা করিয়া তাহার কাণ মলিয়া দিয়া বলিল;—চুপ কর—নইলে এক কিক্‌ মেরে তোকে ঐ গাছের ডগায় তুলে দেব।

পুঁটে ছেলেটার সাঙ্গোপাঙ্গ বোধ হয় সেখানে কেহ ছিল না তাই সে ননাকে দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—ও ননীদা দেখ না আমায় মারছে—

ননীর মনে হইল, তাহার গলাটা যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছে—বুকের ভিতর অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল। মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল।

সে কম্পিতস্বরে বলিল,—ওকে ছেড়ে দাও—ঐটুকু ছেলেকে মারছ কেন?

ফিরিঙ্গি ছেলেটি মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—ঐটুকু ছেলে? পাজী বজ্জাত রাস্কেল কোথাকার! বলিয়া ছেলেটার মাথায় এক গাঁট্টা বসাইয়া দিল। ছেলেটা তারস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল।

খেলার দিকেই তখন সকলের বাহেন্দ্রিয় নিবিষ্ট হইয়া আছে, এদিকের এই পার্শ্বাভিনয় কেহ লক্ষ্য করিল না।

ননী অস্বাভাবিক একটা তর্জ্জন করিয়া কহিল,—ছেড়ে দাও বলছি, নইলে ভাল হবে না।

রোদন রত ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিয়া ফিরিঙ্গি ছেলেটি ননীর মুখের খুব কাছে মুখ আনিয়া বলিল,—লড়্‌তে চাও? আচ্ছা—চলে এস!

কি করিয়া যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহা ননীর ঠিক মনে নাই। হঠাৎ সে দেখিল সে ফিরিঙ্গি ছেলেটির সহিত দারুণ লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের ঘিরিয়া একটা চক্র রচনা হইয়া গেল এবং যাহারা ফুটবল খেলা দেখিতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই নূতন খেলা দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ফিরিঙ্গি ছেলেটি বোধ হয় মুষ্টিযুদ্ধ কিছু কিছু জানিত, তাই প্রথম হইতেই ঘুষি চালাইয়া ননীর নাক মুখ ভাঙ্গিয়া দিবার উপক্রম করিল। ননী কিন্তু মরিয়া হইয়া লাগিয়া রহিল। দুজনের বয়স প্রায় সমান—শরীরও সমান বলবান বলিয়া বোধ হয়। লড়াই বেশ জমিয়া উঠিল।

ননী একবার লেঙ্গি দিয়া প্রতিপক্ষকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল এবং তাহার মুখে মাথায় অপটু হস্তে কিল মারিয়া তাহাকে কাবু করিবার চেষ্টা করিল! ফিরিঙ্গি ছেলেটি কিন্তু ননীকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে ঘুষ চালাইয়া ননীর পেট ও মুখ থেতো করিয়া দিতে লাগিল। ননীর অবস্থা যায় যায় হইয়া উঠিল!

কিন্তু ননীর মনে ভয়ের লেশমাত্র নাই—সে তখন যুদ্ধের উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে! হারজিত যে অতি গৌণ ব্যাপার,—যুদ্ধটাই যে চরম সার্থকতা—এই মহৎ সত্য ননীর শিরায় শিরায় তখন নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড লাফ্‌ দিয়া ননী ফিরিঙ্গি ছেলেটির একেবারে ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল এবং দুই হাতে তাহাকে ভাল্লুকের মত চাপিয়া ধরিয়া পিষিতে

আরম্ভ করিল। ধৃতরাষ্ট্র যেমন করিয়া লৌহভীম চূর্ণ করিয়াছিল এ যেন কতকটা তাই!

ফিরিঙ্গি ছেলেটি আর ঘুষি চালাইতে না পারিয়া প্রাণপণে ননীর আলিঙ্গন মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ননী তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঠার মত নেপ্‌টাইয়া গিয়াছে। তাহার বাহু বন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে!

ক্রমশঃ ফিরিঙ্গি ছেলেটির মুখ নালবর্ণ হইয়া উঠিল! সে বন্ধনমুক্ত হইবার একটা শেষ চেষ্টা করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"হয়েছে, এবার ছেড়ে দাও—pax—শান্তি!

ননী ছাড়িয়া দিতেই দুজনে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।

প্রথমে ফিরিঙ্গি ছেলেটি হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল; "তোমার গায়ে খুব জোর ত! বক্সিং জান্‌লে কোন কালে তুমি আমায় হারিয়ে দিতে।"

ননী তাহার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিয়া উৎফুল্ল ভাবে বাংলা ইংরাজীতে মিশাইয়া বলিল; "তুমি খুব ভাল বক্সিং জানো—না? উঃ কি কিলটাই মেরেছ—এই দেখ ঠোঁট কেটে গেছে।

ফিরিঙ্গি ছেলেটী হাসিয়া বলিল;—তুমি শিখবে? আমি ভাল জানি না বটে কিন্তু তোমাকে শেখাতে পারব।

ননী মহা আগ্রহে বলিল, হ্যাঁ শিখব। কা[ল] থেকেই তাহলে—হ্যাঁ—কি বল?

—আচ্ছা।

—তোমার নাম কি? আমার নাম ননী—নন[ী] গাঙ্গুলী।

—আমার নাম ডিক্—ডিকি ফ্রাঙ্ক্‌লিন।

ডিক চলিয়া গেলে পর ননীর বন্ধুবান্ধব ননীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ফুটবল ম্যাচ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে।

বিশু সগর্ব্বে তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া বলিল, "সাবা[স] খলিফা, হিম্মৎ দেখিয়েছিস বটে! আমি বরাবরই জানি ননেটা চুপচাপ থাকে বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে [সে] একটা আসল গুণ্ডা!—এঃ—ননী, চোখটা একেবারে বুজে গেছে যে!"

ননী একটিমাত্র দৃষ্টিক্ষম চক্ষু ও পটলের মত ফীত ওষ্ঠপুট লইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, ও কিছু নয়—কালই সেরে যাবে। ডিক কিন্তু বেশ ছেলে—না?

সেদিন হল্লা করিতে করিতে, গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিবার পথে ননী জীবনে প্রথম পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ পাইল। যে রাক্ষসটা এতদিন তাহাকে মুঠির মধ্যে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছিল, আজ স্বহস্তে সেই রাক্ষসকে বধ করিয়া যেন বিজয়ীর ললাটিকা পরিয়া সে বাড়ী ফিরিল।

পুষ্পপাত্র-গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত।

পুষ্পপাত্র ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা ৪নং

PUSPAPATRA PHOTO COMPETITION No. 4

১ম পুরস্কার 1st Prize

"প্রতিচ্ছবি"

শ্রীবরেন ঘোষ,

[illegible]

পুষ্পপাত্র ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা ৪নং
PUSPAPATRA PHOTO COMPETITION No. 4

২য় পুরস্কার 2nd Prize

"পরিচর্য্যা"

শ্রীক্ষীরোদ কুমার চৌধুরী, কলিকাতা।

অতিরিক্ত পুরস্কার

"রাত্রিতে জেনারেল পোষ্ট অফিস"

শ্রীঅমরেন্দ্র শেখর ঘোষ, কলিকাতা।

গ্রন্থ-পরিচয়

মাটির স্বর্গ—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—বরেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। উপন্যাস—মূল্য ২৲!

প্লট—এই উপন্যাসখানি যখন মাসিক বসুমতীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল তখনই আমরা ইহা পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম—আমাদের ভালই লাগিয়াছে। অসমঞ্জ বাবুর পরিণত লেখনীর সৃষ্টি যে উৎকৃষ্ট হইবে—এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহও ছিল না। শ্রদ্ধাসিক্ত মনেই গ্রন্থখানি আমরা পড়িয়াছি—আমাদের যতটা ভাল লাগিবে অন্যের ততটা না লাগিতেও পারে। এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য এই—অসমঞ্জবাবুর বয়নকরী প্লটটি সম্পূর্ণ বর্ত্তমানকালের উপযুক্ত নয়। বর্ত্তমান সময়ের লেখকরা প্লটের মধ্যে যে সকল বৈচিত্র্যের সমাবেশ করেন—অসমঞ্জ বাবুর উপন্যাসে তাহা নাই—তাহাতে আমাদের রসোপভোগের কোন অসুবিধা হয় নাই—কারণ আখ্যান-বৈচিত্র্য যে কালের উপযোগীই হউক সেটা আমাদের কাছে তত বড় কথা নয়—রস জমিয়াছে কিনা সেটাই আমরা দেখিতে চাই। অবশ্য প্লটের মধ্যে আর্টের খেলা কম থাকে না—ইহাও স্বীকার করি!

চরিত্র—এই উপন্যাসখানিতে যে কয়টি villain এর চরিত্র আছে তন্মধ্যে গয়ারামের ও সুখদার চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। মহৎ চরিত্রের মধ্যে হীরু ঠাকুরের চরিত্রটি অপূর্ব্ব। হীরুঠাকুরের মুখের কথাগুলি শুনিতে ভালই লাগে। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে হীরুর চরিত্রটি কেমন ফুটিয়াছে—পাঠক বিচার করুন।

হিরু ঠাকুর নেপালকে কহিতেছে—"নাতি, অমৃতের আস্বাদ ত পেলি না, কি আর বুঝবি বল্? দু এক ছিলিম টানা অভ্যাস থাকলে কি আর আজ আমার কাছে এসে তোকে মৎলব জানতে হয়? মৎলব তাহলে আপনি মাথার ভেতর গজ গজিয়ে উঠত?"

মৃদু হাসিয়া নেপাল কহিল—"তাই বুঝি দেবতারা বিপদে পড়লে মহাদেবের কাছেই পরামর্শের জন্য ছুটতো?"

হো হো করিয়া উচ্চ হাসির একটা ঢেউ তুলিয়া হীরু ঠাকুর কহিল—"ঠিকই বলেছিস ভায়া। হাজার হোক নাপতের ঘরের ছেলে, চালাক চতুর, বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, তার ওপর লেখাপড়া শিখিছিস; আবার সবের ওপর মধ্যে মধ্যে একটু আধটু 'মাই-ডিয়ারি করে'ও থাকিস!

চমকিত হইয়া নেপাল বলিয়া উঠিল—"কি! তুমি বলতে চাও, আমি মদ-টদ কিছু খাই?"

"আহা-হা! গায়ে মেখে নিস্ কেন, ভায়া? খাসই যদি, তার হয়েছে কি? ম্যালেরিয়ার দেশে খাবি না? একটু আধটু নেশা করলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হোয়ে যায়? খাবি বৈ কি! আমি ত ডাক-সাইটে নেশাখোর, তুই হলি—আমার নাতি। পথ ত দুজনেরই এক ভায়া, তবে, তোর দিকটায় কাদা, আমার দিকটায় ধুলো।"

"মাইরি বলচি হীরুদা—

"আবার দিব্বি গালে! হ্যারে, 'ফাষ্টবুক'খানাও একেবারে ভুলে গেলি, 'ডু নট সোয়্যার'—'দি মাউস স্কুইক্? ভাখ, হিরুদার এই আড্ডা চিরজীবী হোয়ে থাক, এর বাড়-বাড়ন্ত হোক্। আন্দাজ করে যা বলে দোবো, জানবি,—নির্ঘাৎ। এই তোরই সম্পর্কে তোর বাপকে যা বলেছিলুম, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে! সে ভাল লোক ছিল—স্বর্গে গিয়েছে, নইলে একদিন অমাবস্যের রাত্রে 'গাঁবাড়ির শ্মশানে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সামনা-সামনি ভজিয়ে দিয়ে আসতে পারতুম।"

অন্যত্র---

"শূয়ার, ষ্টুপিড, রাসকেল কোথাকার! সে জাতব্যবসার দোষও নয়, তোর বাপেরও দোষ নয়। অন্ধকার যে দেখচিস, সে তোর নিজেরই—দোষ। প্রেষ্টিজের ভয়ে চোখ বুজিয়ে থাকবি, তা অন্ধকার দেখবি না? বলি, 'প্রেষ্টিজ' তোর বাবার ছিল না? গাঁয়ের লোক কেউ কি তাকে গোপাল নাপতে বলে মনে করত, না শুধু তার সঙ্গে সকলের চুল-ছাঁটবার আর দাড়ি-কামাবার সম্পর্কই ছিল? সে গাঁয়ের সকলেরই দাদা, কাকা, জ্যেঠা, ছোটভাই, ভাইপো হোয়েই কাটিয়ে গেছে। এই---বাগদী পাড়ার ছিমন্ত খুড়োকে দেখলে আমাকেও গাঁজার কলকে লুকিয়ে ফেলতে হয়। কেন? ওকে শুধু ছিমন্ত বাগদী বলেই ত মনে করতে পারি? কিন্তু তা ত আর পারিনা। আমাদের গাঁয়ে-ঘরে এই জিনিষটার ভেতর অনেকখানি আত্মীয়তা, সমবেদনা আর মাধুর্য্য আছে, ভায়া। গ্রামে প্রেষ্টিজের ধার কেউ ধারে না ইত্যাদি ইত্যাদি

বর্ত্তমান যুগের নূতন হাওয়ার কথা মনে করিয়া হিরু ঠাকুর ভাবিল——

কোন, দিকেই বা ঠেকাইয়া রাখা যায়! দেশের ঢেঁকিগুলো সব যাবার দাখিল হয়েছে, তার জায়গায় এক একটা বিরাট কল পাতাল পর্য্যন্ত আসন গেড়ে রাক্ষসের মত দিনরাত হুঙ্কার ছাড়চে। কলুর গোষ্ঠী ঘানি বন্ধ করে দিয়ে, তেলকলে গিয়ে চাকরি নিচ্ছে; প্রামাণিকের দল 'গিলেট' 'ভ্যালেট্' প্রভৃতি রকমারি "সেপটি রেজরের' চাপে ক্রমে ক্ষীণ হোয়ে আসচে। কুমরের চাকে আর পেতল-কাঁসার কারখানার ওপর 'য়্যলুমিনিয়ম' তার রাজাসন বিছিয়ে বসেছে। দেশের বৈদ্যরা রুগী পায় না, ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ হোয়ে আসচে, তাঁতী দুধের ব্যবসা করে, গোয়ালারা কোর্টের পেয়াদা হয়। তীর্থে তীর্থে আর যাত্রী হয় না, সময় ও সুবিধা পেলেই সকলে ছোটে পাহাড়ে। গাঁয়ে গাঁয়ে পণ্ডিতের টোলের জায়গায়, ট্রেনিং স্কুলের' কাঠামো খাড়া হোয়েচে। ঘরের মেয়েরা বাইরে যেতে চায়, ছেলেরা হা-ডু-ডু'র বদলে ফুটবল খেলে, সন্দেশের বদলে কেক-বিস্কুটে তাদের যেন লোভ বেশী। সব চেয়ে মজা এই যে, বুড়োরাও ভোরে উঠে সাজি হাতে বাগানে বাগানে ফুল তোলা ছেড়ে দিয়ে; কুকুরের শেকল হাতে করে মর্নিংওয়াক করতেই ব্যস্ত। আর যাত্রা কথকতা শোনবার ঝোঁক কাটিয়ে সার্কাস বায়োস্কোপকেই তারা বাহবা দেয়।

ভাবিয়া হিরু ঠাকুর সিদ্ধান্ত করিল————

কালের একটা প্রভাব আছে, দেশের ওপর তা না পড়ে পারে না। আশ-পাশের চারি দিককার নতুন হাওয়া জোরে বইতে সুরু করেছে, তখন এ দেশেও তার ধাক্কা না লেগে পারে না। ইয়োরোপ-আমেরিকার ঢেউ ভারত মহাসাগর বেয়ে ভারতের তিনকূলে এসে আছাড় খায়। ভারতবর্ষকে আর ভারতবর্ষ করে কেউ রাখতে পারবে না— 'ইণ্ডিয়া' হয়ে যাবেই * * *

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিল————

"দেশ পুরোপুরি যদি য়ুরোপ হোয়েই পড়ে, তাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু পুরোপুরি না হলে ক্ষতি। দেশের গরু-বাছুর, ছাগল, কুকুর থেকে আরম্ভ করে চাষ-বাস, শিক্ষা-স্বাস্থ্য; ধন; বিজ্ঞান; সব বিষয়েই যদি ঐ রকম উন্নতি করতে পারে ত সে খুব ভাল কথা; কিন্তু আসল দিকে কোন উন্নতির চেষ্টা না করে, খালি পোষাক-পরিচ্ছদ আর কতকগুলো বদ্ আচার-ব্যবহারের নকল করাই ত সব নয়। দেশ পায়না খেতে। দেশের সে রূপও নেই, সে শ্রীও নেই। লোকের এখন না আছে সম্পদ, না আছে শান্তি! ঘরে ঘরে এখন অন্নাভাব, রোগ, হাহাকার আর চোখের জল!

দেশের প্রতি হীরুঠাকুরের ভালবাসা যে কত গভীর তা তার এই কথাগুলি হইতে জানিতে পারা যায়—

"ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরতে হয়; এইখানেই মরব। ভগবানের কাছে এই চাই যে যেখানে জন্মেছি সেখানকার আলো বাতাসের ভিতর দিয়ে জীবনের এতগুলো বছর কেটে গেছে; শেষের বাকী কটা বছর সেইখানেই যেন কেটে যায়। সত্যি বলচি নেপু। সেই আমার পরম সুখ; সেই আমার কামনা। তাতেই আমার পরম তৃপ্তি।

ঐ আমার পূর্ব্বদিকার ঘরখানিতেই যেন আমার মরণের বিছানা পাতা হয়। ওর দক্ষিণের এই খোলা জানালা দিয়ে; আমার চিরদিনের বন্ধু শ্যামসুন্দরপুরের এই আলো; আকাশ; গাছপালা; পথ ঘাট; দূরের ঐ মাঠ-বিল; ঐ জলা; প্রান্তর; প্রান্তরের শেষে ভিন্-গাঁগুলির ঐ অস্পষ্ট রেখা; এই সব দেখতে দেখতেই যেন আমি চোখ বুঝতে পারে।

ছোট চরিত্রের মধ্যে গিরিডির কালীর চরিত্রটি অল্প পরিসরের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণাঙ্গ—তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। তাহার স্বামী নিরুদ্দেশ—সে বৎসরের পর বৎসর রামচন্দ্রের অপেক্ষায় শবরীর মত প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কোথাও তাহাকে যাইতে বলিলে সে বলে—"না ভাই, কখন' সে এসে পড়বে। বাড়ী না পেলে যদি ফিরে যায়!"

চিত্র—অসমঞ্জবাবুর চিত্রাঙ্কণের ক্ষমতাই সব চেয়ে অপূর্ব্ব। শ্যামসুন্দরপুর গ্রামটিকে এমন করিয়াই লেখক ফুটাইয়াছেন যে উহা আমাদের কল্পলোকে চিরদিনের জন্য অক্ষয় হইয়া গেল। এই ত শিল্পীর কাজ। বাঙ্গালার গ্রাম বলিলে বিভূতিবাবুর পথের পাচালীতে অঙ্কিত গ্রামের পাশেই অসমঞ্জবাবুর অঙ্কিত গ্রামটি আমাদের মনের চোখে স্বতই ভাসিয়া উঠিতেছে। অন্যান্য চিত্রের মধ্যে গিরিডির চিত্রটিও বড়ই হৃদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভাষা—অসমঞ্জবাবুর ভাষা সহজ, সরল, স্বচ্ছ প্রাঞ্জল। উপন্যাসের ভাষা ত এমনিই হওয়া উচিত। ভাষার জন্য যদি বুদ্ধিকে পীড়ন করিতে হয়—তবে রসোপভোগ সম্পূর্ণ হইবে কেন? মাটির স্বর্গে লেখক তাঁহার নিজস্ব ভাষাটিকে সর্ব্বত্র অধিকৃত রাখেন নাই! মাঝে মাঝে সবল করিয়া বলিবার জন্য কিছু কিছু কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য অসমঞ্জ বাবুকে দোষ দিই না—কারণ ওটা যুগ ধর্ম্মের প্রভাব। তবু বলি—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। একটা কথা কিন্তু বলিতে হয়—অসমঞ্জবাবুর ভাষায়

ওজস্বিতা ছিল না—এই উপন্যাসখানিতে ভাষা স্থানে স্থানে ওজস্বিনী হইয়াছে—

যেমন—

নেপাল। * * * কিন্তু আমাদের ভাগ্যে দেশের এই শ্রী-সম্পদের এককণাও ভোগ হ'ল না। আমার মনে হয় জীবনের সুখ---টাকা-পয়সা গয়না-গাঁটি বিষয়-আশয় গাড়ী-ঘোড়ার মধ্যে নেই; আছে ভগবানের সৃষ্টির এই সব সৌন্দর্য্য ভোগের ভেতর। কিন্তু সংসারের কাজ-কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রকৃতির এই সব শ্রী-সম্পদের সঙ্গে পরিচয়লাভ আর আমাদের ঘটেই ওঠে না; পাহাড় পর্ব্বত সাগর ঝরণা দূরের কথা মাথার ওপর অনন্ত নীল আকাশের যে সৌন্দর্য্যলীলা তাই বা কখন চেয়ে দেখি বলুন। চোখের সামনে কানের কাছে দিয়ে বছর বছর ছ'টা ঋতু যে অনবরত ডাক দিয়ে সাড়া দিয়ে চলে যায় আসে তা'ও কি কখনো আমরা চাই? কত বসন্ত কত বর্ষা কত শরৎ তাদের মধু ছড়াতে ছড়াতে কখন্ কোন্ সময়ে যে আসে আর যায় তার আভাস পর্য্যন্ত আমরা জানতে পারি না।

অর্চ্চনা। আপনার ভেতর কবিত্ব দেখচি কম নেই নেপাল বাবু!

মাটির স্বর্গ নামের সার্থকতা। মাটির স্বর্গ নাম সার্থক হইয়াছে। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন—"পল্লীর প্রতি গভীর মমতার ফলে মাটীর স্বর্গের সৃষ্টি। গ্রামকে আমি গ্রাম্য দেবতার চেয়েও ভালবাসি।"

সত্যই পুস্তকখানিতে পল্লীর প্রতি গভীর মমতাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। লেখকের পক্ষ হইতে সার্থকতা হইলেই গ্রন্থের নাম সম্পূর্ণ সার্থক হয় না—গ্রন্থের চরিত্রের সহিতও তাহার সার্থকতার সম্বন্ধ থাকা চাই। বলা বাহুল্য—সে সম্পর্ক ত আছেই। হীরুঠাকুর এই মাটির স্বর্গের উদ্গাতা—নেপাল এই স্বর্গে ফিরিয়াই মৃত্যুর আগেই স্বর্গপ্রসাদ ভোগ করিল—ব্রজরাণী স্বামীর প্রাণভরা কামনা দিয়াই এই স্বর্গকে পুনর্গঠন করিল। নেপালের মুখের এই কথাগুলি তাহার প্রাণেরই কথা—

"মন আমার অহর্নিশ আমাদের সেই শ্যামসুন্দরপুরের মাঠে ঘাটেই ছুটে পালিয়ে যায়। সেখানকার সেই পল্লী-শ্রী, পায়ে-চলা সেই মাঠের পথ। সেই আম-কাঁঠালের বাগান, বাঁশ-ঝাড়, ঝোপ-জঙ্গল, নদীপারের সেই কাশ-বন আর পাটের ক্ষেত, গ্রাম-প্রান্তের সেই পদ্ম-ফোটা বিল এ সবের যে রূপ সহরের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সে রূপ আমি খুঁজে পাই না।"

. . . .

তবু বাবা সেই মাটিটুকুর কী যে টান তা আর বলতে পারি না; মনে হয় ম্যালেরিয়ায় মরি আর সাপ-শিয়ালের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যেই বাস করি কিন্তু তাইতেই যেন সব সুখ তাইতেই যেন প্রাণের সব তৃপ্তি। . . . আমার শ্যামসুন্দরপুরের সূর্য্য চিরকাল তাঁকে সকালবেলায় বিলের ধার থেকে উঠতে দেখিচি। নদীর পারে ডুবতে দেখেচি কিন্তু কোলকাতায় এসে একটি দিনও তাঁর উদয় অস্তের খবর পাইনি। মানুষের বাড়ী-ঘর-দোর চারিদিককার বাতাসকে পর্য্যন্ত সেখানে কাছে আসতে দেয় না। ভগবানের রাজ্যে মানুষ কি অত্যাচারই যে চারিদিকে করে রেখেচে!"

অন্যত্র—

* * * হয় ত সমস্ত অর্থ আমি আমার দেশ মায়ের পায়ে ঢেলে দিতুম। হয় ত কেন ওই ঠিক দিতুম। আমি আমার শ্যামসুন্দরপুরের আগেকার সেই রূপ ফিরে আনবার চেষ্টা করতুম। গ্রামের বন-জঙ্গল কাটাতুম পচা পুকুর ডোবা সব বুজিয়ে তার জায়গায় নতুন নতুন সব পুকুর কাটাতুম বাইরে থেকে লোক এনে বসাতুম হাসপাতাল স্কুল টোল এই সব বসাতুম নিরন্নদের অন্নের ব্যবস্থা করতুম্ আর বিপন্নদের ব্যথায় বুক পেতে দিতুম।"

নে।—আর আপনার ভেতর বুঝি কম আছে বলতে চান? এ দেশের ত সকলেই কবি। স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো মুটে মজুর রাজা প্রজা সকলেরই ভেতর ছন্দভরা। ভগবান এ দেশ কবিতার ছন্দে সৃষ্টি করেচেন এর আকাশে সুর বাতাসে সুর মাঠে সুর ঘাটে সুর পাহাড় পর্ব্বত জল স্থল সর্ব্বত্রই এর সুরে ভরা। এ দেশের ধোপায় কাপড় কাচে গান গেয়ে গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকায় গান গেয়ে কুলী মজুর কাজ করে গান গেয়ে দাঁড়ি মাঝিরা নৌকো বায় গান গেয়ে। তাই এদেশের ভিখিরী ফকির পান্থ তীর্থযাত্রী সকলের মুখেই গান। এমন কি এ দেশের ফুল শুধুই তার রং ছড়ায় না গানের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য সে ফুটে ওঠে পাখীরা গান গেয়ে গেয়ে আকাশে ওড়ে। এমন কবিতার দেশ এমন গানের দেশ জগতের আর কোথাও আছে বলতে পারেন?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত অর্চ্চনা কহিল "কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি কে একজন খুব বড় পণ্ডিত নাকি বলে গেছেন যে দেশ যত বেশী অসভ্য আর মূর্খ থাকে তার গান কবিতাও তত বেশী থাকে। আমের দেশে সভ্যদেশে কবিতা গানের জন্ম হয় না। এ দেশ ছিল জংলী লোক ছিল সব বুদ্ধি-শুদ্ধি হীন অজ্ঞান বালকের মত তাই গানেতেই দেশ ভরে আছে।"

"দেখুন, বেশী লেখাপড়া শিখিনি, কে কি বলে গেছেন, সে সব খবর রাখি না, তবে যিনি বলে গেছেন তিনি যেই হোন, তিনি মানবজীবনের সত্যকার আসলবস্তুর সন্ধান পাননি। ভারতের বেদ উপনিষদের গান বাদ দিলেও তার চলতি মেঠো গানের ভেতর যে গভীর ভাবের ইঙ্গিত থাকে, তা বুঝতে তাঁর মত সভ্যদেশের পণ্ডিতকে আরও কিছু জ্ঞানী হতে হবে, না হলে তিনি ভারতের সভ্যতার ওজনই ঠিক বুঝতে পারবেন না।

মৃদু হাসিতে হাসিতে অর্চ্চনা কহিল "তা যাই কেন বলুন না ; এদেশের লোকের মত আলসে জাত আর জগতের কোথাও নেই। পরিশ্রম করতে পারে না, দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে পারবে না ; পারবে শুধু বসে বসে গান করতে।"

একটু উত্তেজিত হইয়া নেপাল কহিল,---"পরিশ্রম করবার এ দেশের লোকের কোনকালেই দরকার যে হত না। আপনি জগতের লোকের সঙ্গে তুলনা করছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে এদেশের তুলনা হয় না। এদেশের লোক বিনা পরিশ্রমেই বসে বসে পেট পুরে খেতে পেতো, পরতে পেতো ; খাওয়া পরার জন্য এ দেশের লোকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলবার দরকারই যে হ'ত না। শুধু সমুদ্রের নোণা জল, পাথরের চাই আর বরফের স্তূপ দিয়ে এ দেশকে ত' ভগবান তৈরী করেন নি।"

মৃত্যু শয্যায় শুইয়া শুইয়াও নেপাল দেখে—

তখন সকালবেলা অদূরের মালীপুকুরে হাঁসের পাল সাঁতার কাটিতে কাটিতে ডুব দিয়া খেলা করে, পুকুর পাড়ে সাঁওতালদের ছেলেরা ধনুকহাতে কাঠবিড়ালের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়, ও-পারের মনসাতলায় ছেলের দল 'চু-কপাটি' কিম্বা 'ধাপ্পি' খেলে। আরও দূরে, নেনোর বটতলায়, রাখালেরা গরু ছাড়িয়া দিয়া ওদিককার জামগাছে উঠিয়া গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে ; তাহারই ওদিকে, কেহ হয়ত আউস ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়, কেহ বা কলাই ক্ষেতে কলাই বুনে। পাড়ার ঝি বৌরা মাঠের বিল হইতে স্নানান্তে তখন খাবার জলের ঘড়া কাঁকে করিয়া ভিজা কাপড়ে ঘরে ফিরে। আর আমবাগানে বাঁশের ঝাড়ে, শিমুল গাছে তেঁতুল ডালে---দোয়েল, শালিক, বুলবুলি 'গৃহস্থের খোকা হ'ক' 'কেষ্ট গোকুলে' প্রভৃতি পাখীর দল শিষ্ দিতে দিতে উড়িয়া বেড়ায়, বৈচিবনের ঝোপে ঝোপে ছাতারের দল উল্লাসে নাচিয়া বেড়ায়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই সব দেখিয়া নেপাল নিজের মনেই এক সময় বলিয়া উঠে, এই আমার স্বর্গ---এই আমার স্বর্গ।"

মোটের উপর, বাংলা দেশকে যাহারা প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসে তাহারা মাটির স্বর্গকেও ভালবাসিবে। রায়

স্নেহের দাবী—উপন্যাস

শ্রীনিবিরাজ হালদার প্রণীত। কালীঘাট, বিপুল সাহিত্য ভবন হইতে প্রকাশিত। পাইকা টাইপ ১৬০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কাগজ ও বাঁধাই মনোজ্ঞ।

নবীন লেখকের উপন্যাসখানি পড়িয়া বেশ জানিতে পারা যায় যে লেখক তাঁহার অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়া বইখানি লিখিয়াছেন। রাণী তাহার দুঃখের জীবনে শেষকালে যে সুখী হইতে পারিল, ইহাতে পাঠকের মনে স্বতঃই একটা আরাম লাগে। ছবির মনের মহত্ব ও ত্যাগ প্রশংসার বস্তু। চণ্ডীর গ্রামের প্রতি ভালবাসা ও দেশ-মায়ের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা খুবই ভাল। দামোদর পারের পল্লী-সৌন্দর্য্য বর্ণনা উপভোগ্য। লেখকের লেখনী বর্ত্তমান উপন্যাসখানির সহজ ও সরল লেখার মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের একটা আশা আমাদের মনে জাগাইয়া দিয়া যাইতেছে। অঃ মু

ভোরের আলো

—গল্প

শ্রীরজত সেন

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। বাইশ বছরের ছেলে একটী সতেরো বছরের মেয়েকে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। ঘটনাচক্রে তাদের পাশাপাশি বাড়ী। দুজনেই মাতৃপিতৃহীন। এখানে মেয়েটির মামার নিষ্ঠুরতা আর ছেলেটির কাকা-কাকীর অগাধ স্নেহ এই দুটি বিভিন্ন মনোগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেয়েটি তার মামার বিষাক্ত সংসারে নিজের দুর্ব্বিষহ জীবনটাকে প্রায় খাপ খাইয়ে এনেছিল—এমন সময় তার স্নেহবুভুক্ষু প্রাণে যার কোমল করের ঘা লাগল, বেশী করে ভাববার সময় পেলে না তাকে বল্‌লে—চল যাই যেখানে আমাদের মিলনে কোন বাধা নেই; যেখানে কেউ আমাদের চেনে না।

মেয়েটীর মামা বল্‌লে—ছিল একরকম কাজকর্ম্ম বেশ চলছিল। এবার রাখ ঝি—টাকার শ্রাদ্ধ।

ছেলেটীর কাকী বল্‌লে—কেন গেল ? সত্যিকারের স্নেহের চাইতে কি মিথ্যা মোহের টনে বেশী ?

কাকা বললেন মিথ্যা মোহ নয়। কিন্তু ওদের ভালবাসা টি'কে থাকবার স্থান পাবে না।

জ্যোৎস্না এবং সমীর। দুজনেই বড় রাস্তায় এলো। সমীর বল্‌লে—একখানা ট্যাক্সী ডাকি। জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করলে যাবে কোথায়?

সহরের বাইরে যেখানে হোক।

জ্যোৎস্না বল্‌লে—পয়সা নষ্ট করে কি লাভ চল বাসে যাই।

দুজনে ষ্টেশনে পৌঁছাল। সমীরের হাতে একটা মাঝারি সুটকেস। ওই ওদের সম্বল।

সমী বল্‌লে—কোথায় যাবে?

জ্যোৎস্না একটু হেসে বল্‌লে—যেখানে নিয়ে যাবে?

সমী বল্‌লে, এত নির্ভরতা?

জ্যোৎস্না পূর্ব্ববৎ হেসে বল্‌লে—কেন নয়?

ভেবে চিন্তে এলো শ্রীরামপুর। ট্রেণে কয়েক মিনিটই বা ছিল। সহরের বাইরেও বটে—আর বেশ নিরিবিলি। সমীরের এক বন্ধু আছে ওখানে শ্রীরামপুর কলেজে পড়ে। ওর বাবা ওখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

বেলা সকাল আট্‌টা হবে। ওরা গঙ্গার ধারে ধারে কলেজের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। এখানকার রাস্তা-ঘাট ওদের কাছে নিতান্ত অপরিচিত। ওর বন্ধু নীতিশ, হোষ্টেলে থাকে—তাকেই তাই তাদের সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী একজন মালীকে দিয়ে ডেকে পাঠালো—নীতিশ বাবুকে ডেকে দে'। সে বোধ হয় এই হোষ্টেলের রাস্তায় বাঙ্গালীর মেয়েকে এই প্রথম দেখলে। গেল চলে।

—জ্যোৎস্না।

বল।

আচ্ছা হঠাৎ এমনি আচম্‌কা বেরিয়ে পড়া—এটা কি রকম যেন লাগছেনা কি?:

সুটকেশটা মাটিতে রাখলে।

জ্যোৎস্না হেসে বল্‌লে—বাব্বাঃ তুমি আবার বাঁকা করে কইতে শিখ্‌লে কবে? কি জান তোমাদের সব বিধাতা অমুক এসব একেবারেই বুঝিনে। জানি জীবনটাই সব চাইতে বড় সত্যি।

সমীর জিজ্ঞাসা করলে—কি রকম লাগ্‌ছে?

জ্যোৎস্না বল্‌লে—এখন সম্প্রতি কিছুই লাগছে না।

সমীর একটু অবাক্ হয়ে বল্‌লে—সে কি? বাড়ীর কথা, কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে—একটুও ভাবনা আসে না?

জ্যোৎস্না বল্‌লে—বাড়ী গেছে মরে। যাওয়ার ভাবনার অর্দ্ধেক তোমার উপর, অপরার্দ্ধের ভার বেশ বইতে পারবো। কিন্তু ওসব এখন চাপা থাক—কে আস্‌ছেন দেখ উনিই কি তোমার বন্ধু?

সমী বল্‌লে—হ্যাঁ।

নীতিশ ওকে দেখে অবাক হোল। বল্‌লে একি রে? তুই—না না তোর প্রেতাত্মা?

সমী হেসে উঠল, বল্‌লে—না রে—স্বয়ং।

নিতীশ বল্‌লে—দেখি হাত বাড়া, ধরে ছুঁয়ে দেখি। ইনি কে? বোন নাকি? তোর আবার বোন কোথায় ছিল, কিন্তু অন্য কিছু মনে করবার সুযোগ বা সৌভাগ্যের চিহ্নও তো নেই।

জ্যোৎস্না হাত তুলে নমস্কার করলে। নীতি প্রতিনমস্কার জানালে।

সমী বল্‌লে—উনি জ্যোৎস্না দেবী, আমার—

নীতি শেষ করাল—বন্ধু?

সমী বল্‌লে—হ্যাঁ, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে নয়, এসো।

তিনজনেই পা চালালো।

নীতি বল্‌লে—কিছুই ত পরিষ্কার হোল না। সমী বল্‌লে—এখন আপাততঃ ঘোলাই থাক; কিন্তু ভাই একটা আশ্রয় যে চাই,—একটু নিরিবিলি। নীতি বল্‌লে—দাঁড়া ভেবে দেখি। একটু পরে বল্‌লে—না রে কোথাও ত দেখছিনে। এক আছে আমাদের বাড়ী ওখানে না-হয় চলনা। সমীর জ্যোৎস্নার দিকে তাকালে। জ্যোৎস্না আস্তে আস্তে বল্‌লে—সে কি করে হবে। আমাদের এমনি করে যাওয়া তাঁরা ভাল ভাববেন! সমী বল্‌লে—এখানে ভাড়া পাওয়া যায় না আলাদা ঘর কিংবা—

নীতি বল্‌লে—ও হ্যাঁ আমাদের সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা যার কথা তোকে লিখেছিলাম,—কিন্তু তাতে কি থাকতে পারবি। ভাঙ্গা-চোরা ধূলোয় ভর্ত্তি।

সমী উৎসাহিত কণ্ঠে বল্‌লে—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়েছে ওই আমাদের বেশ হবে চল্‌।

অবশেষে ওরা নীতিদের পুরাতন জীর্ণ কোটাবাড়ীতে এলো। অনেকখানি জায়গায় গাছপালা ঘেরা। বাড়ীর অনেকাংশ একেবারে জীর্ণ। উপরের ঘরগুলিতে নানাপ্রকার গাছ হয়েছে। নীচে একটা ঘরে কোন প্রকারে থাকা চলে।

তিনজনেই ঢুকলো। বহুদিনের বন্ধ দরজাগুলি নীতি একে একে খুলে দিলে। অপর্য্যাপ্ত আলো আর হাওয়া এসে ঘরে ঢুক্‌লো। ঘরটায় এক ইঞ্চি ধূলো।

নীতি কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বল্‌লে···এখানে কি তিষ্টোতে পারবি—ওঁর কিন্তু কষ্ট হবে ভয়ানক। জ্যোৎস্না অপ্রতিভের হাসি হেসে বল্‌লে—না—না, আপনারা থাকতে পারলে আর আমি পারবোনা? আপনি কিছু ভাববেন না।

নীতি গেল। সমী জ্যোৎস্নাকে বল্‌লে—চল এখানেই আস্তানা গাড়তে হবে। আপাততঃ দেখি সব। সুটকেস্‌টা এখানেই থাক্‌—কি বল?

জ্যোৎস্না বল্‌লে—থাক্‌না!

ওরা দুজন হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ বেড়ালে এদিক ওদিক। বাড়ীটার চতুর্দ্দিকে অনেকখানি বিস্তীর্ণ জায়গা। গাছপালা এত বেশী যে কোন প্রকার ঘেরার প্রয়োজন হয় না। দূরে সরকারী রাস্তা; লোকচলাচল নিতান্ত কম। ওরা একটা পুকুরের ধারে গাছের ছায়ায় বস্‌লো। জ্যোৎস্না বল্‌লে—আর একটু সরে। সমী ওর গা ঘেঁসে বস্‌লো। সমী জিজ্ঞাসা করলে—ক্ষিদে লেগেছে নয়?

জ্যোৎস্না বল্‌লে—একটু।

সমীরের মুখচোখ দুষ্টুমীতে ভরে উঠল; বল্‌লে—এখানে একটা জিনিষ যত ইচ্ছে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে পেট ভরবে কি?

জ্যোৎস্না বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কি?

সমী ওর মাথাটা টেনে নিয়ে ওর ঠোঁটে একটা চুমা দিয়ে বল্‌লে—এই। জ্যোৎস্নার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলোনা। সমীরের সারামুখে একটা সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। সমীরের তপ্ত হাতের মধ্যে ওর শীতল হাত দুটি ভিজে উঠলো। ভয়ানক ঠাণ্ডা।

জ্যোৎস্না হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলে পাগলের মত। সমী একেবারে বিস্মিত হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে—কি ব্যাপার? এমন করে হাসির অর্থ?

জ্যোৎস্না হাত আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, অর্থ কিছুই নয়, হাসলাম এমনি। আচ্ছা বলতে পারো রাতের অন্ধকারে যা' খুব সোজা—সহজ মনে হয়, দিনের আলোয় তা এত কঠিন হয়ে ওঠে কেন?

সমী ওর মুখের পানে তাকিয়ে রইল বুঝতে পারলেনা। জ্যোৎস্না পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে আস্তে বল্‌লে—এই পালিয়ে আসা অজানা অচেনা জায়গায়—এক ঘণ্টা পরে কি হবে না জেনে চুপচাপ বসে থাকা, তোমার বন্ধুর আজন্ম সংস্কার ছাড়িয়ে ওঠা নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার সবই অদ্ভুত নয় কি? সমীরের এত কথা মনে পড়েনি। বাস্তবতার ছোঁয়াচে সে একটু সজীব হয় উঠল,—বললে এই তোমার রাত্রিবেলার আলোয় সহজ আর দিনের আলোয় কঠিন?

জ্যোৎস্না হেসে বল্‌লে—নয় কি! স্বপ্ন সত্যি হবার আশা করে তারা যারা জীবন-চলার পথ সহজ ভাবে। তুমি করবে চাকরী—আমি দুপুরে পড়াবো ছেলে মেয়ে, অনাবিল শান্তির কি সহজ কল্পনা। টবের মধ্যে যে গাছ পোঁতা হয় সেটা বেড়ে উঠবে সন্দেহ নেই—কিন্তু যতখানি তার সত্যিকারের প্রয়োজনীয় ততখানি নয়। একদিন সে শুকিয়ে উঠবেই; তখন তার জন্য মাথা খুঁড়ে মরবে কে! সঙ্কীর্ণতার মধ্যে কিছুতেই তার সজীবতা রক্ষা করা যাবেনা। মানুষকে বাঁচতে হলে এমনি ক্ষুদ্র পথে পা চালালে চলে না। তোমার আমার সম্বন্ধের মধ্যে দৃঢ়তার কথা ছেড়েই দাও, এমনি আলগা এটা হাওয়ার ঘরেই চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু মস্ত বক্তৃতা দিয়ে ফেল্‌লাম—কিছু মনে করলে না ত?

জ্যোৎস্নার মুখে আকস্মিক এ সব শুনে সে বিস্মিত হোল। সে পুরুষ, তার নিকটে যা সম্মুখে তাই একান্ত সত্যি; তার একান্ত নির্ভরস্থলে পা রাখতে গিয়ে দেখে আশ্রয় জীর্ণ। সে ব্যাকুলভাবে জ্যোৎস্নার হাত দুটি ধরে বল্‌লে, "জ্যোৎস্না কেন এত নিরুৎসাহ তোমার

মন। আমি তোমায় স্নেহ করি, ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, তোমার মুখে—এতো কাছে টানবার কথা নয়—এতো একান্ত দূরে ঠেলে দেওয়া।"

জ্যোৎস্না কি বল্‌তে যাচ্ছিল, পশ্চাতে পদশব্দে ফিরে দেখে নীতি আস্‌ছে। ওরা তিনজনেই অগ্রসর হোল। একটা মুটে মস্ত এক ঝাঁকা মাথায় হাঁফাচ্ছে। ঘর-কন্নার হেন জিনিষ নেই যা নীতি কেনেনি। সমীর হেসে বললে—কিরে করেছিস্ কি—কোথায় যাই কোথায় থাকি কিছুই স্থির নেই। তুই কি আজকাল ঘরকান্না অভ্যাস করছিস্ না কি?"

ঝাঁকা নামালো। নীতি আর জ্যোৎস্না নামিয়ে রাখছিল মেঝেয়। নীতি হেসে বললে—ভারি মজার কথা শুনবি? যখন বেরুলাম—অবশ্য জিনিষপত্র কেনবার জন্যে বাজারে যাবো বলেই একেবারে অকুল পাথারে। ভাবলাম ওরা কয়েকদিনের জন্যে অন্ততঃ colonise করবে ওখানে। তাই জিনিষপত্র সব in order of merit এ কিনেছি। প্রথমতঃ সব চাইতে দরকারী পেটের রসদ। অমনি কিন্‌লাম ছোট্ট একটি চুল্লি, চুল্লির উপর চাপাতে হবে হাঁড়ি—তার ভিতর থাক্‌বে চাল, ডাল, নুন ইত্যাদি অমনি ও ক'টাও কেনা গেল। এমন কি রাত্রিবেলা শোবার জন্যে দুটো সতরঞ্চিও। সব in order of merit এ।" তিনজনেই হেসে উঠল।

জ্যোৎস্না বল্লে চমৎকার! হাড়ির মধ্যে চাল আর ডাল তার মধ্যে নুন ঘি আর হলুদ সব একসঙ্গে সন্ধ্যা-খাবার আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

নীতি বল্লে—বেশ তো?

সমী স্যুট্‌কেস্ খুলে একটা দশটাকার নোট বাড়িয়ে বল্লে, এই নে?

নীতি জিজ্ঞাসা করলে "আবার কি আনতে হবে রে?"

সমী বল্লে—না তোর খরচ?

নীতি তাড়াতাড়ি নোটটা রাখতে যেতে সমী স্যুটকেস বন্ধ করলে। স্যুটকেসের ভারি ডালাটা ঝপাৎ করে নীতির হাতে লাগলো;—জ্যোৎস্না উঠলো হেসে।

জ্যোৎস্না রাঁধলো। ওরা খেলে আগে—জ্যোৎস্না পরে। তিনজনে মিলে পরিষ্কার করলে সব। তখন প্রায় বারোটা, জ্যোৎস্না দুখানা সতরঞ্চি পাতলো। সমীরকে বললে চাবীটা দাও। সমী চাবী দেবার সময় জ্যোৎস্নার হাতটা ক্ষণিকের জন্যে চেপে ধরলে—দুজনের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জ্যোৎস্না স্যুটকেস্ খুলে দুটো কাপড় বার করে বালিসের মত করে বললে—আপনারা শোন। নীতি চটি-জোড়া পায়ে ঢুকোতে ঢুকোতে বললে—"আপনারা থাকুন, আমি ত সকাল থেকে উধাও—ভাববে কি? নীতি বেরিয়ে গেল।

জ্যোৎস্না সমীকে বললে—এই রোদ্দুরে বেরুলেন—ডাক না ওঁকে। সমী হেসে বললে—ভয় করছে? জ্যোৎস্না চুপ করলে।

পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর দুজনেই হেসে উঠল অকারণ। সমী জ্যোৎস্নাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে, একটা ঝাপটা হাওয়া হঠাৎ এসে একটা জানলায় আঘাত করলে; দুজনে চমকে উঠে দুজনকে ছেড়ে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো। সমী জ্যোৎস্নার হাত ধরে বললে—এসো গল্প করি। জ্যোৎস্না বসলে—সমী হাত পা ছড়িয়ে ওর কোলে মাথা রেখে শুলো। জ্যোৎস্না সমীরের চুলে আঙ্গুল চালিয়ে দিচ্ছে; সমী ওর বাঁ হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল।

বিকেল পাঁচটা। নীতি এলো; সঙ্গে ছোকরা চাকর। জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে বললে "এটাকে আনলাম, আপনার অনেক সুবিধে হবে। এই ব্যাটা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? প্রণাম কর্।

ওরা গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে ফিরলো। সমী জিজ্ঞাসা করলে—হাঁরে রাত্রিবেলা চোরাছুরী চালাবে না ত কেউ? যে রকম পাড়াগাঁ।

নীতি বললে—না—রে সে ভয় নেই।

জ্যোৎস্না সমীরকে বললে—উনিও থাকুন না—বেশ গল্প করা যাবে।

সমী বললে—বেশ তো—এই থাক না একসঙ্গে, বেশ হবে

নীতি জ্যোৎস্নার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের ভাব বোঝবার চেষ্টা করলে, কোন কিছুর ছায়া তার ওপর পড়েনি; হয়ত নীতিই করলে ভুল; বললে—তোর মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়, কাল সকালবেলা তা হলে হোটেল কর্ত্তা warrent বার করবে।

রাত্রিবেলা সমী জ্যোৎস্নাকে আর রাঁধতে দিলে না। চাকরটাকে দিয়ে খাবার আনিয়ে ওরা খেলো রাত প্রায় এগারোটা হবে। চাকরটা শুলো দরজার বাইরে—সমী আর জ্যোৎস্না শুলো পাশাপাশি আলাদা সতরঞ্চিতে। আশে পাশে সব নিস্তব্ধ।

গভীর রাত্রির সঙ্গে সঙ্গেই সমীরের বুকের ভিতর প্রলয় তাণ্ডব সুরু হোল; সে একবার সতরঞ্চিটা হাতে নিয়ে বললে—জ্যোৎস্না তুমি শোও আমি বাইরে যাচ্ছি। জ্যোৎস্নার সারা অন্তর লজ্জায় নুয়ে পড়ল। কিন্তু এই নগ্ন লজ্জার কাছে নিজেকে ধরা দিতে ওর বাধলো! বললে—কোন দরকার নেই ভিতরে দুজনের জায়গা হবে।

সমী বললে তা নয়। জ্যোৎস্না উঠে ওর হাত থেকে সতরঞ্চি নিয়ে পাতলে।

ওদের পরস্পরের কাছে আসবার বাধা ছিল অনেক গৃহে। একটা দুর্দ্দমনীয় আকুলতা দুজনকেই টেনে এনেছে অজানা অচেনা সর্ব্ব-অপরিচিতের মধ্যে; উদ্দেশ্য তাদের একজনকে অপরে কাছে পাওয়া; কিন্তু আজ এই গভীর রাত্রিতে বাধাহীন ন্যায়যুক্তিহীন কাছে পাওয়াটার সম্পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করে ওরা দুজনেই লজ্জায় ঘেমে উঠল। দিনের বেলায় সমীরের মনে হয়েছিল, জ্যোৎস্নার চাইতে আপনার বুঝি কেউ আর নেই তার, তাই জ্যোৎস্নার একটুখানি হাসিতে ওর সারা অন্তর আনন্দে দুলে উঠেছিল। ঘরের কোণে জ্যোৎস্নাকে বুকের মধ্যে পাবার জন্যে এক এক সময় সমীর পাগল হয়ে উঠতো। আজ অদূর-শায়িতা জ্যোৎস্নাকে সে পরনারী ব্যতীত অপর কিছুই ভাবতে পারলে না। এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে কাছে টেনে নিয়ে আসুক, সমস্ত বাধা চুরমার হয়ে যাক্ কিন্তু ওর সমস্ত সত্তা একটা বিরাট না'-এর দ্বারা ওকে দমিয়ে রাখলে। ভাবলে এ অন্যায়, ভয়ানক অন্যায় ও তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, বন্ধুত্বের দাবী স্নেহ ভালবাসা আকাঙ্ক্ষা করতে পারে আর কিছু নয়। ওদের সম্বন্ধে মধ্যে দৃঢ়তা নেই, ওদের মিলন প্রত্যেকটি কঠিন স্থানে ঘা খেয়ে ফিরবে।

সমীর জ্যোৎস্নাকে ভালবাসে। জ্যোৎস্নাকে ছেড়ে থাকবার ভাবনায় ওর মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল ডাকলে—জ্যোৎস্না?

বল—

জেগে আছ?

হাঁ!

আচ্ছা জ্যোৎস্না এমনি একা আমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভয় হয় না—আমায় বিশ্বাস হয়?

জ্যোৎস্না বললে—কেন অমন করে বলছ? বিশ্বাস না করলে দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে—জ্যোৎস্না শেষ করলে না।

সমী একটু দ্বিধা করে বললে—কিছু মনে কোরোনা, নিজেকে যে বিশ্বাস করতে পারিনে কিছুতেই। হয়ত তোমার পবিত্রতা বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতাও আমার নেই, নিজের কাছে যদি পরাজয় ঘটে কখনও তখন কি করে সহজ হয়ে থাকবো তোমার কাছে? কিন্তু সত্যি জ্যোৎস্না, তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না, কোথাও যেতে দেবোনা তোমায়—যেতে দিতে পারবো না আমাকে রক্ষা করবার ভার তোমায় দিলাম আজ।

নিত্যকালের দুঃখের কবল থেকে ওর মন চাইত মুক্তি। বুভুক্ষিত প্রাণ যা চাইত সমীরের সংস্পর্শে আসবার পর ওরা বুঝলে সেটা প্রেম। প্রেমের সার্থকতা সে যে কেমন করে চেয়েছিল, আনন্দের আবেগ তাকে সেটা বুঝতে দেয়নি ভাল করে। একদিকে একটানা রুদ্ধ ঘরের নিরুৎসাহ জীবনের আকস্মিক মুক্তি আর অপর দিকে বাঞ্ছিত প্রেম তাকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছে যেখান থেকে সহজ দিকে ফেরবার পথ নিতান্ত অপরিসর জ্যোৎস্না সমীরের বুকে একটু জায়গা চেয়েছিল; যে প্রকারেই হোক প্রেমই

ওর নিকট বৃহত্তর হয়ে উঠেছিল কিন্তু সেটাকে আজ আর মহৎ ভাবতে পারলে না।

গৃহত্যাগের সময় ও মনকে বুঝিয়েছিল দুজনে ওরা পরস্পরকে ভালবাসে মিলনে বাধা কি? আধ্যাত্মিক কথাটাও শোনা ছিল; আজ ভাবলে এটা উচ্ছৃঙ্খলতা বই অন্য কিছু নয়। মানুষ লক্ষ গবেষণার পর বিবাহের মধ্যে দিয়ে নরনারীর যে মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন প্রকার মিলনই নহে। জ্যোৎস্নার মনে হোল নারী ক্ষণিক প্রেমে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। দৈহিক কামনাতেই হোক আর মানসিক মিলনেই হোক সে চায় পরিপূর্ণ ভাবে পুরুষকে পেতে। আধ্যাত্মিক মিলনের নামে উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী নারী নয়।

জ্যোৎস্না বললে চল ফিরে

সমী জিজ্ঞাসা করলে-কোথায়?

যেখান থেকে পা চালিয়েছি!

সমী উত্তেজিত স্বরে বললে—অসম্ভব আমি ফিরলেও তোমায় কিছুতেই ওই নোংরা জায়গায় যেতে দিতে পারিনা।

জ্যোৎস্না চুপ করলে।

সারারাত দুজনে কিছুই ভেবেচিন্তে কিনারা করতে পারলেনা। শুধু এটুকু বুঝলে এমনি ভাবে আর একটা রাত্রি ওরা যেন অতিবাহিত করতে পারবেনা অথচ তাদের পরস্পর ব্যতীত কারুর যে এক মুহূর্ত্ত চলতে পারেনা এটাই যেন তাদের মনে হোল বিশেষ করে, দূরে থাকবার কথা ভাবতেই পারলেনা।

ভোরের দিকে সমীর ঘুমিয়ে পড়লো। জ্যোৎস্না বসলো লিখতে। অনেক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পূর্ব্বাকাশে শুকতারাটির দিকে চেয়ে—চোখ দুটো ভিজে উঠল, কি যে লিখবে কিছুই ভেবে পেলোনা।

অবশেষে সমীরকে লিখলে এক টুকরো কাগজে—

"সম্বোধনের মনঃপুত কথা খুঁজে পাচ্ছিনে—মনের ভাষা কি অন্তর স্পর্শ করবেনা।

দেখ, ভেবে ঠিক করলাম এমনি ভাবে আমাদের মিলন সম্ভব নয়! তুমি বলবে দেহের মিলনটাকে অতবড় করে দেখছো কেন, আমি বলবো ওটা ব্যতীত মিলন সম্পূর্ণ হবেনা, সহজ জীবন-যাত্রার পথে সাধারণ মানুষের স্নেহের মিলন নিতান্ত দরকারী। দুনিয়ার যে দিকে দৃষ্টি দেবে দেখবে, যেখানে সংযম সেইখানেই মহত্তর আনন্দ; তাই দৈহিক মিলনেও পর্য্যাপ্ত সংযমের দরকার। কিন্তু সে কেমন করে হবে, আমরা যে বিবাহিত নয়, কোন দিকে কোন সম্বলই ত আমাদের নেই। সমাজ আত্মীয় বন্ধু কেহই ভুলেও চাইবেনা আমাদের দিকে। মানুষ ত এসব বাদ দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না কখনও।

তাই আজ বিদায় নোবো তোমার কাছে—কোথায় যাচ্ছি বলি, এখানে ইয়োরোপীয়ান মিশন আছে আমারই মত মাতৃপিতৃহীনা আমার এক বন্ধু আছে ওখানে; দু'জনে থাকবো।

পথে নেমে জিজ্ঞাসা করে নেবো রাস্তা—ভেবোনা কেমন?

ভেবে দেখো বাস্তবিক কখন আমায় সত্যিকারের তোমার দরকার; অভিমান ত্যাগ করে ডেকো তখন লক্ষ্মী আমার বুঝলে? পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই সব নয়। হঠাৎ মরে গেলেও ভুলে যেওনা—দুঃখে ডেকো। বিদায়ের পূর্ব্বে তোমার শেষ প্রশ্ন হবে বিবাহ। তুমি বলবে—এসো আমরা বিয়ে করি। আমি তার উত্তর দেবো প্রয়োজন যেখানে সব কিছুর ঊর্দ্ধে সেখানে বিয়েটা সত্যি নয়।

জাগরণে আমায় যেতে দিতে না। মনের জোর নারীর বেশী কিন্তু সে পুরুষকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তাই তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছি ঘুমন্ত অবস্থায়। আমার গয়না কখানা বাক্সের তলায় যেমনি ছিল তেমনি রইল, তোমার দরকার বেশী। যেখানেই থাক শুধু এটুকু মনে রেখো একটি লোক আমরণ তোমার কথা ভাববে তোমার মঙ্গল কামনা করবে! আমার প্রণাম নিও।

"তোমার জ্যোৎস্না"

জ্যোৎস্নার অন্তর হাহাকার করে উঠল—চিঠিখানা মুড়ে রেখে ঘাড় ফিরিয়ে বাহিরে পা বাড়ালো।

ভোর হোল। সমী জেগেই দেখলে পায়ের কাছেই চিঠি। তার বুকটায় মোচড় দিয়ে উঠল। চিঠিখানা

ড়ছিল ; নীতিও এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালো, সমী খেতে পায়নি, চিঠিপড়া শেষ করে মুখ তুলে দেখলে নীতি ; চিঠিখানা ওর হাতে তুলে দিলে।—সমী জিজ্ঞাসা করলে—পড়লি ?

হাঁ।

সমী বললে—চল্

কোথায় ?

এই খানিকটা গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।

নীতি জিজ্ঞাসা করলে—কি করবি ?

সমী পথ চল্‌তে চলতে বললে—কি আর করব। ভাবছি মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিলাম।

নীতি বললে—ঠিক তাই নয়—ও পেলো মুক্তি।

গল্পের শেষ

শ্রীবীণা রায়

'দার্জ্জিলিং'এ চল্‌ছে গাড়ী, ছুটছে বাঁকা পথটি দিয়ে
চল্‌ছে গাড়ী আপন মনে গুটি কয়েক যাত্রী নিয়ে।
পথটা যেন সাপের মত পাহাড়টারে জড়িয়ে আছে,
মেঘের ছায়া নৃত্য করে দূরের কাছে 'ফার্ণ' গাছে।
দেখ্‌ছি চেয়ে জান্‌লা দিয়ে হিমালয়ের শোভা যত,
ওপাশেতে আছে বসে তরুণী এক রাণীর মত।
শ্যাওলা রঙের জরীর শাড়ী লুটোয় পায়ের জুতোর পরে
বালার সনে বাঁকা চুড়ি তাহার দুটি কোমল করে।
জড়োসড়ো হয়ে শীতে যাত্রীরা সব বসে আছে,
মেঘের ছায়া নৃত্য করে দূরের কাছের 'ফার্ণ' গাছে।
ঝর্‌ছে গোলাপ পথের পরে, নির্ঝরিণীর কলতান
দূরের থেকে ভেসে এসে মুগ্ধ করে সবার প্রাণ ;
ম্লান আলোতে যাচ্ছে দেখা আঁকা বাঁকা তরুণ শাল
আমার কিন্তু লাগ্‌ছে ভাল ওই মেয়েটির ডালিম গাল।

মাঝে মাঝে উঠ্‌ছে ডেকে না-জানা কোন বনের পাখী
সবার চেয়ে লাগে ভালো পাগল করা কাজল আঁখি !
সজল মেঘ পাহাড় চূড়োয় দিচ্ছে চুমো প্রেমিক প্রায়,
শুভ্র হাতে সবুজ শাল দিল বালা টেনে গায়।
ললাট তাহার রাঙা হোল চল্‌তি মেঘের পরশ পেয়ে
অলক ভিজায় বৃষ্টিধারা জান্‌লা হ'তে শার্সী বেয়ে।
যাত্রীরা সব খাচ্ছে চা দোকান ঘরে বসে ধীরে
আমি কিন্তু 'পেয়ালা' হাতে আসছি গাড়ীর ধারেই ফিরে
মনে হচ্ছে কাব্য আমার শুষ্ক হয়ে ব্যথার ব্যথী
মনে হচ্ছে একা ধরায় ওরেই যেন পেলাম সাথী।

* * * *

আবার কি ? আরতো নেই ! এইখানেতেই গল্প শেষ
তবু যদি শুনতে যাও—বেনেটোলার সেই যে মেস ?
তার পাশের সেই হল্‌দে বাড়ী, পোনরই মাঘ রাত্রিবেলা
গল্পের শেষ দেখে লুচি খাবার কালে খেও মেলা।

বধূদস্যা

শ্রীপ্রমীলা রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রভাতদের বাড়ীটা গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু, বড় ও দোতলা। চারদিক ঘিরে তার সামনে, পিছনে বারান্দা তাই অনেকটা চকমিলান বাড়ী হয়ে পড়েছে। মাঝখানে একটা মস্ত উঠোন—তারই একপাশে বেহারারা পাল্কীটা নামিয়ে রাখ্‌লে। এরা সবাই জগমোহনের চাষী প্রজা—তারা চাষ আবাদও করে—দরকার মত বেহারার কাজও করে। বাড়ীটা নদীর ঘাট থেকে বেশী দূর নয়। জগমোহন পাল্কীর শেষে পায়ে হেঁটে রওনা হলেও তিনি অন্য পথ ধরে, আগেই বাড়ী এসে পৌছে ছিলেন। প্রভাতের বউ আসছে এ খবরটা বাজনার শব্দে সারা গাঁয়ের ছেলেমেয়ে, ও গিন্নিদের আর জানতে বাকী ছিল না—হাতের কাজ ফেলে, যে যেমন অবস্থায় ছিল বৌ দেখতে ছুটে এল। বাড়ীতে আর তিল ধারণের জায়গা ছিল না। পাল্কী নামাতেই প্রভাত বেরিয়ে এসে পাল্কীর ডাণ্ডার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পাল্কীর দরজার মধ্যে এক চুল প্রমাণ যে ফাঁক ছিল, তাই দিয়ে মীনা দেখলে যে উঠোনের মাঝখানে সুন্দর করে আলপনা দিয়ে 'বৌ-ছত্তর' আঁকা তার মধ্যে পাশাপাশি দুখানা পিঁড়ি, আর 'বরণের' নানা রকম জিনিস সাজানো। এত লোক দেখে আর নতুন জায়গায় এসে, মীনার খুবই ভয় হচ্ছিল—তবে ভরসার মধ্যে প্রভাত সঙ্গে ছিল।

একটু পরেই, রোগা, লম্বা মত একজন মেয়েমানুষ, হাতে সোণার কঙ্কণ আর চুড়, গলায় মুড়কী মালা, পরণে একখানা বেগুনী রংয়ের ফুলদার বেনারসী, রং তার একেবারে জ্বলে গিয়েছে, সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর দিয়ে, প্রভাতের বৌ তুল্‌তে এলেন। হড় হড় করে পাল্কীর একটা 'বার' ঠেলে দিয়ে, মাথা নীচু করে পাল্কীর মধ্যে গলা পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে মীনার হাত ধরে বল্লেন—"এসো ভাই এসো।"

এঁর সঙ্গে সম্বন্ধ কি তা সে জান্‌ত না—তাই তাঁকে প্রণামও সে করতে পার্‌লে না। তবু তাঁর আদেশ মত সে পাল্কীর বাইরে এসে দাঁড়ালে।

বাইরে এসে দাঁড়িয়ে তার এত লোকজন দেখে মাথাটা আপনিই নীচু হয়ে এলো, পাতলা কাপড়খানার ফাঁক দিয়ে চোখের কোণের দৃষ্টিতে সে দেখলে তার অল্প দূরেই প্রভাত পাল্কী ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—দেখে তার একটু সাহস হল।

বরণের কুলোখানা হাতে নিয়ে যেতে যেতে সেই মেয়েমানুষটী বল্লেন, "নাও, দাদা, হাতখানা ধরে নিয়ে এসো এই দিকে—শুধু তো আর সেপাইএর মত পাহারা দিয়ে থাকলে হবে না! এসো হাত ধর—গাঁটছড়া-টড়া তো তোমাদের উঠেই গিয়েছে—যে রাঙা বৌ এনেছ—মাথাটা তো ঘুরেই গিয়েছে দেখ ছি।"

প্রভাত একটু হাস্‌লে, বল্লে "হাত আর ধরতে হবে না—পায়ে হেঁটেই বেশ ভাল আস্‌তে পারবে। তোমাদের বুঝি হাত ধরে, পায়ে সেধে এনেছিল ঠানদি?..."

"তা যা বল—আমাদের বিয়ে যখন হয়েছে, তখন কি

আর কোন জ্ঞান, গম্যি ছিল ? যা বলেছে তাই করেছি— হাত দূরের কথা—কোলে করে নিয়ে আসতো তখন !— যা করতে বলেছে—হয়তো ধরে কোলেই বসিয়ে দিয়েছে— তা লজ্জা করেনি, বসেই থেকেছি—যে দুটো একটা কথা বলেছে কখনো—যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেছে তো তখুনি বলে দিয়েছি। আর তোর এই রাঙা বৌকে যদি জিজ্ঞাসা করি "কিলো, বর তোকে চুমু খেয়েছে—ও হয়তো মুখ ফিরিয়েই নেবে।" না লো নাত বৌ ?" বলে তিনি মীনার দিকে চাইলেন। মীনাও তাঁর কথা শুনে সত্যিই হেসে মুখটা ফিরিয়ে নিলে। দেখে তিনি বললেন, "দেখলি প্রভাত ? দেখ্ সত্যি বলিছি কি না! নে ভাই, বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ডান হাতের একটা আঙুল ধর,—ধরে এনে পিঁড়ির ওপর দাঁড় করা। আজ তোর মা থাকলে এমন ঘর সাজন্ত সুন্দর বৌ নিয়ে কত সাধ-আহ্লাদ কর্‌তো—তা সে ভাগ্যিমানীই ছিল— ভোগের বরাত তো ছিল না—না হলে এমন ইন্দির, চন্দর স্বামী এত লোকজন রাজার ঐশ্বয্যি এমন সব সোনার চাঁদ ছেলে—তা ভোগ ছিল না বরাতে!" বলে ঠান্‌দি চোখের কোণা দিয়ে যে দুফোঁটা জল এসেছিল, তা মুছে ফেল্‌লেন।

প্রভাতও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মীনার হাতটা ধরে ঠান্‌দির নির্দ্দেশমত পিঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়াল। হুলু-ধ্বনি আর শাঁখের শব্দে জায়গাটা একেবারে মুখরিত হয়ে উঠলো। ঠান্‌দি বরণ শেষ করে, বেনারসীর খুঁট খুলে একখানা আকবরী মোহরের 'থান' মীনুর হাতে দিলেন। প্রভাত ও মীনা দুজনে তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল! তাদের মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে অজস্র আশীর্ব্বাদ করে তিনি মীনাকে বল্‌লেন "যাও ভাই ঐ ঘরে বসো গে—এ তো তোমারই সব—নিজেই দেখে শুনে নেও ভাই—হাত ধরে ঘরে টেনে নেবার মতও যে কেউ নেই। যা না, ছুঁড়িরা, তোরাও বুঝি নতুন বৌএর মত সং হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি ? যা না, ওর সঙ্গে ঘরে যা না, ওর সঙ্গে ঘরে যা। গল্প-সল্প করগে যা।"

সেই দল থেকে বেরিয়ে একটী মেয়ে এসে মীনার হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে, "আমি তোমার ননদ হই বুঝলে,—ভাগ্যিস্ এ সময় এখনে ছিলাম, না হলে তো তোমাকে দেখতে পেতাম না। প্রভাতদাদার বিয়ে হয়েছে, বৌ খুব সুন্দর, জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে এইটুকুই শুনেছিলাম—এখন চোখে দেখলাম।—আজ জেঠিমা থাকলে তাঁর আর আনন্দের শেষ থাকত না। এসো এই ঘরে যাই—এইটাই তোমার শোবার ঘর। জ্যেঠা মহাশয় নতুন করে করিয়েছেন। প্রণব দাদারও শুনছি বিয়ে হবে—ওবেলা তো তার পাকা দেখা। বেশ হবে—দু'টী যা'য়ে থাকবে—কারুরই একা থাকতে হবে না।—"

মীনা ঘরে এসে মাথায় ঘোম্‌টা একটু কমিয়ে দিয়ে 'ননদ'টীর দিকে চেয়ে দেখলে—শ্যামবর্ণ দোহারা গড়ন— বড় ভাসা ভাসা চোখে—তাকে ঠিক যেন বর্ষার জল পেয়ে পুষ্ট লতিকার মত দেখাচ্ছিল। তার দিকে মীনাকে চাইতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি দেখছ ভাই!"

মীনা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলো—তার পরে ধীরে ধীরে বল্‌লে "তোমাকেই দেখছি—তোমার নাম কি ভাই ?"

"আমার নাম যমুনা। সকলে কিন্তু কালিন্দী বলে ডাকে। আমি কালো কি না ভাই।"

"কই ভাই তুমি কাল, না—আমি কিন্তু তোমায় যমুনা-ই বল্‌বো। কালিন্দী বলবো না।"

"তা তোমার যা ইচ্ছে তাই বলো। আমার বৌদিরা কিন্তু আমাকে 'কালিন্দী'ই বলে।

"কই, তাঁরা কই ? তাঁরা যে আমার কাছে এলেন না!"

"আস্‌বে খন তারা সব তোমাকে দেখতে আস্‌বে বলে সাজ গোজ করছে—আমি কিছু সাজি নি। কালো মানুষের আবার সাজ কি দরকার ?"

মীনা একটু হাস্‌লে—বল্‌লে "কে তোমাকে কালো বলেছে ? এসো—আমি তোমাকে সাজিয়ে দিই।" প্রভাত এসে ঘরে ঢুকে বল্‌লে "একবার এসো তো আমার সঙ্গে!"

মীনা চেয়ে দেখলে প্রভাত তাকেই ডাকছে—সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বড় বারান্দা

পার হয়ে প্রভাত তাকে যে ঘরটাতে নিয়ে গেল—সেটা দেখে মনে হল যে গোটা বাড়ীটার সাথে এই ছোট ঘর খানার কোনই সম্বন্ধ নেই। দেওয়ালের একটা ধার ঘেসে একখানি ব্রোমাইড ছবি ঝুলছে—একজন মেয়ে মানুষের! তার ঠিক নীচেই একখানা খাট পাতা—তাতে পরিষ্কার করে বিছানা পাতা—একখানা লাল পাড় সাড়ী, একটা বড় সিঁদুরের কৌটা—গোটাকতক ফুল, ফুলের মালা, একখানা গীতা সেই খাটের ওপর খুব পরিপাটী করে সাজানো রয়েছে। মাটীতে একটা মোটা সতরঞ্চি দু ভাজ করে পাতা, তার ওপর একটা শীতলপাটী বিছানো, একটা মাথার বালিশ ও একখানা পাখা, ওপরে মশারি টাঙানো। দেওয়ালে আর একধারে, পরমহংস দেবের ছবি, অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের ছবি ও বদরি নারায়ণের ছবি। একটি ছোট মাটীর কলসী মুখে সরা ঢাকা, পাশে একটা গয়ার পাথরের গেলাস। মীনা চেয়ে চেয়ে সমস্তই দেখলে, প্রভাত সেই ব্রোমাইডখানার কাছে গিয়ে, ছবির নীচে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললে, "এই তোমার 'মা' মীনু!"

মীনাও ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে ছবির নীচে ঠিক প্রভাতের মত করেই প্রণাম করলে। জগমোহন ঘরে ঢুকতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে পেছিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন—বহুদিনের হারানো প্রিয়তমাকে মনে হয়ে তাঁর বার্দ্ধক্য-জীর্ণ চোখের কোণে দু ফোঁটা জল এসে পড়ল। মনে মনে স্বর্গগতা স্ত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন "মন্দাকিনী! কোথায় তুমি আছ, তা জানিনা—যেখানেই থাক, তোমার ছেলে-বৌকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তারা মনের অনাবিল শান্তিতে থাকে।" এই বলে তিনি ফিরে আবার বাহিরে চলে গেলেন।

সেখানে তখন প্রণবকে আশীর্ব্বাদ করতে লোকজন সব এসে পড়েছিলেন। জগমোহন বাইরে থেকে প্রভাতকে ডেকে পাঠালেন—প্রণব সেখানেই বসেছিল। প্রভাত সেখানে যেতেই তার বাবা তাকে ইঙ্গিতে চুপ করে বসতে বল্লেন। সে চিরদিনই তাঁর খুব বাধ্য, তাই এখনও এতবড় ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গ সে জানলেও চুপ করেই একধারে বসলো।

পুরোহিতের পরে কন্যাপক্ষের প্রধান যিনি এসেছিলেন তিনি একসেট হীরার বোতাম দিয়ে প্রণবকে আশীর্ব্বাদ করলেন—এতেই তাঁরা যে খুব ধনী তা বোঝা যাচ্ছিল তারপরে প্রভাতকে সকলে আশীর্ব্বাদ করতে বললে—সে একটু মুস্কিলে পড়ল। আশীর্ব্বাদ করে দেবার মত তার কোন জিনিসই কাছে ছিল না—অগত্যা তার নিজেরই বিয়ের পাওয়া হীরার আংটীটা খুলে ভাইকে আশীর্ব্বাদ করল।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যাবার পরে প্রণব ভেতরে উঠে গেল, এবং যেখানে মীনা বসে কালিন্দীর সঙ্গে গল্প করছিল, সেইখানে গিয়ে মীনাকে একটা প্রণাম করে বললে, "আমাকে বোধ হয় আপনি চিনতে পারছেন না—আমি দাদার ছোট ভাই বাইরে একটু হাঙ্গামায় পড়েছিলাম বলে আপনার কাছে আসতে দেরী হল—প্রথম দিনের এ ক্রটী আপনি নিশ্চয় মাপ করবেন।"

টপ্ করে কালিন্দী বললে, "আহা! নিজের বিয়ের ঢাক কি নিজেই পিটতে হয় নাকি? পাছে বউদি জিজ্ঞাসা করে এত দেরী হল কেন, তাই দোষ কাটাচ্ছ, না? ওকে মুখ ভেঙিয়ে প্রণব বললে" নিজের ঢাক নিজে পিটোনই নিয়ম, জানিস্? তুই তবে তোর বিয়ের একমাস আগে থেকে কান্নার সানাই বসিয়েছিলি কেন "আমি রঞ্জনকে বিয়ে করব না। তোকে কি তখন ভূতে পেয়েছিল?—"

স্বামীর কথায় কালিন্দীর চোখ উজ্জল হয়ে উঠল। মৃদু হেসে বললে "সত্যি ভাই, তুমি এত ও জানা—স্রেফ বিয়ের আগে এসে বললে" খোঁড়া, কালো, তারওপর একটা চোখে ফুল পড়া, এই সব কত কি। ভয়ে শুভদৃষ্টির সময় চেয়ে দেখলাম না! ফুল শয্যার দিন তো চোখ বুজেই খুব রাগারাগি করলাম—পাছে চোখ খুললে কিছু বিশ্রী দেখি বলে! ও মা শেষে দেখি দিব্যি গোটা মানুষ—কালোও নয় কিছুই নয়।"

"শেষে কি করলি? দেখলি কি করে? বলনা ভাই কালিন্দী!"

"যাও, বলবনা। তুমি কম হিংসুটে! আমার একটু ভাল বর হচ্ছে, তা তোমার প্রাণে আর সইলো না—"

"হাঁ—তা বইকি—আমি অমনি হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলাম" কালিন্দীর মত বর নেব। "বর কেন? বৌ নেবে।"

"তোর মত বৌ? হয়েছে, তার চেয়ে বলনা 'শ্যাওড়া গাছের পেত্নী নেব' বলে কেঁদেছিলাম।—"

ভীষণ রেগে কালিন্দী বললে "আচ্ছা, আচ্ছা, তোমরাই কেবল আমাকে কালো-কুচ্ছিৎ বল—আর কেউ বলেনা কিন্তু।"———

ক্রমশঃ

প্রতিদান

নাটিকা

শ্রীসুলতা সেন

পুরুষ

জগৎপাল	...	কল্পনাপুরের রাজা
বৃদ্ধ ঋষি	...	তপোবনের অধিকারী
দেবব্রত	...	শিষ্য

নারী

সুচিত্রা	...	রাজার একমাত্র দৌহিত্রি
মুক্তি	...	তপোবনবাসিনী
সোহাগ	...	সুচিত্রার দাসী

পথিকদ্বয়

তপোবনের বালক ও বালিকাগণ

প্রথম দৃশ্য

(রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী পথে দাঁড়াইয়া, সুচিত্রা ও সোহাগ)

সুচিত্রা। আজ কোথায় চলেছি জানিস সোহাগ ?

সোহাগ। কি করে জানব দিদিমণি ? কোন্‌দিকে তোমার খেয়ালি দু' চোখের দৃষ্টি পড়বে ?

সুচিত্রা। সমুদ্র তীরের সূর্য্যাস্ত নাকি বড়ই সুন্দর দৃশ্য, চল্ আমায় দেখিয়ে আন্‌বি।

সোহাগ। ওঃ হরি ! এই মৎলব এঁটে তুমি বেরিয়েছ ? সে যে অনেকদূর—

সুচিত্রা। হোক না দূরে, সন্ধ্যে হবারও ত বহু দেরী এখনও।

সোহাগ। তুমি যা মনে করেছ সে যে করবেই তা আমি জানি, কিন্তু ভুলে যেও না ! ফিরতে রাত হবে ঢে-র।

সুচিত্রা। ফিরতে রাত হোক বা নাই হোক, তোর কথার প্যাঁচে রাত হবে এখানেই।

সোহাগ। হ্যাঁ আমিই ত অযাত্রা—আমারই ত' দীর্ঘ সূত্রতা বেশী, সে যাক এখন মুখকে বিশ্রাম দিয়ে তোর ওই আলসে পা দুটোকে চালা (চলিতে চলিতে একটি মালা কুড়াইয়া) বাঃ কি সুন্দর ! এই মালাটি দেখ সোহাগ। বড় চমৎকার !

সোহাগ। দেখি—এযে—এ—যে।

সুচিত্রা। কি ফুলের তুই জানিস ? এ ফুল দেখেছিস্ আর কোথাও ?

সোহাগ। দেখিনি, তবে—

সুচিত্রা। নাম শুনেছিস বোধহয় ?

সোহাগ। না—তা ওই পারিজাত না কী যেন স্বর্গের ফুল—

সুচিত্রা। ধেৎ—এখনও কী সেই সত্য ত্রেতা আছে আছে নাকি যে নারদমুনির বীণা থেকে খসে পড়বে ?

সোহাগ। তা জানিনে বাপু—নারদের বীণায় কি উর্ব্বশীর গলায় ছিল। তা এটা বেশ বুঝতে পাচ্ছি এ যার-তার মালা নয়।

সুচিত্রা। কার হোতে পারে ? ভূত-প্রেতের ?

সোহাগ। যাও তোমার কথা শুনলেও রাগ হয়, আমি জানিনে মালা কার।

সুচিত্রা। ব্যস্। এই সরল ভাবাটাই শুনতে পেলে বাঁচি, তুই আমার রঙের সাজি দে এঁকে নিই। এখানের দৃশ্যটি বেশ।

সোহাগ। এই নাও, সমুদ্রে যাবে কী রাত্রে ?

(সুচিত্রা নিরুত্তরে ছবি আঁকিতে লাগিল)

ওই বুঝি মেয়ে আবার আঁকতে বসে গেলেন, কী সুখের চাকরিই আমি কচ্ছি বাবা, দিনরাত ওই খেয়ালি মেয়ের তাল সামলে চল, জায়গা অজায়গা সময়-অসময় কিছুই নেই কেবল ছবি আঁকা, আর—ছবি আঁকা, কেনরে

বাছা? বড়টি হোয়েছিস রাজপুত্তুর কত আসছে, বে-থা করে সুখে থাক, তা'নয় যত অনাছিষ্টি! ভাল কাজ হ'য়েছে আমার, হ্যাঁ!

হাসিমুখে, সুচিত্রা। এই দেখ সোহাগ যার মালা তার পায়ের চিহ্নটি কেমন তুলে নিইছি···কী সুন্দর হোয়েছে—

সোহাগ। তোলো তোলো সবই ছবি করে তুলে রাখ! কোথাকার কার পায়ের ছাপ তাও ঠাকুর দেবতার মত ছবি করে তুলে রাখ।

সুচিত্রা। তুই প্রাসাদে যা সোহাগ—দাদুকে বলিস—

সোহাগ। আর তোমার কী কত্তে হবে এখানে থেকে?

সুচিত্রা। দেখি, মালা গাছটা যে ফেলে গেছে—তাকে পাই কি না এদেশে কোন জায়গায়ই ত আমার অচেনা নেই—

সোহাগ। ভাল, সাধুতা দেখছি, যে মালা হারিয়েছে তার চাইতে ভাবনাটা হোলো তোমারই বেশী?

সুচিত্রা। সে তুই বুঝ্‌বিনে সোহাগ, যা ফিরে গিয়ে দাদুকে বলিস—আমার একটু একা বেড়াবার সখ হোয়েছে, তিনি আমায় কিছু বোলবেন না।

সোহাগ। তাহ'লে তুমি সত্যিই যাবে? আর একা?

সুচিত্রা। কী করি বল? মালার মালীক ত আসবে না এখানে? (হাসিয়া) আর তোকেও আমার আর ভালো লাগে না, তাই একাই যাব।

সোহাগ (চটিয়া)। তা না লাগলে আমি কী করব? মহারাজের হুকুম সর্ব্বদা তোমার সাথে থাকতে, তাঁকে অমান্ত কোত্তে ত পারিনি।

সুচিত্রা। হাঃ হাঃ তাই নাকি? আমায় পাহারা দেবার জন্তই তোকে রাখা—

সোহাগ। পাহাড়া দেবার জন্তে না বেঁধে রাখবার জন্তে অত আমি জানিনা।

সুচিত্রা। তা বেশত' বাঁধনের সুতোটি উপভোগ্য বটে।

(একখানি ছবি তুলিয়া ফেলিয়া রাখা। দুজনের প্রস্থান।)

দেবব্রতের প্রবেশ ও ক্লান্তভাবে বসিয়া।

উঃ আরত হাঁটতে পাচ্ছি না। কোথায় যে মালাটি আমার গলা থেকে খসে পড়ে গেছে তাই ভাবছি। বেশ আমিও দেখে নেব কেমন না পাই খুঁজে—এই যে আমার মালা গাছা এখানেই পড়েছিল? এখনও ধুলোর ভেতর আঁকা বাঁকা দাগটি সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাঃ তার পরিবর্ত্তে যা রয়েছে এখানে, সেযে আরও সুন্দর।

(ছবিটি কুড়াইয়া) এ অর্দ্ধ সমাপ্ত ছবি কার আঁকা? কোন্ চিত্রকরের হাতের অঙ্কণ এত নিপুণ? চিত্রের প্রত্যেকটি টানই যেন মুখের পানে চেয়ে হেসে উঠছে, আমার মালার বিনিময়ে কে রেখে গেল এই ছবিটি? সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অতি অসঙ্কোচেই রঙের ওপর রঙ খেলে গিয়েছে, আশ্চর্য্য বটে।

(গান গাহিতে গাহিতে ৪টি বালক বালিকার প্রবেশ)

সাজিয়াছি মোরা চন্দন টিপে সাজিয়াছি বনফুলে
হাতে লয়ে ভরা কুসুমের সাজি চলি পথ ভুলে ভুলে
ফুলের গন্ধে ছুটী আনন্দে
নাচি প্রভাতের আলোকে
গাহি নিতি নিতি বন্দনা গীতি
চিত্ত ডুবাই পুলকে
নিশা যাপি তরুমূলে
সাগরের উপকূলে
মুখে লয়ে হাসি বুকে লয়ে বল চলি মোরা দুলে দুলে
সাজিয়াছি বন ফুলে।

(দেবব্রতের দিকে চাহিয়া) প্রথম বালক। দেবদা তুমি এখানে?

২য়। আমরা তোমায় কত খুঁজেছি আর তুমি বেশ চুপটি করে বসে আছ একাটি।

৩য়। কথা কইছ না যে। তুমি কী কচ্ছিলে এখানে?

দেবব্রত। তোমাদের গান শুনছিলুম, বেশত গাইতে তোমরা শিখেছ?

৪র্থ। হ্যাঁ মুক্তিদিদির মত ত শিখিনি।

১ম। দূর, তাকি আবার হয় নাকি?

দেব। কেন হবে না? গাইতে গাইতেই হবে। চল আমরা আশ্রমে যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজ প্রাসাদ

রাজা। (পায়চারি করিতে করিতে) বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্ত এগিয়ে আসছে। জানি সবই। তবু এখনও প্রতিপদেই কিসের বাধা অনুভব কচ্ছি। ছিলনাত কোনো বাঁধনই, স্ত্রী পুত্র, সবাই একে একে আমার বন্ধন মোচন করে চলে গেছে, চলেছিলাম স্রোতের মুখে গা ঢেলে দিয়ে। চিন্তা—শুধুই ছিল ত্যাগের, কিন্তু তার পরেও পদ্মা—উঃ রাজ্যের শ্রী কন্যা আমার, সব ওলট পালট করে দিয়ে গেল, চিহ্ন রেখে গেল ওই কচি মেয়েটাকে। আমায় আবার নতুন করে গড়ে তুলতে, এ অসাড় প্রাণে আবার সজীবতা! ভগবানকে ডাকতে ওরই মুখ মনে পড়ে যায়, কোথায় যে ও আমায় ঠেলে নিয়ে—ওপানে দাঁড়িয়ে কে?

আজ্ঞে, আমি সোহাগি।

রাজা। ও। চিত্রা কোথায়?

সোহাগ। (নতমুখে নম্রভাবে) তিনি এলেন না।

রাজা। এলে না? কোত্থেকে? কোথায় তাকে রেখে এলে দাসী?

সোহাগ। পথে একটা ফুলের মালা কুড়িয়ে পেয়ে তাঁর যেন কেমন এক আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন এল।

রাজা। (বিস্ময়-বিহ্বল)।

সোহাগ। পথের মাঝে একটা হরিণ শিশুর পিছনে ছুটতে লাগলেন কত ডাকলুম, সাথে সাথে ছুটলুম। পারলুম না ধ'রতে। (চোখ আঁচল দিয়া ঢাকিল)।

(মনোব্যথায় রাজার প্রস্থান)

রাজা। (নেপথ্যে শোনা গেল) যে-যেখানে যত প্রহরী আছে, সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করে খোঁজ। প্রচুর পুরস্কার পাবে।

তৃতীয় দৃশ্য

(পত্র পুষ্পে সুশোভিত উদ্যানে সুচিত্রা।)

গান

চলি খেয়ালে—আমি খেয়ালি।
যারে চিনিনা ডাকে সে খালি।
চলি কাননে ছবি আঁকিয়া;
কেগো ইসারায় আনো ডাকিয়া।
হৃদয় মাঝে—কে তুমি সাজ এ
রঙিন আলোর জ্বালো দেয়ালি?
আমি খেয়ালি।
চাহে তুলি মোর আঁকিতে তোমা।
কোন কাননের তুমি সুষমা?
বাসনা মনে, তব চরণে
উজাড়ি দিতে ফুলের ডালি।
আমি খেয়ালি।

[পথিকদ্বয়ের প্রবেশ]

১। আরে এই দিক থেকেই না গানের সুর শুনছিলুম?

২। তাই ত এ দেখি, খালিই বাগান, গান কে গাইলে?

সুচিত্রার দিকে চাহিয়া। তাই বল? এমন সোনার চাঁদটি থাকতে, আমরা শুধু মেঘের আড়ম্বরই দে দেখছি? তুমি কে গো?

সুচিত্রা। আমি? কেন? তোমাদের কি চাই?

২। ওঃ বাবাঃ। আবার চোখ-রাঙানি? ভস্ম কোরবে নাকি?

১। আরে সব বেটা পাড়া গেঁয়ে, আকাট মুখ্যু সব বেটা সব্ বেটা—হ্যাঁগা—তুমি কাদের গা—? তুমি কি গাইছিলে—গা? তুমি—তুমি—এই—

সুচিত্রা। আমায় কী তোমরা চেন না? আমি যে সবার রাণীদিদি, সুচিত্রা।

উভয়ে। তাতাতা। আমরা পেন্নাম হই দিদি, এই পথে চোলে যান। কোনো ভয় নেই, আমরা আছি। চির দাস—চির দাস।

(বেগে পলায়ন)

সুচিত্রা। এ আমি এলাম কোথায়? দাদুতো কখনই আমায় এখানে নিয়ে আসেন নি, এমন সুন্দর জায়গা কি তিনিও দেখেন নি? ফুলের বনে, পাখীর গান, ময়ূরীর নৃত্য, হরিণের খেলা যে এত সুন্দর, চোখে না দেখলে কে বিশ্বাস করতে পারে? বইয়ের পৃষ্ঠায়, ছবির পটে কতটুকু রঙ ফোটাতে পারে!

যতই প্রকাশ করুন কবি, আর শিল্পী, প্রকাশ করা হয় না কিন্তু কিছুই (স্নানান্তে স্তব পাঠ করিতে করিতে, কমণ্ডলু হাতে মুক্তির প্রবেশ)।

মুক্তি। কে তুমি বোন, একলাটি বোসে এখানে?

সুচিত্রা। আমি সুচিত্রা, আপনি কী সন্ন্যাসিনী?

মুক্তি। সন্ন্যাসিনী, পূজারিণী, তপস্বিনী যা খুসী তাই বোলতে পার। কিন্তু আসলে আমি ও সব কিছুই নয়।

সুচিত্রা। তবে আপনি?

মুক্তি। আপনিও নয়। আমার নাম মুক্তি। ঋষিরা ওই বোলেই আমায় ডাকেন।

সুচিত্রা। আমিত ভাই কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না এ কোথায় এসেছি? পথ হারিয়ে বনে বনে ঘুরেছি সারারাত। এখন ভোর বেলা, তবু তোমার দেখা পেলুম! হ্যাঁ ভাই, এদেশে কি লোক নেই? কেবলি ফুল পাতা আর পাখীর ছড়াছড়ি? একি কাব্যলোকে চলে এলুম?

মুক্তি। না বোন এটা একটা মুনিদের তপোবন। কেন? তোমার দাদুর মুখে শোনোনি? যে, তাঁর রাজ্যের বাইরে এরকম আশ্রম আছে?

সু। কি কোরে জানলে আমারই দাদু রাজা?

মুক্তি। তোমার নামটি শুনেই টের পেয়েছি, তুমিই সকলের রাণীদিদি, তোমার চিত্রনিপুণতার কথা, গরীবের প্রতি দয়ার কথা সবাই জানে, আমরাও শুনতে পাই।

সু। সে যাক তুমি এখানে ওঁদের কাছে তপস্যা শিখছ বুঝি?

মুক্তি। কই আর শিখতে পারি? এই ছেলেদের গান শেখাই, পূজোর ফুল তুলি, আর যাক চল তোমায় ঘরে নিয়ে যাই।

(দুজনের প্রস্থান)

(রাজার প্রবেশ)

সমস্ত রাজ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষে এখানে এলুম তবু তার দেখা নাই। দেশ বিদেশ থেকে অনুচর ফিরে এলো কেউই সংবাদ পেলেনা তার, ওরে পাগলী দিদি আমার, এই বুড়োকে একী সমস্যায় ফেলে গেলি? সেত' আমায় ছেড়ে কখনও কোথাও যায় না। তবে একী হোলো? হা—ঈশ্বর—এক রাত্রে যেন কী হয়ে গিয়েছি। এই কী তাপসদের উদ্যান? যে দিক পানে চাই ফুলের শোভা, পাখীর গানে যেন নন্দন কানন সৃষ্ট হোয়েছে, কিন্তু এত সৌন্দর্য্যও আমায় আজ মুগ্ধ কোত্তে পাচ্ছেনা, পাবকি এখানে আমার নয়নমণিকে?

বৃদ্ধ ঋষির প্রবেশ। প্রণাম—ঠাকুর, আপনাদের অনুমতি না নিয়ে এই তপোবনে প্রবেশ কোরে আপনাদের সাধনায় ব্যাঘাত কোরে থাকলে, ক্ষমা চাই।

ঋষি। কে তুমি পান্থ? পথশ্রমে তোমায় বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্ছে বিশ্রাম করবে আশ্রমে চল—

রাজা। আমি আপনাদেরই একজন দাসানুদাস, তবে বিশ্রামের সময় এখনও আমার আসেনি প্রভু আমি ভ্রান্ত আমি উন্মাদ।

মুক্তির প্রবেশ ফুলের সাজি হাতে।

মুক্তি। আপনি আমাদের মাননীয় রাজ-অতিথি, গুরুদেব,—ইনিই প্রজা-বৎসল রাজা, জগৎ পাল।

ঋষি। এঁকে নিয়ে যাও মা, তপোবন দর্শন করিয়ে, পরিচর্য্যায় তুষ্ট কর।

মুক্তি। আসুন নরপতি!

চতুর্থ দৃশ্য

(উদ্যান পথে চলিতে চলিতে মুক্তি ও সুচিত্রা)

সুচিত্রা। আমায় পথের মাঝে ফেলে কোথায় গিইছিলে বোন্?

মুক্তি। কেন ভাই? ভয় পেয়েছিলে?

সুচিত্রা। ভয় পাবার মেয়ে আমি নই। দাদু আমায় তেমন শিক্ষা দেননি।

মুক্তি। এই যে ভাই আমার বাড়ীটি—

সুচিত্রা। তুমি একা থাকো এখানে?

মুক্তি। এতদিন ত' তাই ছিলুম ভাই, তবে আর আর নেই।

সুচিত্রা। এ ত' ঋষিকের সাথী দিদি! এতো

তোমার এত আনন্দ ?

মুক্তি। হ্যাঁ বোন্, যা কিছু তৃপ্তিময়, তা ক্ষণিকের হোলেও মনটা ভরিয়ে রাখে কানায় কানায়। পথের কষ্টে মুখটি শুকিয়ে গেছে; বিশ্রাম কোরবে, ভেতরে যাও।

(সুচিত্রার গৃহে প্রবেশ)

দেবব্রত। এই যে মুক্তি!

মুক্তি। হঠাৎ আমায় দেখতে এত সাধ কেন দেব-দা ? আজকের ফুলের তোড়া কি পছন্দ হয়নি ?

দেবব্রত। না ভাই, সে কখনই খারাপ হয় না। তোমায় স্মরণ করেছি অন্য কারণে। আজ বেড়াতে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। পথের মাঝে এই ছবিখানি কুড়িয়ে পেয়েছি; তা আবার অর্দ্ধ-সমাপ্ত।

মুক্তি। আর একটি ফুলের মালা ফেলে এসেছ কেমন ? যাক্ তা আমায় কোত্তে হবে কি ? ছবিটি সমাপ্ত করাবে নাকি ?

দেবব্রত। না, যে এটি শেষ করবার অধিকারী তাকেই খুঁজতে হবে।

মুক্তি। কোথায় ? কে সে ?

দেবব্রত! সে কথা জানিনে, তবে ঠিক জানি, সে আছেই। আমি যখন পথ থেকে ছবিটি তুলে নিই তখনও এর প্রতি রেখাটি কাঁচা রঙে তক্‌তক্ কচ্ছিল। তাই বোলছি, আমি তাকে খুঁজে বের কোরব। তুমি সাহায্য কোরবে আমায় ?

মুক্তি। সেত' বেশ কথা। কিন্তু এই যে ছবির মাথায় সুচিত্রা নামটি দেখছি। এটি কার গো ?

দেবব্রত। যে চিত্র আঁকছিল, তারই হওয়া সম্ভব।

মুক্তি। ওঃ তাই বুঝি এত আড়ম্বর কোরে সন্ধানের জন্য ছুটতে চাইছ ?

দেবব্রত। বেশ, সন্ধানের ভার না হয় একলা তুমিই নাও।

মুক্তি। তা দিলে কি হবে ? একি বনের ফুল ? না, পাকা ফল, যে হুকুম কোল্লেই মিলবে ?

দেবব্রত। বেশ আমার ছবিটি তোমার কুটিরেই রেখে দাও। সে না হয় নিরুদ্দেশেই থাক।

মুক্তি। আর উদ্দেশ যদি পাই ? কি দেবে আমায় ?

দেব। তোমায় আর কি দেব ? তুমি ত' কিছুরই প্রত্যাশী নও।

মুক্তি। ওসব কথায় আমি ভুলচিনে। আজ তোমার মনের কথার একটি গান গেয়ে শুনিয়ে দাও।

দেবব্রত। ওঃ বাবা একেবারে গান। তাও মনের কথা ? এ যে একাধারে গায়ক এবং কবির ক্ষমতা চাই। সে আবার কেমন ?

মুক্তি। এই ত' এমনি।

গান

হৃদয় আমার আজি চাহে কারে গো
চলিতে চমকি তাই বারে বারে গো
দেখিনি সে ফুলকলি
সুবাসে পড়েছে ঢলি
মন ওঠে চঞ্চলি
কবো কারে গো!
শ্যামল কাননছায়
আজি প্রাণ মন চায়
সাজাইতে অ-দেখায়
ফুলহারে গো।

দেবব্রত। সত্যি মুক্তি, কি চমৎকার তোমার গলাটি।

মুক্তি। তাতো বোলবেই। তোমার মনের গান গাইলুম কিনা!

দেবব্রত। এ-সব ঠাট্টা করা কত অন্যায় তা জান ? এখানে ঋষিকুমারদের এর চাইতে আর কি অপমান করা যায় ?

মুক্তি। এখানে কিন্তু উর্ব্বশীরও কিছু অভাব নেই।

পঞ্চম দৃশ্য

(আশ্রমের প্রাঙ্গণস্থ বেদীতে বসিয়া বৃদ্ধ ঋষি সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুক্তি।)

মুক্তি। আজ আমার একটা সমস্যার মীমাংসা কোরে দিন গুরুদেব।

ঋষি। কি সমস্যায় পড়েছিস্, মা ?

নতমুখে মুক্তি। আপনার কোনও শিষ্য যদি বিবাহিত হোতে চায় অনুমতি দেবেন কি ?

ঋষি। কেন দেব না মা ? সংসার ছেড়ে যখন অনুমতি চেয়েছিল ব্রহ্মচর্য্য পালনের, তখনও যেমন হাসি-মুখে অনুমতি দিয়েছি, এখনও তেমনি দেব। মনের সাধ অপূর্ণ রেখে, কে কবে সাধনায় উন্নত হোতে পেরেছে বোলতে পারিস মা ?

মুক্তি। গত রাত্রে অনেক চিন্তা কোরে—

ঋষি। কি মা ? বল আমার কাছে আবার লজ্জা কি তোর ?

মুক্তি। আপনার দেবব্রতর এই মালাটি কুড়িয়ে রাজ-কুমারী সুচিত্রা উদাসীনী হয়ে গৃহত্যাগ কোরেছেন ! তারপর সুচিত্রার সুন্দর একটি ছবি পেয়েছেন দেব-দা। আমার মনে হয় দুজনের—

ঋষি। তা বেশ, মা। স্বয়ং রাজলক্ষ্মী আমার উদ্যানমন্ত্রী হবেন, এত সুখের কথা। এই সবই ত' সেই ভোলানাথের খেলা—আমাদের চিন্তার বাইরে। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর এই দম্পতীর জীবন যেন ত্যাগের মাহাত্ম্য উপলব্ধি কোরে উন্নত হয়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(মুক্তির কুটীরের প্রাঙ্গনে মালা হাতে সুচিত্রা)

সুচিত্রা। এ আমি করছি কি ? কোথেকে কার গলার মালা কুড়িয়ে পেয়ে নিরুদ্দেশের সন্ধানে ছুটে চলেছি; একি ইসারা ? আর তারই টানে চলেছি ছুটে ? আশ্চর্য্য, আমার দাদু ? স্নেহময় দাদু হয়ত কেঁদে সারা হোচ্ছেন। নাঃ আর ভাবতে পারিনে। এস মাতাল হাওয়া, এই মালার সুবাস লুটে সেইখানে নিয়ে যাও সেখানে আমার পথ-চলার সমাপ্তি, যেখানে আমার—

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। কি ভাবছিস বোন, ওমনি তন্ময় হোয়ে ?

সুচিত্রা। ভাবছি তোমাকে। সেই যে আমায় একটি ফেলে পালিয়েছ আর দেখা নেই।

মুক্তি। তোর কোলে ছিল মালা। মালার সাথে ছিল কল্পনা। তুই ত একা ছিলিনে ভাই !

সুচিত্রা। সে ঠিক, কিন্তু কল্পনা কী সত্যি হয় দিদি ? কেউ কী আমার মত কল্পনাকে ভালবাসতে পারে ?

মুক্তি। পারে, কল্পনাকে ভালবাসতে পারে বলেই ত কত যুগ থেকে কত প্রেম-পূর্ণ মন তোরই মত মধুময় কল্পনা কোরে আসছে ; যে-কল্পনাকে লক্ষ্য করে ভেসে চলেছিস, অন্য চিন্তা ভুলে তাকি মিথ্যা হোতে পারে চিত্রা ? আমারও জীবন একদিন কল্পনাতে জড়ান ছিল। কত সুন্দর সে অনুভব, মনের উদ্যানে কুঁড়িটি মাথা তুলতেই কে যেন মুচড়ে ভেঙে দিলে। হতাশের নিশ্বাস ফেলে সরে দাঁড়ালুম। লোকে বোল্লে বিধবা, আমি বক্ষের স্পন্দন শুনতে পেলুম। উঃ আমি এলুম নিরুদ্দেশে, লোকে বোল্লে উচ্ছন্ন যাও। পেলুম মুক্তশান্তি। লোকের কথা শুনবার সময় পাইনে আর—যাক সে অতীত দুঃখের কাহিনী।

সুচিত্রা। তোমার কথা শুনে ভারি ভয় হোচ্ছে, বড় দুঃখিনী তুমি নয় ?

মুক্তি। কই আর দুঃখ ? ঈশ্বর আমায় ভালবাসেন, হয়ত তাও শুধু কল্পনাই। তাই বলছিলুম—যাক্ ও কথা। তুই এই ছবিটা শেষ কোরে দেত' ভাই।

সুচিত্রা। একী ? এ যে আমারই হাতের আঁকা ! কী কোরে পেলে তুমি ? আশ্চর্য্য !

মুক্তি। সে যে করেই পাই এখন বোলবার সময়ও নেই, ঢের কাজ।

সুচিত্রা। তন্ময় হইয়া চিত্র আঁকিতে লাগিল।

(নীরবে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল দেবব্রত।)

সুচিত্রা। কি আশ্চর্য্য ! সেই সমুদ্র তীরে ফেলে এসেছিলাম ছবিটি। আজ তা আমারই শেষ কর্তে হোচ্ছে। আমার উপেক্ষিত জিনিষ কার এত আদৃত হোল কে জানে !

দেবব্রত। (স্বগত) কে তুমি সুন্দরী ? তোমার শুভ্র হাতের নিপুণতায় আমায় মুগ্ধ কোরে ফেলেছ সুন্দর অতি সুন্দর তোমার অঙ্কন। অনিমেষ নয়নে চির যুগ-যুগান্তর চেয়ে থাকলেও তৃপ্তি হয় না। তোমার চম্পকাঙ্গুলির সৃষ্টি সত্যই সার্থক।

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। হ্যাঁরে কোত্থেকে কার মালা কুড়িয়ে পেয়েছিস, দিবিনে তাকে ফিরিয়ে? আর সে বেচারি তোর একটা কী মাথা-মুণ্ডু ছবি পেয়েছিল' ওমনি দিয়ে গেছে। এইত ভদ্রতা আর অভদ্রতা।

সুচিত্রা। তা দিয়ে এসনা যার মালা তাকে আমি তো দেব বলেই এসেছি, কে আমার ছবি পেয়েছিল? কার এ—

মুক্তি। মালা? থাক ও প্রশ্নটি ত' কতবারই শুনেছি যার মালা তাকে পরিয়ে দিতে পারবি? তাকে ডাকব?

সুচিত্রা। ডাক'না, পারি কিনা দেখে নিও।

মুক্তি। দে তবে আমার গলায় পরিয়ে—

সুচিত্রা। তুমি ত' পূজনীয়া, পায়ে জড়িয়ে দিলেই দেখাবে ভাল। এস' পরিয়ে দিই।

মুক্তি। থাক্ থাক্, এমন অপাত্রে তোর দান পৌছিয়ে কাজ নেই। ওই তোর মালার মালিক পেছনে দাঁড়িয়ে—

(প্রস্থান)

দেবব্রত। কে তুমি, মূর্ত্তিমতী? কেনই বা ওই তুচ্ছ মালাটির জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসেছ?

সুচিত্রা। জিনিষ ফিরিয়ে দেওয়া বই অন্য আর কোন উদ্দেশ্যই নেই আমার, মালা যদি আপনার হয় ফিরিয়ে নিন।

দেবব্রত। তাই নেব বলেই ত' তোমার অর্দ্ধ সমাপ্ত ছবি নিয়ে পথে বিপথে তোমার সন্ধানে ঘুরেছি আজ আমার সে কষ্ট সার্থক। দাও আমার মালা আমায়।

(সুচিত্রা দেবব্রতর কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিল এবং দেবব্রত মালা খুলিয়া সুচিত্রার কণ্ঠে পরাইল)

সুচিত্রা। ওকি কোরলেন?

দেবব্রত। প্রতিদান। আমরা বন্য ঋষি হলেও, তোমাদের রাজকীয় প্রেমের অমর্য্যাদা করি না।

(রাজাকে লইয়া মুক্তির প্রবেশ)

সুচিত্রা। দাদু, দাদু, কি কোরে এলে পথ চিনে?

রাজা। ভারি মুস্কিল হোয়ে গেল কেমন? কি কাণ্ডটাই করলি দিদি? বুড়ো দাদুকে একেবারে—

সুচিত্রা। তা আমার কি দোষ দাদু?

রাজা। বুঝতে পেরেছি, ওই চোর ভায়ারই সব দোষ। ভায়া হে, কাননবাসী বয়ে অমন চুরিবিদ্যে শিখলে কোথায়? এদিকে এস, আমিত সত্যিই চুরির তদন্ত কোরতে আসিনি, এই বুড়ো বয়সে অতটা দৃষ্টি শক্তিই বা কই? (উভয়ের প্রণাম)।

[বালক বালিকাদের প্রবেশ ও মুক্তির সহিত গান]

মুগ্ধ সজনী;—মিলন রজনী সাজাব রজনী গন্ধায়
আজি কুসুমের কনক-সাজিটি ভরিয়া আনিতে মন ধায়
গগনে পবনে কি খেলা
কে রহিবে ঘরে এ বেলা
এনেছি কেতকি পরাতে কবরীর চুলে গো
রচনা করেছি শয্যা করবীর ফুলেগো
কে আনিল আজি বরিয়া
অভিসার ভরা সন্ধ্যায়।

(যবনিকা পতন)

গনিমা

গল্প

ডাক্তার শ্রীঅমূল্যধন ঘোষ

এই বিরাট সংসারে আমি একা। এই একার জন্যও আমার সারাজীবনের স্বাধীনতা ঘুচাইয়া বৃদ্ধবয়সে আমাকে পরের চাকুরী গ্রহণ করিয়া প্রবাসে কাটাইতে হইতেছে। এককালে আমার ঘর সংসার সবই ছিল,—ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তখনও কাহারও দাসত্ব করি নাই। অভাবের কোলে আমি মানুষ হই নাই;—অর্থের অভাবেও আজ একলার জন্য দেশ-ছাড়া হই নাই। অশান্তির দারুণ তাড়নে ঘর-ছাড়া হইয়া, আমি একটা কিসের সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইতেছি,—আমি নিজেই ঠিক জানিনা।

যাহা হউক, সুদূর প্রবাসে এই বিরলবসতি মুসলমান পল্লীতে আমি একা নিজের জীবনভার বহন করিতেছি। বয়স আমার পঞ্চাশ পার হইয়া গেছে মাত্র। এ বয়সেও লোকের অনেক কাজ থাকে। কাজ আমারও বাকী রহিয়াছে। জীবনের হিসাব-নিকাশের খাতা বন্ধ করিয়া পারের অপেক্ষায় খেয়া-ঘাটে ত' এখনও চুপ করিয়া বসিতে পারি নাই।—অবসরের এখনও একটু দেরী আছে।

দেশে আজও আমার সবই আছে। অবসরের সঙ্গী আছে,—জ্ঞাতিবৃন্দ আছে,—জমিজমা আছে,—পাষাণ-দেবতা 'গোপীনাথ' আছেন;—তাঁহার নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে। শুধু অদৃষ্ট দোষে আমারই ব্যবস্থা উল্টা হইয়া গেছে।

ব্রাহ্মণ সন্তান—পরকালের চিন্তা এখনও ছাড়িতে পারি নাই,—পঞ্চভূতের মায়াও অবশ্যই আছে;—ঊর্দ্ধদেহীক ক্রিয়াদিও অবিশ্বাস নাই। তবু আজ একা ভিন্ন দেশে মরিয়া শৃগাল-কুকুরের আহার জোগাইতে আসিয়াছি।

কলিকাতাবাসী এক হিন্দু জমিদারের গোমস্তাগিরি লইয়া আমি তাঁহার এই মুসলমান প্রজামহলে বাস করিতেছি। রাঁধি-বাড়ি, খাজনা আদায় করি,—অবসর সময়ে একা ঘুরিয়া বেড়াই। কাহারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখি না। শুধু কড়া-ক্রান্তি-কাগ-তিল পর্য্যন্ত কিস্তিতে কিস্তিতে কড়া ভাবে আদায় করি,—খাজনা-গণি,—চেক্ কাটি,—দিন কাটাই।

এরূপ জীবন কি বহিতে ভাল লাগে? নিঃসঙ্গ জীবনের এতটা ফাঁকা জায়গা যা'হোক কিছু দিয়া কি ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় না? আমার আপনার বলিতে কেহ নাই সত্য;—তবু মানুষ কি মানুষকে ছাড়িয়া থাকিতে চায়? কিন্তু সম্প্রতি সমস্ত মানুষ জাতিটার উপরেই আমার দারুণ ঘৃণা হইয়া গিয়াছে। নিজের জীবনটার প্রতিও একটা ধিক্কার আসিয়াছে।

ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী আমি ছাড়িয়া দিয়াছি। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবার সময় আমার গৃহদেবতা 'গোপীনাথের' উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম করি,—কিছুই কামনা করিয়া নহে,—শুধু বহুকালের সংস্কারবশতঃ।

(খ)

এক ধনী মুসলমান নবাব সাহেবের এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী এখানে আছে। ইহা সাধারণের বেড়াইবার স্থান। এবং 'গনিমা' নামে খ্যাত।

মধ্যে মধ্যে এখানে বেড়াইতে আসি। কে এই ধনী মুসলমান? কোথাকার নবাব ইনি? এসব কিছুই আমি জানি না;—জানিবার জন্য কৌতূহলও কখনও হয় নাই। তবে লোকে বলে, ইনি এদেশীয় লোক নহেন,—অল্পকালমাত্র এখানে আসিয়া এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

উদ্যানটী বহুদূর বিস্তৃত। চারিদিক অত্যুচ্চ প্রাচীর-দ্বারা বেষ্টিত, একটী মাত্র লোহার ফটক,—এবং ফটক সংলগ্ন এক ইষ্টকনির্ম্মিত দেউড়ী। বাহির হইতে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বাহিরে চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত কেবল ধান্যক্ষেত্র,—কোথাও লোকালয় নাই।

বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে ত্রিতল অট্টালিকা। প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। অট্টালিকার সম্মুখভাগে এক প্রকাণ্ড সুগভীর 'ইঁদারা'।

উহার জল লইতে বহুদূর হইতে লোকে এখানে আসে শুনিয়াছি, বিস্তর কৌশলে উহা খনিত হইয়াছে।

ইঁদারার চারিদিকে উচ্চ দেওয়াল তুলিয়া তদুপরি প্রশস্ত ছাদ ও বারাণ্ডা নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং তথায় উঠিয়া কূপের জল তুলিয়া স্নানের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। তদ্ব্যতীত কলের সাহায্যে জল উত্তোলন করিয়া অট্টালিকার উপরিস্থ লৌহময় বৃহৎ আধারে রক্ষিত হয়, এবং নলের দ্বারা অট্টালিকার মধ্যে নীত হয়।

বাড়ীর উপরতলার পুরোভাগে একটী স্নানাগার। বাহির হইতে নির্ম্মিত সুন্দর সোপানদ্বারাও এখানে প্রবেশ করা যায়।

উদ্যানটী সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই দেবতা ও উপদেবতা বিষয়ক নানা অপরূপ কথা শুনা যাইত।

কতবার এখানে আসিয়াছি—বেড়াইয়াছি। কত সুন্দর প্রশস্ত পথ ঘাট—কারুকার্য্যখচিত সুদৃশ্য বেদিকার উপর সুন্দর কুসুমলতাবিতান,—সুন্দর সুগভীর সুনির্ম্মল সরোবরের চারিপাশে সজ্জিত বিবিধ সুন্দর সুন্দরবৃক্ষের শোভা—কত সুন্দর দৃশ্য চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেছে—কত বিহগের ললিত কাকলি কানের ভিতর পশিয়াছে,—কত স্নিগ্ধ সুখ মর্ম্মের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া ফিরিয়া গেছে।—আমি শুধু আসিয়াছি, বসিয়াছি' ঘুরিয়াছি ফিরিয়া গেছি।

প্রৌঢ় নবাব সাহেবের সুঠাম সুন্দর গৌরবর্ণ দীর্ঘ উন্নত মূর্ত্তি কতবার আমার সম্মুখে পড়িয়াছে, সামান্য দুই একটা কি তুচ্ছ কথা মনেও পড়ে না,—শুধু মনে পড়ে ময়নার মিষ্ট স্বরের মত, আমার পক্ষে প্রায় অর্থহীন, তাঁহার উর্দ্দু ভাষার উচ্চারণের মধুর রেস্।

সন্ধ্যার পর আটটা বাজিলেই 'গনিমার' ফটক বন্ধ হইয়া যায়। কত সন্ধ্যায় আমার বাহির হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার পিছনে ভারী লোহার ফটক লৌহবর্ম্মের উপর দিয়া সশব্দে টানিয়া রুদ্ধ করা হইয়াছে,—অন্যমনে ফিরিয়া দেখিয়াছি, বাহির হইতে লৌহনিগড় বন্ধ করা হইতেছে। চাকর মালী প্রভৃতি সকলে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।

রাত্রে ভিতরে কেহ থাকে কিনা—নবাব সাহেব কোথায় থাকেন,—এসম্বন্ধে কাহাকেও কোনও দিন কোন আলোচন করিতে শুনি নাই। নবাব সাহেবের আত্মীয় স্বজন কাহাকেও কেহ কখনও এখানে দেখে নাই। কিন্তু কেহ যদি ভিতরে থাকিত তাহা হইলে বাহির হইতে অর্গল বন্ধ করা হইবে কেন? ভোরে যাইয়া দেখিয়াছি, দ্বার খোলা হইয়াছে—লোকজন যাতায়াত করিতেছে, চাকর-মালী কাজে নিযুক্ত আছে,—নবাব সাহেব উদ্যানে পাদচারণ করিতেছেন।

বৃহৎ অট্টালিকার সকল ঘরেরই বাহিরের দিকের সকল জানালা-দরজা সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকে—ভিতরে কোথাও কেহ আছে কিনা, কিছুই জানা যায় না;—কাহাকেও কখনও ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না;—শুধু প্রত্যহ দুপুরবেলায় একটা নিরূপিত সময়ে সাদা ধব্‌ধবে চাপ্‌কান্ পরা একজন পশ্চিমদেশীয় মুসলমান খানসামা কতকগুলা কিসের উপকরণ পরিপাটিরূপে ঢাকা দিয়া দুই হাতে ধরিয়া নিঃশব্দে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে ও ক্ষণিক পরে আবার বাহির হইয়া যায়। সেই সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ নগ্নপদে পরিচ্ছন্নভাবে নানারূপ ফুলফল প্রভৃতি উপচার লইয়া একইভাবে প্রবেশ করে ও চলিয়া যায়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে, অথবা স্থানীয় কাহারও সঙ্গে কোনও পরিচয়ের লক্ষণ দেখা যায় না। একটা যন্ত্রের বাঁধা ধরা কার্য্যের মত তাহাদের আচরণের কোনও ব্যতিক্রম একদিনও ঘটে না।

সাধারণের ধারণা যে নবাব সাহেবের ব্যবস্থামতে এই দুইজন, হিন্দু ও মুসললান উভয় দেবতারই নিত্য পূজা ও সেবার, বিভিন্ন উপকরণ দিয়া যায়।

গ

বৈশাখী পূর্ণিমারাত্রি। রাত্রে আহার করিব না। মনটাও আদৌ ভাল ছিল না। সন্ধ্যায় 'গনিমায়' বেড়াইতে আসিয়াছিলাম। একটা মর্ম্মরাসনে উপবেশন করিয়া চন্দ্রোদয় দেখিতেছিলাম।

অতীতের কত স্মৃতি মর্ম্মে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ঠিক এক বৎসর গৃহছাড়া হইয়াছি। এই পূর্ণিমায় গোপীনাথের ফুলদোল সারিয়া, সারারাত্রি তাঁহার পাষাণ চরণতলে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়া, ভোরে চোরের মত লুকাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি। শপথ করিয়াছি যে যদি আবার আমার হারানিধি ফিরিয়া পাই তবেই আবার ফিরিব;—নচেৎ আমার ঈর্ষাপরায়ণ পাষণ্ড জাতিবর্গ লইয়া

জাতি ও সমাজে থাকিয়া, পাষাণ ঠাকুরের পূজার মিথ্যা আড়ম্বর অভিনয় করিব না।

এই দোল উপলক্ষে আমার বাড়ীতে ধুমধাম ঘটা হইত। এককালে দেশের হিন্দুমুসলমান সকল লোকই জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমাগত হইয়া আনন্দে যোগদান করিত। বিস্তর মুসলমানের বাস,—অথচ হিন্দু-মুসলমান কাহারও মনে একটা জাতিগত বিদ্বেষভাব ছিল না। কিন্তু কিছুকাল হইল একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

বাহিরের দিক দিয়া হিন্দু-মুসলমান একত্র করিবার চেষ্টা যতদিন হইতে বেশী করিয়া সুরু হইয়াছে,—ভিতরের দিকটা ততই তফাৎ হইয়া আসিয়াছে। জাতীয় ধর্ম্মানুশীলনের দোহাই দিয়া জাতির মধ্যে ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের বিষ সঞ্চারিত হইতেছে। প্রায়ই দেখা যাইতেছে যে অনেকেই জাতির দোহাই দিয়া ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত ঈর্ষ্যা ও দলাদলি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পূর্ব্বে হিন্দুপল্লী মধ্যে মুসলমান অধিবাসিরা একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিত না। কোনও বিষয়ে তাহাদের একটা বিশিষ্টতা ছিল না। সম্প্রতি কথায়-বার্ত্তায়, আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে—তাহাদের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। সহরে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ও দাঙ্গা হইলে, পল্লীগ্রামেও তাহার সংক্রমন পৌছিতেছে। বিস্তর বিদেশী মুসলমান এখন নানাসূত্রে এই পাড়া-গাঁয়ে সংস্কারহীন আধা-হিন্দু মুসলমানদের সহিত ঘনিষ্ঠতা চালাইতেছে।

যাহা হউক, ফুলদোল উপলক্ষে আমি শিষ্যদের নিকট সাহায্য সংগ্রহ করিতে যাইতাম। এবারে যখন যাই, তখন কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা চলিতেছিল। দেশের মধ্যেও ছোট-খাটো হাঙ্গামা দেখা দিয়াছিল। উৎসবের আগের রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম আমার জ্ঞাতিভ্রাতার আশ্রয় হইতে আমার এক মাত্র যুবতী বিধবা কন্যা চুরি গিয়াছে।

নিষ্ফল অন্বেষণে রাত্রি দিন কাটিয়া গেল। পুরোহিত পূজা সারিয়া গেল। আমি গৃহত্যাগী হইলাম।

(ঘ)

আজ সম্বৎসর পরে, সেই ফুলদোলের রাত্রে প্রবাসে একাকী;—মনের মধ্যে কত ভাবনার ধারা বহিতে লাগিল। নৈরাশ্যের আবেগে চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শক্তি শিথিল হওয়ায় দেহভার নোয়াইয়া পড়িল। সারা দেহ আপনা হইতে সেই প্রশস্ত প্রস্তরাসনের উপর ধীরে ধীরে বিরামের শয্যা করিয়া লইল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি কিছুই খেয়াল ছিল না। সহসা এক সময় নিদ্রাভঙ্গে চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম,—অনেক রাত্রি হইয়াছে। মনে পড়িল, এতক্ষণে ফটক নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—আমি নিদ্রিতাবস্থায় বন্দী হইয়াছি,—পলাইবার কোনও উপায় নাই। এক প্রকার অজানা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম। এই উদ্যান সম্বন্ধে যে সকল বিভীষিকাময়ী কাহিনী শুনা ছিল, একে একে সে সকল মনে পড়িতে লাগিল। এই মনুষ্য সমাগমহীন অতি বিস্তীর্ণ অবরোধের মধ্যে একা আমার হৃদ্‌কম্পন উপস্থিত হইল।

গভীর নিশীথিনীর স্তব্ধ গম্ভীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া, সহসা অলঙ্কারের শিঞ্জনের ন্যায় কিসের ক্ষীণ মধুর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। শব্দে আকৃষ্ট হইয়া স্নানাগারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম, সোপানের উপর একই স্থানে, গায়ে গায়ে, কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদন বস্ত্রে আগাগোড়া আবৃত, মানুষ মূর্ত্তির মত ছয় সাতটী মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। মলয় মারুতের প্রবল সঞ্চালনে তাহাদের আবরণ-বস্ত্র উড়িতেছে।

মনুষ্য সমাগমের সম্ভাবনাহীন স্থানে এই মূর্ত্তিকয়টীকে মনুষ্যলোকের কোনও জীবন্ত জীব বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না:—শবাচ্ছাদনী বস্ত্রে মুড়ি দিয়া যেন কোন্ গভীর কবর হইতে কয়টি মরা মানুষ উঠিয়া আসিয়াছে।

একটা অতর্কিত চীৎকার আমার বুকের মধ্য হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আমারই ভিতরে কোথায় মিলাইয়া গেল।

আমার ঠিক বিশ্বাস হইল যেন প্রেতলোকের কয়েকটী অতৃপ্ত আত্মা, মায়ার টানে মৃত্যুর অন্ধকার রাজ্য পার হইয়া আসিয়া, এ জগতের আলো হইতে আত্মগোপন জন্য আলুলায়িত কৃষ্ণবসনে চরণতল পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া সন্তর্পনে এপারের খবর লইতে আসিয়াছে।—নচেৎ এমন অসময়ে এখানে মানুষ কেমন করিয়া,—কেনই বা,—আসিবে?

ভয়ে আমার চক্ষু মুদিয়া আসিল। মুখ তুলিয়া সে

দিকে চাহিয়া দেখিবার শক্তি ও সাহস আমার আর রহিল না। কতক্ষণ পরে অন্যদিকে ইঁদারার বারান্দাপানে দৃষ্টি পতিত হইতেই দেখিলাম, পূর্ণিমার নির্ম্মল চন্দ্রকে সম্মুখে রাখিয়া পাশাপাশি সেইরূপ ছয়টী মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের মুখের ও মস্তকের আবরণ উন্মুক্ত থাকায় জ্যোৎস্নালোকে দেখা যাইতেছে যে অলৌকিক সৌন্দর্য্য সম্পন্ন নারী মূর্ত্তি!—গৌর কান্তি মুখমণ্ডলের পশ্চাতে ও নীচে তাহাদের আবরণ বস্ত্রের অন্ধকার ছায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উড়িতেছে,—যেন ছয়টী জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের পশ্চাতে তাহাদেরই উদ্‌গীর্ণ ধূমরাশি উড়িয়া যাইতেছে।

আমি যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। প্রেত-লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যতই যুক্তি ও গল্প শুনিয়া থাকি না কেন—ইহা চিরকালই আমার জ্ঞানের অতীত। —অথচ এক্ষেত্রে চক্ষুকে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই।

চক্ষু মুদিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। মাথা ঘুরিতে লাগিল। চাহিতে ভয় হয়—অথচ কৌতূহল দমন করা যায় না। আবার চাহিয়া দেখিলাম,—ছয়টীই সম্পূর্ণ নগ্নিকা,—তাহাদের অঙ্গের কালো আবরণ খসিয়া গিয়াছে।—তাহাদের সুডৌল সুঠাম অবয়বের প্রত্যেক উন্নত স্থানটীতে চাঁদের আলো পড়িয়া সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

ইহারা কি স্বর্গের কিন্নরী? অথবা মানুষী? কোন অজ্ঞাত অভিসারের আয়োজনে ইহারা এমন সময়ে নগ্নঅঙ্গে অবগাহানুলেপন করিতেছে?

ইহাদের সিক্ত মার্জ্জিত দেহে নব-যৌবনের রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি নির্নিমেষ লোচনে ইহা দেখিতে লাগিলাম। কোনও সুনিপুণ ভাস্কর রচিত মর্ম্মরমূর্ত্তি হিমানি-সিক্ত হইয়া এত সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। ইহা যেন এক অন্য জগতের অপূর্ব্ব ভাস্কর-নির্ম্মিত তুষার-মূর্ত্তির উপর নবারুণের লালিমাময় আভা পড়িয়া গলাইয়া উজ্জ্বল জলধারা বহাইতেছে।

স্নান নিরতাবস্থায় ইহারা একটু সরিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং দেখা যাইতেছে যে অন্য এক অব-গুণ্ঠিতা রমণীকে তাহারা ছয়জনে ধরাধরি করিয়া স্নান করাইয়া দিতেছে। সে তাহার অবগুণ্ঠিকামধ্যে যতই তাহার মুখ লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, ততই তাহারা জোর করিয়া তাহার অঙ্গের বসন খুলিয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতেছে।

কে এই অবগুণ্ঠনবতী? এই যুবতীগণের লজ্জা সঙ্কোচহীন সমুন্নত অনাবৃত কলেবরের উপর নিজের লজ্জাবনত সঙ্কুচিত দেহের ভর দিয়া হেঁট হইয়া নিজের অঙ্গবিশেষের উপর পরিহিত বসন জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কাহার সরমে সে মরমে মরিয়া যাইতেছে? কাহারই বা লালসাময় কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে উহারা, নারী হইয়া, ইহার নিভৃত নারী অঙ্গের গোপনীয় সৌন্দর্য্য খুলিয়া ধরিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছে?

সহসা কোথা হইতে এক ঝলমলে সূক্ষ্ম পোষাক পরা পুরুষ-মূর্ত্তি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই যুবতী-গণের কণ্ঠ হইতে রঙ্গ-রসের হাসির এক মিলিত স্বর আকাশে ভাসিয়া উঠিল। রঙ্গোপভোগের কলাময় অঙ্গ-ভঙ্গীতে তাহাদের ছয়টী দেহ নানাভাবে সঞ্চালিত হইল। তাহাদের পীনোন্নত বক্ষঃস্থলের সঞ্চালন মধুর জ্যোৎস্না-লোককে যেন মুখরিত করিয়া তুলিল। যেন ইহারই শিহরণে অবগুণ্ঠিতার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। যেন নিরুপায় নির্ভরে সে অন্যতমা সুন্দরীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার পীনযুগলের মধ্যভাগে মুখ লুকাইল।

আর যেন উদ্যানের মালিক সেই প্রৌঢ় নবাব সাহেবের পূর্ব্বপরিচিত সেই ময়না-নিন্দিত কণ্ঠস্বর, বহু-দূরাগত সঙ্গীতের শেষ চরণের মত আমার কাণে একটা ভাষাহীন মধুর ঝঙ্কার রাখিয়া মিলাইয়া গেল।

মুহূর্ত্তমধ্যে মনে পড়িল, এই অসময়ে অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক এই গোপনীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে যদি কেহ আমায় দেখিতে পায়, তবে আমার কি শোচনীয় অবস্থায় ঘটিবে। আস্তে আস্তে গুড়ি মারিয়া আমি নিকটস্থ এক লতাবিতানের অন্তরালে আশ্রয় লইলাম। সেখান হইতে কোনও বিষয় পরিদর্শন করা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর রহিল না।

বিচলিত কণ্ঠের ব্যস্ত বাদানুবাদের একটা পরিস্ফুট ভাষা কাণে আসিতে লাগিল। যতটুকু শুনিতে ও অর্থ-বোধ করিতে পারিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, যে একজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। শেষে একযোগে কয়েকটী নারীকণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশিত হইল,—'পয়লা নম্বর ছিনাল!'

তারপর সমস্তই নীরব। অনেকক্ষণ কাণ পাতিয়া

রহিলাম; কিছুই শুনা গেল না। তারপর ধীরে ধীরে লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও কাহারও চিহ্নমাত্র নাই।

পুনরায় সেই বল্লরীমধ্যে ফিরিয়া গিয়া সারারাত্রি লুকাইয়া রহিলাম। মস্তিষ্কমধ্যে নানারূপ অসম্বদ্ধ চিন্তা ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। নানারূপ উদ্বেগ ও আবেগে কয়েকঘণ্টা অতি কষ্টে কাটিয়া গেল। অরুণালোক প্রকাশ পাইতেই প্রাণে ভয় হইতে লাগিল,—পাছে যদি ধরা পড়ি।

অট্টালিকা হইতে অনেকটা দূরে বাগানের মধ্যে গিয়া ধীরে ধীরে পাদচারণ সুরু করিলাম। খানিক-পরে ফটক খোলার শব্দ কাণে গেল। —মনে একটু সাহস আসিল। তারপর ফটকের অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় সম্মুখে দেখি —সেই নবাব সাহেব। একটা সেলাম করিয়া বেশ সহজ স্বরে বলিলেন,— 'বাবুজী, আজ বহুৎ সবেরে আয়েহেঁ!'

আমি শুধু একটা ক্ষুদ্র 'হাঁ' বলিয়া দ্রুতপদে ফটকের পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলাম।

(৬)

সারাদিন বাসায় ফিরিলাম না। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইলাম। অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইলে সময়ে সময়ে এক একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। শ্রান্তিবশে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ কাহার ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি, সম্মুখে আমাদের মনিবের দারোয়ান।

ঘড়িতে দশটা বাজিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু-জীকা তবিয়ৎ কুছ খারাপ হ্যায়?' আমি উঠিয়া বসিয়া উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ'।

তারপর তাহার অনুরোধে কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। পাশের ঘর হইতে সুপ্ত দরোয়ানের নাসিকাধ্বনি শুনা যাইতেছে। নিদ্রার অভাবে আমার শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া নিঃশব্দে দরোজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

এখন 'গনিমার' ফটক খোলা থাকা সম্ভব নয়। তথাপি দিকেই চলিলাম। কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি কিছুই জানি না। ফটক পর্য্যন্ত পৌছিলাম। রুদ্ধ অর্গল ঠেলিয়া দেখিলাম। আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কোনও প্রকারে ভিতরে প্রবেশ লাভ করিবার দারুণ আকাঙ্খা প্রাণে পীড়া দিতে লাগিল।

কিসের এই পীড়া? কেন এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা? গত রাত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই কি আবার দেখিবার আশায়? কতকগুলি নর্ত্তকী যুবতীর কুৎসিৎ ক্রীড়া সন্দর্শন বাসনাতেই কি? এই বয়সে, এই দারুণ মানসিক অবস্থায় আমার উপভোগের কি কিছু ইহাতে থাকিতে পারে?

কিন্তু, বুকে হাত রাখিয়া বলিতে হইলে নিশ্চয়ই বলিব যে কল্য রাত্রির ঘটনা আমাকে উন্মাদ করিয়াছে।—নচেৎ এই গনিমায় এত আকৃষ্ট হইবার মত কোন জিনিস আমি এতদিন পাই নাই।

নিষ্ফল ভ্রমণে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রত্যূষে দারুণ জড়িমা লইয়া বাসায় ফিরিলাম। তখনও দরোয়ানের ঘুম ভাঙ্গে নাই। ঘরে ঢুকিয়া একটা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। আলোকময়ী পৃথিবী আমার চক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। রাত্রে অন্ধকারে মনের তমসা লইয়া আমার বরং একপ্রকার কাটে।

শুইয়া শুইয়া কতক্ষণ কাটিয়া গেছে, বুঝিতে পারি নাই। জাগিয়াছিলাম কিম্বা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না। একটা মানসিক ঘোরের মধ্যে কত প্রকার চিন্তা পর পর আসিয়া ভাসিয়া ডুবিয়া গেছে। তন্দ্রা-লস শ্রবণে দরোয়ানের ডাক পৌছিল। আমি উঠিয়া পড়িলাম। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে স্নান করিলাম,—সামান্য আহারও করিলাম। অসুখ ও অক্ষুধার দোহাই পাড়িলেও তাহার সঙ্গে বেশী কথা কাটাকাটি করিয়া তাহার অনুরোধ কাটাইতে পারিলাম না।

দুপুরবেলা বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। গনিমার রহস্যের যে অজ্ঞাত আকর্ষণের পরিচয় গত রাত্রে পাই-য়াছি, তাহাতে স্থির বুঝিয়াছি যে আর আমার সেখানে না গিয়া একরাত্রিও কাটিতে পারিবে না। তাই আগের দিন বৈকালে যেমন নিজেকে অবসাদের আবেগে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সেখানে প্রবেশ লাভের সুযোগ হারাইয়াছি, —আজ কোনও মতে তাহা হইতে দেওয়া যাইবে না। তাই নানা চিন্তাজনিত উষ্ণ মস্তিষ্কে যদিও ঘুম আসিবার

বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি দুই রাত্রির অনিদ্রায় ক্লান্তবশতঃ পাছে ঘুমাইয়া পড়ি, এই আশঙ্কায় বিশেষ চেষ্টা করিয়া জাগিয়া রহিলাম।

বৈকালে উঠিয়া গনিমার দিকে বেগে রওনা হইলাম। কিন্তু ফটকের কাছে গিয়া ঢুকিতে আর পা উঠিল না। খানিকটা এদিকে ওদিকে পাদচারণ করিয়া সন্ধ্যা করিয়া ফেলিলাম। তারপর ইতস্ততঃ চাহিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

ইহার পূর্ব্বদিনে নিদ্রিতাবস্থায় বন্দী হইয়া এখানে ভয়ে ভয়ে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু, আজ আমি সকল আশঙ্কা বিসর্জ্জন দিয়া, সকল বিপদ মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়া, এখানে সারা রাত্রির ব্যাপার বুঝিবার জন্য লুকাইয়া থাকিতেই আসিয়াছিলাম। তবুও ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকটার মধ্যে একটু কাঁপিয়া উঠিল।

চুপ করিয়া একজায়গায় লুকাইয়া রহিলাম। ফটক বন্ধ হইবার শব্দ কানে গেল। চারিদিকে জন মানবের সাড়া নাই অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। চারিদিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। ইঁদারার উপরিস্থিত বারান্দা ও স্নানাগারের সিঁড়ির উপর বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিলাম। ঘোর মানসিক উদ্বেগের মধ্যে কতকক্ষণ কাটিয়া গেল। পূর্ব্বরাত্রের মত কিছুই কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

বহুক্ষণ পরে অট্টালিকার দ্বিতলে স্নানাগার সংলগ্ন একটা ঘরের মধ্য হইতে মানুষের চাপা আওয়াজ শুনা গেল। কাণ পাতিলাম। কিছুই বুঝা যায় না। গুপ্তস্থল হইতে বাহির হইয়া স্নানাগারের সোপানের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। তথাপি বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শুধু আমার মনে হইল যেন কাহার উপর একটা কিসের জেদাজেদি ও প্রতিপক্ষের মিনতিপূর্ণ তীব্র আপত্তির একটা ধারাবাহিক বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। এটা আমারই ভুল কিনা তাহাও ঠিক বুঝিলাম না। কাহারও ভাষা আমি স্পষ্ট শুনিতে পাই নাই। আমার কল্পনায় যাহা আসিয়াছিল, তাহাতেই একটা ভাষা দিয়া আমি তাহারই উচ্চারণ কৌশল কেবল অনুমান করিয়া লইতে ছিলাম।

ঘরের খোলা জানালায় যেন এক ছায়ামূর্ত্তি সরিয়া যাইতে দেখিলাম। খানিকক্ষণ সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই, দেখিলাম দুইহাতে দুই গরাদে ধরিয়া এক উন্নতদেহ পুরুষ বাহিরের পানে তাকাইতেছে। তাহার মুখের উপর নির্ম্মল চাঁদের আলো পড়াতে স্পষ্ট চিনিলাম,—সেই নবাব সাহেব! আমি তাড়াতাড়ি দেওয়ালের কোলে সরিয়া দাঁড়াইয়া আত্মগোপন করিলাম।

অল্পক্ষণ চুপ্‌চাপ। তারপর জেদাজেদির মাত্রা যেন বড়ই বাড়িয়া উঠিল। যেন একটা খুব রাগারাগি সুরু হইল। তাহার মধ্যে একটা স্বর স্পষ্ট আমার কানে পৌঁছিল, "ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাবার কাছে আমায় পাঠিয়ে দাও,—সেই আশায় আমি যে এক বছর তোমাদের অন্নজল মুখে দিই নি'।—জোর ক'রে আমার জাত-ধর্ম্ম নষ্ট করো' না।"

এই কণ্ঠস্বর আমার কত কালের—যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত!—শব্দময়ী মেদিনীর শতসহস্র বিভিন্ন শব্দের মধ্যে জননী যেমন আপন সন্তানের স্বর ছাঁকিয়া বাছিয়া লইতে পারেন, সেইরূপ এই স্বর আমি চিনিয়া লইলাম। প্রবাসীপুত্রের কণ্ঠস্বর যেমন অহরহ কল্পনায় কানে বাজিয়া বাজিয়া কখনও ভুল হইতে দেয় না,—সেইরূপ এই স্বরও যেন কখনও আমার ভুল হইবার নহে!

আমার বেদনাময় হৃদয়কন্দর মথিত করিয়া, গভীর মর্ম্মবেদনাকে জাগাইয়া তুলিয়া, সেই স্বর যেন কত কাতর আবেদন জানাইতে লাগিল। আমার নিতান্ত নিরুপায় ক্ষীণ শক্তিও যেন একবার লড়িয়া দেখিবার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা হইতে লাগিল যে সেই সুনির্ম্মিত সুকঠিন রুদ্ধ কবাট পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করি!

আমার মাথার ভিতরে রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। খানিক ক্ষণের জন্য ধারণাশক্তির সম্পূর্ণ গোলমাল হইয়া গেল। কি ঘটিয়া গেল, কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। শুধু একটা বিকৃতস্বর কানে প্রবেশ করিল, 'খুন—!' সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্বর উত্তর দিল, 'চুপ্‌!'

তারপর সব নিস্তব্ধ। আর কোনও শব্দ নাই। শুধু স্নানাগারের মধ্যে একটা জল ঢালাঢালির শব্দ শুনা গেল ও নর্দ্দমার নল হইতে আমার নিকটেই জল পড়িতে লাগিল।

অট্টালিকার পাদদেশস্থ অস্পষ্ট ছায়ালোকে যদিও ঠিক

স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি আমার অন্তরাত্মা যেন বলিয়া দিতে লাগিল, "ইহা রক্ত!—হত্যাই হউক, আর আত্মহত্যাই হউক, এ একটা খুনেরই সবটা রক্ত ধুইয়া আসিতেছে!

আমার সর্ব্বশরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। যেন কোন ঘাতকের গুপ্ত ছুরিকাঘাতে আমারই বক্ষের তপ্ত রক্ত নিঃশেষে বাহির হইয়া আমার সমস্ত দেহ হিম অবশ করিয়া দিতেছে।

আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। তারপর কি হইল স্মরণ করিতে পারি না। যখন স্মরণ রাখিবার মত শক্তি ফিরিয়া পাইলাম, তখন দেখিলাম, একান্ত শক্তিহীন দেহে সেখানে শুইয়া আছি,—মাথা তুলিবারও ক্ষমতা নাই। নিজের অবস্থা স্মরণ হওয়াতে, ধরা-পড়ার আশঙ্কায় চারিদিকে চাহিয়া দেখি,—কোথাও কাহারও সাড়া নাই,—শব্দমাত্রও নাই।

একটা ভীষণ স্বপ্নদর্শনের মত একে একে সকল বৃত্তান্ত মনে আসিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম তাহারা গেল কোথায়? আস্তে আস্তে উঠিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিলাম। চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার মনে হইল, হয়ত তাহারা বাহির হইয়া, ফটক বন্ধ করিয়া, আমায় বন্দী অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেছে। এ চিন্তাতেও তখন আমি খুব ভীত হইলাম না। মন আমার এমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে অদৃষ্টচক্রের নিষ্ঠুরতম নিষ্পেষণেও নিজেকে নিক্ষেপ করিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইলাম। তারপর শুনিতে পাইলাম, বহুদূরে বাগানের একান্তে, কোদাল দিয়া মাটি কাটার মত শব্দ হইতেছে। কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিলাম। উঠিয়া যাইবার শক্তিও নাই, উৎসাহও নাই।

খানিকক্ষণের পর শব্দ বন্ধ হইয়া গেল, ও বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া একটা দীর্ঘ পুরুষ-মূর্ত্তি ও কাল ঝল মলে পোষাকে আগাগোড়া ঢাকা পূর্ব্বদৃষ্টবৎ আরও ছয়টী মূর্ত্তি এদিকে আসিতেছে দেখিলাম।

উঠিয়া সরিয়া যাইবার কথা আমার মনে হইল না। সেই মূর্ত্তি কয়েকটী ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া অট্টালিকার অপর পার্শ্ব দিয়া খিড়কির দিকে চলিয়া গেল। তারপর ক্ষণপরেই আবার কখন কোথা দিয়া এদিকে ফিরিয়া আসিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। একেবারে দৃষ্টি পড়িল, যেখানে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে নির্গত হইয়া তাহাদের এদিকে আসিতে দেখিয়াছিলাম, সেখানে তাহারা যেন কাহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া আরও দূরে লইয়া যাইতেছে।

অনেকক্ষণ বিবশ ভাবে কাটাইলাম। তারপর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কাছাকাছি গিয়া ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইতেছি এমন সময়ে দেখিলাম তাহারা এই দিকেই আবার ফিরিয়া আসিতেছে তাহাদের স্কন্ধের উপরে আর কিছু নাই। নিঃশব্দে পাশা পাশি সাত জনই আসিতেছে।

অট্টালিকার অপর পার্শ্ব দিয়া তাহারা পূর্ব্ববারের মত খিড়কির দিকে চলিয়া গেল। নিশ্চেষ্ট ভাবে আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে পথ ধরিয়া তাহারা দুইবার বাগানের সুদূর প্রান্তে এইমাত্র যাতায়াত করিয়াছিল সেই পথ ধরিয়া আমিও আস্তে আস্তে সেই দিকে চলিলাম।

উষার স্নিগ্ধ বাতাস আমার ললাট স্পর্শ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। তাহাতে আমার অবসাদ তিলমাত্র ঘুচিল না—প্রতি পদক্ষেপে আমি যেন উঁচোট খাইয়া পতনোন্মুখ হইতে লাগিলাম। বাগানের শেষভাগে প্রাচীরের কোণে, আমার অনুমিত স্থানে যখন পৌঁছিলাম তখন ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। লতাগুল্মাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের মধ্যে সদ্য কর্ত্তিত স্থানের অবস্থা, আমার কল্পনায় একটা টাট্‌কা কবর খননের অবশ্যম্ভাবীতা জাগাইয়া তুলিল।

আমার দীর্ঘ উপবাসী অন্তরে রাক্ষসী ক্ষুধা যেন সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া সেই মাটি আঁচড়াইয়া খুঁড়িবার জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আমি জোর করিয়া তাহাকে দমন করিয়া সেখান হইতে ফিরিলাম।

কেন এমন করিলাম, নিজেই ভাবিয়া পাইলাম না। আমার ক্ষীণ শক্তিও তাহার বিরুদ্ধে এতক্ষণ যেরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে সম্মুখে পাইয়া বিনা প্রতিবাদে কেন ছাড়িয়া দিলাম, নিজেই বলিতে পারি না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ততক্ষণে গলিমায় অনেক লোকের সমাগম ঘটিয়াছিল। সেই কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আমি সারা দিনটাও হয়ত কাটাইয়া দিতাম। কিন্তু বাগানের মালী আসিয়া সকল লোককেই জানাইয়া দিয়া গেল যে, আজ এখনই ফটক বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সকলকেই বাহিরে যাইতে হইবে।

একান্ত অনিচ্ছায় সকলের শেষে আমি বাহির হইয়া গেলাম। আমার প্রাণের কথা জানাই' এমন লোক কেহই ছিল না। সেখানে বসিয়া থাকাতেও কোনও সার্থকতা ছিল না। তথাপি সেই স্থানটা আগুলিয়া বসিয়া থাকিতেই আমার প্রাণ চাহিতেছিল,—কোনও মতেই ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা ছিল না।

আমার পশ্চাতে ফটক বন্ধ হইয়া গেল। আমি চুপ করিয়া কতকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম! খানিকদূর আসিতেই সহসা নবাব সাহেবের সম্মুখীন হইলাম। লোকটা কোনও কথা না বলিয়া ফিরিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া নিকটস্থ একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম।

মন্দপদে বাসায় ফিরিলাম। দরোয়ান ঘরে ছিল না। আমি আমার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম। নানা চিন্তা আমার মাথায় খেলিয়া যাইতে লাগিল। ফটকবন্ধের সময় ত সেই সাতজনের কাহাকেও বাহির হইতে দেখিলাম না। ইতি মধ্যে নবাবটা তাহার দলবল সমেত কেমন করিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল। এতবড় ব্যাপারটা এমন গোপনে চাপা দিয়া এত সহজে যাহারা সরিয়া পড়িতে পারে, তাহারা এসব কাজে কতদূর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

বারে বারে মনে হইতে লাগিল, হয়ত আমারই জন্য এতটা ঘটিয়া গেল। এদেশে আমি না আসিলে হয়ত এই ভীষণ পরিণাম এত শীঘ্র আসিত না। হয়ত তাহারা আমাকে চিনিতে পারিয়াই এত তাড়াতাড়ি তাহার জাতি ধর্ম্ম নষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়াছিল

একবার মনে হইল, এখন পুলিস ডাকাইয়া কবরটা খুঁড়িলেই সব ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস করিবে কে? এদেশে আমায় চেনে কে? এতবড় ধনী লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারি এমন সহায় আমার কে আছে?

তবে ইহার প্রতিকার কি কিছুই নাই? শৈশবে মাতৃহীন কুসুমকে আমি মাতার স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়াছিলাম। পাছে যত্নে ত্রুটী করিয়া ফেলি এই আশঙ্কায় অল্পবয়সে বিপত্নীক হইয়াও নির্ব্বংশ হইতে প্রস্তুত হইয়াছি তথাপি পুনরায় দারপরিগ্রহ করি নাই। ছায়ার মত সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। তাহার বিবাহ দিয়া জামাতাকে ঘরেই রাখিয়াছিলাম।

অনতিপরে বাল্যেই সে বিধবা হইয়া আমার স্নেহের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আমার একান্ত অন্তরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা আমাদের পরস্পরের বিরহী অন্তরের মর্ম্মব্যথা পরস্পর মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া সহানুভূতির শীতল প্রলেপ শান্ত করিয়া দিতাম।

সে গেছে, আমার কতটা শূন্য করিয়া গেছে, তাহা কে জানিবে? ঐ যে প্রৌঢ় ধন গর্ব্বিত নবাব তাহার অশাসিত প্রবৃত্তির লালসাবহ্নিতে আমার কত কষ্টের গড়া কুঁড়ে ঘরটী পোড়াইয়া দিয়া আমায় গৃহশূন্য করিয়া রিক্ত হস্তে নগ্নদেহে হীম-বর্ষার পথে ছাড়িয়া দিয়াছে,—ভগবানের রাজ্যে উহার বিচার ও শাস্তির কি কোনও বিধান নাই? আমার ক্লান্ত মস্তক স্থাপনের ছিন উপাধানে আস্তীর্ণ জীর্ণ পর্ণকুটীর জ্বালাইয়া সে একটা আগুনের খেলা খেলিয়াছে কিন্তু আমায় একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছে।

ডাক পিয়ন আসিয়া ঘরের জানালা দিয়া একখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া গেল। তুলিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিলাম—আমার গৃহদেবতা গোপীনাথকে রাত্রে কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

আজ প্রাতে গোপীনাথের উদ্দেশে একটা প্রণামও করা হয় নাই;—তাঁহার কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। পত্র পড়িয়াই মনে মনে বলিলাম, "বেশ হইয়াছে। আমার সকল আপদ দূর হইয়াছে। আমার পাষাণ দেবতা তুমি তোমার লাঞ্ছিত গৌরবের ঘোর লজ্জা লইয়া লুকাইয়া থাক আর আমি আমার দলিত হৃদয়ের বেদনা লইয়া সরিয়া পড়ি।

পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। জমিদারের হিসাব-নিকাশের খাতাপত্র বাঁধিয়া লইয়া ঘরে কুলুপ বন্ধ করিয়া বাহির হইলাম। একবার ঘড়ির পানে চাহিলাম।

ট্রেন ছাড়িবার দেরী দেখিয়া একবার গনিমার দিকে চলিলাম। পৌছিয়া দেখিল ম ফটক তেমনই বন্ধ আছে। আবার ফিরিয়া আসিলাম। দরোয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া একবার বলিয়া সহরে জমিদার বাড়ীতে যাইবার জন্ত ষ্টেশনে রওনা হইলাম। টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখি, একখানা প্রথমশ্রেণীর গাড়ী 'রিজার্ভ' করিয়া সেই নবাব সাহেব ও আগাগোড়া কাল বোরোকা মুড়ি দেওয়া ছয়জন রমণী গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছে। ট্রেন তখনই ছাড়িয়া দিল। আমি তাড়াতাড়ি একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। উঠিবার সময় নবাব সাহেব আমায় দেখিতে পাইয়াছিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমি জানালা দিয়া নজর রাখিয়াছিলাম। সহরে নামিয়াও চারিদিকে লক্ষ্য করিলাম। আর তাহাদের কোথাও দেখিতে পাইলাম না। ইতিমধ্যে তাহারা কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।

জমিদারের বাড়ী পৌছিলাম। সকল কথা তাঁহাদের জানাইলাম। পুলিস-তদন্তের ব্যবস্থার জন্ত তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু কোনও সাহায্য পাইলাম না। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম। কাগজ পত্র হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া কাজে ইস্তফা দিলাম। তাঁহারা সহসা আমায় ছাড়িতে রাজী হইলেন না। কিন্তু আমি বিস্তর কান্নাকাটি ও জেদাজেদি করায়, শেষে বৃদ্ধ কর্তামহাশয় বলিলেন, উহার মাথা খারাপ হইয়া গেছে, উহাকে যাইতে দাও।"

ছয়মাস পথে-পথে কত যায়গায় ঘুরিলাম। কত দৃশ্য, কত লোক দেখিলাম। কিন্তু, অস্থির প্রাণ জুড়াইতে, লাখে না মিলল এক।

ছয়মাসের পর আবার একবার 'গনিমায়' ফিরিয়া আসিলাম। এখানে আমার সকল সুখ-শান্তির সমাধি হইয়া গেছে। আমার নিভৃত নীড় ভাঙ্গিয়া আমার একমাত্র শাবক অপহরণ করিয়া ক্রূর সর্প এখানে আনয়ন করিয়াছিল। আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সন্ধান করিয়াছিলাম। উদ্ধারের কোনও চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই সে তাহাকে আমার চক্ষের সম্মুখে মারিয়া ফেলিয়াছে। তাই প্রাণের জালায় যেখানে ছুটিয়া যাই, আবার এখানে উড়িয়া আসি।

এখানে পৌছিয়া দেখিলাম, পুলিসে সে বাগান-বাড়ী অবরোধ করিয়াছে। খবর লইয়া জানিলাম যে সেই নবাব সাহেব একজন হিন্দু বাঙ্গালী যুবতীকে অপহরণ করিয়া আনিয়া পাশবিক অত্যাচার করার অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

আর কোনও বিশেষ সংবাদ জানিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলাম। পূর্ব্বাপর ঘটনার আগা-গোড়া ওলট্-পালট্ হইয়া গেল। ভাবিলাম, আমার কুসুম কি তবে এখনও বাঁচিয়া আছে? বিধির অপূর্ব্ব বিধানে কি তবে সেই গুপ্ত ব্যাপার এতদিনে ধরা পড়িয়াছে? যাহা কিছু পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তৎসমুদায়েরই কি তবে অন্ত অর্থ আছে? কল্পনার বলে যে ছবি মনে মনে আঁকিয়াছি তাহার আগাগোড়াই কি ভুল? আমার কুসুমের অপহরণ ব্যাপারের সঙ্গে, আমার পরিদৃষ্ট শোচনীয় দুর্ঘটনার কোনও প্রমাণিক সংস্রব আর আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলাম, দয়াময়! যেন আমার অতীত ধারণার সবই ভুল হয়। আমার কুসুম আজ যেখানেই থাকুক সে যেন প্রাণে বাঁচিয়া থাকে। যেন একবার চোখে দেখিয়া মরিতে পারি।

মোকদ্দমার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত সেইদিনই সহরে রওনা হইলাম। আদালতে আমার কুসুমের পরিম্লান হতাবশিষ্ট সৌন্দর্য্যটুকু দেখিতে পাইব, এই আশায় ছুটিলাম।

কিন্তু হায়! যাহা দেখিলাম, সবই বিপরিত। আসামী সেই নবাব সাহেব বটে। সে আমায় দেখিয়া মুখ নীচু করিল। কিন্তু অপহৃত, বালিকা, আমার কুসুম নহে। ব্রীড়া সঙ্কুচিতা এক ষোড়শ বর্ষীয় পরমা সুন্দরী সধবা বালিকা। তাহার মুখে চোখে লজ্জার ঘন কালো ছাপ পড়িয়া গেছে।

তাহাকে আমার কুসুমেরই অবস্থায় দেখিয়া আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। গনিমার সেই ভীষণ রাত্রিতে স্পষ্ট শ্রুত আমার কুসুমের কাতরোক্তি মনে পড়িয়া গেল। বুঝিলাম, আমি ভুল শুনি নাই। পিশাচের লালসার এই আগুনেই আমার কুসুম সেদিনই পুড়িয়া গেছে। তাই আজ এই নির্ম্মম নির্য্যাতনে পীড়িতা বালিকার বিশুষ্ক মুখমণ্ডলে মর্ম্মন্তুদ যাতনার গভীর দাগ পড়িয়া আমার কল্পিত কুসুমের মুখ-ছবি ফুটাইয়া তুলিল।

জজের বিচারে নবাবের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। শুনিলাম বালিকার স্বামীকে হত্যা করিয়া তাহাকে অপহরণ করায় এইরূপ দণ্ডের বিধান হইল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আদালত হইতে বাহির হইলাম। বহুকাল পরে মনে মনে গোপীনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'প্রভু' আজ আমার শুধু তুমিই আছ। তোমারই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে তোমারই সন্ধানে ফিরিব।

শিশুর খাদ্য

প্রবন্ধ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

Deeper than the rhythm of art is that rhythm which Art can fain catch, the rhythm of Nature, for the rhythm of Nature is the rhythm of life itself. (Theodore Watts Dunton)

পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন সূর্য্যও দ্রব্যকণা গঠিত এবং পরমাণুই হউক, অথবা আয়নই হউক – সকলেই পৃথক পৃথক সত্তায় প্রাণবিশিষ্ট। অতএব প্রচণ্ড অগ্নিদীপ্ত মহাতেজোময় নিহারীকা হইতে তুষার ধবল শীতল চন্দ্রমা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রাণ নিত্য বিদ্যমান। অপ্রাণজ স্ফটিক হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত পদার্থ মানব পর্য্যন্ত কোথাও প্রাণের বিচ্ছিন্নতা নাই। কিন্তু কি রসায়নিক ব্যাপারে, কি জীব জগতে সর্ব্বত্রই কেবলমাত্র আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ দ্বারা শক্তির শোষণ এবং শোষিত শক্তির পুনঃপ্রকটন সম্ভবপর। যেমন এক দীপ হইতে অন্য দীপ প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইতে স্বামীর পরিধৃত শক্তির কিয়দংশ ব্যয়িত শক্তি পুত্ররূপে প্রকাশ পায়। এইজন্য শাস্ত্রে আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ— পুত্রের এই সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কতিপয় যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জীবজগৎ ব্যতীত রাসায়নিক জগতেও কামনাশূন্য শুদ্ধ প্রেমের আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ বিদ্যমান, শুদ্ধ শোষিত শক্তির পুনঃ প্রকটন জন্য। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে, আণ্টিমনি নামক ধাতুর প্রতি ক্লোরিন গ্যাসের যে তীব্র প্রেমের আকর্ষণ বিদ্যমান তাহাতে এই গ্যাসে আণ্টিমনি চূর্ণ নিপতিত হইয়া তীব্র তেজে ঐ গ্যাসের সহিত মিলিত হয় এবং তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও পরিণতি আণ্টীমনি ক্লোরাইড নামক যৌগিক পদার্থের উৎপাদন। ইহা হইতে এই সত্য প্রতিপন্ন হয়, সুস্থ সবল শরীর সন্তানের জন্মের জন্য স্বামী-স্ত্রীর আকর্ষণ—যাহা সাধারণতঃ প্রেম আখ্যায় অভিহিত হয়, প্রবল অথচ কামনা বর্জ্জিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। কামনাযুক্ত সহবাসের ফলাফল বিচার করিয়া, ইংরাজগণও স্বীকার করিতেছেন যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহবাস কালে, কামনা বর্জ্জনীয়—

* Men and women should not look upon the reproductive function as a means simply of gratifying their passions; but they should regard it as though there was something about it, that is in a way, akin to the divine.—Health and Longevity. By A. C. Sibmon M. D. এই পরামর্শের সার্থকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য লেখক স্পষ্ট দেখাইয়াছেন অন্যথা সন্তান ও মাতার স্বাস্থ্যহানীর সম্ভাবনা এবং শিশুর প্রধান খাদ্য মাতৃস্তন্যের অভাব ঘটাও বিচিত্র নহে। এতদ্ব্যতীত তিনি বলেন কামনার একমাত্র পরিণতি অতৃপ্তি এবং অতৃপ্তির পরিণতি বিরাগ এবং বিরাগের ফলে গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি হানি এবং দুঃখের উৎপত্তি ও অনর্থের সৃষ্টি—It fails to satisfy and leads to a feeling of repulsion and sooner or later gives rise to much misery and suffering. P 113. শাস্ত্রে ঋতু-অন্তে সদ্যস্নাতা স্ত্রীতে শুদ্ধচিত্তে পুত্রার্থে উপগত হইবার যে বিধান আছে, তাহা এই উপদেশের একান্ত অনুকূল এবং ব্যতিক্রমের ফলে আজ নারীজাতি নষ্টস্বাস্থ্য ও দুগ্ধহীন। কারণ স্বাস্থ্যের ও খাদ্যের সহিত স্তন্যদুগ্ধের একান্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া এই অবান্তর বিষয়ের উল্লেখের সার্থকতা এই যে শিশুর জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস তাহার প্রধান প্রকৃত পক্ষে একমাত্র উপযোগী খাদ্য নির্দ্দোষ স্তন্য-দুগ্ধ; যাহার উপর তাহার স্বাস্থ্য, পরিপুষ্টি এবং জীবন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অধুনা বঙ্গদেশে এই স্তন্যের অভাব লক্ষিত হয়। তাহার একমাত্র কারণ মাতার স্বাস্থ্যহানি। রুগ্ন মাতার স্তন্যে বর্দ্ধিত শিশু পূর্ণ পরিপুষ্টি ও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। ফলে বাঙ্গালার শিশুগণ শৈশবে রুগ্ন ও

পীড়িত হইয়া পড়িতেছে। জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও সন্তানের মঙ্গলের জন্য, এবং বংশের গৌরব সুস্থ ও নিরাময় সন্তান লাভের জন্য বাংলার স্নেহ প্রবণ জনক-জননীরা কি পশুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সংযমের উদাহরণ দেখাইয়া জগৎবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন?

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি পালন কার্য্যের জন্য বিধাতা নারীজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সংগ্রাম-বহুলা জগৎ হইতে অতি সন্তর্পণে আপনাকে অপসারিত করিয়া, নিভৃতে অন্তঃপুর মধ্যে সমস্ত স্নেহ দিয়া, নিঃসঙ্কোচে সুস্থ মনে স্বাস্থ্যবতী মাতা সন্তানকে স্তন্য-দুগ্ধে পরিপুষ্ট ও প্রতিপালন করিতে পারিলে, সন্তান স্বাস্থ্য ও আনন্দের মধ্যে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পায়; অন্যথা সন্তানের স্বাস্থ্যলাভের অন্য উপায় নাই।' "A Plentiful supply of breast milk is generally ready at hand when the mother leads a normal healthy life with no worries. But she must be willing and able to devote all her time to the childs frequent needs." ঘরের কথা" নামক সাময়িক পত্রে ডাক্তার শ্রীরমেশ চন্দ্র রায় এল. এম. এস কর্ত্তৃক লিখিত "দুধের কথা" নামক প্রবন্ধ এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ, সন্তানের স্বাস্থ্য প্রয়াসী প্রত্যেক পিতা-মাতাকে আমি উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, হাটে, মাঠে ধরিয়াই গরুকে দোহন করা সুবিধাজনক নহে। যেখানে সেখানে যে সে অবস্থায় গরু যথেষ্ট দুধ দেয় না। নিরিবিলি জায়গায় স্বীয় বৎসতরীর গাত্র স্নেহভরে লেহন করিতে করিতে গরু প্রাণ ভরিয়া দুধ দেয়। মানুষ কিন্তু যেমন তেমন জায়গায় ও মানসিক ও শারীরিক যেমন তেমন অবস্থায় স্বীয় সন্তানকে স্তন্যপান করায়—ফল ব্যাধি, ফল কষ্ট। রাগের অবস্থায় মাই দুধ খাইয়া শিশুর পেটের অসুখ হওয়া নূতন কথা নহে। যে ধাত্রী শিশুকে অপত্য স্নেহের সহিত দুধ দিতে পারিবে, তাহারই দুধ পান করিয়া শিশু উপকৃত হইবে। যে ধাত্রী তাহা না পারিবে—তা তাহার স্বাস্থ্য যত ভাল হউক না কেন—সে ধাত্রীর দুধ পান করাইতে নাই। অতএব সন্তান পালন করিতে বসিয়া জীবনসংগ্রামে যোগ দিবার সুবিধা ও সময় কোন মাতার নাই, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে জমাট দুধ ও মিল্ক ফুডের দ্বারা মাতৃ-স্তন্যের অভাব দূর হইতে পারে কিনা? আজ ২৫ বৎসর ধরিয়া ভারতে জমাট দুধ ও মিল্ক ফুডের আমদানি ও চাহিদা যতই বাড়িতেছে, বাংলার শিশুস্বাস্থ্য ততই নষ্ট হইতেছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি নিম্নে পাঁচ বৎসরের একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব দিলাম: -

সাল	জমাট দুধ	(শ্বেতসার মিশ্রিত খাদ্য)	মিল্ক ফুড	মোট
১৯২৪—২৫	৫৬,৮৩,৬০৫	৬৯,০৫,১৫৫	২৬,১২,৫৪৬	১৩২,০৩০৬
১৯২৪—২৬	৬২,০৩,৬৮৭	৪৯,০৮,৯৬৪	২২,৫২,৭৫৭	১৩৩,৬৪,৬০৮
১৯২৬—২৭	৭৫,৭[illegible],৯৮৫	৫০,৮৮,৭৯৬	২৮,৮০,৯৩৭	১৫৫,৪৪,৯১৮
১৯২৭—২৮	৮৩,০০,৩০০	৪৮,২৩,৮৩৪	৩০,৩৭,১৩৫	১৬১,৬০,২৬৯
৯২৮—২৯	৮৯,০২,৭১৩	৪৪,৮৩,৬৪৪	৩২,৫৯,৩৭৬	১৬৬,৪৫,৭৩৩

প্রতি বৎসর প্রায় পৌনে দুই কোটী মুদ্রা বিদেশে পাঠাইয়া আমরা কি পাইতেছি? খাদ্যপ্রাণহীন (ভিটামিনহীন) শিশুর পক্ষে বিষতুল্য, নানা রোগের আকর কতিপয় তথাকথিত খাদ্য, তাহা শিশুকে খাওয়ান ও তাহাকে অনাহারে রাখা একই কথা। যখন চিকিৎসক মহাশয়েরা শিশুর জন্য এই সকল ফুডের ব্যবস্থা করেন, তখন তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া যান যে শিশুর পক্ষে ভিটামিন অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। ফলে অজ্ঞতা প্লাবিত দেশে ফুডের কাটতি বাড়িয়া যাইতেছে, আর উহাদের জন্মস্থানে উহাদের আদর একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। ইহার ফল,—অর্থনাশ, মনস্তাপ ও স্বাস্থ্যহানি—আমরা ভোগ করিতে বাধ্য। এইরূপে ফুলের মাশুল দিতে

দিতে সমস্ত জাতিটা প্রায় ধ্বংসের শেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! এখনও আপন বুঝে চলিবার সময় আছে, এখনও সতর্ক হইলে জাতিটা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে।

পেটেন্ট ফুড শিশুর পক্ষে বহু কারণে ক্ষতিকর। এ সম্বন্ধে ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী একটি সুচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা উক্ত প্রবন্ধ হইতে একাংশ নিম্নে পাঠক পাঠিকাদিগের জন্য উদ্ধৃত করিলাম।

"গোদুগ্ধ সকল শিশুর উদরে পরিপাক হয় না, গোদুগ্ধ উদরস্থ হইলে, ছানার ন্যায় শক্ত শক্ত দানা হইয়া যায়। গোদুগ্ধের এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষায় স্থির হয়, রুটীর গুড়া, সাগু বা বার্লির মণ্ড, চিনিসহ গোদুগ্ধ শিশুকে সেবন করাইলে, শিশুর উদরে আর বড় বড় শক্ত শক্ত ছানার ন্যায় দানা হয় না। এই সময় অনেক প্রকার গাঢ় দুগ্ধে, রুটী ও চিনি মিশাইয়া, নেসেশল্ ফুড প্রভৃতির ন্যায় অনেক পেটেন্ট খাদ্য আবিষ্কার হয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অনেক প্রশংসা করেন, পরে যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আর্য্য ঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বুঝিলেন, শিশুর অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বে অর্থাৎ শিশুর ছয় মাস বয়স বা দন্ত উঠিবার পূর্ব্বে অন্ন ভক্ষণ করান বিশেষ দোষ, তখন শ্বেতসারবিশিষ্ট সমস্ত শিশুর পথ্য সেবন করান বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়া দোষারোপ করা হয়। ইহার পর পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করেন, শ্বেতসারকে একেবারে মলটে পরিণত করিয়া সোডা বা পটাস্ সহ গাঢ় দুগ্ধে মিশ্রিত হর্লিকস্ মিল্কাদির ন্যায় খাদ্য শিশুর বিশেষ উপযোগী। তাই এই শ্রেণীর খাদ্যের এত প্রশংসা। পরে পুনরায় বহুকালব্যাপী পরীক্ষায় স্থির হয়, যে গাঢ় দুগ্ধ শিশু ও রোগীর পক্ষে বিশেষ অপকারী পদার্থ, ইহা শিশুকে সেবন করাইলে তাহারা নানাপ্রকার রোগপ্রবণ হয়। এজন্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এই খাদ্য শিশুকে সেবন করাইতে একেবারে নিষেধ করিয়াছে। পরে মল্টের সহিত পটাস্ মিশ্রিত করিয়া মেলিন্স ফুড জাতীয় এক প্রকার খাদ্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু মাতৃদুগ্ধের শর্করার নাম দুগ্ধশর্করা (Lactose) এবং মল্টের শর্করাকে শস্যশর্করা (Maltose) বলে। এই দুই শর্করা শরীরের এক যন্ত্রে এক সময়ে পরিপাক হয় না। বিশেষতঃ মেলিন্স ফুডে অধিক পরিমাণে ধাতব বাই কার্ব্বনেট অভ্ পটাস্ (Potas Bicaib) আছে; আধুনিক বিজ্ঞান ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, শিশুর খাদ্যে পটাস্ বিদ্যমান থাকা বিশেষ দোষাবহ, তাহার পরে অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া এলেনবারির ফুড বাহির হয়। তাঁহারা এই খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছেন, মাতৃদুগ্ধে, গোদুগ্ধের তুলনায় চিনির অংশ অধিক, কিন্তু ছানার অংশ কম; তাই তাহারা কৃত্রিম উপায়ে গোদুগ্ধে ছানার অংশ কম করিয়া এবং বাজারের দুগ্ধশর্করা দ্বারা মাতৃদুগ্ধের সমপরিমাণ চিনির অংশ পূর্ণ করিয়া, যখন এলেনবারির ফুড বাহির করিলেন, তখন এই শ্রেণীর ফুডের প্রশংসা কাহার মুখে আর ধরে না। পরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যখন বুঝিলেন যে, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত দুগ্ধ শর্করা, কি শিশু, কি যুবক, কাহার উদরে পরিপাক হয় না, পরন্তু অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় মল ও মূত্রের সঙ্গে বহির্গত হইয়া যায়, তখন এই শ্রেণীর খাদ্য একেবারে পরিত্যক্ত হয়। বেঞ্জার্স ফুড আর এক শ্রেণীর দোষকর খাদ্য। ইহাতে ভাজা ময়দার গুড়া এবং দুগ্ধ পেপ্টোনাইজড্ (Peptonised) করিবার উপাদান মিশ্রিত করা আছে। আধুনিক বিজ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন যে শিশুই হউক আর যুবকই হউক, পাচক রস নিঃসৃত হইয়া স্বাভাবিক ভাবে আহার্য্য পরিপাক করিতে থাকিলে, পাচকযন্ত্র সবল ও সুস্থ থাকে। তাহার বিপরীত কৃত্রিম উপায়ে, কিছুদিন পরিপাকক্রিয়া সমাধা হইতে থাকিলে, পাচক যন্ত্র দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে, সুতরাং এই শ্রেণীর পথ্য ঔষধ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু কখন খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই প্রকার বিলাতী যে খাদ্য লইয়া বিচার করুন না কেন, কোন খাদ্য বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধ নহে।" (প্রাচ্যতত্ত্ব সমালোচনা পৃঃ ২০১—২০২) ইহার উপর টিপ্পনী বাহুল্যমাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শিশুর স্বাভাবিক, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক এক মাত্র খাদ্য মাতৃদুগ্ধ। ভগবানের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা সহজ, কিন্তু তাহার পরিণাম ভয়াবহ। স্তন দুগ্ধকে আমরা উপেক্ষা করিয়া শিশুকে কৃত্রিম খাদ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট করিবার যতই চেষ্টা

Lakshmibilas Press Ltd., Calcutta.

করিতেছি, বিজ্ঞান সাহায্যে আমরা ততই হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে জীবঃ জীবস্য জীবনম্ অর্থাৎ একমাত্র জীবধর্ম্মযুক্ত পদার্থ আহার করিয়াই জীবগণ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ। অতএব এই প্রসঙ্গে অতঃপর মাতৃস্তন্যের বিষয় আর্য্য মত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

আর্য্যগণ মাতৃস্তন্যের উপকারিতা যথেষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা মাতৃস্তন্যের দোষগুণ, স্তন্য বৃদ্ধির উপায়, উৎকৃষ্ট স্তনের লক্ষণ প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচনা চরকসংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সব বিষয়ের আলোচনার স্থান নাই, কিন্তু বিষয়টীর প্রয়োজনীয়তা ও শিশুর স্বাস্থ্য হানি স্মরণ করিয়া আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব আজ ইহার বিস্তৃত আলোচনার সময় আসিয়াছে। অতএব নিম্নে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।১টি বিষয় উদ্ধৃত করিলাম :—

মাতৃস্তন্য সম্বন্ধে চরক সংহিতায় লিখিত আছে—"ইহা জীবনহিত, বৃংহণ, দেহানুকুল এবং স্নিগ্ধতাকারক। রক্তপিত্তে ইহার নস্য এবং চক্ষুশূলে ইহার তর্পণ হিতকর।" (দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত চরক সংহিতা ২২৮ পৃঃ) স্তনের পরিচয় সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে—"স্তন নাতি ঊর্দ্ধ, নাতি বিলম্বিত, নাতি কৃশ, নাতি পীন, অনুরূপ বৃন্তযুক্ত, স্তন শুচুক, এবং যাহা সুখে পান করিবার যোগ্য, তাহাই উৎকৃষ্ট স্তনের লক্ষণ। জলপাত্রে দোহন করিলে উৎকৃষ্ট স্তন্য জলের সহিত সম্পূর্ণভাবে একত্রীভূত হইয়া থাকে। অন্যথা দুহ্যমান দুগ্ধ জলের সহিত একত্রীভূত না হইলে তাহাকে বিকৃত স্তন্য বলিয়া জানিবে। নারী দুধের অভাব হইলে স্তন্য উৎপাদনের উপযুক্ত আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতেও হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ভুলেন নাই। এই সব কারণেই বাঙ্গালাদেশে ইতিপূর্ব্বে কখন মাতৃস্তন্যের অভাব হয় নাই। আজ আমরা এই সব বিধিনির্দ্দেশ বিস্মৃত হইয়া, আধি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া কষ্ট পাইতেছি।

মাতৃস্তন্যের উপকারিতা ইউরোপ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সেখানেও বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং সংযমের অভাবে মাতৃস্তন্যের দৈন্য দেখা দিয়াছে। এই দৈন্য দূর করিবার জন্য অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে মাতৃস্তন্য বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। সেই চেষ্টার ধুয়া আমাদের দেশেও দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে ল্যাক্টাগল, ম্যাম্মাজেন ট্যাবলেট প্রভৃতি ঔষধ ভারতে দেখা দিয়াছে। ইহাদের উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে ল্যাক্টার্গল (তুলার বীজ) বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া জননীকে খাওয়াইবার পূর্ব্বে, বিনা খরচে আয়ুর্ব্বেদ মতে আনুপ, বলিজ যাবতীয় শাক, মধুর, অম্লবহুল সমুদায় আহার, দুগ্ধপান, বেণা, ষষ্টিক ধান্য, শালি ধান্য, ইক্ষু, বালিকা মূল (খাগড়া) দর্ভ, কাশ, ওস্রা মূলের কাথ পান করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ইহাদের প্রকৃতই স্তন্যোৎপাদিকা শক্তি আছে কিনা। কারণ চরক সংহিতায় ইহাদিগকে স্তন্যোৎপাদক বলা হইয়াছে। ইহাদের সহিত শ্রমরাহিত্য ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সকল স্তন্যই শিশুর পক্ষে হিতকর নহে, এ জ্ঞানের পরিচয় চরকসংহিতায় পাওয়া যায়। চরক সংহিতায় স্তন্যের আট প্রকার দোষের উল্লেখ আছে, যথা বৈবর্ণ্য, বৈগন্ধ্য, বিরসতা, পিচ্ছিলতা, ফেনিলতা, রুক্ষতা, গুরুতা ও অতি স্নিগ্ধতা। আকনাদি, শুঁট, দেবদারু, মুথা, দুর্ব্বা, ইন্দ্রযব, চিরতা, কটুকী ও অনন্তমূল এই দশটি স্তন্য শোধক ব্যবহারে স্তন্যের সকল দোষ অপগত হয়। এইরূপ বহু শিক্ষণীয় ও পরীক্ষাযোগ্য বিষয় আর্য্যদিগের গ্রন্থসমূহ মধ্যে নিহিত থাকিয়া কীটদষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাহাদিগকে উদ্ধার করার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে করি,—এ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার ইহাই সার্থকতা।

কতটা স্তন্য শিশুর পক্ষে দরকার, তাহার একটা বাধাবাধি নিয়ম নাই। মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায় যে জন্ম হইতে একমাস পর্য্যন্ত শিশুর পক্ষে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর দুই আউন্স মাতৃদুগ্ধ যথেষ্ট। দুই মাস হইতে চারিমাস পর্য্যন্ত শিশুকে প্রতিবারে পাঁচ আউন্স স্তন্য দেওয়াই সাধারণ বিধি। দিন রাত্রির মধ্যে চল্লিশ আউন্স স্তন্য ছয় মাসের শিশুর পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। পর্য্যাপ্ত খাদ্যের উপর শিশুর পরিপুষ্টি নির্ভর করে। সুতরাং শিশুর পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে তাহার খাদ্যের অভাব ঘটিতেছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক শরীরের ওজন দেখিয়া অনেক সময় প্রদত্ত খাদ্য তাহার পক্ষে যথেষ্ট কিনা বিচার করিতে

হয়; সুতরাং শিশুর শরীরের ওজন ও আকারের চারি মাসের একটা মোটা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

	বালক		বালিকা	
বয়স	ওজন	আকার	ওজন	আকার
জন্ম	৮ পাউণ্ড	১৯ ইঞ্চি	৭ পাউণ্ড	১৯ ইঞ্চি
১ মাস	৮¾ ,,	২০½ ,,	৮ ,,	২০⅛ ,,
২ মাস	১০ ,,	২১ ,,	৯½ ,,	২০¾ ,,
৩ মাস	১১⅛ ,,	২২ ,,	১০½ ,,	১½ ,,
৪ মাস	১২ ,,	২২½ ,,	১১¾ ,,	২২ ,,

অনেকের মতে সুস্থ শিশু উপযুক্ত খাদ্য পাইলে ছয় মাস পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ৪ হইতে ৫ আউন্স পর্য্যন্ত ওজনে বাড়িতে পারে—ছয় মাস হইতে সাপ্তাহিক ওজনের বৃদ্ধির হার একটু কমিয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে তাহার দেহের ওজন অন্ততঃ ছয় পাউণ্ড, প্রসবকালীন দেহের ওজন অপেক্ষা বেশী হওয়া দরকার। ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটিলে বুঝিতে হইবে হয় শিশু অসুস্থ, না হয় তাহার স্বাস্থ্যের অভাব ঘটিতেছে।

নিকষ পাথর

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতা "বুদ্ধদেবের প্রতি", গান্ধীজীর জন্ম-দিবসে আনন্দোৎসবে বক্তৃতা ও জনৈক মহিলাকে লিখিত পত্রধারা প্রকাশিত হইয়াছে।

বক্তৃতার এক যায়গায় কবি বলিতেছেন * "প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দলপাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েচে, কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর, জন্মান্তর ঘটে গেল।" আর এক যায়গায় * "মহাত্মাজীর জীবনের এই তেজ আজ সমগ্রদেশে সঞ্চারিত হয়েচে, আমাদের ম্লানতা মার্জ্জনা করে দিচ্চে। তাঁর এই তেজোদীপ্ত সাধকের মূর্ত্তিই মহাকালের আসনকে অধিকার করে আছেন।" এবং পরিশেষে বলিতেছেন, "আজ যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করচি, এই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আজ আমাদের প্রশংসাবাক্য, উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণই ব্যর্থ হ'বে। আমাদের সাধনা আজ আরম্ভ হল মাত্র; দুর্গম পথ আমাদের সামনে পড়ে রয়েচে।" ঠিক।

উপরিউক্ত তিনটি রচনা ছাড়াও কবির আর একটী রচনা আছে—"মাটির স্বর্গ।" রচনাট শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় বসুমতীতে যে "মাটির স্বর্গ" রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই depriciation ইহাতে তাঁহার স্বর্গ একদম মাটি এবং এই মাটি সরাইয়া স্বর্গ বাহির করিতে প্রকাশককে প্রভূত শ্রম করিতে হইবে। কিন্তু প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষের এই লেখাটুকু প্রকাশের তাৎপর্য্য বোঝা গেল না। রচনাটি পাঠের পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, কবি বুঝি সার্টিফিকেট—সাহিত্য আবার পরিপুষ্ট করিয়াছেন। তাহা না হইলেও depreciation এও কবি বেপরোয়া।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে চারটি।

প্রথম গল্প শ্রীমনোজ বসুর "ফার্ষ্টবুক ও চিত্রাঙ্গদা।" গল্পের প্রথম ছত্রটি পাঠ করিয়াই কল্পনা-প্রবণ পাঠকপাঠিকার হয়ত মনে হইতে পারে, শ্রীমান্ ননী" তেরো খানা ফার্ষ্টবুক ছিঁড়িয়াই চিত্রাঙ্গদা ধরিল, কিন্তু তাহা নয়। ফার্ষ্টবুক পড়িত সে, আর চিত্রাঙ্গদার স্বপ্ন দেখিত তাহার মাষ্টার। গল্পটি বেশ। বিষয় সামান্য হইলেও লেখনী কৌশলে চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষের 'ফেরিওয়ালা।" এই বাংলারই গাঁ-গাওর কথা, মানুষগুলিরও নাম এদেশী, তবুও যেন মনে হয় খানিকটা বিদেশী মাল-মশলা ইহার মধ্যে আছে এবং চেষ্টা সত্বেও তাহার গন্ধটুকুও ঢাকা পড়ে নাই। অথবা ইচ্ছা করিয়াই সেটুকু রাখা হইয়াছে. ফেরীওয়ালার ল্যাংড়া টাট্টুর গলায় "মেড্ ইন আরবী."

কথাটা ঝুলাইয়া দেওয়ার মত। যাহা হউক, গল্পটী মাঝখানে জমিয়া উঠিয়াছে বেশ।

তৃতীয় গল্প শ্রীসীতাদেবীর—"তপস্যার ফল।" বেশ লাগিয়াছে। কিন্তু মন্মথর Retrenchment ভীতিটা যাহার তাড়নায় সে পিসেমশায়ের অর্থরাশি লাভের তপস্যা করে; পরিশেষে আর ছিল কিনা বোঝা গেল না। চতুর্থ গল্প শ্রীনিরঙ্কুশ ভদ্রের "নিষ্কলুস।" একটা আড়ষ্ট রচনা। মাসকয়েক পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মানিক ভট্টাচার্য্যের একটা গল্প প্রবাসীতেই বাহির হইয়াছিল—নাম 'মৃত্যু বিজয়ী।" বোধ করি তাহারই অনুসরণ করিয়া এটি লেখা হইয়াছে।

এ সংখ্যায় রঙ্গিন ছবি আছে মাত্র দুইখানি। প্রথম ছবি শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্তের "যবদ্বীপের নৃত্য।" নগ্নবক্ষ এক তরুণী নাচিতেছেন। সে দেশের নাচ অমনি নগ্নবক্ষেই হইয়া থাকে—কখনও কখনও—কাজেই বলিবার কি থাকিতে পারে?

দ্বিতীয় ছবি "রাধা কৃষ্ণ"—ছবিখানি প্রাচীন।

বসুমতী—কার্ত্তিক—১৩৩৮

এ সংখ্যাটি গল্প-গাছায় ভরাট। গল্প আছে পাচটী আর গাছা আছে একটী!

প্রথম গল্প শ্রীসরোজ নাথ ঘোষের "সহজ-পন্থা।" আড়ষ্ট রচনা। প্রথম আওয়াজে মনে হয় মেল, তারপরই দেখা যায় মেল বটে, কিন্তু ধাপার।

মণ্ডপ হরেন ডাক্তার স্বীয় বুদ্ধি চাতুর্য্যে এতটুকু হইতে এত বড় হয়; অর্থাৎ ধাপে ধাপে মেডিক্যাল কলেজ পার হইয়া গিয়া কিছুদিন মেসোপটেমিয়ায় ঘুরপাক দেয় এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার কোন এক "প্রকাণ্ড ঔষধের কারবারের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডাইরেকটরকে সরাইয়া নিজে তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে। তারপর সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া সুন্দরী "বীণার পেলব কোমল দক্ষিণ করপল্লব" এক নিভৃত সন্ধ্যায় আফিস গৃহ মাঝে দৃঢ় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া "কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত ভাবে বীণাকে আকর্ষণ করিতে" থাকে। পরিশেষে একটা কাণ্ড বাধিতই যদি না কোন বলশালী বাহু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে কক্ষের অপর কোণে নিক্ষেপ" করিত। সাবাস্!

দ্বিতীয় গল্প শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসুর "আত্মঘাতিনী।" প্রথমে ব্যবহারিক সম্পর্কে ঠাকুরপোর—অন্তরে দয়িত-প্রেমের ভিখারিণী হইয়া সুন্দরী ও তরুণী বিধবা অমিয়া হরিপ্রিয়া বৈষ্ণবীর পরামর্শে পরে নামতরঙ্গে ভাসিয়া যায়। "ভালবাসায় বাগড়া" খাইয়া জ্বলিয়া না মরিয়া সেই প্রেম ভগবন্মুখী করিলে জ্বালা জুড়ায়, ইহাই গল্পটীর মর্ম্ম।

হরিপ্রিয়া বলিতেছে, "শোন অমিয়া দিদি! ভালবাসায় ঘা খেয়ে বিষ খাবো মনে করেছিলুম। বাগড়া পড়ল। ভাবলুম, কে আমায় বাধা দিলে? * * * বললুম' হরি আমি যে জ্বলছি। বললে, সে তোর সখ্। সখ্ ক'রে জ্বলছিস্ আবার সখ্ হ'লে নিভে যাবে। ছেলেবেলা একটা সখের পুতুল পাস্‌নি বলে ইত্যাদি।" হায়রে সখের গল্প! পাঠক-পাঠিকা প্রেমকে সখ্ বলিয়া স্বীকার করিবেন কি? বয়োধর্ম্মে এমন মজার কথা বলা চলে বটে।

তৃতীয় গল্প শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী (বি-এস-সি)র "স্নেহের পরশ।" গল্পটী ভাল লাগিল না।

চতুর্থ গল্প কুমার শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের "শিকার।" মৃগয়া নয় মনুষ্য শিকার। স্থান দার্জ্জিলিঙ, শিকার জনৈক কুমার, শিকারী (স্ত্রী) সুন্দরী যুবতি কুমারী অর্পণা, উপকরণ তাহার রূপ-যৌবন-ছলা-কলা এবং এই শিকারের Beater অর্পণার Retd. Depty. Magt. বাবা। কুমার দিব্যেন্দু নারায়ণও সাড়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ধরা দেন নাই। অর্পণা অপেক্ষা আরও নিপুণা কেহ হইলে হয়ত এই প্রাণীটিকে ধরিতে পারিত।

গল্পটির মাঝে একটা প্লট আছে বেশ, ভাষা সুন্দর; স্থানে স্থানে লেখন ভঙ্গীও চমৎকার। আর নায়ক নায়িকার মাঝখানে এক বিরাট হস্তী আনিয়া তাহার মারফৎ উভয়ের প্রথম পরিচয় ঘটানো ব্যাপারটাও আজকালকার গল্প সাহিত্যে নূতন। তাহার কারণ হয়ত দরিদ্র সাহিত্য-সেবীরা হস্তী-কল্পনায় অভ্যস্ত নয় কিন্তু কুমার বাহাদুরের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। গল্পটী বেশ লাগিয়াছে।

কিন্তু নিম্নের কথাগুলি বরদস্ত করা কঠিন। অর্পণা বিদ্যুৎকটাক্ষপাত করিয়া কুমারের করধারণ করিল। আপনার বক্ষোদেশে দক্ষিণ করপল্লব স্থাপন করিয়া বলিল, এইখানে ব্যথা, দারুণ ব্যথা।" যে উদ্দেশ্যে অর্পণাকে দিয়া কথাগুলি বলানো হইয়াছে অন্য রকমেও তাহা সফল করা সম্ভব ছিল না কি?

চতুর্থ গল্প শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "জয়যাত্রা—" তিনকড়ি অত্যন্ত ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার স্ত্রী স্বর্ণ অত্যন্ত বদ্ মেয়ে-মানুষ। সে ধনীর মেয়ে, স্বামী দরিদ্র, তাহাকে দু'মুটা ভাত দিতে পারে মাত্র, বস্ত্র-অলঙ্কার দিতে পারে না। এই কারণে স্বর্ণ স্বামীকে দেখিতে পারে না—ভাল বাসে না—ভক্তি শ্রদ্ধা করে না—ভাত চাহিলে ভাত দেয় না —নিজে পেট ভরিয়া খাইয়া শুইয়া থাকে, স্বামী করে উপবাস—স্বামীকে গোয়াল ঘরে শুইতে দিয়া নিজে শয়নঘরে শোয়—স্বামীর কলেরা হইয়াছে এই ভয়ে সে স্বামীর কাছে পর্য্যন্ত যাইতে সাহস করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এহেন তিনকড়ির এক বন্ধু ছিল, ক্ষিতীশ। সে বোতল বোতল মদ খাইত, গাঁজা টানিত (গল্পটীতে গঞ্জিকারই প্রাধান্য) কিন্তু তাহার নেশা হইত না। লোকটা ঠিক নেশার জন্য নেশা করিত না, কিন্তু করিত। তিনকড়ির মত সেও ছিল পরোপকারী, তাহারা পরের জন্য নিজের প্রাণও দিয়া ফেলিতে পারিত। একবার গ্রামে কলেরার মড়ক লাগে, তাহারা দুইজনে লোকের কি সেবাই না করে। কিন্তু শ্রীমতি স্বর্ণ ইহাও পছন্দ করিত না। এই স্বর্ণই আবার স্বামীর হঠাৎ অপমৃত্যুর খবর শুনিয়াই 'হা নাথ' বলিয়া আকুল হয়। খবরটা সবটুকু অবশ্য সত্য ছিল না, তিনকড়ির অপঘাত হইয়াছিল বটে কিন্তু সে মরে নাই। ফিরিয়া আসিয়া স্বর্ণকে বলে "বিদায় নিতে এলুম।"

নিদ্রোত্থিতার মত স্বর্ণ বলে "চলে যাচ্ছ! কোথায় ?" অমনি তিনকড়ির বক্তৃতা ও প্রস্থান ঐ ক্ষিতিশের সঙ্গে। পুরুষ মানুষ কত আর সহিবে ? কোথায় ? "সে ক্ষিতীশ জানে।" তিনকড়ির প্রস্থানের পরই স্বর্ণের মাথা ঘুরিয়া ওঠে—চোঁ—!!! সে না-শুইয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়ে। ইহারই নাম জয়-যাত্রা!

পঞ্চমটিই গাছা অর্থাৎ চিত্র। চিত্রিত করিয়াছেন শ্রীতারক নাথ সাধু (রায়বাহাদুর)। হে বালকগণ, তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্যামাচরণের গল্পটী পাঠ করিবে তারপর এক রাত্রে (মহাসপ্তমীর রাত্রে হইলেই ভাল হয়) স্বপ্ন দেখিয়া গোপনে দেশত্যাগী হইয়া মনে পড়িতেছে না, কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম। টিন, বলিতেছে আমিও প্রস্রবন হইতে পারি এবং তারপরই একদিন সে পিচকারী রূপে মনুষ্য সমাজে আবির্ভূত হয়।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের "সাগরের মায়া।" বেশ লাগিল।

এ সংখ্যায় রঙ্গীন্ ছবি আছে তিন খানি। প্রথম ছবি শ্রীহেমেন্দ্র নাথ মজুমদারের "প্রেমের রাজ্য।" চমৎকার!

দ্বিতীয় ছবি শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহের "হংস-দূত।" ছবিখানি ফরমাজি না শিল্পীর খেয়ালমাফিক ? এক ডোবার ধারে গাছের তলায় এক তরুণী। তাহার কটিতে বাস, কিন্তু বক্ষ নগ্ন, স্তনযুগলের নীচে একটী রঙ্গিন ফিতা (কেন ? বাহার দিতেছে ? না চোখ দুটিতে আকৃষ্ট করিবার জন্য ?) আর জলে ভাসিতেছে রাজহংস।

তৃতীয় ছবি শ্রীচারু চন্দ্র সেনগুপ্তের "দরদী।" ছবিখানিতে চারু বাবুর বিশেষত্ব বজায় আছে। এমন সেঁইয়ার জন্য দরদ যে আপনই উথলিয়া উঠে। কিন্তু দরদী তো দেখিতেছি রাখাল আর বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা "সেঁইয়া" কি রাজার নন্দিনী ? তা ভরসন্ধ্যায় অতবড় মাঠপাড়ি দিয়া আসিবার কালে দেউড়ীর রক্ষীরা কিছু বলে নাই ?

ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ –১৩৩০

এ সংখ্যা হইতে কুমার শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের উপন্যাস "চিরন্তনীর জয়" আরম্ভ হইয়াছে।

গল্প আছে তিনটি, নক্সা আছে একখানি।

প্রথম গল্প শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "দুটি তারা" মাণিক-বাবু বোধ হয় তাঁহার গল্পে নূতনরূপ দিবার চেষ্টা করিতেছেন; গল্পটী নাটকীয় ভঙ্গীতে লেখা। বিষয়-বস্তু করুণ এবং জমিয়াছেও বেশ।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বি-এ) র "শিশুরাজ।"

"অত্যন্ত অল্প বয়সে মোক্ষদা বিধবা হইয়াছিল। স্বামীর অভাব বুঝিবার সে বয়সও নহে।" (বয়সটা কত ? আট-দশ বছর ?) স্বামীর অকস্মাৎ ও অপঘাত মৃত্যু-সংবাদে "মোক্ষদার বুকের মধ্যেটায় কেমন-যেন-একটু, হাল্কা বোধ হইয়াছি"।" কিন্তু যাঁহারা স্বর্গে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শোনা যায় ঢেঁকি সেখানেও গিয়া ধান ভানে। মোক্ষদারও তাই বিধবা হইয়া নিষ্কৃতি ঘটিল না; তাহার পিতা-মাতা তাহাকে আবার উদ্বাহে বন্দিনী করিতে মনস্থ করিয়া বর পাকড়াইলেন, "বুড়ো" কৈলাসকে।

কৈলাস মোক্ষদাকে বিবাহের আগে একছড়া রূপার চন্দ্রহার দেয়। মোক্ষদা অর্থাৎ সুরেন বাবুর ঢেঁকী বিবাহের আগের রাত্রে, কৈলাসের দেওয়া "হারছড়া" লইয়া তিন ক্রোশ হাঁটিয়া গিয়া গাড়ী ধরে। তারপর যায় কোথায়? কাশী। এত জায়গা থাকিতে সে কাশী যায় কেন? "সে শুনিয়াছিল যে, কাশীতে বহু বিধবা বাস করেন; অতএব তাহার প্রতি দয়া কি সহানুভূতির বোধহয় কোন অভাব সেখানে হইবে না।"

মোক্ষদা অবশ্য যথা সময়ে ষ্টেশনে গিয়া পৌছায় এবং বিনা টিকিটে গাড়ীতে উঠিয়া বসে। সেই কাম্‌রাটিতে যাইতেছিলেন "বিভূতিবাবু সস্ত্রীক।" বিভূতিবাবু বৃদ্ধ, কিন্তু তাহার স্ত্রী, নিস্তারিণী যুবতী; তিনি বিভূতিবাবুর তৃতীয় পক্ষ। দেশের জল হাওয়ায় যখন গৃহিণী সন্তানবতী হইলেন না, তখন এক গণক বলে, কাশীতে গেলে তাঁহাদের সন্তান লাভ হইবে, একটী নয় চার চারিটি। সেই আশায় তাঁহারাও যাইতেছিলেন কাশী। তাঁহাদের সহিত মোক্ষদার পরিচয় ঘটিয়া যায়, বড় মজাদারী রকমে। তাহার আগে ঐ "ছোট মেয়েটি" গিন্নীমার হৃদয়ের ব্যথাটি অনুভব করে এবং "বৃদ্ধ স্বামী লইয়া ঘর করার সম্বন্ধে তাহার দ্বিধাসন্দিগ্ধ ভয়টি নিমেষে যেন নিশ্চয়তার আকাশে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইজনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এই দুইটি নারীর মনে মনে সখিত্বের একটা বন্ধন পড়িয়া গেল।" এই "ছোট মেয়েটি" বুড়ো কর্ত্তার প্রশ্ন শুনিয়া "এক হাত ঘোমটা টানে।" তখনও পরিচয় জমে নাই।

মোক্ষদা যাইতেছিল, বিনা টিকিটে, কিন্তু তাহার ঠেলা কম নয়। মাঝ পথে দেখা দেয়, এক পাঞ্জাবী টিকিট চেকার। তাহার ভয়ে মোক্ষদা বেঞ্চীর নীচে গা-ঢাকা দেয়। কিন্তু চেকারের চোখ দুটিকে ফাঁকী দিতে পারে না। সে কর্ত্তা-গিন্নীর টিকিট দুইখানি দেখিয়া বলে "বাঙ্গালী লোগ্ বড়া চালাক্; বিঞ্চীকা নীচে ছিপা রাখা? উস্‌কো ভী টিকিট দেখ্‌লাও বুড্ডাবাবু!" বুড্ডা বাবু অবশ্য মোক্ষদাকে নিজের লোক বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু চেকার নাছোড়বান্দা! সে বলে, "ও তোমারই লোক। দাও টিকিটের দাম এই বেলা। নইলে দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা লাগ্‌বে।" অগত্যা বুড্ডাবাবু টাকা বাহির করিয়া দেন, চেকার হাসিমুখে চলিয়া যায়। (এ কোম্পানীর রাজত্ব কাহারো চালাকী করিবারযো নাই।) কিন্তু ইহাতে "বুড্ডাবাবু" "ছোট মেয়েটির উপর রাগ করেন না বা তাহাকে একটি কথাও বলেন না" যদিও তিনি অর্থগৃধ্নু, অর্থের শোকে কেবল ঝিমাইতে থাকেন!!!

আর "মোক্ষদা (আট-দশ বছরের ছোট মেয়েটি) যখন বুঝিল বিপদের অবসান হইয়াছে তখন সে তাহার নিরাপদ বিবর হইতে বাহির হইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল" এবং "ধীরে ধীরে গৃহিণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া পা-দুইখানি অতি সন্তর্পণে টিপিতে লাগিল।" (ধন্য ছোট মেয়েটি! আর ধন্য পাকা-মাথা!!!) নিস্তারিণী "পাদুইখানি আরও ছড়াইয়া দিয়া গভীর নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।"

গল্পের এই জায়গাটা পড়িয়া আমাদের ভূতনাথ বলিল, "ছেলেবেলায় গল্প শুনেছিলাম, এক রাজার ছেলে সাতশ' হাত লম্বা বাঁশের ডগায় চড়ে সমুদ্দুর দেখেছিল।"

বলিলাম "বাঁশ কখনও সাতাশ' হাত লম্বা হয়?"

সে চালাক ছেলে; বলিল "কেন হবে না? বাঁশে বাঁশে জোড়াদিয়ে?"

"সে হলেও সে বাঁশ খাড়া থাকে?"

"গল্পের বাঁশ থাকে।" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল। তারপর বলিল, "তা নইলে আবার "গল্প" বল কি?" ঠিক্।

আর এক জায়গায়—নিস্তারিণী কাশী ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া পাণ্ডার প্রেরিত লোক ঈশানকে দূরে দাঁড়াইয়া বিড়ি ফুঁকিতে দেখিয়া (লোকটা বাঙালী যুবক এবং নিস্তারিণীর অপরিচিত) আচমকা বলে—"তোমাকে কি বাবুরাম ঐখানে ধিনিকেষ্টোর মত দাঁড়িয়ে থাকতে পাঠিয়েছেন নাকি?" নিস্তারিণী যে তেজস্বিনী তাহা এই কথাগুলিতেই কেমন ব্যক্ত!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বি-এ) মহাশয়ের শব্দ-বিন্যাসও "অপূর্ব্ব অদ্ভুত।" যেমন—"কাশী শুদ্ধ জুড়িয়া" "ইসারায় ক্ষুদ্র ইঙ্গিত," "লণ্ঠনের আলোবাতি করিতে-ছিল," অনুমানটি মূর্ত্তিমান হনুমান," "নিখিল প্রসন্নতা," "তিনি তাহা কর্ত্তা জানেন," "তোআই দ্বিধা সন্দিগ্ধ ভয়।"

মগজসাফ থাকিলে এমনি অনেক কথাই পড়ায়।

তৃতীয় গল্প শ্রীনগেন্দ্র কুমার গুহ রায়ের "মালবাদল।" কাঁচা হাত; উচ্ছ্বাস ও কবিত্বের প্রয়াস বেশী।

ইহার পর "চলৎচিত্র।" এই খানিই নক্সা—আঁকিয়াছেন দুইজন নক্সাকার, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্ত। ইহার মধ্যে দর্শন আছে বিজ্ঞান আছে, সঙ্গিতশাস্ত্র আছে, গিরিডি আছে, লণ্ডন আছে, রিটা আছে, শিপ্রা আছে, নী—আছে, অমিয়া দিদি আছে, ইংরাজী আছে, বাঙ্গলা আছে, আরও কত কি আছে।

এক জায়গায় বলা হইতেছে···"বর্ত্তমানবতা সম্ভব হয় যদি প্রত্যেক মানুষ তার স্বকৃত স্ব স্ব আভরণ অথবা আবরণ পরিত্যাগ করে সে পুরাতন নীড়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়।" প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরিয়া যায়?

পুরুষ মানুষ বলিতেছে—"মাগো, ভাবতে যে গা শিউরে উঠে।" ওমা! শোন কথা একবার!

"বাবার আদেশ হল বিলেতে গিয়ে মানুষ হয়ে অসতে।" দেশে থেকে ছেলেরা হয় ষাঁড়!!!

Wick সিংহর্লের অধিবাসী বিলাতে থিওজফি পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু সে আমাদের "বিদ্যাধরী" নদীটির এমন খাটি খবর জানিত যে তাহার দ্বারা চমৎকার একটী উপমা দিয়া ফেলিল। থিওজফিষ্ট কিনা! সূক্ষ্ম-শরীরে কলিকাতা কর্পোরেশনের মিটিংএ সে একবার উপস্থিত ছিল।

"অমিয়া-দিদি সৌভাগ্যক্রমে বিয়ের দু'মাস বাদেই বিধবা হয়েছিল"—* * * "কাজেই ওদিককার যত কিছু আশা-আকাঙ্খা সব অগ্নিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সঙ্গীতে।" তিনি একরাত্রে "একটি ভদ্র যুবকের" বাঁশী শুনিয়া ছুটিয়া বাহির হ'ন, পাগলিনীর মত। "কে যেন 'হতভাগী' বলে অমিয়া-দিদিকে,' তখনই "ভিতরে টেনে নিয়ে গেল।" তার কিছুদিন পরে তাঁহার Monomaniaতে মৃত্যু হয়! Sweet tragedy!

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে চারখানি। ছবি কয়খানি বেশ লাগিয়াছে।

— —

অশ্রু জল

শ্রীসুজাতা দেবী ও শ্রীধীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী

অশ্রুজল মুছিও না ঝরুক অঝরে
যে মায়া ফিরিতে চায় ফিরাও না তারে
আমার সুদীর্ঘ পথে সেই শান্তি জল
অশান্তির তীক্ষ্ণতারে করুক বিকল।
ফিরুক সকল মায় স্নেহ প্রেম প্রীতি
প্রথম মিলন রাতি এ মোর মিনতী।
হাসির ভিতর দিয়ে যে বেদনা জাগে
ফুলের বুকেতে প্রাণ যে করুণা মাগে,
কাহারে জানাবে তার প্রেমের বারতা
উষার মধুর বায়ে সকরুণ লতা
হারায়ে নিজের ফুল কাঁদে অবিরল
গভীর বেদনা বুকে চক্ষে অশ্রুজল
তাই বন্ধু আজি তব সিক্ত গণ্ডপরে
আঁকি দিনু যে মাধুরী মুছিও না তারে

———

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের ত্রুটি

গোলটেবিল বৈঠকের যবনিকা পতন হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা এই যে তাহাতে ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার যে কথা ছিল তাহার কতদুর কি হইল। ভারত-বাসী অনেকে হয়ত বলিবেন যে উহা প্রকারান্তরে একটা ওজোর মাত্রই ছিল, ব্রটিশ রাজনৈতিকগণ কোন কালেই ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না অহিংসা-সংগ্রামকে বলপ্রয়োগে দমন করিতে না পারিয়াই তাঁহারা এই কূটনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। ভারতের অধিকাংশ পত্রগুলি এই মতেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। মুসলমান পত্রগুলি খুব উৎসাহিত হইয়া না উঠিলেও তাহারা যেন কতকটা সন্তুষ্টই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গোলটেবিল বৈঠকের নেতা মিঃ গজনভি বা 'হিজ হাইনেস' আগা খাঁ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ব্রটিশ রাজনৈতিকগণ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন তাহাতে তাঁহারা খুবই সন্তুষ্ট। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডাক্তার আমেদকারকেও বিশেষ ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মাদ্রাজের অব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়গুলি দেখা যাইতেছে যে এ বন্দোবস্তে তাহারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হয় নাই। সত্য বটে মহাত্মা গোলটেবিল বৈঠকে বলিয়াছেন যে তিনি যেমন অস্পৃশ্য। জাতি ও সম্প্রদায়গুলির জন্য ভাবেন এবং তাহাদের উন্নতির জন্য চিন্তা করিয়া আসিতেছেন সেরূপ কোন নেতাই করেন না, এমন কি ডাক্তার আমেদকারও নন্; কাজেই এই সমস্ত সম্প্রদায়ের সুখ দুঃখের কথা তাঁহার যেমন জানা আছে, তাহাদের উচ্চাশার খবরও তেমনি তিনি রাখেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার পক্ষের সহিত যুদ্ধ চালাইবার সময় মহাত্মাজী তাহাদের সহিত শুধু যে ঘনিষ্টভাবেই মিশিয়াছিলেন তাহাই নয়, সম্ভ্রান্ত বংশজাত এবং স্বয়ং বিত্তশালী হইয়াও তিনি ভারতের মজুরদের একজন হইয়াই তাহাদের সহিত জেলে গিয়াছিলেন। অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, যুক্ত-প্রদেশে কৃষাণ-বিভীষিকা দেখা দিলে মহাত্মাজী নিজের চরিত্র বলে তাহা সংযত এবং নিরাকরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কলিকাতা কংগ্রেসে লেলুয়া ও হাওড়ার নিকটস্থিত কারখানাগুলির শ্রমিকগণ অভিযান করিয়া কংগ্রেস মণ্ডপ অধিকার করিয়া বসিলে তিনিই তাঁহাদিগকে সংযত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যায় অনুন্নত জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাব কতটা তাহা সুদূর বিলাতে বসিয়া বুঝিতে পারা গেল না। ডাক্তার আমেদকার অনেকস্থান হইতেই তাঁহার কার্য্য প্রণালীর সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইয়া-ছিলেন। অবিশ্বাস সূচক প্রস্তাবও অবশ্য উঠিয়াছিল। কাজেই মহাত্মাজী যে তাঁহাদের আশাভরসার একমাত্র বক্তা ও পৃষ্ঠ-পোষক তাহাই বা কি করিয়া বলা যায় এবং বলিলেও বিদেশী এবং স্বদেশেরও কেহ কেহ তাহা না শুনিতে পারে।

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছে মনে করিয়া যাঁহারা দুঃখ করিতেছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন উহা ব্যর্থ হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদীগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বর্ত্তমানে যে নীতিতে কংগ্রেস পরিচালিত হইতেছে সে নীতির পরিবর্ত্তন না হইলে উহা ভারতের জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের পক্ষ লইয়া দাঁড়াইতে পারিবেনা। এখন যদি সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়, অনুন্নত ও খৃষ্টান, পার্শি প্রভৃতি সংখ্যা লঘিষ্ট জাতিগুলিকে লইয়া তাহাদের আশা-ভরসা পূরণ করিতে পারে এমন শাসন সংস্কার দান করেন তবে তাহা কি কিছুকাল আবার কার্য্যকরী হইবে না? হিন্দুগণ বিশেষতঃ কংগ্রেস এই বিষয়ে কি বলেন?

মহাত্মা গান্ধী যাঁহার বিশ্ব-মানবত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত-ভাবে সমস্ত জগতে গ্রাহ্য হইয়াছে, পৃথিবীর অনেকেই যাঁহাকে মহাত্মা যিশুর অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা

অনুভব করিতেছেন না, অসাধারণ প্রতিভাবান রোমাঁ রোঁলা যাঁহার একান্ত অনুগত বলিলেও চলে, বিখ্যাত ব্যঙ্গ অভিনেতা চার্লি যাঁহার সহিত একবার মাত্র সাক্ষাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণত্ব, শির অবনত করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ওয়েলশের জগৎ বিখ্যাত যাদুকর ও ইংলণ্ডের অসাধারণ রাজনৈতিক মিঃ লয়েড জর্জ্জ যাঁহার গুণগ্রামে একান্ত মুগ্ধ, এমন সর্ব্বজন বরেণ্য নেতাকে পাইয়াও কংগ্রেসকে গোলটেবিল বৈঠকে একভাবে হারিতে হইল কেন? উত্তর সেই পুরাতন এবং সনাতন। দ্বাপরের শেষ লগ্নে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন গল-লগ্নি কৃতবাসে কুরু-দরবারে পাণ্ডব পক্ষের জন্য পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকেও মহাত্মাজির ন্যায় ব্যর্থমনোরথ হইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল—স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত, ভীষণ আত্মাভিমান। কংগ্রেস জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ভারতীয় রাজ-পুরুষগণের উৎসাহে ও উত্তেজনায়। কংগ্রেস লালিত হইয়াছিল ভারতীয় ধন-কুবেরগণের সাহচর্য্যে। কংগ্রেস পালিত হইত বিখ্যাত আইনবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক। কাজেই কংগ্রেস একটী ধনিকগণের অনুষ্ঠান ছিল মাত্র। বাংলার দেশবন্ধু এই ধনিক প্রতিষ্ঠানকে দেশবাসীর হস্তে তুলিয়া দিবার জন্য উহার ভোটার লিষ্ট বাড়াইয়া উহার তাৎকালিক পরিচালকগণকে বিতাড়িত করেন। তখন হইতে কংগ্রেস ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হস্তে আসিয়া পড়ে। হিরেন দত্ত মহাশয় প্রভৃতি অনেক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী দেশবন্ধুর দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে এই অসাধ্য সাধন করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ মধ্যবিত্তদের হইতে আপনাদের রাজনীতির বিশেষত্ব বজায় রাখিবার জন্যই প্রয়াগের নেতা শ্রীযুত চিন্তামণির অধীনে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান মধ্যপন্থিগণ অর্থাৎ স্যর পেট্রো, তেজ বাহাদুর সপ্রু বা শাস্ত্রী মহাশয় সকলেই এই ফেডারেশনকে লালন-পালন করিয়া আসিতেছেন। সকলেই জানেন যে ফেডারেশন মাত্র কয়েকজন, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র, উহার সহিত ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা জনসাধারণের কোন সংশ্রবই নাই। মহাত্মাজী কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া অবধি কংগ্রেসকে আরও একটু নাবাইয়া জন সাধারণের মুখপাত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। বৎসরের পর বৎসর কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত অনেক অনুশাসনই সমার্থিত হইয়াছে, যেমন অস্পৃশ্যতা নিবারণ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, ধনিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন, কিন্তু কংগ্রেস নেতাগণ আজ দশ বৎসরের মধ্যে ঐ রেজ্যুলেশন গুলি কংগ্রেস কার্য্যাবলীর মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছেন মাত্র কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। বাংলার দেশবন্ধু যখন কলিকাতা করপোরেশন দখল করেন তখন তিনি অনেকগুলি তত্ত্বই প্রকাশ করেন। পল্লী-সংস্কার তাঁহার জীবনের প্রিয় স্বপ্ন ছিল। আইন-সভায় উহা কিরূপে কার্য্যকরী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা-পত্র ও পেশ করিয়াছিলেন। সামান্য দুই বৎসর মাত্র নেতৃত্ব করিতে পাইয়াই তিনি কলিকাতায় দুঃস্থ পরিবারদের মধ্যে শিশু-সন্তানের জন্য বিনামূল্যে ধাত্রী দিবার এবং দুগ্ধ-দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন। স্বরাজদল যাহারা এককালে সকলেরই বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা বাংলার নেতা দেশবন্ধুরই কীর্ত্তি। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত কংগ্রেস আজ জন-সাধারণের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সার্ব্বজনীন ভাবে সেই চেষ্টা কেহই করেন নাই! মহাত্মাজী, বল্লভভাই বোম্বাই অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে যে কার্য্য করিয়াছেন, মিঃ যোশী বোম্বাইয়ের শ্রম-জীবিদের যেরূপ ভাবে সঙ্ঘ-বদ্ধ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঐরূপ কোন কার্য্য করিবার চেষ্টা হয় নাই। এই খানেই কংগ্রেস জনসাধারণের ভক্তি অর্জ্জন করিতে না পারিয়া উহা শ্রেণী বিশেষের হস্তে তাহাদের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা কয়েক বৎসর যাবৎ দেখিয়া আসিতেছি যে একমাত্র বোম্বাই ব্যতীত ভারতের অন্যান্য সর্ব্বত্রই কংগ্রেস কতকগুলি স্বার্থান্বেষীর হস্তে পড়িয়া মাত্র দল-বিশেষের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বোম্বায়েও কংগ্রেস ধনীদের আশার একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ হওয়ায় তথাকার ধনীগণ কংগ্রেসকে প্রাণপণে সাহায্য করিতেছে সত্য, শ্রমিক বা পতিতগণের সহিত উহার সম্বন্ধ বিশেষ নাই। বিশ্বজগতে যতটুকু আছে বলিয়া প্রকাশ সেটুকু সম্বন্ধ কংগ্রেসের সহিত নয় উহা সর্দ্দারজীর সহিত বা মহাত্মাজীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে। তাই যদি না হইবে ত মহাত্মাজীকে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে বলিতে হইবে কেন, আমি উহাদের প্রতিনিধি; কংগ্রেসই উহাদের প্রতিনিধি এ-কথাত খুব জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই। তার পর কথা

হইতেছে মুসলমান সম্প্রদায়কে লইয়া। লক্ষৌ প্যাক্ট হইয়াছিল বহু পূর্ব্বে, তখন মণ্টাগু রিফরমের কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। তার পর কত উন্নতি হইয়া গিয়াছে, কতদিকে সভ্যতার আলোক বিকশিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা জ্ঞানতঃ যদিও জানি বাংলার শতকরা ৯৯ জন মুসলমান কৃষকই অজ্ঞ,—উহাদের জ্ঞান দানের কি ব্যবস্থা করিয়াছি। বৎসরের পর বৎসর আমরা হিন্দু-মুসলমান, মহাজন, জমিদার উহাদের নিকট হইতে সুদ বা খাজনা গ্রহণ করিয়াছি, বিনিময়ে উহাদের কি দিয়াছি? ইংরাজকে আমরা গালি দিই যে গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া আমরা তাহাদের অধীনে আসিয়াও এখনও আমরা পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতিরই পশ্চাতে, তর্কস্থলে উহাই যদি সত্য হয়, তবে কি বলিতে পারি না যে ইংরাজ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইলে মধ্যবিত্ত হিন্দুগণ শিক্ষিত হইয়া রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিয়া সৌভাগ্যের উচ্চ ধাপে উঠিয়াছে, তাহাদেরই দেশবাসী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে সঙ্গে লইতে পারে নাই—তাহাদের অধিকাংশ তেমনি অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দরিদ্রতার নিম্ন সোপানে রহিয়াছে। যখন বুঝিলাম এইরূপ করায় আমাদেরই অঙ্গহানি ঘটিয়াছে; তারপরও আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৮৮৫ সালে, এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দির মধ্যে তাহাদিগকে আমাদের ভোগ্য-যোগানদাররূপেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, মনুষ্যত্বের নামে কোন কিছুই দান করি নাই। এইখানেই তাহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য। ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ! সত্য বটে জাতীয়তাবাদীগণ বলিতেছেন আর ভয়ের কারণ নাই, বিশ্বাস করিলেই সমস্ত পথ পরিষ্কার হইবে, তবে তাহারা কিরূপে তাহা বিশ্বাস করিবে। যে হিন্দু বা মুসলমান মহাজন বা হিন্দু-মুসলমান জমিদার অজ্ঞ প্রজা সাধারণের কৃষিজাত অর্থে পুষ্ট হইয়া আসিতেছেন তাঁহারা জানেন যে যতদিন এই কৃষক ও শ্রমজীবি সম্প্রদায় অজ্ঞ থাকিবে ততদিনই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। এরূপ অবস্থায় বিশ্বাস কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে। কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিশ্ব-মানব মহাত্মাজী কেন যে গোল টেবিল বৈঠকে একদিক্ দিয়া সফলকাম হইতে পারিলেন না তাহার কারণ ইহাই।

ইহা করিতে হইবে

এইবার কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে। কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। যে সমস্ত সম্প্রদায় গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের সহিত সাহচর্য্য করিল না তাহাদের সৌ-ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। হিন্দু-সভ্যতার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষমতা স্বীকার্য্য। জেতা আর্য্যগণ পরাজিত অনার্য্যগণকে একেবারে ধ্বংস করেন নাই সত্য, কিন্তু তাহাদিগের ললাটে দাসত্বের চির-কলঙ্ক লেপিয়া দিয়াছিলেন। হুণ, শক্ প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার বীর জাতিগণ ভারতকে জয় করিয়া উহার সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেও সনাতনীর দল উহাকে অনেকটা দূরেই রাখিয়াছিল, প্রমাণ রাজপুতগণ ক্ষত্রিয় হইলেও ভারতের খাস ক্ষত্রিয় সমাজে উহাদের স্থান নাই। মহম্মদী যুগে যে সমস্ত রাজপুত মুসলমান হইয়া যায় তাহাদের আমরা রাজপুত-মুসলমান হিসাবে কতকটা স্থান দিলেও তাহাদিগকে একঘরেই করিয়া রাখিয়াছি। বাংলার কৈবর্ত্ত ও বাগ্দি-রাজ উচ্ছন্ন করিবার জন্য আমরা উত্তর ভারত হইতে অভিজাত সম্প্রদায়ের আমদানী করিয়াছিলাম। যে কৈবর্ত্ত বা বাগ্দিগণ বাংলার সম্রাট ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না আমরা তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিয়া অতি নিকৃষ্ট স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়াছি। আভিজাত্য আমাদের অস্থি মজ্জাগত। আমাদের আচার-ব্যবহার, বিবাহ-প্রথা তাহার সাক্ষ্য। সমস্ত জাতটাকে একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে গেলে, তাহাদিগকে এক স্বার্থের নিকট অগ্রসর করাইয়া লইতে গেলে, তাহাদিগকে জানিতে দিতে হইবে যে তাহারা সকলেই সমান, অভিজাত তাহাদের মধ্যে নাই। যখনই কোন জাতি বড় হইয়াছে তখনই তাহাকে সাম্য-বাদের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। জাপানের সামুরায়েরা, স্পেনের গ্রাণ্ডিরা, ফ্রান্সের ডিউকেরা, জাতি গঠন করিবার পূর্ব্বে জন-সাধারণের সহিত এক শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির কোন সংস্পর্শ নাই, কথাটা অধুনিক উচ্চতম জাতির জন্য, আমাদের পক্ষে উহা প্রযুজ্য নহে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই পূর্ব্বে অভিজাতগণ তাঁহাদের স্বার্থ বজায় রাখিতেন, বর্ত্তমানে ভারতে সেই নাটিকারই অভিনয় হইতেছে মাত্র, কেননা বর্ত্তমান ইউরোপের আমরা অনেক পশ্চাতে। মসজিদের নিকট বাস্ত বাজান হইবে কিনা, কলিকাতায় ইস্লামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা ইত্যাদি আন্দোলনের মূল তত্ত্ব অর্থগত পার্থক্য। কাজেই কংগ্রেস কর্ত্তৃক পরিচালিত শাসনে

মুসলমানদের স্থান কোথায় ঠিক নির্দ্দেশিত না হইলে হিন্দু-মুসলমান মিলন নেতাগণ যতই চেষ্টা করুন না, অসম্ভব থাকিবেই।

পৃথক-নির্ব্বাচন ও স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন নাই যাঁহারা বলেন তাঁহারা আধুনিক উচ্চ-আদর্শের প্রতিধ্বনি করেন মাত্র। তাঁহারা ভুলিয়া যান কেন কোন একটা বিরাট অধিষ্ঠানের নিকট আসিলেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রই রহিয়া যায়। পৃথক-নির্ব্বাচনে মুসলমানদের মধ্যে একটা বেশ হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়, উহাদের মধ্যে যে সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে সন্তুষ্ট রাখিতে জানে সেই নির্ব্বাচিত হয়; একথা সত্য যে এইরূপ প্রতিনিধিই সকল সময়ে উপযুক্ত প্রতিনিধি হন না, কিন্তু রাজনীতিতে উপযুক্ততার স্থান কতটুকু? ব্যায়াম যেমন অঙ্গ-পরিচালনের সহায়ক, নির্ব্বাচন প্রথাও সেইরূপ। ইহাতে একটা জাত একসঙ্গে রাজনীতি ভাবিতে শিক্ষা করে। এইরূপ স্থলে রাজনীতির একজন অধ্যাপক তিনি যতই উহার তত্ত্বগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকুন না কেন, জাতিকে পরিচালনা করিবার একেবারেই উপযুক্ত নন যদি না তাঁহার জনসাধারণের দৃষ্টি তাহার উপর আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকে। মিলিত নির্ব্বাচনে হিন্দু ভোটাধিক্যে হয়ত একজন অর্থবিৎ পণ্ডিত বা একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তাহাতে মুসলমান পক্ষের কি সুবিধা হইবে। যে মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে, সেইত তাহাদের উন্নতির চেষ্টা করিবে, বিদ্যায় অল্প হইলেও সেইত উপযুক্ত প্রতিনিধি। হিন্দু-ছাত্রগণ কয়েক যুগের কালচারের অধিকারী হইয়া বর্ত্তমান মুসলমান ছাত্রগণের অনেক অগ্রে অবস্থিত, তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পদে পদে পিছাইয়া যাওয়া অপেক্ষা একলব্যের মত নির্জ্জন সাধনই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল জনক হইতে পারে। অবশ্য সাধনাই যদি স্বতন্ত্র বিদ্যামন্দির বা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের লক্ষ্য হয়। এ-ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতা লইয়া সাধনা করিতে গেলে ক্রমশঃ পশ্চাৎপদই হইতে হইবে সন্দেহ নাই। তারপর চাকুরীর কথা। মুসলমানগণ তাহাদের জন সংখ্যার অনুপাতে সরকারী চাকুরী দাবী করিতেছেন। তাহা দিয়া দেখিলে ক্ষতি কি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লেখা-পড়া শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যই চাকুরী লাভ। মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যতই চাকুরী পাইতে থাকিবে ততই তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ঘটিবে। আর্থিক দুর্দ্দিনে হিন্দু-মধ্যবিত্তগণ অল্প চাকুরী পাইলে বর্ত্তমানে একটু দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইবেন সত্য—কিন্তু অপর নানাক্ষেত্রেও তাহাদের চোখ খুলিবে, আর মুসলমানেরা যদি সত্যই মনে করে স্বার্থের খাতিরে হিন্দুরা তাহাদের চাপিয়া রাখিতেছে, চাকুরী-ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে আগাইতে দিতেছে না, তবে ভারতের মুক্তির পথ কি আরও বিঘ্নসঙ্কুলই হইবে না?

তবু এস্থলে বলা আবশ্যক প্রজা-সাধারণের জন্য ভূ-স্বামীরা অনেকস্থলে অনেক কিছু আগে করিয়াছেন কিন্তু এখন যখন বেশী কিছু করা দরকার তখন বিশেষ কিছু হইতেছে না আর এখন এমনি একটা যুগ পড়িয়াছে যে রাজা প্রজা সকলেই আপন আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত—পরের জন্য কাহারও কিছু করিবার সাধ্যও যেন নাই। এ অবস্থায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান প্রজা-সাধারণের দিকে ক্রমশঃ মনোযোগ দিতেছে—তথাকথিত অস্পৃশ্য নেতা বা মুস্লিম নেতা যাহারা গোল-টেবিলে ইহাদের পক্ষ হইতে মুখপাত্র হইয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে ইহাদের যোগ মাত্রও নাই। তবু ইহাদের যে ভাবের বাণী টেবিলে নির্গত হইলে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা জোর পাইত তাহা বিপরীত-পন্থী হইয়া সকলেরই স্বাধীনতার বাণীকে ব্যাহত করিয়াছে, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়!

বাংলায় ধর্ষণ-নীতি

বাংলায় ধর্ষণনীতি প্রবর্ত্তিত হইল। বাংলায় ইহা নূতন নহে। ধর্ষণ-নীতি দ্বারা সরকার পক্ষ মনে করিতেছেন যে বাংলা হইতে একেবারে রাজদ্রোহের মূলপাত করিবেন। রাজদ্রোহীতা যে কখনই ধর্ষণ নীতির দ্বার দূর করা যায় না, একথা তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া কি নিষ্প্রয়োজন নয়? আয়র্লণ্ডে ধর্ষণ-নীতি চালাইয়া ইংলণ্ড যখন কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না তখনই না উহাকে ফ্রীষ্টেটে পরিণত করা হইল। ইটালীর উপর অষ্ট্রেলিয়ার ধর্ষণ-নীতি বর্ত্তমানে বাংলায় ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নীতি অপেক্ষাও ভীষণতর ছিল, ফলে তথায় অষ্ট্রীয় শাসনের দিন ফুরাইয়া যায়। নেপলীয়নী যুগে অষ্ট্রেলিয়ার উপর তাহার ধর্ষণ

নীতি চলিয়াছিল কিন্তু কোন ফলোদয় কি হইয়াছিল? উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে তবু সরকার পক্ষ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বস্থলেই এই রাজদ্রোহিতার সহিত সংগ্রাম করিবার প্রয়োজন হইলেই ধর্ষণ নীতিই অবলম্বিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে আইরিশ ফ্রীষ্টেট কেও এই পন্থাই অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে যখন সমাজে আত্ম-দ্রোহ উপস্থিত হয় তখন যাহারা উহার উচ্চস্তর হইতে রাজ-দণ্ড চালনা করেন তখন নিম্নস্তরের সুখ দুঃখের বিষয় অবগত হইতে চেষ্টা করেন না বা হইয়াও উহার দূরীকরণে মনোনিবেশ করেন না। বাংলার সরকার বেশই জানেন যে রাজ-দ্রোহীগণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। জীবন-সংগ্রামের দিনে অন্ন-সংস্থানের যতগুলি পথ ছিল সেগুলি সমস্তই তাহাদের পক্ষে দুরাগম্য হইয়া উঠিতেছে। এই রাজদ্রোহীদলের অনেকেই সরকারী কর্ম্মচারীর পুত্র। পিতা যে চাকুরী করিতেছেন তাহা বা তাহা অপেক্ষা কোন ক্ষুদ্র পদ ও তাহার নিকট মুক্ত নয়। কাজেই ইহারা কতকটা হতাশ-ভাবেই মরিয়া হইয়া উঠে। উহাদের সহিত জাতির সম্বন্ধ আছে ও, নাই-ও। সরকার পক্ষও তাহা স্বীকার করেন। এই আত্মদ্রোহী সম্প্রদায় রাজ-পুরুষগণের যেমন বিভীষিকার কারণ হইয়াছে তাহারা বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বজন সম্মত রাজনীতির ও সেইরূপ ভয়ের কারণে পরিণত হইয়াছে। মহাত্মাজী বা কংগ্রেস চাহেন অহিংস আন্দোলন। রাজ-দ্রোহীগণের কার্য্যাবলীর দ্বারা জগতের নিকট তাঁহাদের এই নীতি একটু যে ছোট হইতেছে তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? এই রাজদ্রোহীর-সংখ্যায় নিশ্চয়ই খুব বেশী নয়। একটা যৌথকারবার খুলিয়া যে সমস্ত প্রদেশে এখনও বিস্তর খালি জমি আছে সেই সেই দেশে এক একটা ফার্ম খুলিয়া যুবকদের কর্ম্মস্থল প্রসার করিয়া দিলে কেমন হয়, সরকার পক্ষ একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি? আর সর্ব্বোপরি প্রয়োজন জাতিকে আত্মশাসন ক্ষমতা দেওয়া। স্বায়ত্তশাসন পাইবার জন্য সকলেই উন্মুখ, ইহাতে যত বিলম্ব হইতেছে ততই নানাদিক হইতে নানা অনাচার দেখা যাইতেছে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্ব্বাচন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় বাংলার নেতারা এবার ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাহারা কর্ম্মী এবং কর্ম্মেই যাহাদের আনন্দ এমন ব্যক্তিবিশেষকে নির্ব্বাচনে সম্মানিত করিয়া দেশের কাজ করিবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। স্বার্থের অট্টহাস্য আমাদের কর্ণকে বধির করিয়াছে। কে কবে কোথায় ভলন্টিয়ার হইয়াছিল, কবে কোন নেতার পার্শ্বচর ছিল এই হিসাবে তাকে সম্মানিত করিতে হইবে বা করপোরেশনী চাকুরী দিতে হইবে, সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। বাংলাই সমস্ত ভারতবর্ষকে মুক্তির পথে চালিত করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে এখন সেই পদগ্রহণ করিতে গেলে স্বার্থত্যাগী আদর্শ দেশ-কর্ম্মীর একান্ত প্রয়োজন। কাজেই ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক কমিটীতে এই শ্রেণীর নেতার সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

পুরী কংগ্রেস

এবারকার কংগ্রেস পুরীতে বসিবে। পুরী আমাদের একটী বিশেষ তীর্থস্থান, কেননা এখানে হিন্দুজাতি তাহাদের বর্ণ-বিশেষের আভিজাত্য ভুলিয়া এক মহান সাম্যবাদের আদর্শতলে মিলিত হয়! এখানে ব্রাহ্মণও চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে দ্বিধা করেন না, কাজেই পুরীর কংগ্রেসে আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য যাহাতে সার্ব্বজনীনত্বে গিয়া পৌছায় তাহা করা কর্ত্তব্য। কংগ্রেসকে প্রবল ও সম্মানিত গেলে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে উহাতে যোগদান করা আমাদের কর্ত্তব্য। কংগ্রেস শ্রেণী বিশেষের বা কোন clique এর অধিকারভুক্ত থাকিলে আমাদের মুক্তি সুদূর পরাহত। সেইজন্য আমাদের মনে হয় বাংলার সমস্ত জেলা হইতে দলে দলে প্রতিনিধি গমন করিয়া উহাকে সর্ব্বসাধারণের মুখপাত্র হিসাবে সবল করিয়া তোলা। পুরীর আবহাওয়া তাহাতে অনেক সাহায্য করিবে, কেননা বার কান্যকুব্জীয়ার তের চুলার প্রয়োজন ত সেখানে নাই।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জোর প্লাকার্ড চারিদিকে মারা হইতেছে। স্বয়ং শরৎচন্দ্র তাহার একজন বিশেষ কর্ম্মী। কবিকে নাকি প্রাচীন বাংলা অক্ষরে শরৎচন্দ্র স্বহস্তে লিখিয়া অভিনন্দন দান করিবেন। কলিকাতা করপোরেশন কবি সম্রাটকে অভিনন্দন দিবেন ঠিক করিয়াছেন। তাঁহার বাংলায় এই অভিনন্দন পত্র লিখিত হইবে বলায় ইংরাজগণ

প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটী রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কর্ম্মকর্ত্তাকে আমরা শুধু এইটুকু মাত্র চলিতে চাহি যে, সপ্তাহের সাতদিনের অন্ততঃ একটী দিন বিনা টিকিটে সাধারণের জন্য প্রদর্শনীটী উন্মুক্ত রাখিলে মন্দ কি হইত? কবিকে যাহারা সম্মান দিতে চাহে, তাহারা যদি পয়সা খরচ করিতে না পারে তবে তাহারা কবিকে সম্মান না দিতে পারায় একটু ক্ষুণ্ণ হইবে না কি?

বড়দিনের মরশুম

কলিকাতায় বড়দিনের মরশুম আসিয়া পড়িল। ব্যাঙের ছাতার মত কার্নিভাল গুলি চারিদিকে গজাইয়া উঠিতেছে। সময় বুঝিয়া বৌবাজারের স্বদেশী মেলাও দীর্ঘ-জীবন লাভ করিল। দুই একটা সার্কাসও আসিতেছে। সিনেমা গুলিও নানা রংয়ের বিজলী বাতি জ্বালিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু দেশী নাট্যাশালা গুলি যেন নেহাৎ ঢ্যাব ঢ্যাব করিতেছে। বড়দিনের সময় আগে যেমন নানা রকমের প্লাকার্ড দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পাইত, রঙ্গ-মঞ্চগুলিতে দর্শক সংখ্যাও তেমনি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া যাইত, এ বৎসর যেন চাল ধানের দরের ন্যায় এদিককার বাজারও খুবই নরম।

মুদ্রাজগৎ

ডলারের অনুপাতে ইংরাজী স্বর্ণ মুদ্রা পাউণ্ডের দর হ্রাস পাইতেছে। সাধারণতঃ একটী ইংরাজী পাউণ্ড ৪.৮৫ ডলারের সমান। এখন ৩.২৯ ডলার একটী ইংরাজী পাউণ্ডের সমান হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ যে ইহাতে বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইংরাজ সরকার আমেরিকার নিকট ঋণী, পাউণ্ডের দর এইরূপ দিন দিন কমিয়া গেলে ঐ ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। এদিকে পৃথিবীর শতকরা ৬০ অংশ স্বর্ণ আমেরিকা ও ফ্রান্সে গিয়া জমিয়াছে, আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করিতে গেলে বা জার্ম্মাণীকে reparation দিতে হইলে আমেরিকা বা ফ্রান্সের স্বর্ণ মুদ্রায়ই উহা শোধ দিতে হইবে। কাজেই ইংলণ্ড ও জার্ম্মানির মুদ্রার মূল্য আমেরিকা ও ফ্রান্সের মুদ্রার মূল্যের অনুপাতে হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু এরূপ করিয়া কতদিন চলিবে। পৃথিবীর স্বর্ণের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাসই হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ রৌপ্য-মানে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যাইতে পারিলে আবার বৎসর কয়েক চলিতে পারিবে।

পল্টন

২২শে নভেম্বর রবিবারে কলিকাতায় প্রায় ৩০০০ দেশী ও বিলাতী পল্টন, সাজোয়া গাড়ী প্রভৃতি লইয়া গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে সুরু করিয়া বেণ্টিক ষ্ট্রীট, চিৎপুর, বিডন ষ্ট্রীট ও সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়া আবার কেল্লাভিমুখে ফিরিয়া যায়। এই বিরাট সৈন্য প্রদর্শনীর অর্থ কি? যখন চারিদিকে ব্যয় সঙ্কোচের পালা চলিয়াছে তখন এই প্রদর্শনীতে যে অর্থব্যয় হইল তাহা কি অপব্যয় নয়?

কর্পোরেশনে সহর সজ্জা

কলিকাতা কর্পোরেশন স্থির করিয়াছেন যে দক্ষিণে কেওড়াতলায় দেশবন্ধুর চিতাভস্মের উপর এক স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবেন, যাহার স্থাপত্যে বাংলায় প্রাচীন গৌড়ীয় আদর্শ প্রতিফলিত হইবে। এই স্মৃতি স্তম্ভের নক্সা কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি আবার ঠিক করা হইয়াছে যে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের দক্ষিণে যে জমি খালি করা হইয়াছে উহার উপর পশ্চিমের সহরগুলির অনুকরণে একটী ঘণ্টাঘর বা clock-tower নির্ম্মাণ করা হইবে। কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ দের উপর উহার নক্সা তৈয়ারী করিবার ভার পড়িয়াছে। উহার ব্যয় অনুমান দুই লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য করা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এই ঘণ্টাঘরটী গৌড়ীয় স্মৃতিরই নকল হইবে এবং যখন তৈয়ারী হইয়া যাইবে তখন কলিকাতার বিশেষ অলঙ্কার বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

কর্পোরেশনের ধাত্রী ও দুগ্ধ সরবরাহ

কলিকাতা কর্পোরেশনের ম্যাটার্নেটী হোম বা সূতিকালয় ও ধাত্রী আছেন, প্রয়োজন হইলে সন্তান-প্রসব করান কার্য্যে সম্পাদন করিয়া থাকেন। কর্পোরেশনের আর একটী জনহিতকর কার্য্য হইতেছে যে যাহারা গরীব এবং সন্তানকে দুগ্ধ খাওয়াইতে পারেন না তাহাদিগকে দুগ্ধ সরবরাহ করা। নানাদিক হইতে আমরা এই দুইটী সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি। দুগ্ধ ঠিক যোগান দেওয়া হয় না, সময়মত ধাত্রী পাওয়া যায় না, ধাত্রীরা নাকি গৃহস্থদের সহিত অশোভন ব্যবহার করেন না ইত্যাদি। কথাগুলি সত্য হইলে দুঃখের বিষয়, কর্ত্তৃপক্ষগণকে উহার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আমরা উপরোধ করিতেছি, তাঁহারা করিবেন কি?

দেশের নিরক্ষরতা

আমাদের দেশে প্রায় শতকরা ৯৫ জন লোক নিরক্ষর। প্রাথমিক শিক্ষার বিল বাংলার আইনসভা হইতে গৃহীত হইলেও অর্থাভাবে উহা দপ্তরে পড়িয়া পচিতেছে, উহাকে কোনকালেও যে কার্য্যকরী করা হইবে এমন আশাও সুদূর ভবিষ্যতে আছে কিনা সন্দেহ। ভারতে শিক্ষা-বিস্তার করা অসম্ভব যাহারা ভাবেন তাহারা প্রায়ই বলেন যে ভারতবর্ষ যেরূপ বিশাল দেশ ইহার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষা-মন্দির স্থাপন করা একপ্রকার অসম্ভবই। তাহার উত্তরে আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় বর্ত্তমানে যেরূপ শিক্ষাদান করা হইতেছে তাহারই নিদর্শন দিতেছি। ভারতের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার বিশালত্ব নিশ্চয়ই বাড়িয়া যায় যদি উহার লোক সংখ্যাটাও আমরা একটু বিশেষ করিয়া ভাবি। মাত্র ৮০ লক্ষ লোকের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার মতন একটা মহাদেশ যে খুবই বিশাল তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিবেন না। এই ৮০ লক্ষ লোক সমস্ত অষ্ট্রেলিয়ার তাবৎ অংশেই ছড়াইয়া বাস করিতেছে। তথাকার অধিবাসিরা প্রায় পশুজীবি। ভেড়ার পাল বা ঘোড়ার দল লইয়া উক্ত মহাদেশের নিভৃত অংশে বাস করে। তাহারাও আমাদেরই মত অনেকেই নিরক্ষর। তথাকার সরকার এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য সহরে সহরে কতকগুলি correspondence স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। এখানকার শিক্ষকমণ্ডলী প্রায় স্ত্রীলোক। তাঁহারা পাঠ্যবিষয়ের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা টাইপ রাইটার দ্বারা লিখিয়া পোষ্ট আফিসের সাহায্যে দেশের দূরতম প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিবার পর সন্ধ্যার সময় গৃহিণীরা এই সমস্ত বিবৃতির সাহায্যে তাহাদের সন্তানগণকে শিক্ষা দান করেন। ইহাতে সরকার পক্ষের খরচাও খুব কম পড়িতেছে। জনসাধারণের শিক্ষার আগ্রহ এত অধিক যে অনেক সময় তাহারা প্রায় ১০।১২ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে এই বিবৃতি লইয়া যায়। আমাদের সরকার যদি অর্থাভাবে স্কুল বিল্ডিং ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়া এখনই সার্ব্বজনীনভাবে লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হন, তবে জেলায় জেলায় এইরূপ স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতে গেলে কত খরচ পড়িবে তাহার একটা অনুমান করিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন না কেন?

বহরমপুর কংগ্রেস

শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগের সভাপতিত্বে বহরমপুর কংগ্রেস শেষ হইয়াছে, ও বাংলার অভাব অভিযোগ তথায় পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৃত্যুতে বাংলা একজন বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত হারাইল। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন পণ্ডিত তেমনি সদালাপী ও সুরসিক ছিলেন। পাণ্ডিত্যে ও দৈনিক জীবন যাত্রায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিয়া চলিতেন—যুগের একটা স্মরণীয় মানুষ ছিলেন তিনি—ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুণ।

মিঃ ষ্টিভেন্সের হত্যা

কুমারী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামে দুটি স্কুলের ছাত্রী ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করিয়াছে। ছিঃ ছিঃ এই কি নারীর কাজ? অসহযোগ-আন্দোলনে ভারতনারীরা অসহনীয় দুঃখ বরণ করিয়া জগতের চোখে যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন এই দুইটি তরুণী নারী তাহা কত অবনমিত করিলেন! ভগবান ইহাদের সুমতি দিন। এ পথ মুক্তির নহে, মরণের নহে, [illegible] নহে। মিঃ ষ্টিভেন্সের পরিবারবর্গের সহিত আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। আর এই দুইটি তরুণীর জন্য বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছি।

রাষ্ট্রে মহাত্মাজী

গোলটেবিলে মহাত্মার শেষ বক্তৃতা

গত ১লা ডিসেম্বর গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। অধিবেশন শেষ হইবার পূর্ব্বে মহাত্মা একটি বক্তৃতায় কংগ্রেসের মতামত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সম্মানজনক সর্ত্তে আমরা সখ্যতা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কংগ্রেস শুধু কথার চালে ভুলিবে না।

আমি কোনরূপ কুহকের রাজ্যে বাস করি না। মন্ত্রিসভা হয়ত ইতিমধ্যেই ভারতসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, আমি কোন কথা বলিলে সে সিদ্ধান্তের যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে এমন আশা আমার নাই।

প্রস্তাবিত সংরক্ষণ সর্ত্ত সমূহ ভারতের স্বার্থের অনুকূল নহে এবং মোটেই সন্তোষজনক নহে। আমি আপোষ করিতে পারি তবে সেটা করিতে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সম্মান বজায় রাখিতে হইবে। একটা মহাদেশের স্বাধীনতা যে শুধু যুক্তিতর্কের কাটাকাটি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বৈঠকের নিকট যে সব রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশের সহিতই আমার মতদ্বৈধ আছে। কারণ তাহা না করিলে আমার পক্ষে প্রকৃতরূপে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করা হয় না। কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায়ের শতকরা ৮৫ জন লোকের প্রতিনিধি। কংগ্রেস জাতি, বর্ণ বিভেদ জানে না। কংগ্রেসের ক্ষেত্র সকলের জন্য। কংগ্রেস সকল সময় নিজের আদর্শ অনুযায়ী চলিতে না পারে। কিন্তু ইহাই একমাত্র শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসকে শুধু একটি দলের প্রতিষ্ঠান, ইহা ধরিয়া লওয়াতেই বৈঠকের কাজে অসুবিধা ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি জানি, তাহাতে আমার কিছু যায় না। একমাত্র কংগ্রেস যে কথা বলে সেই কথাই ভারতবর্ষ পালন করিবে, আমি ব্রিটিশ জনসাধারণকে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম। আমাদের দাবী স্বীকার করিয়া লইলে অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ দাঁড়াইত।

কংগ্রেসই একমাত্র নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠান এবং একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানই সমস্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দাবী মিটাইতে পারে। পাশাপাশি আর একটী গবর্ণমেণ্ট চালান হইতেছে বলিয়া ইহার উপর দোষারূপ করা হইয়াছে। নিজের হাতে কোনরূপ সামরিক বল না থাকা সত্ত্বেও—প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও যে প্রতিষ্ঠান প্রতিদ্বন্দী গবর্ণমেণ্ট চালাইতে সক্ষম, আমাদিগকে স্বাধীনতা দানের ইচ্ছাই যদি আপনাদের থাকিত, তাহা হইলে আপনারা সেই প্রতিষ্ঠানকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেন। কংগ্রেসকে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল বটে; কিন্তু সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার কংগ্রেসের যে দাবী, তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। আমি জানি, সে দাবী প্রতিপন্ন করা এখানে আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তবু জোরের সঙ্গেই আমি সে দাবী করিব। কারণ আমার উপর গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে।

কংগ্রেস বিদ্রোহের প্রতীক একথা আমি স্বীকার করি; কাজেই এই কংগ্রেসের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইলে ইংলণ্ডের গৌরব বর্দ্ধিত হইত।

বিপ্লববাদী বা যে সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মীদের তদ্রূপ মনোভাব তাঁহাদের পক্ষে তিনি ওকালতি করিতেছেন না। মিঃ গজনবী বলিয়াছেন যে, কলিকাতার স্কুলের ছাত্রদিগকে সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ইংরেজ-বিদ্বেষ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমি উহা বিশ্বাস করি না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অসংখ্যবার ঐরূপ ধরণের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। যদি উহা সত্য হয়, কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে আমি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের এজন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছে। তিনি অন্য কি ভাবে ক্ষতিপূরণ করিতে পারিতেন, মিঃ গজনবী তাহা বলেন নাই।

ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে আইন অমান্যের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় না ফেলিয়া আমি সম্মানজনক মীমাংসা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব; কিন্তু যদি ব্যর্থ হই তবে সানন্দে ঐ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইব।

লর্ড আরউইন আমাদিগকে যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অর্ডিন্যান্স কিম্বা লাঠি কিছুই স্বাধীনতার স্রোতবেগে বাধা দিতে পারিবে না। আমার জীবন আপনাদের হাতে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সকলের জীবন, নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রিয় সমিতির সকলের জীবন আপনাদের হাতে; কিন্তু লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণের জীবনরক্ষা করিবার শক্তি যদি আমাদের থাকে, আমি তাহা উৎসর্গ করিতে চাহি না।

আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কিত সংরক্ষণসর্ত্ত ভারতের স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিবে। সংরক্ষণ সর্ত্ত দেওয়া হইবে বলিয়া কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি ভারতের স্বার্থের অনুকূলেই এবং ইংলণ্ডের স্বার্থের প্রতিকূলজনক না হওয়াই উচিত। ভারতের ও ইংলণ্ডের অবৈধ স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে দূরীভূত করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত জয়াকর ও সপ্রুর কথার সমর্থন করিয়া বলিতেছি, একমত হওয়ার বহু উপায়ই আছে। আমাদের বহু সমস্যা আছে যাহা সমাধান করিতে অনেকবারেই ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইবে কিন্তু আমাদিগকে ঐগুলির সমাধান করিতে হইবে। আমি আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে চাই না। আমি চাই সামরিক যুদ্ধ বিরতিকে স্থায়ী শান্তিতে পরিণত করিতে। যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন, তবে ইহা কিছুই নহে—কিন্তু কংগ্রেসকে বিশ্বাস করুন—কারণ কংগ্রেস আমার চেয়েও বড়।

আপনারা আপনাদের নিজের সুগঠিত বিভীষিকাপূর্ণ নীতি দ্বারা বিপ্লববাদের বিভীষিকার সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন। কিন্তু ভারতকে যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা স্বাধীনতা না দিতেছেন এমন সহস্র

লোক প্রস্তুত আছে, যাহারা ততদিন নিজেরাও শান্তি কাহাকে বলে জানিবে না, আপনাদিগকেও জানিতে দিবে না।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান না করিয়া ভারতের স্বরাজ হইতে পারে না; কিন্তু ইহার সমাধানে আমি নিরাশ হই নাই। যে পর্য্যন্ত বিদেশী শাসন থাকিবে সে পর্য্যন্ত কোন সমাধান হইতে পারিবে না।

ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে এই সমস্যা ছিল না এবং এখনও হিন্দু ও মুসলমানেরা গ্রামে শান্তিতেই বাস করে।

আইন অমান্য আন্দোলন ঠেকাইয়া রাখার চেষ্টা করার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমি অন্য পথ ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। তথাপি এখনো একটা আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য আমি কোন ত্যাগকেই অত্যধিক বলিয়া মনে করিব না। কংগ্রেস আন্দোলনের যাহা প্রাণ—অর্থাৎ "ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা" এই আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণায় যদি আমি আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে দেখিবেন আমি সর্ব্বদাই আপোষ নিষ্পত্তির জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা আমার স্বাধীনতার দাবী মানিয়া না লইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপোষ-নিষ্পত্তি অসম্ভব।

কংগ্রেস বিদ্রোহ ভাবের প্রতীক বক্তারা; বে-আইনীর প্রবৃত্তি, বিদ্রোহ এবং বিপ্লব ভয়ের চক্ষে দেখিতেছেন। কোন জাতি যে দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া না যাইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এরূপ আমি জানি না। গুপ্তঘাতকের ছোরা, বিষের বাটি, গোলন্দাজের গুলী এবং শড়কী স্বাধীনতার অন্ধ-প্রেমিকেরা এইসব ধ্বংসের অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু ভারত ইহা চাহে না। ৩৫ কোটি লোকের এই বিরাট ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য নরঘাতক ছোরা, বিষের বাটী, শড়কী বা বুলেটের প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র সমগ্র জাতি এক প্রাণ হইয়া "না" বলিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেই যথেষ্ট হয়,—ভারত এক্ষণে সে ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার পথে অগ্রসর হইয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমি যে দাবী জানাইয়াছি আমি উহার এক চুলও কমাইতে রাজী নহি, যুক্তরাষ্ট্র গঠন সাবকমিটিতে যাহা বলিয়াছি তাহার একবর্ণও আমি প্রত্যাহার করিব না, তথাপি আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি যে, আমি আপোষ নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তুত। ইংরেজ ও ভারতীয় রাজনৈতিক নৈপুণ্যের প্রসূত যে কোন কল্পনা সম্বন্ধে এখনও আমি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত। ধর্ম্মের দোহাই, আপনারা এই বৃদ্ধকে যাহার মাথার উপর দিয়া ৬২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহাকে একটিবার সুযোগ দিন। তাহার প্রতি এবং সে যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটু সুবিচার করুন—বাহ্যতঃ আমাকে আপনারা বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু একথা ঠিক যে, আমি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। উক্ত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমি নগণ্য—কংগ্রেসের নির্দ্দেশ ব্যতীত কিছু করিবার অধিকার আমার নাই।

বিপ্লববাদ দমনের উপায়

গত ১৭ই ডিসেম্বর পৃথিবীর নানা দেশের সংবাদ সংগ্রাহকগণ মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট মহাত্মা গান্ধি বলেন:—

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা অথবা গোল টেবিল বৈঠকে যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য আমি এখন বিশেষ ব্যস্ত নহি। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যাহা ঘটিতেছে তাহাই আমাকে চিন্তান্বিত করিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থাই ভবিষ্যতের সূচনা করে। ভারতের অবস্থা—বিশেষ বাঙ্গালার অবস্থা এখন বড়ই সঙ্কটময়। অতঃপর আর কোন আশাই থাকে না যে, এই গোলটেবিল বৈঠক দ্বারা বড় রকমের কোন ফললাভ হইবে। এই মাত্র যে অর্ডিনান্স্ জারী হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা শাসন কর্ত্তাদের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, আমি তাহারই কথা বলিতেছি। যাহা দমন করিবার উদ্দেশ্যে এই অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে, তাহাকে বিপ্লববাদ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এরূপ নামকরণ অনেকটা সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, কোন ইউরোপীয়ানের জীবননাশ ঘটিলে অথবা জীবন নাশের উদ্যম হইলেই গবর্ণমেণ্ট আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠেন। আমি নিজে এরূপ অপরাধকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রয়োজনের তুলনায় অতিশয় বেশী পরিমাণে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে বিপ্লব দমনের কথা হইতেছে, তাহার ভার আমার উপর পড়িলে, আমি সাধারণ আইনের দ্বারাই তাহার প্রতিকার করিতাম।

"বর্ত্তমানে শাসন কর্ত্তৃত্ব যাহাদের হাতে আছে, তাঁহাদের ক্ষমতা কম নহে। দেশের প্রচলিত সাধারণ আইন অনুসারেই তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। বিপ্লববাদ সম্পর্কে যাহা কিছু বক্তব্য এবং কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিলে আমার মনে হয়, এবিষয়ে বাঙ্গলা দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইবে না।'

"তাহার পর ইহাও বলা প্রয়োজন যে, মূলীভূত কারণ দূর না করিয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট—ভারত গবর্ণমেণ্ট না বলিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বলাই ভাল—ভারত সচিবের সাহায্য লইয়া কেবল মাত্র উপসর্গের প্রতিকারের জন্যই ব্যস্ত হইয়াছেন, মূল রোগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।"

"একথা সকলেই স্বীকার করেন যে বিপ্লববাদী হইবার মোহেই কেহ বিপ্লবী হয় না অথবা বিপ্লব মূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে না। কোনও উদ্দেশ্য না লইয়া কেহই স্বেচ্ছায় জীবন দান করিতে অগ্রসর হয় না। আমার মনে হয়, ইহাও সকলেই স্বীকার করিবেন যে, নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়েই বিপ্লবীরা এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হয়। সেই স্বাধীনতা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ইহা অতি সুনিশ্চিত যে, বিপ্লবমূলক কাণ্ড আর অনুষ্ঠিত হইবে না—আর কিছু না হউক, অন্ততঃ ইউরোপীয়ান অথবা অন্য সম্প্রদায়ের সরকারী কর্ম্মচারী অথবা বে-সরকারী ব্যক্তিগণের উপর আক্রমণ আর চলিবে না।''

"সুতরাং আমার অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিবার সুযোগ হইলে, আমি এই অপরাধ দমনের নিমিত্ত সাধারণ আইনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতাম। এই সঙ্গে আমি বিপ্লবীদের কাম্য স্বাধীনতার স্বরূপ নির্ণয়ের

চেষ্টা করিতাম। তদন্তের ফলে যদি জানিতাম যে, তাহাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিয়া লইতাম। এইরূপ দেশ হইতে বিপ্লবাদ নির্ম্মূল হইয়া যাইত।"

"স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাঁহার সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই উপায় অবলম্বনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপদেশে কর্ণপাত করা হয় নাই অথবা পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করা হয় নাই। সে যাহাই হউক, এখনও সময় আছে। এরূপ গুরুতর বিষয়ে যে কোন সময়ে নীতি পরিবর্ত্তন এবং মত পরিবর্ত্তন করা যায়। আমার আশঙ্কা হয়, যে স্বাধীনতার জন্য সমগ্র জাতির ক্ষুধা জাগ্রত হইয়াছে, তাহা না পাইলে বিপ্লববাদ নির্ম্মূল হইবে না।"

"কংগ্রেস এমন একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছে—যাহা দ্বারা বিপ্লববাদের আর কোনই প্রয়োজন থাকে না। বিপ্লবমূলক কার্য্যের পরিবর্ত্তে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি গ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসের অহিংসা নীতি, বহুল পরিমাণে বিপ্লবমূলক অপরাধকে প্রশমিত করিয়া রাখিয়াছে। কংগ্রেসের নীতির জন্য এখন আর আমি অধিকতর গৌরব দাবী করিতেছি না। তথাপি আমি এই আশা করিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের সুমতি হউক আর নাই হউক, কংগ্রেস তাহার নীতি অনুসরণ করিবেই এবং একদিন না একদিন এই নীতির বলেই কংগ্রেস দেশ হইতে বিপ্লবাদ নির্ম্মূল করিতে পারিবে। আমি স্বীকার করিতেছি যে, খুব ধীরে ধীরে কাজ হইতেছে। এরূপ মত পরিবর্ত্তনের ব্যাপারে মন্থর গতিতে কাজ হওয়াই স্বাভাবিক।"

"আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দমননীতি চালাইবার জন্য যে সমস্ত বিশেষ অস্ত্র ধারণ করিলেন, তাহার সহিত এই সম্মিলনে বিজ্ঞাপিত শাসন পরিবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতির কোনই সামঞ্জস্য নাই। ভারতবর্ষ যথার্থ স্বাধীনতা চায়, কেবল স্বাধীনতার ছায়া মাত্র নহে। মুখে তাহা দেওয়ার আশ্বাস প্রদত্ত হইলেও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণের ফলে মনে হয়, ইহা আন্তরিক নহে। সুতরাং প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার মর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, ভারতবর্ষে এখন যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে এবং অর্ডিনান্স জারী হইতেছে, তাহার কথা অবগত হইয়া আমার মনে গুরুতর আশঙ্কা জাগিতেছে। হয়ত কংগ্রেসের পক্ষে আর সহযোগিতা করিবার কোন পথই উন্মুক্ত থাকিবে না।"

আমি মনে প্রাণে কামনা করি, বৃটেনের জনমত এই সম্পর্কে উপযুক্ত পথে আত্মপ্রকাশ করুক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ বাংলা দেশে যাহা ঘটিতেছে, তাহার ন্যায়সঙ্গত প্রকৃত তথ্য ভারতবাসীর দিক হইতে প্রকাশিত হইলে, তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করা যাইবে না।

বৃটিশের প্রতি মহাত্মার বিদায় বাণী

মহাত্মা গান্ধি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জাহাজে উঠিবার সময় রয়টারের বিশেষ প্রতিনিধির নিকট ইংলণ্ডবাসীদের প্রতি নিম্নলিখিত শেষ বিদায় বাণী প্রদান করেন :—

"ভারতে ফিরিতেছি, তাই আমি আনন্দিত ; কিন্তু ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। এখানে আমি বড় সুখে ছিলাম।"

"ভগবানের যদি ইচ্ছা থাকে, আমাকে ইংরাজদের সহিত আবার সংগ্রাম করিতে হয়, তাহা হইলে ইংরাজেরা যেন আমাকে বিশ্বাস করেন। আমি নিশ্চয়ই বিদ্বেষ পরবশ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না। যাঁহারা আমার প্রিয়তম আত্মীয়, তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহে আমাকে যেরূপ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, সেইরূপ ভাবেই আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইব। সুতরাং ভারতের আত্মমর্য্যাদা অব্যাহত রাখিয়া যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করাই আমার সঙ্কল্প।"

"আমি একথা না বলিয়া পারিতেছি না যে,, নূতন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ধারাগুলি আমি যতই পাঠ করিতেছি, ততই আমার মনে আশঙ্কার কারণ প্রবলতর হইতেছে। নরহত্যার উদ্যমকারিকে পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান হইয়াছে। আমার মতে দেওয়ানি অধিকতর মারাত্মক। প্রয়োজন হইলে আমরা কয়েকজন নিরপরাধ লোকের মস্তকদান করিতে পারি ; কিন্তু সমস্ত জাতির মনুষ্যত্ব নাশ করিবার যে ব্যবস্থা, তাহার কথা ভাবিয়া স্থির থাকিতে পারি না। আমি আশা করিতেছি নূতন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বিধানগুলি খুব ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া বৃটিশ তাহা প্রত্যাহারের জন্য জিদ্‌ করিবেন। আমার মতে এরূপ হুকুমনামা জারী করা রাজনৈতিক ক্ষমতার অমানুষিক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নহে।"

ডান্‌স হলের সভায় বেদীর উপর বুদ্ধদেবের ন্যায় উপবেশন করিয়া মহাত্মা গান্ধী দুই হাজার লোকের নিকট তাঁহার অহিংস নীতি বিশ্লেষণ করেন। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক ছিল।

ফ্রান্সবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মাজী বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা আপনাদের কর্ত্তব্য। এই আন্দোলন সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্নোত্তরে মহাত্মাজী বলেন,—পারস্পারিক আলোচনা দ্বারা ভারতীয় সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা থাকে। তবে তিনি কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্‌ডের বক্তৃতায় সুখী হইতে পারেন নাই। স্বাধীনতা পাইতে ভারতবাসীর কত দিন লাগিবে, তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।"

প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী বলেন যে, লণ্ডন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর তাঁহার কিছু বলিবার নাই। লণ্ডন হইতে জেনেভার কাগজগুলিতে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে যদি ভারতবাসীর ইচ্ছা পূরণ না হয়, তবে ভারতবাসিগণ হিংসামূলক পন্থার আশ্রয় লইবে। মহাত্মাজী এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে উহা রোধ করিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের জীবন দানেও প্রস্তুত আছেন।

কমন্‌স সভায় মিঃ ম্যাকডোনাল্‌ডের বিবৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মাজী বলেন যে, কংগ্রেসের মতামত না জানিয়া এই বিষয়ে কোন বিবৃতি দিবেন না। তিনি ভারতের জনসাধারণকে এই উপদেশ দেন, যেন তারা তাড়াতাড়িতে কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া ফেলিয়া তাঁহার বিবৃতি প্রদান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীবীণাপাণি

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ

৫ম বর্ষ	মাঘ—১৩৩৮	১০ম সংখ্যা

অন্তর্যামী

অমলা দেবী

ফিরে ফিরে চেয়ে দেখে কাঙ্গাল নয়ন
যে বসন্ত ফিরে গেছে নিশঃব্দ চরণ
সে যদি ফিরিয়া আসে পুনঃ আর বার।
মুঞ্জরিয়া বনলতা পুষ্পের সম্ভার
সৌরভে আকুল করি ব্যাকুল বনানী
মরণ সুপ্তির মাঝে স্বপ্ন জাগরণী।
চেয়ে দেখি ধূলা ঘরে বিস্মিত নয়নে,
খেলা ঘর রচেছিনু আপনার মনে।
বসন্তের মর্ম্মরিত পুষ্পিত কাননে,
শরতের সুপ্রভাতে, সন্ধ্যার গগনে,
করেছি চয়ন পুষ্প খেলা ঘর তরে
যতনে লয়েছি তুলি আপন আঁচরে।

সারাদিন ভাবি আজ একি সেই আমি!
অথবা স্বপন মম, ওগো অন্তর্যামী?
এই ক্ষীণ দীপ শিখা যদি নিভে যায়।
অন্ধকার ঢাকি নেয় ঘন মমতায়
আপনার বক্ষমাঝে। তবু জানি মনে
তুমি ছিলে মোর হাতে শুভ সন্ধ্যাক্ষণে।
দেবের চরণ প্রান্তে রাখিয়া তোমারে
শুভাশিষ চেয়েছিনু দুটি জোড় করে।
অন্ধকার অমারাতে দিশা হারা প্রাণে
তুমি মোরে দিয়েছিলে পথের সন্ধান।

গল্প

শ্রীবিমলা দেবী

১

—"মা—" পিঠের ওপর একরাশ ঝাঁকড়া, ঝাঁকড়া খোলা চুল ছড়ান, বাঁ হাতের মুঠোয় কাদামাখা কতক-গুলো বকুল্ ফুল, ডান হাতে—জলে-ভেজা কাগজের নৌকা, লীলা ছুটতে—ছুটতে—এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। ভাঁড়ারের দ্বারের সম্মুখে বসে মা কুটনা কুটছিলেন, শ্বশুর-বাড়ী থেকে সদ্য প্রত্যাগতা দিদি, বসে বসে, গল্প করছিলেন ।

লীলা আব্দারের সুরে বল্লে—"আমার ক্ষিদে পেয়েছে মা।"

লীলার কথার সুরে—দিদির কেমন যেন বিরক্তি বোধ হল। মা যেন একলা ওঁরই!—"এই যে খেয়ে গেলি! দেখনা মা কি রকম কাদায় জলে ভিজে ভূত হ'য়ে এল!"

মা—একটু-খানি হাসলেন—"ছেলে মানুষ এখন কি আর বোঝে"—

—"খুব বোঝে, বোঝে আবার না, দশবছর বয়স হ'ল খুকি আছে কিনা। তুমি একটু-ও শাসন কর না—মা।"

লীলা মায়ের কোলে ঘেঁসে বসে দিদির দিকে চেয়ে রইল! মা তার ভিজে চুল গুলো একবার নেড়ে দিলেন—"কি করে ভিজিয়েছিস!"

—"আমি বুঝি ইচ্ছে করে ভিজিয়েছি! ওত আপনি ভিজে গেল।"

—"তা' আর নয়! কই আমাদের ত ভেজেনা। দিন রাত্তির বিষ্টিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াবেন, বোরোলে অখন দেখো না।"

—"আচ্ছা বেশ! কই দিন-রাত্তির বেড়িয়ে বেড়াই! ফুল আনতে তুমিই ত বল্লে, তাইত গেলাম।"

"আমি যেন ওঁকে ভিজতে বলেছিলাম! শুনলে মা মেয়ের কথা।"

দুই বোনের বিবাদ, মা চুপ করে শোনেন, কারুর কথা রই উত্তর দিতে পারেন না; বড়র দিকে বল্লে, ছোটর দুঃখ হয়, ছোটোর দিকে বল্লে, বড় ক্ষুণ্ণ হয়! তবু যেন ছোট-কেই আড়াল করেন, হেসে বলেন—"আহা করুক, করুক, কদিনই বা ছুটো-ছুটী করতে পাবে? তোরা কি আর করতে পাস?"

বড় রাগ করে চুপ করে থাকে, মনে মনে বলে —"ভালর জন্যই বলি, নইলে আমার আর কি; আমিত দুদিন পরেই চলে যাব।'

মনে হয় তাকে মা এমন করে আড়াল করতেন না, লীলা ছোট মেয়ে কিনা, আদুরী! লীলা এদিক-ওদিক চায়, তার পর হঠাৎ এক সময় উঠে, নৌকা প্রস্তুত কল্লে নূতন কাগজের সন্ধানে ছুটে যায়।

২

হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল; সারা বাড়ীর বুকের উপর অন্ধকারের স্তব্ধতা ছেয়ে গেছে! প্রতিবেশিনিরা এসে, লীলাকে বুকে টেনে নেয়—"মা,তোমার স্বর্গে গেছেন বাছা, চুপ কর—কাঁদতে নেই।"

লীলা সান্ত্বনা মানে না, কোথায় যে, কেমন স্বর্গ, লালা তা জানেনা। ব্যাকুল প্রশ্ন মনের মাঝে বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে মরে; আর কি আসবেন না? তবে সে কাকে মা বলে ডাকবে।

একটা ঝড়ে দশ বৎসরের লীলা যেন অনেক বড় হয়ে গেল! অন্ধকার রাত্রে, মেঘের গর্জ্জনে এখনও তার ভয় করে, তবু সে জানে, ভয় তার করতে নেই!

পিসিমা রাগ করে বলেন—"নে বাপু এইত দুপা যাবি, কে তোর সঙ্গে যাবে; ঐত কুলুঙ্গিতে রয়েছে, যা' নিয়ে আয়।" দিদি নিজের কোলের খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, বল্লেন—"সবই ওর বাড়াবাড়ি,

বিয়ে দিলে সাত ছেলের মা হ'ত ; আমরা ও বয়সে কত কাজ করেছি।"

কাজ করতে কি লীলা আপত্তি করেছে, অন্ধকারেই যে ওর যত অপত্তি। চোখের কোলে জল আসে, মায়ের কথা মনে পড়ে, মা থাকলে,—ভাবে না আর—উঠে যায়।

—"এ নিশ্চয় লীলার কাজ; এমন ডোকলা মেয়ে যদি ভূ-ভারতে আর আছে, খোকার পেনীটাতে কি করেই কালী ফেলেছে, দেখ পিসিমা! মাগো—মা কোন কাজের কি ছিরি আছে, শ্বশুর বাড়ী গেলে ঝাঁটা মেরে অমন বৌ বিদেয় করে দেবে।"

লীলা অপরাধীর মত মুখ করে রোয়াকে দাঁড়িয়ে থাকে।

—"আহা কি ছিরিই হয়েছে! ও মা কি ঘেন্না! বুড়ো মেয়ে চুল বাঁধতেও জানে না! লীলার চোখে জল আসে, ফিতে কাঁটা তুলে নিয়ে উঠে যায়; মায়ের কথা আবার মনে পড়ে; মা-ই যে বেঁধে দিয়েছেন, লীলা কি জানে!

দিদি রাগ করেন—"অমনি মেয়ের রাগ হল! একটা যদি ভাল কথা বলবার যো আছে; আমার কিরে বাপু, তোরই ভালর জন্যে বলি, সাতকাল ধরে কে তোর চুল বেঁধে দেবে? আজ না হয় আমি দিলাম। খোকা কাঁদছে জোট ছাড়িয়ে আয় দিচ্ছি বেঁধে!" লীলা আসে না, বলে 'থাক'।

৩

—"মা—ওমা, দাওনা বেঁধে ফিতেটা, আমি বুঝি পারি।"

—"পারিসনে!" লীলা হেসে মুখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে চাইল।

সন্ধ্যা বেলায়, অফিস প্রত্যাগত স্বামী, চেয়ারে বসে চা পান সমাপ্ত করে, সবে একটা চুরুট ধরিয়ে-ছিলেন; লীলা পাশে বসে, খোকার জামার ঝুল তুলছিল, বড় মেয়ে শান্তি মাথায় বাঁধা ফিতের বিপর্য্যয় ঘটিয়ে লীলার কাছে এসে দাঁড়াল। ফিতেটা আবার বেঁধেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল। শ্রাবণের কাজল আকাশ, সজল গাছ পালা, সিক্তা ধরণী, ভিজে মাটীর গন্ধের সঙ্গে, কি একটা আজনা ফুলের মৃদু সৌরভ ভেসে আসছিল। শান্তি বিপুল উৎসাহে ছুটো-ছুটী করছিল, সঙ্গে তার ক্ষেন্তি, রাণী, দুর্গা, মণ্টু, ভোঁদা। লীলা চুপ করে সেইদিকে অন্যমনে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন তার দুই চোখে জল ভরে উঠল।

স্বামী আস্তে, আস্তে, উঠে এলেন, লীলার কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে, বিস্মিত ভাবে, মৃদু সুরে বল্লেন—"কি হয়েছে!"

লীলা চমকে উঠল, অপ্রতিভ ভাবে একটুখানি হাসলে, চোখের কোণে তখনও দুই বিন্দু অশ্রু টল টল করছিল, কাঁধের ওপর থেকে স্বামীর হাতখানা নিজের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

লীলার মাথাটি নিজের দিকে টেনে নিয়ে, স্নিগ্ধ সুরে স্বামী বল্লেন—"পাগল!"

"মানুষের সৃষ্টি আমি—বিধাতার নই"—

কবিতা

শ্রীবিমল মিত্র।

নিশীথের স্তব্ধতায় অনুভবি আপনার অশ্রান্ত-ক্রন্দন!
আমার অন্তর হ'তে ছিঁড়ে গেছে সুন্দরের অনন্ত বন্ধন!
আমার প্রাণের পুষ্পে আপনারি ধ্বংস বীজ—মৃত্যুর কলুষ!
উন্মত্ত লালসা সাথে ফেলিল সুরায় আজ পূর্ণ যে গণ্ডুষ!
কুটীরের সারা বক্ষ ব্যাপি'
আমার নিশ্বাস-তপ্ত-আঁধারের পঙ্ক মাঝে দীর্ঘ রাত্রি যাপি!
হেথায় নাবে না দিবা; রাত্রি রহে যাত্রা-সাথী জীবনের পথে;—
পঙ্কিল সাগর আজি আমারে ভাসায়ে নেছে কামনার স্রোতে!

পৃথিবীর সর্ব্ব অভিশাপ
আমারে ঘেরিয়া শুধু বসিয়াছে অহর্নিশ মিথ্যা, গ্লানি, পাপ!
আমারে দিল না সুধা নিখিলের পরিপূর্ণ অনন্ত বৈভব—
তাই মোর রিক্ত বক্ষে ভরিয়াছি দুই হস্তে কলুষ-গৌরব!
আমারে করিও ঘৃণা—কলঙ্কের কুণ্ডে আমি পূর্ণ মজ্জমান—
পৃথিবীর হলাহল হৃষ্ট-চিত্তে আকণ্ঠ যে করিয়াছি পান!
সৃজনের প্রতিশোধ লই;—
বিধাতার সৃষ্টি আমি?—কে বলেছে মানুষের নই?

ধর্ম্ম ও ভক্তি

শ্রীলতিকা ঘোষ

প্রবন্ধ

আমার মনে হয়, ধর্ম্ম ও ভক্তি মানুষের অন্তরের জিনিষ, বাইরে থেকে এ দুটী ভাবের প্রভাব কার উপর কিরূপ তা সঠিক বলা শক্ত কাজ।

ধর্ম্মজ্ঞান যার অন্তরে যত বেশী ভক্তি ভাবও তার তত প্রবল আমার বিশ্বাস। কারণ ও দুটী মহৎ ভাব পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল।

তাই অন্তরে ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রাবল্য নেই অথচ নিজেকে পরম ভক্ত বলে মনে করা কিম্বা মনে ভক্তি নেই তবু সাড়ম্বরে আপনাকে পরম ধার্ম্মিক বলে লোকের কাছে প্রতিপন্ন করা অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞানতা বলে মনে হয়।

যে যথার্থ ভক্ত সে নিজেকে ভক্ত বলে প্রচার করতে চায় না, নীরবে নির্জ্জনে প্রাণের দেবতাকে প্রাণের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে তৃপ্ত হয়। এবং তাঁর চরণে একান্তে বিশ্বাস রেখে দিনের পর দিন সুখে হোক দুঃখে হোক ধীর ভাবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করে যায়।

সে যে ভক্তিমান তা তার ধর্ম্মপরায়ণ শান্ত সুমিষ্ট কথাও ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারা যায়।

যে ধার্ম্মিক সে কখনো অন্যায় অধর্ম্মের ছায়া স্পর্শ করতে ইচ্ছা করেনা, সর্ব্ব সময়ে কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিয়োজিত রাখলেও ধর্ম্মপ্রাণতা তার প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। কারণ আপনার কার্য্যদ্বারা সে কোনদিন কাহাকে আঘাত দিতে চায় না। কারো ক্ষতি করতে ইচ্ছা করে না। কাহাকে হিংসা করে না এবং কোনো প্রকার অন্যায় কাজ করতে উৎসাহিত হয় না সেইত পরম ধার্ম্মিক, পরম ভক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। নতুবা মন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হিংসুক অথচ বাইরে পূজা-পার্ব্বণের বৃহৎ আড়ম্বর করলে ও মুখে নানা রূপ বড় বড় কথা, ধর্ম্ম উপদেশ আওড়ালেই যে পরম ধর্ম্মপরায়ণ বা অতি ভক্ত হওয়া যায়, একথা আমার সত্য বলে মনে হয় না। অবশ্য মনের হীনতা পরিহার করবার জন্য পূজা-অর্চনায় মন দেওয়া, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এসব খুবই ভাল। এ থেকে মনকে উন্নত করবার উপাদান ও সৎ ইচ্ছা লাভ করা যায়। ভক্তি অন্তরের জিনিষ; অন্তর থেকে সে তার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে, আর ধর্ম্ম জ্ঞান তারই পুণ্যালোকের সাহায্য নিয়ে মানুষকে সত্য শিব ও সুন্দরের উপাসনা করতে শেখায়, মুক্তির পথে পরিচালিত করে। তাই ব্যবহারের মধ্যে তার প্রকাশ, কে কেমন ভক্ত ও কিরূপ ধার্ম্মিক তা তার চাল-চলন কথা-বার্ত্তা সকলের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই জানতে পারা যায়।

শুধু নিজ নিজ ধর্ম্মের গোঁড়ামী করলে বা কথায় কথায় কোন সংস্কারাদির নামে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে গেল ধর্ম্ম, গেল মান, বলে চীৎকার করলেই যে প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া যায় একথা বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয় না। আমি ধর্ম্ম ও ভক্তিকে যে রূপ অভিন্ন ভাবে দেখি, ও যেরূপে মানুষের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রকাশ অনুভব করি তা পূর্ব্বে বলেছি।

রাগ দ্বেষ অত্যুগ্র কামনা যে জয় করতে পারে, সকলের সঙ্গে যে সুমিষ্ট কথা বলতে, স্নিগ্ধ ব্যবহার করতে পারে এবং মিথ্যাকে ঘৃণা ও প্রলোভনকে জয় করতে পারে, আমার মনে হয় সেই ব্যক্তি যথার্থ ভক্ত ও ধার্ম্মিক হতে পারে। অবশ্য নিজ ধর্ম্মে আস্থাবান হওয়া ও পূজা-অর্চ্চনা করা খুব ভাল কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু মাত্র তাতেই যে সত্যকার ভক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া যায় না, ধার্ম্মিক ও ভক্ত হতে হলে অন্তরে যথার্থ ভক্তির সাহায্য উপলব্ধি করতে

হয়, চিত্তকে উদার মহৎ করতে হয় একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। বরং বাহিরে খুব আড়ম্বর দেখিয়ে পূজা-তীর্থযাত্রা ইত্যাদি না করে নিভৃতে অন্তর দেবতাকে প্রাণের ভক্তি নিবেদন করতে পারলে অনুরাগী ভক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তবু ধর্ম্ম-কর্ম্ম পূজা ইত্যাদির অবসরে তুচ্ছ বিষয়-আশয় লিপ্ত থাকার দরুণ অপরকে পীড়ন বা লোকের সঙ্গে নিষ্করুণ ব্যবহার মিথ্যাভাষন প্রভৃতির মধ্যে জড়িত থাকতে ইচ্ছা করলে যথার্থ ভক্ত হওয়া সহজ নয়। ভক্তি যার প্রাণে আপনার প্রভাব বিস্তার করতে একবার সমর্থ হয় মিথ্যা লোভ হিংসা ঘৃণা কি আর তার চিত্তকে স্পর্শ করতে সাহস পায়?

ধর্ম্মের বিষয় অতিরিক্ত গোঁড়ামী করে তাকে পঙ্গু না করে নিজ নিজ ধর্ম্মের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে পারলে, অনুতপ্ত পতিতকে স্বধর্ম্মের আশ্রয় দিয়ে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করলে নিশ্চয় প্রকৃত ধর্ম্ম ও ভক্তি প্রাণ হওয়া যায়।

প্রত্যেক মহাভক্ত যুগমানবগণ যুগে যুগে এইরূপ ভাবেই ধর্ম্মের প্রচার, জ্ঞানের উদ্বোধন ও ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গেছেন। তাঁরা কেহই আপনাদের ধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধকরে রাখেন নি, এবং মাত্র কোশাকুশি ও জপমালার মধ্যেই ভক্তিকে নিবদ্ধ করে রাখেন নি। সাড়ম্বরে পূজা-অর্চ্চনা তাঁরা কেহই বোধহয় কোনোদিন করেন নি, নীরবে নিভৃতে প্রাণের দেবতাকে আরাধনা করেছিলেন ও ধর্ম্মের প্রচার করতে অত্যন্ত সাধারণভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেছিলেন, এইরূপে তাঁরা সাধনায় যে অপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছিলেন, ক'জন তা পারে? নিত্য পূজা করা অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও যারা মনের মালিন্য দূর করতে সমর্থ হয়না, তারা কি ঐসকল মহাসাধকের সাধন-শক্তির কণামাত্রও লাভ করতে পারে? পূজার্চ্চনা ভক্তিপথের সহায়, কিন্তু মানুষের নির্ম্মল হৃদয় ভক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

মন্দির যেখানে পবিত্র ও বিগ্রহলাভের জন্য ব্যাকুল, দেবতার সেখানে প্রবেশ না করে দূরে থাকা সম্ভব নয়। ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে ভগবান চির বিরাজিত।

এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বাহ্যদৃশ্যে আত্মহারা হওয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য নয়! যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে ভক্তি আর যেখানে ভক্তি সেইখানেই ভগবান একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

কাঁটা কিম্বা ফুল

কবিতা

—শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

কুসুমের পথ বাহি' চলিতে চলিতে
বার বার হয় পথ ভুল,
ফুলের শাখাতে কাঁটা চাহে যে ছলিতে
পলে পলে বিঁধে যে আঙুল!
কণ্টক আসন পাতে কুসুমের পাশে,
কুসুম চাহিতে কাঁটা আপনি সে আসে।
কেতকী কানন-পথে তবু ছুটে চলি,
বকুল সে-পথে হায় ঝরে!
কাঁটার কাননে রহে যে-কুসুমকলি
তারে চাহি' চলি আশা ভরে।
গোলাপ ঝরিয়া যায়—রাখিয়া কণ্টক,
তৃষ্ণায় গুমরি' মরে চিত্তের চাতক!

বার বার পথ ভুল,—শুধু যাওয়া-আসা!
কণ্টকিত ক্ষত বুক ল'য়ে,
মিলাইয়া যায় যত মুকুলিত আশা
ব্যর্থতার হাহাকার ব'য়ে।
আশা যদি ঘুচে যায় থাকুক শূন্যতা,
চাহিনাক' বঞ্চনার ছল চপলতা।
পথে মোর ফুল যদি ফুটাওগো কভু,
কণ্টকেতে ভরাওনা তারে!
ফুল যদি না ফুটাও—কাঁটা দাও, তবু
কাঁটা-ফুল নহে একবারে।
হয় ফুল পথ মোর গন্ধে দিবে ভরি,'
নহে কাঁটা বিদ্ধ্য তারে রহিবে আবরি'।

সংশোধন

গল্প

শ্রীহৃদয় রঞ্জন ঘোষাল, বি-এ, বি-টি

মথুরাকান্ত যে বিষয়-সম্পত্তি, কোম্পানির কাগজ ও নগদ টাকার সংস্থান করিয়াছেন তাহাতে বুঝিয়া চলিলে একটা ছোট-খাট সংসার চাকরী না করিয়াও বেশ সচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিত।

কিন্তু ইদানীং মথুরাকান্ত স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার বংশ-রক্ষার প্রমাণ তৃতীয় পক্ষের এক মাত্র পুত্র শ্রীমান যজ্ঞেশ্বর গোটাকতক পাশ করিয়া মুন্সেফী অথবা অন্ততঃ পক্ষে "রেজেষ্টারী হাকিমীতে" বহাল হইবে।

তাঁহার ওই স্বপ্ন জাল ছিন্ন হইল, যেদিন সুলতানপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উমেশবাবু বলিয়া গেলেন, যে টেষ্ট পরীক্ষায় যজ্ঞেশ্বর কোনও বিষয়ে পাশ করিতে পারে নাই; অপিচ, ইংরাজী সাহিত্যের প্রশ্নোত্তর পত্রে প্রাচ্য শিল্পকলার অনুকরণে বাবা-জীবন যে সমস্ত অপূর্ব্ব চিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যত হাকিমের সুরুচির পরিচায়ক নহে।

কিন্তু মথুরাকান্ত হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুত্রকে কাছে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন;—ফেল হওয়াটা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মানুষের জীবনে জোয়ার-ভাটা আছেই। পরাজয়ের গ্লানিতে অভিভূত হওয়াটাই কাপুরুষের লক্ষণ। স্কটল্যাণ্ডের রাজা "ব্রুস ও মাকসার জালের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। পুনরায় চেষ্টা কর"

যজ্ঞেশ্বরের পিসি সবেমাত্র জপে বসিয়া ছিলেন। আসন ছাড়িয়া ওঠা শাস্ত্রে লেখা না-থাকায় সেখান হইতেই ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "এশুধু মুখপোড়া মাষ্টারদের পয়সা নেবার ফিকির। তুই বাবা, কারো কথা শুনিস্নি। এক্ষুনি ওপরে রেপর্ট করে দে দেখিন্"। বলা বাহুল্য, তাঁহার এক ভাশুর পো আবগারীর দারোগা ছিল, ওই 'পয়সা নেবার ফিকিরে' নাকি বেচারার চাকরী যায়।

কিন্তু কি ভাবিয়া ঠিক জানিনা, মথুরাকান্ত 'রেপোর্ট' করার হাঙ্গামায় না গিয়া সোজা স্কুলে গিয়া হাজির হইলেন, এবং আফিস হইতে লিথো মেসিনে ছাপা ফুলস্কেপ কাগজের দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী নূতন পুস্তকের ফর্দ্দখানি সংগ্রহ করিয়া সেইদিনই কলিকাতার "দি ন্যাশন্যাল অরোরা পাবলিশিং সিণ্ডিকেট"এর ম্যানেজারের নামে বরাবর পাঠাইয়া দিলেন। অগ্রিম টাকাও কিছু মণি অর্ডারে পাঠাইতে ভুলিলেন না।

এদিকে যাহার বিশ্ব বিদ্যামন্দিরে প্রবেশপত্র লাভের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য বৃদ্ধ মথুরাকান্তের উৎসাহের অন্ত ছিল না, সেই যজ্ঞেশ্বরের কিন্তু ওদিকে কোন খেয়ালই ছিল না।

লেখাপড়ার দিকে মন দিবার অবসর তাহার খুবই কম।

আজকাল নানান কাজে তাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

সুরেন বাগ্দী খবর দিয়া গিয়াছে—রাখাল ঢালীর বাতশ্লেষ্মা জ্বর। রাখালের কাছ হইতে যজ্ঞেশ্বর লাঠিখেলার গোটাকতক শক্ত প্যাঁচ শিখিয়াছে।

তাহাকে রোজ একবার দেখিতে যাইতে হয়। জমিদারের পেয়াদা আসিয়া হরি ঠাকুর্দ্দার গরু ক্রোক করিয়া লইয়া গিয়াছে।

এবার রঘুবীর এ গ্রামে ঢুকিলে তাহাকে যেন খবরটা দেওয়া হয়, একথা সুরেনকে বিশেষ করিয়া বলা দরকার।

তাছাড়া, স্কুলে যাইবার পথে যজ্ঞেশ্বরের নিত্য নূতন বিপদ আসিয়া জোটে।

বেহারী ডোমের মা এখন আর চোখে ভাল দেখিতে পায় না! সেদিন বড় পুকুরের ধারে কলমী শাক তুলিতে গিয়া বুড়ী পড়িয়া গিয়া আর উঠিতে পারে নাই যজ্ঞেশ্বর তাহাকে তুলিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দেয়।

পথে যাইতে যাইতে বুড়ী কাঁদিয়া বলে, "মা যখন ছিলেন তখন একখানা কাপড় পুজোর সময় পেতুম ; আর এক মুঠো চাল চাইলে দাদা তোমার পিসি ব্যাজার হন।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্নেহময়ী মায়ের মুখ চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিয়া দৃষ্টিটাকে ঝাপসা করিয়া তোলে।

পাছে বেহারীর মা দেখিতে পায় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি জামার হাতায় চোখের জল লুকাইয়া ফেলিতে হয়।

স্কুলে যাওয়া আর সেদিন হয় না, বাড়ী ফিরিতে হয়।

তারপর, বিকাল বেলা ধোবার বাড়ী কাপড় দিতে গিয়া একজোড়া আন্‌কোরা নূতন থান পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া গৃহকর্ত্রী নিস্তারিণী বাড়ী মাথায় করিয়া তোলেন।

মালতী ঝি আসিয়া সভয়ে জানায় যে দাদাবাবু ঐ কাপড় জোড়া বেহারীর মাকে দিয়া আসিয়াছে।

নিস্তারিণী প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাড়ী ফিরিলে আর তাহাকে আস্ত রাখিবেন না।

সন্ধ্যাবেলায় খিড়কী দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিয়া যজ্ঞেশ্বর হাঁকিল,—"পিসি! ক্ষিদে পেয়েছে। শীগগির কিছু দাও।"

নিস্তারিণী রণমূর্ত্তিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "বেরো বাড়ী থেকে লক্ষ্মীছাড়া! এখন রাজ্যি জয় কোরে এলেন, ওঁকে খেতে দাও! কোন্ আক্কেলে তুই হতভাগা নোতুন কাপড় জোড়া বশী-ডোম্‌নীকে দিয়ে এলি?"

যজ্ঞেশ্বর একেবারে ক্ষেপিয়া ওঠে,—"ওঃ! ভারি যে রোখ্! বেশ করেছি, দিয়েছি। এবার থেকে যেন নিজের পয়সায় কাপড় কেনা হয়।"

নিস্তারিণী নিরুপায় হইয়া কাঁদিয়া ওঠেন।

যজ্ঞেশ্বর আর সেখানে দাঁড়ায় না। দুমদাম্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

এইরূপ একটা না একটা রোজই ঘটে।

মথুরাকান্ত ভাবিলেন, একজন প্রাইভেট মাষ্টার রাখিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।

স্কুলের থার্ড মাষ্টার রতিকান্ত শীল বেশ চালাক চতুর লোক, তাঁহাকে বলিয়া দেখিলে হয়।

অবশেষে ইহা স্থির হইল যে, যজ্ঞেশ্বর রতিকান্তের বাসায় গিয়া পড়িয়া আসিবে।

দিন দুই চারি পরে যজ্ঞেশ্বর আসিয়া বলিল, "মাষ্টার মশায়ের মাহিনা এমাসে আগাম দিতে হইবে।"

মথুরাকান্ত বাক্স হইতে দশ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া যজ্ঞেশ্বরের হাতে দিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "দশ টাকায় কি হইবে!"

মথুরাকান্ত অবাক হইয়া বলিলেন, "সে কি!

"মাসে ত দশটাকা করিয়া দিবার কথা হইয়াছিল।"

"যজ্ঞেশ্বর বলে, "মাষ্টার মশায়ের ছেলে-পিলের অসুখ,—দেশে টাকা পাঠাইতে হইবে। কিছু বেশী দেওয়া ভাল।"

মথুরাকান্ত দ্বিরুক্তি না করিয়া আরও পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

পুত্রের লেখাপড়ার দিকে আগ্রহ দেখিয়া তিনি এতই খুসী হইয়াছিলেন যে এই অতিরিক্ত ব্যয়টা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না।

দুই

এইরূপে মাসখানেক গেল। ইতিমধ্যে একদিন টিফিনের ঘণ্টা হইলে স্কুলের মালীর ঘরে গিয়া যজ্ঞেশ্বর শুনিল, যে বেহারী ডোমের মা গত রাত্রে মারা গিয়াছে। এখনও সৎকার করা হয় নাই। পাড়ার সর্দ্দার বাঁশীডোম সকলকে লইয়া একটা দল পাকাইয়াছে যে "পেরাচিত্তির" না হইলে বুড়িকে কেহ ছুঁইবে না। তা ছাড়া দুবোতল মদ যা এ সব কাজে বরাদ্দ আছে তাহা কে দিবে?

যজ্ঞেশ্বর আর অপেক্ষা না করিয়া সোজা স্কুলের গেটের কাছে চলিয়া আসিয়া বাহিরে যাইতে চাহিল।

দরোয়ান অযোধ্যাপ্রসাদ বাধা দিয়া বলিল, বড়বাবুর হুকুম নেই।

অদূরে নীচের ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেরা মার্কেল খেলিতেছিল। হঠাৎ তাহারা খেলা ফেলিয়া গেটের দিকে ছুটিল।

যাহারা রেলিং এর ফাঁকে হাত বাড়াইয়া রাস্তার

পার্শ্বে উপবিষ্ট চানাচুরওয়ালার নিকট হইতে অবাক জলপান, চিনাবাদাম ও সাড়ে বত্রিশ ভাজা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিল, তাহারাও অনেকে ফটকের কাছে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

ভাবটা এই যে যজ্ঞেশ্বরের সহিত তাহারাও একটা ভোঁ দৌড় দিয়া ভজার দোকান হইতে আমসত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লইবে। গেট খোলা সম্বন্ধে তাহাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

তাহারা জানিত যে কোনও অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করিয়া তোলা যোগে'দার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নহে।

খেলার মাঠে, সাইকেল রেসে, সাঁতারে মারামারি ইত্যাদি ছোট বড় বহু বিষয়ে যজ্ঞেশ্বর তাহাদের এই পরম বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিতে পারিয়াছে।

যজ্ঞেশ্বর গম্ভীর স্বরে বলিল, "তেওয়ারী গেট খুলে দাও।"

তেওয়ারী জানিত জোর করিয়া এ বাবুকে হাঁকাইয়া দিবার দুশ্চেষ্টার ফল শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে।

সে সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া জানাইল যে সে নোকর আদমী। তাহার নিজের কোনও আপত্তি নাই; লেকিন্ জানে কা হুকুম নেহি।

যজ্ঞেশ্বরের মুখ-চোখ ইতিমধ্যেই লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে দৃঢ় পদ বিক্ষেপে তেওয়ারির নিকট আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "চাবি নিকালো উল্লু!"

"বাবুজী গালি মৎ—"

"চোপরও!" বলিয়া যজ্ঞেশ্বর গর্জ্জিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দেখা গেল, তেওয়ারীর বিরাট দেহ গেটের পার্শ্বে মাধবীলতার ঝোপের তলে আশ্রয় লইয়াছে। আর যজ্ঞেশ্বর বালকদের অভিনব আনন্দ কোলাহলের মধ্যে রেলিং টপকাইয়া ঘোষ বাবুদের বাড়ীর মোড় ঘুরিয়া চকের রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তিন

যে সময়ে যজ্ঞেশ্বর তেওয়ারির সহিত শেষ একটা বোঝাপড়ায় ব্যস্ত ছিল, ওদিকে তখন প্রধান শিক্ষকের ঘরে মাষ্টার বাবুদের বিষম তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল।

থার্ড মাষ্টার রতিকান্তবাবু ভয়ানক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আপনি যদি ইহার কোনও step না নেন, তবে আমি পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হইব। মথুর বাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে পারিনা।" হেড্ মাষ্টার উমেশ বাবু বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিলেন,—"দেখুন রতিবাবু, আমার যা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তবে আপনার যদি একান্তই সন্দেহ হয় এবং মথুর বাবুর কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে পুলিশে খবর দিতে পারেন।"

এমন সময়ে তেওয়ারি আসিয়া সুদীর্ঘ এক সেলাম করিয়া বলিল, যে সে আর চাকরী করিবে না। টিফিনের সময় গেট খুলিয়া না দেওয়ায় জগুবাবু—যজ্ঞেশ্বরকে সে এই নামেই ডাকে—তাহাকে মারপিট করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এবং গেট ডাঙিয়া পলাইয়াছে। আবার যাইবার সময় শাসাইয়া গিয়াছে যে তাহার জান খাইয়া লইবে। দেশে তাহার আওরাত আছে, দুইটি লেড়কাভি আছে। তাহাদের কে দেখিবে? সে ছুটি চাহে।

রতিকান্ত বাবু চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন, "দেখুন স্যার! এ নিশ্চয়ই যজ্ঞেশ্বরের কাজ। ঘড়ি যজ্ঞেশ্বরের কাছেই ছিল। এখনি কোথাও সরাইয়া ফেলিবে, নচেৎ যজ্ঞেশ্বর এমন চোরের মত আজ পলাইবে কেন?" তারপর কোনও প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই রতিবাবু সশব্যস্তে তেওয়ারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যজ্ঞেশ্বরের হাতে কোনও 'চিজ' সে দেখিয়াছে কিনা!

তেওয়ারি পূর্ব্বের ব্যাপার কিছুই জানিত না। মাষ্টার বাবুর কথার ভাবে সে মাত্র একটুকু বুঝিল যে ইতিপূর্ব্বে এমন একটা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে যাহার নায়ক ওই ডাকুর সর্দার জগুবাবু।

সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হাঁ সে তো হাম্ দেখিয়েসে।"

"এ্যাঁ! দেখেছিস? সোনার ঘড়ি—লাল ফিতে বাঁধা?"

"জি হাঁ! হল্লার সময় জগুবাবুর পাকিট্‌সে গিরপড়া ফিন ও লেকে ভাগা।"

ব্যস! রতিকান্ত আর দাঁড়াইলেন না, একেবারে থানায় গিয়া হাজির হইলেন।

থানার ছোটবাবু তখন আফিস ঘরে বসিয়া কাজ-কর্ম্ম করিতেছিলেন। রতিকান্তকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "আরে মাষ্টার যে, কি খবর? এমন অসময়ে কোনও—"

রতিবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "আমার সোনার ঘড়িটা চুরি গিয়াছে, আজ সকালে—"

"চাকর বেটাকে বেশ করে ঘু'ষা দিলেই এখনি বার ক'রে দিতে পথ পাবেনা……ওর জন্ম কোনও চিন্তা নাই।" ছোটবাবু এই বলিয়া ফাইলে মনোনিবেশ করিলেন।

রতিকান্ত হতাশ হইয়া পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "চাকর চুরি করে নাই। আমার বাসা এখন একেবারে খালি। আমার স্ত্রীর আবার হয়ে কিনা—এই মাসেই হ'বার সম্ভব। তিনি পুরুলিয়ায় বাপের ওখানে আছেন। চাকর তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। বড় ছেলেটি বড় দুরন্ত, গিরিধারীই তাহাকে সাম্‌লাইতে পারে। যজ্ঞেশ্বর চুরি করিয়াছে।

"যজ্ঞেশ্বর? সে বেটা আবার কে?"

রতিকান্ত একটু কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "সমস্ত ঘটনা না বলিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন না, তবে শুনুন;—যজ্ঞেশ্বর আমাদের স্কুলে পড়ে। সে মজুমদার পাড়ার মথুরাকান্ত বাবুর ছেলে। মথুর বাবু পূর্ব্বে জজ কোর্টের নাজীর ছিলেন, এখন ইন্‌ভ্যালিড পেন্‌সন্‌ লইয়া দেশে আসিয়া সায়েন্টিফিক্‌ এগ্রিকলচার করিবার মনস্থ করিয়াছেন। মথুর বাবুর অনুরোধে আমি আজ এক মাসের কিছু উপর যজ্ঞেশ্বরকে পড়াইতেছি। পড়ার নামে অষ্টরম্ভা, এমন দুর্দ্দান্ত ছেলের জুড়ি মেলা ভার। সে যাহা হউক, সুবিধার মধ্যে যজ্ঞেশ্বর আমার বাসায় আসিয়া পড়িয়া যায়। আজ সকালেও আসিয়াছিল। আমার সোনার ঘড়ি—খাসারহাম, বিয়ের সময় যৌতুক পাওয়া—টেবিলের উপরেই থাকে। রোজ সকালে যজ্ঞেশ্বরই ঘড়িতে দম দেয়, আজ সকালে তাহাকে ঘড়িতে দম দিতে দেখিয়াছি।

দশটার সময় স্কুলে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া অভ্যাস মত টেবিলের উপর হইতে ঘড়ি লইতে গিয়া পাইলাম না। তারপর বিস্তর খোঁজা-খুঁজি করিলাম। বাক্স-তোরঙ্গ বিছানা সব তছনছ করিয়া ফেলিলাম। চালের জালা, তেঁতুলের কলসী, আচারের শিশি, বড়ির হাঁড়ী, গৃহিণীর নিজের হাতের লেবেল মারা নানান রকম মসলার কৌটাও বাদ পড়িল না।

স্কুলে যখন আসিলাম তখন দুইটা ক্লাস হইয়া গিয়াছে, তৃতীয় ঘণ্টা পড়িয়াছে। প্রথমেই আমি যজ্ঞেশ্বরকে বাহিরে ডাকাইয়া আনিয়া ঘড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে হাঁ, না, কিছুই বলিল না। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে ক্লাসের ভিতর চলিয়া গেল।

টিফিনের সময় আমি হেডমাষ্টার মহাশয়কে সব কথা বলিতেছি, এমন সময় স্কুলের দারোয়ান অযোধ্যাপ্রসাদ আসিয়া বলিল যে জগুবাবু তাহাকে ঘুসি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া ফটক টপকাইয়া পলাইয়াছে। আবার—"

ছোটবাবু এতক্ষণ টেবিলের উপর কনুইএর ভর দিয়া দুই হাতে কপাল টিপিয়া নিমীলিত নেত্রে শুনিতেছিলেন, হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন, ঠিক বুঝিলাম না, যজ্ঞেশ্বর দারোয়ানকে ঘুসি মারিল কেন।"

রতিকান্ত উত্তর দিল, "সেই কথাই বলিতেছি। টিফিনের সময় এখন আর ছেলেদের বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে হেডমাষ্টার মহাশয়ের বড় কড়াকড়ি। যজ্ঞেশ্বর আজ জোর করিয়া বাহিরে যাইতে চাহিলে দারোয়ান বাধা দেয়। দারোয়ানের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় যজ্ঞেশ্বরের পকেট হইতে আমার হারাণো ঘড়িটা পড়িয়া যায়। দারোয়ান স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছে। পরে দারোয়ানকে ফেলিয়া দিয়া সে ঘড়ি লইয়া চম্পট দিয়াছে।"

ছোটবাবু আরও দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিবার

পর ডায়েরী করিয়া লইলেন। পরে ঈষৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেটার হয়ত শাস্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু পুলিশ এখন এর Cognisance নিয়েছে, অন্য কোনও উপায় আর নাই।"

চার

মকর্দ্দমার দিন তেওয়ারী হলপ লইয়া এজাহার দিল যে সে যজ্ঞেশ্বরের পকেট হইতে সোনার ঘড়ি পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছে।

পাছে তেওয়ারী শেষ পর্য্যন্ত গোলমাল করিয়া ফেলে, এই ভয়ে রতিকান্ত পণ্ডিত মহাশয়কেও সাক্ষ্য মানিয়াছিল।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "যেদিন পুলিশ যজ্ঞেশ্বরকে ধরে তাহার পরদিন সন্ধ্যায় তেওয়ারি আমার বাসায় দুধ দিতে আসিয়া বলিল যে সে পুলিশের কাছে ঠিক কথা বলিয়াছে বটে কিন্তু আদালতে সে বলিবে যে ঘটনার দিন যজ্ঞেশ্বরের পকেটে ঘড়ি ছিল না। নচেৎ জগুবাবুর জেল হইবে। যজ্ঞেশ্বরের পিতা নাকি তেওয়ারির হাত ধরিয়া বিস্তর কাঁদিয়াছে। আমি বলিলাম,—খবর্দ্দার বেটা! মিথ্যা সাক্ষ্য দিস্ না। এরূপ অধর্ম্ম আর নাই। লক্ষ বৎসর কুম্ভীপাক নরকে পচিতে হইবে।"

আসামীর কাঠগড়ায় উপবিষ্ট যজ্ঞেশ্বরকে, হাকিম অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিলেন যে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

কিন্তু গ্রেপ্তারের দিন হইতে সেই যে যজ্ঞেশ্বর গুম্ হইয়া গিয়াছিল, কোনও মতেই তাহার মুখ হইতে আর একটি কথাও বাহির করা যায় নাই।

অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসা করার পর যজ্ঞেশ্বর একবার তীব্র দৃষ্টিতে বিচারকের মুখের দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই মুখ নত করিল।

যজ্ঞেশ্বরের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া গেল। কিন্তু বিচারক আসামীর বয়স অল্প বলিয়া, সংশোধনের জন্য কোনও রিফর্মেটরি স্কুলে প্রেরণের হুকুম দিলেন।

পাঁচ

যজ্ঞেশ্বরের মকর্দ্দমা শেষ হইবার কিছুদিন পর সুলতানপুরের সাব ডিবিসনাল অফিসরের নামে এ[ক] রেজেষ্টারী চিঠি আসিল;—

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১

মহাশয়!

আমার নিবেদন এই যে, আমি আজ দুই বৎসর হইতে সুলতানপুরের 'সিঙ্গার কোম্পানি' দোকানের সেলাই শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছি। সুলতানপুর হাইস্কুলের মাষ্টার রতিকান্ত বাবুর স্ত্রী একটি সেলাইএর কল খরিদ করেন। আমি তাঁহাকে সেলাই শিখাইতে যাইতাম। সেই সূত্রে রতিবাবুর স্ত্রীর সহিত আমার বিশেষ আলাপ হয়,—মনোরমা আমায় 'দিদি' বলিয়া ডাকিত। সেই সম্পর্কে রতিবাবুও আমাকে দিদি বলেন।

এবারে বাপের বাড়ী যাইবার সময় মনোরমা আমায় বলে যে উনি একলা রহিলেন, বিদেশে মানুষের ভাল-মন্দ কখন কি হয় বলা যায় না। বিশেষ ওঁর কোনও 'যুগ্যতা' বা ঠিক বিলি নেই। দিদি, আমার মাথার দিব্যি রহিল তুমি একটু দেখা-শোনা ক'রো।

মনোরমা চলিয়া যাইবার পর প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় রতিবাবুকে আমি চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিতাম। একদিন সন্ধ্যার পর রতিবাবু নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জ্বর; অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা। আমি বলিলাম, রাত্রে আর বাসায় গিয়া কাজ নাই। আমার পাশের ঘর খালি আছে; আপনার কোনও অসুবিধা হইবে না। ভোর-বেলায় জ্বর ছাড়িলে রতিবাবু নিজের বাসায় চলিয়া যান।

সেই দিনই বেলা ১০টায় আমি এক জরুরি টেলিগ্রাম পাইলাম, আমার মার বড় অসুখ। ১১।২[৫] মিঃ ট্রেণে যাইব ঠিক করিয়া জিনিষপত্র গুছাইতে গিয়া দেখি রতিবাবুর ঘড়িটি আমার ট্রাঙ্কের উপ[র]

হিয়াছে। তখন আর সময় নাই। ভাবিলাম বাড়ী গিয়া পত্র দিব।

কিন্তু আসিয়া দেখি মার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। দশ দিন, দশরাত কোথা দিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই।

কাল সুলতানপুরের দোকানের ম্যানেজার বাবুর পত্রে রতিবাবুর ঘড়ি চুরির ব্যাপার সব জানিতে পারিলাম। পুরুষ মানুষের কি ভুলো মন!

সুলতানপুর থানার দারোগা বাবু কোনও কারণে আমার উপর বড় চটিয়া আছেন, শেষে কোনও পুলিশের হাঙ্গামায় না পড়ি এই ভাবিয়া আপনাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলাম। আপনি আমার সভক্তি প্রণাম লইবেন। নিবেদন ইতি।

শ্রীমতী কিরণশশী দত্ত।

পুঃ—

রতিকান্তবাবুকে আজ এই সঙ্গে এক পত্র দিলাম।

দ্বন্দ্ব

যখন হাজারীবাগ রিফর্মেটরী স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যজ্ঞেশ্বরের মুক্তির সংবাদ পাইলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখানে আসিবার তিন দিন পরেই যজ্ঞেশ্বরের জ্বর হয়, শেষে টাইফয়েড এ দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহার অবস্থা খুবই খারাপ, হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবু একটু পূর্ব্বেই দেখিয়া গিয়াছেন।

যজ্ঞেশ্বর অচৈতন্যের মত পড়িয়াছিল। রক্তলেশহীন নিষ্প্রভ ওষ্ঠ দুইটির দ্রুত কম্পনের সহিত মরণাহত হতভাগ্য বালকের, অস্ফুট মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ, সেই কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শুশ্রূষাকারী অপর দুইটি বালকের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছিল।

সারারাত্রি মৃত্যুর সহিত যুঝিয়া যজ্ঞেশ্বর ভোরের দিকে শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

পূর্ব্বাচলে প্রথম অরুণোদয়ের সহিত যখন বনবিহগগণ নবসূর্য্যের বন্দনা গীতি গাহিয়া উঠিল, তখন উষার স্নিগ্ধ বাতাসে স্নাত হইয়া যজ্ঞেশ্বরের মুক্ত আত্মা যে বিচারালয়ের সিংহদ্বার পানে যাত্রা করিল, সেখানকার ধর্ম্মাধিকরণ পৃথিবীর কোনও মানবের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশ করেন না।

কতদূরে ?

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়ে, তোমার আসার পথ
দেখ্‌ছি বসে—কতদূরে তোমার সোনার রথ ?
চেয়ে চেয়ে ব্যাকুল দিঠি
শ্রান্ত হয়ে পড়ছে লুটি
পথের ধূলায়—, কখন আমার পূরবে মনোরথ ?
কোথায় তুমি ?—কতদূরে তোমার কণকরথ ?

বেলা যে যায়, আস্‌ছে নেমে সাঁঝের অন্ধকার
গোধূলির শেষ দীপ্তিটুকু কতক্ষণই আর—
থাকবে জেগে ? দীপালি তার
একে একে নিভছে এবার,
উজল আঁখিতারায় ঢাকে আকুল অশ্রুধার,—
আমি কেমন করে দেখব তোমায় ? বন্ধুগো আমার !

হয় তো এসে অন্ধকারে কখন্ যাবে চলে
জান্‌ব ন' তা—থাক্‌ব শুধু আর্ত্ত নয়ন মেলে
ধীরে কখন্ ডাকবে এসে
মর্ম্ম-ভাঙার উতল শ্বাসে
সে ডাকটুকু যাবে মিশে, উছল অশ্রুজলে.
হয় তো দেখা হবে না আর—অম্‌নি যাবে চলে !

আমি সারা বেলাই রয়েছি চেয়ে তোমার আশাপথ
কোথায় ওগো ! কতদূরে তোমার সোণার রথ ?

আর্ট্ ও সাহিত্য

প্রবন্ধ

শ্রীশম্ভু চন্দ্র সেনগুপ্ত

আর্ট্ ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই প্রথমে যে কথাটা আমাদের মনের দুয়ারে এসে ধাক্কা দেয় সেটা হচ্ছে—"আর্ট্ কাকে বলে?" আজকাল আর্টের যুগ পড়ে গেছে। সাহিত্যে চাই আর্ট, অভিনয়ে চাই আর্ট, ছবিতে চাই আর্ট, আর্ট চাই সকল জিনিষেই। সুতরাং আর্ট কি ও কাকে বলে সেইটাই আগে জানা দরকার।

"সত্যং-শিবং-সুন্দরং" অর্থাৎ ভগবানের সত্যশিব সুন্দর মূর্ত্তিই হচ্ছে আর্টের কেন্দ্র। এইখানে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন আর্ট কি? আর্ট কি, তা' সংজ্ঞা দিয়ে, পরিভাষা দিয়ে ঠিক করে বোঝানো খুবই শক্ত—বোধ হয় অসম্ভব। মিষ্টি কাকে বলে, সুগন্ধ কি, এসব যেমন সংজ্ঞা দিয়ে বোঝান যায় না, তেমনি পরিভাষা দিয়েও আর্ট বোঝানো যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা ক'রে, আলোচ্য বস্তুর প্রকৃতিটা বুঝতে পারা গেলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। গীতায় ঠিক এই রকম দেখতে পাওয়া যায়। অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরিভাষা দিয়ে না বুঝিয়ে যে অবস্থায় পৌছলে মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যেতে পারে, সেই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা করে অর্জ্জুনকে বুঝিয়েছিলেন, সেই রকম আর্টকেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর দিয়েই বুঝতে হবে।

আর্ট বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি, সেটা আমাদের মনের একটা অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। জার্ম্মান দার্শনিক Schelling বলেছেন "আর্টের বস্তুর মধ্যে আমরা সসীমের মধ্যে অসীমকে পাই; আমাদের না জানিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করানোই হচ্ছে আর্টের প্রকৃতি।" আগেই বলেছি ভগবানই আর্টের কেন্দ্র। তিনি অসীম, তিনি অনন্ত। কাজেই সসীমের মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করাতেনা পারলে আর্টের প্রকৃত আর্টত্ব থাকে না।

কিন্তু আর্টের আর একটু বিশেষত্ব আছে। সসীমের মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করবার পথে, সত্যকে উপলব্ধি করবার পথে আর জগতের স্বাস্থ্য ও উন্নতি সাধনের পথে আর্ট আমাদের সৌন্দর্য্য উপভোগের ভেতর দিয়ে নিয়ে যায়। এইখানে একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। বিজ্ঞান আর দর্শন, দুয়ের কেন্দ্র সত্য, দুয়ের ভিত্তি প্রকৃতি। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের আর্ট থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর ভেতর দিয়ে সেই দিকে নিয়ে চলে। দর্শন আবার আমাদের আর এক পথ দিয়ে সেইদিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সুনীতির কেন্দ্র যেমন ভগবানে "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ" মূর্ত্তি, ধর্ম্মের কেন্দ্র যেমন "ধর্ম্ম অপাপবিদ্ধ" মূর্ত্তি, তেমনি আর্টের কেন্দ্র "সত্য-শিব সুন্দর" মূর্ত্তি। তাই আর্টের বহিরঙ্গ হচ্ছে সৌন্দর্য্য। তাহার সমস্ত technique এই সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য প্রযুক্ত হয়। সৌন্দর্য্যই হচ্ছে আর্টের দেহ। যে কোন বিষয় আমরা আর্ট দিয়ে ব্যক্ত করতে যাই, সেই বিষয় থেকেই আর্ট সৌন্দর্য্য খুঁজে বার কোরে নিজের অঙ্গসৌষ্ঠব পরিপুষ্ট করে। এই কারণে, অনেক সময় আমরা সৌন্দর্য্য মাত্রকেই আর্ট বলে ভুল করে বসি। প্রকৃত আর্টের মধ্যে তার অন্তরঙ্গ স্বাস্থ্য আর বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্য এই দুয়েরই সামঞ্জস্য ও সমাবেশ থাকা চাই।

যে কোন একটা গাছের পাতার ফটো আর্ট না হোতে পারে, কিন্তু একটা সুন্দর দৃশ্যের ফটোকে আর্ট বলতে দ্বিধা করবো না। সেই রকম ছবিতে যদি একরাশ ধূলোকাদা আঁকা থাকে, আর্ট সমালোচকেরা তাকে আর্ট বলতে পারেন, আমার বোধহয় সেটা মোটেই আর্ট নয়। আর্টের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ আলোচনা কোরলেই বুঝতে পারা যাবে যে আর্টকে পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতেই দাঁড় করাতে হবে। সুন্দর আর অসুন্দর এই দুটো জিনিষই পরস্পরের তুলনাতেই

বুঝতে পারা যায়। আমাদের সসীম অনুভূতি শক্তি দিয়ে আমরা পূর্ণ সুন্দরের পূর্ণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পারি না। কাজেই আমাদের অসুন্দরের তুলনায় সুন্দরকে উপলব্ধি করতে হয়। আমরা কাছাকাছি যে সব জিনিষ দেখতে পাই তার মধ্যে গুণের সঙ্গে দোষ যা থাকে সবই অমাদের চোখে এসে পড়ে, কিন্তু দূরের জিনিষ যা দেখি, তাতে দোষ যা থাকে, সেটা আমরা দেখতে পাইনা। তাই পরিপ্রেক্ষণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যতই দূরের দৃশ্যের ছবি আঁকা যায় ততই সেটা সুন্দর হয়, ততই সেটা প্রাণস্পর্শী হয়। তার কারণ এই যে কাছের ধুলোকাদা অন্তরালে থেকে যায় আর সুন্দর দৃশ্যের সৌন্দর্য্যটুকুই আমাদের চোখের সুমুখে ফুটে ওঠে। কাছের দৃশ্যের ছবির মধ্যে যে আর্ট বা কলামাধুরী থাকতে পারে না তা নয়; কিন্তু তাকে প্রাণস্পর্শী করতে হলে তার ভেতর থেকে সৌন্দর্য্য বার করে ফুটিয়ে তুলতে হবে, অসুন্দর যা সব অন্তরালে রাখতে হবে। আর্টের ভিত্তি যেমন সত্য, আর্টের অন্তরঙ্গ যেমন মঙ্গল, আর্টের বহিরঙ্গ তেমনি সৌন্দর্য্য। যে আর্টে এই তিনটী জিনিষের সমাবেশ থাকবে, সেই আর্টকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে আমাদের অন্তর সহজেই মেনে নেবে।

সাহিত্যের সকল বিভাগেই আর্ট প্রকাশের অবসর আছে। বিজ্ঞানেও আছে। কিন্তু উপন্যাস, নাটক ও কবিতাতেই আর্ট প্রকাশের সুবিধা কিছু বেশী। আমাদের দেশে নাটক ও কাব্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক আগে থেকেই লেখা হয়েছে। উপন্যাসও যে ছিলনা এমন নয়।

বিজ্ঞান ও দর্শন লিখতে গেলে যে রকম প্রমাণ ও নিয়মাবলীর মধ্যে আপনাকে বাঁধতে হয়, নাটক ও কাব্যে ততটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে যেতে হয়না। সেই জন্যই পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের চেয়ে নাট্যকার ও কবির সংখ্যা অনেক বেশী দেখতে পাওয়া যায়। নাটক ও কবিতা রচনায় যেটুকু বাঁধাবাঁধি নিয়মে যেতে হয়, উপন্যাস লিখতে গেলে সেটুকুও বাঁধাবাঁধিতে পড়তে হয় না। কবিতার চেয়ে আবার নাটক রচনায় আরও কম লোককে এগোতে দেখা যায়। কবিতা যেমন কল্পনায় আলোচনা করবার জন্য রচনা করা হয় ও কল্পনাতেই আলোচিত হয়, নাটক সেরকম হয়না। নাটক অভিনয়ের জন্যই রচিত হয়। কোন নাটকের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষভাবে অভিনয় না দেখতে পেলেও পড়বার সময় আমরা তার অভিনয় অন্ততঃ কল্পনাতেও দেখে নিতে বাধ্য হই। এই অভিনয় প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চে দেখবার সময়েই হোক, বা মানসপটে কল্পনার চক্ষে দেখবার সময়েই হোক, কোন নাটকে আর্ট ও তার technique কতদূর সাফল্য লাভ করবে সেটা খুব স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। কতটা সত্যঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে ও কতটা সৌন্দর্য্যের ভেতর দিয়ে কতটা মঙ্গল সমাজের হল, একটা নাটকে সমস্তটা যেন প্রত্যক্ষভাবে বেরিয়ে পড়তে চায়। এ-ছাড়া কাব্যের মত নাটকেও অল্পস্থানের মধ্যে কলাকৌশল প্রয়োগ ক'রে বাহাদুরি নিতে হয়। এই সব প্রত্যক্ষমূলক সমালোচনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অল্পস্থানের মধ্যে সুনিপুণ-ভাবে কলাকৌশলপ্রয়োগ ক'রে বাহাদুরি নেওয়া খুবই শক্ত বলেই কম লোকেই নাটক রচনায় এগিয়ে থাকেন।

নাটক ও কবিতার চেয়ে উপন্যাসে আর্ট প্রয়োগের অবসরও যেমন অনেক, তেমনি স্বাধীনতাও যথেষ্ট। আজ পর্য্যন্ত উপন্যাসে কোন বাঁধাবাঁধির নিয়ম হয়নি। এই জন্য উপন্যাস লেখকেরা উপন্যাস লেখবার সময় একটু হাতপা ছড়িয়ে প্রয়োজন মত আর্টের খেলা খেলবার সুযোগ পান। স্বাধীনতার সার মাটীতে আর্টরূপ গোলাপফুল ফোটাবার সুবিধা তাদেরই বেশী। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যারা প্রকৃত আর্টিষ্ট তারা এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার ক'রে আর্টকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তবেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, উপন্যাসে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত অনেকবিষয়ে লেখা যায়, অনেক স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা যায়, কাজেই আর্ট ফুটিয়ে তোলবার অনেক অবসর পাওয়া যায়, ও তাতে কথার মিল, ছন্দের মিল প্রভৃতি কোনই বাঁধাবাঁধির দরকার হয় না। এই সমস্ত কারণে সাধারণতঃ আজকাল যারা সাহিত্য চর্চ্চা করেন, তাঁদের অনেকেরই উপন্যাস লেখবার দিকেই ঝোঁক পড়ে।

সম্প্রতি একটা বিলাতী ধূয়া আমাদের আর্টের প্রয়োগ প্রণালীকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, ধূয়াটা হচ্ছে, "Art for art's sake"—আর্টের খাতিরে আর্ট। একটা চলতি কথা আছে—যে জগতে শতকরা দশজন লোক ভাবে আর অবশিষ্ট নব্বই জন লোক গড্ডালিকার মত সেইদশ জনের অনুসরণ করে। "আর্টের খাতিরে আর্ট" এই ধূয়া ধরে আজকাল আমাদের দেশের জনকয়েক তরুণ সাহিত্যিক আর্টের সার্থকতাকে ব্যর্থ করছেন। এই ধূয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরই যমজ ভায়ের মত আরও একটা ধূয়া প্রচার হয়েচে—সেটার নাম Realistic art—প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট। যারা এই প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্টের দোহাই দেন, তারা এমন ভাবে দেখান, যেন এটা তাঁদের আবিষ্কার করা একটা নতুন তত্ত্ব। আসলে এটা পাশ্চাত্য কথার প্রতিধ্বনি মাত্র। এর মধ্যে কোনো নতুনত্ব ত' দেখতে পাইনা। আর্টের ভিত্তিই যখন সত্য প্রকৃতি, তখন সাধারণ আর্ট থেকে realistic art এর বিশেষত্ব যে কোথায় তাতো খুঁজে পাই না। তবে দেখবার মধ্যে এই দেখতে পাই যে আর্টের খাতিরে আর্ট আর Realistic Art এই দুটোর সহযোগের দোহাই দিয়ে চারদিকে এমন সব বীভৎস, কুৎসিৎ ও অশ্লীল লেখা বার হচ্ছে, যেটা ভদ্র-সমাজে ও মেয়েদের কাছে পড়া যায় না।

ভগবান যখন আর্টের কেন্দ্র, তখন বলা বাহুল্য যে আর্টের মূল মন্ত্র সম্বন্ধেও দেশবিদেশের মনীষিদের মত একই হবে। কিন্তু তাই বলে এটা মনে করা ভুল যে কারুরই মত তার উল্টো হবে না। আর একটা বিষয় সর্ব্ববাদীসম্মত। আর্টের লক্ষ্যবস্তু যে সুন্দর হবে, অথবা তা সুন্দর না হোলেও তাকে যে সুন্দর ক'রে তুলতে হবে, এবিষয়ে সকলেই একমত। আর্টের বস্তু যদি সুন্দরই না হোল, তবে তার রইল কি? আর্টের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের এতই অপরিহার্য্য আর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে অনেক সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরাও বাইরের সৌন্দর্য্যকেই আর্ট মনে করে ভুল করে থাকেন।

শুধু বাইরের সৌন্দর্য্যকে যদি কেউ আর্ট বলতে চান—ভাল কথা; কিন্তু তাঁকে আর্টেরই দিক থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সৌন্দর্য্যকেও দেখতে ও দেখাতে হবে। তখন সেই সৌন্দর্য্যরূপ বাহিরের অঙ্গকেই আর্টের জিনিষ থেকে পৃথক ভাবে আলোচনা করে দেখতে হবে যে, সেই সৌন্দর্য্যের কেন্দ্র আর্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবান; সেই সৌন্দর্য্যেরও ভিত্তি সত্য প্রকৃতি, সেই সৌন্দর্য্যেরও প্রাণ স্বভাবিকতা, তারও লক্ষ্য সমাজের মঙ্গল আর উন্নতি সাধন; সেই সৌন্দর্য্যও আবার প্রকৃত সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত।

আমাদের দেশের ঋষিরা শিবস্বরূপ ভগবানকে সৌন্দর্য্যের নিষ্কর্ষ হিসেবে আর্টের মূল বলে গেছেন। ইউরোপের বিখ্যাত প্রায় সকল মনীষিরা আর্টের Definition দিয়েচেন। গ্রীক দার্শনিক Plato বলেচেন "যাহা উপকারে আসিবে তাহাই শ্রেষ্ঠ, যাহা ক্ষতিকর, তাহাই অশ্রেষ্ঠ।" বম্‌গার্টেন বলেন,—"প্রকৃতিতেই সৌন্দর্য্যের চূড়ান্ত আদর্শ পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতির অনুকরণ করাই আর্টের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।" Sulzer বলেচেন, —"মঙ্গলই আর্টের লক্ষ্য, সৌন্দর্য্য নহে।" Aftsbery বলেন, "যাহা সুন্দর তাহাই সত্য এবং যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহাই মঙ্গল; ঈশ্বর, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলভাব উভয়েরই মূল।" ফিক্টের মতে,—"আর্টের লক্ষ্য সমস্ত মানবত্বের অনুশীলন।" Schelling এর মতে,—"সসীমের মধ্যে অসীমের উপলব্ধিই সৌন্দর্য্য।" Haegle এর মতে,-- "আমাদের সত্য ও সুন্দর মূলে এক।" কঁজার মতে,—"সৌন্দর্য্যের মূল ভিত্তি সুনীতি" গুইয়োর মতে,—"আমাদের উচ্চতম চিন্তা ও অনুভূতির বহির্ব্বিকাশেই আর্টের পরিণতি।" Koster বলেন, "ঈশ্বর, সত্যশিব সুন্দর; এবং এই সত্য-শিব সুন্দরের ভাব আমাদের অন্তরে নিহিত।"

Sir Thomas Brown বলেন,—"প্রকৃতির পরিণতিই আর্ট; ভগবানের আর্টের নামই প্রকৃতি।" Hazlitt বলেচেন, "প্রকৃতির সহিত আর্টের যোগবদ্ধ হয়ে থাকা চাই।" জুবেয়র বলেচেন, "আর্টের মধ্যে যাহা সুন্দর, তাহাই হিতকর, প্রয়োজনীয়; আর্ট মনকে উন্নত করে বলিয়া উহা নীতিবিদের পক্ষে আবশ্যক।" Ruskin বলেন, "উদার মহৎ হৃদয়ের অভিব্যক্তিই

আর্ট; যে উপায়েই হোক, দর্শকের হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে উচ্চ ভাবের উদ্রেক করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট।" উন্নত মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করে যে ভাব যে পরিমাণে তাকে বেশী উন্নত করতে পারে সেই অনুপাতে সেই ভাব উচ্চ। আর্টের বিভিন্ন চতুষ্পাঠীর প্রত্যেকটীর দ্বারে আমি উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখতে চাই—সংযম।" Schiller বলেন,—"আর্ট প্রকৃতির দক্ষিণ হস্ত।" Emerson বলেচেন,—"বিশ্ব চরাচরের নিয়ন্তা যিনি তিনি মঙ্গলস্বরূপ; তাঁহা হইতেই প্রকৃতির প্রয়োজনীয় বা সুন্দর, সর্ব্বপ্রকার আর্টই অভিব্যক্ত হয়েছে; আমরা যখন সর্ব্ব বিষয়েই প্রকৃতির অনুসরণ করিতে বাধ্য, তখন আমাদেরও আর্টকে স্থায়িত্ব দিতে হলে, তাকে সুনীতি দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হবে। আর্ট বিশ্বচরাচরে সৃষ্টির মূল প্রাণ। Tolstoy বলেচেন, "মানবের মঙ্গলসাধনই আর্টের লক্ষ্য।"

ওপরের উক্তিগুলো পড়লেই জানতে পারা যায় যে আর্ট সম্বন্ধে সাধারণ মূলতত্ত্বগুলো দেশনির্ব্বিশেষে সকলেই স্বীকার করে থাকেন। তাই বলে এবিষয়ে যে বিরোধী মত দেখতে পাওয়া যায় না তা নয়।

ভগবান যেমন আর্টের কেন্দ্র; প্রকৃতি তেমনি আর্টের ভিত্তি। ভগবানের একই মঙ্গল ইচ্ছা ফুলে ফলে এক ভাবে বিকশিত হচ্চে, নদীতে সাগরে আর একভাবে পরিস্ফুট হচ্চে; আবার গ্রহনক্ষত্রে আর এক নতুন আকারের প্রকাশ পাচ্চে। কিন্তু যারা art for art's sake এর দোহাই দেন, তারা ওপরের কথার প্রত্যুত্তরে বলতে পারেন, প্রকৃতিতে অমঙ্গলেরও ছাপ দেখা যায় তবে কোনো কোনো যায়গায় অমঙ্গলকেই বা আর্টের ভিত্তি করতে আপত্তি কি? আপত্তি যথেষ্টই আছে। প্রকৃতির রাজ্যে আপাততঃ যেটা অমঙ্গল বলে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে সেটার পরিণাম মঙ্গলজনকই হ'য়ে থাকে।

চেষ্টা করলে মৃত্যু থেকেও যে আর্ট পাওয়া যায় না তা নয়। কিন্তু মৃত্যু থেকে আর্ট বার করবার চেষ্টা প্রকৃতির ইচ্ছা নয় বলেই মনে হয়, তাই মর-বার সময় দর্শকের মন অবসাদে এত অভিভূত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া সমস্ত জীবনের মধ্যে মৃত্যু মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য আসে আর তার তুলনায় প্রকৃতি জীবনের খেলা খেলবার জন্যে আমাদের অনেক দীর্ঘ অবসর দিয়ে থাকে। যে জীবনটা উন্নতির দিকে চলতে চলতে বিচিত্র ভঙ্গীতে আনন্দে নাচতে থাকে, সেই জীবনরূপ আর্টই প্রকৃত আর্টরূপে আমাদের সুমুখে ধরা প্রকৃতির ইচ্ছে বলেই, ঐ আর্ট আমাদের বেশী প্রাণস্পর্শী হয়।

আগেই বলেচি যে ভগবানই আর্টের কেন্দ্র। আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিশেষতঃ উপন্যাসে আর্টের কেন্দ্রে এই সত্য-শিব-সুন্দর ভগবানকে রাখা হয়েচে কি না, তাই নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

বাংলা উপন্যাসকে মোটামুটী দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—সেকালের আর একালের। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারিচাঁদ মিত্র) উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করলেও, বর্ত্তমানে বাংলা উপন্যাস যে ভাবে গড়ে উঠেচে, বঙ্কিমচন্দ্রই যে তার জন্মদাতা আর পথ প্রদর্শক তা অস্বীকার করা চলেনা। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস থেকে রবীন্দ্র নাথের রাজর্ষি পর্য্যন্ত বোধ হয় সেকালের উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর মধ্যে শ্রীশ মজুমদার, দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেরই উপন্যাস এর ভেতর পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়, চোখের বালি, উপন্যাস থেকেই বোধ হয় একালের উপন্যাসের আরম্ভ ধরা যেতে পারে। ঠিক যে কার কোন বই থেকে একালের উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েচে তা বলা সম্ভব নয়। এর মধ্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-গুলো এসে পড়ে। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা বদলিয়ে দিয়েচেন। অনেক বিখ্যাত লেখকের উপন্যাস যে একালের অন্তর্ভুক্ত তা বোধ হয় কাউকেও বলতে হবে না। এর মধ্যে নরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত, অনুরূপা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। আর একজন লেখকের নাম এইখানে না করলে এ প্রবন্ধ

অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। খুব অল্পদিনের ভেতরই তিনি বাংলা সাহিত্যে নাম করেছেন। তাঁর "পথের পাঁচালী" তাঁকে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত করে দিয়েছে। বাস্তবিক এরকম শিশুর মনস্তত্বের বিশ্লেষণ করে কোন উপন্যাস লেখা, বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। তার লেখবার ষ্টাইলও সম্পূর্ণ নতুন। যাই হোক, যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। আমার মনে হয়, একালের উপন্যাসের চেয়ে সেকালের উপন্যাসের ভেতরে আর্টের তিনটী অঙ্গের যথাযোগ্য সমাবেশ বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। একালের উপন্যাসে সে জিনিষটা একেবারে নেই, তা বলচি না! শরৎ বাবুর অনেক উপন্যাসই আর্টের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাঁর "শ্রীকান্ত" খানা পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি কতবড় আর্টিষ্ট। "শ্রীকান্তর" মত বই পৃথিবীর সাহিত্যে গুতিনখানার বেশী নেই। আমি বলতে চাইছিলাম এই যে, শরৎ বাবুর মত উপন্যাস আর কারুর হত দিয়ে বার হচ্চেনা। সেই জন্য বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলো বারবার পড়লে আবার পড়তে ইচ্ছা হয় কিন্তু একালের অনেক উপন্যাস একবার পড়লে আর দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছা হয় না।

সেকালের উপন্যাসগুলোর একটা প্রধান লক্ষণ এই দেখতে পাওয়া যায় যে লেখকেরা ভগবানকে তাদের আর্টের কেন্দ্র রূপে চোখের সুমুখে রেখে উপন্যাস লিখতে বসতেন। বঙ্কিম বাবুর "দেবী চৌধুরাণীতে" আর রবিবাবুর "রাজর্ষিতে" এর জাজ্জল্য প্রমাণ দেখিতে পাই। ভগভক্তি আর ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে নিষ্কাম কাজ করতে শিক্ষা দেওয়াই হল "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসের মূলমন্ত্র। "দেবী চৌধুরাণীর শেষে বঙ্কিমবাবু গীতা থেকে লিখলেন—"পরিত্রানার সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"॥ বইয়ের ভেতর তিনি এই বীজমন্ত্রটীকে উপন্যাসের ঘটনা বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেচেন। "দেবী চৌধুরাণীর" মত অন্যান্য বইয়ের এমন কি "বিষবৃক্ষে"ও ভগবানকে কেন্দ্রে ধ্রুবনক্ষত্ররূপে রাখা হয়েচে।

রবিবাবুর রাজর্ষিরও মূলমন্ত্র হল অন্ধকুসংস্কারের বদলে রাজ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা। রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধে যখন তার ভাই নক্ষত্ররায় সমস্ত ভালবাসা ছিন্নকরে যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন, তখন তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে রাজী হলেন বটে, কিন্তু রাজ্য থেকে বলিদান রহিত করবার জন্য ভগবানের যে আদেশ পেয়েছিলেন, সেই আদেশ রহিত করবার নামগন্ধও করলেন না। ভগবদ্ভক্তিই এই উপন্যাসের মজ্জাগত ভাব।

বঙ্কিম বাবুর অন্যান্য উপন্যাসের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যে সমাজের মঙ্গলসাধন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর আনন্দমঠের শেষে তিনি খুলেই লিখেচেন,—"কে আসিয়া কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে"। এই উক্তিতে Destruction অপেক্ষা Constructionএর, ধ্বংস অপেক্ষা সৃষ্টির, মৃত্যু অপেক্ষা জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। বিষবৃক্ষেও মঙ্গলভাব যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তা তাঁর,—"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম, ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে" এই উক্তি থেকেই জানতে পারা যায়।

বঙ্কিম বাবু ভারতের প্রকৃতি অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই; একটা সামান্য ঘটনার সমাবেশে, ভারতের পরম্পরাগত নিজস্ব জিনিষ—নারীর মাতৃত্বে শ্রদ্ধা—তাঁর বইয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। প্রফুল্ল যখন ভবানী পাঠকের সঙ্গে পরিচয়ের সময় নিজের ঐশ্বর্য্যের বিষয় ভয়ে ভয়ে লুকোবার চেষ্টা করচে, তখন ভবানী তাকে খুব স্বাভাবিকভাবে 'মা' বলে ডাকল। সুন্দরী যুবতী প্রফুল্লও আশ্বস্ত হল। এই 'মা' বলে ডেকে কোন অসহায়া নারীকে অভয় দেওয়া—ষোল আনা ভারতেরই নিজস্ব।

বঙ্কিমবাবু নারীর মাতৃত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই স্বামী-স্ত্রীরও নির্ম্মল দাম্পত্যপ্রেম আঁকতে পেরেচেন। প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রতিবাসীরা কোনো কারণে প্রফুল্লর নামে অপবাদ প্রচার করলো। এই অপবাদের জন্য সমাজে একঘরে হবার ভয়ে বাপের আদেশে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ত্যাগ করতে বাধ্য হল। অনেকদিন পরে ঘটনাচক্রে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে

প্রফুল্লের আবার দেখা হয়। সেই দেখা থেকে প্রফুল্লকে ব্রজেশ্বরের চুম্বন করা পর্য্যন্ত ছবিটী কি মিষ্টি ও খুব স্বাভাবিক। বারবার পড়লেও আবার পড়তে ইচ্ছে হয়।

দেবী চৌধুরাণীর মত আনন্দ মঠের ভিত্তি যে স্থানীয় ও সাময়িক প্রকৃতিকেই করা হয়েচে, আর এই কারণে আনন্দমঠের স্বাভাবিকতা যে ফুটে উঠেচে, তা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু দেবী চৌধুরাণীতে স্বাভাবিকতা যতটা বেশী ফুটেচে, আনন্দমঠে ততটা হয়নি।

বঙ্কিম চাটুজ্যে ও রবিঠাকুর—দুজনেই তাদের উপন্যাসের ভিত্তি করেচেন সত্য প্রকৃতিকে। কিন্তু বঙ্কিম চাটুজ্যে ঐ প্রকৃতির বহির্বিকাশকে, বাহ্যিক আকারকেই বেশী ফোটাতে চেষ্টা করেচেন। রবিঠাকুর প্রকৃতির অন্তর্বিকাশকে—মানুষের অন্তরতম প্রদেশের চিন্তাকেই ব্যক্ত করেচেন। এই ভাবে মনটাকে এক ধারে উল্টিয়ে ফেলে মনস্তত্ব ব্যক্ত করবার চেষ্টা বাংলা উপন্যাসে বোধ হয় রবিঠাকুরই এর সূত্রপাত করেন। রবীন্দ্র নাথ তাঁর বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষিতে এই মনস্তত্ব ব্যক্ত করতে গিয়ে খুবই স্বাভাবিকতার ছাপ দিয়েচেন।

বঙ্কিমবাবুর দেবী চৌধুরাণীতে যেমন অস্বাভাবিকতা এত অল্প যে তার উল্লেখ করার দরকার হয়নি, তেমনি রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষিতেও অস্বাভাবিকতা এতই অল্প যে তার আলোচনা নিষ্প্রোয়জন। দেবী-চৌধুরাণীর মত রাজর্ষি ও আর্ট হিসাবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

স্বাভাবিকতা আর্টের প্রাণ আর অস্বাভাবিকতাতেই আর্টের মৃত্যু। স্বাভাবিকতার অভাবে যেমন সৌন্দর্য্যের অভাব হয়। অপ্রাসঙ্গিক জিনিষের সমাবেশে ও সেই রকম সৌন্দর্য্যের হানি হয়। স্বাভাবিকতা থাকলেই তা প্রাসঙ্গিকতা থাকবে—প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক কোনো বিষয় কার্য্যপরম্পরা ছাড়া সহসা আনতে পারে না। আবার প্রসঙ্গ ক্রমে যে বিষয় এসে পৌছবে সেটাও তো স্বাভাবিক ভাবেই আসবে,—সুতরাং তার স্বাভাবিকতাও স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই বলতে হয় যে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এলেই তার সঙ্গে অস্বাভাবিকতা সুতরাং সৌন্দর্য্যের অভাবও আসবার খুব বেশী সম্ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথ চরিত্র আঁকতে যেমন, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাতেও তেমনি পটু। রবীন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক বর্ণনার বিশেষত্ব এই যে সেগুলিতে তার অনির্ব্বচনীয় কবিত্ব মাখানো আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা খুব প্রত্যক্ষদ্যোতক। তাই সেই বর্ণনা পাঠকদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যায়—একটু ভাববার অবসর দেয় না। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা পাঠকদের ধরে নিতে হয়—সেটা খুব প্রত্যক্ষদ্যোতকহলেও, ওরই মধ্যে কোথায় যেন একটু ছায়াছায়াভাব লুকিয়ে থাকে, পাঠকদের বুঝে বুঝে, ধীরে ধীরে বর্ণনার সঙ্গে চলতে হয়।

উপন্যাসের ধরণেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে পরকীয়া প্রেমের একটা গণ্ডগোল যেন থাকবেই। কিন্তু রবিবাবুর সেকালের উপন্যাসে এটার খুবই অভাব দেখা যায়—নেই বললেই চলে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে নায়ক নায়িকাদের পলায়ন আর চলাচলের একটা হুড়োহুড়ি আছে। খোঁজ খোঁজ ব্যাপারের একটা হুলস্থূল কাণ্ড দেখতে পাই। কিন্তু রবিবাবুর আলোচ্য দুখানা উপন্যাসে, হুড়োহুড়ির, ভাব ততটা দেখা যায় না একটুখানি অপার্থিব ভাব দেখা যায়।

এই পার্থিব আর অপার্থিব ভাব থাকাতেই দুজনের উপন্যাসে মৃত্যুকে দুই বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েচে। 'বিষবৃক্ষে' আমরা কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা আর দেবেন্দ্রর মৃত্যু দেখেচি; 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপের মৃত্যু আর দলনীবেগমের বিষখেয়ে আত্মহত্যা দেখেচি; 'আনন্দমঠে' মহেন্দ্রর স্ত্রীর বিষখেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দেখেচি। এইসব মৃত্যুর ওপর আমাদের সহানুভূতি আসে বটে, এই সব মৃত্যুর বর্ণনা পড়তে পড়তে আমাদের হৃৎপিণ্ড ধরফড় করে বটে—কিন্তু একটার ওপরও আমাদের যথার্থ সহানুভূতি পৌছায় কিনা সন্দেহ—একটা করুণার ভাব জেগে ওঠে মাত্র। কিন্তু রবিবাবুর "বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" যখন বসন্তরায়ের হত্যা আমরা পড়ি, তখন আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ তাঁর জন্য সহানুভূতিতে ভরে ওঠে—মর্ম্ম ভেদ করে কান্না ফুকরিয়ে উঠতে চায়।*

---

* এই প্রবন্ধ লেখবার সময় Tolstoy এর What is Art থেকে কিছু কিছু সাহায্য নিয়েচি। যে সকল ইউরোপীয় মনীষীদের উক্তি এই প্রবন্ধে তুলে দিয়েচি, সেগুলও Tolstoy এর "What is Art" থেকে ইংরাজীর বাংলা তর্জ্জমা করে নেওয়া। লেখক।

স্বামী-স্ত্রী

গল্প

শ্রীরজত সেন

স্বামী এবং স্ত্রী।

সংসারটা ওদের নিকট বহু পুরাতন। কিন্তু বিস্ময় মধু মাধুর্য্য ওরা খুঁজে পায় পরস্পরের মধ্যে। জীবন-যাত্রা-পথ; সেই চিরপুরাতন হাসি কান্না যার পাথেয়। কিন্তু ওদের আনন্দলোকের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, অফুরন্ত।

তাদের মিলন রাত্রি মধুযামিনী, সে সুখস্মৃতি যে ওরা ভুলতে পারেনা।

বারো বছর—এক যুগ! কোলাহল নেই, অশান্তি নেই—জীবনের সমস্ত তুচ্ছ খুঁটি-নাটি নেই—এখনও ওরা মুখের পানে চেয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। হাতে হাত রেখে রহস্যভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। স্ত্রী কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকে—এই—

স্বামী উত্তর দেয়—কি!

তারপর সব নিস্তব্ধ—মাথার ওপরে অগণিত তারারাশি ঝিকমিক করে ওঠে।

স্বামী ডাকে! স্ত্রী বুকের ওপর মাথাটি রেখে বলে—নাম ধরে ডাকতে পারনা দুষ্টু! ওর আঁখিতে মধুর আবদার! স্বামী গালে টোকা দিয়ে বলে—বাবাঃ তোমার অতবড় নাম! রে-ণু-ক-ণা! আচ্ছা এক কাজ করি—রেণুটা বাদ দিয়ে কণা বলে ডাকলে কেমন হয় না? কণা, কণা, কণা।

(ওগো) লক্ষ্মী আমার সোনা!

স্ত্রী সুখের আবেশে গলে পড়ে।

আর এক রাত্রি। কণার অন্তরে যেন কিসের একটা বেদনা অনুভব করে—তার বুকটা হাহাকার করে ওঠে। সে স্বামীর গলা জড়িয়ে বলে—একটা কথা বলি রাগ কোরোনা কিন্তু—কেমন? আচ্ছা আমি যদি মরে যাই তুমি খুব দুঃখ পাবে—কাঁদবে! আর একটা বিয়ে করবে না?

স্বামী—ব্যথা পেয়ে বলে—আচ্ছা কণা লক্ষীটি কেন ওসব বল? আমার বুঝি কষ্ট হয় না!

কণা বলে—সত্যি রাগ কোরোনা। আচ্ছা ধরই না যদি কি বলব স্বর্গে? আচ্ছা বেশ তাই যদি স্বর্গে যাই তুমি সাজাহানের মত তাজ তৈরী করবে—না একটা ছোট গোলাপের গাছ পুঁতবে! ফুল ফুটে চিতার বুকে ঝড়ে পড়বে।

স্বামী কণার হাতটা কোলে তুলে বললে—কণা, সাজাহান ছিলেন ধনকুবের—কিন্তু আমার ঐশ্বর্য্য তো নেই। আমি তাজ তৈরী করব, কিন্তু কিসের জানো চোখের জলের! কিন্তু ছিঃ ওসব কথা থাক।

কণা পড়ল রোগে। তার স্বামী সব ছাড়লো—কোর্টে যাওয়া বন্ধ করলে। খাওয়া দাওয়া কোনদিন হয়। কোনদিন হয়না। ছুটো নার্স এলো—শক্ত রোগ। স্বামী সর্ব্বক্ষণ কণার কাছে বসে থাকে, কণা তার রোগপাণ্ডুর হাত স্বামীর কোলে রেখে বলে, সত্যি ছিঃ অমন কোরোনা—আমি ভাল হ'য়ে উঠবো। তোমারও অসুখ করলে কে দেখবে বলতো?

কণা প্রথম কয়েকদিন বেশ প্রফুল্ল ছিল। পরে সে বুঝলে রোগ শক্ত। সে আরও কাহিল হয়ে পড়লো স্বামীর অবস্থা দেখে। তার শরীরও দিন দিন খারাপ হচ্ছে যে। হা ভগবান! তুমি ওঁকে শান্তি দাও।

কণার কথা কইতে কষ্ট হয়। সে হাসতে পারে না। কি যেন একটা ভাবনা মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্পষ্ট করে সেটা সে নির্ণয় করতে পারেনা। দুর্ব্বল মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

অবশেষে একদিন সে বুঝলে তার ভাব বুঝি পড়েছে। কিন্তু তিনি—কি অসহায়। সে ভাবতে

পারেনা বেদনায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সে বলে ভগবান তুমি ওঁকে দেখ। স্বামী বুঝতে পারেন—অদৃশ্য কাঁটার মত ভাবনাটা মনে বিঁধে আছে ভাবেন অসম্ভব এ হতে পারে না কিছুতেই না; সে তো কোন দোষ করেনি তবে কেন এই নিদারুণ শাস্তি তার?

পরদিন সন্ধ্যায় যখন কণা স্বামীর কোলে মাথা রেখে বল্লে—চল্লাম; তখন তাঁর মনে হোল দেহাভ্যন্তর থেকে কে যেন হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কি যে ঘটছে সে বুঝতে পারছেনা বোধ শক্তি তার যেন হারিয়ে গেছে। কণা বল্লে পৃথিবীর এতদিনের হাসিকান্নার জীবনে, এই শেষ নয় ওগো, আবার আমাদের মিলন হবে তুমি যে আমারি। কণা হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে, একটু জল দাওতো গলা শুকিয়ে গেছে একবারে।

এক ঢোক জল গিলে কণা বল্লে, দুঃখ কোরোনা, তুমি আমার সকল জন্মের স্বামী, আবার যে মিলন হবে। কাঁদছো, ওগো একটা চুমো দাও না তেমন করে? স্বামী তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে একটা চুমো দিলে। কণা দুটো হাত দিয়ে তাকে ধরতে গেল—হাত দুটো ঢলে পড়লো। সব নিস্তব্ধ—নীরব।

স্বামী চম্‌কে উঠ্‌লো,—তার কণা প্রিয়তম কণা চিরদিনের মত চলে গেল?

ওই মুখ থেকে একটী কথাও বেরুবে না। তার কণা তাকে তেমনি আদর করে ডাকবে না? ওগো এও সম্ভব পৃথিবীতে! তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়্‌ছে না কেন? শুকিয়ে গেছে কি! তার বুকখানা ফেটে যাচ্ছে না এমনও আশ্চর্য্য! মানুষ এত ব্যথা কেমন করে সয়!

আত্মীয়া-আত্মীয় কয়েকজন এলেন। সধবারা পায়ে আল্‌তা, কপালে সিঁদুর দিয়ে ওকে একখানা লাল সাড়ী পরিয়ে দিলে।

তার দূর সম্পর্কের বৃদ্ধ কাকা বল্লেন—মুষড়ে পড়লে চলবে না বাবা, তোমাকেই তো তার শেষ কাজ করতে হবে।

তারপর সব মামুলি। মৃতদেহের উপর কাঠ চাপাবার সময় তার বুকে যেমন বেজেছিল, তেমনি আগুন লাল সাড়ী দাউ দাউ করে জলে উঠবার সঙ্গে তার বুকের ভিতরও জলেছিল হু হু করে।

তারপর শূন্য গৃহে শূন্য শয্যা; কিন্তু তাও তো সয়; না হলে সৃষ্টি চলে কি করে! মানুষের নীরবে বসে দুঃখ করবার অবকাশ কোথায়?

এরপর একটা বছর অতিবাহিত হোল। কণাকে এখনও ভোলেনি, এখনও অন্তরটা হাহাকার করে ওঠে তার।

একদিন সকাল বেলা শৈশব বন্ধু রমেনের চিঠি পেলে। রমেন লিখ্‌ছে "শৈলেন, ভাই, তুই মেজো পিসিমাকে চিনিস? যিনি কলকাতায় ছিলেন। পিসিমা বলতে তুই তো অজ্ঞান হতিস্‌। তিনি কাশী যাবেন কলকাতা হয়ে। যদি অসুবিধে না হয় লিখিস্‌। তোর ওখানে কয়েকদিন থেকেই মা গঙ্গা আর কালী বুঝ্‌লি?

শৈলেনের একাকী দিন কাট্‌ছিল না। পিসিমাকে পেলে তবুও একটু—সে তৎক্ষণাৎ 'তার' করে দিল। পরদিন প্রভাতে পিসিমা এলেন; কিন্তু সঙ্গে সে এলো, রমেন হতভাগা তার কথা যদি এক কলম লিখ্‌তো! বাঃ চমৎকার তো মুখখানা অনেকটা কণার মত। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে।

পিসিমা বললেন—কিরে শৈলেন চিন্‌তে পারিস?

শৈলেন বলে—না—ত! তুমি আবার কে? কিন্তু সে যাক পিসিমা তোমার সঙ্গে উনি কে? তোমার তো মেয়ে টেয়ে ছিল না।

পিসিমা হেসে বললেন—আমার বোনঝি, কেন পছন্দ হয়েছে নাকি? ঠিক করবো?

শৈলেন বললে ধ্যেৎ তা কেন?

পিসিমা বললেন—ওখানে পড়তো; এখানে বোর্ডিংএ থাকবে। আজ বিকেলে চলে যাবে।

শৈলেন বললে কেন? আজ বিকেলেই কেন—আমার বাড়ীতে কি দুটো দিনও জায়গা হবে না উনি? আর বোর্ডিংএই বা থাকতে যাবেন কেন? আমার বাড়ীতে কি দুটো দিনও যায়গা হবে না! আমার বাড়ীটাতো গোয়াল নয়।

পিসিমা বললেন—শোন ছেলের কথা, আমি যাবো কাশী। আর ও একা তোর সঙ্গে থাকবে নাকি? তাই তো বলছি বিয়ে করে রাখনা কোন হাঙ্গামাই তো নেই।

এমন সময় অন্তঃপুর থেকে আহ্বান এলো—গুরু গম্ভীর;—"পিসিমা!"

শৈলেন সরে পড়ল।

শৈলেন ভাবছিল—বিয়ে—বিয়ে—বিয়ে! অসম্ভব। কণার মৃত্যু হয়েছে এখনও এক বৎসর হয়নি। শৈলেন মেয়েটির কথা ভাবতে লাগ্‌ল—চমৎকার দেখ্‌তে। কণার জায়গায় নেহাৎ মন্দ দেখাবে না। সব ভেসে গেল। শৈলেনের মনে কখন যে অপরিচিতা মেয়েটি বধূবেশে লাল চেলী গায়ে চন্দনের ফোঁটা কপালে এসে দাঁড়িয়েছে তার খেয়ালই নেই। শৈলেন যেন নবপরিণীতা স্ত্রীর হাত ধরে বল্‌ছে—তুমি কি কণার মত হতে পারবে না আমি যে তোমার মধ্যে তাকে পেতে চাই।

শৈলেনের চমক ভাঙ্গলো। এ রকম চিন্তা করা নিতান্ত অন্যায়। আর দোষই বা কি, আমি তো কণাকে ভুলবো না কখনও! তেমন করে ভালোবাসতে তো পারবো না কাউকে! বিয়েটা দরকার বলেই সংসারে এর এতো প্রয়োজন। নিমেষে তার চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলল।

কখন পিসিমা যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তার হুঁস নেই।

শৈলেন!

কি বলছ—পিসিমা।

পিসিমা ওর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললে—

আচ্ছা শৈলেন—অমন করে সন্ন্যাসী হয়ে থাকবার প্রয়োজনটা কি বল্‌তো বাবা! সংসারে কি কণার মত মেয়ে মেলে না?

শৈলেন বল্লে—সন্ন্যাসী হয়ে থাক্‌বার ইচ্ছে থাকলেই বা কি আর না থাকলেই কি! কণার কথা ছেড়েই দাও দোজবরেকে কে বিয়ে করতে চাইবে বলতো? পিসিমা গালে হাত দিয়ে বল্‌লেন—ওমা এই কথা! আচ্ছা বিয়ে যদি করতে কেউ রাজী হয় তোর মত আছে?

শৈলেন বুঝল পিসিমা কার কথা কইছেন। সেও সুযোগ ত্যাগ করল না, বললে শুধু আমার থাকলেই কি বিয়ে হয়।

পিসিমা বললে ওঃ বিনুর কথা বলছিস্‌। হাসতে হাসতে চলে গেলেন। শৈলেনের হঠাৎ কণার কথা মনে পড়তে বুকটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো…হলেই বা! কণা তো আমারই, কণার স্থানে ত কাউকে বসাতে পারবো না—তার স্মৃতি যে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সন্ধ্যার সময় সে একছড়া বেলফুলের মালা কিনে আন্‌লো। তার ট্রাঙ্ক খুলে কাপড়ের তলায় কণার ছবিখানাকে সেই মালা জড়িয়ে রেখে দিলে।

চমৎকার!

সে কোথায় যেন বেরুচ্ছিল। সিঁড়ির পাশে শুন্‌তে পেলো বিনু ওরফে বিনীতা পিসিমাকে বল্‌ছে—তোমার শুধু বিয়ে বিয়ে-বিয়ে। আমাকে বিদায় করতে পারলে যেন তুমি বাঁচো—না বিয়ে আমি এখন কিছুতেই করতে পারবো না বাপু বলে দিলাম। বিনীতা জান্‌তো শৈলেন নিশ্চয় নিকটে কোথায়ও আছে। কয়দিন থেকে সে শৈলেনের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। সে চেঁচিয়ে বললে, আর তিনিই বা কি মনে করছেন বলতো মাসী? দু'দিনের অতিথি এলাম—এরই মধ্যে এই কাণ্ড। তিনি ভাবছেন নিশ্চয়—ছেলে ধরা বিদ্যেতে একদম পাকা। শৈলেনের মনে হোল এখুনি ছুটে গিয়ে বলে আসে, যে সে কিছু মনে করেনি। সে শুনতে পেলো বিনীতা বল্‌ছে—আর তুমি আমায় কি মনে কর বল্‌তো—যাকে-তাকে বিয়ে করতে হবে নাকি হ্যাংলার মত?

শেষের কথা কয়টি শৈলেনের কাণে যেন গরম সীসে গলিয়ে দিল। ওর আর বাইরে যাওয়া হোলো না; নিজের ঘরে এসে দোয়াত কলম নিয়ে এক টুকরো কাগজে লিখ্‌লে—

"শ্রদ্ধেয়া—

শুধু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে আমি আপনার অযোগ্য। আর ছি ছি আপনি কি করে বল্লেন ওসব—আমি আপনাদের ওরকম ভাবছি।

উত্তরাকাঙ্ক্ষী শৈলেন

সে চাকরকে দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে দিলে।

উত্তর এলো—"শ্রীচরণেষু শৈলেশ বাবু!

আমি যে ওসব বলে ফেলেছি ঝোঁকের বশে, মাপ করবেন না কি? আপনি যোগ্য-অযোগ্যের কথা লিখেছেন সে প্রশ্নটা নারীর কাছ থেকে আসেনা আসে পুরুষের পক্ষ থেকে। আপনি হয়ত যোগ্য কিন্তু আমি আমার নির্গুণ এবং অযোগ্যতা নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব কি করে?

আর একটা কথা—আপনি যদি কখনও কাউকে বিয়ে করেন—তাকে তেমনি করে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারবেন বলেত মনে হচ্ছে না—প্রগল্‌ভতার জন্য পুনরায় ক্ষমা চাইছি।

ইতি
বিনীতা

বিনীতার সম্পূর্ণ মত আছে। বিয়েটা তার পক্ষে এখন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আর অমতেরই বা কি কারণ থাকতে পারে? শৈলেশ দেখতে সুন্দর সুপুরুষ যুবা। টাকা পয়সা মোটর গাড়ী সবই অপরিমিত। একটু খূঁত তার একবার বিয়ে হয়েছিল। হলেই বা সেও তো একজনকে প্রাণদিয়ে ভালবাসতো; কিন্তু টাকা এবং রূপের জয় যেখানে সে ভালবাসার মূল্য কি পুরুষের কাছে। সে তো অম্লান বদনে বিনীতাকে ত্যাগ করে বিয়ে করতে পারলে। পুরুষদের সে খুব ভালো করেই চেনে। তাই চিঠিতে সে দু'একটা অব্যর্থ বাণ ছাড়তে দ্বিধা করেনি। চিঠি পড়ে শৈলেশ আহত পাখীর মত ছট্‌ ফট্ করতে লাগল। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—

"ওগো করুণাময়ী

যাকেই বিয়ে করি হৃদয়টা আমার অত ক্ষুদ্র নয় একটুখানি স্থান তার জন্যে হবে।

ইতি—শৈলেশ।

চিঠি পড়ে বিনীতার চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তার কাছে এসব পুরাতন। তার উনিশ বৎসর বয়সে সে এরকম অনেক পুরুষ দেখেছে।

তারপর মাসখানেকের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিনীতার পছন্দ হবেনা মনে করে শোবার ঘর থেকে কণার অয়েলপেন্টিংখানা সরিয়ে রাখা হয়েছে।

ফুলশয্যার রাত্রে শৈলেশ বিনীতাকে গভীর সোহাগে বুকে নিয়ে বল্লে—বুঝলে বিনু আমার! তোমার মধ্যে আমি কণাকে পেতে চাই। বিনীতা আঁচলের প্রান্তে হাসি লুকিয়ে উত্তর দিলে—আচ্ছা গো আচ্ছা আমি তোমার অন্তরের কণাটী হয়েই রইব।

অনুযোগ

শ্রীমহমুদা বানু

সে যে মোরে ভুলে গেল
আমি ভুলিনি।
কত তারে সেধে সেধে,
পেনু হায় কেঁদে কেঁদে
চিরসাথী অশ্রুর
নির্ঝরিণী।
একা মোরে গেল ফেলে
বুকের দুয়ার ঠেলে,—
কাঁদে প'ড়ে ব্যথাহতা
মন-হরিণী।
আমার আঁখির নীরে
এস, প্রিয়, এস ফিরে।
যায় ঝ'রে আজি মোর
প্রাণ-নলিনী!

বজ্রদগ্ধা

শ্রী প্রমীলা রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"আর কে বলবে ? রঞ্জন ? সে কোন্ সুপুরুষ যে বলবে ? বুঝেছি, বুঝেছি, সে বুঝি বেচারী রবিবাবুর কবিতা চুরি করে তোকে বলেছে "কৃষ্ণকলি তারেই বলি আমি দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ ; কালো, তা'সে যতই কালো হোক !' এঃ ! তোর মাথাটা একেবারে খাওয়া গিয়েছে দেখ ছি।"

"আচ্ছা প্রণব দাদা, তুমি আমায় ঠাট্টা কর কেন বলতো ? আমি কিন্তু জ্যেঠা মশায়কে বলে দেব।

"কি বলবে ? বলবে যে প্রণব দাদা আমায় রঞ্জনের "কালো হরিণ চোখ লেখা চিঠিগুলো চুরি করে পড়েছে। বল গে এক্ষুণি। বল্লে আমার বিয়ের সন্দেশ তোর বন্ধ।"

"চাইনে আমি খেতে আমার ভাগটা তোমাকে আমি নিঃস্বত্ব হয়ে দান করলাম।" বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মীনা, তাকে ডেকে আনবার জন্যে পা বাড়াতেই প্রণব বারণ করলে, বল্লে "ও এক্ষুণি ছুটে আসবে আবার, যাবে কোথায় ? আমি ওকে তাড়াবার জোগাড় দেখছিলাম—আপনি গেল, ভালই হল। প্রভাসের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ? হয়নি ? আচ্ছা—ডাকছি তাকে।" বলে সে প্রভাসকে ডাকতে গেল।

মীনার এই ঘণ্টা কতকের শ্বশুর বাড়ী মন্দ লাগছিল না। প্রথম শ্বশুর বাড়ীর যে ভয় তা যেন ক্রমেই কেটে যাচ্ছিল। ঘুরে ঘুরে ঘরটার চারদিক সে দেখে বেড়াচ্ছিল—এমন সময় কালিন্দী ফিরে এল, সঙ্গে তার দুটি বউ। বউ দুটি এসে তার কাছে বসতে সঙ্কোচে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল দেখে মীনা এগিয়ে গিয়ে নিজেই তাদের ডেকে নিয়ে এল। নতুন বৌ, যে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে না থেকে সটান কথা বলবে এ যেন তাদের স্বপ্নেরও অগোচর। বউ দুটির মধ্যে বড়টার রং ময়লা, বয়সে বোধহয় মীনার চেয়ে দু এক বছরের বড়ই হবে, মুখ গম্ভীর সবজান্তা ভাব। ছোটটী হাসি খুসী ভাব—রংটা খুব ফরসা যেন বনের পাখীকে এনে, খাঁচায় রাখা হয়েছে, নাম শেফালি, তা থেকে শিউলিই বেশী চলতি হয়ে গেছে। মীনার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে তার মুখটা চুলবুল করছিল—কিন্তু বড় যায়ের অনুমতির অপেক্ষায় সে চুপ করেই ছিল।

এরাই যে কালিন্দীর 'বৌদিরা' তা মীনা বুঝতে পেরেছিল—কিন্তু কে বড়, সে প্রণাম পাবে কি তাকেই প্রণাম করতে হবে এটা বুঝে উঠতে পারছিল না। শেষে ভাবলে যে যদি ওরা ছোট হ'ত তবে ওরা নিশ্চয় তাকে প্রণাম করত—অতএব তা নয়—তাকেই এদের প্রণাম করতে হবে। নীচু হয়ে মীনা একে একে তাদের প্রণাম করতে গেল। বড় বৌ অসিতা বেশ গম্ভীর হয়েই তার প্রণাম নিলে যেন এটা তার অবশ্য পাওনা—শেফালি দু পা পিছিয়ে বললে "না, না আমাকে আর করতে হবে না তুমি আমি বেশী ছোট বড় হবো না।"

মীনা উঠে দাঁড়াল। চারিদিক চেয়ে কালি

কোথাও দেখতে পেলে না। তখন অসিতা, শেফালির সাজ-গোজের দিকে তার নজর পড়ল। হাসি তার খুবই পাচ্ছিল, কিন্তু হাসতে সে পাচ্ছিল না কারণ এঁরা 'বড়ঘর' তাতে সে নতুন বৌ। ভুরু পর্য্যন্ত পাতা টেনে তাতে দুপাশে দুটো ব্রোচ আটকে, সমস্ত গায়ে অনন্ত তাবিজ থেকে আরম্ভ করে বিছে, চন্দ্রহার প্রভৃতি যত গহনা আছে সব পরে, অসিতাকে খুবই ভয়াবহ লাগছিল। তার গায়ে একটা আঙুল বসাবার জায়গা নেই। ঘন নীল রংএর জঙ্গলা বেনারসী জামা কাপড় পরে আর সর্ব্বাঙ্গের গহনা গাঁটীতে সন্ধ্যার অন্ধকারে অসিতাকে কুৎসিৎ দেখাচ্ছিল। শিউলিও গহনা পরতে কিছু ত্রুটি করে নি—কিন্তু তবু ওরই মধ্যে, ক্রিম রংএর পাতলা একখানা সাড়ী পরেছিল আর তার রংটা খুব ফরসা ছিল বলে—তার চেহারাটা সহনীয় হচ্ছিল। কিছু একটা বলবার জন্যে অসিতা, শিউলি দুজনেই উৎসুক হচ্ছিল, কিন্তু কি করে আরম্ভ করা যায়, তা আর ভেবে পাচ্ছিল না—বাড়ীতে শুনেছে, প্রভাতের বউ লেখা-পড়া জানা শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ে শেষে কি বলতে কি বলে ফেলি ঘরে বাইরে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না—কারণ তাদের স্বামী-দের, তাদের ওপর আদেশ ছিল যে এখানের কথাবার্ত্তা সব তাদের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। তাদের এ সঙ্কট থেকে মুক্তি দিল কালিন্দী—সে এসে বললে, "বড় বউদি, খোকা কাঁদছে—মা বললে এখন চল—অন্য সময়ে এসো আবার।"

অসিতা যেন বিষম সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেলে—তবুও যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললে, "ঐ দেখ ভাই আমার ডাক এসেছে—কোথাও কি দুদণ্ড স্বস্তিতে বসবার যো' আছে? বাড়ীর বড় বৌ হওয়া যে কী জ্বালা!"

শিউলী হেসে বললে "হলে কেন ভাই দিদি!

"কপাল—আর কি। আচ্ছা, এখন যাই, আবার সময় করে আসব।" এই টুকুর জন্য এত সাজ গোজ করতে ও হলো, কেন সেগুলো যথাযথানে রাখতে হবে ভেবে তার [illegible] অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল। বৌটা মেয়েদেরও তো কম নয়! গয়নাগুলো দেখলেও না। "তুমিও বুঝি নাকি ছোট বউ?

ভয়ে ভয়ে যায়ের দিকে চেয়ে শিউলি বললে "তুমি একাই যাওনা দিদি, আমি একটু পরে যাব। কালিন্দী, তুই ভাই আর একটু পরে এসে আমায় নিয়ে যাস।

"তা আসব—কিন্তু ছোড়দা বাড়ী এসেই তোমাকে না দেখলে, অনর্থ করবে।"

"আচ্ছা, কর করবে—সে দায় আমার।" অসিতা ও কালিন্দী চলে গেল।—শিউলি এইবার বেশ ভাল করে বসে মীনাকে পাশে বসিয়ে তার মুখখানি তুলে ধরে বললে "তুমি তো ভাই কম সুন্দর নও! তোমার নাম কি ভাই?

মেয়েটীর গায়ে পড়ে আলাপ করা দেখে মীনা খুসী হয়ে উঠলো, বললে—"আমার নাম মীনা।"

"ওতো ডাক নাম, ভাল নাম কি?"

আর নাম তো আমার নেই—ঐ মীনাই আমার নাম।"

"বেশ নাম। কলকাতায় তুমি বুঝি ইস্কুলে পড়তে? আমার ভাই ও পাট আর এজন্মে হল না। রংটা কটা ছিল বলে দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে এদের বাড়ী এসেছি আর বাপের বাড়ী দু-রাত্তির থাকতে পাইনে। এই আট বছর বন্দী হয়েছি এ বাড়ীতে—তা মেয়ে মানুষের লেখা পড়ার পাট এ বাড়ীতে নেই—লেখাপড়া বাদ দিয়ে, খেলা-ধুলো কাজকর্ম্ম যা কর কিছুই মানা নেই, না করলেও দোষ নেই—আমার কিন্তু ভাই লেখাপড়ার বড় সাধ! শুনেছি তুমি খুব লেখাপড়া জানো—আমাকে শেখাবে? আমি রোজ দুপুরে তোমার কাছে পালিয়ে আসব! কিন্তু ভয় ওই দিদিকে। একবার যদি টের পায় তো ঠাকরুণকে বলে দেবে। একেই তো ঠাকরুণ আমায় দেখতে পারেন না—আমার গরীব মা বাপকে, পূজোয় তাঁর ছেলেকে তত্ত্ব-তাবাস করতে পারে না বলে, তা বলে আর কি হবে—সবাই তো বড়লোক হয় না?

মীনা কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে প্রণব প্রভাসকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো—তাই দেখে শিউলি এক হাত ঘোমটা

টেনে খাট থেকে নেমে পড়ে এক ছুট দিলে। দেখে প্রণব ও প্রভাস হো হো করে হেসে ওঠলো।

মীনা বল্‌লে "কি! ও অমন করে ছুটে পালালে কেন?"

হাস্‌তে হাস্‌তে প্রণব বল্‌লে—"কে? ধীরেনদার বৌ তো? আমাদের সাম্‌নে বসে থাক্‌লে যদি আমরা খেয়ে ফেলি? আমরা যে হিংস্র শ্বাপদ বিশেষ।

"কেন? দোষ কি হল এতে?"

"খুব দোষ। আপনি কিছু জানেন না। ছুটোছুটি না করলে লজ্জা করা হয়? এতে শীলতা আর সভ্যতা দুই-ই রক্ষে হয়। দোহাই আপনার। আপনি যেন এমনি করে লজ্জা করবেন না। আমাদের মা নেই—আপনি আমাদের লজ্জা কর্‌লে, আমরা দাঁড়াই কোথায়? ধীরেন্‌দাদের 'মা' আছে—ওদের বৌদের লজ্জা করে চলে। এই দেখুন, প্রভাস এসেছে।"

মীনাও বড় কম মুখচোরা ছিল না—তবুও মাতৃহীন সমবয়স্ক দেওর প্রভাসকে সে বড়'র মত করে বললে "আমাকে চিন্‌তে পারছ নাকি ভাই ঠাকুরপো?"

মাথা নেড়ে প্রভাস বল্লে—"হ্যাঁ"।

জগমোহন ছেলেদের খুঁজতে এসে দেখলেন তারা দুজনে মীনার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। তাঁর অন্তর প্রসন্ন হয়ে উঠলো। ঘরে ঢুকেই তিনি বল্লেন—"তোমার ওই স্নেহের রাজ্যে আমাকেও একটু স্থান দিও মা।" লজ্জায় মীনার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠলো। শ্বশুরের কথার উত্তরে সে কিছু বল্‌তে পারলে না।

রাত্রে শোওয়ার আগে জগমোহন প্রভাতকে ডেকে প্রণবের বিয়ে সংক্রান্ত যত কিছু কথা তাকে জানালেন। তিনি যে বিয়ে দিবেন না বলে লোক পাঠিয়েছিলেন এঁদের কাছে, এঁরা তাতে না দমে, তাঁর হাতে-পায়ে ধরে মেয়ে দেখাতে নিয়ে যায়—তার পরে কি করে তিন চার দিনের মধ্যেই এই বিয়ে ঠিক হয়ে আশীর্ব্বাদ স্থির হয় সবই তাকে তিনি খুলেই বল্‌লেন। প্রণব এখনও জাপান যাবে বলে বসে আছে।

সব কথা শুনে প্রভাত বললে—"আপনি যখন স্থির করেছেন তখন তা কোন অমঙ্গলের হতে পারে না ভালই হবে, রাইপুরের জমিদার ওর শ্বশুর হবেন, এতে ওরও একটা সহায় হবে। মেয়েটী ভাল তো?"

"হ্যাঁ—তা ভালই—তবে একে তো আর অন্তের মত হয় না—মুখশ্রী অতি সুন্দর কিন্তু রংটী খুব ফর্‌সা নয় যা ভবিতব্য তা তো হবে, না হলে এই তো দিন পনের আগেও বিয়ের তো কোনো কথাই ছিল না।"

"আপনি আর কিন্তু করবেননা—হয়তো প্রণবের এতে ভালই হবে। বলে প্রভাত তাঁর ঘরের দরজাটী ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

শোয়ার ঘরে মীনা তখন একাই বসেছিল—সামনের জানালা দিয়ে যত দূর দেখা যায় শুধুই মাঠ, তার পরে নদীর জলের অস্পষ্ট রেখা চাঁদের আলোয় রূপোর পাতের মত চিক্ মিক্ করছে—মীনা ভাবছিল, এই আমার স্বামীর ভিটা, এইখানে এদের পরিবার ভুক্ত হয়ে এদের মঙ্গল কামনা করে দিনের পর দিন কাটাতে হবে। একবার শতদলকে মনে পড়ল। মনটা অব্যক্ত ব্যথায় কেঁদে উঠলো। "মা, মা, আমার তুমি আজ এখন কি অবস্থায় আছ জানিনা হয়তো আমার কথা তুমি ভাবছ এখন—তোমাকে এখুনি কি করে জানাই যে আমি ভাল আছি মা। তার এই ভাবনায় বাধা দিয়ে প্রভাত ঘরে এলো—বিছানার ওপর বসে স্তব্ধ মীনাকে কোলের ভিতর টেনে নিয়ে খুব কোমল স্বরে প্রভাত বল্‌লে "মায়ের জন্যে মন কেমন করছে? তার কোলের ভিতরেই মুখ গুঁজে মীনা বললে "যাও। আমি বুঝি তাই বলছি।

"না বললেই হল। আমি বুঝি বুঝতে পারিনি? এ ব্যাপার তো প্রতি ঘরে ঘরে রোজই হচ্ছে। এতো নতুন নয়। তবে এ দুঃখ কেন?"

"না, এ ব্যাপারও নতুন নয়, আর এই যে দুঃখু এও নতুন নয়, কিন্তু তবুও এগুলো হবেই। কিন্তু তাই বলে তোমার টান্‌টাও কম ভেবোনা।"

তার গালে ছুটো আঙুল দিয়ে ঘা মেরে প্রভাত বল্‌লে—"তাই-ই হয়ে থাকে। এর পরে তুমি যখন ছেলে পিলের 'মা' হবে, তখন হাজারিবাগ যেতেও আর খুব ইচ্ছে হবে না।"

"হ্যাঁ—তাই হয়। যা' তা বললেই হল। কক্ষণো তা হয় না।"

"হ্যাঁ গো মশাই তাই হয়। ভালকথা, শ্রাবণের ১৮ই প্রণবের বিয়ে, তা জানো? তা হলে কাল গিয়ে আবার পূজোর আগেই তোমাকে আর একবার ফাঁকি দিয়ে দেখতে পাব। আমার তো এখন থেকেই নাচতে ইচ্ছে করছে।"

"তুমি কি কালই যাবে? আর একদিনও থাকতে পারো না?"

"না—আর তো থাকার যো নেই মীনু—না হলে থাকতে অরুচি কার বল? আমি চলে গেলে ঠান্দি তোমার কাছে শোবেন—ঠান্দির বুড়ো ছাড়লে হয়!..."

"আমি একাই শুতে পার্ব—আমার ভয় করে না।—"

"তুমি পার্লেও—আমি তা দিতে পার্ব না—"—

"আমিও তোমার জায়গায় কাউকে নিতে পারব না।"

"বেশ তো—মাটীতেই শুয়ো দুজনে।—আর তো আপত্তি নেই।"

"হ্যাঁ—তা বরং হতে পারে। কাল আবার শুনছি কি লোক খাওয়ানো আছে।"

"আছে—কাল যে তোমার বউ ভাত।

"এসো—শুয়ে পড়ি।"

পরের দিন সারাদিন লোক খাওয়ানোর গোলমালে কাটিয়ে বিকেলের দিকে প্রভাত ঘুমিয়ে পড়েছিল। ট্রেণের সময় চলে গেলে তার ঘুম ভাঙল। উঠে বসে দেখলে রাত বেশ হয়েছে—ট্রেণও চলে গেছে; কাল্‌কের ছুটীটা বিনা বেতনেই নিতে হবে—তা হোক, এখানে থাকার মেয়াদ তো একদিন বাড়লো—মনে মনে খুসী হয়ে সে মীনাকে এই সুখবরটা দিতে চললো।—

ভেতরে গিয়ে দেখলে, ঠান্দি তাঁর জ্ঞান মত মীনার চুল বাঁধায় মন দিয়েছেন, আর কালিন্দী বসে আছে। দূর থেকেই সে বললে, ঠান্দি, "আজ আর আমার যাওয়া হল না।"

একসঙ্গে কালিন্দী ও ঠান্দি বলে উঠলেন, "তা তো জানতামই ভাই।" পরে মীনার মুখখানা জোর করে ঘুরিয়ে ঠান্দি বল্লেন, 'চুলটা তবে তুই আজ নিজেই বাঁধ নাত বৌ, আমার বাঁধা আজ থাক।"

মীনা খোলা চুলগুলি দুলিয়ে উঠে দাঁড়াল—বললে "থাক্‌গে।' প্রভাত যে আজ যাবে না, এই ছুটো কথাই তার মনে যথেষ্ট পুলক এনে দিয়েছিল।

৯

আবার পূজোর ছুটি। প্রণবের বিয়ে হয়ে গিয়েছে—বৌ সুনন্দ খুব চালাক মেয়ে। সাধ্য-মত সে মীনাকে চটায় না—কারণ প্রণব যে জাপানে গিয়েছে এবং সেখানে সে যে এখনো থাক্‌তে পারছে সে শুধু প্রভাতের জন্যে—মীনাকে চটালে যে প্রভাতও চটবে, এ সোজা কথাটা সে বুঝে নিয়েছিল। সবার সঙ্গে মিশে সে সবার মনের কথা জেনে নিতো, কিন্তু তার মনের কথা কেউই জান্‌তে পার্‌তো না।

বিয়ে, ফুলশয্যা, বৌভাত, সুতো খোলা ইত্যাদি, বিয়ের যত কিছু আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান সেরেই প্রণব দেশলাইএর কাজ শিখতে জাপান চলে গেল। খেলনা তৈরী শিখতেও ইচ্ছে ছিল। দেড় মাস সে গিয়েছে—প্রতি মেলে সবাইকে চিঠি লেখা ও কারো চিঠি পেতে দেরী হলে অভিমান করা যেন তার মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

স্বামীর কাছ থেকে সুনন্দা যে চিঠিগুলো পায়, তা পড়ে তার মন খুসী তো হয়ই না—উপরন্তু জলে ওঠে। উপদেশ ভরা চিঠিগুলো মুঠোর ভিতর পাকিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দাঁতে দাঁতে চেপে বলে, "বাবাকে দেখো, বৌদির কথা শুনো, প্রভাস, প্রশান্তর যত্ন করো—নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখো—" ব্যস্ আর কি হয়ে গেল! গুরুমশাই উপদেশ দিলেন—মিটে গেল। নীচে যেখানে "তোমার প্রণব" বলে নাম সই করা থাকে, সে জায়গাটা ছুরি দিয়ে, না হয় সেফটিপিন দিয়ে চিরে চিরে "তোমার" কথাটা উঠিয়ে দিয়ে, বলে "তোমার! কিসের জন্যেইবা এটা লেখা? আমার তো নয়ই, কার যে তাও আমি ঠিক জানিনে।" রেগে সেও চিঠি লেখে "তোমার চিঠি পেলাম। তোমার কথামত কাজ করতে চেষ্টা করছি—ভাল আছি। প্রণাম জানিও। সেবিকা নন্দা"। সরলমনা প্রণব এই চিঠি পেয়েই খুসী হয়ে

যায়, ভুলেও তার মনে হয়না এটা রাগের চিঠিও হতে পারে!

সুনন্দার দিন এম্‌নি ভাবেই কাট্‌ছিল—'মেল—ডে' যেদিন সেদিন চিঠি পাওয়ার জন্যে যেমন তার ব্যাকুলতার শেষ থাক্‌ত না—পেলেও তেমনি বিরক্তির শেষ থাক্‌ত না। মীনা জিজ্ঞাসা কর্‌ত "ঠাকুরপোর চিঠি এল? কেমন আছেন? তোর চিঠি লেখা হলে দিস্ পাঠিয়ে দেব।" উত্তরে, সে বাইরে হাসিমুখে, খুসীভাব দেখিয়ে বল্‌তো "দেব ভাই দিদি, তোমার চিঠিতে কি লিখেছে, দেখাবে?"

"ওমা, দেখাবনা কেন? দাঁড়া, আনি" বলে মীনা চিঠিখানা এনে তার কোলে ফেলে দিয়ে বলে "পড়—পড়ে মুখস্থ করে নে। ঠাকুরপোর চিঠি পড়ে পড়ে তোর আশ আর মেটে না? না?

"ঠিক—ধরেছ। নিজের মন দিয়ে লোক পরের বিচার করে।"

"আহা! মেয়ের কথার যে ছিরি!" বলে হেসে মীনা উঠে যায়।

সুনন্দা চিঠিটা নিয়ে গিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে, বসে বসে পড়ে—যতক্ষণ পড়ে ততক্ষণ তার মন জ্বালা করে—পড়া শেষ হলে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে—চোখ বেয়ে হু হু করে জল আসে। ভাবে, কেন তার ওপর এ অবহেলা? এই তো মীনাকে সে কত কথাই লিখেছে—কত দেশ বেড়িয়েছে, কেমন কাজ শিখ্‌ছে—কোথায় কি ভাবে সে আছে, এমনি কি কি খায় সেখানে তা পর্য্যন্ত লিখ্‌তে যে ভোলেনি, শুধু তাকে চিঠি লিখতে গেলেই, সে মানুষ সব ভুলে, শুধু নীরস কর্ত্তব্যের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে ও দায়-ঠেলা চিঠি কি না লিখলেই নয়! এবার সে আর এই চিঠির উত্তর দেবেনা—দেখা যাক্—তার চিঠি না পেয়ে সে ব্যস্ত হয় কিনা! হাঁ ঠিক এবার চিঠি না লেখাই স্থির!

মীনা কিন্তু এ সব কিছুই জানলে না—প্রতিবারের মত এবারেও চিঠি চাইতে এসে সে শুনলে লেখা হয়নি। শরীর ভাল নেই। আশ্চর্য্য হয়ে মীনা বল্‌লে "লেখা হয়নি? শরীর ভাল নেই? এ সব কি কথা? শরীরে তো তোমার কিছুই হয় নি নন্দা! যদি কিছু হয়ে থাকে, সে মনে। কিন্তু চিঠি লিখবে না, প্রতিজ্ঞা করার আগে, ভেবে কেন দেখলে না যে তোমার চিঠির অপেক্ষা করে সে যখন চিঠি পাবে না—তখন সে কত ভাবিত উদ্বিগ্ন হবে! তার উৎসাহে কতটা বাধা পড়বে! অভিমান, ততক্ষণই ভাল, যতক্ষণ সে আত্ম-রক্ষক; পর-পীড়ক হলে তার আর দাম থাকে না। আমি কিন্তু কখনো এমন কর্‌তে পারিনে, কোন দিন করিনিও।"

সবাই তো আর ভাসুর নয়! আমার চিঠি না পেলে তার ক্ষতি কিছুই হবে না দিদি

"ওঃ পুরোপুরি অভিমান! ঠিকই ধরেছি—একটু আগে জান্‌তে পারলে ঠাকুরপোকে মানভঞ্জনের' পালা লিখতে বল্‌তাম! তোর প্রতিজ্ঞার দাম আছে ভাই—আমি হলে শেষ পর্য্যন্ত চিঠি না লিখে থাক্‌তে পার্‌তাম না।"

সুনন্দা কিছু না বলে চুপ করে রইলো—মনে মনে বল্লে, "স্বামীর অগাধ ভালবাসা পেলে, এসব বক্তৃতা আমার মুখ দিয়েও বেরোয়! সেদিকে তো ভগবান্ কম দেননি কিছু তাই তোমার এত উপদেশের ঘটা। লিখব না তো চিঠি-যতদিন না চিঠির ভাষা বদল করে। যাকে ভালবাসা যায়, অভিমান তার ওপরেই আসে—সুনন্দা, তার আপন-ভোলা স্বামীকে যে কদিন কাছে পেয়েছিল, তাতেই অত্যন্ত রকম ভালবেসে ফেলেছিল তাকে—তাই তার সামান্য ত্রুটীও তার সহ্য হচ্ছিল না। দেবতাকে সে দেবতার আসনেই দেখতে চায়। মীনা যে কথাগুলো বল্‌লে সেগুলো যে তার মনে হয়নি, তা নয়—কিন্তু এবার সে আর নরম হ'তে চাচ্ছিল না। "জাপানী মেল" তার চিঠি না নিয়েই চলে গেল।—

দক্ষিণ ভারতের নৃত্যকলা

নৃত্যকলা পটু কুমারী এনাক্ষী রমা রাওর নাম আজ ছায়া-চিত্র দ্রষ্টার নিকট অবিদিত নেই! কিন্তু এটা হয়ত অনেকে জানেন না যে তিনি নৃত্যকলাশিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে পৃথিবীতে একজন নামজাদা নাচিয়ে হয়েছেন। বিশেষ তার দক্ষিণ ভারতের নৃত্যকলা একটা দেখবার জিনিষ। এইস্থানে প্রকাশিত কয়েকটি ছবিতে তার বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ করছে।

কুমারী এনাক্ষীব নৃত্যের এই দুটা অবস্থাতেই তার লাজুকতার ভাব ও মোহিনীরূপ বুঝাইতেছে।

মিস্ রমা রাওর নাচের আর দুই অবস্থা

মিস্ রমা রাওর নাচিবার
পূর্ব্বে প্রার্থনার অবস্থা

এই অবস্থায় আনন্দ প্রকাশ
বুঝাইতেছে

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য।
অজন্তা গুহায় এইরূপ নাচের
মূর্ত্তি আছে।

কুমারী এনাক্ষী রমা রাও এম্-এ,

বিপ্লবের পূর্ব্বে রাশিয়া

শ্রীসুধাংশু কুমার মিত্র বি, এস, সি

ইতিহাস—

চিরন্তন প্রথাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে যারা জয়ী হতে পেরেছে তাদের নাম সকল সময়ের জন্যই পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা হয়ে গেছে। তাই যেদিন রাশিয়ার বলশেভিক্‌দল 'রাশিয়া-সম্রাট্ জার' ও তাঁর আমলা-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে পৃথিবীর বুকে মানুষ যে কেবল

নিজেদের ভিতর অসন্তোষের আলোচনা

(হাজার হাজার মানুষ অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে ছিল। দেশের কর্ত্তৃপক্ষ তাদের অবস্থার উন্নতি বিষয়ে কোন সুবন্দোবস্ত করেন নি। ভয় আছে শিক্ষা পেলে তাহারা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কিন্তু বুদ্ধি ভোঁতা থাকলেও জনসাধারণ শাসক শ্রেণীর মনোভাব বুঝতে পেরে নিজেদের উন্নতির জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।)

তার অভিজাতবংশের জন্মের দোহাই দিয়ে প্রভুত্ব করতে পারবে না, এই মর্ম্মবাণী ঘোষণা করলে তখন থেকেই ধনীর আমলাতন্ত্র এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। মধু সংগ্রাহক পাখীর মত রাশিয়ার অবস্থা যখন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট মধু পরিপূর্ণ ফুল, সে সময় ফুলের মধুকে ঘোর বিষাক্ত হলেও যেমন পাখীকে তা থেকে নিবৃত্ত করা যায় না, রাশিয়ার অবস্থাকে ভয়াবহ ও বিকৃত ভাবে রূপ দিলেও মানুষ তাকে ঠিক সেরূপে গ্রহণ করলে না। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর হতেই রাশিয়াকে জানবার জন্য যেন মানুষের মন আরও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে! এবং এই ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে চলেছে।

মস্কোর ঘণ্টা

(এই ঘণ্টাটা পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম আশ্চর্য্য। ইহা খাড়ায় ২৬ ফুট বেড়ে ৬৬ ফুট, উহার ওজন ২০০ টন। ১৭৩৫ সালে এই ঘণ্টাটা মস্কোতে স্থাপিত হয়। তারপর একবার বাজ লেগে ১১ টন ওজনের একটা অংশ খসে পড়ে। ১৮৩৬ সালে ঘণ্টাটা মাটির মধ্যে গেঁতে গিয়েছিল। পরে জারের আদেশানুসারে ইহাকে আইভান হেলিকি নামক স্থানে স্থানান্তরিত করে এই ভাবে রাখা হয়েছে।)

ধনীর খেয়াল চরিতার্থ করতেই যে শ্রমিক মাত্রেরই জন্ম এই ধারণা যখন জার্ম্মান যুদ্ধের পর থেকে ঘোরতর ভাবে শ্রমিকের মনের মধ্যে দেখা দিল, সেদিন থেকেই শ্রমিকদের মন রাশিয়ার দিকে ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে! বলশেভিক-বিরুদ্ধ-দলের প্রচারের ফলে রাশিয়া বলতেই সাধারণ মানুষের নিকট বলশেভিকের ভয়াবহ রূপ মনে পড়ে! এই সব লোকেরা বলশেভিক-দলকে বর্ব্বর, রক্তলোলুপ দানব এই রূপে পৃথিবীর এক

প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্য চালাচ্ছে! এর ফলে সাধারণ মানুষই যে কেবল বলশেভিকদের নাম শুনলে শিউরে উঠে তা নয় বড় বড় রাজপুরুষেরাও ওদের বিশেষ ভয়ের চোখে দেখে! সোভিয়েট বলশেভিক গণতন্ত্র "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা" এই বলে দাবী করে; কিন্তু প্রজাদের অবস্থা এই পর্য্যন্ত না পৌছিলেও বর্ত্তমান বলশেভিক রাশিয়া 'জারের' সময়ের রাশিয়া হতেও মুক্ত, স্বাধীন ও উন্নত এ অস্বীকার করবার উপায় নেই! রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চে আজ বলশেভিক নাটকের যবনিকাপাতে বিয়োগান্ত কি মিলনান্তের স্থির হবে—তার আগে এর আলোচনার রূপই নষ্ট হবে কোন কাজ হবে না।

বরফ ব্যবসায়ী

(রাশিয়ার বহু ব্যবসায়ী মানুষ এই বরফের কারবার করে বড় লোক হয়েছে। তাহারা বছরের প্রারম্ভে মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে রাখে জল পড়িলেই এখানকার ভয়ানক ঠাণ্ডায় ঐ সব গর্ত্তের জল বরফ হয়ে যায়; সেগুলি তাহারা নগরে নগরে বেচে।

যে কোন দেশের বিষয় জানতে হলে সেখানে যারা [illegible] তা[illegible] নিকট হতেই [illegible] জ্ঞান পাওয়া যায়। [illegible]শিয়াতে যেহেতু আমাদের দেশী লোক বিশেষ যায়নি সেজন্য এই দেশের বিষয়ে জানতে হলে আমাদের অন্য কোন বিদেশী ভাষার সাহায্য নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। অবশ্য সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া সম্বন্ধে প্রবন্ধ হতে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সেই জন্য রাশিয়ার বিষয়ে জানতে হলে আমাদের ইংরাজি ভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে চলতে হলে রাষ্ট্রজগতের সকল আন্দোলনের খবরাখবর জানা প্রয়োজন! কার্ল মার্ক প্রবর্ত্তিত সাম্যবাদের কথা না জানা থাকলে বলশেভিক ঠিক রূপ পাওয়া একটু কষ্টকর! যদিও সাম্যবাদ কি ইহা এক কথায় বুঝনো সম্ভবপর নয় তা হলেও সহজ কথায় দুবেলা
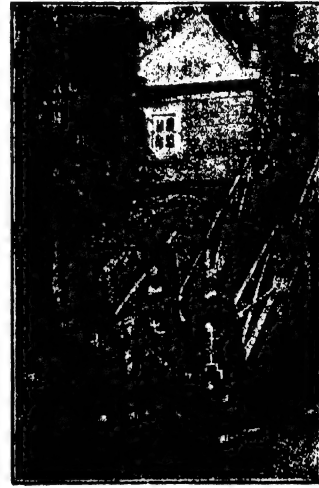
ভলগজ প্রদেশের ভ্রাতৃসংঙ্ঘ।

দু মুঠা সংস্থানের সমাধানকে সাম্যবাদ বলা চলে! চীন দেশের ধর্ম্মপ্রচারক কনফুচিয়াছ বলেন—বস্তুর আকৃতি জানতে হলে, আয়নার যেমন দরকার হয়, সেইরূপ বর্ত্তমানকে বুঝতে হলে অতীতের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন (As we use a glass to examine the forms [illegible] thing s [illegible] we must use autiquity in or ler to nderstand prsent).

এই জন্য বর্ত্তমান রাশিয়ার অবস্থা লেখার প্রারম্ভে আপনাদিগকে একটু অতীতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করি—

ইউরোপ মহাদেশের পূর্ব্বদিকে প্রায় অর্দ্ধভাগ জুড়ে রাশিয়া! প্রাচীন রাশিয়ার রাণী ছিল এই দুই মহাদেশের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রী। পিটার দি গ্রেট রাশিয়াকে ইউরোপী ভাবাপন্ন করাতে সকলে বিশেষ দুঃখিত হয়েছিল, কারণ

তাহাদের মতে ইউরোপীয় সভ্যতা তাদের ধাতু অনুযায়ী নয়! ইউরোপীয় রুশরাজ্য নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা ভাষার মানুষের দ্বারা সমাকীর্ণ! এর ভিতর শ্লাভ জাতির সংখ্যাই ছিল অধিক! তারপর ফিন জাতি। রাশিয়াতে তিন কোটী তাতার জাতির বাস ছিল! সেই সময় এই তাতার জাতি রাশিয়ার বিজেতা ও শাসক ছিল কিন্তু ভাগ্যবিবর্ত্তনে এই জাতিও বিজিত ও শাসিত! ইহাদের মধ্যে ১ কোটী ২০ লক্ষ লোক মুসলমান! ইহার উপরেও আর্টিক সমুদ্রের উপরও বহু আদিম জাতি ও উপজাতির বাস! ইহারা সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে খুব মিলে! এই জন্য এস্থান আর্য্য জাতির উৎপত্তির স্থান বলে অনেকে নির্দ্দেশ করেন! সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণের পর হইতে কিছু কিছু জার্ম্মাণ রাশিয়ায় বাস করতে আরম্ভ করে।

জারের রাজত্বের সময়ের ক্ষমতার মেরুদণ্ড সৈনিক সকল।

অসংখ্য জাতির, ধর্ম্ম ভাষা ইত্যাদির অপূর্ব্ব লীলা নিকেতন এই রাশিয়া স্বেচ্ছাতন্ত্র সম্রাটবংশের কঠোর-শাসনের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল! রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিজেতা সকল সুইডেনের মধ্য দিয়েই আসে! রুড়িক ও তার অনুচরবর্গ সুইডেন হতে এসে শ্লাভদিগকে পরাস্ত করে 'মস্কোতে' রাজধানী স্থাপন করেন। শ্লাভদিগকে তারা "রাশ" (Russ) নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই থেকে এই ভূমিখণ্ডের নাম রাশিয়া (Russia) হয়েছে। পরে রড়িকরের এই দাবী শ্লাভ জাতির সহিত মিলে যায়! প্রাচীন রাশিয়ার অধিবাসী সকল দুইভাগে বিভক্ত ছিল (১) অভিজাত সম্প্রদায় (aristocrats*) (২) শ্রমিক সম্প্রদায়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় (middle class) বলে প্রাচীন রাশিয়ায় কোন সম্প্রদায় ছিল না! সকলের উপরে 'জার' নামে অভিহিত স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায় ও তার নীচে অভিজাত সম্প্রদায়। এই অভিজাত সম্প্রদায় এবং তাদের আত্মীয় ও তাদের আশ্রিতদের দ্বারা পরিতুষ্ট আমলাতন্ত্র এই প্রকাণ্ড রুশ সাম্রাজ্য শাসন করত। এদের নিয়ে ছিল শ্রমিকদল। কিন্তু পরে ধনী অভিজাত সম্প্রদায় ও দরিদ্র শ্রমিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তার উকীল, শিক্ষক প্রভৃতিদের নিয়ে একটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় (বুর্জোয়া) সৃষ্টি হয়েছিল! এই সব সম্প্রদায়ের ক্ষমতার কোন সীমা ছিল। ফলে ধনীক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভিতর শত্রুদের ভাব আগা গোড়া দেখা যায়। প্রাচীন রাশিয়া বলতে প্রথমেই সম্রাট জারকেই বুঝায়। জারের ঘোষণা—"আমার সিংহাসন ভগবানের বেদী, এর নীচে দাঁড়ান তোমাদের ধর্ম্ম, আমার আদেশেই ভগবানের বাণী আর এই আদেশ পালন করাই তোমাদের ধর্ম্ম। এর সাক্ষী—এই ভাবেই রোমানভ বংশের বংশধর সকলে তিনশ বছর মানুষের জীবন মরণ নিয়ে ইচ্ছানুরূপ খেলা করেছিল। রাজকর্ম্মচারীরাও এই খেয়াল চরিতার্থ করতে সিদ্ধ-হস্ত ছিল। কোন প্রজা এক সময়ে জল খেতে নারাজ হলে সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণ বলেছিল "আমি তাকে জলের কাছে আনলুম আর গণ্ডটা জল খেতে ত নারাজ হল"

নদীর উপরকার জল বরফ হয়ে গেলে তার উপর দিয়ে হরিণটানা স্লেজ গাড়ী।

(we brought him to the water and the fool refuses to drink.)

রুশ নরনারীর ঘরোয়া জীবন জ্বালাময় ও দুঃখময় ছিল তাতে আনন্দের কোন নেশাই ছিল না। এই চিরন্তন দুঃখ শ্রমিক সম্প্রদায় না সইতে পেরে 'ভড্‌কা' নামে দেশীয় মদ খেয়ে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে কোন মতে জন্তুর মত দিন নির্ব্বাহ করত। শ্রমিক সম্প্রদায়কে দাস সম্প্রদায় বললেও ভুল হয় না কারণ বেশীর ভাগ শ্রমিকই অর্থনৈতিক গোলাম (serf) ছিল!

এই শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রেণী. বিভাগ দেখা যায়। এই শ্রমিকদের সকলের নীচে ছিল কৃষকরা। যারা মাটী চাষ করে জীবন ধারণ করত! তাদের উপর জমীওয়ালা দল। তাহার উপর জমীদার শ্রেণী! এই সব লোকেদের অভিজাত সম্প্রদায়রা ঘৃণা করত! রাশিয়ার যত আবাদ করবার জমি ছিল তার ভিতর ১০ ভাগের ৯ ভাগ সম্রাট ও অভিজাত সম্প্রদায়ের খাস করা ছিল—এই সব জমীতেই কোটী কোটী রুশ প্রজা দীন-মজুরের দরে গোলামের মত কাজ করত। এ সব ছিল উচ্চ সম্প্রদায়ের ঘরোয়া সম্পত্তি। জারের বেত, পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গীন খোঁচা, যাবজ্জীবন সারভিয়াতে নির্ব্বাসন প্রভৃতি দণ্ড দিয়া জারের আমলাতন্ত্র অভিজাত সম্প্রদায়কে এই প্রভুত্ব করতে সাহায্য করত। এমন কি গরু ঘোড়ার দরে শ্রমিকেরা বাজারে ক্রীত হত। ১৮০১ সালের মস্কো গেজেটে প্রকাশ ;- য অন্যান্য বস্তু ছাড়া, তিনটী সুন্দর ও সুদক্ষ কোচম্যান, দুজন বালিকা ১ জনের বয়স ১৮ বছর ও অপর জনের ১৫। দুজনাই সুকার্য্যক্ষম ও খুব ভাল চুল বাঁধতে পারদর্শী দুজন দাসী বিক্রয় করা হবে—এর পর পিয়ানো ও অর্গ্যান বিক্রয় করা হবে। মানুষের ওপর এর চেয়ে কি ভীষণ অত্যাচার হতে পারে। মনুষ্যত্বের কি ভীষণ অবমাননা?

রাশিয়ার জন সাধারণ নিরক্ষর ছিল, তাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাদের মন ধর্ম্মান্ধতায় ও কু-সংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের অত্যাচারে তারা সদা ব্যতিব্যস্ত ছিল। জাতি হিসাবে তাদের স্থান সব চেয়ে নীচে ছিল, বিপ্লবের পরেই তাহারা বলত—we are dark people. we are kept in darkness, our hearts are dark in darkness." সম্রাট আলেকজান্ডারের সময়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা তুলে দিয়ে তার স্থানে মরা লাটীন আর গ্রীক্

শ্রমিকদের কন্যা।

শিক্ষার ব্যবস্থা হল! আধুনিক দর্শনশাস্ত্র মধ্যতালিকার বহির্ভূত হল। কারণ বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র পড়ে তরুণ ছাত্র সকল রাশিয়ায় সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হয়েছিল! স্থানে স্থানে বিপ্লবও দেখা দিয়াছিল! অভিজাত সম্প্রদায়ে শিক্ষিত ছিল। রাশিয়ায় অনেক বৈপ্লবিক নেতা অভিজাত বংশসম্ভূত ছিল! মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ত শিক্ষিত ছিলই। এই দুই সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করেছিল। এর ফলে রাশিয়ার শিক্ষা চর্চ্চা জার্ম্মাণীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল!

রাশিয়ার জনসাধারণ চির পরাধীন ও প্রপীড়িত বলে সাহিত্যের ভিতর দিয়েই তাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়! ভারতবাসীর ন্যায় রাশিয়ার জন সাধারণের

ভাগ্যের উপর বেশী বিশ্বাস স্থাপন করে। (philosophy of luck) পরকালে ইহকালের সকল দুঃখের অবসান আছে এই বিশ্বাস থাকায় রুশ জাতির ভিতর 'মিস্‌টিক (mystic) ভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই মিস্‌টীক ভাবটা তার সাহিত্যের মধ্যে ভাল ভাবে ফুটে উঠেছে! সাহিত্যে গোগলের পর টলষ্টয় পর্য্যন্ত বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ভাবের লেখার পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয়, রুশ সাহিত্যের মত বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ আর কোন সাহিত্যে নেই। টার্টার বংশসম্ভূত টুর্গেনীভ্-সা হত্যা হতে এই নূতন চিন্তার স্রোত বাহির হয়! শিক্ষিত রুশ তরুণ প্রাচীনত্বকে বিসর্জ্জন দেবার জন্য কবির কথা মতন 'একটা নতুন কিছু কর' (নেতি নেতি) এই ভাবের সৃষ্টি করে যায়। তার পরে তারা "নিহিলিজ্‌ম" এই কথার সৃষ্টি করে। নিহিলিজ্‌ম অর্থে—এই বর্ত্তমানের সকল বিশ্বাসকে চূর্ণ করো, পুরানো সব ফেলে দাও, নূতন কর। তারপর আসলেন ঋষিপ্রতিম, টলষ্টয় তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করলেন। প্রেম, বিনয় স্বার্থত্যাগ আর অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার এই সবই কেবল জগতে শান্তিরাজ্য স্থাপন করতে পারবে।

এরপর থেকে আরম্ভ হল আমলাতন্ত্রের কঠোর শাসন ও প্রজাতন্ত্রের নিপীড়ন। সকলে টলষ্টয়ের মত রাখলে না *বাকুনিন ক্রপট্‌কিনের 'এ্যানারকিষ্ট কমিউনিজ্‌ম' (অরাজতন্ত্রের) বিকৃত ভাবে যুবকদের মধ্যে দেখা দিল। ফলে অশান্তির অনল চারিধারে জলে উঠল। অশেষ নির্য্যাতন লোকের উপর আরম্ভ হ'ল। এর মধ্যেই অর্থনৈতিক কারণবশত ১৯০৫ সালে সমস্ত রাশিয়া জুড়ে হল একটা ধর্ম্মঘট (general strike).

কিন্তু ধর্ম্মঘট টিকল না আর বিপ্লবীরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। তারপর ক'বছর ধরে তারা দল সংগঠন করতে থাকে। অবশেষে ১৯১৭ সালে রুশ সেনাবাহিনী জার্ম্মাণ দ্বারা পরাজিত হয় সেই সময় মার্চ্চ মাস হতে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ বশতঃ বিপ্লব আরম্ভ হয়। সেই সময়ে বলশেভিক দলের বাহিরের আর সকল রাজনৈতিক দল বিপ্লবে যোগ দেয়। পরে সেপ্টেম্বর মাসে লেনিনের অধীনতায় বলশেভিকদল আর একটা বিপ্লব করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারপরে ব্রেষ্টলিটস্ক নামক স্থানে জার্ম্মানদের সহিত সন্ধি করে যুদ্ধ শেষ করে! রুশবিপ্লবের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকাপাত এইখানেই হইল।

লেনি-কে নিকৃষ্ট করে দেখাতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন কিন্তু পার্লামেণ্টে সদস্য ল্যান্সবারীর মতে তাঁকে এই ভাবে অভিহিত করলে ঠিক হয়—The world is my country, to do good is my religion, all mankind are my brothers.

* বাকুনিনের মতে মানবজাতির মুক্তির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুটা, (১) ঈশ্বরে বিশ্বাস (২) রাষ্ট্রের উপর বিশ্বাস।

একটী সংসারের একটী মণি

—গল্প—

শ্রীবিরাম কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

—সুভী…

—যাই মা,

তিন তালার রান্নাঘর হইতে জবাব আসে।

সঙ্গে সঙ্গে তেতালার রান্নাঘর হইতে ভাতের থালা লইয়া যে নীচে নামিয়া আসে তাহারই নাম—সুভী। বাড়ীতে ছেলেপিলে ঝি চাকর সবারই মুখে 'সুভী' এই আদরের নামটী সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া গেলেও কাগজ কলমের মুখে আসিয়া যাহা দাঁড়ায় তাহা—সৌরভী।—এই মেয়েটীরই নাম।

—রবুনকে খেতে দিলি মা?

—এই যে, দিই মা, দুধ গরম হয়নি বলেই ত দিতে দেরী হল,—রবুন্!

…একটী আড়াই বছরের ছোট্ট ছেলে আসিয়া ভাতের থালাটী অধিকার করিয়া বসে। এমনি ছেলে, খাওয়ার সময় পাতের কাছে কেহ বসিয়া না থাকিলে একটী ভাতও দাঁতে কাটিবেনা অথচ যদি কেহ গোছাইয়া গাছাইয়া খাওয়াইয়া দিতে যায়, তাহা হইলেও রবুবাবুর মুখে কিছু রোচেনা, ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সৌরভীর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে।…এমনি সম্বন্ধ এই দুইজনাতে।…বাড়ীতে যে আর এমনি দু একটি কচি কাঁচা নাই তাহা নহে—তবে তাহাদের জন্য সৌরভীকে আর এতটা "ঝক্কি" পোহাইতে হয় না।

সৌরভী বাড়ীর বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ে।

বিবাহযোগ্যা হইলেও বিবাহ হয় নাই।…ছোট খাটো তাহাদের সংসারের সব কিছু দায়িত্ব প্রায় তাহার ওপরেই। বড় ও ছোট বোনের কর্ত্তব্যকেও ইচ্ছা করিয়া সে নিজের ওপর টানিয়া লয়। মা বিধবা মানুষ, তাহার উপর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কোন কিছু পরিশ্রমের কাজ করিতে গেলেই পেটের বেদনায় আই-ঢাই করিতে থাকেন।…বড় বোন শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ী আসিয়াছে দু'দিনের জন্য,—ছোট, দশটার মধ্যে পড়াশুনা স্নান খাওয়া শেষ করিয়া বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে স্কুলের বাসের অপেক্ষায়, সুতরাং বোনদের সহিত বারোমাস পাল্লাপাল্লি করিয়া কাজ করিলে সংসার চলেনা।

তাহা ছাড়া—

বড় ভাইয়ের মা-খেগো ছেলে রবুন্। রবুনের ভার আর কারো ওপর দিয়া সৌরভীর মন ওঠেনা। এমন কি, নিজের মায়ের কাছে রাখিয়াও একদিনের কথা দূরে থাকুক্—দু'দণ্ডের জন্য কোথাও পা বাড়াইয়া তার স্বস্তি নাই।

ইহার উপরেও—

ভাইগুলির খেজমতও কি তাহাকে কম খাটিতে হয়?—সকাল হইতে অমনি করিয়া প্রত্যেকটী খুঁটি নাটি সারিয়া খাওয়া দাওয়ার পর্ব্বশেষ হইতে কোন' কোন' দিন একটা বাজিয়া যায়। বারমাসের তের পার্ব্বণের কথা ছাড়িয়া দিলেও,—বাড়ীতে পাঁচটী অতিথি, আত্মীয় আসিলেও এই নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম নাই।

…এ সংসারটী যেন সৌরভীরই একা—

—কলের পুতুল এই সুভীকে দিনরাত খাটিতে দেখিয়া কেহই আশ্চর্য্য হয় না; আশ-পাশ গৃহস্থরাও জানে, এই বয়সে সৌরভী এমনি করিয়া হাড় জল করে কেন,—সংসারের সমস্ত "খেজমত" একা সে শেষ করিলেও তাহারা জানে মেয়েটী মা-বাপের মুখ চাহিয়া

এতটা করেনা। যাহার জন্য করে, সে তাহার রবুন্।

—প্রয়োজন অপ্রয়োজনে মা-খেগো এই রবুনের বুলি লাগিয়াই আছে—সুভী কোথায়?

সুভী যখন যেখানেই থাকুক্ মাতৃ-হৃদয়ের আবেগাকুল জবাব আসে, কি বাবা,—এই যে আমি!

……এমনি করিয়া সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ভিতর দিয়াও সৌরভীর মধ্যে মাতৃ-স্নেহের অঙ্কুর গজাইয়া ওঠে!…নিজের বিবাহের কথা লইয়া যেখানে আলোচনা হইতে দেখে, সেখান হইতে দূরে সরিয়া গিয়া নির্জ্জনে রবুনের আশ্রয় লয়;—মুখ গম্ভীর হইয়া ওঠে।

সমবয়সীরা অবসর সময়ে বেড়াইতে আসিয়া কোন কোন দিন ফিরিয়া যায় সৌরভীর তিলার্দ্ধ অবসর না দেখিয়া। সৌরভী ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ তাহাদের কাছে আসিয়া খানিক বসে।

—নানান্ বিষয় লইয়া আলোচনা চলে। চলেনা শুধু সৌরভীর মুখে, সে যেন শত কান লইয়া বান্ধবীদের গল্প সল্প শুনিতে থাকে; দেখিলে মনে হয়,—সৌরভীর মত শিষ্ট শান্ত মনোযোগী শ্রোতা দু'টী আর নাই যেন! মোদ্দা, সমবয়সীরা তাহাকে গল্পের আসরে পাইয়াও যেন পায়না। একটু পরেই উহারা একে একে উঠিয়া বলে,—

—সুভী, তোর কাযের ক্ষতি ক'ত্তে চাইনা ভাই—আজ এখন আসি, বুঝলি?

—হ্যাঁ, এসো ভাই, বেলা গেল, এক সংসার কাজকর্ম্মো ঘাড়ে; আর একদিন সকাল সকাল এসো কিন্তু।…নিজের মধ্যের পরম সত্যটীকে সৌরভী কোনও দিন গোপন করেনা।…আর একদিন তাহারা আসে কিনা সন্দেহ।

…খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরের অবসর দু'একদিন এমনি করিয়া কাটিয়া যায়। চারটা না বাজিতেই ভাইরা স্কুল কলেজ হইতে রাজ্যের ক্ষুধা লইয়া বাড়ী ফেরে।—সুতরাং এক্ষেত্রেও সৌরভীর দায়িত্ব কম নয়। …ছোট বোন্ এবং প্রিয় ভাইরা কত কষ্ট করিয়া স্কুল কলেজ হইতে ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার পাথেয় লইয়া ঘরে ফেরে, সুতরাং তাহাদের সেবার ত্রুটী হইলেই বা চলিবে কেন! ইহাদেরও ক্ষুধার একটা সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে বৈকি!

আজ দুপুরে আবার সমবয়সীরা আসিয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া গিয়াছে, তাহাকে রাজবাড়ীতে থিয়েটার দেখিতে যাইতে হইবে তাহাদের সঙ্গে।

কলিকাতার থিয়েটার, একেবারে অতি আধুনিক আন্‌কোরা নূতন বইএর অভিনয়,তাহার উপর কলিকাতার থিয়েটার বড় একটা এদিকে আসে না,—সমবয়সীদের জুলুম, আজ তাহাদের সহিত যাইতেই হইবে। এত অনুরোধ সত্বেও না যাওয়াটা যে ভদ্র সঙ্গত হইবে না ইহাই সৌরভী কেবল ভাবিতে লাগিল। আর, তাহাদের সহিত এমন ছাড়ো ছাড়ো ব্যবহার করিলে কত দিন বা চলে?—সব কিছুই মানিয়া গুণিয়া চলিতে হইবে তো!

কিন্তু রবুন্‌কে লইয়াই বা কেমন করিয়া যাওয়া চলে? —যাহাহোক্, একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সৌরভী সকাল সকাল সংসারের সমস্ত কাজ একাই সারিয়া লইয়াছে। ভাই বোনদের সকাল সকাল খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া ঝঞ্চাটের অর্দ্ধেক পর্ব্ব শেষ করিয়াছে,…ভাই বোনেরা সবাই আগেই চলিয়া গেল পাছে থিয়েটারে যায়গার সঙ্কুলান না হয়, এই আশঙ্কায়।…রবুনও সাহেব সাজিয়া সৌরভীর পিছু পিছু ঘুরিতে লাগিল।

তাহারও থিয়েটারটা দেখিয়া রাখা উচিত বৈকি!—সৌরভীই ত তাহাকে দুপুর বেলা খাওয়াইবার সময় কথা দিয়াছে থিয়েটারে রাজারাজড়ার তলোয়ার যুদ্ধ দেখাইবে।

সুতরাং এক্ষেত্রে না যাওয়াটাই রবুনের কর্ত্তব্যের সীমানার বাইরে আসিয়া পড়ে।

……সৌরভী তেতলায় রান্নাঘরে তালা-চাবি লাগাইয়া দোতালায় শোবার ঘরে আসিয়া দেখে মা পেটের যন্ত্রণায় পাশ ফিরিতে পারিতেছেন না। আজ আবার একাদশী,—তাহার উপর তাঁহার ভিমরুতীও কম নয়। সমস্ত দিনের মধ্যে দুধ কলা দূরে থাকুক যদি এক বিন্দু জলও মুখে দেন। শরীর খারাপ, কিন্তু ছিটি-নাষ্টী করায় গণ্ডায় বণ্ডায়

আছে।—হিন্দুর ঘরের বিধবা না···সৌরভীর মন দমিয়া যায়,—বুঝি কলিকাতার থিয়েটার দেখা হইল না।

—না হোক্! কিন্তু, সমবয়সীরা কি ভাবিবে? তাহারা ত এমনি ওজর আপত্তি দেখিয়া শুনিয়া আরও কতদিন কালোমুখ করিয়া ফিরিয়া গেছে।—রোজ রোজ কি ইহা ভাল দেখায়?

যাহাহোক্, তবুও সৌরভী তেলজল লইয়া মায়ের পেটে মালিস করিতে বসে।

রবুন কিন্তু এততেও সঙ্গ ছাড়ে নাই। থিয়েটার বিশেষতঃ যুদ্ধ বিগ্রহটা দেখার আকাঙ্ক্ষা তাহার দুপুর হইতেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে,—সৌরভী রবুনকে ভুলাইয়া না যাওয়ার ছল্ ছুতায় জামাজুতা খুলিয়া রাখিতে বলে। প্রত্যুত্তরে রবু বাবু হাসিয়া একটি কচি হাতের কিল দেখায়।

···সৌরভী হাসে।

মা পেটের এত যন্ত্রণাতেও না হাসিয়া থাকিতে পারেন না। বলেন, তোর ছেলের অদিখ্যাতায় আর হেসে বাঁচিনে সুভী! একটী কথাতে সৌরভীর মুখে হাসি দ্বিগুণ করিয়া ফুটিয়া ওঠে।

···সন্ধ্যা হইয়াছে অনেকক্ষণ।

মায়ের পেটে তেলজল মালিশ চলিতে থাকে।··· সৌরভী ভাবে, এইবার বুঝি সমবয়সীদের কড়া তাগিদ আসিয়া হাজির হয়।

—দেখিতে দেখিতে হইলও···

······নীচের তলায় জোর দরজার কড়া নাড়িতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের চীৎকার আসে—

সৌরভী! উপর হইতে মায়ের কাছে বসিয়াই সাড়া দেয়

—এই যে এস' ভাই···

তাহারা আর উপরে আসে না। নীচের তালায় একদল মেয়ের কলরব চলিতে থাকে।—তবুও সৌরভী মায়ের কাছ ছাড়না। এমনি মেয়ে!

······মা পেটের ওপর হইতে সৌরভীর হাত সরাইয়া দিয়া বলেন—হয়েছে, থাক আর মালিশ কত্তে হবে না;—তুই যা, সুভী··

না মা তোমার ভারী কষ্ট হচ্ছে—

—হোক্, কষ্ট, আমি বলছি তুই যা, ব্যথা নরম পড়ে এল······

—নাচে হইতে জোর কড়ার শব্দ আসিতে থাকে, —সৌরভী ভাবে, ওরা এতই চঞ্চল!

মা আবার বলেন,—

ওরা তোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে নীচে—ভালো দেখায়না। আমি বল্‌ছি মা, তুই যা, দেখে আয়—

কিন্তু মা, রবুন?

রবুনকে আমি দেখবো'খন,—একটা ছোট বিছানা ক'রে যা, ঘুম পাড়াচ্ছি। ওরা দাঁড়িয়ে থাক্‌ছে, তবে দেরী করিস্ নে মা—

······রবুনের যাওয়া না হইলে যে এখানেই একটী খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবার সম্ভাবনা তাহা বুঝিতে সৌরভীর বাকী রহিল না কিন্তু অনর্থের মূল যে ঐ সমবয়সী বান্ধবীরা—উহাদের উপায়?—এখনও যে তাহারা নীচে হাঁকাহাঁকি করিতেছে।—অতএব, একটা কিছু করিতে ত হইবেই···। এতক্ষণে সৌরভী মায়ের কাছ হইতে উঠিয়া যায়।

রবু বাবু ইহার মধ্যে আবার আর একটী কাজ সারিয়া লইতেছেন। একটী খুব গুরুতর না হইলেও যে তাহা রবু বাবুর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পিসীমার দেওয়া উপহার এক কৌটো ছুঁচো বাজি লইয়া বিড়াল ছানার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন এবং মাঝে মাঝে ছুঁচোবাজী দুই একটা জালাইয়া নিজের শক্তির সীমা বিড়াল-বাচ্চাকে সামনা সামনি উপলব্ধি করিয়া দিতেছেন। বিড়ালছানা তাহাতে ভীত নয় কিন্তু রবু বাবুও ছাড়িবার পাত্রটী নন্। তিনিও একবার দেখিয়া লইবেন ছুঁচো ও বিড়ালের সম্বন্ধ কি

···এই ফাঁকেই সৌরভী বাক্স হইতে সেফালী রংয়ের সাড়ীটী লইয়া পরিল ও আনুসঙ্গিক প্রসাধন শেষ করিয়া যেই মাত্র নীচে আসিয়া হাজির হইবে অমনি ওপর হইতে তলব আসিল—সুভী!—কোথায়?···

···সুভী যেথাই থাকুক একদিকে এই আসন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের কল্পনা করিয়া এবং নাছোড়বান্দা সমবয়সীদের টানাটানিতে তাহার সুমুখে এক মহা সমস্যা আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে। কি যে করিবে ছাই! বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

...এদিকে সমবয়সীরা যেন ঘোড়া লইয়া আসিয়াছে, একটু দাঁড়াইবারও তর সহিতেছে না উহাদের!

......নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় হোক্ অথবা উপস্থিতাদের প্ররোচণাতেই হোক্ সৌরভী নিরুত্তর থাকিয়াই বাড়ীর বাহির হইয়া আসে। কিন্তু তাহার চলার গতিতে যে ইচ্ছা শক্তির অভাব ইহাই ধীরে ধীরে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

...তবুও কি এই বান্ধবীদের কাছে উহার রক্ষা আছে!—হিড়্‌হিড়্ করিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া যায়।

বাড়ীর বাহির হইয়া তাহারা যখন একেবারে সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন রাজবাড়ী হইতে বেশ শোনা যায় যে থিয়েটারের কনসার্ট শেষ হইয়া অভিনয় আরম্ভ হয় হয়।

......সমবয়সীরা অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়াছে—সৌরভীর খাতিরে আর কত সম্ভব? তাহার উপর কলিকাতার থিয়েটার! ন'মাস ছমাসের মধ্যে বছরে ঐ একবার!—সুতরাং ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহারা সৌরভীকে টানাটানি হইতে মুক্তি দিয়া আগাইয়া চলিল। সৌরভী এবারে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল কিন্তু চলিতে লাগিল উহাদের পিছু পিছুই।

কিন্তু পিছন হইতে এই বারে যে আসিয়া আঁচল টানিয়া ধরিল তাহাতে তাহার গতি রোধ না হইয়া যায়না। গায় মুখে ধূলা মাটি মাখিয়া রবুন্ আসিয়া ক্রন্দনের মধ্য দিয়া যাহা ব্যক্ত করিল, তাহার ভাব ভাষা নিতান্ত অস্পষ্ট হইলেও সে যে কয়েকটা আছাড় খাইয়াছে এবং থিয়েটার দেখাইতে না লইয়া যাওয়ার দুঃখটাই যে তাহার চূড়ান্ত নিদর্শন তাহা বুঝিতে আর বাকী রহে না। ছোট ছেলে রবুন্।

...তাহাকে লইয়া সখ্ মিটাইতে গাদাগাদির মধ্যে থিয়েটার দেখিতে যাওয়া চলে না।—ইহা সৌরভীরই একান্ত নিজস্ব মত। অতএব রবুনকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই সে স্থির করিল।—বান্ধবীরা হয়তো এতক্ষণে রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে গিয়া হাজির হইয়াছে।—যাক তাহারা!

...বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সৌরভী কাপড়জামা বদ্‌লাইল যেখানী রংয়ের শাড়ী যেমন ভাঁজে ছিল ঠিক তেমন ভাঁজেই আবার বাক্সে উঠিল।—ইহাতে সৌরভীর দুঃখ নাই।

কলিকাতার এমন থিয়েটার দেখা হইল না ইহাতে তাহার এতটুকু দুঃখ হয় নাই কিন্তু তাহার জন্য নিতান্ত নাবালক শিশুটী আজ এতটা কষ্ট পাইল এই দুঃখই তাহার বুকে থাকিয়া থাকিয়া ব্যথা দিতেছিল। তাহার যাওয়ার ইচ্ছা ছিলনা ইহাও সত্য, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমে যে এতটা অস্বাচ্ছন্দ্য তাহাকে যাতনা দিবে এ ধারণা সে একটও করিতে পারে নাই বাড়ীর বাহির হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও।

মা ডাকিলেন—সুভী...

সৌরভী নিরুত্তর। রবুনকে কোলে লইয়া কিছুই যেন হয় নাই এই ভাবে মায়ের পাশে আসিয়া বসিল।

তোর বুঝি যাওয়া হল না?—মা বলিলেন—হবে কি করে, আদর দিয়ে যে বাঁদর ক'রে তুলিছিস্—তার ফল এখন ভোগ।

সৌরভীর মুখে কোনও জবাব নাই—রবুনের মুখের দিকে তাকাইয়া শুধু হাসিতে থাকে।

যা,—ঘুম পাড়াগে যা ওকে...

নির্ব্বাক হইয়া সে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াছিল ঠিক তেমনি মৌনতার ভঙ্গী লইয়াই সে রবুনকে কোলে নিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল

...রাত্রি দু'টায় রাজবাড়ীর থিয়েটার ভাঙ্গিয়াছে।

ভাই বোনেরা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখে, সুভী থিয়েটার দেখিতে যায় নাই—রবুনকে লইয়া শুইয়া আছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত রাত্রেও ইহারা দু'জনে জাগিয়া আছে। অন্য দিন এ সময়ে বাড়ীর টিক-টিকিটা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া থাকে।

আরও দেখে—এত রাত্রে রবুন্ জাগিয়া সৌরভীর বুকের মধ্যে মুখ লইয়া চক্ চক্ করিয়া সৌরভীরই

আঙুল চুষিতেছে, আর সৌরভী নিষ্পন্দ আঁখি যুগল লইয়া এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে রবুনের দিকে। এত অশান্ত রবুন আজ যেন স্থভীর বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিজেকে মহা শিষ্ট-শান্ত বলিয়া জাহির করিতেছে।

এত রাত্রে ভাই বোনেরা বাড়ীতে ফিরিবার দরুণ একটা ছোটো-খাটো কোলাহল জাগিয়া ওঠে কিন্তু এই দু'জনার সে দিকে একটুও দৃক্‌পাত নাই। বরং, সৌভাগ্যবতী রবুন্‌কে আরও নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া নিয়া অস্ফুষ্ট মাতৃত্বের আবেগে তাহার মুখে-চোখে চুম্বন আঁকিয়া দেয়।

সমস্ত খুঁটি-নাটি লইয়া এ সংসারের এই দিনটা কাটিয়া যায়…

……আবার চন্দ্র সূর্য্যের রাজত্বে বিশেষতঃ এই এই সংসারটীর দ্বারে নূতন করিয়া আর একটী দিন আসিয়া দাঁড়ায়—সৌরভী সুখে দুঃখে হাসিয়া তাহাকে বরণ করে;—আঁচল ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া থাকে তাহার স্নেহের রবুন্।

বাণীদেবীর বন্দনা

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

১

এস বীণাপাণি আজি এ ধরণী
উজল আলোকে ভাতি।
তোমার চরণ-পরশে ধ্বনিবে
এ ক্ষীণ বীণার গীতি।
বিরাট তোমার সুনীল গগন
মোচন করেছে মেঘ-আবরণ
নিখিল তোমারে করিছে বরণ
পরম পুলকে মাতি।
এস বীণাপানি, আজি এ ধরণী
নবীন আলোকে ভাতি।

২

শোভিছে কাননে তরুবীথি দল,
কুসুমের ভারে নতা।
সরসীর বুকে শ্বেত শতদল
সদ্য প্রস্ফুটিতা।
নব জাগরিত নিখিল বিশ্ব,
করিছে আজিকে মধুর হাস্য,
নিরখি নয়ন এ-নব দৃশ্য
হয়েছে পরম প্রীতা।
শুনি' আগমনী, হয়েছে জগৎ
সুষমা বিমণ্ডিতা।

৩

আমার রচিত সকল কথিকা
আমার রচিত সুর
ব্যাকুল করিয়া তোলেনা আমার
সুপ্ত হৃদয়-পুর।
শূন্য করিয়া বাসনার ডালা
গেঁথেছি আজি এ-অর্ঘ্যের মালা
যতনে জ্বেলেছি আরতির আলা
কামনা করিয়া দূর।
করেছি তোমার পায়ে নিবেদন
আমার রচিত সুর।

৪

(দেবি) স্তবকে স্তবকে সাধকেরা আজি
পথ পানে আছে চাহিয়া
(মোরা) মানস কমলে তোমার চরণে,
দিব অঞ্জলি ভরিয়া।
কম্পিত করে করিয়া যতন
পূজিব ওদুটী কমল চরণ
মন মন্দিরে করিব বরণ,
রেখেছি আসন পাতিয়া
(দেবি) এস বীণাপাণি, এস এস আজি,
এ নব প্রভাতে হাসিয়া।

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতীদেবীসরস্বতী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৬

ইরা সেই বাড়ীতেই রহিয়া গিয়াছে। সে প্রচারিকার কার্য্যভার গ্র ণ করিয়াছে, বেতন মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া পায়। তাহার একার পক্ষে এই উপায়ই যথেষ্ট।

দিনের পর দিনগুলা যেমন আসিতেছে, তেমনই চলিয়া যাইতেছে। দিন যাইতে যাইতে সপ্তাহ, সপ্তাহ যাইতে যাইতে মাস, মাস চলিতে চলিতে বৎসরও কাটিয়া গেল।

কাজ করিতে করিতে ইরা হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে, তাহার মন বর্ত্তমান ছাড়িয়া কোন অতীত কালের স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়—সে তখন ভাবে,—সে ভাবনার আদি নাই অন্ত নাই।

কবে সে চলিয়া গিয়াছে। আজ তাহার আসার স্মৃতি মনে পড়ে না, তাহার কথা মনে করিতে গেলেই মনে পড়ে শুধু যাওয়ার স্মৃতিখানা। অব্যক্ত বেদনায় সারা বুক টন টন করিয়া উঠে, অলক্ষিতে গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে, ইরা সচকিত ভাবে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলে, সে ভাবনা ভুলিবার জন্যই তাড়াতাড়ি অন্যকাজে হাত দিতে যায়, কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া সব ভাবনা ভুলিয়া থাকিতে চায় কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, সে চিন্তা কিছুতেই মন হইতেই সরানো যায় না।

সে কোথায় এই খবরটা পাইবার জন্য সে মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, কিন্তু কাহার কাছে সে খবর লইবে? শশাঙ্ককে সে চিনিত, জানিত সুনীল শশাঙ্কের বন্ধু, কিন্তু সাহস করিয়া সে শশাঙ্কের কাছে যাইতে পারেনা; নিরঞ্জনের খোঁজ করিয়াছিল কিন্তু সে কোথায় সে সংবাদ পায় নাই।

রতিলালের বাড়ীর ঠিকানায় মণীষার নামে একখানা পত্র দিয়াছিল, কিন্তু সে পত্রের উত্তর পাওয়া যায় নাই। পরে খোঁজ করিয়া সে জানিতে পারিয়াছে রতিলাল বাবু কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বপুত্রবধু কাশী চলিয়া গিয়াছেন, শশাঙ্কও দুই মাসের ছুটি লইয়া তাঁহাদের সহিত গিয়াছে।

নিরাশায় ইরার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তবু সে আশা ছাড়ে নাই, কোনও না কোন রকমে খোঁজ পাইবার আশা করিয়াছিল।

সে দিন ছিল রবিবার, ইরার ছুটি। সমস্ত সকালটা সে প্রত্যহকার মতই অপেক্ষা করিতেছিল যদি ডাক আসে। একে একে দশটা বাজিয়া গেল, তাহার নামের কোন পত্র আসিল না।

এক একবার মনে হইতেছিল হয়তো মিঃ রায় তাহার সংবাদ জানেন। ধরিতে গেলে যাহাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া যাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার স্নেহ কি তিনি একেবারেই ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন? তিনি কি তাহার কোন সংবাদই রাখেন নাই?

কিন্তু রাখিলেই বা, তাহাতে তাহার কি? মিঃ রায় বা মিস রায় জানিলেও তাহাকে বলিবেন না কারণ তাঁহারা তাহাকে ঘৃণা করেন।

দুপুরে আহারাদির পর সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া একখানি বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল, সেই সময়ে বাহিরে কে কড়া নাড়িল।

পোষ্টম্যান কি?

ইরা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল; পরমুহূর্ত্তে দাসীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে শুইয়া পড়িল। ভাগ্যে সে উঠিয়া যায় নাই, নচেৎ দাসীটাই বা কি মনে করিত?

দাসী দরজা ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; "একখানা টেলিগ্রাফ এসেছে দিদিমণি, এই কাগজখানায় নাম সই করে দিয়ে নিন।"

টেলিগ্রাফ? ইরা এনভেলাপখানা বারেক নাড়া চাড়া করিয়া স্লিপখানাতে নিজের নাম সই করিয়া দিয়া টেলিগ্রাফের কভারখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

আগেই সে নীচের নামের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, টেলিগ্রাফ করিয়াছেন আর মুখার্জ্জি। ভিতরের লেখার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল; শ্লথ হস্ত হইতে টেলিগ্রাফখানা পড়িয়া গেল। তাহাতে লেখা আছে মিস দাস, শীঘ্র এখানে এসো, সুশীলের জীবনসংশয় পীড়া, সে তোমায় একবার দেখিতে চায়।

এক ফোঁটা জলও ইরার চোখ দিয়া পড়িল না, তাহার সমস্ত অন্তর এই একটা আঘাতে যেন নিঃসাড় হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল বদ্ধ দৃষ্টিতে সেই টেলিগ্রাফখানার পানে তাকাইয়া রহিল। টেলিগ্রাফের অক্ষরগুলা প্রকাণ্ড বড় হইয়া তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া রহিল, ইরা ব্যাকুলভাবে দুই হাত কচলাইতে লাগিল।

থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে বাজিয়া উঠিতেছিল সুশীল আজ কাহাকেও চাহে নাই, তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে সে ইরাকেই চাহিয়াছে।

সে জয়পুরেই রহিয়াছে, মিথ্যাকথা সে বলিয়া যায় নাই। ইরা ভাবিয়াছিল সে জয়পুরে যাওয়ার নাম করিয়া অন্য কোথাও গিয়াছে।

মুহূর্ত্ত পরেই ইরা নিজেকে সামলাইয়া লইল, নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইল। ত্রস্ত হস্তে আবশ্যকীয় কয়খানা কাপড় চোপড় একটা সুটকেশে গুছাইয়া লইয়া, হোমের মেমসাহেবকে একখানা পত্র লিখিয়া দাসীর হাতে দিল, এবং একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল।

দীর্ঘ ট্রেণের পথ, এ যেন আর ফুরায় না। কোথায় বাংলা আর কোথায় জয়পুর। ইরা শুষ্ক মুখে ব্যগ্র চোখে জানালা দিয়া বাহির পানে চাহিয়া দেখিতেছে আর কতদূর, এ পথ ফুরাইতে আর কত দেরী?

জয়পুর ষ্টেশনে পৌছাইয়াই ইরা মিঃ মুখার্জ্জির প্রেরিত লোকের দেখা পাইল। মিঃ মুখার্জ্জির মোটর আসিয়াছিল, তাহাতে উঠিয়া যাইতে যাইতে ইরা মিঃ মুখার্জ্জির পরিচয় পাইল। ইনি সুশীলের সম্পর্কীয় কাকা, জয়পুর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী। সুশীল তাঁহারই সুপারিসে উক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে এবং সে তাঁহার নিকটেই থাকে। আজ বাইশ দিন টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়া সে পড়িয়া আছে।

মিঃ মুখার্জ্জি বাড়ীতেই ছিলেন, অভ্যর্থনাসহ তিনি ইরাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর, মাথার চুলগুলি প্রায় সবই সাদা হইয়া গেছে। বিবাহ করা একটা বিষম লেঠা জানিয়াই তিনি এ জীবনে চিরকুমার থাকিয়া গিয়াছেন এবং নারী মাত্রকেই মা বলিয় সম্পর্ক পাতাইয়া থাকেন।

তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় ইরা দুই মিনিটের মধ্যেই সঙ্গীর মুখে জানিতে পারিয়াছিল। সম্মুখে এই সৌম্য দর্শন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার অন্তর নত হইয়া পড়িল, সে ইহাকে কেবল মাত্র ভদ্রতারক্ষার্থেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিতে পারিল না, ভূমিষ্ঠ হইয়া পায়ের ধূলা লইল।

জিজ্ঞাসা করিল "মিঃ মুখার্জ্জি কেমন আছেন?"

মিঃ মুখার্জ্জি তাহার কণ্ঠস্বরের ব্যগ্রতাস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "আজ তিন দিন হতে অজ্ঞান হয়ে ছিল, আজ সকাল হতে জ্ঞান হয়েছে। কাল হতে আজ ঘণ্টা খানেক আগে পর্য্যন্ত বিশ্বাস ছিল না সে বাঁচবে, খানিক আগে ডাক্তারেরা দেখে বলে গেছেন জীবনের ভয় বোধহয় কাটল, আর যদি কোনও নূতন উপসর্গ না এসে জোটে তবে রোগী শীগগীরই আরাম হয়ে উঠবে।"

ইরা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "এখন দেখতে পাব না ?"

একটু হাসিয়া মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "দেখবে বই কি মা, তবে এই মাত্র এলে, এতটা পথ এসে তুমিই শ্রান্ত হয়ে পড়েছ। খানিক বিশ্রাম করে স্নানাহার সেরে তারপর রোগীর কাছে যেয়ো, সেইটাই কি ভাল হবে না মা ?"

মনটা যদিও রোগীর দিকে ছুটিতেছিল তথাপি ইরা বৃদ্ধের স্নেহময় অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না, অগত্যা তাহাকে বিশ্রামের জন্য বসিতে হইল।

(২৭)

"মা" এই স্নেহপূর্ণ আহ্বানে ইরার দাবদগ্ধ হৃদয়টা যেন জুড়াইয়া গিয়াছিল, অকস্মাৎ কেন জানি না তাহার চোখে খানিকটা জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে গোপনে সে জল সামলাইয়া লইল।

পাঁচমিনিট মাত্র বিশ্রাম করিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "স্নানাহার পরে করব এখন, বিশ্রাম অনেকক্ষণ নিয়েছি, এইবার একবার দেখবার অনুমতি পাব কি ?"

মিঃ মুখার্জ্জি এরূপভাবে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন যে ইরার মাথা আপনিই নত হইয়া পড়িল।

মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "বেশ তাই চল মা, কিন্তু রোগীর ঘরে এখন বড় বেশীক্ষণ তোমায় থাকতে দেব না, কেন না এখনও তুমি বড় পরিশ্রান্ত হয়ে রয়েছ।"

সামনের হল পার হইলে একখানি গৃহ, দ্বারে সবুজ পর্দ্দা দুলিতেছিল। মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "এই ঘরে সুশীলকে রাখা হয়েছে।"

ভিতরে ইউরোপীয়ান নার্সের কথা শুনা যাইতেছিল, সে বুঝি রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, রোগী বোধ হয় কিছুতেই ঔষধ খাইতেছিল না।

মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "ওই শুনছো মা, অমনি করে স্বেচ্ছায় এই এত বড় অসুখটা বাড়িয়ে তুলেছে, নইলে বোধ হয় এতটা বেড়ে উঠতে পারত না। ওর তালর জন্যে যা বলতুম সব হেসে উড়িয়ে দিত, জীবনের পরে ওর যে কি তাচ্ছিল্য এসেছে তা বলতে পারিনে। অথচ বললে একটা কথাও বলবে না, এদিকে নিজের খেয়ালমত কাজ ঠিক করে যাবেই। কতদিন বিকারের ঝোঁকে যা তা বলেছে, ইন্দু, ইরা বলে চীৎকার করেছে, তাইতেই অনেক কথা জানতে পেরেছি। সেদিন জিজ্ঞাসা করলুম মিঃ রায়কে ইন্দিরাকে নিয়ে আসতে বলব কি ? ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠল, বললে—না, ওঁদের কোন খবর পর্য্যন্ত দিতে পারবেন না, আমি যে এখানে আছি তাও আমি ওঁদের জানাতে চাইনে।" জিজ্ঞাসা করলুম "ইরাকে খবর দেব ?" খানিক চুপ করে থেকে বললে—"তাই দিন, সে আসুক।" ওর পকেট বুকে তোমার ঠিকানা পেয়ে তাই তোমায় টেলিগ্রাফ করতে পেরেছিলুম। আমার মনে হয় তোমায় দেখে—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘরের মধ্যে ঝন ঝন শব্দ শুনিতে পাইয়া ব্যস্তভাবে তিনি তাড়াতাড়ি পর্দ্দা সরাইয়া ফেলিলেন। দেখা গেল বেচারা নার্স আড়ষ্টভাবে রোগীর কাছে দাঁড়াইয়া আছে। রোগীকে সে ঔষধ খাওয়াইতে গিয়াছিল, কিন্তু সে নার্সের হাত হইতে গ্লাস কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়াই অন্যদিকে ফিরিয়া শুইয়াছে।

মিঃ মুখার্জ্জি পলকের দৃষ্টিপাতেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি মিস্ লুইস ?"

হতাশভাবে মিস্ লুইস্ বলিল, "দেখুন দেখি, রোগী এ রকমভাবে হাত পা চালালে যারা নার্স করতে আসবে তারা কি মারা যাবে না ? গ্লাসটা আমার মাথা লক্ষ্য করেই ছুড়েছিলেন, ভাগ্যে মাথাটা চট করে কাত করে ফেলেছিলুম তাই নইলে এতক্ষণ আমাকেই হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হতো।"

মিঃ মুখার্জ্জি শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "বিকার পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে, কিন্তু যা করেই হোক, ঔষধ তো খাওয়াতেই হবে নইলে রোগ সারবে কি করে ? দেখছ মা, এ রকম রোগীর সেবা করতে আসাও কি বিপদের ?"

ইরা জিজ্ঞাসা করিল, "আর গ্লাস আছে ?"

নার্স উত্তর দিল, "আছে বই কি ?"

টেবিলের উপর হইতে সে আর একটা গ্লাস তুলিল।

মিঃ মুখার্জ্জি ইরার পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারবে মা?"

শুষ্ক হাসিয়া ইরা বলিল, "এ পর্য্যন্ত অনেকের রোগশয্যার পাশে কাটিয়ে এসেছি, রোগী তো কোনদিনই আমার কথার অবাধ্য হয় নি। এখানেও একবার চেষ্টা করে দেখি তো, অবশ্য কতদূর কি করতে পারব তা জানি নে।"

অনুনয়ের স্বরে মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "তবে তুমিই একবার চেষ্টা দেখ মা, নইলে তো আর উপায় দেখছি নে।"

ইরা বিনাবাক্যব্যয়ে গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া লইয়া সুশীলের মাথার কাছে দাঁড়াইল, কথা ফুটিতেছিল না, তবু সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শুষ্ককণ্ঠে ডাকিল, "মিঃ মুখার্জ্জি—"

সে কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া সুশীল চোখ মেলিল।

ইরা বলিল, "ওষুধ এনেছি—খান।"

সে কথা সুশীলের কানে যায় নাই, সে বিস্ময়ান্বিত নেত্রে ইরার পানে তাকাইয়াছিল, যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না ইরা আসিয়াছে।

কোমলকণ্ঠে ইরা আবার ডাকিল, "মিঃ মুখার্জ্জি, ওষুধ খান—"

"ইরা" অস্ফুট একটী শব্দ মাত্র শুনা গেল,

ইরা উত্তর দিল, "হাঁ, আমি ইরা, ঔষুধ এনেছি খেয়ে নিন দেখি।"

সুশীল এতটুকু আপত্তি না করিয়া ঔষধ খাইল, ইরা নিজের রুমালে তাহার মুখখানা মুছাইয়া দিতেছিল, শীর্ণ কালিমাময় হাতখানা তাহার সেই হাতখানার উপর রাখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সুশীল ডাকিল, "ইরা—"

ইরা উত্তর দিল, "কি বলছেন?"

সুশীল তেমনই ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সত্যিই এসেছ ইরা, বল—এ স্বপ্ন নয়, জাগলে তুমি চলে যাবে না?

ইরার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "আমি আপনার স্বপ্নের মধ্যে আসিনি মিঃ মুখার্জ্জি, জাগ্রতে এসেছি, সব সময়েই আমায় কাছে পাবেন।"

"তা হলে আমি আবার বাঁচব ইরা?" সুশীল জিজ্ঞাসু নেত্রে ইরার পানে তাকাইল।

ইরা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "বাঁচবেন বইকি মিঃ মুখার্জ্জি, কি হয়েছে আপনার যাতে মনে ভাবছেন বাঁচব না? সামান্য অসুখ হয়েছে বইতো নয়, এ রকম অসুখ সকলেরই হয়, সকলেই তো বেঁচে ওঠে।"

শূন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সুশীল বলিল, "তাদের সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ আছে। যাক ভাল হয়ে উঠি—তারপর সব বলব।"

রোগী অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। বৃদ্ধ মিঃ মুখার্জ্জির চোকে জল আসিয়াছিল, তিনি জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সত্যি মা, আমার মনে হচ্ছে সুশীল বাঁচবে। তোমার হাতের সেবা পেলে ও শিগ্‌গিরিই ভাল হয়ে উঠবে। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাঁচলুম, একটা বড় ভাবনার দায় হতে নিশ্চিন্ত হলুম। এখন এসো, তোমার রোগী এখন ঘুমিয়েছে, মিস লুইস এখানে থাকুন, তুমি স্নানাহার সেরে নেবে।"

মৃদু কণ্ঠে ইরা বলিল, "চলুন।"

২৮

মনীষার ত্যক্ত কর্ম্মভার আজ ইন্দিরার হাতে পড়িয়াছে, ইন্দিরা স্বেচ্ছায় এ ভার লইয়াছে। মনীষার চেয়ে উহার শক্তি বেশী, অভিজ্ঞতা বেশী কারণ সে পাশ্চাত্যে তাহার শিক্ষা অর্জ্জন করিয়াছে। এই আশ্রমটী এখন কেবলমাত্র আশ্রমই নয়, ধীরে ধীরে ইহার সঙ্গে একটী বিদ্যালয়ও গড়িয়া উঠিয়াছে, মেয়েদের মধ্যে নানাপ্রকার শিক্ষাদানের বন্দোবস্তও হইয়াছে।

সেদিন কন্যার সহিত বেড়াইতে এখানে আসিয়া মিঃ রায় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন, আশ্রমে বহু চরকা চলিতেছে, কয়েকখানি তাঁতও বসিয়াছে। দেশী ও বিদেশী নানা রকমের শিল্প কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এখানকার ছেলে মেয়েরা সকলেই খদ্দর পরে, দরজায় জানালায় যে সব পর্দ্দা ঝুলিতেছে সেগুলিও খদ্দরে প্রস্তুত।

রুদ্ধ কণ্ঠে মিঃ রায় বলিলেন, "একি করছিস্ ইন্দু!"

ইন্দিরা ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি বাবা। একদিন দেশকে ঘৃণা করেছিলুম, দেশের মানুষকে ঘৃণা করেছিলুম, দেশের উৎপন্ন জিনিষকে ঘৃণা করেছিলুম, আজ তাই সারা অন্তর ঢেলে দেশকে পূজা করছি। এতেও কি আমার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না বাবা?"

স্নেহকাতর পিতার মনে অতীত একটী দিনের কথা জাগিয়া উঠিল। মনে হইল—দেশের ডাককে কেবল মাত্র ইন্দিরাই লাঞ্ছনা করিয়া ফিরাইয়া দেয় নাই, তিনিও দিয়াছেন। সেদিন সুশীলের সহিত যে তর্ক হইয়াছিল, তাহাতে কেবল ইন্দিরাই যোগ দেয় নাই, তিনি সুদ্ধ যোগ দিয়াছিলেন। দেশের যে কোন প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহার ডাক আসিয়াছে তিনি যান নাই, অসঙ্কোচে জানাইয়াছেন—তিনি এদেশে আসিয়াছেন মাত্র, ইহা ছাড়া দেশের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই।

মিঃ রায় অধর দংশন করিলেন, কন্যাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার ললাটোপরি পতিত চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে মা, অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে,—আর তা শুধু তোর একার নয়, তোর বাপেরও।"

ইন্দিরা একবার শুধু অশ্রুপূর্ণ চোখ দুটি তুলিয়া পিতার মুখের উপর ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টি নামিয়া পড়িল। অন্তরের ভাষা উদ্ভাসিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছিল সে জোর করিয়া ওষ্ঠাধর চাপিয়া রাখিল।

পিতা কন্যা সেদিন নীরবেই বাড়ী ফিরিলেন। কৃত কর্ম্মের অনুশোচনায় উভয়েই দগ্ধ হইতেছিলেন, অথচ মুখ ফুটিয়া কেহ কাহারও নিকটে কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না।

মিঃ রায়ের মোটর অফিসের গেটে আসিয়া থামিয়া গেল, গেটকিপার সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল। অনেকদিন পরে মিস রায় আজ অফিসে পদার্পণ করিয়াছে, সুশীল চলিয়া যাইবার পর সে আর আসে নাই।

অফিস গৃহের পানে শূন্যনয়নে তাকাইয়া সে দেখিল যে চেয়ারে একদিন সুশীল বসিয়া কাজ করিত; সে চেয়ার আজ বিদেশীয় একজন দখল করিয়াছে; পার্শ্বের ছোট কামরাটায় বসিয়া মিস দাস টাইপ করিত, সে কামরা আজ মিস বেল অধিকার করিয়াছেন।

তাহার মনে হইতেছিল এই অফিসের ভিত্তিপত্তন করিয়াছিল সুশীল, দেশীয়ের কাজ সে দেশীয়ের হাতে রাখিয়াছিল। হয় তো সবই সুশীলের ব্যবস্থাতেই চলিত যদি না সে-ই পিতার মনটাকে বিরূপ করিয়া দিত। সুশীলকে সে কত রকমেই না অপমান করিয়াছে, কেবল এক রকমেই করে নাই।

আজ বহুদিন পূর্ব্বের সেই দিনগুলার কথা মনে করিতে ইন্দিরার দুইটী চোখ সজল হইয়া উঠিল এবং নিজের অজ্ঞাতে কখন সে জল চোখ ছাপাইয়া আরক্ত গণ্ড দুটি ভাসাইয়া ঝরিয়া পড়িল।

মিঃ রায় তখন ম্যানেজার মিঃ ব্রাউনের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, ইন্দিরা দরজার পর্দ্দাটা একটু সরাইয়া বলিল, "বাবা, আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

সত্যই সে আর অফিসে থাকিতে পারিতেছিল না, মনে হইতেছিল এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে সে যেন বাচে।

তাহার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া মিঃ রায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, স্থান কাল ভুলিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোর কি অসুখ করেছে ইন্দু?"

জোর করিয়া মুখে একটুকরা হাসি টানিয়া আনিয়া ইন্দিরা বলিল, "না বাবা, বাড়ীতে আমার অনেক কাজ আছে তাই যেতে চাচ্ছি।"

স্নেহশীল পিতা অনুভবে কতকটা বুঝিয়া ছিলেন তাই একা তাহাকে ছাড়িতে রাজি হইলেন না। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, "চল, আমিও যাই।"

ইন্দিরা রাগ করিয়া বলিল, "তুমি গেলে চলবে কি করে বাবা; কেবল আমাকেই নিয়ে থাকবে, তোমার কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা কি হবে?"

বাড়ীতে ফিরিয়া সে কিছুই করিল না, চুপচাপ বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কেবল অতীতের কথাই ভাবিতে লাগিল।

রাত্রে পিতাপুত্রীতে কথা হইতেছিল।

ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবা, আমাদের বাড়ীতে বিদেশী জিনিস না রেখে যদি দেশী জিনিস রাখি সেটা কি ভাল হয় না? এই তো আজ কালকার যে দিন পড়েছে, আমার মতে আমাদের বিলাসিতায় যে টাকাটা খরচ হয় সেটা না করে বরং গরীবদের দিলে একটা কাজের মত কাজ হয়। বল বাবা—হয় না?"

মিঃ রায় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ইন্দিরা জোর করিয়া বলিল, "না বাবা, হাসলে হবে না, সত্যি আমি অনর্থক বাবুয়ানাগুলো কমিয়ে দেব, ওতে বড্ড বেশী টাকা খরচ হয়।"

মিঃ রায় হাসিমুখে বলিলেন, "একটা কথা মনে হচ্ছে। জানিস ইন্দু, যখন ছোট ছিলুম তখন আমার মা একটা কথা বলতেন—'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।' কথাটা কিন্তু খাঁটি সত্যি কথা। মা থাকতে মার হুকুমে সব কিছুই করতে হতো, না বলবার যো ছিল না। নারায়ণের নির্ম্মাল্য নিয়ে বিলেত রওনা হলুম, ষ্টীমারে উঠেই ফেলতে গেলুম, মনের মধ্যে মার কান্নাভরা মুখখানা জেগে উঠল,—আর তা ফেলা হল না, আস্তে আস্তে বাক্সের এককোণে রেখে দিলুম। ক্রমে এ সংস্কারের ধাক্কা সামলে নিলুম, পুরো নাস্তিক হয়ে গেলুম, ধর্ম্মের ধার দিয়েও যাইনি। তোর যে মা ছিল তাকে নিয়ে কোনদিন এতটুকু কষ্ট পেতে হয় নি। তোকেও তেমনিভাবে গড়ে তুলেছিলুম, আবার কি করে—কেন যে কেঁচে গেলি আমি তাই ঠিক করতে পারি নে। মাতৃ-ভূমিতে পা দিতে না দিতে আমার মায়ের ইচ্ছা তোর মধ্যে জেগে উঠল, আজ আমি কি ভাবি তা জানিস ইন্দু?"

ইন্দিরা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বাবা।"

মিঃ রায় বলিলেন, "আমি ভাবি তোকে যদি এ দেশে না আনতুম, এখানকার আবহাওয়া তোকে এমন ভাবে বদলে ফেলতে পারত না, আমার আদর্শকে আমারই চোখের সামনে এমন ভাবে হত্যা করতে পারত না। এর চেয়ে বিলেতে আমি যে বেশ ছিলুম, আমার মনের ইচ্ছা—"

তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

ইন্দিরা অপলকদৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল। "বাবা—"

মিঃ রায় চমকাইয়া উঠিয়া তাহার পানে চাহিলেন।

রুদ্ধকণ্ঠে ইন্দিরা বলিল, "না বাবা, আমায় তুমি ঠিক নিজের মধ্যেই রেখেছ। চল বাবা, আমরা চলে যাই, আবার বিলেতে গিয়ে থাকি, এখানে থেকে আর দরকার নেই।"

মিঃ রায় কেবল মাথা নাড়িলেন।

উদ্বিগ্ন হইয়া ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা?"

মিঃ রায় কন্যার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "আর তা হয় না মা, আর আমি তোকে নিয়ে যেতে পারব না। তুই যে এই দেশের মেয়ে, এই দেশেরই একটী ছেলের স্ত্রী, তোকে তোর স্থান হতে তিলমাত্র সরানোর ক্ষমতা আমার নাই? তোর পর হতে আমার অধিকার লুপ্ত হয়ে গেছে মা, আমার পিতৃগৌরব, আজ ধরাশায়ী হয়েছে ইন্দু।"

মিঃ রায় দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইলেন, কিন্তু অশ্রুজল গোপন করিতে পারিলেন না, তাঁহার করাঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে তাহা উপছাইয়া পড়িতেছিল।

ইন্দিরা কতক্ষণ নির্ব্বাকে পিতার পানে তাকাইয়া তাঁহার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল; হঠাৎ নিজেও উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বক্ষের উপর মুখখানা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার উচ্ছ্বাসিত রোদনে মিঃ রায় নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তিনি দুই হাতে কন্যার মুখখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন, "ওকি, তুই হঠাৎ কাঁদিলি কেন ইন্দু? না মা, চোখ মোছ মা—কেউ দেখলে কি ভাববে বল দেখি?"

নিজের হাতে তিনি তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুই তো বড্ড বোকা মা, আমি একটা কথা বলতে না বলতে কেঁদে ভাসিয়ে দিলি?"

ইন্দু তবু থামে না—তাহার চোখের জলও কমে না।

মিঃ রায় অতি সন্তর্পণে তাহার হাতখানা নিজের গলা হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, ছোট মেয়েটীর মত তাহার মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

"তোর যা ভাল লাগে তুই তাই কর ইন্দু, আমি তাতে কিছু বলব না। যাতে তোর শান্তি হয়, তুই তাই করবি, তার জন্যে আমায় বলবার দরকার কি মা? টাকার জন্যে কিছু ভাবনা নেই, আমার সবই তো তোর, তা তো জানিস। একটা কাজ বলি, সেইটা কর দেখি মা, দেশের দুর্দ্দশা তো জানিস, অনেক দুস্থ আছে, তারা হয় তো খেতে পাচ্ছে না, ওদের ভার তুই নিজের হাতে তুলে নে। তোর দান ওদের ক্ষুধা মিটাক, ওদের অভাব দূর করে দিক, ওরা তোকে মা বলে জানুক। তুই সত্যিই বলেছিস ইন্দিরা—আমরা আমাদের বিলাসতৃপ্তির জন্যে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে যাই, সে টাকাটা যদি রাখি, অনেক দুস্থ খেয়ে বেঁচে যায়। আমি মত দিচ্ছি, আমার অতুল ঐশ্বর্য্য তোর হাতে দিচ্ছি, তুই এর সদ্ব্যবহার কর।"

ইন্দিরার চোখের জল শুকাইয়া আসিয়াছিল, সে মাথা তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সত্যি বলছ বাবা?"

তাহার কণ্ঠস্বরে যে ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া পিতা প্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন, "সত্যি নয় তো তোকে কি মিছে কথা বলে ভুলাব ইন্দু? বুঝলি মা, এই দেশের বুকে জন্মে এই দেশকে যে ঘৃণা করেছি, এখন এমনি করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, যাদের দরজা হতে তাড়িয়ে দিয়েছি তাদেরই সেবা করতে চাই। বুকটা আমারও দিন রাত জ্বলে যাচ্ছে মা, দেখি যদি এই ভাবে কাজ করে সে জ্বালা কমাতে পারি।

ক্রমশঃ

গান

কুমারী সুষমা

এলো রে মোর আঁখির কোলে
মেঘের মেলা;
নিবিড় কাজল গহন রাতে
তিমির বেলা।
হাওয়ায় দোলা বুকের তালে,
পরাণ ভুলায় মায়ার জালে;
এই বিজনে সুরের স্রোতে
ভাসাই ভেলা॥

কি কথা তোর রাখিস্ ঢেকে
স্বপন দিয়ে;
চিন্‌তে পারি প্রহর গেলে
বিদায় নিয়ে!
আঁধার মনের বাঁধন খুলে
আয় না ভুলে—গানের কূলে
যাবার আগে স্বপন রাগে
খেল্‌তে খেলা॥

ভ্রম সংশোধন:— গতমাসে ৮৮০ পৃঃ 'গল্পের শেষ' কবিতাটি বীণা রায়ের নামে বাহির হইয়াছে। তাহার নাম হইবে বাণী রায়।

চোখের দেখা

গল্প

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

(১)

বীথি প্রত্যহ কলেজ যাইবার সময়, তাহার প্রিয় বান্ধবী সুধাকে তাহার গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কলেজ যাইত। এবং যখন ক্লাসের ছুটি হইত, তখন বাড়ী প্রত্যাগমন কালে, সুধাকে সঙ্গে করিয়া তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিত।

বীথিদের বাড়ী হইতে খানিকটা আগে সুধাদের বাড়ী। সুধার বালিকা জীবনের সাথে যখন তাহার স্কুলের পড়া সাঙ্গ হইল, তখন বাড়ী হইতে কলেজ দূর হওয়ায়, এবং কলেজ বাস এতদূর না আসায় তাহার পিতা মাতা ইহাতে অমত করেন নাই।

বীথিকে প্রথম দেখাতেই, বীথির সেই কৌতুকমাখা সদাহাস্যময়ী মুখখানা বীথির নয়নে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। সুধার সেই স্নিগ্ধ শান্ত চেহারা, ততোধিক শান্ত নম্র ব্যবহার, নিমেষেই বীথিকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

দুই চারিদিন অতিবাহিত হইতেই, তাহাদের অপরিচিত দুইটী জীবন, তিল তিল করিয়া প্রীতি বন্ধনে উভয়ে উভয়কে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। বীথি অনিন্দ্য সুন্দরী, বীথির সুন্দর দুইটী ভ্রূলেখার নিম্নে বৃহদায়তন পক্ষরাজি সুশোভিত পদ্মনেত্র দুইটী, তাহার সুন্দর মুখখানিতে অধিকতর মাধুর্য্য ও কমনীয়তা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

তাহার বেশ প্রসাধন ততোধিক উজ্জ্বল।

সুধার বর্ণ স্নিগ্ধ শ্যাম।

তাহারা নিত্য কলেজ গমনকালে, সদরপথ অতিক্রম করিয়া একটী সাদা দুগ্ধফেননিভ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দেখিতে পাইত। এমন কোন পথিক সে পথে চলিত না, যে, সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা তাহার নয়নের অগোচর রহিবে।

সুধা ও বীথি দেখিত সেই প্রাসাদে একটী সুকুমার তরুণ, পথের ধারে বৃহৎ বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া থাকে। তাহার হাতে থাকে একটী তুলিকা, আর, সম্মুখস্থ টেবিলে থাকে চিত্র শিল্পীর সরঞ্জাম।

একদিন সুধা বলিল, "আচ্ছা বীথি ওই ছেলেটী বোধহয় শিল্পী, না ভাই?"

বীথি চপল কণ্ঠে বলিল, "শিল্পী ভিন্ন আর ত কিছু বলা চলে না, কারণ, হাতে ওর দিনরাত্রি ওই তুলিটী বিরাজ করছে।"

সুধা ফুল্লকণ্ঠে বলিল, "সত্যি ভাই কেমন ছবি উনি আঁকেন আমার বড় দেখতে ইচ্ছা হয়, তোর দেখতে ইচ্ছা হয় না?"

বীথি সেইরকম স্বরে উত্তর দিল, "ছাই ছবি আঁকে কেবল ত পথের পানে চেয়ে থাকে।" সুধা যখন তাহাকে, এ বিষয় লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া, তাহার নিকট হইতে কোনও তুষ্টিকর উত্তর না পাইয়া, নিরাশ হইয়া সে প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া বীথির পানে চাহিত, বীথি তখন তাহার অত্যন্ত সযত্নে রক্ষিত সুবিন্যস্ত, ললাটোপরি পতিত কেশের একটী গুচ্ছ ক্লিপ দ্বারা আটকাইতে, ও শাড়ীর ব্রোচ লইয়া ব্যস্ত থাকিত।

সুধা অনেক ভাবিয়াও তাহার খেয়ালী স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনও অর্থই সংগ্রহ করিতে পারিত না।

(২)

স্নিগ্ধ বাতাস, বাগানের প্রস্ফুটিত বেলফুল হেনা ফুলের সুগন্ধ লইয়া মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছিল।

বীথিদের শানবাঁধান পুকুর ঘাটে বীথি ও সুধা বসিয়াছিল। সহসা মুগ্ধকণ্ঠে সুধা বলিয়া উঠিল, "বীথি জানিস ভাই, আমাদের অনুমান মিথ্যে নয় ওই বাড়ীর সেই ছেলেটী সত্যিই শিল্পী। বীথি তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া, উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল, এবং বলিল, "সত্যি নাকি? কি করে তুই এ সঠিক খবর পেলি?"

সুধা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "হাসলি যে বড় আমি ত তোকে আর কোন কথা বলব্ না" বলিয়া সে কপট ক্রোধ দেখাইয়া, মুখখানি ঘুরাইয়া বসিল!

সহসা বীথির মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, আঁখি যুগল ছলছল করিয়া উঠিল, চকিতে সে তাহার বাহুর মালা সুধার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া, তাহার মুখের অতি সন্নিকটে মুখখানি রাখিয়া, মিনতিমাখা কণ্ঠে বলিল, "সুধা রাগ করলি ভাই? কথা বলবি না?"

সুধা হাসিয়া বলিল, "দূর পাগল তোর ওপর কি আমি রাগ করতে পারি।"

নিমিষে বীথির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, অধর প্রান্তে হাসির বিজলী খেলিয়া গেল, সে ফুল্লকণ্ঠে বলিল, "কি করে খবর পেলি বল?"

সুধা বলিল, "সেদিন আমি একখানা বই আনবার জন্যে দাদার লাইব্রেরী রুমে গিয়েছিলুম, ঘরে ঢুকতেই দেখি, সেই ছেলেটী ভাই, দাদার সঙ্গে গল্প করছেন; আমি চমকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই, দাদা বললেন, পালাচ্ছিস কোথা, একে দেখে লজ্জা করছিস কেন? এ আমার প্রিয় বন্ধু, একজন বড় চিত্রকর। আমি চকিতে একবার তাঁর পানে চাইতেই দেখলুম, তিনি মুখটী নীচু ক'রে বসে আছেন। সেই অবসরে আমি বইখানা নিয়ে চলে এলুম, আমার বড় লজ্জা করছিল ভাই, দাদা তখন কবে কলেজের কি হয়েছিল, কি করে তাঁদের আলাপ হয়েছিল এসব কথা বলতেই ব্যস্ত, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর কাছে অজানা রয়ে গেল। সত্যি ভাই উনি বড় লাজুক।

বীথি বলিল, "তাই নাকি, শিল্পীর লভে পড়েছিস নাকি? তাহলে আমাদের খাওয়াটা কবে হচ্ছে?"

সুধা মনে মনে ভাবিল, হায় বীথির কথা যদি সত্য হইত, সে যদি আজ সকলের বিনিময়ে শিল্পীকে পাইত? সেই মুহূর্ত্তে সুধা সে চিন্তা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "দূর কি যে বলিস বীথি, তোর মতন ত আমার ভুবন ভুলান রূপ নেই যে আমি শিল্পীর লভে পড়ব।"

বীথি কিন্তু সুধার একথার কোন অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিল না। সে বিস্মিত নেত্রে সুধার বিষাদ মাখা মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, দিনের শেষ আলো পৃথীবির বুকে শেষ বিদায় রেখা আঁকিয়া দিতেছে।

(৩)

শিল্পী আপন মনে তাহারি ছবিতে রং ফলাইতে ব্যস্ত থাকিত। পথের দিকে তাহার বড় একটা দৃষ্টি থাকিত না। একদিন দৈবক্রমে তাহার নয়ন যুগল গিয়া বীথির গাড়ীর ভিতরে, তাহারই মুখে পড়িয়াছিল। নিমিষের মাঝে সেই মুখখানা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। বীথি তখন ছিল অন্যমনস্ক, শিল্পী তাহার আঁখি যুগল উত্তোলন করিয়া, বীথির গাড়ীর ভিতরে নিক্ষেপ করিতেই, সুধা ত্রস্তে তাহার আঁখি দুটী শিল্পীর কক্ষ হইতে বাহিরে আনিত। শিল্পী অনিমেষ নয়নে বীথির সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। বীথির চঞ্চল দৃষ্টি কখনও শিল্পীর কক্ষে শিল্পীর চোখে পড়িত না। আর সুধা সে গোপনে দূর হইতে একবার শিল্পীকে চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইত। এমনি করিয়া দিনের পর দিন চলিতে লাগিল।

(৪)

বসন্ত সন্ধ্যার জ্যোৎস্না নির্ম্মল নীলাকাশ। গৃহখানি চিত্র, পুষ্প আলোকমাল্যে বিভূষিত। সবুজ পাতার আড়ালে, প্রদীপগুলি ঝিকিমিকি করিয়া জ্বলিতেছিল। গাছে গাছে শাখে শাখে আলোক ফুল আলোক ফল ধরিয়াছিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের মৃদু মৃদু হাসি। "আসছে, বর আসছে।" আবার সকল কোলাহল নীরব

হইতেছিল। এই নীরবতার মাঝে সুধা ভাবিতেছিল। এই অপরূপ লাবণ্য মাধুরী, সুধার নিকটে—মনে হইতেছিল অমাবস্যার রাত্রি। তাহার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া কত রকমের চিন্তা উঠিতেছিল। শঙ্খ উলুধ্বনির মাঝে রব উঠিতেছিল "বর" "বর না এলে বেশ হয়।" ইত্যবসরে বরের আগমন সংবাদ দিল, দূর হতে বাজনার ধ্বনি। বীথি আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "দেখিস্ ভাই সুধা অমল বাবু তোর প্রাণে যতই প্রেমের ঢেউ তুলুক, কিন্তু আমায় মনে রাখিস বন্ধু বলে, আমায় যেন ভুলে যাস্‌নি।"

সুধা একটু হাসিল, সে হাসি আনন্দের নয়, ব্যথায় আপনার অলক্ষ্যে অধর কোণে যে হাসির রেখা পড়ে, এ সেই হাসি। সে ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "মানুষকে মানুষ ভোলে কি ভাই, তোর স্মৃতিরেখা আমার হৃদয়ে সোণার অক্ষরে লেখা থাকবে।" এই কয়টী কথার ভিতরে যে কত গূঢ় অর্থ লুকান ছিল,—সে একমাত্র ভগবান ভিন্ন কেহই বুঝিল না।

"একি কাঁদছিস সুধা? ছিঃ কাদিস্‌নি, আজ এ আনন্দরাশির ভিতরে চোখের জল ফেলিস্‌নি; আবার ত দুদিন পর ফিরে আস্‌বি তার জন্য দুঃখ কি।" এই বলিয়া বীথি তাহার রুমালে সুধার অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটী মুছাইয়া দিয়া, সে আবার সেই কোলাহল মাঝে আপনাকে ডুবাইয়া দিল। বীথি ভাবিয়াছিল সুধার শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইবে বলিয়া কাঁদিতেছে।

আজ সুধার মনে কালো মেঘ স্তূপীকৃত, সে যত বার চোখের জল মুছিতে লাগিল, ততই উচ্ছ্বসিত অশ্রুভারে তাহার আঁখি ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

জীবনের প্রথম প্রভাতে তাহার হৃদয়কলি যখন বিকাশোন্মুখ, তখন তাহার সেই ক্ষুদ্র জীবনের মর্ম্ম-মুকুরে যে ছায়াটী পড়িয়াছিল আজ সেই ছবিখানি তাহার আঁখির সম্মুখে প্রতি পলে পলে সব চেয়ে দৃশ্যমান হইয়া ভাসিতে লাগিল।

অনেক সাধে আঁকা তাহার মানসপটে কল্পনার রঙীন ছবিটী নিমিষে মুছিয়া হরষ ও বিষাদের মাঝখান দিয়া বিধাতা সুধা ও অমলকে বিবাহের বিচিত্র বন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন।

(৫)

বীথির পরীক্ষার পর, তাহার পিতা সুকুমার বাবু, কন্যার বিবাহের জন্য, কিছু দিনের মতন দেশে তাঁহার পৈত্রিক বাটীতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সংকল্প উপযুক্ত পাত্রে বীথির বিবাহ দিয়া এবং বিবাহ কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া দেশের অন্ধ ধারণা দূর করাইবেন। এবং সেখানকার সকল কার্য্য মিটাইয়া পুনরায় তিনি কর্ম্মস্থান কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

দেশের লোকের ধারণা সুকুমার বাবু, একাদিক্রমে কলিকাতায় অবস্থান করায়, কন্যাকে বিবি বানাইয়াছেন, এবং খৃষ্টান কিংবা ব্রাহ্ম ঘরে কন্যার বিবাহ দিবেন।

দেশের লোকের এই ধারণা ভাঙ্গিবার নিমিত্ত, তিনি দেশেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

বীথিকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনিবার জন্য কলিকাতা-বাসী অনেক লোক তাহার নিকট প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সুকুমার বাবুর একান্ত ইচ্ছা, তাঁহার প্রিয় সুহৃদ সুধীর রঞ্জন বাবুর পুত্রটীর সহিত বীথির বিবাহ দেন। এই কারণে কোনও পাত্র তাঁহার মনোমত হইল না।

(৬)

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে, রজনীর শেষে, নব প্রভাতের অরুণ আলোক স্পর্শে, সুপ্ত ধরণী জাগিয়া উঠিত।

ক্রমে বেলা বাড়িতে থাকিত, দশটা বাজিয়া যাইত কিন্তু সে গাড়ীখানা আর আসিত না। শিল্পীর সকল প্রতীক্ষা ব্যর্থ করিয়া ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইত। শিল্পীর আর চিত্রাঙ্কন ভাল লাগিত না।

এমনি করিয়া কত প্রভাত কত রজনী অবসান হইল।

শিল্পী তাহার অচিন প্রিয়ার কোনই সন্ধান পাইল না।

ক্রমে তাহার ব্যগ্রতা বাড়িয়াই চলিল।

একদিন শিল্পী ভাবিল, যাহার দর্শনে আমার সমস্ত

শরীরে আনন্দের রোমাঞ্চ উঠিত, তাহাকে অমর করিয়া সৃজন করিতে হইবে। বীথির একখানি ছবি আঁকিল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, সে তাহার মানসীর স্মৃতি হইতে অব্যাহতি পাইল না।

অনেক ভাবিয়া সে সংকল্প করিল, কলিকাতায় আর থাকিবে না।

(৭)

দুচার দিন পরের কথা।

তখন সমস্ত পশ্চিম আকাশটায় অস্ত রাগের রঙ্ মাখাইয়া, ধীরে ধীরে দিনমণি আকাশের এক প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছিল। শিল্পী তাহার মুক্ত বাতায়ন-পথে বসিয়া, সেই অপূর্ব্ব সন্ধ্যাকাশের পানে অপলক নয়নে চাহিয়াছিল।

সে রাত্রের গাড়ীতে বিদেশে গমন করিবে।

সহসা ভৃত্য একখানি পত্র হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিল।

শিরোনাম দেখামাত্রই শিল্পী চিনিল এ তাহার জননীর হস্তাক্ষর। সে ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিল তাহার অনুমান মিথ্যা নয়। জননী লিখিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাটীর চাকর দ্বারবান, সরকার গোমস্তা ভিন্ন আর কেহই নাই। তাঁহার ননদও কয় দিন হইল, কোনও এক প্রতিবেশিনীর সহিত, তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন।

উপরন্তু তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন এত বড় বাড়ী, এত ঐশ্বর্য্য, কি চিরদিন তাঁহাকেই দেখিতে হইবে? পুত্রের কি এ সকল কার্য্যের কোনও দায়িত্ব নাই ইত্যাদি—এখানে একটু বলিয়া রাখা প্রয়োজন, এই শিল্পীর প্রকৃত নাম নীহার রঞ্জন বোস। সে—পুরের জমিদারের একমাত্র পুত্র। মাত্র পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হয়।

শিল্পী কোনওদিন অভাব কাহাকে বলে জানিত না, তাহার করুণাময়ী জননী আপন বুকের স্নেহচ্ছায়ায় চিরদিন তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন তাই তাহার সংসারের কোনও অভিজ্ঞতা ছিলনা। আজ সে অভাবকে ভালরূপে চিনিয়াছে। কারণ বীথির অনুপস্থিতিতে, সে তাহার সমস্ত প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা যেন কিসের অভাব অনুভব করে। পত্রখানি বার বার পড়িয়া ভাবিল, সত্যইত তাহার দুঃখিনী জননী কোনওদিন তাহাকে কিছু বলেন নাই। এখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই এ পত্র লিখিয়াছেন, তাহার স্নেহময়ী জননীর শরীর অসুস্থ, একথা ভাবিতেই সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া আদেশ করিল, আমি কাল সকালের গাড়ীতে বাড়ী যাব, আমার জিনিষপত্র ঠিক করে গুছাও।

সুদূর পল্লী হইতে একটী স্নেহময়ী নারীর করুণ আহ্বানে, নিমিষে শিল্পীর সকল সংকল্প ভাসিয়া গেল, হৃদয় হইতে প্রিয়ার চিন্তা অপসারিত হইল।

(৮)

আজ বীথির বিবাহ। তাহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকাটী আত্মীয় স্বজন, দাস-দাসীতে পরিপূর্ণ বীথির একান্ত অনুরোধে, সুধাকেও আসিতে হইয়াছে। বর দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল, "বেশ বর।" বীথির একটী সঙ্গিনী আসিয়া তাহার কানে কানে বলিয়া গেল, সত্যি বীথি তোরই মত সুন্দর তোর বরটী হয়েছে। লজ্জায় বীথির সমস্ত আননটী রক্তাভ হইল। বরণ করিবার সময় বর দেখিয়া সুধার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল।

প্রথমে সে আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। স্থির হইয়া নয়ন মুছিয়া সে বিস্মিত নেত্রে, বিবাহ সভার দিকে চাহিতেই, তাহার অলক্ষ্যে; একটী হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, দুই হস্তে সে তাহার আর্ত্ত বুকখানা চাপিয়া ধরিল।

এই মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার হৃদয়ে ভুলিয়া-যাওয়া অতীতের শতস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষে, একটী নির্জ্জন কক্ষ অধিকার করিল।

শিল্পী তখন বীথির কুসুম পেলব করযুগল আপন হাতের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, মৃদুকণ্ঠে বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিল। বিবাহের দুই দিন পরে, শিল্পী নীহার রঞ্জন বোস, একখানি সুন্দর ছবি বীথিকে দেখাইয়া বলিল, "এ খানা চিনতে পার।" বিথী লাজরক্তিম আননে, গভীর বিস্ময়ে, অপলক নয়নে, ছবিটীর পানে চাহিয়া রহিল। শিল্পী স্মিত হাস্যে অধরপ্রান্ত রঞ্জিত করিয়া বলিল, "চিনতে পারলে না!"

বীথি জড়িতকণ্ঠে বলিল, "আপনি আমার ছবি কোথায় পেলেন?"

কান্ত-সাহিত্যের নান্দী পাঠ

প্রবন্ধ

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

কান্ত-সাহিত্যের নান্দী পাঠ করিতে গেলেই প্রথমেই সম্মুখে পড়ে, "ভারত কাব্য-নিকুঞ্জে জাগো সু-মঙ্গল-ময়ি মা।" মন-প্রাণ মোহিত হইয়া যায়, শ্রবণে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে! শেষের দিকটায় একটা স্বপ্নের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়; চোখের সম্মুখে ভাল করিয়া ধরা পড়িবার—ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার আর অবসর থাকে না,—একেবারে প্রাণের মন্দির-দ্বারে আসিয়া আঘাত করে।

তা'রপর যখন "শুভ্র-রজত গিরি কিরণ বিকিরণে অন্ধ নয়ন যুগ" খুলিয়া যায়, তখন এক অপূর্ব্ব স্বচ্ছ শোভা নয়ন সম্মুখে আবির্ভূত হয়। তখন দেখিতে পাই,

> "তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা,
> ঊর্দ্ধে চাহ অগণিত মণি রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা
> সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল দরশা।"

তখন "নৃত্যপুলক গীতি মুখর কলুষ হর তরঙ্গা" কান্ত-বাণীর অমল ধবল মূর্ত্তিখানি দেখিয়া শ্রদ্ধা বিস্ময়ে প্রাণ ভরিয়া উঠে। বাস্তবিক, কান্তসাহিত্য অভিনব! তাহা একাধারে কবিতা এবং সঙ্গীত। কান্ত শ্যামা বাঙ্‌লার শ্যামা বিহঙ্গ, আপন সুরে বাঙ্‌লার পল্লী-নগর মুখর করিয়া গিয়াছেন! কান্ত-সাহিত্য "স্বচ্ছ নিরমল অপরূপ ঢল ঢল।" বর্ত্তমান যুগের খেয়ালী কবিকুলের ন্যায় কান্ত কোনও আবছায়া সৃষ্টি করিবার অবসর পান নাই। প্রতিভার স্নিগ্ধালোকস্পর্শে কান্ত-কাব্য সুরভিত! বিভিন্ন ভাব কুসুমের শত সম্ভারে কান্ত তন্ময় হইয়া যে মাল্যটি রচনা করিয়াছেন, তাহা পেলব, মধুময়;—ভ্রমর গুঞ্জনে গুঞ্জিত। স্বচ্ছ-সলিলা নদীটির মত কান্তের বাণী মধুর মঙ্গল কলনাদে দুকুল মুখরিত করিয়া ধীর মন্থর গতিতে আপনার মনে বহিয়া চলিয়াছে; কোথাও কাহাকেও আঘাত করে নাই! উহার স্নিগ্ধ স্পর্শে প্রাণ-মন শীতল হয়।

ভক্তি সঙ্গীতে, কান্তের যে ঐকান্তিক আকুলতা তাহা পাঠকের চিত্তে এক অভিনব প্রেরণার সৃষ্টি করে;—জগৎ ভুলাইয়া দেয়। প্রার্থনার আকুলতায়, তাহাদের স্বচ্ছতায়, এবং মর্ম্মের গভীরতায় উহা ভারতীর কমল-কাননে শতদলে বিকশিত।

কবি তাঁহার প্রেমাস্পদকে—সেই চির-কিশোর, চির সুন্দরকে, তাঁহার "দয়ালকে" নানা ভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। কখনও প্রভু, কখনও পিতা, কখনও বা স্নেহময়ী মাতারূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন, আবার কখনও বা সখারূপে,—দয়িতরূপে—পরম প্রেমিক কান্তরূপে ভাবিয়া, প্রাণ খুলিয়া সঙ্গীত গাহিয়াছেন।

সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আপন অন্তরের অনন্ত আকুলতা সেই পরম সুন্দরের রাতুল চরণে অঞ্জলি দিয়াছেন।

সংশয়ের ঘনান্ধকারে পথহারা পথিকের মত কবি কখনও গাহিতেছেন,

> "ওই, বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু,
> দেখাও তব চির আলোকা লোক।"

> "তুমি, নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে
> মলিন মর্ম্ম মুছায়ে,
> তব, পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক, মোর
> মোহ কালি মা ঘুচায়ে।
> "আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া
> বসে, আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া
> আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু
> দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।"

অপরাধীর বেশে মর্ম্মদাহী কবি গাহিতেছেন,—

"আজীবন পাপলিপ্ত লয়ে এ তাপিত চিত,
দূরে রব দাঁড়াইয়া লজ্জিত কম্পিত ভীত ;
সব হারাইয়া প্রভু, হ'য়েছি ভিখারী দীন
তোমারে ভুলিয়া হায় নিরানন্দ কি মলিন ;
কোন্ লাজে দিব পায় ? এ হৃদি কি দেওয়া যায় ?
সে-দিন আমার গতি কি হবে হে দীন-গতি ?"

মাতৃরূপে শরণ লইয়া কবি বলিতেছেন,—

"আহা, কত অপরাধ করেছি আমি,
তোমারি চরণে মাগো !
তবু কোলছাড়া মোরে করনি, আমায়
ফেলে চলে গেলে নাগো।
আমি চলিয়া গিয়াছি "আসি" বলে
তুমি বিদায় দিয়েছ আঁখি-জলে,
কত আশীষ করেছ বলেছ "বাছারে
যেন সাবধানে থেকো।"

সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ হৃদয়ের কি নিখুঁত স্বাভাবিক চিত্র এই স্বল্প কয়টি কথার অন্তরালে প্রকাশ পাইয়াছে।

আবার আবদারের সুরে বলিয়াছেন,—

"মাগো, এ পাতকী ডুবে যদি যায়,
অন্ধকারে চির মরণ সিন্ধুনীরে,
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবেনা তায়।"

"কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা ধূলো কাদা মেখেছি বলে।"

"আমি ত তোমারে চাহিনা জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ,

প্রভৃতি কথার ভিতর দিয়া সখা এবং দয়িতের অপরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব" প্রভৃতির ভিতর দিয়াও কবির ভগবৎ প্রেমের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে!

কবির হৃদয় মুক্ত আকাশের ন্যায় উদার এবং স্বচ্ছ সেখানে কোনও প্রকারের আবিলতার স্থান নাই। ভক্ত কবি ভগবানের প্রতি একাগ্র চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার মন এতটা প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। কখনও মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল, কখনও বা প্রভু বলিয়া চরণে কাতর নিবেদন, আবার কখনও বা দয়িতের সঙ্গে প্রেম মধু পান,—এমনি করিয়া বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া কবির পূজা চলিয়া আসিয়াছে। তাঁহার এই উদারতা 'অভয়ার' একটি গানে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে,—

ঝগড়া ঝাটি যাক্‌রে মিটে
বল কৃষ্ণ কালীর জয়।"

স্বদেশের প্রতি কান্তের যে প্রেম, তাহা মধুর মঙ্গল রসে পরিপূরিত! অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় কান্তের অন্তরের মর্ম্মস্থানে স্বদেশের প্রতি যে প্রীতির বন্যা নীরব বহিয়া চলিয়াছে, তাহা স্বচ্ছ, অনাবিল অনাড়ম্বর।

"বাণীর" সূচনায় কবি উচ্ছ্বসিত চিত্তে গাহিলেন—

"আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ
আর কি আছে সে প্রাণ ?"

'শক্তিসঞ্চারে' কবি ভৈরবীজলদমন্ত্রে আশার বাণী শুনাইলেন,—

'ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্বগগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরনবিতরি, ডাকিছে সুপ্তিমগনে,
নিদ্রালস নয়নে, এখনো কি রবে শয়নে ?
জাগাও, বিশ্ব পুলক পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।"

জন্মভূমির স্তব করিতে যাইয়া আত্মহারা কবি গাহিলেন—

জননী তুল্য তব কে মর-জগতে ?
কোটী কণ্ঠে কহ "জয় মা বরদে!"
দীর্ণ বক্ষহ'তে তপ্ত রক্ত তুলি,
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি।"

কান্তের স্বদেশ-প্রীতি শান্ত এবং মধুর; সেখানে বীণাবেণুর তান আছে, কিন্তু ঢক্কা-নিনাদের অবসর মোটেই নাই?—সমগ্র কান্তকাব্যেই উহার স্থানাভাব। কান্তকাব্য শরতের শান্ত নদীটীর মত নির্ম্মল স্বচ্ছ,

ধোয়ামোছা—অনাবিল। বর্ষার উদ্দামতা এবং আবিলতা ছুয়েরই সেখানে একান্ত অভাব।

স্বদেশ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কান্ত যেন সংগঠনের ইঙ্গিত করিয়াছেন। কান্ত যেন গঠনমূলক কার্য্যকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন; তাই তিনি সংকল্পে গাহিলেন,—

মায়ের দেওয়া মোটাকাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই ?
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই,
পরের জিনিষ কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরে জিনিষ পাই।"

কান্ত যেন আপনার ঘরের দিকেই তাকাইতে বলিয়াছেন। ঘরের লক্ষ্মীকে বাহিরে দিয়া আমরা আজ লক্ষ্মীছাড়া হইয়া বিশ্বের বুকে লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় করিয়া ফিরিতেছি,—আমাদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। তাই কবি একাধিকবার আমাদিগকে ঘরে ফিরিবার জন্যই বলিয়াছেন। কবি বলিতেছেন,—

তাই ভালো মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত;
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব
মা'র বাগানের কলারপাত!
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান,
মোটা হোক সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান।
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।
মিহি কাপড় পর্‌বো না আর যেচে পরের কাছে'
ঘরের মোটা কাপড় পর্‌লে কেমন সাজে,
দেখ্‌তো পর্‌লে কেমন সাজে।
ও ভাই চাষী ও ভাই তাঁতি, আজকে সুপ্রভাত,
কসে লাঙ্গল ধর ভাইরে, কসে চালাও তাঁত।
কসে চালাও তাঁত।
আবার বলিতেছেন,
আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু আজ সাত কোটি ভাই জেগে ওঠ।"

এখনও যদি আমরা না জাগি, তবে সময় ফুরাইয়া যাইবে; তাই কবি বেলা যায় সঙ্গীতে শুনাইলেন,—

"আর কি ভাবিস্ মাঝি ব'সে ?
এই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে
হাল ধরে থাক বসে
এই হাওয়া পড়ে গেলে
স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে,
কূল পাবি নে ভেসে যাবি,
মর্‌বি যে আপ্‌শোষে।"

কান্ত ছিলেন মেকীর শত্রু। যে কোনও প্রকারের ভণ্ডামীই কান্ত সহ্য করিতে পারেন নাই। কখনও গুরুগম্ভীর মন্দ্রে, কখনও বা হাসির তীব্র উপহাসে, সেই কৃত্রিমতাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়াছেন। সমাজের অঙ্কে বহু যুগ সঞ্চিত আবর্জ্জনার বোঝা দেখিয়া কান্ত গাহিলেন,—

"তোরা ঘরের পানে তাকা,
এটা কফ ভরা রুমালের মত
বাইরে একটু আতর মাখা।"

কান্ত সমাজের দুর্গতি দেখিয়া করুণ কণ্ঠে যে গান শুনাইলেন, তাহাতে বাঙলার হিন্দু সমাজের কত খুঁটি-নাটি ঘটনা, কত নগ্ন আবর্জ্জনা স্তূপ বাহির হইয়া পড়িল। একটি উদাহরণ দিতেছি,—

"তোরা ঘরের পানে তাকা,
এটা কফ ভরা রুমালের মত
বাইরে একটু আতর মাখা।
"বহু শাস্ত্রবারিধি কালাচাঁদ বিদ্যানিধি
নিবারণ মাইতির সঙ্গে কর্চ্ছেন তর্ক ফাঁকা।
মাইতি বলে 'মুর্গী ভালো'—শাস্ত্রী বলে 'ধর্ম্ম গেল'
(আবার) আঁধার হ'লে দুজন মিলে
হোটেলে হ'লেন গা ঢাকা।
"অথর্ব্ব বুড়োর সনে, সাত বছরের কনে
বিয়ে দেয় নিঠুর বাপে, হাতিয়ে কিছু টাকা,
(আবার) এমনি কিছু মোহ তক্কার
যে দু'শ' শাস্ত্রী বিদ্যালঙ্কার,
সেই বিয়ের মন্ত্র পড়ায় উড়িয়ে টিকি জয়পাতাকা।

"না যেতে বাসি বিয়ে, মেয়ের যায় সব ফুরিয়ে,
মোছে কপালের সিঁদুর ভাঙ্গে হাতের শাঁখা ;
(তখন) মিলে সব শাস্ত্রীবর্গ, হেসে করান বৃষোৎসর্গ,
মেয়েটির একাদশীর সুব্যবস্থা করেন পাকা।
"সে একাদশীর রেতে, মরে জল পিপাসাতে,
বোকা বাপ দাঁড়িয়ে দেখে মাথায় হাঁকায় পাখা ;
(আবার) বসে সেই মেয়ের পাশে অন্ন গেলে গ্রাসে গ্রাসে,
সমাজে নাই চেতনা, অন্ধবধির মিথ্যা ডাকা।

"পাড়াগাঁয়ে দলাদলি ; শুধু কান মলামলি,
ভাইপোকে রাগের চোটে শালা বলেন কাকা ;
(আবার) পেলে একটু দোষের গন্ধ, অমনি ধোপানাপিত বন্ধ,
এঁরাই আবার সভায় বলেন উচিত মিলে মিশে থাকা।

"পুরোহিত পূজোয় বসে মন্ত্র আওড়াচ্ছে ক'সে,
গায়েতে নামাবলী প্রাণে লুচির ঝাঁকা।
(আবার) বাইরে বসে নব্যহিন্দু গণ্ডুষ কচ্ছেন মন্ত্রসিন্ধু
ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই এক বিন্দু, শুধু কৌলিক বজায় রাখা।"
ইত্যাদি।

হাস্যরসের ভিতর দিয়াও কবি সমাজের রুগ্ন অঙ্গে মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করিয়াছেন। কবির হাস্যরসের তুলনা নাই। বঙ্গ সাহিত্যে উহা অভিনব। উহা কাহাকেও অসঙ্গত আঘাত না করিয়া—ব্যথার অর্ঘ্য জাতির মর্ম্মতলে নিবেদন করিতেছে। যদিও হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্র লালের অনুকরণ করিয়া হাস্যরসের কবিতা লিখিতে কান্ত উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তবু তাহাতে কান্তের চির বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হইয়াই ধরা পড়িয়াছে। কান্তের হাস্যরস কখনও হাসির ভিতর দিয়া ব্যথার নিবেদন করিতেছে, আবার কখনও বা শুদ্ধ হাসাইয়াই মাতাইয়া দিতেছে। "বরের দর", "বেহায়া বেহাই" প্রভৃতি সঙ্গীতের ভিতর দিয়া কবি সমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কত করুণ, কত সত্য, কত নিখুঁত! "বরের দর" সঙ্গীতের এক স্থলে কবি অল্প মাত্র কথায় বরের পিতার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কত বাস্তব হইয়া ফুটিয়াছে।—

"দিও বারাণসী যোড়াই—খর্চ্চ কিছু হ'ল লবাই ;
তা তোমার মেয়ে তোমার জামাই,
তোমার আকিঞ্চন,
আমার কি ভাই ? আজ বাদে কাল মুদ্‌বো দু'নয়ন।"

বাণীর সর্ব্বশেষ 'বিদায়' সঙ্গীতে কবি যে চিত্র জনসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আজকালকার অধিকাংশ ঘরেরই কথা। ঘরে গিন্নীর উৎপাত, ঝি চাকরের কলকোন্দল, ছেলে মেয়ের অশান্ত আব্দার; বাহিরে কামারের উপদ্রব, গোয়ালার জলমিশান খাঁটি দুধ, কাপুড়ের সাঁচ্চা বোল,—গুরুদেবের কিরা, ধোপা নাপিতের উৎপাত প্রভৃতি উপদ্রবের বিদ্রোহে সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের যে দুর্দ্দশার ছবি ফুটিয়াছে, তাহা অপরূপ। একটু উদাহরণ দিই,—

"পড়েছি কি পাপের ফেরে গিন্নীটি যে আবদেরে,
কাপড় দে, গয়না দেরে ফরমাসেতে হই পাগল ;
'পারি নে' বল্লে চল্লেন বাপের বাড়ী
ঘুরিয়ে স্বর্ণনথ সুগোল
(মুখের কাছে)
"ধোপা তিরিশখান দরে কাপড় দেয় দু'মাস পরে,
ভদ্রতা কেমন করে রাখ্‌বো ভাবি তাই কেবল ;
আবার নাপ্তে নবীন বর্ষে দু'দিন
দেখা দিয়ে করে প্রাণ শীতল।"

'উকিল,' 'ডাক্তার,' 'ডেপুটী,' 'দেওয়ানী হাকিম,'—প্রভৃতি গানের সুরে এবং ভঙ্গিমায় কবি তাঁহার দেশবাসীকে হাসির সঙ্গে দারুণ ব্যথায় জ্বালাময়ী কাহিনী শুনাইয়াছেন। আবার অন্যদিকে "বিশ্রামে", "স্বর্গের খবর" দিতে গিয়া কবি শুধু অজস্র হাসির বন্যা নামাইয়াছেন। 'কেরাণী জীবনের চিত্রখানি স্বাভাবিকতায় ভরপুর। "ব্রাহ্মণ বিদায়ের" চিত্রখানি নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও নিতান্ত দুর্লভ নহে।

কান্তের বাণীসাধনা অনাড়ম্বর। বাণীর অমল-ধবল মূর্ত্তিখানিকে আপনার মনোমন্দিরে অভিষিক্ত করিয়া কবি হৃদয়ের শুভ্র প্রীতি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে বসিয়াছিলেন। তাই সেখানে আয়োজন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ততা নাই। মন্দির সাজাইয়া বিজলীর আলোকে

লোকের চক্ষু ঝলসিত করিয়া দিবার আড়ম্বর প্রয়াস সেখানে আদৌ নাই। নীরব-সাধক কবি আপন মনে সুরের লহর তুলিয়া বাণীর কমল কানন মুখরিত করিয়াছেন। বাণীমায়ের তুষার শুভ্রমূর্ত্তিখানির মধ্যে যে মনোভাব নিহিত আছে, তাহা আজকালকার নব্য কবিকুলের মধ্যে অনেকের অজ্ঞাত হইলেও বাণীর দীন পূজারী রজনীকান্তের তাহা অজানা ছিল না। তাই বিনয়ের মূর্ত্ত 'কান্ত' সকলকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিয়া সকলের প্রাণ ভরা ভালবাসা পাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাণী সাধনা নীরবে প্রস্ফুটিত শুভ্র কমলিনীর ন্যায় সৌরভে ভরপুর।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও কবির পূজা বন্ধ হয় নাই। রোগ যন্ত্রণার মধ্য হইতেও কবি "আনন্দময়ীর" সাক্ষাৎ পাইয়া আকুল মনে অমৃত পরিবেষণ করিয়াছেন। "আনন্দময়ী" কাব্যসম্পদে অতুলনীয়। "আনন্দময়ীতে" কবি কোন নূতন ভাবের সৃষ্টি করেন নাই। "আনন্দময়ী" মহাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বাৎসল্য রসে সঞ্জীবিত। উহাতে গিরিরাজ কন্যার পিতৃগৃহে আগমন, আগমনে গিরি রাণীর আনন্দ, তিন দিনমাত্র হিমালয়ে অবস্থান করিয়া, পুনরায় মাতাপিতা, স্বজন প্রতিবেশীকে কাঁদাইয়া, কৈলসে শিবের ভবনে যাত্রা প্রভৃতির ভিতর দিয়া দেবীকে বাঙালী গৃহের কন্যারূপে পরিকল্পনা করিয়া অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার করিয়াছেন। "আনন্দময়ীর" ভূমিকা লিখিতে বসিয়া সুসাহিত্যিক— সারদা চরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রজনী কান্ত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও হৃদয়াকাশে অনন্ত বিশ্বের প্রতিমা গড়িয়া কবিতা লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন।···"আনন্দময়ী" পাঠ করিতে করিতে রামপ্রসাদকে মনে পড়ে। তবে সেকালের ভাষা ও একালের ভাষায় পার্থক্য আছে।"

বাস্তবিক ভাষার বৈশিষ্ট্য কান্ত কাব্যের সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। উহা সংস্কৃত শব্দ বহুল, কিন্তু সরল এবং সরস, মধুর ও গম্ভীর। কান্তের ভাষা সর্ব্বত্রই সমান সুষ্ঠুতার সঙ্গে ভাবকে বহন করিয়া চলিয়াছে, কোথাও স্খলিত পদ হইয়া ভাবের সমাধি-শয্যা রচনা করিবার প্রয়াস পায় নাই। একটা উদাহরণ দিতেছি,—

কনকোজ্জ্বল জলদচুম্বি মণি মন্দির মাঝেরে,
বীণ মুরজে, পর মঙ্গল মধুর বাদ্য বাজেরে।
পেলব নব পল্লব দলে, পূর্ণকুম্ভ পাবন জলে,
কদলী তরু তোরণ তলে কুসুম মাল্য সাজেরে॥
গ্রথিত লক্ষ কুশল কেতু, গঠিত ইন্দ্রচাপ সেতু,
লজ্জিত শশী লক্ষ দীপ সজ্জিত প্রতি সাঁজেরে॥
মাতৃদরশ হরষ গান, আকুল শত সরস প্রাণ,
মঙ্গল ময়ি! জগত জননি! আয় মা বলি নাচেরে।
কহিছে কান্ত মধু পিয়াসী, সার্থক গিরি নগর বাসী
জয় জয় গিরি মহিষী জয়, জয় জয় গিরি রাজেরে॥

ইহার পার্শ্বে আমাদের বর্ত্তমান কবিদের রচনার কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠক, দেখিতে পাইবেন, কান্তের ভাষার সহিত এভাষার পার্থক কত!

"বৎসর পরে আসিছ আবার জননী, বৎস বৎসলা,
তাই-উৎসব-উৎস-প্রসার-স্পন্দমান।
শিশু শশিদূত ঘোষিছে বারতা, ধরণী-পুলক চঞ্চলা
দিশি দিশি শুভশংসি সূচন ছন্দগান।"

"নবমীর শেষ যামে" কান্ত যে বিষাদের সুর জাগাইয়াছেন, তাহা কত প্রাণস্পর্শী!—

"জাগরে দাস দাসি,
জাগরে প্রতিবাসি,
দেখরে কাছে আসি
ফেটে যে গেল বুক।
আয়রে আয় কাছে,
আর কি রাতি আছে!
রাজ—মহিষী হ'য়ে
দেখে যা কত সুখ।"

রাজ মহিষী হ'য়ে দেখে যা কত সুখ—এই একটুখানি কথার ভিতর দিয়া কত খানি মর্ম্মের বেদনা উছলিয়া উঠিয়াছে!

"যামিনী হইলে ভোর
বুকের শোণিতে মোর
লোহিত হইবে উষাকাশ গো।"

প্রভৃতি কথার ভিতর দিয়া একদিকে যেমন কবিত্ব, আবার অপর দিকে তেমনি বিচ্ছেদাশঙ্কার গভীর বেদনা আকুল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। "কার্ত্তিকগণেশের আদর", "রাণীর খেদ" প্রভৃতি কবিতার ভিতর দিয়া স্নেহের যে মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা অভিনব। "আনন্দময়ী" একাধারে সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের ঘর-করণার কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে দর্শন উপনিষদের বাণী শুনাইয়া সর্ব্বশেষে জগন্মাতার অভয় চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। কবি নিজেও বলিয়াছেন, "উৎকট রোগ শয্যায় দুর্ব্বল হস্তে এই সঙ্গীতগুলি লিখিয়াছি। আর কোনও আকর্ষণ না থাকিলেও, ইহাতে জগদম্বার নাম আছে মনে করিয়া, পাঠক অনাদর করিবেন না, এই বিনীত প্রার্থনা।"

মরণোন্মুখ কবি এইরূপে বাণীর সেবায় তন্ময় হইয়া আপনাকে সেই অনাদি কারণের শ্রীচরণে ধীরে ধীরে সমর্পন করিয়া দিতেছিলেন !

কান্ত ছিলেন কবি এবং সাধক—সাধক এবং কবি। তাঁহার সেই অনাড়ম্বর সাধনা জয়যুক্ত হইয়া, তাঁহার স্বদেশবাসীকে এবং তাঁহার সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

* পাবনা কবির স্মৃতি সভায় (১৩৩৭) পঠিত।

স্বামীর বিয়ে

গল্প

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

(১)

বাবা আমার নাম রাখিয়াছিলেন শিবরাণী, কিন্তু আমার বাপমা আমাকে শুধু 'রাণী' বলিয়া ডাকিতেন। আমার রংটা ছিল খুবই ফর্সা, পাড়া-পড়শীরা, যারা দুপুর বেলায় বেড়াইতে আসিত এবং চাল ডা'লের অভাব হইলে মার কাছে চাহিলেই পাইত তাহারা সকলেই মাকে বলিত,—'মা, তোমার মেয়ের রংএর কাছে কাঁচা সোনা হার মেনে যায়। যেমন টানা চোখ তেমনি ছোট ছোট ঠোঁট দু'খানি—আর তেমনি কোঁকড়া কোঁকড়া এক মাথা চুল,—মা যেন সত্যি সত্যিই সাক্ষাৎ দুর্গা—মা সত্যি রাজরাণী হবার উপযুক্ত।'—এই ছিল আমার সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীদের ভবিষ্যদ্বাণী। আর ছিলেন এক আচার্য্য ঠাকুর, গণৎ-কার। কখন কার ফাঁড়া আছে এবং কি উপায়ে কত কম খরচে তিনি সে ফাঁড়া কাটাইতে পারেন এই সব ব্যবস্থা করিয়া, এ-গ্রামে ও-গ্রামে ঘুরিয়া, ঠিক দুপুর বেলায় প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং এই রকম ভাবে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন আমাদের বাড়ীতেই খাইতেন। আমার হাত দেখিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া, তিনি বলিয়া-ছিলেন—আমার এক জমিদারের বাড়ীতে বিয়ে হবে পাশকরা ছেলের সঙ্গে। আমাকে প্রায়ই বলিতেন—"দেখিস্ মা, জমিদারের গিন্নী হ'য়ে তোর এই বুড়ো ছেলেকে যেন ভুলিস্ না।"

আমার বাবা কলিকাতায় চাকরী করিতেন। এক ঘিএর গদীর তিনি ছিলেন মড় মুহুরী। গদীর বাবুরা ওঁর কাজে খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাই তাঁর বেতন হইয়াছিল চল্লিশ টাকা। আমাদের সামান্য কিছু জমি-জায়গা ছিল, তা হ'তে ছয় সাত মাসের খাবার ধান আমরা পাইতাম। আর সংসারের খরচও বেশী ছিল না।

............হঠাৎ কলেরায় বাবা মারা গেলেন। আমাকে ও দুইটী ছোট ভাইকে লইয়া মা বিধবা হইলেন। তখন আমার বয়স বার বৎসর। আমি

গ্রামের পণ্ডিত ম'শায়ের পাঠশালায় পড়িতাম, 'সাহিত্য-পাঠ' শেষ করিয়াছিলাম, শুভঙ্করীর অঙ্কও কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম। তাছাড়া, পাড়ার মুকুয্যেদের 'কলকাতার বৌ'এর কাছে কিছু কার্পেটের কাজও শিখিয়াছিলাম। ভাল জায়গায় বিবাহ দিবার ইচ্ছা আমার বাবার বরাবরই ছিল,—সেই জন্য পোষ্টাপিসের ব্যাঙ্কে তিনি ৭০০৲ টাকা জমা রাখিয়াছিলেন।

বাবার মৃত্যুর পর আমাদের কোন প্রকারে দিন চলিতে লাগিল। আমার বিবাহের জন্য মা বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দেড় হাজারের কম মা ভাল পাত্রের সন্ধান কোথায় পাইলেন না।......আমাদের গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে গোপালপুরে আমার বিবাহের স্থির হইল। ঘটক বলিলেন, 'ছেলেটী রত্ন' কি আর এমন বয়েস, এর মধ্যে দুটো পাশ করে ফেলেছে কলিকাতায় বি-এ পড়ে, বাপ নেই, মা আছে; ঐ একটী ছেলে শাশুড়ীর খুব আদর যত্ন পাবে। আর ছেলেটি রূপে যেন কার্ত্তিক—আমাদের শিবরাণীর সঙ্গে হর গৌরীর মিলন হবে।" বলা বাহুল্য, আমি এসব কথা সবই শুনিয়াছিলাম। আমার যে সব সঙ্গীদের বিবাহ হইয়াছিল, তাহাদের স্বামীদের কথা ভাবিতে লাগিলাম। আর তাহাদের তুলনায় আমার ভাবী স্বামী সম্বন্ধে কত কল্পনাই না করিতে লাগিলাম!.........

বাবার জমা টাকা ছাড়া, মা তাঁহার সমস্ত গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া নূতন গহনা গড়াইয়া দিলেন ও নগদ টাকা বরপক্ষকে মিটাইয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার কিছু ধারও হইল। শুনিলাম, আমি সুন্দরী বলিয়াই আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী অত কম টাকায় অমাকে গ্রহণ করিতে রাজী হইয়া ছিলেন।

... ... বিবাহ হইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল, দেখিলাম ঘটক মিথ্যা বলে নাই আমার স্বামী সত্যই সুন্দর। ফুলশয্যার রাত্রে তিনি বলিলেন, তোমাকে আমি কবে প্রথম দেখেছি জান? আমি বলিলাম, "কেন, বিবাহের রাত্রে, চারি চক্ষুর মিলনের সময়।" তিনি বলিলেন, "নাগো রাণু, তার অনেক আগে; মহেশতলার মেলায় তুমি গিয়াছিলে মনে আছে?...তখন থেকেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলেছিল--তোমাদের গ্রামের বিনয় আমার বন্ধু; সেই দূরথেকে তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল, বুঝেছ—"..............

(২)

বিবাহের পর প্রতি শনিবার আমার স্বামী আমাদের বাড়ী আসিতেন। কলিকাতা হইতে দুই ঘণ্টা ট্রেনে আসিয়া দেবীপুর ষ্টেশনে নামিতে হয়, সেখান হইতে দুই ক্রোশ হাঁটিয়া তবে আমাদের বাড়ী। প্রথম প্রথম মা ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইতেন। তারপর তিনি বলিলেন—"মা গাড়ী পাঠাবার আর দরকার নেই, শনিবার দিন অনেক লোকই ত কলিকাতা হ'তে বাড়ী আসেন। আমি ওদের সঙ্গেই হেঁটে আস্‌বো।"

এক বৎসর এই রকম ভাবেই কাটিল। এরই মধ্যে আমাদের গ্রামে আমার স্বামীর খুব সুখ্যাতি উঠিল। আমাদের গ্রামে যে সখের থিয়েটার ছিল, তাতে তিনি খুব ভাল অভিনয় করিতে লাগিলেন শনিবারে আসিয়াছেন শুনিলেই গ্রামের ছেলেরা থিয়েটারের রিহার্সালে ডাকিয়া লইয়া যাইত।

কিন্তু আমাদের বাড়ী এত ঘন ঘন আসার জন্য আমার শাশুড়ী তাঁর পুত্রের উপর বিরক্ত হইতেন ক্রমে মায়ের কাণে আসিল যে শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিয়াছেন—ছেলে ঘন ঘন শ্বশুর বাড়ী যায়, যদি পরীক্ষার ফল খারাপ হয়, তবে অপয়া বৌটারই দোষ। আমার স্বামীকে প্রথম প্রথম মা পথ-খরচ বলিয়া সাধ্যমত দু'তিন টাকা করিয়া দিতেন। ক্রমে সংসারের অভাব অনটনে তিনি সেই টাকা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন আমার স্বামী নিজেই প্রায়ই আমাকে বলিতেন, "তোমার মায়ের কাছ থেকে গোটা কতক টাকা নিয়ে দিতে পার? আমার একখানা বই কিন্‌তে হবে।" এই রকম কারণ দেখাইয়া মাঝে মাঝে মায়ের কাছ হইতে তিনি টাকা আদায় করিতেন। একটী মাত্র জামাই, পড়িবার ব্যয়ের জন্য চায়, মা "না"—বলিতে পারেন না।

তখন জানিতাম না—কিসের জন্য তিনি টাকা চাহিতেন। কিছু দিন পরে, মায়ের কষ্ট দেখিয়া আর আমি টাকার জন্য মাকে অনুরোধ করিতে পারিতাম না। তখন আমার উপর আমার স্বামীর খুব রাগ হইল। তিনি আসা বন্ধ করিলেন।

*　　　*　　　*　　　*

কিছু দিন পরে শ্বশুর বাড়ী গেলাম। দুই মাসের মধ্যে তিনি একদিন বাড়ী আসিয়াছিলেন। সে মানুষ যেন আর নয়। সব কথাতেই বিরক্তি।......তাঁহার ভাব দেখিয়া শাশুড়ী চিন্তিত হইলেন। আসিতে পত্র লিখিলেও আসেন না; উত্তর দেন,—"এখন বাড়ী গেলে পড়া-শুনার ক্ষতি হ'বে, পরীক্ষা শেষ হ'লে যাব।" একাকী আমার দিন কাটিতে লাগিল। কাহাকেই বা দুঃখের কথা জানাইব? এত টাকা খরচ করিয়া একরকম সর্ব্বস্বান্ত হইয়াই—মা পাশকরা ছেলের হাতে আমাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও কি-যেন আশঙ্কায় চিন্তিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে আর এখানকার সংবাদ জানাইতাম না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী কোথাও গেলে নির্জ্জনে আমি স্বামীর আগেকার লেখা চিঠি-গুলি খুলিয়া পড়িতাম। এইগুলি এখন আমার বড় আদরের—সেই সুখস্মৃতি মাখা চিঠিগুলি এখনও রাখিয়া দিয়াছি, কত রংএর খাম—কত রকমের চিঠির কাগজ! সেই মানুষ এমন হইল কেমন করিয়া—? তাঁর একখানি চিঠি:—

"রাণু, তুমি পত্রের উত্তর দিলে না কেন? তোমার অসুখ করে নাই তো? আমি সোমবারে কলিকাতায় পৌঁছিয়াই তোমাকে পত্র দিয়াছি—। সেই পত্র তুমি মঙ্গলবারে পাইয়াছ। বুধবারে উত্তর দিলে আজ বৃহস্পতিবারে পাইতাম। আমি কলেজের ক্লাশ কামাই করিয়া তোমার চিঠির আশায় মেসে আসিয়া দেখিলাম—চিঠি নাই। আমার আর কলেজ যাওয়া হইল না! দুইটা ক্লাশ নষ্ট হইল—তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিলাম, আকাশ পাতাল ভাবিতেছি—মনে হইতেছে, শনিবারে গিয়া হয়ত দেখিব তোমার অসুখ হইয়াছে। আমি সারারাত জাগিয়া তোমার সেবা করিব। কিন্তু যদি আগে হইতে জানিতে পারিতাম—তোমার জন্য এখান হইতে কিছু ফল লইয়া যাইতাম। রাণু তুমি, চিঠি দিতে আর এত দেরী করিও না। আজ রাত্রে আমার আর ঘুম হইবে না।—ইতি তোমার 'রাজা'।

এতক্ষণ আমার স্বামীর নাম বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁর নাম সুকুমার। তিনিও আমাকে রাণী বলিয়া ডাকিতেন, আর চিঠিতে নিজের নাম না লিখিয়া লিখিতেন—'তোমার রাজা'।

(৩)

ক্রমে পরীক্ষার ফল বাহির হইল; তিনি ফেল করিলেন। অপয়া বলিয়া শাশুড়ী ও প্রতিবেশীনীদের অনেক গঞ্জনা সহ্য করিলাম।

এক দিন তিনি বাড়ী আসিলেন।......রাত্রে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাগা। তোমার আংটিটা হাতে নাই কেন?" বিরক্ত হইয়া তিনি উত্তর করিলেন, 'তোমার সে খোঁজে দরকার কি? তোমার মায়ের কাছ থেকে কিছু টাকা এনে দিতে পার?" আমি বলিলাম "মা আর কোথায় পাবেন? তোমার জন্য একশ টাকা ধার করেছেন। আমার দু'টী ছোট ভাই আছে, মাতো আর, ওদের ভাসিয়ে দিতে পারেন না!" ইহা শুনিয়া তিনি যে ভাষায় আমাকে গাল দিলেন, সে ভাষা তাঁর মুখে সেই আমি প্রথম শুনিলাম।

শাশুড়ী বলিলেন—"এবার ফেল হয়েছিস্ আর একবার পড়।" তিনি বলিলেন "পড়ে শুনে আর কি হবে; আজকাল পাশের আর কোন মূল্য নেই। বরং একটা চাকরীর চেষ্টা দেখিগে। ক'লকাতায় আমার এক বিশেষ বন্ধু আছে সে তার বাপকে বলে আমার চাকরী করে দেবে বলেছে। এখন এই চেষ্টায় কিছু দিন ধরে মেসে থাকতে হবে। আমার খরচার জন্য শতখানেক টাকা চাই। আজ পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করে দাও, বাকী টাকা পাঠিয়ে দিও।" পুত্রের কল্যাণ কামনায় শাশুড়ী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া টাকা আনিয়া দিলেন। তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ছেলে বাড়ী আসে না চিঠি দিলে উত্তর পান না মা প্রমাদ গণিলেন ক্রমে আমি শাশুড়ীর দুই চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইলাম। গঞ্জনা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মাকে চিঠি দিলাম। তিনি লিখিলেন "যখন আমি বেঁচে আছি, তোমাকে অত কষ্ট সইতে হবে না; অদৃষ্টে যা ছিল হয়েছে—শুধু দু'মুঠো ভাতের জন্য তোমাকে অত গঞ্জনা সইতে হবেনা।"…মা লইয়া গেলেন!

* * *

আমাদের গ্রামের 'বিনয়দা' তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। তিনি মোরাদাবাদে চাকরী করিতেন। সম্প্রতি কলিকাতায় বদ্‌লী হইয়াছেন। মায়ের কাছে আমার স্বামীর খবর লইতে আসিয়া সমস্ত শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। বলিলেন—"ঠিক খবর লইয়া আপনাকে জানাইব"। তিনি আসিয়া বলিলেন—"সুকুমার, নূতন এক থিয়েটারে চাকরী করে। বেতন পঁয়ত্রিশ টাকা, তাও রীতিমত পায় না—আর বেতন পেলেই বা কি হবে? থিয়েটারের মেয়েদের……"আর শুনিলাম না। চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, মা চোখ মুছিতেছেন।

* * *

তারপর পাঁচবৎসর পরের কথা। শাশুড়ী লইয়া যান না, স্বামী আসেন না। শাশুড়ী বলিয়াছেন—"বৌয়ের যক্ষার রোগ আছে, সেইজন্য বৌ ত্যাগ করেছি—" এই প্রচার করিয়া পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের স্থির করিয়াছেন এবারেও টাকা পাইবেন। তাঁহার পুত্রের টাকার দরকার, তাই তিনিও মত করিয়াছেন। এদেশে আইবুড়ো মেয়ের অভাব নাই। পাত্রীও জুটিয়াছে।

* * *

চুল আর বাঁধিনা। মাথায় জটা ছাড়াইয়া দিয়া মা আল্‌তা পরাইয়া দিলেন আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বিকেল বেলা—তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, পাড়ার বেনে বৌ মাকে বলিল, "আমি দিঘিতে জল আন্‌তে গিয়েছিলাম—আম বাগানে পাল্কী রয়েছে, বেহারারা বিশ্রাম কর্‌ছে দেখে সন্ধান নিয়ে জান্‌লাম তোমার জামাই আবার বিয়ে করে এইখান দিয়েই যাচ্ছে। কি লজ্জার কথা মা!"

সদর রাস্তার ধারেই আমাদের বাড়ী। বরক'নে এই রাস্তা দিয়াই যাইবে। মনে করিলাম—দরজার পাশে দাঁড়াইয়া বরক'নেকে দেখিয়া লইব। পা উঠিলনা—মা চলিয়া গেলেন। ক্রমে বেহারাদের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পা দু'টাকে ঠেলিয়া লইয়া দরজার নিকটে গেলাম। তখন বর দেখা গেল না। শুধু ক'নের লাল রংএর সাড়ীখানার খানিকটা দেখা গেল। পিছনে ছিল শ্বশুর বাড়ীর পুরাতন চাকর নিতাই।……

"আকাঙ্ক্ষিতা"

দবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ভাল না বাসিবে যদি কাছে এ'স না,
তোমার রূপের ফাঁদে আর বেঁধোনা,
পরাণে জাগাও কেন আকুল আশা,
যদি না মিটাবে, প্রিয়ে অধর তৃষা?

সুন্দর মুখখানি লাগে যে ভালো,
সাধনার ধনি তুমি, নয়ন আলো;
কাঁপিলে তোমার বুক মধুর লাজে,
বন্দী করিতে যাই বুকের মাঝে;

হৃদয়ের সেই সাধ কভু মিটেনা,
তোমারে দেখিলে তবু জাগে কামনা!

প্রিয়া

—গল্প **শ্রীসুবোধ কুমার পাল**

ভাল বেসেছিলাম। ভালবেসেছিলাম তাকে—আমার প্রিয়াকে। কি নিবিড়—কত গভীর ছিল সে প্রেম—আমার সেই প্রাণময় ভালবাসা!

জগতে শুধু তাকেই আমি চেয়েছিলাম, পেয়েছিলামও তাই প্রাণে-প্রাণে—গভীর ভাবে তাকে—নদীর মতোই একটানা অবিরাম সুরে!

এমনি ক'রে, এই ভালবাসার মাঝে, তারই বাহুর বন্ধনে দিন আমার কেটে যেতে লাগ্‌লো—তারই কোলে মাথা রেখে—তারই চোখ-মুখ অলকরাশির দিকে তাকিয়ে থেকে—তারই কত সে প্রণয়-কাকলীর মাঝখানে……

তারপর—তারপর—

স্বপন আমার ভেঙে গেল! সে আমার চ'লে গেল—পরপারে—ঐ নীল যবনিকার ওপারে। কোন্ পাপে, ভগবান্! কোন্ পাপে তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে—প্রিয়াকে আমার কেড়ে নিলে!

একদিন বাদল-সন্ধ্যায় বাড়ীতে ছুটে এসেছিলাম, ঠিক মাতালের মতই ছুটে এসেছিলাম—প্রিয়ার বাহুপাশে এলিয়ে প'ড়ে বাদল-সন্ধ্যাটুকু ভোগ করতে। কিন্তু, সেদিন প্রিয়া বাড়ী ছিল না!—কোথায় গিয়েছিল সেদিন অমন মুহূর্ত্তে সে, আমাকে ছেড়ে, একাকী বেরিয়ে! তবে কি—তবে কি—

ছি-ছি-ছি-ছিঃ………

প্রিয়া—প্রিয়া—প্রিয়া আমার সে—

"ওমর-খৈয়াম" নিয়ে একখানা চেয়ার টেনে বস্‌লাম। একটা লাইনেও মন গেল না। প্রিয়ার আগমন-পথেই মন আমার প'ড়ে রইলো।

একটু পরেই প্রিয়া আমার এলো—সন্ধ্যার সেই বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে। কাপড় বদলে আমার বাহুপাশে ধরা দিলো—হাস্‌লো!

পরের দিন তার সর্দ্দি লাগ্‌লো, কাসি হ'লো। হপ্তাখানেক সে তাতেই ভুগ্‌লো। তারপর শয্যাগত হ'লো। সারারাত ধ'রে বিনিদ্র কাটাতে লাগ্‌লাম তার শিয়রে ব'সে, তার বিবর্ণ ম্লান মুখখানার দিকে তাকিয়ে!

ডাক্তার এলো—ব্যবস্থাপত্র দিল—চ'লে গেলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না, সে আমার চলে গেলো—

তার শেষ নিশ্বাসটুকু—শেষ চাহনিটুকু আজও জ্বলছে আমার প্রাণে—আমার স্মৃতির মর্ম্মর দর্পণে!

সকলে এলো—শবাধারে তাকে তুল্‌লো—বাঁধলো! আমার প্রাণ-প্রিয়াকে! আজও মনে পড়ছে হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের তালে তালে হাতুড়ীর সেই প্রাণ-কাঁপানো শব্দ!—যে-শব্দ তাকে শবাধারে বাঁধবার সময় কানে গিয়েছিলো—মর্ম্মে বিঁধেছিলো!

ঘরে থাকতে পার্‌লাম না, প্রাণ আমার কেঁদে উঠ্‌লো! কী ক'রে থাক্‌বো? কা'র পাশটিতে গিয়ে বস্‌বো? কা'রই-বা আর সে প্রণয়-কাকলী শুনবো? প্রিয়া যে আমার নেই—

ঐ তো সেই আয়নাখানি! যেতে-আস্‌তে দু'বেলা ঐ ওতেই তো প্রিয়া তার মোহিনী মূর্ত্তিটি দেখতো, নখ থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখতো—একটিবার দু'টিবার নয়—কতবার, কতশতবার, তার সেই ঢল-ঢল যৌবন-লাবণ্য, হাস্য, লাস্য; আরও কত কী—আরও কত কী দেখতো! দেখতো, তার নীল আঁখি দু'টি, চকিত চাহনিটি, লাল পেলব ঠোঁট দুটি……

আজও আছে সেই আয়নাখানি—রিক্ত, নিঃস্ব, সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে, শুধু প্রিয়ারই মধুর স্মৃতিটুকু বুকে ক'রে।

ঐ সোফা! একদিন বস্‌তাম ওতে, প্রিয়ারই কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে! আজও সে প'ড়ে রয়েছে একপাশে, কেঁদে কেঁদে উঠছে আমারই মতো থেকে থেকে!

ঐ সেই রুমালখানি—প্রিয়া আমার মুখ মুছতো ওতে, আমিও কতদিন মুছিয়ে দিয়েছি স্বহস্তে! ঐ সেই চিরুণীখানি, প্রিয়া আমার ওতে···! ঐ সেই পেয়ালাটি···

সব আছে—ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু রিক্ত—নিস্ব—সর্ব্বস্বান্ত! চাইতে পারলাম না ওগুলোর দিকে, থাকতেও পারলাম না ঘরের মধ্যে! বেরিয়ে গেলাম ছুটে—উন্মাদের মতো হ'য়ে—জ্ঞান হারিয়ে—

জানিনে কে আমায় ছোটাচ্ছে, ছুটছি কিন্তু অবিরাম—উদ্দাম বেগে! জানিনে কোথায়—কেনই-বা যাচ্ছিলাম, কেনই-বা ছুটছিলাম। তবে হ্যাঁ, ছুটছিলাম বটে! ঐ রকম ছুটে—অবিরাম দৌড়ে, পৌছলাম শেষে সমাধি-ক্ষেত্রে এসে!

এখানেই শায়িত আমার প্রিয়তমা! এখানে—ঐ মাটির নীচে সে! ঐ—ঐ যে আমার প্রিয়ার সমাধি! অনাড়ম্বর সরল সমাধি! ওই যে, ওপরে মার্ব্বেল পাথরে লেখা রয়েছে—উজ্জ্বল তাজা টক্‌টকে লেখা—

"সে ভালবেসেছিল, ভালবাসা পেয়েছিল, এবং সেই ভালবাসা-বাসির মাঝখানে কেবল ভালবেসেই সে মরেছিল!"

সেই প্রিয়া—সেই প্রিয়া আমার এখানে, মাটির নীচে! প্রাণ আমার কেঁদে উঠলো—কেঁদে লুটিয়ে প'ড়লো!

ব'সে থাক্‌লাম, কতক্ষণ ব'সে থাক্‌লাম সেখানে! সন্ধ্যে হ'য়ে গেলো ক্রমে। ইচ্ছে হ'লো রাতটুকু কাটিয়ে দেব—কেঁদে কেঁদে, উত্তপ্ত অশ্রু ফেলে, প্রিয়ারই পাশে—প্রিয়ারই সেই সমধি'পরে!

কিন্তু উন্মাদ উদ্ভ্রান্ত মন আমার সেখানেও থাক্‌লো না, টিক্‌লো না—ছুটে বেরুলো! ঘুর্‌তে লাগ্‌লো সেই শ্মশান নগরীর ধ্বংস-রাজ্যে!

আঁধার! আঁধারের পর আঁধার, কেবল আঁধার—কেবল আঁধার! আলো নেই—চাঁদ নেই—জোনাকীরও এতটুকু আভাসমাত্রও নেই! আঁধার আর আঁধার! বিকট আঁধারে চারদিক ঢাকা! সে-আঁধারে কোলের মানুষ দেখা যায় না! ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম—ছুটতে লাগলাম সেই আঁধার-সমুদ্রে আমি একা, নিতান্ত একা, একেবারে নিঃসহায় একান্ত একা! আমার চারদিকে শুধু শব—শুধু মৃত্যু—শুধু কবর! শুধু কেবল পরিণামের ঘটা! কবর আর কবর! সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস! কেবল ধ্বংসের প্রবাহ! কালের করতালি কটাক্ষ, নিয়তির নির্ম্মম হাস্য!

এই ধ্বংসের মধ্যে মরার রাজ্যে ছুটে চলেছি আমি একা! দেখ্‌তে কি তাকে পাব না? একবার—একটি বার? প্রসারিত বক্ষে দুই বাহু বাড়িয়ে ধরতে যাই তাকে, উন্মাদের মতো মাতাল হ'য়ে, প্রতিহত হই সমাধির পাথরে—আলিঙ্গন করি সমাধির ওপর দেওয়া পরিম্লান শুষ্ক পুষ্পমাল্যে! হা অদৃষ্ট! পেলাম না—পেলাম না—তাকে আমার পেলাম না—

এমনি ক'রে কত ঘুর্‌লাম—অবিরাম ছুটে বেড়ালাম! ক্লান্ত হ'য়ে শেষে ব'সে পড়লাম একটা সমাধির ওপর গিয়ে!

ব'সে আছি—কতক্ষণ ব'সে আছি! আর ভাব্‌ছি তার কথা—আমার প্রিয়ার কথা! অকস্মাৎ ন'ড়ে উঠ্‌লো সমাধির সেই প্রস্তর-পীঠটা, যেখানার ওপর আমি ব'সেছিলাম—ব'সে ব'সে প্রিয়ার কথা ভাবছিলাম! পীঠটা বেশ নড়্‌তে লাগ্‌লো! মনে হ'লো—ভেতর থেকে কে যেন ঠেল্‌ছে সেখানা! আমি লাফিয়ে উঠ্‌লাম এবং স'রে গেলাম! তারপর দেখ্‌লাম—সমাধির যে-পাথরখানার ওপর আমি ব'সেছিলাম, সেখানা সোজা ওপরে উঠে গেলো! কবরের মুখ খুলে গেলো! সেই খোলামুখে একটা বিকৃত উলঙ্গ মৃতদেহ বেরিয়ে এলো। তারপর দেখলাম, যদিও অন্ধকার রাত, তবুও স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম—যেখানে লেখা ছিল—

"এখানে জ্যাক্স শায়িত আছে। সে একজন সংলোক ছিল। সে আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসত। পরমশান্তিতে সে মরেছে।"—

সেই মৃত লোকটাও তার বিকট মণিহীন আঁখি গহ্বর দিয়ে সেগুলো পড়্‌লো এবং ঐন্দ্রজালিকের মতো লেখাগুলোর ওপর ধীরে ধীরে তার সেই শীর্ণ কঙ্কালসার হাতখানা বুলিয়ে দিয়ে সেগুলো মুছে ফেললো।

তারপর সেখানেই আবার লিখ্‌লো—উজ্জল অক্ষরে—বিশদভাবে—

"এখানে জ্যাক্স শায়িত আছে। বিষয় পাবার লোভে অসময়ে সে পিতাকে হত্যা করেছে। নিজের স্ত্রীকে, নিজের ছেলেকে সে নির্য্যাতন ক'রেছে। প্রতিবেশীকে ঠকিয়েছে। শেষে শোচনীয় ভাবে সে মরেছে।"

আমি স্তম্ভিত হ'লাম!

তারপরও আবার দেখ্‌লাম—সমাধিক্ষেত্রের সমস্ত ডালা খুলে গিয়েছে! যত মড়া সব বেরিয়ে এসেছে এবং সমাধি-মন্দিরে তাদের আত্মীয় স্বজন যে-সব মিথ্যা প্রশংসার কথা লিখেছে, সে-গুলো সব নির্ম্মমভাবে মুছে ফেল্‌ছে! কেননা স্বহস্তে সেখানে প্রকৃত কথা লিখে তারা সত্য প্রকাশ করবে!

আমি আরও স্তম্ভিত হ'লাম!

পবিত্র সমাধি-মন্দিরে যাদের সাধু বলা হ'য়েছে, যাদের গুণকীর্ত্তন করা হ'য়েছে, তারা তাহ'লে—সেই স্বর্গগত সাধুরা তাহ'লে সাধু নয়! সুপবিত্র সমাধি-মন্দিরে—অন্তিম শয্যার শিরোদেশে পবিত্র ঐ লেখা-গুলো মিথ্যা তাহ'লে! নিন্দা প্রশংসার অতীতে—মরণের পরেও তাহ'লে ছলনা! ঈশ্বরের দরবারে যাবার পথেও সাধু সাজবার কল্পনা, পাপী হ'য়েও! শেষ বিচারে মুক্তিলাভের ইচ্ছা পাপ ক'রেও!

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে মুখ লুকোলাম!

আমার মনে হ'লো হয়তো আমারও প্রিয়া তার কবর থেকে বেরিয়ে তার সমাধি-মন্দিরে কিছু লিখ্‌ছে! আবার হয়তো দেখতে পাব—আবার হয়তো দেখ্‌তে পাব—তাকে—আমার প্রিয়াকে—

মাতালের মতো ছুটে গেলাম প্রিয়ার সমাধি-মন্দিরের দিকে! দেখ্‌তেও তাকে পেলাম দূর থেকে আমার জীবনাধিক প্রিয়াকে! বোধ হলো যেন সমধি-মন্দিরের গায় কি লিখ্‌ছে সে!

দেখ্‌তে তাকে পেলাম। চিন্‌তেও বেশ পারলাম! কিন্তু—কিন্তু, একি! তার মুখখানি যে ঢাকা! প্রিয়ার মুখখানি তো দেখ্‌তে পেলাম না—কেন? প্রিয়া মুখ লুকিয়ে কেন? প্রিয়া আমায় মুখ দেখাচ্ছে না কেন?

সমাধি-মন্দিরের ওপর নজর গেল! দেখ্‌লাম—লেখা ছিল সেখেনে—

"সে ভালবেসেছিল, ভালবাসা পেয়েছিল, এবং সেই ভালবাসাবাসির মাঝে কেবল ভালবেসেই সে মরেছিল।" এর স্থানে লেখা আছে (কে লিখেছে, হয়তো প্রিয়াই লিখেছে) পড়লাম—

"তার প্রিয়তমাকে লুকিয়ে একদিন সে আর কা'কে ভালবাস্‌তে গিয়েছিল এবং ফেরবার সময় বৃষ্টিতে ভিজে সে বাড়ী এসেছিল। বৃষ্টিতে ভেজার জন্যে তার সর্দ্দি কাসি হয় এবং তাতেই সে মরে যায়!"

স্তম্ভিত হ'লাম। এই প্রিয়া, আর এই তার ভালবাসা! মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো, মাথা বিগ্‌ড়ে গেলো! আমার প্রিয়া—আমার প্রিয়া, সে কি না...

ভগবান্! ভগবান্!

মূর্চ্ছিত হ'য়ে গেলাম আমি প্রিয়ার সেই সমাধি-মন্দিরের পাশে—প্রিয়ারই বক্ষের কাছে!*

* Maupassant's "The dead woman" হইতে।

চোর

—গল্প—

শ্রীসুবাসিনী বালা বসু

পূজার বাজার। বেচাকেনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। দোকানে আর খরিদ্দার ধরে না। সোকেসে, আল্না আলমারিতে, দেরাজে ও মেজেতে জিনিষপত্রের ছড়াছড়ি। চারিদিকে তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি। কেহ নবপরিণীতা প্রিয়ার জন্য সৌন্দর্য্যের মানানসই কাপড় ও ব্লাউস কিনিতেছে। কেহবা সদ্যজাত শিশু-পুত্রের জন্য লাল রংয়ের জামা হাতে লইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এইটাই বেশ হবে না?" আবার অন্য একটী ভদ্রলোক পূজায় জামাই-তত্ত্ব দিবার জন্য শান্তিপুরি ধুতি চাহিতেছেন কিন্তু মনোমত পাড় না পাইয়া দোকানিকে বলিতেছেন, "কি হে! কি রকম দোকান, এইটা মনের মত পাড় নাই।" দোকানি হাত যোড় করিয়া বলিতেছে, "মশাই সব শেষ হয়ে গেছে, কাল ঠিক এই সময় পাবেন।

হঠাৎ এই সময় বাইরে ভয়ানক একটা গোলযোগ আরম্ভ হইল! আমরা ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম একটা দোকানের সামনে কতকগুলো লোক জমা হইয়া, কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "মার শালাকে,—মার—মার,—পুলিশে দাও—"

ব্যাপার কি জানিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। প্রহৃত লেকটার কস বহিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। সর্ব্বাঙ্গ তার ধুলায় আচ্ছন্ন, কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, সকলেই প্রহার করিতে উদ্যত। ইহা দেখিয়া আমি ভীড় সরাইয়া তার দিকে অগ্রসর হইলাম, লোকগুলোকে অনেক কষ্টে শান্ত করিলাম। তার প্রতি আমার সহানুভূতি দেখিয়া, সে আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবু এরা আমাকে মেরে ফেল্লে।"

আমি তাকে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, পুলিশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন তাকে দেখিয়া বলিল, "ইয়ে আদমী চোট্টা হয়, হামারা দোকানসে জুতা চুরি কিয়া হয়,—আভি ইস্‌কো থানামে লে যাও।"

এই বলিয়া দোকানদার পুলিশকে একযোড়া ছোট জুতা দেখাইল, ইয়ে দেখ!

আমি সমস্ত ঘটনা এক মুহূর্ত্তে বুঝিয়া গেলাম। পুলিশ তাকে এক ধাক্কা দিয়া বলিল, চল শালা থানে মে।

চোর বলিয়া প্রথমটা ঘৃণায় আমার সমস্ত মনটা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া লইলাম, কিন্তু তাকে চীৎকার করিয়া বলিতে শুনিলাম, "বাবু আমাকে রক্ষা করুন। না হলে এরা অমাকে জেলে দেবে।" তার কাতর অহ্বান আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি মুখ ফিরাইয়া তার দিকে চাহিলাম, তখনো পর্য্যন্ত তার চোখ বহিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। আমি পুলিশের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিলাম। পুলিশ প্রভু আমার কথা রাখিল না। সে তাহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সে রাত্রে আর ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। কেবল বার বার আমার মনের কোণে এই কথাটি খোঁচা দিতে লাগিল, এত সব বেশী দামের জিনিষ থাকিতে; কেন সে এক যোড়া পাঁচ সিকা দামের জুতা চুরি করিল? হঠাৎ আমার কেমন যেন ঝোঁক চাপিয়া গেল। যেমন করিয়া হউক লোকটীকে বাঁচাইতে হইবে।

পরদিন খপর লইয়া জানিলাম, বেচারাকে হাজতে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। দশটার সময় বিচারের জন্য কাছারীতে উপস্থিত করা হইবে।

আহারাদি শেষ করিয়া দশটার সময় কাছারীতে উপস্থিত হইলাম। একজন উকিল নিযুক্ত করিলাম।

যথা সময়ে আসামীকে কাঠগড়ায় হাজির করা হইল। দেখিলাম, একরাত্রে বেচারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। চোখ কোঠরে বসিয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। চুলগুলো মাথার উপর অসম্ভব রকম খাঁড়া হইয়া রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন লোকটা দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করিবার পর, আজ যেন সবে মাত্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছে।

বিচারক প্রথমে দোকানদারকে প্রশ্ন করিলেন। সে যথাযথ প্রশ্নের উত্তর দিল। তার পর আসামীকে প্রশ্ন করিলেন। সে তো কাঁদিয়া আকুল প্রশ্নের কি উত্তর দিবে। বিচারক তাকে ধমক দিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি চুরি করেছিলে ?

সে হাতযোড় করিয়া উত্তর দিল, "হাঁ হুজুর !"

চুরি করেছিলে কেন ?

এবার সে কোন জবাব দিল না কেবল কাঁদিতে লাগিল।

তোমার জেল হবে ?

সে এবারও কোন জবাব দিল না।

তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তা না হলে বেশী সাজা দেব।

সে এবার বলিতে লাগিল, হুজুর আমি বড় গরিব। কিছুদিন আগে একটা চায়ের দোকানে চাকরী করতাম কিন্তু আজ প্রায় দুমাস হল তাও গিয়েছে। এখন কোনদিন খেতে পাই, কোনদিন পাই না। এর উপর আরো একটা বিপদ আছে। আমার একটা পাঁচবছরের ছেলে আছে। তার কষ্ট সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যেমন করে হোক তার আহার যোগাড় করতে হয়।

পূজার কয়েক দিন আগে, পাড়ায় খেলতে গিয়ে এক বাবুর ছেলের পায়ে জুতো দেখে আসে। বাড়ীতে ফিরে এসে বায়না ধরলো আমাকে মণ্টবাবুর মত জুতো কিনে দাও। আমরা গরীব মানুষ, জুতো কিনবার মত আমাদের শক্তি নেই, একথা তাকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলাম ; কিন্তু অবোধ শিশু কিছুতেই বুঝলো না। কেবল কাঁদে আর বলে, আমাকে মণ্টবাবুর মত জুতো কিনে দাও। এই রকম করে তিন চার দিন কাটল।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এল। গালের একধারে তার আঘাতের চিহ্ন। সমস্ত গালটা লাল হয়ে রয়েছে। তার মা তাকে কোলে তুলে নিয়ে, কেন সে কাঁদছে জিজ্ঞাসা করলো। সে কাঁদতে কাঁদতে যা বললে তার ভাবার্থ এই যে মণ্টুবাবু জুতো খুলে রেখে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছিল। নিকটে কাউকে না দেখে, সে মণ্টবাবুর জুতোটা একবার পায়ে দিয়ে দেখছিল। সেই সময় মণ্টর চাকর সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সে মনিব পুত্রের জুতো তার পায়ে দেখে ক্রুদ্ধ হয় ; এবং তৎক্ষণাৎ জুতো খুলে দিতে আদেশ করে। বেচারা ভয়ে ভয়ে জুতো খুলে দেয়। প্রভুভক্ত ভৃত্য তখন মনিবপুত্রের জুতো পায়ে দেওয়ার জন্য শাস্তিস্বরূপ তার গালে একথা দিয়ে বিদায় করে।

শুনে আমার সমস্ত শরীর জলে উঠলো। কিন্তু কোন তো উপায় নেই, আমি বড় গরিব।

পরদিন সকালে উঠে দেখলাম, ছেলেটার একটু জর জর মত হয়েছে। ডাক্তার দেখাবো কিম্বা কোন ওসুধ দেব এমন পয়সা আমার কাছে নেই। শিউলী ফুলের পাতা নুন দিয়ে ছেঁতো করে খাইয়ে দিলাম। এই রকম করে চার পাঁচ দিন কাটলো।

সেদিন রাত থেকে সে যেন কেমন চমকে চমকে উঠতে লাগলো ও চীৎকার করে বলতে লাগলো বাবা আমাকে মণ্টর মত জুতো কিনে দাও। কখন অতি কাতরস্বরে বলতে লাগলো, আর মেরো না, আর আমি কখন মণ্টবাবুর জুতো পায়ে দেবো না। মা আমার গালে বড্ড ব্যথা, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো। মণ্টবাবুর চাকরটা আমাকে বড্ড মেরেছে বাবা,—তুমি তাকে মারবে না বাবা ?

এই ভাবে রাত কাটলো। সন্ধ্যা হতেই আবার সে নির্জ্জীবের মত পড়ে রইল। সন্ধ্যা হতেই আবার সে সেই রকম চমকে চমকে উঠতে লাগলো ও মধ্যে

মধ্যে চীৎকার করে বলতে লাগলো, বাবা জুতো কিনে দিলে না, আমি যে মরে যাবো।

বউ চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমার সেখানে বসে থাকা অসম্ভব হল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে পারি আজ জুতো নিয়ে তবে বাড়ী ফিরব। উদ্দেশ্য-হীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা জুতোর দোকানে এসে উপস্থিত হলাম। কত রকমের জুতো সোকেসে ও আলমারিতে সাজানো রয়েছে। দেখলাম একটা সো-কেসে একযোড়া ছোট্ট জুতো রয়েছে। সেটা আমার ছেলের পায়ে হতে পারে! যদি আমি দেখতে চাই, তা হলে দোকানদার আমাকে পাগল বলে তাড়িয়ে দেবে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে স্থির করলাম, যেমন করে পারি জুতো যোড়াটা চুরি করতে হবে। এছাড়া আর অন্য উপায় নেই। সুযোগ অন্বেষণ করতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলাম সেই সোকেসটা খুলে বিক্রেতা একজন ক্রেতাকে একযোড়া জুতো দেখাতে দেখাতে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলে গেল, ক্রেতাও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দিকে গেল। আমিও মনে করলাম অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। অবসরে বুঝি সোকেসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু জুতো যোড়াটা উঠিয়ে নেবার সময়, হাত কেঁপে ডালায় লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ডালাটা পড়ে গেল। দোকানদার ব্যস্ত হয়ে, সোকেসের নিকট দৌড়ে এল। জুতো যোড়াটা আমার কম্পিত হাত থেকে খসে আমার পায়ের নিকট, মেজের উপর পড়ে ছিল। দোকানদার মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঘটনটা বুঝে নিল। এবং তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চেপে ধরে চীৎকার করে উঠ্‌লো চোর-চোর। পলকের মধ্যে আমার চারিদিকে লোক জমে গেল। ভয়ে আমি চোখ বুজলাম। তারপর চটাপট শব্দে চারিদিক থেকে আমার উপর প্রহার চলতে লাগলো, ওঃ সে কি প্রহার! এখনো আমার সমস্ত শরীরে ব্যথা রয়েছে। খানিক বাদে দোকানদার আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তায় নীচে এনে বললে, শালাকে পুলিশে দাও। সত্যিই তারা আমাকে পুলিশে দিল।”

আসামী আর বলিতে পারিল না। সমস্ত বিচার কক্ষ নিস্তব্ধ। হঠাৎ আসামী পাগলের মত চীৎকার করিতে করিতে দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বলিল “হুজুর এতক্ষণে ছেলেটা আমাকে না দেখতে পেয়ে মরে গিয়েছে। আর বোধ হয় তাকে দেখতে পাবনা।”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, “আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আমার বৌ মরা ছেলে কোলে করে, কাল রাত থেকে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে।”

আসামী এবার দুই হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে বসিয়া পড়িল। সমস্ত এজলাস কক্ষ নিস্তব্ধ। সমস্ত দর্শকের চক্ষু ছল ছল করিতেছে।

আসামী আবার বলিতে লাগিল, “হুজুর আমি জেলে যেতে ভয় পাচ্ছি না। সেখানে বরং দু'বেলা খেতে পাব কিন্তু সেই হতভাগিনীর কি হবে? হয় সে কুলোকের প্ররোচনায় কুপথে যাবে, না হয় না খেয়ে মরবে। কে তাকে দেখবে?”

তারপর সে প্রাণপণে আপনার অস্থিসার বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিচারক ক্ষীপ্রহস্তে রায় লিখিলেন, আসামী দোষ স্বীকার করিয়াছে তৎজন্য তাহাকে লঘুদণ্ড দেওয়া হইল। তাকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

তিনি সেদিনকার মত আদালত বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

মেকি

গল্প

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

ভারাসিমুলা গ্রামে বিনোদের কোঠা বৈঠকখানায় আসরটা আজ খুব জাঁকিয়ে বসেছে। হরি খুড়া তাঁর প্রাচীন হুঁকোটায় মস্ত বড় একটান দিয়ে ধূমোদ্গীরণ করতে করতে বললে, "না হে বিনোদ, তুমি দেখবে আমাদের অমূল্য আর সে অমূল্য নেই, হাজার হোক্ কলকাতার জমীদার বাড়ীর সরকার সে কি আর আমাদের মত গেঁইয়া আছে। আমার বড় ছেলে সে দিন কলকাতায় গেছল, তার মুখে শুনলুম, সে মস্ত বড় বাড়ী ভাড়া নিয়েছে, পরণে মিহি দিশি ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, বুক পকেটে ঐ যে কি বলে, ফাউন্টপেন না কি? নরুকে কাছে বসিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস করল। যাবার সময় না খাইয়ে ছাড়ে না। হাজার হক্ বড় লোকের কাছে থাকে নজরটা যাবে কোথা?" বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী ছুটিপ নস্যি টেনে বললে "খুড়া আমাদের ঠিক বলেছে। আমার কাছে গেল বছরে যখন অমূল্য, বাবু সেজে এসে দাঁড়াল, আমার বুকটা তখন আনন্দে নেচে উঠল, ভাবলাম গ্রামে একটা লোক প্রকৃত মানুষ হল। যে তিন চারদিন দেশে ছিল, দুটী বেলা, আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করত, বলত, কলকাতায় মনের কথা কইবার লোক নেই দাদা, দিনরাত সাহেবদের সঙ্গে কথা বলতে হয়; তারপর দুচারটা যা ইংরেজী কথা বললে সে কথাগুলো আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া আর কারো মুখে শুনিনি। যাবার দিনে আমার কাছে এসে বললে, দাদা, আমায় যদি দুশ টাকা কর্জ্জ দাও ত ভাল হয়, কলকাতায় থাকা কি খরচ জান ত? দুশ টাকা মাহিনায় থই পাই না। সুদের বিষয় ভাবতে হবেনা; আমি না হয় একেবারে—চারশ টাকা দেব। ও রকম মহৎ লোককে আর ফেরান যায়? আমি তখনি দুশ টাকা দিলুম; টাকা নিয়ে একটা কাগজে টিকিট দিয়ে ইংরাজীতে সই করলে, বললে 'দাদা বাঙ্গলা লেখা একরকম ভুলে গেছি বললেই হয়।'

বিস্মিত ভাবে মাথা নেড়ে বিনোদ বললে, "তাই নাকি হে? এবার অমূল্য এলে বৈঠকখানা সারান তার খরচ।" খুড়ো চোখ বুজে হুঁকায় একটা টান দিয়ে বললে, "এ রকম দশটা বৈঠকখানা অমূল্য এখন তোয়ের করতে পারে। শুনেছি ওর কুঁড়েখানায় এইবার পাকা ইটের গাঁথনি উঠবে।" সেদিন বিনোদের বৈঠকখানায় অমূল্যর আলোচনাটাই তীব্র ভাবে চলতে লাগল।

রায়েদের পুকুর ঘাটে মেয়েদের মজলিসেও সেই অমূল্যর কথা। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা চক্রবর্ত্তী গৃহিণী বেশ ভঙ্গিমার সঙ্গে মাধুরীকে বললে, "ওলো মাধুরী, তোর পরণে আর মিলের কাপড় শোভা পায় না। তোর বর বড় মানুষ, দিশি কাপড় পর। এবার শুনছি ধন দৌলত নিয়ে ঠাকুরপো আসছে।" মাধুরী শীর্ণ ঠোঁট দুটিতে বিষাদ হাসি টেনে বললে, "কি যে বল দিদি!"

"হ্যাঁরে হ্যাঁ আমি যা বলছি তাই ঠিক, এত টাকাতেও তুই সন্তুষ্ট নস্!" এই বলে চক্রবর্ত্তী গৃহিণী নথ নেড়ে ছড়া কাটলো, 'যার ছেলে যত খায় তার ছেলের তত নোলা।" মাতঙ্গিনী কলসী কাঁখে নিয়ে মিনতির স্বরে বললে, "মাথা খাস, আমার কথাটা ভুলিসনি, পরাণের জন্য একটা চাকুরী দেখতে বলিস। ছেলেটা বয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরপো এলে আমার নাম করে বলিস, কিন্তু।" এই রকমে গয়লা পিসি বাগ্দী বৌ সকলেই এক একটা আবেদন পেশ করল। মাধুরী সকলের কথায় 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়ে ভিজে কাপড়টার আঁচল নিংড়োতে নিংড়োতে জীর্ণ খড় ছাউনি দেয়া ঘর খানাতে

এসে দাঁড়াতেই, গয়লা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করে দিল। "আজ ছ বছর আগেকার দুধের দাম নগদ দুটো টাকা বাকি। এক বছর আগে অমূল্য যখন দেশে এসেছিল, তখন গয়লাকে সে স্তোক দিয়ে গেছে, সে মস্ত চাকুরী পেয়েছে এবার এসে তাকে দুটার জায়গায় চারটে টাকা দেবে। আর যতদিন দেশে থাকবে রোজ নগদ পয়সা দিয়ে দুসের করে দুধ নেবে। কিন্তু বছর হ'ল অমূল্যর দেশে আসবার নাম নেই। আজ গয়লা পথে আসতে আসতে হরি খুড়োর কাছে শুনল, অমূল্য অগাধ পয়সা করেছে, এমন কি সে নিজে দেখে এসেছে অমূল্যর বর্ত্তমান অবস্থা, শীঘ্র গ্রামে সে জমীদারী কিনে বসবে। মাধুরী মাথার ঘোমটা টেনে দরজার ফাঁক থেকে মুখ বার করে আস্তে আস্তে বললে, "গয়লা ঠাকুরপো, উনি কলকাতা থেকে এলে পরে আমি বলব।" গয়লা একমুখ হেসে বললে, "আচ্ছা—আচ্ছা। তবে দুধটা যেন আমার কাছ থেকেই নেওয়া হয়।" মাধুরী সারাদিনের পাওনাদারদের তাগাদায় অস্থির হয়ে উঠে। মাথায় হাত দিয়ে বসে সে ভাবতে লাগল, গুজবটা কি সত্যি? আজ দীর্ঘ আটটা বছর এই কুঁড়ের ভিতরে কেটে গেছে। অনেকবার অনেক আশা করে শেষে সমস্ত মিথ্যে হয়ে গেছে। শুধু আজকার কথাগুলি তার সত্যি বলে মনে হতে লাগল। তার পাংশু মুখখানা আনন্দে আবীর গোলার মত লাল হয়ে উঠল; কিন্তু নিমিষে আবার বিবর্ণ হয়ে গেল। এবার যদি মিথ্যে হয় তবে তার বুকখানা ফেটে যাবে। জীবনে সে সুখ পায়নি, প্রতিবার স্বামী তার বুকের ভিতরে সুখের ছবি ফুটিয়ে দেন, কিন্তু পরিশেষে পায় সে কতকগুলি স্তোক বাক্য আর প্রতারণা।

গ্রামের বুকে কালো রং ঘনিয়ে এল। নিমগাছের মাথায় লাজুক চাঁদ হাসতে লাগল।

গভীর রাত—মাধুরী শুয়ে আছে, কিন্তু ঘুম আর আসে না। মাথার উপর খড়ের চালটির স্থানে স্থানে ছেঁদা হয়ে গেছে, মাধুরী চালটির দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। গ্রামের মধ্যে সে না আজ ধনীর ঘরণী? পরণের কাপড়খানির দিকে চেয়ে তার লজ্জা হতে লাগল, কাপড়টা দুটা বছর হয়ে গেছে। মাসে দু'টাকা করে আজ এক বছর পাঠাচ্ছে। তাতে সে কাপড় বা কিনবে কোত্থেকে আর চালের খড় বা বদলাবে কোত্থেকে? তবে এ গুজবটা যেন সত্যি হয়, ভগবান এবার দুঃখ ঘোচাবেন। এবার সে কলকাতার মস্ত বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌বে, গয়না পত্তর যা সব বাঁধা আছে সব ছাড়ান হবে। সে সত্যি ধনীর গৃহিণী হবে। ভারী একগাছা হারের জন্য সে আবদার ধরবে, মাতঙ্গিনীর ছেলের একটা চাকুরীর জন্য সে অনুরোধ করবে, না দিতে পারলে তার মান থাকবে না। হরেক রকমের রঙ্গিন ছবি মনে আঁকতে আঁকতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে দাওয়াটা গোবর জল দিয়ে মাধুরী সবে নিকোতে বসেছে, এমন সময় দেখল গাছের ও পাশে একটা টিনের সুটকেশ হাতে, সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে অমূল্য আসছে। মাধুরী তাড়া-তাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। অমূল্য দাওয়ায় উঠে মাথার ঘাম মুছ্‌তে মুছতে হাঁকলে, "কোথায় গা?" মাধুরী ঢিপ করে একটা প্রণাম করে পাখার বাতাস করতে লাগল।

ইতিমধ্যে বিমল চক্রবর্ত্তী, হরিখুড়া, বিনোদ ও আর আর তার শুভাকাঙ্ক্ষীগণ বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁক-ডাক আরম্ভ করে দিয়েছে। অমূল্য হাসিমুখে তাদের কাছে যেতেই প্রথমে চক্রবর্ত্তী কড়ে আঙ্গুলে যজ্ঞোপবীতটা ধরে মস্ত বড় শ্লোক আউড়ে আশীর্ব্বাদ করে ফেল্‌লে। হরিখুড়া মুখের দিকে চেয়েই থাকে,—অমূল্য হেসে বললে, "খুড় কি দেখছ?"

"বেশ অমূল্য, তোমার চেহারাটী খুব খাসা হয়েছে। দেখ বাবা গরীবদের যেন ভুল না?" গয়লা একখানি সাবেক দুধের দামের ফর্দ্দ হাতে নিয়ে প্রণাম করে বললে, "দাদা ভাল ত?"

"আর তোমাদের পাঁচজনের ইচ্ছায় ও আশীর্ব্বাদে ভাল আছি বই কি। তা, তোমার সব আমি দিয়ে দেব আর ভাবনা নেই।"

গয়লা লজ্জিত হয়ে ফর্দ্দটা তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভিতরে লুকিয়ে হেসে বললে, "না বাবু আপনাদের

মত লোক আমার খদ্দের এত খুব সৌভাগ্য। তবে সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে কি না।" তারপর ঘিওয়ালা তেলওয়ালা সকলেই সৌজন্যতার সঙ্গে নিজের নিজের পাওনাগণ্ডার কথা বলে যেতে লাগল। হরি খুড়োর আর সহ্য হল না, সে রেগে বললে, "দেখ, উনি একজন গণ্যমান্য লোক তোদের টাকা কি মেরে দেবেন? এখন যা।"

চক্রবর্ত্তীর মনটা এতক্ষণ ধড়ফড় করছিল। ছোটলোক-গুলো বিদায় হলে, সে নম্রভাবে বললে, "বাবা অমূল্য তুমি বড় মানুষ আমাদের ও কথা বলতে লজ্জা করে, কিন্তু কি করব বাবা সময়টা কি রকম জানত?"

"না, না, কালই আপনি সব পাবেন।" দাওয়ার উপর সুটকেশটার দিকে চেয়ে চক্রবর্ত্তী মশাই আন্দাজ করে নিয়েছিল ওটা বোধ হয় কর্‌করে নোটে ভরা। আর একবার লোলুপ দৃষ্টি হেনে বললে, "হ্যাঁ বাবা তা আমি জানি কালি পাব। তোমার কাছে ও কটি টাকা ত খোলার কুচি।

বিনোদ এতক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বলে উঠল, "ভায়া বৈঠকখানাটা বহুদিন সংস্কার হয় নি, এবার ভাই তুমি খরচ করে ঠিক করে দাও।"

"তার জন্য কি, সব ঠিকঠাক করে তবে আমি কলকাতায় যাব।"

সে দিন বিনোদের—বৈঠকখানায়—বসে ঘর সারানোর একটা মোটামুটি এষ্টিমেট্ করে অমূল্যর বাড়ী ফিরতে রাত অনেক হয়ে গেল। ঘরের দরজা অমনি বন্ধ ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে দেখল্—মিট্ মিট্ করে আলো জ্বলছে। থালায় ভাত ঢাকা, পাশেই মাধুরী তার অবসাদগ্রস্ত জীর্ণ দেহটী এলিয়ে শুয়ে পড়েছে। অমূল্য আজ অন্য দৃষ্টি দিয়ে মাধুরীকে দেখল! এই সতীলক্ষ্মীর সঙ্গে সে দীর্ঘ বছর প্রবঞ্চনা প্রতারণা করে এসেছে হঠাৎ কি মনে করে সে ডাকল; "মাধুরী মাধুরী।" নিদ্রিতা মাধুরী ধড়মড় করে উঠে বসল। অমূল্য ব্যগ্র ভাবে বললে, "মাধুরী আজ রাত্রেই আমাদের এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে।"

মাধুরী নিদ্রায় কত সুখের স্বপ্ন দেখছিল। এই প্রশ্নে সে চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলে, "কেন, কেন?"

"ঋণে আমার মাথা বিকিয়ে আছে। কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, এখানেও তিষ্টান দায়। জমিদারের বাড়ীতে একটা চাকুরী পেয়েছিলাম বটে। কিন্তু নিজের উচ্ছৃঙ্খলতায় সব খুইয়েছি। গত কাল একটা কাবলি-ওলার কাছে পাঁচ শত টাকা ধার নিয়েছি, সে টাকা আছে, চল, অনেক দূরে চলে যাই এখুনি।"

মাধুরী স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে নীল সাগরের বেলা ভূমিতে তখন ফাগুন জ্যোৎস্নার খেলা চলছে ....

গত

শ্রীহাসিরাশি দেবী

গত সেইদিন; যেদিন প্রভাতে
কুসুমপোহার ল'য়ে প্রসারিয়া হাত
এসেছিল আমার সমুখে,
হর্ষাকুল বক্ষ বহি হাসি লয়ে মুখে,
শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টি রাখি মোর মুখ পরে
কত—কত কৌতূহল ভরে
হেসেছিলে,—কত কথা, কত কী যে ব'লে;
আজি দূরে,—বহুদূরে সে যে গেছে চ'লে।

গত সেইদিন, যেদিনের আলো,
আমারে বাসায়েছিল ভালো
এই ধরণীর মাঝে যত ধূলি কণা,
লতা, পাতা, ফুলদল, সঙ্গীত মূর্চ্ছনা,—
আমারে ভুলাত' তারা নব নব রূপে;
আশা যেত কত গান গাহি চুপে চুপে
কত যে নূতন কথা কাহিনী যে ব'লে,
আজি দূরে, বহুদূরে তারা গেছে চ'লে।

শীতের দিনে পল্লীগ্রামে

—ভ্রমণ—

শ্রীঅনিল চন্দ্র রায় বি-এ

বড়দিনের ছুটিতে পশ্চিমঅঞ্চলে ভ্রমণের ইচ্ছা বহুদিন হইল পোষণ করিতে ছিলাম এইবার সুযোগ মিলিয়া গেল। আমার কোন আত্মীয় বন্ধু ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টার—তিনি ছুটি লইয়া দুইখানি পাশ সংগ্রহ করিলেন ও যাত্রার দিন ঠিক করা গেল। শিয়ালদ-দিল্লী এক্সপ্রেস রাত্রি দশটায় ছাড়ে—সাড়ে আটায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বন্ধুবর অনুপস্থিত—তাঁহার প্রতিনিধি ভ্রাতা আমাকে সংবাদ দিলেন যে অদ্য সন্ধ্যায় তাঁহার অগ্রজ প্রবল জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যাইতে পারিলেন না জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ইত্যাদি। বহুবার বহুস্থানে যাত্রার পূর্ব্বে সহযাত্রী হইবেন বলিয়া যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব প্রতিশ্রুতি দিতেন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কোন অংশই দেখিতে পাই নাই সুতরাং এজন্য কতকটা প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম—বিশেষ নিরাশ না হইয়া কি করিব স্থির করিতে লাগিলাম। ষ্টেশনে জন স্রোত বিপুলরবে চলিয়াছে, কলিকাতাকে একযোগে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত লোক বাহিরে চলিয়াছে। কল্পনার আঁখি হইতে তখন পশ্চিমের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিলীন হইয়া গিয়াছে—কঠোর কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্র তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখ-কাতর বিরাট দেহ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভাবিলাম বাড়ী হইতে যখন বিদায় লইয়া আসিয়াছি তখন আর বাড়ী ফিরিব না—সত্বর জন্মভূমি পল্লীর একখানি টিকিট কাটিয়া অতি-কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া ঢাকা-মেলে উঠিবামাত্র ট্রেনখানি ধূমোদ্গীরণ করতঃ সশব্দে ছাড়িয়া দিল।

যে কামরাখানিতে আশ্রয় লাভ করিলাম তাহাতে দাঁড়াইবার স্থান পাওয়া শক্ত। অন্য সময়ে যে স্থান অপবিত্র বলিয়া লোকে দূরে চলিয়া যায় তথায় নিশ্চিন্তে কয়েকজন দাঁড়াইয়া আছেন। দমদম ছাড়াইয়া ট্রেণখানি প্রলয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসবৎ বারাকপুরে আসিয়া থামিল—ইতিমধ্যে কামরার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-সাহিত্যে অবদান, মহাত্মাজীর রাজনৈতিক দার্শনিকতা, সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতির প্রচণ্ড তর্ক উঠিয়াছে—বাঙ্গালীর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা পরিচয়ের ইহাই উপযুক্ত স্থান। বদ্ধ কামরায় আলোচনায় যোগদান করিতে পারিলাম না। জানলা দিয়া বাহিরের তারাখচিত নীলাকাশের কতক দেখা যাইতেছিল—নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি যেন ঘুমন্ত পৃথিবীর মাথার উপরে জাগিয়া আছে—লাইনের উভয় পার্শ্বের গাছগুলি স্তূপীকৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রহরীর মত মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে।

পোড়াদহে যখন গাড়ী আসিল তখন রাত্রি প্রায় আড়াইটা—শীতের বেশ আমেজ পাওয়া গিয়াছে। হঠাৎ গোলমাল শুনিয়া জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি, একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক পোঁটলা ও লাঠি লইয়া গাড়ীতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কয়েকটি ছোক্‌রা দলবদ্ধ হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে—অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ভদ্রলোক ষ্টেশনে পড়িয়া গেলেন এবং ট্রেণখানি ছাড়িবার ঘণ্টা তখনি বাজিয়া উঠিল—আমি আর থাকিতে পারিলাম না, ভদ্রলোকটিকে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, পোঁটলাটি তুলিয়া লইয়া অপর হস্ত বাড়াইয়া যখন তাঁহাকে তুলিলাম, তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ দুই হস্ত দ্বারা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া অনন্দাশ্রুপ্লুত নেত্রে বলিলেন, "বাবা, আমাদের স্বরাজের বহু দেরী আছে—প্রতি গাড়ী থেকেই আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, আজ এ গাড়ীতে উঠ্‌তে না পারলে আমাকে সমস্ত রাত্রি ষ্টেশনে থাকতে হতো—আমি দাঁড়িয়ে থাকবো বলে উঠ্‌তে চেয়েছি, তাতে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে"—বৃদ্ধের অভিযোগের বিরুদ্ধে বলিবার

কিছু ছিল না—ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্যেও জাতীয় চরিত্রের যে দুরপনেয় কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্যই লজ্জার বিষয়।

গোয়ালন্দে যখন গাড়ী পৌছিল তখনও অন্ধকার-ফর্সা হইয়া যায় নাই—এইখান হইতে ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। ছোট্ট suit caseটি লইয়া ষ্টিমার অভিমুখে চলিলাম—বড়দিনের মরসুমে এখানে এখন কুলিদের রাজত্ব। ষ্টীমারে আমার বহু আত্মীয় বন্ধু চলিয়াছেন প্রত্যেকেই পশ্চিম-যাত্রীকে এই পথে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। খালাসীদের হাঁকডাকের মধ্যে ষ্টীমার নোঙ্গর তুলিয়া ছাড়িয়া দিল—শীতের শীর্ণকায়া পদ্মা যৌবন-সমাপনান্তে অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে বহিয়া চলিয়াছে। ছোট ছোট জেলে ডিঙিগুলি ঢেউয়ের উপর তালে তালে ভাসিয়া চলিয়াছে—শীতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরবর্ত্তী কাশবনগুলি ঝলমল্ করিতেছে এবং তাহারি পার্শ্বে গ্রাম্য বালক বালিকাগণ জলযানের প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। ষ্টীমার তীরের নিকট দিয়া চলিয়াছে—গৃহস্থ প্রাঙ্গন ছায়ায় ভোজন-পরিতৃপ্ত গাভীগুলি লেজ দিয়া মাছি তাড়াইতেছে। শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথ "ছিন্নপত্র" রচনার প্রাক্কালে এ অঞ্চলে বহুদিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন; রূপদক্ষের সোনার কাঠির স্পর্শে এই বিরাট ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য যে সজীব মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বিচিত্র নাই।

সাধুগঞ্জ আমার গন্তব্য স্থান—ষ্টীমার পৌছিতে প্রায় বারটা বাজিল, গোয়ালনন্দ হইতে সমস্ত জল-পথটুকু আনন্দের প্রবাহের মধ্য দিয়া ভাসিয়া আসিয়াছি। ষ্টীমার হইতে নামিলাম, দুই পার্শ্বের হরিৎ শস্যক্ষেত্র বায়ু প্রবাহে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে—মনে হইল, আমার পল্লী-জননী বহু-কাল-বিস্মৃত প্রবাসী তনয়কে সাদর-ব্যগ্র বহু-পাশ মেলিয়া অভিনন্দন করিলেন। নদীতীরের অপ্রশস্ত শুভ্র বালুকাময় রাস্তা সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—রাখাল বালকগণ—গরু চরাইতে লইয়া মেঠো সুরে গান ধরিয়াছে—গ্রাম্য বধূগণ সীমন্তের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া নদী হইতে স্নানান্তে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল। বাড়ীতে যখন পৌছিলাম তখন প্রায় একটা বাজে।

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বন্ধু-বান্ধব সহ বেড়াইতে বাহির হইলাম—গ্রাম্য রাস্তাটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া দূরে মরাগাঙে গিয়া মিশিয়াছে—পারে উভয় পার্শ্বে ঘন জঙ্গল এবং মাঝে মাঝে লতাপাতা শোভিত ক্ষুদ্র গৃহস্থ কুটির অপর্য্যাপ্ত শিশিরে স্নাত হইয়া আছে।

পল্লীবাসীর লেপের আরামটুকু তখন গভীর হইয়া উঠিতেছিল এবং অনেকেই হাই তুলিয়া গাত্রোত্থানের অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন—ঘোষেদের রতীন বারান্দার দাওয়ায় হুঁকা হস্তে প্রবল বেগে কাশি আরম্ভ করিয়াছিল এবং অনতিদূরে শায়িত লাল কুকুরটি মনিবের এই মেজাজে বিশেষ খুসি ছিল না। সমগ্র মাঠ কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে হরিৎ সরিষা ক্ষেত্র হইতে সুমিষ্ট-গন্ধ শীতল বায়ু প্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছে। মাঠের ধারে বাঁশের ঝোড় হইতে বিচিত্র পাখীর কলরব কানে আসিয়া লাগিয়াছে—কৃষকেরা শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লাঙ্গল কাঁধে ক্ষেত্রাভিমুখে চলিতেছে। পরাণের বাড়ী মাঠের ধারে। সে একখানি শতছিন্ন পুরাতন লাল আলোয়ানে আবৃত হইয়া গ্রাম্যপথে গুড় ও কমলালেবু বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। পরাণের স্ত্রী ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া আগুনের সম্মুখে বসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে ছড়া বলিতেছে—এই দৃশ্য দেখিয়া William Morris এর কয়েকটি বিখ্যাত লাইন মনে পড়িল

As oft in the calm of dawning
I have heard the birds rejoice,
As oft I have heard the storm-wind
Go moaning through the wood;
And I knew, that Earth was speaking
And the mother's voice was good.

এখানকার ছোটখাটো বাজারটিতে প্রায় সকল রকম জিনিষই পাওয়া যায় কিন্তু বাজার আরম্ভ হয় প্রায় সাড়ে এগারটার পরে সুতরাং বাজারের জিনিষপত্র কিনিয়া এক বেলার অধিক আহার করা চলে না

এই অর্থকষ্ট এবং অন্ন সমস্যার দিনে একদিক দিয়া ইহার মূল্য আছে! বাজারে খাঁটি দুধের সের তিন পয়সা এবং উক্ত মূল্যে ছোট মাছ পর্য্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়—পশ্চিমবঙ্গবাসী অনেকেই হয়ত, ইহাতে শিহরিয়া উঠিবেন এবং উপাখ্যান বর্ণিত সন্ন্যাসী ও শিষ্যের ন্যায় অনেকেই এই দেশে যাইতে নিষেধ করিবেন।

বিকালে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেলাম—দলে দলে শ্বেত শুভ্র রাজহাঁস পাখা বিস্তার করিয়া মেঘমুক্ত নীলাকাশের মধ্য দিয়া উড়িয়া চলিতেছে। আসন্ন সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া গাঢ় হইয়া আসিতেছে, গৃহাভিমুখী রাখাল বালকের গ্রাম্য গানের সুর মৃদু হইয়া উঠিয়াছে। দূরে লতাপাতা বৃষ্টিত গ্রামের মধ্যে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে—একটি সোনালীরেখা গ্রামখানির কালো ছায়ার উপরে পড়িয়া সুন্দর দেখাইতেছে।

শিশুর খাদ্য—গোদুগ্ধ

—প্রবন্ধ—

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র

ভারতে খাদ্য হিসাবে দুগ্ধের উপকারিতা আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কালে যে ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের ভূয়োদর্শন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দুগ্ধের জন্য কথা আলোচনা করিতে বসিয়া আজ য়ুরোপ অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতেছে, যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধকে অতি সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা ইহার যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে শিশুর কেন সকল মানবের পক্ষে সকল স্বাস্থ্যকর অবস্থায় (all healthy stages of life) ইহা উপকারী; ইহার উপাদনসমূহ নারীর পুষ্টি-সাধক, ক্ষয়-নিবারক এবং উত্তাপ-বর্দ্ধক। কিন্তু দুগ্ধের সম্বন্ধে ইহাই চরম কথা নয়। আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য ব্যবহারিক জগতে দুগ্ধের এমন বহু উপকারিতা দেখিতে পাই, যাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিকট দাবী করিলে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মাত্র পঙ্গু করিয়াই তোলা হয়। বর্ত্তমান সময়ে তাহার সম্বন্ধে মাত্র আমরা এই বলিতে পারি, ইহা Specifc quality of milk as food,—খাদ্য হিসাবে ইহা দুগ্ধের বিশেষ গুণ। সুতরাং দুগ্ধকে যে আদর্শ খাদ্য বলা হয়, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই।

মাতৃস্তন্যের পরই শিশুর একমাত্র খাদ্য গাভিদুগ্ধ। মাতার অভাব গাভি অনেকটা পূর্ণ করে বলিয়াই বোধহয় হিন্দুগণ গো-জাতিকে মাতৃস্থানীয় করিতে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই গাভিকে গোমাতারূপে পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এই প্রথার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা নির্দ্ধারণ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়; সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে, আর্য্যগণ গোজাতির প্রতি এতটা সম্মানসূচক ব্যবহারের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রাচীন ভারতে কোন দিন বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব ঘটে নাই, যে অভাব দূর করিবার জন্য আজ প্রাচ্য জগৎ সুদৃঢ় নিয়মের বাঁধন দিয়াও বহু কমিশন ও দুগ্ধ পরীক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। দুগ্ধের বিশুদ্ধতা নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, আমি পরে আলোচনা করিব, এক্ষণে এইমাত্র বলিতে চাই যে, অবিশুদ্ধ দুগ্ধ বহু প্রাণঘাতী রোগের আকর, সুতরাং স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা নিঃসন্দেহে জোর করিয়া বলিতে পারি, চির জীবন দুগ্ধ না খাওয়ার ফলে শরীরের যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি অবিশুদ্ধ, রোগের জীবাণু সংশ্লিষ্ট দুগ্ধ পানের

ফলে সুনিশ্চিত ক্ষতির তুলনায়, অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং দুগ্ধ গ্রহণের দুগ্ধের পূর্ব্বে বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া একান্ত দরকার নিম্নে উদ্ধৃত ইংরাজি অংশ পাঠ করিলেই পাঠকগণ এই উক্তির সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন—

A great variety of acute and Chronic diseases of man are attributed to milk, among the most importat are Surgical tuberculosis in all its protean forms, typhoid and paratyphoid fevers, diphtheria, Scarlet fever, Sceptic sore and other forms of Strep to Cocacal infection, gastroenteritis, dysentery and so forth. অতএব দুগ্ধের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ এবং তাহা পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইবার পন্থা অবগত হইবার ততটা প্রয়োজন আছে যতটা শরীর রক্ষার জন্য দুগ্ধের প্রয়োজন। দুগ্ধকে আদর্শ খাদ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া লইবার পূর্ব্বে খাদ্য বলিতে আমরা কি বুঝি তৎসম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে খাদ্যের সহিত মানব দেহের সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়; কারণ তাহা হইলে মানব দেহের ক্রমবর্দ্ধন গঠন প্রণালী প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। সাময়িক পত্রে এরূপ শুষ্ক বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত অশোভন হইতে পারে। তবে শরীরের উপর খাদ্যের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন, তাহাতে পাঠক খাদ্যের প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচনে সমর্থ হইবেন।

H. C. Sherman তাঁহার Chemistry of Food and Nutrition নামক পুস্তকে খাদ্যের তিনটি কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যথা (১) To yield Energy (২) to build Tissue এবং (৩) to regulate body processes অর্থাৎ দেহের তাপ বা জীবনীশক্তি সংরক্ষণ, শরীরের ক্ষয় পূর্ণ করিয়া দেহকে ক্রমবর্দ্ধনের পথে লইয়া যাওয়া এবং দেহের সমতা রক্ষা করা। বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা এই সত্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে যে খাদ্যের দ্বারা এই তিন উদ্দেশ্য তখনই সম্ভবপর তখন তাহাতে Carbohydrate (শর্করা) Fat (তৈলজাতীয় পদার্থ) এবং প্রোটিন নামক রাসায়নিক পদার্থ ত্রয় বিদ্যমান থাকে। কারণ Carbohydrate অর্থাৎ Sugar ও Starch জাতীয় খাদ্য হইতে Glycogen নামক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং, যকৃত হইতে ইহার সরবরাহ হওয়ার ফলে শরীরের তাপরক্ষা কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। এখানে একথা উল্লেখের প্রয়োজন যে কোন কোন ক্ষেত্রে Carbohydrate হইতে তৈলজাতীয় উপাদানের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। এইজন্যই রুটি আলু, ভাত প্রভৃতি খাদ্য খাইয়াও কোন কোন ব্যক্তি স্থূলকায় হইয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তবে সাধারণ ভাবে বলিতে হইলে মেদবৃদ্ধি তৈলজাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ। এই তৈল জাতীয় খাদ্যও শরীরের তাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু উভয় খাদ্যের কার্য্য মুখ্যতঃ এক হইলেও উভয়ের উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে যদি একগ্রাম কার্ব্বোহাইড্রেট চারি Calories তাপ প্রদান করিতে সমর্থ হয়, তাহ হইলে একগ্রামতৈল জাতীয় খাদ্য নয় Calories তাপ প্রদান করিয়া থাকে, প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের প্রধান কার্য্য ও সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু (tissue) গঠন এবং দেহযন্ত্রের মধ্যে নাইট্রোজেন সৃষ্টি ও সরবরাহ। এই প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হইতে amino acid নামক পদার্থের সৃষ্টি হয়।

এই amino-acid সূক্ষ্মতন্তু গঠন করে। কিন্তু Ostoborn প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ রসায়ণ শাস্ত্রের সাহায্যে এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন যে ডিম ও দুগ্ধ ব্যতীত খাদ্য দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত প্রোটিন্ জীবন-ধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে কিন্তু শরীরের তাহা অনুকূল নহে। সুতরাং দুগ্ধে যে কেবল তিন জাতীয় উপাদান বিদ্যমান তাহা নহে; শিশুর শরীরের পরিপুষ্টির জন্য দুগ্ধের একান্ত প্রয়োজন। এসম্বন্ধে ডাক্তার J. F. Williams M.D. বলেন the animal Proteins, if milk and eggs are included and ofcourse they should be are

distinctly superior as sources of nitrogen for the body. অতএব দুগ্ধ শুধু শিশুর খাদ্য নয়, ইহা সকল মানবের সকল সুস্থ অবস্থার উপযোগী খাদ্য। ইহা প্রসূতির শরীরের জন্য এবং সন্তানের খাদ্য মাতৃ-স্তন্যের জন্যও একান্ত দরকার। বড়ই পরিতাপের বিষয় এরূপ অমূল্য খাদ্য বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। এস্থলে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত যে যখন একমাত্র প্রোটিনেই নাইট্রোজেন নামক পদার্থ বিদ্যমান; তখন কেবল মাত্র কার্ব্বোহাইড্রেট বা তৈল জাতীয় পদার্থ আহার দ্বারা স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষা করিতে পারা যায় না। কিন্তু দুগ্ধে Carbohydrate, তৈলজাতীয় পদার্থ এবং প্রোটিন বিদ্যমান থাকায়; ইহা শুধু আদর্শ খাদ্য নহে পরন্তু একমাত্র দুগ্ধ আহারের দ্বারা শরীর রক্ষা হওয়া সম্ভব। দুগ্ধের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পর আর কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিবে না কেন আর্য্যগণ দুগ্ধকে অমৃত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। গোজাতির প্রতি, যত্ন ও সম্মানের সঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণ দিবার এইবার চেষ্টা করিব।

যে দুগ্ধ অমৃত নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত ব্যবহার না জানিলে বা তাহার অপব্যবহার করিলে তাহাই আবার হলাহলে পরিণত হয়। আজ-কাল সভ্য জগৎ দুগ্ধের নামে যে পদার্থ পান করিতেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা অমৃত নহে, হলাহল মাত্র। ডিপ্‌থেরিয়া, টাইফয়েড এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রথম ও প্রধান মিডিয়ম বর্ত্তমান সময়ে বাজারের দুগ্ধ। কলিকাতাবাসী মফঃস্বল হইতে আনীত দুগ্ধ ব্যবহার করিতে বাধ্য এবং দুগ্ধের বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে একমাত্র ল্যাকটোমিটারই তাহার সম্বল। কিন্তু দুগ্ধের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি পরীক্ষা করা যতটা প্রয়োজন, তাহা স্বাস্থ্যবতী গাভীর দুগ্ধ কিনা নির্দ্ধারণ করাও ততটা প্রয়োজন। কিন্তু তাহার কোনই উপায় নাই। ইহার ফলে সভ্য জগতে যক্ষার প্রসার বাড়িতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে কি করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যায়? ইহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। সমুদায় সভ্য জগৎ জুড়িয়া আজ এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, নানা গবেষণা, আইনের বাঁধন ও সাধু উপদেশ ব্যর্থ করিয়া একটি মাত্র সত্য সকলকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে, সভ্য জগতে দুগ্ধের পবিত্রতা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু প্রাচীন ভারত এ সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। প্রতি গৃহস্থ দুগ্ধবতী গাভী প্রতিপালন করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিলেন। তাহার ফলে গৃহস্থ দুগ্ধ সরবরাহের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইত না। বিক্রয় বাহুল্য না থাকার ফলে দুগ্ধের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই, কাজেই কৃত্রিমতার প্রয়োজন ঘটে নাই। ইহার উপর গো-জাতির প্রতি সম্মান ও পূজা নির্দ্দেশের ফলে গাভীর সেবা স্বেচ্ছা প্রণোদিত কার্য্য মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, অতীব রুগ্ন গাভীর দুগ্ধ নিষেধাজ্ঞার দ্বারা প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে হয় নাই; গাভীর প্রতি মমতা ও ভক্তির আতিশয্যে হিন্দুগণ রুগ্ন গাভির দুগ্ধ দোহন করিতে স্বেচ্ছায় বিরত থাকিতেন। সভ্যতা আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত আমরা হিন্দুদের অজ্ঞতা প্রসূত এই সকল অনাচার ও কুসংস্কারের প্রতি বীতরাগ হইয়া এবং তাহা দূর করিবার চেষ্টায় অতিমাত্রায় সচেষ্ট হইয়াই আজ আমরা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান কালে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য য়ুরোপ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য না হইলেও, তাহাদের চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। স্বাধীন ও শিক্ষিত দেশে যাহা সম্ভব, আমাদের পরাধীন ও অশিক্ষিত দেশে তাহা সম্ভব নয়। ইহাকে কার্য্যকারী করিয়া তোলা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও, সমস্ত জাতের পক্ষে সম্ভবপর এ কথা কেহ বলিতে সাহস করিবেন না। দুগ্ধের বিশুদ্ধতা কতকটা রক্ষা করিবার সহজ উপায় দুগ্ধকে জ্বাল দিয়া পান করা। ইহাতে অনেকে এই আপত্তি করেন যে জ্বাল দিলে দুগ্ধের Food value অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ভিটামিন নষ্ট হয় এবং ক্যাপসম কনটেন্টের হ্রাস ঘটে। Dr. Ganet Lane Claypon বলেন জ্বাল দেওয়ার ফলে দুগ্ধে আরও এমন অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহা আমরা

নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কিন্তু তথাপি আমি বলিতে বাধ্য ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ক্যালসম ও ফসফরসের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য শিশুকে প্রতিদিন Calceioe এর ৫ গ্রেণ গুড়া খাওয়ান মন্দ নহে। ইহাতে ক্যালসম্ ও ফস্‌ফেট শরীরে মিশিবার উপযোগী আকারে বিদ্যমান আছে।

আর একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। য়ুরোপে Certified milk বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে মিউনিসিপালিটি বিক্রয়ার্থ দুগ্ধের পবিত্রতা নির্দ্ধারণের জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া য়ুরোপের অনুকরণে Certified milk বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করার পক্ষে কি একান্ত অপারগ? কর্ত্তৃপক্ষের কি এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত নয়? ভবিষ্যৎ জাতির মঙ্গলের জন্য দেশের মুরব্বিগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সমস্ত জাতিটাকে ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এ বিষয়ে অবহিত হউন। দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের নামে, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের মঙ্গলের নামে, এবং যে দেশ-সেবার তাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাহারই নামে, আমি তাঁহাদের নিকট দেশবাসীর হইয়া এই আবেদন পেশ করিতেছি, ইহা কি একেবারে নিষ্ফল হইবে?

সমাধান

—গল্প—

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

গাঁয়ের স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া নিমাই যখন কল্‌কাতায় কলেজে পড়িতে যায়, তখন তাহার আনন্দ দেখে কে? পূর্ব্বে কখনও সে কলিকাতা সহর দেখে নাই, পল্লীর বুকেই মানুষ। ট্রেণে চাপিয়া অন্য কোথাও যাইবার সুযোগও তার জীবনে আসে নাই—কেবল্ একবার সে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ী গিয়াছিল; কিন্তু তাহা অনেক দিনের কথা, আজ আর মনে নাই। সহর দেখা এই তাহার প্রথম।...

সহপাঠী দু'চারজন বন্ধু যখন ক্লাসে বসিয়া তাহাদেরই মত গোটাকয়েক ছেলেদের কাছে কলিকাতা সহরের গল্প বলিত, তখন তাহারা অবাক্ বিস্ময়ের সহিত তাহা শুনিত—যেন ঠাকুমার কাছে রূপকথা শুনিতেছে।—কত আশ্চর্য্য জিনিষ কল্‌কাতায়!—কেমন সুন্দর ট্রাম চলে, আবার দোতালা বাস! কত থিয়েটার, কত বায়োস্কোপ, কত বড় বড় রাস্তা, আবার রাস্তার ওপর ইলেক্‌ট্রিক লাইট্!

আর একজন অমনি বাধা দিয়া নিজের অভিজ্ঞতা জানাইয়া বলিত—কেন? গড়ের মাঠ, জুগার্ডেন, মিউজিয়াম্, ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল্!...

নিমাই শুনিত, আর মনে মনে এক সুন্দর চিত্র আঁকিত।...তাই যখন শুনিল হোষ্টেলে থাকিয়া সে কলেজে পড়িবে, তখন আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া উঠিল। পল্লীর আবহাওয়া তাহার বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইল।—সেখানে সহরের মত সৌন্দর্য্য নাই, সেখানে সহরের মত কোলাহল নাই, সেখানে সহুরে লোকের মত মার্জ্জিত লোকের বসবাস নাই, সেখানে আবার মানুষ থাকে।...গোঁয়োভূত হইয়া বাস করা অপেক্ষা বনে বাস করা ভাল।

আনন্দের আতিশয্যে নিমাইয়ের রাত্রে ঘুম হইল না। শুইয়া শুইয়া কত সুন্দর রঙিন ছবির রেখাই মানসপটে টানিতে লাগিল।...

প্রভাত আসিল তাহার অস্পষ্ট ধূসর আলো লইয়া।

…কাক ডাকিয়া উঠিল। প্রভাতের বন্দনা গান সুরু হইল। বিশ্ব জাগিয়া উঠিল নব নেশায়, নব আনন্দে, নব প্রেরণায় উৎফুল্ল হইয়া।

মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া নিমাই চির পরিচিত মাতৃ-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিল।…বিধবা মা চোখের জল মুছিলেন—পুত্রের অমঙ্গলের ভয়ে। হাত দু'টি কপালে ঠেকাইয়া মনে মনে পুত্রের মঙ্গল কামনায় ভগবানের পায়ে নিঃশব্দে অনেকখানি নিবেদন ঢালিয়া দিলেন।

নিমাই কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এখানে কেমন যেন লাগে। সরল পল্লীজীবনের সঙ্গে অনেকখানি প্রভেদ দেখিতে পায়। তাহার বড় অসুবিধা বোধ হয়। ক্রমে সব সহিয়া যায়।—

কলিকাতায় আসিয়া নিমাই দেখিল, তাহার বন্ধুরা সব আস্তে আস্তে মেয়েলি মিহিকণ্ঠে কথা বলে।… হাওয়ায় যেন উড়িয়া যায়। কথায় কথায় রবিবাবুর কবিতা আবৃত্তি করে—

নিমাইও আপ্‌টুডেট্‌ কেলেকেসিয়ান হইল।… একখানি চয়নিকা কিনিল। বন্ধুদের মত কবিতার খাতাও করিল—মাঝে মাঝে দু'একটি কবিতা লিখিয়া বেশ গর্ব্বও অনুভব করিল। মাসিকে বুকভরা আশা লইয়া কবিতা পাঠায়—কিন্তু অর্ব্বাচীন সম্পাদকরা তাহার মূল্য বুঝে না—সবগুলিই ফেরৎ দেয়, উপরন্তু মাঝে মাঝে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চিঠিও দেয়।…

হতাশ হইয়া কবিতা লেখা ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আবার তাহাকে পরাজিত করে। পুনরায় সে কবিতা পাঠায়। ভাগ্যদেবী একটু সদয় হইলেন। নব প্রকাশিত "পূর্ণিমা" পত্রিকার গ্রাহক হওয়াতে তাহার একটা কবিতা "পূর্ণিমায়" বাহির হইল। সার্থকতায় নিমাইয়ের কি আনন্দ! বন্ধু সমাজে সে কবি বলিয়া বেশ পরিচিত হইল। বন্ধুরা বলে—Future Tagore. গর্ব্বে বুকটা ফুলিয়া উঠে। পূর্ণোদ্যমে কলম চলিতে থাকে…

সেদিন পড়িবার ঘরে বসিয়া নিমাই নিবিষ্টচিত্তে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করিতেছিল—

গভীর চিত্তে গোপন শালা, সেথা ঘুমায় সে রাজবালা
জানিনে সে কোন জনমের পাওয়া
দেখেনিলেম ক্ষণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া।—

পিওন আসিয়া দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। প্রথম খানি মায়ের, অনেক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—সংসার আর চলে না।…

নিমাইয়ের রাগ হইল। সংসার চলে না ত সে কি করিবে? কত কষ্ট করিয়া এখানে আছে। এত কম খরচে কি কলিকাতায় থাকা যায়?

পরের চিঠিখানি পড়িল—

অপরিচিতেষু—

শ্রদ্ধেয় নিমাই বাবু,

চাক্ষুষ আলাপ না থাকলেও আজ উপযাচক হয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করছি। আশা করি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। "পূর্ণিমায়" আপনার লেখা কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি—আনন্দ পেয়েছি। আমাদের নারী জাতিকে আপনি যে রকম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন তার জন্য নারীদের পক্ষ হ'তে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ধন্যবাদ দিয়ে অভিনন্দিত করছি।

আমাদের "নারী মঙ্গল সমিতি"র অধিবেশন আগামী বুধবার দিন অনুষ্ঠিত হবে। আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। নমস্কার। ইতি—

বিনীতা

আপনার গুণমুগ্ধা

শ্রীপুষ্পমালা দেবী, সম্পাদিকা "নারীমঙ্গল সমিতি"।

আনন্দের আতিশয্যে নিমাই আত্ম-হারা হইয়া উঠিল।……

হোষ্টেলে কলেজে বন্ধুদের গর্ব্বভরে চিঠিখানি দেখাইয়া বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিল।

বুধবার দিন ভাল করিয়া সাজগোজ করিয়া নিমাই চলিল, নারী মঙ্গল সমিতিতে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে।

বন্ধুরা অনেকে হাসিল, বিশেষতঃ শৈলেন। নিমাই শৈলেনের উপর বরাবরই চটা। কি বিশ্রী ছেলেটা! তাহাকে দেখিলেই হাসে, নানাপ্রকার বিদ্রূপ করে। তাহার লেখা কবিতার একটারও প্রশংসা করে না। বলে বাংলা দেশে কবিতা সুলভ। প্রমাণ স্বরূপ যুক্তি দেখাইয়া বলে—এতো নিত্যই দেখি, যে সকলেই কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেছে।…আমাদের হোটেলের পাশে রেমো মুদির ছেলে কিছু লেখাপড়া শিখে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছে। মদীয় পরিচিত নরেন বাবুর চাকরী যাওয়ায়, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর বাপের পয়সায় খাচ্ছেন আর পূর্ণোদ্যমে কাবতা লিখ্‌ছেন, ওই যে রাস্তা দিয়ে ছেঁড়া চটি পরে নেঙ্‌চাতে নেঙ্‌চাতে রোগা ছেলেটা যাচ্ছে, ওকে গ্রেপ্তার করে জেরা কর, জান্‌তে পারবে সেও কবে কাকে জানলায় দেখে কবিতা লিখে খাতা ভর্ত্তি করেছে। আর অত কথাই বা কেন দাদাদের বিদেশ গমনে বৌদিরা রান্নাঘরে বসে কবিতা লেখেন—ভাত যে পুড়ে যায় সেদিকে হুঁস নেই।…তবুও কি বল্‌তে হবে বাংলা দেশে কবিতা দুর্লভ—বলিয়া নিমাইয়ের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া থাকে।…

নিমাই ভাবে—কলেজে লেখক বলিয়া শৈলেনের নাম আছে, এখন তাহার লেখা মাসিকে বাহির হয় বলিয়া শৈলেনের হিংসা হয়।

ঐরূপ বেশে সজ্জিত নিমাইকে দেখিয়া শৈলেন বলিল—কি হে নিমাই, চল্‌লে কোথায়? দেখো নারী মঙ্গল সমিতিতে অমঙ্গল কিছু করে বোস না।

নিমাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। শ্লেষ ভরে উত্তর দিল—ভয় নেই, তাদের মঙ্গলের জন্য তোমায় যাতে call করে তার ব্যবস্থা করবো।…

নিমই চলিয়া গেল।…সঙ্গে সঙ্গে উচ্চহাস্যে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল।

সুসজ্জিত কক্ষ।……

ঘরের চারিদিক চেয়ারে পরিবেষ্টিত। দেয়ালের ওপর দু'চার খানি জাপানী প্রাকৃতিক দৃশ্য মাত্র। দক্ষিণ দিকটার কোণটায় একটি অর্গান। পূব দিকটায় একটা দেয়াল ঘড়ি। ইলেকট্রিকের আলোতে ঘরখানি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েদের মিটিং তখন চলিতেছিল।

নিমাই সসঙ্কোচে ঘরে প্রবেশ করিতেই—একটি মেয়ে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। নিমাই দেখিল সব মেয়েরাই যেন তাহার দিকে কেমন সকৌতুকে চাহিয়া আছে।…একি! রাস্কেল শৈলেন এখানে আসিল কেমন করিয়া। নাঃ, চিঠিখানি তাহাকে দেখাইয়া সে বড়ই অন্যায় করিয়াছে। শৈলেন কিন্তু তাহার সহিত মোটেই বাক্যালাপ করিল না। যেন তাহাকে সে চেনেই না। নিমাইও তাহার সহিত কোন কথা বলিল না। কেন? কিসের জন্য সে যাচিয়া তাহার সহিত কথা বলিবে? তাহার সহিত কথা বলিয়া তাহার লাভ?

নিমাই সম্পাদিকার সহিত আলাপ করিল। বেশ ভদ্র মেয়েটি। কি সুন্দর তাহাকে দেখিতে! পরণে তাহার একখানি স্কাই রংয়ের খদ্দরের সাড়ী, পায়ে ভেল্‌ভেট্‌ স্লিপার, গলায় সরু মফ্‌চেন, হাতে রিষ্টওয়াচ। এই সামান্য বেশেই যেন তাহাকে অপূর্ব্ব মানাইয়াছে।

নিমাই প্রশংসা ভরা দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তৃপ্তিতে মন তাহার ভরিয়া উঠিল।

শহরের সবই ভাল। কি নেই পাড়াগেঁয়ের জঙ্গলী মেয়েরা।

অনেকক্ষণ আলোচনার পর সেদিনকার সভা ভাঙ্গিয়া গেল। বিদায় লইবার সময় পুষ্পমালা নিমাইকে বলিল—আপনার সঙ্গে আজ আমাদের আলাপ হ'ল এ আমাদের সৌভাগ্য। মধ্যে মধ্যে যদি দয়া করে আমাদের এখানে আসেন।…

নিমাই চরিতার্থ হইল। বলিল—তাতে আর কি। আলাপ হ'ল এবার প্রায়ই আস্‌বো। তারপর নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

কবি নিমাই প্রেমে পড়িয়াছে—নিছক প্রেম।…

মনের মধ্যে কেবল পুষ্পমালার ছবি ভাসিতে থাকে। সেই স্কাই রংয়ের শাড়ী, গলায় মফ্‌চেন, হাতে রিষ্টওয়াচ; যেন একখানি ছবি!

কবির প্রাণ—আর থাকিতে পারে না। ফাউনটেন পেন খুলিয়া কবিতা লিখিতে সুরু করে—সম্মুখে টেবিলের উপর ধূলিপূর্ণ chemistry বইখানি হাসিতে থাকে। কবিতা লিখিয়া নিজেই পড়িতে থাকে। আত্মহারা হইয়া উঠে। বার বার পড়িতে থাকে—

তোমারে দেখেছি আমি সাঁঝেতে বালা,
দেখিয়া তখনই দিনু হৃদয় ডালা।

কি সুন্দর ছুটি লাইন!

—আচ্ছা 'হৃদয়-ডালা' মানে হতে পারে? কেন হবে না—এই হৃদয় হচ্ছে একটা ডালা…তাতে কবির চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা সমস্ত সাজান থাকে। কবি যাকে ভালবাসে তাকেই তার হৃদয় ডালা উপহার দেয়—বা, সুন্দর! আত্মপ্রশংসায় নিমাই উৎফুল্ল উঠে।…

আচ্ছা পুষ্প তাহাকে ভালবাসে? বোধ হয় ভালবাসে। না হইলে কেন তাহাকে তাহাদের বাড়ী যাইবার জন্য অত অনুরোধ করে? কেন তাহাকে দেখিলে অত উৎফুল্ল হইয়া ওঠে? সে তাহাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে। তাহার কবিতার কত প্রশংসা করে। বিয়ে করিতে হয়তো পুষ্পকে—মনের মধ্যে নানা প্রকার চিন্তার লহরী খেলিতে থাকে। ভুলিয়া যায় সে গরীব পিতৃহীন পরমুখাপেক্ষী। এ আশা তাহার পক্ষে আকাশ কুসুম।

নিমাই ঘরে বসিয়া এই সব কথা ভাবিতেছিল। সম্মুখে টেবিলের উপর পুষ্পমালাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা কবিতাটি পড়িয়াছিল। বৃষ্টির ছিট্ আসিয়া গায়ে লাগাতে নিমাই সজাগ হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যেন সে কোন কল্পনার রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল। বাহ্যিক কোন জ্ঞানই তাহার ছিল না। বাহিরে আকাশ জোড়া মেঘ করিয়া কখন যে বৃষ্টি নামিয়াছে, তাহা সে জানিতেই পারে নাই। অকালের বৃষ্টি দেখিতে নিমাইয়ের বেশ লাগিল। তাহারই মত বিরহীর যেন তপ্ত আঁখিজল!…

হঠাৎ কাহার যেন মৃদু করস্পর্শে সে পিছন ফিরিতেই দেখিল, শৈলেন। এমন অসময়ে তাহার ঘরে শৈলেনকে চোরের মত চুপি চুপি আসিতে দেখিয়া সে বেশ চটিয়া উঠিল। রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কি দরকার?

শৈলেন মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—দরকার? ভয় নেই, তোমার মানসপ্রিয়ার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা পড়তে আসিনি, তোমার একখানি চিঠি আছে তাই দিতে এসেছি।" বলিয়া সে নিমাইকে একখানি পোষ্ট কার্ড দিল।

নিমাই দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ মায়ের চিঠি শৈলেন দেখিয়াছে। তাহ'লে সেতো তাহাদের অবস্থা সব জানিতে পারিয়াছে। শৈলেনের উপর বিলক্ষণ চটিয়া উঠিল। কেন তাহার এ অনধিকার চর্চ্চা? তাহার চিঠি সে নিজেই ত Post Box হইতে লইয়া আসিতে পারিত। কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব তাতাইয়া সে বলিল—থ্যাঙ্কস্, এ উপকারটুকু না করলেই ভাল হত। আমার চিঠি আমি নিজেই আনতে পারতুম।…

শৈলেনও শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল—I return your good wishes. হাজার হোক্ বন্ধুত। তাই নিজেই তোমার ঘরে দিয়ে গেলুম। কবিতা লেখার সময় Interupt করলুম, কিছু মনে করো না। বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিমাই গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।…

সেদিন ছিল রবিবার। রবিবারের নীরব সন্ধ্যাটিকে কাটাইবার জন্য নিমাই পুষ্পমালার বাড়ী চলিল। বাড়ীতে ঢুকিয়াই নিমাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। দেখিল—বাড়ীর সামনের বাগানটায় পুষ্প এবং শৈলেন হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে।…তাহাকে দেখিয়া শৈলেন হাসিয়া বলিল—আসুন নিমাইবাবু, Welcome poet. Do come in. নিমাই আর রাগ সাম্লাইতে পারিল না। এতদিনকার পুঞ্জিভূত সমস্ত রাগ তাহার ফাটিয়া বাহির হইল। সজোরে শৈলেনের হাত ছুটি ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল—Shut up your tongue.

শৈলেন হাত ছাড়াইয়া লইল। পুষ্প গম্ভীরস্বরে বলিল—নিমাইবাবু, just learn how to behave with

gentlemen. আপনাকে বারণ করে দিচ্ছি আর— আপনি আমাদের বাড়ীতে আসবেন না। আমার দাদাকে insult করাও যা, আমাকে insult করাও তাই। ছিঃ, ছিঃ, সাধ করে কি আর আপনাদের বলে পাড়াগেঁয়ে ভূত।...আপনি এক্ষুনি বেরিয়ে যান্‌। তা না হ'লে দরোয়ান্‌······

নিমাই থতমত খাইয়া ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কোন উত্তর দিবার মত সামর্থ্য তাহার তখন ছিল না।

তাহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া শৈলেনের মায়া হইল। নিমাইয়ের হাত দুটি ধরিয়া বলিল—নিমাই, পুষ্প আমার বোন্‌, আমার মাসীমার মেয়ে। সুতরাং এখানে তোমার কাব্য এবং প্রেম খাটবে না। আর কখনও এরকম কাজ করো না। নতুন পাড়াগাঁ থেকে এসেছ, ভাবছ Romance খুব সস্তা, তা নয়। ওসব উপন্যাস গল্পেই সম্ভব, বাস্তবে ওসব চলে না। চালাতে গেলেই তোমার মত দুরবস্থা হয়। যাও, বাড়ী যাও। পড়াশুনা করে মায়ের দুঃখ ঘোচাও।······

আজ আর শৈলেনের কথা নিমাইয়ের খারাপ লাগিল না। সত্যই শৈলেন তাহার আন্তরিক বন্ধু। মস্ত সমস্যা হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহার মানসপটে মায়ের উজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি এবং পল্লীর স্নিগ্ধ শ্রী ফুটিয়া উঠিল। বিনা বাক্য ব্যয়ে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ

এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আমেরিকায় ১৯২৭ সালে যতগুলি নূতন মডেলের গাড়ী তৈরী করা হ'য়েছে তার ভিতর শতকরা ১৩ খানা করে বিশেষ ভাবে কাজ দিয়েছে। ১৯২৮ সালে সেই সংখ্যা ৫৬ খানায় উঠেছিল। ১৯২৯ সালে শতকরা ৭৭ খানা আর ঐ সালের শেষ ভাগের মধ্যেই শতকরা ৮৪ খানা ভাল কাজ দিতে আরম্ভ করে। এই তেল পরীক্ষার যন্ত্র এ বিষয়ে সাহায্য করেছিল।

জুতা তৈয়ারী করার কল

সম্প্রতি ইংলণ্ডে এই জুতা তৈয়ারী কল বিশেষ উন্নতি করেছে। এই কলেতে আট ঘণ্টার ভিতর ৬০০ জোড়া জুতা সম্পূর্ণরূপে তৈরী করতে পারা যায়। ইহার ফলে সব জায়গায় যা হয়ে থাকে, মুচীর অন্ন মরিল আর কি!
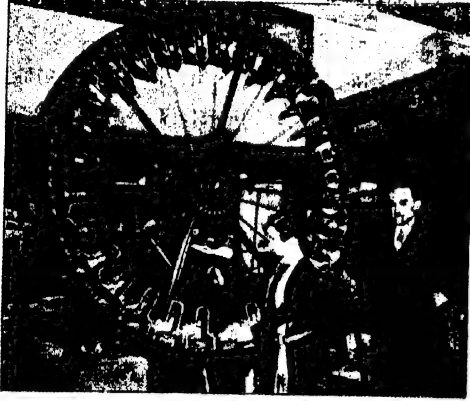
"ইণ্ডিয়া হাউসে" ভারতীয় শিল্প

আপনাদের বোধ হয় মনে আছে যে, লণ্ডনে অবস্থিত ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় শিল্পের কারুকার্য্য করবার জন্য জনকয়েক ভারতীয় শিল্পী সেখানে প্রেরিত হন! তাঁর মধ্যে অবশ্য বেশী বাঙ্গালী ছিলেন! কিন্তু তারপর তাদের কার্য্যের আর কোন খবর পাওয়া যায় না। এই চিত্রটী ইণ্ডিয়া হাউসে শ্রীযুক্ত বর্ম্মাই ডেকোরেট করিতেছেন!

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের সাহস

বিজ্ঞানের জোরেই পাশ্চাত্য দেশগুলি প্রাচ্যের দেশগুলির আদর্শ স্থানীয় ও তাদের চেয়ে শক্তিমান্! কিন্তু এই শক্তি অর্জ্জন করতে তাদের যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে—ভাগ্যক্রমে তারা বড় হয় নাই! এই স্থানে একটী বৈজ্ঞানিকের অদ্ভুত সাহস দেখান যাচ্ছে। এই বৈজ্ঞানিকটি জিওলজির প্রফেসর। জ্ঞান পিপাসা তাঁকে সদ্যোত্থিত আগ্নেয় গিরির ওপর বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেণ্ট করবার জন্য শত শত বিপদের মধ্যেও টেনে নিয়ে গেছে।

বিপদের দান

—এক—

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

ইলা এর মধ্যে দু'বার জানিয়ে গেছে "বাবা, চা যে জুড়িয়ে গেল"—তবু বিছানা ছাড়্বার আগ্রহ আমার ছিল না। অন্যদিন হ'লে চায়ের আসরে আমিই সর্ব্বাগ্রে যোগ দিতুম, কিন্তু আজ?—আজ যেন কিছুই ভালো লাগ্‌ছিল না।

সওদাগরী অফিসে ২৯৮৵৹ মাইনার চাকরী,—পুরা তিরিশও নয়। কারণ মাহিনা নেবার সময়ে ডাক টিকিট বনাম সরকারের নজরানা একটা আনি দিয়ে আস্‌তে হ'তো; কিন্তু কাল থেকে সেটিও নেই; এই গরীবের ২৯৸৵৹ আনায় অফিসের ব্যয় সঙ্কোচ করা হ'য়েছে। পনরটা বছর ধরে খেয়ে খেয়ে এই জীবনটা একরকম সয়েই গিয়েছিল; সত্যি কথা বল্‌তে কি, অফিসের প্রতি একটা যেন কেমন মায়াও জন্মেছিল,—তাই শুধু অন্নচিন্তায় নয় এই দীর্ঘ পনেরটী বছরের বন্ধুটিকে ছেড়ে আস্‌তেও ব্যথা পেয়েছিলুম অনেকখানি বৈ কি! কিন্তু কি ক'রবো, আমি তো আর বড়বাবুর শ্যালক বা জামাতা নই!

মাস তিনেক হ'ল, বড় বাবুর পোষ্য একটী জ্যান্ত আবলুস্ গাছের সঙ্গে মালা বদল করার বিনিময়ে সহকারী রূপে যতীন বাবুকে ৪০৲ টাকা মাসিক আয়ের সংস্থান তিনি করে দিয়েছেন আমার সহকারীর বেতন ৪০ টাকা? এতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি যে কেরাণীর কুল ত্রাতা বড় বাবুর জামাতা। তাঁর তিন মাসের চাকরীটা কায়েমী হ'য়ে রইলো—আর আমার ১৫ বছরের চাকরী? হ্যাঁ তা গেল বৈ কি। অফিসের ব্যয়-সঙ্কোচ তো করতেই হ'বে। খবরটা এখনও গিন্নির কাছে গোপনই রেখেছিলুম।

শুয়ে শুয়ে নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবছিলুম। চায়ের কাপ্‌টী হাতে করে গৃহিণী ঘরে ঢুক্‌লেন।

"ব্যাপার কি গো, আজ রবিবার বলে কি আর উঠতে হ'বে না? এই নাও, চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।"

দেওয়াল ঘড়িটার পানে চেয়ে দেখি, আটটা বাজে সত্যই আর শোওয়া চ'লনা। চায়ের কাপটা তার হাত হ'তে নিলুম।

"একবার বাজার যাওনা! মেয়েটা এসেছে, আজ ষষ্ঠী, কখনতো কিছু পায়না, যাওনা একখানা ছাপা গরদের শাড়ী অনেক রকম তো আজকাল উঠেছে-দেখে-শুনে একখানা নিয়ে এসোনা। কত আদরের ইলা আমাদের, তোমার কি সাধ যায় না। যাকে পূজায় একখানা ভালো শাড়ি কিনে দিতে?"

"সাধতো হয় কিন্তু অবস্থা তো বুঝতেই পারছো। তার উপর চাকরীর যে বাজার।"

"হ্যাঁ তোমার ওই এককথা, অবস্থা তোমার কোনও কালেই ভালো হ'বেনা, তা বলে ষষ্ঠীর দিনে মেয়েটা একখানা ভালো কাপড়ও পরবে না? চা খাওয়া তো হ'য়েছে—এইবার যাওনা একবার। ঝাড়নখানা অমনি নিয়ে যাও, আস্‌বার সময়ে বাজার করে নিয়ে এসো।"

—দুই—

কি নিয়েই বা দোকানে ঢুকি, খালি হাতে কি আর সওদা করা যায়? তবু যাচাই করলুম—২৫ টাকা চায়! হা ভগবান্ ২৫ টা পয়সা আজ আমার ঘরে নেই—২৫ টাকা কোথা পাবো? দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—বেলাও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। বাড়ীর সবাই পথ চেয়ে বসে আছে নিশ্চয়ই—কারণ বাজার নিয়ে গেলে তবে রান্না চাপবে। মাইনা যে কটা টাকা পেয়েছিলুম বাড়ীওয়ালা, মুদি, গয়লা ধোপা, এসবার পাওনা মেটাতেই তা নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে। খুচরা যে কটা পয়সা পড়ে আছে, তাতে বাজারও যে চলেনা!

পথে চলেছি দেখি এক জায়গায় খুব ভীড়। একটা গাঁট কাটা ধরা পড়েছে, উন্মত্ত [illegible] তাকে অর্দ্ধমৃত করে তুলেছে। ভিতরে ঢুকে দেখি বাল্যবন্ধু অভয়।

দশ বছর পরে দেখা—প্রথমটায় চিন্‌তেই পারিনি। আমাকে দেখে যেন অকূলে কূল পেলে।

"ভাই রমেশ, আমায় বাঁচাও ভাই—এরা আমায় মেরে ফেল্‌লে!"

প্রাণপণ শক্তিতে তাকে জনতার ভিতর থেকে টেনে বার করে নিয়ে এলুম। উন্মত্ত জনতা বন্যার স্রোতের মত আমার দিকে ধেয়ে এলো। সাম্‌নেই একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। অভয়কে নিয়ে কোন রকমে তাতে উঠে বল্‌লুম "গড়পার"। ট্যাক্সি তীর বেগে ছুটে চল্‌লো। শীকার পালালো দেখে জনতা "চোর" "চোর" করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—কিন্তু তখন আমাদের ট্যাক্সি তাদের সীমানা ছাড়িয়ে বহু দূরে।

ট্যাক্সিতে বসে যেটুকু খবর অভয়ের কাছ হ'তে পাওয়া গেল তাতে জানা গেল যে, আজ তিন মাস সে বেকার। স্ত্রীপুত্রের অনাহারের ব্যথা সইতে না পেরে আজ সে চুরি ক'রবে বলেই ঘর থেকে বেরিয়েছিল। অনভ্যস্ত হাতে একজন মাড়ওয়ারীর পকেট মারবার সময়ে সে ধরা পড়ে যায় তার ফলেই আজ তার এই অবস্থা! আমি না থাক্‌লে তার শেষ নিঃশ্বাস বোধ হয় ওই উন্মত্ত জনতার মাঝেই মিলেয়ে যেতো।

ট্যাক্সি হ'তে অভয়ের বাড়ীর সাম্‌নে নেমে দেখি মিটারে দেড় টাকা ভাড়া উঠেছে, কিন্তু ভাড়ার টাকা কোথায়? মনে পড়লো অভয়ের অবস্থা—তার স্ত্রী পুত্র আজ তিন দিন উপবাসী! আমার পকেটও শূন্য। অভয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বল্‌লুম, "তাই তো ভাই ভাড়াটা যে আমারও কাছে নেই; তোমার কাছে কি কিছু নেই ভাই?"

"তোমায় তো সবই বলেছি ভাই,—আজ তিন দিন আমরা অনাহারে আছি!" সে আমার পানে ম্লান-কাতর দৃষ্টি মেলে রইলো। তাই তো, কি করি! আমার অবস্থা ও যে প্রায় তাই, আমিও যে আজ বেকার।

সহসা দেখি আমাদের বড় সাহেবের গাড়ীখানা সেখান দিয়েই চলেছে। পথরুখে দাঁড়াতেই মোটর-খানা থেমে গেল। অভিবাদনান্তে ঘটনাটী তাঁকে আদ্যোপান্ত জানিয়ে তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করলুম। তিনি সব শুনে "দুঃখিত বাবু" বলে গাড়ী চালিয়ে দিলেন।

ভাড়া দিতে বিলম্ব দেখে ট্যাক্সি ওয়ালা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অনেকগুলি মিষ্টি বুলি তার নীরবে হজমে করতে হ'লো! কিন্তু উপায়ই বা কি?

একটী ভিখারী মেয়ে তার অন্ধ বাপের হাত ধরে চলেছে। আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

"বাবু, একটী পয়সা অন্ধকে দয়া করো বাবু, বড় গরীব" অভয় তো তাকে তাড়া করে এলো। "এক ঝোলা চাল নিয়ে চলেছেন, ওঁরা আবার গরীব! তিন দিন উপবাসী।

যা যা এখানে কিছু হ'বে টবে না।
ভদ্রলোকের যে ভিক্ষারও যো নেই!

"তুই থাম্ অভয়," আমি তাকে ধমক দিলুম। "কি হয়েছে বাবু তোমাদের, ট্যাক্সিওয়ালা এত চেঁচামেচি করছে কেন?" ভিখারী মেয়েটী আমার পানে এগিয়ে এলো।

"মা আমরা বড় বিপদে পড়েছি। বড় বিপদে পড়েই ট্যাক্সি করে আমাদের ফির্‌তে হয়েছে—কিন্তু ভাড়ার টাকা দেবার ক্ষমতা যে আমাদের নেই মা, তাই আমাদিগকে এই অপমান নীরবে সইতে হচ্ছে। কিন্তু সে যাক্ মা, এই নাও একটী পয়সা। আমি পকেট্ থেকে একটী পয়সা বার করে তাকে দিতে গেলুম, কিন্তু নেবার এতটুকু আগ্রহও প্রকাশ করলে না সে।

"কত ভাড়া দিতে হবে বাবু?"

"দেড়টাকা মা।"

"এই নিন্ বাবু দেড় টাকা। এই নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে দিন্।" একটী একটী করে এই ৯৬টী পয়সা সঞ্চিত করেছিলুম পূজায় নূতন কাপড় কিন্‌বো বলে। নূতন কাপড় পরার চেয়েও বেশী আনন্দ পাব বাবু যদি আপনারা এগুলি নেন্। অপনি দ্বিধা করবেন না বাবু, এতো আপনাদেরই দান।"

হাত পেতে নিতে গিয়ে দেখি ট্যাক্সিওয়ালা কখন্ চলে গিয়েছে। অভয় তার চোখদুটো তাড়া তাড়ি মুছে ফেলে ভিখারী মেয়েটীকে কোলে তুলে নিয়ে চুমা খেয়ে বল্‌লে, "আজ হতে তুই আমার মা। কেমন, মা হতে পারবি না মা?"

"ও একা তোর মা নয়রে অভয়, ও এই অন্ধের মা, ও আমার মা, ও জগতের মা। মা অনন্দময়ী আজ আমাদের কুটীরে এসছে অভয়, স্নেহের বাঁধন দিয়ে ওকে শক্ত করে বাঁধ, যেন পালাতে না পারে।" চোখের জলে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইংরেজী নববর্ষ

১৯৩১ সালকে বিদায় দিয়া ১৯৩২ সালকে আমরা বরণ করিয়া লইতেছি। প্রাচ্য চিরকালই পুরাতনের ভক্ত। প্রাচ্য চিরকালই যাহা কিছু সনাতন তাহার নিকট মস্তক নত করিয়া আসিয়াছে, সেই আদর্শে আমরা পুরাতন ১৯৩১ সালকে শির নত করিয়া বিদায় দিতেছি। নূতন আমাদিগকে সমস্যায় ফেলে, নূতন আমাদের নিকট কুহলিকাময় হয়। ১৯৩২ সাল এই জন্যই শুধু রহস্যময় ও কুহলিকায় ভরা বলিয়া আমাদের নিকট বোধ হইতেছে তাহা নয়, ১৯৩২ সাল হয়ত ভারতবর্ষ বা সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে—একটী স্মরণীয় বৎসর হিসাবে থাকিয়া যাইবে। এই বৎসরে আর্থিক সমস্যার মীমাংসা না করিতে পারিলে জগতের বাণিজ্য-জগতে বিপ্লব দেখা দিতে পারে বলিয়া অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন। মহাত্মাজী অহিংসা আন্দোলন আবার চালাইয়াছেন, ফলাফল ভবিতব্যের হস্তে। নূতন বৎসরে আমরা পুষ্পপাত্রের গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা ও পৃষ্ট-পোষকগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

জাগতিক অর্থ সমস্যা

আর্থিক সমস্যা ক্রমশঃই ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। জগতের অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ সকলেই স্বর্ণমান লইয়া ভীষণ চিন্তিত হইয়াছেন। চেম্বারলিন সাহেব নাকি আন্তর্জাতিক কোন অভিনব মুদ্রা আবিষ্কার করিবার জন্য জাতিবৃন্দকে অনুরোধ করিয়াছেন। এদিকে প্রেসিডেণ্ট হুভার কর্ত্তৃক আমেরিকার নিকট যে সমস্ত জাতি সমর-ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে উক্ত ঋণ হইতে যে কয়েক মাস অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার মেয়াদ প্রায় ফুরাইয়া আসিল। জার্ম্মানি স্পষ্টই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তাহার যুদ্ধের খেসারতের খানিকটা লাঘব বা ন্যায়সঙ্গত কোন ব্যবস্থা না করিলে সে আর দিতে পারিবে না। ইউরোপে ফ্রান্সে অতিরিক্ত স্বর্ণ জমা হওয়ায় ফ্রান্স আর্থিক ব্যবসায়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে. কিন্তু ফ্রান্স উক্ত খেসারৎ কমাইবার বা ন্যায়সঙ্গত কোন বিধি প্রণয়ন করিতে একেবারেই নারাজ। ইংরাজ জাতি ব্যবসা বাণিজ্য পুনরোদ্ধারের জন্য জার্ম্মানিকে একেবারে আর্থিক হিসাবে নষ্ট করিতে চাহিতেছেন না। আমেরিকা ইউরোপের ভাগ্য- নিয়ন্তা হইলেও ইউরোপ যদি এই আর্থিক বিপর্য্যয়ে নষ্ট হইয়া যায় তবে তাহারও যে সর্ব্বনাশ ঘটিবে এই জন্য ইউরোপকে বিপর্য্যস্ত হইতে দিতে রাজী নহে সুতরাং এই সমস্যার মীমাংসা করিতে গেলে সমর-ঋণ ও যুদ্ধের ক্ষতিপুরণের দাবী প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। আমেরিকার জনসাধারণ যাহারা তাহাদের শ্রম-জাত অর্থে Victory Bond বা যুদ্ধ-ঋণ ক্রয় করিয়াছিল উহা যে কেমন করিয়া নাকোচ হইতে পারে তাহা ভাবিতেই পারিতেছেনা। কাজেই স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে যতই কনফারেন্স হইতেছে উহার নিষ্পত্তি কিছুই হইতেছেনা, বরং ব্যাপারটা ক্রমশঃ জটিলই হইয়া উঠিতেছে। শুনা যাইতেছে যে এই জানুয়ারী মাসেই নাকি লুসেনে আবার একটী আর্থিক কনফারেন্স বসিবে। আমেরিকা কতকটা স্বার্থ-ত্যাগ করিতে রাজী হইয়াছে। ফ্রান্স কিন্তু পূর্ব্ববৎ অচলই আছে। এই ফ্রান্সের প্রতিবন্ধকতায়ই নৌবহর সংযত করিবার জন্য যে সম্মিলন হইয়াছিল তাহা বিফল হয়, এবার ও যে এই আর্থিক কনফারেন্স বিফল না হইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

চীন জাপান কলহ

মানচুরিয়া-সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইতেছে। চীন ও জাপান উভয়েই জাতি-সঙ্ঘ বা League of Nations এর সভ্য। League উভয়ের বিবাদ মিটমাট করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে কিন্তু জাপান একরূপ লীগের নির্দ্দেশ না মানিয়াই সমর ঘোষণা করিয়াছে আর চীন যদিও লীগকে

সময়ে সময়ে মানিয়া লইতেছে তবুও সময় পাইলেই উহার নিষেধাজ্ঞা আদপেই মানিতে প্রস্তুত হইতেছে না। মান্‌চুরিয়া জাপানের কাঁচামালের আড়ৎ। গত শতাব্দীতে জাপান যখন চীনকে পরাস্ত করিয়া স্বাধীন হয় তখনই সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে যে পাশ্চাত্য জাতিগুলির ন্যায় সে ও শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান জাতি হইবে। জাপানে কৃষি-কার্য্যের জন্য যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা থাকিলেও শিল্প-জীবনোপযোগী মাল-মাসলা তাহার একেবারেই নাই। এইজন্য সে তাহার শ্যেনদৃষ্টি মান্‌চুরিয়ার দিকে ফেলিতে থাকে। মানচুরিয়া তখন চীনের অধীন হইলেও উহা একপ্রকার অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল বলিলেই চলে। রুশিয়া এই সময় সারা উত্তর ও মধ্য এশিয়ায় তাহার আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উত্তরোত্তর তাহার স্বাধিকার বাড়াইয়া চলিয়াছিল। দক্ষিণ মানচুরিয়ায় রেলপথ বিস্তার করিবার জন্য মতলব করিতেছে দেখিয়া ১৮৯৫ সালে জাপান চীনের সহিত এক সন্ধি করিয়াই জারার মত উহার কতকটা অংশ দখল করিয়া বসে। তাহার পর বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই রুশিয়াকে পরাস্ত করিয়া মান্‌চুরিয়ায় তাহার আধিপত্য সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯১৫ সালে, ইংরাজ প্রভৃতি মিত্রশক্তি সঙ্ঘ জাপানের সত্ব মানিয়া লইয়া আন্তর্জাতিক ভাবে মানচুরিয়ায় জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। স্বাধান চীন এখন জাপানেরই মত উন্নত হইতে চায়। মানচুরিয়া বিবিধ খনির আকর। মানচুরিয়া হস্তচ্যুত হইলে চীন কোন কালেই শিল্প-সম্ভারে উন্নতি করিতে পারিবে না। সাইলেসিয়া যেমন জর্ম্মানির প্রাণ, মানচুরিয়াও অনেকটা চীনের নিকট সেইরূপ। ইহা ব্যতীত মানচুরিয়ার ইতিহাস চীনের নিকট অতিপ্রিয়। যে রাজবংশকে ধ্বংস করিয়া চীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছে, উঁহারা মাঞ্চু বংশ জাত ছিলেন। এতবড় একটা ঐতিহাসিক সম্বন্ধ তাঁহারা একেবারেই বিস্মৃত হইতে পারে না। উভয়ের মনোমালিন্যের কারণ এই। লীগ এই জন্যই ভীষণ সমস্যায় পতিত হইয়াছে। চীনের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া জাপানের দাবী মানিয়া লইতে গেলে একটা জাতির আত্ম-সম্মান ও স্বার্থে আঘাত করা হয় এবং এইরূপ করিলে হয়ত চীন লীগ এর অনুশাসন মানিয়া নাও লইতে পারে আবার অপর পক্ষে জাপানের উপরোধ রক্ষা করিতে না পারিলে জাপান স্পষ্টই বলিতে পারে যে, যে দাবী আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হইতে সমর্থিত হইয়াছে এবং যাহা চীন স্বেচ্ছায় জাপানকে এক সময়ে দিয়াছে তাহা এখন নাকোচ করিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষিত হয়। কথাটা ভাবিবার বটে, দেখা যাক লীগ কিরূপ বিচার করে।

বাংলার কৃষিসম্পদ

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান হইলেও তুলা ও চিনির জন্য আমরা জাভা ও আমেরিকা বা মিশরের মুখাপেক্ষী হই। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এখন বলিতেছেন যে একটু চেষ্টা করিলেই আমেরিকার তুলার ন্যায় তুলা এখানেও উৎপন্ন করা যাইতে পারে। সরকার পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে নাকি যথেষ্ট তদন্ত হইয়া গিয়াছে। সরকারের নিকট হইতে উহার বীজ ও পাওয়া যাইতে পারে। বাংলার পাট একটী প্রধান পণ্য হইলেও উহা ক্রমশঃই বাজার হারাইতেছে। পূর্ব্বে নীল চাষ বাংলার একচেটিয়া ছিল। নীলের অন্তর্দ্ধানের সহিত পাটের আবির্ভাব হয়। এখন পাটও যদি চলিয়া যায় সেই জন্য মনে হয় তুলার চাষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে করিবার চেষ্টা করিলে কেমন হয়? পূর্ব্বে ত বাংলায় যথেষ্টই তুলা উৎপন্ন হইত। এখানকার তুলারই যে সুতা হইত তাহা হইতেই ত মসলিন্‌ প্রস্তুত হইত। তবে বাংলায়ই বা ভাল তুলা উৎপন্ন করিতে পারা যাইবে না কেন।

ইক্ষুর চাষ ও বাংলার একটী অন্যতম সম্পদ ছিল। পাশ্চাত্য যখন চিনির ব্যবহার একেবারেই জানিত না, তখন বাংলার চিনি ইউরোপের বাজার সমূহে নীত হইয়া উহাঁদের বিস্ময় উৎপাদন করে। মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বেও বাংলা হইতে কয়েক কোটী টাকার চিনি ইউরোপে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। জার্ম্মানির 'বীট' সর্করা ও জাভার চাষ আমাদের এই ব্যবসাকে এমন ভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছে যে বর্ত্তমানে এখন প্রতিবৎসর কয়েক কোটী মুদ্রার চিনি ভারতের বাহির হইতে আমদানি করিয়া থাকি। ভারত সরকার তাহার বজেটের সঙ্কুলান করিবার জন্য চিনির উপর কর ক্রমশঃই বাড়াইয়া চলিয়াছেন। জাভার পণ্য এইজন্য অনেকটা মহার্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সুযোগে যদি আমরা আকের চাষ আরম্ভ করিয়া দিয়া আবার চিনির কাজ সুরু করি তাহা হইলে হয়ত আবার একটা লুপ্ত পণ্যের উদ্ধার হইতে পারে। পাটের ব্যবসায়

উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া যাঁহারা চিন্তিত তাঁহারা এই বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে পারেন।

বাণিজ্য শুল্কের হ্রাস

আধা-সরকারী খবরে প্রকাশ এবার আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে আশা করা গিয়াছিল তাহাত হয়ই নাই বরং হ্রাস পাইয়াছে। এরূপ যে হইবে আমরা তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। ব্যবসা-বাণিজ্যে যখন মন্দা পড়িয়াছে তখন শুল্কের হার বাড়াইয়া দিলে উহা হইতে যে আয় হয় তাহার কম্‌তি হইবেই। দারুণ অর্থ-সঙ্কটে সকলেরই অর্থাভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই উহার চাহিদা কমিয়া যাইবে। এইজন্য আমাদের এরূপ সন্দেহ হয় যে ডাক-বিভাগে খাম-পোষ্টকার্ডের মাশুল বাড়াইয়া সরকার ভাল করেন নাই। উহাতেও হয়ত আয়ের কম্‌তিই হইবে।

ইউরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েসনে বড়লাট

ইউরোপীয়ান আসোসিয়েসনের ভোজ সভায় বড়লাট বাহাদুর যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। আমরা চাই ভারতবর্ষকে অনেকটা স্বাবলম্বী হইতে দেখিতে। ১৯১৭ সাল হইতে ক্রমান্বয়ে আমাদিগকে শাসন সংস্কার দেওয়া হইবে তাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। আমাদের মনে হয় এই সন্ধিক্ষণে ভারতবাসী ও ইংরাজ এই উভয় জাতির মনের মিলন হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। অর্ডিনান্সের উপর অর্ডিনান্সের প্রয়োগ করিলে জনসাধারণ একটু চঞ্চল হইবেই। যাহারা ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের নিকট হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে চায় তাহারা এই অবসরে মাথা তুলিবে। তাহারা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে যে ইংরাজ রাজনৈতিকগণ এতদিন কেবল প্রলোভনই দেখাইয়া আসিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি এখন প্রকৃতপক্ষে কাজ করিবারই সময় আসিয়াছে। কোন জাতিকে শুধু প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইবার দিনও কাটিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ ভগবানের বিধানেই এক ভাগ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে একথা অনেক ভারতবাসীই স্বীকার করে। আবার ভারতে যতদিন রাজন্যবর্গ ও বিবিধ জাতির স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত থাকিবে ততদিন ইংরাজ-জাতিও হয়ত ভারতকে কোন প্রকার শাসন-সংস্কার না দিয়াও নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারেন। কিন্তু পরস্পর রেষারেষির উপর যে শাসন-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা নিশ্চয়ই কোন পক্ষেরই সুবিধাজনক হইতে পারে না। উভয় জাতিকেই তাহাতে নানা প্রকার অসুবিধা অনুভব করিতে হয়। এই জন্যই আমাদের মনে হয় ইংরাজগণ যদি স্বার্থের দিক চাহিয়াও ভারতবর্ষের সহিত একটা মিটমাট করেন তবে উভয় জাতির পক্ষেই উহা মঙ্গল জনক হইবে।

ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার

একথা সত্য যে ইংলণ্ডের নবীন সম্প্রদায় ও লেবার-দলের অনেকেই ভাবিতেছেন যে ভারতকে অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা না দিতে পারিলে ইংলণ্ডে রক্ষণ শীলদের প্রাধান্য দূরীভূত হইবে না। তাহারা সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহে। এই দলের প্রভাব খুবই সামান্য। তবু তাহাদিগকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীগণ নানা প্রকার আয়োজন করিতেছে। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি সকলেই তারস্বরে বলিতেছে যে গোলটেবিল বৈঠক যে বিফল হইতে বসিয়াছে তাহার কারণ মহাত্মাজী অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিত একযোগে চলিতে পারিলেন না বলিয়া। ভারতকে স্বাধীনতা দিতে ইংরাজ খুবই উৎসুক তবে ভারতের জাতিবৃন্দ উক্ত দান গ্রহণ করিতে এখনও উপযোগী হয় নাই। White man's burden লইয়া যাঁহারা মশগুল তাঁহাদের ভাবা উচিত উনবিংশ শতাব্দি কাটিয়া গিয়া বিংশ শতাব্দি চলিয়াছে।

প্রোপাগাণ্ডা খুব জোর চলিয়াছে। দলে দলে প্রচারক আমেরিকা ও কানাডায় গিয়া ভারতবিদ্বেষ প্রচার করিতেছে। দুঃখের বিষয় মহারাজ বর্দ্ধমান এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন ; এখন তিনি কানাডায় বাস করিতেছেন। মনট্রিল নগরে সম্প্রতি তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে কংগ্রেস কখনই পতিত জাতিদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই। মহারাজকে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। ভাগ্যগুণে তিনি বিস্তৃত জমিদারীর মালিক হইয়াছিলেন। কতকটা রাজ অনুগ্রহে তিনি উচ্চ কর্ম্মচারী হইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। কংগ্রেসে যোগদান বা রাজনীতি চর্চ্চা তিনি কোন কালে করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তবে সুদূর কানাডায় তিনি একজন রাজনৈতিক বলিয়া

পরিচিত হইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব।

ভারতবর্ষ এখন অনেকটা আন্তর্জ্জাতিক বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক নর-নারীই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা বিষয় জানিতে চাহেন। এইজন্য একশ্রেণীর ভ্রমণকারী শীত ঋতুর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিয়া এখানকার সরকারী কর্ম্মচারীগণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের দপ্তর হইতে কিছু তত্ত্ব লইয়া গিয়া তাহাদের গবেষণা মিস মেয়োর ন্যায় পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহাদের দুই পয়সা প্রাপ্তি ও কিঞ্চিৎ নাম অর্জ্জন হয়, কিন্তু ভারত সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের কোন প্রকার জ্ঞান বৃদ্ধি হয় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মহারাজ বর্দ্ধমান কিন্তু এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে পড়েন না। তিনি একজন ভারতবাসী, ধনী জমিদার, ভূতপূর্ব্ব উচ্চ রাজকর্মচারী, সুতরাং তাঁহার অভিজ্ঞতার যথেষ্টই মূল্য থাকিতে পারে, একথা নিশ্চয়ই কানাডাবাসীগণ ভাবিবেন। মহারাজ বর্দ্ধমান এইজন্য হয়ত ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীগণের অনেকটা উপকার করিতে পারিবেন।

নববর্ষের উপাধি

নববর্ষের উপাধি বর্ষণ হইয়া গেল। শ্রীযুত বি, কে বসু সি-আই-ই হইলেন। চারু বাবু ইতি পূর্ব্বেই হইয়াছেন। উঁহাদেরই বিজয় বাবু বাংলার অন্যতম মন্ত্রী। সুতরাং যে ত্রয়ী এক সময়ে স্বরাজী করপোরেসনকে দাবাইয়া রাখিয়া এক বৎসরের জন্য উহার শাসন দণ্ড কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সরকার কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইলেন। সরকার বাহাদুর মান্যবর ফরকী সাহেবকে নবাবী উপাধি দিয়া যোগ্যের আদর করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মন্ত্রী-মণ্ডল আত্ম-রক্ষার্থ তাঁহার উপর কিরূপ নির্ভর করে তাহা যে সরকার অবগত আছেন এই উপাধি দানেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

আন্দামানের সংস্কার

দ্বীপান্তর বলিতে পূর্ব্বে আন্দামানে নির্ব্বাসন বুঝাইত। মধ্যে কলোনিয়াল সরকার ক্রমাগতঃ কয়েদী প্রেরণে ওথাকার অধিবাসীদের নৈতিক অধোগতি ঘটিতেছে বলিয়া আন্দোলন করায় কয়েদী চালান দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর এখান হইতে এংলো ইণ্ডিয়ানদের যাহারা বেকার বসিয়া আছে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া উহাদের একটী বসতি-আগার রচনা করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাও কিন্তু সফল হয় না। এখন আবার কয়েদী প্রেরণ করিবার কথা হইতেছে। তবে এবার আইন-কানুন একটু বদলাইয়া দিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। যাহা-দিগকে সেখানে প্রেরণ করা হইবে তাহাদিগকে সেখানে দিনকতক নজরবন্দী হিসাবে রাখিয়া পরে কতকটা মুক্তি দেওয়া হইবে। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চাষ করিবার জমি ও কিছু আসবাব পত্র দেওয়া হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিতেছেন যে এইরূপ করিলে আন্দামান দ্বীপটীকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ জনবাসে পরিণত করিতে পারা যাইবে।

স্বাদেশিকতা

স্বদেশপ্রিয়তাই একটা জাতিকে বড় করে। এবৎসর ইংলণ্ডের বড় দুর্ব্বৎসর। তাহার বজেটে ভীষণ ঘাটতি হইয়াছে। এই শীত ঋতুতে ওথাকার ধনীগণ নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে যোগদান করিবার জন্য ইউ-রোপের বিভিন্ন দেশ সমূহে গমন করিয়া থাকেন। এবৎসর তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইবেন না। এইজন্য ইংলণ্ডের সমুদ্রকূল গুলিতে বেশ আমোদের মেলা বসিয়াছে। ধনী-গণ তথায় গমন করিয়া বড়দিনের আনন্দ উৎসব করিতেছেন।

উভয় সঙ্কট

আমাদের কিন্তু মহা মুস্কিল। কংগ্রেস চাহিতেছেন আমরা 'স্বদেশী' দ্রব্যই ব্যবহার করিব। সকল প্রকার বিলাতী পরিত্যাগ করিয়া 'স্বদেশী' শীতবস্ত্র—খরিদ করিব। সুতরাং বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনে আমাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবেই। এদিকে ভারত সরকার বজেটে অতর্কিতভাবে আয়কর বসাইয়া জানুয়ারী মাসে এপ্রেল হইতে হিসাব করিয়া আদায় করিয়া লওয়া হইতেছে। এখানেও সরকার পক্ষ বলিতেছেন, বড় দুর্দ্দিন—স্বার্থত্যাগ দরকার।

খাজনা বন্ধ-আন্দোলন

কংগ্রেস হইতে ব্যাপকভাবে খাজনা-আদায় বন্ধ করি-বার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া মাঝে মাঝে শুনা যায়। গত বারের অহিংসা-আন্দোলন লবণকে অবলম্বন করিয়া আরম্ভ করা হইয়াছিল। ভারত-সরকার লবণকর সম্বন্ধীয়

আইন-কানুন অনেকটা শ্লথ করিয়া দেওয়ায় ঐ মারফৎ যে আয় হইত তাহার অনেকটা অংশ হ্রাস পাইয়াছে। এখন খাজনা-বন্ধকরা আন্দোলন চালাইতে গেলে প্রাদেশিক সরকারগুলি খুবই অক্ষম হইবে। কংগ্রেস যদি মনে করেন যে তাহা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি এইরূপ করিলে জন-সাধারণ তাঁহাদিগের আন্দোলনে যোগদান করিতে পারিবে কি? বোম্বাই বা আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশে রাজস্ব-বন্ধ আইন চলাইতে গেলে তথাকার তালুকদার দের বিশেষ ক্ষতি হইবে, বিশেষতঃ অযোধ্যার অনেক ভূস্বামীই আমাদের জমিদারদের ন্যায় বংশ পরম্পরা তাঁহাদের ভূসত্ত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। পরলোক-গত মহানুভব ও কংগ্রেসের একজন বড় পৃষ্ঠ-পোষক মহারাজ মামুদাবাদ ও একজন বড় ভূস্বামী ছিলেন। এই আন্দোলনে কি তাঁহাদের সহিত কংগ্রেসের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে না? তাহার পর এই ঢেউ বাংলায় আসিলে ইহার ব্যাপকতা বড়ই ভীষণ হইবে, কাজেই বাংলায় এই রাজস্ব-বন্ধ করিবার আন্দোলনে সহানুভূতি পাওয়া যাইবে কিনা খুবই সন্দেহ। বাংলার বাৎসরিক রাজস্ব দুই কোটী আশি লক্ষ। খাস মহল ছাড়িয়া দিলে দুই কোটী ২০ লক্ষ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে কতকগুলি বড় বড় জমিদারী যেমন কাশিমবাজার ষ্টেট, বর্দ্ধমান ষ্টেট ও ভাওয়ালের ষ্টেট সরকারের কোর্ট অফ ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ভূসত্ত্ব-হীন একদল রাজ-নৈতিক বাংলায় আছেন যাঁহারা ভাবেন যে বাংলায় ও এই আইন ব্যাপক ভাবে চলাইতে গেলে মাত্র কয়টী ধনী ও সরকারের সহিত কংগ্রেসকে সংগ্রাম করিতে হইবে কেন না ঐ কয়টী বড় বড় জমিদারীর বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ৭০।৭৫ লক্ষ। কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীর রাজস্ব উহার সহিত যোগ করিলে প্রায় বর্ত্তমান রাজস্বের অর্দ্ধেক হয়। কাজেই রাজস্ব বন্ধ আন্দোলন এখানেও বেশ ব্যাপক ভাবে চলিতে পারে। যাঁহারা এরূপ ভাবিতেছেন তাঁহারা আসল খবরটা রাখেন কি? বাংলার মোট রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটী টাকা। সরকারের প্রাপ্য প্রায় তিন কোটী টাকা বাদ দিলে বাকী ১০ কোটী টাকা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী উহার ন্যায্য অধিকার হিসাবে ভোগ করিয়া থাকে। বাংলার কারবার নাই, ও কল-কারখানা ও খুব বেশী এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যে সমস্ত বাঙ্গালী সহরে থাকিয়া চাকুরী ইত্যাদি করে তাহাদিগকেও ভূস্বত্বের উপর নির্ভর করিতে হয়। ব্যাপক ভাবে রাজস্ব-বন্ধ আইন চালাইতে গেলে শুধুই যে চাষী উৎ-পীড়িত ও জমিদারগণ ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হইবেন তাহা নয়, বাংলার প্রচণ্ড মধ্যবিত্ত শ্রেণী নষ্ট হইয়া যাইবে। বোম্বায়ের সহিত এইখানেই বাংলার পার্থক্য। জোর লেবর আন্দোলন করিলে বোম্বায়ের যেরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা এই রাজস্ব-বন্ধ করিবার আন্দোলন করিলে বাংলার তাহা অপেক্ষাও অধিক ক্ষতি হইবে, কেন না বোম্বায়ের ধনীদের সংস্থান আছে তাহারা দুই এক বৎসর নিজেদের পুঁজি ভাঙ্গাইয়া খাইতে পারে, নিঃস্ব বাঙ্গালী এখানে দুই মাস এই আন্দোলন চলিলে অন্ন-হীন হইয়া ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। আমাদের এরূপ বলিবার আরও একটী কারণ আছে। যে আন্দোলনে জাতির সকলেই মনপ্রাণ ঢালিয়া যোগদান করিতে পারে না সে আন্দোলন কখনই সফল হইতে পারে না। এই বিষয়ে সকলেই একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

বোঝার উপর শাকের আঁটি

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া বাতুলতা মাত্র। এখনকার বাজেট ব্যবস্থাও প্রায় তদনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শান্তি-রক্ষা অজুহাতে সৈন্যবল ও নৌবল ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। মহা-সমরের সময় যে অর্থ প্রয়োজন হইত এখনও সেই অর্থের ব্যয় চলিতেছে। এদিকে জনসাধারণের উপার্জ্জন ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে কাজেই ব্যয় সঙ্কোচ ও নিত্য নতুন উপায়ে আয়কর স্থাপন করিয়া কোন প্রকারে তাল সামলাইয়া লওয়া হইতেছে। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে ইংলণ্ডের সরকার ইউরোপ হইতে অসময়ে যে সমস্ত ফল বিলাতে ধনীদের ব্যবহারের জন্য আসিবে তাহার উপর কর নির্দ্দেশ করিবেন, এক পাউণ্ড ষ্ট্রবেরীর উপর দুই শিলিং ছয় পেন্স শুল্ক বসান হইবে। এদিকে গুজব আমাদের দেশেও নাকি পানের উপর ডিউটী বসান হইতে পারে। পান জন-সাধারণের বিলাস দ্রব্য হইলেও অনেকটা অপরিহার্য্য বস্তুর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পানের কর নির্দ্দেশ করিলে রাজ-কোষে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ হইবে সত্য কিন্তু এইরূপ করিয়া কতদিন চলিবে ?

বালীব্রীজ

বড়লাট মহোদয় ২৯ শে ডিসেম্বর বালী ব্রীজ খুলিয়াছেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই পোলটীর নাম Willingdon Bridge রাখা হইল। এই ব্রীজটি নির্ম্মাণ করিতে ৩৫৯ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। ১৯২৬ সালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় সুতরাং পুরা পাঁচ বৎসর এই পোলটী তৈয়ার করিতে কাটিয়া গিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় কয়লা সরবরাহ করিবার জন্য একটী নূতন রেল রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষগণ ব্যতিব্যস্ত হন। অর্থ-সঙ্কোচতার দরুণ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই, ১৯২২ সাল হইতে জল্পনা-কল্পনা করিয়া ১৯২৬ সাল হইতে প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল।

নেপালের রাজ অতিথি

নেপালরাজ্যের প্রধান সচিব ও অপরাপর বড় বড় রাজকর্ম্মচারীগণ কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীতে নেপালই একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব। নেপালের নৃপতি ভারতসরকার কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর হইল His magesty বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এখানকার প্রধান মন্ত্রী পদটী প্রাচীন হিন্দু আচার অনুযায়ী বংশগত এবং প্রকৃত রাজশক্তি মারহাট্টা জাতির পেশোয়াদের ন্যায় এই প্রধান মন্ত্রীরই উপর ন্যস্ত থাকে।

গ্রেটইষ্টার্ণ হোটেলের সংস্কার

কলিকাতায় ইংরাজী হোটেলের মধ্যে গ্রেটইষ্টার্ণ ও গ্রাণ্ড হোটেল বিখ্যাত। উভয় হোটেলেই জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যথেষ্ট আয়োজন ছিল। গ্রাণ্ড হোটেল চৌরঙ্গীতে অবস্থিত হওয়ায় ও উহরে ব্যবস্থাও নাকি কতকটা সন্তোষজনক হওয়ায় সৌখীন ইউরোপীয় সমাজ গ্রেটইষ্টার্ণ ছাড়িয়া এই হোটেলকেই অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। গ্রেট ইষ্টার্ণের কর্ত্তৃপক্ষ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উহার এক নূতন অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার ব্যবস্থা প্রণালী বার্লিন, প্যারিস বা লণ্ডনের প্রথম শ্রেণীর হোটেলগুলির মতই হইয়াছে। এই অংশে সত্তরটী বেডরুম ও ২২টী সুইট্ আছে। উহার সাধারণ হল ঘর নাকি এক অপূর্ব্ব ব্যাপার হইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য এত মনোরম হইয়াছে যে উহার সৌন্দর্য্য দেখিবার ও উপভোগ করিবার বস্তু হইয়াছে। তখনকার দিনে রাজা বা তাঁহার অনুচরগণই কতকটা বিলাস সম্ভোগ করিতে পারিতেন এখনকার এই বৈশ্য-যুগে ধন-কুবেরগণ এই বিলাস জিনিষটা কতকটা ব্যাপকভাবে নিজেদের ভোগে লাগাইতেছেন। এই জন্যই হোটেল, রেষ্টুরা ইত্যাদিতে এত উন্নতি সম্ভবপর হইতেছে।

উৎসবে দুর্যোগ

দেশে যখন আমোদের উৎসব বহিয়া যায়, আপামর সকলেই যখন স্ফূর্ত্তির মুখে নিজেকে সমর্পণ করে তখনই অনেক লোক-হত্যা ও আত্মহত্যা ঘটে। তাহার খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ কেহ বিচলিত হয় না সত্য কিন্তু চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তি দুখানি চ সুখানি ইহা সত্য। গত বড়দিনের উৎসবে আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে প্রায় ২০০ নাগরিকের অপঘাত মৃত্যু সংঘটিত হয় উহাদের মধ্যে ১৩০ জন গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লাগিয়া মারা গিয়াছে এবং নয় জন অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া বা বিষ ভক্ষণ করিয়া দেহ রক্ষা করিয়াছে। আফ্রিকার কেপটাউনে নানাপ্রকার দুর্ঘটনায় ৩৬ জনকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে মহাপ্রভুর রথযাত্রা উপলক্ষে এইরূপ দুর্ঘটনা পূর্ব্বে প্রায়ই ঘটিত এখন উহার অনেক হ্রাস হইয়াছে।

বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসর সমবায়-প্রাসাদে ভারতীয় চিত্র কলার একটী প্রদর্শনী বসিয়াছিল। মাননীয়া লাট-পত্নী লেডী জ্যাক্সন উহায় প্রবেশ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই কলাভবন সাধারণের প্রবেশের জন্য ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কিছুদিন খোলা ছিল। এখানে যে ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে বাংলার বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবার বেশ চেষ্টা আছে। যাঁহারা এ বিষয়ে চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা চিত্র-প্রদর্শনী দেখিয়া আসিতে পারেন।

চীন জাপানের কাছে হারে কেন ?

অনেকেই হয়ত জানিতে চাহিতে পারেন যে সুবৃহৎ চীন জাপানের নিকট সমর-ক্ষেত্রে শিশুবৎ গণ্য হয় কেন? ইহার প্রকৃত কারণ চীন লোক-বলে

অগণ্য হইলেও উহাদের শিক্ষা দীক্ষা বা অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নাই, যখনই কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় বিপুল সৈন্যবল ভীষণ গোলমাল করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে সত্য কিন্তু উহাতে হতাহতের সংখ্যাও যেমন নগণ্য হয়, যুদ্ধের ফলাফলও তেমনি অনিশ্চিত রহিয়া যায়। চীন-সৈন্যদের মাহিনার হারে অষ্টদশ শতাব্দির মারহাট্টা সৈনিকগণের মত কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, লুট-পাট করাই তাহাদের পেশা। এই জন্যই কোন সেনাপতি একদল সৈন্যকে বেশী দিন তাঁহার অধীনে রাখিতে সমর্থ হইতেছেন না। যেখানে লাভের সম্ভাবনা অধিক সেইখানেই সৈন্যগণ গিয়া উপস্থিত হয়। দস্যু দলপতিগণও তাহাদের দস্যুদল লইয়া জাতির নেতা হিসাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রকৃতপক্ষে চীনের আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত সৈন্যসংখ্যা মাত্র ৬০,০০০ ষাট হাজার।

বাণিজ্য পোতে প্রতিদ্বন্দ্বীতা

নৌশক্তি হ্রাস করিবার জন্য ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ যেমন শত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, সওদাগরী জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যেও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা দিন দিন বেশ মারাত্মক ভাবেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্স একখানি ৭৩,০০০ টনের অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করাইতেছে। জার্ম্মানি ও ইটালী ৫০০০০ টন ভারবাহী কয়খানি জাহাজের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ করিয়া আনিল। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাহাজ মাজেষ্টী ৫৬০০০ টন এবং আমেরিকার লেভিয়াথান ৫৪,০০০ টন। ফ্রান্স সর্ব্বাগ্রেই ইংরাজকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিল বলিয়া মনে হইতেছে।

স্বরাজের প্রতিবন্ধকতা

মহাত্মাজী নাকি বলিয়াছেন যে বিলাতের মন্ত্রী সমাজ হমবগ্ নন্, ভারতকে স্বাবলম্বী করিয়া দিতে তাঁহারা ইচ্ছুক তবে কতকগুলি প্রতিবন্ধক তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যকরী হইতে দিতেছে না। প্রতিবন্ধক গুলি যে কি মহাত্মাজী তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও আমাদের মনে হয় ভারতে ইংরাজদের ব্যবসা বাণিজ্য ও মুসলমানদের স্বার্থ এই দুইটাই অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে বিলাতী ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এবং তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা মন্দ হইবে একথাও সত্য। কংগ্রেসকে এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে ইংরাজদের স্বার্থ বজায় যাহাতে রাখিতে পারা যায় তাহার জন্য দেশী ও বিলাতী অর্থবিৎ পণ্ডিতগণকে লইয়া একটা সভা আহ্বান করিলে মন্দ কি হইত? মুসলমানগণের ন্যায্য দাবী দাওয়া মানিয়া লইয়া উহাদের সহিত একটা আপোষ করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই সবল হইতে পারিতাম। স্বার্থ বলি দিবার সময় আসিয়াছে, জাতীয় ঐক্যের জন্য হিন্দুগণও ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত নহে ইহাও যেমন দেখাইতে হইবে, মুসলমানেরাও ভারতীয় এই ভাবেই তাহাদেরও অগ্রসর হইয়া জাতীয় মঙ্গল তথা ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে হইবে।

মালব্য-জয়ন্তী

ভারত গৌরব পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সপ্ততিতম বর্ষ-আগম উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় দেশমান্য ব্যক্তিগণ পণ্ডিতজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছিলেন। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় সংগঠনের অন্যতম শ্রেষ্ট নায়ক পণ্ডিত মদনমোহন দীর্ঘজীবি হইয়া দেশচালনা করুন—দেশকে তাঁহার আশানুরূপ উন্নত দেখিয়া যান ভগবানের কাছে ইহাই কামনা করি।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্র জয়ন্তী হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধা অঞ্জলি দিয়াছেন। সমগ্র সহর রবীন্দ্র-জয়ন্তী ও মেলার বিজ্ঞাপনে কবির প্রতিকৃতি দিয়া মুড়িয়া ফেলা হইয়াছিল। কবি সম্রাটের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের প্রতিকৃতিও সহরের দেওাল ছাইয়া ফেলিয়াছিল—অবশ্য অন্য কারণে—শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনার বায়স্কোপ অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে। নাচ গান অভিনয়ে মেলা অনেকদিন স্থায়ী হইয়াছিল। খবরের কাগজে কলম কলম রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল—প্রেসের বিল (নানা রং বেরঙের বিজ্ঞাপনে) ও অপরাপর সরঞ্জামি খরচা এই জয়ন্তীতে অনেকই হইয়াছে, বাহির হইতে অনুমান হয়—আধুনিক যুগের জোর প্রচারের ইহা নমুনা বটে—আর কবি নিজেই বলিয়াছেন—মেলা উৎসবের অপরিহার্য্য সঙ্গ বটে।

মালব্য-জয়ন্তী

"পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার অক্লান্ত দেশসেবা, অসাধারণ স্বদেশপ্রীতি, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে দেশবাসীর উন্নতি সাধনের চেষ্টা ইত্যাদি জনহিতকর কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দের এই সভা, পণ্ডিতজীকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন এবং এই সভা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি যেন পণ্ডিত মালব্যকে দীর্ঘজীবী করিয়া আরও বহুদিন স্বদেশের কল্যাণসাধনের সুযোগ প্রদান করেন।" এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব সিনেটহলের বিরাট জনসভায় গৃহীত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে বেতার যন্ত্রে প্রেরিত নিম্নলিখিত বাণীটি পঠিত হয়। "পিলসনা" জাহাজ হইতে মহাত্মাজী জানাইয়াছেন—

"মালব্য জয়ন্তী উপলক্ষে আমি আমার বিনীত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"

সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "অদ্যকার সভায় সভাপতিত্ব করিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। এরূপ মহতী সভার সভাপতিত্ব করিবার কি গুণ আমার আছে তাহা জানি না। তবে একটা কথা আজ আমার মনে হইতেছে। আর তিন মাস পরেই আমিও ৭০ বৎসরে উপনীত হইব। বোধ হয় একথা স্মরণ করিয়াই আমাকে সভাপতির পদে বরণ করা হইয়াছে।

মালব্যজী একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমার মনে হয়, আত্মসংযম ও স্বার্থত্যাগের দিক হইতে বিচার করিলে মহাত্মা গান্ধীর পরেই তাঁহাকে স্থান দিতে হয়। ১৮৯৭ সালে সর্ব্বপ্রথম আমি তাঁহার বক্তৃতা শুনিলাম। সেবারে বীডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। তদবধি আমি সশ্রদ্ধ আগ্রহে তাঁহার কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। এই উপলক্ষে পণ্ডিত মালব্যের ওজস্বিনী বক্তৃতা—হিন্দু শিক্ষা ও সভ্যতার যে আদর্শ, তাহার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। এই শ্রদ্ধাস্পদ দেশনায়কের সংস্পর্শে আসিবার আরও সুযোগ আমার হইয়াছিল। আমি বহুদিন পর্য্যন্ত কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি অধ্যাপক ছিলাম। আমি তাঁহার রাজনীতিও অনুধাবন করিয়াছি। মিঃ গোখলে বলিতেন, রাজনীতি অবসরের আমোদ নহে। এদেশে যাঁহারা রাজনীতি চর্চ্চায় অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদিগকে অনন্যমনা হইয়া কাজ করিতে হইবে। পণ্ডিত মালব্য তাহাই করিতেছেন। তিনি স্বেচ্ছায় নানা নির্য্যাতন বরণ করিয়াছেন; তথাপি নিজের আদর্শ হইতে একটুও বিচলিত হন নাই জাতির উন্নতিকল্পে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসীর ন্যায় রাজনীতি-চর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহার আদর্শ সকলকেই প্রেরণা দান করিবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ হাসান সুরাবর্দ্দি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে আমি তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। আমি এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভাইসচ্যান্সেলার। জনৈক আদর্শ হিন্দুকে অভিনন্দিত করিবার এই সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। এক সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহার সংগঠনী শক্তি অসীম। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার প্রতিভার কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি কেবল রাজনৈতিক নহেন, জাতি-গঠনের কার্য্যে তাঁহার দানও নিতান্ত কম নহে। আমি আশা করি, পণ্ডিত মালব্যের জীবনের যে আদর্শ তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজই গ্রহণ করিবে এবং এতদ্বারা হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে।"

স্যার সি, ভি, রমণ বলেন,—পণ্ডিত মালব্যকে এই যুগের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তাঁহার আদর্শ কেবল এদেশবাসীর মনের উপর নহে বিদেশীর মনেও অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি এক জন বিশিষ্ট সংস্কারক, অল্পদিন পূর্ব্বে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। হিন্দুর প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার কথা ইতিহাসে চিরকাল বর্ণিত থাকিবে। আজ আমরা কেবল তাঁহার বয়সের সম্মান করিতে আসি নাই, তাঁহার কার্য্যাবলীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেও আসিয়াছি। পণ্ডিত মালব্যজীর রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কারণ আমি কখনও কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারি নাই। তবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা আমি বহুবার শুনিয়াছি। আমি বলিতে পারি, এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা আর কোনও নেতা অথবা সমাজসংস্কারকের মুখে শুনি নাই। পণ্ডিত মালব্য যে একজন অসাধারণ বাগ্মী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি কেবল বক্তাই নহেন—তাহার ন্যায় কর্ম্মীও ভারতবর্ষে খুব বেশী নাই, জাতি গঠনের কার্য্যেও তাহার স্থান অসামান্য। আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৯ই পৌষ টাউন-হলে ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক চিত্র ও মেলা প্রদর্শনী উদ্বোধিত হইয়াছিল।

উদ্বোধনের সময় ত্রিপুরার মহারাজা নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন :—

মহাশয়গণ,

আপনারা আমাকে এই মহাযজ্ঞের হোতৃপদে বরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎপূজ্য বিশ্বকবির সংবর্দ্ধনায় কোনো অংশের নেতৃত্ব করিতে আমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্কোচ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তথাপি কবির সহিত ত্রিপুরারাজ-পরিবারের যে চিরপ্রীতির সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে তাহাই আজ আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। পূর্ণ গৌরব মণ্ডিত রবির ভাস্বর দীপ্তির ঐশ্বর্য্যে জগতের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের প্রতি আজ আমার লক্ষ্য নাই। আমি আপনাদিগের আহ্বানে আমার পিতামহ প্রপিতামহের স্নেহপরায়ণ বন্ধু—আমাদিগের বিশ্বজয়ী অন্তরঙ্গের জয়ন্তী-উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত মনে করিতেছি। দরিদ্র সুদামা ব্রাহ্মণের সাহসে আজ আমি বলীয়ান।

বিধাতার বিধানে ত্রিপুরা রাজপরিবার চিরকালই কলাসৌন্দর্য্যসেবী। তাই শুভক্ষণে উদীয়মান রবির তরুণ সৌন্দর্য্যের ছটায় আমার প্রপিতামহ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অবধি কবিবরের সহিত আমাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ। পিতামহ রাধাকিশোর মাণিক্য তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন এবং পিতৃদেব বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

শিল্পপ্রিয় ত্রিপুরা বংশের উপর কবির প্রভাব সামান্য নহে। পক্ষান্তরে গিরিনির্ঝরিণী শোভিতা, বনপুষ্পভূষিতা, শ্যামলা পার্ব্বতী ত্রিপুরার স্বভাবসৌন্দর্য্য যে বিস্ময়াপিক্য প্রমুখ আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চ্চা, সঙ্গীত নৃত্যকলা, চিত্র ও বয়নশিল্প মহাকবিকেও আকৃষ্ট করিয়াছে ; ইহাতে ত্রিপুরাবাসীমাত্রেই গৌরবান্বিত।

আপনারা ক্ষমা করিবেন ; আমি স্বার্থপরের ন্যায় মহাকবির সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধেরই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "বাঙ্গলার কবি—ভারতের কবি—বিশ্বকবি"—আমি তাঁহাকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি।

তথাপি একথা কোনমতেই ভুলিলে চলিবে না যে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মক্ষেত্র কেবলমাত্র সাহিত্যজগতেই আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উদাত্ত স্বরে বাজিয়া উঠিতেছে ; কিন্তু সেখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের চরিতার্থতার জন্ত তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ; সামান্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনও তাঁহার নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে ; শান্তিতে শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া যাহাতে উহা অখণ্ড বিশ্বজীবনের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট না হয়,—উপদেশের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা নিজের জীবনব্যাপী কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সর্ব্বদাই তিনি এই আদর্শকে আপামরসাধারণ সকলের সমক্ষেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই জন্তই শিল্পকলাকে কোনদিনই তিনি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞের উপভোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই ; নিজের দেশের "শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখিবার শিক্ষা" আমরা তাঁহারই নিকট পাইয়াছি ; তাঁহারই নিকট দীক্ষা পাইয়া "শিল্পসৌন্দর্য্যের দিব্য নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদিগের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।" এবিষয়েও ত্রিপুরাবাসীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেন না, দেশীয় শিল্পকলাসম্বন্ধীয় তাঁহার সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ "দেশীয় রাজ্য" প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে আগরতলার ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত হয়। আজ একদিকে যেমন গীতাঞ্জলীর করুণ সুরের ঝঙ্কার আমাদিগের বৈষ্ণব পরিবারের প্রাণে অহরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ "দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধের মহতী উপদেশবাণী রাজ্যপরিচালনাকে "সৌন্দর্য্য এবং কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্বল" করিয়া তুলিবার বিষয়ে দিব্য ইঙ্গিতের নির্দ্দেশে আমাদিগকে ধন্য করিতেছে।

আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদের সময় লইতে চাই না। আসুন, আজ মহাকবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে আমরা সমবেতভাবে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার বরপুত্রকে সুদীর্ঘ জীবন প্রদান করিয়া তাঁহার মুখে স্বীয় অভয়-বাণী বিশ্বময় প্রচার করিতে থাকুন।

কবিবরের আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমি এক্ষণে এই শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইতি, ৯ই পৌষ, ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ।

রবীন্দ্রনাথের উত্তর

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য বেশ ভগ্ন হইয়াছে দেখা যাইতেছিল। তিনি অভিনন্দনের উত্তরে বলেন যে, তিনি জয়ন্তীর কোন খোঁজখবর রাখিতেন না, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজাকে এ অনুষ্ঠানে আহ্বান করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত সুখী হন এবং ঐ পরিবার সম্পর্কে তাঁহার দুইটী বাল্য-স্মৃতির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, অল্পবয়সে যখন তিনি মাসিকপত্রে লিখিতেন, সেই সময় হঠাৎ একদিন বর্ত্তমান মহারাজার প্রপিতামহের নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন যে, তাঁহার লেখা পড়িয়া মহারাজা খুব সুখী হইয়াছেন। কবিকে তখন মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কার্সিয়াংয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকাল হইতেই মহারাজা কেবল যে, তাঁহার বন্ধুরূপে পরিগণিত হন তাহা নহে, পরন্তু সঙ্গীত চিত্র প্রভৃতি চারুকলায় তিনি মহারাজা কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হন। স্বর্গীয় মহারাজা ঐ সমস্ত চারু-কলায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তারপর বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহ কেবল যে তাঁহার বন্ধু ছিলেন, এমন নহে, পরন্তু তিনি রাজ্যসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে কবির পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কবিও সাধ্যানুযায়ী যুক্তিযুক্ত পরামর্শ দিতেন, কারণ, তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, এই দেশীয় রাজ্যটীকে একটি আদর্শ রাজ্যে পরিণত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহারা তাঁহাদের এই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার সুযোগ পাইলেন না।

কবি বলেন যে, প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গই সঙ্গীত, চিত্র ইত্যাদি চারুকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু যদিও বর্ত্তমানে দেশীয় নৃপতিদের

সমস্ত বিষয়ে অনুরাগ অনেকটা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইলেও ত্রিপুরা রাজপরিবারে ঐ সমস্ত কলাবিদ্যার অনুরাগ এখনও রহিয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেন যে, এই রাজপরিবারের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের সখ্যতা বর্তমান থাকায় ত্রিপুরার মহারাজ মুখপাত্র হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন বলিয়া তিনি সমধিক আনন্দিত হইয়াছেন এবং প্রার্থনা করেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য যেন একটি আদর্শ রাজ্যে পরিণত হয়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে টাউন হলে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শরৎচন্দ্র বলেন :—

কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো। বিধাতার এই আশীর্ব্বাদ শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য করেছে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল কোরে আমরা উত্তর কালের জন্য রেখে যেতে চাই এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু তাদের দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যেই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কাণে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেচে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।

সেই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ আজকের এই সাহিত্য-সভা। সাহিত্যের সম্মিলন আরও অনেক বসবে, আয়োজন-প্রয়োজনে তাদের গৌরবও কম হবে না, কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তারা পাবে না। এ'ত সচরাচরের নয়, এ বিশেষ এক দিনের, তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আসরে সভা-নায়কের কাজ আরও করবার ডাক ইতিপূর্ব্বে আমার এসেছে, আহ্বান উপেক্ষা করতে পারি নি, নিজের অযোগ্যতা স্মরণ ক'রেও সসঙ্কোচে কর্ত্তব্য সমাপন করে এসেচি কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আজ লজ্জা বোধ করচি। আমি নিঃসংশয় যে, এ গৌরব আমার প্রাপ্য নয়, এ ভার বহনে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয়বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা।

তথাপি আমন্ত্রণ অস্বীকার করিনি। কেন যে করিনি আমি সেই টুকুই শুধু ব্যক্ত কোরব।

আমি জানি বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালো মন্দ বিচার, এর জাতিকুল নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে এ পরিষদ আহূত হয়নি,—তার প্রয়োজন যথাস্থানে—আমরা সমবেত হয়েছি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিতে। তাঁকে সহজভাবে বলতে—কবি তুমি অনেক দিয়েছো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সরল, সর্ব্ব-সিদ্ধি-দায়িনী ভাষা দিয়েছো তুমি, দিয়েছো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছো অনুরূপ সাহিত্য, দিয়েছো জগতের কাছে বাংলার ভাষা ও ভাবসম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছো যা' সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েছো বড় ক'রে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। প্রজ্ঞাবান যাঁরা যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা করবেন, কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি সেই কথাটাই ছোট ক'রে জানাবো বলে' এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

ভাষার কারুকার্য্য আমার নাই। ওতে যে পরিমাণ বিদ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজন, সে আমি পাইনি, তাই মনের ভাব প্রচলিত সহজ কথায় বলাই আমার অভ্যাস—এবং এমনি কোরেই বল'তে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্গ্রহ এসে বিঘ্ন ঘটালে। একে আমি বিখ্যাত কুঁড়ে তাতে বায়ু-পিত্ত-কফ আদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চক্রের দল একযোগে কুপিত হয়ে আমাকে শয্যাশায়ী ক'রে দিলে। এমন ভরসা ছিল না যে, নড়তে পারবো। কিন্তু একটা বিপদ এই যে, চিরকাল দেখে আসচি আমার অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করে না, যেন ও আমার হ'তে নাই। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সবাই ঘাড় নেড়ে স্মিতহাস্যে বলচেন, উনি আসবেন না তো? এ আমরা জানতাম। সেই বাক্যবাণের ভয়েই আমি কোনমতে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন দেখছি ভালই করেছি। এই না আসতে পারার দুঃখ আমার আমরণ ঘুচত না। কিন্তু, যা লিখে আনবার ইচ্ছে ছিল, সে হয়ে উঠেনি। একটা কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি, তার চেয়েও বড় কৈফিয়ৎ আছে। মানুষের অজস্র পাওয়ার কথাই মনে থাকে, তাই লিখতে গিয়ে দেখলাম কবির কাছ থেকে হিসেব দিতে যাওয়া বৃথা। দফাওয়ারির ফর্দ্দ মেলে না।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে। বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাকরেদী করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন গামছা-কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশযাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে, নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে, অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন। সেখানে আর একদফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর, আবার বোধোদয়-পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাকরেদী সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশযাত্রা—আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা। এমনি বোধোদয়, পদ্যপাঠে বাল্য জীবনের এক অধ্যায় শেষ হ'ল। এলাম সহরে। একমাত্র বোধোদয়ের নজীরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি করেছিলেন ছাত্র-বৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিক সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং সসঙ্কোচে বলা চলে যে সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চখের জলে। তারপর বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর; সঙ্গীত অস্পৃশ্য। সেখানে সবাই চায় পাশ করতে এবং উকীল হ'তে। এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে, তিনি

এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় করে তিনি একদিন পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ।" কে কতক বুঝলে জানিনে কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর-আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাহিরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম সত্য পরিচয়। এরপরে এবাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম সংযম আর ধাতে সইল না, আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরানো পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা।" আর বেরোলো "ভবানী পাঠক।" গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্যতো নয়, ওগুলো বদ্-ছেলের অ-পাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই কোরে নিতে হোলো আমার বাড়ীর গোয়াল ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সে গুলো কারা পড়ে জানিনে। এক ইস্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হোল সহরে। বলা বাহুল্য এর পরে আর ইস্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপর এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্চে। ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সে দিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়; এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি, এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনও দিন লিখেছি; দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে যে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো, আমি তার কোনও খবরই জানিনে, কবির সঙ্গে কোনও দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু, অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথা সাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ঐ কখানা বই বার বার ক'রে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কিনা—এসব বড়কথা কখোনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এই-টুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কি কাব্যে কি কথা সাহিত্যে আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ— শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম—ভয়ের কথা মনেই হলো না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তাতে ভুল যদি থাকে তো থাক, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হয়ে আছে।

জানি রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনায় এ সকল অবান্তর, হয়তো বা অর্থহীন, কিন্তু গোড়াতেই আমি বলেছি যে, আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত, আমি এসেছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোটা কয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসব সভায় নিবেদন ক'রে দিতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যে ভাবে লাভ করেছি, তা' জানালাম, মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেছি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেন নি, তার একটা হেতু এই দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরও বলেছিলেন যে, তোমরা যদি এ কাজ কর, কখনো ভু'লো না যে, অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি সাহিত্য বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখত।

কিন্তু এই সভার অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি, আর না। অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করার এই দণ্ড। এ আপনাদের সইতেই হবে। সে যাই হউক, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত। তাই সকৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদিগকে নমস্কার জানাই।

আচার্য্য রাধাকৃষ্ণের অভিভাষণ

কবির মহৎ কার্য্য ও অসীম প্রভাবের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। জীবনের মাধুর্য্য ও মানব সভ্যতায় তাঁহার প্রচুর দান। আমাদের অনেকের জীবন যখন সংশয় ও সন্দেহে দুর্ব্বহ, যখন বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে এবং যখন রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমাদের গতি

প্রতিহত হইতেছে, সেই সময় তিনি উদ্দীপনাময়ী বাণী দিয়া আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন যে, অর্থসম্পদ বা জড় জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করাই সভ্যতার মাপকাঠি নয়, পরন্তু সত্য ও প্রেম বিতরণ দ্বারা সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

শরীর বা মনকে মানুষ ধরিয়া লইলে চলিবে না। আরও এমন কিছু আছে যাহা বুদ্ধির অতীত—সেটা মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মা—যাহা সর্ব্বভূতের সহিত এক বা যাহা নিজেই সত্যং শিবং সুন্দরম্।

যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, প্রতীচ্য সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে, যুক্তিতর্ক ও বস্তুতন্ত্রের উপর; আর প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে অধ্যাত্মবাদের উপর। সক্রেটিস হইতে রাসেল পর্য্যন্ত সকলেই তর্কশাস্ত্রের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন।

ধরিয়া লওয়া যাউক যে, আমরা ইউটোপিয়ার অধিবাসী সেখানে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি নাই, দারিদ্র্য নাই—সকলেই উত্তম বাড়ীতে বাস করে, খাওয়া-পরার কোন কষ্ট নাই। ইহাই কি আমাদিগকে সুখ দিতে পারে? না। আমাদের ভিতর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অপূরণীয় কামনা সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। মানবাত্মা সর্ব্বদা এমন একটা কিছু চায়, যাহা এই বাহ্যজগৎ দিতে পারে না—যখনই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষ প্রতিদিন মরিতেছে, মানুষ নিরাশার দহনে জলিয়া যাইতেছে, ভালবাসা পদদলিত হইতেছে, সরলতা প্রতারিত হইতেছে—তখনই মনে এ সমস্ত বিষয়ের সমাধানের জন্য শত সহস্র প্রশ্ন জাগিয়া উঠে; তখন বিজ্ঞান, যুক্তিতর্ক বা বস্তুতান্ত্রিকতা ইহার উত্তর দিতে পারে না। আমরা আরও কিছু ভিতরের জিনিষ চাই—আমরা চাই এমন কিছু যাহা অন্তরাত্মাকে সুখী করিতে পারে। আজ হয়ত অনেকেই সুখস্বচ্ছন্দে আছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা অন্তরে বিরাট শূন্যতাই অনুভব করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া এই অন্তর্দৃষ্টিই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক অধিকাংশ সাহিত্যেই ভাব ও প্রেরণার অভাবই দৃষ্ট হইতেছে। বার্ণার্ড'শ এবং এইচ্ জি, ওয়েলসের লেখা বেশ উপদেশপ্রদ, মনোজ্ঞ, চিত্তাকর্ষক ও প্রতিভার পরিচায়ক কিন্তু ঐ সমস্ত লেখা আমাদের মনের অন্তস্থলে মোটেই ঘা দেয় না। রবার্ট ব্রীজের 'টেষ্টামেণ্ট অব বিউটী' দার্শনিকতত্ত্বের উচ্চাঙ্গের বিশদ ব্যাখ্যা কিন্তু উহাও মরমের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ভাবের ঘরে লুকোচুরি করিলে চলে না। নিজের অন্তর্দৃষ্টি না হইলে, অন্যকে অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ এমন দেশের লোক যে, দেশের লোকেরা বংশ-পরম্পরা এমন একটা অধ্যাত্ম-প্রেরণার ধারা রাখিয়া গিয়াছেন যাহার ফলে আজ আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছি। তাঁহার লেখার ভিতর এমন একটা শাশ্বতের প্রেরণা রহিয়াছে, এমন একটী অন্তর্দৃষ্টি রহিয়াছে যাঁহার ফলে আমাদিগকে বাস্তবজগৎ হইতে গভীর সত্যের সন্ধানে লইয়া যায়। তাঁহার লেখা যে কেবল আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ফুটাইয়া দেয় এমন নহে, পরন্তু ইহলোকেই পরলোকের একটা সন্ধান দেয়। জগৎটা মায়াময় বলিলে চলিবে না—এই জগতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাটকে একটি বালিকার চরিত্র অঙ্কন করিয়া একটী সন্ন্যাসীকে ইহাই উপলব্ধি করাইয়াছেন যে, স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন পাশ ছিন্ন করিলেই যে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয় তাহা নহে, কিন্তু পার্থিব অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেই উহা পাওয়া যায়—সসীমের ভিতরই অসীমকে লাভ করা যায়।

তিনি নিজে অনুভূতির উচ্চস্তরে উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়াই সামাজিক বিধানের নামে যে সমস্ত ভণ্ডামি ও দুর্নীতি চলিয়াছে, তিনি তাহার বিরোধী। মানব জীবন আইনের গণ্ডীর বহু উপরে—সেইরূপ সৌন্দর্য্য শৃঙ্খলার উপরে এবং সত্য সামঞ্জস্যের উপরে। যে আত্মার অন্তর্দৃষ্টি ঘটিয়াছে, সেই আত্মা বিশ্বমানবকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা প্রেম দ্বারা সকলকে জয় করে,—শত্রুকে বশীভূত করে, দুষ্টকে দমন করে এবং পাপীকে উদ্ধার করে। কবির সমস্ত লেখার ভিতর দিয়া এই তিনটী সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে:—আত্মার অন্তর্দৃষ্টি, যথার্থ বৈরাগ্য এবং প্রেম ও দয়ার পরিপূর্ণতা। তাঁহার আদর্শ হইতেছে—বহুর ভিতর একের দর্শন। এই আদর্শ লাভ করিতে যাইয়া নিজেকে একেবারে বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না, পরন্তু আত্মোন্নতি লাভ করিতে হইবে।

ডাঃ আরকোহার্ট

স্কটীশচার্চ্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ আরকোহার্ট বক্তৃতাপ্রদান-কালে বলেন যে, যদিও তাঁহার নাম কার্য্য-তালিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি তাঁহাকে যে "রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় ধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে হইবে, এই বিষয়ে এমন কি একখানি পোষ্টকার্ড দ্বারাও তাঁহাকে জানান হয় নাই। শনিবার প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে এই মহতী ও বিদ্বজ্জনপূর্ণ সভার অন্যতম বক্তারূপে তাঁহার নাম দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন। সুতরাং অতীব দুঃখের সহিত তাঁহাকে জানাইতে হইতেছে যে, তিনি যথোচিতভাবে তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইবেন না। যাহা হউক, মহা-কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের সুযোগ পাইয়া তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। যদিও তিনি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ভারতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। কবির অতুলনীয় কাব্য ও সাহিত্য সমগ্র জগতকে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার পথে কতখানি সাহায্য করিয়াছে বক্তা তাহা বিবৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রবীন্দ্রনাথ কোন স্থানবিশেষের কবি নহেন, পরন্তু তিনি সমগ্র জগতের কবি। সমগ্র জগত তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। অতঃপর বক্তা বলেন যে, পার্থিব দুঃখকষ্ট ভোগের পর মানুষ কি করিয়া ভাগবত আনন্দলাভ করিতে পারে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রত্যেকটি লাইন হইতে তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় এবং এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানব জাতির হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।

নিকষ পাথর

ভারতবর্ষ—পৌষ—১৩৩৮

শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁহার একটী কবিতাদ্বারা এ সংখ্যাখানি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। কবিতাটি "প্রিয়তমার" উদ্দেশ্যে রচিত এবং এই প্রিয়তমাটি যে বিশ্বের নয় একান্ত তাঁহারই, একথা কবিতাটি পাঠেই বোধগম্য হইবে। তাঁহার প্রিয়া কিরূপ এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া কবি অধুনা কি অবস্থায় কাল যাপন করিতেছেন, সম্ভবতঃ তাহাই সকলকে জানাই-বার উদ্দেশ্যে কবিতাটি ছাপানো হইয়াছে। একখানা বড় কাগজ হাতে থাকিলে অনেক সুবিধা। কবিতাটি বড় রসাল। নানা কথার পর কবি এক যায়গায় বলিতেছেন—

"মরু-বক্ষ সিক্ত করি বহায়েছো অশ্রু-বিন্দু-লতা
নির্ঝরিণী সমা।"

অর্থাৎ তুমি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছ। কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, একথার তাৎপর্য্য? তাৎপর্য্য যে কি, সে কথা চট্ করিয়া বলা যায় না। কেননা তাৎপর্য্য থাকে তলায়। তবে একথা বোঝা যায়, কবির মরু-বক্ষ সিক্ত করিতে অশ্রুজল নাই, সাদা জলে তাহা ভিজে না। এবং বক্ষ তিনি সিক্তই করিতে চাহেন, শীতল করিতে নয়।

তারপর—

"তোমার গতির লীলা দোলা দেয় সর্ব্ব অঙ্গে মোর
যৌবনের তরঙ্গ আবেগে;"

*　*　*

"তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে সৃজনের আনন্দ হিল্লোল" এই কলি তিনটি আদি-রসাত্মক,—ঘন রসে ভর ভর। ঘাটিতে ভরসা পাই না।

পরিশেষে কবি বলিতেছেন—

"ঘুচায়ে দিয়েছো দেবী আমার নিকট তম হয়ে
বিরহের অমা"

কবি প্রিয়া যে মনোমত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া আমরা সকলেই অতীব সুখী। এমন ভাগ্য আর কয় জনেরই বা হয়?

কিন্তু ওদিকে কবিপ্রিয়া "রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের" জন্ত যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, তাহার পরিশেষে বলিতেছেন—

"আমার প্রণতি-অর্ঘ্য—তোমার প্রতিভা-মুগ্ধ প্রাণ
নিবেদিনু উৎসবের ক্ষণে।"

ইহা যে বিষম সর্ব্বনাশের কথা! প্রাণ যদি তিনি এ ভাবে সর্ব্বজন সমক্ষে রবীন্দ্রোৎসবের ক্ষণে নিবেদন করেন তো কবির দশা হইবে কি?

কবিতাটির একটী কলিতে বলা হইতেছে "আনিয়াছি প্রীতি-অবলেহ।"

"অবলেহ" শব্দটির আভিধানিক অর্থ "চাটিয়া খাইবার ঔষধ।" অবশ্য ঔষধ হিসাবে "কোন কিছুতেই" দোষ নাই। শ্রীরাধারাণী দেবী যদি রবীন্দ্রনাথকে সেই ভাবেই ইহা নিবেদন করিয়া থাকেন তো আমাদের কি?

আর এক যায়গায় দেখা যায়, "বেলাহীন বালুচরে!" পদ্মার বালুচর শ্রীরাধারাণী দেবী চাক্ষুষ দেখিয়াছেন কি? তাহা বেলাহীন নয়, বিরাট, তাহাও কদাচিৎ।

ইহার পরই আবার "আসে নেমে স্বপ্ন-শুভ্র ভোর।" "স্বপ্ন-শুভ্র" ভোরটি কেমন? স্বপ্নের মত শুভ্র? শ্বেত স্বপ্ন কখন দেখি নাই, কাজেই শুভ্র ভোর বুঝিতেও পারিলাম না। পদ্মার ঠিক এপারে বা ওপারে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা হয়ত বলিলেও বলিতে পারেন।

তারপর "অন্তর-নিতলে মোর—"ইঃ। নিতল—Depth নাকি? অর্থাৎ শ্রীরাধারাণী দেবী বলিতে চাহেন In the depth of my heart! শুনিলাম, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার অভি-ধানের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে কয়েক হাজার নূতন শব্দও থাকিবে। সেগুলির মধ্যে ঐসব এবং শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের ব্যবহৃত ও উদ্ভাবিত নিয়ে উদ্ভূত শব্দগুলিকেও তিনি স্থান দিবেন তো?

কিন্তু ঐ সকল দোষ সত্ত্বেও কবিতাটি মোটের উপর ভালই।

শ্রীদিলীপ কুমার রায় রচনা করিয়াছেন "ত্রিযামার দিগ্বিজয়।" ব্যাপারটা যেমনি ভয়াবহ, কবিতাটি পাঠ করিতেও তেমনি দুঃসাহসের দরকার। আমরা প্রাণ হাতে করিয়া কবিতাটি পাঠ করিয়াছি এবং কতকগুলি নূতন শব্দ, সমাস প্রভৃতির স'হত পরিচয় ঘটিয়াছে। তাহার দুই চারিটিকে নিম্নে ছাড়িয়া দিলাম :—

"১ নম্বর—নিস্তল নয়ন যাঁর" (অর্থাৎ তলহীন নয়ন যাঁর। এ কথা লিখিয়াছেন কে? "দুস্তর মগধ যাঁর" তিনি। ২ নম্বর—"হৃদয়ে বিক্লব লুটে।" বিক্লব—জড়তা। অর্থাৎ হৃদয়ে জড়তা লুটাইতেছে। পরের কবিতায় "দুস্তর মগজ যাঁর" তিনি লিখিবেন "হৃদয়ের মাঝে মোর স্ফূর্ত্তি" গড়ায়।"

৩ নম্বর—"প্রান্তের বৈদূর্য্য-তূর্য্য সায়াহ্নে অনচ্ছ কেন?" এই ছত্রটি পাঠ করিয়াই আমাদের ভূতনাথ ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—"দাদা গো!" কিন্তু সান্ত্বনা বাক্যে চোখের জল মুছিয়া কটিতটে ধটি আঁটিয়া আমাদের সহিত ইহার অর্থ বাহির করিতে লাগিয়া যায়। কিন্তু বলিতে কি, সে ছত্রটীর অর্থ আমরা বাহির করিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ অর্থ বুঝাইবার জন্য লেখাও হয় নাই;—ছাপানো লইয়া কথা। ৪ নম্বর—"দিশারীর আঁখি।" "দিশারী" শব্দটি বোধ করি পন্দিচেরী-জাত। বাঙ্গলাভাষার অভিধানে তো নাই-ও,

৫ নম্বর—"শ্রীহীন জয়ে।" ৬ নম্বর—"কুহেলি-মঞ্জীরে," (ইহার পর শোনা যাইবে "ধোঁয়ার নূপুর" বাজে কবির চরণে।) ৭ নম্বর—"স্বপ্ন-দলে" (যেমন শতদলে; বোঁটাটি কিন্তু ঠেকিয়া আছে সেই পন্দিচেরীতে)

"ভঙ্গিমা মুখরা"—ভঙ্গিমায় মুখরা, শব্দে নয়। ইহার পর আরও আছে। কিন্তু আমাদের ভূতনাথ দিলীপকুমারের "মগ্নবীণের" মতই হঠাৎ মগ্ন চৈতন্য হইয়া পড়ায় আমরা নিরস্ত হইলাম।

পরিশেষে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সানুনয় নিবেদন দিলীপবাবু না হয় কিস্কিন্ধ্যাপারে বসিয়া বঙ্গভাষার সপিণ্ডীকরণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা তো প্রবীণ। ছাপাইবার পূর্ব্বে সাহসে ভর করিয়া কবিতাটা আগাগোড়া পাঠ করিলে এমন আবর্জ্জনা অমন নাম-জাদা লোকের নাম-জাদা কাগজে স্থান পাইত না।

এ সংখ্যায় ছোটগল্প আছে চারটি। প্রথম গল্প শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "বদ্‌লি মজুর।" গল্পটির প্রথম অংশ বেশ লাগে। তারপরই তরল ও খাপছাড়া এবং জোর করিয়া বাড়ানো হইয়াছে মনে হয়। প্লট অতি মামুলি। পড়িতে পড়িতে অতি আধুনিক ও পুরাতন আরও দুই চারিটি দেশী ও বিলাতী গল্প মনে পড়িয়া যায়।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদারের "গল্প।" মজলিশ বিশেষে এ ধরণের গল্প জমে বেশ।

তৃতীয় গল্প শ্রীবুদ্ধদেব বসুর "আগন্তুক" মামুলী প্লট। চলনসই।

চতুর্থ গল্প শ্রীবিমল মিত্রের "গতিক।" গতিক দেখিয়া ভাল বোধ হইতেছে না।

"পুরাণ ঝি * * আসিয়াছিল দশ বছর বয়সে—এখন হইয়াছিল চব্বিশ পঁচিশ বছর।" একদিন হঠাৎ পলাইয়া যায়—তখন সে অন্তর্ব্বত্নী। যাইবার কালে পাড়ার মুখুজ্জ্যে গিন্নীর কাছে বলে,"রাত্তির বেলা মেজদাদা আমারই ঘরে।" অপবাদটা অবশ্য মিথ্যা। এই ঝিটি আবার কয়েক মাস পরে ফিরিয়া আসে। "দাদা খবর পাইয়া একটি লাঠি দিয়া মারিতে উদ্যত হইয়া বলিল,—বেরো হারামজাদী—বেরো—এখুনি বেরো!"

"মা বাহিরে চীৎকার শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন।"

"বকিলেন * * অমন একটু আধটু দোষ সকলেই করে —" করে নাকি? কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটুকু কাহার? একটা শব্দ পাওয়া গেল—"লজ্জাস্কর" এ ভুলটি ছাপাখানার মামদোর কি? লিখিয়া কেহ কেহ হয় Notorious. এই দিক দিয়া এ ধরণের গল্প রচনার সার্থকতা আছে।

এ সংখ্যায় রঙীন্ ছবি আছে চারখানি। প্রথম ছবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। দ্বিতীয় ছবি শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "বুদ্ধের বৈরাগ্য।" বুদ্ধ তরবারির দ্বারা স্বীয় কেশ কর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার প্রিয় ভৃত্য ছন্দক বৃক্ষগাত্রে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতেছে। তৃতীয় ছবি শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্যের "সোণালি সুতা।" মন্দ নয়। চতুর্থ ছবি শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডলের "বন্ধুর পথে।" বেশ।

বসুমতী—অগ্রহায়ণ—১৩৩৮

প্রথমেই চোখে পড়িল "কলিকাতা ভ্রমণ।" তাজ্জব কাণ্ড! পাতা উল্টাইয়া দেখি, লিখিয়াছেন শ্রীকলমবাজ কালিরত্ন। আসল লোকটিকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না; সহুরে লোকের মুখে গ্রাম্য মুখোস্ কাপে কাপে বসে কি?

একটি গ্রাম্য ভদ্রলোক কলিকাতার সহর দেখিতে আসিয়াছিলেন, একজনের লেজে ভর করিয়া। তিনি যে ভাব ও ভাষায় ট্রামগাড়ী, ট্যাক্সী, রেডিও প্রভৃতির বর্ণনা করিতেছেন, তাহা পড়িয়া হাসি পায়।

রচনাটির উদ্দেশ্য ব্রড্কাষ্টিং কোংকে গালি দেওয়া। গালাগালিটা বেশ ঝাঁঝাঁনো রকমেই হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও যে ঐ ভৌতিক চক্রের স্বয়ম্ভু বিদ্যাদিগ্গজের দল purge out হইবেন, এমন তো আশা করা যায় না। কলমগজবাবুর খোঁচায় এইটুকু লাভ তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবে হইতে পারে যে কয়েকদিন ধরিয়া কোংর programme এ তাঁহার "স্বয়ম্বর" বা "বাগাড়ম্বর" থাকিবে, যাহার ঠেলায় কলিকাতা শুদ্ধ অস্থির। আর যে কোন এক রবিবারের Liberty বা Advance এ এক সাড়ে তিনগজি প্রবন্ধে দেখিব, এক রেডিও রস-ভোক্তা লিখিতেছেন—এত বড় বাংলা দেশে গল্পিদাদা, বিষ্ণুশর্ম্মা, সরস্বতী কুমার, বসু এবং কোঁথ পড়িয়া বাংলায় যিনি খবর বলেন তিনি অবাধ জুড়িহীন ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা এক একজন এক একটী Self evolved genious.

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে চারিটি। প্রথম গল্প শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "আসল-নকল"। গল্পের বিষয়বস্তু মামুলি প্রথমা স্ত্রীর কাছে স্বামী প্রেম নিবেদন করিয়া তাহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই আবার দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করে। তবে বক্ষ্যমান গল্পটির মধ্যে দুটী জিনিস নূতন আছে। প্রথমেটি শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ ব্যাপারে অশিক্ষিত ছোটলোকের তুলনা গল্পটিতে দেখা যায়। প্রেমময় মিত্র প্রথমার জীবদ্দশায় তাহার প্রতি নানাভাবে প্রেম নিবেদন করিয়াছে এমন কি ঝোঁকের মাথায় বলিয়াও ফেলিয়াছে যে তাহার মৃত্যুর পর সে আর কাহাকেও ভালবাসিবে না বা বিবাহ করিবে না। আর তাহার দোকানের চাকর গোবর্দ্ধন স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করা দূরে থাক, তাহার সহিত ঠিক ছোটলোকের মতই ঝগড়া করিত। কিন্তু উভয়ের স্ত্রীবিয়োগের পর দেখা গেল, প্রেমময় কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিল, অথচ গোবর্দ্ধন পারিল না।

দ্বিতীয়টি—প্রেমময়ের প্রথমা স্ত্রীর নাম—ঝিনুক। প্রেমময়ের নামও প্রেমময় না হইয়া "দুধের বাটি" হইলে ঝিনুকের সহিত বেশ মানাইত।

কিন্তু গল্পটির প্রথম ভাগে রস জমিয়াছে বেশ।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "ঐক্যতান।" রস জমে নাই; জোর করিয়া লেখা। মনে কোন ছাপ পড়ে না।

তৃতীয় গল্প শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী "সহধর্ম্মিনী" বেশ লাগিল।

চতুর্থ গল্প শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ বি-এল) এর "লঘু-প্রারম্ভে।" পরিশেষে ব্যাপারটা গুরুতম হইয়া উঠিয়াছে এবং এমনি অবস্থা ঘটাইতে লেখক বহু কাঠখড় পোড়াইয়াছেন। সুন্দরী শৈলর সহিত মোহিতের প্রথম আলাপ হইতে একেবারে নিবিড়তম সম্বন্ধ অবধি যে ঘটনাগুলি তিনি ঘটাইয়াছেন, সে গুলিতে কম কেরামতির দরকার হয় নাই।

মোহিত ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া দিন কয়েকের জন্য কাশিতে বায়ু সেবন করিতে যায়। একদিন পিতার নিকট হইতে তারে খবর পাইল, সে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। অমনি আনন্দে লম্ফ দিয়া সে "বাবা মার" ছবি দু'খানি "মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম করিল," ভাই-বোনদের ছবিগুলিকে "চুম খাইল।" তারপর আরও দু' একটী ছোট-খাট কাণ্ড ঘটাইল। পরিশেষে বন্ধু বিনয় আসিলে তাহার সহিত বাঙালীদের পক্ষে চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচ্ খেলিতে মাঠে ছুটিল। এবং পাস হওয়ার আনন্দে সে এমন খেলিল যে দর্শকরা একদম থ। সে বল লইয়া "সারা মাঠে চরকীর মত" ঘুরপাক দিয়া বেড়াইতে লাগিল। (উকীলবাবু ফুটবল খেলা দেখিয়াছেন তো? পল্লীগ্রামে ছেলেরা বাতাবী লেবু লইয়া ফুটবল খেলে। তাহা দেখিয়াই এ ধারণা নাকি?)

তারপর খেলা শেষে বিশেশ্বরের মন্দিরে গেল। (এইখান হইতে কেরামতি নম্বর ওয়ান শুরু।)

মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিয়া বাহির হইয়া সে আসিল অহল্যা-বাঈয়ের ঘাটে। (দশাশ্বমেধ ঘাটের জল অনেক পরেই ছল্ ছল্ করিতেছে—তাহা বড় পুরাতন।) সেখানে কিছুক্ষণ চুপ্ চাপ বসিয়া থাকিবার পর তাহার হঠাৎ নজর পড়িল, নিজের পায়ের দিকে। "একি?" তাহার পায়ে জরীর কাজ করা একজোড়া ভেলভেটের স্যাণ্ডাল কেন? আবার "গোড়ালির দিকে আধ আঙ্গুল" ছোটও দেখাইতেছে। "লেডীজ নয় ত?" (লেডীজ ও ল্যাডাজ স্যাণ্ডাল গোড়ালীর দিকে মাত্র আধ আঙ্গুলটাক্ ছোট-বড়।) সে আনন্দের আতিশয্যে মন্দিরের দরজা সেই লেডীজ স্যাণ্ডালের মধ্যেই পা দুখানা ঢুকাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। পথে একটুও অস্বস্তি বা অসুবিধা বোধ করে নাই। যাহা হউক, যাহার স্যাণ্ডাল তাহার সহিত সেখানেই মোহিতের কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা হইল। তারপর স্যাণ্ডাল প্রত্যর্পণ ও নগ্নপদে দুম্ দুম্ শব্দে প্রস্থান। স্যাণ্ডালের অধিকারিণীর নাম কুমারী শৈল।

আবার তাহার সহিত দেখা কলিকাতায় ফিরিবার পথে ট্রেণে (সেকেণ্ড ক্লাসে)। চলিতে চলিতে তাহাদের আলাপ পরিচয়, এবং চলন্তি গাড়ীতে ডাকাতের কবল হইতে সুন্দরী শৈলকে রক্ষা। ব্যাপারটা এইখান হইতেই গুরুতর হইতে সুরু করিল। তারপর ভিতরে ভিতরে ঘনীভূত হইতে হইতে কলিকাতায় গিয়া গুরুতম হইয়া উঠিল। শৈলর মাথায় গাড়ীর সেই ব্যাপারটা কুণ্ডলী পাকাইয়া এমন চাপিয়া বসিল যে কিছুতেই আর যায় না। ক্রমে তাহা রোগে দাঁড়াইল। রোগ হইলে মরিতে কতক্ষণ? সে মর মর হইয়া পড়িল। কেবল বলে, "ঐ এল, পিস্তল দিয়ে মারবে, মারবে।" হয়ত শৈল শেষ অবধি মারাই প'ড়ত, কিন্তু 'নীলমণি বাবু মোহিতকে তার কাছে এনে বল্লেন, শৈল. এই মোহিত এসেছেন, আর তোমার ভয় নেই।" মোহিত বলিল, "লললনে মা ভৈঃ।" তাহা শুনিয়া শৈল হাসিয়া ফেলিল, বাঁচিয়া উঠিল এবং শেষকালে মোহিতকে বিবাহ করিল। তারপর?—তারপর "আমার গল্পটি ফুরাল, নটে গাছটি মুড়াল।"

গল্পটির এক জায়গায় আছে "নারী-কণ্ঠের নিদারুণ আর্ত্ত-চীৎকার।" নিদারুণ শব্দটির অর্থ তো ভীষণ, কঠোর। আর্ত্ত-চীৎকার=কাতর চীৎকার। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে "কঠোর কাতর চীৎকার।" এমনি ধরণের মৌলিকতা না দেখাইলে আবার লেখা! তারপর, মোহিত ডাকাতটার পিস্তল সমেত হাতখানা লক্ষ্য করিয়া যে তাকিয়াটা ছুঁড়িয়াছিল, তাহা একবার দেখিতেছি, "মোটা তাকিয়া" আর একবার দেখা যায় "ছোট অথচ ভারি।" এ জিনিষটি সম্বন্ধে কিসে ছবি দুই রকমই হইতে পারে? অর্থাৎ প্রারম্ভে স্থূল, পরিশেষে সূক্ষ্ম!

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিনখানি।

প্রথম ছবি শ্রীচারু চন্দ্র সেনগুপ্তের "প্রভাতী।" শারদ প্রাতে পদ্মবনে কাশগুচ্ছের আড়ে বিলের জলে এক নারী-মূর্ত্তি। তাহার পীন পয়োধর দুটির উপর বস্ত্রখানি কোনমতে লাগিয়া আছে। নারীর কেশভার উন্মুক্ত, হাত দুইখানি মস্তকের পিছনে রহিয়া পরিপুষ্ট স্তন যুগলকেই স্পষ্টতর করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছে কি?

দ্বিতীয় ছবি শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহের "শিল্প-লক্ষ্মী।" বেশ লাগিল।

তৃতীয় ছবি শ্রীযতীন সাহার "—নয়নের নেশা।" ছবিখানি দেখিয়া তো আমাদের নেশা ধরিল না।

প্রবাসী—পৌষ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় চারটি ছোট গল্প আছে।

প্রথম গল্পটা হেমচন্দ্র বাগচী "প্রতিদিন ও একদিন।" "নিদারুণ আত্ম সম্মান বোধ, কঠিন অভাবজ্ঞান এবং দুয়ের একান্ত সম্পর্কের ফলস্বরূপ—নিষ্করুণ দারিদ্র্য।" গল্পটিতে ইহাররই একখানি চিত্র আছে; পরিশেষে ক্ষুদ্র একটি প্লট। বেশ লাগে। গল্পটি শেষের দিকেই জমিয়াছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সংসার সন্তান।" এক পিতার পর পর তিন বিবাহ; প্রথম দুটির গর্ভের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি বর্ত্তমান। তৃতীয়টি বন্ধ্যা;—পিতা তাঁহাকে বিবাহ করিয়াই গতাসু হন। সপত্নী সন্তানগণের প্রতি তাঁহার কিরূপ ব্যবহার হয়, তাহাই চিত্রিত করা হইয়াছে। গল্পটি রূপক। মন্দ কি? এদেশের রাজা প্রজায় এমনিতর সম্বন্ধই বটে?

তৃতীয় গল্প শ্রীশরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের "রক্ত খদ্যোত। ভূতের গল্প। বর্ণনা গুনে ছবিগুলি বেশ স্পষ্ট; মনের উপর চাপিয়া বসে।

চতুর্থ গল্প শ্রীবিমলাংশু প্রকাশ রায়ের "পূজোর বাজার" গল্পটির মধ্যে প্রাণ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পরিশেষে ক্ষুদ্র একটা প্লেট আছে এই জাতীয় রচনা মনকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এসংখ্যায় রঙ্গিন ছবি আছে তিন খানি। প্রথম ছবি শ্রীবিনয় কৃষ্ণের গুপ্তের "বাতায়ন-তলে" রঙের বাহার আছে; প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা। রাধা কৃষ্ণ অতি অদ্ভুৎ রকমের হইয়াছে।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীচৈতন্য দেব চট্টোপাধ্যায়ের "জননী" [illegible] অদ্ভুৎ। [illegible]

শ্রীশ্রীপরমহংস

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা

পুষ্পপাত্র

৫ম বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৩৮ | ১১শ সংখ্যা

পরলোকগত শাস্ত্রী মহাশয়*

শ্রীকালিদাস রায়

—প্রবন্ধ—

পণ্ডিত ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলার সারস্বত সমাজের একটি দিক্‌পালেরই তিরোধান ঘটিল। আমাদের দেশে যে ইন্দ্রপাত শব্দের প্রয়োগ আছে—এই প্রকার বিরাট-পুরুষের তিরোধানেই তাহার বিশিষ্ট প্রয়োগ হইতে পারে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের যে বয়ঃক্রম হইয়াছিল—তাহাতে তাঁহার মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলা যায় না, বিশেষতঃ বাঙ্গালী সারস্বতব্রতীর পক্ষে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত আর্ কয়জন সারস্বত এদেশে লাভ করিয়াছেন? শাস্ত্রী মহাশয়কে বঙ্কিম-যুগের শেষ সময়ের লোক বলা যাইতে পারে। শোনা যায়, ইনি বাল্য কৈশোরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট উৎসাহ ও রাজেন্দ্রলালের নিকট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবেশীও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা ও বঙ্কিম সাহিত্যসম্মিলনী প্রতিষ্ঠার মূলে শাস্ত্রী মহাশয়ের যে আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্যম ছিল, তাহা তাঁহার সাধারণ সাহিত্যানুরাগ মাত্র নহে।

শাস্ত্রী মহাশয় ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে শয্যাগতই ছিলেন। গত বৎসর দক্ষিণ-কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনীর সময় তিনি পঙ্গু অবস্থাতেই অতি কষ্টে সভায় আসিয়াছিলেন। এমনি প্রাণের টান যে সারস্বত আহ্বানে তিনি রোগশয্যায় শায়িত থাকিতে পারেন নাই। এই সাহিত্য-সম্মেলনী আজ আমন্ত্রকের অভাবে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আজ মনে পড়ে, সাহিত্য-সম্মেলন-প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন তিনি ও আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর।

ইনি অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে

* গত ৩১এ জানুয়ারী ভাটুরিয়া রসচক্রের বৈঠকে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিপূজা উপলক্ষে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

একদিন যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে সে কথা বড় কথা নয়। পুরাতত্ত্বের গবেষণার জন্যই তাঁহার দেশ-বিদেশে খ্যাতি। এই পুরাতত্ত্বের গবেষণায় তিনি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের পদানুসরণ করেন নাই—স্বাধীন, অপরতন্ত্র ও মৌলিক গবেষণার দ্বারা তিনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশে গবেষণার নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ সকলেই অল্প বিস্তর তাঁহার কাছে ঋণী। শাস্ত্রী মহাশয়কে ঐতিহাসিক না বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বা পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, তিনি দেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কোন ইতিহাস লিখিয়া যান নাই—ঐতিহাসিকদিগকে তিনি উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রেরণা, উৎসাহ ও পরিচালনা দান করিয়াছেন এবং ঐতিহাসিক ধারণা ও সংস্কারের শুদ্ধি বিধান করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার ফলে দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার ভ্রান্ত সংস্কারগুলি দূর হইয়াছে। তিনি ছিলেন সূত্রকার—সূত্রাকারে তাঁহার সাধনাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—ভাষ্য ও টীকা করিবার ভার তিনি দিয়াছিলেন শিষ্যস্থানীয় লেখকগণকে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সারস্বত দানের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে অতিকায় গ্রন্থ সন্ধান করিলে ঠিক ধরা যাইবে না—তাঁহার দান বাঙ্গালার ঐতিহাসিক দেহের স্নায়ু শিরায় তেজঃশক্তি ও শোণিত-প্রবাহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকা ও এসিয়াটিক সোসায়েটির জার্ণাল অনুসন্ধান করিলে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিরাট দানের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া, তাঁহার রচনাবলী নানা পত্রিকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে—সেগুলি গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় নাই। এদেশে তেমন গ্রন্থব্যবসায়ী কেহ নাই—যিনি সেগুলিকে একত্র করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিবেন। এ দেশের শিক্ষা দীক্ষার অবস্থা এখনও অনুন্নত—ঐ শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশিত হইলে ক্রেতা জুটিবে না, গ্রন্থব্যবসায়ীরা সে জন্য এদিকে অগ্রসর হ'ন না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত সেই অমূল্য প্রবন্ধগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা।—এবং তিনি যে ঐতিহাসিক সূত্রগুলি দিয়া গিয়াছেন—সেইগুলিকে পূর্ণাবয়ব ঐতিহাসিক নিবন্ধে পরিণত করা। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাবলীর অন্য প্রকাশক যদি নাই জুটে, অন্ততঃ কমলা বুক ডিপো কি সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারেন না? তিনি বহুদিন ধরিয়া কমলা বুক ডিপোর managing ডিরেক্টার সভার সভাপতি ছিলেন।

ঐতিহাসিক উপাদান ও তথ্য আহরণের জন্য সমস্ত জীবনই তিনি অশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন,—তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া লুপ্তপ্রায় কীটদষ্ট পুঁথির উদ্ধার করেন—বিলুপ্ত অংশের পাঠোদ্ধার করেন ও জটিল ও সংশয়িত অংশের মর্ম্মোদ্ধার করেন।—নানা প্রকারের পাঠান্তর মিলাইয়া প্রকৃত পাঠের সন্ধান দেন। ইতিহাসরচনার যেটুকু অতিদুরূহ অংশ, শাস্ত্রী মহাশয় তাহারই ভার লইয়াছিলেন। এই কার্য্যের দ্বারা তিনি একদিকে যেমন দেশের জ্ঞান-সম্পদ্ বাড়াইয়াছেন, অন্য দিকে তেমনি তিনি রস-সাহিত্যেরও উপকরণ দান করিয়াছেন।

সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়, ডাকার্ণব ইত্যাদি গ্রন্থের আবিষ্কার, পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিয়া একদিকে যেমন তিনি বাংলা ভাষার কুলপঞ্জিকানির্ণয় করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজের অনেক গূঢ় তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই আবিষ্কার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ভিত্তিরই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। এই গ্রন্থগুলির ভাষাকে আদিমতম বঙ্গভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে কেহ কেহ রাজী নহেন—কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি এখনও শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তিগুলিকে খণ্ডিত করিতে পারে নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় নানা সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তন্মধ্যে রয়াল এসিয়াটিক সোসায়েটি, বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসায়েটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটি, বেঙ্গল লাইব্রেরি, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সম্পর্ক বলিতে নামমাত্র

সম্পর্ক বুঝিলে চলিবে না—যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন—তাহাতেই তাঁহার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কোন কোনটিতে প্রধান পরিচালকের কাজই করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সহিত এসিয়াটিক সোসায়েটির যতটুকু সম্পর্ক তাহাতে তিনিই ছিলেন মেরুদণ্ড স্বরূপ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের তিনিই ছিলেন কর্ত্তা। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহিত কিছুকাল তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না বটে কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে ও শেষ জীবনে তিনি যথেষ্ট প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁহার নানা ভাবে সম্পর্ক ছিল। নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের Thesisএর পরীক্ষক ছিলেন এবং নানা সমিতি-সংঘের সভাপতি ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে এদেশে দেশাত্ম-বোধের জাগরণ। দেশাত্মবোধ জাগরণের পর হইতে দেশের প্রাচীন গৌরব অনুসন্ধানের একটা সাড়া পড়িয়া যায়। ফলে, অনেক কল্পিত গৌরবকেও দেশের লোক গৌরব বলিয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করে। শাস্ত্রী মহাশয় জানিতেন—দেশের প্রকৃত গৌরবের অভাব নাই—কিন্তু সেগুলি বিস্মৃতপ্রায়। তাই তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন 'বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি।' দেশের লোক প্রকৃত গৌরবের সন্ধান না জানিয়া নানা ভ্রান্ত গৌরবের কল্পনা করিয়া থাকে। তাই তিনি বহু গবেষণার দ্বারা বাঙ্গালার প্রকৃত প্রাচীন গৌরবগুলির সন্ধান করেন। বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে তিনি সেইগুলিকে বিবৃত করিয়া দেশের লোকের গোচরীভূত করেন।—তাঁহার তালিকা পূর্ণাঙ্গ না হইতে পারে—কিন্তু তাহা অসত্য নহে। তালিকাটিকে পরবর্ত্তী গবেষকগণ পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলুক ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

বাঙ্গলা সাহিত্যেও তাঁহার দান অল্প নয়। ছাত্রজীবনে তিনি ভারতমহিলা নামক গ্রন্থ লিখিয়া হোল্কারাজ-প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হ'ন। যৌবনে তিনি 'বাল্মীকির জয়' নামক রূপকাত্মক একখানি আখ্যান গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতেই তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। আজিও সে গ্রন্থের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে তিনি 'বেনের মেয়ে' নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাস-হিসাবে তাহার মূল্য যেমনই হউক, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি অভিনব সৃষ্টি। বাঙ্গালার প্রাচীন সমাজ,ধর্ম্ম, শিল্প,বাণিজ্য ও সভ্যতার ইতিহাসকেই তিনি এই গ্রন্থে কথা-সাহিত্যের ভঙ্গিতে বিবৃত করিয়াছেন। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ ভঙ্গিতে দেশের প্রাচীনতর যুগের ইতিবৃত্ত বিবৃত করিয়া পরে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন। কবি ৺ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার ডঙ্কা-নিশান নামক গদ্য-গ্রন্থে ঐ প্রথাই অবলম্বন করিতেছিলেন—কবিবরের অকাল মৃত্যুতে তাহা অসমাপ্তই থাকিয়া গেল।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল,—এতবড় প্রতিভাবান্ ব্যক্তি কখনো প্রচলিত ভাষাভঙ্গিতেই তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের মূল্যবত্তা আজ বঙ্গদেশ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। যে যুগে তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন—তখন মার্জ্জিত গুরুগম্ভীর ভাষা-ভঙ্গিরই ছিল অতিরিক্ত আদর। জানি না তখনকার লোক শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা-ভঙ্গিকে কি চোখে দেখিত। এখন আর সে দিন নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় ছোট ছোট বাক্যে চলিত ভাষায় অতি সহজ সরল কথায় ভাব প্রকাশ করিতেন। বাংলা ভাষার স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রকৃতিরই তিনি ছিলেন পক্ষপাতী। বাঙ্গালা দেশের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—তাহা তাহার সভ্যতা ও শিক্ষা দীক্ষার সর্ব্ব শাখাতেই পরিস্ফুট—বাংলার ভাষা ও প্রকৃতিগত একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—ইহা ছিল তাঁহার ধারণা। ঐ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি প্রকাশভঙ্গির একটা আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। নিজে সংস্কৃত সাহিত্যে একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়াও যতদূর সম্ভব,সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সহায়তা বর্জ্জন করিয়া চলিতেন এবং বাংলার প্রচলিত শব্দগুচ্ছ ও idiomএর সাহায্যে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণের অনুগ্রবন্ধ রীতিপদ্ধতি

অনুসারেই তিনি বাক্য গঠন করিতেন। যেখানে অন্যে সমাস সন্ধির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করিত, সেখানে তিনি তাহা বর্জ্জন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের সংখ্যা বাড়াইতেন। ইহা তাঁহার দ্বারা অনায়াসেই সম্ভব হইয়াছে। কারণ, তিনি অলঙ্কারের বা ভাষা-সৌষ্ঠবের দিক দিয়াও যান নাই। ভাষার জন্য কোন চিন্তা বা সতর্কতার প্রয়োজন আছে, তাহা মনেও করিতেন না। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন উল্লঙ্ঘিত হইলেও গ্রাহ্য করিতেন না। ইহা তাঁহাকেই সাজিত। অন্য কেহ এইভাবে চলিলে দোষদর্শিগণ বলিত, ব্যাকরণ জানে না—তাই ভুল করছে। তাঁহার পক্ষে ত একথা চলিতে পারে না। সংস্কৃত ব্যাকরণ তাঁহার কাছে ছিল ধারাপাতেরই তুল্য। বাল্যে ধারাপাতের সহিতই তাহা আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল। ভাষাকে স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, শৃঙ্খলমুক্ত ও বাঙ্গালীর রসনার সম্পূর্ণ অনুগত করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষার একটু নমুনা দিই—

"প্রত্যেক ব্রাহ্মণই ছোটখাট একটি লাইব্রেরী রাখিতেন। যাঁহার যত বড় লাইব্রেরী তিনি তত পণ্ডিত। কেন না, গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ। বৌদ্ধদের বিহারে বিহারে, জৈনদের উপাশ্রয়ে উপাশ্রয়ে লাইব্রেরী থাকিত, রাজাদেরও লাইব্রেরী থাকিত। মুসলমান বিজয়ের সময়ে বৌদ্ধদের অনেক লাইব্রেরী নষ্ট হইয়া যায়। বল্লাল সেনেরও লাইব্রেরী ছিল। সে সময়কার ব্রাহ্মণদেরও লাইব্রেরী ছিল। সে সকল লাইব্রেরী কোথায় গেল? বাঙ্গালা বড় খারাপ দেশ। পুঁথি এদেশে থাকে না। আগুন আছে, বৃষ্টি আছে, জল আছে, বন্যা আছে, সকলের চেয়ে শত্রু আছে উই আর ইঁদুর। আর একটা শত্রু, পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র। ইহাদের হাতে অনেক প্রাচীন লাইব্রেরী লোপ পাইয়া গিয়াছে। মুসলমান বাদসাহেরা অনেক লাইব্রেরী রাখিতেন। লাইব্রেরীর সিঁড়িতে পড়িয়া হুমায়ুন দেহত্যাগ করেন।......"

সম্পূর্ণ অনলঙ্কৃত সহজ সরল ভাষা, খাঁটি বাংলা ভাষা। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া গল্প বলার মত—ক্ষণমাত্র লেখনীকে না থামাইয়া, কেবল ভাবপ্রকাশের উদ্দেশ্যে লঘু অথচ দ্রুত সঞ্চারে লেখনীর মুখে যে ভাষা আসে—ইহা সেই ভাষা! সাহিত্যসৃষ্টি এই ভাষায় কতটা চলিতে পারে—বলিতে পারি না। তবে গল্প,—পুরাণো যুগের গল্প যাহাকে আমরা বলি ইতিহাস, তাহা এ ভাষায় অতি চমৎকার ভাবেই বিবৃত হইতে পারিয়াছে। পুরাতন-কথা-কোবিদ গ্রামবৃদ্ধ বক্তা—আর কৌতূহলী শুশ্রুষু শ্রদ্ধাবান তরুণ সম্প্রদায় শ্রোতা—বক্তাকে শ্রদ্ধাভরে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট। এই চিত্রের কথা কল্পনা করিলে—এই ভাষার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে।

আমি নিজে ঐতিহাসিক নহি—শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধনার সকল দিকের কথা আমি জানিও না। তাঁহার রচনাবলীর অনুরাগী পাঠকহিসাবে যতটুকু জানি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাবলী হইতে আমি নিজে যে সকল বিষয়ের সম্বন্ধে নানা তথ্যলাভ করিয়াছি—তাহারই একটা তালিকা দিই—

১। বাঙ্গলা ভাষার জন্ম-পত্রিকা ও কুলুজী।

২। বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালার ধর্ম্মের, সমাজের, শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা, আচার ব্যবহার ও চিন্তাচেষ্টার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

৩। বাঙ্গালার জাতিসমস্যা ও জাতিভেদের গূঢ় রহস্য। কায়স্থ, যোগী ও কৈবর্ত্ত জাতির বিস্তৃত পরিচয়।

৪। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নানা শাখা—তাহাদের প্রচার—আচারপদ্ধতি—সাধনপ্রণালী—তাঁহাদের রূপান্তর ও ক্রম বিলুপ্তি।

৫। বাঙ্গালার বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির সম্পর্ক।

৬। গুভাজু, দেভাজু, শূন্যবাদী, যোগাচারী, সহজিয়া, মীননাথী, গোরক্ষনাথী ও অন্যান্য নাথসম্প্রদায়, ইত্যাদি বাংলার বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পরিচয়।

৭। বাঙ্গালার শিক্ষাসভ্যতার ও প্রাচীন গৌরবের ইতিবৃত্ত।

৮। বাঙ্গালার সমাজ-তত্ত্ব।

৯। বাংলার বিবিধ জাতির বৃত্তিপরিচয়, জন্ম পরিচয়, কুলপরিচয় ইত্যাদি।

১০। বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পবাণিজ্য, দায়ভাগ, সামরিক নীতি, গার্হস্থনীতি টোলচতুষ্পাঠী ইত্যাদির পরিচয়।

১১। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য।

১২। প্রাচীন বাঙ্গালার বিশেষতঃ পাল বংশের ও পাঠানগণের রাজত্বকালের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় ইত্যাদি—

১৩। মগধের ইতিহাস,—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজগৃহ সম্বন্ধে বহু তথ্য।

১৪। ধর্ম্মপূজার আদ্যোপান্ত পরিচয়।

১৫। খনা ও ডাকপুরুষের পরিচয়।

১৬। বৌদ্ধাচার্য্যগণের দোহাপদের পরিচয় ও ব্যাখ্যা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দূরের যাত্রী

শ্রীপ্রভা দেবী সরস্বতী

দূরের পানেতে যাত্রা করেছি
লক্ষ্য আমার নাই ;
কোথা, কোনখানে থেমে যেতে হবে
জানিতে তাহা না চাই।
শুধু ধূ ধূ করে মরুভূমি হেরি—;
শ্যামল সুষমা কোথা,
যেথা পাখী গায় সুমধুরে—দূর
করে যে যাতনা ব্যথা।
অসহ তৃষার জ্বালা—;
দূরে মরিচীকা ডাকিতেছে—যেন
সাজায়ে তাহার ডালা।
কে ডাকিছে মোরে বহুদূর হতে—
পাই নি যে পরিচয়,
অন্তর হতে কে বলে—"ও যেগো
বড় প্রিয়তম হয়।"
কত যুগ হতে ডেকে মোরে যায়
দিই নি কো সাড়া তারে,
লক্ষ জনম ডেকে সে চলেছে
এমনই বারে বারে।
অন্ধ আকাশ কাঁদে,
নীল সে নয়নে হেরি মেঘ মালা
কে পড়িল প্রেম ফাঁদে ?
প্রায়ী ডাকিয়া চলেছে এমনি
জানিনা চিনি না তায়.
জ্বালার মুকুটে সাজিয়াছে ভালো
কারে কাছে পেতে চায়।
বেদনায় ভরা নিশ্বাস তার
ঘনায়ে উঠিছে যেন,
তাহারে চিনি না, এরূপে আকুলে
আমারে ডাকিছে কেন ?
আমারে পাইতে কাছে
যুগে যুগে চায় ; তার ভালোবাসা
আমারে ঘেরিয়া আছে।

বুকের বেদনা আগুনের মত
ছড়ায়ে পড়েছে হেথা,
তার বেদনার গোপন কাহিনী
প্রকাশিত হয় সেথা।

উষার মরুর বুকে ডাক জাগে—
"এসো, এসো কাছে এসো,—
লক্ষ যুগের প্রিয়তমা, ওগো—
আমার বুকেতে মেশো।"

রচেছে কুহেলি মায়া
পান্থ চলিতে হারায়েছে পথ,
কোথা জল, কোথা ছায়া ?
অরূপের রূপ মানস নয়নে
উঠিল যখন ফুটি,
মনে হল—মোর জীবনের যেন
শত কাজ হল ছুটি।

মোর হৃদয়েতে আগুন লেগেছে
লেলিহান শিখা ধায়,
আমারই আগুন তাহার বুকে—সে
আবরি রাখিতে চায়।
চলিয়াছি নিশিদিন—
এমনই করিয়া মরুর বক্ষে
শ্রান্তি ক্লান্তি হীন।

ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র

বোগদাদের রাজসভায় হিন্দু চিকিৎসকগণ

—প্রবন্ধ—

শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র

আমাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র কতদিনের তাহা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। এইরূপ কথিত আছে যখন আমরা নিষ্পাপ ছিলাম তখন আমাদের মধ্যে রোগের জ্বালা যন্ত্রণা বড় ছিল না। ক্রমে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে মানবের মন পাপের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় রোগের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হওয়ায় ব্রহ্মা দয়াপরবশ হইয়া উপবেদের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার মধ্যে একটি বেদকে আয়ুর্ব্বেদ আখ্যা দিয়া সমগ্র মানব জাতি যাহাতে ইহা পাঠ করিয়া রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিলেন ও যাহাতে এই চিকিৎসা বিদ্যা সহজে সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে এইজন্য তিনি স্বয়ং ব্যাখ্যা লিখিয়া প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সমস্ত প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ দেখিতে পাই তাহার মধ্যে চরক ও সুশ্রুত প্রধান। চরক রোগ নিবারণ ও তাহার চিকিৎসা এবং সুশ্রুত রোগ নিবারণ ও অস্ত্র চিকিৎসার বিশদ বিবরণে পরিপূর্ণ। চরকে যে সকল মুনিঋষিদিগের নাম আছে তাহাদের নাম ও গ্রন্থ আমাদিগের কোন পুরাণাদিতে পাই না তাঁহারা পুরাণাদি সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্বেই আবির্ভাব হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয়। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থদ্বয়ের প্রাচীনতা সম্বন্ধে পণ্ডিতবর উইলসন্ বলিতেছেন "......From Charaka and Susrutha being mentioned in the Purans the 9th or 10th century is the most moderate limit of our conjecture; while the style of the authors as well as their having become the heroes of the fable indicate long anterior date. One commentary of Susrutha made by UBHALTA, a Cashmerian is probably as old as 12th or 13th century and his comment it is known was preceded with others.

প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে ঋক্‌বেদ অন্যতম—ইহার প্রথম মণ্ডলে ১১৬ শ্লোকে একজনের একটি পদ বিনষ্ট হওয়ায় তাহাকে কাষ্ঠের পদ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে সুধী পাঠক সহজেই বুঝিতেছেন যে অস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী না হইলে আজকালকার দিনেও অঙ্গচ্ছেদন করা অতীব দুরূহ—এবং ইহা হইতে আরো বুঝা যায় যে স্থানীয় সংজ্ঞালোপ করিবার প্রণালীও তখন অজ্ঞাত ছিল না; কৃত্রিম অঙ্গ প্রস্তুত তখন এদেশেই হইত ও স্থানীয় লোকের উহা অতি সহজেই ব্যবহারের উপযোগী হইত। সুশ্রুত পাঠে অস্থি বিদ্যা, সাধারণ রোগ জ্ঞান, নানাবিধ বিষের কার্য্য ও দেহের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিবার নানাবিধ অস্ত্রের বিবরণ জানা যায়। বর্ত্তমান কালেও সুশ্রুত সময় হইতে যে অস্ত্রের খুব বেশী উন্নতি হইয়াছে তাহা মনে হয় না। পাঠক এই অস্ত্রগুলির অঙ্কন দেখিলে কখন মনে করিতে পারিবেন না যে, ইহা বেদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই দেশে প্রচলিত হইয়া বর্ত্তমানকালের অতি বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। সেই সময়ে শবচ্ছেদ প্রচলন ছিল—এবং শবচ্ছেদ করিতে না জানিলে, শরীরের অস্থির বিবরণ না জানিলে বিজ্ঞ চিকিৎসক হওয়া যায় না তাহা চরক ও সুশ্রুত দুইজনেই বলিয়াছেন।

আমার দৃঢ় ধারণা এই দুই মহাগ্রন্থ বর্ত্তমানকালের চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি। ইহা হইতে এখনকার ইংরাজী চিকিৎসার উদ্ভব হইয়াছে—কেমন করিয়া হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি—যে সময়ে মহামতি হারুণ অল্ রসীদ আরবদেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন

সেই সময়ে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির জন্য বোগদাদে একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত করেন যে যাহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান ভাল করিয়া না পড়িয়াছে তাহারা কখন চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে পারিবে না। এই মহান্ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার মন্ত্রীর উপদেশে ভারতবর্ষ হইতে কান্কা, সল্লাহল, বাকহর, শংক, জদার, মান্কা নামক সুপণ্ডিত চিকিৎসকদিগকে বহু অর্থব্যয়ে ও তোষামোদ করিয়া লইয়া গিয়া চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি গ্রন্থ সকল ভাষান্তরিত করেন—পরে এই অর্থানূদিত বিষয়গুলি গ্রীক্ ভাষায় অনূদিত হইয়া ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়ে। উপর্যুক্ত মহাপণ্ডিতগণ যে কেবল চিকিৎসা শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে তাঁহারা অঙ্ক এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন, এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞান পরিশেষে ইয়োরোপীয় ভাষায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিজ্ঞ পাঠক উপর্যুক্ত নামগুলি পাঠ করিয়া সহজেই বুঝিতেছেন যে পারসী ও আরবী ভাষায় আমাদিগের ভারতীয় চিকিৎসকগণের নামের এরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে। (Prof. Wilson is of opinion that Arabs of the 18th century cultivated the Hindu works on medicine before those of Greeks and the Charaka, the Susrutha and the treatise called Nidana etc. were translated and studied by the Arabians in the days of Harunal Rasid and Mansur (A. D. 773) either from the originals or more probably from translation made at a still earlier period into the language of Persia. (R.A.S. Vol VI. P. 105)

মানব জাতির এই পরম হিতকর বিদ্যা ভারতবর্ষে ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছিল—আমার মনে হয় বৈদেশিক আক্রমণেও গ্রন্থাদি অসভ্য আক্রমণকারীদিগের দ্বারা ভস্মীভূত হয়। আসল পুস্তকাদি যাহা ছিল প্রায় তাহা সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আমরা বর্ত্তমানে যে সমস্ত পুস্তক দেখি তাহার অধিকাংশই টীকাকারদিগের সংকলন বলিয়াই মনে হয়। এই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া দুই চারি জন বিখ্যাত বৈদেশিক মনীষী যাহা বলিয়াছেন তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"They practised dissection on human bodies and the anatomical studies were of high order. We have seen they used various forms of surgical instruments. The Hindus cut for stones, couched for the cataract and extracted the foetus from the womb. They performed abdominal sections, practised cranal surgery successfully and no region of the body was thought sacred to the knife. They repaired nose and ears by plastic operations, treated fractures, reduced dislocations and were experts in performing amputations. They reduced Hernia, cured Piles and Fistulas, inoculated and vaccinated for Small-pox. Field service was thoroughly understood and arrows were extracted with skill. They were acquainted with the circulation of blood; the use of anaesthetics the means of arresting Hæmarrhage and the preper treament of surgical wounds; they enumerated 107 vital parts of the body to be avoided if possible by the surgeon in practising his handicraft; they were the first nation who employed minerals internally and to them we owe the therapeutic use of mercury and arsenic in intermittents; they introduced massage, postural treatment and magnet in therapeutics; they excelled in Chemistry, contrived many instruments for the preperation of Chemical Compounds; Atomic Theory was discovered by Kanada; they knew how to prepare Sulphuric and Nitric Acids and other oxides of Copper, Iron, Lead, Tin and Zinc. (T. A. Wise—Commentary on the Hindu System of Medicine)

হিন্দুদিগের অস্থিবিদ্যার জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া Studies in the medicine of Ancient India নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে Dr. Hœrnle বলিতেছেন—"Probably it will come as a surprise to many as it did so to myself, to discover the amount of anatomical knowledge which is disclosed in the works of the earliest medical writers of India. Its extent and accuracy are surprising when we allow for their early age probably in the 6th century B. C. and their peculiar methods of definition."

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারত জুড়িয়া আয়ুর্বেদের উন্নতি কল্পে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই প্রাণে নব আশার উন্মেষ হইতেছে এবং শীঘ্রই পূর্ব্ব গৌরবের নষ্টভাতি পুনরায় প্রখরভাবে ভারতাকাশে প্রকাশিত হইয়া ভারতের হিতকামীদের আনন্দবর্দ্ধন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রতীক্ষা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

আর কতদিন এ দেহ দেউলে জ্বলিবে দীপ—
এমনি করিয়া জাগিয়া কাটাব রাতি,
আর কতদিন দেবতা বিহীন আসন মোর
মন্দির মাঝে যতনে রাখিব পাতি।
অঞ্চল পাতি রাখিয়া আমার দ্বারে,
পথ পানে চাব' কত আর বারে বারে!
মন্দির মাঝে—কে আর্ত্ত হাহাকারে—
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ব্যাকুল বেদনে কাঁদি,
শুনি যে শ্রবণ পাতি।
আর কতদিন এমনি সাজাব পুষ্পাধার
এমনি করিয়া রহিব পথের পাশে,
আর কতদিন শঙ্কা ও আশে গণিব দিন,
যদি সে কখনো হেথায় ফিরিয়া আসে!
সাজায়ে রেখেছি আরতির তরে দীপিকা,
যতনে রেখেছি বিরহের দুঃখ লিপিকা,
প্রহরের পর প্রহর গণিয়ে বসিয়া রুদ্ধশ্বাসে,
যদি সে ফিরিয়া আসে!
আর কতদিন এ মেয়াদ বহি বসিয়া রব'
এমনি নীরব নিস্তব্ধের মাঝে
আর কতদিন এমনি করিয়া বিরহ সবো?
পলে পলে গণি প্রতিদিন প্রতি সাঁঝে।

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুদূর জাপানে—প্রণব তখন 'দেশের ডাকের অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে দিন গুণছিল। প্রত্যাশিত 'ডাক' এল—সুনন্দা ছাড়া সকলের চিঠিই পাওয়া গেল। একে একে চিঠিগুলো খুলে, তাতে সকলেরই কুশল সংবাদ পেয়ে তার মন থেকে অমঙ্গলের ভয়টা গেল বটে কিন্তু সুনন্দার চিঠি না লেখার কোন কারণই সে বুঝতে পারলে না। চিঠি না পেলেও সে তাকে চিঠি লিখলে, "তোমার চিঠি এ মেলে কেন পেলাম না! তুমি যে ভাল আছ—তা বাড়ীর চিঠি পেয়ে জান্‌লাম—কিন্তু চিঠি কেন লিখলে না? আশা করছি আসচে মেলে তোমার চিঠি পাব—আমাকে উৎকণ্ঠায় না রেখে—দয়া করে চিঠি লিখো—"

এই চিঠি যখন সুনন্দার হাতে পড়ল, তখন সে একটু খুসী হয়ে উঠলেও—অভিমান তার পুরো গেল না। একবার ভাবলে চিঠি একটা লেখা ভাল, আবার ভাবলে না থাক্। শেষের ইচ্ছাটাই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে গেল—তাই পরের 'মেলেও' প্রণব, সুনন্দার চিঠি পেলে না।

সকলেই তাকে চিঠি লিখছে শুধু সুনন্দাই লেখেনা —এটা প্রণবের সরল মনেও একটা খট্‌কা লাগিয়ে দিলে। বিয়ের পর যে দুসপ্তাহ সে সুনন্দাকে দেখেছিল তাতে কোন অন্য ভাব তো সে দেখেনি। যেটুকু পরিচয় সে পেয়েছিল তাতেই সে মুগ্ধ হয়েছিলো—তারপর এই দেড় মাসের মধ্যে একটা মেলও তো বাদ যায়নি—চিঠি সে বরাবরই পেয়েছে। সুনন্দা রাগ করে তার চিঠির যে ভাষায় উত্তর দিতো—প্রণব তা পড়ে ভাবতো "নন্দা এখনো ছেলেমানুষ! বয়েস ১৫ হলে কি হয়! লজ্জাটাও বেশী খুব ওর।" তার পরেই ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে যেত। যখন এখানকার শিক্ষা সেরে সে দেশে ফিরবে, তখন এই চোদ্দ দিনের পরিচিতা নন্দা তাকে কি সাগ্রহেই বরণ করে নেবে আবার! কি কথাই বা সে বলবে! দেখতে কি রকম হবে, এই সব কথাই তার মনে আসা-যাওয়া করতো। এমনি সব চিন্তার মধ্যে, এক রকম নির্ভাবনায় দিন তার কাট্‌ছিল—কেটেও যেত কিন্তু মুস্কিল করলে সুনন্দা। ভগবান তাকে মন দিলেও ভাষা তো দেন নি! ভাষার দৈন্যে সে নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে থাকতো।

এ মেলেও সুনন্দার চিঠি না পেয়ে, সে তার মনের উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা, নিজের এলো-মেলো ভাষায়, অসংযত ভাবেই লিখতে বস্‌লো। লিখতে বসেও তার ভয়ের, ভাবনার শেষ ছিল না—কি জানি সুনন্দা চিঠিখানা কেমন ভাবে নেবে! আগে কিন্তু এ ভয় তার মোটেই ছিল না। প্রায় আট কি নয় পাতা ধরে, সে একই কথার বার বার আবৃত্তি করলে যে দুমেল তার চিঠি না পেয়ে সে যে কী দুশ্চিন্তায় আছে তার ঠিক নেই—রোগ তার কোথায়? শরীরে না মনে? আজ থেকে দিন গুণে এই চিঠির উত্তর, যদি সে ঠিক দিনে না

পায়, তবে বাধ্য হয়ে তার বাবাকে বা বৌদিকে লিখে সে নন্দার নীরবতার কারণ জানবে। এই কথাটা নানা ভাবে জানিয়ে, নাম সই করে শেষে পুনশ্চ দিয়ে আবার লিখলে "আমার চিঠি পেয়ে চিঠি তুমি লিখতেই চাও—না হলে—আমার এখানের তল্পী গুটিয়ে আমি পরের মেলেই রওনা হবো।" চিঠিটা লিখে তার ঘাড় থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল।

এই চিঠিটা যখন স্থনন্দা পেলে, তখন সে বাপের বাড়ী। আসন্ন পুজোয়, তার বাপ-মা তাকে শ্বশুর বাড়ীতে না রেখে নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, পুজা ও কালী পুজা হয়ে গেলে সে আবার শ্বশুর বাড়ী ফিরবে।

বিকেলে বারান্দায় বসে সে মায়ের কাছে চুল বাঁধছিল—এই সময়ে চিঠিখানা সে পেলে—মা রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করলেন "চিঠি কার? জামাইয়ের?"

খামের ওপরের লেখাটা, তারপরের রিডাইরেক্ট করা লেখাটা সবই সে চিনে ছিল, কিন্তু একেবারেই মায়ের কাছে স্বীকার পেতে তার একটু লজ্জা করল—চিঠিটা হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে সে বল্লে "কি জানি! খুলে দেখি আগে তারপরে ত বল্‌বো!...

মেয়ে কিন্তু চিঠিখানা তাঁর সামনে খুললো না দেখেই রুক্মিণী চিঠিখানা কার তা বুঝে নিলেন। চুল বাঁধা শেষ হলে পরিপাটী করে সিঁথেয় সিঁদুর লাগিয়ে কাপড় গামছা সব নিয়ে সে একেবারে তাদের খিড়কীর ঘাটে চলে গেল।

সেখানে তখন কেউ ছিল না দেখে ধীরে ধীরে চিঠিখানা খুলে সে পড়তে লাগল—পড়তে পড়তে তার মুখে মাঝে মৃদু হাসি খেলে যেতে লাগল—শেষ করে চিঠি ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে মনে মনে সে বল্‌লে "কেমন? চিঠি যে লিখতে জানো না? এইবার আমার চিঠিও যাবে—স্থনন্দাকে না চাইলে পাবে, এত ফেলনা সে নয়!...একটা ইট চাপা দিয়ে চিঠিখানা রেখে সে গা ধুতে পুকুরে নাম্‌লো। কি কি কথা এইবার সে গুছিয়ে লিখবে—সেগুলো মনে মনে ভেবে ঠিক কর্‌তে কর্‌তে, পুকুরে লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল।

পুজোর আর দুতিন দিন দেরী—কুটুম সাক্ষাৎ যা আসবার তা এসে গিয়েছে, স্থনন্দাদের বাড়ীটা খুব সরগরম হয়ে রয়েছে। দিনের বেলায় তো নিরিবিলি জায়গা পাওয়াই ভার রাত্রে সমস্ত বাড়ী নিশুতি হলে, তবে স্থনন্দার চিঠি লিখবার একটু সময় ও জায়গা মিললো। তার বিয়ের পরে এই প্রথম পুজো—এ সময়ে যে সে স্বামীর কাছে থাক্‌তে পেলে না সে দুঃখটা তার খুবই হচ্ছিল—আরো মনে হচ্ছিল তার স্বামী আত্মীয় স্বজন ছাড়া হয়ে সেই বিদেশে, বিদেশীদের মধ্যে কেমন করে আছে!

মোমের একটা বাতি জ্বালিয়ে—গভীর রাত্রের নিরালায়, আপন মনের গোপন কথা সে কাগজের বুকে লাইনের পর লাইনে বসিয়ে যেতে লাগল। চিঠি লেখার নেশা তখন তাকে পেয়ে বসেছিল। প্রায় দু আড়াই ঘণ্টা ধরে খান কতক কাগজে মনের মত ভাষা দিয়ে সে যে চিঠি তৈরী করলে—তা আগাগোড়া নিজে যখন পড়লে, তখনো তার মনে হল কিছুই জানানো হল না—"অশ্রু মাখানো নিহিত এ ব্যথা কেমনে তোমারে জানাব গো!" কিন্তু এ ব্যথাই বা কিসের, তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারলে না—ঘুমে তার চোখ দুটো তখন জ্বালা করছিল—কাগজগুলো গুছিয়ে খামে এটে ঠিকানা লিখে, খামখানা হাত বাক্সে ফেলে সে শুয়ে পড়ল। রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে, তার মুখের ওপর প্রণবের চোখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে—এই-ই দেখতে লাগল।

এদিকে প্রভাত বাড়ী এসেছে—পুজো তাদের বাড়ী না হলেও, পুজোর একটু গোলমাল ছিল। জগমোহন তাঁর যা দরকার সব লিষ্ট করে প্রভাতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—দুটী ছেলের শ্বশুর বাড়ী পুজোর তত্ত্ব কর্‌তে হবে। বড় বৌ মীনার চেয়ে মেজ-বৌ স্থনন্দা যে একটু আত্মসুখ প্রয়াসী তা জগমোহন এই ছুতাসেই বুঝে নিয়েছিলেন। মনে তাঁর অশান্তি এলেও মুখে তিনি তা কোনদিনই প্রকাশ করেন নি। একে স্থনন্দা আত্মপরায়না, তার ওপর সে আবার মা-বাপের কাছে আছে—তাঁর তত্তটা কোনমতে ভাল করে দিয়ে যান

রক্ষা হলে হয় এইটাই জগমোহনের মনে দিনরাত হচ্ছিল।

পঞ্চমীর দিন বিকেলে প্রভাত এসে পৌঁছাল। খাওয়া-দাওয়া সমস্ত সেরে পিতা পুত্রে সেই সব জিনিষ-পত্তর দেখা-শোনা হচ্ছিল। মীনা জান্‌তো, আজ রাতে হয়তো সে ঘুমাতেই পাবেনা—তাই বাড়ীর কাজ সারা হবামাত্র বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। অনাগত সুখের আশায় ঘুমও তার আস্‌ছিল না।

প্রভাতের আনা সমস্ত কাপড় দেখা হয়ে গেলে সে কুণ্ঠার সঙ্গে একটা প্যাকেট সব শেষে বের করে বাবার হাতে দিলে। জগমোহন তাকিয়ায় ঠেস দিয়েছিলেন, উঠে বসে প্যাকেটটা খুল্‌তে খুল্‌তে বল্লেন" এতে আবার কি আছে প্রভাত? আমি আর কিছু তোমাকে লিখেছি বলে তো মনে আসছেনা "বলে প্যাকেট তুলে দেখ্‌লেন, একখানা কারমাইকেল শাড়ী ও ব্লাউস্, ১টা কুন্তলীন, ১বাক্স সাবান অয়না, চিরুণী, সিঁন্দুর ২খান, ১টা রূপার সিঁন্দুর কৌটা, ১টা আলতা ও এনামেল করা অশীর্ব্বাদ লেখা সেফটিপিন। জগমোহন চমৎকৃত হয়ে গেলেন। বল্লেন "এ কার প্রভাত?—"

মুখটা নীচু করে প্রভাত বল্লে "এগুলি পূজার কাপড়ের সঙ্গে বৌমা প্রণবের স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। পূজোয় ওঁকে আমারও তো কিছু দেওয়া চাই!"

"আমি তোমার সুবিবেচনার প্রশংসা কর্‌তে পার্‌লাম না। আর এক প্রস্থ কই?"

প্রভাত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাপের দিকে চাইলে

"বুঝলেনা? বড়বৌমার কই? প্রণবের স্ত্রীর তোমার কাছ থেকে পাওয়া দরকার, আর তার কি দরকার নেই?"

"সে তো আপনিই আছেন। তা ছাড়া ছোট আর বড় কখনো সমান হয় বাবা?—"

"বুঝি প্রভাত, তা হয়না—কিন্তু এখনি থেকে এ ব্যবস্থা নয়—আর দুদিন পর থেকে। এখন যে দুজনেই কাঁচা—আবার ইচ্ছা, তুমি আর একপ্রস্থ ঐ রকম কাপড়, জামা, ইত্যাদি আনিয়ে দেও।—"

"আপনি বলেন যদি তো আনিয়ে আবাকে দিতেই হবে—কিন্তু শুধু শুধু শ'খানেক টাকা খরচ! একেবারে বাজে!"

"তা বল্লে হবেনা বাবা! সখ করে তুমি এ ফাঁদে পা দিলে কেন?—আজ রাত হয়েছে, তারপর ট্রেনে এসেছ, এখন শোও গে—কাল কিন্তু তুমি ঐ জিনিষ-গুলোর 'অর্ডার' দিতেই চাও। মনে থাকে যেন!"

প্রভাত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাবার ঘরের দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিলে, জগমোহনের ঘর এই ভাবেই খোলা থাকে; কখন বন্ধ হয়না।

নিজের ঘরে ঢুকবার আগে সে একবার প্রভাস ও প্রশান্তর ঘরে উঁকি দিলে—দেখ্‌লে দুই ভাই ঘুমে অচেতন। দরজাটা খোলা, মশারিও ফেলা নাই। পায়ের চটীটা দরজার কাছে খুলে রেখে ঘরে ঢুকে সে মশারিটা বাতাস দিয়ে ফেলে দিলে। পরে বাইরে থেকে কপাট টেনে দিয়ে নিজের ঘরে চল্‌ল।

ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে মীনা তখনো জেগে; মাথার কাছে বাতির আলো রেখে সে কি একটা পড়্‌ছে। বাতির স্নিগ্ধ আলো তার গোলাপী রংটাকে আরও লাল করে তুলেছে; শাদা কাপড়ের ঘন সবুজ পাড়টা তার সারা গায়ে লতার মত লতিয়ে রয়েছে—পা টিপে গিয়ে বিছানার ওপর সশব্দে বসে পড়তেই মীনা চম্‌কিয়ে বইখানা রাখলে। ততক্ষণে প্রভাত বেশ ভাল করে বিছানার ওপর উঠে বসে মুখটা নীচু করতেই দুটো হাত দিয়ে মীনা নিজের মুখটাকে আড়াল করে বললে "ও তুমি? আমি মনে করেছিলাম বুঝি আর কে এল! তাই চম্‌কে উঠেছি।"

মীনার হাত দুটো সরিয়ে দিতে দিতে প্রভাত বললে "কাকে মনে করেছিলে"? ওপাড়ার হবে মালী? আরে দূর! তুমি কি পারবে আমার সঙ্গে জোরে! হাত আড়াল করলেই বুঝি আমার হাত এড়াবে ভেবেছ?" বলে প্রভাত বাম হাতদিয়ে মীনার দুটা হাত এক সঙ্গে ঠেলে দিয়ে, সে হাত দুটো নিজের বুকের কাছে চেপে ধরে রেখে, তার চোখ, মুখ কপাল একেবারে চুমোয় চুমোয় ছেয়ে দিয়ে বললে এইবার! "এইবার কি করবে?" মীনা কিছুই বললোনা শুধু চোখ বন্ধ করে

রইল—মাঝে মাঝে তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

বিজয়ার দিন সকালে, প্রভাতের নামে একটা পার্শ্বেল এল। সে, সেটা নিয়ে না খুলেই জগমোহনের হাতে দিলে। পার্শ্বেলে যে কি আছে, তা সে জানতো—জগমোহন জিনিষগুলো দেখে খুসী হলেন—বল্‌লেন "এগুলি তুমি দিও নিজের হাতে।"

হাজারিবাগ থেকে শুভ্রাংশু পূজোর তত্ত্বের কাপড়, মিষ্টি সব তত্ত্ব ধরে দু'শত টাকা পাঠিয়েছিলেন—সঙ্গে চিঠি ছিল। "কিনবার লোক অভাবে কাপড় প্রভৃতি কিনে পাঠানো গেল না—মাথার ওপরে বাবা নেই, আপনি তাঁর তুল্য, তাই টাকা ক'টা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম—বিধিমত ব্যবস্থা আপনি করবেন। আর একটা কথা—মা আপনাকে জানাচ্ছেন যে মীহু অনেকদিন হল আপনার কাছে গিয়েছে, এখন যদি একবার তাকে পাঠাতে অনুমতি করেন তো বড় ভাল হয়। বেশী দিন থাক্‌বে না—ছেলে মানুষ, প্রথমবার গিয়েছে, এর পরে বড় হয়ে গেলে তো আর আস্‌তেই চাইবে না। যদি আসা মত হয়, তবে প্রভাতের ছুটি ফুরোলে, সে যদি কলকাতা পর্য্যন্ত এনে দেয় তো—সেখান থেকে আনার ব্যবস্থা আমি করব।"

চিঠিখানা জগমোহন মীনাকে পড়্‌তে দিয়ে তার কি ইচ্ছে জানতে চাইলেন। মীনা চিঠি পড়লে—বল্‌লে "এখন তো আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না বাবা! কালী পূজোর পর নন্দা আসবে—আমি যদি না থাকি তো সে ছেলে মানুষ, কার কাছে এসে দাঁড়াবে! তার ওপর আপনার শরীরটা বড্ডই ভেঙে পড়েছে—আমি চলে গেলে ঠাকুরপোদেরও খুব অসুবিধা হবে।"

চিন্তিত মুখে জগমোহন বললেন, "সবই তো বুঝি মা। এ আঁধার বাড়ীখানাকে একলা তুমি হাসির আলো জেলে আলো করে দিয়েছো—কিন্তু মা বার্ধক্যের মত কেমন করেই বলি যে আমাদের সকলের অসুবিধা হবে যে তুমি স্বামীর কাছে যেতে পাবে না—বিশেষ তিনি যখন শোকার্ত। বাবাকেও ক'দিনই বা পেয়েছেন—স্মৃতি যে এখনও রক্তাক্ত হয়ে আছে।"

"তাতে কিছু হবে না বাবা! নন্দা এলে, তাকে সব শিখিয়ে দিয়ে তবে আমি যাব—না হলে আমার অধর্ম হবে।"

"তবে এই-ই স্থির! শুভ্রাংশুকে আমি এই কথাই লিখে দেব!"

"হ্যাঁ—বাবা—আপনি তাই দিবেন।"

হাজারিবাগে শুভ্রাংশু যখন জগমোহনের চিঠি পেলেন, পড়ে শুধু হাসলেন একটু। চিঠিখানা মলিনাকে দেখিয়ে বল্লেন, "দেখ্‌লে মলিন্—স্বামী কি চিজ্। মীহু এখানে আস্‌তে চাইলে না।"

"তোমার যেমন কথা—যেখানে, যাদের কাছে থাক্‌তে হবে তাদের চটিয়ে কি লাভ? মীহু তো বুদ্ধির কাজ করেছে।" বলে মলিনা হাস্‌লে।

"চটিয়ে লাভ নেই তো?"

"না।"

"মনে থাকে যেন।"

"তা, থাকবে।"

শতদলকে শুভ্রাংশু বল্লেন, "মীনা দুদিন পরে আসবে।"

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা। নন্দার বাপের বাড়ী রাইপুর তার শ্বশুর বাড়ী থেকে বেশী দূর নয়। নৌকোয় করে বিসর্জ্জন দেখ্‌তে বেরিয়ে নন্দা শ্বশুরবাড়ী এসে বিজয়ার প্রণাম সেরে গেল। মীনা তাকে খেতে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপোর চিঠি এসেছে? তুই লিখেছিস্?"

খেতে খেতে নন্দা বল্লে "বিজয়ার চিঠি? পাইও নি—লিখিও নি।"

"লিখিস্ নি কেন, লিখিস্। কাছে থাকলে তো প্রণাম করতে হতো। দূরে আছে বলেই বা তুই তা দিবিনে কেন?" সুনন্দার চোখটা ছলছল করে উঠলো—এই প্রথম পূজোতেই যে স্বামীর সঙ্গ বঞ্চিতা হয়ে রইলো। চোখের জল চোখেই রেখে সে বল্‌লে "তাহ্‌লে মশায় কই দিদি? আকনা—প্রণাম করব।"

মৃদু হেসে মীনা বল্‌লে "বাড়ী নেই। বিসর্জ্জন দেখতে গিয়েছেন। তুই আসবি কবে?"

"[illegible] আসবো।" বলে নন্দা উঠে দাঁড়ালো।

"দাঁড়া তোর সঙ্গে একটা লোক দিই" বলে মীনা তাড়াতাড়ি একজন চাকর ডেকে দিলে। সুনন্দা তাকে আর একবার প্রণাম করে চলে গেল।—

রাত্রি অনেক হ'ল—প্রভাত তখনও শুতে আসছে না দেখে মীনা মনে মনে খুব অস্থির হয়ে উঠছিল—সারাদিনের পরিশ্রমে, চোখে তার ঘুম জড়িয়ে আসছিল; কিন্তু আজকের দিনে প্রভাতের আগে তার শুতে ইচ্ছা করছিল না। বসে থেকে থেকে জানলার গরাদের ওপর মাথা দিয়ে হয়তো বা সে একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল—কিসের একটা ঘনগন্ধে তার নিশ্বাস ভারী হয়ে উঠে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখলে, মোটা একটা ফুলের মালা তার মাথা গলিয়ে গলায় দুলছে—আর পাশেই প্রভাত তার মুখের ওপর অচঞ্চল চোখ দুটো রেখে, তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করছে। ঘুম তো তার ভেঙে গেল—তার পরে দেখ্‌লে সে প্রণাম করবার আগেই প্রভাত উঠে দাঁড়িয়ে, দুই হাতে তার মুখখানাকে তুলে ধরে—তার নিজের মুখ ক্রমশঃ নীচু করে আন্‌ছে—তার চোখের সঙ্গে প্রভাতের চোখ মিল্‌লো—সে গভীর দৃষ্টি সে সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করল।

একটু পরেই প্রভাত আবার আলোর কাছে গিয়ে সেটাকে বাড়িয়ে দিলে। তার পরে একে একে কাপড় জামাগুলো যা সেদিন সকালে এসেছিল সব বের করে বিছানার ওপর রাখলে। চিরদিনের সংযত; গম্ভীর প্রভাতের মাথায় সেদিন তরুণ প্রাণের নাচ আরম্ভ হয়েছিল—একে একে সেগুলো সব নিজে হাতে মীনাকে পরিয়ে দিয়ে, সে যখন তার পায়ের আল্‌তার ওপর আর এক টান আল্‌তা টান্‌তে গেল, তখন মীনা আর চুপ করে থাকতে পারলে না—তাড়াতাড়ি পা'টা সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "এতক্ষণ যা' করেছ, সবই তো সহ্য করলাম কিন্তু এ কি তুমি আমায় পায়ে হাত দেবে?"

"দোষ কি মীনু—কৃষ্ণ কি রাধার পায়ে ধরে বলেননি—

দাসখত লিখে দিলাম শ্রীচরণে—

সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।"

"সে রাধার মান হয়েছিল তাই। আমি তো আর মান করি নি। কিন্তু তোমার এ সব কি পাগলামি? কেন শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করলে? আমার কি কাপড়ের অভাব ঘটেছে?

"পাগলামি আমার নয়, বাবার।"

"মানে বুঝলাম না। খুলে বল।"

"অর্থাৎ নন্দাকে দেবার জন্যে যা এনেছিলাম তা দেখেছ তো? সেই সব দেখে বাবার হুকুম হল, আর একসুট জামা না আনিয়ে দিলে নন্দার কাপড় রাইপুরে তিনি পাঠাবেন না। সুতরাং আন্‌তে হলো। দেখ্‌ছি ভালই হয়েছে—এসব পরে তোমাকে দেখাচ্ছে তা আর কি বলব।"

"যাও, তুমি কেবল ঐ রকম করো নিজের বৌকে সুন্দর দেখে। এব

"না—ঐ প'রেই শোও। খুলো।"

"বাঃ! এই প'রে ঘু গরম।"

ঘুমোতে দিলে তো সেই ঢের—নেহাৎ দয়া ক.

সভয়ে মীনা বললে—"না ঘু. বেলা?"

"ও সব আমি জানিনে। তা বলে ঘুমোতে আজ দেবোনা—বিজয়া কি রোজ রোজ হয় নাকি? আজি সখি, জোলোনাক বিজুরীর বাতি

খুলে দাও সব দ্বার

ঘর আজ হোক বার

বিলায় আলোক মালা পূর্ণিমার রাতি"

"আজ তো পূর্ণিমা না।"

"ওই খানেই তো গোল হল। তা ওটাকে 'দশমীর রাত' করলেও পড়তে বাধবেনা। তার পর শোন—

"এ রাতে কে কার মানে শাসন বারণ!"

তুমি আমি নিশি ভোর,

থাকিব নেশায় ভোর

বার মাস উপবাস, আজকে পারণ"।

"আঃ কি কর্ছো যে! আমার ঘুম পাচ্ছে—আমি ঘুমোলাম।"

"বটে! তাই নাকি? উঠিয়ে বসিয়ে দেব এমনি করে।" বলে প্রভাত মীনার ঘাড়ের নীচে হাত চালিয়ে তাকে উঠিয়ে বসালে।

"নাঃ! তুমি দেখ্‌ছি আমাকে কাল একটা লজ্জাকর ব্যাপারে না ফেলে ছাড়বেই না।

নিশ্চয়ই না। তুমি আমাকে চাচ্ছনা আর সুনন্দা ...ন্যা একলা বিছানায় শুয়ে আছ।"

... চচ্ছিনা কে বললে? সারারাত জাগিয়ে ...খাওয়া হলো?"

...তে আর বাকিই বা কত! তুটো ...া রাতই বা!

...া। আমি তোমার পায়ের ...ম—যা ইচ্ছে তুমি কর। ...নে!"

... আশ্রিতকে আশ্রয় দান ...ই বা সে ধর্ম্ম লাভে ... প্রভাত তার পায়ের কাছ ...াকে একবারে নিজের পাশে শুইয়ে দিলে।

"ঘুমোবেনা, ঘুমোবেনা করেও প্রভাত ও মীনা গল্প কর্‌তে কর্‌তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে—তা তারা কেউ বুঝতে পারেনি। সকলেও মীনার ঘুম আগে ভাঙ্‌লো, ধীরে ধীরে প্রভাতের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে সে যেমন নাম্‌তে যাবে, আঁচলটা শক্ত করে মুঠার মধ্যে চেপে ধরে প্রভাত বল্লে এই, পলাচ্ছ যে চোরের মত!

দুই চোখে মিনতি ভরে মীনা বল্‌লে "ছেড়ে দাও যাই। বেলা হচ্ছে যে!"

"বল—তুপুরে আবার আস্‌বে?"

"আচ্ছা—চেষ্টা দেখ্‌ব।"

"না—ও আমি শুনবনা।" বলে প্রভাত মীনার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে বন্দী করে পাশ ফিরে শুলো। নিরুপায় মীনা বললে "আচ্ছা আস্‌বো। এখন ছাড়ো তো!"

তা ছাড়ছি—কিন্তু কথা দিলে তা মনে থাকে যেন।"

'তা থাক্‌বে—না হলে তোমার কাছে তো অসংখ্য উপায় আছে। বলে হাস্‌তে হাসতে মীনা একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।—

ক্রমশঃ

স্বপ্ন পুরাণ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

মোর কণিকার থেকে পড়েছিল খসি'
তু'চারিটী কথা গান তুচারিটী দিন,
কখনো নৃত্যের ছন্দে কখনো আলসি',
কভু সাড়া দিয়ে মোরে কভু উদাসীন।—
তুচারিটী মাধবীরে কটিবা শরতে,
আনমনে দেখেছিনু আমারি সে পথে,
কিশলয় যেন চেয়ে ছিল মোর পানে
শ্যামাঙ্গিনী শারদার প্রশান্ত নয়নে,

আছিল হয়ত কোন্‌ কাহিনী স্বপন
ক্ষণিক পথেতে মোর শুধু আলাপন।
জ্যোছনা চেয়েছে স্বপ্নে মুকুলেরা আঁখি
হয়ত মেলিল কভু—'মোরে চেন নাকি?'
বিস্মরিত পুরাণের লেখা সেই লিখে
ফিরে তারা কি কহিতে আসিল আজিকে!

নারীর প্রেম

(একদৃশ্যের নাটিকা)

—নাটিকা—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্ত্তী বি-এল

(সুলতা বাইজি সুসজ্জিত হইয়া তাহার প্রেমাস্পদের জন্ম নিজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল—অকস্মাৎ তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সানন্দে অভিবাদন জানাইয়া হাসিয়া কহিল)

এত সৌভাগ্য আমার হবে তা যে স্বপ্নেও ভাবিনি—

সত্যব্রত। স্বপ্নে ভাবা যায় না অথচ ঘটে এমন তো ঢের জিনিষই পৃথিবীতে দেখা যায় লতা—তা ছাড়া দারোয়ানকে দিয়ে যে জরুরী চিঠি দিয়েছ—

সুলতা। তবুও ভাবলুম, হয়তো এখনও রাগ পড়ে নি—সেদিন যে করে তুমি বেরিয়ে গেলে—তারপর প্রায় সাত আটটা দিন চলে গেল—অথচ—

সত্য। দোষটা কি শুধু আমার একার ?

সু। না—না—তোমার দোষ কি, দোষ তো আমার এই পোড়া অদৃষ্টের—তা না হলে আরও তো তোমার কত বন্ধু আসে—কই, কাউকে একটিবারও তো মদ খেতে বারণ করি নে—

সত্য। আচ্ছা লতা, আমার জন্ম তুমি এত......

সু। মিছে কথা—একটুও না—আমি বাইজী, রূপ বেচে, গান বেচে খাই—কারো জন্ম কি আমার মাথার ব্যথা সাজে ?

সত্য। তা বটে—কিন্তু (একটু কি ভাবিয়া পরে) আচ্ছা সুলতা, আজ মাত্র দু'মাস হয় তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়—অথচ এরি মধ্যে এ আমার কি করলে—আমি যে একমুহূর্ত্তও তোমাকে ভুলতে পারছি নে। পাঁচ ছ বছর হয় এই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছি—সুরার সাগরে তরঙ্গ তুলে বেড়িয়েছি—কতবার কত নারীর কাছে ছুটে গিয়েছি একটু ভালবাসার জন্ম—কিন্তু পেয়েছি জ্বালা, যাতনা—দগ্ধ হয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছি—মনে মনে ভেবেছি, আমার অর্থকেই সবাই চায়—আমার জন্ম কারো প্রাণে এতটুকু দরদ নেই—কিন্তু এতদিনে আমার সেই ভুল ভাঙল—

সু। কেমন করে ?

সত্য। তোমার চোখের জলে—তোমার অব্যক্ত বেদনায়—(একটু হাসিয়া) আচ্ছা লতা, আমার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনটার জন্ম জগতের একটি প্রাণীও তো ব্যাকুল হয় না—তবে তুমি কেন এমন হও ?

সু। (হাসিয়া) বোধ হয় অর্থের লোভে—

সত্য। মিথ্যে কথা—সে লোভ যে তোমার নেই তা আমি বেশ জানি—

সু। তবে ?

সত্য। বোধহয় ভালবাসার—প্রাণের টানে। কিন্তু তুমি ঠক্‌বে লতা, এ যা'কে ভালবাসছ তার জন্ম শেষে কাঁদতে হবে—

সু। যদি ভালবেসেই থাকি—না হয় একটু কাঁদব—

সত্য। (সহসা দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া) কাঁদবে লতা, আমার জন্ম তুমি কাঁদবে ?

সু। (সত্যব্রতের বুকে মাথা রাখিয়া) হাঁ প্রিয়তম—

সত্য। কিন্তু কতদিন ?

সু। চিরদিন—(হঠাৎ দূরে সরিয়া গিয়া) না—না, মিথ্যে কথা—আমি তোমাকে ঘৃণা করি—

(সত্যব্রত স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল)

সু। আমরা গণিকা, জগতের ঘৃণ্য কীট বটে—কিন্তু তাই বলে একটা মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খল যুবককে ভালবাসার প্রবৃত্তি আমাদের নেই—

সত্য। তুমি আমায় ভালবাস না সুলতা ?

সু। না—একটুও না—

(কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বিরাট নিস্তব্ধতা সেই গৃহে বিরাজ

করিতে লাগিল। সত্যব্রত পলকহীন দৃষ্টিতে সুলতার দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। হঠাৎ করুণ কণ্ঠে কহিল—)

সত্য। কিন্তু—কিন্তু আমার উপায় কি লতা? আমি যে সত্যই তোমায় ভালবেসেছি—

সু। (বিকট স্বরে হাসিয়া) ভালবেসেছ—তুমি আমায় ভালবেসেছ? আশ্চর্য্য বটে!

সত্য। আশ্চর্য্য কেন?

সু। তুমি যে পুরুষ—পুরুষ কি কখনো ভালবাস্‌তে পারে বন্ধু?

সত্য। পারে না?

সু। না—তারা ভালবাসে শুধু নারীর রূপ, নারীর যৌবন—কিন্তু সত্যিকার ভালবাসা তারা শিখ্‌বে কোথায়?

সত্য। আর নারী?

সু। হাঁ—তারা জানে এ জিনিষটা কি—তাই তাদের ভালবাসা শাশ্বত ভাস্বর, সহস্র কুসুমের সুষমায় মণ্ডিত জ্যোছনার মত পবিত্র, স্নিগ্ধ! নারী যা'কে অন্তরে স্থান দেয়—সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত দয়িতের চরণে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরে—আর পুরুষ মিথ্যা ভালবাসার অভিনয়ে নারীর চিত্ত জয় ক'রে, বিজয়ীর গৌরবে স্ফীত বক্ষে ছুটে যায় নতুনের সন্ধানে—

সত্য। মিথ্যে কথা—

সু। না—মিথ্যে নয়—অত্যন্ত সত্য—আর এ সম্বন্ধে আমি একটা গল্পও জানি—শুনবে?

সত্য। আচ্ছা বল—

সু। সে আজ অনেকদিনের কথা, পাড়াগেঁয়ে একটি মেয়ে ছিল, নাম তার মণিমালা, কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠে তার জড়িয়ে দিলেন বিষের মালা—তাই বছর না ঘুরতেই সে হারাল তার পিতাকে—আর দশ বছরে পা না দিতেই নারীর সব চেয়ে দুর্ভাগ্যের চিহ্ন সাদা দেহে মেখে সে ফিরে এল শ্বশুর বাড়ী থেকে অভাগিনী মায়ের অঞ্চলের পাশে। অবুঝ মেয়ে মায়ের চোখের জল দেখত বটে কিন্তু কারণ কিছুই বুঝ্‌ত না—তখনো সে শরতের জ্যোছনার মত হাসি ছড়িয়ে, কেশ এলিয়ে নিজের নির্ম্মল আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াত। কিন্তু দুরন্ত যৌবন চুপ্‌ করে রইল না—দুদিন না যেতেই তার মন ও দেহের উপর দিয়ে রঙের তুলি বুলিয়ে দিলে—আর সেই কিশোরী বালিকা তার স্তিমিত চোখ দু'টী ঈষৎ মেলে পৃথিবীর পানে তাকালে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে দেখ্‌তে পেল এক যুবককে, যে রঙীন সুধায় ভরা একটি গ্লাস তার সম্মুখে ধরে নিভৃতে বল্লে, 'ওগো বনফুল, তুমি কি কেবল বনেই ফুটে থাক্‌বে—আলো বাতাসে দুল্‌বে না? চেয়ে দেখ, এই বক্ষে তোমার আসন পেতেছি—আর এই মদিরাটুকু এনেছি তোমার মন কুসুমের পাপড়িগুলো রঙীন করতে—ওকি তুমি অমন কর্চ্ছ কেন?

সত্য। (কম্পিত কণ্ঠে) না—না কিছু কর্চ্ছিনে—কিন্তু একি তুমি গল্প বলছ লতা?

সু। হাঁ গল্প বইকি—তা—তা যদি তুমি—

সত্য। (পাশের ইজি চেয়ারের উপর ধপ্‌ করিয়া বসিয়া চক্ষু বুজিয়া নিজের চিত্তের চঞ্চলতাকে সংযত রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে করিতে) না—তুমি বলে যাও—

সু। তারপর সেই চৌদ্দ বৎসরের অনভিজ্ঞা সরলা বালিকা কম্পিত হস্তে তা গ্রহণ করে সবটুকু নিঃশেষে পান করে, মুগ্ধ বিমোহিত হয়ে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের পায়ে বিকিয়ে দিলে। এই ভাবে অসীম আনন্দের হিল্লোলে তারা দু'জন নেচে নেচে দুলে দুলে ভেসে চল্‌ল দীর্ঘ তিনটি মাস—যুবক ভুল্‌লে জগৎ—কিশোরী ভুল্‌লে তার পোড়া অদৃষ্ট—তার ভবিষ্যৎ। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার এমন একটি দিন এল, যেদিন কিশোরী বল্লে, 'কই, বিয়ে করবে যে বলেছিলে?' 'বিধবাকে বিয়ে?' যুবক চিন্তিত হ'ল—বুঝ্‌লে এইবার বুঝি তার ধাপ্পা বাজি ধরা পড়ে—তাই সে বল্লে, 'হাঁ, নিশ্চয়ই—তবে দিন কয়েক পশ্চিমে……না তবে আর বলা হ'ল না—তোমার মুখ যে কেমন ফ্যাকাসে…

সত্য। না—না কিছু নয়—কিন্তু—এ—এ গল্প তুমি…

সু। কোথায় পেয়েছি জানতে চাচ্ছ? জেনো'খন—কিন্তু এখনো যে গল্প শেষ হল না—

সত্য। (উঠিয়া আসিয়া হঠাৎ লতার হাত ধরিয়া) পূর্ব্ব জন্মে কি তুমি ব্যাধ ছিলে লতা?

সু। সে কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন?

(হাত ছাড়িয়া দূরে সরিয়া গিয়া ইজি চেয়ারের উপর বসিয়া)

সত্য। না—কিছু নয়—ভাব্‌ছি···আচ্ছা, তুমি বল—

সু। কিন্তু সেই যে তার পশ্চিমে যাওয়া, তাই হ'ল মণির কাল। অভাগিনী নারী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আশার প্রদীপ জেলে প্রতিনিয়ত পথের পানে চেয়ে রইল—কিন্তু সুদীর্ঘ দু'টী বৎসরের ভিতরেও আশা তার পূর্ণ হল না—শুধু পূর্ণ হল কান দু'টী অজস্র কুৎসায়—তাই প্রাণের দুঃসহ জ্বালা নিবৃত্ত করতে ছুটে গেল এক গভীর নিশীথে খড়দ'র ঘাটে······

(সত্যব্রত অকস্মাৎ ছুটিয়া গিয়া সুলতার হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল)

সত্য। লতা, লতা, সে কি তবে···

সু। ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

সত্য। একি বল্‌ছ লতা, ব্যস্ত হব না? একটা পবিত্র কুসুমকে বৃন্তচ্যুত করেও কি আমি ব্যস্ত হব না? আমি পাপী, আমি নরাধম বটে—কিন্তু মানুষের মতই রক্ত-মাংসে যে এ দেহ গড়া—তাই আজ অনুতাপের তীব্র আগুনে এ বুকটা পুড়ে যাচ্ছে—উঃ অসহ্য—অসহ্য—

(শোকাচ্ছন্ন হইয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতেই সুলতা তাহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে বিছানার উপর শোয়াইয়া মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে বাতাস করিবার পর সত্যব্রত তন্দ্রাভিভূত হইলে সুলতা উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া সমস্ত অলঙ্কার ও বাইজীর বেশ ছাড়িয়া বিধবার বেশে সাদা কাপড় পরিয়া আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং আলোটা ঈষৎ কমাইয়া দিয়া মৃদু মৃদু ডাকিল)

ওগো, চোখ মেলে চেয়ে দেখ—আমি এসেছি—

সত্যব্রত। (স্বপ্ন দেখিতেছে এই মনে করিয়া) এঁ্যা—এঁ্যা—তুমি এসেছ মণিমালা—তুমি এসেছ—এত মহৎ তুমি যে আমার মত নারী হন্তাকে সান্ত্বনা দিতেও তুমি পরপার থেকে ছুটে এসেছ? কিন্তু এলেই যদি আরও একটু কাছে এস,—ঐ দু'খানি হাত আমার কণ্ঠে রেখে শুধু একবার বল, ওগো আমি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করেছি—

সু। বেশ, তাই হবেখ'ন—যদি তুমি ভগবানের নাম নিয়ে একটা শপথ কর—

সত্য। নিশ্চয় নিশ্চয় শপথ করব মণি, যদি···

সু। এতে আর 'যদি' নেই বন্ধু—একটিবার তুমি শপথ করলেই তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে—

সত্য। (আনন্দে গদ্‌গদ্‌ হইয়া) হবে; আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে মণি?

সু। অবশ্যই, যদি তুমি শপথ কর—

সত্য। আচ্ছা, এই আমি শপথ কর্চ্ছি—বল, কি শপথ করব?

সু। উপরের দিকে চেয়ে করযোড়ে শপথ কর, আজ থেকে জীবনে আর কখনই সুরা ও বেশ্যা স্পর্শ করবে না—

সত্য। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরে উপরের দিকে চাহিয়া করযোড়ে) ভগবান, তোমার নাম নিয়ে শপথ কর্চ্ছি আজ থেকে সুরা ও বেশ্যা আমার অস্পৃশ্য—

সু। (হাসিয়া) তুমি যখন শপথ করলে, তা হলে আমিও আমার পণ রক্ষা করি—(ছুটিয়া কাছে আসিয়া দুই হাত দিয়া সত্যব্রতকে জড়াইয়া ধরিয়া) প্রিয়তম, প্রিয়তম—

সত্য। আঃ কি শান্তি—কি তৃপ্তি—মণি, মণি, আমার ধ্যানের ধন, কল্পনার স্বর্গ—সত্যই কি তোমায় ফিরে পেলুম?

সু। কেন পাবে না, প্রিয়তম, মণি যে তোমারই—তোমাকে ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও তার সুখ নেই—তাই না আবার ধরায় ফিরে এসেছে—

সত্য। আবার স্বর্গে ফিরে যাবে না তো?

সু। না—কেন যাব? এই তো আমার স্বর্গ—নারীর সকল তীর্থের বড় তীর্থ কিন্তু (বলিয়াই মাথা নীচু করিল)।

সত্য। আবার 'কিন্তু' কেন মালা—

সু। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে এই সৌভাগ্য অর্জন করতেও আজ আমাকে ঘৃণিতা বাইজী সাজতে হয়েছে—

সত্য। তার অর্থ?

সু। অর্থ বড় সোজা—(আলো বাড়াইয়া) চেয়ে দেখ দেখি, এখন চিনতে পার কিনা—

সত্য। (কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া) এঁ্যা এঁ্যা, তুমি সুলতা আমার মণিমালা?

সু। হাঁ, আমি সুলতাই তোমার মণিমালা—

সত্য। উঃ ভগবান—(কপালে একখানি হস্ত স্থাপন করিয়া ইজিচেয়ারের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল)।

সু। বড় ব্যথা পেলে কেমন?

(একটু হাসিয়া পরে) আজ সেই মণিমালাকে বাইজীরূপে দেখে অন্তরে খুব আঘাত পেলে নয়? কিন্তু হায় বন্ধু, যখন সেই এক ফোঁটা সরলা বালিকাকে নানা ছলে ভুলিয়ে তার অন্তরের সবটুকু ভালবাসা নিংড়ে এনে জয়ের গৌরবে নতুনের সন্ধানে ছুটে গিয়েছিলে—তখন কি ভেবেছিলে একটিবার যে তোমার নির্ম্মম আচরণে সেই অভাগিনীর কোমল পাঁজরাগুলো কেমন করে চুর চুর হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল—কেমন করে সেই মণিমালা তোমার পথ পানে চেয়ে তিলে তিলে পলে পলে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল? না সে ভাবনা তোমার হবে কেন? তুমি যে পুরুষ, স্রষ্টা, বিধাতা—তাই আজো তোমার অধরে হাসির ফোয়ারা ছোটে—কিন্তু আমার·········না-না যা দেখেছ—ও হাসি নয়—হাসির ভাণ মাত্র—

(একটু হাসিয়া পরে) হাসি আমি কোথায় পাব? আমি যে দেখেছি অভাগিনী বৃদ্ধা মা আমার কন্যার এত বড় কলঙ্ক, এত বড় দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে আমারই চোখের সম্মুখে বুকের রক্ত চোখের জল করে ধরার উপর ছড়িয়ে দিলে—আর নির্ম্মম হিন্দু সমাজ এই অত্যাচার, এই নিদারুণ অবিচার...

সত্য। (হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া) মণি, মণি, উঃ এত নিষ্ঠুর তুমি—

সু। (ঈষৎ হাসিয়া) না বন্ধু, আমি নিষ্ঠুর নই—তাই যদি হতুম তো বুকের বেদনা বুকে চেপে এমন করে সেদিন গঙ্গার কূল থেকে ফিরে আসতুম না—

(একটু হাসিয়া পরে) কেন এসেছি জান? প্রায় মাস পাঁচেক পূর্ব্বে একদিন মা'র শেষ কার্য্য সম্পন্ন করে গভীর নিশীথে ছুটে গিয়েছিলুম গঙ্গার জলে এই দগ্ধ বুকের ব্যথা বেদনা বিসর্জ্জন দিতে—মরণের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সেদিন আমার সমস্ত চিত্ত তোমাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিল—কিন্তু পারলুম কই? অমনি চোখের সম্মুখে করে ফুটে উঠল একখানি মুখ, যা আমার কাছে বড় মধুর—বড় মনোরম—যা'র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেই আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছি—অন্তরের ভিতর দাবাগ্নি জ্বালিয়েছি—ওকি তোমার চোখে জল কেন?

সত্য। মণিমালা, ব্যাধেরও বুঝি মায়া আছে কিন্তু তোমার তাও নেই—

সু। মিথ্যে কথা—কে বলে আমার মায়া নেই? আমি যে নারী—আমার মায়া থাকবে না? তাই যদি না থাকত, তবে কেন সেদিন সেই চির শান্তিকে দূরে ঠেলে এমন ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এলুম—কেন তবে এ ঘৃণিতা বাইজির সাজ ধরলুম—সে তো তোমারই উচ্ছৃঙ্খল জীবন ফিরিয়ে আনতে—

(একটু মৌন থাকিয়া পরে কহিল) একদিন শুনেছিলুম, অজস্র টাকার এক মাত্র মালীক তুমি, সুরার নেশায় মত্ত হয়ে কলিকাতার এক পতিতা নারীর চরণের তলে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছ—তুমি জান না, এ সংবাদ তোমাকে না পাওয়ার ব্যথার চেয়েও কত বেশী বেজেছিল এ বুকে। সেদিন মরণের কূলে দাঁড়িয়েও ঠিক এই কথাটাই আমার মনে পড়ে গেল—ভাবলুম, মরণটা তো হাতের মুঠোর ভিতর, যখন ইচ্ছে একে পাব—কিন্তু তোমার এই যে মহামূল্যের দেহটা নষ্ট হচ্ছে, একে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই না ছুটে এসেছি তোমাকে পথে ফিরিয়ে আনতে—নইলে নকল বাইজি সেজে কৌশলে তোমাকে আমার বাড়ীতে এ হীন প্রবৃত্তি আমার হবে কেন?

(চোখের জল মুছিয়া) নিজের দুঃখের কথা—অসম্মানের কথা তখন এতটুকু ভাবি নি—শুধু ভেবেছিলুম, অভাগিনীর এই তুচ্ছ জীবনের বিনিময়েও যদি—

সত্য। (হাত ধরিয়া) মণি, মণি, এত মহৎ এত উচ্চ তুমি—কিন্তু এতই যদি আজ দয়া করলে, তা হলে একটিবার বল, আমার সকল দোষ, সকল অপরাধ ক্ষমা করে আমার এই হতভাগ্য জীবনের ভার তুমি চিরদিন···

সু। চি-র-দি-ন—না প্রভু, সে সৌভাগ্য আমার নেই—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—

সত্য। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি মালা?

সু। চুপ্ কথা কয়ো না—(উপরের দিকে চাহিয়া হাত যোড় করিয়া স্বগতঃ) ঈশ্বর, আমার অতীত জীবনের কোন কথাই ভাল জানিনে, জান্‌তেও চাই নে—কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর তুমিই যে বার বার আমার কানে কানে বলেছ মন্ত্রের ভিতর দিয়ে না পেলেও অন্তরের ভিতর যার মূর্ত্তি অনুক্ষণ বিরাজ করে, তিনিই স্বামী, তিনিই নারীর সকল দেবতার বড় দেবতা। সেই বিশ্বাসেই আমি আজ স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করলুম—স্বামীকে আমার সৎপথে ফিরিয়ে আনলুম—এখন আর কেন—এইবার তোমার দুঃখিনী মেয়েকে চরণে স্থান দাও আমি মরে জুড়াই—

সত্য। (কম্পিত কণ্ঠে) মণি, মণিমালা, আমাকে যদি মানুষ হবার সুযোগ দিলে—এইবার তবে আমাকে সংসারী হতে দাও—(সুলতা আশ্চর্য্য হইয়া সত্যব্রতের পানে মুখ তুলিয়া চাহিল)।

সত্য। আমি যে তোমাকে একান্ত আপনার করে পেতে চাই মালা—হিন্দু সমাজ যদি স্বীকৃত না হয়—অন্য আইনও তো আছে—

সু। (হাসিয়া) আশ্চর্য্য বটে—কিন্তু সে সাহস কি তোমার আছে?

সত্য। নিশ্চয়,নিশ্চয় মণি—তুমি আমাকে বিশ্বাস কর—

সু। (একটু নীরব থাকিয়া পরে) সত্যি সাধ হয়, আবার তোমার ঐ চরণ সেবা করি—কিন্তু তা কি হয় প্রিয়তম?

সত্য। কেন নয়?

সু। তুমি পুরুষ, তোমাকে বিশ্বাস কি? নারীর প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তোমরা ভালবাস—আজ হয়তো আমাকে ভালবেসে গ্রহণ করবে—কিন্তু কাল? একটা তুচ্ছ আবর্জ্জনার মত দূরে নিক্ষেপ করতেও তো তোমার প্রাণে একটু বাজবে না। না তা আর হয় না—তার চেয়ে আজ আমি এমন কাজ করব যা'তে জগতের সমস্ত নারী জাতি শিখ্‌বে যে পুরুষের প্রলোভন কত ভয়ঙ্কর—নির্ম্মমতা কত নিদারুণ—(বলিয়াই সে কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া বক্ষে বসাইয়া দিল)।

সত্য। (তাড়াতাড়ি তাহার কম্পিত দেহ জড়াইয়া ধরিয়া) একি, একি সর্ব্বনাশ—

সু। (সত্যব্রতের কাঁধে মাথা রাখিয়া) অশ্রু কেন প্রিয়তম? না-না আজ আর কেঁদো না—হাস, কথা কও—এ যে আমার সুখের দিন—এমন সুখের দিনে নারীর এত বড় সৌভাগ্যের দিনে, আনন্দ সাগরে তরঙ্গ তুলে দাও—আর আমি সেই তরঙ্গের সাথে নেচে নেচে···

সত্য। মণি, মণি, আমার সাধনার ধন, কল্পনার স্বর্গ—

সু। বাঃ কি শান্তি—কি আরাম—মণিমালার জীবন। যবনিকার মুহূর্ত্তে এমন পরিপূর্ণ সুখ কে আশা করেছিল!

সত্য। মণি, আমার মণি—

সু। আবার ডাক—আবার ডাক—আজ আমার সব বাসনা এক সঙ্গে পূর্ণ করে দাও—

সত্য। মণি, মণি—

সু। বাঃ কি শান্তি—কিন্তু ও কি—তুমি কাঁদছ? না না আজ আর কেঁদ না—আজ আমার চির আকাঙ্ক্ষিত দয়িতের বুকে মাথা রেখে সুখে যেতে দাও—

(একটু থামিয়া পরে) যাবার দিনের শেষ ভিক্ষা—শেষ প্রার্থনা—

—শুধু বল—একটিবার বল,—তুমি আর কখনও এই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে না—

সত্য। না, মণি, তোমায় ছুঁয়ে শপথ করছি, আর আমি এমন করে জীবন যাপন করব না—কিন্তু তুমি—হায়—কেন এ কাজ করলে? কেন এমন করে আমার মুখের সম্মুখে পরিপূর্ণ সুখের পেয়ালা ধরে আবার তা নিষ্ঠুরের মত কেড়ে নিলে—ওঃ আমার যে বুকটা জলে যাচ্ছে—মণি, মণি, আমার ধ্যানের ধন, ভালবাসার উৎস—কেন এ সর্ব্বনাশ করলে?

(সুলতার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল)

যবনিকা পতন।

চলার পথে

গল্প

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি।

বিপুল জগতের সীমাহীন পথে সঙ্গহীন পথিক আমি চলিয়াছি। আমার সাথী নাই—বন্ধু নাই—সুবিপুল বিশ্বে আপন বলিতে কেহই নাই। দারুণ অবসাদে যখন শরীর মন ভরিয়া উঠে—হতাশার অন্ধকারে যখন সমস্ত আশার আলো নিভিয়া যায় তখন একটি মাত্র সান্ত্বনার বাণী শুনাইতে কেহ নাই সমবেদনার একটি কথা বলিয়া মনোভার লঘু করিতে কেহ নাই! তাই আমি একা।

জীবনের প্রভাত হইতেই আমি হতভাগ্য। শৈশবে-কৈশোরে পৃথিবী যখন স্বর্গের মতই প্রতীয়মান হয়, কোমল ও সরস হৃদয়ে সাধারণতঃ যখন একটিও দুঃখের চিহ্ন পড়িতে পারে না—সঙ্গী-সাথীদের মাঝখানে যখন একটির পর একটি করিয়া দিনগুলি অবাধ গতিতে চলিয়া যায়—তখন হইতেই আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের আরম্ভ হইয়াছে। আত্মীয় বন্ধুগণ একটির পর একটি করিয়া ছাড়িয়া গিয়াছেন। যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের স্থান শূন্যই রহিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে নূতন আর কেহই আসেন নাই। তাই শৈশব হইতেই হইয়াছে কল্পনা ও চিন্তাই আমার নিত্য সহচরী। সংসারের সহিত শেষ বন্ধনে যে সোনার বাঁধনটি আমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—যে বন্ধন দারুণ দুর্ব্বিপাকেও আমায় স্থানচ্যুত করিতে দেয় নাই, সেই বাঁধনটি হঠাৎ যে-দিন আপনা হইতে অপসারিত হইল, সে দিন আমার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া অতি দুঃসহ একটা বেদনা আমায় বিমথিত করিয়া তুলিয়াছিল। শিশুকাল হইতেই মা ছিলেন আমার সব। আমার যাহা কিছু অভাব, অভিযোগ ও অভিমান সব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই সঙ্গীহীনতার বেদনা আমার তত বাজে নাই যতটা এখন বাজিতেছে। তাই তাঁর অভাবে সংসারের শূন্যতা আমায় বড়ই কাতর করিয়া দিল। আমি আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিলাম না। বহুদিনের পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী সহসা মুক্তি লাভ করিলে সে যেমন মুক্তির আস্বাদন গ্রহণে সক্ষম হয় না—আমারও অবস্থা তদ্রূপ হইল। কিন্তু যখন দারুণ রিক্ততা, নিদারুণ ঝঞ্ঝার বিক্ষোভ আসিয়া হৃদয়ের উপর উপর্য্যুপরি আঘাত দিতে লাগিল তখন বুঝিলাম, না এ সব আর না—এখন আমি মুক্ত এখন আমি বন্ধনহীন—এখন আমি এক সুদূর অনির্দ্দিষ্ট পথের অবাধ মুক্ত যাত্রী। তাই গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম এক অজানা পথের পথিক হইয়া আপন চির-নিঃসঙ্গতাকেই সাথী করিয়া।

হৃদয়ের অন্তর্হিত শান্তি, জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য সারা ভারতের কত তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইলাম—কত না যত্নে মনের সুগোপন আশা পোষণ করিয়া দেবতার দুয়ারে ধর্ণা দিলাম কত না পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর স্রোতে অবগাহন করিলাম কিন্তু হায় কিছুই হইল না। নির্জ্জন হিমালয়ের তুষারময় বক্ষের উপর শান্তির অন্বেষণে ঘুরিয়াছি—নিবিড় বনানীর চির নিস্তব্ধতার মধ্যে চির শান্তিময় সাধুর আশ্রমে শান্তি খুঁজিয়াছি—কিন্তু মনের সে লুপ্ত শান্তি আমায় ধরা দেয় নাই। মরীচিকার মত দূরে দিগ্বলয়ের পাশেই থাকিয়া গিয়াছে।

অবশেষে পুনরায় লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। পুনরায় কোলাহলময় জনস্রোতের মধ্যে ভাসিয়া হৃদয়ের দারুণ রিক্ততা পূর্ণ করিবার প্রয়াসে যত্নবান হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে পাটনা নগরীর উপকণ্ঠে পথি-পার্শ্বস্থ এক পরিত্যক্ত গৃহে আপনার আশ্রয়স্থল স্থির করিয়া লইলাম। পরিত্যক্ত পতনোন্মুখ গৃহের অধিস্বামী এই গৃহটি লইয়া কোনও কুল-কিনারা পাইতেছিলেন না—তাই অতি অল্প মূল্যের পরিবর্ত্তেই গৃহখানি হস্তান্তরিত করিয়া দিলেন। সবহারা এই অনির্দ্দিষ্ট পথের

হতাশযাত্রী এই পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহের মাঝে বাসা বাঁধিল।

বাড়িটির একদিকে সহরে যাইবার বাঁধা রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে। অপর পার্শ্বে একটি ছোট বাগানের পরই কল কল নিনাদিনী পুণ্যতোয়া জাহ্নবী সাগরসঙ্গমে বহিয়া চলিয়াছে! বহুদিন পূর্ব্বে নাকি এখানে লোকালয় ছিল। প্রথমে এক মহামারীতে বহু লোক ক্ষয় হয়—তৎপরে নূতন সহরের পত্তনের সঙ্গে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ক্রমশঃ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যাওয়াতে এখন এ অঞ্চল প্রায় জনহীন। দূরে দূরে যাহাদের কোনও কিছু উপায় নাই, এমন কতকগুলি দরিদ্র গৃহস্থ কোনও প্রকারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহারা আমার মত নবাগতের আগমনে কিছুমাত্র কৌতূহল প্রদর্শন করিল না—কেন না, তাহাদের দৈনন্দিন 'এক-ঘেয়ে' জীবন-যাত্রার পথে কোনও কিছুরই ভাবান্তর হয় নাই। কচিৎ দু একটি শাকসব্জী বিক্রেতা আসিয়া 'বাবুসাহেবের' কিছু প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিত, জনকতক দুগ্ধ বিক্রেতা খাঁটি ভয়ষা ও দুগ্ধ সরবরাহ করিতে আসিত। ব্যস এই পর্য্যন্ত!

এরূপ স্থানে একেলা থাকা চলে না—বিশেষতঃ গৃহটির আশুসংস্কারের প্রয়োজন। দক্ষিণ হস্তের আবশ্যক ব্যবস্থার নিত্য পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞলোকের প্রয়োজন, কেননা অনশন ব্রতটা এখনও ততটা আয়ত্ত করতে পারি নাই। দয়াময় ভগবানের রাজ্যে কোনও কিছুরই অভাব থাকে না। আমার প্রয়োজনমত তিনিই একটি কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড আনিয়া দিলেন। বসতবাটিকেও ক্রমশঃ বাসোপযোগী করিয়া লইলাম। অন্য কাজ-কর্ম্ম কিছুই নাই। প্রাতকৃত্য সমাপনান্তে নদীতীরে যাইয়া বসিতাম। দূরে নদীবক্ষে কত নৌকা অজানা দেশ হইতে আসিয়া অজানা দেশে চলিয়া যাইত। কৌতূহল বশতঃ হয়ত দু একজন নৌকারোহী আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আপনাদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করিত। পরে রৌদ্র তেজ যখন প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিত—জঠরজ্বালা যখন বাহ্য প্রকৃতির কথা ভুলাইয়া শরীরের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করাইয়া দিত, তখন নদীতীর ছাড়িয়া আবার গৃহে ফিরিয়া যাইতাম।

গৃহসম্মুখস্থ বারান্দার কিছু পরেই বড় রাস্তা। হাটের দিনে কত নর-নারী নানা পণ্যের বোঝা মাথায় লইয়া দূর গ্রাম হইতে সহরের হাটে বেচা-কেনা করিতে যাইত। কেহ কেহবা আবশ্যক অনাবশ্যকে বাগানের মধ্যস্থ ইঁদারায় পিপাসার শান্তি করিতে আসিয়া ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা পাইত। মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী সহরে যাইয়া সমস্ত দিনটা কাটাইয়া আসিতাম। সহরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া জীবনের লুপ্ত একটা অধ্যায়ের কথা মনে পড়িত—মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত আবার ফিরিয়া যাই জ্ঞানের অনন্ত অপার খনির মধ্যে—আবার নিজেকে হারাইয়া দি। মনের মধ্যে এই সব ইচ্ছা মাঝে মঝে উঠিত আবার ক্ষণিকের পর মেঘের মত মিলাইয়া যাইত। কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতাম না। অবশেষে আর কিছুই ভাল লাগিল না। এরূপ নিঃসঙ্গজীবন দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাই একদিন হঠাৎ গিয়া আইন অধ্যয়ন করিবার জন্য ল'কলেজে নাম লিখাইলাম। কিছুই ভাল লাগিত না—খাতায় নাম লিখাইয়াছি তাই অভ্যাসমত দ্বিচক্রযানে আরোহণ করিয়া প্রতিদিন কলেজে যাইতাম ও আবার ফিরিয়া আসিতাম। বই পত্র কিছুই কিনি নাই। একখানি ছোট-খাতা মাত্র ছিল ছাত্রত্বের লক্ষণ। কলিকাতায় আইন পড়ি নাই, এম এ পড়িবার সময় অনেকেই আইন পড়িবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। আইন কলেজ ছুঁইয়া রাখা ভাল এবং ভবিষ্যতে কিছু না কিছু উপকার হইতে পারে—এরূপ উপদেশও অনেক শুভানুধ্যায়ী দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আইন পড়াটাকে তত ভাল মনে করিতাম না। আইন কলেজের বারান্দা দিয়া দিনের মধ্যে বহুবারই যাতায়াত করিতে হইত, কখনও কখনও বা পরিহাসচ্ছলে আইনের ক্লাশেও গিয়াছি কিন্তু তখন সব সময়েই থাকিত মনের মধ্যে একটা বিষম অবজ্ঞার ভাব। সেইরূপ একটা অবজ্ঞার ক্লাশ লইয়াই আইন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া

ছিলাম। কখনও যে পাশ করিতে পারিব এরূপ ধারণা একেবারেই ছিলনা, কেননা যে জিনিষটা মোটেই বুঝিতে চেষ্টা করিনা, যাহা নীরস সেই বিষয়টা কেমন করিয়া মনে রাখিব? সুতরাং সময় ক্ষেপনই ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। লাইব্রেরী হইতে যে সমস্ত পুস্তক লইতাম আইনের সহিত তাহাদের সংস্রব থাকিত খুবই কম। এমনি করিয়াই প্রায় ছাত্রজীবনের কয়মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

২

একটা বড় কিছু জিনিষ সব সময়েই মহাসমারোহে সংঘটিত হয় না। অতি সাধারণ ভাবেই আরম্ভ হইয়া একটা অসাধারণত্বে পর্য্যবসিত হয়। পূজার ছুটির কিছু পূর্ব্বেই হঠাৎ কলেজ নোটিশ বোর্ডে নোটিশ দেখিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত আইনের অধ্যাপক আইন সম্পর্কে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক দিন বক্তৃতা দিবেন। অধ্যাপকটি যে শুধু একজন বিখ্যাত আইনবিৎ তাহা নহে তিনি একজন বিখ্যাত বক্তাও বটে। স্থির করিলাম তাঁর বক্তৃতাগুলি শুনিতে হইবে এবং যদি সহজবোধ্য হয়ত বুঝিবার চেষ্টা করিতেই বা ক্ষতি কি?

অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে উক্ত বক্তৃতার দিন কয়েকজন নূতন সহপাঠির সহিত বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। একের পর এক করিয়া ক্রমশঃ দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল, কেমন করিয়া তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বক্তা আইনপাঠের একটা নূতন ধারা দেখাইয়া দিলেন। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার নিবারণ করিবার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র হইতেছে আইন। এই অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়াইয়া উঠে তখন আর্ত্তের হতাশা ও হুতাশের মধ্যে আশার আলো জ্বালাইয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আইনের অভ্যুত্থান হয়, সভ্যতার সেই আদিম ধূসর প্রারম্ভে পশুবলই ছিল মানবের একমাত্র সম্বল। তাহাতেই "জোর যার, মুলুক তার" এই প্রবাদ বাক্যের প্রচলন। কিন্তু সভ্যতার ক্রম-বিস্তারের সঙ্গে মানব উপলব্ধি করিতে শিখিল, মানুষ ও পশুর মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্যই যথেষ্ট নহে। মানবের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু আকারেই পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না সেই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হইবে এমন একটি জিনিষ যাহা রহিবে চিরকাল মানবের নিজস্ব—যাহাতে অন্য কোনও প্রাণীর কোনও অধিকার নাই। শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হইতেছে মানবের বিচার-বুদ্ধি। এই বিচার-বুদ্ধিই আমাদের মানুষ করিয়াছে। ইহার বলেই সৃষ্ট জগতের মধ্যে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে।

মানব ক্রমশঃ একটির পর একটি করিয়া নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল—তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিধানটি হইতেছে সাম্যের বিধান: সমাজের সকলেই সমান। ধনীর ধন-সম্ভার তাহার জন্য এক নূতন বিধান দিবে না। কপর্দ্দকহীন পথের ভিক্ষুক ও সুবিপুল ধনের অধীশ্বর সমাজের চক্ষে এক—উভয়ের কোনও প্রভেদ নাই। বিচার-বুদ্ধির ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই সাম্যের বিধানই বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং দেশের বর্ত্তমান আইন প্রতিষ্ঠানগুলিই তাহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। সুতরাং প্রত্যেক আইন পরীক্ষার্থীরই নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের উপর সমাজের তথা জগতের কতখানি মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, ইহা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষভাবে বুঝা উচিত। এই গুরুতর দায়িত্বভার বহনের শক্তি যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের আইন অধ্যয়ন করা একেবারেই মিথ্যায় পর্য্যবসিত হয়। ইহাই হইতেছে তাঁর সুবৃহৎ বক্তৃতার অবতরণিকা, তৃতীয় দিবসে আমার সঙ্গী বন্ধুগণ অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময়টা তাঁহারা বৃথা নষ্ট করিতে অপারগ হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। অবতরণিকার ঐ কয়টি কথা আমার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব বাধাইয়া দিল। ভাবিলাম, আমি করিয়াছি কি? ভগবানের অদৃশ্য হস্ত আমায় এ কোথায় আনিয়াছে, যদিই বা আনিয়াছে, এই সাধনার মহাক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ আমার দ্বারা কি সম্ভব হইবে? বক্তৃতার আদ্যোপান্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিলাম ও সবশেষে মনে হইল বিশেষ দুর্ব্বোধ ত নহে। অবশেষে পূজার ছুটি আরম্ভ হইয়া গেল। আইন পাঠের প্রতি আজন্ম পোষিত আমার যে একটা হতশ্রদ্ধা ও অবহেলার

ভাব ছিল এখন তাহার অস্তিত্বও অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। এই তথ্যের সত্যাসত্যের নিরূপণ করণার্থে অধীত বিষয়ের গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলাম। পাঠ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, মনের তৃষ্ণাও তত বাড়িতে লাগিল। নীরস আইনের গ্রন্থমধ্যে জীবন-মরণের জিয়নকাঠি যে কিরূপভাবে গুপ্ত হইয়া থাকিতে পারে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিলাম। অভাবনীয় উপায়ে আমি এক নূতন রসের আস্বাদন পাইলাম।

এইরূপে ক্রমশঃ শেষ পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। পরীক্ষা দিবার পর মনের মধ্যে একটি তৃপ্তি পাইলাম, তাহা পূর্ব্বে কোনও পরীক্ষায় পাই নাই। অবশেষে যখন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল, তখন দেখিলাম, সেই বৎসরের পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে পরীক্ষকগণ কর্তৃক আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইনবেত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি। এই ব্যাপারটি যখনই মনের মধ্যে আলোচনা করিতে থাকি তখনই আমি নিজেই অবাক হইয়া যায়। চিরদিনই যে বিষয়ের সহিত একটা দারুণ অসহযোগ করিয়া আসিয়াছি হঠাৎ তাহার সহিত এ গভীর সহযোগ কেমন করিয়া সম্ভব হইল এবং ইহাই যদি সম্ভবপর হয় তবে জগতে অসম্ভবই বা কি? ভগবানের অলঙ্ঘনীয় বিধান কোন পথ দিয়া কাহাকে কোথায় লইয়া যায় তাহা অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব। ইহার প্রতিবাদ করিবে কে?

৩

অবশেষে একদিন যথাবিধি 'ধড়া-চূড়ায়' সজ্জিত হইয়া পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে বাহির হইলাম। ভাল করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং আদালতে প্রকৃত পক্ষে ভাল উকিল বলিয়া গণ্য হওয়ার মধ্যে যে কতখানি প্রভেদ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। অধিকাংশ দিবসই অপরের প্রদত্ত আইনের সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া দিনাতিপাত করিতে হইত। প্রতিদিনই সংবাদ রাখিতাম কোন ঘরে কোন মোকর্দ্দমা উঠিবে। তাহার মধ্যে [illegible]মটি বাছিয়া লইয়া সেই ঘরে যাইয়া বসিতাম। কদাচ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত, যখন কোনও সিনিয়র উকীল দয়াপরবশ হইয়া আমার মত নবাগতকে তাঁহাদের জুনিয়র করিয়া লইতেন। আবার তাঁহারা যখন একই সময়ে একাধিক মোকর্দ্দমায় লিপ্ত থাকিতেন তখন তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে আমি কিছু কিছু মোকর্দ্দমা নিজেই পরিচালনা করিবার সুযোগ পাইতাম। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল—আমার উৎসাহ কিন্তু ভঙ্গ হইল না। ঘরে অধিক পয়সা আনিতে পারি নাই বলিয়া মনের মধ্যে কিছুমাত্র আক্ষেপ নাই। কোর্ট হইতে ফিরিয়াই আর্দেল লইয়া বসিতাম পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাহির হইয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক নির্জ্জন ঘাটে যাইয়া নিজের কল্পনা লইয়াই বিভোর থাকিতাম। কখনও বা আমার বহুদিনের সাথী বাঁশের বাঁশীটি লইয়া আলাপ করিতাম।

ইত্যবসরে আমার অদৃষ্টাকাশে এক অভিনব ব্যাপারের সংঘটন হইল। রাও বাহাদুর হরিনাথ সিং একজন বিখ্যাত ধনী এবং জমিদার। আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ জায়গীর পাইয়াছিলেন এবং তদবধি নির্ব্বিবাদে সেই সব ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বিগত ১৫ বৎসর ধরিয়া তাঁহার গ্রহের ফের হইয়াছে। নিকট সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতির সহিত বিষয় লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছে। ক্রমান্বয়ে ১৫ বৎসর ধরিয়া মোকর্দ্দমার ফলে সাধারণতঃ লোকের যা অবস্থা হয় তাঁহারও তাই হইয়াছে। গত বৎসর আবার বিখ্যাত সেসন জজ মিঃ টমসনের রায়ে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। আজন্মকাল সুখের ক্রোড়ে লালিত হইয়া জীবনের সন্ধ্যায় আজ এই দারুণ অবস্থা বিপর্য্যয়ে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সরল সবল দেহ তাঁহার দুশ্চিন্তায় নোয়াইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় ব্যারিষ্টারের পরামর্শে হাইকোর্টে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছেন। তাঁহারা আশা দিয়াছেন, কতকগুলি আইনের প্রশ্ন এই মোকর্দ্দমার প্রথম হইতেই লোকের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। সেইগুলির উপর নির্ভর করিয়া পুনরায় মোকর্দ্দমাটির বিশ্লেষণ করিলে হয়ত জেলা জজের রায়ের পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু ঐ প্রশ্নই তাঁহারা

বলিয়াছেন ইহা ভীষণ পরিশ্রম সাপেক্ষ—উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে তাঁহারা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। বড় বড় উকীল এবং ব্যারিষ্টারগণ যাঁহারা অপরের কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে বিনা বাধায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া জগৎমধ্যে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি ন্যস্ত থাকে শুধু লোকের মুদ্রাধারের দিকে—মুদ্রাধারের অবস্থা সন্তোষজনক না হইলে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই। লোকের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিবার তাঁহাদের অবস্থা কোথায়! তাই আজ যে ব্যারিষ্টার সাহেবটি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া রাও বাহাদুরের প্রদত্ত অর্থে প্রভূত বিত্তশালী হইয়াছেন, তিনি নির্ব্বিচারে তাঁহাকে শুনাইলেন পয়সা না পাইলে তিনি বৃথা পরিশ্রম করিতে রাজি নহেন। মোকর্দ্দমার সখ থাকিলে পয়সা সংগ্রহ থাকা চাই। মুখের কথায় কিম্বা পূর্ব্ব সম্পর্কের খাতিরে মোকর্দ্দমা হয় না।

যিনি একদিন আপন অর্থে শত শত দীন দরিদ্রকে প্রতিপালিত করিয়াছেন—যাঁহার প্রদত্ত অর্থে বহু লোকহিতকর অনুষ্ঠান সফলতার আলোক পাইয়া ধন্য হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অদৃষ্টের এ কি দারুণ পরিহাস! কয়েক মাস ধরিয়া এবং কয়েকস্থানে বিফল প্রযত্ন হইয়া তাঁহার পুত্রের বন্ধু এবং আমার এক সহপাঠির পরামর্শে রাও বাহাদুর আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিয়তির চক্রের গতি অপরিজ্ঞেয়—যে মোকর্দ্দমার ফলাফলের উপর রাও বাহাদুরের মান-সম্ভ্রম এবং যথা-সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে সেই মোকর্দ্দমার ভার পড়িল আমার উপর। কেননা, তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। এমন কি এক সঙ্গে অন্যান্য ব্যয়ের উপযোগী দুই এক সহস্র মুদ্রাও তাঁহার নাই। নিমজ্জমান ব্যক্তি স্বীয় প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যেমন ভাসমান তৃণখণ্ডের প্রতিও হস্ত বিস্তার করে, তেমনি রাও বাহাদুর তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব রক্ষার ভার আমার উপর দিয়া বলিলেন—"বাবু সাহেব, আপনি আমার পুত্রের সমবয়সী—বয়সে নবীন হইলেও আদালতে আপনার নাম আছে—এই গরীব বৃদ্ধের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা আপনাকে করিতেই হইবে—অর্থ ও সামর্থ্য আমার নাই। সম্বল আছে শুধু নয়নের অশ্রুরাশি আর আপনাকে দিবার মত আছে আমার প্রাণ খোলা শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।"

প্রথমে ভয় হইল। এমন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে কেমন করিয়া হস্তক্ষেপ করি। নিরুপায় আশ্রয়-সম্বলহীন বৃদ্ধকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতেও অন্তরের অন্তরে দারুণ সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলাম। অনেক চিন্তার পর যুগযুগের অতিপুরাতন বাণী 'যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' স্মরণ করিয়া ও ভগবানের চরণোদ্দেশে নিজের প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া কাগজ পত্রাদি বুঝিয়া লইলাম এবং অকপট চিত্তে তাঁহাকে বলিলাম আমার যথা সাধ্য করিব। মনে ভাবিলাম, ভগবানের কৃপা থাকিলে তিনিই আমায় হাত ধরিয়া অন্ধকার দুর্গম পারাবার পার করিয়া সফলতার আলোকোজ্জ্বল তীরে পৌঁছাইয়া দিবেন! কে বলিতে পারে যে, ইহাই আমার জয়-যাত্রার-পথের বৈজয়ন্তী পতাকা হইবে না!

মাত্র একমাস সময়—তাহার মধ্যে আমায় প্রস্তুত হইয়া লইতে হইবে। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কাগজ পত্র খুলিলাম এবং ক্ষেপা যেমন পরশ পাথর পাইবার লোভে বাহির হইয়াছিল সেইরূপ পূর্ণ উৎসাহে ও অখণ্ড মনোযোগের সহিত স্বপক্ষীয় তথ্য সমূহের অনুসন্ধানে রত হইলাম। কবি সত্যই বলিয়াছেন—'করুণা তোমার কোন পথ দিয়া কোথা নিয়ে যায় কাহারে'—যিনি-সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধিস্বামী, যাঁর ইঙ্গিতে প্রতিপলকে সহস্র সহস্র সৃষ্টির প্রলয় ও গঠন সম্ভবপর হয়—কঠিন পাষাণের হিয়াও দ্রবীভূত হয়, কালের করাল কবলও শিথিল হইয়া আসে, বোধহয় তাঁর অফুরন্ত অশীর্ব্বাদের অনাবিল ধারা আসিয়া আমার সর্ব্ব অঙ্গ পরিপ্লাবিত করিয়া দিল—নিবিড় তমসাচ্ছন্ন প্রহেলিকাময় পথে করুণার কনক কিরণ পাত হইল। সপ্তাহকাল অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বুঝিতে পারিলাম, ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম ও অভ্রান্ত নির্দ্দেশ পাইলাম, যাহার উপর সমস্ত মোকর্দ্দমাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বারম্বার আলোচনা করিয়া প্রত্যেক ছত্রের সম্ভব এবং অসম্ভব রকমারের

ব্যাখ্যা করিয়া দেখিলাম—প্রতিবারেই মন বলিল, 'হাঁ তোমার যুক্তি অভ্রান্ত'। তখন প্রয়োজন শুধু সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া ধীর পদ বিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া। বিজয়ের দিন আসিয়া পড়িল। সে দিন আমার জীবনের বিশেষ স্মরণীয় দিন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে দিনের প্রত্যেক তুচ্ছতম ঘটনাগুলির কথাও আমি ভুলিতে পারিব না—কেননা সেদিন রাও বাহাদুরের মত আমাকেও পথ হইতে কুড়াইয়া সৌভাগ্যের ক্রোড়ে ফেলিয়াছে, সাথীহীন সঙ্গীহীন গৃহহারা উদাস যাত্রীকে আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মাঝে টানিয়া আনিয়াছে এবং সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ও আরও দুইজন বিচারপতির নিকট এই মোকর্দ্দমা উঠিবে। প্রতিপক্ষ বহু অর্থশালী অর্থ ও ব্যবসাব দ্বারা যতদূর সম্ভব হয় তাঁহারা ততদূর করিয়াছেন। কলিকাতা ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের দুইজন প্রসিদ্ধ বিদেশী ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। আমি যখন আমার কাগজ-পত্র এবং গ্রন্থ সম্ভার লইয়া আসন গ্রহণ করিলাম তখন তাঁহাদের গম্ভীর মুখে অবজ্ঞার মৃদু হাসি স্ফুরিত হইল। বিচারকত্রয় আসিয়া কটাক্ষপাতে এই নবীন উকীলের পানে চাহিয়া লইলেন। একজন নবীন উকীল এরূপ জটিল মোকর্দ্দমার ভার লইয়া প্রধান বিচারপতির এজলাসে বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ব্যারিষ্টারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, ইহা দেখিবার ও শুনিবার বিষয় বলিয়া আদালত-গৃহ জনপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দুই সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া আমাদের আইনের তর্ক-বিতর্ক চলিল—ক্রমশঃ দেখিলাম, প্রতিপক্ষের ব্যারিষ্টারদের মুখের অবজ্ঞার হাসি অন্তর্হিত হইয়াছে এবং গম্ভীর মুখমণ্ডল ও ললাটের কুঞ্চনে চিন্তার স্পষ্ট চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে সত্য সত্যই একদিন দুই পক্ষের বক্তব্য শেষ হইল এবং বিচারকগণ তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিবার দিন ঘোষণা করিয়া মোকর্দ্দমার যবনিকা পাত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে কম্পিত আশা ও শঙ্কিত উৎকণ্ঠার প্রবল তাড়না লইয়া বিচার গৃহে প্রবেশ করিলাম এবং বিচারকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে ধীর ও গম্ভীর পদবিক্ষেপে বিচারকত্রয় আপনাপন আসনে উপবেশন করিলেন। প্রধান বিচারপতির স্থির ধীর দৃষ্টি কিয়ৎক্ষণ আমার উপর স্থাপিত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া গেল। তাঁহার প্রশান্ত মুখের পানে চাহিয়া মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। পশ্চাতে উপবিষ্ট রাও বাহাদুরের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার মনের মধ্যেও সংশয় ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বের সীমা নাই। তাঁহার সুগৌর মুখমণ্ডলে তাহার অস্পষ্ট চিহ্ন প্রকটিত হইতেছে।

গুরু গম্ভীর কণ্ঠে প্রধান বিচারপতি তাঁহাদের মন্তব্য পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম হইতেছে আমাদের স্বপক্ষে। আমাদের জয়লাভ হইয়াছে। রাও বাহাদুর তাহার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবেন এবং মোকর্দ্দমার খরচ বাবদ কয়েক সহস্র মুদ্রা নগদ পাইবেন। পরিশেষে আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রধান বিচারপতি বলিলেন "The bar is to be congratulated on its acquisition of such a promising member."

(৪)

তারপর প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রাও বাহাদুরের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা খুবই বাড়িয়াছে। তাঁহার পুত্রগণ আমাকে তাঁহাদের ভায়ের মতই দেখেন এবং তাঁহাদের জননীও আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া থাকেন। মোকর্দ্দমার পারিশ্রমিক স্বরূপ আমি শুধু তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা আমার এ প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। আমার পুরাতন গৃহই তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে আয়তনে ও চাকচিক্যে সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং তাঁহাদেরই অনুরোধে আমায় মোটরকার রাখিতে হইয়াছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর সম্মিলিত আশীর্ব্বাদে আমার দিনগুলি এখন ভাল ভাবেই কাটিতেছে।

আপন কর্ম্মেই তন্ময় হইয়া থাকিতাম। ক্রিকেটের মধ্যে যে এত আকর্ষণ থাকিতে পারে তাহা ধারণাই

করিতে পারিতাম না। মোকর্দ্দমা যতই জটিল হইত, তাহার সেই দুর্ব্বোদ্ধ জটিলতা দূর করিতে ততই আনন্দ পাইতাম। কাজেই আমায় সর্ব্বদাই নিজকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকিতে হইত। প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহর হইতে বহুদূরে নির্জ্জন নদীতীরে যাইয়া বসিতাম। বসিয়া দেখিতাম সেই দ্রুত নদীর শ্রান্তিহীন জলোচ্ছ্বাস ও শুনিতাম তাহার চিরমধুর অস্ফুট কলগান। একদিন আমার নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণ স্থানে পৌছিয়া দেখিলাম কে আমার সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তিময় স্থানের শান্তিভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নদীর তীরে একখানি প্রকাণ্ড মোটরকার দাঁড়াইয়া আছে এবং অদূরস্থিত একটি অর্দ্ধভগ্ন বেদির উপর একজন ইংরাজ ভদ্রলোক এবং একটি ইংরাজ মহিলা উপবিষ্ট আছেন। আমার গাড়ীর শব্দে তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্রমশঃ আমার নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলাম, তাঁহারা আর কেহই নহেন—হাইকোর্টের চিফ্ জাষ্টিষ সার এণ্ড্রু ক্রেজার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী। অভিবাদনাদির পর সার এণ্ড্রু লেডি ক্রেজারের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন ও বলিলেন—কয়েকদিন হইতে আমরা এই পথ দিয়া ভ্রমণ করিতে যাইবার কালে এই কবিজনোচিত স্থানটিতে একটি মোটর দাঁড়াইতে দেখি। মোটরের মালিকের পরিচয় পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। আপনি কোনও সভা-সমিতি বা সান্ধ্য-মজলিসে যোগদান করেন না। অনেক স্থানেই শুনি আপনি নিমন্ত্রিতদের অন্যতম কিন্তু আপনি সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বত্রই দুষ্প্রাপ্য। সেইজন্যই আপনার সহিত আলাপ করিবার জন্য এ হেন নির্জ্জন স্থানে আসিতে হইয়াছে। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহারা যে দয়া দেখাইতেছেন তাহার জন্য তাঁহাদের শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, মহাশয় জগতে আমি চিরদিনই একা, চির দিনই আমি উদাসী। আধুনিক সভ্য সমাজের পরিমার্জ্জিত রুচিও আচার ব্যবহারের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আমার নাই—তাহা ছাড়া তুচ্ছ নগণ্য আমি ধনীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে কুণ্ঠা বোধ করি। অজ্ঞতা বশতঃ হয়ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদের নিকট কোনও অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া ফেলিব। এই ভয়েই আমি কোথাও যাই না। আপন কাজকর্ম্ম লইয়াই কোনও ক্রমে দিনাতিপাত করি। এই স্থানটি বেশ সুন্দর ও নির্জ্জন তাই দিনান্তে পরিশ্রমের পর এই স্থানে আসিয়া শ্রান্তি দূর করি। ইহার পর রোজই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। প্রধান বিচারক ও নবীন উকীলের মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াই চলিল।

একটি জটিল মোকর্দ্দমার জন্য কয়দিন আমার সান্ধ্য-ভ্রমণ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। আজ সেই মোকর্দ্দমার শেষ হইয়াছে এবং আমাদের জয়লাভই সুনিশ্চিত বুঝিয়া মনটা বড়ই শান্তি লাভ করিয়াছে। আজ কোর্ট হইতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই ফিরিয়া জলযোগের বন্দোবস্ত করিতেছি এমন সময় গাড়ী বারান্দায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল শুনিতে পাইলাম। এমন অসময়ে কে আসিল দেখিবার জন্য জানালার নিকট গিয়া দেখিলাম সার এণ্ড্রু ক্রেশার গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। কোনও সংবাদাদি না দিয়াই তিনি আমার উপরের বসিবার ঘরে চলিয়া আসিলেন এবং আমার কাঁধে হাত রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি। এখন বেলা পাচটা বাজিয়াছে এখন হইতে ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরে আপনাকে আমার গৃহে যাইয়া আমার নিকট হাজির হইতে হইবে। এখন আসুন আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত আমায় কিছু খাইতে দিন। এই বলিয়াই তিনি একখানি চেয়ার টানিয়া টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন যথাসময়ে বিনা নিমন্ত্রণের জলযোগ সারিয়া তিনি আমায় সবিশেষ ঘটনা বলিলেন। আগামী কল্য তাঁহার গৃহে একটি বন্ধু সম্মিলনী হইবে। আমাকেও যাইতে হইবে। পাছে আমি না যাই এই জন্যই তিনি স্বয়ং আমায় তাঁহার নিজের ও লেডী ক্রেশারের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। আমার যাওয়া চাই এই কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া তিনি বিদায় লইলেন।

হে জগদীশ্বর, তোমার কি অনন্ত লীলা। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ক্রেশার স্বয়ং আমায় নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন! যে অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় এই অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত তাঁহার চরণে আমার শত সহস্র প্রণাম জ্ঞাপন করিলাম।

নারীর অভিশাপ

গল্প

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

কাঙালীচরণের স্বভাবটাই ছিল অতি সাদাসিধা ধরণের। এমন কোনও একটা বিশেষ গুণ ছিল না, যাতে লাখ লোকের মধ্য থেকে তাকে বাছাই করা যেতে পারত। মুখখানি ছিল ফ্যাকাসে—দেখতে অতি সাধারণ। নিজের মতামত বলে তেমন একটা কিছুই ছিল না। একেবারে নির্ব্বিকার ভাব। বয়স ত্রিশের কোঠায় এবং সে বিবাহিত। ব্যবসার মধ্যে—ভদ্রলোকদের কাপড় জামা প্রভৃতি সরবরাহ করিবার একখানি মাত্র দোকান ছিল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে। চরিত্রের যা বা যৎকিঞ্চিৎ কিছু বিশিষ্টতা ছিল তাও ব্যবসার প্রতিযোগিতার চাপে একেবারে নিঃশেষ হয়েছিল। খরিদ্দারদের মন জোগাতে যেয়ে কাকুতি-মিনতি ও তোষামোদে এমন সিদ্ধি লাভ করেছিল—এমন কি দিনের পর দিন একই নিয়মানুযায়ী কাজ করতে করতে একেবারে মানুষ নামের অযোগ্য হয়েছিল। কোন বড় কাজেও তাকে কখন অনুপ্রাণিত করতে পারত না। এই সুখ সাচ্ছন্দ্যদায়ক বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আত্মতিষ্ঠ হয়ে মানবকুলের অতি প্রাথমিক এবং একান্ত তীব্র বাসনার বিষয়ীভূত গভীর রাগাদির হিল্লোলও কখন যে তাকে স্পর্শ করতে পারে তা একরূপ অসম্ভবই মনে হ'ত। তথাপি জনন ও ভোগলিপ্সা ব্যাধি ও মৃত্যু, যা নিত্য ও চির পরিবর্ত্তনহীন এবং জীবনের যে কোন আকস্মিক আবর্ত্তে ইহাদের কোন একটি অতি নির্ম্মম সত্যরূপে মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে,—তখন সভ্যতার কৃত্রিম মুখোস মুহূর্ত্তে চুরমার করে দেয় এবং অন্তরস্থ সরল ও অজ্ঞাত মানুষটির ক্ষণিক দর্শন মিলে।

কাঙালী চরণের স্ত্রী ছিল অতি—নিরিবিলি প্রকৃতির ছোটখাট মানুষটি। মাথায় একরাশ কাল চুল এবং স্বভাবটি অতি মধুর। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাই ছিল তার চরিত্রের একমাত্র সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। উভয়ে মিলে প্রতি সোমবার প্রাতে দোকানের জানালায় যেখানে জিনিষাদি প্রদর্শিত হ'ত সেখানে সেগুলি সাজাত, গোছাত। নীচের দিকে থাকত মোটা সবুজ রঙের কাগজের বাক্সে সাদা ধবধবে সার্ট, উপরে পিতলের চকচকে দণ্ডের উপর ঝুলত সারি সারি নেকটাই, দুপাশে সাদা কাগজের বাক্সে ঝকঝকে বোতাম; পেছনের দিকে রাশি রাশি খাকি ও সাদা কাপড়ের সোলা টুপী এবং তারও পেছনে কতকগুলি স্তূপাকৃতি বন্ধ বাক্স, যার ভিতরে অপেক্ষাকৃত মূল্যবান টুপী থাকত। এই ভাবে থাকাতে সেগুলি রোদ লেগে বিবর্ণ হতে পারত না।

কাঙ্গালী চরণের স্ত্রী-হিসাব পত্র রাখতেন, সময়ে বা বিলও করতেন। স্বামীর ক্ষুদ্র জীবনে যে সুখ-দুঃখের জোয়ার বইত,—একমাত্র স্ত্রী ভিন্ন সে খবর—আর কেউ জানত না। যখন কোন বিদেশযাত্রী ভদ্রলোক তার দোকান থেকে দু'ডজন সার্ট ও অসংখ্য কলার কিনে নিয়ে যেতেন তখন উভয়ের আনন্দ আর ধরত না। জিনিষপত্র নিয়ে যাবার পর হোটেলে বিল পাঠিয়ে যখন দেখা যেত সে নামের কেউই সেখানে নেই এবং বিলখানি ফেরৎ আসত, তখনকার দুঃখেও উভয়েই সমভাবে ম্রিয়মান হতেন। গত সুদীর্ঘ পাচ বৎসর তারা এক সঙ্গে কাজ করেছেন; কত ভাবে, কত যত্নে, কারবারটি গড়ে তুলেছেন। এর জন্য কত পরামর্শ, কত চিন্তা, কত দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়েছে। সন্তানাদি না থাকায় উভয়ে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন। সম্প্রতি কতকগুলি লক্ষণ হতে একান্তই বোঝা যাচ্ছিল যে একটা পরিবর্ত্তন অতি নিকট এবং অনতিবিলম্বেই তা ঘটবে। দোতলার উপর হ'তে আর

নীচে নামবার সামর্থ্য ছিল না এবং মাতা বরদা সুন্দরী তার দেখা-শুনা ও শুশ্রূষার জন্য এবং বিশেষ ভাবে নবজাত অভ্যাগতকে অভিনন্দন করবার জন্য শ্যামনগর হতে এসেছেন। সময় যতই নিকটবর্ত্তী হতে থাকল কাঙ্গালী চরণের ভাবনাও ততই দেখা দিতে লাগল। তিনি ভাবতেন যা হ'ক গে, এও ত প্রকৃতিরই বিধান। অন্যান্যের স্ত্রীদেরও ত বিনা ক্লেশে হয়; তার স্ত্রীরও কোন বিঘ্ন ঘটবে না নিশ্চয়। নিজেও ত ১৪টি সন্তানের একটি! তার মা ত এখনও বেঁচেই আছেন! কোনরূপ খারাপ হবার সম্ভাবনা একরূপ নাই বললেই চলে। এই রকম নানা যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও সকল চিন্তার পশ্চাৎভাগে স্ত্রীর বর্ত্তমান অবস্থার কথাটাই জেগে থাকত। ভাল দাই এর ত কথাই নাই; ৬ মাস আগে থেকেই ধাত্রী বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ নিকটস্থ নবীন ডাক্তারকে ঠিক করে রাখা হয়েছিল। যতই সময় অগ্রসর হতে লাগল, দোকানের উপযোগী নানা জিনিষের মধ্যে—ক্ষুদ্র শিশুর উপযোগী ফ্রিল ও রিবণ দেওয়া অনেক ছোট খাট—পোষাকেরও আমদানী হ'ল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দোকানে বসে যখন কাঙ্গালী-চরণ জিনিষপত্রে মূল্যের টিকেট লাগাচ্ছিলেন হঠাৎ উপরে একটা সোর-গোল শোনা গেল এবং বরদাসুন্দরী দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বললেন যে হরিদাসীর অবস্থা মোটেই ভাল ঠেক্‌ছে না, শীগ্‌গির করে দাইকে ও ডাক্তারকে খবর দাও। তাড়াতাড়ি করাটা কাঙ্গালী চরণের ধাতেই ছিল না। চিরদিনই খুব ফিট্‌ফাট্ থাকতেন, ধীর গভীর চাল ভালবাসতেন ও সমস্ত কাজের মধ্যেই একটা শৃঙ্খলা খুঁজে বেড়াতেন। দাইএর বাড়ী দোকানের নিকটেই, সেখানে গিয়ে শুনলেন সে এই একটু আগেই আর একজনকে খালাস করতে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নাই। "এলে আমার ওখানে যেন ছুটে যায়,—একটুও দেরী না করে।" এই বলেই ছুটলেন নবীন ডাক্তারের বাড়ীর দিকে। পোয়াটেক মাইল দূরে তার বাড়ী। রাস্তায় একখানি গাড়ীও মিলল না, হেঁটেই চললেন। গিয়ে শুনলেন, ডাক্তার বাবু তখখুনি গোয়াবাগানে একটি ফিটের রোগী দেখতে বেরিয়েছেন। ছুটলেন অমনি গোয়া বাগানে। ব্যস্ততা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার ফিট্‌ফিটে ভাবে ভাটা পড়ল। পাশ দিয়ে দুখানা আরোহী পূর্ণ গাড়ী গেল,—খালি গাড়ী একখানাও বরাতক্রমে জুটল না। গোয়া বাগানে পৌছে শুনলেন, ডাক্তার বাবু সেখান থেকে একটী হামের রোগী দেখতে গেছেন। সৌভাগ্যক্রমে ঠিকানাটি রেখে গিয়েছেন। একদম খালের ওধারে—৫০ নং মাণিকতলা মেন রোড।

বাড়ীতে যে কি অবস্থা হচ্ছে ও মেয়েরা কি কচ্ছে সে কথা ভেবে তাঁর সাজ-সজ্জার দিকে আর কোন খেয়ালই রইল না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীডন ষ্ট্রীট ধরে বরাবর সার্কুলার রোড অবধি দৌড়াতে লাগ্‌লেন! সেখানে ফুটপাথের পাশে একখানা খালি গাড়ী দাঁড়ান দেখে—তাতে লাফিয়ে উঠলেন এবং অনতিবিলম্বে মাণিকতলা মেন রোডে পৌছলেন। তথায় শুনলেন ডাক্তার এই মাত্র বাড়ীর দিকে ফিরেছেন। তখন একান্ত হতাশ হয়ে সিঁড়ির ধাপের উপর বসে পড়লেন। হঠাৎ গাড়ীখানার উপর নজর পড়ায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন। ভাগ্যক্রমেই যানটিকে বিদায় দেন নাই। মুহূর্ত্তে আরোহণ করে গাড়ীখানা ডাক্তারের বাড়ীর দিকে হাঁকালেন। গিয়ে দেখেন ডাক্তার বাবু তখনও বাড়ী পৌছেন নাই কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই ফেরবার সম্ভাবনা। কাঙ্গালীচরণ অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঘরখানি একেবারে ছোট নয়,—বেশ উঁচুও। আলোটা খুব ঢিমে ভাবে জলছিল, বোধ হয় কর্ত্তা বাড়ী নেই বলেই এরূপ অবস্থা। ঈথারের গন্ধে কিন্তু গা বমি বমি কচ্ছিল। গৃহের আসবাবপত্রগুলি সবই মজবুত ও ভারিক্কে ধরণের। তাকের উপর যে বইগুলি ছিল তা বেশ বৃহদায়তন। ঐ তাকেই একটি কাল রঙের ঘড়ী ছিল—কত না দুঃখের সুরে টিক্‌টিক্ কচ্ছিল। দেখতে পেলেন সাড়ে সাতটা বেজেছে, প্রায় সোয়া এক ঘণ্টারও বেশীক্ষণ বাড়ী ছেড়েছেন। বাড়ীর মেয়েরা তার কথা না জানি কী ভাবছে। যত বারই দূরে কোন দরজা খোলার শব্দ

শোনা যাচ্ছিল—তিনি ততবারই একান্ত আগ্রহের সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিলেন। ডাক্তারের কথা শোনার অপেক্ষায় কান পেতে থেকে হয়রাণ হলেন। হঠাৎ বাইরে দৃঢ়পদক্ষেপে চলার শব্দে ও সাথে সাথেই দরজা খোলায় তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। দরজা পার হতে না হতেই তাড়াতাড়ি গিয়ে তার সম্মুখে হাজির হলেন। চেঁচিয়ে বললেন "কিছু মনে করবেন না ডাক্তার বাবু আপনার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ খুঁজে হয়রান হয়ে, অবশেষে এখানে বসে আছি। সেও আজকের কথা নয়। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আমার স্ত্রীর বেদনা সুরু হয়েছে।"

তিনি ভেবেছিলেন তার কথা শোনবামাত্র ডাক্তার না জানি কি করবেন; একটা কিছু করবেন নিশ্চয়। হয়ত একটা ঔষধ নিয়ে, নয়ত ইনজেকসেনের বাক্স নিয়ে কিম্বা আর কিছু নিয়ে, সেই গ্যাসালোকিত রাস্তায় তার সঙ্গে দিবেন লম্বা ছুট।

ডাক্তার কিন্তু কিছুই করলেন না। ধীরে সুস্থে হাতের লাঠি গাছটা জায়গামত রাখলেন। বিরক্তির সঙ্গে টুপীটা মাথা হ'তে ছুড়ে ফেললেন এবং কাঙ্গালী চরণকে দরজা থেকে ভিতরে পুরলেন।

গৃহে প্রবেশান্তর বললেন—"কিহে আমায় আগে থাকতেই নিযুক্ত করে রেখেছ—না?...ডাক্তার কথাগুলি বড় ভালভাবে বললেন না।"

"হ্যাঁ ডাক্তার বাবু সেই আশ্বিন মাসে সব বন্দোবস্ত করেছি—আমার নাম কাঙ্গালীচরণ,—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটে আমার পোষাকের দোকান,—স্মরণ আছে বোধ হয়?"

"হ্যাঁ হে হ্যাঁ।" খুব চকচকে একখানা নোটবই খুলে বললেন—"তাইত; সময় ত এর আগেই হওয়া উচিত ছিল আচ্ছা বলত বর্ত্তমান অবস্থাটা কি?"

"তা ত মশাই জানিনা।"

"তাও বটে, এইনা সবে হাতেপড়ি। এর পরের বারে এর চাইতে ঢের বেশী জানতে পারবে।"

"আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বললেন—আপনার এ সময়ে সেখানে থাকাই কর্ত্তব্য।"

"দেখহে যখন এই প্রথম, তখন তাড়াহুড়ো করবার ত কিছু দেখি না। সারা রাত ভুগতে হবে দেখছি। আর শোন, কয়লা না জোগালে কখন ইঞ্জিন চলে না। আমি সেই কোন সকালে ছুটি মুখে গুঁজে বের হয়েছি।"

"আমাদের ওখানেও ত খাওয়া চলতে পারে। গরম গরমই দেব, যদি চা ইচ্ছে করেন তাও হবে।"

তোমাকে সেজন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার খাবার নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছে, আর প্রথম দিকে থেয়েও ত কিছু করা যাবেনা। তুমি বাড়ী যাও; বলো যে আমি যাচ্ছি পেটটিকে একটু ঠাণ্ডা করেই তোমার বাড়ী ঢুকব,—বুঝলে হে?"

ডাক্তারের দিকে চেয়ে কাঙ্গালীচরণ আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন। এই রকম অবস্থায় ডাক্তারদের যে খাবার কথাও মনে হয় সে আশ্চর্য্য বটে। তিনি কিন্তু বুঝতে পারলেন না,—তার নিজের নিকট বিষয়টি যতই গুরুতর ও ভয়াবহ হউক না কেন ডাক্তারদের নিকট উহা নিত্য নৈমিত্তিক, দৈনন্দিন ব্যাপার মাত্র। এই সব কাজের ভিড়ে নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যদি সতর্ক ও সচকিত না থাকত, তাহলে বোধ হয় তাদের পরমায়ু কোনক্রমেই বৎসরাধিক টিকিত না। কাঙ্গালীচরণ ত তাকে নৃশংস পশুর অধম মনে করলেন এবং রাগে গরগরা হয়ে দোকানের দিকে ফিরলেন।

তাকে ফিরতে দেখে শাশুড়ী ঠাকুরাণী সিঁড়ির মাথা হতে অনুযোগপূর্ণ স্বরে বললেন—"তুমি ত এখন যাও নাই বাপু এত দেরী হল কেন?"

সে হাপাতে হাপাতে বললে "আমার কোনই দোষ নেই মা, যাক্—সব চুকে গেছেত?"

"কি বলছ তুমি, এখনি হয়েছি কি? তার আগে আরও অনেক কষ্ট আছে, দাই বা কোথায় আর ডাক্তার নবীন বাবুই বা কোথায়?

"দাইকে বাড়ী পেলুম না, অন্যত্র খালাস করতে গেছে; তাকে তক্ষুনি খবর দিয়ে পাঠিয়ে দিতে বলেছি এখনও আসেনি বুঝি? ভারি মুস্কিলে পড়া গেল। এদের দিয়ে যে কোনই বিশ্বাস নেই। আর ডাক্তারের তেমনি পৃথিবী শুদ্ধ ঘুরে যদি বা দর্শন পেলুম, তা পেট বোঝাই না করে নড়ছেন না।"

বরদাসুন্দরী উত্তর দিচ্ছিলেন—কিন্তু ঠিক সেই সম

উপরের অর্দ্ধমুক্ত দরজার ভিতর হতে হরিদাসী গোঙানীর স্বরে ডাকল। তিনি দৌড়ে গেলেন এবং দরজা বন্ধ করলেন। কাঙ্গালীচরণও মনোদুঃখে দোকান ঘরে ফিরলেন। দোকানের ছোকরা চাকরটিকে বাড়ী বাড়ী যাওয়ার ছুটী দিলেন। জিনিষাদি যথাস্থানে গুছিয়ে নিজেই দরজা-জানালা বন্ধ করলেন। সব কাজ শেষ করে দোকান ঘরের পেছনে গিয়ে বসলেন। স্থির হয়ে বসতে পারলেন না কিন্তু। এক একবার উঠেন, দুচার পা হাঁটেন, আবার চেয়ারে গিয়ে বসেন। হঠাৎ চিনেমাটীর বাসনের টুক্‌ঠুকী তার কানে গেল। ঝাটীর ঝিকে ট্রের উপর ধূমোদ্গারিণী টিপট, ও চার কাপ প্রভিতি সরঞ্জাম নিয়ে দরজার পাশ দিয়ে যেতে দেখলেন।

জিজ্ঞেস করলেন "কার জন্য নিয়ে যাচ্ছিস্ রে, রাধি ?"

"মার জন্য নিয়ে যাচ্ছি বাবু, তিনি বললেন—হয়ত খেতে পারবেন।"

এই নিত্যকার চাপাত্র আজ প্রাণে কি যে সান্ত্বনা আন্‌ল তা বলবার নয়। স্ত্রীর অবস্থা খুব খারাপ নয় নিশ্চয় —তাহলে খাবার কথা মনে করতে পারতেন না।

মনটা এতই হাল্কা হল যে নিজেও একপাত্র চা খেলেন। চা খাওয়াও শেষ আর নবীন ডাক্তারেরও একটী কাল চামড়ার ব্যাগ হাতে আগমন।

ডাক্তার সহাস্তে জিজ্ঞেস করলেন—"কেমন আছে হে তোমার স্ত্রী ?"

কাঙ্গালীচরণ বেশ স্ফূর্ত্তির সহিতই উত্তর দিলেন "তা এখন অনেকটা ভাল বইকি।"

ডাক্তার—"তা হলে আর কি হবে, বোধ হয় কাল প্রাতে দেখলেই চলতে পারবে।"

কাঙ্গালীচরণ ডাক্তার বাবুর মোটা ওভারকোটটা টেনে ধরেই বললেন—"তাও কি হয় মশাই, আপনি আসতে না দেহে প্রাণ এল। অনুগ্রহ করে উপরে গিয়ে একবার দেখে আসুন। শীগগির এসে বলবেন, অবস্থাটা সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়।"

ডাক্তার উপরে গেলেন। তাঁহার দৃঢ় পদক্ষেপ-শব্দে সমস্ত বাড়ীটা সচকিত হয়ে উঠল। উপরের ঘর হতেও ডাক্তারের পদশব্দ শোনা যেতে লাগল এবং তাতেও প্রাণে অনেকটা সাহসের সঞ্চার হল। পদশব্দ একান্ত সুস্পষ্ট ও খড়খড়ে, ইহা নিজের উপরে একান্ত দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থাই প্রতিপন্ন করে।

উপরে কি হচ্ছে কাঙ্গালীচরণ তাই কান পেতে শোনবার চেষ্টা কচ্ছিলেন, মেজের উপর দিয়ে চেয়ার টেনে নেবার শব্দ শুনতে পেলেন। পরক্ষণেই দরজা খোলার শব্দ ও কে যেন দৌড়ে নীচে নামছে শুনতে পেলেন। অমনি লাফিয়ে উঠলেন ও মাথার সব চুল খাড়া হয়ে উঠল। ভাবলেন, না জানি অতিশয় উত্তেজনা বশতঃ তার শাশুড়ী অসম্বদ্ধ কথা কইচেন। কাঁচী ও সুতার সন্ধানে ছুটেছেন। চক্ষের পলকে তিনি অন্তর্হিত হলেন। ওদিকে রাধী ঝী কতকগুলি ধোয়া কাপড় চোপড় নিয়ে উপরে গেল। তার পর খানিক সময় সব চুপচাপ, কিছু পরে ডাক্তারের ভারী জুতার মচমচে শব্দ সিড়ি বেয়ে নীচের দিকে আসছে মনে হ'ল। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন "ওদিকে একরকম ভালই কিন্তু বড্ডই ফ্যাকাসে কাহিল দেখাচ্ছে।"

"ও কিছু নয় ডাক্তার বাবু"। সঙ্গে সঙ্গেই রুমাল দ্বারা মাথার ঘাম মুছলেন।

"এখুনি ভয়ের কোন কারণ দেখি না—তবে যেরূপ আশা করেছিলাম অবস্থাটা তাত নয় ভালমতে হবে বলে এখনও আশা কচ্ছি।

কাঙ্গালীচরণ হতাশার স্বরে বললেন, "ডাক্তার বাবু ভয়ের কারণ কিছু আছে কি ?

"দেখ সত্যকথা বলতে গেলে আশঙ্কা সব সময়েই আছে। রোগীর অবস্থা যে খুব সহজ তাত নয়। তবে এর চাইতেও আরো খারাপ হ'তে পারত। এক মাত্রা ঔষধ দিয়ে এলুম কেমন কাজ করে দেখি আগে—। আসবার সময় দেখলুম তোমার বাড়ীর সামনা-সামনি, রাস্তার উল্টোদিকে কে একখানা বাড়ী তুলছে, জায়গাটার ক্রমশঃই উন্নতি হচ্ছে। ভাড়াও দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। তোমার এ জায়গাটারও একটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছ নিশ্চয়ই। "নিয়েছি বইকি"কাঙ্গালী চরণের কান ছিল উপরকার শব্দের দিকে। এমন

সময়েও ডাক্তারকে এরূপ সহজ ভাবে সাধারণ বাজে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখে মনে একটু সোয়াস্তি পাওয়া গেল।

"আর বন্দোবস্তই বা নিলুম কি ছাই। মাত্র এক বছরের জন্য নিয়েছি ডাক্তার বাবু।

"আমি হলে কিন্তু দীর্ঘদিনের জন্য নিতুম। এই রাস্তারই অনতিদূরে ঘড়ীওয়ালা মণি বাবু আছেন। তার স্ত্রীর দু দুবার আমি প্রসব করাই আর যখন মাণিক তলায় খোলা ড্রেনের ধারে ছিলেন তখন ওর টাই-ফয়েড জ্বরের চিকিৎসা করি। তোমায় নিশ্চয় বলছি ওর বাড়ীওয়ালা বছর ৬০০৲ টাকা বৃদ্ধি চাইবে। হয় বৃদ্ধি হারে ভাড়া দিতে হবে নয়ত বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।

"তাঁর স্ত্রীর প্রসব ভাল ভাবেই হয়েছিল—?"

"হ্যাঁ খুব ভাল মতেই হয়েছিল—কে ডাকছে না—! ডাক্তার জিজ্ঞাসু নয়নে উপরের দিকে কান খাড়া করলেন এবং তাড়াহুড়ো করে সেই দিকে গেলেন। তখন ফাল্গুন মাস,—সন্ধ্যার সময়টা রীতিমত ঠাণ্ডা। চিমনীতে আগুন জ্বলছিল। হাওয়ার জন্য ধোঁয়া বের হয়ে যেতে পারছিল না, সমস্ত ঘর ধোঁয়ায় ভরপুর।

শীত কাঙ্গালীচরণের হাড়ের ভিতর গিয়ে লেগেছিল সেটা ঠাণ্ডার দরুণ কি ভয়ের দরুন; সে কথা বলা শক্ত—হাত দুটি আগুনের উপরে ছড়িয়ে সামনে ঝুঁকে ছিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় রাধি তার জন্য ঠাণ্ডা ভাত বেড়ে আন্‌লে কিন্তু তিনি তা স্পর্শও করলেন না।

এক বাটী দুধ ছিল, তাই এক চুমুকে নিঃশেষ করলেন এবং তাতে একটু ভালই বোধ করলেন। সবগুলি ইন্দ্রিয় জড় হয়েছিল তার কানে, উপরের ঘরের অতি সামান্য ব্যাপারও অনুসরণ করতে পারত।

একবার তিনি পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন ও ঘাড় বাঁকিয়ে কানের পিছনে হাতখানি রেখে, ভিতরে কি হচ্ছে শোনবার চেষ্টা করলেন। দরজাটি আধ ইঞ্চি খানেক ফাঁক ছিল সেই খোলা পথে ডাক্তারের সন্ত কামান চক চকে মুখখানা দেখতে পেলেন। মনে হল ডাক্তার যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং আগের চেয়ে চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। এইদেখেই তিনি ক্ষিপ্তের মত এক দৌড়ে নীচে নেমে গেলেন এবং মনকে অন্যদিকে ফেরানর জন্য রাস্তায় কি হচ্ছে তা দেখবার জন্য সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। চতুর্দ্দিকে সবগুলি দোকানই বন্ধ। কয়েক জন আমুদে বন্ধু হল্লা করতে করতে থিয়েটার থেকে ফিরছিল। লোকগুলি ক্রমশঃ দূরে সরে পড়ল তখন তিনিও আস্তে আস্তে অগ্ন্যাধারের কাছে ফিরে গেলেন। যে সব কথা তিনি কোন কালেও জানেন নাই। তাঁর উর্ব্বর মস্তিস্কে এখন সেই সব উদয় হতে লাগল। এ কি বিচার ভগবানের! তার প্রীতির আকর শান্ত নির্দ্দোষ স্ত্রী এমন কি করেছে যে তার অদৃষ্টে এই কষ্ট? ভাগ্য দেবতা কি নিষ্ঠুর! নিজের চিন্তায় তিনি নিজেই ভয় পেতে লাগলেন এবং পূর্ব্বে কখনও যে এ সব কথা মনে হয় নাই ত তে আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। রাত্রির বেশীর ভাগই যখন কেটে গেছে কাঙ্গালী চরণ বিশেষ উত্যক্ত হয়ে উঠলেন এবং শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। ওভার কোটটি কিন্তু তার হাতের গোড়াতেই ছিল, তা পাকিয়ে দলামোচড়া করলেন এবং ভাবতে লাগলেন কিসে এই কষ্টের উপশম হয়। অগ্ন্যাধারে আগুন সেও জলে জলে ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। তার রক্তশূন্য সাদা মুখখানি ঘামে ভিজে উঠেছিল এবং বহুক্ষণ ধরে দুঃখের চাপে থাকতে থাকতে অত্যন্ত মানসিক অবসাদ এসেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে উপরের মাঝের দরজা খোলার শব্দ হল ডাক্তার সিঁড়ির মাথায় পা দিলেন অমনি সকল ইন্দ্রিয় চমকিত হয়ে উঠল। কাঙ্গালীচরণ কোন কালেই বেশী কথা কইতেন না বা ভণিতার ধারও ধারতেন না সংক্ষেপে কাজের কথা বলতেন। এমন যে মানুষ তিনিও প্রসবের সংবাদের জন্য একরূপ চীৎকার করেই উঠলেন কিন্তু ডাক্তারের সেই দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক কঠোর মুখের দিকে চাইতেই তিনি যে কোন সুখের সংবাদ নিয়ে নীচে আসছেন না তা এক লহমায় বুঝতে পারলেন। শেষের কয়েক ঘণ্টায় কাঙ্গালীচরণের ন্যায় ডাক্তারের মুখেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন

ঘটেছিল। কেশগুলি সজারুর কাঁটার ন্যায় খাড়া, মুখখানি রক্তবর্ণ ও কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছিল। চোখে একটা হিংস্র দৃষ্টি, মুখের রেখাগুলি এমন সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছিল, দেখলেই মনে হয় যেন সম্ভ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হরণাভিলাষী বিশ্বের সব চেয়ে বড় ক্ষুধার্ত্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধের উপযোগীই বটে। কিন্তু মনে হচ্ছিল বেদনার চিহ্নও সেখানে সুস্পষ্ট, যেন তার সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দী তাকে প্রায় পরাজয়ের মধ্যেই এনেছে। ডাক্তার এসে হাতের উপর হাত রেখে বসলেন, মনে হল তিনি যেন একান্তই অবসন্ন। সেই অবস্থায়ই বললেন—

"দেখ হে কাঙ্গালীচরণ—তোমার সঙ্গে একবার দেখা করা বিশেষ কর্ত্তব্য বলেই মনে করলুম এবং একথাও বলা দরকার যে কেসটা দাঁড়িয়েছে বড় বিশ্রী রকমের। তোমার স্ত্রীর হার্টটা তেমন সবল নয় আর এমন কতকগুলো লক্ষণ দেখছি যা মোটেই ভাল ঠেকছে না। এখন কথা হচ্ছে তুমি যদি আর কাউকে দেখাতে চাও তার সঙ্গে পরামর্শ করতে আমার আপত্তিত নেই-ই বরং ভালই মনে করি।"

সারারাত অনিদ্রায় একেই কাঙ্গালীচরণের মাথা ঝন্‌ঝন্ কচ্ছিল তাতে এই দুঃসংবাদে ডাক্তারের কথার প্রকৃত মর্ম্ম ভালরূপে ধারণাই করতে পারলেন না।

"নীরদ বাবু :কিম্বা সুরেন বাবুকে আনলে হয়ত ১৬৲ ফিতে চল্‌তে পারে, তবে দয়াল বাবু হলেই হয় কারণ এবিষয়ে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ!

"সব চাইতে যিনি ভাল তাকেই আসুন।"

"দয়াল বাবু ২৫৲ টাকার কম আসবেন না। তিনি আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র কিনা।

"ওকে যদি তিনি এই বিপদ হতে মুক্ত করে দিতে পারেন তবে আমার যা কিছু আছে সবই তার,—ছুটব নাকি তার জন্ত ?

"আচ্ছা যাও, আগে কিন্তু আমার বাড়ী গিয়ে ক্লোরফরমের যন্ত্রটি চাইবে। আমার এসিস্‌টেন্টের কাছে পাবে। তাকে বলো যে ক্লোরফরম ও ঈথার যেন আনাও হয়। হার্টটা যেরূপ দুর্ব্বল তাতে খালি ক্লোরফরম সহ্য হবে না। তারপর যাবে দয়াল বাবুর ওখানে আমার কথা বলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।"

কাঙ্গালীচরণ কিছু করতে পেরে বিশেষতঃ ওর কাজে আসছে মনে করে বর্ত্তে গেল। চট করে চলে গেল সিমলায়। নিস্তব্ধ রাস্তায় পদক্ষেপ খট্ খট্ শব্দে ধ্বনিত হচ্ছিল। পুলিসেরা স্থানে স্থানে দালানের বারান্দায় গা হেলান দিয়ে বিশ্রাম কচ্ছিল। পদশব্দে সচকিত হয়ে তাদের চোরা লণ্ঠন ঘুরিয়ে তাকে দেখতে লাগল। রাত্রির বেলে দুবার চাপ দিতেই খালি গায়ে, অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে নবীন বাবুর সহকারীটি দেখা দিলেন।

তাকে সব কথা বলতে তিনি একটি কাচের বোতল ও একটি ব্যাগ দিলেন। বোতলটি পকেটে ঢুকিয়ে ও ব্যাগটিকে হাতে করে—কাঙ্গালী চরণ গায়ের র‍্যাপারটিকে বেশ করে আঁট সাট ভাবে গায় দিয়ে, ছুটলেন গ্রে ষ্ট্রীটে। সেখানে পৌছে একটু খুঁজতেই একটি বাড়ীর গায় পালিস পিতলের উপর দয়াল ডাক্তারের নাম দেখতে পেলেন। এক লাফে তিন তিনটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে দরজার সামনে গেলেন কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে পড়লেন দরজার গায় এবং ঐ ধাক্কার চোটে বোতলটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ঝন্‌ঝন্ করে পড়ল ফুটপাতের উপর। শব্দে মনে হল, যেন তার স্ত্রীর দেহখানাই ভেঙ্গে খান খান হল। দৌড়ের ঝাকুনীতে বুদ্ধিটা বোধ হয় সচকিত হয়েছিল ;—ভাবল আর একটা বোতল জোগাড় করে নিলেই কাজ চলে যেতে পারবে। তখন সে দরজায় আটা বেলের বোতাম জোরে টিপে ধরল। তার মাথার উপর কে যেন রুক্ষ গলায় বলল "বাপু হে, এত যে জোরে টিপছ ব্যাপারখানা কি বলত ?"

তিনি চমকে উঠে উপরের দিকে চাইলেন কিন্তু মানুষের টিকিটিও দেখতে পেলেন না।

সে পুনরায় বেল টিপবার জন্ত অগ্রসর হচ্ছিল কিন্তু দেওয়ালের ভিতর থেকে কে যেন স্পষ্ট ও পরিষ্কার গলায় বললে—

"এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে সারারাত কাঁপতে পারি না।

কোথেকে এসেছে, কি চাই,—শীগ্‌গির করে বল, নইলে টিউব বন্ধ করে চলে যাচ্ছি।"

কাঙ্গালীচরণ জীবনে এই প্রথম দেখতে পেলেন যে কলের ঠিক উপরিভাগে কথা কইবার একটি নলের মুখ দেওয়াল হতে ঝুলছে। তিনি তখন টিউব বরাবর চেঁচিয়ে বললেন, "আপনাকে এখুনি ডাক্তার নবীনবাবুর সঙ্গে একটি প্রসবের রোগী দেখতে আমার বাড়ী যেতে হবে।"

সেই কর্কশ স্বর আবার শ্রুত হ'ল—

"কত দূর হে?"

"এই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে প্রায় কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের কাছে।"

"আমার ফি ২৫৲ টাকা তা নিশ্চয়ই জান। বাকী-টাকি না কিন্তু।"

"তার জন্য ভয় করবেন না—আসবার সময় এ, সি, ই মিক্সচারটা নিয়ে আসবেন কিন্তু।"

"আচ্ছা যাচ্ছি, দাঁড়াও হে একটু।"

কয়েক মিনিট পরে একটি পলিত কেশ কড়া মেজাজের বৃদ্ধ বাহির হয়ে এলেন। বাহির হ'বার সময় ভিতর হ'তে কে একজন ব'লল—

"মাফ্‌লারটি ভাল করে গলায় জড়িয়ে যেও যেন"—মুখ ঘুরিয়ে অস্পষ্ট নিম্ন স্বরে উনি যে কি উত্তর দিলেন তা বোঝা গেল না।

এই বড় ডাক্তারটি জীবনব্যাপী বিরামহীন কঠোর কাজ করতে করতে নিজেও কঠোর হয়ে উঠেছিলেন এবং জগতের অধিকাংশের ন্যায় ক্রমবর্দ্ধনশীল পরিবারের প্রতিকে অধিক ব্যয়ের দরুণ এই ব্যবসায়ের দয়াদাক্ষিণ্যের দিকটা হ'তে অর্থকরী দিকটার প্রতিই বেশী মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাহার সেই কঠিন আবরণের নীচে একখানি অতি দয়ালু চিত্ত ছিল।

রাস্তায় একখানি গাড়ী বা ট্যাক্সীও দেখা গেল না। কাঙ্গালীচরণের সঙ্গে পাঁচ মিনিট সমানে চলেই ডাক্তার হাপাতে লাগলেন। তাকে তখন থামিয়ে বল্লেন :—

"আমার গতি-নৈপুণ্যের সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত দিতে প্রতিজ্ঞা করি নাই বা হাঁটা সম্বন্ধে একটা নূতন রেকর্ড স্থাপন করতেও চাই না। শক্তিতে কুলালে আরও দ্রুত চলতাম। তোমার উৎকণ্ঠার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে কিন্তু এত জোরে হাঁটা আমার সাধ্যের অতীত।"

কাঙ্গালীচরণ উদ্বেগ ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত আস্তে আস্তেই চললেন। বাড়ীর নিকটে গিয়ে আবার ছুটলেন এবং ডাক্তার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সদর দরজা খুলিয়ে ঠিক রাখলেন।

উভয় ডাক্তারের দেখা হ'ল, উপরের ঘরের দরজার বাহিরে কাঙ্গালীচরণ নীচ থেকে তাদের কথাবার্ত্তা আকস্মিকরূপে শুনতে পেলেন। নবীন বাবু বল্লেন,—"রাত্তির বেলা এরূপ ঠেকেই আপনাকে ঠেলে তুলেছি সেজন্য কিছু মনে করবেন না। কেসটা ভারি বিশ্রী, কিন্তু বাড়ীর লোকগুলি খুবই ভদ্র।" তার পর উভয়ে চুপি চুপি কথা বলায় আর কিছুই শোনা গেল না এবং তারা ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

কাঙ্গালীচরণ তার চেয়ারখানিতে বসে অতি নিবিষ্ট চিত্তে সব শুনতে উৎসুক রইলেন। কারণ তিনি এটা ধরতে পেরেছিলেন যে একটা বিশেষ সঙ্কট উপস্থিত। ডাক্তারদের উভয়ের চলা-ফেরার শব্দ শুনছিলেন এবং তাল বাবুর টেনে চলার ও নবীন বাবুর স্পষ্ট সমান তালে পা-ফেলা বেশ বুঝতে পারছিলেন। কয়েক মিনিটের জন্য সব একেবারে নীরব। তারপরেই অতি অদ্ভুত রকমের মাতলামি ভাবের "ভ্যা—না—না—না" গোছের শব্দ—যা পূর্ব্বে আর কখন শোনেন নাই—তাই শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতে একটা মিষ্টি গন্ধও সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে এল। কাঙ্গালীচরণের মত অতি মানসিক উদ্বেগ না থাকলেও হয়ত উহা পেয়ালেই আসত না। শব্দটা আস্তে আস্তে কমে এল এবং অবশেষে একেবারেই থেমে গেল। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যেহেতু তিনি বুঝতে পারলেন যে ঔষধে কাজ করেছে। ভাগ্যে এখন যাই থাকুক, স্ত্রীর কষ্টবোধটা ত আর থাকবে না!

চিৎকারটা বরং সহ্য করা যাচ্ছিল কিন্তু নীরবতা

একান্ত অসহ্য হয়ে উঠল। উপরের সঙ্গে সূত্রটি সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল এবং মনে নানারূপ ভীতিজনক সম্ভাবনার চিত্র জাগতে লাগল। তিনি উঠে সিঁড়ির পাদদেশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধাতুর সহিত ঠোকাঠুকির মত শব্দ কানে এল এবং ডাক্তারদের চাপা গলায় কথা কহার আওয়াজ শুনলেন। তারপর শোনা গেল তার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কথা—ভাবটা ভয়ের না অনুযোগের তা সঠিক বোঝা গেল না—। তার পরক্ষণেই ডাক্তারেরা যেন কি বিড়বিড় করে বললেন। সেইখানে দেয়াল ঠেসান দিয়ে প্রায় ২০ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে তাদের নিম্নস্বরে কথোপকথনের আভাস পেলেন; কিন্তু তার এক অক্ষরও বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ ক্রন্দনের একটা চির রহস্যময় চিক্কণ সুর শোনা গেল; সঙ্গে সঙ্গে তার শাশুড়ী ঠাকুরাণীও আহ্লাদে চিৎকার করে উঠলেন এবং কাঙ্গালীচরণ দ্রুত বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে অভিভূতের ন্যায় সোফার উপর হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন। ভাগ্য-দেবতা সামান্য একটু সুখের মুখ দেখিয়ে আবার পরক্ষণেই গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। মিনিটের পর মিনিট চলে যেতে লাগল কিন্তু সেই মিহি ক্রন্দন ভিন্ন উপর থেকে আর কিছুই শোনা গেল না। কাঙ্গালীচরণের আনন্দের বেগ মন্দীভূত হয়ে এল এবং উপরের দিকে কাণ খাড়া করে একরূপ শ্বাসরোধ করেই পড়ে রইলেন। উপরে পুনরায় আস্তে আস্তে কথা বলার শব্দ শোনা গেল। নিম্নস্বরে কথা বললেও শোনা যায়। মিনিটের পর মিনিট চলে যেতে লাগল কিন্তু যার কথা শোনবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন—তার কথা শোনা গেল না। রাত্রির এই অশান্তি ও দুঃখে তাহার বোধশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল এবং সোফাখানির উপর তিনি একান্ত নিস্তব্ধ ভাবে এলিয়ে পড়েছিলেন। যখন ডাক্তারেরা নীচে এলেন তখনও সেই অবস্থায়ই! কি চেহারাটাই দাঁড়িয়েছিল। ময়লা কাপড় নেহাৎ গোবেচারা, মলিন মুখ, উস্কো-খুস্কো চুল। রাত্রি জাগরণের সকল চিহ্নই সুস্পষ্ট। তাঁরা আসতেই তিনি দেওয়াল ঠেসান দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তাঁর কি মৃত্যু ঘটেছে?"

ডাক্তার বললেন—"না, বেশ ভালই আছেন।"

কাঙ্গালীচরণ আজই প্রথম হাড়ে হাড়ে বুঝলেন দুঃখের ভীষণ ঝঞ্ঝা কত প্রবল, আবার ডাক্তারের কথায় দ্বিতীয় বার অনুভব হল সুখও কিরূপ প্রচুর পরিমাণে আছে—যার আস্বাদ তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও পান নাই। একবার ইচ্ছা হল প্রাণটা খুলে ভগবানকে ডাকেন কিন্তু ডাক্তারেরা সামনে থাকায় লজ্জায় তা পারলেন না। বললেন—"একবার উপরে যেতে পারি কি?"

"দুচার মিনিটের মধ্যেই যেতে পারবেন।"

"দেখুন ডাক্তার বাবু—আমি একান্তই—একেবারেই" এই পর্য্যন্ত বলতেই আর গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না।" তারপর ডাক্তার দয়াল বাবুকে বললেন—"আপনার ফীর ২৫৲টাকা এই নিন্—যদি ১০০৲ টাকা দিতে পারতুম তাও বেশী হ'ত না।"

বুড়ো ডাক্তার হেসে বললেন—"তা হলে ত বেশ ভালই হতো। আসি এখন তবে, নমস্কার।" তিনিও নমস্কার জানিয়ে হাসতে লাগলেন।

কাঙ্গালীচরণ তখন দরজা খুলে দিলেন ও উভয় ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে যে কথাবার্ত্তা কইলেন তা শুনতে পেলেন।

"অবস্থা এক সময়ে ভারি বিশ্রী হয়েছিল—কি বল?

"আপনার সাহায্য পেয়ে বিশেষ উপকার হয়েছে।"

"মুখরক্ষা যে হয়েছে সেই সুখের কারণ। চল না, এক পেয়ালা চা বা কাফী খেয়ে যাবে।"

সে জন্য অনেক ধন্যবাদ কিন্তু পারছি না যেতে,—আরও একটি কেস হাতে রয়েছে।"

একজনের দৃঢ় পদক্ষেপ ও আর একজনের হেঁচড়ান গতি ডাইনে ও বামে চলে গেল। কাঙ্গালীচরণ যখন দরজা বন্ধ করে ফিরলেন তখন তার প্রাণ আনন্দে উন্মত্ত। মনে হল জীবনে যেন এক নব জাগরণ এসেছে। প্রাণে বল বৃদ্ধি হয়েছে এবং অভিজ্ঞতাও হয়েছে যথেষ্ট। এই সব দুঃখ-কষ্টের অন্তরালে হয়ত কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এ হতে তার ও তার স্ত্রীর হয়ত মহদুপকারই হবে। ঠিক বার ঘণ্টা পূর্ব্বেও এই সব ভাব তার মাথায় ঢোকবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। নূতন নূতন

প্রেরণা ও ভাবের জোয়ারে আজ তার প্রাণ ভরপুর। যদি প্রাণে দুঃখের গভীর রেখা বসেই থাকে—সেখানে সুখের অঙ্কুরও গজিয়েছিল নিশ্চয়।

চেঁচিয়ে বল্লেন—"উপরে যাব?" কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই এক একবারে দু তিন ধাপ করে উঠতে লাগলেন।

বরদাসুন্দরী এক টব গরম জল ও একখানি সাবানের সম্মুখে একটী পুঁটুলী হাতে বসেছিলেন। কাঁথার ফাঁক দিয়ে একখানি লাল টুকটুকে মুখ,—নানা ভঙ্গীতে কুঁচকান শরীর, ছোট্ট দুখানি গোলাপের পাপড়ীর মত ঠোঁট ও খরগোসের নাক যেমন সর্ব্বদা নড়ে সেইরূপ এক জোড়া মিটমিটে চোখ দেখা যাচ্ছিল। ঘাড় শক্ত না হওয়ায় একদিকে হেলে কাঁধের উপর লতিয়ে পড়েছিল।

দিদিমা বল্লেন—"কোলে নাও না কাঙ্গালীচরণ—নিজের ছেলেকে একবার নাও না?

সেই ছোট্ট, মিটমিটে, টুকটুকে সয়তানটার উপর কিন্তু তার রাগই হচ্ছিল। সুদীর্ঘ রজনীভরে যে কষ্টটা দিয়েছে তা কিছুতেই ভোলা যাচ্ছিল না। বিছানার উপরে একখানি রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ভালবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে প্রায় দৌড়েই গেলেন তার কাছে—কিন্তু মুখ দিয়ে তখনই কোন কথা বেরুল না।

"সব যে চুকে গেছে সেজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, কি ভয়ানক কষ্টটাই না পেলে?"

"কিন্তু আমার যে কি সুখ হচ্ছে—জীবনে বুঝি এত সুখ পাই নি কখন।"

তার চোখ দুটি নিবদ্ধ ছিল সেই কাঁথার পুঁটুলীর দিকে।

বরদাসুন্দরী বললেন "তুমি এখন কথা টথা বলো না।" স্ত্রী বললে—"তাই বলে চলে যেয়ো না কিন্তু।"

তিনি তখন তার হাতখানি হাতে নিয়ে নিঃশব্দে কাছে বসে রইলেন। ঘরের আলোর জোর কমে এসেছিল, এবং প্রভাতের তরুণ আলোকে জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে উঁকি মারছিল। রাত্রিটা দীর্ঘ ও অন্ধকারময় ছিল সত্য। সেইজন্যই বোধ হয় দিনটি মধুর ও সুন্দর হয়েই দেখা দিল। কোলকাতা আস্তে আস্তে জেগে উঠছিল, রাস্তার কোলাহল ক্রমে বৃদ্ধি হচ্ছিল। কত জীবন এল—আর কত জীবনই বা গেল—কিন্তু এ কোলাহলের বিরাম নাই কোন কালেই। চাকা সমভাবেই ঘুরছে।

ডাক্তার কোনান ডয়েলের দি কার্স অফ ইভ (The curse of Eve) অবলম্বনে লিখিত।

বাউল

শ্রীসুধীর কুমার সেন

ওগো ও ঘাটের মাঝি,—
আমায়, পার করে দাও
পার করে দাও
এই অবেলায়।
আমার শেষ পারাণির
নেইকো কড়ি;
আমি পাই না ভেবে, এখন
কি যে করি;
তাইতে, তোমায় ডাক পাড়ি
ওগো পার করে দাও
পার করে দাও
এই অভাগায়।

একলা হেথায় রইনু বসে
তোমার পথেই চেয়ে;
ওগো পাল তুলে তুমি এলে চলে
পালের হাওয়া বেয়ে;
সাঁঝের আঁধার এল নেবে
অকূলে কূল পাইনা ভেবে,
আমার, দুকূল ওগো হারিয়ে যাবে
পার করে দাও
পার করে দাও
এই অসময়।

শরীর রক্ষার্থে ব্যায়ামের প্রয়োজন

—ব্যায়াম চর্চ্চা—

শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ বি-এস্-সি, বি-এল্

মানুষের মনের সঙ্গে শরীরের নিকটতম সম্বন্ধ জানা সত্ত্বেও আমরা কয়জন এই নিয়ম পালনে অবহিত থাকি? প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির বেশ ভাল ভাবেই জানা আছে যে Healthy mind lives in a healthy body. কিন্তু এ কি সত্য নয় যে, আমাদের য়ুনিভারসিটী জুয়েলরা প্রায় সকলেই ভগ্নস্বাস্থ্য? আধুনিক ব্যয়সাধ্য শিক্ষা

১—ক

অনেক পরিবারকে আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে টেনে আনে। এই আশায় যে আমার ছেলে লেখাপড়া শিখে দশজনের একজন হবে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আমাদের দেশে কয়জন পিতা পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য যত্নবান হন? সত্যই স্বাস্থ্যটা কি এতই অবহেলার জিনিষ? স্বাস্থ্যবান হওয়ায় কি কোন গৌরব নেই? "বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এ ঠিক কথা। কিন্তু যে বিদ্যার অধিকারী হয়েও বিদ্যাদানের কোন সময়ই পেলে না, তার বিদ্বান হওয়ার সার্থকতা কোথায়? দুটো কেতাব মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করলেই যে প্রকৃত বিদ্বান হওয়া যায় এ ধারণা মিথ্যা!

প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাই প্রকৃত বিদ্যা। কিন্তু আমাদের বিদ্যা হয় সূত্র দিয়ে—আরম্ভও এখানে। শেষও এখানে। সমাস ভাঙ্গতে ও গড়তে সূত্রের প্রয়োগ শিল্প ও চাতুর্য্য আমাদের নিকট অজানাই রয়ে যায়—তবুও আমরা "সূত্রবিৎ"। বিদ্যার উদ্দেশ্য মনকে উন্নত ও স্বাস্থ্যবান করা কিন্তু আনুষঙ্গিক ক্রিয়া বাদ দিয়ে যে কিভাবে এ কাজ সফল হয়, তা ভারতের শিক্ষিতদের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারা যায়। এর ফল স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে বি-এ, এম-এ পাশ করার পর আমাদের ছেলেদের আর কোনো উৎসাহ থাকে না! পিতার ভরসা, সমাজের রত্ন, জাতির আশা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তে আধুনিক বিদ্যা-যন্ত্রের ফল স্বরূপ নির্জীব, উৎসাহহীন জীব বিশেষে পরিণত! এখন বিচার্য্য—দোষ কা'র, যন্ত্রের না যন্ত্রীর?

ফুলটী কেবলমাত্র ভাল হলে চলবে না তাকে আরও দুদিন বাঁচাবার জন্য একটী জলপূর্ণ ভাল আধারের প্রয়োজন! মনের চাষের সঙ্গে সঙ্গে শরীরেরও উৎকর্ষ প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জিনিষটা আমরা ধর্ম্মের মধ্যেই আনি না! কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনের মরা-বাঁচার সন্ধিস্থলে এই জিনিষটা আমাদের আর উপেক্ষা করলে চলবে না। আজ শরীর ও মনের চর্চ্চায় জন্য লেগে যেতে হবে—কিছু মাত্র দ্বিধায় জাতির আরও অমঙ্গলই হবে!

বাংলার পূর্ব্ব সম্পদ, পূর্ব্ব সংস্কার, অধুনালুপ্ত জাতীয়তা ও ধন ফিরিয়ে আনতে কারও কি মন এতটুকুও

বিচলিত হয় না? বাংলার যুবকগণ আসুন, আমরা এই শুভ মুহূর্তে বাংলার শ্রী, বাংলার সম্পদ, বাংলার ধন, বাঙ্গালীর জাতীয়তা ফিরিয়ে আনতে ব্যায়াম চর্চা করি!

সাধারণ নিয়মাবলী

কখনও জোর করে পেশীসমূহ বাড়াতে চেষ্টা করবেন না।

অতিরিক্ত ও তাড়াতাড়ি ব্যায়াম হানিকর।

কতকগুলি ঠিক ভাবে করা ব্যায়াম অনেকগুলি বেঠিকের চেয়েও ভাল!

১—খ

ব্যায়ামের মাঝে মাঝে পায়চারি করবেন। সেই সময় পেশী সমূহ ভাল ভাবে ডলে দেবেন!

দরজা ও জানালাগুলি খুলে রাখবেন।

নাক দিয়ে নিশ্বাস নেওয়াই স্বাস্থ্যকর।

সাধাসিধা খাওয়া সবচেয়ে ভাল।

যে জিনিষ খেয়ে হজম করা যায় সেই জিনিষ খাওয়াই ঠিক! এটা আমরা যেন সব সময়েই মনে রাখি যে খাওয়ার জন্য বাঁচা না, বাঁচার জন্য খাওয়া? ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৭ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন।

মদ ও ঐরূপ দ্রব্য পান নিষিদ্ধ!

এই নিয়মগুলি পালন করতে সব সময়েই চেষ্টা করবেন ও মাঝে মাঝে কোন এই বিষয়ে এক্সপার্টের নিকট আপনার ব্যায়ামগুলি দেখাবেন—তাতে আর
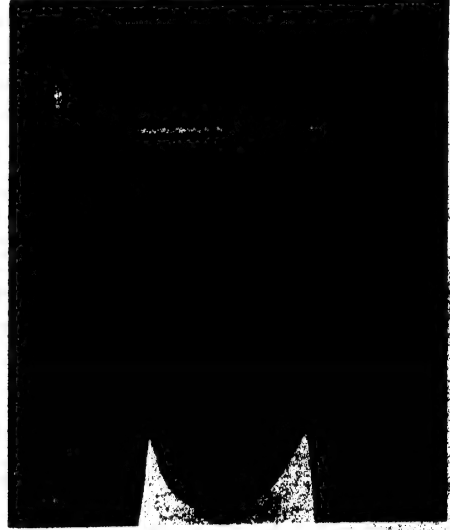
২—ক

কোন ভুল থাকবে না। আমাদের এখানে এলেও আমরা দেখিয়ে দিতে পারি।
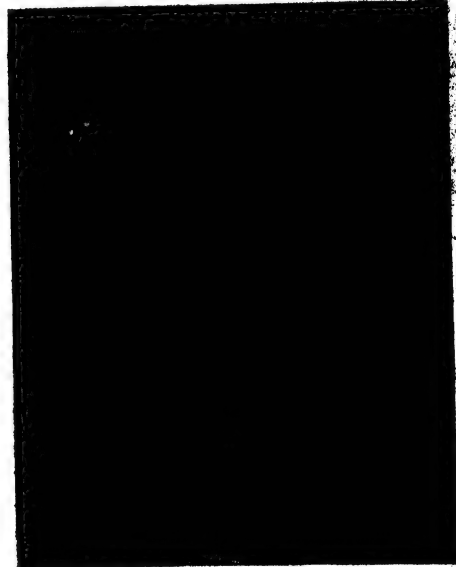
২—খ

এইবারের জন্য আমরা চারটে ফিগার দিলাম।

দাঁড়ান—দাঁড়িয়ে বারবেলের রডটা ছবিতে যে রকম দেখান হয়েছে সে রকম ভাবে ধরুন।

তারপর কব্জি ঘুরিয়ে বারবেলটা কাঁধের দিকে আস্তে আস্তে ওঠান। এই সময়ে উপরের হাতটা গায়েতে শক্ত করে চেপে রাখুন। তারপর ১খ ছবিতে যে রকম দেখান হয়েছে সেইভাবে রাখুন।

এই এক্সারসাইজে ওপর হাতের উপরকার পেশীটা বাড়ে। বারবেলের ওজন ১০ সের হবে! ১০ বার এইভাবে করুন।

কাঁধের ওপর বারবেল নিয়ে যান। ১ক ছবি যে ভাবে দেখান হয়েছে সেইভাবে বারবেলটা ধরুন। পা কিছু ফাঁক করে রাখুন!

তারপর আস্তে আস্তে সোজা করে বারবেলটা ওঠান। ওঠাবার সময় পেছনদিকে একটু হেলিয়ে রাখুন যাতে কাঁধের ও পেছনের পেশী সমূহে জোর পড়ে। ২ক ছবিতে যে রকম দেখান আছে সে রকম করুন! তারপর আস্তে আস্তে নামিয়ে একটু থেমে আবার ঐ রকম করুন! এই রকম ১০ বার করুন।

লেখক

অব্যক্ত

—গল্প—

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

এক

বাণীর বিয়ে!

বাড়ীতে ছেলের মধ্যে আমি ও মেয়ের মধ্যে বাণী। তাই সকলকার আদর অনাদরের মধ্য দিয়ে পরস্পর ঝগড়া মারামারি, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে বড় হ'য়ে আমরা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম যে আমরা এক-মাতৃ-গর্ভ-জাত নয়। বাণী আমার খুড়তুতো বোন।

আমার জ্ঞানতঃ বাড়ীতে কোন বিশেষ উৎসব সমারোহ হয়নি বলে, বাণীর বিয়ের সপ্তাহ পূর্ব্ব থেকে আমার আনন্দ বাড়ীর সকলকার আনন্দ থেকে ছাপিয়ে উঠেছিল।

সমারোহের সহিত বিয়ে হয়ে গেল। বরকে কিন্তু আমার মোটেই পছন্দ হ'ল না এবং বোধ হয় বাণীরও। অবশ্য পছন্দ ও অপছন্দতে কিছু আসে যায় না জানি, তবু বাণীর মনের কোন্ কথা ত আমার অজানা নেই!

ছেলে বেলায় ঝগড়ার মুখে যদি কখনো তাকে বলা হ'ত যে 'তোর কাল বর হবে' তবে সে পাল্টা জবাবে বলত যে 'আমার কেন? তোমার একটা কাল পেত্নী বউ হবে'খন্!' সঙ্গে সঙ্গে অভিমানটাও হ'ত তার মর্ম্মান্তিক!

যা'হক, বিয়ের পরদিন সকালে বর-কনের সঙ্গে আমিও মোটরে চড়ে বসলুম বাণীকে শ্বশুর বাড়ী 'রাখতে যাবার' জন্য।

গিরীন্দ্রদের বাড়ী কলকাতায়। গিরীন্দ্র হচ্ছে নতুন বরের নাম। রংটা ময়লা হলে কি হবে, কলকাতার ছেলে; সেই কাল রূপের চটকে আমাদের মত পাড়াগাঁয়ের লোকদের চোখে আলো ফোটায়! মাথার চুল থেকে নাগরার ডগা পর্য্যন্ত সমস্ত তার আর্টিষ্টিক্! বয়সে সে আমার চেয়ে বছর কয়েকের বড়।

গাড়ীতে সারা রাস্তা তার সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখলুম —নেহাত অভদ্র নয়।

তাদের বড়ীর সামনে হর্ণ দিয়ে যখন গাড়ী থামল সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার!

আতস বাজী যেমন সোঁ করে আকাশে উঠে সশব্দে ফেটে যায় এবং তাই থেকে এক রাশ তারা ফুটে খানিকটা আকাশকে কিছুক্ষণের জন্য রঙীন্ করে তোলে। তেমনি হঠাৎ একটা কলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একদল 'সজীব তারা' আমার চারপাশে উদয় হয়ে জায়গাটাকে আলোকিত, শব্দিত, কম্পিত, এবং পুলকিত করে তুল্লে। হুড়োহুড়ি, জড়াজড়ি, তাড়াতাড়ি করে সবাই ত বরকনেকে প্রায় কাড়াকাড়ি আরম্ভ করলে। তবু কেউ শুধু হাতে আসেনি, কারো হাতে বরণডালা, কারো হাতে জলের ঝারি, কারো হাতে আরো কত কি! তাদের রং-বেরংএর বেশভূষায়, হাসি-তামাসায় এবং প্রায় অধ্-চুড়ি শাঁখের অনৈক্যতাতে আমি যেন হতভম্ব হয়ে গেলুম।

হতভম্ব শুধু আমি একাই হইনি—। চেয়ে দেখলুম পথচারীরা পর্য্যন্ত বরকনেকে একবার চোখের দেখা দেখে আমার মত হতভম্ব হয়ে "তারাবাজী" দেখছিল!

বর কনেকে নিয়ে সকলেই প্রায় বাড়ীর ভেতর ঢুকেছে, এমন সময় পেছনকার একটি ময়লা মত মেয়ে গাড়ীর পানে একবার পেছন ফিরে চেয়েই অগ্রবর্ত্তিনীকে জড়িয়ে ধরে বল্লে 'শুনলাম, "মেজদি কে ব'সে রইল ভাই?"

তখনো আমি গাড়ীর এক কোণে তুবি মালের অবজ্ঞাত এক বস্তার মত বসেছিলুম।

অগ্রবর্ত্তিনী মেজদি চকিতে আমার পানে তাকিয়ে তদগ্রবর্ত্তী গিরীন্দ্রের উদ্দেশ্যে কহিল,—"হাঁ মেজদা, গাড়ীতে বসে ও কে?"

মুখ না ফিরিয়েই গিরীন্দ্র জবাব দিলে শুনলাম "জাসতুতো শলো"!

আমার প্রতি এরূপ সম্বোধন প্রয়োগ ক'রে, কাউকে এমন নবাবোচিত ষ্টাইলে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত আমি দিয়েছি বলে মনে হ'ল না কিন্তু এবার কথাটা শুনে মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে অন্যদিকে ফিরিয়ে বসলুম।

সঙ্গে সঙ্গে মেজদির আগমন, আমার প্রতি তুমি বাড়ীর ভেতর এসনা—ভাই তখন আমার থাক্ বলিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হওন। মেজদি 'থাক মানে' প্রশ্ন উত্থাপন, "থাকের" যে কোন মানে নাই নিরুত্তরে মৃদু হাস্যে তাহা মেজদিকে জ্ঞাপন, ফলে আমার হাত ধরে মেজদির আকর্ষণ, আমার গাড়ী হতে অবতরণ ও মেজদির অনুসরণান্তে বাড়ীর ভিতর একখানি ঘরে প্রবেশ করে সামনে শয্যা দেখে তদুপরি পতন, "একটু শুয়ে থাক আমি আসছি" বলিয়া মেজদির প্রস্থান।

তখন ভাবলাম, গত রাত্রেও ভাল খাওয়া হয় নাই, তাড়াতাড়ি আজ সকালেও কিছু পেটে যায় নাই যদি এই ভাবে আর অধিকক্ষণ কাটাইতে হয় তবে মূর্চ্ছা ও যবনিকা পতন অবশ্যম্ভাবী। বেলা ত কম হয় নাই ?

কিন্তু সে প্রকার কিছু ঘটল না। খানিক পরেই মেজদি এক ডিস্ মিষ্টান্ন ও এক গ্লাশ জল নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় গণ্ডাখানেক দিদি দরজার সামনে হাজির হল।

চিঁড়িয়াখানায় দৃষ্ট কোন অসাধারণ জীব বিশেষের এই বাড়ীতে আবির্ভাব হয়েছে এবং তাহাকে জলযোগ করান হচ্ছে—এই প্রকার সংবাদ রাষ্ট্র না করলে মেজদিকে অনুসরণ করে এতগুলি তারকার উদয় সম্ভব হব না।

মেজদি বলছেন "নাও হে জল খাও !

মেয়েদের মহলে আমি চিরকালই একটু বেশী লাজুক বিশেষতঃ ভোজন ব্যাপারে।

মেজদির শুভ প্রস্তাব শুনিয়া একবার মেঝের খাবারগুলির দিকে একবার দ্বারপ্রান্তবর্ত্তিনীগণের দিকে চাইতেই আমার মনোভাব বুঝে মেজদি বলিলেন "লজ্জা হচ্ছে বুঝি ? এই তোরা যা এখান থেকে"।

একজন বললে "কেন আমরা কি কুটুমের খাবারের ভাগ বসাব ? একজন বললে "না-না, যদি তোরা নজর দিস্ ?"

সেই কাল মেয়েটি, গাড়ীতে শেষ পর্য্যন্ত আমায় ব'সে থাকতে দেখে যে প্রথমে আমার প্রতি মেজদির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে মেজদিকে চাপাগলায় বলিল "তোর হাতে ত ভাঁড়ারের চাবি রয়েছে—দেনা মেজদি আমায় খাবার।"

মেজদি তার উদ্দেশে "হচ্ছে—হচ্ছে থাম্," ও আমার উদ্দেশে "নাও, খেয়ে নাও—আমার কাজ রয়েছে" বলে জনতাকে ধাক্কা দিলেন।

একজন ধাক্কা সামলিয়েও আমায় জিজ্ঞাসা করল "তোমার নাম কি ভাই ?"

আমি বল্লুম, 'অমূল্যরতন'।

প্রশ্নকারিণী চোক মুখ নাচিয়ে বলিল :—তুমি, মনমত

ধন অমূল্য রতন,

কোরবো যতন্

তোমারে।

আর একজন সায় দিল 'তুমি ভালবেসো উমারে'।

কাল মেয়েটি চকিতে আমার দৃষ্টি পথ হ'তে সরে গিয়ে শেষোক্তার পিঠে দুম করে এক প্রচণ্ড কীল্ বসালে ও তারপর হুড়োমুড়ি, চেঁচামেচি করতে করতে সবাই সরে পড়িল।

ই

বাণীর রূপগুণের সুখ্যাতি সবাই করল।

গিরীন্দ্রের দূর সম্পর্কীয়া বর্ষিয়সী একদিদি আমায় বললেন "জান ভাই অমূল্য, আমাদের ছেলেমেয়েরা কাল বলে রাঙা বউ করবার আমাদের অনেক দিনের সাধ ! বরাত ক্রেমে বড় বৌটাও হ'ল কাল। মিন্সেরা অমন ঠকান ঠকাবে, কে জানত বল ? সেই রাগেত অত কম টাকায় সুন্দরী মেয়ে বলে তোমাদের ওখানেই সম্বন্ধ পাকা করতে হল !"

সাগ্রহে প্রশ্ন করলুম "টকা কি রকম ?"

হেসে সাড়ম্বরে তিনি আরম্ভ করলেন—"সে কথা আর বল কেন ভাই! সুরেনের বে'র সময় তাদের কাছে থেকে নগদ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছিল। মেয়ে ত সুন্দরী ছেল না—অমনি পাঁচপাচি গড়ন। তা তারা হাজার টাকাই স্বীকার পেলে। আশীর্ব্বাদের দিন আমাদের সব দল বেঁধে গেল; ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করলুম 'কি গো, কেমন দেখলে ?' কেউ আর মন্দ বললে না। তারপর বে'র রাত্তিরে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড! কনে একেবারে শেওড়া গাছের পেত্নী, 'দেখনা ওই যে আসছে—" বলে রান্নাঘরের রোয়াক হতে উঠানে অবতরণশীলা এক তরুণীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে "ওইটি বড়বৌ" বলিয়া উচ্চ হাস্তে তিনি যেন ফেটে পড়লেন। "বুঝতে পেরেছ ব্যাপার ?—আশীর্ব্বাদের সময় অন্ত মেয়ে দেখিয়েছিল—এত বড় শয়তান তারা।"

নিজের বিরুদ্ধ সমালোচনার শেষাংশটুকু কানে যাওয়াতে বড় বধূ অবগুণ্ঠন দীর্ঘতর করে ফিরে গেল। বর্ষীয়সী দিদি আমার "মানটুকু আছে ষোল আনা!" বলে বড় বধূর উদ্দেশে ঘৃণা এবং হিংসা কুটিল দৃষ্টিপাত করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

গিরীনরা তিন ভাই ও পাঁচ বোন। ছোট বোন উমা ও ভাই তিনটি একেবারে মিশ্কালো। বাকি তিনটি বোন সুন্দরী না হলেও মন্দ নয়। বড় ভগ্নিপতির দিল্লীতে নূতন চাকরী, সেই জন্ত সপরিবারে আসতে পারেন নাই—কাজেই বড় মেয়েটিকে দেখা ভাগ্যে ঘটল না।

রাত্রে গিরীনের সহিত আমি তার খাটে শুলাম ও ঘর কম বলে গিরীনের মা, বাণী, উমা ও সেই বর্ষীয়সী দিদিটি মেঝেয় বিছানা পেতে শুলেন।

একথা সে কথার পর হঠাৎ গিরীনের মা বললেন "যাবার সময় তোমায় একটা জিনিস দেবো অমূল্য!"

আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করলাম "কি ?"

দিদি বললেন "আমার কাল ছেলের বদলে তোমায় [illegible] আমার রাঙা বৌ [illegible]

ছেলের বদলে আমি তোমায় আজ একটি [illegible] দেবো, নিয়ে যেও।"

বর্ষীয়সী দিদিটি সায় দিয়ে ব'লে [illegible] হ্যাঁ, উমির জন্তে বর খুঁজে ত আমরা হয়রাণ [illegible] গেলুম! তেমন পয়সারও বল নেই যে কাল [illegible] পড়তে পাবে না। গিরীনকে ত আর অমূল্যর [illegible] বেশী কিছু দেয় নি, আমরাও দেবো না। একবারে বে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো কি বল ভাই ? উনি বলছে তোমাকে ওর বড্ড পছন্দ হয়েছে, কেবল ও [illegible] কাল তাই, তা না হল তোমার ওই বলত"—

ঘরের বাতি নিভান ছিল। অন্ধকারে [illegible] করলাম নীচে উমার সঙ্গে প্রস্তাবকারিণী দিদির [illegible] বেধেছে। দিদি বলতে যাচ্ছিলেন "তা আমার [illegible] কেন, আমি কি করবো ? তোর মা-ইত কথা [illegible] —কথা শেষ হল না। বুঝলাম দিদির মুখে [illegible] হাত চাপা পড়ল।

গিরীন জিজ্ঞাসা করল "কিহে রাজী ?"

আমি বলে ফেললাম "না"—মনে মনে কিন্তু [illegible] গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করলাম।

গিরীনের মা বললেন "না বললে চলবে না [illegible] জোর করে আমরা বিয়ে দেবো। হাতে পেয়ে কি এমন বর ছাড়তে পারি ?"

আমি গিরীনের একখানা হাত দৃঢ়ভাবে চেপে [illegible] বললাম "আমি কালই বাড়ী যাব—"

গিরীন বল্লে—"তা আমার হাতে ধরলে কি [illegible] ওদের বল—"

তারা সবাই বোধ হয় ভেবেছিল আমি [illegible] ক'রে বিয়ে দেবার প্রস্তাবে আনেক ভয় পেয়ে [illegible] তাই মজা দেখবার জন্ত বর্ষীয়সী দিদি বললেন "[illegible] এ কথাই রইল। এ মাসের [illegible] দিয়ে একেবারে বর কনে [illegible] নিয়ে গিরীন যেতে আসবে'খন! বিয়ে হলে [illegible] আর ত কেউ কিছু বলতে পারবে না।"

[illegible] দুই কাপ [illegible] রইল [illegible]

করিতে উদ্যুক্ত হইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলাম "কাল ভোরেই আমি পালিয়ে যাব।"

গিরীন বললে "বিয়ে না হয় নাই করবে, তা'বলে কেঁদনা।"

ভাগ্যে অন্ধকারে আমার মুখের হাসির ঢেউ তারা দেখতে পায় নি!

ঘরশুদ্ধ সবাই খুব জোরে হেসে উঠ্‌ল।

পাঁচদিন গিরীনদের বাড়ী ছিলাম যেন স্বপ্নলোকে ছিলাম। সারাটাদিন বাড়ীর মেয়েরা বাণীকে নিয়ে কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, পরেশনাথের মন্দির, শিবপুরের বাগান, বায়স্কোপ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত—আমিও বাদ পড়তুম না। অবশ্য সঙ্গে আর একজন পুরুষ থাকতই।

সেদিন রাত্রের কথাটা সবার কানেই গিয়েছিল। সেই জন্য উমা ও আমার অনাগত সম্বন্ধটা জাঁকিয়ে তুলে গিরীনের বোনেরা আমাদের দুজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে।

প্রথমে উমা মোটেই আমার কাছে ঘেঁস্‌ত না। তারপর দরকারে জল-টা পান-টা সসঙ্কোচে এগিয়ে দিতে লাগ্‌ল। তারপর লক্ষ্য করলুম তার সাক্ষাৎটা সকলের অসাক্ষাতেই আমার সঙ্গে ঘট্‌তে লাগল। অবশ্য বিনা কারণে সে আসত না; গৃহস্থালীর কোন কাজে ঘরে ঢুকেই তার দরকার সেরে বেরিয়ে যাবার সময় আমার প্রতি সলজ্জহাস্তে বাঁকা চোখে চেয়ে যেত। অথচ সকলের সাক্ষাতে দেখাত যেন সে আমার সামনে মোটেই বেরোয় না।

সেদিন বিকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছি, মেঝের মেজদি, সেজদি, বাণী আরো দু'একজন তাস নিয়ে পড়েছিল, হটাৎ ন'দি' অনিমা কুলপী বরফ খেতে খেতে এসে আমার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলে "কি বই ভাই ও খানা?"

আমি বল্লুম "মেজদিদি"—

ন'দি' প্রথমটা অবিশ্বাস করে ঝুঁকে আমার পাশেই শুয়ে পড়ল, তারপর যখন দেখলে সত্যি সত্যিই বই খানার নাম "মেজদিদি," বললে "আচ্ছা 'ন'দি'" বলে কোনো বই নেই?"

আমি মুখ না তুলেই বললুম "শুনিনি ত।"

ন'দি' বললে "তোমার এ বইটা শেষ হলে একখানা ভাল বই দেবো—"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "কি বই?"

ন'দি' বললে "উমা"

চকিতে আমার ও নীচের ভিড়ের মধ্যে থেকে উমার দৃষ্টি বিনিময় হতেই উমা হেসে পেছন ফিরে বসল ও ন'দি' "পিরীত জমেছে" বলে তার আধ-খাওয়া বরফটুকু আমার মুখের ভেতর পুরে দিয়ে পালাল। যখন শুনলাম ন'দিনের দিন বাণী বাড়ী ফিরবে তখন আমি বাড়ী যাবার জন্য জামা কাপড় পরে বসলুম। ইচ্ছা থাকলেও আরো চার দিন পড়া কামাই করে এখানে বসে থাকবার প্রস্তাব আ মার ভাল ঠেকল না। বাণী নাকে কেঁদে বল্লে "আমি একলা থাকতে পারবে না," গিরীণের মা হেসে বল্‌লেন "ভয় নেই, ধরে বিয়ে দে'বো না"—ন'দি' ভয় দেখালে "চলে গেলে 'উমা' পাবে না"—।

তিন 'না' মিলেও আমার জামা কাপড় ছাড়াতে পারলে না। উপর থেকে নীচে এসে যে ঘরে আমার জুতো ছিল সে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলুম দরজা বন্ধ। দু'তিন বার ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল; ভেতরে ঢুকে দেখলুম আমার পম্পসু জোড়া পায়ে দিয়ে উমা একা দাঁড়িয়ে আছে।

এই প্রথম তাকে ঠাট্টা করবার লোভ সাম্‌লাতে পারলুম না বললুম "যাচ্ছ ত আমার সঙ্গে?"—

আজ উমা হাসলে না, বিচিত্র ভঙ্গীতে চাইলে না; অসঙ্কোচে অচঞ্চল স্বরে বল্‌লে "নিয়ে গেলে আর কে না যায়!"—

"আচ্ছা, এবার এসে নিয়ে যাব"—বলে তার পা থেকে জুতো খোলবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। অতি সাহসে বল প্রয়োগ করলুম, নিষ্ফ হাস্তে উমা তা সহ্য করে গেল। তখন কি দরকারে মেজদি এসে ঘরে ঢুকেই হেসে বললে "বিদায় নেওয়া হচ্ছে নাকি?" "হ্যাঁ" বলে মেজদিকে বিনয় ক'রে বললুম "জুতো দিতে বলুন না মেজদি—"

মেজদি হেসে বললেন "ছিঃ, যাবার সময় ও কথা বলতে নেই, ওরে উমা, 'জুতো নাহি দিব' নাবলে, বল 'যেতে নাহি দিব'।" বলে তার দরকার সেরে বেরিয়ে যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

মেজদি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই উমা পায়ের জুতো খুলে পাশের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। আর কোন ক্রমেই তাকে বিছানায় ফেরাতে বা কথা বলাতে পারিনি—। তার পিঠের উপর একটা চিম্‌টি কেটে ঘর থেকে—বেরিয়ে গেলুম। রাস্তা-থেকে দেখতে পেলুম, উমা জানলা থেকে জোড়া হাত ছ'টি কপালে ঠেকিয়ে আমার নমস্কার জানাচ্ছে!

তিন

তারপর সুদীর্ঘ ছ'টা বছর কেটে গেল।

জগতের অনেক পরিবর্ত্তনই প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছি, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা-হর্ষও জমা ক'রে রেখেছি বড় কম নয়।

শ্বশুর বাড়ী থেকে বাণী প্রথম এসে বাড়ীতে উমার জন্যে একটু ওকালতী করেছিল, সেকথায় কেউ কান দেয় নি। তাতে বাণী একটু অভিমানও করেছিল আমাদের উপর।

বাণীর চিঠিতেই মাঝে মাঝে খবর পেতুম উমার জন্য অন্য জায়গায় বর খোঁজা হচ্ছে। মেয়ে ডাগর ও ময়লা আর টাকা বেশী খরচ করতে পারা যাবে না ব'লে কোথাও সম্বন্ধ পাকা হ'চ্ছে না। লেখাপড়া বেশ ভালই জানে, সেলাই, বোনা, কাজ-চালান মত পারে; সব চেয়ে মনটা তার এত ভাল যে কেউ ভাবতেও পারে না। লুকিয়ে লুকিয়ে বাণীর কাছে আমার কথা নাকি দিনে অন্ততঃ দশবার জিজ্ঞাসা করে।

বাণী আমায় লিখেছিল, "তুমিত 'রতন' চিনলে না, যদি পার তোমাদের ওখানে একটা পাত্র সন্ধান ক'রো। আর অন্তি অবশ্য আমাদের এখানে একবার এসো।"

পাত্র ত দেখাই হয়নি; অধিকন্তু বাণীর বাড়ীতেও নানা কারণে যাওয়া ঘটে ওঠেনি।

তারপর বাণীদের বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ পত্র পেলুম আমাদের পাশের গাঁয়েই নাকি উমার বিয়ে! পাত্রের পরিচয় পেয়েই সারা দেহ মন আমার সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠল। আদালতে মুহুরীগিরি ক'রে কোন রকমে জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলেছে, কোন রকমের নেশাই তার অপ্রিয় নয়। প্রথম পক্ষের তিনচারটি "গেঁড়ি-গেণ্ডি" বর্ত্তমান। থাকবার খোলার ঘরটুকু পর্য্যন্ত জীর্ণ।

সামর্থ্য থাকতেও যে লোকে অপব্যয় নিবারণের জন্য মেয়েকে জলে ফেলে দিতে পারে, বাণীর শ্বশুরদের আগে এমন আর কাউকে দেখিনি। বিয়ের সময়ও আমি যেতে পারিনি। কিন্তু, এখন বলতে লজ্জা নেই, কেন জানি না; সেই কাল মেয়েটির খুঁটিনাটী খবরটুকুর জন্যও আমি প্রায় প্রত্যহ উন্মুখ হ'য়ে থাকতুম।

বাণীর চিঠি পেলুম "দাদা, তোমরা কি আমায় পর্য্যন্ত ভুলে যেতে বসেছ? আজ তিনমাস তোমাদের খবর পাইনি কেন? আমরা সবাই ভাল আছি। পত্র পাঠমাত্র জবাব দিতে ভুলো না। আর যোশেখ্ মাসে আমায় হরিসভা দেখতে নিয়ে যেও না—দাদা! অনেকদিন দেখিনি, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে।

জান দাদা, আমার ছোট ননদ (তোমার উমা গো) শ্বশুর বাড়ী গেছে। যাবার সময় তার সে কি কান্না! আমার সঙ্গে বড্ড ভাব হয়েছিল কিনা! যাবার আগে একদিন কথায় কথায় বলছিল, 'বৌদি এবার তোমাদের বাড়ীর কাছে থাকব, তুমি যখন বাপের বাড়ী যাবে আমার সঙ্গে দেখা ক'র ভাই, লক্ষ্মীটি! আর তোমার ইয়ে কে—একবার দেখা করতে ব'ল না।'

আমি বলেছিলুম 'আচ্ছা, দাদাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে লিখবো'খন।' লক্ষ্মীটি দাদা, একবার উমার সঙ্গে দেখা ক'র।"

কিন্তু ভেবে পেলুম না, কলকাতার মেসে থেকে, কলেজে পড়তে পড়তে কি করে, কোন মুখেই বা হঠাৎ উমাকে দেখতে যাব? কিন্তু মাস ছয়েক পরে বাণীর দ্বিতীয় পত্র আমায় উমার বাড়ীতে যেতে বাধ্য করালে। বাণী লিখেছিল :—"দাদা আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। ছোট ঠাকুর জামাই কলেরায় মারা গেছেন। বিয়ের

পর থেকেই উমার শরীর ভাল ছিল না—এখন বুকের অসুখ দাঁড়িয়েছে একেবারে শয্যাগত। সেদিনে আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবাই ট্যাক্সি করে তাকে দেখতে গেছলুম। সেও বাঁচবেনা দাদা, যদি পার, তাকে শেষ দেখা দেখে এস—"

সেজে-গুজে, একরাশ দুশ্চিন্তা বুকে বহন করে উমার বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম বটে কিন্তু তার বাড়ী পৌঁছান ঘট্‌ল না।

রাস্তার ধারে শ্মশানে একটা জলন্ত চিতার পাশে গিরীন্দ্রের ছোট ভাই হরেনকে দেখে সব বুঝতে পারলুম।

* * *

বাণীর ছেলের অন্নপ্রাসনের সময় যেতে, বাণী একান্তে ডেকে উমার কথাই বল্‌ছিল "তুমি জাননা দাদা, উমা তোমায় কি ভালই বাসত! আমার বিয়ের পর সত্যি সত্যিই আশা করেছিল যে তোমার সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। তোমার একখানা ফটো আমার ট্রাঙ্ক থেকে সে চুরি করেছিল, তার নিজের রাখবার জায়গা ছিল-না বলে একদিন আমার কাছেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল 'আমায় একটা বাক্স দিতে পার বৌদি!' কাল ছিল বলে সে একদিনের জন্য কারো কাছে মিষ্টি কথা পায়নি! তারপর অমন জায়গায় বিয়ে হ'তে ভেবে ভেবে মনের দুঃখেই ম'রে গেল।"

বল্‌তে বল্‌তে বাণীর দু'চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়ছিল! বার বার চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাণী বলে যাচ্ছিল। "যেদিন আমরা তাকে দেখতে যাই সে দিন তার অবস্থা খুবই খারাপ। একটা ময়লা বিছানায় শরীর একেবারে মিশিয়ে গেছে। মুখের হাসি কিন্তু কমেনি। কাল গালে সে টোল-খাওয়া হাসি যেন এখনো আমার চোখে ভাসছে! ঠাকুর-জামায়ের সঙ্গে তার বিয়েই হয়েছিল, প্রাণের যোগ একদিনের তরেও হয়নি। আমায় একলা পেয়ে দু'হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, 'বৌদি, আমায় এখান থেকে তোরা নিয়ে চল্ ভাই, না হলে আমি বাঁচব না। আমি বল্‌লুম নিয়ে যাব বৈকি, একটু ভাল হয়ে ওঠ। ডাক্তার এখন নাড়াচাড়া করতে বারণ করেছে কি না?

অপ্রসন্ন মুখে সে খালি বললে "ডাক্তার না ছাই! তারপর একটু হেসে বললে তোরা খোঁজ খবর নিসনি আজ সকালে মনটা বড্ড খারাপ হয়েছিল। জীবনে প্রথম একটা অন্যায় কাজ করতে বসেছিলুম" বলে বালিসের তলাথেকে একখানা কাগজ বার করে আমার হাতে দিলে, বল্লে পড়ে ফেল্!"

হঠাৎ বাণী "একটু বস, আসছি" বলে উঠে গেল-ও পাশের ঘর থেকে এক টুক্‌রো ভাজ করা কাগজ এনে আমার হাতে দিয়ে বললে, "আমি ছিঁড়িনি পড়ে দেখ—"

একখানা অসমাপ্ত চিঠিতে লেখা—ছিল :—

"ওগো আলোর দেশের রবি!

অন্ধকারে আলো দেওয়াই না তোমার কাজ? একজনার জীবন-রাত্রি যে তোমার অকরুণ গোপনতায় শেষ হ'তে বসেছে, একটি সূর্য্যমুখী যে তোমার একটি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত বিনা ঝরে যাচ্ছে, এ খবর কি তুমি পাওনি? শুনেছি, তপস্যায় নাকি দেবতার প্রসন্নতা লাভ করা যায়; কিন্তু ওগো নির্ম্মম, নির্ব্বাক পাষাণ দেবতা, আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের একাগ্র সাধনা কি জন্মান্তরেও তোমার প্রীতিকিরণে সুরভিত হয়ে উঠবে না?

জানি, আমার এ ভাষা জগতে প্রকাশ হবে না, জানি শাস্ত্রের অনুশাসনে মনের মধ্যেও এ ইঙ্গিতের ছায়াপাতে আমার ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবে, তবু আজ মরণের অনাকাঙ্ক্ষিত ভয়াল উপকূলে বসে কি তৃপ্তিই যে পাচ্ছি—এত দিনের অব্যক্ত আমার লিপিবদ্ধ ও লোভনীয় স্মৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে এই রকম চিঠি লিখতে!

যখন আর আমি এ জগতে থাকব না, তুমি তোমার গার্হস্থমণ্ডলের মধ্যে জ্যোতিষ্মান হ'য়ে বিরাজ করবে। যদি কখনো এই ধূলি-মলিন, জগতের অবজ্ঞাত, তোমার দীনা উপাসিকার করুণ কাহিনী শুনে আঁখি সজল হ'য়ে ওঠে, নরকের ভীষণতম যাতনা উপভোগ করতে করতেও খানিকক্ষণের জন্য আমার অশরীরি আত্মা পুলকাকুল হ'য়ে উঠবে জেনো।

কিশোর হৃদয় কাননের আশালতার মূলে বিদায় বেলায় তুমিইত শান্তিবারি সেচন করি গিয়েছিলে; তবে কেন ওগো, কেন একটি দিনের জন্যও—"

আর সম্বরণ করতে পারলুম না! দীর্ঘদিনের যত কথা-ব্যথা যত আকুলতা মনের মধ্যে পাহাড়ের মত জমে উঠেছিল, কাল মেয়েটির অব্যক্ত মুখর ভাষায় আজ বাণীর সামনেই সব অশ্রুর আকারে প্রকাশ হতে লাগল!

কাব্যে-সাহিত্যে—প্রেম

প্রবন্ধ

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

স্নেহে, প্রেমে, করুণায়—নানা বৃত্তির সমবায়ে মানব জীবন গঠিত। কিন্তু প্রেম মানুষের হৃদয়ে যেমন আধিপত্য করিয়াছে এমন আর কোন বৃত্তিই পারে নাই। প্রণয়ের জন্য কত রাজ্য-সাম্রাজ্য উৎসন্ন গিয়াছে, কত শান্তির সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সাধু ঘোর সংসারী এবং ভোগমত্ত-সংসারী হইয়াছে। প্রেম সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রভূত প্রভাবশালী। এমন কি, সাহিত্যের অধিকাংশই ব্যাপিয়া আছে প্রণয় কাহিনীতে।

সাহিত্য—জীবনের প্রতিচ্ছবি। জীবনের বাস্তব সত্তায় যাহা কিছু রহিয়াছে এবং থাকিতে পারে, তাহাই সাহিত্যের অবলম্বন। কোনও একটি বিশেষ বৃত্তি যেমন জীবন নহে, তেমনি কোনও একটি ভাবও সাহিত্যের সর্ব্বস্ব নহে। কোনও বিশেষ ব্যক্তি হয়ত কোনও একটি বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে এবং তাহাতে হয়ত বিশেষ হানিও হয় না। কিন্তু সাহিত্য এক ভাবাপন্ন হইলে তাহাতে সাহিত্যের সহিত মানব সমাজেরও অকল্যাণ হয়। কারণ সাহিত্য ব্যষ্টি মানবের সম্পত্তি নহে, তাহা সমগ্র জাতির সম্পদ। সাহিত্যে পরিপূর্ণ জীবনকে পাইতে হয় এবং এই পরিপূর্ণতা লইয়াই সাহিত্য, অর্থাৎ স্নেহ, সখ্য, করুণা, মৈত্রী সমস্তই সম পরিমাণে সাহিত্যের উপকরণ।

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে পূর্ণ জীবনের পরিচয় নাই। তাহা কেবল প্রণয় রসে অভিষিক্ত—তাহাও আবার বিকৃত প্রণয় রসে পরিপ্লুত। প্রেম যে হেয়, তাহা নহে, কিন্তু কেবল মাত্র প্রেমই সাহিত্যের সর্ব্বস্ব হওয়া উচিত নহে। কোনও কবি বা ঔপন্যাসিক কেবলমাত্র প্রণয় চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যিক এবং কবি মাত্রেরই যখন তাহা একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠে, তখন এই ধারণাই বলবত্তর হয় যে, জাতীয় চরিত্রে কোথাও কিছু অস্বাভাবিক অসুস্থতা আসিয়াছে। স্নেহ মায়া, করুণা, প্রীতি, থাকিতে প্রেমের দিকেই আকর্ষণ কেন? ইহার পিছনে অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে।

অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা ভালবাসার যেখানে প্রতিপত্তি সমধিক, সেখানে ভাল করিয়া কষিয়া দেখা উচিত, তাহাতে কতখানি খাদ আছে। কেননা ভোগেচ্ছা প্রায়ই ছদ্মসাজে আপনাকে প্রণয় রূপে প্রকাশ করে।:—

"মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢল ঢল
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভ আকুল।"

অধিকাংশ স্থলেই এই নিতান্ত স্থূল কামনাই প্রণয় বলিয়া পরিচিত। আর এই প্রেম লইয়াই আধুনিক উপন্যাস ও গীতি কাব্যের কারবার চলিয়াছে।

কামে ও প্রেমে ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ভালবাসার গতি মিলনের দিকে। রিরংসাও মিলন চাহে সেই জন্য আসক্তি সহজেই মানুষকে প্রতারিত করিতে পারে। কিন্তু মানব যতই সভ্য হইয়াছে, পশু প্রবৃত্তিকে ততই সে ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে; বা যে প্রবৃত্তিগুলি অপরিহার্য্য, তাহাদের শোধন করিয়া লইয়াছে। এই পরিশুদ্ধ বৃত্তি সমূহের মধ্যে কাম অন্যতম। পরিণয় তাহার সংশোধিত প্রকাশ। তাই প্রেম ব্যাপারে অবাধ মিলন প্রায়ই দুর্নীতিকর।

বেশীর ভাগ—নরনারীকে আশ্রয় করিয়াই প্রেমের লীলা অভিব্যক্ত হয়। প্রণয়ের অর্থ যদি ভালবাসা ব প্রীতিই হয়, তবে কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রণয়ের এমন বিকাশ কেন সংসাধিত হয়? নিখিল বিশ্বে সুন্দর ও শোভনের অভাব নাই। যেখানে সেই সব ছাড়িয়া রমণীই কেবল মাত্র রমণীয়া হয় সেখানে অনুমান করা উচিত, যে তাহা শুদ্ধ অনুরাগ

নহে, তাহা রতি। আবার দাম্পত্য সম্বন্ধ ব্যতীত নর-নারীর মিলনকে সর্ব্বক্ষেত্রে পবিত্র বলিয়া স্বীকার করাও যায় না।

বাংলা কাব্য সাহিত্য প্রায় সর্ব্বাংশে রমণী প্রণয়ে অধিকৃত। সেই জন্যই আশঙ্কা হয় যে এখানে প্রেম বলিয়া কাম না চলিয়া যায় :—

"চিকনিয়া গাঁথিতেছে বকুলের মালা'
আমারেও ঐ সাথে গেঁথে ফেল বালা"

ইহা লালসারই রূপান্তর। যেমন করিয়াই ভাষা ও ছন্দের অলঙ্কারে শোভিত থাকুক, ইহা অতি স্থূল আসক্তি মাত্র। মিলন সাধ ভালবাসার একটা প্রকৃতি বটে, কিন্তু ঐ প্রকৃতির সবটাই প্রকাশের নহে। ইহা ভিন্ন যদি প্রণয়ের আর কোন পরিচয় না থাকে, তবে তাহাকে এড়াইয়া চলাই সভ্য মানবের কর্ত্তব্য।

কাহারো কাহারো আপত্তি যে তাহাতে আর্ট নষ্ট হইয়া যাইবে। শুদ্ধ রুচি ও নীতি লইয়া নহে; শিল্প-কলাই কাব্য-সাহিত্যের সর্ব্বস্ব। যাহা সৌন্দর্য্যময় তাহাই কাব্যের উপাদান। নগ্নতাকেও কেহ কেহ সৌন্দর্য্য বলিয়া চালাইতে কুণ্ঠিত নহেন।

সৌন্দর্য্য সৃজন করে বলিয়াই আর্টের আদর। কিন্তু সৌন্দর্য্যের বিচারও বড় কঠিন। লালসাতেও সৌন্দর্য্য বুদ্ধির উদ্রেক করায়! সেই জন্য নগ্ন মূর্ত্তিও অনেকের কাছে রমণীয়। মানুষের আদি আবির্ভাব উলঙ্গ হইয়া। ক্রমশঃ সভ্যতার বৃদ্ধিতে সে দেহকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। কেবল যে শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষা করিতেই আচ্ছাদনের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নহে; পশুত্বকে আবৃত করিবার জন্যই অমন করা হইয়াছে। আর্টকে বিশ্লেষণ করিয়া যেখানে ভোগ বিলাসকে পাওয়া যাইবে, সেখানে তাহা ত্যাগ করাই বিশেষ কর্ত্তব্য। মানব জীবনে পশু ভাবেরই প্রাবল্য, তাহাতে আর ইন্ধন যোগান উচিত নহে।

মানব মনে সাহিত্যের প্রখর প্রভাব। তাই কাব্য সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে পবিত্র না রাখিলে জাতীয় চরিত্রের অমঙ্গল সাধন করা হয়। বাসনা, সংস্কার এবং সামাজিক সংস্কারের প্রভাবে সুপ্ত থাকে। আর তাহাতেই সামাজিক মানব প্রকৃত হয়। অনেকের মতে জাতি ও সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি পরিমাপ করিয়া কাব্যের বিচার নহে; রসেই তাহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচয়।

মরণশীল বিশ্বে মানুষ বাঁচিতে চায়, অমর হইয়া বাঁচিতে চায়। চায় বংশ পরম্পরা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে। নহিলে, কেবল মাত্র আত্মতুষ্টির জন্য জীবন হইলে সভ্যতা ও সমাজ সৃষ্টির কোনই প্রয়োজনীয়তা রহিত না। সাহিত্যও তাহাই। উহা কেবল মাত্র তুষ্টি-তৃপ্তির উপকরণ নহে, জীবনের অমৃত। সংসারে তিষ্টিয়া থাকিতে, বলবান ও বিজয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে সাহিত্য প্রচুর সহায়তা করে। পতঙ্গ জীবনের ক্ষণিক প্রমোদ বিহ্বলতা জয়ী করে না; করে পরাজিত।

তথাকথিত প্রেমে আর একটা আশঙ্কা যে তাহা ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, অনুপ্রাস প্রভৃতির আবরণে অশ্লীল-তাকেও নির্ব্বিরোধে চালাইয়া দেয়। সাধারণতঃ যাহা কাম সিক্ত, তাহাই মধুর। কারণ, পাশব স্বভাব এখনও মানুষের হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সেই জন্য এরূপ হইয়া থাকে। প্রকাশ্যে, স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন আশ্লেষ অসভ্যতা। তাহা আছে অন্তরালে। আর প্রকৃতির প্রভাবে অত্যাজ্য বলিয়াই আছে। নর প্রকৃতিতে পশু-স্বভাব যেটুকু, সেটুকু রাখিতে হইয়াছে জীব স্বভাবের অপরিহার্য্যতার বশবর্ত্তী হইয়া। কিন্তু উহা এমনি অদম্য বা শৃঙ্খলাবদ্ধ শার্দ্দূলের মত সর্ব্বদাই বাহির হইবার জন্য লালায়িত। যেখানে একটু ফাঁক কি সুবিধা পায় সেইখানেই প্রকট হয়।

কুৎসিত যাহা, তাহাকে একটু চিত্রিত করিলে, একটু সাজাইলে, একটা শোভন আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিলে মনোহর বলিয়া বোধ হয়। ছন্দ, শব্দ অনুপ্রাস এই সব চারু আভরণ। বাসনা বুদ্ধি এই সব সাজে সুসজ্জিত হইয়া প্রতারিত করিবার সুখ সুবিধা পায়। সেইজন্য সাহিত্যে কুরুচি ও কুভাবের বড়ই প্রাবল্য! যাহা সভ্য সমাজে অচল, সাহিত্যে কাব্যে তাহা নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে। সভ্য সমাজে বিশেষতঃ ভারতীয় সমাজে এমন নির্লজ্জ কেহই নাই যে, সাধারণ সমক্ষে নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে পারে। মানসী প্রিয়ার পক্ষেও ইহা বেশ সচল নহে। চোর ডাকাত বা হত্যাকারী ভদ্র সাজ পরিয়া যেমন ভদ্র দলে মিশিয়া যায়, ইতর ভাব গুলাও তেমনি কাব্যের আবরণে শিষ্ট বলিয়া চলিয়া যায়।

যাহা দুর্নীতি ও পাশবাচার, তাহাই অনুষ্ঠান করিতে বা ভাবিতে লজ্জা হয়। মানুষের আচার ও আচরণ দীপ্ত দিবালোকের মত জাগ্রত জগতের কাছে স্বপ্রকাশ; তাহার অনুষ্ঠানে কুণ্ঠা আসিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। মাতৃবক্ষে সন্তান, সুহৃদ সম্মিলনে বন্ধু, সংসারের পরিচর্য্যায় গৃহ-লক্ষ্মী এই সব বিশ্বের কাছে অতুলনীয় দৃশ্য। অভিসার কিন্তু এমন নহে।

আজকাল বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে কামদিগ্ধ ভাবগুলাকে শোভনীয় করিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার নাম মানসিক দুর্নীতি। সমাজে যাহা অচল, তাহা সাহিত্যেও চলিতে পারে না, চলিতে দেওয়া উচিত নহে। এই কথায় একদল সমালোচক বলিবেন, রস যদি না থাকিল, তবে সাহিত্যের রহিল কি? হিতোপদেশ ও চাণক্যশ্লোক কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসন পাইবে? আর নীতিও ত চিরন্তন নহে; যুগে যুগে, কালে কালে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। এই সব কথা কতক সত্য। নীতি শাশ্বত নহে। কিন্তু তাহা সামাজিক আচার। চারিত্র-নীতি সকল সময়েই অটল। মিথ্যা বলিতে নাই, ইহা আজও নাই, কালও ছিল না, ভবিষ্যত যে কাল আসিবে, তাহাতেও থাকিবে না।

সকল বিষয়ের ব্যতিক্রম আছে। নীতিরও আছে। এবং এই সব নীতি নিয়ম কেবল মাত্র সামাজিক নীতি রীতি। কিন্তু সামাজিক বলিয়া এবং উহা পরিবর্ত্তনীয় বলিয়া নীতির মূল আদর্শ অপরিবর্ত্তনীয়। সেই জন্য কাব্য বিচারে যখন রসের কথা উঠে, তখন সেই রস রীতি ও নীতির সনাতনীকে অতিক্রম করিয়া যায় না। সাহিত্য সভ্যতার প্রধান সহায়। এই জন্য অতি সাবধানে সাহিত্য গড়িতে হয়। উহাতে দুর্নীতি প্রচারিত হইলে জাতীয় চরিত্র অবনত হইয়া পড়ে। যে সাহিত্যিক তাহা করেন, তিনি তাঁহার স্বজাতির বিষম শত্রু। মনুষ্য হৃদয় স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। সংযম সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য। প্রলোভন হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হয়। নহিলে প্রায়ই পতন ঘটে। যিনি তাহার উপর কামনাকে মধুর এবং মনোহর করিয়া দেন, তাঁহাকে সন্তানের সহচর বলিলে বেশী বলা হয় না।

রস কাব্যের প্রধান আলম্ব। আর যত বিরোধ ঐ রস লইয়া। সাহিত্যে ও কাব্যে যে সব আবর্জ্জনা ও উপসর্গ চলিতেছে, তাহা ঐ রসের খাতিরে। রুচি জিনিষটা সংস্কারের বশবর্ত্তী। আর সংস্কারের নিয়ামক শিক্ষা-দীক্ষা। শিক্ষার অবলম্বন সাহিত্য। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরে যে রস চালাইয়া ছিলেন, এখনকার দিনে তাহা অচল। কারণ তাহা রুচি সঙ্গত নহে। ভারতচন্দ্রের কবিতায় তখন লোকে রস পাইত। রস ছিল বলিয়াই ত পাইত। এখনই বা তাহা রসহীন কেন? রস বোধ নিত্য বস্তু; কিন্তু রসের আলম্ব নিত্য নহে। শিক্ষায় রুচিপরিবর্ত্তন হইয়া যায়। আর শিক্ষিত সমাজে সাহিত্যের সহায়তাতেই রুচির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

উত্তমের আদর্শ না ধরিলে অধমই উত্তম বলিয়া চলিয়া যায়। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কবি ও ঝুমুরের যে গান হইত সে যে কি অশ্লীল তাহা বর্ণনাতীত। অথচ সেই গানই নিরক্ষর কৃষক হইতে শিক্ষিত পর্য্যন্ত সানন্দে শ্রবণ করিতেন। এবং তাহা তখনকার বাঙ্গালীর পরম উপভোগ্য ছিল। আর আজ শিক্ষিতের ত নহেই, কৃষকেও তাহা শোনে না, শুনিতে চাহে না। কারণ, তাহা হইতে একটু মার্জ্জিত যাত্রা-গানের সৃষ্টি হইয়াছে। মহৎ চিত্র দেখাইতে হয়, তবে তাহার অনুভূতি জাগে। আমাদের যদি আধুনিক য়ুরোপের শিক্ষা-দীক্ষার সহিত পরিচয় না হইত, তাহা হইলে সেই পুরাতন সংস্কারই হয়ত রহিয়া যাইত। কাব্যে যদি শুদ্ধ শোভার চিত্র পাওয়া যায়, তবেই নগ্নতার সৌন্দর্য্য সাহিত্যে আর স্থান পাইবে না। এখন যাহা অতি উপাদেয়, তখন তাহাই অতি হেয় বোধ হইবে।

কোন্ বস্তু কাব্যের বিষয় এবং কি বা নহে, তাহা বলা কঠিন। কাব্যের বিষয় অবলম্বনে জাতিভেদ নাই। পাপপুণ্য, ভালমন্দ, সুন্দর, কুৎসিত, প্রাকৃত, অতি প্রাকৃত, বাস্তব কল্পনা জীবনের যাহা কিছু সমস্ত লইয়াই কাব্য। কিন্তু এই সব স্বাভাবিক ভাবে যেমন আছে তেমনি নহে; তাহার উপর রঙ ফলাইয়া ও তাহার সত্য তত্ত্বটুকু ফুটাইয়া ভাষায় ছন্দে প্রকাশ করাই কবি ও সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য।

আলো আঁধারে জগৎ। দীপ্ত রবির রশ্মি যথাযথ বর্ণনা অথবা অমা রজনীর ঘন তমিস্রার কথা ভাষায় ফুটাইয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ নহে; রৌদ্র কি আনন্দে বিভাসিত, অন্ধকারের কি ভীষণতা, ইহা দেখানই সাহিত্য কর্ত্তব্য।

সাধু ও অসাধু দুই ইচ্ছাই মানুষের অন্তরের বস্তু। কু প্রবৃত্তিটাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করিলে তাহার বীভৎসতা ও অমঙ্গলের দিকটাই দেখাইতে হয়। পাপ যেমন আছে, ঠিক তেমনটি চিত্রিত করা আর একটা কলুষতার সৃষ্টি। সমাজে সংসারে এমন অনেক পামর আছে; বাহ্যদৃষ্টিতে তাহাদের কোন শাস্তি দেখা যায় না। বরং মনে হয় নির্দ্দোষ অপেক্ষা তাহারাই অধিক সুখে কাল কাটাইতেছে। হয়ত কোন পাপী সংসারে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতেছে; তাহাকে আঁকিতে হইলে তাহার মনো ভাবের দগ্ধ অনুতাপ প্রভৃতি দেখানই প্রকৃত কবি এবং সাহিত্যিকের কাজ।

কামও কাব্যের বিষয়। কিন্তু তাহাকে যেন মনোহর করিয়া রঞ্জিত করা না হয়। কাম প্রেমে প্রভেদ, লালসার অপকর্ষতা, রতিরাগ হইতে ভালবাসার পরিণতি, শুদ্ধ অনুরাগের প্রতিচ্ছবি, ভালবাসার প্রচ্ছন্ন রহস্য, এই সবই বিশ্লেষিত ও চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হয়। কেবল নায়ক-নায়িকার রঙ্গ-ভঙ্গ দেখানই প্রণয় চিত্রন নহে। শরীর বৃত্তির লঘুতা দেখাইয়া প্রীতির মহনীয়তা পরিস্ফুট করিয়া তোলাই যথার্থ রস রসিক সাহিত্যিকের কার্য্য।

সৌন্দর্য্য পিপাসা জীব প্রকৃতি। কিন্তু তাহার ভাল মন্দের, শুদ্ধাশুদ্ধের একটা শ্রেণীভেদ আছে। সৌন্দর্য্যের সার্ব্বভৌমিক বিকাশ থাকিলেও মনের গঠনানুসারে শ্রী নিরূপিত হয়। একজন অকর্ষিত চিত্ত, অশিক্ষিতের পক্ষে যাহা শোভন, একজন শিক্ষিতের কাছে হয়ত তাহা কুৎসিত ও ঘৃণাজনক হইবারই সম্ভাবনা। এই পার্থক্যের কারণ প্রথমোক্তের রসবোধ নিতান্ত স্থূল পাশব পর্য্যায়ের। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিচার বুদ্ধি বাড়িয়া চলে; উহাতে অনিত্য হইতে নিত্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। সেই আকর্ষণ যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, তাহা শুদ্ধ সৌন্দর্য।

উন্নত মনের রস বোধ স্থূল ইন্দ্রিয় জনিত নহে আর তাহা নীতির বিরোধীও নহে। অতএব সভ্য মানবের সাহিত্য সৌন্দর্য্য দুর্নীতিমূলক নহে। কেবলমাত্র নীতি না হউক নীতিকে আশ্রয় করিয়াই তাহার মাধুর্য্য। যাহা কলুষতার উত্তেজক সাহিত্যেও তাহা কুৎসিত এবং বর্জ্জনীয়। সাহিত্য দেশ ও কালের অতীত নহে। কারণ সাহিত্য স্রষ্টাও সামাজিক মানব। সাহিত্য দেশ ও কালের অনুকূল হওয়াই উচিত। এবং অমর জীবনই যখন বাঞ্ছনীয় তখন তাহা বিষ না হইয়া অমৃত হওয়াই উচিত। মানব সমাজ সহিত্যে লাভ করিবে সেই সঞ্জীবনী শক্তি!

আনমনা

শ্রীঅমলা দেবী

সাজায় দিবস তারে; অস্ত সিন্ধু তীরে
একটি প্রণাম তরে, ধরার ধূলারে
বরষা বসন্ত অর্ঘ্যে। ঘন বন ছায়
সযত্নে রচিত গৃহ ভেঙ্গে পড়ে যায়,
দীন হীন ক্লিষ্ট মন ভাবে আন মনা
'কে বুঝি হরিয়া নিল আমার সাধনা'।

আজ দেখি মুগ্ধ প্রাণে রাঙ্গান স্বপন
বারে বারে গড়ে তোলা মোর আয়োজন,
সে মোর নৈবেদ্য থালা। ভাঙ্গা খেলা ঘরে
আমারি প্রণতি আঁকা বিনম্র অন্তরে।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

'পরিচয়' পত্রের ২য় সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী লিখিত'কাব্যে-রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থের একটি সমালোচনা দেখিলাম। সমালোচক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল মোটের উপর দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, বইখানি বিশেষ কিছুই হয় নাই। আমি নিজে বইখানি পড়িয়া রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে রসবোধের অনেক নূতন ইঙ্গিত লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছি এবং বইখানির বিজ্ঞাপনের সহিত রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্তের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি, সুতরাং পুস্তকখানির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তাই 'পরিচয়ের'সমালোচনা পড়িয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলাম।

বইখানির বিজ্ঞাপনে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন— "ইহাতে বিচারের নৈপুণ্য ও চিন্তার গভীরতা আছে; সাহিত্য অনুশীলনে তোমার প্রবীণতা আছে ইহাতে কোন সংশয় নাই।"

প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন—"তোমার সমালোচনার অন্তরে চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পেলাম। কোনও কবির সৃষ্টিকে যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম ক তে হলে তার জন্য ধ্যানধারণার প্রয়োজন, নচেৎ তার অন্তরে প্রবেশ করা যায় না। তুমি রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে সমগ্রভাবে দেখেছ এবং তার মর্ম্মের সন্ধান পেয়েছ।"

পরমরসজ্ঞ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন— "রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে আপনার চিন্তা ও বিচার মনকে নাড়া দেয়, কারণ তা গতানুগতিকতায় স্পৃষ্ট নয়, নিজের অনুভূতির প্রকাশ। আপনি প্রমাণ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের আপনি একজন বিশেষজ্ঞ ও পরম রসজ্ঞ।"

যে তিনজন লেখকের অভিমত উপরে দিলাম তাঁহারা সকলেই অগ্রগণ্য ব্যক্তি। সুতরাং এ অবস্থায় কেহ যদি হঠাৎ বইখানিকে 'কিছু হয় নাই' বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয় নাকি? এখন কথা হইতে পারে এ সকল ত বিশেষণ করিয়া সমালোচনা নয়—এ সকল অভিমত মাত্র। অতএব সমালোচনা বলিয়া যাহা মুদ্রিত হইয়াছে সেটিকে বিচার করিয়া দেখা যাক—

সমালোচক প্রথমেই বলিয়াছেন—গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে পাঠকগণের নিকট তাঁহার বক্তব্য-নিবেদন প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"গ্রন্থখানির মধ্যে রসবিচার এবং তত্ত্ববিশ্লেষণ দুয়েরই প্রয়াস আছে।" ইহার পরেই সমালোচক বলিতেছেন,—"রসবিচার অবশ্য বোধগম্য কিন্তু তত্ত্ববিশ্লেষণও কি কাব্যালোচনার অপরিহার্য্য অঙ্গ?"

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, যে কোন কবির সমগ্র কাব্য-সৃষ্টির অন্তরালে যদি কোন গূঢ় সত্য ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে রসবিচারের সহিত তত্ত্ববিশ্লেষণও সেই কবির কাব্যালোচনার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হইবে না কেন?

কাব্যালোচনায় তত্ত্ববিশ্লেষণের যে কোন স্থান নাই, তাহা নানা কথায় ব্যক্ত করিয়া সমালোচক এইবার রসবিচারের কথা তুলিয়া বলিতেছেন—"পুস্তকের প্রথম অধ্যায় 'নিসর্গ।' এই অধ্যায়ে তিনি (বিশ্বপতিবাবু) বলিতেছেন—'কবির চিত্ত বর্ষার রুদ্ররূপ কোনদিন অনুভব করে নাই—মনের গঠনও সেরূপ তাঁহার নয়।" ইহার প্রতিবাদে সমালোচক কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতার মধ্যে রুদ্ররূপের অনুভূতি যথেষ্ট আছে। সমালোচকের প্রথম প্রমাণ—

গগন সঘন অব তিমির মগন ভব
তড়িত চকিত অতি ঘোর মেঘ রব
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব
পন্থ বিজন অতি ঘোর।

(মরণ—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

এই কবিতাটিতে রাধা মৃত্যুকে 'শ্যাম সমান' করিয়া দেখিতেছেন। বিরহ-কাতরা শ্রীরাধা শ্যামবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। কবি বলিতেছেন—বিরহ দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া রাধা আজ মৃত্যুর অভিসারে যাত্রা করিতে চান। যাঁর অভিসারেই তিনি যান না কেন, যখন অভিসারের বর্ণনাই কবি করিতেছেন এবং বিশেষতঃ তিনি যখন ইচ্ছা করিয়া বৈষ্ণবকবিদেরই অনুসরণে কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন তখন বৈষ্ণবপদাবলীর চিরাচরিত বর্ষারজনীর দুর্যোগবর্ণনার রীতিরও অনুসরণ ছাড়া কবির গত্যন্তর কোথায়?

ইহা convention মাত্র। ইহাতে কবির কোন চিত্তবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় না। আর তাছাড়া, ইহার মধ্যে রুদ্ররসের পরিচয় এমন কি পাওয়া গেল? "তড়িত চকিত অতি ঘোর মেঘরব" ইহার মধ্যে সমালোচক রুদ্রত্ব পাইলেন কোথায়? বর্ষারজনীর দুর্যোগের কথা বলিতে গিয়া ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ এবং মেঘগর্জ্জনের কথাও যদি কবি না বলিবেন তাহা হইলে দুর্যোগের চিহ্নমাত্রও যে থাকে না।

এইবার দ্বিতীয় প্রমাণটী পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্—

"ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা—" (বর্ষশেষ—কল্পনা)

সমালোচক বলিতে চান—ইহার মধ্যে বর্ষার রুদ্ররূপের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।—নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ দুই লাইনেই। একটি কবিতার মধ্যে কোন্ রস প্রধান তাহা বুঝিতে হইলে কবিতাটির অংশবিশেষ তুলিয়া দেখাইলেই ত চলে না,—দেখিতে হইবে কবিতাটির মধ্যে একাধিক রসের সমাবেশ হইলেও এই সকল বিভিন্ন সঞ্চারী রস কোন্ স্থায়ী রসকে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

কবি বলিতেছেন—

বর্ষ হয়ে এল শেষ দিন হয়ে এল সমাপন
চৈত্র অবসান
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্ব্বশেষ গান।

ইহার পর কবি বলিতেছেন—

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী,
লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্নঅংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহেনা সহেনা আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

তাহার পর ঈশাণের পুঞ্জমেঘ এবং ঝঞ্ঝাকে আহ্বান করিয়া কবি বলিতেছেন—

শ্যেন-সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে

ইহাকে যদি রুদ্ররসের কবিতা বলিতে হয়, তাহা হইলে Shelleyর 'Ode to the West Wind' কবিতাটিকে অনায়াসে রুদ্রচণ্ড রসের কবিতা বলা যাইতে পারে।

ঠিক এই ধরণের আপত্তি ও প্রতিবাদের আশঙ্কা করিয়াই বিশ্বপতিবাবু রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' নামক কাব্যগ্রন্থের 'বৈশাখ' নামক আর একটি এই শ্রেণীর আপাত রুদ্ররসের কবিতাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই শ্রেণীর কবিতাকে রুদ্ররসের কবিতা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ ইহারা শান্তিরস বা কারুণ্য রসের কবিতা। 'কাব্যে-রবীন্দ্রনাথের' ৩৪ পৃষ্ঠার প্রতি সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এইবার সমালোচক মহাশয়ের তৃতীয় প্রমাণটি বিচার করিয়া দেখা যাক্। ইহা তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ' হইতে উৎকলিত করিয়াছেন। 'নটরাজ' একটি পালাগান। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা ভূমিকায় বলিয়াছেন। এখানে কবি নিজের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত দৃষ্টিতে বর্ষা বা অন্যান্য ঋতুকে দেখেন নাই। কবি এখানে নাটকীয় কৌশলে 'ঋতুলীলার বৈচিত্র্যগুলিকে পাশাপাশি সাজাইয়া পরম্পরা রক্ষা করিয়া 'মঙ্গল কাব্যের' মত একটি অখণ্ড পালাগানের কাব্য রচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ কবিকে এখানে

পালাগানের স্বধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঋতুর প্রকৃতি ও লীলাধর্ম্মের সহিত নাটকীয় সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রত্যেক ঋতুর তদনুযায়ী বিশিষ্ট লীলারূপই কবিকে ব্যক্ত করিতে হইয়াছে। কবি তাঁহার এই 'নটরাজের প্রথম দৃশ্যে গ্রীষ্ম বর্ণনায় বলিতেছেন—

> ধ্যানমগ্ন নীরব মগ্ন নিশ্চল তব চিত্ত,
> নিঃস্ব গগনে বিশ্বভুবনে নিঃশেষ সব বিত্ত।"

এইরূপের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পরদৃশ্যে বর্ষা বর্ণনায় কবিকে বলিতে হইয়াছে—

> "কদম্ববন চঞ্চলি ওঠে দুলি,
> সেইমত তব কম্পিত বাহু তুলি,
> টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি,
> আজ সন্ন্যাসী কাজ নাই তপে তাপে।"
> (সমালোচক মহাশয়ের উদ্ধৃত তৃতীয় প্রমাণ)

ইহা না করিলে রসভঙ্গ ঘটিয়া যায়। কবি এখানে নাট্যকার। বর্ষা তাঁহাকে কোন্ বিশেষরূপের দ্বারা মুগ্ধ করে, কবি এখানে সে কথা বলিবার সুযোগই পান নাই। এখানে পূর্ব্বদৃশ্যের সহিত নাটকীয় সামঞ্জস্য রাখাই তাঁহার প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে তাঁহার মনের নিজস্ব প্রকৃতি অন্বেষণ করিতে গেলে চলিবে কেন? ধ্যানমগ্ন গ্রীষ্মের তপোভঙ্গ করিবার জন্য কবি প্রথম হইতেই প্রস্তুত ছিলেন তাই বর্ষাবর্ণনা করিবার পূর্ব্বেই তিনি একথার ইঙ্গিত দিয়া রাখিয়াছেন—

> তব তাপে-হের সবে কাঁপে,
> দেবলোক হল ক্লান্ত।
> ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তার বেগ,
> বরুণ করুণ শান্ত।

তাহার পর "প্রত্যাশা" নামক কবিতায় কবি বলিতেছেন—

> তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে,
> হৃদয় আমার শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শনে।

কবি যখন গ্রীষ্মবর্ণনা করিতেছেন তখনই তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী বর্ষাবর্ণনায় 'তপের তাপের বাঁধন' 'রসের বর্ষণে' কাটিতে হইবে। সমগ্র পালাগানটি রচনা করিবার পূর্ব্বেই কবি মনে মনে যে নক্সা বা আদর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন প্রত্যেক ঋতুর রূপ এবং প্রকৃতি তাহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সুতরাং কোন একটি বিশিষ্ট ঋতু এখানে বিশেষ করিয়া কবির মনকে অনুরঞ্জিত করিতে পারে নাই। এখানে প্রত্যেক ঋতু ষড়ঋতুর অন্তর্নিহিত গভীর সুরটিকে জাগাইয়া তুলিবার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গভীর সুরের স্বরূপটি যে কি তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভূমিকায় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ইহার পর 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথের' দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসিয়া সমালোচক বলিতেছেন—"রবীন্দ্রনাথকে কি প্রেমিক কবি বলা যায়?…অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর প্রেম সম্বন্ধে কবিতা কি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের একটি বড় অংশ?"

ইহার উত্তরে সমালোচক মহাশয় নিজেই বলিতেছেন—"রবীন্দ্রনাথকে প্রেমিক কবি বলা চলে না। কেন না পুরুষ ও নারীর যে নিগূঢ় সম্বন্ধ জীবনের সহস্র সুখ দুঃখের আবেষ্টনের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় হইয়া উঠে, তাহার অন্তরঙ্গ অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোথাও প্রবল হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রেম তাঁহার কল্পলোকের প্রেম।…হয়তো এই প্রেমের সম্পদ তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনকে অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে।"

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে সমালোচক মহাশয় যদি বইখানি একটু মন দিয়া পড়িতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ'-লেখক ঐ কথাই অনেক পূর্ব্বে বলিয়াছেন। তিনি (বিশ্বপতিবাবু) 'নারী' নামক অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠাতেই পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—"যে প্রেম তাঁহাকে সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়াছে, যে প্রেমের নিগূঢ় অনুভূতি তাঁহাকে সৃষ্টির অণুপরমাণুর মধ্যে চিরসুন্দরের আভাস দেয়, সেই একই প্রেমানুভূতি, সেই একই সৌন্দর্য্যবোধ, সেই একই রসবোধ তাঁহাকে নারীর সৌন্দর্য্যেও মুগ্ধ করিয়াছে।"

ইহার পর সমালোচক বলিতেছেন—"যদি দুঃখানুভূতি কবির বিশেষ মনোবৃত্তি হয়, তাহা হইলে এই বৃত্তি কি করিয়া কবির কাব্যের ভিতর দিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার আলোচনা করিতে হইলে

বিশ্বপতিবাবু যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ কবির সমগ্র কাব্যকে 'রূপজগৎ', 'অরূপের পথে' ও 'অরূপ' এই তিন ভাগে ভাগ করা—ইহাই কি প্রকৃষ্ট?" কেন যে প্রকৃষ্ট নয় তাহা ত বুঝিলাম না।

সমালোচক বলিতেছেন—"বিশ্বপতি বাবু যে নিসর্গ ও নারীর পালা শেষ করিয়া আবার 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে আলোচনা স্থরু করিয়াছেন, তাঁহার আলোচনা রীতির ত্রুটির ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" কিছুই বুঝিলাম না।

রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-কবিতা এবং প্রেমের কবিতার মধ্যে দুইটি দিক আছে। একটি রূপের দিক, আর একটি অরূপের দিক। সমালোচক মহাশয়ের ভাষাতেই বলি—"প্রকৃতির সহিত কবির যে অন্তরঙ্গ পরিচয়, তাঁহার কাব্যের মধ্যে আমরা তাহারই স্তরে স্তরে বিকাশ দেখিতে পাই। তাঁহার সকল বয়সের কবিতাতেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে মুগ্ধ করে; কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাঁহার গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সুদূর যাত্রিনী কল্পনার মধ্য দিয়া আশ্চর্য্য রূপান্তর লাভ করিয়াছে। তাই তাঁহার সকল বয়সের কবিতার মধ্যেই এক অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত জগতের আভাস পাওয়া যায়।" অর্থাৎ এককথায় সমালোচক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গকবিতার এবং প্রেমের কবিতার মধ্যে দুইটি দিক আছে; একটি তার রূপের দিক, আর একটি তার অরূপের দিক।

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই দুইদিক হইতেই নিসর্গ এবং নারীকে দেখা যাইতে পারে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ এবং নারীকে রূপের দিক হইতে যেটুকু দেখিয়াছেন তাহাকে আমরা স্বতন্ত্র করিয়া উপভোগ করিতে পারি; আবার যখন অরূপের দিকের কথা উঠিবে তখন রূপোপভোগের ভিতর দিয়াই সূক্ষ্মভাবে কেমন করিয়া অরূপের একটি ইঙ্গিত ধীরে ধীরে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে এবং সেই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটি কেমন করিয়া একটু একটু করিয়া তাঁহার কাব্য-জীবনের স্তরে স্তরে ক্রমবিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাও দেখানো যাইতে পারে। আমার মনে হয়, বিশ্বপতিবাবু রূপজগতের পালা শেষ করিয়া যে আবার 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে আলোচনা স্থরু করিয়াছেন এই দিক হইতেই তাহার সার্থকতা। ইহার পর আমরা বলি, "ইহাই তাঁহার আলোচনা-রীতির সাফল্যের প্রমাণ।"

সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন—

দুঃখানুভূতি ব্যাপারটি আলোচ্য।...এই দুঃখানুভূতি বলিতে কি বুঝায় তিনি (বিশ্বপতিবাবু) তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। সমালোচক মহাশয়ের মতে দুঃখানুভূতির যে পরিচয় বিশ্বপতি দিয়াছেন তাহা মাত্র এই যে—ইহা pessimism নয়। কিন্তু ইহা যে কি তাহা বিশ্বপতিবাবু বলেন নাই বা বলিতে পারেন নাই।

কিন্তু আমার মনে হয় 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ' এর মধ্যে এই দুঃখানুভূতির পরিচয় বিশ্বপতিবাবু অতি বিশদ ভাবেই দিয়াছেন। সমালোচক যে আলোচ্যমান গ্রন্থখানি ভাল করিয়া না পড়িয়াই সমালোচনা করিয়াছেন এইখানেই তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। 'কাব্যে-রবীন্দ্রনাথ' এর ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে ৫৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই দুঃখানুভূতির বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে কতক অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"রবীন্দ্রনাথকে দুঃখের কবি বলাতে অনেকে হয়ত মনে করিবেন, আমরা বুঝি তাঁহাকে সেই শ্রেণীর লোকদের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে চাই ইংরাজীতে যাঁহাদিগকে pessimist বলে। তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন আমরা বুঝি রবীন্দ্রনাথকে সেই সকল লোকের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে চাই সৃষ্টির মধ্যে যাঁহারা কোন সৌন্দর্য্যের, কোন আনন্দের সন্ধান পান না; সৃষ্টিটা যাঁহাদের নিকট কেবলি দুঃখময়, কেবলি যন্ত্রণাময়, কেবলি কষ্টদায়ক একটা যন্ত্রমাত্র, যাহার মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা অহোরাত্র কেবল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছি। এক প্রকার দুঃখ আছে যা আমরা ভোগ করি সৃষ্টিটাকে অসুন্দর চোখে দেখিয়া। যাহা অসুন্দর তাহা ত আমাদিগকে পীড়া দিবেই। কিন্তু আর এক শ্রেণীর দুঃখ আছে যাহা আমরা ভোগ করি জগৎটা অত্যন্ত বেশী সুন্দর বলিয়া। সুন্দরের মধ্যেই কোথায় একটি অপরিসমাপ্তির ইঙ্গিত আপনা হইতে থাকিয়া যায়। সুন্দরকে ভোগ করিয়া শেষ করা যায় না, তাই তাহার মধ্যে একটি অপরিসমাপ্তি

ফটো প্রতিযোগিতা

১ম পুরস্কার—"নৌকাসারি"

শ্রী এলবার্ট মুখার্জি—মৌলমিন,

২য় পুরস্কার—"আনন্দের চান"

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সরকার—কলিকাতা

বেদনা আপনা হইতেই থাকিয়া যায়। তাহার সহিত বুঝিবা জন্মজন্মান্তরের কত অস্পষ্ট স্মৃতি, কত ব্যথা জাগিয়া উঠে।

"রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্যশব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি নূনম বোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি ॥"

(অভিজ্ঞানশকুন্তলাম্)

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিটাকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন, ইহার অণুপরমাণুর মধ্যে কবি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস অহরহঃ পাইতেছেন; তাই কবির বেদনার অন্ত নাই।" (কাব্যে-রবীন্দ্রনাথ---৫৫—৫৬ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলিয়াছিলেন ঠিক সেই অর্থেই বিশ্বপতিবাবু রবীন্দ্রনাথকে প্রেমের কবি হিসাবে দুঃখের কবি বলিয়াছেন। কাব্যে-রবীন্দ্রনাথ লেখক তাঁর পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াও দিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রবন্ধে চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমের কবি হিসাবে, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকেও দুঃখের কবি বলা যাইতে পারে।"

এত গেল প্রেমের কবিতার ব্যাপার। এইবার আসিতেছে রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমপরিণতির ইতিহাসের কথা। এখানেও বিশ্বপতিবাবু এই 'দুঃখবোধ' কথাটিকে বার বার ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও সমালোচকের অভিযোগ এই যে—"তিনি (বিশ্বপতিবাবু) এই 'দুঃখানুভূতি' বলিতে কি বুঝায় তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই। একস্থানে তিনি বলিতেছেন যে ইহা pessimism নয়। অপর একস্থানে তিনি বলিতেছেন—"এই দুঃখপ্রিয়তা,এই অবসাদ,এই অতৃপ্তি।"

মোটকথা সমালোচক বলিতে চান এই দুঃখানুভূতি জিনিষটি যে কি তাহা বিশ্বপতিবাবু নিজেও বুঝেন নাই এবং আমাদিগকেও বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথের' 'অরূপের পথে' নামক গোটা অধ্যায়টি এই 'দুঃখানুভূতি' জিনিসটি বুঝাইবার জন্যই লিখিত। ৮২ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিশ্বপতিবাবু এই জিনিষটিকে ব্যাখ্যা করিয়া, রবীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণতির মূলে ইহা কিরূপে কাজ করিতেছে তাহা বুঝাইয়া, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য হইতে তাহার যথাযথ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পৃথক করিয়া 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ' হইতে কোন কোন অংশ তুলিয়া দিয়াও এই দুঃখবোধের পরিচয় আমরা দিতে পারি।

"তাই বলিয়া ইংরাজীভাষায় যাহাদের Pessimist বলে তিনি সে শ্রেণীর লোক নন্। তাঁহার এই বিষাদ-প্রিয়তার মূলে সৃষ্টির প্রতি অবিশ্বাসের কোন ইঙ্গিত নাই। তিনি দুঃখকে, অবসাদকে ভালবাসিয়াছেন বোধ হয় এই কারণেই যে তাহার মধ্যে খুব বেশি বঞ্চনা আছে। সুখ জিনিষটি বড্ডবেশি সীমাবদ্ধ, বড্ড বেশি স্থূল। কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়,—ইহা তাঁহার পথ মাত্র। এই দুঃখ তাঁহাকে ক্রমাগত সম্মুখের পানে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই দুঃখবোধ তাঁহাকে কোনদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেয় নাই—ক্রমাগত পরিপূর্ণতর সার্থকতার পানে তাঁহাকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে।......খেয়ার মধ্যে আসিয়া কবি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন--এই দুঃখপ্রিয়তা, এই অজানা অবসাদ শুধু রসের দিক দিয়া তাঁহার মধ্যে সার্থক হইয়া উঠে নাই, ইহা শুধু কেবল একটা রসবিলাসের সহায়তা মাত্র করে নাই, তাহার সহিত আরও অনেক কিছু করিয়াছে। ইহা তাঁহার মধ্যে শুধু একটা অজানা বঞ্চনার সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—ইহা তাঁহাকে সচেতনভাবে একটি পরিপূর্ণতর সার্থকতার দিকে পরিচালিত করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা তাঁহাকে শুধু কেবল অজানা রসের সন্ধান দেয় নাই, তাঁহাকে একটি চিরন্তন রসিকের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছে। তাই দুঃখের প্রতি কবির এত টান, তাই 'খেয়ার' পর 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতালিতে' কবি দুঃখের আর এক নূতন রূপ দেখিয়াছেন।

ইহার পর সমালোচক বলিয়াছেন—"বিশ্বপতিবাবু

দুঃখবোধকে এক বিশিষ্ট অর্থে ধরিয়া লইয়া তাঁহার উক্তি হয়তো সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু তাহা দুঃখবোধ বলিবার তাৎপর্য্য কি ?" তাৎপর্য্য এই যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দুঃখ কথাটিকে এই বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন—সেখানে তিনি বলিয়াছেন—

"অনেক দুঃখে গেছে বোঝা
বেঁধে রাখা নয়ত সোজা,
সুখের ভিতে নহে তোমার অচল বাসা।"

অথবা—

তোমার কাছে শান্তি চাব না,
থাক্‌না আমার দুঃখ ভাবনা।"

অথবা—

দুঃখ যদি না পাবেতো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে।"

অথবা—

"দুঃখ আমার ঘরের জিনিস
খাটি রতন তুইতো চিনিস
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে জিনিস এ মোর অহংকার।

অথবা—

ধনী যে তুই দুঃখ ধনে
এই কথাটি রাখিস মনে।"

অথবা—

সুখের বাধা ভেঙ্গে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে।"

—প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই দুঃখকে একটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বিশ্বপতিবাবু তাই দুঃখ কথাটিকে অব্যাহত রাখিয়া কবির উদ্দিষ্ট অর্থেই তাহা ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত 'দুঃখ' শব্দটির ব্যাখ্যাও তিনি তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন।

অতঃপর সমালোচক বলিতেছেন—"দুঃখ-প্রিয়তা" রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুর নহে। তবে মূলসুরটি কি ? সমালোচক বলেন—"রবীন্দ্রকাব্যের যদি কোন মূলসুর নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে তাহা নিসর্গ।"

নিসর্গ যে কেমন করিয়া কোনও কাব্যের সুর হইতে পারে তাহা বুঝিলাম না। নিসর্গ কি একটা সুর ?

কাব্যে সুর বলিতে আমরা কি বুঝি ? সুর তাহাই যাহা কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়া বাজিয়া উঠে। নিসর্গকে অবলম্বন করিয়া করুণ সুরও বাজিয়া উঠিতে পারে, আবার রুদ্র, শান্ত বা অন্য যে কোন সুর বাজিয়া উঠিতে পারে। সুতরাং নিসর্গ একটা অবলম্বন মাত্র। আসল কথা, কোনও কবির কাব্যের মূলসুর সেইটি, যাহা যে কোন অবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া বাজিয়া উঠে।—সে অবলম্বন নিসর্গই হউক, নারীই হউক বা অন্য যাহাই হউক না কেন। রবীন্দ্রনাথের সকল শ্রেণীর কবিতার মধ্যেই আমরা একটা "নাল্পে-সুখমস্তি"র আভাস পাই এবং এই মূল সুরটিই তাঁর কবিতাকে একটা ক্রমপরিণতির দিকে ক্রমাগত আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই 'নাল্পে সুখমস্তির' ভাবটিকেই বিশ্বপতিবাবু 'দুঃখবোধ' বলিয়াছেন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'দুঃখ' শব্দটিকে এই অর্থেই বারবার তাঁহার বহু কবিতায় ব্যবহার করিয়াছেন।

অতঃপর সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন—"সহজ হবি, সহজ হবি ওরে মন সহজ হবি," "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে ?" এইগুলি কবিতা নয়, গান। বিশ্বপতিবাবু বোধ হয় এই গানগুলি শোনেন নাই, তাই রসসৃষ্টি হিসাবে ইহাদের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে চান না। যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন এইগুলি তত্ত্বের ব্যাখ্যান নয়—রসসৃষ্টি। একথার উত্তরে সমালোচক মহাশয়কে আমার জিজ্ঞাসা এই যে—

এতেনিমে চোরে চানক আরি আঁধি রাতি
হাতকা লিনু কাঙানোয়া পায়কা লিনু বাঁকে
চলত পবন শোরহি আঙ্গে নামে।"

এই গানটীকে তিনি কাব্যরসসৃষ্টি হিসাবে কোন্ স্থান দিবেন ? এটি একটি বিখ্যাত হিন্দুস্থানী ঠুংরী, এবং সমালোচক মহাশয়ের মত আমিও বলিতে পারি যে এই গান শুনিয়া আমি বহুবার মুগ্ধ হইয়াছি। গানটিকে বাংলায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায় এই—"পবন বহিতেছে, অন্ধকার রাত্রে আমি আঙ্গিনায় একলা শুইয়াছিলাম, এমন সময় চোর (শ্রীকৃষ্ণ) আসিয়া আমার হাতের কঙ্কণ এবং পায়ের বাঁকমল খুলিয়া লইয়া গেল।"

এখন কেহ যদি বলেন এই রচনার মধ্যে রসসৃষ্টির কোন সন্ধান পাইলাম না, তখন সমালোচক মহাশয়ের মত আমি যদি বলিয়া উঠি যে—আপনি বোধ হয় এই গানটি শোনেন নাই, তাই রসসৃষ্টি হিসাবে এই রচনার উৎকর্ষ স্বীকার করিতে চান্ না, তাহা হইলে আমার রসবোধ সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ হইবে নাকি ? বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা সম্বন্ধেও কেহ যদি বলেন—আপনি এই পদ খোল করতালের সঙ্গে কীর্ত্তনে গাওয়া শুনেন নাই, তাই রসসৃষ্টি হিসাবে ইহার উৎকর্ষ স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না! তখন সমালোচক মহাশয় কি বলিবেন ?

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩০

সেদিনকার সংবাদপত্রখানা খুলিয়াই প্রথমে যে লাইনটির উপর দৃষ্টি পড়িল, তাহাতে সুশীল স্তম্ভিত হইয়া গেল! বড় বড় অক্ষরে প্রথমেই লেখা আছে "দেশের সেবায় ক্রোড়পতির সর্ব্বস্ব দান, মিঃ ও মিস রায়ের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ।" রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুশীল সব সংবাদ পড়িয়া গেল। মিঃ রায় ও মিস্ রায় দেশ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। দেশের অন্যান্য দরিদ্রদের জন্য মাসিক বৃত্তি ঠিক করিয়াছেন, পল্লী-সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যে এবং চরকা-তাঁতের বহুল প্রচলন জন্য তিনি বহু অর্থ দিতেছেন। মিস রায় নারী কর্ম্মীদল গঠন করিয়া তাহাদের লইয়া নানা কাজ করিয়া বেড়াইতেছেন, দেশের হসপিটালগুলিতে রোগীদের জন্য অনেক অর্থ দিয়াছেন।

এই কি সেই ইন্দিরা?

সুশীলের মনে পড়িল কয়েক বৎসর পূর্ব্বের সেই একটা দিনের কথা, যেদিন তাহার খদ্দর পরা লইয়া ইন্দিরা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল, সেদিন সে স্পষ্টই জানাইয়াছিল এই পরাধীন দেশের অধিবাসীদের দেশ-সেবা নিছক পাগলামী মাত্র; যেদিন সে স্পষ্টই বলিয়াছিল, এ দেশ স্বাধীন ইউরোপ নহে, এ পরাধীন ভারতবর্ষ, এ জাতি চির পরাধীন, দাসত্বের বোঝা নীরবে মাথায় লয়।

মনে পড়িল—ইন্দিরা নিজেকে এ দেশের অধিবাসিনী বাঙ্গালী নারী নামে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। পিতৃ প্রদত্ত পাশ্চাত্য ভাব তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল, এই জন্যই সুশীলকে সে দারুণ ঘৃণা করিয়াছিল।

আজ একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন তাহার! এই যে লেখা রহিয়াছে আদর্শ ত্যাগশীলা রমণী মিস রায় দেশের কাজে নিজের যথা সর্ব্বস্ব দিয়াছেন, নিজের আত্মসম্মান ভুলিয়া দরিদ্রদের কুটিরে কুটিরে ফিরিতেছেন, খদ্দরের প্রতিষ্ঠান, নানাস্থানে স্কুল স্থাপনা, এমন কি নিজে শিক্ষয়িত্রীর কাজ পর্য্যন্ত করিতেছেন। এ সব কি? ইন্দিরার এমন পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হইল? কে করাইল?

সুশীলের সম্মুখে কাগজখানা খোলা পড়িয়া ছিল, তাহার মনটা তখন কোথায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল কে জানে।

ইরা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ডাকিল না, পিছনে দাঁড়াইতেই সংবাদ পত্রের উপর দৃষ্টি পড়িল। এক নিমিষের দৃষ্টিপাতে ইরা সবটা পড়িয়া লইল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানা রক্ত শূন্য হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিকভাব সে জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিল।

শান্ত সংযত কণ্ঠে সে ডাকিল, "মিঃ মুখার্জ্জি!" অকস্মাৎ চমকাইয়া সুশীল পিছন ফিরিয়া চাহিল। ইরা বলিল, "আপনি বললেন বেড়াতে যাবেন, কিন্তু এখনও তো আপনার পোষাক পরা হয় নি দেখছি।"

সুশীল শ্রান্তভাবে বলিল, "আজ আর বেড়াতে যাব না ইরা, ইচ্ছা করছে না। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, আজ সেই কথার উত্তরটা আগে আমায় দাও দেখি।"

ইরা শঙ্কিতভাবে সুশীলের মুখের পানে চাহিল।

সুশীল বলিল, "তুমি শুনেছ আমি অসুখের সময় তোমাকেই আমার পাশে পেতে চেয়েছিলুম, এখনও তোমার সাহচর্য্যে নেশার মতই আমায় পেয়ে বসেছে। আমি তোমায় একেবারে নিজের ভাবে পেতে চাই, তোমার আমার মধ্যে বিরাট ব্যবধান জাগিয়ে রাখতে আমি ইচ্ছুক নই। এ ব্যবধান কি দূর হবে না ইরা?"

ইরার মুখে অন্তরের দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল, সে মাথা নাড়িয়া জানাইল—"না।"

তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কোমল কণ্ঠে সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও না? এখনও এত দৃঢ়তা? তোমার কোনখানে বাধছে ইরা, ধরা দিয়েও ধরা না দিয়ে তুমি পালিয়ে যাচ্ছো কেন?"

ধীরে ধীরে ইরা হাত ছাড়াইয়া লইল, দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "মিঃ মুখার্জ্জি, নিজের অন্তরের অন্তরতম স্থানটা একবার খোঁজ করে দেখবেন, তারপর আমায় বিয়ে করবার প্রস্তাব করবেন। আজ আপনি স্বীকার না করলেও করতে পারেন, কিন্তু আমি ভাল রকমই জানি—আপনি একমাত্র ইন্দিরাকেই ভালবাসেন। এ কথা ঠিক জানবেন—বাল্যের ভালবাসা মরে না, সে ভালবাসা অমর হয়ে থাকে, আর আছেও ঠিক তাই। আজ আপনি আমায় ভালবাসেন বলছেন, আমি বেশ জানি, আপনার এ ভাব ভালবাসা নয়, হীন কামনা মাত্র, তাই বলছি—আমায় এ রকম ভাবে ভালবাসার কথা বলে অপমান করবেন না; আঘাত দিয়ে দিয়ে আমার মনটাকে আপনার'পর হতে বিরূপ করে তুলবেন না। আমি যা আছি আমায় তাই থাকতে দিন, আপনি যা আছেন তাই থাকুন।"

সুশীল আর তাহার পানে তাকাইতে পারিল না, তাহার চোখ দুইটা আপনিই অবনত হইয়া পড়িল। একটু পরে যখন মুখ তুলিল তখন ইরা চলিয়া গিয়াছে।

ইরা—ইন্দিরা,—

কোথায় কাহার আসন? একদিন ছিল যেদিন সুশীল ইন্দিরা ছাড়া আর কোনও নারীর চিন্তা করে নাই, বহু শ্বেত সুন্দরীর চটুল চপল হাস্য, বহু প্রলোভন সে এড়াইয়া গিয়াছে, পাছে তাহাদের সঙ্গে পড়িয়া সে ইন্দিরার কথা ভুলিয়া যায় এই জন্য সে নারী সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া চলিত। আজও সে অন্তরের নিভৃত কন্দর অন্বেষণ করিয়া কি পাইল? সেই ইন্দিরাই যে তাহার সারা অন্তর জুড়িয়া বসিয়া আছে, ইরার স্থান সেখানে কোথায়?

কিন্তু ইন্দিরাই যে তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছে। আর ইহাও সত্য ইন্দিরাকে প্রাণপেক্ষা ভালবাসিলেও যদি তাহাদের মিলন হইত, কেহই সে বিবাহিত জীবনে সুখী হইতে পারিত না। তাহাদের বিবাহিত জীবনে প্রতি বিষয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হইত যাহার ফলে উভয়ে উভয়ের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিত, এবং শান্তির আশায় শীঘ্রই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। এ বরং ভালই হইয়াছে, বিবাহের আগে দুজনেই দুজনের ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া সরিয়া গিয়াছে।

সুশীল যাহা চায় ইরার মধ্যে সে সবই আছে, তাই তাহার মনে হইতেছে পথ চলিতে ইরাকে তাহার পার্শ্বে চাই-ই, নহিলে তাহার জীবনটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বৃদ্ধ মিঃ মুখার্জ্জি ইরাকে পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। এ দেশের মেয়েরা যে এমন ভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে এ ধারণা যেন তাঁহার ছিল না। তাই তিনি সেদিন মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "বুঝলে মা, আজ আমার মনে হয় যৌবনে যদি তোমার মত একটী মেয়ে দেখতুম, নিশ্চয়ই কাল বিলম্ব না করে তাকে বিয়ে করে ফেলতুম। এখন ভাবনা হয় কি জানো? অদৃষ্টক্রমে বুড়োবয়সে একটী মা লাভ করলুম, কোনদিন আবার তাকে হারিয়ে ফেলব। তাই ভাবি মা, দুদিনের জন্যে এসে চির অন্ধকার ঘরে আলোর বিকাশ করে আবার তো তুমি ফিরে তোমার জায়গায় যাবে, তখন আমার উপায় কি হবে? আগে বরং

ছিলুম ভাল, কেন না অন্ধ হয়ে অন্ধকারে ছিলুন, আলো কি পদার্থ তা আর জানতে পারি নি। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে আলো এনে যেমন আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ, এখন যদি এ আলো সরিয়ে নিয়ে যাও, আমার যা অবস্থা হবে সেটা তো সহজেই বুঝতে পারবে। এমন বদঅভ্যাস করে দিয়েছ, আগে যে জিনিসটা না হলেও হয় তো চলতো, এখন তা নাহলে আর কিছুতেই চলে না। হাতের কাছে না চাইতে সব জিনিস পেয়ে এমন বদঅভ্যাস হয়ে গেছে যে এ সুযোগ আর ছাড়তে ইচ্ছা করে না। এখন ভাবছি, তুমি গেলে আমার উপায় কি হবে?"

বিষণ্ণ হাসিয়া ইরা বলিল, "আপনাকে কে খবর দিলে যে আমি যাব, আপনি মিথ্যে আকাশকুসুম গড়ছেন কাকা। আমি এসেছি যখন তখন সহজে আর নড়ছিনে, কারণ আমার যাওয়ার জায়গাই বা কোথায়? যেখানেই যাই সেই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খেতে হবে; এখানে এমন আরামে খাওয়া-পরা যদি পাই, কে আর পরের খোসামোদ করে চাকরী করতে যায় বলুন দেখি?"

মিঃ মুখার্জ্জি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "তা কি হয় মা তোমার জীবন কি শুধু চাকরী করেই কাটাবে? সংসারী হওয়া—

তিনি যে উদ্দেশে এ কথাগুলি বলিতেছিলেন তাহা বুঝিয়া ইরার গণ্ড দুটি আরক্ত হইয়া উঠিল, সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "আমি বলছি কাকা, আপনি যা বলছেন তা হবে না, আপনি যা বুঝছেন তা ভুল, ওর মধ্যে সত্যি এতটুকু নেই। আমি একটা অশুভ গ্রহের মত মিস রায় আর মিঃ মুখার্জ্জির মাঝখানে উঠে একটা দেয়াল তুলে দিয়েছি। আমি জানতুম না আমার দ্বারা এমন একটা "বিপ্লবের" অনুষ্ঠান হবে। আমার আশ্রয় ছিল না বলে বাধ্য হয়ে মিঃ মুখার্জ্জির কাছে কর্ম্ম প্রার্থিনী হয়েছিলুম, কিন্তু তা থেকে যে এ রকম একটা কাণ্ড ঘটবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এখন আশ্রয় পেয়েছি কাকা, নিজের আর ওঁদের অবস্থা বুঝবার মত সময় এখন এসেছে, আমি নিজেই ওঁদের কাছ হতে এখন সরে যেতে চাই।"

মিঃ মুখার্জ্জি তাহার হেঁয়ালিভরা কথার অর্থ বুঝিলেন না তাই বিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

একটু পরে মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "কিন্তু ইন্দিরা—"

জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া ইরা বলিল, "আজকের সংবাদপত্র খানা পড়ে দেখবেন কাকা, ইন্দিরা তার কাজের ফলে অনেক এগিয়ে এসেছে, ওঁদের মাঝে আর কোন ব্যবধান নেই।"

মিঃ মুখার্জ্জি একবার শুধু ইরার পানে তাকাইয়া চক্ষু নামাইয়া লইয়া যেন কি ভাবিতে লাগিলেন।

৩১

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে পুনরায় দেখা হইল।

সুশীল বিস্মিতনেত্রে ইন্দিরার পানে তাকাইয়া রহিল, ইন্দিরা অপলক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ইন্দিরার গতাই অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে যেন অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও লম্বা হইয়াছে। সুশীল যে বিলাসিনী ইন্দিরাকে দেখিয়া গিয়াছিল, আজ তাহাকে দেখিতে পাইল না; সে বিলাসিনী ইন্দিরার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সম্মুখে ইন্দিরার পবিত্রা তাপসী মূর্ত্তি।

সুশীল দৃষ্টি অবনত করিল। তাহার অন্তর গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কোন মুখে সে ইন্দিরার [illegible] কথা বলিবে? তাহার সর্ব্বাঙ্গে তাহার অন্তরে যে নিজের হাতেই ক্লেদ মাখিয়াছে এই ক্লেদময় সিংহাসনে সে তাহার অভীষ্টদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবে কি করিয়া, কি দিয়া তাহার পর সে তাহার দেবীর পূজা করিবে?

যদি ইরা আসিয়া মাঝে না দাঁড়াইত?

কিন্তু ইরারই বা অপরাধ কি? ইরা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া স্বেচ্ছায় তাহার জীবিকা কর্ম্ম— ত্যাগ করিয়া যখন চলিয়া গেল, সুশীল কেন তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল, কেন সে তখন ইরাকে [illegible] যাইতে দিল না? তাহার পর কেন সে সেদিন জয়পুরে তাহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিল?

সুশীলের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল।

অপরাধী সে মহাপাপে অপরাধী হইয়াছে। নিজে সে ধ্বংস হইয়াছে, নিজের অন্তর বিষাক্ত করিয়াছে, ইরার সরল হৃদয়ও বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে।

ইন্দিরা বহুকাল পূর্ব্বে যেমন তাহার হাত ধরিত তেমনই সঙ্কোচহীন ভাবে তাহার হাত ধরিল, তেমনই অজস্র কথা বলিয়া চলিল।

সুশীল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল যাহাকে সে একদিন ঘৃণা করিয়াছিল, সে আজ কত উপরে, আর সে কত নীচে আসিয়া পড়িয়াছে।

তাহার নীরবতা হঠাৎ একসময়ে ইন্দিরাকে সচেতন করিয়া তুলিল, সে প্রশ্ন করিল, "তুমি হঠাৎ এ রকম হয়ে পড়েছ কেন? এতদিন পরে দেখা, একটা কথাও বলছ না যে?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীল বলিল, "আমার অপরাধের বোঝা এত বেশী রকম হয়ে উঠেছে ইন্দু, সত্যিই আমি সে জন্যে মোটে শান্তি পাচ্ছি নে; তোমার পানে চাইতে আমার চোখ নুইয়ে পড়ছে।"

ইন্দিরা হাসিয়া উঠিল, সুশীলের হাতখানা টানিয়া লইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, "তোমার অপরাধ? তোমার কাছে আমি কতটা অপরাধ করেছি তা ভেবে বরং আমারই সঙ্কুচিতা হওয়ার কারণ ছিল।"

সুশীল স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু তুমি তোমার সে অপরাধ কাজ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পেরেছ ইন্দিরা।"

"তুমিও পেরেছ গো—তুমিও পেরেছ। বাবার কাছে এসো এখন, আর বেশী বিনয় প্রকাশে দরকার নেই, বাবা তোমার আশায় বসে আছেন।"

সুশীল নিজের অপরাধের কথা সবিস্তারে বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে ভাবিয়াছিল, ইন্দিরা সে অবকাশ দিল না, সে তাহার কোন কথাই কানে তুলিল না।

মিঃ রায় সুশীলকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন ও সেই মুহূর্ত্তেই বিবাহের কথাবার্ত্তা, দিন পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া ফেলিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "এবার আর ফেলে রাখছি না, বিয়েটা আগে দিয়ে দেই তারপর যা হবার হবে। তোমরা দুজনেই দুজনের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছ, এমন সুসময়টাকে আমি মিথ্যে কেটে যেতে দেব না। আমার শরীরের অবস্থাও যে রকম হয়েছে তাতে আর ফেলে রাখবার সাহসও করছি নে।"

সুশীল জরুরী কাজের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল, হঠাৎ ইন্দিরার সহিত দেখা হইয়া যাওয়ায় সে জড়াইয়া পড়িল, তার তাহার জয়পুর ফিরা হইল না।

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র শীঘ্রই নানাদিকে বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রেরিত হইল। জয়পুরে মিঃ মুখার্জ্জি ও ইরা, কাশীতে রতিনাথ, মনসা, খড়্গপুরে শশাঙ্ক নিরঞ্জনও নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র পত্রও ছিল মিঃ রায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—আসা চাই-ই।

মিঃ মুখার্জ্জি পত্রখানা দু-একবার নাড়াচাড়া করিয়া পার্শ্বে উপবিষ্টা ইরার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "সেখানে গিয়ে কাজ নেই, কি বল মা?"

ইরার মনের অবস্থা তিনি বেশ বুঝিতে ছিলেন, তাই স্বেচ্ছায় কলিকাতা যাইতে অসম্মত হইতেছিলেন।

শুষ্ক হাসিয়া ইরা বলিল, "সেটা কিন্তু উচিৎ হবে না কাকা, ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও আপনার সেখানে যাওয়া দরকার। চলুন না এক সঙ্গেই যাই, আমাকেও একবার কলিকাতায় যেতে হবে।"

মিঃ মুখার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেতে হবে কেন?"

ইরা বলিল, "যে বাড়ীতে ছিলুম তাতে অনেক জিনিষপত্র রয়েছে, কয়েকমাসের বাড়ী ভাড়াও বাকি পড়েছে। বাড়ী ভাড়া চুকিয়ে জিনিষপত্রগুলো বিক্রি করে আমি চিরকালের মতই এখানে চলে আসব। বাংলার সঙ্গে সব সম্পর্কই আমার মিটিয়ে দিয়ে আসব, আর যাব না।"

ইরা ও মিঃ মুখার্জ্জি যে দিন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইলেন, সেই দিনই বিবাহ।

ইরা মিঃ রায়ের বাড়ী যাইতে রাজি হইল না, বলিল "আপনি বিয়ে বাড়ীতে যান কাকা, আমি আমার নিজের বাসায় এখন যাব।"

মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "আমার মতে আগে ওখানে গেলেই ভাল হত না—"

আর্দ্রকণ্ঠে ইরা বলিল, "আমি যদি পারি তবে এখনই ফিরে আসব কাকা, আর যদি না পারি, তা হলেও আমায় মাপ করবেন, ওঁদেরও মাপ করতে বলবেন।"

তাহার অন্তরের অতি গোপনে যে স্থানটী ছিল, তাহার কথা মনে করিয়াই মিঃ মুখার্জ্জি আর অনুরোধ করিলেন না, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তাই ভাল।"

ইরা চলিয়া গেল।

৩২

বিবাহ বাটী নিমন্ত্রিতগণে ভরিয়া গিয়াছে। যে যেখানে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছিলেন, মিঃ রায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার একমাত্র আদরিণী কন্যার শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানে সকলকেই যোগ দিতে হইয়াছে।

মনীষা প্রথমে আসিতে চায় নাই, ইন্দিরার অনুযোগ-পূর্ণ পত্র পাইয়া শেষটায় তাহাকেও আসিতে হইয়াছে ও কর্ত্রীপদ লইতে হইয়াছে।

আজ ইন্দিরার বিবাহে মনীষার যত আনন্দ হইতেছিল এত আনন্দ বোধ হয় আর কাহারও হয় নাই। সে দেশে ফিরিয়া ইন্দিরার পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃতা হইয়া গেছে, তাহার প্রতিষ্ঠানগুলির সার্থকতা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যালগ্নে শুভ বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

সুশীলের অন্তর আজ বিমলানন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে যেমনভাবে চাহিয়াছিল ইন্দিরাকে ঠিক তেমনইভাবে তাহার পার্শ্বে পাইয়াছে। নূতন আশায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে, সন্মুখে সে নূতন আলো দেখিতে পাইতেছে।

এই আনন্দের মাঝখানে—অন্তরের কোথায় কি জানি একটা গোপন ব্যথা কাঁটার মত খচ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল, এ বেদনাটাকে দূর করিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সক্ষম হয় নাই।

নবদম্পতি যখন সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিতেছিল, সেই সময় পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল একজন, সে ইরা।

মিঃ মুখার্জ্জি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, ইরা, এসেছ মা, আমি ভাবছিলুম—হয় তো আসবে না। যাক, এসেছ, ভালই হয়েছে।"

তাঁহার আনন্দোচ্চারিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া সুশীল চাহিল, ইরার উপর দৃষ্টি পড়িতেই তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

ততক্ষণে মিঃ মুখার্জ্জি বলিতেছিলেন, "বুঝেছ দেবনারায়ণ, মা টিকে ভাগ্যে পেয়েছি নইলে এই বুড়োবয়সে যে কি মুস্কিলে পড়তে হতো তা আর বলতে পারি নে। সত্যই জীবনটা যেন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল, একঘেয়ে কাজ করতে আর ভাল লাগত না, শ্রান্তির সময় মনটা এমনই একটী মায়ের স্নেহ চাইত। ভগবান আছেন একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। আমি যদিও মুখ ফুটে কোন দিন চাইনি আমার মন চেয়েছিল সেই জন্যেই তিনি ইরাকে জুটিয়ে দিলেন। ইরা যদি না থাকত সুশীলকে বাঁচাতে পারতুম না এ কথা ঠিক; নার্স কি নিজের লোকের মত প্রাণ ঢেলে সেবা-যত্ন করতে পারে? ওরা মাইনে পায় বইতো নয়, সেই জন্যেই সেটুকু খাটে, নইলে রোগী বাঁচল কি মরল তাতে ওদের কি আসে যায়?"

তাঁহার বক্তৃতাস্রোত অনর্গল চলিল।

ইরা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, এই কথাটাই সুশীলের অন্তরে বাজিয়া উঠিতেছিল। ইরা তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে কিন্তু সে তাহার পরিবর্ত্তে ইরাকে কি দিয়াছে? আজ সে সুখী হইয়াছে। ঈপ্সিতাকে পাইয়াছে, কিন্তু ইরা কি পাইল?

ইন্দিরা ইরার গলা জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ কর ইরা; আমি তোমায় চিনতে না পেরে কেবল মাত্র ক্ষমতা গর্ব্বে অন্ধ হয়ে তোমায় অনেক অপমান করেছি। তুমি আজ কি বুঝতে পারবে ভাই, শেষে যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলুম তখন হতে আমার অন্তর তুষানলে কি রকমভাবে পুড়ছে?"

ইরা শুধু হাসিল, বলিল, "আমি তাকে অপমান বলে কোনদিনই ধারণা করিনি মিসেস মুখার্জ্জি। আমি জানতুম গরীবকে দু কথা বলবার অধিকার

বড় লোকের নিশ্চয়ই আছে, তাই যদি দু কথা আপনারা বলেও যান, আমাদের তা মনে করে রাখতে গেলে চলে না।"

মর্ম্ম পীড়িতা ইন্দিরা বলিল, "তুমি যে কিছু মনে কর নি তা আমি তোমার এই কথাতেই বুঝতে পারছি। যাক, সে সব কথা এখন আর তুলব না, তবে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতেও কি পারব না? সে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে, এ কথা অস্বীকার করবে কি?"

শান্ত কণ্ঠে ইরা বলিল, "না মিসেস মুখার্জ্জি, যদিই কিছু করে থাকি তা কিছু নেওয়ার আশায় করি নি। আমার জীবনে এই শিক্ষা আমি পেয়েছি যার কাছে যাই পাই না, তাকে তাই ফিরিয়ে দেব! আমরা খৃশ্চান, আমাদের শাস্ত্রে বলে—"

সহিষ্ণুভাবে ইন্দিরা বলিয়া উঠিল, "তুমি না হয় আমার এই কৃতজ্ঞতা ও ফিরিয়ে দিয়ো, তবু জেনো, আমি তোমায় আমার কৃতজ্ঞতা জানাবই। এসো, তোমায় আমার মনীষাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই॥"

সে ইরাকে টানিয়া লইয়া গেল।

সুশীল আর বাহির হইতে পারিল না, একা চুপ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া রহিল। বাহির হইতে মিঃ রায় কয়েকবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বড় মাথা ধরিয়াছে বলিয়া সে আহ্বান সে কাটাইয়া দিল।

ইরার শীর্ণাকৃতি, শুষ্কমুখ আর বেদনাভরা কথাগুলা তাহার মনটাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিরন্তর আঘাত দিতে ছিল। তাহার মনে হইতেছিল একটী নারীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহাকে চিরদুঃখের আবর্ত্তে ফেলিয়া রাখিয়া তাহার সুখী হওয়া উচিত হয় নাই।

নিজের চিন্তায় সে এত বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল, যে কখন নিমন্ত্রিতগণ আহার করিয়া একে একে বিদায় লইলেন, তাহাও সে জানিতে পারে নাই। সম্প্রতি সে কঠিন ব্যারাম হইতে উঠিয়াছে এবং আজ তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে জানিয়া মিঃ রায় সুশীলকে ডাকিয়া বিরক্ত করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

"মিঃ মুখার্জ্জি—"

হঠাৎ এই আহ্বানে চমকাইয়া উঠিয়া সুশীল চাহিয়া দেখিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইরা।

শান্ত কণ্ঠে সে বলিল, "আপনার শরীর অসুস্থ জেনেও বিরক্ত করতে এসেছি। আমি এখনই চলে যাচ্ছি, কাল যে কোন সময় জয়পুর রওনা হব—আর এখানে আসা বা আপনার সঙ্গে দেখা শোনা করা হবে না। জীবনে আর কোনদিন হয় তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না, তাই শেষ দেখা করে যেতে এলুম।"

রুদ্ধকণ্ঠে সুশীল বলিল, "জীবনে আর কোন দিন দেখা হবে না কেন ইরা, আমি তো মাঝে মাঝে জয়পুরে যেতে পারি।"

হাত যোড় করিয়া ইরা বলিল, "মাপ করবেন ওইটী আর করবেন না; অন্ততঃ পক্ষে আমি যতদিন ওখানে থাকব আপনি আর যাবেন না।"

সুশীল মুখ ফিরাইল।

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ইরা বলিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার জীবন সুখময় হোক, ইন্দিরা সুখী হোক। ইন্দিরার মুখে শুনলুম আপনি সস্ত্রীক মাস দুই একের মত জয়পুরে থাকবেন ঠিক করেছেন, সেই জন্যই আপনাকে বলতে এসেছি, জয়পুর ছাড়া আরও অনেক জায়গা আছে যা আপনার "হানিমুনের" পক্ষে ভালই হবে। আপনার কাছে সবিনয় অনুরোধ আমায় আর সে আশ্রয়চ্যুত করবেন না, আমায় ওখান হতে তাড়াবেন না, একটু শান্তি ভোগ করতে দিন।"

অশ্রুজলে তাহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল, কণ্ঠ স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

রুদ্ধ কণ্ঠে সুশীল বলিয়া উঠিল, "তাই হবে ইরা, তাই করব; তুমি যেখানে থাকবে আমি জীবনে কখনও সেদিকে যাব না প্রতিজ্ঞা করছি।"

ধীরে ধীরে ইরা নত হইয়া তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিল, তাহার চোখ হইতে কয়েক ফোঁটা জল সুশীলের পায়ের উপর পড়িল।

ইরা উঠিয়া দাঁড়াইল। অবাধ্য অশ্রু মানা মানিতে ছিল না, চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দুঃখের প্রতিমূর্ত্তি ইরা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সুশীল একদৃষ্টে তাহার গমন পথের পানে তাকাইয়া রহিল। নিজে সে যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে, সে আগুন নিভাইবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। এই নারীর সর্ব্বস্ব লইয়া জীবনের পথে চলিতে তাহাকে পাথেয় দিল জীবনব্যাপী চোখের জল, হৃদয়ভরা ব্যথা।

সমাপ্ত

কিসে চলে ?

গল্প

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

এক

ভাতের বদলে গ্রামোফন্ নিয়ে দীপঙ্কর সে রাতটা কাটিয়ে দিল। রাত তখন এগারোটা।· অতীশ এল। বল্‌ল—কাল সমীর—কলিকাতায় যাবে—আমার টাকাটা;

কাল দেব—। দীপঙ্কর ছোট করে বল্‌ল।

পিনে-রেকর্ডে সংযোগে কলটা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—

কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ আরো কি তোমার চাই।

দীপঙ্কর হাসল—ঠিক! কলের মুখ দিয়েও জীবনের ভাষা পাওয়া যায়। বাঃ!

কল থেমে গেল। অতীশ বল্‌ল—কাল কিন্তু আট্‌টার মধ্যেই টাকা চাই। সমীরের মোটর আট্‌টায়। আজ রাতে হোলেই ভাল হোত।

দীপঙ্কর জানাল—কণ্ঠের তার স্বাভাবিক তেজস্বিতা ডুবে গেল; ক্ষীণ স্বরে ধ্বনিত হোল—তাই পাবে। আজ বৃহস্পতিবার—কেউ টাকা দেবে না। কাল যেমন করেই হোক্—আট্‌টার আগেই তোমার টাকাটা যোগাড় করে দেব।

অতীশ চলে গেল।

খেয়াল ভাল লাগল না। মোড় ফিরাতে দস্তুর মত কালোয়াতি রেকর্ডে পিন জুড়ে দিল। তাও ভাল লাগল না। গ্রামোফনে চাবি মেরে উঠে গেল।

দুই

বার কতক ছাদে পায়চারি করে বেড়াল। হাত ঘড়িটার পানে চেয়ে দেখল—রাত দু'টো।

হাসি আসে—এ দারিদ্র্য! না, দারিদ্র্যের বিলাস! সেও গরীব! তার চোখে রোল্ড গোল্ডের চশমা!—হাতে রিষ্টওয়াচ—তাও আবার সোনার। দোতলা বাড়ী—যতই ভাঙা হোক্, ইট কাঠ চূণ সুরকি তাতে যথেষ্ট আছে। সেও গরীব!

হাঁ সে গরীব! ও গুলি বিক্রি করলে—সে একবার। বাঁধা দিলে উছ্‌কাবার ক্ষমতা নেই তার। তার পক্ষে টাই-টাই বজায় রাখায় রাখাই ভাল।

বাস্তবিকই সে গরীব! সে জানে—যারা কুলি-মজুর, খেটে খেতে পারে তারা গরীব নয়। তাদের একটা নির্দ্দিষ্ট আয় আছে। তারা বজেট যদি না ছাপায়—কোন কষ্ট পায় না। কিন্তু তাঁকে ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে; তার পেট ভরুক্—আর না ভরুক্ সভ্য সমাজ তা' দেখবে না।

ক্ষীণ হাসিতে তার মুখখানি একবার উজ্জ্বল হোয়ে উঠল। দিন চারেক আগে যেদিন সরকারী বেয়ারা—পাড়াগাঁর গেজেট বল্‌ল এই শুভ ১৩৩৫ সাল পরে বেন্টুর মা তিন দিন উপোষ করেছে, চার দিন খুদ ফুটিয়ে খেয়েছে। সেদিন মুখে ভাত তুল্‌তে তুল্‌তে হাসি হাসি মুখেই দীপঙ্কর বলেছিল—আমাদেরও প্রায় সেই অবস্থা! শ্রোতারা সকলেই সে কথা হেসে উড়িয়ে দিল। সত্যি বল্‌তে কি দীপঙ্করও জান্‌ত না যে, সত্যি-সত্যিই কোন দিন তার জীবনে অভাব এত উলঙ্গ হোয়ে ফুটে উঠ্‌তে পারে।

সে শিউরে উঠল। যদি উৎপলা বার দুই বমি করে এলিয়ে না পড়ত—তা'হলে এ দারিদ্র্য আরও কি ভীষণ ভাবে ফুটে উঠত। সত্যি, তা'হলে সে তার স্ত্রীর কাছেও ছোট হোয়ে পড়ত যে, সে বিয়ে করেছে—বিয়ের আনন্দটুকু নিঃশেষ করে লুটে নিতে চায়—অথচ বৌকে খেতে দিতে পারে না। ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জার কথা।

তারও দোষ ছিল—। সে তারিখটা ছিল—মাসের আটাশে। একত্রিশে মাসের শেষ—। সে বুঝেছিল—তার হাতে অবশিষ্ট যা' আছে—তা'তে এ'কটা দিন চল্‌তে পারে না। তবু সে চায়নি যে, চাকরই বিয়োর

জন্য একটা মাসের বেশী সুদ্ সে দেয়। তাই বুধবারও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততার ভিতর দিয়ে কাটিয়ে দিল। বৃহস্পতিবার অভাব ভয়ানক মূর্ত্তিতে দেখা দিল—। চাল নেই—আলু নেই—কোনও তরকারি নেই। পাওনাদারদের ভিতরেও দুই একজন টাকা চায়। এখনিই! কেননা তারা পাবে—অথচ তাদের গরজ—কেমন করে টাকাগুলো ফেলে রাখে।

কিন্তু এ ভাবেই বা চলে কিসে? ধার! ধার! কেবল ধার, সামান্য ব্রহ্মত্রভোগীরা প্রজার কাছে থেকে যা' কিছু খাজনা পায়—আশ্বিন-কার্ত্তিক-মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র। বাকি ৭টা মাস তাদের হয় ধারের উপর—নয় উবৃত্ত অর্থের বিনিময়ে চালাতে হয়।

তিন

হাস্তে হাস্তে অতীশ বল্ল—আপনি দারিদ্র্যের কি জানেন? জীবনটাই স্ফূর্তির ভিতর দিয়ে—হাসির আনন্দের মাঝখানে কাটালেন। আপনার মুখে দারিদ্র্যের কথা শুনলে হাসিই আসে।

ভাল! দীপঙ্কর ছোট করে বল্ল মাত্র।

কিন্তু সুরটা তার অতীশের মোটেই ভাল লাগল না। এত স্বীকার নয় এ উপেক্ষা, সে ছাড়্ল না। ফের বল্ল—ভালো কি? সত্যই কি আর আপনি গরীব? যার সোনার ঘড়ি, সোনার চশমা—

দীপঙ্কর তাকে কথা চালাতে দিল না। নিজেই বল্তে সুরু কর্‌ল—দোতলা বাড়ী—শাল-দোশালা বলে যাও! কিন্তু এগুলো দিয়ে কি কর্‌তে বলো? একটা গোলা আছে? বা এক আধটা খামার বাড়ী? অতীশ এ রকম কোনও একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে থতমত খেয়ে ঐ প্রশ্ন এড়িয়েই গেল। সে হেসে বল্ল—এ-গুলো যার আছে, অন্ততঃ সে নিজেকে গরীব বলে প্রচার কর্‌তে পারে না।

কেন না এ-গুলো বিক্রি করে সে কিছু পয়সা পেতে পারে— এই ত? দীপঙ্কর একটু দম নিল। মৃদু হাসিতে তার ঠোঁট-মুখ চোখ-চক্ষু ভরে উঠল। সে তার কথা চালিয়ে গেল, কিন্তু সে কত দিন? ও গুলো ত' আবার হবেনা -যে, আবার বিক্রি কর্‌বো। সুতরাং ও গুলোর থাকা-না-থাকা দুইই সমান।

অতীশ বল্ল-না, আপনার সঙ্গে তর্ক করা চলে না। তাই বলে স্বীকার করতে পারিনে যে—আপনি গরীব।

সে উঠে গেল। দীপঙ্কর হাস্‌ল। সে যে বড়লোক নয়, একথা জানাতে তার এ প্রচেষ্টা কেন? ধন-অপবাদ ত' ভালই। লোকের কাছে থেকে সম্মান পাওয়া যেতে পারে।

উৎপলা এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল কিছু পয়সা দিতে পারো?

কেন? কি কর্‌বে? দীপঙ্করের মুখ ভার হোয়ে এল।

যদি না বলি। বলে উৎপলা স্বামীর মুখের পানে চাইল। একটু কাশ্‌ল। কিন্তু সেদিক থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে বল্ল—থাক্। হাতে যদি না থাকে দরকার নেই।

দীপঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে জানাল, হাতে নেই, একথাটা মিথ্যা হবে। তবে খুব কমই আছে। ত' কত চাই?

উৎপলা উত্তর দিল—চার আনা।

দীপঙ্কর হাস্‌ল। পরে ধীরে ধীরে বল্ল—অতোত নেই-আটপয়সা আছে।

উৎপলাও পিঠ পিঠ বল্ল এত বড় বাড়ী—চার চার আনা পয়সা যে হাতে নেই—একথা কেউ বিশ্বাস কর্‌তে চায় না।

স্নিগ্ধ মধুর হাসি দীপঙ্করের অধরে লেগেই ছিল। সে তাই চিবুতে চিবুতে বল্ল, যারা বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে—একথা বলে, তাদের জানিয়ে দিও, বড় বাড়ীতে ও গরীব লোক থাকে। বাড়ী যার, আর যে এ-বাড়ীতে সংসার কর্‌ছে—এ দুই লোক এক নয়।

উৎপলা তা' জানে। তবে তার স্বামীর হাতে যে একটা পয়সাও থাকে না লোকের কথায় কথায় এ যেন তারও মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, দীপঙ্কর সবই হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু উৎপলার এই অবিশ্বাস থেকে থেকে তার [illegible]।

দীপঙ্কর বল্‌ল—কি—আমার কথা তুমিও বিশ্বাস করছো না ?

উৎপলা উত্তর দিল—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছুই আসে যায় না। লোকে অবিশ্বাস করে—তাদেরই বা দোষ দিই কি করে? মাঝে মাঝে এমন খরচও করো—যে, দেখলে মোটেই মনে হয় না যে—তোমার হাতে পয়সা নেই।

দীপঙ্কর এ-কথার কোনও উত্তর দিল না। শুধু বসে বসে মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগ্‌ল।

চার

সবে চার পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে—এরই ভিতরে দীপঙ্কর শুন্‌ল—বাইরে থেকে সুজিত ডেকে বলছে—আগুন! আগুন! চা'র পেয়ালা মেঝেতে নামিয়ে রেখে সে টপাটপ ছাদের উপরে উঠে গেল। দেখে আকাশ লাল—লাল। কোন পাগল দেবতা হোরির আবির-ধারায় আকাশের একপাশ রাঙিয়ে দিয়েছেন। দীপঙ্কর ডেকে বল্‌ল—বায়ু কোণে আগুন—না ?

সুজিৎ নীচে থেকে উত্তর দিল—হাঁ।

দীপঙ্কর বল্‌ল—আর দু'একজনকে ডেকে নেবো না ?

নিশ্চয়ই। বাস দীপঙ্কর নেমে এল। উৎপলা বল্‌ল—চা-টা খেয়ে যাবে না। উত্তর দিল—না, হয় ত' আসতে রাত হবে। খিল দেও। কাউকে ডেকে দিয়ে যাবো কি ?

ভালো হয়। বলে উৎপলা দীপঙ্করের মুখের পানে চাইল। দীপঙ্কর শুধু মাত্র বল্‌ল—আগুন। তার মুখ থেকে আর কোনও কথাই শোনা গেল না। সে বার হোয়ে চলে গেল।

পাগলের দেবতা যখন তার খোরাক জোটাতে উদগ্র উল্লাসে খেয়ে আসেন—তখন যারা তাতে বাধা দিতে যায়—দীপঙ্কর চিরদিনই তাদের অগ্রণী থাকে। এর ভিতরে নূতন কিছু নেই। নূতন করল—তার পরের দিন সে। সেই ঘর-পোড়াদের সে ২৫৲ পঁচিশ টাকা ধার দিয়ে বল্‌ল। অতীশ জিজ্ঞাসা করল—পাবেন ?

দীপঙ্কর উত্তর দিল—বল্‌তে পারি নে। তবে আশা রাখি—এরা আমার ভিটের প্রজা।

উৎপলা শুনে বিরক্ত হল। বল্‌ল—এই হাত খাটোর সময়ে পঁচিশ টাকা দিয়ে দিলে ?

আল্‌কো পেলাম। দেখি—যদি ঐ উপায়ে কিছু বাড়ে। পয়সার বড় দরকার—দেখতেই ত' পাচ্ছ।—দীপঙ্কর মনে মনে হিসাব করে দেখে এ টাকা কয়টা যদি দু'বছর পরে ফিরে আসে—ত'। হলে এর ডবল হতে পারে।

উৎপলা স্বামীর মুখের পানে চেয়ে হেসে ফেল্‌ল। বল্‌ল—পয়সার অভাব ত' দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু আসলো হয়ত যাবে। তোমার বাড়াত' দূরের কথা।

দীপঙ্কর শান্ত সুরেই উত্তর দিল—তাই যদি হয়—তাতে কি হবে? ওঁরা ত' আমারই প্রজা। মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই; খাওয়ার সংস্থান নেই। কেমন করে ওরা বেঁচে থাকবে ?

উৎপলা ব্যথিত হোল। ক্ষিপ্ত কণ্ঠেই উত্তর করল—যার বৌ চেয়ে চার আনা পয়সা পায় না—পঁচিশ টাকা পয়মাল্ত করা তারই সাজে বটে!

উৎপলা দাঁড়াল না। চলে গেল। দীপঙ্কর চেয়ে রইল—তার যাওয়ার পথের পানে। একটি নিঃশ্বাস আপনিই বুক ভেদ করে বার হোয়ে এল—ধীরে অতি ধীরে। হায়! এই তার মানস-প্রতিমা—কলালক্ষ্মী।

অতীশ এসে পাশে দাঁড়াল। দীপঙ্কর যেন উদাসীন। অতীশ তা' লক্ষ্য করল। বল্‌ল—কি ভাবছেন ?

হাসিতে দীপঙ্করের মুখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠল। বল্‌ল—হাতে পয়সা নেই।

কালই পঁচিশ টাকা ধার দিলেন—আর আজই হাত শূন্য! অতীশ বিস্মিত হোল। পরে বল্‌ল—এ অবস্থায় আপনার পঁচিশ টাকা ধার দেওয়া ঠিক হয় নি।

জানি। কিন্তু সে ত' হস্ত-চ্যুত পাশা! এখন তার জন্যে সমস্ত অনুশোচনাই বৃথা ?

দীপঙ্কর চুপ করল। অতীশ তার মুখের পানে চাইল। দেখল—সে মুখ ভাব হীন। একটু আগেই যা তার মুখে সে চিন্তার ধারা দেখতে পেয়েছিল। এত শীঘ্র থেকে ফেলা যায়। হবে? কিন্তু দীপঙ্করের হাত যে খাটো—পয়সার টানাটানি যে তাকে কষ্ট দিচ্ছে—অতীশ

তা' জানে। তাই তার মন থেকে—যাদের কাছ থেকে পাওয়ার কোন আশা নেই—এমন লোকদের পঁচিশ পঁচিশটে টাকা দেওয়ার ক্ষোভ কিছুতেই সে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারচে না। তাই সে ফের সুর টান্‌ল—কিন্তু পঁচিশ পঁচিশটে টাকা!

অতীশের বলা হোল না। দীপঙ্কর তাকাল। তার চোখ দু'টো তখন হাসছে। সে বল্‌ল—ও টাকাটা আমার আল্‌ফো পাওয়া—

আল্‌ফো!—অতীশ বিস্মিত হোল।

দীপঙ্কর তার বিস্ময় দূর করে দিয়ে বল্‌ল—আল্‌ফো—হাঁ। সংসারীতে গল্প লিখে ও পঁচিশ টাকা পেয়েছি তাই—

অতীশ বাধা দিল—গল্প লিখতেও ত' মাথার খরচ আছে। তার দাম পঁচিশ টাকায় হয় না।

তা' জানি। কিন্তু লিখচি ত' অনেক দিন—বার হয়েচেও অনেক। আজও কোনখান থেকে বিশেষ কিছুই পাইনি। কাজেই যা' পেয়েছি, তাকে আল্‌ফো ছাড়া আর কি বল্‌বো।—দীপঙ্কর বল্‌ল। অতীশও আর কিছু বল্‌ল না। তার মন তখন স্বীকার করে নেছে—একে কিছু বলাই বৃথা।

পাঁচ

কথাটা চাপা থাক্‌ল না। আজ ক্ষ্যান্তর পিসি—কাল সুদনের মা—তার পর দিন হারু খুড়ো—একে একে সবাই এসে টাকা ধার চায়। কিন্তু কেউই টাকা পায় না। নিরাশ হোয়ে সকলকেই ফিরতে হয়।

বলাবলি করে—টাকা আছে। হাড় কৃপণ। বৌটাকে ভাল খেতে পরতে দেয় না। দু' পাঁচটা টাকা দিয়ে কারও উপকার করে না। ওর টাকার আর কি হবে? সন্তান ত' নেই। থাক্—ভোলারাই থাক্।

সনাতন চালাক ছোক্‌রা। কাজ বাগাতে ভারি ওস্তাদ। সে ঠিক করল—আর কেউ না পারলেও সে কিছু না কিছু দীপঙ্করের কাছ থেকে বার করে নিয়ে তবে তাকে ছাড়বে।

সে যায় আসে—খোসামোদ করে। দীপঙ্কর মনে মনে হাসে—মুখে কিছু বলে না।...... চলে মন্দ নয়। দীপঙ্করের বাড়ীর আসর গুল্‌জার। শৈলেন বল্‌ল—দাদা, তোমাকে কিন্তু সকলে ভাল বলে না।

দীপঙ্করের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল—আমিও ত' ঠিক ভাল নই যে, সকলে আমাকে ভাল বলবে।

কথাটা কি ঠিক হোল? প্রশ্ন করে শৈলেন দীপঙ্করের মুখের পানে চেয়ে রইল।—অঠিকই বা কোন জায়গায় হোল!

শৈলেন কি বলবে?—চুপ করে থাক্‌ল। যে কথা উড়িয়ে দিতে চায়—তাকে পারা যায় না। অতীশ হেসে বল্‌ল—যারা আপনার কাছে আসে না—তারা আপনার নিন্দা করে তার মানে একটা ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু যারা আপনার কাছে আসে—ওঠে-বসে—আপনাকে দিয়ে যেটুকু নেওয়া যায়—তা' ষোল আনা আদায় করে—তখনই আমি ভাবি—

বাধা দিয়ে দীপঙ্কর বল্‌ল—ঐ একই উত্তর। তারাও আমাকে হজম করতে পারে না। আমি যে একেবারে বদ্‌হজমীর জিনিষ কিনা?

সনাতন বসে বসেই এ আলোচনা শোনে। সে বুদ্ধিমান ছোক্‌রা। ওঠে না; সেখানে বসেই থাকে। বসে বসেই রাঙা হয়। তার পানে চেয়ে দীপঙ্কর একটু হাস্‌ল। সে হাসি মায়ার—না করুণার। কিছুই বোঝা যায় না। সনাতনের বসা হোয়ে ওঠে না আর। সে উঠে পড়ে। যাওয়ার সময় শুধু বলে যায়—আজ এখন উঠি। আবার আস্‌বো। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—একটা জরুরি কাজ বাকি পড়ে আছে।

সনাতন চলে যেতেই অতীশ বলল—যাক্—! বাঁচা গেল। তোমার মত যারা—তাদের যেন খুব জরুরি কাজ ঘন ঘন থাকে। আমরা তা'হলে একটু প্রাণ ভরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি।

দীপঙ্কর বল্‌ল—ছিঃ! ওদের বেশী কিছু বলো না। ওরা বড় দয়ার পাত্র। স্বার্থই দেখে—আর লোকের ছিদ্রই খোঁজে। কাজেই না পারে—ভাল করে পাঁচ জনের সঙ্গে মিশতে—না পারে প্রাণ খুলে হাসি-মস্করাতে যোগ দিতে।

হঠাৎ বাড়ীর ভিতর থেকে শিকল বেজে উঠল। দীপঙ্কর উত্তর দিল—যাই।—ডাক্তার বল্‌ল—ওই জন্যেই ত' আপনার এখানে আসা পোষায় না ম'শায়। আপনি স্থির হোয়ে এক দণ্ডও বস্‌তে পারেন না। অমন যদি—বাড়ীর ভিতর গিয়ে থাকলেই হয়।

দীপঙ্কর উত্তর দিল—তা' হয় না। ভিতরকে ছেঁটে ফেলে কেবল বাহির নিয়ে থাক্‌তেও পারা যায় না। ও-দু'টোকেই চায়—বুঝলে ডাক্তার ?

ডাক্তার হয় ত' বা ছাই বুঝল। তা' না বুঝুক দীপঙ্কর সে সব কিছু লক্ষ্য করল না। সে ভিতরে চলে গেল।

ছয়

উৎপলা বল্‌ল—এক জোড়া কাপড় কিনে দেবে ?

দীপঙ্কর হেসে উত্তর দিল—কাপড় ত' আমাদের কিন্‌তে নেই।

যদি না থাকে—তা' হলেও না ? প্রশ্ন করে উৎপলা দীপঙ্কর মুখের পানে চাইল। চোখে মুখে দীপঙ্করের তখন যেন একটা উজ্জ্বল হাসি নাচ্‌ছিল। উৎপলার প্রার্থনা—কাকুতি সে গ্রাহ্যও করল না। হাসির আড়াল দিয়ে সে বলে গেল—না, অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনা দূরের কথা আমাদের মনেও আন্‌তে নেই।

উৎপলা ছাড়্‌তে চায় না। হয় ত' তার যথার্থই কাপড়ের দরকার হয়েছিল। নয় ত' বা সে এক জোড়া কাপড় তার স্বামীর কাছ থেকেই চায়—অন্যের হাত তোলা দান যা' নয়। কিন্তু দীপঙ্করের বুঝি সেদিকে গ্রাহ্যও নেই। সহজ সুরেই বল্‌ল—কি কর্‌বো ? দিতে কি অসাধ ? হাতে পয়সা নেই।

দিতে কি অসাধ—উৎপলার বুকে আঘাতই করল। বিয়ে ত' তাদের অনেক দিনই হয়েছে। কি পেয়েছে সে স্বামীর কাছ থেকে। কই ? স্মৃতির পটে ত' তার দানের অঙ্ক উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে না। দু'টো মিষ্টি কথা! সে ত' সকলেই সকলকে দেয়। তার ভিতরে ত' এমন নূতন কিছু নেই। কিন্তু—থাক্। ক্ষোভের হাসিতে তার মুখখানি ভরে উঠল। যা'

সে চায়—তাতেই সে ঐ একই উত্তর পায়। ব্যথা-ম্লান কণ্ঠে সে বল্‌ল—অত নেই-নেই—বল্‌তে নেই।

কথাটা সকলেরই কাণে গেল। জনে জনে সকলেই দীপঙ্করকে শুনিয়ে দিল নেই-নেই কর্‌লে সাপের বিষও থাকে না। এতেই ত' তাদের এত বড় সংসারটা চলেছে। এতদিন যা' স্বচ্ছলাভালি চলে এসেছে—আজ তা' অচল হয় কেন ?

এমন কেন হয়—এ প্রশ্নটা এক একবার দীপঙ্করের প্রাণেও ওঠে, মীমাংসা হয় না। বুঝ্‌তে সে পারে—কেন এমন হয়। তবু সে ত' সেই স্রোতেই গা ভাসিয়ে চলে। সকলেই যখন—কেন চল্‌বে না—আগে ত' চল্‌ত—এই প্রশ্নে তাকে জ্বালিয়ে তোলে—তখন সে বিরক্ত হোয়ে জবাব দেয়—আগে জিনিষপত্র সস্তা ছিল—এখন সব দর বেড়ে গেছে। অথচ আমার আর কিছুই বাড়ে নি।

লোকে তবু ছাড়ে না। শুনিয়ে বলে—বাড়ীর লোক কমেছে—এ কথা ত' তাকে স্বীকার কর্‌তেই হবে।

সেও স্বীকার করল—ব্যথার হাসি অধরে মিলিয়ে দিয়ে বল্‌ল—নিজের দোষ বল—আর যাই বল—খাইয়ে লোক কমে নি। আর যারা চলে গেছে—তাদেরই জন্যে আমার ট্যাক্‌স ৬৲ ছ' টাকা থেকে তিন ছক্‌ আঠার টাকা হয়েছে।

কেউ বা তাড়া দেয়। কেউ বিরক্ত হোয়ে চলে যায়। কেউ কেউ বা তাকে তখনও বোঝাতে চেষ্টা করে—তার চলা উচিত ? এতদিন যখন চলেছে—সে কেন না স্বীকার করবে—যে—তারও চলে। সে জমা-খরচের খাতা খুলে দেখিয়ে দিল একজাই হিসাবে এবার খাজনা আদায় ২০৮৲ দু'শ আট টাকা মাত্র। এতে কি একটা ভদ্র পরিবারের চল্‌তে পারে ?

যারা দেখে—তারা একটু স্তম্ভিত হয়। নেই-নেই কর্‌লেও খরচ সে কিছু কম করে না—এ সকলেই জানে। এ দু'শো টাকায় সে খরচ ত' সম্ভব নয়। মাসিক আয়ের গড় সতের টাকাই হয় না। অন্ন-সমস্যা—বস্ত্র-সমস্যা—এই নানান সমস্যার যুগে এ আর ত' কিছু নয়। অথচ সে ভদ্র—অপেক্ষাকৃত বড়লোক

গৃহস্থ। মিউনিসিপালিটির সদস্যরা তার আয় বেশী বলে স্থির করে বছরের পর বছর তার ট্যাক্স্ বাড়িয়েই চলেছেন। তার আবেদনও মঞ্জুর হয় না।

একজন জিজ্ঞাসা করে বসল—আয় যদি এত কম ত' চলে কি করে?

হেসে দীপঙ্কর জানাল—কখনও কখনও ধার করে; আর মাঝে মাঝে দু' দশ টাকা অন্য আয়ও আছে।

যারা নেতিবাদের বিরোধী—তারা এই সুযোগ পেয়ে বলে বসল—তবে চলে না বল্‌তে পারো না। যেমন করেই হোক্—চল্‌বে ত' বটে!

হাসিতে দীপঙ্করের মুখখানি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল—চলে—একথা স্বীকার কর্‌তে পারি—যদি কেউ আমার কাছে এক পয়সাও না চায়। নেই-নেই করেও আমি লোকের চাওয়ার হাত থেকে নিস্তার পাই নে। যারা আমার কাছে আশা করে তাদের দিতে না পেরে আমারই কি কষ্ট কিছু কম হয়। কিন্তু কি কর্‌বো? অথচ আমাকে ভদ্রতার অত্যাচার সহ্য কর্‌তে হয়—সমাজের সঙ্গে টাল মিলিয়ে চল্‌তে হয়।

দীপঙ্কর চুপ কর্‌ল। এর পরে আর কথা চলে না। বাধ্য হয়েই সকলকে পথ দেখ্‌তে হয়।

সাত

ডাক্তার বল্‌ল—হাতে ত' পয়সা থাকে না—তবে কেন বাড়ীতে চায়ের আড্ডা বসিয়ে পয়সার বাজে খরচ করেন?

প্রশ্নটা হয় ত' ঠিক! দুধটা না হয় ঘরের, যখন ঘরে থাকে না তখনও এত অল্প লাগে যে সেটা না ধর্‌লেই চলে। কিন্তু চিনি আছে—চা আছে। এ দুটোতে যে কিছু পয়সা খরচ হয়—তা' অস্বীকার করা যায় না। স্নিগ্ধ কণ্ঠে দীপঙ্কর বল্‌ল—কি জানো ডাক্তার, পাঁচটা ছেলে আসে। খুব অল্প খরচে তাদের কিছু খেতে দিতে পারি। দিতে ত' সাধ যায়—কি কর্‌বো—পারি নে। অক্ষম।

আবার শিকল বেজে উঠ্‌ল। বাড়ীর ভিতর থেকে ডাক এল। ডাক্তার কাণ খাড়া করে বল্‌ল—ঐ রে আবার!

হাসিতে দীপঙ্করের মুখ ভরে উঠ্‌ল। কিছুই সে বল্‌ল না। উঠে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে যা' শোনার—তাই শুনেই সে ফিরে এল—দিতে ইচ্ছে করে?—কিন্তু সে শুধু বুঝি পরকে। নিজের বৌ—নিজের মা এঁদের বেলায় বুঝি হাত উপুড় হতে চায় না। না, হাত চিৎ করাই অভ্যাস—উপুর হবে কি করে? কি বলো?

দীপঙ্কর কিছুই বল্‌ল না। বলার কিছু ত' তার নেই। উত্তর ত' তার ঐ একই। কিন্তু বিশ্বাস করে কে? মানুষের ইচ্ছাকে কেউ বিচার করে না—তার কথার ও কাজের সমালোচনাই করে শুধু।

ডাক্তার সেই কথারই পেই ধরে ছিল—বল্‌ল—চার পয়সার মুড়ি দিলে কি হয় না?

দীপঙ্কর উত্তর দিল—না, বোধ হয়, হয় না। প্রথমতঃ চার পয়সার মুড়িতে কুলায় না। তার সঙ্গে মিষ্টিও চাই। শুধু মুড়ি কি কাউকে দেওয়া যায়। তার উপরে চা'র হয় ত' একটা নেশা আছে। পাঁচ জনে বসে নেশা না কর্‌লে কি জুত্‌ হয়।

ডাক্তার গম্ভীর হোয়ে বল্‌ল—তা নয়। চা খাওয়াটা আমরা সাহেবদের কাছ থেকে পেয়েছি। এম্‌নি আমরা অনুকরণপ্রিয়। ওকে মজ্জাগত করে নিতে চাই—ছাড়্‌তে পারি নে।

দীপঙ্করের চোখ হেসে উঠ্‌ল—মুখ বল্‌ল—হবে।

ডাক্তার এই একটি কথায় ঠিক খুসি হতে পার্‌ল না। বল্‌ল—আপনাকে বোঝাই দায়! আপনি একটি হেঁয়ালী।

আবার বাড়ীর ভিতর হতে আহ্বান এল। দীপঙ্কর উঠে গেল। ডাক্তার নীরবে বসে রইল। হয় ত' কিছু ভাব্‌ছিল। যাক্।

অতীশ ঘরে ঢুকেই বল্‌ল—কি ডাক্তার, চুপি চুপি বসে কি কর্‌ছো?

ডাক্তারও সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠ্‌ল—আরে ম'শায়,

আপনাদের এখানে কি আসা চলে। একটু 'আধটু' আসি—কিন্তু যে অহঙ্কার! কেন? আমরা কি মানুষ নই?

তা' বোধ হয় নাই। অতীশ একবার চেয়ে নিল—ডাক্তারের মুখের পানে, সেখানে বুঝি তখন আলো আঁধারের খেলা চল্‌ছে। একটা অস্বস্তির রেখা ফুটে উঠেছে। অতীশ তার আরব্ধ কথা শেষ কর্‌ল—কিন্তু যাঁকে লক্ষ্য করে বল্‌ছো—তাঁর অহঙ্কার বেশী আছে বলে মনে হয় না ডাক্তার! তবে তাঁকে ঐ ভাবেই থাক্‌তে হয়। এ হয়ত তাঁর বড় সৌভাগ্যের ফল—নয় ত' বিধাতার প্রচণ্ড পরিহাস!

আট

দীপঙ্কর শিষ্য বাড়ী ঘুরে এসেছে। কিছু টাকা সে হাতে পেয়েওছে। বর্ত্তমান যুগের পক্ষে তা' বেশী না হলেও—ত্রিশ চল্লিশ হ'তে পারে।

অতীশ এসে বল্‌ল—এইবার হয় ত' দিন কতক বেশ সচ্ছল ভাবে চল্‌বে।

দীপঙ্কর জবাব দিল—ভগবান জানেন। তার মুখে সেই হাসি। খানিকটা সে চুপ করে কি ভেবে নিল। মুখের হাসি যেন মুখেই মিলিয়ে গেল। সে বল্‌ল—ভাবছি—সময়—অসময় নেই—মাঝে মাঝে টাকার খুবই দরকার হয়ে পড়ে। তা' এর থেকে গোটা কুড়িক্ টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেবো।

অতীশ সমর্থন কর্‌ল—সে খুবই ভাল কথা। সংসারে থাকতে হ'লেই টাকার দরকার মাঝে মাঝে কিছু কিছু করে জমালে হাতে দু' পয়সা হবেও, এবং কেউ কোনো দিন কিছু চাইলে—আপনি দিতেও পার্‌বেন—দুই এক পয়সা।

একটি ছেলে এসে দাঁড়াল—ম্লানমুখে—সশঙ্কভাবে। দীপঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাইল।

সে তেমনই সশঙ্কে উত্তর দিল—আমি প্রফুল্লের ভাই।

আর কিছুই সে বল্‌তে পার্‌ল না। প্রফুল্ল রাজদ্রোহী সন্দেহে অন্তরিত হোয়েছে। তারই আয়ে সংসার চল্‌ত—কাজেই অবস্থা অবচ্ছল। এতদিন বুড়ো বাপ ছিলেন তাঁরই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে সকলের দু'টো দু'টো আহার জুটছিল। আজ মাস পাঁচ হয় তিনিও মারা গেছেন। এখন একদম অচল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞাসা করল—চাকরির চেষ্টা করেছ?

ছেলেটি উত্তর দিল—জোটে না। জুটলেও থাকে না। পিছনে পুলিশের লোক ফিক্রের মত লেগেই আছে।

হুঁ!—দীপঙ্কর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। তার সঞ্চিত টাকা কয়টি সে সেই ছেলেটির হাতে দিয়ে বল্‌ল—আমার আর বেশী কিছু নেই। এই দিয়ে অন্ততঃ পথে ফেরি করো গে'। তার বেশী ত' এ দিয়ে হবে না?

ছেলেটি আশার বেশী পেয়ে খুসি হয়েই চলে গেল।

অতীশ জিজ্ঞাসা কর্‌ল—সব টাকাটাই দিলেন?

হুঁ।—বলে একটু দমে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে দীপঙ্কর উত্তর দিল—আমার চেয়ে ওর দরকার বেশী! আমার যেমন চলছে—তেমনিই চলে যাবে। না হয় আরও পাঁচবার বল্‌বো—চলে কি করে?

নয়

দীপঙ্কর শিষ্য বাড়ী থেকে এসেছে—সুতরাং সকলেই জানে—এখন তার হাতে টাকা আছে নিশ্চয়। দোকানী দত্ত ম'শায় এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

দীপঙ্কর হেসে জিজ্ঞাসা করল—কি বলো?

আমাদের টাকাটা বড্ড বেশীদিন হোয়ে গেছে।

ওঃ! তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে সে জানাল—আরও কিছু দিন সবুর করতে হবে।

দোকানী চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার সময় তিক্ত কণ্ঠেই বলে গেল—উঠনো খেয়েছেন সে কথাটা ভুললে চলে কি করে? আমরা গাঁটের পয়সার মাল দিয়ে কি চোর হোয়ে গেছি।

দীপঙ্কর বসে বসে শুনল। ব্যথাও সে পেল। কিন্তু—

স্ত্রী মাইমে চাইল। বল্‌ল—শিষ্য বাড়ী থেকে এসেছেন। এখন ত' হাতে টাকা আছে। আমরা

...রাণী। তাড়া খেটে খাই। টাকা না পেলে চলে ...কি করে?

টাকা না পেলে যে চলে না—তা' দীপঙ্কর জানে।

উৎপলা বল্ল—টাকা ত' পেয়েছ—দিয়ে দেও না ...লে?

কেন যে দিয়ে দেওয়া যায় না—তার কি উত্তর ...বে সে?

উৎপলা ফের বল্ল—আমি আর কথা শুনতে পারি ...। ওর আর কতই বা বাকি আছে। ফেলে দিলেই ...হয়।

ত্যা' আর পারি কই?

দীপঙ্কর তার সেই নিজের হাসি হাস্‌ল। পরে স্পষ্ট ...ঠে জানিয়ে দিল—যে, যখন তার সঙ্গে সে জীবন জড়িয়েছে—তখন দু'টো কথা শুনতে হবে বৈকি?

নীচে থেকে ঝির গলা কাণে এল—সে বলছে—আমিই কেবল পাবো না। কেন? ঝি রাখার সখ আছে—টাকা বার করার সময়ই শুধু বাজে।

খড়ম খটাস্ খটাস্ করতে করতে অতীশ এসে হাজির। দীপঙ্করের মুখের পানে সে তাকাল—মুখখানা একটু বেশী গম্ভীর—অস্বাভাবিকও বটে! সে প্রশ্ন করল—কি ভাবছেন?

দীপঙ্কর হেসে ফেল্‌ল। সে হাসি মধুরও বটে—মলিনও বটে। উত্তর দিল—কিসে চলে?

অতীশও হাস্‌ল। কিন্তু কিছুই সে আর বলতে পারল না।*

* গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত

শুধু কেরাণী

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার জীবনে আজি পলে পলে পড়িতেছে বাধা
মায়াময় স্বর্ণের শৃঙ্খলে, নয়নে লাগায় ধাঁধাঁ
বর্ত্তমান সোনার স্বপন—
দিনেকার যাত্রাপথে তাই চলি মরণ আঁধারে,
জীবন সন্ধানে ফিরি মরণের অতল পাথারে
ব্যর্থতায় ভরিয়া জীবন!
তবু এই শূন্য বক্ষে পুষে চলি নিতি নব আশা
প্রেয়সীর স্মিত হাস্য, মিতাদের প্রীতি ভালবাসা!
মন চাহে বালকের হাসি
যেথায় রাখাল ছেলে মাঠে মাঠে গেয়ে চলে গান
সাথে তার দুই পাশে শোভে মাঠে সোনালিয়া ধান
সেথা যেতে আজও ভালবাসি।

দু'ফোঁটা দুধের লাগি হেথা মোর কেঁদে ওঠে ছেলে
অসহায় পিতা আমি মৃত্যুলীলা হেরি আঁখি মেলে
চেয়ে রই একাকী নীরব
জানিনাক বোঝে কিনা দারিদ্র্যের ব্যথা ভগবান
তবু চাই উর্দ্ধোপানে; জীবনের গ্লানি অপমান
অশ্রুজলে জানাই এ'সব।
জীবনে মানিতে গিয়া শৃঙ্খলায় রোষ রক্ত আঁখি
দেখিনু সায়াহ্নে আজ আপনারে দিয়া গেছি ফাঁকি
শূন্য করি এ জীবন খানি—
ক্লান্ত কণ্ঠে বাহিরায় এ জীবনে কি করিনু হায়
অবিশ্রাম চালিয়া লেখনী, র'ল প্রাণ ...
হইলাম শুধুই কেরাণী।

পুষ্পপাত্র

"রূপালি আভা"

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিমিটেড, কলিকাতা।

জীবনবীমা-প্রসঙ্গ
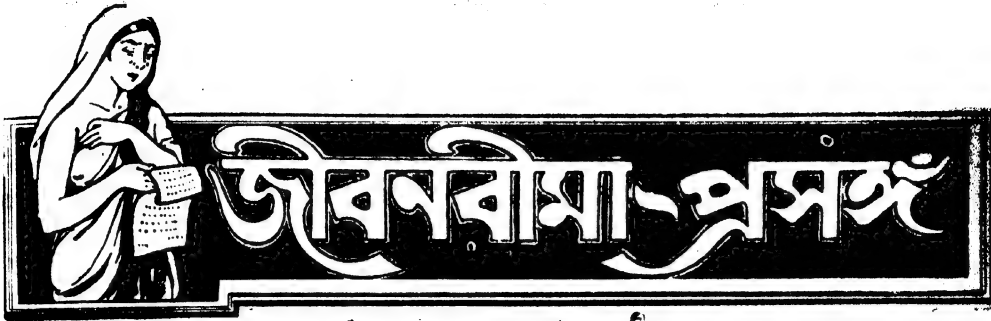
বিখ্যাত মনীষী Winston Churchill জীবন-বীমা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"If I had my way I would write the word "Assure" over the door of every cottage and upon the Blotting Book of every public man"—সত্যই এমন জীবন বীমার উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার দিন নাই ; এমন কি ভারতবর্ষের মত দেশ যেখানে বীমার প্রচার ও প্রচলন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের তুলনায় নাই বলিলেও হয়, তথায়ও এই প্রশ্নের উত্তর দিবার আবশ্যকতা হয় না। জীবন বীমার বিজ্ঞান-সম্মত সূত্র গুলি সাধারণের বোধগম্য নহে কিন্তু দীর্ঘ কাল-ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে উহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন এখন কাহারও মনে জাগে না।

জীবনবীমার আলোচনা করিতে হইলে "The Law of Average" জিনিষটি মনে রাখিতে হইবে —প্রকৃতপক্ষে বীমা একপ্রকার 'গড়পরতা' প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন বস্তুর নিয়মিতরূপে আবির্ভাব দেখিয়া সেই বস্তুর পুনরায় আগমন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়—বীমার কার্য্য হইতেছে এই অনিশ্চয়তার ভাবটিকে দূর করা। অবশ্য ইহা প্রকাশ করা অসম্ভব যে কখন ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু হইবে কিন্তু কোন বীমা কোম্পানি ইহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিবেন যে বৎসরে নির্দ্দিষ্ট বয়স্ক বহু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে কতজন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। বীমা কোম্পানি ইহা আন্দাজে গণনা করিয়া বলেন না তাঁহারা "Law of Average"র নিয়ম প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গণিত শাস্ত্রের মাপ কাঠির দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। সুতরাং জীবন-বীমার অন্তর্নিহিত ভাব হইতেছে ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে তাঁহাদের জীবনের দায়িত্ব (risk) লইয়া চাঁদা সংগ্রহ করা ও মরণান্তে বা দায়িত্বকাল পূর্ণ হইলে বীমাকারিকে টাকা প্রত্যর্পণ করা। বীমাকারীগণ একযোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন না অন্য কোম্পানিকে একসঙ্গে টাকা দিতে হয় না পরন্তু বীমাকারীগণের নিকট হইতে আদায় চাঁদাগুলি কোম্পানির খরচা বাদে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে বাড়িয়া বীমা তহবিলে মজুত হইয়া থাকে এবং ইহাদ্বারা কোম্পানি ভবিষ্যতের ঋণ শোধ করিয়া থাকেন।

বীমার উৎপত্তির ইতিহাস অন্ধকারে আবৃত। পূর্ব্ব কালে নাবিকেরা সমুদ্র যাত্রার প্রাক্কালে বিচিত্র পণ্যদ্রব্য সমূহ ও জাহাজ বিপদের ভয়ে বীমা করিয়া রাখিতেন এবং নৌবীমাই (marine insurance) সম্ভবত—প্রথম প্রচলন হয়—ইংল্যাণ্ডে জীবন-বীমার প্রথম প্রচলন সম্ভবতঃ রাণী ইলিজাবেথের রাজত্ব কাল হইতে। "Industrial Revolution"এর পর হইতে ইংল্যাণ্ডে জীবন-বীমার বৈজ্ঞানিক প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বীমার প্রচলন প্রায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে—মিঃ ম্যাক্রাউচান প্লাটারের উদ্যোগে—। অধুনা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ "ওরিয়্যানটাল" বোম্বাই সহরে একটি ক্ষুদ্র ঘরে কার্য্য আরম্ভ করেন। ভারতীয় কোম্পানিগুলির মধ্যে মাদ্রাজ ইকুইটেবল সর্ব্বপ্রথম জীবন বীমার কার্য্য আরম্ভ করিয়া ছিলেন। বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কোম্পানি হিন্দু মিউচিয়াল—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত বাংলায় দেখা দেয়—আত্মবিস্মৃত জাতি জাগরণের শিহরণে নিজেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করে। এই সময়ে "ন্যাশনাল" "ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান" ও "হিন্দুস্থান কোয়াপেরিটিভ" আত্মপ্রকাশ করে। দেশের এই অবস্থার সুযোগ লইয়া অনেক কোম্পানিই স্থাপিত হয় কিন্তু বীমা [illegible] অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত এই কোম্পানিগুলি দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া অচিরেই লুপ্ত হয়। গবর্ণমেণ্টও এই সমস্ত দেখিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে "Indian Life Insurance Companis Act." প্রবর্ত্তন করে —এই এ্যক্টের দ্বারা কোম্পানিগুলির যথেচ্ছাচারিতা করিবার পথ অনেকাংশেই লুপ্ত হইয়াছে—।

এই এ্যাক্ট অনুযায়ী ভারত সরকার কর্ত্তৃক একজন বিশেষজ্ঞ বীমা-বিদ ভারতীয় কোম্পানিগুলির কার্য্যকলাপ পরিবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত আছেন—কোম্পানিগুলিকে প্রতি বৎসর তাহাদের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ দাখিল করিতে হয়; এইগুলি সংগ্রহ করিয়া—তিনি প্রতি বৎসর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, উহা 'Blue Book' নামে অভিহিত। ১৯২৯ এর Blue Book হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতবর্ষে ২৫৭টি কোম্পানি কার্য্য করিতেছে—তন্মধ্যে—১৪৯টি বিদেশী এবং ১০৮টি ভারতীয়। ভারতীয় কোম্পানিগুলির মধ্যে—৪৬টি বোম্বাইতে; ২০টি বঙ্গদেশে, ১৯টি মান্দ্রাজে—১২টি পাঞ্জাবে, ৪টি দিল্লীতে, বর্ম্মায় দুইটি, আজমীরে একটি এবং মধ্য প্রদেশে ২টি কাজ করিতেছে।

বিচিত্রা

ভারতবর্ষীয় বীমাপত্রিকার মধ্যে Indian Insurance Journal সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বঙ্গদেশে বীমা প্রচলন করিবার জন্য বাংলার সাহিত্য পত্রিকায় প্রথমে বীমাপ্রসঙ্গের অবতারণা করেন। এজন্য তাঁহার গৌরব করিবার অধিকার আছে; কিন্তু সময়ের তালে তালে (বিশেষতঃ সাময়িক পত্রের) পা ফেলিয়া চলিতে হয় নচেৎ সমূহ ক্ষতি। তাঁহার সম্পাদিত Indian Insurance Journal একদা ভারতের বীমাজগতে একচ্ছত্র রাজত্ব করিত; তখন তিনি তাহা যে ভাবে সাজাইয়া দিতেন সকলেই সেইরূপে তাহাকে গ্রহণ করিত, কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বীমা-জগতের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বীমা বিষয়ে লোকের কৌতূহল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভারতের বীমা-জগতে নব নব বিবিধ বীমা-পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে। এমত অবস্থায় তিনি সেই পুরাতন ভাবে বিলাতী পত্রিকা হইতে অধিকাংশ প্রবন্ধাদি উদ্ধৃত করিয়া, ছবি এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য বিহীন ভাবে এখনও কাগজ প্রকাশ করিতেছেন, অবশ্য এখনও তাঁহার পত্রিকার প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া মনে হয় কিন্তু এরূপভাবে আর কতদিন চলিবে? Christmas সংখ্যা Journalএ এখনও এমন দুই একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়, যাহা বিলাতী পত্রিকায় উদ্ধৃত হইবার উপযুক্ত কিন্তু চিত্র-বহুল বার্ষিক সংখ্যা "Insurance World" উহাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। বিশ্বাস মহাশয় সময় থাকিতেই সতর্ক হউন নতুবা—

'তোমারে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।

* * * *

হিন্দু মিউচ্যাল লাইফ্ ইনসিওরেন্স কোম্পানির বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল এবং উহা বাংলা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতীয়গণ পরিচালিত কোম্পানির মধ্যে প্রথম স্থাপিত এবং কোম্পানির সম্পাদকপদে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ বীমাবিদ্‌গণের অন্যতম ব্যক্তি নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এই সুদীর্ঘ কালে কোম্পানি আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ বোধ হয়, ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত কোম্পানির কার্য্য পরিচালন অবেতনভোগী লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল এমন কি এজেন্টগণও নাকি বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতেন—আরও একটি কারণ বোধহয় এই কোম্পানি মুসলমানদিগের জীবন গ্রহণ করেন না এবং পাঁচ হাজার টাকার উপরে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।

* * * *

বোম্বাইওয়ালারা বীমাক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু বাঙ্গালীকে এই পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়াছে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইনসিওরেন্স কোম্পানি—এ বৎসর হিন্দুস্থান ভারতীয় বীমাকোম্পানিদের মধ্যে নূতন কার্য্য সংগ্রহে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। হিন্দুস্থান অতীতের কলঙ্ক মুক্ত করিয়া শুদ্ধ পবিত্রচিত্তে ভারতের প্রাঙ্গণে আসিয়া শঙ্খ-নিনাদ করিয়াছে—এ বিজয় আহ্বানের মোহপাশ ভারতবাসী উপেক্ষা করিতে পারে নাই। প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্যের দিনে আমরা ইহার কর্ণধার প্রবীণ কর্ম্মীদের অভিনন্দন করিতেছি।

* * * *

এখন হইতে **পুষ্পপাত্রে** নিয়মিতরূপে বীমাপ্রসঙ্গ প্রকাশিত হইবে। স্বদেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা দেশীয় পত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য—এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা পুষ্পপাত্রে এই বিভাগ খুলিলাম। দেশীয় বীমা কোম্পানিগুলি আলোচনার জন্য আমাদিগকে তাঁহাদের কার্য্যবিবরণী পাঠাইলে আনন্দিত হইব—বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। বীমা-প্রসঙ্গের আলোচনা ব্যতীত ভারতীয় খ্যাতনামা বীমাবিদ্‌গণের প্রতিকৃতি ও কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পুষ্পপাত্রে প্রকাশিত হইবে।

নানাকথা

ছাত্র সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথ :— কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের প্রতি নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করিয়াছেন :— আমাদের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের ছাত্রেরা আমার নিকট হইতে একটী বাণী দাবী করিতে আসিয়াছে। আমি যে বাণী পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি, শুধু তাহারই পুনরাবৃত্তি করিব। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করা উচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা নিদারুণ দুঃসহ। আমাদের দেশের সেবার জন্য আমাদিগকে এরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—যাহা গঠনমূলক, যে পন্থা স্থায়ী এবং মূলগত। ঐরূপ সেবা এবং আত্মশক্তির অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা কোন শক্তির নাই। নৈরাশ্য আমাদিগকে যেন শক্তির সেই অপরিমেয় প্রশান্তি দান করে, যাহা ব্যর্থ ভাবপ্রবণতা এবং আত্মক্ষয়কারী ধ্বংসমূলক প্রচেষ্টায় নিজের সম্বলকে অপচিত না করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নীরব সাধনায় প্রবৃত্ত থাকে।

প্রধান মন্ত্রীর নিকট রবীন্দ্রনাথের তার :— মহাত্মা গান্ধীজীর গ্রেপ্তার হইতে সুচনা করিয়া ভারত সরকার যেরূপ চাঞ্চল্যকর ও বে-পরোয়া দমন-নীতি চালাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের ও আপনাদের মধ্যে এক দুঃখজনক স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তুলিতেছে এবং আপনাদের প্রতিনিধিগণের সহিত শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক আপোষ নিষ্পত্তিবিষয়ে আমাদের সহযোগিতা অতিশয় কষ্টকর করিয়া তুলিতেছে।

মহাত্মা গান্ধীর কারাজীবন :— মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান সপ্তাহে যারবেদা জেল হইতে কুমারী মীরাবাইয়ের নিকট যে চিঠি দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার এবং সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের স্বাস্থ্য বেশ ভাল আছে। চরকার কথা উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী লিখিয়াছেন যে, তিনি এখনও দৈনিক দুই শত গজের অধিক সূতা কাটিতে পারেন না। এতদিন যে সূতা তিনি সুনাইতে পারেন নাই, সেই বাকি সূতা সুনাইয়া লইবার জন্যই তিনি ব্যস্ত আছেন। মহাত্মাজী প্রত্যহ অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল ভ্রমণ করিয়া থাকেন। মহাত্মাজী আরও জানাইয়াছেন যে, তিনি বই কেতাবও বেশ পড়িতেছেন।

গান্ধীজী ভিন্ন আপোষ সম্ভব নহে :— পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ রবার্ট বার্ণেস সহরের ব্যবসায়ীদিগকে এই মর্ম্মে এক চিঠি লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 'পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোককে আপনারা ইচ্ছা করিলেও চিরন্তন পরাধীনতার মধ্যে রাখিতে পারেন না।" তিনি বর্ণ, সম্প্রদায় ও অর্থনীতি সম্পর্কিত সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান বিবাদের মত এত বড় সমস্যা আর নাই। মিঃ বার্ণেস মিঃ গান্ধীর চরিত্রের এক হৃদয়গ্রাহী এবং সুন্দর সমালোচনামূলক আলোচনা করিয়া বলিতেছেন— "আজ হউক কিম্বা কাল হউক, গান্ধীজীকে মুক্তি দিতেই হইবে এবং আমরা পছন্দ করি কিম্বা নাই করি, তাঁহার সহিত আপোষের কথা চালাইতে হইবে। রাজনৈতিক ভারতের পক্ষ হইতে তাঁহার কথাই সত্য ও গুরুত্বসম্পন্ন। তিনি যে আপোষ গ্রহণ করিবেন না, সেই আপোষ কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না।" বর্ত্তমানকালে ভারতের সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ধাঁধার তুল্য।

মহাত্মা গান্ধীকে ছাড়িয়া দাও :—আমেরিকার ধর্ম্মযাজকদের আবেদন—

মহাত্মা গান্ধীকে ছাড়িয়া দিয়া ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতা করার আবেদন করি। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্‌ডের নিকট এক তার করা হইয়াছে। বিশপ জে ম্যাকনেল, বিশপ এফ, বি ফিশার এবং র‍্যাবি ষ্টিফেন ওয়াইজ প্রমুখ এক শত ছয়জন আমেরিকান ধর্ম্মযাজক ঐ তারে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সাংবাদিক বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক বৃত্তি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সমিতির পক্ষ হইতে যে স্কীম দেওয়া হইয়াছে। সে সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য মিঃ ডবলিউ সি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অধ্যাপক এস, সি, রায় ও ডাঃ প্রিয়েন্দ্র প্রসাদ নিয়োগীকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করার কথা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতবর্ষের স্বর্ণে ইংলণ্ডের লাভ—

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সরকারী ব্যাঙ্কের মারফত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ আমেরিকার পাওনা দেড় কোটি পাউণ্ড পরিশোধ করিয়া দিবেন। কারণ, এই তারিখেই উক্ত টাকার মেয়াদ শেষ হইবে। এই টাকা পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সঞ্চিত স্বর্ণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হইবে না। ভারত হইতে যে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ এই কয় মাসে প্রেরিত হইয়াছে, তাহার দ্বারাই ইংলণ্ডকে এই ঋণ পরিশোধে গৌণভাবে সাহায্য করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। এই ঋণ পরিশোধের জন্য আর্থিক বাজারের উপর সুফল ফলিয়াছে এবং ষ্টার্লিংয়ের দাম কিঞ্চিত বাড়িয়া গিয়াছে 'টাইমস', 'মর্ণিংপোষ্ট'; 'ফাইনানসিয়াল নিউজ', 'ডেলি মেল

'টেলি টেলিগ্রাফ', 'ডেলি হেরাল্ড' প্রভৃতি পত্রিকা এই ব্যাপারে খুব উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় তিনকোটী পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ প্রেরিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

আধুনিক জীবনযাত্রায় মুসোলিনী—

রোমে ফ্যাসিষ্ট মেডিক্যাল কংগ্রেসের উদ্বোধন কালে সিনর মুসোলিনী বলেন' "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমান জীবনযাত্রায় আহার, পরিচ্ছদ, কাজ ও নিদ্রায় সমস্ত পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কারণ, স্বাস্থ্যের পক্ষে আলো, বাতাস ও ব্যায়ামের একান্ত প্রয়োজন।" মুসোলিনী মেয়েদের শরীর 'শীর্ণ' করিবার বাতিকের নিন্দা করেন এবং জন্ম নিরোধের জন্য যে প্রবল আন্দোলন হইতেছে, তাহা আক্রমণ করেন। তিনি বলেন যে, যে জাতির মধ্যে জন্মের সংখ্যা হ্রাস পায়, তাহা শীঘ্রই ধ্বংস হইবে।

সহযোগিতাই সাম্রাজ্যের ভিত্তি ঃ—

কর্ডওয়েলার্স ক্লাবে ভারতের হাই কমিশনার স্যার বি, এল, মিত্র বক্তৃতায় বলেন যে সদিচ্ছা ও সহযোগীতার ভিত্তিতেই সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃটীশ কমনওয়েলথের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কে উহাই হইতেছে মূলকথা এবং এই জন্য সাম্রাজ্য দাঁড়াইয়া আছে। তিনি আশা করেন যে সদিচ্ছা ও সহযোগিতায় বাধা উৎপাদন করে এমন কিছুই করিতে দেওয়া হইবে না। সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চম ব্যক্তিই হইতেছে ভারতীয় এবং ভারতের শিক্ষা কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত নহে, পরন্ত মানবতার দিক হইতেই এই শিক্ষার বিস্তার হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে যত মাল আমদানি হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগই বৃটেন হইতে যায়, কিন্তু বৃটেন ভারতবর্ষ হইতে মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ রপ্তানি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ প্রচেষ্টা—মহাত্মা গান্ধীর অভিমত ঃ—

গত ১৪ই জানুয়ারীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর নিম্নোক্তরূপ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে:— অস্পৃশ্যতা নিবারণ সমস্যার রাজনীতিক গুরুত্বও অনেক আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুখ্যতঃ সমস্যাটা ধর্ম্মমূলক এবং হিন্দুদেরই উহার সমাধান করা কর্ত্তব্য। ঐ সমস্যা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, উহা বর্ত্তমান রাজনীতিক সমস্যাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, কোন রাজনীতিক প্রশ্ন অপেক্ষাও উহার গুরুত্ব কম নহে; কাজেই অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন পথে যাহাতে রাজনীতিক সমস্যা কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অহিংসা প্রচার প্রচেষ্টায় নারী ঃ—

মহাত্মা সকাশে টলষ্টয় দুহিতা:—গত ১৪ই জানুয়ারীর "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে মহাদেব দেশাই লিখিত ইউরোপের পত্র শীর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে আছে:—ইটালীতে যাহারা মহাত্মার সহিত দেখা করেন, কাউণ্ট টলষ্টয়-দুহিতা মস্কোটাইন টলষ্টয় তাহার মধ্যে অন্যতমা। মহাত্মার সহিত দেখা হইলে তিনি বলেন,—"আপনার সাক্ষাৎলাভের সুযোগের প্রতীক্ষা অনেকদিন হইতে করিতেছিলাম, যদি আমার পিতা বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আপনার অহিংস সংগ্রামের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন।"

মহাত্মা—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার মনে হয়, নারীরা যদি শুধু ভুলিয়া যাইতে পারে যে, তাহারা পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাহা হইলেই আমার বিশ্বাস যুদ্ধ নিবারণ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা তাঁহারা অনেক বেশী কাজ করিতে পারেন—যদি যুদ্ধাদি সংশ্লিষ্টদের সমস্ত মাতা, কন্যা ও পত্নীগণ তাহাদের পুরুষ আত্মীয়দের কোন ক্রমে যুদ্ধবিগ্রহে দিতে যোগদান বরদাস্ত করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়াই আমার মনে হয়।

অহিংসার শক্তি প্রচারে ভারতীয় নারীর কৃতিত্বের কথাও মহাত্মা উল্লেখ করেন এবং বলেন—ইউরোপীয় নারীদেরও ভারতের নারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

মুসলমান পি-আর-এস ঃ—

প্রকাশ যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ১৯৩০ সালের জন্য নির্দ্ধারিত বিজ্ঞানের পি-আর-এস বৃত্তিটী ডাঃ কুদ্রত-ই খোদাকে দিয়াছেন। ইনি লণ্ডন বিশ্বলয়ের ডি-এস-সি এবং বর্ত্তমানে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। ১৮৬৮ সাল হইতে পি-আর-এস বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। এ পর্য্যন্ত আর কোন মুসলমান ইহা লাভ করেন নাই। মুসলমানদের মধ্যে ডাঃ কুদ্রত-ই-খোদাই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানের অধিকারী হইলেন।

মালব্যজীর নিবেদন ঃ—

পণ্ডিতজী সকলকে এই শপথ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন:—"যতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট দূর না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক মহাত্মা গান্ধী এবং অগণিত ভ্রাতা-ভগিনী জেলে থাকিবেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিব, অর্থাৎ মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন পর্য্যন্ত বেশীই হউক, আর কমই হউক, যে সব জিনিষ একান্ত আবশ্যক না হইবে, আমরা তাহা ক্রয় করিব না এবং যে সব জিনিষ ক্রয় করিব, সেসব ক্ষেত্রে শুধু স্বদেশী দ্রব্যই ক্রয় করিব।"

পণ্ডিতজীর বিশ্বাস এই যে, ইহার ফল খুব বেশী হইবে।

স্বর্ণ বিক্রয় করিওনা—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্বর্ণ রপ্তানী সম্বন্ধে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন— "এই দেশ হইতে এত বেশী সোণা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। যে সব সোণা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইতেছে, সেগুলি সব খরিদ করা ভারত গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল, কিন্তু তাহারা তাহা করিতেছেন না; কারণ তাঁহারা বাট্টার হারে টাকার মূল্য

গিনির সঙ্গে যুক্ত রাখিতে চাহেন। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সোণা বিক্রয় না করিয়া সেগুলি জমা রাখা দেশের লোকদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যদি দেশের সোণা এইভাবে বিদেশে রপ্তানী হইতে দেই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদের আর্থিক প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উহা বিদেশ হইতে ফিরিয়া পাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইবে।"

অতঃপর পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—"দুঃখে কষ্টে পতিত হইলে সোণা বিক্রয় করা লোকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, ইহা বুঝি, কিন্তু এখন বাজার চড়া আছে, এখন উহা বিক্রয় করিয়া পরে দরকার হইলে পুনরায় খরিদ করিব, এইরূপ ধারণা বশে সোণা বিক্রয় করিতে যাওয়া অত্যন্ত ভুল। পণ্ডিতজী ইহাও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী যদি বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হইবে। উহাতে বাটার হার নামিয়া যাইবে এবং তাহার ফলে জিনিষ পত্রের দর চড়িবে। বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার পক্ষে উহা একান্তই আবশ্যক।"

উপসংহারে পণ্ডিত মালব্য বলেন—"দেশের স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ উভয় দিক বিবেচনা করিয়াই আমি আমার দেশবাসীদিগকে ঘরের সোনা ঘরে রাখিতে বলিতেছি। ঐরূপ করিলে সকল দিক হইতে তাঁহারা লাভবান্ হইবেন। দেশের নরনারী সকলের নিকট পুঁজিদার এবং ব্যবসায়ী-ভারতের কল্যাণকামী যাঁহারা তাঁহাদের সকলের নিকট আমার এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন বর্ত্তমানে স্বর্ণ বিক্রয় না করেন কিংবা বিদেশে রপ্তানী না করেন।

৮০ লক্ষ টাকার বিলাতী দ্রব্যের আমদানী হ্রাস—ডিসেম্বর মাসের হিসাবঃ—শুল্ক বিভাগের কালেক্টরের রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় যে পরিমাণ বিলাতী জিনিষ আমদানী হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে ৮০ লক্ষ টাকার কম জিনিষ আমদানী হইয়াছে। গত নবেম্বর মাসের তুলনায়ও ডিসেম্বর মাসে বিলাতী জিনিষের আমদানী ১২ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে মোট আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা; কিন্তু এবার আমদানী হইয়াছে ২ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা মাত্র। এবার কোন জিনিষ কি পরিমাণ আমদানী হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

কাপড়	২৩ লক্ষ টাকা	(৭ লক্ষ টাকার কম)
যন্ত্রপাতি	২৫ "	(৯ " ")
চিনি	২৩ "	(৫ " ")
তৈল	১৫ "	(১৩ " ")
লৌহ	৯ "	(১০ " ")
মদ	৭ "	(১ " ")
ধাতুদ্রব্য	৬ "	(৫ " ")
লোহালকড়	৬ "	(২ " ")
তামাক	১ "	(৩ " ")

রপ্তানী

গত ডিসেম্বর মাসে গত ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাস অপেক্ষা মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটী ৫২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই মাসে কোন জিনিষ রপ্তানী বেশী কম হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

চট থলে প্রভৃতি	১ কোটী	৯৯ লক্ষ	(—১৪ লক্ষ)
কাঁচা পাট	১ "	৯০ "	(+৩৯ ")
চা	১ "	৩৪ "	(—২৭ ")
গালা		২৩ "	(+ ২ ")
চামড়া		১৫ "	(— ৫ ")
শস্য		১৩ "	(+ ১ ")
লৌহ (কাঁচা)		১১ "	(+ ৩ ")
ম্যাঙ্গানিজ		২ "	(— ২ ")

এই মাসে গত মাস অপেক্ষা ৬০ লক্ষ গজ কম কাপড় আমদানী হইয়াছে এবং মূল্যের দিক দিয়া ৮ লক্ষ টাকার কম কাপড় আমদানী হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে যে সব মাল রপ্তানী হইয়াছে তাহার মধ্যে কাঁচা পাট ছাড়া অধিকাংশ জিনিষ আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, জাপানী ও সিংহলে রপ্তানী হইয়াছে।

স্বামীর মালিকানা চলিবেনা :—ক্যাম্ব্রিজের মুদির দোকানের জন ডোভার সেম নামক জনৈক কর্ম্মচারী চার্লস ফ্রেডারিক সিয়ারস্ নামক একজন ডাক্তারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিয়াছে। আবেদনকারী বলিতেছে যে, তাহার তরুণী স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী—এত সুন্দরী যে, তাহাকে ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরীর হেলেনের সহিত উপমা দেওয়া যায়। ডাক্তারটি একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক, তিনি একবার এই "হেলেনকে" চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তারপর হইতেই আবেদনকারীর স্ত্রীর সঙ্গে তাহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং ডাক্তারটি অজ্ঞাতসারে তাহার বাড়ীতে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া আমোদপ্রমোদের জন্য বাহির হইয়া যাইতেন, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ডাক্তার তাহার স্ত্রীকে ফুসলাইয়া লইয়া গিয়াছে। অভিযোগের উত্তরে ডাক্তারটি বলেন যে ইহা কোন দোষের ব্যাপার নহে। উক্ত নারীর সঙ্গে তাঁহার যে সম্পর্ক, তাহা একেবারে "পবিত্র বন্ধুত্ব"। তাঁহারা এই বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন। বিখ্যাত অবিবাহিত বিচারক মিঃ জাষ্টিস্ ম্যাককার্ডির এজলাসে এই মামলার শুনানী উঠিয়াছিল। বিচারপতি মন্তব্য করেন, "এখনও এই দেশে বিবাহের কতকগুলি অধঃপতনের লক্ষণ রহিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর মর্য্যাদা যাহাই থাকুক না কেন, এখনও তাহাকে স্বামীদের চাকরাণীর মত মনে করা যাইতেছে। কিন্তু আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, স্ত্রীর দেহের উপর স্বামীর কোন অধিকার নাই। সেই স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি,

স্বামীর নহে। স্ত্রী ইচ্ছা করিলে তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, সে সন্তান ধারণ করিবে কি না, ইহাও তাহার নিজের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে এবং কখন সেই সন্তান জন্মিবে তাহাও স্ত্রীই ঠিক করিয়া দিবে। বিবাহের নাম করিয়া বর্ত্তমান যুগে কোন পুরুষই স্ত্রীর মালিক হইতে পারে না। ইংলণ্ডের বিবাহিতা নারী স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে।"

পরিষদের উদ্বোধনে বড়লাটের বক্তৃতা :—

সরকারী বাজেটে ব্যয়-সঙ্কোচাদির কথা উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন, ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীর সুপারিশী সরকার যে ভাবে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন, আর কোন গবর্ণমেণ্ট ঐ ভাবে ব্যয় সঙ্কোচাদি বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। প্রস্তাবিত রাজস্ব বিল সম্বন্ধে বড়লাট বলেন, এই অধিবেশনে আপনাদিগকে আর কোন রাজস্ব বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে না বা কোন নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারণের জন্য ভোট দিতে হইবে না। তিনি বলেন—ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটের উপর বেশ ভাল। তুলনায় জগতের অন্য কোন দেশ অপেক্ষা মন্দ নহে। ভারতের পণ্যাদি জগতের অন্যান্য দেশের বাজারে বেশ সুবিধা পাইতেছে। ভারতের শিল্প-বাণিজ্য বেশ উন্নতির পথে, কাপড়ের কলগুলির ক্রমেই বিস্তার সাধন ঘটিতেছে। চিনির ব্যবসায়ে ভারতে বেশ অগ্রগতি সূচিত হইতেছে। বাটার হার—অতঃপর বড়লাট বাটার হার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার সহিত বিলাতের স্বর্ণমুদ্রার (ষ্টার্লিং) সংযোগ রক্ষা করার ফলে ভারতের কল্যাণই সাধিত হইয়াছে। ভারতের ঋণ উহার ফলে ৮৪ কোটী হইতে ৬১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। আমরা ধার না করিয়াই দেড় কোটি ষ্টার্লিং ধার দিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহা কম সাফল্যের কথা নহে। বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে ভারতের আর্থিক প্রতিষ্ঠা বিশেষ ভাবে উন্নত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন পণ্য বিশেষভাবে তুলার দর বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বর্ণরপ্তানি—অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে যে, স্বর্ণ রপ্তানির ফলে ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। কিন্তু ঐ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক, বর্ত্তমানে যাহারা স্বর্ণ বিক্রয় করিবে তাহারা বিশেষভাবে লাভবান হইবে বর্ত্তমান সময়ে স্বর্ণ ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে লাভজনক। ভারত যে বিপুল স্বর্ণভাণ্ডারের অধিকারী, তাহার তুলনায় ৪০ কোটী টাকার স্বর্ণ রপ্তানি অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। বর্ত্তমানে স্বর্ণ রপ্তানি করিয়া ভারতের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইয়াছে।

আপোষের স্থান নাই

রাজনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে লর্ড উইলিংডন বলেন,—কংগ্রেস শান্তি বা আপোষ নিষ্পত্তির সকল যোগসূত্র যতদিন পর্য্যন্ত একেবারে ছিন্ন করেন নাই ততদিন পর্য্যন্ত আমি বা আমার গবর্ণমেণ্ট শান্তি ও আপোষ মীমাংসার পথ হইতে কিঞ্চিৎমাত্রও সরিয়া দাঁড়াইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না, কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান উপেক্ষা করা কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভবপর নহে, যাঁহারা আইন-অমান্যের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের এবং সাধারণের সরকারী নীতি সম্বন্ধে ভুল বুঝিবার কোনই হেতু নাই—সরকারের বর্ত্তমান নীতি সম্পর্কে কোন আপোষ চলিতে পারে না, যাহাতে অতিরিক্ত ক্ষমতাগুলির কোন অপব্যবহার না হয় তজ্জন্য সরকার যেমন সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, তদ্রূপ যতদিন পর্য্যন্ত আইন-অমান্য আন্দোলন বলবৎ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সরকার বর্ত্তমান নীতির কঠোরতা কোনক্রমেই হ্রাস করিতে পারেন না। কেননা বর্ত্তমান অবস্থার জন্যই ঐ নীতি অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছে।

ভারতের তুল্যাধিকারই লক্ষ্য

পরিশিষ্টে বড়লাট বলেন,—গত কয়েক মাস ধরিয়া আমাদিগকে যে অসুবিধার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে, এবং যে সকল গুরুতর সমস্যা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, ঐ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকিয়াও আমি একথা বলিতে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেছি যে, আমি আমার কর্ম-জীবনের শেষ অধ্যায়ে ভারতকে তাহার যোগ্য আসন—বৃটীশ সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশের সম্পূর্ণ তুল্যাধিকার অর্জ্জনের পথেই লইয়া যাইবার সুযোগ পাইয়াছি।

নবীন তুরস্ক—প্রত্যক্ষদর্শী পরিব্রাজকের বর্ণনা—

মিঃ এইচ, এস, মোহাম্মদ নামক জনৈক পরিব্রাজক সুপ্রসিদ্ধ "বোম্বাই ক্রনিকেল পত্রে" নবীন তুরস্ক সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদান করা গেল :—

"ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া আমি গত নবেম্বর মাসে তুরস্কে আগমন করি। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে দেশ "Sick man of Europe" নামে অভিহিত হইত, সেই দেশে আজ অভিনব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিলাম। তুরস্কে এখন যৌবনসুলভ উদ্যম, স্ফূর্ত্তি ও তেজস্বীতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। মহামান্য কামাল পাশার অক্লান্ত ও অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে ইহা এখন ইউরোপের উন্নতিশীল দেশসমূহের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে।

পর্দ্দা ও টুপী

যাহাতে তুরস্কের পুরুষ ও রমণী নিজেদের ও অপর জাতির লোকের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতে পারে, তাহার জন্য তুরস্ক সকলপ্রকার কুলগত পোষাক (যথা—টুপী, পর্দ্দা, ইত্যাদি) চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছে। মহিলাবর্গ যাঁহারা এতদিন পর্দ্দার অন্তরালে বাস করিতেন, তাঁহারা ইউরোপীয় রমণীদের মত পোষাকে সজ্জিতা হইয়া চলাফেরা করেন, জীবনযাত্রার প্রতিযোগিতায় মহিলারা পুরুষের সমকক্ষতা লাভে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, কেরাণী, টাইপিষ্ট ও 'বেচনদার' রূপে বৃত্তি ব্যতিত ইউরোপের মত জীবিকা অর্জ্জনের অন্যান্য বৃত্তিও

(যথা হোটেল পরিচারিকা প্রভৃতি) তাঁহারা অবলীলাক্রমে অবলম্বন করিতেছেন। পুরুষদিগকেও ইউরোপীয় পোষাক ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। তুর্কি ফেজ অতীতের কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

ধর্ম্মবিরোধী নহে

কতিপয় ব্যক্তি স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া অনবরত এইরূপ প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, কামাল পাশা বর্ত্তমান তুরস্ক হইতে ধর্ম্মকে একেবারে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন। ইহা সত্যের অপলাপ মাত্র। পক্ষান্তরে বিগত যুগে যেরূপ করা হইত, এখন ঠিক সেইরূপ ধর্ম্মমূলক সকলপ্রকার অনুষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে। মহানগরী স্তাম্বুলে আজিও ৫০০ মসজিদ বিদ্যমান আছে এবং তাহা ইসলামের গৌরব মহিমা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে।

জুম্মার নামাজে কামাল পাশা

গোঁড়া তুর্কী যেমন নিয়মিতভাবে শুক্রবারের জুম্মার নামাজের জন্য মসজিদে গমন করিয়া থাকেন, ঠিক তেমনিভাবে রাষ্ট্রপতি কামাল পাশা শুক্রবারের নামাজের জন্য মসজিদে গমন করেন। এই ভাবে তিনি ধর্ম্মকে উন্নীত করিয়াছেন। মোল্লাদিগকে (যাজক শ্রেণী) সম্পূর্ণরূপে আরবী ভাষা আয়ত্ত করিতে হয়। মোল্লাবৃত্তির জন্য ইহাদিগকে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়। আরবী অক্ষর তিরহিত হইয়াছে; তুর্কী ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে।

স্বদেশী ব্রত

তুর্কী জাতি কামাল পাশাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। বিগত ইউরোপীয় মহা-সমরের পর তুরস্ক তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের কতকটা অংশ হারাইয়া ফেলিলেও এখনও তাহার যাহা আছে, তাহা ফ্রান্সের চতুর্গুণ। স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য তুর্কী গবর্ণমেণ্ট নিতান্তই ব্যাকুল। তাই সুলভ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার কবল হইতে স্বদেশজাত দ্রব্যসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কঠোর শুল্কপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। অতিশয় চড়া দরে পণ্য-শুল্ক প্রদান না করিলে, কোনও বিদেশী দ্রব্য তুরস্কে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। শক্তিশালী সৈন্যদল, নৌবহর ও বিমানশক্তি গঠনের অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট সুবিস্তৃত কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

সুলভে জীবনযাত্রা

বর্ত্তমান তুরস্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, এখানে সুলভে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। এখানে গম এত প্রচুর যে, হাজার হাজার মণ গম রুশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হইতেছে। তুর্কী কৃষিকুল সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। অন্যান্য দেশের মত তুর্কী গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণের রপ্তানি নিষেধ করিয়া দিয়াছে। এক্সচেঞ্জ কমিটির অনুমতি ব্যতীত কেহ স্বর্ণের বিনিময়ে তুর্কী-নোট চালাইতে পারে না।

ভ্রমণকারীদের জন্য তুরস্কে বেশ সুব্যবস্থা আছে। হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলি খুবই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন এবং বাবুর্চ্চিগণ খাদ্য-সংক্রান্ত নূতনপদ্ধতি অনুসারে পাক করিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে তাহারা হস্ত স্পর্শ না করিয়া পাক করে। বোম্বাই অঞ্চলে যেরূপ "টাকিশবাথের" প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তুরস্কে সেরূপ আদৌ পরিলক্ষিত হয় না।

আলো-আঁধারি

(সত্যেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ছন্দে)

শ্রীজগৎমোহন সেন, বি, এস, সি, সি, ই, ডি।

আধো আলো আধো আঁধিয়ার
কৃষ্ণ মেঘ শান্ত মন্থর,
করুণ বেহাগে বাঁধি তার
ক্রন্দনের ছন্দে তান ধর।
নয়ন ঢেকেছে নীলাকাশ
দিগবধূ পাণ্ডু বিহ্বল,
মুখে নাই আজি উল্লাস
চক্ষে তার অশ্রু উচ্ছল।
দানব বিজিত অমরায়
লুণ্ঠনের চিহ্ন প্রস্ফুট
কে নিল লুটিয়া আজি হায়
নন্দনের স্বর্ণ সম্পুট।

বেদনা গোপনে সুন্দর
উর্ব্বশীর পিষ্ট যৌবন,
আকুলিয়া তোলে অন্তর
লাঞ্ছিতার আর্ত্ত ক্রন্দন।
সমীরণে নাহি সঞ্চার
পর্ণভার বৃক্ষে নিশ্চল,
নদী জলে কল ঝঙ্কার
সুপ্ত আজ,—জ্যোৎস্না নিষ্ফল।
দূরে দূরে দূরে আঁধিয়ার
লিপ্ত তার শূন্য প্রান্তর
কি ফল চাঁদেরে সাধি আর
ক্রন্দনের ছন্দে তান ধর।

গ্রন্থ-পরিচয়

ভারত মহিলা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে বৈদিক যুগ, উপনিষদ যুগ, পৌরাণিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগের ৩৭টি স্মরণীয়া মহিলার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রধানতম সাক্ষী হইতেছে নারীজাতির শিক্ষা, সভ্যতা, স্বদেশ-প্রীতি ও বদান্যতার ইতিহাস। সেই দেশ সভ্য যথা রমণী পূজিতা—এই বাণী প্রাচীন ভারতে যথার্থরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল।...জগতের অন্যান্য দেশে যখন নারীজাতির প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা প্রীতি প্রদর্শিত হইত না সেই অতি দূর শতাব্দীতে ভারতে নারী পুরুষের কাছে সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ......নারীজাতির ইতিহাসে বৈচিত্র্য আছে। নারী জাতির ইতিহাস কেবল শিক্ষার ইতিহাস নহে। আমরা একদিকে যেমন ঈশ্বর পরায়ণা ভক্তিমতী নারীর অদম্য আত্মনিবেদন দেখিতে পাই—তেমনি দেখিতে পাই দেশের জন্য, সমাজের জন্য, সতী ধর্ম্মের জন্য, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, নারী শক্তির প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে। এই যে ইতিহাস ইহা একদিনের ইতিহাস নহে। এই ইতিহাস নানা রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। ...এই রূপ চেষ্টা ইহার পূর্ব্বে অনেকে করিয়াছেন; কিন্তু বিস্তারিত ভাবে ঐতিহাসিক ক্রম পদ্ধতি ক্রমে প্রকাশ করিবার উদ্যম বোধ হয় এই প্রথম।

যোগেন্দ্র বাবু প্রাচীন ভারতের এই ৩৭টী মহিমময়ী নারীর বৈচিত্র্যময় জীবন-পরিচয় দিয়া ভারত মহিলা প্রথম খণ্ড বাহির করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থখানি আগ্রহ সহকারে পড়িয়াছি ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। বই খানির ছাপা, বাঁধাই, কাগজ প্রভৃতি সুন্দর। প্রাপ্তিস্থান—ষ্টুডেণ্টস্ এম্পোরিয়াম ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গের মহিলা কবি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে রামী, চন্দ্রাবতী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের লীলাদেবী, উমাদেবীরও সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শুধু প্রথম দিককার পাঁচজন মাত্র মহিলা ছাড়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি সকলেই বর্ত্তমান কালের। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ ৩৩টি মহিলা কবির ও পরিশিষ্টে আরো কয়েকটী মহিলা কবির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কবিদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত কাব্য পরিচয় ও চিত্রও আছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছে-গ্রন্থ মধ্যে কোনরূপে ত্রুটি থাকিলে এবং আমার অজ্ঞতা বশতঃ যদি কোন মহিলা কবির বিষয় উল্লিখিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাকে দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব। যোগেন্দ্রবাবু মহিলা কবিদের যতটুকু পরিচয় দিতে পারিয়াছেন সে জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বাংলা সাহিত্যে আরো অনেক উল্লেখ যোগ্য মহিলা কবি আছেন তাঁহাদের পরিচয়ও ক্রমশঃ তিনি পাইবেন। এ ধরণের গ্রন্থ এই ভাবেই পূর্ণ হইয়া থাকে। আশা করি বই দু' খানির বহুল প্রচার হইবে।

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব—শ্রীঅক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। গ্রন্থ খানি ৭০পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মোটা এন্টিকে ছাপা, বাঁধাই ভাল। মূল্য বারো আনা।

জগৎ সৃষ্টি ও তাহার কার্য্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে বিভিন্নরূপে উল্লিখিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান এ যুগের মানুষের চিন্তাধারাকে একটা নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছে যাহার ফলে মধ্য যুগের অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তি আজ শিথিল। বৈজ্ঞানিকগণ বহু কঠিন গবেষণা পর্য্যবেক্ষণ ও নানা পরীক্ষা দ্বারা জাগতিক ব্যাপারের যে নব নব সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছেন। গ্রন্থকার সে গুলিকে শিক্ষিত সাধারণের উপযোগী করিয়া গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিষয়গুলি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই জানা দরকার, বিশেষ করিয়া মানবজাতির ইতিহাসটি। কিন্তু নানা বিষয়; তাহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থও নানা প্রকার। সে গুলি পাঠ করার সুযোগও সুবিধা সকলের থাকা সম্ভবও নয়। অথচ এ সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত ভাসা ভাসা। পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় এমন একখানিও গ্রন্থ ছিল না, যাহা হইতে এইসকল বিষয় জানা যায়। কিন্তু এই গ্রন্থখানির দ্বারা সে অভাব পূরণ হইল। বিষয় গুলি জটিল—লিখিবার গুণে অতি সহজ হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

'রজনী গন্ধা' কবিতার বই। শ্রীভক্তিসুধা ধর প্রণীত। দাম বারো আনা। 'পরিচারিকা'তে শ্রীকালিদাস রায় মহাশয় বলিয়াছেন 'শ্রীমতী ভক্তিসুধার রচনাগুলিতে অপূর্ব্ব কোন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে এ কথা বলিয়া অত্যুক্তির প্রশ্রয় দিতে চাহি না—কারণ, বৈশিষ্ট্য পদার্থটি সুলভ না হলেও কবিতার অন্যান্য অঙ্গের দিক্ হইতে বিচার করিলে ইঁহার রচনাগুলিকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।' কালিদাস বাবুর সহিত আমরাও একমত। লেখিকার লিখিবার আগ্রহ আছে, আজকাল বেশী না লিখিলেও কয়েক বছর আগে অনেক কাগজেই ইনি লেখা পাঠাইতেন। আশাকরি প্রথম পুস্তক রজনী গন্ধা প্রকাশের পরে আবার লেখায় ইহার পূর্ব্বের উৎসাহের কতকটা দেখিতে পাইব।

ছাগ দুগ্ধ

প্রবন্ধ

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র

শিশুর খাদ্য হিসাবে গত দুই প্রবন্ধে আমরা মাতৃস্তন্য ও গাভিদুগ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সকলেই যে এই দুই জিনিষ শিশুর প্রধান খাদ্যরূপে চলিতেছে স্বীকার করিবেন সে সম্বন্ধে কোন মত-দ্বৈধ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে ছাগ দুগ্ধকে শিশুর খাদ্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেখাইতে চাই যে খাদ্য হিসাবে ইহার দাবী উপেক্ষণীয় নহে বরং অনেক কারণে গোদুগ্ধ অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্বীকার্য্য।

আমাদের দেশে ছাগদুগ্ধের উপকারিতা অতি প্রাচীন কালেই স্বীকৃত হইয়াছিল। আজও বৈদ্যগণ পেটরোগা (of weak digestion) লোকদিগের জন্য ছাগ দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহাতে অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে ছাগ-দুগ্ধের কোন ধারক (astringent) শক্তি আছে। এ কথা সত্য না হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে গাভি দুগ্ধ অপেক্ষা ছাগ দুগ্ধ হজম করা সহজ। ইহার সহজ প্রমাণ এই যে গাভিদুগ্ধ পান করিয়া শিশুরা প্রায়ই যে "দুধতোলে" তাহাতে প্রায়ই শক্ত ছানার দানা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ছাগ দুগ্ধ পান করিয়া শিশুরা যে দুধ তোলে তাহাতে মাতৃ-দুগ্ধ পানের পর ফেনার অনুরূপ পদার্থ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ছানার দানা—কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সব বিষয় আলোচনা করিয়া ডাঃ আর পিট ছাগদুগ্ধ সম্বন্ধে The Practitioner নামক বিখ্যাত ডাক্তারী পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন—Goat's milk is more digestible than Cow's milk * * In my experience I have known several weakly children who were unable to digest Cow's milk thrive when supplied with that taken from a goat and in the case of three premature babies (One only three and a half pound at birth) grow up to be healthy children. Sept. 1931. 339—400.) ইহার পর সহজেই অনুমেয় যে শিশুর খাদ্য হিসাবে তিনি ছাগ দুগ্ধকে উচ্চ স্থান প্রদানে সঙ্কুচিত হইতে পারেন না।

এক্ষণে কথা হইতেছে ছাগ দুগ্ধের পরিপোষক শক্তি (nutrition value) লইয়া। এই বিষয় লইয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডে আলোচনা চলিতেছে। ছাগ দুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও পরিপোষক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য The British Goat Society নামে এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং সরকার বাহাদুর ইহার কার্য্য তৎপরতা স্বীকার করিয়া লইয়া Minister of Agriculture and Fisheries এর মারফতে—অর্থ সাহায্য করিয়া এই সমিতিকে তাহার সাধু কার্য্যে প্রণোদিত ও ইহার গবেষণায় উৎসাহিত করিয়াছেন। এই সমিতি ছাগ দুগ্ধ সম্বন্ধে যে সকল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তন্মধ্যে একটি এই যে পরিপোষক শক্তিতে ছাগদুগ্ধ গাভিদুগ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে বরং সুস্থ ছাগীর দুগ্ধ পরিপোষক শক্তি গুণে গাভি দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। ছাগিগণকে বিশেষ ভাবে প্রতিপালন করিয়া তাহারা ২৪ ঘণ্টায় প্রত্যেক ছাগীর নিকট হইতে দেড় গ্যালন দুগ্ধ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ গাভী দুগ্ধ সরবরাহ আর্থিক সমস্যার দিনে একটা মহা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধের অভাবে সটী ও খুচিশুলা খাইয়া পেটের পীড়ায় ভুগিয়া নবাগত অতিথি বিশীর্ণ মুখে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া যখন প্রতিদিন আমাদের প্রাণ স্নেহের খরশরে বিদ্ধ করিতেছেন, তখন শি কপালে করাঘাত মাত্র করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া না থাকিয়া ছাগ দুগ্ধের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য নহে কি? ইহাতে অর্থ সমস্যারও অনেকটা সমাধান

হওয়া সম্ভব। কারণ এক মাত্র কলিকাতা সহরের কথা ছাড়িয়া দিলে গ্রামে এবং তথা কথিত অন্যান্য সহরে দুই একটি দুগ্ধবতী ছাগ পোষার জন্য যে স্থান ও সঙ্গতির প্রয়োজন সৌভাগ্যক্রমে এখনও মধ্যবিত্ত এমন কি চাষী বাঙ্গালীর পক্ষেও অপারগ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। একটি উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী বা দুইটী সাধারণ দুগ্ধবতী ছাগীর দুগ্ধ একটি শিশুর পক্ষে পর্য্যাপ্ত। একটি বা দুইটি ছাগীর পোষণ খরচা মাসিক আট আনার অধিক নয়। অতএব আশা করা যায় পাঠকগণের মধ্যে অন্ততঃ ২।১ জনও এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। তাহা হইলেই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।

ছাগ দুগ্ধের আরও একটি গুণ আছে। তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। সমস্ত পশু যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু ছাগের যক্ষারোগ হইতে আজও দেখা যায় নাই। য়ুরোপের চিকিৎসক মণ্ডলী এই সত্য লক্ষ্য করিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছেন। কোথা হইতে মানবের এই প্রধান শত্রুকে রোধ করিবার শক্তি ছাগ জাতি লাভ করিয়াছে, সে সমস্ত কোন কথাই জোর করিয়া নিঃসন্দেহে বলিতে না পারিলেও ছাগজাতির এই শক্তি (Immunity) সম্বন্ধে তাঁহাদের মত দ্বৈধ নাই;—তাঁহারা সকলেই ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করেন। ইহার দ্বারা ছাগ দুগ্ধের আরও মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে গাভী দুগ্ধের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প; সুতরাং গাভি দুগ্ধের দ্বারা যক্ষার জীবাণু শিশু শরীরে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা—দূর করিবার উপোযোগী উপায় আজও অনায়াস সুলভ নয়। কিন্তু ছাগ দুগ্ধে এ বালাই নাই। ছাগ দুগ্ধের অন্য সকল সুবিধা এই যে ছাগদুগ্ধ পানে শিশুর শরীরে যক্ষার জীবাণু প্রবেশ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যক্ষার প্রসার রোধ রূপ যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, শিশুর আহারের জন্য ছাগ দুগ্ধের ব্যবস্থার দ্বারা সেই সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব পর।

আর একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। আজ কাল য়ুরোপের চিকিৎসক মণ্ডলী ক্রমশঃ স্বীকার করিতেছেন যে যক্ষার আক্রমণ নিবারণ করিবার শক্তি ছাগদুগ্ধের আছে। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের একজন চিকিৎসক বলেন —as milk is derived from the blood of the animal Secreting it is oovious that the immunity possessed should be transmitted through the milk and that the immunity is due to some Special immunizing property which accounts for its beneficial effects when supplied to tuberculous children, who are taking milk not only free from the tubercle bacillus, but also possessing Special immunizing properties. অতএব রিকেট, স্ক্রফুলা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত শিশুদেরপক্ষে গাভিদুগ্ধ অপেক্ষা ছাগদুগ্ধ অধিকতর উপকারী।

"মা-মরা" শিশুকে লইয়া গৃহস্থকে বিব্রত হইতে হয়। চিকিৎসকগণ তাহাদের জন্য য়্যালেনবারি ফুডের ব্যবস্থা করেন। সেই সকল চিকিৎসকগণের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা দয়া করিয়া যেন ছাগদুগ্ধের কথা স্মরণ রাখেন। কারণ British medical journal এ প্রকাশিত প্রবন্ধের নজির দিয়া আমরা আজ তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিবার স্পর্দ্ধা রাখি যে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে মাতৃদুগ্ধের পরই ছাগদুগ্ধ শিশুর উপযোগী। অধিকন্তু Taylor, Weld, Branion, Kay প্রভৃতি পণ্ডিতগণ টোরোনটো (Toronto) বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ছাগের Hypersensitiveness মানবের Hypersensitivenessএর অনুরূপ। এই সত্য আবিষ্কারের পর ছাগীর রক্ত যাহা দুগ্ধের আকারে রূপান্তরিত দেহে দেখা দেয়, মানব শরীরের মধ্যে সর্ব্ব অবস্থায় স্থান পাইবার উপোযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ভু-প্রদক্ষিণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

কানামাছি খেলা

Tip it off ছাড়াও কোনও দিন রাত্রে smoking Roomএ কানামাছি খেলা হ'ত। একজনের চোখে একখানা রুমাল বেঁধে দেওয়া হ'ত। যে যে খেল্‌ত সকলেই ঘরের ভেতরে থাক্‌ত। অর্থাৎ খেলোয়াড়রা কেউ ঘর থেকে যেতে পারত না। যার চোখ বাঁধা সে ঘুরে ঘুরে কাউকে ধরবার চেষ্টা কর্ত্ত এবং যদি কখনও কাউকে ধরে ফেল্‌ত, তাহ'লে যে অংশটা ধরেছে শুধু সেই থানটা থেকে অনুভব ক'রে বল্‌তে হ'ত "কে"। যদি ঠিক বল্‌তে পারত তা হ'লে যাকে ধরা হয়েছে তার চোখে রুমালটা বেঁধে দেওয়া হ'ত। এই লুকোচুরী খেলাতেও মহিলারা যোগ দিতেন। আমাদের জাহাজে এখন তিনজন মহিলা যাত্রী। সেই গাল ফুলান Scandinavian কলম্বোতে একজন ইংরাজ মহিলা একটা ছেলে ও একটা মেয়ে সঙ্গে 2nd class এ উঠেছিলেন—এর খেলায় খুব ঝোঁক। আর ছিলেন প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার Gun এর পৌত্রী।

Tip it off বা কানা মাছি খেলাতে কি আমোদ হ'ত বল্‌তে পারি না তবে এই খেলা নিয়ে একটা বেশ ঝগড়া হয়েছিল—একদিন রাত্রে fist class এর মহিলাটী আসেন নি। তিনিই পাণ্ডা, পাণ্ডার অভাবে খেলা আরম্ভ হচ্ছে না। সেই Australian বালকটী সকলের সামনে বলে ফেলেছিল miss আজকে আর এলনা—তাতে একজন (বুড়োমতন লোকটা) বল্লেন "miss has infected the whole ship" তাতে অষ্ট্রেলিয়ান ছোঁড়াটা ব'ল্লে "miss is old enough to be my grandmother"

কলম্বো থেকে ৯ দিনের দিন (কলকাতা থেকে ১৫ দিন) আমরা আফ্রিকার cape guardafui এর অনতিদূরে Socotra দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। আগে থেকেই জানা গিয়েছিল যে ৪৮ ঘণ্টা ধ'রে সমুদ্র বড় rough থাক্‌বে। সুতরাং তার জন্যে তৈরী থাকা গিয়েছিল। অর্থাৎ মনকে খুব শক্ত করে রাখা গিয়েছিল যাতে আর Sea-Sick না হ'তে হয়। বাস্তবিক কলম্বো ছাড়বার পর আর তিন দিন ধ'রে Sea Sick হ'তে হয় নি। কারণ যখন বমি পেত নীচে গিয়ে Toiletএ বা নিজের cabinএ Sinkএ বমি ক'রে এসে তখনি যে ক'রে হোক Deck এর ওপর এসে চেয়ারে বসা যেত আর সমুদ্রের হাওয়ায় খানিক বাদে relief পাওয়া যেত। পরদিন রবিবার সকাল বেলা, Breakfast ক'রে Deck এর ওপর বেড়াচ্ছি, এমন সময় first class এর ডেকের ওপর থেকে একটা whistle বেজে উঠ্‌ল আর যত crew ও lascar সব uniform প'রে সব first class এর ডেকের ওপর হাজির। ইংরেজ crewরা যার যেমন পোষাক পরা ছিল সে সেই পোষাকে এবং দেশীয় lascarরা সাদা ঝুল ঝুলে পাঞ্জাবী প'রে একটা লাল কাপড় belt এর মতন ক'রে কোমরে জড়িয়েছিল। খানিক বাদে আর একটা order পেতেই সকলে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং এক একটা দল এক একটা life boat এর কাছে গিয়ে life-boat গুলোকে ধ'রে নাড়া নাড়ি আরম্ভ ক'রে দিলে। life-boat গুলোকে যেন এখনি নামাবে আর কি। প্রথমটা মনে হ'ল এই Socotraর কাছেই বুঝি সমুদ্রে গোর হ'ল। তাড়াতাড়ি Cabin এ গিয়ে trunk এর ভেতর থেকে Bank

এর draft খানা নিয়ে বেশ ক'রে Belt এর পকেটে রেখে দেওয়া হ'ল। কারণ যদি প্রাণে প্রাণে life-boat এ ক'রে কোনও ডাঙ্গায় ওঠা যায় তা হ'লে দিন কতকের জন্যেও প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখবে। তার পর Deck এর ওপরে এসে অন্য অন্য যাত্রীদের মনের ভাব দেখে ভুল ধারণা কেটে গেল—আমাদের জাহাজের কোনও বিপদ হয় নি। প্রত্যেক রবিবার দিন crew ও lascar দের drill করান হয়, সেই জন্যে আজও drill করান হ'চ্ছে। ৭ দিন অন্তর Drill করাবার উদ্দেশ্য এই যে যদি কোনও সময়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তা হ'লে life boat গুলি তাড়াতাড়ি ভাসাবার সময় কোনও গোলমাল হবে না। আজ বেলা ১০ টার পর Smoking Roomএ একটা মিটিং হ'ল। Frist class থেকে miss এসে ব'ললেন যে আজ রবিবার তা গোটা কতক prayer Song করা যাক। সকলেই যোগদান করল—এবং ঘণ্টা খানেক ধ'রে গান হয়ে মিটিং ভঙ্গ হ'ল। একটা গান এখনও আমার কানে বাজ্‌ছে—

Onward Christian Soldier, marching on to war
With the cross of jesus going on before
Christ the royal master leads against the foe
Forward unto him where his banners go.

এই দুদিন ধরে সমুদ্রের যে ব্যাপার দেখেছি জীবনে তা কখনও ভুলতে পারব না। সমুদ্র যে এমন ভীষণ দর্শন তা শোনা গিয়েছিল প্রত্যক্ষ করা হয় নি। Bay of Bengal পেরিয়ে আসা গেল, Indian ocean পেরিয়ে আসা গেল Arab Sea পেরিয়ে যাব যাব হ'ইছি আর একটা দিন বাদে Arab Seaও পেরিয়ে যাব তাই বুঝি সমুদ্রের দেবতা নিজের প্রত্যক্ষ রূপ দেখিয়ে দিলেন। আমি যে এ ন'দিনে Sea Sickness একেবারে ভুলেই গেছলুম তাই মনে প'ড়িয়ে দোবার জন্যে বুঝি এত চেষ্টা সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন, ঢেউয়ের তর্জ্জন—বড় বড় ঢেউগুলো এসে যখন জাহাজে লাগ্‌ত ও জাহাজ তোলপাড় করত আমার তখন মনে বড় ফুর্ত্তি হ'ত—তারপর জাহাজের propeller এর ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ আওয়াজ—এই কটা আওয়াজের সংমিশ্রণে বেশ একটা ভীষণ আওয়াজ শোনা যেত। আর এ দুদিন ধ'রে passengerরা যেন কেমন কেমন হ'য়ে গিয়েছিল। Deck এ কিম্বা এ ঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে যেন কত মদ খেয়েছে কত্তই মাতাল হ'য়ে পড়েছে—জাহাজ এমনি দুলছিল যে পা ঠিক রেখে চলাই দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

এই দুদিন আমাদের জাহাজের গতি সমুদ্রের অনুকূলে যে হারে চলত তার অর্দ্ধেক হারে চলত।

সন্ধ্যার পর cabinএ রয়েছি এমন সময় Boy এসে বল্লে "বাবু একখানা জাহাজ দেখা যাচ্ছে—Deck এর ওপরে যাও দেখগে কেমন সুন্দর"। আমি বল্লুম জাহাজ যাচ্ছে তা আবার দেখব কি? কিন্তু Boy জেদ করাতে Deck এর ওপর যাওয়া গেল—বাস্তবিক একটা দেখবার জিনিষ। ঠিক মনে হয় যেন কোনও প্রাসাদে বিবাহ ক্রিয়া হবে বলে আলো দিয়ে প্রাসাদটিকে সাজান হয়েছে। দূর থেকে সমুদ্রের ওপর কোনও জাহাজকে দেখ্‌লে মনে হয় যেন থেমে রয়েছে। আর cabin গুলোতে আলো জ্বালান ছিল ব'লে অন্ধকারের মধ্যে port hole গুলোকে গোল গোল জানলার মত দেখাচ্ছিল। আর সেই জাহাজের main mast এর ওপরের আলোটা মাঝে মাঝে নিব্‌চে ও জলছে। আমাদের জাহাজের main mast এর দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের ও জাহাজের main mast এর আলোটা নিব্‌চে ও জল্‌ছে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে আলো দ্বারা Signal করা হচ্ছে। একটা জাহাজ যখন আর একটা জাহাজকে দেখ্‌তে পায় বা একটা limited distance এর মধ্যে আসে তখন এই রকম International law আছে যে পরস্পর পরস্পরকে Signal করবে। দিনের বেলা নিশানের দ্বারা বা flag Signal করা হয়। জাহাজের পেছন দিকে যে flag post থাকে তাকে nation এর flag উড়িয়ে দেয় যদি ইংরাজের জাহাজ হয় তা হ'লে British flag উড়িয়ে দেয় যদি জার্ম্মাণ জাহাজ হয় তা হ'লে Germanyর নিশান ওড়ান হয়।

ক্রমশঃ

বাতায়নের মায়া

—চিত্র—

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

কুহেলীর স্বপন ঘোর ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে।

উষার ধূসর পাণ্ডুর শুভ্রতায় নীলের পরশ টুকু কি স্নিগ্ধ, কি কোমল ভাবে দেখে গেছে! মরি মরি! চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।

ও আকাশ, আমার বাতায়নের আকাশ!

অসীমকে সীমায় বেঁধে রাখতে যায় আপন ক্ষুদ্র বেষ্টণীর মধ্যে, পাগল সে!

ঐ আবার নীলের স্নিগ্ধতায় লালের ছোঁয়াচ লাগে, এবুঝি পূবের নীলিমা? ওদিক্‌কার পুষ্পহীন ঝাকড়া তেঁতুল গাছটার ঘন শাখা পল্লবে যেন গোলাপ ফুটেছে, একটী দুটী নয় থরে থরে।

অদূরে কুয়াসায় হারিয়ে যাওয়া উঁচু রেলপথ এবার বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে পথের ধারে ধারে ক্রমশঃ গড়িয়ে আসা হিম শীর্ণ পিঙ্গল শরবন, তার শ্রীহীন পাণ্ডুর পুষ্প গুচ্ছ গুলি আলোর চেতনা পেয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলবার চেষ্টা করছে।

তার নীচে, ভাগ করা ছোট ছোট ক্ষেতগুলির স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় হীরার কণার মত ঝিক্ মিক্ করছে ওকি!

ও কোন্ তন্দ্রাহারা বিবশা বিরহিণীর আকুল নয়ন জল নিশীথ রাতের স্তব্ধ আঁধারে কখন ঝরে পড়েছে অঝোরে! আহা! কেমন স্বচ্ছ শুভ্র অশ্রুকণাগুলি! কিন্তু ও থাকবেনা, এখনি শুকিয়ে যাবে নিঃশেষে নীরবে, কি গভীর গোপন ব্যথা বুকে নিয়ে তা কেউ জানবেনা।

ঐ সেই খয়ের রংয়ের নাম না-জানা পাখীটা তার ঝোপের ভেতরকার নিরালা নীড়টি ছেড়ে সামনের নিম গাছে গিয়ে বসল, ও রোজ ঐ খানটিতে এমনি করেই খানিক বসে থাকে চুপটী করে, তারপর কোন সময় উড়ে যায় কে জানে।

সে হয়তো গান জানেনা, কিম্বা গাইতে ভুলে গেছে।

পট পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে কি দ্রুত!

নয়ন স্নিগ্ধকর কোমল নীলিমায় সেই গোপনীয় আভাস টুকু আর নেই। নির্ম্মল গগন তল প্লাবিত করে গলানো সোনা ঝরে পড়ছে ধারায় ধারায়। সেই সোনার জলে ধুয়ে গাছ পালা ক্ষেত খামার কৃষকের পর্ণ কুটীর পর্য্যন্ত অভিনব আনন্দ শ্রীতে যেন ঝল্ মল্ করছে।

রেল লাইনের ওপারে সেই কালোর ছোপ ধরা কতদিনকার পুরানো কে জানে, জন শূন্য প্রকাণ্ড সাদা বাড়ীখানা সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রাজপুরীর মত কখন্ জেগে উঠল? তার মাথার উপর এক ঝাক্ চিল অকারণে পাক খাচ্ছে।

চাষা,—চাষীদের মেয়ে ছেলে সবাই মিলে কাজে লেগে গেছে। উৎসাহ দীপ্ত হাসি ভরা মুখ নিয়ে তারা মনের আনন্দে গান ধরেছে।

কোনখানে কোনো গ্লানি, কোন বেদনাই যেন নেই আর, শুধু আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনা আর জাগরণের বিপুল চাঞ্চল্য।

কেবল 'পাওয়ার-হাউসের' লম্বা কালো চিমনীটা নিঃশব্দে ধূম উদ্গীরণ করছে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া পরিপূর্ণ অনাবিল প্রসন্নতার মাঝখানে একটা রুক্ষ উদাস ভাবের সৃষ্টি করে।

রেলের ধারের সেই দীর্ঘোন্নত দেহ ধারী সিগ্‌ন্যালটা প্রকৃতির আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে ভ্রূক্ষেপ না করে নিরলস সতর্ক প্রহরীর মত যেমনকার তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, আশ্বাস ভরা বাহু দুখানা ওপর পানে তুলে সে ইসারায় কি বলছে?

এই যে, এই যে, আর দেরী নেই—দেরী নেই

ভরা দুপুর।

প্রভাতের সে মধুর কৈশোর ভাব লুপ্ত।

প্রকৃতির পরিপূর্ণ যৌবনের অধীর মত্ততা উদ্দাম আবেগ সমস্ত আকাশ বাতাসকে যেন বিহ্বল করে তুলেছে। তরুণ সূর্য্যকিরণের সে স্পর্শ সুখকর মিষ্টতা আর নেই। মাঘ-মধ্যাহ্নের চন্ চনে রোদে ক্ষেতের কচি কচি সবুজ শস্যগুলি কেমন অলস ভাবে এলিয়ে পড়েছে।

অদূরে স্বল্পাবগুণ্ঠনা এক কৃষক বধূ আল্‌সের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে আসছে তার হাতের সদ্য মাজা পিতলের ঘটিটী দীপ্ত রবি করে ঝক্ ঝক্ করছে, রাণীর মহার্ঘ স্বর্ণ ভৃঙ্গারের সব! ঐ ঘটির শীতল স্নিগ্ধ বারিতে তার আতপতপ্ত কর্ম্মক্লান্ত স্বামীর পিপাসা নিবারণ হবে, ক্লান্তি দূর হবে।—ওতো বারি নয় অমৃত!

গাছে গাছে, শাখায় পল্লবে মৃদু শিহরণ জাগিয়ে ওকে? কি কথা বলে যায় কানে কানে? বোঝা যায় না, কিন্তু বড় মধুর অলস করুণ তার সুরটুকু।

ঝরা পাতার মৃদু মর্ম্মর শব্দে ও কোন্ অদেখা অনাগতের চরণ ধ্বনি বাজে?

সিগ্ন্যালের একখানা বাহু শ্লথ হয়ে ঝুলে পড়ল, ক্লান্তিতে বুঝি?

বাতাসের ব্যাকুলতা ক্রমেই উদ্বেল হয়ে উঠছে যে!

আকাশ নির্ম্মল সুন্দর, ভাস্বর, কিন্তু কি অকরুণ!

চোখ দুটো যেন জ্বালা করছে।

ঐ! দুপুরের সেই প্যাসেঞ্জারখানা বেরিয়ে গেল, গুরু গম্ভীর গুম্ গুম্ শব্দে স্বপ্নালসা প্রকৃতিকে সচকিত করে আমার বাতায়নকে কাঁপিয়ে দিয়ে। প্রতিধ্বনি দিশেহারা হয়ে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি জানি কোন্ হারানোর সন্ধানে! ঘুরে ফিরে হায়! হায়! করে সে যেন বলছে—কই কই? কোথায় গো? কতদূরে?

বেলা পড়ে গেছে।

সেই ঘুমন্তপুরীর চূড়ায় চূড়ায় হাজার মাণিক জ্বেলে অস্তরবি বিদায় নিচ্ছে একখানা চক্‌চকে স্বর্ণ থালার মত।

গোধূলির প্রাণ খোলা অকুণ্ঠিত হাসিতে বিষণ্ণ শর-বনও যেন হাসছে। হাসি নেই শুধু ওই কালো চিম্‌নীটার, এতটুকু বিশ্রাম বুঝি নেই ওর? সারাদিন, সারারাত, অবিরাম, অনর্গল, বুকের তলের জমাট বাঁধা ব্যথার বাষ্প ভক্ ভক্ করে বার করছে রাশি রাশি।

সে বাষ্প পশ্চিম দিগন্তের দীপ্ত জাফরাণী রংয়ে একটা বক্র কাজল-কালো রেখা টেনে দিয়েছে, রূপসীর সুন্দর ললাটে কুটিল ভ্রূকুটীর মত।

কৃষকেরা হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে ব্যস্ত, এবার ঘরে ফিরতে হবে।

সামনের কুঁড়েখানায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটী মেয়ে, কি যেন ভাবছিল—সেই ছিন্ন-মলিন-বেশ রূপহীনা মেয়েটীকেও ছবির মত অপরূপ করে তুলেছে।

রেল লাইনের ধারে ধারে ক'জন পথিক চলেছে, কি জানি কোথায়; কোন্ অজানা পথের যাত্রী ওরা?

এ ধারের লাল আবীর ছড়ানো সবুজ ক্ষেতের পাশ দিয়ে, তেঁতুল গাছের তল দিয়ে বেঁকে গিয়ে যে সরু পায়ে-হাঁটা পথখানি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, সেই পথে ফিরছিল এক পসারিণী উজাড় করা হাল্কা পসরা মাথায় নিয়ে। তার চরণ শ্রান্ত, কিন্তু গতি লঘু, উৎসাহ চঞ্চল।

পসরা শূন্য, তবু মুখখানা আনন্দ দীপ্ত,—এই শূন্যতাই যে তার পরম সার্থকতা!

ঊর্দ্ধে সিগ্‌নালের ঠিক মাথার উপর একটা রঙীন ঘুড়ী ক্রমাগত ঘুরপাক্ খেয়ে মরছে—লক্ষ্যহারা জীবনের মত।

নীচে একপাল কাক পাশাপাশি বসে আছে, নির্ব্বাক গম্ভীর ভাবে। বাতাস মন্থর, দিনশেষের আলোর ধারা শ্রান্ত উদাস।

সন্ধ্যার কোলে দিনের চিতা জ্বলছে, তার বিচ্ছুরিত প্রোজ্জ্বল শিখায় রক্তচ্ছটা, ওদিককার আকাশ একেবারে লালে লাল।

এদিকে ক্রমশঃ ঘনায়মান ধূসর-নীলিমায় অমল শুভ্রতার চকিত আভাস জাগিয়ে বলাকার দল সারি বেঁধে নিঃশব্দে উড়ে গেল নীল সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া একগাছি শ্বেত-পদ্মের মালার মত।

কোথা থেকে একখানা তরল ধূসর আবরণ শরবনের পানে নেমে আসছে আস্তে আস্তে।

ঐ যাঃ চিতা নিভে গেল—সারা-দিবসের আশা

আনন্দ। সংশয় উদ্বেগের পরিসমাপ্তি করে দিয়ে, এখন শুধু ছাই আর ধোঁয়া।

চারিদিক ধূমে ধূমাচ্ছন্ন!

সেই নিভৃত পাষাণ প্রাসাদখানি এখন সমাধির মত গভীর গাঢ় স্তব্ধতায় ছম্ ছম্ করছে। শুধু নির্জ্জন ঝাপ্‌সা শিখরের এককোণে বসে একটা শকুনী ঘাড় বেঁকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে কি দেখছে? ধ্বংসের লীলা বুঝি? ওকি সত্যই ঘুমন্তপুরীর? ওর ওই বিশাল উঁচু পাষাণ বুকে একটুকু জীবনের স্পন্দন, প্রাণের অনুভূতি, বাস্তবিক নেই কি?

আহা গো! অমন সুন্দর ইন্দ্রভবন অসাড় মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে কোন্ যাদুকরের মায়ায়?

চিম্‌নীটা আরো ভীষণ স্তব্ধ! তার পায়ের কাছে এখন আলো জল জল্ করছে নিদাঘ নিশান্তের নির্ম্মল শুভ্র শুকতারার মত, একটি নয় অনেকগুলি, তবুও ওর অন্তরের গ্লানি, প্রাণের কালিমা এতটুকু ঘোচেনি তো!

মাল গাড়ীখানা আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেল, হয়তো একটু বিশ্রাম নিতে। উঃ! কি রকম হাঁপাচ্ছে! ফোঁস্ ফোঁস্ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে ক্রমাগত। কি জানি, ওর এ দুরূহ দীর্ঘ যাত্রাপথ শেষ হবে কোথায় গিয়ে!

সমস্তই অস্পষ্ট ঝাপসা।

সন্ধ্যার ম্লানিমা নিবিড় হয়ে এলো,—কী দ্রুত।

সবুজ ক্ষেতগুলো যেন জল ভরা পুকুর।

সামনের কুটীর খানায় কে বুঝি আগুন জ্বেলেছে। তার দীপ্তচ্ছটা দূর থেকে আলেয়ার আলোর মত দেখাচ্ছে।

ঐ! অচল ট্রেণখানা চললো এবার রাজ্যের দুশ্চিন্তার বোঝা বয়ে ভারাক্রান্ত মন্থর গতিতে। গাড়ীর পর গাড়ী ফুরোয় না যেন অসম্ভব দীর্ঘ! তেমনি বিশ্রী কালচে রং যেন একটা প্রকাণ্ড অজগর, এঞ্জিনের আলোটুকুই তার সর্ব্বস্ব, মাথার মণি।

ব্রেকভ্যানের পিছনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে উদ্ধমুখে নিস্পন্দ স্তব্ধ ভাবে, তারা যেন এ জগতের প্রাণী নয়, শুধু ছায়া।

আবার! আবার সেই প্রতিধ্বনির কান্না!

হায় ও কেন কাঁদে! অমন করে গুমরে গুমরে ব্যাকুল হয়ে ও কাকে ডাকে? ডেকে সাড়া পায় না, তবু ডাকে। এ কান্নার বুঝি শেষ নেই আর?

রেলপথ অন্ধকার একান্ত জনহীন।

ও পারের গাছ-পালার সারি নীল-কালোয় ছায়ায় মিশে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। দূরে, পাশাপাশি দুটো আলো দেখা যাচ্ছে, টক টকে লাল।

উদাসী আকাশের নিঃসঙ্গ বেদনায় সান্ত্বনা দিতে শুধু একটী, একটী মাত্র তারা কি স্নিগ্ধ মধুর হাসিটুকু তার!

কোথায় বাঁশী বাজে না? হাঁ বাঁশীই তো! কাছে না দূরে, অতি মৃদু করুণ, ব্যথা ব্যাকুল তার সুর, মনে হয় জীবনের সার্থকতার স্বপ্ন থেকে যেন এখনি জেগে উঠেছে।

হায়! ব্যথা ও এমন মধুর হয় নাকি!

কত রাত্রি—কি জানি!

সন্ধ্যার সে অপরিমেয় ব্যাকুলতা এখন স্থির, অকম্প, স্তব্ধ। বড় অন্ধকার, জমাট বাঁধা মিশ মিশে কালো অনমুমেয় অসীম রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

দৃষ্টি চলে না, শুধু দেখতে ইচ্ছা করে। অন্ধকার, অসুন্দর নয় সুন্দর। তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় শুধু চোখ দিয়ে নয় অন্তরের গূঢ়তম, নিবিড়তম নিথর বেদনার অনুভূতি দিয়ে।

সেই টকটকে লাল আলো দুটো আঁধারের কালিমার মধ্যে কি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! যেন দীর্ঘ জাগরণে আরক্ত দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত দুটী চোখ নির্নিমেষ হয়ে চেয়ে আছে। চেয়ে চেয়ে চোখের তারা ফেটে রক্ত পড়ছে, তবু চাওয়ার বিরাম নাই—উঃ! ঐ বাঁশী থেমে গেল। সুখের শেষ রেশটুকু কেঁপে কেঁপে বুঝি চলে গেল—আর কেন?—হায়!—আর কেন?—

ওঃ কি গাঢ় নিঝুম নিস্তব্ধতা! এই শব্দহীন নিষুতি রাতে আমার নিঃসঙ্গ স্তব্ধ বাতায়নে থেকে থেকে ঝরে পড়ে কি জানি কোন্ যুগ যুগান্তরের বিরহীর আশাহীন পুঞ্জিভূত শীতল দীর্ঘশ্বাস!

আহা! ওদিককার ঐ অতন্দ্র তারাদুটি মৌন গভীর মর্ম্মব্যথায় যেন ছল্ ছল্ টল্ টল্ করছে। সহনাতীত বেদনায় থেকে থেকে শিউরে উঠে ব্যাকুল হয়ে বিহ্বল হয়ে যেন বলছে—পারি না, আর যে পারি না গো!—পারি না!—আঃ!

বাতায়ন! হে মোর নিভৃতের সাথী। তোমার ব্যথায় বিধুর পুলকে মধুর, আশায় চঞ্চল, তোমার স্তব্ধ উজ্জ্বল আঁধারে মেশা বিচিত্র নব নব রূপের স্বপ্ন দিয়ে আমাকে ঘিরে রেখো—কুহকীর কুহক মায়ার মত। বিদায় বন্ধু!—

সাময়িক প্রসঙ্গ

অনাগত ভবিষ্যৎ

সম্মুখে নিশ্চয়ই খুব দুর্বৎসর পড়িয়া রহিয়াছে। জগতের তাবৎ অর্থবিৎ পণ্ডিতগণই বলিয়াছেন যে ১৯৩২ বা ৩৩ সাল মানব জাতির নিকট অতি ভীষণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত করিবে, উহার তাল সামলাইতে পারিলে বর্ত্তমান সভ্যতা আবার স্থায়ী হইতে পারে। এ অবস্থায় যদি শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের আর্থিক অবস্থা অনেকটা সুবিধাজনক হইয়াছে, উহার আয়-ব্যয় অনেকটা হিসাবের মধ্যে আসিয়াছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আমরা আরাম অনুভব করি। সম্প্রতি সরকার পক্ষ আমাদিগকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, ভয় নাই; নূতন করে আর স্থাপন করা হইবে না। ভারতের আর্থিক অবস্থা এতটা সন্তোষজনক হইয়াছে যে, ভারত সরকার উহার খানিকটা ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আমদানী-রপ্তানীর একটা হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে আমদানীর পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ১৯৩০ সালে ডিসেম্বর মাসে ৩'২৪ কোটী টাকার জিনিষ আমদানী করা হইয়াছিল, এ বৎসর উহার পরিমাণ মাত্র ২'৪১ কোটী টাকা। গত বৎসরের অনুপাতে এ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ৭ লক্ষ টাকা কাপড় চোপড়, ৯ লক্ষ টাকা মেসিনারী, ৫ লক্ষ টাকা চিনি, ১০ লক্ষ টাকা লোহার সামগ্রী কম আসিয়াছে। আমদানী কমিলেই আমদানী শুল্কের হ্রাস সংঘটিত হইয়া থাকে, সুতরাং উহাতে কি সরকার পক্ষের আয়ের লাঘব হইবে না?

স্থগিত লুসেন বৈঠক

লুসেনে সমর-ঋণের মীমাংসা সম্বন্ধে যে বৈঠক বসিবার কথা ছিল, আপাততঃ তাহা স্থগিত রহিল। আমেরিকা ঋণভারগ্রস্ত ইউরোপকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে তাঁহাদের অর্থের প্রয়োজন আছে, সমর-ঋণ নাকোচ করিতে আদপেই রাজী নয়। ফ্রান্স কাজেই আমেরিকার সহিত সুরে সুর মিশাইয়া বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে তাঁহারাই বা কি করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দিতে পারেন। এদিকে জগতের বিখ্যাত অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে জগতের তাবৎ স্বর্ণই যখন ফ্রান্স ও আমেরিকায় গিয়া শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িতেছে তখন পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের জন্য স্বর্ণকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন একটা অবলম্বন খাড়া করিতে হইবে। কথাটা অনেকটা ভাবিবার তাহাতে সন্দেহ কি? পণ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিন হ্রাস হইবার একমাত্র কারণই স্বর্ণ মুদ্রার সঙ্কীর্ণতা। এই ধাতু ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে থাকিলে নিশ্চয়ই এমন সময় আসিবে যখন জগতের তাবৎ জাতিই মুদ্রা জগৎ হইতে উহাকে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া হয় রূপা অথবা অন্য কোন একটী ধাতুকে মান করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া দিবে, তখন স্বর্ণ সামান্য পণ্য দ্রব্যে পরিণত হইয়া এখন যে মহা-সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত আছে তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে।

সোণার বাজার

মানব সংস্কারের দাস। স্বর্ণ তাহার বহু পুরাতন বন্ধু। এই স্বর্ণকে ত্যাগ করিতে যে তাবৎ সভ্য-সমাজ পারিবে তাহা বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই আমেরিকা ও ফ্রান্স অনেকটা নিশ্চিন্ত আছে। ইংলণ্ডকে বৎসরে তিনশত হইতে চারিশত মিলিয়ন পাউণ্ড সংগ্রহ করিবার জন্য গলদঘর্ম্ম হইতে হইতেছে। বিলাতী কাগজ ওয়ালারা বলিতেছে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানি হওয়ায় জগতের আর্থিক জগতে অনেকটা সুস্থতা আনিয়া দিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে গত সেপ্টেম্বর হইতে এই কয়েক মাসের মধ্যে ৪০ কোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। যাহারা মনে করিতেছেন যে এই রপ্তানী ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ লাভবান হইতেছে, তাহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে ভারত হইতে আরও খানিকটা স্বর্ণ চলিয়া গেলেই ভারতের মুদ্রার মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে অসম্ভব হ্রাস হইয়া যাইবে, তখন ভারতীয় পণ্য-বিদেশীয়দের নিকট খুব অল্প মূল্যেই বিকাইবে। সুতরাং স্বর্ণের এই নিষ্কাসনে ভারতের কি মঙ্গল সংঘটিত হইতেছে আমরা ত বুঝিতে পারিতেছি না। জগতে স্বর্ণের যেরূপ চাহিদা বাড়িয়া উঠিতেছে, আমাদের মনে হয় স্বর্ণের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ টাকা ভরি পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়াইতে পারে। অন্ন-বস্ত্রের ন্যায় স্বর্ণও ভারতীয় হিন্দুদের একটী আবশ্যকীয় দ্রব্য। অনেক পুণ্য কার্য্যেই স্বর্ণ অপরিত্যজ্য। কাজেই এখন ২৭।২৮ টাকা স্বর্ণের ভরি বিক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে হয়ত ৩৫।৪০ টাকা ভরি কিনিতে হইতে পারে। সুতরাং সুবিধাটা কোথায় ?

বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্কট

পৃথিবীর তাবৎ সভ্য জাতির চিন্তাশীল লেখকগণ সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, মানব সভ্যতা ক্রমশঃ এক ভীষণ সঙ্কটজনক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে, পরিত্রাণ পাওয়া ভীষণ সন্দেহজনক। প্রায় সকল দেশেই বেকার সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে উহাদের সংখ্যা হ্রাস করিবার কোন প্রতিকার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইল না। যন্ত্রপাতির উন্নতির সহিত শিল্প-জাত দ্রব্যের ক্রমশঃই প্রাচুর্য্য ঘটিতেছে। কিন্তু উহাদিগকে বিক্রয় করিবার কোন পন্থাই বাহির করিতে পারা যাইতেছেনা। সত্যকথা বলিতে কি, জগতের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। বাংলার পাট এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে যে, অচিরেই পাটের চাষ না কমাইয়া দিলে এই পণ্যের মূল্য অসম্ভবরূপে হ্রাস পাইয়া উহার চাষ উঠিয়াই যাইতে পারে। শুনা যায় যে ব্রেজিলে এত অধিক পরিমাণে কফি উৎপন্ন হইতেছে যে উহা রাস্তা মেরামতের মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। আমেরিকার অনেক প্রদেশেই গম গোলাজাত করিয়া রাখা হইয়াছে, হয়ত ভবিষ্যতে উহা নষ্ট করিয়া ফেলাও হইতে পারে। জাভায় ইক্ষু চাষ কমাইয়া আনা হইতেছে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে রবারের চাষ হইত, রবারের প্রাচুর্য্য ঘটায় উহা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অথচ এই সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্য সাধারণের ব্যবহারের জন্য জগতের বাজার-গুলিতে আনিয়া দিলে কৃষীর দুঃখ-ক্লেশের যে অনেকটা লাঘব করা হইত তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এইরূপ হইতেছে কেন ? ইহার একমাত্র উত্তর হইতেছে যে ব্যক্তি বিশেষের প্রচুর লাভ করিবার দারুণ উচ্চাশা। একজন ধনী যদি তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ অন্যরূপ হইত। বিশ বা পঁচিশ অধস্তন পুরুষের জন্য আপনার আদর্শ অনুযায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিরীকৃত করিতে যাইয়াই জগতের এই সঙ্কটজনক অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচ্যে কামান গর্জ্জন

প্রাচ্যে কামান গর্জ্জন উঠিয়াছে। বহু পুরাতন চীন জাপানকে যুদ্ধ প্রদান করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে। আমরা গত সংখ্যায় স্পষ্টই বলিয়াছিলাম যে চীন-জাপান কলহের কোন একটা মীমাংসা করা জাতি-সঙ্ঘের পক্ষে অনেকটাই অসম্ভব। কার্য্যতঃ এখন তাহাই দেখা যাইতেছে। যদিও জাতি-সঙ্ঘ প্রাণপণে এই

যুধ্যমান জাতি দুইটীকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু ফলতঃ এমন কোন মীমাংসাই করিতে পারিতেছেন না, যাহাতে এই জাতি দুইটী যুদ্ধ হইতে বিরত হয়। চীন-জাপানের এই আত্মকলহ যাঁহারা বর্ত্তমানে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছেন, তাঁহারা হয়ত বুঝিতে পারিতেছেন না যে এই অগ্নিকুণ্ড হইতেই হয়ত এমন অগ্ন্যুৎপাত হইতে পারে যাহাতে সমস্ত সভ্য জগৎ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে পারে।

আমেরিকা জাপানকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে ও নৌবল-সংক্রান্ত ব্যাপারে খর্ব্ব করিবার জন্য অনেকদিন হইতেই সুবিধা অন্বেষণ করিয়া আসিতেছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার এক বিরাট উপনিবেশ। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা তাহার নৌবল অসীম প্রতিপত্তি-শালী থাকুক ইহাই চাহিয়া থাকে। ক্ষুদ্র জাপান তাহার এই মহৎ উদ্দেশ্যের এক বড় অন্তরায়। চীনে বাণিজ্য বিস্তারে জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমেরিকার নিকট অসহ্য। ভারতের বাজারসমূহে জাপানী বস্ত্র-শিল্প শুধুই যে মানচেস্টার জখম করিয়াছে তাহা নয়, উহাতে আমেরিকারও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কাজেই আমেরিকা জাপানকে একটু হুমকী দিয়াছেন। ইংরাজ কিন্তু এই হুমকীতে যোগদান করিতে এখনও রাজী হয় নাই। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের ক্ষমতা হ্রাস হইলেই আমেরিকার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাতে তাহার যে বিশেষ অসুবিধা আছে একথা ইংরাজদের বেশ ভাল রকমই জানা আছে। কাজেই জাতিসঙ্ঘের পক্ষ হইতে যাহাতে চীন-জাপানের কলহ মিটিয়া যায় সেই জন্য ইংরাজ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

সময়ে সময়ে এ গুজবও আসিতেছে এবং অনেকে সন্দেহও করিতেছেন যে সোভিয়েট রাশিয়া চীনাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; সেইজন্যই চীনাগণ নব বলে বলীয়ান হইয়া আবার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে। নতুবা চীনা জাতি নতজানু হইয়া ইতিমধ্যেই জাপানের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া সন্ধি করিত। গত সংখ্যায় আমরা বলিয়াছি যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত চীনা সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ৬০ হাজার। সেনাপতি চিংকাইসেক শুধুই যে ৬০ হাজার সৈন্যের উপর নির্ভর করিতেছেন এমন মনে করিবার কারণও না থাকিতে পারে। সমগ্র চীন মহাদেশ দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তর চীন—উহার রাজধানী নানকীন এবং দক্ষিণ চীন উহার রাজধানী ক্যাণ্টন। ক্যাণ্টনে রাশিয়ার প্রতিপত্তি অনেক দিন হইল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সম্প্রতি তার আসিয়াছে এই ক্যাণ্টন সরকার নানকীনের সাহায্যার্থ কতকগুলি এরোপ্লেন পাঠাইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ কখনই সমবেত ভাবে একসঙ্গে দাঁড়ায় নাই, এই সুযোগে যদি উত্তর-দক্ষিণের সঙ্ঘ হইয়া যায়, তাহা হইলে চীন যে পরাক্রমশালী হইবে তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ?

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগণের নিকট এই চীন জাপান কলহ এক ভীষণ সমস্যার অবতারণা করিয়াছে। জাপান উহাদের জাতিসঙ্ঘের একজন সভ্য, জাপান ক্ষমতাশালী। জাপান সুদূর প্রাচ্যে Balance of power অনেকটা রাখিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই জাপান সমগ্র ইউরোপের নিকট জয়মাল্য পাইয়াছে। এখন জাপান নব-বলদীপ্ত চীনের নিকট পরাস্ত হইয়া গেলে জগতে এক নূতন সমস্যার উদয় হইবে। অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত জাপান ইউরোপের সখা থাকিয়া এতদিন ইউরোপের Imperialism কে সাহায্যই করিয়া আসিয়াছে। স্বাধীন চীন এখন প্রবল হইলে শুধুই উহাদের পণ্য ক্ষেত্র নষ্ট হইয়া যাইবে তাহাই নহে, চীন ও সোভিয়েট একত্র যোগে সৈন্য চালনা করিলে মধ্য যুগের চেঙ্গিস খান বা টৈমুরলঙ্গের মতন তাহারা ইউরোপের উপর লাফাইয়া পড়িয়া ইউরোপকে মহা ব্যতিব্যস্ত করিতে পারে। মধ্য এসিয়া চিরকালই জগতে ভীষণ অশান্তি সৃজন করিয়া আসিয়াছে, এখানে যে লোক সংখ্যা ও বীর্য্য নিহিত আছে তাহাকে সংযত করিবার মত ক্ষমতা সমস্ত বিশ্বের নাই। কথাটা খুবই ভাবিবার বিষয় এই জন্যই সমগ্র ইউরোপ ভীষণ চিন্তিত।

বাণিজ্যশুল্ক

বাণিজ্য শুল্ক লইয়া ইংলণ্ডে মন্ত্রি সভায় ভীষণ মতান্তর পরিলক্ষিত হইতেছে। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ও তাহার মতাবলম্বীগণ free trader হিসাবে রক্ষণশীলদের tariff প্রোগ্রাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে সমস্ত দ্রব্যের উপরই শুল্ক বসান যাইতে পারে কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইলে উল্টা বিপত্তি ঘটিবে। এই মতভেদ ভবিষ্যতে ভীষণাকার ধারণ করিলে হয়ত মন্ত্রী সভার অদল বদল ঘটিবে, তখনও কি ম্যাকডোনাল্ড সাহেব প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন?

লর্ড আরুইন

লর্ড আরুইন এতদিন পর মুখ খুলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে লর্ড উইলিংডন যাহা করিতেছেন তিনি বড় লাট থাকিলেও হয়ত তাহাই করিতেন। কথাটা খুবই সত্য যাঁহারা এখনও বলিতে চাহেন যে শাসন কর্ত্তার পরিবর্ত্তন হইলে শাসননীতির পরিবর্ত্তন হয় তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সমস্ত ইংরাজ দল গুলিরই একটি নীতি সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে আছে, বাহ্যতঃ উহার প্রবর্ত্তন না দেখা গেলেও ফল্গু নদীর ন্যায় উহার অন্তঃশীলা ভাব ভারতশাসন কার্য্যে সর্ব্বদাই দেখা গিয়া থাকে।

সার সামুয়েল হোর

সার সামুয়েল হোর একজন সাম্রাজ্যবাদী। লর্ড বারকেনহেডের ন্যায় তিনিও একজন স্বনাম ধন্য পুরুষ। সেনাপতি ডায়ারের যে দল ইংলণ্ডে আছে তাহারা অনবরতই বলিয়া থাকে যে ভারতকে তাহারা যেমন তরবারীর সাহায্যে জয় করিয়াছে সেইরূপ তরবারীর সাহায্যে উহাকে শাসন করিয়া চলিবে। সার সামুয়েল হোর বা লর্ড বারকেনহেড্ বাহ্যতঃ এই দলের মুখপাত্র হিসাবে আত্মমত প্রকাশ না করিলেও অনেকটা এই মতই যে হৃদয়ে পোষণ করেন তাহা সময়ে সময়ে তাঁহাদের বাক্যাবলী হইতেই প্রকাশ হয়। ভারতের মধ্যপন্থীগণ এই সমস্ত স্পষ্ট কথায় একটু ব্যথিত হইয়া বলেন তোমরা এমন কর্কশভাবে সত্য কথা বল কেন? সত্য কথাইত ভাল। তবে সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ চাণক্যনীতি এই হিসাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখে শোভনীয় হয় না ইহা সত্য।

ফ্রানচাইজ কমিটি

ফ্রানচাইজ কমিটীর ইংরাজ সভ্যবৃন্দ ও উঁহাদের সভাপতি ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিয়াছেন। যে সমস্ত ভারতীয় সভ্যকে উক্ত কমিটীতে কার্য্য করিতে হইবে তাঁহাদের নামের ইস্তাহারও সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক সভ্যদের নামের তালিকাও বাহির হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই তালিকা গুলি সর্ব্বাংশেই অপূর্ণ। যে সমস্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া এই কমিটীগুলি করা হইয়াছে তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেক বরেণ্য নেতা ছিলেন যাঁহাদিগকে বাদ দিয়া কমিটী অনেকটা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় ফ্রানচাইজ কমিটীতে শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে লওয়া উচিত ছিল। বাংলার কমিটীতেও যাঁহারা সাহায্য করিতে রাজী এমন দুই একজন মধ্যপন্থী লইলে মন্দ হইত না।

প্রধান মন্ত্রী ফ্রানচাইজ কমিটীর চেয়ারম্যান ও সভ্যগণকে যে অনুশাসন পত্র দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে তাঁহারা সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের কথা যতদূর সম্ভব না তুলিয়া কি প্রকারে ভোটার সংখ্যা নির্ণয় করা যাইতে পারে তাহারই উপর যেন নজর রাখেন। কংগ্রেস কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চাহেন না। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন তুলিয়া দিতে পারিলে অন্য যে সমস্ত বিশেষ নির্ব্বাচন আছে তাহা আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে। এই নির্দ্দেশটী লক্ষ্য করিলে স্বতঃই এই সন্দেহ হয় যে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এখনও কংগ্রেসের সহিত সাহচর্য্য করিতে হয়ত প্রস্তুত আছেন, তবে উহা সময় সাপেক্ষ।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বা বিশেষ নির্ব্বাচন লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর তাবৎ সভ্যদেশ হইতেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ক্রমশঃই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ভারতে উহার নূতন করিয়া পরিবর্ত্তন করিতে গেলে ভারতকে কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া দেওয়া হইবে মাত্র ইহা খুবই সত্য। কিন্তু যদি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন মানিয়াই লইতে হয় এবং উহা যদি এখানকার নির্ব্বাচন পদ্ধতির মূল মন্ত্র হয় তবে বাংলায় সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে যাঁহারা ভাবেন বাংলার বিশেষ ক্ষতি হইবে তাঁহারা নিশ্চয়ই বাংলার তাবৎ তথ্য অবগত নন।

গত লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট অনুযায়ী নির্ব্বাচন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করায়, যাঁহারা এক টাকা রোড সেস্ বা ২৲ টাকা চৌকীদারী ট্যাক্স দেন তাঁহারা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রবর্ত্তিত শাসন প্রণালীতে ভোটার রূপে গণ্য হন। এই ব্যবস্থায় হিন্দু ভোটার শতকরা ৬০ ও মুসলমান ভোটার ৪০ হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার একটু ব্যতিক্রম করিলে অর্থাৎ এক টাকা রোড সেস ও এক টাকা চৌকীদারী ট্যাক্স করিয়া দিলেই ভোটার সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যা ১১।৯ হইয়া দাঁড়াইবে। এই অনুপাত আরও বৃদ্ধি পাইবে যদি adult suffrage ধরা হয়, তখন খুব সম্ভব উহা ৬০।৪০ বা বর্ত্তমান ব্যবস্থার উল্টা হইয়া দাঁড়াইবে। জেলা বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডগুলির নির্ব্বাচন যাঁহারা কয়েক বৎসর যত্ন সহকারে দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিতে বাধ্য হইবেন যে এক বর্দ্ধমান বিভাগ ও কলিকাতা সহর ব্যতীত সর্ব্বত্র হইতেই মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। কাজেই এখানে জয়েণ্ট ইলেকটোরেট অপেক্ষা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রণালী থাকিলে শুধুই যে হিন্দু সভ্যের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইবে তাহা নয়, অনুন্নত জাতি সম্প্রদায়ের কেহ কেহ হয়ত বা নির্ব্বাচিতও হইতে পারেন। যাঁহারা নির্ব্বাচন প্রণালী কি হইবে লইয়া ভাবিতেছেন তাঁহারা এই বিষয়ে একটু বিবেচনা করিবেন কি?

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন বসিয়াছে। এবার অনেকগুলি সরকারী ও বে-সরকারী বিল এই অধিবেশনে পেশ করা হইবে। হুগলী বাঁশবেরিয়ার শ্রীমনীন্দ্র দেব মহাশয় অনেকগুলি বিল লইয়া আলোচনা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কোন বিলই এ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইল না। ডাক্তার নরেশচন্দ্র তাঁহার জুটবিল পুনর্ব্বার পেশ করিবেন। এবার ত সরকার পক্ষ যাহাতে পাটের চাষ অন্য বৎসরের ন্যায় না হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। পাটের চাষ কমান দরকার এ কথা যদি সত্য হয় তবে ডাক্তার নরেশচন্দ্রের বিলটী পাশ করিয়া দিতে সরকার পক্ষের আপত্তি কি থাকিতে পারে? স্বায়ত্ত শাসনের মন্ত্রী মহাশয় এবারকার অধিবেশনে মোটর ট্যাক্সের বিলটী উত্থাপন করিবেন। বাংলার মোটর সংঘ কি করিয়াছেন জানি না, তবে যতদূর মনে হয় বিলটী পাশ হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে কলিকাতা ও মফস্বলের বাস কোম্পানী গুলি খুবই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। বাংলার বাস সিণ্ডিকেট যদি ইউরোপীয় মোটর ও তেল কোম্পানীগুলির সহিত আলোচনা করিয়া এ বিলটী বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে হয়ত খানিকটা ফলোদয় হইত।

সেণ্ট্রাল রোড কমিটি

সেদিন রোটারি ক্লাবের একটী বক্তৃতার প্রকাশ যে সেণ্ট্রাল রোড কমিটী বাৎসরিক যে ৪ কোটী টাকা আদায় করিয়া থাকেন তাহা হইতে মাত্র এক কোটী টাকা সারা ভারতবর্ষের রাস্তাগুলির উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হইয়া থাকে। যে টাকা রাস্তার জন্য সংগৃহীত হয় তাহা রাস্তার উন্নতির জন্যই ব্যয় করা উচিত নয় কি? তাহার জন্য আবার নূতন করিয়া কর ধার্য্য করিবার কি আছে?

স্বায়ত্ত্ব শাসন মন্ত্রীর অভিলাষ

সেদিন রোটারী ক্লাবের একটি সভায় বাংলার স্বায়ত্ত বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় বাংলার লোকালবোর্ড প্রভৃতির

ইতিহাস ও উন্নতি ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন বাংলা সরকার স্থানীয় লোকালবোর্ড হইতে চৌকিদারী ট্যাক্স মারফৎ যে ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকেন উহা অনেকটা অপব্যয়ই হয়। বাংলার চৌকিদারগণ দুইজন মনিবের অধীন হওয়ায় তাহারা কার্য্যতঃ কোন কার্য্যই করিতে পারে না। তবে এই বহু পুরাতন প্রথা একেবারে উঠাইয়া না দিয়া চৌকিদারদের সংখ্যা অর্দ্ধেক করিয়া দিলে খরচ অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে। ঐ বেশী ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া একটী ২।৩ কোটী টাকার ঋণ উন্মুক্ত করিয়া পল্লীসংস্কারের জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করিলে বাংলার পল্লীগুলির স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি করিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বজবজ হইতে হুগলী পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে যে সমস্ত রাইপেরিয়ান মিউনিসিপালিটীগুলি আছে উহাদিগকে তড়িৎ সরবরাহ করিবার জন্য সরকার হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে শুধুই যে ছোট ছোট কলকারখানা গজাইতে পারে তাহাই নয়, উহা হইতে ঐ মিউনিসিপালিটী গুলির কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। মন্তব্যগুলি প্রাণহীন নয়, ইহাতে যথেষ্ট ভাবিবার বিষয় আছে। আমরা মন্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

নারী প্রগতি

নারী প্রগতির চরম পরিণতির একটী সংবাদ সম্প্রতি আমাদের দেশে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইংলণ্ডে একটী দম্পতি পরস্পর মনোমালিন্য হওয়ায় কোর্ট হইতে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার আবেদন করে। পুরুষ পক্ষ হইতে বলা হয় যে তাঁহার জীবনসঙ্গিনীর চরিত্রে অনেক নৈতিক দোষ প্রবেশ করিয়াছে। রমণী পক্ষ হইতে বলা হয় যে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। জজ সাহেব তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে কোন স্বামীই তাহার স্ত্রীর দেহের অধিকারী নহে, স্ত্রীগণ তাহাদের দেহ লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। স্বামী ইহার জন্য স্ত্রীকে শাসন করিলে সে তাহার অধিকারের বাহিরে পদার্পন করে মাত্র। বাংলায় যাহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া এই তত্ত্বই প্রচার করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা এই সংবাদে নিশ্চয়ই কতকটা আশ্বস্ত হইবেন।

দোষণীয় কি?

আমেরিকার একটী নগরে একটী ব্যায়ামাগার আছে। সেখানে নরনারী উলঙ্গ অবস্থায় ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া থাকে। দুর্নীতির ওজুহাতে তথাকার পুলিশ উক্ত ক্লাবের নর-নারী সমস্ত সভ্যবৃন্দকে আদালতে দোষী হিসাবে অভিযুক্ত করে। জজ সাহেব বলিয়াছেন যে ব্যায়াম চর্চ্চা হিসাবে নিতান্ত গোপন স্থানে নর নারীর এইরূপ উলঙ্গ অবস্থা দোষণীয় হইতে পারে না। সুতরাং পুলিশের আবেদন নিষ্ফল হইয়াছে।

মুসোলিনির অভিমত

বিশ্ব বিখ্যাত মুসোলিনী সম্প্রতি নাকি বলিয়াছেন যে জগতের সভ্য নর নারী কৃত্রিম উপায়ে জীবন যাপন করিতে যাইয়া ক্রমশঃই প্রকৃতির নিকট হইতে সরিয়া পড়িতেছে। কথাটা খুবই সত্য। তিনি এই শিক্ষাটি মহাত্মার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ষ্টেটশম্যান একটু বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে উহাতে ইটালীর আলুর বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে কেননা তিনি বলিয়াছেন যে আলুর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষণ করিলে শরীর সবল হয়। যাহা হউক উহাতে উপহাসের কিছুই নাই। ভগবানের অভিপ্রেত নয় যে আমরা প্রকৃতির কোল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করি। এই জন্যই নানাপ্রকার ভীষণ ব্যাধি আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। পশ্চিমের সূর্য্য করে স্নান করিবার ফ্যাসন ও সমুদ্রোপকূলে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবার যে উদ্যোগ চলিতেছে উহা নিশ্চয়ই স্বভাবের সহিত একত্র বাস করিবার একান্ত প্রেরণা।

নারী পুলিশ

মহাসমরের অবসান হইবার পর ইউরোপের অনেক রাজ্যই যুদ্ধের সময় যে সমস্ত রমণী পুলিশের কার্য্য, করিতেন তাহাদিগের জন কয়েককে বহাল রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে দিল্লীতে কয়েকটী রমণী পুলিশ নিয়োগ করা হইয়াছে। সহযোগী ষ্টেটশম্যান বলেন যে রাজনৈতিক অপরাধ যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এইরূপ পুলিশ নিয়োগ করিলে অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি পুলিশকে যে মাহিনা দেওয়া হয়, উহাতে যে শ্রেণীর রমণীগণ আসিলে উপকার পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায় তাহারা আসিবে কি? যদি না আসে তাহা হইলে উপকার অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইতে পারে। সহযোগী যাহাই বলুন না কেন ইউরোপ যাহা বাধ্য হইয়া করিয়াছেন এদেশে তাহা ব্যাপকভাবে চালাইতে গেলে কখনই সুফল পাওয়া যাইবে না। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশের রমণীগণ শিক্ষায় এখনও অনেক পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে সুতরাং এই অভিনব ব্যবস্থায় একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইতে পারে মাত্র।

স্যর মহম্মদের মৃত্যু

স্যর মহম্মদ সফির মৃত্যুতে ভারতীয় মুসলমান সমাজ একজন যোগ্যতম নেতা হারাইয়াছেন। স্যর সফি ধনীগৃহে জন্ম গ্রহণ না করিলেও নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়

বসে লাহোর হাইকোর্টের প্রধান ব্যবহার জীবি হয়েন। তাহার পর ভারত সরকারের উচ্চতম শাসন-পরিষদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌর বিশ্ব বিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ ও মাহিশূরের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য ভারতের সমস্ত জন সাধারণ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

রুমানিয়ার প্রেম-ব্যাপার

রুমানিয়ার প্রেম ব্যাপার ক্রমশঃই উপন্যাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান নৃপতি কারোল কোন এক যুবতার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া উদাসী হইয়াছিলেন। দারিদ্র্যের দারুণ পীড়নে তাঁহার প্রেম-তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, তিনি তাঁহার স্বেচ্ছা গৃহীতা প্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া আবার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এবার তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রাজকুমার নিকোলস্ এই নাটকীয় অভিনয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কুমার নিকোলস একজন বিবাহিত পুরুষ। তাঁহার স্ত্রী জীবিতা আছেন। তাহা হইলে কি হয়? তিনি একটী পরকীয়ার সহিত প্রেমে হাবুডবু খাইতেছেন। ভ্রাতা ক্যারোল তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত কে করে? দেখা যাক কুমার সাহেব অগ্রজের ন্যায় বনবাস গ্রহণ করেন কি না?

টমাস বাটা

বাটা কোম্পানী জুতার ব্যবসায়ী। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই কলিকাতা সহরে উহাদের কয়েকটী জুতার দোকান খোলা হইয়াছে। এই কারবারের মালিক বাটা গত মাসে স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। গত মহাসমরের পর যে সমস্ত লোক কোটীপতি হইয়াছেন মিঃ বাটা তাঁহাদেরই একজন। তাঁহার সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ নাকি ১০ কোটী টাকা। অষ্ট্রীয়া-হংগেরী রাজ্য ভাঙ্গিয়া গত যুদ্ধের পর জেকোশ্লাভেকিয়া বলিয়া যে রাজ্য গঠন করা হইয়াছে, মিঃ বাটা তাহারই একজন প্রজা। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি সামান্য চর্ম্মকার হিসাবে জীবন গঠন সুরু করিয়া সামান্য একজন জুতার ব্যবসায়ী হয়েন। তাহার পর এই কয়েক বৎসরের মধ্যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভা বলে এই বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার জুতার কারখানা একটী প্রকাণ্ড সহর। সেখানে তাঁহার কারিগরগণ বাস করে। কারিগরগণকে খাদ্য যোগাইবার জন্য হোটেল, রেষ্টুরা প্রভৃতি সমস্তই এই বাটা কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই বাটা কোম্পানীর ব্যাঙ্কে তাহারা তাহাদের সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখে। উক্ত সহরের রাস্তা ইত্যাদি সমস্তই বাটা কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে কোন লোক বিপুল বিত্তের অধিকারী হইতে পারে তাহার একমাত্র উদাহরণ মিঃ বাটা।

উন্নত বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের উন্নতি যেরূপ দ্রুত হইয়া চলিল তাহাতে এখনও যে সমস্ত ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহা ভবিষ্যতে যে সম্ভব হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাও থাকিতে পারে। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে টেলিভিজন্ ক্রমশঃই নাকি টেলিফোনের ন্যায় সম্ভব হইয়া আসিবে। টেলিফোনের জন্য উহার হাতলটী উঠাইলেই, নম্বরের সহিত যাহাকে চাওয়া যাইতেছে তাহার মূর্ত্তিটীও নাকি ভাসিয়া আসিবে। কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই জন্যই বলিতেছেন যে এই Telivision এর যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ভাবে দোষশূন্য করিয়া সৃজন করিতে পারিলে সমুদ্রগর্ভে কি আছে তাহা নির্ণয় করা আর কঠিন হইবে না।

রাজস্বের চাপ

রাজস্বের চাপ ভীষণ হওয়ায় বিলাতের দুইটী অভিজাত নাকি তাঁহাদের সম্পত্তির কতকটা অংশ বিক্রয় করিয়া দিবেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। বাংলার ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড লিটন তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত সামান্য গৃহে গিয়া উঠিয়াছেন। ভারতসচিবের সহকারী ও Franchise Committeeর সভাপতি লর্ড লোথিয়ানও নাকি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির খানিকটা বিক্রয় করিবেন।

প্রাণনাশ চেষ্টা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বীণা দাস নাম্নী একটি ডিপ্লোমাপ্রার্থী মহিলা বাংলার লাট স্যর ষ্টানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করিয়া ৪ বার গুলি ছোড়ে—সৌভাগ্যের কথা লাটের গায় একটিও লাগে নাই। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সামান্য আহত হইয়াছিলেন। এই ভীষণ সংবাদে আমরা একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভারত নারী, বাংলার নারী, মহত্ত্বা, পর্য্যন্ত যাঁহাদের উজ্জ্বল কাহিনী দেশে বিদেশে শুনাইয়াছেন একি তাঁহাদেরই কাহারও কার্য্য? এ ভাবে দেশের স্বাধীনতা আসিবে—না কি কাজ হইবে? দেশের এই সঙ্কট কালে—দেশের গৌরব, তাহার নর ও নারীর গৌরব যাহাতে অব্যাহত থাকে সেই পথেই সকলের চলা কর্ত্তব্য।

রূপের পূজারি

—গল্প—

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী এম, এ, ডি, লিট্,

ভাস্কর দীপকের নাম মহাস্থানগড়ের লোকের মুখে মুখে ফিরে।

এই তরুণ বয়সেই সে যে নৈপুণ্য লাভ করেছে, অনেক শিল্পী আজীবন সাধনায়ও তার সন্ধান পায় না।

পাটলিপুত্রের শিক্ষা হয়ে উঠেছে তার একান্ত সার্থক। তার হাতের স্পর্শ পেয়ে জড় পাথরের মধ্যে যে অপূর্ব্ব রূপ ও সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে তা যেন সত্যই প্রাণবন্ত।

শিল্পী-সরস্বতীর স্নেহের দুলাল সে,—কলা-লক্ষ্মীও তাই আপনা হতেই তার কাছটীতে ধরা দিয়েছেন।

রাজধানীর কোলাহল থেকে একটুখানি দূরে করতোয়ার তীরে তার শিল্প-ভবন,—দূর থেকে দেখায় ঠিক্ একখানি পটে আঁকা ছবির মত।

কুচ্‌কুচে কাল পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাটটীতে প্রায়ই দেখা যায়, দু'একখানা ময়ূরপঙ্খী, হাঁসপঙ্খী বাঁধা রয়েছে। সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা আসেন শিল্পীর কলা-ভবন দেখতে। দীপকের হাতে রচা মর্ম্মর মূর্ত্তি না হ'লে তাঁদের দেবায়তনের শোভা বাড়ে না, বিলাস-ভবনের সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে না!

তরুণ শিল্পী কে দেখলে মনে হয় সে নিজেও যেন কোন নিপুণতর শিল্পীর আপন হাতে গড়া একটী প্রশান্ত দেবমূর্ত্তি!

কথা কয় সে খুবই কম। যে রূপের রেখা আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায়, যে সজীবতা গাছের কচিপাতার মধ্যে ফুটে উঠে,—মাটী ও পাথরের মাঝে তাকে ধরে রাখার সাধনায়ই সে বিভোর!

তার কলা-ভবনে মাঝে মাঝে নূপুরের শিঞ্জন উঠে, নগরের তরুণ তরুণীরা সেখানে ভিড় জমায়—শিল্পীর হাতে তারা নিজেদের রূপের ছাপ পাথরের বুকে তুলে রাখতে চায়!

শিল্পীর সামনে এসে বসলেই তরুণীর চঞ্চলতা মায়া-মন্ত্রে থেমে যায়, কিশোর ভাস্করের টানা টানা চোখ দুটীর দিকে চেয়ে তাদের চোখের দৃষ্টি নত হয়ে আসে!

কী গভীর রহস্য ভরা সে দৃষ্টি! মুখের উপর তার তৃপ্তির আলো হেসে খেলে বেড়ায়!

যে রূপের হিল্লোলে ধরার প্রাণে বসন্ত জাগে, মাদকতার মোহে মানুষের মনে অকারণে পুলকের সঞ্চার হয়, শিল্পীর খেয়াল সে দিকে নেই। সে চলেছে নিজের মনে পাথর কেটে! দুদিন বাদে পাথর তার কঠিনতা ছাড়ে, সেখানে ফুটে উঠে এক মায়ালোকের কমনীয়তা!

লোকে ধন্য ধন্য করে। শিল্পীর মুখে ফুটে উঠে একটুখানি হাসি! ভারি মিষ্টি!

* * * *

রাজপ্রাসাদে শিল্পীর ডাক পড়ে। কুমারী মণিকার অনবদ্য সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলতে হবে মর্ম্মরের মাঝে।

শিল্পীর আনন্দ আজ আর ধরে না। মনে হ'ল সার্থক তার সাধনা! এতদিন ধরে এই কামনাইত সে করছিল।

পাটলিপুত্রের কলা-ভবনে সে ছিল যখন ছাত্র, তখনই শুনেছিল কুমারী মণিকার কথা। তার শিক্ষক জীবরাজ বলেছিলেন, শিল্পীর অপূর্ব্ব কামনা এসে রূপ গ্রহণ করেছে মহাস্থানগড়ের রাজকুমারীর মাঝে। যে পাথরের বুকে সেই সুষমাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে, সেই হবে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

তার জীবনে এসেছে আজ সেই মহাপরীক্ষার দিন। আশা ও আশঙ্কায় তার বুক দুলে দুলে উঠে!

* * * *

রাজ বাড়ীর উপবন।

তারই মাঝে ছায়াশীতল লতাকুঞ্জ। ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়, বাতাসের দোলা লেগে ঝর ঝর

করে বকুল ঝরে পড়ে কচি দুর্ব্বা দিয়ে রচা পুষ্পপাত্রের উপর।

পাষাণ-বেদিকার উপর বসে রাজকুমারী মণিকা—মূর্ত্তিমতী বনলক্ষ্মীরই মত! দুটী পেলব বাহুলতা দিয়ে একটী রাজহংসীকে বুকে চেপে ধরে আদর করছেন।

তরুণ শিল্পী 'ছেনি' হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে—মর্ম্মর খণ্ডটী তারই পাশে!

গুরু জীবরাজের যত্নে দেওয়া শিক্ষার কঠোর পরীক্ষার দিন আজ!

রাজকুমারীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ কুমারীর দৃষ্টিও ক্ষণেকের জন্য তার মুখের উপর এসে পড়ে! শিল্পীর দেহের মধ্যে তড়িৎ চমকিয়ে যায়। এ কী চাউনি! চোখের দৃষ্টির মাঝে একী স্বপ্ন লোকের যাদু!

শিল্পীর হাত অবশ হয়ে আসে। হাতুড়ি ও ছেনি খসে পড়ে কঠিন প্রস্তরের উপর। লজ্জায় সমস্ত মুখখানি তার রাঙ্গা হয়ে উঠে।

রাজকুমারীও তার আসন থেকে উঠে পড়েন। রাজহংসীটিকে উড়িয়ে দেন উপবনের সরোবরের দিকে।

চঞ্চলা হরিণীর মত লীলায়িত ভঙ্গীতে রাজকুমারী লতাকুঞ্জের বাহিরে আসেন।

সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন হয়, "কি হ'লো ভাস্কর।"

পিছন ফিরে শিল্পী দেখতে পায়, মহাস্থান গড়ের মহারাজ শ্যামলবর্ম্ম দেব। সঙ্গে মহামাত্যের পুত্র অভিজিৎ।

আভূমিনত হয়ে অভিবাদন করে শিল্পী উত্তর দ্যায় "ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন মহারাজ। সহসা অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমার হাত থেকে গিয়ে ছেনিটী ভেঙ্গে গ্যাছে, রাজকুমারী যদি দয়া করে কাল্ ঠিক এই সময়টীতে একবার বসেন আমি আমার কাজ আরম্ভ করবো।"

রাজা বলেন "তাই হবে।"

পরদিন।

আবার সেই মহা পরীক্ষা!

দীপক আজ তার তার অবাধ্য মনকে কঠোর শাসন করে। ছিঃ ছিঃ একী দুর্ব্বলতা তার! কে জানে তার চোখে মুখে হয়ত লালসার হীন ছায়া দেখতে পেয়েই রাজকুমারী অমন বিরক্তি ভরে চলে গেলেন।

যথা সময়ে রাজকুমারী উপবনে আসেন। সঙ্গে মহারাজ ও মহামাত্য পুত্র। শিল্পী দেখে রাজকুমারীর চোখে মুখে যেন এক অপূর্ব্ব শান্তভাব মাখানো! বেশভূষারও তাঁর অসাধারণ পারিপাট্য। আবার শিল্পীর বুক তার অজ্ঞাত সারেই কেঁপে উঠে।

যথাস্থানে শিল্পী গিয়ে দাঁড়ায়। কতক্ষণ যায়। সাড়া নেই।

শিল্পীর হাত উঠেনা। তাকেও যেন কেউ পাথর করে রেখে গ্যাছে। আত্ম সমাহিত সাধকের মত সে রাজকুমারীর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে।

অধীর হয়ে মহামাত্য পুত্র বলে উঠেন, "কি হ'লো শিল্পী, আজও আবার চুপচাপ কেন?"

শিল্পীর চেতনা ফিরে আসে। তবু শুধু মূঢ়ের মত সে একবার কুমারীর মুখের দিকে আর একবার মহামাত্য পুত্রের ক্রোধরক্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কোন অজানার সন্ধানে তার মন যেন ব্যস্ত।

গম্ভীরকণ্ঠে রাজা বলেন, "ভাস্কর আজও তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ নও। আজও তোমার ছুটি। দেখো কাল যেন আর এমন না হয়।"

* * * *

ধীরে ধীরে দিনের আলো নিভে আসে।

কলাভবনের একান্তে স্থিত একটী নিভৃত কুটীরে বসে ভাস্কর কত কী ভাবে।

নিজেকে সে ধিক্কার দ্যায়। অভিমানে চোখ ছেপে অশ্রুধারা পরিপুষ্ট গণ্ড দুটিকে ভিজিয়ে তুলে।

দীপ বর্ত্তিকাটিকে উজ্জ্বলতর করে দিয়ে ছেনি ও হাতুড়ী নিয়ে সে বসে—সে চায় নিভৃতেই রাজকুমারীর মূর্ত্তিখানি গড়ে তুলতে।

দুটী কালো চোখ মনের কোণে এসে উঁকি দেয়, আর সব এলো মেলো হয়ে যায়।

চমকে উঠে ভাস্কর দেখে, পাথরের গায়ে একটী আঁচড়ও সে কাটতে পারেনি।

দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছ দুই হাতে চেপে ধরে সে সেই মাটির উপরই শুয়ে পড়ে। অজ্ঞাত সারেই নিদ্রা আসে রজনীর শেষ যামে।

° ° °

মহাস্থান গড়ের রাজ দরবার।

বন্দীরা স্তুতি পাঠ করে।

বেত্রবতীকে পুরোভাগে রেখে মহারাজ শ্যামল বর্ম্মদেব সভাধিষ্ঠিত হন। চারিদিকে জয় ধ্বনি উঠে।

ভাস্কর দীপক এসে রাজ সভায় দাঁড়ায়। চোখে তার সদ্য জাগরণের ক্লান্তি মাখানো, মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া।

অভিভূতের মত সে বলে উঠে;

"মহারাজ! আমায় ক্ষমা করবেন। রাজকুমারীর মর্ম্মর মূর্ত্তি গড়বার ভার আর কারও উপর দিন।

রাজার ললাট কুঞ্চিত হয়। ভাস্করের স্পর্দ্ধা দেখে সভার লোক শিউরে উঠে। এ কী প্রগল্‌ভতা।

রাজাদেশ লঙ্ঘন? তরুণ শিল্পী কি তার জীবনের উপর কোনই মায়া রাখে না?

প্রশ্ন হয়, "কেন, শুনতে পারি?"

উন্মাদের মত চীৎকার করে ভাস্কর জানায়, "আমি পারবো না, আমি পারবো না। রাজকুমারীর রূপ আমায় মুগ্ধ করেছে, আমায় শক্তিহীন করেছে—আমায় উন্মাদ করে তুলেছে!"

উন্মাদই বটে। এমন অসম্ভব কথা উন্মাদ ছাড়া আর কার মুখে সাজে? সভার লোক তরুণ শিল্পীর শোচনীয় পরিণাম ভেবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

রাজার আদেশ হয়, এই দণ্ডেই একে বাতুলাগারে পাঠিয়ে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গেই রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে পড়েন। রাজসভা সে দিনকার মত ভেঙ্গে যায়।

এবার দেখা যায় শিল্পীর দৃষ্টির মধ্যে সত্য সত্যই বা উন্মাদের লক্ষণ!

* * * *

দীর্ঘ বিশটী বছর কাল সাগরে বিলীন হয়ে যায়। জগৎ সংসারে অনেক কিছুরই পরিবর্ত্তন ঘটে।

মহাস্থান গড়ের রাজা আজ আগেকার সেই মহামাত্য পুত্র অভিজিৎ, রাণী রাজকুমারী মণিকা।

বৈশাখী পূর্ণিমা।

ভগবান তথাগতের পুণ্য জন্মতিথি। পরম সৌগত মহারাজ অভিজিৎ বর্ম্মদেবের আদেশে আজ সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব সমারোহ।

জরা মৃত্যুর অতীত মানবকে মুক্তির পথ দেখাতে ধরায় যাঁর আবির্ভাব, তাঁর পবিত্র জন্মাহে বন্দীশালার দ্বারও আজ উন্মুক্ত! নগরের নরনারী এসে বন্দীদের কত খাদ্য দ্রব্য দেয় কত বন্দী মুক্তিও পায়। বাহিরের উৎসব স্রোত কারাকক্ষেও প্রবেশ করে!

মহারাণী মণিকার হাত ধরে মহারাজ অভিজিৎ বর্ম্মদেব বন্দীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে বেড়ান। কারাধ্যক্ষ ও দেহরক্ষী সঙ্গে সঙ্গেই চলে।

বাতুলাগারে বাতুলদের নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গী দেখে অতি গম্ভীর রাজারও ঠোঁটে অল্প হাসির রেখা ফুটে উঠে, মহারাণী মণিকার চোখ দুটী উঠে কিন্তু ছল ছল করে। মানুষের এ কী অবস্থা! এর চেয়ে মরণও যে অনেক ভাল।

একটী নিস্তব্ধ কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে রাজা জিজ্ঞাসা করেন, "ওখানে কেউ নেই না কি।"

সসম্ভ্রমে কারাধ্যক্ষ জানায়, "মহারাজ! ওখানে একটী অনেক দিনের বাতুল আছে। সে বুঝি আগে ভাস্করের কাজ করত। একখানা পাথর নিয়ে অনেক দিন ধরে দিনরাত বসে কী একটা তৈরী করতো। এখন সব সময়েই সেটীর কাছে বসে থাকে। কোন কথা বলে না। শুধু মানুষ দেখলেই পাথরখানাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলে।"

রাজা ও রাণী নিঃশব্দে এগিয়ে যান, দেখেন এক মর্ম্মর রচিত নারী মূর্ত্তির সম্মুখে যুক্ত করে উপবিষ্ট সেই বন্দী। তার চোখ দুটী খোলা, দৃষ্টি মূর্ত্তিটীর মুখপানে নিবদ্ধ—তার মধ্যে মাখানো এক অপূর্ব্ব বিভোরতা!

আরও কাছে এগিয়ে এসে রাজারাণী দুই জনেই চমকে উঠেন, এ কি! এ মূর্ত্তি যে মহারাণী মণিকারই কিশোর বয়সের প্রতিকৃতি! সকল রহস্য তরল হয়ে উঠে।

ধরাগলায় মহারাণী ডাকেন, "দীপক! ভাই আমার!"

বন্দীর দৃষ্টি ফিরে আসে।

রাজ ইঙ্গিতে কারারক্ষী দ্বার উন্মুক্ত করে।

রাজা ব্যাকুলভাবে বন্দীকে বুকের মাঝে চেপে ধরেন, "বন্ধু! আমাদের ক্ষমা করো।"

বন্দীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মহারাণীর মুখের উপর। দুই চোখ ছেপে আবার জল গড়িয়ে পড়ে মুক্তা ফলের মত! অধরের কোণে হাসির রেখাটী আস্তে আস্তে আবার ফুটে উঠে।

নিকষ পাথর
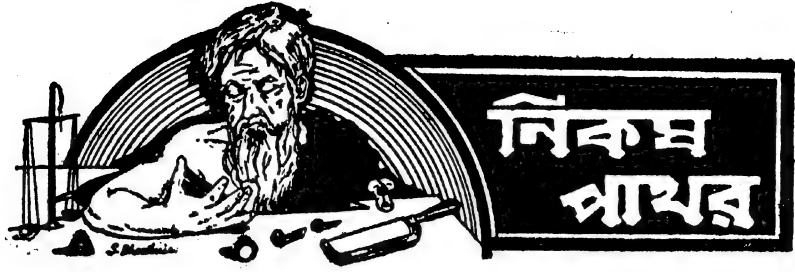
(শ্রীবিষ্ণুদাস)

প্রবাসী—মাঘ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় শ্রীসীতাদেবীর একখানি নূতন উপন্যাস সুরু হইয়াছে—"মাতৃঋণ।"

ছোট গল্প আছে চারটি।

প্রথম গল্প শ্রীসুধাকান্ত দের "ট্রেনে।" গল্পটির উদ্দেশ্য বোধ করি "Hindu moslem unity" সন্দেহ নাই; সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া। উপদেশটুকু কালপযোগী; কিন্তু এই পোড়া দেশে পঁচিশ বৎসেররও উপর হইল, সাম্প্রদায়িক বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। ফলে, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু রথী মহারথী অসংখ্য বক্তৃতা ও রচনায় এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। গল্প উপন্যাসেও কেহ্ কেহ দু'চার কথা বলিতে ছাড়েন নাই। এটি সেগুলির সংখ্যা বাড়াইল মাত্র। উপদেশটুকু যদি ফলবান্ হয়, মন্দ কি? ইহার অধিক বলিতে ভরসা পাই না।

কিন্তু গল্প হিসাবে ইহা প্রবাসীর উপযোগী হয় নাই। গল্পটির পঞ্চম ছত্রে দেখা যায়, প্রত্যেক "কামরা লাল টুপিতে ভরিয়া গিয়াছে।" এই "লাল টুপির" দ্বারা লেখক "মুসলমানগণকে" বুঝাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এই কলিকাতার পথে-বিপথে এবং বাহিরেও যে সকল মুসলমানের শির লাল টুপী পরিশোভিত দেখা যায়, তাঁহারা সংখ্যায় এত অল্প যে উহা তাঁহাদের একটা বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা যায় না, যেমন যায় "লাল পাগড়ী" দ্বারা পুলিশকে, "লাল ঘোড়ার" দ্বারা অগ্নিকে।

গল্প বলিবার ধরণটিও প্রাচীন।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমনোজ বসুর "আলেয়া।" বালিকা বধূর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনই গল্পটির মর্ম্ম।

সুষমা বালিকা। মাত্র তিন দিনেব বধূ সে। পিতৃ-ক্রোড় হইতে শ্বশুর-গৃহে তথা স্বামী-গৃহে আসিয়াছে। নূতন যায়গায়। অপরিণত মন।—পিতৃ-গৃহের বিশেষ করিয়া পিতার জন্য কাঁদে। শৈশবেই সে মাতৃহীনা। কিন্তু তাহার মেডিক্যাল কলেজের থার্ডইয়ারে পড়া স্বামীটি তাহার এ মনোবেদনা ন বুঝিয়া ঐ বিষয় লইয়াই তাহার সহিত "ফষ্টি-নাষ্টি" করে, সুষমার বালিকাসুলভ লজ্জাহীনতায় একটু বকেও। তারপর বৌভাতের রাত্রে সুষমা পিতাকে দেখিতে একাকিনী সকলের অজানিতে স্বামী গৃহ হইতে হাঁটিয়া যাত্রা করে। কিন্তু পথিমধ্যে সে "নাকাল" হয়। শেষটুকু Dramatic মনে ভয় ও কারুণ্য জাগায়।

এই সুষমার ক্রিয়া-কলাপ ও কথায় কখনও মনে হয়, তাহার পিতা তাহাকে শ্রীমান পঞ্চানন বাপা-জীবনের হাতে গৌরীদান করিয়াছিলেন, কখনও মনে হয় সে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া "দাদা গো", "দাদা গো" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে একাকিনী পিতৃ সন্দর্শনোদ্দেশে দূরগ্রামে যাত্রা হইতে বুঝি, সে বালিকা। আবার যখন দেখা যায় সে স্বামীর পাঠে বিঘ্ন ঘটাইয়া ফুঁ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেছে, এবং তাঁহার মাথা ধরিয়াছে বলিয়া টিপিয়া দিতেছে, তখন আর সে বালিকা নয়। তবে দুজ্ঞেয় স্ত্রী-চরিত্র; তা সে বড়ই বা কি, আর ছোটই বা কি? গল্পে রসই আসল। গল্পটিতে তাহার অভাব নাই; অবশ্য জলের ভাগই বেশী।

সুষমা যখন চলিয়া যায় তখনকার কথা। "বৈশাখ মাসের শস্যহীন শুষ্ক বিল।" যখন সে বিল ভাঙিয়া ছুটিল তখন তাহার "মাথার উপর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া যাইতেছে!" "তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে।" কিন্তু পাখীগুলির নাম কি? সেগুলি Imaginary না migratory birds?

আবার দেখা যায় "দলে দলে" "আলোচোরারা" "নানা দিকে মুখ মেলিয়া আগুন জ্বালাইয়া পথহারাকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া তোলে।" একটার ঠেলাতেই অস্থির; কিন্তু যে দেশে দলে দলে আলোচোরা বাহির হয় সে দেশের লোক নিশ্চয়ই বড় চতুর।

পরিশেষে "বড় বড় কালো মেটের মত

আলেয়ার দল" দেখিয়া আমরাও আর অগ্রসর হইতে চাহিনা। "মেটের" মত কালো, না জানি সে কি!

তৃতীয় গল্প শ্রীশৈলেশ ভট্টাচার্য্যের "প্রারম্ভে।" বেশ লাগিয়াছে। কিন্তু "শাঁখের শব্দ যেন নরম শ্যাওলার উপর দিয়া চলিয়া কাণে বাজিতেছে।" ব্যাপারটা বোধগম্য হইল না। অবশ্য শিশুমন অনেক রকম অদ্ভুৎ কল্পনা করে। তেতলার ছাদে cistern এর পাইপকেও কোন কোন শিশুকে "মাষ্টার মহাশয়ের ঘাড় ও মাথা" বলিয়া কল্পনা করিতে শুনিয়াছি। শ্যাওলা-শেওলা নাকি?

চতুর্থ গল্প শ্রীক্ষেত্র মোহন সেনের "কুলী।" গল্পটির রস জমিয়াছে যেখানে বিপিন বাবু কুলী হারাইয়া নাকাল হইতেছেন—আশা, নৈরাশ্য ও ভয় এই তিনটি ভাবে মন ভরিয়া উঠে। এবং পরিশেষে তিনি কুলীর সন্ধান পাওয়াতে মনও তাঁহার সহিত আশ্বস্ত হয়। সত্যই কুলীদের মধ্যে অনেক সংলোকও আছে। কিন্তু জুলুম-বাজী আবার সততার লক্ষণও নয়। হাওড়া ও শিয়ালদা ষ্টেশনের কুলী যে জুলুমবাজ নয় এমন কথা কোন্ যাত্রী বলিতে পারেন?

এ সংখ্যায় কবির অঙ্কিত চারিখানা ছবি আছে। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় ছবির সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সে গুলি ছবিগুলি কোন বাস্তব মনুষ্য বা অপর জীব বা অপর জন্তুর প্রতিরূপ নহে, সম্পূর্ণরূপে কবির মানস সৃষ্টি।" স্বয়ং কবিও বলিয়াছেন "আমি কোন বিষয় ভেবে আঁকিনে—দৈবক্রমে কোনো অজ্ঞাত কুলশীল চেহারা চল্‌তি কলমের মুখে খাড়া হ'য়ে ওঠে।" এ সম্বন্ধে আর কি বলিবার থাকিতে পারে?

শ্রীকনু দেশাই অঙ্কিত "আলোকের সন্ধানে" ছবিখানি বেশ। দেখিয়া মনে হয়, মহাত্মাজী চলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি এমনি নধর?

ভারতবর্ষ—১৩৩৮—মাঘ

এ সংখ্যার মাত্র তিনটি ছোট গল্প আছে।

প্রথম গল্প শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সর্পিল।" গল্পটি জমিয়াছে বেশ। কিন্তু স্বামী যখন কালীপূজার নিরত তখন স্ত্রী তাহার বাল্যবন্ধু অনন্তর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া ভাল-বাসাবাসি করে, এ ব্যাপারটা মজার হইলেও মধুর ও সুন্দর নয়, তা সে স্ত্রী যতই কেন স্বামীর উদ্ভট খেয়ালে ক্লিষ্টা হউক না।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "আর এক দিক।" প্রেমের গল্প। পত্রাকারে লিখিত। এক জায়গায় আছে। "ভালবাসা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের এবং তোমার যা আদর্শ, তার পরিণতি বিবাহ। আমাদের তথা-কথিত ভালবাসার পরিণতি বা পরিণাম যদি তাই হয়, তাহলে তোমার এবং আমার তার চেয়ে দুরদৃষ্ট আমি কল্পনা করতে পারি না।" করা উচিতও নয়; কেননা দরিদ্রের পক্ষে ধনীর কন্যা বিবাহ অর্থে গোয়াল-ঘরে হাতী বাঁধিতে যাওয়া। কিন্তু ভালবাসার পরিণতি বিবাহ না হইয়া যদি চিরবিরহ হয় তো মঙ্গলের নতুবা ঐ পরিণতিতে না পৌছিয়াই মিলনের চেষ্টা করিলেই "কেলেঙ্কারী"!

আর এক জায়গায় আছে, "তুমি নিরাবরণ হয়ে মঞ্চের উপর দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পেতে না। তুমি জানো, আর্টএর জন্য তোমার এটুকু নিলর্জ্জতা আমি মার্জ্জনা করিতে পারি।" Bravo!

ভাগ্যে বাংলা দেশে "আর্টপাগলা'র সংখ্যা নগণ্য। নতুবা ঘরও বাহিরের সীমা-নির্দ্দেশ করা কঠিন হইত, আর এই "পাগল—সোনাদের" জন্য কেবল মধ্যম নারায়ণের ব্যবস্থা করিলে উপকার পাওয়া যাইত না, উত্তম-মধ্যম-নারায়ণের আশ্রয় লইতে হইত।

তৃতীয় গল্প শ্রীকেশব নাথ রায় চৌধুরীর "প্রাণের অর্ঘ্য।" এটিও প্রণয় ঘটিত।

মজাটা দেখুন একবার—পাশের বাড়ীতে গান হইতেছিল—

"থাকতে পারলুম না; উঠে শুনতে লাগলুম সেই মধুর গান খানি! "ভোরের আলোয় চোখ যখন বিশ্বের সৌন্দর্য্যের পরিচয় নিচ্ছিল, তখনও মনে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেই সুর। কিন্তু পরে সেই বাড়ীতে গিয়ে দাসীকে দিয়ে আমার নামের কার্ডখানা দিতেই এক সুন্দরী তরুণী তাড়াতাড়ি এসে হাসতে হাসতে বললেন, "আসুন, আসুন।"

"যাক্ খুসী হলুম। ভয় হচ্ছিল ইনি যদি পর্দ্দানসীন হ'ন!"

"এখানকার কোন্ স্কুলে শিক্ষয়িত্রী তিনি।"

এদেশের তরুণরা এক মহিলার গানে বিমোহিত হইয়া তাঁহার কাছে কার্ড পাঠাইয়া দেয়, আর তরুণী অমনি ছুটিয়া আসিয়া হাসিয়া বলে "আসুন!" ইনি আর্টের দোহাই দিয়া "নিরাবরণ করিতে চাহেন নাই," পর্দ্দানশীনের "সুযোগ লইয়া এমন অভিনব কাণ্ড ঘটাইলেন। এই তরুণীটি আবার "স্কুল শিক্ষয়িত্রী!" তবে ভরসার কথা এই যে, তরুণটি তাঁহাকে "দিদি" সম্বোধন করিয়াছিল, আর কিছু নয়। আর এই এক-

দিনের "দিদিটিও" "ভাইটির" হাত ধরিয়াছিলেন। চমৎকার পর্দ্দাহীনতার ধারণা।

দুনিয়াটা এমনি মজাদারী হইলে গল্পটি সত্যই ভাল হইত।

এ সংখ্যায় রঙ্গিন্ ছবি আছে তিনখানি। ভাল লাগিল না।

বসুমতী—পৌষ—১৩৩৮

প্রথম গল্প শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "৭০৩"—বেশ মজার। গোড়া হইতে শেষ অবধি চমৎকার জমিয়াছে। গল্পটিতে একটু নূতনত্বও দেখা যায়।

ভবকান্ত ঘোষালের "রজক দুহিতার সহিত পরিণয়েই" তাঁহার শ্বশুরের আপত্তি এবং পরিণয়টা যে হয় নাই সে কথা ঘোষাল মহাশয় কাহিনীর মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু রজক দুহিতার প্রতি ঘোষাল মহাশয়ের মনে একটু প্রেম বা পীরিত জন্মিয়াছিল; ইহা তাঁহার শ্বশুর মহাশয় নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিবেন। যত গোল পরিণয়ে; পীরিতে কি আসে যায়?

দ্বিতীয় গল্প রায় শ্রীতারক নাথ সাধু বাহাদুরের "মৃত্যু মঙ্গলময়"। এমন গল্প এ যাবৎ বসুমতী বা আর কোন মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে বলিয়া মনে তো পড়ে না।

মৃত্যু যে মঙ্গলময় গল্পটিতে তাহাই প্রমাণ করিয়া লেখক মহাশয় পাঠক-পাঠিকাগণের মহদুপকার সাধন করিলেন। প্রবন্ধ লিখিলেও চলিত, কিন্তু তাহা পড়িত কে? গল্পের প্রতি লোভ মানুষের চিরদিনই প্রবল। খাসা গল্প হইয়াছে! পরিশেষে যে উপদেশের ঘটা আছে তাহা ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে সুধাধারা? ধন্য বঙ্গ সাহিত্য!

তৃতীয় গল্প শ্রীসৌরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "যাত্রা শেষ।" পড়িয়া তৃপ্তি পাওয়া গেল না।

লেখক লিখিতেছেন—"ঝোপঝাড় ভিতরে ভিতরে আমার নাড়ী ধরিয়া টানিতেছিল"—ব্যাপারটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ নাই। একটু সাবধানে থাকিলে এমন বিপদে আর পড়িতে হইবে না।

"সে ব্যাটা-ছেলের মত কোমরে—।" শুধু "ছেলে" বলিলে যদি পাঠক-পাঠিকাগণ না—বুঝিতে পারেন, তাই কি এই পার্থক্য? অবশ্য শুধু "পাটা" না বলিয়া "বোকা-পাটা" বলিলে "বোকা" ও "পাটা" দুই-ই বুঝায়।

"ঈষৎ চ্যাপ্টা," "দুইখানি কালোচোখ," প্রভৃতি শব্দ বিন্যাসও ঐ "বোকা-পাটার" মত।

চতুর্থ গল্প শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবীর "পুত্রবধূ।" গত মাসেই সম্ভব বসুমতীতে লেখিকার আর একটি গল্প পড়িয়াছিলাম, নাম মনে পড়িতেছে না, অনেকটা বক্ষ্যমান গল্পটির মতই। এটি কিন্তু ভাল লাগিল না।

একটা দোষ, লেখিকা বা লেখক ইনি যিনিই হউন, ইহাকে চাপিয়া ধরিতেছে, প্রতি কথায় উপমা, ও দার্শনিকতা। ইহাতে গল্পের রস জমে না,—পাঠকের মনকে পীড়া দেয়।

"জীবনে আর কোন মুহূর্ত্তে মানুষ অর্থকে এতখানি ভালবাসিতে পারে না, যতখানি ভালবাসিতে পারে যৌবনে।" কথাটা সত্য কি? অভিজ্ঞতা দিয়া না ঝোঁকের মাথায় কথাটি লেখা হইয়াছে?

পঞ্চম গল্প শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "সুধাকণা।" ভক্ত ভগবানের বিষয় যাহা খুসী বলিলেও তাহার অনাদর করা অনুচিত। অতএব—আহা!

কিন্তু "বিরাট আনন্দ যজ্ঞে" আহ্বানের "আগমনী" খামখা "করুণ" হইবে কেন? ভুলিয়া যাইতেছি যে ভক্ত ভক্তিরসে মাতাল;—বাকী প্রশ্নগুলিও চাপা থাক্।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "করুণাময়ী।" স্বাস্থ্য-সমাচারেই ছাপানো উচিত ছিল।

এ সংখ্যায় রঙীন্ ছবি আছে তিনখানি। ভাল লাগিল না।

দ্রষ্টব্য ঃ—এই সংখ্যায় রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণীর বড় গল্প বাহির হইবার কথা ছিল। নানা কারণে হয় নাই। শীঘ্রই বাহির হইবে।

"দোল"

৫ম বর্ষ | চৈত্র—১৩৩৮ | ১২শ সংখ্যা

যুগ পরিবর্ত্তন

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম-এ

বর্ত্তমান শতাব্দীকে অনেকেই আগামী যুগের বার্ত্তাবহ হিসাবে মনে করিতেছেন। মানুষের ভাব-ধারা যেরূপে দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে, আচার-ব্যবহার যেরূপ দিন দিন নূতন আকার ধারণ করিতেছে, বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত ও সযত্নে প্রতিপালিত সামাজিক নিয়মাবলীর যেরূপ রূপান্তর সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে এরূপ মনে করিবার যে যথেষ্ট কারণ আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? মানব-ইতিহাস এক যুগ হইতে অন্য যুগে লাফাইয়া চলিয়াছে। যাঁহারা ভাবেন, ইতিহাস এক যুগের বাণী অন্য যুগে আবৃত্তি মাত্রই করিয়া চলে, তাঁহারা যুগ-বাণীর বিশিষ্টতা ভালরূপে বুঝিবার চেষ্টা করেন না। আদিম যুগের মানব ও বর্ত্তমান যুগের মানব নিশ্চয়ই এক নয়। মানব যখন পশুরই নিকটবর্ত্তী জীব ছিল, তখন তাহার মাংসপেশী সমূহ যথেষ্ট সতেজ ও বলবান ছিল। তাহার শারীরিক বল ও যথেষ্ট ছিল। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য করিবার শক্তিও প্রবল ছিল। সভ্যতা বিকাশের সহিত মানব প্রকৃতির সাহায্য ত্যাগ করিয়া যতই কৃত্রিম উপায়ে জীবন-যাপন ব্যবস্থা স্থির করিতেছে ততই তাহার পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতার হ্রাস পাইতেছে। অসভ্য মানব, বর্ত্তমান মানবের পূর্ব্বপুরুষ হইলেও, পশুর সহিত তাহার পার্থক্য সামান্যই।

সমাজ ও আচার ব্যবহারের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও বহু সংস্কার সংসাধিত হইয়া এক অভিনব ব্যবস্থা ও আচার-ব্যবহারের সৃষ্টি হইয়াছে। আদিম মানব পিতার নাম বা গোষ্ঠীর নাম জানিত না। মাতৃ-গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া মাতাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া মাতৃ-নামেই পরিচিত হইত। বিবাহ-প্রথা তখন খুবই সরল ও বিপদপূর্ণ ছিল। সবল ব্যতীত কেহই রমণী উপভোগ করিবার সুযোগ পাইত না। নারী জাতির কোন স্বাধীনতাই ছিল না। গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রতিপালনের জন্য অনেক সময় তাহাকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইত। মানব অপেক্ষাকৃত অধিক শারীরিক বলের অধিকারী হইয়া রমণীগণকে একেবারেই

করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিত। রাজা বা রাজ্য তখন কিছুই ছিল না। ক্রমশঃ গোষ্ঠীপতির আবির্ভাবের সহিত clan state ও পরে tribal state এর আবির্ভাব হয়।

মানব-সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজা বা রাষ্ট্র বহুদিনের তপস্যার ফল। আমরা যাহাকে সাধারণ-তন্ত্র বা গণ-তন্ত্র বলি, কতকটা ঐ ধরণের শাসন প্রণালীই মানব প্রথমে আবিষ্কার করে। রাষ্ট্র ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া যখন অনেক গোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখনই সকলের প্রতিভূরূপে রাজার আবির্ভাব হয়। বৈদিক যুগে বর্ত্তমান কালের ন্যায় নৃপতি দেখিতে পাওয়া যায় না। কতকগুলি গোষ্ঠীর সম্মিলনে যে সমস্ত রাষ্ট্র সংঘটিত হইয়াছিল তখন উঁহাদের নেতা অনেকটা সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মাত্র ছিল। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন রাজা পুরু ঐ রকম একটা রাষ্ট্রের নায়ক ছিলেন মাত্র, রাজা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তিনি ঠিক তাহা ছিলেন না।

মধ্য যুগে 'ভগবান' আবিষ্কৃত হন। পরকাল এবং পারলৌকিক ধ্যান ধারণা ক্রমশঃ মানবকে মুগ্ধ করিতে থাকে। এই যুগে মানব-মস্তিষ্ক ক্রমশঃ সংপ্রসারিত হইয়া উহার বিকাশ আরম্ভ হয়। কতকগুলি লোক ধ্যান ধারণার চর্চ্চা করিয়া ক্রমশঃ জনসাধারণকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হয়। বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে Intellectual aristocracy বলি প্রকৃতপক্ষে এই মধ্যযুগে তাহাদের জন্ম হয়। Priestcraftই এই Intellectual aristocracyর ধারক ও বাহক। Priestcraft হইতে Political king ও তাহার রাজত্ব জন্ম গ্রহণ করে। রাজার আবির্ভাবের সহিত একদল বংশগত অভিজাতের সৃষ্টি হয়। এই অভিজাত সম্প্রদায় সাধারণ অপেক্ষা আর্থিক স্বচ্ছলতায় প্রতিপালিত হওয়ায় এবং জ্ঞান চর্চ্চার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পাওয়ায় ক্রমশঃ তাহারা রাজার প্রধান সহায়ক হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সভ্যতায় যে সমস্ত ব্যবস্থা-বিধি এখন আমরা লক্ষ্য করিতেছি, যে সমস্ত আইন-কানুন আমরা মানিয়া চলিতেছি, তাহা ঐ সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায় এবং রাজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইউরোপে যে Land Legislation বা ভূমিস্বত্ব আইন আছে বা উহার অনুকরণে এখানে ঐ আইনের যে সংস্করণ চালান হইয়াছে, উহা ঐ অভিজাত সম্প্রদায়ের সুখ-সুবিধার উপর দৃষ্টি রাখিয়াই রচিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির আবিষ্কারের সহিত মধ্য-যুগের অবসান ঘটে। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে মানব ক্রমশঃ মনস্তত্ত্ব ছাড়িয়া ভূতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ তত্ত্বের সত্যানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিতে থাকে। প্রকৃতিদেবীও ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁহার রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সত্যগুলি দেখাইতে লাগিলেন। বহুদিনের সত্য তখন মিথ্যায় আসিয়া পরিণত হইতে লাগিল। গ্যালিলিও যখন বলিলেন সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে না, তাৎকালিক পাদরী সমাজ এই সত্য আবিষ্কারের জন্য তাহার উপর ভীষণ খড়্গহস্ত হইয়াছিল, তাহার কারণ তাহারা নূতন ভাব-ধারায় আপনাদের একাধিপত্য হারাইয়া ফেলিবে এইরূপ আশঙ্কাই করিয়াছিল। তাহার পর আসিল সত্যের উপর সত্যের বন্যা। সীমাহীন আট্‌লাণ্টিকেরও পার দেখা দিল। সমুদ্রের উপর যথেষ্ট নিশ্চয়তা লইয়া নাবিকবৃন্দ পাড়ি দিতে আরম্ভ করিল। বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের সহিত দূরতা হ্রাস পাইল, বৈদ্যুতিক তত্ত্বের বিকাশের সহিত দূরদেশে সংবাদাদি প্রেরণ ও গ্রহণের অসাধারণ সুবিধা হইয়া গেল। জ্ঞান ক্রমশঃ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। বর্ত্তমান যুগ বলিতে গেলে দুইশত বৎসর পূর্ব্বেই উহার সূচনা হইয়াছে এখন প্রকৃতপক্ষে একটা নূতন যুগে আসিয়া পড়িয়াছি।

কাজেই এখন অনেক পুরাতন সত্য আমাদের নিকট অসার মিথ্যায় পরিণত হইয়াছে। এখন যদি বলা যায় যে নারীর অন্তঃপুরই একমাত্র নিবাস ভূমি, তবে উহা ভীষণ উপহাসের বস্তুই হইবে। যে নারী গত মহাযুদ্ধে তাহার ভায়েদের সহিত সমানভাবে

সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছে, যে নারী নরের তাবং বিদ্যায় শিক্ষিতা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে পুনরায় ঘোমটার অন্তরালে বা অন্তঃপুরের এককোণে ঠেসিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে গেলে বাতুলতা মাত্রই প্রকাশ পাইবে। নারী এতদিন নরের ভোগ্যই ছিল এইজন্য নানা আবরণে নারীকে নরের ভোগের জন্য নিয়োগ করা হইয়াছিল। ঐ সমস্ত আবরণ এখন আপনা হইতেই অপসারিত হইয়া যাইবে। অভিজাত সম্প্রদায় নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া সাধারণকে বিবিধ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া তাহাদেরই পরিশ্রম জাত দ্রব্যের একটা মোটা অংশ আইনের দোহাই দিয়া যাহা হস্তগত করিয়া আসিতেছিল তাহার ব্যতিক্রম এখন ঘটিবেই, উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকার প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে পুরাতনের জন্য যাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে পুরাতন চলিয়া যাইবেই। নূতন যুগের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মধ্য যুগের যত প্রকার বাজে আছে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান যুগে ধ্বংস পাইবে। এক একটী দেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যে দেশাত্মবোধ বা Nationalism গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা ধ্বংস পাইবেই। যাঁহারা আজ League of Nationকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে ভবিষ্যতে ঐ League মানবকে এক মহা মানব-সভ্যতার সম্মুখীন করিয়া দিবে। নারীর সতীত্ব ধারণার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে বলিয়া যাঁহারা ভয় পাইতেছেন তাঁহারা জানিয়া রাখুন প্রাচীন যুগের ঐ ধারণায় অনেকটা বিপ্লব আসিবেই, কেননা নারীকে এখন সমানভাবে পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদীগণ যাহারা এখনও সাম্রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর আছেন তাহারা জানিয়া রাখুন যে নিষ্কর্ম্ম-জীবনের অবসান ঘটিয়াছে, মানব-সভ্যতা এমন এক মহাযুগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যেখানে সকল সম্প্রদায়কেই তাহার শক্তি অনুযায়ী সভ্যতার পুষ্টির জন্য তাহার খোরাক যোগাইতে হইবে। সনাতনীগণ যাঁহারা তাঁহাদের মজ্জাগত ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি বর্ত্তমানে অসত্য বলিয়া প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া ভয় পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে শীঘ্রই নূতন তত্ত্বগুলিকে পুরাতনের স্থলে অভিষেক করিয়া লইতে হইবে।

যখন মানব এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আত্মীয় স্বজন লইয়া বাস করিত, জমির উৎপন্ন দ্রব্যই যখন তাহার একমাত্র ভরণ পোষণের অবলম্বন ছিল, তখন মানব জাতি নিজের সমাজ ব্যতীত অপর কিছু বুঝিতে পারিত না। তাহার দূরদৃষ্টি ছিল না বলিলেই চলে। এখন সমস্ত পৃথিবীই এক বিরাট গোষ্ঠিতে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতায় বসিয়া আমরা লণ্ডনের রেডিও অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারি। ঘণ্টায় একশত মাইল বেগে শূন্যপথে পরিভ্রমণ করিতে পারি। যুদ্ধ বাধিলে সমস্ত পৃথিবীই যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হইবে এবং পুরুষ নারী ভেদে সকলকেই যোদ্ধায় পরিণত হইতে হইবে। পৃথিবীর যে কোন্ প্রান্তে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে তাহার বিপরীত দিক হইতেও সাহায্যের জন্য অন্ন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয়, এক দেশের ফসল অন্য দেশে নীত হইয়া অতি সত্বর নানাবিধ শিল্প-সম্ভারে পরিণত হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরিত হইতেছে। রক্তগত বৈষম্য থাকিলেও নানা জাতির সংমিশ্রণে এক বিরাট জাতির সৃষ্টির আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ভাষা একত্রিত হইয়া এক মহাভাষার সৃজন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সমস্ত জাতির বেশ ভূষাও প্রায় এক হইয়া আসিতেছে; কাজেই এই নব-যুগে পুরাতনের জন্য বিলাপ করা মিথ্যা। মহা-মানবজাতি যখন সৃজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাহাতে যোগ দিতেই হইবে।

বাংলার মেয়ে

চিঠি

শ্রীপ্রভা দেবী সরস্বতী

প্রিয় সুদি :—

তোমার পত্র খানা অনেক ঘুরে অনেক দিন পরে আমার কাছে এসে পৌচেছে। কি করে যে আমার সন্ধান পেলে আমি কেবল তাই ভাবছি। আমি তো ভেবেছিলুম চিরদিনই সমাজ সংসার হতে এমনি দূরে থাকব, যেখানে কোন লোকে আমার সন্ধান পাবে না।

আজ তোমার পত্রখানা পড়ে অনেক কথাই মনে পড়ে গেল সুদি, পুরানো সে কথাগুলো মনে জেগে আজ মনের অতলতল হতে জলই উথলে উঠছে, চোখ দিয়ে ঝরে পড়তে চাইছে।

আমার দেশ,--মনে করতে সব ভুলে যাই। সে আমার দেশ, সেখানে যারা আছে তারা আমার আত্মীয়, আমার নিজের লোক। আজ সকলকে ছেড়ে আমি এসেছি কোথায়,—অনেক দূরে—যেখানে কারও সাড়াশব্দ মেলে না!

আমি আজ নির্ব্বাসিত, স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন দণ্ড নিয়েছি কিনা জানতে চেয়েছ। বল দেখি দিদি, স্বেচ্ছায় কেউ নির্ব্বাসন দণ্ড নেয়?

এখানে এই পাহাড়ের ধারে শুনতে পাই বাতাস এসে ঝাউ গাছের পাতায় আঘাত করে ঝির ঝির করে কাঁপায়, তার মৃদু শব্দ টুকু, আমার প্রাণ তখন আকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় এই বাতাস আমার দেশের উপর দিয়ে বয়ে আসছে, ওর ওই স্বরে আমি শুনতে পাই দেশের ডাক।

মেঘগুলো যখন এলোমেলো ভাবে উড়তে উড়তে আসে, মনে হয় ওরা আমার দেশের কথা নিয়ে আসছে। পাখীরা যখন উড়তে উড়তে আসে—মনে হয় ওদের ডেকে জিজ্ঞাসা করি দেশের সব কে কেমন আছে।

আজও সব তেমনি আছে সু-দি, কিছুর বদল হয় নি? আমাদের বাড়ীর পেছনে পুকুরের ঘাটে আজও তেমনি মেয়েরা আসে, গল্প করে, জলে ঢেউ দিয়ে কলসী ভরে জল নেয়? পাখীরা আজও কালো জলে ছায়া ফেলে উড়ে যায়। পুকুরের ধারে বাঁশ-গাছের সরু শাখাগুলো বাতাসে আজও তেমনি দোলে, বাবলা ফুল গুলো আজও মেঘভরা আকাশের কোলে ফোটে,—আবার তেমনি করে তলা বিছিয়ে ঝরে পড়ে?

আমাদের বাড়ীর সামনের সেই ধূলো ভরা পথে ছেলে মেয়েরা আজও তেমনি করে খেলে বেড়ায়?

হয়তো সবই তেমনি আছে, কেবল আমিই নেই। বাড়ীর সামনে পথের ধারে গ্রামের পুরুষেরা তেমনই করে জটলা করে, নানা বিষয়ের আলোচনা করে, মেয়েরা ঘাটে গিয়ে পাঁচ বিষয় নিয়ে গল্প করে,—সবই তেমনই হয়, ওদের মাঝে নেই কেবল আমি।

ওই গ্রামের বুকে আমিও একটী মেয়ে হয়ে জন্মেছিলুম, ওখানেই আমার বাল্য কৈশোর কেটেছিল, যৌবন এসেছিল।

তোমার কাছেই তো দিনের বেশী সময় কাটাতুম, তুমি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় হোলেও আমাদের মধ্যে সে বড় ছোটর প্রভেদ তুমি রাখ নি, তোমার সব কথা তুমি অসঙ্কোচে আমার কাছে বলতে, আমি ছোট হলেও তোমার সব কথা শুধু শুনেই যেতুম।

তারপর হল আমার বিয়ে--

বয়স তখন আমার চৌদ্দ পনের,—বাপ-মা আমার বিয়ের ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। গ্রামের লোকে এত কথা বলছে যা শুনলে জ্ঞান হারাতে হয়।

বিয়ের পাত্র যখন ঠিক হল তখন দুই এক জন বলছিল "মেয়েটাকে হাত পা ধরে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।"

কেন তা তখন বুঝি নি, বুঝলুম বিয়ের রাত্রে, স্বামী যখন এসে পাশে দাঁড়ালেন।

তুমিই না সে দিন বলেছিলে দিদি—স্বামী যাই হোন সে বিচার করার ভার মেয়েদের ওপর নেই। স্ত্রীকে স্বামী বিচার করতে পারে, স্বামীকে বিচার করা মেয়েদের এদেশে চলবে না।

তোমার কথাই মেনে নিয়েছিলুম; তিনি যাই হোন আমার কাছে দেবতা, আমার বড় অসময়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমায় গ্রহণ করে আমার মা বাপকে রক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু তারপর—

সে শ্রদ্ধা ভক্তি অটুট রাখতে পারিনি সু-দি, সে জন্যে তোমরাও তো আমায় বড় কম লাঞ্ছনা দাওনি। তেমরা স্পষ্টই বলেছিলে "যে মেয়ে স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করতে পারেনা তার গলায় দড়ি দিয়ে মরণই ভালো।"

কথাটা সত্যি; আবহমান কাল থেকে এই রকমই বিচার চলে আসছে যে। স্বামীকে দেবতা বলে পূজো করে এই দেশের মেয়েরা নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করেছে, কারণ দেবতা অতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়ে নিজের পাওনা হতে এক চুল কম পেতে চায় না, ওর যা পাওনা ওকে তা দিতেই হবে, বরং কিছু বেশী দিলেও ভালো হয়।

এযে রক্ত মাংসে তৈরী দেবতা, এর তৃপ্তি যে কিছুতেই নেই। চিরদিন পেয়ে ওর কেবল পাওনার দিকেই নজর বেশী, নিজের পাওনার এতটুকু ক্রটি সে সইবে না।

ভেবোনা যে ভক্তি শ্রদ্ধা করবার চেষ্টা করিনি, স্বামীকে স্বামী পাওনা দেইনি। নিজেকে নিঃশেষ করে সবই ঢেলে দিলুম, কিন্তু তাঁর তবু তৃপ্তি হল না।

আচ্ছা সু-দি, স্বামীর দেবতা—কিন্তু দেবতা কি ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়ে খুসি হন না? আমার দেবতা চিরদিনই ভ্রূ কুঁচকে রইলেন; প্রসন্ন চোখে কোন দিন চাননি।

কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত স্বামী;—তবু আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করে গেছি, কোনদিন তাঁকে ঘৃণা করিনি।

তবু পান হতে চূণটুকু যদি খসত—আমার নিস্তার থাকত না। আমার সারা গায়ের দাগ আজও মিলায় নি, দেবতার দান আমায় মহীয়ান করে তুলেছে।

আমার একটী সন্তান হয়েছিল জানো না সম্ভব। ভগবান তাকে রাখেনি, দুইদিন সে বেঁচে ছিল, উঃ, তার সে কষ্ট যদি দেখতে সু-দি তুমি নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করে তাকে সে যন্ত্রণার হাত হতে বাঁচাতে।

তার বাপের পাপের ফল সে ভোগ করতে এসেছিল, —অভাগা শিশু—"

দুদিন সে ছিল, একটী বারের জন্য সে চোখ মেলেনি, এতটুকু বুকের দুধ তাকে খাওয়াতে পারিনি। তৃষ্ণায়, ক্ষিধেয় সে ছটফট করেছে, আমি তাকে কোলে নিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে বসে দুটো দিন দুটো রাত কাটিয়েছি।

এক ফোঁটা চোখের জলও কি ঝরল না? বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছিল,—একটু কাঁদতে পারলেও যে বাঁচতুম।

আমারই কোলে তেমনি কাঁদতে কাঁদতে সে নীরব হয়ে গেল, তার শুষ্ক গলা হতে আর সুর ফুটলো না।

একবার তখন যেন আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠেছিলুম। ওরে, তুই কেন এসেছিলি? এলিই যদি—কেন থাকলিনে?

উঃ, আজও ছেলেটার কান্না ভুলতে পারিনি সু-দি, আজও মনে হয় যেন সে এতটুকু দুধ খাবে বলে মাথা নাড়ছে, তার মুখে বুকের দুধ দিচ্ছি, সে গিলতে পারছে না।

এই রকম কত অভাগা ছেলেইত আমাদের দেশে জন্মায়, কত শিশুই তো এমনি করে বাপ মায়ের পাপের ফলে ফুটে ঝরে পড়ে? এই শিশুমৃত্যুর পাপে পাপী কে —আমরা,—এদের বাপ মা।

মা হওয়ার আগেই যদি আত্মহত্যা করতুম তা হলে এ পাপ তো আমার লাগতো না। নিজের কষ্ট ছেড়ে দেই, দশমাস তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলুম, প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করেছিলুম, সে সব আজ মনে নেই, মনে হচ্ছে তার সেই বিকৃত দেহ, এতটুকু খেতে পাওয়ার জন্যে তার সেই ছটফটানি।

স্বামীর সেবার জন্য আবার আমায় উঠতে হল, আবার সবই আগের মত নিজের হাতে করতে হতো।

কিন্তু সু-দি, ভক্তি হারালুম, শ্রদ্ধা হারালুম। আর স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করতে পারলুম না।

আবার? আবার হতভাগ্য জীবদের সংসারে আনব? তারা বুকের দুধ খেতে পাবে না, তারা জগতে এসে জগতের সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে না, তবে তাদের এনে লাভ কি?

সতী নারীর আদর্শ নিয়ে চলতে পারলুম না। এ সব কথা গল্পে চলতে পারে, সীতা সতী সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে উপদেশ দেওয়া চলতে পারে, যারা পালন করবে তাদের দিকটাও দেখা কর্ত্তব্য নয় কি?

ক্ষীণ বিকলাঙ্গ সন্তানের বাপ বলে পরিচয় দেওয়ার চেয়ে ওদের না আনাই ভালো; এ রকম লোকদের বিয়ে করে লাভ কি? ওরা যাদের পৃথিবীতে আনবে তারা কত অল্প আয়ু আনবে, হয় তো হয়েই মরে যাবে, না হয় চির রুগ্ন হয়ে কিছু কাল বেঁচে থেকে আবার কতকগুলি অল্পায়ু রুগ্ন বংশধর রেখে যাবে।

এমনই অল্পায়ু বংশধরদের সৃষ্টি করে বংশ রাখার চেয়ে বংশ নির্ব্বংশ করে তারা যাক্,—পৃথিবীর ভার অনেক কমে যাক।

যাক, ও সব কথা থাক, আমার কথাই বলে যাই।

...স্বামী আমার 'পরে মোটেই খুসি হতে পারেন নি, তিনি আমায় নির্য্যাতন করতে লাগলেন বড় কম নয়।

হঠাৎ একদিন শুনতে পেলুম—আমার দ্বারা বংশ-রক্ষা হল না বলেই তিনি আবার বিবাহ করবার চেষ্টায় আছেন। শুনলুম পাত্রী ও ঠিক হয়ে গেছে, সামনের মাঘ মাসে বিবাহ।

হায়রে বাংলা, এখানে মেয়েদের দিকে চায় কে, তাই না এমনি করে যূপকাষ্ঠে তাদের আত্মবলি দিতে হয়? কোন সে কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগা—জেনে শুনেও এমন পাত্রকে কন্যাদান করছে।

স্বামীকে দৃঢ় কণ্ঠেই জানালুম তাঁর আর বিয়ে করা হবে না, আমি কখনও আর একটী অভাগিনীকে আনতে দেব না।

আবার সে ও এসে আমারই মত অরুন্তুদ কষ্ট পাবে তো, তার ও গর্ভে সন্তান আসবে, আমারই মত কোলে নিয়ে সেও তার মুখের পানে চেয়ে নিঃশব্দে কেবল চোখের জলই ফেলবে তো।

স্বামী একেবারে চটে উঠলেন, স্পষ্টই জানালেন বংশ রক্ষার জন্যে তাঁকে আবার বিয়ে করতেই হবে।

বললুম—"বংশ রক্ষা না হয় নাই হল। ক্ষীণ জীবী সন্তান নিয়ে কি লাভ?"

কিন্তু স্বামী অচল, অটল।

খুব গোপনেই একখানা পত্র দিলুম মেয়ের বাপকে—

সেই পত্রের কথা যে দিন প্রকাশ হল সেদিনকার অবস্থা একবার ভেবে দেখ সু-দি।

প্রহারে জর্জ্জরিত দেহে অচৈতন্যাবস্থায় পড়ে রইলুম। প্রথম যেদিন চোখ মেলতে পারলুম কাছে কাউকেই দেখতে পেলুম না; ঘরের বাইরে অনেক লোকের কথাবার্ত্তা শুনতে পেলুম।

একটী মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম আমি আজ বাইশদিন বিছানায় পড়ে আছি। শুনতে পেলুম আমার স্বামীর বিয়ে হয়েছে, বাড়ীতে অনেক লোকজন, আত্মীয় স্বজন সব এসেছে।

তারপর সু-দি, তারপরকার কথা কি আর বলতে হবে?

একদিন পথে এসে দাঁড়ালুম।

আমার কেউ নেই,—কেউ আমায় ডাকলে না, আমার সামনে স্বামীর বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল, কেউ দরজা খুলল না।

ডাকলুম—"ওগো, দরজা খোল—"

উত্তর পেলুম না।

তারপর—

আর পেছন পানে চাইলুম না, সোজা এগিয়ে চললুম।

আজ আমি এখানে। দেশ হতে বহুদূরে এসেছি স্বেচ্ছায়, দেশের লোকের পরে দারুণ বিতৃষ্ণা এসেছিল।

বেশ রয়েছি এখানে, এখানে এই নেপালিরা

আমায় ভালোবাসে, ভক্তি করে, মা বলে ডাকে। মনে হয়—এই ভালো।

তবু সু-দি, মাঝে মাঝে অন্যমনা হয়ে পড়ি, দেশের কথা মনে পড়ে, তোমাদের সকলের কথা মনে পড়ে। স্বামীর কথা ভুলে গেছি, কিন্তু ছেলেটার কথা তো ভুলতে পারি নি।

বলেছ আমি সতী সীতার আদর্শ মেনে চলি নি, আমার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে, শেষে নরকবাস আমার ব্যবস্থা করেছ।

তাই যদি হয়—হোক। নরক কোথায়—আছে কিনা তা জানি নে, এ জন্মে যে নরক দেখেছি মনে হয় তার মত ভয়ানক আর কিছু নেই। আর কষ্ট? এমন কোন কষ্ট আর নেই সু-দি যা সইতে পারব না।

বাংলা দেশের মেয়ে হয়ে জন্মেছি অনেক পাপের ফলে,—অনেক পাপ না করলে কেউ বাংলার মেয়ে হয়ে জন্মায় না। তাদের চোখে দৃষ্টি থেকেও নেই, বেদনা বোধ করবার শক্তি তাদের নেই, তাদের কিছু নেই।

তেমন দিন আসবে কি সু-দি যে দিন বংশরক্ষার কল্পনা মন হতে দূর হয়ে যাবে, যে রকমই হোক একটী ছেলে রেখে যেতে হ'বে বংশের নাম রাখবার জন্যে এ কথা মানুষ ভুলবে কি?

পত্র বড় দীর্ঘ হয়ে গেছে, এখন বিদায়ের সময় এসেছে। লিখেছ আমার স্বামীর তিনটী সন্তানের মধ্যে একটী মাত্র যে বর্তমান আছে সে চিররুগ্ন। তাকে কি আশীর্ব্বাদ করব জানি নে, তবে এ কথা বলছি তার যদি বোধ শক্তি থাকে—তবে এই বংশ রাখবার চেষ্টা না করে আত্মহত্যা করে বিলুপ্ত করে দিক। আজীবন বেঁচে থেকে মরণের অধিক যন্ত্রণা ভোগ করবে বই তো নয়; আবার সে যে বংশধর রাখবে সে ও তো ওরই মত পঙ্গু হবে?

আমি ভাই সু-দি; পার যদি ঘৃণা না করে উত্তর দিয়ো।

তোমার স্নেহের

"কমল"

এস

শ্রীসুধীরকুমার সেন

শরতের মধুর উষায়
তোমারে স্মরণ করি
দিওহে আজকে আমায়
রাঙ্গা ঐ চরণ তরী !!
এস এ আকুল প্রাণে,
এস গো বেণুর তানে,
আজি মোর ছন্দ মাঝে
তোমারে লইমু বার' !!
বাঁশীটী হস্তে লয়ে
কী মধুর বাজাও তুমি ;
তটিনী ঢেউ খেলে যায়
উতলা কানন ভূমি ;

এলে হে পরাণ প্রিয়,
এলে মোর স্মরণীয়,
জ্যোছনা লুটায় যখন
ধরণী আলোয় ভরি !!
শেফালির শুভ্র রংয়ে
তোমারে পড়লো মনে ;
সাদা মেঘ ভেলায় চেপে
চলেছে কোন গগনে ;
শরতের শ্যামল ক্ষেতে
রেখেছি আসন পেতে
এস মোর দুঃখ ব্যথা
নিমিষে সকল হরি।

আদান প্রদান

প্রবন্ধ—

শ্রীকনকলতা ঘোষ

প্রত্যেক মানুষকে জগতে এসে দেওয়া নেওয়া করতেই হয়, আদান প্রদান ব্যতীত এখানে কোন কিছুই একতরফা চলে না।

স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা প্রীতি সেবা এসবই দিতেও হয় নিতেও হয়, ঐ সুন্দর আন্তরিকতার স্পর্শ ও আদান প্রদান না হলে জীবনের কোনো সার্থকতা লাভ করা যায় না।

ভালবাসা এমন জিনিষ যা না দিয়ে ও তৃপ্তি হয় না আর না পেয়ে ও বাঁচা যায় না সুতরাং প্রত্যেক লোকের পক্ষেই এর আদান প্রদান অপরিহার্য্য। আন্তরিক ভালবাসার স্পর্শ না পেলে এই কঠোর সংসার ভূমিতে প্রাণ ধারণ করে থাকা মানুষের পক্ষে সত্যই অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার হত একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের অন্তরে অন্তরে যে অদৃশ্য বন্ধন অলক্ষ্যে বসে বিধাতা সৃষ্টি করেন ভালবাসার মধ্যে দিয়ে তারই প্রকাশ হয় বলে মানুষ অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ও এখানে বাস করতে পারে।

এসব হল মানুষের অন্তর্জগতের দেনা পাওনার কথা, এবার বহির্জগতের দেওয়া নেওয়া সম্বন্ধে কিছু বলতে ইচ্ছা করি।

আমার মনে হয় ব্যবহারিক জগতে সাধারণতঃ এই দেওয়া নেওয়ার নিয়ম এইযে যার আছে সে দেয়, এবং যার নেই সে নেয়। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে যাঁরা এ জন্মে ধনী গৃহে জন্মগ্রহণ করেন বা নিজের চেষ্টায় ধনী হতে পারেন তাঁরা যথাসাধ্য দান করবেন তাদের, যারা সত্যই বিপন্ন অভাবগ্রস্ত, অন্যের সাহায্য বা দয়ার দান না পেলে যাদের দিন চলে না। যারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে এজন্মে অনন্ত দুঃখ দুর্গতি ভোগ করে, তারা যেন ধনীব্যক্তিদের হৃদয়হীন ব্যবহারে আর বেশী দুঃখ না পায় ও তাঁদের দানের প্রবৃত্তির অভাব হেতু অনাহারে মৃত্যুপথ যাত্রী না হয় ইহা দেখা প্রত্যেক ধনী ও স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের পক্ষেই কর্ত্তব্য কাজ বলে মনে হয়।

অবশ্য একজন বড়লোক পঞ্চাশ জন গরীব লোকের অভাব মোচন করতে বাধ্য এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু একজন ধনীলোক তাঁর আত্মীয় অনাত্মীয় অন্ততঃ দশজন অভাবগ্রস্তকে গ্রাসাচ্ছাদনের সাহায্য করবেন এরকম আশা করা অনুচিত নয়।

যদি এইরকম ভাবে প্রত্যেক বিত্তবান ব্যক্তি তাঁর নিকট বা দূর সম্পর্কীয় পাঁচ দশজন অভাবগ্রস্ত আত্মীয়কে স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হয়ে যথাসম্ভব সাহায্য দান করেন ও অপরিচিত প্রার্থীকে অপমানে বিতাড়িত না করে দয়া করে যৎসামান্য কিছু দেন তাহলেই ত অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

সকল সময়ে সকল দেশে যদি অর্থবান লোকেরা মাত্র আপনার সংসারের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে সস্নেহ দৃষ্টিতে আর দুপাঁচটি বিপন্নের সংসারের দিকে চেয়ে দেখেন, তাহলে যেমন তাঁদের কোন ক্ষতি স্বীকার করবার আবশ্যক হয় না অথচ তাঁদের অন্তরের মহত্ব প্রকাশ হয় তেমনি অনেকগুলি সংসার প্রতিপালন করা হয় এবং এইনিয়ম সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হলে কোথা-ও আর দারিদ্র্য সমস্যা প্রবল হয়ে উঠে না।

এ দেশের কথাই ধরা যাক, শুনা যায় বহুদিন পূর্ব্বে এখানে চারিদিকে এখনকার মত এমন অন্নের হাহাকার ছিল না।

আমার মনে হয় তার অনেকগুলি কারণ আছে। তার মধ্যে একটি কারণ পূর্ব্বে লোকের অভাব বোধ কম ছিল, ব্যয় বাহুল্য প্রায় ছিলনা বললেও চলে, আর একটি

কারণ লোকের দয়াদাক্ষিণ্য ছিল। আগেকার দিনে এদেশের বিত্তশালী লোকদেরও খুব বিলাসিতা ছিলনা এবং অভাব বোধও অধিক ছিল না। সামান্য অর্থ ব্যয় করেই ধনী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সকলেই আপনার পরিবারস্থ সকলের অভাব মোচন করতে পারতেন। সেজন্য খুব বেশী অর্থ না থাকলেও তাঁদের গৃহে অর্থাভাব বা অস্বচ্ছলতা থাকত না। এবং যাঁদের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত তাঁরা তাই দিয়ে সানন্দে দান ধ্যান দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি করতে পারতেন, এজন্যও অনেক গরীব দুঃখী তাঁদের কাছে পয়সা কাপড়, পাত পেতে খাওয়া পেয়ে পরিতৃপ্ত হোতো।

এখনকার দিনে লোকের সেই দেওয়ার প্রবৃত্তিটাও পাঁচ রকম সমস্যার মধ্যে পড়ে কমে গেছে, আর নানা কারণে দিকে দিকে নিরন্নের হাহাকারও বেড়ে গেছে।

তবে এখনকার লোকের যে দানের স্পৃহা আদৌ নেই তা নয়, আছে অবশ্যই, কিন্তু কমে গেছে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার জটিলতা ও প্রলোভনের প্রাবল্যের মধ্যে পড়ে সাধারণ লোক সকলে আপনাদের অভাব বোধ ও আকাঙ্ক্ষাকে এত বাড়িয়ে তুলেছে যে নিজের প্রাত্যহিক ব্যয় সঙ্কুলান করে তারপর অন্যের প্রতি দৃষ্টি দেবার সামর্থ্য থাকে না।

খুব বেশী অর্থ বা খুব বড় হৃদয় যাঁদের আছে তাঁরাই এখনকার দিনেও স্বেচ্ছায় অপরকে সাহায্য-দান করে দেওয়ার নিয়মটা বজায় রেখেছেন। (বাধ্য হয়ে দেওয়া বা প্রার্থীকে দু একটা পয়সা বা মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়ার কথা স্বতন্ত্র) কিন্তু এরূপ অবস্থার উন্নতি সাধন করতে ইচ্ছা করলে সকলকেই এ সব বিষয় বিশেষ বিবেচনা করতে হবে।

যার কাউকে তেমন কিছু দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার কছে এসেও যদি কেউ হাত পেতে দাঁড়ায় এবং এমন কোন আত্মীয় স্বজন যদি তার থাকে যার অবস্থা তার চেয়েও অস্বচ্ছল তা হলে আমার মনে হয় সুবিধা বা ইচ্ছা না থাকলেও সেই ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য বোধেও প্রার্থীকে যৎসামান্য দান করতে ও অভাবগ্রস্ত আত্মীয়কে কিছু সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। সংসারী লোকের মন প্রয়োজন হলে এ রকম দিতে যদি কখনো বিরক্ত হয় তা হলে মনকে শাসন করা আবশ্যক, কারণ এরকম বিরক্ত হওয়া তার অন্যায়। যারা প্রার্থী বা যাদের সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলে মনে হয়, তাদের এমন কিছু অসাধারণ কেউ দেন না যার জন্য দাতার আপনাকে যথেষ্ট বঞ্চিত করতে হয়। হতে পারে যেটা দান বা সাহায্য করা হয় সেটা থাকলে তাঁর একদিন বায়স্কোপ দেখা হ'ত বা বেশী হলে তা দিয়ে দুদিন কোনো সুখাদ্য গ্রহণ না হয় একখানা ভাল কাপড় কেনা চল্‌তো। সেটা হয় তখন হল না কিন্তু তার দরুণ দাতার এমন কোনো ক্ষতি ত হলনা অথচ অন্যের পরম উপকার হ'ল।

সুতরাং মন এতে বিরক্ত হ'তে পারবে কেন? তাই যদি তাকে হ'তে দেওয়া হয় তাহ'লে মানুষের মনুষ্যত্ব থেকে কি করে?

বরং নিজের সখ মেটাবার বা বাহুল্য জিনিষ কেনবার জন্য; সঞ্চিত করবার জন্য সাধারণতঃ স্বচ্ছল অবস্থার লোকেদের হাতে যে উদবৃত্ত অর্থ থাকে তা থেকে প্রতিমাসে যদি কিছু কিছু করে নিয়মিত দান করা হয়, যাদের অত্যন্ত অভাব এমন লোকেদের কিছু কিছু যদি দেওয়া যায় তাতে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তার মূল্য যে কোনো সখ মিটানোর চেয়ে কম নয়। আপনার মনকে যদি আমরা এই কথা বুঝিয়ে দিতে পারি তাহলে সেই বোঝবার শক্তির মধ্যে দিয়েই আমাদের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়।

ক্ষমতার অতিরিক্ত বা নিজেকে ও পুত্র পরিবার-বর্গকে বঞ্চিত করে যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার কথা আমি বলছিনা, এরকম দানের পরামর্শ বোধ হয় কেহ কাহাকে দিতে পারে না। যাঁরা স্বেচ্ছায় ঐ প্রকার দান করেন তাঁরা অসাধারণ মহৎ লোক তাঁরা আমাদের নমস্য।

তবে একটা কথা আমাদের সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক যে এ জগতে এসে যাঁরা, হাত তুলে দিতে পারে তারা ভাগ্যবান, যাদের হাত পেতে নিতে হয় তারা দুর্ভাগ্য।

দেওয়ার মত গৌরব নেই, নেওয়ার মত লজ্জা নেই। সেজন্য আমাদের সর্ব্বদা এই কথা মনে রেখে কাজ করা উচিত যে যখন যাকে যা দেব (পরিমাণ যেমনই হোক) তা যেন সম্পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়েই দিতে পারি। কাহাকেও সামান্য কিছু অর্থ বা দ্রব্য দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ বা বিদ্রূপ করে যেন যাকে দেব তার নেওয়ার লজ্জা আরও বাড়িয়ে না দিই এবং নিজের দেওয়ার গৌরবকে যেন ম্লান না করি।

বেদনা—তাহারই দেওয়া দান

শ্রীমতী প্রভা দেবী সরস্বতী

আমার কল্পনা মাঝে যবে প্রিয়, নেমে এসো তুমি,
ভুলে যাই সব আমি, ভুলে যাই স্বর্গ আর ভূমি।
মনে পড়ে একদিন উদেছিলে আমার গগনে
দৃপ্ত শশধর প্রায়, ধরা শুভ্র, উজ্জল কিরণে।
মনে পড়ে একদিন গেয়েছিলে অনন্ত সে গান,
ভাবি নাই কোনদিন সে সুরের হবে অবসান।
রাতি শেষে উদেছিলে পূরব আকাশে শুকতারা
তারপরে গেলে অস্তে, আমি হইলাম সর্ব্বহারা।
একদিন জীবনের পাত্র তব পরিপূর্ণ করি
ধরেছিলে ওষ্ঠে মোর; জলে তুমি রেখেছিলে ভরি
সেই নদী যাহা আজি ধূ ধূ করে, একবিন্দু বারি
বুকে নাই যার শুধু যেন হাহাকার শুনি তারি।
পথিক চলিতে পথে—হেরে নদী ছুটে জল আশে
তার তীরে, বুক তার ফেটে যায় দুরন্ত তিয়াসে।
আমার দুপাশে হেরি কত হাসি, কত খেলা গান
ছুটি যে উহার মাঝে হারাধনে করিতে সন্ধান।
ভুল যবে ভেঙ্গে যায়, হাসিবারে গিয়া কেঁদে ফেলি
দূরের পানেতে শুধু ক্লান্ত আঁখি রাখিয়াছি মেলি।
কোন পথে—কোন্‌খানে হারায়েছে আমার সকল,
আজ যত ভাবি তত হারাইয়া ফেলি মোর বল।
অসীম কাজের মাঝে আনমনা কখন চকিতে
হয়ে পড়ি জানি না গো; জেগে উঠি তখনি ত্বরিতে।
মনে হয় কোথা তুমি কোথা আমি, কত ব্যবধান
আমাদের মাঝে জাগে, আমি কোথা করিব সন্ধান
পথের সাথীরে মোর। সে গিয়াছে কোথায় হারায়ে
আমি তারে ডেকে চলি ক্লান্ত মোর দুবাহু বাড়ায়ে।
কে নিয়েছে তারে ডাকি, কে রয়েছে ব্যবধান মাঝে
জানি নি তাহারে আজও, চিন্তা মাঝে আর সর্ব্বকাজে
শুধু মনে হয় তারে, কোনখানে হারায়ে ফেলেছি
আজ ও তার আশা নিয়ে তবু আমি এ পথে চলেছি।
কুহেলী আবৃত সন্ধ্যা, দিন গেছে কখন চলিয়া,
অন্ধকার আসিতেছে কৃষ্ণপক্ষ শূন্যেতে মেলিয়া
অতি ধীরে ধীরে এই কোলাহলময় ধরা পরে।
রে বিহগী; ক্ষতে তোর ঝর ঝর রক্তধারা ঝরে,
ব্যথায় অবশ তনু,—উড়িবার শকতি কোথায়?
জ্বলিল সাঁজের তারা আকাশের একটী কোণায়
অতি ধীরে সঙ্গোপনে। ও বুঝি বুঝিলে ব্যথা তোর
ঢেলে দেয় সান্ত্বনা সে, এমনি ঢালিবে প্রাণ ভোর।
আজিকে নিশীথ রাতে গেয়ে যারে তোর শেষ গান,
এ ব্যথা নীরবে বুকে চেপে রাখ—ভাবি তার দান।

লক্ষহীরার লাখ টাকা

গল্প

শ্রীশ্রীশ চন্দ্র বসু বার-এ্যাট্-ল

(১)

—কে এসেচে, মিতা?

মিতার ভাল নাম কি তা জানা নাই; হীরা তাকে মিতা বলে ডাকৃত। হীরার অনেক পরিচারিকা ছিল কিন্তু মিতা ও গীতাই ছিল তাদের মধ্যে প্রধানা। হীরা এই দুজনকে তার কনিষ্ঠার মত দেখ্‌ত; আর তারাও হীরাকে তাদের জ্যেষ্ঠার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। হীরা ছিল নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণিকা। তার বিপুল ঐশ্বর্য্য; তার সুন্দর ও সুসজ্জিত বাসগৃহ ও তার পার্শ্বে একটি মনোরম উপবন বেষ্টিত স্বচ্ছ সরোবর, তার চারিধারে মর্ম্মর গঠিত সোপান ও বসিবার স্থান; নগরের একটি উপভোগের সামগ্রী ছিল। হীরা সুন্দরী, প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিলেও হীরাতে যৌবনের সকল সৌন্দর্য্যই পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল; এমন কি, হীরাকে স্থির-যৌবনা বললেও অত্যুক্তি হ'ত না। হীরার চরিত্রে তখন আর চপলতা ছিল না। চোখে প্রতিভার তীব্রতা ছিল, গভীর ভাবের অভিব্যক্তি ছিল, কিন্তু প্রথম-যৌবন-সুলভ বন-কুরঙ্গিণীর মত চঞ্চলতা ছিল না। হীরা প্রতি রাত্রে একজন মাত্র অভ্যাগতকে গৃহে স্থান দিত। তারা হীরার দ্বারে এসে একটি ঘণ্টা বাজালে মিতা বা গীতা এসে তাদের অভ্যর্থনা করত, ও সেই সময়েই রাত্রের জন্য পণ নির্দ্ধারিত হ'ত। এইদিন দ্বারে ঘণ্টা বাজলে মিতা আগন্তুককে অভ্যর্থনা করতে গেল ও তাকে নীচে অপেক্ষা করতে বলে হীরাকে সংবাদ দিতে এলো।

—কে এসেচে, মিতা?

—একজন ছোকড়া গোছের বাবু, নাম সুন্দর দাস, বাপের নাম দেবীদাস।

—দেবীদাস! দেবীদাস ত সম্প্রতি মারা গিয়েছে। সে ছিল নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক, কোটীটাকার উপর রেখে গিয়েচে। ছোকরা কত দেবে বল্‌চে?

—সে কিছু বল্‌লে না। বললে তোমার কাছে এসে নিজেই বলবে।

—কেন! যা তুই আবার যা।

মিতা যাচ্ছিল, হীরা তাকে ডেকে বল্‌লে—আচ্ছা থাক, তাকে নিয়েই আয়।

দেবীদাস ত জীবনে কখনও গণিকাগৃহে পদার্পণ করেনি। সে সকল সুখ, সকল সম্ভোগ প্রত্যাখান করে একাগ্রচিত্তে অর্থের আরাধনা করে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করে গিয়েছে। সে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী অবশ্যই ছিল সে নিজে। কিন্তু এখন সে নাই; তার উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত তাদের যারা অসীম পরিশ্রমে দেবীদাসকে উপার্জ্জনে সহায়তা করেছিল। সংহিতাকারেরা সব মূর্খ, তাই এক বাক্যে বলে, বাপের সম্পত্তি ছেলে পাবে। সন্তান তার পিতার সন্তান হবার জন্য কি চেষ্টা করেছে? আদরে ও আলস্যে পালিত ধনীর সন্তান তার পিতার উপার্জ্জনে কি সাহায্য করেছে যে সে তার পিতার সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হবে? এইতো তার পিতা মরতে না মরতেই, তার পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি পেতে না পেতেই, সুন্দরদাস হীরার দ্বারে এসে উপস্থিত। বিনা কষ্টে সে এখন কোটীপতি। তার কাছ থেকে বেশী পণ চাওয়ায় হীরার কোন বাধা নেই। মিতা এসে বল্‌লে—

—এসেচেন।

হীরা মুখ ফিরিয়ে দেখলে দ্বারে সুন্দরদাস। সুন্দরদাস বাস্তবিকই সুন্দর। দীপালোকে, দ্বারে দণ্ডায়মান সুন্দরদাসকে দেখে হীরার ভ্রম হ'ল বুঝি স্বয়ং অনঙ্গদেব সন্ধ্যাকালে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেচেন। হীরা

চমকে উঠল, তার তুষার-শীতল হৃদয় ক্ষণিকের জন্য যেন স্পন্দিত হ'ল কিন্তু তখনই সংযত হ'য়ে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—

—তুমি শ্রেষ্ঠী দেবীদাসের ছেলে সুন্দরদাস? কি মনে করে?

সুন্দরদাস লজ্জাবনত মুখে উত্তর দিল—

—এসেচি……

—এসেচোত এসো, এইখানে বোসো।

সুন্দরদাস বসলে; হীরা জিজ্ঞাসা করলে—

—কি দেবে মিতাকে বলনি কেন? এসব নীরস কথার আলোচনা আমি নিজে করি না; ওরাই করে। আমার মুখে ইতর দোকানদারীর পরিবর্ত্তে প্রেমের মিষ্ট আলাপনই তোমার উপভোগ্য হবে। যাক্ মিতাকে যখন বলনি, এখন আমাকেই বলো কত দেবে?

এই সময় মিতা ও গীতা স্বর্ণপাত্রে নানারূপ আহার্য্য ফল ও পানীয় এনে সুন্দরদাসের সম্মুখে রাখল। হীরা যত্ন করে খাওয়াইল। আহার ও পানান্তে সুন্দরদাস বলল—

হীরা, পণের কথা তবে কেন আলোচনা করচ। বাস্তবিকই দেনাপাওনার দোকানদারী তোমার মুখে বা তোমার কাছে শোভা পায় না। জানত আমি এখন আমার পিতার সম্পত্তি পেয়েচি; তোমার উপযুক্ত পুরস্কারই দেবো, কৃপণতা করব না। কিন্তু হীরা, তোমায় মূল্য দিয়ে আমার মুহূর্ত্তের কামনা তৃপ্তির জন্য তোমার কাছে আসেনি। ঐ বাতায়নে তোমায় যেদিন প্রথম দেখি সেই দিন থেকে তোমার জন্য আমি উন্মাদ!

—আমার জন্য তুমি উন্মাদ! কেন? আমাতে তুমি কি দেখেছিলে?

—দেখেছিলাম তুমি অসাধারণ সুন্দরী, এক অপরূপ নারী, আমার কল্পনা-প্রতিমা। ইচ্ছা হয়েছিল তোমাকে দেখি, তোমার সঙ্গে কথা কই, তোমার অন্তরে যে অফুরন্ত সুধার নির্ঝরিণী প্রবাহিত হচ্ছে,—তোমার সঙ্গে মিষ্ট আলাপনে, তোমার ঐ বিম্বাধর চুম্বনে, তোমার কোমল বাহু বেষ্টিত আলিঙ্গনে, সেই সুধা আকণ্ঠ পান করে বিভোর হয়ে থাকি। হীরা, এই আশায় আজ তোমার কাছে এসেচি। এ সময়ে হীন অর্থের আলোচনা করো না। আমাকে বিশ্বাস করো, অনুতপ্ত হবে না। তোমাকে পাবার জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব দান করতে পারি।

হীরার অধরপ্রান্তে যেন অবিশ্বাসের ঈষৎ হাসি দেখা দিল। কিন্তু অন্তরে তার সুন্দরদাসের কথাগুলি যেন অমিয় বর্ষণ করছিল। কামনা-পীড়িত, পানোন্মত্ত অনেক অভ্যাগতের মুখেই হীরা এরূপ অনেক কথা পূর্ব্বে শুনেছিল; কিন্তু সে সব কথা তার কানেই গিয়েছিল মাত্র, হৃদয়ে কখনও প্রবেশ করেনি। কেউ কখনও হীরার প্রাণের সাড়া পায়নি। হীরা জানত তার হৃদয় বলে কোন দ্রব্য নাই, এবং জীবনে কখনও সে তার কোন উপদ্রবই অনুভব করেনি। তবুও, হীরা বারবনিতা, লোকের মনোরঞ্জন করাই তার জীবিকা, সুতরাং সে কর্ত্তব্য হীরা অতি যত্নেই পালন করতো। কথোপকথনে হীরা ছিল অতি মিষ্টভাষিণী ও তার ব্যবহারে তার প্রণয়ীরা মোহিত হ'ত বই কখনও ব্যথিত হ'ত না। কিন্তু সে মিষ্ট হাসি, সে মধুর ভাষা সুধু মুখের মাত্র, মনের নয়; এবং এই মর্ম্মহীন অভিনয়ে হীরা অন্তরে আঘাত পেত বই কখনও সুখী হ'তো না। কিন্তু গণিকা হলেও হীরা মানুষ; অজ্ঞাত ভাবে তার শরীরেও প্রবৃত্তির পীড়ন ছিল, অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ছিল। এ সব বৃত্তির তৃপ্তিসুখ হ'তে হীরা বঞ্চিত হবে কেন? গণিকা বলে? সে যে আজ গণিকা সে কি তার দোষ? সে একজন দীনা গণিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল, পঙ্কে পদ্ম ফুল ফুটেছিল। উন্মেষমুখ যৌবনে সে একটি ভগ্ন কুটিরে বাস করত, নিজের ও তার রুগ্না মাতার জীবনধারণের জন্য রুক্ষ কেশে মলিন বেশে নদী-তীরের মাঝি-মাল্লাদের কাছে, বাজারে কুলি মজুরদের কাছে যৎসামান্য অর্থপণে হীরা আত্মবিক্রয় করতো। এই তাদের বংশগত ব্যবসা; তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তার মা তাকে এই জীবনেই দীক্ষিতা করেছিল। সে কি হীরার দোষ? দেশে রাজা ছিল, নগরে ধনী ছিল, শাস্ত্রবিদের ও সমাজ সংস্কারকের অভাব ছিল না কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন

মহাজন সেই—অপ্সরানিন্দিতা বালিকাকে তার অবশ্যম্ভাবী ঘৃণ্য জীবন থেকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, উদ্যোগ করেছিলেন? অতি সামান্য অর্থেই যে রুগ্নার পথ্য জুট্‌তো, বালিকার জীবিকানির্ব্বাহ হ'তো। কিন্তু সে চেষ্টা, সে অনুষ্ঠান করবে কে? করবে কেন? সমাজের সকল নেতাই ত পুরুষ। পুরুষ চরিত্রে যে জন্মগত এক পশুত্বের বা পুরুষত্বের প্রভাব আছে তার প্রকৃতিই যে বহু স্ত্রীগামী। জগতে যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক তাহা এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় এবং তাই পুরুষ তার প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তির পূর্ণ বেগ ধারণের জন্য স্বতঃই একাধিক স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করে। এবং সেই জন্যই গণিকাকে স্থাপন করাই পুরুষের স্বার্থ, তাদের উদ্ধার বা উচ্ছেদ করা নয়। এই সত্যেরই উপর স্বর্গের রম্ভা, মেনকা উর্ব্বশী থেকে মর্ত্ত্যের বালিকা হীরা পর্য্যন্ত সকল দেশে সকল গণিকাই আবহমানকাল দণ্ডায়মান। নীতিশাস্ত্র সংযম শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতি-প্রতিকূল সে শিক্ষা জগতে কয়জন গ্রহণ করতে পেরেচেন? যারা পেরেচেন তাঁদের মধ্যেই বা কয়জন হীরাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন? হীরাকে সুধু তার রুগ্না গর্ভধারিণীর বক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন করলে, তার দরিদ্র গণিকা গৃহের দূষিত বায়ু হ'তে স্থানান্তরিত করলেই যথেষ্ট হ'তো না, হীরার উদ্ধার হ'তো না। হীরা তখন যৌবনে পদার্পণ করেচে, তার বৃত্তির তৃপ্তি আবশ্যক, তাকে উদ্ধার করতে হলে তার বিবাহ আবশ্যক। কয়জন নীতিজ্ঞ হীরার জন্ম জেনে তাঁদের পুত্রের সঙ্গে হীরার বিবাহ প্রস্তাব করেছিলেন? অন্য কোন গণিকা বালিকার এ সুযোগ হয়েছিল কিনা জানা নাই; কিন্তু অভাগিনী হীরার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটেনি। তাই সে আযৌবন গণিকার প্রেমহীন জীবন ভার বহুকষ্টেই আজ অবধি বহন করে এসেছিল; এবং তাই বুঝি আজ সুন্দরকান্তি সুন্দরদাসের সুমিষ্ট কথাগুলি হীরার প্রাণের কোন এক অজানা তারে এক মধুর ঝঙ্কার করেছিল। কিন্তু ব্যবসা হীরার প্রাণ নিয়ে নয়, প্রাণের ধার সে জীবনে কখনও ধারেনি। তাই সুন্দর দাসের কথাগুলি শুনতে খুব প্রীতিকর হলেও তার তত বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছিল না। সে সুন্দর দাসের কথা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলে—

—তুমি কি সত্যই আমাকে অত ভালবাসো?

—যত বলেচি তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসি। তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে কেন এসেচি,—এসেচি এই কথাগুলি বলতে।

—তোমার বাসনা ত অতি সহজেই তৃপ্ত হতে পারে, সুন্দরদাস; আমি ত তোমাকে ফিরে যেতে বলিনি। কেবল পণের কথাটা প্রথমে ধার্য্য করে নাও।

—তুমি কত চাও বলো?

—এক লক্ষ টাকা।

—এক লক্ষ টাকা!

হীরা সুন্দরদাসের কথা যেন না শুনেই বল্‌লে—

—তোমার প্রেমব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সকল উপকরণই এখানে আছে। চেয়ে দেখ কি সুন্দর এই প্রমোদ আগার, ঐ দেখ ঐ কক্ষে কত কারুকার্য্য খচিত কুসুম কোমল শয্যা, তারপর...আমি। তুমি ত বলেচ আমি সুন্দরী। আমার চোখে উন্মাদনা শক্তি আছে, অধরে সুধা আছে, প্রাণে প্রেম আছে···

—কিন্তু···এক লক্ষ টাকা! এ যে অসম্ভব। অন্যের কাছে তো তুমি এর শতাংশের একাংশও চাওনা। আমার কাছে একলক্ষ কেন চাও?

—কেন চাই? তুমি আমাকে ভালবাসো বলে, আমি তোমার কল্পনা প্রতিমা বলে, আমাকে নিয়ে তুমি স্বর্গসুখ পাবে বলে। অন্যের কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনেক কম নি। কিন্তু আমি তাদের কি? ক্ষণিকের কামনা নিয়ে আমার কাছে তারা আসে ক্ষণিকের পরে চলে যায়। যদি তোমার কথা সত্য হয় ত আমাকে পেলে তোমার যে আনন্দ সে তুলনায় তাদের ক্ষণিকের তৃপ্তির দাম কি? তারপর, সুন্দরদাস, তুমি এখন কোটিপতি তুমি বলেচ আমাকে তোমার সর্ব্বস্ব দান করতে পারো, তার তুলনায় ত এক লাখ টাকা অনেক কম।

—এক হাজার টাকা নাও।

—না।

সুন্দরদাস উঠল ও ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে যাচ্ছিল; হীরা বলল—

—কেন মিছে যাচ্ছ, সুন্দরদাস, আবার ত ফিরতে হবে।

—আচ্ছা, আমি দশ হাজার টাকা দিচ্ছি···

—না।

—তবে আসি; নমস্কার—

২

রাত্রি প্রভাত প্রায়। হীরার চোখে নিদ্রা নাই। দুগ্ধফেননিভ শয্যা আজ তার কাছে কণ্টকময়। সুন্দরদাস ফির্‌ল না; চিরবিজয়ী হীরা বুঝি আজ তার কাছে পরাজিতা। এই দুশ্চিন্তা তাকে অস্থির কর্‌ছিল। লক্ষ টাকা চেয়ে সে কি অন্যায় করেচে? সে যে কত ভালবাসা দেখিয়েছিল, তার সর্ব্বস্ব দান করতে পারে বলেছিল। তবে কি সেও মিথ্যাবাদী? অন্য পুরুষের মত সেও কি ক্ষণিকের তরে তার মন পাবার জন্য কতকগুলো অসার মিথ্যাকথা বলে গিয়েছে? ভাবতে ভাবতে হীরার একটা কথা মনে এলো; তবে কি সুন্দরদাসের তাকে পছন্দ হয়নি, দূর থেকে যা দেখেছিল কাছে এসে সে কি সে তা পায়নি? তবে কি হীরার রূপের হার হয়েছে, সৌন্দর্য্যের অবসান হয়েছে? আর কি তার মুখে মোহিনী শক্তি নাই, চোখে উদ্দিপনাভাব নাই? হীরা কি আর সে হীরা নাই? আছে কেবল তার কঙ্কাল অবশেষ? তাই কি যা আযৌবন তার একদিনও ঘটেনি আজ তার তাই ঘটেচে, তার কুসুম শয্যায় আজ সে একা! হীরা বেগে শয্যা পরিত্যাগ করে, আলুথালু বেশে, একটি বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। হীরা দেখল যেন সম্মুখে তার এক অর্দ্ধ বিবসনা অপূর্ব্ব অপ্সরা মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তার সুগঠিত স্বর্ণকান্তি দেহতরু, কুঞ্চিত কৃষ্ণ বর্ণ কেশরাজী, মোহন মুখমণ্ডল, উন্নত নাসিকা, বিলোল নয়ন, পিনোন্নত পয়োধর, ক্ষীণ কোটি, গুরুভার নিতম্ব দেখে হীরা আপনার রূপে আপনি মোহিত হইল। আর রোষে দর্পে বলল, সুন্দর দাস, তুমি দুর্ভাগ্য তাই তুমি এই অসামান্য রূপরাশি উপভোগ করতে পেলে না। ব্যর্থ প্রেম হীরার উত্তেজনার কারণ নয়; সে প্রেম অভিনয়ই করে এসেছে, অনুভব কখনও করেনি। তার অন্তরের অন্তস্থলে যে প্রেম ছিল না একথা বলা যায় না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে এমন কারও সাক্ষাৎ পায়নি যে তার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যে গভীর প্রেমরাশী নিদ্রিত ছিল তা জাগাতে পারে, তার ঘন তুষারাবৃত প্রেমসিন্ধু মাঝে প্রলয় উপস্থিত কর্‌তে পারে। তবে হীরার আজ এ যন্ত্রনা কেন? তার আত্মশ্লাঘায় আঘাত লেগেচে বলে। সুন্দরদাস তাকে উপেক্ষা করেচে, তার সৌন্দর্য্যের অপমান করেচে, অভিমানিনী হীরার তাই এত যন্ত্রণা। কিন্তু এ জগতে সকল যাতনারই অবসান আছে; তাই যখন প্রত্যুষের স্নিগ্ধ বায়ু কক্ষ মধ্যে বহিতে লাগিল হীরা নিদ্রা দেবীর স্নেহময় ক্রোড়ে সকল বেদনা থেকে শান্তি পেল। যখন মিতা এসে তার ঘুম ভাঙ্গালো তখন অনেক বেলা হয়েচে। মিতা যেন কি একটা অপ্রিয় সংবাদ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরার সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় ও অনিদ্রায় মুখে ক্লান্তি ও শরীরে অবসাদ দেখে বলতে সাহস পেলে না।

—কি বলতে যাচ্ছিলি, বলনা।

—দিদি, শুনলুম কাল রাত্রে সুন্দরদাস কুসুমের কাছে গেছলো, আর, বাড়ী যাবার সময় তাকে এক-লাখ টাকা দিয়ে গেছে; আবার বলে, গেছে যে—যে চায়না সেই পায়, যে চায় সে পায়না।

হীরা চমকে উঠল। বিস্ময়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। হৃদয়ে তার শত বৃশ্চিক যেন এক সঙ্গে দংশন করল। কুসুমকে এক লক্ষ টাকা দিয়েচে! কুসুমকে! সে কে? সে কি? কৃষ্ণা, খর্ব্বা, স্থুলাঙ্গী, জীর্ণ কুটিরে বাস, ইতর লোকের সঙ্গে সহবাস! কুসুমকে! এ যে হীরার প্রতি দ্বিগুণ অপমান! হীরাকে লক্ষ টাকার যোগ্য মনে করেনি; তখনি আবার সেই টাকা এমন একজনকে দিয়েচে যে হীরার পায়ের নখের যোগ্য নয়! পুরুষের একি প্রকৃতি! কোন পুরীষ-পঙ্কে পুরুষের সৃষ্টি যে সে সুখতপ্ত কুসুমশয্যায় এক অপ্সরীর প্রেমালিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করে

[কুসুমে]রের মত পূতিপঙ্ক হ্রদে নিমজ্জিত হয়ে স্বর্গ সুখ উপভোগ করে! হীরা হিংসায় উন্মত্তা হল। কিন্তু সে একথা ভাবল না যে কুসুমের মত কুশ্রী না হ'লেও সেও একদিন কুসুমেরই মত জীর্ণ ভবনে মলিন বসনে ইতরের সঙ্গ করত। আজ হীরার সে দিন নাই; নিজের প্রতিভা বলে সে আজ গণিকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেশে গণ্যমান্য সকলেরই পদধূলি হীরার গৃহে পড়ত। এবং তাঁদেরই সঙ্গ আলাপনে হীরার জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ হয়েছিল। আর যেদিন দেশের রাজা হীরার সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য স্বরূপ দুটি ময়ূর উপহার পাঠিয়েছিলেন সেই দিন থেকে হীরার অভিমানের আর সীমা ছিল না। তাই আজ হীরা বুঝল না যে নিজের মূল্য নিজে বাড়াতে যায় জগতের চোখে সে তা লঘু করে মাত্র। কিন্তু হীরা ভাবল সুন্দর দাস যদি কুসুমকে লক্ষ টাকা দিয়ে থাকে ত সে টাকা সে হীরাকে দিলে না কেন? লক্ষ টাকা চেয়ে কি হীরা অন্যায় করেচে? জগতে যে দ্রব্যের মূল্য বেশি করে নির্দ্দিষ্ট হয় ধনী ত তাই কিনে নিজের অভিমানের তৃপ্তি সাধন করে। কেনই বা আবার হীরাকে লক্ষ্য করে বলে গেলো—"যে চায় সে পায় না?" এ গভীর প্রহেলিকার মীমাংসা করতেই হবে। অস্থির অসংযত প্রাণে কয়ে উঠ্‌লো,—"এর মীমাংসা করতেই হবে।" এই সময় হীরা বাতায়ন দিয়া দেখল সুন্দরদাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। হীরা একবার তাকে ক্ষীণ স্বরে ডাকল ও তখনই নেমে গিয়ে আবার ডাকল—

—সুন্দরদাস! কোথা যাচ্চ?

—এমন কোথাও নয়।

একবার ভিতরে এসো।

—না।

হীরা তার কথায় আরও মধু মিশিয়ে, অপাঙ্গে অনঙ্গের তীব্রতম বাণ সংযোজন করে, তার কোমল হস্তে সুন্দরদাসের হস্ত ধারণ করে বল্‌লে,—রাগ কোরো না, এসো।

সুন্দরদাস ধীরে হাতটি ছাড়িয়ে নিচ্ছিল, হীরা আবার বলল—

—তবে কি তুমি আর আমায় চাও না, প্রিয়? আর, আমায় ভালবাসো না?

—না।

—কেন? লাখ টাকা চেয়েছিলাম বলে? কিন্তু, প্রিয়তম, সে টাকা ত তুমি কাল রাত্রেই অন্যত্র দিয়ে গিয়েছ। আমি তার জন্য হিংসা করি না, সে নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি সুন্দরী হবে।

—তুমি তার চেয়ে শতগুণ বেশি সুন্দরী।

—তবে তুমি আস্‌তে চাইচ না কেন?

—আমার ইচ্ছা নাই, তাই।

—আমি বুঝ্‌তে পেরেচি আমি লাখ টাকা চেয়েছিলাম বলে তোমার মনে কষ্ট হয়েচে। ছাখো, আমার ঐশ্বর্য্য অলঙ্কার, যা না হলে তোমাদের আমাকে মনে ধরবে না, এ সব অনেক দাম দিয়ে কিন্‌তে হয়। এ সবের জন্য আমার টাকার আবশ্যক। থাক, আমি লাখ টাকা চেয়েচি, তুমি চলে গেছো—এর মধ্যে কে দোষী, কে নির্দ্দোষ এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না। যা নিজেই দিতে চেয়েছিলে তাই দিও, তুমি এসো।

—না।

—কেন?

—কেন, কিছুই নয়; দেরী হচ্চে, বাড়ী যাই।

তখন হীরা আকুল নয়নে সুন্দরদাসের উত্তরীয় ধরে বল্‌লে—

—কেন এ পরিবর্ত্তন? কি হয়েচে? আমার নামে তোমায় কে কি বলেচে? তুমি যে কালরাত্রে কত কথা বলেছিলে? এত শীঘ্র সে সব কথা ভুলে গেলে? কি হয়েচে আমাকে খুলে বলো।

—তবে ক্ষণিকের জন্য চলো, বলচি।

হীরা যেন হাতে স্বর্গ পে'লে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সুন্দরদাসকে তার গৃহে নিয়ে গেল। কিন্তু সুন্দরদাস হীরার অনেক আদর অভ্যর্থনা স্বত্বেও তার প্রমোদ আগারে উঠ্‌ল না, নীচেই বসল। হীরা অস্থির অন্তরে বল্‌লে।

—বলো।

—সখিসোনা আর রেবতীর গল্প জান?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। একজন কবি ঐ দুজনের নামে একটি কবিতা লিখে আমাকে শুনিয়েছিলেন। সখিসোনা আর রেবতীতে খুব ভালবাসাবাসি ছিল। সখিসোনা বাণিজ্য করতে গেলো, আর রেবতী তার জন্য বাড়ীতে বসে কাঁদতে লাগলো। একদিন একটা চিল্ এসে তার মাথা থেকে একটা খোঁপার কাঁটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো। কাঁটায় হীরা মুক্ত বসানো, এমন কাঁটা কেউ কখনও দেখেনি। দেশের রাজা একদিন সভা করে বসে আছেন; এমন সময় সেই কাঁটাটি সেইখানে চিলের মুখ থেকে পড়লো। রাজা ত হীরার ফুল বসানো কাঁটা দেখে বড় আশ্চর্য্য হলেন, আর মন্ত্রীকে বল্লেন, কার এমন মাথায় ফুল খোঁজ করো। রেবতী গিয়ে বল্লে সেটি তার ফুল। রাজা রেবতীকে দেখে মুগ্ধ হলেন আর তার খোঁপায় সেই হীরার ফুল কাঁটাটি পরিয়ে দিয়ে বললেন—এ ফুল তোমারই মাথার উপযুক্ত, আমাকে তুমি বিয়ে করবে? রেবতী বললে—"না, আমি যাকে বিয়ে করবো সে বাণিজ্য করতে বিদেশে গেছে।" রাজা কি করবেন, বড় দুঃখিত হয়ে রেবতীকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এই ত সখিসোনা আর রেবতীর গল্প।

—এ গল্পের আরও আছে, তোমার কবি বোধ হয় জানতেন না। বলি শোনো। রেবতী বাড়ী ফিরে আসবার দিন কয়েক পরে খবর পেলে যে সখিসোনা বিদেশে বিয়ে থা করেচে, বউকে নিয়ে সেখানে ঘর-সংসার করচে। এই শুনে রেবতীর বুক ভেঙ্গে গেল; দিন কতক খুব কান্নাকাটী করলে। তারপর ভাবলে, কেবল কাঁদলে কি হবে, রাজা বিয়ে করতে চেয়েছিল, তার কাছে যাই। রাজার কাছে যখন গেল, রাজা ভাল করে কথা কইলে না, যেন চিনতেই পারলে না। তারপর রেবতী তার মাথার কাঁটার গল্প যখন মনে করিয়ে দিলে তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কি চাও?" রেবতী বল্লে, "আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।" রাজা মুখ ফিরিয়েলে,—"না লব।" রেবতী জিজ্ঞাসা করলে—"কেন? আমার মাথায় হীরার ফুল পরিয়ে আমাকে ত বিয়ে করতে চেয়েছিলে?" রাজা বল্লে, "আমার এখন মত বদলে গেছে; এখন আর আমি হীরের ফুলওলা মেয়ে পছন্দ করি না, রূপোর ফুলওলা মেয়ে ভালবাসি।"

হীরা বল্লে

—এ গল্পের মানে বুঝতে পারলুম না।

—এর মানে মানুষের মন একটি অদ্ভুত পদার্থ; ধরতে যাও পালাবে, নিজে পালাও ধরতে আস্‌বে। সুতরাং ধরবার সুযোগ পেলে ছাড়বে না। মানুষ আজ যা আনন্দের সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে করে, কাল হয়ত সে সেকথা ভাবতেও শিউরে ওঠে।

এই বলে সুন্দরদাস চলে গেল; হীরার দিকে একবার চাইলেও না।

৩

নগরে একজন পণ্ডিত ছিল, লোকে তাকে বল্‌ত—পাগলা পণ্ডিত। পণ্ডিত পাগলা হলেও পণ্ডিত ছিল। অনেকেই তার কাছে বিপদে পড়লে পরামর্শ করতে যেত। হীরা গণিকা হলেও পণ্ডিতের তার উপর ঘৃণা ছিল না, বরং সুন্দরী বলে তাকে শ্রদ্ধাই করত। একদিন পণ্ডিত তার চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে এমন সময়ে হীরা গিয়ে উপস্থিত। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলে—

—কি হীরা, কি মনে করে? কিছু পরামর্শ আছে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি সম্বন্ধে?

—প্রেম সম্বন্ধে।

কথা শুনেই পণ্ডিত লাফিয়ে উঠলো—

—কি সর্ব্বনাশ! প্রেম-সম্বন্ধে! শাস্ত্র সব বিষয়ের বিচার করতে পারে কেবল প্রেম সম্বন্ধে নয়। বরং হীরা যদি জিজ্ঞাসা করতে আস্‌তো, এ বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আত্মা কিরূপ পদার্থ? কোন অজ্ঞাত ধারায় এ বিশ্ব প্রবাহিত হচ্ছে? তা হলে বরং যুক্তি, তর্ক, বিচার, মীমাংসার দ্বারা তোমার প্রশ্নের কতকটা উত্তর দিতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু প্রেম! এর বিশ্লেষণ আমার

অসাধ্য। প্রেম সম্বন্ধে শুধু এই কথাটি জানা আছে যে জগতের মধ্যে প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বনিকৃষ্ট পদার্থ। একে ধরতে যাও পারবে না। যখন মনে করেছ ধরেচি তখন দেখবে প্রেম অনেক দূরে; আবার যখন মনে করেছ যে প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেচ তখন দেখবে তুমি তার পূর্ণ কবলে……

এই বল্‌তে বল্‌তে ব্রাহ্মণ উত্তেজিত হয়ে বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌তে লাগলো—

প্রেম হীরা? প্রেমেই মনুষ্যত্বের ভিত্তি। এই অপরিজ্ঞাত শক্তি দেবতার অপেক্ষাও শক্তিমান। কেননা দেবতারাও প্রেমের পদতলে পরাজিত। প্রেম সকলের প্রতি সমভাবে তার প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী বা নির্ধন, সুরূপ বা কুরূপ প্রেমের চক্ষে এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই; সকলেই সমভাবে ভালবাসার দাস। প্রেম, হীরা! এই অপরিজ্ঞেয় প্রহেলিকা জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বিচার বুদ্ধি ব্যর্থ করেচে; কিন্তু আবার যারা তর্ক বিচার পরিত্যাগ করে, অন্ধ হয়ে, প্রেমের পদে আত্মসমর্পণ করেচে—এ বিশ্বের অনিবার্য্য স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েচে, প্রেম আপনার হৃদয় খুলে তাদের নিত্য নূতন সুখে তাদের চিরজীবনের জন্য মগ্ন করে রেখেচে। প্রেম, হীরা! ……কিন্তু যাক্, এসব মীমাংসার চেষ্টা বৃথা। কি পরামর্শের জন্য এসেচ, বলো।

যে ভালবাসে না তাকে কি করে ভালবাসাতে হ'বে, তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেচি।

—যাকে পুরুষ ভালবাসেনা তার প্রতি সে পুরুষের অন্তর সাগরের ন্যায় গভীর, প্রস্তরের ন্যায় কঠিন। অসম্ভবের অনুসরণ করে সময় নষ্ট করো না। এ পৃথিবীতে সুখী হবার সময় অতি অল্প; যদি তাকে ভালবেসে থাকো তাকে ভোলবার চেষ্টা করো।

—আমি তাকে ভালবাসি না।

—তা হলে তোমার কি এলো-গেলো?

—আমি চাই সে আমাকে ভালবাসুক।

—তা হলে তোমায় তাকে ভালবাসতে হবে

—না, কখনও না

—দর্শন-শাস্ত্র স্ত্রীলোকের বুদ্ধি নিয়ে প্রস্তুত হয়নি। আমার কথা না শুনবে ত আমার কাছে এসেচ কেন? যাও, তোমাদের ঠাকুরদের দোর ধরগে। অসম্ভবকে সম্ভব করা ঠাকুর দেবতারাই পারে।

হীরা রোষে পণ্ডিতকে পরিত্যাগ করে চলে গেল। পথে যেতে যেতে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লো—"সাধে পণ্ডিতটাকে লোকে পাগ্‌লা বলে, কিছু জানে না। আমি তাকে ভালবাসিনে, বাসিনে, বাসিনে; তাকে ভালবাস্‌বো না, বাস্‌বো না, বাস্‌বো না। আমি তাকে ভালবাস্‌বো, পাগল আর কি! সে আমাকে অপমান করেচে, তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবো। কিন্তু কি করি, কার পরামর্শ নি?" পাগলের মত এই সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ী এসে মিতা ও গীতাকে ডেকে বল্‌লে—

—পণ্ডিতটা কিছু না, বলে, তাকে ভাল্‌বাস্‌তে হবে। তোরা কিছু জানিস্ কি করে ভালবাসাতে হয়?

—আমাদের দেশে, দিদি, একটা তুক্ আছে। যখন পুরুষ রাস্তা দিয়ে চলে যাবে তখন তার পায়ের দাগের উপর পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে চল্‌লে সেই পুরুষ তোমার কাছে তখনই চলে আস্‌বে, তোমাকে ভালবাস্‌বে।

—কপ্পার কথা!

—তবে পাগলা পণ্ডিত যা বলেচে তাই করো, তাকে ভালবাসো।

—পাগলা হয়েচিস মিতা। আমি তাকে ভালবাসবো! ছি!

হীরা ভালবাস্‌বে! সে যে গণিকা, সে কি কখনও পুরুষকে ভালবাস্‌তে পারে? হীরা আযৌবন এই ত দেখেচে, এই ত জেনেচে যে পুরুষ কেবল তার কাছ থেকে আপনার ঐহিক বাসনার তৃপ্তি চায়। তাদের কাছে ত হীরার গৃহ এক পণ্যবীথিকা মাত্র যেখানে অর্থপণে, মিথ্যার আবরণে, তারা কেবল হীরার কাছ থেকে তার ক্ষণিকের প্রণয় কিন্‌তে আসে। সে ব্যবসায়ে ত কখনও কারও সঙ্গে হীরার হৃদয়ের বিনিময় হয়নি। তবে এই রোষ, এই হিংসার অন্তরালে কোথা

হ'তে হীরার কণ্ঠে আজ মধুমাখা আলাপন এসেচে? কোথা হ'তে আজ এক অসীম কোমলতা ধীরে ধীরে তার হৃদয় হ'তে উত্থিত হয়ে নয়নের অবিরল নীরে পরিণত হচ্চে। কবিগণ হীরার কাছে প্রেমের অনেক গুণই কীর্ত্তন করেছেন, কিন্তু সে গান ত হীরার প্রাণে কখনও প্রবেশ করেনি। তথাপি হীরা সুন্দরদাসকে সুন্দর দেখেছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও তার অধরসুধা পান করবার জন্য হীরার বাসনা হয়েছিল, তার সুকোমল বাহুযুগলে সুন্দরের বলিষ্ঠ দেহকে বেষ্টন করতে, তার দেহ সুরভি আঘ্রাণ করতে, তার স্পর্শ সুখে বিভোর হতে হীরার প্রাণে ধীরে ধীরে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌ছিল। উপেক্ষায় উন্মত্তা হীরা একথা বোঝেনি যে রোষ, ঘৃণা, অভিমান প্রেমেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র, একথা সে ধারণা করতে পারেনি যে অজ্ঞানিত ভাবে সে আজ প্রেমের পদতলে আপনাকে পূর্ণভাবে বলি দিতে বসেচে।

৪

প্রেম কল্পনার খেলা, তাই প্রেমের দেবতা অনঙ্গ। মানুষের বাসনা কামনা সবই কল্পনার দাস। কোনও কার্য্যে সুখের কল্পনা কমাইয়া দাও সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য কামনাও কমিয়া যাইবে; বাড়াইয়া দাও, বাসনা আরও বাড়িবে। স্ত্রী ও পুরুষের হৃদয়ে পরস্পরের জন্য যে এক চিরন্তন প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত রয়েচে, সে কেবল তাদের মিলন-সুখের কল্পনায় মাত্র। এ বিশ্বের কেন সৃষ্টি? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে চোখ চেয়ে দেখ্‌লে এই প্রতীত হয় যে স্থিতির বিধি লয়েই এই বিশ্বের সৃষ্টি। মিলনই এই স্থিতি-বিধির মূল। কিন্তু মিলনে আনন্দ না থাকলে সৃষ্টজন মিলবে কেন? মধুবিনা মধুপ আসবে কেন? তাই বুঝি স্রষ্টা কুসুমে আসব দিয়েছেন, মনুষ্য হৃদয়ে মিলন সুখের কল্পনা সৃষ্টি করেছেন, মিলনে আনন্দের বিধান করেছেন। মিলন সুখের এই কল্পনা, এই আকাঙ্ক্ষাই প্রেম, প্রণয়, স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা। হীরা সুন্দরদাসকে ভেবে, তার উপর রাগ-অভিমান করে একটা অজ্ঞাত সুখের পূর্ব্বাভাস পাচ্ছিল। সেই কল্পনা, সেই অপরিজ্ঞাত সুখের বাসনাই তার প্রেম ও সেই প্রেম তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন কর্‌ছিল, তাকে গ্রাস কর্‌ছিল। সন্ধ্যার সময় বাতায়নে দাঁড়িয়ে, আকাশ পানে চেয়ে, সে কাতর কণ্ঠে ভগবানকে ডাকল; "ভগবান, আমি আযৌবন পরকেই সুখী করে এসেছি, নিজে কখনও সুখী হইনি। আজ আমি সুখের পিপাসী, আমাকে বঞ্চিত করো না, সুন্দরদাসকে এনে দাও।" হঠাৎ দিগন্তে মেঘ গর্জ্জে উঠল, যেন দেবতা বজ্রনিনাদে বলল, তথাস্তু। হীরা চমকে মুখ ফিরালে ও দেখল দ্বারে সুন্দরদাস,—নীরবে অবিচলিত নেত্রে হীরাকে নিরীক্ষণ করচে। হীরার বিস্মিত নেত্রে আনন্দের উৎস ফুটে উঠল, বলল—

—তুমি!

—আমাকে ডেকেচ কেন?

—প্রিয়তম, আমি অপরাধ করেচি, আমাকে মার্জ্জনা করো। আমি বুঝতে পেরেচি আমারই দোষ; কিন্তু কি করবো বল, লোকে আমায় আদর দিয়ে, মাথায় তুলে আমাকে নষ্ট করেচে, আমার অভিমান বাড়িয়ে দিয়েচে; তাই আমি সব সময় নিজের ন্যায়-অন্যায় বুঝ্‌তে পারি না। যাক্, সে সব কথা ভুলে যাও। এসো, আমাকে আদর করো, আলিঙ্গন করো।

—এই জন্যই কি আমাকে ডাকিয়েচ?

—আর কিসের জন্য, প্রিয়? মনে হয় বুঝি তোমাকে ভালবেসেচি। ভাবো দেখি এতে কত সুখ। প্রথমে এসেছিলে তোমার প্রাণপূর্ণ প্রণয় দিতে, আমার ভালবাসা প্রত্যাশা করনি। আজ, আমি তোমাকে ভালবেসেচি, তোমার জন্য উন্মাদ হয়েচি। দ্যাখো, এই প্রমোদ আগার কত ফুলে সাজিয়েচি, ঐ দ্যাখো তোমার জন্য বেল ফুলের মালা, যার গন্ধ বিরহী অন্তরে মিলনের সুখ জাগিয়ে দেয়। এসো...

সুন্দরদাস নীরবে দাঁড়িয়ে রহিল। হীরা বলল—

—তুমি আমাকে এখনও চাও। আমি জানি তুমি চাও, কেবল অভিমানে কথা কইচ না।

—না।

—কেন? কেন তুমি আমার প্রতি এত উদাসীন? কি করেচি আমি? সেই লাখ টাকা? যাক্ টাকা, যাক সব, তুমি সুন্দর, আমি শুধু তোমাকে চাই, তোমার অধরসুধা পান করতে চাই, তোমার পদতলে আমায় বিলিয়ে দিতে চাই। এসো···

—না।

—কেন? কেন? কেন? তবে তুমি কি চাও?

—এমন কিছু না, অতি সামান্য জিনিষ, আমি ভালবাস্তে চাই।

—আমায় কি তুমি ভালবাসো না? তুমি ত নিজেই বলেচ আমায় কত ভালবাসো। তবে কি সে সব কথা সত্য নয়?

—সত্য ছিল সেই দিন। কিন্তু সেদিন চলে গেছে, অনেক দূরে চলে গেছে; সে সব এখন অতীতের কথা এখন হীরা আর উপায় নাই। পিঞ্জর এখন উন্মুক্ত পাখী উড়ে গেছে, এ জীবনে আর তাকে ধরতে পারবে না।

চিরগরবিণী হীরার গর্ব্ব আবার ফিরে এলো। একটু সরে গিয়ে, সুন্দরদাসকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—

—এই কি পুরুষের ভালবাসা?

—এই পুরুষের ভালবাসা।

এই বলে সুন্দরদাস চলে যাচ্ছিল; হীরা ছুটে গিয়ে তার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়্লো ও তার পাদুখানি তার কোমল বাহুতে বেষ্টন করে, সুন্দরের মুখপানে চেয়ে কাতরস্বরে বলতে লাগলো—

—কোথা যাবে? কেন যাবে? যেওনা, আমায় ছেড়ে অমন করে যেওনা···

সুন্দরদাস কোনও উত্তর দিলে না, অথবা দিতে পারল না, ধীরে ধীরে হীরার বাহুযুগল হ'তে তার পা-দুখানি সরিয়ে নিয়ে হীরার গৃহ ত্যাগ করে চলে গেল। আর হীরা? সেই মর্ম্মর গঠিত হর্ম্ম্য-তলে পড়ে আলুথালু বেশে আলুলায়িত কেশে হীরা আজ সকল অভিমান পরিত্যাগ করে সকল অপমান উপেক্ষা করে, উন্মাদিনী প্রায় সুন্দরদাসের পদরেণু বার বার চুম্বন করতে লাগল।

৫

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েচে। পুষ্প-সুবাসিত উপবন মাঝে মর্ম্মর গঠিত বেদীর উপর সুকোমল শয্যায় অর্দ্ধশায়িতা অবস্থায় হীরা ভাবছে। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে প্রকৃতি তখন যেন এক অমানুষিক মূর্ত্তি ধারণ করেচে। যা আছে তা যেন নাই, যা নাই তা যেন আছে। সেই স্তিমিত আলোক-অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন হীরা মানুষ নয়; যেন এক শুভ্রবসনা অশরীরী সুন্দরী সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে অভিসারে এসে আকুল প্রাণে তার প্রণয়ীর প্রতীক্ষা করচে! সুন্দরদাসই হীরার এক মাত্র চিন্তা। সুন্দরদাস দূরদেশে বাণিজ্য করতে চলে গিয়েচে। তাকে পাবার হীরার আর কোন আশা নাই। আর সে হীরার কাছে আসবে না। নিরাশায় হীরার অন্তর আজ অবসন্ন। তার হৃদয়ে যে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়েচে তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবার হীরার আর ক্ষমতা নাই। তবে কি সে সত্যই সুন্দরদাসকে ভাল বেসেছিল? বেসেছিল বৈকি। তা না হ'লে সুন্দরের উপেক্ষায় সে আজ এই মৃত্যুযন্ত্রণা পাবে কেন? হীরা ভালবেসেছিল সে ভালবাসা তার অস্থি মজ্জাগত হয়েছিল। আজ হীরা বাস্তবিকই পরাজিতা। আজ হীরা জেনেচে যে সৌন্দর্য্য চিরবিজয়ী নয়। আজ হীরা বুঝেচে যে একদিন এমনদিন আসবে, যে দিন তার দীপ্ত সৌন্দর্য্যের অবসান হবে, যেদিন সে বৃদ্ধা হবে, যেদিন তার শুভ্র কেশ, ভগ্নদন্ত, লোলচর্ম্ম দেখে লোকে তাকে ঘৃণা করবে, যেদিন তার জীবনের ইতিহাস বিগত যৌবনের স্মৃতি তাকে পরিহাস করবে আর তার আজিকার স্তাবকগণ সেই পরিহাসে যোগ দিয়ে অট্টহাস্যে তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলবে—"ঐ পরিণাম!" হীরার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হল। সে ত্রস্তে উঠে বসল। জীবন ভার আর বহন করতে সে সাহস হারাল। ক্ষণেক চিন্তার পর হীরা মিতা ও গীতাকে ডাকল, ও তারা এলে রুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগল—

—ভগ্নিগণ, আমার গৃহ, সম্পত্তি, অলঙ্কারাদি যা কিছু আছে তোমরা দুজনে ভাগ করে নাও। তোমাদেরই যত্নে এ সব আমি উপার্জ্জন করেছি; এ ঐশ্বর্য্যের আজ থেকে তোমরাই অধিকারিণী। সুন্দর চলে গেছে; আমিও যাবো, অনেক দূরে যাবো, এমন দেশে যাবো যেখানে ভালবাসার ভাণ নাই, আত্মদানে যন্ত্রণা নাই।

"সেকি দিদি, সেকি দিদি" বলে দুজনে কেঁদে উঠল। হীরা স্থির গম্ভীর স্বরে বলল—

—কেঁদনা, বোন। এখনও আমার যৌবন আছে সৌন্দর্য্য আছে, এতেও ছ্যাখো কি অপমান। বৃদ্ধা হয়ে বেঁচে থাকা—উঃ! কি মহাপাপ! আশীর্ব্বাদ করি প্রেমে আমি যে যন্ত্রণা পেয়েচি তোমাদের যেন যে যন্ত্রণা পেতে না হয়। সুখী হয়ো।

মিতা ও গীতা কাঁদতে কাঁদতে হীরাকে নমস্কার করল। হীরা আবার বলল—

—কেঁদোনা মিতা, কেঁদোনা গীতা, এ চরম সময়ে আমার মনকে চঞ্চল করো না। তোমরা দুজনে গান গাও, বিরহের। সেই করুণ সঙ্গীতটি, যেটি শুনতে শুনতে কতবার কেঁদেছি, তখন বুঝতে পারতুম না কেন কেঁদেছি···মিতা ও গীতা গাহিল। হীরা সেই গান শুনতে শুনতে হঠাৎ উঠে বসল ও মুহূর্ত্তের চিন্তার পর তার কবরি হতে মাণিমুক্তা খচিত একটি সুদীর্ঘ সুবর্ণ কণ্টক উৎপাটিত করে আপনার মর্ম্মস্থলে আমূল বিদ্ধ করল। মিতা ও গীতা হীরার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন হীরা শায়িতা, নীরব নিশ্চল, তার বক্ষের বসন ঈষৎ রক্ত রাগে রঞ্জিত হয়েচে। হীরা একটি অপরাধ করেছিল, তার কোটীপতি প্রণয়ীর কাছ থেকে একলক্ষ টাকা পণ চেয়েছিল, তাই আজ গণিকা লক্ষহীরা তার বক্ষ রক্ত পাত করে সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করল।

এলো বসন্ত-রাণী

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ

(১)

এলো বসন্ত-রাণী—
রূপের আতর ছড়ায়ে ছড়ায়ে
উড়ায়ে আঁচলখানি।
তাই বুঝি নীল গগনের গায়
আলোকের লীলা চলে ইসারায়,
কল-কাকলীর কণ্ঠে জেগেছে
নব জীবনের বাণী।
এলো বসন্ত-রাণী।

(২)

তরুলতিকার হিয়ায় আজি কী
রূপ মদমত্ততা!
বকুল পলাশ কী কহিতে চায়
কহিতে পারে না কথা।
চুপি চুপি কি-যে দখিণা মলয়
নব মালতীর কাণে কাণে কয়,
দয়িত-প্রথম-পরশ-কাতর
তরুণী মাধবী লতা।

(৩)

চূত কলিকায় ধরেনাকো মধু
ভোলা পিক তাহা পিয়া,
সরসীতে বাঁধা সরোজ মায়ায়
অলিমন খেয়ালিয়া।
কুলু কুলু কুলু নদী ছুটে ধায়
কি জানি কেমনে সাগরে ভোলায়,
আমার জগৎ কেন মোরে চায়
কেড়ে নিতে চায় হিয়া।

(৪)

ওগো বসন্ত রাণি!
আকাশে বাতাসে দিলে তুমি কোন
যাদুতুলি রেখা টানি।
পরাণ আমার সুখে শিহরায়,
ছুটে যেতে চায় খোঁজে অজানায়,
পলে পলে মোরে আকাশ বাতাস
দেয় আজি হাতছানি।
এলো বসন্ত-রাণী!

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

৯০

আবার হাজারিবাগে। তিন চার দিন হলো মলিনার একটী ছেলে হয়েছে—শতদল অনেকদিন পরে হাতে একটা কাজ পেয়ে ঝেড়ে উঠে বসেছেন। এখন সময়ে অসময়েই তাঁর স্বামীকে মনে পড়্‌ছে, এমন আনন্দের ভাগ তাঁকে দিতে না পেরে অহর্নিশি তার মন কাঁদ্‌ছিল।

মলিনার মা নাতি হওয়ার খবর পেয়ে তাঁর মানুষ করা ভাইপো 'নেত্যের' বৌকে নিয়ে দুদিন হল সেখানে পৌঁছেছেন। বৌটী গরীবের মেয়ে, কাজকর্ম্ম খুবই পারে। সে এসেই মলিনার সব কাজগুলি হাতে তুলে নিয়েছে—তার ওপর সকালে সন্ধ্যায় শতদলের কাছে বসে থেকে তাঁর সঙ্গে গল্প-গাছা করে মনটাকে তাঁর অন্যদিকে ভুলিয়ে রাখে। কাছে কাছে থেকে বৌ অনিলা তাঁর মনকে অধিকার করে নিয়েছিল—সন্ধ্যায় এসে বস্‌লেই অনিলা কোথা থেকে এসে তাঁর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতো—পায়ে তেল জল দিতে বস্‌তো—হেসে শতদল বলতেন "এসব তো আমার অভ্যাস নেই মা—দুদিনের জন্যে এসে শেষে আমার বদ্‌-অভ্যাস করে দিয়ে যাবে?"

"কেন মা? আপনি যখনই ডাক্‌বেন তখনই আস্‌ব।"

দুপুরে মলিনার কাছে বসে তার ছেলে কার মত হবে, এই সে রোজ আলোচনা করত। শাশুড়ী আসার পর থেকে শুভ্রাংশু একেবারে বাড়ীর ভেতরের দিকে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছিলেন; দুবেলা শুধু খেতে আসা ছাড়া আর পারতপক্ষে ভেতরের পথ মাড়াতেন না। দুবেলার চা ও খাবার খাওয়া তার বাইরেই চল্‌তো।

মলিনার খোকা হওয়ার খবর পেয়ে মীনা তখুনি তাকে দেখ্‌বার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো—কিন্তু কি করে সে যাবে! প্রভাতের ছুটী তো সেই বড়দিনের সময়! তা ছাড়া প্রথম বার সে এখান থেকে, "বিনা" খবরে কেমন করে গিয়ে উঠবে! প্রভাতকে যদি জানানো যায় তো সে যা হোক করে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেই—কিন্তু জানানো যায় কি করে?

অনেক ভেবে ভেবে সে ঠিক কর্‌লে শুভ্রাংশুর খোকার খবরই সে প্রভাতকে এমন ভাবে লিখবে, যাতে করে সে বুঝতে পারবে যে খোকাকে দেখবার জন্যে সে খুব ব্যস্ত হয়েছে। সেই দিন দুপুরেই খাওয়া-দাওয়ার পরে মীনা প্রভাতকে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল।

"শ্রীচরণেষু,

পরশু তোমাকে চিঠি লিখেছি—আজ আবার সে চিঠির উত্তর না পেয়েই লিখ্‌তে বসেছি। হাজারি-বাগ থেকে খবর পেলেম বড়দার খোকা হয়েছে,

বৌদি যে ছোট ছেলেটা নিয়ে কি করছে তা মনে হয়ে আমার কেবলি হাসি পাচ্ছে! বাবা থাকলে আজ আর আনন্দের শেষ থাকতো না। বৌদিকে একটা চিঠি লিখব ভাবছি—ম্যাডোনা লাইফ তার কেমন লাগছে—

খোকাকে কি দিয়ে দেখব বল তো! তুমি যা ঠিক করে দেবে তাই ঠিক।

কবে আসবে—এই তো দিন রাত ভাবছি। এ চিঠিটা আমার বাড়তি চিঠি—সুতরাং এর পরে তোমার দুটো চিঠির উত্তর একসঙ্গে দিয়ে সমান করে নেব।

মীনা।"

আফিসে বসে প্রভাত মীনার এই চিঠিখানা পেয়ে সেই দিনই শুভ্রাংশকে লিখলে। "আপনাদের খবর অনেকদিন পাইনা। শুনলাম বাড়ীতে নবকুমারের আগমন হয়েছে—তাকে দেখবার আমার খুব ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলেও ছুটী অভাবে তা হয়ে উঠলো না। আপনার বোন অনেকদিন হল আপনাদের কাছ ছেড়ে এসেছে—বিশেষ সে শ্বশুর মহাশয়ের জন্য এখনও খুব কাতর—এখন দিন কতক তার আপনাদের কাছে ঘুরে আসাই ভাল। আমার তো ছুটী নাই—না হলে আমি রেখে আসতাম। কলকাতা পর্যন্ত এলে, আপনি কি ওখানে নিতে পারবেন? যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম ও আশীর্বাদ দিবেন।" এই চিঠি পেয়ে শুভ্রাংশু তখনি শতদলকে একটা 'দিন' দেখবার জন্যে পীড়াপীড়ি লাগিয়ে দিলেন। মলিনার দেখা পাওয়া যায় না এই সময় মীনা যদি কিছুদিন আসে তো তবু, কথা বলা যাবে,কথা না বলে তিনি আর থাকতে পারছিলেন না। দিন দেখান হয়ে গেলে, শুভ্রাংশু জগমোহনকে মীনার আসার জন্য চিঠি লিখলেন—এবারে জগমোহন আর মীনাকে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই শুভ্রাংশুকে লিখে দিলেন, যে নিয়ে যেতে পারে। চিঠি লেখা হয়ে গেলে খেতে বসে একদিন তিনি মীনাকে বললেন "শুভ্রাংশু আবার চিঠি লিখেছিলেন মা—এবার আমি তোমাকে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই, নিয়ে যেতে লিখে দিয়েছি। যেতে তুমি পাবে বটে, কিন্তু থাকতে বেশী দিন পাবে না মা। এ বাড়ীর সমস্ত ভার যেমন তুমি সহজেই মাথায় তুলে নিয়েছ, এমন আর কেউ পারবে না। এখন তুমি না হলে এ বাড়ীর আর কিছুই চলে না।"

মীনা তাঁর পাতে কলা ও সন্দেশ দিতে দিতে বল্লে "আপনি যা বলবেন তাই হবে বাবা। যেদিন আসতে লিখবেন, সেই দিনই আমি চলে আসব। বড়দার খোকাকে দেখবার জন্যেও মনটা খুব উৎসুক হয়ে উঠেছে।"

"শুভ্রাংশুর নবকুমার হয়েছে? কই আমি তো শুনিনি।"

মীনার চোখ দুটো ছল ছল করে এলো—গলাটা ভারী হয়ে উঠলো—বললে, "বাবা তো নেই আপনাকে আর কে খবর দেবে; বাবা থাকলে নিশ্চয় লিখতেন।"

আবাল্য বন্ধু রমাপতির কথায় জগমোহনের মনে বায়স্কোপের ছবি ভেসে উঠলো—একের পর এক তার শেষ নেই—মুখে তিনি "হরি নারায়ণ!" বলে উঠে পড়লেন।—

সুনন্দা কাছেই বসেছিল, তিনি উঠতেই সেও উঠে তাঁর আঁচাবার জল, গামছা দিয়ে, হরিতকী কেটে নিয়ে তাঁর শোওয়ার ঘরে গেল। মেঝেটা মুছে ফেলে, সতরঞ্চি বিছিয়ে একখানা মাদুর তার ওপর বিছিয়ে দিলে। সেদিনের খবরের কাগজ পাশে রেখে দিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে সে চলে গেল।

মীনা ততক্ষণে তাদের দুজনের ভাত বাড়িয়ে নিয়ে,দুধ, মিষ্টি জল সব নিয়ে বসেছিল। সুনন্দার আসতে দেরী হচ্ছে দেখে, সে একবার ডাকল, "নন্দা, আয়!…"যাচ্ছি" বলে নন্দা ওপর থেকে নেমে এল। দুজনে খেতে বসে রান্নার দোষগুণ নিয়ে খুব কথা চলল। হাসতে হাসতে সুনন্দা বল্লে, "দেখ ভাই দিদি, এটা কেমন রেঁধেছে। বাবা একেবারে কিছু বলবেন না—ঠাকুর-পোরাও তেমনি—শুধু শুধু তেল ঘি নষ্ট করে এক অপরূপ খাদ্য বানিয়েছে!"

মীনা বললে, "রান্নাটা আমার ভাল আসে না নন্দা! তোর তো রান্নায় খুব হাত আছে—দুএকটা করে তরকারী যদি তুই রাঁধিস্ তো বাবার খাওয়াটা ভাল হয়!"

"চালাকী করো না দিদি! মেয়ে মানুষে রাঁধতে জানে না, এ আবার একটা কথা হল?"

"ঠাট্টা নয় ভাই সত্যিই আমি জানিনে—তাই সাহস করে এগোই না। তুই যদি রাঁধিস্ তো, তোর কোন কষ্ট করতে হবে না—আমি সব তোর হাতের কাছে গুছিয়ে দেব।"

"রান্না হলেই হল। বাড়ীর রান্না যেমনই হোক্ বাবা ভাল বলে খাবেন, তা দেখছ দিদি?"

"সেই জন্যেই তো যা' তা রেঁধে দিতে পারি না ভাই! রাঁধবি তুই?"

"আচ্ছা রাঁধব। কিন্তু পরিবেষণ আমি করতে পারবো না—তা আগে থেকেই বলছি।"

"কেন তুই রাঁধবি, তুই খেতে দিবি, সেই তো ভাল—তা না যদি পারিস্ তো আমিই না হয় দেব, দেখিস্ বাবা কত খুসী হবেন।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। আঁচিয়ে উঠে মীনা ও সুনন্দা আপনার ঘরে চলে গেল। মীনা একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা খুলতে খুলতে ঘুমিয়ে পড়ল। আর সুনন্দা ঘরে গিয়ে ভেবে পেলেনা কি করবে! ঘরের জিনিসগুলি ঝেড়ে, মুছে, ঠিক করে সাজিয়ে রেখেও তার সময় কাটলো না—একবার ভাবলে রায়পুরে চিঠি লিখবে—আবার ভাবলে না থাক্—হাতবাক্স খুলে প্রণবের বিজয়ার চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল। চিঠিখানা পড়ার পরে মনটা তার করুণ বিষাদে ভরে গেল। মানুষ যখন যাকে চায়, তখন তাকে পায় না কেন? এ যেন একটা মস্ত বড় সমস্যা—তার প্রাণ আজ যেমন করে স্বামীর কাছে আত্মদান করতে চাইছে, তেমন করে প্রকাশ হতে কোনদিনই তো এর আগে যে চায়নি! কিন্তু স্বামী! সে তো কতদূরে—হয়ত তার দিন নতুন দেশে, নতুন দৃশ্য নিয়ে সুখেই কেটে যাচ্ছে—সামনে মহৎ আশা, উচ্চ লক্ষ্য—যে জন্যে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে এসেছে, তা শিখে দেশে ফিরবে! কিন্তু তার দিন! কি করে কাটে! পথ দীর্ঘ হোক ক্ষতি নেই কিন্তু পাথেয়ও তো চাই! মন বিকল হয়ে গেছে শরীরও উঠতে চায় না—বসে থেকে থেকে করার মত কোনো কাজ হাতের কাছে না পেয়ে সুনন্দা হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে 'চয়নিকা'খানা নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়তে লাগল। পাতা খুলতেই বেড়িয়ে পড়ল 'নারীর উক্তি'। সেইটাকেই সে একটু জোরে নিজের কাণকে শুনিয়ে পড়তে লাগল—

"মিছে তর্ক থাক্—তবে থাক্—
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা—

সত্যিইতো পুরুষ কবে নারীর মন বুঝতে চেয়েছে? খেলনার মত হাতে তুলে খেলা ক'রেই গিয়েছে, যেদিন খেলার চাঞ্চল্য ফুরিয়েছে অকেজো জিনিসের মত ঘরের কোণে তার ঠাঁই হয়েছে—এইতো জীবন! দুপুর বেলায় চারি দিক রৌদ্রে ফেটে যাচ্ছে—ঘুঘুর একটানা করুণ সুর কাণে ভেসে আসছে—চারিদিকে সব নিস্তব্ধ—ঘরের ঘড়িটা শুধু টিক্ টিক্ করেই চলেছে—এই সীমাহীন অতল নীরবতার মধ্যে সুনন্দা কোথায় হারিয়ে গেল। ধীরে ধীরে তার চোখ দিয়ে অশ্রু ধারা বেড়িয়ে এল।

সন্ধ্যার পরে, সমস্ত কাজ শেষ হলে মীনা ও সুনন্দা বসে গল্প করছিল প্রশান্ত সেখানে এসে বললে, বৌদি দাদার চিঠি পেলাম আজ; লিখেছেন আপনাকে নিয়ে শীগ্‌গির করে কলকাতা যেতে। আমার টেলিগ্রাফ লাইনে ঢুকবার কি ব্যবস্থা করে রেখেছেন; আপনি যাবেন তো? আমি একা হলে তো কালই চলে যেতাম, কিন্তু আপনি যখন যাবেন- দিন না দেখে তো আর যাবেন না তাই দুদিন পরেই যাবো।"

"বাবাকে বলেছেন চিঠির কথা? প্রশান্ত মীনার সমবয়স্ক হলেও সে তাকে আপনি বলেই কথা বলতো।"

"হ্যাঁ বাবাকে বলেছি, বাবা আপনাকে জানাতে বললেন।"

তবে যাবো—আমি ও বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি। নন্দার কাছে ঠানদিদির থাকার কথা বলে আসি। কালিন্দী যদি থাকতো, তাহলে ওর অনেকটা সুবিধা হতো; কিন্তু সে তো শ্বশুরবাড়ী। ছোড়াদিকেও বলব একটু সময় করে আসবে এবাড়ী।"

ছোড়দি অর্থে শিউলি। জগমোহনের খুড়া শিরীষ চন্দ্র ও পিতা ক্ষিতিমোহন দুজনে খুড়তুতো জ্যেঠতুতো ভাই ছিলেন। আগে সবাই একান্নে ছিলেন; পরিবার বৃদ্ধি হওয়ায় ও পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব কমে আসায় শেষে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোন দায়ে অদায়ে, আপদে বিপদে, তখন দুই বাড়ী এক হয়ে যেত। দুই বাড়ীর ঠিক মাঝখানে একটা দরজা ছিল তাই দিয়ে মেয়েদের যাতায়াত চল্‌ত।—

রান্নাঘরে গিয়ে মীনা দেখ্‌লে রান্নার তখনও দেরী আছে, এই ফাঁকে একবার পুরানো বাড়ীটা ঘুরে আস্‌বে ঠিক করে, সুনন্দাকে ডাকতে গেল। গিয়ে দেখ্‌লে সে তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে—মীনা তাকে ডাকতে সে বল্‌লে, আজ আর আমি যাবনা-তুমি যাও দিদি।

"একা, একা, থাক্‌বি তার চেয়ে চল দুজনে যাই।"

"আজ আর আমি পার্‌ছিনা—তুমি একাই যাও।"

প্রভাসের পড়ার ঘর থেকে তাকে ডেকে নিয়ে সে শিউলীদের বাড়ী গেল।

সেখানে গিয়ে দেখলে, অসীতা রান্নাঘরে রুটি বেলছে, আর শিউলী, শাশুড়ীর কাছে বসে আছে। তাঁর কখন্ কি দরকার হবে; ঠানদিদির দেখা নেই। কোথায় হয়ত বেড়াতে বেরিয়েছেন—বাইরের ঘর থেকে ঠান্‌দির বর শিরীষ চন্দ্রের দাবার ঘুঁটী চালবার শব্দ আসছে—তাঁর ছেলে অবনী পাড়ায় কোন্ আড্ডায় আছেন; নাতিরা কল্‌কাতায় চাকরী করে—তারা পূজার ছুটিতে এসেছিল, আবার বড়দিনের ছুটিতে আসবে।

মীনা রান্নাঘরেই ঢুকে পড়ল। অসীতা মুখ তুলে দেখে বললে "বৌ!" সে যে তাদের সকলের চেয়ে বড় একথাটা সবসময়েই মনে রাখত; তার ওপর নিজে লেখাপড়া বা আধুনিকতার কোনো কিছু বেশী ধার ধারতোনা বলে, তার চেয়ে যারাই বয়সে বা সম্বন্ধে ছোট, তাদের ওপর একালের মেয়ে' বলে খুব কৃপার চোখে দেখ্‌ত। শিউলীর কিন্তু এসব বালাই ছিলনা; লেখাপড়া সেও জানতোনা বিশেষ, লেখাপড়া জানা কোন লোক বা লেখাপড়ার ওপর তার কোন আক্রোশ ছিলনা। এমনকি সে লুকিয়ে লুকিয়ে স্বামী নরেন্দ্র নাথ কে দিয়ে দ্বিতীয় ভাগ, বোধোদয়, ফার্ষ্ট বুক সব আনিয়ে, বড় বড় ছুটীতে সে যখন আস্‌তো, তার কাছে নিয়মমত পড়্‌তো। এরই ফলে স্বামী যখন তার কাছে না থাক্‌তো, তখন সে কাঁচা হাতের আঁকা বাঁকা অক্ষরে বানান করে করে নরেনকে চিঠি লিখে, তার খবর নিতো ও নিজেদের খবর দিতো আর অসীতা কিছুই পারতোনা—তার স্বামী মনীন্দ্র বাড়ীতে ঠাকুর দাদা শিরীষ বা বাবা অবনীকে যে চিঠি লিখ্‌তো—তাতেই খবর পেয়ে অসিতা চুপ করে থাক্‌তো। ভাই নরেন্ যে বৌকে পড়ায় ছুটি ছাটায় বাড়ী এসে, এখবরটা সে কোন রকমে যোগাড় করে-ছিল—তারও মনে যে একবার পড়বার জন্য ইচ্ছে হয়নি এমন নয়—কথাটা সে অসীতার কাছে পেড়েও ছিল কিন্তু অবাক্ হয়ে গালে হাত দিয়ে সে বলেছিল, "ওমা" সে কি কথা? তোমার কাছে পড়ব কি? গম্ভীর হয়ে মনীন্ বল্লে" কেন, বৌমা তো পড়েন।"

আরও বেশী রকম আশ্চর্য্য হয়ে সে বল্লে "কে? ছোট-বৌ? ওমা—লজ্জা করে না?—"

আশ্চর্য্য! অন্য কোন কাজে, কথায় লজ্জা করেনা, যত লজ্জা পড়তে! না?—ছোট-বৌমা তো বেশ ভাল কাজই কর্‌ছেন। শুধু বাজে কথায় সময় কাটিয়ে না দিয়ে তাও পড়া-শুনো করেন বলেই, নরেন্ তাও দু একখান তাঁর চিঠি-পত্তর পায়!—আমার তো আর তা হবার যো নেই! যখন বাড়ী আসি তখন জানতে পারি যে তুমি আছ—তোমারও কি ইচ্ছে হয়না যে চিঠি লিখে আমার খবর নেও? বারমাসই তো বিদেশে থাকি যদি কোনো ছুটীতে বাড়ী না-ই এলাম!"

বাধা দিয়ে অসিতা বল্লে, "ছোট-বৌ তো এ সংসারে বড়-বৌ হয়নি! বড়-বৌ হওয়ার ঝঞ্ঝাট্ কত! সে সময় কত পায়! ত ছাড়া মাথার ওপর গুরুজন থাক্‌তে আমি বেহায়ার মত তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারবো তোমার চিঠিও আবার তাঁদের হাত দিয়েই আসবে তো!"

হতাশ হয়ে মনীন্ বল্লে, "থাক্ কাজ নেই তোমার লেখাপড়া শিখে! যেমন চল্‌ছে তাই চলুক। তা হলে তোমার আসল টান্‌টা আমার ওপরে নয়—সেটা এ বাড়ীর বড়-বৌয়ের ওপর। তার গৌরব তুমি এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না।"

অসীতা আর কোনো কথা বলেনি। তখন তার ছেলেপিলে ছিল না। তারপর জ্ঞাতি দেওর প্রভাতের সুন্দরী ও লেখাপড়া-জানা বৌ হয়েছে, শুনে ও দেখে তার মনে আবার অনেক দিনের পুরোনো কথাটা আবার ধুইয়ে উঠছিল। হয় তো আবার মনীন্ তাকে বলে বসবে, "প্রভাতের বৌ-এর কাছেই না হয় লেখা-পড়া শেখ।"

এবারে তাহলে সে বল্‌বে যে ছেলের মায়ের আর লেখাপড়ার দরকার নেই। কিছু আগে তার খোকা হওয়ায় সে মনের মধ্যে এই একটা জোরের কথা পেয়েছিল—আর এখন শিউলী বা মীনার থেকে সে যে গৌরবময় 'ছেলের-মা'র পদে উঠেছে, এটাও তার আর একটা মর্য্যাদা ছিল। তাই আজ যখন মীনা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল—সে শুধু তাকে "বৌ" বলে ডেকেই ক্ষান্ত হল—ভাবটা এই যে সে তার চেয়ে কত বড়—মীনা যেন তার নাগাল পাবে না। তাকে যে বসতে বলা দরকার—সে কথাটা তার মনেই রইল না।—

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে মীনাই একটা পিড়ী টেনে বস্‌লে। অসীতার হাতের কাজ সমানেই চল্‌তে লাগল—একটী বামুনের মেয়ে রাঁধছিল—উনুনে তরকারী কি একটা হচ্ছিল সেটা নামিয়ে রেখে রুটী সেঁকবার জন্য চাটুটা বসিয়ে দিয়ে বামুন মেয়ে মীনার দিকে ফিরে বল্‌লে, "তোমাদের খাওয়া হয়ে গেছে বৌদি?"

মীনা আসার পর থেকে জগমোহনের বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া থেকে সমস্ত কাজই সময়মত হচ্ছিল এটাও শিরীষচন্দ্রের বাড়ীতে একটা আলোচনার বিষয় হয়েছিল। কর্ত্তারা বল্‌তেন, "রাঁধবার লোক ওদেরও আছে আমাদেরও আছে আমরা তবে সময়মত শুতে খেতে পাইনে কেন? এবাড়ীর দুপুর নেই, বিকেল নেই—একেবারে দিন আর রাত।—"

ঠান্‌দি রেগে বল্‌তেন "এখন না হয় নাত-বৌদের আমলে রাঁধবার লোক হয়েছে, আমার সময়ে তো আমি একাই এই দুটো সংসারের রান্না চালিয়েছি! জগ'র মা ছোটবেলা থেকেই তো বিদেশে, তার ওপর ওদের তখন উঠতি অবস্থা—নড়েও বসতে হতনা—জান্‌তও না। তারপর ভাসুর মারা গেলে, জগ' যখন মা বৌ-নিয়ে এখানে এলো তখন তার সেই শোকের সময় আমি কি আর তাকে উঠে-হেঁটে কাজ করতে বলি! না সে-ই তা পারে? আঁস নিরিমিষ দুটো হেঁসেলই তো চালিয়েছি—জগ' ক্রমশঃ পয়সা রোজগারে মন দিলে; বৌএর তখন এ বছর, ওবছর ছেলে—সে ছেলেই সাম্‌লে উঠতে পার্‌ত না—তা রান্না করবে কখন! ভাগ ভিন্ন হলে তোমরা, তখন শুনি রান্নার লোক চাই—দেখি লোকও তোমরা খুঁজে পেতে আন্‌লে—ব্যাস্। চারকাল ধরে আমারই কি সব করতে হবে? এমন আশ্চর্য্যি কথাও তো শুনিনি!"

শিরীষ গিন্নীর মুখের এমন তোড়ের কাছে কথায় পেই হারিয়ে ফেলে মাথা চুলকিয়ে পালিয়ে যেতেন। অসিতা শুনে রাগে ফুল্‌তো, "বেশ উনি না হয় খুব কাজেরই লোক ছিলেন তাই বলে সবাই হবে নাকি?"

আর শিউলী হেসেই অস্থির হতো। বল্‌তো "ঠানদি এত শীগগীর থামলেন যে! বুড়ো বুড়ীর ঝগড়া শুনতে আমি বড্ড ভালবাসি! নারদ—নারদ—ঢেঁকী চড়ে এসো একবার! বাবা; ঠাকুরদার কান প্রাণ দুই-ই ঠাণ্ডা করে ছেড়েছে।"

ঠান্‌দি হাতে কিল উঁচিয়ে ছুটে তাকে মারতো যেতো। বল্‌তো "লাগে কেন বেআক্কেলে বুড়ো আমার সঙ্গে, দিন গেলে দিন মনে থাকেনা—না?"

শিউলী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌তো, "বা-বাঃ ঝগড়াটা পাড়াকুঁদুলী! আমাদের এত কিন্তু ঝগড়া হয়না। তুমি ঠাকুরদাকে একটুও ভালবাসো না।"

"ওলো—ছুঁড়ি তোর ঠাকুরদাই আমাকে দেখ্‌তে পারেনা—যে চন্দ্রাবলী জুটেছে! আর ঝগড়ার কথা

কি বল্‌ছিস্‌! দাঁড়া আমার মত বয়েস হোক্‌ তখন দেখ্‌বি এ পিরীত কতদিন থাকে? এখন যে "নতুন প্রেমে নতুন বধূ

আগাগোড়া কেবল মধু"

"ও ঠান্‌দি! তোমার আবার এসব বুলিও জানা আছে! ধন্যি বাবা!—"

"থাকবেনা কেন? যাত্রা, থিয়েটারে শুনিছি যে! যাই দেখি বুড়ো আবার কি করে!"

"দরদও আছে!" বলে শিউলী হেসে পালালো।

তাই আজ মীনাকে দেখে বামুন মেয়েও ওই খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে। অসীতা এইবার সচেতন হয়ে উঠ্‌লো—একটু ভারিক্কি চালে বল্‌লে "খাওয়া কি আর হয়েছে—এখুনি! জ্যেঠামহাশয় তো এখন খাননা বলে জান্‌তাম—তবে আজ কাল যদি নিয়ম বদলে থাকে!"—

মীনা তার এ ইঙ্গিত বুঝলে, বললে, "না ভাই বড়দি সত্যিই খাওয়া হয়নি—বাবা তো এখনও ভেতরেই আসেন নি। নন্দা শুয়ে আছে, আমি এই ফাঁকে একবার তোমাদের কাছে এলাম! ছোড়দি ঠান্‌দি এঁরা সব কই? কাকিমাই বা কই?"

অসিতার হাতের কাজ যেন দু পাঁচ মিনিট কামাই গেলে, একটা ভাষণ বিপর্য্যয় ঘটবে এম্নি ভাব দেখিয়ে সে বল্লে, "মা, ঘরে আছেন, ছোট বৌও সেখানে আছে। ঠাকুমা কোথায় বেড়াতে গেছেন।"

"তোমার খোকা বুঝি ঘুমোচ্ছে?" "হাঁ ঘুমোচ্ছে যে দস্যি ছেলে, সারা দিনদস্যি বৃত্তি করে সন্ধ্যেবেলা ঘুমিয়ে পড়েছে। সংসারের এই কাজের ওপর আবার ছেলের ঝঞ্ঝাট্‌ পোয়ানো যে জ্বালা তা যার না হয়েছে সে বুঝবেনা! কেন যে লোকে ছেলে চায় আমি তাই শুধু ভাবি?"

অসিতার সংসারের এই ফর্দ্দ দেওয়া দেখে মীনার খুব হাসি পাচ্ছিল—কিন্তু মুখে কিছু না বলে, সে বললে, "ঠানদি এলে একবার পাঠিয়ে দিও তো ভাই বড়দি! আমি ছোড়দি আর কাকিমার সাথে দেখা করে যাই—রাত হল।"

"কেন, ঠানদিকে কেন?"

"আমি হাজারিবাগ যাব কিনা তাই যে দিন ক'টা ফিরে না আসছি নন্দার কাছে থাক্‌বেন—কালিন্দী তো নেই—সে থাকলে খুব ভাল হতো।

"না, কালিন্দীকে তার বর এখন কিছুদিন পাঠাবে না বলেছে। তা তুমি যে এই অবস্থায় হাজারিবাগ যাবে বৌ—অতদূরের পথ যদি বিপদ ঘটে কিছু?"

"বিপদ আর কি ঘট্‌বে?"

"তাকি বলা যায়? জ্যেঠামশাই যে পাঠাচ্ছেন! তা তুমি বাপু ভাল করে না মত নিয়ে যেওনা। শেষে হিতে বিপরীত হবে?"

"কার সঙ্গে কথা বলছ দিদি?" বলে শিউলী সেখানে এলো।

"এই যে ছোড়দি—ঠানদি এলে একবার আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ো তো! আমি যাব কিনা, তাই নন্দার কাছে তিনি রাত্তিরে শোবেন।"

মীনা আসার পর থেকে শিউলীর চিঠি-পত্তর লেখা, ডাকে দেওয়ার কোনো ভাবনাই ছিল না—এখন সে চলে যাবে শুনে তার মনও অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। বললে, "যেতে হয়তো তুমি পাবে না মীনু, জ্যেঠামশাই নিশ্চয় তোমার কথা জানেন না; না হলে তিনি নিজেই অমত করতেন!"

মীনা বল্‌লে "আমি তো বেশীদিন থাক্‌বো না—দেখাই যাক্‌ কি হয়! মনে করে দিও পাঠিয়ে একবার!" বলে সে বাড়ী গেল।

১১

দুপুর বেলা মীনা তার বাক্সটা গুছিয়ে নিচ্ছিল-যদি হাজারিবাগ যাওয়া হয়, তবে আর গোছাবার সময় পাবে না। সুনন্দা তার কাছে বসে ছিল। এতবড় বাড়ীতে এখন যে তার একা থাকতে হবে, এই চিন্তাই তার মনে তখন প্রবল ছিল। মীনাকে সে যে খুব পছন্দ করত, তা নয়, তবুও সংসারের যা কিছু ঝঞ্ঝাট্‌ তার কিছুই তাকে পোহাতে হয় না, এক রকম নিজের খুসীমত দিন কেটে যায়, এটাও তার খুব আরামের ছিল। কিন্তু মীনা চলে গেলে এ সবই যে তার ঘাড়ে এসে পড়বে—এতে কর্ত্তৃত্বের দরুণ তার

যে একটা আনন্দ হচ্ছিল, সেটা কাজের চাপে চাপা পড়বার মত হল। কর্তৃত্ব করা ভাল, কিন্তু খাটুনীটা যদি আর কেউ খেটে দেয়! এমন সময়ে ঠানদি এসে হাজির হলেন।

চেয়ে দেখে মীনা তাড়াতাড়ি নিজের ট্রাঙ্কের ওপর একখানা ধোওয়া পাট করা কাপড় খুলে বিছিয়ে দিয়ে বল্লে, "বসুন—বসতে আজ্ঞা হোক্। কাল রাত্রে ডেকে এসেছিলাম আর এখন সময় হল! না? ১৮।২০ ঘণ্টার মধ্যে ঠাকুরদার কাছে কি একবারও ছুটি পান নি? ছেলে ছোক্‌রারা কিন্তু বউদের এত ভালবাসে না!"

ট্রাঙ্কের ওপর না বসে, মেজেতে বস্‌তে বস্‌তে ঠানদি বল্লেন, "আর বলিস্‌নে—হাড়-জ্বালানে বুড়োকে নিয়ে, হাড় ক'খানা আমার ভাজা ভাজা করে তুল্‌লে! এই তার ভাত, আবার তার জল, আবার দুপুরের ঘুম, সব না সেরে কি বেরুবার যো' আছে?"

"তা ভাল করে ঘুম-টুম পাড়িয়ে এসেছেন তো? না হলে একা ঘরে কাউকে না দেখে হয়তো ভয় পেয়ে ডরিয়ে উঠ্‌বেন আবার!"

"তুই গিয়ে শান্ত করিস্! কি বলিস্ পারবিনে?"

"আবার আমাকে কেন? ঘরেই তো দুজন আছে।"

"তারা পুরানো হয়ে গিয়েছে।"

ঠাকুরদামশায় পুরোনো জিনিসই ভালবাসেন। পুরোনো জিনিসের আদর বেশী, পুরোনো চাল, ভাতে বাড়ে, জানেন তো—ঠাকুরদা কি আর এই এতকালের দেখা আপনার টাক মাথায় সিঁদুর পরা—গলার মুড়কী মালা, হাতের কাঁকনের মিষ্টি বুলি তার ওপর গলার চেনা স্বর ছেড়ে, একেবারে হাল ফ্যাসানের নতুন মানুষকে সহ্য করে উঠ্‌তে পারবেন?"

"খুব যা হোক্, কথাটা আমায় ফিরিয়ে দিলি? যাক্ ওসব বাজে কথা! শুনলুম তুই নাকি প্রভাতের সঙ্গে দেখা করতে কল্‌কাতা চলেছিস্?"

"ওমা—ঠানদি বলেন কি? আমি তো মা'র কাছে যাব।"

"ওই হোল—মার কাছে কি কল্‌কাতা ডিঙিয়ে যাব? ওই এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে প্রভাতকেও দেখা হবে, মায়ের কাছেও যাওয়া হবে; আবার এখানে আসার সময়েও কি আর প্রভাতের মুখখানা না দেখে আস্‌বি না সে-ই না দেখে ছেড়ে দেবে?"

বলে হাত বাড়িয়ে মীনার মুখখানা তুলে ধরে সুর দিয়ে বললেন—

"সাধে কি চাহিয়া থাকি?
হেরিয়া ও রূপ রাশি—"

"যান্ ঠানদি আপনি বড় অসভ্য! কথায় কথায় ছড়া, কথায় কথায় গান্! কে শিখিয়েছে? ঠাকুরদা? সখ্ তো কম নয়!"

"ওরে হ্যাঁ—রে-সে করে তাতে দোষ নেই—আমি মুখে বল্লেই দোষ হয়! না? তা ভাল মেয়ের মত, কল্‌কাতায় প্রভাতের সঙ্গে দেখা না করেই না হয় হাজারিবাগ যাবি কিন্তু সেই যাওয়ার পথেই তো কাঁটা!

"কেন ঠানদি?" তার মত সুর করে ঠানদি বল্লেন "কেন ঠানদি? নেক্ জান না কিছু? বলি ওরে মুখ্যু, তোর এই অবস্থায় তোকে পাঠালে যে তোর মা শুদ্ধ আমাকে গাল দেবে। বল্‌বে যে ঘরেই না হয় বড় কেষ্ট নেই—তা বলে আর সাত গুষ্টি তো আছে কেউ বারণ করেনি। জগা তোকে যেতে মত করেছে?"

"তিনি তো বারণ করেন নি ঠাকুমা! আর তিনি না বল্‌লেই কি আমি যেতে পারি?"

চিন্তিত মুখে ঠানদি বল্লেন "তা হলে তোর ছেলে পিলে হবে একথা সে জানেনা তাই মত করেছে—নাহলে জান্‌লে যেতে দেবে বলে তো মনে হয় না। দেখি, তার সঙ্গে কথা বলে। হয়তো খবরটা তাকে আমাকেই শোনাতে হবে। সে বাড়ী আছে নাক?"

"থাকার তো কথা—এ সময়টা বাবা ঘুমোন।"

"তুই যে একেবারে মিইয়ে গেলি! কেমন? আঁতে ঘা পড়লে সকলেরই এমনি হয়! প্রভাতকে দেখ্‌তে পাব না হয়তো, সেটাই বেশী করে মনে হচ্ছে! না? সাধু পুরুষ কোথায় গেল বচন? এইবার কপ্‌চাও! যাই আমি জগর কাছে, তোর যাবার একটা হেস্ত-নেস্ত করে আস।" বলে তিনি হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

জগমোহন তখন সবে মাত্র ঘুম ভেঙে উঠে তাঁর যোগবিশিষ্ট রামায়ণখানা নিয়ে বসেছেন। মনটা তাঁরও একটু চঞ্চল ছিল—একাদিক্রমে ক'মাস ধরে মীনার সযত্ন সেবায় ও মিষ্টি ব্যবহারে তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়েই ছিলেন। সে চলে গেলে, যদিও বেশীদিনের জন্যে নয়, তবুও সেই ক'টা দিনই বা তাঁর এমন করে কে গুছিয়ে দেবে? সে আসার আগে অবিশ্যি সবই লোক জনে করত কিন্তু আসার পর থেকে আর কিছুরই গোলযোগ ছিল না। যোগবাশিষ্টখানা হাতে থাকলেও মন তাঁর এই সব অবান্তর কথা নিয়েই নাড়া-চাড়া কর্‌ছিল।

"জগ—ঘরে আছ নাকি?" বাইরে থেকে ঠান্‌দি হাঁক দিলেন।

"হাঁ আছি। কে খুড়ীমা নাকি? এস এস—আর তো মোটে এসোই না—দেখও না যে থাকলাম কি গেলাম!"

দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকে তিনি বললেন "বালাই—ষাট্‌! ওকি কথা? যে লক্ষ্মীদের ঘরে এনেছ, তারাই তোমাকে এখন দেখা-শোনা করে। আর বাবা! সময়ও পাইনে; তোমার ছোট খুড়োর 'মহড়া' নেওয়াতো মুখের কথা নয়! তার ওপর দাবার নেশায় এমন পেয়ে রেখেছে যে দিন রাত জ্ঞান নেই। 'চালই' চল্‌ছে।"

মৃদু হেসে জগমোহন বললেন "ছোট খুড়োর সেই মামুলি রোগ আবার বেড়ে উঠেছে তাহলে? অবনীদা, বউঠাকরুণ সব ভালোতো?"

"হুঁ ভালত সবাই একরকম। শুনলাম তুমি নাকি মীনাদিদিকে তার বাপের বাড়ী যেতে বলেছ—মানে তোমার যেতে আপত্তি নেই বলেছ?"

"হাঁ—খুড়িমা। এসেছে অনেক দিন একবার ঘুরে আসুক। বেশীদিন তো রাখবো না।"

"বেশী দিন থাকা বা না যাওয়ার কথা বলছিনে। মীনু দিদির যে সন্তান হবে, তা কি তুমি জাননা?"

চমকিয়ে উঠে জগমোহন বল্লেন, "কই না তো! আমাকে তো কেউ বলেনি।"

ক্ষোভের সঙ্গে ঠানদি বল্লেন "বল্‌বে আর কে বাবা! ঘরে তো আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই! নন্দা তো ছেলেমানুষ!

কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে জগমোহন বললেন "কি করি বল তো খুড়ীমা! বৌমার বাপের বাড়ী সকলে পথ চেয়ে আছেন; কাল সকালে প্রভাতও হয়তো ষ্টেশনে এদের নিতে আসবো হঠাৎ যদি আজ যাওয়া বন্ধ হয়, তবে সকলেই উৎকণ্ঠায় পড়বে, কি করি ভেবে পাচ্ছিনা শুধু কি প্রশান্তকেই যেতে বলব!"

"তাই ছাড়া আর উপায় কি বাবা! বরং তুমি প্রভাতকে একখানা 'তার' করে দাও যে "এখন বৌমার যাওয়ার সুবিধা হল না, পরে যাবেন। তারপরে চিঠিতে খুলে লিখো সব! আর বড়দিনের সময়েতো প্রভাত আসবে-ই।"

"হাঁ—তাই করি।" বলে তিনি উঠে বাইরে গেলেন। ঠান্‌দি মিনার কাছে গিয়ে বল্লেন, "যা বলেছি তাই; জগ' জানেই না তোর কথা! নে খোল এখন সব! বড্ড আশাতেই 'নৈরাশ' হলি! তা কি আর করব বল্‌! ছেলের মা হতে গেলে এসব কষ্ট সইতে হয়।"

"আঃ! বৌদি! আপনার বাক্যস্রোত থামান্‌ তো! যান্‌, যান্‌, ঘরে গিয়ে দেখুনগে আপনার সে অসহায় দুগ্ধপোষ্য 'বুড়োটার' এতক্ষণে হয়তো গলা শুকিয়ে গেল!"

"কাঁধা ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী, কুস্বপনের গোড়া!"

"তা তো বল্‌বেই এখন। দেখবখন, যখন রাঙা খোকা কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তখন এ রাগ কোথায় থাকে! ও নন্দা! তোর দিদি তো রাগেই ফুলছে—পায় তো মারে আমাকে! তুই না হয় কিছু মিষ্টিমুখ করা আমাকে! এমন সুখবর শোনালাম তোকে!"

নন্দার মনে যাই থাক্‌ বাইরে হেসে বল্লে "শুধু খোসখবর কানে শুনেই কি কেউ আর মিষ্টি মুখ করায়? আগে দেখি, শুনি, যাচাই করি! কোলে নেই!"

"আ-মরণ কথার ছিরি দেখ না। যাচাই করবি কি-লো। মেকি নাকি। তোর বর আর তোদের ছেলে এক সঙ্গেই হয়তো আসবে। কাকে ফেলে কাকে নিবি ঠিক করে রাখিস্—নইলে তখন হয়তো ধাঁধাঁয় পড়বি।"

মীনা ও নন্দা একসঙ্গেই হেসে বল্লে, "ঠানদির মুখ যেন মিউনিসিপ্যালিটীর ড্রেন। ও ঠাকরুণ! মাঝে মাঝে একটু বুরুষ চালাবেন পরিষ্কার থাকবে।"

"বেলা গেল—আজকের মত যাই" বলে ঠান্‌দি চলে গেলেন।

রাত্রে প্রশান্ত একাই গেল। মীনা যেতে পারলনা বলে প্রভাত যেন কিছু না ভাবে এই মর্ম্মে সে তাকে একখানা চিঠি লিখেছিল। ভেবেছিল, প্রশান্তর সঙ্গেই সেখানা দিয়ে দেবে আর প্রভাত তাহলে সকালেই পেয়ে যাবে। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রশান্তের হাতে তার লেখা প্রভাতের চিঠি দিতে খুবই লজ্জা হল—প্রণবের মত সে এত কথা-বার্ত্তা বলেনা একটু গম্ভীর প্রকৃতি। শেষে ঠিক করলে পেতে প্রভাতের একদিন দেরী হলেও, চিঠিখানা ডাকে দেওয়াই সঙ্গত ও নিরাপদ। খেতে বসে জগমোহন মীনার খোঁজ করেছিলেন; কিন্তু আজই দুপুর বেলা ঠান্‌দি তাঁকে যে খবর শুনিয়ে এসেছেন তাতে সে আজই আর তাঁর সামনে যেতে পারছিল না। তাই সে আড়ালে থেকে নন্দাকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠালে যে তার শরীর ভাল নেই। নন্দা এসে সেই কথা জানাতে, তিনি অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বল্লেন "আহা—থাক্ ব্যস্ত হবার কোনো দরকার নেই। মা—নন্দা মেজ-বৌমা তোমার দিদিকে তুমি একটু দেখাশুনো করো মা। আর তো আমার কেউ নেই যাকে আমি এ ভার দিতে পারি। যা' যখন দরকার হবে, আমাকে জানাতে সঙ্কোচ করোনা মা।" বলে কি যেন একটা কথা মনে পড়ায় বল্লেন, "হাঁ মা প্রণব তোমাকে নিয়মিত চিঠি পত্তর লেখে তো। তাতে লজ্জা কি মা। বল—আমি তোমাদের ঘরে এনেছি—তোমাদের সুখ সুবিধা দেখতে আমি বাধ্য!"

কুণ্ঠিতা লজ্জিতা হয়ে নন্দা বললে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বাবা। আমাদের তো কোনো অসুবিধেই নেই। আর বারোমাস যখন আপনার কাছে থাকব তখন লজ্জাই বা করব কেন। তবে দিদিকে যত্ন করার কথা যা বলেচেন, তা আমি আমার সাধ্যমত করব—আর যা' না জানি বা যা' আমার সাধ্যে না কুলাবে তা ওবাড়ীর ঠানদিকে বল্‌ব।"

সন্তুষ্ট হয়ে, তিনি খাওয়া শেষ করে চলে গেলেন। মীনা দরজার আড়ালে ছিল, তিনি চলে যেতেই বেরিয়ে এল। নন্দা বল্লে "তুমি বুঝি সেইকাল থেকে দাঁড়িয়েই ছিলে।

"হ্যাঁ—বাবার খাওয়া ভাল হয়েছে তো। হাঁ—নন্দা তুই কাল বলেছিলি যে আজ থেকে রাঁধবি তার কি হোল।"

"তুমি আজ চলে যাবে শুনেছিলাম—সত্যি বলছি, কিছু যদি আমার ভাল লাগছিল! তা রাঁধব কি। কাল দেখো আর ভুল হবেনা। তোমাকে যত্ন করবার হুকুমও বাবা আমাকে দিয়েছেন—এবার যা' বলব তাই শুনতে হবে—যা করব তাতে বাধা দিতে পারবে না।—"

"আচ্ছা রে আচ্ছা—বড় যে গিন্নী হয়েছিস্!"

প্রশান্তের কাছে জগমোহন যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে কি লেখা ছিল জানিনা, পড়ে কিন্তু প্রভাত লাল হয়ে উঠলো। চিঠিখানা তখনকার মত পকেটে রেখে সে প্রশান্তের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেল। স্নানাহার সেরে দুই ভাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। প্রভাতের মনে ইচ্ছা রইলো যে তার অপিসের সাহেবকে বলে ঘণ্টাখানেকের ছুটী নিয়ে সে একেবারে টেলিগ্রাফ অফিসেই প্রশান্তকে হাজির করে দেবে। তারপর তার কপাল! প্রণবের দেশে ফিরবার সময় হয়ে এল। সে আসার মধ্যেই যদি প্রশান্ত টেলিগ্রাফে ঢুকতে পারে তো ভাল না হলে প্রণব এসে দেশেলাই এর একটা কারখানা খুলবে বলে জানিয়েছে—তাতে টাকারও দরকার।

সেদিন যাত্রাটা দুজনেরই শুভ ছিলো। প্রভাত আফিসে গিয়েই ছুটি পেলো আর প্রশান্তও টেলিগ্রাফ

অফিসের সাহেবকে দু একটা সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে ঢুকে পড়লো প্রভাত নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলো! ডেস্কের কাছে বসে, প্রভাত আবার পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে পড়তে লাগল। জগমোহন লিখেছেন "পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ বাবা প্রভাত, প্রশান্তকে তোমার কথা মত পাঠালাম। বৌমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা শুভ্রাংশু লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি সন্তানসম্ভবা এ আমার জানা ছিলনা—তাই তার যাওয়ার ঠিক হয়েছিল এখন খুড়ীমার কথামত তাঁর যাওয়া স্থগিত হলো। পরে ভগবানের কৃপায় সুপ্রসব হয়ে গেলে একেবারে যাবেন। তুমি শারীরিক কেমন আছ। মেজ বৌমাকেও আনা হয়েছে। প্রাশান্তের টেলিগ্রাফ লাইনে ঢুকবার কি হলো জানাবে—

এ চিঠির প্রভাত কি উত্তর দেবে তা আর ভেবে পেলেনা। সারাদিনের কাজ তার অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়েই হল। বিকেলে যখন ছুটী হলে সে মেসে ফিরবার জন্যে উঠে দাঁড়ালে, দেখলে সারাদিনে কাজ তার কিছুই হয়নি! এতটা সময়, এমন অন্যমনস্ক হয়ে কেমন করে কাটলো এইটাই তার আশ্চর্য্য বোধ হল।

একই মেশে প্রশান্ত ও প্রভাত দুজনে থাকবার জায়গা কোন রকমে হয়ে গেল। জগমোহনের চিঠির উত্তর দিতে হবে এটা মনে থাক্‌লেও কাজে হচ্ছিল না। কি করে লেখা যায়! উপস্থিত দায়টা সে প্রশান্তের ওপর দিয়েই চালালে।

তার পরের দিনে মীনার চিঠি এল। সে লিখেছে, "বাবা যেতে বারণ করলেন বলে আমি যেতে পেলাম না। তোমার কাছে যাওয়ার একটা সুযোগ মাটী হল; এখন আবার তোমার ছুটীর আশায় থাকা ছাড়া অন্য গতি নেই তাই মনে করে ছুটী হলেই এসো কিন্তু।" চিঠিটা পড়ে সে হাসলে। ভাবলে মীনা কেমন সহজ ভাবে, যেন সে কিছুই জানেনা, তাকে না যাওয়ার কারণ দেখিয়েছে; কি?—না বাবার নিষেধ। এই চিঠির উত্তরে সে যে কি লিখবে তাও তখুনি ঠিক হয়ে গেল।

তখন অফিসের সময়, চিঠি লিখ্‌বার সময় আর হল না। আফিসে গিয়েও সারাদিনের মধ্যে ঘা[ড়] তুলে চাইবার অবসর তার হল না। কাল কা[জে] গাফিলী হয়েছে—আজ যদি সে ক্ষতিপূরণ না হ[য়] তাব সকলেই তার দৃষ্টান্ত দেখে কাজ করবে[।] একেবারে সাড়ে পাঁচটায়, হাতের কলমটা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। কল্‌কাতার পথে তখনই আলো জ্বে[লে] দিয়েছে—সে তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে রাস্তার ক[ল] থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে নিয়ে মাথায়, চো[খে] মুখে ঝাপ্‌টা দিলে—পকেট থেকে রুমাল বের ক[রে] চোখ, মুখ মুছে নিয়ে মেসের দিকে চল্‌লো।

প্রশান্ত তার অফিস্ থেকে এসে কোথায় গিয়েছে[;] ঘরে সে একাই রইলো। কিছুক্ষণ বসে থাকার প[র] উঠে মীনাকে চিঠি লিখতে বস্‌ল—কারণ প্রশান্ত ফি[রে] আসার আগেই চিঠিটা শেষ হওয়া চাই। লিখ্‌[তে] বসে তার কিন্তু হাসিই পেতে লাগ্‌ল—কি লিখি[!] শেষে লিখ্‌লে, "মীনারাণি! চিঠি তোমার পেলাম কিন্তু তুমি আস্‌বে বলেই প্রতীক্ষা করে ছিলাম; তু[মি] এলে না, এল তোমার চিঠি! যাক্, যা পাওয়া যা[য়] তাই ভালো। এলে না কেন? আমি কি[ন্তু] একটু বল্‌তে পারি! বল্‌ব? কেন এলে না! [না] থাক্, তুমি হয়তো রাগ করছ! হয়তো এবার গে[লে] কথাই বল্‌বে না? হয় তো না-না থাক্ আমি চু[প] কর্‌ছি। কিন্তু তুমি যদি অনুমতি দাও তো বল্‌[তে] পারি কেন আসা বন্ধ হলো। সাবধান হয়ে থাক্‌বে—বৌমাকে যত্ন করো। আমি শীগ্‌গীরই যাব।"

চিঠি লিখে খামে এঁটে সে ভাব্‌লে এইবার তে[া] জগমোহনকে চিঠি না লিখলেই নয়! কারণ তা[র] লেখা এ চিঠি মীনার কাছে—তাঁরই হাত দিয়ে যাবে তবে? অনেকক্ষণ ভেবে সে চোখ কান বুজে [যে] চিঠিখানা লিখ্‌লে তাতে তাঁর ও প্রভাসের কুশ[ল] প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই রইলো না।

রাত্রে শুয়ে দুই ভাই নানা কথা আলোচনা[র] পরে, প্রভাত বল্লে "তোর বুঝি বড়দিনে ছুটি হবে ন[া] শান্ত?"

"না দাদা, নতুন ঢুকিয়েছে, ছুটি বোধহয় দেবে না

না দিক্ আমিও চাইনে। তার চেয়ে বরং তখন ওপর ওয়ালাদের বেশ করে খোসামোদ করে বিলেত ঘুরে আসার পথটা তৈরী করে নেব। তুমি তো বাড়ী যাবে না?"

"হ্যাঁ-যাব। খোকার টেষ্ট তো এসে পড়্ল—বাবা আর কতদিক্ দেখ্বেন? যদি টুইশনিতে আর গোটা কতক টাকার জোগাড় করতে পারি তো—টেষ্টের পরে একজামিন পর্য্যন্ত আমার কাছেই রাখ্তাম—আমি, তুই দুজনে মিলে দেখা-শোনা কর্লে চাই কি একটা স্কলার শিপ্ও পেতে পারে। দেখি তো কি হয়!"

হাজারিবাগ থেকে শুভ্রাংশু লিখ্লেন, "মীনাকে এখন না পাঠিয়ে ভালই হয়েছে! মা বল্ছিলেন আরো কিছুদিন পরে তাকে আন্বেন—তোমাদের বাড়ীতে লোকাভাবও তো বটে! আমি যদি সুবিধা করে উঠ্তে পারি তো একবার দেখে আস্ব।"

সে চিঠি পড়ে প্রভাত ভাবলে বাকী আর কেউ রইলো না খবর জান্তে! যা হোক্ ভেবে-চিন্তে একটা উত্তর দেওয়া যাবে।

বড়দিনের ছুটি এসে পড়ল। প্রভাত ছুটি পেয়েই বাড়ী রওনা হল। মীনাকে দেখবার জন্যে সে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিল। বাড়ী যখন পৌছাল তখন জগমোহন বাড়ী ছিলেন না। প্রভাসও বিকেলে খেল্তে গিয়েছে। বারান্দায় জুতোর শব্দ পেয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেই ঠানদি বল্লেন, "এই যে কেষ্ট চন্দর হাজির! নে লো নাতবৌ বেরিয়ে আয়-তোর জন্যে কি এনেছে দেখেই যাই।"

হেসে প্রভাত বল্লে, "আঃ বাড়ী ঢুকেই কুব্জা রাণীর দর্শন পেলাম—আর কাউকে দেখ্তে এখন ইচ্ছেই কর্ছে না।"

"আহা মরি আর কি? কুব্জা রাণীকে দেখ্তেই তো খাল বিল ডিঙিয়ে এসেছ! নে খাওয়া দিকি আমাদের, সুখবর শোনাই।"

"সুখবর আমি শুনেছি—তা খাওয়ানর ভারটা আমি ছোট ঠাকুরদার হাতে দিলাম—তিনি আর আমি অভিন্নাত্মা কিনা! বুড়ো বয়সে তুমি কি খেতে ভালবাস্ছ সেটা তো আমার ভাল করে জানা নেই কিনা! ঠাকুরদা-ই তা বল্তে পার্বেন।"

প্রভাতের কান দুটী মলে দিয়ে ঠান্দি বল্লেন "ছেলের বাপ হলি তবু বুদ্ধি হল না! ঘরে যে আমার নন্দা দিদিও আছে!"

তাই শুনে প্রভাত লজ্জিত হয়ে সেখান ছেড়ে চলে গেল। ঠান্দিও আপনার বাড়ী গেলেন। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই যে প্রভাতকে মুখ ধোওয়ার জল খাবার এসব দেয়! কাজে কাজেই মীনাকে উঠ্তে হল।

তবু সে বল্লে, "তুই কেন ঠান্দিকে থাক্তে বল্লি নে। এখন না হয় ডেকে আন্ গিয়ে। আমি তোকে এগিয়ে দিয়ে আস্ছি।"

বেশ কথা বল্লে দিদি! ঠানদিদি অন্য বাড়ী থেকে এসে খাবার জল দেবেন, আর তুমি বাড়ী থেকেও দিতে পারবেনা! এ তোমার কোন দেশী কথা হল? লজ্জা করার আর সময় পেলেনা। না অমন করলে আমিই দিয়ে দেব।

আসলে, প্রভাতের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ রাত্রের নির্জ্জনতায় হয়, এইটাই ছিল মীনার মনোগত ইচ্ছা দিনের কোলাহলে সে সাক্ষাতের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায় পাছে—তাই এখন প্রভাতের কাছে যেতে তার ইচ্ছাই ছিলনা। নন্দাও যে একথা মোটে বুঝে নি তা নয়, তবুও কি করা যাবে, এই বিধায় সে মীনাকে যেতে বলছিল। মীনা উঠলে—একটা রেকাবে খাবার গুছিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে সে প্রভাত যে ঘরে ছিল সে ঘরে গেল। খাটের ওপরের বিছানাটা পেতে নিয়ে প্রভাত তার ওপর শুয়ে পড়েছিল। খাবার রেকাবী ও জলের গ্লাসটা খাটের ওপরে নামিয়ে রেখে, সে আসবার জন্য ফিরতেই প্রভাত বাঁ হাত দিয়ে তার ডান হাতটা চেপে ধরলে। পাছে দাঁড়িয়ে কথা বললে নন্দা শুনতে পায় তাই সে একেবারে প্রভাতের কানে কানেই বল্লে 'ছিঃ'; নন্দা আছে যে! এখন ছেড়ে দেও। প্রভাত হাতটা ছেড়ে দিয়ে খাবারের রেকাবীটা

টেনে নিলে। মীনা কিন্তু দেখলে যে তার মুখ হাসিতে ভরে গিয়েছে—এ হাসি যে কেন তা বুঝতে মীনার একটুও দেরী হলনা। তার মুখ এবং কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, তবুও সে ধীর পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে ঘরে এসে প্রভাত আগেই ঘুমিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। অনেক রাত্রে মীনা যখন শুতে এল তখন সে গভীর নিদ্রামগ্ন। দেখে মীনা একটু আশ্চর্য্য হলেও, উপস্থিত লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পেলে ভেবে স্বস্তি পেল। একটু ঘরের মধ্যে ঘুরে ধীরে ধীরে সেও বিছানায় এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল্‌। রাত যখন আড়াইটে কি তিনটে হবে প্রভাতের ঘুম তখন ভাঙ্‌ল। প্রথম ঝোঁকে সে ভাবলে মেসেই শুয়ে আছি নাকি? ভাল করে চোখ মুছে দেখ্‌লে যে না, তার নিজের বাড়ীতে, নিজের ঘরে আছে। মাস 'অঘ্রাণ' হলে কি হয়, ঘরের জানালা খুলে শোওয়াই তার অভ্যাস, শীতকালেও এর ব্যতিক্রম হয় না। পূর্ণিমার তখনো দেরী ছিল—জানলা দিয়ে চাঁদের যে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুক্‌ছিল তারই আবছায়ায় সে মীনার ঘুমন্ত দেহের একটা আভাস পেলে। মীনা ঘুমোচ্ছিল খুব গভীর ভাবেই; ঘুমের আড়ালে তার সঙ্কোচ, লজ্জা সব চলে গিয়ে তার ঘুমন্ত মুখের ওপর শান্ত সৌন্দর্য্য খেলা করছিল। অন্ধকারে ভাল করে সব দেখা যাচ্ছিল না বলে, প্রভাত উঠে একবার আলো জাল্‌তে গেল। কিন্তু আলোর মধ্যে এমন ভাবে তাকে দেখতে পাবে না বলে, আলো আর জাল্‌লে না। দুই চোখে অসীম আগ্রহ নিয়ে, প্রভাত সেই আধ অন্ধকারের মধ্যে প্রিয়তমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আলো আঁধারের খেলায় সবই তার স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। এই যে সুন্দরী তরুণী, নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তার পাশে শুয়ে আছে, এও স্বপ্ন, সারাদিনের কাজের কাছে, রাতের এই মায়া, এও স্বপ্ন! কেন পৃথিবী এত মায়ায় ঘেরা!

মীনার কাণের কাছে নীচু হয়ে প্রভাত ডাক্‌লে "এই!" অত মৃদু আহ্বানও মীনার কাণের ভিতর দিয়ে গিয়ে তার ঘুমন্ত প্রাণে চেতনা জাগিয়ে দিলে। চোখ খুলে চাইতেই বললে "ঘুমোচ্ছ যে!" "তুমি তো বারণ করনি।" "আমি ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম—তুমিও তো ডাকনি।" ব্যস্‌! কথার সূত্র হারিয়ে দুজনেই বাইরের আলোর দিকে চেয়ে রইলো। খানিক পরে প্রভাত বল্‌লে "এই! কথা বল না! একেবারেই চুপ করলে যে!" "কি বল্‌ব বল! কথা কি এখন ভাল লাগ্‌বে? তার চেয়ে তুমি একটা গল্প বল না।" "আমার গল্প ভাল লাগ্‌বে না। তোমার কি মনে হচ্ছে? বল্‌ব? আচ্ছা না, বলব না কি বল্লে? গল্প বল্‌তে না? আচ্ছা বল্‌ছি, না বল্‌ব না কাল বল্‌ব—আজ তুমি বক্তা আমি শ্রোতা —আঃ! কতদিন ধরে যে কাণ দুটো তৃষিত হয়ে আছে!" "তুমি গল্প বলবে না আমারও কথা ভাল লাগ্‌ছে না—তার চেয়ে এসো চুপ করেই থাকি।" বলে মীনা তার ডান হাত দিয়ে প্রভাতের একটা হাত চেপে ধর্‌লে। প্রভাত তখনো বসে ছিলো—নিজের মুঠোর মধ্যে মীনার হাতখানা ধরে সে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়্‌ল—'এই পরমপ্রিয় হাতখানি ধরে সারাজীবন যেন চল্‌তে পাই ভগবান্‌!' মনে তার তখন এই কথাই বার বার জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত বিছানায় ছটফট্‌ করে করে, নন্দা যখন দেখলে ঠানদি বেশ ঘুমোচ্ছেন, তখন হাতের চূড়ী গুঁজে, চাবীর রিংটী খুলে বিছানায় রেখে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। মীনার ঘরের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে পাশের জান্‌লা দুটী খোলা। এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাকে ধীরে ধীরে জানলার কাছে নিয়ে গেল; সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে নন্দা দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের ভিতরটা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু রাত্রির নিস্তব্ধতায় কথার স্বরগুলি ভেসে কাণে আসছিল। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠ্‌লো বুকের মাঝে একটা অব্যক্ত ব্যথা গুমরে উঠ্‌লো—কি যেন নাই, কিসের যেন সত্য অভাব ঘটেছে এইটাই তার মনে ঘুরতে লাগ্‌ল। ঘুমোবে মনে করে সে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস চোখে মুখে লাগাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু ঘরে ঢুকে বাকী রাতটুকু তার আর ঘুম হল না। শুধুই মনে হতে লাগ্‌ল—

"চন্দ্রমা শালিনী, মধুর যামিনী
সে শুধু গো যদি আসিত!"

শরীর রক্ষার্থে ব্যায়ামের প্রয়োজন

শ্রীবিষ্ণু চরণ ঘোষ বি-এস্‌সি, বি-এল

১ম চিত্র
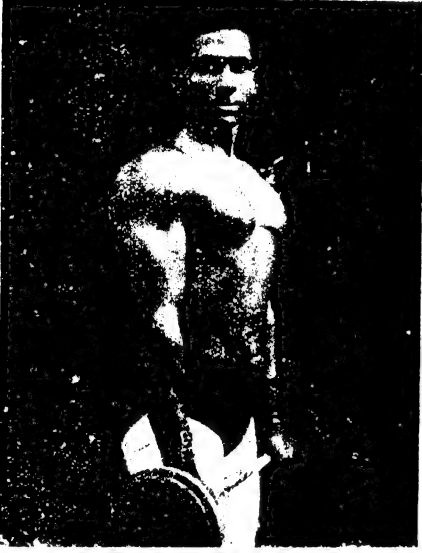
১ম চিত্রের মত দাঁড়ান। বারবেলের উপর ধরে হাঁটু পর্য্যন্ত যতটা সম্ভব নামান।

২য় চিত্র

এখন বাহুর উপর দিক ঠিক রেখে বারবেলটিকে কাঁধের সমান পর্য্যন্ত তুলুন। হাতটা বুকের সঙ্গে চেপে রাখুন। তারপর ৩য় চিত্র অনুসারী শেষ করুন। আস্তে আস্তে নামান ও হাতের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করুন; ছেড়ে দিন। ১০ বার এই রকম ১০ সের ওজনের বারবেল নিয়ে করুন। এতে হাত ও কাঁধের কসরত হয়।
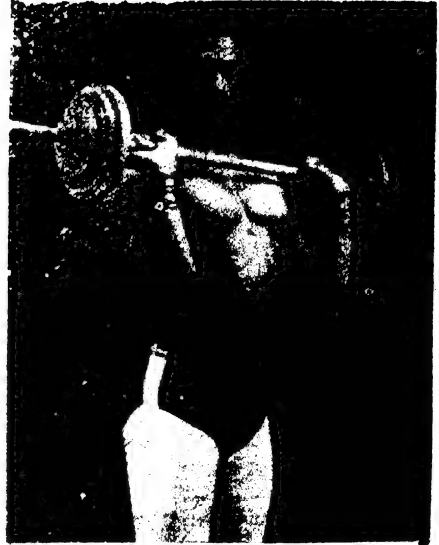
৪ক চিত্র

৪ক চিত্রের মত দাঁড়ান। দু'মুঠোর মধ্যে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক রেখে বারবেলকে কোমরের উপর নামান।

৪খ চিত্র

এখন শরীর যতদূর সম্ভব সোজা রেখে বারবেল দু' পাশে ধরে বাইরের দিকে উঠান। ৪ খ চিত্রের অনুযায়ী ঐ স্থানে কিছুক্ষণ রাখুন। তারপর ৪ক চিত্রে নামুন। ৪খ এই সময়ে কাঁধের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করিতে ও ৪ ক হইলে ছেড়ে দিতে ভুলবেন না। ঐ রকম ১০বার করুন—ঐ ওজন নিয়ে। তারপর বারবেলটী তলা দিয়ে ধরে আবার ১০ বার করুন।

ভ্রম সংশোধন—ফাল্গুন মাসে ১ক চিত্রের পর ২খ চিত্র ১খ চিত্রের পর ২ক চিত্র হইবে।
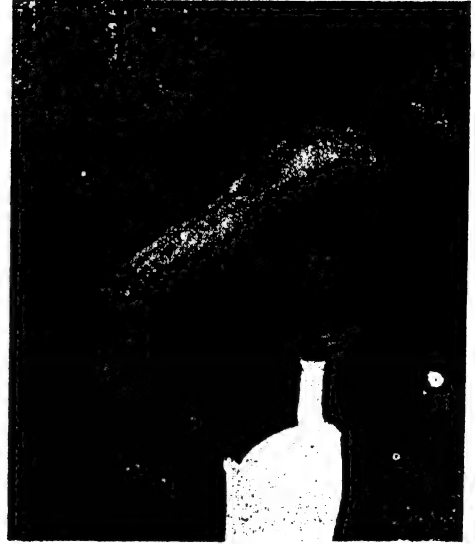
বৈজ্ঞানিক জগৎ

ইং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফেরাডেই 'ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক ইনডাকশ্যান' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কারের ফলে আজ ব্রডকাষ্টিং রেডিও, টেলিফোন ও টেলিভিশ্যানাদি সম্ভব হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক ফেরাডে।
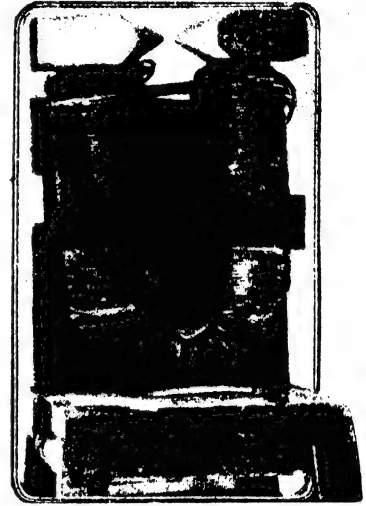
মাইকেল ফেরাডের বিখ্যাত আবিষ্কার "হর্স সু সেপ্ট এলেকট্রো ম্যাগনেট"।

এই ঘরে ফেরাডে একজন দপ্তরীর এপ্রেন্টিস্ ছিলেন।

এই যন্ত্রেতে ডাঃ আলেকজাণ্ডারসন তাঁর বিখ্যাত
আবিষ্কারের সাহায্যে দূরদেশে
অবস্থিত মানুষের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন
ও সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্ত্তি প্রতিফলিত
দেখিতেছেন।
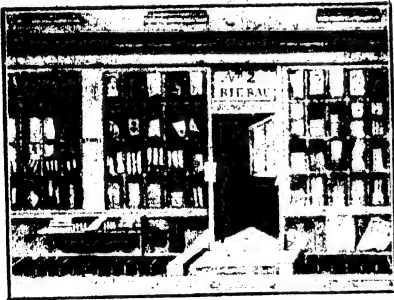
এই দোকানে চাকরীর সময় মিষ্টার ফেরাডের
এনসাইক্লোপিডিয়া হইতে একটী প্রবন্ধ পড়িয়া
ইলেকট্রিসিটির প্রতি আগ্রহ
জন্মিয়াছিল।

ফরাসী বৈজ্ঞানিকের বিখ্যাত আবিষ্কার টেলি-
ফোনের সাহায্যে টেলিফোনকারীকে দেখিতে
পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

এমিল্ জেনিংস্

চিত্রজগতে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিয়ান বলে এমিলের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে—অভিনয় প্রতিভায় ইনি চিত্র জগতে নিজেকে অন্যতম শিল্পীদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আঠার শো ছিয়াশি সালের ছাব্বিশে জুলাই ইনি জন্মান এ্যামেরিকার ব্রুকলিন সহরে।

তখন ইনি সদ্যজাত শিশু বললেই হয়—বয়স দশমাস ছাড়িয়ে যায়নি, এঁর মার হোল কঠিন অসুখ। ডাক্তাররা বললেন সুইজারল্যাণ্ড যেতে না পারলে অসুখ সারবে না। ব্রুকলিন সহরে এঁর বাবার একটি ছোট কারখানা ছিল। রান্নার বাসন পত্র তৈরী হোত সেখানে। তার আয় হতে তিনি যা সঞ্চয় করেছিলেন তাই নিয়ে এ্যামেরিকা ছাড়লেন।

সুইজারল্যাণ্ডের জুরিচ্ সহরে এঁর বাবা চলে এলেন সপরিবারে—সেখানেই দশবছর এঁদের কেটে যায় স্বচ্ছন্দে।

তার পর বাবা সপরিবারে চলে আসেন জার্ম্মানির গর্লিজ্ সহরে।

এমিলরা তিন ভাই ও এক বোন। বড় ভাই "ওয়ার্নার জেনিংস" আমদানী রপ্তানির কারবার করেন চীনদেশে সাংহাই সহরে। ছোট ভাই "ওয়াল্টার জেনিংস" কে থাকতে হয় বার্লিনে, তিনি সেখানকার ইউফ ফিল্মী কোম্পানীর জন্য বায়োস্কোপের বই লেখেন। এঁদের ছোট বোনটির বিয়ে হয় সাইলেশিয়ার এক বিচারকের সঙ্গে। মেজছেলে এমিলের কথা এবার বলি।

এমিলের স্বভাব ছেলে বেলা থেকেই কেমন যেন খাপছাড়া—ভবঘুরের মত। একদিন হঠাৎ এঁর সখ হোল থিয়েটার করবার। পাড়ার ছেলেমেয়েদের জুটিয়ে বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ খাটিয়ে অভিনয় সুরু হোল, প্রতিবেশীদেরও নিমন্ত্রণ হোল অভিনয় দেখবার জন্য।

এমিলদের থিয়েটার তখন পুরোদমে চলছে, একটি ছেলে বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরলো, ছেলেটি কোন জাহাজে চাকরী করে। এমিলের সঙ্গে ছেলেটির ভাব জমতে বিশেষ দেরী হোল না, থিয়েটারও ভেঙ্গে গেল। চোদ্দ বছরের ছেলে সমুদ্রের গল্প শুনতে শুনতে উৎসুক হয়ে পড়লো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য। পাছে কেউ কোন আপত্তি তোলে তাই একদিন রাত্রে চুপি চুপি এমিল বেরিয়ে পড়লো সদ্য পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে ক'খানি বই শুধু সঙ্গে নিয়ে।

হামবার্গে পৌঁছে এমিল একখানি মাল জাহাজে চাকরী নিলেন। কিন্তু সমুদ্রে বেড়াবার সখ দু'দিনেই মিটে গেল—জাহাজটাও যেমন নোংরা কাজটাও তেমনি ছোটলোকের মত, দুই-ই হোল এঁর অপছন্দ। জাহাজের সঙ্গীও তার ভাল লাগতো না, এককোণে চুপ করে বসে পাতা উল্টাতো—উইলিয়ম টেল, গেটে, শিলার—প্রভৃতির লেখা যে কখানা বই সে সঙ্গে এনেছিল।

একদিন রাত্রে ঝড় উঠলো। দুর্য্যোগ ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে দেখে জাহাজের লোকগুলো বেপরোয়া মদ খেতে সুরু করে দিল। হঠাৎ তাদের খেয়াল হোল—ওই বইগুলো পড়ে তাদের শোনাতে হবে। এমিল ভয়ে ভয়ে শিলারের কবিতা পড়তে লাগলো—কিন্তু মাতালদের তা ভাল লাগলোনা মোটেই—বইগুলো কেড়ে নিয়ে তারা জলে ফেলে দিল। এমিলের দুঃখের আর সীমা রইল না—নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার দিন যেন আর কাটিতে চায় না।

কদিন পর জাহাজ এসে ভিড়ল লণ্ডনের বন্দরে। এমিল কাউকে কিছু না বলে লণ্ডনের পথে বেরিয়ে পড়লো নিঃসম্বল অবস্থায়। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে হঠাৎ তার পরিচয় হোল এলবার্ট বার্লিনের সঙ্গে। বার্লিন তাকে সব ব্যবস্থা করে দিলেন ফেরবার—এমিল বাড়ী ফিরে এল।

দু-তিন সপ্তাহ পরের কথা—

প্রকাণ্ড রঙ্গালয়ের এক ছোট অভিনেতা—একটি ছেলের সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব হোল—সঙ্গে সঙ্গে এঁরও

খেয়াল হোল প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চে যোগ দেবার, কিন্তু জাহাজে চাকরী নেওয়ার জন্য বাড়িতে বকুনি বড় কম হয়নি। আবার প্রকাণ্ড রঙ্গালয়ে অভিনয় করাটা সে দেশে তখনও তেমন ভাল চোখে লোকে দেখতে শেখেনি, কাজেই থিয়েটারে আর যাওয়া হোল না বাপের গালমন্দর ভয়ে।

কিছুদিন পরে এমিলের চোখে পড়লো একটি ভ্রাম্যমান থিয়েটারের দল চলেছে তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে। এবার আর আগ্রহ চেপে রাখতে পারলেন না, কাউকে কিছু না বলে তাদের দলভুক্ত হয়ে পড়লেন। এই দলে এঁকে সব রকম বইয়েই অভিনয় করতে হোত—ট্রাজেডী কমেডী অপেরা—সব কিছুরই পুরদস্তুর অভিনেতা হয়ে পড়লেন। মাইনেও হোল—সপ্তাহে পাঁচ শিলিং। মাসের মধ্যে বেশীদিন না খেয়েই কাটতে লাগলো—মাইনে এত কম।

নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে থিয়েটারের দলটি এসে পৌছল গার্ডেল্‌জেন নামে ছোট একটি সহরে। এখানে একটি ষ্টক্ কোম্পানীতে চাকরী নিয়ে এমিল আরো কিছু রোজগার করতে লাগলেন। এই কোম্পানিতে তখন আর্নেষ্ট লুবিচ্ আর লেথের মেণ্ড কাজ করতেন—এঁরা দুজন পরে হোলিউডের অন্যতম প্রযোজক হন।

কয়েকটি কোম্পানীতে এমনিভাবে ঘোরবার পর এমিলের ভাগ্য ফিরলো—জার্ম্মান সম্রাট কাইজারের এক ভাইপোর পৃষ্ঠপোষকতায় ডার্মষ্টেড সহরে একটি কোম্পানী চলতো, এমিল সেই কোম্পানীর অন্যতম সদস্য হলেন।

এখানে একদিন ম্যাক্‌স্ রাইনহার্ট এমিলকে ডাকলেন বার্লিনের ডুস থিয়েটারের তরফ থেকে। সেই সময়ে জার্ম্মাণ কবি শিগেল্ সেক্সপিয়রের নাটকগুলি জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছেন—আর তাই বার্লিনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল। এমিল তাতে অভিনয় করলো অনন্যসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে। তারপর হাউপ্টমানের ক'খানা নাটক ইনি অভিনয় করেন অপূর্ব্ব সাফল্য গৌরবে। সারা বার্লিন মুগ্ধ হোল এই তরুণ অভিনেতার অভিনয় দেখে।

জার্ম্মানীতে তখন চলচ্চিত্রের প্রবর্ত্তন সুরু হয়েছে সবেমাত্র। ক্রমে ক্রমে জার্ম্মেনীর সহর গুলো সিনেমা আর ছবিতে বোঝাই হয়ে গেল কিন্তু তখনও এমিল ছায়া ছবি দেখতে পর্য্যন্ত যেতেন না। ডুস্ থিয়েটারের একটি ছেলে একদিন এমিলকে আশা দিল যে ছায়াচিত্রে অভিনয় করলে উপায় হবে যথেষ্ট। এমিলেরও পয়সার অনাটন তখন খুবই, কাজেই ইনি রাজী হলেন।

এতদিন ইনি কাটিয়েছেন দিনের পর দিন নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টির পরিকল্পনায়, এক একটি চরিত্রে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলবার অক্লান্ত চেষ্টায়। কিন্তু বায়োস্কোপে ঢুকে এঁর প্রথম কাজ হোল নদীর একটা পুলের ওপর থেকে নৌকায় লাফিয়ে পড়তে হবে। তিনি নিজেকে একাজে ভারী অপমানিত বোধ করলেন, ষ্টুডিও ছেড়ে দিলেন।

সপ্তাহ কয়েক পরে আবার এমিল বায়োস্কোপে

ঢুকলেন—টাকার দরকার। আগে মাইনে হয়েছিল দৈনিক দশ শিলিং এখন হোল ত্ব'পাউণ্ড। রবার্ট গেন তখন "ক্যাবিনেট্ অব্ ডক্টর কেলিগারি" নামে একখানি ছবির প্রযোজনা করছিলেন এই ছবিতে এক বুড়োর ভূমিকা এমিলকে দেওয়া হোল—তাতে কলা কৌশল দেখাবার স্থযোগ নেই মোটেই—নিজের উপরে জেনিংসের রাগ হোল।

তিনদিন কাজ করার পর ঠিক হোল, যতখানি ছবি তোলা হয়েছে তাই দেখানো হবে। পর্দ্দায় নিজের ছবি দেখা এমিলের জীবনে এই প্রথম, কিন্তু ছবি দেখেই ইনি চমকে উঠলেন, নিজের অভিনয়ই এঁর এত খারাপ লাগলো যে সেখানে বসে থাকা এঁর পক্ষে হয়ে উঠলো অসহ্য। ইনি উঠে বাইরে চলে এলেন।

তারপর ইনি আর ষ্টুডিওতে ফিরে যেতে চান নি। শেষে কর্ত্তৃপক্ষ যখন জানালেন যে ফিরে না গেলে তাঁকে গ্রেফতার করা হবে, তখন বাধ্য হয়ে এঁকে ফিরে আসতে হোল।

কিন্তু পরে এই ছবিতেই জেনিংসের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। সমালোচকেরা বললো—স্বাভাবিক অভিনয় করবার জন্য ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরতে যিনি ভয় পান না ভবিষ্যতে তিনি নিশ্চয়ই একজন বড় অভিনেতা হবেন। এমিল তো অবাক!

তারপর যে ছবিখানিতে জেনিংস্ অপূর্ব্ব সাফল্য অর্জ্জন করলেন সে ছবি খানি হোল "প্যাশ্যান।" পোলা নেগ্রীও এই ছবিখানিতে নায়িকার ভূমিকায় নেমে খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

এই 'প্যাশ্যান' ছবিখানি এ্যামেরিকায় যেদিন প্রথম দেখানো হোল তার পরদিন হতে ক্রমাগত প্রশ্ন আসতে লাগলো—যে শিল্পী প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছে তার নাম কি?

তখনো পর্য্যন্ত শিল্পী হিসাবে এঁর নাম ছবি পর্দ্দার উপর দেওয়া হয়নি।

দিন কয়েক পরে এ্যামেরিকা হতে চিঠি এল এঁর কাছে—হলিউডের চলচ্চিত্রে যোগ দেবার অনুরোধ জানিয়ে—মাইনে দৈনিক চার পাউণ্ড—।

এমিল তখন দু-কাজ করছিলেন—অভিনয় আর বায়োস্কোপ। রঙ্গমঞ্চে ইনি তখন কুঁজোর ভূমিকার নামছিলেন রাইন্হার্টের "মিরাক্ল" নাটকে। কিন্তু দু'কাজ রাখতে শরীর ভেঙ্গে পড়লো, ডাক্তাররা বললেন দুটোর একটা ছেড়ে দিতেই হবে। ইনি রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিলেন।

এঁর শ্রেষ্ঠ মূক ছবিগুলো এই সময়ে তোলা হয়—"লভস্ অব ফ্যারাও" "পিটার দি গ্রেট" "ট্র্যাজেডি অব লভ" "দি লাষ্ট লাফ" "ভডেভিল্" প্রভৃতি। এই সব ছবি তোলার সময় এঁকে সপ্তাহে ছশো পাউণ্ড করে দেওয়া হোত।

হোলিউড একদিন ধরে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারেনি—শেষে এঁকে তারা নিয়ে গেল। হোলিউডে ইনি প্রথম নামেন লেজোস বিরো নামে এক হাঙ্গেরীয় লেখকের লেখা "দি ওয়ে অব অল্ ফ্লেশ" বইয়েতে। এই ছবিতে ইনি যা অপূর্ব্ব-সুন্দর অভিনয় করেছেন তা চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাস চির-কাল অমর হয়ে থাকবে। এই ছবিখানিই এঁকে শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি অভিনেতা সম্মান দেয়।

তারপর সারা আমেরিকা মুখর চিত্র নিয়ে মেতে উঠলো, এমিল সে আন্দোলনের সঙ্গে সমান তালে পা' ফেলে চলতে পারলেন না, কেননা—এঁর ইংরাজী উচ্চারণ ঠিক ইংরাজ বা এ্যামেরিকানদের মত নয় আর মুখর চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ইনি স্বীকার করে নিতে পারলেন না। ইনি আবার ফিরে এলেন জার্ম্মানীতে আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি আর প্রচুর অর্থাগমকে উপেক্ষা করে। জার্ম্মানীতে ইনি এখন নীরব ছবিতে অভিনয় করছেন।

"ফাল্গুন"

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

১

(ফাল্গুন) ছড়িয়ে হাসি, বাজিয়ে বাঁশী,
কিরণ মেখে,
(এসেছে) রং ধরিয়ে ধরণীর এই
শ্যামল বুকে।
বিরল শাখে ভরিয়ে পাতা
জাগিয়ে সকল তরুলতা
(এসেছে) শিশির বুকে, চরণ এঁকে,
পরম সুখে।

২

(দখিনে) খোলা আগল, বায়ু পাগল,
বইছে বেগে
(পাপিয়া) মধুর সুরে হরষ ভরে
গাইছে রাগে
শ্যামল বনে নদীর পাশে
ঝুমকো লতা উঠল হেসে,
(এসেছে) ফাগুন আজি, কানন রাজি,
উঠল জেগে।

৩

(ধরণী) নবীন গানে নবীন প্রাণে
উঠল মেতে
(ফাগুনি) আঁচলখানি দেয় যে টানি
বনের পথে।
গুঞ্জরিয়া আসছে অলি
ফুলের বুকে পড়ছে ঢলি,
(ফুলের) মিষ্টি মধু, লুটছে শুধু,
হর্ষ সাথে।

৪

(মলয়া) সোহাগ ভরে পরশ করে,
ফুলের মুখে,
(শিহরি) কাঁপন লাগে, কুসুম বাগে,
লতার বুকে
ধরার ধুলায় পথের পাশে,
আম্র মুকুল পড়ছে খসে,
(মলয়া) গন্ধ তারি, রাখছে ভরি,
আপন বুকে।

চীন জাপান যুদ্ধ।

প্রবন্ধ—

শ্রীবরেন্দ্র নারায়ণ বসু

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় সকল বিবাদের মূলে রহিয়াছে মানুষের সম্পদ-লিপ্সা। সেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয় জাতি সমূহ সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্রোপকূলে অজ্ঞাত দ্বীপপুঞ্জে এবং পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল সভ্য অসভ্য সকল দেশেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই বাণিজ্য-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কূটবুদ্ধির সাহায্যে শক্তিমান জাতি সকল জগতের প্রায় সকল স্থানেই সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া বা করিবার

'Herald Tribune'
মুগুরের উপযুক্ত সময়ই বটে!

চেষ্টা করিয়া দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমান চীন জাপান যুদ্ধের মূলসূত্র যদি খুঁজিতে যাই, তবে আমরা দেখিতে পাইব, সেই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। একদিকে ইউরো-মার্কিণ বণিককুল এবং অন্যদিকে জাপান—এই দুই দৈত্যের শোষণ বুদ্ধির মাঝে পড়িয়া গৃহদ্বন্দ্বনিরত দুর্ব্বল চীনের দুর্গতি চরমে আসিয়া পৌছিয়াছে। এবং এই চীন-জাপান যুদ্ধের মূলে মাঞ্চুরিয়া সমস্যা ও জাপানের বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বয়কট নীতিই প্রধান।

বিগত ১৯০৫ সনে রুষ-জাপান সন্ধির পর হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত একমাত্র জাপানের সহিত চীনের পর পর কতকগুলি সন্ধি ও চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত সন্ধি ও চুক্তির মূলে এত প্রশ্ন ও জটিলতা রহিয়াছে তাহা বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা অসম্ভব, যাহা হউক এই সমস্ত সন্ধির ফলে জাপান, মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে নানাপ্রকার অধিকারের দাবী করিতেছে—যথা রাষ্ট্রনীতি, রেলওয়ে, সেনা সন্নিবেশ, শান্তি শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যবস্থার উন্নতি, জমির পত্তনি, খনি ব্যবসায়, বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য বিবিধ অধিকার।

নিজের দেশে কোনও বৈদেশিক জাতির এতগুলি দাবী ও অধিকারকে মিটাইতে গেলে কোন দেশেরই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় থাকিতে পারে না এবং চীনের বিশ্বাস এই যে জাপান ছলে বলে কৌশলে যে সমস্ত চুক্তি চীনের স্কন্ধে চাপাইয়াছে, সেগুলির অন্তরালে জাপানের সামরিক ও সাম্রাজ্যগত উভয় প্রকারের দুর্ব্বুদ্ধি রহিয়াছে। সুতরাং চীনের পক্ষ হইতে ও প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ৫ প্রকার দাবী উল্লিখিত হইয়াছে (১) রিক্তজান এবং চাইরেন সহরের পুনরুদ্ধার সমস্যা।

(২) মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে জাপানের সেনা সন্নিবেশের অধিকার সমস্যা।

(৩) জমির পত্তনীতে জাপানের অধিকার সমস্যা।

(৪) রেলওয়ে সমূহের সমস্যা।

(৫) মাঞ্চুরিয়াতে বোজেনবাসীদের সমস্যা।

কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের বিপুল বাণিজ্য সম্ভারের কথাই সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাপানীদের মতে মাঞ্চুরিয়ায় তাহারা দেড়শত কোটী ইয়েন (এক ইয়েনের মূল্য ।১০ আনা) ব্যবসায়ের মূলধন স্বরূপ খাটাইতেছে এবং তথায়

পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতির ব্যবসায়ের মূলধন মোট ৫৫ কোটী ইয়েন হইবে। এই জন্যই পাশ্চাত্য জাতি সমূহ নবশক্তি সন্ধির চুক্তি অনুসারে মাঞ্চুরিয়ায় open door policy অর্থাৎ বাণিজ্যের অবাধ অধিকারের দাবী করিতেছে। এখানে পাঠকবর্গ আরও বুঝিতে পারিতেছেন যে, চীন ও জাপানের মধ্যে শান্তির জন্য ইউরো-মার্কিণ শক্তিপুঞ্জের এত ব্যাকুলতা কেন।

বর্ত্তমান জাপানের প্রধান মন্ত্রী সুযোশী ইনুকাই, তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর। জাপানীরা তাঁহাকে "বৃদ্ধ শৃগাল" বলিয়া অভিহিত করে। সম্প্রতি তিনি টোকিও সহরে কোনও মার্কিণ সংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন "জাপান মাঞ্চুরিয়ায় এক ইঞ্চি জমীরও লোভ করে না। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, চীন আমাদের সন্ধি সর্ত্তের মর্য্যাদা রক্ষা করে। আমরা এই সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে মাঞ্চুরিয়ায় ন্যূনাধিক ১ শত কোটি ডলার মুদ্রা মূল্যের অধিকার লাভ করিয়াছি। পরন্তু চীনা দস্যু ও বিপ্লবীদের আক্রমণ হইতে জাপ প্রজারা এবং ৮লক্ষ কোরিয়াবাসী রক্ষা পায়, ইহারও ব্যবস্থা চীন সরকারকে করিতে হইবে। কোরিয়াবাসীরা জাপানের প্রজা, এ কথাটা যেন চীন সরকার মনে রাখেন। আমরা মাঞ্চুরিয়াটাকে দান স্বরূপ গ্রহণ করিতে চাই না। আমাদিগকে মাঞ্চুরিয়ার তিন কোটি চীনা প্রজাকেও রক্ষা করিতে হইবে। চীনারা শান্তিপ্রিয় জাতি, তাহারা যুদ্ধকে ঘৃণা করে, তাহারা যোদ্ধজাতিও নহে। জাপান চীন সাম্রাজ্যের সামান্য অংশেরও লোভ করে না। জাপান জানে, চীনের হস্তে প্রবল অস্ত্র রহিয়াছে। বাণিজ্য বর্জ্জন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে আমরা ভয় করি, এই কারণে আমরা চীনের কোন অংশ দখল করিতে চাহি না। কিন্তু চীনের যুদ্ধপ্রিয় কর্ত্তারা আমাদের দুরভিসন্ধি আছে এই মিথ্যা কথা রটাইতেছে।

এবার চীন কি বলে দেখুন। হার্বিন সহরে চীন লেখক ফ্রেডারিক কু মার্কিন পত্রে লিখিয়াছেন "জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ার রাজনীতিক, আর্থিক, ব্যবসায় সম্পর্কীয় এবং রাজস্ব সম্পর্কিত কর্ত্তৃত্ব নীরবে ও দ্রুতগতিতে আত্মসাৎ করিতেছে। তাহাদের ছুতা এই যে, তাহারা জাপ প্রজার রক্ষার্থে মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক অধিকার বিস্তার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা ফেংটিয়েন বিভাগটি এইরূপে পুর্ণভাবে গ্রাস করিয়াছে এবং হিলাং কিয়াং ও কিরিন বিভাগেও দ্রুত অধিকার বিস্তৃত করিতেছে। ঐ সকল বিভাগকে তাহারা ইতিমধ্যেই জাপ উপনিবেশে পরিণত করিয়াছে। উত্তরে সিতসিহার হইতে দক্ষিণে চিনটো পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগই এখন জাপ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত কোরিয়ার মতই বলিলে হয়। এই ভূভাগে নাম মাত্র চীন কর্ম্মচারীরা আছেন বটে, কিন্তু তাহারা জাপ কর্ত্তৃপক্ষের ক্রীড়নক মাত্র। এই অধিকৃত ভূভাগে ন্যূনাধিক ১৮ হাজার সশস্ত্র রণদক্ষ সেনা ও রণসম্ভার লইয়া জাপ সেনাপতি লেপ্টানেণ্ট জেনারেল সিগেরু হোঞ্জো বিরাজ করিতেছেন। অবশেষে কেন সংঘর্ষ সংঘটিত হইল তাহারও একটু ইতিহাস আছে, প্রথমে মাঞ্চুরিয়ার নন্নী নাম্নী নদীর সেতুই অনর্থের সৃষ্টিপাত

'Simplicissimus' (Munich) চিনে দুর্ভিক্ষ "বিষাক্ত বাষ্পের প্রয়োজন কি সেনাপতি? তার পূর্ব্বেই কাজ সাবার।"

করে, এই জন্য সেই সেতুর কথা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নন্নী নদী সুপ্রশস্ত, উহার অনেকগুলি শাখা প্রশাখা আছে, উহার সহিত অনেকগুলি ডাঙা ভূমিরও সংস্পর্শ আছে। এই নদীর সেতুটী চীনারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। নন্নী সেতু ধ্বংস করিলে জাপানের কি ক্ষতির সম্ভাবনা, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় যে রেলপথ আছে উহা জাপানীদের অধিকারভুক্ত। উহার নাম South Manchurian Railway, উহার সহিত চীনের মূল রেলপথের যোগাযোগ আছে। যদি নন্নী সেতু ধ্বংস করা হয়, তাহা হইলে সেই যোগাযোগও নষ্ট হয়। চীনের এই রেলপথের নাম Chinese Eastern Railway। সেতুটি মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে সামরিক প্রয়োজনে দুইটির মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট স্থান। হার্বিন সহরের উত্তরে যে সিতসিহার নামক সহর আছে, তাহারই সন্নিকটে চীনের মূল রেল লাইনের সহিত জাপানের দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের যোগাযোগ হইয়াছে। সুতরাং এই নদীর সেতু নষ্ট হইলে জাপানের আর উত্তর মাঞ্চুরিয়ার হার্বিন সহরের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে না। পরন্তু হার্বিন ও উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় রাসিয়ান যে প্রভাব আছে তাহার দিকে নজর রাখিবারও কোন উপায় থাকে না।

তাহার উপ ভ্লাডিভষ্টক বন্দরের পার্শ্বস্থ সমুদ্রে যাইবার পথ জাপানের পক্ষে একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বুঝা যায়, কেন জাপান চীনের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। সমুদ্রের উপর প্রভাব হস্তচ্যুত হওয়া কি সমুদ্র বেষ্টিত জাপানের পক্ষে সহজ কথা?

পৃথিবীর পঞ্চম নগর—"সাংহাই"

Chinese Eastern Railwayতে কেবল যে চীনের কর্তৃত্ব আছে তাহা নহে উহাতে আংশিকভাবে রাসিয়ারও যে সামরিক অধিকার আছে। পরন্তু সাইবিরিয়ার সহিত যেখানে উত্তর মাঞ্চুরিয়ার যোগাযোগ হইয়াছে সেই সীমান্তের নিকট রাসিয়ার মাঞ্চুলি নামক প্রবল সামরিক আড্ডা আছে। ধরিতে গেলে মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ সমূহের দক্ষিণাংশ জাপান দ্বারা অধিকৃত হইলেও উত্তরে রাসিয়ার সেনা ও মধ্যস্থলে চীন সেনা তাহার পথ আগুলিয়া আছে।

যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে জাপানের প্রভাবের বাহিরে মাঞ্চুরিয়ার Railway System এর সামরিক প্রয়োজনে বাঞ্ছনীয় key position স্থান অধিকার করিবার সূত্রেই আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় এই সময়ের মধ্যে মাঞ্চুরিয়ার একজন জাপানী সেনানী (General) Staff Officer নিহত হন। জাপ কর্তৃপক্ষ এই হত্যাকাণ্ডের জন্য চীন সরকারকে দায়ী করেন। চীন কর্তৃপক্ষ বলেন, হত্যাকারীকে ধরিতে না পারিলে তাহাকে সনাক্ত করিতে না পারিলে তাঁহারা কাহাকে শাস্তি দিবেন? জাপ কর্তৃপক্ষ বলেন চীন সরকার যখন মাঞ্চুরিয়ার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী তখন তাহারা অধিবাসিমাত্রেরই ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য দায়ী। চীন জবাবে বলেন বিপ্লবী বা দস্যুরা যদি গুপ্তহত্যা করে তবে সেই দুর্ঘটনার জন্য তাঁহারা আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু হত্যাকারীকে ধরিতে না পারিলে তাহার শাস্তি বিধান কিরূপে করিবেন?
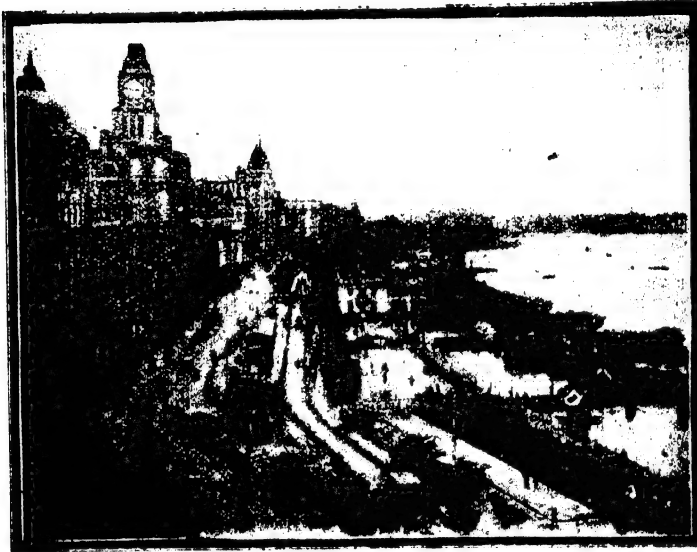
জাপান কিন্তু ক্ষতিপূরণের জন্য চীনকে চাপিয়া ধরেন। ইহাই হইল বিরোধের সূত্রপাত।

ইহার পরই জাপান তাহার অধিকারের বাহিরে সীমানা অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে সেনা প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। চীন ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পিটেইং নামক স্থানে বোমা ফেলিয়া জাপানের দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেল লাইন উড়াইয়া দেয়। ঐ স্থানটি মুকডেন সহরের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহার ২০ মিনিটের মধ্যেই জাপসেনা কামান দাগিয়া সমস্ত জেলাটাকেই অধিকার করিয়া বসে। রাত্রি ১১টার সময় চীনা সেনা বোমা ফেলে, ভোর ৪টার সময় জাপসেনা মুকডেন সহর অধিকার করে।

ক্রমে জাপান সমগ্র মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া তথায় নিজেদের শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে এবং খাস

তরুণ-চৈনিক সেনাপতি চ্যাংকাইসেক সাংহাইয়ে চৈনিক যুদ্ধনেতা।

চীনের একশত মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। চীনের রেলপথগুলিও জাপানের হস্তগত। চীনা সরকার প্রথমটা নির্ব্বাক হইয়াছিলেন। চীনা ছাত্রগণ চীন সরকারকে যুদ্ধকার্য্যে অবহিত করিবার জন্য রাজধানী পিকিঙে যাত্রা করিতে চাহিলে রেল কোম্পানী প্রথমতঃ তাহাদিগকে অনুমতি দেয় নাই। অতঃপর ছাত্রগণ রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়ে এবং রেল চলা কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে। অবশেষে ছাত্রদের দাবী স্বীকৃত হয়—তাহারা বিনা ভাড়ায় পিকিঙে যাইয়া সরকারের নিকট যুবক সম্প্রদায়ের মনোভাব ব্যক্ত করে, চীনা সরকার অগত্যা যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন। জাপান রণতরী শাংহাই অবরোধ করিয়া ইয়াংসি বাহিয়া নানকিং পৌছিয়াছে। উভয় পক্ষে যুদ্ধ ও হতাহতের সংবাদ চরিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চীন বিশ্বের দরবারে এই অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনায় আবেদন যথেষ্টই করিয়াছে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিরাও জাপানের কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে সংযত হইবার জন্য অনুরোধ করা স্বত্বেও সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে সাহসী হইল কি প্রকারে? জাপানের মাথায় কি এইটুকু বুদ্ধি নাই যে, আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি ও স্বার্থের বারুদখানায় যদি আগুন ধরিয়া যায়, তবে পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে এবং সেই আগুনে জাপানেরও ভস্মীভূত হইবার আশঙ্কা থাকিতে পারে।

জাপান ইহা জানে এবং জানিয়াও তাহার সাহসী হইবার গূঢ়তর কারণ আছে। বিগত ইউরোপীয় সমরের পর হইতে একমাত্র আমেরিকা ব্যতীত সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বেকার, বাণিজ্যের বাজার মন্দা এবং অর্থ নৈতিক দুর্গতির চাপে পড়িয়া ইউরোপীয় রাজ্য গুলি নিজেদের ঘর সামলাইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিরাট অভিজান চালাইবার মত সাহস ও শক্তি তাহাদের না থাকারই কথা। নিজেদের এই দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ মহাযুদ্ধের পর হইতেই বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর ধুয়া ধরিয়া বড় বড় বুলি আওড়াইতেছেন। কিন্তু কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না—এক অন্যের অগোচরে শক্তিসঞ্চয়ের জন্য চক্রান্তজাল বিস্তার করিতেছে। ফলে নৌবল হ্রাসের বড় বড় প্রস্তাব এবং যুদ্ধ নিবারণের জন্য কেলগ প্যাক্টে সোৎসাহে স্বীকার সত্বেও পৃথিবীর আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা পূর্ব্বের মতই মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে। জাপান জানে যে, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের এই শান্তির বাণী আন্তরিক নহে, উহা ভবিষ্যতের আয়োজনের জন্য সময় গ্রহণের নামান্তর মাত্র।

জাপান আরও জানে যে, প্রত্যেক শক্তিশালী রাষ্ট্রই মনে মনে সাম্রাজ্যবাদী। সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই কেহ লাভের গণ্ডা ছাড়িবে না। মরক্কোর রীফযুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্তির যে আন্দোলন চলিয়াছে, শান্তিবাণীওয়ালা পাশ্চাত্য জাতিসমূহ—তাহার জন্য কোথাও তাহাদের বজ্রমুষ্টি শিথিল করে নাই এবং দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করার সুযোগ তাহারা কোথাও বিসর্জ্জন দেয় নাই। সুতরাং আজ সুযোগ বুঝিয়া জাপান যদি চীনের বন্দর গুলি দখল করিতে এবং আপনার প্রভুত্ব এসিয়ার উপর বিস্তার করিতে পারে, তবে মূর্খের মত সে উহা ছাড়িয়া দিবে কেন? জাপান জানে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই—এই

মাসতুতো ভায়ের দল চীনের জন্য আন্তরিক মঙ্গল বুদ্ধি লইয়া চীৎকার করিতেছে না, তাহাদের চীৎকারের মর্ম্মার্থ এই—পাছে জাপান একাই সমগ্র চীনকে গ্রাস করিয়া ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের বিপুল বাণিজ্য সম্ভারকে ধ্বংস করিয়া ফেলে!

এই জন্যই সে দিন বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের কাউন্সিলের অধিবেশন জাপ প্রনিনিধি মিঃ স্যাটো নির্লজ্জের মত বসিয়া বলিলেন, "অতীতে অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্র চীনের উপর যখন অনুরূপ অভিযান চালাইয়াছিল তখন তো চতুর্দ্দিক হইতে অত চীৎকার উঠে নাই তবে আমাদের বেলাই বা কেন এত হট্টগোল বাধাইতেছ? বিশেষতঃ কেলগ্ চুক্তি তো রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্গত চুক্তি নহে। সুতরাং কেলগ চুক্তির কথা স্মরণ করিয়া দিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কি অধিকার আছে?

এই স্পষ্ট উক্তির সোজা অর্থ এই যে যেহেতু অন্যে চুরি করিয়াছে এবং সেই চুরির জন্য কোন শাস্তি হয় নাই। সে জন্য আমরাই বা চুরি করিব না কেন?

এই যুক্তির উপর টীকা নিষ্প্রোয়োজন। তবে বিলাতের সাইমন সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া ইতালীর গ্রাণ্ডি সাহেব পর্য্যন্ত চিন্তাব্যাকুল চিত্তে জেনেভার দিকে ছুটিয়াছেন কেন? এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই জরুরী অধিবেশনেরই বা অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমস্ত পৃথিবীর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে মোড়ালগিরির দাবী করে, কিন্তু জাপান এই মোড়লগিরি অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া এবং তোপের মুখে শান্তির বাণী উড়াইয়া দিয়া চীনের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং জাপানকে এক্ষণে সমবেতভাবে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার—ভাই হে চুপে চুপে যাহা কর আপত্তি নাই, কিন্তু এত হাঁক ডাক দিয়া করিলে আমরা মুখ দেখাই কি করে, তার চেয়ে এস এমন একটা আপোষ রফা করিয়া দিই যাহাতে তুমি নির্ব্বিবাদে চীনের বন্দরে ও রাজ্যে আমাদের সঙ্গে সমানভাবে ভোগ দখল বজায় রাখিতে পার। যদি সত্যকার মানবকল্যাণ ও দুর্ব্বলকে রক্ষার আন্তরিক ইচ্ছা রাষ্ট্রসঙ্ঘ তথা পাশ্চত্য শক্তিপুঞ্জের থাকিত তবে প্রশান্ত সমুদ্রতীরে এই লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় কখনও হইতে পারিত না।

ন্যানকিং "নেপোলিয়ন" রাষ্ট্রনায়ক সস্ত্রীক চ্যাংকাইসেক!

নিরস্ত্রীকরণ ও জগতের শান্তি

শ্রীসুন্দর মোহন বসু বি, এস, সি, বি, এল,

জেনেভার অস্ত্রনিয়ন্ত্রন সভার প্রতি যতই জগতের দৃষ্টি আকর্ষিত হক না কেন ইহা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই সভা জগতে যুদ্ধ বিগ্রহ নিবারণ করে শান্তি আনয়ন করতে অক্ষম। বিগত মহাসমরের পর ইউরোপের দিকে তাকালে বেশ দেখা যায় যে ইহা যে রণভূমি ছিল সেই রণভূমিই এখনও আছে। ভার্সাই সন্ধি জগতের সকল পরধন-লোলুপ জাতির যেন একটি বিরাট যৌথকারবার রূপে পরিণত হয়েছে। ডাঃ ঠাকুরের মত ব্যক্তি জাতি সঙ্ঘকে যতই সে উদারতার বড়াই করুকনা কেন সুশিক্ষিত দস্যুরদল বলেছেন। কেলগ তার প্যাক্টের ভাষার আড়ম্বরে জগৎকে ভুলাবার বৃথা চেষ্টা করলেও এই ভিত্তিহীন প্যাক্টের উপরই এই বিরাট নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক স্থাপিত। যদিও কেলগ তাঁর এই শান্তি প্রস্তাবে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তবু তাঁর এই উদ্যম যুক্তি ও সময়ের পরীক্ষায় এখনও সফলকাম হতে পারে নাই।

এই বৈঠক কয়েকটি আইন করে যুদ্ধকামী জাতির কতকগুলি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র কমাতে পারা ব্যতীত আর কিছু করতে পারবে বলে আশা করা যায় না। এতে ফল এই হবে যে এই সকল জাতি আরও ভাল করে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হবে। আজ পর্যান্ত অশান্তির মূল কারণ কি না জেনে কেবল মাত্র অশান্তির বাহ্যিক কারণ সকল প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে জগতে শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে তাই এই উদ্যম বিফল মনোরোথ হচ্ছে। প্রত্যেক জাতির পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ ঈর্ষা যখন বর্ত্তমান তখন কেবলমাত্র সভা সমিতি বা আইন কানুন করে কি এদের মধ্যে সখ্যভাব আনতে পারা যায়? ব্রীটন, 'ইতালী, ফ্রান্স এদের প্রত্যেকের মধ্যে সামান্য কিছু হলেই এরা মারমুখী হয়ে উঠে; এদের মধ্যে কেমন করে কোন মীমাংসা হওয়া সম্ভব? জার্ম্মানীর এই দুরবস্থার সময় সে ক্ষতিপূরণ করতে পারব না বলায় ফ্রান্স ও আমেরিকার সহানুভূতি দূরে থাকুক চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে। গণ-তন্ত্রের সবশিশু রাসিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে যে five years plan করেছে দেখে জগৎ আজ মুগ্ধ কিন্তু কোন গুপ্ত কারণে ইহা কারো কারো গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। জাপান এই বর্ত্তমান যুদ্ধে তার নির্লজ্জ পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে। এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শান্তি-বৈঠকের সাফল্য যে কতদূর সন্দেহ জনক তা কি কারও অবিদিত?

এখন দেখা যাক যে জাতিসঙ্ঘ কি এমন কার্য্য করেছে যাতে এর স্থিতি বাঞ্ছনীয়; কারণ যদি এমন একটি সুগঠিত সভা শান্তি স্থাপন করতে না পারে তবে এই ক্ষুদ্র সভা কি করে সেই কার্য্য করতে সাহসী হয়? এই লীগের স্থিতির অনুকূল এবং প্রতিকূলের সমস্ত মতামত সংগ্রহ করলে দেখা যায় যে অনেকেই এর স্থিতি প্রার্থনা করে না। রবীন্দ্র নাথ বলেন 'তোমরা জগতের শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করছ এই League of Nations এর দ্বারা কিন্তু এই সকল জাতির Idealist Dreamer প্রতি-না হয়ে তাদের রাজনীতিকেরাই এই বৈঠকের প্রতিনিধি হয়। আমার মতে এইরূপ কোন কার্য্যই শান্তিস্থাপন করতে পারে না। এ যেন ঠিক একদল দস্যুকে নিয়ে একটি সুশিক্ষিত প্রহরীদল সংগঠন করা। আমি সম্প্রতি অনেক দেশে ভ্রমণ করে দেখলাম যে সর্ব্বত্রই এই রাজনীতিকেরা কি অশান্তির সৃষ্টি করেছে। কেমন করে তারা এই শান্তি বৈঠকে গোলমালের সূচনা করেছে এবং কি শোচনীয় অবস্থায় এই বিরাট মানবসভ্যতাকে এনে ফেলেছে। মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান চীন জাপান যুদ্ধ দেখে বলেছেন যে এই লীগ একটি ক্ষমতাহীন প্রতিষ্ঠান এবং শান্তিভঙ্গ স্থলে অনুমোদনই করে।

জার্ম্মানীর এক বিশিষ্ট প্রকাশক Dr. A. Mend-dalsshon Bartholdy ও ঠিক এই মত পোষণ করেন, এবং জার্ম্মানী এই লীগ ভুক্ত থাকিবেন কিনা এই প্রশ্ন করেন। এই লীগ যদিও সুনিয়ন্ত্রিত এবং অনেক জাতির প্রতিনিধি যোগদান করিয়া থাকেন তথাপি উহা শান্তির জন্য দায়ী নয় কারণ ভারসাইয়ে যে সম্প্র-দায়ের গঠন হয়েছিল তাকে উদার দৃষ্টিতে দেখলেও League ছাড়া Union আখ্যা দেওয়া যায় না। Dr. Bartholdy বলেন যে League যদি শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করতে না পারে তা হলে এর প্রয়োজন কি? Union এর উদ্দেশ্য দেশের ও জাতির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি না করে কোন গঠন মূলক কার্য্য করা।

League এর বহু বাহ্যিক আড়ম্বর থাকা সত্বেও কার্য্যতঃ বিশেষ কোন ফল দেখা যায় না। ফরাসীদের মতে যে Formal Security জন্য League এর দরকার তা এই League দিতে পারেনা। আদত কথা এই League এর কার্য্য স্পষ্টতঃ কিছুই বোঝা যায় না। কারণ সভা বা সমালোচনা করাইত আর লীগের কার্য্য নয়। ফ্রান্স এই লীগের কার্য্যকে প্রকাশ্যেই সন্দেহ করে কিন্তু Tripple Allianceএর সত্ব ভঙ্গ হওয়ায় ফ্রান্সকে বাধ্য হয়ে লীগ ভুক্ত হতে হয়েছে। এই অস্ত্রনিয়ন্ত্রন সভার সফলতায় ফ্রান্সের যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং সেই জন্য Naval Conference যোগদান না করায় আবার একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি এই জেনেভা বৈঠকে পাঠাবার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা সত্বেও ফ্রান্স বিপদের আশঙ্কা করে বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করে নাই। ওয়াশিংটন কনফারেন্স এর সর্ত্তানুযায়ী ৭০,০০০ টনের বড় জাহাজ না তৈয়ারী করলেও ইতালীর পোত নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে ফ্রান্স উপযুক্ত আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই। এই সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন সত্বেও অস্ত্রনিয়ন্ত্রনের কামনা কি বামনের চাঁদ ধরার ইচ্ছার মত নয়? বর্ত্তমান চীন-জাপানের দ্বন্দ্বে এই লীগ যে কত অসহায় এবং অক্ষম তা বেশ প্রতীয়মান হয়।

শান্তি স্থাপনে অস্ত্রনিয়ন্ত্রন অধিক না হলেও এই লীগের মতই অকৃতকার্য্য হবে। দিনে দিনে অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ সমস্যার এক একটী নূতন শাখা গজাচ্ছে। কর্ত্তাদের দৃষ্টি army এবং navy কাটছাট করতেই বদ্ধ কিন্তু শুধু এতেই কার্য্যসিদ্ধি হবেনা। আকাশের দিক থেকে যে বিপদের সম্ভাবনা তা এদের একচক্ষু হরিণের মত দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। Anglo French Students Conference এ অধ্যাপক গিলবার্ট বলেছেন যে যদিও আমাদের নৈতিক আস্থা আছে তথাপি শূন্য হতে যুদ্ধের বিপক্ষে কোন পার্থিব আস্থা নেই। লণ্ডন ও প্যারিস পরস্পর আক্রমণ করতে পারে কিন্তু কারও আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতা নেই। জার্ম্মাণীর আকাশবাহী বাণিজ্য পোতও এত বেশী আছে যে তাতে বোমাদ্বারা প্যারিস অনায়াসে ধ্বংস করা যায়। এই সব বন্ধ করবার প্রথম উপায় আছে যে সামরিক aviation বন্ধ করা এবং একটা আন্তর্জাতিক আকাশপোত সমিতি গঠন করা। এই একটা নূতন বাধা লীগের সামনে অধ্যাপক উত্থাপিত করেছেন কে জানে কালে আরও কত উঠবে।

সমস্ত জাতি অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের যতই বাচনিক আড়ম্বর করুক না কেন ভিতরে ভিতরে সকলেই যুদ্ধার্থ বেশ ভাল ভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে এটা কি যুদ্ধেরই নামান্তর নয়? যদিও বৃটিশ রাজ নৈতিকেরা খুব তারস্বরে অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের ঘোষণা কচ্ছেন কিন্তু প্রকৃত ঘটনায় তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণ হচ্ছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ক্যাপ্তেন ইডেন খুব বড় গলায় ঘোষণা করেছেন যে বৃটিশ প্রতিনিধিগণ নিষ্পাপ অন্তরে বলতে পারেন যে গতযুদ্ধের পর বৃটেন সকল কর্ম্ম ক্ষেত্রেই অস্ত্রনিয়ন্ত্রণে অগ্রবর্ত্তী এমন কি বৃহৎ শক্তি কয়টির মধ্যে তারাই খুব কঠিন ও নির্ম্মম ভাবে সৈন্য বিভাগে কাট ছাট করেছে। গত বৎসর প্রধান মন্ত্রীও কতকটা এইরূপ বলেছেন কিন্তু মন্ত্রীমশাই বা তাঁর সতীর্থ মানবজাতির প্রতি তাঁদের ভালবাসার পরিচয় দিতে যতই চীৎকার করুন না কেন তাঁদের কথা যে কত অন্তঃসার শূন্য তা স্পষ্টই বোঝা যায়। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা ধরলেও বৃটিশ সামরিক ব্যয় ১৮৯৩ হ'তে আজ পর্য্যন্ত ৩৩৫০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১১০,০০০,০০০, পাউণ্ড হয়েছে। এখন প্রধান মন্ত্রী ইহার কি উত্তর দিবেন তা তিনিই ভাল জানেন, ইহা ছাড়া ঔপনিবেশিক সৈন্য, ভারতীয় সৈন্য এবং অন্তরীক্ষ সৈন্যদলেও কত লোক আছে। অস্ত্রনিয়ন্ত্রনের প্রতি কাহারও আগ্রহ দেখা যায় না বরং ইউরোপ ১৯১৪ সালে যেমন সামরিক ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিল এখন তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয় কারণ তখনকার চাইতে এখনকার অস্ত্রশস্ত্র সমূহ অধিক কার্য্যকারী।

সাহিত্যিক, প্রকাশক বা মনীষীগণ লক্ষ্য করেছেন যে অন্তরে অন্তরে সামরিক আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। H. G. Wells বলছেন যে তোমাদের আন্দোলন কেবল কথার কথা। কারণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানির ২৫ বৎসরের নীচের অর্দ্ধেক যুবকই সমর পাগল। রোগের ঔষধ ঠিক না করে তোমরা কেবল উপর উপর চিকিৎসা কচ্ছ তাতে কি রোগের শান্তি হতে পারে? এই যুদ্ধের প্রতি যে ইচ্ছা ইহার মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

No more war movement in England এর সভাপতির চিঠিতে প্রকাশ যে আর্ম্মিষ্টিসের পর ১২বৎসরে প্রকৃত অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। ইউরোপের যুদ্ধের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলেই প্রায় বলে যে ১৯৩৬ বা ৩৮ সালে আবার একটি মহা যুদ্ধ হবে। আমাদের নিজেদের war office ১৯৫০ সালে আবার যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্য সংগঠন করতে আরম্ভ করেছে। ম্যাকসিম গোর্কি এইসকল সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন যে শক্তিবর্গ সব করতেই প্রস্তুত কিন্তু মুখে নিরস্ত্রীকরণের আস্ফালন করে থাকেন। এই জন্যই

গোষ্ঠি যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন করে এইসব চিরতরে বন্ধ করে সত্য শান্তি ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য মানবজাতিকে আহ্বান করেছেন।

Mr. Raymond. B, Fosdick. অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের দুইটী উপায় স্থির করেছেন। প্রথম উপায়টি হচ্ছে যে শক্তিবর্গের পরস্পরের অস্ত্রসংখ্যা সমান ভাবে কমান। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে এমন একটি দলের সংগঠন করা যার সভ্যগণ যুদ্ধ বিগ্রহের বিরুদ্ধে এবং শান্তি স্থাপনে বদ্ধপরিকর হবে এবং এর ফলে যুদ্ধের কারণ না থাকায় অশান্তির নিবারণ আপনা হতেই হবে। দ্বিতীয় উপায়টীই অধিক কার্য্যকরী এবং এতেই আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব কলহের মীমাংসা হবে বলে মনে হয়। মানুষ যখন বুঝতে পারবে যে তাদের বিবাদ মিটাবার কার্যকরী উপায় আছে তখন আপনা হতে তারা শান্ত হবে। এই দ্বিতীয় উপায়টিকে কার্য্যকরী করতে Mr. Fosdick বলেন যে একটা Court of International Justice করা হ'ক এবং —Act for Pacific Settlement of International Disputes আইনের দ্বারা জগতের সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করা হ'ক। তিনি বলেন যে যতদিন মানুষের অশান্তির মূল কারণ দূরীভূত না হয়ে বাহ্যিক অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলবে এবং এমন একটি Institution যাহা আন্তর্জাতিক বিবাদসমূহ মিটাবে প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন প্রকৃত শান্তির আশা করা যায় না। ১২ ইঞ্চ কামানের গোলা থেকে ৮ ইঞ্চি গোলা করা বা সৈন্যসংখ্যা শতকরা ১০।১২ জন কমালে অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে আরও সঙ্গিন করে তোলা হবে। Mr. Fosdick এই অস্ত্রনিয়ন্ত্রনের প্রথা হতে সাবধান হবার জন্য বলছেন—"বাক্সের মধ্যে বারুদ আছে কিন্তু ডালার উপর সাবধান হও—" এই কথাটী শুনে আমরা আশ্বস্ত হয়ে আছি।

জগতে শান্তি আনতে প্রধানত এই চাই যে সমগ্র জগতের মানবজাতির যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় মত পোষণ—যা সামান্য মাত্র যুদ্ধেচ্ছাকেও পিষে ফেলবে। Prof Albert Einstein জগতের সকল জাতিকে অনুরোধ করেন যে তারা যেন শুধু মুখে অস্ত্রনিয়ন্ত্রণের কথা না বলে কাজে কিছু করেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও বলেন যে রাজনৈতিকের দ্বারা শান্তিস্থাপন হতে পারে না। তিনি আরও বলেন "তোমরা এই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নাও। ঐ সব রাজনৈতিকের দ্বারা এসব কাজ হবে না। যদি তোমরা মনে কর থাক যুদ্ধের আর আশঙ্কা নেই তবে তোমাদের মত মূর্খ আর জগতে নেই। আমাদের সম্মুখে এখন গত মহাযুদ্ধের চাইতেও বিভীষিকাময়ী ও ধ্বংসকরী অস্ত্রশস্ত্রসমূহ বিদ্যমান। সারা বিশ্বে এমন একটি বিরাট আন্দোলন চাই যার প্রত্যেক সভ্য যুদ্ধের কল্পনা মাত্র প্রাণের সহিত ঘৃণা করবে এবং তারা জীবনে কখনও সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হবে না এমনি কঠিন পণ করবে। সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তির যুদ্ধ বা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগ চাই এবং এতে জগতের রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন হওয়া সম্ভব। এই কার্য্য শক্ত হলেও মহৎ এবং সকলের মিলিত চেষ্টায় কিছুই অসম্ভব নয়।

Scientific American কিন্তু Prof Einstien এর মত ঠিক অনুমোদন করেন না। এর মতে Complete disarmament সম্ভব নয় তবে armament কিছু restricted করা যেতে পারে। যেদিন সমগ্র জগতের লোক একই বিরাট ভ্রাতৃমণ্ডলীতে পরিণত হবে সেদিন সুখের বিষয় বটে কিন্তু তার দেরী যথেষ্ট।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে এই Geneva Conference এর কার্য্য সফল হবে না। যতদিন মানবের অন্তর্নিহিত লোভ বা কামনার অন্ত না হবে ততদিন এক জাতি অপর জাতির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকবে এবং অস্ত্রনিয়ন্ত্রণত দূরের কথা অহিংসাও জগতে শান্তিস্থাপনে অক্ষম। যদি পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি না থাকে তবে এই নিরস্ত্রীকরণের কথাই উঠতে পারে না। এই মীমাংসা যতই আদর্শস্থানীয় হ'ক না কেন সামরিক রীতিনীতি শিক্ষাপূর্ণ জাতিদের মনে ধরবেনা। তিনি প্রশ্ন করেন যে ইংলণ্ডে ২০ লক্ষ লোক যখন জগতের ৪৫টী দেশকে এই অস্ত্রনিয়ন্ত্রণে যোগদান করতে নিমন্ত্রণ করেছিল তখন কি তারা একবারও অর্দ্ধভুক্ত অর্দ্ধ উলঙ্গ জীর্ণ শীর্ণ মূক দিগের মুক্তির কথা একবারও ভেবেছিল?

ক্যান্টনবারীর ডীন বলেন যতদিন এই স্বাধীনতা সমগ্র মানব জাতির সম্পদ না হবে ততদিন প্রকৃত শান্তির আশা সুদূর পরাহত। শুধু এই সবরমতী আশ্রমের সাধু মনিষীই জগতে এমন দিন আনতে পারে যেদিন সমগ্র মানবজাতি ভাই ভাই বলে আলিঙ্গন করে জীবন সংগ্রামে হাত ধরাধরি করে চলবে।*

---

* ইংরাজী হইতে।

খেলা ঘরে

চিত্র | শ্রীসুবাসিনী বালা বসু

১

দুর্গা! দুর্গা!

এখনো দেখছি কারো ওঠা হয়নি। ও বড় বৌমা, ও ছোট বৌমা ওঠ না গো। বেলা যে অনেক হলো। ও ভূতো—ও সিধু! আজ কি আর তোদের ঘুম ভাঙবে না,—নেকাপড়া করতে হবে না? ওরে হরে,—চাকর নয় তো নবাব পুত্তুর—ঘুম আর ভাঙে না।

(মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া) এই যে যাই মা। কৃতার্থ করে দিলে। গোয়াল মুক্ত করাব কখন, আর বাজারেই বা যাবে কখন?

(মুখ খিচাইয়া) হবে খনে;—বলি কোন দুপুরে?

দেখ বউমা বাগানে কেমন সুন্দর কচি কচি নধর নধর শাক হয়েছে,—কিছু উঠিয়ে নিয়ে এলাম। বেশ করে তেল দিয়ে মাখ মাখ করে ভাজ দিকি; খেতে বেশ হবে খন।

ওরে হরে কি মাছ আনলি দেখি, নেকড়াটা খোলতো বা—বা! বেশ জ্যান্ত রুই মাছটা তো। কত নিলে?

(আশ্চর্য্য ভাবে স্বর টানিয়া) ছ আনা; তুই তো অবাক করলি। ওরে হতভাগা ছ'আনা দিয়ে কে তোকে আনতে বললে শুনি। তিন আনা হলে ঠিক হোতো। তোদের আর কি বল, লাগে টাকা দেবে গৌরিসেন। এমন চাকর নিয়ে কি বাপু ঘর করা যায়। কোন দিন দেখছি পথে বসাবে।

ও বাবা নরেন! শিগ্গী উঠে, হাত পা ধুয়ে, কানুকে একবার কবরেজের বাড়ী নিয়ে যা তো দিকি। কাল রাত থেকে বেচারার আবার একটু জ্বর জ্বর মত হয়েছে। ও কি খাবে-টাবে একবার ভাল করে জিগ্গেস করে নিস।

ও বৌমা বেলা যে অনেকটা হলো। তুমি ঠাকুর ভোগটা চড়াও, আমি ততক্ষণে টপ্ করে, পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি।

ও ক্যান্তোর পিসীমা কেমন আছ?

(অতি দুঃখিত ভাবে) আর আমার কথা বলো না ভাই—

(অতি নিরাশ ভাবে) শরীরের আর দোষ কি, খেটে খেটে আর পারি না ছাই—শরীর একেবারে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। হাঁ ভাই রমেশ যে স্বদেশীতে ধরা পড়ে ছিল কি হল?

(আশ্চর্য্যভাবে) ছ' মাসের জেল হয়ে গেল,—আহা কোথা থেকে এক হুজুগ এল আর ছোঁড়াগুলো নেকাপড়া ছেড়ে দিয়ে, দল বেঁধে জেলে চল্লো। একটু তো বোঝে না, না বাপ মার কথা শোনে। টপ্ করে একটা ডুব দিয়ে যাই। যেদিকে না দেখলো সে দিকে তো আর হবে না।

ও রানু আজ ফুল তুলিসনি?

(মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া)—মা! ও ঠাকুরমা ভুলে গেছি,—মাথা কিনলে। যাই আবার এই ভরা দুপুরে ফুল তুলতে যাই। না বাপু তুমি সাজি রাখো, তোমায় যেতে হবে না।

(মিনতির স্বরে) আহা! উঠো না, ও'কটা খেয়ে নাও। বাইরে যাচ্ছো কি খাবে না খাবে তার ঠিক নেই। কি বকাট হলে কি না খাজনা দেখ না। আহা!

উঠ্ছো কেন বসো বসো,—ও বড় বৌমা রুইমাছের এক টুকরা পেটি দিয়ে যাও। ওই কাগজি নেবু দিয়ে মাখো দিকি, খেতে বেশ হবে খন। নরেনকে চাট্টি ভাত দিয়ে যাও; আর ভাজা ভাজা দেখে দুখানা রুই-মাছ দও।

(আদরের স্বরে)—কি খেতে পারবি না,—বলিস কিরে এই তো খাবার বয়স; নইলে বাঁচবি কি করে। হাঁ শোন ভাল করে খাবে দাবে, পয়সার দিকে টানা টানি কেরো না যেন। বাড়ীর চাকরের মধ্যে কাকে সঙ্গে নিচ্ছ।

(সন্তুষ্টভাবে)—হরে, তা বেশ চটপটে আছে।

(সামনের দিকে মুখ তুলিয়া একটু চীৎকার করিয়া) ও রামু জল দিয়ে যা।

তুই যে উঠলি নরেন, ও কটা খেয়ে নে। আজ আবার তোকে কর্ত্তার সঙ্গে মহলে বেরুতে হবে।

—হাঁ আর শোন্ কর্ত্তার সঙ্গে থাকবি। খাওয়া দাওয়া ভাল করে দেখবি।

ও রামু ছেলে মেয়েদের ডাক, এই ফাঁকে এই পাতে সব খেয়ে নিক।

* * * *

এস দিদি এস, বসো।

—আর বলো না দিদি, যা গরম, তার উপর আবার মাছির উৎপাত। আর সহ্য হয় না ইচ্ছে করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই। সারা সকালটা জল ঢেলে তবে এই সানটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।

কোলে বুঝি তোমার সুরেশের ছেলে।

(করুণস্বরে)—তা দিদি কেঁদে আর কি করবে বল। কর্ম্মফল-কর্ম্মফল তো ভোগ করতে হবে। আহা এ বেঁচে থাক—মায়ের কোল যোড়া করে থাক, বংশের মুখ উজ্জল করুক। মুখটা ঠিক বাপের মত হয়েছে।

কি নাম রেখেছ দিদি?

—আয় তিনকড়ি আমার কাছে আয়। হাঁ কি বলছো দিদি?—হাঁ ছোট বৌমার এই পাঁচ মাস—

—সাধটাধ দেব বৈকি! এ বৌয়ের এই প্রথম একটু ধুমধাম করে দিতে হবে তো। গরমের ছুটী হয়েছে, বীরেন আজ আসছে। কর্ত্তা মহল থেকে ফিরে এলেই এ কাজটা সেরে ফেলবো।

—তা বৈকি ছোট বৌমার এখন বয়স হয়েছে, কোলে একটা না হলে মানায় না।

হাঁ রামুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। আসছে অঘ্রাণে দু'হাত এক করে দেবো।

—ছেলে ন'পাড়ার জমিদারের মেজ ছেলে।

ওরে তিন--কড়ি পাকা চুল তুলে দিতে পারিস। হাঁ দিদি তিনকড়ির বয়স কত হল?

(আশ্চর্য্যভাবে) মোটে আড়াই বছরের? ও কিরে আমাকে তোর ভাল লাগে, পছন্দ হয়, বিয়ে করবি?

হা—হা,—দেখ দিদি দেখ, ছেলের কীর্ত্তি দেখ—মাথা নেড়ে আবার বলছে না।

কেন রে, (চুলে হাত দিয়া) দেখ আমার কেমন সুন্দর সাদা সাদা চুল, (গালে হাত দিয়া) গাল কেমন চুপসে গেছে, চামড়া ঝুলে পড়েছে,—

শোন ভাই শোন, আবার মাথা নেড়ে জোরে জোরে বলছে না—না—

যাক্ ভাই আমাকে আর বিয়ে করে কাজ নেই। আমি এমনি আশীর্ব্বাদ করছি, আমার মাথায় যত--চুল তত তোর পরমায়ু হোক। আর একটা রাঙা টুকটুকে বউ হোক।

(জিজ্ঞাসার স্বরে) উঠলে দিদি?

(বাহিরের দিকে চাহিয়া) হাঁ বেলা প্রায় গড়িয়ে এল, আমি ও উঠি। পার যদি কাল দুপুরে এস।

ও রামু চল গা ধুয়ে আসি। দেখ দেখি তোর মা খুড়িমারা গা ধুয়ে এসেছে কি না?

(চীৎকার করিয়া) যাক ভাল হয়েছে।

হারামজাদি—হারামজাদির যদি একটু লজ্জা সরম থাকে লা। আমি যে বুড়ো মাগি হয়ে গেলাম, আমি কি না মাথার কাপড় টেনে দিয়ে পথের এক পাশে এসে দাঁড়ালাম। আর উনি কি না আঁচল উড়িয়ে,ওদের পাশ দিয়ে টকটক্ করে টাট্টু ঘোড়ার মত দৌড়ে এলেন। চৌদ্দ বছরের মাগি হোল' যদি একটু লজ্জা সরম থাকে লা।

—অমনি রাঙা চোখে পানি ভরে এল। থাক্ থাক্ আর ঢং করিস না। আমারো একদিন তোর মত বয়স ছিল, আজ না হয় বুড় হয়েছি। বুঝি লো সব বুঝি—

(গলা একটু নামাইয়া)—আর বল কেন দিদি,—কতকগুলো বয়াটে ছোঁড়ার জ্বালায় আর পথে ঘাটে বেরুবার যো আছে। সোমত্ত নাতনিটীকে নিয়ে গা ধুতে যাচ্ছি, আর কতকগুলো আধঘড়েল ছোঁড়া বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তা জোড়া করে চলেছে ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েছেলে দেখে একটু রাস্তা ছেড়েদে, সে তো দূরে থাক আবার আড়ে আড়ে দেখে। ইচ্ছা করে হতভাগা ড্যাকড়াদের মুখে মুড়ো জ্বেলেদি।

(ব্যস্তভাবে)—যাই টপকরে আবার গাটা ধুয়ে আসি, আজ আবার ছেলেটার আসবার কথা আছে।

(মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া)—ঠাকুরমা ক্ষিধে পেয়েছে! এই তো খানিক আগে গণ্ডেপিণ্ডে খেলি,—এর মধ্যে আবার ক্ষিধে কিরে? যাকে বলগে গলায় একটা হাঁড়ি বেঁধে দিতে।

(রাগত ভাবে)—আপনি আচ্ছা লোকতো ঠাকুর মশাই। কখন সন্ধ্যে উতরে গেছে, আর আপনি এখন কিনা পূজো করতে—

—সে আমি জানি। আপনার বাড়ীতে রোজ রোজ অসুখ বিসুখ,—এখন চলুন পূজোর ঘরে।

(কাহাকে উদ্দেশ করিয়া)—ও বৌমারা প্রসাদ একটু মাথায় ঠেকাও,—ও ছেলেমেয়েগুলো কোথায় গেলি—এই নে রে। (আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ও হাত জোড় করিয়া)—হে হরি—হে ভগবান, আমার ছোট বৌমাকে ভালোয় ভালোয় খালাস করো।

রাত অনেক হোল এখনো তো বীরেন এল না!

(ভীত ভাবে)—উঃ

(আনন্দিত ভাবে)—ও তুই! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়ে ছিলম। মনে করলাম কোন চোর টোর পিছন থেকে জাপটে ধরলে,—থাক্—থাক্, আর নমস্কার করতে হবে না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি আমার মাথায় যত চুল তত তোর পরমায়ু হোক।

আয় আয় সানের উপর বসবি আয়। ও রাণু পাখাটা নিয়ে আয়। (কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া) ও কেন্দো। পা ধোবার জল আর গামছা খানা দিয়ে যা।

নে—নে, আর বক্ বক্ করিস না। মুখ হাত পা ধুয়ে একটু জলটল মুখে দে।

ও রাণু খাবারের রেকাবিটা দিয়ে যা তো।

খা—খা সবটুকু খেয়ে নে।

(দুঃখিত ভাবে) আহা বড্ড রোগা হয়ে গেছিস্। মা-বৌ কাছে না থাকলে কি খাবার সুবিধে হয়, না পুরুষ মানুষের যত্ন হয়।

খুব ধরপাকড় হচ্ছে না? হবে না যেমন কাজ তার তেমন ফল। দেখ বাবা ওসব স্বদেশী এদেশীতে মাতিসনে; তাহলে আমি একেবারে প্রাণে মারা যাবো।

(কাহাকে যেন উদ্দেশ্য করিয়া) ও বড় বৌমা রাত যে অনেক হোল, এদের খাবারের যায়গা টায়গাগুলো করো।

ওকটা খেতে পারবি।

ও তা হলে রাত অনেক হয়েছে। কাল আবার তোর গল্প শুনবো, আজ শুগে। আমিও শুতে যাই।

* * * *

"গাণ্ড—দিগ্রাণ্ড" বলিতে একটি বার তের বছরের ছেলে হুড়মুড় করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং পা দিয়ে মেয়েটীর সাজানো খেলাঘর ভেঙ্গে দিতে দিতে বলিল, "বড় গিন্নী হবার সাধ হয়েছে, যখন দু'বছর পরে হবি, তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল।"

মাটির খেলনা ছেলেটীর পদভরে পট্‌পট্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। প্রথমে বালিকা দাদাকে দেখিয়া ভীত, বিচলিত ও চমকিত হইল। পর মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাদাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিল। কিন্তু কিছু ক্ষণের মধ্যেই পরাজিত হইল। তখন সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দেখ মা নবুদা আমার খেলা ভেঙ্গে দিচ্ছে"

মায়ের কোন সাড়া পাওয়া গেল না, এবার সে একেবারে নিরুপায় হইয়া তার শেষ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিল "মর মর এক্ষুণি মর, তা হলে আমি এখনি কালিবাড়ীতে জোড়া পাঁঠা দেবো।"

ভ্রাতা নবকৃষ্ণ ঘোষ ভগিনী ইন্দুমতীর কথায় কাণ না দিয়া, তার কার্য্য সমাধা করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

পাপাত্মা

মহাম্মদ এছাহক বি-এ

১

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রাবণের এক বর্ষা-আঁধার বৃহস্পতিবারে, কুঠিয়াল সাহেবের পাটের দালাল বজলার রহমান বিশ্বাসের পুত্ররূপে, জন্মগ্রহণ করি।

বয়সে ছোট হইলেও মাতাকে পিতা অপেক্ষা অনেক বড় দেখাইত, কারণ পিতা ছিলেন অত্যন্ত কৃশ, মাতা ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। প্রতিবাসীরা ব্যঙ্গস্থলে তাঁহাকে 'দোলা', 'পাটের বস্তা' প্রভৃতি বলিয়া সম্ভাষণ করিত,—কিন্তু সাক্ষাতে নহে; কেননা কলহে তাঁহার প্রতিযোগী ও-অঞ্চলে ত—কেহ ছিলই না অন্য কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ।

পিতামাতার মোটেই মনের মিল ছিল না। পিতার নৈতিক চরিত্র নাকি বড়ই মন্দ ছিল; সে জন্য মাতা তাঁহাকে ব্যভিচারী বলিয়া সর্ব্বদাই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। অন্য লোকে তাঁহাকে নামের শেষে 'চোর' এই মধুময় খেতাবটি সংযুক্ত করিতে প্রায়ই ভুলিত না। শুনি আমার জন্মের পূর্ব্বে পিতা নাকি একবার চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

বাড়ীতে প্রায় ঝগড়াঝাটি লাগিয়াই—থাকিত। যতদূর সাধ্য, পিতা, মাতার সংসর্গ এড়াইয়া চলিতেন। হাতে পাইলেই মাতা তাঁহাকে দুই চারিটী মিঠাবুলি না শুনাইয়া ছাড়িতেন না। ক্ষীণ-তনু পিতা আমার, পত্নীকে ঠিক যমের মত ভয় করিতেন। কিন্তু তথাপি তিনি সময় সময় মরিয়া হইয়া তাঁহার প্রতিবাদ করিতে ছাড়িতেন না। কখনও কখনও এরূপও দেখিয়াছি, কথা কাটাকাটি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাপার শেষে লাঠালাঠিতে পরিণত হইয়াছে; শেষকালে পিতার পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমার পক্ষে—এই বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্যণীয় হইয়া পড়িল যে পিতামাতা ব্যতিরেকে আমার পারিপার্শ্বিকেরা প্রায় সকলেই যেন আমাকে একটু কৌতুক মিশ্রিত ঘৃণার চক্ষে দেখে। পরে বুঝিতে পারিলাম এরূপ আচরণ শুধু আমার নিজস্ব কোন দোষ-গুণের জন্য নহে। আমি যে "বজলুচোরের" সন্তান, আমার জননী যে প্রকাশ্যভাবে আমার পিতাকে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত নহে, আমার পিতা যে প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া নিদ্রিতা মাতার কেশ ছেদন করে, আমার জনক জননীর অষ্টপ্রহর অদ্ভুত কলহপরায়ণতা যে পাড়াপ্রতিবাসীর একটা দৈনন্দিন আলোচনা ও কৌতুকের বিষয় শুধু এই সব কারণেই তাহারা আমাকে তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখে।

যেখানে আমার ছাত্রজীবন আরম্ভ হয় সেই কুঠিপাড়া মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও যে আমাকে বড় সুচক্ষে দেখিতেন এমন নহে! তাঁহারা যেন প্রায়ই শ্রেণীর অন্যান্য বালক হইতে আমাকে একটু ভিন্ন করিয়া দেখিতেন। আমার সামান্য ত্রুটী তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত বড় বলিয়া মনে হইত। যে অপরাধের জন্য অন্য বালকের পক্ষে শুধু তিরস্কারের ব্যবস্থা, তাহারই জন্য আমাকে বেত্রাঘাত সহ করিতে হইত। তবে একথাও সত্য যে অতি শৈশব হইতেই আমি একটু দুরন্ত প্রকৃতির হইয়াছিলাম।

সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের প্রতি সাধারণে যেরূপ স্নেহপ্রবণ বুঝিলাম, আমার প্রতি সেরূপ নহে। যাহা অন্যান্য সহপাঠী ও সমবয়স্ক বালক বালিকাগণকে আমি নিত্য অযাচিত ভাবে সর্ব্বত্রই লাভ করিতে দেখি, অল্পবয়স্কদিগের সেই স্বাভাবিক অধিকার অতি বাঞ্ছিত স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমার সেই সবুজ হৃদয়েই কেমন এক বিদ্রোহের অনল জ্বলিয়া উঠিল। যাহারা সকলে আমাকে ঘৃণা

করিতে লাগিল আমি তাহাদিগকে দ্বিগুণ ঘৃণা ও অবহেলা করিতে শিখিলাম। আঘাতের পরিবর্তে প্রতিঘাত করিতে লাগিলাম। আমার হৃদয় নিহিত রুদ্ধ নিদারুণ অভিমান চতুর্দ্দিকেই বিদ্বেষের বিষ ছড়াইতে লাগিল।

ফলে সত্বরই কলহে পটু, তাস খেলায় অদ্বিতীয়, পক্ষী শাবকের উপর ঢিল ছোড়ায় সিদ্ধহস্ত, কুমন্ত্রণায় শকুনী, ধুমপানে মহাদেব ও শিক্ষকদের নামে ছড়া বাঁধায় বিশ্বকবি হিসাবে আমার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং শীঘ্রই আমি বিদ্যালয়ের 'ডেঁপো' ছেলেদের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইলাম।

কেবল একটী প্রাণী আমাকে ঘৃণা করিত না এবং আমিও তাহাকে সুচক্ষেই দেখিতাম। সে আমাদের প্রতিবাসী স্বর্ণকার এনায়েত উল্লার ফতিমা নাম্নী চাঁপা ফুলের মত সুন্দর ছোট্ট মেয়েটী। আমার দুরন্তপনা তাহাকে বিরক্ত না করিয়া বরং সন্তুষ্টই করিত। ফতিমা বয়সে আমার দুই বৎসরের ছোট। যখন দুইজন আরও অল্পবয়স্ক ছিলাম, তখন আমার পুতুল কন্যার সহিত, ফতিমার পুতুল পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। সেই হইতে ফতিমা আমার বেহান, আমি ফতিমার বেহাই।

২

চৌদ্দ বৎসর বয়সে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া (অবশ্য তৃতীয় বারে) আমি স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। আমার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে যেরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিতে আমার পিতার বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই চুক্তিতে আমাকে গ্রহণ করিলেন যে যদ্যপি ছয় মাসের মধ্যে আমার চরিত্রে কোন দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে পিতা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যালয় হইতে আমাকে অপসারিত করিবেন।

যাহা হউক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভের পরই আমার চরিত্রে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হইল। বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার হিসাবে আমি শিক্ষক ও ছাত্র প্রায় সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলাম। পড়াশুনায় তেমন ভাল ছিলাম না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতাম। শিক্ষকগণ আমার শ্রেণী কক্ষের কার্য্যে ও পরীক্ষা গৃহের কার্য্যের মধ্যে এই বিষম বৈষম্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতেন। বৎসরের পর বৎসর আমি শ্রেণীর পর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলাম।

দিন বেশ ভাল ভাবেই কাটিতে লাগিল, বাস্তবিক, লোকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বড়ই কাঙ্ক্ষণীয় জিনিস, এই সময় এনায়েত-দুহিতা ফতিমাবিবি প্রায়ই তাহার জননীর সহিত আমাদের বাটীতে আসিয়া দর্শন দিয়া যাইত। আহা কি রূপ! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সৌন্দর্য্য যেন ক্রমেই কূল ছাপিয়া উঠিতেছে। যে কারণেই হউক ফতিমা প্রথম হইতেই যেন আমাকে একটু বেশী আপনার জন ভাবিত। আমাদের বাটীতে আসিলে প্রায়ই সে আমার পড়িবার ঘরে ছোট্ট জলচৌকিটার উপর তাহার অনুপম দেহভার বিন্যস্ত করিয়া বসিত, পুস্তকগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিত, আমার সঙ্গে গল্প করিত এবং সময় সময় কোন কোন ছবির বিষয় বুঝাইয়া লইত। কখন বা আমার অজ্ঞাতে জানালার ফাঁকে আমার পাঠনিরত মুখের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিত। ঐ আকর্ষণ সেই শৈশবের পুতুল বিবাহ হইতেই উদ্ভূত কি?

এস্থলে একটু স্বরূপ বলা আবশ্যক। কৃশকায় পিঙ্গলবর্ণ পিতার ঔরসে ও ঘোর কৃষ্ণ স্থূলাঙ্গী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামাতার প্রকৃতির অধিকারী হইলেও তাহাদের সহিত আমার আকৃতিগত কোন সাদৃশ্য ছিল না। আমার উজ্জ্বল শ্যাম ঈষৎ দীর্ঘাকৃতি দেহের উপর এমন একটা লালিত্য ও কমনীয়তা খেলা করিত যে কেহ কেহ আমাকে সুন্দর সুপুরুষ বলিয়াও অত্যুক্তি করিত। পাড়ার ডাগর মেয়েরা আমার প্রকৃতি, আমার বংশ প্রভৃতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও আকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। সুতরাং ফতিমাবিবি—আমার বেহান সাহেবা যে আর একটু অগ্রসর হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমি যেবার ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম, সেবার নিঃসন্দেহে বুঝিলাম, ফতিমা আমাকে ভালবাসিয়াছে আর আমি? শুধু ভালবাসিয়াছি বলিলে সত্যের অঙ্গহানি করা হয়। ফতিমার রূপে গুণে দৃষ্টিতে ও চলন ভঙ্গিমায় আমি একেবারে মজিয়া গিয়াছি। ভাবিতেছ শিক্ষার্থীর একি আচরণ! কিন্তু যদি দুরদর্শী হও, তবে বেশ বুঝিতে পারিবে, আমার মত ধুরন্ধরেরা একটু অকালপক্কই হয়, নইলে উত্তরকালে অত উন্নতি করিবে কি করিয়া?

সুখের উপর সুখ; ফতিমার সঙ্গে আমার বর্ত্তমানে যেরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল তাহা আমাদের উভয়েরই পিতামাতার অগোচর ছিল না। এনায়েত মিঞার নিকট পিতা তাহার কন্যার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তিনি উত্তর দিবার পূর্ব্বে কিছু সময় লইলেন। কেন লইলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক বর দেখিতে বেশ, আগামী বৎসর এণ্ট্রান্স দিবে, সর্ব্বোপরি কন্যা তাহাকে ভালবাসে, এই সব বিবেচনা করিয়া সঙ্গতিপন্ন এনায়েত উল্লা খুব বড় একটা ভোজের জোরে সর্ব্বসাধারণের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া সাগ্রহেই পিতার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। স্থির থাকিল প্রবেশিকার শেষ পরীক্ষা প্রদানের পরই শুভ কার্য্য সমাধান হইবে।

স্কুলের ভাল খেলোয়ার, ভাল ছেলে, এবং এনায়েত দুহিতা সুন্দরী ফতিমার মনোনীত বর, এই সব বিবেচনা করিয়া ইচ্ছা থাকিলেও কেহ আর আমার সম্মুখে নিন্দা অথবা ব্যঙ্গোক্তি করিতে সাহসী হইত না। আহা, দিন যদি এম্নি যাইত! কিন্তু চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা! চুরিই যাহার একমাত্র অবলম্বন তাহার পক্ষে না ধরা পড়ার সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় না।

প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। লিখিতেছি খুব ভাল। শেষ দিনের পরীক্ষার পনর মিনিটকাল অবশিষ্ট থাকিতে এক দয়ামায়া বর্জ্জিত কাটখোট্টা ধরণের গার্ড আমার এতকাল ভাল ছেলে হইবার, বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিবার, পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া শিক্ষক মহাশয়গণের বিস্ময়ে অবাক হইবার মূল সূত্রটী অম্লান বদনে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। পরীক্ষা গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলাম। মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সহস্রবার মৃত্যুকে বরণ করিতে ইচ্ছা হইল। মিথ্যা সুনামের এত আকর্ষণী শক্তি! আমার এই চুরি বিদ্যা দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইলে বোধ হয় আমার হৃদয়ে এতখানি লাগিত না! হায়, সেই ধরা পড়িলাম, তাও মাত্র পনর মিনিট পূর্ব্বে! কেন পরীক্ষার প্রথম দিন ধরা পড়িলে ক্ষতি ছিল কি? পোড়া বিধাতা কি কাণ্ডজ্ঞানহীন। কূলে আনিয়া ভরা ডুবি! শেষ আসরে চিচিং ফাঁক! এই পনর মিনিট যদি কোনক্রমে কাটিয়া যাইত তবে ২০৲ টাকা জলপানি আটকায় কে? নিষ্ঠুর গার্ড, জাহান্নামেও যেন তোমার স্থান না হয়। এই হইতেই বিদ্যামন্দিরের নিকট আমার চির বিদায়।

৩

আমি সম্প্রতি যেরূপে শিক্ষকগণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলাম, সেটী আমার কতকটা ছদ্মরূপ। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক দোষই বিদ্যমান ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার গোপন করিবার কৌশলও প্রবল হইয়াছিল। তাহারই ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের ন্যায় আমার প্রকৃত রূপটী প্রচ্ছন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। লোক চক্ষুর অন্তরালে মানসনিকুঞ্জে কত গুপ্ত-লীলা কত ব্যভিচার কত পাপাচারই সাধিত হয়। রজনীর অন্ধকারে, যবনিকার অন্তরালে কত নবসৃষ্ট পাপ পুঞ্জ ধরণীর আকাশ বাতাসকে সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে, কয়জন তাহার সন্ধান জানে। তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, তোমার মনের কবাট বন্ধ রাখিতে পার, তোমার পাপ প্রচ্ছন্ন রাখিতে সমর্থ হও, তবে তুমি ভাগ্যবান,—তুমি সাধু। আর যদি তুমি নির্ব্বোধ হও, গুপ্তলীলা প্রচ্ছন্ন রাখিবার শিল্প না জান, তবে তুমি দুর্ভাগ্য, তুমি পাপী।

ছাত্রগণের শ্রদ্ধা ও শুভদৃষ্টি লাভ করিয়া সম্প্রতি প্রকৃত

ভাল হইবার একটী প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জাগিতেছিল। নির্জ্জনে সর্ব্বদাই আমি আত্মগ্লানি বোধ করিতাম। আত্মদোষ ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া মনে হইত। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবরে পর অমার সমস্ত কলুষ কালিমা ধুইয়া মুছিয়া প্রকৃতই আমি ভাল হইব; নিজের নিকট নিজের আর এই দুঃসহ কলঙ্কভার বহিব না। আমার এই একান্ত ইচ্ছাশক্তিতে আমি কতকটা ভালর দিকে অগ্রসরও হইয়াছিলাম। কিন্তু হায়রে নিয়তি; হায়রে ১৫ মিনিট!

পরীক্ষাগৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার পর আর ছদ্মরূপের কোন আবশ্যকতা বোধ করিলাম না। যাহারা আমাকে কিছুদিন পূর্ব্বে ভক্তি করিয়াছ, ভালবাসিয়াছে তাহাদের ব্যাঙ্গোক্তি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। কেহ কেহ সম্মুখেই শুনাইয়া দিল, 'চোরের ছেলে চোর হইবে, এত স্বতঃসিদ্ধ কথা'। সমস্ত হৃদয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। ভালবাসায় ভালবাসা, ঘৃণায় ঘৃণা, হিংসায় প্রতিহিংসা আকর্ষণ করে। অপরের এই মর্ম্মান্তিক ঘৃণা আমার হৃদয়ে ঘৃণার বীজই বপন করিয়াছিল। আমি প্রকাশ্যেই সমস্ত অসদাচরণে লিপ্ত হইতে পারিলাম—ইহাই তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে তাহাদের অভিমতকে আমি তৃণজ্ঞানও করিনা,—তাহাদের মতামতকে আমি পদদলিত করি।

পাপের পথে শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বিবেক বলিয়া আমারও একটা কিছু ছিল। পূর্ব্বে যখনই কোন কুকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি, তখনই কে যেন ভিতর হইতে বাধা দিত। এখন সেই বিবেকের অনুশাসন স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া চলিল। বিলাসসাগরে গা ঢালিয়া দিলাম। সহরে আমার নাম জাহির হইল ১নং চোরাবাবু। কৃপণ প্রকৃতির পিতা আমার বাবুগিরির রসদ যোগাইতে পরাঙ্মুখ ছিলেন। পত্নী তাড়নায় বিপর্য্যস্ত পিতা গোপনে আমাকে অনেক বুঝাইলেন। আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিলাম না, বরং আমার বিলাসিতা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়া উঠিল। পিতা উপদেশ ছাড়িয়া ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন; তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না।

আমি যখন টেরী-কাটিয়া, চশমা আঁটিয়া সিগারেট মুখে কোঁচা দোলাইতে দোলাইতে আতর এসেন্সে ভরপুর হইয়া ছড়ি হস্তে সহরের পথ দিয়া যাইতাম তখন প্রায় কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতাম না। যাহাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হইত, তাহারা কেহ কেহ বিস্মিত হইত, কেহ কেহ উপহাস মিশ্রিত মৃদুহাসি হাসিত, কেহ কেহ বাক্যালাপ করিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু আমি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া আপন মনে চলিয়া যাইতাম। ইহাতে এক দিন এক খিলি বিক্রেতা আমাকে বলিয়া বসিল, "আহা বেটা যেন লাট সাহেবের ছোট শ্যালা।" মনে মনে আনন্দ অনুভব করিলাম, কেন না আমার বিলাসিতার মূলে একটা খেয়াল ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। আমি জানিতাম যে এরূপ বিলাসিতা আমার পক্ষে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি এবং ইহাতে লোকে আমাকে বিদ্রূপ না করিয়া পারে না। তথাপি আমি যে তাহাদের বিদ্রূপকে অধিকতর বিদ্রূপ করি, তাহাই সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য আমার এই অস্বাভাবিক আচরণের অবতারণা।

যাহা হউক তাম্বুল বিক্রেতার এই সম্ভাষণে মনে মনে প্রীত হইলেও বাবুয়ানা মেজাজ দেখাইবার জন্য ছড়ি উঁচাইয়া তাহাকে আচ্ছা কয়েক ঘা দিলাম। বেটা 'মারে গেছিরে' বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল; প্রহার বোধ হয় একটু গুরুতরই হইয়া থাকিবে।

সেদিন সকালে বাটী হইতে আসিবার সময় পিতাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম। তাহার কারণ অন্য কিছুই নয়, আমি পূর্ব্বদিন আমার ভাবী শ্বশুর এনায়েৎ উল্লার নিকট হইতে পিতার নাম করিয়া ৩০৲ টী টাকা লইয়া ছিলাম। অবশ্য টাকা আনিতে যাওয়ার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল,সেটী সফল হয় নাই। বিবাহের প্রস্তাব অবধি আমি প্রায়ই আর ফাতিমার দেখা পাই নাই। যদি এই সুযোগে তাহাকে দেখিতে পারি, এবং আমার এই বিলাসমণ্ডিত তনুখানি তাহাকে দেখাইতে পারি,

ক্ষতি কি? রথ দেখা, কলা বেচা এবং পান কেনা সবই হয়। কিন্তু ফতিমার দর্শন পাইলাম না, আমার রথ দেখা হইল না; তবে অপর দুটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কারণ টাকা লইয়া বাটী হইতে বাহির হইবার সময় পাশের ঘরের একটা জানালা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। এই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলে বৈঠকখানার অভ্যন্তর ভাগটা দেখা যায়। ওখানে কে দাঁড়াইয়াছিল ও ওরূপ ভঙ্গীতে কে জানালা বন্ধ করিল তাহা বুঝিতে আর আমার বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইল না। মিথ্যা করিয়া এই টাকা আনয়ন ব্যাপারটী পিতার কর্ণগোচর হইয়াছিল, এবং সেইজন্যই তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, কোন ভৎর্সনা করেন নাই; কেননা সম্প্রতি তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভৎর্সনায় কোনই ফলোদয় হইবে না।

যাহা হউক, পান বিক্রেতাকে প্রহারের পর বাজারের মধ্যে এক মনোহারী দোকানে বার্ডসাই ও হিমানী কিনিতে গিয়া কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের সহিত গল্প-গুজবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সেখান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম, বৈঠকখানা ঘরে একখানি টুলের উপর পিতা উপবিষ্ট, তাহারই সম্মুখেই একখানি মাদুরের উপর বসিয়া সেই প্রহৃত পানওয়ালা। তাহার পিঠে প্রহারের দাগগুলি দূর হইতেই রক্তবর্ণ দেখাইতেছে। সন্দিহান চিত্তে বারান্দায় পদার্পণ করিতেই ক্রুদ্ধ পিতা বিনা বাক্যব্যয়ে এক লম্ফে আসিয়া আমার হাত হইতে ছড়িখানা কাড়িয়া লইলেন, এবং নিমেষে বাম হস্ত আমার সুবিন্যস্ত টেরীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দৃঢ় মুঠিতে আমার তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ ধারণ করিলেন এবং কোন প্রকার সতর্কবাণী প্রকাশ না করিয়াই তিনি আমার আপাদ মস্তক বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। আমি প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনই ফলোদয় হইল না। তিনি উত্তরোত্তর আমাকে অধিকতর বেগে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইহা এত কালের সঞ্চিত রুদ্ধ ক্রোধের প্রতিশোধ। সময় সময় একটা হিংস্র বাসনা আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু আমার চীৎকারে ও পিতার হুঙ্কারে বাটিতে তখন রাস্তার লোক ভিড় করিয়াছে, সুতরাং বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল না। তাহাদের অধিকাংশই আসিয়াছিল তামাসা দেখিতে। দু'এক জন লোক পিতাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টিত হইল কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। পিতা তাহাদিগকে শুনাইয়া ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ তোমরা একবার বেটা হারামজাদা হঠাৎবাবুর কীর্ত্তিখানা। ওকে দেখে তোমরা কেউকি বুঝতে পার যে ও আমার ছেলে? এ সব ওই মাগীর কীর্ত্তি। মাগী চুরি করে টাকা-পয়সা দেওয়াতেই ও বেটা এরূপ হনুমান সাজতে পেরেছে। তারপর দেখ দেখি কি অত্যাচার। এই নিরীহ পানওয়ালাকে কি মারটাই মেরেছে। আমার কাছে এসে ও কেঁদে আকুল; বলে কিনা এর প্রতিবিধান না করলে ও থানায় যাবে। আমি অনেক হাতে পায় ধরে তবে ওকে নিবৃত্ত করেছি। বেটা মাদারের ফুলের কোন গুণ থাক্‌লে তবু বা হ'ত। এদিকে পরীক্ষার খাতা নকল ক'রে ঝাঁটা খেয়ে বিদায় হয়েছে, তার আবার ফুটানি।"

এই বক্তৃতার অবসরে একবার চোখ মেলিয়া দেখিলাম, উপস্থিত প্রায় সকলেই সহাস্য বদনে এই কৌতুক সম্ভাষণ উপভোগ করিতেছে আর সেই পানওয়ালা বিগলিত সব গুলি দন্তবিকাশ করিয়া হাসির লহরী ছুটাইতেছে।

বক্তৃতা অন্তে পুনরায় প্রহারের উদ্যম করিতেই ভিতরের দিকের একটা দরজা খুলিয়া একহস্ত কটিদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক রুদ্র মূর্ত্তিতে জননী সেইগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং অন্য হস্তের তর্জ্জনী হেলাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বলি তুমি অত বড় ছেলের গায় হাত তোল।

মাকে আর বেশী কিছু বলিতে হইল না। উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া দুই পা অগ্রসর হইতেই তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন

উপস্থিত সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। লজ্জায় ক্রোধে, দুঃখে ও ধিক্কারে বজ্রাহতের স্থায় আমি সেই বৈঠকখানা গৃহের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিলাম।

৪

পিতার সিন্দুকের চাবি কোথায় থাকে, তাহা আমি জানিতাম। উল্লিখিত ঘটনার পরের দিন সুবিধামত গভীর নিশীথে সিন্দুক খুলিয়া প্রায় বার শত টাকার নোট লইয়া উধাও হইলাম। দেশান্তরিত হইবার সময় শুধু একটী বন্ধন মাত্র, একখানি মুখচ্ছবি আমাকে পশ্চাতে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু অদৃষ্টের ভীষণ পরিহাস, পিতার হস্তে নিদারুন লাঞ্ছনা ও সর্ব্বসমক্ষে অপমান প্রভৃতির স্মৃতি আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল—বন্ধন কার্য্যকরী হইল না।

অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ শিথিল চরিত্র যুবকের সহসা বহু অর্থ হস্তগত হইলে যে দশা হয় আমারও তাহাই হইল। আমার নৈতিক চরিত্র পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিলাম।

ইহারপর দুই বৎসর কাল কি ভাবে কাটিয়া গেল সে বিবরণে আবশ্যক নাই, কারণ তাহা মোটেই সুরুচিসম্পন্ন হইবে না। কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বারবনিতার কৃত্রিম প্রেমে আমার হৃত অর্থ উড়িয়া গেল।

পরিধানে মাত্র একখানি ছিন্নবস্ত্র সার করিয়া আমার প্রাণবঁধুয়ার নিকট হইতে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া যেদিন চীৎপুর রোডের ফুটপাথের উপর আসিয়া পড়িলাম, সেদিন আমার চৈতন্ত হইল; মোহ কাটিয়া গেল। কোথায় নির্জ্জন মধুর সুশোভিত ত্রিতল কক্ষের দুগ্ধফেন-নিভ শয্যা, আর কোথায় নিম্নের কোলাহলক্লান্ত জনতা-বহুল ইষ্টকজর্জ্জর রাস্তা! একি ভীষণ অবনতি।

বারবনিতার হৃদয় যে শুষ্ক মরু, তাহার বেশবিন্যাস, মধুর হাসি, তাহার প্রেমাভিনয় সবই যে অর্থের জন্য ছলনামাত্র তাহা আমার মত আর কে বুঝিবে?

শত দোষ সত্ত্বেও পিতামাতার স্নেহকরুণ মুখ দুটী হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। আবাল্য পরিচিত আমাদের সেই গঞ্জের বাড়ীখানি সঙ্গে সঙ্গে আরও একটী চিরবাঞ্ছিত মুখ চুম্বকের আকর্ষণে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

অনেক অনুসন্ধানের পর আমার পূর্ব্বসহপাঠী এক ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মত আমার দুর্দ্দশার কথা তাহার গোচর করিলাম। বন্ধু আমার গম্ভীরসহানুভূতির সহিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্ত করিলেন, এবং একটীও ভর্ৎসনাবাক্য উচ্চারণ না করিয়া মৃদু উপদেশ সহকারে নিজব্যয়ে আমাকে বাটী পাঠাইলেন।

দীর্ঘকাল পরে বাটী আসিয়া দেখিলাম, একযোগে কতগুলি টাকা হারাইয়া এবং একমাত্র পুত্রের সহসা অন্তর্ধানে পিতা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার স্বভাবতঃ শীর্ণদেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। মনে বড় আঘাত লাগিল; তাঁহার এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশায় আমিই প্রধান কারণ। তাহার উপর তিনি যখন আমাকে দেখিয়া নির্ব্বাক আহ্লাদে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তখন আমার অশ্রু আর বাঁধ মানিল না, হৃদয়ের অনেক দিনের জমাট বাঁধা অনেক কলঙ্ক অশ্রুরূপে ঝরিয়া পিতার বক্ষ প্লাবিত করিল, মাতার শারীরিক কোন পরিবর্ত্তন বোধ করিতে পারিলাম না, তবে তিনিও যেন আমাকে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।

৫

প্রবাসে যখন পাপস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম তখন মৃদু বায়ু সঞ্চালিত সেতারের তারের মত হৃদয়ের একটী নিভৃত তন্ত্রী কোন্ এক সুধামাখা স্মৃতির স্পর্শে অনুক্ষণই বাজিয়া বাজিয়া উঠিত। দৈহিক ব্যাধিতে দেহের অনিষ্ট করে, কিন্তু নিন্দা, ঘৃণা, অবহেলা ও অপমানে আত্মার অপচয় ঘটায়—মানুষ উন্মাদ হয়—কেহ কেহ বা আত্মহত্যা করে।

কাজেই আমি যে মানসিক বিকারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণাধিকা ফতিমাকে বিস্মৃত হইয়া দীর্ঘ প্রবাসে কাল-যাপন করিয়াছিলাম, তাহা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

আশা আকাঙ্খায় দোলায়মান হৃদয় লইয়া দীর্ঘকাল

পরে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, আমার ফতিমা তখনও আমার আশাপথ পানে চাহিয়া আছে, তখনও সে অপরের হয় নাই। জীবনে কয়েকবার মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এই একবার। দুই হাত তুলিয়া খোদাতালাকে ধন্যবাদ দিলাম। বলা বাহুল্য, গত দুই বৎসর চিৎপুর রোডে আমার জীবনের যে অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল, তাহা বেমালুম গোপন করিয়া ফেলিলাম। কলিকাতা নিবাসী বন্ধুকে প্রতিশ্রুত করিয়া আসিয়াছিলাম তিনি ব্যাপারটী প্রকাশ করিবেন না।

পিতা কালবিলম্ব না করিয়া শুভকার্য্য সমাধা করিতে মনস্থ করিলেন। কন্যা পক্ষও অধীর অপেক্ষায় দিন কাটাইতেছিলেন, আনুষঙ্গিক সমস্ত আয়োজন স্থির হইল, বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। গত জীবনের প্রতি চাহিয়া স্বভাবতঃই মনে একটী ধিক্কারের ভাব আসিয়াছিল। এইবার স্থিরসঙ্কল্প হইলাম ফতিমার মত নিষ্কলুষ রত্ন লাভ করিয়া আমি নিজেকে তাহার উপযুক্ত জীবনসঙ্গী বলিয়া প্রমাণিত করিব। তাহার অগোচরে আমার চরিত্রে যে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিব।

অধীর প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলাম। দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল। কল্পনায় শূন্যে মন্দির নির্ম্মাণ করিলাম। আমার বহুদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা সকল হইতে চলিতেছে। এই আর কয়েক দিন মাত্র, তার পরই আমার মানসসুন্দরী, আমার কল্পনায় সহচরী, আমার শিরি, আমার লায়লী আমার অঙ্ক শায়িনী হইবে, সারা জগৎ আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও আমার শ্রেষ্ঠ কাম্য আমাকে ভালবাসার চক্ষেই দেখিবে। সারা দুনিয়ার উপেক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া আমরা যুগল-বিহঙ্গ জীবন-আকাশে ভাসিয়া যাইব।

ভালবাসা পরশ পাথর। আমার ছাত্র জীবনের শেষভাগে যে আমি একটু ভালর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তাহা অনেকটা এই ভালবাসার গুণে। যদি যথা সময়ে, ফতিমাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার জীবনের গতি হয়ত অন্যরূপ হইত।

বিবাহের আর তিনদিন মাত্র বাকী। বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্য্য আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। বায়ু বহিতেছে না। দূরে একটি কদম গাছের ডালে বসিয়া একটী ঘুঘু গম্ভীর স্বরে ডাকিতেছে। আমাদের বাটীর পিছনের বেতের ঝোপে মধ্যে মধ্যে একটী ডাহুক ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে।

গোলাবী রঙের নূতন পাতায় সজ্জিত হইয়া নববধূর ন্যায় দণ্ডায়মানা ক্বচিৎ কখন উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া পাতাগুলিকে দোলাইয়া ঝলসাইয়া দিতেছে। আর সব নীরব নিথর। আমি বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় একটি তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়া তাল-পাখার সাহায্যে বাতাস লইতে লইতে এইগুলি লক্ষ্য করিতেছি। সব দৃশ্যই আজ আমার নিকট স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছে। অনতি দূরে ঐ এনায়েত মিঞার বাটী সংলগ্ন আম বাগান, শাখা-প্রশাখাগুলি সব মুকুলে ভরা। একটী বৃক্ষের শিরোদেশ স্বর্ণ লতিকায় আনত। তাহারই উপর একটী কোকিল বসিয়া কুহুস্বরে ডাকিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, এই কুহুতানের মধ্যে দিয়া যেন প্রিয়ার সম্ভাষণ গীতি ফুটিয়া উঠিতেছে। হৃদয় আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। এখনও সুদীর্ঘ তিন দিন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

বিকালের দিকে সহসা জাগরিত হইয়া সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শরীর গরম হইয়া উঠিল; মধ্য রাত্রিতে বিষম জ্বর। হস্ত, পদ ও মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা। রাত্রি প্রভাত হইল, জ্বর বিচ্ছেদ হইল না। শারীরিক উত্তাপ সাড়ে চার ডিগ্রি পাঁচ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিল। বিবাহ বাড়ীর সমস্ত উৎসাহের আয়োজন মন্দীভূত হইয়া পড়িল। পিতা-মাতা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভাবী শ্বশুর আসিয়া পুনঃ পুনঃ দেখিয়া যাইতে লগিলেন, তাঁহারও মুখে চিন্তা ও বিষাদের ছাপ। সহরের খ্যাতনামা, ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চিন্তিত

মুখে বিদায় হইলেন। আমার অসাক্ষাতে তিনি পিতাকে কি বলিলেন জানিতে পারিলাম না।

তিন দিন একভাবে কাটিবার পর চতুর্থ দিনের সায়াহ্নে আমার শারীরিক তাপ কতকটা প্রশমিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বসন্তের গুটী বাহির হইল। এ সেই ধরণের বসন্ত যাহাতে চর্ম্মের উপরিভাগের গুটীগুলি তেমন স্পষ্টতা লাভ না করিয়া অভ্যন্তর ভাগ পচাইয়া তুলে। ক্রমেই সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিল, তৎসঙ্গে কি অপরিসীম অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু অনেক ভাল। বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বেই বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

৩

আমার যে প্রকৃতির ব্যাধি হইয়াছিল, তাহাতে শতকরা নিরানব্বই জন লোকই ইহলীলা সংবরণ করে। কিন্তু বিধাতা আমাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন, নইলে আমাকে লইয়া অদৃষ্টের ছিনিমিনি খেলা চলে না। এ বিশ্বের কি কোন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন? আমার তো সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয়। যদি থাকেন, তবে তিনি দয়ামায়া বর্জ্জিত নিষ্ঠুর পরিহাসপটু অপরিণামদর্শী বিধাতা—তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেন তাঁহার খেলার পুতুল করিয়া; অথবা তিনি সেই সব সৌভাগ্য লালিত নধরকান্তি উচ্চ হর্ম্ম্যবাসী, তুহিনশুভ্র শয্যাশায়ী সদা সহাস্যবদন নন্দদুলালগুলিকে স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়া বিশ্রামকালে তাঁহার কোন অপটু কর্ম্মচারীর হস্তে আমাদের মত কতকগুলি আবর্জ্জনা স্তূপ গড়িয়া তুলেন। যদি সত্যই স্বর্গীয় কর্তৃপক্ষ কেহ থাকে তবে আমি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। কেন এসব বলিতেছি শুন।

আমি ভাল হইয়া উঠিলাম, কিন্তু কাল ব্যাধির আক্রমণ ফলে আমার দেহ যন্ত্রখানি—বিশেষতঃ মুখমণ্ডল এমনই কুৎসিত আকার ধারণ করিল যে আমাকে সেই পূর্ব্ব মানুষ বলিয়া কেহ চিনিতেই পারিল না, আমার দক্ষিণ চক্ষুটী অন্ধ হইয়া গিয়াছে। নাসিকাটী যেন উড়িয়া গিয়াছে। গণ্ডদুটী নাতিদীর্ঘ গিরি সঙ্কুল পার্ব্বত্যভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। মস্তক স্থানে স্থানে টাকবিশিষ্ট। নিম্ন ওষ্ঠের খানিকটা অংশ পচিয়া খসিয়া পড়ায় মুখবিবরের সহিত সেই শূন্য স্থানের সংযোগ ভারত মানচিত্রের আরবসাগর সংলগ্ন কচ্ছ উপসাগরের আকার ধারণ করিয়াছে। সেই যুক্ত পথে দুইটী দন্তের শিরোদেশ সাগর নিমজ্জিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় পরিদৃশ্যমান। আরোগ্য লাভ করিয়া প্রথম যেদিন দর্পণ সমক্ষে স্বীয় মুখ নিরীক্ষণ করিলাম, সেদিন সবিস্ময়ে দেখিলাম কুঞ্চিত কেশদাম, টানা নাসিকা আয়ত চক্ষু বিশিষ্ট আমার লাবণ্যময় বদনমণ্ডলের স্থলে একটী রক্তদন্ত একচক্ষু দানবের ভীষণ মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে।

দেহটি যেরূপ সহজেই পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যদি তদ্রূপ হইত! ফতিমার প্রতি আমার হৃদয়ের টান তেমনি প্রবল রহিয়াছে, বরং প্রবলতর হইয়াছে। ব্যাধির ঘোরে আমি নাকি প্রায়ই তাহার নাম উচ্চারণ করিয়াছি। দর্পণে মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবার পর হইতেই আমার মনে কিসের যেন একটা অজানিত আশঙ্কার ক্ষীণ রেখা সর্ব্বদাই খেলিয়া বেড়াইতেছে, এবং ফতিমা সম্বন্ধে ক্রমাগতই আমাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। ভাবী শ্বশুর আরোগ্য লাভের পর মাত্র একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সেই যে তিনি সেদিন আমাকে দেখিয়া রুষ্ট মুখে বিদায় হইলেন, তারপর আর এদিকে আসেন নাই। বিবাহের তখনও বারদিন বাকী। আমি অধীর প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলাম। দিন আর কাটে না। কতদিন ফতিমাকে দেখি নাই। তাহার পর বার দিন অপেক্ষা করিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর। ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে একবার দেখিবার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই রোধ করতে পারিলাম না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাহা অতি সহজসাধ্য ছিল, বারদিন পর যাহা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সুলভ হইবে, তাহারই জন্য এখন বুদ্ধি খরচ করিতে হইল।

আমি জানিতাম, গ্রীষ্মকালে ফতিমা তাহাদের খিড়কীর পুকুরে দিনে রাত্রে তিন চার বার স্নান করে। আমি সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া পুকুর

পারের একটী আমগাছ তলে আত্মগোপন করিলাম। আমগাছের নীচেই অন্তঃপুরের ঘাট।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই দেখিলাম এক মুক্তকেশী সুন্দরী তরুণী মৃদুমন্দ গতিতে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আহা কি মাধুরী! কি স্বর্ণলতা বিনিন্দিত অঙ্গজ্যোতি।

বেতস লতিকাসুলভ দোলায়মান ক্ষীণ দেহ খানির সহজ সরল গতিভঙ্গিমা আমার লুব্ধ হৃদয়ে কত শত রাগিণীর সঞ্চার করিতে লাগিল। এই আমার মানস প্রতিমা, পক্ষকাল পরে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী পদে অভিষিক্ত হইবে। তাহাকে আমি পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, কিন্তু আড়াই বৎসর কালের মধ্যে যৌবন যোয়ার সেই ক্ষীণ দেহলতাকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে যে সম্পূর্ণ কোহিনুরে পরিণত করিয়াছে। দুদিন পরে এই কোহি-নুর আমার হৃদয়ের কোণে কোণে যত লুকান আঁধার রহিয়াছে সেগুলিকে বিনাশ করিয়া দিবে, আমি আবার মানুষ হইব।

তখন পশ্চিমের সোনালিবর্ণ মিলাইয়া গিয়াছে। তৃতীয়ার চাঁদ অনতিদূরস্থ বাঁশবনের মাথার উপর ম্লান হাসি হাসিতেছে। আর অপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সমস্ত হৃদয় মন সম্মুখস্থ অবগাহনরত দেববালিকার দিকে ছুটিয়া চলিল। আমি যথাসাধ্য সতর্কতা সহকারে আসিয়া ফতিমার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিয়া ডাকিলাম "ফতিমা"! ঈষৎ চমকিত ভাবে ফতিমা আমার দিকে চাহিল। তখনও রাত্রির অন্ধকার জমাট বাঁধে নাই। ফতিমা সেই তরল অন্ধকারাবৃত আমার মুখমণ্ডলের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিবার পরই সভয়ে অনুচ্চস্বরে 'মাগো' বলিয়া সেখান হইতে পলায়ন তৎপর হইল।

আমি দ্রুতগমনশীল ফতিমার হাত খানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলাম, ফতিমা, আমি—আমি, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না। আমি তোমার জহুরল।

ভীত সন্দেহ ও বিস্ময়পূর্ণ লোচনে ফতিমা আমার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই স্নিগ্ধ আয়ত লোচনের আকুলি-বিকুলি ও আমার মানস-সরোবরে কত চাপল্যপূর্ণ প্রেম তরঙ্গের সঞ্চার করিতে লাগিল। মুগ্ধনয়নে আমি সেই সুন্দর মুখের ঘন পরিবর্ত্তন উপভোগ করিতে লাগিলাম। ফতিমা কিছু-ক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিল। তার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিল।" তুমি—তুমি, জহুরল? কখনই নয়। তুমি এই রাক্ষসের মুণ্ড পরিয়া কিরূপে সেই সুন্দর জহুরল হইতে পারে? ছাড় শীঘ্র, নইলে আমি এখনই চীৎকার করিব।"

"ফতিমা, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। ভাল করিয়া আমায় দেখ—আমি জহুরল। ভীষণ বসন্ত ব্যাধির ফলে আমার মুখাবয়ব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আর কয়দিন পরই সমস্ত ধাঁধাঁ কাটিয়া যাইবে। কিন্তু বার দিন আমার নিকট বার বৎসর বলিয়া মনে হইতেছিল, থাকিতে পারিলাম না। তোমাকে না দেখিয়া বহুদিন কাটাইয়াছি, কিন্তু আর পারিলাম না। সেইজন্য প্রাণেশ্বরি, আজ এই সন্ধ্যার অন্ধকারে তোমার ওই চাঁদ বদনখানি দেখিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া আমি অন্য হস্তে ফতিমার বামহস্ত ধারণ করিয়া তাহার কোল ঘেষিয়া দাঁড়াইলাম।

ফতিমা নীরব, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। একবার দেখিলাম তাহার সমস্ত মুখের উপর তীব্র যাতনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণই সে ভাব অন্তর্হিত হইয়া তাহার স্থলে লজ্জা এবং তৎপর বির-ক্তির ভাব পরিস্ফুট হইল। সে ধীরে আমার বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, "বুঝিলাম, তুমি সত্যই জহুরল, কিন্তু—কিন্তু—

"কিন্তু কি ফতিমা।"

"তুমি এখনও পরপুরুষ। রাতের আঁধারে পুকুর ঘাটে এই গোপন অভিসার আমি মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করি না।"

মনে আঘাতও পাইলাম। এই কি আমার সর্ব্ব-স্বাধিকারিণীর উক্তি, যে ফতিমা একদিন আমার সঙ্গ পরম স্পৃহণীয় মনে করিত, যাহার অচপল মুগ্ধ দৃষ্টি আমার অজ্ঞাতে গবাক্ষপথে আমার পাঠনিরত মুখের দিকে নিবদ্ধ থাকিত, তাহার মুখে আজ একি

কথা! হয়ত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফতিমার কর্ত্তব্য জ্ঞানও বাড়িয়াছে। হয়ত বাস্তবিকই আমি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। নিমেষে আমার তমসাময় বিগত জীবনের কথা মনে হইল। আমি পাতকী, এটাও আমার পাপকার্য্যের অন্যতম। গোপনে নিশীথে নির্জ্জন স্থানে কুমারী যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছি; ধিক আমাকে! শত ধিক আমার নিলর্জ্জ ধৈর্য্যহীনতায়।

দুই হাত পিছাইয়া কাতর কণ্ঠে বলিলাম, "ফতিমা, ক্ষমা করিও, আমি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়াছি। তুমি এখনও আমার হও নাই, এ কথা স্মরণ করিয়া আমার কাজ করা উচিত ছিল। আমার এই নির্লজ্জ হঠকারিতার জন্য মনে অত্যন্ত ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছে। নিজগুণে ক্ষমা করিও। আমি এখনই প্রস্থান করিতেছি।

কোন উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ দ্রুত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। বহুদূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, ক্ষীণ জ্যোৎস্নাস্নাত ফতিমা ঠিক সেই স্থানেই প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

৭

উল্লিখিত ঘটনার পর তিন মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। এই স্বল্পকালের মধ্যে সংসারে আমার বলিতে যাহা কিছু ছিল সব হারাইয়াছি। হৃদয়ের নিভৃত কোণে আমার ভাল হইবার যে একটু আশাবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। যে ব্যাধির ফলে সেদিন ফতিমা বিবি আমাকে দেখিয়া আম্র বৃক্ষ নিবাসী প্রেতাত্মা ভ্রমে মূর্চ্ছিতা হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সে শুধু আমাকে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। প্রথমে পিতা পরে মাতা ঐ কাল ব্যাধির করাল কবলে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। ইদানীং পিতার শরীর সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাঁহাকে আর বেশী দিন ভুগিতে হইল না। পীড়িত হইবার পর চতুর্থ দিবস শেষ বেলা আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না। পিতা পীড়িত হইবার একদিন অন্তর মাতা পীড়িতা হন। আহা সে কি বিভীষিকাময় করুণ দৃশ্য! স্থূলকায়া জননীর দেহ স্থানে স্থানে ফাটিয়া উঠিল, জলটুকু পর্য্যন্ত গলাধঃকরণের ক্ষমতা রহিল না। মধ্যে মধ্যে করুণ আর্ত্তনাদ! পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা বিরহিত। গলিত স্ফোটক বহুল সারা দেহ হইতে এমন ভীষণ দুর্গন্ধ নির্গত হইতে লাগিল যে আমার পক্ষেও তাঁহার নিকটে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। এত কষ্ট তবু প্রাণ বাহির হয় না। জীবন মৃত্যুর সে কি ভীষণ সংগ্রাম! মানব জীবনের কি ভয়াবহ শোচনীয় পরিণাম। পীড়িতা হইবার পর এগার দিনের দিন সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া আমাকে এই নির্দ্দয় সংসারে একাকী রাখিয়া তিনিও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। পাড়ার লোকেরা কেহ কেহ যে মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ না করিল এমন নহে, তবে "সারা জীবন সোয়ামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে, এখন ঝগড়ার মানুষের অভাব হইল দেখিয়া মাগী তাড়াতাড়ি স্বামীর পিছে দোজখে গেল। সেখানে গিয়াও দুইজন নাকি কাটাকাটি করিবে।" এরূপ অভিমতও নাকি কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছিল।

আমার নয়নের তারা, আমার জীবনাকাশের জ্যোৎস্না আমার হৃদয় বান্ধবী আমার শিরির শুভ বিবাহ যথা সময়ে যথারীতি নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে —কিন্তু আমার সঙ্গে নহে। ব্যাপারটী এমন কিছু জটিল নয়। তাহার সহিত আমার শেষ অভিসারের পরই সে বাটী গিয়া স্পষ্ট কথায় পিতাকে জানায় "তোমার ভাবী জামাতা আজ সন্ধ্যায় আমাকে দর্শন দিয়াছিল আমি যে জহুরলকে ভালবাসিয়াছিলাম, সে জহুরল ইহধামে নাই। তাহার স্থলে একটী বিকটা-কৃতি জীবের অভ্যুদয় হইয়াছে। মাপ করিবেন তাহাকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, সংসার করা আরো দূরের কথা। সুতরাং আমি আপনাকে না বলিয়াই পারি না যে যদি এই রাক্ষসমুখো অদ্ভুৎ জীবের সহিত পরিণীত হই, তবে আমি আত্মহত্যা

করিব।" একমাত্র কন্যার পিতা এনায়েত উল্লা কন্যাকে অভয় প্রদান করিয়া ভিন্ন বরের সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন, ফলে যে রাত্রিতে ফতিমার বিবাহ আমার সহিত হইবার কথা ছিল, সেই রাত্রিতে সেই বিয়াহ নাহজাতপুর নিবাসী রহমত জান তালুকদারের পুত্র রাজসাহী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র নূরউদ্দিনের সহিত মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইল। বরের নিটোল চেহারা, হাসি হাসি মুখ, নাসিকার নিম্নে ঈষৎ গুম্ফ রেখা। নবদম্পতি সুখী হউক। আমিন।"

৮

ভীষণ বসন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় আমার দেহ যষ্টিখানা জর্জ্জরিত হইয়াছিল—পচিয়া গলিয়া আমাকে নরকযন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, আমি বিকলাঙ্গ হইয়াছিলাম। কিন্তু ফতিমাকে হাসিমুখে পরহস্তগত হইতে দেখিয়া আমাকে এ কি সাংঘাতিক ব্যাধিতে পাইয়া বসিল। কাল ব্যাধির আক্রমণ যে ইহার নিকট কিছুই নহে। নরক যন্ত্রণা বলিয়া কিছু আছে কি? যদি থাকে তবে কি সে এত ভীষণ হইতে পারে? হৃদয়ে এরূপ অসহনীয় যন্ত্রনা ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিলাম।

কিন্তু শত সহস্র লোক সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, শত শত নূরউদ্দিন শত শত ফতিমাকে নির্ব্বিঘ্নে বুকে লইয়া ঘুমাইবে, চাঁদ উঠিয়া তাহাদের ফুল শয্যাকে আলোকিত করিবে, শিশির-সিক্ত মলয় হিল্লোলে তাহাদের নব-প্রেম মঞ্জুরিত হইয়া উঠিবে, দিকে দিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিবে রঙ্গরসে দুনিয়া ভরপুর হইবে, কেবল আমি এই বঞ্চিত অনাদৃত হতভাগা শুধু অভিমান ভরে দুনিয়া বক্ষ হইতে অপসৃত হইব! কেহই আমার হৃদয় বেদনা জানিবে না, বুঝিবে না! কখনই নহে!

প্রতিহিংসা! সুতীব্র প্রতিহিংসা! কিন্তু কাহার বিরুদ্ধে? যিনি এই দুনিয়ার মালিক, যাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাকি বৃক্ষপত্রও কম্পিত হয় না, যাহার ব্যবস্থায় কেহ বাদশা কেহ ফকির, কেহ রূপবান, কেহ কুৎসিত, কেহ সুখী, কেহ অসুখী—শুধু তাহাই নহে যে মুমূর্ষু তৃষিতের মুখ হইতে শীতল বারি কাড়িয়া লয়, ফুল্ল কুসুম কোড়কে কীট প্রবেশ করায়, নিষ্পাপ সুকুমার মতি শিশুকে হত্যা করিয়া জননীর কোল শূন্য করে, মৃত্যু, অবিচার পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি যাহার নিত্য সহচর, যাহার উৎপীড়নের ফলে হাসিমুখ কাল হয়, উৎসব বন্ধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া যায়, একের মুখের গ্রাস অন্যে লাভ করে—সেই ভণ্ডের বিরুদ্ধে।

যদি মানবের কোন ভাগ্যবিধাতা থাকিয়া থাকে, তবে সে আজন্ম আমাকে পদে পদে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে, মানব হৃদয়সুলভ আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়া আমাকে পশুত্বের দিকে টানিয়া লইয়াছে। তাহাকে আমি ন্যায়পরায়ণ বলি কোন্ হিসাবে? আর যে ন্যায়পরায়ণ নয় তার তথা-কথিত বিধিনিষেধগুলিকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করা আমার মতে অন্যায় নয়।

সংসারের একমাত্র অবলম্বন পিতামাতাও আমার এই সঙ্কট সময়ে আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁদের বিরহ যন্ত্রণা আমার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্ভাগ্যের সহিত একীভূত হইয়া আরও আমাকে পাগল করিয়া তুলিল।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম, আমি যেরূপ অযথা উৎপীড়িত ও বঞ্চিত হইয়াছি, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন অপরকেও সেইরূপ যথাসাধ্য উৎপীড়িত ও বঞ্চিত করিব। যাহা কিছু দূষনীয়, যাহা কিছু কলঙ্ক পূর্ণ যত কিছু অন্যায় অবিচার সবগুলির অবতারণা করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে জীবনমরু উত্তীর্ণ হইব। এইরূপেই আমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কেন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিব।

হৃদয়ের তীব্র যাতনা দেহের শিরায় শিরায় আগুন জ্বালিয়া দিল। বিশ্বের আনন্দ কোলাহল আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। একবার মনে করিলাম দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গ সাজিয়া রক্ত পিপাসা দমন করি, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে সেরূপ করা সমীচীন মনে হইল না। এদিকে হৃদয়ের আবেগও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। এরূপ

যাতনাকে হ্রাস করিবার জন্য জীবন ভুলিবার জন্য প্রথমেই সুরা দেবীর আশ্রয় লইলাম। বোতলকে বোতল উড়িয়া যাইতে লাগিল।

আহা কি আরাম! কি অনাবিল শান্তি! সুরা যদি এ জগতে না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের মত পাপী-তাপী, বঞ্চিত দলিতদের দশা কি হইত? হতভাগ্য মানুষ যখন সংসারের অবিচারে, অদৃষ্টের পরিহাসে, বিধাতার অভিশাপে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য হইতে বঞ্চিত হইয়া হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিকের দংশন ভোগ করে, পদে পদে অপমানিত হইয়া মানুষের নিকট হইতে শৃগাল কুকুরবৎ বিতাড়িত হইয়া জীবন ভুলিতে চায়, সংসারের যমযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে, হৃদয়ের কালানল নির্ব্বাপিত করিতে চায়, তখন তাহার ন্যায় সর্ব্বসন্তাপনাশী সর্ব্বভবজ্বালাহর অকপট বন্ধু আর কে? ক্রন্দন রত শিশু যেমন মাতৃচুম্বনে পরিতৃপ্ত হয় তেমনি সুরা সেবনে তাপক্লিষ্ট হৃদয় শান্তিলাভ করে। কিন্তু যাহারা এ হেন বন্ধুকে এরূপ জঘন্য বলিয়া ব্যবস্থা পত্র দিয়াছে—ইহাকে অস্পৃশ্য নরকের দ্বার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, তাহারা আমার মত হতভাগ্যদের অসহনীয় হৃদয়জ্বালা নিবারণের অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছে কি? এরূপ বিচার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বেই আমি সুরার একনিষ্ঠ সেবক হইয়া উঠিলাম।

একদিন মত্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া নেশার ঘোরে দেখিলাম, ফতিমাবিবি আমার পদমূলে লুটাইয়া আমার প্রেম ভিক্ষা করিতেছে। পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়ায় আমি অভিমানভরে মুখ ফিরাইয়া লইলাম। রোরুদ্যমানা ফতিমাবিবি তখন আমার পাদদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহুদ্বারা বাহু বেষ্টন করিল। আবির রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি আমার মুখের নিকট আনিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পৃথিবীর যাবতীয় কোকিলের স্বরমধু একত্রিত করিয়া স্থিরনেত্রে কহিল, "প্রাণনাথ, আমাকে কি ক্ষমা করিবে না?" ওঃহা, আর কি আমি থাকিতে পারি? প্রেমকম্পিত জড়িত কণ্ঠে, "প্রাণ আমার, প্রেয়সী আমার" বলিয়া সম্প্রসারিত বাহুদ্বারা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু একি, সহসা নিদারুণ ধাক্কায় চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলাম, শ্মশ্রুগুম্ফবিমণ্ডিত পাগড়ী চাপরাশধারী ভীম মূর্ত্তি পাহারাওয়ালা আমাকে হাত ধরিয়া থানায় লইয়া যাইতেছে, তাহাকেই আমি 'প্রাণ আমার প্রেয়সি আমার' বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি। কিন্তু সে প্রেয়সীসুলভ ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিয়া রাসভ বিনিন্দিত কণ্ঠ বাজাইয়া বলিয়া উঠিল, "শ্যালা।"

তখন পূর্ণ চৈতন্যের উদয়—হইয়াছে—ব্যাপার বেশ ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। পকেট হইতে মণি ব্যাগ বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী চকচকে সিকি লইয়া বলিলাম, তুমি আমাকে আজ যে আনন্দ দান করিলে, তাহার তুলনা নাই। কি দিয়া তোমাকে তুষ্ট করিব? এই লও তোমার দক্ষিণা, ইহার বেশী আর আমার নিকট নাই।' পাহারাওয়ালা এদিক ওদিক চাহিল, এক গাল হাসিয়া সিকিটি গ্রহণ করিয়া বলিল "দাদা তোম্‌সে বহুৎ মেহেরবান্‌। এয়্‌ছি কাম্‌ আওর কভি মৎ করো। তোম্‌ হরদম দারু পিও, বদমায়েসী যব্‌ তক্‌ ছাকো কর্‌ ভালো, মগর্‌ তোম্‌কো দেল বহুৎ ছাচ্চা রাখনা চাহিয়ে আওর তোম রাস্তাকো বিচ্‌ মৎ গেঁরো।"

উত্তম যুক্তি!

* * * *

এ জঘন্য কাহিনী দীর্ঘ করিয়া আর লাভ কি? এই খানেই ইহার উপসংহার করি। আমি এখন বৃদ্ধ—অল্পদিন পূর্ব্বে কারামুক্ত হইয়াছি। শ্রীঘর আমার পক্ষে নূতন নয়! কিন্তু এইবার মুক্ত হইবার পর পাপকার্য্যে কেমন একটা বিতৃষ্ণা বোধ করিতেছি। পাপে আর আনন্দ পাইতেছি না। যে ব্যক্তি বোতল দেবীর আরাধনায় পৈতৃক সর্ব্বস্ব অপব্যয় করিয়া, অর্থ সংগ্রহের জন্য চৌর্য্য, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতিকে নিত্য সহচরপদে বরণ করিয়াছে, শুধু পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কত নির্দ্দোষ নরনারীকে অযথা উৎপীড়িত করিয়াছে, যে নরাধম শুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যভিচারে লিপ্ত হইতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই—শুধু তাহাই নহে, যাহার প্রতিহিংসামূলক ষড়যন্ত্রের ফলে এনায়েত উল্লা আজ পথের ফকির, যে সুকৌশলে নির্ম্মল চরিত্র সুঠামকান্তি নূরউদ্দিনকে হত্যা করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে আত্মহারা

হইয়াছে, এবং ক্ষতিমার পুষ্পিত হৃদয়কুঞ্জকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, সেই নির্ম্মম-হৃদয় পাপীর একি অস্বাভাবিক ভাবান্তর! মসীকৃষ্ণ মেঘের গায়ে বিজলী চমকের মত কি যেন একটা অজ্ঞাত অনুভূতি মধ্যে মধ্যে হৃদয় তন্ত্রীকে শিহরিত করিয়া তুলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কত নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি, কত করুণ—কাহিনীর জ্বালাময়ী স্মৃতি আমার মনের দ্বারে আঘাত করিতেছে। তবে একি অনুশোচনা না বিবেকের সাড়া? কিন্তু বিবেক, সে ত আমার নাই। অনুশোচনা! সেত আমার হইতে পারে না। তবে একি বার্দ্ধক্যের দৌর্ব্বল্য! কি জানি।

বৃদ্ধ হইয়াছি বটে। মানুষ বৃদ্ধ হয়। তার পর? তারপর পরলোক গমন করে। সে লোক কেমন? শুনিয়াছি স্বর্গ এবং নরকের কাহিনী। আমার জন্য কোনটী নির্দ্ধারিত? সে প্রশ্ন উত্থাপন করাই বাতুলতা। অষ্টম বর্ষীয় বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিবে, "নরক! নরক! নরক!" তাদের সহিত আমিও ভিন্নমত নহি।

তবে অবশেষে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই—আমার সন্দেহ মোচন করিতে চাই—আমার কৃত এই ক্ষমার অযোগ্য পরিমাণ বিগর্হিত পাপাচরণের জন্য আমিই কি সম্পূর্ণ দায়ী?

বর্ষা বিদায়

শ্রীহাসি রাশি দেবী

বিদায় বর্ষ! আজি বিদায়াভিনন্দন
বহিয়া এনেছি সাজায়ে বরণ ডালাতে,
গত দিবসের সুখ-হাসি-দুঃখ ক্রন্দন
গাঁথিয়া এনেছি স্মৃতির শুভ্র-মালাতে।
তোমার বিদায় বাসরে গাহিব গান,
আজিকে করিয়া জ্যোছনা সায়রে স্নান;
তোমারে ঘেরিয়া সারা রাতি রব' জাগি,
ক্লান্ত হৃদয়ে মেলিয়া অলস আঁখি,
জাগিয়া উঠিয়া যখন ডাকিবে পাখী
আসিবে প্রভাত জগতে প্রদীপ জ্বালাতে,
তোমার চরণ চিহ্ন হৃদয়ে আঁকি,—
কুড়ায়ে লইব স্মৃতিটি—বরণডালাতে।
বিদায় বর্ষ! দীরঘ জীবনে কত
এমনি বরষ আসিয়াছে, গেছে চলিয়া—
হৃদয় কাননে নব পল্লব শত
তারই সনে ফুল ফুটায়ে গিয়াছে দলিয়া।
ভুলিনি কারেও; ভুলিব না কোনদিন,—
নূতন সুরেতে বাজে না হৃদয় বীণ;
পুরাতন সুরেই বেজে ওঠে বার বার,
সেই হাসি,—গান, সেই ঝরে আঁখি ধার;
নিরাশা ও আশা সেই ভয় ভাবনার
কত কথা কানে মৃদু স্বরে যায় বলিয়া,
যে চলিয়া যায়, জানি সে আসেনা আর
তবু তারে চাই কঠিন সত্যে ছলিয়া॥
বিদায় বর্ষ! বন্ধু! এ স্নেহ চুম্বন
লহ আজিকার বেদনার তীরে দাঁড়ায়ে,
সম্বল শুধু এইটুকু অবলম্বন,
ক্ষণিকের তরে বুকে বাঁধি বাহু বাড়ায়ে।
চলিবার পথে এই যে ক্ষণিক খেলা,
খেলিতে খেলিতে শেষ হ'য়ে যায় বেলা;
আবার যে আসে দীর্ঘ দিবস রাতি,
চলার পথের ক্ষণিক হইতে সাথী;
কাঁদে এ হৃদয়, আনন্দে কভু মাতি
ছুটে যেতে চায় সকল গণ্ডি ছাড়ায়ে,—
কভু বা একাকী বেলাভূমে বসি গাঁথি
সব সুখ দুঃখ মরণের তীরে দাঁড়ায়ে॥

র পথ্য

প্রবন্ধ—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কতিপয় নিত্য ব্যবহার্য্য পথ্যের প্রণয়ন প্রণালী লিপিবদ্ধ করিব। একথা স্বীকার্য্য যে বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন; এবং উপযুক্ত পথ্য নির্ব্বাচন উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচনের ন্যায় হিতকারী। অনেক স্থলে একমাত্র পথ্যের দ্বারাই রোগী রোগমুক্ত হইয়া থাকে, ঔষধ উপলক্ষ্য মাত্র। প্রাচীন কালে বংশ পরম্পরাগত জ্ঞান পরিচালিত প্রাচীনেরা এ সম্বন্ধে যে তৎপরতা দেখাইতেন, বর্ত্তমান সময়ে সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার ফলে পরিবার মধ্যে সামান্য পীড়া হইলেই আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা একান্ত অসহায় ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন এবং নার্স প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া গৃহস্থকে যে ব্যয়ভারে নিপীড়িত করেন, ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে সে ব্যয় একান্ত অশোভন। সুতরাং বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকাগণকে প্রাথমিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রোগীর সেবা, ঔষধ ও পথ্য প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা হওয়া উচিত। নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রণয়ন কালে কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া সুকুমার মতি শিশুদিগের জন্য স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান পাঠের যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে অজ্ঞতা প্লাবিত এই বঙ্গদেশে বিজ্ঞানের আলো বিকীর্ণ হইতেছে কিনা বলিতে পারি না, তবে যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট "বিজ্ঞান-পাঠ"গুলি দুর্ব্বোধ্য "অজ্ঞান পাঠ" রূপে ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সংবাদ আমরা রাখি। শিক্ষণীয় বিষয়কে কি করিয়া সাধারণের উপযোগী করিতে হয়, সে জ্ঞান বহু লেখকের নাই বলিয়াই মনে হয়। ফলে এরূপ পুস্তক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাহারও চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারা যায় যে,প্রকৃত শিক্ষা তাহাই,যাহা নর-নারীকে ভাবী জীবন-সংগ্রামে উপযুক্ত শক্তি ও সাহস দান করিতে সমর্থ। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আজকাল কুমারীরা সঙ্গীত শিক্ষা প্রভৃতির প্রতি যে পরিমাণ আগ্রহ দেখাইতেছেন, "শিশুপালন," "শিশুর খাদ্য-নির্ব্বাচন," "রোগে শিশুর সেবা" এবং "শিশুর পথ্য প্রণয়ন প্রণালী" শিক্ষার জন্য তাহাদের সেই পরিমাণ আগ্রহ আকর্ষণ করিবার জন্য অভিভাবকগণের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। সঙ্গীত আদির দ্বারা কর্ম্মক্লান্ত স্বামীর চিত্তকে বিশ্রামের মধ্যে অবসাদের জড়তা হইতে মুক্ত করিয়া সতেজ করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক স্ত্রীর জীবনের কাম্য হইতে পারে; কারণ ইহার দ্বারাই আরামলব্ধ বিশ্রামকে উভয়ের নিকট পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারা যায়। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের পথে সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর পার্শ্বে অবস্থান করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে পবিত্র ব্রত রূপে উদ্‌যাপন করিবার পক্ষে আমার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সাধ্বীকে যে প্রভূত পাথেয় দান করিতে সমর্থ, তাহা বিলাস-সর্ব্বস্ব দম্পতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলেও কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধ্বীর নিকট অমূল্য।

১। চূণের জল (Lime water)—পেট রোগা শিশুরা দুধ হজম করিতে পারে না। ফলে তাহাদের বদহজম ও অম্ল হইতে দেখা যায়। আজকাল দুধকে সাইট্রেট করিয়া দিবার ব্যবস্থা চিকিৎসগণ দিয়া থাকেন। সোডি সাইট্রেট বা সাইট্রো সেডিন (Citro Sodine) প্রায়ই এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে Citro sodine ব্যয় সাপেক্ষ। পূর্ব্বে বিনা খরচায়, বাঙ্গালীর সংসারে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইত। চূণের জলের কথা সৌভাগ্যক্রমে আজিও বাঙ্গালীর একান্ত অজ্ঞাত নয়। কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত প্রণালী অনেকেই জানেন না। "চূণের জল" প্রস্তুত করিবার সহজ নিয়ম নিম্নে দেওয়া হইল।

আড়াই সের পরিমাণ জল ও অর্দ্ধ ছটাক চূণ (Slaked lime) একটি বোতলে পুরিয়া, বোতলের মুখ ছিপি বন্ধ করিয়া কয়েক মিনিট ধরিয়া ঝাঁকাইতে হয়। তাহার পর বোতলটিকে ছিপি বন্ধ অবস্থায় একটি স্থানে ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া, জলটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইতে

হয়। পরে কাঁচের বা আলুমিনিয়ম পাত্রে এই জল ছাঁকিয়া রাখা উচিত। চূণের জলের সঙ্গে বায়ু মিশিতে কদাচ দিতে নাই। এইজন্য চূণের জলকে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। চায়ের চামচের এক চামচ এই জল শিশুর পক্ষে দিনে দুইবার যথেষ্ট। বদহজম এবং অম্লে ইহা আশু ফলপ্রদ, এবং চিকিৎসক মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

২। পেপ্টনাইজড মিল্ক (Peptonised milk)—যে সকল শিশু কিছুতেই খাঁটি গো-দুগ্ধ হজম করিতে পারে না, তাহাদের জন্য চিকিৎসকরা প্রায়ই Fair child's Peptonising Powder অথবা Savory and Moore's Peptonising Pelletsএর ব্যবস্থা করেন। দুধকে সহজে অল্প খরচায় Peptonise করিবার উপায় এইরূপ—দেড় পোয়া দুধের সহিত ৬০ ফোঁটা Liq Pepticus (লাইকর পেপটিকস্) ও দশ গ্রেন সোডি বাই কার্ব্ব মিশাইয়া, দুধকে এক ঘণ্টা কাল ঈষৎ উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। পরে উক্ত দুধকে অল্প তাতাইয়া প্রয়োজনমত শিশুকে পান করান যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে ইহার সহিত তালের মিছরি মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

যে সকল ছেলে অনবরত দুধ তুলে অথবা দুগ্ধ পানে যাহাদের উদরে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চার হয়, তাহাদের পক্ষে Peptonised milk উপকারী। আধ সের দুধে Citrosodine ট্যাবলেটের দুইটি মিশাইয়া পাঁচ মিনিট পরে ঐ দুগ্ধ প্রয়োজন মত শিশুকে পান করান মন্দ নহে। যে সকল শিশু দুধ তুলে, তাহাদিগকে Citrosodine ট্যাবলেট দিনে দুইটা করিয়া পৃথকভাবে খাওয়াইলেও যথেষ্ট উপকার হয়। ঔষধের দোকানে এই পেটেণ্ট ঔষধ কিনিতে পাওয়া যায়।

৩। য়্যালম্ হোয়ে (alum whey)—চিকিৎসা শাস্ত্রে ফিটকিরির astringent শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে উদারময় ও অতিসার রোগে প্রাচীনারা শিশুদিগকে দুধের সহিত ফিটকিরিচূর্ণ পান করাইতেন। এখনও উদারময় ও অতিসার রোগে চিকিৎসকগণ alum wheyএর ব্যবস্থা করেন। ইহার প্রণয়ন প্রণালী এইরূপ:—দুই ড্রাম মেডিকেটেড ফিটকিরিচূর্ণ (alum medicated or refined) দুই ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধসের ফুটন্ত দুধে সমস্ত মিশ্রিত পদার্থটা ফেলিয়া দিউন। তাহার পর একখানি পরিষ্কার পাতলা বস্ত্রখণ্ডে দুধ ছাঁকিয়া, শিশুকে প্রয়োজনমত পান করিতে দিবেন।

৪। শিশুদের প্রায়ই খুক-খুকে কাসি হয়। গৃহস্থ কাশির জন্য প্রায়ই চিকিৎসকের দারস্থ হন। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই খাদ্যের পরিবর্ত্তনের দ্বারাই শিশু নিরাময় হইতে পারে। যদি ঔষধ দিবার একান্ত প্রয়োজন মনে হয় তবে—Gumwater দেওয়া উচিত।

গমওয়াটার (Gum water)—একটি মৃৎপাত্রে অর্দ্ধ ছটাক Gum arabio (আরবিগঁদ) ও এক ছটাক কাশির চিনি মিশ্রিত করুন। তাহাতে অর্দ্ধ সের জল দিন। তারপর পাত্রটিকে এক হাঁড়ি ফুটন্ত জলে বসাইয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে থাকুন। গঁদ উত্তমরূপে জলের সহিত মিশিয়া যাইলে পর পাত্রটিকে নামাইয়া লইবেন। ইহাই Gumwater। পাতি লেবুর রস মিশাইয়া পান করিলে খুক্ খুকে কাশি নিবারিত হয়।

৫। কালমেঘ—কাল মেঘ গাছ, বনে-জঙ্গলে পর্য্যাপ্ত জন্মে। কিন্তু ইহার উপকারিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি শিশুকে কালমেঘের রস নিয়মিত ভাবে পান করান হইত। আজকাল বেঙ্গল কেমিকেলের কালমেঘের লিকুইড টাটকা কালমেঘের রসের স্থান অধিকার করিতেছে। কিন্তু সূর্য্যের আলোর অভাব ঘটিলে, দীপশিখা যতটুকু কার্য্যকরী, তাহার অধিক ইহার উপকারিতা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যে সকল শিশু কাল কাল কাদাটে মল ত্যাগ করে তাহাদের পক্ষে কালমেঘ বিশেষ উপকারী। শিশুদের উদরে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অভাব হেতু খাদ্যের দ্বারা যকৃতের পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা সমধিক। কাল মেঘ ব্যবহারে শিশুর যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি হইতে পারে না। কাল মেঘ ব্যবহারের নিয়ম—কাল মেঘ গাছের ৪।৫ পাতা ২।৪টা যোয়ানের সহিত অল্প থেৎলাইয়া লইবেন। পরে সিকি ছটাক রস তপ্ত দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া শিশুকে পান করাইবেন। সপ্তাহে সাধারণতঃ দুইবার এই ভাবে পান করাইলেই যথেষ্ট হইবে।

জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন*

শ্রীকালিদাস রায়

১। জাতিভেদ—উপজাতিভেদ—শ্রেণীভেদ ইত্যাদি সহস্র ভেদের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দুসমাজ, ভূমিকম্পে জীর্ণ হর্ম্ম্যের মতন কাঁপিতেছে। যে সমাজ মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া কেবল ভেদের উপর স্থাপিত—তাহার বলভরসা কতটুকু? তাহা কতদিন আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবে? দেশে যে সকল আন্দোলন জাতিতে জাতিতে ভেদবিদ্বেষ বাড়াইয়া দেয়—তাহা জাতীয় জীবনের যাত্রাপথে কি বিষম বাধাস্বরূপ নয়? যাঁহারা দেশের কল্যাণ চাহেন তাঁহাদের এ সকল আন্দোলনে সহানুভূতি নাই।

২। ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলি যে আপনাদের সামাজিক পদবী উন্নত করিতে চাহিতেছে—এ চেষ্টার মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত ও জাতীয় জীবনের পক্ষে কল্যাণজনক কিছু আছে কিনা নিরপেক্ষ সুধীগণের তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা তাই জিজ্ঞাসা করি—ব্রাহ্মণেতর জাতি মাত্রেই কি শূদ্র? তাহারা যদি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে তাহাদের শূদ্রত্ব পরিহারের কি কোন উপায় নাই? ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া যাঁহারা সমাজে চলিতেছেন তাহারা সকলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ আছেন কিনা? তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শাস্ত্রমতে ক্রিয়াবৈগুণ্যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'ন নাই কি? হিন্দুশাস্ত্র এমন অনুদার সঙ্কীর্ণ ও অবিচারক হইতে পারে না—যে বলিবে সর্ব্বপ্রকার অনাচার সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকিয়া যাইবে। আমরা নিরপেক্ষ নির্ভীক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা অনাচারী সংসংস্কারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বর্জ্জন করিবেন কিনা?

যে সকল ব্রাহ্মণেতর জাতি উচ্চতর পদবীতে উন্নীত হইতে চাহিতেছে, তাহারা কেবলমাত্র গায়ের জোরেই উঠিতেছে কি? তাহারাও কি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহায়তা পায় নাই? কল্পতরু হিন্দুশাস্ত্র কি তাহাদিগকে ২।১ টি শ্লোক দিয়াও সাহায্য করে নাই? ক্রমাবিস্রিয়মাণ ঐতিহাসিক তথ্য কি তাহাদের অনুকূলে কোন কথাই বলে না? বিভিন্ন জাতির কুলজী, কুলপঞ্জিকা, ঘটককারিকা কি তাহাদের পক্ষে কোন সাক্ষ্য দেয় না? রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকা কি এমন অনেক কথা প্রকাশ করে নাই, যাহাতে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে বর্ণসঙ্কর বা শূদ্র বলিয়া অবহেলা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অসঙ্গত?

কথা হইতে পারে, যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর জাতিদের সহায়তা করিতেছে, তাহারা বিশিষ্ট কোন স্বার্থের জন্য অথবা উদরান্নের সুবিধার জন্যই ইহা করিতেছে! ইহাই যদি সত্য হয়—তবে সত্যাশিক্ষিত ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণকেও ত্যাগ করিতে হয়—তাহার সংখ্যা যে কত তাঁহাদের আত্মীয়-বন্ধু-পরিপোষকের সংখ্যা যে কত এবং ভবিষ্যতে যে কত বৃদ্ধি পাইবে কর্মঠতন্ত্রীরা কি তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বাংলাদেশে দুইকোটি ব্রাহ্মণেতরের উপরে যে ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জনকে তাঁহারা কর্মঠতন্ত্রের গণ্ডীতে রাখিবেন? এমনটাও তো ভাবা যাইতে পারে সকলেই কিছু স্বার্থের জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নয়নে সাহায্য করিতেছেন না—এমন লোকওতো অনেকে থাকিতে পারেন—যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, উদার, নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক—তন্নতন্ন করিয়া শাস্ত্র ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন—ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির যথার্থ দাবি কি? এমনওতো হইতে পারে—কর্মঠতন্ত্রীরা কেবল আত্মপ্রাধান্যের পরিপোষক ও ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে যে প্রতিকূল শ্লোকগুলি কেবল সেই শ্লোকগুলিকেই বাছিয়া লইয়াছেন—আর নিঃস্বার্থ

* জাতিবন্ধমূলক কোন একটি তথা-কথিত সামাজিক সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

নির্ভীক শাস্ত্রজ্ঞগণ বিপরীত শ্লোকগুলিকেও শাস্ত্রের সম্পত্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। স্বার্থ যে কোন্ পক্ষের বেশী, তাই বা কে জানে? আত্মপ্রাধান্য রক্ষার চেষ্টার মধ্যে স্বার্থের স্থান কম কি?

যে জাতির মধ্যে শিক্ষা-সভ্যতার উন্নতি হইয়াছে তাহারাই জাতিবর্ণের উচ্চতর পদবীতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সে জন্য শাস্ত্রানুশীলন করিতেছে। তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণের নিকট বর্জ্জনীয়—কেবল বৈদ্যকায়স্থ কেন? সুবর্ণ বণিক, মাহিষ্য, গন্ধবণিক, উগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী ইত্যাদি সংশূদ্র বলিয়া আখ্যাত বহু জাতিই তো অশৌচ-কাল সঙ্কোচ করিয়া ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য পদবীতে উন্নীত হইতে চাহিতেছে। একই নিয়মে একই শাস্ত্র-বিধি অনুসারে সকলেই তবে বর্জ্জনীয়। অর্থাৎ শিক্ষিত সভ্য-জাতি মাত্রেই বর্জ্জনীয়। অনুন্নত অশিক্ষিত জাতিগুলিতো রীতিমত অস্পৃশ্য। ইহাদের সহিত বহু সহকারী ব্রাহ্মণও বর্জ্জনীয়। তাহার ফল কি দাঁড়াইল? ব্রাহ্মণ কয়েক জন কি শাক্যকুলের মত হিমালয়ের পাদদেশে আশ্রয় লইবে? তাহারা তবে কাহাদের ব্রাহ্মণ হইয়া থাকিবে? বহু ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায়ও এই সঙ্গে লোপ পাইবে না কি? বিরুদ্ধাচরণ করিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহই তাঁহাদিগকে মানিবে না।

আপনার নিকট আপনি মান্য হইয়া থাকিলে কাহারো শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হয় না। দশজনের স্বীকৃতির উপরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—নতুবা শ্রেষ্ঠতার কোন মূল্য থাকে না। ব্রাহ্মণ যেমন, "ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই"—এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছে—ব্রাহ্মণেতর জাতিও "ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ছিল—এখন আর নাই" এই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে পারে। এখন কথা হইতে পারে—দেখা যাইতেছে কোন জাতির মধ্যেই সকল লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই। যাহারা বিদ্রোহী হয় নাই তাহারাই শুদ্ধিতন্ত্রী ব্রাহ্মণের অবলম্বন। তাঁহাদের এই স্বপ্ন অচিরেই ভাঙ্গিবে। সকল জাতির পক্ষেই আপন আপন জাতিই বড়, ব্রাহ্মণ হইতেও বড়—ব্রাহ্মণ হইতে ঢের বেশী আত্মীয় ও সহায়। কথায় বলে, কুটুম্ব—নারায়ণ। ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিতে পারে, স্বজাতিকে ত্যাগ করিতে পারে না। কাজেই স্বজাতির মধ্যে নব প্রবুদ্ধ আন্দোলনেরই অদূর ভবিষ্যতেই জয় লাভ হইবে। তাহা ছাড়া, এই জাতিগত আন্দোলন শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তৃতির ফল—শিক্ষা-সভ্যতার যত বেশী বিস্তার হইবে ততই নিম্নতর পদবী কেহ সহ্য করিবে না। ইহাই স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণেতর জাতিকে শাসনে রাখিতে হইলে একমাত্র উপায় শিক্ষাসভ্যতার বিস্তৃতির গতিরোধ করা।

শূদ্রত্ব অতি ঘৃণিত অপবাদ, শূদ্রের যে সকল প্রতিশব্দ আছে, তাহার ব্যাকরণগত অর্থগুলি ভাবিয়া দেখিলেই হয়। শূদ্রকে বাংলায় তর্জ্জমা করিলে দাঁড়ায়,—নফর, গোলাম, বান্দা। শূদ্রত্বের অর্থ হিন্দুর যাহা শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার—ভারতের বিদ্যাবৈদগ্ধ্যের যাহা কিছু গৌরবাত্মক তাহার সবেতেই অনধিকার। ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষা সংস্কৃতির (বিদেশীই হউক আর স্বদেশীই হউক) সহিত এই শূদ্রত্বের সামঞ্জস্য বিধান করা বড়ই কঠিন। সমুন্নত আচার আচরণ রীতিনীতি প্রথাপদ্ধতি প্রাচীন যুগের বিধি ব্যবস্থার অনুযায়ী না হইলেও যুগধর্ম্মের উপযোগী। তাহার সহিতও শূদ্রত্বের সামঞ্জস্য হয় না। তাহা ছাড়া, জগদ্ব্যাপী স্বাতন্ত্র্য বাদের জাগরণের যুগে কোন প্রকার হীনতা, দাসত্ব, আত্মাবনতি বা মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা সহনীয়ও নয়—স্পৃহনীয়ও নহে। এ যুগে ব্রাহ্মণ যাহা কিছুর গৌরব করিতে পারেন—অন্যান্য জাতিও তাহারই গৌরব করিতে পারেন। এযুগে ব্রাহ্মণ যাহা কিছু অধিগত করিতে পারেন, তাহা যে কেহ চেষ্টা করিলেই পারেন বা পারিতেছেন। কাজেই কৃত্রিম ভেদকে কিছুতেই বজায় রাখা যায় না।

যে ব্রাহ্মণ মনুসংহিতার বিধি মিলাইয়া ঋষিগণের অনুসৃত আচার আচরণ মিলাইয়া আপন সমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতেছেন না—সে ব্রাহ্মণ কৃত্রিম বৈশ্যের বর্ণোচিত বিধি বা অনুশাসন মিলাইয়া অপরাপর জাতির পদবী নির্দ্দেশে অধিকারী নহেন। তাঁহারা যে হিসাবে ব্রাহ্মণ, অন্যান্য সভ্য জাতিরা সে

"শকুন্তলা"

হিসাবেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য। তাহারা যে এখনো ব্রাহ্মণ জাতিকে মানিতেছে এবং মানিতেছে বলিয়াই তাদের নিম্নতর পদবীতে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ মনে করিতেছে, ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে এযুগে ইহাই যথেষ্ট। যাঁহারা জগৎসংসারের খোঁজ রাখেন, যাঁহারা যুগধর্ম্ম কি বোঝেন, তাঁহারা অবশ্যই আমাকে সমর্থন করিবেন।

আমাদের মনে হয়—বাংলার জাতিসমূহের উচ্চতর পদবীতে আরোহণ-প্রয়াস ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ জনিত সামান্য অকল্যাণ সৃষ্টি করিলেও জাতীয় জীবনের প্রভূত কল্যাণ সাধনই করিবে।

১। যে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা সকল জাতির পক্ষেই স্পৃহণীয়—যে স্বাধীনতালাভের প্রয়াসই বর্ত্তমানযুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহাও তাহারি অঙ্গীভূত এবং তাহারই পরিপোষক! স্বদেশী শৃঙ্খল না খসিলে বিদেশী শৃঙ্খল খসিবে কেন? শাসন যাহারই হউক—সমাজেরই হউক ধর্ম্মেরই হউক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই হউক আর রাষ্ট্রীয় জীবনেরই হউক—নির্ব্বিচারে না মানিবার সাহস ও তেজস্বিতার মর্য্যাদা কে অস্বীকার করিবে? অনুশাসন যাহারই হউক—যে যুগের হউক—যে দেশের হউক—যে শাস্ত্রেরই হউক তাহা যাচাই করিয়া—পরীক্ষা করিয়া—বিচার করিয়া লওয়া মনুষ্যত্বেরই অঙ্গ। এই প্রয়াসে যে সাহস, নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মমর্য্যাদা বোধ ও তেজস্বিতার প্রয়োজন হইতেছে—তাহাই অনেক অবিচার অনাচার অন্ধসংস্কার ও মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে উৎসাহিত করিবে।

২। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শকেই খুব বড় মনে করেন, তাঁহারা ছত্রিশ জাতির বদলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা স্পৃহণীয় মনে করেন। হিন্দু-সমাজের পক্ষে তাহাই যদি কল্যাণকর হয়—তবে তাহা এই প্রয়াসেই সিদ্ধ হইবে। কোন একটি বর্ণ-স্তরে যে সকল জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, কালে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চলিতে পারিবে—উপজাতি বা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একবর্ণত্বের আদর্শে বৈবাহিক আদান প্রদান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ সংশয় অবিশ্বাসের সংস্কার কমিয়া আসিতেছে।

৩। যাঁহারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে ও একবর্ণত্বের পক্ষপাতী তাঁহাদেরও এই চেষ্টার প্রতিকূলতা করা উচিত নয়। মহামিলনের পূর্ব্বে অগ্রে চারিটি স্তরে মিলন বাঞ্ছনীয়। এই প্রয়াস তাঁহাদের স্বপ্নপোষিত মহামিলনের সহায়তাই করিবে।

৪। নিম্নজাতি উচ্চতর পদবীতে আরোহণ করিলে নিম্নতর জাতির সহিত উহার প্রভেদ বাড়িয়া যাইতে পারে—এই প্রয়াসে নিম্নতর জাতির প্রতি ঘৃণা ও সূচিত হয় সত্য—কিন্তু নিম্নতর জাতিও তো সেই পদবীতেই থাকিতেছে না, সেও তো উঠিতেছে কাজেই প্রভেদ বাড়িবে না—কমিয়াই আসিবে। আর ব্রাহ্মণ সকলেরই উন্নয়নপ্রয়াসের যখন বিরোধী, তখন পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী সহানুভূতি ও সহযোগিতা বাড়িবার কথা। নিজে সে কারণে বিদ্রোহী, অপরেও সে কারণে বিদ্রোহী হইলে তাহাকে সহায়তা করাই স্বাভাবিক, শত্রুতা করার কথা নহে, একই যুক্তি একই দাবির অস্ত্র সকলেরই ব্যবহার করার কথা। ফলে, এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া সকলেই যে কোন জাতির উন্নয়নকেই সহায়তা করিবেন এবং করিতেছেন। এই সঙ্গে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টাও যোগ দেওয়া হইতেছে।

৫। সমস্ত বাংলা দেশে ১৩ লক্ষ + ১ লক্ষ = ১৪ লক্ষ লোক ছাড়া সকলেই শূদ্র এবং ম্লেচ্ছ,—ইহা বড়ই কলঙ্কের কথা। শূদ্রের অর্থ হেয় বা জঘন্য। ফলে সমগ্রদেশবাসীই হেয় ও জঘন্য শ্রেণীর জীব বলিয়া ভারতে তথা জগতে পরিচিত। কান্যকুব্জ হইতে আগত পাঁচ জন লোকের বংশধরদেরই তো এই দেশটা নয়—তাঁহারা অতিথি, দেশের মাটির খাঁটি মালিক যাহারা তাহারা চিরদিনই ঘৃণ্য? এই শূদ্রত্বের অপবাদ দেশবাসীকে সত্যসত্যই শূদ্রভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা বলেন, দ্বিজত্বের অভিমানই দ্বিজাতিকে মহত্ত্বের সেবক ও অনুবর্ত্তী করিয়াছে—তাঁহারা কি স্বীকার করেন না শূদ্রত্বের আত্মগ্লানিও মানুষকে হীনতার অনুগামী

করিয়া তোলে ? এক সময় আজ, বঙ্গ, কলিঙ্গের অধিবাসীরা হয়ত অনাচারী বর্ব্বর ও ধর্ম্মনীতিহীন ছিল—চিরদিনই কোন জাতি এক অবস্থায় থাকে না। ইউরোপীয়েরাও এক সময়ে গুহায় বা বৃক্ষশাখায় বাস করিত, তাই বলিয়া কেহ তাহাদিগকে আজ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ বাসিগণের সহিত সগোত্র বলে না। পক্ষান্তরে, দ্বিজাতির বংশধর আচার-বৈগুণ্যে শূদ্রাধম হইয়া পড়িতে পারে। অবনমনের কথা আমি বলিতেছি না—সে প্রথা থাকিলে মন্দ হইত না। সে প্রথা নাই বলিয়া অধিরোহণের প্রথাও রোধ করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে ? ব্রাহ্মণের পুত্রও শূদ্র হইয়াই জন্মায়—সংস্কারের দ্বারাই দ্বিজত্ব পায়। বাঙ্গালী জাতিও শূদ্র হইয়া জন্মিয়াছিল—সংস্কারের দ্বারা আজ দ্বিজত্ব লাভ করিবে। ব্যক্তির পক্ষে যে ব্যবস্থা—জাতির পক্ষেও তাই।

শূদ্রত্বের অপবাদ দূর হইলে ক্রমে শূদ্রমনোভাব ঘুচিয়া যাইবে, দ্বিজত্বের অভিমান তাহাকে উচ্চতর আদর্শের দিকেই টানিবে। আমার মনে হয়—শূদ্রমনোভাব দূর হইয়া দ্বিজত্বাভিমান জাগিয়াছে বলিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী আর সচ্ছূদ্রত্বের কৃপাদত্ত অভিধা সহ্য করিতে পারিতেছে না। পাশ্চাত্য-প্রভাব তো বর্ণগৌরবের প্রয়াসী করে না।

ব্রাহ্মণ-প্রভাব-শাসিত শূদ্রজাতিকে জোর করিয়া হিন্দুজাতি বলা হইত,—এতদিনে এই শূদ্রজাতি হিন্দুজাতিতে পরিণত হইতে চাহিতেছে। যাহারা হিন্দুর শাস্ত্র, আচার, সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকার পাইল না—তাহারা আবার হিন্দু কিসের ? হিন্দু আজ বিদেশীর কাছে তাহার রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যগত সর্ব্ববিধ অধিকার দাবি করে, তাহার আগে স্বদেশীয়ের কাছে তাহার ধর্ম্ম ও সভ্যতার সর্ব্ববিধ অধিকার আদায় করিবেই। এই প্রয়াস সে অধিকার লাভের সহায়তা করিবে।

৬। বাংলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দু শিক্ষা-দীক্ষা আচার-ব্যবহার ও মনুষ্যত্বে যতটা উন্নত হইয়াছে—তাহাতে শূদ্রত্বের সঙ্গে তাহার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্যই সঙ্গতি বা সমন্বয় হয় না। শূদ্রের কাছে যে ধর্ম্ম বোধ, যে জ্ঞানগৌরব, যে মনুষ্যত্ব প্রত্যাশা করা যায় না—যখন তাহাই নিত্য পাইতেছি তখন নিশ্চয়ই তাহারা শূদ্র কোন দিনই ছিল না—কৃত্রিম শাসনে তাহাদিগকে জোর করিয়া শূদ্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। আর যদি সুযোগ পাইলে শূদ্রও সর্ব্ববিষয়ে গরীয়ান হইতে পারে ইহাই স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোককে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ না দেওয়ার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

৭। যাহাই হউক—যে দেশে মানুষের সামাজিক মর্য্যাদা জাতিবিচারের দ্বারা পরিমিত ও নির্দ্দিষ্ট—সে দেশের শিক্ষিত লোকেরা যে জাতিগত মর্য্যাদাকেই প্রতিষ্ঠিত করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? আজ যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়—৫০ বৎসর পরে হইবে। আজ যাহা চিরপ্রচলিত প্রথা বলিয়া অনেকের কাছে সমাদৃত—৫০ বৎসর পরে তাহার সংবাদ কেহই রাখিবে না। আজ যাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে—দূর ভবিষ্যৎ তাহাকেই চিরপ্রচলিত প্রথারূপে সমাদর করিবে। যে প্রথা চলিতেছে—তাহাও যেমন জন কতক মানুষেরই কীর্ত্তি—যাহা চলিবে তাহাও হইবে জন কতক মানুষেরই সৃষ্টি। কে কাহার বংশধর তাহা লইয়া বৃথাই মাথা ঘামান। জোর গলায় যে যাহা ঘোষণা করে তাহাই চিরদিন স্বীকৃত হইয়াছে—হইবেও। বংশধারার প্রবাহগুলিকে আমরা যতটা সরল, স্বচ্ছ ও অনাবিল মনে করিয়া গৌরবের স্বপ্ন দেখি—প্রাকৃতিক জগতে ঠিক তাহা কোন দিনই নয়। জাতি চিরদিনই একটা সামাজিক চিহ্ন মাত্র—জীবিতের শোণিতেও তাহার বৈশিষ্ট্য লেখা নাই—মৃতের ভস্মবিশ্লেষণেও তাহা পাওয়া যায় না।

৮। উচ্চতর পদবীতে আরোহণ-প্রয়াসে জ্ঞানের একটি শাখা বেশ ফলবতী হইয়াছে। সকল জাতিই আপন আপন কুলজী,—জাতির ইতিহাস ও ঘটককারিকা ইত্যাদি আলোচনা করিতেছেন—ইতিহাসও কিছু কিছু আলোচিত হইতেছে—ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত চর্চ্চা বাড়িয়াছে—শাস্ত্রানুশীলনেরও প্রয়োজন হইয়াছে। স্বজাতির পদবীগৌরব-প্রতিষ্ঠার অনুকূল মত ও যুক্তির অনুসন্ধানেই ইতিহাসশাস্ত্রাদির আলোচনার আরম্ভ,—ক্রমে শাস্ত্রাদিতে অনুরাগ,—তারপর হিন্দুত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকারের সূত্রগুলির সন্ধান। ফলে হিন্দুশাস্ত্র

আজ শুধু ব্রাহ্মণ বৈদ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই—সকলেই আলোচনা করিতেছেন—পুস্তক প্রবন্ধাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা কি দেশের পক্ষে সুখের কথা নয়?

আত্মপ্রাধান্য-রক্ষণে উদ্‌গ্রীব শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের অনেক কথাই গোপনে রাখিতেছেন—অন্যান্য জাতির মর্য্যাদা যাহাতে স্বীকৃত হইতে পারে—এমন শ্লোকাদিকে তাঁহারা অবহেলা করিয়া চলিতেন, অথবা চাপিয়া যাইতেন—আত্মপ্রাধান্য-বিস্তারের অনুকূল শাস্ত্রাংশগুলিকে বার বার শুনাইয়া দিতেন—অনেক জিনিসের অপব্যাখ্যাও করিতেন—এখন আর সে উপায় নাই। এই প্রয়াসের ফলে, শাস্ত্রে ইতিহাসে ও কুলপঞ্জিকাতে এমন অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—যাহাতে ব্রাহ্মণ জাতিকেও জাত্যভিমান অনেকটা কমাইতে হইয়াছে। যাঁহারা শিক্ষিত ও সত্যনিষ্ঠ তাঁহারা জাতি জিনিষটাকে আর সংকীর্ণ গণ্ডিত দৃষ্টিতে না দেখিয়া অনেকটা উদার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন।

নব প্রবুদ্ধ জাতিবর্ণগত আন্দোলনে এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্ম সাধিত হইবে বা হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

অসময়ে

শ্রীপূর্ণ শশী দেবী

সেদিন　ফাগুন সাঁঝে—রংয়ের আগুন জ্বেলে,
　　আঁধার মনের রুদ্ধ দুয়ার ঠেলে,
যখন　সে এসেছিল চুপি চুপি গোপন চরণ ফেলে।
তখন　মরমের মোর গহন-গোপন পুরে
　　চৈতি বাতাস কাঁদ্‌ছে উদাস সুরে
তার　তপ্ত-শ্বাসে ফুলগুলি সব গিয়েছিল ঝরে।
সেই　অনাগতের চরণ পরশ লেগে
　　কি আকুল কাঁপন উঠেছিল জেগে
　　শুদ্ধ হিয়া গুঞ্জরিল কি গভীর অনুরাগে।
মোর　ঝরা-কুঞ্জের শুকনো পাপ্‌ড়ী গুলি
　　কি অধীর আকাঙ্ক্ষায় যতনে তুলি
　　দিয়েছিলাম চরণে তার নীরব প্রেমাঞ্জলি।

　　বুঝি সুগন্ধহীন সে ঝরা ফুলে
　　সে পায়নি প্রীতি তাই দু'পায়ে দলে
　　চলে গেল মর্ম্মস্থিয়া আকুল মর্ম্মতলে।
হায়!　জানি সে আর আস্‌বে না তো ফিরে
তার　পরশখানি থাকবে শুধু ঘিরে
এই　ব্যর্থ-পূজার বেদন-ভরা শ্রীহীন মন্দিরে।
কিন্তু　জানিনা সেই অসময়ে, ভ্রষ্ট লগনে।
　　কূজনহীন বিজন এ ঝরা কাননে
　　সে এলে কেন ফাগুন বেলার অবসানে?
　　পথ ভুলে কি এসেছিল—অসতর্ক ক্ষণে?

গেটে স্মৃতিবার্ষিকী

প্রবন্ধ

শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়

গোটে একজন জার্ম্মাণ কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার পুরা নাম জন্ উল্ফগ্যাঙ্গ ভন গ্যেটে। ১৭৪৯ সালের ২৮শে আগষ্ট তিনি ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-মেইন এ জন্মগ্রহণ করেন। গ্যেটের পিতামহ দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিবার পর 'জুম ওয়েইডেনহফ' নামে একটি হোটেলের মালিক হইয়া হোটেল পরিচালক হিসাবে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র জোহান কাস্পার, গ্যেটের পিতা, লিপজিগে আইন অধ্যয়ন করিয়া ইটালিতে ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরিয়া সরকারের অধীনে চাকুরী করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, কিন্তু তিনি পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহিত পরিচিত ছিলেন না, কাজেই তাঁহার পক্ষে সহজে চাকুরী জোটান সম্ভব হইল না। তখন তিনি সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টের 'বার্জার মেষ্টার' জোয়ান উলফগ্যাঙ্গ টেকস্টারের দুহিতা ক্যাথারিয়ানা এলিজাবেথের পাণিগ্রহণ করেন। কবি গ্যেটে এই দম্পতির প্রথম সন্তান। এই বিদুষী মহিলাই গ্যেটের মনে বহুমুখী প্রতিভার অঙ্কুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আর পিতার নিকট হইতে তিনি দুইটি বিশেষ গুণ লাভ করিয়াছিলেন, দৃঢ় একাগ্রতা ও অমায়িক স্বভাব।

বাল্যাবস্থায় গ্যেটেকে প্রথমতঃ তাঁহার পিতাই শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, পরে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেও তিনি শিক্ষিত হন, ১৭৫৯ সালের যুদ্ধের ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরটি ফরাসিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তখন উক্ত সহরে ফরাসী নাট্যবিদগণ কর্ত্তৃক অভিনয়াদি হইত। কবি গ্যেটে ঐ সমস্ত অভিনয় হইতেই সম্ভবতঃ প্রথম কাব্য-প্রেরণা পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিপথে আর একটি অশেষ বিলাসিতাপূর্ণ দৃশ্যও উদ্ভাসিত ছিল, সেইটি হইল সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের রাজ্যাভিষেক। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার গুপ্ত প্রণয় ঘটিত ব্যাপারের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় কাব্য প্রেরণার গতি অব্যবস্থিত চিত্ততায় কথঞ্চিৎ লঘু হইয়া পড়ে। তিনি একাগ্রচিত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অধ্যয়নে রত থাকিয়া সমস্ত অপবাদের কথা ভুলিতে চাহিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় চিঠি-পত্রাদির মধ্য দিয়া পাওয়া গিয়াছিল।

ষোড়শবর্ষের কিঞ্চিদধিক বয়সে তিনি ফ্রাঙ্কফোর্ট ত্যাগ করিয়া লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া আগ্রহসহকারে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। লিপজিগে আসিয়া গ্যেটে বুঝিলেন, ফ্রাঙ্কফোর্টের সাহিত্য-সাধনা কিছুই হয় নাই। তিনিই ডবলিউ বেরিকের পরিচালনায় সাধারণ 'এ্যানাক্রিয়োনেটিক' ছন্দে তদানীন্তন লিপজিগ সমাজের বাস্তব অবস্থার ছাপ ফেলেন। এই সময়ে গ্যেটে এ্যানা ক্যাথারিয়ানা স্বনকফ্ নামে লিপজিগের কোন এক মদ ব্যবসায়ীর কন্যার প্রেমে পড়েন। লিপজিগের ছাত্রাবস্থায় তাঁহার স্বীয় জীবনের রোমান্স লইয়া রচিত 'ডাইলন্ দি ভায়লিবটেন' এবং 'ডাই মিস্ক আলডাইজেন' দুইটি ক্ষুদ্র নাটিকা 'আলেকজেন্দ্রাতে' অভিনীত হয়।

লিপজিগে অবস্থান করিবার সময় তিনি চিত্রাঙ্কন বিদ্যাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এ এফ ওয়েসলারের নিকট অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেন, ছাত্রাবস্থায়ই তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ এতই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ফ্রাঙ্কফোর্টের বাড়ীতে ফিরিতে হয়। গ্যেটে বাড়ীতে থাকিবার সময় তাঁহার মাতার বান্ধবী ক্যাথারিয়ানা ভন্ ক্লেটেনবার্গ তাঁহার চিন্তাধারা অদ্বৈতবাদের দিকে ধাবিত করান। আরোগ্য লাভ করিবার পর তাঁহার পিতা আইন অধ্যয়ন সমাধা করিবার জন্য তাঁহাকে ষ্ট্র্যাস্‌বার্গে পাঠাইবার সঙ্কল্প করেন। ষ্ট্র্যাস্‌বার্গে যাইয়া জার্ম্মেণীর নিজস্ব কৃষ্টির উৎকর্ষ দর্শনে গ্যেটের মন হইতে ফরাসীকৃষ্টি-প্রীতিভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। ষ্ট্র্যাস্‌বার্গ জীবনে কবির একটি

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা রহিয়াছে। তিনি সেখানে চক্ষু চিকিৎসার জন্ত আগত হারডার' এর সহিত সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। এই চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট হইতে গ্যেটে সারগর্ভ অনেক কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার আইন অধ্যয়নে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মিল না, পরন্তু তিনি আরও কয়েকটি বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইতে প্রয়াস করিলেন, ঐ সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ঔষধিশাস্ত্রের বিষয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ষ্ট্রাস্‌বার্গে কবি ফ্রেডারিক ব্রায়ন নাম্নী জনৈক গ্রামবাসী 'প্যাষ্টরের' কন্যাকে ভালবাসিয়া ফেলেন, প্রথম হইতেই জানা গিয়াছিল ফ্রেডারিক ব্রায়নের সহিত গ্যেটের বিবাহ ঘটা অসম্ভব, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত কবি'র জীবনে এই নারীর ভালবাসা একটা বিষাদের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ষ্ট্রাস্‌বার্গ হইতে ডিগ্রী লাভ করিয়া গ্যেটে বাড়ী ফেরেন এবং ওকালতী ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন, পর বৎসর তিনি 'ওয়েজলারের' ইম্পেরিয়েল ল' কোর্টেই মাস চারি অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি ওয়েইমার কোর্টেই স্থায়ীভাবে ছিলেন।

ওয়েজলা'রএ তিনি অনেক নূতন বন্ধু বান্ধবের সহিত পরিচিত হন এবং এখানে চারলটি বাফ নামে কোন একটি মহিলার সহিত তাঁহার ভালবাসা জন্মে। এই ভালবাসার বিষয় লইয়া 'ওয়ারদার্ন লেইডেন' নামে কবি একখানি উপন্যাসেরও অবতারণা করেন। অনুমান ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি ফ্রাঙ্কফোর্ট নিবাসী জনৈক ধনী মহাজনের বিধবা পত্নীর কন্যা লিলি স্কোনেম্যানের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু সামাজিক বাধাবিঘ্নের দরুণ শেষ পর্য্যন্ত এই নারীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইতে বাধ্য হন।

একদা ওয়েইমার'এর রাজপুত্র চার্লস্ অগ্যাষ্টাস্ ফ্রাঙ্কফোর্টের পথে প্যারীতে যাইবার সময় গ্যেটের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইয়া পরিতুষ্ট হন এবং কবিকে আগামী বৎসর তিনি রাজা হইবার পর ওয়েইমার'এ যাইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া যান। কিছুদিন পর গ্যেটেকে ওয়েইমার'এ যাইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়, তিনি এই দ্বিতীয় বারের অনুরোধ উপেক্ষা না করিয়া যথাসময়ে ক্ষুদ্র স্যাক্সন্ রাজধানীতে উপস্থিত হন। ওয়েইমার'এ যাইয়া গ্যেটে কিছুদিন খুব আমোদ প্রমোদে কাটাইলেন কিন্তু কিছুদিন পর তিনি ওয়েইমার গভর্ণমেণ্টের সুকঠিন রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যসমূহ অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদিত করেন। গ্যেটে ওয়েইমার গভর্ণমেণ্টের আত্মাস্বরূপ ছিলেন। তিনি কৃষির উৎকর্ষ এবং সরকারের খনিজ সম্পদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্যেটে একরকম কাহাকেও না জনাইয়া ইটালী যাত্রা করেন, তিনি ২৯শে অক্টোবর রোমে উপনীত হন, রোমবাসী জার্ম্মান কলাবিদ্‌গণ কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন, পর বৎসর বসন্ত সমাগমে তিনি ন্যাপলস্ ও সিসিলি বেড়াইয়া জুন মাসে পুনরায় রোমে ফিরিয়া আসিয়া সেখানে মাস দশেক অবস্থান করিবার পর জার্ম্মেনী রওনা হন।

ইটালী হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে কবি'র জীবনে চঞ্চলতা ও অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্যেটে ভেনিসে আগমন করেন। পরে ডিউক্যাল থিয়েটারের ডিরেক্টার পদ লাভ করিয়া এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত ওয়েইমার'এ আসিতে বাধ্য হন।

'উইল্ হেল্‌ম্ মেইষ্টার' নামক নভেল লেখা শেষ হইবার পর গ্যেটে উৎসাহী সমালোচকরূপে শিলারকে পান। কবি শিলারই গ্যেটেকে পুনর্ব্বার কবিতা লিখিবার অনুপ্রেরণা দেন। কবি শিলারের সহিত গ্যেটের বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে যখন শিলার 'ডাই হরেন' নামক পত্রিকা বাহির করিয়া গ্যেটেকে সাহায্যের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান; এবং উহার পর হইতে কবি শিলারের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গ্যেটে তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। গ্যেটে এবং শিলারের বন্ধুত্ব ব্যক্তিগত জগত হইতে কাব্যজগতেই অধিকতর প্রসারিত ছিল। তাহার প্রমাণ তাঁহাদের লিখিত পত্রাবলীতেই রহিয়াছে। গ্যেটে অবশ্য তাঁহার ইচ্ছানুসারেই চলিতেন কিন্তু একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে,

শিলার অনেকক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রেরণা দান করিয়াছিলেন। শিলারের প্রেরণাই তিনি নাট্যকাব্যে 'হারমানে আণ্ড ডরোথিয়া', 'এচিলিস' প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন।

১৮০৫ সালে শিলারের মৃত্যুর পর হইতে গোটে সাহিত্যচর্চ্চায় গভীর মনোনিবেশ করেন। ১৮০৬ সালে ক্রাইস্টিয়েনের সহিত তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন, এই সময়ে বেটিনা ভন্ আর্নিম্ এবং প্রকাশক ফরম্যানের পালিত কন্যা হারজিলিয়েরের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হইয়া বার্দ্ধক্য জীবনেও রোমান্সের সৃষ্টি করেন, মিনা হারজলিয়েবের সহিত পরিচয়ের ঘটনাটি তাঁহার শেষ জীবনে রচিত সনেট সমূহেও রাখিয়া গিয়াছে।

১৮০৮ সালে কবি'র বিশ্ববিখ্যাত নাটক 'ফ্যষ্টের' প্রথম ভাগ বাহির হয়। উহার দশ এগার বৎসর পরে 'ওয়েষ্ট অষ্টলিচার ডিওয়ান' নামক পুস্তকে পূর্ব্ব হইতে অনেক উচ্চ ধরণের কবিতা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, কবি গ্যেটের সাহিত্যচর্চ্চার চির অবসান হয়—'ফ্যষ্টের' দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিবার পর।

জার্ম্মেনীর সাহিত্যাকাশের সেই চির উজ্জ্বল তপন গ্যেটের ১৮৩২ সালের ২২শে মার্চ্চ তিরোভাব ঘটে।

গ্যেটের কাব্য, নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতির ইংরেজি অনুবাদ অধিক পরিমাণে হয় নাই, আর হইয়া থাকিলেও মিলটন, সেক্সপীয়র বা হোমারের বই'এর মত তাহা সহজলভ্য নহে। বাংলায়ও গোটে সম্বন্ধে ততটা গবেষণা হয় নাই যতটা হইয়াছে অন্যান্য বিদেশী খ্যাতনামা সাহিত্যিক সম্বন্ধে। আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'পাঠসঞ্চয়ে' গ্যেটের উক্তি সংগ্রহ পড়িয়া গ্যেটের দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ পাই, আর দুই একজন অধ্যাপক গোটে সম্বন্ধে অল্পাধিক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী সম্বন্ধে অতটুকু আলোচনা কি যথেষ্ট ?

মনীষি গোটে কিন্তু ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছেন। তিনি মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটক পড়িয়া যেরূপ ভাবাভিভূত হইয়াছিলেন সে কথা হিষ্টরি অব স্যান্সক্রিট লিটারেচারেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

Wouldst thou the young year's blossom and
the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed,
Wouldst thou in one sole name the Heaven
and earth combine
I name thee, O Shakuntala ! and all at
Once is said—
Goethe.

তিনি ১৮৩২ সালের ২২শে মার্চ্চ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৩২ সালের ২২শে মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যু তারিখ হইতে শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। জার্ম্মেণীতে উক্ত মনীষীর শত বার্ষিকী মহাসমারোহে আগামী ২২শে মার্চ্চ তারিখে সুসম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে জার্ম্মেণীতে বহু পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন চলিতেছে।

* এই প্রবন্ধটি লিখিতে আমাকে 'সর্ব্ববিদ্যা সংগ্রহের' সাহায্য লইতে হইয়াছে। —লেখক

গান

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ,

আলো আলো তোমারি ও আলো,
আঁধার হৃদয়ে জ্বালো মোর আলো ;
আলোর ঝর্ণা, কাঞ্চন বর্ণা,
দূর ক'রে দিক সব কালো-কালো।
মৌন এ বেদনা এ গোপন কথা,
হিয়ার আবরণে ঢাকা যত ব্যথা—
থাকুক সুপ্ত থাকুক গুপ্ত
তোমার দান সে যে ভালো ভালো।
আমার আমি যাক্—যাক্ সে ঘুচে
জগতে যা আমার যাক তা মুছে
মিথ্যার আবরণ করি অপসারণ
করুণা তোমার ঢালো ঢালো।
আলোর ঝর্ণা কাঞ্চন বর্ণা
দূর ক'রে দিক সব কালো-কালো।

নানাকথা

চীনের খ্যাতনামা কবি :—চীনের "মুকুটহীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজকবি" এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত ও চীনের আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম নেতা সু সি-মাউ অতি শোচনীয়রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি পিকিং যাইবার উদ্দেশ্যে বিমানপোত যোগে রওনা হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্যান্টাং প্রদেশের কাইসান্ পল্লীতে পোতটী ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং আগুন লাগিয়া যায়। কবি সু সি-মাউ জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মারা যান এবং তাঁহার নরদেহ কঙ্কালে পরিণত হয়। বিখ্যাত চৈনিক দার্শনিক ডাঃ হু সিনের অধীনে যে নূতন সাহিত্য আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, পরলোকগত কবি তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও কাব্য প্রতিভার জন্য তিনি সমগ্র চীনের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি শোচনীয়রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের মধ্যে দ্রুততা ও বেগের স্পন্দন ছিল এবং এই দ্রুততার মধ্যেই তাঁহার জীবন শেষ হইয়া গেল। ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী চীনা ভাষায় অনুদিত করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার একজন নায়ক ছিলেন। কিন্তু কবির মৃত্যুতে এই শ্রমসাধ্য গুরুতর কাজের যথেষ্ট ক্ষতি এবং বিলম্ব সাধিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। যদিও স্বকীয় কাব্য প্রতিভার জন্যই তাঁহার প্রসিদ্ধি অধিকতর বিস্তার হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার অনুবাদ সাহিত্য তাঁহাকে যশের পথে যথেষ্ট অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডের টমাস হার্ডি, ফ্রান্সের ভলটেয়ার, ভারতবর্ষের ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিকদিগের গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। কবি চেকিয়াং প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাংহাই ও পিকিংয়ে শিক্ষালাভ করিয়া, তাঁহার পাঠ সমাপ্তির জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্য-সুন্দরী তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। আমেরিকা হইতে তিনি ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য গমন করেন এবং তথায় তিনি এক বৎসর কাল গভীর ভাবে সাহিত্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। এইকবি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কার্য্য এবং নিয়মিতভাবে সাহিত্যের সেবা করিতে ছিলেন।

পাশ্চাত্যের চক্ষে মহাত্মাজী :—নিউ ইয়র্ক 'এইজ' পত্রের গত ৭ই জানুয়ারি তারিখের সংখ্যায় লণ্ডনের ব্যারিষ্টার মিঃ আর্চিবল্ড জনসন লিখিতেছেন :—ভারতের জন্য স্বাধীনতা লাভে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া দুঃখিত মনে গান্ধী বিদায় লইলেন। কস্থথ, গ্যারিবল্ডি, ডেনিয়েল ও কোনেলের ন্যায় এই দুর্ব্বল হিন্দু যে প্রকার সাহস ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার দেশের স্বাধীনতা দাবী করিয়াছিলেন সেরূপ গাম্ভীর্য্য ও সাহস বোধ হয় কাহারা রাজার কাছে মোটকেও দেখাইতে পারেন নাই। আমাদের এই বিষয়টী বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত; কেননা এই ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল। উহাতে বুঝা গেল যে, স্কচ কবি বার্ণস মনুষ্য প্রকৃতি এক ও অভিন্ন বলিয়া যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

মহাত্মা গান্ধী যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে অগ্রবর্ত্তী রাজনীতিকের কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় সাহসের সহিত তাঁহার ও তাঁহার দেশবাসীর পক্ষে ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে গোলটেবিলের যবনিকাপাত করা হইয়াছে। ভারত হইতে আগত এই কৃষ্ণকায় লোকটী ইংলণ্ডের সবচেয়ে যোগ্য রাজনীতিকেরই মত শক্তিশালী যুক্তি-তর্ক সহায়ে ইংরোপের কাছে ভারতের অধিকার ঘোষণা করিল। কি চমৎকারই না শক্তি সাহস দেখাইলেন!

লণ্ডনের পথে এই কৃষ্ণকায় লোকটি কটিবাস পরিহিত ও একটি শাল দ্বারা দেহ আবৃত অবস্থায় বিচরণ করিতেছিলেন এবং একটী ইংরাজ নারী একজন এডমিরালের কন্যা—ভারতের জন্য জীবন উৎসর্গ

করিয়া তাঁহার পেছনে পেছনে তাঁহার কাগজপত্র লইয়া ঘুরিতেছেন— এই দৃশ্যই বা কত মনোরম!

বর্ত্তমান জগৎ ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা, রাজনৈতিক অশান্তি, আর্থিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতির জন্য ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু গান্ধী একান্ত সাধারণভাবে অথচ নিশ্চিন্তরূপে এইভাবে বিকৃত জগতেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। লোকের বাস্তব জীবনের সমস্তার সহিত এই দুর্ব্বল লোকটীর কোন স্বার্থ আছে—একথা আপাততঃ না মনে হইলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের নেতাগণও আজ তাহার সঙ্গে সমান মর্য্যাদা লইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে বাধ্য হইতেছেন।

সাধারণ মানব যাহাকে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলিয়া মনে করে, তাঁহার মধ্যে তাহার কিছুই নাই। কেননা, পাশ্চাত্য জগতের যা কিছু বৈভব তাঁহার মধ্যে থাকিলেও বাহিরে তাঁহার মধ্যে উহার কোন অভিব্যক্তি নাই। দেখিতেও তিনি সুপুরুষ নহেন। সক্রেটিস ও ভলটেয়ারও এমনই ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যেও তেমন কোন আকর্ষণী শক্তি নাই। কেননা, তাহার মধ্যে আত্মম্ভরিতা বা আত্মস্বার্থ সাধনের চেষ্টা কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। অথচ এমন লোক কি করিয়া এই মহান মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন ও এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা অনেকেই ভাবিয়া কুল পান না। আজ ভারতের অগণিত জনসাধারণের উপর তাহার যে প্রভাব, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। এই কারণে নিজের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া স্বয়ং সম্রাট ও তাহার পরিষদের কাছেও তিনি ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিতে ভীত হন নাই।

পরলোকে এডগার ওয়ালেসঃ—ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক এডগার ওয়ালেস অল্পদিন রোগে ভুগিবার পর হলিউডে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাহার পত্নী মিসেস ওয়ালেস স্বামীর পীড়ার খবর পাইয়া ইংলণ্ড হইতে জাহাজ যোগে হলিউড অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পথিমধ্যেই তিনি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছেন। এডগার ওয়ালেস্ প্রথম জীবনে অনেক দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। পরে তিনি উপন্যাস লিখিতে সুরু করেন এবং ইহাতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি সাংবাদিক এবং ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সংবাদ দাতা হিসাবেও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্র নির্ম্মাণ কেন্দ্র আমেরিকার হলিউড সহরে বাস করিতে থাকেন। কারণ, একটী ছায়াচিত্র নির্ম্মাতা কোম্পানীর সহিত সপ্তাহে ৮০০ পাউণ্ড বেতনে তিনি ছায়াচিত্রের জন্য গল্প লিখিতে চুক্তিবদ্ধ হন। এই ভাবে তিনি জীবনে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার ঘোড়দৌড় খেলার এক তীব্র বাতিক ছিল এবং এই জন্য তিনি যথেষ্ট টাকা লোকসানও দিয়াছেন। তিনি প্রায় দেড়শত উপন্যাস, ছয় খানি নাটক এবং দুইশত ছোট গল্প লিখিয়াছেন।

সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণ সমস্যা :—

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ নিজের জন্য আমেরিকার নিকট হইতে বহু কোটী টাকা ধার করে এবং ইংলণ্ড অনেক টাকা ধার করিয়া মিত্রপক্ষের অন্যান্য শক্তিকে ধার দেয়। মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মাণীর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া তাহাকেও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবত বহু কোটী টাকা ঋণ স্বীকার করাইয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমানে কোন জাতির নিকট কোন পক্ষের কত টাকা দেনা পাওনা আছে, তাহার হিসাব এইরূপ :—

ইংলণ্ডের নিকট ৯৪ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, ফ্রান্সের নিকট ৮২ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, ইটালীর নিকট ৪২ কোটী পাউণ্ড।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে চুক্তিক্রমে স্থির হইয়াছে যে ৬২ বৎসরেরই কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ হইবে এজন্য সুদ সমেত আমেরিকাকে দিতে হইবে :—

ইংলণ্ডের ২২৮ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড

ফ্রান্সের ১৪০ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড

ইটালীর ৪৯ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড

এই তিন দেশ ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকেও আমেরিকা বহু টাকা ধার দিয়াছে। মোটমাট ইউরোপের সকল দেশগুলির কাছে আমেরিকা ২৩৭ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড পাইবে এবং ৬২ বৎসরের সুদসহ এজন্য বিভিন্ন দেশকে মোট ৪৫৫ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে হইবে।

এখন ইংলণ্ড যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশকে যে টাকা কর্জ্জ দেয় তজ্জন্য ফ্রান্সের নিকট মোট ৬৫ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ও ইটালীর নিকট মোট ৬১ কোটী ১১ লক্ষ পাউণ্ড পাইবে। আরও কয়েকটি ছোট ছোট দেশের ঋণ লইয়া ইংলণ্ড মোট ১৩৯ কোটি পাউণ্ড বিভিন্ন দেশের কাছে পাইবে; কিন্তু ইংলণ্ড রাশিয়ার কাছে যে ৯০ কোটী পাউণ্ড ধার দিয়াছিল, তজ্জন্য এই পর্য্যন্ত এক পয়সাও পায় নাই এবং ভবিষ্যতে কিছু পাওয়ারও সম্ভাবনা নাই। উহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এই পর্য্যন্ত ইংলণ্ড অন্যান্য দেশ হইতে যে টাকা পাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা ২০ কোটী আমেরিকার দিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ১৯৮৪ সন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে বৎসরে ৩ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া আমেরিকার কাছে পরিশোধ করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার দরুণ রব উঠিয়াছে যে, আমেরিকার ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির নিকট যে পাওনা আছে, তাহা ছাড়িয়া দিক। কিন্তু আমেরিকা তাহার পাওনা টাকা ছাড়িয়া দিবে কিনা সন্দেহ। এদিকে ফ্রান্স যে পরিমাণ টাকা আমেরিকা ও ইংলণ্ডকে দিতেছে, তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা

জার্ম্মাণীর নিকট হইতে পাইতেছে। কাজেই সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণ বাতিল করিয়া দেওয়ার প্রস্তাবে ফ্রান্স রাজী নহে।

আগামী জুন মাসে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য লুসেনে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী বেলজিয়াম ও জাপানের মধ্যে একটি বৈঠক হইবে। আমেরিকা সম্ভবতঃ এই বৈঠকে যোগদান করিবে না।

বিভিন্ন শক্তির প্রস্তাব

অস্ত্র-হ্রাস সম্মেলনে নিম্নলিখিত বড় বড় জাতিসমূহ বড় বড় স্কীম পেশ করিয়াছেন :—

বৃটেন—সাবমেরিণ দরকার নাই, গ্যাসের উপর নিষেধাজ্ঞা, বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ নিষিদ্ধ এবং অস্ত্র হ্রাসের জন্য একটী চিরস্থায়ী কমিশন নিয়োগ।

আমেরিকা—বিমানপোতযোগে গোলা বর্ষণের দ্বারা সাধারণ নাগরিকের জীবন যাহাতে বিপন্ন না হইতে পারে, ট্যাঙ্ক ও বড় বড় কামানের উপর নিষেধ বিধি এবং যুদ্ধের মালমসলা তৈরারীর খরচ সীমাবদ্ধ করা।

ফ্রান্স—বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের অধীনে এক আন্তর্জ্জাতিক পুলিশ ও বিমানবাহিনী নিয়োগ, সাবমেরিণ ও যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা হ্রাস, বড় বড় রণপোত, বড় বড় কামান বন্দুক এবং বিমানযোগে নাগরিকদিগকে স্থানান্তরিতকরণ আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হইবে, আপোষ ও সালিশী বাধ্যতামূলক।

জার্ম্মেণী—ব্যাপকভাবে সমস্ত জগতের সমস্ত অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ইটালী—বড় বড় জাহাজ, সাবমেরিণ, বিমানপোতবাহী যুদ্ধ জাহাজ, বড় বড় কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বোমা নিক্ষেপকারী উড়ো-জাহাজ ও বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস করা। সাধারণ নাগরিকদের জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধের বর্ত্তমান আইন কানুনের পরিবর্ত্তন সাধন।

জাপান—উড়োজাহাজযোগে বোমা বৃষ্টি, বিষাক্ত গ্যাস এবং সাংঘাতিক রোগের জীবাণু ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ, যুদ্ধ-জাহাজের আকার, বড় কামানের গোলাবর্ষণ শক্তি এবং বিমান-পোতবাহী যুদ্ধ জাহাজের বহন ক্ষমতা ও সাবমেরিণের সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে।

সোভিয়েট রুশিয়া এবং বেলজিয়ম অস্ত্রহ্রাস সম্মেলনে তাঁহাদের স্ব স্ব পক্ষীয় অস্ত্রহ্রাসের প্রস্তাবগুলি পেশ করিয়াছেন। সমস্ত প্রধান শক্তিই তাঁহাদের প্রস্তাবসমূহ উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং ঐগুলি লইয়া এক্ষণে আলোচনা সুরু হইতে পারে।

বেলজিয়াম বৃটেনের অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন।

সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ হইতে মিঃ লিটভি সাধারণভাবে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দেওয়াই যুদ্ধের বিরুদ্ধে একমাত্র নিরাপদ নীতি।

তিনি বলেন যে, গত ১৯২৯ সনের বৈঠকেও সোভিয়েট ডেলিগেটগণ সর্ব্বপ্রথম এই ধরণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সমস্ত প্রকার সাঙ্ঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র একেবারে হ্রাস করিবার প্রস্তাব আনিয়াছেন। সোভিয়েটগণ কোন অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে চাহেন না, তাহাদের স্বাধীনতা এবং অভ্যন্তরীণ উন্নতি যে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না—এই প্রকার প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। যদি অন্যান্য শক্তিবর্গ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন, তবেই ইহা সম্পন্ন হইতে পারে।

মিঃ পল হিমেন্স বেলজিয়ামের পক্ষ হইতে অস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব করেন এবং বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের কর্তৃত্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, আর একবার যুদ্ধ বাধিলে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বনাশ, বিপ্লব ও নিদারুণ ধ্বংস লীলা দেখা দিবে।

ডাক বিভাগের ক্ষতি :—ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগে ১৯৩০-১৯৩১ সনের রিপোর্টে প্রকাশ যে এই বৎসর এই বিভাগে গবর্ণমেন্টের মোট ৬২ লক্ষ ৯ হাজার ২১১৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনে এই বিভাগে গবর্ণমেন্টের ২১ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৩৩৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। দেশের অর্থনীতিক দুরবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দার জন্যই এই ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মত। রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯৩০-৩১ সনের শেষে ভারতবর্ষে মোট ২৪ হাজার ১৭০টি পোষ্টাফিস এবং মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার ২০৩ জন কর্ম্মচারী ছিল। এই বৎসরে ৫ কোটী ৪০ লক্ষ রেজেষ্টারী জিনিষ লইয়া মোট ১২৯ কোটী ৯৭ লক্ষ জিনিষ ডাক বিভাগের মারফতে বিলি হইয়াছে, ৬৩ লক্ষ টাকার ডাকটিকিট বিক্রয় হইয়াছে, ৩ কোটী ৯০ লক্ষ মণিঅর্ডারে ৮৬ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকার মণিঅর্ডার হইয়াছে এবং ভিঃ পিঃ পার্শেলের মারফতে ২৪ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উহা ছাড়া ৫০ লক্ষ ইনসিওরে মোট ১৩৮ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বিলি হইয়াছে। এই বৎসরে অস্থায়ীভাবে নূতন ১৫৮টী পোষ্ট আফিস খোলা হইয়াছে। এবং গত বৎসরে যে সব অস্থায়ী পোষ্টাফিস খোলা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৪১০টী পোষ্টাফিসকে স্থায়ী করা হইয়াছে। এই বৎসরে ডাক ও তার বিভাগে গবর্ণমেন্টের মোট ৭ কোটী ৫০ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৭১৲ টাকা আয় ও ৮ কোটী ১৩ লক্ষ ৫৮৩৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ক্রোড়পতির সংখ্যা হ্রাস :—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের যে সব ব্যক্তির বৎসরে ৫০ হাজার ডলার আয় হয় অর্থাৎ যাহাদের শতকরা বার্ষিক সুদের হার ৫ ধার্য্য করিয়া ১০ লক্ষ ডলার (আমাদের দেশের ৩৮॥০ লক্ষ টাকা) মূল্যের সম্পত্তি আছে তাহাদিগকে মিলিয়নার বা আমাদের দেশের কথায় ক্রোড়পতি বলা হইয়া থাকে। বিগত

১৯২৮ সনে আয়কর বিভাগের হিসাবে দেখা যায় যে, এই বৎসর ঐ দেশে মোট ৪৩১৮৪ জন এই ধরণের লোক ছিলেন। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দার দরুণ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে সনে ১৯২৯ ক্রোড়পতি সংখ্যা কমিয়া ৩৮৬৫০ জনে দাঁড়ায়। ১৯৩০ সনে এই সংখ্যা আরও কমিয়া মোট ১৯৬৮৮ জন হয়। কাজেই গত ২।৩ বৎসরে আমেরিকার ২৩৪৯৬ জন ক্রোড়পতি কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সনে আমেরিকাতে ৫১১ জন লোকের বৎসরে ১০ লক্ষ ডলারের বেশী আয় হইত। কিন্তু ১৯৩০ সনে তথায় এই ধরণের মাত্র ১৪০ জন লোক ছিল। এই ভাবে ক্রোড়পতির সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে গবর্ণমেন্টের আয়কর বাবদ ৯।।০ কোটী ডলার কমিয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপনের সুফল :— আজকাল সমগ্র জগতে বৎসরে দেড় কোটী পাউণ্ড অথবা ২০ কোটী টাকার বিলাতী দোক্তা বিক্রয় হয়। মিঃ উইলিয়াম উইগলি এই ব্যবসায়ের প্রায় একচেটিয়া মালিক। তিনি বলেন যে, সংবাদপত্রে ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দিবার ফলেই তিনি বাজারে এই জিনিষের এত কাটতি বাড়াইতে পারিয়াছেন।

পৃথিবীতে রেলপথের পরিমাণ :— বর্তমানে সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৭লক্ষ ৫৬ হাজার মাইল রেলপথ আছে। উহার মধ্যে কয়েকটী দেশে রেল লাইনের পরিমাণ এইরূপ :—যুক্তরাজ্যে ২লক্ষ ৬৭ হাজার মাইল, রুষিয়া ৪৬ হাজার মাইল, জার্ম্মানী ৩৯ হাজার মাইল, ভারতবর্ষ ৩৩ হাজার মাইল, ফ্রান্স ৩১ হাজার মাইল, অষ্ট্রেলিয়া ২৩ হাজার মাইল, অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ২৮ হাজার মাইল; ইংলণ্ড ২৩ হাজার ৪শত ১৭ মাইল, কানাডা ২৬ হাজার ৭শত ৫০ মাইল, আর্জেন্টাইন ২০ মাইল; ম্যাক্সিকো ১৬ হাজার মাইল, ব্রেজিল ১৪ হাজার মাইল, ইটালী ১১ হাজার মাইল, স্পেন ১০ হাজার মাইল, জাপান ৭।। হাজার মাইল ও সুইজারল্যাণ্ড ৩৫০০ মাইল। সমগ্র পৃথিবীতে রেল লাইনের বাবদ ৯২৫ কোটী পাউণ্ড মুদ্রা খাটিতেছে।

কৃত্রিম রবার :— আমেরিকার রেভাঃ জে, এ নিউল্যাণ্ড নামক একজন পাদ্রী গত ২৫ বৎসর ধরিয়া গবেষণা করার পর বর্ত্তমানে কৃত্রিম উপায়ে রবার তৈয়ারীর পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই রবার তৈয়ার করিতে এ্যাসেটীলিন লবণ, জল প্রভৃতি কয়েকটী উপাদান লাগে; এই রবার দামেও সস্তা অথচ পেট্রল প্রভৃতির দ্বারা উহা সহজে নষ্ট হয় না।

সমস্ত সঞ্চয় দান :— বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপক এস, সি, দে তাঁহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় কিছুকাল উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারও ছিলেন। দানের পরিমাণ ৫৭০০০৲ টাকার অধিক। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের জন্মদিনোৎসবে এই দানের কথা ঘোষিত হইয়াছে।

ডাঃ প্রাইবেটের ভারত ভ্রমণ :—

জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার এডমণ্ড প্রাইবেট ভারতভ্রমণ ব্যপদেশে সস্ত্রীক মাদ্রাজে আসিয়াছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় ভারতবর্ষের প্রতি এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অনুরক্ত। তিনি ইটালীতে মহাত্মাজীর সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে সময় মহাত্মাজী তাঁহাকে ভারতে আসিতে বলেন। অধ্যাপক মহাশয় সস্ত্রীক ভারতাভিমুখে রওনা হন। তিনি মহাত্মাজীর সহিত একই জাহাজে ভারতে আসেন। ভারতবর্ষে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করেন। তিনি প্রধান প্রধান সহর, কতকগুলি গ্রাম এবং অনেক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে তিনি কি দেখিলেন, এই প্রশ্ন করায় জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন :—"কোন জাতিই নিজের অনিষ্ট না করিয়া অপর জাতির অনিষ্ট করিতে পারে না। ভারতের নিকট আমার উপদেশ এই যে; তাহারা যেন অহিংসার আদর্শে অবিচলিত থাকে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অহিংসার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্যই গান্ধীজীর বাণী এত সম্মানিত। এই অহিংসার বাণী ভারতীয় সভ্যতারই অংশ বিশেষ, মহাত্মা গান্ধী এই নীতিকে সমষ্টিগত ভাবে প্রয়োগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উহার শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন। ইউরোপের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, হিংসানীতির মহাকর্দ্দমে একবার পতিত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া দুঃসাধ্য। এজন্যই বর্ত্তমান সঙ্কটকালে মহাত্মাজীর বাণী এত গুরুতর।

ভারতবাসীদের সম্বন্ধে স্বীয় ধারণা বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহাশয় বলেন :—"ভারতবাসীরা অতিশয় দয়ালু ও কোমলহৃদয় তাহারা সকলকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। দরিদ্রতম ভারতবাসীর পক্ষে ও এই কথা প্রযোজ্য। আমি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি। সুদূর পল্লীতে অতি দরিদ্র অধিবাসীদের বাড়ীতেও আমি গিয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, অতি দারিদ্র্য তাহাদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। এরূপ শোচনীয় দারিদ্র ইউরোপের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতের গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য সত্বে ও তাহাদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও বাড়ীগুলির পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, ভারতবর্ষে সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতা ইউরোপ অপেক্ষা অনেক কম। ভারতীয়দের চরিত্র অতিশয় চমৎকার। ভারতের বড় বড় নগরের ক্ষুদ্র গলির মধ্যেও আমার স্ত্রী নিজেকে যতটা নিরাপদ মনে করিয়াছেন, ইউরোপে তাহা পায়েন নাই। কোথায়ও আমি বর্ণবিদ্বেষের লক্ষণ দেখি নাই।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে, এসম্পর্কে তিনি কিছু বলিতে অনিচ্ছুক। তিনি শুধু এইটুকু বলেন যে, তিনি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সরলভাবে বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন। একাধিক্রমে

তিন সপ্তাহ মহাত্মাজীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, অহিংসার নীতির পক্ষে সকলের সমর্থন পাইবার জন্যই মহাত্মাজী চেষ্টিত, জটিলতার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তঁহার নাই ইটালীর সংবাদপত্রে মহাত্মাজীর উক্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে, গান্ধীজীর প্রতিবাদের পরও কেহ ঐ কথা বিশ্বাস করিতে পারে দেখিয়া তিনি বিস্মিত।. ইটালীতে মহাত্মাজী কোন সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট কোন কথা বলেন নাই; অধ্যাপক মহাশয় ইটালীতে মহাত্মাজীর সঙ্গে ছিলেন।

নারীর ভোটাধিকার সমস্যা :—ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনের যেমন সংখ্যাধিক্যের নীতি ও নারীদিগের ভোটাধিকার আছে, ফ্রান্সের নির্ব্বাচন রীতি ও তদনুরূপ করিবার চেষ্টায় একটি নূতন আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইয়াছিল। চেম্বারে এই আইন গৃহীত হয়। কিন্তু "সেকেলে ধরণের" সিনেটে উহা ১৫৭-১৩৪ ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ফলে, মিঃ লাভেলের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। সিনেট নারীদিগের এত অধিক ভোটাধিকার মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। ফ্রান্সের রাজনীতিক সমস্যার গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অস্ত্র হ্রাস সমস্যা এবং সুদূর প্রাচ্যের প্রশ্ন সমূহই ইহার মধ্যে প্রধান।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা :—বিলাতের শ্রমিকদলের মুখপত্র ডেইলি হেরাল্ড পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে:—কোন দেশেরই রেহাই নাই। ব্রেষ্ট হইতে ব্রষ্টনিটস্ক পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপ আজ পীড়িত।

এতদিন পর্য্যন্ত ফ্রান্স বড়াই করিয়া আসিতেছিল যে, অন্যান্য দেশ যে রোগে ভুগিতেছে সেই রোগ হইতে সে মুক্ত; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, সে সব চেয়ে বেশী আক্রান্ত। ব্যাপার ইতিমধ্যেই এতদূর গড়াইছে যে, ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব এক সাঙ্ঘাতিক অবস্থার পরিচয় দিতেছে। জার্ম্মাণী এবং হাঙ্গারী আমদানী অপেক্ষা অনেক বেশী রপ্তানি করিতেছে; তাহাদের স্বচ্ছল হওয়ার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ উভয়দেশই মরার পথে।

১৯৩১ সালের শেষ দিবস জার্ম্মাণীতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৬৬৬০০০। চারি বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশে মাসে গড়পড়তা ছয় শত লোক দেউলিয়া হইত, এখন হইতেছে আড়াই হাজার। বার্লিনের লোরসিগ হ্যানওভারের হ্যানম্যাগ, ব্রাণ্ডেন বর্গের ক্রম্নাবর প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কারবারগুলি কারবার গুটাইয়াছে। এমন কোন ব্যাঙ্ক নাই যাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ নাই। মজুরী হ্রাস পাইতেছে। জীবন যাত্রার আদর্শ নামিয়া যাইতেছে। জার্ম্মাণী যুদ্ধের আগে যে পরিমাণ মাংস খাইত, এখন আর তাহা পায় না, মদ্যপান অর্দ্ধেক হইয়াছে।

দ্রুতবেগে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্ম্মেণীর দেড় কোটী কৃষকের মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার বেকার। শীতের পর সম্ভবতঃ ৪ লক্ষ দাঁড়াইবে।

আয় কমিতেছে, লোকের মেজাজ খাপ্পা হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ যে সমস্ত স্থানে যন্ত্রাদি তৈয়ারী হয়, সে সমস্ত স্থানে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে। কমিউনিজম বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিমধ্যেই দাঙ্গা ও রক্তারক্তি হইয়া গেছে। হাঙ্গারীর নগরে নগরে সহস্র অসহায় লোক রাস্তা পরিষ্কার করিয়া, ভিক্ষা করিয়া, ছাঁচড়ামি করিয়া খাইতেছে। অষ্ট্রিয়ার বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে, সাময়িক ভাবে বেকার নহে, বড় বড় কারখানা বন্ধ হইয়া গেলে যে অবস্থা হয়, তাহাই হইয়াছে। বড় বড় শিল্পে স্বাভাবিক অবস্থায় যে অর্ডার পাওয়া যাইত, এখন তাহার শতকরা ২১ ভাগ পাওয়া যাইতেছে। উইন্টার হেল্প নামক সেবাসঙ্ঘ সহস্র মধ্যবিত্ত ও শ্রমিককে আহার্য্য ও আশ্রয় দিয়া কোনক্রমে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, আজিকার মধ্যে ইউরোপের এই অবস্থা।

ফ্রান্স অহঙ্কার করিত যে, তথায় কেহ বেকার নাই। আজ কোথায় গেল তাহার সেই গৌরব? তথায় দ্রুতবেগে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই, বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে ফ্রান্সের বেকারের সংখ্যা একলক্ষ হইতে দুই লক্ষের মধ্যে। ৩০৫০০০০ জন শ্রমিকের মধ্যে শতকরা ৫০ জন সারা দিনের মত কাজ পায় না; অন্ততঃ ১০০০০ জনকে সপ্তাহে তিন দিন বেকার থাকিতে হয়। রেলের আয় কমিয়া গিয়াছে। কাঁচা লোহের উৎপাদন আগে মাসে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার টন ছিল, এখন ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার টন হইতেছে; ইস্পাতের উৎপাদন ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টন হইতে ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টনে নামিয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে যেখানে ১৩৮ টি চুল্লি ছিল, এখন সেখানে ৯৮ টি আছে।

জার্ম্মাণীর জমীদারগণ আজ দেউলিয়া। ইউরোপের কৃষকগণ আজ ঋণভারে জর্জ্জরিত। ফরাসী কৃষক একটু সন্ত্রস্ত। এতদিন পর্য্যন্ত পশমী মোজায় টাকা জমাইয়া মাটির তলায় পুতিয়া রাখাই তাহাদের স্বভাব ছিল। তাহাদেরও দুর্দ্দশা। গোলআলু শস্য ও আঙুরের চাষিগণ বিশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

মদের কারবার নাই বলিলেই চলে। পাঁচ বৎসর আগে ফ্রান্স জার্ম্মাণীতে ২ লক্ষ বোতল শ্যাম্পেন পাঠাইয়াছিল, গত বৎসর পাঠাইয়াছে মাত্র ৫৭ হাজার বোতল।

ইউরোপের একমাথা হইতে আর এক মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র

একই কাহিনী,—উৎপাদন মজুরী হ্রাস ব্যয় সঙ্কোচ, কষ্টবৃদ্ধি। সবগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের সাহিত্য ও শিল্প :— ডাঃ এডওয়ার্ড জে, টমসন পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্পর্কে ভারতবর্ষে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। লাহোরে তিনি দুইটি সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। একটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এবং অপরটি ভারতীয় দেশীয় সাহিত্যের অনুশীলন বিষয়ে। প্রথম সভায় পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ এ, সি, উলনার এবং দ্বিতীয় সভায় মিঃ মনোহরলাল বার-এট-ল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় দেশীয় সাহিত্যের অনুশীলন সম্পর্কে ডাঃ টমসন্ বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। জাপানের মত ভারতবর্ষেও ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিবৎসর একটী 'ইয়ার-বুক' কিম্বা বার্ষিক বিবরণী ও পরিচয় প্রকাশ করা উচিত। এই সমস্ত বিবরণীও পরিচয় পত্র ভারতীয় সাহিত্য-বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা সম্পাদিত করিতে হইবে এতদ্ভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যিকদিগের জন্য নোবেল প্রাইজের অনুরূপ একটী পুরস্কারের (টাকার দিক দিয়া পুরস্কারটা ততটা মূল্যবান না হইলেও ক্ষতি নাই) ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা দ্বারা সাহিত্যিকদের এবং ভারতবর্ষের যথেষ্ট উপকার হইবে।

ডাঃ আম্বেদকারের প্রতিবাদ :— রাও বাহাদুর এম; সি, রাজা গত ১৩ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অনুন্নত হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করিয়া আসিতেছেন। সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগীতা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ হইতে যে কমিটি মনোনীত হয়, তাহাতেও গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে তাঁহাকেই অনুন্নত হিন্দুদের পক্ষের প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। ভারতের অনুন্নত হিন্দুদের মনোভাব তিনি খুব ভালরূপে অবগত আছেন। বর্ত্তমানে তিনি সংবাদপত্রে একটী বিবৃতি দিয়া ডাঃ আম্বেদকারের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হয়, তাহা হইলে অনুন্নত হিন্দুদের পক্ষে যৌথনির্ব্বাচনমণ্ডলী দ্বারাই অধিক লাভ হইবে এবং উহার সাহায্যে তাহারা যথোপযুক্ত পরিমাণ সদস্য মনোনীত করিতে পারিবে।

আমদানী হ্রাস :— কাষ্টম বিভাগের হিসাবে জানা যায় যে, গত জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় গত বৎসর জানুয়ারী মাস অপেক্ষা ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকার বিলাতি মাল কম আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে ৩ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকার এবং গত জানুয়ারী মাসে ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকার বিলাতি মাল আমদানী হইয়াছে। এবার জানুয়ারী মাসে গত বৎসর অপেক্ষা কোন জিনিষ কত টাকার কম আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব এইরূপ :—

লোহা ও ইস্পাত	৬ লক্ষ টাকার কম
চিনি	২৬ „ „ „
অন্যান্য ধাতু	৫ „ „ „
লোহার জিনিষ	৫ „ „ „
মদ	৫ „ „ „
তামাক	৪ „ „ „

এই মাসের চিনির আমদানী খুবই হ্রাস পাইয়াছে। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে ৩২ হাজার টন চিনি আমদানী হয়। কিন্তু এবার এই মাসে মাত্র ৬ হাজার টন চিনি আমদানী হইয়াছে। দামের দিক দিয়াও আমদানী জিনিষের মূল্য ২৬ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। গত মাসে বিদেশ হইতে কোন গম আমদানী হয় নাই।

কাপড়চোপড়

গত বৎসর জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় ৮৯৬ গাঁট ধোলাই কাপড় আমদানী হয়। কিন্তু এবার আমদানী হইয়াছে ১১১০ গাঁইট। উহার মধ্যে ২৫৮ গাঁইট মখমলের মধ্যে ১২৭ গাঁইট জাপান হইতে আনদানী হয়। ধোলাই কাপড়ের মধ্যে ২৪৭ গাঁইট নয়ানসুখ আছে, কিন্তু তাহা সমস্তই জাপান হইতে আমদানী হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার রঙ্গিন কাপড় এই মাসে ১৩৩৯ গাঁইট আমদানী হইয়াছে উহার মধ্যে জাপান হইতে আসিয়াছে ১০০৪ গাইট। বাজারে ইটালীয় জিনিষের আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গত মাসে কোরা কাপড়ের আমদানি গত জানুয়ারী মাস অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। গত বৎসর ৩০৪২ গাঁইট ধুতির স্থলে প্রায় মাত্র ১৭৭৬ গাঁইট ধুতি আমদানী হইয়াছে। উহার মধ্যে জাপান হইতে আমদানী হইয়াছে—১৩৯০ গাঁইট। জাপানী ও দেশী কাপড়ই অধিক বিক্রয় হইতেছে বলিয়া ইংলণ্ড হইতে আগত কাপড়ের দাম খুব কমিয়া গিয়াছে এবং ইংলণ্ডের পক্ষে মাত্র ২।৪ রকম ছাড়া অন্য কোন প্রকার কাপড়ের ব্যবসা চালান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সার্ট তৈয়ারীর জন্য গত মাসে বিদেশ হইতে যে ২৩০৩ গাইট কোরা ছিট আমদানী হইয়াছে তাহার সমস্তই চীন জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী। গত মাসে ইংলণ্ড হইতে ১৯০ গাইট ছাতার কাপড় আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় উহা অনেক বেশী। এই মাসে বিদেশ হইতে ১১৪২ গাঁইট কৃত্রিম রেশমের কাপড় আমদানী হয়। উহার মধ্যে জাপান হইতে ৯৯৬ গাঁইট এবং ইটালী হইতে ১০৭ গাঁইট আমদানী হইয়াছে।

জীবনবীমা-প্রসঙ্গ

বীমাক্ষেত্রে কৃতী বাঙ্গালী

দেশপূজ্য পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বলিয়াছেন—সুবোধ
তি ভাল ছেলে, সে মন দিয়া লেখাপড়া করে কখন
কাহার সহিত ঝগড়া বিবাদ করে না, অসময়ে
থায়ও খেলা করে না" ইত্যাদি। আত্মবিস্মৃত মেরু-
হীন জাতি এই আদর্শের বিকৃতভাবে অনুপ্রাণিত
য়া এপর্য্যন্ত শুধু আশা উদ্যমহীন, পুঁথির গুরুভারে
ভাল ছেলেই বাহির করিয়াছে—দয়ার সাগরের
ত রাখাল, অনাদর উপেক্ষার পাত্র মন্দ ছেলেটিরই
আজ আবশ্যক হইয়াছে, যে সুবোধ বালকের মত
হীন নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের সীমার মধ্যে আপনাকে
দ্ধ রাখিবে না—চঞ্চল অফুরন্ত প্রাণের আবেগে
য নব নব সৃষ্টি কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিবে।
দা বঙ্গপল্লীর এক অজ্ঞাত প্রান্তে মৈমনসিংহের
দরিদ্র বালক পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের গণনার
য বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছিল এবং উত্তরকালে
গ্র দেশের প্রভূত যশ ও সম্মান লাভ করিয়া
নীরঞ্জন সরকার নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল।
নলিনীরঞ্জনের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে
ই বিস্মিত হইতে হয়—দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ
য়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিথ্যা আভিজাত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া
যেমন একহস্তে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন
হস্তে অভিমানী বিমুখ ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন কল্যাণ
সতত আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—মাতৃ-
স্নেহানুরাগী কর্ম্মপ্রিয় বালকের এ প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে।
দীর্ঘ কালের অবিরাম সাধনার পর ভাগ্যলক্ষ্মী বিজয়
মাল্য তাঁহার গলে অর্পণ করিয়াছেন। যশ সিংহাসনে

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ তিনি অতীতের সংগ্রামপূর্ণ
ভবিষ্যতের আশায় সান্ত্বনা পাইবার দিনগুলির কথা
মনে করিতেছেন এবং সিদ্ধিলাভের আনন্দের মধ্যে এই

কথাটাই বার বার মনে আসিতেছে সে ইচ্ছাশক্তি, একাগ্রতা এবং আগ্রহ থাকিলে বিধিলিপিও খণ্ডন করা যায়।

নলিনীরঞ্জনের বাল্যকালেই পিতৃবিয়োগ হয়—পাচটি কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষা এবং মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয় সুতরাং পিতার মোক্তারির কর্ম্মস্থল নেত্রকোণা তাঁহাকে অচিরে পরিত্যাগ করিতে হইল। স্বীয় জন্মভূমি পল্লীতে মাতার ও কয়েকটি ভ্রাতার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া নলিনীরঞ্জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহ মৈমনসিং সহরে অধ্যয়নের জন্য আগমন করেন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তথাকার সিটি কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংসার তখন তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখকাতর বিরাট দেহ লইয়া এই কর্ম্মপ্রিয় বালকটির সম্মুখে উপস্থিত হয়—তিনি উচ্চশিক্ষার মোহ পরিত্যাগ করিয়া সেই তরুণ বয়সেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস বাংলার জাগরিত জীবনের এক অপূর্ব্ব প্রেরণাময় অধ্যায়—সেদিন নবজাগ্রত জাতি দীর্ঘকালের মোহনিদ্রাভঙ্গে উপেক্ষিত দেশমাতৃকার চরণ বন্দনা করিয়াছিল এবং ইহার ফলস্বরূপ ১৯০৫ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রত্যেক রেখাটি মর্ম্ম ছেঁড়া রুধির-সিক্ত তুলিকায় অঙ্কিত। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়—সেদিনকার দেশব্যাপী অনুপ্রেরণার মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎরায় প্রভৃতি মনিষীর সংস্পর্শে আসিয়া এই তরুণ যুবকের প্রাণ দেশের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। 'দারিদ্র্যপীড়িত নিরন্ন দেশের পুঞ্জিভূত দুঃখরাশি শুধু বক্তৃতার দ্বারা যাইবে না, গঠনমূলক কার্য্যে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থান কোয়াপেরেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং নলিনীরঞ্জনের প্রচেষ্টায় সোসাইটি কর্তৃক একটি সমবায় তহবিল গঠিত হয় কিন্তু অনভ্যস্ত দেশবাসী ইহার উপযোগীতা বুঝিতে না পারায় ইহা অকালে বিলুপ্ত হয়—এই সময়ে নলিনীরঞ্জনের বেতন মাত্র ত্রিশটাকা ছিল। অধুনা "হিন্দুস্থান ভবন" যেস্থানে বিরাজ করিতেছে তথায় একদল কর্ম্মবিমুখ ব্যক্তি বাস করিত, তাহারা স্থান পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক ছিল, কর্তৃপক্ষগণ এই সমস্যার কোনই সমাধান করিতে পারিতেছিলেন না; নলিনীরঞ্জন এই ব্যক্তিদিগের সহিত কৌশলে আলাপ করিয়া তাহাদিগকে অন্যত্র সরাইয়া কর্তৃপক্ষগণকে স্থান সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এইরূপ নানা কার্য্যের মধ্য দিয়া তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা প্রকাশ পাইতে লাগিল, তিনি অফিস কমিটির সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হইলেন ও সোসাইটির অন্যতম প্রবর্ত্তক ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কৃতিত্বে তাঁহাকে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। অফিস কমিটির কার্য্যে কিছুদিন থাকিবার পর সহকারী সম্পাদকের পদ অধিকার করিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা ও সফলতা লাভের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা ও একাগ্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি কোম্পানির গৌরবময় ম্যানেজারের পদ অধিকার করিলেন। তদানিন্তন সোসাইটির সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নলিনীরঞ্জনের এই কর্ম্মক্ষমতায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজের বিজয়-যাত্রার সেনানীরূপে গ্রহণ করিলেন। নলিনীরঞ্জন পরবর্ত্তী জীবনে দেশবন্ধুর প্রদত্ত এই সম্মানের গৌরবকে যথাযোগ্য-রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু অনুষ্ঠিত স্বরাজপার্টির তিনি অন্যতম অধিনায়ক এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ফরওয়ার্ড অধুনা লিবার্টির তিনি অন্যতম ডিরেক্টর। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায়, কলিকাতা কর্পোরেশনে ও পোর্টট্রাষ্টে নলিনীরঞ্জন অসাধারণ বাক্‌পটুতা ও গঠনমূলক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিরূপে তিনি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটিতে অনেক সারগর্ভ মন্তব্য প্রদান করিয়াছেন—সম্প্রতি বঙ্গীয় National chamber of commerce এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দুই বৎসর হইল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ বীমাসঙ্ঘের সভাপতির আসন নলিনীরঞ্জন গৌরবের সহিত অলঙ্কৃত করিয়াছেন—

ভারতীয় বীমাবিদদের পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক সম্মানের বস্তু আর কিছুই নাই। দেশের বহু জন হিতকর প্রতিষ্ঠানের অধিনায়করূপে—দেশবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিস্বরূপ নলিনীরঞ্জন আজ প্রভূত যশ ও সম্মানের অধিকারী, তাঁহার পরিচালিত হিন্দুস্থানও ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। চিরজীবন দারিদ্র্যের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহা কোন পুঁথিতে মিলিবে না।

নলিনীরঞ্জনের কৃত কর্ম্মক্ষেত্রের নিকটে দাঁড়াইয়া আজ এই প্রশ্নই বার বার মনে আসে ইচ্ছাশক্তি এবং একাগ্রতা থাকিলে লোকে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বর্ত্তমান শতাব্দীর ধ্বংসকারী সমস্ত যন্ত্রই বিধাতা এই অসহায় বালকের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু নিরভিমানী বালক তাহার প্রত্যেকটিকেই সুদীর্ঘ সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া বিজয়ীবীরের ন্যায় ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বিচিত্রা

সাহিত্য-পত্রিকায় বীমা-প্রসঙ্গের অবতারণা করিলে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের চেষ্টা না হইলেও আভিজাত্য গৌরব নাকি ক্ষুণ্ণ হয়, অপরদিকে বীমাপ্রসঙ্গেরও বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব হয় না—বাংলা দেশের বীমাজগতে সুপরিচিত জনৈক ব্যক্তি আমাদিগের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ আনিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা এই কৈফিয়ৎ দিয়াছি—যে দেশে বীমার প্রচলন অন্যত্রের তুলনায় নাই বলিলেও চলে তথায় শুধু সাহিত্য-পত্রিকায় নহে—পথে-ঘাটে-মাঠে সর্ব্বত্র ঐ প্রসঙ্গের আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। আলোচনা গুলি যাহাতে সঙ্গত হয় সেইজন্যই তাঁহাদের ন্যায় বীমাবিদদের সাহায্য প্রার্থনা করি। বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্র বিপ্লব এবং সর্ব্বোপরি ফেরঙ্গ সভ্যতার বিকৃতি আদর্শে সাহিত্য-লক্ষ্মী ম্রিয়মান হইয়া উঠিয়াছেন—বর্ত্তমানে তাঁহার সমাচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাহির করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

* * *

Government Securityর দর হ্রাস হওয়াতে বীমা জগতে বিশেষ চাঞ্চল্য আসিয়াছে। যে কোম্পানি গুলিকে এই সময়ে পঞ্চবার্ষিক হিসাব নিকাশ করিতে হইবে তাহাদের অবস্থা শোচনীয়—বীমা-তহবিলের গচ্ছিত অর্থ ছিনি-মিনি খেলার উপযুক্ত নহে; নিতান্ত নিরাপদ মনে করিয়া যাঁহারা কোম্পানির কাগজ কিনিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমানে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। এই বিষয় আমরা আগামী সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করিব।

* * *

ওরিয়্যানটেলের কলিকাতা শাখা বিভাগের জনপ্রিয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত এল, আর, কৃষ্ণ সামিয়ার হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৯ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত আয়ার সততা ও ভদ্রতার জন্য জনপ্রিয় ছিলেন এবং কলিকাতার কণ্টকিত বীমাক্ষেত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অধ্যবসায় ও কর্ম্মক্ষমতার দ্বারা তিনি অতি ক্ষুদ্র পদ হইতে ক্রমে সৌভাগ্যের উচ্চশীর্ষে আরোহণ করেন—আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

• • • • •

এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত কর্ম্ম ইতিহাস প্রকাশিত হইল। বাংলার অভিজ্ঞ বীমাবিদগণের কর্ম্মজীবনের কাহিনী এখন হইতে পুষ্পপাত্রের অঙ্গ শোভা বৃদ্ধি করিবে। বাংলাদেশের অগণিত কর্ম্মীবৃন্দ যাঁহারা ব্যর্থতার মধ্য দিয়া আশা উদ্যমহীন জীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাঁহারা এই ইতিহাস হইতে অন্তপ্রেরণা ও শক্তি সঞ্চয় করিবেন। নির্ভীক উন্নত পুরুষকারের নিকট অদৃষ্টবাদীর অনুশোচনা বিলুপ্ত হইবার দিন আসিয়াছে।

বিরহে মিলন

গল্প—

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

১

শিশির মহাসমারোহের মধ্যে শুভ্রাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, অপূর্ব্ববাবুর নিকট হইতে একি টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সত্বর শিশিরকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া চাই-ই। শিশির ইহার কারণ কিছু কিছু অনুভব করিতে পারিল, এবং তাহার হৃদয় নিমেষে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কোনমতেই এই সুদূর প্রবাসী বৃদ্ধের করুণ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। তৎক্ষনাৎ নব বরের বেশ পরিত্যাগ করিয়া রাঁচি যাত্রা করিল।

তাহার মাসিমা আসিয়া বলিলেন, হারে শিশির ফুলশয্যার আগে যে গাঁটছড়া খুলতে নাই—

বাঁধা দিয়া শিশির বলিল, শীঘ্রই ফিরে আসছি মাসীমা, ফিরে এলেই সব হবে'খন, জরুরী তার এসেছে।

তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া, তিনি আর কিছুই বলিলেন না। তিনি জানিতেন যে শিশিরের মুখের কথার সাথে কাজের সম্বন্ধ নিকটতম। তাই তিনি বিস্মিত নেত্রে একবার চাহিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

২

"বাবা তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে এখন?"

মৃত্যুপথযাত্রী পিতার শিয়রে বসিয়া তাঁহার একমাত্র আদরের দুহিতা প্রভাতী, এই কয়টী প্রশ্ন করিয়া, পিতার রোগক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অপূর্ব্ব বাবু ধীরে ধীরে মুদ্রিত আঁখিযুগল মেলিয়া প্রভাতীর বিষাদমাখা মুখখানির পানে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "কষ্ট কি আর মা, আজ যে আমার কি আনন্দের দিন তুই তার কি বুঝবি, কিন্তু মা এত আনন্দের মাঝেও আমি পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারছি না। আমার চির আকাঙ্খিত ধন মরণ হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছে। আমি ওর শান্তিমাখা কোলের ভিতর মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু প্রভা তোর কথা মনে হলে যে আমার সে ঘুমেও তৃপ্তি নেই, আমি বাবা হয়ে তোর জীবনের একটা পথ করে দিতে পারলুম না। শিশিরকে টেলিগ্রাম করলাম, সেও ত এল না, আমি পিতা হয়ে কি করে তোকে এই কূলহারা অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব, শুধু এই কথা ভাবতেই যে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। শিশির যদি আসে আর একবার বলে দেখি, তুই আপত্তি করিস্‌নি [illegible]!

পিতার মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু গোপন করিবার প্রয়াসে অঞ্চল প্রান্তে আনন আবৃত করিয়া সে নিঃশব্দে পিতার মস্তকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে ছিল। এতক্ষণে সে কণ্ঠ যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া অধর প্রান্তে একটু হাসি টানিয়া বলিল, বাবা তুমি অল্পেতে ব্যস্ত হও কেন? তুমি ভাবছ আমি অভিভাবকহীনা হব, কিন্তু পৃথিবীতে যার আপন বলতে কেউ নেই, তার অনাথের সেই চিরসখা ভগবান ত আছেন। আর স্বর্গ থেকে তোমার ও মার যে আশীষ ধারা ঝরবে, সেই আশীষ ধারার স্নিগ্ধ আলোক, আমাকে অন্ধকারে

আলোক দেখাবে, বিপদে ধৈর্য্য ধরার অসীম ক্ষমতা দেবে, দারুণ শোকে যখন কাতর হব, তখন আমায় সান্ত্বনা দেবে। তুমি এখন আর কিছু ভেবোনা। আমার জন্য তুমি দুঃখ কোরোনা বাবা। এবার তুমি একটু ঘুমাবার চেষ্টা করো দেখি।"

এমন সময়ে দাসী আসিয়া জানাইল, বাহিরে একটী ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছেন। অপূর্ব্ববাবু উঠিয়া বসিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না। উৎফুল্লকণ্ঠে প্রভাতীর পানে চাহিয়া বলিলেন, প্রভা দেখত মা শিশির বোধহয় এল। ইত্যবসরে ডাক্তার সহ শিশির রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া অপূর্ব্ব বাবুর আননখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি শিশিরকে কাছে বসাইয়া তাহার পানে চাহিয়া প্রচুর হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি আর থামে না। ডাক্তার বাবু রোগীর পানে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে শিশিরকে বলিলেন, আপনার এ রকম অবস্থায় ঘরে আসাটা উচিৎ হয় নাই শিশির বাবু, রোগী হার্টফেল করতে পারে।

শিশির বিবর্ণ মুখে উঠিয়া যাইতেই, অপূর্ব্ব বাবু তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন—আপনার ভয় নেই ডাক্তার বাবু। শিশির তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "এখন কেমন আছেন কাকা। রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বাবুর মুখমণ্ডল শুকাইয়া গেল। প্রভাতী দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া সবই লক্ষ্য করিতেছিল সহসা পিতার এই ভাব দর্শনে সে ছুটিয়া আসিয়া পিতার বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিল ডাক্তার বাবু একটু দেখুন। ডাক্তার বাবু ইনজেকশান দিতে রুগী একটু সুস্থ হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া সস্নেহে প্রভার মস্তকোপরি হস্ত স্থাপন করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, প্রভা ও দিকে কেন মা ঠিক এই শিশিরের পাশটায় এসে বোসো। প্রভাতী বসিতেই তিনি তাহার কম্পিত কর দুখানি, শিশিরের হাতের পরে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "শিশির আজ হতে তুমি ছাড়া প্রভাতীর আপন বলতে কেউ রইলনা। বৃদ্ধের দুই চোখের পাশ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল ডাক্তার বাবুর সকল চেষ্টা ব্যথ করিয়া সহসা অপূর্ব্ব বাবুর হৃদকম্পন থামিয়া গেল।

ছিন্ন ললিতার ন্যায় প্রভাতী তাঁহার শয্যাপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

শিশির মৃতের মুখখানার পানে চাহিয়া নিঃশব্দে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

তখন সবেমাত্র আকাশের পূর্ব্বদিকটা আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস তরুপল্লবগুলিকে চকিতে জাগাইয়া দিতেছিল।

৬

অপূর্ব্ব বাবুর প্রথমা পত্নী যখন বিগত হয়, তখন তিনি তাহার শোকে, অল্প একটু কাতর হইয়াছিলেন কারণ তখন তিনি সবেমাত্র সেই সুগন্ধ ভরা সুন্দর পুষ্পটির সুবাস গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যখন সেই অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পুষ্পটী অকালে ঝরিয়া পড়িল তখন তিনি সংসারের সকল মায়া কাটাইয়া একদিন বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। বহুদিন যাবত বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া একসময় তিনি রাঁচী আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার বাটীর পাশে এক ভদ্রলোক তাঁহার অসামান্য সুন্দরী নব পরিণীত পত্নী রমাকে লইয়া বাস করিতেন। অপূর্ব্ব বাবু এই ক্ষুদ্র পরিবারটির সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। একদিন তিনি বেড়াইয়া ফিরিয়া ভৃত্যের মুখে শুনিলেন ও বাড়ীর মাঠাকুরাণ আপনাকে কতবার ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, বাবুও আপনাকে দেখবার জন্য কি রকম ছটফট কচ্ছিলেন হঠাৎ দমবন্ধ হয়ে তিনি মারা গেলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি পার্শ্বের বাটীতে গমন করিলেন। এই ভাবে কিছুদিন যাইবার পর তিনি বিধবা রমার পানি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এ সুখও তাঁহার ভাগ্যে সহিল না। কিছুদিন পর রমা তাঁহাকে একটী কন্যা রত্ন উপহার দিয়া প্রসব গৃহেই তাহার জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়াছিল। সেই হইতেই তিনি রাঁচীতে বাস করেন। কিন্তু কেহ তাহার সহিত আলাপ করিত না। শিশির যখন বি, এ, পরীক্ষার পর রাঁচী ভ্রমণ করিতে আসিল অপূর্ব্ব বাবুর

অতীত কাহিনী সমস্ত অবগত হইয়াও যখন সে প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার সহিত আলাপ করিল তখন অপূর্ব্ব বাবু তাহাকে পুত্রের মতই ভালবাসিলেন ও আনন্দ পাইলেন। তেমনি তাঁহার বিষাদও আসিল কারণ শিশির প্রভাতীকে গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল শিশির বলিয়াছিল সে কোনও দিন বিবাহ করিবে না। কারণ প্রণয় জালে জড়িত হইলে জীবনের সমস্ত সংকল্প বিসর্জ্জন দিতে হয়। তবে বলিয়াছিল প্রভাতীর জন্য সু পাত্র খুঁজিয়া দিবে কিন্তু এই দুই বৎসরের শত চেষ্টাতেও শিশিরের সন্ধানে সৎপাত্র মিলিলনা।

শিশির রাঁচী হইতে ফিরিয়া যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইল, তখন মৃণাল এম-এ পড়িত। শিশিরের নির্ম্মল চরিত্র তাহার মধুর ব্যবহার মৃণালের মনকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। যথার্থ সুপুরুষ শিশিরকে দেখিয়া মৃণালের প্রাণে একটা গোপন বাসনা জাগিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, শিশির তাহার ভগ্নী শুভ্রারি উপযুক্ত পাত্র। শিশির মৃণালের সহিত প্রায় তাহাদের বাড়ী যাতায়াত করিত। মৃণাল তাহার সবিশেষ খোঁজ লইয়া একদিন শুভ্রাকে বিবাহ করিবার কথা উত্থাপন করিতে, শিশির বন্ধুপ্রেমে আত্মহারা হইয়া জীবনের সকল সঙ্কল্প ভাসাইয়া মৃণালের সহোদরা শুভ্রার কণ্ঠে সাদরে বরণ মালা পরাইয়া দিয়াছিল।

শুভ্রা জ্যোৎস্নাস্নাতা ছাদে বসিয়া আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে। আজ দিন তিনেক হইল শিশির মৃণালকে কোনও কথা গোপন না করিয়া এক পত্র লিখিয়াছে। তাহাতে লিখিয়াছে, সে প্রভাতীকে লইয়া দুচারদিনের ভিতরে কলিকাতায় রওনা হইবে। এবং প্রভাতী তাহারই গৃহে থাকিবে। উপযুক্ত পাত্র না পাইলে, সেই তাহাকে বিবাহ করিবে। মৃণাল এই সমাচার অবগত হইয়া শুভ্রাকে তাহার স্বামীগৃহ হইতে লইয়া আসিয়াছে। শুভ্রা পূর্ণিমার চাঁদখানির পানে চাহিয়াছিল। উজ্জল চাঁদ তাহার নিকট মনে হইতেছিল যেন একটা জলন্ত আগুনের পিণ্ড। তাহার মনে হইল, নিভিয়া যাক্ আজিকার এই উজ্জ্বল চাঁদের আলো। এই ব্যর্থতা ভরা জীবন লইয়া তাহাকে কতদিন এই প্রবঞ্চনাময় জগতে থাকিতে হইবে সে যে তাহার অন্তর মাঝের ভক্তি, প্রীতি, সে[illegible] দিয়া সেই চরণ দুটীর তরে পূজার অর্ঘ সাজাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার জীবনের সকল আশা, সকল বাসনাকে কি নিমেষে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। একটি গভীর নিশ্বাস তাহার বক্ষভেদ করিয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল।

আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া, তাহার চি[illegible] আদরের সেতারখানিতে মধুর ঝঙ্কার তুলিল। ছড়ি[illegible] টানে টানে তার সকরুণ সুরের ধ্বনি গৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। শুভ্রা কখন যে আপনার সুর সাধিতে সাধিতে বিভোর হইয়া সেই সুরে ক[illegible] মিলাইয়া গান ধরিয়াছিল, তাহা সে নিজেও জানেনা সে তখন গাহিতেছিল

"দোলাতে দোলে মন
মিলনে বিরহে,
জানি বারে বারে তুমিহে
চির হে (আমার তুমিত চিরহে)

কখন যে তাহার বৌদি নীরা আসিয়া তাহার শ্রোতা হইয়াছিল. তাহা সে জানিতে পারে নাই। গান থামিলে নীরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বে[illegible] চমৎকার গাইলে ভাই তুমি, এমন করে গাইতে [illegible] তোমায় আর কোনদিন শুনিনি।" শুভ্রা আপনার প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া, সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে মলিন হাসিয়া বলিল, "আপনি কখন এসেছিলেন বৌদি [illegible] দাদা কি এখনও ফেরেননি ?"

নীরা বলিল "না তিনি এখনও ফেরেননি, তি[illegible] টেলিফোনে জানিয়েছেন, আজ তাঁর ফিরতে একটু রা[illegible] হবে।"

শুভ্রা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "কেন বৌদি, দাদা কোথা[illegible] যাবেন আজ ?"

নীরা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "অপূর্ব্ব বাবুর [illegible] মেয়েটির জন্য তাঁর একটি অবিবাহিত ব্যারিষ্টার ব[illegible] আছে তার কাছে একবার যাবেন। এত জায়গায় চেষ্টা করলেন কিন্তু কেউ ত রাজি হচ্ছে না।" সহসা নীরা

দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল," আচ্ছা বিধবা বিয়ের মেয়ে বলে ত কেউ গ্রহণ করতে চাইছে না। একি অন্যায় কথা, সে নির্দ্দোষ বালিকার কি দোষ? তার নির্ম্মল ফুলের মত হৃদয় সেই রকম শুভ্র পবিত্র তার প্রাণ তার উপর কেন এ অন্যায় নির্য্যাতন? সে কি জানে? আচ্ছা এই বিশ্বের মাঝে এমন কি একটা ছেলে নেই যে এই নিরপরাধিণী বালিকাকে সাদরে আপনার জীবন যাত্রার পথে সহযাত্রী করতে পারে? নেই কি? আমার মনে হয় আছে কতজন কঠোর সমাজের শাসনের ভয়ে পারেনা।"

এই বলিয়া সে জিজ্ঞাসু নেত্রে শুভ্রার পানে চাহিল।

শুভ্রা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "এ আর বেশী কথা কি বৌদি? এই প্রথা জগতে চিরদিনই প্রচলিত হয়ে আসছে। জগৎ এখন কেবল কামনা আর স্বার্থের ভারে টলমল করছে। জগৎ আজ উৎসন্ন যেতে বসেছে কেবল ওই স্বার্থপর মানুষগুলোর জন্য। তারা নিজের সুখের শূন্য এতই ব্যস্ত, এতই উন্মুখ যে সেই কারণে কত পবিত্র জীবন অকালে ব্যর্থতায় পরিণত হয়। সে দিয়ে চাইবার তাদের মোটেই অবসর থাকেনা।

নীরা বলিল, "ঠিক কথা বলেছ তুমি শুভ্রা, তবে তুমি অধীর হয়োনা, তুমি শুধু তোমার চোখ ভরে দেখ, বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা, দেখ কত দুঃখ তিনি মানুষকে দিতে পারেন। একদিন তাঁর বিষাদ ভাণ্ডার নিশ্চয় শূন্য হবে। একদিন নিশ্চয় সুবাতাস বইবে, তখন তোমার হৃদয় গগনে যে কালো মেঘখানা আজ তোমার সুখের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, সেখানা ধীরে ধীরে আকাশের বুক থেকে একেবারে লুপ্ত হবে।

ইত্যবসরে গেটে মৃণালের গাড়ীর হর্ণ শুনিতে, নীরা ত্রস্তে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

শুভ্রার প্রাণখানা তখন আশা ও নিরাশার দোলায় দুলিতে লাগিল।

৫

"শিশির বাবু" শিশির পিছন ফিরতেই দেখিল, প্রভাতী কবাটের পাশে দণ্ডায়মান। শিশির স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি বলছ প্রভা? ভিতরে এস তোমার চেহারাখানা বড় শুকনো দেখাচ্ছে, অসুখ করেনি ত?

শিশির প্রভাতীকে প্রথম যেদিন দেখিয়াছিল, সেইদিন হইতে সে তাহাকে আপনি সহোদরার ন্যায় ভালবাসিয়াছিল। অপূর্ব্ব বাবুর মৃত্যুর পর তাহার ব্যথা-ভরা মুখখানার পানে চাহিয়া, তাহার দুঃখে বিগলিত আপন মনকে সম্মত করাইয়াছিল, সে প্রভাতীকে বিবাহ করিবে।

প্রভাতী বলিল, "না শিশিরবাবু আমার শরীর খারাপ হয়নি, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে এসেছিলাম।"

শিশির বলিল, "কি বলবে বল প্রভা?"

প্রভাতী বিনীত কণ্ঠে বলিল, "আমি গেল বছর ম্যাট্রিক পাস করেছি। আমি কোনও মেয়ে স্কুলে পড়াতে পারি। আপনি দয়া করে যদি কোনও একটা স্কুলে আমার জন্য শিক্ষয়িত্রী পদের দরখাস্ত করে দেন।" বলিয়া সে উৎসুক নয়নে শিশিরের পানে চাহিয়া রহিল।

শিশির বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "সে-কি প্রভা তুমি একথা বলছ কেন? কাকাবাবু যে তোমাকে আমার হাতে সমর্পন করে নিশ্চিন্তে ওপারের যাত্রী হয়েছেন। আমাকে তোমার সুব্যবস্থা করতেই হয়ে—নাহলে তাঁর আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হবে। তুমি কি শুভ্রার কথা ভেবে একথা বলছ! কিন্তু শুভ্রা তোমাকে মোটেই অনাদর করবেনা। সে খুব ভাল মেয়ে, আমি তাকে অনেকদিন থেকে চিনি। যদিও আমি তোমাকে তার কথা সবই বলেছি, তাকে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তোমাকে বিয়ে করব জানিয়ে এই দেখ সে তার উত্তর আমাকে দিয়েছে।" এই বলিয়া শিশির শুভ্রার পত্রখানা, তাহার হাতে দিল। পত্রখানা পড়িতে পড়িতে শুভ্রার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহা দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা শিশিরবাবু তাঁর আশাভরা হৃদয়গগনে আমার ধূমকেতুর মত উদয় হওয়া কি কর্ত্তব্য? আমার কিন্তু কোনও ক্ষমতা নেই এর একটা প্রতিকার করব?

শিশির ধীরকণ্ঠে বহিল "তুমি এর কি প্রতিকার করবে প্রভা ? আমাদের জীবনপথের সারথীর ইচ্ছামত আমাদের জীবন চল্‌বে। কার সাধ্য যে সে অন্য ভাবে যাবে ?" কাল আমরা কলিকাতায় রওনা হব। তুমি তোমার জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখো।" হঠাৎ তাহার অস্তবেলার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় সে ত্রস্তে একটু কাজের জন্য বাহিরে গেল। তখন সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগন রাঙ্গাইয়া অস্তপথে চলিয়াছে। দিনের শেষ আলো ধরার বুকে বিদায় রেখা আঁকিয়া দিতেছে।

৬

শিশির কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, মৃণালের নিকট শুনিল সে প্রভাতীর বিবাহের জন্য অনেক প্রাচীন পন্থীদের নিকট, ও আধুনিক সমাজে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সকলের নিকট হইতেই তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। যদিও কোনও শিক্ষিত যুবক সম্মত হইত, তৎপরে তাহাদের পিতা মাতার নিকট বংশের পরিচয় দিতে না পারায় সে প্রস্তাব সেইখানেই সমাপ্ত হইত। আবার এদিকে বিলাত ফেরত যুবকেরা প্রথমেই পাত্রীর শিক্ষা-দীক্ষার বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, আজকালকার দিনে মাত্র ম্যাট্রিক অবধি শিক্ষালাভ শুনিয়া তাঁহারা কোনও মতে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না। মৃণাল তাহাকে স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে যে, সে প্রভাতীকে বিবাহ করিলে, তাহার গৃহে শুভ্রাকে পাঠাইবে না। শিশির এই বিষয় শুভ্রার কি মতামত জানিতে চাহিয়া, তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছে।

নির্জ্জন স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। শিশির আপনার কক্ষে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। বাস্তবিক, বিধাতার কি বিচিত্র লীলা, কেবল কি কর্ত্তব্যের পানে চাহিয়া আমাকে প্রভাতীকে বিবাহ করিতে হইবে ? হ্যাঁ কর্ত্তব্য পালনই মানবের ধর্ম্ম। সেই যদি আমার দ্বারা না হইবে তবে আমার মানব জন্মই বৃথা। শুভ্রাকে ত তার দাদা আমার নিকট আসতে দিবে না। তবে সেদিন শুভ্রার সজল আঁখিদুটী নীরব কথায় যেন আমায় বার বারই বলিতেছিল সে সেই মুহূর্ত্তেই আমার নিকট আসিতে চায়। দেখি আমি একবার তাকে আনিতে গেলে সে কি বলে। সে কি জানে না, আমার হৃদয় আকাশে, অরুণোদয়ের সাথে, আমার মর্ম্মমুকুরে কার ছায়া পড়িয়াছিল।

সে আপনার অলক্ষ্যে উচ্চরবে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, এই কি আমার জীবনের স্বপ্ন সফলতা ?

হঠাৎ সে দ্বার রুদ্ধ করার শব্দে চমকিয়া চাহিতেই, তাহার গৃহমধ্যে যাহা দেখিল, তাহাতে সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। সে বিস্ফারিত নেত্রে শুভ্রার, পানে চাহিয়া, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "একী শুভ্রা হঠাৎ তুমি এখানে কি করে এলে ? ওখানে কেন কাছে এস" লজ্জায় শুভ্রার স্বগৌর আননখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। শুভ্রা একটুখানি মিষ্টি হাসি হাসিয়া, শিশিরের পদধূলি গ্রহণ করিতেই, শিশির সস্নেহে তাহার কম্পিত করযুগল আপন হাতের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া সাদরে তাহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইল। সে কিছুক্ষণ অনিমেষ নয়নে শুভ্রার ম্লান আননখানার পানে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল যে, আননখানিতে একদিন প্রাণের অফুরন্ত আনন্দ বিকশিত নির্ম্মল হাসিতে পূর্ণ থাকিত, আজ তাহার সেই সদাহাস্যময়ী আননখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। শিশির সেই মুখখানির উপর স্নেহের দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "শুভ্রা তোমার দাদা যে এখানে আসতে দিল, তুমি কি এখনই চলে যাবে ?"

শুভ্রা ধীর কণ্ঠে বলিল বৌদিকে আমি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এসেছি। আমি যাব কোথায় ? এখন জগতে আমার তোমার বাড়ীর চেয়ে পবিত্র স্থান আর নাই। সেখানে যতই দুঃখ থাক যতই বিষাদ থাক না কেন, সেই আমার মহাতীর্থ তুমি কি জান না"—তাহার কথা অর্দ্ধ পথে থামাইয়া, সহসা শিশির মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "শুভ্রা, আমি মত বদলে ফেল্লাম, আমি প্রভাতীকে বিয়ে করতে পারব না।"

শুভ্রা বলিল, "কেন তুমি ও কথা বলছ ? তাকে যদি তুমি বিয়ে কর, আমারও ক্ষতি হবে না ; তোমারও না। ভালবাসা অন্তরের অন্তরতম বস্তু, হাজার

বিঘ্ন উপস্থিত হলেও, প্রকৃত ভালবাসা কখনও ছিন্ন হতে পারে না, তোমার আমার সম্বন্ধ কত যুগ যুগান্তর হতে এক ভাবেই চলে আসছে, আমাদের পূর্ব্বজন্মের কোনও পাপের ফলে, এ জীবনটা কিছু দূরে দূরে থাকতে হবে। তুমি প্রভাতীকে বিবাহ কর এবং তার প্রতি যথোচিত ভাবে স্বামীর কর্ত্তব্য পালন কর। তার প্রাণে যাতে কোনও রকম আঘাত না লাগে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো। জান ত মানুষকে ব্যথা দিলে, সেই ব্যথা আবার ঘুরে এসে নিজের বুকে লাগে।"

শিশিরের মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "কত সাধ করে ফুল তুলেছিলাম শুভ্রা, মালা আমার গাঁথা হল না।" এই কথার ভিতরে তাহার প্রাণের বেদনা রাশি ঝরিয়া পড়িল।

শুভ্রা জোর করিয়া মুখের উপর একটু হাসি টানিয়া বলিল, "তুমি একটুতে অত অধীর হও কেন? আমি চিরদিনই তোমার। যাই অনেকক্ষণ এসেছি মাসীমার সঙ্গে, প্রভাতীর সঙ্গে একবার দেখা করিনি, যাই একবার দেখা করি।" এই বলিয়া সে চঞ্চল চরণে কক্ষের বাহিরে আসিল। তাহার অবাধ্য অশ্রু কিছুতেই বাধা মানিতেছিল না। সে কক্ষের বাহিরে আসিতেই তাহার গণ্ড ভাসাইয়া অশ্রুজল ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। সে অঞ্চল প্রান্তে অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটী মুছিয়া, প্রভাতীর উদ্দেশ্যে গমন করিল।

৬

আজ শিশিরের বিবাহ। দু' একজন আত্মীয়া আসিয়াছেন। এ বিবাহে কাহারও উৎসাহ নাই। কেবল শুভ্রা একা সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। সে মালা গাঁথিবার জন্য বাগান হইতে ফুল আনিতে গেল। সেখানে তাহার মাসীমা উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুভ্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তখন ত মালীকে দিয়ে ফুল আনালে, আবার ফুল কি হবে?"

শুভ্রা বলিল, "সে কতটা ফুল মাসীমা? সে ত নারায়ণ পূজার জন্য রইল, এ আমি মালা গাঁথবার জন্য তুলছি।"

মাসীমা বিদ্রূপ মাখা কণ্ঠে বলিলেন, "আহা নিজের হাতে মালা গেঁথে দেবে সতীনের জন্য।"

শুভ্রা স্মিত মুখে বলিল, "সতীন বলো প্রভেদ কি মাসীমা? আমি যেমন ওর এক পত্নী সেও হবে আর এক পত্নী। পূর্ব্বযুগে যখন পুরুষরা যত ইচ্ছে বিয়ে করতেন, তখনকার মেয়েরা কি সংসার করত না মাসীমা?"

তাহার মাসীমা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সবই অনাছিষ্টি বাপু যা ইচ্ছে কর গিয়ে।" তিনি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। শুভ্রা আঁচল ভরিয়া ফুল লইয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শিশির একখানা পত্র হস্তে বসিয়া আছে। শিশির শুভ্রার হাতে পত্রখানা দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি শুভ্রা?"

শুভ্রা পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া, নিম্নের নামটী দেখিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে একটী মেয়ে পড়ত, দেখছি ত সেই মেয়েটী লিখেছে, সে আবার আমার বৌদির দূর সম্পর্কে বোন হয়।"

শিশির ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "কি লিখেছে শুভ্রা পড়ত।"

শুভ্রা বলিল, "পড়ছি"।

"প্রিয় শুভ্রা

তুমি ত এখন সংসার পথের যাত্রী হয়েছ। আমি এখনও সেই চিরপুরাতন স্কুলেরই ছাত্রী। নীরাদির কাছে শুনলুম, তুমি সংসার পথের যাত্রী অবশ্য, কিন্তু তোমার সম্মুখের সে পথ, ভয়াবহ কণ্টকে পরিপূর্ণ এবং তোমার সম্মুখে এক বিশাল নদী। আমি আশা করেছিলুম, তুমি সেই বিশাল নদী পার হয়ে, সংসারের সুপ্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারবে না। কোনও মেয়েই আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে না। কেউ আপনার প্রাণের জিনিষ, আপনার হাতে অপরকে দিতে পারে না। কিন্তু দেখলুম, তুমি তোমার নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে, সংসারের নির্দ্দিষ্ট পথে চলতে অগ্রসর হয়েছ। আমি শুনে এত আশ্চর্য্য হলুম, আমি ভাবলুম সেই শুভ্রা সেই ছোট্ট মেয়েটী আমাদের ক্লাসে এসে ভর্ত্তি হয়েছিল। আমি তখন স্থির করলুম, আমার এক কাকীমা মাসখানেক হ'ল মারা গিয়াছেন, কাকাকে যদি সম্মত করাতে পারি সেই মেয়েটীকে বিয়ে করবার জন্য। তা দেখলুম ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন আছেন। কাকাকে বলতেই তিনি সম্মত হলেন। তোমার বোধহয় এতে কিছুই আপত্তি নেই। আজ ১০টায় লগ্ন। আমরা সকলে সাড়ে আটটায় তোমাদের বাড়ী পৌঁছাব। আমার ভালবাসা জেনো।

ইতি তোমার বন্ধু লেখা।"

নিকষ পাথর
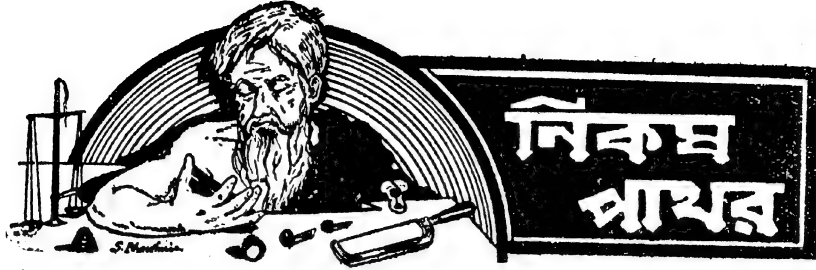
[শ্রীবিষ্ণুদাস]

প্রবাসী—ফাল্গুন—১৩৩৮

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে চারিটি। প্রথম গল্প শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের "মল্লিকা।" বাঙ্গালীর ঘরের করুণ চিত্র।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "মল্লিনাথ" সরস রচনা। সুরু হইতে শেষ অবধি হাস্যরসে জমাট। প্লাটটিও খাসা এবং পরিশেষে প্রেমের নেশা বা-হেমন্তকুমারের জীবন্ত সমাধির লেখক শ্রীধুরন্ধর দেবশর্ম্মার "গৃহিণীর" মন্তব্যটুকু খাঁটি। আচ্ছা সবাই আজকাল কলম ধরতে যায় কেন বল দেকিন? মুয়ে আগুন—মুয়ে আগুন।

তৃতীয় গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "তীর্থের ফল।" একটি চিত্র। মন্দ লাগে না। "বিস্তীর্ণ ভারতে অসংখ্য জাতির গণ্ডীরেখা উর্ণ-নাভের মত সম্প্রসারিত। তার চেয়ে সূক্ষ্মতন্তুজাল অন্তঃপুরের বাতায়নে বিলম্বিত। একই গ্রামের পাশাপাশি বাড়ীর দুবেলা দেখা অতিপরিচিত লোকগুলির মধ্যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি কোন্ ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করে তাহার তথ্য কে নির্ণয় করিবে? কথাগুলি সত্য। আমাদের জাতীয় জীবনে যে অবনতি তাহা কতটা ইহারই ফলে।

চতুর্থ গল্প শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটকের "দেশের পথে" শেষ ভাগে বেশ লাগিয়াছে।

এ সংখ্যায় রঙ্গীন ছবি আছে তিনখানি।

বসুমতী—মাঘ—১৩৩৮

ছোট গল্প আছে পাচটি। প্রথমটি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "চন্দর" স্যর। নক্সা—বেশ লাগিয়াছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীঅরবিন্দ দত্তের "পাপের মন" ভাল লাগে নাই।

তৃতীয় গল্প শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্তের "মৃণাল"—একটি ইংরাজি রচনাকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু বেশ হইয়াছে।

চতুর্থ গল্প শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের "ভূতের বাড়ী।" সুরু হইতে মাঝ অবধি বেশ জমাট। কিন্তু শেষটুকু খাপছাড়া।

পঞ্চম গল্প শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "অসাধারণ" রচনাটির মাঝে Story element যাহা আছে, তাহা তেমন ভাল লাগেনা বটে কিন্তু পল্লীচিত্রগুলি সুন্দর। মনকে গ্রামের পানে উধাও করে।

রঙ্গিন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেন গুপ্তের "বঁধু কি আর বলিব আমি।" ছবিখানি দেখিয়া আমারও শিল্পীকে বলি "বঁধু, কি আর বলিব আমি?"

দ্বিতীয় ছবি শ্রীহেমেন্দ্র নাথ মজুমদারের "কাঞ্চন-জঙ্ঘা প্রদোষে।" সুন্দর।

তৃতীয় ছবি শ্রী (মিঃ) সবখেলের "একলব্য।" সম্ভবতঃ তপস্যার পূর্ব্বেই। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইত। কিন্তু দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ঢাকা, বাম হস্তেরটি দেখাইতেছে বটে।

ভারতবর্ষ—ফাল্গুন—১৩৩৮

এ সংখ্যায় ছোটগল্প আছে চারিটি।

প্রথম গল্প শ্রীবুদ্ধদেব বসুর "পুনরাগমন।" গল্প-রসপিপাসুগণের ভাল লাগিবে না। "পুনরাগমন" নামটিরও সার্থকতা বোঝা গেল না।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের "কাব্যের ভূমিকা।" রচনাটিতে নূতনত্ব আছে; লাগেও বেশ।

তৃতীয় গল্প শ্রীনগেন্দ্র কুমার গুহরায়ের "ব্রতচারী" আবর্জ্জনারই সামিল।

চতুর্থ গল্প শ্রীপ্রভাত কিরণ বসুর "রুদ্ধ স্রোত" নামটা "জ্যাঠা মশাই" দিলেই ঠিক মানাইত। চলন-সই রচনা।

এ সংখ্যায় রঙ্গিন ছবি আছে চারখানা।

প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের "পার্থ-সারথী।" ভাল লাগে নাই।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ চট্টোপাধ্যায়ের তরুণের স্বপ্ন!" তরুণ বিভোর হয় কামিনী ও কাঞ্চনের স্বপ্নে! ছবিখানিতে তাহাই চিত্রিত।

তৃতীয় ছবি শ্রীসারদাচরণ উকীলের "বেণী-বিনোদিনী মন্দ লাগে নাই।

চতুর্থ ছবি শ্রীসতীশচন্দ্র সাহার "ইদের চাঁদ।"

সাময়িক প্রসঙ্গ

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা:—

আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সমিতির অধিবেশন আগত প্রায়। লীগের বর্ত্তমান সদস্যসংখ্যা পঞ্চাশের অধিক হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ক্ষমতাশালী প্রায় সমুদায় জাতিই এখন এই লীগের সভ্য। সোভিয়েট রাশিয়া লীগকে বলিয়াছে যে, তাহারা সর্ব্বাস্ত্রকরণে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শান্তির বারতা জগতে প্রচার করিতে রাজী আছে যদি জাতিসঙ্ঘ নিরস্ত্রীকরণে রাজী হয়। বর্ত্তমান জার্ম্মানী একপ্রকার অস্ত্রহীন, গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ তাহার সৈন্যসংখ্যা মাত্র এক লক্ষ, নৌবল দশহাজার টন নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। এখনও সেই বিধিই বলবৎ আছে। কোন প্রকার সব মেরিণ, বা বড় বড় উড়োজাহাজ তৈয়ার করিবার অধিকার তাহার নাই। কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে যে, পকেট যুদ্ধ জাহাজ নামক তুইখানি মারাত্মক রণপোত জার্ম্মানি নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। নেপলিয়ন-যুগের অন্তে ইংলণ্ড যেমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, বর্ত্তমান কালে মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাজ্যও সেইরূপ মহা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসরে কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট হুভার সাহেব অস্ত্র-শস্ত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে কম করিবার প্রস্তাব করিলে তাঁহাকে অনেকটা মুস্কিলেই পড়িতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটী পাউণ্ড স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া আমেরিকা ১৫ খানি ক্রুজার নামক যুদ্ধ-জাহাজ ও অন্যান্য রণ-পোত নির্ম্মাণ করাইতেছেন। আমেরিকার এই রণসম্ভার স্বভাবতঃই জাপানকে একটু ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। জাপান ক্ষুদ্র হইলেও আমেরিকার সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার জন্য তাহার প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণপোত বহর বাড়াইয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ফ্রান্স প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটী পাউণ্ড মুদ্রা সৈন্য বিভাগের জন্য ধার্য্য করিয়াছে। ফ্রান্সের সৈন্যগণ ও সেনানায়কগণ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের তুলনায় শতকরা পঞ্চাশ টাকা কম মাহিনা পাইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত অর্থের পরিমাণটা ডবল করিয়া লইলে তবে অন্যান্য দেশের সহিত সমান অনুপাত রাখা হইতে পারে। ইটালী ফ্রান্সের মিত্র হইলেও ভূমধ্যসাগর লইয়া উহার সহিত বংশগত বৈরী ভাব বহুদিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে। কাজেই মুসোলিনীর ইটালীও রণ-সম্ভার সংগ্রহে ফ্রান্সের সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। ফলকথা বলিতে গেলে ইহা ঠিক যে বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার শক্তিপুঞ্জের সৈন্যবল ও রণসম্ভার গত মহাযুদ্ধকালীন যাহা ছিল তাহা অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সমিতির গত অধিবেশনে জগতে স্থায়ীভাবে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে অন্যান্য শক্তিগুলিকে জার্ম্মানির অনুপাতে সমরসম্ভার কমাইয়া জাতিসঙ্ঘের হস্তে তাবৎ ক্ষমতা অর্পণ করিতে বলা হয়। জাতিসঙ্ঘ যাহাতে তাহার ক্ষমতা বজায় রাখিতে পারে তাহার জন্য তাহার হস্তে আন্তর্জাতিক সৈন্য ও পুলিশের ভার ছাড়িয়া দিবার কথাও থাকে। এই প্রস্তাবটী উঠিলেই কোন শক্তিই উহাতে সম্মতি দিতে পারে নাই। সোভিয়েট রাশিয়া স্পষ্টই বলে যে তাহাতে ফ্রান্সের ক্ষমতাই বৃদ্ধি পাইবে, কেন না জাতিসঙ্ঘ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডই পরিচালনা করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডও এই প্রস্তাবটী সমর্থন করিতে অস্বীকার করে। আমেরিকাও ভীষণ

আপত্তি জানাইয়াছিল। ইহাই হইল জাতিসঙ্ঘের মানসিক অবস্থা।

বিশ্বাসের উপর ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়, কিন্তু অবিশ্বাসের উপর উহার ভিত্তি গড়িতে গেলেই অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটে। এই জন্যই লীগের তাবৎ প্রস্তাবই উহার দপ্তর জাত হইয়া কীট দষ্ট হইতেছে। তবে ইহাতে সুইজার্লাণ্ডের লাভ আছে। লীগের অধিবেশন আরম্ভ হইলে জগতের বিবিধ জাতির সমাগম হওয়ায় উহার হোটেল ও রেস্তঁরাগুলি জোর চলে। বর্ত্তমান বৎসরেও পঞ্চাশটী হোটেল নূতন রং করাইয়া লাভের আশায় বসিয়া আছে।

লীগ ও চীন-জাপান

১৯২২ সালে ওয়াশিংটন সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধে জাপান ইউরোপের শক্তিপুঞ্জকে সাহায্য করিবার পুরস্কারস্বরূপ সারা চীনে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার লাভ করে। কিন্তু আমেরিকা উক্ত ভারসাই সন্ধির সর্ত্তগুলি মানিয়া না লওয়ায় তাহার সহিত জার্ম্মানির যেমন নূতন সন্ধি হয়, চীন-জাপানের বিবাদ নিবারণের জন্য আমেরিকার অধিনায়কতায় উক্ত ওয়াশিংটন সন্ধি, ইংলণ্ড, জাপান, ফ্রান্স এবং আমেরিকা কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুযায়ী জাপান চীনের উপর তাবৎ সত্ব প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়। সমগ্র চীন সমস্ত জাতির জন্যই উন্মুক্ত থাকিবে ইহাই স্বীকার করা হয়। চীনের আভ্যন্তরিন স্বাধীনতা সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে মানিয়া লওয়া হয়। এবং এই কথা সুস্পষ্ট ভাবেই বলা হয় যে, ভবিষ্যতে কোন জাতিই চীনে তাহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি করিবার কোন প্রকারই চেষ্টা করিতে পারিবে না।

বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভে আমেরিকা উক্ত সন্ধি অনুযায়ী জাপানকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছিল। জাপান কিন্তু পূর্ব্বকার সন্ধি অনুযায়ী লীগের নিকট সুপারিশ করা সুরু করিয়া দেয়। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সুদূর প্রাচ্যে জাপানের প্রতিষ্ঠা যাহাতে বজায় থাকে তাহাই চাহে। কেন না জাপান-হীন প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকার দাম্ভিকতায় পূর্ণ হইতে পারে ইহাই তাহাদের আশঙ্কা।

সাংহাই সহরটী একটী বাণিজ্য কেন্দ্র ও পোতাশ্রয়। এখানে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান ও আরও দুই একটি জাতির অধিকৃত ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে যেখানে ঐ সমস্ত জাতি তাহাদের আইন ও আচার অনুযায়ী চলিয়া থাকেন। চীনা সাংহাই উক্ত অংশগুলির সংলগ্ন। যুদ্ধের প্রারম্ভে এই জন্যই কথা উঠিয়াছিল যে, আন্তর্জাতিক উপনিবেশ গুলিকে নিরাপদে রাখিবার জন্য একদল সৈন্য মোতায়েন থাকিবে এবং যুযুধমান জাতি দুইটি এই সমস্ত অংশগুলির মধ্য দিয়া সৈন্য পরিচালনা করিবেন না বা উহাদিগকে যুদ্ধের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করিবেন না।

জাপানীরা এই সত্ব মানিয়া লইবার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। আমেরিকা ইংলণ্ডের যুক্ত নিষেধাজ্ঞা পাইলেও জাপান উক্ত সত্ব প্রতিপালনে তাহার অক্ষমতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকে। ফলতঃ দেখা গেল যে জাপান অনেক সময়েই এই অংশগুলিকে তাহার সমর অভিযানের কেন্দ্র করিয়া তুলিতেছে। চীনের প্রতিবাদ জাতিসঙ্ঘ গ্রহণ করিলেও, জাপানকে ঐ সত্ব মানিয়া চলিবার জন্য কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞাই প্রদান করিলেন না। অবশেষে জাপান তাহার বিরাট-বাহিনী এই সমস্ত অংশে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিয়া ভীষণ ভাবে চীন আক্রমণ চালাইতে লাগিল। লীগের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় চীন ও জাপান এই দুই জাতির প্রতিনিধি আছে। উভয় জাতির প্রতিনিধিই তাহাদের জাতিগুলির দাবী-দাওয়া জোর গলায় প্রচার করিয়া আসিতেছে, কিন্তু লীগ চীনের দাবী অন্তরে ন্যায্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও জাপানকে মুখে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে না পারায় জাপান একটীর পর একটী সত্ব উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে।

যুদ্ধ এখনও চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব উঠিলেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, জাপানী দাবী-গুলি চীনের অপমানকর হওয়ায় চীন মানিয়া লইতেছে না। এই জন্যই সম্ভবতঃ এই কথা মনে হয়, তবে কি জাতি-সঙ্ঘ প্রবলেরই বন্ধু এবং দুর্ব্বলের পক্ষে উদাসীন? তাহাই যদি না হইবে তাহা হইলে লীগের অধিনায়কগণ স্পষ্টই বলুন চীনা সরকার দোষী এবং তাহাদের দোষের

একটা ফিরিস্তিও বাহির করিয়া দিতে পারেন। আর যদি জাপানী পক্ষের দাবী-দাওয়াগুলি একটু বেশী রকমই হইয়া থাকে তবে জাপানকে দাবাইয়া দিতেছেন না কেন? লীগ তাবৎ বিশ্ব হইতে যুদ্ধকে নির্ব্বাসন করিয়া দিয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, এইত তাহার উপযুক্ত সময়, তবে কর্ত্তৃপক্ষগণ বৃথা সময় ব্যয় করিয়া উদাসীন রহিতেছেন কেন? লীগ যে জাতি বিশেষের প্রতি অনুকম্পাযুক্ত নহেন তাহা প্রমাণ করিবারই উপযুক্ত সময় আসিয়াছে।

ঘাটতি বাজেট

বর্ত্তমান মাসে সরকার পক্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাবগুলি পেশ করা হইয়া থাকে। গত কয়েক বৎসর হইতে আয় অপেক্ষা ব্যয়ই অধিক ধরা হইতেছিল। এই বৎসরের হিসাবগুলিতে এই ব্যয়-ভার যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই নয় উহার পূরণ করিবার জন্য কোন প্রকার পন্থাই খুঁজিয়া মিলিতেছে না। পোষ্টাফিসের বাজেটেও অনেক টাকা কম হইয়াছে। ডাকের টিকিটের দাম বাড়াইয়াও উহার কোনই মীমাংসা হইল না। বাংলা সরকারেরও প্রায় দুই কোটী টাকা কম আয় হইয়াছে। সকলেরই যখন আয় কমিতেছে তখন কলিকাতা করপোরেশনেরই বা আয় না কমিয়া যায় কেন। তাহারও প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা অর্থ সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। আমরা পূর্ব্বকারের সংখ্যায় স্পষ্টই বলিয়াছিলাম যে আয়-ব্যয়ের হিসাবকে যুদ্ধের সময়ের যে হারে উহা নির্দ্ধারিত হইত ঠিক সেই হারে করিতে গেলে এমন সময় আসিবে যে যখন ব্যয় আয়ের সহিত কিছুতেই মিলাইয়া দিতে পারা যাইবে না। ক্রমশঃ অর্থ-জগতে সেই অবস্থাই আসিতেছে বলিয়া সন্দেহ হয়। সামান্য দুই চারিজন কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিলে বা দুই চার টাকা এলাউন্স কমাইলেই এই মীমাংসার সমাধান হইবে না, শাসনভার যে অতিরিক্ত ব্যয় সাপেক্ষ হইয়া উঠিতেছে একথা কেন কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীকার করেন না? যে দেশের শতকরা আশীজন লোকের দুই বেলায় অন্ন-সংস্থান নাই, সেই দেশের এক তৃতীয়াংশ আয় সামরিক বিভাগে ব্যয় করিলে কি একটু অসঙ্গত হয় না? তাহার পর জগতের আর্থিক দুর্যোগে যখন সকলেরই আয় হ্রাস হইয়া যাইতেছে তখন উত্তরোত্তর বিবিধ কর স্থাপন কতটা ক্ষতিকর তাহাও ভাবিবার বিষয় নয় কি?

অবাধ বাণিজ্য নীতি

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগের ন্যায় অবাধবাণিজ্যও পরিত্যাগ করিল। স্বর্ণমান ও অবাধ-বাণিজ্য ইংলণ্ডের নিজস্ব সম্পত্তি। নেপলীয়ন যুগের অবসান ঘটিলে ইংলণ্ড অসম্ভব রূপে ধনী হইয়া উঠে, তাহার ফলেই স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন ঘটে। বিবিধ কল-কারখানার প্রবর্ত্তন হওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ায় ইংলণ্ড কৃষি পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে। কালে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে ইংলণ্ড বাহির হইতে একমাত্র শস্য ছাড়া আর কিছুই আমদানী করিত না। এই শস্যের উপর শুল্ক থাকিলে উহার মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে এবং উহার সহিত শ্রমিকদেরও বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এই আশঙ্কায় মধ্যবিত্ত রাজনৈতিকগণ তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী রবার্ট পীলের সাহায্যে আমদানী-রপ্তানি দ্রব্যগুলির উপর সকল প্রকার শুল্কই তুলিয়া দিয়া অবাধ-বাণিজ্য বরণ করিয়া লন। তাহার পর প্রায় আশী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জগতের তাবৎ জাতিই শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যত্নশীল হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজী পণ্য জগতের বাজারগুলিতে তেমন জোর বিক্রয় হইতেছে না। ইংরাজ জাত এখন অনেকটা মহাজন ও বাণিজ্য-জাহাজগুলির মালিক হওয়ায় তাহার একটা স্থায়ী আয়ও হইয়া গিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা পড়িলেও তাহার চলিতে পারে কিন্তু যে সমস্ত কৃষি-প্রধান দেশ ইংলণ্ডে—তাহাদের কৃষি-জাত পণ্য পাঠাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে যেদিন হইতে উক্ত অবাধ-বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করা হইবে স্থির করা হয়, সেইদিন রাত্রেই ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্য-পোতগুলি নানা প্রকার বাণিজ্য সম্ভার লইয়া ইংলণ্ডের

উপকূল অভিমুখে অভিযান করে। ইংরাজ সাংবাদিকগণ ইহাদিগকে "আর মাডার বহর" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছেন। উহার সহিত ইহার খানিকটা সাদৃশ্যও আছে। আরমাডার অভিযান যেমন এক প্রবল বাত্যায় প্রতিহত হয়, এ ক্ষেত্রেও নাকি এক ভীষণ বাত্যা এই বাণিজ্য-পোতগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। ইংলণ্ডের উপকূলগুলি বাণিজ্য সম্ভারে এইরূপ ভরিয়া উঠিয়াছিল যে কুলীদিগকে দ্বিগুণ রোজ দিয়া কার্য্য করাইতে হইয়াছিল।

অবাধ বাণিজ্য পরিত্যাগ করা ইংলণ্ডের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না বলিয়া অনেকেই ইতিমধ্যে সন্দেহ করিতেছেন। ইকনমিষ্ট কোন দলেরই মুখপত্র নহে, উহা খুব কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছে যে বর্ত্তমান ন্যাশ্যানাল গবর্ণমেণ্ট রক্ষণশীলদের প্রস্তাবগুলি চালাইয়া দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। অবাধ বাণিজ্য পরিত্যাগ করায় গত নির্ব্বাচনের সময় যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা ভঙ্গ করা হইল। সাধারণের স্বার্থ ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইবে। ভূতপূর্ব্ব শ্রমজীবি নেতা জর্জ্জ হেনডারসন বর্ত্তমান শাসন-পরিষদকে মান্য করিলেও তিনি বলিয়াছেন যে এই অবাধ-বাণিজ্য নীতিবর্জ্জন হেতু যে আয় হইবে উহা আয়কর হ্রাসের জন্য ব্যয় করিলে চলিবে না। কেননা উহা অনেক সময়ই গরীব প্রজাদের আহার্য্য বস্তুর উপর ধার্য্য কর হইতে গৃহীত হইবে। সুতরাং উহা তাহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যয় করাই উচিত। ক্যাবিনেটের অনেক সদস্যই নাকি সরকার পক্ষের এই নীতি সমর্থন করিতে পারিতেছেন না; দেখা যাক ইংলণ্ড এই ধাক্কা কেমন করিয়া সামলাইয়া লয়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পদ

কলিকাতা আর্টস্কুলে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি প্রদর্শিত হইতেছে। অনেকেই বলিতেছেন ছবিগুলি সর্ব্বপ্রকার বিশিষ্টতাহীন—নিতান্ত আড়ম্বর হীন। কবিও তাহাই বলিয়াছেন, ছবিগুলি খুবই সাধারণভাবে অঙ্কিত। এখন কথা হইতেছে যে এই সাধারণ ছবিগুলি যাহা অনেক সময়েই ছেলে মানুষী বলিয়া মনে হয়, তাহা লইয়া এত গোলমাল করিবার কি আছে? ইহারও পশ্চাতে স্বভাবের দিকে ফিরিয়া যাইবার আন্দোলন আছে। অনেক আধুনিক চিত্রবিৎগণ অঙ্কনবিদ্যায় অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়াও আধুনিক পদ্ধতির ভক্ত নন। তাঁহারা পুরাতন কালের সাদাসিদা। ভাবকেই অধিক পছন্দ করেন। লণ্ডন সহরে অনেক সময়ে ছোট ছোট ছেলেদের অঙ্কিত ছবি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী খোলা হয়, উক্ত ছবিগুলি একান্ত স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত হওয়ার দরুণ অনেক সময়েই বড় বড় চিত্রকরগণ পর্য্যন্ত উহা হইতে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, যে সমস্ত কারিকর ইলোরা ও অজন্তার গুহা গুলির মধ্যে মূর্ত্তি খোদাই করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্ব-পূজিত মহাকবি। তাঁহার ভাব, ধারণা ভাষার শত-আবরণে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠে, তাঁহার তুলিকা স্পর্শে সেগুলি কিরূপ আকার ধারণ করে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি তাহাই ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া দিতেছে মাত্র। এই ছবিগুলির কোন মূল্যই নাই বলিয়া যাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের ইহা জানা উচিত যে একেবারে স্বাভাবিকতা গ্রহণ করিবার যুগে এই চিত্র-গুলি নিশ্চয়ই বিশেষ মূল্যবান।

ভাল খেলোয়াড়

সন্তোষের ছোট কুমার শ্রীমান প্রতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই খুব উজ্জ্বল। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স মাত্র অষ্টাদশ। এই অল্প বয়সেই তিনি একজন নিপুণ টেনিস খেলোয়াড় হইয়াছেন। চামেরিয়া চ্যালেঞ্জ কপ, সুজাতা মেমোরিয়াল কপ প্রভৃতি কয়েকটী কপ ও মেডেল দুই বৎসর পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। গত বৎসর পূজার সময় দার্জ্জিলিং জিম-খানার টেনিস ক্লাবে বিখ্যাত সাহেব খেলোয়াড় মিঃ ব্রাণ্ডি, আই-সি-এস কে পরাস্ত করিয়া একটী কপ ও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। কয়েকদিন হইল কলিকাতা সাউথ ক্লাব সমস্ত ভারতীয় খেলোয়াড়দের লইয়া একটী জুনিয়র টেনিশ চ্যাম্-পিয়নসিপ গঠন করিয়া একটী বিরাট 'কম্পিটিশন' খেলার আয়োজন করেন। কুমার প্রতীন্দ্রনাথই একমাত্র বাঙ্গালী খেলোয়াড় যিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চতুর্থ রাউণ্ড পর্য্যন্ত

যাইতে পারিয়াছিলেন। মাদ্রাজের বিখ্যাত টেনিস বীর রথনামের নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমরা আশাকরি ভবিষ্যতে কুমার যথেষ্ট উন্নতি করিয়া এ বৎসরের বিজয়ী বীর মেটা ও রথনামকে আগামী বৎসর পরাস্ত করিয়া বাংলার রণজী বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে পারিবেন। বিলিয়ার্ডেও কুমারের হাতের নিপুণতা আছে। দার্জ্জিলিং জিমখানা ক্লাবে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

বাংলার হিন্দু মহাসভা

বাংলায় হিন্দু-মহাসভার যে প্রাদেশিক শাখা আছে উহার কর্ত্তৃপক্ষের অনেকটা অদল-বদল সংঘটি হইয়াছে। শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈনের সহিত শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সেক্রেটারী পদে নিয়োগে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীযুত রায় চৌধুরী মহাশয় একজন উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি। তিনি রাঢ়ের অভিজাত বংশজাত ও রটেন। তাঁহার নিকট আমরা অনেক কিছুই আশা করিতেছি। মুসলমানগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ সময়ে হিন্দুগণ নেতৃহীন অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হইলে বাংলার দুরদৃষ্টই বলিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই বাংলার অধিবাসী, উভয় জাতি উভয়জাতিকে ভালবাসিতে গেলে উভয়েরই সংঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের গোঁড়ামীর জন্য অনেক সময়ই অনেক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু একটী সঙ্ঘ আর একটী সঙ্ঘের নিকট কোন বিষয়ে আপত্তি করিয়া উহার মীমাংসা করিয়া লইতে পারিলে অনেক সময়েই অনেক বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ অন্তর্হিত হইয়া থাকে। এইজন্যই সঙ্ঘবদ্ধ মুসলমানদের সহিত সখ্যভাব বজায় রাখিয়া বাংলার হিন্দুগণকে চলিতে হইলে তাহাদিগকে একটা প্রতিষ্ঠানের অধীনে আসিতেই হইবে। হিন্দু-মহাসভাই সেই প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা ফি মাত্র পাঁচ আনা। কিন্তু এই পাঁচ আনার মাত্র দুই পয়সা প্রাদেশিক সভা পাইয়া থাকেন। এই প্রাদেশিক সভাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে একদিকে যেমন যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন অন্যদিকে লোক-বলেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমানে শুনা যায়, সারা বাংলায় এই সভার নাকি ৩৫০টী শাখা আছে। কিন্তু শাখাগুলির কোন কার্য্য বিবরণীই আমরা পাই না কেননা অধিকাংশস্থলেই তাহারা মৃতবৎ অবস্থাপন্ন। এই সমস্ত শাখাগুলিকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া উহাদের প্রাণ আমাদিগকেই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য বাংলার বয়োপ্রাপ্ত তাবৎ হিন্দু-নরনারীকেই আমরা আহ্বান করিতেছি। যাঁহার যতদূর সাধ্য অর্থ সাহায্য করিবার জন্যও অনুরোধ করিতেছি। এই মহাসভায় যোগদান করিলে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হইবেন বলিয়া যাঁহারা সন্দেহ করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা শুধু এই কথাই বলিতে চাহি যে, কোন সঙ্ঘ ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে কোন মানবই কোন সঙ্ঘ ব্যতীত জীবন ধারণও করিতে পারে না। হিন্দু মহাসভা, ও মুসলমানদের লীগ যতই অধিকতর ব্যাপকভাবে সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া উঠিবে, ততই উহাদের স্বার্থ অনেক সময় বিভিন্নমুখী হইলেও, পরস্পর পরস্পরের সহিত আপোষ করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাইবে। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে মহাসভা বা লীগ পরিত্যাগ করিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলে কংগ্রেসে যোগদান করিলেই সমস্ত ব্যবধান দূর হইয়া যাইতে পারে। তাহার উত্তরে আমরা এই বলিতে চাই যে কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। দুইটি বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয় রাখা তাহার পক্ষে অনেক সময় বিশেষ অসুবিধার হয়। হিন্দুসভার কার্য্যকরগণকে একটী কার্য্য-বিবরণী বাহির করিয়া প্রকৃত কার্য্যে তন্ময় হইবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

মিঃ ডি ভ্যালেরা

ডি ভ্যালেরা এবার সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া আইরিশ সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। বারবার কারাবাস এমন কি প্রাণদণ্ডের হাত হইতেও বাঁচিয়া অবশেষে ডি ভ্যালেরা দেশ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হইলেন। এখন আয়ার্লান্ডের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক কিরূপ হয় তাহা দেখিবার যোগ্য। সংবাদে প্রকাশ ভ্যালেরা প্রেসিডেন্ট হইয়াই মন্ত্রীদের মোটা মাইনা কমাইয়া দিয়াছেন ও অনেক রাজবন্দী-দের মুক্তি দিয়াছেন।

বাঙ্গালার জমিদারী ও জমিদার

গত দুই বৎসর হইতে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য অসম্ভব কমিয়া যাওয়ায় জমিদারদের ভূমি রাজস্ব মোটেই আদায় হইতেছে না। বাংলা ও আসামের জমিদারেরা কেহ সিকি, কেহ এক তৃতীয়াংশ খাজনা মাত্র আদায় করিতে পারিতেছে। ইহার বেশী কাহারও আদায় হইতেছে না। অথচ জমিদারদের সূর্য্যাস্ত নিয়মে মোট জমিদারীর আদায়ের প্রায় চতুর্থাংশ পরিমাণ সরকারী খাজনা অবশ্য দেয়। ইহা ছাড়া জমিদার মাত্রেরই সরঞ্জাম খরচ, নানা সাধারণ দান, ক্রিয়া কলাপ প্রভৃতি আছে। এ অবস্থায় বাংলা ও আসামের প্রায় জমিদারই অসম্ভব ঋণে ডুবিয়াছেন। দু'এক বৎসর মধ্যে যদি সুবৎসর না আসে তবে এদেশে বর্ত্তমান জমিদারদের চিহ্নও থাকিবে না। কেহ কেহ এই সুযোগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা বাংলার জমিদারদের ধ্বংসের জন্য অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইতে-ছেন কিন্তু তাহাতে লাভ কি হইবে? প্রজাদের ভূমি রাজস্ব যে কোন অবস্থায় হউক দিতেই হইবে। এবং এসব জমিদার লোপ পাইলে তাহার স্থলে অপর কেহ জমিদার হইবেন। হয়তো বাংলা অপর জাতির উপনিবেশেই পরিণত হইবে। যে কোন সরকারের হাতে জমিদারী পড়িলেও প্রজাদের সুবিধা কিছু নাই। এখন-কার জমিদারদের হাতে নানা ভাবে রেহাই পাইয়া খাজনা দিলেও উদ্ধার আছে কিন্তু তখন তাহা চলে না। এ অবস্থায় জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এবং প্রজাদেরও কর্ত্তব্য তাহারা যতটা পারে খাজনা জমিদারদের দিয়া দেয়। বাংলার ও আসামের সব জমিদার ও প্রজাকে মিলিত ভাবে পরামর্শ করিয়া বাঁচিবার উপায় নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত। এখন বাজারের এমন অবস্থা হইয়াছে যে সম্পত্ত বাঁধা দিয়াও ঋণ পাইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেন্ট কোন কোন স্থলে সূর্য্যাস্ত আইন একটু শিথিল করিলেও আরো কি করিতে পারেন দেখা কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় কোন কোন স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া যায় যে কেহ কেহ প্রজাদের খাজনা না দিবার জন্য উস্কাইয়া প্রজা হিতৈষী রূপে পরিণত হইবার চেষ্টা করেন। ইহা মোটেই সঙ্গত নহে। কি ভাবে দেশে সুবৎসর আসিতে পারে, সকলেরই সেই দিকে চেষ্টা করা দরকার। এবং এসময়ে কেহ ধ্বংস না হইয়া যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে তাহাই দেখা উচিত।

পণ্ডিতজীর নিবেদন

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজী আবার দেশবাসীকে স্বদেশী ব্যবহার করিতে ও স্বদেশী দ্রব্যই বিকি-কিনি করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। বর্ত্তমান দুঃসময়ে স্বদেশীর দিকে বার বার লোকের মন আকৃষ্ট করিবার প্রয়োজন আছে তাই পণ্ডিতজীর এই নিবেদন।

সাধনা ঔষধালয়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া ঢাকার প্রসিদ্ধ সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়াছেন। এই বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় তাঁহারই প্রাক্তন মাত্র অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র ঘোষ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন) কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া, ভারতে ও ভারতের বাহিরে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিতেছে। আচার্য্য রায় এই ঔষধালয়ের কারখানার চারিদিকে ঘুরিয়া যে সকল ঔষধ তৈয়ারি হইতেছিল, সেগুলি সম্বন্ধে অধ্যক্ষকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন, এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রণালী যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিয়া ঔষধগুলি প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, আনন্দ প্রকাশ করেন। আফিসের কাগজ পত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অসংখ্য অর্ডারের চিঠি দেখিয়া, বিশেষ ভাবে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে এই কারখানার ঔষধের জন্য অর্ডার আসিতেছে দেখিয়া, তিনি অধ্যক্ষকে অভিনন্দিত করেন।